সাগরজলে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি. কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ / জানুয়ারী ১৯৬৫

বুক ট্রাস্ট ৩০/১ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং লিপি মুদ্রণ ৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে যশোদা মাইতি কর্তৃক মুদ্রিত ঃ

পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

সমুদ্রমানুষ

শিউলি ফুলেব মতো শুভ্র জ্যোৎস্না। দক্ষিণ-মেরুব বিষণ্ণ ববফে ওব ছায়া থমকে আছে। বায়ুতবঙ্গে কেমন একটা শিস-দেওয়া শঙ্খচিলেব নিথব আওয়াজ। আওয়াজটা ভাঙা ঢেউয়েব মাথায় কেমন আছড়ে-পিছড়ে পড়ছে।

জাহাজটাকে কেন্দ্র করে নীল-কাচ জলেব ছোট ছোট ঢেউগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে চাইছে জ্যোৎস্নার ছায়া ছায়া রূপটাকে।

দুটো ছায়া সংলগ্ন। ডেক থেকে দুটো ছায়া তেবছা হয়ে পড়েছে সমুদ্রবুকে। জাহাজটা চলাব সঙ্গে সঙ্গে ছায়াদুটোও ভাঙা ভাঙা ঢেউযেব মাথায় ভেসে চলেছে।

খুব ভাল লাগছে রূপটা, তাই না?

উত্তব এল না। একটা খণ্ড শাব কালো ছায়া চাঁদটাকে তখন ঢেকে দিয়েছে। নিস্পন্দ অন্ধকাব। বেডিয়ম ডায়াল ঘড়িটাব বুকে শুধু ঘূর্ণমান সেকেন্ডেব টিক টিক শব্দ। দুটো চোখ স্থিব, ঝুলছে সাবাটা ক্ষণ ডায়ালটাব উপব।

মেরুব ববফগুলো হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কী বলিস?

ব্রিজে তখন ঘন্টিব আওয়াজ। ওয়াচেব বেল বাজল ব্রিজে। টিক টিক কবে মিনিটেব কাঁটাটা বাণ্টব ঘবে মিলিয়ে যায়নি। কাঁটা ঘুবিয়ে ঠিক কবে নিতে নিতে বলল তিন মিনিট স্লো।

কী কবছিস তুই ঝুঁকে ঝুঁকে? দুটো কথাব একটাবও জবাব নেই।

ঘড়িটা স্লো। মিলিয়ে নিলাম।

পাগলা ঘড়িব সঙ্গে তুই পাগল হয়ে গেছিস? প্রত্যেকটা ওয়াচেই তোকে ঘড়ি মেলাতে হয়?

মোবাবক হাসল, কবে নিই। যদি ভুল কবি।

ভুল কবি, ভুল কবি! ভুল কবলে তোব কোবানশবিফ অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

মোবাবক এবাবও হাসল, আচ্ছা শেখব, সি রুটগুলো তো একই থাকে?

প্রায় তাই।

ঘড়িটা হাত থেকে খুলে নিল। কানেব উপর বেখে পবখ কবে দেখল একটানা টিক টিক শব্দটাব কোথাও কোনও ছন্দপতন হচ্ছে না।

মানুষেব বোগ অনেক হয় শুনেছি, কিন্তু ঘড়ি বোগ তো শুনিনি।

ঘড়ি বোগ! আমাব ঘড়ি-বোগ হয়েছে বলছিস? বল। যা মুখে আসে তাই বল।—আবও কিছু প্রকাশ কবা মোবাবকেব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কী ভেবে সে চুপ কবে থাকল।

হয়েছে বাবা থাক। ঘড়ি-বোগেব কথা বললেই তোব বাগ হয়। আব বলব না। আমি কি একা বলি? জাহাজেব সবাই বলছে মোবাবকেব ঘড়ি বোগ হয়েছে।

সবাই বলবে বলে তুইও বলবি?

এই চারদিন ধবে যা অবস্থা দেখছি, তাতে আমিও না-বলে আব থাকতে পাবছি না।

মোবাবক আলিব চেতনায় ছোট্ট একটা ঝড় বয়ে গেল। ঘড়ি-সম্বন্ধে কত কথা প্রকাশ কবার ইচ্ছা আছে, কত বলাব আছে শেখরকে, কিন্তু বলতে পাবল কই! বলার শক্তিটা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিবাদ জানানো হল না মোবারকের। ঘড়ির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল শুধু। নিথর নিস্পন্দ ঘড়িটার বুকে আবার চাইতেও ভয় করছে। কারণ সবাই বলছে ওর ঘড়ি-রোগ হয়েছে।

হঠাৎ এক ঝলক ছোট ভাঙা-ঢেউয়ের মাথা থেকে ওঠা নরম ঠান্ডা হাওয়া দু'জনের মুখেই মিষ্টি স্পর্শ বুলিয়ে গেল। শেখর দাঁড়িয়ে আছে। আয়ত চোখ বিস্তীর্ণ সাগরজলের উপর। মোবারক আলির জোয়ান চাটগাঁই চেহারাটার দীর্ঘ ছায়া আলতোভাবে সাগরজলে তেমনি বিলম্বিত। কিছুক্ষণ নির্বাক উভয়ে। শুধু মেশিনের ঝম ঝম শব্দ ওদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে উঠছে নামছে।

শেখর আরও কাছাকাছি হয়ে এল ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। হাত রাখল মোবারকের কাঁধে, রাগ করেছিস?

মোবারকের হাতদুটো ওভারকোটের পকেটে। জোয়ান চাটগাঁই চেহারাটা স্থির। খোদাই করা প্রস্তরমূর্তিটার ঠোঁটে শুধু শিশিরবিন্দুর মতো পাণ্ডুর হাসি।

চারদিন আগেও কিন্তু মোবারক ছিল অত্যন্ত উচ্ছল। হাসি ছিল ওর সম্পদ। চারদিন আগে ওর মাউথ অর্গানটা হাজারও জানালার কপাট খুলে দিয়েছিল। শঙ্খচূড় সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে সাউথ ওয়ার্ফের কাঠের কারখানার বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে, সাদা মানুষের ঠাঁই ধরাতে পারেনি। শঙ্খচূড় সাপের খেলা, মাউথ অর্গানের বুকে ভারতীয় অপরূপ সুর তাই একটি সমুদ্র মানুষকে মেলবোর্নের সাদা মানুষের মনে চিরদিনের জন্যই খোদাই করে দিয়ে এসেছে। আর ঘড়িটা হাতে বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটা কিনা একটা বিবর্ণ আর ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

মোবারকের পাখির পালকের মতো মিষ্টি ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, শেখর, আমার ঘড়ি রোগ হয়েছে যারা বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু তুই করিস না।

শেখর উত্তর করল না। মোবারক আলির বলিষ্ঠ হাতদুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল, চল শুয়ে পড়ি গে। ভোর তিনটেয় আবার টার্ন হবে।

দু'জনেই ডেক পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফোকশালে নামল। ফোকশালে ঢুকে শেখরই বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিল মোবারক আলির। মোবারকের দৃষ্টি তখন শঙ্খচূড় সাপের ঝাঁপিতে। চামড়ার ঝাঁপিটা বাংকের এককোণে পড়ে আছে। ওরই দ্বিতীয় ভাঁজে মেঘবর্ণের শঙ্খমুখী সাপ।

নে, শুয়ে পড়। শেখর নিজের বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল। জামা ছেড়ে মোবারক শুয়ে পড়লে সে আলো নিভিয়ে দিল।

অধিক রাত্রে কাঁসের আওয়াজে শেখর জেগে দেখল পাশের বিছানা খালি। দেয়ালে টাঙানো রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িটাও নেই। মোবারক ফোকশালে নেই। মনটা তাই ওর আঁতকে উঠল।

জাহাজটা তখন আছড়ে পড়ছে নোনা ঢেউয়ের মাথায়। বাইরে আকাশচেরা ঝড়। আলি কোথায় এ ঝড়ের রাতে? বাথরুমে? কিন্তু ঘড়িটা?

বাথরুম খোঁজা হল নেই। মেসরুম শূন্য। শুধু কটা জলের টব আগুনে ফুটছে।

শেখর ডেক পথে এসে থামল। ডেক পথ অন্ধকার। দেওয়ানির ঝাপটায় অনাবৃত ডেক একেবারে অস্পষ্ট। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে হ্যান্ডিং লাইনটা কোনওরকমে ধরে ফেলল। হ্যান্ডিং লাইন ধরে চারদিকে চেয়ে দেখল কোনও মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে কি না। কিন্তু কোথা থেকেও এতটুকু আওয়াজ ভেসে আসছে না। মাস্টের আলোটা শুধু ওদিকে টিমটিম করে জ্বলছে। সেই সময় কতকটা হিম ঠান্ডা ঢেউয়ের জল এসে সমস্ত শরীরটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল শেখরের। ভ্রুক্ষেপ নেই তবু তার। সে খুঁজছে।

মাঝে মাঝে প্রপেলারটা জল থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। আর সেই সময় জাহাজের আর্ত চিৎকার। এই বুঝি স্টিয়ারিংটা অচল হয়ে গেল। এই বুঝি আকাশচেরা ঝড় দুমড়ে দিল সমস্ত জাহাজটাকে। তবু এই আকাশচেরা ঝড়ের ভিতর দিয়েই আঁতি-পাঁতি করে সে অনুসন্ধান করল। শেষে কোনওরকমে সিঁড়ির দুটো রড ধরে বোট-ডেকে উঠতেই দেখল তিন নম্বর বোটের বাড়ারের পাশে মোবারক দাঁড়িয়ে ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় দেওয়ানি দেখছে। রেডিয়ম ডায়াল ঘড়িটা ঝুলছে হাতে।

ওয়াচের ঘণ্টা পড়ল, রাত বারোটা।

শেখর ডাকল সেইসময়, মোবারক নেমে আয়। ফোকশালে চল।

ভোরের আকাশ জুড়ে মেঘের আবরণ এতটুকু নেই। শুধু দক্ষিণ মেরুর দিকে ক'টা বিচিত্র রঙের খণ্ড মেঘ দিগন্ত ঘিরে ভোরের ঘুমে অচেতন। মনে হয় মুঠি মুঠি ইন্দ্রধনুচূর্ণ কে যেন তন্বী মেয়ের শাড়ির নীলাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে চুপি চুপি সরে গেছে।

শেখর ইঞ্জিন-রুম থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের উপর দাঁড়াল। সে নূতন জাহাজি। এখনও তার মন অন্যান্য পুরনো জাহাজিদের মতো মরে যায়নি। তাই সে ডেক-পথে এসে একবারের জন্য থামল। আকাশের দিকে চোখ তুলে সমুদ্র আর আকাশের বিচিত্র রূপের ভিতর ডুবে থাকতে চাইল। কিন্তু কানে মাউথ-অর্গানের মিষ্টি সুর বাজতেই সে ডেক পথ দিয়ে আফটার-পিক উঠে এসে দেখল মোবারক নেচে নেচে মেসরুমের ভিতর বাঁশি বাজাচ্ছে। আরও ক'জন জাহাজি দাঁড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে।

চার দিন চার রাতের বিবর্ণ মোবারক ফিরে পেয়েছে ওর পুরনো সম্পদ। হাসি আর আনন্দ। বাঁশির সুর আর সাপের নাচ। অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে থাকা শেখর আবার দু'পা এগিয়ে ভাবল, সিডনি থেকে জাহাজ ছাড়ার পর চার রাত চার দিন ও এতটা বিবর্ণ আর ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল কেন? তারপর কাল রাত বারোটার সময় বোট ডেকের তিন নম্বর বোটের বাড়ারের পাশে দাঁড়িয়েই বা কী দেখছিল?

সুরটা তখন উঠছে নামছে। মিষ্টি সুর। অদ্ভুত বাজায় মোবারক। মরা ডেক আর ইঞ্জিনের ভিতর গোটা সফর ধরে সে যেন আজও জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শেখর মেসরুমের ভিতর ঢুকতেই মোবারক বলল, একটা নূতন সুর দিলাম। নিউ প্লাইমাউথের পথে পথে এই সুরেই বাঁশি বাজাব।

থাক হয়েছে। কখন তো ইঞ্জিন রুম থেকে এসে স্নান করে বসে আছিস। এখনও খানাটা নিতে পারলি না? কেবল আমার আশায় বসে থাকিস। কখন আমি আসব, কখন আমি ভাত নেব। বাঁশি রেখে প্লাসদুটো আর থালা নিয়ে আয় নীচ থেকে। ততক্ষণ আমি হাত-পা ধুয়ে আসছি। আর শোন, আমার লকারে কাঁচা লঙ্কা আর টম্যাটো আছে। ওগুলো নিয়ে একসঙ্গে সব মেখে নে তো।

মোবারক বাঁশিটা জামার আস্তিনে মুছে নীচে চলে গেল।

বারো তেরো নটের গতি যদি জাহাজের হয় তবে সিডনি থেকে নিউ প্লাইমাউথের পথ সাত দিনের। কাজেই জাহাজ বন্দরে পৌঁছতে আরও তিন দিন প্রায় বাকি। আরও ছ'টা ওয়াচ মোবারককে পহরা দিতে হবে। সে প্রহরা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই ওকে বাঁশিতে সুর দিতে হয়। অভ্যাস রাখতে হয়। কারণ জাহাজ বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তো সে তার চার্লি চ্যাপলিন কায়দায় পোশাক পরে নেমে পড়বে বন্দর পথে। যেমনটা সে প্রতি বন্দরেই করে আসছে। তারপর সেই বরফ গলা বন্দর পথের উপর দিয়ে ধীর ছন্দোবদ্ধ বাঁশির তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে উচ্ছল পাখির মতো লাফিয়ে চলবে। পথের পাশে কাঠের রং-বেরঙের ঘরগুলির জানালা খুলে যাবে। ড্রোণ ফুলের মতো সাদা মুখগুলি জানালার পাশে উঁকি দিয়ে দেখবে একজন ভারতীয় নাবিক বিচিত্র কায়দায় কাঠের বাড়িগুলোকে বাঁশির সুরে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

দক্ষিণ আর উত্তর দ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে নিউ প্লাইমাউথ।

পাহাড়ি বন্দর। এগমন্ট পর্বতের কোলে ধাপে ধাপে পাহাড় সিঁড়ির ছায়ায় নিউ প্লাইমাউথ বন্দর গড়ে উঠেছে। সিডনি থেকে দক্ষিণ পুবে জাহাজ চালিয়ে জাহাজ বাঁধা হয়েছে সেই বন্দরে।

জাহাজ ঘাটার সামনের পথটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের বুক চিরে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উপরে উঠে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে কাঠের রং-বেরঙের অলিন্দে। দূরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শেষ পাহাড়ের সোনালি বরফচূড়া। শীতের দেশে সোনাগলা রোদে মনে হল এগমন্ট পর্বতে কে যেন আগুন ধরিয়েছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তাই দেখল মোবারক। ঝলসে উঠল ওর আয়ত চোখদুটো। শেখর এসে ডাকতেই মোবারকের হুঁশ হল, ফোকশাল হতে বেরিয়েছিস তো সেই কখন, কিন্তু এখনও কিনারায় নামলি না যে?

মোবারক লেদার-ব্যাগের প্রথম ভাঁজ থেকে বার করল বাঁশিটা (যার দ্বিতীয় ভাঁজে সাপটা তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে)। ঠোঁটের ভাঁজে গুঁজে দিল বাঁশিটা। শেষে হ্যান্ডশেক করল শেখরের সঙ্গে। একসময় শেখর বলল, আই উইশ ইউ গুড লাক।

মোবারকের কিন্তু ঠোঁট নড়ল না। শুধু চোখদুটো যেন একটু হাসল। সেই চোখদুটোই যেন হেসে জবাব দিয়েছে, তোমার শুভেচ্ছা আমার জীবনে অক্ষয় হোক।

গ্যাংওয়ে ধরে জেটিতে নেমে এল মোবারক। তারপর পথে। কালো পিচঢালা পথ। হিম-ঠান্ডা বরফগলা পথ ক্রেন মেশিনের গা ঘেঁষে পাহাড়-সিঁড়ির বুকে 'দ'-এর মতো উঠে গেছে। সেই পথ ধরে হাঁটছে সে। হাতে লেদার-ব্যাগ। ঠোঁটের ফাঁকে মাউথ-অর্গান। সুরে সুরে নিজের মনে নিজেই যেন সে ডুবে আছে। কখনও পাহাড় অলিন্দ ঘেঁষে, কখনও ট্রাম-লাইন ধরে বরাবর চড়াই-উতরাইয়ে ওঠা-নামা করতে করতে চলেছে ভারতীয় নাবিকটি।

নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে মোবারক এই প্রথম এল।

মোবারকের বাঁশির সুরে ডুবে-থাকা মন কখনও দেখল কখনও দেখল না জানালাপথের উপর উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা সাদা মেয়েমানুষের ড্রোণফুলের মতো মুখগুলি। পাহাড়ের উপর থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে ওকে।

ফিজ্‌রয়ে এসে থামল মোবারক। মুখ থেকে বাঁশিটা নামিয়ে আনল। ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে আছে ফিজ্‌রয়ের প্রতিটি ঘর, প্রতিটি মানুষ। সমস্ত শহরই যেন বিচিত্র ফুলের উৎসবে মেতে আছে। ফিজ্‌রয়ের ফুলের উৎসবে দাঁড়িয়ে ভাবল একবার, মেথডিস্ট চার্চের পাশ দিয়ে পিকাকোরা পার্কটা ঘুরে এলে হত। কিন্তু রাত যে বেশি হয়ে যাবে। তা ছাড়া জাহাজটা অনেকদিন এ বন্দরে থাকবে। আর-এক বিকেলে ঘুরে এলেই হবে।

ফিজ্‌রয় হতে ট্রামে চড়েই বন্দরের দিকে ফিরল মোবারক। একরবগির ট্রামে চড়ে এক কোণে বসে বাঁশিটা ক'বার বাজাল। আরোহীরা কান পেতে শুনল। নূতন একটা সুর। বিদেশি সুর। খুব শ্রুতিমধুর ঠেকছে। মেয়েরা জোয়ান দীর্ঘ চাটগাঁই চেহারা দেখে ফিসফিসিয়ে তাই বলল, ইন্ডিয়ান, এ ম্যান অব মিস্টিক ল্যান্ড।

ট্রাম বন্দরে এসে থামতেই মোবারক নেমে পড়ল। সামনেই সি ম্যানস মিশন। পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। শহরের বুকে জাহাজিদের এই এক আড্ডাখানা। দিনের পর দিন সমুদ্রের মরা ঢেউ গুনে এখানে এসে সব জাহাজিই একটু গানবাজনায় ডুবে থাকতে চায়। আগামী সমুদ্রযাত্রার জন্য মনটাকে এখান থেকে একটু চাঙ্গা করে নেয়।

মোবারক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল একটা সাহেব বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে। পাশে আরও দু'জন সাহেব দাঁড়িয়ে। সেও একবার থামল টেবিলটার কাছে এসে। কিন্তু পৃথিবীটা ক'বার প্রদক্ষিণ করার পরও এ খেলাটাকে সমঝে উঠতে পারেনি। তাই যেখানে নাচ-গান হচ্ছে, যে হলটার ভিতর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে, সেদিকেই সে এগিয়ে গেল।

বিভিন্ন দেশের জাহাজিতে হলটা ভরে আছে। মঞ্চের উপর ক'জন মেয়ে সাদা পোশাক পরে পা তুলে নাচছে। নাচ দেখে মনে হয় এক পায়ের উপর ভর করে আর-একটা পা আকাশের দিকে কতদূর তুলে দেওয়া যায় তারই যেন প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রথম প্রথম মোবারকের চোখে এসব খুব খারাপ লাগত। কিন্তু সফরে সফরে এমন নাচ দেখে, আজকাল এ পা-তোলার প্রতিযোগিতাকে নাচ বলে, নৃত্যশিল্প বলে ভাবতে পারছে। শেষে একটা চেয়ার টেনে বসতেই দেখল পাশের চেয়ারে শেখর। হাঁটুর ভাঁজের ওপর টুপি।

ফিসফিস করে ডাকল, শেখর।

ফিসফিস করে উত্তর এল, আমি তো ভাবলাম তুই সোজা জাহাজে চলে যাবি।

কতক্ষণ হল নাচ আরম্ভ হয়েছে?

তা অনেকক্ষণ। এদের সিস্টেম কিন্তু আলাদা। অন্যান্য বন্দরে সি-ম্যানস মিশনে দেখে এসেছি ওদের ভিন্ন লোক থাকে গান-বাজনার জন্য। কিন্তু এখানে জাহাজিদের মধ্যে যদি কেউ কোনও আর্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকেন, তাঁকে ডাকা হয়। তোর নাম আমি এবার প্রস্তাব করব।

মঞ্চের উপর তখন সেই পা-তোলা মেয়েটির নাচ প্রায় শেষ। কোল্ড ড্রিংকসের ঘরটা পার হয়ে কাকে কী যেন বলে এল শেখর।

মঞ্চের উপর যারা নাচছিল তাদের নাচ শেষ। শেষে তারা নুয়ে নুয়ে কেমন পিছিয়ে পিছিয়ে দু' পা

ভাঁজ করে বিলিতি কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেল।

মোবারক শেখরের কলার টেনে বলল, আমি কিন্তু অমনভাবে ঠ্যাং ভাঁজ করতে পারব না।

তুই তোর মতো করবি।

সেই সময় কালো পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক এলেন মঞ্চে। এসে তিনি মাইকের সামনে মুখ রেখে বললেন, এবারের প্রোগ্রাম লিলিয়ু, ভায়োলিন, তারপর সৈয়দ মোবারক আলির মাউথ-অর্গান।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে লিলি এসে ঢুকল। মোবারক উঠে গিয়ে পর্দার পাশে দাঁড়াল। ভায়োলিন বাজাচ্ছে লিলি। কাঁধের উপর রেখে বাজাচ্ছে। খুব মিষ্টি হাত। গায়ে সাটিনের ব্লাউজ, ফারের কোট উইংস-এর পাশে রেখে গেছে, মোবারক কোটের লাগোয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফারের কোট থেকে উৎকট বিলিতি এসেন্সের গন্ধ উঠছে। মোবারক একটু সরে দাঁড়াল।

লিলির চোখ কালো, চুল কালো। সেই চোখ চুল দেখতে দেখতে কখন লিলি হাত নামিয়ে নিয়েছে বেহালা থেকে মোবারক খেয়াল করে উঠতে পারেনি। মেয়েটি বেরিয়ে আসতেই খেয়াল হল এবার ওকে মঞ্চের ভিতর ঢুকতে হবে। কিন্তু ঢুকতে যেতেই সামনের উঁচু কাঠটা ওর পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লিলির ভায়োলিনের উপর। একটা তার ছিঁড়ে গেছে। আর হাতটা একটু কেটে গেছে মোবারকের। রুমাল দিয়ে হাতের রক্তটা মুছে অপরাধীর মতো বলল, আপনার ভায়োলিনের তারটা ছিঁড়ে গেল।

লিলি অত্যন্ত সহজভাবে বলল, আপনার হাতটা খুব কেটে গেছে, তাই না? দেখি তো হাতটা।

না, তেমন কিছু হয়নি।—এতটুকু কাটায় কিছু আসে যায় না মোবারকের।

একটা তার ছিঁড়লে লিলি আর একটা তার জড়িয়ে নেয়।

আপনি যান। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

মঞ্চের ভিতর ঢুকতে যাবে, আবার ডাকল লিলি, দাঁড়ান, হাতটা বেঁধে দি। উইংস এর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের রুমালটা জড়িয়ে দিল মোবারকের হাতে। সেই সময় দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের কয়েকজন ছুটে এসেছিলেন।

মঞ্চে ঢোকার আগে আরেকবার চাইল মোবারক লিলির দিকে। সারা মুখে ছড়িয়ে আছে শিশিরভেজা গোলাপের রং, বাদশা-বেগম চেহারা। ভ্রু লতা বড় সরু আর তীক্ষ্ণ।

মোবারক যখন হাসে, তখন ওর ঠোঁট হাসে না। চোখ হাসে। মোবারক হাসল। লিলিও হাসল।

তারপর মঞ্চের উপর মোবারকের মাউথ-অর্গান বাজানো একসময়ে শেষ হল। মোবারক বেরিয়ে আসবে। জনতার হাততালি থেমে গেল। কিছু মুখ চেয়ার থেকে উঠে বলল, আবার হোক।

মোবারক ফিরে দাঁড়িয়ে বলল অনেকদিন থাকব এ বন্দরে।

তারপর মিঠে সালাম ঠুকল সকলের উদ্দেশে। উইংস-এর পাশ কাটিয়ে বাইরে আসতেই লিলি বলল, বেশ হয়েছে। সুন্দর বাজিয়েছেন তো। ভারতীয় সুর এত মিষ্টি এই প্রথম জানলাম।

একটু থেমে আবার বলল কালও নিশ্চয়ই মিশানে আসছেন?

খুব সম্ভব।

কখন?

সেটা ঠিক বলতে পারলাম না।

লিলি আর মোবারক একসঙ্গেই মঞ্চের বাইরে চলে এল। পিয়ানো আর বিগড্রামের আসর পার হয়ে শেখরের পাশে দাঁড়াল। খুব আস্তে পরিচয় করিয়ে দিল শেখরকে লিলির সঙ্গে। শেখর দাঁড়াল। হ্যান্ডশেক করল। কিছু বলতে হবে এবং কী বলা যায় এই ভাবতে গিয়েই অনুভব করল ওর মুখে এসে সমস্ত রক্তটা যেন চাপ দিতে চাইছে। মোবারক বুঝতে পেরে বলল, আমার বন্ধুটি অত্যন্ত লাজুক। তা ছাড়া নূতন জাহাজি।

শেখরের মুখ কেমন আরও রক্ত-লাল হয়ে উঠতে থাকলে মোবারক আবার বলল, জাহাজে চল। বেশ রাত হয়েছে।

লিলি নিজের কালো চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি।

শেখর অনেক চেষ্টা করে উত্তর দিল, খুব ভোরে আমাদের উঠতে হয়।

প্রথমদিন সকাল সকালই ফিরল জাহাজে। লিলি এসেছিল দরজা পর্যন্ত। এসেছিল বিদায় দিতে।

সি-ম্যানস মিশন থেকে কালো পথ নেমে গেছে জেটিতে। সেই পথ ধরেই ওরা নেমে আসছে। কার্নিভাল আর ক'টা স্টেশনারি দোকান পার হয়ে ওরা এসে থামল ক্রেন-মেশিনের নীচে। মোবারকের চিন্তাধাবাটা ক্রেন-মেশিনের নীচে থামতেই কেমন চমক খেল। লিলির বিদায়বেলাকার গুডনাইট কথাটাতে কেমন একটা ছোট্ট সহজ ভাব ছিল। কিন্তু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে গ্যাংওয়েতে ঢুকতেই সেই মুখের সঙ্গে সারি সারি আরও ক'টা মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠল। আজকার লিলির মতোই চেহারা ওদের। তফাত শুধু চোখে আর চুলে। চোখ নীল, চুল সোনালি।

বুনো সাইরিসের স্প্যানিশ মেয়েটির কথা মনে হলে তার লজ্জা লাগে। সে বলত, আমি কবি, কবিতা লিখি। নিজামা পার্কে বসে সে গল্প করত, দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে মোবারকের পাণ্ডিত্য জানতে চেয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতি জানার শখও ছিল তার অত্যন্ত তীব্র। সে বলত, মোবারক থেকে যাও, তোমায় আমি সব দেব। মোবারক সে মেয়েটিকে সত্যি বারবার অনুকম্পা করেছে। খুব অসহায় যেন সে। নিজামা পার্কে বসে ওকে বারবার দেখে তাই মনে হয়েছিল, ফ্লোরিদা, করিয়েন্টজে বারবার সে এক কথা বলত, সব হবে, সব পাবে, থেকে যাও।

মোবারকের মনে হয়েছে সে সময় জৈনবের দীর্ঘ-এলায়িত চুলকে। মনে হয়েছে ওর নাকের নথ। বাঁশপাতার মতো ফুর ফুর করে কাঁপছে। আম্মাজানের কথা তখন সে শুনতে পেত, মোবারক ঘুমোসনি। তোর বাপজির কথা যে এখনও শেষ হল না বে।

সে বলত, আম্মা আর-একদিন, আজ থাক। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মনে পড়েছে মেলবোর্ন থেকে জিলঙের পথ। ক্যাডিলাক ছুটেছে প্রাণপণে। উইলিয়ামের স্ত্রী গাড়ি চালাতে চালাতে একটি ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় গাড়ি ব্রেক কষে দিল। স্থানটি নির্জন। দূরে একদল ক্যাঙারু লাফিয়ে দূর হতে দূরান্তরে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই ঘনসন্নিবেশিত ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় চন্দ্রালোকিত নির্জন মাঠে বলেছিল বউটি, এদিকে আসবে মোবারক?

দূরে গমখেতগুলির প্রতি আঙুল তুলে বলেছিল, আজ যদি জিলঙে আমরা না পৌঁছাই?

উইলিয়াম নিশ্চয়ই তা হলে চিন্তা করবে।

মোটেই না। বলব তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। ওর জন্যে তুমি এবার কতগুলি ভারতীয় টিকিট সংগ্রহ করে এনেছ?

অনেক।

দেখালে না তো?

বাড়ি পৌঁছে দেখাব।

গাড়ি আর আমি চালাতে পারব না মোবারক। গত সফরেও চালিয়ে গেছি, এবারও চালিয়ে যাচ্ছি। আমার কী অত দায় পড়েছে?

উইলিয়ামকে পাঠালেই পারতে তা হলে।

তুমি বুঝি জানো না সে অত্যন্ত স্বার্থপর।

কথাটা বলা যাবে ওকে?

না, খবরদার। ওকে কিন্তু কিছু বলবে না।

উইলিয়াম নিশ্চয়ই আমার জন্য এবার অনেক টিকিট জমিয়ে রেখেছে।

জানি না।

উইলিয়ামের স্ত্রী ওর শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছিল আগামী মাস থেকে ক্যাঙারুরা বাচ্চা দিতে শুরু করবে। এ মাঠে অনেকবার খরগোশ শিকার করতে এসেছি আমরা। তাই আমি জানি ক্যাঙারু বাচ্চা দেয় কখন।

উইলিয়ামের স্ত্রীর ঠোঁটদুটো আর চোখদুটোতে উদগ্র কামনা জাগছে। শঙ্খচূড় সাপটার কথা মনে হয়েছিল তার সে সময়। সে দু'পা সরে দাঁড়িয়ে ক্যাডিলাকের ভিতর ঢুকে বলল, এসো। উইলিয়াম সত্যি খুব স্বার্থপর।

মোবারক বাংকের উপরে পড়ে আরও কিছু ভাবছিল, কিন্তু শেখর এসে ডাকছে সে সময়, ওঠ ওঠ

খাবি চ। খানা তোর লকারে তুলে রেখেছি। তোব খানা নিয়ে ভাণ্ডাবি সাবেংকে নালিশ জানিয়েছে।

সে শুনেও শুনল না যেন। অন্য কথা টেনে নিয়ে বলল, লিলিয়ানকে কেমন লাগে শেখব?

সে কথা পবে বলব। এখন যা-হয় দুটো খেয়ে নে। ঠান্ডা ভাতগুলো খাবি কী কবে তাই ভাবছি।

খাব, খেয়ে নেব ঠিক। কিন্তু লিলি বড ভাল মেয়ে। অন্য বন্দবেব মেয়েদেব থেকে অনেক তফাত। আম্মাজানেব মতো সে আমায় আজ যত্ন কবল। কাটা হাত সে কত সুন্দব কবে বেঁধে দিয়ে বলেছে, জল যেন হাতে না লাগে।

দু' দণ্ডেই লিলিয়ানব সঙ্গে তা হলে প্রেম হযে গেছে বলতে চাস।

না, প্রেম আমাব হয়নি। আমাব প্রেম দুটো জিনিসেব সঙ্গে। এক, সাপটা। দ্বিতীয়, মাউথ-অর্গান। প্রেম আমাব হতে পাবে না আব।

শেখব ঠোঁটে বিদ্রুপ টেনে প্রশ্ন কবল, আব হাতঘড়িটা?

মোবাবক লাফ দিয়ে বাংকেব উপব বসে পড়ল। ভূত দেখাব মতো ভয় পেয়ে সে যেন কাঁপছে। গলা ওব কথা বলতে কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, বিবর্ণ আব শুকনো হয়ে গেছে ঠোঁটদুটো। তবু সে অত্যন্ত নিচু গলায় শেখবকে বললে, আল্লাব কসম শেখব, এ কথা তুই আব তুলিস না।

নিউ প্লাইমাউথ বন্দবেব প্রথম ভোব। মোবাবক আব শেখবেব প্রথম সকাল।

কুয়াশাচ্ছন্ন ডেক। উইনচ-ড্রাইভাববা ভোব বাত থেকে ফলকায় কাজ কবছে। ক্রেনেব নীচে ট্রাকগুলোতে বোঝাই হচ্ছে ফসফেট।

ট্রাক একটা দুটো নয়, অনেকগুলো। ভিতবে দু'-একজন সাহেব বসে আছে। নিষ্কর্মা মানুষেব মতো বসে সিগাবেট টানছে। ওবা অপেক্ষা কবছে ট্রাকগুলো কতক্ষণে বোঝাই হবে।

পাঁচটা ক্রেন একসঙ্গে পাঁচটা ফলকায় কাজে ব্যস্ত। ক্রেন ড্রাইভাববা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছে সূর্য উঠবে কি উঠবে না। সঙ্গে লক্ষ বাখছে ডেকেব উপব কিনাবাব সাহেব কখন হাবিয়া হাপিজের নির্দেশ দিচ্ছে। নির্দেশ দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে পা-টা লিভাবেব উপব টিপে গিয়াব তুলে দেয়। তাবপব দু'-পাঁচ হন্দব মাল ক্রেনটা তুলে নিয়ে ট্রাকের উপব ঢেলে ফলকায় আবাব ফিবে আসে। ক্রেন ড্রাইভাববা তখন হাতটানা দিয়ে নিশ্চুপ হযে বসেন। এক মুহূর্তের বিশ্রাম।

ক্রেন পাব হয়ে আব-এক টুকবো সমুদ্র। এখানে জেটি ব্রিজেব মতো সমুদ্রেব উপব কতকটা এগিয়ে গিযে থমকে দাঁড়িয়েছে। দু'-চাবটা বযা ভাসছে জলে। বাতে সেই বয়ায় হলুদ আলো কখনও জ্বলে কখনও নেবে। এই এক টুকবো সমুদ্রেব বেলাভূমি পাহাড় থেকে একেবাবে খাড়া নেমে আসেনি। বেলাভূমি ক্রমশ ঢালু বলে এখানেই সপ্তাহে দু'দিন কার্নিভ্যাল বসে। অন্যান্য দিন বিকালে সমুদ্রস্নান কবতে শহব হতে নেমে আসে মেয়ে-পুরুষবা।

ইঞ্জিন-সাবেঙেব চলনে ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। আফটাব-পিকে উঠে একবার গ্যালিতে উঁকি দিচ্ছে, আবার ছোট-টিন্ডালকে ডেকে বলছে, যাওবে মিয়া কামে যাও। ঘণ্টি পড়ব এখন।

সেই শব্দে শেখব আব মোবাবক কেবিন থেকে উপবে উঠে এল। দাঁড়াল এসে দুটো বিটের সামনে, যেখানে লোহাব মোটা তাবগুলো প্যাঁচ খেয়ে বয়েছে। ডেক-টিন্ডাল কয়েকজন ডেক-জাহাজি নিয়ে ফানেলেব ডগায় গিয়ে উঠেছে। ফানেলটা বং হচ্ছে। হলুদ রং। ডেক-সাবেং বয় কেবিনের সামনে বাটলাবেব সঙ্গে ফিস ফিস কবে নিভৃতে কিছু যেন শলা-পরামর্শ কবছে। কিছু বিক্রিব ব্যবস্থা, কিছু পয়সা-সংগ্রহেব ব্যবস্থা। ডেক-ভাণ্ডাবি পাঁচ নম্বর ফলকা পাব হয়ে সাবেঙেব পাশে চুপচাপ দাঁড়াল। কাবণ ক্রু-দেব বেশন বাঁচিয়ে তাবও কিছু মশলা, চাল ডাল জমেছে, বেচে সেও কিছু পয়সা সংগ্রহ কবতে চায়।

জাহাজ বন্দবে এলে ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়। তখন ইঞ্জিন-রুমে নাবিকেরা সকলেই সাতটা-পাঁচটা কাজ কবে। মোবাবক আব শেখব তাই আজ একসঙ্গে ইঞ্জিন-রুমে নামার জন্য নীল বঙেব ওয়ার্কিং ড্রেস পবে অপেক্ষা কবছে। টিন্ডাল এলেই নেমে যাবে। বড়-টিন্ডাল আসেনি বলে, ওরা উঁকি দিয়ে দেখছে বন্দবেব জল কতটা গভীব।

লুৎফল এবং আরও ক'জন নাবিক সারেঙের কাছে ছুটি নিয়ে কিনারায় গেছে। অনেকে নিজেদেব

জন্য কিছু সেলমন কি হেরিং মাছ আনার জন্য পয়সা দিয়েছে। সেই সময় শেখরও বলেছে, আমাদের জন্য যেন কিছু আনা হয়। কিছু হেরিং আর টম্যাটো।

এই নীরস লোহার ডেক-এ একঘেয়ে খানার পর দুটো টম্যাটো চাটনি, হেরিং-এর ঝোল অমৃতের মতো খায় নাবিকেরা। তাই জাহাজ বন্দরে এলে প্রথম ভোরেই সারেং দু'-একজনকে কিনারায় পাঠিয়ে দেয় বাজার করতে। বলে দেয় কিছু শাক যেন নিয়ে আসে। শাকের পয়সা দিতে হয় না। অনেক বন্দর আছে যেখানে সমুদ্র-তীরে বিভিন্ন রকমের শাক আগাছার মতো বাড়তে থাকে। সেই শাক ভারতীয় নাবিকেরা যতদিন থাকে ততদিন ডেক বোঝাই করে। এমনকী শেষ পর্যন্ত বাড়তি শাকগুলো বরফ-ঘরে বাটলারকে জমা দিয়ে দেয়।

গতরাতে ঘড়িটা নিয়ে মোবারক আর শেখরের ভিতর যে মন-কষাকষি হয়েছিল, নিউজিল্যান্ডের প্রথম ভোরের হালকা আমেজে সব যেন ফুৎকারে উবে গেছে। মোবারক আবার উচ্ছল হয়ে উঠেছে, শেখর চঞ্চল হয়েছে ইঞ্জিন-রুমে নামার জন্যে। ইঞ্জিন-রুমে ফিলটার খুলতে হবে আজ। তিন নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি সাহায্য করতে হবে একটু। শেখর ইঞ্জিনিয়ারের হেলপার হিসেবে কাজ করতে খুব ভালবাসে। ওর যত ভয় বয়লারগুলোকে। বয়লারে কয়লা ঠেলে দেওয়ার কথা মনে হলে ভয়ে ওর শরীরে কাঁটা দেয়।

সাড়ে বারোটায় খানার টিফিনে দু'জনেই ইঞ্জিন-রুম থেকে পাশাপাশি উঠে এসেছিল ডেক-এ। ডেকের সামনে ফলকা। ফলকা দুটো পার হয়ে জাহাজের গলুই। গলুইয়ের বুকে এক ঝাঁক চিড়িয়া খুঁটে খুঁটে কিছু খাচ্ছে।

মোবারক আর শেখর স্টারবোর্ড-সাইড ধরে গলুইতে উঠে এল। খানা নিল দু' থালায়, খানা খেল। খানার টেবিলে একবার লিলিব্লুর কথা উঠেছিল, যেন রাজহাঁসের পালকে-মোড়া মেয়েটা। ঘন অন্ধকারের মতো চোখ আর চুল। নাক ওর কচি ডালিম পাতার মতো নরম আর সরু। ঠোঁটদুটো যতটা হালকা, ততটা ভিজে ভিজে। রক্ত-লাল রং সেই ঠোঁটের। চিবুকে রয়েছে বর্ষার প্রজাপতির ক্ষীণ ডানার ভাঁজ। ঘাড়ের উপর একগুচ্ছ বব-করা চুল। শুধু বব-করা এক ঘাড় চুলটা মোবারকের অপছন্দ। সে চুল কেন জৈনব খাতুনের মতো এলায়িত আর দীর্ঘ হল না, সেজন্য হেরিং-এর মাথাটা চিবোবার সময় ক'বার আফসোস করেছে মোবারক।

মোবারক বলেছে, লিলি চুলটা আরও বড় করে রাখতে পারল না?

শেখর এঁটো-কাঁটা সব থালায় তুলে সামান্য হেসে বলল, মিশনে যখন দেখা হবে তখন বলবি, চুলগুলো বড় করে রাখতে পারলে না গো মেয়ে?

মোবারক শেখরকে চোখ টিপে বলল, চুপ কর হতভাগা।

অর্থাৎ বড়-টিন্ডাল তখন মেসরুমে ঢুকছে খানা খেতে। বগলে একটা মাদুর। খানা খেয়ে থালার উপর কুলকুচা করে একেবারে পাঁচ ওক্তের নামাজ পড়ে নীচে নামবে। এমনটাই স্বভাব ওর।

•

শনিবার, আজ সাড়ে বারোটায় ছুটি। সুতরাং এই মাত্র কাজ থেকে খালাস হল শেখর আর মোবারক। খিদে অত্যন্ত বেশি পাওয়ায় স্নান না সেরেই খেয়ে নিয়েছে। তারপর হাতে কাজ আছে অনেক। সে কাজগুলো শেষ না করে স্নান করলে কাজগুলো আজও পড়ে থাকবে। কাল রবিবার, ছুটির দিন। ছুটির দিনেও হাতে একগাদা কাজ থাকুক মোবারকের পছন্দ নয়।

ক্রেনের হারিয়া-হাপিজে ফসফেটের ধুলো সমস্ত বন্দর জুড়ে কুয়াশার সঙ্গে মিশে সাদা হয়ে উড়ছে। সেই ধুলোর ভিতর শেখর আর মোবারক কাজ করেছে। ফিল্টারের কাজ শেষ হলে দু'জনেই তিন নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে উইনচে দু' ঘণ্টার জন্য হরদম খেটেছে। স্ট্রেপার খুলতে যে কালি শেখরের গায়ে লেগেছিল মোবারক গরম জল আর সাবান দিয়ে সেই কালি রগড়ে তুলে দিচ্ছে এখন। চার টব গরম জলে স্নান করেছে ওরা।

তার আগে মোবারক ওয়ার্কিং ড্রেসগুলো কেচেছে। শেখরের ওয়ার্কিং ড্রেসও ধুয়ে দিয়েছে। শেখরের জামাকাপড়ও মোবারকই ধুয়ে রাখে। আর হরদম বিড়বিড় করে বকে। বলে, জাহাজে মরতে এলি কেন? সফর শেষ করে যদি একবার কলকাতায় ফিরতে পারি তবে মাসিমাকে বলে

দেব, জাহাজে যেন তোকে আর না পাঠায়। আমি না থাকলে তুই যে মবে যেতিস।

শেখব হেসে বলল, পিঠেব কালিটা সব উঠল তো?

তাবপব বাথরুম থেকে উঁকি দিয়ে বলল, মোবাবক এদিকে চেয়ে দ্যাখ না।

মোবাবক উঁকি দিয়ে বলল, কী!

দেখছিস না ক্রেনেব নীচে দুটো মেয়ে সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধবছে।

দেখলাম তো।

আমি ওদেব সঙ্গে এখন গিয়ে মাছ ধবব। একটা ছিপ ওদেব থেকে চেয়ে নেব। তুই যাবি না? তুই মাছ ধববি না?

না।

তবে সাবাটা দুপুব ফোকশালে বসে কী করবি?

কিছুই কবব না।

ঠিক আছে মাছ যদি ওঠে তোমায় আমি দিচ্ছি না, একা ধরব, একা রাঁধব, একা খাব।

খাবি, বেশ কববি। আমায় কি ভয় দেখাচ্ছিস?

শেখব স্নান সেবে বলল, জামাকাপড়গুলো উনুনের পাশে টাঙিয়ে বাখিস, নয় তো শুকাবে না।

জামাকাপডগুলো শেখবেব।

শেখব সত্যি একসময় গ্যাংওয়ে ধবে নীচে নেমে মাছ ধবতে চলে গেল। এবং একটা ছিপ চাইতেই পাশেব মেয়েটি সানন্দে ছিপ বাড়িয়ে বললে, ইউ নো হাউ টু ফিশ?

শেখব স্বীকাব কবতে মেয়েটি বলল, গ্র্যান্ড।

তাবপব দুটো মেয়েব মাঝখানে নির্বিকাবভাবে বসে মাছ ধবাব জন্য ছিপেব সুতোটা সে গভীব জলে ছুঁড়ে ফেলল আব সন্তর্পণে দু'বাব দুটো মুখেব প্রতি চেয়ে গভীরভাবে যেন আত্মনিয়োগ কবল মাছ ধবাব প্রতি। সে যেন যথার্থই মাছ ধবতে এসেছে।

সাজগোজ কবে মোবাবক ডেক অতিক্রম করে যখন গ্যাংওয়ে দিয়ে জেটিতে নামছে কিনাবায় বেব হবাব জন্য, তখন প্রায় তিনটে বাজে। লায়ন বকেব ওপাবে সমুদ্র-সন্ধ্যায় সূর্য ডুবছে তখন। বিকেলেব আকাশটা একবাশ ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় ভবে গেছে। আকাশ, নিউ-প্লাইমাউথ বন্দব মোবাবকেব মতোই যেন সাজগোজ কবা। সে পথ ধবে হাঁটাব সময় শেখব যেখানে মাছ ধরছে সেদিকে নজর দিল। ক' কদম পা চালিয়ে শেখবেব পাশে ঝুঁকে দেখল বেশ ক'টা জ্যান্ত মাছ লাফাচ্ছে। মেয়েদুটো ছিপ ফেলে তখনও বসে বয়েছে। কিন্তু মোবাবককে দেখে ওবা যেন আশ্চর্য হল।

শেখব বলল, অত চোখ দিয়ে দেখলে কী হবে, মাছেব ঝোল বেঁধে তোমায় আমি দিচ্ছি না, একা ধবেছি একা খাব।

মোবাবক কোনও জবাব দিল না, শুধু বলল, লিলিস্লুব সঙ্গে মিশনে দেখা হলে বলবি আজ আমার যাওয়া হচ্ছে না, আজ যাচ্ছি পিকাকোবা পার্কে।

মোবাবকেব পোশাকটা বেশ ঢলঢলে। কালো ক্যাপ মাথায়। গলার টাইটা ডবল ক্রসিং-এ বাঁধা, অনেকখানি নীচে ঝুলে পড়েছে। হাতে ব্যাগটা ঝুলছে।

শেখব বড়শিটা ওদেব ফেবত দিয়ে বলল, সাপটা নিয়ে বেবোচ্ছিস কেন? এত ঠান্ডায় ওটা কিছুতেই নডবে না।

নডবে না, নড়বে না। তাতে হয়েছে কী। আমি তো ওটা নাচানোব জন্য নিয়ে বের হইনি। হাতে বয়েছে, থাক।

সে অবশ্যি সত্যি, হাতে রয়েছে থাক।

সব কিছুতেই তুই আমাব সঙ্গে লাগিস কেন বল তো শেখব?

ভাল লাগে বলে, আমার কথা এমন কবে আব কেউ তো হজম কবে না তাই।

তুই কিন্তু বলবি লিলিকে।

বলব।

পথ ধবে হাঁটছে মোবাবক। লায়ন বক অতিক্রম করে জোর হাওয়া ছুটছে বলে ওভারকোটের প্রান্ত

বাতাসে উড়ছে, টুপিটা পর্যন্ত। টুপিটাকে টেনে টুনে সে ভাল করে মাথার ভিতরে ঠেলে দিল। সে যখন হাঁটে তখন কেমন উন্মনা হয়ে যায়। দেশের কথা নিশ্চয়ই মনে হয়। নাবিক হয়েও সে সমুদ্রকে ভালবাসতে পারেনি।

বন্দর পার হলে দু'-দুটো মদের দোকান পাশাপাশি। বন্দরের কাজ-করা সাহেব মানুষগুলো সেখানে লাইন দিয়ে মদ টানছে। যাঁরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছেন তাঁরা হাঁটছেন বেলাভূমিতে। কার্নিভ্যাল আজ বসবে না।

বিকালে ফ্লাস্ক-ভর্তি কফি নিয়ে এক দঙ্গল মেয়ে-বউ এসে সমুদ্রে স্নান করে গেছে, মোবারক ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। এখন যাঁরা এসেছেন বেড়াতে, সান্ধ্যভ্রমণ ওঁদের বিলাস।

মোবারক আবার হাঁটছে।

মদের দোকান পার হলে ডানদিকে সি-ম্যানস মিশন। মিশনের দরজা ঠেলে দু'-একজন নাবিক তখন থেকেই ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। দু'-একটা লাল নীল আলো তখন থেকেই জ্বেলে দেওয়া হয়েছে অন্ধকারকে ঠেলে দেওয়া জন্যে।

সামনের চত্বর পার হয়ে ট্রাম লাইনের শেষ গতিরেখা। তার পশ্চিমে পাহাড বনভূমি এবং সমুদ্র। সমুদ্র সেখানে প্রবল প্রাণবন্ত। পাহাড়টা সেখানে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে, অত্যন্ত খাড়া। উঁচু মাথায় আলোঘর। সমুদ্রের উপর এখন থেকেই আলো ফেলতে শুরু করেছে।

মোবারকের একবার ইচ্ছা হল খাড়া পাহাড়টায় উঠতে। কিন্তু প্রবলভাবে মোড দেওয়া বলে পাহাড়টার পথ কোনদিক থেকে কোথায় গিয়ে মিশেছে সে হদিশ এখান থেকে সংগ্রহ করা মুশকিল।

ট্রাম লাইনটা গেছে পশ্চিম হতে পুবে। বন্দরের মানুষগুলোই একমাত্র এখান থেকে ট্রামে ওঠে। পবে দু' ফার্লং পথ একান্ত জনহীন। এর ভিতর কোনও স্টপেজ নেই। শুধু ঢেউখেলানো পাহাড, চড়াই আর উতরাই। নিউ-প্লাইমাউথ শহরটা পাহাড়ের কোলে ধাপে ধাপে গ্যালারির মতো গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ঘর থেকে সমুদ্রের ঢেউ আর জাহাজ স্পষ্ট। জাহাজ থেকে ফানেলের ধোঁয়া ঘরবাড়ি হয়ে এগমন্ট পাহাড়ের দিকে ছোটে এবং নিঃশেষে পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেয় একসময়।

মোবারক এসে থামল এক ধূসর সংকীর্ণ উপত্যকায়। সে ট্রাম লাইন অতিক্রম করে দুটো পাহাড়ের ফাঁকে এসে গেল। এখানে পথ সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। সে বাঁশিটা বের করে এই সংকীর্ণ উপত্যকায় পা দুটো বিছিয়ে বসল। শুকনো কাঠের উপরে বসে সামনের এক-আকাশ তারা আর শহরের প্রতি দৃষ্টি ছড়িয়ে নিভৃতে বাঁশিটা বাজাল। তারপর আবার পথ ধরে হেঁটে গেল সামনে। ইলেকট্রিকের তার মাঠের উপর দিয়ে ছায়া ফেলে ফেলে ক্রমশ বুঝি ওয়াইঙ্গানার দিকে চলে গেছে। সেই ছায়ায় ট্রাক্টর দিয়ে মাটিতে চাষ করছে চাষিরা। চাষির মেয়ে-বউ মাটি থেকে নুয়ে নুয়ে কিছু সংগ্রহ করছে। মোবারক সেখানেও হাঁটছে বাঁশি বাজিয়ে। চাষি আর ওর মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল। একটি অভূতপূর্ব বিদেশি সুরে তন্ময় হয়ে শিস দিল মেয়েটি। এবং মোবারক যখন সামনের আপেল-বাগানটায় পিকাকোরা পার্কের পথ ধরার জন্য ঢুকে গেল, মেয়েটি তখন কাঁধে তার বেলচে ফেলে একটি ইংরাজি গান ভারতীয় সংগীতের অনুকরণ করে গাইবাব চেষ্টা করল।

মোবারক শুনেও যেন শুনল না। সে শোনে না। সে এমন তো কত বন্দরে দেখে এল।

পিকাকোরা পার্কে যেতে হলে দুটো পথে যাওয়া যায়। এক শহর ধরে, ফিজরয়ের বুক মাড়িয়ে। আর-এক, এই চড়াই-উতরাই, গমখেত, আপেল বাগান এবং প্রেস-বিটেরিয়ান চার্চটা যে পাহাড়-ছাদে আছে, সেই পাহাড়-ছাদ অতিক্রম করে।

এখন সেই পথ ধরেছে মোবারক। সে নুয়ে নুয়ে বাঁশি বাজিয়ে উঠছে পাহাড-ছাদে।

পাহাড়-ছাদে ওঠার পথ ত্রিশ ডিগ্রি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মতো। দু'দিকে ঢালু জমি। জমিতে মসৃণ সবুজ ঘাস। সারি সারি কৌরি-পাইনের বনভূমি। অনেক নীচে ঢালু জমির কোলে কৌরি-পাইনের গাছগুলো সেপাইসান্ত্রির মতো সমস্ত নগরীকে পাহারা দিচ্ছে যেন। উপরে উঠতে হলে ওদেব বলে কয়ে উঠতে হবে সেই বুঝি নিয়ম।

যেহেতু বরফ ঝবে গেছে সেইহেতু কৌরি-পাইনের পাতাঝরা শাখায় শাখায় নূতন কিশলয় খেয়ালখুশি মতো বর্শার ফলকরেখায় প্রকাশ পাচ্ছে। পথ ধরে হেঁটে গেলে অদ্ভুত এক সবুজ গন্ধ।

সবুজ ঘাসেব এইসব দৃশ্য মোবাবককে বাঁশির ভিতব পুনবায় উন্মনা কবে দিল। সে পাহাড়-ছাদে উঠছে বাঁশিতে ভাবতীয় হালকা সংগীতেব সুব দিতে দিতে। নির্জন সেই কৌবি-পাইনেব বনভূমি ভাবতীয় নাবিকেব পায়ে পায়ে ছন্দ মিলিয়ে বুঝি শিস দিচ্ছে।

মোবাবক অবাক হল এবং নীবব হয়ে দাঁড়াল পথের উপর। অনেকক্ষণ কান পেতে সে অনুভব কবতে পাবল পিছনে ফেলে-আসা গমখেতেব সেই মেয়েটি শিস দিচ্ছে। ঠিক ওব বাঁশিব সুবেব সঙ্গে এক লয়ে। পথটা ইংবেজি S' অক্ষবেব মতো পাক খেয়েছে বলে মোড়ে এসে সেই শিস পুনবায় কানে এল। এবং পেছন ঘুবতেই দেখল অনেক নীচে সমুদ্র, নীল-লাল মিশনেব আলো, জাহাজ, জাহাজেব ফরোয়ার্ড-পিক। পাহাড়েব আব-এক ধাপে মোটবগুলো খুব জোবে ছুটছে। ওবা নিশ্চয়ই সেন্ট ম্যাবাইনে যাচ্ছে। মোবাবকেব তীব্র আফসোস শেখবকে সঙ্গে নিয়ে আসেনি বলে। সে এল একা। শেখবটা কেমন যেন। একেবাবেই ঘবমুখো। কেবল বইয়েব উপব মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বড়জোব সি ম্যানস মিশন পর্যন্ত আসবে। তাব অধিক নয়। তাব অধিক যদিও পা বাড়ায় সে দিনে। দিনমানে তাব জাহাজে ফেবা চাই নতুবা সে মোবাবকেব সঙ্গে ঝগড়া কবে।

মোবাবক আবাব ফেল্ট-ক্যাপ আব ওভাবকোট টেনে-টুনে পাহাড়-ছাদেব দিকে পা বাড়াল, শুনল, কে যেন চিৎকাব কবে ডাকছে ওব নাম ধবে। ডাকছে, মো—বা— ব—ক। একবাব নয়, দু'বাব নয়, অনেকবাব ডাক উঠতেই সে অবাক হয়ে চাবিদিকে চাইল ঘুবে ঘুবে। অথচ কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু মনে হচ্ছে গলাটা কোনও মেয়েব।

সন্তর্পণে ভাল কবে নজব দিয়েও যখন কিছু দেখতে পেল না তখন সে ভয়ে ভয়ে যেন উত্তর কবল, কে। কে আমায় ডাকছেন? তাব সেই কথাব প্রতিধ্বনি পাহাড-ছাদে উঠে খান খান হযে উপত্যকাব বুকে ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মেয়ে পাহাড়-ছাদেব কৌবি-পাইনের অন্তবাল হতে বেব হয়ে খিল খিল কবে হেসে উঠল। সেই একঝাঁক মেয়েব ভিতব হতে বেব হয়ে এল লিলি। পাহাড় ছাদ হতে সে নেমে আসছে, ঠোঁটেব ভাঁজে ওব ইংবেজি গানেব এক কলি, 'উই আব ইন দি সেইম বোট'। সে গান গেযে গেয়ে নীচে নেমে আসছে।

মোবাবক লিলিকে দেখে যতটা অবাক না হয়েছে, তাব চেয়ে দ্বিগুণ বিস্ময় মেনেছে এই একঝাঁক মেযেব হাসিব বহব আব উঁকি ঝুঁকি দেখে। ওবা তখনও খিল খিল কবে হাসছে, মোবাবকেব মনে হল লিলি নিশ্চয়ই এই এক দঙ্গল মেযে নিয়ে অন্য পথে ওকে অনুসবণ করেছে। নিশ্চয়ই ওব সৌন্দর্যবোধকে ব্যঙ্গ কবাব জন্য ওবা অমনভাবে ওকে চমকে দিয়ে ওব গতিপথে রুখে দাঁড়িযেছে।

লিলি নীচে নেমে তখন পথেব ওপব ওব হাত ধবে বলল এসো।

সেই পাক খাওয়া সবুজ পাহাড়-পথে ওব হাত ধবে টানতে টানতে লিলি মোবাবককে পাহাড় ছাদে নিয়ে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য হল এবারও মোবারক। এই পাহাড়-ছাদে একটি দীর্ঘ কাঠেব সবুজ হস্টেল-ঘব যে আছে এবং এখানে এক-দঙ্গল মেয়ে সামনেব প্রেস-বিটেবিয়ান মিশন স্কুলে যে শিক্ষা গ্রহণ কবে, নীচে থেকে একেবাবেই তা বোঝা যায়নি। এমনকী বোট ডেক থেকে বাইনোকুলার দিয়ে পযন্ত একবাব খুঁজে খুঁজে দেখা হয়নি।

লিলি নিজেব ঘবে মোবাবককে নিয়ে ঢুকল। ঘবগুলি আকারে ছোট বলে মোবাবক দরজা দিয়ে অত্যন্ত নুযে ঢুকেছে। পাহাড়-ছাদেব এক-দঙ্গল মাউরি মেয়ে হেসেছে নিঃশব্দে ওর অবস্থা দেখে। মোবাবক ঘরে ঢুকে দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। লিলি বলল, আমি এইমাত্র মিশনে যাব ভেবেছিলাম। আজ আমার প্রোগ্রাম ছিল সাড়ে আটটায়। কিন্তু হঠাৎ নীচে আমাদেব প্রেস-বিটেরিয়ান মিশন হস্টেলেব জানলা থেকে তোমাব বাঁশির সুব শুনতে পেলাম। কৌরি-পাইনেব ছায়ার আড়ালে দাঁড়িযে দেখলাম, তুমি ক্রমশ পাহাড়-পথ ধবে উপবে উঠে আসছ। তোমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য সকলে একসঙ্গে নিঃশব্দে অপেক্ষা কবছিলাম আব দেখছি তুমি তখন মাউথ-অর্গানটা বাজাতে বাজাতে উপবে উঠে আসছ।

তাবপব লিলি সব মেয়েদেব প্রতি হাত তুলে বলল, এবা সবাই আমার সিস্টার। এখানে আমরা সকলে সিস্টাব হওয়াব জন্য শিক্ষা গ্রহণ কবছি। এই বিদ্যালয়, Sisters' Training School এখানকার

পাঠ শেষ করে সবাই একদিন সাউথ আর নর্থ আয়ারল্যান্ড-এর ছোট ছোট শহরে, গ্রামে চলে যাব মানুষের সেবার জন্য।

হঠাৎ লিলির কী মনে পড়তেই বলল, তোমার হাতটা দেখি, তোমার হাত। জল নিশ্চয়ই ধরোনি।

কিন্তু হাতের উপর কোনও dressing না দেখে সে অবাক হয়ে বলল, এ কী? হাতটা খালি। নোংরা লেগে বিষাক্ত হবে যে!

বলে হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করে দেখল এবং কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, না না অমন করে চ'লো না মোবারক। আমাদের এখানে যখন প্রথম পাঠ গ্রহণ করি, তখন এ কথাই বলা হয়, আমরা প্রত্যেকে প্রথম যেন নিজেদের চিনতে শিখি, নিজেদের ভালবাসতে শিখি। নিজের শরীর সুস্থ না থাকলে অপরকে কী করে সেবা করব বলো? তুমি তোমার শরীরের প্রতি অবহেলা কোরো না, তুমি নাবিক, বিদেশ-বিভুঁইয়ে তোমার বাস।

শেষ পর্যন্ত লিলি আবার বলল, ছিঃ ছিঃ, এতক্ষণ মোবারককে দাঁড় করিয়ে রাখলাম. এসো, বসো। কফি খাবে? লিজেন, যা তো কিচেন থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে আয়।

মোবারক বলল চেয়ারটায় বসে, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না তো?

দিচ্ছি দিচ্ছি। এলে যখন একটু বসো। পরিচয় আর কী করবে? পরিচয় তো এদের তোমায় দিয়েই দিয়েছি। আমরা এখানে সবাই সিস্টার। আর তোমার পরিচয়। সে খবর তারা কালই জেনেছে।

বলে সে সাদা ভেলভেটে আবৃত একটি তাকের প্রতি চাইল। অর্থাৎ ওর অন্তরালে ভায়োলিনটা চুপ করে যেন উঁকি দিয়ে মোবারককে দেখছে। বলল, ভায়োলিনের তারটা জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

মোবারক বলল, হাতটাও আমার সেরে গেছে।

লিলি এই সময়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে প্রায় প্রত্যেককে একটা একটা দিয়ে নিজেও একটা ধরাল। মোবারক ধোঁয়া টেনে বলল, তোমাদের এ কাঠের ঘরগুলো সত্যি সুন্দব। আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমার যে এখন উঠতে হয়। একটু পিকাকোরা পার্কে যাব ভাবছি।

সে যাবে, আমিও না-হয় সঙ্গে যাব।

তোমার সাড়ে-আটটায় আবার প্রোগ্রাম যে।

সাড়ে-আটটা বাজতে এখনও বেশ দেরি।

ঘরের ভিতর দুটো লোহার খাট। খাটে সাদা তকতকে চাদরের নিভাঁজ আস্তর। ছিমছাম ঘরের চেহারা। ঘরের সবুজ দেয়ালে সারি সারি ফটো। বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। পরের ছবিটা জিশুর কবর হতে পুনরাবির্ভাবের।

মোবারক শেষে ইলেকট্রিক হিটারের পাশে টিপয়টার দিকে তাকাল। টিপয়ের উপর নীল ভেলভেটের ঢাকনা। উপরে তার কাচ-ঘেরা আলোঘর, বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকতম উৎকৃষ্ট বাতি। এবং পাশেই দেয়ালে ঝুলছে একটি বড় লাল ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারটার গতকালের তারিখের উপর একটি লাল ক্রশের দাগ। মোবারক সেটা দেখল খুব হিসেব করে যেন—বড্ড সূক্ষ্ম হিসেবে দেখল।

কফি এল এক কাপ। কফি লিজেনই পরিবেশন করল মোবারককে। লিলি তার কোমরের সাদা অ্যাপ্রনটা খুলে রেখে বলল, পিকাকোরা পার্কের পথ এদিক দিয়ে সহজ, সে তোমায় কে বলেছে?

জাহাজের একজন উইনচ-ড্রাইভার।

প্রত্যেকেই ছোট ছোট কাপে কফি পান করছে আর শুনছে মোবারকের কথা। দেখছে মোবারকের অস্বাভাবিক দীর্ঘ দেহ, ওর গায়ের রং, ওর দেহের অপূর্ব বাঙালি চেহারার ঢং।

লিলি হিটারটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, তোমার দেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের মাউরিদের চেহারায় বেশ একটা মিল আছে। শুধু শরীরের দিক থেকে আমরা তোমাদের চাইতে একটু খাটো।

মোবারক হঠাৎ হেসে বলল, আর তোমাকে যদি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া যেত তবে বাঙালি ঘরের লক্ষ্মীমেয়ের মতো দেখাত।

একসঙ্গে সেই একঝাঁক মেয়ে ওর দিকে ঝুঁকে বলল, তোমাদের দেশের মেয়েরা শাড়ি পরে, তাই না মোবারক?

শাড়ি পরলে দেখতে কেমন লাগে?— শেষ প্রশ্নটা করল লিজেন।

মোবারক কফিটুকু শেষ করে লিজেনের হাতে কাপ দিয়ে বলল, বাঙালির মতো লাগে, ভারতীয়ের মতো মনে হয়।

তারপর সে সক্রেটিসের ছবিটার প্রতি আর-একবার চেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে পা বাড়াতে চাইল সামনের চত্বরটার প্রতি। কিন্তু লিলি বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব। পিকাকোরা পার্ক ঘুরে সব দেখিয়ে শুনিয়ে তারপর না-হয় একসঙ্গেই সি-ম্যানস মিশনে যাওয়া যাবে। কোনও আপত্তি থাকবে না আশা করি।

মোবারক বারান্দায় নেমে লিলির জন্য অপেক্ষা করল। বলল, নিশ্চয়ই না। আপত্তি থাকার মতো কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না, বিশেষত যতক্ষণ তোমার দেশে আছি।

একসময়ে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে এল লিলি আর মোবারক। লিলির পোশাকে নিখুঁত পারিপাট্য—নীল ডোরা-কাটা স্কার্ট, রক্তলাল ফুল ছাপের ব্লাউজ, কাঁধে ঝুলানো ফারের ঘি-রঙের কোট, মাথায় ধূসর পালকের টুপি। জুতোর হিলদুটো ওর নিতম্বকে খাড়া করে রেখেছে।

এই পাহাড় আর সামনের একটি সংকীর্ণ উপত্যকা পার হলেই পিকাকোরা পার্ক। পার্কের নামডাক প্রচুর। নিউজিল্যান্ডে কোনও বিদেশি গেলে প্রথমেই কোনও দর্শনীয় বস্তু হিসাবে পিকাকোরা পার্কের নাম উল্লেখ করা হয়। মোবারক সেই পার্ক দেখতে যাচ্ছে।

পথে লিলি মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পিকাকোরার উপর করে ফেলেছিল। ওরা কোথায় বসে একটু বিশ্রাম করবে, কোন গাছটা দু'হাজার বছরের, ঝিলের উপর ক'টা স্কিপ, স্কিপগুলো ভাড়া করে বেড়াবে কি বেড়াবে না নৌকাবিলাসে কত খরচ তারই মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে করতে একসময় উপত্যকাটা পার হয়ে এল।

লিলি বলেছে, এমন পার্ক হয়তো তুমি কোথাও দেখতে পাবে না।

মোবারক উত্তর না করে শুধু হেঁটে হেঁটে গেছে।

পিকাকোরায় ঢুকে তার মনে হল, তার দেশের পার্বত্য অঞ্চলের অযত্নে বর্ধিত অবিন্যস্ত বন। কোথাও তার সংকীর্ণ পথ আছে। কোথাও পথের নিশানা নেই। বিরাট বিরাট কৌরি পাইনের তলায় হাজারও আগাছা, আগাছার বুকে নীল হলুদ ফুল, ফুলের গন্ধে নেশাগ্রস্ত হয়ে যেন মেয়েটা মোবারকের হাত ধরে চলেছে। সেই বনভূমিতে দশ গজ অন্তর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে বিংশ শতাব্দীকে সজাগ করে রেখেছে।

আগাছার মাথা ভেঙে মোবারক আর লিলির পথ করে চলেছে। জোড়ায় জোড়ায় অমন কত মানুষ রাতের নিভৃতে বন্য প্রেমে মশগুল। ওরা বিচিত্র রকমের আলাপ করছে বন্য ছায়ার অলিতে গলিতে। মোবারক আর লিলি ওদের প্রতি চোখ না তুলে সেই ছোট্ট ঝিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ঝিলের উত্তর তীর ধরে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। ছোট ছোট স্কিপ কিনারায় বাঁধা। উত্তর তীরেই রয়েছে রেস্টরুম। বারান্দায় রয়েছে গোল টেবিল। ওখানে ক'জন সাহেব-মেম বসে গল্পগুজব করছেন আর বোতলের মদ গলায় ঢালছেন। নীচে বৃত্তের মতো গোল করা শৌখিন বাগান। বাগানে মৌসুমি ফুলের চাষের জন্য মাটিগুলোকে ভুরভুরে করে রাখা হয়েছে।

মোবারক আর লিলি বসল সিঁড়ির বুকে, স্কিপের উপর একটা পা রেখে।

লিলি ছোট স্কিপটার গলুইয়ে পা নাচিয়ে বলল, চলো না মোবারক, স্কিপে সামনের পাহাড়টায় ঘুরে আসি। বেশ আনন্দ পাবে।

মোবারক বলল, আজ না, আর-একদিন।

শেষে বলল, এই তোমার পিকাকোরা পার্ক।

কেন তোমার ভাল লাগেনি।

সে কথা বলেছি?

তবে?

রাতে ঘোরার পক্ষে এ নেহাত মন্দ জায়গা নয়।

এর অর্থ?

অর্থ সহজ। কোনও জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। আমার দেশে এমন জঙ্গলে রাতের বেলায় ঘুরতে হলে খুব বিপদ হতে পারে।

তোমার দেশ বিচিত্র।

লিলি ঝিলের পাড় ধরে যাবার সময় বলল, আমার যেতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু এখন না গেলে সাড়ে-আটটার প্রোগ্রাম ধরতে পারব না। তুমিও চলো সঙ্গে।

পার্কটা আর-একটু ঘুরে দেখব ভাবছিলাম।

আজ চলো। কাল দেখবে। আমিও আসব তোমার সঙ্গে।

কী ভেবে মোবারক বলল, বেশ তাই চলো। নয় তো আবার কোথায় জঙ্গলে হারিয়ে যাব, তারপর আর হয়তো খুঁজেই পাবে না।

লিলি হাসল। মোবারকও হাসল। পিকাকোরা পার্কের শেষ মাথায় এসে মোবারক পুনরায় বাঁশিটা বের করল প্যান্টের পকেট থেকে। এখান থেকে শহর আরম্ভ।

লিলি মোবারকের ডান হাতটা নিজের নরম হাতের ভাঁজে এনে বলল, ফিজ্‌রয়েন ট্রাম ধরব, সময় কম লাগবে আমাদের।

মোবারক দ্রুত হাঁটতে লিলি বলল, একটু আস্তে চলো, তোমার সঙ্গে হেঁটে যে পারছি না।

এসো। আস্তেই হাঁটছি। ওখানটায় কী হবে? অনেক লোকজন কাজ করছে একসঙ্গে। একটি মাঠের দিকে নির্দেশ করে মোবারক প্রশ্ন করল লিলিকে।

কুইন এলিজাবেথ কমনওয়েলথ ট্যুরে এখানটায় আসছেন।

কবে?

তা প্রায় ধরো আরও একমাস।

এত আগে থেকে!

অনেক খরচপত্তর হবে। গোটা শহরটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলবে, তাই এত আগে থেকে প্রস্তুতি। শহরের কোনও খুঁত যেন অতিথির চোখে ধরা না পড়ে।

কুইনকে হয়তো দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না।

কেন, কেন?

তার আগেই হয়তো জাহাজ ছেড়ে দেবে।

তার আগেই দেবে!

কথা বলতে যেয়ে লিলির গলাটা হঠাৎ খুব ভারী হয়ে উঠল। চলতে চলতে আবার সে বলল, আচ্ছা মোবারক, এই যে দু'দিনের পরিচয় আমাদের সঙ্গে তোমাদের হয়, তোমরা যখন চলে যাও তখন কষ্ট হয় না?

এমন একটা প্রশ্ন লিলির, যার সহজ এবং সত্য উত্তর হয় না। তবু মোবারক অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, হয় এবং সহ্যও করতে হয় তা। তার জন্যই আমরা জাহাজি, আমরা নাবিক। পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে আমাদের এমন ঘটে। তার জন্য তোমাকে দেখার সঙ্গে কত মেয়ের মুখ যে মনে পড়ে। উইলিয়ামের স্ত্রীকে মনে পড়ে, এডিস-ডি-কেলি, ডিয়েনা সকলকে এমনি বন্দরে বন্দরে রেখে এসেছি, জাহাজ ছাড়ার সময় অন্য নাবিকের কেমন হয় বলতে পারি না, আমার কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে তাদের জন্য। তাদের দেখেছি বন্দরে দাঁড়িয়ে জাহাজ ছাড়ার সময় হাতের রুমাল উড়িয়ে দিতে। আমাকে অভিনন্দন জানাত দুটো হাত নেড়ে। বলত, আবার যখন আসবে আমাকে চিঠি দিয়ে আসবে কিন্তু। তোমার জন্য আমি জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করব। এমন অনেক বন্দর আছে পৃথিবীর, দ্বিতীয় বার যেখানে হয়তো আমার আর যাওয়াই হবে না।

কথা শেষ করে মোবারক মাউথ-অর্গান বাজাল। নিজের দুঃখ ঢেকে রাখার জন্য ছুটে নেমে গেল। লিলিকে ছুটে ছুটেই প্রায় আসতে হয়েছিল সেই সময়।

ট্রামে উঠে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে লিলি। ট্রামের যাত্রীরা মোবারককে তখন দেখছে। দৃষ্টিতে বিস্ময়। ওকে খুঁটে খুঁটে নিরীক্ষণ করছে। এমনকী দু'-একজন উঠে ওর কাছে এসে বসল। শুধাল, নাম? দেশ? কী করা হয়?

মোবারক মোটামুটি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল একেবারে। লিলি মাঝে মাঝে বাইরে আঙুল দেখিয়ে বলছে ওকে—এটার নাম এই, পথের নাম এই, এখানে পোস্টাপিস আছে,

দূবেব ওই যে বাড়িটা দেখছ ওটা কলেজ, এটা মিউজিয়াম। একদিন তোমায় সব দেখিয়ে নিয়ে যাব।

মোবাবক কখনও শুনছে কখনও শোনেনি। কখনও বাঁশি বাজানোব শখ জন্মেছিল ওর। কিন্তু এই একদল যাত্রীব সামনে সে কেমন লজ্জিত, কুণ্ঠিত এবং সংকুচিত। তাই সে লিলিব পাশে আবও ঘেঁষে বসল। লিলি যেন সমস্ত বিপদে তাব সহায়।

মোবাবক ট্রামেব জানালায় মুখ বেখেছে। ট্রামেব গতিব সঙ্গে ফিজবয় আর লিলিব জগৎকে অতিক্রম কবে সে বিচবণ করছে তাব নিজেব জগতে, সেখানে বয়েছে তাব বাপজি, আম্মাজান, নানা জসীমউদ্দিন সাবেং, জৈনব খাতুন। পৃথিবীব ভাল কিছু দেখলেই মনে হয়, ওব শামীনগড়, শামীনগড়েব মাঠ তাব সড়ক, কাঠেব পুল, কর্ণফুলিব বাঁওড়। বন্দবেব অপবাধ-প্রবণ জীবনটা দেখলেও মনে হয় বাপজি আম্মাজান—। অথচ শামীনগড়েব জগৎ স্মরণেব সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখদুটো ক্লান্ত, অসহায় এবং নালিশ জানাবাব একান্ত আগ্রহ জন্মে। কিন্তু কাউকে বলতে পাবল না বলে, কাউকে তাব বিগত জীবনেব ইতিহাসটা প্রকাশ কবা হয়ে ওঠেনি বলে বিষকুম্ভেব মতো সে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছে আত্ম-যন্ত্রণায়। এই যন্ত্রণা ভুলে থাকাব জন্যে সে ভালবেসেছে তাব বাঁশিটাকে আব শঙ্খচূড় সাপটাকে। যখন মনেব ভিতব সমস্ত পৃথিবীকে বেইমান বলে মনে হয় তখনই ব্যাগ থেকে সাপটাকে টেনে বাব কবে এবং ডেকেব উপব কিংবা বন্দবেব পথে সাপ নাচিয়ে নিজেব যন্ত্রণা ভুলে থাকাব চেষ্টা কবে। অথচ শেখব তা বুঝল না।

ফিজবয় অতিক্রম কবে ট্রামটা ডান দিকে বাঁক ঘুবল। তাবপব সামনেব দিকে অর্থাৎ সি ম্যানস মিশনেব প্রতি। নীচে বেলাভূমি। কার্নিভালেব খালি দোকান-পাট এবং উপবেব দু' চারটা অসংলগ্ন কাঠেব ঘব, ঘবেব জানালায় বিদেশিনীব মুখ, মেঝেব উপব দু'-একটি ফুটফুটে ছেলেব দৌবাত্ম্য। শিশুদেব দেখলে মোবাবক হাসে, নিজেব জগতে ফিবে আসাব পথ খুঁজে পায়? সে প্রশ্ন কবল তাই লিলিকে, তোমাদেব বাড়ি কি নর্থ আয়াবল্যান্ডে?

একথা কেন মোবাবক?

হস্টেলে থাকো বলে বলছি।

ফিজবয়ে আমাব বাড়ি। সেখানে মা আছেন।

বাবা?

নেই, আমাব শিশুবয়সেই তাঁব মৃত্যু হয়।

মোবাবক লিলিব কথা শুনেও অপলক লিলিকে দেখল। উত্তবটা ওব কাছে বেখাপ্পা ঠেকছে। মা আছেন বাবা নেই। শিশুবয়সে তাঁব মৃত্যু হয়। মোবাবক বলল, তিনি আবাব বিয়ে কবেছেন নিশ্চয়ই।

না, বিয়ে তিনি আব কবেননি। কববেন না। আমাব মাকে দেখলে তুমি সে কথা বিশ্বাস কবতে পাববে।

সেখানে তোমাব ছোট ভাই কিংবা অন্য কেউ আছে?

একমাত্র আমিই তাঁদেব সন্তান। তুমি যাবে আমাদেব বাড়িতে? চলো না কাল। তোমার সঙ্গে পবিচিত হতে পাবলে মা খুব খুশি হবেন।

মোবাবক চুপ কবে থাকল। আম্মাজানকে মনে পড়ছে। শামীনগড়ের সড়ক পাব হয়ে টিনকাঠের ঘব, আম্মাজানেব আয়ত চোখ আব নাকেব সরু নথটা বাঁশপাতার মতো কেঁপে কেঁপে কীসেব ইশারা দিচ্ছে যেন।

মোবাবকেব একবাশ লোমে আবৃত হাতেব কব্জিতে লিলি নিজের নবম আঙুলগুলি স্পর্শ করে কবে বলছে তখন, যাবে তো কাল? চলো না, মা খুব খুশি হবেন।

মোবাবক তেমনি মুখ বেখেছে জানালায়। সি-ম্যানস মিশনের দিকে গাড়িটা কত জোবে ছুটেছে তাই যেন মুখ বাড়িয়ে দেখছে। শীতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার ভিতরও ওর কপাল ঘামছে।

লিলি বলল, তোমায় আমি নিয়ে যাব কাল।

না না, নিয়ে যেতে হবে না। মোবারক চিৎকার করতে যেয়েও কেমন নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত করে নিল এবং লিলিব মুখ থেকে চোখ নামিয়ে ট্রামের সমস্ত মেয়ে-পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দিতেই দেখল সবাই

হাঁ করে চেয়ে আছে, ওর ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আর দৃঢ় বলিষ্ঠ মুখের বিকৃত রূপের কোনও সুপ্ত আত্মচিন্তার কথা ওরা সন্তর্পণে শুনছে।

এমন সময় লিলি কথার মোড় ফিরিয়ে বলল, মোবারক, আমার দেশ তোমার কেমন লাগে?

ভাল। বেশ লাগে।

ইতিমধ্যে ট্রাম ছোট ছোট দুটো চড়াই-উতরাই অতিক্রম করেছে। বন্দর-পথ এসে মিশেছে চড়াই-উতরাইয়ে। সঙ্গমস্থলে প্রকাণ্ড গেট। ছাদে তার একটি ক্রাউন, কাগজ আর ইলেকট্রিক ভাল্বে তৈরি। ক্রাউনের দু' পাশে দুটো প্রকাণ্ড পিচবোর্ডের সিংহ থাবা উঁচিয়ে জাহাজগুলোকে যেন দেখছে। কুইন এলিজাবেথ আসছেন, প্রথমে তিনি এই সদর দরজা দিয়ে বন্দর-পথে শহরে ঢুকবেন। তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে এই সব করা হয়েছে।

লিলি সিংহদুটো দেখে প্রশ্ন করল, মোবারক, তোমার দেশে সিংহ পাওয়া যায়। তুমি সিংহ দেখেছ?

দেখেছি।

বাঘ?

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, দয়া করে তারা এসে মাঝে মাঝে আমাদের অঞ্চলে উপদ্রব করত। সুতরাং বাঘ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই প্রায় বাঘ শিকার করতে যেতে হত।

তারপর?

তারপর মোবারক তার নিজের জীবনের এক আশ্চর্য বাঘশিকারের কাহিনি লিলিকে বলল, ট্রামের মেয়ে-পুরুষেরা পর্যন্ত শুধু আশ্চর্য হল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছু যেন বলল।

লিলি সে সময় প্রশ্ন করল, সত্যি বলছ?

মোবারক মিথ্যা বলে না।— বলে কোট খুলে ফেলল এক টানে, প্যান্টের ভিতর থেকে জামাটা টেনে তুলে দেখাল পিঠের ক্ষতস্থানটি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রামের মেয়ে পুরুষেরা সব এসে ঝুঁকে পড়েছে ওর পিঠের ওপর। দেখছে বিস্ময়-ভরা দুটো চোখে মোবারকের পিঠে এক আঁজলা মাংস নেই।

লিলি তাড়াতাড়ি ওর জামা টেনে পিঠটা ঢেকে দিল। বলল, তুমি আশ্চর্য মোবারক। তোমাকে তার জন্য পিঠ খুলে নজির দিতে বলিনি।

মোবারক সেই শুনে কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আবার তাকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছে।

লিলি হেসে বলল, হয়েছে থাক, অমন করে চেয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু দেখবে নামার সময়, হুঁশিয়ার হয়ে নামবে, মাথা যেন ছাদে না ঠেকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটবার ঘটল। মোবারককে নামবার আগে অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে হয়েছে। এবং সতর্ক হয়ে বেঞ্চ থেকে না উঠার জন্য ওর মাথাটা ধাক্কা খেয়েছে রডে। রডের জয়েন্ট ছুটে গেল। মোবারক চেয়েছে ফ্যাল ফ্যাল করে আবার। ওর নরম মন লজ্জিত হল। ওর বেহুঁশের জন্য এমন হয়েছে। তাই বলল কনডাক্টরের প্রতি, আমি এর খেসারত দিচ্ছি। দয়া করে আপনি নিন। আমার অপরাধ হয়েছে।

লিলি দু' হাতে ওর মাথাটা কাছে টেনে বলল, দেখি দেখি, আগেই বলেছি এমনটা হবে। আমার কথা তো তখন খেয়াল করলে না।

না না, তেমন কিছু হয়নি। তুমি আমায় বিশ্বাস করো।— কনডাক্টরের প্রতি আবার চেয়ে বলল, আমার খেসারতটা? পাউন্ড তিনেক দিলে নিশ্চয়ই চলবে।

কনডাক্টর হেসে উঠল। বলল, ধন্যবাদ। পাউন্ড তিনেক দিয়ে ডাক্তার দেখানো হোক। মাথায় আপনার নিশ্চয়ই চোট লেগেছে। অপরাধ কোম্পানির, রডটা আরও উপরে ঝুলানো উচিত।

আমার কিন্তু তেমন কিছু হয়নি।— বলে সে কনডাক্টরের প্রতি পিঠের আঘাত দেখানোর মতো মাথা দেখাবার প্রচেষ্টা করতে গেলে লিলি তার হাত টেনে বলল, এসো নামবে। আমরা এসে গেছি মিশনে।

মোবারক সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় শুনল কথাটা। লিলি কথাটা শুনে মোবারকের প্রতি আকৃষ্ট

হল আরও তীব্রভাবে। ট্রামের মেয়ে-পুরুষরা বলছে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়, ইন্ডিয়ান, এ ম্যান অফ মিস্টিক ল্যান্ড।

মোবারক ফিরছে জাহাজে। একা। শেখর আজ সি-ম্যানস মিশনে যায়নি, নিশ্চয়ই এখন সে বাংকে শুয়ে বই পড়ছে ফিরিঙ্গিদের। বিদেশ-বন্দরে নেমেই ওর ফিরিঙ্গিদের বই কেনার বাতিক। সফরের অর্ধেক পয়সা বই কেনার পেছনে খরচ করছে। বড় মালোম থেকে জাহাজের সব অফিসারগুষ্টি ওর কাছ থেকে বই চেয়ে নেয়। পড়ে। আবার ফিরিয়ে দেয়।

মোবারক কাঠের সিঁড়ি ধরে ডেক-এ উঠছে। গ্যাংওয়েতে ঝিমোচ্ছে কোয়ার্টার-মাস্টার। একগাল দাড়ি আর ভুরুর ভিতর চোখদুটো ওর জুতোর শব্দে সজাগ হল। একটু নড়েচড়ে বসল। আল্লা আল্লা করে মুখের কাছে তুড়ি দিল হাতে।

মোবারক বলল, চাচার ঘুম পাচ্ছে।

হাঁ রে বাজান, বুড়া জানে আর সহ্য হয় না।

জাহাজে কারও সাড়া শব্দ নেই। ফলকায়-ফলকায় ইতস্তত আলো জ্বলছে। ফলকার উপর কাঠ বিছানো। তারপরে ত্রিপল বিছানো। কিনারায় লোহার পাত খিল-আঁটা। আগামী দশ দিনের মতো জাহাজের মাল-খালাস বন্ধ। ক্রিসমাস-ডে। তাই কোনও শ্রমিকই কাজ করছে না বন্দরে। বন্দরে ক্রেনগুলো জাহাজে ছায়া ফেলে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলকার সমান্তরাল করে ফুট দুই উপরে ডেরিকগুলো পাতা। উইনচ মেশিনের উপর দিয়ে দুটো ছায়া গেছে বয় কেবিন পর্যন্ত। সে দুটো ডেরিকের ছায়া।

মোবারক দাঁড়াল ডেক-এ। বন্দর জুড়ে হালকা কুয়াশার রং দেখল। ব্রিজের দু'উইংস-এ কোনও আলো জ্বলছে না। ইঞ্জিন-রুম থেকে ব্যালেস্ট পাম্পের খট খট বিকৃত শব্দ কানে বাজছে শুধু।

সে ডেক পার হল। গ্যালি অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নীচে নামল। স্টারবোর্ড আর পোর্ট সাইডের ভিতর কোনও কেবিনেই যেন কোনও শব্দ উঠছে না।

সিঁড়ির শেষ ধাপের পোর্ট-সাইডের আলো নেভানো। পথ অন্ধকার। কেবিনে ঢুকতে সন্তর্পণে পা ফেলছে মোবারক।

শেষ কেবিন থেকে একটি আশ্চর্য সুর তিন নম্বর কেবিনে ভেসে এল। নিশ্চয়ই এত রাত্রে কেউ কোরান পড়ছে বাংকে। যেমন শেখর বই পড়ছে বুকে কম্বল টেনে দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে আরও দু'-একটি পায়ের শব্দ কানে এল মোবারকের। সে কেবিনের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিতেই চোখ ঝলসে উঠল ওর। ডেক জাহাজি বড় টিন্ডাল একটি মাউরি মেয়েকে ধরে এনেছে রাতযাপনের জন্য।

বড়-টিন্ডাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে কেমন অলস পা ফেলে। সে মদ টেনেছে প্রচুর। মেয়েটাকে জড়িয়ে সে তার কেবিনে ঢুকে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে স্তিমিত গোঙানি মোবারকের কানে ভেসে আসছে। সে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল শেখরের মুখের উপর বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুটো হাতই হিমে শীতল। কম্বলটা টেনে দিল বুক থেকে গলা পর্যন্ত। মুখ থেকে বইটা তুলে বাংকের ফাঁক দিয়ে পড়ে থাকা দুটো হাত তুলে এনে কম্বলের নীচে রাখল। তারপর লকার খুলে প্রতিদিনের মতো খানা বের করে বাংকের উপরে বসল। নুনের পট শেখর নীচে লকারের এক কোনায় রেখে দিয়েছে। সে থালায় দেখল দুটো মাছভাজা রয়েছে। একেবারে সমান ভাগ। চারটে স্যালমনের দুটো ওর জন্য ভেজেছে।

পরিমিত হাসি মোবারকের ঠোঁটে। ভাত খেতে খেতে শেখরের প্রতি চোখ তুলে দেখছে, দুটো চোখে ওর গভীর ঘুম। এমন ঘুম মোবারকেরও এককালে ছিল। শামীনগড়ে ছোট্ট এক উঠোনে যখন রাঙা মোরগ ডেকে উঠত, এক ঝাঁক শালিখ ঠোঁট গুঁজে কিচ কিচ করত কামরাঙা গাছে, যখন আম্মাজান ভোরের আহ্বান শুনতেন গাঁয়ের মসজিদে তখনই তিনি ডাকতেন, মোবারক ওঠ। মবু আমার ওঠরে। ভোর যে হল।—যখন রোদ কামরাঙা গাছের ছায়া উঠোনে ফেলত তখনও ডাকতেন তিনি, মবু, বাপ তুই আমার এখনও ঘুম থেকে উঠলি না! বেলা যে অনেক হল, ওঠ, উঠে পড়তে বোস। তোর

বাপজি সফর থেকে ফিরে যখন শোনবেন তুই পড়িস না, তখন যে তিনি দুঃখ পাবেন।

শেখরের মুখ অত্যন্ত নিষ্পাপ ঠেকে। তবু ইদানীং সে বলে, মোবারক, আর পারছি না। কতকাল হল যেন দেশ ছেড়ে এসেছি। আঠারো মাস সফরে বিরক্ত হয়ে গেছি। কী হবে, কবে যাব কিছুই তোরা বলতে পারছিস না।

সে কী বলবে। সে কি জানে জাহাজের পরবর্তী সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে! ক্যাপ্টেন নিজেও হয়তো বলতে পারবে না। সে খবর শুধু দিতে পারে কোম্পানির এজেন্ট-অফিস। কিন্তু অফিসে আজও লোক গেছে, অথচ কোনও খবর নেই।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও মোবারক বসে থাকে। ঘুমের জন্য বসে থাকে। শরীরটা বসে বসে ক্লান্ত না হলে ওর ঘুম আসে না। অনেক সমস্যা এই জাহাজির। লিলি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার পাহাড়-ছাদে স্কুল-হস্টেলে ফিরে গেছে। শেখরের মতোই হয়তো তার ঘরের মেয়ে লিজেন পেতে রেখেছে বিছানা। সাদা ধবধবে বিছানায় লিলিরা এখন শুয়ে পড়বে।

দেশের মেয়ে জৈনব খাতুন বলেছে এককালে, নে না। নিয়ে দ্যাখ না হাতে, বাপজি কেমন চিজ ধরে এনেছে কর্ণফুলির বাঁওড়ের ভাঙন থেকে। ভয় নেই, ভয় কীরে! বিষদাঁত ওর ভেঙে দিয়েছি। তোর হাতে বনজ বাঁধা। ডর কীসের তবে?

ডর নেই বলছিস?—অন্ধকারে জৈনব খাতুনের মাথার উপর মুখ রেখে বলেছে। ওর চুলের সোঁদা গন্ধ মোবারকের নাকে কত বছর পরে এখনও যেন ঝাঁঝ দেয়। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বলত অন্ধকারে, নে ধর। তোর আর আমার সাদির রাতে ওকে মাঝখানে পাশবালিশের মতো শুইয়ে দেব। ছোবল দেবে তোরে আর আমারে। ছোবল নয়, চুমো খাবে।

মোবারকরা সাতপুরুষ নাবিক।

জৈনব খাতুনরা সাতপুরুষ বেদে। ওরা ঘর-বেদে। ওর বাপজি ওঝা। সাপের মন্ত্র পড়ে, বিষদাঁত উপড়ে দেয় সাপের। সাপে-কাটা মড়ার বিষ নামায় মা মনসার উপর খিস্তি করে। খিস্তি করা ওদের স্বভাব। সে স্বভাব জৈনব খাতুনকেও পেয়ে বসেছিল।

দুটো বাড়ি। একটি হরীতকী গাছ বাড়িদুটোর সীমানা। সে গাছের ছায়ায় দু'জনে একত্র হত রাত্রে। কত কথা হত দু'জনে। সাদির পর ওরা কে কাকে প্রথম বুকে টানবে সেই নিয়ে কথা হত। এ ব্যাপারে মোবারকের লজ্জা ছিল, কিন্তু জৈনব খাতুন কেমন নির্লজ্জ আর স্বাভাবিক। জৈনব জেনেছে ছোট বয়স থেকে সাদি ওর মোবারকের সঙ্গে হবে। আম্মাজান বলতেন, তোর বাপজিরও এই ইচ্ছা ছিল।

এক টুকরো গভীর অন্ধকার। হরীতকীর ছায়া পার হলে অন্ধকার ধূসর। সে অন্ধকারে পথ চেনা যায়। সামনাসামনি এলে লোক চেনা যায়, পথে কিছু পড়ে থাকলেও অনায়াসে সমঝে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু গভীর অন্ধকারে জৈনবের দেহ ছিল ছায়াশূন্য। শুধু ওর ফিস ফিস কথাগুলো মোবারকের কানে আসত। শামীনগড়ের গ্রাম তখন ঘুমিয়ে থাকত। শুধু কর্ণফুলির বাঁওড়ে মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ত মিশনারিদের চার্চে, ঘণ্টার শব্দ হত ঢং ঢং। মোবারক বলত তখন, রাত অনেক হল।

জৈনব খাতুন বলেছে, ভারী একটা রাত রে আমার! এখন রাত না জাগতে পারলে সাদির পর রাত জাগবি কী করে? তখন যে তোরে ঘুমুতে দিচ্ছি না রে মবু। তুই যে আমার দিলের সব দুনিয়া জুড়ে পড়ে আছিস।

তারপর দু'জন ফিরত দুই বিপরীতমুখো ঘরে। মোবারক পায়ে পায়ে হেঁটে আসত। দরজা খুলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে আম্মাজানের পাশে শুয়ে ভাবত, জৈনব ঘরে ফিরেছে, এখন হয়তো শুয়ে পড়েছে নিজের লাল কাঁথার বিছানায়। নিশ্চয়ই সে ঘুম যাচ্ছে খুব। সে এককাল ছিল বটে। ঘুমে ক্লান্ত। বিছানা ছাড়তে দুঃখ। আম্মাজান কেবল ডেকে ডেকে সারা হতেন, ওরে মবু ওঠ, কত আর ঘুমুবি।

তেমন ঘুম আর চোখদুটো এখন ঘুমোয় না, গভীর ঘুম চোখ থেকে নাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরে দাঁড়িয়েছে। কোনও হালকা আওয়াজ পেলেই অবচেতন মন যেন বলে, না, আর ঘুম নয়। মাঝে মাঝে মোবারকের ভয় হয়, ঘুম যদি রাতের অন্ধকারে চিরদিনের জন্য বিদায় চায়? তখন? তখন কী হবে! নিশ্চয় শেখর তিরস্কার করবে, করুক, সে তো বুঝবে না সব। মোবারক মাটির গন্ধ ছেড়ে কেন জাহাজি হল, জাহাজি জীবনে কী করে তীব্র অনুশোচনায় এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধের যন্ত্রণায় সে জ্বলছে—শেখর

একটু ভেবে যদি কোনও প্রশ্ন করে একবার বলত, মাঝে মাঝে তুই সহসা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কী ভাবিস বল তো মোবাবক? তা সে বলেনি, ওব কথায় শুধু শাসন, নতুবা করুণা। দবদ কিংবা আন্তরিকতা দিয়ে সে কোনওদিন প্রশ্ন কবতে পাবল না মোবাবককে।

লকাবেব এক কোণে লেদাব ব্যাগে শঙ্খচূড়। ব্যাগেব দ্বিতীয় ভাঁজে বাবো ফিটেব লম্বা সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে হিস হিস কবছে, সর্পভুক সাপ খানা খেতে চায়, গোমাংস দিনেব পব দিন খেয়ে ওব অরুচি ধবেছে।

মোবাবক বাংক থেকে উঠে দু' টুকবো গোমাংস ব্যাগেব ভিতব ঠেলে দিল। তাবপব ব্যাগেব মুখ বন্ধ কবে বাংকে বসতেই মনে হল প্রথম যেদিন বাতে ওকে সাপটা দেখিয়ে জৈনব খাতুন হবীতকীব ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, দেখেছিস শঙ্খচুড়েব বাচ্চাটাব কেমন হলুদ বং?

মোবাবক বলেছে, তোব গায়েব মতো।

পেটেব দিকটা দেখেছিস কেমন সাদা?

অর্থাৎ আমাব মতো বং ওব।

মোবাবক নুয়ে অন্ধকাবে সাপেব উপব সন্তর্পণে হাত চালিয়ে বলত, বাচ্চা বলে, দেখবি এটা নিশ্চয়ই পোষ মানবে।

পোষ মানবে ঠিক তোব মতো, তুই যেমন আমাব পোষ মেনেছিস। তাবপব হঠাৎ আবার মোবাবকেব হাত টেনে বলত, জৈনব, তুই এটা নিবি। বাচ্চা আছে, তুই তো বাপজিকে একটা সাপেব জন্য কত বলেছিস' কিন্তু দেয়নি' ভয়ে দেয়নি, কোনওদিন বিষ-দাঁত উঠে আবাব কামড়ে দেবে সেই ভয়ে। আমি তোকে পোষ মানিয়েছি, তুই এটাকে পোষ মানা, দেখি তোব কত মুবোদ।

মোবাবক হবীতকী গাছেব অন্ধকাবে ফিস ফিস কবে বলেছে, তোব বাপজি বাগ কববে না তো?

না বে, না। বলব ঝাঁপি খুলে সাপটা কোথায় যে গেল'

কিন্তু আম্মাকে না বললে যে চলে না।—ততোধিক সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিয়েছে মোবাবক।

তাহলে আম্মাকে বল, বুঝলি' কাল বাতে না হয় আবাব আসব এই অন্ধকাবে। বলবি কিন্তু, বুঝলি' তুই বাপজিকে বোজ বোজ সাপেব জন্য জ্বালাতন কবে খাস, একটা সাপ পোষাব শখ তোব, তাই এটা দিচ্ছি। মনে বাখিস স্রেফ কথা বলে দিচ্ছি, এ সাপটা আমাব, বাপজিব কাছ থেকে আজ এটা চেয়ে নিয়েছি। আমাব শখেব জিনিস তোবে দিলাম, আমাব মতো একে ভালবাসবি কিন্তু।

বাংকে মোবাবক তখন কম্বল টেনে শুয়ে পড়েছে। মাথাব উপবে বাতিব বাল্‌বে পাক খাচ্ছে উড়ন্ত তিন-চাবটে পোকা। যেমন এই জাহাজটা আবর্তন কবছে পৃথিবীকে। ওবা পোর্ট-হোল দিয়ে উড়ে এসেছে ভিতবে। ওদেব মৃত্যু আসন্ন।

শঙ্খচুড়েব বং বদলাল অদ্ভুতভাবে। প্রথমে ছিল ওব হলদে রং। দিন যাওয়াব সঙ্গে ওটা বাদামি রঙে বদলে গেল। এখন কালো বং। শীতেব বিষে সাপটা বুঝি জর্জবিত। মাঝে মাঝে সে এখনও রং পাল্টায়। শীতেব বন্দবে একবকম, নিবক্ষরেখীয় অঞ্চলে খয়েবি, আবাব আফ্রিকাব কেপটাউন বন্দবে একেবাবেই যেন সাদা হয়ে গেল। এই পবিবর্তন দেখে জাহাজিবা অবাক হয়েছে, কিন্তু মোবাবক হয়নি। ছ'-সাত সফব ধবে সাপেব বং পাল্টানো দেখে তাব অরুচি ধবেছে এখন।

তাবপব মোবাবক পাশ ফিবে শুয়ে কম্বল টেনে দিল মুখে। স্টাবোর্ড-সাইডের কেবিন থেকে স্টোব-রুমেব বাঁক ঘুবে ভেসে আসছে এখনও একটি স্তিমিত গোঙানি। হয় মেয়েটা গোঙাচ্ছে, নয় তো ডেক-বড-টিন্ডাল। দু'জনেই মদে মাতাল এবং স্থবিব। যখন মেজাজ ফিববে তখন সে নিশ্চয়ই চিৎকার কবতে শুরু কববে, আব মেয়েটা ফাঁক বুঝে বাথরুমে যাবাব নাম কবে ডেক অতিক্রম কবে জেটিতে নেমে পড়বে।

মোবাবক আবাব পাশ ফিবে শুল। কম্বলটা এবার মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। কোনও শব্দ যেন কানে না আসে। তাবপব হাতেব কনুইয়েব ভাঁজ চোখেব উপর বেখে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তা থেকে মুক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল বালিশে মুখ চেপে। ঘুম আসছে না। কাল ববিবাব। কার্নিভাল জমবে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। এইচ জি বুচাবেব মদের দোকানে লিলি অপেক্ষা কববে তার জন্যে। সে যেন খুব তাড়াতাড়ি কাল বেব হয়।

জৈনব খাতুনও দু' বাড়ির সীমানায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করেছিল, কাল আসবি তো! কী রে মবু? আসবি কি না বল?

রোজ এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী হয়?

কেন, তোকে দেখি।

দিনের বেলায় তো কত দেখিস।

সে দেখা আর এ দেখা! তুই কিছু বুঝিস না রে! চুপি চুপি চুরি করে দেখতে তোকে ভাল লাগে। দিনের বেলায় দেখলে মনে হয় তুই বড্ড ভাল মানুষ। ফকির-দরবেশের মতো মনে হয়। তুই আসবি কিন্তু, কেমন? আসবি তো?

মোবারক অন্ধকারে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়েছে।

অন্ধকার বলে দেখতে পায়নি। জৈনব প্রশ্ন করত তাই আবার, কিছু বললি না যে!

আসব রে, আসব।— জৈনবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে উত্তর করত তখন মোবারক।

রবিবারের সকালে জাহাজে সব নাবিকেরই কিছু-না-কিছু কাজ থাকে। ফোকশাল সাফাই তাদের ভিতর অন্যতম। সে সময় বাংকের বিছানা গুটিয়ে আফটার-পিকে তুলতে হয়। বালতি বালতি জল আনতে হয় নীচে, জল ঢালতে হয়। সাবান-জল দিয়ে বালকেডের বিভিন্ন এলোমেলো কালির দাগ, নোংরা মুছে দেওয়ার কাজ নাবিকদের। মেঝেটা ভাল করে ধুয়ে তারপর রং করত হয় তখন। বিছানা রোদে দেওয়ার কাজটাও নাবিকদের ডিউটির মধ্যে ধরা হয়।

ভোরে মোবারক সেই কাজের জন্য এক টব জল নিয়ে নীচে এসেছে। শেখর এনেছে এক বালতি সাবান-জল. নিজেদের কেবিনটা ভাল করে পরিষ্কার করছে তারা। মাঝে মাঝে সারেং উঁকি দিয়ে দেখছে কতটা হল। আর বলছে, জলদি কর রে মিঞা। বাড়িওলার আসার সময় হইয়া গেল।

ব্রিজ থেকে ঠিক দশটায় ক্যাপ্টেন নীচে নামবে। পিছনে থাকবেন বড়-মালোম, তারপব বাটলার। বয়-কেবিন সাফাই সেরে এদিকে আসবেন অর্থাৎ জাহাজেব গলুইয়েব দিকে।

জাহাজের গলুইয়ের স্টাবোর্ড-সাইডে ডেক জাহাজিরা এক সারিতে দাঁড়িয়েছে ঠিক দশটা বাজতে পনেরো মিনিট আগে। পোর্ট-সাইডে ইঞ্জিন-রুমে নাবিকেরা অপেক্ষা করছে সাফাইয়ের জন্য। ইঞ্জিন-সারেঙের আগের মতো ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। একবার গ্যালিতে, একবার মেসরুমে, তারপর বাথরুমে, কেবিনে কেবিনে উঁকি দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও ত্রুটি, কোথাও নোংরা কি একদলা বুড়ো জাহাজির কফ, পোড়া সিগারেটের টুকরো বাংকের কিনারায় কিংবা কোনও অন্ধকারে আড়াল দিচ্ছে কি না, ঘুরে ঘুরে তাও দেখছেন। ক্যাপ্টেন নীচে নেমে কোনও ত্রুটি দেখেন তো নিশ্চয়ই বলবেন, ছ্যারেং ক্লিন মাংতা। এই তিনটি মাত্র শব্দ ক্যাপ্টেনের। সারেং সেই তিনটি মাত্র শব্দেই হাত কচলাতে কচলাতে বলবে, ইয়েস স্যার। আই ক্লিন ডু।

বুড়ো ক্যাপ্টেন গলুইয়ে উঠে এলে সারেং হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলবে, একসারিতে দাঁড়াও রে মিঞার দল।

ক্যাপ্টেনকে কেউ গুডমর্নিং দিল। কেউ সেলাম জানাল।

ক্যাপ্টেন গ্যালিতে ঢুকে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখলেন ভাত, গোস্তের ঝোল, আলুভাজা। কতকটা ঝোল মুখে দিয়ে অনুভব করতে চাইলেন ঝোলের কেমন স্বাদ উঠেছে। নাবিকদের প্রতি চেয়ে বললেন, রান্না খারাপ হচ্ছে কি তোমাদের?

সারেং বলল, নো সাব।

ক্যাপ্টেন খেঁকিয়ে উঠলেন, তোমায় আমি জিজ্ঞেস করছি না সারেং।

সারেং চুপসে গেল। মোবারক বলল, ভাণ্ডারির রান্না ভাল।

ক্যাপ্টেন নীচে নামার আগে ইঞ্জিন-ক্রুদের বাথরুমটা দেখে নিলেন। ইঞ্জিনরুম-টোপাজ সঙ্গে ঢুকেছে এবং সব খুলে দেখাল, কোথাও সে পরিষ্কার করতে ত্রুটি রাখেনি।

তারপর বড়-মালোম, বাটলার, ক্যাপ্টেন নীচে বন্দরের প্রতি রবিবারের মতো আজও টর্চ মেরে

মেবে দেখলেন কেবিনগুলো। পিছনে বয়েছে ইঞ্জিন-রুম সাবেং, শঙ্কিত দৃষ্টি চোখে। কখন ক্যাপ্টেন কী বলে বসেন। কোথায় ত্রুটি দেখিয়ে বলে বসেন, লেজ্জি বাগাব। একদম সুন্থিওয়ালা আছে।

মোবাবক আব শেখর একটু দূবে সরে বেলিং-এব উপর ভব কবে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন মই বেয়ে গলুইয়ের ছাদে উঠছেন। কু-দেব ফ্রেশ-ওয়াটার ট্যাংকে আলো ফেলে দেখলেন ভিতবে ময়লা জমল কি জমল না। তারপর নীচে নামাব সময় শেখবকে একা পেয়ে ক্যাপ্টেন কানেব কাছে মুখ নিয়ে বললেন, অ্যানি গার্ল ইন দি পোর্ট, স্যাখোব?

শেখব সেই সময় মুচকি হেসে মোবাবকেব দিকে সামান্য তাকিয়েছে। বলেছে, নো স্যাব।

ব্যাড ব্যাড। নো গার্ল ইন দি পোর্ট মিনস ইউ আব নট এ সেইলব।

শেখব এবাবও মুচকি হাসল।

মোবাবক হাসছে না। সে উঁকি দিয়ে দূবে এইচ জি বুচাবেব মদেব দোকানেব বাবান্দায় লিলি এসেছে কি না দেখছে। লিলি এলে বাবান্দায় দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই হাত নাড়বে। অথবা পালকেব টুপি উড়িয়ে ইশাবা কবে বলবে, এসো।

দুপুববেলায় পোশাক পবে উপবে উঠে এল মোবাবক। বন্দবেব কোলাহল-মুখরিত জাহাজগুলো একেবাবে নিশ্চুপ। ববিবাব। তার ওপব ক্রিসমাস-ডে। সুতবাং কোনও মানুষজন জাহাজ-ডকে কাজ কবছে না। শুধু একটা মাত্র জাহাজ বন্দর থেকে ধীবে ধীবে সমুদ্রে নামছে। অনেকক্ষণ টানাটানি কবেছে দুটো টাগ-বোট। টাগ-বোটেব মাঝিবা জাহাজটাকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়ে ঘাটে এসে কমাল উড়িয়ে বিদায় নিল। সুতবাং গোটা বন্দবটা নিস্তব্ধ।

অথচ বন্দব-সীমানায় লোহাব বডেব বেড়া অতিক্রম কবে সমুদ্রেব ঠোঁট-ছোঁওয়া বালিব চটানে শহবেব পাহাড়-সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে লোক নেমে আসছে। ওবা জমছে সব কার্নিভালে। কার্নিভালেব খালি দোকানগুলো ভরে উঠেছে। মেয়ে দোকানিবা তাদেব পাবিপাট্য এবং ঝকঝকে পোশাকেব ভিতব কেবল হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আজ থেকে ক্রিসমাস-ডে আবম্ভ।

আবাশে তখন বেশ সোনালি বোদ। নির্মেঘ আকাশ। দিগন্তে শুধু একটি কুয়াশাব ছায়া ঝুলছে। এগমন্ট হিলেব ববফ সোনালি বোদে তখন নাইছে। জেটির কিনাবে কেউ আজ মাছ ধবছে না। ক্রেনেব নীচে তাই কোনও কোলাহল উঠছে না। শুধু দু'-একজন নাবিক এখনও জাহাজ থেকে নেমে যায়নি বলে পোর্ট-হোল দিয়ে দু -একটি আওয়াজ গড়িয়ে পড়ছে বন্দবে।

মোবাবক ডেক-এ এসে আব-একবাব উঁকি দিল। শেখবটা আজও ওর সঙ্গে বের হল না। নীচে কী একটা ইংরেজি পত্রিকায় সে ডুবে বয়েছে। হয়তো যখন বিকেল নামবে বন্দবে তখনই সে তার ইজিচেয়াবটা নিয়ে আসবে ডেক-এ এবং সেখানে বসেই হাজাব মানুষেব ভিড় দেখবে। এবং যেদিন শেখব পথে নামবে সেদিন সে পবিপূর্ণ উজ্জ্বল, বাস্তায় মেয়েদেব ডেকে বলবে, হ্যালো মাই ডার্লিং। মোবাবক বিবক্ত হয়, শাসন কবে এবং সেজন্যই বুঝি শেখব অন্তত আর কিছুদিনেব জন্য জাহাজ থেকে নামে না। শেখব আজও কার্নিভালে যাবাব জন্য জাহাজ থেকে নামল না।

কোয়ার্টাব মাস্টাব যেখানে বসে জাল বুনছে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখল এইচ জি বুচারের মদেব দোকানেব বাবান্দায় লিলি ওব জাহাজেব দিকে চোখ বেখে মোবারকেব জন্য অপেক্ষা করছে। মোবাবককে দেখে সত্যি লিলি ওব পালকের টুপি বাতাসে উড়িয়ে দিল। হাত নেড়ে নেড়ে ওকে ডাকছে।

মোবাবক কাঠেব সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। হাতের লেদাব-ব্যাগটা ওব অলক্ষে অত্যন্ত বেশি ঝুলছে। ব্যাগেব প্রথম ভাঁজে কালকেব কেনা দু'-তিনটি আপেল গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিতরে। মোবাবক মাউথ-অর্গান বাজিয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে। সারা পথে ওর ছায়া যেন নেচে নেচে চলেছে। লোহাব বেড়া যেখানে, বন্দব সীমানা যেখানে শেষ, সেখানে কার্নিভালের কতক ছেলে-ছোকরা রডের ফাঁকে মুখ বেখে ভাবতীয় নাবিকটিকে পরম কৌতূহলে দেখছে। কেউ কেউ বলছে, হ্যালো ইন্ডিয়ান, ম্যু নো ম্যাজিক?

মোবাবক মাথা দুলিয়ে বলছে, নো।

মোবারক যত এইচ জি বুচারের মদেব দোকানের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তত ছেলে-ছোকরা আব

ছোট ছোট মেয়েগুলো শুধু বন্দরের লোহার বেড়াটা ব্যবধান রেখে ওর পেছন পেছন ছুটেছে। মোবারক সেজন্য বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয়নি, বরং মাঝে মাঝে বাতাসে তার হাত উঁচিয়ে দিয়ে বলেছে, কাম অন মাই বয়েজ।

মোবারকের স্বাভাবিক নিস্পৃহ দৃষ্টিকে এক সময়ে সেই পিছু-নেওয়া দলটি যেন সহ্য করতে পারল না। তারা আবার কার্নিভালে নেমে গেল। মোবারক হেসে দূর থেকে আবার ডাকল, এসো। তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাদের বাঁশি বাজিয়ে শোনাব।

বন্দর-গেট পার হলেই এইচ জি বুচারের মদের দোকান। দোকানের ভিতরে কাউন্টারে সারি দিয়ে কজন মেয়ে-পুরুষ হাতে কাচের গ্লাস নিয়ে অপেক্ষা করছে মদ খাওয়ার জন্য। লিলি মোবারককে দেখে নীচে নেমে এল। সামনের একটি জাহাজের চিমনি এবং ব্রিজের ফাঁক দিয়ে একফালি রোদে ওর মুখ উজ্জ্বল। মোবারক সামনে দু'কদম পা বাড়াতেই ওর ছায়াটা সোনালি রোদের তেজটা ঢেকে দিল। লিলি মোবারকের হাত টেনে বলল, এখনই কার্নিভালে ঢুকবে, না পিকাকোরা পার্কটা ঘুরে ফিরে দেখে পরে যাবে?

মোবারক কোনও উত্তর করল না।

এইচ. জি. বুচারের মদের দোকান অতিক্রম করলে একটি ছোট্ট স্টেশনারি দোকান। দোকানে টালির বারান্দা। কাঠের ঘর। লাল রং ঘরের। বারান্দার খুঁটিতে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে একজন ভদ্রমহিলা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মোবারককে দেখছে। মেয়েটির শ্যাম্পু-করা চুল উড়ছে ফুরফুরে হাওয়ায়। ছেলেটি তার মায়ের কাছে মুখ নিয়ে বলছে, দ্যাট জায়েন্ট! ইজিন্ট মাদার? প্লেজ মাউথ-অর্গান গুড।

মোবারক স্পষ্ট শুনেছে সেই কথা। সে হেসেছে। তারপর দু' কদম বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, নো মাই বয়, আই য়্যাম নট এ জায়েন্ট। আই য়্যাম এ ম্যান, ইন্ডিয়ান। ডোন্ট ফিয়ার মি।

বলে দু' হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে মুখোমুখি বলল, য়্যাম আই জায়েন্ট? আই য়্যাম অ্যান ইণ্ডিয়ান, গুড ম্যান। সি-ই সি-ম্যান। মিনস সেইলর। সেইলর অফ অ্যান ইংলিশ শিপ। ইউ লাইক শিপ?

সেই ছোট্ট সাত-আট বছরের ছেলেটি এতটুকু সঙ্কুচিত না হয়ে বলল, ইয়েস আই ডু।

লিলি হাসল। ভদ্রমহিলা হাসছেন। ভদ্রমহিলা লিলিকে ডেকে বললেন, ন্যানী এই বিদেশিকে ফিজরয়ের পোস্টাফিসের কাছে প্রথম দেখেছে সেদিন। আমায় বলল, মা এসো, এসো না! গেলাম ওর কথা মতো। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এঁকেই দেখেছি সেদিন। বাঁশি বাজিয়ে মেথডিস্ট চার্চের দিকে হেঁটে চলেছেন। আমি বুঝেছিলাম তিনি এই ছোট্ট শহরে আগন্তুক। ন্যানী, তার বাবা যখন কাজ থেকে ফিরে এল, তখন দু' হাত বড় করে ভয়ে বিস্ময়ে বলল, এ জায়ান্ট। আমি হেসে বলেছি, না, উনি একজন বিদেশি এবং নিশ্চয়ই উনি নাবিক হবেন।

মোবারক তাদের কথা মোটেই লক্ষ করছে না। বলছে, তুমি যাবে আমার জাহাজে? কাল এসো না। ওই তো দেখা যাচ্ছে আমার জাহাজ। হলুদ রঙের চিমনি, উপরে কালো পর্তাব-দেওয়া দাগ! ওই জাহাজটা এই ভাল মানুষটির। তুমি জাহাজে গেলে দেখতে পাবে আমি দৈত্য নই। আমি মানুষ, আমি ভারতীয়।

তারপর একজোড়া উজ্জ্বল-জীবন কপোত-কপোতীর মতো হাতে হাত ধরে পাহাড়-সিঁড়িতে উঠে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। ন্যানী আর ন্যানীর মা চেয়ে থেকেছে যতক্ষণ না ওদের দুটো রং-বেরঙের দেহ পাহাড়-ছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর ন্যানীর হাত ধরে ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট ঘরের জীবনধারার রঙিন কাল্পনিক চিন্তা করতে করতে কানির্ভালের ভিড়ের ভিতর মিশে গেল ওর মা। বাতাসের দিকে চেয়ে দেখছে ওর মা, সিগারেটের ধোঁয়াটা বড্ড বেশি পাক খাচ্ছে।

বুকে অশান্ত জ্বালা লিলির। অষ্টাদশী যৌবনের জ্বালা। মোবারকের নিস্পৃহ ভাব এবং উদার মনোবৃত্তির নীরব কীটদংশন ওকে অশান্ত করে তুলেছে। ওর চোখ জ্বলছে। দেহের প্রতি রোমকূপে আবর্তিত হচ্ছে রক্তের ঘোর-পাক। ত্রিশটি রাতের কৌরি-পাইনের ব্যর্থতার অন্ধকার ওর বুকে আশাহত বধূর মতো বোবা কান্নার ঢেউ তুলছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই লাল ক্যালেন্ডারের মুখোমুখি। একটি স্তিমিত

আলো জ্বলছে ঘরে। পাশের খাটে লিজেন কালো কম্বলের তলায় ঘুমুচ্ছে। সমস্ত প্রেস বিটেবিয়ান স্কুল হস্টেলটা ঘুমে শিলীভূত। সে প্রতিরাতের মতো আজও বিলাসভ্রমণ থেকে ফিরে একটি দাগ কেটে দিল। লাল ক্যালেন্ডারে সাদা রঙের তুলি তুলে খুব ধীরে ধীরে টুয়েন্টি এইটথ তারিখটা মুছে দিয়ে ভাবল, মোবারক নিশ্চয়ই এখন জাহাজে ফিরেছে।

ঘরে আলো, বাইরে অন্ধকার। সবুজ টেনিস লন ধূম-ধূসরিত যেন। কুয়াশা ঝরছে আকাশ থেকে। টেনিস লনের সীমান্তে প্রেস-বিটেবিয়ান চার্চ। চার্চের আলো কুয়াশার স্তর ভেঙে লিলির ঘরে পৌঁছতে পারছে না। পাশের জানালা খোলা। কনকনে ছুঁচের মতো ঠান্ডা হাওয়া দরজার পর্দা উড়িয়ে ঘরে ঢুকছে। লাল স্কার্ট উড়ছে লিলির। তবু স্থিরনিবদ্ধ-দৃষ্টি তারিখটার প্রতি। গাড়ির চাকার মতো বিগত তারিখগুলো পাহাড় সিঁড়ি ভেঙে সমুদ্রের দিকে কেবল ছুটছে যেন দ্রুত। ওর হাত কাঁপছে।

ভেলভেটের পর্দাটা কাঁপছে দরজায়। ক্যালেন্ডারের দু'-তিনটে পাতা উড়ছে ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে যেন। পাশের খাটে লিজেন পাশ ফিরে শুল। লিলির দেহ কাঁপছে তখন উদগ্র কামনার আর্তিতে।

রেস্টরুমের সান-ডায়েল ক্লকের ছায়াশূন্য কাঁটা বুকের ভিতর ঠুকে ঠুকে কেমন টিক টিক করে গভীর দাগ কেটে চলেছে কেবল। ওর অবিন্যস্ত শ্যাম্পু-করা চুলগুলি ঠান্ডা বাতাসের তাড়নায় নারকেল পাতার মতো মুখের উপর ঝরে পড়ছে। সে ক্লান্ত। ওর চোখে জল কি জ্বালা ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

পাশের চেয়ারটা টেনে বসল লিলি। ক্লান্ত হাতদুটো বিছিয়ে দিল টেবিলে। তারপর হাতদুটোর ভাঁজে মুখ রেখে টেবিলের উপর পড়ে থাকল। তখনও কনকনে সমুদ্রহাওয়া ঘরের পর্দা উড়িয়ে লিজেনের কম্বলের ভিতর ঢুকছে ছুঁচের ফলার মতো। লিলি নড়ছে না। লিজেন পাশ ফিরে আবার শুল। বাতাসের তীব্র তাড়নায় সে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জাগছে।

লিলি চেয়ার থেকে উঠে এল এক সময়ে। অশান্ত বুকের জ্বালা কিছুতেই নিরছে না। তাই সে পায়চারি করছে মেঝের উপর। মাঝে মাঝে জানালার উপর ঝুঁকে পাহাড়-ছাদ থেকে দেখার চেষ্টা করছে বন্দর। বন্দরের বিদেশি জাহাজ। মোবারকের শিপ। মোবারক বুঝি কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উঠছে জাহাজে। ওর অস্পষ্ট ছায়া লিলির জানালায় স্পষ্ট। প্রেস-বিটেবিয়ান চার্চের পাহাড়-ছাদে অন্তত লিলির চোখদুটো সেই কথাই বলে।

বন্দর অতিক্রম করে লিলির দৃষ্টি আর চলছে না। আদিগন্ত সমুদ্রে নীল অন্ধকার। সমুদ্রের বুকে জাহাজটা নোঙর করা। জাহাজের আলো সমুদ্রের নীল অন্ধকারে আকাশ তারার মতো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। জাহাজটা বুঝি দুলছে শীতের ঠান্ডায়। দুলছে কি কাঁপছে লিলির চোখ ঠাহর করতে পারল না। তারপর ওর দৃষ্টি সমুদ্র থেকে বন্দরে, ক্রমশ পাহাড়-সিঁড়ি ডিঙিয়ে ছাদে, ছাদ থেকে ঘরে, শেষ পর্যন্ত ভেলভেটের পর্দায় ঢাকা শেলফের বুকে। ভায়োলিনটা সেখানে রয়েছে। লিলির সব জ্বালা থমকে যেন সেখানে। তাই নীরবে ভায়োলিনটা বের করে আবার এসে জানালার উপর ভর করে দাঁড়াল। নীরব রাত আর এক-আকাশ তারাকে সাক্ষী রেখে সে বার বার বাজাল, মোবারক আমার, সে আমার, সে আমার। লিলি ভায়োলিনের উপর পড়ে আবার কাঁদল যেন— উই আর ইন দি সেম বোট।

ভায়োলিনের উপর লিলির করুণ কান্না শুনে লিজেন জেগে বিস্মিত হয়ে বলল, কী করছিস তুই লিউ? দরজা-জানালা খোলা রেখে এভাবে দাঁড়িয়ে বন্দরের কী দেখছিস। ইস্, বিছানা-পত্তর বাতাসে কী ঠান্ডা হয়ে গেছে, দ্যাখ তো? আর এত রাতে কেউ বেহালা বাজায়, না বাজাতে আছে।

লিজেন খাট থেকে নেমে এল। অবিন্যস্ত চুলগুলি দু'হাতে চেপে পর্দা সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর জানালার পাশে লিলির হাত টেনে বলল, কী হয়েছে তোর? এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

লিলি উত্তর করল না। কিছু যেন সে ভাবছে।

লিজেন পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, মোবারকের জাহাজ আজ বুঝি ছেড়ে দিয়েছে?

না।— লিলি খাটের দিকে আসতে আসতে উত্তর করল।

লিজেন দু'-চার বার নাকটা জোরে জোরে টেনে বলল, তুই মদ খেয়েছিস লিউ?

খেয়েছি।

তুই না সিস্টার?

মানি না।

ক্লিউ।

মানি না, মানি না, আমি কিছু মানি না।

এমন করছিস কেন?

লিলি কী ভেবে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল আবার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুনল বাইরের ওকগাছগুলোর পাতা থেকে শিশির ঝরছে। শিশিরের শব্দ স্কাইলাইটের কাচে রিন রিন শব্দে বাজছে। লিজেনের দিকে চেয়ে ও বলল, খুব ঠান্ডা পড়েছে আজ।

রাত ক্রমশ গড়িয়ে চলেছে। চার্চের ঘড়িতে শব্দ উঠছে—টিক টিক। অন্যান্য ঘরগুলোর কাচের ছায়ায় কোনও আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধ পাহাড়-ছাদে শুধু লিলি আর লিজেন জেগে রয়েছে।

লিজেন বলল, রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়।

লিলি ফারের কোট খুলে ছুঁড়ে দিল আলনায়। ব্লাউজটা টান মেরে খুলে ফেলল। স্কার্টের বোতাম খুলে স্লিপিং গাউনটা তুলে নিল বিছানার একপ্রান্ত থেকে। তারপর নিজের নগ্ন সৌন্দর্যে সে কেমন অভিভূত! দেহের প্রতি অঙ্গে কেমন তীব্র শিহরণ অনুভব করল। হৃদয় তার অবাক। চোখদুটো প্রতিদিন তার বিস্ময় মেনেছে, একজন সাধারণ মানুষ রাতের পর রাত কৌরি-পাইনের অন্ধকারকে কেমন ব্যর্থ করে তুলতে পারে। গমখেতগুলো পার হয়ে যে পাহাড়-ছাদ রয়েছে, যে রেস্টরুম রয়েছে, যে সানডায়েল ক্লক আলোর ছায়ায় ঘণ্টা বাজাচ্ছে, সেই নির্জন এক টুকরো পৃথিবীতেও মোবারক কেমন ভারী ভালমানুষ! সে বলেছে কেবল তার জাহাজের কথা, জাহাজি জীবনের দুঃখবেদনা, একঘেয়ে জীবনপ্রবাহ, ফোকশাল, শেখর, শেখরের দেশ, তার শামীনগড়। এইসব বলে মোবারক মাঝে মাঝে চুপ করে যেত।

তখন সানডায়েল ক্লকের একটুকরো পৃথিবীতে শিশির ঝরত। কৌরি-পাইনের কচি কিশলয়ে শির শির শব্দ উঠত। ওক গাছগুলো নীরবে উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের নরনারীর জীবন ও যৌবনের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সামান্য মুহূর্তের বুঝি কামনা করত। কিন্তু মোবারক তখন উঠেছে। বাঁশি ব্যাগ থেকে বের করেছে। হঠাৎ লিলিকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলেছে, আমি গেলাম, তুমি ঘরে যাও। কাল সন্ধ্যায় আবার সি-ম্যানস মিশনে। ওক গাছগুলো তখন যেন সোজা হয়ে দাঁড়াত। স্তব্ধ রাতের বুকে একটি মুহূর্তের জন্য কান পাতা নিষ্ফল হল। মোবারক নেমেছে তখন পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙে, বাঁশিতে সুর দিয়ে দিয়ে বন্দরের দিকে চলে যাচ্ছে। লিলি ফিরছে তার প্রেস-বিটেরিয়ান স্কুল হস্টেলে। শরীর কাঁপছে তার। তবু চিনার গাছের-নীচে নিঃশব্দে আরও একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে মোবারকের বাঁশি শুনছে।

আরও কত রাত রয়েছে, কত রাত থাকল। সমুদ্রে সূর্যাস্তের রক্ত-লগ্নে তারা দু'জন গেছে সেন্ট মেরাইনে। সমুদ্রতীরে যেখানে পাহাড়ের শিকড় সিঁড়ির মতো সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছে, সেখানে তারা দু'জনে দাঁড়াত দু'হাত ধরে, হাতদুটো দুলত, স্কার্ট আর ওভারকোট উড়ত দুরন্ত বাতাসে। শ্যাম্পু করা চুল ফুর ফুর করত লিলির। দু'জনে দুটো সিগারেট টেনে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। তখন সমুদ্রের নীল তরঙ্গ দুরন্ত শিশুর মতো চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে পা ছুঁই ছুঁই করত তাদের।

হঠাৎ মোবারক বলেছে, আমি চলি জাহাজে, তুমি ঘরে যাও, কাল সন্ধ্যায় আবার মিশনে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

লিলির আফসোস, তার পরিপুষ্ট গমের মতো সৌন্দর্যকে মোবারক তীব্রভাবে অবহেলা এবং বিদ্রূপ করে চলেছে। রাতের পর রাত সেন্ট মেরাইন হতে লায়ন রকের বুক পর্যন্ত ওদের বিচরণ। কিন্তু মোবারক সব কথা বলে, সব পথ বিচরণ করে, সব রূপ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ার সময় যখন ওক গাছের ছায়ায় বসত তখনই দেখেছে ভারতীয় নাবিকটির চোখে জ্বালা। সে সময় লিলি ওর বলিষ্ঠ হাত টেনে এনে নিজের নরম হাতের উপর চাপ দিয়েছে। মোবারক চুপ করে থাকত তখন। কথা বলত না। কষ্টে ও তখন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু যখন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইত লিলি, মোবারককে বলতে শোনা গেছে তখন, চলি। কাল আবার—

লিলি উত্তেজনায় তখন কেবল কেঁপেছে। কোনও কথা বলতে পারেনি।

মোবারকের মনে হয়েছে জৈনবের কথা, নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না।

লিলি বলল লিজেনকে তখন, মানুষটা অদ্ভুত লিজেন।

তারপর কম্বলের ভিতর ঢোকার আগে আর-একবার অনুরোধ করল, লিজেন, আমি যে মদ খেয়েছি তুই কিন্তু কাউকে বলিস না। বলবি না তো? কী রে? বল না তুই আবার বলে দিবি কি না। মোবারক পর্যন্ত আমায় কেমন ঘৃণা করল আজ। বলল, তুমি না সিস্টার। সিস্টারদের তো মদ খেতে নেই জানি।

আরও কিছু বলেছে?

না, এ সম্বন্ধে তেমন আর কিছু বলেনি।

লিজেন এক সময় মাথার উপরকার আলোটা নিভিয়ে দিল। বলল, এ শহর ভারতীয় নাবিকটিকে ভুলতে পারবে না। কাল দেখলাম ফিজ্বয়-এর বাজারে মাউথ-অর্গান কেনার ধুম লেগেছে। অনেকে আবার মোবারকের মতো অনুকরণ করে পা ফেলে ফেলে চলে।

লিলি কম্বলের তলায় মুখ নিয়ে হাসল। বলল, শুধু ভুলতে পারবে না, নয় রে। ভোলা ওকে চলবে না। নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে অক্ষয় অমর হয়ে থাকল সে।

বিশেষ করে লিলির জীবনে।

না, শুধু লিলির জীবনেই নয়, প্রতিটি নিউ-প্লাইমাউথ মানুষের জীবনে ও যে অক্ষয় অমর হয়ে থাকল।

সে কেন হবে?

হবে না, হচ্ছে।

এসব কী বলছিস তুই।

আমি ঠিক বলছি।

তুই ঠিক বলছিস?

ঠিক।

সে কেমন করে হবে?

হবে, যেমন করে হয়। তুই শুধু কাল সকলকে বলে দিবি খবরটা। আমি স্কুলে যাচ্ছি না। তুই-ই আমার হয়ে বলবি, মোবারক ম্যাজিক দেখাবে।

লিজেন লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। আলোটা পুনরায় জ্বেলে দিল এবং ছুটে এসে লিলিকে কম্বলসহ জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক বলছিস।

কম্বলের ভিতর চুপি চুপি বলল লিলি, ঠিক বলছি।

লিজেন আনন্দে নেচে নেচে গাইল সেই খাটের উপর— ইফ আই উড বি দাই ডার্লিং—। কম্বলের ভিতর থেকে তখন লিলি জোরে হাসছে। সে বলছে আবার, মোবারক সাপের নাচ দেখাবে। সাপের ম্যাজিক।

মোবারক বুঝি বললে?

না রে না। সে বলবে কেন? সে যে আমায় সত্যি আজ সান-ডায়াল ক্লকে সাপের নাচ দেখাল।

ধ্যাৎ। আমি তোর কথা ছাই বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট করে বল, সব খুলে বল। কী মজা হবে না একটা। ওফ। ভাবতে গেলে শরীর আমার এখনই যে শিউরে উঠছে রে। সাপটা তোর চোখের সামনে নাচল? তোকে মোবারক বুঝি বললে সে ম্যাজিক জানে, সাপটা দেখতে কেমন রে?

কালো।

ছবিতে যেমন দেখতে?

ঠিক সে রকম বলতে পারিস।

তোর ভয় করল না?

ভয়। লিলি মুহূর্তের জন্য চুপ করল। নিজেকে প্রশ্ন করল, ভয়? তা ভয় করেছে, একটু করেছে। না, মিথ্যে কথা। ভয় একটু করেনি, ভয়ে সে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সে অন্ধকার রাতের বুকে ভূমিকম্পের মতো থর থর করে কাঁপছিল। মোবারক তখন তাকিয়েছে, চোখে বিদ্রূপ, চোখে তার জ্বালা। থরো থরো মেঘের মতো সেও অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। পাহাড়-ছাদে দুটো উন্মত্ত যৌবনকে বেস্টকমের আলোয় সান-ডায়াল ক্লকের উপর নেচে ব্যঙ্গ করছে যেন তখন শঙ্খচূড়টা।

এমন ঘটত না, যদি লিলি বেখাপ্পা প্রশ্ন করে মোবারককে উত্তেজিত করে না তুলত। সংশয় আর সন্দেহকে কেন্দ্র করে লিলি নেশার তাড়নায় মোবারককে কাছে টানবার প্রচেষ্টা করেছিল, রাতে স্কুল হস্টেলে ফিরে আসার আগে বিক্ষিপ্ত ঘটনাটা ঘটল। সামনের উপত্যকার ঠিক শেষ প্রান্তের পাহাড়-ছাদে। যেখানে রেস্টরুম রয়েছে, যেখানে সান-ডায়েল ক্লক রয়েছে। যেখানটা নির্জন, যেখানে কৌরি-পাইনের শাখায় এখনও কিশলয় বেরুচ্ছে। আর কাছে সমুদ্রের বাতিঘরের বাতিওয়ালার হাসিটা হাঁচিটা যেখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়, সেই পাহাড়ে। সেখানে সে প্রশ্ন করেছে, মোবারক, তোমার দেশ বিরাট। দেশ বিচিত্র, সে দেশের মানুষ বিচিত্র! তাদের জীবনধারা বিভিন্ন। পোশাক আচার, রীতিনীতি সব বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলবশত কোনও প্রশ্ন করলে রাগ করবে না তো?

মোবারক ক্লকের ডায়ালটার উপর আধ-শোয়া অবস্থাতেই বলেছে, না। রাগ আমি করব না, বিভিন্ন বন্দরে কত বিদেশিনীর কাছে কত বিচিত্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমার দেশ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মেটাতে। কিন্তু আমি রাগ করিনি।

তোমার দেশে অনেক সাধুসন্ন্যাসী আছেন। ফকির দরবেশ আওলিয়া আছেন, তাই না মোবারক?

আছেন।

গল্পের বইয়ে সেই সাধুসন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প পড়েছি।

সেগুলো তো গল্পই।

ক্লকের ডায়ালে দু'জনেই বসে আছে। দু'দশ কদম দূরে রেস্টরুমের একটি সংকীর্ণ আলো ওদের দু'জনের ফাঁক দিয়ে আরও নীচে নেমে গেছে। শীত একটু বেশি পড়েছে বলে কেউ এ পাহাড়-ছাদে বেড়াতে আসেনি। একমাত্র লিলি আর মোবারক বসে বসে গল্প করছে। অন্য পাহাড় প্রান্তে লাইট হাউজের বাতিওয়ালা মাঝে মাঝে ঠান্ডায় কাশছেন বুঝি। সেই শব্দ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছে পাহাড়-ছাদে।

মোবারক চুপ করে ছিল।

লিলি সানডায়েল ক্লকে বসেছে। পা দুটো তুলে। লাল স্কার্টটা হাঁটুর নীচে নামানোর জন্য টানছে। লাল নখ-পালিশের নরম রবারের মতো আঙুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সেই স্কার্টের গা। হাত ইচ্ছে করেই যেন আর একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। চোখদুটো টান টান করে চাইছে মোবারকের দিকে। আরক্তিম ঠোঁটদুটোয় আবার অহেতুক কথা যেন—ফকির, দরবেশ, সাধুসন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে ইচ্ছা করলে হাওয়ায় হিমালয়ে মিলিয়ে যেতে পারেন—ঠিক? যোগী বলে এক ধরনের সম্প্রদায় আছেন তাঁরা বরফে বসে নাকি ধ্যান করেন, ঠিক?

সেগুলো গল্পে জেনেছ, সুতরাং সেগুলো গল্পের মতোই থাক। তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে? এবার আমি উঠব। রাত অনেক হয়েছে।

তুমি রাগ করলে মোবারক?

লিলি, তুমি অসুস্থ।

অসুস্থ! মদ খেয়েছি বলে?

লিলি, তুমি না সিস্টার? সিস্টারদের তো মদ খেতে নেই জানি।

আমি সত্যি অসুস্থ নই মোবারক। —দৃঢ় গলায় বলল লিলি।—তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

বলো, উত্তর দিচ্ছি।

সেই সাধুসন্ন্যাসীরা হাতের মাটি ফুঁ দিয়ে সোনা করে দেন শুনেছি। তাঁরা ভোজবাজি জানেন।

মিথ্যে কথা।

তুমি মিথ্যে বলছ মোবারক।

লিলি!

কী করব বলো? তোমার দেশের নাবিকেরাই একথা বলে গেছে। সমস্ত দেশটা নাকি জাদুকরের দেশ।

মোবারক কড়া চোখে এবার লিলির দিকে চোখ তুলে চাইল। তারপর ভিতরের গুমরে মরা ব্যাধিটা

চাড়া দিয়ে উঠতে থাকলে, চিনাব গাছের পাতাগুলো যে-মুখো হয়ে দুলছে সেদিকে নজব ফিবিয়ে দিয়ে বললে, এবাব ওঠা যাক।

তুমি তো আমাব উত্তব দিলে না।

মিথ্যে যে বলে, তাব কোনও জবাবেবই দাম নেই লিলি।

তুমি বাগ কবলে মোবাবক?

বাগ আমি কবিনি।

তোমাব দেশেব মেয়েবা শাড়ি পবে। তুমি বিয়ে কবেছ মোবাবক? জ্যান্ত সাপ দেখেছ? সাপ।

দেখেছি। তুমি দেখবে?— মোবাবক নিজেব ব্যাগটা আবও কাছে টেনে নিল।

লিলি হেসেই যেন কূল পেল না। এবং সে হাসতে হাসতে সত্যি এক সময়ে ডায়ালেব উপব গড়িয়ে পড়ল। বলল, মোবাবক, তোমাব কথায় হাসব কি কাঁদব বুঝতে পাবছি না।

ব্যাগটা কোলেব কাছে টেনে অত্যন্ত সহজ ভাবে বলল মোবাবক, তুমি হেসো না। দেখতে চাও, দেখিয়ে দিচ্ছি। শীত এখনও যায়নি বলে সাপটা বেব কবিনি।

দোহাই মোবাবক, অমন কথা তুমি আব বোলো না। তুমি দেখছি তোমাব সাধু সন্ন্যাসীদেব মতো আমাব সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ভেলকি খেলবে। এ যে শীতেব দেশ, এখানে সাপ পাবে কোথায়?

অত কথায় কাজ কী। দেখতে চাও তো দেখিয়ে দিচ্ছি।

ওসব বুজরুকিতে আমাব বিশ্বাস নেই। তুমি দয়া কবে থামো মোবারক।

মোবাবক তাব ব্যক্তিত্বে খোঁচা খেয়ে যেন মাবমুখো হয়ে উঠল, লিলি তখনও ওকে বিদ্রুপ কবে হাসছে। সে হাসিব আওয়াজ চড়াই-উতবাইয়েব ভাঁজে ভাঁজে আঘাত খেতে খেতে ছুটেছে বন্দবেব দিকে। বন্দব হতে সমুদ্রে। যে জাহাজটাকে আলো দিচ্ছে এখন লাইটহাউজটা সেখানে গিয়ে বুঝি ঝুপ কবে থেমে গেল। লিলি উঠে বসল, তাবপব মোবাবক—

মোবাবক নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। ওব ভিতবটা আঘাত খেয়ে শঙ্খচূড়টাব মতোই ফুলে ফুলে উঠছে। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বেইমানিতে ওব জর্জবিত মন কেঁদে উঠল যেন বলতে বলতে মোবাবক মিথ্যা বলে না। এই তোমাব চোখেব সামনে পড়ে বয়েছে শঙ্খচূড়টা।

কালো মোটা দড়িব মতো সত্যিই কিছু একটা পড়ে বয়েছে ডায়ালেব উপব। একটু নড়ে নড়ে ডায়ালেব বুক বেয়ে অন্ধকাবে মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে সময় মোবাবক অবাক হয়ে দেখল, লিলি ওরই কাছে ছুটে এসে ওব বুকে আছাড় খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। কোনও আওয়াজ নেই, কেবল শ্বাস ফেলছে জোবে। ভয় পেয়ে সমুদ্রেব ছোট ছোট তবঙ্গেব মতো হিল হিল কবে কাঁপছে। মুখ তুলছে না বুক থেকে। বিবর্ণ ভয়ে চোখ বুজে আছে।

মোবাবক মাউথ-অর্গানটা দিয়ে ছোট ছোট দুটো শব্দ কবতেই ডায়ালটাব উপব শঙ্খচূড়টা ব্যাগেব ভিতব গিয়ে ঢুকল। সে তখন তাব কোলেব উপব পড়ে-থাকা মেয়েব চুলেব ভিতব সন্তর্পণে আঙুল চালিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে অপবাধীব মতো বলল, সাপটা চলে গেছে লিলি। তুমি এমন ভয় পাবে জানলে শঙ্খচূড়টাকে তোমায় আমি দেখাতাম না। আমাব সত্যি খুব ত্রুটি হয়েছে।

লিলি তখনও পড়ে বয়েছে এবং পড়ে থাকল।

আবাব বলল মোবাবক, ওঠো, বাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। বেশি দেবি কবে ফিবলে ভাতগুলো আব খাওয়া যাবে না।

লিলি তখন উঠল। কিন্তু বিবর্ণ ভয়টা তখনও কাটেনি, তবু অস্পষ্ট কবে বলল, তুমি ম্যাজিসিয়ান।

মোবাবক কথা আর বাড়াল না। বিদেশেব এই নির্জন পাহাড়-ছাদে লিলিব দেহেব দিকে চেয়ে তার করুণা হল। সে বলল, চলো, তোমাকে হস্টেলে বেখে আসি।

লিলি নীববে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে-যাওয়া পথ ধবে মোবাবককে অনুসবণ কবল শুধু। আর মোবাবকেব দৃঢ় পদক্ষেপেব সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করে নিল, এ শীতের দেশ। এখানে কোনও জীবজন্তুই এককালে ছিল না। ঔপনিবেশিকরা নিজেদেব প্রয়োজনে ছাগল-ভেড়া গোরু-ঘোড়া আমদানি করেছিল মাত্র। তাবপর মোবারক তো নাবিক অথচ সে তার নিজেব দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং সংক্ষিপ্ত কথাব আব চোখের জ্বালায় আমার চিন্তাধাবাকে নিশ্চয়ই বশীভূত করে নিয়েছিল, যার ফলে

ডায়ালের উপর ভীষণ এবং ভয়ংকর দীর্ঘ সাপকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। লিলি তাই গোটা পথ ধরে কোনও কথা বলেনি এবং সমস্ত দেহে একটি পরাজয়ের গ্লানি মেখে স্কুল হস্টেলে ঢুকেছে। কেবল মোবারক যখন তাকে রেখে নীচে বন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছিল তখনই কোনও রকমে বাতাসে পাণ্ডুর হাতটা ঢেউ খেলিয়ে বলেছিল, গুডনাইট মোবারক!...

মোবারক পাহাড়-ছাদ থেকে নামতে নামতে উত্তর করেছে, গুডনাইট।

লিজেন আবার প্রশ্ন করল, কী রে? তোর ভয় করল না?

হ্যাঁ, ভয় করেছিল। ভয়ে আমি মোবারককে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

লিজেন সে কথা শুনে মুচকে হাসল, তারপর?

তারপর চোখ বুজে রয়েছি।

তারপর?

তারপর কিচ্ছু না। যখন সে বলল, ওঠো, সাপটা চলে গেছে, তখন চেয়ে দেখি সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটি একেবারে অদৃশ্য।

বলে লিলি লিজেনকে আবার কেমন ভয়ে ভয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, দৃশ্যটা মনে হ'লে আমার এখনও বুক কাঁপে লিজেন। তুই আমার সঙ্গে শুয়ে থাক।

তা হলে আর কিছুই হল না?

আঃ ফাজিল! এমন করলে তোর সঙ্গে কথা বলব না বলছি।

থাক হয়েছে, আর বলব না। কিন্তু মোবারক কালকে ম্যাজিক দেখাবে তো!

দেখাবে না বলছিস? নিশ্চয়ই দেখাবে। আমি অনুরোধ করলে সে নিশ্চয়ই দেখাবে। সি-ম্যানস মিশনের প্রোগ্রাম কালকে সম্পূর্ণই বদলে দেব। তোর কেবল কাজ থাকল তুই স্কুলের সকলকে বলে দিবি, সি-ম্যানস মিশনের চত্বরে মোবারক ম্যাজিক দেখাবে, সাপের নাচ।

কিন্তু কাল কুইন আসছেন ডুনেডিন থেকে।

কুইন! আসুক।

লোক তেমন তবে জমবে কি?

জমবে না! কী যে বলিস তুই। এই ছোট শহরে কোনও রকমে যদি এই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ে তা হলে গোটা শহর ভেঙে লোক নামতে শুরু করবে বন্দরে। এ দেশের লোক সাপের নাচ কোনও কালে দেখেছে, না আর দেখবে? কুইন এলিজাবেথকে কী দেখবে রে? তিনি তো মেয়ে। আমার মতো মেয়েমানুষ।

বাকি রাতের জন্য বুঝি তবে আর ঘুম আসছে না। কম্বলের নীচে লিজেনকে জড়িয়ে মুখোমুখি দু'জন শুয়ে রয়েছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা পাক খাচ্ছে ভিতরে। সেই চিন্তা পাক খাচ্ছে সমুদ্রমানুষটিকে কেন্দ্র করে। চিন্তায় তার রয়েছে মোবারকের জাহাজ, মোবারকের কেবিন, তার বাংক। দৃঢ় বলিষ্ঠ দৃষ্টি, উন্নত নাক, হালকা ঠোঁট, আয়ত চোখ মোবারকের। লিলি ভাবতে ভাবতে নিজের বালিশটা আরও জোরে চেপে ধরল। কানদুটো থেকে তখন ওর গরম হলকা বের হচ্ছে। লিজেন নাক ডাকাচ্ছে কম্বলের তলায়। তেমনি করে কুয়াশা এখনও আকাশ থেকে ঝরছে মনে হল। স্কাইলাইটের শব্দ তেমন করেই এখন রিন রিন সঙ্গীতের মতো শিহরন জাগাচ্ছে ওর শরীরে। তাই সে তার নিজের পাণ্ডুর হালকা বরফ হাতদুটো দু'পায়ের ফাঁকে আরও জোরে চেপে ধরল। মোবারক নিশ্চয়ই তার বাংকে এখন ঘুমুচ্ছে। মানুষটার গভীর ঘুম হয়তো।

লিলির যথার্থই আর ঘুম আসছে না। একবার ইচ্ছে হল লিজেনকে ডেকে তোলে। মেয়েটার বড্ড ঘুম। এত ঘুম ভাল নয়।

রাত ভোর হতে তেমন আর নিশ্চয়ই দেরি নেই। লিজেনকে সকাল-সকাল ডেকে তুলতে হবে। বাতিওয়ালার ঘরে ম্যাক্সিসের মোরগগুলো ডাকছে। তৃতীয় প্রহরের ডাক হবে হয়তো। ঘরে একটা ঘড়ি থাকলে ভাল হত। ইচ্ছে করলেই ঘড়ি একটা সে কিনে পরতে পারে। কিন্তু কেমন খেয়াল জীবনের, মনটা ঘড়ির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে যেন পারল না। লিজেনটা তো মস্ত কৃপণ। তাই সেও ঘড়ি পরল না। অথচ আজ কেবল বার বার ঘড়ি দেখার প্রয়োজন হচ্ছে। ঘড়ি থাকলে দেখত রাত

আর কতটা আছে। ভোর হতে আর কতক্ষণ, সাজগোজ করে সি-ম্যানস মিশনে পৌঁছতে কত দেরি, বন্দরের জাহাজটা আর ক' কদমের পথ, জানার বড্ড আকাঙ্ক্ষা জাগছে।

লিলি কম্বল ছেড়ে উঠল। ঘুম এল না বলে সে এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। লিজেন যেন টের না পায় সেজন্য পা টিপে টিপে বারান্দার রেলিং-এ ভর করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। উঁকি দিয়ে চার্চের ঘড়িতে ক'টা বাজল দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কুয়াশায় এখনও পাহাড়-ছাদটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে বলে সেই শীতের ঠান্ডায় লিলি সবুজ টেনিস-লনের শিশির ভেঙে চার্চটার দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় চার্চে শব্দ উঠছে ঢং ঢং ঢং। তিনটা বাজল।

রাত যে এত দীর্ঘ লিলি জীবনে এই প্রথম বুঝল। রাত আর কাটতে চায় না। রাত আর যেতে চায় না। শীতের এই দীর্ঘ রাতে বারান্দায় তাই সে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখছে বন্দর। নীচে কুয়াশার এতটুকু চিহ্ন নেই, একটা দাগ পর্যন্ত আঁকেনি। মোবারকের জাহাজের ব্রিজে কোনও মানুষের ছায়া পায়চারি করছে ইতস্তত যেন। লিলি চোখদুটো ভাল করে রগড়ে আবার এক ঝলক অপলক দৃষ্টিতে ভাল করে দেখে বুঝল, সেটা মানুষের ছায়া নয়। মাস্টের আলো বাতাসে দুলে একটি প্রকম্পিত শূন্য-ছায়ার সৃষ্টি করেছে ব্রিজে। লিলি নিজের অপরিণত দৃষ্টির জন্য ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। মনটা সম্পূর্ণ ওর মোবারক ময় হয়ে উঠেছে। যখন শীতের একঝাঁক পাখি উপত্যকার সীমানা ভেঙে অন্য পাহাড়ে উড়ে গেল, যখন একজন শ্রমিক মেয়ে বউকে ঠেলে এক কৌটো টিফিন বগল দাবা করে বন্দরের দিকে ছুটছে হাবিয়া-হাপিজের জন্য, সি ম্যানস মিশনের দরজা যখন বন্ধ, ফিজ্‌ঘরে আর চার্চ স্ট্রিটের দোকানিরা আপেলগুলো যখন রুমালে মুছে সেলফে ত্রিভুজের মতো অথবা স্কাই স্ক্রেপারের মতো সাজাচ্ছে, একটি নূতন বিয়ে হওয়া বউ যখন তার পাহাড়সিঁড়ির ঘর থেকে সমুদ্রের বুকে ঠেলে-ওঠা সূর্যটাকে সতেজ মন নিয়ে দেখছে, তখন লিলি আর লিজেনের ঘরে স্কুল হস্টেলের মেয়েরা রীতিমতো একটা হাট বসিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নের রকমফের রয়েছে ওদের। চোখ বড় করে, কখনও ছোট করে, কখনও-বা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ম্যাজিকের রহস্য জানার জন্য ভিড় করছে মেয়েগুলো। খবর শুনে কেউ নেচে নেচে ঘরে ঢুকল, কেউ শিস দিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল। লিলি টুথপেস্ট মুখে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কথা বলছে, দাঁড়া, দাঁড়া বলছি। লিজেন বিছানাগুলোর উপর উটপাখির ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বলছে, আমাদের গিলে ফেলবি নাকি তোরা?

লিলি স্নান করেছে এক সময় গরম জলে, লিজেনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে, সে আজ স্কুলে থাকতে পারবে না। তার আজ কাজ রয়েছে বন্দরে। বন্দরের সি ম্যানস মিশনে। তারপর আলমারি খুলল, লিজেনকে ডেকে বলল, কোন স্কার্টটা পরলে মানাবে ভাল। কোন ব্লাউজটা আজকের আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক মতো খাপ খাবে?

সেই শুনে লিজেন বারান্দায় এল। সবুজ টেনিস-লনের শিশির-ভেজা ঘাসের উপর শীতের এক টুকরো পাতলা রোদের রং দেখল। পাহাড়-সিঁড়ি দেখল, সমুদ্রের রং দেখল। শেষে ঘরে ঢুকে বলল, সবুজ স্কার্ট পরে, সাদা সাটিনের ব্লাউজটা গায়ে দে। মেজাজের সঙ্গে আবহাওয়া খাপ খাবে।

তাই হল। তাই পরল লিলি। সবুজ স্কার্ট পরল, সাদা সাটিনের জামা গায় দিল। ধূসর রঙের একটি কোট রাখল হাতের কনুইয়ে, যদি কুয়াশা নামে, যদি কনকনে ঠান্ডা ওঠে সমুদ্র থেকে। চুলের উপর আরেকবার ব্রাশ চালাল। দুটো অত্যন্ত হালকা ফুলমোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়াল বড় আয়নাটার সামনে। তারপর প্রসাধনে বসল। ঠিক জানলাটার রং দেখে ঠোঁটের উপর লিপস্টিক দিয়ে মেরুন রঙ বুলিয়ে দিল সরু করে। ভ্রুতে পেন্সিল টেনে আরও দীর্ঘ করে দিল ইগল পাখির ডানার মতো। শেষে ভ্রুদুটো প্রশস্ত করে শরিফ মেজাজে হাসল। হাসি দেখে লিজেন বলল, তুই বাজরানি।

লিলি লিজেনের গালে চুমো খেয়ে বলল, তবে তুই আমার বাঁদি।

বলে আলনার কাছে গেল। আলনায় তিন-চারটা ভ্যানিটি ব্যাগ। এবারও জানালার রং দেখে একটা তুলে নিল পছন্দ মতো, কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বারান্দায় বের হয়ে জুতো টেনে জুতো পরলে। পরে দুরন্ত দুটো হাত উড়ন্ত বুলবুলের মতো বাতাসে নাচিয়ে নাচিয়ে স্কুল-হস্টেলের সকল মেয়েদের অভিবাদন করে পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে গেল।

পাহাড়ের পথ শঙ্খমুখী। ঘুরে ঘুরে পাহাড় থেকে উপত্যকায় নেমেছে। গমখেতে ঢুকেছে,

আপেল-বাগানেব অলিগলি ধবে কববখানাব পাঁচিলের বাঁ দিকের পথ অতিক্রম করে এসে থেমেছে ট্রাম স্টপেজে। শেষে শেডেব তলায় দাঁড়িয়ে ট্রামেব জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ট্রাম এলে উঠবে, সি ম্যানস মিশনে নামবে।

মিশন পৌঁছতে বেশ বেলা হল লিলির। মিশনের সামনেব গোটা চত্বরটায় বোদ। হালকা বোদ, পাতলা বোদ। সে বোদেব তেজ নেই, তোয়াজ আছে। সে মিষ্টি মিষ্টি রোদ গায়ে লাগলে মন নবম হয়, শীত যেন উষ্ণ হয়। সে বোদ গায়ে মেখে লিলি মিশনেব দবজা ঠেলে ঘবে ঢুকল।

যেই ঘরে ঢোকা সেই দশটা প্রশ্ন। এমন অবেলায়, এমন অসময়ে। তাবপব খুলে বলতে মবিশ বলল, বলছ কী লিলি।

লিটন কনুই কোমবে বেখে বলল, এ যে বীতিমতো আজগুবি কথা হল। বিশ্বেস হচ্ছে না, কেমন কবে হবে?

লিলি তত বলছে, আমি দেখেছি সে মন্ত্র পড়ে কোত্থেকে একটা কালো সাপ এনে ডায়ালেব উপব ফেলল। তাবপব আবাব দেখেছি ডায়ালেব বুক বেয়ে সেই সাপটা অন্ধকাবে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটু বং চড়িয়েছে কথাটা বলাব সময়। লিটন আবাব মিশনেব সেক্রেটাবিকে বলাব সময় বং-চড়ানো পর্দায় আব একটি স্থূল প্রলেপ দিয়েছে, ক্রমশ সে চড়ানো বং বন্দব থেকে ক্রেনগুলোব পায়ে পায়ে কাঠেব ঘবেব অলিন্দ ধবে দোকানে দোকানে বিস্তাবিত হল। ঘবে যে-ই ফিবেছে বন্দব থেকে সেই কুইন এলিজাবেথেব সমাবোহপূর্ণ জাহাজটাব সঙ্গে খবব দিয়েছে বন্দবে সন্ধ্যায় ম্যাজিক হবে, সাপেব নাচ। মোবাবক নাচাবে সাপ, মন্ত্র পড়ে সাপটাকে ভাবতবর্ষ থেকে এনে সকলেব চোখেব সামনে নাচাবে। মোবাবক, ইন্ডিয়ান, এ ম্যান অফ মিস্টিক ল্যান্ড।

তাবপব লিলি গেছে মোবাবকেব জাহাজে। একটি ডেনিস, দুটো আমেবিকান জাহাজ পাব হলে সে জাহাজ। মাল খালাস হতে কিছু বাকি বলে কাঠেব সিঁড়িটা প্রায় খাড়া হয়ে গ্যাংওয়েতে উঠে গেছে তাই সে দু'দিকেব দুটো দড়ি ধবে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠল। সামনে গোল টেবিলে কোয়ার্টাব-মাস্টাব মাছ ধবাব জাল বুনছে। চিত্ত তাব একাগ্র। তবু লিলিব দেহগন্ধে চোখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে কেমন ঢোক গিলল। দু'-একটি জরুবি প্রশ্ন কবা দবকাব, এ যে জাহাজ, এখানে যে যাব খুশি মতো উঠতে নামতে যে পাবে না, সে কথা না জানিয়ে ওব জমকালো পোশাকেব প্রতি শুধু সেলাম ঠুকল একটি। এবং লিলি যখন বলল, মোবাবক কোন কেবিনে থাকে, সে তাব কাছেই এসেছে তখন সুখানি সাহেবেব চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আবও গদ গদ হয়ে উঠল। জাল বোনা ফেলে কুর্নিশেব কায়দায় বলল, আসুন। আমি আপনাব বান্দা।

লিলি ডেক এ ছোট ছোট পা ফেলে চলেছে আব দৃষ্টি বেখেছে চাবিদিকে। সে দৃষ্টি কৌতূহলেব। উইনচ ড্রাইভাববা কী কবে মেশিন চালাচ্ছে, ক্রেন ড্রাইভাব কেমন কবে নীচে নুয়ে দেখছে সব, দু'নম্বব মালোম ফলকায় ফলকায় কী সব কথা বলে যাচ্ছে, ওব দৃষ্টিতে সব ধবা পড়ল। তাবপব সে এল পিছিলে, যেখানে গ্যালি, বাথকম, মেসকম। দু' চাবজন জাহাজি মেসকমে মাদুব বিছিয়ে তখন ভাত খাচ্ছে। দু' একজন একটু জায়গা কবে নামাজ পড়ে নিচ্ছে। লিলি মেসকমে উঁকি দিয়ে তাও দেখে নিল। সুখানি তখন বলছে, ওদিকে নয়, এদিকে আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে। সেখানেই মোবাবকেব কেবিন। আপনি আসুন।

লিলি নীচে নামল, নেমে আওয়াজ পেল ফোকশালে-ফোকশালে জাহাজিব। মোবাবকেব স্তিমিত আওয়াজও ওব কানে এসে ধাক্কা খেল। মোবাবক অন্যান্য জাহাজিব তুলনায় যেন খুব আস্তে কথা বলছে।

শেষে এ কেবিন সে কেবিন দেখে লিলি ঢুকল মোবাবকেব কেবিনে। ঢুকে প্রথমে শেখবেব সঙ্গে হ্যান্ডশেক কবে মোবাবকেব দিকে এগিয়ে গেল।

মোবাবক তখন বলল, গুড মর্নিং। লিলি, তোমাব শবীব ভাল তো?

নিশ্চয়ই। তাই তোমাব জাহাজে এসেছি।

সে তো আমাব সৌভাগ্য।

আমি তোমাব সৌভাগ্যকে টেনে নিয়ে আসতে বাজি নই। আমাব সৌভাগ্যকে তোমাব কাছে নিয়ে এসেছি।

তবে বোসো।

বিপরীত হলে বুঝি বসতে দিতে না?

শেখর হেসে বলল, আমি কিন্তু দিতাম।

শেখর বালিশের নীচে থেকে সিগারেট বার করে লিলিকে দিয়ে বলল, নাও ধরাও। তাড়াতাড়ি করো। এখনই আবার ঘণ্টা পড়বে ইঞ্জিন-রুমে। এলে তো খুব সময় মতো। এখনই তো আমাদের কাজে বের হয়ে যেতে হবে।

হবে তো হবে।— মোবারকের দিকে চেয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা আছে, কথা বলব। আগে বসো। তোমাকে বসতেই বা দিই কোথায়? বাংকের উপর পা দুলিয়ে রেলিং-এ বসতে তোমার হয়তো খুব অসুবিধা হবে।

অসুবিধা হলেও তো আর না বসে পারছি না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলব?—বলে শেখরের বাংকে বালকেডের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়ল এবং নিশ্চিন্তে সিগারেট টেনে দম নিল যেন দু'বার।

এমন সময় ইঞ্জিন-রুমে ঘণ্টার শব্দ উঠেছে। উইন্ডস-হোলের ফাঁক থেকে চিৎকার করছে ইঞ্জিন রুম বড়-টিন্ডাল, জোয়ান লোক টাণ্টু কামে যাও।

শেখর বলল, তা হলে উঠি।

মোবারক বলল, সারেংকে বলবি শেখর, ইঞ্জিন-রুমে নামতে আমার একটু দেরি হবে। লিলির কথা বলবি।

শেখর চলে যাওয়ার সময় লিলি বলল, তুমি বুঝি জাহাজ ছেড়ে কোথাও যাও না?

কেন? যাই তো। মাঝে মাঝে মিশনে যাই। তোমাকে দেখি, মোবারককে দেখি। তারপর জাহাজে আবার ফিরে আসি।

মোবারক বলল, ও যাবে কি বাইরে? ওর যে একগাদা বই রয়েছে জাহাজে। সেগুলো ফেলে ওর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না।

তারপর শেখর চলে গেলে মোবারক ওর লকার খুলে বইয়ের স্তূপ লিলিকে দেখিয়ে বলল, গোটা সফর ধরে এরই ভিতর শেখর ডুবে রয়েছে। লেখাপড়া জানা ছেলে কেন যে জাহাজে মরতে এল বুঝি না ছাই।

লিলি বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে টের পেল আঙুলের দু'ফাঁকের সিগারেটটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সে পকেট থেকে তাই আর-একটা সিগারেট বের করে মোবারককে একটা দিল। তারপর পোড়া সিগারেট থেকে আগুন ধরিয়ে হুস হুস করে জোরে টানল ক'বার। শেখরের বাংকে বসে উন্মনা হয়ে ভীষণ কিছু যেন চিন্তা করছে লিলি।

মোবারক তার বাংকে বসে প্রশ্ন করল, তারপর? কী বলছিলে?

বলব, বলার জন্যই তোমাকে এমন অসময়ে বিরক্ত করছি। তুমি নিশ্চয়ই রাগ করোনি মোবারক?

রাগ করার কথাটা এত বেশি বলা হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত রাগ না করে পারব না দেখছি।

তবে যে আমার বলা হবে না।

মোবারক হেসে ফেলল বলতে বলতে, বলো বলো, রাগ আমি করব না।

লিলি আধ-পোড়া সিগারেটটা হিলের তলায় ঘষে পোর্ট-হোল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আরক্তিম ঠোঁটে একটি হালকা হাসির পাপড়ি মেলে বলল, মিশনের প্রোগ্রাম আজ বদল করে দিলাম। তোমার আজ মাউথ-অর্গান বাজানো হবে না।

সে তো ভাল কথা। দু'জনে বেশ তবে সানক্রকের ডায়ালের উপর বসে গল্প করা যাবে। বাতিওয়ালার হাঁচিটা কাশিটা শুনে ফিস ফিস করে বলবে, আস্তে মোবারক।

লিলি সব কথা বাদ দিয়ে ফোকশালের উষ্ণতা মেখে বলল, তুমি ইন্ডিয়ান মোবারক।

সে কথা ভাবতে তোমার আপত্তি আছে কি?

না, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আজ অন্তত আমার সম্মান-রক্ষার্থে একটি বিষয়ে আপত্তি করবে না।

মোবারক কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, আমার সাধ্যের আওতায় থাকলে আপত্তি থাকার তো কিছু কথা নয়।

তেমন কথাই বলব। তুমি ইন্ডিয়ান তাই তোমার পক্ষে সম্ভব। কাল তুমি আমায় ডায়ালের উপর সাপ, সাপের নাচ দেখিয়েছিলে।

মোবারক এবারও হেসে উঠল, সে কথা তুমি এখনও ভুলতে পারোনি? সে তেমন কিছু না। কথাটা ভুলে যাও। অমন ভয় পাবে জানলে নিশ্চয়ই সাপটা দেখাতাম না। বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যা বলছি না। তা ছাড়া তোমার তো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।

লিলিকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখাল। অথচ অম্লান ওর চোখের দৃষ্টি। তেমনই হালকা হাসি ওর ঠোঁটে। চোখের নীল তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। সে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মোবারকের বলিষ্ঠ দুটো হাত ওর নিজের নরম দুটো হাতে অঞ্জলির মতো গ্রহণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, বলো তুমি আমার কথা রাখবে?

মোবাবক লিলিকে কাছে টেনে আরও কাছে বসল। ফোকশালগুলো নির্জন, কোথাও থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। শুধু ছাদের উপর পিছনের গ্যালিতে ভাণ্ডারির কাঠের ছেনি নাড়ার শব্দ ঠক ঠক করে নীচে নেমে আসছে। সে গত রাতের সান ডায়াল ক্লকের ত্রুটির জন্য আজ সর্বতোভাবে লিলির অনুরোধকে অনুগ্রহের মতো যেন ঠেলতে পারছে না। তাই মুখোমুখি হয়ে বলল, বলো, বিন্দুমাত্র সম্ভব হলে তোমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব।

তুমি ইন্ডিয়ান, তোমার পক্ষে সব সম্ভব। মিশন চত্বরে আজ শহর ভেঙে লোক জমবে। খবরটা আমিই সকলকে দিয়েছি। তোমাকে না জানিয়ে মিস্টার লিউডকে বলে প্রোগ্রাম করেছি-ভিন্ন। ভিন্ন মঞ্চ হবে চত্বরে। সেখানে তোমার প্রোগ্রাম। তুমি সাপের নাচ দেখাবে সেই মঞ্চে।

গত রাতে লিলি ডায়ালের উপর বিদ্রুপ করে যতটা উচ্চকিত হয়ে হেসেছিল, মোবারক হাসছে তার দ্বিগুণ চড়ায় সে হেসে হেসে বাংকের উপর গড়িয়ে পড়ল এই বলে, ব্লিউ, তার জন্য তোমাব এত ম্রিয়মাণ হয়ে অনুরোধ, এমন ভাঙা গলায় দু'হাত হাতে তুলে এত বিনীত হয়ে বলা?

তারপর বাংকের উপর সে সোজা হয়ে বলল, কথা আমি তোমার নিশ্চয়ই রাখব। শীত না থাকলে তুমি না বললেও আমি পথে-ঘাটে এমনি নাচাতাম, যেমন করে অন্য সব বন্দরে নাচিয়েছি।

লিলি এবার সহজ হয়ে বসল বাংকে। ওর উচ্চকিত হাসির জন্য ওব কতক ভাঙা ভাঙা ইংবেজি একেবারেই বুঝতে পারেনি সে। শুধু এই বুঝল, মোবারক তাকে কথা দিয়েছে, সে সাপ নাচাবে। ভারতবর্ষ থেকে সাপটাকে সে মন্ত্র পড়ে ধরে নিয়ে আসবে বোধ হয়।

লিলি এবার বাংক থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল, তবে চলি। সন্ধ্যা সাতটায় প্রোগ্রাম। আমি গাড়ি নিয়ে আসব, তুমি ছ'টায় রেডি হয়ে থাকবে।

লিলি মোবারকের বুকের কাছে এসে মুখ তুলে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল। সে নুয়ে হাত ধরল লিলির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ওদের দুটো মুখ। কিন্তু সাহস হল না মেয়েটির। ওর নরম দেহ মাধবীলতার মতো কেঁপে উঠলেও সে আর-একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর আরক্তিম ঠোঁটদুটোয় চুমো খেতে পারল না, শুধু মুখোমুখি হয়ে বলল ফিস ফিস করে, মাই ডার্লিং, মাই ম্যাজিসিয়ান।

মোবারক আর্তনাদ করে যেন উঠল, ব্লিউ, আমি জাদুকর নই।

লিলি ততক্ষণে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে।

মোবারক দরজার বাইরে এসেছে যেন আর্তনাদ করতে করতেই, লিলি, আমি জাদুকর নই। সাপটা আমার ভেলকি নয়, সে জীবন্ত, আমার পোষমানা জীব।

লিলি ডেক ধরে 'দ'-এর মতো পা ফেলে প্রায় ছুটে যাওয়ার মতো যেন হাঁটছে। ডান হাত বাতাসে নেড়ে বলছে, জাদুকর যারা তারা তো এমনি করেই বলে মোবারক।

বিশ্বাস না হয় নীচে আমার ফোকশালে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।— কথাটা বলে কিছুক্ষণ পিছিলের রেলিং ধরে হাঁফিয়ে নিল বুঝি মোবারক।

লিলি সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে নামছে মোবারকের প্রতি দৃপ্ত দৃষ্টি তুলে। ওর জাদুকর মোবারক। আশ্চর্য এক দেশের মাটির গন্ধ ওর দেহে, চোখদুটোয় কেমন এক মায়ায় ভরা ডাক। জেটিতে নেমে হাত নেড়ে

বলল, না না মোবাবক, তোমাব সে ম্যাজিক, তোমার সে সাপেব নাচ একা ফোকশালে দাঁড়িয়ে দেখলে আমি ঠিক থাকতে পাবব না। তুমি সে অনুবোধ আমায় আব কোরো না।

মোবারক বেলিং-এ ঝুঁকে জড়িয়ে এতটা উত্তেজিত হয়েছে যে সে আব কোনও কথা পর্যন্ত বলতে পাবল না। সে শুধু চেয়ে বয়েছে লিলিব দিকে। তাব দেহছায়া সোনালি বোদে পাহাড় সিঁড়িব ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়েব দিকে যে পথ গেছে সেই পথে কেমন কবে হারিয়ে যাচ্ছে তাই দেখছে দাঁড়িয়ে।

ভাণ্ডাবি, গ্যালি থেকে উঁকি দিয়ে বলেছে তখন, এই মিঞা, মাইয়াডা কী কইল বে ব?

মোবাবক কোনওবকমে যেন বলল ভাণ্ডাবিকে, কিছু না।

লিলি যতটা হালকা হয়ে পাখিব ডানাব মতো উড়ে উড়ে পাহাড় সিঁড়িতে হাবিয়ে গেল, মোবারক তত প্রস্তবেব মতো ভাবী হয়ে সেই পিছিলেব উপব থেকে পাঁচ নম্বব চাব নম্বব ফলকা অতিক্রম কবে না-চলি না-চলিব মতো ইঞ্জিন-কমে গিয়ে নামল। ওব বুকে আবাব জ্বালা ধবেছে। লিলি এতক্ষণ বাংকে বসে কথা বলেনি তো, বিদ্রুপ কবেছে। মোবাবকেব পোষমানা জীবটিকে সে ভেল্কি বলেই জেনেছে।

নিজেব মনেই বিড বিড কবতে কবতে এক সময় মোবাবক টানেলেব ভিতবও ঢুকে গেল। সে শেখবকে খুঁজছে। শেখবেব কাছে তাব নালিশ। শেখবকে বলবে মেয়েটা এতক্ষণ কথা বলে গেল না তো, বিদ্রুপ কবে গেল। সেই কথাব পুনবাবৃত্তি তাই ওব ঠোঁটদুটোয় কেবল পাক খাচ্ছে।

শেখবকে মোবাবক টানেলেব তলায় খুঁজে পেল না। টানেলেব ভিতরও না। প্রপেলাব শ্যাফট পর্যন্ত সে তন্ন তন্ন কবে খুঁজেছে কিন্তু পায়নি। টানেলেব বাইবে এসে এভাপবেটাবেব তামাব পাইপগুলোতে যাবা স্ক্রেপ কবছে তাদেব ভিতবও সে নেই। তাবপব জেনাবেল পাম্পেব নীচে এবং পাশে, স্টোকহোলে কিন্তু কোথাও নেই। সারেংকে জিজ্ঞেস কবতে সাবেং বলল, বাঙালিবাবু চাব নম্বব সাবেব সঙ্গে এক নম্বব উইনচে কাজ কবছে।

সেই শুনে মোবাবক ছুটল হ্যাবিকেন ডেকে। শেখবকে বলতেই হবে, ব্লিউ এতক্ষণ ওব কেবিনে বসে শঙ্খচূডটাকে ভেলকি বলে বিদ্রুপ কবে গেল। মেয়েটাকে সমুচিত জবাব দিতে হবে।

মোবাবক স্টোকহোলেব সিঁডি ধবে উপবে উঠল। চিমনিটাব গোডায় দাঁড়িয়ে শ্বাস নিল জোরে। পা দুটো ক্রমশ যেন প্রস্তবীভূত হয়ে উঠছে। উত্তেজনা এবং মনেব আঁকুপাকু শেখবকে না বলা পর্যন্ত খালাস হবে না। সে তাই বোট ডেক থেকে নেমে তিন নম্বব ফলকা অতিক্রম কবে এক নম্বর উইনচেব পাশে গিয়ে দাঁডাল।

শেখব কাজ কবছে। চাব নম্বব সাব উইনচেব ভিতবে ঢুকে স্ক্রেপাব খুলছে। দুটো পা শুধু বাইরে বেব হযে আছে ওর। হাতুড়ি, বাটালি, স্প্যানাব যখন যা কিছুব দবকার সববরাহ কবছে শেখব। ঢিলে স্ক্রেপাবগুলোব ফাইল কবে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

মোবাবক শেখবেব পাশে দাঁডিয়ে বলল, ব্লিউ আমাব সাপটাকে অস্বীকাব কবল।

কবেছে তো বেশ কবেছে, তাতে তোব কী এল গেল?

তুই এটা কেমন কথা বলছিস শেখব!

আমি ঠিক বলছি।

না, তুই ঠিক বলিসনি। আমি জ্যান্ত সাপটা কালকে দেখালাম আব সে বলছে কিনা জাদু করে আমি সাপ দেখিয়েছি। আমার পোষমানা জীবটিকে অস্বীকাব কবে বলবে ম্যাজিক, আব মুখ বুজে তা হজম কবব?

একান্তই যদি অস্বীকাব করে তো সাপটাকে ওর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে পবখ করতে বলবি, সত্য কি মিথ্যা।

মোবাবক এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হল, এতক্ষণে যেন পথ পেল, একগলা উত্তেজনা থেকে খালাস পেল। কিন্তু কথা সে ঠিক বাখবে। মঞ্চের উপর সাপেব নাচ সে যথার্থই দেখাবে। সেই দেখে যদি ওবা ওকে জাদুকর ভাবে তো বয়ে গেল। সে শুধু লিলিকে প্রমাণ দেবে, সাপটা তার ঘবের মানুষ। জৈনব খাতুনেব অতি আদর করে দেওয়া। বিগত প্রেমের এক জীবন্ত ফসিল।

পাহাড়-সিঁড়িব ধাপে ধাপে লিলি কিন্তু তখনও 'দ'-এর মতো পা ফেলে কেমন উজ্জ্বল হয়ে হাঁটছে।

বুকে তার অফুরন্ত প্রেম, অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত কানাকানির কথা। মোবারককে নিউ-প্লাইমাউথের ঘরে ঘরে ভালবাসায় বেঁধে রেখেছে। তারা একান্ত বিস্ময়ে কাচের শার্সি তুলে অপেক্ষা করেছে প্রতি বিকেলে, মোবারক বাঁশি বাজিয়ে যাবে। যাবে পাহাড়-ছাদে, যাবে ব্লিউর স্কুল-হস্টেলে। ব্লিউকে দেখে কত মেয়ে তাই হিংসে করছে। লিজেনও বুঝি!

লিলি চড়াই ভেঙে উতরাই ভেঙে হাঁটছে। অসহিষ্ণু মন নীল আকাশ দেখছে। চার্চ স্ট্রিট, নিউ স্ট্রিট, গির্জার পুকুর অতিক্রম করে সে নেমেছে ফিজরয়ে। একটা কাফেতে ঢুকে ঢক ঢক করে গলায় ঢালল কিছু, বখশিশ দিল বয়টাকে, খুশি মতো পয়সা খরচ করল। যাকে পেল, পরিচিত অ-পরিচিত তাকেই ম্যাজিকের খবর দিয়ে ফুরফুরে চুল উড়িয়ে বাঁদিকের পথ ধরে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল। সব আজ তার ভাল লাগছে। সুন্দর মনে হচ্ছে এই পৃথিবীকে। পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হল তারা আজ অত্যন্ত খুশি। সোনালি রোদকে মনে হল খিল খিল করে হাসছে। সমুদ্রের নীল তরঙ্গে দেখল নির্ভাঁজ ঢেউ, তারপর একটা দমকা হাওয়ায় নিজের রুমালটা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, মোবারক, মাই ডার্লিং, মাই ম্যাজিসিয়ান।

লিলি আবার বালিয়াড়ি থেকে উঠে গেল। পাহাড়-সিঁড়ি বেয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘরে গেলে হয়। মাকে খবর দিলে হত! কিন্তু লিলির কেমন সংকোচ হল। মা নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছেন। সে তাই পিকাকোরা পার্কের পথ ধরে রানি এলিজাবেথকে যে চত্বরে প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হবে সেখানে গিয়ে ঢুকল। বিরাট মঞ্চ করা হয়েছে, হাজার অতিথির জন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে। তারপর দামি কার্পেট বিছানো, চত্বরে ঢোকার প্রথম দরজায় দু'জন অশ্বারোহী পুরুষ। ঝকঝকে তলোয়ার হাতে। রুপালি রঙের কটিবন্ধ। তারা লায়ন রকের দিকে মুখ করে আছে।

সে হাঁটল শহরের বিভিন্ন পথ ধরে। পথগুলো সুসজ্জিত। কাঠের ঘরগুলো বিভিন্ন ফুলের সমারোহে নৃত্যচঞ্চল মেয়ের মতো মুখরিত হয়ে উঠেছে। পথের দু' পাশে কাঠের রেলিং দেওয়া। গ্রাম থেকে লোকের ভিড় সেই রেলিং লাগোয়া হয়ে অপেক্ষা করছে কখন রানি এই পথ ধরে যাবেন। এলিজাবেথের গাড়িতে তারা ফুল ছিটিয়ে দেবে। ঘরের বারান্দাগুলোতে মানুষের ভিড়। তারা বন্দরের দিকে দৃষ্টি রেখে উন্মুখ হয়ে আছে।

লিলি নিজের মনেই হাসল, মানুষগুলো পাগল।

শেষে যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে একটুকরো কুয়াশার মায়া মেখে নিউ-প্লাইমাউথের মাটিকে চুমো খেল, যখন কুইন এলিজাবেথের শোভাযাত্রা শত অশ্বারোহীর ঠক ঠক আওয়াজের ভিতর মিলিয়ে গেল, যখন সেই ভগ্ন জনতা শহর ভেঙে বন্দরে ছুটেছে, সেই সময় লিলি লিটনের মোটর হাঁকিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে হাঁকল, সুখানি, মোবারককে খবর দাও ভাই ব্লিউ এসেছে গাড়ি নিয়ে।

উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রার মতো লিলির শরীর উইংস-এর আলোতে ঝক ঝক করছে। ওর সবুজ স্কার্টে আলোব বন্যা নেমেছে যেন। মোবারক ডেক অতিক্রম করে আসছে তখন। শেখর ওকে অনুসরণ করছে। দু'জন বাঙালি একজন মাউরি মেয়েকে অলক্ষে উঁকি দিয়ে দেখল, পাঁচ নম্বর সাবের কেবিনের ফাঁক থেকে, মেয়েটা উঠে আসছে।

মোবারকের গায়ে দামি নেভি ব্লু সার্জ। হাতে লেদার ব্যাগ। মাথায় নীল ফেল্ট ক্যাপ। আমেরিকান কায়দায় টাইটা ঝুলিয়েছে নাভি পর্যন্ত। ডান হাতটা পকেটে। সে সিঁড়ি দিয়ে নামল কেমন ক্লান্ত পা ফেলে। নীচে নামলে লিটন গাড়ির দরজা খুলে দিল। লিলি হ্যান্ডশেক করল দু'জনের সঙ্গে কিন্তু কোনও কথা হল না। মোবারক নীরব। গাড়িটা যখন বন্দর-পথ ভেঙে এইচ জি বুচারের মদের দোকান পিছনে ফেলে মিশনের চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করল সেই সময় লিলি বলল, দেখেছ শেখর, দেখেছ মোবারক, শহব ভেঙে জনতা এসে কেমন ভিড় করেছে!

মোবারক উত্তর করল না, শুধু শেখর 'হুঁ' বলে কিছু প্রতিধ্বনি করল মাত্র।

মোবারকের দীর্ঘ দেহটা চত্বরে নামতেই জনতা দু' ভাগ হয়ে পথ করে দিল। লিলির হাত ধরে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন দৃষ্টি তাব বিরাট জনতাকে পার হয়ে সেই পাহাড়-ছাদে। যেখানে রেস্ট-রুম রয়েছে। যেখানে সান ডায়েল ক্লক রয়েছে। সে দেখল ভিড় থেমে আছে বাতিঘরের পাহাড়-ছাদের নীচের ধাপ পর্যন্ত। পাহাড়-সিঁড়ির হাঁটু ভাঙা 'দ'-এর স্তরে স্তরে গ্যালারি। সব মানুষ উন্মুখ

প্রত্যাশায় বসে আছে। নীরব, নিস্তব্ধ, এতটুকু আওয়াজ নেই কোথাও। শুধু এক পশলা হিমের গুঁড়ো রিন রিন শব্দে ক্রমশ নীচে নেমে আসছে।

মোবারক গিয়ে মঞ্চে উঠল। লেদার ব্যাগটা উইংস-এর ছায়ায় রেখেছে। তারপর উইংস-এর তলায় হাত বাড়িয়ে সাপটাকে টেনে টেনে বের করল। বিস্ময়ে 'থ' হয়ে থাকা হাজারও মানুষের চোখের উপর বারো ফিটের শঙ্খচূড়টাকে দুলিয়ে দুলিয়ে নাচাল। দু'ঠোঁটে তার মাউথ-অর্গান বাজছে এবং সে দুলে দুলে ভয়ংকর সাপের মুখোমুখি হল। জনতার উন্মুখ দৃষ্টি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অনেকে এই ভয়ংকর দৃশ্যকে সহ্য করতে না পেরে চোখ ঢাকল।

তারপর মোবারক নেমেছে মঞ্চ থেকে। সাপটা গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হাজারও মানুষের কণ্ঠ উচ্চকিত। তারা অদ্ভুতভাবে টুপি উড়িয়ে মোবারককে অভিবাদন জানাল। অনেকে ভিড় ঠেলে এসে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহটাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। লিলি এল, সেক্রেটারি এল কিন্তু কারও সঙ্গে সে কথা বলল না। শুধু একসময় উইংস-এর আড়াল থেকে ব্যাগটা নিয়ে লিলির হাত চেপে ধরল। বলল, চলো পাহাড়-ছাদের সান ডায়াল ক্লকে।

সেই সান ডায়াল ক্লক আর রেস্টরুম, সেই পাহাড়-ছাদ। বিগত অনেকগুলো রাতের কবোষ্ণ নিশ্বাস যেখানে লিলির সিক্ত ঠোঁটগুলোয় কামনার আর্তি লতিয়ে লতিয়ে আবার হিমশীতল হয়েছে।

লিলি এল, মোবারক এল। নিঃশব্দ উভয়ে। ডান হাতের কঠিন চাপে মাঝে মাঝে লিলির নরম হাতটা আর্তনাদ করছে। তবু সে কিছু বলছে না, কাঁদছে না। হাতের কঠিন চাপে শুধু মাঝে মাঝে মোবারকের উপর ঢলে পড়তে চাইছে।

পাহাড়-ছাদে সান ডায়াল ক্লকের উপর ত্রিভুজের মতো কাঠটাকে ব্যবধান রেখে দু'জন বসল। তারপর ব্যাগ থেকে টেনে টেনে মোবারক শঙ্খচূড়টা বের করছে। শীত তীব্র বলে কিছুতেই ভিতরের গরম ছেড়ে হিমশীতল ঠান্ডায় আসতে চাইছে না সে। তবু অনেক টেনে সাপটা লিলির সামনে বের করতেই প্রায় আর্তনাদ করে উঠল লিলি, মোবারক, এটাকে সরিয়ে নাও, প্লিজ।

দ্যাখোই না !— বলে সাপটাকে আরও কাছে টেনে নিল মোবারক।

ভারতবর্ষ থেকে এটাকে মন্ত্র পড়ে নিয়ে আসিনি, দয়া করে আমার ব্যাগের ভিতরই শঙ্খচূড়টা থাকে। এটা আমার পোষমানা জীব।

ডায়ালের উপর ভয়ে লিলি উঠে বসেছে। লিলির শ্যাম্পু-করা ফুর ফুর চুলগুলি উড়ছে।

মোবারক ক্লান্ত, লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত। মাথা নিচু করে তাই সে অনেকক্ষণ বসে থাকল।

লিলি বলল ওর হাত টেনে, তোমার আজ জাহাজে ফিরতে হবে না, আজ চলো ফিজরয়ে মায়ের কাছে।

মোবারক উত্তর দিতে পারল না, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে শুধু ডায়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

অন্য কোনও আওয়াজ নেই। পাহাড়-ছাদ, কৌরি-পাইনের বনভূমি অন্ধকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। একমাত্র উপত্যকার গ্যালারির মতো চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বন্দর থেকে ট্রাকগুলো মাল নিয়ে শহর ছাড়িয়ে অন্য পাহাড়-প্রান্তে ছুটছে। তারা দু'জন পাহাড়-ছাদ থেকে নেমে এল সেই সময়।

নীচে কবর-ভূমি। কবরের পাঁচিল ঘেঁষে পথ, পথ গিয়ে থেমেছে ট্রাম স্টপেজে।

লিলি এসে একবার কবর-ভূমির দরজায় থামল। পিছনে মোবারক। মোবারক কথা বলছে না। সে কেমন আনমনা হয়ে পাহাড়-সিঁড়ি ভেঙে হাঁটছে।

লিলি বলল, মোবারক, তুমি আমার বাবার কথা শুনেছিলে।

মোবারক বলল, তিনি তো মারা গেছেন।

তাঁর সমাধি আছে এই কবর-ভূমিতে। চলো না দেখবে।

লিলি চাইছে মোবারক পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। ওর আনমনা মন লিলির চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হোক।

সদর দরজার পরে লাল কাঠের ঘর। দারোয়ান বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ বার বার একই সুর করে পড়ছে।

বারান্দার সামনে কালো সরীসৃপের মতো অমসৃণ পথ। লিলি আর মোবারক সেই পথে আরও দুটো গ্যাসপোস্ট অতিক্রম করে গেল।

প্রতি কবরের বুকে নিভন্ত মোমের আলো। প্রিয়জনেরা সন্ধ্যায় আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জ্বলে আর জ্বলতে পারছে না।

লিলি আর মোবারক এসে থামল ক্ষুদ্র একটি আপেল গাছের ছায়ায়। জাফরানি রঙের আলো গ্যাসপোস্ট হতে ঝরে পড়েছে, নিভন্ত মোমের আলো নিবু নিবু হয়ে কবরের ক্রসের উপর জ্বলছে। লিলি বসল হাঁটু গেড়ে এবং মোবারক সেই মতো অনুসরণ করে কবরের প্রতি আর-একটু ঝুঁকে বসল।

লিলি বলল তখন, মা সন্ধ্যায় রোজ এখানে আলো জ্বেলে দিয়ে যান।

কিন্তু নিভন্ত আলো এবং বিবর্ণ জাফরানি রঙের আলোর ছায়ায় কবরের উপর কতকগুলো হরফ অত্যন্ত অস্পষ্ট। সেজন্য মোবারক আরও একটু ঝুঁকে অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে দেখার চেষ্টা করল লেখাদুটো কীসের। আলোর পড়ো-পড়ো শিখা নিঃশেষ হয়ে গেল বলে, নিভন্ত আলো একেবারে নিভে গেল বলে দেশলাইয়ের আলো জ্বালল মোবারক। জাফরানি আলোয় হঠাৎ নীল-নীল চোখে দেখল সে হরফের রেখাগুলো নীল হয়ে উঠেছে। নীল রেখায় মূর্ত হয়েছে, পাতার ফাঁকে চুইয়ে পড়া জাফরানি রঙের নীচে দুটো কথা, ক্রসের উপর, প্রথমে ইংরেজিতে, হেনাফোর্ড এবং আরো কী; পরে বাংলা হরফে...

লিলি ডায়ালের উপর চোখ বুজে দু'চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মোবারকের হাত থেকে ছাড়া সাপটা তখন ডায়াল থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে ধূপছায়া এক পাহাড় অন্ধকারে লিলির পা জড়িয়ে কোমর অতিক্রম করে যেন বুকের ভিতরের উষ্ণতা খুঁজছে: ব্লাউজের অন্তরালে মাথাটা, ঢুকিয়ে বুকের চারপাশে প্যাঁচ কষবে বুঝি।

লিলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডায়ালের উপর ঢলে পড়ার সময় মোবারক ওকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিল। ব্লাউজের অন্তরাল থেকে সাপের মাথাটা খুঁজে টেনে টেনে বের করল। হাতের উপর প্যাঁচ খেলিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, শঙ্খচূড়টা আমার হাতে। ভয় নেই, চোখ খুলে চেয়ে দ্যাখো। ও অন্যায় করে না। প্রতিদিন দেখলে তুমিও ওকে ভালবেসে ফেলতে।

লিলি মোবারকের বাঁ হাতের উপর সমস্ত শরীরের অবলম্বন রেখে কোনও রকমে একবার অর্ধ-নিমীলিত হয়ে চাইল হাতে প্যাঁচ-খাওয়া সাপটার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে চোখ বুজে ফেলল। শেষে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আর পারছি না মোবারক। তারপর বলল, আমি বিশ্বাস করি।

সাপটা চলে গেল মোবারকের নির্দেশে, ডায়ালের বুক বেয়ে বেয়ে ব্যাগের ভিতর ঢুকে চুপ করে বসে থাকল। একবারের জন্যও সে আজ ফোঁস করে বলল না, এসব কী হচ্ছে?

মোবারক বলল, শঙ্খচূড়টা চলে গেছে ল্লিউ!

লিলি এবার সোজাসুজি তাকাল। দু'হাতে হঠাৎ মোবারককে সাপটার মতো পেঁচিয়ে ধরল। ডালিম পাতার মতো সরু নাকটা আর রক্তিম ঠোঁটদুটো বুকের উপর ঘষে ঘষে বলল, মাই ডার্লিং, আই লাভ ইউ।

তারপর লিলি থেকে থেকে বার বার বলছে এক কথা, বুকের উপর নাক-মুখ ঘষে বলছে শুধু, মো— বা—র—ক।

তার মনের প্রকাশ, সমস্ত কামনার উষ্ণতা, তীব্র নিবিড়তার ঘনিষ্ঠতা, একটি কথার ভিতরই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আকাশ-ঝরা তারার মতো সে কথা ওর মনে রেখাঙ্কিত করে দিল ল্লিউর কান্না-ভরা হৃদয়ের ছবি। মন তাই তার ঝরনার গলে-পড়া হীরকচূর্ণের মতো গলে গলে পড়ল। সেইজন্যই বুঝি আবার ডাকল, ল্লি-উ।

লিলি বুকের উপর পড়ে থেকেই উত্তর করল, মো—বা—র—ক!

শঙ্খচূড় চলে গেছে। সুতরাং চলো কৌরি-পাইনের তলায় গিয়ে বসি।

লিলি নিথর। দুটো হাত সেই আগের মতো জড়ানো এবং কোনও জবাব উঠল না ওর কণ্ঠে। সে নির্জন রাতের মতো নীরব হয়ে গেছে। কামনাবহ্নি পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে রক্তপ্রবাহ হতে।

মোবারক অনুভব করছে ওর শরীর ক'বার কেমন করে যেন রোমাঞ্চিত হল। হরীতকী গাছের

ছায়াব নীচের অন্ধকারটার মতো এ অন্ধকারটাও হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানছে। শামীনগড়ের বাল্যপ্রেম এখানটায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

মোবারক ওর কাছ থেকে দু'কদম সবে দাঁড়াবার চেষ্টা কবল, কিন্তু পারল না। সে ওব সঙ্গে যেন সম্পূর্ণ জট পাকিয়ে আছে, ওব যেন এতটুকু ক্ষমতা নেই এ জট ছাড়িয়ে মুক্ত হবার।

পাশেই ক্লকেব সিমেন্ট-করা ডায়াল। কোনও অদৃশ্য শক্তি ওদের দু'জনকে সে দিকে যেন শুধু টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর দুটো তারা আকাশ থেকে খসে পড়ল সেই ডায়ালে। ডায়ালেব বুকে ওরা এগিয়ে গেল। এবং ক'ফোঁটা শিশিরবিন্দু গড়িয়ে এসে থমকে দাঁড়াল পৃথিবীর কোলে। নির্গমপথে সবুজ সেই বং জন্মেব ইশারা দিল।

তারপব?

তাবপর আবার নীরব সব। মোবারক ক্লান্ত দেহটা নিয়ে কোনও বকমে উঠে দাঁড়াল।

সে সময় চার্চের ঘড়িতে বাবোটা বাজাব শব্দ শোনা গেল। কৌরি-পাইনেব অন্ধকাব ভেঙে সে শব্দ মোবারকেব কানে এসে ধাক্কা খেল। সে শব্দে মোবারক উৎকর্ণ হল। দু'হাত উপরে তুলে পাগলের মতো ডেকে উঠল তারপর, খোদা হাফেজ।

অনেকক্ষণ পব শেখব পা বাড়াল ডেক থেকে মেসরুমের দিকে। এতক্ষণ এই ভোবেব আলোয় শেখব পাহাড-সিঁডিব দিকে চোখ বেখে প্রতীক্ষায় ছিল মোবারকেব। গত রাতে সে জাহাজে ফেরেনি।

মেসরুমে ঢুকে টিনের থালায় ওর খাবাব নিয়ে নিল, মোবারকেব খাবারটা গত বাতের মতোই সাজিয়ে লকাবে বেখে দিয়ে এসেছে। যখনই আসুক, দু' মুঠো অন্তত কিছু মুখে দিতে পাববে।

কিন্তু মেসরুমে খেতে বসতেই ইঞ্জিন-সারেং এসে দরজার উপর ভব করে ডাকল, শেখর, তোকে বাড়িওয়ালা ডাকছে। বড-মালোম, বড-মিস্ত্রি ওঁবাও ব্রিজে আছেন।

আমায় ক্যাপ্টেন ডাকছেন?

হুঁ। ডাকছেন। মোবাবক কাল জাহাজে আসেনি। আজ কাজে যায়নি, আমি তাই বিপোর্ট দিয়েছি।

কাল আসেনি, আজ আসত। আঠাবো মাস সফরে কাল রাতেই শুধু আসেনি। আর তার জন্যই আপনি বিপোর্ট দিয়ে দিলেন?

আমি বাপু ওসব বুঝিনে। যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। আমার সঙ্গে তুমি এসো।

শেখব হাত মুখ ধুয়ে মেসরুম থেকে বেবিয়ে এল এবং প্রথমবারের মতো থামল এসে অ্যাকোমডেশন-ল্যাডারের গুঁড়িতে। সারেং আগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ব্রিজে গিয়ে খবর দিল, শেখব নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পব সারেং ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, ওপরে উঠে আয়।

' শেখর কোনওরকমে লাফিয়ে উঠল। মই বেয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিন ঘুরে উঠে গেল ব্রিজে। ভিতরে ঢুকে দেখল চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্টিয়াবিং-হুইলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। কম্পাসটার সোজাসুজি বার্নিশ-করা মেহগনি কাঠেব রেলিংয়ের ওপব ভর কবে বসে আছেন চিফ অফিসার আর ক্যাপ্টেন।

শেখর ঢুকতেই চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন কবলেন, মোবারক কোথায় গেছে শেখর? তুমি বলতে পারো?

পারি। সন্ধ্যায় সে সি-ম্যানস মিশনে গেছে।

তারপরের খবরটা জানতে চাই।

তারপবের খবব আপনি ঠিক যা জানেন আমিও তাই জানি স্যার।

কিন্তু সারেং যে বলল মোবারকের সব খবর তুমি রাখো।

রাখি। কিন্তু কতটা রাখি সারেং সাব তা জানতেন না।

শেখর!—চিফ ইঞ্জিনিয়ার ধমক দিয়ে উঠলেন।—সব খুলে না বললে লগবুকে স্যার তোমার নাম তুলে নেবেন।

যা আমি জানি না স্যার, জানবাব কথা নয়, সে নিয়ে যদি সারেং সাহেবের কথার উপব ভর করে লগবুকে আমার নাম তোলেন তবে ক্ষতি আমার হবে ঠিক, কিন্তু মোবারকের খোঁজ পাওয়া যাবে না।

মোবারকের নামে ওয়ারেন্ট যাচ্ছে। শুনেছি সে এগমন্ট-হিলের দিকে একটি মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।

শেখর চুপ করে থাকল।

হাতে আমাদের এতটুকু সময় নেই। কারণ জাহাজ আজ-কালই ছেড়ে দেবে, নয়তো অপেক্ষা করা যেত।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে শেষে বললেন, তা হলে যেতে পারে স্যার?

হুম করে একটি শব্দ ঘোঁৎ করে ক্যাপ্টেনের নাক মুখ দুই-ই জুড়ে বেরিয়ে এল। ক্যাপ্টেন সম্মতি জানিয়েছেন।

শেখর ব্রিজ থেকে তখন নেমে এল ডেকের উপর। মাউন্ট এগমন্ট আর লায়ন রকের বুক জুড়ে ওর বিবর্ণ দৃষ্টি। বড্ড অসহায় ও আজ। অন্তর থেকে খুব সহজভাবে উঠে এল কথাগুলি, জাহাজ সেল করবে। ওয়ারেন্ট যাচ্ছে মোবারকের নামে। হয়তো সে না ফিরলে শেখরের অস্তিত্ব জাহাজে দুঃসহ হয়ে উঠবে। অনুভব করল আজ তার জীবনটা কেমন অর্থহীন হয়ে উঠেছে। আঠারো মাস সফরে দরিয়ার বুকে ওদের দু'জনের ভিতর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজ আর গৃহজীবনে সে সম্পর্ক গড়ে ওঠা ভার। তাই মোবারক আর শেখর দুই ভিন্ন জাতির দু' ধারা সমুদ্রের একঘেয়ে জীবনে এক রক্ত হয়ে গেল। সেই ধারা যদি দু'-ধারা হয় তবে শেখর ঝরা পাহাড়ি কুরচির মতো মলিনতায় ঢাকা পড়বে।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে ওঠায় শেখর ফোকশালের দিকে পা বাড়াল।

সারেং নীচে এসেছিল শেখরকে খুঁজতে, সে যেন নীচে কাজ করতে যায়। চার নম্বর সাবকে সাহায্য করতে হবে। কন্ডেন্সার খোলা হয়েছে, পানি মারতে হবে পাইপে। সে শুনেও শুনল না। সারাটা দুপুর বসে বসে মোবারকের দুর্যোগপূর্ণ জীবনের কথা সে চিন্তা করল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সফরের নিঃসঙ্গ জাহাজি জীবনের কথা ভেবে যেন মুষড়ে পড়ল।

বিকেলবেলায় শেখর একবার মাত্র উঠে এসেছিল ডেক-এ। মোবারকের ওয়ারেন্টের মতোই যেন বিকেলটা পাণ্ডুর হয়ে আছে। সব চুপ হয়ে আছে। জাহাজিরাও। শুধু কার্পেন্টার আর দু' নম্বর অ্যাপ্রেন্টিস ফলকার ওপর ক' ভাঁজ ত্রিপল ঢাকা দিয়ে নীচে লোহার পাতের ওপর কিল আঁটছে। ডেক-এ আর কেউ নেই। ডেক-পথ, এলিওয়ে-পথ সব শূন্য। শুধু পোর্ট-সাইডের গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার কনকনে হাওয়ার ভিতর বসে বসে কাঁপছে।

ক্রেন মেশিনের নীচে জেটির ওপর গাড়ি দাঁড়িয়ে। সে গাড়িতে সারেং বড়-মালোম ওয়ারেন্ট দিতে যাচ্ছেন। শেখর দাঁড়িয়ে থাকল। বড়-মালোম কেবিন থেকে বেরিয়ে এলে একবার অনুরোধ করবে। শুধু এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে বলবে। কারণ ওর মন বলছে আজ যখনই হোক মোবারক ফিরবে। পোর্ট-সাইডের এলিওয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। বুকের ভিতর কেমন যেন ধুক ধুক একটা বিচিত্র শব্দ উঠছে। কেমন এক বিচিত্র রকমের জড়তায় সে পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে।

পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে ওর শরীর মন সব। কারণ এলিওয়ে ধরে চিফ অফিসার বের হয়ে আসছেন। আসছেন ওর দিকে। এসেই এমন দুটো রক্তচোখ নিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে গেলেন যে, সে কিছুতেই অনুরোধ করতে পারল না, শুধু একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে দেখুন মোবারক আসে কি না।

চিফ অফিসার গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেলেন। পরে জাহাজ থেকে জেটিতে নামল সারেং সাব। ওঁরা মোটরে উঠে পাহাড়-সিঁড়ির পথে এজেন্ট-অফিসের দিকে চলে যেতেই দেখল সেই পথ ধরে বন্দরের দিকে আর-একটি নীল গাড়ি উল্কার মতো ছুটে আসছে। এসেই খ্যাচ করে ব্রেক কষল সিঁড়ির সামনে। দরজা খুলে ছবির মতো বেরিয়ে এল অষ্টাদশী লিলি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শেখর। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর বিবর্ণ মুখ। চিৎকার করে উঠল, লিলি! ভগবান মঙ্গলময়। মোবারক কোথায়?

চিৎকার করতে করতে শেখর ছুটে গিয়েছে কাঠের সিঁড়িটা পর্যন্ত। সিঁড়ি থেকে লিলিকে নামিয়ে আনতে আনতে বলল, মোবারক যে আসেনি! সে কোথায়?

ফিক্সরয়ে আমাদের বাড়িতে।
মোবারকের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওয়ারেন্ট দিয়েছে কোম্পানি।
ওয়ারেন্ট। ওয়ারেন্ট যাচ্ছে।
ঠোঁটের ভাঁজে ক'বার কথাগুলি শুধু উচ্চারিত হল। তারপর চিন্তা করল মুহূর্তের জন্য এবং চোখ তুলে চাইল শেখরের দিকে—ভয় নেই। ওয়ারেন্ট দিয়ে ওরা কিছু করতে পারবে না। কারণ মোবারককে আমি বিয়ে করছি।
শেষে কোটের আস্তিন টেনে ঘড়িটা একবার দেখে বলল, চলো তোমার কেবিনে। কথা আছে।
লোহার ডেকের উপর জুতোর হিলের খট খট শব্দ করে পা বাড়াল লিলি। চলেছে সে পিছিলের দিকে। তামাটে রঙের হালকা মোজায় জড়ানো পা দুটোর চলার ঢঙে কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব। মনে হয় পা দুটো এক্ষুনি যেন হাঁটুর মাঝামাঝি ভেঙে পড়বে। কোনওবকমে তবু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পিছিলে। মুহূর্তের জন্য থামল ক্রু-গ্যালির সামনে। পিছন ফিরে ডাকল, শেখব!
লিলিব কণ্ঠস্বরটা ভাঙা কাঁসাব শব্দের মতো শোনাল। শেখর এতটুকু সাড়া দিতে পারল না। সমস্তটা ডেক-পথ অতিক্রম করতে করতে সে ভাবছিল বাকি সফরের নিঃসঙ্গ জীবনেব কথা। মোবারক আর ফিরছে না। লিলি তাকে বিয়ে করবে। এছাড়া ওব আরও কথা আছে। ফোকশালে গিয়ে সে কথা হবে। কী কথা। কেমন কথা! সে কথাব ভিতরে শেখবের জাহাজডুবিব কথা নেই তো।
সেই সময়ে অনেকগুলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পিছিলের ডেকে পায়চাবি করছিল। শেখবের দিকে চেয়ে সে দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তাদেব প্রশ্ন কবা হয়ে ওঠেনি, শেখর আব লিলির মুখেব দিকে চেয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যেই যথাসম্ভব অনুমানেব জবাবগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।
লিলি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। ভিতরে ঢুকল ফোকশালেব। শেখবও ঢুকল এবং ঢুকেই বলল, বোসো।
লিলি বসল না। দাঁড়িয়ে থেকেই স্কার্টের পকেট হতে বাব কবে নিল সিগাবেটেব প্যাকেটটা! দু' চোখের ভুরু উঁচিয়ে শেষে হাত বাড়াল শেখবেব দিকে, তোমাব লকারের চাবিটা!
লিলিব চোখ আর মুখ দেখে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠল শেখব। হয়তো ভুল করেই শেখরের চাবিটা চাইছে। দবকাব মোবাবকের চাবির, ওর লকারের। বিয়ে-থা হবে, কাজেই মোবাবকের সবকিছুর ওয়ারিশ লিলি। সাবেংকে ডেকে আনলে হয়, চাবিটা সারেঙেব কাছেই আছে। গাদা মেবে সবকিছুই সামনেব লকারটার ভিতব রেখে গেছে।
সারেংকে ডেকে আনছি। মোবারকেব চাবিটা ওব কাছেই আছে। তুমি দাঁড়াও, চাবিটা এনে দিচ্ছি।
আমি তোমাব চাবি চাইছি। মোবারকের চাবি দিয়ে আমার কী হবে? ওটা আমাকে দিয়ে বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসো। ততক্ষণে আমি এদিকের সব ঠিক করে রাখছি। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।
সব কথার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না শেখর। তবু নির্বিকারভাবে বালিশের নীচ থেকে চাবিটা বেব করে দিল লিলিকে। এদিক-ওদিক খুঁজে সাবানের বাক্সটা বের করে বাথরুমের দিকে চলে গেল।
ইতিমধ্যে ক'জন জাহাজি এসে উঁকি মেরে গেছে শেখরের ফোকশালে। সারেংও একবার এসেছিল দেখতে। টিন্ডাল, ডংকিম্যান সবাই দেখে গেছে লিলি শেখরের লকার থেকে কী সব টেনে টেনে বের করছে। ওসব দেখে ফোঁস ফোঁস করে উঠেছিল তিন নম্বর ডংকিম্যান, মাগিটা আবার এসেছে শেখরবাবুর মাথা খেতে। আজকে হয়তো শেখরবাবুকে নিয়েই ভাগবে। তাই ওকে সাবধান করতে হবে, সারেংকে বুঝিয়ে বলতে হবে নচ্ছার মেয়েটার সম্বন্ধে।
এমন অনেক কিছু ভেবেই যখন উপরের দিকে উঠতে যাবে সে সময় দেখল শেখরবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল তিন নম্বর ওয়াচের ডংকিম্যান। কিছু বলতে গিয়েও শেখরবাবুকে বলতে পারল না। এবার আরও বেশি দূরে সরে দাঁড়াল। শেখরবাবুর মুখটা আজ খুব বেশি থমথমে। চিঠি-লিখে-দেওয়া বাবু। দেশের খবর যে দুটো-একটা আজও পায় সে এই বাবুর মেহেরবানিতেই। এ বাবু কি আর সেই মোবারকের মতো? সাদা মেয়ের ভেলকিতে পড়বেন ইনি?
শেখর ভিতরে ঢুকে দেখল লিলি চকোলেট রঙের স্যুট আর ইটালিয়ান আর্টিফিসিয়াল সিল্কের

শার্ট ভাঁজ করে রেখেছে ওরই পাশে। চকচক করছে বাংকের নীচে জুতোজোড়া পর্যন্ত। শেখরকে দেখে বলল, বাইরে অপেক্ষা করছি, জামাকাপড় ছেড়ে নাও। যেতে হবে মোবারককে দেখতে।

ওরা দু'জন একসময় উঠে এল। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উপরের ঘন সাদা কুয়াশার ছায়াটা চিমনির ধোঁয়ায় কেমন ধূসর হয়ে উঠেছে। লায়ন রক থেকে মাউন্ট এগমন্টের মাথায় মাথায় সেই আবরণ। ধূসর কুয়াশায় আবৃত ডেক-পথে এসে শেখরের চোখদুটোও কেমন ধূসর হয়ে উঠতে থাকল। একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতে থাকল লিলিকে কেন্দ্র করে। মোবারককে দেখতে যেতে হবে। লিলি ওকে নিতে এসেছে তাই? মনের ভিতরেই গুমরে মরতে থাকল শেখর। মোবারক কেমন আছে? কী হয়েছে ওর? কোনও প্রশ্নেরই সহজ উত্তর সে খুঁজে বের করতে পারল না। কী যেন একটা অস্বস্তি সবকিছুকে কেন্দ্র করে। হয়তো মোবারককে দেখবার উন্মুখ আগ্রহ তাকে সহজ হতে দেয়নি। সেজন্য আর একটাও প্রশ্ন সে লিলিকে করতে পারল না।

তারা দু'জন এসে থামল গ্যাংওয়েতে। কোয়ার্টার-মাস্টারই বাধা হয়ে দাঁড়াল। শেখর আর-একবারের জন্য বিস্মিত হল। গ্যাংওয়ের বুকে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার-মাস্টার হাত মুখ দাড়ি নেড়ে শেখরকে বলেছে, যেতে দেওয়া হবে না। জাহাজ কাল ছাড়ছে। ক্যাপ্টেন কাউকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন না।

লিলি কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না দু'জন একদেশি মানুষের জাতভাষা থেকে। শুধু শেখরের দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে, সে অনুবাদ করে নিশ্চয়ই বলবে দু'জনের মধ্যে এতক্ষণ কী কথা হল।

আর শেখর যখন অনুবাদ করে শোনাল লিলিকে তখন সত্যি যেন ওর হাঁটুর ভাঁজদুটো ভেঙে এল। যাতে কাঠের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জেটির জলে ডুবে না যায় সেজন্য যেন দড়িটা শক্ত করে ধরল। শেখরকে অনেক কথা বলবার ছিল। মোবারকের অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় মাতৃভাষায় চিৎকারের অর্থ সে কিছুই বোঝে না। আজ লিলির জীবনে শেখবকে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কই, সে যেতে পারল না, কোম্পানি তার পথ রোধ করে বসে আছে, সে পথ থেকে টেনে নিয়ে যাবার কতটুকু শক্তি লিলির? মোবারকের ভালমন্দের ভার ওর উপর বর্তে আছে, কিন্তু শেখরেব? কাজেই এক অপার্থিব ভাবলেশহীন দৃষ্টির বিনিময় হল শুধু শেখর আর লিলির মধ্যে। শেষে প্রায় টলতে টলতে দু' হাতে দু' দিকের দড়ি শক্ত করে ধরে লিলি নেমে গেল জেটিতে, পার্ক-করা মোটরে উঠে পাহাড়েব ঢেউয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেখর তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে পাহাড়ি ঢেউয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে, ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে নীল-লাল আলোর রেশ কুয়াশার জাল ভেদ করে ওর দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে তুলছে। মৃত্যুর মতো সে দৃষ্টি স্থির। তবু তার ভিতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুটো জীবন, মোবারক আর লিলি। কিন্তু মোবারক আর ফিরল না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদায় নেবে জাহাজ। সুখানি এসেছিল ডেক-এ। স্টোর-রুম হতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদায়ের চিহ্নিত কালো বর্ডারের ফ্ল্যাগটা হাতে করে নিয়ে এসেছিল। এখন ওটাই উড়ছে মাস্টে।

ডেকেব ওপর পায়চারি করছে শেখর। দৃষ্টি ওর পাহাড়ি ঢেউয়ের ভাঁজে সংকীর্ণ উপত্যকার রং-বেরঙের কাঠের বাড়িগুলোর ছায়ায়। এমনি এক কাঠের ঘরের নরম ছায়ায় মোবাবক আর লিলির দুটো চখা-চখির আকাশ-নীড়। মোবারক অসুস্থ। লিলি ওর ভাল-মন্দের ভার নিয়েছে। শেখরকে দেখতে চেয়েছিল ও। লিলির জীবনে শেখরের প্রয়োজন খুব বেশি।

ইঞ্জিন-সারেং সেই পথেই এল। সেই পথেই নেমে গেল ইঞ্জিন-রুমে। ইঞ্জিন-রুমে ঢোকার আগে সজারুর মতো খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখে গেল শেখবকে। নীচে নেমে গেল ও। বয়লারে আগুন দেবে, স্টিম তুলতে হবে দুশো ত্রিশ। স্টিম গেজের কালো কাঁটাটা লাল দাগে উঠে থরথর করে কাঁপবে।

সাড়ে বারোটায় চর্বিভাজা রুটি খেল সবাই। আধখানা করে রুটি খেয়ে আধ বদনা করে জল ঢালল গলাতে। সারেং ডাকল, মাস্টার।

ক্রু-গ্যালির সামনে টিন্ডাল থেকে কোলবয় সব দাঁড়াল সার বেঁধে। নূতন করে ওয়াচ ভাগ হল। এক

নম্বর ওয়াচে মোবারক যেখানে বয়লার টানছিল শেখরকে সেই বয়লারে ঠেলে দেওয়া হল। শেখর মাস্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সব। বুকের ভেতরে কে যেন ছুরির ফলা দিয়ে আঁচড় টানছে একটা একটা করে। ধুকধুক করছে বুকের একটা ক্ষতস্থান। দু' নম্বর বয়লার, কোম্পানির শয়তান পুষে-রাখা কসবি, বাবুর প্রতি ওর খুব বেশি টান। কসবিটাকে শায়েস্তা কবতে পারে মোবাবক, ছোট-টিন্ডাল আর সিলেটি আগওয়ালা গণি।

চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শেখর। প্রতিবাদ জানাল না। প্রতিবাদ জানিয়ে কোনও লাভ নেই। সে জানে মোবারক আজ জাহাজে থাকলে দু' নম্বর বয়লারে ওকে ঠেলে দেওয়া দূরে থাক, কেউ একথা তুলতে পর্যন্ত সাহস করত না, মোবারককে জাহাজিরা সমীহ করে চলত। শেখর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবল, মোবারক তুই চলে গেলি! গেলি তো আমায় নিয়ে গেলি না কেন? দেশেও যে আর ফেরা হল না আমার দেখছি। কী করে হবে? আমি নূতন আগওয়ালা, দু' নম্বর বয়লারের স্টিম দুশো ত্রিশে তুলে রাখা, সে কি আমার কাজ?

ডেক-সারেং আর ডেক-বড়-টিন্ডাল দু'দিকের দু' পিকে চলে গেছে, সঙ্গে গেছে দু' ভাগ হয়ে ডেক-জাহাজিরা। হাপিজ হবে লোহার মোটা তার, হাসিল টেনে তোলা হবে, ওয়ার পিন ড্রাম গড় গড় করে উঠবে, সেই সঙ্গে পাঁচ খেয়ে উঠবে ম্যানিলা হ্যাম্পের মোটা মোটা হাসিল।

কিনারায় ক'জন সোরম্যান ছুটোছুটি করছে। দু'পিকের দু'মালোমের নির্দেশমতো হাসিল খুলে দেওয়ার ভার ওদের উপর। সমস্ত জাহাজ আর জেটি জুড়ে কর্মচাঞ্চল্য। বাংক লাইন কোম্পানির জাহাজ সিউলবাংক সিডনিতে বওয়ানা হচ্ছে। আবার কবে আসে কি আসবে না কেউ তা বলতে পারবে না।

একসময় পাইলট উঠে এল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। ব্রিজে উঠে দেখল দূবে ফরোয়ার্ড-পিকের নীচে, পিছনে আফটার-পিকের তলায় দুটো টাগ-বোট জাহাজকে টানছে।

শেখর আগওয়ালাব পোশাক পরে মাথায় নীল টুপি টেনে বেব হয়ে এল ফোকশাল থেকে। বোট-ডেকে এসে স্কাইলাইটের পাশে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। শেখর শেষবাবেব মতো দেখে নিল পাহাড়ি শহবটাকে, সি-ম্যানস মিশনকে আর ফিজরয়ের বুকে ঘর বাঁধবার স্বপ্নময় দুটো জীবনকে। চোখদুটো কেন জানি ছলছলিয়ে উঠল। তবু খুব সন্তর্পণে পা বাড়াতে হল, নীচে নামতে হবে। নীচে নামবাব লোহার জালিটার উপর দাঁড়াতেই ভোঁ ভোঁ করে চিৎকার কবে উঠল হুইসেলটা, দিকে দিকে খবব পাঠাল, বিদায় নিচ্ছে সিউলবাংক নূতন দেশ, নূতন জমির জন্য।

শেখর নীচে নেমেই দু' নম্বর বয়লাবের এক নম্বব ওয়াচের আগওয়ালা গণির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর জুড়িদাব। আবও যারা নেমে এল তারাও নম্বর মিলিয়ে বয়লারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যাবার সময় সবাই একবার দেখে গেল, শেখর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে শুধু ভুতুড়ে স্টিম গেজটা দেখছে।

এক সময়ে গণির দিকে চেয়ে বলল শেখর, র‍্যাগ স্লাইস শাবল?

'ওই নীচে। চুলো তিনটা প্রথমেই টেনে নিস, জাম হয়ে আছে।

জাহাজ ছাড়বে ক'টায়?

তোদের 'পরি'তেই।

তুই চুলো টানিসনি?

টেনেছি, কিন্তু চুলো অস্ট্রেলিয়ান কোল খাচ্ছে। শুয়োরের বাচ্চা বড়-মিস্ত্রি পকেট বাংকার খুলে দিয়ে গেছে। ক্রস-বাংকাব বন্ধ। অস্ট্রেলিয়ান কোল শেষ না হলে আর ক্রস-বাংকার খুলছে না।

প্রথম ওয়াচ শেষ হতে এখন দশ মিনিট বাকি। মাথায় সাদা টুপি-আঁটা বড়-টিন্ডাল এক নম্বর পরিদের ডেকে বলল, যাওরে ব তোমরা। গোসল-টোসল করগা। একটু পানি আমার লাইগা রাইখা দ্যান যে।

গণি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলে শেখর এসে দাঁড়াল বয়লারের সামনে। চেয়ে দেখল স্টিম নামছে! দুশো ত্রিশ থেকে দুশো দশে নেমে এসেছে। আরও নামবে। তাড়াতাড়ি বয়লারের পোর্ট-সাইডের দরজাটা খুলে কয়েক শাবল কয়লা হাঁকড়াল। তবু স্টিম এক পয়েন্ট বাড়ছে না, দু' নম্বর বয়লাব আর অস্ট্রেলিয়ান কোল মিলে যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে। এমন সময়ে চিৎকার উঠল পাশ থেকে, বড়-টিন্ডাল হাঁকছে, স্টিম

নামছে, কয়লা হাঁকড়াও, র‍্যাগ মারো, স্লাইশ দাগো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক উঠল, আল্লা আল্লা! শো শো করে উঠল বয়লারের স্টিমককগুলি। একসঙ্গে ছয় বয়লারের ছয় র‍্যাগ উঠল, ঠন ঠন করে বাড়ি পড়ল নীচে, লোহার প্লেটে। স্লাইস হাঁকড়াল একসঙ্গে, ভিতরের জ্বলন্ত আগুন থেকে ঝাং-ধরা পোড়া কয়লা চড় চড় করে ফেটে উঠল। র‍্যাগ মেরে টেনে আনল ছাই, পোড়া কয়লা। পাশ থেকে জ্বলন্ত পোড়া কয়লার উপর বালতি বালতি নোনা জল ছিটকে পড়ল। সমস্ত স্টোকহোলটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে। শেখর চোখ মেলে চাইতে পারছে না, চোখ বুজেই টানছে। দূর থেকে আবার চিৎকার করছে বড়-টিন্ডাল, স্টিম নামছে। একসঙ্গে দুটো শাবল শন শন করে উঠল। ঝন ঝন করে বাড়ি পড়ল লোহার প্লেটে, কয়লা হাঁকড়াল শাবলের পর শাবল। ছয় বয়লারের পোর্ট সাইডের ছয় চুলো নিমেষে ভরে উঠল। এয়ারভাল্‌বটা টেনে দিতেই কালো কয়লা লাল হয়ে উঠল।

শেখর হুম হুম করে কয়লা মারছে দু' নম্বর বয়লারের তিন নম্বর চুলোতে। বারবার করে ত্রিশ সের ওজনের স্লাইস টানতে গিয়ে মোচড় দিয়ে উঠছিল হাতের নরম পেশিগুলো। অন্য আগওয়ালাদের পোড়া কয়লা টানা শেষ। ছাই হাপিজ হয়ে গেছে। স্টিম ওদের দুশো ত্রিশে। তাই উইন্ডস-হোলের নীচে বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারল। কিন্তু শেখরের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উইন্ডস-হোলের নীচে বসে মুহূর্তের জন্য হাওয়া খেতে পারল না। ঘাম আর ছাইয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে মুখ। পোড়া কয়লায় ঢেকে গেছে চোখ। মুহূর্তের জন্য থেমে রগড়ে নিল একবার চোখদুটো, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দেখল স্টিম গেজটা, দুশো ত্রিশে তবু উঠল কই?

ডংকিম্যান একবার এসেছিল ইঞ্জিন-রুম থেকে। তিন নম্বর মিস্ত্রি দু' নম্বর বয়লারের স্টিম চাইছে আরও।

ডংকিম্যান এসে থেমেছিল ইঞ্জিন-রুম পেরিয়ে স্টোকহোলের প্রথম দরজায়। পকেট বাংকারের কোনায় দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিল কথাটা। শেখরের কাছে যেতে ওর সাহস হয়নি। বলা তো যায় না! হয়তো স্টিম তুলতে গিয়ে গনগনে লোহার র‍্যাগটা শেখর ডংকিম্যানের মাথায় মেরে পরখ করে দেখতে পারে, দ্বিতীয়বার সে র‍্যাগ দিয়ে টন টন আগুনে কয়লার মাথা ভাঙতে পারে কি না। এমন হানাহানি কতবার কত জাহাজে হল। স্টিম না উঠলে কয়লার জাহাজে, চিৎকার করবে তো ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন-রুম হতে করো, স্টিমেব জন্যে স্টোকহোলে ঢুকেছ কি মরেছ। প্রথমেই পোড়া লাল লোহার ত্রিশ-সেরি স্লাইসটা ভিতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসবে, বল্লমের মতো করে হাঁকড়াবে ইঞ্জিনিয়ারের বুকে, শেষে টেনে এনে মানুষটা সহ স্লাইসটা ঢুকিয়ে দেবে চুলোর ভিতর! র‍্যাগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উলটে পালটে দুটো টান। একেবারে সাফ। গনগনে চুলোটা সাদা মানুষের তেল খেয়ে স্টিম দেবে দুশো ত্রিশ। তাই যখন এমনি হানাহানি চলে স্টিম নিয়ে, ফায়ারম্যান স্টিম দিতে পারছে না, ইঞ্জিনিয়ার স্টিম চাইছে, তখন ডংকিম্যান কিংবা তেলওয়ালাকেই আসতে হয় দূতের কার্য করতে। দহরম-মহরম যা হবার ওদের ওপর দিয়েই হোক। কারণ এ সময়ে ফায়ারম্যানদের স্টিম তোলার ব্যাপারে দু'-একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পুড়িয়ে দিলে নাকি দড়ি কিংবা হাজতেব ব্যবস্থা হয় না। ডংকিম্যান তাই পকেট বাংকার পর্যন্তই এসেছিল। শেখরের হাতে লাল লোহার গনগনে র‍্যাগটা দেখে আর এক পাও ভিতরে আসতে সাহস করেনি।

টিন্ডাল দু' হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল আবার, দুই নম্বর বয়লার আউর স্টিম মাংতা।

ট্যাংক-টপেব ওপর লোহার প্লেটে মাত্র র‍্যাগটা রেখেছে শেখর, সে সময় দেখল চিৎকার করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে টিন্ডাল, আউর স্টিম মাংতা। আল্লার নাম করো রে ব। মারো জোরে র‍্যাগ, কয়লা দাগাও রে ব।

স্লাইস র‍্যাগ শাবল আর টন টন কয়লার আগুন জোঁকের মতো চুষে খাচ্ছে যেন শেখরের বুকের রক্ত। তবু টান মেরে খুলল এয়ার-ভাল্‌বটা। লোহার হাতল ধরে দরজা খুলে শাবল শাবল কয়লা হাঁকড়াতে থাকল। তিন চুলোয় কয়লা খাচ্ছে রমারম। ভরে উঠেছে ফায়ার ব্রিজটা পর্যন্ত। শেষে আবার টেনে দিল এয়ার-ভাল্‌ব। জোরে বেরিয়ে এল আগুনের হলকা। ঝলসে উঠল মুখ, দেহের রক্তটা একেবারেই সব ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেল বুঝি, কাঠ হয়ে গেল ভিতরটা।

খট খট শেষে বন্ধ করে দিল তিন চুলোয় তিন দরজা। মুহূর্তের জন্য ভর করে দাঁড়াল শাবলের

বাঁটের উপর। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে আয়ত্তের মধ্যে এনে চাইল স্টিম গেজের দিকে। দুশো পঁচিশে গিয়ে কালো কাঁটাটা কাঁপছে। দুশো ত্রিশো তবুও উঠল না। চারিদিকে চেয়ে দেখল তখন উইন্ডস-হোলের নীচ থেকে বেরিয়ে আসছে মনু, ইদাহী, লুৎফল। মুহূর্তের বিশ্রামে ওরা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার হাত চালাতে হবে।

সমস্ত সফরের অভিশাপ হয়ে দু' নম্বর বয়লার আজ শেখরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। মোবারক আলি সারা সফর তাকে সুখ দিয়ে নিজে এখন সুখের ঘর তৈরি করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে রেখে গেছে। প্রায়শ্চিত্ত সে করবে।

রাত আট থেকে বারো—পুরো চার ঘণ্টা, স্লাইস, র‍্যাগ, শাবল আর কয়লার ভিতর ডুবে থাকল শেখর। তার ভিতর ডুবে রইল ওর দেহ মন সব। কয়লা হাঁকড়ানো বাদে পৃথক কোনও অস্তিত্ব আছে শেখরের, মুহূর্তের জন্য আজ সেকথা ভাবতে পারল না। তাই জলের পট থেকে বারবার জল খেয়ে ঢাক করে তুলল পেটটাকে। কয়লা আর শাবলের ঠুন ঠুন আওয়াজের ফাঁকে হাঁক আসছে ফায়ারম্যানদের কাছ থেকে, পানি খেয়ে খেয়ে বাঙালি বাবুটা যে ঢাক হয়ে মরবে গো!

ইদাহী র‍্যাগ মেরে দাঁড়াল শেখরের সামনে। মাথার ফেজ টুপিটা শেখরের মুখের ওপর ঝেড়ে বলল, ফালতু থেকে বাবুর শরীর আরও বাবু হয়ে গেছে। আর পড়লি তো পড় একেবারে দু' নম্বর বয়লারে।

শেষে হি হি করে হেসে সবাইকে যেন জানিয়ে দিল ইদাহী হাসছে।

পবিপূর্ণ অনুভূতিশূন্য শেখবের হৃদয় আজ ব্লাস্ট ফার্নেসের মতো ঝলসে উঠল না ইদাহীর কথায়। মোবারক আজ জাহাজে থাকলে হয়তো ইদাহীর রসিকতার ফল ঘটত বিপরীত। হয়তো হাতের শাবলটা নিশপিশ করে উঠত ইদাহীর মাথাটাকে চৌচির করে দেবার জন্য। পরিবর্তন হয়েছে জাহাজের, মোবারক নেই। পরিবর্তন হয়েছে ওর মনের, সে আজ অনুভূতিশূন্য। কিন্তু এই অনুভূতিশূন্য হৃদয়েও কী করে যেন গরম সীসে-গলা তরঙ্গের মতো একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ মোবারককে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হতে থাকল। ইদাহী ঠিক বলেছে। ওর রসিকতা সম্পূর্ণ সার্থক আট থেকে বারোটাব ওয়াচে। 'ফালতু থেকে বাবুর শবীর আরও বাবু হয়ে গেছে।' মোবাবক যদি প্রথম থেকেই শেখরের প্রতি করুণা না করত, তা হলে হয়তো এই আঠারো মাস সফরে ওবও নবম পেশী শক্ত হয়ে উঠত। দু' নম্বর বয়লার আর ইদাহী মিলে কঠিন বসিকতা করতে অন্তত সাহস পেত না আজ।

একসময় 'পরি' শেষ করে লোহার রডে-তৈরি হাটুভাঙা সিঁড়িটার মুখে এসে দাঁড়াল শেখর। সবাই ওর পাশ কাটিয়ে তরতর করে উঠে গেল উপরে। কিন্তু ওর ভয় করছে। লোহার সিঁড়িটাও যদি ব্যঙ্গ করে! যদি পরিহাসচ্ছলে ছিটকে ফেলে দেয় সিঁড়ি থেকে। তা হলে তো শেষ। নীচে পড়ে দুমড়ে যাবে। কয়লার সঙ্গে মিশে যাবে ওর হাড়-পাঁজর রক্তমাংস। ছুটে আসবে 'বাড়িওয়ালা', বড়-মিস্ত্রি, আরও সবাই। ঝ্যাক ঝ্যাক শব্দ করে চলা প্রপেলারটা কিন্তু থামবে না। তিন নম্বর ওয়াচের লোকেরা তখন ছিটকে-পড়া শেখরের রক্তমাংসের কণাগুলো কয়লার সঙ্গে—'আহা লোকটা বড় ভাল ছিল গো', বলে মিশিয়ে নেবে। খট খট করে শব্দ হবে বয়লারের দরজা খোলার। হুম হুম করে হাঁকড়াবে হাড়-পাঁজর, রক্তমাংস—দু' নম্বর বয়লারে। হয়তো তখন কসবিটা স্টিম দেবে দুশো ত্রিশ। আর জাহাজ থেকে শুধু একটা নাম বাদ পড়বে। কোম্পানির আর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন নেই।

আকাশে সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকার। একটা বলিষ্ঠ ছায়া সেই অন্ধকারে এগিয়ে এসে দুটো বলিষ্ঠ হাত শেখরের দিকে বাড়িয়ে দিল। রজনীর সেই দ্বিতীয় প্রহরে শেখরের অনুভূতিশূন্য দেহটা তেমনি পড়ে আছে ফানেলের উপব। মৃত্যুর মতো স্থির দৃষ্টি ফিজরয়ের বুকে মোবারককে খুঁজছে। অনুভূতিশূন্য দেহটাকে দুটো হাত এসে জড়িয়ে নিল। বলল, শেখর চলো, পরি সেই কখন ভেঙেছে।

শেখরের মড়ার মতো স্থির দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল জাহাজে, ছড়িয়ে পড়ল ছায়াটাকে ঘিরে। সন্ত্রস্ত প্রশ্ন এল সঙ্গে সঙ্গে, কে?

আমি আলি।

আলি! মোবারক!

অনুভূতিশূন্য দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়ল বলিষ্ঠ ছায়ার বুকে।

দ্যাখো দ্যাখো।

বলে ক্লান্ত দুটো হাত মোবারকের দু' গাল লেপটে দিল।

দ্যাখো দ্যাখো, রক্তমাংসের কেমন তাজা গন্ধ।

অসহায় অপরাধীর মতো শেষে কেঁদে নালিশ জানাল, আমাকে দু' নম্বর বয়লারে সারেং ঠেলে দিয়েছে।

সেই আকাশের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দুটো ছায়া একাত্ম তখন। দুটো অসহায় উত্তর-গোলার্ধের মানুষ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাশাপাশি সংলগ্ন তখন। কোনও প্রশ্ন নেই, কোনও উত্তর নেই। সব প্রশ্ন, সব উত্তর দু'জনের হারিয়ে গেছে। বোবা হয়ে গেছে যেন।

তারপর এক সময়ে ওরা দু'জনেই নেমে এল নীচে, টুইন-ডেকে। নিঃশব্দে। মোবারককে অবলম্বন করে শেখর এসে দাঁড়াল আফটার-পিকে। মোবারক গ্যালিতে ঢুকে এক টব গরম জল বের করে আনল, বাথরুমে স্নানের সমস্ত ব্যবস্থা করল শেখরের। মোবারকই স্নান করিয়ে দিল। ফোসকা পড়া হাতদুটো ব্যান্ডেজ করে দিল। শেখর চুপচাপ বসে থাকল। জড় পদার্থের মতো স্থির হয়ে থাকল। সব প্রশ্ন, সব উত্তর কেমন জট পাকিয়ে গেছে ওর। মোবারকের দিকে চেয়ে কোনও প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারল না। একটা কথা বলতে পারল না।

মোবারক আর লিলির সম্পর্ক তবে ভেঙে গেছে। কেন ভাঙল, কী করে ভাঙল, কোথায় ভাঙল, সব প্রশ্ন গলায় এসে কেন জানি চুপ হয়ে আছে।

শেখর কোনওরকমে আবার ক্লান্ত চোখে দেখল মোবারককে। মোবারক যেন মরে ভূত হয়ে ফিরেছে জাহাজে। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে চোখ, কেমন এক নিভৃত পবাজয়ের প্রলেপ ওর জীবনকে কেন্দ্র করে। শেষে শেখরের চোখদুটো থামল একান্ত স্থির হয়ে। মোবারকের বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়িটা ঝুলছে। যেন একটা অক্টোপাস নিরীহ তিমি মাছের মুখে ঝুলে আছে।

ঝড় উঠল!

সমুদ্রে ঝিমুচ্ছে।

ঝড় এল মনে, মোবারকের।

মোবারক দাঁড়িয়ে আছে জোনাকি রাতের ছায়া-ছায়া আলোতে, বোট-ডেকে। লাইফ-বোটের রাডাবের পাশে ঠিক সেই আগের মতো জ্বলছে ওর চোখ, ধক ধক করে জ্বলে উঠছে। জ্বলছে বুকের ভিতর ফুসফুস পর্যন্ত। লিলি হয়তো তখন পিকাকোবা পার্কের পশ্চিমের পাহাড়ে। পাহাড়-ছাদে কৌরি-পাইনের তলায় চোখ রেখেছে বন্দরে। মোবারকের জাহাজ যেখানে ছিল, সে জেটিতে। হয়তো ওর দু' চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

মোবারকের চোখেও জল এল।

লিলি কিছুই জানল না কেন সে চলে এল। কিছুই বুঝল না, কেন সে দক্ষিণ-গোলার্ধের সবুজ দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে ছুটল উত্তর-গোলার্ধে। অজ্ঞাত থাকল এ খবর লিলির কাছে। কিন্তু তার মা? শেখর প্রশ্ন করে সহজ কোনও জবাব পেল না। স্থির করতে পারল না, তিনি জানলেন কি জানলেন না। শুধু শব্দ করছে ঘড়িটা—টিক, টিক, টিক—সেই মোবারকের বাপের আমল থেকে।

মায়ের কথা মনে হল প্রথম। মায়ের মুখ, আম্মাজানের অশ্রুভরা চোখ, শামীনগড়ের আপন মাটির গন্ধে যেন লেপটে রয়েছে। জৈনব বিবি হয়তো স্বামীর বুকে শুয়ে এখন স্বপ্ন দেখছে মোবারকের। হয়তো সেই স্বপ্নে আছে লিলি আর মোবারকের দেহ সান-ডায়াল ক্লকের ওপর। মোবারকের ওপর যে আস্থা ছিল জৈনবের, সব হয়তো কাচের মতো ভেঙে গেছে। দেন-মোহরের সময় মাকে যেমন ও খুঁজে পাচ্ছিল না শামীনগড়ের মাটিতে, পৃথিবী তখন যেমন চুপ হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে, সেই মতো পৃথিবী আজও চুপ হয়ে রয়েছে সমুদ্রের লোনা-লাগা মরা ঢেউয়ের মাথায়।

দুরু দুরু শব্দ কোথা থেকে সব ভেসে আসছে। বোধহয় নীল লোনা জল থেকে এল সে শব্দ। সে আওয়াজে মুখ তুলে সে চাইল দূরে। ইস্পাতের ফলার মতো ছুটে আসছে ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক। লোনা

জলের বুক চিরে আসছে তারা। হয়তো অতিকায় একটা ডলফিন সাগরের অন্ধকার নিবাস থেকে ছুটে আসছে, আক্রমণ করেছে নিরীহ ফ্লাইং-ফিশের দলকে। সন্ত্রস্ত হয়ে তাই তারা উড়তে চেয়েছে আকাশে।

ঝাঁকটা এদিকেই ছুটে আসছে।

এসে ঝপ ঝপ করে পড়ল সমুদ্রে। জাহাজের কিনারায় শুধু একটা মাছ লাফিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে মোবারক তুলে নিল মাছটা। ব্রিজের উইংস-এর আলোতে দেখল তেমন জখম হয়নি উড়ন্ত নিরীহ সামুদ্রিক জীবটি। অন্যদিন হলে ধরেই মোবারক মাছটার পাখাদুটো ছিঁড়ে দিত। ক্রুগ্যালির সামনে গিয়ে হেঁকে বলত, ভাণ্ডারি চাচা, এটা দু'ভাগ করে আমাকে আর শেখরকে ভেজে দেবে।

মোবারক খুব নরম হাতে তুলে ধরল জীবটিকে। চক চক করে উঠছে ওর শরীর ইস্পাত ফলকের মতো। সমস্তটা শরীর জুড়ে দুটো পাখা প্রায় লেজ পর্যন্ত চলে গেছে। মাঝে মাঝে জীবটা নিজের মুখ খুলে ধরছিল, যেমন করে রুই-কাতলা পচা পুকুরের জল টানে। এই উৎকট লোনা জলে এমন নিরীহ শৌখিন জীবটাই বা বাঁচে কী করে! নিজেই প্রশ্ন করল নিজেকে মোবারক। বাঁচে, যেমন করে বেঁচে আছে লিলি কৌরি-পাইনের তলায়, যেমন করে বেঁচে আছে জৈনব বিবি ওর স্বামীর বুকে, যেমন করে বেঁচে আছে আম্মাজান ওর। আর ভাবতে পারল না মোবারক। চোখ দুটো ঘোলা হয়ে উঠল। সবকিছু যেন সবুজ হয়ে আসছে। ছ' বছর আগের এক কাহিনি, সে কাহিনির সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডুবে যাওয়া কাহিনির পরিচয় আছে। মোবারকের সাত পুরুষের নাবিক বংশে যেখানে এসে থামতে চেয়েছিল, যে শেষ পুরুষকে চেয়েছিল শামীনগড়ের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে, আপন মাটির গন্ধের সঙ্গে চেয়েছিল যে শেষ পুরুষকে জমির সঙ্গে জীবনকে মানিয়ে নিতে, সেই মানিয়ে নেওয়ার পরমক্ষণেই ভূতের মতো ঘড়িটা এসে তাদের নাবিক বংশে আশ্রয় নিয়েছিল। সমুদ্র আবার তাই তাদের টেনেছে। উত্তর-পুরুষ মোবারক তাই পূর্বপুরুষের ধারাটাকেই অক্ষুণ্ণ রাখল।

মোবারক ছেড়ে দিল উড়ন্ত সামুদ্রিক জীবটাকে। ক্রুগ্যালির দিকে ছুটে গিয়ে আজ আর বলল না, ভাণ্ডারি চাচা, ভেজে দিয়ো আমাকে আর শেখরকে।

মনের ভিতর আজ যেসব বিশৃঙ্খলা চলছে, যে বিশৃঙ্খলার ইতিহাস নিয়ে ওর জীবন-চরিত রচিত, সেই চিন্তাধারাই আজ সমান করে দিল একটা মানুষকে আর মাছকে। ডলফিনের কাছে এই নিরীহ জীবটি যেমন অসহায়, তেমন অসহায় মোবারক পৃথিবীর কাছে, সমুদ্রের কাছে, কৌরি-পাইনের তলায় আর সান-ডায়াল ক্লকের ওপর। মোবারক অনুতপ্ত, দুর্নিবার অনুতাপের জ্বালায় ডেকের কাঠে কাঠে খুঁজছে শান্তির আশ্রয়। সান-ডায়াল ক্লকের উপর রক্তমাংসের দেহটার জন্য যে বিচিত্র কাহিনি ওর জীবনের সঙ্গে যোগ হল, যে গুনাহ দুটো জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল, তার থেকে মুক্তি কোথায়?

হাতের ঘড়িটা বিগত দিনের ঘটনার সঙ্গে যোগ দিয়ে আজও যেন হাসছে।

হাসছে। সব যেন হাসছে। কেমন এক অপার্থিব চিৎকার সমুদ্র-বুকের। বুঝি হাসছে অগভীর জলে হাঙরের ঝাঁক। অগভীর জলের হাসি তাই চিৎকার হয়ে আসছে মোবারকের কানে।

মোবারক চুপ। কাহিনি শুনছে আম্মাজানের মুখ থেকে। বিচিত্র অনুভূতি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনি। নিভৃত নীল সমুদ্র, নীল আকাশের দশমী চাঁদ নিবিড় হয়ে আছে ওর মুখের উপর। শামীনগড়ের মাটিতে তখন তার আম্মাজান শীতে উনুনের প্রজ্বলিত কাঠের আগুনের পাশে বসে কাহিনি বলছেন।

টিন-কাঠের ঘর। সিমেন্ট বাঁধানো ভিটে। উনুনে আগুন জ্বলছে। আম্মাজান কাহিনি বলতে বলতে চুপ হয়ে যান। শীতে প্রজ্বলিত কাঠের আগুনে মায়ের মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

মোবারক উনুনের পাশে বসে আছে। পা দুটো উনুনের দিকে বাড়ানো। আগুনে দুটো মুখ রক্তাভ হয়ে উঠতে থাকলে আম্মাজান তখন আবার বলতে থাকেন।

মোবারকের বয়স তখন দশ।

আম্মাজান পূর্ণ-যৌবনা। ডাকলেন, আলি।

মোবারক শুধু মুহূর্তের জন্য আর-একটু সংলগ্ন হয়ে বসতে চাইল আম্মাজানের পায়ের কাছে। আম্মাজান আবার ডাকলেন, আলি। বললেন, তোর বাপজি সফর করে বাড়িতে এলে বারণ করবি আর সফরে যেতে। তুই বড় হয়েছিস। কথা বলতে পারিস।

চকচক করে উঠল আম্মাজানের নাকের নোলক, বেসর, নাক-ফুল সব। গলার বিছাহারটা কত কাল থেকে যেন মলিন হয়ে আছে। দিনের পর দিন শুধু ওর প্রত্যাশা, আলির বাপজির সফর কবে শেষ হবে। কবে ফিরবে শামীনগড়ে। কবে বুকের ওপর বিছিয়ে থাকা বিছেহারটায় দুটো হাত চেপে বসবে, বলবে, তুই পথ চেয়ে ছিলি বিবি। সমস্ত সফর তাই পাগলের মতো কাটল।—সবুজ শাড়ির কাঁথাটা দুটো মুখের ওপর বিছিয়ে দিয়ে এক রাতে নিভৃতে বলেছিল মোবারকের তখন জন্ম হয়নি, বিবি তোর মিষ্টি মুখ শুধু আমায় টানে। দরিয়ার বুকে শুধু তোর মুখ দেখি। পাঁচ ওক্ত নামাজে তোর মিষ্টি মুখটাই শুধু চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

কেমন কবি-কবি হয়ে কথা বলে আলির বাপজি। আরও বলত, মুখ ঠোঁটের সংলগ্ন হয়ে বলত, বিবি।—ঠুন ঠুন করে খুন্তিটা বাজল কড়াইয়ে। মোবারক মায়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, বাপজি কবে আসবেন আম্মাজান?

মাস দুই তো হল তিনি সফরে গেছেন। শুধু চিঠি আসে, কিন্তু তাতে লেখা থাকে না তো তিনি কবে ফিরছেন। তুই এলে এবার বলবি, তোমায় আমি যেতে দেব না বাপজি! তুই বলিস, অন্তত তোর আম্মাজানের জন্য বলিস।

শীতের চাদরটা গা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল মোবারকের। হাতের খুন্তিটা কড়াইয়ে রাখল আম্মাজান। হাত বাড়িয়ে তুলে দিল চাদরটা। তারপর তুলে আনল মোবারককে কোলে। শামীনগড়ের নিস্তব্ধ রাতে নিবিড় হয়ে বসে রইল মা আর ছেলে উনুনের পাশে।

জন্ম হয়েছিল মোবারকের শামীনগড়ের মাটিতে। বাপজির ভীত সন্ত্রস্ত মন প্রশ্ন করেছিল ওঁর বাপজিকে, বাচ্চাটার জন্ম শামীনগড়ে না হয়ে অন্যত্র হলে হয় না?

মোবারকের নানা জসিমউদ্দিন সারেং বৃদ্ধ, অথর্ব। বলি-রেখায় মুখ শতেক ভাঁজে কুঞ্চিত। বারান্দায় বসে সারাদিন খুট খুট করেন আর গড়গড়ায় তামাক টানেন। প্রশ্ন শুনে তিনি চোখদুটো লাল করে বলেছিলেন, ব্যাটার কথা শোন।

তারপর চুপ। আবার প্রশ্ন করলে আর দুটো কথা বলবেন, মোবারকের বাপজি তা জানতেন, তামাম দুনিয়া দেখলাম, শামীনগড়ের মাটি সেরা মাটি।

শামীনগড়ের মাটি সেরা মাটি মোবারকের নানা-সাহেবের কাছে। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হতে হবে। এ মাটি বনেদি।

এ গ্রামের শিশুদের স্বপ্ন উত্তর-মেরু, দক্ষিণ-মেরু, উত্তর-গোলার্ধ, দক্ষিণ-গোলার্ধ—লন্ডন, নিউইয়র্ক, পানামা, সুয়েজ। ওরা গল্প শোনে সফর শেষ করে আসা নাবিকদেব কাছে বন্য দ্বীপপুঞ্জের, সাগরপারের দেশের, ইঞ্জিন আর ডেকের।

বাপজি তাই চেয়েছিলেন মোবারকের জন্ম অন্যত্র হোক। শামীনগড়ের মাটিতে অভিশপ্ত নাবিক-জীবনের বিষ মাখানো আছে। এখানকার আকাশে-বাতাসে সর্বত্র নাবিকের ডাক। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হয়ে জন্মাতে হয়। সমুদ্র তাদের টানে।

পুরুষানুক্রমে নাবিক বংশের ধারাকে চেয়েছিলেন বাপজি বদলাতে। এ বংশে যে নূতন মানুষটি আসছে সে যদি পুরুষ হয়ে শামীনগড়ের মাটিতে জন্মায়, তবে সে নাবিক হবেই। বাপজি তা চান না। মোবারক সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মাক। অন্যত্র তার জন্ম হোক। যে হাজারও গুনাহ তার জীবনে দিন দিন যোগ হচ্ছে, মোবারক নাবিক হলে সে গুনাহের সম্মুখীন ওকেও হতে হবে। অন্যত্র জন্ম হলে সহজ সাধারণ পরিবেশে মোবারক গড়ে উঠবে সহজ সাধারণ মানুষের মতো। হাজার গোনাগার অন্তত তাকে হতে হবে না।

খুক খুক করে কাশতে কাশতে ডেকেছিল বাপজিকে ওর নানা, এই ব্যাটা মুরগিচোরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস কী? বাচ্চা তোর এখানেই হবে। খোদাকে ডাক, বাচ্চাটা যেন ছেলে হয়ে জন্মায়। আর জন্মালেই যেন নাবিক হয়ে জন্মায়।

বৃদ্ধ অথর্ব অসহায় মানুষটার কাছে বাপজি দাঁড়িয়ে রইল স্থবির হয়ে। এক প্রশ্ন করতে এসে অনেক প্রশ্নের উত্তর শুনতে হল সেদিন বাপজিকে।

সেই কবে! কোনও এক আমলে।

খুক খুক করে কাশেন আর বলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল তখন।

নানা-সাহেবের নানার বাপজির ইতিহাস। তখনও কলের জাহাজ হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চলে কাঠের জাহাজে।

কাঠ চেরাই হত কলকাতা বন্দরে, চিটাগাং বন্দরে। জাহাজ তৈরি করত দেশি মিস্ত্রিরা।

শামীনগড়ের নৌকো চলত কর্ণফুলির বাঁওড়ে। লোনা জল ডিঙিয়ে নাও যেত সুন্দরবনে। কাঠ চেরাই করত কাঠ বয়ে আনত। জাহাজ তৈরি হত সে কাঠে। মোবারকেব নানা-সাহেব জসিমউদ্দিন সারেঙের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিল সেই নাওয়ের মাঝি।

জসিমউদ্দিন সারেং কাশতেই থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে দম নিয়ে বললেন, তারপব ঠিক জানেন না কী কবে বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ণফুলির নাওয়ের মাঝি থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজেব ডেক সাফাইয়ের কাজ থেকে পাল-খাটানোর কাজ পেয়েছিলেন।

ও কালটা প্রায় অস্পষ্ট। বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ ঠিক নজর করতে পারল না বৃদ্ধ আর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহেব আমলটাকে। তবে বৃদ্ধের চোখে স্পষ্ট এখনও প্রপিতামহের আমল। অবশ্য সবই শোনা কাহিনি। যেমন কবে গল্প বলতেন, শীতের কাঠের আগুনে আম্মাজান—বংশেব, নাবিক বংশেব ইতিহাস মোবারককে। তামাক দিতে, পান দিতে এসে এমন অনেক কাহিনি শুনতে হত আম্মাজানকে সাবেং জসিমউদ্দিনেব কাছ থেকে।

বলছেন জসিমউদ্দিন সাবেং। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও বাপজি। পানটা তামাকটা দিতে এসে আম্মাজানও শুনল।

জসিমউদ্দিন সাবেঙেব প্রপিতামহ সফব দিয়ে ফিবেই সব মোল্লা-মৌলবিদের ডাকতেন। সিন্নি দিতেন। কোবানশবিফ পাঠ হত। সকলকে বলতেন, গুনাহ্‌ অনেক জমা না হলে দবিযাব পানি কাউকে টানে না। আব হয কী, সেই গুনাহ বন্দবে ঠেকে ঠেকে হাজার গুণ বাড়ে।

খুব জোব দু' মাস। তাবপব উচাটন হয়ে উঠত ওর জাহাজের নেশা। অস্বস্তি ফুটে উঠত সারাটা মুখে। সমুদ্র যাকে একবাব টেনেছে তাকে আব ফেবানো যায় না। ফেবানো যায় না বলেই পুরুষানুক্রমিক জাহাজি গতি অক্ষুণ্ণ থাকল।

জসিমউদ্দিন সারেঙের পিতামহের আমল।

নূতন কলেব জাহাজ হয়েছে বিলেতে। পালের জাহাজেব দিন চুকল।

কলের জাহাজ হল বিলেতে। সমুদ্রতীরের ছোট বন্দর ক্যামবেল টাউন থেকে স্কচ সাহেব গেলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান মার্চেন্ট অফিসে। তিনি বাণিজ্য করতেন আমদানি-রপ্তানির। শা-জোয়ান মরদ। প্রথম থেকেই ঘুঘু ব্যবসায়ী।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব তখন ভাবতবর্ষে—গাজিপুরে। রীতিমতো তামাক টানেন গড়গড়ায়, দেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাংলায় জমা-খরচ রাখতে পর্যন্ত শিখে গেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া মার্চেন্ট অফিস থেকে জানতে পারলেন তাঁর গ্রামের ম্যাকিনন ভারতবর্ষে আসতে চাইছে ব্যবসায়ের খাতিরে। তাকে তিনি নিয়ে এলেন। অংশীদারি ব্যবসা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলতে থাকল।

ম্যাকিনন সাহেব কাজ নিলেন কাশীপুরে। চিনির কলের ম্যানেজার।

জসিমউদ্দিন সারেঙের পিতামহের আমলেই এ দেশে এসেছিলেন ম্যাকিনন সাহেব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজের সফর শেষ করে মাত্র কলকাতায় নেমেছেন পিতামহ। গঙ্গার উপকূলে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা সে আমলের লাইটারের মাঝি। লোকটা হেঁকে বলল, অ্যারা ব সাজাদ সারেঙের ব্যাডা, দ্যাশে ফিরবা কী করতে? নূতন সাব আইল, নতুন জাহাজ কিনল, পুব দেশে রওয়ানা হইল বইলা রে ব। আর একডা সফর দিয়া দ্যাও। ট্যায়া অনেক মিলব রে ব।

গঙ্গার উপকূলে সাজাদ সারেঙের ব্যাটা দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। তবে কি কলের জাহাজ এল এ দেশে? তিনিও হেঁকে বলেছিলেন, অ মিঞা এদিকডায় হোন তো, সফরে রইলাম পোরা দুইডা বছর, দ্যাশের খবর কি আর রাখি, কী কও? কলের জাহাজ আইল রে ব এ দ্যাশে?

কথাডা কী জান, আউনের কথা আছে। তবে অহন পর্যন্ত আইয়ে ন। তুমি ত, রে ব্যাডা বিলাত গ্যাছিলা। কলের জাহাজ কেমনডা দ্যাখচ?

মিঞা ভাই এ কথা আর কইয়ো না। নিজের চক্ষে না পরখ করলে অ কথা বোঝানের নারে ব। তামাম দুনিয়া তুইরা য্যান কলের জাহাজডা। ইঞ্জিনডার যেমন তরিবত, ত্যামন কেরামতি। খোদার মালোম সাহেবগো মাথায় এ বুদ্ধিডা খ্যালল ক্যান কইরা। চলনের সময় রে ব কেবল ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ করে।—বলে হু হু করে হেসে উঠল জসিমউদ্দিন সারেঙের নানা-সাহেব।

দু'জনেই শেষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে গঙ্গার উপকূলে। আকাশ-পাতাল ভাবল। রাজার দেশ, রাজার মতো বুদ্ধি। দুনিয়া জুড়ে ওদের বাদশাহি, দুনিয়া জুড়ে ওদের প্রতিপত্তি, সে প্রতিপত্তি রাখতে হলে এমন কলের জাহাজ না হলেই বা চলে কী করে? জসিমউদ্দিন সারেঙের নানা-সাহেব, সাজাদ সারেঙের ব্যাটা নূতন স্বপ্ন দেখল গঙ্গার উপকূলে দাঁড়িয়ে। কলের জাহাজ আসবে এ দেশে। সেই জাহাজের সে জাহাজি হবে, ঝক্কর ঝক্কর শব্দ হবে কেরামতি ইঞ্জিনটার। কান পেতে সে শুনবে। দেশে গিয়ে দুটো শক্ত হাত সবার সামনে তুলে ধরে বলবে, সাহেবদের কলেব ইঞ্জিন আমি এ দু'হাতে ঠেলে চালাই।

কোম্পানির জাহাজ ছাড়তে অনেক দেরি। গাজিপুরের ম্যাকেঞ্জি সাহেব যাচ্ছেন দক্ষিণ দেশে। সে দেশে যাবার জন্য তিনি কলের জাহাজ কিনবেন। প্রথম থেকে পরিচয় থাকলে ম্যাকেঞ্জি সাহেব নিশ্চয়ই কলের জাহাজ ঠেলার ভার তাকে দেবেন।

ম্যাকনিন, ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠার আমল। সন ১৮৪৭। পূর্ব ভারতের আভ্যন্তরীণ বিস্তৃত জলপথে তখন কোনও বাণিজ্য জাহাজ চলত না। ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিচক্ষণ লোক, বিস্তৃত জলপথকেই তিনিই প্রথম বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যবহারে আনলেন। কিছু পালের জাহাজ কিনলেন। সে জাহাজ চলতে থাকল পূর্ব ভারতের জলপথ জুড়ে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে তিনি তাদের বিশেষ সহায়তা পেলেন।

সেই জাহাজেই কিছুদিন কাজ করেছিল এই হারাম জসিমউদ্দিন সারেঙেব নানা, সাজাদ সারেঙের ব্যাটা। গড়গড়ায় তামাক টানতে গিয়ে আবার তিনি ক'বার খক খক করে কাশলেন।

১৮৫৩ সালে এ দেশে কলের জাহাজ এল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব কিনে আনলেন সে জাহাজ। নূতন জাহাজ, নূতন নাম 'অরোরা'। সাজাদ সারেঙের ব্যাটা সে জাহাজে কাজ পেল। কয়লাওয়ালার কাজ। বাংকার থেকে ঠেলে ঠেলে কয়লা নিয়ে আসত গাড়ি করে। সাহেব ফায়ারম্যানদের পায়ের কাছে ম্যাডিসিন-কার উলটে দিয়ে বলত, লাও সাহেব, বায়লটে ঢোকাও।

দক্ষিণ দেশে (অস্ট্রেলিয়া) তখন লোক আসতে শুরু করেছে। সে দেশের মাটিতে কেবল সোনা ছড়িয়ে আছে, লোকে বলে। জাহাজ যাচ্ছে পশ্চিম দেশ থেকে, সঙ্গে লোক যাচ্ছে। তারা আর ফিরবে না। ঘরবাড়ি তৈরি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেবে। তাল তাল সোনা বিদেশে পাঠিয়ে ওরা নাকি ফেঁপে উঠছে।

নূতন দেশ। নূতন জমি। কী হয়, কী না হয় তখনও পরখ করা হয়নি। খেতে হবে, শুতে হবে, পরতে হবে। দরকার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। পশ্চিম হতে আসে। যাতায়াত খরচ ওদের বেশি, দাম বেশি দিয়ে তাই কিনতে হয়। ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিচক্ষণ লোক, তিনি এবার মওকা পেলেন। 'অরোরা' জাহাজে খাবার থেকে আরম্ভ করে সাবান পর্যন্ত নিয়ে রওয়ানা হলেন দক্ষিণ দেশের দিকে। ম্যাকিনন সাহেবকে বলে গেলেন, ফেরবার পথে জাহাজ বোঝাই তাল-তাল সোনা নিয়ে ফিরবেন।

এদিকে নানি আমার ঘরে বসে দিন গুনছেন, কবে ওঁর খসম ফিরবে। পাঁচ বছর হয়েছে কর্ণফুলির বাঁওড়ে বদনা হাতে বাক্স মাথায় চলে গেছে খসম। চিঠি-পত্তরের রেওয়াজ নেই সেকালে, তাই চিঠি পায়নি। বিদেশ থেকে লোক ঘরে এলে তার মুখে কিছু খবর আসে। সেই খবরে নানি জানলেন কলের জাহাজে কাজ পেয়েছেন নানা। নানির মুখ ভারী খুশি হয়ে উঠেছিল সেদিন, সে খবরে।

আর এক রাত। নানির চোখে ঘুম নেই! কর্ণফুলির বাঁওড়ে লগার খট খট শব্দ কানে আসছে। চোখ বুজে পড়ে আছে নানি। ঠিক তখন দরজার খট খট শব্দ পেলেন। নানির বয়েস কম। জোয়ান বিবি। বাপজি আমার কম বয়সের। রক্ত ওর তাই ছলাৎ করে উঠল। নানা-সাহেব হয়তো ফিরছেন সফর শেষ করে। কর্ণফুলির বাঁওড়ে লগার যে খট খট শব্দ পেলেন, সেই নাও করেই হয়তো ফিরছেন। ঝড়ের বেগে উঠে দাঁড়ালেন। রেড়ির তেলের প্রদীপটাতে আগুন ধরিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন প্রতিবেশী—কলকাতা লাইটারের মাঝি। তিনিই খবরটা দিয়েছিলেন। কেপহোর গেবো আইলে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুবেছে। সলিল সমাধি হয়েছে 'অরোরা'র (১৮৫৬, পনেরো মে)। রবার্ট ম্যাকেঞ্জি ডুবেছে। সাজাদ সারেঙের ব্যাটা ডুবি হয়েছে।

সে আমল আর এ আমল অনেক তফাত। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস নিলেন জসিমউদ্দিন সারেং। ডুবল ডুবলই! আর কোনও খোঁজ খবর নেওয়া হল না। নানির আবার নিকা হল।

শামীনগড়ের মাটিতে তখন নাবিকের ডাক উঠেছে। গাঁয়ের জোয়ানরা খবর পেল কলকাতায় কলের জাহাজ হরেক-রকমের। ম্যাকিনন সাহেব আনিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেব ডুবেছে, 'অরোরা' ডুবেছে, তাল তাল সোনা ডুবেছে, ম্যাকিনন সাহেব কেয়ার করে না। উঠতে গেলে পড়তে হয়। এ তো দুনিয়াদারির কথা। এক জাহাজ ডুবেছে, দু' জাহাজ কিনলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাক হাঁকলেন। জাহাজ যাওয়া-আসা করবে বর্মা মুল্লুকে—মেল জাহাজ।

কর্ণফুলির বাঁওড়ের বুক চিরে চাটগাঁয়ের ভাঙন পেরিয়ে শামীনগড়ের জোয়ানরা ছুটল নাও করে কলের জাহাজে কাজ করতে, বাপজিও তাদের সঙ্গে ছুটলেন। এ হারামের তখন জন্ম হয়েছে।

তুই মুরগিচোরের বাচ্চা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস? ইমান তোর সায় দেয় না? ইজ্জত তোর নেই? জাহাজডুবিতে নানাজি মরলেন, হারামের বাচ্চা তোর বাপজির কি জাহাজডুবি হয়েছে? জসিমউদ্দিন সারেং কি মরল? তবে? আমার বাপজি তো কেয়ারই করলেন না। নানাজি মরল, বাপজি ছুটলেন। ম্যাকিনন সাহেব তখন জাহাজের কোম্পানি খুলেছে—বি আই কোম্পানি। বাপজি গিয়ে বলল, সাজাদ সারেঙের ব্যাটা, বাপজির বাপ 'অরোরা'র কয়লাওয়ালা ছিল। সাহেব পুরানো খাতা খুললেন, কী দেখলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে, তোমার নাম কোম্পানির ঘরে লিখা হইল। আর তুই ব্যাটা বেইমানের পুত, তোর বাপজি মরল না, তুই মরলি না জাহাজডুবিতে, আর বলছিস কিনা তোর বিবির বাচ্চাটার জন্ম ভিনগাঁয়ে হোক! মর মর! ভাগ ব্যাটা আমার কাছ থেকে। আমার বাপজি তো শেষকালটাতে এডেনের এদিকটাতে পানি ডাকাতের হাতে জান খোয়াল। কই সেজন্য তো জসিমউদ্দিন সারেং ঘরে বসে থাকল না, বিবির আঁচল ধরে তো প্যান প্যান করল না?

বিগত দিনের খবরগুলি ক্লান্ত হয়ে ঝিমোচ্ছে মোবারকের মগজের বিভিন্ন অলি-গলিতে। আর-একটু সে সরে দাঁড়াল। লাইফ-বোটের রাডারটা ওর দিকে যেন তেরছা চেয়ে আছে। দু'পা পিছিয়ে ভর করল এনামেল রং-করা রেলিং-এর রডটাতে। উইংস-এর আলো তেমনি নির্জীব, নিস্তেজ, নীল সমুদ্র সোনালি রংয়ের ছায়া ফেলে যাচ্ছে। যেমন উনুনের কাঠের আগুনটা খুব সোনালি হয়ে উঠলে আম্মাজান আর-একটু দূরে সরে বসতেন, দেওয়ালের ওপর ঠেস দিয়ে বসে বলতেন, তাই আলি তোর জন্ম হল শামীনগড়ে। তারপর তিন বৎসর তোর বাপজির সাক্ষাৎ নেই। সফরে গেছেন, তাই তোকে নিয়েই পড়ে থাকতে হল। তোকে নিয়েই আমার সময় কাটে। শেষে একদিন তিনি ফেরেন সফর থেকে। কর্ণফুলির বাঁওড় থেকে হেঁটে আসেন। মাথায় পেটি, হাতে চকচকে পেতলের বদনা। সফর দিয়ে এসেছেন, কত জিনিস আনলেন তোর আর আমার জন্য। তিনি এসেও মোল্লা-মৌলবিদের ডাকতেন। দাওয়াত দিতেন দরবেশ ফকিরদের গরিব গরবাদের। খয়রাত করতেন মসজিদে মাদ্রাসাতে। হদিশ নিতেন তাদের কাছ থেকে। ডেকের কাঠে কাঠে গুনাহ। হারামজাতেরা হারাম খেয়ে মানুষ। না-পাক লোকদের সঙ্গে মিশে থাকতে হয়। তাই বলেন সফরে আর ফিরছেন না। সাত পুরুষের জমি আছে, ভিটে আছে, মোবারক আছে, আর বিবি আছে। সুখের সংসার, বন্দরের কসবিদের হাতে আর নাকাল হতে হবে না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে থাকলে, নোনা পানির ঢেউ শুনলে ওদের কাছে না গিয়েও থাকা যায় না। তাই গুনাহ হাজার গুণে বাড়ে।

ভাগ্যিস তোর নানাজি সে সময়ে বেঁচে নেই। প্রায় দুটো মাস। শেষে একসময় কেমন যেন মনমরা হয়ে যেতেন বাপজি। বারান্দায় এসে চুপচাপ কেবল বসে থাকতেন, দেখতেন শামীনগড়ের মাথার ওপরের আকাশকে, মেঘকে। এরাও সেখানে যাবে যে দেশ থেকে বাপজি সফর দিয়ে এলেন। তখন কিছু কটা পিংলা চোখ ভাসতে থাকে আকাশের গায়ে। তারা হয়তো এখন অন্য জাহাজির অপেক্ষায় আছে। অর্কিড আর পাইনের নীচে অপেক্ষা করছে চুপি চুপি।

আকাশের গায়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে বাপজির চোখদুটো আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। কানের ওপর তখন আওয়াজ উঠছে গত সফরের সতেরো-কুড়ি রুপোর কাঁচা টাকার। কিন্তু ভুল ভাঙল বিবি এসে সামনে দাঁড়াতেই। বিবির হাতের চুড়ি বাজছে ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজে।

আম্মাজান সে সময়ে খুব সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারতেন বাপজির সামনে। কারণ সব সফর শেষে বাপজির এমন আড়ষ্ট চোখ। দেখে দেখে আম্মাজানের অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি চিনতে পারলেন এ দুটো চোখে কীসের প্রত্যাশা। কেন বাপজির চোখে এত অবসাদ। আম্মাজান আরও কাছে গিয়ে বলতেন, আপনাকে আজ খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

বাপজি কোনও রকমে চোখদুটো তুলে ধরতেন আম্মাজানের মুখের দিকে। শেষে জবাব দিতেন, বিবি, তুই কিছু মনে করিস না, আমি সফরে যাব! বিবি, দুনিয়াটা এখানে আজকাল আমার খুব ছোট ঠেকছে। এ তো আজও বোঝলাম না কেন এমন হল। বিদেশে গেলে দেশ আমায় টানে, দেশে এলে বিদেশ টানে। সারেং বলেন, জাহাজের টাংকির পানি যে একবার খেল, নোনা জলের ঢেউ যে একবার দেখল, ঘর তাকে কিছুতেই বাঁধতে পারে না, দরিয়া ওকে টানবেই। তাই সফরে আবার যাচ্ছি, আলিকে তুই দেখিস। খবরদার সফরের কথা কিছু ওকে শোনাবি না। জাহাজের গল্প কিছু ওকে বলবি না। তবে কিন্তু আমার মতো ওকেও জাহাজি হতে হবে, হাজার গোনাগার হতে হবে।

পুরো চার মাস বাদেই বাপজি ফিরলেন সফর করে। খুব কম সফর, এমন কম সফর বাপজির জীবনে প্রথম।

মোবারকের শরীর যেমন আজ নোনাতে খেয়েছে, রুগ্ন অসহায় যেমন সে আজ, বাপজি এসেছিলেন সেদিন ঠিক এই চেহারা নিয়ে। হাতের ওপর ঘড়িটা সাপের মতো প্যাঁচ খেয়ে আছে। আম্মাজান ঘড়িটা দেখে ভূত দেখার মতো ভয় পেয়েছিলেন। ঘড়িটার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তিকর টিক টিক।

আম্মাজান হাতের ওপর ঝুঁকে দেখলেন, কলটার ভিতর কি কোনও জিন পাখি হয়ে আছে? কিচ কিচ শব্দ করছে একটানা! ওটা বুঝি কাচের ওপর ধাক্কা খেয়ে টিক টিক করছে। কানের পর্দায় ভাসছে। মোবারক আলিও সেদিন ঝুঁকে দেখছিল ঘড়িটা। বাপের আমল থেকে যেটা আজও বেজে চলেছে। শুধু মাঝে মাঝে ওয়াচের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই হয়।

বাপজি বসেছিলেন তক্তপোশে—রুগ্ন, অসহায় চোখ। খুব নিচু গলায় বলেছিলেন, বিবি, আমার বিছানা দে।

অজু করবেন না? নমাজ পড়বেন না?

না, বিছানা দে।

আম্মাজান তক্তপোশের ওপর বিছিয়ে দিলেন নীল শাড়ির কাঁথাটা। মোরগের পালক দিয়ে তৈরি বালিশটা রাখলেন শিয়রে। গায়ের কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন দড়িতে। শেষে একটা ভিজা গামছা দিয়ে পা মুছে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। বললেন, ইবলিশটাকে খুলে ফেলুন। শামু ওঝাকে ডাকছি, শরীরটা আপনার খুব খারাপ হয়ে গেল।

বাপজি শুধু বললেন, না।

তিনি চিত হয়ে শুয়েছিলেন তক্তপোশে। দেখছিলেন টিনের চালের দিকে। অপলক কিছু দেখছিলেন যেন।

আম্মাজান এক সময়ে ডেকেও সাড়া পেলেন না, বুঝি ঘুমিয়ে গেছেন। শেষে বাধ্য হয়ে আম্মাজান হাতের প্যাঁচ-খাওয়া ইবলিশটাকে খুলতে গেলেন। কিন্তু কী করে যে ওটা হাতে এঁটে রয়েছে তার হদিশ পেলেন না। অনেক এদিক-ওদিক টেনে এতটুকু ঢিলে ঢালা করতে পারলেন না। চোখে পড়ল কাটারিটা, তক্তপোশের নীচে। হাতে নিলেন, কচ কচ করে কাটলেন ইবলিশের লেজটাকে। ইবলিশটা

কিন্তু এতটুকু দমল না। অস্বস্তিকর শব্দটা তখনও চলছে। প্রায় মাঝরাতের অন্ধকারে শামীনগড়ের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠল। কর্ণফুলির বাঁওড়ের ওপারে সমতল ভূমির বুকে নন্দনপুর গ্রাম আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। রোমান-ক্যাথলিক চার্চের ঘড়ির ঘণ্টা বাজল ঢং—ঢং—। এগারো বার বাজল।

ঘণ্টার আওয়াজে বাপজি ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। নীল কাঁথার বিছানার ওপর বসে কী হাতড়ালেন। হাতের দিকে চেয়ে দেখলেন ঘড়িটা নেই। ডাকলেন, বিবি! ঘড়িটা কই? আমার ঘড়ি!

আম্মাজানের চোখে হালকা ঘুমের আমেজ ছিল মাত্র, তাই সহজেই ভেঙে গেল আম্মাজানের ঘুম।

ইবলিশটা! আছে। পেটিতে রেখেছি।

দে দে, শিগগির দে।

আম্মাজান নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইবলিশটা! ইবলিশটা দিয়ে কী হয়? কী হবে! মাঝরাতে তিনি এসব কী বলছেন! সফর থেকে এসে এমন কেন হয়ে গেলেন?

শিয়রের পাশেই কুপি। তক্তপোশের নীচে মাটির হাঁড়িতে আগুন জিয়ানো গন্ধক মেশানো পাটকাঠি, দেশি দেশলাই আছে শিয়রে। এক গোছা। এক গোছা থেকে অন্ধকারে একটা বেছে নিলেন। তক্তপোশের নীচে মাটির হাঁড়িতে গুঁজে আগুন জ্বালালেন, কুপি ধরালেন। ইবলিশটাকে বাপজির হাতে দিয়ে শেষে যেন তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন আম্মাজান কিন্তু বাপজি দাঁড়িয়ে থাকলেন দরজার ওপর। ঘড়িটা আম্মাজানের চোখের সামনে ঝুলিয়ে বললেন, ঘড়ির ফিতাটা এমন হল কী করে?

আম্মাজানের গলা কেমন ফ্যাস ফ্যাস করতে থাকল। বাপজির চোখে অবিশ্বাস, অনুতাপের যেন শেষ নেই। তাই আম্মাজানের গলা দিয়ে দু' কাঠের ভিতর তার চালনার মতো ক'বার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল কিন্তু কী বললেন তা প্রকাশ পেল না। শেষে বাপজি নামলেন উঠোনে। উন্মুক্ত আকাশতলে দু'হাত প্রসারিত করে চিৎকার করে যেন কেঁদে উঠলেন, খোদা হাফেজ।

ভয়ে আম্মাজান ডাকল মোবারককে, মোবারক ওঠ তোর বাপজি কোথায় যাচ্ছে, ডাক তোর বাপজিকে।

মোবারক বারান্দায় এসে ডাকল, বাপজি।

উঠোনের ওপাশের আতারেডার পাশ থেকে শুধু সেই এক শব্দ, খোদা হাফেজ! বিবি, ভয় পাস নে, বারোটায় ঠিক ফিরব। মরু আমার বাপজি ভাল তো, শুয়ে থাকগে। আমি এলাম বলে। খোদা হাফেজ!

উন্মুক্ত আকাশ। নীল সমুদ্র। মাঝরাতের অন্ধকার চিরে জাহাজটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছে। ফরোয়ার্ড-পিকের মাস্টের আলোটা পর্যন্ত মনে হয় ঝিমিয়ে পড়ছে। হয়তো সেদিকে যে নাবিক এখন প্রহরী আছে, তার চোখে ঘুমের আঁচ।

গুঁড়ি গুঁড়ি অন্ধকারে একটা ছায়া টলতে টলতে ডেকের উপর দিয়ে আসছে। মাস্টের নীচে দাঁড়িয়ে কী যেন খুঁজল। হয়তো তিন নম্বর ওয়াচের সুখানি ব্রিজে যাচ্ছে পরি দিতে। কিন্তু সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠতে মানুষটার যেন খুব কষ্ট। দু'হাতের কনুইতে ভর করে লোকটা কোনও রকমে বোট-ডেকে উঠে এল। তারপর আবার কী খুঁজল। তারপর এক এক করে অনেক ক'টা শব্দ ধাক্কা খেল ওর কানে, খোদা হাফেজ।

সেই মানুষটা জলের ট্যাংকটার সামনে এসে হেঁকে ডাকল, মোবারক!

খোদা হাফেজ!

মোবারক!

কে? শেখর? এ অন্ধকারে তুই কেন এলি আবার ডেক-এ?

শেখর ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল, তোর চারটা-আটটা পরি। এখন বাজে বারোটা। এ মাঝরাতে বাড়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কী বকছিস অন্ধকারে খোদা হাফেজ, খোদা হাফেজ বলে? কেন এমন করছিস? কী হয়েছে তোর?

কিছু তো হয়নি। এমনিতেই একটু খোদার কাছে মোনাজাত করছিলাম। কিন্তু তুই অন্ধকারে এলি,

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠলি, জাহাজটা দুলছে, যদি পড়ে যেতিস? হাতদুটো তো বুকের সঙ্গে বাঁধা।

সে চিন্তা কি তোর আছে? থাকলে কি তুই ওপরে আসতে পারতিস?

শেখর মোবারকের আরও নিকটবর্তী হতে চাইলে মোবারক বাধা দিল, দেওয়ানি আজকে খুব বেড়েছে, এদিকে আসিসনে। উল্টে কিন্তু সমুদ্রে পড়ে যাবি।

শেখর চার্ট-রুমের নীচে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, এদিকটায় উঠে আয় তবে। ফোকশালে চল।

মোবারক চার্ট-রুমের এদিকটায় এসে শেখরের হাত ধরে ফোকশালের দিকে যেতে থাকল। শেখর তখন বলল, লিলিকে ছেড়ে এসে তুই খুব বেশি ভেঙে পড়ছিস।

মোবারক ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল শেখরকে। দুটো কম্বল ওর শরীরের ওপর ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়ে বলল, সব আধুনিকতার ওপরে মানুষের মনে সংস্কার বলে একটি পদার্থ আছে, যাকে আমরা অতি আধুনিকতা দিয়েও ঠেকাতে পারি না। সেই সংস্কারে বাধে এমন কোনও কাজ করলেই আমাদের মনে একটা দুরন্ত অনুতাপ গুমরে ওঠে, ভেতর থেকে একটা জ্বালা অনুভব করি।

কেমন সাধুভাষায় কথা বলে যেতে থাকল মোবারক।

ফোকশালের স্তিমিত আলোটা জ্বলছে। ঘরটাকে কেন্দ্র করে গুমরে গুমরে মরছে পাইপের নরম হাওয়া। শেখরের চোখে তখন ঘুমের আঁচ। বিড় বিড় করে বকছে মোবারক। যে সারাটা সফরে অত্যন্ত কম কথা বলেছে, সে আজ খুব বেশি বকছে। ঘড়িটা আগের মতোই ঝুলছে বাংকের এক কোণে। মোবারকের চোখদুটো সেদিকেই নিবদ্ধ।

শেখর পাশ ফিরে বলল, বিড় বিড় করে আর তোকে বকতে হবে না, এখন ঘুমো। তিনটা না বাজতেই আবার টান্ডু হবে।

মোবারক চুপ হয়ে গেল। কম্বলটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শেখর সুইচ টিপে স্তিমিত আলোটাকে অন্ধকার করে দিয়ে বলল, বেচারা।

ভোরের সমুদ্র। কুয়াশা নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝড় নেই, তাই দেওয়ানিও নেই। ভোরের প্রসন্ন হলুদ আলো ঠিকরে পড়ছে ডেক-এ ডেক-এ।

সেই আগের মতোই সমুদ্রের বুক চিরে ঝিমিয়ে চলেছে জাহাজ। বারো-তেরো নটের, কয়লার আর ব্যাংক লাইনের পুরনো জাহাজ 'সিউল বাংক' চলেছে নিজের খুশি মতো। নোনা জলের বুকে ছক্ ছক্ করে শব্দ তুলছে প্রপেলারটা।

ক্রু গ্যালির সামনে থেকে দু'নম্বর পরিওয়ালার দল চলে গেছে। ডেকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মোবারক—ক্লান্ত, চোখদুটো লাল। মাথার টুপিটা র‍্যাগ-টানা ছাইয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মোবারক আফটার-পিকে উঠেই গ্যালির ভিতর ঢুকে গেল, গরম জলের টব নামিয়ে নিল উনুনের ওপর থেকে। বাথরুমের ভিতর রাখল টবটা। সাবান নিয়ে এল, চান করল।

'পরি' ভাঙার সঙ্গে বাথরুমে একটা গণ্ডগোল চলে। টিন্ডাল, ডংকিম্যান, গ্রিজার, ফায়ারম্যান, ট্রিমার হইচই করে স্নান করে। গরম জলে সাবানে ছাইয়ে-ঢাকা শরীর ধুয়ে নেয়, জাহাজিরা শেষে এক শানকি খানা খায়। এক ওক্ত নমাজ পড়ে, তারপর আবার কম্বলটা টেনে দিয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে বাংকের উপর অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

মোবারক চান শেষ করে ফোকশাল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, শেখর দু'থালায় ভাত নিয়ে বসে আছে। একটা থালা টেনে নিল মোবারক। বসতে বসতে বলল, খাইয়ে দিতে হবে, না নিজেই আজ চামচ দিয়ে খেতে পারবি?

শেখর চুপ করে থাকল। শুধু আহত হাতটা দিয়ে চামচের ডগায় কোনও রকমে ডেলা ডেলা ভাতগুলি উল্টে পাল্টে দেখছে।

মোবারক নুনের টিনটা এনে দু'থালায় একটু একটু করে নুন রাখল। এদিক-ওদিক আর চাইল না। দ্বিতীয় বার আর কোনও প্রশ্নও করল না শেখরকে। ডালের টিন থেকে দু'হাতা ডাল নিয়ে সমস্তটা ভাত মেখে নিল। ক্ষুধায় ঢোক ঢোক জল আর ভাত গিলতে থাকল। কিন্তু এক সময় চোখ তুলতেই দেখল, শেখর উঠে যাচ্ছে।

খেলি না? না খেয়ে উঠে যাচ্ছিস যে? তা বললেই পারতিস, না খাইয়ে দিলে খেতে পারব না?

খেতে পারব না বলেই তো তোর আশায় বসে আছি।

কিন্তু আমার যে খুব খিদে! তুই বুঝিস তো 'পরি' শেষ করে এলে কতটা কষ্ট হয়? কেমন খিদে লাগে? শরীরটা কেমন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

শেখর কেন জানি আর একটাও কথা বলতে পারল না। চুপচাপ সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। মোবারক তেমনি আবার বলল, তুই বস, আমি হাতটা ধুয়ে আসি। তোকে খাইয়ে দিয়ে আমি খাব। আমার অত্যন্ত খিদে লাগায় ভুলেই গেছিলাম যে তোরও খিদে লাগতে পারে।

মোবারক উঠতে চাইলে শেখর বাধা দিয়ে বলল, তুই খেয়ে নে, ততক্ষণ আমি বসি। খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে আমায় খাইয়ে দিবি। আজকাল নিজের দিকটাই খুব বেশি করে ভাবছি মোবারক। জাহাজ শুনলাম সিডনি হয়ে হোমে যাচ্ছে। হোমে গেলে নিশ্চয়ই কলম্বোতে আমাদের পে অফ করবে।

মোবারক আরও দু'ঢেলা ভাত মুখে পুরে বলল, তুই আমার চাইতে অনেক বেশি অসহায় এ জাহাজে। আর তাই নিজের দিকটা আজকাল খুব বেশি করে ভাবছিস।

কেন, এত দিন তো এমন ভাবিনি।

ভাবতে দিইনি বলে ভাবিসনি। কিন্তু এখন নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তোকে দেখবার আমার সময় হয় না। আর তুই আমার উপর আজকাল কথায় কথায় রাগ করিস।

শেখর শুধু 'হুঁ' করে একটা আওয়াজ করল। তারপর চুপ কবে দেখল, মোবাবক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে খাচ্ছে।

মোবারক আবার বলল, দেশের জন্যে তোর মন কাঁদে? হাজাব-হাজার মাইল দূরে তোর মাকে আত্মীয়স্বজনকে আজকাল খুব বেশি মনে পড়ছে তাই না শেখর? এই লম্বা সফরে নিশ্চয়ই তোর মনে হচ্ছে দেশে কুলিগিরি করে খাওয়া অনেক গুণে ভাল, কারণ সেখানে সারাদিন খাটনির পর মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে দু'দন্ড মিশে থাকা যায়। জীবনধারণের পক্ষে এ যে কত প্রয়োজন, তুই নিশ্চয়ই আজকাল খুব বেশি অনুভব করছিস?

দেশের কথা মনে হলেই দীর্ঘ সফরটা ভীষণ খারাপ লাগে শেখরের। সমুদ্রের নোনা জলে উঁকি দিয়ে অনুভব করে এই জলটাই তার দেশের মাটির সঙ্গে মিশে আছে, অথচ সে আজ কতদূরে।

শেখর মোবারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শেষে নিজে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। তার শঙ্করপুর গ্রামটা চোখের ওপর ভাসছে। মা বাবা, মায়েব কথাই, মায়ের ছবিই খুব বেশি কবে উঁকি দিচ্ছে। জাহাজে উঠবার আগে মায়ের দুটো ঝাপসা চোখ বিদায়ের সময় কেমন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সব এক এক করে চোখের উপর ভাসছে।

শেখর চোখ খুলে বলল, তোর আম্মাজান নিশ্চয়ই কেঁদেছিলেন, না রে?

চুপ করে রইল মোবারক। ওর বুকের ভিতর তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পাক খেয়ে মরছে। তবু ঢক ঢক করে কাচের গ্লাস থেকে গলায় জল ঢেলে বলল, আম্মাজান? আম্মাজান আমার থেকেও নেই শেখর।

মোবারক চোখ নামিয়ে আনলে শেখর ওর দিকে চেয়ে অনুভব করল আম্মাজান সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে না। আঠারো মাস সফরে এমন বিবর্ণ চোখ সে অনেকবার দেখেছে। একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েই এমন আনমনা হয়ে গেছে বহুবার মোবারক। কিন্তু আজ এ অতি অপ্রত্যাশিত। মোবারক গত রাতের মতো বিড় বিড় করে বকতে শুরু করেছে আবার। মনে মনে শেখরের অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হল। আম্মাজানকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই নিবিড় স্নেহের অন্তরালে কোনও ঝড় উঠেছিল, সে ঝড়ে ওকে শামীনগড় থেকে উপড়ে এনে জাহাজের ডেকে ফেলে রেখেছে। অথচ সব বলেও আম্মাজান সম্বন্ধে মোবারক চুপ করে থাকে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতেই বাকি ভাত খেয়ে নিল মোবারক। হাত ধুয়ে নিল বাথরুমে ঢুকে। শেখরকে খাইয়ে দিল। এঁটো বাসন ধুয়ে আনল। শেষে মেসরুমের লকারে কাচের গ্লাস আর থালা দুটো রেখে তরতর করে নেমে গেল ফোকশালে। ফোকশালে ঢুকে কম্বলদুটো মাথার ওপর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শেখর ফোকশালে গিয়ে ঢুকল না। কারণ পরি কিংবা ডে-ম্যানের বালাই ওর নেই। হাতে ঘা বলে

কাজ থেকে ওর ছুটি। কেবল সাড়ে বারোটায় একবার মেজ-মালোমের কাছে হাতে ওষুধ লাগাতে যেতে হয়। তারপর সারাদিন ছুটি। সারাদিন একঘেয়ে সমুদ্রদর্শন।

শেখর ডেকের ওপর পায়চারি করল অনেকক্ষণ। তারপর ব্রিজের দিকে চাইতেই দেখল তিন নম্বর মালোম নেমে আসছেন।

নেমে আসতেই শেখর প্রশ্ন করল, আমাদের জাহাজ, স্যার, নিশ্চয়ই সিডনি হয়ে হোমে ফিরবে। কলম্বোতে আমাদের নিশ্চয়ই নামিয়ে দেওয়া হবে?

তিন নম্বর মালোম টুইন-ডেক পার হয়ে যাবার সময় বললেন, ঠিক নেই। মনে হয় সিডনি থেকে পুরনো লোহা নিয়ে জাহাজ জাপানে যাবে।

শেখর ডেকের ওপর পায়চারি করছিল অনেকক্ষণ শুধু এই খবরটা জানবার জন্য। আঠারো মাস সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ওর অনুভূতি যেন মরতে বসেছে। শুধু একটা খবরের প্রত্যাশা ওর জীবনে। তার দেশ, তার বাড়ির খবর। তার ঘরে সে কবে ফিরবে? কিন্তু সে অনুভূতি আজ যেন বিবশ জরাগ্রস্ত। ঠিক মতো দেশের মানুষদের ভাবতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে সেই অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হল যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে জাহাজ। কোন এক আদ্যিকালে জাহাজের সিঁড়িতে পা দিয়ে উঠেছিল আজ পর্যন্ত সে সিঁড়িতে পা দেওয়াই আছে। আম-জামের ছায়া কেবল কোনও এক রাতের স্বপ্ন! ভাই বোন কোনও এক দেশের রাজকন্যা রাজকুমার। ওর পক্ষিরাজ ঘোড়া পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে কিন্তু আম, জাম, নারকেলের ছায়ায় আর-একবারের জন্যে হারিয়ে যেতে চাইছে না।

আজকাল শেখরের স্বভাব হয়ে গেছে সারেং কিংবা টিন্ডালকে দেখলেই প্রশ্ন করে জানতে চায় জাহাজের পরবর্তী যাত্রা সম্বন্ধে তারা কোনও খবর রাখে কি না! কিন্তু তারা হেসে সে প্রশ্নের জবাব দেয়, আরে, সফর যত বাড়বে টাকা তত বাড়বে। দেশে গেলেই তো হয়ে গেল।

শেখর ওদের বিদ্রূপ বোঝে, কটাক্ষ বোঝে। তবু বেহায়ার মতো শুধু এক প্রশ্ন, জাহাজ কবে ফিরবে দেশে। কিন্তু তিন নম্বরের কথায় শেখরের চোখদুটো জ্বলে উঠল। তিন নম্বর সমস্ত খুঁটিনাটি খবর রাখে। তার খবর হক খবর। সে খবরের ভিতর জাল-জুয়াচুরি বিদ্রূপ কটাক্ষ মিথ্যা ফেরেব্‌বাজির প্রশ্ন নেই। সুতরাং জাহাজ জাপানে যাবেই। তারপর হয়তো চিনে, শেষে হয়তো একদিন সিউলব্যাংক বে অফ বিসকের প্রচণ্ড ঝড়ে তীব্র দেওয়ানির হিক্কায় ডুববে। দেশের লোক শুধু টেলিগ্রাম পাবে—ব্যাংক লাইন কোম্পানির সিউলব্যাংক জাহাজ ঝড়ের ভিতর হারিয়ে গেছে। ব্যস, এই পর্যন্ত। নাবিক-জীবনের পাওনা এইখানেই শেষ। এইখানেই বিরতি।

এই দীর্ঘ সফরে জাহাজটা কতবার কত ঝড়ের সম্মুখীন হল। কতবার দেখা গেছে বুড়ো ক্যাপ্টেন চার্ট-রুমের মোটা কাচের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন। জাহাজের ঈশ্বর দুনিয়ার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, আমার জাহাজকে বাঁচাও।

নীচে ইঞ্জিন-রুমে টেলিগ্রামের অ্যাস্টার্ন অ্যাহেডের সামনে টেবিলের উপর ভর করে থাকেন সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার। কান পেতে শোনেন ইঞ্জিনের কোনও বেখাপ্পা আওয়াজ উঠছে কি না। প্রচণ্ড ঝড়ের বুকে 'আগিল' আর 'পিছিলের' দুরন্ত ওঠানামাতে শঙ্কিত হয়ে শুধু একটা প্রচণ্ড ভাঙনের প্রত্যাশা করেন। মৃত্যুর সঙ্গে মনে মনে বোঝাপড়া করেন। হিসাব করেন এত বড় শরীরটা হাঙরে খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে, অথবা সমস্ত জাহাজটা সমুদ্রের নীচে তলিয়ে গেলে দম আটকে মরতে ওদের কতক্ষণ সময় নেবে। আর বাড়ির কথা মনে হলে ছোট মেয়ে কনীর ঢলঢলে মুখ, কচি কচি হাতের সমুদ্রতীরের বিদায়-সম্ভাষণ শুধু মনে পড়ে। ইঞ্জিনের গরম হাওয়ায় চোখের জলটা বের হয়ে আবার শুকিয়ে যায়। ইঞ্জিনটা বেখাপ্পা শব্দ তুলছে, সিলিন্ডারটা বুঝি উড়ে যাবে।

ফোকশালে-ফোকশালে তখন চিৎকার ওঠে, আল্লা। সারেং কোনও রকমে টলতে টলতে মেসরুমে এসে ভাণ্ডারিকে ডাকে, সব ফেলে নীচে যাও, নীচে যাও ভাণ্ডারি। দেওয়ানি, দেওয়ানি খুব জোর উঠছে। পাগলি খেপে গেছে। খানা পাকাতে হবে না, নীচে গিয়ে আগে জান বাঁচাও।

সারেঙের চিৎকারই শুধু ভাণ্ডারির কানে পৌঁছয় কিন্তু শব্দগুলি স্পষ্ট হয় না। তবু ভাণ্ডারি নিজের জান বাঁচাবার জন্য নীচে ছোটে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বাংকের রড ধরে উপুড় হয়ে থাকে।

সে সময় টানেল-পথ খুলে দেওয়া হয়। ইঞ্জিন-রুম জাহাজিরা সে পথে ওঠানামা করে তখন। তাদের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ঝড় যত ওঠে উঠুক, ইঞ্জিন চালু রাখতেই হবে। লাল দাগে স্টিম গেজের কালো কাঁটা থর থর করে কাঁপবেই। কাজেই ফায়ারম্যানদের টলতে টলতে শাবল নিয়ে কেবল কয়লার ওপর পড়ে থাকতে হয়। কারণ বয়লারের ফার্নেসে শাবল হাঁকড়াতে হবেই। কিন্তু অস্থির পা দুটোর ওপর কোনও রকমেই শরীরটা ভর করে থাকতে চায় না। শুধু সামনে বা পিছনে ঝুঁকে পড়তে চায়। তবু চোখদুটোর সহজ স্বচ্ছ অনুসন্ধানের দৃষ্টি স্টিম গেজের বুকে, স্টিম উঠছে কি নামছে। কয়লা হাঁকড়াবে কি হাঁকড়াবে না। অস্থির পা দুটো আর চলবে কি চলবে না।

শেখর চোখের ওপর দেওয়ানি দেখল অনেকবার। ঝড়, সাইক্লোন, টাইফুন, কুয়াশায় জাহাজের বেশির ভাগ সফর। লিমন বে আর বে অব বিসকের দেওয়ানির কথা মনে হলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। সেই বিনিদ্র রাতের কাহিনি পরিবার-পরিজনদের বললে তারা নিশ্চয়ই আর জাহাজি হতে দেবে না।

একটা ঠক ঠক আওয়াজে শেখর ফিরে চাইল। উইন্ড-মেশিনের নীচে ফাইভার, ফিফথ এঞ্জিনিয়ার। স্প্যানার দিয়ে ঢিলে স্ট্রেপারের মুখ আঁটছে। চার 'ফলকা' পার হয়ে পাঁচ নম্বর 'ফলকা'র সামনে আসতেই ফাইভার ডাকলেন, শেখর।

শেখর দাঁড়াল না। সোজা চলে এল পিছিলে, গ্যালির সামনে ইচ্ছা করেই ও দাঁড়ায়নি। কারণ ফিফথ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ সেকেন্ডের ফাইভার, বাঙালি ক্রিশ্চিয়ান এবং জাহাজের অফিসার র‍্যাংকে বলে সাধারণ বাঙালি জাহাজিদের অত্যন্ত করুণার চোখে দেখেন। জাহাজিদের ভিতর থাকা-খাওয়ার অসুবিধা নিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি মুখ টিপে হাসেন। মুখ টিপে হাসেন এইজন্য যে, তোমরা আর কী পেতে চাও বাপু! অনেক পেয়েছ। কোম্পানি তোমাদের অনেক সুখ-সুবিধা দিয়েছে। দেশে থাকলে লাঙল বইতে, ধান পেতে আধ খোরাকি, রোজ পেতে পাঁচ সিকা, খেতে পেতে শুকনো মাছপোড়া আর ভাত। আর জাহাজে এসে রোজ, দু'বেলা গোস্ত, ভাত, চর্বিভাজা রুটি, চা-দুধ-চিনি। আর কী চাই।

অথচ তিনি অত্যন্ত বিনীত হয়ে বিদ্রোহের সময় বাঙালি জাহাজিদের মুখোমুখি বলেন, অনুচিত! কোম্পানির অনুচিত!

কেউ যদি জাহাজিদের মধ্যে বলল, দেখুন না স্যার, পাঁচ মাসের আগের গোস্ত! গোস্তে পোকা পড়েছে। নিজের চোখে দেখা। এ পেল্লাই খাটুনির পর তৃপ্তি করে দু' মুঠো ভাত যদি মুখে না দিতে পারি, কত বড় কষ্টের কথা বলুন?

পাঁচ নম্বর সাব উত্তর দেন, ঠিক, ঠিক। তোমরা জানাও মাস্টারকে। জানাও কোম্পানিকে। লন্ডনের ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে রিপোর্ট দাও।

কিন্তু সেকেন্ড থার্ড যদি ফাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে চায়, কী ব্যাপার? তখন ওর সুর পালটে যায়, আরে, ও বাগারগুলো চিরদিনই বিদ্রোহ করে আসছে, বাকি দিনও করবে। ওসব কুকুরের হট-টেম্পার কোম্পানির দেখলে কি চলে?

নীচে ফোকশালে ঢুকে শেখর দেখল মোবারক ঘুমোয়নি। কম্বলের ফাঁকে পিট পিট করে চেয়ে আছে। শেখরকে দেখছে। শেখর নিজের দেয়ালে উপর বসে বাংকের হেলান দিয়ে বলল, কী রে? ঘুম আসছে না? লিলি নিশ্চয়ই চোখে জেগে আছে?

শরীর থেকে দু'হাতে কম্বলটা ঠেলে দিল মোবারক। উঠে বসল বাংকে। তার পর কেমন ব্যাজার মুখে বলল, সমুদ্রমানুষদের জীবনটাই ঝড় আর জলের মধ্যে শেখর। লিলির মতো মেয়েরা সে ঝড় আর জলের কাছে কতটুকু? চোখের ঘুমটাকে লিলির মতো মেয়েরা কেড়ে নেয় না, কেড়ে নেয় জীবনের ক্ষুদ্র সংস্কার, ক্ষুদ্র গুনাহ। লিলি যদি সাধারণ ওক আর পাইনের তলায় নিশীথের বন্দর-অভিসারিকার মতো আসত, তা হলে কোনও অনুশোচনাই ছিল না। কিন্তু সে এসেছে আমার জীবনের একটা বড় ক্ষত হয়ে।

মুহূর্তের ভিতর শেখর স্তব্ধ হয়ে গেল। নির্বাক হয়ে থাকল। খোদা হাফেজ বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখল মোবারকের চোখ থেকে ঝর ঝর করে নোনা জল ঝরছে।

আমার গুনাহ হাজার গুনাহ শেখর। বাপজির গুনাহ অনেক কম। আরও কম।

শেখর বালিশ টেনে বালিশের ওপর দুটো কনুই ভর করে একটু সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, আমি কিন্তু, মোবারক, সমুদ্রের ঝড়-জলেই বেশি কাবু। আগওয়ালার কঠোর পরিশ্রমকে ভয় পাই। মন আমার দেশের জন্য কাঁদে। রাতে শুয়ে শুয়ে দেশের কত বিচিত্র কথা ভাবি। কত কল্পলোকের কল্পনা করি।

ওটা বেশিদিন থাকে না। দু'-চার সফর বাদে নূতন নাবিক-জীবনে সমুদ্র আর জাহাজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। দুনিয়ার সব দেশ ঘুরে, সব নাবিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাই বুঝেছি। সেখানে সমুদ্রের ঝড়-জল নয়, দেশের আম-জাম-নারকেল ছায়ার স্বপ্ন নয়, পচা গোস্তের খানাপিনা নিয়ে বিদ্রোহ নয়, বিদ্রোহ নিজের জীবনের ওপর একটা ক্ষুদ্র আপত্তি নিয়ে। যা কোনও দিন ভাবিসনি অথচ নাবিক বলেই এটা অবশ্য-পাওনা। যেমন আমার বাপজি কার্ডিফ বন্দরে ফ্লাওয়ার গার্লের সঙ্গে যে ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেবার বাপজির বিদ্রোহ ঝড়-জলের ওপর বা খানাপিনার ওপর নয়, বিদ্রোহ নিজের জীবনের ওপর। ঘৃণা নিজেকে নিয়ে, 'খোদা হাফেজ' করে করে যে গুনাহের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। ঘড়িটা যে কাহিনির সাক্ষী হয়ে মোবারকের হাতে আজও ঝুলছে।

শামীনগড় মোবারকের জন্মভূমি।

শামীনগড়ের সড়ক বাপজির এগারোটা থেকে বারোটার পরিভ্রমণের পথ।

টিনকাঠের বারান্দায় আম্মাজান উন্মুখ। বাপজির প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকেন। কখন অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেছে মানুষটা, এখনও ফিরছেন না। এখনও আতাবেড়ার ওপারে শামীনগড়ের পথে পায়ের শব্দ ওঠছে না। অন্ধকার উঠোনে সেইজন্য নেমে এলেন আম্মাজান।

আম্মাজানের পায়ের সংলগ্ন হয়ে হাঁটছে মোবারক। আতাবেড়ার পাশে এসে হঠাৎ দু'জনই থামল। দু'জনই আতাবেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, ক্রমশ একটি শব্দ শামীনগড়ের সড়ক ধরে তেঁতুলতলার অন্ধকার পার হয়ে গ্রাম্য পথের দিকে উঠে আসছে কি না।

অনেকক্ষণ হল রোমান-ক্যাথলিক চার্চে বারোটা বাজার শব্দ উঠেছে। কিন্তু বাপজি ফিরছেন না বলে আতাবেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন আম্মাজান। সড়কের ওপারে অশ্বত্থগাছের নীচে মসজিদ থেকে আজান উঠছে তখন। আর সেই ছন্দোবদ্ধ জ্যোতির্ময় সুরের সঙ্গে পায়ের আওয়াজ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

আম্মাজানের উন্মুখ মন স্বাভাবিক হয়ে এল।

মোবারক ডাকল, আম্মা।

আম্মাজান বললেন, চল ঘরে চল। তোর বাপজি ফিরছেন।

উঠোন পার হয়ে এল তারা। তারপর বারান্দায়। বারান্দায় উঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন আম্মাজান। মোবারক ঘরের ভিতর ঢুকে তক্তপোশের উপর আলোয়ান জড়িয়ে বসে থাকল।

বাপজিও ঘরের আলো লক্ষ করে বারান্দায় উঠে আসলেন। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন আম্মাজানের। আম্মা নির্বাক। বাপজির চোখে বিস্ময়।

তুই বিবি এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? বলেছি তো বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরব। শুয়ে থাকলেই পারতি। খোদা হাফেজ! ভিতরে চল, হুঃ হুঃ, ভিতরে। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব এখন।

চৌকাঠ থেকে নড়লেন না আম্মাজান। কোনও আওয়াজ করলেন না তিনি। এক ফাঁকে বাপজি ঘরের ভিতর ঢুকে কুলুঙ্গি থেকে নিলেন কুপিটা। ডালা খুলে পেটির ভিতর সযত্নে রাখলেন ঘড়িটা। সহজ হয়ে দাঁড়ালেন এবং আবার চিৎকার করে ডাকলেন, খোদা হাফেজ।

তারপর বারান্দার দিকে চেয়ে অনুরোধ করলেন, ঘরে আয় বিবি। আয় না! আমার উপর রাগ করলি তুই? রাগ করবি। রাগ করার অধিকার তোর আছে।

মবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, মবু, তুই ডাক না তোর আম্মাকে। ভিতরে আসতে বল।

মবু ডাকল, আম্মা, ভিতরে এসো।

কিন্তু আম্মাজান যখন ভিতরে ঢুকলেন তখন বাপ আর ব্যাটা বুঝল, তিনি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে

কাঁদছিলেন। ভেজা-ভেজা চোখদুটো তখনও তার সাক্ষী হয়ে কুপির আলোতে জ্বল জ্বল করছে। বাপজি তাঁর বলিষ্ঠ বুকে দুটো হাত জড়িয়ে রাখলেন। বললেন, বিবি, তুই কাঁদলি। কিন্তু আমি যে দিনরাত ধরে মনের ভিতর কেঁদে চলেছি সে তো তুই দেখতে পেলি না।

আম্মাজান আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, কী হয়েছে আপনার? এমন হয়ে গেছেন কেন?

এমন হয়ে গেছি কেন?

বাপজির চোখে-মুখে এক ঝলক খড়ের আগুন যেন দাউ দাউ জ্বলে উঠল। এমন না হয়ে উপায়ই বা কী ছিল? সমুদ্র-পাঁজবে জাহাজের পোর্ট-হোল দিয়ে যে বীভৎস চিৎকারটা গলে পড়ে নোনা জলে হারিয়ে গেল, যার সাক্ষী কেউ ছিল না শুধু ঘড়িটা বাদে, যে গুনাহের হাত থেকে বাঁচতে দেশে ছুটে আসতে হল, বাত এগারো থেকে বারোটা খোদা হাফেজ বলতে হল, তবু পোড়-খাওয়া জীবনটা যখন ঝিমিয়ে পড়ল না, অনুতাপ আব অনুশোচনা যখন বেড়ে চলেছে, তখন এমন না হয়ে উপায়ই বা ছিল কী?

বাপজি বললেন, তোকে আমি সব বলব। দু'দিন সবুর কর, সময় দে। এমন করে ভেঙে পড়িস না। এত সহজে ভেঙে পড়লে বাকি জীবনটা চলবে কী করে।

আম্মাজান তক্তপোশের কাছে এসে নীল ডুরে শাড়ির কাঁথাটা ঝেড়ে দিলেন। হাতে কুপিটা নিয়ে বাপজির কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাপজিও একটু সরে এলেন আম্মাজানের কাছে। মবু ঘুমিয়ে আছে ভেবে আম্মাজানের চকচকে পরিপুষ্ট মুখটা কুপির আলোতে তুলে ধরলেন, নোলক, নাকফুল, বেসর সব একসঙ্গে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছে, হঠাৎ ওঠা ঝড়ের পরে পবিষ্কার আকাশের মতো। মাসের পর মাস ধরে যে নির্বাক অসহিষ্ণু আকাঙ্ক্ষা জমে ছিল তাই যেন আজ এই সহসা মধুযামিনীতে আম্মাজানের চোখে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাপজিও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হাত থেকে কুপিটা পড়ে গেল মাটিতে। আলো গেল নিভে। উত্তপ্ত নিশ্বাসগুলো আছাড় খেয়ে পড়ল দেয়ালে দেয়ালে। আর সেই সময় বাপজি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, খোদা হাফেজ।

শামীনগড়েব সড়ক কর্ণফুলির বাঁওড় পার হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে। মগেব মুল্লুকে কোথায় যেয়ে পথটা হাবিয়ে গেছে শামীনগড়ের মানুষেরা তার খবর রাখে না। খবর রাখাব প্রয়োজন হয় না। বাপজি তাই এই সড়কের হদিস রাখেন মসজিদ পার হয়ে কর্ণফুলিব পুল পর্যন্ত। রাত এগারোটা থেকে বারোটা বাপজি মসজিদ পার হয়ে পুল পর্যন্ত হাঁটেন। ফেরেন আবার রাতের অন্ধকারেই। বাড়িব মসজিদ অতিক্রম করে উঠোনে যেয়ে ঢোকেন। বিবি অপেক্ষা করে থাকে। বিবির চোখ তখন ভাব হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে বলেন তিনি, তোকে সব বলব, সময় আসুক, তুই আমায় সময় দে।

এমনি করে প্রতিদিন রাত বারোটার পর ঘড়িটার সঙ্গে বাপজির গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেমনি রাত বারোটা বাজার শব্দ মোবারক গভীর আগ্রহের সঙ্গে শোনে। ঠোঁটদুটো তখন ওর শুকনো হয়ে ওঠে। চোখদুটো সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এবং এই বারোটা বাজার আগে সে ডেক-এ উঠবে। পায়চারি কববে অফিসার গ্যালির পশ্চিমের বিট পর্যন্ত। বারোটা বাজলে আকাশের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে মবু সবার অলক্ষে ডাকবে—খোদা হাফেজ। সেই শামীনগড়ের সড়কের বাপজির মতো।

মোবারক বসেছিল ফোকশালে, নিজের বাংকে। দু'হাঁটু ভেঙে মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল হাঁটুর ভিতর। পাশের বাংকে ঘুমিয়ে রয়েছে শেখর। কেবিনের ওপাশের পথ ধরে কেউ সন্তর্পণে উপরে ওঠে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তেলওয়ালা হবে দু'নম্বর পরির। শেষ বারের মতো ওর ওয়াচের তেল স্টিয়ারিং ইঞ্জিনে দিয়ে গেল। ডেকে গেল, যাদের পরবর্তী পরি দিতে হবে তাদের।

পোর্ট-হোল খোলা। কাচের ফাঁক দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। ফুরফুরে হাওয়ায় শেখরের চুল উড়ছে। শেখরের অনাড়ম্বর সরল সহজ মুখের প্রতি চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

মিষ্টি মিষ্টি মুখ, দুনিয়ার সুখের খবরটাই শুধু জানা আছে চোখদুটোয়। সে চোখে সে আম্মাজানকে অনুভব করতে পারে।

সে এখনও বাংকের উপর বসে রয়েছে। ভাবছে অনেক কথা। অনেক কালের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি।

যাদের পরিতে যাবার কথা শেষ রাতে, তারা এক এক করে উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। সতর্ক চোখে সে একটু আড়াল দিয়ে বসল সকলের।

ওদের পায়ের শব্দ ফুগ্যালির সামনে মিলিয়ে গেল। ইঞ্জিন-রুম থেকে ঝ্যাক্ ঝ্যাক্ শব্দ কাচের ঘুলঘুলি গলে ফোকশালের ভিতর ঢুকছে।

সেই শব্দ সাপের মতো বেয়ে ওর শরীরের উপর যেন উঠে আসছে। কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা। কী যেন ভাবতে ভাবতে চোখদুটো অন্ধকার হয়ে এল। আলো গেল নিভে। আম্মাজান যেন কাঁদছেন আর বলছেন, বাপজি আর ফ্লাওয়ার গার্লের কথা, ঘাঁড় আর বাপজির দোস্ত রহমত মিঞার কথা—

১৯৩৫ সালের অনেক টুকরো ঘটনা। যোগ দিলে অনেক হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশনে বাপজি তখন ছোট-টিন্ডাল।

ক্লান্ত আর অনেক আফসোসে গুমরে-মরা মনটা চেয়ে থাকল ঘড়িটার প্রতি। উন্মনা হয়ে শামীনগড়ের মাটিতে গড়াগড়ি খেল মনটা। আম্মাজানের নালিশ শুনল। তিনি বলেছিলেন, তোর বাপজি সে রাতেই চলে গেল।

বে অফ বিসকের ঝড়ে এগিয়ে চলছিল জাহাজ, বাপজির জাহাজ, বাপজি সে জাহাজে ছোট-টিন্ডাল।

বাপজি আর রহমত মিঞা থাকতেন এক ফোকশালে পাশাপাশি বাংকে। জাহাজের তিনি ডংকিম্যান। কলকাতা বন্দরেই প্রথম পরিচয় এবং একটা সম্পর্কও কী করে যেন দু'জনের ভিতর বের হয়ে পড়েছিল। তারপর দু'জন সালাম আলাইকুম আর ওয়ালেকুম সালামের ভিতর প্রথম পরিচয় থেকে ভাইসাব আর মিঞাসাব পর্যন্ত উঠেছিলেন।

ঝড়ের দরিয়ায় পোর্ট-হোল খোলা চলে না। ঝড়ের দরিয়ায় দুস্তি রাখাটাও ভয়ানক ব্যাপার। কেউ কাউকে সামলাতে পারে না। নিজেকে নিজে সামলাও, নিজেকে নিজে বাঁচাও। তবু যখন অত্যন্ত দেওয়ানির জন্য বাংক থেকে উঠতে পারছিলেন না রহমত মিঞা, লকার থেকে খাবার তুলে এনে খেতে পারছিলেন না, তখন বাপজি ধরে ধরে সব সাহায্য করেছিলেন। পেট ভরে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন দোস্তকে। গোটা সফর ধরে এমন করেই চালিয়ে এনেছেন, এমন করে দোস্তকে বিপদে-আপদে আগলে এসেছেন।

চিটাগাং আব নোয়াখালির জাহাজিরা বে অফ বিসকে-কে বলে বয়া বিস্কুট। তারা আগে থেকে জানে এখানে এলে ঝড় উঠবে, দুলবে জাহাজটা অত্যধিক। দুলে দুলে টানেল-পথে চলতে হবে, ডেক-পথে ইঞ্জিন-রুমে যাওয়া যাবে না। সুতরাং বাপজি অনেক তরিবত করে বুঝিয়েছিলেন দোস্তকে, আপনি দেওয়ানি উঠলে কেন যে নোনাপানি খান না, বুঝি না মিঞাসাব।

কম্বল ঠেলে কোনওরকমে উঠে বসেন রহমত। বলেন, মেজাজে না ধরলে কী করি বলেন ভাইসাব?

বয়া বিস্কুটে ঝড় উঠবে জেনেই বাপজি কিছু কমলালেবু বেশি করে কিনে চিফ স্টুয়ার্টের কাছে জিম্মা রেখেছিলেন রেফ্রিজিরেটারে রাখার জন্য। তিনি কিছু কমলালেবু ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন।

হালকা শীর্ণ চেহারা রহমত মিঞার। কাজ করে গোটা জীবন আর গোটা সফর ধরে কেবল টাকাই জমিয়েছেন, একবার তাকিয়ে দেখেননি কেমন হালত হয়েছে শরীরের। বাপজির করুণা দোস্তের ওই দেহ দেখে। বলেছিলেন সেজন্য, খান, শরীর হালকা হবে।

তিনি কমলার কোয়া ছাড়িয়ে দিলেন দোস্তকে। শরবত করে দিলেন। পেট ভরে খেতে দিলেন রুটি। কতকটা নোনাপানি চেখে বললেন, খেয়ে ফেলুন, শরীরটা হালকা হবে।

এক সকালে দরিয়ার বুক থেকে ঝড় বিদায় নিল। স্থির হয়ে এল সমুদ্র-ঢেউ। ছোট ছোট ঢেউয়ে এখন ছোট ছোট পারপয়েজ মাছ। তারা ঢেউয়ের রুপালি পর্দায় খেলছে। সামনের ডেকে বাপজি হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখলেন সেখানে চার-টনি ড্যারিকটা ভেঙে পড়ে আছে। ঝড়ের বীভৎস গতির আঁচটা এতক্ষণে যেন আঁচ করতে পারলেন। ফোকশালে ফিরে এসে বসলেন, আল্লার মেহেরবানি খুব মিঞাসাব, জাহাজটা এ দফে আমাদের বেঁচে গেল।

এ দফে বেঁচে গেল বলেই কার্ডিক বন্দরের এক সোনালি সকালে জাহাজটা এসে ভিড়ল। বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর রয়েছে লাইট-হাউজ, আলো ফেলছিল রাতে।

জাহাজটা তখন নোঙর করা। বাপজি মিঞাসাব তখন জাহাজ-ডেকে। লাইট-হাউজের আলোতে বার বার দু'জনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই সোনালি সকালে লাইট-হাউজের ঘরে আর আলো জ্বলছে না। রাতের উদ্দামতা ভোরের আলোয় সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাই লাইট-হাউজটা পাহাড়েব উপর শুধু মঠের মতো দাঁড়িয়ে বয়েছে।

যেমন বাপজি এসেছিলেন এ বন্দবে, রহমত মিঞাও তেমনি এ বন্দরে দু'বার এসে, কার্ডিফের রাউদ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং তার পাশের অপ্রশস্ত গলি আর বেইজ্জত মেয়েমানুষ সব দেখে গিয়েছিলেন। তিনি ড্রাইডকের পাশ দিয়ে অনেক বার হেঁটেছেন, অনেক বার মুখস্থ করেছেন সেই অপ্রশস্ত পথটা। তখনকার দিনে মেয়েমানুষগুলি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত ওদের জন্য। এদের দেশে এই নাকি রীতি।

ভাইসাব আব মিঞাসাব দু'জনে মিলে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। বন্দর আর শহরের ভগ্নাংশ দেখলেন। পুরনো স্মৃতি দু'-একটা দু'জনেরই মনে ভেসে উঠেছিল। কোন তেলওয়ালা রাতের অন্ধকারে জাহাজ থেকে পালাতে গিয়ে সুখানির হাতে ধরা পড়েছিল, সে খবর জমাট হাসিতেই দোস্তকে দিলেন বাপজি। বহমত মিঞা দেখছেন তখন নীচেব বিটে হাসিল কতখানি টেনে বাধা হচ্ছে। তারপর চোখ গেল আরও দূবে, অনেক দূরে, সেই অপ্রশস্ত পথ, ড্রাইডক, পাশের ডকে যুদ্ধজাহাজ। কিছুটা গেলে বাঁ দিকটায় কয়লার জেটি।

জাহাজ হোমে এলে একবাব ড্রাইডক করা হয়। একবাব সবফাই করা হয়। সবফাই করে দেখা হয় জাহাজটা আব সমুদ্রের ঢেউ কত দিন ভাঙতে পারবে, বয়লারটা কতকাল আব নির্দিষ্ট স্টিম দিতে পারবে। সব দেখে একসময় এ জাহাজেবও বিপোর্ট গেল কোম্পানিব ঘরে, জাহাজেব মেবামত অনেক। বিট, প্লেট, একজস্ট পাইপ থেকে ট্যাংকটপেব উপর স্কাম বকসটা পর্যন্ত। অর্থাৎ জাহাজটাকে ঘাটে অনেক দিন বসতে হবে।

তখনও সকাল হয়নি ভাল করে। ইংলিশ চ্যানেল থেকে ঠান্ডা হাওয়া সমস্ত বাত ধরে বালিয়াড়ি ভেঙে আছড়ে পড়ছে বন্দরটায়। কুয়াশা কিছু নেমেছিল, কিন্তু কেমন করে আবার তারা সমুদ্রের আব-এক দিগন্তে ভেসে গেছে। কার্ডিফ ক্যাসেল থেকে যে বাসটা বন্দবে আসে সে বাসটা পর্যন্ত আসেনি। এইমাত্র ধোবি মেয়েটা গাধাব পিঠে কাপড় তুলে নিশ্চিন্তে ড্রাইডকের পাড় ধরে সামনের মাঠটাব প্রতি এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ই কাঠের সিঁড়ি ধবে জেটিতে নেমেছিলেন বাপজি, রহমত মিঞা এবং জাহাজের অন্যান্য জাহাজিরা। মাথায় মোট-ঘাট, হাতে তাদের পেতলেব বদনা। গ্রীষ্মের সকাল, শীত কম। তবু জাহাজিবা মাথায় সকলে মাফলার এঁটে নিয়েছিল। একমাত্র বাপজি এবং বাপজির অনুরোধে রহমত মিঞা মাথায় ফেল্ট ক্যাপ টেনে বন্দরে নেমেছিলেন।

জেটিতে নেমে তিনি প্রথমেই দোস্তেব হাত ধরে বললেন, সালাম আলাইকুম মিঞাসাহেব।

ওয়ালেকুম সালাম। সরাইখানায় গিয়ে খবব-টবব নেবেন।

নসিব খারাপ।

নসিব জবর খারাপ। নয় তো আপনি আর আমি দু'সরাইখানায় পড়ব কেন।

কিন্তু কোম্পানির নির্দেশ তো আর খেলাপ করা চলবে না। কোম্পানির নির্দেশেই জাহাজিদের দুটো ভাগ হয়েছে। দুটো সরাইখানা ভাড়া হয়েছে ওদের থাকার জন্য।

মালপত্র কোম্পানির মোটরে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেল। বাপজি আর রহমত মিঞা অন্যান্য জাহাজিদের সঙ্গে ধোবি মাঠ পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেন। যাঁরা কার্ডিফ ক্যাসেল পাব হয়ে রেলপুলটার নীচের সরাইখানায় যাবেন তাঁরা পথের মোড়টায় এসে থামলেন। এখান থেকেই বাসে উঠতে হবে তাঁদের। সেজন্য বাপজি বাস স্টপেজে ওঁদের সঙ্গে দাঁড়ালেন। কারণ এ দলে রয়েছে রহমত মিঞা। ভাবলেন, রহমত মিঞাকে বাসে তুলে দিয়ে তারপর তিনি ধোবি মাঠ অতিক্রম করবেন। ধোবি মাঠ অতিক্রম করেই তাঁদের সরাইখানা।

বাপজির সঙ্গের জাহাজিরা তখন হেঁটে চলেছে সরাইখানাটার দিকে। বাপজি শুধু বাসস্ট্যান্ডে বন্দরের কালো সর্পিল পথটার উপর অপেক্ষা করেছিলেন রহমত মিঞা যতক্ষণ না বাসে উঠলেন এবং চলে গেলেন। বিদায়বেলায় দু'হাত উপরে তুলে সালাম জানিয়েছিলেন বাপজি। শেষে একান্ত আনমনে যখন বন্দরেব রুপালি সকাল অতিক্রম করছিলেন মাঠ পার হতে তখন দেখলেন বালুবেলার পথ ধরে একটি মাত্র ধোবি মেয়ে। গাধার পিঠে এক গাদা কাপড়। হেট হেট করছে আর পিট পিট করে চাইছে মাঠের উপরে মানুষগুলোর দিকে। তাকে দেখে বাপজি ভাবছিলেন আম্মাজানকে, ব্যাটা মবুকে, কাঞ্চনেব ডালকে। কাঞ্চন গাছটায় এখন হয়তো ফুল ফুটেছে।

রাত্রিবেলায় ব্যাটা আর বিবির কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং কখন সকাল হল তিনি যেন সেদিন টের করতে পারেননি। বাপজি ওয়াল ক্লকটার দিকে চোখ তুলে দেখছিলেন ক'টা বাজে। রহমত মিঞার সরাইখানাটা একবার ঘুরে এলে হত। মনটা যেন দোস্তের জন্য কেমন কেমন করছে! এক ফোকশালে থাকার অভ্যাসের ফল।

কী ভেবে এক সময় পাশের জানালাটায় চোখ তুলে দিলেন। কমার্শিয়াল ড্রাইডক পার হয়ে সাদা বর্ডারের জাহাজের কালো চিমনিটা আকাশমুখো হয়ে আছে। ইনডাস্ট্রিয়েল ড্রাইডকে রং সারা হচ্ছে যুদ্ধের জাহাজগুলোর। বন্দর ধরে কিছুটা দক্ষিণমুখো গেলে কয়লার জেটি, বাংকার নেওয়া হচ্ছে দুটো জাহাজে। বালুবেলা ধরে একটি মেয়ে এ দিকেই উঠে আসছে, এই পথে। ধোবি মেয়েটা বুঝি। প্রতি ভোরের পুনরাবৃত্তি।

হাতের কনুইয়ে ঝুলছে ঝুড়ি। মেয়েটি আসছে এ দিকেই। এই সরাইখানাতেই। বাপজি তার ভুল বুঝতে পারলেন, কাবণ মেয়েটা এতক্ষণে তার গাধা নিয়ে শহরমুখো চলেছে। এত দেশ এতবার ঘুরেও তিনি যেন বিদেশি মানুষদের চেহারার তফাতটা ধরতে পারেন না।

শামীনগড়ের কথা ভেবে বাপজি আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একটি গুঞ্জন উঠেছে তখন সরাইখানার সদর দবজায়। সেখানটায় ভিড় জমিয়েছে সব নাবিকেরা। একমাত্র বাপজি দেয়ালে ঠেস দিয়ে তখনও উন্মনা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে কিছুদিন থেকেই আবার শামীনগড়কে ভাবতে শুরু কবেছেন। জাহাজেব ডেক, দরিয়ার নীল লোনা জল একঘেয়ে লাগছে। জল আর মাটির সব বৈচিত্র্য টিনকাঠের ঘরেব কাছে হার মেনেছে। আবার তিনি ফিরে যেতে চান দেশে, বিবি আর মবুর বুকে মুখ লুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চান কিছুদিন।

সদর দরজার গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে এদিকে সরে আসছে।

বাপজি চোখ তুলে দেখলেন, নাবিকেরা সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে গুঞ্জন তুলেছে।

জাহাজিরা কেউ কেউ মেয়েটির ঝুড়ি থেকে ফুল তুলে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের গুচ্ছগুলো দেখতে দেখতে অনর্থক প্রশ্ন করলে অনেকে, কিন্তু দু'শিলিং দিয়ে কেউ একগুচ্ছ কিনে নিলে না।

মেয়েটি সরাইখানায় এসেছে ফুল বিক্রি করতে। ভোরের রোদ গায়ে মেখে প্রতিদিন শহরের পাড়ায় পাড়ায় ফুল বিক্রি করতে বের হয়। আজ এসে গেছে বন্দরে, ঢুকে গেছে সরাইখানায়। নতুন মানুষের মুখ দেখে কৌতুক অনুভব করছে। সরাইখানার দীর্ঘ মেঝের উপর দু'সারিতে রাখা অনেক লোহার ক্যাম্পখাট। ফাঁক দিয়ে সরলরেখার মতো একটি সংকীর্ণ পথ অন্য প্রান্তের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে। পথের বাঁ পাশটা থেমেছে বাপজির টেবিলের পায়ার ছোট গোল চাকতিগুলোতে। সেই পথ ধরে আসছে মেয়েটা। সচকিত ভাব ওর চোখে মুখে। অন্য জাহাজিরা তার পিছনে। মেয়েটা সরাইখানায় ঢুকে পড়েছে বলে ওরা খিল খিল করে হাসছে।

হাতের ইশারায় বাপজি ফ্লাওয়ার-গার্লকে ডাকলেন। অন্যান্য জাহাজি বন্ধুর আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মেয়েটি গরিব, ফুল বিক্রি করে সংসার চালায়। ফুলগুলি নিয়ে দেখি দেখি করে না-দেখার ইচ্ছা ও না-কেনার ইচ্ছাকে আর তাদের অসভ্য ইঙ্গিতগুলিকে তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাই হাত তুলে ডাকলেন এবং কাছে এলে ঝুড়ি থেকে একগুচ্ছ ব্ল্যাক-প্রিন্স নিয়ে দাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, কত?

বাপজির টেবিল ঘেঁষে সন্তর্পণে দাঁড়াল মেয়েটি। ব্ল্যাক-প্রিন্সের দিকে চেয়ে কিছু যেন দামের কথা চিন্তা করলে—কত দাম হতে পারে, কত দাম দিলে দু'জনের কেউ ঠকবে না। তারপর বাপজির প্রতি নবম নরম দুটো চোখ তুলে অকুণ্ঠ গলায় জবাব দিল, দু'বব।

দু'বব। এত কম! বাপজি খুশি হলেন। দুটো বব মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন।

জাহাজিদের দিকে মুখ তুলে মেয়েটি হাত পেতে দুটো বব নিল এবং খুশি মুখে বাপজিকে অভিবাদন জানাল। তারপর এক অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে সদর দরজাটায় দাঁড়াল। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল নীচের পথের জনতাকে। শেষে বাঁ পাশের মদের দোকানটা অতিক্রম করে একটা সরু গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই গেল সরাইখানায় প্রথম রাত যাপনের পর প্রথম সকালের খবর। বিকেলে বাপজি একবার ভাবলেন, রহমত মিঞার সরাইখানায় যাবেন। মিঞাসাবের দিন বিলেতের হাওয়ায় কেমন গুজরান হচ্ছে দেখে আসবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না। সারেং সাব ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার জাহাজে যেতে হবে। অন্তত কয়েকটি রাতের জন্য একটি বয়লার চালু রাখতে হবে। সেজন্য বিকেলে গেলেন বাপজি জাহাজে, দু'জন আগওয়ালা গেলেন সঙ্গে। ওদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সে রাতেই তিনি ফিরেছিলেন সরাইখানায়।

পরদিন সকালে তেমনি নেচে নেচে এল মেয়েটি। ফুল বিক্রি করতে এসেছে ফুলওয়ালি। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে, ফুল চাই।

জাহাজিরা যে যার চকি থেকে উঁকি মারছে জানালা দিয়ে। কেউ কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে নীচে নেমে সদর দরজাটা পর্যন্ত গেছে। কিছু কিছু ফুল তারা হাতে তুলে নিয়ে গতকালের মতো বলেছে, তোমার ফুল ভাল নয়।

বাপজি চকি থেকে ওঠেননি। দেয়াল ঘেঁষে বসেছিলেন, বসেই থাকলেন! জানালা দিয়ে দেখছিলেন তিনি তখন অনেক দূরের একটি দেশ। সে দেশে তাঁর ব্যাটা আর বিবি থাকে। বন্দরের কালো পিচ-ঢালা পথে যে মেয়েটি আসে এবং সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, ফুল চাই, তাকে ভাবতে গিয়েই কেমন করে তিনি যেন আম্মাজানের কাছে চলে যান। আম্মাজানের দুটো ডাগর চোখের কথা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবেন!

মেয়েটি তখন সদর দরজা ধরে বাপজির টেবিলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে তার এক কথা, ফুল চাই, ফুল দেব।

বাপজি মুখ তুলে দেখলেন ফুলকন্যাকে। ফুলের ঘ্রানে মেয়েটির শরীর যেন আশ্চর্য রহস্যময়। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ গায়ে। মাথায় তার পালকের টুপি। ভিজে ভিজে ঠোঁটদুটোয় চলকে-পড়া হাসি। তাই বিবি আর ব্যাটাকে রেখে আসা মানুষটি কিছুতেই মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাই ফ্লাওয়ার-গার্ল টেবিলের পাশে সন্তর্পণে দাঁড়াতেই তিনি পুরো একটি ক্রাউন দিয়ে রেহাই পেলেন।

ফ্লাওয়ার-গার্ল জানল, এ জোয়ান জাহাজি যেন তার নিজের মানুষ। দরদ রয়েছে তার। অন্যান্য জাহাজির মতো নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন না প্রতিদিন। ফুল কিনবেন, ফুল কিনে পয়সা দেবেন।

মেয়েটি আবার চলে গেছে। সদর দরজা পার হয়ে সে সদর রাস্তায় নেমেছে। প্রথম ভোরের মতো আজও মদের দোকানটা বাঁ পাশে রেখে একটা সরু গলিতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। বাপজির চোখদুটো তখন জানালায়। দৃষ্টি তার অন্যত্র। বন্দরের প্রতি চোখ রেখেছেন তিনি, কত দিনে জাহাজটা মেরামত হবে, কত দিনে বয়া বিস্‌কুটের ঢেউ ভেঙে জিব্রালটার হয়ে দেশের মাটিতে পৌঁছবে। ব্যাটা আর বিবির জন্য মনটা খুবই উন্মুখ। বিবিকে একটা খত দিতে হবে। মবুর জন্য দোয়া পাঠাতে হবে।

গোলাপটি তিনি হাতে নিলেন। নাকের কাছে নিয়ে গোলাপের গন্ধ নিলেন কি পাপড়িগুলোর ভিতর কোনও কীট রয়েছে কি না পরখ করলেন, বোঝা গেল না। তবু তিনি গোলাপটিকে ধরে রাখলেন দু'আঙুলের ডগায় এবং সকলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সমস্ত মুখটিকে পাপড়িগুলোর ভিতর ডুবিয়ে দিতে চাইলেন। নিশ্বাস নিলেন জোরে জোরে। মাসের পর মাস সমুদ্র আর বন্দর দেখে যে মন ঝিমিয়ে পড়েছিল, সেই মনে গোলাপের মিষ্টি গন্ধে একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল। জোরে জোরে আরও দুটো শ্বাস টানলেন সেজন্য। এবং এক সময়ে ফুলটিকে বুকের উপর চেপে ধরে পরবর্তী সকালের জন্য অপেক্ষা করলেন।

সকাল এল তেমনি। সমুদ্রের বুক মাড়িয়ে যে মনটা শুকনো হয়ে উঠেছে, যে হৃদয়ের কান্না গুমরে

মবছে গোটা দেহটার ভিতরে, সেই মন আর হৃদয় দুটো চোখের উপর ভর দিয়ে ঝুলে আছে জানালায়, একটি সকালের জন্য, একটি ছায়া-শরীরের জন্য। উন্মুখ আর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সে কান্না, বিবির দুটো চোখ, বিবির মতো একটি দেহ যার ছায়া-শরীরে, সেই বিদেশিনীর জন্য প্রতীক্ষা। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন বাপজি। বাসি গোলাপটি হাতে নিয়েছেন অন্যমনস্কভাবে। চোখের উপর তুলে ধরেছেন, দেখছেন বিবর্ণ রূপটি। জীবন আর যৌবনের বিবর্ণ গন্ধ পাচ্ছেন এখানটায় তিনি।

প্রতি ভোরেই এমন ঘটেছে। বাপজি প্রতীক্ষায় থাকতেন জানালার দুটো গরাদে মুখ রেখে, তাঁর উত্তর-ত্রিশের উন্মত্ত যৌবন ফুলের সমারোহের সঙ্গে চলকে-পড়া একঝলক হাসির প্রত্যাশার হিসাব টেনেছে কত বার কত ভাবে, মেয়েটি এই বুঝি এল, এই বুঝি রাউদ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দেয়াল ঘেঁষে পা বাড়াল ধোবি মাঠের উপর।

ধোবি মাঠের ঘাসে ঘাসে নীল ফুল। সেই ফুলের উপর পায়ের ছাপ রেখে আসত ফ্লাওয়ার-গার্ল। ঝুড়িটা তখন কনুইয়ে দুলত। ধোবি মাঠের উপর পা রাখার আগে দূর থেকে একবার জানালার দিকে চেয়ে আড়-চোখে অনুভব করত জাহাজি মানুষটির উন্মনা চোখে কী জেগে রয়েছে। তারপর ফুলের বোঁটায় কামড় দিয়ে না দেখি না দেখি করে একসময়ে এসে থেমে পড়ত সরাইখানার সদর দরজায়। হাঁক দিয়ে দিয়ে ঢুকত, ফুল, ফুল চাই।

এ ফুল দেওয়া-নেওয়া বাপজির আর থামল না। ফুল কিনলেন, মিঠে হাসি দেখলেন এবং একদিন রুজ-লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটে কামনার চিহ্ন দেখতে পেলেন। বাপজি জাহাজি। চরিত্রটা জাহাজির মতো। পাইনের ছায়াজঙ্গলে একবার ডুব দিতে ইচ্ছা হল। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে প্রথম দিনের প্রথম আলাপ 'দাম কত'র পরে আর যে কোনও আলাপই হয়নি। কামনার জ্বালা যতই উপচে পড়ুক, হাজার হলেও যে তিনি ভারতীয়। সুতরাং বলতে পারেন না প্রথম দর্শনেই অন্যান্য দেশের মানুষগুলোর মতো— উড ইউ বি প্লিজড...। কারণ শরম বলে একটি ছোট্ট কথা সব সময়ের জন্যই উত্যক্ত করে মারছে। তা ছাড়া জাহাজি মানুষের জাহাজটা যেমন নিজের হয় না, চরিত্রটিও সে তেমন নিজের বলে দাবি করতে পারে না। বাইরের নিয়োন ঝলসানো রঙে সে আনমনা হয়ে পড়বেই, তিনি তখন বাপজিই হোন আর সাধু সন্ত, ফকির দরবেশই হউন। বাপজি সে কথা কসম খেয়ে স্বীকার করেন।

স্বীকার করতেন তিনি সেই অশুভ লগ্নটির কথা। মেয়েটি এল, ফুল রাখল টেবিলে, শেষে হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে সরু গলিটায় ঢুকে গেল। টেবিলের উপর রাখা দুটো শিলিং সেদিন ফুলকন্যা তুলে নেয়নি। প্রথম বিস্ময় মেনেছিলেন দেখে, পরে কী ভাবতে ভাবতে ভেবেছিলেন মেয়েটি হযতো ভুল করেছে। কাল যখন আসবে তখন সংশোধন করে দিলেই চলবে। সেইজন্য তিনি আর বিশেষ করে অন্য কিছু ভাবলেন না। শুধু ফুলটি হাতে নিয়ে কী খবর রয়েছে ফুলের গন্ধটায়, তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাইলেন। এবং একবার রহমত মিঞার সরাইখানায় বিকেলে গেলে কেমন হয় সে-কথা চিন্তা করে সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সদর দরজার সিঁড়িটাতে নেমে ভাবলেন, মার্কেটের দিকে যাবেন। কিছু কেনাকাটা করে ফিরবার পথে কোনও বড় দোকানে ঢুকে মবু আর আম্মাজানের জন্য কিছু জিনিস পছন্দ করবেন। প্যান্টের পকেটে তিনি হাত রাখলেন, মাথাটা নুইয়ে সংক্ষিপ্ত দুটো পা ফেললেন, এবং আবার কী মনে করে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে টেবিল থেকে ফুলটি তুলে নিলেন। তারপর বাজার-ফেরত রহমত মিঞার সরাইখানায় একবার ঢুকতে হবে। বলতে হবে দোসকে, বুঝলেন, এ ফুল রোজ একটি ফুলওয়ালি দিয়ে যায়। রূপের কথাটাও একবার চেখে চেখে বলবেন, দোস নিশ্চয়ই তোবা তোবা করে দুটো কানে হাত দেবেন। বলবেন, ভাইসাব ঘরে যে আপনার বিবি রয়েছে তার কথাটা মেহেরবানি করে মনে রাখবেন।

মবুর বাপজি তখন নিশ্চয়ই হাসবে। বিবি আর ফুলকন্যা? কোথায় কী! টেমস আর কর্ণফুলি।

বাপজি প্রতীক্ষা করলেন বাসের জন্য। সামনের পথটার দিকে চেয়ে থাকলেন। কিন্তু বাঁ পাশের গলিটার দিকে মাঝে মাঝেই চোখদুটোকে টেনে আনছেন, এ পথ ধরে মেয়েটি গেছে। ওর পায়ের শব্দ এখনও যেন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কান পাতলেন সন্তর্পণে। তারপর বুঝতে পারলেন। একসময় ও মেয়ের পায়ের শব্দই ঘরের বাইরে সদর দরজার সিঁড়িটা পর্যন্ত তাকে বের করে এনেছে, দু' কদম পা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

মার্কেট যাবার বাসটা আসতে দেরি দেখে বাঁ পাশের গলিটায় ঢুকে পড়লেন তিনি। পথটা এখানে মোড় নিয়েছে। মদের দোকানটায় ভিড় নেই। পথ থেকে মনে হচ্ছে দোকানটা বন্ধ। পাশের ঘর থেকে দুটো ছোট মেয়ে রাস্তাটা অতিক্রম করে অন্য একটা টালির ছাদ-ঘেরা বাড়িতে ঢুকে গেল। তিনি চোখ তুলে দেখলেন। খুব আঁকা-বাঁকা পথ। দু'কদম আগের মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় না। আড়ালে আড়ালে যেন এখানকার মানুষেরা চলে, তিনি তাই আরও এগিয়ে গেলেন।

পথটা এখানে প্রশস্ত। ততটা যেন বাঁক খায়নি। দূরের মানুষ চোখে পড়ে। কাছের মানুষ আরও কাছে আসছে। বাপজি এখানে থামলেন। কিন্তু ফুলকন্যার কোনও চিহ্ন পেলেন না। গলির বাঁকে বাঁকে সে কোথায় হারিয়ে গেছে তখন। তাকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

পরে তিনি ফিরে এসেছিলেন সরাইখানায়। কোথাও বের হননি বলে দুপুরটা কাটল অস্বস্তিতে। ঘুম এল না। বিছানায় পড়ে শুধু খানিক গড়াগড়ি দিলেন। মনটা ছটফট করছে। কেন এমন হয়। কিছু ফুলের বিনিময়ে রক্ত জল-করা টাকার অযথা খরচটা বিশেষ বিনিময় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আজকের শিলিং টেবিল থেকে তুলে না নেওয়ায় তিনি যেন বুকে ধস নামার তীব্র বেদনা অনুভব করছেন। পাশ ফিরে শুলেন। জানালা দিয়ে চাইলেন আবার। এখান থেকে যুদ্ধ-জাহাজগুলোই কেবল চোখে পড়ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়েল ড্রাই-ডকে, দু' নম্বর জেটির জাহাজটায় দু'জন সাহেব দুটো কামানের মুখে উঁকি দিয়ে ওর ভেতরটা যেন দেখছেন। বাপজি এবার আর-একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন জানালায়। দেখলেন এবার বেলাভূমি আর কত দূর।

দূরের আকাশটা হঠাৎ মেঘে ভার হয়ে এল। কালো ছায়া নেমেছে বেলাভূমির কিনারে। যে ঝোড়ো হাওয়া আসছিল কিছুদিন আবার সেটা উঠতে শুরু করেছে। একঝলক হাওয়া বেলাভূমি থেকে নেমে জানালায় ঢুকছে।

বাপজি আরও একটু এগোলেন। চোখদুটোতে ওর কেমন জ্বালা ধরেছে। মেয়েটার কথা মনে হলেই বুকে ধস নামতে শুরু করে।

জাহাজিরা এক এক করে চান শেষ করেছে। বাপজিকে কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন করল, তবিয়ত কি ভাল না মিঞার? কেমন মন-মরা মন-মরা ঠেকছে?

বাপজি কেমন শুকনো হাসি হাসলেন। চোখ টানলেন মিরু শেখের দিকে চেয়ে। লোকটা তার ক্যাম্পখাটে বসে পা মুছে বালিশের নীচ থেকে টেনে বের করছে কোরানশরিফটা। এক্ষুনি সে কোরানশরিফ পাঠ করতে বসে যাবে। সুর ধরে ধরে পড়বে। চোখে ঘুম আসতে চাইবে যখন দুপুরের খানা খেয়ে তখনও সে হেলে হেলে পড়বে। তারপর একসময় কখন অন্ধকারে বের হয়ে পড়বে, ফিরবে ঠিক ভোরে। গলা পর্যন্ত টেনে আসবে। রাতের অন্ধকার আর কানাগলির বেশবাসে বেসামাল হয়ে ঘরে এসে বিশ্রী ঢেঁকুর তুলবে।

বাপজি একবার গলাটা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কী মনে করে কচ্ছপের মতো গলাটা টেনে নিলেন আবার। একটি প্রশ্ন রয়েছে। ওকে প্রশ্ন করে জানতে হয় কিছু, কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চান করতে চলে গেলেন। একসঙ্গে খানা খাওয়ার কথা, পরে গেলে খানা মিলবে না।

খানা খাওয়ার পর তিনি বালিশ টেনে শুয়ে পড়লেন। জাহাজের মেরামত এখনও হয়নি। ট্যাংক টপের প্লেটগুলো বদল করা হচ্ছে কারণ ছাই আর নোনা জলে প্লেটগুলো আর প্লেট নেই। প্লেটের রিবিট মারতে আরও প্রায় দশ দিন। জাহাজের মেজ সাব সে কথা বলেছেন। দশ দিন পর এ মাটি এ ঘাট ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। আবার হয়তো কতকাল বাদে। হয়তো সহস্র রজনী পরে তিনি তাঁর জাহাজ এ ঘাটে বাঁধবেন। তখন হয়তো ফুলকন্যার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিংবা যেমন করে প্রতি সকালে একটি ফুল দিয়ে যায় সে সকালে তা আর নাও দিতে পারে।

আর মাত্র দশ দিন। কথাটাকে তিনি অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবলেন। ভাবলেন সমুদ্রের উপর প্রতি সকালের প্রতীক্ষাগুলো জাহাজের ঘুলঘুলি ভরা জীবনের কাচগুলিতে ধাক্কা খেয়ে নিজের বাংকেই বার বার ফিরে আসবে। সমুদ্রের ঢেউগুলো কাচের জানালায় ধাক্কা মেরে হয়তো তাঁকে বার বার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, তবু সেই মিষ্টিমুখ আর ব্ল্যাক প্রিন্সের রাজত্বকে তিনি যেন ভুলতে পারবেন না।

তিনি ভুলতে পারবেন না বলেই বুঝি সেদিনের দুপুরটায় ঘুম যেতে পারলেন না। বিকেলে তিনি

সময় করে গেলেন কার্ডিফ ক্যাসেলের গা-ঘেঁষা রেলওয়ে ব্রিজের নীচের সরাইখানায়। দোসকে খবরটা না দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

যখন গেলেন, কার্ডিভ ক্যাসেলের কিনারে তখন হিমেল সন্ধ্যা নেমেছে, আলোর ফুলকি জ্বলছে কাচ দিয়ে ঘেরা ঘরগুলোতে। বাপজির তখন শীত শীত করছে। কোট টেনে তিনি ক্যাসেল-ঘেঁষা ফুটপাতে নেমে পড়লেন। উঁচু পাঁচিলটার দিকে চেয়ে ক্যাসেল ডাইনে ফেলে সামনের কটন স্ট্রিটে সংক্ষিপ্ত পা চালিয়ে দিলেন।

রাজা-বাদশার এ দেশ। এ মাটিতে রাজা-বাদশার গন্ধ। কত রাজা-বাদশা এ মাটিতেও জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের রাজত্বে কতকাল ধরে সূর্যাস্ত যায় না, আঙুল গুনে গুনে হিসেব করতে চাইলেন যেন সব কিছু। সেই সুবাস রয়েছে ভোরে যে মেয়েটি আসে, হাসে, কথা বলে, ফুল দিয়ে দাম না দিয়ে চলে যায় সেই মেয়েটির শরীরে। বিবিকে যদি একথা যেয়ে বলতে পারে, বিবি হয়তো চোখের জল ফেলবে, বলবে, ডাইনি। তবু মনের কোনও এক প্রত্যন্তে বিবি বাপজিকে করুণা করতে করতে ভাববে, রাজা-বাদশার দেশের মেয়ে তার খসমকে পিয়ার করেছে। সে কম কথা নয়, সে অনেক কথা বিবির কাছে।

বাপজি কিন্তু রেলওয়ে ব্রিজের নীচের সরাইখানায় যেয়ে মিঞাকে পেলেন না। অন্যান্য জাহাজি ভাইদের প্রশ্ন করলেন সেজন্য। তাদের কাছেই জানতে পারলেন, মিঞাজান গেছেন লিটন স্ট্রিটের এক বাড়িতে। এক মেমসাব এসে নিয়ে গেছে।

খবর শুনে প্রীত হলেন কি দুঃখ পেলেন, কার্ডিফ ক্যাসেল পাঁচিল-ঘেঁষা রাতটা মাত্র তার সাক্ষী থাকল।

দুটো চোখ আর একটি জানালা। একটি মাঠ আর তার নীলাভ ফুল। একটি ভোর আর একটি মেয়ের জন্য একটি মানুষের প্রতীক্ষা। এই নিয়ে কার্ডিফ বন্দরের এক কোণে প্রতিদিনের একটি সকাল বেশ জমে উঠেছে।

কোনওদিন প্রথম ধুবি মেয়েটি সে তার গাধাটাকে তাড়াতে তাড়াতে চলে যেত, কোনওদিন ফুলকন্যা ঝুড়িটা হাতে প্রথম মাঠটাকে অতিক্রম করে সরাইখানার সদর দরজায় এসে হাঁক দিত। সেই সকালে প্রথম এসেছিল ফুলকন্যা এবং বাপজি ইচ্ছা করেই জানালায় মুখ না রেখে অন্য দিকে দুটো চোখ তুলে বসেছিলেন। মনে মনে তিনি রাগ করেছেন। মেয়েটির সঙ্গে আজ মন কষাকষি হবে। পরপর দু'সকালে ফুল রেখে দাম না-নিয়ে চলে যাওয়াটাকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি কেমন বিব্রত বোধ করতে থাকেন। যখন মেয়েটি হেসে তার স্পষ্ট সহজ ইংরেজিতে অভিবাদন করল তখন তিনি হেসে ফেললেন, তারপর কী ভেবে চুপ হয়ে যান, কিছু বলতে পারেন না, রাতের সব কল্পনাগুলো ঠোঁটের গোড়ায় এসে থেমে থাকে।

মেয়েটি সে তার সহজ ভঙ্গিতে প্রতি সকালের মতো টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। ঝুড়ি থেকে দুটো ফুলেব গুচ্ছ সন্তর্পণে রেখে দিতে দিতে আবার হাসল।

তিনি আর হাসলেন না। এমনকী অন্যান্য দিনের মতো লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে কিছু অপ্রকাশের ইচ্ছাও রাখলেন না। বললেন, তিন দিনে ছ' শিলিং। এই নাও— বলে শিলিং ক'টা হাতে দিতে গেলেন।

মেয়েটি টেবিলের উপর চোখ রেখে বলল, না থাক।

কেন থাকবে?

কেন থাকবে না?

বাপজি বললেন, দাম যদি নাও, তবে ফুল নেব। দাম না-নিলে তুমি আর ফুল দিয়ো না।

বাপজির বাঙালি মন, বাঙালি বুদ্ধি। তিনি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন যেন, কিন্তু মেয়েটির প্রতি চোখ তুলে আর বলতে পারলেন না।

ফুলকন্যা টেবিল থেকে আর-একটু দূরে সরে বলল, বাইরে আসবেন একটু।

এই প্রথম মেয়েটির সঙ্গে বাপজির কথাপ্রসঙ্গে কথা হল। তিনি তার ডাকে বিমুগ্ধ হলেন। বাইরে রের হলেন গলার টাইটা টানতে টানতে।

গ্রীষ্মের ভোর হলেও শীত শীত করছে বাপজির। বাইরে বের হয়ে কোটের বোতামগুলো টেনে দিলেন এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে।

ফুলকন্যা চোখের ইশারায় বাপজিকে পথ চলতে বলে পাশাপাশি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল। ওরা তখন বন্দর-পথটা অতিক্রম করে উত্তর দিকের খাড়া পাহাড়টার বেলাভূমিতে নেমে পড়েছে। এখানে এসে বাপজিই প্রথম কথা বললেন, তোমার নাম?

উত্তর এল লাল-লাল দুটো ঠোঁটের ফাঁক থেকে, রেনিল।

বাঃ! বেশ নাম তো। কতকাল হল এই ফুল বেচে খাওয়া?

সে অনেক কাল। ছোট বয়েস থেকে। বাবা-মা যখন মারা গেলেন তখন থেকে।

এই বন্দরে আর-একবার আমি এসেছিলাম।— খুব অসংলগ্ন কথা বললেন বাপজি।

মেয়েটি উত্তরে বলল, কবে?

সে অনেক কাল আগে। জাহাজে তখন আমি কোল-বয়ের কাজ করি।

ওরা হাঁটছে। পা ওদের বালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। পা টেনে টেনে হাঁটছে তারা। বাপজি মেয়েটিকে বালির ভিতর থেকে পা টেনে তুলতে মাঝে মাঝে সাহায্য করছেন। অধিকাংশ সময় বাপজির বলিষ্ঠ হাতটার উপর ভর করে মেয়েটি আলুতোভাবে হেঁটে চলেছে।

খাড়া পাহাড়ের নীচে এসে ওরা দু'জন বসল দুটো পা সামনের দিকে ছড়িয়ে। পাশের ঝুড়ি থেকে একটি লাল ফুল ছিঁড়ে বাপজির কালো কোটে পরিয়ে দিয়ে মেয়েটি চেয়ে থাকল সমুদ্র যেখানে পাহাড়ের কিনারে বাঁক খেয়েছে সেদিকে।

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে বালিয়াড়ি থেকে। বাপজি চেয়ে ছিলেন তখন কেমন অন্যমনস্কভাবে। চুলগুলি কপালে জড়িয়ে জড়িয়ে উড়ছে।

রেনিল বলল, তোমার নাম?

সৈয়দ মজিবুর রহমান।

জাহাজে তোমায় কী কাজ করতে হয়?

টিন্ডালের কাজ। জাহাজের ছোট-টিন্ডাল।

কতকাল ধরে এ কাজ তোমায় করতে হচ্ছে?

সে কবে থেকে মনে নেই। তবু মনে আছে বাপজি প্রথম আমায় কলকাতা বন্দরে এনে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন কোল-বয়ের কাজ দিয়ে, সেদিন আমি দাড়ি গোঁফ কামাতে শিখিনি।

দেশে তোমার বিবি আছে?

হ্যাঁ আছে। বিবি ব্যাটা দুই-ই আছে।

কষ্ট হয় না তাদের জন্য? বিবি জাহাজে আসতে বারণ করে না?

করে।

সেই ধসটা আবার নামতে শুরু করেছে বাপজির বুকে। বিবি-ব্যাটার কথা মনে হতেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। জোরে শ্বাস টানলেন। বি-বি, ব্যা-টা। দুটো জীবন। অনেক দূরে থাকা বাপজির আত্মার আত্মীয়। তারা জানি কেমন আছে! আল্লাতায়ালা কেমন জানি রেখেছেন।

বাপজির অন্যমনস্ক দৃষ্টির সঙ্গে রেনিলও দৃষ্টি মিলাল। দৃষ্টি মিলিয়ে সেও দেখছে জাহাজের চিমনিগুলোকে, লাল নীল বর্ডারের বিভিন্ন রঙের ফানেলগুলোকে। পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত জাহাজ এসেছে। কত জাহাজি এসেছে সঙ্গে। নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে এসেছে তারা। আর রেনিলকে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁক ধরে বেঁচে থাকতে হচ্ছে কতকাল থেকে। ফুল বেচে তার জীবনটা যে কিছুতেই চলছে না। তাই দু'মাস আগে আজকের মানুষটির মতো ইয়াকুব হোসেনকেও সে এনে এখানটায় বসিয়েছিল, কথা বলেছিল, গান গেয়েছিল, সুর মিলিয়ে মিলিয়ে শিস দিয়েছিল। সে মানুষটা সিঙ্গাপুরের, এ মানুষটি ভারতীয়। দু'জনের দুটো ধারা।

এ মানুষটি চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। আজকে এই পাহাড়ের নীচে বসে সেজন্য রেনিলের বলতে ভয় হল, একটা গান ধরব। অথবা অনুরোধ করতে সংকুচিত হল, তোমার দেশের একটা গান গাইবে?

বাপজি হঠাৎ ভয়ংকর মানুষের মতো রেনিলের কবজিটা চেপে ধরলেন। ডাকলেন, রেনিল...।

রেনিল চোখ তুলে তাকাল।

বাপজি কিন্তু সেই চোখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন না। আমতা আমতা করে কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। সব কামনা বাসনা জ্বলে জ্বলে নিবে গেল। অজ্ঞাতেই হাতটা নিজের কোলের উপর ঢলে পড়ল। এবং কিছুই ঘটেনি এমন ভেবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, চারিদিকে চেয়ে চেয়ে কতকিছু দেখলেন, ছবির মতো শহরটা, ছোট বড় কল-কারখানা, কয়লার ওয়াগন। তারপর একসময় জামার নীচে হাত নিয়ে অনুভব করলেন, তিনি দর দর করে ঘামছেন।

রেনিল সহজভাবেই বলল, তুমি রোজ আসবে এখানটায়। বসব, কথা বলব।

বাপজি গলায় স্প্রিং-টানা পুতুলের মতো দু'বার ঘাড়টা কাত করে সায় দিলেন মাত্র।

বালির ধস আবার ভাঙতে হচ্ছে দু'জনকে। বাপজি বুকের ভিতর থেকে কথাটাকে কিছুতেই ঠেলে বের করে দিতে পারছে না, রোজ আসবে এখানটায় সকালে। বসব, কথা বলব। কী হবে এখানে এসে বলতে পারলেন না। তিনি শুধু হাঁটলেন আর হাঁটলেন।

মোবারক শুধু ডেকের উপর হেঁটেই গেল। রাত এগারোটা থেকে বারোটা সে ডেক-পথ বার বার অতিক্রম করে। জাহাজের ডেক-জাহাজিরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে বোট-ডেকের উপর নুয়ে থাকে, সমুদ্রের জল দেখে, জলের নীচে ফসফরাসের আবর্তনের ভিতর একটি মুখ দেখার চেষ্টা করে, সে তার আম্মাজান। ঘড়ির আবর্তনের ভিতর দেখে বাপজিকে। এখনও শুনতে পায় সেই চিৎকার সেই ডাক, খোদা হাফেজ। বাপজি দু' হাত উপরে তুলে শামীনগড়ের সড়ক ধরে হাঁটছেন। চিৎকার করছেন, খোদা হাফেজ। আম্মাজান বারান্দার উপর কান পেতে রয়েছেন।

শীতের রাত। ঘুম নেই চোখে আম্মাজানের। নীল কাঁথা জড়িয়ে বারান্দায় বসে রয়েছেন। নিবু নিবু হয়ে কুপিটা জ্বলছে। মবু মায়ের কোল ঘেঁষে উষ্ণ শরীরের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

সামনে উঠোনে অন্ধকার। পাশে দোচালা টিনের ঘরটা। বার-বাড়ির উঠোনের পরে মসজিদ। তেঁতুল গাছটা আরও দূরে, দুটো ভুতুড়ে পেঁচা সেই কখন থেকে ডাকছে। সঙ্গে উঠোনের অন্ধকারটা হাত বাড়িয়ে টানছে যেন তাদের দু'জনকে।

অনেকক্ষণ পর ফিরলেন বাপজি। ক্লান্ত। নির্বাক। সংক্ষিপ্ত পায়ে বারান্দার পৈঠা ধরে ঘরে ঢুকতে চাইলেন। তা দেখে উঠে দাঁড়ালেন আম্মাজান। মবু এল পাশে পাশে। বাপজিকে ঘরে ঠেলে দিলেন আম্মাজান। শুইয়ে দিয়ে লেপটা টেনে দিলেন। কুপিটা রাখলেন কুলুঙ্গিতে। মবুর পা-টা মুছিয়ে দিয়ে পাশে শুইয়ে দিলেন এবং শিয়রে বসে রইলেন তিনি।

বাপজি হাত টানলেন আম্মাজানের। বললেন, ঘুমোবি না তুই! কেবল রাগ আর রাগ। কতকাল আর এমন রাগ করে থাকবি বল তো।

গত রাতের কাহিনিটা যা বলতে বলতে বাপজি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তার জের টেনে বললেন আম্মাজান, শেষে কী হল?

কী হবে? যা হবার তাই হল। খুন করলাম।

আম্মাজান সেই শুনে এতটুকু বিস্মিত হলেন না। কুলুঙ্গিতে রাখা দপ দপ করে জ্বলা কুপিটার প্রতি চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বললেন, কবে? কাকে? কেন?

বাপজি বালিশের নীচ থেকে হাতঘড়িটা নিয়ে বিবির চোখের উপর ধরলেন। বললেন, এর জন্য। এই ইবলিশটা আমায় খুন করিয়েছে।

আম্মাজান সে তার নরম ঠান্ডা হাতটা বাপজির কপালে লেপ্টে দিলেন। ঘড়িটার প্রতি চেয়ে থাকলেন তীক্ষ্ণভাবে। ঘড়ির ভিতর এমন কী রহস্য আছে বুঝতে পারলেন না। বাপজির দু'চোখের উপর মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, দাও না ইবলিশটাকে ফেলে দিয়ে আসি।

বাপজি চমকে উঠলেন।

এ কী বলছিস বিবি! এর জন্য এত বড় খুনখারাপিটা হল আর তুই বলছিস কিনা দিন ফেলে দিয়ে আসি। অমন কথা আর বলিস না।

বলে তিনি পাশ ফিরে শুতে চাইলেন। এবং লেপটা দিয়ে ঢেকে দিলেন মুখটা।

আম্মাজান তখন বললেন, শোনো।

লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বাপজির মুখের উপর আবার নুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। শোনো। পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা, কাকে খুন করলে, কখন খুন করলে?

এক গ্লাস পানি দিবি আমায়?

টিনের উপর শীতের কুয়াশা জমেছে। টিপ টিপ শব্দে শিশির ঘরের পাশেব কালোজাম গাছটাব পাতা থেকে ঝরছে। এমন আস্তে কথা বলছিলেন বাপজি যে, শিশিরের শব্দে আম্মাজান সে কথা শুনতে পায়নি।

কী বললে?

পানি। পানি দে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

তিনি তক্তপোশ থেকে নামলেন। গা থেকে মেঝের উপর রাখলেন নীল কাঁথাটা। তারপর আরও দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে কোনায়-রাখা মেটে কলসি থেকে জল ভরে খসমের দিকে তুলে ধবলেন, নাও।

ঢক ঢক করে এত সহজে খেয়ে ফেললেন যে আম্মাজান তক্তপোশে বসতে না বসতেই বাপজি গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন আবার, আর-এক গ্লাস।

আপনার জ্বর আসছে? শীতে যে কাঁপছেন!

খুব কাঁপছি নাকি, কাঁপছি না তো। বিবি তোর এমন কথা কেন? পানি দিতে বলছি তুই তাই দে। পানি দে। জ্বব আসল কি শীতে কাঁপছি এসব তো তোর দেখাব দরকার নেই।

বাপজি সে তাব দুটো চোখকে বালিশে ঢেকে আরও একটা কথা ভাবার চেষ্টা কবতে গিয়ে কেমন অসহায় ভাবলেন নিজেকে। কিন্তু এ কথা তো বিবিকে বলা যায় না। বিবিও যে ভয়ে তবে কাঁপবে। পাশে মবুটা রয়েছে, ভয় পেয়ে নিশ্চয় সে চিৎকার কবে উঠবে। তিনি সেজন্য বালিশ থেকে মাথাটা তুলে একটু সহজ হয়ে বসার চেষ্টা করলেন। বিবির দিকে চেয়ে থাকলেন বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে।

আমি জ্বরে কি শীতে কাঁপছি না রে। বেশ আছি, ভাল আছি।

আম্মাজানের হাতের পানিটা ঢক ঢক কবে না খেয়ে আস্তে আস্তে খেলেন এবাব। তারপর বিবিকে লেপের তলায় টেনে নিয়ে টিনকাঠের ঘরের ঠান্ডা শীত থেকে উষ্ণ হতে চাইলেন। মুখেব কাছে মুখ নিয়ে বললেন, রেনিলটা তোর মতোই ছেলেমানুষ ছিল রে বিবি। সারাটা সকাল লাইট-হাউজের নীচে বালিয়াড়ির বালিতে পা ঢুকিয়ে বসে থাকত। তোব কথা বলত, মবুর কথা বলত। ঘরের আপনজনের মতো জাহাজির নিঃসঙ্গ জীবনটাকে সব দিক থেকে ভরে তোলার চেষ্টা করত। কিন্তু বিবির মতো কবে তো তাকে পেলাম না। যেমন তোকে পেয়েছি আজকেব বাতে, যেমন কবে তোকে পেতে চেয়েছি।

বিবির মুখের উপর গড়িয়ে পড়া চুলগুলি সরিয়ে দিলেন বাপজি। ভারী ভাবী চোখদুটোর প্রতি মুখ নিয়ে তিনি কেমন একটি মিঠে শব্দ করলেন। বললেন, তোর মতো কিন্তু রেনিল কথায় কথায় কাঁদত না। কী করে হেসে জীবনটাকে পার করতে হয় তা জানে।

মবুটা ঘুমোতে পারছে না। ছটফট করছে। এপাশ ওপাশ হচ্ছে। বাপজির মনে হল এই প্রথম মবুর বয়েস হয়েছে। আলাদা করে ওর জন্য কিংবা ও পাশের তক্তপোশটায় বিছানা করে দিতে বলবে বিবিকে। তিনি ডাকলেন, মবু ঘুমোলি?

কোনও উত্তর এল না। চুপচাপ হয়ে গেছে পাশের ছোট শরীরটা। আম্মাজান আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, ওকে ডেকো না। ও ঘুমিয়ে আছে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, তারপর কী হল? কাকে খুন করলে, কখন খুন করলে?

কোনও কোনও দিন বুঝলি, বিবি, আমি আর রেনিল ক্যাসেলের পাশে বিটন স্ট্রিট ধরে ঘুরে বেড়াতাম। রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিশ্চিন্তে এসে বসতাম লাইট-হাউজের গোড়ায়। গল্প হত সেখানে। তারপর আবার অনেক বেড়ানো, অনেক কথার ফুলঝুরি। ঠিক দুপুর হওয়ার আগে বলত, এবার তা হলে আসি। কাল ঠিক সকালে। কী ফুল আনব বল?

যে ফুল চেয়েছি, সে ফুলই সে সংগ্রহ করে এনেছে। আমার হয়তো ঘুম তখনও ভাঙেনি কিংবা কম্বলের তলায় তোর কথা চিন্তা করছি সে সময়, সে আমার মুখের কম্বল টেনে বলেছে, বাপস্ ঘুম

বটে একখানা, জাহাজি মানুষের অত ঘুমুতে নেই। কোনওদিন গরম পানি আর তোয়ালে ঠিকঠাক করে রাখত। সরাইখানাতে দু'জন একসঙ্গে চা খেয়ে তারপর বেড়াতে বের হতাম কোনওদিন। আবার সেই বিটন স্ট্রিট, কিংস অ্যাভিনিউ এবং কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশের প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে যেতাম। ফিরে আসতে কোনওদিন দুপুর গড়িয়ে যেত। এই ছিল কাজ আর ছিল অনেক অনর্থক এবং অহেতুক কথা— তুই, আমি, মবু, আমার দেশ শামীনগড়।

রেনিলকে এক দুপুরে বললাম, মবুর জন্য কিছু কিনতে হয়। বিবির জন্যও কিছু।

সেই শুনে রেনিল অত্যন্ত খুশি হল। বলল, চলো না আমি পছন্দ করে কিনব। লিডস্লের দোকানে সব পাবে। যা চাও, পাবে।

আমি শুনে খুশি হলাম, সে বলে খুশি হল। এবং দু'জনে সেই দুপুরেই বন্দর থেকে বাস ধরে চলে গেলাম। থিয়েটার হলটা পার হয়ে বাঁদিকের একটা বাঁক ঘুরে একসিলেটরে মাটির নীচে নেমে গেলাম। মাটির নীচে যেন আর-একটা শহর। রেনিল আমার হাত ধরে প্রথমে একবার সব দোকানটা ঘুরিয়ে দেখাল। কোথায় কী পাওয়া যায়, দাম কত হতে পারে, বিবির জন্য কী মানাবে ভাল, মবুর বয়েস কত, দেখতে কেমন, কী জিনিস ওর পছন্দ, সব শো-কেস দেখতে দেখতে জেনে নিল।

তারপর কেনাকাটা। সে কিনল পছন্দ করে তোর আর আমার জন্য। আমার কাছে তোর আর মবুর গল্প শুনে শুনে ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। সে কিনে কিনে একবার শুধু বলত, বেশ মানাবে মবুকে, বেশ মানাবে ভাল বিবিকে। আমি খুশি খুশি হয়ে বলেছি, খুব পছন্দ হবে ওদের। তোমার কথা বিবিকে বলব। সে শুনে খুব খুশি হবে।

দোকানটা খুবই বড়। আমরা একসিলেটরে নীচে নেমে গিয়েছিলাম, এবং সব দেখে ও কিনে আসতে প্রায় চারঘণ্টার মতো সময় লেগেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার আলো সব জ্বলে উঠছে। এমন সময় রেনিল দোকানে ঢোকার মুখের দরজাতে ঘড়ির শো-কেসটার সামনে থমকে দাঁড়াল। আমার প্রতি চেয়ে বলল, ঘড়ির এ রকমটা বেশ।

ঘড়িটা ছোট। শো-কেসের এক কোনায় ভালমানুষের মতো যেন চুপ করে বসে আছে এবং কতকাল থেকে দর্শকদের নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন করে খুব সন্তর্পণে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। গায়ে ঝুলানো দামের অঙ্কটি অত্যন্ত বেশি। রেনিল চোখ তুলে বলল, কোম্পানির কয়েকটা মাত্র ঘড়ি ইংলন্ডের মাটিতে আছে। কিন্তু কেউ কিনছে না। নতুন নিয়মের মেরামত বলে সাধারণ মানুষ কিনতে ভয় পাচ্ছে।

তুমি কিনবে?— হঠাৎ আমায় রেনিল প্রশ্ন করল।

কার জন্য?

কেন, বিবির জন্য।

বাপজি এবার আম্মাজানকে আরও কাছে টেনে বললেন, জানিস আমি তখন হাসলাম। তুই যে ঘড়িই দেখিসনি। কিন্তু ওকে কিছুই বললাম না, দরকার নেই, শুনে হয়তো শুধু হাসবে। সে তো জানে না তুই কেমন অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করিস। সে জানলে এমন কথা নিশ্চয়ই বলত না।

বুঝলি বিবি, মন আমার একটা কথা বলল শুধু, তোমার জন্য যে এত কেনাকাটা করল আর তাকে তুমি কিছু দিলে না। কিছু অন্তত দাও। কিছু দিয়ে ওকে খুশি করো। বাদশার দেশের মেয়েকে উপহার দিতে হয় কিছু। তাই যতটা হঠাৎ সে বলেছিল, তুমি কিনবে, ততটা হঠাৎই আমি শো-কেসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দাম দিয়ে ঘড়িটাকে কিনে নিলাম। এবং ওকে আরও অবাক করে দেওয়ার জন্য মুহূর্তে বাঁ হাতটা বুকের উপর টেনে নিয়ে ঘড়িটা কবজিতে জড়িয়ে দিলাম। দুটো চোখ ওর খুশিতে টস টস করে উঠল। কীসের ইশারায় সে যেন আমাকে বিমুগ্ধ করে দিলে।

বিবি, তুই আমার বউ। তোর কাছে আমার গোপন রাখার কিছু নেই। গুনাহ অনেক করেছি, সে গুনাহের কথা তোকে বলতে পেরে গুনাহের আফসোস থেকে রেহাই পেয়েছি তেমনি। কিন্তু আমার হাজার গুনাহ। ঘড়িটাকে কেন্দ্র করে তারপর যে খুন-খারাপিটা হয়ে গেল।

রেনিল আমায় ধরে নিয়ে গেল সেই লাইট-হাউজের গোড়ায়, পাহাড়ের নীচে। ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতো নেমে গেছে পাহাড়টা। একটা আবছা আলোর ছায়ায় আমরা বসে পড়েছিলাম। একটা সুযোগের

প্রত্যাশায় আমি তখন উন্মুখ। অদ্ভুত এক প্রতীক্ষায় আছি। কী যেন সব এলোমেলোভাবে ভাবছি। হাতে ঘড়িটা ওর চক চক করছে। চক চক করছে ওর চোখদুটো। মাঝে মাঝে আমার প্রতি মুখ বাড়িয়ে সেও প্রতীক্ষা করছে কিছুর।

ভুল হল আমার সেখানেই। গুনাহ আমার সেজন্য। হঠাৎ আমার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল রেনিল, ছিঃ! বিবিকে যেয়ে জবাব দেবে কী! জাহাজি বলে অমন পেটুক হতে আছে।

কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। আমার সব সত্তা হারিয়ে গেছে তখন। আর কোনও কথা না বলায় সে সব কিছু সহজ করে হাত ধরে টানল। বললে, চলো স্টুডিয়োতে যাই। দু'জনে একসঙ্গে একটা ছবি তুলব। দেশে ফিরে বিবিকে আবার বোলো না। বললে বিবি তোমায় তালাক দেবে।

আমি কিছু বলতে পারিনি। সে কিন্তু অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে।

বিবি, তুই বুঝবি না সে রাতে আমার বুকে কী জ্বালা!

বন্দর থেকে ছবিঘরটা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে গেছি। কথা বলার যত দবকার সব রেনিলই বলেছিল। ওব পিছনে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন সে বলল, কী অত ভাবছ? এত ভাবলে কিন্তু খাবাপ হবে বলে দিচ্ছি।

বিবি বে, ভাবছিলাম ওর কথা। বিদেশিনীর চরিত্রের কথা।

এবার বাপজি নিশ্বাস নিলেন জোরে এবং পাশ ফিরতে বললেন, ছবিঘরে ছবি তোলা হল। আমাব আর রেনিলের একসঙ্গে ছবি।

বাপজি অযথা হেসে উঠলেন জোরে এবং নিজেই বললেন, আবার রাগ করলি আমি হাসলাম বলে। এমন জোরে হাসতে নেই, অত জোরে হাসলে মবু চিৎকার দিয়ে উঠবে, তুই ভয় পাস এসব কথা আগে স্মরণ করিয়ে দিলেই পারিস; তবে আর এমন জোরে হাসতাম না। আস্তে, যেমন করে হাসলে তুই ভয় পাবি না, মবুর ঘুম ভাঙবে না। আমি ঠিক বলিনি? তুই তো আজকাল কেবল ভাবিস আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। খোদা-হাফেজেব ভিতর যে দোয়া আছে সে তো টেব পাস না। তুই জানিস কেবল রাগ কবতে আব চোখের জল ফেলতে।

জাহাজিরা উঠে আসছে সব। বারোটার ওয়াচ শেষ হল মাত্র। বারোটা থেকে চারটা আর-একটা ওয়াচ রয়েছে। পরের ওয়াচে মোবারক। চার থেকে আটের পরিদার সে।

যারা ফানেলের গুঁড়ি ধরে উঠে আসছিল তারা দেখল মোবারককে। দেখে কিছু আজ বলল না। শুধু ভাবল, মোবারক আলি, জাহাজের জোয়ান জাহাজিটা পাগল হয়ে গেছে।

পিছিলে ওঠার সময় জাহাজিরা দেখল, শেখর আজও আহত হাতটা নিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠছে। ওঠার সময় শবীর থেকে কম্বলটা আজও আবার পড়ে গেল। আহত হাতদুটো দিয়ে কোনও রকমেই যেন কম্বলটা জডিয়ে রাখতে পারে না। তাই পাশের জাহাজি কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দেবার সময় বলল, যেয়ে কী হবে! ওর মতো ওকে থাকতে দাও। মেয়েটার জন্য ওর দিলটা ফেটে গেছে।

শেখর ভাবল অন্য কিছু। প্রতিরাতেই মোবারককে ধরে সে নীচে নামিয়ে আনে। হাজার রকমের প্রশ্ন করে। বকে কখনও। নিজেই ধমক দেয়। কখনও উত্তর পায় না। এমন অনেক কিছু হয়ে আসছে। তথাপি আজ পর্যন্ত ও জানল না প্রশান্ত মহাসাগরের এদিগের দরিয়াটা ওর জীবনে কোন সর্বনাশ টেনে এনেছে।

এখান থেকে 'খোদা হাফেজ' শব্দটা অস্পষ্ট। ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে কথাটা এমন করে মিলে গেছে যে, ব্রিজে যে অফিসার প্রহরা দেন তিনি পর্যন্ত শুনতে পান না। দেখতে পান না বোট-ডেকের লাইফবোটের রাডারের পাশে মানুষটা ঝুঁকে আছে, দূরের সমুদ্র দেখছে। রাতে ঘুম নেই মানুষটার। বোট-ডেকের উপর পায়চারি করতে করতে নিজেই কেবল কী বিড় বিড় করে বকে। আবার এমন সময় আসে যখন দেখা যায় মোবারক রীতিমতো হাসে, কথা কয়, রাত এগারো থেকে চারটার কাহিনি ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

ডেকের উপর উঠে শেখর কোনওরকমে ঠান্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য কম্বলটা শরীরের উপর শক্ত করে ধরল। ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে নুয়ে নুয়ে হাঁটল। আজ আবার দুলছে জাহাজটা। ঢেউগুলো পাক খাচ্ছে। মাস্টের আলোটা দুলছে বলে ওর ছায়াটা একবার বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শেখর চোখ রাখল সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। ভাবল, কত বিচিত্র এই জাহাজি জীবন। একদল জাহাজি নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে, এক দল এই রাতের গভীরেও কোরানশরিফ পাঠ করছে। একদল এখুনি বাথরুমে ঢুকবে, তারপর খানা খাবে টিনের থালায় করে। সামনের ডেক-কেবিনে আছেন পাঁচ নম্বর সাব। পরি তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পোর্ট-হোল ধরে চেয়ে আছেন তিনি। বুঝি দক্ষিণ আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখছেন। নক্ষত্রের ভিতর কোনও মুখের ছবি হয়তো। হয়তো ভাবছেন অনেক দূরের ঘর বাড়ির কথা।

কম্বলটা আবার শরীর থেকে পড়ে যাচ্ছিল বলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। চোখে জল তার। কেন এমন জল আসে! মোবারক বোঝে না তাব কষ্ট হয় উঠে আসতে! আহত হাতদুটো এখনও যে নিরাময় হয়ে ওঠেনি।

কোনওরকমে টলতে টলতে শেখর নেমে দাঁড়াল বোট-ডেকে ওঠার সিঁড়ির নীচে। নীচে দাঁড়িয়ে ডাকল, মোবারক, আর পারি না রে। এবার আয়। বারোটা কখন বেজে গেছে।

মোবারক নিঃশব্দে নেমে এলে শেখর বলল, এভাবে আর কতদিন?

মোবারক হাসল চোখদুটো বুজে। সঙ্গে সঙ্গে বাপজির জাহাজটার কথা আবার নূতন করে মনে পড়ল, আম্মাজান যে জাহাজের গল্প অনেকবার শুনিয়েছে।

আম্মাজান বলতেন, জাহাজের মেরামত হয়ে গেছে। ড্রাই-ডকের ভিতর বড় বড় সিঁড়ি লাগিয়ে জাহাজের নীচে রং করে চলেছে ডক-শ্রমিকরা। প্রপেলারেব নীচে দু'জন মানুষ, সাদা রঙের উপর লাল রং লাগানোর জন্য বাড়িয়ে ধবেছে ব্রাশটা। সে সময় রেনিল আর বাপজি এসে দাঁড়ালেন ডকের পাড়ে। বললেন, এই আমার জাহাজ। এ জাহাজেই একদিন বিবির কাছে যেয়ে পৌঁছব।

রেনিলের চোখদুটো ছল ছল করছে। বাপজি জাহাজের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে থাকার মতো। পবে রেনিলের আর-একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, আবার আসব, আবার দেখতে পাব তোমায়।

ঘড়িটা একটু কাত করে দেখল রেনিল। যেন সব জানালে, পারে। কোনও কথাই বললে না সে। যে মানুষটা রং লাগাচ্ছে তার দিকে চেয়ে থাকলে শুধু।

পবদিন সরাইখানা ছাড়তে হবে। জাহাজে মোটঘাট নিয়ে উঠতে হবে ঠিক দশটায়। সবাইকে কিনার থেকেই সেদিনেব মতো খাওয়া সেরে আসতে হচ্ছে বলে রেনিল সকালে ওর লিটন স্ট্রিটের ছোট্ট বাসায় নিমন্ত্রণ জানাল বাপজিকে এবং সেই সকালে রেনিল সে তার ছিমছাম ঘরটিতে বাপজিকে বসিয়ে বললে, মজিবুর, ঘরে ফিরছ, বিবিকে যেয়ে পাবে, মবুকে যেয়ে পাবে, কিন্তু আমার কথা?

তোমার কথাও মনে থাকবে।

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল রেনিল। টেবিলের উপর কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে বসে থাকল। কোথায় যেন তার অপরাধ। কোথায় যেন তার কীসের কুণ্ঠা। কোথায় যেন কিছু প্রকাশের অনিচ্ছা।

বিদায়ের সময় রেনিল বাপজিব হাত টেনে নিয়ে হাতের আঙুলে একটি আংটি পরিয়ে দিল। বলল, আমাকে এভাবেই সব দিতে হচ্ছে।

আঙুলটি চোখের উপর তুলে ধরলেন বাপজি। একটি নাম— রেনিল। একটি আংটি, মিনা করা, ঘরের নীলচে আলো চক্ চক্ করছে।

তারপর একই টেবিলে বসে দু'জন খেল।

রেনিলের কণ্ঠে আবার সহজ স্বাভাবিক আলাপ।

বাপজি আরও কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রেনিল কিছুতেই ততদূর পর্যন্ত যায়নি।

বারান্দায় এসে বিদায় দেবার সময় মুখ ঘুরিয়ে নিল রেনিল।

স্পষ্ট দেখেছেন বাপজি, রেনিল তখন চোখের জল ফেলছে।

জানালার গরাদদুটো সাক্ষী থাকল। বাপজি আর রেনিল। রেনিলের ছোট সহজ মন। দুটো গভীর চোখ তার, সব কিছু মিলে বিদায়বেলায় অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল পরিবেশটিকে। বাপজি সেজন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পা ফেলেছেন। লিটন স্ট্রিট থেকে রাউদ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা পর্যন্ত মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে এসেছেন। থামলেন এসে প্রথম কারখানার সদর দরজার পাশে। বি-আই কোম্পানির সাদা বর্ডারের চিমনি দেখলেন।

ড্রাই-ডকে জল এসে নামছে। টাগবোট এসে টানছে জাহাজটাকে।

ছুটে গেলেন বাপজি।

ডেক থেকে জাহাজিরা দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিলে সেই ধরে উঠলেন বাপজি।

খবর পেয়ে ছুটে এসেছে রহমত মিঞা। বাপজিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, এসে গেলেন! এসে গেলেন! ওঃ, কী চিন্তাতেই না ফেলেছিলেন। আসুন এখন ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বুড়ো বাড়িয়ালা দেখলে আবার ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

সিঁড়ি ধবে নীচে নামতে বারিক বলল, সেলাম-আলাই-কুম টিন্ডাল সাহেব। তবিয়ত ঠিক আছে তো?

বাপজি হাত তুলে তুলে সকলকে অভিবাদন কবলেন। নীচে নামলেন। এক সময়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাংকের উপর এলিয়ে পড়লেন। কী যেন ফেলে গেলেন এই বন্দরে। কার্ডিক বন্দরের কানা গলিব মোড়ে ছোট্ট ঘরটা তার একান্ত প্রিয়জনকে যেন বেধে রেখেছে।

দুটো পাহাড়ের ফাঁক ধরে নোনা জলের উপর নীল রং মেখে জাহাজটা সমুদ্রে পড়বে এমন সময় বাপজি এসে দাঁড়ালেন ডেক-এ। দূরে লাইট-হাউজ। গোড়ায় তার পাহাড় আর পাথব— 'দ'-এব মতো সিঁড়ি ধরে ধবে নীচে বালিয়াড়িতে নেমেছে। ছোট সংকীর্ণ জলা জঙ্গল, পাহাড় আর পাথব, কত দুপুরে ওবা সেখানে মশগুল হয়ে উঠেছে। সে আর রেনিল এসে বসত, গল্প কবত, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। রেলিং ধবে সব নূতন করে ভাবাব চেষ্টা কবলেন বাপজি।

ক্রমশ সবে যাচ্ছে পাহাড়টা। লাইট-হাউজের বালিয়াড়িটা আড়াল পড়ে গেছে। বেটল-সিপের চিমনিগুলো চোখে পড়ছে না। দূবে সমস্ত শহবটা ক্রমশ সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকাবে হাজাব আলো বুকে নিয়ে সমুদ্রতীবে ভেসে উঠেছে।

বাপজি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পিছন থেকে তখন কে যেন ডাকল, ভাইসাব।

বহমত মিঞাব গলা ভাইসাব নীচে আসুন, খানা খাবেন।

ওয়াব পিন ড্রামটা পিছনে ফেলে বাপজি গিয়ে উঠলেন পিছিলে। আবার কার গলা শুনলেন। বারিক মিঞা বলছে, নসিব বহমত মিঞাব। ঘরও পেল, ঘড়িও পেল।

গ্যালি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, রহমতেব ঘড়িটা দেখলে টিন্ডাল?

বাপজি উত্তব কবলেন না। চোখ তুলে তাকালেন তিনি বাবিকেব প্রতি। বারিক এই বলে কী বলতে চায়, তিনি তাব অর্থ বুঝতে চান।

বহমত মিঞা বাবিককে বলল, দেখবে, দেখবে। ভাইসাবকে আর একান্তে পেলাম কখন?

দু'জন হাত ধবাধবি করে নীচে নামলেন।

মিঞা সাবেব মুখে প্রসন্ন হাসি। অনেক খবর আছে মিঞা সাবেব। অনেক খবব তিনি দেবেন বাপজিকে।

দু'জন পাশাপাশি বাংকে বসে প্রথম দু'জন দু'জনকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

হাতঘড়িটা হাতে থাকে না, থাকে বেশিরভাগ সময় বালিশের নীচে। আফসোস করল রহমত। সবসময় ঘড়িটা হাতে রাখতে পারে না বলে অনুতাপ তার।

শেষ পর্যন্ত বালিশের নীচ থেকে টেনে বের করল ঘড়িটা। দুটো হাতে চেপে ধরে ঘড়িটা, কেমন অসংলগ্ন ভাবে বলে গেল, ঘড়িটা বকশিশ পেয়েছি। একটি মেয়ে দিয়েছে। লিটন স্ট্রিটে সে থাকে। ফুল কিনতে গিয়ে ভাব হল। তাই দিল। খুবসুরত। আপনি তো সবাইখানায় গেলেন না একবার যে দেখাব।

বকশিশ!

দাঁতে দাঁত চাপলেন বাপজি।

বকশিশ!

বাপজিব চোখ সহসা জ্বলে উঠল। তবু তাঁর অস্পষ্ট আওয়াজ। গলাটা শুকনো। চোখের উত্তাপ নিভে আসছে। উত্তেজনায় থরো থবো করে কাঁপছে শরীর। রেনিল! রেনিল! গলার অস্পষ্ট আওয়াজে তিনি বিস্ময়ে চকিত হলেন।

তাবপব বাপজির উত্তর-ত্রিশের উষ্ণ যৌবন ক্ষণিক স্তব্ধ থেকে চিৎকার করে উঠল, মিঞাসাব!

ভাইসাব।

উত্তর দিতে গিয়ে রহমতের মনটা খুবই সংকীর্ণ হয়ে গেল। চোখ তুলতে পারল না। দপ দপ করে কপালের শিরা-উপশিরাগুলো উঠছে নামছে।

কোনও রকমে ফিস ফিস শব্দ করে বললে, বকশিশ নয় ভাইসাব। বকশিশ নয়। মিথ্যা কথা বলেছি! লিটন স্ট্রিটের এক ফুলওয়ালির বাড়িতে রাতে ফুর্তি করতাম। ফুর্তি করে একদিন ফিরছি ফুলওয়ালি বলল, ঘড়িটা কিনবেন? বড্ড বিপদে পড়েছি। কাল, কালই তো কিনলাম। আপনার কাছে ঝুটাবাত বলে কোনও লাভ নেই। আপনি আমার দোস ভাইসাব।

দোস।

দাঁতে দাঁত আবার চাপলেন তিনি।

বাপজি আর রহমত মিঞা। ডেক আর সিঁড়ি-পথ। ফোকশাল আর বাংক। বাংকে বসে রহমত মিঞা ডাকল, চলেন, খানা খেয়ে নি ভাইসাব।

তিনি উত্তর করলেন না। সিঁড়ি ধরে ছুটে গেলেন ডেক-এ। দু' হাত উপরে তুলে এক আকাশ তারাকে সাক্ষী রেখে কিছু যেন বললেন।

জাহাজের জাহাজিরা অবাক হয়ে দেখছে বাপজি কেমন পাগলের মতো ইতস্তত ডেকের উপর পায়চারি করছেন।

ডেক-পথ অন্ধকার। ফোকশাল অন্ধকার। থেকে থেকে স্টিয়ারিং ইঞ্জিন গর্জন করে উঠছে। অন্ধকার পথে বাপজি ডেক থেকে সন্তর্পণে একসময় নেমে এলেন এবং কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন বাংকে।

সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে আবার। বে অফ বিসকে— ঝড়ের সমুদ্র। জাহাজ দুলছে। লোহার পাত দিয়ে আঁটা পোর্ট হোলগুলো। বাইরে সমুদ্রের তীব্র গর্জন ফোকশালে তেমন ভয়ংকর ভাবে গলে পড়তে পারছে না। এই ভয়ংকর দোলানির ভিতরও নির্বিঘ্নে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে জাহাজিরা।

রাত তখন এগারোটা। ডংকিম্যান এসে প্রহরীদের ডেকে গেছে। বাংকে বাংকে আওয়াজ তুলেছে, টাণ্টু। খুব আস্তে ডেকেছেন। জোরে ডাকলে অন্য প্রহরীদের ঘুম ভাঙবে।

বাপজির বাংকের পাশে আওয়াজ উঠল। চোখ বুজে ছিলেন, আওয়াজ শুনে চোখ মেলে তাকালেন। অন্ধকার ঘরে দেখলেন কেউ নেই। কেবল ডংকিম্যানের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে সেই শব্দ ডেকের দিকে পা বাড়িয়েছে।

উঠে আলো জ্বালালেন বাপজি। মগ বাংকের নীচ থেকে টেনে বের করার সময়ে দেখলেন রহমত মিঞা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাতঘড়িটা ঝুলছে তাকের উপর। ঘুমের আগে বুঝি ভুলে গেছিল ঘড়িটা খুলে পেটিতে রাখতে হবে।

বাপজি কী ভেবে সতর্ক ভাবে চোখ বুলালেন চারিদিকে। ধীরে সংক্ষেপ দৃষ্টি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন খুব আস্তে। এসে দাঁড়ালেন রহমত মিঞার বাংকের ধারে। আলো নিভিয়ে দিলেন পা টিপে টিপে। আস্তে তুলে আনলেন ওর হাতটা নিজের হাতের উপর। শরীরটা শীতের রাতেও ঘামছে। শিস উঠছে দুটো কান থেকে। ফুলে ফুলে উঠছে হৃৎপিণ্ডটা। হাতদুটো কাঁপছে ঘড়ির ফিতেটা খুলতে গিয়ে। তবু খুলতে হবে। কাঁপতে কাঁপতে কোনও রকমে ঘড়ির ফিতেটা খুলতে গেলেন।

রমহত মিঞা হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসল। অন্ধকারের ভিতর চিৎকার করে উঠল, চোর চোর! ভাইসাব জাগেন। আমার হাতঘড়িটা ধরে কে যেন টানছে। ও ভাইসাব ওঠেন।

দেশলাইয়ের কাঠির মতো নরম মানুষ রহমত মিঞা। শক্তি-সামর্থ্যবিহীন মানুষের গলাটা কেবল ক্যাঁক ক্যাঁক করছে। সে আওয়াজ থামিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এক হাতে মিঞার মুখ চেপে ধরলেন। চেপে ধরে চেষ্টা করলেন ঘড়িটা খুলতে।

সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ পেলেন বাপজি। কোনও জাহাজি যেন ঠক ঠক পা ফেলে নীচে নেমে আসছে। জরাগ্রস্ত রুগির মতো বাপজির হাত পা কিছুতেই আর স্থির থাকছে না। গলার ফ্যাস ফ্যাস আওয়াজটা তখনও উঠছে। ভেজানো দরজার ফাঁকে গলে গলে পড়ছে। ভয়ে বাপজির হাতদুটো অজান্তেই রহমত মিঞার গলার উপর চেপে বসল। ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজটা থামিয়ে দিতে হবে। কারণ জাহাজে সব অপরাধের ক্ষমা আছে, চুরির ক্ষমা নেই।

ঠক ঠক আওয়াজটা ডেক-জাহাজির ফোকশালের দিকে চলে গেল। আর কোনও আওয়াজ নেই। সব চুপ। শুধু থেকে থেকে তখনও গোঙানি উঠছে রহমত মিঞার গলা থেকে। বাপজি যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাংকের পাশে।

একসময়ে রহমত মিঞার গলা থেকে সে আওয়াজটা সম্পূর্ণ থেমে গেল।

বাপজি হুঁশ ফিরতেই আলো জ্বাললেন। রহমত মিঞার নীল মুখটা বালিশের উপর কতকটা লালা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বাপজি বুঝলেন রহমত মিঞার মৃত্যু হয়েছে। বুঝলেন, তিনি খুনি। সমস্ত সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিগুলি এক এক কবে মাথায় জেগে উঠল আবার। প্যাঁচ ঘুবিয়ে পোর্ট-হোলের কাচ খুললেন। বাংক থেকে তুলে আনলেন রহমত মিঞাব নীল দেহটা। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে মুখ বাডিয়ে দেখলেন ব্রিজের উইংস থেকে কেউ কিছু দেখছে কি না। তারপর পোর্ট-হোল গলিয়ে, রহমত মিঞার পাতলা দেহটা সমুদ্রের অনন্ত নোনা জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডাকলেন, খোদা হাফেজ!

রহমত মিঞার গলা টিপে মাবতে, ঘড়ি খুলতে, পোর্ট-হোল দিয়ে লোনাজলে ফেলে দিতে পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল, কাজেই ঠিক পৌনে বারোটায় ডেকেব উপর ছুটে বেবিয়ে এলেন তিনি। টলতে টলতে উইনচ-মেশিনের কোনায় এসে উবুড় হয়ে পড়ে থাকলেন। কিন্তু ওয়াচের বারোটা বাজার সঙ্গেই তিনি যেন তাঁর আগের স্বভাব ফিরে পেলেন। উন্মুখ আকাশতলে দু'হাত প্রসারিত কবে ডাকলেন সেই এক ডাক— খোদা হাফেজ।

শামীনগড়ের মানুষ হয়ে বাঁচবি কসম থাকল, আম্মাজানেব কসম।

ইঞ্জিন-রুমের স্টোক-হোলড তখন বিদ্রুপ করে মোবারককে। স্লাইসটা টেনে নিতে হাতটা কাঁপছে তাব। উইন্ডস-হোল দিয়ে হাওয়া বইছে না। মুঠো মুঠো শ্বাস টেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে মোবাবকেব। বুকটা কাঁপছে! চোখদুটো জ্বলছে।

বয়লারের ভিতর কত হাজার হাজার টন কয়লা পুবে চলেছে কত হাজার মাস ধবে। জ্বলুনি এখনও জ্বলছে।

ছাইয়েব ভিতর আগুনটা চাপা থাকে বেশি। ঘুস ঘুস জ্বলতে থাকে। পোড়া ঘায়ের মতো জ্বালা হয়। মোবাবকেব ফুসফুসটা সেই ঘায়ের মতো জ্বালা করছে।

ধুতুরা ফুলের মতো উইন্ডস-হোলের মুখটা। নীল নোনা জলের হাওয়া উইন্ডস-হোলের মুখটা আর বুঝি টানতে পাবছে না। কয়লা মাবতে কিংবা জ্বলন্ত কয়লা উলটে দিতে যখন মোবারকের বুকটা ধডফড় করে ওঠে তখনই সে উইন্ডস-হোলের বাতাস জোরে টেনে নেয় এবং ব্লাডারের মতো ফুলিয়ে তোলে ফুসফুসটাকে। কিন্তু এই তিন রাত তিন দিনেব প্রহরীগুলোতে সে আর মুঠো মুঠো বাতাস টেনে নিতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে শিকল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মোবারক। নীচ থেকে সে চাইল ত্রিশ ফুট উপরের ধুতুবা ফুলের মুখটাকে বাতাসমুখো করে দিতে।

শামীনগড়ে ধুতুরা ফুল খোঁপায় গুঁজে জৈনব খাতুন আসত হরীতকী গাছের নীচে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মবুর হাত ধরে বলত, পাহাড় চিরে হাওয়া আসছে এ সরু পথটায়। মবু সে তার বুকে জৈনবেব মুখটা তখন টেনে ধরত। বলত সোহাগি সোহাগি কথা।

শামীনগড়ের ছবি ভাবছে আর শিকল টানছে মোবারক। ইদ্রিশ আকবরের হাতে ব্যালচে। ওরা হুস্ হুস্ করে কয়লা হাঁকড়াচ্ছে চুলোর ভিতর। চুলো কয়লায় ভরে উঠলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এক সময় দু'জনই দুটো শাবলের উপর ভর করে বলল, স্টিম যে নাইমা গেল মিঞা।

হুঁশ হল মোবারকেব। চমকে উঠল সে স্টিম গেজটা দেখে। তর তর করে স্টিম যে কোথায় নেমে গেল! দু'নম্বর বয়লার কোম্পানির পুষে রাখা কসবি তঞ্চকতা করতে শুরু করছে আবার। সেজন্য শক্ত মুঠোয় শাবল টেনে কয়লা হাঁকড়াতে থাকল বয়লারের ভিতর। বিরক্ত হয়ে বলল, কসবি।

কাকে উদ্দেশ করে? জৈনব খাতুন তো তখন হরীতকী গাছের নীচে। বয়লারের স্টিম তো তখন

তর তর করে উঠছে। ইদ্রিশ আকবর দু'জন দু'জনের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চোখ টেনে ইশারায় বলছে যেন, শুনছ, মিঞা যে সত্যি পাগল বনে গেল।

মোবারকের হাত এবং ব্যালচে ব্যথায় দুটোই যেন ককিয়ে কাঁদছে। তবু কয়লায় কালো করে তুলছে বয়লারের তিন চুলো। কবরের মতো উঁচু হয়ে উঠছে ফায়ার ব্রিজের বুকটা। শেষে সেই কয়লা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচের প্লেটের উপর। ভিতরে আর এতটুকু জায়গা নেই। মোবারক ওদের মতো শাবল তবু টানছে। কয়লা হাঁকড়াচ্ছে। সেই দেখে ছুটে এসেছে আকবর। হাত ধরে বলেছে, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিঞার। শেষে চুলোর দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে হাওয়ার ভালব্‌গুলো উঁচিয়ে দিল সে।

মোবারক কেমন অবাক এবং বিস্ময় মানল আকবরের কথায়। আকবরের মতো ছাপোষা লোক এ কথা বলতে সাহস করল। উন্মাদ মোবারক। কী সব বলছে হাড়-জিরজিরে লোকটা!

কেন আম্মাজানও তো বলতেন বাপজিকে, আপনি কি মবুর বাপ পাগল হয়ে গেছেন।

শামীনগড়ের সড়কটা তখন কেঁপে উঠত।

খবরদার। তুই অমন কথা বলবি না বিবি।— বাপজি চিৎকার করে উঠতেন।

আম্মাজান সড়ক থেকে বাপজিকে ধরে ধরে উঠোন পর্যন্ত এনেছিলেন। দু'জনই চুপ। মবু তখন তাদের পায়ে পায়ে হাঁটছে। রাতের অন্ধকার চিরে ফিস ফিস করে একসময় বললেন আম্মাজান, মবুর বাপ, আপনি আমায় খবরদার বলতে পারেন, কিন্তু শামীনগড়ের মানুষদের তো চুপ করাতে পারবেন না।

অন্ধকারের ভিতর দীর্ঘ মজবুত দেহটা আরও দীর্ঘতর হতে চাইল। তেঁতুল গাছ এবং মসজিদের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে বাপজি প্রশ্ন করলেন, কেন, তারা কী বলে?

আম্মাজান ভয়ে ভয়ে বললেন, উঠোন থেকে ঘরে চলুন।

বল, ওরা কী বলে?— বাপজি এতটুকু নড়লেন না। মবু পর্যন্ত তাই দেখে আঁতকে উঠছে।

না না, আমি তেমন কথা বলতে পারব না।

তোকে বলতেই হবে মবুর মা। —খুব দৃঢ়কণ্ঠে বাপজি এবার জবাব পেতে চাইলেন।

আম্মাজান একান্ত অসহায়। থর থর করে কাঁপছেন তিনি। তিনি বাপজির সেই দৃঢ় এবং অনমনীয় মনোভাবকে কিছুতেই আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাই ছুটে এসে বাপজির বুকে মাথা ঠুকলেন ঠাস ঠাস করে।

খোদার কসম, মবুর বাপ, আমায় আর সে কথা বলতে বলবেন না। আমায় মেরে ফেলুন, গলা টিপে মেরে ফেলুন।

বলে বাপজির দুটো শক্ত হাত নিজের গলার কাছে টেনে আনলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে ঢলে পড়লেন বাপজির শরীরের উপর।

বাপজি তখন হেসেছিলেন। উন্মাদের মতো শামীনগড়ের বুক আর কর্ণফুলির জল কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। রাতের অন্ধকারে যে পাখিগুলো নীরবে ঘুমোয় তারা পর্যন্ত ভয়ে আঁতকে উঠেছিল, পাখা ঝাপটা দিয়ে হাসির ঢেউটাকে ডানার ভিতর টেনে আবার ঘুম যেতে চেয়েছিল।

তিনি উন্মাদের মতো জাহাজি ঢং-এ হেসেছিলেন। বলেছিলেন, জানি তারা কী বলে।

তারপর আম্মাজানকে কাঁধে ফেলে, মবুকে এক হাতে টেনে ঘরে নিয়ে তুললেন। আম্মাজানকে নীল কাঁথার নীচে শুইয়ে দিয়ে সেদিন প্রথম কসম খেলেন, হাজার গুনাহের কথা তিনি বিবিকে বলবেন।

তারপরের ঘটনাগুলো মবু সব জানে। তক্তপোশ থেকে জানে, আম্মাজানের মুখ থেকে জানে।

তারপরের কাহিনিগুলো মোবারক চোখের উপর দেখেছে।

শুনেছে অনেক কথা। তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে শুনল রহমত মিঞা, ঘড়ি আর ফুল বেচে খেত যে মেয়েটি, সে মেয়েটির গল্প।

বাপজি তার হাজার গুনাহের কথা একমাত্র আম্মাজানকেই বললেন। সেই গুনাহগারের গল্প শুনে আম্মাজান ভোরবেলায় দেখলেন, বাপজি একেবারে অন্য মানুষ। সাধারণ মানুষ। নাবিকের মতো তিনি আবার পাহাড়ের প্রতি চেয়ে রয়েছেন। চোখদুটোয় নাবিকের ডাক উঠেছে।

ভোরবেলায় বাপজি বারান্দার কোণ থেকে প্রথম বদনাটা টেনে নিলেন সেদিন। জল ভরে চলে গেলেন মসজিদের দিকে। তেঁতুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রামের মানুষদের সালাম জানালেন। তরি-তবিয়ত কার কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন।

গ্রামের মানুষেরা অবাক হল, কেউ নাবিকেব এমনি জীবনধারা ভেবে আদাব করে চলে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন বাপজি। তারপর অজু করে মসজিদ গেলেন অনেকদিন পর নামাজ পড়তে। দু' হাঁটু ভেঙে নামাজ পড়ার সময় এক অদ্ভুত বুক ঠেলে ওঠা কান্নায় তিনি ঝর ঝর করে কেঁদে দিলেন। আসমানের প্রতি দু' হাত তুলে দোয়া মাগলেন, খোদা, মবু আর বিবিকে শান্তিতে রাখো।

নামাজ সেরে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভোরের আকাশে তখন এক দল কাক পাহাড়-প্রান্তে ছুটে গেল। কামরাঙা গাছটায় এক দল টিয়া দোল খাচ্ছে। নীচে উঠোনে শালিখগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে খোদার মসজিদে আপনি মর্জি মিশিয়ে দিচ্ছে। সফর শেষে বাপজি পৃথিবীব রূপ, রস, গন্ধ আজ যেন এই প্রথম পেলেন। কেমন হালকা হয়ে তিনি তাই ছুটে ছুটে এলেন ঘরে। তারপর নিভৃতে বিবিকে বুকে টেনে বললেন, বিবি, দবিয়া যে আবাব আমায় টানছে... বিবি, ভিতরে নাবিকের রক্ত আবার আমায় মোচড় দিচ্ছে।

সেই পুনরাবৃত্তি। যে পুনবাবৃত্তি বাপজি সফরের পর সফর করে আসছেন।

আম্মাজান সহজভাবে বললেন, আঁর কেন?

কেন নয় তুই বল?

ব্যাটাকে সাদি দিন। ব্যাটার বিবি ঘরে আনুন।

সাদি?—মাথা নেড়ে বললেন বাপজি, দেব। ওর সঙ্গে জৈনবকে মানাবে ভাল। এ সফবটা ঘুবে আসি তারপরেই দেব। এক ব্যাটার সাদি, টাকা পয়সার দরকার। ব্যাটার বিবি ঘরে আনব সে কি আমার কম আনন্দের কথা? কিন্তু টাকা চাই, অনেক টাকা। গোটা শামীনগডেব সমাজ দাওয়াত পাবে, শেখ, সৈয়দ সব মেমান আসবে, সে কি কম কথা?

মোবারক আলি আর জৈনব খাতুন। দুটো নাম। দুটো সবুজ মন হবীতকী গাছেব নীচে যে ছোট্ট খেলাঘব পেতেছিল তাদেরই কথা হচ্ছিল আম্মাজান আর বাপজির ভিতরে। মবু সেদিন বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়েছিল উঠোনেব উপর। বলেছিল ওর কচি মনটা, খোদা তুমি সাক্ষী থাকলে।

খোদা সেদিন সাক্ষী ছিল নিশ্চয়ই। নতুবা উঠোনের উপর মবু আর জৈনবকে দেখে বাপজি বলে উঠলেন কেন ঘর থেকে, দ্যাখো, দ্যাখো বিবি, কেমন মানিয়েছে দু'জনকে। আম্মাজান ঠিক একই সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে গেছিলেন, যেন একটি মাত্র সংগীত আল্লার কাছে নিবেদন করলেন।

সংগীতের মতোই শুনাল। মবু আর জৈনব শুনল। লজ্জায় আর শরমে দু'জনেই কেমন নুয়ে পড়ল।

বাপজি নেমে এলেন উঠোনে।

লঘু সংগীতের মতো পা ফেলে বারান্দা থেকে নামলেন আম্মাজান। এবং দু'জনকে দু'জন কোলে নিযে মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

আম্মাজান বললেন, ব্যাটা আমার ভাল। ব্যাটার কোনও দোষ নেই।

বাপজি বললেন, আমার জৈনব ভাল। জৈনবের উপর ব্যাটা বড় অত্যাচার করে।

মবুর দিকে চেয়ে বললেন বাপজি, মবু তুই কিন্তু তোর বিবির উপর ভরসা রাখবি। বিবি যা বলে তাই শুনবি, তাই করবি, না শুনলে আল্লা তায়লা রাগ করবে।

আম্মাজান চোখের উপর দেখলেন যেন একটি দুরন্ত আরবি ঘোড়াকে শক্ত লাগামে টেনে ধরেছে ছোট্ট একটি মেয়ে। সে মেয়ে জৈনব খাতুন। একটি অভিশপ্ত নাবিক বংশকে রক্ষা করছে। সে জন্যই বুঝি আম্মাজান বাপজির ক্লান্ত সুরটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছিলেন, মবু কোনওদিন জৈনবের কথার বার হবে না। তাই না ব্যাটা?

আম্মাজান নিশ্বাস টানলেন জোরে। সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের ভিতর কোথায় যেন নির্ভরতা রয়েছে। সে নির্ভরতা বুঝি মবুর উত্তরকালকে ঘরে বেঁধে রাখার আশ্বাস, শামীনগড়ের মাটিতে মোবারকের জীবন-বন্ধনের আশ্বাস।

দু'জনেই খুশি হয়েছিলেন। আর নয়, কারণ অনেকদূর গড়িয়েছে। বাপজির উত্তরপুরুষ চাষি হোক—

এই বলে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি মোনাজাত করেছিলেন সেদিন। আম্মাজান আকাশের দিকে চেয়ে নীরব ছিলেন তখন।

দু'জনই আতাবেডাব পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে জৈনব আর মোবারককে অনেক ষাট সোহাগ করেছিলেন এবং সে কথার জের থেকেই বাপজি এক কথায় বললেন, আজ রাত্রেই সব গুছিয়ে রাখবি মবুর মা, কাল ভোরে আমি কর্ণফুলির বাঁওড়ে যাব।

আম্মাজানের ক্ষণিক আনন্দ মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

চোখে আবার সেই বিষণ্ণতার ছায়া নেমেছে আম্মাজানের। আতাবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে কেমন নুয়ে পড়লেন বুকের একটি অব্যক্ত বেদনায়। এতকাল পরেও মবুর বাপ বেদনার তীব্র আঁচটা ধরতে পারল না।

বাপজি বিকেলে গেলেন হরিনগঞ্জের হাটে। হাট থেকে ভাল মাছ আর ভাল সওদা করে ফিরলেন। দাওয়াত করলেন জৈনবের বাপজিকে। ঘরবেদের সঙ্গে তাই সৈয়দ বংশের মোকাবিলা হল রাতে। খেতে খেতে দু'জন অর্থাৎ দুই বাপজি কথায় কথায় প্রাণ খুলে হাসলেন। নূতন মেমানের সঙ্গে নূতনভাবে আলাপ হল। জৈনব খাতুন এ ঘরের বিবি হয়ে আসবে, মোবারকের বাপজি ঘর-বেদে ওঝা বংশকে কথা দিলেন।

সকলের খাওয়া শেষে নিজে দু' মুঠো খেয়ে টিনকাঠের ঘরটায় যখন এসে ঢুকলেন আম্মাজান নীরবে, তখন দেখলেন বাপজি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েছেন। বুঝছেন, প্রতি সফরে যাওয়ার আগে বিষণ্ণতার ছায়া যেমন করে বাপজিব উপর নেমে আসত এ সফরেও তাই এসেছে। আম্মাজান এই দেখে প্রতিবার যেমন কান্নাকাটি করেন আর পেটি সাজান, এবারেও তেমনি চোখের জল ফেললেন আর পেটি সাজালেন। পেটির ভিতর থেকে টেনে টেনে সব বের করতে গিয়েই দেখলেন একটা আংটি পেটিব এক কোনায় পড়ে আছে। আংটিটা মিনাই করা আর চকচকে। উপরে ক'টি আঁকাবাঁকা রেখা।

কুপির আলোয় বাপজির চোখের উপর সন্তর্পণে আংটিটা তুলে ধরলেন আম্মাজান।

বাপজি সহজভাবে বললেন, রেনিল আংটিটা দিয়েছিল আমায়।—তারপর হঠাৎ কী ভেবে বললেন, তুই রাখবি নাকি অ'ংটিটা?

না। —আম্মাজান ঘাড় কাত করে অসম্মতি জানালেন।

হাতে নিলেন আংটিটা বাপজি। নিজের আঙুলে পরলেন।

তা হলে আমারটা আমারই থাক। কলকাতায় গিয়ে রেনিলের নামটা পালটে নিজের নামটা লিখে নেব।

আপনার হাতঘড়িটা?—আম্মাজান প্রশ্ন করলেন।—দিন। পেটির ভিতর রেখে দি।

ফিতা কেটে দেওয়া হাতঘডিটা মবুই বালিশের তলা থেকে টেনে এনে আম্মাজানের হাতে দিয়েছিল। আব মবুর মা দু'জোড়া চোখকে আড়াল করে পেটিতে রাখার নাম করে নিজের আঁচলের এক কোনায় বেঁধে ফেললেন। বাপজি অন্যমনস্ক ছিলেন বলে লক্ষ করেননি, কিন্তু নীল কাঁথার নীচ থেকে দুটো চোখ সেসব দেখে ফেলল। আম্মাজান তার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেন না।

পরদিন সকালে শামীনগড়ের মানুষেরা জড়ো হল উঠোনে। প্রতি সফরের মতো বাপজিকে তারা দোয়া জানাল। মবু আর আম্মাজানকে বিপদে আপদে দেখাশোনার ভার নিল। তাদের দলে ছিল রসিদ চাচা। ভিন গাঁয়েব লোক। বাপজির দূরকুটুম। সে এসেছিল মবুর বাপকে বলতে, সফর-ফেরত তার জন্য যেন একটা জাহাজের চাকরি ঠিক করে আসে। গাঁয়ে গাঁয়ে গাওয়াল করে, পানসুপারি বিক্রি করে আর পেট চালানো যাচ্ছে না।

সকলকে আদাব জানালেন বাপজি। রসিদ চাচাকে বললেন, এদিকটায় গাওয়াল করতে এলে তোর চাচিকে দেখে যাস। তার তল্লাশ নিস। মবুটা বড় হয়ে উঠেছে, তাকে দেখিস।

আম্মাজান আতাবেড়ার এপাশ থেকে সব শুনলেন। তিনি কেবল কাঁদলেন আর কাঁদলেন।

কর্ণফুলির বাঁওড় পর্যন্ত মবু গেল বাপজির সঙ্গে। মাদুর আর পেতলের বদনাটা তার হাতে। সঙ্গে গেল গ্রামের কয়েকজন। তাদের মাথায় কারও বাপজির পেটি, বিছানা, কেউ সঙ্গ দিয়ে চলেছে।

বাঁওড়ে নৌকো থাকে। মাঝি থাকে। লগি খুঁটির মতো গোঁজা থাকে পাড়ে। খুঁটিতে নৌকোর দড়ি

বাঁধা। বাপজি সেই নৌকায় ওঠার আগে মবুকে আর একবার কোলে টেনে নিলেন, মুখ থেকে চিবোনো পান এনে কিছুটা মবুর মুখে পুরে দিলেন। তারপর চাইলেন শামীনগড়ের দিকে দিকে। পাহাড়-প্রান্তে চোখ গেল। নীচে মাঠ। সবুজ ঘাস। খেসারি কলাই গাছে নীলচে-নীলচে ফুল। তারপর মবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আম্মার কথা শুনিস মবু। দেখিস তোর ব্যবহারে তিনি যেন দুঃখ না পান। আম্মা বড় ভাল।

বলতে বলতে বাপজির গলাটা ধরে এল। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ মবুকে বুকে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে কেমন অসহায় আর ক্লান্ত সুরে বললেন, মালিক গফুর।

শেষে 'আল্লা আল্লা' বলতে বলতে উঠে গেলেন নৌকায়।

নৌকাটা অনেকদূর পর্যন্ত গেল কর্ণফুলির বাঁওড় ধরে ধরে। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণে বাপ আর ব্যাটা দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করল। এক সময়ে নৌকা বাঁওড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল। কিন্তু নৌকার মাস্তুলটা মবুর চোখের উপর তখনও ছায়া ফেলছে।

মবু ফিরে এল ঘরে। লোকজনও ফিরে এল শামীনগড়ে।

বাড়িতে ঢুকে ডাকল মবু, আম্মা। আম্মা!

কোথাও থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে সে ঘরে ঢুকে গেল। দেখল আম্মাজান নীলকাঁথার নীচে বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে আছেন।

আবার সে ডাকল, আম্মা।

আম্মাজান বালিশের ভিতর মুখ রেখে আড়ষ্ট গলায় বললেন, তোর বাপজি চলে গেল মবু!

জি আম্মা।—মবু তক্তপোশে বসে আম্মার মুখের উপর মুখ রাখল।

তোকে কিছু বলে গেলেন?

জি আম্মা।

কী বলে গেলেন?

বললেন, তুই তোর আম্মার কথা শুনবি, আম্মা বড় ভাল।

আমার কথা তুই শুনবি।

জি।

তবে বল, তুই তোর বাপেব মতো হবি না, নাবিক হবি না।

না, নাবিক হব না।

শামীনগড়ের মানুষ হয়ে বাঁচবি, কসম থাকল।

তাই বাঁচব, কসম খেলাম।

ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। হাত তুলে দেখালেন সকলকে। ওই যে পাহাড়। বিন্দু বিন্দু হয়ে আকাশ-সীমানায় ভেসে উঠেছে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজিরা দেখল দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফেটে ওঠা একটা ঢিবি। আকাশের দিকে তার মুখ। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ, থরে থরে উপরের দিকে উঠে গেছে। মাথায় তার কাঠের ক্রস বসানো। একদল সমুদ্রপাখি দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে উড়ছে। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হাত তুলে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন।

মোবারক, শেখর, জাহাজের সব জাহাজিরা শুনে শিউরে উঠল।

শিউরে উঠেছিলেন সেদিন আম্মাজানও, সমস্ত শামীনগড় সে খবরে চুপ মেরে গেছে, সড়কের ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে সন্তর্পণে সে দুর্ঘটনার খবর শুনতে শুনতে।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওই বুক ঠেলে ওঠা ঢিবিটাতে যদি মোবারকের জীবন-ইতিহাসের পাতা উল্টানো থেমে যেত, তবে আজ অন্তত আকবর ইদ্রিশ জাহাজের সব জাহাজিরা ওকে পাগল বলে হাসি মশকরা করতে সাহস পেত না। ঢিবিটা এবং ঢিবির উপর ওই কাঠের ক্রসটা আজও তার

জীবনে জীবন্ত বিদ্রূপ তাই। হাজার গুনাহাগারের একটি অতীত প্রতীকচিহ্ন।

অতীত প্রতীকচিহ্ন বাপজি শামীনগড় ছেড়ে চলে গেলেন। শেষবারের মতো মোবারক কর্ণফুলির বাঁওড়ে দেখেছিল নৌকার মাস্তুলের শেষ ডগাটা। তারপর?

তারপর কর্ণফুলি থেকে কলকাতা। কলকাতার বন্দরে কোম্পানির জাহাজ, বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার দু'দিন আগে একটি মাত্র চিঠি। তাতে জাহাজ ছাড়ার খবর। আম্মাজান আর মোবারকের দোয়া, কোন কোম্পানির জাহাজ, কোথায় যাওয়া হবে। প্রতি সফরে কলকাতায় গিয়ে যেমনি একটি মাত্র চিঠি দেন তেমনি চিঠি।

আম্মাজান প্রতিবারের মতো সেদিন নাকের নথ দুলিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মবুকে দেখালেন। বললেন, তোর বাপজির খত। মুনশিজির কাছে যা, খতে কী লেখা আছে সব শুনে আসবি।

খুশি খুশি মন আম্মাজানের। মবুর মুখে তাই বারবার চুমু খান। মুখটাকে ছোপ-ছোপ লালে-লাল করে দেন। তিনি অনেক সোহাগ করলেন মবুকে। এবং একসময় ওকে টেনে আনলেন বুকে। আম্মাজানের উষ্ণ স্পন্দন নাবিক বংশের উত্তরপুরুষকে শোনালেন। যেন বলতে চাইলেন, শুনে রাখ মবু, এই স্পন্দনে কত ব্যর্থতার গ্লানি ডুবে আছে।

মবু শেষে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে আতাবেড়ার পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল শামীনগড়ের শেষ গড়ে। গেল সে মুনশির বাড়ি। ঝোপের নীচে উঁকি দিয়ে ডাকল, বাড়ি আছেন চাচা?

কে?—ভরাগলায় উত্তর করলেন চাচা।

আমি মবু। খত আছে বাপজির। মেহেরবানি করে খতটা পড়ে দেবেন?

খড়ম পায়ে মুনশি-চাচা ঝোপের পাশে এসে দাঁড়াল। চশমার ফাঁক দিয়ে মবুকে দেখে বললেন, কীরে? ক'দিনে বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছিস।—বলে খতটা মবুর হাত থেকে নিয়ে নিজে একবার পড়লেন, পরে জোরে জোরে মবুকে শোনালেন।

মুনশিজি জানেন খতটা একবার পড়ে দিলে মবু যাবে না। পড়তে হল তিন থেকে চারবার। সমস্ত খতটা সে হুবহু মুখস্থ করবে শুনে শুনে। বাড়িতে পৌঁছে আম্মাকে মুখস্থ বলবে। বলার ভঙ্গি দেখে আম্মা বলবেন, মবু আমার মৌলবি হবে। মুনশিজির চাইতে বেশি পড়াওয়ালা আদমি হবে।

মবুই আবার এসে সেসব কথা খত পড়াবার সময় মুনশিজিকে বলেছে, সেই শুনে দাড়ি নেড়ে হেসেছেন তিনি।

সেখান থেকে মবু ছুটেছে জৈনবের বাড়ি। গড়ের মেঠোপথে উঁচু-নিচু ছোট ছোট ঢিবি মাড়িয়ে সে এল সড়কটার উপর। সড়কের দু'পাশে মাদার আর পলাশ গাছ। মুখ উঁচু করে সে চাইল একবার। পলাশ আর মাদারের ডালে ডালে ফুল। আকাশ-প্রান্ত ধরে দুটো লালরঙের পাড় সড়ক ধরে কর্ণফুলির বাঁওড় পর্যন্ত চলে গেছে। গাং-শালিকেরা এসেছে তখন এদিকটার পলাশ ফুলের মধু খেতে। মধু খাচ্ছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডালের শাখা-প্রশাখায়।

সড়কের উপর মবুও লাফাল অনেকক্ষণ। ঢিল ছুড়ে লাফাল। পাখি তাড়িয়ে লাফা'ল। তারপর মেজাজমতো গেল সে জৈনবের বাড়ি।

জৈনব উঠোনে। জৈনব খেলছে। উঠোনের উপর অনেক ঝাঁপি। ওর বাপ ঝাঁপি খুলছে। সাপ টেনে বের করছে জৈনব।

সাপগুলো ছোবল দিতে চায় জৈনবকে। সাপের অসহায় কেরামতিগুলোর দিকে চেয়ে সে হাসল, পারবি ছোবল দিতে!—বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাসল খিল খিল করে।

মবুকে উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জৈনব গেল ওর পাশে। হাত ধরে টানল। বলল, আয় আয়, দেখবি কত সাপ বাপজি পাহাড় থেকে ধরে এনেছে।

একটা সাপ ফোঁস করে উঠেছে মবুর মুখের সামনে।

নাম এর কালকেউটে, এইটির নাম চন্দ্রবোড়া। চন্দন তিলকে এ পাশের ঝাঁপিতে। দুধরাজ সাপ দেখবি?—বলে জৈনব বাপজির প্রতি চোখ তুলে তাকাল।

ওটা খুলবি না।—বাপজি জৈনবকে ধমকের সুরে বললেন। উঠোনের উপর জৈনব আর মবু।

জৈনব ডাকে মবুকে, ও মাতব্বর মিঞা, ওটা হাতে কী?

বাপজানের খত। কলকাতা থেকে আম্মাকে খত দিয়েছে।

বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকলে তুমি আমায় খত দেবা না?

জরুর দেব।

শাড়িটা পরেছে জৈনব প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে। বুকের উপরটা খালি। ফাল্গুন মাস পড়েছে। শীত এখনও যায়নি। শীতে সাপগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এক এক করে ঝাঁপি তুলছে বাপজি ঘরের ভিতর। সন্ধ্যায় পাইকার আসবে সাপ কিনতে। তাই সাপগুলো বালতির জলে ধুয়ে সাফ সাফাই কবে রেখেছে বাপ-বেটি মিলে।

হঠাৎ খেয়াল হল মবুর, আম্মাজান আতাবেড়ার পাশে বসে আছেন। চোখদুটো বেড়ার ফাঁকে রেখে কাঞ্চন ফুলের গাছটাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। বাড়িতে ঢোকার আগে প্রথম কাঞ্চন ডালের নীচে দিয়ে মাথাটা বাড়াবে মবু। আম্মা তা জানেন। তাই কাঞ্চন ফুলের নীচেব ফাঁকা পথটা অনেক প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশার প্রতীক। আম্মাজান প্রত্যাশায় আছেন মবু এক্ষুনি অনেক খবর নিয়ে আসবে বাপজির।

মবু আতাবেড়ার ওপাশটায় চোখের উপর চিঠিটা রাখল বিজ্ঞের মতো। আব অজ্ঞেব মতো কথাগুলি আওড়ে গেল। আম্মাজান তাই দেখে হি হি করে হাসলেন। হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কাছে এলে মবুর হাত ধরে বললেন, দুষ্টু ছেলে। তোর বাপজিব জাহাজ ছাড়তে আব মাত্র তিনদিন। এ তিন রাত আমরা ঘুমোব না, কেমন?

কেন ঘুমোব না?

তোব বাপজির কথা বসে বসে ভাবব।

ব্যাটা আব বিবি একটি সফব যাওয়া মানুষের জন্য মোনাজাত কববে।

বেশ হবে না আম্মা?

ভাল হবে। তোব বাপজি তবে দবিয়াব কোনও ইবলিশের হাতে পড়বেন না। আল্লা ওব সব কসুর ক্ষমা কববেন।

তিনি দুটো আঙুল ঠোঁটে ছুঁয়ে হাতটা মবুর চোখের উপর নাড়তে থাকলেন। মবু খপ করে একটি আঙুল ধবলে বললেন, বাপজির তোর এবার ছ' মাসের সফর। কী মজা।

দুটো আঙুলে দুটো সময় নির্দিষ্ট করে আম্মাজান প্রতি রাতে নীল কাঁথার নীচে এমন করতেন। যখন শামীনগড়ে সন্ধ্যা নেমে আসত পাহাড় অলিন্দে এই ছোট্ট গায়ে, যখন আজান দিত মসজিদে মৌলবি, তখন আম্মাজান নামাজ পড়তে বসতেন মবুকে পাশে নিয়ে। দু'জন মিলে আল্লার কাছে অনেক মেহেরবানিব জন্য দোয়া মাগতেন। তার খসম, তার পিয়ার, অনেক দূরের মানুষটির তবিয়তেব জন্য অনেকক্ষণ মোনাজাত কবতেন।

শামীনগড়েব এই টিনকাঠের ঘরটিতে এভাবে কতদিন গেল। কত প্রহর আপন মর্জিতে কালের সঙ্গে মিলে গেল। কত জোনাকি জ্বলে আবার সড়কের ধারে নিভে গেল, তবু আম্মাজানের প্রত্যাশার হাতছানি লেগেই থাকল চোখের অঞ্জনে।

রসিদ চাচা আসতেন গাওয়াল করতেন। আতাবেড়ার ওপাশ থেকে হাঁকতেন, ভাবি, এলাম। পান সুপারি রাখবে নাকি এসো। মিঞা মাথার ঝাঁকা নামাতো আর মুখের উপর গামছা ঘুবিয়ে বলতেন, ভাবি, ভাইয়ার কোনও খত এল?

আম্মাজান আতাবেড়ার এপাশে মবুর হাত ধরে বলতেন, কই না তো। কোনও খত এল না তো। মিঞার কাছে কোনও খবর আছে নাকি?

আম্মাজান কথা বলতেন মবুর কানে ফিস ফিস করে। মবু সেই কথাগুলি কবিতার মতো আওড়ে রসিদ চাচাকে শোনাত। অর্থাৎ কথা হত মবু আর রসিদ চাচার ভিতর। আম্মাজানের ফিস ফিস গলায় আওয়াজ উঠত মাত্র।

দণ্ডের সঙ্গে কত প্রহর এল। প্রহরের সঙ্গে দিন এল। দিনের সঙ্গে এল এবার মাস। মাস কালের সঙ্গে মিশে গেল। খত এল এবার দক্ষিণ সমুদ্র থেকে। বাপজি গেছেন সেই এক কোন দেশে যেখানটায় তাল তাল সোনা নিয়ে আসার জন্য ওর পূর্বপুরুষ গিয়েছিলেন কোনও এক কোম্পানির জাহাজে, কিন্তু ফিরে আসেননি।

আম্মাজান হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মবু রে মবু।

মবু ডাকল, জি আম্মা। চোখে জল কেন? কাঁদছিস কেন আম্মা?

তোর বাপজি এবার দক্ষিণ দরিয়ায় গেল, কী হবে?

কী হবে? ফিরে আসবে সফর শেষে। তোর আর আমার জন্য চিজ নিয়ে আসবে অনেক।

খতে লেখা ছিল—প্রশান্ত মহাসাগরের বুক ধরে আমাদের জাহাজ নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে বিবি। মাল খালাস করে জাহাজ সিডনি যাবে। তারপর দেশে ফিরবে। আমি আবার তোকে আর মবুকে দেখতে পাব। মবু নিশ্চয়ই আমার কথা আজকাল খুব বলে। এসেই কী হবে বলতো? বলতে পারলি না! ব্যাটার সাদি হবে। অনেক টাকা এবার কোম্পানির ঘরে পাওনা হবে। এক ব্যাটার সাদি। কত লোক-লস্কর! কত মেমান! কত দৌলত! আর অনেক দাওয়াত। জৈনব নিশ্চয়ই আর একটু বড় হয়েছে। ওকে আমার দোয়া জানাবি। মালিক গফুর ভরসা।—বলে খত শেষ করেছিলেন বাপজি।

এবার থেকে মবুর চোখের উপর আম্মাজানের আঙুল নাড়ানো আরও বেড়ে গেল। নীল কাঁথার নীচে ঢোকার আগে অনেকক্ষণ এইরকম চলত আর বাপজির বলা অনেক কথার পুনরাবৃত্তি হত। আতাবেড়ার ওপাশটায় যদি কারও ডাক উঠত, আম্মাজান মবুকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতেন, কোনও খবর যদি মানুষেরা নিয়ে আসে। যদি খবর দেয় মবুকে, কর্ণফুলির বাঁওড়ে তার বাপের নাও কেউ দেখে এসেছে।

কই কেউ তো কোনও খবর দিল না। যারা এল তারা সকলেই জোত-জমির কথা, হালচাষের কথা, দেশের কথা বলে মবুর কাছে বিদায় নিল। আতাবেড়ার এপাশের কোনও খবরই বয়ে আনল না তারা।

কত পুরুষ আগে নানিও এমনি অপেক্ষা করতেন বিছানায় শুয়ে। তখন এ ঘর থেকেই বাঁওড়ে লগির শব্দ শোনা যেত। নানি কাঁথা থেকে শীতকালে মুখ বার করে রাখতেন। লগির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। যদি ক্রমশ দূরে সরে যেত শব্দটা তিনি হতাশার চিহ্ন আঁকতেন মুখে। আর বুঝি এল না। ঘাটে বুঝি আর নাও বাঁধল না।

আম্মাজানের পাশেই শুয়ে থাকে মবু। ওর চোখে গভীর ঘুম। কুলুঙ্গি থেকে আম্মা কুপিটা মবুর মুখের উপর ধরতেন। সেই মুখে মবুর বাপজিকে অনুভব করার চেষ্টা করতেন। হিজল পাহাড়ের বাতাস তখন নেমে আসত জানালাটার উপর। সেই বাতাসে জানালা দরজা ঠক ঠক করে নড়ত। আম্মাজান চমকে উঠতেন। ডেকে তুলতেন তিনি তখন মবুকে। বলতেন, মবু ওঠ, কে যেন বাইরে দরজা নাড়ছে।

তিনি ভাবতেন হয়তো মবুর বাপজি। হয়তো নিভৃতে এবং নীরব অন্ধকারে তিনি এসে টিনকাঠের ঘরটায় চুপি চুপি উঠেছেন বিবিকে অবাক করে দেবার জন্যে। গেল সফরের আগের সফরে তো তিনি তাই করেছিলেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দরজাটা চুপি চুপি নেড়েছিলেন। আম্মাজান যত ডাকছেন ভয়ে ভয়ে, কে! কে! তত বারান্দার ছায়াটা দেওয়াল সংলগ্ন হয়ে চুপ করে ছিল। তারপর একসময় আম্মাজান চিৎকার করে উঠল, তিনি বলেছিলেন, বিবি, আমি রে আমি! দরজা খোল।

দরজা খুললে দেখতে পেয়েছিলেন বাপজির দুটো দুষ্টুমি-ভরা চোখ। চোখে অনেককালের বিবিকে-ব্যাটাকে না দেখার আর্জি। শেষে আম্মাজান বাপজির সংলগ্ন হয়ে তক্তপোশটা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং দু'জন একসঙ্গে মবুর মুখের উপর ঠোঁট রেখেছিলেন। বাপজির গলায় অনেক কথার প্রকাশ তখন, কোম্পানির আর্জি আর খোদার মর্জি কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ শুনি উড়োজাহাজে আমাদের আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসতে হবে। জাহাজ নাকি আর তাদের চলছে না।

আম্মাজান ভাবতেন, এ সফরটাতেও যদি কিছু এমনি একটা হয়। একটা উড়োজাহাজ যদি বাপজিকে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভারতবর্ষে পৌঁছে দেয়। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা তাই জমা হতে থাকল তাঁর দিনের পর দিন।

কিন্তু বাপজি তো ফিরছেন না।

শামীনগড়ে এল বৈশাখ মাস। ভরদুপুরে ঘাটে আম্মাজান জল আনতে গিয়ে কেমন আনমনা হয়ে কাঞ্চন গাছের ফুলগুলির দিকে চেয়ে থাকেন আর ঘরে ফিরে মবুকে বলেন, না একটা খত, না একটা খবর। বাপজি তোর ভাবে কী বলত? জাহাজ ফিরতে দেরি হয় তো একটা খতে লিখে দে দু' লাইন। তা দিবি না পর্যন্ত? বাড়ির লোকগুলির কী করে দিন কাটছে সে হিসেব পর্যন্ত রাখে না লোকটা।

হিঙ্গল পাহাড় আর মৌরি-পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যে আকাশটা শামীনগড় থেকে দেখা যায়, সেখানে ক'দিন থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেঘে মেঘে আকাশ দিন দিন কালো হয়ে উঠছে। শামীনগড়ের মানুষেরা ভাবল, এবার জল-ঝড় কিছু একটা হবেই। কালবৈশাখী পাহাড় চিরে এদিকটায় নেমে আসবেই।

আম্মাজান কী ভেবে সেদিন জানালা দিয়ে সে আকাশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। জল-ঝড়ের রাতে একা একা তাঁর বড্ড ভয়। মবুর উপর এখনও তিনি নির্ভর করতে পারছেন না।

সেই জল-ঝড়ের দিন আবার এসে গেল।

বিকেলে ঘাট থেকে জল এনে মবুকে বললেন আম্মাজান, কোথাও যাসনে। দেখেছিস আসমানটা কেমন কালো করে আসছে।

সে রাতে আম্মাজান সকাল-সকাল খেয়ে মবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেশলাই ঠিক করে বালিশের নীচে রাখলেন। কুলুঙ্গিতে কুপির সলতে তুলে ধরলেন উপরে। তারপর মোটা সলতেয় আগুন ধরিয়ে জল-ঝড়ের ভয়কে ঠেলে দিতে চাইলেন দূরে।

এমন রাতকেই আম্মাজানের ভয়, এমন রাতে তাঁর বুক ফেটে কান্না ওঠে। অভিমানে বাপজিকে তখন গালমন্দ দেন, বেইমানি আমার সঙ্গেই করলা মিঞা। তঞ্চকতা কবে আমার জীবনটাকে মাটি করে দিলা।

ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। মেঘে মেঘে ঢেউ দিচ্ছে আকাশে। দক্ষিণ-সমুদ্র যেন ফুঁসে ফুঁসে শামীনগড়ের এই ছোট্ট টিনকাঠের ঘরকে পর্যন্ত গিলতে আসছে।

এক এক করে ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করে দিলেন তিনি। শেষ জানালাটা বন্ধ করার সময় প্রশ্ন করলেন, তোর বাপজির জাহাজ ঝড়ের দরিয়ায়, না বন্দরে?

মবু উত্তর করেনি। সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝড়-বাদলের রাতে ওর চোখে ঘুমটা যেন বেশি করে আঠার মতো লেগে থাকে।

বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ পেয়ে শেষে জানালাটা বন্ধ করলেন। তক্তপোশে ফিরতে না ফিরতেই অনুভব করলেন ঝড়ের বেগে টিনকাঠের ঘরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। প্রথমদিকের জানালার একটি কবাট ঠাস করে খুলে গেল। বৃষ্টির ছাট আর ঝড় এসে ঢুকছে ঘরে। বিছানা-পত্র ভিজিয়ে ভয়াবহ করে তুলেছে ঘরটাকে। আম্মাজান ডাকলেন, খোদা।

ছুটে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেবার সময় দেখলেন মবু ভয়ে তক্তপোশের উপর বসে কাঁদছে।

জানালাটা বন্ধ করলেন। তক্তপোশের পাশে এসে দাঁড়ালেন আবার। মবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, খোদাকে ডাক মবু। তিনি ছাড়া আমাদের আর কে আছেন?

ভীষণ শব্দ। ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। কড় কড় করে আকাশের অনেক রাক্ষুসে শব্দ আছড়ে পড়ছে শামীনগড়ের অনেক উঠোনে। দরজাটা কে যেন বাইরে থেকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি দরজাটার দিকে চেয়ে শঙ্কিত হলেন। এক্ষুনি হয়তো ওটা উলটে পড়বে। দরজার পাশে গিয়ে ভারী কিছু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা দরজাটা ভেঙে পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে সঙ্গে টিনকাঠের শক্ত ঘরটা পাখির মতো উড়তে থাকবে আকাশে।

উঠে দাঁড়ালেন আম্মাজান। দরজার কাছে এসে মানুষের শব্দ পেলেন। বারান্দায় পড়ে কোনও মানুষ যেন গোঙাচ্ছে। কিন্তু মানুষটা কে, কোন মাঠে সে ঝড় পেয়েছে, এত বাড়ি থাকতে শামীনগড়ে এখানেই বা কেন, শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ের জন্য কিছুই ভিতরে থেকে জানতে পারলেন না। তবু অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে দরজার উপর কান রাখলেন তিনি।

আঁতকে উঠলেন আম্মাজান। শুধু কয়েকটি শব্দের পুনরাবৃত্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মুখে।

আম্মাজান আড়ষ্ট কণ্ঠে ডাকলেন, মবু, এদিকটায় আয় রে বাপ।

তারপর দু'জনে দরজার উপর আবার কান রেখে সন্তর্পণে শুনলেন বারান্দার মানুষটি গোঙাতে গোঙাতে বলছে, দরজা খুলুন, আপনাদের টেলিগ্রাম।

দরজা খোলা হল। আম্মাজান আর মবু অন্ধকারে বারান্দার উপর হাতড়ে হাতড়ে বেড়ালেন লোকটাকে। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলেন দাওয়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে মানুষটা। ঝড় আর শিলাবৃষ্টির আঘাতে মানুষটি আর উঠতে পারছে না। ওকে ধরে তুলে আনার সময় আবার শুনলেন

আম্মাজান, আপনাদের টেলিগ্রাম। দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজডুবির খবর আছে। মজিবর রহমান সে জাহাজের জাহাজি।

চোখে জল নেই আম্মার। শুধু ক'টি অস্পষ্ট শব্দ। সে শব্দ ঝড়, জল, রাতকে বিদ্রুপ করছে। তিনি দুটো হাত অবলম্বনের জন্য মবুর প্রতি বাড়ালেন, কিন্তু তার আগে 'গফুর মালিক এ কী করলে' বলে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তারপর সমস্ত রাত ধরে ঝড়-জলে নিঝুম হয়ে থাকল ঘরটা। শামীনগড় কোনও খবরই রাখল না তার।

সকালবেলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ের কোলে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। সব মানুষেরা জানল কর্ণফুলির বাঁওড়ে আর বাপজির নৌকোর লগির শব্দ উঠবে না। শামীনগড়ের জাহাজি-জীবন থেকে একজন জাহাজি বিদায় নিল।

সব খবর শুনে শামীনগড়ের সমাজ চুপ মেরে গেছে।

শিউরে উঠেছিলেন বারবার আম্মাজান সেদিন।

প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজ-ডেকে মোবারক, শেখর, জাহাজের অন্যান্য জাহাজিরা আর-এক ইতিহাস শুনে শিউরে উঠল।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজিরা তখন দেখল দূরের একটা টিবি। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ, থরে থরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। মাথায় তার ক্রস। দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে একদল সমুদ্রপাখি। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে।

ক্যাপ্টেন হাত তুলে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বললেন, কথাগুলো বিবর্ণ। কথাগুলো জাহাজিদের ভয়াবহ দিনের কথা।

জাহাজিরা ডেকের উপর দাঁড়িয়েছে সরলরেখার মতো করে। পাহাড়ের উপর কাঠের ক্রসটিকে দেখে ক্যাপ্টেন, বড়-মালোম, মেজ-মালোম বুকের উপর ক্রস টানছে। বাইবেল থেকে একটি সংগীতের সুর তুললেন কণ্ঠে। আর অন্যান্য ভারতীয় জাহাজিরা তাদের ধর্মীয় মতে ক্রসটাকে শ্রদ্ধা জানাল।

মোবারক চুপ করে সকলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন বলছেন, বিশ বছর আগে কোম্পানির জাহাজ ফিরছে নিউ-প্লাইমাউথ থেকে সিডনিতে। সিডনি থেকে জাহাজিরা যার যার দেশে ফিরবে, বাড়িতে বাড়িতে তারা খত পাঠিয়ে দিয়েছে। চিজ কিনে জাহাজ বোঝাই করেছে বিবি ব্যাটা মেমানদের জন্য। কিন্তু রাতের টাইফুনে কীসে কী হল। ভয়ে দিশেহারা হল সুখানি আর তিন নম্বর মালোম সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ দেখে আর গর্জন শুনে। ভুল পথে জাহাজ এসে ধাক্কা খেল ওই পাহাড়টায়। পাহাড় তখন জলের নীচে। পাহাড় মাত্র গড়ে উঠছে। আঘাত খেয়ে জাহাজের নীচটা চিরে গেল। কাজেই কোনও উপায় থাকল না জাহাজিদের বাঁচবার। লাইফ-বেল্ট পরে সবাই এসে উপরে জড়ো হল। লাইফ-বোট হারিয়া করতে গিয়ে অনেকে ছিটকে জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভীষণ ঝড়ের জন্য কিছুতেই বোট শেষ পর্যন্ত হারিয়া করা গেল না। একটা বোটের হাসিল ছিঁড়ে গেল। আর-একটা বোট উলটে কোথায় ভেসে গেল কোনও জাহাজি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখল না। বেতার-সংকেতে শুধু এক খবর, জাহাজ ডুবছে। রেসকিউ পাঠাবার মতো সময় আর অফিসের হল না।

রাত তখন বারোটা।

জাহাজডুবির প্রায় দশবছর বাদে কোম্পানির ক্যাপ্টেন সুপারিনটেনডেন্ট এই পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখে গেলেন এই পাহাড়টা সমুদ্রের উপর ধীরে ধীরে জাগছে। সবুজ শ্যামল প্রলেপ পড়ছে প্রবালদ্বীপে। তিনি সেই মৃত জাহাজিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাহাড়ের উপর বেদি গড়লেন। একটি কাঠের ক্রস প্রতিষ্ঠা করলেন। ঝড়ের দরিয়ায় নির্ঝরের বাণী আহ্বান করলেন। আজও তাই কোনও জাহাজি যখন এই পথ ধরে যায় তখন এই দ্বীপটির কাছে এসে সকলে হাত তুলে প্রার্থনা করে। প্রভু, জাহাজ আর জাহাজিদের শান্তি দাও।

জাহাজিরা সকলেই মিনিটকাল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর যে যার মতো কাজে চলে গেল।

একমাত্র মোবারক ডেক ছেড়ে অন্যত্র গেল না।

শেখর নীচে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ডাকল, এবার চলো।

মোবারক ডেক থেকে নেমে যাওয়ার সময় শেখরকে শুধু একটি প্রশ্ন করল, সমুদ্রপাখিগুলো দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে উড়ে উড়ে কাঁদছে কি আনন্দ করছে?

বিরক্ত হয়ে শেখর জবাব দিল, কী করে বলব।

নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না। জৈনবের কসম।

কথাগুলি বড় বড় হরফে ক্রেপার করা বালকেডের উপর চক দিয়ে লিখল মোবারক।

'নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না'—পড়ে পড়ে সে হাসল।

সব বেইমান। বাপজি। আম্মাজান। বেইমান জৈনব খাতুন।

চোখ ঢাকল মোবারক। দুটো হাত বাড়িয়ে বাংকের কাছে এল। বলল, দ্যাখ তো শেখর, হাতদুটো আমার কোনওদিন বেইমানি করেছে কি না। বেইমানির কোনও চিহ্ন আছে কি না।

শেখর বিস্মিত হল না। জাহাজের সব জাহাজিদের মতো সেও বুঝি জেনে নিয়েছে মোবাবক উন্মাদ। লিলিকে ছেড়ে এসে আরও উন্মাদ হয়ে গেল। কিন্তু সে অন্যান্য জাহাজিদেব মতো তাকে বিদ্রুপ করে না। সে চায় মোবারক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। সে যদি ঘুমোত।

শেখর আহত হাতদুটো নিয়েই উঠল কোনওরকমে। মোবারকের হাত টেনে বলল, আয় ঘুমোবি। অমন বিড়বিড় করে আর বকিস না। স্বাভাবিকভাবে দুটো কথা বল। ঘুমো। লিলিকে ভুলে যা, দেখবি মনটা অনেক হালকা হবে। আমার হাতদুটোর দিকে চা। দ্যাখ এব কত যন্ত্রণা। দয়া হয় না তোর? তার উপর তুই যদি দিন দিন এমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠিস তবে জাহাজে দিন আমার কী কবে কাটে বল তো?

মোবারক চুপ করে থাকল। শেখর হাত টেনে আবার বলল, বালকেডের উপব ও কথাগুলো লিখলি কেন?

জৈনবেব কসমের কথা মনে পড়ল, তাই লিখলাম। নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না, জৈনব হরীতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কসম দিয়েছিল।—বলে কেমন পাগলের মতো আবার হেসে উঠল মোবারক।

কী দেখছে মোবারক পোর্ট-হোল দিয়ে। শেখব বিস্মিত হল। গলা বাড়াল ঘুলঘুলিতে। সন্তর্পণে দেখল সে পাহাড়টা। আবছা একটুকরো মেঘেব মতো এখনও আকাশ-কিনারায় ভেসে আছে। কাঠের ক্রসটা তখন আড়াল পড়েছে পাহাড়ের।

শেখব কাচটা দিয়ে প্রথম ঘুলঘুলিটা বন্ধ করে দিল। লোহার চাকতিটা দিয়ে ঢেকে দিল কাচটা। বুকের উপর একটি আহত হাত ঝুলিয়ে সে এল তারপর মোবারকের কাছে। বলল, কারও বাপ বুঝি আর জাহাজডুবিতে মরে না?

মোবারক চাইল শেখরের প্রতি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। কাচ দিয়ে ঘুলঘুলি বন্ধ করলেই কি আর বন্ধ হয়। শেখর কি ভেবেছে লোহার পাত দিয়ে মনের উৎপাতগুলিকে বন্ধ করে দেবে। ঘুম যে আসে না, গুনাহ যে হাজার গুনাহ, বাংকের পরতে পরতে যে সাপের অনেক ছোবল, শঙ্খচূড়টা জৈনবের ভালবাসার জীবন্ত ফসিল, সেগুলিও কি শেখর একটা ভঙ্গুর কাচ দিয়ে চেপে দিতে চায়। আর বলতে চায়, ওসব কিছু না। ওসব তোর অনর্থক এবং অহেতুক মনের জট।

এই অনর্থক এবং অহেতুক মনের জটগুলি সে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে বহুবার। কিন্তু বারবার তার অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। চেষ্টার সঙ্গে জটের বন্ধন বেড়েছে। অনুতাপ অনুশোচনায় বারবার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েছে বুকটা।

লিলির বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর অনুশোচনা হাজার গুণে বেড়েছে। জাহাজের সকলকে সে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

আর শেখরটা যেন কেমন। কেবল যখন-তখন বলে, ঘুমো ঘুমো। কিন্তু সে ঘুমোতে পারছে কই? দুঃখ যে তার অনেক।

শেষ পর্যন্ত কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল মোবারক। প্রতিদিনের মতো কনুইটা রাখল চোখের উপর।

বাংকেব নীচে শীতে শঙ্খচূড়টা নিশ্চয়ই লজ্জায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। লাজ আছে তবে জৈনবের? লজ্জাবতী আমার! আম্মাজানের মতোই তুই বেইমান।

আম্মাজান তখন অনেক ফারাকে। জৈনব তুই খিল খিল করে হেসেছিলি হরীতকী গাছের নীচে। মনে তোর আগুন। যে আগুনটা কুদরত মিঞার কপালে শেষ কালে একটা হেই করে ছেঁকা দিয়েছিল।

হঠাৎ পাশের বাংকটাকে উদ্দেশ করে বলল মোবারক, সাপে কাটা মড়া দেখেছিস শেখর?

পাশের বাংকটা যেন বিরক্ত হল। উত্তর করল, না।

সাপের ছোবল খেয়েছিস?

না।

মেয়েমানুষের ছোবল?

শেখর ধমক দিল মোবারককে, এসব কী হচ্ছে শুনি? এর নাম ঘুম! এভাবে মানুষ ঘুমোয়! কত আর জ্বালাবি বল তো? অহেতুক মনের জট নিয়ে নিজে জ্বলছিস, আমাকে জ্বালাচ্ছিস। এ কি তোর উচিত হল? এত করে বলি ঘুমোতে আর তুই কম্বলের নীচে থেকে বলছিস, মেয়েমানুষের ছোবল আমি খেয়েছি কি না।

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা মোবারকের মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এক নিদারুণ উত্তাপ ওর মনের প্রকাশ করার আগ্রহকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। শেখর কেমন হৃদয়হীন। নাবিক বংশের ইতিহাস শুনতে সে কেমন বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু প্রকাশের আগ্রহটা যখন একান্ত ওকে উন্মাদ করে তোলে তখন খাপছাড়াভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ধমক খায় শেখরের, আর বাজে বকিস না। দুটো পায়ে পড়ি এবার। ঘুমো, ঘুমো।

বলে বালকেডের উপর কী সব আঙুল দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা টানে। রেখাগুলো যেন আর ক'টা দিন আছে সফর শেষে ঘরে ফেরার হিসেব।

মোবারক বেহায়ার মতো আবার বলল, এমন কবে আমার বাপজিও দাগ টানতেন। হিসেব করতেন আর কতদিন বাকি কর্ণফুলির বাঁওড়ে নৌকা বাঁধার।

শেখর কোনও উত্তর করল না। মুখ ফেরাল মাত্র।

দুটো আরশোলা লকারটার নীচ থেকে বের হল এবং শঙ্খচূড়টা যে ব্যাগের ভিতর আছে তার ভিতরে ঢুকে গেল।

তা হলে তুই ঘুমোবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস?

ঘুম পেলে ঘুমোব। ছোবল তবে তুই মেয়েমানুষের খাসনি?—কথাটার বাঁক ঘুরাল এবার।

শেখর বিরক্ত হল এবারও। বাংকের উপব সে উঠে বসল, এমন করবি তো ফোকশাল থেকে বের হয়ে যাব বলছি।

বের হবি? কেন? আমি উন্মাদের মতো কথা বলছি! আকবর ইদ্রিশ তো আজ মুখের উপরই এ কথা বলল। দু' নম্বর বয়লারটায় তখন কয়লা মারছিলাম তাই রক্ষে। ছাপোষা মানুষ, তার আবার এত সাহস।

ওরা ঠিক বলেছে।—দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল শেখর।—না ঘুমিয়ে সারাদিন ধরে বিড় বিড করলে ওরা বলবেই। ঘুমো, আগের মতো চুপচাপ থাক, দেখি কার কত বুকের পাটা।

ওরা ঠিক বলেছে, মোবারক উন্মাদ। কথাগুলো ক'বার করে মোবারক মনে মনে আওড়াল। শেষে সে শেখরের বাংকেব পাশে দাঁড়াল। বলল, তুই অসুস্থ। বেশি ওঠাবসা করিস না। শুয়ে পড়।

শেখরের আহত হাতটা বুকে নিয়ে আবার বলল মোবারক, আমি উন্মাদ নই। তবে তোর যখন ঘুম আসে না তখন ডেকে যাই আমি বরং।

নুয়ে নুয়ে চৌকাঠ অতিক্রম করার চেষ্টা করল মোবারক। ডেকে উঠে যাওয়ার জন্য স্টোর-রুমের পাশে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিযে দেখল একবার শেখরকে। বোবা চোখদুটো ওর এতটুকু নড়ছে না। অপলক। স্থির। সে পা বাড়াল তবু।

শেখরের সকরুণ কণ্ঠ শুনল সে আবাব, উপরে যাসনে। ফিরে আয়। চারটে না বাজতেই আবার পরি। শুয়ে ঘুমো। আমার কথা রাখ। তুই ঘুমুলে আমি সত্যি খুব সুখী হব।

সুখী হবে! সুখী হওয়ার মতো এমন কী সম্পর্ক আমার সঙ্গে! যারা সুখী হতে পারত তারা সুখী হয়নি। ইচ্ছে কবে হয়নি। অন্য পথ ধরে তারা চলে গেল। মবুর কথা তখন তারা ভাবেনি। শামীনগড়ের সড়ক,

মাটি, হরীতকী গাছ, পলাশের লাল ফুল, মৌরি পাহাড়ের লালচে ঘাস পর্যন্ত ব্যথায় বিমর্ষ হয়েছিল সেদিন। অন্ধকার রাত। সে সময় সড়ক থেকে মাঠে এসে নামছে মোবারক।

কে! কে ডাকছে?

সারেং ডাকছে।

কেন এমন সময় সারেং ডাকল?

তা আমি কী করে বলব?—ইদ্রিশ কথাগুলোর জবাব দিল উদাসীনভাবে, যেন সে কোনও খবর রাখে না।

মোবারককে আর নামতে হল না নীচে। সারেং তখন উঠে আসছে। সকলের সামনে সে মোবারককে অপমান করল। অন্য কোনও জাহাজিকে উদ্দেশ করে যেন বলছে, দু' নম্বর বয়লাবে স্টিম ওঠেনি। কেবল শাবলের পর শাবলই হাঁকড়ে গেছে। না একবার স্লাইস, না একবার র‍্যাগ! পাগলামি করতে হয় দেশে ফিরে যেন করে। পাগলামি করার জায়গা এ জাহাজ নয়। বেশি উৎপাত করলে বাড়িওয়ালাব কাছে নালিশ যাবে।

অবাক হল মোবারক। চোখদুটো টাটাল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে থাকতে চিৎকাব করে উঠল, সারেং সাব, আমি পাগল! আপনিও আমায় পাগল বললেন?

তারপর লজ্জায় আর কোনওদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। আস্তে আস্তে ডেক-পথ অতিক্রম করে সে বোট-ডেকে উঠে গেল এবং মাথাটা দু' হাঁটুতে গুঁজে বসে পড়ল তিন নম্বব বোটের পাশে।

বুক বেযে উঠে এল এবার। জোর করে হাসিটা সে চেপে রেখেছে এতক্ষণ। বেশি জোর করতে গিয়ে চোখ থেকে জল পডল। জল মুছল জামাব আস্তিনে। চোখ তুলে তাকাল সে দূর থেকে দূবে।

একটি অ্যালবাট্রস নীল আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়ে নীল নোনা জলের গভীরে হারিয়ে গেল।

অ্যালবাট্রসেব অন্য দলটা হাওয়ার উপর দুলে দুলে পাহাড়টার দিকে ছুটছে। পুরানো অ্যালবাট্রসটা তখন বসে আছে কাঠেব ক্রসটার উপব। চিঁ-হি চিঁ-হি করে কাঁদছে। সে কান্নার মানে একটি মাত্র নাবিক বুঝি জানে। জাহাজে বসে সে বুঝি এখনও দেখছে, নীল অসীম আকাশ আর অনন্ত দবিয়ায় সেই কান্নাব মানে টিবি অতিক্রম করে দূরে, অনেক দূরে, সেই চট্টগ্রামের এক পাহাড় অলিন্দের সড়ক ধরে হাঁটছে। মাথায় তার ঝুড়ি। গাওয়াল করতে বেব হয়েছে। কাঞ্চন গাছেব নীচে প্রতীক্ষায় উন্মনা দুটো চোখ। সে চোখ আম্মাজানের। পানসুপারি বিক্রি করতে ভাবির কাছে আসছেন রসিদ চাচা। কাঞ্চনের ডালে আম্মাজান প্রতীক্ষায় ঝুঁকে আছেন।

ঝুমুনিয়া বিল থেকে ফিরছে মবু। হাতে তার একজোড়া বালিহাঁস। কঙ্কা পেতে ধরে এনেছে। কাঞ্চনগাছটা পর্যন্ত এসেছে অন্যমনস্কভাবে। জৈনবের ডাগর ডাগর দুটো চোখ, পরিমিত বিস্ময় চোখে। ভাবছে সে চোখদুটোর কথা। ভাবছে, বালিহাঁসের জোড়া চোখের উপর তুলে ধরবে। বলবে, দ্যাখো কী ধরে আনলাম। তোর বাপজির চাইতে কম আমায় করিতকম্মা ভাবিস না। তোব বাপজি ধরে আনে সাপ, ঝুমুনিয়া বিল থেকে আমি ধরে আনি ডাহুক আর হাঁস।

কিন্তু এবার সে থমকে দাঁড়াল। আম্মাজান এখানে একা! কাঞ্চনফুলের ডালটার উপর থুতনি। কী দেখছেন এত সড়ক ধরে!

মবু পিছন থেকে ডাকল, আম্মা তুই এখানে?

থতমত খেলেন যেন আম্মাজান। গলায় সহজ সুর আম্মাজানের, তুই কোথায় যাস বল তো?

তারপর আবার সড়ক ধরে চাইলেন, বললেন, ওটা কে আসছে রে?

রসিদ চাচা।

আসছে যখন, ডাকবি, বলবি ভিতরে বসতে। পানসুপুরি দুই-ই রাখব।— বলে তিনি ধীরে ধীরে আতাবেড়ার ওপাশটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথের উপর ছায়া ফেলে মানুষটা সড়ক ধরে তেঁতুল গাছের নীচে উঠে এল। ছায়াটা এখানে এসে ছায়ার সঙ্গে মিশে গেল। তারপর ক্রমশ পা পা করে উঠোনের উপর যেয়ে হাঁকল, চাই পানসুপুরি। ভাবি, এলাম গো। তোকে না দেখলে মনটা আমার ভেজে না। সোবান আল্লা, ওরে মবু, বিলের খেতের নাড়া

তোদের একটাও নেই। বাড়িতে থাকিস, নিজের জমি-জায়গাগুলোও একবার দেখেশুনে রাখতে পারিস না?

ভাবি আতাবেড়ার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বলল, আর ওর কথা বলবেন না মিঞা। সারাদিন কোথায় থাকে, কী করে ওই জানে। চারগন্ডা পান দিন, দু' গন্ডা সুপুরি। কাল চুন লাগবে, খয়ের লাগবে। কাল আবার আসবেন।

কত কাল এলেন রসিদ চাচা। কত কাল তিনি আম্মাজানকে পানসুপুরি দিলেন। খয়ের চুন দিলেন।

হিজল পাহাড়ের মাথায় কতবার চাঁদ উঠল, কতবার নিভে গেল। জাফরানি রঙের ছায়া হরীতকী গাছের নীচে কতবার নেমে কতবার হারিয়ে গেল। দুটো ছায়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে তখন। ফিস ফিস করে অনেক কথাবার্তা। কত অহেতুক আর অনর্থক কথা কেবল বলছে আর বলছে।

এমন করে কত দিন। এমন করে কতকাল।

চাঁদ আর চাঁদনি রাত। ফুল আর ফুলের সমারোহ। ধানের শিষের মতো দুটো পাখি হাওয়ার উপর জীবনের অনেক প্রাচুর্য নিয়ে দোল খেয়েছে এভাবে।

কিন্তু একদিন। নীরব তখন হরীতকী গাছের ছায়াটা। খিল খিল হাসিতে ওপাশের জঙ্গলটা কেঁপে উঠল।

আর একদিন। হরীতকী গাছটা ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদ নেই সেদিন হিজল পাহাড়ে। অনেকক্ষণ হল অন্ধকার হিজ্জলের জঙ্গল। তারই ছায়া-অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোয় দেখেছিল জৈনবের মুখ মবু। মুখের উপর কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে।

ফিস ফিস কণ্ঠে প্রশ্ন, তুমি কি পাগল মাতব্বর মিঞা? মিঞা, তুমি এটা বোঝো না রসিদ চাচার সঙ্গে আম্মাজানের কী সম্পর্ক! চোখের উপর দেখেও চুপ!

মবু সে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জৈনবের মুখ চেপে ধরেছিল সেদিন। বলেছিল, চুপ চুপ। গুনাহ হবে, অমন কথা বলিস না।

হরীতকী গাছটায় ঠেস দিয়ে তবু জৈনব বলতে ছাড়ল না, মিঞা, তুমি আমার মুখ চেপে ধরতে পারো। কিন্তু শামীনগড়ের মুখে মাটি চাপা দিবে কী করে!

মবুর চোখদুটো কুঞ্চিত হল। কাছে টেনে নিল জৈনবকে। একটা হাত উপরের দিকে ছুঁড়ে বলল, কে আছে এমন? শামীনগড়ে কার এত হিম্মত আছে? বলতে হয় সামনে দাঁড়িয়ে বলুক, চুপি চুপি বলবে কেন?

তারপর ধীরে ধীরে কেমন উদাসীনের মতো বলল মবু, বাপজি একটা খুন করে খোদা হাফেজ বলেছে। আমি শামীনগড়ের হাজার মানুষ খুন করেও যেমন মবু তেমনি থাকব। আম্মাজানের মুখের উপর কুৎসিত কলঙ্ক লেপটে দিলে বাপজির ব্যাটা তা সহ্য করবে কেন!

রসিদ চাচা আর আম্মাজান। কোথায় আর কী। কলঙ্ক! কুৎসিত কলঙ্ক। ভিখারির মতো দেখতে লোকটা, একপাল কাচ্চা-বাচ্চা ঘরে। বিবি খন খন করে কথা কয়। পানসুপুরির সঙ্গে আম্মাজানের সম্পর্ক। দেহ ও মনের সঙ্গে সম্পর্ক শামীনগড়ের মাটি কসম খেয়ে বলুক।

ভীষণ গরম। এলোমেলো কিছু চিন্তা। টুকরো-টুকরো গরমের হাওয়া। কামরাঙা গাছটা শির শির করে কাঁপছে। ঘরের ভিতরে আম্মাজান। দুটো তক্তপোশ দু'পাশে। সেই তক্তপোশ থেকে রাতের এক ফাঁকে নেমে এসেছে মবু। জৈনবের ঠান্ডা দেহটার উত্তাপ নিচ্ছে তখন।

হরীতকী গাছটা অতিক্রম করলে দুটো কাঁঠালি চাঁপার গাছ। দক্ষিণের হাওয়া বইছে। অনেক চাঁপা ঝরছে মাটিতে। অন্য রাতে সেগুলো জৈনব তুলে আনে। মবুর দু' হাতে গুঁজে দেয়। কিন্তু আজ কেউ চাঁপা ফুল দিল না। চুপচাপ। কোথায় যেন দুটো জীবনকে কেন্দ্র করে একটি ঝড়ের অঙ্কুর, একটি ব্যর্থতার অন্ধকার ধীরে ধীরে জন্মলাভ করছে।

জৈনব গলায় অদ্ভুত রকমের শব্দ করল একটা। গলাটা টিপে ধরলে যেমন শব্দ হয় তেমনি। খক খক করে কাশল। কাশতে কাশতে বলল, তোমার মনে কষ্ট দিলাম, কিন্তু কী করব? শামীনগড়ের বুকে বেঁচে থাকার জন্যই এ কথা বলছি। রসিদ চাচাকে তোমার বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়ো। নইলে সাদি সম্বন্ধে বাপজি অমত করবেন।

তাই হবে জৈনব। তোর কথাই থাকবে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাটাতে সায় দিল মবু। এবার জৈনবকে ছেড়ে আরও পূর্বদিকে সরে দাঁড়াল। কাঁঠালি চাঁপা গাছটার নীচে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে গেল। বারান্দায় উঠে দরজা খুলল অত্যন্ত সন্তর্পণে। আম্মার বিছানার পাশে দাঁড়াল। কুকুরের মতো ঘ্রাণ নিল আম্মার দেহ থেকে। নিজের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হল এবার। এত অবিশ্বাস!

আম্মাজানের মুখে এত প্রশান্তি। এত কালের এত ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত এমন প্রশান্তি টেনে দিয়েছে মুখের উপর। কোনও মালিন্য নেই, কোনও কলঙ্ক নেই। তবু শামীনগড়ের মানুষেরা অসহায় মোবারককে, অসহায় আম্মাকে কোনও এক ঘুলঘুলির জীবনে ঠেলে দিতে চায়। এত নিমকহারাম এই মাটি আর জল।

এই জল আর মাটি। কত আরাম আর বিরামের সুখস্বপ্ন এখানে। কত বিনিদ্র রাতে কত গল্প গড়ে উঠেছে। আম্মাজানের গল্প। পূর্বপুরুষের অনেক ইতিহাস উনুনের পাড়ে আম্মাজান মবুর সংলগ্ন হয়ে বলেছেন। দুটো জীবন অনেক ব্যর্থতার ভিতরও অনেক মশগুল ছিল।

রসিদ চাচা আর আম্মাজান। অবিশ্বাস আর কলঙ্ক। এই কথাগুলো মবু জৈনবের কাছেই নয়, আরও কোথাও কোনও পথচলা ইতিহাসের ইঙ্গিতে, কোনও এক উপলব্ধির জগতে, যেন সে শুনতে পেয়েছে। তাই সে ফিরে গেল নিজের তক্তপোশে। বালিশ টেনে মুখ গুঁজে দিল।

ভোরবেলা আম্মা প্রতিদিনের মতো ডাকলেন উঠোন থেকে, ওরে মবু, ওঠ। কত আর ঘুমোবি? সকাল কি তোর আর হয় না। মুনশিপাড়ার ছেলেরা কখন মাঠে চলে গেছে। উঠে একবার মাঠে যা।

মবু সেদিন এ খাট থেকে ও খাট করেনি। খাট বদলে ঘুম যেতে চায়নি। সোজা উঠে এসে বাঁশ থেকে লুঙ্গি টেনেছে। কাপড় পালটে উঠোনে নেমেছে। তারপর কামরাঙা গাছটার দিকে তাকিয়ে অন্য কোনও এক আসমানের কথা চিন্তা করেছে।

আম্মাজান পিছনে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন মবুর পিঠে। বললেন, যা হাত-মুখ ধুয়ে আয়। পান্তা খেয়ে মাঠে যা। গিয়ে দ্যাখ লোকগুলি কাজ করছে কি না। জমি-জিরাতগুলো তুই না দেখলে কে দেখবে বল।

মবুর সামনে এলেন তিনি, কী রে? চোখগুলো এমন লাল কেন? সারারাত ঘুমুসনি বুঝি।

মবু উত্তর করল না। কামরাঙা গাছ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে এনে আম্মাজানকে দেখল শুধু। তারপর চোখদুটো মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিল।

আম্মাজান আবার প্রশ্ন করলেন, তুই আজকাল এমন অন্যমনস্ক থাকিস কেন রে? তেমন করে আমার সঙ্গে কথা বলিস না। ডাকলে সাড়া দিস না। কী হয়েছে তোর? আমি কী করেছি বল তো। আমার আর কে আছে তুই ছাড়া।

আম্মাজান উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে আরও বলেছিলেন, ধান উঠুক, জৈনবের সঙ্গে সাদি এ সালেই দেব।

মনের জমাট বাঁধা অন্ধকারগুলো চিরে সেই সকালে মবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল। এ যে সাদি সম্বন্ধের কথা নয়। বলেছিল, কী যে বলিস আম্মা! আমি কি তোর সেই ব্যাটা? সাদির জন্য পাগল হবে তোর মবু!

তবে কী হয়েছে খুলে বল। এমন চুপচাপ থাকলে আমার বড় ভয় হয়। সফরে যাওয়ার আগে তোর বাপজিও এমন হয়ে থাকতেন। আম্মাজানের কণ্ঠে অনেক অসহায়ের জিজ্ঞাসা সেদিন।

না না, তেমন কিছু নয়।

সহজ প্রশ্নটাকে আড়াল করে বলল মবু, বাপ দাদা সাতপুরুষ নাবিক ছিল। আমার খুনে তো তারই ডাক আম্মা। তাই খুন যখন মোচড় দিয়ে ওঠে তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কিছু ভাবিস না আম্মা। দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। কসম যখন খেয়েছি তখন শামীনগড়ের মানুষ হয়েই বাঁচব।

আচ্ছা আম্মা...।— কী বলতে গিয়ে মবু এবার একেবারেই থেমে গেল। আর বলল না কিছু। আম্মাজান প্রতীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ। ব্যাটা তার বলবে কিছু। কিন্তু মবু আর মাটি থেকে চোখ সরাল না। উঠোনের উপর দু'জন পরস্পরের প্রতি এক নিদারুণ অবিশ্বাসের ভিতর নির্বাক থাকল।

আম্মাজান মবুর হাত ধরে টানলেন।

এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি ভয় হয় মবু। তুইও কি শেষ পর্যন্ত বাপের মতো হবি? যা, দুটো

পান্তা খেয়ে মাঠে যা। ধানগুলো দেখেশুনে তোল। দেশের যে অবস্থা, কখন অকাল আসবে সে ভয়েই মরি।

মবু গিয়েছিল মাঠে। জমি-জিরাত দেখার পরিবর্তে মনের ভিতর সেই অবিশ্বাসের জ্বালা বার বার অনুসন্ধান করেছিল যদি সেখানে কোথাও আম্মাজানকে অন্য মেয়েমানুষের মতো বিচার করা যায়।

কিন্তু.. !

কিন্তু যে অনেক।

অনেকগুলো কিন্তুই মবুর মনের ভিতর পাক খেতে থাকল। শামীনগড়ের মানুষেরা তাই তার সঙ্গে প্রাণ খুলে আর হাসি-মসকরা করতে সাহস করল না। কোথায় একটি কিন্তু ধরবে মবু, সেই ভয়ে তারাও যেন তাকে এড়িয়ে চলল।

মাঠে গিয়ে অস্থির এবং অসুস্থ দুই-ই হয়ে উঠল মন। অসময়ে বাড়ি ফেরার জন্য মন মেজাজ বেজায় তাগাদা দিল। বাড়ি ফিরল সেজন্য। উঠোনের উপর পা দিয়ে অনুভব করল আতাবেড়াটা কথা বলছে। ওপাশটায় উচ্চকিত হাসি। আম্মাজান আর রসিদ চাচা প্রাণ খুলে হাসছেন। অসুস্থ মনটা আরও অসুস্থ হয়ে উঠল। সে উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁকল, কে ওখানটায়, কে এমন করে হাসছে।

আতাবেড়ার পাশ থেকে আম্মাজান সহজ ভাবে বললেন, তোর রসিদ চাচা রে মবু। আয় আয়। এত সকাল সকাল মাঠ থেকে ফিরলি আজ?

মবু উঠোন থেকে সোজা উঠে গেল টিনকাঠের ঘরটায়। ক্লান্ত দেহ আর মন নিয়ে এলিয়ে পড়ল তক্তপোশের উপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, এ কী করলাম? আম্মাজানকে এমন কুৎসিত গালমন্দ দিলাম। খোদা এ কি সত্যি— আম্মাজান রসিদ চাচাকে নিকাহ করতে চান!

ঘরের ভিতর থেকে সে স্পষ্ট শুনল। রসিদ চাচা আম্মাজানকে ফিস ফিস করে বলছেন, ভাবি, বিপদে-আপদে কিন্তু ডাকিস। তারপর ঝুড়ি মাথায় গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

বিপদ! কীসের বিপদ! মবুর মতো এমন জোয়ান ব্যাটা থাকতে আম্মাজানের কী বিপদ? তা হলে রসিদ চাচা কী বলতে চায়, কী ভাবতে চায়।

আম্মাজান ঘরে ঢুকল। তক্তপোশ থেকে উঠে বসল মবু। বাঁ হাতটা ভর করল তক্তপোশের এক পাশে। পা দুটো নীচের মেঝেটা যেন স্পর্শ করতে পারছে না। আরও কাছে এলে মবু হঠাৎ প্রশ্ন করল, কীসের বিপদ আম্মা?

আমার আবার বিপদ কীসের?

এইমাত্র রসিদ চাচা যে বলে গেলেন।

আম্মাজান আবার হাসলেন। অত্যন্ত সরল সহজ হাসি। বললেন, এমনি কথার কথা। তোর চাচা বলল, ভাবি বিপদে-আপদে ডাকিস। ভাইয়া থাকলেও আজ আর আমায় এ কথা বলতে হত না। আল্লার কাজ আল্লা করেছেন। কিন্তু আল্লার এ দু'চোখ থাকতে তো তোদের দেখাশোনা না করে পারি না। দশজনে দশকথা বললেই কি আর শুনব?

দশজনের দশকথা তিনি শুনবেন না কেন?

সেই কথায় আম্মাজানের মুখ মেঘের মতো ভারী হয়ে গেল। মবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি কী যেন অনুসন্ধান করলেন। কাঠের প্রজ্বলিত আগুনে যে মুখটা রক্তাভ হয়ে উঠত নাবিক বংশের ইতিহাস শুনতে শুনতে, এই মুখ সেই মুখ কি না, আম্মাজানের পায়ে পায়ে যে আলি ঘুর ঘুর করত সেই মোবারক কি না তিনি যেন তাই হাতড়ে বেড়ালেন। তারপর যেমন সংলগ্ন হয়ে দু'জন দু'জনকে গল্প বলতেন তেমনি সংলগ্ন হয়ে বসলেন আম্মাজান মোবারকের পাশে। অত্যন্ত নরম কণ্ঠে শোনালেন তাকে, রসিদ তোর চাচা হয়।

আর কোনও কথা হল না। মবুর মন এমন উৎক্ষিপ্ত কেন, ঝোড়ো বাতাসের মতো মাঝে মাঝে এমন চড়াসুরে চিৎকার করছে কেন, অন্যমনস্ক হয়ে কী আকাশ-পাতাল ভাবে, আম্মাজান সব কিছুরই ঢেঁড়া টানতে গিয়ে তিনি নিজেই যেন তার তলায় পড়ে পিষে যাচ্ছেন।

'রসিদ তোর চাচা হয়', এ কথার ভিতর কতটা দৃঢ়তা আছে মবু অনুভব করতে পেরে তখুনি ছুটল শামীনগড়ের পথ ধরে। আম্মাজান পাঁজদোয়ার দিয়ে ভিতর-বাড়ির উঠোনে নামার সময় দরজায় ঠেস দিয়ে ডাকলেন, ভরদুপুরে মবু যাস না, যাস না, আমার মাথা খাস। মবু, ওরে তুই খাবি-দাবি না!

মবু তখন সকল শোনার বাইরে। সে শামীনগড়ের পথ ধরে-ধরে ছুটল। কোনও প্রশ্ন কিংবা কোনও জবাব দিল না, সে শুধু ছুটছে। চোখদুটো কেবল কী অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে নয়, মাঠের এক প্রান্তে একটি মেঠো পথ ধরে রসিদ তখন হন হন করে ছুটছে। মাথায় পানসুপুরির ঝুড়িটা কাঁপছে যেন। রোদের তীব্র আঁচের ভিতর একটি সরু রেখা টেনে টেনে মবু কোনও রকমে রসিদ মিঞার ঝাঁকাটা ধরে ফেলল। বলল, চাচা, কোনও দিন যদি শামীনগড়ের পথে দেখি তবে তোমার খুনে গোসল করব বলছি।

মবু!

রসিদ।

ভাইয়া না থাকায় তুই এত বড় কথা বললি। আমি গরিব বলে তুই আমায় খুন করবি?

গরিবের জন্য নয়, ইজ্জতের জন্য। বাপজির ব্যাটা যে এখনও বেঁচে আছে রসিদ।

তারপর দু'জন নীরবে দু'দিকে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি। সংসারের অনেকগুলি আবর্তনের ভিতর যেন আর-একটি ঘূর্ণাবর্ত। উঠেই থেমে গেছে। যদি ওঠে আবার, সেটা অন্য। সেটা নতুন করে উঠবে।

মবু মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াল। অনেকক্ষণ। পাহাড়ের পীঠস্থানের পাশে সে কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসেছিল। তারপর সূর্যাস্তে সে যেন কোথায় কোন গ্রামে শুনতে পেল মসজিদে আজান। ডাহুকের ডাক, ঘুঘু পাখির আর্তনাদে সে চমকে গেল। এই পাহাড়ের নীচেই কখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। ঘরে ফিরতে আজ অনেক রাত হবে যখন সে শামীনগড়ে পৌঁছবে।

শামীনগড়ে পৌঁছে দেখল ঘরের দরজা খোলা। সন্তর্পণে আতাবেড়া অতিক্রম করে ভিতরের উঠোনে ঢুকল। প্রদীপ জ্বলছে রান্নাঘরে। দরজার একটা পাট ভেজানো। রান্নাঘরে আম্মাজান জেগে রয়েছেন।

এক পাট দরজার উপর ভর করে উঁকি দিল মবু। ঘুম-ঘুম চোখে আম্মাজান ঢুলছেন। সামনে একটা টিনের থালায় খাবার ঢাকা। হাতে লাঠি। ঘুম-ঘুম চোখেও তিনি বেড়াল তাড়াচ্ছেন।

দরজা নড়ে উঠতেই আম্মাজান চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, কে? মবু, এসেছিস মবু?

মবু অন্ধকারে চোরের মতো দাঁড়িয়ে উত্তর করল, জি আম্মা।

সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে মাঠে-মাঠে ঘুরলি, এত রাত করে ঘরে ফিরলি? আমায় কষ্ট দিতে বুঝি তোর খুব ভাল লাগে?

মোবারক কোনও উত্তর না করে খেতে বসল। থালাটা কাছে টেনে মুখ তুলে একেবার আম্মার প্রতি তাকাল। তারপর খেতে খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, কত পানসুপুরি লাগে আম্মা?

কত আর লাগবে। তোর রসিদ চাচাকে এক কাঠা ধান দেই, রোজকার পান তিনি সেই থেকেই দিয়ে যান।

কাল আমি হাটে যাব ভাবছি। পানসুপুরি হাট থেকেই আনব ভাবছি। চাচা তোকে সরল মানুষ পেয়ে খুব ঠকাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে তো জানে না আম্মা, আমার মতো ব্যাটা তোর ঘরে আছে। জানলে নিশ্চয়ই এতটা ঠকাবার সাহস করত না।

কিন্তু ভোরে তোর রসিদ চাচা এলে কী বলব?

বলবি অনেকদিন সে ঠকিয়েছে, এখন থেকে তুই আর ঠকতে নারাজ।

এমন কথা মানুষ মানুষকে বলতে পারে? তুই বলতে পারতিস?— আম্মাজান এই প্রথম মবুর কাছে অসহায় বোধ করতে থাকলেন। মবু বড় হয়ে গেছে। বাপজির মতো মোটা গলায় আজ সেও শাসন করতে শিখেছে।

মোবারকের কথাগুলোর ভিতর কোথায় যেন এক বেসুরো আওয়াজ পেলেন আম্মাজান। ভেবে ভেবে অনেকক্ষণ নীরব থাকলেন তিনি। চোখদুটো ভারী হয়ে এল না, এমনকী কোনও ব্যথা অনুভব করলেন না। তবু কেন জানি এক অসহ্য যন্ত্রণা। এবং জীবনের হাজারও ব্যর্থতার গ্লানিগুলো অপমান হয়ে আজ হৃদয়ে বাজল। তিনি আর-একবারের জন্য মুখ তুলে বলতে পারলেন না, মোবারক তোর গলার সেই বেসুরো আওয়াজটা আতাবেড়ার এ পাশটায় একেবারে মিথ্যে। তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালাটায়। যেখানটায় দু'পাহাড় চিরে একটি ঝড়ের সংকেত শুনেছিলেন তিনি।

এক এক করে দু'দিন গেল। রসিদ চাচা আর এলেন না। আম্মাজান সে সম্বন্ধে মোবারককে আর

কোনও প্রশ্নই করলেন না। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তার শিথিল হয়ে উঠেছে। বন্ধনের দৃঢ় গিঁটগুলো ফসকা গেরোর মতো মনে হচ্ছে। এক্ষুনি খুলে পড়বে! যে-কোনও মুহূর্তে খুলে যেতে পারে।

মোবারকও কেমন আড়ালে-আবডালে দিনগুলো কাটাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে বসে গল্প আর জমাতে পারছে না। কোথায় যেন তার কুণ্ঠা। দিন-দিন কী করে যেন আম্মাজানের প্রতি এক ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হয়ে উঠছে।

আম্মাজান তাই একদিন স্পষ্টই অনুভব করতে পারলেন শামীনগড়ে তিনি উচ্ছিষ্ট। শামীনগড়ের সমাজ তাঁর প্রতি আরও বিরূপ হয়ে উঠেছে আর মোবারকও দিন দিন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। অন্যমনস্ক ভাব ওর এখনও কাটল না। সে আম্মাজানের কাছে আর মুখ তুলে, কিংবা হেসে গল্প করছে না। কাজের কথা, জোত-জমির কথা বলছে না। চুপচাপ থাকে। অসময়ে খায়। কোনওরকমে দিন গুজরান করছে। সে রাতে তিনি আবার জানালার ধারে দাঁড়ালেন। দু'পাহাড়ের ফাঁকটাকে দেখলেন। আসমানে এক টুকরো কাস্তের মতো চাঁদ। চাঁদে কালো কালো কলঙ্ক রেখা। জানালার দু'গরাদে মুখ রেখে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, আমি তবে খারাপ মেয়েমানুষ।

রাত গেল। ভোর হল। শামীনগড়ের জীবনে কোনও ব্যতিক্রম ঘটল না। মাঠে যারা যাবে তারা সার বেঁধে চলে গেছে। গৃহাগত নাবিকেরা হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে গড়ের পথ ধরে হাঁটল। বিবি বধূরা ঘাট থেকে জল এনে ঘরে ফিরছে। বাসন ধুয়ে যারা ঘাট থেকে ঘরে গেল তারা শুধু বলল, মবুর মা-টা কী! লজ্জা-শরমের বালাই নেই। রসিদটা আসে আর ওর সঙ্গে যত বেঢঙে আলাপ।

মবু ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াল। প্রতিদিনের মতো আজও ঝুলানো বাঁশ থেকে লুঙি টানল। পরনের পোশাকটা বদলাল। উঠোনে নেমে নিমের ডালে দাঁতন করল। দেখল কামরাঙা গাছটা। গাছে ফুল এসেছে প্রচুর। তারপর কামরাঙা গাছের ফাঁক দিয়ে জাফরিকাটা আসমানের দিকে নজর দিয়ে ডাকল, আম্মা।

কোনও শব্দ নেই, জবাব নেই, আতাবেড়ার পাশ দিয়ে একটি নেড়ি কুকুর কী চাটতে চাটতে বের হয়ে গেল। উঠোন অতিক্রম করে কুকুরটা গেল পুকুরের দিকে।

মবু আবার ডাকল, আম্মা!

দুটো হুলো বেড়াল আতাবেড়ার উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ তুলে ডাকল কিছুক্ষণ। তারপর ওরা গেল জৈনবদের বাড়ির দিকে।

মোবারক অন্যমনস্ক ভাবেই এল পাঁজদোয়ারে। দাঁতন ফেলে মুখ ধোয়ার সময় ডাকল, আম্মা, আম্মা!

কোনও উত্তর নেই, নেই, ঘাটে গেল বুঝি। কাঞ্চনের ডালটা ধরে আম্মা উন্মুখ হয়ে নেই তো! আতাবেড়াটা পর্যন্ত হেঁটে এসে দেখল সেখানেও তিনি নেই।

এবারে মবু ছুটে-ছুটে এল ঘাটে। চিৎকার করে ডাকল, আম্মা! আম্মা! আম্মা!

ঘাটের জল পরিষ্কার। দুটো পুঁটি মাছ জলের নীচে চিত হয়ে ডন খাচ্ছে, নাচছে। গত রাতের মবু আর আম্মার উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সে ছুটে ছুটে গেল আবার। আম্মা কোথাও যান না। এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত তিনি শামীনগড়ের কোনও গড়ে একা পা বাড়ান না। জৈনবদের বাড়িতে যাওয়ার সময় ডাকতেন মবুকে, চল মবু। তিনি কোথায়, তিনি কোথায়।

ছুটে ছুটে মবু জৈনবদের বাড়িতেও একবার গেল। খুব নিচু গলায় বলল, তোদের বাড়ি আম্মা, আম্মা এসেছেন?

বিস্ময়ে জৈনব বলল, কবে আসেন একা?

মোবারক হঠাৎ এবং এই প্রথম কেঁদে দিল ন্যাংটো ছেলের মতো। বলল, আম্মা বাড়িতে নেই, ঘাটে নেই, কোথাও নেই। জৈনব আমি কী করব, কাকে বলব, কোথায় খুঁজব?

জৈনবের চোখদুটো বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল, মবু কী বলছিস তুই? আম্মা নেই!

না, নেই। আম্মা আমার এক ডাকে সাড়া দেন। আজ কত ডাকলাম, কতবার কতভাবে, কিন্তু আম্মা তো সাড়া দিলেন না।

মবু এবার গাছে-গাছে দেখল। মাঠে-মাঠে খুঁজে বেড়াল। শামীনগড়ের প্রতি ঘাটের পাড়ে পাড়ে আম্মাজানের পায়ের ছাপ দেখার চেষ্টা করল। ফিস ফিস করে প্রতি ঘাটকে বলল, বল তুই বেইমানি করিসনি? আম্মাকে বুকে টেনে নিসনি?

ঘাটের জলে মাছের আওয়াজ হল। আর কোনও জবাব নেই।

হু হু করে উঠল মবুর মন। তিনি বুঝি কোথাও নেই, কোথাও নেই।

ঘরে ফিরে এল মবু। উঠোনের উপর একান্ত ছেলেমানুষের মতো গড়িয়ে পড়ল। কাঁদল গড়াগড়ি দিয়ে। কেঁদে এক কথা প্রকাশ করল শুধু, আম্মা—আম্মা—আম্মা। শামীনগড়ের মানুষেরা সেই দেখে ফিস ফিস করতে করতে পথে নেমে গেল।

কামরাঙা গাছটায় যে সবুজ টিয়াব দল কামবাঙা খেতে এসেছিল তাবা বিকেলের পড়ন্ত রোদে উড়ে-উড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্ধ্যাব ধূপছায়া অন্ধকার পাব হয়ে গুটি-গুটি যখন এল রাত্রি, তখন মবু নিজেকে আরও একা-একা অনুভব করল, তখনই সে দাঁড়াল গিয়ে হরীতকী গাছটার ছায়ায়। জৈনবকে ডেকে বলল, আম্মাকে খুঁজতে বের হলাম।

কোথায় খুঁজবে?

সব মেমানদেব বাড়ি। বসিদ চাচাব কাছে।

আমি খবব পাব কী কবে?

পাবি। খবব তোকে দেব।

মবু ছুটল গড় থেকে গড়ে। মাঠ থেকে মাঠে। পাহাড় থেকে আব-এক পাহাড়েব ছায়ায়। গ্রামেব পর গ্রাম পার হয়ে সে এল প্রথম বসিদ চাচাব বাড়ি। চাচার ভাঙা কুঁড়েতে ঢুকে গিয়ে ডাকল, আম্মা, এখানটায় এসেছিস? আম্মা।

বসিদ চাচাব ছোট ছোট ছেলেগুলো ডাক শুনে বের হয়ে এল। বলল, ভাইয়া তুই।

কেমন পাগলেব মতো শুধাল, তোব বাপজি কোথায় বে?

বাপজি ঘরে নেই। মাঠে গেছেন।

মাঠে গিয়ে মবু নাগাল পেল বসিদের। চিৎকার কবে বলল, অ বসিদ মিঞা, তোমাব ঘবে আম্মা আছেন? বলো, ঠিক কথা বলো, নয়তো তোমার একদিন কি আমাব একদিন।

বসিদ কাছাকাছি এসে বলল, কী বলছিস মবু। খবর কি তবে সত্যি, তোব আম্মা নিখোঁজ!

বসিদেব মুখেব দিকে চেয়ে হঠাৎ মবুর চোখদুটো মাটিতে নেমে এল। ম্যাটিব সঙ্গে মিশে গেল। ধীরে ধীবে বললে, এ কী সর্বনাশ কবলাম আমি আমাব।

মবু, আমি তো আব শামীনগড়ে যাইনি।

না না চাচা, সব ভুল সব ভুল। কিন্তু তাই বলে আমাব এমন সাজা। চাচা, আমি কোথায় যাব? আব কোথায় খুঁজব?

চল, দেখা যাক বলে রসিদও ওর সঙ্গ নিল, তাবপর অনেক দূর—অনেক দূবন্ধে।

অনেক খোঁজ। অনেক অনুসন্ধান।

মবুব মামাব ঘব বটেব-কান্দি। ঘুবতে ঘুরতে সেখানে মবু গেল। সব খুলে বলল। খবর দিল। মামা আর নানা বললেন, তোব সঙ্গে তোর আম্মা বেইমানি কবেছে। মায়-ঝিয়ে ঝগড়া হয়। বাপ-ব্যাটায় লাঠালাঠি হয়। তাই বলে রাতের অন্ধকারে ভেগে পড়া বেইমানি ছাড়া আর কী।

মামা বললেন, তোর ওইখানটায় কেউ নেই। কে তোরে দেখবে? এখন থেকে এখানটায় থাকবি।

মবু চুপ। কিছু বলল না। তবু কী দেখি-দেখি করে কতদিন এ দেশটায় কেটে গেল। বাড়ি তার আগলাচ্ছে জৈনব। জৈনব খাতুন।

কত আর আগলাবে? কতদিন আগলাবে? জৈনব তো উন্মুখ। কত প্রতীক্ষার রাত হয়তো হরীতকী গাছটার নীচে কাটছে। এবার তাই যেতে হয়। এবার শেষ ফয়সালা করতে হয়। শামীনগড় আজ আবার তাকে ডাকছে। জৈনব তার আকর্ষণ। শামীনগড়ে বেঁচে থাকার একমাত্র উপকরণ। আম্মাজানের কাছে মোবারকের কসম, আজ সবটাই নির্ভর করছে জৈনবের উপর।

শামীনগড়ে যখন ফিরে এল মবু তখন আর-এক অন্ধকার নেমেছে মসজিদের উপর। একটা কাক সে বাতের অন্ধকাবে মসজিদের উপর পড়ে চিৎকার করছে। অন্ধকারে মবুর শরীরটা কণ্টকিত হয়ে উঠল। অনেক দূর থেকে সে হেঁটে এসেছে, শরীর ক্লান্ত। সমস্ত দিনেব উপবাসে সে আর ভালভাবে পা ফেলতে

পারছে না। শামীনগড়ের কোনও মানুষের সঙ্গে পথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। একবার তাই সে জানতে পারল না দেশের খবর, ঘাটের খবর, গড়ের খবর।

কিন্তু উঠোনের উপর দিয়ে পা টিপে টিপে যখন বারান্দায় গিয়ে উঠল, দেখল ঘরের দরজা খোলা, একদিকের পাল্লাটা খসে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে ঘরের অনেকগুলো আশ্চর্য রাত একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। হাতড়ে হাতড়ে বেড়াল মবু। কোথাও কিছু আছে কি না দেখল। আম্মাজানের তক্তপোশটার উপর অন্ধকারে কতক্ষণ বসে থাকল। অনুভব করল ঘরদোরগুলি বড্ড ফাঁকা। পাশের তক্তপোশটা নেই। অনেক কিছু নেই। যে যার নিজের নিজের ভেবে রাতের বেলায় সব তুলে নিয়ে গেছে। জৈনব নেমকহারাম। এত কাছাকাছি থেকেও ঘরদোরগুলি দেখেনি।

তারপর সে গেল হরীতকী গাছটার নীচে। আজকের মতো একমুঠো আহারের বন্দোবস্ত হয় কি না সেই ভেবে ডাকল, জৈনব, ও জৈনব। একবার এসে দ্যাখ আমি না এসেছি।

প্রথম কোনও আওয়াজ এল না। পরে খুট করে একটি শব্দ হল। দরজা খোলার শব্দ। একটি ছায়া অন্ধকারকে আরও গভীর করে হবীতকী গাছটার নীচে নেমে আসছে।

খুব কাছাকাছি এল ছায়াটা। বলল, আমি জানি মবু তুই একদিন ফিরবি। তাই এতদিন ঘরে কান পেতে রেখেছি, কবে এসে তুই ডাকবি।

সহজ ভাবে জৈনব বলল, মামুর বাড়ি আম্মাকে পেলি?

মবু যেন কিছুই হয়নি এমনতর করে বলল, না, কোথায় আর পেলাম? কোথায় যে আম্মা হারিয়ে গেল আজও বুঝতে পারছি না। আমি চলে যাওয়ার পর থানা-পুলিশ হয়েছিল রে?

কে কাব থানা-পুলিশ করবে, তুমিও যেমন!

বড় খিদে পেয়েছে, একমুঠো খাবার দিবি? যা হয় কিছু।

দিচ্ছি, একটু দাঁড়া।— বলে ঘরের দিকে ফিরতেই মবু ওর হাত ধরে ফেলল। এবং কতদিন আগে যেমন করে টানত তেমনি বুকে টেনে নিতে চাইল।

জৈনব দূরে সরে দাঁড়াল। হাত তুলে নিল। বলল, বুকে আর টানিস না। এখন আমি অন্যের বিবি। কুদরত মিঞার সঙ্গে সাদি হয়ে গেছে।

সামনের অন্ধকারটাকে কে যেন চিরে দিল কি সংলগ্ন করে দিল, ঠিক ঠাওর করা গেল না। কিন্তু মবু তখনও ঝিম মেবে আছে। ভয়ে চোখ বুজে গেছে। দু'হাতে কান ঢেকে ফেলেছে। তবু বলেছে চিৎকার করে, কী বললি! কী বললি জৈনব?

পথটার উপর মবুর মাথাটা ঘুরতে থাকল। সমস্ত শামীনগড় যেন দুলছে। কাঁপছে। আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জৈনবের দেহটা খাতে পড়া ঘূর্ণাবর্তের মতো চোখের উপর পাক খেতে থাকল। এরা কে? এবা কোন ইতিহাস? এরা কোন ইতিহাসের বিবর্তনের কথা বলছে?

মবু শুধু বলল, একটা আলো দিবি?

খাবি না?

না। একটা আলো দে।

জৈনব কুপি জ্বালিয়ে ফিরে এল আবার। নীরবে কাঁঠালি চাঁপার অন্ধকারটা পার হয়ে এল উঠোনে। ঘরে ঢুকল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনায় পেল কাঠের বাক্স। খুঁজে খুঁজে দেখল কী আছে কী নেই। পেল শুধু নীচে সেই পুরনো আমলের ঘড়িটা, আর কিছু নেই। ঘরটা ফাঁকা। শঙ্খচূড়ের ঝাঁপিটা ফাঁকা।

জৈনবের প্রতি এবার রাগ-রাগ হয়ে বলল, শঙ্খচূড়টাকেও বিদায় করেছিস?

বিদায় করিনি। আছে। আমার কাছেই রয়েছে। ঝাঁপিতে থাকলে ওটা মরে ভূত হয়ে থাকত।

তারপর আর কোনও কথা নেই। ওরা আবার গেছে হরীতকীর গাছটার নীচে। কুপির আলোয় জৈনব গেছে শঙ্খচূড়টা আনতে।

সেদিন ওরা ছিল নিঃশব্দ। কাঁঠালি চাঁপার গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নীচে মবু চোরের মতো প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু আর ভাবতে পারছে না আম্মাজান আর জৈনব সম্বন্ধে। মনের ভিতর এক দুরন্ত ঝড়। শামীনগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঁচবে কী করে! ভোর হলে এ মুখ শামীনগড়ের সমাজকে আর দেখাবে কীভাবে!

জৈনব শঙ্খচূড়ের ঝাঁপিটা নিয়ে এলে চোরের মতোই ফিস ফিস করে বলল, আমার বাড়িতে যাবি একবার? বাপজির পেটিটা মাথায় তুলে দিবি।

জৈনব মবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে থাকল।

তুই যত পারিস আমায় শাস্তি দে। ঘর ছেড়ে তবু তুই যাস না।

আর কিছু বলতে পারল না, মাথা নিচু করে শুধু কাঁদল জৈনব।

শামীনগড়ের মাটির সঙ্গে কী আর সম্পর্ক! তুই হাসতে হাসতে কুদরত মিঞার সঙ্গে ঘর করলি, আম্মাজান হাসতে হাসতে নিখোঁজ হলেন, আমি আজ কাঁদতে কাঁদতেই না হয় নাবিক হলাম! কী বলিস, কী বলিস জৈনব।

বলে জৈনবের দু'হাত ধরে মবু এমন পাগলের মতো ঝাঁকি দিতে থাকল, মনে হল শুধু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেয়েটাকে খুন করবে। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটাকে বুকে চেপে মাথায় মুখ রেখে সে বলল, বাড়িঘর আমার দেখিস। কুদরতকে বলিস, তোর বাপজিকে বলিস, অন্তত সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে মসজিদে তিনি যেন একবার আজান দেন।

জৈনব মুখ তুলল না।

মবু আবার বলল, আজ আর বাধা দিস না। আমায় যেতেই হবে। সাত পুরুষের ধারাটা আমায় পাগল করে দিয়েছে।

জৈনব মুখ তুলে চাইল মোবারকের দিকে। বলল, নাবিক হলে চরিত্র মন্দ হয়।

মন্দ হবে না।

জৈনব সে তার বুকের উষ্ণ উত্তাপগুলো জড়ো করে প্রকাশ করল এবার, মাতব্বর মিঞা, তুমি নাবিক হও, কিন্তু চরিত্র মন্দ করতে পারবা না, কসম থাকল।

মোবারক শামীনগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে এক কসম ভেঙে আর-এক কসম খেল, নাবিক হব, চরিত্র মন্দ না করে বাঁচব, কসম খেলাম।

আর সানডায়েল ক্লকে পুরনো কসম ভেঙে নতুন কসম খেতে গিয়ে দেখল মোবারকের গুনাহ। হাজার গুনাহ। দেহটা না-পাক। নাবিক হব, চরিত্র মন্দ না করে বাঁচব, সে কসম আর থাকল না। বিশেষ করে বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর সে বুঝে আসছে, জৈনব যত স্বার্থপর, বাপজি তার দ্বিগুণ। শেখর বেজাত, অজাত, বে-শরিফের লোক। মোবারকের কথায় সে বিদ্রোহ করে। ওর ঘুম আসে না। আবার সেই বলে কিনা মবু ঘুমোলে তার ভাল লাগবে। ওসব কটাক্ষ। ওসব কটাক্ষ। ওসব বিদ্রুপ, চাচা আপন জান বাঁচা। আম্মাজান তাই নিখোঁজ হয়ে বাঁচলেন, বাপজি বাঁচলেন জাহাজডুবি থেকে... আর শেখর! সে বাঁচল..! সে বেইমান। সে অজাত, বেজাত, কাফের।... তোবা তোবা কী বকছি সব।.. খোদা হাফেজ।

মোবারক আজকাল দেখে লিলি ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ছায়ার মতো ছবির মতো বোট-ডেকে, ফোকশালে, স্টোকোলে—সর্বত্র যেন লিলি তার সঙ্গ নেয়।

ফোকশালে আর ফলকায় কতবার মোবারক অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চুপি চুপি বলেছে, এ তো কৌবি-পাইনের গুঁড়ি নয়, পিকাকোরা পার্কও নয়, পাহাড়ের সান ডায়েল ক্লকটা এখানে নেই। এ সমুদ্র, এখানে এলে ডুবতে হবে। মরতে হবে, এমন করে এসে সব সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি বলছি ডুবে মরব।

হাতঘড়িটার উপর একবার নজর দিল। কানের উপর রেখে দেখল। পরখ করল। আওয়াজ ঠিক উঠছে। আগের মতো, ওয়াচের সঙ্গে সময় মিলিয়ে উঠছে। লিলির ছায়াটা মন থেকে কিছুতেই সরছে না। মরছে না। বিবির মতো, জৈনবের মতো ঠোঁট টিপে হাসছে। বে-ইজ্জারি রং-তামাশা করছে। ভুলের মাশুল তুলছে। মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখল মোবারক, শেখর ক্রু-গ্যালি পার হয়ে ডেক-পথে নেমে আসছে। সমস্ত শরীর কম্বলে জড়ানো। পাজামার নীচে পা দুটো খালি। সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়ায় অবিন্যস্ত চুল কম্বল সব উড়ছে।

মোবারক তিন নম্বর বোটের আড়ালে আড়াল করল নিজেকে। আর কেন! আবার কেন!

সামনের ডেক-এ ডেক-জাহাজি ইয়াকুব রং করছে। রঙের টবটা কোমরে ঝুলছে ইয়াকুবের। মাস্টের উপর ঝুলে-ঝুলে রং করতে গিয়ে কিছু রং গড়িয়ে পড়েছে নীচে। আমলদার ধমকে উঠল মাস্টের গুঁড়ি

থেকে, অঃ মিঞা, রং পড়ছে, সাবধানে কাম করো। সেই সময় শেখর পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, নীচে চল মোবারক।

সে মুখ তুলল না। চোখ খুলে তাকাল না। মুখের উপর কতকগুলি বিকৃত রেখা শুধু কুঞ্চিত হচ্ছে। যেন বলতে চায়, আর কেন, আবার কেন। দোহাই তোদের, একা একটু থাকতে দে।

শেখর আবার বলল, নীচে চল মোবারক।

এবার সে মুখ তুলে উত্তর করল, মেহেরবানি করে এ হারামের জন্য আর তকলিফ না করলেও চলবে। মাথা গরম হয়েছে আমার, বেশ হয়েছে, ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ জানা। ওর কাছে ধরে নিয়ে চল। যা ইচ্ছে তাই কর। কিচ্ছু বলব না।

বলে নিজের হাতদুটো শেখরের প্রতি বাড়িয়ে ধরল।

শেখর ওর হাত ধরে বলল, নীচে চল। সেখানে তোর ভালর জন্য যা করতে হয় সব করব। চল। ও—ঠ।

মোবারক কিছুতেই উঠল না।

শেখর বাধ্য হয়ে মোবারকের পাশে বসল। স্কাইলাইটের কাচদুটো খোলা। ফাঁক দিয়ে শব্দ আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ। ওদের ছোট ছোট কথার আওয়াজগুলো সে শব্দের ভিতর ডুবে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বাকি সফরটা না ঘুমিয়ে কাটাবি ঠিক করলি।

না ঘুমিয়ে থাকতে পারলে মন্দ কী। কথাগুলো আবার মাথা গরমের মতো শোনাল না তো! পাশের জীবন্ত বিদ্রূপটার প্রতি চাইল আড়চোখে।

শেখর বলল, মরে যাবি যে।

যাক, মাথা গরমের কথা বলেনি! তুই কি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাস! শেখরের শরীরটা উত্তপ্ত ঠেকল। কপালে, বুকে হাত দিয়ে বলল মোবারক, তোর শরীরটা গরম ঠেকছে। ঠান্ডা লাগিয়ে আবার আমাকে ভোগাবি ভাবছিস! নীচে যা। নয়তো আবার জ্বর আসবে।

যাব। তুই যদি নীচে যাস তবে।

নীচে যেয়ে কী হবে? ঘুম আমার আসবে না। জানিস নালিশ আমার পর্বতপ্রমাণ। গুনাহ্ আমার হাজার গুনাহ।

ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় গায়ের কম্বলটা নীচে পড়ে গেল। মোবারক কম্বলটা শেখরের শরীরে জড়িয়ে দিল। তারপর দু'জনেই চুপ। দু'জনেই নির্বাক হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু মোবারক কিছু যেন বলতে চায়। তীব্র দুঃসহ অস্বস্তিতে সে ছটফট করছে। কিছু বলার কিছু প্রকাশের প্রচণ্ড আগ্রহ। শেখরের কাছে ঝুঁকে চেয়েছে কিছু প্রকাশ করতে। কিন্তু পারেনি। ভাটা ভাটা দুটো চোখ নিয়ে এগিয়ে এসে আবার সরে গেছে। শেষে একবার শেখরের প্রতি অত্যন্ত বেশি ঝুঁকতেই সে একান্ত বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, এমন করছিস কেন! কী হয়েছে তোর!

মোবারক এবার বিবর্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ল। গেজগ্লাস ফাটার তীব্র আওয়াজের মতো সে আওয়াজ ভয়াবহ। অবিশ্বাস্য। রূপকথার মতো শোনাল। মোবারক তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে। শেখর, লিলি আমার বোন!

দুটো সমুদ্রমানুষকে কেন্দ্র করে একটি অবিশ্বাস্য এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। শেখর ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধের মতো, হা-ঘরের মানুষের মতো চেয়ে আছে। কোনও প্রশ্ন, কোনও কথা, কোনও জবাব উঠল না ওর মুখ থেকে। কেবল কেমন এক রহস্যময় জীবনের গন্ধ পেল মোবারকের দুটো চোখে! চোখদুটোর ভিতর হাজারো গুনাহের আফসোস নোনা জলের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে।

এমন করে চুপচাপ বসে থাকা কেমন ঠেকছে। খালি পা দুটো কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাবল, কিছু বলতে হয়, কিছু করতে হয়। বলতে হয় লিলির সম্বন্ধে। মনের ভিতর যখন সেই ভাবনাগুলো পাক খাচ্ছে তখন দেখল মোবারক নিজেই প্রকাশ করছে আবার, লিলিকে ছেড়ে আসতে হল সেজন্য। কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। জৈনবের মতো, বিবির মতো ভালবাসি। সে আমার অপরাধ, আমার গোস্তাগি। আমার মনের হারেমে হারাম খাচ্ছি। বোনের মতো রক্তের সম্পর্ক আছে বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। বিবেক তাই জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে। বাপজি বেইমান, বাপজি হারাম, শেখর, বাপজি কাফের!

সেই অপরিচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট প্রকাশের ভিতর মোবারক কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে। ওর নরম উজ্জ্বল চোখদুটোতে ঘন কুয়াশার অন্ধকার। ওর বলিষ্ঠ উজ্জ্বল মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে ওর ঠোঁটদুটো। ও যেন ওরই ভিতর মরে আছে। শুধু তার পিটানো সাদা ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে কতকগুলি স্তিমিত এবং বিনীত শব্দ। মোবারক বলছে, আমার বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। সবাই— সব, সব আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করল। ঘড়ি, বাপজি, আম্মা, লিলি, জৈনব সবাই আমায় ঠকাল। কী নিয়ে বাঁচব শেখর? কাকে নিয়ে বাঁচব? কী নিয়ে মরব, কাকে নিয়ে বাঁচব? বাঁচা-মবা দুই-ই সমান, বেঁচে থাকলে বিবেক শুধু বলবে, তুমি হারাম, গুনাহগার না-পাক। মরলে খোদা আমায় ক্ষমা করবেন না। ইন্তেকালের সময় শয়তানের পাল্লায় পড়ব।

একটু থেমে মোবারক আবার বলল, জৈনবের কসম, আম্মার কসম ভেঙে যে কসম নতুন করে গড়তে গেলাম, সে কসম যে হাজার গুনাহে ভরা শেখর।

কাঁদছে মোবারক।

সে সমুদ্র-জীবনের শেষ ক'টা পাতা উল্টাচ্ছে।

শেখর জবু-থুবু হয়ে বসে আছে। নক্ষত্র গুনছে আকাশের। নক্ষত্রের রাত দেখাব চেষ্টা করছে, কিন্তু নক্ষত্রবিহীন আসমান। নীল আকাশ। এখনও দিন। সূর্য এখনও পাটে বসেনি। বড্ড নরম আলো আকাশে। দিনেরা এখানে এখন সকাল্ল-সকাল বিদায় নেয়। সাগরপাখিরা সন্ধ্যায় অন্ধকাব ডানায় বয়ে নেমে আসে। তবু দিন। তবু সূর্য নক্ষত্রেব বাতকে জানালাব পর্দা সরাতে দেয়নি। বলেনি, এবার তুমি এসো, আমি যাই।

তবে শেখর আকাশেব দিকে চেয়ে এত কী দেখছে!

সাগরপাখিরা জাহাজ-ডেকে সন্ধ্যা নামানোর আগে ববফেব দেশে উড়ে চলে গেল। আকাশের গায়ে কোনও নাম, কোনও নক্ষত্রের কথা বলে গেল না। কোন নক্ষত্র কোন সন্ধ্যায় সান-ডায়েল ক্লকে কোন জন্মের ইশারা দিয়েছিল তার রেখাচিহ্ন এঁকে গেল না পর্যন্ত।

আকাশের গায়ে তবু কিছু ঘটছে। সেই পালতোলা নৌকোর জাহাজ থেকে সপ্তডিঙা ময়ূরপঙ্খী। বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়। সঙ্গে চলেছে মাঝিমাল্লা। দাঁড় পড়ছে ছপ ছপ। আওয়াজ উঠছে পালে বৈঠাব। পাঁচশ জোয়ানেব ক্লান্ত জীবন। বাঙালি তারা, নাবিক তারা। চাঁটগাই সিলেটি সমুদ্রমানুষ তারা।

দুটো মানুষ। দুটো জাহাজি। দুই দরিয়ার নীরব বন্ধু। একজনের আকাশে আগামী দিনের অনেক সুখ স্বপ্নেব রেখাচিহ্ন। একজনের আসমানে কোনও চিহ্ন নেই। শুধু আফসোস আর আফসোস।

আসমান আব আকাশ, পানি আর জল, সাগব আর দরিয়া, বেদনার চিহ্ন আর সুখেব বেখা মিলিয়ে তবু দুই বন্ধু। এক ফোকশালের দুই জাহাজি।

ওদের মুখ আকাশমুখো। আসমানমুখো ওদের চিন্তা।

জাহাজ তাদের দেশে ফিরছে। সিডনিতে দু'দিনের হল্ট। গম বোঝাই হবে, তারপর আর-এক দবিয়া, আর্ব-এক উপসাগর, আর-এক নদীর মোহনা। নাম তার গঙ্গা। গঙ্গার উপকূলে জাহাজ বাঁধা হবে।

সে কোনদিন। কবে? এমন অনেক জিজ্ঞাসা এখনও অনেক জাহাজিদেব মনে। মোবারক আর শেখর দুই সমুদ্রমানুষ মেঘের রং বদলানো দেখতে দেখতে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনে নিল।

মোবারক হঠাৎ ইতিহাসের পাতা উল্টানো থামিয়ে দিল। খরগোশের মতো চোখ তুলে সে কেবল পথ খুঁজছে। বলল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে—

নক্ষত্রেরা এবার আকাশে উঠতে শুরু করছে। এক, দুই, তিন, অনেক। শেখর আর গুনতে পারছে না।

ফসফেট টানতে পারছে না আর জাহাজিরা। নেরু আয়লেন্ড, ওসেন আয়লেন্ড, কাকাতিয়া আয়লেন্ড—এক, দুই, তিন। অনেক অনেক। অনেক দ্বীপে ওরা ঘুরেছে ফসফেট বোঝাইয়ের জন্য। বাপজি আর তার জাহাজের জাহাজিরাও সেদিন আসমানমুখো মুখ করে ডেকের উপর বসেছিল বোধ হয়। দেশে ফেরার জন্য কোম্পানির ঘরে হয়তো সেদিন নালিশ জানিয়েছিল।

অনেক কথা বলল মোবারক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা। শামীনগড়ের কথা, বাপজি, ফ্লাওয়ার গার্ল, আম্মাজান, জৈনব— অনেক অনেক কথা।

তবু কথা ফুরোয় না। শেষ হয় না আম্মাজানের জলছবি। আকাশ দরিয়া নক্ষত্র মিশে এখনও অনেক

খবরের সামিয়ানা টানছে। সেই সামিয়ানার নীচে বসে দুই সমুদ্রমানুষ পরস্পরকে আরও গভীর ভাবে টেনে নিল।

কিছু বলে হাঁফ ছাড়ছে মোবারক। হাঁফ ছেড়ে ক্রমশ হালকা হচ্ছে।

ঘড়িটা তেমনি পড়ে আছে পেটিতে, মোবারক বলল।— কিন্তু মেলবোর্নে জাহাজ পৌঁছলে ওর সম্বন্ধে আমার কেন জানি অহেতুক কৌতূহল জন্মাল। সাউথ-ওয়ার্ফের বস্তি অঞ্চল থেকে ফেরার পথে বুঝতে পারলাম কৌতূহল অহেতুক নয়। ঘড়ির সঙ্গে বাপজির জীবন জড়িয়ে আছে। আম্মাজানকে হারালাম। নাবিক হওয়ার জন্য এ ইবলিশটাই বুঝি দায়ী। ভাবলাম পোর্ট-মেলবোর্নে দিই ওকে বেচে। এতকাল ধরে যে পড়ে থাকল, তাকে কিনবেই বা কে! প্রথম সফরে চাবিটা ওর ঘুরিয়েছি। কিন্তু একেবারে বেসামাল। তোয়াক্কা কিছুতেই কাউকে করল না। কাঁটাদুটো আর ঘুরল না, পেটিতে ফেলে রাখা আর পানিতে ফেলে দেওয়া এক কথা। তবু ফেলে দিতে মন চাইল না, বাপজির হাতের চিহ্ন।

জাহাজে খবর এল, ফসফেট নিয়ে জাহাজ যাচ্ছে নিউ-প্লাইমাউথে। ভায়া সিডনি জাহাজ যাবে। মনে হল ঘড়ি ঠিক করে নিলে হয়। ইবলিশটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে বাপজির জাহাজডুবি সমুদ্র দেখলে হয়।

সেদিন সেজন্য ঘড়িটা নিয়ে কলিন স্ট্রিটে গিয়েছি। ইউনিভার্সিটির পাশের রাস্তায় ঘড়ি মেরামতের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি। কোথাও কিছু হল না। ঘড়িটা বহু পুরনো আর ভিন্ন নিয়মের মেরামত বলে সবাই মেরামত করতে অস্বীকার করল।

তবে শেষ পর্যন্ত হল। প্রিন্সেস স্ট্রিটের দোকানি বলল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। কোনও ক্ষতি নেই বলে আমিও দিলাম। ঘড়িটা মেরামত হল। চার ঘণ্টা অন্তর দম দিতে হয় এই ফারাকটা থাকল শুধু।

বাপজির চিহ্নটা হাতে বাঁধলাম। তুই চোখের ওপর দেখলি সেই থেকে কেমন বিষণ্ণ হয়ে পডেছি। তখন থেকে আম্মাজানকে খুব বেশি মনে পড়ল। বাপজির অস্পষ্ট 'খোদা হাফেজ' কানে ঠোক্কর খেতে থাকল বার বার। জাহাজটাকে মনে হল দোজখের মতো। ওয়াচে ওয়াচে চাবি দেওয়া, কানের উপর রেখে শব্দ শোনা, সময় ঠিক রাখা অভ্যাসে দাঁড়াল। তার উপর অন্যান্য জাহাজিদের বিদ্রুপ-কটাক্ষে ভেঙে পডলাম। তবু প্রতিজ্ঞা আমার, বাপজির চিহ্নটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে রাত বারোটার সময় ঝুঁকে থাকলাম তিন নম্বর জেটির পাশে রেলিং-এর উপর। ঝড়ের সমুদ্রকে দেখলাম, বে অফ বিসকে, লিমন বে আর বে অফ বেঙ্গলের মতো ঝড়ের সমুদ্র। তুই কিন্তু শেখর এক সময় উপরে এসে আমায় নীচে ফোকশালে নিয়ে গেলি।

কথা বলতে পারছে না মোবারক। গলাটা শুকিয়ে উঠছে। তবু কোনওবকমে যতটুকু পারছে বলছে।

তুই শোন, তুই শোন শেখর। সব শুনে যদি মোবারকের উপর দয়া হয়, তবে অন্তত শেখর, ভগবানের কাছে একবার এ হারামের জন্য প্রার্থনা করিস। বলিস, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করো।

আসলে ঘড়িটায় এখনও রহমত মিঞার কঙ্কাল লেগে আছে। বাপজি কী যে করল! কেন যে বোঝলেন না, রেনিল বেশ্যা মেয়ে, তিনি প্রতারিত, রহমত মিঞাও প্রতারিত! আমিই বা কেন যে ঘড়িটা নিয়ে ঘুরছি। বহমত মিঞার প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নিচ্ছে। ঘড়িটার জন্য হাজার গুনাহগার হলাম। জৈনবের কসম খেলাপ হল। রহমত মিঞার কঙ্কালটা টেনে নিয়ে গেল বুঝি আমাদের বাপজির কবরখানায়। বিশ বছর আগের প্রেতাত্মা চার্চের ঘড়িতে বারোটা বেজে আওয়াজ তুলল যেন, বারোটা বাজালাম। বাপজি গলা টিপেছে দোস্তের, তুমি গলা টিপেছ বোনের ইজ্জতের। তোমার নিজের। তাই সেই রাতে বাপজির মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম, খোদা হাফেজ। চোখ থেকে সে রাতেই ঘুম বিদায় নিল। আজ পর্যন্ত ঘুমোতে পারলাম না। দরিয়া কেবল ডাকছে।

কববখানায় 'খোদা হাফেজ' চিৎকার তোলার পর কী করে, কেমন করে ফিজরয়ের এক গরম কাঠের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম সে খেয়াল নেই। কিন্তু চোখ খুলতে দেখি লিলিও ঝুঁকে আছে আমার মুখের ওপর। অবাক চোখে কিছু যেন বলছে। ওর মা প্রতীক্ষা করছেন। কিছু যেন থেকে থেকে বলছেন। ক'জন লোক, ওরা ডাক্তার, আবার প্রতিবেশীও হতে পারে, তাদের খুব ধীর এবং সংক্ষিপ্ত পায়চারি। কার্পেটের উপর তাঁরা ধীরে ধীরে হাঁটছেন। মনে হল সব ঘরটা জুড়ে উষ্ণ স্রোত। লিলির চোখদুটো ভার ভার।

আমার দৃষ্টি তখন একটি ছবির প্রতি। নিথর, নিঃশব্দ দেহটা। লিলির মা হাতের স্পন্দন শুনছেন। হাতের স্পন্দন অনুভব করছেন।

চুপ হয়ে শুনছে শেখর। শুনে শুনে বিরক্ত বোধ করছে না। কিংবা বেইমানের মতো বলছে না, আজ থাক, হয়েছে, এ খবর অনেকবার আর অনেককাল থেকে শুনে আসছি।

সমুদ্রে ভাঙা ভাঙা ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় কল কল মিঠে আওয়াজ। এই মিঠে সমুদ্রকে দেখে মনে হয় না সে কোনওদিন জাহাজের সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারে, বেইমানি করতে পারে।

ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে পোর্ট-হোলের আলো। তিনি পায়চারি করছেন কেবিনে। পোর্ট-হোলের আলোটা সেজন্য মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে উঠছে।

ব্রিজের উইংস-এ আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আলো জ্বেলেছেন সুখানি সাহেব। ব্রিজ থেকে তিনি নীচে নামবার সময় বললেন, এইবার আনন্দ করেন, যত পারেন করেন। জাহাজ সিডনি হইয়া দেশে ফিরব। সিডনি যাইয়া গম আর রসদ নিব।

সব জাহাজির চোখে-মুখে ঘরে ফেরার আনন্দ। দেশে ফেরার জন্য ওরা মনকে প্রস্তুত করছে। বাংকে বাংকে আবার গল্প-গুজব জমে উঠেছে— দেশের গল্প, ঘরের গল্প। কার বিবি, কার মেমান সফর-ফেরত কী কী নিতে বলেছে, কলকাতা বন্দরে স্থিতিতে থাকার খরচ, কতদিন থাকতে হবে তারও হিসেব টানছে তারা।

রাতে সেদিন জাহাজে ফিরতে পারলাম না। লিলি আমাকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে। তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করাবে, কী যে পাগলামি শুরু করল লিলি! যাবার পথে কবরখানা পড়ে, লিলি তার বাবার সমাধিতে কিছু ফুল দিল। আমাকেও দিতে বলল। নুয়ে ফুল দিতেই বড় বড় অক্ষরে সেই নাম— বোঝলাম ঘড়িটাই আমাকে তাড়া করছে, সে-ই রহমত মিঞার প্রেতাত্মা। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। জ্ঞান হারালাম।

মোবারক তখন বলছে, সে পরিবেশ, সে পরিচয়, সে কাহিনি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই রাত আর দিনকে মনে হচ্ছে আমার এক দুঃস্বপ্ন। ফিজরয় যেন অন্য এক দুনিয়া। বাপজি অয়েল পেন্টিং-এর ভেতর। পাশে লিলি। ওর টানা টানা চোখদুটোয় আম্মাজানের গভীরতা। বাপজি ঠিক আগের মতো। এক গাল ছাঁটা ছাঁটা কুচকুচে দাড়ি। বলিষ্ঠ মুখে সুষ্ঠু গোঁফের রেখা।

চেয়ে আছি। চোখ আমার বাপজির মুখ থেকে নামছে না। বাপজিকে নতুন করে যেন দেখছি।

লিলির মা আমার চেতনাকে উসকে দেবার জন্য বললেন, ফটোর মানুষটি মূক-বধির।

কবোষ্ণ কাঠের ঘর।

এই কথায় সবার মন উন্মুখ হয়ে উঠল সেই কাঠের ঘরে। যাঁরা পায়চারি করছিলেন তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। চেতনা ফিরেছে ভেবে লিলির মা আশ্বস্ত হলেন। তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফটোর মানুষটি মূক-বধির। যতদিন ঘর করেছিলেন তিনি একজন মূক-বধিরকে নিয়ে ঘর করেছিলেন।

বাপজির বাঙালির মুখের কমনীয় রূপ লিলির মাকে মুগ্ধ করেছিল। এক নতুন শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিয়েছিল। দু'বার স্বামী-পরিত্যক্তা মাউরি মেয়ে জানলেন না মানুষটি কোন দেশের, কোন জাতের। তিনি জানতে চাইলেনও না, জানতে দিলেনও না কাউকে।

কী ভেবে চুপ করে থাকল মোবারক। ইয়াকুব মাস্টে রং করে তখন ফিরে গেছে ফোকশালে। আমলদার ফলঞ্চগুলো টেনে তুলেছে ফলকার ভিতর থেকে। মেজ-মালোম একবার ব্রিজের উইংস-এর ভিতর দিয়ে কী যেন দেখে গেছেন।

সত্যি লিলির মা এক অদ্ভুত মেয়ে। লিলির বাপজি যেমন এক অদ্ভুত মানুষ। পৃথিবীর উচ্চতম কাইটিরিয়া জলপ্রপাতের সংলগ্ন ছোট্ট পাহাড়ের এক অদ্ভুত পরিবেশের ভিতর তিনি বড় হয়েছেন। লিলির আম্মা হেনলে উইলির জীবনও অনেক সংকটের মধ্যে দিয়ে গেছে। কর্ণফুলির বাঁওড়ের ধারে বাপজির মতো। জলপ্রপাত থেকে হ্রদের তীরে, ছোট্ট নদীরেখায় অনেক বেদনার চিহ্ন উইলিও রেখে এসেছিলেন সেদিন।

ছোট্ট শহর থেকে নেলসনে।

উইলো গাছের ছায়া থেকে এলেন কৌরি-পাইনের ছায়ায়। দক্ষিণ দ্বীপের বন্য-ঘাসের পৃথিবী থেকে

তিনি এলেন সমুদ্রতীরে, নেলসন বন্দরে। স্থল থেকে জলে। জীবন থেকে যৌবনে। অনেক সুখ থেকে অনেক দুঃখে।

নেলসনে তিনি প্রথমবারের মতো স্বামী-পরিত্যক্তা হলেন। শহরের স্থানীয় হাসপাতালের লেডি ডাক্তার হেনলে উইলি একদিন তাই শহর পরিত্যাগ করে কুক প্রণালী অতিক্রম করেন। এবং ওয়েলিংটনে এসে দ্বিতীয়বার জীবনকে নতুন করে অনুসন্ধান করার সময় এক নতুন মানুষের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হলেন।

বিবাহ করলেন দ্বিতীয়বার। পরিত্যক্তাও হলেন দ্বিতীয়বারের মতো।

তিনি বলেছিলেন, সে আমার অন্ধকার যুগ। মনে পড়ছে না কখন কীভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদগুলো এল। তবু বুঝতে আমার বাকি নেই দুটো মতের অমিল থেকেই আমি আর তারা যে যার মতো দু'দিকে সরে দাঁড়িয়েছি।

তারপর থেকে আবার অনুসন্ধান এবং জীবনের অনুসন্ধানে ক্রমশ তিনি তাঁর মোটর দক্ষিণ থেকে কেবল উত্তরে চালিয়েছেন। মোটর চালিয়ে এসেছেন তিনি ওয়েলিংটন থেকে ওয়াঙ্গানাইতে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। অপরিসীম বেদনায় হেনলে উইলি তখন পীড়িত। শান্তির আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে তিনি চাকুরির পর চাকুরি ত্যাগ করছেন। তিনি অবলম্বন চান। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চান আবার।

এবার তিনি চলেছেন হায়েরার দিকে। সেও দক্ষিণ থেকে উত্তরে। মোটর চলেছে সমুদ্রের বেলাভূমির পাড় ধরে। পিচ ঢালা সড়কে তাঁর গাড়ি। এঁকেবেঁকে অনেক তীরের বাঁক ঘুরে। মোটর আর উইলি উভয়ই কেমন অন্যমনস্ক যেন। চলতে হবে তাই চলছেন। থামতে হবে তাই থামছেন। একবার শুধু ভেবেছিলেন, এভাবে দক্ষিণ থেকে কেবল উত্তরে না চলে সমুদ্র অতিক্রম করলে কেমন হয়? বিদেশে গিয়ে নতুন ভাবে ঘর বাঁধলে কেমন হয়?

হঠাৎ লক্ষ করলেন উইলি প্রবল ঝড়ে এ দেশটা ক্ষত-বিক্ষত। দূরের গমখেতগুলো পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেছে। সকাল করে দু'-একজন গ্রামের মানুষ মাঠের আলে আলে ভেড়ার পাল নিয়ে দূরের পাহাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ঝর ঝর করে নুন ঝরছে গমের শিষ থেকে। আর-একটা মাঠ পার হলেন। ঘাসগুলো বড় নোনা। আর-একটা বাঁকে মোটর ঘুরতেই আচমকা স্পিড কমিয়ে দিয়ে কিছু যেন দেখলেন। অনুভব করলেন ঝড়ের শিস দেওয়া ডাক এখনও কমেনি। দূর-দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে সেই ডাক।

মোটর দাঁড় করিয়ে দিলেন পথের উপর। দূর থেকে পরখ করলেন তিনি। কিছু যেন বিস্ময়ের চিহ্ন পেলেন। প্রবল ঝড়ে ক্ষত-বিক্ষত বেলাভূমিতে ঢেউয়ের ঠোঁট ছুঁয়ে মৃত মানুষের বুঝি আভাস পেলেন।

সন্তর্পণে তিনি পথ অতিক্রম করে বেলাভূমিতে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চললেন। ঝড়ের সমুদ্র হয়তো এখানটায় ফেলে গেছে নির্দয়ের মতো। নীরবে যে মানুষটা মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে।

সেই বেলাভূমি সংলগ্ন কোনও মানুষের সাড়া পেলেন না তিনি। কাকে ডাকবেন? কাকে ডেকে বলবেন, তোমরা আমার সঙ্গে এসো। কী বিস্ময় আছে এখানটায় দেখি।

না, তিনি কিছুই বলতে পারেননি। বলতে পারেননি, এসো তোমরা। কে আছ কাছে, একবার এসে এই ঝড়ে-পড়া মানুষকে রক্ষা করো।

তিনি শুধু হেঁটে গিয়েছিলেন নীচে। চুপচাপ নেমে গিয়েছিলেন বেলাভূমির বুকে।

সমুদ্রের কাছাকাছি এসে টুপিটা হাতে নিলেন। ঈশ্বরকে মনে করে ক্রশ টানলেন বুকে। বুকে লাইফ-বেল্ট আঁটা মানুষটা চিত হয়ে আছে। মুখ শুকনো। কপাল ভেজা-ভেজা। চোখদুটো স্থির। কিন্তু উজ্জ্বল। তিনি দ্রুত মানুষটির পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন। কোথাও জাহাজডুবি কিংবা নৌকাডুবি হয়েছে। হাত তুলে মুখের কাছে এবং বুকের কাছে কান রেখে আরও কিছু অনুভব করতে গিয়ে অবাক হলেন উইলি। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বেলাভূমির কিনারে কিনারে মানুষ দেখার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কোনও মানুষ নেই, কেউ নেই। কোথাও নেই। উইলি বলে উঠল, ঈশ্বর, কী হবে?

মোটর অনেক উপরে। কালো সরীসৃপের মতো পথটা এখান থেকে অস্পষ্ট। বেলাভূমির বুক ভেঙে উপরে ওঠা আরও কঠিন। তবু উইলি ভিজা সপসপে মানুষটাকে দু'হাতে তোলার চেষ্টা করলেন। ঘেমে উঠলেন তিনি। এতটুকু নড়ল না দেহটা। এপাশ ওপাশ হল মাত্র। তিনি উপুড় করে দিলেন দেহটা। তিনি তবু সাহায্য চান। মানুষ চান। আর বলেন, ঈশ্বর, কী হবে।

ঈশ্বর, কী হবে? দেহটার ভিতর এখনও যে প্রাণ আছে। অস্থির হয়ে উঠল উইলির মনটা। ছুটতে ছুটতে

গিয়ে তিনি উপরে উঠলেন। মোটর নীচে নামানোর অনেক চেষ্টা। চাকাগুলি ক্যাঁক ক্যাঁক করে উঠল। বালিতে আটকে যাচ্ছে চাকা। মোটর তিনি এতটুকু নড়াতে পারলেন না।

কী উপায় তবে! কী করা যায় তা হলে? যতক্ষণ মানুষের কোনও সাড়া না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি মৃতপ্রায় মানুষটার জন্য কী করতে পারেন! অনেকগুলো ভাবনা এসে উইলিকে উত্তেজিত করে তুলল।

কিছু শুকনো খড়ের প্রয়োজন। আগুন জ্বালালে শরীরটা অন্তত গরম থাকবে। আগুন জ্বালার জন্য তিনি আকাশ-পাতাল ভাবলেন। গ্রাম এখানে কোথায়, কোনদিকে কে জানে! শুধু একটু আগুন। আগুন পেলে মানুষটা বাঁচবে। দিগন্ত জুড়ে শুধু সমুদ্র আর বেলাভূমি। আগুন নেই। মানুষ নেই। ঝড় এখানে জীবনের কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি যাকে ধরে উইলি খড়কুটো অনুসন্ধান করবেন।

মাথাটা নিচু করে কিছু আবার ভাবলেন তিনি। বললেন, ঈশ্বর, পেয়েছি!

বটুয়া নিলেন সোফা থেকে। সিগারেট লাইটারটা হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে ফেললেন সোফাটা। নারকোলের ছোবড়া বের কবে হাফ গ্যালন পেট্রল নিলেন টিনে। তাবপর আবাব নীচে, আরও নীচে। আগুন জ্বালানো হল। ভিজে জামাকাপড়গুলো খুলে একধারে রেখে দিলেন। এপাশ-ওপাশ করে সেঁকে নিলেন দেহটা। সেই সময় বিমুগ্ধ হলেন তিনি। মানুষটি পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এসেছে কে জানে! বাঙালি চেহারায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, ঈশ্বর, কী হবে?

বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল উইলিকে। কোনও মানুষের চিহ্ন পান কি না তার জন্য পরীক্ষা করলেন। ভোরের কুয়াশা তখন দূরে সরে গেছে। সকালেব সূর্য উঁকি দিচ্ছে অন্য এক পাহাড়-প্রান্তে। এবার উইলি জেলেডিঙির শব্দ পেলেন। তারাও দূরে। অনেক দূবে। শুধু পালেব ছায়া দূব থেকে আলতো ভাবে এসে বালিয়াড়িতে থেমেছে। কানে এসে ঠোক্কব খাচ্ছে কাঠেব ঠক ঠক শব্দ। পাশেব পাহাড়টাও প্রতিধ্বনি করছে—ঠক ঠক।

উইলি সন্তর্পণে জলের ভিতর নেমে গেলেন। ডিঙিগুলোর কাছে পৌঁছানোব চেষ্টা কবলেন তিনি। জলের ভিতর দাঁড়িয়ে তিনি দু'হাত মুখের উপর ভাঁজ করে হু-ই-ই বলে এক বিপদসূচক চিৎকার তুললেন।

কোনও সাড়া এল না। তারা জল ডিঙিয়ে পাড়ে এল না।

তিনি আবার ডাকলেন। চিৎকারগুলো ভেসে ভেসে অন্য কোনও এক দেশে গিয়ে পৌঁছল। ফের ডাকলেন। আকাশে উড়িয়ে দিলেন হাতের রুমালটা।

জেলেডিঙিগুলি তখনও শব্দ তুলছে। ছপ ছপ। ঠক ঠক। পাহাড-প্রান্তেব অন্য বাঁক থেকে একটা নৌকো এদিকটায় এগিয়ে আসছে। আবও কাছে আসছে। নৌকাটা তীরে ভিড়লে তিনি বললেন, এদিকটায় এসো। দ্যাখো কী হয়েছে। কোন এক পৃথিবীর মানুষ এসে তোমার পৃথিবীতে নৌকা ভিড়িয়েছে।

জল থেকে তীরে উঠলেন উইলি। সাগরডুবি মানুষটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিদেশি নাবিককে দেখে তিনি অন্য কোনও এক জগতের কথা চিন্তা কবতে করতে, হাতের অনামিকায় দেখলেন আংটি। জ্বল জ্বল করছে, কিছু গোল গোল হরফ আংটির উপর। আবার অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কিছু ভাববাব সময় আংটিটা পকেটে ভরে ফেললেন।

ডিঙিটা টেনে টেনে তীরে তুলে ফেলল এবং লাফিয়ে নামল নৌকোব আরোহীরা। যেখানটায় উইলি বসে আছে সেখানটায় তারা ছুটল। জোয়ান জোয়ান উত্তর দ্বীপের মানুষেরা অবাক হল আর-একটি বিদেশি জোয়ানকে দেখে। জোয়ানের সাহস আছে! অনেক সময় ধরে ঝড়ের বিরুদ্ধে, ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটেছে। আকাশের নক্ষত্র দেখে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করেছে। সংজ্ঞা হাবিয়েছে এক সময়। চোখের নীচ তাই গভীর কালো কালো অক্ষত অনেক রেখা চিত হয়ে আছে। উলঙ্গ। উইলি জামাকাপড় এক ধারে জমা করে রেখেছে। লাইফ-বেল্টের উপর মাথাটা আলতোভাবে বাখা। বালির বুকে বিদেশি জোয়ান অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

উইলি বললেন, আপনারা দয়া করে একটু আসুন।

কী হল? এ তো উত্তর দ্বীপের দক্ষিণ দ্বীপের মানুষ নয়। এমন কেন হল?

উইলি বললেন, ঝড়ে জাহাজডুবি হয়েছে নিশ্চয়ই।

ঝড়। ঝড়-বাদলের রাত। কী ভয়ানক দুর্যোগ।

দয়া করে তুলে ধরুন। দেখবেন বুকে যেন চোট না লাগে।— উইলি মাথার কাছে এসে বললেন, মাথাটা আমি ধরছি।

পারবেন তো একা?

পারব। এবার আপনারা হাঁটুন।

কোথায় নিয়ে যাবেন?

ওই মোটরে।

সেখান থেকে?

অনেক দূরে। হায়রার কোনও হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারখানায়।

জাহাজডুবি মানুষটাকে মোটরে রাখার সময় জেলেডিঙির মানুষেরা বলল, আমরা আসি।

একজন বলল, বোধ হয় এ যাত্রা মানুষটা বাঁচবে।

বাঁচবে নয়। বাঁচতে হবে।— হেনলি উইলির তাই মত।

মোটরটা চলেছে। পিছন থেকে জেলেডিঙির মানুষেরা হাত তুলে বিদায় জানাল। উইলিও মুখটা ফিরিয়ে বাঁ হাতটা উপরের দিকে তুলে দিলেন। পিছনে তাকানোর সময় কই? সামনে, আরও সামনে তাকে ছুটতে হবে। পাহাড়ি উপত্যকার পর গ্রাম। মাঠ। বাঁপাশে সমুদ্রে ছোট ছোট সবুজ দ্বীপ। এখানে এসে পথ মোড় খেয়েছে। হঠাৎ মনে হল গাছগুলো, মাঠগুলো, ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে চার পাশে। কৌরি-পাইনের ছায়া, উইলোর ঝোপ, ঘাসের জঙ্গল সব সমান হয়ে গেছে চোখদুটোয়। উইলি কী ভেবে স্পিড আর-একটু কমিয়ে দিলেন।

এখান থেকে সমুদ্র আর দেখা যায় না। পাহাড় কেটে প্রশস্ত পথ গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কখনও গ্রাম, কখনও মাঠ, কখনও কৌরি-পাইনের বনভূমির ভিতর দিয়ে মোটর ছুটছে। মাঝে মাঝে মোটরটা উইলি সহসা থামিয়ে দিয়েছেন। জাহাজডুবি মানুষের বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করেছেন। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছেন।

কিন্তু কী নাম' কী নামে, কী পরিচয়ে হাসপাতালে ভরতি করানো হবে। কোন দেশ থেকে এসেছে! আংটির উপর গোল গোল হরফগুলো নিশ্চয়ই ওর নাম অথবা দেশের নাম। এখন ওর কী নাম হবে? হতে পারে? হাসপাতালে কী বলব? দক্ষিণ দ্বীপের মানুষ? মন্দ হয় না। মাওরি। ওই বেশ, ওই ভাল। হেনাফোর্ড। হেনলি হেনাফোর্ড। বেশ হবে। ওই ভাল হবে।

হেনলি উইলি আরও কী সব ভাবল। শির শির করে কাঁপল কানদুটো। ঠোঁটদুটো কাঁপল। কী সব ভাবছে। ওই পথ। পথের মোড়েই ডাক্তারখানা। আরও পরে হাসপাতালের সদর দরজা।

মোবারকের ফুসফুস থেকে একটি বিলম্বিত দীর্ঘ নিশ্বাস কাঠের পাটাতনকে আসন্ন ঝড় থেকে যেন বিমুক্ত করে দিল। ছায়া ছায়া অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে আবার। দু'নম্বর পরির সুখানি ব্রিজে ওঠে গেছে। দু'উইংস-এর মাথায় পাক খেয়ে শেষবেলায় এসে থেমেছে কম্পাসটার সামনে' লাভবাস লাইন ঠিক করছে। তিন নম্বর মালোম পায়চারি করছেন ব্রিজে।

প্রশ্ন করল শেখর, হায়েরাতে তিনি ভাল হয়ে উঠলেন?

ভাল হলেন। কিন্তু কথা বলতে পারলেন না আর।

গভীর আগ্রহে শেখর পুনরায় প্রশ্ন করল, তিনি কি কখনও কথা বলতে পারেননি, কিংবা কানে শুনতে পাননি?

না। তিনি কথা বলতে পারতেন না, কানে শুনতে পেতেন না। উইলি একজন বোবা মানুষকে নিয়ে আঠারো বছর ঘর করেছেন। নেলসন থেকে যে অনেক দুঃখকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, নিউ-প্লাইমাউথে সে দুঃখ আর এক বিন্দু রইল না। এখানে তিনি এক সুখের নীড় রচনা করেছিলেন। উইলির নূতন জীবনের সঙ্গে বাপজি পরিচিত হল স্বামী হিসাবে। লিলি উইলির মেয়ে। বাপজির দ্বিতীয় সন্তান।

মোবারক বুঝি এবার শেষ বারের মতো দম নিল। অন্ধকারে শেখরের হাত খুঁজল। হাতের উপর হাত চেপে শেষ বারের মতো গল্প করতে চাইল। পাটাতনের উপর কম্বলের নীচে হাত ঢাকা শেখরের।

আর-একটু সংলগ্ন হয়ে বসল তাই। ফিস ফিস করে বলল, সমুদ্রমানুষেরা সহজে মরে না শেখর। গত সফরে রেঙ্গুনে যাওয়ার পথে সমুদ্র থেকে দু'জন জাহাজিকে তুলে নিয়েছি। ওরা ছিল কোরিয়ার যুদ্ধবন্দি মানুষ। ছত্রিশ দিন ওরা একনাগাড়ে জলের উপর ভেসে ছিল। বিভিন্ন দেশের পত্রিকাগুলো ফলাও করে কত খবর।

মোবারক এবার শেখরের হাতদুটো কম্বলের নীচ থেকে টেনে আনল। হাত ধরে বলল, বাপজি জাহাজডুবি থেকে বাঁচবেন, সে আর বিস্ময়ের কী। সে তেমন বলার কী। তবু বললাম তোকে। অনেক কথা বললাম। আমি না-পাক মানুষ, আমার ডাক আল্লার কানে পৌঁছায় না। তিনি আমার ডাক শুনবেন না। কিন্তু তুই গুনাহগার হসনি। তোর ডাক তিনি শুনবেন, তুই অন্তত তোর ঈশ্বরেব কাছে একবার প্রার্থনা করিস। বলিস, ঈশ্বর তুমি ওকে ক্ষমা কোরো। মবু অনেক কসম খেয়ে অনেক ভেঙেছে, বোনের ইজ্জত নিয়েছে, এবার তুমি ওকে শাস্তি দাও।

সহসা শেখরের দুটো হাত খুব শক্ত করে ধরে চিৎকার করে উঠল মোবারক, বলিস শেখর, তুই বলিস এ গুনাহগাবেব্ন জন্য। তোর ঈশ্বরের কাছে বলিস, ওকে শাস্তি দাও, ওকে ঘুমোতে দাও। কসম থাকল তোর উপর শেখর। তুই বলিস, তুই ডাকিস তোর ঈশ্বরকে।

শেখর কিছু বলল না। বলতে পারল না।

দু'জন সমুদ্রমানুষ ছায়া ছায়া অন্ধকারে অনুভব করতে পারল সমুদ্র কাঁপছে। ফানেল ঝুঁকছে একবার গঙ্গাবাজু আবার যমুনাবাজু। ঝড় ওঠার লক্ষণ। চিড়িয়া পাখিগুলো তখন আকাশ আর সমুদ্রকে ছেয়ে ফেলেছে। ওরা ডাক তুলেছে ঝড়ের ডাক। টাইফুনের ডাক। অতল সমুদ্র হতে শঙ্খচিলের আওয়াজ।

বাত গভীর। এগারোটা বেজে গেছে। তিন নম্বর পরির আমলদার আড়ামোড়া ভাঙল। হাই তুলে তুড়ি দিল মুখে। পাশেব বাংকগুলোকে সজাগ করার জন্য বেলিং-এ শব্দ করল।

শেখর অনেকগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শব্দে জেগে গেছে। অন্ধকার ফোকশালে একবার চোখ খুলে আবার চোখ বুজে পড়ে আছে। পাশের বাংকটা নিশ্চয়ই খালি। প্রতি রাতের মতো সে এখন বোট-ডেকে। ধড়ির উপর ছায়া ছায়া অন্ধকারটায় ঝুঁকছে। 'খোদা হাফেজ' বলছে দু'হাত উপরে তুলে।

উঠবে উঠবে করেও শেখর দেরি করে ফেলল উঠতে। সে জানে তাকে উঠতে হবেই। মোবাবককে বোট-ডেক থেকে ধবে আনতে হবে। প্রতি রাতের মতো বাংকে জোর করে শুইয়ে দিতে হবে। ঠান্ডা শীতের জন্য কম্বল ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। তার উপর হাতদুটো ভাল করে নিরাময় হয়ে ওঠেনি। একটি ঘোর অবসাদ শেখরকে ঘিরে রেখেছে। উঠবে উঠবে করেও উঠতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে পাশের ফোকশালেব টুংটাং শব্দ শুনছে। থালা-মগের আওয়াজ। কোনও পরিদার বুঝি নীচে নেমে দু'নম্বর পরীর কিছু ঠিক ঠাক করছে।

স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনটা খুব মোচড় খাচ্ছে। খাঁজকাটা বড় হুইলটা ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। ঝড় ওঠার আগে প্রতি রাতে এমনি করে কাঁদে। শেখরের শব্দটা মুখস্থ হয়ে গেছে। এই শুনে ওর নূতন জাহাজি বুকটা ভয়ে ধুক ধুক শুরু করে। কম্বলের নীচে মুখ রেখে সে উঠি উঠি করে সব শুনল। সামনের পথটা ধরে কজন পবিদার গায়ে নীল উর্দি জড়িয়ে সিঁড়িতে উঠে যাচ্ছে। ওরা তিন নম্বর ওয়াচের পরিদার। সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ কেমন হালকা। কেমন অসংলগ্ন। সমুদ্রের নীরবতা কত ভয়ানক, শব্দগুলো তাই যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

উপরের ডেক-এ কিছু নাবিকের ফেরার শব্দ আসছে। অস্পষ্ট কথা বিনিময় হল। তিন নম্বর পরিদারেরা এখন গিয়ে অফিসার গ্যালিব ছাদে বসে আছে। বয়লার রুমের গরমের আঁচ এই ছাদ থেকেই পাওয়া যায়। এ দলে থাকবে বুড়ো বাদশা মিঞা। সকলের শেষে সে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে অফিসার গ্যালির ছাদে গিয়ে বসবে।

বাদশা মিঞা কুঁজো হয়ে গেছে জাহাজের কাজ করতে করতে। বছবের পর বছর সফর দিয়ে হাজারও নাবিকের গল্প জমা করে রেখেছে। ওর সঙ্গে পরি দিয়ে লাভ আছে। আগুন নিভিয়ে, ছাই হাপিজ করে কিছুটা কয়লা সুটের মুখে ঠেলে বাংকে সে বসবে গল্প করতে। বাদশা একের পর এক উজির নাজিরের গল্প করবে। শেষ পর্যন্ত সে গল্প করবে নিজের। পাঁচ নম্বর বিবিটা কী কবে এক

নম্বর বিবির ছাওয়ালের সঙ্গে ভেগে পড়েছিল, আজকাল রসিয়ে রসিয়ে সে গল্পও করে।

নাঃ, শুয়ে থাকলে আর চলে না। উঠতে হবেই যখন তখন তাড়াতাড়ি ওঠাই ভাল। সোয়েটার গায়ে দিতে হবে। টুপি মাথায় পরতে হবে। অনেক কাজ। অনেক কাজ হাতে নিয়ে শেখর বাংক থেকে নামল। হাই তুলল। কিন্তু এমন করে আর কতদিন? কী যে ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে মোবারক। আর কত বার কত রাতে তাকে টেনে নামাবে? বিরক্তিতে শেখরের মুখটা ব্যাজার হয়ে গেল। তবু আলো জ্বেলে কম্বলটা টেনে নিতেই অবাক হল, এক অখণ্ড বিস্ময় পাশের বাংকটাতে। সমুদ্রমানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কম্বলটা এক পাশে পড়ে থাকায় শীত ঢাকছে না ওর। হাতে হাতঘড়িটা নেই। বালকেডেও ঝুলছে না। তন্ন তন্ন করে পেটি বদনা সব খুলল। সেখানেও নেই। কিন্তু মোবারকের বাংকের পাশে এসে দাঁড়াতেই আর-এক হিমেল তরঙ্গ গা বেয়ে নামতে থাকল। সব কিছু অবিন্যস্ত। অসংলগ্ন। পা দুটো, হাতদুটো— সব। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে। তীব্র শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

হাতটা আস্তে বাড়াল। হয়তো শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু হাতটা কিছুতেই সটান হয়ে পড়ে থাকা মানুষটার উপর যেতে চাইছে না। পারছে না একবার পরখ করে দেখতে মোবারক মরে ঠান্ডা হয়ে আছে কি না। চিৎকার করে ডাকতে চাইল, মো—বা—র—ক। কিন্তু কিছুতেই গলা থেকে ডাক উঠল না। তাই অসহায় বিবর্ণ ফোকশালের আলোতে শেখর কেঁদে উঠল, ঈশ্বর! কী হবে? কী হবে।

তবু শেষ প্রচেষ্টা ওর। কোনওরকমে এবার হাতটা না বাড়িয়ে মুখ বাড়াল ওর মাথার কাছে। মুখের কাছে মুখ রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে পরীক্ষা করল, আছে কি নেই। এবার কাঁদবে কি চিৎকার করবে ভেবে পেল না। ভেবে পেল না ঈশ্বরকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে, না মোবারককে জড়িয়ে ধরে বলবে, মোবারক ঘুমোচ্ছে। ওর চোখে সমুদ্র-ঘুম।

কিছুই করতে পারল না। যতক্ষণ পারল মোবারকের সমস্ত শরীরে কম্বলটা ঢেকে দিয়ে ওর মাথার উপর মুখ রেখে পড়ে রইল।

রাত তিনটার সময় কোনও জাহাজির সিঁড়ি দিয়ে ফোকশালে নামার ঠক ঠক আওয়াজে ঘুম ভাঙল শেখরের। জেগে দেখল সে ঘুমিয়েছিল সমুদ্রমানুষের বুকের উপর মুখ রেখে। বুক থেকে মুখ তুলে সহজ হয়ে দাঁড়াল। চোখ রগড়ে নিজের কম্বল দুটো তুলে আনল বাংক থেকে, বিছিয়ে দিল সমুদ্র-ঘুম ঘুমিয়ে থাকা সমুদ্রমানুষের উপর। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মনটা। পরিতৃপ্ত হৃদয়। আর সে সময় দুটো হাত আপনিতেই জোড় হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে—খোদা, তুমি ওকে শাস্তি দাও। ঈশ্বর, তুমি ওকে ক্ষমা করো। প্রভু, তোমার আশীর্বাদে সে তার পুরনো জীবন ফিরে পাক।

সমুদ্রে আজ কোনও সঙ্কীর্ণতা রইল না। সব ধর্ম সব মানুষের ভালর জন্য। সেজন্য বুঝি খোদা, ঈশ্বর, প্রভুকে ডাকতে গিয়ে গলা ওর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। চোখ এল ঝাপসা হয়ে। মোবারকের অসহায় পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে খোদা ও ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সে কেঁদে ফেলল।

রাত সোয়া তিনটার সময় স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে তেল দিতে এসে তেলওয়ালা ইমরান ডেকে গেল মোবারককে। ওকে ওয়াচে যেতে হবে। শেখর নিজের প্রায় শুকিয়ে-ওঠা আহত হাতদুটোকে একবাব ভাঁজ করে আবার খুলল। পরীক্ষা করল ওর সামর্থ্যটুকুকে। সমুদ্রমানুষ জাহাজে থাকায় দু'নম্বর বয়লার, কোম্পানির পুষে রাখা কসবি ওর সঙ্গে কিছুতেই বিদ্রূপ করতে আজ সাহস করবে না। তাই ইমরান ডাকলে ওকে বাধা দিয়ে বলল, মোবারককে ডেকো না চাচা। ওর পরি আমি দেব। ওকে ঘুমোতে দাও। মোবারক ঘুমোক। খোদা হাফেজ।

সমুদ্রপাখির কান্না

দুব থেকে দুবান্তে ঘুঘু পাখির কান্নাব মতো সরে যাচ্ছে নারকেলের বাগান, তাল সুপাবিব বন, ছোট বড় খুপরি ঘর, তেলের কল।

দু'পাশে জেলেডিঙিগুলো, নাচছে ওরা। ঢেউয়ের মাথায় ডিঙিগুলো কাঁপছে। দূবে জাল সরিয়ে নিযেছে জেলেরা। জাল টানবে তারা। টাটকা ইলিশ ধরবে। বাজারে বলবে, গঙ্গাব ইলিশ।

একটা ফেরি পারাপাব করছে' দু'পাবেব পড়শিদেব। ওবা তাদেব দেখছে, ভাবছে আকাশ-পাতাল।

এখানে পাটকলেব চিমনির ধোঁয়া আকাশটাকে আব কালো কবছে না। নীল পাঁশুটে আকাশ। খুব উপবে গন্ডা-চাবেক শকুন, খুব নীচে গন্ডা দুই চিল। ডিঙিব জেলেবা হাতে লাঠি নিয়ে এখন চিল তাড়াচ্ছে।

উজান বাইছে গঙ্গাব নীচে ইলিশেব ঝাঁকগুলো।

চোখ-ঝলসানো দুপুরের রোদ। মাঠে মাঠে ইটের ভাটা। দুটো গোরুর গাড়ি ইট বোঝাই। মাঠ ভেঙে গ্রামেব দিকে ওরা চলেছে। গাড়োয়ান হাঁকছে, চল চল। কেমন একটা টাক-ফাটানো শব্দ।

এত দুব থেকে সে শব্দ অস্পষ্ট। জাহাজিবা সে শব্দ শুনতে পায় না। প্রপেলারটা গায়ে ছন্দ মেখে শব্দ তুলছে—ঝিক ঝিক। বিচিত্র রকমের আওয়াজ। জাহাজিরা সে আওয়াজে অভ্যস্ত।

এ নদী ভাবতবর্ষের নদী। নাম তার গঙ্গা। পাড়েব মাটি বাংলাদেশ, চিল শকুন, গোরুর গাড়ি, টেনে টুনে শাড়ির আঁচল বাঁধা, শির শির কবে কাঁপানো হাওয়া, সবুজ-ঘাস, নীল নীল আকাশ, কালো মেঘের ঝম ঝম বৃষ্টি—এগুলো বাংলাদেশের গান। সবুজ-ঘাসে, অবুঝ-মনে দোল খাবার মতো এই দেশ। বাংলাদেশ। ইতিহাস ভূগোল বলে, বঙ্গদেশ। সাহেবরা বলেন, বেঙ্গল। ওপারের জঙ্গলে খালের ধারে নিশুতি-রাতে চুপি চুপি যারা হাঁটে, তাদেব বলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

সেই দেশের একদল মানুষ বিদেশের মালবাহী জাহাজে জাহাজি হয়ে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে।

দূরে—এ, অনেক দূরের দিগন্তে একটা ঝোপের মতো ছোট্ট আকাশ। মেজ-মালোম সেই দিকে হাত তুলে দিয়েছেন। একটা ঘন-নীল জলার পাশে সবুজ একটা দেশ। বিষণ্ণ দেশ।

মেজ-মালোম ডেকের উপর দাঁড়িয়ে একজন জাহাজিকে ডেকে বললেন, দ্যাটস সুন্দব-বন আই থিংক। দ্যায়ার ড্যাড কিলড এ রয়েল বেঙ্গল টাইগ্রেস।

দ্যাটস মাইট বি।— সেই জাহাজি জবাব দিল। আত্মগত ভাবে বলল, রয়েল বেঙ্গল টাইগ্রেস—মেয়ে বাঘ। মেজ-মালোমের বাপ একটা মেয়ে-বাঘ খুন করেছিলেন।

আমলদার ক'জন জাহাজির সাহায্যে ফলঙ্কা বাঁধছে। সেও শুনল কথাগুলো। শুনতে তারও ভাল লাগছে। মেজ-মালোমের বাপ একটা মেয়ে-বাঘ খুন কবেছে। মদত আছে, সাহেবের ব্যাটা সাহেব। বিলিতি সাহেব। রং চটে গেছে বাংলাদেশের হাড়গলানো নোনা গরমে। পিঠের ঘা-গুলো দগদগে লাল। ফোসকা গলে এমনটা হয়েছে।

গঙ্গার জল কেটে জাহাজ গিয়ে নামবে সমুদ্রে। জোয়ারে জোয়ারে নদীর মোহনায় গিয়ে পড়তে হবে। আজকে নিয়ে তিন জোয়ার লাগল। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গঙ্গা। খাঁড়িতে জল কম। দু'দিন লেগে গেল কলকাতা বন্দর থেকে এতটা পথ আসতে। আজকের জোয়ারে জাহাজ উপসাগবে গিয়ে নামবে।

প্রপেলারটা তেমন পাক খাচ্ছে না। নীচ থেকে কাদা-জল তুলে আনছে। খাঁড়িতে জল কম বলে পাইলটকে জোরে চোং ফুঁকতে হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন পায়চারি করছেন ব্রিজে। ব্রিজের দু' উইংস-এ এসে মাঝে মাঝে থামছেন। উঁকি দিচ্ছেন নীচে। ডেক-জাহাজিদের উইন্ডস-হোলে রং করা দেখছেন। পঁচিশ টাকার খালাসি বেঁটেখাটো মোটা মানুষ। তর তর করে মাস্টে চড়ে ডাকছে, হেঁইও মিঞা, রঙের টবটা দাও।

রগচটা আমলদার টেক্কা দিল কথায়।

আরে মিঞা, রইয়া সইয়া কাম করো। সারা সফর ত পইড়্যা থাকল, এখন থাইকা এত ক্যান? বাড়িআলারে কাম দ্যাখাও বুঝি!

পঁচিশ টাকার খালাসি এবার চেপে বসল।

নীচ থাইকা কথা কইতে মিঞা জুইত লাগে। ওপরে আইসা কথাটা কও তো দ্যাখি মরদের বাচ্চা তবে স্যান কমু।

ব্রিজের দিকে চাইল আমলদার। বাড়িআলা ব্রিজে আছেন কি নেই দেখল। পাইলট কম্পাসটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্টিয়ারিং-এর উপর ঝুঁকে আছেন সুখানি সাহেব। বাড়িআলা গেছে চার্ট-রুমে। মৌকা বুঝে কথা পাড়ল আমলদার।

আরে ব্যাডা! ব্যাডার কথা শোনো! কাম না কইরা আমলদার হইলাম নাকি!

অনুত্তম উঠে আসছে ইঞ্জিন-রুম থেকে। কয়লার কালো নীল জাহাজি উর্দিটা। সমস্ত মুখে কালির ছোপ। ক্লান্ত। আস্তে আস্তে ডেক-এ পা ফেলছে। মাস্টের নীচে এসে সে ফলকার উপর প্রথমবারের মতো বসল।

পঁচিশ টাকার খালাসি ফলগুা থেকে বলছে, দিমু নাকি রঙের টব উবুত কইর‍্যা?

মুখ তুলে হাসল অনুত্তম।

জাহাজে উঠে সকলকে তো দোস বলে জেনেছি। দোসের যদি এমন তরিবত হয় তবে দেবে রঙেব টব উবুত করে।

কীরকম লাগছে নতুন সফর? বায়লটের গরমটা ক্যামন? বাবু-মানষের কি এ কাম সাজে।

অনুত্তমের বিষণ্ণ মুখ দেখে আমলদার ডেক-বড়-টিন্ডালের দয়া হল। দড়িটায় আরও শক্ত করে গিঁট মেরে বলল, যাও গোসল করো গা। দানাপানি দুইটা মুখে দ্যাওগা। চোখ মুখ কই গেছে গা।

অনুত্তম ফলকার উপর দু'পা তুলে আরও কিছুক্ষণ বসল। ড্যারিকের ছায়া ওর মুখে পড়েছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরটায় একটা মাটিকাটা জাহাজ। ক'জন জাহাজি সে জাহাজটায় রেলিং-এ ঝুঁকে আছে। অনুত্তম হঠাৎ ডাকল, চাচা ও চাচা, এদিকটায় একটু শোনবেন?

আমারে ডাকছ নাকি?

বলে ডেক-বড়-টিন্ডাল কাছে এল। পাশে বসল। টুপিটা খুলে রাখল ফলকার উপরে। টুপিতে রং লেগে রয়েছে। একটা বিড়ি হুস হুস করে টানল টিন্ডাল।

অনুত্তম বলল, আচ্ছা, দু'দিনে তো এতটুকু এলাম। জাহাজ সমুদ্রে পড়বে কখন?

ক্যান্ নদীটা ভাল লাগছে না? নিজের দ্যাশটা ছাইড়া যাইতে কষ্ট হয় না!

অনুত্তম চুপ করে থাকল। কষ্ট হয়, সে কষ্টের কথা তার মনে-মনেই থাক। জাহাজটা মালবাহী—তেরোজন ডেক-ক্রু, পঁচিশজন ইঞ্জিন-ক্রু। মেসরুম বয়, মেট বাটলার। ডেক-অফিসার, ক্যাপ্টেন, পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়ার। অ্যাপ্রেন্টিস দু'জন। জাহাজের সমাজ এবং সামাজিকতা এরাই। ডেক, ইঞ্জিন-ক্রু অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের। দু'জন মাত্র বাঙালি হিন্দু ইঞ্জিন-রুমে আছে। মন এবং মেজাজ মিলিয়ে এদের সঙ্গে চলতে কষ্ট হয়। কাজেই দুঃসহ হয়েছে। তবু সে বলল, সমুদ্র আর কতদূর! গঙ্গার বুকে বুকে আর কত সময় কাটবে!

দুইটা দিন তো হইলের ব্যাডা! এতেই বিরক্ত হইয়া পড়লা!

বিরক্ত। বিরক্ত কেন সে হবে। তবে জাহাজ ছাড়ার সময় মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অনেকগুলো ছবির ভিতর সে মা, বোন, পড়শিকে ভেবেছে। মা, বোন, পড়শির কথা ভেবে সে বেদনা অনুভব করেছে। বিরক্ত বোধ করেনি। কিন্তু কেন জানি জাহাজের এই দু'দিনকে মনে হয়েছে দু'সপ্তাহ।

ডেকের উপর প্রচণ্ড গরম, ইঞ্জিন-রুমে প্রচণ্ড খাটুনি। ঘুম আছে, খানা-পিনা আছে। গাল-গল্পও রয়েছে ডেক-এ। তার উপর রয়েছে জল আর জল। রয়েছে জাহাজের প্রথম নোঙর আর সফরের শেষ বন্দর, নিতান্ত আটপৌরে কথা। ডেকের উপর অনেক কৌতূহলও আছে, তবু কীসে যেন ফাঁক, কীসের অভাব যেন দু'দিনকে দুটো সপ্তাহ করে দিয়েছে। ঢাকাই ডেক-টিন্ডালকে সে সব কথা বলতে পারছে না, বুঝাতে পারছে না সে, তার দাহটা কোথায়।

অনুত্তম বিস্মিত হল পাড়ে পাড়ে একটি মেয়েমানুষকে চলতে দেখে। সে বলল, দেখতে পাচ্ছেন চাচা, টিবিটা মাড়িয়ে একটা মেয়েমানুষ যাচ্ছে!

ডেক-বড়-টিন্ডাল ঘাড় তুলে তাকাল।

ওর মাথার ঝুড়িতে কী আছে বলুন?

ডেক-বড়-টিন্ডাল উত্তর করল না। ডায়মন্ডহারবারের কাছে টিবিটার নীচে শেষবারের মতো মেয়েমানুষটা হারিয়ে গেল। গঙ্গার পাড়ে পাড়ে এতক্ষণ সে হেঁটে এসেছে। মাথায় ওর মোট। কাপড়টা টানটান করে পরা।

যে জাহাজিরা এতক্ষণ কাজ করছিল ডেক-এ, তারা রেলিং-এ এসে ভর করে দেখল অন্য একটা পৃথিবীকে। পৃথিবীটা টিবির ওপাশে হারিয়ে গেছে। আর দেখা যাচ্ছে না। আর সে অন্য টিবিতে উঠছে না। টিবিব এপাশে একটা গোরু লেজ উঁচিয়ে মাঠের দিকে ছুটছে।

অনুত্তম এবার ড্যারিকের ছায়া থেকে উঠে দাঁড়াল। জাহাজের যমুনাবাজুতে বাঙালি আগওয়ালা হবিদাস সেনকে হাতের ইশারায় ডাকল, শোনেন।

কাছে এলে বলল, মেজ-মালোম আপনার সঙ্গে কী কথা বললেন?

মেজ-মালোম ব্রিজে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, ব্রিজে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলাব দিয়ে কিছু দেখবেন।

কী দেখবেন তিনি?

কিছু দেখবেন হয়তো! গত সফরে এ ঘাটে অনেক মেয়েমানুষকে স্নান করতে দেখেছেন। এবার তারা স্নান করতে আসেনি কেন তিনি জানতে চাইলেন।

আপনি কী বললেন মেজ-মালোমকে?

কী বলব আর! তবু বললাম, বোধ হয় কুমিরে ঘাট থেকে মানুষ নিয়ে গেছে।

ব্রিজে মেজ-মালোম দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখে বাইনোকুলার। অনুত্তম তা-ও দেখল। মেজ-মালোম বাঁ দিকের উইংসটায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূরবিনের কাচটাতে এখন একটা মেয়েমানুষ মোট-মাথায় হাঁটছে।

মেজ-মালোম হয়তো ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, হাউ লাভলি!

ক্যাপ্টেন এসে এইমাত্র মেজ-মালোমের পাশে দাঁড়ালেন। তিনিও দূরবিনটা হাতে নিয়ে দেখলেন মেয়েমানুষটাকে।

ব্রিজে উঠে গিয়ে একবার দেখলে হত। যমুনাবাজুর উইংস-এ ভর করে বললে হত, এনি ওম্যান সেকেন্ড! কিন্তু বুড়ো ক্যাপ্টেনের মুখে অনেকগুলো রেখা। রেখাগুলো বুঝি জাহাজি জীবনের বন্দর পাওয়ার প্রতীক। মুখের রেখাগুলো সহস্র বন্দরের কথা বলছে। অনুত্তম আর ব্রিজে উঠতে সাহস করল না। মুখের উপর রেখা পড়ুক তখন উঠবে। সে আবার হাঁটতে থাকল।

নদীর পুবদিকটায় আর-একটা নদী এসে এখানে গঙ্গা-যমুনা হয়েছে। পাল তুলেছে দুটো নৌকা, পাটের নৌকা। ওরাও গিয়ে নদীর মোহানায় নামবে। নদীর পশ্চিম তীরে হাঁড়ি-বোঝাই অনেক কোষা নৌকা। নৌকার গলুই থেকে উনুনের ধোঁয়া উঠছে। নৌকার মাঝি কড়াইয়ে ইলিশ মাছের ডিম ভাজছে। ভাজা-ভাজা গন্ধ ডিমের। অনুত্তম জাহাজের গলুইয়ে উঠে জোরে শ্বাস নিল দুটো। ভাজা ডিমের গন্ধে জিভটা ভারী হয়ে উঠল।

ডান দিকের গ্যালিটায় ডেক-ভাণ্ডারি ঝিমোচ্ছে। হাতে কাজ নেই ওর এখন। মেজাজের গল্প হচ্ছে ডেক-কশপের সঙ্গে। গত সফরে ক্ল্যানলাইন কোম্পানির সারেং সাবের কেচ্ছা কেত্তন হচ্ছে। হুস্ হুস্ পাইপ টানছে ভান্ডারি।

ডেক-কশপের হাতে রঙের টব। রংগুলো ডেক-জাহাজিদের দিয়ে এসে একটু সময়ের জন্য গল্প করছে। গল্প করা তার অভ্যাস। দেশের গল্প, জোত-জমির গল্প, তিন নম্বর বিবির গল্প। বড় দুঃখ তার,

বিবিরা দেশে ফেরার আগে বেইমানি করে। তিন নম্বর বিবিটা এখনও ঠিক আছে। এবার দেশে ফিরে হয়তো তাকেও বেঠিক দেখবে। মিঞা-মাতব্বরদের ডেকে তালাক দেবে তখন। জাহাজিদের বিবি বদলানোটা সুখের নয়, স্বভাবের নয়, দুঃখের। কিনারায় লোকগুলো তা টের করতে পারে না। অযথা গালমন্দ দেয়, দোষারোপ করে।

গলুইয়ের শেষ দিকটায় যেখানে কোম্পানির ফ্ল্যাগ উড়ছে, সেই রেলিং-এ ভর করে ইঞ্জিন-ছোট-টিন্ডাল গলা ছেড়ে গান ধরেছে। খুব খাটো মানুষ টিন্ডাল। সামনের দুটো দাঁত সোনায় বাঁধানো। যেমন কালো তেমন রোগা বিশীর্ণ মানুষ। গলার রগগুলো গুন টানা নৌকার মতো টিন্ডালের দেহটাকে টানছে। রগগুলো ভাসা-ভাসা। বুকে মাদুলি দুলছে সোনার। হাতের বাজুতে অনেকগুলো ফকির-দরবেশের কবচ, আধ-কাঁচাপাকা মাথার চুল। মাথার ফেজ টুপিটা কপাল ঢেকে রেখেছে, পিট পিট করছে চোখদুটো। খুব ছোট চোখ। অনুত্তমকে গলুইতে দেখে গান থামিয়ে দিল টিন্ডাল। বলল, কী রে ব্যাটা, লাগছে কেমন জাহাজটা! জাহাজ কলম্বোতে নোঙ্গর পাইলে কিনারায় নামবা না? মেয়েমানুষ ধরবা না!

অনুত্তম জিভ কাটল, কী যে বলেন চাচা!

ব্যাটা জাহাজি হইছ, কিন্তু মনটা মেয়েমানুষের মতো করে রাখছ ক্যান! গতিক-বিতিক তোমার সুবিধার দ্যাখছি না।

দেশে সফর শেষ করে যখন ফিরব তখন পড়শিকে জবাব দেব কী? তা ছাড়া ঘরে আমার মা বোন আছে।

আরে, কী যে কও ব্যাটা। মা বোন কি আমাব ছিল না? এখনও ঘরে বিবি,বেটি সব আছে। কলম্বোতে গেলেই বোঝবা কেমন খত লেখে বিবি। চাচা তো ডাকলা বাতিজা। বাতিজার কাছে একটা আর্জি আছে চাচাব। বিবির খতের জবাব কিন্তু তোমায় লিখ্যা দিতে হইব।

দেব। চাচি যদি খত দেয় তবে নিশ্চয়ই দেব জবাব লিখে।

শুনে ছোট-টিন্ডাল খুব খুশি হল। আবও অনেক গল্প করল অনুত্তমেব সঙ্গে। গত সফরের গল্প। গল্প কবতে করতে টিন্ডাল হি হি করে হাসল। সোনায় বাঁধানো দাঁত চিক চিক করে উঠছে তখন।

অনুত্তম একটু রং চড়িয়ে বলল, হাসলে সোনায় বাঁধানো দাঁতদুটো আপনার চমৎকার দেখায়।

ইঞ্জিন-টিন্ডাল এবার আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

পাঁচ নম্বর বিবিও তোমার মতন কথা কইত। খসমের দাঁত দুইডা য্যান মানিক।

অনুত্তম আরও সংলগ্ন হয়ে দাঁড়াল সাজাদ মিঞার। টিন্ডাল সাজাদ মিঞা কয়লাওয়ালা থেকে আজ খোদ টিন্ডাল। ন'কুড়ি টাকা মাসের রোজগার। খানা-পিনা কোম্পানির। তা ছাড়া বে-ইজ্জতি মালেব ব্যবসা আছে কিছু কিছু। ছোট বড় বন্দরে-বন্দরে অনেক ছোট বড় চালান। তাতেও একটা মোটা রকমের মুনাফা আছে সাজাদ মিঞার।

গলুইয়ের নীচে প্রপেলারটা জলের ভিতর ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করছে। জলের উপর রেখা টেনে টেনে আসছে জাহাজটা। অনুত্তম রেলিং-এর উপর আর একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। জল ঘোলা। নীচে পাখাগুলো অস্পষ্ট। বুদ বুদ শব্দগুলো জলেব উপর উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

চাচা?

কিছু বলবে?

কলম্বোতে যেতে আর কতদিন?

জাহাজটা তেমন চলছে না। তবু জোর লাগলে ন'দিন। ন'দিন বাদে আমাদের জাহাজ আবার নোঙ্গর পাইব।

কিনারায় ইচ্ছামতো ঘুরতে পারব তো!

নিশ্চয়ই পারবা। কোম্পানিব সাধ্য কী ধইর‍্যা রাখে!

চিঠি পাব কী করে?

পাইলট আসব চিঠি নিয়া। কোম্পানির এজেন্টও আসতে পারে। তোমার চাচিও সে সঙ্গে খত দিব। খতের জবাব কিন্তু লিখ্যা দিবা। সকলের আগে আমার খতের দু'টা টান মারবা। তুমি আমার পরিদার।

কতকগুলো পাখি এসে উড়ে উড়ে জাহাজের উপর বসল সেই সময়। গঙ্গায় যে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো পড়ছে, ডুবে ডুবে এখন তাই খাচ্ছে। তারা সাঁতার কাটছে। ভেসে বেড়াচ্ছে।

সাজাদ মিঞা বলল, এগুলো চিড়িয়া পাখি। জাহাজের পিছন পিছন এরা অনেকদিন পর্যন্ত উড়ে উড়ে চলব।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল অনুত্তম। পাখিগুলো পায়রার মতো। সাদা সাদা। পাখাদুটোর শেষ প্রান্তে ছাই-রঙের পালক আছে দুটো দুটো করে।

এত কী তন্ময় হয়ে দেখছ বাত্তিজা। দেখবা প্রশান্ত মহাসাগরের চিড়িয়া। চিড়িয়ার মতো চিড়িয়া। পাখি যে এত বড় হয়, না দেখলে বিশ্বাস করবা না। সাহেবরা পাখিগুলিরে এ্যালবাট্রাস পাখি কয়।

অনুত্তম পাখিগুলির দিকে চেয়ে ভাবল, টিন্ডাল সাজাদ মিঞা। বুড়ো সাজাদ মিঞা। কাঁচাপাকা দাড়ি। জবুথবু হয়ে হাঁটে। জবর-জবর কথা কয়। শুকনো পানের পিচে মুখটা থুথুতে ভরে থাকে। ডেকের উপর টলে টলে হাঁটে। বুড়ো কাপ্তান ওর কাছে যমের মতো। বাঙালি পাঁচ নম্বর সার ওর আপনার লোক। দু'দিনে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

অনুত্তম বুড়ো সাজাদ মিঞার পাশ থেকে সরে এসে ফোকশালে নামার জন্য পা বাড়াল। সিঁড়ি ধরে নীচে নামার সময় বাঁদিকের টুইন-ডেকের ফোকশালে দেখল জব্বর মিঞা পেট ফুলিয়ে পেটের নীচে তেল মালিশ করছে। পাশের একটা বাংকে কোরান শরিফের পাতা উল্টাচ্ছে জমীর। দু'নম্বর বাংকে জমীর শেখ একটা জালের নকশার উপর ঝুঁকে আছে।

অঃ মিঞা।— জমীর নীচ থেকে কাকে যেন ডাকল।

ডাক শুনে জব্বর মুখ তুলল।

কিত তা কও?

জালের এ গিঁট শিখলা কী করি?

জব্বর মিঞা নিজের পেটের যন্ত্রণায় বাঁচছে না। তার উপর জমীর ভুঁইয়ার কাণ্ডগুলোতে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। জব্বর কোনও উত্তর করল না।

আরে মিঞা, মুখিতে যে রা নাই।

মুখিতে রা থাকে না ভুঁইয়া। তায়—তকলিফ সব আমার। প্যাটের ব্যামোতে পরানটা জ্বইলা-পুইড়া খাক। তুমি তোমার জালের নকসা লইয়া আছ। বিবির পরানটারে দ্যাশে ফিরা সুখ দিতে চাইছ।

কথাগুলো শুনতে শুনতে আরও দু'সিঁড়ির পাক ঘুরে সে গিয়ে ঢুকল নিজের ফোকশালে। হরিদাস সেনের বাংক পার হয়ে তার বাংক। হরিদাস সেন কেমন যেন চুপচাপ থাকে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার উপকূলে চুপচাপ কী সব দ্যাখে। সে এই জাহাজের আগওয়ালা। বয়লারে আগুন জ্বালায়, শাবলে কয়লা মারে। অনুত্তমের মতো হরিদাস সেনকে কয়লা টানতে হয় না। কোল-বয়ের কাজ গত সফরে হরিদাস সেন শেষ করেছে।

কে যেন উঁকি দিল দরজার উপর থেকে। সারেং। লম্বা সাদা দাড়ি, পাক খেয়ে খেয়ে কোমর পর্যন্ত নেমেছে। বড় বড় চোখদুটোতে অনেক সফরের অভিজ্ঞতা। অনেক সমুদ্র তীরে জাহাজ ভিড়িয়েছেন নোঙর ফেলে জাহাজের। অনেক বন্দরের নাম ভুলে গেছেন, তবু তিনি জানেন কলম্বো বন্দর থেকে কাঠের হাতি কিনে নেওয়া যায। ডারবান থেকে বুয়েনস-এয়ার্সে সে হাতির আটগুণ দামে বিক্রি। ময়ূরীর পালকের পাখা দেখলে বুয়েনস-এয়ার্সের সুন্দরী মেয়েরা ধূপছায়া অন্ধকারে ডাঙ্গিগোর সামনে জেঁকে ধরবে। বলবে, আমায় একটা। কত দাম?

দাম নেই।— সারেং পছন্দমতো মেয়েগুলোকে একটি একটি করে পালকের পাখা বিনা পয়সায় হাতে গুঁজে দিতেন।

সারেং চুপচাপ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখদুটোতে গোলাপি হাসি। তিনি হাসছেন। অনুত্তম ডাকলেই ভিতরে ঢোকেন। অনুত্তমকে কিছু তিনি বলতে চান।

জামাকাপড় ছাড়ার সময় বলল অনুত্তম, কী দেখছেন চাচা?

দেখছি তোমাকে।

আমাকে দেখে লাভ?

সারেঙের কানদুটো লাল হল।

দেখছি বাবু এমনিতেই।

গোঁফের রেখাদুটো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনুত্তমের। নরম নরম অথচ শক্ত-সমর্থ চেহারা তার। বুকের পাঁজরাগুলো উষ্ণতায় ফুলে-ফেঁপে উঠছে। অনুত্তম উঠে এসে লকারটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল।

চুপচাপ এত কী ভাবছেন?

ভাবছি বাবু তোমার মা'র কথা।— সারেংকে খুব চিন্তিত মনে হল।

অনুত্তম আড়চোখে চাইল। বুকের পাঁজরাগুলো আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

আমার মাকে ভেবে আপনার কী হবে?

ভাবি, মা কেমন করে এমন দুধের ছেলেকে তার বুকের কাছ থেকে ছাড়ে। জাহাজিদের ইজ্জত নাই বাবু।

ইজ্জত নাই কেন?

ইজ্জত থাকে না। দেশেও না, বিদেশ-বন্দবেও না। জাহাজি যখন হয়েছ তখন বুঝতে পারবা বাবু।

অনুত্তমের পাশে এসে বসলেন সারেং। লুঙিটা টেনে বসলেন। খক খক করে কাশলেন দু'-তিনবার। লক্ষ করলেন বালকেডগুলোতে কোথায় কালো দাগ পড়েছে। বললেন, জাহাজ কলম্বো যাচ্ছে। কিছু রসদ নিব।

কলম্বো পৌঁছাতে আমাদের কতদিন?— ফের প্রশ্ন করল অনুত্তম।

ছোট-টিন্ডাল বলল, ন'দিন।

হঠাৎ জিভ কেটে বলল সারেং, সোভান আল্লা, ভুলেই গেছি! তোমার তো আবার আটটা-বারোটা পবি। গোসল কইবা দানা-পানি দুইটা যা-হয় খাওগা। পরে এক লাচা ঘুম যাও। জাহাজ কিন্তু তোমাব পবিতে দরিয়ায় পডব। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের দিন। দরিয়ার অবস্থা বড় খারাপ।

সাবেংকে কেমন চিন্তিত দেখাল।

তুমি তো রে নতুন জাহাজি। বড় তকলিফ, বড় কষ্ট।

বলে সারেং নিজের ফোকশালে চলে গেলেন।

বড তকলিফ, বড় কষ্ট! এ দু'দিন অনুত্তম বুঝতে পেরেছে কতটা তকলিফ, কতটা কষ্ট। চাব ঘণ্টা একটানা পবিশ্রম করেও স্যুটের মুখ কয়লায় ভরতে পারেনি। আগওয়ালাদের ঠিকমতো কয়লা দিতে পারেনি। বয়লারের জ্বলন্ত পোড়া কয়লাগুলো নামানোর সময় শ্বাস টানতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে। হরিদাস সেন বলেছে, জাহাজ তো পুরোদমে চালুই হল না। বয়লারগুলো কয়লা অর্ধেকও খাচ্ছে না, এখন থেকে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না।

এইমাত্র ফোকশালে এসে ঢুকেছে হরিদাস সেন। অনেকক্ষণ পর ডেক থেকে এইমাত্র নামল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে সে বাংকের উপর শুয়ে পড়ল। অনুত্তমের দিকে চেয়ে বলল, এখনও চান করলে না! কখন খাবে, কখন ঘুমাবে? রাতে ফুলস্পিডে চলবে জাহাজ।

ফুলস্পিডে জাহাজ চলার সময় কত স্টিম রাখতে হবে?

দুশো পঞ্চাশ।

কলম্বো কতদূর এখান থেকে?

অনেক দূর। অনেক দিনের পথ।

সেকেন্ড অফিসার বাইনোকুলার দিয়ে ব্রিজ থেকে কী দেখছিলেন?

টিবির পাশে সেই মেয়েমানুষটাকে।

আমরা দেখতে চাইলে দিতেন?

মেজ-মালোম ভাল লোক, হয়তো দিতে পারেন।

এবার পাশ ফিরে শুল হরিদাস। অনুত্তম উপরে উঠে গেল। বাথরুমে চান করতে হবে। দু'টব জল বাথরুম থেকে নিয়ে নিয়েছে। এখন পুবের আকাশটা কালো। উত্তরের আকাশটায় অনেকগুলো খণ্ড-মেঘ জমে অখণ্ড হয়ে উঠেছে। স্নান সারতে সারতে সে সব দেখল। দু' তীরের সীমারেখা ক্রমশ দূরে সরছে। অনেকগুলো ছোট বড় নদী এখানটায় এসে মিলেছে। বিচিত্র একটি শব্দ তুলছে

জাহাজিদের কানে। জেলেডিঙিগুলো আর নেই, দু'তীরের মানুষগুলো অস্পষ্ট। কোথাও হয়তো পুজো হচ্ছে। ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ। কাঁসির শব্দে অনুত্তম এবার মাকে ভাবল। ওরা এখন কী করছে! মা নিশ্চয়ই বাবার সঙ্গে বসে সংসারের গল্প করছেন এখন। পড়শি কী ভাবছে? সে হয়তো এখন অনেক দিন আগের একটা চিঠি নিয়ে অন্যমনা।

গ্যালি থেকে একটা গন্ধ—দুর্গন্ধ। বাতাস সে গন্ধ বয়ে এনেছে। অনুত্তমের কাছে অপরিচিত নয় এ পচা গোস্তের সিদ্ধ গন্ধটা। এ সময়ে ভাণ্ডারি বিকেলের গোস্ত এক হাড়ি জলে শুধু সিদ্ধ করে ঝুড়িতে তুলে রাখে। সন্ধ্যায় নুন-লংকার ছ্যাক ছ্যাক আওয়াজ গ্যালিতে। গোস্তটা তখন রান্না হয়। গোরুর গোস্ত, গাই-গোরুর। ওদের পাপ-পুণ্যি বলে বুঝি কিছু নেই।

গাই-গোরুগুলি বাচ্চা দেয়। একবার নয়, দু'বার নয়, সে অনেকবার গাই-গোরুকে বাচ্চা দিতে দেখেছে। বাবা বলতেন, এখানে কী তোমার অনু? ভিতরবাড়িতে যাও।

শৈল-গোরুটা তো বাচ্চা হতেই মারা গেল। মা'র কী কান্না! মা সারা দিনরাত গোরুটার জন্য জেগে ছিলেন। সারারাত ধরে গরম কাপড়ে লেজের নীচটা সেঁকেছিলেন। তবু শৈলটা বাঁচল না।

মা জানেন না জাহাজিদের কত দুঃখ। গাই-গোরুর জন্য তাদের দুঃখ আরও বেশি। অথচ তার গোস্ত খেয়েই জাহাজিদের জাহাজে বাঁচতে হয়। নোনা পানির ঢেউ গুনতে হয়। দেওয়ানি সহ্য করতে হয়।

দেওয়ানির কষ্ট বড় কষ্ট।

গ্যালি থেকে মুখ বার করে কী বলল ভাণ্ডারি। ওর দাড়িটা শিং মাছের দাড়ির মতো। সেই দাড়ি নেড়ে অনুত্তমকে ব্যঙ্গ করল।

জ্যাঠা, আপনি বুড়ো-জানে দেওয়ানি সহ্য করতে পারেন আর আমি জোয়ান মানুষ দেওয়ানি সহ্য করতে পারব না?

অনুত্তমের কথা শুনে ভাণ্ডারি গোস্ত কাটার চাকুটা জোরে জোরে ঘষল টেবিলের কাঠে। রাগে অনুত্তমের দিকে চোখ না তুলেই, বলল, বুড়ো জান! আরে, ব ব্যাডা তোমার মতো আমারও একদিন জোয়ানকি ছিল রে।

ছুঁচলো দাড়িটাতে খুব মোলায়েম করে হাত বুলাল একবার। চোখের উপর রেখে চাকুর ধারটা পরীক্ষা করল। তারপর ধাই করে পাশের একটা পচা গোস্তের টুকরোতে মানুষ খুন করার মতো ছ্যাক করে চাকুটা বসিয়ে দিল। ফিক ফিক করে হাসল। বলল, কীরে ব্যাডা জোয়ানকিডা দ্যাখলা? বুড়া জান জোয়ান ব্যাডার সামিল, আশা করি বোঝলা।

অনুত্তম সব বুঝেছে। বুঝেছে জাহাজে উঠে সব মানুষগুলোই কেমন খেপে গেছে। সে নিজেও নতুবা এতবার নীচ থেকে উপরে উঠছে কেন, উপর থেকে নীচে নামছে কেন! হরিদাস সেন চুপচাপ থাকে। মেজ-মালোম দু'তীরের দিকে বার বার বাইনোকুলার তুলে এত কী খুঁজছেন। সারেং সাদা দাড়ির ভিতর বিশদ কতকগুলো বন্দরের গল্প নিয়ে তাকে কী এত শোনাতে চায়? জব্বর মিঞা ভয়ে পেট উঁচু করে রেখেছে। পেটে তেল মালিশ করছে অনবরত। কয়লাওয়ালার কাজটাকে ভয় পেয়ে সারেঙের ফালতু হিসাবে কাজ করতে চাইছে। পাঁচ নম্বর বিবির গল্প কবে সোনায় বাঁধানো দাঁতদুটোর কত গরব আর কেরামতি, খতের ভিতর কত জান-পহচানের কথা লিখা থাকবে, ছোট-টিন্ডাল সব প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মেসরুমে বসে খাবার খেল অনুত্তম। তারপর রেলিং-এ ভর করে দাঁড়াল। আকাশ দেখল, মেঘ-মেঘ আকাশ, গঙ্গার ঘোলা জলে আকাশের ছায়া ধুলি-ধূসরিত। তীরের গাছগুলোকে, বাড়িগুলোকে ঝোপের মত মনে হচ্ছে। আগুন জ্বলছে একটা ঝোপের পাশ থেকে। ডেকের উপর কয়েকজন জাহাজি বলল, কার জানি সর্বনাশ হল।

প্রথম জাহাজি গল্প আরম্ভ করল। অনুত্তম রেলিং-এ ভর দিয়ে শুনছে। জাহাজি গল্প আরম্ভ করল, আগুন লেগেছিল। সে রাত দুর্যোগের রাত। ঝড় প্রথম, তারপরে বৃষ্টি। আগুন নিভে গেছিল বৃষ্টিতে। সে আর তার স্ত্রী বৃষ্টি ভিজে সারারাত সেই ভস্ম-ধন-সম্পত্তি আগলে বসে ছিল। কান্নাকাটি করেছে বিবিটা, 'সব গেল সব গেল' বলে চিৎকার করেছে, তবু রাতভোরে যখন পড়শিরা আর দাঁড়িয়ে নেই, তখন নাকি...। কী বলছে জাহাজিটা! ডেক-জাহাজি মাজেদ বলল, তোর সেই বিবিটাই গলায় দড়ি দিয়েছিল?

মাজেদের প্রশ্ন ঝুলে আছে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত। কোনও উত্তর দিল না হারুন আলি। কাপ্তেন আর বড়-মালোমকে গলুইয়ের দিকে আসতে দেখে রঙের টবটা কোমরে ঝুলিয়ে সামনের একটা ড্যারিকে রং দিতে লেগে গেল। সর্বনাশ যার হয়েছে, তার হোক। ওর কোনও সর্বনাশ হয়নি। বিবি গলায় দড়ি দিয়েছে, বিবির নসিব নিয়ে ভেগেছে। গিয়েছে বলে আর একজন এসেছে। চৌধুরীর বেটি নুরভানু এখন ওর পাছদুয়ারে ঘুর ঘুর করে। অমন বিবির নসিব ক'জনের ক'টা আছে!

মনে মনে হলফ করেছে মাজেদ, আর না, আর ফাঁকি না। এবার নিয়ে দু'দিনে তিনবার বড়-মালোমের সামনে পড়ল। তাড়াতাড়ি মাজেদ সামনের কয়েল করা হিবিং লাইনটা কাঁধে ফেলে লেহুদা চিৎকার করছে, অঃ ভাই ডেক-কশপ, কোথায় রাখব হিবিং লাইনটা? শালার পো বড়-মালোম যে এবারেও দেখে ফেলল।

ডেক-কশপ ওপাশের গ্যালি থেকে বলল, যাও মিঞা, কামে যাও। দাঁড়াইয়া থাইক্যা আর সং দেখাইয়ো না।

মাজেদ হিবিং লাইনটা কাঁধে ফেলে ছুটে ছুটে সামনের ডেক-এ গেল। হারুন আলির প্রথম বিবিটা মরেছে গলায় দড়ি দিয়ে, নুরভানু মরবে গলায় কলসি বেঁধে। কথাটা ভেবে কীরকম তৃপ্তি পেল যেন মাজেদ। সামনের ডেক-এ মোটা শরীরটা টেনে আনতে খুব কষ্ট হল ওর। ইতস্তত চেয়ে যখন দেখল কেউ নেই, বেশ আড়াল রয়েছে এই ডেক-ছাদটার নীচে, তখন সে মৌজসে একটা বিড়ি ধরা'ল। বিড়িটা টানল কিছুক্ষণ, মেজ-মিস্ত্রি আবার আসছে! শালা ভোঁদকা হারামজাদা! মেজাজটা ওর তিরিক্ষি হয়ে গেল। পায়ের তলায় বিড়িটা আড়াল করে মেজ-মিস্ত্রি কাছে আসতেই ইচ্ছে করে ফিক করে হেসে দিল। 'বলল, সেলাম সাব।

সেলাম।

গট গট করে মেজ-মিস্ত্রি বের হয়ে গেলে বিড়িটা ডেক থেকে তুলে আরও দুটো টান দিল এবং মেজ-মিস্ত্রির পিছন ধরে ডাকল আবার, সাব ?

মেজ-মিস্ত্রি মুখ ফেরালেন।

এবারেও মাজেদ হাসল। যেন দুনিয়াদারিতে সে ফকির-দরবেশ।

মেজ-মিস্ত্রি যমুনাবাজুতে এক নম্বর উইংস-এর দিকে পা পাড়ালেন। মাজেদ সঙ্গে সঙ্গে এল, সাব?

মেজ-মিস্ত্রি রুখে দাঁড়ালেন, ননসেন্স!

শালা মদখোর।— মাজেদ বাংলায় খিস্তি করল। তারপর মাথাটা নিচু করে বলল, সাব টু বটল্ হ্যাভ। মাংতা সাব?

মেজ-মিস্ত্রি খুব খুশি হয়ে বলল, বাট...

নো বাট সাব, নো হাউ মুচ। টু স্মল, দাম পানি কা মাফিক।— মাজেদ গলে গলে পড়ল।

মেজ-মিস্ত্রির চোখ জ্বলে জ্বলে উঠছে। তিনি আরও আড়ালে ডাকলেন মাজেদকে। এবং বিলি ব্যবস্থার আয়োজনটা পর্যন্ত করে ফেললেন।

কড়কড়ে নোটগুলো হাতে নিয়ে মাজেদ বলল, মি সারভেন্ট সাব। ইউ অর্ডার, মি কেরি আউট। ইউ গিভ রুপি, আই গিভ ড্রিংক। মি গুড সাব। শালা মদখোর!

মেজ-মিস্ত্রি ঝুঁকে ঝুঁকে কেবল মাথা নাড়লেন। মাজেদ ডেক-ছাদেব নীচ দিয়ে আর একবার দেখল তিন নম্বর মালোম দু' নম্বর ফলকার উপর দাঁড়িয়ে কী করছে। বড়-মালোম গলুই থেকে নেমে আসছেন কি না, তারপর আর-একটা সেলাম ঠুকে হিবিং লাইনটা কাঁধে ফেলে সামনের ডেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনুত্তম দেখল মাজেদকে অদৃশ্য হয়ে যেতে। মাজেদটা বুনো হাতির মতন থপ থপ করে হাঁটে। ভিতরে ভিতরে কীসের একটা আফসোস সব সময় চলছে। সারাটা দিন সে সাহেবদের আমলদারদের খিস্তি করে বেড়াবে। পদ্মপুকুরের সোলেমান সাহেবের রেস্তোরাঁর গল্প, খোশবাই পাকাদাড়ি কালু বিশ্বাসের বড় বেটি হয়জুন বিবির গল্প, গান-বাজনা, শরাব আর সাথি-সঙ্গতের কথা বলবে রসিয়ে রসিয়ে। সন্ধ্যার পর ডেক-জাহাজিদের হাতে যখন কোনও কাজ থাকবে না তখন জাহাজি মানুষগুলো গলুইয়ের একটা বেঞ্চিতে মাজেদকে ঘিরে বসবে। কোনও জাহাজি যদি গল্প শোনা শেষ না করেই হাসতে আরম্ভ করে, মাজেদ বলবে, দেব নাকি শালা তোরে এক থাপ্পর! কথা না বুঝেই তুমি হাসতে

আরম্ভ করেছ। কালু বিশ্বাসের বড় বেটি আমায় বলে কিনা, নিকা করতে চাও মিঞা? বড় সুখ তো। নিকা করতে কাঁচা পয়সার মোকাবেলা লাগে। দেন-মোহরের টাকাটা বা'জিকে গুনে গুনে দিতে পারবা তো এ সফরে? পারো তো আইসো। বা'জানকে বলে-কয়ে দেখা যাবে'খন। কী জব্বর কথা কালু বিশ্বাসের বেটির!

মাজেদ হেসে হেসে কয়, জব্বর মিয়ার ফোলা পেট দেব নাকি ফাঁসায়ে?

জব্বব চোখদুটো ঈষৎ টেনে বলে, কিততা কও। অঃ কথা না কইয়ো। তোব পেডটা দশ মাসের পেডটাব মতো। তুমি আবার কারে চোখ ঠাওরাও।

আমারটা যদি দশ মাসের হয়, তোমারটা দশ বছরের।

অন্যান্য জাহাজিরা উচ্ছল হল খিস্তি শুনে।

উঠরে মিঞা, পেট আমার কেমন দুগাইছে।

জব্বর এই কথা বলে তখন ওঠে, নীচে নামে। বিড় বিড় করে মাজেদকে গাল-মন্দ দেয়।

অনুত্তম ডেকের উপর দাঁড়িয়ে হাসল। তারপর নীচে নেমে গেল। ফোকশালের চৌকাঠ পার হয়ে বাংকের উপব শুয়ে গড়াগড়ি দেবার সময় ডাকল, দাদা, ঘুমোলেন?

হরিদাস সেন চোখের উপর থেকে কনুই সরিয়ে জবাব দিল, না, ঘুম আসছে না।

আটটা বাবোটায় আপনারও তো পবি, ঘুমোন।

দুপুরটা গডিয়ে গেল। গড়িয়ে গডিয়ে অনেক দূরে গেল মনটা। অনেকগুলো কথা মনে হল। অনুত্তম অবাক হল ভেবে, কথাগুলো বড বেয়ারা। এমন করে তো পড়শিকে কোনওদিন ভাবেনি। পড়শিকে এমন কবে কোনওদিন মনে হয়নি। জাহাজে উঠে বিচিত্র বকমের ভাবনাগুলোতে যে ডুবতে শুরু কবেছে।

বিকেল। অনেকগুলো গডানো চিন্তার ভিতর অনুত্তম কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হরিদাস সেনের ঘুম আসেনি। সে গ্যালি থেকে এক মগে দু'কাপ চা এনেছে। অনুত্তমকে ডেকেছে। নিজে এখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আত্মগতভাবে।

ডাক শুনে অনুত্তম উঠেছিল। চা খেয়েছিল। গডাতে গডাতে সিঁড়ি ধরে ডেকে গেছিল। দু' তীর তখন আকাশেব সঙ্গে মিশে গেছে। বাংলাদেশের শেষ রেখা-দুটো আকাশ-সীমান্তে। দিগন্তবেলায় মেঘেব খণ্ডরূপেব মতো ভেসে উঠেছে সুন্দরবনের অসংখ্য দ্বীপগুলো।

সব জাহাজিরা জড়ো হয়েছে গলুইয়ে। সরলরেখার মতো করে দাঁড়িয়েছে তাবা। বঙ্গোপসাগরেব নীল নোনা জলে চোখ মেলছে।

অনেকগুলো সমুদ্রপাখি উড়ছে জাহাজের পিছনে। এখন জাহাজের চাবিদিকে পাখিগুলো ঢেউয়ের মত উঠছে-নামছে। বাতাসের উপর পাখিগুলো পল্টন খাচ্ছে পায়বার মতো।

গলুইয়ে অনেকগুলো জাহাজির কণ্ঠ এক, ওরা হাঁকছে, আল্লা-হু-আকবর। সেই চিৎকারে নোনাজল যেন কাঁপছে। বর্ষার মতো ছুটছে উড়ন্ত মাছগুলো।

ইঞ্জিন-সারেং দু' হাত তুলে কেমন পাগলেব মত বলল, পাগলি, এসে গেছি তোর বুকে। এখন তুই আব আমি। আমার খেলা তুই দেখবি, তোর খেলা আমি দেখব।

এ খেলাব শেষ নেই, এ খেলার অন্ত নেই।—সারেং ভাবল আত্মগতভাবে।

সমুদ্র-দর্শন এই প্রথম অনুত্তমের। নীরব সে। এই মুহূর্তের জন্য সাগরের এই বিশালতার ভিতর অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। সমুদ্রের উপর নিস্তেজ মনটাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হল তাই। উড়িয়ে দিতে শখ গেল। সাবেঙের মতো বলতে ইচ্ছে হল, পাগলি, আমিও এসে গেছি।

পাশে এসে দাঁড়াল সারেং, অনুত্তমের সংলগ্ন হয়ে দাঁড়াল।

চাচা, কতকাল থেকে আপনার জাহাজে চাকরি?

প্রথম লড়াইয়ের আগে থাইক্যা।

লড়াই আপনি করেছেন?

সারেং সেই সময় জবাব না দিয়ে দূরে আঙুল তুলে দিল, ওই দ্যাখো বাবু, দূরে পাইলট-জাহাজ।

আগে পাইলট-জাহাজে কাজ করতাম। প্রথম লড়াইয়ে পাইলট-জাহাজের কয়লাওয়ালা ছিলাম। জাহাজটার কী নাম কও তো?

কী করে বলব?

লেডি ফ্রেজার। মাইয়ালোকের নাম। জাহাজটা তুফানে ডুবব না কোনওদিন। মাইয়ালোক তো, তুফানের মায়া-দয়া আছে।

সমুদ্রে আপনি তুফান দেখেছেন?

তুফান! কী কও বাবু! তুফান দ্যাখি নাই! কতবার কত তুফানে পড়ছি তার কি শ্যাষ আছে! তুফানকে চিনি, দরিয়াকে চিনি। কখন কোন দরিয়ায় আসমানের কোন রঙে ক্যামন তুফান উঠবে তা আমি কাপ্তানের চাইতে ভাল কইতে পারি।

বারোটা-চারটে যাদের ইঞ্জিন-রুমে পরি, তারা সকলেই বোট-ডেক ধরে নেমে আসছে। টুইন-ডেকে নেমে ওরাও চিৎকার করে উঠল, আল্লা-হু-আকবর। অনন্ত অসীম সমুদ্রে ওরা খোদাকে স্মরণ করে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে নিল।

দূরে পাইলট-শিপ ছোট্ট এক ভেলার মতো। মোহনায় ছোট ছোট নৌকো। জেলে-নৌকো কি যাত্রী-নৌকো, দূর থেকে ধরা যাচ্ছে না। মোহনা ধরে আর-একটা জাহাজ ঢুকছে। টানা মরিসনের জাহাজ, সে জাহাজের নাবিকেরা হাত তুলে দিল, বিদায়!

হাত তুলে এরাও জানাল, বিদায় বন্ধু। তোমরা ঘরে ফিরলে, আমরা ঘর ছাড়লাম। অনেক গল্প জমা করে দেশের মাটিতে গিয়ে যখন তোমবা পৌঁছবে তখন দরিয়ার উপর অন্য বন্দরের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকব।

এরই নাম বুঝি সাগর-সংগম, ভাবল অনুত্তম। পুণ্যার্থীরা এখানেই বুঝি পুণ্য সঞ্চয় করতে আসে। মৈত্র মহাশয় এখানেই বুঝি তীর্থস্নান লাগি এসেছিলেন একদিন। "পুণ্যালোভাতুর মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর, আমি তব হব সাথী।'... এও স্থির হল "রাখাল যাইবে সাথে।... 'এখন শীতের দিন, শান্ত নদীনদ, অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ কিছু নাই, যাতায়াতে মাস দুই কাল—তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।' " অঙ্গীকার করেছিলেন ব্রাহ্মণ।

এক সময়—

> "চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
> অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
> 'ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার?' "

জোয়ার যখন আসে দু'কূল ছাপিয়ে আসে। চন্দ্র-সূর্যের গাণিতিক নিয়মে জোয়ার আসবেই। দু'কূল ছাপিয়েই আসবে। না আসলেও ক্ষতি নেই। জাহাজ এসে ভিড়েছে এখন উপসাগরে। রাখাল বালকের মতো অনুত্তম এখন জোয়ারের প্রতীক্ষা করে না। সে প্রতীক্ষা করছে অন্য একটা বন্দরের, অন্য একটা জগতের।

কলম্বো কতদূর? আর কতদিন?

'জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল'—এখন থেকেই সে বন্দর চায়, তীর চায়। বন্দরে জাহাজ নোঙর করে মাটির গন্ধ পেতে চায় অনুত্তম। পড়শির অনুরূপ একটি জগতের সঙ্গে মিশে গিয়ে জাহাজের দুঃখকে, সাগর আর আশমানের দুঃখকে ভুলে থাকতে চায়।

দুই

এ দুঃখ সকলের। সকল মানুষের।

উত্তরের দিকে শেষবারের মতো চোখ তুলে দিল অনুত্তম।

দক্ষিণের আকাশ তখন শূন্য।

সুন্দরবনের অসংখ্য দ্বীপগুলো আর আকাশ-সীমানায় ভাসছে না। পশ্চিমের আকাশে লাল রং। সূর্য আরব সাগরের তীরে ডুবে গেছে।

সুন্দরবনের অসংখ্য দ্বীপগুলোর আলো জ্বলবে এবার। আর-একটু অন্ধকাব হোক। পশ্চিম আকাশের লাল বংটা মাটির রং ধরুক। আমদানি-রপ্তানিব ডিঙিগুলোয় মাঝিরা নামাজ পড়তে বসুক, তখন আলো জ্বলবে।

পাইলট-বোটের মাঝিরা দড়াদড়ি টানছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টিয়ারি কবছে সারেং।

জাহাজে মাঝি-মাল্লারা ঝুঁকল পশ্চিমের রেলিংটাতে। সমুদ্র দেখল, পাইলট-বোটটাকে জাহাজের কিনারায় ভিড়তে দেখল। ডেক-জাহাজিবা তখন দড়িব সিঁড়ি ফেলে দিচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামছেন বাঙালি সাহেব। তিনি সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে বোটেব পাটাতনে নামলেন। হাত তুলে বিদায় জানালেন বড়-মালোম, মেজ-মালোম, কাপ্তানকে।

গডগড করে উঠল বোটেব মোটবটা। এবাব তিনি চললেন, বোটেব সারেং তখন দাঁড়িয়ে নীচেব পাটাতনে। উপরের পাটাতনে দাঁডিয়ে তিনি সিগাবেট ধবিয়েছেন। সাগব আব আকাশেব মাঝখানটায় ধোঁয়াটা পাক খাচ্ছে এখন।

সমুদ্র থেকে দুটো মাছ লাফ দিয়ে উপরে উঠল একসঙ্গে। বর্শা-ফলকেব মত মাছদুটো উপবেব আকাশটাকে গেঁথে দিতে চাইল। ওদের অক্ষমতায় ওরা যেন লজ্জা পেয়েছে। নীল নোনা জলে হারিয়ে গিয়ে ফুটকবি তুলল দুটো, তাবপব মিলিয়ে গেল সমুদ্রে।

পাইলট সাহেবেব বউটা হয়ত আক্ষেপ কবছে, একটা কথা বলতে ভুল হল। সাহেব বন্দবে বাত না কাটিয়ে সোজা ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ঘবে ফিরে এলেই ভাল করতেন।

অনুত্তমের পাশে ইঞ্জিন-সাবেং হরিদাস সেন উঠে এসেছে ফোকশাল থেকে। ভাণ্ডাবি হাওয়া খাওয়ার জন্য পাটাতনেব উপর পা ছড়িয়ে বসল। মেজ-মিস্ত্রি পিছিলেব দিকে নেমে আসছেন। ভাণ্ডাবি সেই দেখে বেশি হাওয়া খাওয়াব নাম কবে উঠে দাঁডাল। তিনি পিছিল ঘুরে যাবাব সময় ভাণ্ডাবি বলল, গুডমর্নিং সাব।

সারেং বলল, সেলাম সাব।

হবিদাস সেন বলল, গুড ইভনিং সেকেন্ড।

অনুত্তম অপাঙ্গে চোখ বুলাল। মানুষটাকে সে জুজুর মতো ভয় করে। মানুষটা তাদেব সব ইঞ্জিন-খালাসিদের বিধি-নিষেধের মালিক, সারেঙের মা বাপ। ওয়েলস-দেশীয় তিনি। ছ' ফিটের উপর লম্বা। পিঠ তাঁর ধনুকের মতো বাঁক দেওয়া। চোখদুটো গোল গোল। নাকটা বাজ পাখির ঠোঁটের মতো বেঁকে গেছে।

চোয়াল ফজলি আমের মতো ছুঁচলো, বাংলা পাঁচেব মতো দেখতে।

মেজ-মিস্ত্রিকে আসতে দেখেই অনুত্তম হবিদাস সেনের পিছনে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। মেজ-মিস্ত্রি সিঁড়ি ধরে পিছিলের নীচে নেমে গেছেন। স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের কল-কব্জাগুলি দেখে যমুনাবাজু ধরে আবার গলুইতে উঠেছেন এবং টুইন-ডেকে নেমে গেছেন। এবাব অনুত্তম ঠাট্টা কবে বলল, কী জ্যাঠা, সন্ধ্যাব সময় সাহেবকে যে তুমি গুড-মর্নিং বললে। সাহেব ভাববে, তুমি ওর সঙ্গে মশকরা করেছ। নযতো বলবে, পাগল।

ভাণ্ডারি খেপে গেল।

অঃ ব্যানার্জি কী কইলা? আমি পাগল! আমি আমি মশকরা করছি! মাইজলা মিস্তরিরে ডাইকা কই দিকি!

কী কবেন?

কব ব্যানার্জি কইছে আমি নাকি আপনার সঙ্গে মশকরা করছি, আমি নাকি পাগল!

সারেং অনেকদূর গড়াবে ভেবে ধমক দিল ভাণ্ডারিকে।

বাইছালি রাখো মিঞা। একটা ছোট ছাওয়াল তোমার সঙ্গে দুইটা হাসিব কথা কইছে, তার লাগি ছোটবা তুমি মাইজলা সাবের কাছে!

ভাণ্ডারি চুপ করে গেল। সকলেই চুপ করে গেল। হরিদাস সেন বলল, খানা খাবি চল অনুত্তম। কেন জাহাজে আজেবাজে কথা বলিস? ভাণ্ডারি আবার একটা মানুষ নাকি!

গ্যালি থেকে মুখ ভেংচে বলল ভাণ্ডারি, কয়লায়ালা একটা চাকরি নাকি! জাহাজের কয়লায়ালা,

দ্যাশের চকিদারি এক সামিলের কাজ রে! বড় বড় কথা ন কইয়ো। চিনি চিনি, কোন ব্যাটার কত ক্ষেমতা তা আমি জানি।— গড় গড় করতে থাকল ভাণ্ডারি।

ওরা দু'জন তখন নেমে গেছে ফোকশালে। ভাণ্ডারির শেষের কথাগুলি শুনতে পায়নি। খানাপিনার জন্য তারা বাসন আনতে গেছে। হরিদাস আর অনুত্তম এক বিশু। এক ডেকচিতে ওদের দু'জনের জন্য তরকারি আলাদা থাকে। একটা বড় এনামেলের থালাতে বসে দু'জন একসঙ্গে খায়। খানা খেতে খেতে দু'জন দেশের গল্প করে।

সারেং সাব।— ভাণ্ডারি গ্যালি থেকে মুখ বার করে ডাকল।

আবার ডাকো কীসের লাগি?

ব্যানার্জির মতো ছাওয়াল আমার ঘরে আছে।

তা হইল কী?

অরে আপে তাপে কথা কইতে বারণ কইর‍্যা দিয়েন।

কিছু বে-তরি কইছে তোমারে?

কইছে না! কইছে না আপনে কন!— ভাণ্ডারি আড়ষ্ট গলায় বলল।

কী কইল, সাফ কও ত দেখি?

ব্যানার্জি কয়, আমার নাকি বয়েস তিনকুড়ি পার হইয়া গ্যাছে। নলি আমি জুচ্চুরি কইরা বাইর করছি। আল্লা নাই আমার, আল্লা আমার কসুর ক্ষেমা দিব না।

সারেং গলুই থেকে চিৎকার করে ডাকল, অনুত্তম, এই দুই নম্বর পরির কয়লায়ালা!

অনুত্তম সেই চিৎকারে নীচ থেকে সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠল। এবং সারেঙের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আমায় ডাকছেন সারেং সাব?

তুমি ভাণ্ডারিরে কী কইছ?

অনুত্তম প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল। একবার সারেং-এর দিকে আবার ভাণ্ডারির দিকে চেয়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল কিছু। কিন্তু অন্ধকার নেমে আসছে জাহাজ-ডেকে। ওদের মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গলুইয়ের আলো এখনও জ্বালানো হয়নি। সে অন্ধকার খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে অনুত্তমের কাছে। সারেঙের রক্তচক্ষুতে সে অন্ধকার আরও গভীরতা পেয়েছে। একবার ইচ্ছা হল হরিদাস সেনকে ডাকে। বলে, দাদা, ওরা আমায় ঠেলে ফেলে দেবে। আপনি তাড়াতাড়ি উঠে আসুন।

কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে আরও অসহায় অনুভব করল নিজেকে।

সারেং গ্যালির দিকে এগিয়ে বলল, এই ভাণ্ডারি, ব্যানার্জি কী কইছে তোমারে কও?

ভাণ্ডারি গ্যালি থেকে বের হল না। আলুর ঝুড়ি থেকে চর্বির ভিতর কতকগুলো কাটা আলু ছ্যাঁক করে ছেড়ে দিল। তারপর ছেনি দিয়ে নাড়ল আলুগুলোকে। সারেঙের কথার কোনও জবাব দিল না।

সারেং অনুত্তমকেই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কইছ ভাণ্ডারিরে তিনকুড়ির বেশি বয়স হইছে? তুমি কইছ সে জোচ্চুরি কইরা নলি বাইর করছে?

অনুত্তমও হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলল। রুক্ষকণ্ঠে বলল, না, আমি বলিনি। এ কথা আমি বলিনি। শুধু বলেছি, ভাণ্ডারি, অত্যন্ত বেশি বয়সে আর জাহাজে এলেন কেন? জাহাজে কাজ করার পক্ষে আপনার খুব বেশি বয়স হয়ে গেছে।

সারেং নিজেও জানে ভাণ্ডারি অত্যন্ত বেশি বয়সের মানুষ। লাঠি ঠুকে ঠুকে ফোকশালে হাঁটে। খক খক করে কাশে সারাদিন। সমস্ত গ্যালিতে দলা দলা কফ পড়ে থাকে। অনুত্তম এ নিয়ে দু'দিন নালিশ জানিয়েছে। ভাণ্ডারির রাগ সেজন্য। কোথাকার নবাব এসেছেন! সমস্ত জনম ধরে সফর করেছি, গ্যালির কড়ি বরগা কতবার নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এমন করে কেউ নালিশ দেয়নি।

সারেং তবু অনুত্তমকেই ধমকাল, ভাণ্ডারির বয়স নিয়ে আর কিছু বলবে না।

তারপর ভাণ্ডারিকেও তিনি ধমকালেন, তোমার হালে নিকা করা বিবিটার বাচ্চা হইব শুনছি, অথচ সাইন কইরা টাকা পাঠাও নাই, খুব শরমের কথা।

ভাণ্ডারি আর কোনও কথাই বলছে না। খক খক করে কাশছে গ্যালিতে। গরমে ভীষণ ঘামছে। ঘামগুলো গামছায় মুছল। ভাজা ভাজা আলুগুলি একটি ঝুড়িতে তুলছে এখন।

অনুত্তমের দিকে চেয়ে বলল সারেং, যাও, খানা খাইয়া ঘুমাও গা। আটটা-বারোটা পরি। বয়লার ইন্ডিয়ান কয়লা খাইতাছে। খুব পেরেসান।

একটু থেমে আবার বলল, জাহাজে বাপ-মা সঙ্গে আসে না, সারেংই মা-বাপ, অন্যায় করলে দুই-দশটা কথা কইতে হয়। তার লাগি রাগ করন লাগে না। তোমার মা-বাপও তোমাকে দুইটা-চারটা ভাল মন্দ কথা কয়।

অনুত্তম নীচে চলে গেল। খানা খেল একসময় হরিদাস সেনের সঙ্গে। হরিদাস সেন পোর্ট-হোলের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের অন্ধকারে আবাব কী দেখতে শুরু কবেছে।

অনুত্তম বলেছিল, দাদা, কী দেখছেন অন্ধকারে?

তোর বউদির মুখটা দেখছি। পোর্ট-হোল দিয়ে অন্ধকার সমুদ্রে ওকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।

পাশের আর একটি পোর্ট-হোলে অনুত্তম মুখ রাখল। সামনে শুধু অন্ধকার। সমুদ্রে একটি অদ্ভুত বিষণ্ণ শব্দ। শোঁ শোঁ আওয়াজ দূরে, পাইলট-শিপের আলোগুলি দুলছে। নীল, লাল, হলুদ রঙের আলো। সারি সারি বয়ার মুখে আলো জ্বলছে দপ দপ। নিভছে, জ্বলছে, তেপান্তব মাঠে রাত গভীরে ভুতুড়ে আলেয়ার মতো।

জাহাজ এমন সময় খুব ঝুঁকে পড়ল যমুনাবাজুতে, আবাব গঙ্গাবাজুতে ঝুঁকে ওঠানামা করতে থাকল। অনুত্তম টাল সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, দাদা, ও দাদা! এটা হচ্ছে কী!

হরিদাস সেন পোর্ট-হোলেব ঘুলঘুলি থেকে মুখ তুলে হাসল। জাহাজেব এই গঙ্গাযমুনাব ওঠানামাগুলো নীল নোনা ঢেউয়ের পরিহাস। উন্মুক্ত আকাশের নীচে উজ্জ্বল তরঙ্গে জাহাজ নেশাগ্রস্ত হয়েছে। একটু দুলবে। একটু টলবে। তার জন্য চিৎকার করলে হবে কেন?

অনুত্তম বালকেড ধরে ভয়ে ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলল। হরিদাস সেনের হাসিতে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছে।

সে আর পারছে না দাঁড়াতে। সিঁড়ি ধরে সে নীচে নেমে গেল। স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে তেল দিল। সাত্তার ঘরে ঘবে দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখল, দেওয়ানিতে কেমন আছে সবাই। সকলকে ডেকে ডেকে বলল, আবার, মার মার কাট কাট অবস্থা আগুনওয়ালাদেব। এক কয়লাওয়ালা পরিতে দু'-দু'বার করে পড়েছে। অনুত্তমের ফোকশালে ঢুকে বলল, বাঙালিবাবুরেও বুঝি দেওয়ানিতে ধরল। প্রথম প্রথম একটু ধরবে। ঠেসে কাজ করবে। তাহলে দেখবে পাগলি কাহিল করতে পারছে না।

নিশ্চিন্তে একটু বসল সাত্তার।

হরিদাস অনুত্তমের বাংকে বসে অপেক্ষা করতে থাকল, ডংকিম্যান কখন বলবে, জোয়ান লোক, টান্টু। দানাপানি দুটো খাও। আর মাত্র...

বলে সময়ের উল্লেখ করবে।

সাত্তার এখনও কিছু বলছে না। অনুত্তম কখনও ওক দিচ্ছে। পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলিতে সমুদ্রের জল উপছে পড়ছে। বাইরে ঝড়, দেওয়ানি। বাংকের উপর বসে থাকা যাচ্ছে না। অনুত্তমের চোখে-মুখে নিদারুণ ক্লান্তি। নিদারুণ অস্বস্তি। সাত্তার বসে বসে বিড়ি টানছে।

হরিদাস আর প্রতীক্ষা না করে বলল, আটটা-বারোটার পরিদাবদের সময় হয়ে গেছে?

সাত্তার কোনও জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাংক থেকে উঠে ফোকশালের চৌকাঠে পা বাখল। সে মানুষগুলোব, কয়লাওয়ালা আগুনওয়ালাদের, মুখের ভয়ার্ত রূপটা দেখে তামাশা করার জন্য একবার মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময় বলল, সময় হয়ে গেছে। বয়লারে মার মার কাট কাট। দু'শো পঞ্চাশ স্টিম কিছুতেই দিতে পারছে না আগয়ালারা। সারেং নীচে চলে গেছে। বয়লারের আগুন সামলানো দায়।

অনুত্তম ভয়ে ভয়ে বললে, দাদা, কী হবে। আমি যে উঠতে পর্যন্ত পারছি না। উঠলেই মাথাটা পাক দেয়।

হরিদাস সেন কী বলবে। বলার কিছু নেই। সে চুপ করে বাংকের নীচ থেকে মগটা বের করল। উপরে যাবে। জল খাবে। হাতে-মুখে জল দেবে। একবার ভয়ে বিবর্ণ মনটা বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করবে, মনের সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করে ডেক-জাহাজিদের সঙ্গে খোশগল্পে মাতবে। স্টোক-

হোলডের দুঃখটাকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

দাদা, আপনি হেসে আমার তামাশা দেখছেন। বলছেন না কেন, এমন কেন হচ্ছে?

হরিদাস এবার আরও জোরে হাসল, তোর বউদি বিশ্বাস করত না। সে কেবল হাসত। জাহাজের এই দেওয়ানি নতুন জাহাজিকে কত অসহায় করে তোলে, তোর বউদি অনুভব করতে পারত না।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে।

অনুত্তম ধীরে ধীরে এবার বাংকে এসে বসল। মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। খাবারগুলো উল্টে আসছে পেটের ভিতর থেকে। বাংকে বসে ওক দিতে আরম্ভ করল।

হরিদাস আর পোর্ট-হোলে দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল। এক গ্লাস জলে নুন মিশাল। বারবার ঢালাঢালি করার সময় ভাণ্ডারি বলল, কী রে? জোয়ান-মরদরে ধরছে বুঝি ইবার। আমারে কয় বুড়া জান। ঠ্যালা ইবার সামলাও।

হরিদাসের ইচ্ছা হল ভাণ্ডারির গলা টিপে ধরতে। দরজায় উপর উঁকি দিয়ে বলল, মিঞা, বদখত কথা কম বলবে।

তারপর জলের গ্লাস নিয়ে নীচে নেমে গেল। ফোকশালে ঢুকে বলল, জলটা খেয়ে ফ্যাল, গলাফাটানে বমিটা হয়ত কমবে।

হরিদাস সেনের এই কথাগুলোতে মায়ের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মেজ-মিস্ত্রির বাংলা পাঁচের মতো মুখটা। বাংকারে হাজার টন কয়লা। কয়লা সব তাকেই টেনে এনে ফেলতে হবে নীচে। বমিটা উঠে আসছে কেবল। জ্বরে পাওয়া রুগির মতো কাঁপতে কাঁপতে বাংকের উপর এলিয়ে পড়ল ভয়ে।

সময়টা এগিয়ে আসছে কচ্ছপের মতো। একটা বিবশ জরাগ্রস্ত সময়। হরিদাস সেনের পর্যন্ত ভয় হচ্ছে সময়টার কথা ভাবতে। আটটা-বারোটার প্রহরী। রাতে চার ঘন্টা, দিনে চার ঘন্টা অমানুষিক খাটুনি।

এক নম্বর পরির ডংকিম্যান পানি নিতে এসেছে। পিছিলে। স্টোক-হোলডে এক টব পানি তিনজন ফায়ারম্যান আর দু'জন আগওয়ালা আরও খেয়ে শেষ করেছে। গরম ধরেছে মানুষগুলোর। আরও পানি চাই। সাত্তার এসেছে সেজন্য। গলুইয়ের উপর উঠে সকলকে বলছে, নীচে বড় হালা-হালি।

আকাশে মুঠো-মুঠো তারা। এক আঁজল তারাকে সাক্ষী রাখতে হল। বলতে ইচ্ছে হল, তোমরা আমার পড়শিকে দেখো। পড়শি হয়তো জানালার গরাদে মুখ রেখে ওই এক আঁজল তারাকেই এখন দেখছে। অনুত্তম খুব খুশি হল ভেবে, পড়শিও হয়তো তার মতো জাহাজি মানুষটার কথা ভাবছে। বলছে, বল তো সে এখন কোন সাগরে? বল তো সে এখন কী করছে?

অনুত্তম পোর্ট-হোলে চোখ রেখে অনেকক্ষণ উত্তর-আকাশের একমুঠো তারাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। দুটো তারা পাশাপাশি জ্বলছে। তারপর নীচে একটি, শেষে ত্যারচা হয়ে নীচের দিকে আরও চারটি তারা ক্রমশ নেমে গেছে। ওরা হয়তো পড়শির জানালার উপর এখন উঁকি দিচ্ছে। একটি তারা হঠাৎ নীচে গড়াল। অদৃশ্য হল। পড়শি বলেছে, এই সময় তিনটি ফুল এবং তিনজন ঋষির নাম করতে হয়।

দাদা!— আবার ডাকল অনুত্তম। হরিদাস সেনকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আরও ঘাবড়ে গেছে।

আমি কী করব বলুন? শরীরে আমার এতটুকু শক্তি নেই। আমি পারব না, পারব না। সারেংকে আপনি ডেকে বলুন কিছু। সারেং এসে আমার অবস্থা দেখুন।

ভয়ে অনুত্তম আবার বেশি করে ওক দিতে থাকল। বমি যা হবার হয়ে গেছে, এখন শুধু ওক। পিছিলটা যখন খুব বেশি আকাশমুখো হয়, তখন অনুত্তম ওক বন্ধ করে হাঁফাতে থাকে। রেলিং-এ ভর করে বলে, দাদা, সারেংকে দয়া করে বলুন আমি আর পারছি না।

হরিদাস সেন কিছু না বলে উপরে উঠে গেল। বিরক্ত বোধ করছে সে। সারেংকে ডেকে বললেই কি শুনবে! কেন এই জাহাজে কাজে আসা! আর আসা তো কয়লার জাহাজে কেন আসা! কয়লার জাহাজের মেহনতি মানুষের যন্ত্রণা কি জানা নেই!

হাত-মুখ ধুয়ে হরিদাস সেন নেমে এল। আবার এক মগ চা করল। চা খেতে খেতে ডাকল, এবার ওঠ। আর শুয়ে থাকতে হবে না। জামা-কাপড় পরে নীচে চল।

অনুত্তমের ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সে শুয়ে ছিল, শুয়েই আছে। কোনও জবাব দিচ্ছে না।

খবর পেয়ে ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে এসেছে সারেং, গলুই পার হয়েছে, ফোকশালে ঢুকে অনুত্তমের শরীরের উত্তাপ দেখল প্রথম। শেষে ওকে দু' হাতে টেনে তুলল, যাও, কাজে যাও। জাহাজে কেউ কারও মা বাপ না। তোমার পরি কে দিব? কোন লোক আর ফালতু আছে? উঠ উঠ, জামা-কাপড় তাড়াতাড়ি পইরা নেও।

অনুত্তম ফ্যাল ফ্যাল করে সারেঙের মুখের দিকে তাকাল। কোনও দয়া কোনও মমতার চিহ্ন পেল না মুখটাতে। একবার ইচ্ছা হল বলে, আমাকে কলম্বোতে নামিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মেজ সাহেবের গোল গোল চোখদুটোর কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠল। বাংক থেকে উঠে জামা-কাপড় বের করবার জন্য লকার খুলল। জামা-কাপড় পড়ে হরিদাস সেনের সঙ্গে গলুইতে উঠে গেল। সেই একমুঠো নক্ষত্র এখনও তেমনি আকাশে ঝুলছে। ওদের দিকে চেয়ে বলল, তাকে বোলো আমি বাংকারে যাচ্ছি। সমুদ্রে ভীষণ ঝড়। আমাকে দেওয়ানিতে ধরেছে। ওকে বোলো আমি এখন ওক দিচ্ছি।

একটা লোহার বড় অবলম্বন করে দাঁড়াল অনুত্তম, সমুদ্র থেকে জলের ঝাপটা আসছে। সে নীচের দিকে চাইল। জলের দিকে চাইল। অন্ধকারে ঢেউয়ের রেখাগুলো অস্পষ্ট। দূরে এখনও সারি সারি বয়া। বয়ার আলো নিভছে, জ্বলছে। অন্ধকার গ্রামের ভিতর এমন অনেক আলো জ্বলত তার দেশে। এ দেশ অন্য দেশ। সমুদ্রের দেশ। এখানেও ফুটকরি আলো জ্বলে। এখন হয়তো পড়শি কোনও এক ফুটকরির আলোতেই অন্যমনা।

ওরা দু'জন টুইন-ডেক পার হয়ে বোট-ডেকে উঠল। মেজ-মালোম একটা ডেক চেয়ারে বসে আছেন। বোট ডেকের আলোছায়াতে তিনিও চুপচাপ। তিনিও আকাশের নক্ষত্র দেখছেন কি বঙ্গোপসাগরের উত্তাপ নিচ্ছেন, বোঝা যাচ্ছে না। বোট-ডেকের আলোছায়াতে মেজ মালোমকে খুব রহস্যময় মনে হল। চোখদুটোর দৃষ্টি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করে অন্য কোনও এক আলোর পৃথিবীকে যেন খুঁজছে। হরিদাস সেন ডেক চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, স্যার।

মুখ তুলে মেজ মালোম দেখলেন অনুত্তমকে, হরিদাস সেনকে। অনুত্তমের প্রতি আঙুল তুলে বললেন, ইয়ু নিউ-কামার, সিট ডাউন হিয়ার।

একটু থেমে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, কোল-বয় জব ভেরি ট্রাবল-সাম জব। বাট ডোন্ট ফিয়ার।

আত্মগতভাবে বললেন মেজ মালোম, উই আর সেলর, উই আর কার্সড। ম্যান উইদাউট ওম্যান। ম্যান উইদাউট ক্যারেক্টার।

থেমে থেমে বললেন তিনি, থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন তিনি।

কেবিন থেকে কাপ্তানের কুকুরটা পোর্ট-হোলে মুখ বার করে ঘেও ঘেও চিৎকার করছে। মেজ মালোম মুখ তুলে চাইলেন উপরে। তিনি হাসলেন। বাঁদিকে ফানেলের শেডটাতে বসে রয়েছেন অনুত্তম। মেজ-মালোমকে দেখছে। দেখতে ভাল লাগল। তিনি কেন হাসলেন। অনুত্তম প্রশ্ন করল, হোয়াই আর ইয়ু লাফিং স্যার?

ক্যাপ্টেনস ডগ ক্রাইং ফর এ বিচ।

মেজ-মালোম আবার হাসতে থাকলেন ঠোঁটদুটো চেপে এবং পরক্ষণেই এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে, অনুত্তম এবং হরিদাস সেন কিছুই আর প্রশ্ন করতে পারল না।

অনুত্তমের শরীরটা আবার গুলিয়ে উঠল। একটি শব্দ নীচে, স্টোক-হোলডে। ফানেলের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথম-প্রথম নীচে স্টোক-হোলডের দিকে চাইলে এমনিতেই মাথাটা ঘুরে উঠত। আজ জানি কী হবে—অনুত্তম ভেবে সারা হল। শব্দটা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। আল্লা-হু আকবর— তিনজন মানুষের চিৎকার। ওরা কিছুক্ষণ আগে নেমে গেছে। বয়লারের গরম আর কালো কয়লার চাঙ্গার দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। পুরানো জাহাজি বলে শরীরটা গুলিয়ে উঠছে না।

দু'জন লোক উঠে এল সিঁড়ি ধরে। ফানেলের গুঁড়িতে এসে একটা মানুষকে ওরা বোট-ডেকে শুইয়ে

দিল। ফিট গেছে এক নম্বর পরির কয়লায়ালা মনু। আগওয়ালা দু'জন এখন হাঁপাচ্ছে। উইন্ডস-হোলের উপর হেলান দিয়ে ওরাও কুকুরটার চিৎকার শুনল।

অনুত্তম ভয়ে আবার ওক দিল। ধমকাল হরিদাস সেন, এই নীচে যা! এখানে দাঁড়িয়ে আর ঢং করতে হবে না।

মেজ-মালোম ডেক-চেয়ার থেকে উঠে এসে দেখলেন মনুকে। কোনও কিছু বললেন না, কেবিন থেকে এক পুরিয়া ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন।

ওরা দু'জন আবার মনুকে কাঁধে নিল। হন হন করে সোয়ারির মতো বোট-ডেক পার হল। সিঁড়ি ধরে নামল কুইন-ডেকে। তারপর গলুই। গলুইয়ে অনেক জাহাজি। ওরা ভিড় করেছে।

সারেং সিঁড়ি ধরে খুব তাড়াতাড়ি স্টোক-হোলড থেকে উপরে এসে উঠেছে। ফানেলের গুঁড়িতে এসে চিৎকার করে বলল, আরে মিঞা, মনুকে গোসল করাবা না, সোজা ফোকশালে নিয়ে ফেইলা রাখো।

আরও কিছু বলতে বলতে বোট-ডেকের উপর দিয়ে গলুইয়ের দিকে ছুটল।

এরই নাম বুঝি হালা-হালি—সিঁড়ি ধরে নামার সময় ভাবল অনুত্তম। মনুর মতো জোয়ান মরদ পরিতে পড়েছে। অনেক নীচে স্টোক-হোলড। প্লেটের উপর মানুষগুলোকে পুতুলের মতো মনে হল। সেখানে বড়-টিন্ডাল আর একজন আগয়ালা বয়লারগুলোর খবরদারি করছে। দু'নম্বর পরির আগওয়ালা টলতে-টলতে গিয়ে নামছে। স্টিম-ককগুলোর ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দের ভিতর এক এক করে ওরা নেমে গেল।

ছোট-টিন্ডাল নেমে আসছে সকলের শেষে। সিঁড়ি ধরে নামার সময় সেও চিৎকার করল, জাহাজে বড় হালা-হালি। ডব পাবা না মিঞারা। ডর ধরলে সব গেল। মনুর মতো তবে অজ্ঞান হয়ে যাবা।

কথাগুলো নিজের পরিদারদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে ছোট-টিন্ডাল। তার পরির মানুষগুলি ভয় পেলে তার বদনাম, টিন্ডালি করে করে সে এ কথাটা বেশ ভাল বুঝেছে।

স্টোক-হোলডে নামতে তিনটি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। দু'নম্বর সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেখল তিনজন লোক তিনটি বয়লারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্টিম গেজটা দেখছে। বয়লারের আগুনের হলকাতে ওদের মুখগুলো শুকিয়ে উঠছে। চুলোর দরজা খুলে এখন ক'শাবল কয়লা হাঁকড়াল।

অনুত্তম আর নীচে নামল না। এখান থেকে দুটো পথ দু'দিকে চলে গেছে। ডানদিকের বাংকারে সে ঢুকবে। হেঁটে এসে দরজার সামনে সে দাঁড়াল। দরজার মুখে অসীম অন্ধকার। বাদুড়ের ডানার মতো সে অন্ধকার ওকে গ্রাস করতে চাইছে। একটা ভুতুড়ে শব্দ উঠছে ভিতরে। দরজার মুখে প্রথম বারের মতো সে থামল। ওর ভয়-ভয় করছে।

হরিদাস সেন তিন নম্বর সিঁড়ি থেকে মুখ বার করে বলছে, ভয় নেই, আমরা তো আছি। মনের জোর কিন্তু হারাবি না।

অন্ধকার বাংকারে এবার উঁকি দিল অনুত্তম। মুশকিল আসানের মতো একটা কালো লম্ফ জ্বলছে দপ দপ করে। ভিতরে আর কোনও আলো নেই। সেই আলো-অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু একটি শব্দ আসছে, নিশ্চয়ই এক নম্বর পরিদার মজিদ এখন গাড়ি টানছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার বাংকারটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দূরে এক কোনায় ভুতুড়ে ছায়ার মতো মজিদের দেহটা একটা শাবল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মজিদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। বাংকারে ঢুকে অনুত্তম লম্ফটা হাতে নিল। মজিদের মুখ দেখে সে হাসল। বাদুড়ের ডানার মতোই রং হয়েছে মুখে। লাল চোখ দুটো পিট পিট করছে। স্যাট তখনও ভরতে পারেনি। তাই শাবল টানছে, গাড়ি টানছে, কয়লা ফেলছে স্যাটের মুখে অনবরত। ঘামে নীল জামা, কোর্তা সব ভিজে গেছে। কয়লার ধুলায় নাকটা পর্যন্ত বন্ধ। ভুতুড়ে অন্ধকারটার মতোই সে নাকি সুরে কথা বলছে, আইলা ব্যানার্জি। বইসো।

মজিদ পা দুটো ছড়িয়ে বসল প্রথম। পরে বাংকারের প্লেটের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, একটু জিরাইয়া লই। হাত দুইটা পা দুইটা কুলাইতে পারতাছে না আর। বিড়িটা আঙ্গাইয়া দিবা?— বলে একটি বিড়ি পকেট থেকে বের করে দিল।

জাহাজটা ভীষণ গঙ্গাবাজু-যমুনাবাজু হচ্ছে বলে ঠেলাগাড়ির উপর শাবলটা ঠুং ঠাং শব্দ করছে।

এপাশ-ওপাশ হচ্ছে মজিদের মাথাটা। হাতদুটো পা দুটো স্থির থাকছে না।

অনুত্তম ওক দিতে দিতে বসে পড়ল। কতকগুলি জল এসে পড়ল মুখ থেকে, হাতদুটো প্লেটের উপর ভর করে বলল, যমুনাবাজুর বাংকার কে দেখছে রে?

দুর্ভাগ্যের হাসি হাসল মজিদ। হঠাৎ উঠে বসে পড়ল। বলল, এই হারাম।

মুখটা নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, জোয়ান পুত ঘবে আছেবে ব্যানার্জি, ছাওয়ালটা ভাবে, বা'জান জাহাজে কাজ করে, কিডা না একটা করে। মাইয়াটা তক কইয়া বেড়ায়, বা'জান একটা-দুইটা টাকা পায় না, চার কুড়ি দশ টাকা পায়।

সহসা মজিদ চিৎকার করতে আরম্ভ কবল। কান্নার মতো সে চিৎকাব। সমস্ত বাংকার গুম গুম করছে। সে গান কবছে, আরে আমার সাধের মিঞাভাই, তিন দরিয়ার কূলে আমি সাধের ডিঙ্গা বাই।

এবার উঠে দাঁড়াল সে। শাবলটার উপব ঝুঁকে শক্ত-সমর্থ হতে চাইল। তারপর শাবলটা কাঁধে ফেলে গাড়িটা টেনে জোয়ান মানুষের মতো হাজাব টন কয়লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আব এখানটায় বইসা ওক দিলে কী হইব বে ব্যানার্জি। চল, তলায় যাই।— আবদুল ডাকল অনুত্তমকে।

আবদুল অনুত্তমেব জুড়িদাব। একসঙ্গে নামবে বলে সে সিঁড়িব মুখে প্রতীক্ষা কবছে।

স্টোক হোলডে নেমে গেল ওরা দু'জন।

হবিদাস সেনেব পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল অনুত্তম, দাদা!

হবিদাস সেন মুখ ফেরাল। চোখদুটো সেনের জ্বলছে। ফোকশালের চোখদুটো অন্য। অনুত্তম ভয় পেল ফেব কথা বলতে। দাদার গলার রগগুলো এখন এক-এক করে ভেসে উঠছে। মানুষ খেকো বাঘেব মতো সে বিবক্ত বোধ কবছে। দ্বিতীয়বার আব ডাকতে সাহস করল না সে। ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে দাদাব পোর্ট-হোলেব মুখটা ভাবতে চেষ্টা করল। এক পা.দু'পা করে এসে টিন্ডালেব মুখোমুখি দাঁডাল তাবপব।

টিন্ডাল পর্যন্ত একবার চোখ তুলে অনুত্তমকে দেখল না। সে স্টিম-গেজটা দেখছে। ভাবছে এখন চুলা টানবে কি পবে চুলা টানবে। এক-এক কবে তিন বয়লাবেব চুলাগুলি গোড়ালি উঁচু করে দেখল।

এই স্টোক-হোলডেব মানুষগুলোকে অনুত্তম চিনতে পারছে না। ওরা বয়লাবগুলোকে নিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে যেন। ওবা কেউ কাউকে চিনছে না, যেন ওরা এখন অন্য দেশের মানুষ। ওদেব সম্পর্ক বয়লাবের সঙ্গে, আগুনেব সঙ্গে। অনুত্তম সমস্ত স্টোক-হোলড ঘুরেও ফোকশালের কোনও পরিচিত ব্যক্তিকে খুঁজে পেল না। ওর জুড়িদার আবদুল পর্যন্ত ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। এইসব দেখে সে আবার ওক দিতে আরম্ভ করেছে। টলছে দেহটা। জাহাজেব পল্টন খাওয়া এখানেও রেহাই নেই।

এক নম্বব বয়লাবেব আগওয়ালা চিৎকার করছে তখন, আগুন আগুন। পানি পানি। জলদি পানি মাব।

অনুত্তম টলতে টলতেই দু' ঠ্যাঙের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করল এবং আবদুলেব সঙ্গে সি-ওয়াটার-কক থেকে দু'বালতি জল নিয়ে ছুটল। র‍্যাগ দিয়ে এক নম্বর আগওয়ালা আগুন টেনে নামাচ্ছে এখনও। চুলা টানছে, পবিষ্কাব কবছে চুলার ভিতরটা। পোড়া কয়লা সব ফেলে দিচ্ছে। টিন্ডাল জানোযারেব মতো হাঁকল, আরে শালা কয়লায়ালার দল, তোমরা আমার বিবিব বুকেব তামাশা দেখছ নাকি। পানি নিয়ে দৌড়াতে পারলা না!

বয়লারের তিন চুলা। তিনটি করে চুলা টানতে হবে আগওয়ালাদের। বাঁ দিকের চুলাগুলি সকলে টানছে। চার ঘণ্টা ধরে যে কয়লা বয়লার খেয়েছে এখন সেই আগুনগুলিকেই নামানো হচ্ছে সব। আগুনের উপর পানি ঢেলে দেওয়ায় সমস্ত স্টোক-হোলডে অন্ধকার। আগওয়ালারা উইন্ডস-হোলের নীচে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে পারছে, কয়লাওয়ালাদের সে সুযোগ পর্যন্ত নেই। হরিদাস তখন চিৎকার হাঁকছে পাগলের মতো, আগুন নয়, খুন খুন! খুন গিরছে। পা.... নি।

চোখ বুঁজে বলছে, কয়লায়ালারা গেল কই সব!

বেহুঁশ হয়ে অনুত্তম জল ঢেলে দিল হরিদাসের উপর। আবদুল সেই ছাই অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে প্লেটের উপর গড়িয়ে পা-টা জ্বালিয়েছে। তবু সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কক থেকে পানি এনে

বলছে, দিমু নাকি সব পানিটা বয়লারে চুলাতে ঢাইলা? সব আপদ চুইকা যাইব তাইলে।

তিনজন আগওয়ালা ন'চুলার আগুন টেনে শেষ করল সব। জল দিয়ে সে আগুন নেভানো হয়েছে। জমা হয়েছে ছাইগুলো দু'নম্বর বয়লারের সম্মুখে। শাবল টানতে অনুত্তমের পিঠ কুঁজো, শিরদাঁড়ায় হিমেল স্রোত নামছে। সোজা হয়ে শাবল টানতে হবে, সমস্ত ছাইগুলি হাপিজ করতে হবে, ভেবে ওর কান্না পেতে থাকল। টিন্ডালকে বসে থাকতে দেখে বলল, চাচা, মেহেরবানি করে একটু হাত লাগাবেন?

টিন্ডাল প্রথম বললে না কিছু। আমলাদার মানুষ, কম কথা বলতে হয়। তাই ফিক ফিক করে হাসল। পরে খুব মৌজ করে আমলদারি ঢং বদলে দিয়ে বলল, মাত্র আর আট দিন। দেখতে দেখতে চলে যাবে। খত আসবে দশ থেকে, বিবির খত। বন্দর পাবে সামনে, মেয়েমানুষ পাবে সে দেশটায়, এই আগুনের জ্বালা, সব পেরেসান ওখানটায় মেয়েমানুষের বুকের ঠান্ডায় জুড়িয়ে নেবে। চালাও চালাও, হাত চালাও, শাবল চালাও।

অনুত্তম ওক দিতে দিতেই ছাইগুলো শাবলে এ্যাস-রিজেক্টরে ভরে দিতে থাকল। আবদুল উপরে উঠে উইনচ চালাচ্ছে। এক নম্বর আগওয়ালা বিদ্রুপ করে বলছে, টিপলা দ্যাওবে ব্যনার্জির মুখে, তবে আর ওক উঠব না।

হরিদাস সেন এবার খেপে গেল, এই হারামজাদা রয়ে-সয়ে কথা ক'বি। নয়তো র‍্যাগটা দিয়ে দেব মাথা চৌচির করে!

এখন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে অনুত্তম। দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছে। এতক্ষণ বেহুঁশ হয়ে কাজ করেছিল বলে স্টোক-হোলডের একশোচল্লিশ ডিগ্রি উত্তাপকে অনুভব করার ফুরসত পায়নি। এই উত্তাপ ওর বুকের রক্ত সব শুষে নিয়েছে যেন। সে কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে উইন্ডস-হোলের নীচে এসে পড়ল। কোনও রকমে জলের টবটা তুলে ঢক ঢক করে সব জলটা খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল।

ছুটে এসেছে হরিদাস সেন।

আরে করছিস কী! করছিস কী! এখন জল খেয়ে মরবি যে।

জলের টবটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে টিন্ডালের জিম্মায় রেখে দিয়ে বলল, তুই জিরিয়ে নে, আমরা সবাই মিলে ছাইটা হাপিজ করে দিচ্ছি।

টিন্ডাল কয়েক শাবল ছাই টানার সময় কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল আবার। তিনি ফিস ফিস করে বললেন, মনে থাকে যেন ব্যানার্জি। একদিকে জাহাজে নোঙর পাইব, অন্যদিকে তুমি তোমার চাচির খত লিখতে বসবা। মনে রাখবা আমি তোমার আমলদার। বিবি আমার জোয়ান বিবি। খুব মোলায়েম ভাষায় দু'-চারটা টান দিয়ে দিবা। বিবি যেন বোঝে ওর লাগি দরদ আমার কত।

বলে হি হি করে অনর্থক টিন্ডাল হাসলেন। অনুত্তমের কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, বিবি আমার জান রে ব্যানার্জি। বিবি আমার পরানের বাদশাহি।

টিন্ডালের কথা শুনে অনুত্তম এই প্রথম হাসল স্টোক-হোলডে। নিজের মেহনতি জীবনটার জন্য যেমন দুঃখ, টিন্ডাল-চাচার এই কথাগুলি শুনেও তেমনি দুঃখ হয় অথচ হাসি পায়। দুঃখটা হাসি হয়ে ঠোঁটের উপর ভেসে ওঠে। টিন্ডাল বিবি বিবি করে পাগল। ভাণ্ডারি সাইন করে বিবির নামে টাকা পাঠাননি। সারেং সাব ধমকেছে সেজন্য।

ছাই-হাপিজ শেষ। স্টোক-হোলড পরিষ্কার। তিনজন আগওয়ালা কয়লা হাঁকড়াচ্ছে রমারম। হরিদাস সেনকে মানুষ-খেকো বাঘের মতো মনে হচ্ছে না আর। অযথা এখন শিস দিচ্ছে উইন্ডস-হোলের নীচে দাঁড়িয়ে। অন্য দু'জন আগওয়ালার নজর স্টিম-গেজে। দু'শো পঞ্চাশ স্টিম এখনও তারা তুলতে পারেনি। টিন্ডাল গাল-মন্দ দিচ্ছে তাদের।

অনুত্তম সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময় কত কিছু ভাবল। জাহাজের কাজে মনের জোর, মনের সাহস। তাগদ, শক্তি, কথাগুলো একদম মিথ্যা। বাজে। মনের জোর না থাকলে তাগদ, শক্তি কোনও কাজে আসে না।

আবদুল পিছনে উঠে আসছে। ওর কাঁধে দুটো শাবল—দু' বাংকারের। ভাল শাবলটা ও নিশ্চয়ই নিজের জন্য রাখবে। একবার ইচ্ছা হল রুখে দাঁড়িয়ে বলে, তুমিও কয়লায়ালা, আমিও কয়লায়ালা। এক অধিকার। তুমি ভালটা নেবে, আমি খারাপটা নেব কোন নিয়মে। কিন্তু আবদুল এসে ভাল

শাবলটাই ওকে দিয়ে দিল। এবাব নিয়মের কথা মনে হল না তার। শুধু ভাবল, আবদুল ভাল মানুষ। জাহাজে আসাব আগে সাদি কবে এসেছে। মাটিতে কাজ কবলে আব কিছু না হোক সমস্ত দিন মেহনতেব পব বিবিকে কাছে পেত। বিবি কাছে না থাকলে অন্য কোনও এক মেয়েজগৎ। সে কলম্বো বন্দবে বিবিব কাছে খত লিখবে। নিজে লিখতে জানে বলে এখন থেকেই প্রতিদিন খতেব উপব অনেকগুলো সুখ-দুঃখেব আঁচড় কেটে বাখছে। দু'-একজন জাহাজি ওকে লিখে দেওয়াব জন্য ধবেছে।

বাংকাবে ঢোকাব আগে সে আকাশমুখো হল। মুখেব উপব আয়তক্ষেত্রেব মতো এক টুকবো আকাশ ঝুলছে। দুটো নক্ষত্র সেখানে। নক্ষত্রদুটো ঘড়িব পেন্ডুলামেব মতো দুলছে। গলাব ভিতব আবাব একটা ওক এসে থামতেই মনে হল জাহাজেব ওঠানামা এখনও কমেনি। আকাশে নক্ষত্রদুটো স্থিব নেই সেজন্য। নক্ষত্রগুলো হয়তো কিছু ভেবে হাসল।

আলো থেকে বাংকাবেব অন্ধকাবে ঢুকে মনে হল জাহাজটা অতিকায় একটা তিমি মাছ। হেলেদুলে চলেছে। সে তাব অন্ধকাব গহ্ববে বসে কয়লা পড়াব শব্দ, ইঞ্জিনেব শব্দ, শাবলেব শব্দ শুনে সন্ত্রস্ত হচ্ছে। কিছুই নজবে আটকাচ্ছে না। গাড়িটা কোথায়? সেই গর্তটা কোনদিকে, যাব ভিতব গাড়ি-গাড়ি কয়লা ফেলতে হবে। কয়লা কত। মুশকিল আসানেব মতো লম্ফটা দূবে জ্বলছে। চাবিদিক থেকে বন্ধ বলে লম্ফব শিখও অস্পষ্ট কবে বেখেছে বাংকাব। পচা গবম। হাই তুলল অনুত্তম। এই অন্ধকাবে কয়লাব উপব শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হল। যমুনাবাজুব বাংকাবে গাড়ি ভর্তি কবছে আবদুল। এক গাড়ি ফেলল, দু' গাড়ি ফেলছে, তিন গাড়ি। বাংকাবটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখে। গাড়িটা টেনে এনে স্যুটেব মুখ দেখল অনুত্তম। অনেক দূবে কয়লা নেমে গেছে। মাথাটা ঘুবে গেল আবাব। ওক উঠছে। জাহাজটা গঙ্গাবাজুতে খুব বেশি হেলে গেল। অনুত্তম দু'হাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আবদুল গাড়ি গাড়ি কয়লা ফেলছে এখনও। ক'গাড়ি ফেলল শুয়ে শুয়ে গুনল—এক, দুই, তিন, চাব। ঘুমে চোখদুটো জড়িয়ে আসছে।

অনুত্তম ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। অনেকক্ষণ ঘুমোল। স্বপ্ন দেখল, মা বাবা বসে গল্প কবছেন। ছোট বোন ওব পুতুলেব বিয়ে দিচ্ছে। বাবা হঠাৎ মা'ব উপব খিঁচিয়ে উঠলেন। তাবপব হঠাৎ দেখল, বাবা দৈত্য হযে গিযে ছোট বোনটাব গলা টিপে ধবেছে। জাহাজটা যাচ্ছে তখন ধানখেতেব উপর দিয়ে। বাঁশঝাড়েব নীচ দিয়ে সে সব কিছু দেখতে পেল। ধানখেতে জল কম। ঠেকে ঠেকে চলছে জাহাজটা। অনুত্তম এখন পিছন থেকে জাহাজটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ওব মুখেব উপব কে যেন জুতো ঠেকাল। সেই দৈত্যটা বুঝি। ধড়ফড় কবে উঠে বসল অনুত্তম, কে। কে।

দেখল মেজ-মিস্ত্রিব গোল গোল চোখ দুটো পিট পিট কবছে। অনুত্তম কেঁদে উঠল, স্যাব স্যাব । আব কিছু সে প্রকাশ কবতে পাবল না ভয়ে।

ইয়ু লেজি বাগাব। সুন্তিওয়ালা।— ঢাঁই কবে অনুত্তমেব পিঠে লাথি মাবলেন তিনি।— কাম অন, গেট ওয়ার্ক।

'টিন্ডাল, টিন্ডাল' বলে চিৎকাব কবতে থাকলেন মেজ-মিস্ত্রি।

ইয়েস সাব, ইয়েস সাব। এই কয়লায়ালা হাবামজাদা, বেইমানের পুত, বাংকাবে পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে।

বলে তিনিও একটা ধাক্কা দিলেন অনুত্তমকে। পবে 'ইয়েস সাব, সাব' কবে পুনরায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, আব কিছু ভয় নেই, এ বান্দা বেঁচে থাকতে স্যুটেব মুখ ভববেই।

মেজ-মিস্ত্রি গড গড কবে উঠে গেলেন। অনুত্তম ছুটছে এখন পাগলা ঘোড়ার মতো। পিঠেব উপর বসে টিন্ডাল সাজাদ মিঞা। ও হাঁকছে, এই ব্যাড়া, জলদি চলো।

অনুত্তম সব ভুলে গেছে। হাতেব যন্ত্রণা, পায়েব যন্ত্রণা আর যেন নেই। গলার কাছে এসে ভয়ে থেমে আছে ওকটা।

স্যুটের মুখে ঝুপ শব্দ হচ্ছে এখন। গাড়ি উল্টে কয়লা ফেলছে অনুত্তম। গাড়ি টানছে, কয়লা ভবছে, স্যুটেব মুখে গিয়ে সেই কয়লা ফেলছে। কতক্ষণ পর্যন্ত এমন চলেছিল সে বলতে পাববে না, কতক্ষণ পর্যন্ত এই দুবন্ত মেহনতি জীবন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কবেছিল, তাও বলতে পাববে না—শুধু, মনে আছে

তিন নম্বর পরিদারের কথা। সে এসে বাংকারে ঢুকে চিৎকার করছে, অ রে ব্যনার্জি, স্যটের মুখিতে আর কত কয়লা দেবা? কয়লা ভরি এখন তো উবদা হয়ে পড়ছে স্যটের রানি পেরেসানি।

তিন নম্বর পরির কয়লাওয়ালাকে সে কোনও জবাব দিল না। জবাব দেবার মতো ক্ষমতা শরীরে নেই। শাবলটা গাড়ির উপর রেখে টলতে টলতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল। গলার ওকটা ঠেলে উঠছে। গলার শিরা-উপশিরাগুলি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠল। কোনও রকমে একহাতে গলা চেপে সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময় নাকে-মুখে এসে ওকটা জমা হয়েছে। বোট-ডেকের উপরে এসে আর টাল সামলাতে পারল না। উপুড় হয়ে গেল অনুত্তম। নাক-মুখ দিয়ে প্রচণ্ড জোবে ওকটা বের হয়ে এল। খানিকটা রক্ত-জল। আঁশটে দুর্গন্ধ। রক্তবমি হচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে সে ছটফট করতে লাগল।

ব্রিজ থেকে ক্যাপ্টেনের কুকুরটা একমাত্র সাক্ষী থেকেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে নামল কুকুরটা। চেটে চেটে রক্তগুলো খেল। অনুত্তমের মুখটা চাটল। কিন্তু তবু যেন তৃপ্তি পেল না। সামনে অন্ধকার। জল শুধু, জলের অন্ধকার। কুকুরটার এখন কান্না পাচ্ছে।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল—দি ডগ'স ক্রাইং ফব এ বিচ।

সমুদ্রটা কাঁপছে।

সমুদ্রেব অন্ধকাবে অনেকগুলো কান্নার প্রতীক হয়ে কুকুরের কান্নাটা এখন দূর-দিগন্তে ভেসে যাচ্ছে।

জল শুধু জল। দিগন্ত-বিস্তৃত অসীম জলরাশির একঘেয়েমি থেকে এই ক্রন্দন উত্থিত হয়। সমুদ্রযাত্রায় হতাশাবও শেষ থাকে না।

তিন

এখানে জাহাজ আর আকাশের রং, দিগন্তে সোনালি রেখা, রাতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, কখনও কুয়াশা, কখনও মেঘ। ঝড-বৃষ্টি হয়েছে রাতে। সমুদ্রটা আলকেউটের মতো দিনবাত্র কেবল ফুঁসছে। জাহাজিরা সাতদিন ধরে এসব দেখে দেখে যন্ত্রে সময় গোনার মতো সময়টাকে গুনছে। ওরা তীরের প্রতীক্ষায়, বন্দরের প্রতীক্ষায় বাববার চোখ মেলছে দিগন্তের দিকে, বন্দর কখন আসবে, বন্দব কখন উঁকি দেবে।

এখানে ভোবে সূর্য উঠবে। লাল সূর্য নীল সমুদ্রটাকে ভেঙে দু' টুকরো করবে, মনে হবে নীল রাজহাঁসটা অতিকায় একটা সোনার ডিম পাড়ছে। উত্তাপ পেয়ে ওটা ফুলছে, বড হচ্ছে। তারপর সমুদ্রের উপর ভেসে উঠবে। কাঁপবে কিছুক্ষণ। জাহাজিরা কেউ দেখবে, কেউ দেখবে না। ডিমটা আকাশের উপর উঠে ক্রমশ গোল হতে থাকবে আর রুপালি রং ধরতে থাকবে। তখন নীল কোর্তা পরে পা টিপে টিপে উপরে উঠবে ডেক-জাহাজিরা, সিঁড়িতে কোনও শব্দ করবে না। ইঞ্জিন-রুমের বাবোটা-চারটার পবিদাররা ঘুমোচ্ছে।

পোর্ট-সাইডের কেবিনেব দরজা বন্ধ। দরজার ভিতর অদ্ভুত রকমের একটি সুর। এই সময় প্রতিদিন সমুদ্রের নোনা পানিতে সুরের কিছু প্রতিধ্বনি ওঠে। ইঞ্জিন-সারেং কোরানশরিফ পাঠ করেন। তিনি যেন এই সময় কার জন্য কাঁদেন।

ডেক-জাহাজিরা এখন স্টাবোর্ড-সাইডের বেঞ্চিটাতে বসে আছে। যতক্ষণ না সাড়ে সাতটা বাজবে ততক্ষণ ওরা এখানটায় অপেক্ষা করবে।

ডেক-সারেং আসবে। সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ডেক-সারেং ওদের একটু তফাত রেখে বসবে। বলবে, কই রে ভাণ্ডারি, আমার চা কই?

ঠিক এই সময়ে অনুত্তম ফোকশাল থেকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। চুপচাপ ওদের পাশে এসে বসল। সে ডেক-জাহাজিদের পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে গল্প শুনছে। যন্ত্রে সময় গোনার মতো প্রতীক্ষা করছে, আটটা-বারোটা কখন। কখন আবার মৃত্যুর মতো একটা জীবন অস্থিরভাবে তার বুকের উপর পায়চারি শুরু করবে। তবে ওই রক্ষে, রক্ত-বমিটা এখন নেই। গলা আপনিতেই চিরেছিল, আপনিতেই নিরাময় হয়ে গেছে।

ডেক-সারেং অনুত্তমের দিকে চোখ তুলে বলল, ব্যানার্জির শরীর ভাল যাচ্ছে তরে-ব?
তা কোনও রকমে চাচা।
অনুত্তম বলে হাসল। শেষে সাবেঙের মুখোমুখি বসে বলল, কলম্বো বন্দরে জাহাজ কতদিন থাকবে চাচা? আমরা নামতে পারব তো? রাতে শহর ঘুরতে পাব?
হুঁ হুঁ অনায়াসে। ভোরবেলায় জাহাজে হাজিরা দিতে পারলেই হইল।
জাহাজ বন্দরে কতদিন থাকবে?
কী করে কই! মাইজলা-মালোম তো কয় কেবল রসদ নাকি নিব।
পরের প্রশ্নটা অনুত্তমের মনে। কলম্বো থেকে কোথায় যাবে জাহাজ? যাবে ডারবান। কয়লা নেবে। মেজ-মালোম তাই বলেছে। স্যুট থেকে কয়লা নিতে মাত্র চার ঘণ্টা। কলকাতার কয়লাঘাটায় তাই জাহাজটা পড়ে থাকেনি। কিছু পাটের গাঁট আছে, তাও নামানো হবে। মেজ-মালোম বাইনোকুলারটা হাতে নিয়ে চুপচাপ সমুদ্রে একটা যাত্রী-জাহাজ দেখার সময় অনুত্তমকে সেই কথাই বলেছে।
অনুত্তম বলেছিল, স্যার, কী দেখছেন?
দেখছি জাহাজটা। কোন কোম্পানির আর কোন শ্রেণির যাত্রী দেখছি।
কিছু দেখতে পেলেন?
দেখেছি। দেখলাম কোম্পানির ফ্ল্যাগ, জাহাজের নাম।
কোন কোম্পানির?
পি এন্ড ও কোম্পানির। যাত্রী কোন শ্রেণিব, দূববিনে ধরা পড়ছে না।
দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন মেজ-মালোম, গত সফবে জাহাজটাকে সিঙ্গাপুব থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছিলাম। আমাদের জাহাজ তখন হারবারের দিকে যাচ্ছে।
মেজ-মালোম ভদ্র, খুব ভাল, জাহাজ চলার পব থেকে অনেকবার ডেকে কথা বলেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবু কেন জানি অনুত্তম এতগুলো প্রশ্ন করতে সংকোচবোধ করেছিল। মেজ-মালোম কথা শুরু করলে শেষ হয় না। আগে কোন কোম্পানির জাহাজে ছিলেন, কোথায় কোথায় গেছেন, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কথাও উঠল, কত কথা যে উঠল। কিন্তু মেজ-মালোম ডেক-পাটাতন থেকে ফলকায় উঠে যাওয়াব সময় বললেন, স্ট্যাচু অফ লিবার্টিকে দূরবিনে দেখতে হয় না, এই যা বক্ষে। প্রকাণ্ড সেই মূর্তি। মেয়েমানুষেব মূর্তি। ডানহাতে এক প্রকাণ্ড টর্চ জ্বলছে। হাজার বাতির আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। যদি নিউয়ার্ক কোনওদিন যাও তবে দেখতে পাবে।
ফলকার কিলগুলো দেখলেন মেজ-মালোম। টেনে টেনে পরীক্ষা করলেন তিনি, এই কিলগুলো সমুদ্রেব ঝড়ে নরম হয়ে গিয়েছে কি না। তারপর বলেছিলেন ফের, জাহাজ এবার পানামা ক্যানেলের উপর দিয়ে যাবে। ক্যানেল দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে অনুত্তম।
সারেং অনুত্তমের মুখোমুখি বসে হাই তুলল। একজন পঁচিশ টাকার নাবিক এবং তেইশ টাকার দু'জন নাবিককে ডেক-টিন্ডালের হাতে তুলে দিলেন তিনি। মেজ-মালোম বলে গেছেন, ফবোয়ার্ড-পিকের মাস্তুল দুটোয় রং লাগাতে হবে। সারেং বাকি সব নাবিকদের নিয়ে বসে থাকলেন সাড়ে সাতের ঘণ্টির জন্য। ওরা সব মিলে এখন ড্যারিক হাপিজ করবে।
ব্রিজে ঘণ্টি পড়ল। ডেক-সারেং ডাকলেন এবার, ওরে ভাই সব, আইসো।
ডেক-কশপ পিঠে দড়ি ফেলে এদিকেই আসছে। মাজেদ টুপিটা মাথায় টেনে ড্যারিকের নীচে গিয়ে দাঁড়াল, মাস্তুলের কপিকলের ভিতর মোটা লোহার তার ভ'রে হাঁকছে মাজেদ, মার টান হাইয়ো, জোয়ান লোক ভাইয়ো।
সারেং জবাব দিল, সামনে ভাই কলম্বো বন্দর।
শুধু নীল আর নীলের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁচকা দিচ্ছে জাহাজিরা, হাইয়ো।
ব্যাটার বিবি ভারী সুন্দর।
হাইয়ো।
সোমন্দির পো বড়-মালোম।
হাইয়ো।

কলম্বো বন্দরে বিবি ধরুম।

হাইয়ো।

বিবির চলন বেসামাল।

হাইয়ো।

হ্যাঁচকাটা এবার জোরে পড়েছে। ড্যারিকটা অনেক উপরে উঠে গেল।

মনের ঝাল হল কামাল।

হাইয়ো, হাইয়ো বলে ড্যারিকটা একেবারে খাড়া করে দিল জাহাজিরা।

বান্দোরে মিঞা, জোরে বান্দো।— সারেং মাজেদকে কথাটা বলে ড্যারিকটার দিকে চাইল। কপিকলটা ঠিকমতো ঝুলছে কি না দেখল। বিকালে জাহাজ বন্দর ধরবে। সারেংকে খুব খুশি মনে হল।

অনুত্তমও খুশি হল এই খবরে। প্রতিদিন আশা করেছে মাটি বুঝি এই দেখবে, এই দেখবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে, সমুদ্রের নীল ঢেউগুলোর ভিতর জমি দেখার জন্য, মাটির রং দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। সমুদ্রে অসংখ্য দ্বীপ, কিন্তু সাতদিন ধরে কোনও মাটিব দেখা নেই। বন্দরের কথা ভেবে সে খুবই উচ্ছল হয়ে উঠল। হরিদাস সেনেব মতো ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শিস দিতে ইচ্ছে হল। এদিক-ওদিক অনেক দূরে সে দৃষ্টি মেলেছে সেজন্য। আকাশ দেখবে, নক্ষত্র দেখবে, মাটি দেখবে। দিগন্তে মাটিব রেখা দেখে আশ্চর্য হবে। সকলের আগে মাটির সংবাদ দিয়ে জাহাজিদের অবাক করবে। কিন্তু এমন সময় ডাকল পরিদার ছোট-টিন্ডাল, অরে ব্যানার্জি, যাও। কয়লা শাবল বুঝে নাওগা।

সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে ওঠার সময় উত্তেজনায় হেঁকে বলল অনুত্তম, সোমন্দির পো বড়-মালোম, কলম্বো বন্দরে বিবি ধরুম।

নীচে স্টোক-হোলড। সেই কয়লা, সেই শাবল, বাংকার, গাড়ি। কালো অন্ধকার। মুশকিল আসানের মতো লম্ফটা জ্বলছে। একটা মানুষ ছায়াব মতো, ভূতের মতো। অনুত্তম সিঁড়ি ধরে নীচে নামল। প্লেটের উপর দাঁড়াল। হরিদাস সেনের মানুষ-খেকো বাঘের মতো সেই চেহারা। উইন্ডস-হোলের নীচে দাঁড়িয়ে এখন তিনি শিস দিচ্ছেন। টিন্ডালের চিৎকার। সে খিস্তি করছে বাংকারে ঢোকার সময়।

বিকেলে বন্দর ধববে জাহাজ। জাহাজিদের কাছে বন্দর খুবই শিহরনের খবর।

বন্দর ধরবে জাহাজ।

কতদিন পরে যেন ধরল। কত যুগ পবে যেন মাটির স্পর্শ পাবে তারা?

অনুত্তম হিসেব করে বুঝল, মাটির জন্য এই অপেক্ষা হাতের কড গুনে বোঝানো যায় না। সে তাই আর সময়ের হিসেব না করে বাংকারে ঢুকে মজিদের গলা জড়িয়ে আবৃত্তি করল, সামনে ভাই কলম্বো বন্দর, ব্যাটার বিবি ভারী সুন্দর।

তুই কি পাগল হইলিরে ব্যানার্জি!

আমি পাগল হয়েছি সখি মাটির লাগিয়া। —কীর্তনেব সুরে অনুত্তম গান ধরল। মজিদ হেসে কূল পাচ্ছে না। বিকেলে জাহাজ বন্দর ধরবে। অনুত্তম এ কথাটাও গানের সুরে বলল।

অঃ! তোমার ফুর্তি এর লাগি?—মজিদ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

অনুত্তম মজিদকে নিয়ে বাংকারে বসে গল্প করতে চাইল আজ। নিভৃতে, নীরবে, দু'জন চুপচাপ বসে দেশের গল্প, নদীর গল্প, মা কী বলেছে, বাবা কী বলেছেন, বোনটা কী ভেবেছে আসবার সময়, পড়শি তখন জানালায় কেমনভাবে আঁচলটা দুলিয়েছিল, ওর চোখে জল কি মুক্তো ঝুলেছে না কেঁদেছে, সেসব কথাগুলো বলার একান্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মাল তার। সে গাড়িটার কাছে এসে শাবলটা তুলে নিল হাতে, তারপর অনেক দূরে শাবলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আজ আর কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না মজিদ। আয় একটু বসে গল্প করি।

কিন্তু মজিদ বসল না। সে উঠে দাঁড়াল। বললে, স্যাটের মুখ দ্যাখ।

অনুত্তম শাবল দিয়ে আবার স্যাটের মুখটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখল। নীচে স্টিম-ককগুলি অদ্ভুত ঝিম ঝিম শব্দ করছে। আল্লাহ আকবর কি ইনসে আল্লা এখন আর কেউ নীচে বলছে না। সারা জাহাজে উত্তেজনা। সামনে বন্দর, মাটি, মেয়েমানুষ।

এমন সময় আবদুল ঢুকল। মজিদ বের হল বাংকারের দরজা দিয়ে। লম্ফটা খুব জোরে জ্বলছে। অনুত্তম বলল মজিদকে, ব্যাটাব বিবি ভারী সুন্দর।

তোবা তোবা।—মজিদ কান ছুঁয়ে উপরে উঠে গেল।

টিণ্ডাল ঢুকল। বেসুরো গান ওর রগ বের করা কণ্ঠে। ভিতবে ঢুকে অনুত্তমের পাশে দাঁড়াল। বলল, সাবাস ব্যাটা।

তাবপর সে বসে পড়ল।

অনুত্তম গাডিটা ধরে ঠেলা দিচ্ছিল। কিন্তু টিণ্ডাল গাড়িব হাতলটা ধবে ফেলল। বলল, পরি শেষ করে দুটো খাবা, ঘুমোবা। বেশিক্ষণ কিন্তু ঘুমোবা না, তোমার চাচিব খতটা আবার লিখে দিতে হবে। মনে থাকে যেন ব্যানার্জি, তুমি আমায় চাচা ডেকেছ। ভাতিজার কিন্তু চাচাব লাগি এ কাজটুকু কবতেই হবে। লিখবা, মিঞাজান তোমাব জবাব পেয়েছে, সে খুব সুখী হয়েছে।

অনুত্তম হেসে ফেলল। টিণ্ডালও লজ্জা পেয়ে ফিক ফিক করে হেসে সিঁড়ি ধবে নীচে নেমে গেল।

আবদুল বিজ্ঞেব মতো পাশ থেকে বললে, পাগল।

ভীষণ কড়া বোদ ঝরছে আকাশ থেকে। পরি শেষ কবে অনুত্তম লাইফ-বোটেব ছায়ায় দু' ঠ্যাং ছড়িয়ে আজ প্রথম একটু নিশ্চিন্তে বসল। কড়া রোদটাকে আড়াল করে সে তাকাল ব্রিজেব দিকে। মেজ-মালোমেব এখন ওয়াচ। তিনি ব্রিজে পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে বুকে ঝুলানো দূরবিনটা তুলে দূরের বন্দব দেখছেন।

অনুত্তমও খুঁজল। সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে সেখানে খুঁজল। সমুদ্র-কিনারায় এক টুকরো মাটিব আশায় সে অপেক্ষা কবে আছে।

শূন্য। সব শূন্য। শুধু আকাশ-দিগন্ত। শুধু সমুদ্র-রেখা। ঢেউ, পাবপয়েজ মাছ, উড়ুক্কু মাছেব ঝাঁক। অন্য কিছু নেই।

মেজ-মালোমেব দযা হল। তিনি দেখছেন, অনুত্তম বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে মাটি খুঁজছে। ওর মুখ কযলায় কালো। চোখদুটো লাল। ক্লান্ত। চোখে বন্দরেব আশা। তিনি ব্রিজ থেকে ঝুঁকে ডাকলেন, হ্যাল্লো অনুত্তম!

ইয়েস স্যার! অ্যানি ল্যান্ড, সেকেন্ড?—অনুত্তম ছুটে ব্রিজের আরও কাছে গেল। মাথার উপর টুপিটা টেনে দিল।

মেজ-মালোম বললেন, ইয়েস!

অনুত্তম চিৎকাব করে উঠল, ওঃ ফাইন! কী মজা হবে! কখন? হোয়েন উই উইল অ্যাবাইভ দেয়াব? কখন আমবা যাব, মাটিতে নামব?

মেজ-মালোম ব্রিজে এবার সহজ হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, ইউ উইল গেট দি পোর্ট বিফোর ইভনিং। উই উইল ল্যান্ড দেয়াব।

হরিদাস সেন এবং আবদুল একসঙ্গে ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসছে। অনুত্তমের পাশে দাঁড়িয়ে ওবাও শুনল। শুনল জাহাজ সন্ধ্যার আগেই বন্দর ধরবে।

অনুত্তম বোট-ডেক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। টুইন-ডেক সে দৌড়ে পার হল। গলুইতে সে এসে থামল প্রথম খবরটা দেবে ভেবে। সকল জাহাজিদের খবর দিতে হবে। মেজ-মালোম দূরবিনে কলম্বো বন্দর দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এসে দেখল ডেক-জাহাজিদের মেসরুমে হই হই কাণ্ড! মাজেদটা নাচছে। লুঙি মাথায় পাগডি করে হুলা-হুলা নাচ। এনামেলের থালা বাজাচ্ছে বসির, এনারদ্দি। রঙের খালি টব ঢোলকের মতো করে বাজাচ্ছে মকবুল আর হুইউ-হুইউ করছে। সিটি মাবছে।

মানুষের এমন বেসামাল চলন অনুত্তম এই প্রথম দেখল। সে লজ্জায় প্রথম চোখ বুজেছে। পরে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এই মাজেদ, তুই এটা করছস কী!

ডেক-সারেং এদিকটায় আসতে কে একজন ডেকে বলল, সারেং সাব, এখন ওদিকটায় যাবেন না।

সারেং সাব জানেন, জাহাজে কী হয়, কী না হয়। তিনি গলুইয়ে আর উঠলেন না। ডেকের উপর

দাঁড়িয়ে পাহারায় থাকলেন। দেখলেন এখন বড়-মালোম কোথায়! বড়-মালোম আগিলের ডেক-এ। জাহাজিরা মাটির খবর পেয়ে উন্মত্ত হয়েছে। মেসরুমে ওরা তাই উৎসবে মেতেছে। তিনি ডেক-এ দাঁড়িয়ে ওদের চিৎকারগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন। ভাবলেন বরং সামনের ডেক-এ এগিয়ে যাওয়া যাক। বড়-মালোমকে অন্য কাজের কথা বলা যাক। কাজটা বুঝে নিতে যতটা দেরি হয় ততক্ষণ ওরা আনন্দ করুক।

সংক্রামক ব্যাধির মতো এই আনন্দটা সকল জাহাজিদের মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল। আমলদারদের দুঃখ, নেহাত তারা আমলদার। তারা নীচেই থাকল। ফোকশালে বসে ওদের অশ্রাব্য গানগুলো শুনল। উপরে উঠে সাধারণ জাহাজিদের সঙ্গে মিশে যেতে পারল না। অন্য সব জাহাজিরা, যারা শুধু খাটতে এসেছে, খাটাতে আসেনি, লুঙি মাথায় পাগড়ি করে হুলা-হুল্লা নাচল।

ওরা আনন্দ করছে। আজ সন্ধ্যায় বন্দর পাবে সেই আনন্দে।

ওরা উৎসবে মেতেছে। মাটির স্পর্শে উন্মত্ত হবে সেই উৎসব।

মাজেদ ক্লান্ত হয়ে এখন হাঁপাচ্ছে এক কোনায়।

মজিদ নীচে নেমে পেটি খুলল। ফোকশালের আলোটা জ্বালা ছিল, সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

অনুত্তম স্নান সেরে হরিদাস সেনের সঙ্গে খেতে বসেছে। পড়শির কথা ভাবছে। বন্দর আসবে, বন্দরে নেমে পড়শির মনোমতো জিনিস কিনতে হবে, সে কথাও ভাবল। সহসা মুখ তুলে এক গ্লাস জল ঢালল গলায় ঢক ঢক কবে এবং আরও সহসা প্রশ্ন করে বসল হরিদাস সেনকে, দাদা, বউদিকে চিঠি দেবেন না? বউদির কথা নিশ্চয়ই খুব বেশি মনে পডছে আজ।

হরিদাস সেন চুপ থাকল কিছুক্ষণ। কী ভেবে বলল, নিশ্চয়ই দিতে হবে। তোব বউদির বাচ্চা হবে। খুব চিন্তায় আছি।

চিঠি পাইলট নিযে আসবে, না এজেন্ট নিয়ে আসবে?—অনুত্তম ফের প্রশ্ন কবল।

পাইলটও আনতে পারে, এজেন্টও আনতে পারে।

খেতে খেতে ভাবল অনুত্তম, মা'র চিঠিটা আজই লিখে রাখতে হবে।

হাত-মুখ ধুযে অনুত্তম সিঁডি ধরে নীচে নামল। ফোকশালে ঢুকল, মজিদ বসে আছে বাংকে। মজিদেব পাশে বসে ওব পকেট থেকে দুটো লবঙ্গ তুলে নিল হাতে। বলল, কী রে? এখানে বসে আছিস? ঘুম পাচ্ছে না?

মজিদ অনুত্তমের কথার জবাব না দিয়ে ফিস ফিস কবে বলল, অঃ ব্যানার্জি, আমার একটা কথা বাখবি!

তোর আবার কী কথা? খত লিখে দেওয়ার কথা বুঝি? বিবিকে খত দেওয়ার খুব শখ তো দেখছি।

বিবির কথা কইয়া আর শরম দ্যাস ক্যান?

অনুত্তম দেখল মজিদ খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। কথা বলছে না। কিছু অপ্রকাশেব বেদনায় চোখদুটো ভারী-ভাবী। অনুত্তম এবার মজিদকে জড়িয়ে ধরে বলল, বল কী হয়েছে? তোর কথা আমি বাখব।

একটা কাগজের মোড়ক অনুত্তমের হাতে তুলে দিল মজিদ।

কী আছে এর ভিতর?

আমসত্ত্ব আছে।

কেমন ভয়ে ভয়ে জবাব দিল মজিদ, মাইয়াটা আসনের সময় দুটো জোর কইরা পেটিতে ভইরা দিছে। কইছে, বাজান আপনে খাইয়েন। তরে দিলাম। তুই খাইবি।

সে তো বেশ কথা! খাব। নিশ্চয়ই খাব।

তুই একলা খাবি।

তাই খাব। আমার মা-ও পাকিস্তানের বাড়িতে আমসত্ত্ব দিত। ওর মনে পড়ল ছোট একটা ঘরের কথা। ছোট একটা দরজার কথা। বারান্দায় অনেকগুলো শ্বেতপাথর থাকত। মা তার উপর আমের গোলা ঢেলে দিতেন। অনুত্তম হাতে একটা পাট-কাঠি নিয়ে কাক শালিক তাড়াত। সে বসে থাকত, ঘুমে ঢুলু ঢুলু হত চোখদুটো। মা তখন পুকুরঘাটে স্নান করতে গেছেন। তিনি ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে বলতেন, কই রে অনু, কাপড়টা দে তো বাবা। চুলগুলি থেকে জল টপ টপ করে মাটিতে পড়ত তখন।

মা'র স্নিগ্ধ মুখে-চোখে অনেক স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল সেদিন। বাঁশঝাড়ের নীচে, পুঁটিমাছের জলে, কামরাঙা গাছের ছায়ায়, কমলা রঙের রোদে মা'র মুখের অনেকগুলো ছবি চোখের উপর ঝুলতে থাকল অনুত্তমের। বর্ষার দিনে বাবা নৌকোয় করে ফিরতেন মুড়াপাড়া থেকে। আখ আনতেন, বড় বড় জল-কচু আনতেন। ঘাটে নৌকা ভিড়লে বাবা ছইয়ের ভিতর থেকে ডাকতেন, আয় রে অনু। তোর জন্য আখ এনেছি।

আমার বড় পুত সোলেমান তর মতো। মাইয়াটায় দিব, পোলাটায় খাইব। হেইয়রে ব্যানার্জি।— অনুত্তমের হাত ধরে বলল মজিদ, পোলাটা দেখতে তর মতো। চুরি কইরা আমসত্ত্ব খায়, মাইয়াটা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দে।

তোর বিবি সোলেমানকে কিছু বলে না?

তর যে কথা! বিবি বাঁইচা থাকলে জাহাজে ফের আসতে দেয়। কী যে হেইতের অসুখে ধরল, আল্লাই জানে।

অনুত্তম চুপ করে থাকল এবার। এতদিন ধরে ওর বিবিকে নিয়ে আবদুল, মাজেদ, এমনকী ছোট-টিন্ডাল পর্যন্ত হাসি-মশকরা করেছে। অথচ সে একবারও কিছু বলেনি। চোখদুটো ভার-ভার করে বাংকে বসে থেকেছে। মজিদের বিবি নেই। বিবিকে জাহাজে আসবার আগে গোর দিয়ে এসেছে।

মজিদ মুখ নিচু করে বলল, বিবির কথা ভুইলা থাকতে চাই। জাহাজে আইছি, তগোবে পাইছি, কত কথা এখন মনে হয়।

বাংকে বসেই অনুত্তম আমসত্ত্বটুকু খেল। মজিদ খুব খুশি হল দেখে। বলল, পরানটা বড় তৃপ্তি পাইল ব্যানার্জি।

মজিদ উঠে গেল তারপর। অনুত্তম দেখল মজিদের খাওয়াটা। ওরা একই কাজ করে। মজিদের বয়স উত্তর-পঞ্চাশে। অথচ তুই-তুকারি করে অনুত্তম। কী করে যে এই ক'দিনে তুই তুকারিটা এসে গেছে। অনুত্তম বলতে পারে না। উত্তর-পঞ্চাশের মানুষটা বড় রোগা। শীর্ণ। মুখের চোয়ালের হাড়গুলো অতিমাত্রায় উঁচু। চোখগুলো সাদা সাদা। বিশীর্ণ। উত্তাপ-শূন্য। ঘোলাটে। দু'দিন বাদে হয়তো ছানি পড়বে। উপরের চোয়ালে একটাও দাঁত নেই। কথা বলার সময় নীচের দুটো দাঁত উপরের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে। অনুত্তম প্রথমদিন ওর কথা শুনেই হেসেছিল। ভেবেছিল এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে ফোকশালে, বাংকারে দিন-রাত্রি কাটবে। মনটা কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল তখন। আজকে ভাবল অনুত্তম, জাহাজে এরাই তার সব। একটি অদ্ভুত রকমের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে মানুষগুলোর সঙ্গে। মানুষগুলো তার মা'র মতো, বোনের মতো, পড়শির মতো।

হাতে কোনও কাজ নেই। এখন শোয়া। ঘুম না এলেও শুয়ে চোখদুটোকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা। আটটা-বারোটার পরিতে জাহাজ কলম্বো বন্দরে বাঁধা থাকবে। না ঘুমোলেও তেমন কোনও ক্ষতি নেই। বরং বাংকে শুয়ে পড়শিকে ভাবা যাক। পড়শির চোখদুটো, মুখটা পলাশের নীচে কেমন রাঙা হত, জাহাজে এখন একা থাকলেই কেবল জানালায় সেই পড়শির মুখ মনে পড়ে।

কিন্তু আজ শুধু সে কিনার দেখার জন্য অপেক্ষায় আছে। হয়তো এতক্ষণ জাহাজ-ডেকে কলম্বো বন্দরের ছায়াটা আকাশ-সীমানায় ভেসে উঠেছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। ঘুম না এলেও শরীরে জড়তা এসেছে। হাত-পা ছুঁড়ে তা ভাঙল। শেষে সিঁড়ি ধরে উপরে ছুটে গেল।

গঙ্গাবাজুর একটা বেঞ্চিতে তিন-চারজন জাহাজি রেলিং-এর উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওরা অন্য কোনও এক বন্দরের গল্প করছে। বুড়ো ইঞ্জিন-ভাণ্ডারি গ্যালি থেকেই ফোড়ন কাটছে মাঝে মাঝে। গল্পটা নেহাত গল্পেরই মতো। প্রতীক্ষাগুলো ওদের অন্য আকাশের জন্য। ওরা আকাশ-সীমানায় অন্য একটা ছায়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

দূরের একটা দেশ ছায়ার রং ধরেও ধরছে না। নীল ঢেউগুলোর ভাঁজে অস্পষ্ট হয়ে রহস্য ছড়িয়ে রেখেছে। একজন বলল, ওই তো। ওই তো।

অন্যজন বলল, ওটা তো মেঘের টুকরো। কুমির ছিল, মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

সকলে দেখল, সত্যি। আকাশের মেঘটা ছড়িয়ে গিয়ে এখন মানুষের রূপ ধরছে। মেয়ে-মানুষের। সব জাহাজিরা এসে গলুইতে ভিড় করল আবার। কিন্তু ওটা শেষ পর্যন্ত নেকড়ে বাঘ হয়ে গেল।

অনুত্তম বলল, তারপর ওটা জাহাজ হয়ে যাবে।

জাহাজ আর হয়নি। মেঘের টুকরোটা সরে সরে সমুদ্রের অন্য-তীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু সামনে নীল আর নীল রংটার উপর কতকগুলো ফিঙে পাখির ওড়াউড়ি। পাখি উড়ে ছায়া ফেলছে। কিংবা হাজারও ফুটকরি থেকে একটা ফুটকরি মুখে পুরে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নীল আর ধূসর সমুদ্রে পাখিগুলো বাস্তুভিটে শূন্য। দুটো পাখির রঙিন স্বপ্ন কোনও এক বন্দর-সীমানায় হয়তো বাসা বেঁধেছে। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও তীরে ফিরে যাবে। না গেলে অনুত্তম পাখিগুলোকে অসহায় ভাববে। পাখিগুলোও তার মতো পেটের দায়ে তীর ছেড়ে সমুদ্রে এসেছে, সঙ্গে এ কথাটাও মনে হবে।

বুড়ো ভাণ্ডারি রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতে চাইবে পাখিগুলোকে নিয়ে। গল্পের ভিতর কোনও গল্পেরই ইশারা থাকবে না। জাহাজিরা ভাণ্ডারির গল্প শুনতে চাইবে না। বন্দরের মেয়েমানুষ দেখার জন্য ওরা পাগল। পাখিদের ডানার হাওয়ায় ওদের মনটা এখন বন্দরের উপর উড়ছে।

বুড়ো ক্যাপ্টেনের চোখে বাইনোকুলার। পোর্ট-হোলের ভিতর থেকে বাইনোকুলারের মুখ দুটো বের করে নীচের দিকে ঝুঁকে আছেন।

বুড়ো বয়সে অত শখ কেন মাটি দেখার।

কোনও একজন জাহাজি ঠাট্টা করল। হাসল।

চোখের নজরকে ঝুলিয়ে রেখেছে অনুত্তম। সমুদ্রের উপর ঝুলছে। এতগুলি হাসি এবং কথার ভিতর সে একবারও ফিরে দেখেনি, কে হাসল, কে বুড়ো কাপ্তানকে বিদ্রূপ করল। আজ সাতদিন হল এই সমুদ্র, দু'দিন হল নদীর মোহনা—জল আর জল, এবার সে মাটি দেখার জন্য পাগল। ডায়মন্ডহারবারের ঢিবিটার উতবাইয়ে যে মেয়েটা নেমে গেল, সে তো এক যুগের কথা হবে। মেজ-মালোম আরও অনেকক্ষণ দেখেছিলেন। দূরবিনের চোখদুটোতে মেয়ে-মানুষের দেহটা অনেকক্ষণ ঝুলছিল বোধহয়।

রক্ত-বমি, আটপৌরে জাহাজি জীবন, আটটা-বারোটার ওয়াচ, সব দুঃখগুলো বন্দরের প্রতীক্ষাতে অন্য কোনও সুখী মনের দরজায় এনে অনুত্তমকে হাজির করেছে। এমন অপেক্ষার জীবন সে কোনওদিন হাতড়ায়নি। সুখী হবার এমন ইচ্ছা মনে তার কোনওদিন জাগেনি। সমুদ্র পার হয়ে কোনও দেশের কাছে এসে প্রতীক্ষার সফলতায় এমন আধমিশ্র আনন্দ জীবনে সে কোনওদিন উপলব্ধি করেনি।

সহসা অনুত্তম পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

মাটি, ওই মাটি! তোমরা কে আছ নীচে, সব উপরে উঠে এসো। মাটি! মাটি! ল্যান্ড!

দ্বীপটা আকাশ-সীমানায় ভেসে উঠেছে। রুপালি দ্বীপে সোনালি রাজ্য রাবণ রাজার দেশ। সেতু-বন্ধন, রাম-লক্ষ্মণ, অশোক বনে সীতা, ঠাকুমার ছেঁড়া রামায়ণ, ভাঙা চশমা, অনেকগুলো চোখ, বিকেলের বারান্দায় মা-ঠাকুমার রামায়ণ পাঠ—সব এক-এক করে চোখে ভাসল। দিগন্তরেখায় সেতু-বন্ধনের ওপরে একটি ধূসর উঁচু-নিচু দেশ জলরঙা ছবির মতো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অন্যান্য জাহাজিরাও ঝুঁকল। তারাও বলল, ওই মাটি, ওই দ্বীপ।

ওই মাটি, ওই দ্বীপ। কেউ কেউ গল্প আরম্ভ করেছে আবার। হাতির গল্প। কাঠের হাতি কিনে অন্য বন্দরে বেচার গল্প। অনুত্তম সব শুনছে। চোখ ওর জলরঙা ছবি থেকে কিছুতেই উঠে আসছে না।

বিকেল আসছে গড়িয়ে গড়িয়ে। জাহাজিরা কাজে ঢিল দিয়েছে। হালটা বেঁকে আছে এখন জাহাজের। সমুদ্রের বুকে প্রপেলারের আঁচড়টা বৃত্তাকার হয়ে আসছে। বন্দরের মুখ ধরেছে জাহাজ।

টিন্ডাল অনুত্তমের পাশে এসে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ রেখে বললে, খতটা লিখে দিবা না?

চিঠি আগে আসুক।

টিন্ডাল ঠোঁট কামড়ে হাসল। অবহেলার এক টুকরো হাসি। হাসিতে তাচ্ছিল্যের অনেক টুকরো টুকরো খবর। ওটা একটা কথার কথা নয়। বিবি তার তেমন বিবি নয়। খত একটা না লিখে থাকবে বিবি, কথাটা ভাবতেও কষ্ট হয় ছোট-টিন্ডালের।

অনুত্তমের ইচ্ছা নেই এই সময় সে ফোকশালে নামে, সে তার নিজের জগতের যে আনন্দটুকু নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। সে তাই উঠি-উঠি করে আরও অনেকক্ষণ বসে থাকল।

একসময় অনুত্তম উঠে দাঁড়াল। বলল, চলুন, চাচা। আপনার খতটা লিখে দিয়ে আবার উপরে আসব।

অনুত্তম যখন খত লিখে উপরে উঠে এসেছিল তখন সে দেখেছে কলম্বো বন্দরের পাইলট এসে জাহাজে উঠেছে। কাপ্তেনের সঙ্গে গল্প করছে ব্রিজে উঠে। মেজ-মালোম, বড়-মালোম, দু'জন ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-গল্প শুনছে।

মেজ-মালোম এখন এদিকেই আসছেন। বিষণ্ণ তিনি। ক্লান্ত তিনি। তিনি টুইন-ডেকে নেমে ডেক-সারেংকে ডাকলেন। বন্দর দেখে তিনি খুশি হতে পারেননি যেন।

বন্দরের জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো জাহাজ বয়াতে বাঁধা। অনেক দূর-সমুদ্রে বন্দরের সীমানা। ডকে স্থান-সংকুলানের বড় অভাব।

সারেঙের হাতে এক বান্ডিল চিঠি তুলে দিলেন মেজ-মালোম এবং কিছু বললেন। সারেং মাথা নিচু করে শুনল। তারপর ফিরে এল পিছিলে। তার হাতে চিঠি। দেশের খত। জাহাজিরা সব এসে সারেংকে বৃত্ত করে দাঁড়িয়েছে। সবার কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন, সারেং সাব, আমার চিঠি, আমার কোনও খত?

সারেং কোনও জবাব না দিয়ে হরিদাস সেনের হাতে সব চিঠিগুলি তুলে দিল।

হরিদাস সেন ডাকল, মকবুল হোসেন।

মকবুল চিঠিটা নিয়ে অনুত্তমের গলা জড়িয়ে ধরল, আমার খত।

খুব খুশি মকবুল। চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বলল, ব্যানার্জি, একটু পড়ে দ্যাখ না কী লিখা আছে?

দাঁড়া দেখছি।—অনুত্তম বাধা দিল মকবুলের কথায়।

ফরিয়াদ শেখ, জাফর মিঞা। হরিদাস সেন ওদের চিঠিগুলো দিয়ে অনুত্তমের দিকে হাত বাড়াল।

তোর চিঠি ধর।

পড়শির চিঠি। নীল খামে মোড়া চিঠিটা অদ্ভুত রকমের নরম বলে মনে হল। সে চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল আপাতত।

মকবুলের চিঠিটা পড়ে দিল। জাফর মিঞার চিঠি পড়ে দেওয়ার সময় দেখল ছোট-টিন্ডাল চুপি চুপি দূরে সরে যাচ্ছে। ওর কোনও চিঠি আসেনি। বিবি খতে দুটো লাইন লিখে খসমের সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। তাই ওর কবজিতে বাঁধা কবচগুলি বড্ড ঝুল ঝুল করছে। গলার রগদুটো বেশি মোটা হয়ে গেছে। মাজেদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে অভিমানে কাঁপল।

অনুত্তম ছোট-টিন্ডালকে ডেকে এ সময় বিরক্ত করতে চাইল না। ডেক-সারেং তখনও হরিদাস সেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিজেও একটা খতের অপেক্ষায় আছেন। হরিদাস সেনের কণ্ঠে তিনি তাঁর নিজের নাম শুনতে চান। কিন্তু শুনতে পেলেন না। তিনি দুঃখে দু'পাটি দাঁত ঘষলেন। সব জাহাজিদের উপর প্রতিশোধ নেবার ভঙ্গিতে বললেন, জাহাজ জেটিতে বাঁধা হবে না, বয়াতে বাঁধা হবে। নেও ইবারে আল্লাদে আটখানা হও।

সব জাহাজিরাই চোখ কুঁচকাল। তাদের বিস্ময়ভরা কণ্ঠে একটি মাত্র প্রশ্ন, সে কী সারেং সাব?

সারেং নিজের দুঃখটা ঢাকার জন্য সমুদ্রের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, জেটি খালি নাই।

অনুত্তম ঠিক বুঝতে পারেনি এতক্ষণ সারেং সাব কেন এত বিষণ্ণ, ভাল মানুষ মেজ-মালোমকে কেন এত অসুখী দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা এবার তার কাছে কাচের মতো পরিষ্কার হল, জাহাজ বয়াতে বাঁধা হচ্ছে। অনেক দূরে বন্দর। জাহাজ থেকে অন্য অনেক জাহাজ অতিক্রম করে বন্দর, একেবারে অস্পষ্ট। বয়াতে জাহাজ বাঁধা হয়েছে। জাহাজিরা বন্দরে নামতে পারছে না।

কলম্বো বন্দরের পশ্চিমের আকাশটা লাল। আর-একটা বিকেল। আর কিছুক্ষণ পর নীল অন্ধকার নামবে দ্বীপটার উপর। আলো জ্বলবে সামনের অনেকগুলো জাহাজে। মেজ-মালোম বোট-ডেকে তেমনি প্রতীক্ষা করবেন। চোখে দূরবিন আঁটা থাকবে। ইজি-চেয়ারটায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে দেহটা। চোখদুটো দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে বন্দরের অস্পষ্ট রেখায় অন্য একটা জগতকে দেখার চেষ্টা করবে।

বোট-ডেক ধরে তখন জাহাজিরা নামবে। নতুন জাহাজি অনুত্তম মেজ-মালোমের পাশে বসে

প্রতীক্ষা করবে। মনটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে বলবে, অ্যানি ওয়্যান, সেকেন্ড?

মেজ-মালোম মাথাটা তুলে দূরবিনের কাচটা মুছে সংক্ষিপ্ত জবাব দেবেন, নো।

আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে জাহাজিদের মন। অনুত্তম বলবে, ইফ অ্যানি ওয়্যান, উড ইউ প্লিজ...

সন্তর্পণে দূরবিনটি চোখের উপর ঝুলিয়ে বলবেন, আই মাস্ট...!

এই দুটো কথার ভিতর থেকে জাহাজি-জীবনের যে বেদনার উত্তাপটুকু দূরবিনের কাচটায় সঞ্চারিত হবে এবং প্রকম্পিত হবে, মেজ-মালোম হয়তো তাতে লজ্জা পেতে পারেন, কিন্তু না পাওয়ার বিরাট অক্ষমতাকে অস্বীকার করবেন কী করে? তিনি তখন হয়তো বলবেন, আমি তোমাদের নিশ্চয়ই ডাকব। যদি দয়া করে এই দূরবিনের কাচটা একটা মেয়ে-মানুষের দেহ ধরতে পারে, তবে সকলকে ডেকে বলব, এসো, তোমরা দ্যাখো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ে-মানুষের সবটুকুকে দ্যাখো।

চার

ফোকশালে অন্ধকার। অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্ন থেকে একজন জাহাজি জাগল। সে চুপচাপ বসে রাতের গভীরতার সঙ্গে ঠাকুমার গল্প মনে করছে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রাজপুত্র-রাজকন্যা। ঠাকুমার সেই চৌকোমুখ, বলিষ্ঠ চেহারা, রাতভর পাখার হাওয়া, অনেক মধুব গল্প। গ্রহ-নক্ষত্রের খবব। ঠাকুমার সেই আকাশগঙ্গা, স্বাতী নক্ষত্র, আরও কী, আরও কী যেন! জাহাজি মানুষটা অন্ধকার ফোকশালে বাংকের উপব বসে আর মনে করতে পারছে না।

বর্ষাকাল। জমিতে জল। ধানখেত। ধানখেতেব আল। নৌকা যাচ্ছে। প্রথম কোষা-নৌকা, পরে ডিঙি-নৌকা, বড় বড় পানসি নাও, বজরা। ধীরে ধীরে একটা জাহাজ গেল। মেঘনার কালো জল থেকে জাহাজটা জমিতে উঠল। জাহাজিরা লগি মেরে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের নীচ থেকে ঠাকুমা কাকে যেন বলছেন, আরে ওই তো তোমার হারানো ছেলে। ও ধন-বউ এসে দ্যাখো, তোমার ছেলেটা ওই দ্যাখো, ওই দ্যাখো লগি ঠেলছে। বামুনের ছেলে মাঝি হয়ে গেছে। কী হবে! কী হবে ধন-বউ!

ঠাকুমা এবং ধন-বউ জাহাজিকে দেখার জন্যে আস্তে আস্তে গভীর জলে নেমে গেল। ওই জলটায় তারাও দুটো ফুটকরি তুলেছে। দুটো ফুটকরি, দুটো শেষ নিশ্বাস এবং বিশ্বাসের কথা বলে আবার জলের সঙ্গে মিশে গেছে।

অনুত্তম স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেছিল, মা-আ-আ! ঠাকুমা-আ-আ-আ।

বাংকের অন্ধকারে বসে এখন ভাবছে পাশের বাংকের হরিদাস সেন শুনতে পায়নি তো! শুনলে নিশ্চয়ই ডাকত, বলত, এই কাঁদছিস কেন? ওঠ, ওঠ। হাতে-মুখে জল দিয়ে আয়। আবার ঘুমো।

ফোকশালে ভীষণ গরম। কোথাও হাওয়া আসার পথ নেই। পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলি বন্ধ। কাচ দিয়ে আঁটা। ঘুম হালকা হলে মানুষ স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে অনুভব করতে পেরেছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে যেন তার মুখেব উপর উপুড় হয়েছিল। শ্বাস ফেলছিল জোরে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে পায়ের শব্দও শুনতে পেয়েছে। সিঁড়ি থেকে সে শব্দটা সারেঙের ঘরে মিলিয়ে গেছে। ঘুম হালকা হলে এসবও কি মানুষের হয়।

ভেবে কিছুই হদিশ করতে পারল না। তার মুখের উপর কে নুয়েছিল। কে মুখে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, তারপর আস্তে আস্তে বাংকে উঠে এসে পাশে শুতে চেয়েছিল! এক-এক করে সে সব মনে করতে পারছে। কিন্তু মুখটা মনে করতে পারছে না। মুখের আদলটা কি সারেঙের মতো। তিনি কেন হবেন। আর এই গভীর রাতে কেনই বা তিনি আসবেন তার বাংকে!

অনুত্তম রাতের আর-একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনটায় কোনও শব্দ নেই। নিঃশব্দ। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই মনে হল। বাংক থেকে সে নামল। পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলিটা খুলে দিল। ফোকশালের বাইরে এসে সিঁড়িটার পাশে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াল। এখানেও অন্ধকার। একটা সুর। দূরের ফোকশাল থেকে অদ্ভুত রকমের সুরটি সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। ডাইনে আরও দুটো ফোকশাল। ইঁদুরে খুট খুট শব্দ করছে বুঝি দরজার নীচে।

পরের ফোকশালটায় আলো জ্বলছে। দরজার ফাঁক দিয়ে অনুত্তম দেখল দুলে দুলে কোরানশরিফ পাঠ করছেন সারেং। ইচ্ছে হল একবার ডাকে, সারেং সাব।

অনুত্তম সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল। মেসরুমে আলো নেই। গ্যালি অন্ধকার। দূরে বন্দরের বুকে অনেকগুলি আলোর ফুলকি। জাহাজগুলো ছায়া ফেলেছে। মাস্টের আলোগুলি দুলছে বাতাসে। গলুইয়ে অনুত্তম দাঁড়াল অনেকক্ষণ। এক অদ্ভুত নীরবতা এই জাহাজে। জাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বন্দরে এসে নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। কেবল ঘুম নেই আজ অনুত্তমের চোখে। পায়চারি করতে করতে ভাবছে, এ দুঃস্বপ্নটার অর্থ কী।

দুঃস্বপ্নটার অর্থ ভাবতে ভাবতে অনুত্তম আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। ডাইনে দুটো ফলকা। রসদ নেওয়া হয়ে গেছে বলে ডানদিকের ড্যারিকটা নামানো। সামনের কেবিনে থাকে পাঁচ নম্বর সাব। উপরে বয়-কেবিনের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠেছে। বাটলার সিঁড়ি ধরে নিজের কেবিনের দিকে চলে যাচ্ছেন। আবার আলো নিভে গেছে।

পাঁচ নম্বর সাব ঘুমোচ্ছেন কেবিনে। স্লিপিং-গাউনের নীচে হাত রেখে শ্বাস ফেলছেন জোরে জোরে। হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তিনি। চোখ রগড়ে বালিশ টেনে আবার কিন্তু শুয়ে পড়লেন। পাঁচ নম্বর সাবের চোখে যদি কোনও দুঃস্বপ্ন এসে থাকে। তাড়াতাড়ি অনুত্তম আরও সামনে পা বাড়াল।

মেজ-মিস্ত্রির ঘরে দুটো ছবি। একটা বই দিয়ে মেজ-মিস্ত্রির মুখ ঢাকা। দেওয়ালে দুটো ছবিই নগ্ন নারীমূর্তির। পায়ের দিকে ছবিদুটো টাঙানো। অনুত্তম এ ঘরে অনেকবার এসেছে। কিন্তু দিনের বেলায় মেজ-মিস্ত্রি অন্য মানুষ। অনুত্তম আরও এগিয়ে গেল।

গ্যাংওয়ের টেবিলের উপর সুখানি সাব ঢুলছিলেন, কেডা? কেডারে তুমি চোরের মতো হাঁটছ।

আমি ব্যানার্জি, চাচা।

অঃ।

নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। টেবিলের উপর বসে আবার ঘুম গেলেন। গ্যাংওয়ের নীচে সিঁড়িটা কাঁপছে। সিঁড়িটা তুলে দেওয়া হয়েছে। ভোররাতে জাহাজের হাসিল খোলা হবে। নোঙর তোলা হবে। সুখানি সাব ঘড়ি দেখে সকল ডেক-জাহাজিদের ডাকবেন।

পরের কেবিনটা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের। তিনি একটা দৈনিক কাগজ পড়ছেন। মাথার কাছে একটা টিপয়। হুইস্কির বোতল টিপয়টার উপর। অনুত্তম দূর থেকে পোর্ট-হোলের ফাঁক দিয়ে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আশ্চর্য মানুষ তিনি! ন'দিন জাহাজ চালিয়ে মাত্র দু'দিন ডেক-এ বের হয়েছেন। তাঁকে সে মাত্র দু'বার দেখেছে। একবার ইঞ্জিন-রুমের ব্যালেস্ট পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে মেজ-মিস্ত্রিকে কিছু দেখাচ্ছিলেন, আর-একবার এই গ্যাংওয়েতে দাঁড়িয়ে তিনি কলকাতা বন্দরের ভাড়া করা মেয়ে-মানুষটাকে এ সফরের মতো হাত তুলে বিদায় জানিয়েছিলেন। পরের সফরে এলে তার ঘরেই উঠবেন শপথ করেছিলেন সেই সঙ্গে। কেবিনে পড়ে সারাদিন ঘুমোন তিনি, চোখদুটো ড্যাবা ড্যাবা নারকেল কুলের মতো ফুলিয়ে রাখেন। সমস্ত রাত টিপয় থেকে মদ তুলে খান। ভোরের দিকে আবার ঘুম যান।

খুব গরম। অফিসারদের কেবিনগুলো পার হলেই তিন নম্বর ফলকা। ফলকার উপর বসল অনুত্তম। ফুরফুরে হাওয়া উঠে আসছে সমুদ্র থেকে, শরীরটা বেশ ঠান্ডা লাগছে। ব্রিজে কেউ নেই। আলো-ছায়ার মিষ্টি মিষ্টি অন্ধকার শুধু। মাস্টের ডানদিকের আলোটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে। চকচক করছে ব্রিজের কাচটা।

তিন নম্বর ফলকার পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি বোট-ডেকে উঠে গেছে। বোট-ডেকে মেজ-মালোমের কেবিন। তিনি ঘুমিয়ে রয়েছেন। কেমন করে ঘুমোচ্ছেন, একবার সিঁড়ি ধরে উঠে দেখলে হত। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকল। পাশাপাশি অনেকগুলো জাহাজ। জাহাজের মেলা। অন্য জাহাজগুলোয় সাড়াশব্দ নেই। সে এবার কেবিনের পাশে পোর্ট-হোলের উপর পা টিপে টিপে মুখ বাড়াল। তিনি কেবিনে নেই। কাঠের বাংকে সাদা নরম লিনেনের চাদর। নিভাঁজ। টিপয়ের উপর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। দেয়ালে জিশুখ্রিস্টের ছবি। একটি বন্দুক দাঁড় করানো এক কোনায়। অন্য একটা টিপয়ে গোটা পাঁচেক বই। পোর্ট-হোলে লিনেনের পর্দাটা বাতাসে কাঁপছে। কিন্তু মেজ-মালোম কেবিনে নেই।

অনুত্তম পা বাড়াল সামনে। মনে মনে মেজ-মালোমকে খুঁজছে।

মেজ-মালোম এখানটায়। অনুত্তম দেখতে পেল ডেক-চেয়ারে তিনি ঘুমুচ্ছেন। সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়ায় চুলগুলি উড়ছে। হাত থেকে দূরবিনটা সরে এসে কোলের কাছে পড়ে আছে।

অনুত্তম এই প্রথম মেজ-মালোমের মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। মেজ-মালোমের মুখের ভিতর একটি আশ্চর্য রকমের বাঙালি গড়ন। রং বদলালে তিনি বাঙালি হতে পারতেন। বাঙালি-সুলভ নরম চেহারা তাঁর। কিন্তু অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর অনুত্তম বুঝতে পারল মেজ-মালোম বড় অসুখী।

মেজ-মালোম বড় অসহায়। অনুত্তমের মতো অসহায়। দূরবিনটা হাতে নিলে কেমন হয়। দূরের জাহাজগুলোর ফাঁক দিয়ে বন্দর দেখলে কেমন হয়। খুব সন্তর্পণে দূরবিনটা তুলতেই মেজ-মালোম জেগে গেলেন। কেমন হকচকিয়ে বললেন, হু আর ইউ?

এমনটা হবে এবং এতটা অতর্কিতে হবে অনুত্তম ভাবতে পারেনি। সেও হকচকিয়ে গেল। থতমত খেয়ে বলল, আমি স্যার, আমি।

ওঃ ইউ। আই সি। সিট ডাউন প্লিজ।

মেজ-মালোমের পাশে বসে দূরবিনটা চোখের উপর তুলে ধরার আগে বলল, ইয়োর বাইনোকুলার, সেকেন্ড।

'অল রাইট অল রাইট' বলে মেজ-মালোম দূরবিনটা সম্বন্ধে কথাগুলি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি পরিবর্তে বলে উঠলেন, হ্যাভ এ লুক অনুত্তম, এ প্যাসেঞ্জার-শিপ। গেট দিজ অ্যান্ড হ্যাভ এ ওয়াচ।

মেজ-মালোম সামনের দিকে ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে দিলেন। মুখের উপর একটা পোকা ভন ভন করছে। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন। ডেক-চেয়ার থেকে উঠে একটু পায়চারি করে আবার এসে বসলেন।

এখনও ফুরফুরে বাতাস। এখনও পোর্ট-হোলের পাশে একমুঠো আকাশ, অনেক গ্রহ নক্ষত্র। বন্দরে হাজার আলোর ব্যস্ততা। এসব দেখে দেখে মেজ-মালোম আবার ডাকলেন, অনুত্তম!

ইয়েস, সেকেন্ড।

ভেরি বিউটিফুল নাইট।

ইয়েস, সেকেন্ড।

ইফ অ্যানি ওম্যান ইন দি প্যাসেঞ্জার-ডেক...

আই উড কল ইউ স্যার।

মেজ-মালোম হাসলেন।

গভীর রাত। বোট-ডেকের ঠান্ডায় ঘুম এসে গেল মেজ-মালোমের। মেজ-মালোম অনুত্তমকে বলেছে ডাকতে, যাত্রী-জাহাজের ডেক-এ যদি কোনও মেয়েমানুষ এই গভীর রাতে পায়চারি করতে বের হয় তবে যেন তাকে ডাকা হয়। তিনি ঘুম থেকে উঠবেন। গ্রহ-নক্ষত্রের রাত্রিতে তিনি দূরবিনের ভিতর ডুবে যাবেন।

দূরবিন চোখে এঁটে অনুত্তম বসে থাকল। রাত্রিকে পাহারা দিল। দূরবিনের কাচে যাত্রী-জাহাজের ডেক থেকে বন্দরের ফাঁকটুকু দেখার চেষ্টা করল।

কোথাও কিছু নেই।

রাত্রি ক্রমশ বাড়ছে। আলো-অন্ধকারে রাত্রির কিছুই স্পষ্ট নয়। যাত্রী-জাহাজটাকে অনুত্তম অনেক কষ্টে দূরবিনের আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু কিছুই নেই। ডেক খালি।

অনুত্তম কিন্তু তবু বসে থাকল। যাত্রী-জাহাজের পাটাতনে মেয়েমানুষ দেখার চেষ্টা করল।

রাত্রি ক্রমশ বাড়ছে। গ্যাংওয়েতে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন সুখানি সাহেব। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখদুটোতে জল ছিটাচ্ছেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বড়-মালোমের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে বোতাম টিপে ধরলেন।

বড়-মালোম উঠেছেন।

মেজ-মালোমও উঠেছেন এবং বলেছেন অনুত্তমকে, অ্যানি ওম্যান?

অনুত্তম চুপ করে থেকেছে। সেই থেকে মেজ-মালোম জেনেছেন যাত্রী-জাহাজের পাটাতন খালি।

সুখানি সাহেব ডেকে তুলেছেন ডেক-জাহাজিদের। নীল কোর্তা পরে মানুষগুলো জাহাজের আগিল পিছিল ছুটছে। আবার সেই চিৎকার—হেই মারো, মারো টান, হাইও। সারেং চিৎকার করছে। টিন্ডাল হাঁকছে। মেজ-মালোম, বড়-মালোম আগিল পিছিল হাতে ইশারা দিচ্ছেন। বলছেন, উইনচ হারিয়া, হাপিজ।

নীচে সমুদ্রের জলে ছোট ডিঙিনৌকায় তিনজন করে মানুষ। বয়া থেকে তারা হাসিল খুলে দিচ্ছে। ওরা কী সব বলাবলি করল তেলেগু ভাষায়। এই জাহাজের জাহাজিদের গল্প করছে হয়তো। দু'দণ্ডের জন্য জাহাজটা এল, নোঙর খেল, রসদ নিল, কিন্তু জাহাজিরা বন্দর-পথে নামতে পারল না। দুঃখ তাদেরও হয়েছে বুঝি! হাসিল খুলতে ওরা দেরি করছে।

ইঞ্জিন-রুমের বারোটা-চারটার পরিদাররা নেমে গেছে নীচে। বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে ওদের কয়লা শাবলেব শব্দ পাচ্ছে অনুত্তম।

জাহাজ বন্দর থেকে আবার সমুদ্রে নামছে। আবার অন্য বন্দরের জন্য ওদের প্রতীক্ষা। জাহাজিরা আবার দিন গুনতে আরম্ভ করেছে।

জল আবার জল। সে জলের রং নীল। আকাশের রং নীল। ঝড় উঠবে সমুদ্রে, জাহাজিদের রক্ত নীল হবে। বিবির খতের জন্য প্রতীক্ষা, ছোট-টিন্ডালের নীল খামে একটা চিঠি আসবে, অবিরত জল ভাঙবে প্রপেলারটা, রাতের আঁধারে জলের নীচে লক্ষ জোনাকির মতো ফসফরাস জ্বলাবে। ফসফরাসেব নীল রঙে জাহাজিরা মুখ দেখবে। মেজ-মালোম দূরবিনের কাচটায় দেখতে পাবেন দুটো নীল-নীল চোখ। রাতের ঘন অন্ধকারে বাংকের উপর স্বপ্ন দেখবে অনুত্তম, পড়শির পরনে নীল শাড়ি। একটা নীল স্বপ্ন। পড়শির মুখটা নীল হয়ে গেছে।

ভোর হয়ে গেছে। জাহাজ অনেক দূর-সমুদ্রে। কলম্বো বন্দর এখনও দেখা যাচ্ছে। জাহাজিবা জায়গা ছাড়ছে না। পিছিলেব বেঞ্চিতে বসে ওরা বন্দব দেখছে।

মাজেদ এসে হাত ধরে টানল অনুত্তমের।

এই কয়লায়ালা ওঠ। না ঘুমিয়ে রাত ভর তো বন্দর দেখেছিস। এবার একটু জায়গা দে, আমরাও বসে বন্দরটা দেখি।

অনুত্তম হাত টেনে নিল। বলল, পাটাতনে বসে দ্যাখ বে। অমন মোটা গতর নিয়ে বসলে বেঞ্চি ভেঙে যাবে।

আরে শালা কয়লায়ালা, তুমিও দেখছি কথা শিখে গেছ! ওদিন না বমি করে ডেক ভাসিয়েছ আর শালা তোমার এক্ষনি এত কথা?

অনুত্তম এখনও জাহাজি-খিস্তিগুলো রপ্ত করতে পারেনি। সে বলল, বসে দেখতে হয় দ্যাখ। মুখের সামনে প্যাট প্যাট করিস না। বেশি প্যাট প্যাট করলে পেটের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।

আমারটা তুই ফাঁসাবি, কিন্তু তোরটা কে ফাঁসাবে?

মেজ-মিস্ত্রি।

অনুত্তমের কথায় মাজেদ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। অনুত্তমের মুখে মেজ-সাব লাথি মেরেছে। এ অপমান শুধু অনুত্তমের নয়, সব বাঙালি জাহাজিদের। মাজেদ অন্তত তাই মনে করে। সে তাই চিৎকার করে বলেছিল, ও সারেং-সাব, ইঞ্জিনের মেজ-সাব আজ মেরেছে অনুত্তমের মুখে লাথি, কাল মারবে আপনার মুখে। তখন কে ধরবে?

ইঞ্জিন-সারেং ধরি মাছ না-ছুঁই পানির মতো করে এড়িয়ে গিয়েছিল কথাটা।

মাজেদ অনুত্তমের হাত ধরে ফেলল।

রাগ করলি তুই!

রাগ কেন করব? এ তো দুনিয়ার নিয়ম। যে যাকে নরম পাবে সে তার ভুঁড়ি ফাঁসাবে। তুই জব্বরকে, আমি তোকে, মেজ-মিস্ত্রি আমাকে। একদিন সত্যি দেখবি মেজ-মিস্ত্রি আমার ভুঁড়ি ফাঁসাবে।

মাজেদের চোখদুটো কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, ফাঁসাবে আর তুই তা সহ্য করবি!

অনুত্তম কিছু জবাব দেওয়ার আগে এক নম্বর ওয়াচের তেলওয়ালা সাত্তার এসে ডাকল, আটটা-বারোটার পরিদারদের টাণ্টু।

অনুত্তম আর উত্তর করল না। জাহাজ দেখল, পাটাতন থেকে চিমনি পর্যন্ত দেখল। কলম্বো বন্দরকে শেষবারের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এবার ডাকল মাজেদকে, নে বোস। ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে এসে তো আর দেখতে পাব না বন্দরটা। শেষ দেখাটা তুই-ই দ্যাখ।

তারপর সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কতদিন পর্যন্ত এই ভয়াবহ জীবন একনাগাড়ে চলবে কে জানে! তেলওয়ালা সাত্তার গ্যালি থেকে হাসছে। অনুত্তমের বিষণ্ণতা দেখে ওর হাসি পেল।

অনুত্তম হাসতে পারল না। শাবলটা, ভাঙা গাড়িটা, লম্ফটা ওর জন্য বাংকারের অন্ধকারে প্রতীক্ষা করছে। বাংকারে মজিদ স্যুটের মুখে কয়লা ফেলতে ফেলতে হয়তো ভাবছে ছেলেটাকে মেয়েটাকে, মাইয়াডায় কয়, বা'জি জা'জে কাজ করে, কিডা না একটা করে!

পাঁচ

প্রজাপতির পাখনার রোদের গন্ধ মিলানোর মতো আকাশ-প্রত্যন্তে নির্ভাঁজ সমুদ্রটা মিশে গেছে।

সমুদ্র শান্ত।

কমলা রঙের রোদটা জাহাজিদের মনে অন্য একটা বন্দরের মধুর প্রতীক্ষা এনে দিয়েছে। আবেশ এনে দিয়েছে।

আবার আড্ডা জমেছে ফোকশালে-ফোকশালে। জব্বর মিঞা বসে হুঁকো টানছে। কাশছে খক খক। পেটে সে এখন হাত বুলোয় না। ফালতুতে সারেং তাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পেট ফুলিয়ে বাংকে এখন বসে থাকে না। তেল মালিশ করে না পেটে। বেশ আছে।

সাগরের জল কেটে চলেছে জাহাজ।

জাহাজিদের মন কেটে অনেকগুলো চিন্তা কাঠের পাটাতনে পাক খাচ্ছে।

মেজ-মালোম লিখলেন তাঁর ডায়েরির পাতায়, ইটস নট এ স্টরমি নাইট, নট এ স্টরমি ডে। সেলবস আব ওয়েটিং ফর এ পোর্ট। ওম্যান দে লাইক টু হ্যাভ। অল ওম্যান লিভস ফব এ ম্যান।

তাবপর লিখেছেন তিনি, বাইশ দিন ধরে জাহাজ চলবে। ডারবান বন্দরে পৌঁছতে অনেকগুলো দিন। এক পক্ষ আবও ছ'দিন। রাতের এই পূর্ণিমা যাবে। অন্ধকার বাত নামবে। চাঁদ উঠবে। বাইশ দিনে বাইশটি নক্ষত্র আকাশ-সীমানায় জাগবে। বাইশজন জাহাজির চোখে ঘুম থাকবে না। বন্দরে নামার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

তিনি লিখলেন, কিন্তু জাহাজিরা সেখানেও নামতে পারছে না। তিনি এবার ডায়েরির পাতা শেষ করলেন। ডায়েবির পাতা বন্ধ করলেন। পোর্ট-হোলের কাঁপানো পর্দাটা সরিয়ে সমুদ্র দেখলেন। কমলা রঙের বোদটা ক্রমশ নীল বং ধরছে। জাহাজের পিছনের দিক থেকে ছায়া নেমে আসছে। বোট-ডেক ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে সুখানি। ফোকশালে ফিরছে তখন জাহাজিরা। রং করা হযেছে ফরোয়ার্ড-পিকে। দুধের মতো সাদা ডেকটা সেজন্য। মেজ-মালোম পর্দাটা আবার টেনে দিলেন। দরজা খুলে ইজিচেয়ারটা ডেকের উপর এনে যে নক্ষত্রগুলো এখন উঠছে তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকবেন এবার।

গলুইয়ের মানুষগুলো জটলা পাকাচ্ছে। ডেক-জাহাজিরা খাচ্ছে পাটাতনে বসে। কশপ নামাজ পড়ছে ডেকের উপর। খানা খেয়ে নামাজ পড়ে ডেক-কশপ ফোকশালে ঢুকে খেয়া জালের গিঁট দিতে বসবে। নামাজ পড়তে পড়তে বারবার সেজন্য সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

ওদিকটায় ডেকটাতে বড়-মালোম আর ডেক-সারেং। ভাঙা ভাঙা ইংবেজিতে ডেক-সারেং বড়-মালোমকে কী সব দেখাচ্ছেন ডেকের উপর। বুঝি কাজ দেখাচ্ছেন। ডেক-এ যে একদল মানুষ কাজ করে গেছে তিনি তাদের সাক্ষী। বড়-মালোমকে সব কাজটা দেখিয়ে তিনি এবারও গলুইতে ফিরবেন। চান করবেন, নামাজ পড়বেন। খানা খাবেন তারপর। গলুইতে বসবেন শেষে গল্প জমানোর জন্য।

ইঞ্জিন-সারেং বসবে গলুইয়ের গঙ্গাবাজুর বেঞ্চিতে। তিনি সাদা দাড়িতে হাতের আঙুলগুলি চালিয়ে দিয়ে ডাকবেন, এ ভাণ্ডারি, কী পাকাইছ একবার দ্যাও দেখি।

তিনিও খাবেন। বসবেন। সমুদ্রের নীল জলে গত সফবেব অনেকগুলি খোয়াবকে দেখবেন।

অনুত্তম উঠবে এই সময়। বিকেলেব অসহিষ্ণু মনটা ফোকশালে শুয়ে শুয়ে যখন ক্লান্ত হবে, যখন হবিদাস সেনের নাকটা গড়গড় কববে, সে সময় চোখ মুছতে মুছতে উপবে উঠে বেঞ্চিতে বসবে। মনটা বড্ড ফাঁকা ঠেকে এই সময়। ঘুঘু পাখিব ডাকেব মতো নির্জন হয়ে গেছে যেন জাহাজটা। নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। রাত নামবে আবার ডেক-এ। চাঁদ উঠবে। নক্ষত্রের রাতকে পাটাতনে বসে দেখবে অনুত্তম। কিছুক্ষণ বাদে সে বাত ডেকেব উপব উঁকি দেবে।

গ্রহ-নক্ষত্রেব বাত, চুপি চুপি আকাশ, বাদাম দেওয়া নৌকাব মতো বুড়ি-গঙ্গাব পাড়ে পাড়ে ভাঁটাব টানে যেন ছুটছে। ভিড়বে গিয়ে হয়তো সদর ঘাটে। এ আকাশ, এ বাত ফিকে মসলিনেব মতো, জ্যোৎস্না, কোনও এক পল্লিব অনাবৃতা কন্যাব মতো। বুড়ি-গঙ্গাব তীবে সে কন্যাব ঘব। সেই ঘরে সে উঁকি দেবে। কন্যাব দেহ দেখবে। এইসব এলোমেলো চিন্তা সমুদ্রে নোনা-ঢেউয়েব একঘেয়েমি জীবন থেকে তাকে বিমুক্ত বাখে। কয়লা টানাব কঠোব পরিশ্রম থেকে সে দু' দণ্ডেব জন্য তখন পালিয়ে বাঁচে। তখন মনে হয় অনেক সুখ, অনেক সম্পদেব ঘবানা এই মুহূর্তগুলো। জীবনেব ঠাঁই বজায় বাখছে এরা। স্টোক-হোলডেব অসহ্য গবম, অসহিষ্ণু মন, টাইফুন-ঝড়, টিন্ডালেব লাল চোখ, মেজ সাহেবেব বাংলা পাঁচেব মতো মুখ, নয়তো এতদিনে তাব সত্তাকে অক্টোপাসেব নীবব আলিঙ্গনেব মতো গ্রাস করে ফেলত। সে তাই সমস্ত আকাশটাকে কোনও এক পল্লিব বধূ কিংবা অনাবৃতা সদ্য বিধবা কুমাবী কন্যা ভেবে মাঝে মাঝে বাত-জাগা-পাটাতনে মাদুর বিছিয়ে, দু' ঠ্যাং ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে কল্পনাব জগতে ডুবে থাকে। সে জগৎ তাব একান্ত নিজেব। সে সেখানে পড়শিব সঙ্গে শুক আব শাবি। তাল আব তমাল। দেহ এবং মন। কিন্তু এমন সময তাব জগৎকে ভেঙে টুকবো টুকরো করবে সাত্তাব। নীবস কণ্ঠে মেজাজ চড়িয়ে বলবে, টাণ্টু।

সে কাজে নামবে আবাব। কাজ থেকে উঠবে আবাব। বাত বাবোটায় আব একবাব পায়চাবি কববে ডেক-এ। স্নান সেবে সমুদ্র দেখবে, অন্ধকাব দেখবে। চুলগুলি উড়বে ফুবফুবে হাওয়ায়। মনটা উড়ু উড়ু কববে। বাংলাদেশেব একটি সবুজ মাঠ, কোমল জীবন, সড়কে হিজলেব সারি, ডালভাঙা অশ্বত্থ গাছটা, ডাঁশা আমেব আচাব, কুলপি ববফ, পড়শিব ভাঙা ভাঙা কথা সব এক-এক কবে মনে পড়বে।

বোট-ডেকে উঠে যাওয়াব সময় দেখল অনুত্তম দু'জন লোক মজিদকে বাংকাব থেকে তুলে আনছে। কাকড়াব ঠ্যাং-এব মতো কুঁকড়ে আছে মজিদ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে একটা সামুদ্রিক কাঁকড়া ওব পেটে চিমটি কাটছে। আগুনে ছ্যাঁকা দেওয়াব মতো মানুষটা হঠাৎ বলছে, আল্লাবে, তুই ইডা কিডা কবলি।

মজিদ ক্রমশ নুয়ে পড়ছে। ওব চোখদুটো জবা ফুলেব মতো লাল। খালি গা। বাঁ হাত দিয়ে তলপেট চেপে বেখেছে।

মজিদেব কী হল আবাব।

সুখানি নেমে যাওয়াব সময় বলল। লোক দু'জন উত্তব কবল না। অনুত্তম ওদের পাশে হেঁটে গেল। মজিদেব পেটেব উপর হাত বেখে প্রশ্ন কবল, কোন জায়গায় ব্যথা হচ্ছে?

কেমন আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল মজিদ, এ জায়গায়। ধবিস না বে। লাগে। আমি তো বে আব বাঁচুম না বে ব্যানার্জি।

যে দু'জন লোক তুলে এনেছে, তাবা ধমক দিয়েছে।

মানুষেব বুঝি অসুখ হয় না মিঞা।

অনুত্তম আব দাঁড়াল না। ছুটে সে বোট-ডেকে গেল। মেজ-মালোমকে খববটা দিতে হবে।

মেজ-মালোমেব কেবিনে ঢুকে দেখল অনুত্তম, তিনি চোখ বুজে আছেন। অনুত্তম ডাকল, সেকেন্ড। ইয়েস কাম-ইন।

বাংক থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অনুত্তমেব পিছনে পিছনে মজিদেব ফোকশালে নেমে গেলেন।

মজিদেব বাংকেব পাশে আবও দু'-চাবজন জাহাজি জটলা পাকাচ্ছে তখন। ওবা সকলে মেজ-মালোমেব অপেক্ষায় আছে। তিনি ভিতরে ঢুকলে জাহাজিরা সরে দাঁড়াল। হাত তুলে নিলেন তিনি। নাড়ি দেখলেন। পেট টিপে দেখলেন। বললেন, কনস্টিপেশন। তারপর দবজার ওপাশটায় পা বাড়াবার সময় তিনি একটু অন্যমনস্ক হলেন। অনুত্তম মজিদেব পাশে বসে দেখল মেজ-মালোমেব যাওয়াটা।

তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন তাও সে লক্ষ করল। মজিদের হাত দু'টো টিপে দেওয়ার সময় বলল, দেখবি মেজ ঔষধ দিলে তুই ভাল হয়ে উঠবি।

অনুত্তমের হাত ধরে আরও কুঁকড়ে গেল মজিদ। গোঙাল। এপাশ-ওপাশ ফিরে ছটফট করল। পেটের উপর হাত রেখে বলল, আর পারি না রে ব্যানার্জি। আমারে পাগল করে দিছে।

খবর পেয়ে সারেং এসে ঢুকল ফোকশালে। অনুত্তমকে বসে থাকতে দেখে ধমক দিল।

এখানটায় বইসা ক্যান। পরিতে চুলা টানছে, বাংকার খালি, বইসা থাকলে চলব।

অনুত্তম ডেক-এ উঠে গেল। উঠে যাওয়ার আগে দেখল জব্বর নিজের বাংকে বসে পেটে তেল মালিশ করছে। মজিদের পরিবর্তে স্টোক-হোলডে পাঠানো হবে জব্বরকে। তলপেট তাই আবার ব্যথা। সে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে।

অনুত্তম ডেকের উপর থামল। এখান থেকেও মজিদের গোঙানিটা শোনা যাচ্ছে। ওর পাশে এখন কেউ নেই। যে যার মতো কাজ কবছে। মনে হল প্রতিটি জাহাজি অদ্ভুতভাবে নিঃসঙ্গ। অসহায়। মজিদের ভগ্ন মনটা এখন হয়তো ছেলেটার কাছে পড়ে আছে। মেয়েটাকে-ছেলেটাকে ভাবছে, বাংকারে যে গল্পগুলো জমত মজিদ শেষ পর্যন্ত ওর ছেলেকে-মেয়েকে সে গল্পে টেনে আনত। বিবিকে গোর দেওয়ার পর ওরা দু'জন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। মজিদ বলেছিল, ওদের দু'জনকে মাটিতে রেখে যেতে পারলেই সে খুশি। ওদের জন্য সে পরদেশি হয়ে টাকা কামাচ্ছে। মেয়েটাকে সাদি দিয়ে ঘরজামাই রাখবে, ছেলেটাকে সাদি দিয়ে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে যাবে। সফরের টাকায় জমি কিনবে দু' বিঘা। দাম-দস্তুর সব ঠিক হয়ে আছে, গিয়ে টাকাটা দেবে। অনেক পরিকল্পনা মজিদের মনে।

সফরে-সফরে জাহাজিদের এক পরিকল্পনা। সফরশেষে ঘরে ফেরা, আবার জাহাজের জাহাজি, বাংকে শুয়ে স্মৃতিজীবি হয়ে থাকা, টাকার হিসেব, জমির হিসেব, ক' কুড়ি টাকায় ক'টা বিবি পাওয়া যায় তার হিসেব।

অনুত্তম রঙ্গরস করে বলেছিল একদিন মজিদকে, ঘরে ফিরে নিকা করবি না একটা?

মজিদ দু'পাটি দাঁত বের কবে এমন হেসেছিল যে অনুত্তম দ্বিতীয়বার তেমন কথা বলতে সাহস করেনি।

ওটা করব টিণ্ডালরা, আমলদাররা। ওটা অগো ব্যাপার। আমলদারদের একচেটিয়া ব্যাবসা। ওসব কথা আমারে বলে লজ্জা দিস না।

ক্যান ব্যানার্জি? আমি কি হেই মানুষ। তুই এতদিনে এইটা বুঝলি।

অনুত্তম জবাব দিয়েছিল, হাসি-মশকরা বুঝতে হয়।

মজিদ বলেছিল, বিবিরে যেখানে গোর দিছি ওখানটাতে আমাব একটা জায়গা রাখছি। জাহাজি মানুষেব গোর দেওনের লোক থাকে না। পোলারে কইছি, তবা ভাই-বইন মিলা তগো আম্মার পাশে আমারে রাইখ্যা দিস। দুইটা চেরাগ জ্বালাইয়া দিস রোজ।

এই নীবস ডেকের উপর সব কথাগুলিই মনে পড়ছে অনুত্তমের। সে উঠে এল এবার বোট-ডেকে। তারপর ফানেলের গুঁড়ি ধরে স্টোক-হোলডে নেমে গেল। যন্ত্রেব মতো কাজগুলো করল। সে এখন শাবলটার মতো অথবা লোহার গাড়িটার মতো হয়ে গেছে। অনুভূতিশূন্য। চেতনাগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, কয়লাগুলোর মতো মনটা বোবা হয়ে গেছে।

পরি শেষ করে অনুত্তম যখন বোট-ডেকে উঠল তখন আকাশে অন্ধকার। গ্রহ নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। এক অখণ্ড অন্ধকারে জাহাজটা যেন থেমে রয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাল। কতকগুলি শীর্ণ আলোর রেখা ঢেউগুলোর মাথায়। টিপ টিপ বৃষ্টি। ভিজতে ভাল লাগছে। অনুত্তম মুখটা আকাশমুখো করে নীরস ডেকের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের কোনও এক পরম রমণীয় মুহূর্তকে খুঁজতে থাকল। কিন্তু মজিদ সেখানে বার বার তার শীর্ণ দেহ এবং মন নিয়ে আকাশের অন্ধকারে উঁকি দিচ্ছে। তাই সে টুইন-ডেক অতিক্রম করে সিঁড়ি ধরে গলুইতে উঠল। ভাণ্ডারির গ্যালির দরজা বন্ধ। মেসরুমের দরজা বন্ধ। গলুই থেকে সিঁড়ি ধরে ফোকশালের দরজাগুলো অতিক্রম করে মজিদের ফোকশালে গিয়ে ঢুকল। সে ঘুমোচ্ছে। দুটো হাত বুকের উপর প্রার্থনার মতো করে রেখেছে। পাশের বাংকে হেদত মিঞা কোরানশরিফ পাঠ করছে দুলে দুলে।

অনুত্তম বলল, আস্তে চাচা, মজিদের ঘুম ভাঙবে।

হেদত কেমন খেপে গেল। সে আরও জোবে পড়তে শুরু করল।

অনুত্তম অত্যন্ত বিরক্ত হল হেদত মিঞার কাণ্ড দেখে। হেদতের বাংকটা পুবমুখো। সে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, আপনাকে বলছি আপনি অত চিল্লাবেন না। আপনি আমলদার বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন না। জাহাজে জাহাজিদের সুখ-দুঃখ আপনার বুঝতে হবে।

ওদের কলহের শব্দে মজিদ কিন্তু ততক্ষণে জেগে গেল। সে গোঙাতে শুরু করেছে। বলছে, অমন চিল্লাচ্ছ ক্যান মিঞা?

অনুত্তম এবার খুব দৃঢ় অথচ নরম গলায় বললে, আল্লার নাম আপনি মনে মনে করুন। কেউ কিছু বলবে না। মজিদকে ঘুমোতে দেবেন।

হরিদাস সেন আর সারেং এল মজিদকে দেখতে। স্নান সারতে অনুত্তম এ সময় বাথরুমে চলে গেল। ওরা দেখবে মজিদকে। স্নান সেরে মজিদকে সে ওষুধ খাওয়াল, জল খাওয়াল। তখনও দুলে দুলে কোরান পাঠ করছে হেদত। মজিদের চিৎকার ছাপিয়ে হেদতের কণ্ঠ পোর্ট-হোলে গলে পড়ছে।

সারেং বলল, আরে মিঞা, বোঝার উপর আর শাকের আঁটি চাপাও ক্যান! ওবে একটু শান্তিতে থাকতে দ্যাও।

হরিদাস সেন চোখ রাঙিয়ে বলল, মিঞা, জাহাজটা তোমার একার নয়। আরও দশজন লোক এখানে থাকে। খুশিমতো চলতে পাববে না। আল্লাকে মনে মনে ডাকবে।

হেদত জিদ ধরেছে।

আমাব বাংকে বসে আমি পডব, উলঙ্গ হযে নাচব। তাতে তোমার কী মিঞা! আল্লার নামের চেয়েও মিঞার জানের কষ্ট বুঝি বেশি?

বেশি, অনেক বেশি।

হরিদাস সেন দু' হাত তুলে বলল, তোমার মতো মানুষের মুখে আল্লা তার নাম শুনতে চান না। আল্লাকে ডাকতে হয়, বোট-ডেকে গিয়ে ডাকবে। বাংকে বসে ডাকলে মনে মনে ডাকবে আল্লাকে। যদি তা না করো, ক্যাপ্টেনকে নালিশ জানাব। দবকাব হলে পোর্ট-হোল দিয়ে ঠেলে দরিয়ার জলে ফেলে দেব।

হরিদাস সেন উত্তেজিত হয়ে অনেকগুলি কথা বলে ফেলল।

কী মিঞা! কী মিঞা! তোমার মুখে লাথি! থু থু! আল্লার নাম তুমি নিতে দেবে না এত বড় কথা। ইবলিস, শয়তান!

হেদত মিঞা বাংকের উপর বসে লুঙি টানছে আর লাফাচ্ছে। হরিদাস সেন উত্তেজিত হয়ে ওকে চেপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মজিদ 'গেলাম রে' বলে এক ভয়াবহ কণ্ঠে এমন চিৎকার করে উঠল যে হরিদাস সেন, সারেং চোখদুটো বড় বড করে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। অনুত্তম ভয় পেয়ে কেবল বলছে, কী হয়েছে! কোথায় লাগছে?

মুখটা নীল হয়ে গেছে মজিদের। হেদত তখনও অমানুষিক চিৎকাব করে অন্যান্য জাহাজিদের কাছে নালিশ জানাচ্ছে। ডেক-জাহাজি মাজেদ মজিদের শিয়রে বসে বলছে, আল্লা!

হরিদাস সেন উপুড় হয়ে আছে বাংকের রেলিং-এ। অনুত্তম হতবাক। সারেং গেছে মেজ-মালোমকে ডাকতে।

মেজ-মালোম এলেন কিছুক্ষণ পর। দেখলেন তিনি। মাথা চুলকালেন চুপচাপ। মজিদের চোখ টেনে রক্ত দেখলেন। রক্ত কম, ফ্যাকাসে। চোখের কোণে পিঁচুটি। মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ। মুখ সাদা সাদা। ছাইয়ের মতো রং। হাত রাখলেন তিনি পেটের উপর, পেটের নাড়ি পল্টন খাচ্ছে। মেজ-মালোমের সাধারণ বিদ্যাটুকুতে এ রোগ ধরা পড়ছে না। তিনি চুপচাপ বের হয়ে গেলেন।

হেদত মিঞা ফোকশাল থেকে ক্ষুণ্ণ মনে বের হয়ে গেল। সে ঘরে ঘরে এখন নালিশ দিচ্ছে অনুত্তমের নামে। হরিদাস সেনকে ভয় পায় বলে ওর নামটা জড়ায়নি। ফোকশালে বসে সব কথাগুলিই শুনতে পেল অনুত্তম।

মেজ-মালোম তখন উঠে গেছেন। যাবার আগে বলে গেছেন, আগামী বন্দরটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আর কোনও উপায় নেই।

ডাক্তার নেই জাহাজে— আফসোস। এতগুলো জাহাজির প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কোম্পানি, সারেং বললে, সোভান আল্লা।

তিনি বের হলেন পা টিপে টিপে। আরও দু'-একজন যারা ছিল তারাও চলে গেল।

তারপর অনেকগুলি দিন গেছে জাহাজে। অনেকগুলি রাত কাটল জাহাজে। অনেকগুলো উড়ুক্কু মাছ ডেক-পাটাতনে আছাড় খেয়েছে। ঝড় উঠেছে। ঝড়-বাদলের রাত গেছে। জাহাজিরা উন্মুখ অন্য বন্দরের জন্য। মজিদের অবস্থা দিন-দিনই খারাপ। অনুত্তম বার বার প্রশ্ন করছে, আর কতদিন সেকেন্ড?

মজিদও বিছানায় শুয়ে কেবল এক প্রশ্ন করেছে, আর কতদিন?

জাহাজিরা উত্তর করেছে, এই তো এসে গেছি।

কিন্তু ইদানীং মজিদ আর তেমন প্রশ্ন করছে না। বাংকের সঙ্গে ওর দেহটা মিশে গেছে। অনুত্তম রোজ ভোরবেলায় পাগুলো হাতগুলো টিপে দেয়।

এমন কোনও এক ভোরে মজিদের পাশে বসেছিল অনুত্তম। ফোকশালে আর কেউ নেই। পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্রের গর্জন গানের মতো ভেসে আসছে। মজিদ উৎকর্ণ হয়ে যেন শুনছে সে গান। সমুদ্রের গান। অপলক তার দৃষ্টি। ডেকের উপর দু'-একজন মাঝি-মাল্লার পায়ের শব্দ। তাবা চলছে। হাঁটছে। কাজ করছে। শব্দগুলো তার প্রতীক। জীবনের প্রতীক। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল মজিদ, ব্যানার্জি।

অনুত্তম মজিদের মুখের কাছে এগিয়ে গেল । কপালে হাত রেখে বললে, আমায় কিছু বলবি।

তুই আমার পুত।

মজিদের ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজগুলো বড় অস্পষ্ট। বড় অসহায়।

আমি তোর পুত।— অনুত্তম স্বীকার করল।

ইবারে শেষ বন্দরে নোঙর ফেললুম।— মজিদ অপ্রত্যাশিতভাবে খুশি হল। হাসল। প্রশ্ন করল, কোন দরিয়ায় আছি রে ব্যানার্জি?

দেশের দরিয়ায়।

হঠাৎ সে দুটো হাত চেপে ধরল অনুত্তমেব। বুকের কাছে টেনে বলল, খোদাকে ডাক, আল্লারে ডাক। আমার লাইগা মোনাজাত কর, মরি ত মরি এ দরিয়ার পানিতে মরি য্যান। এ দরিয়ার পানিতেই গোর খাই য্যান। এ পানি আমার দ্যাশের পানি।

এমন কথা বলতে নেই মজিদ।

তুই আমার পুত। তর কষ্ট হয় বুজি। কিন্তু কত আশা। সোলেমানরে কইয়া রাখছিলাম আমারে তগো আম্মার পাশে রাখবি।

অনুত্তম যেন এখন ওব অন্য বন্দরে নোঙর ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তাই সে জবাব দিচ্ছে না। কথা বলছে না।

একটা কথা রে ব্যানার্জি, সোলেমানের লিখা দিবি হেগো আম্মার পাশে আমার নামে য্যান একটা চেরাগ জ্বালায়। রোজ চেরাগটা জ্বালানোর সময় মোনাজাত করবে। আমি আমার বিবির মুখটা তখন দ্যাখতে পামু।

চেরাগেব আলোতে মজিদ তার বিবির মুখ দেখতে চায়। পেয়ারা গাছের নীচে মাটির অন্ধকারে বিবি তার প্রতীক্ষা করছে। অনেক আলো বিবির মুখে পড়বে চেরাগের আলোতে। দুটো চেরাগের দুটো নাম। দুটো মন। দুটো আলোর রেখা। সেই-রেখাদুটোয় মজিদ বিস্মৃতির অন্ধকারে কোনও এক গোপন স্মৃতিকে লালন করছে।

পরি দিতে অনুত্তম এবং হরিদাস সেন উপরে উঠে গেল একসময়। শীত পড়েছে খুব। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আফ্রিকার উপকূল থেকে নেমে আসছে। মাঝি-মাল্লারা খুব বেশি জামা চাপিয়েছে শরীরে। অনুত্তম ঠক ঠক করে শীতে কাঁপছিল। ফলকার কাছে এসে সে প্রশ্ন করল, দাদা, মজিদ কি সত্যি বাঁচবে না?

কী বলব বলো! মেজ-মালোম তো সেই কথাই বলেন। কাল ক্যাপ্টেন, বড়-মালোম সকলেই ওকে দেখে গেছে।

ওকে বাঁচাবার তবে কোনও উপায় নেই?

ঠোঁট উল্টাল হরিদাস সেন। আকাশে তখন অনেক আলো। বয়লারের চুল্লিতে তখন গনগনে আগুন। মেজ-মালোম চুপচাপ বসে আছেন ডেকে।

রঙের টব নিয়ে মাজেদ তর তর করে মাস্টে উঠে যাচ্ছে। ডেক-সারেং, ভাণ্ডারি আর বাটলার কলহ করছে। কোথাও এতটুকু অন্যমনস্কতা নেই। ব্রিজে ক্যাপ্টেন। তার কুকুর। চিৎকার করছে কুকুরটা। সুখানি কম্পাসটার উপর ঝুঁকে আছে। ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস দু'জন লাইফবোটে বসে একটা ইংরেজি গানের কলি কোরাস ধরেছে। এই সব দেখতে দেখতে অনুত্তম নীচে গিয়ে নামল। জব্বর মিঞা বাংকার থেকে বের হয়ে বলল, মজিদের অবস্থাটা কেমন ব্যানার্জি?

ভাল না।

বাঁচব না?

না।

জব্বর মিঞা ফোলা পেটের উপর হাত রেখে বলল, সব নসিব।

ছোট-টিন্ডাল সেই সময় নীচে নামল, হারে'ব সব নসিব! বিবির খত কলম্বোতে মিলল না। ডারবানে নিশ্চয়ই একটা মিলব। ব্যানার্জি, তোমার চাচির খতের জবাবটা লিখা দিবা তো!

দেব চাচা, দেব।— অনুত্তম কেমন বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

স্টোক-হোলডে আবার সেই ব্যস্ততা।

পরি শেষ করে টিন্ডাল, অনুত্তম, হরিদাস সেন একসঙ্গে উঠে এল। ওরা বোট-ডেক থেকে নেমে জলের জন্য অফিসার গ্যালির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গলুই-এর ট্যাংকে জল নেই। এখন ইঞ্জিন-রুমের ট্যাংক থেকে মেপে জল দেওয়া হচ্ছে। অনুত্তমের মনটা কিন্তু মজিদের ফোকশালে পড়ে আছে। জল দিতে দেরি দেখে সে গলুইতে চলে গেল। নীচে নেমে ফোকশালে ঢুকল। মজিদ চিত হয়ে শুয়ে আছে। হাতগুলো শক্ত। পাগুলো শক্ত। কশ দিয়ে লালা পড়ছে, তার দাগ! চোখদুটো ওর ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মতো। মনে হয় চোখদুটো এক্ষুনি বের হয়ে আসবে।

আরও কাছে গেল অনুত্তম। কপালে হাত রাখল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মজিদকে। ওর চোখদুটো স্থির, অপলক। এখনও যেন অনুত্তমকে কিছু বলতে চাইছে।

কী রে কিছু বলবি?— অনুত্তম কেঁদে দিল।

কোরান পড়ছে হেদত মিঞা। আন্দোলিত হচ্ছে ওর সুরের ওঠানামা। সুরটা আজ বড় ভাল লাগল শুনতে। মজিদের পাশে একটু জায়গা করে বসল অনুত্তম। বসল দুটো আয়াত শোনার জন্য। পোর্ট-হোলটা খোলা। কনকনে হাওয়া আসছে। এবার অনুত্তম মজিদের দেহের উপর হাত রেখে অন্য একটা জগতে ডুবে গেল।

সারেং দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, তুমি চান-খাওয়া না করেই এখানটায় এসে আবার বসে থাকলা। তুমিও দেখছি অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বা না।

ফের এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে বলল, মজিদ আছে কেমন?

অনুত্তম এবার উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এল সন্তর্পণে। ধীরে ধীরে বলল, মজিদ মারা গেছে সারেং সাব।

হেদত মিঞা কেঁপে উঠল। বাংক ধরে সে ঝুঁকতে থাকল। কোরানশরিফটা ঠেলে দূরে ফেলে দিয়েছে।

সারেং-সাব, সারেং-সাব!— বলে সে চিৎকার করে উঠল।

কী হয়েছে হেদত! এমন চিৎকার করছ কেন?

এ ফোকশালে আর থাকছি না সারেং-সাব! আমি অন্য ফোকশালে যাব।

সারেং ফোকশালে-ফোকশালে খবরটা দিল। উপরে উঠে ক্যাপ্টেনকে বলল, সাব, মজিদ ডেড।

ক্যাপ্টেন বুকে ক্রস টেনে টেলিগ্রাম করলেন ইঞ্জিন-রুমে।

জাহাজ থামিয়ে দেওয়া হোক। জাহাজের একজন জাহাজি মারা গেছে।

তিন নম্বর সাব সারেংকে দিয়ে স্টোক-হোলডে খবর পাঠালেন, আর যেন বয়লারে কয়লা হাঁকড়ানো না হয়। জাহাজ সমুদ্রের উপর থামবে। জাহাজের এক জাহাজিকে সলিল-সমাধি দেওয়া হবে।

ফোকশালে বসে অনুত্তম বুঝতে পারল জাহাজ আর চলছে না। প্রপেলারটা থেমে গেছে। স্টিয়ারিং-ইঞ্জিন থেকে থেকে শব্দ করছে। মজিদের মৃত্যুতে ওর কান্না পাচ্ছে বুঝি। মজিদের ফোকশালে এখন ভিড়। সারেং এসে এখন বলবে, অনুত্তম, এবার উঠে এসো। মজিদকে আর ছুঁয়ো না।

অনুত্তম উঠে দাঁড়াল। মজিদকে সে আর ছুঁল না। ক্যাপ্টেন, বড়-মিস্ত্রি, মেজ-মালোম গলুইয়ে ভিড় করেছে। কয়েকজন জাহাজি মজিদকে ওর বিছানাটাসহ উপরে নিয়ে গেল। সাহেবরা সরে পথ করে দিলেন। ডেকের উপর মজিদকে রাখা হল।

উপরে নীল আকাশ। নীচে নীল দরিয়া। সাদা জাহাজটা চুপচাপ থেমে আছে। উসকো-খুসকো চুলগুলি হাওয়ায় কাঁপছে। ছায়া-ছায়া হয়ে গেছে কমলা রঙের রোদটা। মাঝি-মাল্লার মৃত্যুতে রোদের রং বিষণ্ণ। অস্পষ্ট পৃথিবী ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তখন ছোট-টিন্ডাল গেছে স্টোর-রুমে। একটা বড পাটের থলে লাগবে। মজিদকে ঘিরে ক'জন জাহাজি কপাল চাপড়ে শোক করছে এখন।

অনুত্তম শোক করছে না। কাঁদছে না। ডেকের উপর সে সকল থেকে আলাদা হয়ে সমুদ্র আর আকাশকে দেখছে। সমুদ্রের নীচে অনেক মাছ। কিছুক্ষণ পর মজিদের দেহটা ঠুকরে ঠুকরে তারা খাবে।

হরিদাস সেন গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মজিদের মৃত্যু নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবছে। ঘরে তার বউ আছে। বউয়েব প্রথম বাচ্চা হবে। বাচ্চা হতে গিয়ে বউটা হয়তো তার মরবে। হরিদাস সেনের বুকটা ধড়াস কবে উঠল।

সাহেবরা জটলা করছে অন্যদিকে। মেজ-মালোমের হাতে বাইবেল। তিনি পাতাব পর পাতা উলটে যাচ্ছেন। বড়-মিস্ত্রি পাইপ টানছেন। মাঝে মাঝে বাইবেলের উপর ঝুঁকে তিনি মেজ-মালোমকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বারিক আর লুৎফল থলের মুখে মজিদকে ঠেলে দিল। তার সঙ্গে ঠেলে দিল কতকগুলো কালো ভারী পাথর। তারপর দড়ি দিয়ে মুখটা শক্ত করে বেঁধে দিল। পাটের থলেটা মজিদের কফিন। পাথরগুলো ওর তৈজস। পাথরগুলো দিয়ে সে সমুদ্রের সিঁড়ি ভাঙবে। সমুদ্রের অতল অন্ধকারে নেমে যাবে ধীরে ধীরে। হাঙর, তিমি, অক্টোপাস একটি অপরিচিত জীবকে দেখে প্রথমে আঁতকে উঠবে। পরে ওরা চোখ ট্যারা করে বলবে, রাজ্য জয় করতে বের হলে বুঝি!

সব জাহাজিরা সার করে দাঁড়াল। অনুত্তম সকলের শেষে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না মজিদের কফিনটা। বাংকারে কত মশকরা, কত হাসি-ঠাট্টার গল্প মজিদের সঙ্গে। সে মানুষ আজকে সাদা জাহাজ থেকে নীল সাগরে আশ্রয় নিচ্ছে। কোরান পড়ছে বড়-টিন্ডাল। আয়াতগুলো অদ্ভুত রকমের অনুভূতি সৃষ্টি করছে সকলের মনে। ওরা সকলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মজিদের জীবনটাকে অনুত্তম কবিতার মতো করে ভাবতে চাইল। মৃত্যু সমুদ্র গানেব মতো উদার, আক্ষেপশূন্য। হৃদয়ের বিশাল সমুদ্রে যেমন ঝড়ের পর প্রশান্তি। শান্তি। আনন্দ। কবিতা। মৃত্যুকে সে কবিতার মতো করে ভাবছে। আজ হৃদয়ে তার পরম রমণীয় সুর। সে কাঁদছে না। অনেকগুলো কবিতার সুর বার বার করে মনের দরজায় হোঁচট খাচ্ছে অনুত্তমের।

মেজ-মালোম বাইবেল পড়ে মৃত আত্মাব শান্তি কামনা করছেন।

জাহাজিরা সকলে মজিদের কফিনটা কোলের কাছে তুলে ধরল। অসীম সমুদ্র। অনন্ত আকাশ। মুখার্জি সাহেব ব্রিজে। সকলে আকাশমুখো। সৌর জগতের কোনও এক কোণ এক টুকবো কান্না আজ। জাহাজের হুইসলটা এবার আকাশ-পাতাল মথিত করে দিক-দিগন্তে সেই বেদনার বার্তাকে বহন করে নিয়ে চলল। এমন সময় মজিদকে সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হেদত মিঞা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দু' হাত উপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, ইনসে আল্লা। আল্লা— হু— আকবর।

সকলে একসঙ্গে চিৎকার করছে, আল্লা— হু— আকবর।

অনুত্তম কিছু বলতে পারল না, গীতা থেকে তার কোনও শ্লোক মুখস্থ নেই। কোনও মন্ত্র সে উচ্চারণ

করতে পারল না। শুধু কতকগুলি কবিতা বার বার আয়াতগুলোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হল।

মজিদের কফিনটা ধীরে ধীরে সমুদ্রের অতলে ডুবছে। যেন 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে— সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।'

অনুত্তমের প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হল, 'অতিদূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।' মজিদ সমুদ্রের অতলে অন্ধকারে কোনও এক দারুচিনি দ্বীপের অন্ধকারেই হয়তো আশ্রয় নেবে আজ।

অনুত্তম ধীরে ধীরে বলল, 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল, পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল, পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার নাটোরের বনলতা সেন।'

মজিদ চেয়েছিল ওর শেষ আশ্রয়টুকু যেন ওর বিবির কাছেই মেলে। সব লেনদেন চুকিয়ে আর-এক অন্ধকারে সে বিবির মুখোমুখি হতে চেয়েছিল।

সিন্ধু-সারসীদের যখন পাহাড়ে ফেরার সময় হয়েছিল, জাহাজিরা তখন শুনেছে জাহাজ রাত দশটায় বন্দর ধরবে। অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকেই পশ্চিমের আকাশে একখণ্ড দেশকে আবিষ্কার করেছে। সেজন্য ডেক-জাহাজিদের গলুইতে ভিড়। ভিড়ের ভিতর মানুষগুলো সব জবুথবু হয়ে বসে আছে।

ইঞ্জিন-সারেং কিন্তু হাসি-মশকরায় মশগুল হতে হতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। জাহাজেরই কোনও একজন জাহাজির কথা ভাবছে। দুটো হাত, দুটো পা, মুখটা ডিমের মতো। চোখ টানা-টানা। নাক-মুখের কথা ভাবল। বয়সের কথা ভাবল। ওর মুখটা ভিজে ভিজে ঠেকছে। চোখদুটো, হাত-পা সব নরম, মসৃণ। কমলার কোয়ার মতো টসটসে। মেয়েমানুষের মতো ঠোঁটদুটোতে উত্তাপ।

অনুত্তমকে নিয়ে ফিস ফিস করে রসিকতা করেছিল ডেক-সারেং, আপনার কপাল তো ভাল মিঞা। যা হোক একজন তো তবু জাহাজে এসেছে।

ইঞ্জিন-সারেং বিরক্ত বোধ করে ডেক-পাটাতনে নেমে গেল। জাহাজে দশজনের দশটা কান আছে, যদি কেউ শুনতে পায়। কেলেংকারি। মুখটা এবারে তিনি দু' হাতে মুছলেন। ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জমে উঠছে। ঘসে ঘসে দুটো হাত গরম করে নিজের গলুইতে এসে উঠলেন। অনেকগুলো নজর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়ে কিছু যেন খুঁজছেন। সারেং সাবের বিরক্তিবোধটা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু এ সময় তিনি দেখতে পেলেন অনুত্তমকে। তিনি খুশি হলেন।

হরিদাস সেন প্রথমে, পিছনে অনুত্তম বের হল। ওদের হাতে টিনের কলাই করা থালা। প্রত্যেকের হাতে কাচের গ্লাস। দু'নম্বর পরির জাহাজিরা খেতে আসছে। সারেং সাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ওরা এখন টিন থেকে ভাত নেবে, বিশু থেকে গোস্ত নেবে, কফিভাজা নেবে। গ্যালির ভিতর থেকে সারেং সাব উঁকি দিলেন মেসরুমে। তিনি অনুত্তমের সঙ্গে গল্প করতে চাইবেন। খানা-পিনা একেবারে তুলে দিয়েছে অনুত্তম। ভাত সে একেবারেই খায় না, বাটলার থেকে সারেঙের নাম করে দু'-একটা ডিম নিয়ে সে অন্তত খেতে পারে, এ কথাগুলোও তিনি বলবেন।

অনুত্তম বলবে, বেশ তো আছি চাচা, আর কেন।

সারেং বলবেন, কেন নয়! জাহাজে শরীর রাখতে হবে তো!

যে শরীর আছে, ওতেই চলে যাবে।— অনুত্তম বলবে।

খেতে খেতে হরিদাস সেন কনুইটা টিপে দেবে অনুত্তমের। ডংকিম্যান দাড়ির নীচে লজ্জার হাসি হাসবে। আগওলা জাফর আলি, আকবর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সারেং সাব ক'দিন থেকেই বিরক্ত বোধ করছেন। সারেং সাব এবার জাহাজে তার ফালতু সংগ্রহ করতে পারেননি। সেজন্য দিন যত যাচ্ছে তত বেশি করে অনুত্তমের পিছন নিচ্ছেন তিনি। স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে ডিম, আপেল এনে দিচ্ছেন। সেও বেশ মজা করে খাচ্ছে। সারেং সাবকে কিছু বলছে না। আকবর সতর্ক থাকতে বলছে— বেশি পাত্তা দিবি না, ওটা ইবলিশের বাচ্চা। নোংরা।

সারেং সাব অনুত্তমকে সবসময় সঙ্গ দিতে চান। অনুত্তম হাত-মুখ ধুয়ে নীচে গিয়ে বসল, তিনিও

তার পাশে গিয়ে বসলেন। অনুত্তম কথা বলল সকলের সঙ্গে, তিনি বসে বসে সব শুনলেন। সেই দুঃস্বপ্নের পর থেকেই এমন হয়েছে! তিনি কীসের যেন জ্বালা অনুভব করছেন। উত্তপ্ত হচ্ছেন দিনের পর দিন।

ফোকশাল থেকে জাহাজিরা যখন ফালতু-ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে এবং অনুত্তম উঠবে উঠবে করছে, সে সময় সারেং সাব তার হাতটা জোরে চেপে ধরে বললেন, দ্যাখতো ব্যাটা জ্বর আইল নাকি আমার?

জ্বর আপনার আসেনি, কোনওদিন জ্বর আসবে বলেও মনে হয় না।

বলে কাপড় ছাড়তে ফালতু-ঘরে চলে গেল অনুত্তম। সারেং সাব বিছানাটা আঙুল দিয়ে টিপলেন। টিপে দুটো নরম ঠোঁটের উত্তাপ পেতে চাইলেন। বিছানাতে দিনের পর দিন যে ডিমের মতো মুখটা লেপ্টে থাকে, সে মুখের সহজ স্পর্শ পেতে চাইলেন যেন তিনি।

অনুত্তম নিজের বাংকে ফিরে এলে সারেং আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে বিরক্ত হয়ে উপরে উঠে গেল। এ পরিতে হালা-হালি হবে না ভেবে নিশ্চিন্তে রেলিং-এর উপর ভর করে দাঁড়াল।

ডারবান শহরে আলোগুলো জ্বলছে। অনেকগুলো তারা হয়ে আকাশ-দিগন্তে ওরা ঝুলছে। সমস্ত রাত ধরে ঝুলবে। দূরে ইতস্তত কিছু কিছু জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছে। লাল নীল। ছোট ছোট জাহাজ। ওরা হয়তো তিমি মাছ ধরছে। সারেং এসে এ সময় আবার পাশে দাঁড়াল। তিনি গল্প আরম্ভ করলেন, জাহাজগুলো অনেক দূরে হারিয়ে যাবে, আট-দশদিন ধরে একটা তিমি মাছের পিছনে ঘুরবে, হয়তো একটা তিমি মাছ ধরবে ও। তিনি সে গল্প থেকে অন্য সফরের গল্পে এলেন। সে সফবে এ বন্দরে তার জাহাজ দু'মাস ছিল। জাহাজের দেওয়ানি আর কয়লার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কিঙ্করনাথ এক নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেল। বন্দরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল। আরও বললেন, অনুত্তমও পারবে বলে মনে হয় না। ফালতুতে তেমন কষ্ট নেই। সারেঙের ফালতু হয়ে থাকবে। ভালভাবে জাহাজে বাঁচবে। যদি অনুত্তম রাজি থাকে তো মেজ-মিস্ত্রিকে তিনি বলে-কয়ে দেখতে পাবেন।

অনুত্তম উত্তব না দিয়ে আর একটু সবে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল শুধু। কানেব ভিতর সারেঙের ফালতু শব্দটি খুব বিশ্রীভাবে আঘাত কবেছে।

সাবেং সাব অনুত্তমকে বুঝিয়ে বলার মতো কবে বলেছিলেন, ভেবে দ্যাখ কথাটা। ফালতুতে থাকা মানেই কোনও কাজে না-থাকা। সারেঙের ফুট-ফরমাস ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। কোনও হালা-হালি নেই। সমস্ত রাত ঘুম হবে। বন্দর ঘুরতে পাবে অনেক।

তিনি আরও সংলগ্ন হলেন, দরকার হয় আমার থাইকা টাকা নিবি। কী রে? রাজি আছস? কমু মেজ-মিস্ত্রিরে?

মুখটা ওর কালো হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে সে বোট-ডেকে উঠে গেল। ইচ্ছে হল সব খুলে বলে হরিদাস সেনকে। কিন্তু হরিদাস সেন হয়তো উত্তরে বলবে, কী দরকার ছিল এই কাঁচা বয়সে জাহাজে আসার! রাগে এবং বিরক্তিতে নিজের হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে হল সেজন্য। কিন্তু পরির সময় হয়ে গেছে ভেবে সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর জাহাজ থামিয়ে দেওয়া হবে। পাইলট উঠবে জাহাজে। সিগন্যালিং হচ্ছে। একটা মোটরবোট উড়ে আসছে অন্ধকারে। জাহাজের পাশে এসে বোটটা থামবে। জাহাজিরা দড়ির সিঁড়ি ফেলবে সমুদ্রে। সেই ধরে পাইলট ডেকে উঠবে।

আগওয়ালারা বসে গল্প করছে স্টোক-হোলডে। জাহাজ বেশি গতিতে চলছে না। কয়লা কম খাচ্ছে বয়লারগুলো। একটু অবসর পেয়েছে বলে প্লেটের উপর সবাই গোল হয়ে বসেছে। ওরা প্রাণ খুলে গল্পের ভিতর হাসল। আকাশি রঙের আলোর ভিতর মানুষগুলোকে অদ্ভুতভাবে ভাল লাগল দেখতে। অনুত্তমও সেই ওদের পাশে জমজমাট হয়ে বসে পড়ল।

বড়-টিন্ডাল বলল, কী রে? এত তাড়াতাড়ি যে নীচে নামলা!

বড্ড শীত চাচা ডেক-এ। তাই নেমে এলাম।

ডারবানে গিয়া বউমার কাছে খত লিখবা না।

অনুত্তম হাসল।
কিনারার আলো দ্যাখতে পাইছ?
বন্দর এসে গেছে। আর একটু পর জাহাজ পাইলট ধরবে।
তারপর টিন্ডালের কথায় শেষ বারের মতো বয়লারে কয়লা হাঁকড়াল আগওয়ালা। ফার্নেস ডোরে র‍্যাগ ঢুকিয়ে দুটো টান মারল। শেষে উইন্ডস-হোলের নীচে এসে জড়ো হল তারা। উপরের দিকে চেয়ে দেখল দু' নম্বর পরিদাররা নামছে কি নামছে না। নামতে থাকলে এরা উপরে উঠতে থাকবে।
দু' নম্বর পরির আগওয়ালারা নেমে আসছে। ওরা নেমে এবার শাবল ধরবে।
ছাইগুলি হাপিজ করে বাংকারে ঢোকার আগে আবদুল বলল অনুত্তমকে, সাবেং সাবের নজর কিন্তু খুব বেশি ভাল ঠেকছে না ব্যানার্জি। লোকটা নোংরা।
ওনাব নাকি জুর-জুর ঠেকছে আজকাল! জুর-জুরটা বের করে দেব।
অনুত্তম বাংকারে ঢুকে গেল। লক্ষটার ভুতুড়ে আলোয় উঁকি দিয়ে দেখল সুটেব গর্তটার কত নীচে কয়লা নেমেছে। কয়লা যদি কম নামে, শাবলের উপর বসে একটু বেশি সময় বাড়িঘবের চিন্তা করবে। একটু বেশি সময় পড়শির আটপোরে জীবন নিয়ে বিমুগ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু কয়লা অনেকখানি নেমেছে দেখে আজ আব শাবলের উপর বসল না। গাড়ি টেনে, শাবল টেনে হাজার টন কয়লার সামনে দাঁড়াতেই আর-একটা ছায়ার অন্ধকার এসে ওর শরীরকে ঢেকে ফেলল।
কে! কে!!— চিৎকার দিয়ে উঠল অনুত্তম। ওর কেমন ভয়ে ধরেছে।
আমি সারেং সাব।— ফিস ফিস কণ্ঠে মানুষটা বলল।
সারেং সাব অদ্ভুতভাবে নজব ঘোরালেন বাংকারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখছেন বাংকারটা। অনুত্তম শাবলে কয়লা টানছে। অনুত্তমকে তিনি দেখার কিংবা আলাপ কবার জন্য আসেননি, এ ভাবটা কবে তিনি সমস্ত বাংকার ঘুবে বেড়ালেন। যেখানে হাজার টন কয়লা আছে এবং অনুত্তমের শাবল শব্দ করছে সেখানে গেলেন না আপাতত।
অনুত্তম গাড়ি টেনে স্যুটেব গর্তে উলটে ফেলে দিয়ে বলল, চাচাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?
তা হইছে। জাহাজ বন্দর ধবব, কয়লা নিব, ক— ত কাজ। বাংকারে কত কয়লা আছে তার রিপোর্ট দিতে হইবে মাইজলা-সাবকে।
এবাব সারেং সাব অনুত্তমের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অনুত্তমের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেয়েছেন। ওব হাত নিজের হাতে টেনে বললেন, আমার ফালতু হইতে তর লজ্জা হয়? শরম লাগে? লজ্জা কী। কোনও হালা-হালিতে থাকতে হইব না। সুখের চাকরি। কিনারায় যখন যাইবি টাকা নিবি আমার থাইকা। কী রে নিবি তো?
কোম্পানির ঘরে আমারও তো টাকা জমেছে চাচা।
তা আমি জানি না! টাকা সকলের জমছে। টাকার জন্যই তো এই চাকরি। কিন্তু বাতিজারে দুই-চাবটা টাকা চাচায় দিব তার জন্য অমত করতে নাই। নিবি। নিবি কিন্তু।
বলে অনুত্তমের হাতদুটো দাড়ির ভিতর ঘবতে চাইলেন।
অনুত্তম মরিয়া হয়ে বলল, চাচা, খবরদার। আমি আপনার চেয়ে বেশি জোয়ান।
সারেং খিল খিল করে হেসে উঠল।
তা জানি না? তা জানি না? কিন্তু বাতিজা মনে রাইখো এইটা জাহাজ। এখানটায় অনেক তরিবত আছে আবার অনেক পেরেসান আছে।
হাতটা ছেড়ে দিলেন সারেং এবং সোহাগ করার মতো অনুত্তমকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। আদর কবার মতোই বললেন, রাগ করস ক্যান। চাচা-বাতিজার সম্পর্ক আমাগো। কোনও বেইজ্জতের কথাই উঠতে পারব না।
অনুত্তম বলল, হাতদুটো সরিয়ে নিন।
সারেং মিঠে-কড়া হাসল। এবার তিনি আরও জোরে চেপে ধরেছেন। অনুত্তম সারেঙের গলা টিপে ধরতে চাইল। স্যুটের গর্তে ফেলে দিয়ে গাড়ি গাড়ি কয়লা ফেলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সে শুধু পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, সারেং সাব!

তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে এমন জোরে ঠেলে দিল যে সারেং উপুড় হয়ে প্লেটের উপর পড়ে গোঙাতে থাকলেন, আল্লা রে, আমার হাত ভাঙ্গি গেল রে।

সারেঙের অবস্থা দেখে অনুত্তমের কেমন ভয় ধরে গেল। ফাটা বেলুনের মতো মন তার চুপসে গেছে। শূন্য ঠেকছে সব। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল সে। সারেং সাব প্লেটের উপর পড়ে গোঙাচ্ছেন এখনও। উঠতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। নীচ থেকে দু'জন মানুষের গলার আওয়াজ পেল সে। ওরা সিঁড়ি ধরে যেন উঠে আসছে। ওরা গোঙানি শুনে বাংকারে হয়তো ছুটে আসবে। ধরে ফেলবে ওকে। কাপ্তেনকে নালিশ দেবে, এ আদমি সারেং সাবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভয়ে আড়ষ্ট হল অনুত্তম। এবং দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ি ধরে পাগলের মতো ছুটল। বোট-ডেক পার হল। টুইন-ডেকে নেমে দেখল প্রায় জাহাজিরাই এখানে জড়ো হয়েছে। বন্দর দেখছে ওরা। ভিড় থেকে একটু দূরে হ্যাচের উপর মেজ-মালোম। তিনি চুপচাপ বসে আছেন। চোখে সেই আগের মতো দূরবিন আঁটা।

অনুত্তম হাঁপাতে হাঁপাতে হ্যাচের উপর বসে পড়ল। মেজ-মালোমের পাশে বসে কিছুই হয়নি এমন মুখ করে সেও বন্দর দেখতে থাকল। তারপর চুপি চুপি প্রশ্ন করল, অ্যানি ওম্যান সেকেন্ড?

অন্যান্য জাহাজিদের মনেও তেমনি একটি প্রশ্ন। সকলের নজরে এক প্রতীক্ষা। কিন্তু রাত গভীর। দু'দিকে আলো-অন্ধকারের ভিড়। অনেক জাহাজ বাঁধা, একটা অর্ধবৃত্তের মতো বন্দর রাতের মতো ঘুমোচ্ছে।

'অ্যানি ওম্যান সেকেন্ড' এই প্রশ্নের পর অনুত্তম আর-কোনও প্রশ্ন করেনি। মেজ-মালোম মাঝে মাঝে তীরেব ঝোপগুলি দেখছেন। অনুত্তমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোনও জবাব দেননি। এই থেকে সে বুঝে নিয়েছে দূরবিনের কাচদুটোয় উত্তর দেবার মতো কিছু ঝুলে নেই। কিন্তু ধূসব ডেকটাব মতো রং-চটা ভয়ে মাঝে মাঝে ওর বুকে ধস নামছে। সে আঁতকে উঠছে। একবার ইচ্ছা হল মেজ-মালোমকে সব খুলে বলে সারেঙের কথা, সারেঙের হাত ভাঙার কথা।

ভয়ে অনুত্তম কুঁকড়ে গেল সত্যি। হ্যাচের উপর দুটো হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকল। মেজ-মালোম বলেছিলেন, কী হয়েছে অনুত্তম! মনমরা কেন?

অনুত্তম মিথ্যা কথা বলেছিল, বাড়িঘরের কথা বড্ড বেশি মনে পড়ছে।

মেজ-মালোম দুটো ঝাঁকি দিলেন ওর মাথায়। দূরবিনটা ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, বসে বসে দ্যাখো। কিছু নজর করতে পারলে আমাকে ডেকো। জাহাজ এখন বাঁধবে। আফ্‌ট-পার্টে যাচ্ছি।

জাহাজ যখন কয়লার জেটিতে বাঁধা হচ্ছে, ওয়ার পিন ড্রামগুলো যখন গড গড় করছে তখনই দুটো কথা রাষ্ট্র হল। প্রথম কথা জাহাজ ভোররাতে সেইল করবে, কোনও জাহাজিকে বন্দরে নামতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় খবর, ইঞ্জিন-সাবেং আছড় পড়ে হাত ভেঙেছেন।

জাহাজিরা নামতে পারবে না, কেন নামতে পারবে না? কোনও কোনও নাবিক এই কথাগুলো বলে চিৎকার করেছে। জাহাজিরা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে এই খবরে। তাদের মন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষার জগৎ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। গুঞ্জন উঠেছে ফোকশালে ফোকশালে। ওরা বিদ্রোহ করতে চায়।

সাবেং একটু রঙ্গরস করতে চেয়েছিল অনুত্তমের সঙ্গে। আছড় পড়ে হাত ভেঙেছে না ছাই! অনুত্তমের ইচ্ছা হল জোর গলায় বলে, ওসব ঢং, ওসব মিথ্যে! কিন্তু ভোররাতে জাহাজ বন্দর থেকে সেইল কববে ভাবতেই মুখটা তেতো হয়ে উঠল। ভোররাতেব ভিতর কয়লা ফেলার যন্ত্রটা ক্রস-বাংকারে এবং সমস্ত ডেক কয়লা বোঝাই করে দেবে। কিছু পাটের গাঁট পর্যন্ত নামানো হবে, শুধু জাহাজিরা নামতে পারবে না। হতাশায় ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একমাসের সমুদ্রযাত্রাকে মনে হল অনেক যুগের সমুদ্রযাত্রা। মাটির স্পর্শ না পেয়ে মন ক্রমশ বিষিয়ে উঠছে। বিরক্ত হল সে। দূরবিনটা হ্যাচের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। খালিচোখে বন্দর দেখে আফসোস তার, এই বন্দরেও নামতে পারল না। কিন্তু দূরে রেল-পুলের নীচে একটা ছায়া দুলছে। বুকে যে ধস নামছিল আবার তা নামছে। দূরবিন চোখেব উপর এঁটে লাফ দিয়ে নামল হ্যাচ থেকে, রেলিং-এর উপর এসে ঝুঁকল অনুত্তম। অন্যান্য জাহাজিরাও ছুটে এসেছে। এতক্ষণে ওরা দেখতে পেল, ওটা নেড়ি কুকুরের ছায়া। দূরবিনের কাচে সে ছায়া স্পষ্ট। অনুত্তম যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জাহাজে প্রথম আজ জাহাজি-খিস্তি করল।

তারপর অনুত্তম গরম জলে স্নান সেরেছে। সারেংকে দু'জন লোক ধরে ধরে নীচে নিয়ে গেছে, সে তাও দেখল। তিনি এখন বাংকে পড়ে গোঙাচ্ছেন। জাহাজ বাঁধা হয়ে গেছে। যন্ত্রের মুখ থেকে এখন ক্রস-বাংকারে কয়লা পড়ছে। যন্ত্রটা অনেকটা হাওড়ার ব্রিজের মতো। ব্রিজে উঠতে একদিন একটি খোঁড়া মেয়ে দুটো পয়সা চেয়েছিল। দুটো পয়সা সে দিয়েছে। আজ হলে সে ডবল দিত। সব দিত।

অনেকগুলো নিগ্রো স্যোর-ম্যান জাহাজে উঠে ক্রস-বাংকার এবং বোট-ডেকে ছড়িয়ে গেছে। ওরা কয়লা সামাল দেবে। কেউ কেউ ভাণ্ডারিকে খুঁজল। ওরা ভাত কিনবে। পকেটে ভাতগুলি রেখে মুড়ির মতো খাবে।

অনুত্তম রাত্রির পোশাক পরে মাজেদের সঙ্গে ফোকশাল থেকে উপরে উঠল। গলুইতে কয়েকজন নিগ্রো জটলা করছে। ওরা ভাত কিনে খাচ্ছে। ভাণ্ডারি চুপি চুপি ভাত বিক্রি কবে তখন পয়সা গুনছে। অনুত্তমকে দেখে সে আমতা আমতা করে কী সব অস্পষ্ট কথা বলল।

অনুত্তম লক্ষ করল না। সে মাজেদকে বলল, কী রে? দেখবি দূরবিনে?

কী দেখব, কী আছে দেখার! এত রাতে বন্দরে মেয়েমানুষ আসতে বসে আছে!

ওপাশের দু'জন নিগ্রোকে কেন্দ্র করে কয়েকজন জাহাজি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে ওদের বিবির খবর নিচ্ছে। নিগ্রোগুলো হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ওরা বলল, ওদের দু'জন করে বিবি। ওয়ান, নো গুড। টু, গুড। অর্থাৎ একজন বিবিকে নিয়েঘর করে সুখ নেই। দু'জন থাকবে। তিনজন থাকবে। দরকার হয় আরও বেশি থাকবে। দিনের খাটুনি রাতের আনন্দে সামঞ্জস্য খুঁজবে। জাহাজিদের সে সৌভাগ্য নেই। কাজেই বন্দরে এসে শাক দিয়ে ভাত খাওয়ার মতো কথাগুলিকে গিলছিল, কিন্তু হজম করতে পারছে না।

মাজেদ এ পাশ থেকে জোর গলায় বলল, ওরে জাফর, নিগ্রোগুলোকে বলে দে একমাস ধরে আমরা বিবির মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কোনও ব্যবস্থা করতে পারলে বকশিশ দেব।

অনুত্তমেব হাত থেকে এবার দূরবিনটা নিল মাজেদ। নসিবে থাকলে মিলতেও পারে। দূরবিনটা চোখের উপর তুলে ঘুবিয়ে ঘুরিয়ে সে বন্দর-পথ দেখল, কিছুই নেই, সব ফাঁকা। দু'-একজন নিগ্রো পুরুষ যন্ত্রটার নীচে কাজ করছে। কয়েকজন ওলন্দাজ কাস্টম অফিসার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা গাড়ির ভিতব অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। অন্যান্য জাহাজের নাবিকেরা গভীর রাতে ফিরছে। ওরা পর্যন্ত নিঃসঙ্গ।

তবু মাজেদের আশা, অনুত্তমের আশা, মেজ-মালোম এসে এখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরও আশা, সমস্ত রাত ধরে তারা যদি এই ডেক-এ দূরবিন নিয়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে, তবে এক সময় অন্ততঃ দূরবিনের কাচে একটা মেয়েমানুষের শরীর আটকে যাবেই যাবে। মাজেদ সেই আশায় ক্যাম্বিসের ডেক-চেয়ার বোট-ডেকে টেনে এনেছে। ওরা এখন প্রতীক্ষায় বসবে। মেজ-মালোম এবার ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন। শিকার ধরার মতো অনুত্তম পাশে বসে থাকবে। মাজেদ এবং আরও ক'জন জাহাজি বসে সারারাত পাহারা দেবে।

সমস্ত রাত ওরা ডেকের উপর বসে থাকল। ডেকের উপর সমস্ত কাজগুলোকে শেষ হতে দেখল। ক্রস-বাংকারে কয়লা ভরে যন্ত্রটা এখন ডেকের উপর কয়লা ফেলছে। দু'জন ডেক-অ্যাপ্রেন্টিসকে নিয়ে তিন-নম্বর মালোম ফলকার উপর কাঠের পাটাতন বিছিয়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি ফলকাটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকবেন। ফলকার কিনারে কিনারে লোহার পাতের উপর কিল ঠাসবেন। স্টাবোর্ড-সাইডের ডেক কয়লায় ভরে গেলে জাহাজের হাসিল খোলা হবে। এই সময় মেজ-মালোম দূরবিনটা হাতে নিয়ে কেবিনে ঢুকবেন। পোর্ট-হোলের কাঁপানো পর্দাটা টেনে দিয়ে বাংকে তিনি এলিয়ে পড়বেন। বালিশে মুখ গুঁজে আর-একটা দুঃস্বপ্নের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবেন।

ভোররাতে জাহাজ যখন অন্য বন্দরে পাড়ি জমাবার জন্যে সমুদ্রে পড়েছিল তখন কনকনে ঠান্ডা শীত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য জাহাজিরা যার যার ফোকশালে গড়াগড়ি দিতে চেয়েছিল। কোনও জাহাজির ঠ্যাং দুটো কট কট করছে, কোনও জাহাজির বুক টিপ টিপ করছে। অনুত্তম একবার এপাশ হল, আবার ওপাশ হল। কিন্তু কোথাও যেন সুখ নেই। আনন্দ নেই। হরিদাস সেন একটা রবারের পুতুল টেনে বের করছে। ওই নিয়ে সে উপুড় হয়ে শুল। শরীরে তার বিশেষ প্রশান্তি নেমে আসছে। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হয়ে গেছে। সমুদ্রে শীত বেড়েছে মনে হয়। জাহাজিরা গরম পোশাক পরেছে। কুয়াশায় ডেক আচ্ছন্ন। জাহাজ, দরিয়া, আকাশ সব। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মতো কুয়াশার টুকরোগুলো দানা বাঁধছে। ভেজা ডেক। ফানেলের ধোঁয়াটা কম। কুয়াশায় পড়ে তারাও দানা বাঁধছে। আটটা-বারোটার পরিদারদের ডাকতে লুৎফল উপরে উঠে এসেছে। ওর শরীরেও শীত। এখন সে গ্যালিতে। উনুনের উপর হাত দুটো সেঁকতে সেঁকতে ভাণ্ডারির সঙ্গে বিশুর গোস্ত সম্বন্ধে তর্ক শুরু করে দিল।

ডেক-জাহাজিদের হাতে হোস-পাইপ, স্টিক-ব্রুম। ওরা ডেক-এ জল মারছে। সমুদ্রের নোনাপানিতে গলুই, ফলকা সব ধুয়ে দিচ্ছে। সাবানজল নিয়ে দেয়াল ধুতে গেছে একদল জাহাজি।

মেজ-মালোম উঠেছেন। ঘুম ভেঙেছে আজ সকাল-সকাল। চা খেয়েছেন তিনি। স্যান্ডউইচ মুখে পুরে আবার পোর্ট-হোলের পর্দাটা খুলে দিয়েছেন। মেসরুম বয় দুটো আপেল রেখে গেছে টিপয়তে। ধীরে ধীরে তিনি সে দুটোও খাবেন। কিন্তু পর্দাটা টেনে দেবার সময়ই মনে হয়েছিল শরীর বড্ড দুর্বল। মাথাটা কেমন ধরেছে। রাতের দুঃস্বপ্ন তাকে অত্যন্ত কাহিল করে ফেলেছে। তিনি বিছানার উপর ফের বসে পড়লেন। দরজার পাশ থেকে রাতের পোশাক টোপাস তুলে নিয়ে গেছে। টোপাসকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন।

শীতের মধ্যেও আজ খুব ভোররাতে স্নান করেছে সারেং। জাহাজিরা নীচে হাসাহাসি করেছিল এ নিয়ে। সেই হাসাহাসির শব্দ শুনেই অনুত্তম ঘুম থেকে উঠেছে। কাজে যাওয়ার জন্য পোশাক পরেছে। সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সময়ই শুনল মানুষটার সেই সুর। দরজা বন্ধ করে কোরানশরিফ পাঠ করছেন তিনি। মেসরুমের কাছে এসে সেও মাথাটা কেমন ভারী-ভারী অনুভব করল। পা দুটোয় শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত রাত জেগে থাকায় শরীর খুব দুর্বল। ইঞ্জিন-রুমে ফালতু থাকতে পারলে বেশ হত। মেহনতি কাজ থেকে রেহাই পাওয়া যেত। সারেঙের যৌনতা আর থাকত না। অযথা হাসল সে গ্যালির সামনে। বুড়ো ভাণ্ডারি তখন গোস্তের গন্ধ নিচ্ছে হাঁড়ির ঢাকনা ফাঁক করে। চোখ কুঁচকাল ভাণ্ডারি। নাক কুঁচকাল। মাংসের গন্ধ এখন ওর নাকের ডগায় ঝুলছে।

বোট-ডেকে উঠতেই মনে হল মজিদকে। চারদিন আগে ওকে সলিল সমাধি দেওয়া হয়েছে। ওর বিবির কবরের পাশে আর-একটা চেরাগ জ্বালানোর কথা লিখেছে অনুত্তম। ওর বিবি দেখতে কেমন ছিল? ওর, ওব মেয়েটা? আরও কিছু ভাবতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। অবাক হল দেখে— দুটো পাখি। বিমুগ্ধ হল সে। দুটো পাখি ফানেলের গুঁড়িতে। ওরা ফুরফুর করে উড়ছে। ফানেলের উত্তাপে ওরা প্রচণ্ড শীত থেকে আত্মরক্ষা করছে নিজেদের। পাখিদুটো পাশাপাশি এখন। ওরা স্বামী-স্ত্রী। পাশাপাশি থাকায় বড়-ছোট ধরা পড়ছে। ছোট পাখির সিঁথিতে লাল দাগ। অনুত্তম বুঝতে পারল যেন কিছুদিন হল ওদের বিয়ে হয়েছে।

সে ঝুঁকে দাঁড়াল পাখিদুটোর সামনে। কিন্তু পুরুষ-চড়াইটা সব সময় মেয়ে-চড়াইটাকে আড়াল করে রাখতে চায়। অনুত্তমের রাগ হল দেখে। কিন্তু কথায় কোনও বিরক্তি প্রকাশ করল না। সে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, হ্যালো মিস্টার, হাউ ডু ইউ ডু। নিশ্চয়ই ভাল আছ আশা করছি। সমুদ্রযাত্রা লাগছে কেমন? মন্দ লাগছে না নিশ্চয়ই। মিসেসকে নিয়ে খুব সুখে আছ। আমাদের ভাগ্যে কিন্তু তা নেই।

অবশ্য মেয়ে-চড়াইটাকেই সে খুব বেশি করে দেখছিল। দেখছিল আড়চোখে ওর কথা শুনে পাখিদুটো যেন আরও বেশি সংলগ্ন হল। কিচমিচ করে দু'জনের ভিতর কী কথা হচ্ছে অনুত্তম বুঝতে পারল না। বুঝি ভয়ে সংলগ্ন হয়েছে। অনুত্তমের রাগ ক্রমশ চড়ছে। অত কী কথা তোমাদের? এবার সে রেগে গিয়ে বলেই ফেলল, মিসেস, আমাদের সঙ্গে তোমার জমবে তো! ভাল লাগবে তো! তুমি শুধু মিস্টারকে নিয়েই পড়ে থেকো না। আমাদেরও দেখো। নতুবা খুন-খারাবি নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে।

পাখিদুটো ভয়ে উড়ে গেল। অনুত্তমের হাসি পেল ভীষণ। সে স্টেনসান ধরে খুব জোরে হাসছে। ভয় পেয়েছে!

সমস্ত জাহাজ জুড়ে একটি মাত্র কথা, মিস্টার! মিসেস। মেয়েমানুষের সঙ্গে বোট-ডেকে অনুত্তম কথা বলছে। নাবিকেরা উন্মত্তের মতো বোট-ডেকের দিকে এগিয়ে আসছে। এলিওয়েয়ের পথে গুটি

গুটি এলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিসারেরা। ভাণ্ডারি নাকে মাংসের গন্ধ ঝুলিয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনওরকমে বোট-ডেকে উঠে এল। সাবেং এল। টিন্ডালরা এল। সব জাহাজিরা জড়ো হল বোট-ডেকে। অবাক হয়ে দেখল দুটো পাখি। দুটো চড়াই। অনুত্তম তাদের সঙ্গে গল্প করছে।

চড়াইদুটোকে পরম বিস্ময় নিয়ে দেখল নাবিকেরা। পাখিদুটো এখন লাইফবোটের কার্নিসে গা ঝাড়ছে। মেজ-মালোম সবাইকে ঠেলে সামনে গেলেন। তিনিও পাখিদুটোকে সমুদ্র-জীবনেব নিঃসঙ্গ দুনিয়ায় পরম বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন। বললেন, ইউ আর মাই গেস্ট।

ক'টুকরো আপেল তিনি কাগজেব উপর রেখে শিস দিয়ে ডাকলেন, কাম অন। গেট ইয়োৎ ফুড অ্যান্ড মেক ফ্রেন্ডশিপ।

ছয়

একটি মেয়ে-চড়াই, একটা পুরুষ-চড়াই। একটি মেয়ে-জগৎ, একটি পুরুষ-জগৎ। সুতরাং দু'দিনের মধ্যেই জমে উঠল আলাপ। অন্তরঙ্গতা ঘনিয়ে এল সকলেব, বাড়ল আন্তবিকতা পাখিদুটোর সঙ্গে। কফিনে ঢাকা মৃতদেহের মতো নির্জীব জাহাজ-ডেকে মিসেস স্প্যারো পৃথিবীব মেয়ে-জগৎ হতে দুটো বক্তঠোঁটের উজ্জ্বল জীবন নিয়ে এল। মিস্টাবও আছেন। শিস দিয়ে স্প্যাবো দুটোকে নাচানো হয়। অনুত্তম শিস দিতে জানে ভাল। মেয়ে-চড়াইটাকে নিয়ে সে সমস্তটা বিকেল পড়ে থাকে।

জাহাজ তখন কেপ-অফ-গুডের পাশাপাশি।

পববর্তী সকালে জাহাজিবা দেখবে সূর্য উঠছে আটলান্টিক মহাসাগবে। আকাশ পর্যন্ত কাঁপছে সমুদ্রেব উত্তাল তবঙ্গে। জাহাজটা তখন কাঁপবে। ফোকশালে ঢুকে কিচমিচ কান্না তুলবে পাখিদুটো।

শীতেব বিকেল। বালিচবের মতো সমুদ্র নীরব। তিতিব পাখির কান্নাব মতো জাহাজিরা আবাব অন্য বন্দরেব জন্য অপেক্ষা কবছে। অপেক্ষা অনুত্তমেরও। বিকেলে গেছে সে ডেক-এ। বর্ষার ফড়িং ধবাব মতো মেয়ে-চড়াইটার পিছনে লেগেছে। পাখিদুটোকে সমস্ত ডেক জুড়ে উড়িয়ে বেড়াল। শিস দিল। খাবাব দিল। পুরুষ-চড়াইটা অনুত্তমকে এখনও ভয় পায়। তাই পুরুষ-চড়াইটা উড়ে গেলে মেয়ে-চড়াইটাও পিছন পিছন ওড়ে। অনুত্তম আকাশমুখো হয়ে থাকে তখন। বাতাসে পাখিদুটোব দোল খাওয়া দেখে। পড়শিকে মনে হয় তখন। পড়শিব ঠোঁটদুটো মেয়ে-চড়াইটাব মতো যেন লাল। লজ্জা পেলে আরক্তিম হয়। অনেকদিন ঠোঁটদুটোকে রক্তাক্ত করতে চেয়েছে। পারেনি। পাববে না। লজ্জায় নয়, সংকোচে নয়, ভয়ে। পাখিদুটো এখনও ডেকের উপব উড়ছে, উড়ুক, এই পর্যন্ত ভেবে অনুপম আকাশমুখো হতে ডেকমুখো হল।

পোর্ট-হোলে ক্যাপ্টেনের মুখ। তিনি অপলক দেখছেন। তিনিও ভাবছেন, পাখিদুটো উড়ছে, উড়ুক। নীবস ডেক-এ জীবনকে খুঁজে পাক।

মেজ-মালোমেব এখন ওয়াচ। ব্রিজে তিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন। নজর ওব ডেকেব উপব। অনুত্তম পাখিদের পেছনে লেগেছে। ওর চোখেব উপর চড়াইদুটো। ওরা উড়ছে, পাখিদুটো উড়ুক।

সন্ধ্যার সময় মেজ-মালোম বোট-ডেকে বসে মিসেস স্প্যারোকে ডেকেছেন। ওবা বোট-ডেকেব উপব দিয়ে উড়ে গেল। মেজ-মালোম বললেন, এসো, বসো। তামাশা দেখাও। তোমবা আমাদেব বন্ধু। জাহাজে যখন দৈবাৎ এসে গেছ, তখন দু' দণ্ডের আলাপ তো করতেই হবে।

মিসেস স্প্যারো স্কাইলাইটের উপর বসে এবাবও গা ঝাড়ল। মেজ মালোম খুব সন্তর্পণে হেঁটে গেলেন। পাখিটা উড়ে গেল। মাথার উপর পাক দিয়ে পাখিদুটো উড়ছে।

অনুত্তম বোট-ডেক ধরে উঠে গেল। সে বিষণ্ণ। চুপচাপ ফানেলের গুঁড়িতে স্টোক-হোলডে নামার জন্য বসল। মেজ-মালোম মেসরুম বয়ের কেবিনের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। পাখিদুটো বেলিং-এর উপর চুপচাপ বসে আছে। মেজ-মালোম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাখিদুটোকে দেখছেন। অনুত্তম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মনটাকে দেখল। জাফর আলি বলেছে, সারেঙের ষড়যন্ত্রের কথা। সারেং মেজ-মিস্ত্রির সঙ্গে ক'দিন ধরে কী সব শলা-পরামর্শ আঁটছে। জাফর আলি এলিওয়েয়ের পাশ থেকে শুনে

ফেলেছিল, সাব অনুত্তম ব্যাড, নো গুড সাব, নো গুড জব। মি অর্ডার, হি সায়লেন্ট। হি হোপলেস সাব। মেজ-মিস্ত্রিকে নালিশ দিচ্ছিল।

কাল থেকে অনুত্তমের পরি বদল হবে। পাখিদুটোকে উড়িয়ে যখন সে ক্লান্ত এবং একটু দম নেওয়ার জন্য যখন সে ফল্কার উপর বসে ছিল, সারেং এসে এই সময় বলেছে, তোমার পরি বদল হইল রে অনুত্তম। তুমি কাইল থাইকা মাইজলা-মিস্ত্রির ওয়াচে কয়লা ফেলবা।

ওয়াচ বদল হল, পরি বদল হয়েছে। বাংলা পাঁচের মতো যে মানুষের মুখটা, সে হয়তো এবার থেকে রোজ বাংকারে এসে দু' ঠ্যাং ফাঁক করে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো লাথি এবার মুখে না মেরে পেটে মারবে। হাত দুটো খুব শক্ত-শক্ত মনে হল। স্টেনসান ধরে হাতের শক্তি পরীক্ষা করল অনুত্তম। তারপর আস্তে আস্তে সে সিঁড়ি ধরে পাখিদুটোর উজ্জ্বল জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেল। শিস দিল। একটা কবিতা আবৃত্তি করল।

ভোরের বেলা সমুদ্র তার রং পালটাল। ঢং বদলাল। সমুদ্র গভীর নীল। ঢেউগুলোর ভিতর কালো কালো অন্ধকার যেন। আকাশ চিরে মেঘের টুকরোগুলি ক্রমশ নেমে আসছে। উড়ুক্কু মাছগুলো বর্শা-ফলকের মতো ছুটছে দিগন্তের দিকে। জাহাজ ওঠা-নামা করছে ভয়ানক। হিবিং লাইন বাঁধা আছে ডেকের উপর। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো আছড়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কায় গাড়িটা উল্টে গেল একবার। আবার পড়ল। অনুত্তম এবার গাড়ির হাতল দুটো শক্ত করে ধরেছে। এবার পড়লে হাত-পা ভেঙে জাহাজে খোঁড়া হয়ে থাকবে। এমনকী তার প্রাণসংশয়ও হতে পারে। সারেং সাবের ষড়যন্ত্র। সারেং এবং মেজ-মিস্ত্রির নির্দেশ, ঝড়ের ভিতরও খোলা ডেকের কয়লা যেন টানা হয়। ঝড়, টাইফুনে খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ভেসে গেলে, যাবে। জাহাজে কাজ করলে কত দুর্ঘটনারই তো শিকার হতে হয়। কে কাকে ধবে? ছাপোষা কোল-বয়দেব এত ঘাড় বাঁকা হবে কেন!

মেজ-মিস্ত্রি ভয়ানক চটে গেছেন।

সমুদ্রের জলে ভিজে ভিজে অনুত্তম প্রচণ্ড শীতে থর থর কবে কাঁপছিল।

ওপাশের ডেক-এ কাজ করছে জব্বর। সে খিস্তি করছে মেজ-মিস্ত্রিকে। বার বার ডেকের উপর তার কয়লার গাড়ি উল্টে পড়ে যাচ্ছে। আছাড় খাচ্ছে সে। অনুত্তমকে উদ্দেশ করে বলল, আরে ব্যানার্জি, আমলদার যদি মেইন্দামুইখ্যা হয় তবে জাহাজের দুঃখ আর রাখনের জায়গা নাই।

অনুত্তম নীরব ছিল। ভয়ে সে কিছু বলছে না। সমুদ্রেব বিশাল সব ঢেউ ডেক ভাসিয়ে নিচ্ছে বারবার।

জব্বর নিজেই যেন জবাব দিল, ডেকের উপর কয়লা নিতে এই পয়লা দেখলামরে ব। পানিতে জামাকাপড় ভিজা কী হইছে একবার মাইজলা-সাব হুমুন্দিরপো আইসা চোখ মেইলা দেখুক!

কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ খুব বেগে নেমে আসছে। ওদের মুখ ভিজছে নোনা জলের ঝাপটায়। চোখ নাক মুখ জ্বলছে!

অনুত্তম পাতলুনের নোনা-জলগুলি কেঁচে ফেলল। সারেং সাব ত্যারচা চোখ মেরে হিবিং লাইনে ঝুলে ডেক পার হলেন।

কী রে ব? কাজ করতে কষ্ট লাগে বুঝি।

জব্বর মিঞাকে উদ্দেশ করে কথাটা যেন বললেন তিনি। ঝড়ের জন্য গঙ্গাবাজুতে জাহাজটা এত বেশি ঝুঁকেছিল যে, আর-একটু হলে অনুত্তম এবং সারেং দু'জনেই সমুদ্রে ছিটকে পড়ত। সারেং সাব বুদ্ধি করে ডেকের উপর শুয়ে পড়েছেন। অনুত্তম দৈবের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে গাড়ির হাতল ধরে ঝুলেছিল।

জব্বর মিঞা এখন ঠক ঠক করে শীতে কাঁপছে। ডেকের উপর হাঁটু-তক নোনাপানি জমেছে। গঙ্গাবাজু যমুনাবাজুতে জাহাজ ওঠা-নামা করছে বলে কিছুটা জল নেমে গেছে এখন। নোনাপানির ভিতর দিয়েই ওরা গাড়ি দুটোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শীতে হাত দুটো ঠান্ডা, অবশ। গাড়িব হাতল শক্ত করে ধরতে না পারায় গাড়ি ওরা ঠিক টানতে পারছে না। কয়লা শাবলে ঠিক তুলতে পারছে না। ওরা কেবল জলের ভিতর উল্টে পড়ছে। জব্বর মিঞা ফোলা পেটে হাত বুলিয়ে শুধু বলল, আল্লা রে, একটা অসুখ দে না রে আল্লা! জ্বর, সর্দি, কাশি যা হয় কিছু একটা! মক্তিদের মতো প্যাট ফুলি মরি না

ক্যান রে! তুই কি নাই রে আল্লা! হমুন্দির পো মাইজলা মিস্তিরির ঘাড়টা চাবাইয়া খাইতে পারস না তুই!

অনেক কষ্টে এ কথাগুলি বলল জব্বর। বয়লারের প্রচণ্ড গরম ভোগ করে ডেকের উপর কনকনে শীতটায় সে ভেঙে পড়েছে। এখানে ঝড় বেশি। দেওয়ানি বেশি। ঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্রের জলে ওরা ভিজছে। চোখ-মুখ জ্বালা করে বলে হাতড়ে হাতড়ে শাবলটা বের করতে হয়। শ্বাস টানতে কষ্ট হয় বলে হিবিং লাইনে ঝুলে ওরা উপুড় হয়ে থাকে।

ডেক-ভাণ্ডারির গ্যালিতে জড়ো হয়েছে সব জাহাজিরা। ঝড়েব ভিতব অনুত্তম, জব্বরকে কয়লা টানতে দেখে আফসোস করছে তারা। মেজ-মিস্ত্রি কি মানুষ না! দুটো মানুষকে এমনভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে! ঝড়-জলে মানুষগুলো তো মরবে! সারেং সাবের কি চোখ নাই গ! বাংকারে কয়লা থাকতে এ ঝড়ে ডেকের কয়লা ওদের ফেলতে হচ্ছে! কয়লায়ালাদেব সুখ-দুঃখ না বুঝলে তোবা আমলদাবরা কী কবতে আছিস?

মাজেদ বলল, তোমবা তো জানো না মিঞা! এটা সারেং সাবেরই শলা-পরামর্শ। ওরা দু'জন মিলে অনুত্তমকে মেবে ফেলার ব্যবস্থা করছে। সবাই যদি এর বিরুদ্ধে না দাঁড়াও তবে ব্যানার্জি নির্ঘাত মারা যাবে জাহাজে।

জাফব বলল, ইঞ্জিন-খালাসিদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

আর-একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজে। সমুদ্রের ঝড় ক্রমশ যেন বাড়ছে। ডেকের উপর দিয়ে ঢেউটা চলে যাওয়াব সময় সে এবং গাড়িটা দুই-ই গড়িয়ে পড়ল নীচে। সে এখন উঠতে চেষ্টা কবছে জলের নীচ থেকে। কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল জলেব উপর। প্রচণ্ড শীতে সে আর দাঁড়াতে পাবছে না। ভিজে জামাটা খুলতে চাইল শরীর থেকে। গ্যালি থেকে জাহাজিরা চিৎকার করল, খুলিস না অনুত্তম। তবে ঠান্ডা লেগে নির্ঘাত মরে যাবি।

ঝোড়ো হাওয়াব জন্য কথাগুলি অস্পষ্ট। সে আরও সামনে এগিয়ে গেল। কথাগুলো শুনল এবং কযলার স্তূপকে দেখল। সে দাঁড়াতে পাবছে না। টলছে। ডেক-জাহাজিদেব সমবেদনায় তার দু'চোখ ভিজে উঠল।

সমুদ্র ফুঁসছে। মিসেস স্প্যাবো জাহাজেব কোন অন্তরালে লুকিয়ে আছে কে জানে। যদি না থাকে ঝড়ে সেও উড়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সে গাড়ি, শাবল ফেলে বোট-ডেকে ছুটল। পাখিদুটো ওব মতোই অসহায় জাহাজে।

অনুত্তম বোট-ডেকে এসে শিস দিল। বলল, তোমরা গেলে কই গো?

তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। বোট-ডেকের কোথাও পাখিদুটো চুপ কবে বসে নেই। ঝোড়ো হাওয়াটা প্রতিধ্বনি করে হাসছে। দূরেব ঢেউগুলো অনেকগুলো সাপের মতো কিলবিল করে উঠল। অনুত্তম এবাব জোর গলায় ডাকল, মিসেস, মিস্টাব, তোমবা উত্তর দাও। কোথায় আছ বলো? আমি এখানে রয়েছি। তোমরা আমার কাছে এসো। আমার ঘরে চলো। শিস দিয়ে দিয়ে সে সামনেব ডেকে নামল। কেউ কোনও উত্তর দিল না। কিচমিচ কবে বলল না, আমরা এখানটায় আছি।

ব্যানার্জি, গেট ব্যাক টু ইয়োর জব।— একটি দৃঢ় কণ্ঠেব জবাব। অনুত্তম ভয়ে পিছনে তাকাতে পারছে না। বাংলা পাঁচের মতো মুখটা প্রতীক্ষা করছে।

চারটা-আটটার পরিদারদের শেষ ঘন্টি পড়ল। ওদের ওয়াচ শেষ।

অনুত্তম বলল, আই হ্যাভ ফিনিশড মাই জব স্যার।

স্টিল ইউ হ্যাভ. আই থিংক! কাম অ্যালং।— ওরা দু'জনে এগিয়ে গেল। বোট-ডেকে উঠল। সিঁড়ি ধরে স্টোক-হোলডে নামল। মেজ-মিস্ত্রি বয়লারের নীচে টর্চ মেরে বললেন, ট্যাংক-টপ হাম ক্লিন মাংতা।

ঘাড়টা কাত করে বললেন, ইউ উইল ডু ইট। এভরি ডে অ্যান্ড ইন এভরি ওয়াচ।

হাও লং আই শ্যাল হ্যাভ টু ওয়ার্ক হিয়ার?

সাট আপ ইউ হেল। আই অ্যাম ইওর বস, রিমেম্বার!

অনুত্তম আর কোনও কথা বলল না। সে একটা বালতি ও খুরপি নিয়ে বয়লারগুলোর নীচে নেমে

গেল। ডেকের বিক্ষুব্ধ ঝড়, বয়লারের প্রচণ্ড গরমে ওর মুখ ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে। মুখটা মনে হল ঝলসে যাবে। সে বয়লারের নীচ থেকে উঠে কশপের কাছ থেকে একটা পাটের থলে চেয়ে নিল। থলেটা মাথায় মুখে প্যাঁচ দিয়ে নীচে নেমে গেল আবার। খুরপি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে ছাই তোলার সময় সে বুঝতে পারল দু'ঘণ্টা করে প্রতি পরিতে বেশি করে খাটলে চার থেকে পাঁচ মাস লাগবে ছাইগুলো নীচ থেকে তুলে উপরে হাপিজ করতে। খুরপি দিয়ে ছাই তুলে যখন বালতি ভরছিল তখন দেখল জামা আর পাতলুন থেকে জলটা বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

মেজ-মিস্ত্রি দু' ঘণ্টার পর এক সময় নীচে নেমে এসেছেন। বয়লারের নীচে টর্চ মেরে দেখেছেন, অনুত্তম কী করছে। ওকে তখনও কাজ করতে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। বলে পাঠিয়েছেন তেলয়ালাকে দিয়ে, ওকে এবার যেতে বল।

প্রচণ্ড উত্তাপে অনুত্তম তখন ভীষণভাবে ঘামছিল। তাকে যেতে বলা হয়েছে, সে খুশি হল। ইঞ্জিন-রুম ধরে সিঁড়ি ধরে উপবে উঠার সময় আবার মনে হল পাখিদুটোর কথা। ওরা কোথায়, কী করছে! কিন্তু সমুদ্রের মতো এক বিশাল ক্লান্তিতে সে অবসন্ন। মেজ-মালোম এখন ঘুমোচ্ছেন। ওর কেবিনে একবার খোঁজ করতে হবে। ইঞ্জিন-রুমের বালকেড ধরে সে এল। বোট-ডেকে মেজ-মালোমেব কেবিন। সিঁড়ি দিয়ে বোট-ডেকে উঠতে হবে।

একটি শব্দ প্রথম। দুটো শব্দ হল। এবার একসঙ্গে অনেকগুলো শব্দ। কিচমিচ আওয়াজ। সিঁড়ির নীচে একজস্ট-পাইপ। তার পাশে দুটো পাখি পাশাপাশি। একজস্ট-পাইপ থেকে উত্তাপ নিচ্ছে তাবা। ঝড়-জল থেকে আড়াল নিয়েছে। অনুত্তমকে দেখে এখন কিচমিচ কবে উঠল।

অনুত্তম ওদেব পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। পাখিদুটো উড়ল না। সে ধমক দিল, হয়েছে বাবা, অনেক হয়েছে। এবার থামো তো বাপু। খুব তো ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে?

পাখিদুটো কিচমিচ করে ঠোঁট মেলাল।

অনুত্তম বলল ফের, বেশ আছ তোমরা!

শেষে সে অনেকক্ষণ পাখিদুটোকে দেখল। চেয়ে থাকল ওদের দুটো ঠোঁটেব দিকে। বসে বসে অনেক ক'বার বিশ্লেষণ কবল জীবনের প্রয়োজনেব তাগিদে পাখিদুটোব সমৃদ্ধিব কাছে তাদের জাহাজি-জীবন খুব বেশি হার মেনেছে।

এদিকে-ওদিকে চেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াল পাখিদুটো।

মিসেস স্প্যারোব ঘব নেই। কথাটা ভাবল অনুত্তম ফোকশালে ঢুকে।

দিন দুই পরে খবর পেল অনুত্তম, মিসেস স্প্যারো শীতে কাঁপছে। মেজ-মালোম অনেক সাধাসাধি কবেছেন ওর ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মিসেস স্প্যারো অসম্মতি জানিয়েছে। মেজ-মালোমকে দেখে বোটের উপব থেকে উড়ে গিয়ে স্কাইলাইটে বসেছে। মিস্টার তো বেচারা! মিসেসকে ফেলে সে যেতে পাবছে না। সুতরাং একটা ঘর চাই।

ঘব ওদের করতে হবে। অনুত্তম এই ভেবে ডেক-এ উঠে গেল। আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রেব ঢেউ নেই। শান্ত। প্রপেলারটা গঙ্গার মোহনার মতো শব্দ কবছে এখন। শীতের বিকেল। জাহাজটা ইকোয়েডরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। শীতের দিনগুলি বড় হয়ে আসছে ক্রমশ। আরও বড হবে।

সেই শীতের বিকেলে অনুত্তম দেখল বোট-ডেকে জাহাজের সব অফিসাররা গোল হয়ে বসেছে। মেজ-মালোম ব্রিজে ছিলেন, তিনিও এসে ওদের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। সাহেববা খানা-পিনা করছেন। মিসেস স্প্যারো ওদের মাথার উপর উড়ছে। তারা মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন পাখিটাকে। ক্যাপ্টেন হাসির কথা বলছেন। ওরা অনেক হাসি-ঠাট্টা করল। মেজ-মিস্ত্রি সবচেয়ে বেশি মিসেসকে নিয়ে বেয়াদপি করছে। বেয়াদপ! অনুত্তম লাইফ-বোটের আড়ালে বসে সব শুনছিল। বিরক্ত হয়ে সে নেমে গেল। কশপকে ডেকে বলল, চাচা, একটা কাঠের বাক্স দিতে পারেন?

কী হবে বাক্স দিয়ে?

মেয়ে-চড়াইটার জন্য ঘর করব। শীতে ওদের খুব কষ্ট। রাতে ভাল ঘুম হয় না। তার উপর সাহেবদের যন্ত্রণা তো আছেই।

মনে মনে অনুত্তমও একটি ষড়যন্ত্র করে ফেলল। পাখিদুটোর সঙ্গে মেজ-মিস্ত্রির আলাপ মোটেও ওর পছন্দ নয়। মেজ-মিস্ত্রির সব কথাগুলো ওর বেয়াদপি বোধ হয়েছে। ভাবল মেজ-মালোমকে মেজ-মিস্ত্রি সম্বন্ধে নালিশ দেবে। প্রত্যেকের একটা মান-সম্ভ্রম আছে। মেজ-মালোম নিশ্চয়ই মেজ-মিস্ত্রিকে শাসিয়ে দেবেন।

মিসেস স্প্যারোর জন্য ঘর করবে, মেয়ে-চড়াইটা পুরুষ-চড়াইটার সঙ্গে থাকবে, সুখে থাকবে, স্বচ্ছন্দে থাকবে। বোট-ডেক থেকে গলুইতে নিয়ে যাবে পাখিদুটোকে। তখন টের পাবে মেজ-মিস্ত্রি কত ধানে কত চাল হয়। কত দুঃখে কত বিদ্রোহ হয়। মেজ মিস্ত্রি আস্তে আস্তে সব টের পাবে। দাঁতে দাঁত চাপল অনুত্তম। ষড়যন্ত্রটা খুব পাকাপোক্ত, টের পাবে না, কাজ হাসিল হবে। বোট ডেকে বসে পাখিদুটোর সঙ্গে হাসি-মশকরায় আর মশগুল হতে হবে না। মেজ-মিস্ত্রি এবার নীরস ডক-এ আকাশের নক্ষত্রগুলোর কড়িকাঠ গুনবেন। মনে মনে খুব হেসে নিল অনুত্তম।

অনুত্তম কশপের কাছ থেকে একটি ছোট কাঠের বাক্স সংগ্রহ করল। কিছু খড়কুটো, বাটালি, হাতুড়ি, পেরেক নিয়ে গলুইয়ের এক কোনায় বসে ঠুক ঠুক করে ছাই অন্ধকারে ঘরটি তৈরি করে আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াল কিছুক্ষণ। হরিদাস সেনকে ডেকে বলল, দাদা আসুন, দেখে যান।

সকলকে সে ঘরটা দেখাল। ডেকে জাহাজিদের দেখাল। ভাণ্ডারিকে দেখাল। ইঞ্জিন-খালাসিদের ফোকশালে ঢুকে বলল, চাচা, দেখেন তো মেয়ে-চড়াইটার ঘরটা কেমন হল? এখানটায় ওরা শোবে, এখানটায় ওরা বসবে। এটা দরজা, এই পথ দিয়ে বের হয়ে আকাশে উড়বে। বোট ডেকে যেতে ওদের বারণ করব। মেজ মিস্ত্রির ট্যারা-চোখ মেয়ে-চড়াইটার পছন্দ নয়।

জাহাজিরা খুশি হল। খুশি হল এই ভেবে মেয়ে-চড়াইটা ওদের গলুইতে চলে আসছে। বোট-ডেকে আর ফুর ফুর করে উড়ছে না। গলুইতে উড়বে। ওরা তখন গল্প করবে খোশ-মেজাজে। ছোট টিন্ডাল সোনালি দাঁত দুটো বের করে হাসল। কলম্বোতে বিবির খত আসেনি, ডারবানে সে খতের জবাব দেয়নি, আমেরিকার বন্দরে খতের জবাব নিশ্চয়ই আসবে। তখন জবাব দেবে দুটো লাইনে—আমাদের জাহাজে একটা মেয়ে চড়াই এসেছে। ওকে নিয়েই আমরা সকলে পড়ে থাকি। কিন্তু বিবি, তার চিঠি না পেলে মনটা কেমন করে।

অনুত্তম ভাবল সারেংকে ডেকে বলা যাক, দেখুন চাচা, আমার হাতে কী। আপনি আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে পারেন কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই। মেয়ে চড়াইটার জন্য ঘর করতে পেরে আজ আমার খুব আনন্দ। আপনার সঙ্গে আজ আবার কথা বলব।

সে চুপচাপ দাঁড়াল সারেঙের দরজাটার পাশে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ আজও। তিনি সুর ধরে কোরানশরিফ পাঠ করছেন রোজকার মতো। আয়াতের শব্দগুলো কান্নার শোকচিহ্ন হয়ে গলে পড়ল বাইরে। অনুত্তম হাত রাখল দরজার উপর আস্তে আস্তে। ডাকল, চাচা, ও চাচা।

কে।— ভিতর থেকে আওয়াজ এল।

আমি চাচা, আমি অনুত্তম। দরজা খুলে দেখুন কী এনেছি।

সারেং ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন। অনুত্তমকে দরজার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আয় ভিতরে আয়।

অনুত্তম ভিতরে সংক্ষিপ্ত পা ফেলে বলল, হাতে এটা কী বলুন তো?

কাঠের বাক্স।

না, ঠিক হল না। চড়াইটার ঘর। এবার থেকে চড়াই দুটো এই ঘরে থাকবে। শীতে ওদের খুব কষ্ট। একটু থেমে বলল অনুত্তম, ভাল হয়েছে না ঘরটা? এই ঘর পেয়ে ওরা খুশি হবে তো।

সারেং সাব মাথা তুলে বললেন, খুশি হবে।

গ্যালির কাছে এসে ভাবল অনুত্তম মেজ মালোম ভাল লোক। পাখিদুটোর শীতের দুঃখ তিনি বুঝবেন। গলুইতে পাখিদুটোকে নিয়ে এলে তিনি রাগ করবেন না। দু' দণ্ডের আলাপ যদি করতে হয় মেজ-মালোম গলুইতে এসে করবেন। গলুইয়ে এবার থেকে মজলিশ বসবে, সে মজলিশে বসবে, সে মজলিশে নিশ্চয়ই ভিড়বেন তিনি।

অনুত্তম খুব সন্তর্পণে টুইন-ডেক ধরে হেঁটে গেল। সে প্রথমবারের মতো উঠে এল দু' নম্বর ফলকার

পাশে এবং উঁকি দিল গোড়ালি তুলে। স্পষ্ট দেখতে পেল একজস্ট পাইপের উত্তরে পাখিদুটো চুপচাপ বসে রয়েছে। বোট-ডেকে উঠবার পথে মেজ-মিস্ত্রি আবার দেখে ফেলছে কি না। কিন্তু এলিওয়ে খালি। মেসরুমমেট ডাইনিং হলের দিকে যাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে পাখিদুটোর পাশে কাঠের বাক্সটা নামিয়ে রাখল অনুত্তম। কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো ভিতবে ছড়িয়ে আর-একটু দূরে যেয়ে সে বসল। শিস দিল জোরে জোরে। বলল, তোমাদের জন্য ঘর করেছি। ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে এত কী দেখছ, ঘরটা দ্যাখো। এত কষ্ট করে করলাম অথচ ঘর দেখে খুশি হলে না। কিচ কিচ করলে না একবার! ভিতরে খাবার দেওয়া আছে, খিদে পেলে খাবে। যদি না খাও তবে আমরা সবাই রাগ করব।

অনুত্তম এসে এবার রেলিংয়ের উপর ভর করে দাঁড়াল। সামনের অন্ধকারটা নিকষ কালো। এখানে রাতের অন্ধকার সমুদ্রের অতল স্পর্শ করেছে। সে চোখ বুজল। প্রাণীজগতের সবগুলো চেনা-অচেনা মুখ এসে ওর চোখের উপর এক-এক করে ভিড় করতে আরম্ভ করছে। এখান থেকে মিসিসিপি অনেক দূর। আর অনেক অন্ধকার এই পথটার উপর শুয়ে আছে। সমুদ্রের এই যে অন্ধকার, এই যে নীরবতা, জাহাজ আর জাহাজিরা, পাখিদুটো মিলে এক বিরাট অখণ্ডতা। এক বিরাট বিস্ময়। প্রাণীজগতের সব চেনা-অচেনা মুখ এবং হৃদয়গুলোকে, পাখিদুটোব ভালবাসার হৃদয় দিয়ে সে অনুভব করতে চাইল। পড়শির মুখ জানালার কাছে, আকাশ থেকে শেষ রাতের নক্ষত্রটা জানালার আরও কাছে গিয়ে থেমেছে, ওরা দু'জন হয়তো জানালায় আরও সংলগ্ন, আরও মুখোমুখি। পড়শি হয়তো শুধু শেষ রাতের নক্ষত্রটাকে দেখছে এখন।

পকেট থেকে চিঠিটি বেব কবে অন্যান্য বাতের মতো আজ শেষবার তারিখ মিলিয়ে নিল অনুত্তম। আজ সেই দিন। আজ সেই রাত। যে দুঃখ ভুলে থাকার জন্য সে এতদিন পাখিদুটোকে ডেকের উপব উড়িয়ে বেড়িয়েছে আজ সেই দুঃখের রাত। পড়শির ঘরে সানাই বাজছে। ডারবানে পাওয়া চিঠিতে মা'র নরম হৃদয়ের শেষ দুটো লাইন— অনু, মিতুব বিয়ে হবে। তুমি দুঃখ পেয়ো না।

জাহাজি-মানুষের আবার দুঃখ! সে সমুদ্রের বিশাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হেসেছিল। এই সময়ে ওর চোখদুটোয় জল নেমেছে। চোখের অস্পষ্ট অন্ধকারে ক্রমশ মিতুর মুখটা মেয়ে-চড়াইটার মতো হতে থাকে। সে চোখেব জল মুছে ফেলল। এবার দেখল মিতু চড়াই হয়ে গেছে এবং শেষরাতে যে নক্ষত্রটা উঠবে তার চারিদিকে ফুর ফুর করে উড়ছে।

সাত

নীল ঢেউয়ের মাথায় সোনালি রোদের চুমকি। সমুদ্রে জলতবঙ্গ আওযাজ। আকাশেব কোনও এক প্রত্যন্তে শুধু একটুকরো ভেড়ার লোমের মতো সাদা মেঘ। কোনও এক সকালে বৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না। সমুদ্রের উত্তাপ বাড়ছে। জাহাজের উত্তাপে উত্তপ্ত হচ্ছে জাহাজিরা।

মাজেদ বলল, তোমরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।

জাফর আলি বলল, আজ অনুত্তমের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কাল আমার ঘাড়ে চাপবে।

মকবুল হোসেন বলল, আমলদারদের গলা টিপে মার। ওদের চোখ নেই, ওরা দেখতে পায় না। সারেং কোন বুদ্ধিতে অনুত্তমের বিরুদ্ধে নালিশ দিতে গেল।

অনুত্তমের ফোকশালে আজ অনেকগুলো জাহাজি একসঙ্গে বসে একটা ফয়সালা করতে চাইছে। চালু জাহাজে মেজ-মিস্ত্রির এই বেয়াদবিকে ওবা অগ্রাহ্য করতে চায়। সমুদ্রের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে জাহাজেব উত্তাপ বাড়ছে। ইকোয়েডরের উপরে জাহাজ। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কোনও প্রবালদ্বীপকে দেখতে গেলে পায়ে এখন ছেঁকা লাগে। ফোকশালে-ফোকশালে প্রচণ্ড গরম। কিন্তু অনুত্তমকে আরও নীচে নামতে হয়। বয়লারগুলোর তলায় বসে বস্তার উপর বস্তা শরীরে চাপিয়ে কাজ করার সময় সৈঁকারুটির উত্তাপে সে মৃত্যুর মতো কঠিন হয়, দাঁতে দাঁত চাপে সে। মেজ-মিস্ত্রি তাকে খুন করতে চায়। বয়লারের নীচ থেকে উঠে আসার সময় তাকে পাগলের মতো লাগে। চোখদুটি খুনি রক্তে লাল। মরবে মরবে ভাব। পাগলের মতোই সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ছুটবে। ইঞ্জিন-রুমের দরজা পার হলেই

ফলকা। ফলকার উপর চিত হয়ে অনুত্তম হাত-পা ছুঁড়ে বলবে, মাজেদ আমি টানতে পারছি না। হাওয়া নেই। তোরা আমায় ধর।

তবু তোদের দয়া হয় না!—মাজেদ উত্তেজিতভাবে ফোকশালে পায়চারি করছে।

তবু তোরা মাস্টার দিতে ভয় পাস। তোরা মানুষ না। জাহাজি বলে তোরা সব কুকুর পাঁঠা।

হরিদাস সেন চুপ করে বসে আছে। সে জানে জাহাজিরা সবই কুকুর পাঁঠা। জাহাজি মানুষগুলো বিদ্রোহ করতে জানে না। জাহাজ-জীবনের বিচিত্র সব গল্প সে শুনেছে। কিছু কিছু সে নিজেও দেখেছে। বিদ্রোহের শেষে অধিকাংশ জাহাজিরা ভাল সেজে কাপ্তেনকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, স্যার, আমরা তো কিছু করতে চাইনি, ওই লোকটাই আমাদের খেপিয়ে তুলেছে। তারপর সে লোকটির যা হবার তাই হয়। জাহাজের মা-বাপ ক্যাপ্টেন। তিনি বিচার করে ওকে লক করতে পাবেন। কিনারায় তাকে নির্বাসনও দিতে পারেন। বন্দরের কোর্টে বিচার হয়ে ওর ফাঁসির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। সবকিছুই সেই মা-বাপের ইচ্ছা। হরিদাস সেন তাই কথাগুলো না-শুনি, না-শুনি করে একটা সিগারেট টানছে।

সিগারেটের ধুয়োটা ফোকশালে পাক খেল। জাহাজি মানুষগুলোর নিশ্বাসকে স্তব্ধ করে দিয়ে সিগারেটের ধুয়োটা উপরে উঠল। ধাক্কা খেল ছাদে। নীচে তারা আবার গড়িয়ে গেল। বিড়ির ধুয়োগুলো মিশে গেল তার সঙ্গে। ফোকশালে আবার একটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার। জাহাজি মানুষগুলোর মুখ অস্পষ্ট। অনুত্তম নিজের শরীরটা বাংক থেকে টেনে তুলতে পারছে না। অত্যন্ত গরমে হাত-পা'র রক্তপ্রবাহ থেমে যেতে চাইছে। ঝির ঝির করছে সমস্ত শরীর। হাড়ের ভিতর মজ্জাগুলো হয়তো গলে গেছে বিশীর্ণ উত্তাপে। শরীরটা দিন দিন শীর্ণ হয়ে উঠছে।

সব জাহাজিরা মিলে ফোকশালে যখন মশগুল হচ্ছিল অনুত্তম তখন ডেক-এ উঠেছে চুপিচুপি। গ্যালি পার হয়ে ফলকা পার হয়েছে। গোড়ালি তুলে দূর থেকে খুঁজছে পাখিদুটোকে। আজ পর্যন্ত পাখিদুটো ওর তৈরি করা ঘরটায় আশ্রয় নিল না। কাঠের বাক্সটার ভিতর যে বিস্কুটের গুঁড়ো কিংবা মাংসের কুচি দেওয়া থাকে সেগুলো দিনের পর দিন নষ্ট হচ্ছে। মাত্র একদিন দেখেছে পাখিদুটোকে কাঠের বাক্সটার উপর বসতে। সে তখন কত রকমের শিস দিয়েছে। এখন তো আবার গরমই পড়ে গেল। মেয়ে-চড়াইটা আবার ফুর ফুর করে উড়ছে।

সমুদ্রের উত্তাপে এবং জাহাজের উত্তাপে সে উত্তপ্ত। তার উপর পাখিদুটো দিনের পর দিন বেইমানি করছে। তবু প্রতিদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কতরকমের শিস দিয়ে বুঝিয়েছে, এ ঘর তোমার, তোমাদের। পুরুষ-চড়াইটাও থাকবে। কোনও ভয় নেই। সব বিপদ আমরা আগলাব। আমরা দেখব। কিন্তু মেয়ে-চড়াইটা এমনি বেইমান, শুধু ঢেউ খেলিয়ে অনুত্তমের মাথার উপর উড়ল। আজও উড়ছে। কিছুতেই কাঠের বাক্সটার ভিতর গিয়ে বসবে না, খাবারগুলো খাবে না।

চোখদুটো বড় করে মেয়ে-চড়াইটাকে শাসাল অনুত্তম, দেব আজ ঘরটাকে ভেঙে। কী বাপু দরকার আমার তুমি জাহাজে থাকলে আর গেলে! মেজ-মিস্ত্রির পয়সা বেশি তো, কাজেই যত বেঢঙের আলাপ সব তোমার ওর সঙ্গে। গলা টিপে মেরে দেব। চিনতে পারবে তখন যেমন ভালবাসি তেমন বিদ্রোহ করি।

আস্তে আস্তে মেয়ে-চড়াইটা নীচে নেমে আসছে।

খুব কাছে আসলে চড়াইটা, অনুত্তম মিষ্টি শিস দিল। পড়শির বাড়ির কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় যে শিসে ওকে সজাগ করত সেই শিস। শিসগুলো অদ্ভুতভাবে আজ মোলায়েম হল। খুব মিষ্টি-মিষ্টি শোনাল। মেয়ে-চড়াইটা তখন উড়ে এসে দুটো পাক খেয়ে ওর মাথার উপর বসে পড়ল। সমুদ্রের নীল ঢেউ, একঘেয়ে জীবন, রাত্রির নিরুত্তাপ আলাপ মনে হল সুন্দর, মনে হল মজলিশি আলাপ। সে আহ্লাদে চিৎকার করে ডাকল, দাদা, ও দাদা, ও মাজেদ, তোরা সবাই আয়, দ্যাখ দ্যাখ কী হল!

মেজ-মিস্ত্রি এলিওয়ে থেকে চুপি দিল সেই সময়।

সবকিছুর সংকীর্ণতা ভুলে অনুত্তম অদ্ভুত আনন্দে বলে উঠল, স্যার, মিসেস স্প্যারো লাভস মি।

কিন্তু মনে হল মেজ-মিস্ত্রির চোখে যেন রুক্ষ দৃষ্টি। সে এবার ঢোক গিলতে থাকল, বলতে থাকল, লাভস মি। নো নো, নট লাভস মি, বাট লাইকস মি।

তারপর সে অপরাধীর মতো চোখদুটো নামিয়ে নিল মেজ-মিস্ত্রির মুখ থেকে।

মেজ-মিস্ত্রি তখনও চোখদুটো কুঁচকে রাখলেন। কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটে উঠছে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন তিনি। একটা পা রাখলেন এলিওয়ে থেকে বের হয়ে আসবার দরজার চৌকাঠে। চড়াইটাকে দেখছেন তিনি। মেয়ে-চড়াইয়ের মাথার লাল দাগটা কলকাতা বন্দরের কোনও কোনও মেয়ের সিঁথির রেখার মতো। মেয়েদের সেই কপালের রক্ত-টিপ আর সিঁথির রক্ত-রেখা ওকে বিচলিত করেছে কতবার। বন্দর-পথে হাঁটতে হাঁটতে কতবার তিনি অন্যমনস্ক হয়েছেন। বলতে চেয়েছেন তিনি কিছু। কিন্তু বলতে পারেননি। চড়াইটার সিঁথিতে রক্ত-রেখা দেখে তিনি কলকাতা বন্দর-পথকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ভুলে থাকতে পারেন।

কিন্তু অনুত্তম...

মেজ-মিস্ত্রি কেবিনে ফিরে গেলেন। অনুত্তম ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, মেজ-মিস্ত্রিকে ফিরে যেতে দেখে ধীরে ধীরে ফলকার পাশ থেকে কাঠের বাক্সটা নিয়ে গলুইয়ের দিকে পা বাড়াল। মেয়ে-চড়াইটা এবং পুরুষ-চড়াইটা আজ উড়ে উড়ে ওর সঙ্গে গলুইতে প্রথম এসেছে। সে কাঠের বাক্সটা গ্যালির দক্ষিণ গঙ্গাবাজুর উইনচ-মেশিনের আড়ালে রেখে বলেছে, তোমাদের ঘর এখানে রাখলাম। বসতে হয় বসো, না হয় কাল নির্ঘাত তোমাদের ঘর ভেঙে দেব। সমুদ্রে ডুবিয়ে দেব সব।

অনুত্তম ফোকশালে নেমে দেখল কেউ নেই। একমাত্র হরিদাস সেন বাংকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বালিশের ভিতর মুখটা ডুবে গেছে বলে অনুত্তম বাংকের রেলিং-এ হাত রেখে ডাকল, দাদা, ও দাদা, মেয়ে-চড়াইটা আজ আমার মাথার উপর এসে বসেছে। ভয়-ডর নেই ওর।

হরিদাস সেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। শেষে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, মেয়ে-জাতটার ভয়-ডর কম। তোর বউদি কী লিখেছে জানিস? লিখেছে আবার যদি সফরে বের হই, তবে নির্ঘাত সে আত্মহত্যা করবে। করুক, আত্মহত্যা করুক! আমি সেজন্য জাহাজে না এসে পারি!

আত্মগতভাবে বলল হরিদাস সেন, পুরুষ জাতের ওপর মেয়ে জাতটার দাবির আর অন্ত নেই।

ফোকশালে-ফোকশালে তখন ফিস ফিস কণ্ঠের আওয়াজ। ফিস ফিস কণ্ঠের আলাপ। হরিদাস সেন নিজের ফোকশালে বসে কিছুই বুঝতে পারছে না। তবু আলাপগুলো যে ভাল আলাপ নয়, বে-তরি জীবনের যে বে-হিসেবি আলাপ, হরিদাস সেন এই বাংকে বসেও তা বুঝতে পারল। সে এসেছিল ফোকশালে একটি সিগারেট প্যাকেট নিতে, বয়লারের ভার দিয়ে এসেছে ছোট-টিন্ডালের উপর। সে একটি সিগারেট পাবার বিনিময়ে বয়লার আগলাচ্ছে। অনুত্তমের বাংকটা খালি। ওর কতকগুলি জামাকাপড় বাংকের উপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। ওর ছ'ঘণ্টা করে ওয়াচ। মেজ-মিস্ত্রি ওকে দিনে ছ'ঘণ্টা, রাতে ছ'ঘণ্টা করে খাটাচ্ছেন, বাঁ দিকের ফোকশালটায় ওর পরিদাররা স্নান-খাওয়া সেরে পরবর্তী বন্দরের গল্প আরম্ভ করেছিল, এখন তারাও ফিস ফিস করে কিছু বলছে। অনুত্তম বয়লারের নীচে খুরপি দিয়ে হয়তো এখনও ছাই খুঁড়ছে। মেজ-মিস্ত্রির এই অত্যাচার দেখে হরিদাস পর্যন্ত ভেঙে পড়ছে।

এক নম্বর পরিদারের ফোকশালে তখনও চুপি চুপি কথার শেষ নেই। হরিদাস সেন ভাবল কোনও গোপনীয় কথা হচ্ছে। পা টিপে টিপে সে বালকেডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফিস ফিস কণ্ঠের সেই আলাপগুলোকে অনেক তরিবত করে শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। শুধু দুটো অতি পরিচিত শব্দ কানে এসে ঠোক্কর খাচ্ছে। ব্যানার্জি, অনুত্তম— একটা খুন-খারাপির আলাপ যেন। বিস্ময়ে হৃৎপিণ্ডটা হরিদাস সেনের ধড়ফড় করে উঠল। কীসের খুন-খারাপি! কেন এই খুন খারাপি!

হরিদাস সেন তর তর করে সিঁড়ি ধরে প্রথম সিঁড়ি ভাঙল। পাশের ঘরটাতে বড়-টিন্ডাল থাকে, একজন তেলওয়ালা থেকে। ওদের মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া নেমেছে। হরিদাস অনেকগুলো বে-খাপ্পা চিন্তায় নিজে কাঁপছিল। এখন ওদের উৎকণ্ঠিত মুখগুলি দেখে নিজেকে আর সংযত করতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, কী হয়েছে জাহাজে! আপনারা সবাই এমন চুপচাপ কেন।

বড়-টিন্ডালের ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। তেলওয়ালা ইমরান চোখদুটো নীচে নামিয়ে বললে, লাই-লোহে-ই-ল্লেলা!

কেউ কিছু বলছে না! সব চুপ! এমন কী ব্যাপার চলেছে জাহাজে! এমন সময় ডেকের উপর চিৎকার শুনতে পেল সে। মজিদ চিৎকার করছে, জাহাজিরা পাঁঠা! পাঁঠা! পাঁঠা! কই? সারেং হারামজাদা কই? ও শালোর গলা টিপে ধরব এখন। শালোকে খুন কবব।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সে বলছে, তোরা কে আছিস আয়।

হরিদাস সেন নীচ থেকেই বুঝতে পারল, ডেকের উপর ওরা ছুটছে। ছুটে ছুটে ওরা ডেক-গ্যালি অতিক্রম করছে। এবার সিঁড়ি ধরে নীচে নামবে। হরিদাস সিঁডিব গোড়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সমুদ্রে দেওয়ানি আছে বলে জাহাজটা বড্ড ওঠা-নামা করছে। সে সিঁড়ির বেলিং-এ ভর করে দাঁড়াল। সকলে সিঁড়ি ধরে নীচে নামছে। সারেঙের দরজা বন্ধ।

হরিদাস সেনকে নীচে পাথরেব মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাজেদ প্রথমে অবাক হল। জাহাজে এমন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে, অথচ সে এখানে। মাজেদ মুখের উপব ঝুঁকে প্রশ্ন করল, তুমি এখানে মিঞা?

হরিদাস সেনের মাথাটা সামনে আরও ঝুঁকে পড়ল, কী হয়েছে মাজেদ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাজেদ হরিদাস সেনের গলা জডিয়ে ধরল। হাউ হাউ করে কাঁদল। বলল, মেজ-মিস্ত্রি অনুত্তমকে মেরে ফেলেছে।

অন্যান্য জাহাজিরা পাশে দাঁডিয়ে হরিদাস সেনের মুখের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু ওব মুখটা দেখতে পুতুলের মতো মনে হল। কাচের পুতুল। মুখ ফ্যাকাসে, বক্ত নেই মনে হচ্ছে। মাজেদ কান্না ভুলে গেছে এতক্ষণে। সে একটা হুংকার ছাড়ল। সে এখন সারেঙের দরজাব উপব হুমড়ি খেয়ে পডেছে। দরজাটা ভাঙবে। দরজাটা সবাই ঠেলছে। সবাই মিলে সারেংকে এখন খুন করবে।

হরিদাস সেন ডাকল, মাজেদ।

মাজেদ দরজা থেকে উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাহাজিবাও উঠে এল। ভিতর থেকে সারেঙের কোনও আওয়াজ পাচ্ছে না।

হরিদাস বলল, ফোকশালে কেউ নেই। সারেং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ব্রিজে গেছেন।

সব জাহাজিবা মিলে ব্রিজেব দিকে ছুটছিল। হরিদাস আবার ডাকল, মাজেদ।

মাজেদ ঘুরে দাঁড়ালে বলল, অনুত্তম কোথায়? কী করে এমন সব হল।

অনুত্তম ইঞ্জিন-রুমে। মেজ-মিস্ত্রি ধাক্কা মেরে প্লেটের উপর ওকে ফেলে দিয়েছে। মাথাটা ফেটে গেছে। নাকে-মুখে রক্ত। জাফর আলি দেখে এল সে চিত হয়ে পড়ে আছে। বড-মালোম, বড়-মিস্ত্রি, বাডিওয়ালা সব ওখানে।

হবিদাস সেন আর কোনও কথা না বলে ওদের সকলকে ডিঙিয়ে ছুটল ইঞ্জিন-রুমে। ওব পিছনে অন্যান্য জাহাজিরা ছুটছে। ডেক থেকে প্রত্যেকে বড় বড় কয়লার চাং হাতে করে নিল। ওরা মেজ-মিস্ত্রিকে ঢিল মেরে খুন করবে। এই দেখে আমলদারবা যে যার মতো ফোকশালে ঢুকে দবজা বন্ধ করে বসে আছে। মেসরুম বয়, ক্যাপ্টেন-বয়, বাটলার দরজা বন্ধ করে পোর্ট-হোলের কাচটা খুলে বেখেছে। উন্মত্ত জাহাজি-মিছিলটাকে ওরা দেখে আল্লার নাম স্মরণ করছে।

মকবুলের হাতে একটা হাতুড়ি ছিল। সে হাওয়ার উপর হাতুড়িটা ঘুরিয়ে বলল, মুখের উপর ঢিল মারবা মিঞারা। মাইজলা সাবেরে ঢিল দিয়া ভূত বানাইবা।

সরীসৃপের মতো আদিম হিংস্রতা ওদের চোখে-মুখে। হাতের কাছে যে যা পেল কুড়িয়ে নিল। ওরা হই হই করতে করতে ইঞ্জিন-রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাঙালি পাঁচ নম্বর সাব দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। যারা আগে এসে দরজায় ভিড় করেছে তাদের তিনি আগলে রেখেছেন। ইঞ্জিন-রুমে কাউকে নামতে দিচ্ছেন না। হরিদাস দরজার কাছে এসে দৃঢ় গলায় বলল, নামতে দিন সকলকে।

পাঁচ নম্বর সাব দরজার হাতল দুটো আরও জোরে চেপে ধবল। দরজার উপর উপুড় হয়ে বলল, ক্যাপ্টেনের বারণ আছে। তোমরা সবাই অপেক্ষা করো। এক্ষুনি অনুত্তমকে ইঞ্জিন-রুম থেকে তুলে আনা হচ্ছে।

জাফর আলি দরজার উপর ধাক্কা দিল। ওর দেখাদেখি অন্যান্য জাহাজিরা দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওরা দরজায় ধাক্কা মারছে আর বলছে, মাইজলা সাবের খুন চাই। খুন দিয়ে অনুত্তমের গোসল চাই।

ওদের শব্দগুলো ক্র্যাংক-ওয়েভের আবর্তে পড়ে বীভৎসভাবে পাক খাচ্ছে। বড়-মালোম শুনে শিউরে উঠলেন। বুড়ো কাপ্তানের চোখে বন্দুকটা ভেসে উঠল। তিনি সিঁড়ি ধরে ব্রিজে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেজ-মালোম বাঁধা দিলেন, এখন উঠতে হবে না। জাহাজিরা ডেকের উপর বিদ্রোহ করেছে।

মেজ-মিস্ত্রি এভাপরেটাবেব পাশে দাঁড়িয়ে বেতসপাতার মতো কাঁপছেন। খুন-খারাপিটা একমাত্র তার জন্যই অপেক্ষা করছে বুঝি।

মেজ-মালোম ধীরে ধীরে অনুত্তমের মাথাটা চ্যাটচ্যাটে রক্ত থেকে একটা নরম বালিশের উপর তুলে রাখলেন। দুটো ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে, আরও একটা দেবেন কি না ভাবছেন। এমন সময় আবাব ওদের চিৎকাব তিনি শুনতে পেলেন, মাইজলা সাবের খুন চাই।

তিনি চিৎকাবের অর্থ ধরতে পারেননি, তবু বুঝতে পেবেছেন জাহাজিদেব মাথায় খুন চেপে গেছে। বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মেজ-মালোম চোখ তুলে কাপ্তানকে দেখলেন। তিনি অসংযত। অনেক বিচ্ছিন্ন অন্ধকার তার চোখে। এই সময় বিরাট শব্দ করে ইঞ্জিন-রুমেব দবজাটা ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ল। আর সেই জাহাজি ভিড়টা পাগলের মতো সিঁড়ি ধরে গড়িয়ে নামছে। এব সামনে দাঁড়ানো কাব সাধ্য, মেজ-মালোম ভাবলেন। তিনি নিজেও হকচকিয়ে গিয়েছেন। মেজ-মিস্ত্রিকে টানেল-পথটার মুখে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ কবে দেওয়া যায় কিন্তু তখন হয়তো ক্যাপ্টেনের গলা টিপে ধববে। অনেকগুলো খুনেব আশঙ্কা কবে মেজ-মালোম তাড়াতাড়ি অনুত্তমের দেহটা কাঁধে ফেলে নিলেন এবং অপ্রশস্ত সিঁড়িব মুখে এসে দাঁড়ালেন।

জাহাজি ভিডটা নামতে নামতে দেখল মেজ-মালোমকে। চোখদুটো মেজ-মালোমের ভারী-ভারী। তিনি বেদনাহত। তিনি বিষণ্ণ। অনুত্তমের নীল জামাটা বক্তে ভিজে গেছে। নীল জামা থেকে মেজ-মালোমেব সাদা জামায রক্তের ছোপ লাগছে। নীচের ঠোঁট তিনি দাঁতে চেপে রেখেছেন। এতগুলো জাহাজির ভিড দেখে কান্নাটা তাঁরও বুঝি পাচ্ছিল। জাহাজিরা দেখল ব্যান্ডেজ করা মাথাটা তিনি অত্যন্ত সযত্নে ধরে রেখেছেন। এইসব দেখে সিঁড়ির রড ধরে ওরা থমকে দাঁড়াল।

সিঁড়ি ধবে মাত্র একটা লোক উপরে উঠতে পারে। মেজ-মালোম সিঁডিব মুখ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন বিষণ্ণ সুরে, লেট মি গো।

কিন্তু বড ধরে যে জাহাজিবা ভিড করে ছিল তাদের চোখে একটা মাত্র প্রশ্ন ঝুলছে, সেকেন্ড, অনুত্তম ডেড?

মেজ-মালোম তাদের চোখ দেখে বুঝতে পেরেছেন যেন। তিনি বললেন, হি ইজ নট ডেড। হি শুড লিভ অ্যান্ড এলাইভ। প্লিজ ইউ অল লেট মি হ্যাভ সাম ওয়াটার।

তারপর ওরা এক-এক করে যখন সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল তখন তিনি সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ কবলেন। বললেন, হি ইজ সেন্সলেস।

জাহাজিরা ডেক ধরে আবার ছুটছে। মুহূর্তের ভিতর বিদ্রোহের কথাগুলো ওরা ভুলে গেল। কয়লাব চাংগুলো ওরা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মকবুল আনন্দের আতিশয্যে হাতের হাতুড়িটা পর্যন্ত সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওরা হই-হল্লা করে গ্যালির উনুনে টবের পর টব জল গরম করতে লাগল।

মেজ-মালোমের অনেক দুঃখ, তবু তিনি হাসলেন। বোট-ডেক থেকে তিনি দেখলেন টবেব পর টব গরম জল এনে ওরা বোট-ডেকের উপর তুলছে। এতগুলো গরম জল দেখে তিনি আত্মগতভাবে অনুত্তমকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখেছ তোমাদের দেশের লোকগুলি কেমন বোকা-বোকা!

কেবিনের ভিতর ঢুকে তিনি অনুত্তমের মুখের উপর ঝুঁকে থাকলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু কোনও সাড়া পাচ্ছেন না বলে তিনি কেমন মুষড়ে পড়েছেন যেন। ওর শরীরের রক্ত গরম জলে তিনি পরিষ্কার করেছেন আনমনাভাবে। কেবিনে হাওয়া খেলার জন্য পর্দাটা সরিয়ে দিলেন তিনি। আকাশ

দেখলেন। নীল আকাশ। কোনও গ্লানি নেই। কোনও মালিন্য নেই। অনেক নক্ষত্র দেখলেন, তারপর একটি ধীর সংক্ষিপ্ত দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, লর্ড, ইউ হেলপ আস। লেট হিম ব্যাক টু হিজ সেনস।

অনুত্তমকে নিজের কেবিনে রেখেছেন মেজ-মালোম। একটা টেবিলফ্যান আছে, অনবরত ঘুরছে ফ্যানটা। মেসরুম বয় দেখাশুনা করছে। মেজ-মালোম অন্য বাংকটায় বসে কতকগুলি দরকারি ঔষধপত্রের বই দেখছেন। আবও দশদিন বন্দব ধরতে। তবু তিনি আশা কবেছেন রাতের ভিতরই ওর জ্ঞান ফিরবে। জাহাজিবা এসে একসময় ভিড় করেছিল, তিনি সকলকে ভিড় করতে নিষেধ করেছেন। মেসরুম বয় রয়েছে, তিনি আছেন, রাত জাগার জন্য যদি কারও দবকাব হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই ডাকবেন।

ঘড়িতে সময় গুনছেন মেজ-মালোম। রাত্রির অন্ধকারগুলোকে ভাগ ভাগ করে পল দণ্ডের হিসেব টানছেন। সামনের একটা চেয়াবে বসে তিনি অনুত্তমের শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামা দেখছেন। বার্মিংহামের কোনও এক বাত্রির কথা মনে হল। ছোট একটি ঘরের কথা ভাবলেন তিনি। বার্মিংহামের কোনও এক মৃত্যুব প্রত্যক্ষ চিন্তায় অনুত্তমেব মুখ দেখলেন। বিবর্ণ মুখে প্রতিচ্ছবি দেখলেন অন্য কোনও এক প্রিয়জনেব। সমুদ্রেব বুকে সবুজ দ্বীপেব মতো মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দু' হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠলেন, গড সেভ হিম। হি ইজ মাই লস্ট ব্রাদার। প্লিজ লেট হিম ব্যাক টু হিজ সেনস।

মেজ-মালোম পুনরাবৃত্তি কবলেন কথাটাব। তাবপব মুখ থেকে দু' হাত নামালেন তিনি এবং ধীবে ধীবে চোখ তুলতেই দেখলেন অনুত্তম ফ্যাল ফ্যাল করে কেবিনটার চারিদিকে চেয়ে দেখছে। অনেক বিস্ময় তার চোখে। তাব মুখের বেখাগুলো দেখে তিনি বুঝতে পারলেন ভিতরে সে খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে।

অনুত্তমেব জ্ঞান ফিরতে দেখে মেজ-মালোমের এত আনন্দ হল যে একবার ইচ্ছা হল তিনি সকলকে বলে বেড়ান, অনুত্তমেব জ্ঞান ফিবেছে, তোমবা সকলে এসে ওকে দেখে যাও। জাহাজের গলুই থেকে আগিল পর্যন্ত একবার ছুটে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল, অনুত্তমকে কোলে তুলে তিনি আকাশের সব নক্ষত্রদের দেখেন। কিন্তু কিছুই করতে পাবলেন না। ধীরে ধীবে অনুত্তমের ডান হাতটি নিজেব ডান হাতে তুলে বললেন, ইউ ফিল বেটাব আই থিংক।

ফিস ফিস করে আবার বললেন, হোয়াট এ লাভলি নাইট!

তিনি পোর্ট-হোলেব পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, ইটস এ মুন-লিট-নাইট।

এবার তিনি দবজার ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে ডাকলেন, ক্যাপ্টেন, গেট ডাউন প্লিজ। হি হ্যাজ বিটাবনড টু হিজ সেনস।

ক্যাপ্টেন উপব থেকে নেমে আসলেন। অনুত্তমেব পাশে একটা চেয়ার টেনে তিনি বসে বললেন, হি ইজ কোয়াইট ওকে নাউ।

মেজ-মালোম বললেন, হি শুড হ্যাভ এ লং রেস্ট।

ক্যাপ্টেন বেব হয়ে যাবার সময় বললেন, হি উইল গেট।

খবর পেয়ে অন্যান্য জাহাজিবা এল দরজার উপব। মেজ-মালোম দরজাব পাশে দাঁড়িয়ে সকলকে অনুবোধ কবলেন, এক এক করে দেখে যাওয়াব জন্য। আব কোনও চিন্তা নেই। সে শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে। ভিতরে যেন ভিড় না হয়। ঢুকে যেন কেউ কোনও কথা না বলে, কেঁদে না ফেলে। কিন্তু মাজেদ এবং হরিদাস সেনকে দেখে অনুত্তম কিছুতেই চোখের জল ধরে বাখতে পারল না। সে কেঁদে দিল। বলল, দাদা আমি কি আর বাঁচব না? দেশে আব ফিরতে পারব না? মা যে কাঁদবেন। মাকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

অনুত্তম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মাজেদ কাঁদল। হরিদাস সেনেব ঠোঁটদুটো থর থর করে কেঁপে উঠল। মাজেদ কাঁদল হরিদাসের গলা জড়িয়ে। মেজ-মালোম ধমক দিতে গেলেন, ওরা যেন এভাবে রুগির সামনে না কাঁদে। কিন্তু ধমক দেওয়ার আগে ওঁর গলাটাও কেঁপে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের দুর্বলতাটুকু ঢাকার জন্য পোর্ট-হোলের ভিতব মুখ ঢুকিয়ে দিলেন। জ্যোৎস্না রাত। অষ্টমীর ভাঙা চাঁদ। নীল সমুদ্র। দূরে এক অখণ্ড রহস্যের ছায়া। কিন্তু সেখানেও তিনি অনুত্তমের অসহায় মুখটিকে শুধু দেখতে পাচ্ছেন, অনুত্তম

কাঁদছে। ওর মা কাঁদছে। মা'র চোখে কোন এক সুদূর দরিয়ায় জাহাজডুবির স্বপ্ন হয়তো। সে স্বপ্ন থেকে তিনি এখন জেগেছেন। সারারাত ধরে ছটফট করছেন। ঘর-বার হচ্ছেন। তিনি হয়তো আকাশের নক্ষত্র দেখার সময় অনুত্তমের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কথা ভাবছেন। সমুদ্রে নিঃসঙ্গ জীবনের কথা মনে করছেন।

হরিদাস চোখের জল মুছে বলল, দেশে ফিরবি না কেন? ভাল হয়ে নিশ্চয়ই ফিরবি।

মাজেদ প্রশ্ন করল, মেজ-সাব তোকে মেরেছে কেন?

সে একটা ফয়সালা করতে চায়। ধাক্কা দিয়ে মেজ-মিস্ত্রিকে সে দরিয়ার পানিতে অন্ধকার রাতে গোপনে ঠেলে দেবে, এই কথাটা ভাবল। যদি অনুত্তম ভাল হয়ে না ওঠে, মেজ-মিস্ত্রিকেও আর দেশে ফিরতে হবে না। রাতে মেজ-মিস্ত্রি যখন ওয়াচ শেষ করে ডেকের অন্ধকারে পা বাড়াবে তখন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বলবে, তুমি জাহান্নামে যাও। তোমার দেশে আমি একটা খত পাঠাব তোমাকে খুন করার সংবাদ দিয়ে।

অনুত্তম ধীরে ধীরে সব খুলে বলল। মেজ-মালোম অধীর আগ্রহে শুনলেন। তিনি বাংলা বোঝেন না। কিন্তু অনুত্তমকে কথা বলতে দেখে তাঁর এত ভাল লাগল যে, এ সময়ে যে কথা বলা ঠিক উচিত হচ্ছে না তা পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

মেজ-মিস্ত্রি অনুত্তমকে দু'-দু'বার করে বয়লারের নীচে পাঠিয়েছেন। গায়ে বস্তা পেঁচিয়ে সে বয়লারের নীচে নেমে ট্যাংক-টপ খুব ভালভাবে দু'-দু'বার পরিষ্কার করেছে। প্রচণ্ড উত্তাপ দাঁত কামড়ে সে সহ্য করেছে। কোথাও ছাই আর এতটুকু নেই। অথচ মৃত্যুর মতো মেজ-সাব দূরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তাকে আরও ভালভাবে নীচটা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বয়লারের নীচে বসে থাকার অর্থই মৃত্যুর কাছাকাছি কোনও স্থানে পৌঁছানো। সে তখন নীচ থেকে ইঞ্জিন-রুমে উঠে এসেছিল, বলেছিল, আর সে পারবে না, আজকের মতো তাকে অন্তত ছুটি দিতেই হবে। সামান্য কয়লায়ালাকে মুখের ওপর কথা বলতে দেখে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন, সেই জন্য অনুত্তমের কলার ধরে বলেছিলেন, ইউ ইন্ডিয়ান ব্লাডি, ইউ উইল নট কেরি আউট মাই অর্ডার! অনুত্তম অপমানিত বোধ করেছিল। তা ছাড়া একদিন তিনি বাংকারে লাথি মেরেছেন, মেজ-সাবের সবগুলো দুর্ব্যবহার এক-এক করে মনে পড়ছিল! সে প্রচণ্ড উত্তাপে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, মেজ-মিস্ত্রির মুখে সে ঘুসি চালিয়েছিল। মেজ-সাব ওকে জেনারেটরের উপর ঠেলে ফেলে দিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

এতগুলো কথা বলতে অনুত্তমের অনেক সময় লাগল। মেজ-মালোমের মনে পড়ল অনুত্তমের কথা বলা ঠিক উচিত হচ্ছে না। তিনি সকলের প্রতি এবার মুখ তুলে বললেন, নো, নো, নো। তিনি সকলকে কেবিনে যেতে বলে দিলেন। অনুত্তমের কথা বলা বারণ। হরিদাস এবং মাজেদ মেজ-মালোমের কথামতো বোট-ডেক ধরে নীচে নেমে গেল। অনুত্তমকে গরম দুধ খাইয়ে তিনি পাশের একটি বাংকে শুয়ে জাহাজি-জীবনের কিছু কিছু দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করলেন।

তারপর রোজকার মতো সমুদ্রের একঘেয়ে জীবনটা ভোরের দরজায় এসে আবার উঁকি দিয়েছে। অনুত্তমকে ধরে এনে মেজ-মালোম পোর্ট-হোলের পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন। পরদা সরিয়ে দিয়েছেন পোর্ট-হোলের। ফুর ফুর করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। জাহাজিরা কেউ কেউ গল্প করে গেছে অনুত্তমের সঙ্গে। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেছে। অনেক রক্তক্ষরণে যে দুর্বলতা সে অনুভব করেছিল, সমস্ত রাত্রির ঘুমের প্রশান্তিতে তা দূর হয়ে গেছে। ভোরের সূর্যালোকের সঙ্গে পাখিদুটোর কথা মনে হল।

সেকেন্ড!— অনুত্তম ইজিচেয়ার থেকে মাথা না-তুলে ডাকল মেজ-মালোমকে।

মেজ-মালোম ক্ষুর চালাতে গিয়ে হঠাৎ সেটা বন্ধ করলেন। ঝুঁকে দাঁড়ালেন এসে অনুত্তমের মুখের উপর।

অ্যানি থিংগ ইউ লাইক টু হ্যাভ?

দি টু বার্ডস, মিসেস স্প্যারো অ্যান্ড মিস্টার স্প্যারো, প্লিজ কনভে মাই গুডমর্নিং টু দেম।

মেজ-মালোম হাসলেন।

ইউ লাভ দেম টু মাচ।

অনুত্তম তখন পোর্ট-হোলের ফাঁক দিয়ে দূব সমুদ্রে কতগুলি শুশুক মাছ ভাসতে দেখল। বলল, ইয়েস আই ডু, অ্যাজ দি ডলোফিন'স লাভ টু দি সি।

মেজ-মালোম দেখলেন অনুত্তমের মুখটা, সাদা সাদা পাঁশুটে চোখদুটোতে ওর সমুদ্রের ওপারের অন্য কোনও বিদেশেব কথা-কাহিনির ছবি যেন। তিনি আয়নাটার সামনে সবে দাঁড়ালেন। নিজের মুখের রেখাগুলোর সঙ্গে অনুত্তমের মুখেব রেখাগুলো মিলিয়ে ভাবতে চাইলেন কিছু। কিন্তু সাবানে ঘষা মুখটার ছদ্মবেশে তিনি হাজার বছরের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির ছদ্মবেশকে দেখতে পেলেন। অনুত্তমের মুখের সঙ্গে তাই এত বেশি ফারাক। বিদেশি-বিদেশি। তিনি এবারও হাসলেন।

অ্যাজ দি সি অ্যান্ড দি সি-বিচ উই হ্যাভ মেড ফ্রেন্ডশিপ উইথ দি টু স্প্যারোজ।

অনুত্তম মনে মনে ভাবল, মেঘ যেমন আকাশকে ভালবেসেছে, মাটি যেমন সমুদ্রকে, তেমনি এক বন্ধুত্বেব গভীরতা আজ পাখিদুটোর সঙ্গে। অনুত্তম মেজ-মালোমকে বললেন, সেকেন্ড, উড ইউ প্লিজ টেক মি টু দেম?

মেজ-মালোম মুখটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলেছিলেন তখন এবং তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছবেন ভাবছেন।

বাট ইউ আর উইক অ্যান্ড ইট ইজ টু মাচ। সো ইট ইজ নট টুডে বাট টুমবো।

উইল টুমবো কাম এগেইন?

ইয়েস ইট উইল কাম।

পরদিন খুব ভোরবেলায় মেজ-মালোম অনুত্তমকে ধবে বোট-ডেক থেকে টুইন-ডেকে নেমেছিলেন। ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু পাখিদুটো বোট-ডেকে নেই। পাখিদুটি কোথাও উড়ছে না। উড়তে না দেখে অনুত্তমেব বুকটা কাঁপল।ওবা এসে এখন গলুইতে উঠেছে। গলুইতে সেই পাখিদুটো। কাঠের বাক্সটার চাবপাশে ওরা উড়ছে না। অনুত্তমের বুকটা ধড়ফড় কবে উঠল। সে কেমন রুক্ষ কণ্ঠে বলল, মেজ, শেষ পর্যন্ত পাখি দুটো আমার সঙ্গে বেইমানি কবল। ওরা পালিয়ে গেল জাহাজ থেকে? কিন্তু যাবে কোথায়, তবে যে ওবা সমুদ্রে ডুবে মববে।

সে মেজ-মালোমের কাঁধ ধরে বাক্সটার আরও সামনে এগিয়ে গেল। তাবপব বাক্সের ভিতর উঁকি দিয়ে সে অদ্ভুত এক আনন্দে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে দিয়ে বলল, দেয়ার আর দি টু বার্ডস। পাখিদুটো আজ ঘর পেয়েছে।

অনুত্তম এবাব বাক্সটাব ভিতর ভালভাবে উঁকি দিয়ে মেজ-মালোমকে আরও জোরে জড়িয়ে ধবল, সেকেন্ড! সেকেন্ড! ইটস এ গ্লরিয়াস ডে ফর আস। মেয়ে-চড়াইটা ডিম দিয়েছে। দুটো বাচ্চা হবে। মেক ফ্রেন্ডশিপ এগেইন।

মেজ-মালোম মেয়ে-চড়াইটা এবং দুটো ডিমের উত্তাপ দেখে আত্মগতভাবে বললেন, দিস ইজ টুমবো, অ্যান্ড ইট উইল কাম এগেইন।

আট

জাহাজ ক্যারেবিয়ান সমুদ্র অতিক্রম করে মেক্সিকো উপসাগরে পড়বে-পড়বে সময়ে খবরটা এল জাহাজে।

জাহাজিরা ভেবেছিল দু'দিন পর আমেরিকার তীর দেখে কলম্বাস এবং তার নাবিকদের মতো চিৎকার কববে, ল্যান্ড! ল্যান্ড! কী দীর্ঘ যাত্রা।

কিন্তু তা হয়নি। হবে না। এখন মনে হচ্ছে হাজার বছর ধরে যেন জাহাজিরা গঙ্গাব উপকূল থেকে জাহাজ বাইছে।

সুতরাং সমুদ্রের ঝড় আর টাইফুন দেখে যখন নাবিকেরা ক্লান্ত, পড়শির মেয়ে-জগৎটা যখন মেয়ে-চড়ুইটার ঠোঁট থেকে তীরের প্রতীক্ষাতে ক্রমশ জাহাজিদের মন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিল, খবরটা সেই সময় ডেকের উপর গড়াগড়ি খেয়েছে।

খবরটা জাহাজিদের কাছে একান্ত অপ্রত্যাশিত। ডেক-এ খবরটা গড়াগড়ি খাবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের আগিল অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাফর আলি, মকবুল মার্কনিকে গিয়ে বলেছে, সাব, হোয়াট সাব? সাব নো পোর্ট। নো ওম্যান।

কোম্পানির উপর সব মানুষগুলিই খেপে গেছে।

মার্কনি বলেছেন, আমাদের কী হাত আছে বলো? ২১ নং বারি স্ট্রিট, লন্ডন থেকে যে খবর এসেছে সে খবর মতো আমরা জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছি।

কী করবে! জাহাজিরা এখন যে যার মতো কাজ করছে। কাজ করতে কারও ভাল লাগছিল না। দু'মাস ধরে জল আর জল দেখে জাহাজি জীবনটাকে কিছুতেই আর সহজ করে তুলতে পারছে না। মেয়ে-চড়াইটা বাচ্চার উপর তা দিচ্ছিল, কোনও কোনও জাহাজি গিয়ে এখন ওখানটায় বসেছে।

জাহাজিদের অনেকগুলো আকাঙ্ক্ষা ছিল আগামী বন্দরটা সম্বন্ধে, মিসিসিপি নদীর তীরে সে বন্দর। অনুত্তম জানত, সে-বন্দবে তারা নামতে পারবে না। আমেরিকার দক্ষিণ-দেশগুলোতে কালো আদমির প্রতি এখনও অহেতুক অনেক ঘৃণা। তবু বন্দরে দশ দিন দশ রাত জাহাজ থাকবে, পাটের গাঁট নামানো হবে, সালফার বোঝাই হবে নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরের জন্য। কিনারার অনেক খবর মেজ-মালোম এসে দেবে। রাত কাটানোর গল্প, মেয়েমানুষের গল্প। তা ছাড়া মিসিসিপির তীরে দু'-একজন মেয়েমানুষ নিশ্চয়ই শহর থেকে গাড়ি করে বেড়াতে আসবে। অনুত্তম তাদের দেখবে। জাহাজিরা একটি মেয়ে-জগতেব মুখ দেখে দীর্ঘ সফরের নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি পাবে। সমুদ্রে আবার যদি ঝড় আসে, টাইফুন আসে, নতুন করে এক বন্দরের কথা ভেবে অনায়াসে বাংকে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে। কিন্তু দু'মাস ধরে এই নিস্তরঙ্গ সমুদ্র-সফর জাহাজি-জীবনকে অর্থহীন করে তুলেছে। কিছুই নেই, কিছুই নেই ভাব। কিছুই আর ভাল লাগছে না ভাব। তাই ডেক ধরে জাহাজিরা হাঁটবার সময় সভ্যতার বড় বড় বুলিগুলির কথা ভেবে এখন একটা 'ফুঃ' শব্দ করে। মেয়ে-চড়াইটার দুটো বাচ্চা হয়েছে এবং কেন হয়েছে, পুরুষ-চড়াইটা পাখা দিয়ে সে কারণগুলোকে আড়াল করেনি। মেয়ে-চড়াইটা খুব খুশি। পুরুষ-চড়াইও খুব খুশি। খুশিতে ডগমগ কবছে এখন। মানুষেব সভ্যতাকে ল্যাং মাবছে।

অনুত্তম ভেবে ভেবে খুব খুশি হল। মারুক ল্যাং। মেরে মেরে মাটির সভ্যতাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিক। কিন্তু চড়াইদুটোর কত ক্ষমতা। চড়াইদুটোর অক্ষমতার কথা ভাবল বাক্সটার দিকে চেয়ে। উঁকি দিয়ে ভাল করে দেখল এবং বলল, খবরটা শুনতে পেলে? পাওনি? তা পাবে কেন? খুব সুখে আছ, স্বামী-স্ত্রীতে বেশ খেলা হচ্ছে। আর আমরা হা-হুতাশ করে মরছি। জাহাজ নিউজিল্যান্ড যাচ্ছে, পাটের গাঁট ওখানেই নামানো হবে। কোম্পানির কী সব মর্জি, অথচ ওরা ভাবে না যে একদল মানুষ জাহাজটাতে কাজ করছে। মেয়েমানুষ দেখাব জন্য ওরা পাগল! নীল সমুদ্রের ঢেউ গুনতে কত আর ভাল লাগে, তুমিই বলো! তোমাকে সাক্ষী রাখলাম।

জাহাজিরা এসে সব গলুইয়ে ভিড করেছে। ওদেব হাতে কাজ সরছে না। তাই ডেক থেকে ঘুরে যাচ্ছে। দু'দিন বাদে বন্দর ধরবে, পাটের গাঁট নামানো হবে, সালফার বোঝাই হবে নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরের জন্য। এখন সেই নোঙরেব কথা ভুলে জাহাজ ববাবর নিউ-প্লাইমাউথ যাবে। হেড অফিসের মর্জির কথা ভেবে জাহাজিরা মনে মনে আফসোস করছে। দু'দিন পরে মিসিসিপির তীরে লুসিয়ানার যে বন্দরটা পেত সে বন্দর ডাইনে ফেলে জাহাজ সোজা মেক্সিকো উপসাগর অতিক্রম করবে কোনও এক সন্ধ্যায়, তারপর পানামার তীরে ভিড়বে জাহাজটা।

বারিক ডেক ধরে আসার সময় বলল, বন্দর পাইতে আবার একমাস।

গলুইয়ের উপর যে জাহাজিরা ভিড় করে ছিল, একমাসের সময়টাতে তারা অনন্তকাল বলে ভাবল, ভাবল যেদিন ওরা পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাবে সে দিনটি হল কোনও এক অনন্ত-কালকেই অতিক্রম করে। অনেক প্রতীক্ষা আর অনেক সময় গোনার ইতিহাস অনন্তকালের পর্দাকে সরিয়ে দেবেই একদিন। তখন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শে ওরা উন্মাদ হবে। পাগল হবে। কিনারাব মানুষগুলো ট্যারা-চোখে দেখবে, একজন জাহাজি মানুষ একটি মেয়েমানুষের কোমর ধরে ছুটছে' জাহাজিগুলো ইতর। জাহাজিগুলোর ইজ্জত নেই।

জাফর আলি বলল, হায় রে নসিব।

অনুত্তম এবং মাজেদ পাখিদুটোর নিবিড় ভালবাসার কথা ভাবছিল। সেই সময় দেখল তারা জাফর আলি আকাশের দিকে চেয়ে বলছে, হায় রে খোদা।

মাজেদ বলল ঠাট্টা করে, হায় রে খোদা! পেটের ব্যামোতে পেল নাকি রে, জাফর?

না রে ভাই।

জাফরের পিঠের উপর কয়েল করা হিবিং লাইনটা ডেকের উপর ঝুলে পড়ল। এখন ওটা বাতাসে নড়ছে। হিবিং লাইনটা সামলে বলল, বিবির মুখটা স্মরণে আনতে পাবছি না।

সব নসিবের খেইল।—মাজেদ বলল।

জাফর হাঁটতে হাঁটতে বলল, আরও একমাস! সোজা কথা! জমির দেখা নাই, পাড়ের দেখা নাই। বিবির মুখ ভেবে বাংকের উপর মুখ গুঁজে থাকি, নসিবতের এমন খেইল, সে বিবির মুখটা পর্যন্ত আজ স্মরণে আনতে পারছি না। হারিয়ে গেছে, সব হারিয়ে গেছে।

জাফর আলি কথাগুলি বলে লাফিয়ে লাফিয়ে বোট-ডেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিবিব মুখটা স্মরণ করতে পারছে না বলেই যেন ডেকের উপর সে উন্মাদের মতো লাফ দিল।

মাজেদের মনটা এমন সময় অদ্ভুত এক আনন্দের প্রাচুর্যে ভবে উঠল। খুশিতে সে উজ্জ্বল হল। জাহাজ বন্দর না ধরে ভালই করেছে। কোম্পানির ঘরে টাকা জমছে অনেক। বন্দর ধবলে অনেক খবচ। হয়জুন-বিবিব জন্য টাকা জমত না। মেয়ে-চড়াইয়ের দুনিয়া বন্দরে ওত পেতে থাকত। কোম্পানির টাকায় বেহিসেবি খরচে বন্দবে সে ডুবত। জাহাজে ফেরার সময় ভাবত, জীবনটা ফেবার হয়ে গেছে। হয়জুনের বাপকে কডকড়ে নোটগুলি তুলে দিতে আর পারল না, মিঞা, দিলাম তোমারে দেন-মোহরের টাকা। কবে এবার বিবিকে ঘরে পাঠাবা বলে দাও। ঘর আমার খাঁ খাঁ করছে।

এবার কোম্পানির ঘরে টাকায় টাকা আনবে। ব্যাংক লাইনেব সফর—তিন বছরে দু'বাব। গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে জাহাজটা। চিন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া কত দেশ। দেশে দেশে টাকা। বাবো মাসের পর তেরো মাসের সময় কোম্পানির ঘরে সুদ জমবে। টাকায় টাকা বাড়বে। সামনের বন্দর পেতে আরও একমাস। সেই মাসের টাকাটাও কোম্পানির ঘবে জমল। সে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সাধারণ একটা হিসেব টেনে ফেলল। টাকাটা অনেক নয়। তবু দেন-মোহবের টাকাটা হয়ে যাবে। চড়াইদুটোব কাছে গিয়ে আবার সে বসল। হয়জুন বিবির মুখটা স্মরণ করতে গিয়ে দেখল সেও সেই মুখটা হারিয়ে ফেলেছে। অনেক চেষ্টা করেও মুখের আদলটাকে চোখেব উপর ছবির মতো করে টানতে পারল না। একটা আবছা ভাব হয়জুন বিবির মুখের। মুখের উপর মাকড়সার জালের মতো মসলিনি পর্দাটা কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে। পর্দাটা এখন কাঁপছে। কাঁপা পর্দাটা ছিড়ে গেল। ফাঁক দিয়ে হয়জুনের সুরমা টানা চোখ দেখতে পাচ্ছে মাজেদ। কিন্তু সে চোখে মাজেদের কথা নয়, অন্য কোনও মানুষের কথা যেন। সে ফিস ফিস করে বলল অনুত্তমকে, দেখবি পানামা খালে খবর আসবে হারুন আলির বিবিটা গলায় কলসি দিয়েছে।

বলে ফিক ফিক কবে হাসল মাজেদ। তারপর চড়াইয়ের বাচ্চাদুটোকে হাতে নিয়ে বলল, গলাটা ছিড়ে জবাই করে দেই।

অনুত্তম তাড়াতাড়ি মাজেদেব হাতটা জোরে চেপে ধরল, খবরদার।

মাথাটা ব্যান্ডেজ করা অনুত্তমের। চারদিনের পর মেজ-মালোম খুলে দেবেন বলেছেন। মাজেদ জোর করল না। বাচ্চাদুটোকে জায়গা মতো রেখে বলল, বলেছি বলেই কি জবাই করে দেব? পাখিদুটোর জন্য আমার বুঝি দরদ নেই?

কিন্তু ভাবল সে, হয়জুন বিবির সুরমাটানা চোখে যে-মরদের জন্যই টান থাকুক না কেন, দুটো বাচ্চার জন্যই যে মরদের দরদ সেটা সে বুঝতে পারল। এখন ভাবল টাকাটা এত না জমলেও পারত কোম্পানির ঘরে। আরও ভাবল, বন্দরে খরচ হক-খরচ। হক-খরচটি করতে না পেরে তার খুব আফসোস। সুতরাং জমি দেখার জন্য মাজেদও আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মাজেদ গলুইতে এসে দু' হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, কোম্পানিকে বলে দাও জাহাজ থামাতে। না হলে জাহাজ ফুটো করে দেব। ফুটো কোম্পানির মাথায় লাল চেরাগ জ্বালিয়ে ছাড়ব।

এত দুঃখেও জাহাজিদের হাসি পেল। মাজেদ বলছে কী! হারুন আলি একটা বেঞ্চির এক কোনায়

বসে চোখ বুজেছিল। মাজেদের বে-তরি কথাগুলো সে যেন হজম করতে পারছে না। এখানে অন্ধকার থাকলে সে কানে আঙুল দিতে পারত। নুর-ভানুর মুখ বেশি করে ছবির মতো চোখের উপর ভাসাতে পারত। তবু সে ভাবল বিবির মুখ বড় খুবসুরত। এখন সে পাছদুয়ারে নিশ্চয়ই ঘুর ঘুর করছে আর তার জাহাজি খসমের কথা ভাবছে। ভাবুক। ভেবে ভেবে সারা হোক। নাকের নোলক হয়তো দখিনা বাতাসে নড়ছে। বিবির খত আসবে পানামা-খালে। খতে অনেক মোহব্বতের কথা থাকবে।

মাজেদ হারুন আলির সামনে এসে দাঁড়াল। নাড়া দিয়ে ডাকল, এই মিঞা, ঘুমোচ্ছ নাকি! চিত হয়ে তো পড়বা পানিতে।

হারুন আলি চোখ বন্ধ করেই বলল, মিঞা, ফাইজলামি করার জায়গা না পাও তো নীচে গিয়া চিত হইয়া বাংকে পইড়া থাকো।

মাজেদ খেপে গেল। বলল, চিত হয়ে থাকব কেন? আমি কি কারুর বিবির মুখে ঠোঁট ঠেকাইছি?

হারুন আলি এখনও চোখ খুলল না।

মিঞা ভাই, দুইটা পায়ে ধইরা কই ক্ষ্যামা দাও আমারে। আমারে চোখ বুইজা শান্তিতে থাকতে দ্যাও।

থাকো থাকো চোখ বুইজাই থাকো। চোখ বুইজাই দুনিয়ারে দ্যাখো। চোখ খুইলা তো দুনিয়াডারে দ্যাখনের সময় পাইলা না। দ্যাখতে পারলে বুঝতে পারতা খুবসুরত দুনিয়াডাই দুনিয়া নয়। আরও দুনিয়া আছে, সেখানে মরদের লাগি যে দরদ সেটা বিবির শখের বাচ্চার জন্য। ওঁয়া ওঁয়া করবে, তোঁয়া তোঁয়া করবে। আমার সোনা রে, মণিডা রে বলবে।

হারুন আলি বিরক্ত হয়ে নীচে নেমে গেল। মাজেদ হাসল গলা ছেড়ে। ডেক-সারেং গলুইতে উঠে আসাব সময় বলল, মাজেদ, তুমি বড় চিল্লাও। দরিয়ার পানিতে এমন কইরা চিল্লাইলে পাগলি রাগ করে।

মাজেদ বিনয়ের অবতার সেজে বলল, আচ্ছা সারেং সাব, আর হবে না। চোখ ট্যারা করে অনুত্তমের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। অর্থাৎ সারেং সাবের সঙ্গেও সে মশকরা করছে।

অনুত্তম উঠে এল বাচ্চাদুটোর পাশ থেকে। গ্যালিতে উঁকি দিয়ে দেখল ভাণ্ডারি ময়দা ডলছে। উনুনের উপর গোস্তের হাঁড়ি, পচা গোস্তের চামসে গন্ধ। সমস্ত ডেক জুড়ে গন্ধটা উড়ছে। গুনগুন কবে আবার গান করল ছোট-টিন্ডাল। রসের গান—অঃ নাইয়া বইল গিয়া তারে আমার সাধের জোয়ান বিবি রে...। পানামার তীরে এজেন্ট আসবে। ওর সঙ্গে চিঠি আসবে। সোনালি দাঁত দুটোয় আবার অনেক হাসির ঝলক। মাজেদ অনুত্তমকে টেনে ফোকশালে নিয়ে গেল। টিন্ডালের গান শুনে সে বুঝতে পেরেছে, টিন্ডালের চোখে পাঁচ নম্বর বিবির খোয়াব। এক্ষুনি হয়তো অনুত্তমের পিছন ধরবে, বাতিজা, খতের জবাবটা।

পরদিন সকালেও ধরেছিল অনুত্তমকে, বাতিজা, খতের জবাবটা লিখা দিবা তো?

কাকে না দিয়েছি বলুন? কিন্তু খত আপনার এল কই?

তা দিয়েছ, তা দিয়েছ। এবারে দেখবা বিবি খত দিবই দিব। না দিলে তোমার টিন্ডাল চাচার কান কেটে দিবা।

হরিদাস সেন বালকেডে হেলান দিয়ে হাসিটা জোর করে চেপে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। টিন্ডাল ধরতে পারল হরিদাস সেন ওর কথা শুনেই হাসছে। হাসুক। বিবিকে নিয়ে হাসা। মশকরা। আল্লা-তায়লা কিছুতেই সহ্য করবে না। পাঁচ নম্বর বিবি তেমন বিবি না। এ হাসির মুখে পোকা পড়বে। কিন্তু টিন্ডাল কিছু প্রকাশ করল না। চুপচাপ ডেক-ছাদে উঠে গেল। গানের শেষ কলি দুটো বাকি আছে, গলা ছেড়ে তাই বাকিটুকু গাওয়ার ইচ্ছা। এবার গলুইয়ের ছাদে বসে আসমান আর দরিয়াকে সাথি রেখে গান করবে আর বিবির যৌবন-পুষ্ট দেহটার কথা ভাববে। দেন-মোহরের সময় দশ বিঘা জমি আব তেরো কুড়ি এক টাকা লেগেছে, লাগুক। বিবির একটা খতেই দেন-মোহরের হিসেব উসুল হবে।

সকাল প্রায় দশটায় ডেক-ভাণ্ডারি প্রথম সকলকে জানান দিল যে, কিনার দেখা যাচ্ছে। তারপব এক-এক করে সকলেই এসে গলুইতে জড়ো হল এবং কিনার দেখল।

মেজ-মালোম বোট-ডেকে স্কাইলাইটের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন তিন নম্বর সাবকে। কিনাব

এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিন নম্বর ডেক-এ উঠে দেখে যাক কিনারা কিন্তু নীচে ইঞ্জিনের শব্দে তিনি কিছুই শুনতে পাননি। তিনি সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকলেন, মেজ-মালোম কী বলেন শোনার জন্য। সিলেন্ডারের পাশে এসে বুঝতে পারলেন মেজ তাকে কিনার দেখার জন্য ডাকছেন। তিনি এবার সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বললেন, ম্যাক্সিকান-গার্ল হাউ নাইস, সেকেন্ড?

বড়-মালোম চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল, ফাইন। টেস্ট।

মেজ-মালোম বললেন, আই লাইক দেয়ার ড্রেস অ্যান্ড দি আমব্রেলা। কান্ট্রিগার্ল পুটস অন ফাইন সিল্কি গাউন অ্যান্ড ফাইন ফ্রক।

তিন নম্বর সাবের দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, ডিড ইউ গেট এনি ফ্রেন্ডশিপ হিয়ার?

তিন নম্বর সাব কাঁধটা অদ্ভুতভাবে নাড়ালেন।

সার্টেনলি। শি ওয়াজ এ ফাইন লেডি।

উইল শি ওয়েট?

নো, নো, নেভার।

মেজ-মালোম এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তিন নম্বর সাবের ভাড়া করা স্ত্রী কোলন শহরে কিংবা পানামা বন্দরে অপেক্ষা করবে না। প্রথম কথা, জাহাজের আগিল হঠাৎ মুখ ফেরাল, দ্বিতীয় কথা, কোলন শহরে কিংবা পানামা বন্দরে কখনও এ কোম্পানির জাহাজ নোঙর করে না।

অনুত্তমের কাজ থেকে ছুটি। ডেক-জাহাজিরাও গা লাগিয়ে কাজ করছে না। তাই জাহাজের যমুনাবাজুতে কিনার দেখার জন্য যে ভিড়টা জমেছিল এখনও তাদের দু'-একজন বসে কিনার দেখছে। অনুত্তম নীচ থেকে উঠে এল। হাতে কাজ নেই বলে সেও কিনার দেখতে বসে গেল।

পাঁচ নম্বর সাব বলেছে জাহাজ মধ্য-আমেরিকার কিনার ছুঁয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জাহাজ লিমন-বেতে পৌঁছবে। আরও বলেছেন, খালটা পাহাড়ের উপর কাটা হয়েছে। কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে পাহাড়ের উপর। জাহাজটা সমুদ্র থেকে লক প্রথায় প্রায় পঁচাশি ফুটের মতো উপরে তুলে দেওয়া হবে।

মেজ-মালোম বলেছিলেন, তুমি আশ্চর্য হবে পানামা ক্যানেল দেখে।

অনুত্তম আশ্চর্য হয়েছে কিনার দেখে। আশ্চর্য তীরের পাহাড়শ্রেণি দেখে। উঁচু নিচু ঢেউখেলানো সবুজ একটা পাঁচিল সমুদ্রকে যেন বেঁধে রেখেছে। বেলাভূমিতে কোনও মানুষ নেই। প্রাণী নেই। কোনও জেলেডিঙি মাছ ধরছে না। এখানে সমুদ্র পাঁচিল-ঘেরা পাহাড়ের ভিতর শুধু জাহাজি মানুষের খণ্ড আলাপে বিমুগ্ধ থাকে। সমুদ্র এখানে শান্ত, কোনও তাড়া নেই। মাটি এখানে ভেজা, জাহাজিরা জাহাজ থেকে সেই ভেজা গন্ধ পাচ্ছে। অনেক দূর থেকে ঘাসের সবুজ গন্ধটা হঠাৎ-হঠাৎ জাহাজিদের উৎক্ষিপ্ত করে তুলছে। গাছের আড়ালে হয়তো কোনও কাঠবেড়ালি এখন উঁকি দিয়ে দেখছে জাহাজটাকে। জাহাজি-মানুষদের খণ্ড আলাপটুকু সেও শুনছে।

সমুদ্র-কিনারে জাহাজটাকে দেখে আজ প্রথম বুঝতে পারল অনুত্তম জাহাজটার গতি যেন বেড়েছে। তীরের দিকে চেয়ে মনে হল সে ট্রেনে বসে রয়েছে। গ্রামগুলো, নগরগুলো পিছনের দিকে ছুটছে। এখানে গ্রাম নেই, নগর নেই, অরণ্য আছে। অরণ্যের হৃদয় আছে। অরণ্যের গাছগুলো ক্রমশ সরে যাচ্ছে অনুত্তমের চোখ থেকে। ওর কষ্ট হতে থাকল। কারণ সে এই অরণ্য-জীবনে বাংলাদেশের কোনও এক গ্রাম, গ্রামের পথ, শ্যাওলা ভরা এঁদো পুকুরের ছবি আঁকতে আঁকতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছে ওর স্বপ্নগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে বলে। অরণ্য-জীবন জাহাজকে ফেলে হৃদয়কে ফেলে, কেবল ছুটছে। ভেজা গন্ধ, কোনও এক অজানা পাখির ডাক দু' দণ্ডের শান্তি ওকে দিল না। শুধু কবির কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হল। মজিদের মৃত্যুর পর যে কবির কবিতা নীরস-ডেকে তাকে বাঁচতে শিখিয়েছে।

সে তার দৃষ্টিকে এবার সংক্ষিপ্ত করল। নীচে সেই নীল সমুদ্র। জল এখানে গভীর নীল নয়, ফ্যাকাসে নীল। বুদবুদ উঠছে জলে। দূরে একটা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মাছ ভেসে ছিল। প্রপেলারের শব্দে সে আকাশের দিকে লাফ মেরে এখন সমুদ্রের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সারেং বলল, মাছটার নাম সুরমাই-মাছ। জাহাজ চলার সময় জাহাজিরা মোটা তারের বড়শি ফেলে এ মাছ অনেক ধরে। এ সফরে

অনেক ঝামেলা জাহাজে। মাছের জন্য মোটা তার তাই নীল জলে আর ফেলা হয়নি।

আর কিছুক্ষণ পর আমেরিকার অন্য তীরে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাল এমন সময় তাদের জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে থাকবে। ক্যানেল অতিক্রম করে জাহাজ সাগরে পড়বে। টিন্ডাল বলেছিল, মোহনাতে প্রশান্ত মহাসাগরের অ্যালবাট্রসগুলো খুব প্রকাণ্ড। সে চিড়িয়া দেখলে অনুত্তম অবাক হবে।

পানামা খালের ওপারে সূর্য ডুবে গেছে। ধূসর অন্ধকার নেমে আসছে জাহাজ-ডেকে। জাহাজিরা দড়াদড়ি সব জড়ো করছে। লিমন উপসাগরে জাহাজ। জাহাজের গতি কম। এক্ষুনি থামবে। ছোট ছোট মোটর-বোটে কতকগুলো নিগ্রো জাহাজে উঠে এল। ওরা হইচই বাধিয়ে দিয়েছে ডেকের উপর। নোঙর ফেলা হবে।

জাহাজি-জীবনে পানামা খাল যারা কোনওদিন অতিক্রম করেনি, পাহাড়ের উপর শহর দেখে এবং তাব ফাঁক দিয়ে জাহাজ নেমে আসতে দেখে তারা বিস্মিত হল। জাহাজিদের মুখোমুখি এখন আকাশ। পাহাড়ের ভিতর জাহাজ ঝুলছে। ক্রমশ নেমে এল জাহাজটা। তারা দেখল এবং আশ্চর্য হল। হাতে তাদের কাজ নেই। সব কাজগুলো নিগ্রো স্যোর-ম্যানরা বুঝে নিয়েছে। পানামার তীরে লকগেটগুলোতে যত দড়াদড়ি বাঁধা সব ওরাই করবে। ডেকে এখন পায়চারি করবে মাজেদ, জাফর, মকবুল, সবাই। যারা সঙ্গে করে কিছু ব্যবসা এনেছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিনারার লোকদের সঙ্গে তাদের দর কষাকষি চলবে।

চিঠটি! চিঠটি! অনেক চিঠি।

এক বান্ডিল চিঠি নিয়ে ডেক-সারেং ছুটে আসছে।

হরিদাস, অনুত্তম!—জোরে-জোরে ডাকল ডেক-সারেং।

হরিদাস সেন গ্যালি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, দিন, দেখি কার কার চিঠি আছে।

ছোট-টিন্ডাল দর কষাকষি করছিল নিগ্রোদের সঙ্গে। কিন্তু চিঠির খবর শুনে সেও ছুটে এল। গলুইয়ের উপর উঠে হাঁপাতে থাকল। এদিক-ওদিক ইতি-উতি করে বলল, আমার চিঠি, আমার খত! কোনও খত আসেনি আমার?

ইঞ্জিন-সারেং ধমক দিল, দাঁড়াও। খত আসলে তো পাইবাই।

জাহাজি মানুষগুলো ধর্মীয় কথা শোনার মতো হরিদাস সেনের মুখে নামগুলো শুনছে।

মকবুল হোসেন। একটা, দুটো, তিনটে—মকবুলের তিনটি চিঠি! কী নসিব!

অনুত্তম এক-এক করে চিঠিগুলি ভাঁজ করছে। তার অনেক চিঠি। মনে হল নীল খামে পড়শিও একটা চিঠি দিয়েছে। চিঠির ভিতর আতর মাখানো। চিঠির মুখ খুলতেই ভুর ভুর করে গন্ধ বের হল। সে আশা করেছিল নীল খামের চিঠিতে অনেক খবর থাকবে, কিন্তু খুলে দেখল দুটো মাত্র লাইন—তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ো। আমি ভাল আছি। মাসিমা মেসোমশাইয়ের শরীর ভাল আছে।

এর চেয়ে বেশি কিছু লেখার বুঝি আজ ফুরসত নেই পড়শির। আর-একবার অজানা পাখির ডাক শোনার জন্য তীরের অরণ্যে চোখ মেলল সে। কিন্তু সেখানেও বারবার পড়শির অবশ দুটো চোখ অরণ্যের ফাঁক থেকে উঁকি দিতে থাকল।

হরিদাস সেন ডাকল, মাজেদ আলি—

মাজেদ খতটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কে তাকে এ খত দিল। তার দুনিয়ায় এমন কে আছে যে তাকে একটা খত দিয়ে তার খবরগুলো রাখতে চায়! তবে যে মানুষই খত লিখুক না, মাজেদের আনন্দ সেও একটা খত পেয়েছে। জাহাজি মানুষগুলো যেন মনে না করে মাজেদের দুনিয়ায় কাক-প্রাণী বলে কেউ নেই। সে অনুত্তমকে জড়িয়ে ধরে বলল, চিঠিটা পড় তো, কে কী লিখেছে দেখি?

চিঠিটা পড়ে দিল অনুত্তম। লিখেছে ওর গ্রাম সম্পর্কে এক ফুফাতো ভাই। মাজেদের শেষ সম্বল ভিটেমাটিটুকু সে কিনতে চায়।

হরিদাস সেন ডাকল, জনাব মাজেদ মিঞা।

ইঞ্জিন-ছোট-টিন্ডাল সোনালি দাঁতদুটোতে আর এক ঝলক হাসি টেনে বলল, হুঃ, বলছি না খত আমার আসবেই। বিবি কি আমার তেমন বিবি! খত না দিয়ে থাকবে বিবি! কই রে অনুত্তম, চাচা আমার, গেলি কই? তর চাচির খতটা একবার দ্যাখ।

অনুত্তমকে ধরে নিয়ে টিন্ডাল নীচে নেমে গেল। ফোকশালে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ট্যাক থেকে লক্ষ মণি-মুক্তোর মতো চিঠিটা বের করে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, খতে লিখা দেবা দেশে ফেরার সময় বিবির জন্য তামাম দুনিয়ার জিনিস কিনে নিয়ে যাব।

অনুত্তম চিঠি খুলে বলল, খত আপনার বিবি দেয়নি চাচা।

কে দিল, কে দিল তবে?

সোলেমান।

কী লিখেছে তবে?

লিখেছে, বহুত বহুত আদাবপর সমাচার এই যে বাপজান আপনার দু'খানা খতের জবাবে লিখিতেছি যে ছোট আম্মাজান মাসখানেক ধরে নিখোঁজ হইয়াছেন। বর্তমানে জানিতে পারিলাম তিনি সোনামুখীপুরের মৌলভী সাহেবের বাড়িতে ছোট সাহেবের সঙ্গে আছেন।

টিন্ডাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। শুনল কথাগুলো। পোর্ট-হোলের দরজায় উঁকি দিল সে। সে তার মুখটা এখন ঢেকে রেখেছে। ছোট বিবির বেইমানির খবরে সে কতখানি আঘাত পেয়েছে, সে আঘাতের বেদনাটুকু গোপন রাখতে চায়। পোর্ট-হোলের পর সমুদ্র। নীল জল। গভীর জল। ছোট বিবির চোখদুটোতেও অনেক গভীরতা ছিল। সফরে আসার আগে বিবি তার কেঁদেছিল। এখন সে বেইমানি করেছে, করুক। ডেকের উত্তাপ তার সব দুঃখের স্মৃতি মুছে দেবে। ছোট বিবির বেইমানিতে, তার দু' চোখে, আর কত উত্তাপ আছে।

অনুত্তমের চোখদুটো তখন ফোকশালের ছাদে। দুটো আরশোলা ছাদে ঘোরাফেরা করছে। সামনের পোর্ট-হোলটা খোলা। ছোট-টিন্ডাল একসময় চিঠিটা নিয়ে চুপি চুপি বের হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও ঘুলঘুলিতে ওর মুখটা ঝুলেছিল। ঘুলঘুলিতে তীরের খণ্ড ছবি ভেসে উঠছে এখন। চালচিত্রের মতো মনে হচ্ছে। টিন্ডাল সাহেবের বিবির কথা মনে পড়তেই বালিশে মুখ গুঁজে দিতে ইচ্ছে হল। সে বালিশটা বুকে টেনে শুয়ে পড়ল এই সময়। চোখ বুজে চুপচাপ পড়শিকে ভাবতে চাইল। কিন্তু টিন্ডালের মুখ, ওর পাঁচ নম্বর বিবির মুখ, সোনামুখীপুরের ছোট সাহেব, বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দিল না। নিজের চিঠিগুলি খুলে বারবার করে পড়ল। পড়শির দু' লাইনের চিঠি মুখস্থ। তবু খুলেছে, তবু পড়েছে। তারপর একসময় বাংকে পড়ে ছটফট করতে করতেই উঠে এসেছে ডেক-এ।

অনুত্তম হেঁটে এল বোট-ডেক পর্যন্ত। তখন প্রথম লকগেট থেকে দ্বিতীয় লকগেটে ঢুকেছে জাহাজটা। আগিল এবং পিছিলে দড়াদড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করছে নিগ্রোগুলো। তরমুজের মতো কালো রং ওদের। ঘাড় এবং কাঁধ দুই-ই চওড়া। ঈষৎ অন্ধকারে ওদের রং আরও কালো হয়, ঘন হয়। অনুত্তমের পাশেই একটা অন্ধকার। অন্ধকারে দু'জন মানুষ। ফিসফিস করে ওরা কথা বলছে।

অনুত্তম পিছন ফিরে দেখল, সেই ঘন অন্ধকারে ছোট-টিন্ডাল। সোনালি দাঁতদুটোর ঝিলিকে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সেখানে কারা এবং কেন দাঁড়িয়ে আছে। ওর গলার আওয়াজে মেসরুম পার হয়ে অন্যদিকে চলে গেল মানুষ দু'জন। সে হাসল। সোনামুখীপুরের ছোট সাহেব এখন পাঁচ নম্বর বিবির সঙ্গে হাসি-মশকরা করছে। ছোট-টিন্ডাল এখন ডেকের বুকে চোরা-বেসাতি বিক্রিতে অন্য একটা হিসেব টানছে—সে হিসেবে ছ' নম্বর বিবির মুখ নিশ্চয়ই আবার বাঁধা পড়েছে।

সামনের কাঠের ডেকটা পার হয়ে অনুত্তম নামল এসে লোহার ডেকটাতে। এখানে তিনটি লাইফবোট হুকের উপর ঝুলে আছে। তারই একপাশে মেজ-মালোম বসে আছেন সেই আগের মতো। চোখে বাইনোকুলার। কোলন শহরের নীরস ইট-কাঠের ফাঁকে ফাঁকে পইপই করে কী যেন খুঁজছেন।

অ্যানি ওম্যান, সেকেন্ড?

নো।

ইফ অ্যানি ওম্যান উড ইউ প্লিজ।

সেই কলম্বো বন্দরের পুনরাবৃত্তি।

মেজ-মালোম সেই বন্দরের মতো দু'বার মাথা ওঠা-নামা করে জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই ডাকবে। কোলন শহরের ইট-কাঠের ফাঁকে দূরবিনের কাচে যদি কোনওরকমে ওদের একটা দেহ আটকে যায়

তবে নিশ্চয়ই ডাকবে সকলকে। বাইনোকুলারটা দিয়ে বলবে, নাও দ্যাখো। মেয়েমানুষের সবটুকুকে দ্যাখো।

কিন্তু কই কিছুই তো নজরে এল না। শুধু ইট-কাঠ, শুধু মরা শহরটা আর ক'টা কুকুরের মাঝে মাঝে ঝিমোনো আর্ত চিৎকার। পানামার তীরে কোলন শহরটা খুব সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিন নম্বর লকগেট অতিক্রম করে নিগ্রো স্যোর-ম্যানদের হাতে তেমন কোনও কাজ থাকে না, অন্তত যতক্ষণ না জাহাজ গ্যালার্ড-কাটে গিয়ে পৌঁছবে।

নয়

এখন জাহাজ চলেছে একটা কৃত্রিম হ্রদের উপর দিয়ে। পানামা কর্তৃপক্ষ কয়েক মাইল জুড়ে পাহাড়ের উপর এই হ্রদ সৃষ্টি করেছেন। হ্রদের ভিতর ছোট বড় পাহাড়ি দ্বীপ ঘন জঙ্গলে ঢাকা। কেয়া ফুলের মতো একরকম ফুলের সমারোহে পাহাড়ি দ্বীপেরা হলদে রং ধরেছে।

জাহাজের সার্চ-লাইট আজ জ্বলছে। ফরোয়ার্ড-পিকে কয়েকজন জাহাজির সঙ্গে বিদঘুটে ইংরেজিতে একজন নিগ্রো জঙ্গলের জন্তু-জানোয়াবদের গল্পে মশগুল। নিগ্রোটা গল্প করতে পারবে গ্যালার্ড-কাট পর্যন্ত। তারপর আবার একটা ছুটোছুটি দড়াদড়ি নিয়ে। বড় বড় মানিলা হ্যাম্পের হাসিল কয়েল করা মোটা মোটা তার নিয়ে ওরা আবার ডেক-এ টানা হ্যাঁচড়া করবে।

কয়েকজন জাহাজি মেজ-মালোমের দু'পাশে বসে রয়েছে। তিনি চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে ডেক-চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়েছেন। এখানে শুধু কৃত্রিম হ্রদের বুকে ছোট বড় ঢিবি। ছোট বড় পাহাড়। গভীর অন্ধকার চারপাশে। তিনি মাঝে মাঝে টর্চ মেরে পাহাড়ের বুকে কোনও বসতি আছে কি না দেখছেন।

উইংস থেকে একটা হলুদ রঙের আলো জলের উপর পড়েছে। সেই আলোতে অনুত্তম দেখল লাল নীল সারি সারি বয়াগুলি, পাশে শাপলা ফুলের মতো ফুল। সে মেজ-মালোমের টর্চটা নিল। টর্চ জ্বেলে দেখল বয়াগুলি অতিক্রম করে আরও অজস্র ফুল ফুটে আছে। জাহাজটা খুব আস্তে চলেছে বলে তেমন ঢেউ নেই। ফুলের ডগাগুলো তাই কাঁপল না।

কিন্তু মেজ-মালোম কী ভেবে হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন। ছোট ছোট পাহাডের ছায়ায় কিছু দেখার জন্য উন্মুখ হলেন। গ্যালার্ড-কাটে জাহাজ ঢুকতে এখনও অনেক সময় বাকি। দূরবিনের মুখটা সেজন্য ঘুরিয়ে দিলেন ক'বার। কিছুই নজরে আসছে না। সব অস্পষ্ট। ছোট বড ঢিবিগুলো অতিক্রম করে, অনেক দূরে, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে কোলন শহরটা। পানামা ক্যানেল হাসপাতালের স্তিমিত আলোটাও নেই। স্প্যানিশ-মিশান ধাঁচের ওয়াশিংটন হোটেলের উজ্জ্বল আলোটাও নিভে গেছে।

সব জাহাজিদের মতো দু'মাস ধরে সমুদ্রের নীল ঢেউ গুনে অনুত্তম এখন একান্ত নিরাশ। আর কি কিছু মিলবে কোথাও?

পানামা বন্দরে পৌঁছতে রাত আবও অনেক গভীর হবে। শুধু শুধু এই রাত জেগে বসে থাকা। বোট-ডেকে মেজ-মালোমের এই পাগলামিটুকু তার আজ ভাল লাগল না। কিন্তু বসে না থেকেই বা উপায় কী। একমাস পর বন্দর পাবে নিউ-প্লাইমাউথ। প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে সে বন্দর। সেখানে জাহাজিরা সব নামতে পারবে।

বন্দরটা পাহাড়ি বন্দর। চড়াই-উতরাই পথ। মাউরি মেয়েদের দেশ। দেখতে মানুষগুলি বাঙালিদের মতো। মেয়েগুলো বাঙালি বউদের মতো। সব শোনা কথা। অনুত্তম ভাবল, কতটা সহ্য হবে কে জানে। সুতরাং সে বন্দর পাবার আগে পানামা শহরই একমাত্র বন্দর যেখানে দু'চোখ মেলে প্রত্যাশায় আপাতত বসে থাকা যাবে। সেখানে মেজ-মালোম হয়তো হঠাৎই বলে উঠবেন, ওম্যান! ওম্যান! বোট-ডেকের উপর চিৎকার করে সকল জাহাজিদের জাগিয়ে দেবেন তিনি। যদি হয়, কী যে একটা হবে। অনুত্তম আর ভাবতে পারল না।

পাহাড় কেটে এখানে খাল করা হয়েছে। দু'দিকে খাড়া পাহাড়, তার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে।

উপর থেকে জল পড়ার শব্দ সকল জাহাজিদের কানে এল। ঝরনার জল পড়ছে। মকবুল বলল, জাহাজ সেই ঝরনার পাশে এসে গেছে।

জাফর আলি বলল, একবার এখানে আমরা কুমির দেখেছিলাম। জাহাজে বড়-মালোম বন্দুক দিয়ে মারতে চেয়েছিলেন কুমিরটাকে। কিন্তু নিগ্রোগুলো বারণ করল। বলল, ক্যানেল-এরিয়াতে কিছু শিকার করা নিষেধ আছে। তিনি কুমিরটা তাই মারলেন না।

জামির আরও সংলগ্ন হয়ে বসল অনুত্তমের। জাহাজ খালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বলে গরম সকলের বেশি লাগছে। অনুত্তম মনের বিরক্ত ভাবটা ঢেকে বলল, আর একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে বোস। ভোররাত পর্যন্ত এখানে সকলকে বসে থাকতে হবে। এত ঘন হয়ে বসলে গরম বেশি লাগবে।

জামিরের কণ্ঠে ফিস ফিস আওয়াজ তখন, যদি খবর আসে পানামা বন্দরে আজ থামাতে হবে।

মাজেদ কথাটা শুনে ফেলল। সে রেগে গেছে।

দ্যাখ জামির, অধিক আশা ভাল না। এবার সফর করতে এসে কার মুখ না জানি দেখে জাহাজে উঠেছিলাম। বসে আছিস, চুপচাপ বসে থাক। কী হবে কী না হবে এখন থেকে বলে লাভ নেই।

মেজ-মালোমের মুখে কোনও কথা নেই। তিনি বসে বসে পায়ের আঙুল নাড়াচ্ছেন। জাহাজে দড়িদড়া টানার শব্দে তিনি শুধু মুখ তুলে একবার দেখলেন, কোথায় এল জাহাজ। বুঝতে পারলেন গ্যালার্ড-কাটে পৌঁছতে আর দেরি নেই।

জাহাজ আবার অনেক ওপর থেকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। আরও নীচে, আরও নীচে নামছে জাহাজ।

পানামা-বন্দরের তীর ছুঁয়ে জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বে সেইসময় মেজ-মালোম শেষবারের মতো দূরবিনটা চোখে তুলে নিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ। পানামা বন্দরের বুকে কোনও মানুষের সাড়া পাচ্ছেন না। জাহাজিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

মেজ-মালোম দূরবিনের কাচটায় এখন অস্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছেন যেন। লাল বাড়িটা থেকে কোনও মানুষ যেন পথের উপর নেমে আসছে। তিনিও অন্যান্য জাহাজিদের মতো দূরবিনের ভিতর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। কাচটায় অস্পষ্ট ছবিটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। তিনি ভাবলেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠুক। জাহাজিদের নিশ্বাস এখন তিনি শুনতে পাচ্ছেন। পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে অনুত্তম। অন্যান্য জাহাজিরা উঁকি দিয়ে আছে। ওরা আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারছে না হয়তো। তিনি বললেন, দেয়ার ইজ সামথিং বাট ।

অনুত্তম বলল, ইয়েস, ইয়েস। দেন?

দেন? শি ইজ এ ফাইন লেডি।

মেজ-মালোম এবার সত্যি ডেকের উপর চিৎকার করে উঠলেন ওম্যান। ওম্যান।

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ডেক-চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। দূরবিনটা হাত থেকে পড়ে গেল। এখন তাই নিয়ে ঝগড়া লেগেছে জাহাজিদের ভিতর। অনুত্তম জোর করে দূরবিনটা টেনে নিল এবং চোখের উপর সেঁটে দিল। কিন্তু মেজ-মালোম তখন বলছেন, শি ইজ আউট অফ সাইট।

অনুত্তম কান্নার সুরে বলে উঠল, হোয়াট?

মেজ-মালোম আর কোনও উত্তর করতে পারলেন না। সামনের একটা গির্জাতে বুড়ি মেয়েটা কখন ঢুকে গেছে। গির্জাতে ঢং ঢং ঘণ্টা পড়তে থাকল। মেজ-মালোম ভাবলেন মেয়েমানুষটা গির্জার ভিতর এখন ঘণ্টি বাজাচ্ছে। পানামা শহরের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে যেন বলছে, এবার তোমরা ওঠো, প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে।

গির্জাতে ঘণ্টাধ্বনি আর বাজছে না। ভোরের সূর্য পানামার তীরে উঠে গেছে। পাহাড় এসে নেমেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। আজ রবিবার। পানামা শহরের মানুষগুলো ভাল পোশাক পরে এখন হয়তো রওনা হয়েছে গির্জাতে।

বোট-ডেকে জাহাজিরা এতক্ষণ অবশ হয়ে বসেছিল। তীরের শেষ বিন্দু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ওরা টলতে থাকল। তারপর ডেক থেকে টলতে টলতে নেমে গেল জাহাজিরা। অবসন্ন মন এবং দেহকে নিয়ে কোনওরকমে ফোকশালে ঢুকে পড়ল।

জাহাজ থেকে কিনারার লোকগুলি ছোট একটা মোটর-বোটে নেমে গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মুখে যে জাহাজগুলো ক্যানেল অতিক্রম করার জন্য বসে আছে এখন সেইসব জাহাজগুলোতে গিয়ে ওরা উঠে পড়বে।

অফুরন্ত শূন্যতা নিয়ে নীচের ডেক-এ নেমে এল অনুত্তম। থামল এসে পাখিদুটোর রাতের আবাসে। রাতের অন্ধকারে পাখিদুটো ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। সে পাখিদুটোর ঠোঁটের উপর ঝুঁকে বসে পড়ল। দিনের পর দিন ধরে সমুদ্রের নীল ঢেউ গুনে এল, আশা— মেয়েমানুষ অন্তত পানামার তীরে চোখে পড়বেই। কিন্তু মনটা চরম আশাহত। পরম প্রত্যাশাগুলা টুকরো টুকরো হয়ে অনেক আগেই ভেঙে গেছে। চড়াইদুটো এখনও ঘুমুচ্ছে। নির্বিঘ্নে, নির্ভয়ে।

পানামা বন্দর কেবল দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। জাহাজ চলেছে আবার ফুলস্পিডে। তীরের রেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবার এক মাস জল শুধু জল। আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার সময় তবু দু'-একটা প্রবালদ্বীপ চোখে পড়েছে, মাটির গন্ধ পেয়েছে তারা, কিন্তু এই সমুদ্রজগতে তাও নেই। ভয়ানকভাবে মুষড়ে পড়ল অনুত্তম।

হয়তো ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে সূর্য উঠেছে অনেক আগে। জাহাজিরা দেখল একদল পাখি উড়ে উড়ে ক্রমশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসছে। পাখির ডানাগুলো প্রকাণ্ড। পাখিরা সমুদ্রপাখি এবং অতিকায়।

পানামা-বন্দর থেকে কয়েকটি জাহাজ একসঙ্গে ছেড়েছে বিভিন্ন বন্দরের উদ্দেশে। জাহাজগুলো এখন বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। পাখির দলটা সমুদ্রের উপর এসে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই জাহাজেরও পিছন নিয়েছে দুটো পাখি। জাহাজটা সমুদ্রের বুকে যে জল কেটে এসেছে সেই জলরেখাব উপর তারা বিশ্রাম নেবার জন্য বসল। সেখানে সাঁতার কাটছে, ঢেউ দিচ্ছে, লুটোপুটি খাচ্ছে, আবার কখনও নীল ঢেউয়ের তলায় অদৃশ্য হযে যাচ্ছে। প্রপেলারের আবর্তে পড়ে যে মাছগুলো ডানা ভেঙেছে, ঠুকরে ঠুকরে পাখিদুটো এখন তাই খাচ্ছে। অনেক আনন্দ ওদের। অনেক সুখী ওরা। জাহাজিরা রেলিং-এ ঝুঁকে আবাব আফসোস করতে আরম্ভ করেছে।

দুটো পাখিকে অনুত্তম অনেকক্ষণ উড়তে দেখল, ডুব দিতে দেখল, সাঁতার কাটতে দেখল। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামছে সমুদ্রে। কোন অসীম থেকে এক খণ্ড মেঘ এসে হাসি-খুশি সমুদ্রকে চঞ্চল করে তুলল। ঝড়ে-পড়া ঢাউস ঘুড়ির মতো পাখিদুটোও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওরা আকাশ থেকে ঝুপ করে সমুদ্রের নীচে হারিয়ে যায়। আবার কখন ভেসে উঠে দিগন্তে উড়ে যেতে থাকে। ওরা ঝড় ভালবাসে। টাইফুনে চকা-চকির প্রেমালাপে রত হয়। জলেব নীচে আর আকাশের তলায় পল্টন খেয়ে বিমুগ্ধ হয়। জলের নীচ থেকে ওরা পুবের সমুদ্রে ভেসে উঠল আবার। জলের উপর হাঁসের মতো সাঁতার কাটছে। সব জাহাজিরা প্রায় ভিড় করেছে গলুইতে পাখিদুটো দেখাব জন্য। তীর দেখা যাচ্ছে না আর। তারা নিঃসঙ্গ। ঝড়ের সমুদ্রে এই পাখিদুটোই তাদের জীবনের বিচিত্র অনুভবের প্রতীক। ওরা সকলে মিলে পাখিদুটোকে নিয়ে বেশ মজে আছে।

একসময় সারেং এসে বললেন, ব্যানার্জি, কাজে যাও রে। মাইজলা-সাব আজ থাইকা তোমারে কাজ করতে কইছে।

অনুত্তম ভিড় থেকে বের হয়ে প্রশ্ন করল, কোন পরিতে?

পরিতে না। ফালতু তুমি। ইঞ্জিন-রুমে পাঁচ নম্বর সাবের সঙ্গে কাজ করবা। দুইটা যা হয় কিছু খাইয়া জলদি যাও।

অনুত্তম ইঞ্জিন-রুমে নামার আগে আর-একবার কাঠের বাক্সটার পাশে গিয়ে বসেছিল। চড়াইদুটো তখন বাচ্চাদুটোকে খাওয়াচ্ছে। সে এখানে এসে বসলে কেমন আহ্লাদে পুলকিত হয়। বাচ্চাদুটোকে খাওয়াতে দেখে সে খুব খুশি হল। দীর্ঘ এক মাসের সমুদ্রযাত্রা। চড়াইদুটোর সমৃদ্ধ পরিবারটিকে কেন্দ্র করেই এক মাসের সমুদ্রযাত্রার নিঃসঙ্গ জীবনকে অতিক্রম করতে হবে।

ইঞ্জিন-রুমের দরজায় এসে দেখল প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে পাঁচ নম্বর সাব বাইশ-টেবিলে কাজ করছেন। স্ক্রেপার ফাইল করছেন তিনি। অনুত্তম তিনটি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে বাইশ-টেবিলটাব পাশে দাঁড়াল। পাঁচ নম্বর সাবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করল। বাঙালি পাঁচ নম্বর সাব অনুত্তমকে খুশি-খুশি দেখে বলল, কী ব্যাপার, খুব যে আহ্লাদ দেখছি!

অনুত্তম খুশি হয়েই জবাব দিল, আর বলবেন না স্যার। বাচ্চাদুটো বড়দের মতো খেতে শিখে গেছে। কী কিচির মিচির করে। কান ঝালাপালা করে দেয়।

ও, তার জন্য!—ঠোঁট ওলটালেন পাঁচ নম্বর সাব। অনুত্তম বড্ড ছেলেমানুষ। তিনি সেজন্য হাসলেন।

আর-একজন জাহাজিকে সারেং ইঞ্জিন-রুমে পাঠিয়েছেন। প্লেটগুলো না ঘষায় জং ধরেছে। লাল হয়ে উঠেছে। খড় খড় করছে পায়ের নীচে। প্লেটের উপর পা ফেলতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই জাহাজি এসে প্রথম অনুত্তমেব পাশে দাঁড়াল। কানেব কাছে মুখ নিয়ে বলল, একটা বিশেষ খবর আছে।

অনুত্তম বিস্মিত হল। খবর। কীসের খবর। জাহাজে কি আবাব হুলা-হুলা নাচ আরম্ভ হল? জাহাজিরা কি আবার খেপে গেছে? মাজেদ কি আবাব উলঙ্গ হয়ে নাচছে? কী যে কবে মাজেদ। এনারদ্দি, জমির, জাফর ওকে উসকায়। উসকিয়ে উসকিয়ে ওর মেজাজকে বিগড়ে দেয়। কী দরকার বাপু ভাল মানুষটাকে খেপিয়ে। খেপে গেলে তো আর রক্ষে থাকে না। তখন যা খুশি তাই করে।

কীসের খবর?—অনুত্তম প্রশ্ন কবল। একটা স্ক্রেপার হাতে তুলে দেখল ঠিকমতো ফাইল হয়েছে কি না। আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দেখল। কিন্তু সেই জাহাজি তখনও চুপ কবে বসে আছে। সে মনে মনে রাগ করল।

কী রে? চুপ করে যে আছিস বড়?

খবরের বুকে বহস্য জড়াবার জন্য বলল জাহাজিটা, আছে, আছে। খবব আছে।

অনুত্তম পাঁচ নম্বরকে আব-একটা ফাইল দিয়ে বলল, ঠাট্টা করছিস বুঝি? মাজেদ পাগলামি শুরু করে দেয়নি তো আবার?

জাহাজিটা হাতে ছোবড়া নিয়ে প্লেট ঘষতে বসল।

খবরটা গোপন কবছিস কেন? বল না কীসের খবব।

সে জাহাজি প্লেটের উপবে ঝুঁকে বলল, জাহাজের পিছনে যে অ্যালবাট্রস দুটো উড়ছিল ওবা এখন এসে মাস্টে বসেছে।

অনুত্তম অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি। তাই নাকি।

হ্যাঁ, মিথ্যে বলছি না। লেডি অ্যালবাট্রস তো পাবলে গ্যালির ভিতব ঢুকে পড়ে।

লেডি অ্যালবাট্রস বুঝি কিছু খেতে চায়? কিছু মাংসেব কুচি ছুঁড়ে দিলেই পাবতিস।

পাঁচ নম্বর সাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, অ্যালবাট্রস পাখি জাহাজেব পিছনে কতদিন উড়তে পারে?

জাহাজটা যতদিন চলবে ততদিন। হাজার-হাজাব মাইল।

কীসের আওয়াজে ওরা তিনজনেই উপবের দিকে চোখ তুলে দিল। ওবা দেখল উপরে স্কাই-লাইটের ভিতব একটি উৎকণ্ঠিত মুখ। মাজেদ চিৎকার করে কী যেন বলছে। ইঞ্জিনেব বীভৎস আওয়াজে শব্দগুলো অস্পষ্ট। শব্দগুলো আওয়াজেব ভিতব ঢাকা পড়েছে। শেষ শব্দটা সিলিন্ডারের পিঠে ধাক্কা খেয়ে ইঞ্জিনেব তীব্র আওয়াজেব ভিতবও অনুত্তমের কানেব কাছে কাছে এসে থমকে গেল, ডেড।

ডেড। ধক করে জ্বলে উঠল অনুত্তমের চোখ। নীল জলে ফসফরাস জ্বলাব মতো চোখ থেকে আগুন বের হচ্ছে। সিঁড়ির রড ধরে উপরে উঠে স্কাই-লাইটের ভিতর মুখ বাড়াতেই শুনল, মেয়ে-চড়াইটা মরেছে। ছোট চিড়িয়া পাখিটা ওটাকে খেয়ে ফেলেছে।

অনুত্তম কোনওরকমে স্কাই-লাইটের ভিতর থেকে বোট-ডেকে উঠে এল। পা দুটো উত্তেজনায় কাঁপছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন। কোনওরকমে টাল সামলে আবার সে ছুটল মেজ-মালোমের কেবিনে। কিন্তু কেবিনের দরজা বন্ধ। ভিতরে তিনি নেই। নিশ্চয়ই তিনি ব্রিজে আছেন এখন। অনুত্তম অ্যাকোমডেশন-ল্যাডারের পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল। চিৎকার করে ডাকল, সেকেন্ড, সেকেন্ড, গেট ডাউন প্লিজ। মিসেস স্প্যারো ডেড, সোয়ালোড বাই লেডি অ্যালবাট্রস।

যত জোরে ডেকেছিল অনুত্তম তার চাইতে বেশি জোরে নেমে এসেছিল মেজ-মালোম। কেবিন থেকে বন্দুকটা হাতে নিয়ে এসেছেন তিনি। বোট-ডেকে এসে দাঁড়ালেন। বন্দুকের উপর একটা হাত

ভর করে রেখেছেন। দেখলেন, অ্যালবাট্রস দুটো অনেক দূরে। বন্দুকের পাল্লার বাইরে, ঢেউয়ের চড়াই-উতরাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে ওঠা-নামা করে দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। বন্দুক তুলে এক-এক করে কয়েকটা গুলি করলেন তিনি। কিন্তু সব ক'টা আওয়াজই ঢেউয়ের ভিতর ডুবে গেল। মেজ-মালোম খেপে গেলেন।

মেজ-মালোম বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে শপথ করেছিলেন, লেডি অ্যালবাট্রসকে তিনি খুন করবেন। হাতের উপরটা বন্দুকটা চেপে গজ গজ করছেন। অনুত্তম ভাবল, জাহাজে একটা খুন-খারাপি হবে।

জাহাজিরা যে জগৎটিকে নিয়ে মুগ্ধ ছিল সেখানে সে জগৎটি নেই। অনুত্তম কাঠের বাক্সটার সামনে গিয়ে বসল। দেখল, তার পুরুষ-চড়াইটা পর্যন্ত কোথায় পালিয়েছে। বাচ্চা দুটো পায়ের আওয়াজে কিচ কিচ করে উঠল। ওরা যেতে চায়। পুরুষ-চড়াইটা থাকলে আর কিছু না হোক, বাচ্চাদুটো বাঁচত। ওরা বড় হত। উড়তে পারত আবার ডেক-এ। পুরুষ-চড়াইটা কোথায় গেল! কাঠের বাক্সটার সামনে বসে ভাবতে ভাবতে আনমনা হল সে।

কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকবে সে। পাখিটাকে খুঁজতে হয়। পুরুষ-চড়াই হয়তো ইঞ্জিন-রুমের কোনও অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। সেজন্য অনুত্তম ইঞ্জিন-রুমে নেমে গেল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সমস্ত ইঞ্জিন-রুমে শিস দিয়ে বেড়াল। কোথাও নেই। কোনও খোঁজ পেল না। ফলকায় খুঁজছে। মেজ-মালোমের কেবিনে উঁকি দিয়ে বলে এসেছে, পুরুষ-চড়াইটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু মেজ-মালোম উত্তর করেননি। বন্দুকের উপর থুতনি রেখে বাংকে বসে আছেন। মিসেস স্প্যারোর মৃত্যুতে তিনি কেমন আরও হতাশ হয়ে পড়েছেন।

ফোকশালে ঢুকে অনুত্তম দেখল, মাজেদ, জাফর উন্মুখ। জামির বলল, পেলি খুঁজে?

অনুত্তম হাত-পা বাংকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, না, কোথাও পেলাম না। ক্যাপ্টেন, মেজ-মিস্ত্রি সকলে আজ আফসোস করছেন।

হঠাৎ অনুত্তমের সমস্ত অভিমানটা মাজেদের উপর ভেঙে পড়ল, তোরা ডেক-এ কাজ করিস, মেয়ে-চড়াইটার দিকে একটু নজর রাখতে পারলি না। ছিঃ ছিঃ, অসহায় দুটো পাখিকে তোদের মতো সাঁই সাঁই জোয়ান জাহাজিরা থাকতে রক্ষা করতে পারলি না!

অনুত্তম বাংকের উপর শুয়ে সকল জাহাজিদের গাল দিল।

তোরা মরে যা। সব মরে যা। কোনও দরকার নেই তোদের মতো পুরুষ-মানুষ জাহাজে থাকার।

মাজেদ, জাফর নিজেদের অপরাধী ভাবল। তারা মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনুত্তমের সামনে। কোনও জবাব দিল না। অনুত্তম সেই দেখে বালিশের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

বিকেলে অনুত্তম ডেকের উপর পায়চারি করেছে। পাহারায় থেকেছে কখন অ্যালবাট্রস দুটো বন্দুকের পাল্লার ভিতর আসে। মেজ-মালোমও চেয়ারে বন্দুকটা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষায় আছেন। জাহাজিরা ডেক-এ নামতে-উঠতে পাখিদুটোর গতিবিধি লক্ষ রাখল। কিন্তু সমস্ত দিনমান পাখিদুটো আকাশের উপর উড়েই চলেছে। জাহাজের পিছন পিছন এখন আসছে তারা। বন্দুকের পাল্লায় ভুলেও একবার এল না।

বিকেল গড়িয়ে রাত এল ডেক-এ। অনুত্তম ভেবেছিল রাতে এসে অন্তত পাখিদুটো মাস্টে বসবে। সমস্ত দিনের পর ডানায় যখন ক্লান্তি নামবে, রাতের অন্ধকারে যখন বুঝবে ডেক-এ কেউ নেই তখন ঠিক মাস্টে এসে বসবে। দেখেছে—পাখিদুটো মাস্টের উপর আশ্রয় নেয় কি না। কিন্তু তারা জাহাজে আসেনি। হয়তো সমুদ্র-বুকে এখনও উড়ছে, নয়তো কিনারায় ফিরে গেছে।

সারা রাত জেগে ভোরবেলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল অনুত্তম। একটা দুঃস্বপ্নে সে এখন ছটফট করছে বাংকের উপর। লেডি অ্যালবাট্রসের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। লেডি অ্যালবাট্রসের কান্নায় সমস্ত চরাচর বুঝি কাঁদছে। পড়শির মুখ জানালার পাশে। সেখানেও সে পাখিটার জন্য কান্না দেখতে পেল।

এক তীব্র আওয়াজে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেল অনুত্তম। বাংকের উপর বসে স্বপ্নটার কথা ভেবে চোখ রগড়াল। জাহাজের গলুইতে কতগুলো মানুষের ছুটে যাওয়ার আওয়াজ উঠছে। সিঁড়িতে

একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের উপরে ওঠার শব্দ হচ্ছে। ওরাও যেন ছুটছে। এমন সময় একজন জাহাজি উপরে ওঠার মুখে বলে গেল, শিগগির অনুত্তম।

আর-একজন জাহাজি মুখ বাড়াল। সেও উপরে ছুটছে।

পুরুষ-অ্যালবাট্রসটা খুন হয়েছে।

খুন। আর-একটা মৃত্যু জাহাজে। একের পর এক মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসছে জাহাজ-ডেকে। অনুত্তম আর ভাবতে পারল না। সেও সিঁড়ি ধরে ডেক-এ উঠে গেল। গ্যালি পার হয়ে দেখল মাস্টের গুঁড়িতে মেজ-মালোম। পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে পুরুষ-অ্যালবাট্রসটা। জাহাজিরা ঘিরে দাঁড়িয়ে পাখিটার মৃত্যু দেখছে। লেডি অ্যালবাট্রস চিঁ চিঁ করতে করতে ছুটছে ঢেউয়ের দেশ পেরিয়ে অন্য কোনও এক দেশে। আকাশের নীলিমাতে ভয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

অনুত্তম একান্ত চুপ হয়ে দাঁড়াল পাখিটার পাশে। ওর বুক চৌচির হয়ে গেছে। রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে। মাঝে মাঝে ফাঁক করে দিচ্ছে ঠোঁটদুটো। সমস্ত ডেক জুড়ে প্রায় পাখা দুটো নড়ছে। অন্য দেশের ছাড়পত্র চাইছে। সেই সঙ্গে একফোঁটা জল, জল চায়। অনুত্তম ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল। ঠোঁটের ভিতব জল ঢেলে দিল। মনটা হুঁ হুঁ করে উঠছে।

পাখিটা বাঁচল না।

কী ভেবে অনুত্তম চেয়ে আনল বাঁইবেলটা। ক'জন জাহাজিকে সাব কবে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রার্থনা করল। যেমন করে একজন নাবিকের মৃতদেহ সলিল-সমাধি দেওয়া হয় ঠিক তেমনি সাগরের চিড়িয়াকে সাগরের অতলেই ডুবিয়ে দেওয়া হল। অনুত্তম দেখল আর-একটা জীবন, যেখানে ছিল লেডি অ্যালবাট্রসের মতো মেয়ে জগৎ, যাদের বিচরণ ছিল সমুদ্র আব আকাশে, দুর্যোগের রাতে নীল ঢেউ ছিল যাদের পোতাশ্রয়, তেমনি একটি পৃথিবীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা জীব ধীরে ধীরে নীল সাগরের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

লেডি অ্যালবাট্রসের কান্না তখনও থামেনি। সে আবার জাহাজের দিকেই ফিরে আসছে। বিশ্ব-চরাচর জুড়ে সে তাব কান্নাকে ছড়িয়ে দিল। সাগরকে সাক্ষী রাখল। পুরুষ অ্যালবাট্রসটা এখন যে সমুদ্রেব উপর ভেসে আছে সেখানে গিয়ে বসল। তার নোনা কান্নাব দু' ফোঁটা চোখের জলে সাগরেব জলকে আরও গভীর করে দিয়ে শেষে আকাশের নীচে উড়ে চলল।

পাখিটা জাহাজের পিছুন নিয়েছে ফের।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব দেখতে দেখতে আজ অনুত্তমের মনে পড়ল মজিদকে। নোনা-জলের অতলে সে হয়তো সম্পূর্ণই হারিয়ে গেছে। ওর বিবির কবরের পাশে আজও হয়তো চেরাগটা জ্বালছে কেউ। নুয়ে নুয়ে ডেক পার হবার সময় হৃদয়ের গভীবে বিশ্ব-চরাচরের অদ্ভুত এক কান্নাকে উপলব্ধি করে সে টস টস করে ডেকের উপর চোখেব জল ফেলল। সমস্ত সমুদ্রটা পড়শির মতো হয়ে চোখের উপর ভাসল। গভীর আত্মোপলব্ধিতে সে চোখ বুজল এবার।

নীল সমুদ্র।

নীল ঢেউ।

নীল আকাশ।

অনেকগুলো নীল মৃত্যু দুঃসহ শূন্যতা এনে দিয়েছে জাহাজ-ডেকে।

নীরস ডেক আর-একটা নীল মৃত্যুর অপেক্ষায় হাহাকার করছে। লেডি অ্যালবাট্রস খুন হবে, ফিনকি দিয়ে নীল রক্ত ছুটবে, ডেক ভিজবে। মেজ-মালোম গজগজ কবছেন, গড়গড় করছেন, লেডি অ্যালবাট্রস মেয়ে-চড়াইটাকে খুন করেছে, খুনের আসামি এখনও জাহাজে ভিড়ছে না, সমুদ্রের নীল অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু মেজ-মালোমের নজর এড়ানো কষ্ট। অনেক ঢেউ পার হয়ে তার দৃষ্টি, তার নজর। প্রপেলারটা যে জল কেটে এসেছে তার উপর পাখিটা বসেছে। যে ছোট ছোট মাছগুলো পাখার আঘাত মারছে, পাখিটা ডুবে ডুবে তাই খাচ্ছে।

দিনের পর দিন মেজ-মালোম বোট-ডেকে পায়চারি করলেন বন্দুকটা হাতে নিয়ে। ব্রিজে পায়চারি করার সময় নজর রেখেছেন দূরে। কোনওদিন দেখেছেন পাখিটা আকাশে উড়ে নীলিমাতে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার কোনওদিন দেখেছেন সেই নীলিমা থেকেই সে আত্মপ্রকাশ করছে।

কতদিন লেডি অ্যালবাট্রস জাহাজকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে উড়ল। কত ঝড়ের রাতে পাখিটার কান্না তিনি শুনতে পেয়েছেন। চি-হি, চি-হি করে কাঁদছে। ঝড়ের দুরন্ত ঘূর্ণিতেও কান্না থামেনি ওর। প্রতিদিন ভোরে অনুত্তম গলুইতে উঠে বেঞ্চিতে বসত। মেজ-মালোমের মতো সেও দেখত পেত পাখিটা জাহাজের পিছনে উড়ে উড়ে আসছে। কিন্তু এভাবে সে আর কতদিন উড়বে। হয়তো সে জানে জাহাজ একদিন তাকে তীরে পৌঁছে দেবে। তার আগে যদি মেজ তার বুক চৌচির করে রক্তে আবার ডেক ভেজায়! বেঞ্চিতে বসেই অনুত্তম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, লেডি অ্যালবাট্রস যেন বন্দুকের পাল্লার ভিতর উড়তে উড়তে চলে না আসে। কোনওরকমে আর কিছুদিন সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে কিনারায় যেন ভিড়ে যায়।

অনুত্তম এই বেঞ্চিতে বসেই ভাবত দীর্ঘ একটানা সমুদ্রযাত্রার দিন-রাত্রির একঘেয়ে রংগুলো শেষ হবে কী করে। ভাবতে তার আরও আশ্চর্য লাগে দিন-রাত্রির নিস্তরঙ্গ জীবন একভাবে না একভাবে ঠিক শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভোরে উঠে এই বেঞ্চিতে বসা, লেডি অ্যালবাট্রসের সমুদ্র-বিচরণ দেখা, সমুদ্র-গর্জন শোনা, ইঞ্জিন-রুমের ফালতুর কাজ, দু'বেলা দু' মুঠো আহার, বিকেলে আবার সমুদ্র-দর্শন, সমুদ্রপাখির কান্না শোনা। রাতেও সে কান্না শুনতে পায়। গভীর রাতে পাখিটা শুধু কাঁদে না। গভীর বাতে সমুদ্র-গর্জনের সঙ্গে সে কান্নার আওয়াজ মিশে থাকে না।

গভীব রাতে সে ডেক-এ উঠে দেখল সোনালি চাঁদ রুপালি রাজ্য সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রপাখি সে রাজ্যে উড়ছে না যেন। ডেক-জাহাজিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেজ-মালোম আটটা-বারোটা পরি শেষ করে কেবিনে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। দু' উইংস-এর দুটো আলো জাহাজকে সমুদ্রের উপর স্পষ্ট করে রেখেছে।

অনুত্তম ভাবল, এ সময়ে লেডি অ্যালবাট্রস এসে যদি জাহাজে আশ্রয় নিত, গলুইতে এসে যদি পাখা ছড়িয়ে বসত। ওর ইচ্ছা হল, মেয়ে-চড়াইয়ের মতো গল্প গলুইতে আবার জমে উঠুক। জাহাজিরা বসুক গোল হয়ে। চড়াইয়ের জীবনকে লেডি অ্যালবাট্রসের ভিতর খুঁজে পাক। তারপর ভোররাতে মেজ-মালোমের অলক্ষে সমুদ্র-দিগন্তে উড়ে যাক পাখিটা। সমুদ্রের অসীমে হারিয়ে গিয়ে আবাব আবার তার পুরুষ অ্যালবাট্রসের জন্য কান্না জেগে উঠুক। ভেবে, অনুত্তম গ্যালি পার হয়ে টুইন-ডেকে নামল। সুখানি নেমে আসছেন বোট-ডেক থেকে। চায়ের একটা মগ হাতে। সুখানি হয়তো এখন প্রশ্ন করবে, তুমি এখন ডেক-এ ব্যানার্জি?

হ্যাঁ, ডেক-এ আছি। ফোকশালে আর ভাল লাগছে না। এই জবাব দেবে ভাবল অনুত্তম। কিন্তু সুখানি এদিকে না এসে বোট-ডেক থেকে নেমে অফিসার গ্যালিতে ঢুকে গেল। সেখানে আগুন জিয়ানো আছে। চা গরম হবে।

অনুত্তম ডেকের উপর হেঁটে এসে সোনালি চাঁদকে দেখল। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এক অফুরন্ত নীল বিস্মৃতির ভিতর রুপালি রাজ্যকে অনুভব করতে চাইল। লেডি অ্যালবাট্রস রুপালি রাজ্যেব অসীমে, ঢেউগুলোর আবর্ত-অন্ধকারে উত্তাপ পাওয়ার জন্য হয়তো জলের ফসফরাসে ঠোকরাচ্ছে এখন। ঢেউয়েব মাথায় চুমকি বসানো নীল রাত্রিকে শাপ-শাপান্ত করছে।

সোনালি চাঁদ বহস্য ছড়িয়ে রেখেছে বিশ্ব-চরাচরে। নীল আকাশ। দুঃসহ আকাশ। হাজার নক্ষত্রের রাত-আকাশে। লেডি অ্যালবাট্রসের কান্নার উত্তাপে সে রাতগুলো আর কত গরম হবে? লেডি অ্যালবাট্রসের হিমেল স্পর্শে বা সে আকাশে কতটা শান্তি নেমে আসবে?

কিন্তু অনুত্তম জানে তার মনের সৌরলোকে সে বেদনা অসীম, অপার। হাজার নক্ষত্র-রাতের চেয়ে তার এই জাহাজের রাত, পাখিটার কান্না, তিন-তিনটি মৃত্যু অনেক বড় সত্য জীবনে। সৌরলোকের কাছে সে যত ক্ষুদ্র হোক, আকাশের বেদনার কাছে সে যত ক্ষীণ হোক, জাহাজ-ডেকে সে কান্না একটি মানুষেরই কান্না।

সৌরলোকের এই নিদারুণ সুখ-দুঃখের ভিতর সহসা অনুত্তম আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনার সময় দেখল লেডি অ্যালবাট্রস মাস্টের মাথার উপর। গভীর রাতে সেই জন্যই কান্না শুনতে পায়নি তার। প্রতিদিন রাতে যখন সব ডেক-জাহাজিরা ঘুমিয়ে পড়েছে, যখন মেজ-মালোম পরি শেষ করে শেষবারের মতো পাখিটাকে অনুসন্ধান করে কেবিনে ঢুকে গেছেন, তখন হয়তো সে এসে মাস্টে

আশ্রয় নিয়ে রাত যাপন করেছে। হয়তো ভোররাতে আবার সমুদ্রে নেমে গেছে।

সে মাস্টের নীচে দাঁড়িয়ে দেখল পাখিটা নির্বিঘ্নে বসে আছে। বুঝি-বা ঘুমুচ্ছে। হয়তো ভোররাতে জাগবে। ভোররাতে উড়বে। কোনওদিন যদি সেই রাতের শেষে ঘুম না ভাঙে, মেজ-মালোম বোট-ডেক ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। তারপর হয়তো একটি শব্দ। আর একটি কান্না। জাহাজ-ডেকটা শেষবারের মতো রক্ত এবং কান্নার দুঃখে ব্যথিত হবে। বিষণ্ণ হবে। অনুত্তম আস্তে আস্তে মাস্টের গুঁড়িতে বসে পড়ল। আর সে ডেকটাকে বিষণ্ণ হতে দেবে না। মনে মনে বলল, তুমি ঘুমোও, আমি পাহারায় থাকি।

সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে মাস্টের নীচে বসে থাকল। পাখিটা কতকাল থেকে উড়ছে। ডানার পালকগুলোতে পর্যন্ত ক্লান্তি নেমেছে। স্নিগ্ধ নীল চোখদুটোতে ওর ঘুম। গভীর ঘুম।

ঠান্ডা হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। অনুত্তমের শীত শীত করতে লাগল। তবু হাঁটুর উপরই মুখ গুঁজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানত না, যদি না পড়শিকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙত। কী সব আজগুবি স্বপ্ন! একটি বিদেশি মেয়ের মুখ, চোখ তার নীল, গোলাপি রঙের দেহ অথচ হুবহু পড়শির মতো। তার নাকি বাচ্চা হবে। অন্য একজন অত্যন্ত অপরিচিতা বিদেশি মেয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলছে, আপনি সৌভাগ্যবান, পড়শি পুরুষ-সন্তান প্রসব করেছে। সে যেন দরজার গোড়ায় পায়চারি করতে করতে এতক্ষণ অবসন্ন হয়ে পড়ছিল, এখন একটি কান্না শুনে ভেবেছে, পড়শি মা হল।

কিন্তু বিদেশিনী খাঁচায় করে শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা বের করে দিল। পড়শির সন্তান খাঁচার ভিতর নড়ছে না। বিদেশিনী অনুত্তমের হাতে খাঁচাটা দিয়ে বলল, ভাগ্য মন্দ আপনার। পড়শির সন্তান মারা গেছে।

সমুদ্রের জলে সে এবার খাঁচাটা ডুবিয়ে দিল। তখনই সে স্বপ্ন থেকে জেগেছে। পুব দিগন্তে চেয়ে দেখল শেষ রাতের আলোটুকুই আকাশের কিনারাতে ধূসর হয়ে উঠেছে। ভোরের রং চড়ছে। চড়াইয়ের বাচ্চাদুটো মরে গেছে কবে। সে ভাবল এবার, জাহাজে তিনটি মৃত্যু হয়নি। বাচ্চাদুটোর মৃত্যুকেও মৃত্যু বলে ভাবল। ঠিক সেই সময় হাত দুটো উপরের দিকে তুলে হুস করল। লেডি অ্যালবাট্রসকে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ফোকশালে নেমে শিস দিল দুটো। কিন্তু তখনও সে সময় সময় পুরুষ-চড়াইকে জাহাজের অলিগলিতে খুঁজছে। এই অনুসন্ধান তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

দিন আসে জাহাজে। রাতও আসে। তবু অনুত্তমের মনে হয় এই দিন বুঝি আর শেষ হবে না। এই রাত শেষে জাহাজ-ডেকে ভোর বুঝি আর আসবে না।

সবই হয়। দিনের পর দিন প্রপেলার যত পাক খাচ্ছে, জাহাজিদের মন বন্দরের প্রত্যাশায় তত বেশি উন্মুখ হচ্ছে।

অনুত্তমকে চুপ করে গলুইয়ের বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে মাজেদ তাকে আশার কথা শোনাল, বন্দরে কার্নিভেল আছে। অনুত্তম আর মাজেদ একসঙ্গে যাবে। তামাশা দেখবে। কোম্পানির ঘরে পাঁচশো টাকা আছে। না হয় সবটাই তুলবে।

অনুত্তম উত্তর করেছিল তখন, হয়তো শুনব জাহাজ নিউ-প্লাইমাউথ যাবে না, অকল্যান্ডে যাবে। আবার দিন গুনব বসে। তার চেয়ে বরং দিন না গুনে বসে থাকি, যেদিন জাহাজ মর্জিমতো ভিড়বে সেদিনই নামব।

সে হিসেব করে দেখল আরও প্রায় দু'হাজার মাইলের মতো সমুদ্রের জল ভাঙতে হবে প্রপেলারটাকে। আরও প্রায় ন'রাত্রি মাস্টের নীচে বসে পাহারা দিয়ে পাখিটার রাত্রি-যাপনে সাহায্য করতে হবে। তারপর বন্দরে মেজ যখন মেয়েমানুষ পাবে তখন চড়াই পাখির দুঃখটা ভুলে নিজের সেই ভাড়াকরা স্ত্রী-জগৎ নিয়ে ডুবে থাকবে। লেডি অ্যালবাট্রসকে খুন করার তখন কোনও প্রশ্নই থাকবে না।

মাজেদ অনুত্তমের পাশে বসে আগামী বন্দর সম্বন্ধে ছবি আঁকছে। নিউ-প্লাইমাউথ বন্দর, পাহাড়ি বন্দর সমুদ্রের তীর থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। চড়াই-উতরাই পথ। পথের দু'পাশে আপেল

গাছ। গাছে গাছে আপেল ঝুলছে। আপেল সংগ্রহ করছে মেয়ে-পুরুষ। মাজেদ এমন সব ভাবল বসে বসে।

মেয়ে-পুরুষদের অনেকগুলো ছবি অনেক রকমভাবে অনুত্তমের মনের দরজায় এখন উঁকি মারছে। মেজর জন্য যে মেয়েটা বন্দরে অপেক্ষা করবে সে না জানি দেখতে কেমন। পড়শির মতো দেখতে নিশ্চয়ই হবে না। যদি সে কোনও মেয়েকে খুঁজে পায় ঠিক পড়শির মতো দেখতে তবে সেও মাজেদের মতো কোম্পানির ঘর থেকে সব টাকা তুলবে। একটি পরিপুষ্ট হিসেবে ওর মন আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল। সেখানে পড়শির দেহকে সে আরও খোলাখুলি ভাবে দেখল।

প্রশান্ত মহাসাগরের দিনগুলো উজ্জ্বল দিন। কয়েকদিন থেকে রাতগুলোও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সমুদ্রে ঝড় নেই, কুয়াশা নেই। আকাশে মেঘ জমছে না। দিগন্ত-বেলায় সমুদ্র কচ্ছপের পিঠের মতো বেঁকে গেছে। সেখানে দু'-এক খণ্ড মেঘ জমে, কিন্তু আঁধার রাতে তারা পৃথিবীর অন্য আঁধারে আশ্রয় নেয়। সে অনেক দিন সমুদ্রে তিমি মাছ দেখার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। কিন্তু কোথাও আজ পর্যন্ত তিমি মাছ জলের উপর ভেসে উঠল না। তবে এখন আর আক্ষেপ নেই। লেডি অ্যালবাট্রস সমুদ্রের উপর আর-একটি মিষ্টি জগৎ সৃষ্টি করেছে। অনুত্তম গলুইয়ের বুকে বেঞ্চিতে বসে সে জগৎকে নিয়ে এখন বিমুগ্ধ থাকে।

সে জাহাজ-ডেকে রাত্রিগুলোকে পাহারা দিত সন্তর্পণে। কোনও-কোনও দিন গভীর রাতে ডেকের উপর পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠত। মেজ-মালোম বন্দুক নিয়ে বোট-ডেকে হামাগুড়ি দিচ্ছেন না তো! চোখ মেলে সে জাগত। জাফর বোট-ডেক দিয়ে নামছে। ফরোয়ার্ড-পিকে মিডলওয়াচের পরি শেষ করে গলুইতে ফিরছে। ওরই পায়ের শব্দ। জাফরকে ডেকের উপর দেখেই সে আড়াল করে রাখত নিজেকে। উইনচ-মেশিনের পাশে মাথাটা নুইয়ে দিত। তারপর মাস্টের উপর চেয়ে যখন দেখতে পেত পাখিটা নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে, তখন আবার দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকত। যখন পুবের আকাশটা পরিষ্কার হতে আরম্ভ করত অথবা সোনালি চাঁদের রূপটাকে ফ্যাকাসে হতে দেখত তখন সে হুস করত হাত তুলে। পাখিটাকে তাড়িয়ে রাত্রির হিসেব করত, আর ক'রাত্রি, আর কতদিন!

অনুত্তম মাঝে মাঝে বেঞ্চিতে বসে ভাবত মেজ কি মেয়ে-চড়াইকে তার চেয়ে বেশি ভালবেসেছিল! মেজ কি মেয়ে-চড়াইটার ঠোঁটদুটোয় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোনও মিষ্টি-ঠোঁটের রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! চড়াইটাকে নিয়ে সকল জাহাজিরা এখনও সে জগৎকে ভেঙে নতুন বন্দরের প্রতীক্ষায় আছে। তিনিও সেই বন্দরের প্রতীক্ষায় থাকুন না। সে গলুই থেকে দেখল মেজ ব্রিজ থেকে দূরবিন দিয়ে লেডি অ্যালবাট্রসকে দেখছে। দক্ষিণ-সমুদ্রে পাখিটা বিচরণ করছে। মেজ উদ্বিগ্ন। অনুত্তমকে দুটো রূপই বিস্মিত করল।

আজকাল ইঞ্জিন-রুমে অনেক কাজ অনুত্তমের। ফিল্টারের পাইপ বদলানো, এভাপরেটারের তামার পাইপ স্ক্রেপ করা, টেস্ট টিউবে বয়লার-ওয়াটার রাখা, পাঁচ নম্বর সারেকে হাতের কাজ এগিয়ে দেওয়া, অনেকগুলো কাজের হিসাব টেনে সে ইঞ্জিন-রুমে নেমে গেল। নেমে যাওয়ার আগে দেখেছিল লেডি অ্যালবাট্রস জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। মেজ-মালোম নজর রেখেছেন তার উপর। মেজর উপর মনটা বিদ্রোহ করতে চাইল। ভাবল, বিকেলবেলায় মেজর সঙ্গে পাখিটা সম্বন্ধে মোকাবিলা করবে। বলবে, মেয়ে-চড়াইটার জন্য তোমার যে এত দরদ ছিল আমার দরদ তার চাইতে কোনও অংশেই কম ছিল না। মিসেস মরেছে বলে তুমি যতটা আঘাত পেয়েছ আমি তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেয়েছি। সে আঘাত আমি ভুলেছি, তুমিও ভুলে যাও। এসো না আমরা সব ভুলে লেডি অ্যালবাট্রসকে আবার ভালবাসতে শুরু করি। তুমি আর আমি আবার একটা স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করি জাহাজে।

মেজ-মালোম ব্রিজে পায়চারি করছেন। পাখিটা ক্রমশ উড়ে আসছে এদিকে। দুশ্চিন্তায় অনুত্তম খুব অন্যমনস্কভাবে ফিল্টারের পাইপ বদলাল আজ। বয়লার-কক থেকে টিউবে গরম জল রাখল।

এভাপরেটার খোলা হয়েছে। দরজার সঙ্গে তামার কয়েল করা পাইপ আঁটা। পাইপগুলোয় নুনে ভরা। অনুত্তম বসে বসে সেগুলো স্ক্রেপ করতে থাকল।

স্কাই-লাইটের ভিতর আজ আবার একটি মুখ। মুখে দুশ্চিন্তার রেখা স্পষ্ট। উৎকণ্ঠিত সে। মেয়ে-চড়াইটার মৃত্যুর দিনে এমনি মুখ সে স্কাই-লাইটের ফাঁকে উঁকি মারতে দেখেছিল।

মাজেদ সিঁড়ি ধরে তরতর করে নেমে আসছে। কয়েল-করা পাইপ থেকে চোখ তুলে অনুত্তম এখন কোনও দুর্ঘটনার প্রত্যাশা করছে। ওর হৃৎপিণ্ড কয়েল করতে থাকল। মাজেদ এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। কিন্তু উভয়ে নির্বাক। মাজেদ খুব হাঁপাচ্ছে। জোরে শ্বাস ফেলছে সে। মুখ খুলে শ্বাস ফেলল। বলল, তাড়াতাড়ি উপরে চল। লেডি অ্যালবাট্রসকে খুন করতে যাচ্ছে মেজ-মালোম।

অনুত্তম ঢোক গিলে বলল, পাখিটা জাহাজে ফিরে এল আবার!

মাজেদ আর অনুত্তম সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। প্রথম সিঁড়িটা অতিক্রম করে কশপের ঘর পার হবার সময় মাজেদ বলল, দু'নম্বর মাস্টে এসে পাখিটা বসেছে। মেজ-মালোম ব্রিজের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

খাড়া সিঁড়ির দু'রড ধরে উঠছে দু'জন জাহাজি। ওরা উন্মাদের মতো ছুটছে।

জাহাজি দু'জন সিঁড়ি থেকে স্কাই-লাইটের ভিতর মুখ বাড়াল। আরও উপরে উঠবে তারা। বোট-ডেকে উঠবে। আরও সিঁড়ি ভাঙবে।

মেজ-মালোম এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছেন ব্রিজে। খুব সন্তর্পণে। মাস্ট থেকে পাখিটা যেন দেখতে না পায়। তিনি মাথা এবং বন্দুকের নল আড়াল করে এগোচ্ছেন। ট্রিগারের উপর আঙুলটা কাঁপছে।

মাজেদ স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়ে বোট-ডেকে উঠে গেল। অনুত্তম ওঠার জন্যে শেষ তিনটি ধাপ অতিক্রম করবে, এমন সময় সে দেখল মেজ ফায়ারিং করবার জন্য বন্দুক তুলে ধরেছেন। ট্রিগারের বুকে একটা আঙুল চেপে বসছে।

লেডি অ্যালবাট্রস খুন হচ্ছে দেখে অনুত্তম শিউরে উঠল। শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে-ধমনীতে রক্তের কালো কালো দাগ পড়ছে। বুকটা শুকিয়ে গেল। সে সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যেন ডেক, বোট-ডেক, ব্রিজ সব। মেজ-মালোমের মুখ মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেছে। অনুত্তম চিৎকার করে উঠল, সেকেন্ড!

মুহূর্তের ভিতর মনে হল সে অন্ধ হয়ে গেছে। তিনটি ধাপের শেষ ধাপে ওর হাত ঠেকছে না। পায়ের নীচে কোনও অবলম্বন নেই। সে কি শেষ পর্যন্ত পাখি হয়ে গেল! সে কি দুর্যোগ-রাতে নীল আকাশে জাহাজিকান্নার উত্তাপ পাওয়ার জন্য লেডি অ্যালবাট্রসের প্রেতাত্মার সঙ্গে উড়ছে।

মেজ-মালোম বন্দুক তুলে ফায়ারিং করেছিলেন। হাত কেঁপেছিল। ট্রিগারের উপর আঙুল কেঁপেছিল। অনুত্তমের মুখে আর্ত-চিৎকার শুনেছিলেন, সেকেন্ড। লেডি অ্যালবাট্রসের পাশ কেটে গুলিটা বের হয়ে গেছে। লেডি অ্যালবাট্রস উড়ছে না। নড়ছে না। কিন্তু মাজেদ স্কাই-লাইটে মাথা কুটছে। মেজ-মালোম বন্দুক ফেলে ছুটছেন নীচে।

অনুত্তমের রক্তাক্ত দেহটা চিত হয়ে সিলেন্ডারের উপর পড়েছিল। মেজ-মালোম অনুত্তমকে তুলে কাঁধে ফেললেন। বললেন, হোয়াই, হোয়াই...।

আড়ষ্ট-কণ্ঠে আর কিছু তিনি প্রকাশ করতে পারলেন না।

ওর চোখদুটো স্নিগ্ধ আজ। মৃত্যুর সহজ দুটো ঠোঁট আর কিছুক্ষণ পর হয়তো চুমু খাবে। সে চোখ বুজে মেজ-মালোমের মুখ সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মাকড়সার জালের মতো সে মুখ হিজিবিজি নয়। সে মুখে অনুত্তম বিশ্ব-চরাচরকে দেখতে পেল। সেখানে মা, বাবা, পড়শি, দুটো চড়াই সকলে যেন ভিড় করেছে। তাই আস্তে আস্তে এবং চুপি চুপি যেন বলল অনুত্তম, শি ইজ দি ওনলি ওম্যান ইন দি শিপ, য়্যান্ড স্টিল টু ডেজ টু হ্যাভ দি পোর্ট, সেকেন্ড!

ফের জাহাজ থামল সমুদ্রে। ফের জাহাজিরা গোল হয়ে দাঁড়াল। মেজ-মালোম আবৃত্তি করলেন। তিনি সামগানের মতো উচ্চারণ করলেন কথাগুলো। হে প্রভু, তোমার এই শান্তি-পারাবারে খুদে নাবিকটিকে আশ্রয় দাও। মেজ-মালোম বাইবেল পাঠ করতে গিয়ে খুব ভেঙে পড়েছেন। মেজ-মিস্ত্রি একটা সাদা চাদর দিয়ে অনুত্তমের শরীরটা ঢেকে দিলেন। হরিদাস সেন পাশে বসে রয়েছে।

একমাত্র মাজেদ আলি বুক চাপড়ে পাগলের মতো কাঁদছে। সারেং কোরানশরিফ পাঠ করছেন। ক্যাপ্টেন শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি স্থির। নিষ্পলক।

অনুত্তমকে সলিল-সমাধি দেওয়ার পর ওরা সকলে যখন সমুদ্রের জল শরীরে ছিটিয়ে আকাশ দেখছিল সেই সময় মেজ-মালোম দেখলেন, লেডি অ্যালবাট্রস মাস্তুলের ডগায় বসে। বুকের নীচে পুরুষ-চড়াইটা। পুরুষ-চড়াইটা এবং লেডি অ্যালবাট্রসের চোখে আজ বন্দর-জাহাজের মতো নির্ভয়ের দৃষ্টি।

বিদেশিনী

শেষ রাত বলে সমুদ্র অস্পষ্ট, গাঢ় নীল অন্ধকার সামনে এবং নাবিকেরা এখন দীর্ঘ সফরের জন্য ক্লান্ত। ভোর হলে সামনে তীর দেখা যাবে আর আশ্চর্য এক জগতের সন্ধান তখন, নাবিকেরা শেষ বাতের দিকে মাস্তুলের নীচে ডেকের রেলিং-এ উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। ছোট-টিন্ডালের গলা সকলের আগে পাওয়া যাচ্ছে। সে রেলিং-এ ভর দিয়ে দেশের নদী-নালাকে স্মরণ কবে গান গাইছিল। মাস্তুলের সব আলো ক্রমশ নিভে যাচ্ছিল। কোয়ার্টার-মাস্টার সব আলো এক-এক করে নিভিয়ে দিচ্ছে। যারা বাবোটা-চারটার পবিদার, যারা এইমাত্র ফোকশালে নেমে গেছে এবং ঘুমের জন্য বাংকের কম্বল তোষক ঝাড়ছিল তাদেরও গলা পাওয়া যাচ্ছে। কারও ঘুম আসছে না। বন্দরের জন্য, মাটির জন্য নাবিকদের চোখে ঘুম ছিল না। শুধু এখন প্রপেলারের একটানা শব্দ, স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের শব্দ এবং ছোট-টিন্ডালের কণ্ঠস্বর সমুদ্রের জলে ভেসে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বন্দরের টানে জাহাজের গতি খুব দ্রুত মনে হচ্ছিল। তখন সুমন দেখল, ব্রিজে ছোট-মালোম। তিনি যেন ব্রিজে দাঁড়িয়ে দূরবর্তী কোনও সমুদ্রের ছায়ায় সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছেন।

তখন কাপ্তানের পোর্ট-হোল বন্ধ। কেবিনের দরজা বন্ধ। মনে হচ্ছিল সমুদ্র হালকা কুয়াশার ভিতর ডুবে আছে। কোনও তরঙ্গসংকুল সমুদ্র নয়। নির্জন এবং নিরাশ্রয়ের মতো সমুদ্র একা একা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর এই জাহাজ সমুদ্রের শান্তি ভঙ্গ করে যাচ্ছিল, দূরেব আকাশে কিছু অ্যালবাট্রস পাখি, নীচে কিছু ডলফিনের ঝাঁক এবং হয়তো এই অঞ্চলে তিমি মাছের একদা বাসস্থান ছিল, এখন শূন্য সব, শূন্য আকাশে সুমন শুধু ভেড়ার লোমের মতো কিছু মেঘ দেখতে পেল। কাপ্তান পোর্ট-হোল খুলছেন না। নাবিকেরা তীর দেখার জন্য যখন রেলিং-এ উল্লাসে ফেটে পড়ছিল, যখন সকলে পিছিলে হইচই কবছে, দীর্ঘদিন সমুদ্র অতিক্রম করার পর বন্দরের জন্য আকুল, তখনও কাপ্তান পড়ে পড়ে কেবিনে ঘুমোচ্ছেন। সুতরাং সুমন মাস্তুলের নীচে বসে জলের ভিতর ভাঙা-ভাঙা শব্দ শুনল অথবা কোথাও অদৃশ্য এক ইচ্ছার ভিতর তার বাংলাদেশ এবং পল্লির গাভি-সকলের ডাক, আর এইদিনেই হয়তো ধানেরা সোনালি মাঠে শুয়ে আছে।

সুমন মাস্তুলের নীচে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। ওর ওয়াচের লোকেরা সিঁড়ি ধরে নেমে গেছে কখন! সে চুপচাপ বসে থাকল। জাহাজ ক্রমশ সমুদ্র অতিক্রম করে মোহনার দিকে এগুচ্ছে। ক্রমশ ওর পেছনের আকাশ আলোকিত হচ্ছিল। আর ক্রমশ তীরের গাছ-গাছালি এবং পাখিদের চেনা যাচ্ছে। নাবিকেরা যে যার জায়গা ছাড়ছিল না। ওরা বসে বসে দেশের গল্প করছিল, বিবিদের গল্প করছিল। ওরা পরস্পর ঠাট্টা-মশকরা করার সময়ই দেখল, জাহাজ মোহনা অতিক্রম করে নদীর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। এবং দ্রুত সব মাঠ ফেলে যাচ্ছে দু'পাশে। অথবা দূরে দূরে সব তেলের পিপে, মাঠময় শস্যক্ষেত্র এবং এও হতে পারে বনজ ঘাস, ছোট ছোট কীটপতঙ্গ হয়তো ঘাসের ভিতর এখন খেলা করছে। সুমন আলস্যে হাই তুলল একটা।

কিছু অপরিচিত পাখি মাস্তুলের উপর এসে বসল। যেসব মাঠ দ্রুত জাহাজের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে কিছু কুঁড়েঘর জাতীয় ঘর এবং কিছু নিগ্রো পুরুষ-রমণী দেখা যাচ্ছে। সুমন বসে বসে সব দেখল। আর এক ওয়াচের পথ। সুমনের হাতে অন্য কোনও কাজ এখন নেই। সে বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসে থাকল। জাহাজ বন্দরে লাগলে ওদের ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হবে। হাতে প্রচুর সময়,

সুতরাং সে আলস্যে মাস্তুলে গা এলিয়ে দেখল সূর্যের আলো সোনার জলের মতো মাস্তুলের ক্রোজনেস্ট ধরে উঠে যাচ্ছে। নাবিকদের জটলা ক্রমশ বাড়ছে। দু'দিকে নদীর তীর, মাঠ এবং গ্রাম্য টালির ঘর, নিগ্রো যুবক দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছিল, নিগ্রো যুবতী স্কিপে বসে মাছ ধরছিল এবং মাঠ ধরে চাষের জন্য চাষি মজুরেরা ট্রাক্টর চালাতে চলে যাচ্ছে।

আজ আর সুমনের কোনও ওয়াচ থাকছে না। বিকেলে বন্দরে বেরোতে পারবে। সে এ সময় মনে মনে সুচারু অথবা সামাদকে খুঁজছিল। নাবিকদের জটলার ভিতর সুচারু অথবা সামাদ আছে কি না একবার উঁকি দিয়ে দেখল। বিকেলে ওরা তিনজন একসঙ্গে বের হবে, সুখ এবং আনন্দ... আর বিস্ময়কর ঘটনা মায়ের মৃত্যুর মতো কোথাও না কোথাও উঁকি দিয়ে থাকবে। সুচারুর হাতে উল্কি এবং অস্পষ্ট ছবি, লিজার মুখ সে-ছবির ভিতর সে লুকিয়ে রেখেছে। আর ঠিক বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডের পাশ ঘেঁষে উল্কিতে আঁকা নাম—'লিজা'। ওর নিরুদ্দিষ্ট বিস্ময়কর লিজার অনুসন্ধানের জন্য, কোনও মিশনারি অথবা হাসপাতালের ভিতর, গির্জার ছায়ায়, ওর ভিন্ন ভিন্ন অনুসন্ধান। অথবা লাল সূর্য আফ্রিকার মাঠে, যবদ্বীপের কোনও প্রাচীন মন্দির-গাত্রে অথবা পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও ফসফেট কারখানার হাসপাতালে সে বারবার লিজাকে খুঁজেছে। লায়ন-রক অতিক্রম করে নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে এক মাউরি যুবতীর মুখে সে লিজাকে আবিষ্কার করে কিছুদিন পাগলের মতো ছিল। সুমন বসে বসে সুচারুর জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সুচারু নিশ্চয়ই ফোকশালে বসে এখন লিজার ছবির উপর উপুড় হয়ে আছে।

এখন ডেকে-ডেকে জল মারছে নাবিকেরা। সুতরাং জাহাজময় ডেক-নাবিকেরা ছড়িয়ে পড়ছিল। ওরা হাসিল তুলছে অথবা ওয়ার পিন ড্রাম ঘুরিয়ে হাসিল খুলে ফেলছে। কেউ গোলা রং নিয়ে জানালাতে নীল রং দিচ্ছিল। কেউ পোর্ট হোলের কাচ মুছে দিচ্ছে। এবং পোর্ট-হোলে কাপ্তানের মুখ এবং দূরে তেমনি সব মাঠ সোনালি ধানের মতো রঙ নিয়ে শুয়ে আছে। মিসিসিপি নদী ধরে জাহাজ এগোচ্ছিল। সামনে ছোট বন্দর। নাবিকেরা দীর্ঘদিন পর মাঠ এবং গ্রাম্যকুটির দু'পাশে রেখে যেতে পারছে। ওরা এই বন্দর থেকে সালফার নেবে। খালি জাহাজ। ওরা কার্ডিফে ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া পোর্ট থেকে আনা লোহার আকরিক বের করে দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের ভেতরে ভেতরে এবং পোর্ট অফ জামাইকার বন্দর বাঁয়ে ফেলে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। সেই কবে কোনও এক দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে ওরা কার্ডিফ বন্দর ছেড়ে এসেছে এবং কত যুগ আগে যেন ঘটনাটা। আটলান্টিকের ঝড় অথবা সেই বে অফ বিসকের সাইক্লোন এখন আর ওরা মনে করতে পারছে না। মাটির জন্য, নারী এবং সুরার জন্য, এই নিকটবর্তী বন্দর ওদের বড় টানছিল।

জাহাজ দ্রুত, দু'পাশে মাঠ, পপলার কুঞ্জ এবং উইলো ঝোপ পিছনে ফেলে এগোচ্ছে। গাছের ছায়ার ভিতর লাল নীল কাঠের ঘর এবং উন্নততর জীবনধারণের প্রণালী, কিছু শ্বেতকায় রমণীর মুখ অথবা এখানে কোনও ভাঙা গির্জা চোখে পড়ছে না, এখানে নিগ্রো বালিকার আলিঙ্গনে কোনও মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে না, কিছু বাস-ট্রাক চোখে পড়ছিল, কিছু মোটর-বোট চোখে পড়ছিল এবং ওরা তীরে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখতে দেখতে গল্প করছে। সবকিছুই দ্রুত দু'পাশে রেখে জাহাজ ছুটছে। সুতরাং উইলো ঝোপের পাশে অথবা লাল নীল কাঠের জানলায় সুন্দর সুন্দর মুখগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে। নাবিকেরা ওদের দেখে শিস দিচ্ছিল, বন্দরের জন্য নাবিকদের চোখে যথার্থই ঘুম ছিল না এতদিন। যত বন্দরের কাছে এগোচ্ছে তত নাবিকদের উত্তেজনা বাড়ছে। দু' পারের গ্রাম মাঠ পাখি দেখে নাবিকেরা উল্লাসে রঙের টব মেসরুমে বাজাচ্ছে। সুমন মাস্টের নীচ থেকে উঠে পড়ল। কারণ রোদের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সে ডেক ধরে পিছনের দিকে এগুতে থাকল। তখন তীর ধরে কচি-কাঁচা বয়সের যুবক যুবতীরা সাইকেলে কাজে বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও মোটরের পাশে শীর্ণ এক রমণী এবং নীচে এক নিগ্রো বালকের মুখ আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার মতো।

তখন ডেক-সারেং, ইঞ্জিন-সারেং হাঁকল, জাহাজিরা মাস্তার লাগাও।

তখন জাহাজের চিমনির ভেতর থেকে কে যেন হেঁকে উঠল, ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধবে নিগ্রোদের সঙ্গে।

বড়-মালোম বললেন, নিগ্রোরা এবার সাহেবদের মাথায় বোতল ভাঙবে।

শহরময় উত্তেজনা। বড়-মালোম সকলকে বলে গেলেন, বন্দরে কোনও জাহাজি নামবে না। কাপ্তান

যেন কী বই পড়ছিলেন। তিনি চোখ তুলে দেখলেন না। তিনি বোট-ডেকে পায়চারি করতে থাকলেন।

তিনি একসময় বললেন, শুধু ভারতীয় নাবিকেরা নামবে না।

তিনি তারপর তরতর করে সিঁড়ি ধরে ব্রিজে উঠে গেলেন।

বড়-মালোম বললেন, এ অঞ্চলে কালোদের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা আছে। তিনি 'ঘৃণা' কথাটা উচ্চারণ করলেন না। তিনি শুধু বললেন, খুব দুঃখিত সারেং। কোনও উপায় নেই।

সুমন অত্যন্ত ব্যথিত হল। সুচারু দাঁতে দাঁত চাপল, এবং বলল, শুয়োরের বাচ্চা বড়-মালোম। খুব দুঃখিত সারেং!

সে ব্যঙ্গ করল বড়-মালোমকে। সে যেন কী বলতে চাইল গজগজ করে। কিন্তু সারেঙের মুখ দেখে এবং অন্যান্য নাবিকের সম্মানের জন্য সে কিছু উচ্চারণ করল না। সেও অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে সিঁড়ি ধরে নেমে পিছিলের দিকে হেঁটে যেতে থাকল।

খবরটা ইচ্ছে করলে কাপ্তান আগে দিতে পারতেন। পাইলট অফিসার জাহাজে উঠে নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে, বন্দরে ভারতীয় নাবিকদের নামতে দেওয়া হবে না। স্থানীয় আইনে এই বিষয় সম্পর্কে সবল ভাষায় কিছু লেখা নেই অথবা এমনও হতে পারে দাঙ্গা হোক বা না হোক, কালো মানুষের প্রতি অবজ্ঞার হেতুতে কালো মানুষদের জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হবে না। সুচারু গজগজ করছিল, সুমন কথা বলতে পারছে না। পাইলট অফিসার সমুদ্রে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠেছিলেন, এখন তিনিই পথ দেখিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছেন, এই পিছিল থেকে ব্রিজে কাপ্তানকে এবং পাইলট অফিসারকে দেখা যাচ্ছে। জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রি বোট-ডেক লাফিয়ে পার হচ্ছে। ওর হাতে স্প্যানার, পকেটে হাতুড়ি চিজেল। সে কোনও উইনচ-মেশিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে অথবা দেখে মনে হয় বন্দর দেখে সেও উত্তেজিত, মদের জন্য মেয়ের জন্য হেনরি সারারাত রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরবে।

জাহাজের অলি-গলিতে সকলে এখন অশ্লীল গান গাইছে। যে উল্লাসে নাবিকেরা ফেটে পড়ছিল এখন তা যন্ত্রণার মতো। জাহাজটা বন্দরে বাঁধা থাকবে দিনের পর দিন, ওরা তীর দেখতে পাবে এবং তীরের সব রমণীদের দেখতে পাবে, বাঘের থাবার মতো ওদের চোখ হন্যে হয়ে কেবল যুবতী খুঁজবে অথচ নামতে পারবে না। হেনরি এসে তীরের গল্প করবে কখনও। ওরা ক্ষুধার্ত, ওরা সেজন্য অশ্লীল গান গাইছিল। বার্চ গাছের ভেতর থেকে ওরা সূর্যের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। এবং মনে হচ্ছিল বার্চ গাছগুলো সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে তীরকে ঢেকে রাখতে চাইছে। সুতরাং জাহাজিরা সিঁড়ি ধরে ফোকশালে নেমে যেতে থাকল। মাটির স্পর্শের আশায় সুমন এতদিন উৎফুল্ল ছিল, সুচারু এই বন্দরে কোনও গির্জায় অথবা মিশনারি বিদ্যালয়ে তার নিখোঁজ সন্ন্যাসিনীকে আর-একবার খুঁজে দেখতে পারবে এবং সামাদ নেশা করে বিবির জন্য নতুন সব খবর নিতে পারবে অথবা কোনও অশ্লীল ছবি (সামাদের এক ধরনের অশ্লীল ছবি সংগ্রহের বাতিক) কিছুই আর গোপন থাকল না, ওরা নামতে পারছে না, ওরা মাটির স্পর্শ পাবে না, এক অপার তৃষ্ণা এই মাটির জন্য। ওদের চারপাশে পাখিরা থাকবে, ঘাসেরা থাকবে এবং রমণীরা ফুল ফোটার মতো বিচরণ করবে। ওরা জাহাজে কয়েদি পুরুষের মতো পল-দণ্ড-প্রহর এবং দিন-মাস-কাল কাটিয়ে বৃদ্ধ বাঘের মতো নিজের থাবা নিজেই চেটে চেটে সুখ পাবে। সুতরাং অশ্লীল সব উচ্চারণ সুমনের মুখেও এসে গেছিল। সে সহসা সেই উচ্চারণের মুখে প্রায় কান্না-কান্না গলায় বলে ফেলল, মা, মাগো।

সুমন আর দেরি করল না। তীর দেখে লাভ নেই, এইসব গ্রাম্য মানুষের মুখ দেখে সুখ নেই। সে স্নান করে চা খেল এবং নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে ফোকশালের দরজা বন্ধ করে দিল। মায়ের স্মৃতি মনে পড়ছিল। ডারবান বন্দরে সেই শেষ চিঠি মা'র। এবং পরের চিঠিতে, তখন জাহাজ কেপটাউনে, মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছিল। সে পাশ ফিরে শুতেই শুনল দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। ওর মনে হল সামাদ। সুতরাং সে উঠে দরজা না খুলে বাংকের উপর বুকটা ঠেলে শুয়ে থেকেই দরজাটা টেনে খুলে দিল। দরজা খুলে দেখল সামাদ নয়, জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রি, হেনরি। হেনরির টোবাকোর পাইপে ধোঁয়া উঠছে। সুমন শুয়ে আছে। হেনরিকে সে কোনও প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন করলেই যেন কষ্টটা বাড়বে, যেন বলবে, আমি দুঃখিত সুমন, তোমরা বন্দরে নামতে পারবে না। আমি দুঃখিত। আমরা একসঙ্গে

ঘুরতে পারব না, দুঃখিত। অন্য সব বন্দরে বিশেষ করে সেই দুঃসহ চিঠির পর এই হেনরি, সামাদ এবং সুচারুর চেয়েও আপনজনের মতো কাছে থেকে সান্ত্বনা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রেখে সব বন্দর, জীবন সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে।

সামাদ এবং সুচারু ডেক-নাবিক। তাই ওরা এখন উপরে কাজ করছে। সুমন শুয়ে থেকেই বুঝতে পারছে এখন জাহাজ বন্দরে বাঁধা হচ্ছে। ওয়াব পিন ড্রাম থেকে হাসিল খুলে দেওয়া হচ্ছিল এবং মেজ-মালোমের কণ্ঠ ভেসে আসছে। তিনি কখনও বলছেন, হারিয়া, কখনও হাপিজ। তখন হেনরি বলল, আমরা এবার একসঙ্গে বন্দরে ঘুরতে পারব না সুমন।

সুমন পাশ ফিরে শুল। এবং বলল, হেনরি, আমাদের জাহাজ বন্দরে কতদিন থাকবে?

যেন সুমনের বলার ইচ্ছা, যত সত্বর সম্ভব আমাদের এ বন্দর ছেড়ে যাওয়া দরকার। অথবা বলতে চাইল চারপাশে এত সুখ, আর আমরা রোজ জাহাজের ভিতর কয়েদির মতো দিন কাটাব, এ আমার ভাল লাগছে না হেনরি, তোমরা রোজ বিকেলে বন্দরে নেমে যাবে, রোজ তোমরা ফুর্তি করবে, এ আমার ভাল লাগছে না হেনরি। তখন হেনরি বলল, বন্দর ছাড়তে অনেক দেরি হবে। বন্দরের শ্রমিক সম্পর্কে সে কিছু মন্তব্য করল।

হেনরি বলল, কাল থেকে ওরা ধর্মঘট করছে।

সুমন বলল, আমাদের কপাল মন্দ হেনরি।

হেনরি শিস দেবার মতো ঠোঁট কুঁচকে বলল, একা একা খুব ঘুরব। তুমি যেতে পারবে না, দুঃখ হচ্ছে।

সুমনের মনে হল হেনরি বোধহয় ওকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। সিঁড়িতে তখন ডেক-টিন্ডাল হাঁক দিল এবং ইঞ্জিনের পবি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে পিছিলে জুতোর শব্দ এবং সকলে এখন বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসে থাকবে অথবা অদূরে শহব, শহরের গির্জা এবং কাছের লাল-নীল রঙের ঘর আরও বড় বড় অট্টালিকার মতো প্রাসাদ দেখে হয়তো সব জাহাজিরা সমুদ্রের দুঃখ ভুলে যাবে, এইসব ভেবে হেনরি বলল, তোমার শুয়ে থাকতে এখন ভাল লাগছে?

সুমন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বাজে কথা, চলো উপরে বসব।

আমার ভাল লাগছে না হেনরি।

ভাল না লাগুক, ওঠো, উপরে যাবে।—হেনরি এই বলে সুমনের হাত ধরে টেনে তুলল।

সুমন ব্যাজার মুখে বলল, আমার ভাল লাগছে না কিছু।

হেনরি সুচারুর বাংকে ফের বসে পড়ল এবং বলল, মাঠে ছেলেরা বেসবল খেলছে।

অসময়ে!

রাস্তায় লোকজন দেখা যাবে। সামনে একটা মেয়েদের স্কুল। আমার পোর্ট-হোল থেকে সব দেখা যাবে।

সুমন বলল, তা হলে উপরে ওঠা যাক।

বসন্তের দিন বলে সূর্যের আলো তেমন তীক্ষ্ণ নয়। হেনরি আগে আগে সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। সে দেখল ডেক-কশপ, দড়ি, ছোট কাঠের টুকরো এবং রঙের টব নিয়ে স্টোর-রুমের দিকে যাচ্ছে। যাবার সময় সেও একবার রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল। ছবির মতো মেয়েদের বিদ্যালয় দেখল এবং বড় বড় সব ওক গাছের ছায়া, পিচের মসৃণ পথ এবং বিদ্যালয়ে ফুলের মতো সব কিশোরীদের মুখ দেখে সে নড়তে পারল না।

সুমন বলল, নাইস হেনরি। ছবির মতো শহরটা। এবং এ সময় ওরা দূরে কলের চিমনি দেখতে পেল। শীতের শেষ বেলা। মাঠগুলো ফাঁকা। কার্পাস এবং তামাকের খেতেও কোনও শস্য নেই। নদীর অন্য তীরে সব নিগ্রো চাষিদের গ্রাম এবং পাশে ছোট-বড় সব গোলাবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দুগ্ধবতী গাভীরা মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছিল। সমুদ্রের মতো এই মাঠের দৃশ্য এক নয়। ইতস্তত সব তেলের পিপে এবং বসন্তের হলুদ রঙের রোদ মাঠময় ভেসে বেড়াচ্ছিল। ছোট-বড় বার্চ গাছ, উইলোর ঝোপ এবং কোথাও কোনও পারসিমন গাছের সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে। নীচে জেটি। ক্রেনগুলো দৈত্যের মতো

দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই এক বিদ্যালয়, যেখানে ফুলের মতো মেয়েরা আসতে শুরু করেছে।

ঠিক তখনই সুচারু পাশে এসে দাঁড়াল। হেনরিকে বলল, সাহেব, আমার কথা মনে রাখবে তো?

হেনরি ঠিক ধরতে পারল না। সুতরাং ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

আরে সাহেব!— বলে সে তার বুকের বোতাম খুলে বুকের উপর আঁকা নামটা দেখাল। বলল, ওকে তুমি কিন্তু খুঁজবে।

হেনরি এবার হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা, আমার মনে থাকবে। আমি লিজার ছবি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

সুচারু খুব গাঢ় গলায় বলল, লিজার কথা বললে সবাই তোমরা হেসে ফ্যালো, এটা আমার ভাল লাগে না।

হেনরি বলল, আমি কিন্তু তোমাকে অসম্মান করার জন্য হাসিনি।

সুমন এ সময় হেনরি এবং সুচারু উভয়ের মুখ দেখল, তারপর সুচারুর দিকে তাকিয়ে বলল, জানিস, হেনরি ওর স্ত্রীকে তোর লিজার কথা লিখেছে।

সুচারু আর কোনও কথা বলল না। সিঁড়ি ধরে নেমে গেল ফোকশালে।

সুমন বলল, আমি জানি ওকে তোমরা কোথাও খুঁজে পাবে না।

হেনরি কী ভাবল, পরে অন্য কথায় এসে গেল। বলল, চলো আমার কেবিনে।

সে হাঁটতে হাঁটতে বলল, সুমন, তুমি নতুন জাহাজি, সুচারুকে দেখে তুমি খুব বিস্মিত হচ্ছ!

সুমন বলল, আমরা সবাই কোনও না কোনও আবেগে ভুগছি।

ওরা কথা বলতে বলতে দু' নম্বর ফলকা অতিক্রম করে গেল। ওরা এলিওয়েতে ঢুকে প্রথম ডানদিকের কেবিনে বসে পড়ল। এদিকটা জাহাজের সাহেব অফিসাররা থাকে। কোনও সাধারণ জাহাজির আসা নিষেধ। হেনরি বলল, অন্য যে-কোনও জাহাজে তুমি এভাবে অকারণ কোনও অফিসারের ঘরে ঢুকে বসতে পারতে না।

আমি জানি।

সুমন নিজের দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে করার আগে কলকাতার বন্দরে জাহাজে ওঠার পর হেনরির অবয়ব, বিসদৃশ চেহারা, হেনরির মুখ লম্বা পাঁচের মতো, এসব মনে করার চেষ্টা করল। সুমন হেনরিকে দেখলেই ভয় পেত। এবং হেনরির জানা ছিল না, এই অল্প বয়সের নাবিক সুমন, এত অল্প বয়সে যে জাহাজের চিমনির আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে, নীচে স্টোক-হোলডে নামতে ভয় পাচ্ছিল, হেনরি হেসে বলেছিল, তোমার নাম খোকা। তুমি ভয় পাচ্ছ? অথবা স্টিম-কক থেকে জল নেবার সময় সল্ট টেস্ট করার সময় এক ভয়ংকর শব্দে যখন সুমন ইঁদুরের মতো ইঞ্জিন-রুমে নামতে নামতে ফের সিঁড়ি ধরে ছুটে পালাচ্ছিল, তখন হেনরি না হেসে পারেনি, সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাত ধরেছিল সুমনের এবং টেস্ট-কক সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান দেবার সময় বলেছিল, তোমার নাম?

সে মিষ্টি চেহারার জন্য সুমনকে ভালবাসতে চেয়েছিল।

হেনরি বলল, কাপ্তান ব্যাপারটাকে ভাল চোখে প্রথম-প্রথম দেখতেন না।

জানি হেনরি।

অথচ দ্যাখো সব ঠিক হয়ে গেল।

সুমন কোনও উত্তর দিল না এবার।

সুতরাং সম্ভব-অসম্ভবের কথা না ভেবে, এসো, আমরা পোর্ট-হোল দিয়ে মেয়েদের স্কুলটা দেখি।

একটু থেমে তারপর হেনরি ফের বলল, আমার মনে হয় সুচারু আজ হোক কাল হোক লিজাকে খুঁজে পাবেই।

সুমন বলল, পেলে খুব ভাল হয় হেনরি। বন্দর এলে ওর মুখ দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। সে মদ খায় না, সব পয়সা বাঁচিয়ে ছুটির দিনে যেখানে যত গির্জা আছে, মিশনারি বিদ্যালয় আছে অথবা হাসপাতাল, সর্বত্র সে লিজার খোঁজে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়।

সুমন এবং হেনরি পোর্ট-হোল দিয়ে জেটি অতিক্রম করে মেয়েদের স্কুল দেখছিল, বিচিত্র সব পোশাকে মেয়েরা স্কুলের সদর দরজায় ঢুকে যাচ্ছে। ওরা বসে বসে ভিন্ন ভিন্ন মেয়ের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন

উক্তি করছিল। তারপর ওরা দু'জনেই চুপ। দু'জনকেই খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। দুই পোর্ট-হোলে দুটো মুখ তখন মুখোশের মতো। এমনকী পাইপের ধোঁয়া কখন নিভে গেছে, কখন মেসরুম বয় হেনরির কফি রেখে গেছে এবং কিছু ফল, কিছুই খেয়াল নেই। ওরা পরস্পর কোনও কথা না বলে স্কুলের ঘণ্টা পড়তে শুনল এবং সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওরা পোর্ট-হোল থেকে মুখ তুলে নিল। সুমনকে বড় বেশি বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। হেনরি নিজের কফি দু'ভাগ করে বলল, দ্যাখো সুমন, কোনও দুঃখ রেখো না। তোমার জন্য পারি তো কিছু ফুল আনার চেষ্টা করব।

সুমন বলল, ভাল লাগছে না।

হেনরি পাইপের ছাইটা জলে ফেলে দেবার সময় বলল, স্থানীয় আইন বড় কড়া। নয়তো একটা রিস্ক নেওয়া যেত।

দ্যাখো সুমন!— বলে হেনরি তিরস্কারের ভঙ্গি টানল মুখে।— মুখ গোমরা রাখবে না। সবসময় হাসিখুশি মুখ চাই। কেমন, মনে থাকবে!

বলে সুমনের মাথায় হাত রেখে পুরোহিতের মতো বলল, বন্দর থেকে ফিবে সুন্দরী মেয়েদের গল্প বলব। খুশি!

খুশি! নারী এবং ফুল জীবনে বড় দরকার।

হেনরি বলল, তোমার জন্য আর কী করতে পারি?

সুমন দু'হাত ফাঁক করে ইঙ্গিতে দেখাল।

আচ্ছা হবে।

সুমন ডেকে নেমে দেখল বড়-মালোম ফরোয়ার্ড-পিক থেকে জাহাজ বেঁধে ফিরছেন। বড মালোমকে দেখে সুমন মুখ ব্যাজার করে ফেলল। বড়-মালোম আমোদপ্রিয় লোক। তিনি চিৎকার করে বললেন, হেল্লো সন-লাইক সেলর, শহরের ঘাস মাঠ ফুল দেখে ভাল লাগছে না?

সুমন বড়-মালোমের সামনে দাঁড়িয়ে ফের শুধাল, স্যার, আমাদের কি একদিনও অন্তত একবারের জন্যও কিনারায় নামতে দেওয়া হবে না?

বড মালোম পর্যন্ত মুখ ব্যাজার করে ফেললেন। তিনি দেখলেন সুমনের চোখে এখনও যেন সেই মাতৃ-বিয়োগের চিহ্ন ফুটে আছে। সুতরাং মাঠে মাঠে ফুল ফুটুক, এই কথা তিনি সুমনকে বলতে পারলেন না। অথবা বলতে পারলেন না কোনও মসৃণ পথ ধরে ঘাস ফুল পাখির অরণ্যে তুমি হারিয়ে যাও। মানুষেব প্রতি মানুষের এই ঘৃণা, অবহেলা, বড়-মালোমকেও ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে। তিনি যেন মাথা হেঁট করে সুমনের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এই মুহূর্তে স্পষ্ট কোনও জবাব দিতে পারলেন না সুমনকে।

দুই

সাল ১৯৫৩। এবং সম্ভবত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দেশগুলোতে তখন কার্পাস অথবা তামাকেব চাষ-শেষ। গোলায় ফসল উঠে গেছে। তামাকের ফসল আস্তাবলের মতো দীর্ঘ ঘরে ঠান্ডায় শুকোতে দেওয়া হচ্ছে এখনও। আপেল এবং বুনো চেরি গাছে এখন বেগুনি রঙের আবছা অন্ধকার। সারাদিনেব রোদ গাছগুলোকে, গাছের পাতাগুলোকে কখনও লাল, কখনও হলুদ রঙে রাঙিয়ে তোলে, যেন রঙিন চলচ্চিত্র। আর সম্ভবত সুমন জাহাজে স্টোকারের কাজ করছিল।

যেহেতু ওয়াচ নেই, যেহেতু ইঞ্জিনের নাবিকরা এখন বয়লার সংক্রান্ত নানা কাজে ব্যস্ত এবং একনাগাড়ে কাজ সাতটা থেকে চারটা পর্যন্ত। আর সুমনকে চার নম্বর সাব অর্থাৎ হেনবি উইনচ-মেশিনে হেলপার হিসাবে নিয়ে কাজ করছিল, সুতরাং নানারকমের কথা অর্থাৎ হাসি-ঠাট্টা-তামাশা চলছিল। সুমনের মায়ের মৃত্যুসংবাদ কেপটাউনে পৌঁছানো মাত্র জাহাজের সকলে, বিশেষ করে অফিসার-মহল এই ছোট্ট নাবিকের জন্য বেদনা অনুভব করেছিল। তখন জাহাজে সুমন বড় নিঃসঙ্গ। তখন ওকে সারেং ওয়াচে না দিয়ে ফালতু করে দিয়েছে। বড়-মালোম থেকে সব অফিসাব

সুমনের ছোট্ট ফোকশালে ঢুকে সমবেদনা জানিয়েছে। অন্যান্য জাহাজিরা ফাঁক পেলেই ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ব্যস্ত থাকত এবং অনমনস্ক রাখার চেষ্টা করত। আর এভাবেই চার নম্বর মিস্ত্রি হেনরি সুমনের সমবয়সির মতো অথবা কখনও ঠাট্টা-তামাশা, কখনও একসঙ্গে বন্দরে ঘুরে বেড়ানো, কেনাকাটা করা, মোট কথা বয়সের ব্যবধান দু'জনকে অন্তরঙ্গ হতে বাধা দেয়নি।

দেন হেনরি?— সুমন মেশিনের ভিতর থেকে স্ট্রেপার খোলার সময় কথাটা বলল।

হেনরি বলল, আর একটু নীচে।

ঠিক আছে হেনরি?

ইয়েস...ইয়েস...নো। আর একটু নীচে। বেশ।

ওরা উভয়ে মিলে উইনচ-মেশিনের স্ট্রেপার খুলছিল। অনেক দিন একনাগাড়ে উইনচ চলার জন্য স্ট্রেপারগুলো ক্ষয়ে গেছে। পিতলের ব্রাশ ঘসে দিতে হবে এবং সযত্নে লাগিয়ে রাখতে হবে। মাল নামানো হবে না বন্দরে, তবু হাতে যখন কাজ নেই, যখন বন্দরে কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকতে হবে, তখন এইসব ছোট ছোট মেরামতি কাজগুলো সেরে ফেলা ভাল। ওরা উভয়ে কাজ করছিল এবং গল্প করছিল।

তারপর হেনরি. ।

বুঝলে পথের ঠিক উলটোদিকে একটা সাইনবোর্ড ঝোলানো ছিল।

হেনরি বলল ফের, জোরে টান দ্যাও সুমন।

সুমন অনেক চেষ্টা করেও নাট খুলে আনতে পারল না। হেনরি প্লেটের পাশ থেকে নিজেই হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর ক্রাংক-স্যাফটের ভিতর মাথা গলিয়ে অনেক কষ্টে নাটবোল্ট, স্ট্রেপার, সব খুলে ফেলল। তেলকালির জন্য ওর তখন মুখের চেহারা বহুরূপীর মতো, মুখ তুলতেই দেখল সামনে মাঠ আর অন্য তীরে মোটরগাড়ি, একদল যুবক-যুবতী গাড়িতে করে নদীর পাড় ধরে মোহনার দিকে যাচ্ছে, ওরা দক্ষিণ-দেশের গ্রাম্য সংগীত গাইছিল এবং রুমাল ওড়াচ্ছিল। হেনরি যুবতীদের দেখে ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করছে। নাবিকরা ফের রেলিং-এ এসে ভিড় করে দাঁড়াল। আর হেনরি হাতের স্প্যানার দুলিয়ে যুবক-যুবতীদের গানের সঙ্গে পা ঠুকে তাল মেলাল এবং গান গাইল, রা...রা...রা।

বালতির ভিতর হাতুড়ি বাটালি এবং স্প্যানার ছিল, পাশে কেরোসিনের পট ছিল একটা। সুমন সেই পটের ভিতর উইনচের ছোট ছোট সব যন্ত্রের অংশ তেলে ভিজিয়ে রাখল। যুবক-যুবতীরা দূরে হুডখোলা গাড়ির ভিতর রুমাল ওড়াচ্ছে এখনও। বড় বড় বার্চগাছ পথের দু'পাশে, কচ্ছপের মতো গাড়িটা ধীরে ধীরে যাচ্ছে। হেনরি ওদের দেখে গিনি মুরগির গল্প করছিল, যেন এইসব যুবক-যুবতীরা গিনি মুরগির উদ্দেশে কার্পাসখেতে হারিয়ে যাবে এবং পরস্পর গিনি মুরগির সন্ধান করতে গিয়ে ভালবেসে ফেলবে। সুমনের যেন বলার ইচ্ছা, এভাবে যেতে পারি না হেনরি? আমরা এভাবে কোথাও কোনও যুবতীকে ভালবাসতে পারি না? কিন্তু সে কিছুই বলল না। সে কপালে হাত রেখে দূরের হুডখোলা গাড়ির ভিতর ফের ওদের দেখার চেষ্টা করলে দেখল, বার্চগাছের আড়ালে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। জিভে সুমন এক ধরনের বিস্বাদ অনুভব করতে পারছে এখন। ওর কিছুই ভাল লাগছিল না। কাজে উৎসাহ পাচ্ছিল না। ডেক ধরে অন্যান্য নাবিকদের যারা কর্ণফুলির মাঠে-ঘাসে বড় হয়েছে, এবং যারা মেয়েমানুষের উৎসাহে বন্দরে ধর্মভীরুতার জন্য মদ স্পর্শ করে না, তাদের সকলের দু' পানির মতো যে উৎসাহটুকু ছিল, সেটা পর্যন্ত ডেকে মাস্তার দেবার পর নিভে গেছে।

সুতরাং সুমন প্রশ্ন করল, বিজ্ঞাপনে কী দেখলে হেনরি?

হেনরি বলল, 'আসুন, অন্তরঙ্গ হোন'— এই লেখা ছিল।

হেনরি হেঁটে যাচ্ছিল ডেক ধরে। পিছনে সুমন বালতি হাতে চার নম্বরকে অনুসরণ করছে। ওরা ইঞ্জিন-রুমের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। চার নম্বর দরজায় হেলান দিয়ে পাইপে টোবাকো পুরে দিল। এবং টিপে টিপে ভিতরে ফস করে আগুন জ্বালল, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে সুমনকে বলল, পালকে পেট ভরে মদ খাওয়া গেল। বিনে পয়সায় ভোজ।

তার মানে?

ফের নেমন্তন্ন পাওয়া গেছে।

মেয়েমানুষের!

আরে না না। কেবল মেয়ে মেয়ে করছ। কাল অনেক চেষ্টা করেও পাইনি।

মেজ-মালোমকে দেখলাম জাহাজেই তুলে এনেছিল।

উনি গুণী লোক। —অথবা হেনরি যেন বলতে চাইল সব বন্দরে ওর রক্ষিতা আছে।

হেনরি আগুনটা বুড়ো আঙুলে টিপে ধরল, তারপর একটু থেমে বলল, ভদ্রলোক পাবের মালিক। ওর ছোট ভাই কার্ডিফের রুদ ইঞ্জিনিয়ারিং ডকে কাজ করছে।

সুমন জানত, হেনরি কার্ডিফের লোক। এবং ওব দাদা রুদ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় বড় পদে অধিষ্ঠিত। সেজন্য সুমন বলল, ভদ্রলোক খুব খাওয়ালেন?

খু...উ...ব। ভদ্রলোক বললেন, জাহাজ কোথা থেকে এল? বললাম, কার্ডিফ থেকে। ভদ্রলোক আর ছাড়তে চায় না।

সুমন বলল, শহরটা কেমন দেখলে?

হেনরি টাকবায় এক ধরনের শব্দ করল। তার মানে বলতে চাইল, ফাইন। অথবা বলার ইচ্ছা যেন যেতে যেতে লণ্ডনে গোলাপের গন্ধ পাবে খুব।

তারপর সুমন সহসা প্রশ্ন করে বসল, অ্যানি গার্ল?

হেনবি মিষ্টি হাসল। বলল, নো।

সুমন বলল, ফাইভার মনে হচ্ছে খুব চেষ্টা-চরিত্র করছে।

হেনরি বলল, চেষ্টা-চরিত্র করলে আমিও একটা পেতে পারি।

ওবা পবস্পব কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নীচে নামছে। সিঁড়ির সামনে ইঞ্জিন-কশপের ঘর। কশপ ঘরের ভিতর বড বড তামার পাত সরাচ্ছে। আব বসে বসে কীসের যেন হিসাব কষছে। সুমন একবার উঁকি দিয়ে বলল, একটা হাফ-রাউন্ড ফাইল চাই চাচা।

সে মিহি হাফ-রাউন্ড ফাইল বালতির ভিতর বেখে নীচে নেমে গেল। টানেলে ইঞ্জিন-জাহাজিরা বং করছে, ওদের ইতস্তত শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইঞ্জিনের কোনও শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ব্যালেস্ট পাম্পেব ওঠা-নামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবং অদূরে ট্যাংক-টপের উপর বসে কারা যেন অশ্লীল সব গল্প করছে। সুমন মুখটা এক সময় ব্যাজার করে বলল, কাপ্তান অন্তত একদিনের জন্য অনুমতি দিতে পারত। আমরা শান্ত-শিষ্ট বালকেব মতো শহবটা ঘুরে আসতে পাবতাম।

হেনরি হাতেব ফাইলটা ঘষতে ঘষতে বলল, তুমি পাগল সুমন! শহরটাতে তবে হইচই পড়ে যাবে না! এখানে কিছু নিগ্রোপল্লি আছে, ওবা পর্যন্ত ওদের শহর এলাকা ধরে হাঁটতে পারে না।

এইসব খবর সুমনও জানত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দেশগুলোতে এখনও ভয়ংকর বর্ণবৈষম্য, ওদের বীরগাথা সব শীতের রাতে উনুনের পাশে প্রজ্বলিত হয়, ওরা সেইসব বেদিমূলে মাথা রেখে এখনও বর্ণবৈষম্যের গান গায়। গ্রাম্য সংগীতে এইসব উত্তেজক বীরগাথা এখনও শহরে, মাঠে-ঘাটে এবং সর্বত্র প্রচলিত। এবং শহরেব প্রধান জায়গাগুলোতে কোনও নিগ্রোর বসতি নেই, দূরে বস্তি অঞ্চলে ওরা থাকে। আলাদা গির্জা এবং আলাদা সমাধিক্ষেত্র। সুতরাং সুমন চিৎকার করে যেন বলতে চাইল, এটা মানুষের অপমান। এবং ফাইল চালাতে গিয়ে সুমন অন্যমনস্কভাবে একটা আঙুল খানিকটা চেপটে দিল।

হেনরি বলল, হল তো।

হেনরি তাড়াতাড়ি মেজ-মালোমের ঘর থেকে ব্যান্ডেজ এনে আঙুলটা বেঁধে দেবার সময় ফিস ফিস করে বলল, মনে হয় আজ একজনকে ধরতে পারব।

সুমন হাসতে হাসতে বলল, তিন নম্বর কী বলছে?

ওর তো ঠিক করা ঘর আছে। কিন্তু কাল গিয়ে দেখেছে সেখানে এখন অন্য মেয়েমানুষ। সে খবব নিয়ে জেনেছে, ও আর ওর মা টেক্সাসের দিকে মদের দোকানে কাজ নিয়ে চলে গিয়েছে।

বিকেলের দিকে ফাইভার, হেনরি, বড়-মালোম এবং তিন নম্বর মিস্ত্রি পরপর প্রায় নেমে গেলেন। সুচারু, সুমন এবং সামাদ ওদের নেমে যেতে দেখল। ওরা তিনজনই দেখল নেমে যাবার সময় কোয়ার্টার-মাস্টার ওদের সেলাম দিচ্ছে। সামনে জেটি এবং ক্রেন পেরিয়ে গেলে শহরে ঢোকার পথ,

বেসবলের মাঠ ডানদিক ঘেঁষে, পরে পাকা রাস্তা এবং পাশে ঘোড়ার আস্তাবলের মতো লম্বা পাঁচিলঘেরা মাঠ। দুটি তরুণী কিংবা যুবতীও হতে পারে, পরনে সাদা প্যান্ট আর খুব আঁটো গেঞ্জি পরা মনে হচ্ছিল, ওরা আন্দাজে সব ভেবে পরস্পর কিঞ্চিৎ রসিকতা করল।

সুচারু বলল, সামাদ ওর বিবিকে প্যান্ট পরাবে বলছে।

সুমন বলল, পুরনো বাজার থেকে তবে একটা প্যান্ট কিনে নিতে হয়।

প্যান্টের কথাবার্তা প্রসঙ্গে সামাদ গত সফরের বাদশা মিঞার গল্প করল। গল্পটা এইরকমের, বিবির চিঠি আসে না। বাদশা মিঞা জাহাজের বড়-টিন্ডাল। সবে মাত্র চার নম্বর বিবিকে সাদি করে সফর করতে এসেছে। জাহাজে দু'জন বাঙালিবাবু ছিলেন, ওরা বাদশা মিঞার বিবির কাছে খত লিখে দিত। অথচ একটারও জবাব নেই। ওর চার বিবির নয় ব্যাটা। বড়টা খন খন করে কথা কয়, মেজটা তালাক, আর তার পরেরটা মরে গেল।

সামাদ বলল, বাদশা মিঞা আমাদের বলত, আমার আট ব্যাটার সাদি দিয়েছি। আর মাত্র এক ব্যাটা বাকি।

বাদশা মিঞা বলত, খতের জবাব আসবেই। তামাম দুনিয়ার চিজ নিয়ে যাচ্ছি বিবির জন্য।

বাদশা মিঞা বন্দরে-বন্দরে চিঠি দিয়েছে।

তারপর আসল ঘটনা।— সামাদ হেসে হেসে বলতে বলতে থেমে গেল। বলল, এখন হেসে বলতে পারছি। কিন্তু তখন তোদের পর্যন্ত বাদশা মিঞাকে দেখলে মুখে কথা জোগাত না। বাদশা মিঞার বয়স ষাটের কাছে। পুরনো বাজার থেকে নতুন বিবির জন্য হাই-হিলের জুতো কিনেছে, ছোট ব্যাটার জন্য মেমেদের পুরনো স্লিপিং গাউন কিনেছে।

সুচারু বলল, কী হবে পুরনো গাউন দিয়ে?

সেই তো কথা!

সামাদ মাটিতে থুথু ফেলল। বেশি কথা বললে ওর দু' ঠোঁটের কশে থুথু জমতে থাকে। বলল, বাদশা আমাদের পাঁচ নম্বর সাবকে সব খুলে দেখাল। শেষ ব্যাটার সাদি, সুতরাং জাঁকজমক করতে হয়। সাদির দিনে ব্যাটা গাউনটা শেরওয়ানির মতো গায়ে দেবে।

সামাদ এখানে একটু থামল।

আমরা বোধহয় তখন আফ্রিকা ঘুরে দেশে ফিরছিলাম, পোর্ট সৈয়দে চিঠি এল, ওর বিবি ওর ছোট ব্যাটার সঙ্গে ভেগে গেছে।

সামাদ এবার কেমন বিষণ্ণ গলায় বলল, পুরনো বাজার থেকে প্যান্ট কিনে গাউন কিনে বিবিকে পরিয়ে দেখতে ভয় হয়। চারধারে মনে হয় তখন বাদশা ঘুরছে।

সামাদের মুখ এখন যথার্থই করুণ দেখাচ্ছে।

চার মাস হতে চলল বিবির একটা খত পাচ্ছি না। ভেবেছিলাম এ বন্দরে বিবির খত আসবে। কিন্তু সকলের খত এল।

বলে সামাদ আর কথা বলতে পারছে না যেন। সামাদ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এখন সামাদকে চেনা যাচ্ছে না। ওর বিবির জন্য কষ্ট এবং কিছু অশ্লীল ছবি ওর কাছে সবসময় থাকে, অথচ এই মুহূর্তে সামাদ বিবির জন্য যথার্থই কাঁদছে।

সামাদ ফের বলল, সালিমা বারবার বলেছিল ওর জন্য একটা গরম ব্লাউজ নিয়ে যেতে।

সামাদ ভাবল, এখন এই বিকেলে বাদশা মিঞার গল্পটা ওদের না শোনালেও হত। সেইসব দৃশ্য সে যেন হুবহু মনে করতে পারছে। ভাল মানুষটা কেমন পাগলের মতো হয়ে গেল এবং সবার সামনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল।

সামাদ বলল, সেই ভয়ে কার্ডিফের সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেটে ঢুকে ফের ফিরে এসেছি। তারপর সামাদ কেমন সরল মানুষের মতো বলল, কী সব আজে-বাজে কথা বলে ফেললাম তোদের। কিছু মনে করিস না।

সুচারু বলল, আমিও প্যান্ট কেনার ব্যাপারে ঠাট্টা করেছি।

ঠাট্টা করবি কী রে!— বলে সামাদ সুচারুর দিকে তাকাল।

আমার মাঝে মাঝে খুবই শখ হয় রাতে সালিমাকে প্যান্ট গাউন পরিয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকি।

খুব আস্তে আস্তে সামাদ কথা বলছে। ওর গলার স্বর দৃঢ়, কোনও বাচালতা নেই। শেষে বলল সামাদ, বিবিকে একদিন কথাটা বলেছিলাম, সে তো হেসে লুটিয়ে পড়ল। মেয়েদের নানারকমের ছবি দেখিয়ে বলেছি, দেখেছিস কী খুবসুরত।

সুচারু বলল, আমি একটু নীচে যাচ্ছি।

সুমন জানত, এখন সুচারু কী করবে। কোনও করুণ দৃশ্য শেষে সুচারুর লিজার কথা মনে হয়। লিজা সম্পর্কে সামাদ কিছুটা খবর রাখে, কারণ সামাদ এবং সুচারু অন্য এক সফরে ব্যাংক লাইনের একই জাহাজে ছিল। সুচারু নিশ্চয়ই এখন পুরনো সব ছবি টেনে বের করবে। এবং দরজা বন্ধ করে সেইসব ছবির উপর নুয়ে থাকবে।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল মাঠে। তিনজন নাবিকের মুখেই সূর্যাস্তের শেষে আলো। তখন নদীর জলে কিছু স্কিপ ভাসছিল। শীত শেষ হয়ে গেছে বলে কিছু পাখি ফের বকি অঞ্চলে বোধহয় ফিরে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের লাল রং উইপিং উইলোর ঝোপে পড়ছে, সেখানে ছোট বড় পাখি ফুর ফুর করে উড়ছিল। জাহাজিরা সব ডেকে বসে কোনও পুরনো স্মৃতির ভিতর ডুবে ছিল। কেউ সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হিসাব করে দেশের মাতব্বরদের কথা ভাবছিল, ব্যবসার কথা ভাবছিল এবং ঘর-দোর ঠিক করার কথা ভাবছিল। কেউ হয়তো তীর দেখার সময় ছোট ছোট শিশুদের দেখছিল এবং সন্তানদের কথা মনে করে, প্রিয়জনের কথা মনে করে বিষণ্ণ হচ্ছিল। আর কিছু জাহাজি, এখন ডেকে তাস খেলছে বসে বসে ওরা তীরে না নেমেও মেয়েদের সম্পর্কে কটূক্তি করে আনন্দ পাচ্ছিল।

সুমন দেখল একসময়, সুচারু, সামাদ কেউ নেই। সে একা। এখন যেন কিছু করণীয় নেই, শুধু বসে বসে তীর দেখা অথবা যারা দূরবর্তী গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, যারা শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে যাবে ভেবে আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না, তাদের কিছু ক্লান্ত অবয়ব সরাইখানার ভিতর এখনও দৃশ্যমান এবং সহসা মনে হল সর্বত্র আলো, ডেকে আলো, মাস্তুলে আলো, উইংস-এ আলো এবং বন্দরের বিচিত্র সব বিজ্ঞাপনে আলোর বন্যা। সুতরাং সুমন বসন্তের আকাশ দেখল একবার, এই আকাশ মানুষের জন্য, মাঠ মানুষের জন্য, প্রাণ ভালবাসা মানুষের জন্য, আর নদীর জলে যেন মায়ের মুখ প্রতিবিম্বের মতো ভাসছে। সুমন দীর্ঘ সময় আবিষ্ট হয়ে বসে থাকল। কোনও কোলাহল ভাল লাগছিল না। শুধু মায়ের স্মৃতি শরৎকালীন মেঘের মতো কোনও শীতের নক্ষত্রকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ সুমন এভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। সহসা খেয়াল হল ভাণ্ডারি গ্যালিতে মশলা দিয়ে মাংস ভাজছে। কিছু জাহাজি মেসরুমে নামাজ পড়ছিল। নীচে এখনও যেন কে রঙের টবটা একনাগাড়ে বাজিয়ে চলেছে। সুমনের এসব কিছুই ভাল লাগছিল না। আর সিঁড়ি ধরে নামবার সময় দেখল বড়-টিন্ডাল তামাক কাটছে। প্রাচীন নাবিকের মতো মুখ। ফোকশালে অম্বরী তামাকের গন্ধ। উপরের বাংকে ডংকিম্যান রশির জাল বুনছে। বড়-টিন্ডালের মুখ ভয়ানক উদাস। সুমনকে নেমে যেতে দেখে বললেন, এত জলদি নীচে নাইমা আইলা জ্যাঠা?

সুমন বলল, ভাল লাগছে না জাঠা।

বড়-টিন্ডাল বলল, যাও ঘুমাও গা। রাইতের পরির পরে তো ঘুমাও নাই?

অথবা বড়-টিন্ডাল যেন সব ধরতে পারছে। এই যে এতদিন সমুদ্রে জাহাজ বেয়ে আসা শুধু যেন তীরের জন্য, ঘাস-মাটির জন্য আর সেই তীর এত কাছে, এত নিকটবর্তী শহর, পাব, রেস্তোরাঁ এবং ভাসমান আকাশের মতো আস্তাবলের মাঠ, যেন সবই দৃশ্যবহুল ছবি অথচ সুমন নীচে নেমে অবাক হয়ে গেল, সুচারু সামাদ রঙের টব বাজাচ্ছে এবং নেচে নেচে গাইছিল, ফান্দে পড়িয়া বগায় কান্দে । কোনও করুণ দৃশ্য এখন আর সুচারু সামাদ বহন করছে না।

ফোকশালে ঢুকলে সামাদ আর সুচারু চুপ হয়ে গেল।

সুচারু বলল, যুবতীর দুঃখ ভুলে থাকছি।

সামাদ বলল, চমৎকার গান।

অন্যান্য নাবিকরা বলল, শালা, জাহাজে আগুন লাগুক।

সুমন শুনল সব। এই বিপরীত-ধর্মী জীবন এখানে সবসময় সুমনকে আঘাত করছে। সে নীচে এসেও কোনও শান্তি পেল না। বরং হেনরি তীর থেকে ফিরলে ওর জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারে। ঘড়ি দেখে বুঝল, রাত গভীর হতে দেরি নেই। নাবিকেরা এখন যে যার ফোকশালে শুয়ে পড়বে। এবং বড়-মালোম হয়তো এখনই কোনও বেশ্যা রমণীকে টানতে টানতে কেবিনে তুলে আনবেন, অথবা নিমন্ত্রিত অতিথির মতো আগে এসেই বসে থাকবে। সুমন ডেক ধরে হেনরির কেবিন পর্যন্ত হেঁটে গেল।

হেনরি দরজা খুললে সুমন বলল, এত সকাল সকাল?

হেনরি মদ খেয়েছে বলে আচ্ছন্ন মানুষের মতো বিড় বিড় করে কী উত্তর করল সুমন বুঝতে পারল না।

সুমন কেবিনে ঢুকে বাংকে বসল। ওর খুব হাই উঠছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল ওর। তবু তীরের কিছু খবর নেবার জন্য সে বসে থাকল বাংকে।

হেনরি সহসা বাথরুমে ঝড়ের বেগে ঢুকে গেল। কেবিনে নীল রঙের আলো জ্বলছে। ওর মা'র ছবি টেবিলে এবং স্ত্রীর ছবি দেয়ালে টাঙানো। হেনরির বালিশ থেকে ছবিটা মুখোমুখি। এবং সুমন এই বাংকে বসে টের পাচ্ছে হেনরি বাথরুমে বমি করছে। এক অস্পষ্ট বেদনা হেনরি সবসময় বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখে, যা এই বন্দর-শহরে এলে ধরা যায়।

বমি করার পর হেনরিকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। সুমন ওকে বাংকে শুয়ে পড়তে সাহায্য করল এবং কম্বল টেনে দেবার সময় বলল, কী, শরীর হালকা বোধ হচ্ছে তো?

হেনরির চোয়াল দুটো ভারী এবং বয়স্ক বলে ওর হাসিটুকু ভিতরে আটকে থাকল। বড় বড় হাই তোলার জন্য হাত-পা শক্ত করে রাখছে। তারপর পাশ ফিরে বলল, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, কী দরকার ছিল জাহাজি হওয়ার। বড় একঘেয়েমি এই জাহাজে।

সুমন বুঝল হেনরি একদম ভাল নেই। স্ত্রীর বিরহে খুবই কাতর। সুতরাং হেনরি এখন সুমনের সঙ্গে সারারাত বকবক করতে চাইবে? অত্যধিক মদের জন্য হেনরি খুব আড়ষ্ট হয়ে আছে। সুমন আর বসল না। ধীরে ধীরে বাইরে এসে দরজা টেনে দিল।

হেনরি মাথা তুলে দেখল সুমনকে। সুমন চলে যাচ্ছে। হেনরি পাশের টেবিল থেকে মায়ের ছবিটা মুখের কাছে নিয়ে এল। মা'র অল্প বয়সের এই ছবি। তারপর সে তার বউয়ের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। স্ত্রীর মুখে সরল হাসি, এই হাসিটুকুর ছায়াতেই হেনরি আশ্রয় চেয়েছে বারবার। তারপর সে উঠে মায়ের ছবির পাশে ওর বউয়ের ছবি রাখল এবং নিজের ছবি পকেট থেকে বের করে পাশাপাশি ছবিগুলো সাজাল। বন্দরে এমন সব মুখ সে যেন দেখে এসেছে কত। সে মনে মনে বলল, তোমরা সব এক। তোমাদের কোনও তফাত নেই। বলে, একা-একা এই অপরিচিত বন্দরের ভেতর হো হো করে হেসে উঠল।

তিন

খুব ভোরে উঠেই সুচারু চা করেছে। সামাদ উপরের বাংকে। সে চায়ের গন্ধ পেয়েই নিজের মগ বের করে চিৎকার করতে থাকল, আমার চা, আমার চা।

সুচারু বলল, আমি কারও জন্য চা করিনি।

সামাদ বলল, দে বাবা, একটু দে।

সুচারু বলল, তুই বড্ড কুঁড়ে।

সামাদ বলল, বন্দরে জাহাজ নিয়ে এসেছি। এখন বিশ্রাম। কাল তোকে আমি খুব ভোরে উঠে চা করে খাওয়াব।

ঠিক?

ঠিক।

নে ধর। এই সুমন।

সুচারু সুমনকে ডাকল, নে। তুইও খা।

বলে চা তিনভাগ করে তিনজনই খেয়ে নিল।

জাহাজের খোলে রং লাগানোর জন্য ফলগুলোতে তখন দড়ি বাঁধা হচ্ছিল। সবাই এক-এক করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সুচারু, সামাদ চা খেয়ে উপরে উঠে গেল। ফলকায়-ফলকায় দ্রুত ওরা ছুটে বেড়াচ্ছে। ডেক-টিন্ডাল হোস-পাইপ নিয়ে গেছে বোট-ডেকে। হেনরি কেবিন থেকে ওর সব ক্যানারি পাখিগুলো বের করে খাঁচার উপরে জল ঢেলে দিচ্ছে।

সুমন ওর বাংকে নীল পোশাক পরে নিল। বড়-মালোম ইউনিফর্ম পড়ে ডেক-সারেঙের কাজ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং সুমন নীল পোশাকের ভিতর ঢুকে যেতেই রাতের অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা মনে হল। অল্প জলে জাহাজটা আটকে গেছে। সে একা একা জাহাজটাকে ঠেলে ঠেলে নিচ্ছিল, যেন একটা কচ্ছপ জাহাজটাকে চড়ায় তুলে দিয়েছে, বড়-মালোম লগি মারছেন। জাহাজের ফরোয়ার্ড পিকে তখন সব সৈন্য-সামন্তরা যেন কুচকাওয়াজ করছিল। আর সামাদ যেন হুবহু ক্রোজনেস্টে বসে কাক তাড়াচ্ছে।

ইঞ্জিন-সারেং তখন ডেকের উপরে হাঁকল, জোয়ান লোক টান্টু।

সুমন গ্যালির পাশে এসে দাঁড়াল। ইঞ্জিন-সারেং সকলকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। স্মোক-বক্স পরিষ্কারের জন্য তিনজন ফায়ার-ম্যান আর দু'জন কোল-বয়কে দিয়ে দিলেন। ছোট-টিন্ডাল ওদের নিয়ে ইঞ্জিন রুমে নেমে গেল। ডংকিম্যান এবং দু'জন ফায়ারম্যানকে আজও টানেল-পথে রং করতে নির্দেশ দিলেন। কিছু কোল-বয়কে প্লেট ঘষতে নির্দেশ দিয়ে নিজে যুবকের মতো লাফ দিলেন একটা। সুমনকে ফালতু হিসেবে আজও হেনরির সঙ্গে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন উইনচে। সুতরাং সুমনও ডেকে নেমে গেল। তারপর ইঞ্জিন রুমে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নীচে নামার সময় সে গুন গুন করে গান গাইল। সে কশপের কাছে থেকে নানা সাইজের স্প্যানার হাতুড়ি বাটালি নিয়ে উপরে উঠতেই দেখল ডেক-বড় টিন্ডাল জাহাজের সর্বত্র জল মেরে যাচ্ছে। সুমন মাস্টের নীচে বালতি নিয়ে বসে থাকল হেনরির জন্য। হেনরি আসছে। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে। ওর পকেটে আপেল। সে আপেল কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল। এবং তীরে তেমনি নিকটবর্তী শহর, কল-কারখানা, চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। জেটি প্রায় জনশূন্য। শহরের অ্যাম্বুলেন্স গেল। কোনও গির্জায় হয়তো ঘণ্টা বাজছে। বেসবলের মাঠে একজন মেয়ে গলফ খেলছে মনে হচ্ছে। পোষা কুকুরটা গলফের বল তুলে আনার জন্য ছুটছিল, পেছনে অন্য তীর এবং মাঠ। গোলায় যারা ফসল তুলছিল তারা বের হয়ে পড়েছে বাজার করার জন্য। দোকানিরা সব কাচের ঘর খুলে দিচ্ছে।

সুমন কিছু ভাবছিল হয়তো। অথবা বলার ইচ্ছা, আর ভাল লাগছে না। রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না। যতসব আজগুবি স্বপ্ন এবং মায়ের প্রতিবিম্ব সর্বদা স্বপ্নের মতো একপাশে বসে থাকছে।

হেনরি ডাকল, হেই।

এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখল জোরে একটা আপেল ওর দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। সুমন আপেলটা লুফে নিল। তারপর দু'জন আপেল কামড়ে খাচ্ছিল এবং পরস্পর দুলে দুলে হাসছিল! তারপর সুমনও সহসা হেনরির মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, হেই! হেই...হেই। ওরা গানের মতো কোমর বাঁকিয়ে ধরল। ডেকে যখন বড়-মালোম অথবা কাপ্তান কিংবা বড়-মিস্ত্রিকে দেখা যাচ্ছে না এবং চিফ কুকের গ্যালির জন্য জায়গাটা বেশ গোপনীয়, তখন ধীরে-সুস্থে একটু কোমর বাঁকিয়ে নাচা যাক।

কিন্তু ওরা দেখল লাইফ-বোটের পাশ দিয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে বড়-মালোম এবং মেজ-মালোম নেমে আসছেন। হেনরি এবং সুমন তাড়াতাড়ি উইনচ-মেশিনের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ওরা কাছে এলে সুমন বলল, গুড মর্নিং স্যার।

গুড মর্নিং।

বড়-মালোম বললেন, খুব খারাপ লাগছে?

মেজ-মালোম বললেন, ট্যান-টেলাস।

সুমন বলল, ইয়েস স্যার।

ছোট-মালোম বললেন, শহরটা বড় সুন্দর।

ওরা চলে যাচ্ছিল। ওরা ঘুরে ঘুরে দেখছে। ওরাও প্রাচীন নাবিকের মতো মুখ করে রেখেছে। নিশান উড়ছে মাস্তুলে। জেটির অন্য প্রান্তে কিছু জাহাজ, হংকং অথবা আফ্রিকার বন্দর থেকে জাহাজগুলি এসেছে। জাহাজের পিকে সোমালি নাবিকের মুখ। মেজ-মালোম ঠাট্টা করে বললেন, সুমন ইচ্ছা করলে তুমি নেমে যেতে পারো। তোমাকে দেখলে ওরা স্প্যানিশ বলে ভাববে।

সুমন বলল, কোয়ার্টার-মাস্টার রাজি হচ্ছে না।

হেনরি ফিসফিস করে বলল, কাপ্তান তো কিছু দেখছেন না। নেমে গেলেই হল।

বড-মালোম বললেন, খুব মারাত্মক জায়গা। পুলিশ-কুকুর, নাৎসি বাহিনী এবং এখানেই ন্যাশনাল স্টেটস পার্টির বড় আড্ডা।

সুমন আর কথা বলল না। দাঁড়িয়ে থাকল। এ সময় হেনরি মেশিনের ভেতর থেকে মাথা বের করে বলল, সেকেন্ড, কাইন্ডলি একটা কাজ করিয়ে দিতে হবে।

কী কাজ?

আমার ঘরটা একটু রং করে দিতে হবে।

কী ব্যাপার!

একজন আসবেন। বড় নোংরা হয়ে আছে কেবিনটা।

একটু চকচকে করে দিতে হবে?

দিলে ভাল হয়।

দেন হ্যাপি ডে।

ইয়েস, হ্যাপি ডে।

ওরা চলে গেলে সুমন কিছুক্ষণ ড্রাম কভারে বসে থাকল। হেনরি মেশিনেব ভেতর ঢুকে কাজ করছিল। খুট খুট শব্দ হচ্ছে। হেনরি খুট খুট করে চিজেল চালাচ্ছে। হেনরি এখনও কিছু খুলে বলছে না, এখনও চুপচাপ কাজ কবে যাচ্ছে। ওর অভিমান হচ্ছিল। সুতরাং আহত গলায় বলল, হেনরি, তোমার কে আসবে?

একজন মহিলা আসবে।

আমি কথা বলতে পারব না?

না।

কেন?

ওরা কালা আদমিদের সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করবে।

আমাব রং তো কালো নয়।

কিন্তু কথায় কথায় তুমি ভারতীয় বলে চেঁচালে আমি মুশকিলে পড়ব।

সুমন চুপ করে থাকল। সে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। এবং বালক-সুলভ ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ভারী বয়ে গেল।

সুমন মনে মনে চটে গেছে বুঝতে পেরে হেনরি বলল, বকবক করতে পারবে না কিন্তু। ভাঙা-ভাঙা ইংরিজি বলবে আর খুব ভাল মানুষ সেজে থাকবে। অশ্লীল কথাবার্তা বললে পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্রে হারিয়া করে দেব।

হেনরি এইসব কথা বলছিল আর চিজেল মারছিল।

ন্যাশনাল স্টেটস রাইট পার্টিকে আমার বড় ভয়।— সে ফিস ফিস করে বলল, যে ভদ্রলোক মদ খাওয়াল, তার বোন, বোনের মেয়ে আসবে। খুব বনেদি ঘর। কথাবার্তা সাবধানে বলবে।

সংকীর্ণ পরিসরের জন্য চিজেলের উপর হাতুড়িটাকে কিছুতেই হেনরি সহজভাবে মারতে পারছিল না। সে নীচে থেকে উঠে এসে লিভার-প্লেটে হাঁটু গেড়ে বসল। পেট বুক ওয়ার পিন ড্রামের উপব রেখে চিজেলটা সে স্ট্রেপারের মুখে গলাতে চাইল। সে যেন ঝুঁকে বুঝল, এখান থেকেই কাজের সুবিধা বেশি। সুতরাং এখন আর কোনও মেয়েমানুষ সম্পর্কে কথা নয়। ওরা একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করল।

হেনরি খুব নুয়ে নুয়ে কাজ করছিল বলে পিঠে ফিক ধরে গেল। সে মাস্তুলে পিঠ টান টান করে বসল কিছুক্ষণ। মাস্তুলে রং লাগাচ্ছে সামাদ। নীচে সুচারু দড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। মাস্তুলের ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রং ফেলছিল সামাদ। সুমন দু'বার মুখ তুলে দেখল, তৃতীয়বার শাসাল। সামাদ কিছু শুনতে পাচ্ছে না মতো মাস্টের চার ধারে ঘুরে ঘুরে রং লাগাচ্ছে। সামনের ডেক থেকে নাবিকরা দড়ি কাঁধে ফিরে আসছে। এবং ফলকার নীচে লম্বা স্টিকব্রুম নিয়ে নাবিকরা জাহাজের খোল পরিষ্কার করছিল। আর তখনই হেনরি বলল, মিসেস ভারোদির নানারকমের পাখি পোষার শখ। তিনি আমার সবুজ রঙের ক্যানারি পাখিগুলি দেখতে আসবেন।

জাহাজে এ বড় উত্তেজক খবর। সারাদিনের কাজ বড় দায় মনে হচ্ছে। বিকেলের দিকে একটু আগে ইঞ্জিন জাহাজিদের কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যারা স্মোক বক্স পরিষ্কার করছিল, ওরা এখন স্নান করছে বাথরুমে। সুমন বাথরুমে ঢুকে আনন্দে লা লা করে উঠল।

সুচারু এবং সামাদ ডেক-নাবিক। তবু ওরা একসঙ্গে ছোট এক ফোকশাল বেছে তিনজন আশ্রয় নিয়েছে এই জাহাজে। এই নিয়ে প্রথম-প্রথম দুই সারেংই ঝুটঝামেলা করেছিল, এখন সব সয়ে গেছে। সুতরাং ওরা তিনজন একসঙ্গে বাথরুমে ঢুকে উলঙ্গ হয়ে চানে মেতে গেল। বালতি বালতি জল ঢেলে সাবান মেখে, তেলে জলে শরীর মনোরম করে একসময় একসঙ্গে বেরিয়ে দেখল সূর্য অন্য প্রান্তে মাঠের ওপাশের গোলাবাড়িতে হেলে পড়েছে। গাছের ছায়া এখন দীর্ঘতর অথবা লম্বা ছায়ার মতো। ওরা দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখল।

আজও বড় মালোম, মেজ মিস্ত্রি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। পাশের জাহাজে একটি সোমালিয়ান নাবিক কী এক কারণে অন্য নাবিকের বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়ে বিচে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স, ভিড়। সুমন সব নাবিকের সঙ্গে সেই মৃতদেহ দেখার সময় লক্ষ করল, জেটিতে হেনরি এবং ভারোদি, তার মেয়ে ওরা হেনরির সঙ্গে জাহাজে উঠে আসছে।

সে এবার চটপট তৈরি হয়ে নিল। বসন্তকাল, ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া। এবং উষ্ণতা কম। সুমন সাদা শার্ট এবং হাফপ্যান্ট পরল আর তেলে জলে এই শরীর কোমল ত্বকে মিষ্টি গন্ধ পুরোপুরি এক ভারতীয় যুবকের মতো ডেক ধ র হেঁটে গেল।

সামাদ পথে ধরল, বলল, গন্ধে গন্ধে যাওয়া হচ্ছে।

সুমন প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে হাসল। ভাবটা যেন ওটা কিছু নয়, এমনি ঘুরতে ঘুরতে যাওয়া।

হেনরির সঙ্গে সুমনের ধীরে ধীরে যেন এক আত্মীয়তা গড়ে উঠছে। জাহাজের সব নাবিকরাই এটা জেনে গেছে, সুমন এক তরুণ নাবিক এবং সুমনের মিষ্টি মুখ অথবা মায়ের মৃত্যুর খবরে অসহায় চোখ সকল নাবিকদের কাছে, সকল অফিসারদের ভিতর কোনও এক অলৌকিক ঘটনার মতো। সুমনের বালক সুলভ চপলতা সকলকে আপনার করে নিয়েছে।

সুমন যেতে যেতে এক নম্বর মাস্তুলের নীচে একটু দাঁড়াল। প্রথম ফলকার পাশে কিছু নরম কাঠ ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে তখন ঝড় এবং ঢেউ। এইসব ভাসমান কাঠ ঝড়ের তরঙ্গমালায় ডেকে আটকে গেছিল। কাঠগুলো এখনও আছে। নরম কাঠে হেনরি অবসর সময়ে আশ্চর্য সব মূর্তি তৈরি করছে। সে কাঠগুলো খুব যত্নের সঙ্গে একপাশে জড়ো করে রেখেছে।

হেনরি হয়তো এখন ওর কাঠের মূর্তিগুলো ওদের দেখাচ্ছে। কোথাও জিশুকে গোরুর গাড়িতে টানছে এবং কোথাও পাহাড়ের নীচে সমুদ্রের বেলাভূমি অথবা ভারতবর্ষের কিছু দেবদেবী, তাইফের কোনও মন্দিরের বৌদ্ধমূর্তির অবিকল নকল, হ্যানয়ের শান্তির দেবী এবং ত্রিনিদাদ অঞ্চলের কোনও ল্যাটিন আমেরিকান চাষির মুখ, সে সারি সারি সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। কখনো এই কাঠ-খোদাইয়ের ভিতর ক্যানারি পাখিরা শস্য খাচ্ছে। কোনও নিগ্রো রমণীর মাথায় মোরগের পালক গোঁজা এবং সুমনের ঘরে একটা বাতিদান রয়েছে যা হেনরি ওর দেশের জন্য এবং ভাবী স্ত্রীর জন্য উপহার দিয়েছে।

হেনরির পাশের কেবিনগুলো খালি। শুধু ব্রিজের পাশে কাপ্তানের ঘরে আলো জ্বলছে। তিনি বুড়ো মানুষ, সুতরাং বন্দরে নামেননি। প্রায় বন্দরে ডেক-চেয়ারে বসে থাকেন এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সে সন্তর্পণে হেঁটে এসে দরজার উপর কান রেখে বুঝল হেনরি ওদের পাখিগুলো সম্পর্কে কী যেন

বিশ্লেষণ করছে। মাঝে মাঝে মেয়েটির উচ্চকিত হাসি শোনা যাচ্ছিল। সুমন আর দাঁড়াতে পারছে না অথবা অপেক্ষা করার ধৈর্যটুকু যেন তার একেবারে নেই। সে দরজায় টোকা মারল।

দরজা খোলার আগে জুতোর খসখস শব্দে মনে হল হেনরি এদিকে আসছে। সুমন এই সামান্য সময়টুকুর ভিতর ফের তার বেল্ট এবং জামার কলার টেনে-টুনে নিল আর দরজা খুলতেই সে দেখল এক কিশোরী মেয়ের মুখ, কোনও গ্রাম্য পাবের সরল বালিকা যেন, চোখ রেশমের মতো গভীর, চুলে সোনালি রং, শরীরের রং বসন্তকালীন গমের মতো। সুমন হেনরির কথামতো গোবেচারা লোক সাজতে গিয়ে ভয়ংকরভাবে বুড়বক বনে গেল।

সুমনকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই হেনরি বলল, মাই ফ্রেন্ড। কাপ্তানের সন-লাইক-সেলর। ভেরি জলি, অ্যান্ড ভেরি ইয়াং।

তারপর সে বলল, সরল নাবিক আমাদের সুম্যান।

নামটাকে সে একটু বিদেশি কায়দায় উচ্চারণ করল।

কিছুক্ষণ আগে তোমাদের কাছে এর গল্প করেছি। বিখ্যাত ম্যাটাডব ওজালিওব পৌত্র। দেন ওজালিও দ্য সুম্যান, এরা হচ্ছেন মিসেস ভারোদি টিলডেন আর ইনি তার একমাত্র কন্যা ফুরফুরে প্রজাপতি মারিয়া। এঁদের পূর্বপুরুষ ১৭৯৩ সালে নতুন জমিব উদ্দেশে কার্পাস চাষেব জন্য এখানে চলে আসেন।

হেনরি কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতাব মতো থেকে থেকে কথাগুলো বলছিল। ভারোদি যেন কিছুই শুনছেন না। বংশ-মর্যাদায় গর্বিত চেহারা নিয়ে তিনি গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন।

ক্রমশ ঘেমে উঠছে সুমন। সংকোচ এবং মিথ্যা অভিনয়ের জন্য ওব ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মিসেস ভারোদি পাখির খাঁচাগুলো দেখছিলেন। তিনি মাত্র একবার চোখ তুলে সুমনকে দেখেছেন। ভাবখানা যেন—ইয়েস সুম্যান, ওজালিও দ্য এই জাতীয় কোনও বিখ্যাত ম্যাটাডর, স্পেনে হয়তো থাকবে। তার জন্য লাফালাফি করার মতো কিছু নেই। ভারোদি কথা প্রসঙ্গে উইলিয়ম হার্পারেব নাম উচ্চারণ করলেন।

তিনিও আমাদের একজন পূর্বপুরুষ।— বলে তিনি ফের পাখির খাঁচার ভিতর থেকে দুর্লভ পাখিব অনুসন্ধানে রত হলেন। ফের কী ভেবে বললেন, মিস্টার হেনরি, আপনার জানবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের এই দক্ষিণ-দেশগুলোতে যে কোনও শিক্ষিত লোককে বললেই তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে হার্পারের নাম উচ্চারণ করবে। দাস-প্রথা লোপ করার জন্য যখন খুব বাড়াবাড়ি চলছে তখন তিনি এবং ভার্জিনিয়ার উইলিয়াম অ্যান্ড মেবি কলেজের অধ্যাপক টমাস রডারিক, পরে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, দক্ষিণ ক্যারোলিনার জন সি. ক্যালহাউন, তাঁরা এক নতুন যুক্তি আবিষ্কার করলেন এবং বললেন, উন্নততর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে সরকারি কাজে বেশি আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাব জন্য দাস-প্রথার প্রয়োজন আছে।

তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিলেন। অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা, বংশ-মর্যাদায় আমরাও কম যাচ্ছি না।

মারিয়া চুপচাপ বসে ছিল। সুমন চুপচাপ সামনের একটা বাংকে জবুথবু হয়ে বসে ছিল। সুমন মারিয়ার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে তাকে হেনরি ক্রমশ মহৎ করে তোলার চেষ্টা করছে। মেয়েটির হাঁটু থেকে ফ্রক উঠে আসছিল। যত তাকে মহৎ করে তোলা হচ্ছে তত সে তার নাবিক সুলভ প্রবৃত্তি যেন হারিয়ে ফেলছে।

ভারোদি প্রায় সব সময়ই খাঁচার উপর নুয়ে ছিলেন। তিনি কী যেন দেখছেন পাখিগুলোর ভেতর। তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে কথা বলে যাচ্ছিলেন, আর দুর্লভ প্রজাতির পাখিগুলো লক্ষ করছিলেন, শেষে এক সময় হেনরির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই পাখিটাই রেয়ার। এটা, মিস্টার হেনরি, আমার চাই।

হেনরি বলল, আচ্ছা হবে।

মারিয়া বাংক থেকে উঠে পড়ল। এবং পোর্ট-হোল দিয়ে নিজের পরিচিত শহরটিকে দেখতে গিয়ে কেমন অপরিচিত শহর বলে মনে হল। ছোট ঘুলঘুলি, সব স্পষ্ট দেখা যায় না।

সুমন পোর্ট-হোলে মুখ না রেখেই বলল, বড় সুন্দর শহর।

এইটুকু বলতেই ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে চাইল।

কিশোরী বালিকা সুমনের কথাবার্তা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল। কারণ সুমনের চুল, চোখ এবং মুখ মেয়েটির কাছে জাদুকরের পালিত পুত্রের মতো। ওর ছবির বইয়ে এমন একটা মুখ যেন কোথাও আঁকা আছে।

সুমন মারিয়ার এই আগ্রহটুকু লক্ষ করে আরও শান্ত হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এখন মারিয়া একটু অন্যমনস্ক গোছের। শরীরে নরম সিল্কের স্কার্ট এবং পরনে বাদামি রঙের গাউন। কিছুটা সেমিজের মতো ঢং পোশাকে। খুব হালকা বলে বগল পর্যন্ত খালি দেখাচ্ছে। মুখে এক ধরনের গোলাপি রঙের প্রসাধন। মুখে কিছু জরির কাজ থাকলে জাপানি পুতুলের মতো মুখ মনে হত। চোখ যথাযথ এবং ভ্রু টানা বলে কথা বললেই বড় চঞ্চল মনে হয়, কারণ মুখে নানা রকমের ভঙ্গি মেয়েটির অজান্তেই ফুটতে থাকে। আর সুকোমল প্রবৃত্তিরা খেলা করতে থাকে শরীরে। সুমন গ্রাম্য বালকের মতো মুখ করে কেবিনের সব কিছু দেখছিল। হেনরি দাস-প্রথা সম্পর্কে বলছিল, এই যে ভারতীয় নাবিকরা বন্দরে নামতে পারছে না, খুবই অমানবিক এবং পাশের জাহাজে সোমালি নাবিকের বুকে ক্ষত, হয়তো ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সবই অত্যন্ত দুঃখজনক। সুতরাং সুমনেরও ইচ্ছা হল কিছু বলতে। ইচ্ছা হল বেসবলের মাঠ ধরে দূরে যে অশ্বশালা দেখা যাচ্ছে, তার ওপাশে কী আছে জানতে।

ভারোদি মেয়ের দিকে এবার মুখ করে বসল। সুমন পাশে বাংকের ওপর পা সোজা করে বসে আছে এবং হেনরি মেসরুম বয়কে ডাকতে বাইরে গেছে।

ভারোদিকে মারিয়া কানে কানে কী ফিস ফিস করে বলতেই ভারোদি প্রশ্ন করল সুমনকে, তুমি কখনও ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করোনি?

এই প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য জাদুকরের পালিত পুত্রের মুখের দিকে মুখ ফেরাল মারিয়া। মুখ ফেরালেই সেই ঘন কালো চুল এবং সেই এক মুখ অথবা মারিয়ার মনে হল বুনো ফুলের গন্ধের জন্য কেউ যেন সব সময় এই ঘন কালো চুলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সুমন অত্যন্ত বিচলিত গলায় বলল, না।

ভারোদি কেমন আহত গলায় বলল, পারিবারিক ট্র্যাডিশন নষ্ট করে দিচ্ছ?

সুমন একটু সোজা হয়ে বসল। এবং ধীর-স্থির ভাবে জবাব দিল, খুব বেদনায়। তবু চেষ্টা করছি যাতে একেবারে নষ্ট হয়ে না যায়।

সফর শেষে লড়বে।

এবার সে চতুর হতে চাইল। বলল, না, কাকাবা লড়ছে।

খুব আশার কথা। ট্র্যাডিশন নষ্ট হচ্ছে না খুব আশার কথা।

ততক্ষণে হেনরি ফিরে এসেছে। বয় কফি দিয়ে গেল। কেবিনে সেই এক নীল আলো। আলোর ভিতর সকলকেই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হেনরি ঢুকেই বলল, কী কথা হচ্ছিল?

লড়াইয়ের কথা।— মারিয়া ফ্রক ঠিক-ঠাক করে বসল।

ষাঁড়ের লড়াইয়ের কথা।— ভারোদি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেন ষাঁড় কথাটা যুক্ত করল।

হেনরি এক সময় কফি খেতে খেতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের গল্প করল। দ্বীপের মেয়েদের গল্প বলল। আনারস সংগ্রহের সময়ে বিচিত্র পোশাক অথবা নীল সমুদ্র, দূর থেকে আনারস খেতগুলোর ভেড়ার পালের মতো দৃশ্য, লম্বা নীল রঙের মেটাল পথ, সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে নারকেল-কুঞ্জ এবং নারকেল পাতার বিচিত্র টুপি অথবা দ্বীপবাসীদের খালি গা, হালকা পোশাক সবই গল্প বলার সময় অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। মারিয়া খুব মন দিয়ে দ্বীপের গল্প, বন্দরের গল্প এবং সমুদ্রের গল্প শুনছিল। আর এই সব গল্প ওকে কোনও রূপকথার জগতে যেন নিয়ে যায়, যেন সে কোনও লালরঙের পাহাড়ের গিরিপথ ধরে কোনও ঝরনা আবিষ্কারের জন্য ছুটছে। দু'ধারে বিচিত্র সব গাছে বিচিত্র রঙের ফুল এবং নানা দেশের পাখিরা মধু খেতে এসে এক অপরিচিত ফুলের মতো বালিকাকে দেখে মাথার উপর উড়ছিল। আর দূরে কোথাও কোনও কুঁড়েঘর আছে এবং ডাইনি আছে অথবা কোনও ড্রাগন সমুদ্রের নীল জল অতিক্রম করে উঠে আসছে। এইসব গল্পের ভিতর ওর লাইটহাউসের ছবি মনে আসছিল, ছোট এক বালক মিকি, বাবা মা লাইটহাউজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ছোট্ট মিকি একা-একা সমুদ্রের ধারে বসে দূরের সব জাহাজ

অথবা শুকনো কাঠ ভেসে যেতে দেখছে এবং সেইসব দূরবর্তী জাহাজের মাস্তুল গোনার সময় ওব চোখে-মুখে অপরিসীম এক লাবণ্য ভেসে থাকত। সেই মিকি বড় হয়ে যেন সুম্যান হয়ে গেছে— ওজালিও দা সুম্যান। মনে হতেই মারিয়া ভিতরে ভিতরে লজ্জায় গুটিয়ে গেল।

সুতরাং মারিয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব শান্ত। মারিয়া ছোট ছোট প্রশ্ন করছিল। এবং সুমন ছোট ছোট জবাব দিচ্ছে। মারিয়ার হাতে সাদা দস্তানা। ক্যানারি পাখিগুলো এলিওয়েতে কিচির-মিচির শব্দ কবছে। ভারোদি গল্প প্রসঙ্গে কার্ডিফের কথা বলল, কার্ডিফ ক্যাসেলের কথা বলল এবং সেখানেই তার দুটো নাইটিংগেল পাখি পোষার শখ হয় একথাও ওদের জানাল।

ভারোদি বলল, আমরা গোল্ডেন ইগল ধরার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছি। তাবপর ট্যাঙ্গানাইকা থেকে আমদানি কবতে হয়েছে।

হেনরি বলল, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই। যদি অনুমতি দাও।

ভারোদি বলল, কী?

তোমার এই নানা জাতের পাখি পোষাব শখ কেন?

ভাবোদি প্রথম এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, এই এমনি।

অসুবিধা হলে থাক।

এবাব ভারোদি কিছু স্পষ্ট হল যেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু করাব ছিল না। তা ছাডা পাখিদের ডিম ফুটে বাচ্চা দেবার প্রণালী আমাকে প্রেবণা দেয়।

তাবপব ভাবোদি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, কিছু করণীয় নেই। নাচ গান হল্লা আব ভাল লাগে না। ন্যাশনাল স্টেটস বাইট পার্টিব কিছু কাজ থাকে হাতে, বাকি সময় এই পাখিদের নিয়ে। একসময অনেক দেশ ঘুবেছি, কিন্তু সর্বত্রই এক ঘটনা। ঘটনা সম্পর্কে ভাবোদি কিছু বিশ্লেষণ কবল না।

হেনবি বলল, গ্যানিকে আসতে বললাম, এল না।

ওব অনেক কাজ। ওর স্ত্রী মরগানে যাচ্ছে। সেখানে গ্যানির বড একটা মদের দোকান আছে। একা বেচারা সব দেখে উঠতে পারে না।

এলিওয়েতে মেসরুমমেটের গলা পাওয়া যাচ্ছে। ফোকশালে এখন নাবিকবা বসে তামাক খাচ্ছে। আব ফলকাব উপর বসে সুচারু সামাদ তিন তাস খেলতে খেলতে চিৎকার করছে।

পাশের জাহাজে যে হত্যাজনিত ঘটনাব উত্তেজনা ছিল, তা এখন নেই। কারণ এইমাত্র মৃত লোকটিকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সুমন কেন যে সহসা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বসল মারিয়াকে, তোমার সমুদ্রে যেতে ইচ্ছা হয় না?

মারিয়া বলল, না।

সুমন যেন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না তখন। কথা বলে অন্তরঙ্গ হওযাব চেষ্টা, অথচ কোনও গল্পই যেন ভারোদি এবং মারিয়াকে আবিষ্ট করতে পারছে না। অসংলগ্ন কথার জন্য হেনরি খুক খুক কবে হেসে ফেলল। সে চোখ টিপল এবং চোখে ইঙ্গিত অর্থাৎ তুমি সুমন ষাঁড়-লডাইয়েব জাত, তোমার আব কতটা বুদ্ধি হবে।

ভারোদি বলল, এত ছোট বয়সে জাহাজে এসেছ, মা রাগ করে না?

ভারোদির চোখে মুখে কেমন একটা ভর্ৎসনার সুর ছিল।

সুমন বলল, না।

কেন না, তা সে আর বিস্তারিত করে বলল না।

বাকিটুকু হেনরি খুলে বলল, কিছুদিন হল ওর মা মারা গেছেন।

ভারোদির চোখ সহসা ঝাপসা হয়ে গেল। সে সুমনের মুখ দেখল। সে মাথা নিচু করে রেখেছে। পাশে মারিয়া। এই অপ্রীতিকর সংবাদে ওকেও যেন বিচলিত দেখাচ্ছে।

কেবিনে কোনও শব্দ হচ্ছে না তখন। সকলেই চুপচাপ। জেটি অতিক্রম করলে বন্দর এবং দূরে কারখানায় শিফটের বাঁশি বাজছে। তখন ভারোদি উঠে পড়ল। ওঠাব সময় ভাবোদি হেনরিকে বলল, কাল তোমরা এসো।

জাদুকরের পালিত পুত্রের হাতে হাত রাখল মারিয়া। বলল, কাল এসো।

এলিওয়ে-পথে প্রথম ভারোদি এবং পরে হেনরি। আর মারিয়া সুমন পাশাপাশি হাঁটছিল। ওরা কোনও কথা বলছিল না। হেনরি ওদের ইঞ্জিন-ঘরে নিয়ে গেল। ইঞ্জিনের মোটামুটি কাজের প্রকরণগুলি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। মারিয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ধরে নামছিল। নীচের দিকে তাকাতে মারিয়ার ভয় লাগছে। আর সুমন লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে।

বড় বড় বয়লারগুলো মারিয়ার কাছে দৈত্যের পেটের মতো। সে ভিতরে মুখ রেখে একবার হা-হা করে উঠল। শব্দটা ইঞ্জিন-রুমে গম গম করছে। দুটো বয়লার বন্ধ এবং অন্য বয়লারে এখনও কিছু স্টিম আছে। পাশের স্টিম-ককে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ উঠছে। আর উপরে বাংকার। কোনও আলো নেই সেখানে, খুব অন্ধকার। অন্ধকারে মারিয়া সুমনের হাত ধরে পা টিপে টিপে হাঁটছিল।

হেনরি একসময় বলল, এগুলো কয়লার বাংকার।

সুমন নীচে নেমে বলল, এটা টানেল-পথ। ওটা প্রপেলার-শ্যাফট।

মারিয়া প্রশ্ন করল, যদি শ্যাফটটা ভেঙে যায়?

তবে জাহাজ চলবে না।

এতক্ষণ পরে সুমন ওদের সঙ্গে প্রথম খুব সহজভাবে কথা বলতে পারল। এবং ওদের সঙ্গে ওর নিজের পর্বত প্রমাণ ব্যবধানটা যেন মুহূর্তে ঘুচে গেল। কারণ তাদের এই জাহাজ এবং সারাদিনের নিমিত্ত নীচের ওই শ্যাফট এবং ইঞ্জিন-রুমের প্রতিটি ভগ্নাংশ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। সুতরাং সে ঠাট্টার সুরে মারিয়াকে বলল, তোমাকে সমুদ্রে নিয়ে যাব মারিয়া।

আমি যাবই না।— মারিয়া লজ্জিত মুখে বলল।

কত সুন্দর সুন্দর দ্বীপ আছে, বড় টিয়াপাখি আছে।

থাকুক গে।

বড় বড় ঝিনুক আছে, ঝিনুকে মুক্তো আছে।

হেনরি সুর ধরে বলল, বড় বড় তিমি মাছ আছে, ডলফিনের ঝাঁক আছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল এবং এইসব বলছিল। হেনরি ভারোদিকে জাহাজটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। পিছিলে ভারতীয় নাবিকরা ভিড় করে আছে। ভারোদি ওদের দেখে মুখ কোঁচকাল এবং বলল, দি সেম নিগ্রো পিপল। হেল।

সুচারু কথাটা শুনে ফেলেছে। তার মুখ দিয়ে একটা বাংলা খিস্তি বেরিয়ে গেল।

সামাদ বলল, খুব যে সংস্কৃত আওড়াচ্ছিস।

সুচারু বলল, দ্যাখ সুমনটা পিছনে পিছনে কুকুরের মতো কেমন ছুটছে।

সামাদ বলল, ভাল করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুমনটা পারবে না। আমি হলে ও মাগির বাপের জাত ধরে টান মারতাম।

রাত বলে এবং বন্দরে কোনও কাজ হচ্ছে না বলে জাহাজ চুপচাপ হয়ে আছে। জেটি পেরিয়ে ভাঙা টালির ছাদের ঘর। এবং পরে সেই এক মেটাল রোড, পাব, রেস্তোরাঁ এবং কিছু দক্ষিণে হেঁটে গেলে শহরের বাসস্ট্যান্ড। সামনে সোজা হেঁটে গেলে ছোট দুটো পাব, বাজার এবং বড় মাংসের দোকান। আরও পরে গ্যানির পাব। এখন হয়তো দোকানে গ্যানি নেই। ওরা রাস্তায় পড়লে ভারোদি বলল, কাল তোমরা কিন্তু এসো।

পাশে ওদের গাড়ি, ড্রাইভার এবং পরিচারিকা। ঠিক বন্দরের মুখে সুমন আর হেনরি ওদের বিদায় জানাল। সুমন বেশি দূর হেঁটে যেতে সাহস পেল না। পথে ইতস্তত সব সাদা মুখ, সে ভয়ে ফের জাহাজের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করার সময় দেখল হেনরি ওর হাত চেপে ধরেছে। সে বলল, সামনের পাবটা একবার ঘুরে আসি।

সুমন বলল, তুমি যাও। আমার যেতে ভয় করছে।

সুমনের মুখ এখন যথার্থই শুকনো দেখাচ্ছে। কাচের ঘরের সামনে কাউন্টার আর বারান্দার মতো ব্যালকনি, থরে থরে সিলভার-ওক সাজানো আর জানালাতে সব রঙিন পর্দা। হেনরি সুমনের হাত ধরে পাবের ভিতর যেন জোর করেই ঢুকে গেল।

ওরা দু'জন কাউন্টারে লাইন দিয়ে বিয়ার নিল। তারপর পাশের সোফাতে পাশাপাশি বসে যত তাড়াতাড়ি পারল গিলে ফেলল। আর একটু বিয়ার। এবার কাউন্টারে হেনরি একা উঠে গেল। সুমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সকলেই যেন ওকে লক্ষ করছিল অথবা সে এক আশ্চর্য সামগ্রী এবং পাশের বুড়ো লোকটি হেনরির কানে কানে ফিস ফিস করে কী বলতেই সে বলল, ইয়েস স্ক্যান্ডেনেভিয়ান।

যখন যা মুখে আসছে হেনরি সাদা লোকদের সুমন সম্পর্কে বলে যাচ্ছে। সুমন যে ইন্ডিয়ান তা গোপন করে যাচ্ছে।

ক্রমশ সুমনের ভয় ভেঙে যেতে আরম্ভ করছে। পথে সে হেনরির সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল। সে দূরের অশ্বশালার পাঁচিলের ওপাশে যেতে চাইল অথবা অন্য তীরে যে সব খেত খামার এবং যেখানে এখনও অন্ধকারে বসন্তের মাঠ পড়ে আছে. সে যেন ভাবল, কাল সে কোথাও চলে যাবে আর হয়তো সেইসব মাঠে ট্রাক্টরে চাষ হচ্ছে এখন, আর ধোঁয়া উঠছে। গ্রাম্য মানুষরা ভিড় করছে রোজ পাবে, রেস্তোরাঁয়। ফসল ভাল হয়েছে বলে বড় বড় ছোলা মুরগি বাজারে প্রচুর বিক্রি।

সিঁড়ি ধরে ওরা জাহাজে উঠছিল। গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার অনুযোগের সুরে বলল, তুমি পালিয়ে কিনার থেকে ঘুরে এলে?

হেনরি আর সুমন দু'জনেই টলছিল। উত্তর দিতে গিয়ে ওরা প্রায় দু'জনেই একসঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, চুপ রও।

সাহেব, আমি তোমাকে বলছি না। আমি সুমনকে বলছি।

হেনরি এবারেও ধমক দিল।

কোয়ার্টার-মাস্টার বলল, সাহেব, আমাদের নামা বারণ।

হেনরি আর কোনও কথা বলল না। সে সুমনের হাত ধরে এসিওয়েতে ঢুকে গেল। সে বিশ্রী রকমের গান গাইছিল। সুমন হেনরিকে কেবিনে রেখে ডেক ধরে গ্যালি অতিক্রম করতেই সারেং প্রশ্ন করল, তুই বাইরে কার হুকুমে গেছিলি?

আমার হুকুমে চাচা। মাপ করবেন।

সারেং বলল, বড়-মালোমকে বলব।

বলবেন।— সে থেমে মুখের উপর হাত নেড়ে বলল, চাচা, একশোবার বলবেন।

সুমন ভয়ানক টলছিল বলে সারেং আর কথা বলতে সাহস করল না। সারেঙের সব রাগ তখন হেনরির উপর। সে এই ছোকরা নাবিককে নিয়ে যা খুশি তাই করছে। ধরে নিয়ে মদ খাওয়াচ্ছে। অন্য সব বন্দরেও এগুলো হচ্ছিল। মায়ের মৃত্যু সুমনকে যেন খুব বেপরোয়া করে তুলছে। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে ওর শেষ ভালবাসার আশ্রয়টুকু গেছে। বন্দরের কোনও সুখকেই সে এখন ছেড়ে দিতে চাইছে না। সুতরাং সারেং বড়-টিন্ডালকে ডেকে বলল, আমি কিন্তু আর পারছি না বড়-টিন্ডাল। সুমন খুব বে সামাল হয়ে পড়ছে।

চার

সেদিন ছিল রবিবার। সুতরাং কাজ থেকে ছুটি। বড়-মালোম, কাপ্তান, ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস এবং মেজ-মিস্ত্রি এইমাত্র সেজেগুজে চার্চে যাবার জন্য বেরোচ্ছেন। মেজ-মালোমের মালপত্র সম্পর্কিত কিছু কাজ ছিল।

নিউ-আর্লিনস থেকে কোম্পানির এজেন্ট আসার কথা আছে। সে জন্য মেজ-মালোমকে জাহাজে থাকতেই হল। এক্ষেত্রে হেনরি জাহাজে ব্যক্তিগত কাজের জন্য থেকে গেল। এই অবসর সময়টুকু সে খেয়াল-খুশিমতো নিজের কাজ করবে! যেহেতু ভারোদি তার সবুজ রঙের ক্যানারি পাখিটাকে দুর্লভ জাতের বলেছে, এবং এই দুর্লভ পাখির জন্য হন্যে হয়ে ভারোদি ফের জাহাজে উঠে আসতে পারে, সেজন্য সে তার অন্য ক্যানারি পাখিগুলোকেও সবুজ রঙ করতে বসে গেল। বিশেষ করে ভারোদি তার দুর্লভ পাখিটাকে যেন যথার্থই চিনে ফেলেছে। অনেক দুর্ভোগের পর ডাচ ক্যানারি হল্যান্ড থেকে

সে সংগ্রহ করেছিল। শুধু শরীরের জন্য এবং দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য এই দামি পাখিটা হাতছাড়া হয়ে যাক, সে তা চাইল না। পাখিটার উপর ভারোদির ভয়ংকর লোভ। পাখির মাথার নরম কালো রঙের ঝুঁটি ভারোদিকে আকুল করে দেয়, অথবা গলার সুমিষ্ট স্বর। সে রং গুলতে বসে গেল। সে বেছে বেছে ঝুঁটিওয়ালা একটা স্কচ-ক্যানারির শরীরে সবুজ রং মাখিয়ে দিল এবং ডাচ-ক্যানারির শরীর থেকে সাবান জলে রং তুলে ফেলল। স্বাভাবিক রঙের এই পাখিটা ভয়ংকর কুৎসিত, সে পাখিটাকে স্বাভাবিক রঙেই রেখে দিল।

তারপরও হেনরির হাতে কিছু কাজ থাকে। সে তার হাতুড়ি, বাটালি নিয়ে, কিছু বার্নিস রজন নিয়ে, কিছু কাঠ নিয়ে বসে গেল। বয় এসে কফি দিল, স্যান্ড-উইচ রাখল এবং আপেল রেখে চলে গেল একটা।

সুমন বাংকে চোখ মেলে দেখল পোর্ট-হোল দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। এই রোদের ভিতর সে হাত রাখল, হাতের রেখা রোদের জন্য ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। সে শুয়ে থেকে হাই তুলল, তাবপর রাতের ঘটনার কথা মনে হতেই ফের বালিশে মুখ গুঁজে দেবার ইচ্ছা হল। ওর খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল, এতক্ষণে যেন মনে হল সে সারেংকে অপমান করেছে।

সিঁড়ির মুখে উঠতেই সারেঙের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, আমি তোর ভালর জন্যই চিৎকার করি।

সুমন লজ্জিত মুখে বলল, আর যাব না সারেং সাব।

অথচ এক ভয়ংকর তৃষ্ণা এই মাটির জন্য, গাছগাছালির জন্য এবং ভিতরে ভিতরে উত্তেজক সব চিন্তা সাবারাত, সাবা মাস ধরে কাজ করছে।

সে ফের বলল, বড একঘেয়ে লাগছে সারেং সাব।

সারেং বলল, কী করবি, জায়গাটা ভাল না। যখন তখন এখানে সাদা কালোকে গুম করে দিচ্ছে, কালো সাদাকে। দাঙ্গার সময় ভয়ংকর সন্ত্রাস।

সুমন বলল, কাল কিন্তু কেউ ধরতে পারেনি সারেং সাব।

সুমনের রংটা উজ্জ্বল বলে এমন হয়েছে, সারেং মন্তব্য করতে চাইল।

কথাটা বড়-মালোমের কানে এবং শেষ পর্যন্ত কাপ্তানের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। কাপ্তান হেনরিকে ডেকে সব খোলাখুলি জানতে চাইলেন। হেনরি গতকালের ঘটনা, ভারোদি এবং মারিয়ার কাছে সুমন, ওজালিও দ্য সুম্যান এই নামেব পরিচিতি এবং ঘরে চা খাবার নিমন্ত্রণ সব খুলে বলল, কাপ্তানের মনে এই ছোকরা নাবিকেব জন্য প্রথম থেকেই অদ্ভুত সহানুভূতি ছিল। তারপর ওর মা... আহা, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। কাপ্তান যেন নিজের সন্তানের কথা মনে করতে পারছেন। কবরভূমিতে তখন নানা রকম ফুল ফোটার সময়। তিনি দু'দিন বেশি সময় রেখেছিলেন হাতে, তিনি যদি ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে বিমানযোগে ফিরে যেতে পারেন... অথচ এই জাগতিক ব্যাপারে কত অক্ষম এই ভাবনায় তিনি শুধু বললেন, ঠিক আছে, সাবধানে চলাফেরা করবে।

তা ছাড়া কোনও এক নাবিক যুবকের চিন্তা, সমুদ্র অতিক্রম করার পর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন হবার চিন্তা বুড়ো বয়সেও কাপ্তান যেন অনুভব করতে পারছেন। বন্দরে এসে নাবিকেরা নামতে পারল না, জাহাজে আটক হয়ে থাকল, বড় দুঃখজনক ঘটনা। বন্দরে নামতে পারছে না জাহাজিরা—এই অপরিসীম বেদনা এখন কাপ্তানকে কাতর করছে।

রবিবার বলে জাহাজিদের কাজ থেকে ছুটি। ডেক-এ কোনও নাবিকের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই ফোকশালে গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। কোনও প্রাচীন নাবিক হয়তো এখন ওর প্রথম সফর কিংবা অন্য কোনও ন্যক্কারজনক গল্প বলে সকল জাহাজিদের খুশি করছে। কাপ্তান ডেক-চেয়ারে বসে ক্রমাগত হাই তুলছেন। বৃদ্ধের মুখে প্রাচীন সফরের বিচিত্র সব গল্প। তিনি তাঁর দীর্ঘ জাহাজি-জীবনের কত সব রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা মনে করতে পারছেন... কত সব সমুদ্রে কত রং-বেরঙের দ্বীপ এবং রং-বেরঙের মেয়েমানুষ। দক্ষিণ-সমুদ্রে, ট্রেরিটি আয়র্ল্যান্ডের কথা মনে পড়ল, অসভ্য মেয়েদের পোশাক কামনা-বাসনার উদ্রেক করতে ভীষণ পটু... তিনি সেই সব ছবির ভিতর স্পষ্ট চলে যেতে থাকলেন। সারা সফর ধরে তিনি সংযত থাকতে চেয়েছেন, অথচ এক দুর্নিবার আকর্ষণ বন্দরের, মেয়েদের সঙ্গে সহবাসের জন্য জাহাজিরা আকুল, সমুদ্রের লোনা জল কামনার আমোদে

মথিত হয়। সেই সব যৌন আকর্ষণের জন্য বুড়ো কাপ্তান যেন এখনও কোনও পাবে অথবা রেস্তোরাঁয় চলে যেতে পারেন, তারপর দূরে সব জল-জঙ্গল এবং পার্কের অন্ধকার, কখনও জাহাজের দুর্ভেদ্য কেবিনে... আর স্ত্রীর সন্দিগ্ধ মনটা এই করেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল একসময়ে এবং তিনি জাহাজেই খবর পেয়েছিলেন, স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

তিনি হেনরিকে বললেন, ওকে নিয়ে সাবধানে চলাফেরা করবে।

হেনরি নেমে গেল ডেক-এ। হেনরি পিছিলে সুচারুকে দেখল। সে আপনমনে দুটো কাঠি বাজাচ্ছে। এবং ডেকের পিছিলে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। হেনরি ডাকল, এই সুচারু।

সুচারু দেশের বৈরাগীদের মতো পা তুলে তুলে নাচছিল এবং কাঠি বাজাচ্ছিল। সে হেনরির কথা শুনতে পেল না।

অন্য পাশে ডেক-সারেং, ইঞ্জিন-সারেং বসে বসে গল্প করছিল। বড়-টিন্ডাল ফোকশালে কোরানশরিফ পড়ছে। ডংকিম্যান বচসা করছে ভাণ্ডারির সঙ্গে বিশুর গোশ্ত নিয়ে। রাগে দুঃখে ভাণ্ডারি বড় বড় টুকরো করে মাংস কাটছিল। বন্দরের নতুন আমদানি মাংস বলে সোঁদা গন্ধ উঠছে না। হেনরি এইসব দেখতে দেখতে সুমনের ফোকশালে নেমে গেল। দেখল ফোকশাল খালি, দেখল ছোট-টিন্ডাল সুচারুর বাংকে উপুড় হয়ে দেশে খত লিখছে। কোমরের লুঙিটা অনেকটা নেমে গেছে। হেনরি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে টিন্ডালের লুঙি আব একটু নামিয়ে দিতেই ছোট-টিন্ডাল বলে উঠল, তোবা তোবা।

সে পরে বলল, সালাম সাব।

হেনরি বলল, সালাম।

টিন্ডাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে চাইলে ওকে বসতে বলে হেনরি, সুমন সম্পর্কে প্রশ্ন করল, ছোঁড়াটা কোথায়?

টিণ্ডাল বলল, জানি না সাব।

জানো না তো বসে বসে কী করছ?— হেনরি কৃত্রিম ভর্ৎসনা করল।

খত লিখছি সাব।

কার কাছে?

বিবির কাছে।

কী লিখলে পড়ে শোনাও তো।— হেনরি ঠাট্টা করে বলল।

ওটা বলতে নেই সাব।

কী হয় বললে?

গুনা হয়। বিবি পরানের ধন। তার কথা মাইনষেরে কইতে নাই।

সাবাস। হেনরির যেন মনে হল বিবি যথার্থই পরানের ধন। পাশের বাংকে সামাদ বুকের নীচে বালিশ রেখে নুয়ে নুয়ে কী সব দেখছে। হেনরির এবং টিন্ডালের কোনও কথাই সে যেন শুনতে পাচ্ছে না। সে শুয়ে শুয়ে কিছু অশ্লীল ছবি দেখছিল। প্রতিটি ছবি দেখার পর সংগোপনে বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলছে। হেনরি সামাদকে বলল, কী করছ?

সামাদ উপরের বাংকে বলে হেনরি নীচে থেকে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বেঁটেখাটো এই মানুষটি উঁকি দিতে চাইল না। শুধু বলল, সুমন কোথায় বলতে পারো?

হ্যাঁ সাব। বাথরুমে গেছে সুমন।

ছবিগুলি প্রতিটিই অশ্লীল। নিঃসঙ্গ এই জীবনে এই ছবিগুলিই সামাদের একমাত্র সম্বল। সে এইসব ছবির ভিতর সালিমার মুখ হারিয়ে ফেলে। সে ওর বিবির কথা সমুদ্রে এসে ভুলে যায়। এখন এই অরুচিকর নগ্ন ছবিই তার পরানের ধন, জীবনধারণের উপকরণ। সে সেজন্য চোখদুটো হেনরির দিকে জ্বল জ্বল করে রাখল। হেনরির কথা সে যথার্থই এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল না, যেন সে অন্য কোনও আমোদে মুগ্ধ হয়ে ছিল।

হেনরি উপরে ওঠার আগে একবার স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে ঢুকে টর্চ মেরে কী সব দেখল, অদ্ভুত এক শব্দ আসছে, ওর সন্দেহ হল, কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে কোথাও। সে চারিদিকটা ভাল করে টর্চ মেরে দেখল। ইঞ্জিন-ঘরটা এখানে খুবই অন্ধকার। দিনের বেলাতেও আলো ঢুকতে চায় না।

ভৌতিক ঘটনার মতো আশ্চর্য করে দিচ্ছে তাকে। সে ইঞ্জিন-সারেংকে ডেকে বলতেই তিনি হেসে ফেলেন। ওরা দু'জনে এবার উঁকি দিয়ে দেখলেন নদীর জল, দুটো ভাঙা টিনের বাক্সে ধাক্কা খাচ্ছে এবং শব্দ তুলছে। শব্দটা তেল-জল নির্গমনের পথ ধরে উপরে উঠে আসছিল। এবং ফিস ফিস শব্দের মতো ইঞ্জিনের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল।

হেনরি বলল, কার কাজ?

সুচারুর। বিকেলে বড়শি ফেলে ছোট ছোট সারডিন ধরবে বলছে।

হেনরি উপরে ওঠার সময় ভাবল, ভারোদিকে আর-একবার এই পিছিলে এনে ভৌতিক শব্দটা শুনিয়ে দেবে। ভারোদি ওর পাখিটার জন্য পাগল, ওটা কেন যে মরতে সে রং করতে গেছিল, ভেবে পেল না। সে তার সব রং গুলে সব পাখিগুলোকে বিচিত্র রকমের পাখি করে রেখেছে। ভারোদিকে ঠকাবার জন্য ভাল জাতের পাখিগুলোর সব রং তুলে ফেলেছে। হেনরি সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে ভাবল, এই ভাল। ভারোদিকে নানা রকমের প্রলোভনে মত্ত করতে হবে এবং ভারোদির জন্য সে নানারকম কৌশল আয়ত্ত করছে। এই বন্দর, বন্দর-পথ এবং পারসিমন গাছের সুমিষ্ট গন্ধের ভিতর ভারোদির আয়ত চোখ অথবা যৌবন—সব নিয়ে এক খেলা, হেনরি সেজন্য পাগলের মতো সুমনকে খুঁজতে আরম্ভ করেছে। কারণ কাপ্তানের সব কথা সুমনকে বলা হয়নি। সুমন অলীক ওজালিও নামক ষাঁড়-লড়াইয়ের বংশধর। আর এই চালিয়াতি মার্কা পরিকল্পনার ভিতর দিনগুলো মন্দ যাবে না, নাবিক-জীবনে এর চেয়ে অধিক মহৎ আর কী করণীয় আছে! শুধু দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা, বন্দরে বন্দরে অপরিচিত মুখ, দুদিনের আবাসস্থল, আবার সমুদ্র এবং সমুদ্রে কখনও দ্বীপ কখনও নারিকেল-কুঞ্জ, জাহাজের মাস্তুল রং করা, চিমনি রং করা, নীচে বয়লার এবং বাংকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনি অথবা ইকুয়েডরের উষ্ণ প্রবাহে সবই ক্লান্তিকর। বন্দরে রমণীর মুখ শুধু শুভবার্তা বহন করে আনে। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গলা ছেড়ে হাঁকল, সুমন...

পরে কিছুটা বিকৃত গলায় মশকরা করতে চাইল, সুম্যান দ্য ওজালিও।

বাথরুম থেকে সুমন উত্তর করল, এই যে যাচ্ছি।

হেনরি ফের ঠাট্টা করে বলল, ভিতরে ওজালিও দ্য সুম্যান আছেন?

সুমন বলল, আছেন। ভিতরের লোকটি জানতে চাইছেন কথাটা সুম্যান দ্য ওজালিও অথবা ওজালিও দ্য সুম্যান?

সেটা মালিকের ইচ্ছা।

সেটা উল্টো-পাল্টা হলে ধরে ফেলবে।

ধরে ফেলবে! দেখি মুখটা?

বলে সুমন বের হতেই ওর চিবুক ধরে নাড়া দিল এবং পরস্পর হাসতে হাসতে পিছনের দিকে বেঁকে গেল।

খুব ভাল খবর আছে।— হেনরি সহসা হাসি থামিয়ে মুখে রহস্যজনক ছবি ফুটিয়ে তুলল।

খুব ভাল খবর?

খু-উ-উ-ব। কাপ্তান কিনারায় ছোকরা নাবিককে দেখেশুনে রাখতে বলেছেন। বলেছেন ওটা তো বাচাল ছোকরা। কীসে কী বলে ফেলবে!

ঠাট্টা হচ্ছে?

আরে না। ঠাট্টা কেন করব? — হেনরি এবার সবটা খুলে বলল।

সুমন সব শুনে আশ্চর্য এবং ভিতরে যে ভয়টুকুর জন্য সে কাল সারারাত ভাল ঘুমোতে পারেনি, কারণ কাপ্তান তাকে ডেকে শাসন করতে পারেন এবং লগবুকে নাম তুলতে পারেন। কত রকমের ভয় এইসব জাহাজিদের, সে সেজন্যে অনেকটা হালকা বোধ করছে। সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। বলেছেন, সাবধানে চলাফেরা করতে।

আমার কিন্তু খুব ভয় করছে হেনরি।

তা হলে যাবে না। আমি একাই যাব।

সুমন কিছুক্ষণ কী ভাবল। মাটির টান এবং মারিয়ার নীল চোখ নেশার মতো ওকে টানছে। সুমন

তারপর কী ভেবে বলল, দরকার নেই ঝুট-ঝামেলার। আমার কথা বললে বরং বলকে ওজালিও দ্য সুম্যান অসুস্থ।

তা হলে মা আর মেয়ে একেবারে এই ফোকশালে। হাতেনাতে ধরা পড়বে। ওরা মাতৃহীন বালককে অসুস্থ জেনে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না।

সুমন বলল, তবে বলবে...

অথচ কী বলতে হবে ভেবে পেল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে হেনরির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কী বলব বলো?

বলবে, এই একটা কিছু বলে দেবে।

এ তো তোমার মা নন যে, লায়েক ছেলে যা বোঝাবে, তাই বুঝবে।

সুমন বলল, তবে যাওয়াই যাক। মারিয়ার সঙ্গে চেঁচামেচি করে ছুটোছুটি করে বিকেলটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

পাঁচ

দুপুরের দিকে যখন জাহাজের সবাই যে যার ফোকশালে দিবানিদ্রার জন্য শুয়ে পড়েছে, একমাত্র কোয়ার্টার-মাস্টার যখন গ্যাংওয়েতে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং ইঞ্জিন-রুমে একমাত্র ফায়ারম্যান ইদ্রিশালি, তখন সুচারু চুপি চুপি হেনরির কেবিনে ঢুকে বলল, আমার কোনও খবর আছে?

হেনরি সুচারুকে দেখল। গলায় রুপোর হার এবং সেখানে সোনার ক্রস ঝুলছে। হেনরি সুচারুকে বলল, তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

সুচারু নিজের হাত বাড়িয়ে বলল, দেখবে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ছোট একটা আঙুল আছে।

তুমি আমাকে আগেই বলেছ।

ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী দেখলেই কথা নেই, ঝুঁকে পড়বে।

পড়ব।

জানো হেনরি, আমি আজ হোক কাল হোক ওকে খুঁজে পাবই।

হেনরি আজ আর হাসল না। কোথাও সুচারুর এমন দুঃখ নিহিত আছে যে সে ছেলেমানুষের মতো এই বিশ্বাস নিয়ে বন্দরে বন্দরে ঘুরছে। হেনরি শুধু বলল, সব সময় আমি তোমার কথা মনে রাখি। বন্দরে নামলে তোমার কথা বেশি মনে হয়।

বিকেলে হেনরির কেবিনে সুমন খুব হইচই করছিল। কারণ হেনরি অদ্ভুত রঙের একটা ক্যানারি পাখির গায়ে সরু শেকল লাগিয়েছে। হাতে বালার মতো সরু ইস্পাতের চুড়ি, তাতে ক্যানারি পাখিটাকে ক্লিপ দিয়ে এঁটে নিয়েছে। পাখিটা উড়ে উড়ে হেনরির কাঁধে, মাথায় বসছিল। যাতে পাখিটা কাঁধে মাথায় হেগে না দেয়, যাতে পাখিটা অযথা যখন তখন মলমূত্র ত্যাগ না করতে পারে তার জন্য সারা দুপুর পাখিটা ওর বরাদ্দ খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুমন এসব দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, এটা কী হচ্ছে?

ভারোদির জন্য পাখিটা নিয়ে যাচ্ছি।

তার জন্য সং সেজে!

সং কোথায় দেখলে?

সং নয় এটা! হাতে ইস্পাতের চুড়ি, বগলে মিলিটারি কায়দায় ফিতে লাগানো।

আমি এভাবে অনেক বন্দর ঘুরেছি। এটা আমার প্রথম নয়।

তারপর হেনরি দেয়ালের একটা ফটো দেখিয়ে বলল, ওটা দেখলে তোমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে অসুবিধা হবে না।

সুমন দেয়ালের ছবি দেখে বুঝতে পারছে এক সময় হেনরি বন্দরে এই ক্যানারি পাখি হাতে বেঁধে

ঘুরেছে। সুমন বলল, এই ছবিটা প্রথম দেখলাম। কোথায় ছিল ছবিটা? আগে দ্যাখাওনি তো!

লকারে ভরা ছিল। আজ পাখিটা হাতে বাঁধতেই ছবিটার কথা মনে হল।

সুতরাং ছবিটা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে।

সঙ্গে আজ বড় বেশি বউয়ের কথা মনে পড়ছে।

হঠাৎ?

এই পাখিদের জন্য বউয়ের সঙ্গে বিবাদ।

হেনরি যেন বড বেশি দূর থেকে কথা বলছে এখন। সে ফের বলল, বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে কত রকমের অশান্তি এবং অনেক ঘটনা যা তুমি এখনও জানো না সুমন।

হেনরি এইটুকু বলে অন্যমনস্কের মতো মুখ করে রাখল।

জামার হাত গুটানো ছিল বলে হাতের উল্কি দেখা যাচ্ছে হেনরির, উল্কিতে উলঙ্গ পরির ছবি, মাথায় ক্রস, তার নীচে ইস্পাতের চুড়ি। আর ওদের দু'জনের মাথায় ফেল্ট-ক্যাপ ছিল, ওরা দু'জনই হাতি-ঘোড়া ছবি আঁকা হাওয়াইন শার্ট পরেছিল।

গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার বলল, সুমন তুমি ফের!

হেনরি কাপ্তানের সম্মতির কথা জানাল। তারপর শিস দিতে দিতে ওরা সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নেমে গেল।

রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুচারু, সামাদ। ওরা দেখল হেনরি এবং সুমন ক্রমশ জেটি ধরে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ডেক থেকে সারেং দেখল, ওরা হেঁটে হেঁটে জেটি ধরে শহরের দিকে যাচ্ছে। কাপ্তান ব্রিজ থেকে দেখল, ওরা মসৃণ ঘাসের মাঠ অতিক্রম করে শহরের পথে উঠে যাচ্ছে।

তখন সুমন হেনরিকে না বলে পারল না দারুণ, দারুণ—এই মাঠের ঘাসে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছে। সুমন খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে দু'টোয়ের উপর ভর করে ঘোড়ার কদম দেবার মতো কিছুক্ষণ অকারণ পুলকে লাফাল।

হেনরি যত হাঁটছিল পাখিটা তত মাথায় উড়ছিল, আর এক বিশ্রী রকমের শব্দ চিপ-চিপ, চিপ-চিপ। এত সাবধানতা সত্ত্বেও পাখিটা একবার ওর মাথায়-মুখে মুতে দিল। হেনরি খিস্তি করে বলল, শালা মুরগির বাচ্চা।

সুমন ও হেনরিকে শহরের কিছু নাবালক এবং বৃদ্ধ যাদের হাতে কোনও কাজ নেই এবং যারা বিশ্রী রকমের অসভ্যতা করতে ভালবাসে তারা ঘিরে ধরেছে। এই পাখির জন্য যেন হেনরি বাঁদরওয়ালা, আশেপাশের দোকানে অথবা জানলায় মুখ, বাঁদরনাচ দেখার বাসনার মতো মুখ বার করে রেখেছে সাদা মানুষরা। কোনও নিগ্রো পুরুষ-রমণী চোখে পড়ছে না। ওরা বুঝল এই শহর সংরক্ষিত অঞ্চল। দূরে কিছু বস্তি অঞ্চল চোখে পড়ছে। সেখানে হেঁটে গেলে ভাঙা গির্জা চোখে পড়বে, ভাঙা টালির ছাদ চোখে পড়বে। খালি গা, ছেঁড়া প্যান্ট পরে কোমরে বেল্ট এঁটে মানুষগুলো মদের দোকানে এখন হয়তো সস্তা মদ গিলছে।

লুসিয়ানার এই বন্দর শুধু সালফার রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। কিছু তেলের পিপে আছে। এবং অনেক দূরে একটা-দুটো অয়েল-ট্যাংকার দেখা যাচ্ছে। যুবতীদের গড়ন লম্বা, কাছিমের পিঠের মতো বলিষ্ঠ পাছা। আর এই সব যৌবনের জন্য, নীল চোখের জন্য এবং যৌনতার সুড়সুড়িতে ওরা দ্রুত হাঁটছিল। বিকেলের সূর্য এবারে অস্ত যাচ্ছে। ঘন পপলারের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের নরম আলোতে ঘাস মাঠ ফুল হলুদ রঙের মতো, তার উপর দিয়ে সব ছোট ছোট ওয়ারবলার পাখি কার্পাসের জমিতে ফিরে যাচ্ছে ওরা বিরাট অশ্বশালার পাশ দিয়ে হাঁটছিল। ওরা পুরনো দুর্গের মতো বাড়ি অতিক্রম করে গেল এবং মনে হচ্ছে ওরা শহরের খুব ভিতরে ঢুকে গেছে।

সুমন বলল, একটা ট্যাকসি ধরা যাক।

বেশ তো হেঁটে চলে এলাম।

সদর রাস্তার দু'ধারে বড় বড় বাড়ি। বাস চলছে। গাড়ি অনবরত হর্ন দিচ্ছে। ফুটপাতে মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। বাড়ির সামনে সদর দরজার উপর মৌটুসি লতার ঝাড় অথবা লতানো গোলাপের কুঞ্জ। বাগানে থোকা থোকা হলুদ রঙের স্কাইলার্ক ফুল আর মাঠে সোনালি চুলের মেয়েরা টেনিস

খলছে। যেন কোথাও এতটুকু সংকীর্ণতা নেই, মানুষের অন্তরে ঘৃণা নেই, ভালবাসার কাঙাল, ওরা দুজনে এই ভালবাসার অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরছিল। ঠিক তখনই ঝকঝকে গাড়ির ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া, হেই।

ভারোদি বলল, আমরা জাহাজে তোমাদের আনতে গেছিলাম।

হেনরি বলল, এমন তো কথা ছিল না।

মারিয়া বলল, কথায় কথায় কাল একেবারে ভুলে গেছিলাম বলতে। আজ দুপুরে মনে হল, গাড়ি পাঠানো দরকার।

মারিয়া এক ফাঁকে ওজালিও দ্য সুম্যানকে দেখে নিল। জাদুকরের পালিত পুত্রকে বড় গম্ভীর মনে হচ্ছে। সে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। প্রশ্ন করল, শহরটা কেমন লাগছে?

ভাল।— সুমন সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

গাড়িতে ঢোকার সময় ক্যানারি পাখিটা অনেকক্ষণ ধরে পাখা ঝাপটাল। ভয়ে পাখিটা চোখ উল্টে দিচ্ছে বার বার। ভারোদি ওর মাথায় ফুঁ দিল। আদর করার মতো হাত বুলিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেবার সময় বলল, সারাদিন আমি নিজে তদারক করেছি ওর ঘরের জন্য। ঘরটাতে দুটো গোল্ডেন উডপেকার ছিল। গত শীতে ওরা মারা গেছে। এত যত্ন সত্ত্বেও ওদের বাঁচানো গেল না।

ভারোদি আফসোসের ভঙ্গিতে হেনরির দিকে তাকাল।

সূর্য অস্ত গেছে। নাচঘরের দরজায় ব্যান্ড বাজছে। ওজালিও দ্য সুম্যান গাড়ির পিছনে বসে শহরের বাড়ি ঘর দেখছিল। কোথাও বেদির মতো এপিথাপের চিহ্ন। ওরা হ্রদের পাড় ধরে যাচ্ছে। কিছু স্কিপ হ্রদের জলে, কিছু ফানুস কোথাও হাওয়ায় পুড়ছে। শহরটা হ্রদের বুকে রুপালি ছবির মতো ভাসছিল।

ওরা আসতেই সদর দরজার লোহার বড় গেট খুলে গেল। বড় এবং প্রাচীন দুর্গের মতো বাড়ি। উঁচু দেয়াল। দেয়ালের মাথায় সরু লোহার তার এবং বকের ধারালো ঠোঁটের মতো ছুরির ফলা। সামনে প্রশস্ত মাঠ, পাঁচিল সংলগ্ন বড় ম্যাপল গাছের ছায়া আর ফাঁকে ফাঁকে আলোর ডুম জ্বলছে। দেয়ালে পোর্ট হোলের মতো গবাক্ষ পথ। কোথাও অর্কেডিয়ানের সুর থেকে থেকে বেজে উঠছিল। বাড়ির ঘরে নেকড়ের ছবি—পারিবারিক চিহ্ন। অভিজাত এই বংশের মর্যাদা পড়তির মুখে অথবা গৌরব চুমিত, হেনরি বসে বসে এই সব ভাবছিল।

মোটর ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের মতো জায়গাটুকু অতিক্রম করে বড় প্যাসেজের ভিতর ঢুকে গেল বড় নিঃস্তব্ধ মনে হচ্ছে, অতিকায় এই বাড়ির ভিতর মানুষের সাড়া বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু এক বৃদ্ধ ওদের জন্য পার্লারে প্রতীক্ষা করছিলেন।

কারস্টেন ট্যালডন নাম এবং পরিচয় দিয়ে ভারোদি বলল, আমার শ্বশুর মশাই।

হেনরি এবং সুমন অভিবাদন জানাল।

ওরা নাবিক—এই পরিচয়, তারপর ভারোদি তার সেই বিচিত্র পাখিটার কথা বলল, বলল গ্যানির বদৌলতে এই নাবিকদের সঙ্গে সংযোগ। ওদের জাহাজ এখন বন্দরে, কোনও কাজ হচ্ছে না, ওরা শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে, সুতরাং অবসর সময়টুকু শহরের কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়ানো। পাখিটা বড় বিশ্রীভাবে ডাকছে। ভারোদি এবার ক্যানারি পাখিটাকে নিজের হাতে নিয়ে মাথায় ফুঁ দিতে থাকল আর ডাকছে না। ওরা এবার নিশ্চিন্তে সবাই যেন সোফায় বসতে পারে। বৃদ্ধও বসে পড়লেন। বিদেশি নাবিকদের কাছ থেকে দ্বীপ অথবা সমুদ্রের অভিজ্ঞতার কথা কে না জানতে চায়।

মারিয়া দাদুকে বলল, জানো দাদু, ইনি ওজালিও দ্য সুম্যান। ওর ঠাকুরদা বিখ্যাত একজন ম্যাটাডর ছিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি খোকা স্পেন থেকে এসেছ? স্পেন বড় সুন্দর দেশ। কিছু পাহাড় আছে শুনেছি। ছোট ছোট পাহাড়ের নীচে ছবির মতো গ্রাম। বড় ইচ্ছা কোথাও বের হয়ে পড়ি, কিন্তু হল না।

বৃদ্ধ কথাপ্রসঙ্গে স্পেনের বিখ্যাত জেনারেল ফ্রাংকোর নাম করলেন এবং আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, মারিয়া তাড়াতাড়ি ডাকল, দাদু দাদু!

মারিয়া ওদের দিকে চোখ তুলে দেখল। ভারোদি বৃদ্ধের হাত ধরে বললেন, তুমি চলো এবার, খাবার সময় হয়ে গেছে।

যেন ভারোদি জোর করেই বৃদ্ধকে তুলে নিল। বৃদ্ধ হেঁটে চলে যাচ্ছেন। প্রাচীন দুর্গের মতো এই বাড়ির সরু সব প্যাসেজ, পায়ের চটির শব্দ বহু দূর থেকে যেন ভেসে আসছে।

ভারোদি বলল, ছেলে মারা যাবার পর থেকেই খুব ইমোশানে ভুগছেন। এক্ষুনি হয়তো কেঁদে ফেলতেন।

ভারোদি বলল, লিংকনেব আমলের বাড়ি। গৃহযুদ্ধে ওঁদের পূর্বপুরুষ লড়াই করেছেন। বহু বীরগাথা এখনও এ বাড়ি সম্পর্কে প্রচলিত। এক্ষুনি তিনি কেঁদে-কেটে সেই বীরগাথা তোমাদের শোনাতে থাকবেন। তোমরা বিব্রত হও চাই না।

ভারোদি ব্যাজার মুখ নিয়ে বসে থাকল। বাইরে ইতস্তত দু'-একজন পরিচারিকার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে এবং বাগানের মালি রেড-ইন্ডিয়ান যুবকটি করিডরে অপেক্ষা করছিল। ভারোদি ডাকলেই ঢুকবে, এমত চোখ-মুখ যেন।

কফি খাবার আগে বরং বাড়িটা তোমাদের দেখানো যাক।

এই বলে ভারোদি তার যুবক পরিচারককে ডাকলেন। যুবক সামনের সব দরজা খুলে দিচ্ছে। পরিচারক এক-এক করে বড় বড় কাঠের দরজা টেনে খুলে দিতেই মনে হল এই দুর্লভ পাথরের দেয়ালের ভিতর মারিয়া ফুলের মতো। ভারোদির হাতের উপর ক্যানারি পাখি। সে পরিচারকের হাতে পাখিটা দিয়ে আগে হাঁটতে থাকল। ঘরের পর ঘর এবং অদ্ভুত সব গলিপথ। বেঁকে বেঁকে চলে গেছে, শেষ হচ্ছে না। ওরা একটা বড় হলঘরের ভিতর এসে ঢুকল। বড় বড় শ্বেত-পাথরের সব মূর্তি, অধিকাংশ পুরুষ-মানুষেব এবং নগ্ন। দেয়ালে পরিবারের ঐতিহাসিক পুরুষদের তৈলচিত্র। বড় কালো গ্রানাইট পাথরের টেবিলে ফুলের বড় ভাস। দুর্লভ গোলাপের গুচ্ছ সাজানো, কোনায় বড় পিয়ানো, উপরে ঝাড়লণ্ঠন। আর গ্রানাইট পাথরের মসৃণ মেঝে। ভারোদি বলল, এটা আগে নাচঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত।

আর ছোট্ট দরজা দিয়ে ওরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অন্য এক অপ্রশস্ত ঘরে ঢুকে গেল। একটু অন্ধকার-অন্ধকার মনে হচ্ছে। ভিতরে ঢুকে কী টিপে দিতেই ভয়ংকর লাল আলোতে ঘরটা ভরে গেল। বিচিত্র সব ছবি দেয়ালে সাজানো। কোথাও রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময়কার যুদ্ধেব দলিল, কোথাও বিস্তীর্ণ মাঠে শাস্তির বিকল্প হিসাবে কোনও নিগ্রো পুরুষের অঙ্গহানি করা হচ্ছে। বড় নৃশংস ঘটনা, সুমন চোখ বুজে ফেলল। আর ঠিক পরবর্তী ছবিতে একটা ইগল পাখিকে খাবার লোভে রেটল সাপটা লাফ দিচ্ছিল। পাখিটা সাপটার গলা ফুটো করে দিয়েছে। চোখদুটো সাপের গাল থেকে যেন ঝুলে পড়ছে। ওরা ক্রমশ পর পর সব ঘর অতিক্রম করতে করতে চলে গেল। ঘরগুলোতে অস্পষ্ট অন্ধকার এবং রহস্যের গন্ধ যেন এই বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে বিদ্যমান। একটা পুরনো গন্ধ এই দুর্গের মতো বাড়ির দেয়ালে। বহু পুরনো ফ্যাশনের নিদর্শন এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। তারপর সামনে ফের বড় বড় হলঘর, এইসব ঘর অতিক্রম করার সময় ভারোদি এই বংশের নানারকমের বীরগাথা শোনাচ্ছিল। শ্বেতকায় জাতির অধঃপতন আর ওরা জার্মানি থেকে আগত, রক্তে পুরোপুরি আর্য, দাস-প্রথার শেষ সুবিধাটুকু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে এবং বড় কষ্টকর জীবন এই শ্বেতকায় মানুষদের, জীবন মাত্রেই একে অপরের দাস এবং এভাবেই সভ্যতা গড়ে উঠছে। যেন সব বক্তব্যে এই অহংকারটুকু ধরা পড়ছিল ভারোদির, মহান ব্যক্তিরা সব গোরু-ঘোড়াকেও স্বাধীন করে দেবার সপক্ষে। এই অসম্মানের বিরুদ্ধে হেনরি, আমাদের আমৃত্যু লড়াই।

কেমন এক নেশাগ্রস্থ রমণীর মতো ভারোদি এই সব কথা বলে যাচ্ছিল। ভারোদিকে এখন আব চেনাই যাচ্ছে না। সুমনের মনে হল এই দেশের সাদা-কালোর ব্যাপারটা ভারোদির কাছে কোনও বন্য জীবের সঙ্গে সুন্দরী রমণীর সহবাসের মতো। এত বর্ণবিদ্বেষ যে, মুখে প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে উঠছিল ভারোদির।

তখন হেনরি বলল, নিগ্রো যুবকের অঙ্গহানির ছবিটা বড় নৃশংস দেখাচ্ছে।

ভারোদি প্রচণ্ড হেসে উঠল। এই ভীতিকর হাসির জন্য সুমন কিছুটা হতবাক হয়ে গেল।

সে ভয়ে গুটিয়ে আসছে। মারিয়া পাশে নেই। কোথায় গেল মারিয়া! মারিয়া পাশে না থাকায় সে বড়ই অসহায় বোধ করছে। সে তাড়াতাড়ি একজন পরিচারকের সঙ্গে খোলা মাঠে নেমে গেল। মারিয়া

কবিডরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে সুমনকে ফুলের বাগানে নেমে যেতে দেখে হাসছিল। সুমন দেখল এই মিষ্টি মেয়ের মুখ বর্ণ-সংস্কারে এখনও আক্রান্ত নয়। শুধু নিগ্রোদের সম্পর্কে এক অহেতুক ভীতি বয়েছে। সে দূরের কোনও এক নিগ্রোপল্লির কথা বলল। একবার নিউ-অর্লিনস হয়ে ডালাস যাবার পথে নিগ্রোপল্লির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ওদের দারিদ্র্য, ওদের অপরিচ্ছন্নতা ওকে কীভাবে আকুল করেছিল, সেসব গল্প করার সময় সে দেখল, তার মা হেঁটে যাচ্ছেন। সে সুমনের হাত ছেড়ে দিল। হেনরি মা'র সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে, দাদু তাঁর ঘর থেকে উঁকি দিয়ে ওদের চুপি চুপি দেখছেন। মারিয়া চুপ করে গোপনে সুমনের হাতে দুটো চকোলেট দিয়ে বলল, কাল তুমি আমাব ঘবে এসে বসবে ওজালিও। আমার অনেক সুন্দর সুন্দর বই আছে আমি তোমাকে দেখাব।

সুমন সেই ফুলের জগৎ থেকে দেখল, ভারোদি এবং হেনরি অনেকগুলো অপবিচিত গাছের ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা ঘরের দরজা খুলে দিতেই ডজন খানেক ডালকুত্তা ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলো রাক্ষসের মতো বাড়িময় ছুটে বেড়াতে থাকল আর ঘেউ ঘেউ করছে। হেনবিকে আঙুল তুলে কুকুরগুলির জন্ম-পরিচয় দেবার সময় হাসতে হাসতে ভারেদি কী সব যেন অশ্লীল ইঙ্গিত কবছিল।

সুমন বলল, এই সব কুকুর দিয়ে কী হয়?

মারিয়া বলল, আমি জানি না। শুধু মাঝে মাঝে কিছু অপরিচিত মানুষ এ বাড়িতে জড়ো হন কোনওদিন। তখন ওঁরা কুকুবগুলো নিয়ে কোথায় যান আমি জানি না।

এই বাড়ির ভিতর, এই আলো এবং সমাবোহের ভিতর, সুমনেব মনে হল মাবিযাও খুব নিঃসঙ্গ। ভাবোদি মাবিয়ার জন্য প্রায় ভিন্ন মহলের মতো করে দিয়েছে। সেখানে একজন পবিচারকেব ওত্ত্বাবধানে মারিয়া ক্রমশ বড় হচ্ছিল এবং সংসারের কোথাও কোথাও এক ভয়ংকর নৃশংস ঘটনা ঘটছে যা মাবিয়া দেখতে পাচ্ছে না অথচ অনুভব করতে পারছে। মারিয়া ঘাসেব উপব বসে অপলক জাদুকরেব পালিত পুত্রের মুখ দেখতে থাকল। সেইসব ডালকুত্তাগুলো এখন বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আব অনর্থক ঘেউ ঘেউ করে দুর্গের মতো এই বাড়ির পাথরের প্রাচীন দেয়ালে মাথা ঘসছে।

তখন মারিয়া খুব আস্তে আস্তে ডাকল, ওজালিও।

ছয়

জাহাজ দীর্ঘদিন পর বন্দর ধরেছে। এবং সম্প্রতি খবর, ধর্মঘটীরা আপসকামী। ডক-কর্তৃপক্ষ ওদেব শর্তগুলি পুনরায় বিবেচনা করে দেখছেন।

কাপ্তান বড-মালোমকে ডেকে বললেন, আগামী কাল থেকে মনে হয় ডকে ফেব স্বাভাবিক অবস্থা চালু হবে।

বড়-মালোম ডেক-সারেংকে চার নম্বর ফলকা সাফ করতে বলে দিলেন।

ঠিক মাস্তুলের নীচে প্লেট তুললে সিঁড়ি, সামাদ প্লেটটা তুলে ধরলে পঁচিশ টাকার খালাসি আজিজ এবং সারেং নেমে গেল। তেইশ টাকার খালাসি সামাদ। সেও ওদের সঙ্গে নেমে গেল। ওরা নীচে সব স্টিক-বুম হারিয়া করে দিয়েছে।

সামাদ বলল, সারেং সাব, সুচারুকে দিন। আমরা তাড়াতাড়ি হাতে হাতে কাজটা সেরে ফেলব।

আর সুচারু নীচে নেমেই অযথা গলা ছেড়ে হইচই করতে আরম্ভ করল। এবং এই ফলকায় নামলে ওব মনে হয় সে যেন কোনও গভীর খাদে নেমে গেছে এবং পৃথিবীটা এই সংসার নিয়ে, গাছপালা পাখি নিয়ে, ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে ভিতরে হইচই করতেই ফলকার ভিতরটা গম গম করে উঠল।

ওদেব মাথায় টুপি পরা ছিল। কোন আদ্যিকালে যেন ওরা ব্রাজিলের ভিক্টোবিয়া বন্দর থেকে আকরিক লৌহ নিয়েছিল কার্ডিফ বন্দরের জন্য। তারপর আর এই ফলকা সাফসোফ করা হয়নি, জাহাজ শুধু অনির্দিষ্ট যাত্রার উদ্দেশে ক্রমাগত চলছে। আগামীকাল এইসব ফলকাব ভিতর গন্ধক

নেওয়া হবে। সুতবাং স্টিক-ব্রুম দিয়ে জাহাজেব খোল পবিষ্কাব কবছে তাবা।

সেই কবে ওবা ভিক্টোবিয়া বন্দব পিছনে ফেলে এসেছে। অথবা কিছু কিছু স্মৃতি জাহাজিদেব মনে এখনও লেগে আছে। একটা অপ্রশস্ত লেগুনেব ভিতব দিয়ে জাহাজটা এগোচ্ছিল। দু'ধাবে উঁচু পাহাড়। নীল সমুদ্র অনেক দূব পর্যন্ত পাহাড় কেটে যেন ভিতবে ঢুকে গেছে। সমুদ্র থেকে ঠিক এমনি বসন্তেব বাতাস বইছিল। জাহাজেব অনতিদূবে মাথাব উপব লম্বা কংক্রিটেব ব্রিজ এবং ব্রিজেব নীচে একটা তরুণী মেয়ে সব সময় ভিক্ষা কবত। মেয়েটা অন্ধ, গায়ে ভাল পোশাক, ঠোঁট পুরু, চুল নিগ্রোদেব মতো এবং গায়েব বং তামাটে। সুচারু মেয়েটাব জন্য দুঃখ বোধ কবত। সে এবং সামাদ প্রতিদিন বাতে শহবে যাবাব জন্য ব্রিজ অতিক্রম কবাব সময় পযসা দিত এবং একদিন সামাদ ওকে নিয়ে পাহাড়েব পাদদেশে, ঠিক যেখানে আকবিক লোহাব গুদাম তাব পাশে যেখানে গুদামেব বক্ষক বসে বসে পাইপ টানত, অংশীদাব হিসাবে ওকে ভোগ কবল। সুচারু বাগে এবং দুঃখে অনেকদিন সামাদেব সঙ্গে কথা বলেনি।

দীর্ঘদিন সুচারু সেই মেয়েটিব ছবি ভুলতে পাবেনি। সেই সুগঠিত শবীবেব মেয়েটিকে সামাদ প্রলোভনে মত্ত কবে একটা বিশ্রীবকমেব কাণ্ড বাঁধিয়েছিল।

সুচারু এবং সামাদ একসঙ্গে একটা দিক পবিষ্কাব কবছিল। অন্যদিকে সাবেং পঁচিশ টাকাব খালাসিকে নিয়ে কাজটা ঘুবে দেখছে। ওবা একমনে কাজ কবছিল। ওবা স্টিক-ব্রুম উপবে তুলে ক্রমশ হামাগুড়ি দিতে থাকল। দীর্ঘদিন সমুদ্র দেখে দেখে এক ভযংকব ক্লান্তি। সামাদ ফিস ফিস কবে বলল বাতে বাংকে আব শুয়ে থাকতে পাবছি না, বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুচারু বলল, কেন তোব ছবিগুলো?

সামাদ অত্যন্ত বিমর্ষ গলায় বলল, ওতে আব কিছু হয না।

সুচারু অন্য কথায় এল, হ্যা বে, সুমন কখন ফিবেছে বে?

বাবু বেশ বাত কবে ফিবেছেন।

কিছু বলল? সুচারু স্টিক ব্রুম বেখে সামাদেব পাযেব কাছে বসল।

না। সাধু বাবাজি বনে গেছে। খুব ভাল মানুষ, আব অবাক, এক ফোঁটা মদ গেলেনি। সুচারু বলল, একেবাবেই কিছু বলছে না?

একেবাবে বোবা বনে গেছে। আমি বললাম, কী বে কিছু হল?

কী বলল?

বলল না কিছু হয়নি। কিছু খেল না পর্যন্ত, শুয়ে পড়ল।

কিছু জাহাজি ফলকাব ওপাশে কাজ কবছিল। সাবেং উপবে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আব কাজ তাবপব চবিভাজা রুটি খাবাব জন্য আধঘণ্টাব মতো ছুটি। সেজন্য সামাদ এবং সুচারু গা লাগিয়ে কাজ কবল না। কাবণ সাবাদিন ধবে এই জাহাজেব খোল পবিষ্কাব কবা, সাবাদিন এখানে খুট খুট কবতে হবে কোম্পানিকে কিছু কাজ দেখানোব কথা, একই জাযগা বাব বাব সাফ কবতে হবে, ঘুবে ফিবে সাবাদিন শুধু হামাগুড়ি দেওযা, সুতবাং ওবা আড়ালে বসে টিফিন পর্যন্ত আড্ডা মাবতে চাইল। কাজ সামান্য, অতএব সুচারু পা মেলে বসে পড়ল। আব উপবে তখন ডেক-নাবিকেবা সাবানজল দিয়ে বালকেড ধুয়ে গেছে কেউ ফলঙ্কা বেঁধে জাহাজেব পাশে ঝুলে পড়েছে এবং স্ক্যাপ কবছে অথবা বং। কোমবে বঙেব টব। নদীতে মৃদু বাতাস বইছিল, ছোট ছোট ঢেউ। তীবেব কল-কাবখানাব চিমনিব ধোঁয় এবং মানুষেবা বড় বাস্তায় হাঁটছে। বড় বাস্তায় ট্যাকসি বাস, আব শহবেব ঢালুতে ম্যাপল গাছেব শাখা-প্রশাখায এক ঝাঁক পাখি। এ সময সুমন ফলকাব ভিতবে উঁকি দিল। তাবপব সে ছেলেবেলায যেমন কুযোব ভিতব মুখ বেখে নিজেব গলাব স্বব শুনত, এখানেও তেমনি সে নিজেব গলাব স্বব শুনতে চাইল।

নীচ থেকে সামাদ স্টিক ব্রুমটা উপবেব দিকে ছুঁড়ে দিল। সামাদ জানত এতটা উপবে স্টিক-ব্রুমটা উঠবে না, তবু সুমনকে কৃত্রিম ভয দেখাবাব জন্য একটু বসিকতা কবল।

সুমন হাতেব বুড়ো আঙুল ওদেব দিকে ঠেলে ধবল। বলল, পাবলি না।

সুমন চলে যাচ্ছিল।

সুচারু ডাকল, এই শোন, শোন না।

না, নীচে নামব না।
কিছু বলব না, এই শোন।
না রে সাবেং দেখতে পাবে। হাতে অনেক কাজ।
কাজ দেখাস না বাপু, তোব পাযে পডছি, শোন।
বল না।
অত জোরে বলা যাবে না।
সুমন চারপাশটা দেখে বলল, কেউ নেই।
আমি কি খারাপ কথা বলব ভাবছিস?
তবে কী কববি?— সুমনকে খুব লাজুক লাজুক দেখাচ্ছে।
একটা কথা বলব কানে কানে।
ওরা কী জানতে চাইছে এবং কী ধবনেব খবব শুনলে ওবা খুশি হবে সুমন জানত। ওবা মাবিয়াব খবরের জন্য এমন কবছে। সুমন ঘডিতে সময দেখল। মাত্র পনেরো মিনিট। তাবপব চা এবং চাপাটিব জন্য টিফিন। ওব ইঞ্জিন-রুমে কাজ টানেল পথ স্ক্র্যাপ কবা এবং বং কবাব কাজ। সে চুপি চুপি একপাশে নেমে বলল, কী বলবি বল।
কী বকম লাগল?
ভাল।
তারপর?
তাবপব কী আবাব! ওবা তোব রাস্তাব মেয়ে নয। বিবাট দুর্গের মতো বাড়ি। বড বড সব ডালকুত্তা। উঁচু পাঁচিল ঘেবা বাড়ি, সদব দবজায বড লোহাব গেট। মাবিয়াব মা টা বড পাগলাটে। বিচিত্র পাখি পোষাব শখ। মাবিয়া আমাকে কত বকমেব ওয়াববলাব পাখি দেখাল।
সামাদ বলল, আবে রাখ বে, বাস্তাব মেয়েব বুঝি ঘব থাকে না! আগে বল কী বকম দিল তোকে।
জানিস এজন্য আমি নামতে চাইনি। মাবিয়াকে নিয়ে ফাজলামি ভাল লাগে না।
সুচাক বলল, ওয়াববলাব পাখি কী বকমেব বে?
আমাদেব দেশেব টুনটুনি পাখির মতো দেখতে।— সুমনকে কিছুটা সহজ দেখাল এবাব।
সামাদ বলল টুনটুনি পাখিব ডিম পাড়া দেখেছিস?
সুচাক বলল, না। তবে ওবা বড কামুক। সময অসময় নেই। ঠিক জাহাজিদেব মতো। জায়গা পেলেই হল।
সামাদ কেমন তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আমি আব সুচাক হাসিল বেয়ে ডাঙায় নেমে যাব ভাবছি। ইঃ ভাবী আমাব দেশ বে! আমাদেব বং কালো বলে নামতে দেওযা হবে না!
সুমন বলল, পুলিশে ধববে।
সুচাক বলল, ধরুক। তবু আমবা ডাঙায় নামব।
ব্রিজে টিফিনেব ঘণ্টা পডছে। হুডমুড কবে সকলে উপবে ছুটছে। যাবা ডেবিক হাপিজ কবছিল তাবা তাডাতাড়ি বাঁধাছাঁদা কবে ছুটে এল। কাল থেকে জাহাজ বোঝাই হতে শুরু হবে। জাহাজিবা সব যাব ফোকশালে নেমে চা কবে ফেলল এবং চর্বিভাজা রুটিব জন্য গ্যালিব পাশে দাঁড়াল। আব এই রোদে নদীব মতো জলেব বেখা মিসিসিপিব এবং খাড়ি নদীতে নৌকায় পাল তোলাব মতো অবস্থা, আবহাওযায় যেন পুবোপুবি বাংলাদেশ, শুধু পলাশ ফুল ফুটছে না অথবা শিমুল ফুল ফুটছে না তবু এক ধবনেব নীল বঙেব বিচিত্র সব ফুলেবা সামনেব মাঠ এবং গোলাবাড়ি ছেয়ে আছে। সুমন, সুচাক এবং সামাদ বেলিং এব পাশে বেঞ্চিতে বসে পা দোলাতে থাকল আব চর্বিভাজা রুটি খেতে থাকল।
ভাণ্ডাবি গ্যালি থেকে সুমনকে উঁকি দিয়ে দেখল, তাবপব বলল, হাঁ বে বাজান, মাইয়াটাব সোনা চুলে মুখ ডুবাইছনি?
সুমন বেগে বলল, জ্যাঠা ভাল হবে না, পিছনে লাগলে ভাল হবে না কিন্তু!
ভাণ্ডাবি মযদাব হাত ধুয়ে ফেলল। সে এবাব গোস্ত কাটতে বসবে। চিফ স্টুয়ার্ট একবাব উঁকি দিয়ে

গেল গ্যালিতে। টিন্ডাল ডংকিম্যানকে পুরনো খত পড়ে শোনাচ্ছে। তখন ভাণ্ডারি বলল, আমি খারাপ কথা কই না রে বাজান। তগো বয়সে আমরা-অ কত মুখ ডুবাইছি।

সামাদ বলল, জ্যাঠা মুখ ডুবান নাই, কন সান করছেন।

তা করছি, সরমের কথা কী আছে।

তারপর বলল ভাণ্ডারি, কালা আদমি বলে কেউ কিছু বলছে না তো!

না জ্যাঠা, ধরতেই পারছে না আমি ইন্ডিয়ান।

সামাদ সুমনের কানে ফিস ফিস করে বলল, ওসব ওজালিও-ফোজালিও বুঝি না। মাগির দেমাক তোমাকে ভেঙে আসতে হবে। বুক চিতিয়ে চলবে, আদর্শের কথা বলবে, তা চলবে না।

নীচে কে যেন চিৎকার করছিল তখন। গালাগালি দিচ্ছিল। তোবা তোবা করছিল। মনে হচ্ছে বড়-টিন্ডালের গলা। সে সারেংকে নালিশ দিচ্ছিল, দ্যাখেন আইসা কাণ্ড। আমার বালিশেব তলাতে...

বৃদ্ধ বড়-টিন্ডাল বয়সের জন্য ধর্মভীরু। পাঁচ ওক্ত নামাজ আর অবসর সময়ে কোরান শরিফ পাঠ। সুমন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল, দেখল বালিশের নীচে এক উলঙ্গ যুবক এবং যুবতীর ছবি। টিন্ডাল চেঁচামেচি করছিল তখন। নাবিকেরা সবাই ভিড় করেছে। বৃদ্ধ টিন্ডাল ছবিটা স্পর্শ করছে না। সে আল্লার কাছে এই গোনাগারের বিচার চাইছে। সুমন বুঝল ওটা সামাদের কাণ্ড। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে বলল, আবাব তুই বড়-টিন্ডালের পেছনে লেগেছিস?

সামাদ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ল। সে বলছিল, শালা ভণ্ড বেওমিজ। কাল ফের দেশে খত লিখেছে, ওর আব-একটা নিকার দরকার। লিখেছে, তিন বিঘা জমি লিখে দেবে, হাজার টাকা দেন-মোহর দেবে। আসার পথে কোন মসজিদে এক তেরো বছরের মেয়ে ওকে অজু করতে কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়েছিল, এখন দেশে ফিরে ওকে সাদি করার মতলবে আছে। কাল রাতেও ছোট-টিন্ডালকে দিয়ে খত লিখিয়েছে।

তাতে তোর কী?

আমার কিছু নয় বলছিস? আমার কিছু না হলে ওটা করি! জাহাজ থেকে নামার আগে ওকে আমি পাগল বানিয়ে ছাড়ব।

যারা জড়ো হয়েছিল, ইঞ্জিন-সারেং তাদের সকলকে চলে যেতে বলল। এবং বড়-টিন্ডালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, এত শুচিবাই নিয়ে জাহাজে এসো না মিঞা।

বড়-টিন্ডাল বলল, আমি অগো কী করছি কন। অরা ক্যান আমার পিছনে লাগে!

সুচারু ঢুকে বলল, কই দেখি ছবিটা।

সে ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল, তারপর বলল, ঠিক আছে, সব গুনা আমার থাকল। ছবিটা আমি নিলাম।

উপরে উঠে সামাদকে বলল, তুই একটা উজবুক। এমন সুন্দর ছবিটা তুই টিন্ডালের বালিশের নীচে রাখলি! ছবিটার দেখছি জাত গেল।

সামাদ বলল, জানিস, শুয়োরের বাচ্চা ফের আমার বিরুদ্ধে সালিমার বাপকে খত লিখেছে। কাল সারারাত শুয়োরের বাচ্চা ওই করছিল।

কেন অমন কবছে!

টাকা! টাকার গরমে করছে। তিন কুলে কেউ নেই, একটা করে সাদি করবে আর জাহাজে আসার আগে তালাক দেবে।

সুচারু তাড়াতাড়ি সামাদকে নিয়ে ফলকাতে নেমে গেল। সামাদ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

শালা, আমাকে বলে দোজখের পয়দিশ, শালা তুই কী রে! আমি ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখি, একশো বার দেখব। আমার সালিমা ওটা জানে। তুই তো সফরে, তোর বিবি অন্যের সঙ্গে র‍্যালা দেবে ভেবে তালাক দিস। কচি মেয়ের জান লিস। লতুন লতুন তোর ফুল চাই।

আঃ কী হচ্ছে!

সুচারু সামাদকে ধমক দিল। সামাদকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, বাড়িতে ফেরার সময় ছবিগুলো কোথায় রেখে যাস?

রেখে যাব কোথায়? সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে যাই। সালিমা যত্ন করে রেখে দেয়।

কিছু বলে না?

কী বলবে? সেও আমার সঙ্গে উপুড় হয়ে থাকে ছবির ভিতর! জাহাজে আসাব সময় ছবিগুলো যত্ন করে পেটিতে রেখে দেয় আর কাঁদে।

তারপর সামাদ কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, তুই বিয়ে করিসনি ভাল আছিস। শালা বিয়ে করলে অভ্যাসটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

এবাব সুচারু ছবিটা ভাল করে চোখের সামনে তুলে ধরল। ফোকশালেব আলোতে সে নুয়ে দেখল ছবিটা। শরীরে এক ধরনের লালসার জন্ম হচ্ছে।

দুপুব বারোটায় ভাত খাবার জন্য জাহাজিদের এক ঘণ্টার ছুটি। সামাদ সুচারু দেখল সুমন এখনও ফিবছে না। ওবা নিজেরা বিশু থেকে গোস্ত নিল এবং ভাত নিল। সুমনেব খাবাবটুকু যত্ন করে লকারে রেখে ওবা খেয়ে ইঞ্জিন-রুমের দিকে নেমে গেল। সেখানে বড়-মিস্ত্রি, মেজ-মিস্ত্রি, হেনরি আব সুমন নাটবোল্ট খোলায় ব্যস্ত, ওবা বুঝতে পারল কনডেনসার খোলা হয়েছে, হাতেব কাজ সাবতে একটু দেরি, সুমন কাজ না সেরে ওপরে উঠতে পারছে না।

জাহাজে ওদের অমানুষিক পরিশ্রম। সুতরাং সমুদ্রের একঘেয়েমিব ক্লান্তি যখন বন্দবে এসেও মিটছে না তখন আব দেবি নয়, সমুদ্রে ভেসে পড়াই ভাল। অন্য বন্দরেব জন্য ফেব উন্মুখ হওয়া যাবে। সুচারু বলল, দেখলি, কী উৎসাহ কাজে। নাওয়া-খাওয়াব কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে।

সামাদ বলল, কার কথা বলছিস?

আব কার কথা? জাদুকবের পালিত পুত্রের কথা!

সামাদ সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় বলল, সালিমা বড় জ্বালাচ্ছে।

সুচারু বলল, তার মানে?

সামাদ বলল, কাজের ভিতব কেবল সালিমার মুখ দেখতে পাচ্ছি। কোনও কিছু ভাল লাগছে না। চাব মাস হতে চলল কোনও চিঠি নেই ওর।

ভিতরে ভিতবে সামাদ সালিমার খত না পেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সামাদ একদিন বলেছিল, সালিমা, আমি সমুদ্রে চলে গেলে তর অন্য পুরুষেব মুখ মনে আসে না?

সালিমা মুখ খুব গম্ভীর করে রেখেছিল এবং তিন দিন না খেয়ে থেকেছে। সামাদ বলেছিল তখন, আমাব কসুব হয়েছে, ক্ষ্যামা দে। আর বলব না।

পবমুহূর্তে সালিমাব দাঁতগুলো হাসিতে ঝকঝক করছিল। জাহাজি মানুষটি তাব পরানের ধন এবং স্বপ্নেব মতো। কারণ এই দরিয়ার মানুষটি বড় সরল, বড় অবোধ। সংগোপনে কিছু লালন করে না। বন্দরেব সব খবর, সব মেয়েমানুষের খবর এবং জাহাজের শক্ত কাঠে শুয়ে সালিমার জন্য যে দুঃখ, সব খুলে বলার সময় সরল মানুষটিকে বড় কাতর দেখায়। সালিমার নরম চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেন জানি সামাদ অপলক চেয়ে থাকে।

সালিমার এমন এক মুখ যার অসতী হবার ভয় নেই। সুর্মাটানা বলে মাঝে মাঝে হিন্দুদেব দেবীর মতো মনে হয়। চোখদুটো ভাসা-ভাসা এবং শরীরের উত্তাপ অনেকক্ষণ পোহাতে পাবে। সামাদ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলল, চার মাসের উপর হতে চলল, শালা একটা খত নেই বিবির!

সুচারু বলল, সেদিন তুই চিঠি দিলি না!

আমি তো দিয়েই যাচ্ছি।

সুচারু বলল, তা হলে চিঠির গণ্ডগোল হচ্ছে।

সবার বেলায় হচ্ছে না, শুধু আমার বেলায় হচ্ছে!

সুতরাং সুচারু চুপ করে গেল। হাতে ওদের যা কাজ আছে পাঁচটা বাজতে বাজতে শেষ হয়ে যাবে। তারপব স্নান, তারপব রেলিং-এর বেঞ্চিতে একটু বসা এবং নদীর চারপাশের দৃশ্য দেখা।

ফোকশালে তখন সুচারু ছিল, সামাদ ছিল। সুমন নেই, হেনরির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ভোর থেকেই সামাদ কথা কম বলছিল, এখন যেন আরও কথা কম বলছে। সুচারু চা করে এনেছিল। দু'জনে পাশাপাশি বসে নিঃশব্দে চা খাচ্ছে।

সুচারু বলল, চুপচাপ থাকলে ভাল লাগে না। কথা বল সামাদ।

কী কথা বলব। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

বলেছিলি ছিপ ফেলে মাছ ধরবি।

ভাল লাগছে না কিছু।

সুচারু বলল, আজ কালের মধ্যে চিঠি আসবে। চল, উপরে গিয়ে বসি।

সামাদ খেপে গেল সহসা। সে বলে উঠল শালা বড়-টিন্ডালকে আজ আমি মারব।

তুই এমন করছিস কেন।

আমার মনে হয় সালিমার বাপকে ও ভিক্টোরিয়া পোর্টের কথা খুলে লিখেছে।

ওর কী দায় পড়ল?

ওর দায় অনেক। - কী বলতে গিয়ে সামাদ চুপ করে গেল।

ওপরে চল। এসব পাগলামি আমার ভাল লাগছে না।

বিবিটা মনে হয় ছেনালি করছে।

কী আজেবাজে বকছিস? আর করছে তো বেশ করছে।— সুচারু যেন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কথা বলছে, তুই তো মেয়েমানুষ পেলে বন্দরে কুকুরের মতো করিস।

করি। বেশ করি।

তবে ও কী দোষ করল।

সাদি করার পর কথাটা বলবি।

সামাদ চায়ের কাপটা বাংকের নীচে রেখে দেবার সময় আরও কী বলতে চাইল কিন্তু পারল না। সব যেন খুলে বলা যাচ্ছে না। সমুদ্রের সব বন্দরে, সব মেয়েমানুষের ঘর থেকে বেরোবার পর একটি মাত্র মুখ নক্ষত্রের মতো দূরের আকাশে জ্বলতে থাকে। সে মুখ সালিমার। এই একটি মাত্র মুখই সামাদের বাতিঘর। সে যেন বলতে চাইল, জাহাজে ওঠার পর দেশ বলতে আমি আমার সেই একমাত্র বাতিঘরকে বুঝি। সব হারাতে পারি, সালিমাকে হারাতে পারি না।

ফোকশালে ফোকশালে এখন স্নান অথবা আহারের জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। জাহাজ ডেকে বিকেলের রোদ। গাছের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে জাহাজ, ঘাস, মাটি, ফুলকে অদৃশ্য করে দিচ্ছে।

সুচারু এবং সামাদ ফোকশালে বসেছিল। অথচ কোনও কথা বলছে না। যেন ওরা কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। এক সময়ে সামাদ বাংক থেকে উঠে পড়ল। সুচারু বাংকের নীচ থেকে মাছ ধরার জন্য ছোট কৌটা নিল একটা। ওরা দু'জনেই উপরে উঠে রেলিং এর ধারে নদীর জলে বড়শি ফেলল। ভিতরের দুঃখ বেদনাকে ভুলে থাকার জন্য অন্যমনস্ক হতে চাইল।

ওরা স্টারবোর্ড সাইডের রেলিং-এ ভর দিয়ে বড়শি ফেলেছে। ডেক-জাহাজিরা পাশাপাশি কোথাও বসে অন্য কোনও বন্দরের গল্প করছে। অথবা কোথাও জোর বচসা হচ্ছে বিশুর গোস্ত নিয়ে, যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটে থাকে এবং সব কিছুর ফয়সালা করছে। অন্য তীরে কিছু স্কিপ। স্কিপে যুবক যুবতীরা নদীর জলে জলবিহার করছে। শহরের ঢালু জমিতে যেখানে মসৃণ ঘাস আছে ও ম্যাপল গাছের অন্ধকার আছে, যুবক যুবতীরা সেখানে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। সুযোগ খুঁজছে কোনও আড়ালের।

সন্ধ্যের সময় ওরা দেখল আকাশের পুব দিকের মাথায় বড় চাঁদ। আজ রাতে এই নদীর জলে জ্যোৎস্না থাকবে। শহরে বন্দরে জ্যোৎস্না থাকবে। সব বার্চ গাছের মাথায়, গির্জার মাথায় জ্যোৎস্না থাকবে। বন্দরের কে লাইল ভেসে আসছিল জাহাজে। শহরের ঢালু জমিতে খুব ভিড়। যেন এই জ্যোৎস্নার জন্য ওরা শুকসারি আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সুচারু এইসব দেখে ভাবল, রাতে যখন কেউ জেগে থাকবে না, যখন সব জাহাজিরা ফোকশালে নেমে আসবে, অন্তত এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নদীর জলে নেমে সাঁতার কাটালে সামনে তীর পাওয়া যাবে, ছোট স্কিপও পাওয়া যেতে পারে, অথবা ঘুরে-ফিরে সাঁতার কাটা, ঘুরে ফিরে মাঠের মসৃণ ঘাসের ভিতর একটু ডুবে থাকে মন্দ নয়। সুতরাং সুচারু বলল, দেখছিস, চারধারে কী জ্যোৎস্না উঠেছে।

সামাদ বলল, তাই তো।

সুচারু বলল, এই যাবি রাতে কোথাও?

সামাদ বলল, কী করে?

কেন দড়ির সিঁড়ি ফেলে দেব। তারপর নীচে, জলে। তারপর ফের সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে যাব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, সামনে যে মাঠ দেখছিস, সেখানেও উঠে যেতে পারি, কারণ অন্য তীরে শুধু চাষাবাদের জমি, রাত হলে সেখানে আলো থাকে না, শুধু এক বিস্ময়কর জ্যোৎস্না। চুপচাপ দু'জনে বসে সেই মাঠে দেশের গল্প করব।

কারাগারে বন্দি যুবকের মতো জাহাজিরা ছটফট করছিল। নোঙর তোলার পর ফের সমুদ্র, এক দীর্ঘ যাত্রা, সুতরাং সামাদ, সুচারু ফলঞ্চা বাঁধতে কাঠ লাগবে ভেবে এবং দেরি হবে ভেবে দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দিল। মিসিসিপির এই অংশে জল গভীর। কিছু দূরে দু'পাশে ঘন বন। আর দেওদার জাতীয় গাছ নদীর দু'তীরে। অথবা মাঠ ভেঙে গেলে কোনও গ্রাম্য নিগ্রো যুবকের কুটির। সেখানে প্রচুর আঙুর ফল মিলতে পারে।

আর তখন শহরের ভিতর দুর্গের মতো বাড়িতে ওজালিও দা সুম্যান মারিয়ার পড়ার ঘরে বসে বসে গল্প করছিল। মারিয়া 'রয় রোজার্স, কাউ বয় আনুয়েল' বইটির পাতা খুলে ছবি দেখাল। সেলফে নানারকমের ছোটদের বই। সামনে বড় টেবিল দামি পাথরের, টেবিলে দামি ক্যালেন্ডার। দোয়াতদানিতে হরেক রকমের কলম এবং লম্বা মেহগিনি কাঠের উজ্জ্বল আসবাবপত্র, বাতিদান, ঘরে ঝাড়লণ্ঠন, আলোর নানারকমের ফোয়ারা।

দুর্গের মতো এই বাড়িটাকে পাথরের স্তূপ বলে মনে হয়। শুধু এই ঘর, ভাল আসবাবপত্র ও মারিয়া সব মিলে বাড়িটার প্রাণের প্রতীক। হেনরিকে ভাবোদি পাখির জগতে নিয়ে গেছে।

সুমন টেবিলটার অন্যপাশের সারি সারি আলমারির কাচের ভিতর নানারকমের বই দেখতে পেল। কোথাও 'এনিমেল ট্রেভেলার্স' অথবা 'বার্ডস ইন মাই ইন্ডিয়ান গার্ডেন', 'দি লিভিং ওয়ার্ল্ড অফ সায়েন্স' কিংবা কোথাও মিকি মাউস অ্যানুয়েল কত হরেক রকমের বই এবং সেই বইটি অ্যান্ডি প্যান্ডি রকি বড় —মারিয়া বইটি বের করে বুকে চেপে ধরল।

সুমন বলল, বইটা দেখি।

খুব যত্ন করে বইটি সে মেলে ধরল। বইয়ের বাড়িঘরের মতো ছবি, সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া রকি, যেন বলার ইচ্ছা মারিয়ার এই রকির পিঠে চেপে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা হয়। সে কথা প্রসঙ্গে ডিজনিল্যান্ডের গল্প করল। ওদের খামারবাড়ির গল্প করল এবং কার্পাস জমির কথা বলার সময় বলল, কই তুমি কোনও কথা বলছ না কেন! তুমি যে বলেছিলে তিমি মাছের গল্প বলবে?

সুমন বানিয়ে বানিয়ে যত সব আজগুবি গল্পে ডুবে গেল।

মারিয়া অবাক হয়ে বলল, ভয়ে সেখানে কেউ যেত না?

না। আদিবাসীরা মনে করত ওটা কোনও অপদেবতা।

শব্দটা কেন হত?

তিমি মাছটা খুব বুড়ো ছিল। ওর দাঁত ছিল না। মাথার ফুটো দিয়ে জল ছেড়ে শব্দ করত। বুড়ো মাছটা একা হয়ে গেল। দুঃখে তিমি মাছটা দ্বীপের যে দিকে খাড়া পাহাড় ছিল এবং যেখানে বড় ঝিল ছিল পাথরের ভিতরে, মাছটা সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

ও কী করে খাবে? সমুদ্রে না ঘুরে বেড়ালে খেতে পারে কী করে!

যখন সমুদ্রে জোয়ার আসত তখন উপচে জল ঢুকে যেত ঝিলে। তিমি মাছটা জোয়ারের সময় হাঁ করে থাকত, ছোট কুচো মাছ মুখে ঢুকলে মুখ বন্ধ করে জল বের করে দিত — উপরে ছাদ ছিল পাথরের, ছোট একটা মুখ ছাদে। ছাদের মুখে শঙ্খের মতো আওয়াজ হত।

আরিত্তুসের ভয় করত না?

সে তো বন্ধুত্ব করে ফেলল।

সে বন্ধুত্ব করল কেন?

ওর বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যেত। একা ছেলেটা ছোট ছোট মাছ ধরে রাখত বড় মাছ শিকারের জন্য। সে একদিন যেতে যেতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

ওর ভয় করত না?

ভয় কী! একটা ঝিল আছে। ও ঝিলের পাড়ে আছে। আর ছোট ছোট দুটো চোখে একটা জাহাজের মতো মাছটা এগিয়ে আসছিল।

মাছটা লেজ নাড়ছিল?

মাছটা বলল, খোকা, তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

আচ্ছা ওজালিও, সমুদ্রে একা একা তোমার ভয় করে না?

একা কোথায়? আমরা তো অনেকে থাকি।

যখন ঝড় হয়?

ঝড়ের সময় খুব কষ্ট।

মারিয়ার ট্রেজার আইল্যান্ডের গল্প মনে পড়ল। বলল, কোনও দ্বীপে যদি কেবল সোনা থাকে, কী ভাল হয় না?

মোটেই না। সোনার চেয়ে মাটি আমাদের বেশি ভাল লাগে। মারিয়ার মতো ফুল বেশি আমাদের ভাল লাগে।

যা!— মারিয়া মুখ নিচু করে বলল, তোমাকে দেখে আমার এক জাদুকরের কথা মনে আসছিল।

তাই বুঝি!

মারিয়া বলল, গুহায় জাদুকর থাকতেন।

সেই তিমি মাছটার মতো বুঝি?

না। তিমি মাছ কেন হবে? সে তো মানুষ। জাদুকরের এক পালিত পুত্র ছিল। তার একটা পোষা বেড়াল ছিল। আর ভোর হলেই সূর্যের আলো এসে গুহায় পড়ত।

তাহলে জাদুকরের খুব ভাগ্য বলতে হবে।

বিচিত্র রকমেব ফুল ফুটত গুহার মুখে।

তাহলে জাদুকর খুব সুখী লোক ছিলেন।

যাদুকর তার জড়িবুটি নিয়ে আলাদা ঘরে থাকতেন।

ওব একা ভয় করত না?— কৃত্রিম বালকসুলভ স্বরে মারিয়াকে রাগিয়ে দিতে চাইল সুমন।

ওর ভয় কববে কেন? ও তো একা ছিল না। ওর পালিত পুত্র ছিল। যে জাদুকরের জন্য হাট-বাজার করত।

তারপর? — সুমন খুব কৌতূহল দেখাল।

বলছি বলছি। একটু জল খাব।

বলে সে পরিচারককে ডাকল। সুমনের মনে হল বড় সুখী এবং কোমল মারিয়া। ঠোঁটের রং চেরি ফলের মতো, চোখের নীচটা ঈষৎ নীল এবং জ্র জোড়া সরু। সুমন টের পেল, জল খাবার সময় কোমল ত্বকের নীচে জলেব শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মারিয়া জল খাবার পব রুমাল দিয়ে খুব আলতোভাবে ঠোঁট মুছল। তারপর রুমালটা ফের ভাঁজ করে বলল, তোমার মুখ ছবিতে আঁকা সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মতো।

সুমন বলল, তাই বুঝি!

হুবহু তাই। আমি মাকেও তাই বললাম।

তিনি কী বললেন?

তোর যত আজগুবি কথা, তিনি বললেন।

ঠিকই বলেছেন।

সুমনের কথায় কেমন আহত হল মারিয়া। সে সরে গেল এবং ওর ছোট্ট নরম রং-বেরঙের চেয়ারটাতে বসে পড়ল। সে বইয়ের পাতা উল্টে দেখল, সুমনের দিকে তাকাল না। অল্প সময়ের ভিতর ওর চোখ ফেটে জলে ভারী দেখাল মুখ। সুতরাং সুমন হেসে উঠল। বলল, এই মেয়ে, কী হচ্ছে!

কিছু হচ্ছে না।— মারিয়া উঠে জানালার ধারে চলে গেল।

সুমন পিছনে পিছনে গেল এবং মারিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের কুকুরগুলিকে দেখতে পাচ্ছি না।

জানি না।

মা কোথায়?

জানি না।

সুমন বলল, চলো কফি খাবে।

মারিয়া পিছনে ফিরে দেখল তার পরিচারকটি কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কফির সঙ্গে দুধ মেশাল এবং মিষ্টি ক'চামচ জিজ্ঞাসা করার সময় পরস্পর হেসে উঠল।

না ওজালিও, তুমি আমাকে খুব ছোট ভেবে অবহেলা করো।

তুমি তো খুব ছোট।

মা-ও আমাকে খুব ছোট ভাবেন। তুমিও আমাকে খুব ছোট ভাববে?

কী ক্ষতি বলো!

তা হলে তোমাকেও আমি জ্যাক বলে ডাকব।

তোমার খুশি।

সুমন এবার মারিয়াকে ভাল করে দেখল। বয়সের এমন কোথাও এসে সে পৌঁছেছে যেখানে বালিকাসুলভ ইচ্ছা এবং কৈশোরের স্নিগ্ধ ভালবাসা মারিয়ার প্রাণকে আকুল করছে।

হেনরি এখনও ফিরছে না। ঘড়িতে আটটা বেজে গেছে। মারিয়া আর কথা না বলে টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকল এবং কফি খেল। সুমনের কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

সুমন বলল, চলো হেনরিকে খোঁজা যাক।

মারিয়া প্রথমে তার পরিচারককে পাঠাল মায়ের কাছে। এই মুহূর্তে ওরা সেখানে যেতে পারবে কি না অনুমতি চাইতে।

তখন ভারোদি হেনরিকে নিয়ে ওর পাখির বাগানে বসেছিল। চারধারে লাল নীল স্তিমিত আলো এবং ফুল-ফলের ছোট ছোট গাছ। ছোট ছোট গাছ, ছোট ছোট খাঁচা, বড় বড় তারের জাল দেওয়া ঘর এবং নীচে ছোট সরু কৃত্রিম খাল, ছোট সরু রাস্তা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বেঞ্চ। রবিবার সাধারণের জন্য খোলা থাকে বলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে।

ভারোদি কথা-প্রসঙ্গে হেনরিকে বলল, আমরা আমাদের গুপ্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।

হেনরি ঠোঁট চেটে ভারোদিকে দেখল, তারপর সে উঠে গিয়ে জলার ধারে এক দঙ্গল ফিশার পাখি দেখে এল। এক কৃত্রিম জলাধার, পাশে ছোট ছোট সিলভার ওক এবং কিছু ফার্ন জাতীয় গাছ, জলে লিলি ফুলের মতো এক ধরনের নীলাভ ফুল এবং উপরে সাদা ডুমের আলো। ভিতরে পাখিগুলো উড়ছিল।

হেনরি এইসব দেখতে দেখতে বলল, তোমার দেশের উন্নয়নের পক্ষে ব্ল্যাকদের দান অসামান্য।

ভারোদি ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ল, আমাদের সুবিধার জন্য যেসব গোরু-ঘোড়া আমদানি করেছিলাম তাদের সমান অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, তবে!

তারপর কেমন নেশাগ্রস্ত রমণীর মতো হেনরির হাত ধরে টেনে আরও উত্তরের দিকে চলে গেল। পাঁচিল সংলগ্ন ছোট ছোট পাথরের ঘর, দরজায় লোহার শক্ত গেট। এত দীর্ঘকাল পরেও ভয়ংকর মজবুত দেখাচ্ছিল। ভারোদি বলল, এই সব মজবুত ঘর আমাদের উত্তর-পুরুষ পারিবারিক দাস-ব্যবসায়ের জন্য করে গেছিলেন।

কিন্তু তুমি বললে যে কার্পাস জমির জন্য তোমরা এখানে এসেছিলে!

জমির সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক। আমার মনে হয় সেটা ১৮০৭ সাল হবে, দাস-ব্যবসায়ে আমেরিকানদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে একটা আইন পাশ হয় এবং ১৮২০ সালে দাস ব্যবসা দস্যুবৃত্তির সামিল বলে ঘোষণা করল সরকার। অথচ এসব আইন পারিবারিক দাস-ব্যবসায় প্রযোজ্য ছিল না। দাস আমদানি নিষিদ্ধ সুতরাং এই পরিবার পারিবারিক দাস-ব্যবসা শুরু করে দিল। তা ছাড়া, পারিবারিক দাস-ব্যবসা বেশি লাভজনক ছিল।

হেনরি এক অদ্ভুত ছবি দেখল অথবা ভারোদি এই সব পারিবারিক দাস-ব্যবসা সম্পর্কে বলার সময় সাল, তারিখ, নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করছিল। যেন কোনও ধর্মযাজক ধর্ম প্রচার করছে। ভারোদির মুখ চোখ খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। শ্বেতকায় জাতির শুদ্ধতার জন্য সে ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করছে, অথবা সে সন্ন্যাসিনী, এই মহান জাতির সর্বনাশ টেনে যারা আনছে তাদের কারও নিস্তার নেই, এমন এক ভঙ্গি নিয়ে ভারোদি দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রাচীন সব পাথরের ভিতর এক দীর্ঘ অতীতের ছবি ফুটে বেরুচ্ছিল। নৃশংস এবং ঘৃণ্য। নিগ্রো সবল যুবক-যুবতীদের ধরে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা হত। ওরা কাজ করত খেত-খামারে। আর বড় হলে দু'হাজার অথবা পঁচিশশো ডলারে বিক্রি করা হত নিগ্রো সন্তানদের, পশু বেচে দেবার মতো বিক্রির ব্যবস্থা। ভারোদি সেই সব কথা বলল। এই সব সারি সারি ঘর এখন আর কোনও কাজে আসছে না। অথচ একসময় তিন-চার জন নিগ্রো রমণী প্রতি মাসে এইসব ঘরে সন্তান প্রসব করে চলে যেত। তারপর ওদের জন্য খামার ছিল। তারপর একটু থেমে ভারোদি হাসতে হাসতে বলল, পারিবারিক দাস-ব্যবসা পোলট্রির মতো। লুসিয়ানার বহু পরিবার এভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন এক সময়। অথচ দ্যাখো, কী দিন কী হয়ে গেল। ক্রমশ আমরা হেরে যাচ্ছি।

ভারোদির গলার স্বর কান্নার মতো শোনাল। সে তিক্ত গলায় বলে উঠল, সেদিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক প্রশাসনিক আদেশে বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীতে বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ এবং সমান সুযোগ থাকবে। একের পর এক সুপ্রিম কোর্ট নিগ্রোদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সব রায় দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কী করব হেনরি? সেই গৃহযুদ্ধের আমল থেকে আমরা হেরে চলেছি। আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি। ক্রমশ ক্রমশ!

পাগলের মতো দুঃখে ভারোদি ভেঙে পড়ল।

ভারোদি অনেকক্ষণ সেই আলো-অন্ধকারে স্থবির হয়ে বসে থাকল। সুতরাং হেনরি এই পারিবারিক দাস-ব্যবসা অসম্মানজনক এবং গ্লানিকর এ কথা বলতে পারল না। ভারোদির প্রতি যথার্থ নাবিকের মতো ব্যবহার করল। সে অন্য কথায় ফিরে এল। বিধবা রমণীর কিছু ইচ্ছা হেনরির সব সময় জানা থাকে। কৌশলের দ্বারা সেই ইচ্ছার ঘরে পা ফেলতে হবে। সে বলল, ভারোদি, তোমার রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কত বিচিত্র দেশের পাখি! তোমার সংগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি! কত বড় বড় সব আলসেশিয়ান কুকুরের যৌনতা তোমাকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করে।

ভারোদিকে কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সে বলল, চলো, আর-একটু দক্ষিণে এগোনো যাক।

কথায় এবং আচরণে ব্ল্যাক-দের প্রতি ভারোদির সব সময় সেই এক কটূক্তি, ওরা চাষের জন্য, জমি বুনবার জন্য, সমাজে এবং সংসারে ওদের ব্যবহার গোরু-ঘোড়ার মতো। সমান অধিকার প্রসঙ্গে হেনরি আর ভুলেও কথা বলতে চাইল না। এই বাড়ি দীর্ঘ এবং পাঁচিলের নীচে বিস্তৃত জমি, জমিতে হরেক রকমের পাখি, পাখির খাঁচা, কৃত্রিম সব ঘন জঙ্গল। হেনরি এবং ভারোদি পাশাপাশি হাঁটছিল। দু'জন রেড-ইন্ডিয়ান পরিচারক পেরাম্বুলেটরে দুটো রবিন পাখির খাঁচা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভারোদির অনিদ্রার রোগ—অভ্যাস, পাখি দেখা শুয়ে শুয়ে। পাখি দেখতে দেখতে, রাতে পাখির যৌনতা দেখতে দেখতে ভারোদি ঘুমোয়।

কথায় কথায় ভারোদি জেনারেল লি-র কথা বলল। আর 'কথিত আছে' এই ধরনের প্রবাদের ভিতর যেন বলার ইচ্ছা, জেনারেল লি বাড়ির কোথাও না কোথাও এক সময়ে বসে উত্তরের দেশগুলোর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

হেনরি উত্তর দিল না। মারিয়াদের পূর্বপুরুষ বহু বিজয়ের কাহিনি এই অঞ্চলে প্রবাদের মতো সংরক্ষিত করে গেছে। যার ফলে স্থানীয় এই শহরে কোনও নিগ্রো বসতি নেই, শহরের ভিতরে কোনও নিগ্রো সমস্যা নেই। এবং স্থানীয় আইন এখনও এই দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই সব কথা বলতে বলতে ভারোদি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তারপর সহসা কী ভেবে বলল, তুমি তাজা রেটল সাপ দেখেছ হেনরি?

হেনরি বলল, না।

ভয়ংকর। আমার ইচ্ছা আছে, একদিন তোমাকে এবং ওজালিওকে নিয়ে সামনের মরুভূমির মতো জায়গাগুলো দেখে আসব। এ অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। মাঠে সামান্য ঘাস, কাঁটাজাতীয় গাছ আর বড় বড় পাথরের ফাঁকে কপাল থাকলে রেটল সাপও চোখে পড়তে পারে।

এখন এই বিরাট দুর্গের মতো বাড়িটাতে ভারোদিকে বড় অবসন্ন লাগছে। ভিতরে মিথ্যা অহমিকার জন্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ভারোদি হাসতে হাসতে বলল, রেটল সাপ দাঁত বের করে হাসতে পারে। ভীষণ কুৎসিত।

হেনরি স্পষ্ট দেখল ভারোদির গা ভয়ে এবং বীভৎস দৃশ্যের জন্য শিউবে উঠল। সে একটু সামলে নিয়ে বলল, ওদের দাঁত একরকমের। হাসলে নিগ্রোদেরও একরকম দেখায়।

হেনরি ভারোদির কথা অনুধাবন না করতে পেরে বলল, কাদের দাঁত?

নিগারদের।

অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা ওদের চোখ-মুখ সবার অমানুষিক। তারপর হেনরিকে ধরে সোজা সামনের একটা ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। নিজের হাতে কিছু ছবির আবরণ খুলে দিল। নানা রকমের নিগ্রো পুরুষ-রমণীর ছবি, নানাপ্রকার রেটল সাপের কঙ্কাল। ভারোদি কেমন পাগলের মতো বলল, কেমন একবকম দেখাচ্ছে না?

হেনরির এ সময় ভারোদির জন্য কষ্ট হতে থাকল। অনর্থক এ কী সংস্কার যা আত্ম-প্রতারণাব মতো! রেটল সাপের কঙ্কালগুলো খট খট করে বাজছিল। হেনরি বলল, ছবিগুলো রেখে তোমার কী লাভ?

এগুলো আমি রাখিনি। বহুদিন থেকে এ ঘরে পড়ে আছে। সেই গৃহযুদ্ধেব আমল থেকে।

ক্রমশ বিশ্রী ধরনের পরিস্থিতিব সম্মুখীন হতে হচ্ছে ভেবে হেনরি বিব্রত বোধ করল। সে ভাবল সুমনকে এবং আসতে বারণ করবে। কারণ কালো মানুষদেব ভীতি এইসব সাদা মানুষদের পাগল করে দিচ্ছে। এই বর্ণবৈষম্য হেনরি নিজের দেশেও কম-বেশি উপলব্ধি করেছে অথচ যেন এত প্রকট নয় এবং অস্বাভাবিক ভাবে সকলে হিক্কাগ্রস্ত রুগিব মতো ভুগছে না। সুতরাং সুমন ভারতীয় এবং বর্ণবৈষম্যে সে নিগ্রোদের সমগোত্রীয়। একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। সে বাচাল ছোকরার জন্য মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বলল, ওজালিওকে ডেকে দিলে ভাল হয়।

এত তাডাতাড়ি?

বেশ বাত হল।

এমন সময় মারিয়ার পরিচারক রেড ইন্ডিয়ান যুবকটি ভারোদির অনুমতি চাইলে বলল, আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।

হেনবি বলল, এবার আমরা যাব।

আব একটু বোসো। এসো না একদিন আমরা এখানে রাতে সবাই মিলে আহার করি।

বেশ ভাল প্রস্তাব।

কবে হবে বলো?

তোমাব সুবিধামতো।

হেনরি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, কাল হলে হয় না!

ঠিক আছে, কালই হবে।

এখন দেখলে মনে হয় না ভারোদি কিছুক্ষণ আগেও নীল রক্তকে সম্মানিত রাখার জন্য হিক্কাগ্রস্ত রোগীর মতো ছিল। এখন খুব স্বাভাবিক। সুতবাং এখানে এসে এই সাদা-কালোর কথা বরং না তোলাই ভাল। হেনরি বলল, ভারোদি, মিস্টার ট্যালডনের ছবিটা দেখালে না তো!

তাঁর ছবির ঘর আলাদা। সেখানে শুধু তাঁর বাবা থাকেন। আমরা সহজে ঢুকতে পারি না। একটু থেমে বলল, আমার ঘরে গোপনীয় ছবি আছে। কাল এসো, তোমাদের দেখাব।

হেনরি এবং ভারোদি করিডরের ভিতর হাঁটছে। তাদের পায়ের শব্দ প্রাসাদের অলিন্দে জলের ফোঁটা যেন, অনেক উঁচু থেকে টুপটাপ শব্দ করে পড়ছে।

তখন দূরে ওজালিও এবং মারিয়ার উচ্ছল হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। বহুদূর থেকে ওজালিওর হাসি এবং আনন্দ তরঙ্গের মতো অনেক হলঘর পার হয়ে এই করিডরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। ভারোদি আপন মনে বলল, বেচারা ওজালিও!

তারপর হেনরির দিকে মুখ তুলে বলল, ওজালিওর মা কতদিন হল মারা গেছেন?

এই সেদিন। আমাদের জাহাজ তখন ডারবানে।

কী অসুখে মারা গেছেন?

কোনও অসুখের কথা চিঠিতে লেখা ছিল না। ওজালিও চিঠি দিয়েও জবাব পায়নি। আমাদের কলকাতার এজেন্ট-অফিস খবর দিল, তাব মা মারা গেছে।

হেনরি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। স্পেনেব লোক ওজালিও, সুতরাং কলকাতার সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকতে পারে। খুব ভুল হয়ে গেল। হেনরি মিথ্যা জবাবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল কিন্তু ভারোদিকে ওজালিওর আরামপ্রিয় এবং স্নিগ্ধ মুখের পাশে মাতৃহীন ছবি এত বেশি ভারাক্রান্ত করছিল যে, সে বুঝেই উঠতে পাবছে না কেন হেনরি সহসা চোখ-মুখ লাল করে কথা বলতে গিয়ে তোতলামিতে আড়ষ্ট হচ্ছে। যেন ভারোদি তখন বলতে চাইছে, প্রিয় ওজালিওর চোখ বড় মহিমাময়। সে স্পষ্ট করে বলল, প্রিয় ওজালিওর মুখ খুব মায়ামাখানো। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা হয়।

হেনরি হাসতে হাসতে বলল, সেজন্য আমাদেরও হিংসে হয়। জাহাজের সবাই ওকে ভালবাসে। মায়ের মৃত্যুর পব তো কথাই নেই। জাহাজে যখন প্রথম উঠল, কাপ্তান মেজ-মিস্ত্রিকে বললেন, কী হে, এক নাবালক ছোকরাকে ধবে আনলে! 'নলি' ভাল করে দেখেছে তো!

উত্তরে মেজ-মিস্ত্রি কী বললেন?

বললেন, ওর কাছে জাহাজি শিক্ষাব ছাড়পত্র আছে।

এ প্রসঙ্গে বেশিদূর যাওয়া ভাল নয় ভেবে হেনরি বলল, এবারে যাওয়া যাক।

কৃত্রিম পাহাড়টার নীচে গাড়ি ছিল। মারিয়া ছুটে ছুটে আসছে। পিছনে ওজালিও। কবিডরে তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেনরি গাড়ি-বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। ভারোদি পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, তোমরা এলে বেশ লাগে। নাবিকদের সম্পর্কে আমার সবসময় কৌতূহল আছে। আব যখন জানলাম গ্যানিব কাছে তুমি আমাদের পরিচিত নাবিক- বন্ধু, তখন তো কথাই নেই। ভাবলাম, তাহলে এবার খুব হইচই কবা যাবে।

গাড়িতে বসে হেনরি কিন্তু সুমনের সঙ্গে একটা কথাও বলল না, ওরা পবিচিত পথ ধবে যাচ্ছিল। সামনে বড় হাসপাতাল এবং বেসবল খেলার মাঠের বড় আলোটা ওরা অতিক্রম করে গেল। মোটর খুব দ্রুত ছুটছিল। সুমন গাড়ির জানলাতে মুখ রেখে শহরের আলো, ঘর, বাতি দেখতে দেখতে বলল, এসো, এখানে নেমে যাই। তারপব বাকি পথটা আমরা হেঁটে যাব।

ভাল লাগছে না সুমন, তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিবব।

জেটিতে ঢোকার মুখেই ওদের ছেড়ে দেওয়া হল।

হেনরি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি জাহাজে যাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।

মানে!

মানে আমি একটু খাব।

আমিও খাব।

না।

কেন নয়?

আমি আর দায়িত্ব নিতে পারছি না।— হেনরি খুব ক্লান্ত গলায় বলল।

কীসের দায়িত্ব?

সুমন হেনরির এই উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারছে না। ক্রেনের শেকলের ছায়াটা ওর মুখের উপর দুলছে। সে মাথা নিচু করে বলল, আমি কালা-আদমি এবং আমি ইন্ডিয়ান, সাদা বলে পরিচয় দিয়ে নিজেও অসম্মানবোধ করছি। মাটির টান, শহরের জৌলুস আর সুন্দরী মেয়েদের ছবি আমার কাছে নেশার মতো। আমাকে... আমাকে..

সুমন বাকিটুকু প্রকাশ কবতে পাবল না। সুমন এই অসম্মানেব জন্য অন্ধকাবেব ভেতব তেমনি মাথা নিচু কবে বাখল।

হেনবি বলল, তুমি আমাব উপব বাগ কবছ?

না, কাবও উপব বাগ নেই।— সুমন ধীবে ধীবে জাহাজেব দিকে হাঁটতে থাকল।

হেনবি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটল। বলল, ভাবোদি ন্যাশনাল স্টেটস বাইট পার্টিব গোঁড়া সমর্থক।

আমি জানি। তিনি স্থানীয় শাখাব সম্পাদক।

তিনি কালো মানুষদেব সম্পর্কে খুবই বেপবোয়া। খুবই ঘৃণা কবেন।

হেনবি, আমি সব জানি। তাব ঘবে বেটল সাপেব ছবি এবং নিগ্রো বমণীব মুখ পাশাপাশি আঁকা আছে। অহেতুক ঘৃণা পোষণ কবছেন তিনি। তাঁব সংস্কাব তাকে পাগল কবে দিচ্ছে। এও এক ধবনেব অসুখ।

তাবপব হাসতে হাসতে বলল, আমাব এক দূব সম্পর্কেব বিধবা পিসিব কথা মনে পড়ছে। তিনি মুসলমানদেব ছায়া মাড়ালে স্নান কবতেন। মাবিয়াব মাকে আমাব সেই বিধবা পিসিব মতোই দেখাচ্ছিল। আব জানো হেনবি, অবাক, এত দীর্ঘদিন পবেও হঠাৎ সেই ছবিটা আমি হুবহু মনে কবতে পাবলাম।

এই সব কথায় সুমনকে খুব বয়স্ক মনে হচ্ছে। সুমন এক পবিণত মানুষেব মতো কথা বলছে দেখে হেনবিব হাসি পেল। বলল, হয়েছে, আব ভাবী ভাবী কথা তোমাকে বলতে হবে না। বাবুব প্রাণে খুব লেগেছে। চলেন, দেখব কত মদ খেতে পাবেন।

বলে ফেব দু'জনেই নিঃসঙ্গ জেটিব ভেতব উচ্ছল হয়ে উঠল যেন জাহাজি মানুষেব জীবনে মাটি এবং মদেব মতো আব মেয়ে মানুষ এই আলেয়াব মতো, ফাঁক পেলেই জাহাজিদেব টানছে আব টানছে।

সাত

ফোকশালে ঢুকে সুমন দেখল ঠিক পোর্ট হোলেব পাশে সুচাক এবং সামাদ বসে বসে দড়িব সিঁড়ি ঠিক কবছে। ওদেব মুখ খুব ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। সুমন পোর্ট-হোল পর্যন্ত হেঁটে গেল না, কাবণ শবীর খুব টলছে এবং কোনও কথা বলতে পাবছে না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বাংকে বসে হাত তুলে কিছু বলবে ভাবলে। কিন্তু তাব আগেই কী ভেবে সে সঙ্গে সঙ্গে জুতো, মোজা, জামা, প্যান্ট নিয়ে শুয়ে পড়ল।

সুচাক এবং সামাদ খুব নিবিষ্ট মনে কাজ কবছিল বলে সুমনকে একেবাবেই লক্ষ কবেনি। সুচাক গিঁটটা টেনে বলল, ঠিক আছে। ছেঁড়বাব ভয় নেই।

সে হাতঘড়ি দেখল।

আব সামাদ হাত ঝেড়ে উঠতেই দেখল, বাংকে সুমন। জামা-প্যান্ট না ছেড়েই শুয়ে পড়েছে। সে কাছে যেতেই বুঝল, খুব টেনে এসেছে বাচাল ছোকবা। সুতবাং সে ওকে টানাটানি না কবে পায়েব জুতো মোজা খুলে দিল। তাবপব সে উপবে উঠে সন্তর্পণে বড় টিন্ডালেব দবজাব সামনে কান পেতে বাখল। ভিতবে আলো আছে মনে হল। অথচ কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হল বড় টিন্ডাল ঘুমিয়ে পড়েছে, আব ওব দোসব ডংকিম্যান ইদ্রিশালিও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুচাক উপবে উঠে যাবাব সময় দেখল সামাদ অন্ধকাবেব ভিতব লুকিয়ে থেকে বড় টিন্ডালেব ফোকশালে কান পেতে বেখেছে। সুচাক ফিস ফিস কবে বলল, এই কী হচ্ছে?

অ্যাঁ।— সামাদ ভয়ে আঁতকে উঠল।

অঃ তুই। কিছু হচ্ছে না।

বলে সে ধীবে ধীবে সুচাকব সঙ্গে উপবে উঠে গেল। সামাদ ফেব কম কথা বলতে শুরু কবেছে, ফেব ওকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ডেকেব সর্বত্র ঘুবে ঘুবে সুচাকই প্রায় সব কিছু লক্ষ কবল। বসন্তকাল, সুতবাং এই ঠান্ডা বাতাস বড় আবামদায়ক। নদীব জল এখন অন্ধকাবেব মতো। ডেকেব উপব কোনও প্রাণীব সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টাব-মাস্টাব শুধু জেগে আছেন। আব কিছু

আলো জ্বলছে ডেকের উপর। সুচারু লক্ষ করে বুঝল কোয়ার্টার-মাস্টার যাবার সময় তাদের দেখতে পাবে না। এ সময় কাপ্তান বোট-ডেকে একটা ডেক-চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকেন, সুচারু দেখল, আজ তিনিও নেই। কোথাও কোন পুলিশ-ফাঁড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজছে। গ্যালির দরজা বন্ধ। ভাণ্ডারি ফোকশালে চলে গেছে। একমাত্র ইঞ্জিনের আগওয়ালা জেগে। সে উঠে আসার সময় দরজা খোলা দেখতে পেলে সন্দেহ করবে। ওরা নীচে নেমে ওদের ফোকশালের দরজা ভাল করে বন্ধ করে দেবার আগে পোর্ট-হোল দিয়ে দড়ির সিঁড়ি নীচে ফেলে দিল এবং এইবেলা বের হয়ে পড়তে হবে। বেশি দেরি করলে ধরা পড়বার ভয় আছে। বন্দরের কোনও কোলাহল শোনা যাচ্ছে না। শুধু দূর থেকে কোনও মেশিন-ঘরের একটা ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ ভেসে আসছে। অন্য তীরে মেপল গাছের নীচে রং-বেরঙের নৌকার ভিড়। নৌকা খালি করে যুবক-যুবতীরা শহরে উঠে গেছে। অথবা কোনও ব্যালেতে নাচ শেষে যুবক-যুবতীরা ঘরমুখী। এ হেন শান্ত নির্জনতার ফাঁকে দূরবর্তী কোনও স্টেশনে ট্রেনের হুইসিল শোনা যাচ্ছে। এই বেলা ওরা নিরাপদ ভেবে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল নীচে।

উভয়ে সাঁতার কাটছিল জলে। আকাশে অজস্র নক্ষত্র জ্বলছে। ক্রমশ ওরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বন্দরের আলো জলে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছিল। ওরা ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছিল। চারিদিক আলো-অন্ধকারে রহস্যময়। নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ। ওরা কোনও কথা বলছিল না। ওরা তীরে উঠে কোনও মাঠে চুপচাপ বসে থাকবে অথবা চারিদিকে আলোকিত জ্যোৎস্না, নানারকমের কীট পতঙ্গের আওয়াজ এবং কোথাও রহস্যের ছোঁয়া, ওরা মাটি এবং নারীর জন্য তীর ছুঁতে চাইল এবার।

এক সময় সুচারু বলল, বাবার কথা খুব মনে পড়ছে।

সামাদ বলল, সালিমার চিঠি বুঝি আর আসবে না।

সুচারু বলল, বাবা বলতেন বন্দরে নেমে শুধু মেয়েমানুষের খোঁজ করবে না, ঈশ্বরকেও অনুসন্ধান করবে।

সামাদ বলল, হেনরি কিছু বলল তোকে?

না।

এই ধরনের উত্তর হবে সামাদ নিশ্চিত ছিল।

সুচারু ফের কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল।

দেখেছিস আকাশটা কত পরিষ্কার। কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না! ঠিক আমাদের দেশের মতো, না!

সামাদ বলল, আকাশটা সব জায়গাতেই এক।

বাবা হলে বলতেন, মন্দিরে মসজিদে সর্বত্র!

বলে মুখ নিচু করে একটু জল তুলে আবার ফুৎ করে ছেড়ে দিল।

সুচারু জলের ভিতর পায়ে কী লাগতেই আঁতকে উঠল। বলল, এই রে খেয়েছে!

কী হল!

সাঁতার কাটা থামিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে সামাদের মনে হল, সুচারু ওকে ভয় দেখাচ্ছে।

মনে হল পায়ের নীচে কী যেন ঠান্ডার মতো লাগছে।

সামাদ ভয়ে ভয়ে বলল, যা!

সে তাড়াতাড়ি আরও উপরে ওঠার জন্য বড় বড় হাত ফেলে সাঁতার কাটতে থাকল। কী জানি নদীর এত উপরেও যদি কোনও হাঙর টের পেয়ে যায়।

সুচারু ডুবে গেল যেন। সামাদ পেছনের দিকে তাকাচ্ছে। সুচারু আর উঠছে না। ওর শরীর হিম হয়ে আসতে থাকল। কালো অন্ধকার জলে সুচারু কোথায় নেমে গেল! সে ডাকল, এই সুচারু!

অথচ খেয়াল হল জলের নীচ থেকে ওর ডাক কানে পৌঁছবে না। সে সাঁতার কাটতে পারল না। সে কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। আর তখুনি ঠিক ওর পিছনে সুচারু ভোঁস করে ভেসে বলল, নীচে জাহাজের মাস্তুলের মতো মনে হল।

সে রহস্য করে বলল, একটা জাহাজের কঙ্কাল জলের নীচে পড়ে আছে।

এই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ভিতর সামাদের মনে হল, কোথাও কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই সুচারুর মুখে। সুচারু মিষ্টি-মিষ্টি হাসল। বলল, আমার গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ওদের মুখে এখন বড় বড় অপরিচিত গাছের ছায়া পড়ছে। গাছের ফাঁকে চাঁদের আলো মহিমময় ঈশ্বরের মতো। ওরা বুঝল ক্রমশ ওরা তীরের নিকটবর্তী জায়গায় এসে যাচ্ছে। ওরা আনন্দে যথার্থই এবার জলের উপর ভেসে ভেসে শিস দিয়ে গান গাইল।

সামনে ছোট জেটির মতো বাঁধা পাড়। কিছু স্কিপ বাঁধা সেখানে। পাশে ছোট ছোট বয়াতে লাল আলো। ওরা তীরে উঠে দেখল সেইসব বড় বড় গাছ জড়াজড়ি করে আছে এখানে। জাহাজ থেকে জায়গাটাকে কুঞ্জবনের মতো মনে হয়। ওরা তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে কিছুক্ষণ এই মাঠের ভিতর ছুটে বেড়াল এবং চুপচাপ শুধু আকাশ দেখার সময় সুচারু বলল, আমরা এত কষ্ট করে এখানে এলাম কেন সামাদ?

কীসের কষ্টের কথা বলছিস?

এই যে এতটা জল কেটে এপারে এলাম কেন? আচ্ছা সামাদ, মনে হচ্ছে না দূরে কুকুর ডাকছে?

সামাদ কান পেতে শুনল, হ্যাঁ রে, কুকুর ডাকছে।

সুচারু বলল, কোথাও কি মনে হয় তুই আর সালিমা পৃথিবীর দুই পৃথিবীর দুই বিপরীত বিন্দুতে বসে আছিস?

সামাদ চুপ করে থাকল।

মনে হয় না, মাঠের জ্যোৎস্না পার হয়ে গেলেই তোর গ্রাম পড়বে? মনে হয় না, এই মাঠের শেষেই তোদের বাড়ি? সালিমা সেখানে কুপি জ্বেলে সরষে বেটে পুঁটিমাছ রান্না করছে?

সুচারু একটু হেঁটে এল গাছগুলোর চারধারে। এত জ্যোৎস্নার প্লাবন, সাদা মাঠ এবং আকাশ বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের শরৎকালীন আকাশের মতো। ওর মাকে মনে পড়ছে না। ওর বাবাকেই মনে পড়ছে। খুব ছোটবেলায় ওর মা ঝাড়গ্রামের দিকে কোথায় চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। বাবা বলতেন, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন শহরে-নগরে সৈনিকেরা ছড়িয়ে পড়ছিল। আরও এমন সব কথা বলতেন যা সুচারু ধরতে পারত না, খুব হেঁয়ালি করে কথা বলতে ভালবাসতেন। স্ত্রীজাতি মাতৃজাতি—ওদের ভোগে তৃপ্তি। বিপদে ওরা পাথর বনে যায় না। ওহে রবার্ট সুচারু, এসো, আমার কাছে এসো। প্রতি সফরে ওর বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, তুমি গির্জায় যাবে ওটা মানুষের তৃপ্তি শান্তির ঘর। না গেলে দুঃখ পাব। তারপর একটু থেমে বলতেন, আমার জন্য একটা ভাল দামি বিলিতি কোট আনবে। অনেকদিন ধরে একটা ভাল কোট পরতে পারছি না।

একটা কিনে দিলেই পারিস?

প্রত্যেকবারই কিনে নিয়ে যাই।

কী করেন এত কোট দিয়ে?

কী আর করবে, টাকার টান পড়লে বেচে মদ খান।

পাশে মেটাল রোড। ওরা দেখল ট্রাক বোঝাই হয়ে হাঁস-মুরগি যাচ্ছে। ওরা গাছের অন্ধকারে চুপচাপ লুকিয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল, দূরে কোনও নিগ্রো-গ্রামে উৎসব চলছে। থেকে থেকে 'হেই হেই' এক ধরনের খুব দূরবর্তী নদীর ঢেউয়ের মতো শব্দ ভেসে আসছিল।

ওরা উঠে গিয়ে সামনের একটা স্কিপে বসল। স্কিপে ছোট মোটর আছে। এবং ওরা হাত দিয়ে দেখল, ওটা চালালে খুব তাড়াতাড়ি অনেকটা দূরে ঘুরে আসা যায়।

সুচারু বলল, চল, নদীর উপরের দিকটা দেখে আসি।— বলে স্টার্টারটা টেনে ধরল।

সামাদ বলল, শব্দে মানুষজন জেগে উঠতে পারে।

সুচারু বলল, পাল তুলে দিলে হত। অথচ কোনও বোটেই পাল নেই।

বলে অন্য স্কিপগুলোতে ঘুরে বেড়াল। পালে চলে এমন কোথাও কোনও স্কিপ যদি পড়ে থাকে অথবা নৌকার জন্য ওরা অনেক দূর হেঁটে গেলে দেখল, বিরাট খামারবাড়ি, বাড়ির সদরে আলো জ্বলছে এবং ঘাটে সেই স্কিপ বাঁধা। ওরা পাল তুলে সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জোয়ারের সময়। স্রোতে টান রয়েছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি নদীর উপরে উঠে যেতে পারল।

ওরা ক্রমশ নদীর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ক্রমশ বন্দরের আলো পিছনে ফেলে, দু'পারের নিগ্রো বস্তি অঞ্চল পিছনে ফেলে এবং যখন আর জাহাজের মাস্তুলের আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, তখন মনে হচ্ছিল দু'পারেই ঘন বন, দেওদার জাতীয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের মুখ যখন ছায়াছবির মতো কোমল অথবা এও হতে পারে সালিমা তরুণী, সামাদ শালুক তোলার ফিকির খুঁজছিল মনে মনে। সামাদ বলল, বর্ষাকাল তখন। সালিমা জমিতে ডুবে ডুবে শালুক তুলছে। আমি ডুব দিয়ে পা ধরতেই ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে যেন। দু'ধারে হেমলক গাছ অথবা বড় বড় গরান গাছের মতো গাছের ছায়া জায়গাটিকে অপার্থিব করে তুলেছে। নৌকোর কোনও শব্দ নেই। এই খাঁড়ি নদীতে যাতায়াতের জন্য অথবা মাল বইবার জন্য কোনও ফেরিবোটের শব্দ ভেসে আসছে না। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ নির্জন এই অঞ্চলে সহসা এক আলোর ফোয়ারা গাছ-গাছালি ভেদ করে ওদের উপর এসে পড়তেই ওরা হকচকিয়ে গেল। যেন কোনও সার্চলাইট থেকে ওদের মুখে আলো এসে পড়ছে। ওরা তাড়াতাড়ি ভাটার মুখে ফের স্কিপ ঘুরিয়ে দিতেই মনে হল দূরে কোথাও পিয়ানো বাজছে। কোনও গির্জায় হয়তো এই মধ্যরাত্রে কোনও মৃতদেহের কবর হচ্ছে অথবা কোনও মিশনারি হাসপাতাল থাকতে পারে। সুচারু তাড়াতাড়ি হাত তুলে দিয়ে কী বলতে চাইল। কোনও চ্যাপেলের পুরোহিত সার্ভিস শেষ করে যেন বাইবেল থেকে ধর্মীয় সঙ্গীত পাঠ করছেন।

সুচারু বলল শুধু, আমি এখানে নেমে যাব সামাদ।

তুই পাগল সুচারু।

আমি দেখে আসব।

না, আমি আর একমুহূর্ত দেরি করব না।— বলে সে জোরে ভাঁটার টানের সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দিল।

সামাদ।

সামাদ বলল, সুচারু, তুই আজ হোক কাল হোক পাগল হয়ে যাবি।

ক্রমশ স্কিপ ফের বন্দরের দিকে নেমে যাচ্ছিল। সুচারু কোনও কথা বলল না। শুধু দু'গলুইয়ের মাঝখানে পা রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তারপর দু'হাত উপরের দিকে তুলে, একদা যেসব ধর্মীয় সঙ্গীত লিজা এবং সে গির্জার ভিতর পাশাপাশি উচ্চারণ করত, এই মধ্যরাত্রিতে নিঃসঙ্গ নদীর জলে পাগলের মতো সেইসব ধর্মীয় সঙ্গীত সে গাইতে থাকল।

আট

ভোরে উঠে জাহাজিরা দেখল গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্র থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে দ্রুত। কিনার থেকে নিগ্রো কুলি উঠে আসছে। ওরা রেন-কোট গায়ে উঠে আসছে। ওদের মাথায় টুপি ছিল। ওরা পকেটে হাত রেখে উপরে উঠে দ্রুত কাজ করতে থাকল। ফলকা থেকে সব কাঠ খুলে একপাশে সাজিয়ে রাখল তারা। ডেক-জাহাজিরা ওদের সাহায্য করছে কাজে। বৃষ্টির জন্য এবং ঠান্ডা হাওয়ার জন্য কাজে ডেক-জাহাজিদের নিদারুণ কষ্ট। ওরা মাঝে মাঝে ফোকশালে ঢুকে কাগজে ক্যাপস্টেন তামাক পেঁচিয়ে শরীর এবং হাত গরম করার জন্য সিগারেট টানছে। উইনচ-মেশিনগুলো গড় গড় করে উঠল। ডেরিকের সঙ্গে ক্রেন-মেশিনগুলোও কাজ করছে। সারি সারি ট্রাক, সালফার বোঝাই। ট্রাক খালি হচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে। চারিদিকে ব্যস্ততা। মেজ-মালোম ফলকায় মুখ রেখে কী যেন বলে যাচ্ছেন। সকলে কাজে বের হয়ে পড়েছে। কিনার থেকে কাস্টম অফিসার এসেছিলেন। তিনি জাহাজের সর্বত্র কী দেখে ফের নেমে যাচ্ছেন। ডেক-সারেং ফরোয়ার্ড-পিকে যাবার সময় বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল এবং সুচারু দুই নম্বর ফলকার ভিতরে কাজ করছে তখন।

তখন ইঞ্জিন-রুমে নামার সময় দু'নম্বর ফলকাতে সুমন উঁকি দিল। ফলকার ভিতরে একজন নিগ্রো যুবক এবং সুচারু। ওরা নিবিষ্ট মনে কথা বলছিল। সুমন সুচারুকে উঁকি মেরে বলল, আমরা কোথায় যাব জানিস?

সুচারু চিৎকার করে জবাব দিল, সালফার নিয়ে নিউ-প্লাইমাউথ যাব।

সেটা কোথায় জানিস?

জানবার দরকার নেই।

আমরা পানামা ক্যানেল পার হয়ে মাসখানেক প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে থাকব।

তোকে কে বলল?

হেনরি বলল। এজেন্ট-অফিস থেকে আমাদের ভয়েজের নোটিশ পড়ে গেছে।

সুচারু বলল, নীচে আয় না!

সুমন জবাবে বলল, ভোরে উঠে দেখলাম তুই আর সামাদ নেই। তোদের বাংক খালি।

সামাদ চিৎকার করে বলল, শালা টিন্ডালের কাজ। ভোররাতে আমাদের ডেকে তুলেছে। সারা রাত যদি চোখে একটু ঘুম লাগত।

তোরা গেছিলি কোথায়?

সুচারু তাড়াতাড়ি ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারা করল।

তুই নীচে আয় না! সব খুলে বলছি।

সুমন নীচে নামলে সুচারু নিগ্রো যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, বার্ট উইলিয়াম, অ্যান্ড দি ইয়াং ইন্ডিয়ান সেলর শ্রীসৌমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সুমন বলে ডাকি।

সুচারু একসঙ্গে কথাগুলো বলল।

সুমন বার্টকে লক্ষ করে বলল, তুমি টম কাকার কুটির পড়েছ?

সুমন নিগ্রোদেব সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি খবর রাখে না। বার্টকে কিছু বলবার মতো সুমনের আব কিছু জানা ছিল না। কথোপকথনের জন্য কোনও সূত্র দরকার। সে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর এই একটি মাত্র নিগ্রো সম্পর্কিত ঘটনার কথা মনে করতে পারল।

বার্ট হাসল। বলল, গল্পটা আমাদের জানা আছে।

সুমন প্রশ্ন করল, তুমি পড়োনি?

আমি পড়তে জানি না। আমি বই পড়তে জানি না।

মনে মনে সুমন ভাবল, একেবারে নিরক্ষর। সুমন অন্য কথায় এল, আমরা ডারবান বন্দরে প্রচুর নিগ্রো দেখেছি। ওরা অত্যন্ত সরল। কী যেন নাম?

সুমন সুচারুকে উদ্দেশ কবে প্রশ্নটা কবল এই কী যেন নাম, নামটা ভুলে যাচ্ছি। কী যেন বলছিল .. হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওয়ান ওয়াইফ নো গুড, টু ওয়াইভস গুড, থ্রি ওয়াইভস ভেরি গুড। কী জানি কেন আমাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।

তাই বুঝি।

বার্ট উপরের দিকে তাকাল। সুচারু উপরের দিকে তাকাল। সামাদ বেলচা দিয়ে গন্ধক ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা নাকে-মুখে রুমাল বেঁধে নিয়েছিল বলে মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, বার্ট, আই হ্যাভ ওনলি ওয়ান।

সুমন বলল, খুব সুন্দর দেশ।

সুচারু বলল, সাহেব নদীর উপরের দিকটাতে মনে হয় কোনও বসতি নেই।

না। এখানে এই ছোট্ট শহর শুধু গন্ধক রপ্তানির জন্য গড়ে উঠেছে বলতে পারো। আর কিছু তেল রপ্তানি হচ্ছে হাল আমলে।

সুচারু গত রাতের সেই বনের ভেতর থেকে যে উজ্জ্বল আলো বেরোচ্ছিল তার কথা জানতে চাইল।

বার্ট কাজ করে যাচ্ছে এবং কথা বলে যাচ্ছে। ওর মাথায় কালো টুপি, পরনে নীল রঙের বয়লার স্যুট। গামবুট পরে সে হাঁটছিল। অন্যান্য নিগ্রো কুলিরা উপরে হল্লা করছে। হাতের সংকেতে মাল ওঠা-নামা করছে। বার্ট পকেট থেকে পাশপোর্ট সাইজের একটা ছবি বেব করল, খুব যত্নে সে সংরক্ষণ করছে। সে বলল, মাই ডার্লিং।— বলে ছবিটা সে সকলকে দেখাল এবং ফের বলল, আই হ্যাভ ওনলি ওয়ান।

'তারপর সে হা হা করে হেসে উঠল।

ওরা সকলেই বার্টের সরল এবং অকপট ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল। সামাদ সুচারু উভয়ে ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ল। নিগ্রো রমণী, চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, চোখের নীচে ছোট আব এবং মোটা নাকের নীচে ঠোঁট-উঁচু রমণীর সবল বাহু পরস্পরকে আকর্ষণ করছিল। সুমন এক ফাঁকে ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল, তারপর ছবিটা ফেরত দেবার সময় বলল, নাইস গার্ল।

ভেরি বিউটিফুল।

বার্ট বলল, তিনি লিখতে পড়তে জানেন। আলবামাতে আমাদের একটা আন্দোলন চলছে, তিনি এখন সেখানে আছেন।

তা হলে তুমি এখন একা!

আমি টাকা জমাচ্ছি। ছুটি নিয়ে ওর কাছে শিগগিরই চলে যাব।

বলে সে রা রা করে গান করতে লাগল, অদ্ভুত গান, স্ত্রীর কথা মনে হতেই সে লাফিয়ে লাফিয়ে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করে গান গাইল, ক্লড ম্যাক নামক কবির কবিতা— মৃত্যু যদি আসে আসুক, মরব নাকো খাঁচায় হয়ে বন্দি, বীরের মতো লড়ব মোরা থাকব নাকো খাঁচায় হয়ে বন্দি।

সুমন উপরে ওঠার সময় বলল, ওকে আমাদের ফোকশালে নিয়ে যাবি, টিফিনে গল্প করা যাবে।

সুমন বাংকারে ঢুকে দেখল প্রায় সব কোল-বয় এবং স্টোকাররা কয়লা লেভেলের কাজে লেগে গেছে। সুমনও বেলচা হাতে ভিতরে ঢুকে গেল। এটা ক্রস-বাংকার। গুঁড়ো কয়লা বলে ওদের লেভেল করতে কষ্ট হচ্ছে না। কয়লা অনেক নীচে নেমে গেছে। সামনের কোনও বন্দর থেকে ফের কয়লা নিতে হবে। পকেট বাংকারও প্রায় নিঃশেষ। সুতরাং দীর্ঘ যাত্রার আগে আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের কোনও বন্দরে বাংকার ভরে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে হবে।

সারেং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছেন। মেজ-মিস্ত্রি একবার কাজের তদারক করে গেছেন। দিনটা মেঘলা বলে বাংকারের অন্ধকার অন্য দিনের চেয়ে বেশি। ওরা আনাচে-কানাচে লম্ফ জ্বেলে কয়লা লেভেল করছে। ওরা কাজ করার সময় দেশ-বাড়ির গল্প করছিল। সমুদ্রযাত্রা কবে শেষ হবে আর কবে দেশের দিকে জাহাজের আগিল ফেরানো হবে এইসব অথবা সারাজীবন যেন এভাবেই কাটবে, শুধু জল, শুধু নীল আকাশ, শুধু বন্দরে অপরিচিত মেয়েমানুষের গন্ধ এবং ওরা আর যথার্থই বন্দরে না নেমে থাকতে পারছিল না।

সুতরাং খারাপ দিনের জন্য, ঝড়-বৃষ্টির জন্য জাহাজিদের ফোকশালে অথবা কেবিনে আটকে রাখা যায় না। যে-কোনও ফাঁকে, যে-কোনও অজুহাতে বন্দরের মাটি ছুঁতে পারলে তারা খুশি হয়। কারণ সমুদ্র অতিক্রম করে যে বন্দর, বন্দরের কোলাহল এবং মাটির স্পর্শ ওদের কাছে তীর্থের মতো। শুধু বুড়ো নাবিকেরা ফোকশালে বসে বসে তামাক টানে আর দেশের বর্ষার জন্য, জলের জন্য মাছ শিকারের আশায় জাল বুনতে থাকে। কিনার থেকে ফিরলে যুবক জাহাজিদের সঙ্গে বন্দরের গালগল্প। ওরা বন্দরের অলিগলি মুখস্থ রেখেছে। সব ওরা অনর্গল বলে যাবে। মনেই হয় না তারা নামাজি মানুষ, পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে, কিনারায় নামে না, তবে টমেটোর মতো মেয়েমানুষের রসালো গল্প বলতে ওস্তাদ। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলবে, ওহে যুবক জাহাজিরা, বন্দরে নামলে আমাদের জন্য পাকা টমেটো এনো। অথবা ওরা তাজা মাছের কথা বলবে। বরফ-ঘরের পচা মাংস, মাছ খেতে স্বাদ নেই। দেশের বড় পাবদা মাছের গল্প হবে তখন, কই মাছের গল্প হবে, ওরা নদী খাল বিলের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন ফের গোটা সফর শেষ করে সত্যি-সত্যিই ঘরে ফিরে যাবে।

সুচারু মেসরুমে দেখল ওদের বিশুর গোস্ত, ডাল এবং কফিভাজা ভাণ্ডারি আলাদা করে রেখে দিয়েছে। সুচারু নীচে নেমে গেল। তিনটে গেলাস নিয়ে এল উপরে। মেসরুমের টেবিলে থালা এবং গেলাস জলে ধুল ভাল করে, তারপর আলাদা থালায় ভাত ডাল বেড়ে, পাশে কফিভাজা রেখে সামাদ এবং সুমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

বারোটার ঘণ্টা পড়লে সব ইঞ্জিন এবং ডেক-জাহাজিরা দুপুরে খাবারের জন্য পিছিলে জড়ো হল। সুমন সামাদ হাত ধুয়ে নিল তাড়াতাড়ি, তারপর খেতে বসে বলল, সুচারু, বার্টকে টিফিনে আসতে বললি না?

সামাদ বলল, সে আসছে। ওর টিফিন নিয়ে আসবে ওর মা। সে নীচে টিফিন আনতে গেছে।

কিন্তু সুমন খেতে বসেই দেখল বার্ট জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। সুমন হাতে ইশারা করলে বার্ট ভিতরে ঢুকে গেল। সুচারু সুমন তাড়াতাড়ি খেয়ে সামাদকে বাসন ধুতে বলে বার্টকে সঙ্গে করে নীচে নেমে বলল, আমরা এখানে থাকি। এই আমাদের বাংক, এখানে সামাদ, এখানে সুচারু আর আমি এই বাংকে। উই আর থ্রি মাসকেটিয়ার্স।

সুচারু বলল, উই আর থ্রি 'স' অথবা 'এস' বলতে পারো। সুমন, সুচারু, সামাদ।

করে দেশ থেকে বের হয়েছ?

সুমন কর গুনে বলল, প্রায় আটমাস হতে চলল।

করে ফিরবে?

সুমন উপরের দিকে হাত তুলে ঈশ্বরকে দেখাল, সেটা তিনি জানেন।

বার্ট ওর থলে থেকে বের করলে বড় দুটো আলুসেদ্ধ এবং মোটা রুটি, সেদ্ধ মাংস সেদ্ধ গাজর আর একটু নুন। সে সবগুলো খাবারের উপর নুন ছড়িয়ে দিল। তারপর খাবারগুলো খবরের কাগজের উপরে রেখে গব গব করে বিয়ার ঢেলে দিল কতকটা, সে মাংসের সঙ্গে রুটির সঙ্গে কোকোকোলার মতো মদ গিলতে থাকল।

সে খেতে খেতে বলল, ইউ লাইক?

সুমন বলল, না, এখন খেলে কাজ করতে পারব না।

না খেলে কী করে কাজ করবে?

তুমি খাও সাহেব।— সামাদ বার্টকে বলল।

না না একটু মুখে দাও।

বলে সে জোর করে সুমনের মুখে, সুচারুর মুখে এবং সামাদের মুখে ঢেলে দেবার উপক্রম করল।

সে বলল, উঁহু, ছোট হাঁ করলে চলবে না। বড়, আরও বড়, বেশ ঢক ঢক করে গিলে ফেলো। আমার মা নিজের হাতে তৈরি করেছেন।

বিজ্ঞাপন দেবার মতো হাত নেড়ে নেড়ে বলল, স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

সুমন বলল, বড্ড ঝাঁঝ।

বার্ট বলল এ তো সরকারি মদ নয়। মা অনেক যত্ন করে লুকিয়ে চুরিয়ে করেন। কাল মাকে বলব তোমাদের জন্য আলাদা করে আনতে।

সামাদ বলল, না বাপু, তোমার জিনিস খেলে হজম হবে না। আমার এক্ষুনি বমি হয়ে যাবে।

সুমন বলল, বড় কড়া জিনিস।

বার্ট বলল, এটা নামে বিয়ার। কাজে বিয়ারের ফাদার।

কথা প্রসঙ্গেই বার্টের বাবার কথা জানতে চাইল সুমন।

বার্ট গোৎ করে রুটি গিলে ফেলল, তারপর মুখে ফের ঢক ঢক করে মদ ঢেলে বলল, তিনি বেঁচে নেই। তিনি ১৯২১-এ মারা গেছেন।

সুমন বলল বাট ইউ আর সো ইয়াং।

বার্ট ততক্ষণে সব খাবারটা শেষ করে ফেলেছে। সে বলল, মি পসথমাস চাইল্ড। তিনি ১৯২১-এ ওকলাহোমার টুলসাতে শ্বেতাঙ্গদের হাতে মারা যান। ইট ওয়াজ এ লিঞ্চিং।

তার মানে?

তার মানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা, লাশটাকে গাছে ঝুলিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছাল তুলে নেওয়া হয়েছিল। তখন ভয়ংকর দাঙ্গা।

সুচারু বলল, হরিবল। এসবও হত তোমার দেশে?

হত নয়, এখনও হচ্ছে। এখনও প্রচুর নিগ্রো গুম হয়ে যাচ্ছে।

ভয়ংকর ব্যাপার।— সুচারু বাংকের উপর বসে সিগারেট বের করে বার্টকে একটা দিল।

বার্ট মদ কুলকুচো করার মতো শেষ মদটুকু গিলে ফেলল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, কেবল মায়ের জন্য এখানে পড়ে আছি। তিনি কোথাও যেতে চাইছেন না। মাকে কত বলছি, চলো, আমরা

উত্তরে উঠে যাই, সেখানে বিদ্বেষ এত তীব্র নয়, কিন্তু মা যেতে চান না। তাঁর পূর্বপুরুষ এখানেই প্রথম স্বাধীন বাতাসে নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কিছু বললেই বলবেন, পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কোথায় যাব?

সুচারু প্রশ্ন করল, তুমি বললে যে ওকলাহোমাতে, সেখানে তোমার বাবা কয়লার খনিতে কাজ করতে গেছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

না না, দুঃখের ব্যাপাব বেশিদিন থাকছে না। আজ হোক কাল হোক আমরা ওদের সঙ্গে একসাথে খানা খাবই দেখবে, তোমাকে বলে দিলাম। আমাদের একজন অহিংস আন্দোলন চালাবাব মনস্থ কবেছেন। তিনি তোমাদের গান্ধীব মতবাদে বিশ্বাসী। আমাকে ডার্লিং সব খুলে বলেছে। সে এক মারাত্মক ব্যাপাব।

বার্টের কথাগুলো খুব ছাড়া-ছাড়া ছিল। সে যেন ওর স্ত্রীর কথাগুলো গুছিয়ে বলতে গিয়ে শেষে আর পারছে না।

সে বসে বসে খুব অপ্রতিভ ভঙ্গিতে টোবাকো টানছিল। ওর মুখে সর্বদা বিস্ময়কর হাসি লুকিয়ে থাকে, অথবা মনে হচ্ছিল বার্ট সর্বদাই হাসছে মিষ্টি-মিষ্টি করে। তারপর উঠে পড়ল বাংক থেকে এবং দু'হাত উপবে তুলে পা, হাঁটু এবং শবীর শক্ত করে হাই তুলল একটা আর বেব হবার সময় বলল, ইউ গান্ধী পিপল প্লিজ লিসেন, অবশেষে আমাদেব জয় সুনিশ্চিত। অ্যাট লাস্ট উই মাস্ট উইন।

কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা উত্তেজনা-বশে সে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। সুচারু সামাদ পরস্পর মুখ দেখল। সুমন নিজেব লকারে কী যেন খুঁজছে তখন। এইমাত্র সে লকারেব ভিতর কিছু হারিয়ে ফেলেছে যাব জন্য ওব অপরিসীম দুঃখ। সামাদ পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিক, সুচারু ভারতীয় আর সুমন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। ওবা আর কোনও কথা বলতে পারল না। ওরা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে যে যার কাজে চলে গেল। এই বর্ণসংস্কারের মতো ওরাও যেন দেশভাগ নিয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত।

দিন খারাপ যাচ্ছে বলে কাজ কোথাও থেমে নেই। এক সঙ্গে আটটা উইনচ চলছে। মাঝে মাঝে ক্রেনেও মাল তুলে আনা হচ্ছিল। উপরে সেই একই রকমের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং বাতাস। বোধ হয় ক্যাবেবিয়ান সমুদ্রে এখন ঝড এবং বৃষ্টি দুই-ই হচ্ছে। মেপল গাছের শাখা খুব আন্দোলিত হচ্ছে এবং এই ঝোড়ো হাওয়াব জন্য গুঁড়ো সালফার ডেকময়, আকাশময় আর বাতাসে গুঁড়ো সালফার মাঠেব প্রান্তে উড়ে যাচ্ছিল। সুচারু ডেকেব উপর উঠে দেখল, সব গুঁড়ো সালফার উড়ে উড়ে সাদা পাখির মতো সেই রহস্যময় জগৎটাব দিকে যাচ্ছে। সুতরাং সে নীচে ফলকার ভিতর ঢুকেই বার্টকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বার্ট, নদী ধরে কয়েক মাইল উঠে গেলে একটা গভীর বনেব মতো মনে হয় না?

বার্ট ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, নদীব কোন দিকটার কথা বলছ?

সুচারু গুঁড়ো সালফাব দিযে জাহাজেব খোলে ছোট একটা মানচিত্রের মতো এঁকে ফেলল। বলল, এখানে।

এখানে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীবা একটা শিশুসদন খুলেছে নিগ্রোদের জন্য।

রাতে একটা সার্চ-লাইট দেখলাম।

ওটা ওদের হাসপাতালে ঢুকে যাবাব সদর দরজার ওপর।

বার্ট জায়গাটা সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। বলল, ঘন পপলার গাছ আছে সামনে। সুতরাং বাতে খুব জঙ্গলের মতো মনে হয়।

তারপর কেমন সন্দিগ্ধ গলায় বার্ট বলল, এত সব খবর পেলে কী করে?

সুচারু কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, কিন্তু এখানে এই তীব্র বর্ণবৈষম্যের ভিতর ওরা সাহস পেল।

ওবা স্থানীয় নয়। ওরা উত্তর থেকে এসেছে। এবং শোনা যায় সন্ন্যাসিনীদের কেউ কেউ নিগ্রোদের ভিতর মিশনারি কাজ করার জন্য সমুদ্র অতিক্রম করে এখানে চলে এসেছেন।

ওরা কাজ করতে পারছেন?

ওরা জীবন বিপন্ন করে কাজ চালাচ্ছেন।

সুচারু তাডাতাড়ি পাগলের মতো উপরে উঠে গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা লিজার ছবি বের করে

আনল লকাব থেকে এবং নীচে নেমে ছবিটা ওব হাতে দিয়ে বলল, এক কাজ কববে বার্ট।

খুব সন্তর্পণে এবং কানে কানে বলল, ওখানে তুমি যাবে একবাব?

কেন বলো তো?

ছবিটা দিলাম।— বলে ছবিটাব উপব ঝুঁকে সে কী দেখে বলল, ষোলো বছব আগে তোলা ছবি। তাকে এখনও খুঁজছি।

বার্ট দেখল এক সুন্দব নীল চুলেব বালিকাব ছবি। সে বলল, কে?

সুচাক কোনও উত্তব না দিয়ে শুধু বলল, একদিন যাবে, ছবিব সঙ্গে মুখ মিলিয়ে খুঁজে দেখবে।

অথবা সে থেমে যেন সেই ছ'টি আঙুলেব কথা বলল।

ওব একটা হাতে ছ'টা আঙুল।

বার্ট সুচাকব মুখেব দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তাবপব হাত ধবে বলল আমি যাব।

বলে ছবিটা খুব যত্ন কবে ওব স্ত্রীব সঙ্গে বেখে দিল।

ফলকাব ভিতব থেকে আকাশটা চাবকোনা মনে হচ্ছিল। সুচাক আকাশে যেন কিছু খুঁজছিল। কোনও মুখ, কোনও সন্ন্যাসিনীব মুখ। গড় গড় শব্দ হচ্ছিল উপবে এবং এক সময়ে ওব চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সালফাবেব জন্য হয়তো চোখ-মুখ জ্বালা কবছে। ওব শবীব চুলকোচ্ছে। সে কাজ কবাব ভিতব ফেব প্রতীতেব স্মৃতি স্মবণ কবতে গিয়ে তাব প্রিয়, কোমল কিশোবীব মুখকে কিছুতেই সন্ন্যাসিনীব মুখেব সঙ্গে মেলাতে পাবল না। সুতবাং সে ভাবল বিকেলেব দিকে নিশ্চয় ঝড় থাকবে না, বৃষ্টি থাকবে না, আকাশ পবিষ্কাব থাকবে এবং জলে শান্ত ভাব থাকবে আব সে অনায়াসে এই নদী অতিক্রম কবে কোনও স্কিপে চড়ে সন্ন্যাসিনীদেব বাজত্বেব ভিতব ঢুকে গোপনে গাছ গাছালিব স্বাদ এবং সন্ন্যাসিনীদেব চনাক মুখেব স্বাদ নিতে নিতে হয়তো সে সকল দুঃখ ভুলে যাবে।

নয়

এখন আব গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে না। খুব ঢল নেমেছে। সুতবাং কাজ একেবাবে বন্ধ। সুমন পোর্ট হোল বন্ধ কবে দিল। কাঠেব তক্তা দিয়ে সব ফলকা ঢেকে দেওয়া হযেছে। ত্রিপলে কিল আঁটা হয়েছে। সুতবাং বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি, বৃষ্টিতে কোনও ক্ষতি কবতে পাবছিল না। ডেক জাহাজিবা অথবা তীবেব লোকজন আগিল অথবা পিছিলেব ডেক-ছাদেব নীচে দাঁড়িয়ে নিজেদেব বৃষ্টি থেকে বক্ষা কবছে। দূবে একদল গাধা বৃষ্টিতে ভিজছিল। ওবা মেপল গাছের ছায়ায় জড়ো হয়েছে। পুরুষ গাধাটা অনর্থক চেঁচাচ্ছিল। আব সব মানুষেবা, যুবক-যুবতীবা দবজায় অথবা জানালায় হাত বেখে বৃষ্টিব প্রথম জল ধবাব চেষ্টা কবছে। মাবিয়া নিজেব জানালায় বৃষ্টিব জলে কাচ ভিজতে দেখে সেই এক গল্প মনে কবতে পাবছে, জাদুকবেব পালিত পুত্রেব মুখ সেই গল্পেব ভিতব কেবল ভেসে উঠছে। সে এ সময় নিজেব শোবাব ঘব থেকে বেব হয়ে সোজা সামনেব হলঘব অতিক্রম কবে সরু প্যাসেজেব ভিতব ঢুকে গেল। দীর্ঘ এই প্যাসেজ পেবিয়ে গেলে বান্নাবাড়ি এবং পবে ভাবোদিব ঘব। সে হলঘব পাব হয়ে সিঁড়ি ধবে মায়েব ঘবে ঢোকাব আগে পবিচাবককে ডাকল। এবং পবিচাবকেব অনুমতিব অপেক্ষায় সে বেল টিপল দবজাব।

বড় বাড়ি, পবিচাবকেবা সকলেই বেড-ইন্ডিয়ান। প্রাসাদের মতো জাঁকজমক। দবজাব মুখে সেই বৃদ্ধ পবিচাবকটি বলল, ইউ মাবিয়া। কাম-ইন।

মাবিয়া দবজা ঠেলে ঘবেব ভিতব ঢুকে গেল।

ভাবোদি শুয়ে ছিল, সামনে আয়না, পিছনে আয়না, আভিজাত্যেব সব ছবিটা ঘবেব দামি আসবাবপত্র নিয়ে উজ্জ্বল। মাবিয়া মায়ের পাশে বসল এবং যেন বলাব ইচ্ছা, মা আমি উইচ-ককে যাব, ওজালিও উইচ-ককে আসবে। অথবা যেন বলার ইচ্ছা মাবিয়ার, এই বৃষ্টিব দিনে টার্কির বোস্ট, আহা টার্কির বোস্ট, গ্রিনপিজ, একটু আবকে ভিজিয়ে নরম আপেল, সামনে ওজালিওব সবল অকপট-মুখ

থাকবে, হয়তো ওজালিও ওর সমুদ্রের গল্প করবে, বিশেষ করে এই বৃষ্টির দিনে ঘাস মাটি সব যখন ভিজে যাচ্ছিল, আর একা একা এই দৈত্যের মতো বাড়িটা যখন খুব নিঃসঙ্গ, তখন বন্দরের উইচ-কক থেকে ওজালিও...

মারিয়া ফ্রক টেনে মখমলের মতো ফ্রকেব ভিতর মুখ গুঁজে বসে থাকল, চোখে 'উইচ-ককে ওজালিও' এই ছবি ভাসছিল।

ভারোদি খুব আদরের গলায় বলল, কিছু বলবে মারিয়া?

মারিয়া মায়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, খুব বৃষ্টি মা।

ভারোদি আফসোসেব গলায় বলল হুঁ, খুব বৃষ্টি।

আবলুস কাঠের খাটেব উপর ভারোদির সুন্দর এবং পুষ্ট শরীর বিছানার সঙ্গে মিশে ছিল।

নরম ইটালিয়ান সিল্কের চাদর, মখমলের মতো সর্বত্র জরির কাজ, পাতলা আলখাল্লার মতো গাউনে শরীর ঢাকা। শুধু বুকের ভিতব 'ব' এব মতো ফাঁক। সুপুষ্ট যৌবনকে ধরে রাখাব সব কৌশল যেন ভারোদির আয়ত্তে। পাশে বড আলমারি, কিছু বই এবং পায়ের নীচে বড় জর্জিয়ান রুপোর ফ্রেমেব আয়না। আয়নায় এই ঘরেব প্রায় সব প্রতিফলিত। ভারোদি পায়ের নীচেব আয়নায় প্রথম নিজেকে দেখল, জানালার কাচে জল পড়ার শব্দ শুনল, তারপর মেয়েকে দেখতে দেখতে বলল, সত্যি খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

মারিয়া জানালাব কাছে উঠে গেল একবার, কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসে হাই তুলল। এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। সে পেবাম্বুলেটরেব উপর গোল্ডকোস্টের এক বিচিত্র বর্ণের পাখির সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করল, তারপর সহসা বলার মতো বলে ফেলল, মা, আজ ওজালিও আসবে না? মিস্টাব হেনরি আসবে না?

ওবা তো আসবে বলে গেছে।

কিন্তু এই বৃষ্টিতে।

ভারোদি বলল, তুমি বরং যাও। গাড়ি বেব করতে বলে দিচ্ছি।

মারিয়া বলল, মা, আমি গাড়ি চালিয়ে নেব।

সাবধানে চালাবে।

বিছানার ওপাশ থেকে ফোন তুলে কেরানি-ঘরে ভারোদি নির্দেশ পাঠাল গাড়ি বেব করা হোক. কোন কোন গাড়ি বের করা হবে তাও বলে দিল ভারোদি। সে ফোনে জানাল, মারিয়া এখন বের হবে। কোন পরিচারক সঙ্গে যাবে, তারও একটা নির্দেশ থাকল। এখন আর কোনও কাজ নেই ভারোদিব। সম্পত্তি-বিষয়ক সব কাজ ভারোদি নটা থেকে একটার ভিতর সেরে ফেলেছে। প্রতিদিন এই সময়টুকু নীচের অফিস ঘরে সে বসে। ওর তখন নানাবিধ কাজ, তেলের খনি থেকে লোক আসে, ডাকের সব অফিসিয়াল চিঠি, কোর্টের নানারকমের সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খামারের বিস্তর সমস্যা নিয়ে তখন আলোচনা হয়, বৃদ্ধ ম্যানেজার আছেন সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে, মোটামুটি সব কাজের ভার তাঁরই উপবে। সুতরাং অপরাহ্নে কোনও কাজ থাকে না, অন্যদিন ক্রাইম নভেল পড়াব ইচ্ছা এ সময় সাধাবণত হয়ে থাকে অথবা সব যৌন মামলার বিবরণ, স্বামীর মৃত্যুর পর এ স্বভাবটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ভারোদি খুব অসহিষ্ণু, যৌন ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল, মদ অল্প মাত্রায় স্পর্শ করেন, আর মাঝে মাঝে হইচই প্রিয় মনে হয় অথবা যেন সংসারে একজন বুড়ো মানুষ আছেন, যিনি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সাবারাত কাঁদেন। ভারোদির এই দুঃখজনক পরিস্থিতি ভাল লাগছে না. ওর নাৎসি যুবকরা প্রতি সপ্তাহে রোববার সকালে গির্জার প্রার্থনাশেষে সমবেত হয়, ওরা ওর হাতেব মশালের মতো এবং পার্টির কাজকর্ম কমে যাচ্ছে বলে ভারোদির দুঃখ। আলবামার্তে উঁচু পর্যায়েব বৈঠক বসবাব কথা ছিল। দিন সম্পর্কে মতবিবোধ চলছে। কেউ বলছিল, ইস্টারের ছুটির আগেই সমস্ত কর্মসূচি ঠিক করে ফেলা উচিত। কারণ অনেক নিগ্রোপল্লিতে শোনা যাচ্ছে, এক যুবক অহিংস মতবাদের ঝোলা নিয়ে নাগরিক অধিকাবের আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য ভিতরে ভিতরে সচেষ্ট হচ্ছে। ভারোদির মুখ কুঁচকে উঠছে। মনে মনে আজগুবি সব ভাবনার জন্য সে নিজেকেই ধিক্কাব দিচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল কোটি কোটি কালো লোক এশিয়া আফ্রিকা থেকে দামামা বাজিয়ে অগ্রসর

হচ্ছে ক্রমশ। হাইওয়ে ধরে কালো মানুষের মিছিল যাচ্ছে। সাদা মানুষেরা, মেয়েরা, রমণীরা সেই কালো মানুষের হাত ধরে ভালবাসার কথা বলছে। ঘৃণায় ভারোদির মুখ কুৎসিত হয়ে গেল। সবই দুর্ঘটনার সামিল। ভারোদি বিছানা থেকে উঠে পাফে দামি পাউডার গালে মেখে মুখের ভয়ংকর রেখাগুলো মুছে দিতে চাইল। বারবার মনে হচ্ছে মানচিত্রের মতো বিচিত্র দাগ সৃষ্টি হচ্ছে, ভয়ংকর রেখাগুলোকে সে কিছুতেই মুছে দিতে পারছে না। রেখাগুলো ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। উদার আকাশ আর উইলো ঝোপের ওয়ারবলার পাখিরা এখন বৃষ্টিতে ভিজছে, ভারোদি নিজের জানালা খুলে দিল, বৃষ্টির ছাঁট আসছে, দেওয়ালে মৃত স্বামীর ছবি, দেওয়ালের রং মেজেন্টা, ঝড়-জলে সবই এক হয়ে যাবার মতো, তবু মুখের প্রকট ছবি আয়নার কাচ থেকে মুছে যাচ্ছে না। ভারোদি দু'হাতে মুখ চেপে বিছানার উপর বসে পড়ল।

মারিয়া তখন হালকা পাখির মতো উড়ছিল। বৃষ্টি ক্রমশ ধরে আসছে। পাঁচিলের ওপাশে দীর্ঘ সব উইলো পপলারের শাখা এবং ফাঁকে ফাঁকে আকাশ পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। বাড়ির সামনে কিছু জল জমে আছে, ঝড়ের জন্য কীট-পতঙ্গ, সব মৃত ডাল ইতস্তত ছড়ানো। জলের সঙ্গে শুকনো পাতা, ঘাস এবং পাখির পালক ভেসে যাচ্ছিল। মারিয়ার বেগুনি রঙের ফ্রক গায়ে ছিল, নীচে পাতলা রেশমের মতো হালকা জামা এবং হালকা বাদামি রঙের জরির কাজ-করা ফিতা ঝুলিয়ে, সাদা মোজা পরে সোনালি চুলে প্রজাপতি ক্লিপ, হাতে সরু সোনার ফিতাতে মুক্তোর মতো ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে বাজছে.. মারিয়া দু'বার সেই মনোরম হালকা পোশাকের ভিতর করিডরে ছুটে বেড়াল। তারপর জানালার শার্সি খুলে দেখল, বাগানের ফুলগাছ থেকে অসময়ের সব ফুল ঝরে গেছে। বৃষ্টির জল ঝরছে। সদর দরজা দিয়ে পাঁচিল অতিক্রম করে, সামনের পথ দেখা যাচ্ছে। শহরের সব ছোট ছোট বালকেরা জলের ভিতর পথে পথে হইচই করছিল। মারিয়ার জলে নেমে খালি পায়ে হইচই করতে ইচ্ছা হচ্ছিল অথবা দূরবর্তী আস্তাবলের প্রাচীন বৃক্ষের নীচে ওজালিওর হাত ধরে চলে যাওয়া এবং কোথাও কোনও বিস্তৃত মাঠের সবুজ ঘাসের ভিতর চুপচাপ বসে থাকা মনোরম, কারণ জাদুকরের পালিত পুত্রের বন-উপবনের চাঁপাফুল গাছটির মতো এই বসে থাকা কেন যে শুধু অপেক্ষার কথা বলে।

গাড়িতে বসে মারিয়ার মনে হল রাস্তা ফাঁকা। তেমনি ইতস্তত জল জমে আছে। যারা পারে অথবা রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছিল তারা এখন জুতো ভিজিয়ে জলের ভিতর হাঁটছে। গাড়ির জল পথের দু-পাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে লোকজন নামিয়ে দিয়ে গেল। ওদের পায়ে গামবুট, হাতে গাঁইতি। ওরা সব ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নিমেষে শহরকে শুকনো আতসবাজির মতো করে ফের চলে যাচ্ছে। শহরে ফের রোদ। আকাশ বড় ঝকঝকে। পার্কে ছোট ছোট শিশুরা, বৃদ্ধ সকল এবং যুবক-যুবতীরা ফের উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণে বের হয়েছে। ভোর থেকে যে অসহায় অবস্থা ছিল শহরে, আবহাওয়ার জন্য সব কিছু পীড়াদায়ক, শহরবাসীরা প্রথম বর্ষণকে দুঃখজনক ভেবে দরজা জানালা বন্ধ করে যখন মুখ গোমড়া করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই বৃষ্টির জল, পথঘাট ধুয়ে মুছে শহরকে তাজা করে চলে গেল আর রোদের জন্য মনে হচ্ছিল শহরটা ফুরফুরে হাওয়ায় ঠিক মারিয়ার মতো উড়তে চাইছে এখন।

মারিয়া ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে উইচ-ককে নেমে গেল। সে ক্রেনগুলির নীচ দিয়ে ছোট্ট পুতুলের মতো হাঁটতে থাকল। মাস্তুলে পাখিরা বসে আছে। শেষ ট্রাক গন্ধক নামিয়ে চলে যাচ্ছে। নিগ্রো কুলিরা মোটর সাইকেলে এক-এক করে চলে যাচ্ছিল। এখন ছুটির সময়। এখন ক্রেন-ড্রাইভার সিঁড়ি ধরে নীচে নামছে। মাল তোলা এবং নামানোর কোলাহল ধীরে ধীরে নিঃশেষ এবং গন্ধকের গুঁড়ো আর উড়ছে না। সুতরাং জাহাজের উপর কুয়াশার মতো ভাবটা নেই। ফলকার কাঠ ফেলে ত্রিপলে ঢেকে খিল এঁটে দেওয়া হচ্ছে। ডেক-জাহাজিরা পিছিলে জড়ো হচ্ছিল। ইঞ্জিন-জাহাজিরা এক-এক করে ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসছে। তখন মারিয়া পোর্ট-হোলে উঁকি দিল। নীরস এই জাহাজ-ডেকে জাহাজিরা যখন আড্ডা মেরে যাচ্ছিল, যখন জাহাজিদের ক্লিষ্ট মুখ খুবই করুণ দেখাচ্ছে এবং সর্বত্র নিদারুণ অসহিষ্ণু এক ভাব, তখন মারিয়ার সুন্দর গড়ন, বালিকাসুলভ অবয়ব সকলের ভিতর প্রাণের সঞ্চার করছে। সব জাহাজিদের মারিয়ার উপস্থিতি যেন মহিমময় করছে।

সুমন কয়লা লেভেল করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে চিমনির গুঁড়িতে বসে পড়ল। শরীরে খুব ধকল গেছে। বাংকে কয়লার গুঁড়ো উড়ছিল। সুতরাং মুখ নিগ্রো-পুরুষের মতো কালো দেখাচ্ছে। চোখ কয়লার গুঁড়োর জন্য ভয়ংকর লাল। নীল পোশাক এখন আর চেনা যাচ্ছে না। সব কালো রং—হাত, মুখ এবং পায়ের সাদা রংটুকু পর্যন্ত কয়লার মতো কালো। ওকে চেনা যাচ্ছিল না। যারা বাংকারে কাজ করেছে তাঁদের সকলেরই এক অবস্থা। ওরা সার বেঁধে বোট-ডেকে উঠে দেখল সুমন চুপচাপ বসে হাঁপাচ্ছে। সকলে চলে যাবার পর পিছনে পিছনে সেও নেমে গেল। বোট-ডেক পার হয়ে টুইন-ডেকে নামার সময় সে মারিয়ার গলা পেল। মারিয়া ওকে ডাকছে। সে ভয়ে ভয়ে মুখ ফেরাল না, ধরা পড়ে যেতে পারে অথবা কৃষ্ণকায় এই মানুষগুলো এখন মারিয়ার কাছে যথার্থই ভয়ের কারণ। সে দাঁড়াতে চাইল না। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাবার মতো পা বাড়াতেই মনে হল ফের মারিয়া বলছে, ওজালিও দ্য সুম্যান কোন দিকটায় থাকে?

সুমন তাড়াতাড়ি হেনবির কেবিনের দিকে হাত তুলে সরে পড়ল। মারিয়া খুব বিব্রত বোধ করছে। হেনরির কেবিন বন্ধ। সে এলিওয়ে-পথে কাউকে দেখল না। ওর ভয় করছে, সব কালো মুখ, ঠিক নিগ্রো যুবকদের মতো এবং এক নৃশংস চেহারা সব সময় মারিয়াকে যেন ভীত-সন্ত্রস্ত করতে থাকল। সে তাড়াতাড়ি মেজ মালোমের কেবিনের দিকে যাবার সময় যেন দেখল ইঞ্জিন-রুমের দরজায় কে নুয়ে আছে। ভাল করে দরজায় উঁকি দিতে যেন মনে হল হেনরি কাজ থেকে উঠে আসছে।

ফোকশালে ঢুকে সুমন লকারের নীচ থেকে মগ টেনে বের করল। খুব আলগা করে তোয়ালেটা কাঁধে নিল এবং সাবান তেল নিয়ে উপরে বাথরুমে ঢুকে গেল। খুব তাড়াতাড়ি সে হাতের কাজগুলো সেরে নিচ্ছিল। কাজের জামা-কাপড়গুলো কোনওরকমে কেচে ভাল করে স্নান করল। সে নীচে নেমে অন্য নোংরা পোশাকগুলো লাথি মেরে বাংকের নীচে ঢুকিয়ে দিল। সুমন দ্রুত কাজ সেরে উপরে উঠে ভাণ্ডারিকে বলল, জ্যাঠা, সুচারু সামাদকে বলবে, খেয়ে নিতে। ওরা যেন আমার জন্য বসে না থাকে। ফিরতে দেরি হবে।

তখন সূর্য ক্রমশ বার্চ অথবা মেপলগাছের নীচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তখন মেপল অথবা ওক গাছের অন্য প্রান্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছে বলে গাছের কাণ্ডগুলো দূর থেকে হাতির দাঁতের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গাছের ফাঁকে মেটাল রোড ধরে আপেল-বোঝাই ট্রাকগাড়ি যাচ্ছে। এবং সর্বত্র লাল রঙিন ছবি, কিছু হেরনপাখি উড়ে যাচ্ছে, ওদের ডানা গলা গৃধিনীর মতো। ডেক ধরে যাবার সময় সে সব দেখল। সে নিজের জামা প্যান্ট এবং জুতোর চাকচিক্য ফের ভাল করে দেখে নিল। সামনের এলিওয়ে-পথে ঢুকে গেলেই বাঁদিকে দরজা, দরজা ঠেলে দিলে নিশ্চয়ই মারিয়া ..এখন হয়তো মারিয়া হেনরির সঙ্গে গল্প করছে।

কিন্তু সুমন কেবিনে ঢুকে দেখল, মারিয়া চুপচাপ বসে আছে। হেনরিকে কেবিনের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মারিয়া উঠে আসছে। মারিয়া ওর হাত ধরে অভ্যর্থনা করল এবং ওরা পাশাপাশি বসে পড়ল। হেনরি কেবিনে নেই, সুতরাং সে প্রশ্ন করল, হেনরিকে দেখছি না?

ও আসছে।

কোথায় গেল আবার!

গেছে পাশের কেবিনে।

পাশের কেবিন তিন নম্বর মিস্ত্রির। সুতরাং সুমন বলল, থার্ড অথবা সেকেন্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

না।

করলে পারতে। খুব জলি। খুব চিৎকার করে গান গায়।

তাই বুঝি?

তুমি আলাপ করবে? ডাকব?

থাক।

সুমন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল। একা একজন মেয়ের পাশে বসে থাকার সাহসই যেন তার নেই।

মাবিয়া পোর্ট-হোল দিয়ে নিজেব শহবটা দেখছে। সে মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হচ্ছে শহবেব ট্রাক বাস দেখে।

সুমন বলল, আমি ববং হেনবিকে খুঁজে দেখি।

কেন? সে তো বলে গেল আসছে।

সুমন ফেব বসে বলল, আমাদেব থার্ড এবং সেকেন্ড খুব ভাল লোক।

হেনবি?

খুব ভাল।

তুমি?— মাবিয়া এবাব হেসে ফেলল এবং পাযচাবি কবতে থাকল।

আমি ভাল নই।

এই কথাব ভিতব সুমনকে খুব বিষণ্ণ দেখাল। সে অন্যদিকে মুখ কবে দেওয়ালেব দিকে তাকাল। দেওয়ালে হেনবিব স্ত্রী অথবা মা'ব ছবি ঝুলছে না। সেখানে আজ দুটো কাঠেব ক্রস ঝুলছে, ঠিক ছাদেব নিচে এবং ক্রসটাব সামনে ক্যানাবি পাখি, মাবিয়া ক্যানাবি পাখিব খাঁচাতে মুখ বেখে বলল, আমি তোমাকে একটা কথা বলব ওজালিও?

আমাকে বলবে? কী কথা।

মাবিযা খাঁচা থেকে মুখ না তুলেই বলল, আমি তোমাকে জাদুকবেব পুত্র বলে ডাকব।

সুমন অবাক হযে বলল, যাঃ! আমি জাদুকবেব পুত্র হতে যাব কেন?

মাবিযা লজ্জায এবং অপমানে যেন খাঁচা থেকে কিছুতেই মুখ তুলতে পাবছে না। সে কেমন মন্ত্রপড়াব মতো বলে গেল, তোমাব চোখ এত কালো, চুল এত কালো! ঠিক জাদুকবেব পালিত পুত্রেব মতো মুখ তোমাব। জাদুকবেব পালিত পুত্রেব নাম এমিল। আমি তোমাকে এমিল বলে ডাকব।

কেন, ওজালিও নামটা তো বেশ।

আমাব এমিল নামটা ভাল লাগে। আমি তোমাকে মিস্টাব এমিল বলব।

আমাব কাছে এমিলও যা, ওজালিও তাই। কিছু আসে যায় না মাবিয়া। তুমি যে কোনও নামে ডাকতে পাবো।

মাবিযা এবাব খাঁচাটা ঘুবিযে দিল এবং ঘুবিয়ে দিতেই ক্যানাবিগুলো উড়তে থাকল ভিতবে আব গান গাইতে থাকল। মাবিযাকে এখন আব লজ্জিত অথবা অপমানিত দেখাচ্ছে না। সে সুমনেব পাশে বসে বলল, ভোবে কী বিশ্রী আবহাওযা গেছে।

ভযংকব।

সমুদ্রে বৃষ্টি হলে তোমাদেব খাবাপ লাগে?

খুব। খুব খাবাপ লাগে। তখন আমাদেব কেবল বমি পায়।— বলে মুখে চোখে বমিব ভঙ্গি ফুটিযে তুলল সুমন।

আচ্ছা, মিস্টাব এমিল—

বলে মাবিয়া চোখে-মুখে বযস্ক যুবতীব ছাপ আঁকতে চাইল, আচ্ছা, আমি বলছিলাম তোমবা সমুদ্রে না থাকো, আচ্ছা মিস্টাব এমিল, এই সমুদ্রে তোমবা বড বড তিমিমাছ দ্যাখো, তাই না?

অনেক বড বড তিমিমাছ।

অনেক বড? কত বড হবে! জাহাজটাব মতো বড় হবে?

না, এত বড হবে না। তবে শুনেছি জাহাজটাব মতো বড একটা তিমি সেই দ্বীপটাব ভিতব থাকত।

কোন দ্বীপটাব কথা বলছ?

সেই যে বলেছিলাম, একটা বুড়ো তিমিকে তাডিয়ে দিয়েছিল।

সেই ছেলেটাব কী নাম যেন।

নামটা আমি ভুলে গেছি। এই এমিল-টেমিল কিছু হবে।

আবাব তুমি আমাকে খুব ছোট মনে কবছ মিস্টাব এমিল।

ছোট! কোথায় ছোট ভাবলাম? হ্যালো মিস মাবিয়া, আপনি সেই ছোট এমিলকে ঠিক চেনেন না। সে ভাল মানুষ নয়।

ঠাট্টা করবে না মিস্টার এমিল। তা হলে কথা বলব না। আচ্ছা মিস্টার এমিল, ছেলেটা তিমি মাছটার কাছে গেল কেন?

বলেছিলাম না, ওর বাপ সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যেত। ওর একা-একা ভাল লাগত না। তাই সে পাথরটা সরিয়ে হামাগুড়ি দিত। ঝিলের পাড়ে ঢুকে যেত।

ভিতরে ভিতরে মারিয়া ভয়ংকর কিছু ভাবছে যেন। সে চিবুকে হাত রেখে বলল, অন্য কেউ দেখতে পেত না ঝিলটা?

দেখবে কী করে! চারধারে খাড়া পাহাড়। পাহাড় বেয়ে ওঠে কার সাধ্য!

ছোট ছেলেটা !

সে কেবল জানত, ছোট একটা পাথর আছে, ওটা সরালেই ঢুকে যাবার পথ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যেতে হয়।

ওর মা ছিল না?

না।

আহা! বেচারার খুব কষ্ট।

খু উ উর। মাছটা ওর দুঃখ বুঝত। মাছটা ওকে লেজ নেড়ে নেড়ে আদর করতে চাইত। নানা রকমের খেলা দেখাত। কখনও ডুবে, কখনও সাঁতার কেটে, কখনও মাথার ভিতর দিয়ে জল বের করে দিত। পাহাড়টা খাড়া হয়ে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। জল বের করে দেবার সময় মনে হত পাহাড়টা কাঁপছে। আর ভীষণ আওয়াজ, জাহাজের বাঁশির মতো। ছেলেটা হাততালি দিত।

ছেলেটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

না।

তবে কী করে জানলে? আচ্ছা মিস্টার এমিল ছেলেটা ওর বাবাকে বলত না?

না, বলত না।

আচ্ছা মিস্টার এমিল ও কেন বলত না?

সুমন খুব অসহায় বোধ করল নিজেকে এবার। সেই ছেলেটির কী যেন নাম, নেকদ্বীপের ঘটনা, ওরা সেখানে ফসফেট আনতে যেত নিউজিল্যান্ড বন্দরগুলোর জন্য। সে খুব হালকাভাবে বলল, ছোট এমিল !

না, ওকে তুমি এমিল বলবে না।

ছোট এমিল ।

এমিল বললে আমি রাগ করব মিস্টার এমিল।

ছোট ওজালিও একদিন দেখল তার মা বাবার বন্ধুর সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। সুমন ওকে ছোট ওজালিও নাম দিল।

ওর বাবা!

ওর বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়ে গেছে।

ছোট ওজালিও ডাকল, মা। মা তুমি কোথায় গিয়েছিলে?— সুমন ফের বলল।

মা কী বললেন?

বললেন, বোলো না কিন্তু বাবাকে। বললে কিন্তু আমাকে আর পাবে না। মাকে সে গোপনে দেখে ফেলেছিল। বাবা এলে সে বলে দিল ঘটনাটা। সেদিনই ওর মা হারিয়ে গেল।

মারিয়া একটা ঢোক গিলল।

সুমন বলল, সে ভেবেছিল এই গোপনে দেখা বন্ধুটির কথা বাবাকে কিংবা অন্য কাউকে বলবে না। বললে হয়তো মা'র মতো তার একমাত্র বন্ধুটিও ডুব দেবে। হারিয়ে যাবে।

মারিয়া বড় বড় চোখে সুমনকে দেখল। ফের একটা ঢোক গিলল। সে এবার খুব কাছে এসে বসল সুমনের, তারপর বলল, ওকে আমরা ছোট এমিল বলেই ডাকব।

যত সময় যাচ্ছিল, যত ওরা পরস্পর পরিচিত হচ্ছিল উভয়ে, তত নাবিক সুমনকে মারিয়া ভালমানুষ করে তুলছে। নাবিকের চরিত্রে শুধু ভোজের নেমন্তন্ন অথবা মাটি পেলেই মদ এবং

মেয়েমানুষের ছবি, সুমন এখন যেন মারিয়াকে চুরি করে দেখছিল, ফুলের মতো মেয়ে আর সুমন মারিয়াকে এই মুহূর্তে প্রীতি এবং ভালবাসা দিতে চাইল। সে সহসা বলে ফেলল, মারিয়া, তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং সংকুচিত গলায় কথাটা বলল সুমন।

মারিয়ার ভিতর ধীরে ধীরে ভালবাসার জন্ম হচ্ছিল বোধ হয়। সে ফ্রক টেনে দিল তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, খুব বৃষ্টি হয়েছে। ট্রাউট মাছ ধরতে গেলে হয়।

এই বিকেলে।

হ্যাঁ, খারাপ কী হবে? আমাদের গুড়ুইয়ের সব জানা আছে। গাড়ি করে আমরা আমাদের গ্রীষ্মাবাসের দিকে চলে যাব।

মারিয়া ছোট এক খাঁড়ি-নদীর কথা বলল, ওদের সম্পত্তির ভিতর দিয়ে এই নদী বয়ে যাচ্ছে। বর্ষা হয়ে গেছে, সুতরাং নদী ধরে তীরের ঘোলা জল নামছে আর ছোট মাছ খাবার লোভে সমুদ্র থেকে ট্রাউট মাছ নিশ্চয়ই নদীর ভিতর উঠে আসছে। মারিয়া বড়শি ফেলে মাছ ধরার কৌশলের কথা জানাল।

কিছু স্মৃতির কথা স্মরণ করে বলল সুমন, মাছ ধরার নেশা আমার ভীষণ।

অবিবেচকের মতো দেশের গল্প জুড়ে দিল।— স্পেন দেশটা বাংলাদেশের মতো। এবং মেঘনা পদ্মার জলে যখন বর্ষার দিনে মাঠ ভেসে যায়, যখন সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয় এবং জমিতে ধান গাছ থাকে, পাট গাছ থাকে, বর্ষার জলে সব সরপুঁটি এবং রাক্ষুসে সব বোয়াল মাছ ডিম পাড়ার জন্য অল্প জলে উঠে আসে, মাঠময় তখন মানুষের মাছ শিকার উৎসব। ট্রাউট মাছ প্রসঙ্গে সে মারিয়াকে এসব কথা বলল।

সুমন ফের একটু হেসে বলল, তোমাদের রাক্ষুসে ট্রাউট মাছ আর আমাদের রাক্ষুসে বোয়াল মাছ একরকমের পেটুক, সাপ ব্যাং যা পাবে তাই খাবে।

মারিয়াকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে এ সময়। সে উঠে দাঁড়াল একবার, পরে সুমনের ডানপাশে বসে বলল, তাই বুঝি?

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে খুব বৃষ্টি হলে জোয়ারের জল মাঠে উঠে আসবে। সব ধানের জমি পাটের জমি। মাছগুলো ডিম পাড়ার জন্য ধান গাছের ভিতর চিত হয়ে পড়ে থাকবে। পুরুষ বোয়ালগুলো পেট থেকে কামড়ে কামড়ে ডিম বের করবে।

ও মা, তাই বুঝি।

তখন আটটা-দশটা বোয়াল একসঙ্গে হুটোপুটি করতে থাকে।

মারিয়া বিস্ময়ে কথা বলতে পারছে না।

আমরা খুব আস্তে আস্তে আস্তে বৃষ্টিতে ধানখেতের ভিতর খুব সন্তর্পণে হাঁটি। হাতে মাছ ধরার জন্য পোলো। দূর থেকে ধানগাছগুলো খুব নড়তে দেখলে কথা নেই। একবার বুঝলে এই বড় এক সাপ পোলোর তলায়। পানস-সাপ। ভীষণ। ফণা তুলে ছোবল দিতে আসছিল।

আচ্ছা মিস্টার এমিল, সাপটা তোমাকে কামড়াল না?

পোলোর ভিতর থেকে বের হতে পারছে না, কামড়াবে কী করে।

ওঃ, পোলোটা কী মিস্টার এমিল?

বাঁশের তৈরি।

বাঁশ।

ভীষণ লম্বা একরকমের ঘাস। পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা হবে। সুমন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হাতের ইশারায় সবটা বোঝাবার চেষ্টা করল।

হেনরি কেবিনে ঢুকে দেখল সুমন দাঁড়িয়ে কী সব ব্যাখ্যা করছে। মারিয়া ঠিক জাপানি পুতুলের মতো বসে ছিল। চিবুকে হাত রেখে, খুব বয়স্ক, মুখের এমন এক ভঙ্গি রেখে অন্যমনস্ক। হেনরির প্রবেশ এবং বিকেল মরে যাচ্ছে এইসব ঘটনা লক্ষ করছিল না।

হেনরি মারিয়াকে হাত নেড়ে বলল, খুব যে অন্যমনস্ক।

মারিয়া উঠে দাঁড়াল। হাতের রুমাল দিয়ে আলতোভাবে মুখ মুছে বলল, এতক্ষণে এলে?

কেন, বেশ তো জমে গিয়েছিলে। তিমি মাছটার গল্প তোমাকে বলেছে। বলেছে খুব মিষ্টি মেয়ে, খুব হাসে, খুব কথা কয়, খুব লাফায়, খুব কোমল।

হেনরি, আমি কিন্তু এবার চিৎকার করব। তুমি আমাকে ঠাট্টা করবে না। আমি এখন খুকি নই।

বলেছে, মারিয়াকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে, সুন্দর এক দ্বীপে যেখানে দারুচিনি গাছ আছে, পলাশগাছ আছে আর শুধু চারিদিকে সমুদ্র। বছরে দুটো-একটা জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়লে পড়তে পারে তেমন দ্বীপে ওজালিও

সুমন বলল, কী ঠাট্টা করছ সব।

হেনরি খুব হেসে উঠল এবার। কারণ সে দেখল উভয়েই কেমন আহত হয়েছে অথবা এসব কথা নাবিকের পক্ষে শোনা ভাল নয়, শুধু দুঃখকর স্মৃতির কাজ করে ওরা। সুমন খুব হালকা গলায় বলল এবার ওঠা যাক।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলল মারিয়া, ট্রাউট মাছ শিকারে যাব ভাবছি।

তোমরা যাও। আমার যেতে শখ নেই। আমি বরং ভারোদির সঙ্গে কোনও 'বলে' যাব।

মারিয়া এবার উঠে দাঁড়াল। সে, ওজালিও এবং হেনরি জেটিতে নেমে গেল। ওরা কখনও মাছ সমুদ্র এবং দ্বীপের গল্প করছিল। হেনরি জেটি অতিক্রম করে একটা প্রাচীন হেমলক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাল, তারপর সেই দুর্গের মতো বাড়িতে ঢুকে দেখল পরিবারের বৃদ্ধ পার্লারে বসে ঢক ঢক করে মদ গিলছেন।

ওরা বৃদ্ধের ছোট পার্লার অতিক্রম করে সামনের বড় বৈঠকখানায় ঢুকল। মারিয়া দৌড়ে ভিতরে চলে গেল মাকে খবর দিতে। সুমন পায়চারি করে বড় বড় সব ছবির নীচে সন, তারিখ পড়ছিল। ভারোদি সেজেগুজে আসছে। ভারোদির জন্য হেনরি অপেক্ষা করছে। ঘড়িতে টিক টিক করে সময় বাজছে। সুমন কোনও উৎসাহ প্রকাশ করছে না। কারণ এখনও কোমর ধরে পা ফেলা দেখলে সে কৌতুক বোধ করে। ওর হাসি পায়। গোটা ব্যাপারটাই কেমন কৃত্রিম মনে হয়। বরং মারিয়ার সঙ্গে ট্রাউট মাছ শিকারে গেলে দারুণ জমত। সুতরাং সুমন দরজার সামনে এসে গোপনে উঁকি দিতেই দেখল মারিয়া ফের আলোর ভিতর থেকে নেমে আসছে। কাছে এলে মারিয়াকে বলল, মাছ শিকারের কী হল?

হাতে ইশারা করে কী দেখাল মারিয়া। সুমন দেখল ভিতরের সিঁড়ি ধরে ভারোদি নেমে আসছে। ওর হাতে দামি ব্যাগ এবং খুব নরম পাতলা গাউন পরেছে। পায়ের সবটাই হালকা মোজায় ঢাকা। এবং এত বেশি রং মেখেছে আর এত বেশি তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে যে সুমন কিছুতেই ভারোদির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

বেরোবার সময় ভারোদি সুমনকে দেখে প্রশ্ন করল, কী ওজালিও? যাবে নাকি?

আমার ভাল লাগে না। বরং আপনারা যান।

সুমন মনমরা মানুষের মতো কথাটা বলে হেনরির দিকে তাকাল। তারপর কাছে গিয়ে বলল, হেনরি আমি বরং জাহাজে চলি। আস্তে আস্তে বলল, একা একা শহরে ঘুরতে ভয় লাগে।

কেন, মারিয়া তো থাকছে।

সুমন বলল, মারিয়া নাচবে না?

বয়স হলে নাচবে।— ভারোদি এগোতে থাকল।

হেনরি চোখ টিপল পিছন থেকে। এবং ভারোদি যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে ঠিক তখন হেনরি ওর পিছনে চিমটি কেটে দিল। বলল, হতভাগা।

অত্যন্ত ফিস ফিস গলায় বলল, তুমি ওজালিও ভুলে যাবে না তোমার দেশটা এখন ভারতবর্ষ নয়, সেটা স্পেন।

তাছাড়া হাতে সময় কম বলে এবং এত কম সময় নিয়ে ট্রাউট মাছ শিকারে যাওয়া যায় না। বরং রোববার দেখে, এখনও গ্রীষ্মের গরম, এখন রোজই বৃষ্টি হবে এবং রোববারে ওদের সেই কান্ট্রি ভিলাতে লাল রঙের বাড়িতে চলে যাবে তারা, আর মিস্টার উড আছেন সেখানে, মিসেস উড আছেন, খুব ভাল মানুষ, স্থানীয় সম্পত্তির তদারকে আছেন। ছোট নদী, মিসিসিপির জল নেমে যাচ্ছে

ছোট ছোট খাঁড়ি নদী ধরে, একটু সামনে গেলেই সমুদ্র। এখন গ্রীষ্মের দিন বলে সমুদ্রে ঝড় লেগেই থাকে, বৃষ্টি লেগেই থাকে।— মারিয়া সুমনকে নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় কথাগুলো বলল।

সুমন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পেল। গাড়িটা সদর দরজায় যেতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল।

মারিয়া আগে আগে যাচ্ছে। পিছনে সুমন এবং ওরা একে একে ভিতরে ঢুকে গেল। সে জানলার পাশে বসলে দেখতে পেল গাড়িটাকে কেউ অনুসরণ করছে। লোকটাকে দেখে তার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। সে বলল, আমি জাহাজে ফিরে যাব মারিয়া।

মারিয়া দেখল জানলার ওপাশটাতে গুডুই, যে মাছের অলিগলি সব চেনে। গুডুই জানালা থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে সুমনকে দেখছে।

মারিয়া হেসে উঠল, আমাদের গুডুই। খুব ভাল লোক, বিনয়ী। আচ্ছা মিস্টার এমিল, তোমার এত বড় বাড়ি ভাল লাগে?

খুব ভাল লাগে।

ছাই। আমার লাগে না। একা একা— এই গুডুই আছে বলে আমার খারাপ লাগে না। গুডুই না থাকলে কী যে খারাপ লাগে।

গুডুইকে তো কাল দেখিনি।

দেখবে কী করে, এতদিন সে আমাদের কান্ট্রি ভিলাতে ছিল। ও কাল রাতে এসেছে। হোস্টেলে যখন থাকি গুডুই আমাকে কতরকমের চিঠি দেবে। আচ্ছা মিস্টার এমিল তুমি যখন সমুদ্রে থাকবে, আমাকে চিঠি দেবে না?

একশো বার দেব। রোজ একটা করে দেব।

দেবে না ছাই।

গাড়িতে কিছুক্ষণ শহরের এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ফিরে এলে সুমন দেখল, গুডুই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে অসুবিধা হল না এই রেড ইন্ডিয়ান প্রৌঢ়টি বিশ্বস্ত ভৃত্য মারিয়ার। সুতরাং ওর ভয় আংশিক কমে গেল। মারিয়া গুডুইকে বলল, ওর নাম ওজালিও দা সুম্যান। আমি ওকে সূর্যকরের পুত্র বলে ডাকি। দেখেছিস চোখ চুল কত কালো, দেখেছিস গায়ের রং।

সুমন বলল, গল্পের এমিলকে কিছুতেই ভুলতে পারছ না?

মারিয়া বলল, না।

তারপর সহসা ছুটে কোথায় যে মারিয়া পালিয়ে গেল। সুমন চারিদিকে লক্ষ করল। কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করল, এই ঘর মারিয়ার ব্যবহারের জন্য। ঘরটি কোনও জাপানি পুতুলের জন্য যেন সংরক্ষিত। পাথরের কালো দেয়াল, দেয়ালে সব উজ্জ্বল বাতি, উপরে ঝাড়লণ্ঠন এবং ছোট পালঙ্ক, বড় টেবিল সামনে এবং আলমারির ভিতর, টেবিলের উপর ওর শিশু বয়সের নানারকম খেলনা, কাঠের ঘোড়া, ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি পাখি, ছোট ছোট পাথরের তৈজসপত্র। একটা বড় পেরাম্বুলেটর। যেন একটা বয়স মারিয়ার, যা এইসব শিশুসুলভ ইচ্ছার মায়া নানারকম প্রলোভন তাকে ঘিরে রেখেছে। মারিয়ার সব ছেড়ে ছুড়ে এখন বড় পুতুলের জন্য অথবা জীবন্ত পুতুলের জন্য ভিতরে ভিতরে বুঝি হাহাকার, মারিয়ার এই ঘর তারই যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুমন ভিতরে এখন একা এবং সে খুব বিব্রত বোধ করতে থাকল। এমনকী পাশের জানলাতে সে গুডুইকে পর্যন্ত দেখতে পেল না। তাকে মারিয়া এই ঘরে একা ফেলে কোথায় সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমন ভয়ে ভয়ে ডাকল, মারিয়া।

কোনও উত্তর আসছে না। পাথরের দেয়ালে মারিয়ার নানা বয়সের ছবি। কোথাও মারিয়া জলপ্রপাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অথবা বড় ক্যাকটাসের নীচে ওর চঞ্চল চোখ ঘাসের পোকা খোঁজার মতো। সুমন ওর পালঙ্ক অতিক্রম করে ছোট প্যাসেজ ধরে হাঁটতে থাকল। দেয়াল ধরে বিচিত্র সব গলি এর শেষ কোথায় সে বুঝতে পারছে না। সে যেন বাড়িটার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছে। এত বড় বাড়ির ভিতর সে কিছুতেই এমন কোনও নির্দশন পেল না যা তাকে গাড়ি-বারান্দায় অথবা কৃত্রিম পাহাড়ের নীচে নিয়ে যেতে পারে। সে ফের ডাকল, মা-রি-য়া।

সুমন মারিয়ার এই দুষ্ট বুদ্ধির জন্য রাগে দুঃখে চিৎকার করে ডাকল, মা-রি-য়া।

সে ক্রমশ হেঁটে গাড়ি-বারান্দার উদ্দেশে যতবার যেতে চাইছে ততবার সে যেন একই বৃত্তে ঘুরছে অথবা ততবার একই পাথরের দেয়াল, জানলা, বড় বড় দরজার উপর ওর ছায়া পড়ছে আর নিজেকে কোনও এক রহস্যময় বাড়ির ভিতব গুপ্তধন-সন্ধানকারীর মতো মনে হচ্ছে, কারণ কোনও পরিচারিকার কণ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে না, বৃদ্ধের কাশির শব্দ আসছে না, বার বার দেয়ালের নীচে নেমে সেই এক জলাশয় দেখল, যা কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না।

সুমন সেই জলাশয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকল। আর তখন অন্য পাড়ে মারিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সে বলল, চলে এসো।

সুমন বলল, জলে সব ভিজে যাবে।

মারিয়া বলল, একটু নেমে দ্যাখো।

জলে নামতেই মনে হল জল অল্প। এবং নীচে শান বাঁধানো। সে হেঁটে হেঁটে অন্য পাড়ে উঠে গেল। সামনে ভারোদির সেই পাখির জগৎ, সব নানা রঙের কৃত্রিম ফোয়ারা, পৃথিবীর সব বিচিত্র পাখি এবং সেখানেই মারিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মারিয়া ঘাসের ভিতর, ঝোপের ভিতর সমুদ্রের মানুষটিকে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে চেয়েছিল।

ভিতরে না ঢুকলে এত বড় প্রাসাদেব এত অলিগলি, কোথায় কোনটা গেছে বোঝা কঠিন। সুমন বিরক্ত এবং আহত গলায় বলল, মারিয়া, আমাকে জাহাজে রেখে এসো। মারিয়ার প্রচণ্ড আকর্ষণ এই সময়ে সুমনকে এতটুকু বিষণ্ণ করতে পারছে না। মারিয়া সুমনের কথা শুনতে পেল না, সে ফের উইলো ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমন একটা বড় পপলার গাছেব নীচে। ওর ছায়া আলোর জন্য খুব বড় দেখাচ্ছে। 'এখন ফুল ফোটাবার সময়' কে যেন পাঁচিলের ওপাশে এই কথা হেঁকে হেঁকে চলে যাচ্ছে। সুমন নিজের জায়গা ছেড়ে এতটুকু নড়ল না। সে সেই রেড ইন্ডিয়ান নফরটিকে পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। নফরটি পর্যন্ত ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। শুধু এই কৃত্রিম অরণ্যের ভিতর কোথাও মারিয়া লুকিয়ে আছে, কিছু খাঁচায় রাখা নানা দেশের বিচিত্র বর্ণের পাখি, কোথাও কৃত্রিম হ্রদের ভিতর অল্প জল আর ছোট ছোট ঝোপ, গিনি মুরগিদের বাসস্থানেব জন্য। সুমন আলো এবং অন্ধকারের ভিতর তার সোনার আপেলটিকে খুঁজে বেড়াতে থাকল।

ঝোপ-জঙ্গলেব ভিতর ছোট ছোট আলোব ডুম জ্বলছে। অমসৃণ সংকীর্ণ পথ। সুমন সন্তর্পণে সামনের দিকে হেঁটে গেল এবার। সামনে ছোট ছোট পাথরের ঘর, যেখানে মোবগ-মুবগির মতো নিগ্রো রমণীরা বসবাস করত ডিম ফোটাবার জন্য। এখন এইসব ঘরের কোথাও হয়তো মাবিয়া মুবগি সেজে বসে রয়েছে। সুমন হেঁটে যাবাব সময় সব লক্ষ কবে গেল এবং ফিস ফিস কবে ডাকল, মারি...য়া, মারি . য়া, এসব কী হচ্ছে! মারিয়া, আমাকে জাহাজে নিযে চলো, আমি এখানে আর আসব না। মারি...য়া, মারি.. য়া — সে আক্রোশে এবার ফেটে পড়ল।

আর তখনই মারিয়াব সাদা মখমলের মতো ফ্রক ঝোপের ভিতব থেকে ফুলের মতো ভেসে উঠল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে সুমনেব সংলগ্ন হয়ে বলল, তুমি এক্ষুনি জাহাজে ফিরে যাবে মিস্টার এমিল।

সুমন দেখল মারিয়ার চোখ অভিমানে ভারী দেখাচ্ছে। তবু সুমন কেমন দুঃখী মানুষের মতো বলতে চাইল যেন, মারিয়া, মাঠের কোথাও না কোথাও ডেইজি ফুলেরা নিঃশব্দে ফুটে থাকে, আবার মাঠের কোথাও না কোথাও রেটল সাপেব ইগল পাখি ধরে খাবার জন্য মরা মানুষের মতো অভিনয়ের স্পৃহা. আমি এই দুর্গের মতো বাড়িতে একা এক নিঃসঙ্গ ভয়ে সর্বদা আতঙ্কে আছি। আমি শুধু এক আকর্ষণে এখানে চলে আসি. . মারিয়া, তুমি ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে ভয় দেখাবে না, আমি খুব দুঃখী মানুষ, নাবিক, মাতৃহীন উদ্বাস্তু যুবক অথবা বলতে পারো বর্ষার দিনে ক্যাকটাসের বিরল হলুদ রঙের ফুলেব মতো, সহসা সব কিছু পৃথিবীর চুরি করে দেখার ইচ্ছা। সুমন নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে মারিয়াকে শরীরের ঈষৎ সংলগ্ন করে নিতেই মারিয়া জুতোর টোতে ভর করে জাদুকরের পালিত পুত্রের ঠোঁটে ঈষৎ হাসির মতো ঠোঁট ছোঁয়াল।

জলের স্পর্শের মতো সুমন মারিয়ার ত্বক স্পর্শ করল।

মাবিয়া সুমনেব হাত ধবে এখন হাঁটছে। সে বলল, আচ্ছা, মিস্টাব এমিল, আমাদেব ছোট এমিল এত ভিতু ছিল না তো।

ছোট এমিল।

হ্যাঁ। তাব একটা ছোট্ট বেডাল ছিল। সে একদিন জাদুকবেব জন্য বাজাব কবতে গিয়ে দেখল, মাঠে মাঠে সব মানুষেবা কাঁদছে। সে দেখল, গাছেব সব পাতা ঝবে যাচ্ছে। গাছগুলো সব মবে যাচ্ছিল।

ওঃ।— বলে সুমন ফেব অন্যমনস্ক হতে চাইল। মাবিযাব গল্পেব জন্য সে কোনও উৎসাহ দেখাল না। কাবণ সে দেখল, বেড-ইন্ডিয়ান প্রৌঢটি আডালে সব সময় ওদেব লক্ষ বাখছে। সুতবাং সে মাবিয়াকে এক সময় বিবক্ত গলায় বলল, গুডুই দেখছে আমাদেব।

দেখুক।

গুডুই তোমাব লোক ভাল নয়।

খুব ভাল। সে, জানো মিস্টাব এমিল, সে আমাকে বড কবে তুলেছে।

ওঃ।— সুমন বলল, তবে চলি।

মাবিয়া হাত টেনে বলল, বোসো মিস্টাব এমিল। আমি তোমাকে জাহাজে নিযে যাব। মাবিযা কৃত্রিম ধমকেব সুবে কথাটা বলল। সুমন চুপচাপ হাঁটছিল। সুতবাং ফেব মাবিযা বলল কাল তোমবা এখানে খাবে।

আমাব খেতে ইচ্ছে নেই।

কিন্তু মা যে হেনবিব সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক কবে ফেলেছেন।

বেশ কবেছেন।— সুমন কিঞ্চিৎ বিবক্ত গলায় কথাটা বলে হাঁটতে থাকল।

মাবিযাও পিছু পিছু সুমনকে অনুসবণ কবছে। এত বড় বাডি এবং এই কৃত্রিম ঝোপ জঙ্গল অথবা বিচিত্র সব দেশেব পাখ-পাখালিব ভিতব দিয়ে সুমন হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও এই বাতেব আলোয় কোনও হবনপাখি শুধু ঝিমুচ্ছে, কোনও উড-পেকাব কাঠেব ভিতব ঠোঁট গুঁজে বসে আছে, আব সুমন এবং মাবিযা ক্রমশ সদব দবজাব দিকে পাঁচিলেব পাশ দিয়ে হাঁটছিল। আগামী কাল কোথাও ট্রাউট মাছ ধবতে গেলে বেশ হত। এইসব অঞ্চলেব কোথাও পাহাড আছে, জলপ্রপাত আছে অথবা প্রকাণ্ড মাঠেব ভিতব গোলাবাডি এবং কোনও প্রৌঢ ব্যক্তি সেইসব বক্ষণাবেক্ষণ কবছেন। সুমন কেমন ছেলেমানুষেব মতো বলে ফেলল, ট্রাউটমাছ তবে ধবতে আব যাওয়া হবে না।

বোববাব। বোববাবে যাব।

আব যাওযা হবে না।

সত্যি যাব বলছি। মা না গেলে তুমি আমি চলে যাব। গুডুই সঙ্গে থাকবে।

গুডুই ভাল নয মাবিযা।

গুডুই সোনাব মানুষ, সে আমাব ভালব জন্য প্রাণ দিতে পাবে।

সুমন আব কথা বাডাল না। সে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলাব সময দেখল, সব ফাঁকা, সবই গুলিয়ে যাচ্ছে। সে সুতবাং চুপচাপ হেঁটে গাডি-বাবান্দাব নীচে এসে দাঁডাল। সে ইচ্ছা কবলেও একা জাহাজে যেতে পাবত না, শহবেব আঁকাবাঁকা পথ তাব কাছে এখনও অপবিচিত। সুতবাং সে মাবিয়াব হাতে নিজেকে সঁপে দেবাব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

সুমন গাডিতে বসে ভাবল, না, আব না, কাল কোনও অসুস্থতাব অজুহাতে সংগোপনে বাতেব অন্ধকাবে ইদ্রিশেব ফোকশালে ঢুকে যাবে। এভাবে অদায়িত্বশীল যুবকেব মতো অথবা ফেবেববাজ পুরুষেব মতো বেঁচে থাকা অর্থহীন। সুমন জানলা দিয়ে শহবে কাচেব ঘব দোকানেব শো-রুম এবং কোথাও কার্নিভেলেব বিচিত্র সাজ-পোশাক পবা স্ত্রী-পুরুষেব দল দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পডছিল, আব সহসা মনে হল সে একজন ফুলওয়ালা, বসন্তে সে ফুল ফেবি কবতে বেব হয়েছে। ওব মনে হল যেন এটা হেমন্তকাল, মনে হল কোথাও না কোথাও স্থলপদ্ম ফুটে আছে, শুধু সংগ্রহেব যা দেবি।

গুডুই গাড়ি চালাচ্ছে, ওব পায়েব পেশি ভয়ংকব শক্ত। সে বড় বেশি দ্রুত গাডি চালাচ্ছে। মাবিয়া এক প্রান্তে গাডিব জানলাতে মুখ বেখেছিল। বাতাসে ওর চুল সামান্য উড়ছে। মুখে সামান্য ক্লান্তিব

চিহ্ন এবং চোখ দেখলে মনে হবে দূরবর্তী কোনও প্রপাতের ছায়া চোখে আর কোথাও এক মেষ-শাবক সন্তর্পণে জলপান করছে।

বন্দরে মারিয়া বলল, কাল একটু সকাল-সকাল আসব।

এতটুকু প্রতীক্ষা না করে সুমন সোজা হাঁটতে থাকল। গাড়ির দরজাতে মারিয়া হেলান দিয়ে শৈশবের স্মৃতির পাখিটিকে যেন হেঁটে যেতে দিচ্ছে। পাখিটির অন্তরে রাজ্যের দুঃখ।

সুমন গ্যাংওয়ের সিঁড়ি ধরে জাহাজে উঠে যাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে খুব ক্লান্ত পায়ে উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ি অতিক্রম করে একবার পিছনে তাকাল। জেটির অন্য পাশে মারিয়া এখনও অপেক্ষা করছে। ওর ভিতর থেকে এ সময় কিছু কাতর উক্তি উঠে আসছিল। সে সুতরাং মাথা নিচু করে হাঁটছে। ওর মনে হচ্ছিল সে নিজের কাছে খুবই ছোট হয়ে যাচ্ছে। কোনও বন্দরে সম্ভ্রান্ত রমণী ওর জন্য অপেক্ষা করেনি। সে সাধারণ নাবিক, সে মায়ের মৃত্যুর পর কিছু অশ্লীলতার জন্য বন্দরে-বন্দরে সাধারণ গণিকালয়গুলোতে অন্য অনেক নাবিকের সঙ্গে হানা দিয়েছে। কোনও সততার অভিনয় ছিল না, আদর্শের অভিনয় ছিল না, শিস দিয়ে শুধু কখনও কখনও ইতর পুরুষের মতো চলে গেছে বন্দরের সব ঘিঞ্জি গলিতে, সারাদিনের ক্লান্তি, দীর্ঘ সমুদ্রসফরের বেদনাবহ স্মৃতি নিমেষে উবে গেছে, কিন্তু মারিয়া ফুলের মতো, মারিয়ার আকর্ষণ হেমন্তের স্থলপদ্মের মতো কেবল কাছে টানছে। যত কাছে টানছে তত সুমনের উৎসাহ কমে যাচ্ছে, তত এক বিষণ্ণ করুণ স্বরে সর্বত্র কারা হেঁকে যাচ্ছে। সে কিছুতেই সহজভাবে মারিয়াকে আলোকিত করতে পারছে না। ভারোদির কঠিন মুখ এবং কঠিন উক্তি নিগ্রো সম্পর্কে অথবা দেওয়ালের সব বীভৎস ছবি ওকে পিছন থেকে কেবল তাড়া করে ফিরছে। সহজ সরল মারিয়ার সঙ্গে অকারণ মিথ্যা ছলনায় জড়িয়ে পড়ে সে এখন হাঁসফাঁস করছে। সে আর হাঁটতে পারল না। সে ডেকের উপর ক্রমশ যেন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। ডেক-এ কারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তীরে সারি সারি পপলার গাছে জোনাকি জ্বলছে, শহরের আলো চোখের উপর শুধু পাক খাচ্ছে এবং নিজে এক হতবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক, সে আকাশের দিকে নিজের দুটো হাত প্রসারিত করে দিল এবং আবেগে বলে উঠল, মা, আমার মাগো! শৈশবের কিছু স্মৃতি, দাঙ্গা এবং মৃত এক পুরুষের ছবি অথবা সেই মুসলমান যুবক, মায়ের লাঞ্ছিত মুখ...আর কী যেন...কী যেন, সে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার ভিতর হাতড়াতে থাকল।

মা মাগো!- সে ফের বলল। মায়ের কাছে বিদায়ের সময়টুকু বড় করুণ। মা দুঃখ করছিলেন, সুমন, আমি একা একা কী করে থাকব? মায়ের সেই করুণ স্মৃতি, মায়ের সহসা মৃত্যু সুমনকে বড় বেশি আবেগধর্মী করে তুলেছে। কোথাও কোনও আকর্ষণ নেই, বন্দরে-বন্দরে রাত যাপনের সময় প্রায়ই ওর এ কথা মনে হত। শুধু মারিয়া নতুন করে অন্য এক ভালবাসার জগৎ ধীরে ধীরে তৈরি করে তুলছে। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয়টুকু সুমনকে বড় বেশি কাতর করছে। মারিয়ার কাছে সহজভাবে বেঁচে থাকার জন্য সে আকুল হতে গিয়ে দেখল আকাশের সব নক্ষত্রেরা সারি সারি পপলারের পিছনে কোনও দুর্গের অভ্যন্তরে উইলো ঝোপের ভিতর একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং দূরে সে সহসা একটা হাহাকারের দৃশ্য দেখতে পেল।

দশ

বোধ হয় এ রজনী দুঃখের রজনী। কারণ সুমন ফোকশালে ঢুকে দেখল সুচারু সামাদ বাংকে শুয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে ওরা ঘুমে আচ্ছন্ন। পোর্ট-হোল খোলা। তিনটে টিপয়ে ভাতের থালা, ছোট ডেকচিতে ভেড়ার মাংস। বাঁধাকপি ভাজা এবং মসুরির ডাল। কিছু মিষ্টি জলের মাছভাজা সে ভাতের উপর দেখতে পেল। সে প্রথমে পোশাক ছেড়ে লকারে ঝুলিয়ে রাখল। কোনও শব্দ না হয় সেজন্য সে সন্তর্পণে বাংকের নীচ থেকে মগ বের করে উপরে উঠে যাবার সময় দেখল, সারেঙের ঘর খোলা। সারেং অন্যদিন এ সময় নিজের দরজা বন্ধ করে দেন এবং অন্যান্য ফোকশালে ইতস্তত আলাপ শোনা গেলেও দরজা বন্ধ থাকে। এই একমাত্র বন্দর যেখানে ভারতীয় নাবিকদের ভিতর ক্ষোভের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

সে উপরে উঠে গেল। স্টার্বোর্ড-সাইডের বেঞ্চিতে বসে বড়-টিন্ডালের কিছু বিপজ্জনক উক্তি শুনতেই বুঝল, এই পিছিলে কিছুক্ষণ আগে যমুনাবাজুর সারেং সুচারু এবং সামাদকে নিয়ে প্রচণ্ড গালমাল বাঁধিয়েছিল। ফলে ওরা অভুক্ত এখনও। এবং ওরা যে দু'জনের একজনও ঘুমোয়নি, ঘুমোতে পারে না, সে বাথরুমে স্নান করার সময় তা ধরতে পারল। সুতরাং সুমন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নীচে নেমে এসে তোয়ালে তারে ঝুলিয়ে দেবার সময় ডাকল এই সুচারু।

সুচারু উত্তর করল না।

সুমন পাশের বাংকে উঁকি দিয়ে ডাকল, এই সামাদ, সামাদ।

সামাদ উঠল। ভয়ংকর বিরক্ত দেখাচ্ছে মুখ। সে বলল, কী ব্যাড ব্যাড করছিস।

কী হয়েছে রে?

সারেং জেগে রয়েছে। আমাদের নামতে দেবে না জলে। নামলে সে কাপ্তানকে নালিশ করবে।

আচ্ছা লোক তো। তোরা খেলি না?

সামাদ উত্তর দিল না, সামাদ ফের শুয়ে পড়ল।

খাওয়ার উপর রাগ করলে সারেঙের কী হবে?

সামাদ ছেলেমানুষের মতো বলল, তোর ইচ্ছা হয় খেয়ে নে। আমরা খাব না।

সুমন বলল, তোরা না খেলে আমি খাই কী করে।

সুচারু কোনও কথা বলছিল না। সামাদ পাশ ফিরে শুল এবং অশ্লীল উক্তি করতে থাকল বড় টিন্ডাল সম্পর্কে। বলল, গলা টিপে শালাকে একদিন পোর্ট-হোল দিয়ে দরিয়াতে হানিয়া করে দেব। তবে বুঝবে আমার নাম সামাদ আলি।

সুমন এমন উক্তি শুনে দমে গেল। কারণ বড় টিন্ডালের উপর ওর অহেতুক রাগের কারণটা আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি। সে হেসে বলল, খিদে পেয়েছে, আর দেরি করিস না। আয়।

সব তাতেই তোর হাসি। হাসার কথা কী হল? তোর খিদে পেয়েছে, তুই খেয়ে নে। আমরা খাব না। আমরা সারেং ঘুমালে জলে নেমে যাব।

সুমন এবার বলল, সারেং টের পেল কী করে?

সামাদ জবাব দিল, শুয়োরের বাচ্চা বড়-টিন্ডাল বলে দিয়েছে। শালা আমাদের ওকে ওকে ছিল। কাল রাতে জাহাজে উঠে আসবার সময় দেখেছে। সফরে যাবার সময় যখন দেখলাম শালা গাঁয়ের মানুষ বড় টিন্ডাল ইবলিশটা আমার সঙ্গে একই জাহাজে সফর করতে যাচ্ছে, শালা মনটা তখনই ভেঙে গেল। সফরটা ভাল যাবে না, শালা আমি যেখানে যা করছি সব সালিমার বাপকে খতে জানিয়ে দিচ্ছে। ভাল হবে না, ভাল হবে না বড়-টিন্ডাল, তুমিও শেখের বাচ্চা, আমিও শেখের বাচ্চা। — বলে সামাদ কেন যে অনর্থক চেঁচাতে লাগল।

সুমন তাড়াতাড়ি হাত ধরে বলল, এই সামাদ, তুই খেপে গেলি। কী করছিস।

সুচারু তখনও কোনও কথা বলছে না, সে চুপচাপ শুয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে। কারণ তার স্থির প্রত্যয়, সে জলে নেমে যাবেই।

সামাদ তখনও বড়-টিন্ডালকে উদ্দেশ করে চেঁচাচ্ছিল। পাশের ফোকশালে বড় টিন্ডাল, সব শুনতে পাচ্ছে অথচ কিছু বলছে না। সুমনের ব্যাপারটা খারাপ লাগছিল। সে তাড়াতাড়ি সামাদের মুখে হাত রাখতেই সামাদ যথার্থই পাগলের মতো কেঁদে ফেলল, আমার বিবিটা চারমাস হল একটা খত দিচ্ছে না সুমন।

সুমন বলল, তাতে তোর বড়-টিন্ডালের কী দোষ।

সামাদ চুপ করে থাকল। কিছু বলছে না। ওকে খুব নিস্তেজ দেখাচ্ছিল।

অন্য ফোকশালে বড়-টিন্ডালকে ডংকিম্যান বলছিল, টিন্ডাল, আপনেরে কী কৈতাছে শোনেন।

টিন্ডাল বলল, আরে কৈতে দ্যাও। ছাওয়াল-পাওয়ালের লগে আমার ইতরামি সাজে না।

তখন সুমন সামাদকে বলল, খত নিশ্চয়ই আসবে। আমার মনে হয় চিঠির কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে। হয়তো ঠিকানা ভুল করছে।

সামাদ এবারেও কোনও জবাব দিল না। সে চুপ করে থাকল। সালিমা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি এ

সময় ওর ভিতর থেকে উঠে আসছিল। সুমন অথবা সুচারুকে বড়-টিন্ডালের সব ঘটনাটা খুলে বলা দরকার। তিনটে চিঠির একটারও জবাব নেই! এ সময় তার নদীর চরের কথা মনে পড়ল, কৈশোরের সালিমা শীতলক্ষ্যার জল থেকে ঝিনুক তুলে আনত এবং দু'জনে মিলে ঝিনুকের ভিতর মুক্তা খুঁজত। ওর বাবার ঝিনুকের কারবার ছিল। সালিমা নদীর গর্ভস্থল থেকে ডুবে ডুবে কোঁচড় ভরে ঝিনুক সংগ্রহ করত। জলের ভিতর শালিমার সেই মিষ্টি মুখ সামাদ এখন মনে করতে পারছে অথবা সামাদের যেন মনে হল সালিমার সঙ্গে সে শীতলক্ষ্যার জলের নীচে ডুবে ডুবে সাঁতার কাটার সময় সালিমার অস্পষ্ট ছবি... সে একবার কচুরিপানার ভিতর সালিমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। সালিমা বলেছিল, তুই আমারে নষ্ট কইরা দিলি? বলে খিল খিল করে হাসতে হাসতে চরের পথে ছুটেছিল। নল-খাগড়ার বন, তরমুজের জমি পার হলে ওদের সেই ছোট গ্রাম্য খড়ের বাড়ি। ঘরের ভিতর লুকিয়ে বারবার হেসে আকস্মিক এই ঘটনার জন্য সে সামাদকে ভালবেসে ফেলেছিল।

সুমন এবার সুচারুর হাত ধরল।

এই ওঠ। আয় খেয়ে নি। আমার খিদে পেয়েছে। সুমন সামাদের হাত ধরেও অনুরোধ করল।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। অন্যান্য ফোকশালে ডেক অথবা ইঞ্জিন-জাহাজিদের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ডেক-সারেং ইঞ্জিন-সারেংকে কী বুঝিয়ে বলছে সুচারু সম্পর্কে। সারেং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, সে ডেক-সারেঙের কথা কিছুতেই রাখতে পারছে না বলে দুঃখিত। সুতরাং ডেক-সারেং নিজের ফোকশালে উঠে গেল এবং দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

সামাদ সুচারুকে বলল, আমরা না কাল রাতে নেমে যাব সুচারু।

সুচারু জবাব না দিয়ে নিজের স্মৃতিতে ডুবে থাকতে চাইল। বড় অস্পষ্ট এবং মুখের অবয়বে অপূর্ব কমনীয় ভাব, ঠিক যেন পদ্মপাতায় জল এবং জলে আকাশের প্রতিবিম্ব ভাসছে। লিজার কথা মনে এলেই এমন একটা ছবি চোখের উপর ভাসতে থাকে। সুতরাং সুচারু বার্টের বর্ণিত মিশনারি হাসপাতালের উদ্দেশে যাবেই যাবে। সুচারু আর-একবার সেই নিরুদ্দিষ্ট কিশোরীকে খুঁজে বের করবে বলে এবং প্রেম নামক এক বস্তুর জন্য সে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে বকতে সারেঙের ঘরের দিকে উঠে গেল। তারপর দরজায় মৃদু আঘাত করে ডাকল, সারেং সাব।

আবার কেন?

আর-একবার বলতে এলাম।

যারা জেগে ছিল তারাও ধীরে ধীরে এসে ভিড় করল।

ওরা সকলে বলল, যেতে দিন সারেং সাব।

সারেং খেপে গেল। বলল, সব পাগল নিয়ে খেলা দেখছি।

সুচারু খুব বিনীত এবং ভদ্রজনের মতো বলল, আজকের মতো যেতে দিন। রাত ভোর না হতেই ফিরে আসব। কেউ টের পাবে না। আমি আর কোনওদিন যেতে চাইব না।

সারেং কিছু বলল না। সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তিনি কোনও অনুমতি দিলেন না। তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। এবং সুচারু ধীরে ধীরে নেমে এসে বাংকে শুয়ে পড়ল। সে খেল না, সে শক্ত হয়ে বাংকে পড়ে থাকল। তারপর সকলে যখন যথার্থই ঘুমিয়ে পড়েছে এবং কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, সে একা-একা দড়ির সিঁড়ি হারিয়া করে দিল এবং সন্তর্পণে সকলের অজ্ঞাতে নেমে গেল। ওর ভাত এবং ভোজ্যদ্রব্য টিপয়ের উপর পড়ে থাকল। আলো জ্বলতে থাকল ফোকশালে। এমনকী এই মুহূর্তে সামাদ ঘুমোচ্ছে, সুমন ঘুমোচ্ছে। শুধু ফোকশালে আলোটা গভীর রাতেও জ্বলছিল।

কীসের শব্দে সুমনই প্রথম জেগে উঠল। দেখল, আলো জ্বলছে এবং সুচারু ফোকশালে নেই। সামাদ বাংকে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। সে ডাকল, এই সামাদ, সামাদ, দ্যাখ সুচারু জলে নেমে গেছে। সামাদ বাংকের উপর উঠে বসলে বলল, সুচারুর এটা বাড়াবাড়ি। কী অর্থ হয় এসব ছেলেমানুষির! কবে কোন এক লিজা ওকে ছেড়ে চলে গেছে, কবে ওকে অভিমান করে বলেছে, সে কোথাও গিয়ে সন্ন্যাসিনী হবে আর সেই থেকে সে পৃথিবীর সব বন্দর চষে বেড়াচ্ছে।

সামাদ ডাকল, সুমন।

ওর গলার আওয়াজ গম্ভীর শোনাল এবং দেখে মনে হচ্ছে না সামাদ এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বাংকে,

যেন সে এইমাত্র দড়িব সিঁড়িতে সুচারুকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে আব এইমাত্র সে যেন কোনও শোকাবহ দৃশ্য থেকে উঠে এসেছে। সে যেন বলতে চাইল, আমি সুচারুকে তিন সফব থেকে দেখে আসছি। সে যেখানে গেছে, যে বন্দবে গেছে, প্রত্যেক গির্জায় সে অনুসন্ধান কবেছে, প্রত্যেক মানুষেব ভিতব সে তাব লিজাকে অনুসন্ধান কবেছে। সে নিজে লিজাব ফোটো দেখিয়ে সকলকে বলেছে, এই লিজা, পার্টিকলেব বড সাহেবেব মেয়ে. সে বলেছে. কোথাও আমি তাকে খুঁজে পাবই। সে আমাব জন্য কোথাও না কোথাও প্রতীক্ষা কবে থাকবে। আব তখন আমবা ওকে পাগল ভেবেছি। কত বকমেব লোক জাহাজে উঠে আসে, কত বকমেব দুঃখ বুকে বয়ে বেড়ায় এবং জীবনেব আশ্চর্য সব অলৌকিক বিশ্বাস নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত এই জাহাজেব ফোকশালে কাটিয়ে দেয় আব কোনও বন্দবে মৃত্যুব সময় কয়েকজন জাহাজি বন্ধু, কিছু বিদেশি ফুল এবং এক অপবিচিত কববখানা। সামাদ এবাব মুখ তুলে বলল, ববার্ট সুচারু বড গবিব ছিল। লিজা বড সাহেবেব মেয়ে। ওবা দু'জনে একই মিশনাবি বিদ্যালয়ে পডত, একই গির্জায় প্রার্থনা কবেছে কিন্তু বড সাহেব ভযংকব কড়া মেজাজেব লোক। তিনি তাঁব একমাত্র মেয়েকে একজন নেটিভেব হাত থেকে বক্ষাব জন্য দেশে ফিবে গেলেন। লিজাকে সুচারুব কোনও চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যেতে দিলেন না।

ফোকশালে আলো জ্বলছে। পোর্ট-হোল খোলা, ঠান্ডা হাওয়া তবু আসছে না। সামাদকে পিবেব মতো মনে হচ্ছে। সে মাথা ঠান্ডা বেখে খুব ফিসফিস কবে কথা বলছিল, সুচারু তাবপব থেকে কিছু অদ্ভুত বেনামা চিঠি পেত। কখনও লেখা থাকত, ওবা নতুন বসতি স্থাপনেব জন্য অস্ট্রেলিয়ায় নিউ ক্যাসেল অঞ্চলে চলে গেছে, কখনও চিঠিতে লেখা থাকত, ওবা ডোমিসাইল্ড নিয়ে আমেবিকাতে যাচ্ছে অথবা কখনও সাউথ আফ্রিকা। এমনকী সে এক সময ‌চিঠি পেয়েছে লিজা অকল্যান্ডেব কোনও গির্জা থেকে দীক্ষা নিয়ে উধাও। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এবং সেই ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুমন সামাদেব এই মুহূর্তেব চেহাবা যেন চিনতে পাবছে না। বাতেব প্রথম দিকে সামাদ তাব বিবি সম্পর্কে নানা সংশয নিয়ে দুঃখ পাচ্ছিল দেখে মনে হবে না সেই এক সামাদ, যে সর্বদা অশ্লীল সব বমণীব ছবি বালিশেব নীচে লুকিয়ে বাখতে উৎসাহ পায। সে ডাকল, সামাদ, চল ডেক এ। আমাব আজ ঘুম হবে না। আমি সুচারুব জন্য ডেক-এ জেগে থাকব। সে যতক্ষণ না ফিবছে আমবা অন্ধকাবে পাহাবা দেব।

তাবপব সে আবও কাছে গিয়ে বলল, দেখি সাবেং টেব পায কী কবে।

ওবা ফোকশালেব আলো নিভিয়ে দিল। ভিতবে অন্ধকাব, জেটিব মৃদু আলো নেমে আসছে। ওবা দবজা ভেজিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি ধবে উপবে উঠে গেল। গ্যালিব দবজা খুলে সামাদ একটু চা কবে নিল এবং ফলকাব কাঠে বসে ওবা চা খাবাব সময় দেখল চাবিদিকে চাঁদেব আলো। মাস্তুলেব ছায়া ওদেব শবীবে, আব ডেক-এ কোনও আলো জ্বলছে না, বড-মালোমেব কেবিনেব দবজা খোলা মনে হচ্ছে, উনি যেন কোনও বমণীকে এলিওয়ে থেকে তুলে নিচ্ছেন।

বার্চগাছেব অন্ধকাবে জ্যোৎস্নাব শেষ আলোটুকু পডছিল। ওবা মুখোমুখি এখন বসে। ওবা জাহাজি সুচারুব জন্য ডেক-এ পাহাবায় আছে। ওবা সুচারুকে সকলেব অলক্ষে তুলে আনতে চায় জাহাজে।

সুমন একসময বলল, চল দেখি পিছিলে, জলে কোনও শব্দ হচ্ছে কি না দেখা যাক।

টেব পাওয়া যাবে না। সুচারু ডুবে ডুবে সাঁতাব কাটে।

তবু একবাব দেখা যাক।

বলে সুমন উঠে পড়ল। ওবা নীচে নেমে দড়িব সিঁড়িটা প্রথমে ফেলে দিল। তাবপব বেলিং এ ঝুঁকতেই দেখল সুচারু নদীব জলে সাঁতাব কেটে ফিবছে। ওরা দড়িব সিঁড়িটা টেনে ধবল। ওবা হাত নেড়ে ওদেব উপস্থিতিব কথা বলল। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দড়ির সিঁড়িটাকে আবও শক্ত কবে বেঁধে দিল সামাদ। সুচারু ক্রমশ সিঁড়ি ধবে উপবে উঠে আসছে। সুমন উঁকি দিয়ে দেখল, যুবক সুচারু ওকে ধববাব জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

উপবে উঠে সুচারু কথা বলতে পাবল না।

সুমন বলল, কোনও খবব?

সুচারু সামাদের কাঁধে হাত রেখে বলল, না।

আর কিছু বলতে পারছিল না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সে হাঁপাচ্ছে।

সুচারু ফের বলল, একটু জল খাব।

সুমন তাড়াতাড়ি জল এনে দিলে সুচারু জল খেল এবং বলল, নীচে চল সুমন, ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে।

কী কাণ্ড? কীসের কাণ্ড?

নীচে আয় বলছি।

ওরা নীচে নেমে গেল। সুচারু জামা-কাপড় ছেড়ে বাংকে বসে বলল, খুব সাহস করে ভিতরে ঢুকে গেলাম।

কী দেখলি?

সব ছোট-ছোট সন্ন্যাসিনীদের ঘর। পাশে প্রসূতি-কেন্দ্র। খুব ছোট। তিন-চারটি বেড। আর সন্ন্যাসিনীদের ঘরগুলো খুবই ছোট। সামনে সব লতানে গোলাপের গাছ, ঠিক ঝোপের মতো।

তারপর?

ওরা দেখল, একজন অপরিচিত পুরুষ ওদের জানালায়-জানালায় হেঁটে যাচ্ছে।

তারপর?

তারপর ভয়ে চিৎকার!

সামাদ বলল, তোর এত সাহস!

লিজার মুখ আবিষ্কারের জন্যে পাগলের মতো ঘুরছিলাম। ঘরে ওদের অল্প আলো জ্বলছে। ওরা আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো ভয় পেল। ওরা চিৎকার করে বলছিল, ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করুন। এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালাগুলো বন্ধ হতে থাকল। কোথাও কোনও পুরুষ-কণ্ঠ নেই, শুধু শিশু-প্রসূতিদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম!

সুচারু এইটুকু বলে একটা ঢোক গিলল, তারপর চুপচাপ।

তারপর কী হল?-- সামাদ ঝুঁকে পড়ল সুচারুর মুখে।

শুধু একটি জানালা এই ভয়ংকর রাত্রির ভিতরও খোলা ছিল। অস্পষ্ট আলোতে সাদা পোশাক পরা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখলাম, বীভৎস মুখ, পুড়ে গেছে, চোখদুটো সামান্য জ্বলজ্বল করছিল, হাতগুলো শীর্ণ দেখাচ্ছে অথবা কঙ্কালের মতো।

সুচারু এইটুকু বলে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে বলছিল সুচারু, ভিতরে তখন চেঁচামেচি হচ্ছে। দূরের খামারবাড়ি থেকে তখন লোকজন ছুটে আসছে এবং চোর অথবা অন্য কোনও উপদ্রবের কথা ভেবে পুলিশের সাহায্য চাইছিল ওরা।

সুচারু এবার পাশ ফিরে শুল। যখন কোথাও কোনও দুঃখ জেগে নেই, শুধু থেকে থেকে জেটির অন্য প্রান্ত থেকে পপলারের শব্দ ভেসে আসছে এবং শেষ রাতের নক্ষত্র জাগছে কোথাও।

সামাদ বলল, সুমন, উঠে আয়।

সুমন উঠে নিজের বাংকে চলে গেল। কারণ সুমন এবং সামাদ জানত এই বন্দরে সুচারু আর বের হবে না। ফের অন্য বন্দর এলে, অন্য গির্জায় অথবা কোনও শহরের পথে ছবিটির সঙ্গে মুখ মিলিয়ে দেখবে, তারপর সেই এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় নিরাশ হয়ে ফেরা এবং সে ফের বালকসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়বে। সফরে-সফরে সুচারু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আসছে।

সুতরাং এ রজনী দুঃখের রজনী। তিনজন জাহাজি যুবক ফোকশালের স্বল্প আলোর ভিতরে পোর্ট হোল খোলা রেখে মৃত মানুষের মতো পড়ে থাকল। ওদের চোখে ঘুম আসছে না। ভোর হতে দেরি নেই এবং বন্দরে কোনও তৈলবাহী জাহাজ এসে ভিড়ছে, কিছু লোকজনের চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে জেটিতে। অথচ এই জাহাজিরা শুধু দূরের মাঠ দেখল অন্ধকারে ভিতর, যুবতীরা কেবল হেঁটে যাচ্ছে, যুবতীরা যুবকরা হাত তুলে হেঁটে যাচ্ছে, যুবতীদের শরীর যেন জাহাজময় ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওরা তিনজন এই শেষ রাতটুকুতে কিছুতেই আর ঘুমোতে পারল না। শরীরে ক্রমশ বিশ্রীরকমের উত্তাপ জমছে। ওরা ঘুমের ভান করে শক্ত হয়ে পড়ে থাকল।

শুধু সুমনের মনে হল উইচ-ককের পথ অতিক্রম করে গেলে, আস্তাবলের মাঠ পার হয়ে গেলে এবং শহরের সদর রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে সেই দুর্গের মতো বাড়ি, যেখানে ফুলের মতো মারিয়া অন্ধকারের ভেতর ফুটে রয়েছে। সে সন্তর্পণে বাংক থেকে নেমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল এবং মাস্তুলের নীচে একলা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

এগারো

হেনরি ঘুম থেকে উঠে পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। তীরের সব পপলার জাতীয় গাছগুলো এখনও সামান্য অন্ধকারে ডুবে আছে। দু'-একজন শ্রমিককে ইতস্তত হেঁটে জেটিতে নেমে আসতে দেখা যাচ্ছিল। ডানদিকের বড় গুদামখানার মাথায় আলোটা এখনও জ্বলছে। এবং রাস্তার আলো একটা লোক নিভিয়ে দিয়ে গেল। হেনরি অভ্যাস মতো তোয়ালে কাঁধে ফেলে ডেকে বের হতেই দেখল সুমন মাস্তুলের গুঁড়িতে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। সে ডাকল, হেই।

সুমন ওর প্রথম ডাকে কোনও সাড়া দিল না। সুতরাং হেনরি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খুব ঘুমুচ্ছে হতভাগা! মনে মনে এই ভেবে হেনরি একটু রসিকতা করতে চাইল। একটু সাদা পেস্ট নাকের ডগায় এবং দু' গালে লেপ্টে দিতেই সুমন চোখ মেলে তাকাল। সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হাত-পা টান করে হাই তুলল।

হেনরি ভাল ছেলের মতো প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার? এখানে বসে বসে ঘুমানো হচ্ছে!

সুমন গতরাতের ঘটনাটুকু খুলে বলতে পারত। কিন্তু না বলে সে উঠে দাঁড়াল। এবং চারিদিকে চোখ মেলে তাকাতেই বুঝল পপলার গাছগুলোর ফাঁকে সূর্য এবার উঠবে। কাপ্তান ব্রিজে পায়চারি করছেন। মেজ মালোম বোট-ডেকে বসে হাওয়া খাচ্ছেন ভোরের, সুমন হাই তোলার সময় ভেবেই পেল না কখন সে রাতে ডেকের উপর এসে এই মাস্তুলের গুঁড়িতে বসেছিল। হেনরিকে শুধু বলল, রাতে ঘুমোতে পারিনি।

কেন কী হয়েছে? মারিয়া কিছু বলেছে?

না।— সে চলে যাচ্ছিল পিছিলের দিকে, কী ভেবে ফের ঘুরে দাঁড়াল এবং বলল, রাতে ফিরলে কখন?

ঠিক বলতে পারব না।

কেন, হুঁশ ছিল না?

হেনরির মুখ লজ্জিত দেখাল।

এত রাত!

ভারোদির সঙ্গে সামনের একটা শহরে গেছিলাম।

খুব ফুর্তি করলে?

খু-উ-উব।

আমার কিছু হল না।

কেন? মারিয়া তোমাকে...

ধ্যাৎ। একটা বাজে মেয়ে। একটু কচি খুকি...

তবু এটা ওটা... চুমুটা খেলে কী আর দোষের! বালিকা বলে কিছু জানে না বুঝি?

বাচ্চা মেয়ে কী আর বুঝবে!— সুমন মারিয়া সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চাইল। এবং পিছিলের দিকে হেঁটে যেতে চাইলে হেনরি ফের ডাকল, হেই সুমন, দ্যাখো গালে তোমার কী লেগে আছে।

সুমন গালে হাত রেখে বুঝল আঠা-আঠা কিছু এবং সে হাতের স্পর্শে হেনরির দুষ্টুবুদ্ধিটুকু ধরে ফেলতেই হেনরিকে ধরার জন্য সে কেবিনের দিকে ছুটল। হেনরি ডেক ধরে পালাবার চেষ্টা করছে। হয়তো এখন সুমন ডেক থেকে কিছু সালফার নিয়ে ওর মুখে মেখে দেবে। সুতরাং হেনরি তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই মনে হল দরজার পাশ দিয়ে সুমন হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

সে দরজা ফাঁক করে ডাকল, হেই। সুমন এবার পিছন ফিরে তাকাল না, সে যথার্থই এবার চলে যাচ্ছে দেখে হেনরি সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং নিজেব তোয়ালেটা দিয়ে বলল, মুছে ফেলো মুখটা।

সুমন মুখ মুছে ভাল করে দেখল হেনরিকে। হেনরির চোখ-মুখ খুব বসে গেছে। প্রায় সারারাত হেনরি বন্দরে ভারোদিকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে এসেছে অথবা বলা যেতে পারে সারারাত ভারোদিকে নিয়ে এক যৌন ক্রিয়াশীল জগৎ এবং সেই জগতে লোভ, লালসা লাল শালুর মতো সারারাত ঠান্ডা হাওয়ায় দেওয়ালের সর্বত্র উড়ছিল। সে বলল, তোমার চোখ-মুখ বসে গেছে হেনবি, তুমি মরবে।

আজ আর যাব না।

সুমন ভারোদির মেয়ে মারিয়ার প্রসঙ্গে বলল, আজ যে রাতে খাওয়ার কথা।

তবে কী করা যাবে? সত্যি বলছি আমার আর ইচ্ছা করছে না।— হেনরি সামান্য অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলল।

মারিয়াকে বিকেলে বলে দিলে ভাল হত, আমরা যেতে পারব না।

হেনবি হাঁটতে থাকল সুমনের সঙ্গে। বলল, কাল আমিও বলে এলাম, তুমি আমি যাব।

একসঙ্গে হইচই করে দু'-চার দিন যা আছে কাটিযে দেব! সামান্য তো খাওয়া।

তারপর ওরা রেলিং এর কাছে এসে দাঁড়ালে হেনরি বলল, খেয়ে দেয়ে আর দেরি করব না। সোজা জাহাজে চলে আসব। ফেরার সময় একটা পাইট নিয়ে জাহাজে ফিরব। ওখানে বেশি করে খেলে ভারোদি আমাকে ঠিক বধ করে ফেলবে।

সেই ভাল। তোমার কেবিনে বসে খাওয়া যাবে।

এখন আর সুমনের নড়তে ইচ্ছা করছিল না। সে রেলিং-এর উপর ঝুঁকে বলল, এত রাত পর্যন্ত কী করলে?

বলব না।— মিষ্টি মিষ্টি করে হাসল হেনবি।

ভেরি গুড।— বলে সুমন চলে যেতে চাইলে হেনরি বলল, আরে দাঁড়াও।

সুমন বলল, এবার ঠিক তোমার বউকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব।

মাই বয়! - বলে হেনবি উদাস গলায় ডাকল।

মাই বয়, তুমি এই ভাবে আর যাই বলো আমার এই কেচ্ছার সঙ্গে সেই সতী-সাধ্বীকে জড়িয়ো না।

এইটুকু বলে হেনরি খুব তাড়াহুড়ো দাঁত মাজতে থাকল এবং পাশে নিজের বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। হেনরি এই কথায় যথার্থই বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। হেনরি বাথরুম থেকে কখন বের হবে, কে জানে! সুতরাং ডেক এ দাঁড়িয়ে গাছগাছালির ফাঁকে সূর্য উঠতে দেখল। সূর্যের আলো ওর মুখে পড়ে এক নিষ্পাপ বালকের ছবি এঁকে দিয়েছে। সে ইতস্তত করছিল নিজের ফোকশালে নেমে যাবে কি না, না হেনরি বের হলে ওকে বলে পিছিলে উঠে যাবে, কারণ সামান্য রসিকতা করলে হেনরিকে খুব দুঃখিত দেখায়। কোথায় এক অসামান্য বেদনা সব সময় বাজতে থাকে যেন। সুমন অনেক চেষ্টা করেও সেই অসামান্য বেদনার আভাস আজ পর্যন্ত পায়নি। কিন্তু বাথরুমে কোনও শব্দ হচ্ছে না। মনে হল মানুষটা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে দেরি করছে। সে আর অপেক্ষা করল না। বেলা বাড়ছে। এখুনি সারেং সকলকে ডাকবে এবং বলবে, টান্টু। সে একা-একা ডেক ধরে পিছিলের দিকে উঠে যাচ্ছে।

এই নিঃসঙ্গ জাহাজে সুমনের মনে হচ্ছিল কোথাও কোনও ভোরের পাখি ডাকছে, ঠিক নিঃসঙ্গ দুপুরে দূরবর্তী কোনও ঘুঘুপাখির ডাকের মতো। নির্জন এই জাহাজ-ডেকে সুমন সেই দুর্গের মতো পাঁচিলের ভিতর মারিয়ার মুখ শুধু মনে করতে পারল। আর মায়ের কোমল মুখ মাঝে মাঝে হাহাকারের দৃশ্য সৃষ্টি করছিল। মারিয়ার সরল এবং অকপট ভালবাসার কথা ভেবে সুমন ফোকশালে নেমে যেতে পারল না। সেখানে নেমে গেলেই অন্ধকার। সেখানে কোনও জলের আরশি থাকে না, কোনও প্রতিবিম্ব ভাসে না, সুতরাং সুমন রেলিং-এর উপর ভর করে দাঁড়াল এবং নদীর জলে নিজের মুখ দেখতে পেল। নদীর জল, ছোট ছোট ঢেউ। ভোরের সূর্য সহজেই আলোর মালা সেই জলে অনবরত নিক্ষেপ করে চলেছে। ওর পেছনে মাস্তুলের ছায়া খুব লম্বা হয়ে নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল।

ওর মনে পড়ছিল সেই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার গল্প, মনে পড়ছিল সেই লেডি অ্যালবাট্রসের গল্প। লেডি অ্যালবাট্রাস সারাদিন এবং প্রায় সারারাত সমুদ্রে বিচরণ করার পর ভোররাতের দিকে এই মাস্তুলে এসে আশ্রয় নিত। আর সর্বত্র সেই এক করুণ ছবি, শুধু নারীজাতির জন্য মানুষের ক্রমান্বয় অকপট ভালবাসা। আর তখনই মনে হল পেছনে ওর কে হাত রেখেছে কাঁধে। সুমন ঘাড় তুলে তাকাল। হেনরি। এবং হেনরি ওর পাশে দাঁড়িয়ে এখন হুবহু ওর মতো নদীর জল দেখে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছে।

জলে অল্প ঢেউ ছিল বলে ওদের দু'জনের প্রতিবিম্ব ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে হালকা পাখির পালকের মতো জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। ওরা উভয়ে কোনও কথা বলছিল না। ওরা জলের নীচে প্রতিবিম্ব দেখে নিজেদের চেনার চেষ্টা করছিল।

তখন সুচারু গঙ্গাবাজুতে হাঁকছিল, সুমন, সুমন রে।

সুমন রেলিং থেকেই হাঁক পাড়ল, বলল, যাচ্ছি!

এ সময় ওদের চা খাবার সময়। কিছুক্ষণের ভিতরই জাহাজিরা ফোকশাল থেকে বেরিয়ে পড়বে। চা খেয়ে ওরা ডেকময় নিজেদের কাজ করে বেড়াবে। সুতরাং সুমন চা খাবার জন্যে নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল।

পাশাপাশি বাংক। সুচারু সামাদ এবং সুমনের ফোকশাল। সামাদ নীচে বসে চা করছে, সে সুমনের চা আলগা করে রেখে দেবার সময় দেখল অসময়ে সুমন লকারের দরজা খুলছে। এবং সে কী খুঁজল কিছুক্ষণ, তারপর লকারের নীচ থেকে কোনও গোপনীয় ছবি বের করে উল্টে-পাল্টে দেখল। মায়ের ছবি, বিবর্ণ, সারা মুখে সামান্য হাসি এবং মা তখন যুবতী। সুমন মায়ের জন্য হতাশায় ভেঙে পড়ল অথবা মায়ের মতো মারিয়ার জন্যও যেন এক আকর্ষণ, স্ত্রীজাতির আকর্ষণ থেকেই রেহাই পাচ্ছে না। যত ভাবছে আর কিছুতেই নয়, যত ভাবছে আজ অন্য কোনও ফোকশালে নিজেকে অদৃশ্য করে রাখবে, তত এক মারাত্মক আকর্ষণ, যেন শীতের জন্য সূর্যের প্রতীক্ষা। সুমন ছবিটা রেখে ফের উপরে উঠে গেল, সামনে সেই উইচককের পথ এবং সূর্য যখন উইলোঝোপের ভেতর তার রহস্য হারিয়ে ফেলবে, মারিয়া বড় গাড়ি করে বন্দরে নেমে আসবে তখন। এবং বলবে, ওজালিও সুম্যান, আমি আবার এলাম অথবা বলবে, জাদুকরের পালিত পুত্র, আমি আবার এলাম।

বার্ট তখন জাহাজের উপর হই হই করতে করতে উপরে উঠে এল। সুমনের সামনে এসে হাত প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে হ্যান্ডশেক করল। কিন্তু সুমন কোনও কথা না বলে হাঁটতে থাকলে বার্টের বিস্ময়— এই সুমন, উজ্জ্বল তরুণ যুবা সুমন, মুখ ব্যাজার করে হাঁটছে! সে বলল, এনিথিং বং সুম্যান?

সুমন তাকাল বার্টের দিকে। সুমন হেসে কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সেই ভেতরে থেকে থেকে কষ্ট এবং সুমন ইঞ্জিন-রুমে নামার সময় দেখল বার্ট আর তাকে অনুসরণ করছে না। সে কাজের জন্য কশপের ঘরে ঢুকে বালতিতে কিছু যন্ত্রপাতি ভরবার সময় দেখল সিঁড়ি ধরে হেনরি নেমে আসছে নীচে। ওর গলায় রুমাল বাঁধা। সুতরাং যন্ত্রপাতি হাতুড়ি, বাটালি, স্প্যানার নিয়ে ওকে উপরে উঠতে হল না। কোলবয় এবং ফায়ারম্যানদের কাজ এখন স্মোক-বকসে। ওরা তিন নম্বর বয়লারের স্মোক-বকস পরিষ্কারের জন্য দরজা খুলে দেখছে।

সুমন হেনরিকে অনুসরণ করে নীচে নেমে গেল। ঠিক জেনারেটারের পাশে 'বাইশ' টেবিল, কিছু ফাইল সারার কাজ, সুমন নিজেই বিয়ারিং বেঁধে ফাইল সারতে থাকল। হেনরি টর্চ মেরে ব্যালেস্ট পাম্প এবং অন্যান্য পাম্পগুলো দেখছিল। একটা প্লেট তুলে সে ট্যাংক-টপের ভিতরে নেমে গেল। সব মিষ্টিজলের ট্যাংক নীচে। তলানি জল ফেলে জাহাজ নোঙর তোলার আগে জল ভরে নেবার জন্য ভেতরটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছোট ছোট বালতি, পুরনো পরিষ্কার ন্যাকড়া হাতে জাহাজিরা ট্যাংকের নীচে নেমে লাল ময়লা জল পরিষ্কার করছিল, ওদের কথাবার্তা ভেসে আসছে। ওরা এই ট্যাংকের ভিতরে বসেও অশ্লীল গল্প করছিল। সেই এক স্ত্রীজাতির গল্প। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর জাহাজিরা বন্দরে নামতে পারছিল না, বড় এক দুঃখ, তারা কাতর এই দুঃখে। সুমন মিথ্যা পরিচয়ে ওজালিও দ্য সুম্যান এই নামে পালিয়ে পালিয়ে অথবা আর কতদিন মিথ্যা পরিচয়ে মারিয়াকে পাগল করবে, আর কতদিন এই মিথ্যা মোহকে ধরে রেখে জাহাজি সুমন ইতর যুবকের মতো চলাফেরা করবে, সুমনের এ সময় মুখে বিস্বাদ লাগছিল। সুমন আপন মনে ফাইল করার সময় দেখল, সেই এক মুখ, মারিয়ার মুখ মায়ের

মতো ভালবাসা নিয়ে যেন বন্দরে অপেক্ষা করছে, মুখটা চোখের সামনে বড় বেশি জ্বল জ্বল করছিল।

হেনরির হাতে একটা বিয়ারিং। সে বিয়ারিংটার মাপ-জোক নিচ্ছিল। সে সুমনের ফাইল ঘষা দেখছিল। ঠিক হচ্ছে না,সুতরাং নিজেই ফাইল হাতে নিল। প্যান্টের পেছনে দু'বার ঘষল ফাইলটা, তারপর নিবিষ্ট মনে কাজ করতে থাকল। কাজ করার সময় হেনরি বড় বেশি আন্তরিক। কিছু জাহাজি টানেল-পথে অথবা স্মোক-বকসের ভেতর কাজ করছে এবং ওরা নিজেদের অদৃশ্য রেখে বাংকারের ভিতর গলে গিয়ে দেশের গল্পে মশগুল। এই জাহাজি ভাইদের আলস্যের জন্য সুমন সংকোচ বোধ করছিল। আর ওরা বড় আন্তরিক, কাজের সময়ে হেনরি অথবা বড়-মালোম, মেজ-মালোম, মেজ-মিস্ত্রি সকলে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে কাজের সময় কাজ, ফুর্তির সময় ফুর্তি, সবই চুটিয়ে ভোগ করার স্বভাব এদের। এবং ঠিক এ সময়ই সুমন অত্যন্ত খাটো গলায় বলল, আমি আর মারিয়ার কাছে যাব না হেনরি। আমি ধরা পড়ে যাব। মারিয়ার চাকরটা তক্কে-তক্কে আছে, সে আজ হোক কাল হোক ঠিক টের পাবে— আমি ইন্ডিয়ান, আমি স্পেন দেশের লোক নই, আমার বংশ কোনও কালে ষাঁড় লড়াইয়ের নাম পর্যন্ত শোনেনি, আমি এক সাধারণ নাবিক সুমন,'আমি কোনও মিথ্যা ষাঁড়-লড়িয়ে ওজালিওর বংশধর নই। অথবা তোমরা আমাকে আর ওজালিও দ্য সুম্যান বলে ডেকো না।

চাকর-বাকর মানুষ, ওরা মনিবের ভাল তো চাইবেই।— হেনরি চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে বাঁ-পাশে রেখে দিল।

কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি, জীবনে অনেক কষ্ট সুমন, জীবনে নারী সহবাস ছাড়া আর কী থাকে বলো।— হেনরি অসহায় যুবকের মতো কথাটা বলল।

কাল রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। সেই ঘরটা, মনে আছে হেনরি তুমি এবং আমি প্রথম যেদিন ভারোদির ঘরটা দেখি, সেই ঘর, নিগ্রো যুবতীর একটা কঙ্কাল এবং রেটল সাপের সেই বিদ্‌ঘুটে হাড়টা আর একটা সোনার ইগল যেন সেই দুর্গের মতো বাড়িটার উপর উড়ছিল। মারিয়াকে ঠিক রাজকন্যার মতো মনে হচ্ছিল। বন্দিনী।

আর কিছু দ্যাখোনি?

আমি জানি সব ব্যাপারেই তুমি আমাকে ঠাট্টা করবে।

আমি ঠাট্টা করছি না সুমন। জাহাজি জীবনে অনেক জটিলতা থাকে, আবার আনন্দও থাকে।

বলে সে ফাইলটা পাশে রেখে দিল। 'বাইশ' থেকে বিয়ারিংটা খুলে ভাল করে কটন ওয়েস্ট দিয়ে মুছে দু'বার ফুঁ দিল [illegible] বিয়ারিংটার তেল ঢোকার মুখে। তারপর বিয়ারিংটা পাশে রেখে ফের চুরুটটা ঠোঁটে তুলে বলল, জাহাজি জীবনে বড় একঘেয়েমি থাকে, এই দ্যাখো না, বেশ আমাদের দিনগুলো সমুদ্রে কেটে যাচ্ছিল [illegible] মা মারা গেলেন, ডারবান বন্দরে তুমি মায়ের মৃত্যুর খবর পেলে। তুমি দেশে ফিরতে পারলে না। বেশ ছিলাম আমরা, কিন্তু এই বন্দরে ভয়ংকর বর্ণবৈষম্য বলে, নিগ্রো-বিদ্বেষ বলে ভারতীয় নাবিকদের নামতে বারণ করে দেওয়া হল। বলো তুমি, কী দরকার ছিল ভারোদির সঙ্গে আমার আলাপের? সে এই জাহাজে পাখি সংগ্রহের জন্য আমার কেবিনে এল, ওর মেয়ে মারিয়া এল, তুমি আমার ঘরে এলে এবং পরিচয় হল। মিথ্যা পরিচয়ে আমি তোমাকে স্প্যানিশ বলে চালিয়ে দিলাম। তোমারও সায় ছিল এতে কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে না যে, তুমি ভুল করে ফেলেছ?

খুব ভুল হয়ে গেল।

ভুল নয় সুমন, এটাই সমুদ্রের নিয়তি। তুমি এখন রোজ ধরা পড়ার ভয়ে কেমন দিন দিন মুষড়ে পড়বে।

আমি আর যাব না হেনরি।

যাবার যখন সময় হবে সব ভুলে যাবে সুমন।

না, আজ আমি বলছি, ঠিক বলছি, দেখো...

এবার হেনরি খুব বিরক্ত গলায় বলল, যাবে না, যাবে না। রোজ তোমাকে এই এক কথা বলতে শুনি।

সুতরাং সুমন আর কথা বলল না। হেনরি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, ওয়েলসের লোক। বিদেশি এবং জাহাজের অফিসার। সুতরাং এই মুহূর্তে সুমনের মনে হল ওর সঙ্গে সত্যি বক বক করা মানায় না।

হেনবি ভেতরে ভেতরে হয়তো যথার্থই রেগে গেছে। অথবা মনে হল, হেনবির তাকে এখন আর দরকার নেই। মাতৃবিয়োগের পর সুমনের এই বিদেশি মানুষটির সঙ্গে যে অসমবয়সি গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এখন তা আর ধরা যাচ্ছে না। অথবা বিধবা ভাবোদি ওকে হয়তো সবই দিচ্ছে। বরং হেনবির এখন একা-একাই ভাল লাগার কথা। সে ভাবোদিকে নিয়ে বড় মেটাল বোড ধরে সামনের শহরে চলে যাবে। আর বাকি ক' রাত নাচঘরে অথবা কোনও দামি হোটেলে রাতের আস্তানা গেড়ে, মদ খেয়ে প্রলাপনা করে গাড়িতে মাঝরাতে বন্দরে ফিরে আসা এক ভয়ংকর উত্তেজনার খবর, যেন বেঁচে থাকার জন্যই এমনই এক উত্তেজনা চাইছে। সুমন হাতের কটন ওয়েস্টগুলো বালতিতে রাখল এবং হেনবি সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকলে, সে শুধু ওকে অনুসরণ করল।

ঠিক ইঞ্জিন-সিলিন্ডারের বাঁ পাশের সিঁড়িতে উঠে হেনবি পেছনের দিকে তাকাল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে সুমনের মুখ দেখার চেষ্টা করল। মুখ থম থম করছে সুমনের। মুখ গম্ভীর দেখালে সুমনের চোখদুটো আরও বড় দেখায়। হেনবি মনে মনে না হেসে পারল না, এই তরুণ যুবা, ভারতবর্ষের যুবা বড় বেশি আবেগে ভুগছে। চোখদুটি ভারী, আষাঢ়ের জল-ঝড়ের মতো মুখ। স্কাইলাইট থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ছে, ওরা উভয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল এবং যেতে যেতে হেনবির যেন বলার ইচ্ছা, ভাবোদি এখনও ষোলো বছরের ছুড়ির মতো ওজালিও।

হেনবি উপরে উঠে যাচ্ছে, সুমনও উঠে যাচ্ছে।

হেনবির যেন আরও বলার ইচ্ছা, তুই রাগ করলে আমি মরে যাব বাছা। ভাবোদির বুক আর উরু সমান, এ কথাটাও মনে হল হেনবির, বড় নরম এবং সময়ে শক্ত। কোমরের কাছে মাংস নেই বললেই হয়। আর পাছাতে কী চর্বি রে ওজালিও। হলদে হলদে দাগ। নীল শিরা উপশিরা সব শরীরে। ভিতর পাকদণ্ডীর মতো ঘুরে-ফিরে মাংসের ভিতর হারিয়ে গেছে। কী কোমল শরীর রে ওজালিও। অমন জায়গায় হাত রাখলে দু'-চারদিন, তুইও অতল জলে ডুবে যেতিস। ভিজা ভিজা, সব সময় ক্ষরণ হচ্ছে। মন বলার ইচ্ছা হেনবির, কচি এক বাবুইয়ের বাসা, বৃষ্টির পর ভোরের রোদের মতো নরম এবং সুকোমল চাপ চাপ, হাত দিলেই হাত ক্রমশ ভেতরের দিকে বসে যাচ্ছে। হেনবি ঠিক ইঞ্জিনের দরজার সামনে সুমনকে এসব বলতে চাইল।

কিন্তু সুমনের গম্ভীর মুখ দেখে কিছুই বলতে সাহস পেল না। সে উইনচ মেশিন পর্যন্ত ধীরে ধীরে হেঁটে গেল।

সব উইনচগুলোই চলছিল। শুধু ডানদিকের উইনচের রিয়ারিং স্ক্রয়ে যাবার জন্য মাল উঠতে নামতে উইনচম্যানকে খুব অসুবিধায় ফেলছে। আজ সারাদিন মেরামত করলে মনে হয় মেশিন কাল থেকে ফের কাজ করতে পারবে। সুমন ডেক-এ সালফার উড়ছিল বলে মাথায় টুপি পরে নিল। চোখ মুখ জ্বালা জ্বালা করছে। আর সব ডেকময় ব্যস্ততা, নীচে সেই এক ক্রেন-মেশিনের শব্দ এবং ফলকার ভেতর সেই সব নিগ্রো কুলিদের চিৎকার, চুরি করে মদ্যপান এবং অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য হল্লা।

হেনবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুরুট টানল, তারপর চুরুটের শেষ অংশটুকু ঢিল মেরে নদীর জলে ফেলে বলল, দেন মাই বয়, তুমি যাচ্ছ না?

না।

না গেলে তো চলবে না, বয়।

হেনবি ঠিকভাবে কথা বলো।

সুমনের কিছুই প্রায় ভাল লাগছিল না। সে বিরক্ত হয়ে হেনবিকে ধমক দিল।

হেনবি হেসে বলল, আচ্ছা সুমন, তুমি বলো জাহাজে আমাদের কে আছে?

কেউ নেই।

কে আমাদের ভালবাসে?

কেউ না।

তবে মিস্টার ওজালিও, পাড়ে যদি কেউ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকে, কত সৌভাগ্যের কথা বলো।

অত বড় বাড়িটায় তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাও, ভাবোদি তোমাকে নিয়ে বড় শহরে চলে

যায়, আমার ভাল লাগে না, মারিয়ার রেড-ইন্ডিয়ান চাকর শুভুই কোথাও কেবল উঁকি দিয়ে থাকে। আমার ক্রমশ ভয়টা বাড়ে।

ভারোদিকে নিয়ে কোথাও চলে যাই, ভারোদির তাই ইচ্ছা।

তখন আমি একা একা কী করি বলো তো?

কেন, ফুলের মতো মারিয়া।

ধ্যাৎ, ওটা নচ্ছার মেয়ে।

কেন, কিছু বলেছে?

কী আর বলবে।

সুমন এই প্রসঙ্গে ভারোদির পাখির জগতের কথা বলল। সেখানে নানা দেশের পাখি ছোট ছোট কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি করে পুষে রাখা হয়েছে। সেই বড় পাঁচিলের পাশে স্পেন দেশের যুবক ওজালিও হেঁটে বেড়ায়। মারিয়া আলো এবং ফুলের ভিতর মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে স্পেন দেশের যুবককে বিব্রত করে, ওসব কথা বলার সময় সুমনকে খুবই চিন্তিত মনে হল।

কী আরাম!

হেনরি চোখ বুজে বসে থাকল, যেন কত কী ভাবছে। তারপর সহসা কিছু আবিষ্কারের মতো বলল, মেয়ে মা'র মতো ইশারায় কোনও গোপন কথা বলছে না তোমাকে?

না।

তবে আর নচ্ছার কীসের!

সুমন এবার লজ্জিত হবার মতো কিছুক্ষণ কী ভাবল। অথবা ভিতরে ভিতরে এক সুন্দর দৃশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে? ভয়ে হোক, ভীতিতে হোক, সুমন কেমন পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছিল সেই কৃত্রিম অরণ্যের ভিতর। সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে যখন দ্বীপ এবং সমুদ্রের গল্প বলছিল, যখন কোথাও কোনও পারসিমন গাছ থেকে সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে অথবা মনে হচ্ছিল এত বড় দুর্গের মতো প্রাচীন বাড়ির ভিতর ফুলের মতো মারিয়া, মারিয়ার সোনালি চুলের সৌরভ, ছোট ছোট ওয়ারবলার পাখির ডাক এবং বোধহয় সেটা জ্যোৎস্নারাত ছিল, সুমন সহসাই বলে ফেলল, জানো হেনরি, মারিয়া আমাকে চুমু খেয়েছে।

আর কিছু? ওটা তো নতুন খবর নয় আমার কাছে।

না, আর কিছু না।

যুবতী হলে হয়তো হত।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতন চোখ মেলে তাকাল এবার হেনরি। তারপর আফসোসের গলায় বলল, নাবিক জীবনে এটাই বড় দৈব। কথা নেই, বার্তা নেই, বন্দরে এক সুন্দরী বালিকা অথবা যুবতীর সঙ্গে আকস্মিক আলাপ। তুমি নাবিক বলেই সে আলাপ করবে। ঘরে নিয়ে যাবে, সমুদ্রের এবং দ্বীপের গল্প শুনতে শুনতে তোমাকে একসময় ভালবেসে ফেলবে। আমরা নাবিকরা তখন মিথ্যা প্রেমের জন্য এবং অহমিকার জন্য বানিয়ে বানিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প বলি। সেসব সত্য ভেবে একদিন বলবে, তুমি থেকে যাও, তোমাকে ঘর দেব থাকার, জল দেব খেতে, আর সব ভালবাসা আমার অঞ্জলিতে তোমার জন্য তুলে রাখব।

হেনরি এখন আর সাধারণ নাবিকের মতো কথা বলছে না। সে গত রাত্রে ভারোদির সঙ্গে রাত্রি যাপনের পর যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সে এবার উইনচের তলায় ঢুকে গেল এবং বলল, বুঝলে সুমন, আমার স্ত্রীর বিশ্বাস, আমি তাকে ভালবাসি না। বাড়িতে যতদিন থাকব, রোজ একবার না একবার আমাদের বচসা হবেই। অযথা মেয়েটা আমাকে গালাগাল করে। অথচ জানো, পরিত্যাগ করে কোথাও যায় না। কতবার বলেছি, অসুবিধা হলে অন্যত্র ঘর করো।

সুমন হেনরির কথা চুপচাপ শুনছে। কোনও জবাব দিচ্ছে না।

স্ত্রী আমার দজ্জাল। বলে, যেদিন ঘর ছেড়ে যাব, সেদিন গলাটা টিপে তবে যাব।

একেবারে ভয়ংকর

ভয়ংকর আর বলতে! শয়তানের মতো কথাবার্তা। কিন্তু যতদিন দেশে থাকব, সে কাজ থেকে ছুটি

নেবে। আমার পছন্দমতো রান্না করবে, নিজেই বাজার করবে, ভালমন্দ কিনে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে, ঠিক বুঝলে মায়ের মতো। আর বলবে, এবার শহরে বন্দরে কোথাও একটা কাজ খুঁজে নাও, আর সমুদ্রে যেয়ে কাজ নেই।

কতদিন আমরা আমাদের ফুলের মতো মেয়ে জুলির হাত ধরে সেই গ্রাম্য কটেজে ফিরে গেছি। আমাদের গ্রামের জমির ভিতর কতদিন সে এবং আমি একা একা হেঁটে সফরের গল্প করতে করতে আনমনা হয়ে গেছি। তখনই স্ত্রীর মুখ বিষণ্ণ দেখাত, তখনই সে কান্না-কান্না গলায় বলেছে, বলো তোমার জন্য আমি আর কী করতে পারি, তুমি চলে গেলে আমি কোথাও বেঁচে থাকার সুখ পাই না।

হেনরি বলল, সুতরাং সুমন বেশিদিন পারি না।

স্ত্রী এবং জুলির কথা মনে আসতেই, বোধহয় চোখদুটো জলে ভার হয়ে আসছিল। সে নীচে অন্ধের মতো ওয়াশার খোঁজার অছিলায় চার ধাবে হাতড়াতে থাকল এবং বলতে থাকল, আবার সমুদ্র, আবার যাত্রা উত্তর-সমুদ্রে অথবা দক্ষিণ-সমুদ্রে। স্ত্রীর বিষণ্ণ মুখ তখন আমাকে বড় কাতর করে রাখে সুমন। তুমি আর যাই বলো সেই সতী-সাধ্বীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো না।

কেমন পাগলের মতো এবং কান্না-কান্না গলায় কথা বলতে থাকল হেনরি। মনে হয় সে এখন উইনচের নীচে শুয়ে থেকে কেবল স্ত্রীর জন্য, ওর সেই গ্রাম্য কুটিরের জন্য এবং যব, গম গাছের মতো নিরীহ এক ভালবাসার জন্য কাঁদবে। অথচ তার সঙ্গেই মানুষের ভেতরে এক মাংসের পাকদণ্ডী আছে, ভাবোদির মতো স্ত্রীজাতির পাকদণ্ডীতে পুরুষের সেই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, এবং মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা, স্বপ্ন অথবা উত্তেজনার জন্য এই পাকদণ্ডীর ভেতরে ভেতরে নীল লাল, হলুদবর্ণের এক রহস্য এবং গন্ধময় বিশ্রী উত্তেজনায় শুধু হাত দিতে পারলেই নরম চাপ চাপ কোমল ত্বকে ভালবাসার স্বাদ। সেই নোনা স্বাদ অথবা সমুদ্রের স্বাদের জন্য হেনরি এখন আকুল। হেনরিকে জাহাজ-ডেকে এখন পাগলের মতো লাগছিল দেখতে। সে নীচে লম্বা হয়ে আছে এবং কোথাও সে তার পরম বস্তুটিকে হারিয়ে আকাশের দিকে পা তুলে মাস্তুলের গায়ে মাথা রেখে গুম মেরে গেছে।

বারো

প্রচণ্ড রোদের জন্য ডেকের কাঠ এবং লোহা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। লোহার ডেক-এ প্রায় পা রাখা যাচ্ছিল না। সামাদ লাফিয়ে ডেক পার হচ্ছে। সূর্য এখন মাথার উপর। পিছিলে কশপ নদী থেকে জল তুলে স্নান করছে। ভিতরের ট্যাংক থেকে আজ কেন জানি জল দেওয়া হচ্ছে না। সামাদের মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছিল। ফোকশালে ফিরে স্নানের জল আজ আবার তাকে নদী থেকে তুলতে হবে। বড়-টিন্ডালের মুখটা মনে পড়ল। যত বড়-টিন্ডালের কথাবার্তা রহস্যজনক মনে হচ্ছে, তত সংশয়টা প্রবল হচ্ছে এবং সে ভিতরে ভিতরে ভয়ংকর এক ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কতবার ভেবেছে সুচারুকে বললে হয়, সুমনকে বললে হয়। সুচারু সুমন মিলে যদি কোনও উপায় বের করতে পারে। কিন্তু এমন এক সাংঘাতিক ঘটনা যা প্রাণের চেয়েও গোপনে রাখতে হয়। সালিমার চোখ এবং ভালবাসার কথা মনে হলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। সে ডেক-ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে কেমন বিড় বিড় করে বকতে থাকল, বড়-টিন্ডালের গলা টিপে দেব। আমি সব সহ্য করব কিন্তু সালিমাকে নিয়ে তামাশা সহ্য করব না।

এখন বারোটা বাজতে সামান্য বাকি। তারপর দুপুরে খাবার। দু'-একজন জাহাজি এবার বোট-ডেক থেকে নেমে আসবে। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। কাজের সময় বলে, এবং টিফিন হয়নি বলে ফোকশালের দরজা ভেজানো। ভেতরের মানুষ এখন বাইরে। ওরা উপরে কাজ করছে। এ সময়টা খালি ফোকশাল বলে সামাদ দ্রুত নীচে নেমে বড়-টিন্ডালের ঘরে ঢুকে গেল। সন্তর্পণে সে টিন্ডালের বালিশের নীচে এবং লকারে যেখানে যতটা পারা যায় হাত ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজল। সে কিছু পেল না। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেতেই সে দরজা টপকে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং ভাল মানুষের মতো মুখ করে রাখার সময় মনে হল শরীরের ভিতর অস্থির এক যন্ত্রণা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ওর মাথায় বুঝি কিছু

ছিল না। শুধু রক্ত ছিল। সেই রক্ত কেবল টগবগ করে ফুটছে। যেন সে এক আত্মহত্যার আসামি। আসামির মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সংশয়টা যখন দ্রুত মাথার ভিতর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়, যখন এই সংশয়ের জন্য তার প্রিয় যুবতীর চোখ-মুখ করুণ এবং সে নিজে সংগোপনে আত্মহত্যাকারী এক যুবক, তখন কেবল মনে হয় সব বন্ধ দরজা-জানালার আগুন ডেকময় ছড়িয়ে পড়ুক। সে বড়-টিন্ডালের গলায় দড়ির ফাঁসি পরিয়ে দরকার হলে ডেকে নিয়ে যাবে এবং কপিকলে তুলে মাস্তুলের ডগায় ঝুলিয়ে রেখে বলবে, এই বড়-টিন্ডাল ইবলিশ। শয়তান। এই বড়-টিন্ডাল আমার সই সাদা কাগজে রেখে দিয়েছে। সুচারু রে, আমাব হাতে তখন একটা টাকা ছিল না। শিপিং অফিসে মাস্তার দিতে দিতে জুতো ক্ষয়ে গেছে। না জাহাজ, না সফর। হাতের টাকা সব শেষ। কলকাতার লাথিন্ত আমি তখন একা। নিঃসঙ্গ। সুচারু রে, আমি মবে যাব, আমার তখন অসুখ ছিল।

সামাদের কাতর কণ্ঠ পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলিতে শোনা যাচ্ছিল। ওর চোখ আগুনের মতো এখন জ্বলছে। যেন সে এখন এক হত্যাকারী যুবক। মনে মনে সে বড়-টিন্ডালের সঙ্গে বচসা করছে! সে তাব ফোকশালে বসে চিৎকার করে বড়-টিন্ডালের লালসার কথা বলতে চাইছে। জাহাজে যত দিন যাচ্ছে, যত সালিমার চিঠি আসছে না, তত তার সংশয় এবং পাগলপ্রায় চিৎকার করার বাসনা, বলার ইচ্ছা, এই বড়-টিন্ডাল আমার গাঁয়ের মানুষ। দেশ-গাঁয়ে ওর অবস্থা ভাল এবং মাতব্বর মানুষ। বড়-টিন্ডাল ফিরে সব প্রতিবেশীদের দাওয়াত দেবে। সে মসজিদের জন্য নানা খাতে তহবিল দিয়েছে। সে মসজিদে বড একটা ইন্দারা বানিয়ে দিয়েছে এবং বড-টিন্ডালের বাপ আজিজ সারেং, বড়-বাড়ির হাসিম বিশ্বাসের সঙ্গে এবং চন্দদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছেলে রহমানকে মাতব্বর বানিয়ে দিয়ে গেছে। বাপের রোগ ছেলেতেও বর্তেছে।

সহসা মনে হল পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলিতে দিন-দুপুরে আজিজ সারেঙের সাদা চুলেব ভিতর কালো কঠিন মুখটা ভাসছে। অথবা পেন্ডুলামেব মতো দুলছে। এই আজিজ সারেং, সামাদ বলল, অথবা মনে হল সামাদেব, এই আজিজ সারেং ওব বাপকে ফুসলে-ফাসলে তালাকে মত্ত করেছিল। তালাকের বিবি আজিজ সাবেঙেব ঘরে উঠে গিযেছিল। সামাদ বলতে চাইল, আজিজ, তোমার ভূত আমার মাকে গিলে ফেলে এখানে তামাশা দেখাতে এসেছে। আজিজ, মনে নেই তুমি মান্দারের ডালে ঝুলেছিলে! তোমাব ব্যাটা বড় টিন্ডাল এবারে জাহাজের মাস্তুলে ঝুলে থাকবে।— বলে সে তার নিজের চুল ধরে টানতে থাকল।

সামাদ ভাবল, আজ ফেব সালিমাকে একটা চিঠি দেবে। ঠিকানায় সালিমার বাপের নাম থাকবে না। অন্য ঠিকানা থাকবে, লোক-মাবফতে চিঠিটা সালিমার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। তার গ্রামে কোন মানুষ তার আপনার জন, খুঁজতে গিয়ে মনে হল ওর পক্ষে বুঝি কেউ নেই। সকলের কাছে সামাদ বেজন্মা। সকলের কাছে সামাদ অহংকারী যুবক এবং সকলেই সামাদের শক্ত-সমর্থ চেহারাকে যেন ভয় পায়। আর সেই ভয়ের জন্য সকলেই এখন বড়-টিন্ডালের আশ্রয়ে থাকতে চায়। বৃদ্ধ আজিজ সারেং যেমন ওর যুবতী মাকে ফুসলে নিযেছিল, তেমনি আজিজ সারেঙের ব্যাটা এই বড়-টিন্ডাল এখন প্রায় বৃদ্ধ বলা চলে, ওর ভালবাসার বিবি সালিমাকে ফুসলে নিতে চায়। যেমন গ্রামের অন্য সকলে টিন্ডালেব আশ্রয়ে থাকতে চায়, তেমনি সালিমার বাপ জমি-জিরেতের লোভে হয়তো এতদিন সেই আশ্রয়ে চলে গেছে এবং বড়-টিন্ডাল ইদ্রিশকে দিয়ে খত লেখাচ্ছে, ওডা একটা ইবলিশের বাচ্চা। ওডারে তুমি অহন পর্যন্ত জামাই রাখছ কোন আক্কলে, মিঞা, বুঝি না।

অথবা হয়তো বড়-টিন্ডাল কোনও শরিয়ত ব্যাখ্যার সাহায্যে সালিমার বাপের মনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি পেটি খুলে ফেলল। যেন দেরি করলেই সে সব হারিয়ে ফেলবে। সে একটা চিঠি লিখে ফেলল। সে তার ভিন গাঁয়ের ফুফাতো ভাই নবির নামে চিঠি দিল। যেন সে সালিমার সঙ্গে দেখা করে। যেন এই চিঠি তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বড়-টিন্ডালের ষড়যন্ত্র কতদূর এগিয়েছে, কি আদৌ কোনও সন্দেহের ঘটনা নয়, সে বুঝতে পারছে না সব, এখন কী করা দরকার, কাকে বললে সে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিস্তার পাবে বুঝতে পারল না।

তখন উপরে খাওয়ার ঘন্টা বাজছে। সে তার চিঠিটা যত্ন করে পকেটে রেখে দিল। চিঠি পোস্ট কবাব

ব্যাপারে সারেঙের সাহায্য চাইল না। কারণ বড়-টিন্ডালের সঙ্গে সকলেই যেন শলাপরামর্শ করে চলেছে। সে সোজা মেজ-মালোমের কেবিনে ঢুকে গেল এবং বলল, সাব, এই আমার খত। সাব, ডাকে ফেলে দিয়ো।

বলে সে বের হয়ে এল। তার এই চিঠির উত্তর যদি যথাসময়ে আসে, যদি নবি চিঠিটা পেয়ে মুহূর্তে দেরি না করে এবং সালিমাও চিঠির জবাব লিখে দেয় সঙ্গে সঙ্গে, তবে. . সে হাতের কর গুনতে বসে গেল — কবে কোন বন্দরে সে সালিমার চিঠি পেতে পারে। কর গুনে বুঝল নোঙর তোলার মুখে মুখে ওর চিঠি যদি যথাসময়ে আসে, তবে চলে আসবে। না এলে! সে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখতে থাকল।

বড়-টিন্ডাল রহমান তখন দুলতে দুলতে ডেকের উপর দিয়ে হাঁটছে।

সে ফোকশালে নামাব জন্য সিঁড়ির দরজার সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। বড় আয়েসি এই রহমান। বয়সে বৃদ্ধ হলে কী হবে, মুখে ওর রাঙানো দাড়ি, চুলে খুশবো তেল এবং মেহেদি বঙের দাড়িতে আতরের গন্ধ। এখনও ওর শরীর ভয়ংকব শক্ত সমর্থ। দাঁত একটাও পড়েনি। গলায় কালো তার বাঁধা। রুপোর চাকতি ঝুলছে গলায়। সারাজীবন কয়লার জাহাজে কাজ করে কবে হাতেব পেশি খুব শক্ত। দাঁত পান-দোক্তার জন্য কালো রঙের, যত দাঁত কালো, জিভ তত লাল। হা কবলে বড়-টিন্ডালের মুখে ভয়ংকব সব দৃশ্য ফুটে ওঠে। কুমিরের মতো মনে হয় তখন। হা করা মুখে পান-জর্দার মতো কত সব লালসাব লাল ঝোল। এই দৃশ্য দেখলে সরল অকপট যুবতীদের ভয়ে চোখ বুজে আসে।

বড-টিন্ডালের নীল পোশাকে সামান্য কালির দাগ লেগে থাকে না। কাজ করে করে কেমন এক কৌশল আয়ত্ত কবেছে অথবা বড-টিন্ডাল যেন শুধু এই জাহাজে আছে আগয়ালাদের নির্দেশ দেবার জন্য। বড-টিন্ডালকে স্টোক-হোলডে আরও বেশি কুশলী মনে হয়। কাজেব সময় কাজ। কোন আগযালার সাহস তখন বযলাবে স্টিম না রেখে সোজা দাঁড়িযে থাকে। যখন জাহাজে ঝডেব জন্য স্টিম ঠিক বাখতে পারে না আগয়ালারা, তখন এই বৃদ্ধ টিন্ডাল একাই একশো। মুহূর্তে কয়লায় সে ফার্নেস ভরে দেবে, তাবপব এয়াবভালব টেনে বলবে, দ্যাখ বে মিঞা, আগুন কাবে কয।

বড-টিন্ডালেব বড় পিয়ারের লোক ইদ্রিশ। ইদ্রিশই জাহাজেব ডংকিম্যান। সে থাকে নীচের বাংকে। বড-টিন্ডাল থাকে উপরের বাংকে। এক ঘরে এক সফরে সে বড়-টিন্ডালেব বান্দা। টিন্ডাল ওকে কোবানেব শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাচ্ছে। বাড়ি ফিরে ইদ্রিশেব আবেগ ঢেলে কোরান পাঠ সুতরাং ইমামের সামিল এই মানুষ। ইদ্রিশ নীচে নেমে দরজা ঠেলতে দেখল টিন্ডালের পেটির ডালা খোলা। সে দৌড়ে উপরে উঠে ডাকল, বড-টিন্ডাল।

বড-টিন্ডাল তখন বদনার জলে হাত-মুখ ধুচ্ছিল। এখন খাবাব সময়, এখন হাঁক-ডাকেব সময় নয়। খানা পিনা হবে। অজু হবে। নামাজ হবে। তাবপর মিঞা সময় বুঝে কথা কও। সুতবাং ডংকিম্যানেব এই হাঁক ডাকে বড-টিন্ডাল একটু বিরক্ত হল।

কী কথা কও?

নীচে যান। গিয়া দ্যাখেন আপনাব বড় পেটির ঢাকনা খোলা।

বড-টিন্ডাল সামান্য ভ্রূ কুঁচকাল।

ওডাতে আমার কিছু নাইবে মিঞা।

তাবপর হাসতে হাসতে বলল, গোস্তর ড্যাকচিটা লও।

ডংকিম্যানের বিশু বড়-টিন্ডালের সঙ্গে। ওরা দু'জন মাদুর বিছিয়ে খেতে বসে গেল। সামাদ, সুচারু এবং সুমন টেবিলের উপব ঝুঁকে খাচ্ছে। বড়-টিন্ডাল খেতে খেতে দু'বাব মুখ তুলে তাকাল। সামাদের পিছনটা দেখা যাচ্ছে। শক্ত ঘাড়। লম্বা মানুষ। সে ওস্তাদের মতো দু'বার ঢেকুব তুলে জল খেল বদনা থেকে। মাংসের টুকরো দাঁতের ফাঁকে, সে তার দাঁতকাঠিতে মাংসের কুচিটা বের করে ফুঁ করতেই সেই কুচি পাখার বাতাসে উড়তে উড়তে সামাদের পায়ের কাছে এসে পড়ল। ফের মাংসের বড় টুকরো লাল জিভে ফেলে দিয়ে বলল, ছাগল-পাগলের কাণ্ড ইদ্রিশ।

বলে টিন্ডাল গোস্তব হাঁড়ি থেকে বেশি পবিমাণে গোস্ত নিতে গিয়ে দেখল, সব হাড়, মাংস নেই। টিন্ডাল এবাব রুখে উঠল ভাণ্ডারির উপর, কেডায় আছ এহানে?

দু'নম্বর পরিব কয়ালায়ালা মুনিম মুখ বাড়াল জানালায়, কিছু বলছেন টিন্ডাল সাব?

ভাণ্ডারির কওতো আমি অরে ডাকছি।— বলে আঙুলে ইশারা করল।

ভাণ্ডারি এলে টিন্ডাল লুঙ্গি ধরে চিৎকার করে উঠল, তুমি অ-মিঞা ছাগল-পাগল হৈলা।

ক্যান সাব এই কথা কন?

কমু না।

হাণ্ডির মধ্যে তুমি ইসব কী রাখছ?

ইট্টু সবুর করেন। দিতাছি।

বলে ভাণ্ডারি কিছু নরম মাংস এনে দিলে খুব আয়েসি মানুষের মতো বয়ে মুখের হা বড় করে রসে ভেজানো গোল্লার মতো জিভের তলায় ফেলে দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। কী দেখল যেন, বুঝি সামাদকে। ইবলিশের বাচ্চার হিম্মত দেখে জল খেল ঢক ঢক করে। তারপর রসের কথা বলার মতো বলল, বোঝলা ইদ্রিশ, তোমার মনে আছে? ছোট পোলার সাদিতে ভুঁইয়ারা কীরকম একটা দাওয়াত দিছিল!

তা মনে আছে না।

ইবারে ভাবছি, দেশে গেলে তোমাগ সকলরে ভুঁইঞাগ ছোট পোলার যেফতের মতো একটা সাদির যেফত খাওয়ামু।

বলে সহসা টিন্ডাল এত জোরে হেসে উঠল যে, সামাদ বিষম খেল, কাচের গ্লাস ফেলে দিয়ে সুচারু জলে ভাসিয়ে দিল মাদুর এবং অন্য নাবিকেরা পর্যন্ত ছুটে এসে টিন্ডালের গোল গোল মুখ দেখার সময় বলল, এত হাসেন ক্যান?

হাসির সময়ে লোকে হাসে, না কান্দে?

ইদ্রিশ বলল, হাসে।

সামাদ খেতে খেতে হাত থালা থেকে উঠিয়ে নিল। সে মাথা গুঁজে সব শুনে যাচ্ছিল। সে খাচ্ছে না। ওর ইচ্ছা হচ্ছে এখন বড়-টিন্ডালের পাছায় লাথি মারতে। লাথি মেরে নদীর জলে ফেলে দিতে। অথবা দূরে নিয়ে গিয়ে পেটে লাথি। জবাই করা ষাঁড়-গোরুর মতো ছটফট করতে করতে এই নৃশংস ইতর লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ুক এবং এও হতে পারে সামাদ স্থির থাকতে না পেরে বোধহয় পাছাতে এই মুহূর্তে লাথি বসিয়ে দেবে। সে উঠে দাঁড়াল। চোখ লাল করে বড়-টিন্ডালকে দেখল।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনও উঠে গেল। হাত ধরে বলল, এই, তুই না খেয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

কোথাও যাচ্ছি না। হাত ছেড়ে দে।

খেয়ে যা। তোর ভাত নিয়ে কে বসে থাকবে?

ভাত ফেলে দে। খাব না।

কী ছেলেমানুষি করছিস সামাদ?— বলে সুমন জোর করে ওকে টেনে আনতে চাইল।

হাত ছাড় বলছি।

না হাত ছাড়ব না। না খেলে ছাড়ব না।

ছাড়বি না?-- বলে সে এমন জোরে ঠেলে দিল সুমনকে যে সে গিয়ে টিন্ডালের ঘাড়ে পড়ল। মাথাটা দেয়ালে ঠেকতেই রক্তপাত হল। সকলে ছুটোছুটি করে মেসরুমে যেতেই দেখল, সুচারু সুমনকে ফোকশালে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বরফ দিচ্ছে এবং এই দুপুরে দুঃসহ গরমের ভিতর পিছিলে কোলাহল পড়ে গেল। সুচারু এবং অন্য নাবিকেরা ভেবে পেল না, কেন সামাদ এমন সব গোঁয়ার্তুমি করছে। মারধোর করছে। সারেং পর্যন্ত চিৎকার করে উঠল, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সে ছুটে নীচে সুমনের ফোকশালে ঢুকে বলল, কী হয়েছে বল। কাপ্তানকে আমি নালিশ দেব।

সুচারু বলল, কিছু হয়নি সারেং সাব।

সুমন বলল, সামান্য কেটে গেছে। জোর করতে গেছিলাম, ওর সঙ্গে আমি পারি!

ডংকিম্যান নীচে নেমে বলল, সারেং সাব, যদি এর বিচার আপনি না করেন তবে আপনাকে আমরা কিন্তু ছাড়ব না।

সুচারু লাফ দিয়ে বাংক থেকে নেমে হুংকার দিয়ে উঠল, কার বিচার করবে মিঞা? যাও বলছি এখান থেকে।— বলে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

তবু লোকগুলি যাচ্ছিল না। দরজায় ওরা ভিড় বাড়াচ্ছে। খবর এভাবে চাপা দিতে চাইলে কাপ্তানের ঘরে পৌঁছতে সময় বেশি নেবে না। সুচারু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলল, সারেং সাব, আপনি ওদের যেতে বলুন। বেশি লাগেনি। একটু কেটে গেছে। বরফ দিতেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

এই দেখুন।— বলে সুমন উঠে এসে মাথাটা দেখাল সারেং সাবকে।

এবার আপনারা যান।

ওরা চলে গেল। সামাদ চুপচাপ বসে ছিল একপাশে। এই ব্যবহারের জন্য সে সংকোচবোধ করছিল। ভিতরে কী যেন এক গ্লানি অথবা উত্তেজনা অথবা এমনও হতে পারে শরীরের ভিতর সেই রোষের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিয়ত জ্বলছে। সালিমার কোমল মুখ এবং অসহায় চোখের সুষমাটুকু স্মৃতির ভিতর ভেসে উঠলেই সে যেন কেন পাগলের মতো হয়ে যায়। এই বড় টিন্ডাল রহমান খেতে বসে ওকে নানাভাবে অপমান করার বাসনাতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সে ওর পাছাতে লাথি মারার জন্য উঠেছিল, অথবা সে যে কী করতে উঠে গেল খাবার ফেলে এখন এ মুহূর্তে বুঝতে পারল না। সে চোখ-মুখ বুজে বাংকে পড়ে থাকতে চাইলে সুমন কাছে এসে দাঁড়াল।

যা এবারে উপরে উঠে খেয়ে নে। যেভাবে ধাক্কা মেরেছিলি আমি কিন্তু খতম হয়ে যেতে পারতাম।

সামাদ কোনও কথা বলল না। ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকল। সুচারু খাবার উপর থেকে নিয়ে এল এবং খেতে দিলে সে চুপচাপ খেতে খেতে অঝোরে কাঁদতে থাকল। সুচারু এবং সুমন কিছুতেই বুঝতে পারছে না, সামাদ এখন খেতে খেতে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে কেন? সুচারু বলল, যা, খেতে বসে কেউ কাঁদে নাকি?

সুমন বলল, তুই কেন কাঁদছিস বল তো?

সামাদ উঠে গেল। পোর্ট-হোল খুলে নদীর জল দেখতে থাকল। ওর বুকটা কতক হালকা যেন। সে বলল, কবে আমার চিঠি আসবে সুমন?

দেখিস তোর বিবির চিঠি আমরা এ বন্দরেই পাব।

বস্তুত সুমন এবং সুচারু শুধু আশ্বাসই দিতে পারে। বড়-টিন্ডালের সঙ্গে এখন যেভাবে বিবাদ চরমে উঠছে, ক্রমশ যেভাবে সামাদ মরিয়া হয়ে উঠছে সময়-সময় অথবা কেমন যেন এক হিংসা এবং জ্বালা উভয়ে উভয়ের প্রতি গড়ে তুলছে। ভিতরে ওদের কী এক রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই সফরের প্রথম দিন থেকে মনে হয় বড়-টিন্ডাল সামাদের সাত রাজার ধন এক মাণিক্য লুকিয়ে রেখেছে, দিচ্ছে না, অথবা চুরি করে নিয়েছে সব। সুচারু সারেং সাবকে ডেকে বলল, বড়-টিন্ডালকে সামলাবেন। আমার ভয় হচ্ছে, বড়-টিন্ডাল আগুন নিয়ে খেলা করছে।

জানি না বাবু! তোমরা যা খুশি করো।

সুমনের আঘাত খুব যে সামান্য ছিল তা নয়। চোয়ালে লেগেছে। চোয়ালের নীচটা ফুলে উঠেছে। সে বসে বসে বরফ লাগাচ্ছে এখন। তারপর সব বরফটুকু জল হয়ে গেলে সামাদ এসে সুমনের সামনে দাঁড়াল। বলল, আমি পাগল হয়ে যাব সুমন।

পাগল আর হতে হবে না। এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো শুয়ে থাক। ডেক সারেংকে বলে ছুটি করিয়ে দিচ্ছি।

সুমন এবং সুচারু বের হয়ে যেতে চাইলে সামাদ বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।

বলে সে বালিশে হেলান দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। সামাদ কেন রেগে যাচ্ছিল টিন্ডালের উপর, কী সন্দেহ তার, কোন সংশয় ওকে এমন করে মাঝে মাঝে পাগল করে দিচ্ছে, সব খুলে বলতে পারলে ভাল হত। অথচ এমন এক ঘটনা যা খুলে বলা যায় না, খুলে বললে ওর সংশয়কে যদি আদৌ গুরুত্ব না দেয় ওরা, যদি ভাবে, সত্যি পাগল বনে যাবে সামাদ। সংশয় এবং সন্দেহ সামাদকে পাগল করে দিচ্ছে। বড-টিন্ডালের এই বয়স, বয়সে সালিমার মতো যুবতী বিবি নিকাহ— না, তা কী করে হয় — কিন্তু সব হয় সুমন, এই বড়-টিন্ডাল সব করতে পারে। সামাদ বালিশে মুখ গুঁজে দিল এবার। তারপর ধীরে ধীরে এক গ্রাম্য ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল, মাঠ পার হলে বড় এক অশ্বত্থগাছ। গাছের নীচে ছোট নদী। নদীতে এখন আর কত জল, বুঝি হাঁটুজল থাকে। নদীর ওপারে ঘর। বৈশাখী উঠলে সালিমা ওর ঘরে গোরু-বাছুর নিয়ে যাবার জন্য নদী পার হয়ে, যেন ছোট নদীটি

পার হচ্ছে, ছোট এক বালিকার মতো নদী পার হয়ে মাঠে যব গম ফসলের ভিতর ওর সেই গাভী-সকলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর ঝড়। কী ঝড়, কী ঝড়! সেই ঝড়ের ভিতর পড়ে সে পথ হারিয়ে অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় যুবকের জন্য অপেক্ষায় আছে! ঝড় থামলেই সেই যুবক নদী ধরে নৌকায় উঠে আসবে। আর মনে হল তখন দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। সে নেমে দরজা খুলে দিল। বার্ট সামনে দাঁড়িয়ে। কালো মানুষ। চোখ শ্বেতপাথরের মতো সাদা। বার্ট সোজা ফোকশালে ঢুকে সুমনের বাংকে বসে পড়ল। সামাদকে বলল, কাজে যাওনি?

শরীরটা ভাল নেই।

বার্ট ফিসফিস করে বলল, তোমাদের জন্য একটা জিনিস এনেছি।— বার্ট এমন ভাবে বলল, যেন কত গোপনীয় বস্তু সে কিনার থেকে তুলে এনেছে।

কী এনেছ দেখি?— সামাদ সেই গোপনীয় বস্তুটি দেখতে চাইল।

বার্ট এবার হাসল।

আমার মা তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের কথা বলতেই মা বললেন, ওরা তো কিছু ভাল-মন্দ খেতে পায় না জাহাজে, তুই ওদের জন্য এটুকু নিয়ে যা।

সামাদ বলল, তোমার মাকে একদিন জাহাজে নিয়ে এসো না! আমরা দেখব। আলাপ করব। তোমার মাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়।

বস্তুত সামাদ এই বৃদ্ধ মহিলার অসামান্য এক ভালবাসা এবং স্নেহের স্পর্শে বড়-টিন্ডালের নিষ্ঠুরতার কথা ভুলে গেল।

বার্ট বলল, মা সারারাত জেগে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন।

বলে সে তার ব্যাগ থেকে একটা বাক্স বের করল। পদ্মফুলের মতো তিনটে ফুল। দুধ, ডিম, মাখন এবং ময়দা দিয়ে তৈরি এই তিনটে ফুলের ভিতর থেকে মিষ্টি গন্ধ উঠছিল। ছোট একটা প্যাকেট, প্যাকেটের ভিতর গ্রিনপিজ সিদ্ধ এবং আরকে রাখা ভেড়ার মাংস। তারপর ক্যাবেজ এবং ফুলকপির সিঙারা-প্রায় দেখতে এক রকমের খাবার। মনে হল সামাদের, স্পর্শ করলে টের পাওয়া যাবে বার্ট এবং তার মা কত যত্ন নিয়ে এসব করে দিয়েছেন। ভালবাসার স্পর্শে কী জাদু আছে কে জানে, সামাদ তার সব ক্ষোভের কথা ভুলে গেল। সে ফের বলল, আমাদের নামতে দিচ্ছে না বার্ট। নামতে পেলে ওঁর সামনে বসে একদিন খেয়ে আসা যেত।

বার্ট শেষে বের করল সেই মদ। অবশ্য এই মদে তত ঝাঁজ নেই। তত কড়া নয়। তত মাতাল করবে না। সে তার মাকে এইসব সরল অকপট নাবিকদের গল্প করার সময় মদ খাওয়ার গল্প করেছে। সুতরাং তিনি তাদের জন্য কম ঝাঁঝের, কম কড়া হবে এবং তেমন মাতাল করবে না, তেমন মদ পাঠিয়েছেন। বার্ট বলল, সুমন, সুচারুকে দেখছি না?

ওরা উপরে কাজ করছে।

তোমরা কিন্তু খাবে।

এই বার্টকে এখন দেখলে মনেই হয় না, বার্ট হইচই-প্রিয় মানুষ। বার্ট বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসল। বলল, সুমনকে খুব ঝেড়েছে শুনেছি।

সামাদ সংকোচ বোধ করছিল কথার জবাব দিতে, সে চুপ করে থাকল। বার্ট সামাদের এই সংকোচটুকু দূর করে দেবার জন্য বলল, আরে, একসঙ্গে থাকলে এসব হয়।

তুমি বসো। তোমার জন্য আমি একটু চা করে আনছি।

দু'লাফে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল সামাদ। কিছু জাহাজি ওকে এড়িয়ে চলছে। সে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করল না। যেন বার্ট এসে ওর যা সামান্য গ্লানি ছিল সব দূর করে দিয়েছে। সে চা করে ফিরে এসে দেখল সুচারু বার্টের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সুমন স্নান সেরে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সে সাজগোজ করছিল। সে একটা কেক খাচ্ছিল। ওর সবুর সইছিল না। কারণ জেটির ওপাশে বড়-রাস্তায় মারিয়ার গাড়ি ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সে সাজগোজ করার সময় শিস দিচ্ছিল। হেনরি তাড়া দিচ্ছে। সে মেসরুম বয়কে দু'বার পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছে আর কত দেরি সুমনের।

বার্ট বলল, কী ব্যাপার? তুমি যাচ্ছ কোথায়?

সুমন সব খুলে বলল না। সামাদ এবং সুচারু পর্যন্ত বিরক্ত বোধ করল, বার্ট জানে ওদের নামা বারণ। বার্ট জানত, সুমন ইন্ডিয়ান, সে যতই সুপুরুষ হোক, জাত এবং অঞ্চলের জন্য সে প্রায় নিগ্রোদের সামিল। সুতরাং সকলেই প্রায় নির্বাক থাকলে সুমন জবাব দিল, যাচ্ছি হেনরির কেবিনে।

হেনরি!

আমাদের জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রি।

সেখানে কিনার থেকে ওর আত্মীয়স্বজন উঠে আসার কথা আছে।— সুমন সব খুলে বলতে চাইল না।

সুচারু বলল, ফুটফুটে মেয়ে আসবে। আমাদের সে মেয়ে ফুলের মতো। নাম মারিয়া, মারিয়া ট্যালডন।

ট্যালডন! ওফ! অ্যান আগলি ফ্যামিলি! হরিবল! অ্যান আগলি গার্ল!

সামাদ বলল, তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না বার্ট। খুব সুন্দর মেয়ে। গোলাপ ফুল দেখেছ? তাজা গোলাপ? শিশিরে ফোটা নয়। বেশ বসন্তের দিনে ফোটা, তেমন দেখতে মারিয়া।

এই ছোট্ট শহরে ট্যালডন পরিবার নিগ্রোদের কাছে সেই এক রেটল সাপের মতো ভয়ংকর। সুতরাং বার্ট বলল, ওরা কী নৃশংস তোমরা জানো না।

সামাদ বলল, কেন, ওরা কী করল?

বার্ট কী ভাবল। সে একটা চুরুট টানছিল। সে সেই চুরুটের ছাই পোর্ট-হোলে ঝেড়ে এসে বসল। বলল, ভারোদি ট্যালডন এখানকার ন্যাশনাল স্টেটস রাইট পার্টির সর্বময় কর্ত্রী। ওর স্বামী লিবারেল ছিল বলে তাকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি।

কী বলছ!—- সুচারু প্রায় আঁতকে ওঠার মতো বলল।

এরা এই অঞ্চলের বনেদি পরিবার। আমরা একদিন শুনলাম মিস্টার ট্যালডন মারা গেছেন। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে গুজব ছড়ানো হল।

আত্মহত্যাও হতে পারে।

আরে না, আগের দিন তিনি আমাদের কিঙের সঙ্গে পদযাত্রায় বের হয়েছেন। পরদিন এই কাণ্ড।

বার্ট এবার আপনজনের মতো সুমনকে সাবধান হতে বলল।

তুমি সাবধানে থাকবে! বেশি মেলামেশা করবে না।— তারপর কেমন শক্ত হয়ে গেল বলতে বলতে, ওদের শুধু আমরা ঘৃণা করতে পারি সুমন। তোমার যাওয়াটা আমার কেন জানি ভাল লাগছে না। এদের যা কাণ্ড! ইচ্ছা করলে জাহাজেই তোমাকে গুম করে দিতে পারে।

সুমন বলল, আমরা আর এখানে ক'দিন মাত্র। তারপর বার্ট আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। অন্য কোনও বন্দরে। পথে শুধু সমুদ্র, কোনও কোনও সময় দ্বীপ এবং নারকেলগাছ। আর আমাদের এই নিঃসঙ্গ জাহাজ, সে যে কী নিঃসঙ্গতা বুঝবে না বার্ট। আমি, সুচারু, সামাদ তখন অনর্থক এই ফোকশালে খচসা করব। পাগলের মতো অপেক্ষা করব তীরের জন্য। মানুষের মুখ দেখার জন্য কতদিন ছটফট করব।

তারপর বলার ইচ্ছা যেন, আমাদের এই মারিয়া সুতরাং বন্দরে প্রায় পদ্মফুলের মতো। সেই রাজপুত্রের গল্প মনে পড়ে গেল। দিন যায় মাস যায়। শুধু মরুভূমি। না জল, না আলো এবং বাতাস। এবার রাজপুত্র বুঝি মরে যাবে, কোথাও কিছু নেই। না ফুল ফল, না পাখি। শুধু এক দিঘি সামনে। মাঝে এক পদ্মফুল। রাত হলে পদ্মফুলের পাপড়ি খুলে যায়। সুন্দরী এক রাজকন্যার মুখ সেই ফুলের ভিতর! সেই ফুল ফোটার অপেক্ষাতে রাজপুত্র সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মরুভূমির কথা ভুলে তীরে বসে থাকে। সুমন এখন সেই রাজপুত্রের মতো। সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে ফুল ফোটার অপেক্ষাতে বসে আছে। সে বার্টের হাত চেপে বলল, মারিয়া বড় ভাল মেয়ে বার্ট। সে আমার তোমার মতো অকপট, সরল। কথা বললে, তুমি তাকে না ভালবেসে পারতে না।

ওরা আমাদের বড্ড ঘৃণা করে সুমন। ওরা কালো মানুষের শত্রু।

সুমন বলল, আমি জানি বার্ট।

ওরাই তোমাদের বন্দরে নামতে দিচ্ছে না।

জানি বার্ট।

তোমরা গান্ধী পিপল। তোমরা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পবতে পারো।

বার্ট ক্রমশ বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সে বলল, আমার স্ত্রী আমাকে সব বলেছেন। তোমার দেশের কথা তাঁব মুখেই প্রথম শুনি। তিনি আমাকে তোমাদের মহাত্মার কথাও বলেছেন।

তারপব সে চুরুটটা ফেলে দিয়ে বলল, তোমাব আত্মসম্মানে বাঁধছে না ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে?

সুমন চুপ করে থাকল সামান্য সময়। ওব সত্যি ভাল লাগছিল না। বার্টের ওপর সে কেমন বিরক্ত বোধ করছিল। তবু বার্ট যখন আপনজনের মতো কথা বলে তখন যেন না শুনে না মান্য করে থাকা যায় না। বার্ট বালকেডে হেলান দিয়ে এখন সুমনের মুখ দেখছে। ঘর অন্ধকার। কারণ সূর্য নেমে গেছে নদীব ওপারে। বার্চগাছ এবং পপলাবেব গাঢ় নির্জনতা পোর্ট-হোলের ভিতরেও যেন ছায়া ফেলেছে। ফোকশালের ভিতরটা ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলে আলো জ্বেলে দেওয়া হল। বার্ট সুমনের অসহায় মুখ দেখে, মানুষেব নাবীজাতির জন্য এক আকর্ষণ, ওর স্ত্রী কোথায় এবং কতদূরে সে যেন এখন বলতে পারে না, কিঙের সঙ্গে কোথায় চলে যাচ্ছে সে জানে না, সে কেমন একা এবং নিঃসঙ্গ, সাবাদিন কাজেব পব ঘবে ফিবলে একমাত্র স্ত্রীব ছবি সম্বল থাকে, সে সেই ছবির ভিতর ডুবে থাকে, নদীর শান্ত নির্জনে অন্ধকাবে সে একা একা হেঁটে বেড়ায়, সুমনকে দেখে তার সেই নির্জনতাব কথা মনে পড়ল। ভিতবে বুঝি সেই কষ্টটা কাজ কবছে সুমনেব, মানুষেব শুধু স্ত্রীজাতির জন্য এক আকর্ষণ। সে বলল, আলাপ কী করে?

হেনবিব ঘবে ভাগোদি এসেছিলেন। সঙ্গে ও এসেছিল।

যেমন সন্তান পিতাকে কৈফিয়ত দেয় সুমনেব কথাবার্তার ভঙ্গিতে তেমন একটা ভাব ছিল।

যাও। — বার্ট যেন পিতৃসুলভ আদেশে কথাটা বলল।

কিন্তু সাবধানে বাছা, ওবা যেমন কালো মানুষ ঘৃণা করে তেমনি শুনেছি সুন্দর মানুষের মাথা পেলে চিবিয়ে খায়।

বলে এমন জোবে হাসতে থাকল বার্ট যে ওরা সকলেই বিস্মিত। কেমন পাগলের মতো হাসতে থাকল বার্ট। ওবা দেখল বার্টের অসহায় মুখে কী এক করুণ যন্ত্রণা ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠে আবাব মিলিয়ে যাচ্ছে। শতবর্ষেব অসম্মান, অপমান এবং অবমাননা জাতি সম্পর্কে, দেশ সম্পর্কে এবং মানুষ সম্পর্কে ভয়ংকব এক অবিশ্বাস গাঁথা হয়ে গেছে। সে, ভাল কিছু থাকতে পাবে এইসব শ্বেতকায় মানুষদেব ভিতব, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাবছে না। ঘৃণা, উৎকট বিদ্বেষ এবং শত্রুর মতো আচরণ - সেই এক সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করার সময় সুমন দেখল, দবজায় হেনরি উঁকি দিচ্ছে। বলছে, এই ওজালিও, মারিয়া এসে বসে আছে। জলদি জলদি।

যত দ্রুত এসেছিল হেনবি, ঠিক তত দ্রুত সে উপরে উঠে গেল। আর সুমন হেনরির লেজ ধরে গাছ থেকে গাছে লাফ দেবাব মতো দু'লাফে ডেক পাব হয়ে হেনরির কেবিনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবই নিদারুণ তৃষ্ণাব মতো।

সুমন হেনরিব কেবিনে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মারিয়ার পাশে বসে প্রথম রুমালে মুখ মুছে কী দেখল ঘরের ভিতব, তারপর বলল, কতক্ষণ?

মাবিয়া মুখোমুখি বসে। কী ভাবল, তারপর বলল, অনেকক্ষণ।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

তোমার দেরি দেখে হেনরিকে বললাম, চলো ওজালিওর কেবিনে গিয়ে বসি।

সুমন তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলল, গেলে কোথায়?

হেনবি যে ভয় দেখাল।

সুমন স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল, ভয়! কীসের ভয়।

হেনরি বাধা দিল কথায়।

ওজালিও, তুমি মাবাত্মক কথা বলছ।

মারিয়া বলল, ভয় আছে। কী বলো হেনরি?

হেনরির তর সইছে না। তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে নেমে বন্দরের পথে হাঁটতে চায়। সে বলল, পথে সব শোনা যাবে।

বলে হেনরি দেরি করল না। দরজা বন্ধ করে গ্যাংওয়েতে নেমে গেল। তারপর জেটি। বড় বড় ক্রেন। ওরা ক্রেনের নীচ দিয়ে হাঁটতে থাকল।

কেবিনটা হেনরির পাশে নিলে না কেন?— মারিয়া হাঁটতে হাঁটতে সুমনকে প্রশ্ন করল।

কিছু অসুবিধা ছিল মারিয়া।

অসুবিধা কেন?

সুমন কী জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না, সে ধরা পড়ার ভয়ে কেমন আমতা-আমতা করতে থাকল। এবং হেনরি এ সময় সুচতুর নাবিকদের মতো ফের গল্প আরম্ভ করে দিল। বলল, ও হতভাগাব কথা আব বলবে না। জাহাজে উঠেই পিছিলে নিরিবিলি একটা কেবিন বেছে নিলে। কত বললাম, কলকাতা থেকে যখন সব ইন্ডিয়ানরা উঠবে তখন বুঝবে ঠেলা। বাবু তখন বললেন, দেখা যাবে। দ্যাখো এখন। কী মজা বোঝো।

আমার তো ভালই লাগছে।— সুমন হেনরির চেয়ে চতুর হবার চেষ্টা করল। বলল, চলে তো যাচ্ছে। ওরা কিন্তু খুব ভাল লোক মারিয়া। কী বলো হেনরি!

সুমন হেনবির দিকে চোখ টিপে হাসল।

তা ঠিক।

আমাদের ইন্ডিয়ানদের মতো?— মারিয়া হাতের দস্তানাটা ভাল করে টেনে দিল।

পশ্চিম দিকের বড় গুদামঘরটা পার হলে সুমন বলল, কালো মানুষের ভয়ে বুঝি আমার কেবিনে গেলে না!

হেনরি যে বলল, তোমার চারপাশে সব ব্ল্যাক পিপল।

ওবা কিন্তু ঠিক ব্ল্যাক নয়। ওদের রং বাদামি।— উইচককেব পথে উঠে যাবার মুখে মারিয়াকে ভুল শুধবে দেবার চেষ্টা করল!

মারিয়া বলল, ওই একই কথা।

ব্ল্যাকদের ভয় পাও কেন বুঝি না। ওদের ঘৃণা করারই বা কী আছে। আমরা মানুষ, ওরাও মানুষ।— সুমনেব অন্তর থেকে কথাটা উঠে এল।

কে বলেছে ভয় নেই ওজালিও!— হেনরি প্রায় বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত কবতে চাইল সুমনকে।

সুমন সরল অকপট মানুষ। সে বুঝতে না পেরে খেপে গেল, কীসের ভয় হেনরি। এত ভাল লোক হয়। এমন সরল অকপট মানুষ তুমি পাবে?— বলতে বলতে সুমনের চোখ-মুখ রাগে কুঁচকে যাচ্ছিল।

হেনরি তাড়াতাড়ি চোখ টিপে দিল।

ওজালিও, তুমি একটা আহাম্মক। যা তুমি জানো না, আর জানবেই বা কী করে। মাত্র প্রথম সফর দিচ্ছ ওদের সঙ্গে। ওরা কী ভয়ংকর আমি জানি।

হেনরি চোখে-মুখে এমন এক কদর্থ ফুটিয়ে তুলল যে, মারিয়ার সরল চোখে প্রায় কান্না জমে উঠেছে।

মাবিয়া বলল, লক্ষ্মী ওজালিও, তুমি কাল থেকে হেনরির কেবিনে চলে এসো।

হেনরি গাড়ির ভিতর ঢুকে বসতে বসতে বলল, ওজালিওকে কিন্তু ওরা খুব ভালবাসে মারিয়া। খুব ভালবাসে। আমি তো দেখেছি। ভালমন্দ সব ওকে দিয়ে তবে খায়।

সুমন দেখল গুডুই স্টিয়ারিং-এ বসে আছে চুপচাপ। হেনরি গুডুইয়ের পাশে বসে গেছে। সে মাবিয়াকে নিয়ে পেছনের সিটে বসল। গুডুইকে দেখে যে সামান্য ভয়টুকু জন্মেছিল, পিছনে মারিয়ার পাশে বসে সে ভয়টুকু ভোলার চেষ্টা করল।

মারিয়া বলল, ওরা খুব ভালবাসে?

খুব খুব।

আমি কত বলেছি ওজালিও, তুমি থেকো না ওদের সঙ্গে। আমার পাশের কেবিনটা কাপ্তানকে বলে

ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি চলে এসো। কিন্তু ছোঁড়া কিছুতেই আসবে না।

মারিয়া সুমনের হাত চেপে ধরল, ওজালিও, বলো তুমি আসবে।

হেনরি যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, ও আর আসছে!

কেন আসবে না?— মারিয়া হেনরির কাঁধের উপর ঝুঁকে কারণটা জানতে চাইল।

ব্ল্যাক ইন্ডিয়ানগুলো শুধু ওকে ভালবাসে না, হতভাগাটাও ওদের ভালবেসে ফেলেছে।

ওটা কিন্তু ঠিক নয় ওজালিও।— মারিয়া কেমন মুখ গোমড়া করে ফেলল।

তুমিই বলো, ওটা ঠিক!— হেনরি কপট ভঙ্গিতে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল।

সুমন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হেনরির এইসব কপট উক্তি সুমনকে খুব বিব্রত করছে এবং মাঝে মাঝে সে আন্তরিক ভাবে কালো মানুষের সপক্ষে বলার সময় দেখছিল, মারিয়ার বড় বড় চোখ আরও বড় হয়ে যাচ্ছে।

মারিয়া সুমনকে ভয় দেখানোর জন্য বলল, দাঁড়াও, মাকে বলছি।

এই নাও! হয়ে গেল।— সুমন ভয়ে টেঁসে গেল।

মারিয়া সোজা হয়ে বসল এবার। এ সময়ে সুমনের মনে হল মারিয়া আর কিশোরী নয়, যুবতী। মারিয়া চোখ টান টান করে কথা বলছে।

তবে বলো, চলে আসবে হেনরির কেবিনে।

হেনরি এবার সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে ভেবে বলল, আরে না না, ও ওখানেই থাকুক। ওকে আমরা জোর করে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে চাইলে জাহাজে বিদ্রোহ দেখা দেবে।

ওঃ!— যেন কত বুঝে ফেলেছে মারিয়া। সে এবার সুমনের দিকে সামান্য চোখ তুলে তাকাল। যেন ওই সুম্যান দ্য ওজালিও সার্কাস খেলোয়াড়। চারিদিকে সব বন্য জীব। সিংহ, বাঘের খেলা। ওপোসাম দুটো-একটা আছে। সুমন সব বন্য জন্তু নিয়ে রিঙের ভেতর খেলা করছে। ওর বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল দানবের মতো, অথবা আরও ভয়ংকর, ওজালিওকে ওরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। যত বিস্ময় বাড়ছিল তত এই তরুণ যুবকটি সম্পর্কে হৃদয়ের গভীরে স্নেহ বলা যেতে পারে অথবা মায়া মমতা এবং এক অসীম আকর্ষণ, ঠিক এক মরুভূমির জলাশয় যেন, এই যুবক মারিয়াকে ক্রমশ ভালবাসায় আবদ্ধ করে ফেলছে।

হেনরি বলল, সুমন সেখানেই ভাল আছে।— তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেনরি ফিস ফিস করে বলল, মাকে এসব আবার বোলো না। তিনি শুনলে দুঃখ পাবেন।

হেনরির কথা শুনে মারিয়া একেবারে শান্ত। সে বার বার সুমনকে দেখবে বলে চোখ তুলছিল, কিন্তু সামান্য তুলতেই ওজালিওর শান্তশিষ্ট মুখ ওকে বড় বিচলিত করছিল। ভালভাবে চোখ তুলে দেখতে পর্যন্ত বুক কাঁপছে। বেসবলের মাঠ এবং অশ্বশালার পাঁচিল পার হয়ে শহরের বড় পথ। দু'পাশে নানা রঙের ঘরবাড়ি, পারসিমন গাছের সুমিষ্ট গন্ধ এবং হ্রদের জলে লাল নীল রঙের বাতি। এখন বসন্তের উৎসব মনে হয় সর্বত্র। বসন্তকালীন গমের শিষ হয়তো কোথাও এখন দুলছে। বাতাসে তার গন্ধ। মাঠ নদী অতিক্রম করে সে ঘ্রাণ এখন ওদের মথিত করছে।

মারিয়া গাড়িতে বসে শুধু ভাবছিল, এই ওজালিও, জাদুকরের পালিত পুত্র ছোট্ট এমিলের মতো মানুষটি এখন ইচ্ছা করলেই ফুল ফোটাতে পারে। সে মনের ভিতর ডুবে যেতে যেতে শুনতে পেল, কোথাও কোনও আলোক-উজ্জ্বল রাত্রিতে দেবদূতেরা যেন গান গাইছে। যেন এক মরুভূমির উপর দিয়ে সেই জাদুকর পুত্রের হাত ধরে হাঁটছে। পুত্র ইসাক, এব্রাহাম এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপের ভিতর পুত্রকে ঈশ্বরের নামে নিবেদন করছেন। পুত্র ইসাক মৃত্যুভয়ে এতটুকু কাতর ছিল না। অপার এক সুষমামণ্ডিত মুখ ইসাকের। সেই মুখ ধারণ করে আছে যেন ওজালিও। বস্তুত ভালবাসার ফুল ফুটতে থাকলে যেমন হয়, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু অলৌকিক এবং যা কিছু নির্মল জলের মতো স্বচ্ছ, সবই ফুল ফোটাবার জন্য। ধীরে ধীরে গোপনে ওজালিওর হাত মারিয়া কোলে নিয়ে বসে থাকল। বলার ইচ্ছে, তুমি আমাকে জড়িয়ে থাকো। তোমার উষ্ণতায় আমাকে উত্তাপ নিতে দাও। আরও কত কিছু বলার ইচ্ছা মারিয়ার। কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না। সে কেমন অকুণ্ঠ চিত্তে চুপচাপ বসে দূরে এক সমুদ্র দেখতে পেল। সমুদ্রে সাদা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে। তার সেই দেবদূত ডেক-এ

দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। এক অলৌকিক হাত। সেই অলৌকিক হাতের স্পর্শ মানুষের জন্য বুঝি শুধু ভালবাসা বহন করে এনেছে। কিন্তু সমুদ্রে সেই জাহাজ মনের আয়নায় বেশিক্ষণ দেখতে পেল না মারিয়া। জাহাজ ক্রমে হারিয়ে গেল। শুধু পোর্ট-হোলে তখন তার বাঞ্ছিত মুখ। তারপর ক্রমে সেই মুখও হারিয়ে গেল। শুধু দুই চোখ। দুই চোখে টুপটাপ শিশিরের মতো অশ্রুপাত। মারিয়া অবলম্বনের জন্য সুমনের হাত অজ্ঞাতেই জোরে চেপে ধরল। আর তখন দেখল সামনে সেই দুর্গের মতো বাড়ি। বাড়ির সদর দরজা খুলে যাচ্ছে। বড় কালো রঙের গাড়িতে দু'জন নাবিক। সদরে আজ বড় বড় লণ্ঠন দুলছে। লনে কত সব গাড়ি এবং কত সব বিচিত্র পোশাকে যুবক-যুবতীরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। চপল এবং কপট উল্লাস সকলের ভিতর। সকলে নাচের শুরুতেই মদ খেতে আরম্ভ করেছে।

তেরো

সামাদ ওপরের বাংকে শুয়ে শুয়ে পা নাড়ছিল। নীচে সুচারু ঘুমোচ্ছে। এবং ফোকশালে আলো জ্বলছিল। সুমনের ফিরতে দেরি হবে, সে বন্দরে নেমে গেছে। সামাদের এখন সাত-পাঁচ চিন্তা, ওর ঘুম আসছিল না। ওর কেবল সালিমার কথা মনে পড়ছে। ভিতরে ভিতরে এক অহরহ আগুন সামাদের। কী যেন সে ফেলে এসেছে, সফর শেষে বাড়ি ফিরে সেই পদ্মফুলের মতো মুখ আর বুঝি ভেসে উঠবে না। সামাদের চোখ জ্বলছে। সে রাগে ফুঁসছে। অথবা মনের ভিতর বেশি ডুবে গেলে সব প্রায় আবশির মতো। সে দেখতে পায় সালিমা রুপোর মল পায়ে পুকুরে ডুব দিয়ে ফিরছে। দেখতে পায়, পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের নীচে। অথচ কী আশ্চর্য, আজ সালিমার মুখ কিছুতেই মনে করতে পারছে না। সালিমা কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করতে যাচ্ছিল, সালিমা, আমাকে ফেলে তুই কোথায় যাবি?

এভাবেই সব হয়ে যাচ্ছিল। বন্দরের পর বন্দর এসেছে আর সামাদের প্রতীক্ষার সময় বেড়েছে। কার চিঠি এল, কে চিঠি দিল! চিঠি! সারেং সাব এক-এক করে সব চিঠি বিলি করে দিচ্ছে, বন্দরে কেবল দেশ থেকে তার চিঠি নেই। সে চিৎকার করে দু'হাত তুলে বলতে চাইত, সালিমা, তুই কি এখন মাঠের ভিতর একা ফসল তুলছিস? অথচ বলতে পারত না, ওর গলা ধরে আসত। কারণ যত দিন যাচ্ছে তত সংশয় বাড়ছে, তত বড়-টিন্ডালের ষড়যন্ত্রের ফলে সে যেন হাঁসফাঁস করছে। এই বড়-টিন্ডাল ছলচাতুরি করে একটা সাদা কাগজ ওর কাছ থেকে হাতিয়েছে, তখন কী ভাল মানুষ টিন্ডাল! এখন মনে হয় এই শয়তান ইবলিশের গলা টিপে দিলে কেমন হয়! সে ক্ষণে ক্ষণে ডেকের উপর চিৎকার করে উঠত, তোমার কি কোনও ইমান নাই? বলো টিন্ডাল?

ক্রমে কত বন্দর পার করে জাহাজ আমেরিকার উপকূলে চলে এল। অথচ দেশ থেকে চিঠি এল না। ক্রমে সাত-আট মাস কেটে গেল। না চিঠি, না ভালমন্দ কোনও খবর। এই সফরে বড়-টিন্ডাল, গাঁয়ের মাতব্বর মানুষ বড়-টিন্ডাল, ওর সঙ্গে সফর দিচ্ছে। শিপিং অফিসে মাস্তার দেবার আগে ওয়াটগঞ্জের লাথিতে দেখা, রহমান গাঁয়ের লোক, সামাদ লাথিতে রহমানকে কার্যকারণে আল্লার সামিল ভেবে ফেলেছিল। এমন শয়তান মানুষটা, সফরে সফরে যার সাদি আর তালাকের ঘটা, সে প্রায় সামাদের সঙ্গে বাপের মতো ব্যবহার করতে লাগল। তখন সুখে-দুঃখে রহমান, অসুখে-বিসুখে রহমান, প্রায় যেন যথার্থই আল্লাহ রহমানে রহিম। অসুখে রহমান, বিসুখে রহমান, টাকা লাগে তোমার মিঞা, কত লাগে? লাগে লাও। বিদেশে বিভুঁয়ে পড়ে থাকবে, কিছু হলে দেশের লোককে মুখ দেখামু কী করে!— রহমান যথার্থই সামাদের কঠিন অসুখে বড় রকমের সাহায্য করে বসল।

সামাদ বলল, এত টাকা মিঞা শোধ দেব কী করে?

আরে মিঞা, টাকা বড় না মানুষ বড়?

বড়-মানুষ।— সামাদ এই ভেবে সাদা কাগজে একটা সই দিয়ে বলল, কাগজটা তোমার হুন্ডির মতো থাকল বড়-টিন্ডাল, ইদ্রিশ লিখে দেবে বাকিটা। সফর শেষে শোধ দিয়ে দেব। কাগজ আমাকে ফেরত দিবা।

আরে মিঞা!— রহমান তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল কাগজটাকে।— কাগজ বড়, না মানুষের জবান বড়? তবে দিছ যখন রাইখা দেই। মিঞা, তোমার তো কাঁচা বয়স। এই বয়সে মতি ঠিক থাকনের কথা না, দিছ যখন দ্যাও। যত্ন কৈরা রাইখা দেই।

সাদা কাগজে সই দিয়ে দিল সামাদ। ওর শরীর দুর্বল। গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ সামাদকে এই অর্থ সাহায্য বড় অসম্মানের দায়ে ঠেলে দিয়েছিল। সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে যেন বলার ইচ্ছা, মিঞা টাকা বড় না, মানুষ বড়। বস্তুত সাদা কাগজে আপাত-সম্মান রক্ষা করে ভেবেছিল, ভাল হলে ইদ্রিশকে দিয়ে কাগজটা পুরো লিখিয়ে নেবে। ওর শরীর দুর্বল এবং দুর্বলতা সেরে গেলে দু'-দশজনকে সাক্ষী রেখে গোটা অক্ষরে ইদ্রিশকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে, টাকা তোমার সফর শেষে শোধ। নয়তো দেশে গিয়ে তুমি যা মানুষ, দশজনকে ডেকে আমার জমি-জেরাতের উপর হাত বাড়াবে। চশমখোর লোক তুমি, মিঞা, তোমারে চিনতে বাকি নেই।

সামাদ আরোগ্য লাভের পর ভাবল, কাজটা ঠিক হয়নি। সাদা কাগজে সই করা ঠিক হয়নি। ইজ্জতের কথা ভেবে সে কাজটা করেছে। কিন্তু বড় কাঁচা কাজ, কী যে করে! একদিন বলল, কাগজটা দেখি রহমানসাব। কাগজটারে গোটা অক্ষরে লিখা দিই।

রহমান পেটি, বদনা এবং মায় বিছানার নীচে সর্বত্র খুঁজে বলল, কই যে রাখছি, এতদিন পরে কি মনে থাকে!-কিবা একটারে ব কাগজ। পরে তুমি অন্য কাগজে লিখা দিয়।

কিন্তু ব্রেজিলের ভিক্টোরিয়া বন্দরে সামাদকে রহমান শাসাল, তোমার ইজ্জত নাই মিঞা? পানিতে সব ইজ্জত ডুবাইছ!

সামাদ এখন এই বাংকে শুয়ে ভিক্টোরিয়া বন্দরে সেই সেতু এবং সেতুর মুখে অন্ধ মেয়েটির মুখ মনে করতে পারল। দু'পা ফাঁক করা মেয়েটি গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে ভিক্ষা চাইত। কী যেন ছিল মেয়ের শরীরে, অথবা যা হয়, লোনা জলে, লোনা অন্ধকারে শরীরের ভিতর নিয়ত কেবল কী যেন বাজে, এই শরীর তখন নিজের মনে হয় না। রাত হলে চোখ জ্বালা করে, হাত-পা উত্তেজনাতে অধীর হতে থাকে, তখন সালিমার চোখ-মুখ আর ভাসে না, এক বুক লোনা জল পার হলে কেবল এক কালো বেড়ালের মুখ চোখের উপর ভাসতে থাকে। সে লোভে-লালসায় বন্দর পার হয়ে অন্ধ ভিখারির হাত ধরে রাতে ডুব দিতে চেয়েছিল। প্রতি রাতে ডুব দেওয়া। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা জাহাজিদের পাগল করে দেয়। সবই সময়ের আহার। সুতরাং জাহাজি মানুষের আর ভালমন্দ বিচার! সে দেশের মাতব্বর মানুষ রহমানের তিরস্কারকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। আর রহমানও একটা অজুহাত পেয়ে গেল। সময়ে-অসময়ে ওর চরিত্রকে কটাক্ষ করে কথা বলছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সামাদ যে ইবলিশ এবং দোজখের পয়দিশ, না-পাক মানুষ, ইমানদার রহমান সে কথা বার বার প্রকাশ করছে। আর সেই থেকে চিঠি আসছে না। সেই থেকে সাদা কাগজটা সম্পর্কে সন্দেহ। বড়-টিন্ডাল রহমান সেই থেকে, বুঝি ওর কাজ হাসিল, ফাঁক পেলেই ডংকিম্যান ইদ্রিশের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে। সেই থেকে মনে হচ্ছিল বড়-টিন্ডাল রহমান বুড়ো বয়সে ফের সাদি-সমন্দের কথা ভাবছে। শেষ বয়সে সালিমার মুখ দেখে মাথা ঘুরে গেছে বড়-টিন্ডালের। হারমাদ মানুষ, করতে পারে না হেন কাজ নেই।

দেশ থেকে রহমানের চিঠি এলে সামাদ বলত, আমার কোনও খবর আছে মিঞা?

তোমার আবার খবর কী রে মিঞা!

সালিমার বাপের খবর, গাঁয়ের মানুষের খবর চিঠিতে থাকে না? সালিমার খবর?

কথা শোনো! সালিমার খবর আমারে দিব ক্যান? তোমার বিবি, তোমারে খবর না-দিয়া আমারে দিব। আল্লা!

বড়-টিন্ডালের মুখের ভিতর তখন সে একটা বড় গহ্বর দেখতে পেত। গহ্বরে হিজিবিজি সব কীট-পতঙ্গ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ সব কীট-পতঙ্গের হাত-পা-পাখা এবং চোখের কিছু অংশ যেন কচি-কাঁচা পেলে মানুষটির খেতে বড় লোভ। সেই সব কচি-কাঁচা পতঙ্গের অংশ মাঝে মাঝে ওর চোখে সালিমার চোখ-মুখ হয়ে দেখা দিত।

সে যেন শুনতে পেত কারা ফিস ফিস করে বলছে, বড়-টিন্ডাল রহমান দেন-মোহরের নামে সব সম্পত্তি সালিমাকে লিখে দিতে চাইছে।

সেই এক মাঠ, সবুজ এবং প্রায় যেন শস্য-দানাতে কোমলমতি এক বালিকা, বালিকাব মুখ সালিমাব মতো, কোনও এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় এসে সেই মাঠেব ফসল উপড়ে ফেলেছে। ফসলেব গাছ গাছালি সব গ্রামময় মাঠময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওব মনে হচ্ছিল ওগুলো ফসলেব অংশ নয় যেন সালিমাকে পাশবিক অত্যাচাবে হত্যা কবে গ্রামময় মাঠময় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও চুল কোথাও ছিন্নভিন্ন হাত-পা-চোখ। ধূর্ত ঝড়টা ঝোপেব আড়ালে বসে বসে হাসছিল। বহমানেব চোখেমুখে সেই ধূর্ত হাসি দেখে সে কেমন আঁতকে উঠত।

সে আব বাংকে শুয়ে থাকতে পাবত না। সে ধড়ফড় কবে বাংকে উঠে বসত। পাগল-প্রায় বলে উঠত, আমাব কাগজটা, সাদা কাগজটা।

সে যেন তাব চাবপাশে হাতড়ে হাতড়ে কী খুঁজত অনেকক্ষণ। তাবপব নিমেষে চোখ বুজে বলত, আল্লা, তুই ইমানদাব না হলে কী কবি।

সে নেমে গেল এবাব বাংক থেকে। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। ভিতবে তবুও যেন কেমন হাঁসফাঁস কবছে। সে সিঁড়ি ধবে উপবে উঠবাব সময় অলক্ষে বড় টিন্ডালেব দবজায় কান পেতে থাকল। না, কিছু শোনা যাচ্ছে না। বড় নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে বড় টিন্ডাল। সালিমাব বাপকে খত লিখে সব জানিয়ে দেয়, এই সামাদ এক হাবমাদ মানুষ, বন্দবে-বন্দবে বেশ্যা মেয়ে পেলে পাগল হয়ে যায়, তোমাব কন্যাবে কইয়ো কী হাবমাদ তাব খসমেব স্বভাব। কিন্তু দবজা থেকে মুখ তুলে আনাব সময় যেন শুনতে পেল, পাক জনাবেষু। যথার্থই খত লিখছে সালিমাব বাপকে। বহমানেব কণ্ঠস্বব সে ভিতবে শুনতে পেল। ইদ্রিশকে দিয়ে খত লেখাচ্ছে। সামাদ খুব সন্তর্পণে পবেবটুকু শোনাব জন্য কান পাতল। ওব বুক কাঁপছে। ওব মাথা কেমন পাগলেব মতো লাগছে। সে চিৎকাব কবে বলতে পাবত, খুন খাবাবি হবে মিঞা! খতে তুমি মিঞাজিকে কী লিখছ! তোমাবে আমি চিনি মিঞা। সফব শেষে তুমি পবেবে নিশান উড়াইবা! কিন্তু মনে হল দবজাব ওপাশে সবাই চুপচাপ। না কোনও কণ্ঠস্বব, না কোনও শব্দ।

সে মুখ দবজা থেকে তুলে আনতে পাবল না। ভূতেব মতো ফিস ফিস শব্দ ফোকশালেব ভিতব। লাথি মেবে দবজা ভেঙে দেবাব ইচ্ছা হল। সমুদ্রেব জলে গলা টিপে হাবিয়া কবে দিলে কেমন হয়। তাবপব ফেব কণ্ঠস্বব— আমাব শেষ বয়সেব শখ বে মিঞা, খোয়াব কইতে পাবো। এই বলে খত শেষ কবছে বুঝি।

সামাদ চিৎকাব কবে উঠতে চাইল, মিঞা, তোমাব খোয়াব ভাইঙ্গা দিমু। কিন্তু সংগোপনে সব কবে যাচ্ছে বড়-টিন্ডাল। ওব সংশয় বাড়ছে। সংশয়েব উপব নির্ভব কবে এই সিঁড়িব মুখে চিৎকাব খুব অহেতুক মনে হবে। সে চিৎকাব কবে কিছু বলতে পাবল না। মিঞা তোমাব মুখ ভাইঙ্গা দিমু, খোয়াব ভাইঙ্গা দিমু। তবে সকলে ভাববে, সামাদ পাগল কোনও কথা নাই বার্তা নাই সামাদ দবজায় লাথি মাবছে। কাপ্তান তবে লগবুকে নাম তুলে ফেলবে সামাদেব এবং প্রয়োজনে কাপ্তান তাকে ডেকের নীচে স্টোক হোলডেব পাশে ভয়ংকব এক অন্ধকাব ঘবে নিক্ষেপ কবে দিতে পাবে।

সামাদ সুতবাং কিছু বলল না। সিঁড়ি ধবে উপবে উঠতে থাকল। আর বিড় বিড় করে বকতে থাকল, তোমাব মুখ ভেঙে দেব মিঞা, খোয়াবে গবম পানি।

সে এখন কী কববে ভেবে পেল না। ডেক-এ সাদা জ্যোৎস্না। ব্রিজে কে যেন পায়চাবি করছে। মাস্তুলেব আলো বাতাসে দুলছে। সে দু'হাঁটু মুড়ে মাস্তুলেব গুঁড়িতে মাথা গুঁজে বসে থাকল। সে এ বন্দব পর্যন্ত অপেক্ষা কববে। বিবির চিঠি যদি এ বন্দবে না আসে তবে সামনে যে সমুদ্র পাবে সেখানে এই টিন্ডাল, বড়-টিন্ডাল বহমান মিঞাব লাশ সমুদ্রে ভাসাবে। মিঞাব হাত থেকে সালিমাকে বক্ষা কবাব আব কী উপায় আছে তাব।

সে দু'হাত জোড় করে বাখল প্রার্থনাব মতো। কিছু পবে মাথাব উপব তুলে দিল হাতদুটো। সে যেন কোনও অবলম্বন চায়। অথবা সে এখন ভয়ংকব বকমেব সিদ্ধান্ত মনে মনে নিয়ে ফেলেছে। বোধহয় জাহাজ সমুদ্রে নেমে যাবাব আগেই একটা খুন খাবাবি হয়ে যাবে। সে পাগলেব মতো নিঃসঙ্গ ডেকে আবাব যেন চিৎকাব কবতে চাইল, আমাব সাদা কাগজটা বড়-টিন্ডাল।

সামাদ ভূতেব মতো কাব গলার স্বব শুনতে পেল। সব জাহাজিবা এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। পাহাড়ে

ঘণ্টাধ্বনি হলে দূর-সমুদ্রে মাস্তুলের অগ্রভাগ থেকে জাহাজিরা যেমন বুঝতে পারে কোথাও থেকে বিপদ-সংকেতের মতো এই জাহাজ, মাস্তুল এবং সাদা জ্যোৎস্না আর মাস্টের আলো তাকে দুলে দুলে সংকেত দিচ্ছে, শেষ বয়সের সুখ, শেষ বয়সের খোয়াব।

সে একবার ডেক-সারেংকে বলেছিল, সারেং সাব, আমার একটা সই-করা সাদা কাগজ বড়-টিন্ডাল রেখে দিয়েছে।

কেন দিয়েছিলি! তুই দিয়েছিলি কেন!

কিছু টাকা নিয়েছিলাম অসুখের সময়। তখন রহমানকে ভালমানুষ ভেবে সাদা কাগজে সই দিয়ে বলেছিলাম, পরে লিখিয়ে দেব। সুমন অথবা সুচারুকে দিয়ে লিখিয়ে দেব।

কেউ সাদা কাগজে সই দেয়?

আমি যে সারেং সাব ছোট হতে পারিনি, একটা গোঁয়ার মানুষ আছে আমার ভিতর।— সে বলতে পারত। কিন্তু না বলে শুধু বলেছে, আহাম্মক না হলে দেয়!

কাগজ তোমার দিয়ে দেবে।

বলে সে বড়-টিন্ডালকে কাগজের কথা বললে বড়-টিন্ডাল উত্তরে বলত, ওটা কি আর আমার কাছে আছে! কই যে রাখছি।— বড-টিন্ডাল ভালমানুষের মতো তখন দু'আঙুলে জরদা পাতা মুখে ফেলে হাঁ করে থাকত।

সাবেং বলত, তবে তো সামাদ তোর খুব সুবিধা রে।— যেন সামাদের সঙ্গে সারেং রসিকতা করতে চাইল। বলল, ভালই হল। হাবিয়ে গেলে দেনাও হারিয়ে গেল।

আমি তো তেমন মানুষ না সাব। আমি আমার কাগজটা চাই।

কাগজটা থেকে কী ভয় থাকতে পারে, কেন আতঙ্কে আছে, কাউকে খুলে বলতে পারত না। বললেই হাসাহাসি করবে, তোর কি মাথা খাবাপ আছে সামাদ! সব খুলেও বলতে পারছে না সুমন কিংবা সুচারুকে। এতে সালিমা সবার কাছে খাটো হয়ে যাবে। এই সালিমা, যার নাকে নথ, কোমরে রুপোর বিছা এবং পায়ে মল, মাঠের ভিতর যখন গমগাছ থাকে, গম তুলতে যব তুলতে ফসলের খেতে কী তার হাঁকডাক, কী তার পালিয়ে বেড়ানো, অথবা পাটখেত বড় হলে সালিমা এবং সে খেতের ভিতর আগাছা বেছে দেবার সময় দু'জনে হায়, প্রায় জোড়াপাখি যেন উড়ে যায়, এসব মনে হলে আরও পাগল লাগে। সে চিৎকার করে বলতে চায়, কে আছ রে মিঞা, সালিমারে বাইন্দা রাখে কে? আমাব সোনামুখী বউরে নিয়া যায় কোনে? দেশের ভাষা মনের ভিতর ভাসতে থাকে। ঠিক সালিমার দুই চোখের মতো মাঠ এবং ফসলের কথা মনে হলে ডেকের উপর দু'হাত ছুঁড়ে ছুটে ছুটে যায়। বলে, আমাব সোনামুখী বউরে নিয়া যায় কোনে!

জাহাজ তখন সমুদ্রে। ভিক্টোরিয়া বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। জাহাজ যাবে কার্ডিফে। আকরিক লৌহ নিয়ে জাহাজ বেশ চলছে। ক্রমশ উত্তরের দিকে জাহাজ উঠে যাচ্ছিল। নীল দরিয়া ধরে ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পুবে অথবা পশ্চিমে, অথচ খত নেই। সামাদের সেই থেকে আতঙ্ক। বিবির খত এল না। নিশীথে সে ডেকের উপর একা বোট-ডেকের পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল। আটটা-বারোটা ওয়াচ শেষে বড়-টিন্ডাল ডেকের উপরে উঠে আসবে, ফানেলের গুঁড়ি ধরে মুখটা বার করলেই, কারণ বড়-টিন্ডাল সকলের শেষে উঠে যেতে ভালবাসে, অন্য পরিদারদের সে স্টিম এবং কয়লা বুঝিয়ে উঠতে উঠতে ওর পবিদারেরা সিঁড়ি ভেঙে ততক্ষণে ডেক পার হয়ে চলে যায়। থাকে এক শুধু বড়-টিন্ডাল। সে সকলের শেষে ওয়াচ থেকে উঠতে যাবে, কারণ কেউ নেই তখন। পিছনেব আলোটা শুধু জ্বলছে। কাপ্তানের ঘরে কোনও আলো ছিল না। আর ঝড় ছিল, বৃষ্টি ছিল। ঢেউ পর্বতপ্রমাণ উঠে আসছে। সামাদ হামাগুড়ি দিতে দিতে ফানেলের গুঁড়িতে চলে গিয়েছিল। সিঁড়ি থেকে মুখ তুলতেই সামাদ খপ করে রহমানের চুল ধরে ফেলল, মিঞাসাব, তোমার মনের ইচ্ছাটা কী ইবারে কও দ্যাখি, শুনি।

আমার আবার ইচ্ছা!

সামাদ চুল আরও শক্ত কবে ধরেছিল এবং টেনে বোট-ডেকের উপরে তুলে এনেছিল, তা না হলে নীচে যারা স্টোক-হোলডে কয়লা মারছে এবং ঝড়ের দরিয়াতে যারা 'আল্লা বহমানে রহিম' বলে স্টিম

ঠিক রাখার জন্য প্রাণপাত করছে, তারা শুনতে পাবে। শুনলে রক্ষা থাকবে না। সকলে ছুটে এসে সামাদকে ঘিরে ধরবে। বলবে, মিঞা, পাগলামির আর জায়গা পাও না। কারণে-অকারণে তুমি বড়-টিন্ডালের পিছনে লেগে থাকছ।

সুতরাং লোকটাকে সে ফানেলের পিছনে টেনে এনেছিল এবং বাঘ যেমন শিকারবস্তুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তেমনভাবে সে বড়-টিন্ডালের উপর হামলে পড়েছিল। ফলে বাঘের থাবাতে প্রাণ যাবার মতো টিন্ডালের প্রাণ যায় আর কী। সে ভয়ে ভয়ে বলল, আমার ইসছা কিছু নাইরে। বুড়া হৈলে ইসছা থাকতে নাই।

সামাদ হুংকার ছেড়ে বলেছিল, আমার সাদা কাগজটা বড় দরকার টিন্ডাল।

সাদা কাগজ আমার কাজে লাগে না। ওডা আমার কাছে নাই। থাকলে দিয়া দিতাম।

সামাদ আর স্থির থাকতে পারেনি। সে টেনে টিন্ডালকে বোট-ডেকের পাশে, প্রায় যেখান থেকে ধাক্কা মারলে সমুদ্রের জলে পড়ে যাবে, কোনও খোঁজ পাওয়া যাবে না, রাতের আঁধারে একটা ছোট্ট মানুষ দরিয়ায় হারিয়ে যাবে, তেমন জায়গায় এনে দাঁড় করাল। তারপর খুব সন্তর্পণে শাসাল, চিৎকার দিলে পানিতে হারিয়া। শালা, তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলব। বলে দে, কাগজটা কোথায়।

টিন্ডালের গলা শুকনো। চোখে সর্ষেফুল দেখছে। সে কোনওরকমে সামাদের প্রায় পায়ের কাছে হাত রেখে বলল, তুই, তুই বিশ্বাস কর সামাদ।

যেন সামাদ তার বাপ-দাদা, চৌদ্দ পুরুষের সমান!

কই যে রাখছি! খুঁইজ্যা পাইলেই তরে দিয়া দিমু।— বলে পা বাড়াতে চেয়েছিল টিন্ডাল। কিন্তু সামাদ তেমনি প্রায় দানবের মতো দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। যেন এক হারমাদ, তার হাত থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়া দায়।

হাঁটু কাঁপছিল, গলা কাঁপছিল বড়-টিন্ডালের, আমারে যাইতে দে। আমি কসম খাই আর একবার ভাল কইরা খুঁজমু।

সামাদ কোনও জবাব দিল না। যেমন দানবের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। ব্রিজে তখন মেজ-মালোম। তিনি ব্রিজে পায়চারি করছেন। টিন্ডাল ডেক থেকে দেখতে পাচ্ছে মেজ-মালোমকে, অথচ চিৎকার করে বলতে পারছে না, আপনারা কে কোনখানে আছেন, ছুইটা আসেন, আমারে হারমাদটা পানিতে হারিয়া করতে চায়।

অথচ কিছুই বলতে পারছে না, কারণ তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। অন্ধকারে সামাদের চোখ প্রায় বাঘের মতো জ্বলছিল।

টিন্ডাল এবার উপায়ান্তর না দেখে মৃত্যুভয়ে কাতরাতে থাকল। আর না পেরে সামাদের বুকের কাছে মুখ এনে বলল, কাল তুই আর আমি পেটি বদনা সব খুঁজমু।

সামাদের তারপর কেমন করুণা হয়েছিল মানুষটার উপর। বেঁটে শক্ত-সমর্থ মানুষ, বয়স হলে কী হবে, কবজিতে টিন্ডালের প্রচণ্ড জোর, তবু এই মানুষের মৃত্যুভয়ে করুণ মুখ দেখে সে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। আর টিন্ডালও পরদিন যথার্থ সামাদকে সঙ্গে নিয়ে সব পেটি লকার এবং বিছানা, মায় পান খাবার জরদার ডিবার ভেতর পর্যন্ত, সেই সাদা কাগজের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল, কাগজ কোথাও নেই। সাদা পাতার মতো ধোওয়া তুলসীপাতা সেজে কেবল বড়-টিন্ডাল বসে থাকল। সেই থেকে বড়-টিন্ডাল বড় সেয়ানা। সে তখন থেকে আর একা বোট-ডেকে উঠে আসে না। একা-একা অন্ধকার রাতে রেলিং-এ দাঁড়ালে বিচিত্র ঝড় এবং তাণ্ডব মানুষের মনে উন্মার্গগামিতা জাগায়।

বুঝি ভিতরে বড়-টিন্ডাল স্বপ্ন দেখছে, সেই ঝড় এবং উন্মার্গগামিতা বড়-টিন্ডালকে অসহিষ্ণু করে দিচ্ছে, কবে জাহাজ সফর শেষে দেশে ফিরবে তাই ভাবছে।

আর বন্দরে প্রায় রাতে চিঠি— পাক জনাবেষু, মিঞা রে আমার শেষ বয়সের শখ, শেষ বয়সের খোয়াব, আমার ইচ্ছা যায় একবার সদর ঘুইরা আসি। নতুন বিবির চান্দের মতো মুখখানি চোখে ভাসে। ইসছা, দশ-পাঁচ গাঁ তাজ্জব বনে যায়, বড়-টিন্ডাল রহমান খরচ-পত্তর করেছে। আর জীবনভর যা কিছু সঞ্চয় বড়-টিন্ডালের, তিলমাত্র অর্থ অপব্যয় না করে কেবল সঞ্চয়, সব তোমার কন্যার মিষ্টিমুখে স্বাদে সোয়াদে, হায় এই সোয়াদে কত প্রাণের মূল্য দেয়। তখন বড়-টিন্ডাল উপুড় হয়ে পড়ে থাকে এবং

আরশির ভিতর মুখ দেখতে দেখতে তার চুলের রং, দাড়ির রং মেহেদি করার ফের বাসনা জাগে।

এবার জাহাজ থেকে দেশে ফিরলেই দাড়িব রংটা মেহেদি করে ফেলবে। নিমেষে বড়-টিন্ডাল জাহাজে মোল্লা মৌলবি বনে গেল। নামাজের সময় ঠিক রাখল, রুপোর দাঁতকাঠি গলায় ঝোলাল, বয়সের ভারে সম্মানিত ব্যক্তি এবং সজ্জন, এমন মানুষ হয় না, শরিয়তি ব্যাখ্যাতে মাতব্বর মানুষ, বড়-টিন্ডাল যথার্থই দিলের ভিতর মহাফেজখানা খুলে ফেলল।

সামাদ সেই থেকে বাংকে অথবা ডেকেব উপর শুকনো মুখে থাকত। যত মানুষটা মোল্লা মৌলবির ভান করে ক্রমে সব জাহাজিদের হাত কবছে, তত সে গলায় একটা শুকনো ভাব অনুভব করছে। গলা কাঠ-কাঠ ঠেকছে। সে কিছু বলতে পারছে না। আপন মনে কেবল ফুঁসছে, দিলের ইচ্ছা ফুসমন্তরে হাওয়া কইরা দিমু মিঞা। সে বলতে পারত, আমার প্রাণের ধন, তারে লইয়া... আমার শেষ বয়সের শখ রে মিঞা, খোয়াব কইতে পারো।... এমন খোয়াব তোমারে মিঞা পুষতে দেব না। গ্রামের অর্থবান মানুষ বড়-টিন্ডালকে এবার যথার্থই তাব হত্যা করার বাসনা জাগল।

মাস্তুলের আলোটা কেন জানি দপ করে নিভে গেল। এখন আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সামাদ এবার দু'হাঁটু থেকে মুখ তুলে তাকাল। আকাশ বড় পরিষ্কার। এমন নির্মল আকাশ দেখে মনেব ভিতব বড় আশা হয়। নিশ্চয়ই কোথাও ফুল ফুটবে। তকতকে আকাশে কত নক্ষত্র এবং হয়তো এখন সালিমা তাব জানলায় জেগে বসে বসে মাঠেব ভিতব মসজিদ এবং বড় অশ্বত্থগাছের মাথায় হাজাব জোনাকি জ্বলা, এইসব দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই তা'র চোখে জল এসে গেছে।

সেই কবে তার মানুষটা সফব কবতে বের হয়ে গেছে, না চিঠি, না ফিরে আসা। বুঝি খতে লেখা থাকে, কার খত! বড টিন্ডাল বহমানের খত, সালিমার বাপের নামে সেই খতে লেখা থাকে, আমাব শেষ বয়সেব শখ রে মিঞা, খোয়াব কইতে পাবো। সামাদ ডেক-এ পায়চারি করতে থাকল।

সুচারু এবং সুমন দুই বন্ধু জাহাজে, একই ফোকশালে নিবাস, অথচ এই সংশয়ের কথা সে, লজ্জায় হতে পাবে, ঘৃণায় হতে পাবে, প্রকাশ কবতে পাবছে না। চিঠি না এলে কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে এবং বিস্ময়ে ওর দু' হাঁটু ভেঙে আসছে। শবিযতি মতে এমন কথা চাউর হয়ে গেলেও সে বড় অসহায়।

সে সামনের একটা বিটে ফের বসে পডল। সে সালিমাব মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পেল। সেই ঘাম বড় বড় ফোঁটা হয়ে গেল। তারপব মুক্তাবিন্দুর মতো চোখের কোণে ঝুলে থাকল। সাদা কাগজে সই, তাব উপর তালাকনামা লেখা, সাক্ষী ইদ্রিশ। কে যেন তখন উচ্চস্বরে সেই তালাকনামা উচ্চাবণ করে যাচ্ছে। সালিমা দলিজে বসে শুনছে আর বলছে, না, না, মিছা কথা। হারমাদ মানুষটা আমার যব গম গাছের মতো। বলতে বলতে বুঝি সালিমা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

চোদ্দো

সুমনের মনে হল সে এক স্বপ্নেব জগতে বিচরণ কবছে। এমন উজ্জ্বল আলো ঘর বাতি, এত সমারোহ এবং চাকচিক্য জীবনে সে এই প্রথম দেখতে পেল। সেই বাঁশিয়ালা, যে ক্লারিওনেট বাজায়, যার হাতে কত হরেক রকমের লাল নীল পাথবেব আংটি থাকে, সে এখন একা ডায়াসে বাঁশি বাজাচ্ছে। সুমন খাবার টেবিলে বসে এই দক্ষিণ অঞ্চলেব গান বাজনা এবং বাঁশির স্বব শুনতে শুনতে দু' টুকরো নরম মাংস তুলে মুখে ফেলে দিল। সে সামান্য মদ খেল। মদ খেয়ে মাতলামি করার ইচ্ছা নেই। সে এই সমারোহের ভিতর মারিয়াকে নিয়ে যেদিকে সব পাখি এবং অন্য সব বিচিত্র গাছপালা এবং আলোতে আলোময়, আবার কোথাও ইচ্ছামতো ঘুটঘুটে অন্ধকাব সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিকে চলে যেতে চাইল। এক সময় হেনরির নির্দেশে সুমন আহার শেষ করে সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

মারিয়ার বয়স কম বলে সে মদ স্পর্শ করতে পায়নি। নাচঘর ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। মদের জন্য এবং হই-হুল্লোড়ের জন্য সকলেই এখন ক্লান্ত। কেউ কেউ বাগানেব ভিতর ঢুকে পা ছড়িয়ে গল্প করতে বসেছে। যুবক-যুবতীরা মদ্যপানের পব টলছিল। অতিথিরা কেউ কেউ চলে যাচ্ছে, ভারোদি নিজে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদেব বিদায় দিচ্ছে। সুমন এবং মারিয়া এখন পড়ার ঘরে, ওরা ছুটোছুটি

করছিল। টেবিলের একপাশে মারিয়া, অন্য পাশে সুমন। মারিয়ার হাতে সেই বই, জাদুকরের পালিত পুত্রের মুখ যে বইয়ে আঁকা আছে। সুমন বলল, আমাকে দ্যাখাও মারিয়া। ছবিটা আমি দেখব।

মারিয়া ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, না। দেখাব না। তুমি দেখলে অহংকার তোমার বাড়বে।

অহংকার বাড়বে কেন?

ছবিতে তুমি এমন সুন্দর দেখতে।

দ্যাখাও না লক্ষ্মীটি।

আমার পাশে বসতে হবে।

বসব।

একসঙ্গে ছবিটা আমরা দেখব।

দ্যাখাও।— বলে একলাফে সুমন টেবিল পার হয়ে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বইটা কেড়ে নিয়ে বলল এটা সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।

কোথায়?

আমার দেশে।

কী হবে নিয়ে?

ছবি দেখলে তোমার কথা মনে পড়বে।

•

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল মারিয়া। সে আর ছুটল না, লাফাল না। ওজালিওর হাত ধরে সরু লম্বা গলি পার হয়ে গেল। হ্রদের মতো জলাশয়ের উপর দিয়ে মারিয়া এখন হাঁটছে। ফ্রক টেনে তুলেছে মারিয়া। সুমন নামতে পারছে না। ওর প্যান্ট তবে জলে ভিজে যাবে। সুমন হ্রদের পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। মারিয়া জল থেকে উঠে বলল, ওজালিও, তুমি এসো।

ওরা ফের হাত ধরে হাঁটতে থাকল। এদিকে আউট-হাউজ ওদের। ওরা আউট হাউজ পার হয়ে গেল। মারিয়া সুমনের হাত ধরে ভাবোদির পাখির জগতে আজ নেমে গেল না। বাড়িটার পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল। কত বড় বাড়ি আর কত উঁচু দেয়াল, সুমন মুখ উঁচু করে বাড়িটা দেখল। বাড়ির এদিকটাতে তেমন আলো নেই। আবছা আবছা অন্ধকার এবং এক ধরনের লম্বা বৃক্ষ তার ঝাফরিকাটা ছায়া মুখে গড়িয়ে পড়েছে। মারিয়ার মুখে কত রকমের কথা। চপল হাসি কথায় কথায়। সুমনকে অন্যমনস্ক দেখলে ওর ভাল লাগে না। সে সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে সুমনকে আগলে বলল ওজালিও, আমাদের এত বড় বাড়ি, তোমার ভাল লাগছে না?

সুমন কেমন নিরুত্তাপ গলায় বলল, ভাল লাগছে।

তোমাদের বাড়ি এমন দেখতে?

না।

দেয়ালে বড় বড় ছবি আছে?

না।

ওরা কথা বলতে বলতে পুরনো অশ্বশালার দিকে এসেছে।

সুমন বলল, না মারিয়া, আমাদের বাড়ি এত বড় নয়। খুব ছোট বাড়ি, সামনে নদী আছে। ছোট ঝোপের মতো কাশবন আছে। শরৎকাল এলে রেণু রেণু কাশের ফুল উড়ে বেড়ায়। শীত পার হলে তরমুজের লতায় বালির চর সবুজ হয়ে থাকে। তরমুজ, কত তরমুজ গ্রীষ্মের দিনে। বিকেলে সব তরমুজ তুলে নিলে মনে হবে চরটা ফাঁকা। কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে সেই বালির চরে দাঁড়ালে দেখবে, আবার সব বড় বড় তরমুজ, রাতের বেলায় কোনও পাখি, বোধ হয় উটপাখিই হবে ডিম পেড়ে রেখে গেছে। তরমুজগুলোকে তখন উটপাখির ডিমের মতো মনে হয়।

মারিয়া বলল, তুমি উটপাখি দেখেছ?

সুমন মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী ভাবল। তারপর গল্প বলার মতো বলে চলল, কারণ এই মারিয়া সমনের মুখে, কারণ সুমন এক নাবিক, সারা পৃথিবীর সব বন্দরের ছবি ওর নখদর্পণে এবং এই সুমন পৃথিবীর যাবতীয় খবর নিয়ে এসেছে মারিয়া নামক এক বালিকার জন্য। সুমন বলল, আমরা একবার

আফ্রিকার উপকূলে, বন্দরের নাম লরেনজুমারকুইস, কী কারণে বন্দরে আমরা মাল নামাতে পারলাম না। কী কারণে আমাদের ছুটি ছিল এখন আর তা মনে করতে পারছি না, উটপাখি ধরার জন্য আমরা জাহাজ থেকে নেমে গেলাম।

হেনরি সঙ্গে ছিল?

সে না থাকলে আমি কোথাও যাই না।

সে হাঁটতে হাঁটতে তার কথার ভিতর এক মরুভূমির দৃশ্য ফুটিয়ে তুলল। বস্তুত এমন সব কথা বলল যাতে করে মনে হয় ওরা উভয়ে এখন সেই মরুভূমিতে উটপাখির ছদ্মবেশে, উটপাখির দলে ভিড়ে গেছে। পাখিদের অজ্ঞাতে ওরা দলে ভিড়ে গিয়ে এক-দুই করে সহস্র উটপাখি সংহার করে চলেছে।

মারিয়া বলল, এত পাখি দিয়ে কী করা হয়?

আহার করা হয়।

কিন্তু কী জানো, আমরা দেখলাম, সেই মরুভূমির পাড়ে এক মরূদ্যান। সেখানে এক ঝাঁক পাখি দাঁডিয়ে আছে! কী ব্যাপার! ওরা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আমরা ওদের তেড়ে গেলাম। ওরা কিন্তু নড়ল না। আমাদের মায়া হল। যাদের সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম, ওরা আদিবাসী, আমরা বললাম, হয়েছে, ব্যস এবার চলি, উটপাখি মেরে কাজ নেই। তোমরা আমাদের ববং দুটো বাচ্চা দাও। আমব' জাহাজে পুষব।

এনেছিলে?

এনেছিলাম। কিন্তু কী জানো, জাহাজ যখন আমাদের বুয়েনসএয়ার্স গেল তখন কী শীত! বরফ পডছে। পাখির ছানা দুটো শীতে মরে গেল।

মরে গেল!

হ্যাঁ, মরে গেল।— সুমন আর কথা বলছে না। হ্রদের পাড়ে মারিয়ার হাত ধরে হাঁটছে। সে জাহাজি নানা অলীক গল্পে মারিয়াকে অবাক করে দিতে চায়।

সহসা মারিয়া কী যেন মনে করে পুলকিত হয়ে উঠল, জানো ওজালিও, আমাদের খামারবাড়ির পাশে ছোট একটা নদী আছে। মা বলেছেন, নদীতে একসময় সোনা পাওয়া যেত।

তাই বুঝি।

মারিয়াব ভাল লাগল না। সুমনের স্বরে কেমন অবিশ্বাসেব সুর ছিল।

তুমি বিশ্বাস কবছ না?

বিশ্বাস করব না কেন? এখন পাওয়া যায় না? তুমি আমি চলে যেতাম।

পাওয়া যায়।

তবে চলো না একদিন চলে যাই।

সে যে অনেক পাথর। কালো কালো পাথর। পাথরেব উপর দিয়ে নদীব জল চলে গেছে। ডুব দিয়ে পাথব তুলতে হয়। কপালে থাকলে একটা পাথরেই কপাল ফিরে যাবে, কপালে না থাকলে হাজার হাজাব লক্ষ লক্ষ পাথব তুলেও কাজ দেবে না। সব-ফাঁকা।

সে কপাল কী কবে পাওয়া যায়?

গুভুই বলেছে, পুণ্যবান হতে হয়।

কার মতো?

এব্রাহামের মতো।

তারপর একসময় মারিয়া একরকম পাখির গল্প করল। ওদের দক্ষিণাঞ্চলে সেইসব পাখি পাওয়া যায়। পাখিরা ডিম প্রসবেব পরে মুক্তা অন্বেষণে যায়। মারিয়া পাখিটার নাম বলতে পারল না।

সুমন বলল, কে বলতে পারবে?

গুভুই বলতে পারবে। ডাকব গুভুইকে?

না, ডেকে কাজ নেই।

সুমন জানে গুভুই এখানে কোথাও আছে। ডাকলেই গাছ-গাছালির ফাঁক থেকে উঠে আসবে।

গুভুইকে ডাকতে হল না। সে নিজেই কোথা থেকে বের হয়ে এল। প্রায় সব যেন বেতারে খবর

পাগানোর মতো। সুমনের তাল-বেতালের গল্প মনে পড়ল। গুড়ুই, তুমি আমাদের বেতাল পঞ্চবিংশতি। সহস্র এক গল্প বলে বুঝি এই বাড়ি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সুমন বলল, পাখির নাম কী গুড়ুই?

গুড়ুই জবাব দিল না।

মারিয়া বলল, পাখির নাম কী?

গুড়ুই মোটা গলায় কী বলল সুমন বুঝতে পারল না। সে মারিয়ার দিকে তাকাল।

পাখির নাম সান।— মারিয়া জবাব দিল।

মুক্তো খুঁজতে যায় কেন?

সে তার বাচ্চার জন্য।

সুমন একটু অন্ধকার আবছা জায়গায় ঢুকতেই দেখল গুড়ুই ফের কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যা থাকে কপালে, এই গুড়ুই প্রায় গুপ্তচরের মতো অথবা নিশাচর প্রাণীর মতো ওর চারধারে থাকছে। সে আদৌ ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাইল না। সে বলল, বাচ্চার জন্য মুক্তো খুঁজতে যায় সে তো ভারী আশ্চর্য।

মুক্তো না হলে চলে না। বাচ্চার চোখ ফুটানো দায়। পাখি তার বাচ্চার জন্য মুক্তো খুঁজে নিয়ে আসে।

তারপর?

তারপর পাখি সেই মুক্তো ঠোঁটে নিয়ে বসে থাকে। জল না হলে কাজ হয় না। বৃষ্টির জল চাই। ঠোঁটে মুক্তো পাখির, মেঘের আশায় আকাশের দিকে চোখ পাখির, বৃষ্টি হলে জল বাচ্চার চোখে পড়বে। মুক্তোর জলে বাচ্চার চোখ ফুটবে।

তারপর?

তারপর আবার কী! বাচ্চার চোখ ফুটলে পাখি চলে যাবে অন্যত্র। বাচ্চা আপন প্রাণে তখন পৃথিবীর আলো বাতাস বুক ভরে নেবে। বাচ্চাটা বড় হবে। এবং এই বাচ্চাও একদিন উড়ে চলে যাবে।

তখন মুক্তোর কী হবে?

পড়ে থাকবে। যারা যাযাবর জাতি তাদের নাকি একরকমের ঘ্রাণশক্তি আছে। তারাই টের করতে পারে কোন বনে সানপাখি আছে। এ অঞ্চলের মানুষেরা সেই সানপাখি ধরার জন্য দিনের পর দিন বনের ভিতর তাঁবু ফেলে থাকে।

ওরা খুঁজে পায় তেমন পাখি?

আমরা একবার গিয়েছিলাম। মা তার দলবল নিয়ে সেই পাখিটি ধরার জন্য দু' বছর কী না ঘুরেছেন।— মারিয়া সেই রোমাঞ্চকর যাত্রার অভিজ্ঞতা বলার জন্য ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসল।

কী এক পাখি, তার নাম সানপাখি, কিংবদন্তীর মতো এই পাখি জলে থাকে, বনে থাকে এবং আকাশের খুব উঁচুতে উড়ে বেড়ায়। এত উঁচুতে বেড়ায় যে অন্য কোনও পাখি তেমন উঁচুতে উড়তে পারে না। এত জলের নীচে ডুবে চলে যেতে পারে যে, অন্য কোনও পাখি তেমন নীচে নেমে যেতে পারে না। পাখি মুক্তোর খোঁজে নদীর মোহনাতে বড় বড় ঝিনুক তুলে আনে। ঠুকরে ঠুকরে সেই ঝিনুক ভেঙে তার মাংস খায় আর নদীর মোহনাতে মুক্তো খুঁজে বেড়ায়। এই সানপাখির জন্য ভারোদি এমন কোনও বন নেই, এমন কোনও নদীর মোহনা নেই, আর এমন কোনও পাহাড় পর্বত নেই, যেখানে তাঁবু ফেলে একসময় বসে থাকেনি। গুড়ুই নাকের ঘ্রাণে বন থেকে বনে, মোহনা থেকে মোহনায় এবং পাহাড়ে পর্বতে পাখি ধরার জন্য দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কোথাও, না সেই পাখি, না সেই মুক্তো। বস্তুত ভারোদি পরিবারিক দাস ব্যবসা উঠে যাবার পর এই পাখির ব্যবসা অর্থাৎ মুক্তো বিক্রির ব্যবসা বড় রকমের লাভজনক ব্যবসা ভেবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। এমনকী মারিয়া যা বলল, তাতে মনে হয় ওদের সেই খামারবাড়িতে পক্ষীদের জন্য সবুজ রঙের সব বসবাসের উপযুক্ত বাসা তৈরি করে রেখেছিল। কোনও রকমে এক জোড়া পাখি সংগ্রহ করতে পারলেই আর কথা নেই। ডিম ফুটবে, বাচ্চা হবে, বাচ্চা বড় হলে পাখি হবে, পাখি তখন নদীর মোহনা থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে আনবে। এক দুই তিন— এভাবে হাজার ডিম, হাজার লক্ষ পাখি আর হাজার মুক্তো। সে মুক্তোর ব্যবসা খোলার জন্য সানপাখি ধরার প্রলোভনে তাঁবুতে দীর্ঘদিন বাস করতে করতে এক সময় বিচিত্র এইসব পাখিদের

ভালবেসে ফেলল। তাব সাঙ্গোপাঙ্গবা যত বকমেব পাখি ছিল বনে, সব ধবে এনে বেখে দিত। গুডুই গন্ধ শুঁকে বলত, না, এটা সানপাখি নয়। গন্ধেব তাবতম্যে সানপাখি ববিনপাখি হয়ে যায়। তা না হলে দেখতে সানপাখি জ্রিশুব সেই প্রিয় ববিনপাখিদেব মতো। তাবপব বুঝি একসময় ভাবোদি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সানপাখিব অস্তিত্ব আব নেই। তিনি ঘবে ফেবাব সময় বিচিত্র বর্ণেব সব পাখি নিয়ে ফিবেছিলেন। মাবিয়া বসে বসে মাযেব সেই অভিযানেব গল্প বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পডছিল এমনভাবে মাবিযা তাব মাযেব অভিযানেব গল্প বলল যে, সবটাই প্রায় কপকথাব মতো শোনাল। সাবি সাবি গাডি, কর্মচাবীব দল, যাযাবব ব্যক্তি হিসাবে বেড ইন্ডিয়ান গুডুইকে ধবে আনা এবং গভীব বনাঞ্চলে প্রবেশ কবাব মুখে এক নিগ্রো ডাইনিব গল্পে সুমন বিস্ময়কবভাবে ডুবে গেল। সে কিছুতেই বিশ্বাস কবতে পাবল না। যেন এক বাজহাঁস সত্যি সোনাব ডিম পেডে চলেছে। তবু সবটা শোনাব পব সে এমনভাবে হাসল যেন সব আজগুবি গল্প মাবিযা সুমনকে শোনাচ্ছে।

আমি জানি তুমি বিশ্বাস কববে না। — বলে সে ডাকল, গুডুই, গুডুই।

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য গুডুই কোথা থেকে বেব হযে সামনে এসে দাঁডাল।

সুমন এবাব গুডুইকে দেখে কেন জানি যথার্থই ভয় পেযে গেল। সে বলল, আমি জাহাজে যাব মাবিযা।

মাবিযা না শোনাব ভান কবে থাকল। সে গুডুইকে বলল, হ্যাঁবে, আমি মা'ব সঙ্গে সানপাখি ধবতে গেছি না?

গুডুই ঘাড নেডে সম্মতি জানাল।

সুমন বলল আমি তোমাব সব বিশ্বাস কবছি মাবিযা। চলো ভিতবে যাওয়া যাক।— সে আব এই আবছা আলো অন্ধকাবে গুডুইযেব সামনে দাঁডিয়ে থাকতে সাহস পেল না।

তুমি মাঝে মাঝে এমন মুখ কালো কবে বাখো কেন ওজালিও?

সুমন খুব চালাক চতুব ছোকবাব মতো বলল, কই মুখ কালো কবলাম?

কিন্তু আব তাবপব কিছুতেই জমল না। সুমন অত্যন্ত দুঃখেব গলায বলল, মাবিযা, তুমি আমি হাঁটছি আব গুডুই আমাদেব অনুসবণ কবছে কেন?

মাবিয়া খুব আপনজনেব মতো কাছে এসে দাঁডাল। বলল, গুডুইযেব ওপব আমাব দেখাশোনাব ভাব। সে সবসময আমাব পাশে পাশে থাকবে এই নিয়ম এই সংসাবে।

যেন বলতে চাইল ওজালিও যতদিন আমি যুবতী না হচ্ছি, ততদিন এই গুডুই পাশে পাশে থেকে আমাকে বক্ষা কববে।

ওবা এবাব অন্য প্রসঙ্গে এল। অন্য কোনও কথা বলে মাবিযা সুমনকে এই বংশ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত কবতে চাইছে। ওবা প্রাচীন পাথবেব গুহাব পাশ দিয়ে হাঁটছে। গুহাব মুখে লোহাব জাল দিয়ে দবজা ভিতবে এক জোডা কবে অতিকায হিংস্র কুকুব। মানুষেব মাংসে এবং বক্তে এই কুকুরের বুঝি ক্ষুধা নিবাবণ হয। সুমন এক এক কবে গুহাব মুখ পাব হচ্ছে আব সেই কুকুবগুলো আর্তনাদ কবে উঠছে। যেমন চোব ঘবে ঢুকলে গৃহস্থ মানুষকে সজাগ কবাব দায় গৃহপালিত কুকুবটিব উপব, তেমনি এই গৃহে কোনও কালো মানুষ ঢুকলে কুকুবেব দায আর্তনাদ কবা। সুমনেব বক্তে বুঝি সেই কালো মানুষেব ঐতিহ্যবাহী গন্ধ। যা এই পবিবাবকে বিশুদ্ধ কবাব দায়ে এবাব ধবা পডবে। কুকুবগুলি দবজাব কাছে এসে হুমডি খেযে পডছিল, লোভে-লালসায ওদেব মুখ থেকে লালা ঝবছে। গুডুই এসব দেখে কেমন তাজ্জব বনে গেল। এই মানুষ তবে কে? এই মানুষ, যাব নাম ওজালিও দ্য সুম্যান, যে জাহাজেব তরুণ নাবিক এবং স্পেন দেশেব মানুষ, তাকে দেখে তবে এই কুকুবদেব জিভে এমন লালসাব জল গডাচ্ছে কেন? সে বিশ্রীভাবে একটা হ্যাচ্চো দিল। সুমন কুকুবেব আর্তনাদ শুনতে পেল না। এইসব গুহাব ভিতব এককালে সন্তান প্রসব কবে নিগ্রো বমণীবা খামাবে চলে যেত। সে দবজায এখন কুকুবেব মুখ দেখতে পেল না। যেন বার্টেব মা বার্টকে কোলে নিযে বসে বয়েছে দবজাব মুখে। বসে আছে এক জাদুকবেব প্রত্যাশায়। যে মানুষ তাদেব সব অপমান এবং দাসত্ব ঘুচিয়ে মানুষেব মতো মর্যাদা দেবে। বার্ট বলেছে, সেই মানুষ এসে গেছে আমাদেব ভিতব। সে ফুল ফোটাবাব জন্য পাযে হেঁটে সাব আলবামা বাজ্য ঘুবে বেডাচ্ছে।

সুমন বার্টের জননীর মুখ দেখেনি। তবু কল্পনায় এমন এক মুখ চোখের উপর ভেসে উঠল, যা ঠিক বার্টের মুখের মতো। এবং বার্টের মা-ই যেন নিগ্রো রমণীর পোশাক পরে গুহার দরজায় বসে আছে। বার্টের তিরস্কার সে যেন এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। এত বড় উঁচু পাঁচিল আর সব বড় বড় গাছের নীচে পরিত্যক্ত দুর্গের ছবি— সুমন মাথা নিচু করে হাঁটছে। সে এই মারিয়াকে ফেলে কিছুতেই চলে যেতে পারছে না যেন। এত অসম্মান, কারণ গুডুই দূরে দূরে হাঁটছে, সে এই বালিকাকে ক্রমান্বয়ে পাহারা দিয়ে নদার উৎসের মতো পবিত্র রাখার চেষ্টা করছে। গুডুই সুমনকে বড় বেশি অবিশ্বাস করছিল।

মারিয়া দেখল, চুপচাপ সুমন হাঁটছে। কোনও কথা বলছে না। সে হাত ধরে বলল, কী ভাবছ?

কিছু ভাবছি না।

কেবল চুপচাপ হাঁটছ। কথা বলছ না।

তুমি কথা বলছ, আমি শুনছি। শুনতে ভাল লাগছে।

মারিয়া এবার খোলাখুলি বলল, গুডুই সম্পর্কে তোমার অহেতুক ভয়টা কাটছে না।

আমার ভাল লাগে না। আমি হাঁটছি, তুমি হাঁটছ। আড়ালে সে দূরে হাঁটছে।

আচ্ছা দাঁড়াও। - বলে সে গুডুইকে ডাকতেই দু' লাফে ও হাজির।

তুই এখানে বোস। না ডাকলে উঠবি না।

গুডুই বসে বসে শিস দিতে লাগল।

এবার মারিয়া বলল, তুমি হাঁ করো ওজালিও।

সুমন হাঁ করলে মারিয়া ওর মুখে দুটো চকোলেট ফেলে দিল। তারপর ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমি যুবতী হলে সে আর আমাদের পাশে থাকবে না।

সুমনের যেন বলার ইচ্ছা হল তুমি আর কোনও দিন যুবতী হবে না মারিয়া। তোমাকে বুঝি ওরা কোনও দিন যুবতী হতে দেবে না।

সামনে সেই ভারোদির পাখির জগৎ। ওরা হাঁটতে হাঁটতে সেই পাখির জগতে এসে গেছে। দরজায় ঢুকলেই লাল নীল বর্ণের আলো, তার নীচে ছোট বড় সব পাখি।

পাখির জগতে ঢুকে যাবার আগে সুমন বড় একটা পাথরের মূর্তির নীচে দাঁড়াল। মারিয়ার মুখ তুলল। আলো জ্বালা বলে এখন মারিয়াকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর মুখে সরল ছবি কী করে যেন সহসা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল এখন অন্য এক মুখ, ভালবাসার মুখ করুণা করো তুমি, আমি এক যুবতী নদীর উৎসে বসে আছি লহ মোরে করুণা করে এমন এক বিষণ্ণ ভাব।

প্রাসাদটার চারপাশে প্রচুর গাছগাছালি। বিচিত্র রঙের সব ঝালর যেন ঝুলে আছে। বাড়ির ভিতর এখনও হয়তো কেউ নাচছে। নাচঘরে কেউ হয়তো এখনও গাইছে, আই নো দাই হার্ট। পিয়ানো এবং মুখখোলা বাঁশির সুর শরীরের যাবতীয় ইচ্ছাকে উদ্দাম করে তুলছে। মারিয়া সুমনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। ওর বড় ফ্রক ঘাগরার মতো দেখাচ্ছিল। ওর সোনালি চুল মাঠের অগুনতি হলুদ ফুলের মতো যেন সেখানে সকল সময়ের জন্য শীতের মাঠে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আর এত বড় বাড়ি, এত বড় মাঠ এত সব বৃক্ষ সকলের নীচে রকমারি আলোর ফোয়ারা হয়ে দুর্গের মতো এই প্রাচীন প্রাসাদ অন্ধকারে ডুবে থাকছে না আর, যেন বন্দিনী রাজকন্যা সোনার কাঠি রুপার কাঠি হাতে নিয়ে জেগে উঠেছে। সুমন পাগলের মতো মারিয়াকে বুকে জড়িয়ে চুমো খেল। আর মারিয়া যেন অঠার মতো লেগে আছে কিছুতেই ছাড়বে না। মারিয়া চোখ বুজে কী ভাবছিল, চোখ খুলে বলল এবার ওজালিও, আমি আর বেশিদিন থাকছি না। আমাদের স্কুল খুলে যাবে। আমি চলে যাব।

সুমন মুখের কাছে নুয়ে বলল, সেই এমিলের গল্পটা তো তুমি বললে না।

মারিয়া বুকের কাছে প্রায় মুখ এনে বলল, আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে না।

সুমন ওর চিবুক তুলে বলল, তার আগে বোধ হয় আমরাই চলে যাব। তুমি আমাকে মনে রাখবে মারিয়া?— সুমনের কণ্ঠ খুব কাতর শোনাল।

মারিয়ার গলার স্বর গাঢ় শোনাল, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো ওজালিও?

সুমন হাঁটতে থাকল। সে উত্তর দিতে পারল না।

মারিয়া নিজেকেই যেন শোনাল কোনওদিন ভুলতে পারব না। কোনওদিন না।

এই সহজ সরল ইচ্ছার কথা সুমনকে বড় কাতর করেছে। সে যেন এবার বলতে চাইল, তুমি কবে যুবতী হবে মারিয়া?

মারিয়া এবার কানে কানে বলল, মা যবে বলবেন।

সুমনের চোখ-মুখ কেমন এখন অপার্থিব দেখাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রের নীল জল এবং অমানুষিক খাটুনির কথা মনে হলে ওর কেবল কান্না পায়। এই জাহাজ আবার অন্য বন্দরে চলে যাবে। শুধু এই অসামান্য ভালবাসার স্মৃতি মাঝে মাঝে ওর স্বপ্নের ভেতর এক মনোরম উপত্যকা সৃষ্টি করবে। অথবা সমুদ্রের ঝড়ের ভিতর অথবা এও হতে পারে সে বার বার হন্যে হয়ে অন্য কোনও বন্দরে এই মারিয়া নামক বালিকার এক কোমল অবয়বকে পাগলের মতো অন্বেষণ করে বেড়াবে। সুমন এবার বেশ সময় নিয়ে বলল, মারিয়া, এমন আশ্চর্য সানপাখিব গল্প কোনওদিন ভুলতে পারব না।

এভাবেই সুমনের সময় এ শহরে কেটে যাচ্ছে। সময় পেলেই বন্দরে নেমে যাওয়া এবং প্রাচীন দুর্গের মতো এই বাড়ির ভিতরে ঢুকে মারিয়া নামক এক বালিকার সঙ্গে সব আজগুবি গল্প। সুমন নানারকমের আজগুবি গল্পে মারিয়াকে মাতিয়ে রেখেছে। ওরা জানত না ফুল বেশিদিন ফুটে থাকে না। ওরা জানত না, বর্ষার জল নদী চিরকাল বহন করে না। তুষারে আবৃত থাকে পাহাড়। বরফ-গলা জলে নদী তার রুক্ষতা দূর করতে পারে।

তারপর এই বাড়ি খালি হয়ে গেলে ভারোদি এসে দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দায়। হেনরি চুরুট টানছে। গুড়ুই ভাল মানুষের মতো স্টিয়ারিং-এ বসে আছে। শুধু হাত তুলে দেওয়া। হাত তুলে দিলেই গুড়ুই গাড়ি চালিয়ে কৃত্রিম পাহাড় পেছনে ফেলে চলে যাবে।

পথে যেতে যেতে হেনরি বলল. মারিয়া কী বলছে সুমন?

কিছু বলছে না।

এখনও কিছু বলাতে পারলে না?

তার বয়েস আব কত হেনরি।

অনেক বয়েস। মেয়েদের বয়েস বারো পার হলেই অনেক।

আমি জানি না।

একবার জানার চেষ্টা করো। না জানতে চাইলে তোমাকে জানতে দেবে কেন।

চেষ্টায় আছি।

তুমি একটা আকাট মুখ্যু। চেষ্টা করতে করতেই বন্দর ছেড়ে দেবে।

এই, গুড়ুই শুনতে পাচ্ছে!

আরে, ওই মানুষটা তোমার আমার কথা বুঝতে পারে না।

কেন?

শুনে অভ্যাস নেই বলে।

ঘরবাড়ি দেখার সময় মনে হল সুমন ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। হেনরি আর কিছু বলল না। সুমন এসব কথায় আজকাল রাগ করছে।

পনেরো

বসন্তকাল বলে সমুদ্রে মাঝে মাঝে ঝড় উঠছে। শনিবারের বিকেল। সুতরাং সকাল-সকাল সব জাহাজিদের ছুটি। সমুদ্রে এবং মোহনায় ঝড় লেগে আছে বলে সালফার বোঝাই হতে সময় নিচ্ছিল। ঝোড়ো হাওয়ায় সামনের গুদামঘর অতিক্রম করে বন্দরের সর্বত্র এবং উইচ-ককের পথে এই সালফারের গুঁড়ো উড়ে চলে যাচ্ছে। জাহাজে এখন বেশি মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে না। ঝড়ের জন্য ফলকাতে সালফার নামানো যাচ্ছে না।বৃষ্টি এলে সালফার ভিজে যাবে ভয়ে, ছুটির আগেই সব কাঠ ফেলে ত্রিপল দিয়ে ফলকা ঢেকে দেওয়া হল। এবং সকাল-সকাল জাহাজিদের ছুটি হয়ে গেল।

হেনরি ছুটি পেয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকল না। কিছু কাঠ নিয়ে, রঞ্জন নিয়ে কাঠের উপর কারুকার্য করতে বসে গেল। যাবার আগে তার স্মৃতি ভারোদির ঘরে রাখার বাসনা। সে একটা জিশুর জলপানের ছবি কাঠের ভিতর খোদাই করছিল। জিশুর কাঁধে সেই বড় ক্রশ এবং নুয়ে ঝরনার জলপান করছেন। হিব্রু ভাষার মতো কিছু ভাষা সেই ক্রশটার গায়ে সে খোদাই করার চেষ্টা করল। আর নীচে একজন নিগ্রো বালকের মুখ, চাতক পাখির মতো দৃষ্টি চোখে, সে অঞ্জলিতে জল তুলে জিশুর মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কাল রোববার। পরশু সোমবার। এবং সম্ভবত সোমবার বিকেলে জাহাজ ছাড়তে পারে। এতদিন খুব ফুর্তি করা গেল ভারোদির সঙ্গে। ভারোদির শখ কাঠের উপর কারুকার্য করা ছবির ফ্রেমে হেনরির স্মৃতি ধরে রাখে।

হেনরি প্রথম ভেবেছিল ভারোদির জন্য কুকুরের মুখ এঁকে দেয়। কুকুরের মতো দীর্ঘ যৌনতাই এখন ভারোদির একান্ত সম্বল। অথবা সব রক্তই লাল সুতরাং গোরু-ঘোড়ার ছবি অথবা সাদা মানুষের অবয়ব এবং তার পাশে কোনও শস্যক্ষেত্র, বীজ বপনের সময় চাষির আন্তরিক মুখ আঁকারও বাসনা ছিল হেনরির। হেনরি এইসব সংরক্ষিত অঞ্চলে কোনও নিগ্রো যুবক অথবা যুবতী দেখতে পায়নি। দূরে দূরে নিগ্রো গ্রাম এবং বসতি। কিছু কুকুরের ডাক এবং মোরগ-মুরগির লড়াই। বসতি দূর না হলে নিগ্রো যুবক-যুবতীদের সঙ্গে মদ্যপান করা যেত। এবং গোপনে মদ্যপান। তারপর দু'জনের পাশাপাশি বসে থাকার ঘটনা এবং দৈহিক ক্রিয়াকলাপের অদ্ভুত এক ছবি কাঠের ভিতর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। যদি এই কারুকার্য যথাযথ হয় তবে ভারোদির জন্য এই উপহার স্মৃতির মতো এবং নিগ্রো যুবক-যুবতী সম্পর্কে হিক্কা তুলতে তুলতে এক সময় নিজের মাংস নিজে কামড়ে ধরবে। ভারোদি যুবতী এবং বিধবা। হেনরির জিভে প্রায় জল আসার মতো। ভারোদি মদ্যপান করার পর বড় অস্থিরচিত্ত। বড় বেশি ক্ষরণ, ফলে ভারোদি ওকে টানতে লাগল, যেন এক মেষশাবককে টেনে টেনে সেই অতিকায় নেকড়ে বার বার উল্লম্ফন দিচ্ছে, গত রাত্রে হেনরি পালিয়ে আসতে চাইলে ভারোদি কলার ধরে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে গেছে এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

জাহাজে ফিরে কাঠের ভিতর ভারোদির সেই কামনাপীড়িত মুখের ছবি আঁকার বাসনা হয়েছিল কিন্তু মাতাল বলে হাত-পা স্থির ছিল না, টলে টলে পড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং ভোর হলে উলঙ্গ ভারোদির অবয়ব কেবল কোমল প্রাণের মতো কেবিনময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এই অবয়বের কারুকার্য কাঠে ওর বড় ধরে রাখার ইচ্ছা। সে ছুটি পেলে কাঠ খোদাই করে উলঙ্গ ভারোদির মুখ এবং অবয়ব এঁকে বসে থাকবে। পাশে, ঠিক যোনিদেশের পাশে নিগ্রো এক যুবকের মুখ এঁকে দেবে। এবং দিয়ে রেপ করাতে পারলে যেন আর কিছু থাকে না। ভারোদির শক্ত শরীরে যেন আবহমানকাল ধরে ঘৃণা মিশে আছে নিগ্রোদের প্রতি, রেপ করাতে পারলে বুঝি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কী যে মাঝে মাঝে মনে হয়, যুবতীর এমন রূপলাবণ্য আর পাছা সে যেন কতকাল স্পর্শ করেনি। সারা রাত যদি নিয়ে পড়ে থাকত, এখন মনে হয় তবে বড় ভাল লাগত। অথচ হেনরি মনে করতে পারছে না সে কেন পালাচ্ছিল। পিচ্ছিল আঁশটে গন্ধ কি ওকে মাঝে মাঝে বমির মতো উৎকট আবেগে ভোগায়? তখন এমনভাবে কি তাকে ভোগাচ্ছিল? এখন আর সে মনে করতে পারছে না। বাংলা কথায়— যা মাগি পাছায় যা মাংস এবং শরীরে যা পিঠে-পায়েস, তাতে করে নিগ্রো যুবক না হলে মানায় না। এইসব কারণে বুঝি ক্ষিপ্ত ছিল হেনরি। সে সুতরাং ভাবল, ঠিক জঙ্ঘার পাশে নিগ্রো যুবকের মুখ এঁকে দেবে। অথবা রেপের দৃশ্য এঁকে দিয়ে বলবে, নাও তোমার স্মৃতি, তুমি তোমার ঘরে উড-পেকার অথবা স্কাইলার্ক ফুলের মতো গোপনে পুরে রাখতে পারো। তারপর সহসা, কী মনে হল হেনরির, মুখের ছবি কেটে বাদ দিলে পা থাকে, জঙ্ঘা থাকে। সে ইচ্ছা করেই রংটা কাঠের রং হবে এই ভেবেছিল। তারপর মনে হল কী দরকার এসব বিতিকিচ্ছি ঘটনার সম্মুখীন হয়ে, বরং সে জিশুর ছবি এঁকে দেবে, দিয়ে বলবে, এই নাও, তোমার ঘরে আমার স্মৃতি এবং মানুষের রক্ত লাল, মাছের রক্ত লাল, গোরু-ভেড়া সকলের রক্ত লাল, ঈশ্বরের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাও। সুতরাং সে ক্রশের নীচে এক নিগ্রো বালকের মুখ জিশুর শৈশবকালীন মুখের রেখাতে ভরে দিতে চাইল। মনে মনে এখন সে দূরের এক মাঠে বোধহয় কোনও বালুবেলা হবে, কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে, বুঝি একদল সৈন্য যাচ্ছে, শৈশবের জিশু

পালাচ্ছিল। গমখেতেব ভিতব দিযে পালাচ্ছিল। ছোট ছোট গমেব চাবা। অনেকদিন আগে তখন গমের চাবা ছোট ছিল। ঈশ্বরেব অপাব মহিমা, গাছেব ফলন ক্ষণিকের ভিতব জন্ম নিল। হেনবিব এখন এই সময় কাঠে বজনে এমন এক ছবি আঁকাব বাসনা।

টুইন-ডেকে বসে কাজ কবছিল হেনবি। উপবে বোট-ডেকেব ছাদ আছে। সুতবাং বৃষ্টিব ছাঁট আসছে না। আকাশেব গুমোট ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। বৃষ্টি আব বৃষ্টি। কখনও ঝড। ঝড থেমে গেলে বৃষ্টি নামছে। ঝড এবং বৃষ্টি দুই ই হেনবিব প্রিয়। সে পিছিলেব দিকে মুখ তুলে দেখল, সুচারু সামাদ আসছে। সুমন নেই।

কাল ফিবতে সুমনেব খুব বাত হযে গেছে। সে সেই শহবেব বড জাদুঘব এবং ক্রিতুস উপগ্রহের মন্দিব দেখে এসেছে। মাবিয়াব সঙ্গে সুমন আজকাল কখন কোথায় যে চলে যাচ্ছে এবং কখন ফিরে আসছে কেউ টেব পাচ্ছে না।

এখন ইঞ্জিন রুমে কাজ প্রায় নেই বললেই হয়। ট্যাংক-টপ পবিষ্কাবেব কাজ শেষ। বয়লাবেব পাশে যে স্তূপীকৃত ছাই ছিল তাও শেষ। কিনাব থেকে ট্রাক এসে সব নিয়ে গেছে। লেবেলিং শেষ। এব বয়লাবেব সব স্মোক বক্স পবিষ্কাব। মোদ্দা কথা সাফ সুতবোব কাজ বলতে জাহাজে এখন তেমন বেশি কিছু নেই। কেবল জাহাজ সমুদ্রে নেমে গেলে পাটাতন ধোওযা হবে। সাবান-জলে ডেবিক, মাস্ট এবং বোট ডেক ধুয়ে পাকলে, ফেব বং লাগানো। সুতবাং সুমন, এক তরুণ নাবিক সুমন সাবেংকে বলে মেজ মিস্ত্রিব কাছ থেকে শুক্র শনি ছুটি নিযেছিল। শনিবাব নিশ্চযই শহবেব কোনও বড হলঘবে ওর মাবিয়াব সঙ্গে ছবি দেখাব ইচ্ছা। অথবা গাডিতে কবে ওদেব খামাবে চলে যাবে। ট্রাউট মাছ ধবার কথাও আছে। মাবিযাদেব খাঁডি নদীতে এ সময বৃষ্টিব জলে সমুদ্র থেকে বড় বড সব বাক্ষুসে ট্রাউট মাছ উঠে আসবে। মেজ মিস্ত্রিব পুবনো বক্ষিতা আছে। তিনিও এই ছুটিব সমযটুকুতে জাহাজে থাকবেন না। পুবনো বক্ষিতাব ঘবে বাত কাটাবাব জন্য চলে যাবেন। অথচ হাতে সময আজ কাল দু'দিন। সোমবাব জাহাজ ছাডছে। দু'দিনেব ভিতব এই স্মৃতিফলক শেষ না কবতে পাবলে অন্য সফরে ভাবোদিব ঘবে ওঠা যাবে না। উপহাবেব বিনিমযে সে ভাবোদিব ঘবে আবাব এলে উঠতে পাববে। শুধু ক্যানাবি পাখিটা এবং পাখিটা মবে যেতে পাবে একদিন, কাবণ রুগণ ক্যানাবি পাখি ভাবোদিব সংসাবে উড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিল এইসব, এই শেষ পর্যন্ত পববর্তী সফবে আতসবাজিব মতো ফুরফুরে বাতাসেব ভিতব ফুল হযে ভাবোদিব মনে ভাসতে থাকবে।

কাবণ এই দেশেব গবম জল হাওযায বেশিদিন পাখি বাঁচবে না। ববং এই কাঠ খোদাই করে শিল্পসৃষ্টি ভাবোদিব মনে নানাবকমেব ছবি এঁকে দেবে, জাহাজি হেনবি কত বকমেব লবেল পাতার মুখ আঁকতে জানে। এক সুন্দব লবেল পাতাব ঘব আবিষ্কাব কবে নিশ্চযই ভাবোদি তীবেব মানুষকে আর ভালবাসতে পাববে না। এই শবীব, হেনবি ভাবল, ভাবোদিকে বড বেশি জঙ্গি সুখ দিচ্ছে। কত বিচিত্র ভঙ্গিতে উত্তাপেব কলে বাতাস দিতে জানে ভাবোদি। সে তাড়াতাড়ি হাত চালিযে কাজ কবতে থাকল। এ বন্দবে এলে মেয়েমানুষেব জন্যে আব ভাবনা থাকবে না।

ওব চোখে মুখে বৃষ্টিব সামান্য ছাট লাগছিল। সে খুব নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছে। জল বৃষ্টি ঝড কিছুই ভ্রুক্ষেপ কবছে না। ঘন বৃষ্টিব জন্য তীবেব গাছপালা পাখি ক্রমে অস্পষ্ট হযে উঠছে। এমন ঝড়বৃষ্টি থাকলে বাতে ভাবোদিব ঘবে আবাম কবা অথবা ভাবোদি গাড়ি চালিযে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে কোথায় কখন যে নিযে যায়, কোন হলঘবে যে ওব নাচ থাকে এবং কত সব দূরবর্তী শহবে নিমেষে উধাও হয়ে যেতে পাবে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। এমন জল-ঝডেব বাতে ভাবোদি তাকে ফেলে কোথাও আজ আব যেতে চাইবে না। এই জল-ঝডেব বাতে ভাবোদিব কাচেব জানলায় কিছু সেই পেইন্টেড স্টর্কেব ছবি এবং পাবসিমন গাছেব সুমিষ্ট ছায়া, চুঁইয়ে চুঁইয়ে সারাবাত জল পড়বে তার শব্দ, আব বড আযনার ভিতব বড খাট, ভাবোদিব শবীবে সোনালি গাউন এবং নীচে অন্তর্বাসশূন্য পোশাক এবং ত্বকে তাব কোমল ঘ্রাণ, কামনাব জ্বরে ভুগে ভুগে মদেব গ্লাস সামনে বেখে গাউন কোমরেব কাছে তুলে এনে অথবা খুলে ফেলে ধীবে ধীবে মদে সামান্য ঠোঁটেব স্পর্শ এবং পাশে নগ্ন যুবকেব ছবি, সামনে-পিছনে

কুর্ভিয়ান আয়নায় পাশবালিশে পড়ে থাকা বিধবা যুবতীর শরীরে হায় কী কামনা বাসনার গন্ধ, বস্তু হনরি কাঠের ভিতর শিল্পসৃষ্টির সময় এসব ভাবতে ভাবতে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বৃষ্টির জলে জাহাজ ধুয়ে মুছে গেল। জাহাজিরা যে যার ফোকশালে বসে দেশের গল্প করছিল। সামাদ এই অবেলাতে বাংকে পড়ে পড়ে মনে হয় ঘুমোচ্ছে। সুচারু ওর বাবাকে চিঠি লিখছে। সে তার বাবাকে লিখল, বাবা, আমরা পোর্ট অফ জামাইকা হয়ে পানামা ক্যানেল অতিক্রম করব। এবং সম্ভবত তেইশ-চব্বিশ দিনের সমুদ্রযাত্রা। আমরা পরে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বন্দর পাব। আপনি আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি দেবেন। বলে জাহাজের নাম, এজেন্ট অফিসের নাম এবং রাস্তার ঠিকানা, দেশ বন্দর প্রভৃতির সঠিক পরিচয় দিয়ে সে চিঠি শেষ করল। তারপর উপরের দিকে তাকাতেই দেখল একটা পা উপরের বাংকে ঝুলছে। সহসা দেখল পা'টা যেন ছাদ থেকে না বাংকের রেলিং থেকে ঝুলে আছে, বোঝা যাচ্ছে না, কারণ সে নীচের বাংকে শুয়ে উপুড় হয়ে চিঠি লিখছিল বুঝতে পারছিল না, সামাদ এখন ঘুমোচ্ছে না ইচ্ছে করে ওর মাথার উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

সুতরাং সে উঠে বসল এবং মাথা তুলে দেখল, সামাদ ঘুমোয়নি সে শুয়ে শুয়ে বড় অন্যমনস্ক। ওর নাকের ডগা দেখা যাচ্ছে। ওর চোখদুটো সুচারু দেখতে পেল না। সে ধীরে ধীরে সামাদের গায়ে হাত রাখল। যদি সামাদ জেগে থাকে, যদি সামাদ এখন একটু চা খেতে চায় তবে চা করে দু'জনে বসে বসে খাওয়া যাবে। কিন্তু এই সামাদ, বন্দরে যত দিন যাচ্ছে, সে যত বিবির চিঠি পাচ্ছে না তত সে এখন নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে কী এক অসহায় যন্ত্রণা যেন সময় এবং সুযোগের অপেক্ষাতে সে দিন গুনছে। সুমন জাহাজে নেই। সে ভোররেলা বের হয়ে গেছে। জাহাজে রাতে ফিরতে পারে। না ও পারে। আদৌ ফিরবে কি না কে জানে সারাদিন জাহাজের মাস্তুলের অথবা ফলকায় অমানুষিক খাটুনির পর কিছু ভাল লাগে না। দেশে জাহাজ ফিরলে অথবা না ফিরলে সামাদেরও যেন অনুভূতি ক্রমে মরে যাচ্ছে। ক্রমে মরে আসছে। সে কেবল এখন বাংকে সময় অথবা সুযোগ পেলেই ঘুমায়। কেন জানি ওর এখন এই বন্দরের হাতছানি কোনও আগ্রহ সৃষ্টি করে না।

হাতের স্পর্শে সামাদ পাশ ফিরে শুল। চোখ মেলে তাকালে দেখল সুচারু ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

কী রে? কী দেখছিস?

চা খাবি? বড় ঝড়-বৃষ্টি। চা করে আনি।

আন করে।

বলে সে চাবিটা কোমর থেকে খুলে দিল। সুচারু লকার খুলে চা চিনি এবং কনডেন্সড মিল্কের কৌটা হাতে নিয়ে উপরে উঠে গেল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। সারেং নামাজ পড়ছেন এবং ফোকশালে কিছু হুতের কথাবার্তা হচ্ছিল। সুমন হয়তো এখন সেই বড়-বাড়ির পাঁচিলের ভিতর অথবা অন্য কোথাও চলে গেছে। ওর একদিন ট্রাউট মাছ ধরার কথা আছে। মারিয়া, সুমনের ছোট্ট বালিকা বন্ধু ওকে কোথায় কোন এক নদীর পাড়ে নিয়ে যাবে। বড় খামারবাড়ি। দূরে, বনাঞ্চল এবং নানারকমের গাছগাছালি ভেঙে গেলে সেই নদী। নদীতে বৃষ্টি হলে বড় সব রাক্ষুসে মাছেরা উঠে আসে সুমন গতকাল ফোকশালে বসে এ সব গল্প করল চা অথবা চাপাটি খেতে খেতে, যেন এক রাজকন্যা মিলে গেছে বন্দরে, সে সব ফেলে সেই রাজকন্যার সঙ্গে তপোবনে এবার হারিয়ে যাবে। জাহাজ ছেড়ে দেবার আগে সে আর ভাবছে না, জাহাজে তার আর ভাল লাগছে না। মারিয়াকে ছেড়ে তার আর জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে হয় না আজ যখন এমন ঘন বৃষ্টি এবং মাঠ-ঘাট সব ভেসে গেছে তখন সে মাছ ধরতে নিশ্চয়ই মারিয়ার সঙ্গে নদীর মোহনাতে চলে গেছে। ফিরতে ওর রাত হবে। আর যদি না ফেরে ওর খাবার সুচারু গ্যালি থেকে নেবে কি না, রাতের খাবার লকারে না রেখে দিলে কী হতে পারে, উপোস থাকতে পারে, তা হবে কেন, সে তো এখন আর রাতে ফিরে কিছু খায় না, দু'দিন হবে, না আরও বেশি হতে পারে, লকারে ওর খাবার নষ্ট হয়েছে। তবু যদি কোনও কারণে সুমন, সবল নাবিক সুমন ফিরে এসে খেতে চায়, এই ভেবে সুচারু আজও ভাবল লকারে খাবার তুলে রাখলে কার কী ক্ষতি। রেশনে যা বরাদ্দ সে তা খাবে। সে তা পাবে। খাবার নষ্ট হয় হোক।

সুচারু গ্যালিতে চা করার সময় বলল, ভাণ্ডারি চাচা, সুমনের খাবার রাখবে। আমি নিয়ে রেখে দেব।

সে তারপর চা করল। দুটো চাপাটি নিল সঙ্গে। নীচে নেমে সামাদকে ডাকলে মনে হল সে কেমন গুম মেরে আছে। কথা সহজে বলতে চায় না, যেন সে খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ এবং অনাবশ্যক কথা কী কথা হতে পারে, জাহাজে যা কথা হয় ইতর কথা, এবং অশ্লীল চিন্তা, সে একদা যেসব অশ্লীল ছবি বালিশের নীচে রেখে দিত, এখন যেন তা সে কোথায় কোন ঝোড়ো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। সে বিনীত যুবকের মতো কাজ করছে। সন্দেহ— ক্রমে এক সন্দেহ, সংশয় বড়-টিন্ডালকে কেন্দ্র করে ঝড়ের আগে অনড় বায়ুস্তরের মতো। সে চুপচাপ। কেবল কাজ করে যাচ্ছে। সে এত বেশি কাজ করেছে যে সকালে কাজের তালিকা দেখে তাজ্জব বনে গেছে। সে দু'নম্বর মাস্তুলের সবটা এবং তিনটে ডেরিক একদিনে রং করেছে। সে ফানেলের চারপাশটায় নতুন রং লাগিয়েছে। দুলে দুলে উড়ে উড়ে প্রায় যেন সামাদ ফানেলের চারপাশে ঝুলে রং করছিল। খুব দ্রুত কাজ করছিল, প্রায় একাই একশো। ডেক-জাহাজিরা মাঝে মাঝে এই নিয়ে ইতর রসিকতা করছিল, শালা সামাদ দেখছি এই সফরেই টিন্ডাল বনে যেতে চায়। অথবা কেউ কেউ বলাবলি করছিল, ওরে শালা, এত যে কাম দেখাচ্ছিস কামের পয়সা তর খাবে কে। কেউ বলছিল, শালা, তুমি সাবেংকে তেলাচ্ছ।

সামাদের তখন বিনীত উত্তর, কোম্পানির পয়সা খাচ্ছি। কাজ না করলে চলবে কেন? কাজ না করলে গোনাগার হতে হবে।

সামাদ অধিক পরিশ্রমের জন্য ভীষণ ক্লান্তিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন হয়ে পড়ত। অধিক পরিশ্রমের ফলে সে ভিতরের কষ্টটা ভুলে থাকতে পারত। ক্রমে সেই এক ভয় তাকে পাগল করে দিচ্ছে, নিজেকে সংযত রাখার জন্য এবং সব ভুলে থাকার জন্য আর বিশেষ করে নবির চিঠির প্রত্যাশায় আছে, কারণ বিবি তার চিঠি দেয় না, নবি প্রতিবেশী এবং বন্ধু, কী সম্পর্কে ওর আত্মীয়, সালিমার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কাছাকাছি লোক, শেষ চিঠি নবির কাছে, নবিভাই, বিবি আমারে চিঠি দেয় না, কী কসুর আমার জানি না, জবাবে তুমি সব বিস্তারিত লিখে জানাবা। সেই চিঠিরও জবাব নেই। দিন যত যায় জাহাজে সে কাজপাগল মানুষ হয়ে ওঠে। সে কাজের ভিতর ডুবে থাকলে সালিমার মুখ প্রায় যেন কচুরিপানার লাল নীল ফুলের মতো ফুলঝুরি হয়ে ফুটে ওঠে চোখে। আর স্রোতের জলে ভেসে গেলে শুধু পানা থাকে, জল থাকে, কিন্তু মাঠে মাঠে ফুল থাকে না তখন, কেবল বড়-টিন্ডালের মুখ ভাসতে থাকে। বড় টিন্ডালের দুঃসহ ইতর মুখ ক্রমে ওকে পাগল করে দেয়। ওই এক মানুষ আছে জাহাজে, সাদা কাগজে সই নিয়ে আল্লা মেহেরবানকে সজ্জন সেজে হাসে, গায়, গুয়া দিয়া শুকনা পান খায়, আর মাঝে মাঝে শেষ বয়সের নিকা— স্বপ্ন দেখতে দেখতে কচি কাঁচা মুখ সালিমার, দাঁতের ভিতর রুপোর দাঁতন-কাঠি চালায়। তখন সামাদের চোখ ঘোলাটে হতে থাকে। হাত-পা শক্ত হতে থাকে এবং সব বিসদৃশ ঘটনা জাহাজে যেন এইমাত্র ঘটে যাবে। বড়-টিন্ডালকে হত্যা করার বাসনা। সে তার সব ভিতরের জ্বালা-যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিতে চায়। এইসব অমানুষিক ইচ্ছা ভুলে থাকার জন্য সে জাহাজে কাজের ভিতর ডুবে আছে। সে দ্রুত ছুটছে। বল্গা ধরে রাখছে। দ্রুতগামী এক অশ্বের খুরে এইবার আগুন জ্বলবে। সে তার স্থৈর্য দিয়ে খুরের ভিতর আগুন জ্বলতে দিচ্ছে না। ফলে সারাদিন পরিশ্রমের পর ফোকশালে ফিরে গেলেই ঘুম পায়। সে বাংকে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সালিমার সুন্দর উজ্জ্বল মুখ, নাকে নথ, মেয়ের ঠোঁটে বাজোর হাসি এবং চোখে সালিমার স্বপ্ন নিয়ে জেগে থাকে। তারপর ঘুম চলে আসে। সুতরাং সে টের করতে পারছে না, কখন সুমন জাহাজে উঠে আসছে এবং কখন নেমে যাচ্ছে। সুচারু চা করে আনলে বলল, দু'দিন থেকে সুমনটাকে দেখছি না। কোথায় যায়, কী করছে, কে জানে।

সুচারু বলল, সেই বড়-বাড়িতে যাচ্ছে। হেনরির যেমন কাণ্ড। সুমন এখন আমাদের ওজালিও দা সুম্যান। সে আর ভারতবর্ষের মানুষ না, সে স্পেন দেশের লোক। যার বাড়ি, তিনি বিধবা যুবতী। তার পূর্বপুরুষ দাস-প্রথা রক্ষা করার জন্য লড়েছে। ভয়ংকর বর্ণবিদ্বেষী। ধরা পড়লে রক্ষা থাকবে না। কী সাহস ওর বুঝতে পারছি না। হেনরি কাজটা ঠিক করেনি।

এই হেনরি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, অথচ যেন সে এই জাহাজে কেবল পাখি ওড়াতে এসেছে। কী দরকার ছিল সেই বিধবা যুবতীকে বলা, এই আমাদের সুমন, ওজালিও দ্য সুম্যান, এর পিতৃপুরুষ বিখ্যাত

ন্যাটাডব ওজালিওব বংশধব। সবল গোবেচোবা সুমনকে কেন যে হেনবি এত বড় বিপদেব মুখে ঠেলে দিল। বিধবা যুবতী ভাবোদি, মেয়ে তাব মাবিয়া। মাবিয়াব চোখে, চুলে কী যেন রূপ আছে প্রায় মায়াবিনীব মতো, বালিকা সুমনকে পাগল কবে দিয়েছে। সে জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে বের হয়ে গেছে। কখন আসবে, কি আসবে না, কেউ যেন আব এখন তাব খবব দিতে পাবছে না।

ইতস্তত দু'-একজন জাহাজিব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ দবজা পাব হয়ে অন্য ফোকশালে নেমে গেল। কেউ কেউ দবজায় উঁকি দিয়ে জাহাজ কবে ছাড়ছে, কোথায় যাচ্ছে, সেকথা বলে গেল। ওরা অন্ধকাব থেকে সব শুনল। পোর্ট-হোলেব কাচ বন্ধ কবে দিল সুচারু। বৃষ্টি আসছে। সে আলো জ্বেলে দিল। সামাদ চা খেতে খেতে শুনছিল বুঝি। দূবে দূবে যেসব পপলাব গাছ আছে তাব ফাঁকে শহবেব হাজাব আলো জোনাকি জ্বলাব মতো। সে বুঝি নিবিষ্ট মনে তাই দেখছে। সুচারু বলল, হ্যাঁবে সামাদ, তোব চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল।

চমকে ওঠাব মতো তাকাল সামাদ। সে এই অন্যমনস্কতায় লজ্জা পেল। কিন্তু চা খেতে খেতে তাব চোখে অসহায় জ্বালা ক্ষোভ ফুটে উঠল। কী যেন দুবাবোগ্য ব্যাধি ভিতবে ভিতবে কাজ কবছে, সে কিছুতেই আব সুচারুব দিকে মন দিতে পাবল না।

সুচারু বুঝল সামাদ তাব বিবিব খববেব জন্য উন্মুখ। বড়-টিন্ডাল বহমান সম্পর্কে সে ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে। মনে হয না এখন টিন্ডালেব সম্পর্কে ওব কোনও সন্দেহ অথবা সংশয় আছে। সে আব এখন মাঝে মাঝে, আমাব সাদা কাগজটা বড়-টিন্ডাল, এই বলে চিৎকাব কবে ওঠে না। কথায় কথায় ছুটে গিয়ে বড টিন্ডালেব সঙ্গে বচসা কবে না। সুচারু এবং সুমন কিছুতেই এই বহস্য উদ্ধাব কবতে পাবেনি। যতবাব টিন্ডাল সম্পর্কে খোঁজখবব নিতে চেয়েছে ততবাব সামাদ চুপচাপ, আপনমনে প্রায় কিব সেই এক বহমানে বহিম বনে যাবাব মতো মুখ কবে থেকেছে। এই চুপ কবে যাওয়া, ভালমানুষ হয়ে যাওয়া সামাদেব, সুচারুব ভাল লাগছিল না। সে সকলেব সঙ্গে ভাল ব্যবহাব কবছে। সকলেব সঙ্গে হেসে কথা বলছে। জাহাজিসুলভ ইতব কথা সে কাবও সঙ্গে বলছে না। এমনকী গতকাল সুচারু সামান্য ইতব বসিকতা কবতে গেলে কষ্ট হয়েছিল। সে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে আবম্ভ কবেছে। এবং দিনেব শেষে এই সন্ধ্যায বৃষ্টিব শব্দেব ভিতব সে নিবিষ্ট মনে নামাজ পড়তে বসে গেল।

সবকিছুই সুচারুব আকস্মিক মনে হচ্ছে। সামাদ নামাজ পডাব জন্য উপবে উঠে গেল। হাত মুখ ধুয়ে সে অজু সেবে ফোকশালে ফিবে এল। কোনও কথা বলছে না। প্রায় মোল্লা মৌলবিব মতো সে এখন গম্ভীব। সে একটা চাদব বিছাল বাংকে। হাঁটু মুড়ে বসল এবং সে তাব ঈশ্ববেব প্রতীক্ষাতে যথার্থই অন্য মানুষ হয়ে গেল।

তাবপব একসময অনেকক্ষণ সে চোখ বুজে থাকল। কোথাও আল্লাব করুণাব কথা ভেবে গমখেতেব ভিতব সহসা সালিমা যেন দূবে দূবে ভেসে উঠছে এবং সহসা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যেন। সালিমা তাব হাজি মানুষটিব সঙ্গে সেই বিস্তীর্ণ এবং অসীম শস্যক্ষেত্রেব ভিতব লুকোচুবি খেলতে চাইছে। সে পিছনে পিছনে যত ছুটছে তত মনে হচ্ছে ওদেব পবস্পব ব্যবধানটা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সে তাব প্রিয় যুবতীকে ছুঁতে পাবছে না।

সুচারু একসময় আব সামাদকে বিবক্ত কবতে চাইল না। সে সন্তর্পণে ফোকশাল থেকে বেব হয়ে গেল। সিঁড়ি ধবে ডেক-এ উঠে এল। এখন আব বৃষ্টি পডছে না। বন্দবে লাল নীল বাতি এবং মাস্তুলেব আলো জ্বলছিল। তাব বলতে ইচ্ছা হল আমবা জাহাজি মানুষ, কত দূবদেশে আমাদেব যাত্রা, কত সমুদ্র পাব হলে আমাদেব বন্দব, বন্দবে আমবা কত অসহায়। সুচারু চুপচাপ বেলিং এ ভব কবে দাঁড়িয়ে থাকল। গির্জার মাথায় ক্রস। সেখানে সে হেনবিব পাখিটা আবিষ্কাবের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, না পাখি, না ক্রস কেবল অন্ধকাব সামনে। এত দেশ ঘুবে, এত বন্দব ঘুবে সে তার সবুজ আলো আব আবিষ্কার করতে পাবল না। আমবা সকলে সেই আলোব সন্ধানে ঘুবছি। এই বলে সে কিছুক্ষণ আকাশ দেখল শহবেব মাঠ দেখল এবং ওপাবে নিগ্রো বস্তি পাব হলে হাসপাতালেব মাথায় ঈশ্ববেব অপাব মহিমার স্পর্শ পেল যেন। সে খুব বিচলিত বোধ কবল। সে অন্ধকাব ডেক থেকে কিছুতেই নড়তে পাবল না।

ষোলো

এই উপত্যকা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে ক্রমশ উপরের দিকে যাচ্ছে। জমি বৃহৎ আকারের এবং জল-ঝড়ের জন্য সামনের পথ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। মারিয়া গাড়িতে জোরে জোরে গান গাইছে। সুমন একদিকে চুপচাপ বসেছিল। গাড়ির কাচে বৃষ্টির জল এবং বড় গাড়ি, ইচ্ছা করলে সে এবং মারিয়া আড়াআড়ি করে শুয়ে থাকতে পারে যেন। গুড়ুই ইচ্ছা করেই ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল। শনিবারের বিকেল, ছুটির দিন সকলের। সুতরাং সব গাড়িগুলো হুস করে বন্দর থেকে হাইওয়ে ধরে ছুটছিল এবং ওদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। অথবা পেছনে ফেলে টা টা করে চলে যাচ্ছে। চারদিকে গাড়ি কাদাজল ছিটোচ্ছে। আর এক বিচিত্র শব্দ, বড় বড় রেডউড গাছগুলো থেকে জল পড়ছে সুতরাং জলের শব্দ। এইসব অভিজ্ঞতা সুমনের কোনওদিন ছিল না, এত বড় গাড়ি চড়ে সে এবং মারিয়া ট্রাউটমাছ ধরতে যাচ্ছে। দু'ধারে কোথাও নিগ্রোপল্লি এবং হাঁস মুরগি এবং শূকরের ডাক। রেডউড জাতীয় গাছগুলো রাস্তা অন্ধকার করে রেখেছে।

সুমন ইচ্ছা করেই আজ পাশের সব গাছ-গাছালির নাম জানতে চাইল না। সে আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের নিগ্রোপল্লিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জল মাঠ থেকে নেমে যাচ্ছে অথবা ছোট ছোট নিগ্রো বালকদের এই বৃষ্টির ভিতর ছোটাছুটি করতে দেখল। সে দেখল, কোনও নিগ্রো যুবক ঘরে বসে জানলায় মুখ রেখে এই বৃষ্টির শব্দ শুনছে। কোনও নিগ্রো যুবতী বচসা করছে বোধহয়। আর কোথাও টালির ছাদের মতো ঘর। কাঠের নীল লাল রঙের দেয়ালের জীর্ণ ভাঙা কাঠ খসে পড়ছে। কোথাও বড় খামারবাড়ি এবং সমুদ্রের ধারে বলে বড় বড় জাল শুকাবার জন্য থাম পোঁতা। আর সব হাঁস মুরগিরা গাড়ির শব্দে ছুটে পালাচ্ছিল। বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। গ্রামের শেষে কাঠের ভাঙা গির্জা তারপর কোনও ধাবার মতো মদের দোকান, সেখানে সব নিগ্রো পুরুষ-রমণীরা এই দিনে জড়ো হয়েছে। কোথাও বড় বড় গোয়াল, আর সব বড় বড় গাভী। অনেক গোরু বাছুর, লম্বা কাঠ দিয়ে তৈরি খোঁয়ার, ভিতরে সব কাদাজলের ভিতর গোরুগুলি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। আর গ্রামের সব শেষে সমাধিক্ষেত্র। তারপর ফের লম্বা মাঠ, দু'ধারে সেই এক রেডউড জাতীয় গাছ, যেন মাঠের শেষ নেই, গাড়ি চলছে তো চলছেই। মাঠে জন মনিষ্যির কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দূরে দূরে সব গভীর বন। হাঁস মুরগি বোঝাই হয়ে বড় বড় ট্রাক দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছে। কোনও রেড ইন্ডিয়ান যুবক ঘোড়ায় চড়ে শস্যক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিল। সামনে রেড-ইন্ডিয়ানদের সংরক্ষিত অঞ্চল, আবার মাঠ এবং মাঠের শেষে বড় লম্বা একটা কাঠের ক্রস। ক্রসের নীচে ওদের গাড়িটা প্রথমবারের মতো থামল। আর প্রথমবারের মতো মারিয়া এই গাড়ির ভিতর কথা বলল সুমনের সঙ্গে, ওজালিও, তুমি কথা বলছ না কেন? চুপচাপ চারপাশে এত কী দেখছ?

এ সময় বৃষ্টিটা ধরে আসছে। গুড়ুই ইঞ্জিনের ডালা খুলে কী যেন দেখছে। শেষ বেলায় রোদ ওঠার জন্য অবেলায় মাঠ এবং গাছ-গাছালি খুব ঝকঝকে মনে হচ্ছিল।

তোমার দেশ দেখছি মারিয়া, তোমার দেশের মানুষদের দেখছি।

সামনের দিকে ঘাড় ঘোরাল মারিয়া। বলল, তুমি কথা না বললে আমার ভাল লাগে না ওজালিও।

মারিয়া সুমনের মুখ দেখল, সরল নাবিক সুমন। অনভিজ্ঞ এবং তরুণ। আর মারিয়া কিশোরী। মারিয়া সুমনের হাত ধরে বলল, তোমার ভাল লাগছে না? আমাদের এই খামার, রোদ্দুর শেষবেলায় ভাল লাগছে না?

তোমাদের খামারে আমরা কখন পৌঁছাব মারিয়া?

সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় পৌঁছে যাব। সেখানে সেই বুড়োবুড়িকে দেখবে, ওরা সেখানে আমাদের খামার দেখাশোনা করছে।

মারিয়া সামান্য সময় মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, জায়গাটা তোমার খুব ভাল লাগবে।

তাই বুঝি!

মা যে ঘরটাতে এসে থাকেন, তার পাশে ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানা, বড় বড় সব পাথর আর

গ্রামাদেব প্রিয় নদী। বড় দুটো ওপোসাম আছে, সেদিন মা চিঠি পেয়েছেন ওদেব বাচ্চা হয়েছে। মিসেস উড বাচ্চাগুলোব কত বকমেব গল্প লিখে জানিয়েছে।

গাড়ি ফেব চলছিল এবং ওবা বড একটা মোড ঘুবতেই দেখল, সামনে বড একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। সেখানে ট্যালডন পবিবাবেব পবিচিতি লেখা আছে। তাব নীচ দিয়ে এই খামাবে ঢোকাব পথ। সুমন বহুদুব পর্যন্ত চোখ তুলে তাকাল। শুধু জমি এবং নবম মাটি আব ঠিক বাংলাদেশেব মতো সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটি থেকে। সুমন বলল, তা হলে এসে গেছি।

মাবিয়া হাসল। বলল, না ওজালিও, আমবা এখনও আসিনি। আমাদেব জমি মাত্র আবম্ভ হল। এখন প্রায় আবও আধ ঘন্টাব মতো গাড়ি চালালে তুমি আমাদেব গ্রীষ্মাবাস পাবে।

এই পবিবাবেব গ্রীষ্মাবাস বড় কাছে যেন, ওবা তো ইচ্ছা কবলে গবমেব সময় উত্তবে চলে যেতে পাবে অথবা বকি অঞ্চলেব পাহাড়ি জায়গায়। সুমন বলল, গবমেব সময ঠান্ডায় যাওয়া দবকাব। কিন্তু এখানেও গবমই মনে হচ্ছে মাবিয়া।

মাবিয়া বলল, গেলে বুঝতে পাববে।

মাঠেব ভিতব দূবে দূবে আলো জ্বলছিল মনে হল। ওবা যখন সেই গ্রীষ্মাবাসেব ভিতব ঢুকে গেল তখন সামান্য বাত হয়েছে। ঠিক সদব দবজাব সামনে মিস্টাব আব মিসেস উড ওদেব জন্য অপেক্ষা কবছিলেন। ভিতবে ঢুকে সুমনেব মনে হল জায়গাটা তপোবনেব মতো। এক পবনেব ঠান্ডা হাওয়া সেই তপোবনেব মতো গাছ-গাছালিব ভিতব প্রবাহিত হচ্ছিল যেন।

নানা জাতেব গাছ জায়গাটাকে ঢেকে বেখেছে। কেয়াবি কবা বাগান। মিস্টাব আব মিসেস উড নানাবকম মৌসুমি ফুলেব চাষ কবেছেন। মিসলটোব লতাব ঝোপ এবং পাশেই যেন জলাজমিতে বর্ণাঢ্য ফুল ফুটে আছে। বুনো মোস্কোদাইন এবং দ্রাক্ষালতায় ঢাকা ঘাস দিয়ে তৈবি অথবা ঘাসেব প্লাস্টাব দেওয়া কুঁড়েঘব। প্রচুব অর্থব্যয়ে মাবিয়াব মা ভাবোদি এইসব ঘব নির্মাণ কবেছেন। গাড়ি থেকে নামলেই মাবিয়া বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাব সঙ্গে পবিচয় কবিযে দিল, মাই সেলব ফ্রেন্ড ওজালিও দা সুম্যান। ইনি মিস্টাব উড।

সুমন সেই বুড়ো-বুড়িব সঙ্গে হাত মেলাল। আব এ সময়েই সুমন ফাঁকা মাঠেব ভিতব কিছু ঘোড়াব ডাক শুনতে পেল।

মিস্টাব উড আগে যাচ্ছিলেন। যাবাব মুখে নানাবকমেব ফুল এবং লতাপাতা ওদেব শবীবে লাগছিল। ওবা সেই লতাপাতাব ঝোপ ফাঁক কবে ঘবেব দিকে এগোচ্ছে। মাবিয়া প্রায় সব ব্যাপাবেই সুমনকে সাহায্য কবছিল।

মিসেস উড সুমনকে আলোব ভিতব দাঁড কবিয়ে এবাব খুব ভাল কবে দেখল। ঘাসেব তৈবি এই কুঁড়েঘব দুটো মা এবং মেযেব জন্য। ভাবোদিব ঘবে মাবিয়া থাকবে। এবং মাবিয়াব ঘবে ওজালিও দা সুম্যান। সব এত পবিচ্ছন্ন এবং মিষ্টি গন্ধ ফুল-ফলেব আব এই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাব আদব, সুমনকে প্রায় পবাস্ত কবাব সামিল। বৃদ্ধাব গলায় বড বড পাথবেব মালা। মাথায বঙিন টুপি, শবীবেব চামড়া কুঁচকে গেছে এবং চোখেব ভিতব ঘোলাটে ভাব। মিসেস উড একবাব দেখতে দেখতে চিৎকাব কবে উঠল — হে প্রায দেবদূতেব সামিল গা।

মাবিয়া সুমনকে জড়িয়ে বলল, মাই সেলাব ফ্রেন্ড। মাই ওজালিও। মাই এমিল

সে খুব আদব কবাব মতো কাছে টেনে বলল, সমুদ্রেব ওপাব থেকে সে আমাদেব কাছে এসেছে। • ওদেব জাহাজে পাখিব খোঁজে গিয়েছিলেন।

মাবিয়া প্রথম পবিচয়েব গল্পটা প্রায় বলে ফেলল। তাবপব একসময় কাতব গলায় বলল, ওব মা নেই বাবা নেই।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাব চোখ এই কথায় সজল হয়ে উঠল। বোধহয় স্মৃতিতে ওদেব সন্তানেব মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠেছে। সেই মহাযুদ্ধেব কবলে তাঁবা তাঁদেব তিন সন্তানকে হাবিয়েছিলেন। সুতবাং বৃদ্ধ বলে উঠল, ঈশ্বব মঙ্গলময়।

বলে বিশ্রামেব জন্য ছোট পার্লাবে নিয়ে সুমনকে বসাল। তাড়াতাড়ি সামান্য কফিব আয়োজন কবা হল। মাবিয়া ঠিক ওব মা ভাবোদিব মতো সুমনকে দেখাশোনা কবছে। সে সুমনেব ঘবে ঢুকে কোথায়

কী রাখা দরকার সব পরীক্ষা করে দেখল। বৃদ্ধার কাজে কোনও ফাঁকি নেই। বাথরুমে টাওয়েল, গন্ধযুক্ত সাবান, পেস্ট এবং ঝরনার জল সব ঠিক আছে। বড় খাট, শিয়রে টেবিল, কিছু ক্লাসিকাল ইংরেজি বই এবং নীল আলোর ফুলদানিতে লতানে ক্লিমাটিস এবং কিছু হালকা গন্ধ যেন, সুমন, বাঙালি ছোকরা নাবিক, এখন রাজার ছেলের মতো। হায়, বাঙালি ছোকরা নাবিক প্রেমের ফ্যাসাদে পড়ে গেল, মিথ্যা চাটুকার সাজাতে গিয়ে, জাহাজের চার নম্বর সাব হেনরির দুষ্ট বুদ্ধিতে প্রেমের ফ্যাসাদে পড়ে গেল। মারিয়া সদা শঙ্কিত, কোথাও এই প্রিয় যুবকের আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটে যাবে এই ভেবে।

মারিয়া নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পালটাবার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। বৃষ্টি হয়েছে বলে বেশ ঠান্ডা মনে হচ্ছিল। সে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ সাবানে ঘসে ঘসে ধুল। খুব পাতলা ফ্রক গায়ে দেবার আগে হাত-কাটা হালকা গেঞ্জি গায়ে দিল। মখমলের মতো নরম সিল্কের গেঞ্জিতে বুকের সামান্য অঙ্গ ঢেকে প্রায় সবটাই খোলা রাখল আর কী প্রাণবন্তকর ইচ্ছা, শরীরের ভিতর যুবতী হবার! সব যেন ঠেলে-ঠুলে বের হয়ে আসতে চাইছে। নিজের অঙ্কুর উদ্‌গমনের কথা ভেবে আয়নায় প্রতিবিম্বের কাছে মারিয়ার খুব সংকোচ হল। সে তাড়াতাড়ি হালকা গরম পালকের মতো ফ্রক গায়ে দিয়ে বের হতেই দেখল, টেবিলে সুমন। সুমন স্নান সেরে খুব সাধারণ পোশাকে, অর্থাৎ পায়জামা পাঞ্জাবি সাদা রঙের, পিছন থেকে বড় লম্বা মনে হচ্ছে সুমনকে। সে টেবিলে বসে বইয়ের পাতা উলটাবার সময়, ক্যাপ্টেনের মুখ মনে করতে পারল, জাহাজ-ডেকে বোট-মাস্টারের কথা মনে পড়ল, এই দেশ উত্তর-আমেরিকার, এখানে নিগ্রোবিদ্বেষ ভয়ানক, ভারতীয় জাহাজিদের সেজন্য এই বন্দরে নামা বারণ, কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল এবং সুমনকে বড় অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে।

অন্যমনস্কতার জন্য হোক অথবা অন্য কারণে সুমন বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। সে বারান্দায় বের হয়ে পায়চারি করতে থাকল। আলো-অন্ধকারে সবই রহস্যময় যেন। ডায়নামোর শব্দ ভেসে আসছে অনবরত। বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর বড় অবয়বের চাঁদ আকাশে, সব যেন ঠিক তপোবনের মতো মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে ধূর্ত শেয়ালের ডাক শুনতে পেল। এবং মায়ের মুখ মনে পড়ছিল খুব। মারিয়া আপন আত্মীয়ের মতো, মারিয়াকে আর কিছুতেই বালিকা ভাবতে পারছে না সে। মনে হল সামনে এক সোনালি ধানের খেত, মনে হল সেই জমির উপর এক পুরুষ এবং অবয়বে সুমনের মতো। সোমবার বিকেলে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। স্প্যানিশ যুবক সেজে বিখ্যাত অলীক ম্যাটাডরের বংশধর সেজে, ওজালিও দ্য সুম্যান সেজে, যা হোক এই বন্দরের দিনগুলো সে স্বপ্নের মতো কাটিয়ে দিতে পারছে। মাঝে মাত্র একটা দিন, তারপর হয়তো কতকাল পর ফের এই বন্দরে আসা হবে, খুঁজলে দেখা যাবে মায়ের মতো মেয়েও সেদিন বর্ণবিদ্বেষের যন্ত্রণায় ভুগছে। সে পায়চারি করতে করতে ভাবল, আজ রাতে মারিয়াকে বললে কেমন হয়। ভেবে মুখ তুলতেই দেখল মারিয়া ঘরের ভিতরে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে।

সুমন ভিতরে ঢুকে ওর পাশে বসল।

কেমন লাগছে জায়গাটা?— মারিয়া বলল।

ভাল! হেনরিকে নিয়ে এলে পারতাম।

তোমার বন্ধুটি মা'র সঙ্গে মরগানে চলে গেছে।

জানি।

জায়গাটা ছবির মতো। ভোর হলে দেখতে পাবে সব।

সুমনকে চুপ থাকতে দেখে কথাটা বলল মারিয়া।

দেখবে আমাদের জায়গাটা সবচেয়ে উঁচু। দেখবে চারধারে সব জমি ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। তুমি বাইনোকুলার চোখে দিলে দেখতে পাবে ঠিক হ্যাগেল মাউন্টের পাশে আমাদের ট্রাক্টারগুলোর গ্যারেজ। দক্ষিণ দিকে তাকালে দেখতে পাবে নিগ্রোদের বস্তি, ওরা আমাদের এইসব খেত-খামারে কাজ করে। আর পশ্চিমে দেখবে সব বড় বড় গাছ, ফাঁকে ফাঁকে মনে হবে বড় রাস্তা চলে গেছে। কিন্তু সেগুলো রাস্তা নয়, মিসিসিপি নদীর ছোট-বড় খাড়ি। আর ঠিক দক্ষিণ পুবে রয়েছে আমাদের এক বনাঞ্চল। সেখানে তুমি ইচ্ছা করলে কাল শিকারে যেতে পারো। সব ধূর্ত শেয়াল চোখে পড়তে পারে তোমার, সুচতুর ওপোসামও তুমি দেখে ফেলতে পারো, আর সব নানা রকমের বন্য পাখি।

ঘিনি মুরগিরা পর্যন্ত সেসব জায়গায় ঘর তৈরি করে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছে।

সুমন বলল, ছেলেবেলাতে মা আমাকে রামের বনবাসের গল্প শোনাতেন। রূপকথার গল্প বলতেন। তপোবনের কথা বলতেন। জায়গাটা সেইসব গল্পের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তাই বুঝি!

অথবা সুমনের যেন বলার ইচ্ছা, অল দি সেইন্টস মে কাম হিযাব টু লাভ ইউ। অথচ সুমন কিছু বলল না। শুধু মারিয়ার মুখ দেখার জন্য বসে থাকল। মারিয়া এখনও পা দোলাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে টার্কি রোস্টের গন্ধ ভেসে আসছে। বুড়ো-বুড়ি এই ছোট্ট মেয়েটির সুখ-সুবিধার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে। স্থানীয় সব টাটকা জিনিস এনে ভাঁড়ার ঘর ভরে তুলেছে। কিছু পানীয়, কারণ সঙ্গে একজন বিদেশি বন্ধু আসছেন মারিয়ার। আর গুড়ুই গ্যারেজের দিকে গাড়ি নিয়ে চলে আসবে। ঠিক রান্নাঘরের ওপাশে গুডুইয়ের থাকবার ঘর। ঘরের লাগোয়া বড় এক হলঘরের মতো জায়গায় গুডুই থাকবে।

মারিয়া এবার উঠে এসে সুমনের টেবিলের উপর বসল। ঘরে হাওয়া ঢুকছিল বলে সুমন এবং মারিয়ার ববকাটা চুলে বাতাস যেন বিলি কেটে যাচ্ছে।

মারিয়া চুলে হাত রেখে বলল, ওজালিও, তুমি যত যাবার সময় আসছে তত কেমন চুপচাপ, কথা বলছ না ভাল করে। কেবল চুপচাপ আমার পাশে বসে থাকতে ভালবাসো।

সুমন চোখ তুলে তাকাল।

তুমি অন্তত কিছু বলো, চুপচাপ থাকলে আমার বড় কষ্ট। মনে হয় তুমি আমার বিরহে কাতর।

সুমন এবার টেবিলে কনুই রেখে সেই জরির কাজ করা জাপানি পুতুলের মতো মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকল। কোনও কথা, কোনও আলাপ অথবা কোনও গল্প সে এখন মনে করতে পারছে না। বরং ওর ইচ্ছা হল সারারাত এভাবে, ওরা দু'জন চুপচাপ বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থেকে এই যে চারদিকে ঈশ্বর ঘাস, ফুল, পাখি এবং গাছ-গাছালি ছড়িয়ে রেখেছেন তার ভিতর এমন এক গান আছে, নীরবে শোনার মতো গান, কোনও ফুলের ভিতর প্রজাপতির ডানায় রং, আহা আমরা মানুষেরা সুন্দরের জন্য পিপাসার্ত। ভারোদির হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিগ্রো যুবক-যুবতী সম্পর্কে বড় ঘৃণার জন্ম দিচ্ছিল। সুমন ভেবে পাচ্ছিল না এই মারিয়া যার শৈশব প্রাচুর্যে কাটছে, এই মারিয়া যার শরীর গমের শিষের মতো হালকা এবং যৌনজীবনে যুবতী হলে বড়ই যে পটু হবে, সে এভাবে একজন সাধারণ নাবিকের জন্য হাহাকার করে উঠছে কেন। সে আলগা করে মারিয়ার কোমরে হাত রাখল, যেন এক সরল বালক এখন কোমল ভালবাসার উপর হাত রাখছে।

মারিয়া সুমনের কপালে চুমু খেল। ঠোঁটে চুমো খেল। বলল, মাই ওজালিও।

সুমন ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কিছু বলবে?

আমি বড় হলে তোমার দেশে চলে যাব।

যাবে।—কেমন অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলল সুমন।

তুমি যাবার আগে ঠিকানা দেবে না আমাকে?

সুমন অন্যদিনের মতো ফের বিব্রত বোধ করতে লাগল। মনে হল সব কথা বরং খুলে বলা ভাল। যেন বলা ভাল, আমার দেশ মারিয়া স্পেন নয়, আমি ওজালিও দ্য সুম্যান নই। আমি একজন গরিব ভারতীয় নাবিক। তোমার দেশে কালো মানুষের প্রতি ভয়ংকর বিদ্বেষ। অথচ আমি তোমাদের সঙ্গে সাদা মানুষের অহংকার নিয়ে মিশেছি। আমি সুচতুর অভিনয়ে তোমাকে ঠকিয়েছি।

সুমন বলল, জাহাজি মানুষের আর কী ঠিকানা?—এই কথা বলে সে রেহাই পেতে চাইল।

তারপর ওরা দু'জন বারান্দা থেকে পরস্পর হাত ধরে নেমে গেল। চাঁদের আলো মাঠময়, সেই ঝরনামোর শব্দ ভেসে আসছে। নীচে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে আর বড় বড় গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো জাফরিকাটা। ওদের মুখে সেইসব ছায়া বড় বেশি কৌতূহল উদ্রেক করছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাউট মাছ শিকারের গল্প আরম্ভ করল। মারিয়া গত বছর ট্রাউট মাছ শিকার করতে গিয়ে যে দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল তার গল্প করল। ওরা কাল ভোরে হাগেল মাউন্টের ওপাশটায় অথবা যেখানে বনের গভীরে ছোট নদী সমুদ্রে মেশার জন্য আকুল, ঠিক সেই বনের শেষে মাছ ধরার জন্য ওরা চলে যাবে। মিস্টার উড সব ঠিক করে রেখেছেন। যতটা পথ

পারা যাবে জিপে এবং পরবর্তী পথটুকু হেঁটে, এসব গল্পও মারিয়া সুমনকে শোনাচ্ছিল।

ওরা বড় একটা ওক গাছের নীচে শান-বাঁধানো বেদির উপর বসল। নরম ঘাস নীচে এবং অপরিচিত ফুলের সুবাসে জায়গাটা ভরে গেছে। মাথার ওপর মৌমাছি গুঞ্জন করছিল। বোধহয় দ্রাক্ষালতায় ফুল ফুটবে। অথবা পালিত মৌচাক কোথাও রয়েছে।

খেতে বসে বৃদ্ধ উড নানারকমের রসিকতা করলেন, তিনি একসময় মেক্সিকোর কোনও দক্ষিণ অঞ্চলের শহরে মদের দোকান খুলেছিলেন, সেখানে সামনে একটা মাঠ ছিল এবং মাঝে মাঝে বড় মেলা বসত এবং মেলায় বড় এক সার্কাস পার্টি আসত। ঠিক সিংহ-বাঘের মেলা নয়, শুধু ষাঁড়ের মেলা। বড় বড় ষাঁড় ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন মানুষ রিং-এর ভিতর ঢুকে যাবে। ওরা রং-চঙে পোশাক পরে ক্লাউনের মতো খ্যাপা ষাঁড়ের পেছনে ছুটে বেড়াত এবং খ্যাপা ষাঁড়ের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নানা অঙ্গভঙ্গি করত। সেই দেখে গ্যালারির মানুষগুলো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত। ওজালিও বিখ্যাত ষাঁড় লড়াই সম্পর্কে মজার মজার ঘটনার উল্লেখ করলেন।

বড় দুটো খরগোশের রোস্ট। মারিয়া কেটে কেটে একটু বন্য কায়দায় সুমনের প্লেটে তুলে দিচ্ছে। কিছু ফ্রেঞ্চ বিন সেদ্ধ, কিছু গিনি মুরগির ডিম ভাজা, চা এবং পরে পানীয়। স্যালাড সামান্য লেটুসের। আর ফলের আরক রাখা আছে।

পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছিল। রাত দশটা, ওরা তাড়াতাড়ি খেতে থাকল। কারণ সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে হবে। মিস্টার উডের নির্দেশ মতো ওদের খুব সকালে ওঠার কথা। তিনি বিকেলেই সব ঠিক করে রেখেছেন। নানারকমের মশলা তৈরি করিয়েছেন মাছ শিকারের জন্য। তিনি আজ একবার জিপগাড়ি করে জায়গাটাও নির্বাচন করে এসেছেন। যে পাথরটার চারপাশে জল নেমে যাচ্ছে এবং যে পাথরটার খাঁজে কিছু লম্বা ঘাস ছিল, তা পরিষ্কার করে জায়গাটাকে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এই অঞ্চলে যেহেতু কিছু রেটল সাপের প্রকোপ আছে তার জন্য চারপাশে কিছু নিগ্রো শ্রমিক রেখেছেন যারা সবসময় মারিয়া এবং অতিথিটির উপর সতর্ক নজর রাখবে। মিস্টার উড বুড়ো মানুষ, মারিয়াদের কর্মচারী। যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। তিনি মাছ শিকারের জন্য কী কী ব্যবস্থা করে রেখেছেন সব হুবহু বলে যেতে থাকলেন।

মিস্টার উডের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মারিয়াকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বোধহয় সে এখন তার মায়ের মতো চোখমুখ করে এস্টেটের কর্মচারীটির প্রতি একটু রাশভারী হতে চায়। সে যে সামান্য বালিকা নয়, কথাবার্তায় তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল। সে হাত তুলে দেওয়ালে আঁকা মানচিত্রের উপর একটা বড় লম্বা লাঠি রাখল। আর মানচিত্রের নীচে সেই লাঠি দিয়ে কী নির্দেশ করতেই উড উঠে দাঁড়াল এবং বলল, এখানে এবার কিছু বুনে উঠতে পারিনি।

মারিয়া বলল, কেন?

এবার জল এত বেশি যে আমরা গ্রীষ্মের ধান বুনে উঠতে পারিনি।

মা বলেছিলেন যে এখানে পাম্পের ব্যবস্থা করা হবে?

পাম্প ইনস্টলেশানের কাজ শেষ হয়ে ওঠেনি।

তা হলে আগামী বছর থেকে এখানে কোনও অজন্মা থাকবে না।—বলে সে মানচিত্র থেকে এবার স্টিকটা তুলে নিল।

বৃদ্ধ বললেন, না।

মারিয়া এবার সুমনের দিকে মুখ তুলে বলল, তোমাকে খুব আশ্চর্য করে দিতে পারতাম।

সুমন বুঝতে না পেরে মাংসের টুকরোটা মুখে রেখেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

মারিয়া জিভের উপর থেকে চামচটা আংশিক সরিয়ে নিয়ে বলল, এখানে আমাদের প্রতি বছর ধানের চাষ হয়।

মিস্টার উড ঘাড় কাত করে বললেন, জলের উপর সেই ধানগাছের ভিতর ছোট স্কিপে ঘুরে বেড়ানো বড় আরামদায়ক স্যার।

বলে সে মারিয়াকে গ্লাসে ফলের রস ঢালতে সাহায্য করল। তারপর ওরা চারজন সেই রসটুকু গিলে যে যার ঘরের দিকে এগুতে থাকল। বৃদ্ধ যাবার আগে সুমনকে অভিবাদন জানাল। সুমন

কথাবার্তায় ওদের সঙ্গে বড় বেশি ভদ্র হয়ে উঠেছে। ওর এই মার্জিত আচরণ, সবসময় প্রায় নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বড় খুশি রাখছে। এতদিন ওদের কথা বলার লোক ছিল না যেন অথবা সেই যুদ্ধের আমলের ছবি, মৃত সন্তানের জনক-জননীর মুখ বড় কষ্টের, দুঃখ এবং কাতর উক্তি সবসময় কথাবার্তার সঙ্গে মিশে থাকে।

সুমন বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে বলল, দেন গুড-নাইট মারিয়া।

মারিয়া সুমনের মুখে হাত রেখে বলল, চুপ।

তারপর চারিদিকে যখন দেখল কেউ কাছে নেই, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পাশের বাড়িতে চলে গেছেন এবং সেই ঝিঁঝি পোকার মতো ডায়নামোর শব্দ মাঠের উপর দিয়ে ভেসে আসছে, তখন মারিয়া ওর হাত ধরে বলল, আমার ঘরে এসো ওজালিও।

সুমন এই বালিকার কী ইচ্ছা এখন যেন স্পষ্ট ধরতে পারছে। সে তবু মারিয়ার সঙ্গে খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে গেল। মারিয়া দরজা বন্ধ করে দিতে গেলে সুমন অত্যন্ত আড়ষ্ট গলায় বলল, প্লিজ মারিয়া ..

মারিয়াকে খুব অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ওর গলা চোখ মুখ যেন বসে যাচ্ছিল ক্রমশ। অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ছে। সে কোনওরকমে বলল, গুভুই আজ আমাদের পাশে থাকছে না। সে বাবুর্চিখানায় শোবে।

মারিয়ার সেই এক ক্ষীণ গলায় ডাক, ওজালিও! অথবা যেন বলার ইচ্ছা আমার বড় কষ্ট, আমি এখন যুবতী হবার মুখে ওজালিও...।

সুমন খুবই বিচলিত। মারিয়ার কাছ থেকে সোজাসুজি এমন আচরণ প্রত্যাশা করেনি। তার এই ছদ্মবেশ থেকে যেন এক্ষুনি মুক্তি চাই। বলার ইচ্ছা, মারিয়া, আমি ওজালিও নই। আমি ভারতীয় নাবিক। কাপ্তান আমাদের ভারতীয় নাবিকদের নামতে বারণ করেছিলেন। আমি মাটির জন্য, মানুষের জন্য নেমে এসেছি। সুমন অথচ কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। মারিয়াকে বড় বেশি নির্লজ্জ এবং বেহায়া মনে হচ্ছে। সুমন শেষবারের মতো যেন বলল, তুমি দরজা থেকে সরে দাঁড়াও মারিয়া। আমার সাহস নেই। এমন সুন্দর মেয়েকে কীভাবে আদর করতে হয়, আমি ঠিক কিছু জানিও না। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মারিয়াকে নড়তে না দেখে সুমন কঠিন গলায় ডাকল, দরজা থেকে সরে এসো মারিয়া।

এই প্রথম সুমনকে যথার্থ পুরুষের মতো ভেবে লজ্জিত এবং সংকুচিত হল মারিয়া। সে দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর চোখ মেঝের দিকে, সে চোখ তুলে যথার্থই তাকাতে পারছে না। বস্তুত মারিয়ার সহসা এই নির্লজ্জ ভাবটুকু সুমনকে ব্যথিত করেছে।

কিন্তু মারিয়া খুব অসহায় বালিকার মতো মাথা নিচু করে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুমন দরজা অতিক্রম করে বারান্দায় এসে নামল। তারপর খুব সহজ গলায় বলল, এসো, বাইরে এসো। আমরা বারান্দায় বসে মাঠ দেখি। ইচ্ছা করলে তুমি তোমার সেই জাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের গল্প করতে পারো।

মারিয়া সেই যে দাঁড়িয়ে ছিল মাথা নিচু করে, তার থেকে এতটুকু নড়ল না। সুমন বাইরে লম্বা স্যাবে হাত রেখে মারিয়াকে বলল, আকাশ দেখে মনেই হচ্ছে না বিকেলে এত ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মারিয়ার কী সব মনে হচ্ছিল তখন, অপমান স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের অথবা মনে হচ্ছিল এই ভূমিখণ্ড বিদীর্ণ হলে সে তার ভিতরে যেন আশ্রয় নিতে পারত। সুতরাং মারিয়া যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল মাথা নিচু করে, ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ তুলে সে দেখল না মানুষটি তার অপেক্ষাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটিকে সহসা অন্য গ্রহের বাসিন্দা বলে মনে হল। ঈশ্বরের জগতে সংযম এবং তিতিক্ষা বলে একটা বস্তু আছে যার দাম অথবা মূল্য প্রায় ঈশ্বরের সমান। আর সুমন যেন বুঝেছিল ভালবাসার দাম অত সহজ মূল্যে পরিশোধ করতে নেই। তাই সে সরল বালকের মতো মুখ করে জাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের বাকি গল্পটুকু আগ্রহ ভরে শুনতে চাইল।

কিন্তু মারিয়া সেই যে দাঁড়িয়ে ছিল মাথা নিচু করে, আর এতটুকু নড়ল না।

সুমন বারান্দায় জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে ছিল। সুমন মারিয়াকে উদ্দেশ করে বলল, জানো মারিয়া, এই মাঠের জন্যই হোক অথবা তপোবনের মতো জায়গাটা বলেই হয়তো আমার আর সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে

করছে না। তোমাকে নিয়ে, সেই যে বলেছিলে না সামনে হ্যাগেল মাউন্ট আছে, অথবা বনাঞ্চলের কথাও বলেছিলে, সেখানে এই রাতে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

তবু মারিয়া মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। আর বারান্দা থেকে ওর মুখ স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছিল না। সুতরাং সুমন দরজার ভিতর ঢুকে মারিয়ার মুখ তুলে ধরতেই দেখল মারিয়া অপমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সুমন ভয়ংকর বিব্রত বোধ করতে থাকল। সে বলল, এই মারিয়া, কী হচ্ছে! ছিঃ ছিঃ, আমি কিছু বুঝে বলিনি। এই শোনো, আহা এমন করতে নেই। মারিয়া...মারিয়া।

পাগলের মতো মারিয়ার ভিতর থেকে কান্নার আবেগ উঠে আসছিল। এ সময় বোধহয় ওকে কাঁদতে দেওয়াই ভাল। সুমন দরজার উপর হেলান দিয়ে এবার একটা সিগারেট ধরাল। এবং সেই মাঠের দিকে মুখ করে সিগারেট টানতে থাকল। ঘরের নীল আলোর ভিতর মারিয়ার মুখ বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। জানলাতে তেমনি সামান্য হাওয়া এবং চারপাশের নাম না জানা গাছগুলো থেকে পাতা ঝরে পড়ার শব্দ অথবা জলের ফোঁটা পড়ছে যেন কোথাও, তার শব্দ। অনেক দূর দিয়ে বোধহয় কোনও ট্রেন যাচ্ছে, তার শব্দ পেল সুমন। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। সামাদ এবং সুচারুর কথা মনে হল। বোধহয় জাহাজের বাংকে শুয়ে ওরা ঘুমোচ্ছে। বন্দরের কিছু বেশ্যা মেয়ের মুখও মনে পড়ছিল সুমনের। জাহাজে ভয়ংকর পিচিং-এর সময় কাজের ভিতর যে কষ্ট, সবই ক্রমশ মনে আসছিল আর পাশে দাঁড়িয়ে লজ্জার জন্য হোক, অপমানের জন্য হোক অথবা দামি ভালবাসার জন্য হোক, সরলমতি বালিকা কাঁদছে। সুমনের কিছুই এখন ভাল লাগছিল না। সে তো মারিয়াকে বন্দরের আর দশটা খারাপ মেয়ের মতো ভাবতে পারে না। সে যে কখন মারিয়াকে নিজের মধ্যে বড় জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে জানেই না। কাল রবিবার, জাহাজের শেষ ছুটির দিন। এবং এই মারিয়া মায়ের মতো যেন আপন এই মারিয়া, সামান্য পরিচয় থেকে ভালবাসা, হায় জাহাজি মানুষের কত কষ্ট, সব ছেড়ে-ছুড়ে একদিন অন্য বন্দরের জন্য যাত্রা, অথচ সে এই বনাঞ্চলের কোনও রেডউডের ভিতর অথবা কোনও বড় ফণীমনসা গাছের নীচে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরের স্বপ্ন দেখল। সামনে নদী, কিছু শস্যক্ষেত্র এবং ফলের বাগান, কিছু গাভী আর সেই এক বালিকার মতো মুখ, মারিয়া মায়ের মতো শাড়ি পরে দরজায় এই নদী-নালার মানুষটির জন্য প্রতীক্ষা করবে। এক সুখ-স্বপ্ন, এক ইচ্ছার কথা এবং স্বপ্নের মতো ইচ্ছা সুমনকে প্রাণের ভিতর বড় আকুল করছে।

সুমন এবার মারিয়ার হাত ধরল। বলল, এসো।

মারিয়া সুমনের পাশে হাঁটতে থাকল। বিনীত এবং বাধ্য যুবতীর মতো অথবা বালিকা মারিয়া সুমনের পাশের চেয়ারে বসে চুপ করে থাকল। সামনে শুধু মাঠ। চাঁদের আলো মায়াময়। নানা রং-বেরঙের কেয়ারি-করা ফুলের বাগান আশেপাশে। সরু রাস্তার উপর নানারকমের লতা-পাতার আচ্ছাদন। এবং দূরের মাঠে জোনাকি জ্বলছে, এমন সব আলোর মালা, সব যেন হায় রহস্যে ঘেরা। পেটা ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজল। কিন্তু উভয়ে কোনও কথা বলল না। চুপচাপ মুখোমুখি বসে রাতের কোলাহল অর্থাৎ পাখিরা কোথাও ডাকছে প্রহরে প্রহরে, ঘাসের ভিতর ঝিঁঝি পোকার ডাক এবং ওপোসামের বাচ্চাটা মনে হয় মায়ের দুধ খাচ্ছিল, তার চুক চুক শব্দ মাঠ পার হয়ে এদিকে ভেসে আসছে। ওরা নিবিষ্ট মনে শেষ সময়টুকু খুব কাছে থাকছে। বাচাল ছোকরার মতো কথা বলে নির্মল জলে নিজের প্রতিবিম্বকে নিয়ে শুধু খেলা করতে চাইল না। বরং স্পষ্ট এক মানুষের চেহারা থাকুক, সন্ন্যাসীর মতো মুখ থাকুক, সন্ন্যাসিনীর মতো তিতিক্ষা এবং সংযম থাকুক সবসময়, ওরা বসে বসে তখন বোধহয় তাই চাইছিল।

সুমন এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, এবার শুতে যাও মারিয়া। রাত জেগে বসে থাকলে শরীর খারাপ হবে।

কিছু না শোনার ভান করে মারিয়া বসে থাকল। মারিয়া উঠল না। সামনের মাঠ দেখতে দেখতে বলল, গ্রামের মানুষরা সব হাহাকার করছে। সব গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছিল।

সুমন বুঝল, এবার মারিয়া সে তার প্রিয় জাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে।

গ্রামের পাশে নদী ছিল একটা। তার জল শুকিয়ে গেল। ফুলে-ফলে ভরা সব গাছ নেড়া হয়ে গেল। বেঞ্চিতে বসে গ্রামের বৃদ্ধরা গাছের শেষ পাতা ঝরে পড়তে দেখল। গাঁয়ে তখন আর কোনও

বালক-বালিকা দেখা যাচ্ছে না। এই মরুভূমি সদৃশ দেশের অবস্থা দেখে সকলেই আতঙ্কে পালিয়ে গেছে। এমিল এসে জাদুকরকে সব বললে তিনি বললেন, তুমি সামনের মাঠ পার হয়ে চলে যাবে, সামনের গ্রাম মাঠ এবং পাহাড় পার হলে দেখবে এক নদী। নদী পাহাড় থেকে খুব জোরে নীচে নেমে আসছে বলে জলে স্রোত ভয়ংকর। তুমি নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে যাবে। লক্ষ করলে দেখতে পাবে একটা করে চাঁপাফুল জলে ভেসে যাচ্ছে। তোমাকে শুধু নদীর উৎসস্থলে সেই চাঁপা ফুলগাছটিকে খুঁজে বের করতে হবে এমিল।

দিন যায়। এমিল হাঁটছে। সেই চাঁপাফুলের জল যেখানে পড়বে সব জাদুর স্পর্শের মতো ফের ফুল ফলে ভরে যাবে। প্রিয় এমিলের সঙ্গে তার পোষা বেড়ালটাও ছিল। ওরা হাঁটছে, মাঠ আর শেষ হচ্ছে না। কিন্তু এমিলের দুঃখ নেই, মানুষের জন্য, ফল ফুলের জন্য তার ভালবাসার অন্ত নেই। সে মাঠ এবং পাহাড় ভেঙে নদীর উৎস খুঁজতে যাচ্ছে। যেতে যেতে দেখল কোনও জন মনিষ্যির সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামগুলো সব হাহাকার করছে। সে ক্রমাগত হাঁটছিল। মানুষের জন্য সে দিন নেই, রাত নেই, হাঁটছে। তারপর সে একদিন নদীর উৎস খুঁজে পেল। পাহাড়ি নদীর পাড়ে চাঁপা ফুলের গাছটি, বড় কষ্টসাধ্য ওঠা। নীচে নদীর জল, প্রপাতের মতো। গড়িয়ে পড়ে গেলে মৃত্যু। গাছটা থেকে একটা করে ফুল ঝরে পড়ছে। জলের ঘূর্ণিতে পড়েই ফুলগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল দূরে। পোষা বেড়ালটা কেবল মিউ মিউ করছে। এমিল অনেক চেষ্টা করেও সেই ছোট গাছটিতে উঠতে পারল না, অথবা একটা ফুল সংগ্রহ করতে পারল না। কিন্তু দেখল, সোনার চাঁপাগাছটিতে একটি ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে এবং গাছের সরু ডালটিতে নেমে যাচ্ছে, হায় হায় নীচে প্রপাতের জল, পড়ে গেলে মরে যাবে, এমিল জীবনের মায়া না করে গাছটাতে উঠে গিয়ে ফ্রক পরা মেয়েটিকে নামিয়ে আনতে সাহায্য করল। নীচে নামলে দেখল, ছোট বালিকার হাতে সেই সোনার চাঁপা। চাঁপা ফুলটি এমিলের হাতে দিয়ে ফ্রক পরা মেয়েটি অনেক বড় হয়ে গেল, ঠিক এমিলের মা'র মতো। তিনি সামনে দাঁড়িয়ে মা মেরির গান গাইছিলেন আর বলছিলেন, আমি এই বনের দেবী, এমিল। যতবার যারা এই ফুল নিতে এসেছে ততবার আমি ছোট্ট মেয়ে সেজে গাছে উঠে গেছি। কিন্তু কেউ আমাকে রক্ষা করতে আসেনি। তারা ফুল না নিয়ে চলে গেছে। যাও এমিল, এই ফুলের জল সব গাছে গাছে মাঠে মাঠে এবং নদীতে সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। আবার ঈশ্বর মুখ তুলে তাকাবেন।

এইটুকু শেষ করে মারিয়া সুমনের মুখ দেখল। এই জ্যোৎস্না এবং নিঃসঙ্গ নির্জন রাত্রিতে সুমনের মুখে বোধহয় ঈশ্বরের অপার মহিমার ছবি ফুটে উঠেছিল যা দেখে মারিয়া নিজের দুঃখ ভুলে যাচ্ছিল।

সুমন বলল তারপর মারিয়া?

তারপর থেকে শুনেছি, আমাদের ছোট্ট এমিল গাছে গাছে কেবল ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে। যেখানে ফুল ফোটে না, শুনেছি সেই প্রিয় জাদুকরের পালিত পুত্র সেখানে চলে যান। ফুল ফোটানো তার নেশা হয়ে গেছে।

মারিয়া এইটুকু শেষ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মারিয়া এখন বিজয়িনীর মতো চলে যাচ্ছে। সে যাবার সময় একবার সুমনের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। সুমন শুধু দেখল মারিয়া চলে যাচ্ছে। সে দেখল দরজা পর্যন্ত মারিয়া সোজা হেঁটে গেছে। তারপর কী ভেবে দরজার উপর মাথা রেখে সামান্য সময় মারিয়া অপেক্ষা করল এবং সুমনের কেন যে মনে হল—না, আর না। আর স্প্যানিশ নাবিকের ছদ্মবেশ নয়। সব খুলে বলা দরকার। না বলতে পারলে চিরকালের জন্য সে মারিয়ার কাছে ছোট হয়ে থাকবে। সে বলল, তোমাকে আজ হোক কাল হোক সব খুলে বলব। আমার ছদ্মবেশে তুমি প্রতারিত হও, আমি চাই না।

মারিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু সুমনকে ফের অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সে বারবার সিগারেট খাচ্ছিল। মারিয়া ক্ষোভে-দুঃখে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুমন বাকি রাতটুকু বারান্দায় পায়চারি করল শুধু। সে ঘুমোতে পারল না। সে সামান্য নাবিক। সে সামান্য মিথ্যা কথা বলে এক অসামান্য ভালবাসায় জড়িয়ে পড়েছে। ওর মনে হচ্ছিল কেবল সে মারিয়ার সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। অথচ জীবনের কোথাও না কোথাও মানুষ ফুল ফোটাতে চায়। সুতরাং সে ভাবল আজই সে সব খুলে বলবে, মারিয়া, আমি ওজাসিও দ্য সুম্যান নই। আমি শুধু সুমন। আমি

স্প্যানিশ নই, আমার দেশ পূর্ববঙ্গ। গায়ের রং উজ্জ্বল বলে হেনরি স্প্যানিশ বলে চালিয়ে দিয়েছে। আমি ভারতবর্ষের একজন গরিব মানুষ। আমার ঘর নেই, আমার মা নেই, বাবা নেই। আমার জন্য কোনও ভালবাসা কোথাও অপেক্ষা করছে না। আমি একজন জাহাজের মানুষ, এখন শুধু জাহাজি। আর এইসব ভাবার সময়ই ভারোদির সেই কঠিন মুখ, এ অঞ্চলে ভারতীয় যুবকেরা নিগ্রো পুরুষের সামিল, ঘোর নিগ্রোবিদ্বেষী ভারোদি কিছুতেই তবে ক্ষমা করবে না। সেই কঠিন মুখের কথা মনে আসতেই পুলিশের কথা মনে হল। সে জাহাজ থেকে পালিয়ে নামছে। একথা জানাজানি হলে ওর অপরাধের ক্ষমা নেই। সে মারিয়াদের বড় দুর্গের মতো বাড়ির ভিতর বড় পাথরের ঘর দেখেছিল, বড় বড় কুকুরের মুখ দেখেছিল। নিগ্রো পুরুষের সামিল ভেবে লিঞ্চিং অথবা গুপ্তহত্যার কথা মনে এসে গেল। সে যত সেই প্রিয় এমিলের মুখ স্মরণ করে ফুল ফোটানোর চেষ্টায় সবকিছু খুলে বলবে স্থির করছিল, তত ভিতর থেকে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। সে সহসা ঠিক সামনে যেন দেখতে পেল, প্রিয় এমিল ফুল ফোটানোর জন্য মৃত গাছে, শুকনো নদীতে এবং মরুভূমির মতো বিস্তীর্ণ মাঠে চাঁপাফুলের জল দিয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল সামনে যে মাঠ, যেখানে রাতের জ্যোৎস্না রহস্যময় এবং যেখানে জলাজমিতে সব বর্ণাঢ্য ফুল ফুটে আছে, ঠিক সেখানে অল্প সময়ের জন্য হাঁটতে।

কিন্তু সে বেশিদূর হেঁটে যেতে পারল না। ওর ভীষণ অবসাদ শরীরে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে হল সব খুলে বলতে পারলে হয়তো ওর ঘুম আসবে। সে ছুটে মারিয়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে আসছে। মারিয়ার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর শুধু নীল আলোটা জ্বলছে। চারপাশে কুয়াশার মতো ভাব। সুমন সামনে পিছনে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সব অস্পষ্ট। শুধু কোথাও থেকে মিষ্টি সুর ভেসে আসছে পিয়ানোর। সে ধীরে ধীরে বাইরে বের হয়ে গেল। বাবুর্চিখানা পার হয়ে মাঠের গায়ে গির্জার সামনে, সে হেঁটে গেল। সে যত নিকটবর্তী হচ্ছিল তত পিয়ানোর সুর উঁচু লয়ে গমগম করে উঠছে। সে কুয়াশার ভিতরে অস্পষ্ট আলো দেখতে পেল। মনে হল মারিয়াদের পারিবারিক গির্জার ভিতর কে যেন আলখাল্লা পরে ক্রসের সামনে দাঁড়িয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে গেল। পিছন থেকে সেই মখমলের মতো আলখাল্লা মেঝে পর্যন্ত লুটাচ্ছে। খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছিল অবয়বকে। সে বিস্মিত, কারণ মারিয়া এই গির্জার মানুষটি সম্পর্কে সুমনকে কিছু বলেনি সে কিছুক্ষণ গির্জার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিয়ানোর বাজনা শুনল। এই ভোরের হাওয়া এত মিষ্টি লাগছিল, এত তাজা মনে হচ্ছিল যে সে তার তঞ্চকতার কথা ভুলে গিয়ে বেদির সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। সে ভেবেই পাচ্ছিল না, স্লিপিং গাউন পরলে মারিয়াকে এত লম্বা মনে হতে পারে, এত দীর্ঘাঙ্গী। সে বেদির সামনে দাঁড়াতেই বুঝল অন্য কেউ নয়, মারিয়া নিজে, মারিয়া পাগলিনীপ্রায় ঝড়ের বেগে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। চেতনাশূন্যপ্রায় মারিয়া। ঝড়ের বেগ এখনও বাইরে তেমনি আছে। সুতরাং এই ঘরের পর্দা উড়ছিল। মারিয়াকে এখন যথার্থই যুবতী মনে হচ্ছে। যেন প্রথম থেকে ইচ্ছা করে সাজানো সব আধো-আধো কথা মারিয়ার, অত্যধিক আদর অথবা যত্নের জন্য যুবতী হবার বাসনাকে ঢেকে রেখেছিল। এই সুমন এক আশ্চর্য দেশের যুবক, সে জাদুকরের মতো পাষাণে জলের উৎস খুলে দিয়েছে। সুমন ধীরে ধীরে হাত রাখল মারিয়ার কাঁধে। সে আজ আর কিছুতেই ব্যক্তিগত অপরাধের কথাটুকু বলে মারিয়ার স্নিগ্ধ মুখে হতাশার ছবি এঁকে দিতে পারল না। সে শুধু ধীরে ধীরে বলল. ভোর হয়ে গেছে মারিয়া। এবার আমাদের ট্রাউটমাছ শিকারে যাত্রা করতে হয়।

সতেরো

ভোরের রোদে মাঠ, গাছপালা ঝলমল করছে। খুব ভোরে-ভোরে রওনা হবার কথা। কিন্তু আস্তাবল থেকে ঘোড়া আসতে দেরি হয়ে গেল। মারিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সুমন। সামনে বিস্তীর্ণ নিচু জমি এবং পরে নদী। নদী পার হলে সেই প্রিয় পাহাড়। সুমন দূরবিনে সব দেখছিল। মারিয়া কোথায় কী আছে, কোনদিকে তাকালে হ্যাগেল মাউন্ট অথবা তার পাদদেশে এখন কী কী ফুল ফোটার

কথা, কোন কোন প্রজাপতি ওড়ার কথা এবং পাখিদের ডিম পাড়ার সময় হল কি না সব বিস্তারিত বলে হচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছ সেই হ্যাগেল মাউন্টের পাশে আমাদের ট্রাক্টরগুলোর গ্যারেজ? একটু দক্ষিণে তাকাও, দেখতে পাচ্ছ কিছু নিগ্রোপল্লি? সুমন মারিয়ার কথামতো দূরবিনের কাচে সেই ছোট্ট পাহাড় গ্যারেজ, এবং নিগ্রোপল্লি অথবা দূরের সব ঘাস মাটি দেখে কেমন আবেগে ডুবে গেল। এখন আর সেই বিষণ্ণ, করুণ ভাব মারিয়ার চোখে মুখে নেই। শুধু সারারাত জেগে থাকার জন্য চোখের নীচে সামান্য কালচে আভা কেমন কাজল-মাখানো চোখ করে দিয়েছে।

তারপর ওরা দেখল আস্তাবল থেকে ঘোড়া আসছে। ঘোড়াগুলো মাঠের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। দ্রুত দৌড়াতে পারে। শিকারী কুকুর রয়েছে সঙ্গে। ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে আসছে। গ্যারেজ থেকে জিপ বার করা হচ্ছে। সামান্য ট্রাউটমাছ শিকারে যাবার জন্য কতরকমের ব্যবস্থা।

মিস্টার উড জিপের সামনে বসেছিলেন। পেছনে সুমন এবং মারিয়া। ঘোড়ায় চড়ে গুড়ুই আসছে। কাঁধে বন্দুক ঝুলছে। জিপ ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে চড়াই উতরাই পার হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঝোপ চষা মাঠের মতো জমি, চারধারে বড় বড় সব উঁচু লম্বা গাছ, জিপ এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। ফলে মারিয়া সুমন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। ভীষণ দুলছিল। ভীষণভাবে একে অন্যের উপর হুমড়ি পড়ছিল। আর মারিয়া সেই এক নদীর উৎসে বসন্তের ঝরনার মতো কল কল হেসে সুমনের লুটিয়ে পড়ছিল। ওদের হাত পা ব্যথা হবার জোগাড়। পিছনে ঘোড়ায় চড়ে কিছু নিগ্রো যুবক আসছে। ওরা সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। জিপের ভিতর মিস্টার উড সবরকমের সরঞ্জাম মাছ ধরার জন্য ঠিক করে রেখেছেন। ট্রাউটমাছদের এখন ডিম পাড়ার সময়। ওরা নদীর জলে উজান পেলে উপরে উঠে আসে। ব্যাং অথবা আরশোলা জলের উপর ভেসে থাকলেই হল। গপ করে গিলে ফেলবে।

এই অঞ্চলের মাটি গিরিমাটি রঙের। বৃষ্টি হয়েছে বলে ধুলো উড়ছে না। ছোট বড় পাথর জমিতে। বড় ঘাস। ঘাসের ভিতরে জিপটা প্রায় ডুবে আছে। ঘোড়াগুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ঘাসের উপর শুধু মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। ঘাস লম্বা বলে ঘোড়াগুলো পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। মারিয়া এবং সুমনের মুখে ঘাসের স্পর্শ লাগছে। কোথাও ছোট কাঠের সেতু, কোথাও দু'পাশে পাইন লম্বা গাছ যা মৃত বলে মনে হয় এবং ক্রমশ ওরা গভীর বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল। যেতে যেতে মিস্টার উডই বেশি গল্প করছিলেন। তিনি বনাঞ্চলের নাম, গাছের নাম এবং ফুলের নাম বলে যাচ্ছিলেন, এই বনে রেটল সাপ এবং পুমা নামক বাঘ জাতীয় জন্তু সহসা চোখে পড়ে যেতে পারে। সিটের নীচে রাইফেল। সব ঠিকঠাক। মিস্টার উড বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে, কারণ তার উপর ফুলের মতো মারিয়া এই অতিথির রক্ষার দায়িত্ব। তার কোনও ত্রুটির জন্য ওদের কোনও অসুবিধা হলে অসম্মানের অন্ত থাকবে না।

গভীর বনের ভিতর লম্বা সরু গাছ দেখতে পেল। বড় বড় পাতা এবং পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা অথবা নীল রঙের ফুল দেখতে পেল। এখানে ঘাস এত মসৃণ যে শুয়ে বসে থাকা চলে যেন। কাঁটা ও ঝোপ-জঙ্গল নেই। পাতা পড়ে নেই। নির্মল আকাশের মতো বনের এই অংশটা পরিচ্ছন্ন। শুধু লম্বা গাছগুলো অনেক উপরে উঠে গিয়ে ছাতার মতো ছায়া দিচ্ছে। ওরা এবার হেঁটে যাবে। ঘোড়াগুলো গাছে বেঁধে রাখা হল। পাতা এত ঘন এবং গাছের ছায়া এত ঘন যে এতটুকু রোদ মাটিতে এসে পড়ছে না। সুমন এমন সুন্দর বনভূমি দেখে বিস্মিত হল। সে মারিয়াকে ঠাট্টা করে বলল, বুঝলে মারিয়া, আমার মনে হয় সেই জাদুকরের পালিত পুত্র, আমার আসার আগে এ পথে চলে গেছে। ফুল দিয়ে অন্য বনভূমিতে যেসব গাছ আমরা আসার পথে মৃত দেখে এসেছি, সেখানে চলে গেছে।

এমন বনভূমি পেলে কেবল ছোটা যায়। কেবল লুকোচুরি খেলা যায়। গাছে গাছে কেমন সব লতানে গাছে হলুদ রঙের বন্য ফল। কুচফলের পাতার মতো লতাগাছ। ওদের মুখে শরীরে সেইসব লতা সুড়সুড়ি দিলে যা হয়, যেন পুলকিত হওয়া চলে, পুলকিত হলে বন এবং নদী পার হয়ে কোনও দূর

দেশে আশ্রমের মতো ঘর করে বসবাসের ইচ্ছা। সুমন ভাবল, যদি যেতে যেতে তেমন কোনও আশ্রয় মিলে যায়। যেতে যেতে যদি কোনও নদী মিলে যায় এবং সামান্য শস্যক্ষেত্র মিলে যায়, তা হলে আর কী লাগে? নদীর জল, বনের ফল আর জমির শস্য। জীবনে মারিয়ার মতো ফুল ফুটে থাকলে শুধু ফুল ফল শস্যই ঈশ্বরের সামিল। সে এবার আড়ালে মারিয়ার মুখ দেখার জন্য টুপ করে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাকল, মারিয়া, আমি কোথায়?

তুমি কোথায় ওজ্জালিও!

তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আমি এদিকে। তুমি এসো।

আমার ভয় করছে।

ভয় কী? আমি তো রয়েছি।

তুমি হাত বাড়িয়ে দাও। হাত না বাড়ালে আমি যেতে পারছি না।

সুমন বলল, আমি এখানে।

তুমি কেবল দূরে সরে যাচ্ছ ওজালিও।

না, আমি এখানে।— সুমন জোরে চিৎকার করে বলল।

অনেক দূরে চলে গেছ ওজালিও।

না, আমি এখানে। আমাকে তুমি তুলে নিয়ে যাও।

এত দূরে চলে গেছ! তুমি কোথায় ওজ্জালিও?

পাহাড়ে-পাহাড়ে ওদের কথার প্রতিধ্বনি উঠছে। যেন এই প্রতিধ্বনি ভুবনময় ছড়িয়ে পড়ছে। দ্যাখো আমরা হারিয়ে গেছি। আমাদের খুঁজে নাও। সুমন ছুটছিল, ছোট ছোট ঢিবির আড়ালে আড়ালে ছুটছিল। ক্ষণে দেখা গেল সুমন ছুটছে, ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল। মারিয়া দেখেই ডাকল, ওজালিও, তুমি একা একা কোথায় যাচ্ছ! পথ হারিয়ে ফেলবে। সামনে যে বন আছে, বনের ভিতরে ঢুকে গেলে তুমি পথ চিনতে পারবে না। তুমি আর ছুটো না।

পিছনে উড। ওদের শুধু অনুসরণ করা। উড মাছ ধরার জায়গা করছে। গুডুইকে শুধু মারিয়ার পিছনে অনুসরণ করতে বলছে। গুডুইকে ফলে দেখা যাচ্ছে না। সে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে দূরবিনে ওদের পথ এবং বনের ভিতর ওদের ছোটাছুটি দেখে মনে মনে হাসছিল। মারিয়াকে খুব ভীত দেখাচ্ছে। কোথায় ওরা চলে এসেছে কে জানে। সে নিরুপায় হয়ে ডাকল, গুডুই।

বনের ভিতর মুহূর্তে তোলপাড় শব্দ শোনা গেল। গুডুইয়ের নেড়া মাথা দেখা গেল। সামনে এসে একেবারে হাজির। সে পায়ের কাছে বসে পড়ল। মারিয়ার ভয় কেটে গেছে। সে বলল, যা তুই। মাছের জায়গা ঠিক করে রাখ। আমি ওজালিওকে নিয়ে ফিরছি।

একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে সুমন ডাকল, দ্যাখো দ্যাখো মারিয়া, কী সুন্দর পাখি!

মারিয়া এবার ছুটে ঢিবিটার উপরে উঠে গেল। বলল, কোথায়?

দেখতে পাচ্ছ না!— বলে হাত তুলে দিল সুমন।

একজোড়া পাখি। ওরা নিবিষ্ট মনে সুমন এবং মারিয়াকে দেখছে। পাখির রং সোনালি। ঠোঁট নীল রঙের। পা রুপোলি রঙের। চোখের রং লাল, সিঁদুরের মতো লাল। সুমন বলল, দেখলে মনে হয় এরাই সানপাখি।

মারিয়া কিছুক্ষণ দেখল পাখি-জোড়া। ওরা ওদের ভাল করে দেখার জন্য গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

কী সুন্দর না দেখতে!

ঠিক তোমার মতো মারিয়া।

আমি খুব সুন্দর?

খুব। তুমি পাখির মতো দেখতে।

ওজালিও!— মারিয়া সুমনকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সুমন বলল, পাখি দ্যাখো মারিয়া।

তোমার হাত বড় ঠান্ডা ওজালিও।

পাখির চোখ দ্যাখো মারিয়া।
বুকে তোমার শব্দ হচ্ছে না ওজ্জালিও।
পাখির হৃদপিন্ডে শব্দ হয় না।
তুমি কী ওজ্জালিও!
আমি কিছু না।
তোমার কি কিছু ভাল লাগে না?
আমার সবকিছু ভাল লাগে মারিয়া।
ভাল লাগলে তুমি এমন ঠান্ডা মেরে যাচ্ছ কেন!
দ্যাখো, গুডুইয়ের মুখ!— সুমন দূরে গুডুইকে লতাপাতার ভিতর আবিষ্কার করে পাথর হয়ে গেল।
তুমি ওদিকে তাকাবে না। তোমার ভয় কী!
গুডুইকে বড় ভয় লাগে।
তুমি রাজার মতো থাকো।
আমি সামান্য জাহাজি।
না, তুমি রাজা। বনের রাজা। তুমি দ্যাখো। তুমি দ্যাখো। তুমি নিজেকে দ্যাখো।
কোথায় দেখব? কার আয়নায় মুখ দেখব মারিয়া?

আমার চোখে তুমি তোমার মুখ দ্যাখো— বুঝি বলার ইচ্ছা হল মারিয়ার। কিন্তু বলতে পারল না। মারিয়া, পাগলের মতো বনের রাজাকে, যেমন লতাপাতা বড় বৃক্ষ পেলে জড়িয়ে ধরে আশ্রয় চায়, আকাশ স্পর্শ করতে চায়, তেমনি মারিয়া সুখ অথবা আকাশ স্পর্শ করার লোভে সুমনের গায়ে লতাপাতা হয়ে গেল। বনের রাজা স্থির ছিল, কারণ কেবল যেন এক দ্রুতগামী অশ্বের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই অশ্ব একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটছে। অশ্বারোহী মানুষের ভয়ংকর মুখ লতাপাতার আড়ালে কেবল ভেসে উঠছে।

মারিয়া লতাপাতা হয়ে গেল। সময় পার হল, কিন্তু বনের রাজা পাথর। সুমন কোনও কিছুই পরিবর্তে অর্পণ করল না। সে শুধু শরীরে তার মারিয়া নামক লতাপাতা নিয়ে স্থির থাকল। মারিয়া ক্রমে আকুল হল, মারিয়া ক্রমে বনের ভিতর সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং পাথরের কাছে কিছুই প্রাপ্য নেই ভাবতেই সে ছুটতে থাকল। এবার সুমনও ছুটতে থাকল। মারিয়া বেশি দূরে যেতে পারল না। জমিটা ক্রমে উঁচুতে উঠতে উঠতে নদীর খাদে শেষ হয়ে গেছে। সেই জমির আড়ালে দাঁড়িয়ে সে তাদের প্রিয় নদীটা দেখতে পেল। অনেক নীচে নদী খুব সরু জলের রেখাতে বইছে। সুমন এবং মারিয়া পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই নদীর জল উবু হয়ে দেখতে থাকল।

সুমনকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে। মনে হল গুডুই যথার্থই মাছ ধরার জায়গা করার জন্য মিস্টার উড়ের কাছে ফিরে গেছে। যখন এত গাছ-গাছালি রয়েছে, যখন দু'পাশে হ্যাগেল মাউন্টের ছায়া বসেছে এবং উপত্যকার মতো বনভূমি তখন বনের রাজা হতে ক্ষতি কী! সে রাজা হয়ে সব দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সব নৃশংস ঘটনা মনে উঁকি দিচ্ছে। কেবল গুডুইয়ের মুখ ভেসে উঠছে আর সেই আত্মীয়ের মুখ, মা যার ভয়ে সর্বদা বিষণ্ণ থাকতেন। মা'র মুখে এক গ্লানিকর ছবি ফুটে থাকত সবসময়। কেবল তিনি যেন সুমনের জন্যই বেঁচে আছেন, সুমন কবে বড় হবে, সুমন বড় হলে সুমন আর তার মা—মা'র চোখে তেমন একটা আশার আলো ফুটে থাকত। কিন্তু কেন জানি আসার আগে মা'র চোখ সাদা-সাদা দেখাচ্ছিল, মা সবসময় গর্ভবতী রমণীর মতো দুঃখে কাতর থাকতেন। কী যেন এক রহস্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি, তার সব ধরা পড়ে যাবে, ধরা পড়ে গেলে তিনি আর মুখ দেখাবেন কী করে, সেই ভয়। আর আত্মীয়টি সুমনকে নানাভাবে অত্যাচার করত, পীড়ন করত। সুমন দুঃখে এবং বেদনায় শীতের এক ভোরে হালিশহরের ক্যাম্পে জাহাজি মানুষের ছাড়পত্র নিয়ে রাইফেল ট্রেনিং-এ চলে গেল। সামান্য দু' মাস আড়াই মাসের ট্রেনিং, তারপর ভদ্রা জাহাজ। ভদ্রা জাহাজের চ্যাটার্জি সাহেবের মুখ মনে পড়ছিল কেবল। সবকিছু ছেড়ে এত দূরের দেশে এই বনের ভিতর মারিয়ার পাশে নিজেকে বড় বেশি অবিশ্বাস্য লাগছে। কেমন স্বপ্নের মতো ঘটনা, কেমন জাদুকরের ভোজবাজির মতো গোটা জীবনটাই পালটে গেল বুঝি।

সহসা মারিয়ার চিৎকারে সুমনের হুঁশ ফিরে এল। নীচে এক নিগ্রো পুরুষ চুরি করে মাছ ধরছে। মারিয়া চিৎকার করছে, হেই, তুই কে রে? চুরি করে মাছ ধরছিস?

সুমন বলল, কী করছ? মাছ ধরছে ধরুক না।

কিন্তু মারিয়া সুমনের কথা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করছে না। যারা দূরে দূরে ছিল তারা পর্যন্ত ছুটে আসছে। বুঝি গুড়ুইয়েন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আগুন ছড়াচ্ছিল। মানুষটি তাড়াতাড়ি বড়শি ফেলে দিল হাত থেকে। সে উপরের দিকে তাকাল। সুমন অবাক, মনে হচ্ছে বার্ট যেন। ঠিক বার্টের মতো মুখ এবং মনে হয় নীচে সেই নিগ্রো পুরুষ যে বিস্ময়ে হতবাক যার মুখ থেকে কথা সরছে না। তাকে তোতলামিতে পেয়ে বসেছে, হতবাক মানুষটি কোথায় বড়শি ফেলে বনের ভিতর লুকোবার চেষ্টা করবে, তা না, সে সেই যে উপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে মুখ আর নামাচ্ছে না। কারণ বুঝি এই মানুষের বিশ্বাসে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না—সুমন, সরল নাবিক সুমন জাহাজ থেকে পালিয়ে এতদূরে চলে আসতে পারে। বার্ট বনের ভিতর অদৃশ্য হবার পরিবর্তে ক্রমশ সামনের দিকে উঠে আসতে থাকল। ঠিক খাদের মুখে এসে যখন দেখল, না সুমনই, সে চিৎকার করে উঠল, হ্যালো ইন্ডিয়ান। তুমি এখানে। কী সর্বনাশ।

মারিয়া ব্যাপারটা প্রথম বুঝতে পারল না। জঘন্য নিগ্রো যুবকের সঙ্গে কী করে আলাপ। সে একবার বার্টকে দেখছিল একবার সুমনকে। উড এবং গুড়ুইকে পাশাপাশি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সুমন বার্টকে সহাস্যে বলল, আমি ট্রাউটমাছ ধরতে এসেছি।

বার্ট চিৎকার করে বলল, হাউ ইটস পসিবল। তুমি কী করেছ।

সুমন বুঝতে পারল, এই পরিবার এ অঞ্চলে কুখ্যাত পরিবার। নিগ্রো পুরুষ রমণীর কাছে ভয়ংকর পরিবার। তার পক্ষে এতদূর আসা উচিত হয়নি। সে এবার স্থির করে ফেলল, গতকাল যা সে বারবার মারিয়াকে বলবে বলে স্থির করেছিল, এই মুহূর্তে সব বলে দেবে, কারণ বার্ট উঠে আসছে। তার কাছে পরিচয় জেনে নেবে মারিয়া। সুমনের আত্মসম্মানের পক্ষে ভয়ংকর লজ্জা। সে তাড়াতাড়ি চিৎকার করে সেই পাহাড়ময় প্রতিধ্বনি তুলে দিল, আমি মারিয়াদের কাছে ইন্ডিয়ান নই। স্প্যানিশ। আমি সুমন নই সুম্যান দা ওকাম্পিও।

বার্ট এবার যথার্থই বোবা বনে গেল যেন। কী সর্বনাশ, এই মানুষের এখন প্রাণ বাঁচানো দায়। এই আগুন নিয়ে খেলা সুমন আগুন নিয়ে খেলছে, কী যে করা উচিত, বার্ট স্থির করতে পারছে না, সে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না। পা অবশ হয়ে আসছে। সে দুর্বল বোধ করছিল। এখন কী বলা দরকার সুমনকে সে বুঝতে পারল না। কিছু বলতে গেলেই এত নীচে সে আছে যে চিৎকার করে না বললে কিছু শুনতে পাবে না। অথচ আশেপাশে এই মেয়ের রক্ষাকারী গুড়ুই থাকতে পারে, ফার্মের ম্যানেজার উড থাকতে পারে এবং সেইসব গুপ্তচর মানুষ, যারা এখানে সেখানে নীল রক্তের সম্মান-রক্ষার্থে অর্থাৎ আমরা সাদা মানুষ, আমরা উচ্চবর্ণের মানুষ, গোরু-ঘোড়ার সামিল কালোজাতির রক্তে স্বাধীনতার ইচ্ছা বেইমানের সামিল, এবং সবকিছু বেইমানের সামিল ভেবে যেখানে যত নীতি ন্যায় সব ধূলিসাৎ করে ওরা বুঝি এবার ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। বার্ট ঘোড়ার পায়ের শব্দ, বুঝি পাহাড় উতরাই পার হয়ে গেলে সামনে যে নদী নদীর দু পাশে ঘাস এবং ঝোপের ভিতর যে সামান্য পথ, সেখানে যেন খুরের শব্দ, দ্রুত কারা ছুটে আসছে সুমনকে ধরার জন্য, শুনতে পেল। যদি সুমনের এই স্প্যানিশ ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায় তবে নির্ঘাত গুপ্তহত্যা অথবা আকস্মিক মৃত্যু। রক্ত নীল নয়, বাপু তুমি কালো মানুষ, এত কী স্পর্ধা থাকে তোমার, এমন যে নীলবর্ণের রক্ত রক্তের ভিতর কেবল নীল পদ্ম ফুটে থাকে, তুমি এমন কী মানুষ, যার রক্ত নীল নয়, সাদা নয় এবং যে রক্ত কালো এবং বিষের মতো যে রক্তে কেবল নোনা স্বাদ, ফুলের মতো মেয়ে মারিয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে ভেবেছিলে পার পাবে। কে যেন, বুঝি গুড়ুই আশেপাশে রয়েছে কুকুরের মতো ঘ্রাণ-শক্তি গুড়ুইয়ের থাকে। ওর সেই ভেসে ওঠা মুখ এবং মাঝে মাঝে অতিকায় এক দৈত্য সদর-দেউড়ি আগলে আছে, বন-উপবনে ঢুকতে মানা, সেখানে সেই ফুলকুমারী যার দু'পাশে ক্ষীরের নদী, মাথায় যার সোনার পাহাড় এবং গাছে গাছে মণি-মাণিক্য ঝুলছে, তুমি এক সামান্য কালো রক্তের মানুষ, কোথাকার এক উটকো লোক এসে এমন নীল রক্ত ছুঁয়ে দিলে। সুতরাং বার্ট চিৎকার করে আর কিছু বলল না। সে উঠে আসতে থাকল। সে দ্রুত পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে

. াকল। সে মুখে আঙুল বেখে অনেক দূব থেকে হুঁশিয়াব কবে দেবাব অছিলাতে নানাবকমেব অঙ্গভঙ্গি কবতে থাকল। যেন বলাব ইচ্ছা, বাপু, আব কোনও কথা নয়। ভাল ছেলে স্প্যানিশ ছেলে ওজালিওব ‌মতো দিনটা কাটিয়ে জাহাজে ফিবে যাও। বাপু, তোমাব যে কী সব ছেলেমানুষি। বার্ট মনে মনে সুমনেব উপব খেপে গেল।

গল্পেব এমিল তখন সুমনকে তাড়া কবছে। মাঠে মাঠে ঘাসে ঘাসে এমিল ফুল ফোটাচ্ছে। এখন স ই যেন এক এমিল। সদব-দেউড়িতে গোপন অহংকাব দৈত্যব মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে ফুলে ফুলে সই দৈত্যকে মানুষেব গান শোনাতে চাইল। ওব হাতে সেই জল। সব অহংকাব মানুষেব অহংকাব . ছ দিয়ে আমবা নিযত এক মানুষ বর্ষায় বৃষ্টিতে আমবা নিয়ত এক মানুষ তুমি আমি এবং সকলে। এই পৃথিবীময় নিরুপম এক সৌন্দর্য আছে, যেখানে যা কিছু ফুল ফল সব আমাদেব জন্য মানুষেব জন্য। এসো, এবাবে ফুল ফোটাই। সুমনেব মনে হল জীবনে এই প্রথম সে একবাব ফুল ফোটাবাব সুযোগ পযেছে। সে কোনওদিন এমন সুযোগ আব পাবে না। সেই চাঁপাফুলটি আব হয়তো ঈশ্বব তাব হাতে কোনওদিন গুঁজে দেবেন না। সে মনে মনে বলল, এই ই সময়, এমন সময় আব আসবে না।

মাবিয়া অবাক চোখে দেখতে পেল বার্ট শশকেব মতো ক্রমে ছুটে আসছে। সে চড়াই উতবাই পাব হয়ে আসছে। কখনও ওব মুখ দেখা যাচ্ছে কখনও ঝোপ জঙ্গলেব ভিতব হাবিয়ে যাচ্ছে। আব সেই দ ে ধাবমান অশ্বগুলিব খুবে কোনও শব্দ উঠছে না। কেমন সব নিমেষে চুপ হয়ে গেছে। ওবা জঙ্গলেব ভতব কান পেতে সকলে কী শোনাব চেষ্টা কবছে। সে সন্তর্পণে এবাব সুমনেব বুকেব কাছে মুখ এনে বলল সুম্যান তুমি স্প্যানিশ নও। তুমি তুমি ।

না।

সুমনকে শান্ত এবং স্থিব দেখাচ্ছিল। কোনও আবেগ বোধ কবছিল না। আমাব পবিচয়ে আমি। আমাব বক্ত নীল নয়, আমি ভাবতবর্ষেব মানুষ, গবিব এবং উদ্বাস্তু এসব বলাব ইচ্ছা। আমাব দেশ ছিল মাটি ছিল, আমাব খালেব জলে বড় বোয়াল মাছ ভেসে আসত, আমি ভোব হলে মাঠ পাব হয়ে তবমুজ খেতে চলে গেছি আব আমাদেব ছোট একটা নদী ছিল, দু' পাড়ে বনজঙ্গল ঘাস দেখলে মনে হবে এই যেন সেই নদী এবং আমাব ছোট্ট এক বাল্যসখা ছিল কী নাম তাব, আমি তাব নাম তোমাকে বলতে পাবব না মেয়ে, আব ছিল আমাব মা। বাবাকে মনে কবতে পাবি না।

মনে কবতে পাবলেও মা'ব মুখ এত বেশি কাছেব যে বাবাকে খুব দূবেব মানুষ বলে মনে হয়। তোমাকে আমি মেয়ে, প্রাণেব চেযে বেশি মূল্য দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। আমি বাংলাদেশেব মানুষ মাবিয়া।

তবে তুমি স্প্যানিশ নও?— কেমন আবেগে মাবিয়াব কণ্ঠ রুদ্ধ হতে চাইল।

আমি ইন্ডিয়ান মাবিয়া। কতদিন আমবা সমুদ্রে ছিলাম। যেন আমবা কোনওদিন আব তীব পাব না মনে হত। মাটি আমবা আব দেখতে পাব না। মাটিতে আব কোনওদিন পা দিতে পাবব না। মাবিয়া।

সে কোমল গলায় ডাকল। এবং মাবিয়া চোখ তুলে তাকালে বলল, মাটিব লোভ বড় লোভ। মাটিব লোভ সামলাতে পাবিনি। আমি এক মহান ভাবতবর্ষেব লোক।

মাবিয়া কোথায এবং কবে যেন এই মহান ভাবতবর্ষেব নাম শুনেছিল। 'বার্ডস ইন মাই ইন্ডিয়ান গার্ডেন' বইটিব কথা মনে আসছে। কত দূর সেই দেশ, কত নদী নালা এবং সমুদ্র পাব হলে সেই দেশ, মাবিয়াব কল্পনায় তা এল না। সে দেখল, ওজালিও মাথা তুলে ওব দিকে তাকাতে পাবছে না। মাবিয়াব বলাব ইচ্ছা যেন, তাতে কী হয়েছে, তুমি যে দেশেব হও, ওজালিও, আমাব কাছে তুমি জাদুকবেব পালিত পুত্র। তবু মাবিয়াব চোখে কেন যে আতঙ্ক।

বার্ট ছুটছে তখন। সে উপবেব দিকে ছুটে আসছে। ওকে দেখা যাচ্ছে না। সে শস্যক্ষেত্রেব ভিতব দিযে ছুটছে। শুধু এখন তাকালে, গাছগুলো নড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে হবে কোনও প্রাণী যেন ভয় পেয়ে ছুটছে।

সুমন সব খুলে বলল, আমি একটা বড় বকমেব অপবাধ কবে ফেলেছি। তোমাকে খুলে বলাই ভাল। তোমাব সঙ্গে এত মিশেও কেমন ছোট হয়ে ছিলাম নিজেব কাছে। এখন আর নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে না। আমি বাদামি মানুষেব জাত। বংটা এমনিতেই উজ্জ্বল ছিল, সমুদ্রে ঘুরে ঘুবে আবও

উজ্জ্বল হয়ে গেল। হেনরিটা বুঝলে আমাকে তোমাদের কাছে স্প্যানিশ বলে চালিয়ে দিল।

মারিয়া কথা বলছিল না। অথবা কী বলবে ভাবতে পারছিল না। সে কেমন ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে কাঁপছে।

জাহাজ বাঁধার সময় জানতে পারলাম আমরা যারা ভারতবর্ষের লোক তাদের নামতে দেওয়া হবে না। কালো-সাদাতে ভীষণ দাঙ্গা। আমরা তোমাদের কাছে কালো মানুষের মতো বলে বুঝি এমন একটা নিষেধ জাহাজে পাচার হয়ে গেল।

মারিয়া কেমন হতাশ চোখে এখন সুমনকে দেখছে। বাজ-পড়া মানুষের মতো মারিয়া স্থির এবং অপলক। সে কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

দিনের পর দিন, আমাদের যারা ইউরোপের লোক, তারা বেশ নেমে যাচ্ছে। আমরা নামতে পারছি না। আমাদের খুব কষ্ট হত। ছুটি হলেই তোমাদের সুন্দব উইচ-ককের পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যেন কেউ আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করে আছে মনে হত। অথবা কেউ আমাকে নিতে আসবে এমন মনে হত। কার জন্য আমার এই প্রতীক্ষা, আমি বুঝতে পারছিলাম না। এক বিকেলে তুমি এলে জাহাজে। হেনরি আমার বন্ধু-লোক। আমাব দুঃখটা বুঝতে পাবত। হেনরি সুযোগ বুকে আমাকে ওজালিও বলে চালিয়ে দিল।

মারিয়া কিন্তু কোনও কথা বলতে পাবছে না। সে বুঝি তা হলে এবার যথার্থই পাথব বনে যাবে।

তুমি কথা বলছ না কেন মারিয়া? তুমি এমন চুপচাপ থাকলে আমাব কিন্তু ভয় করে। এই মারিয়া, মারিয়া!

সে দু'হাতে ধবে মারিয়াকে ঝাঁকাতে থাকল।

শোনো লক্ষ্মী, আমার সোনা, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। কতদিন মনে করেছি তোমাকে খুলে বলব। কতদিন মনে হয়েছে, না, আর না, বন্দরে আর নামব না। তোমাব সঙ্গে মিশব না। মিথ্যা ওজালিওব অভিনয় করব না। কিন্তু সব ভুলে গেছি। তোমার এমন সুন্দর চোখ, সোনালি চুল আমাকে পাগল করে দিয়েছে মারিয়া। মারিয়া, প্লিজ কথা বলো। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি সাহস পাচ্ছি না।

বার্ট তেমনি ছুটে আসছে শস্যক্ষেত্রের ভিতব। ঘোড়াব পায়ের শব্দ তেমনি প্রতিধ্বনি তুলে কোথাও খুব কাছে এসে থেমে গেল। চারিদিকে এত ফুল ফল, চারিদিকে এমন সবুজ শস্যক্ষেত্র, আর নদী পাহাড় মিলে এমন নিসর্গ বনভূমি কী করা যায়, মাবিয়ার চোখ সাদা দেখাচ্ছে, মারিয়ার উজ্জ্বল চোখ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, বুঝি মূর্ছা যাবে মাবিয়া, সুমন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। এবং বুকেব কাছে নিয়ে বলল, আমাব কথা ভেবে মূর্ছা যাচ্ছ মাবিয়া। তবু তুমি স্পষ্ট শুনে রাখো, আমি লোভে এমন কবিনি। তোমাব জানা দরকাব, আমি ভারতবর্ষেব লোক। আমি জাহাজি মানুষ। আমি ওজালিও নই। আমার বংশে কোনও ষাঁড়-লড়িয়ে ছিল না। তাব নাম পর্যন্ত তাঁবা শোনেননি। দেশের একটা ঠিকানা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু কোনও লাভ হবে না। সেখানে আমার কেউ নেই, মা নেই, বাবা নেই, সংসারে আমি বড় একা। আত্মীয়টি মায়ের মৃত্যুর পব কোনও সম্পর্ক রাখবেন কি না সন্দেহ আছে। আমাব মা'র সঙ্গে ওব কোনও সম্পর্ক ছিল বুঝি। আমার মা'টা মবে গেল? মরে গেল, না মেরে ফেলল, কে জানে!

বলে সে সামনের গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকল।

সেই শস্যক্ষেত্রের ভিতর তেমনি বার্ট উঠে আসছে। ও খুব কাছাকাছি এসে গেছে। সে একটা টিবিব পাশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল।

সুমন ফের মুখ তুলে নিল মারিয়ার। বলল, আমার মুখের দিকে তাকাও মারিয়া। দ্যাখো, আমি সেই মায়ের পুত্র। আমি আব কতটা ভাল হব?

আব তখনই সুমন দেখল বার্ট একটা টিবির পাশ থেকে হামাগুড়ি দিচ্ছে উঠে আসাব জন্য।

সুমন যেন এবার যথার্থই সাহস পেয়েছে। সে ডাকল, বার্ট।

বার্ট সেখান থেকেই হাত তুলে দিল। বলল, শিগগির পালাও সুমন। গুডুই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। সে খবর দিতে বাড়ির দিকে ছুটছে।

মারিয়া মূর্ছা যাবার আগে সামান্য সময়ের জন্য প্রাণ পেল বুঝি। গুডুই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। এইসব বনভূমি, সমতল মাঠ এবং নদীনালা পার হয়ে সে বেগে ছুটে যাচ্ছে খবব দিতে। এক খবর—

কোথাকার এক কালো আদমি, জাতে বর্ণসংকর, এত বড় বংশের নীল রক্তের মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। দু' পাশে যে অরণ্য রয়েছে সেখানে শুধু সেই ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ ক্রমে দূরবর্তী হচ্ছিল। মারিয়ার চোখে এক ভয়ংকর ত্রাস ফুটে উঠছে। বড় বড় সব ডালকুত্তা কতদিন পরে ছাড়া পেয়েছে। লোহার জাল থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা জাদুকরের পালিত পুত্রকে খরগোশের মতো পায়ের কাছে ফেলে রেখেছে, মারিয়া পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, সুমন, মাই ফ্রেন্ড।

সে ভাল করে জড়িয়ে ধরল সুমনকে। এবং বার্টকে উদ্দেশ করে বলল, আপনি একমাত্র ওকে রক্ষা করতে পারেন। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ওকে নিয়ে যান।

সে তাড়াতাড়ি বার্টের কাছে ছুটে গেল। চারিদিকে বড় বড় গাছের জন্য ঢিবিটার উপরে উঠে বার্টকে সে দেখতে পেল না। কেবল দূরে দেখতে পেল সমতল ভূমির উপর দিয়ে লম্বা ঘাসের ভিতর গুড্ডুই অশ্বারোহী সৈনিকের মতো দ্রুত ছুটছে। এবং মৃত্যুর জন্য বুঝি এক তরুণ জাদুকর প্রস্তুত হচ্ছে। এই পাহাড়ের পাশে অথবা অন্য কোথাও এক ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছিল আর কুকুরের ছবি, বড় বড় কুকুর যেন ঘোঁত ঘোঁত করছিল এবং চারপাশ থেকে পার্টির সেই যুবকেরা ঘোড়ায় চড়ে উঠে আসছে। কুকুরগুলো সামনে পথ দেখিয়ে চলছে। যে পথেই সুমন ছুটে যাক না, কুকুরগুলো ঠিক সেই সেই পথে ছুটে যাবে।

বার্ট বলল, আমার সঙ্গে তোমাকে পালাতে হবে সুমন।

কোথায়?

সামনের দিকে। দু' চোখ যেদিকে যায়। নদী পার হয়ে আমরা চলে যাব।

অঃ।— সুমন যেন কিছুই শুনছে না।—কী সুন্দর এই নদী মারিয়া।

বার্ট খেপে গেল, সুমন, জলদি করো।

মারিয়া বলল, সুমন, প্লিজ।

বার্ট বলল, এক্ষুনি পালাতে হবে। দেরি করলে ধরা পড়ে যাব। সামনে নদী। নদী পার হলে বন পাব। তারপর বড় রাস্তা আছে।

বনের ভিতর আমি তুমি মারিয়া, বেশ হবে।

সুমন।— বার্ট চিৎকার করে উঠল।— এখন আর নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করার সময় নয়। দেরি করলে কিছুতেই আর রক্ষা করা যাবে না।

সুমন সামান্য হাসল। কথা বলল না। সে যেন আবার নিজের ভিতর ডুবে গেছে। মনেই হয় না, সুমন এখন এক বনের ভিতর, গাছপালা পাখির ভেতর আটকা পড়েছে। কোথাও যেন কারা ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, কেউ যেন এই বনের ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছে। এক বাদামি মানুষকে পাকড়াও করার জন্য। এই অরণ্য কেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সে সোজাসুজি বলল, আমি ইন্ডিয়ান, মারিয়া।

মারিয়া কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওর শরীর কাঁপছে, হাত-পা কাঁপছে। ওর গলা কাঠ-কাঠ, শুকনো। জল তেষ্টা পাচ্ছে কেবল। সে এমন এক সোজা সরল নাবিকের দিকে তাকাতে পারছে না। তাকালেই বুকের ভিতরে টুপটাপ শিশিরের শব্দের মতো কান্না ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জমছে। সে কোনওরকমে বলল, বার্ট, হেলপ মি। তুমি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাও। বার্ট, এক্ষুনি মিস্টার উড চলে আসবেন। আমি যে কী করব। গুড্ডুই সব জেনে ফেলেছে, সে ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে ছুটছে।

সুমন মারিয়ার হতাশ চোখ দেখে মজা পাচ্ছে। এই মেয়ে যেন তার কত কালের আত্মীয়া। ওর মা'র কথা মনে পড়ছে। সুমনের মনে হল, এই মেয়ের এখন কিছু ভাল লাগছে না। ঠিক মায়ের মতো এই মেয়ে, সুমনকে রক্ষা করতে চাইছে। ঝড় ঝাপটা যা কিছু আসবে, সব মারিয়া বুক পেতে নিতে পারবে ভাবতেই সে কেমন আরও মহান হয়ে যেতে চাইল। এর চেয়ে আর কী প্রাপ্য আছে জীবনে, যেন এই জীবন ফুলের মতো, ফুল ফোটাও, তুমি সুমন ভারতবর্ষের মানুষ, তুমি তো সুমন ইচ্ছা করলেই ফুল ফোটাতে পারো। কারা যেন এই ফুল ফোটাবার কথা বলছে। কারা যেন এই বনের ভিতর হাঁকছে, ফুল ফোটাও। সে চারিদিকে তাকাতে থাকল। না, কেউ হাঁকছে না। মারিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে মনে মনে বলল, তুমি মেয়ে কাঁদছ। আমার জন্য কাঁদছ। তবে আর আমার ভয় কীসের। আমি তো আর পালাতে পারি না। আমি পালালে, বলবে ব্যাটা একটা ইন্ডিয়ান পালাচ্ছে, মারিয়া, তুমি আমার দিকটা

ভেবে দেখছ না। তুমি কেবল নিজের ভালবাসার দিকটা দেখছ।

বার্ট আর পারছে না। সে চিৎকার করে উঠল, কী হচ্ছে তোমার! ছেলেমানুষির একটা সীমা আছে। গুড়ুই খবর নিয়ে যাচ্ছে। তুমি না পালালে বাঁচবে না।

মারিয়া ওকে নদীর ঢালুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাত ধরে টানতে থাকলে সুমন বলল, তোমার মা কী ভাববেন! আমি তোমাদের অতিথি। তিনি আমাকে কত বিশ্বাস করে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে গেলে বড় অভদ্রতা হবে।

বার্ট বলল, সুমন, ইউ উইল ডাই। আমরা কিছু করতে পারব না।

মৃত্যু! মৃত্যু কথাটা শুনতে ভারী মজা লাগছে। কেন এই মৃত্যু? অসম্ভব।

বার্ট ফের বলল, লিঞ্চিং। কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে। এখনও পালালে তোমাকে আমরা রক্ষা করতে পারি।

কোথায় পালাব!

নদীর ওপারে।

তা হলেই বুঝি পালানো যায়! নদীর ওপারে গেলেই বুঝি পালানো যায়!— বলে ফের বালকের মতো হেসে দিল সুমন।

বার্ট বলল আমরা যদি এই বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে পারি তবে ভোরের দিকে নদীর মোহনাতে লুজান বলে একটা গ্রাম পাব। সেখানে আমার পিসিমার মোটর বোট আছে বোটে আমি সমুদ্রে পৌঁছে দেব। এরা তোমার নাগাল পাবে না।

মারিয়া বলল আমি সঙ্গে যাব বার্ট। আপনি আমাকে প্লিজ সঙ্গে নিন।

পাগল তুমি। বার্ট যেন নিজের কাছেই কৈফিয়ত দিচ্ছে! — তুমি গেলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হবে। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, ঘরে ফিরে যাও।

সুমন এবার উপহাসের ভঙ্গিতে বলল, তুমি বেশ মজা দেখতে এসেছ।

এই প্রথম সে বার্টকে ঠাট্টার সুরে কথা বলল, আমি ব্যাটা ইন্ডিয়ান পালাব, আর তোমরা সারা জীবন গল্প করবে, ব্যাটা এক ইন্ডিয়ান ফলস মেরে প্রেম করে চলে গেল। শালা নদীর পাড় ধরে পালাচ্ছিল। ওতে নেই বাপু। আমার আর কী আছে!

এসবও ভাবল। মা নেই। আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নেই। মারিয়াই আমার সব। তাকে ফেলে চোরের মতো পালাব—হয়? সে কেমন বিষণ্ণ চোখে মারিয়ার দিকে তাকাল। ঈশ্বর, কোথাও কোনও এমন নদী নেই, বেলাভূমি নেই অথবা অরণ্য যেখানে আমি আর মারিয়া হাত ধরাধরি করে চলে যেতে পারি। কেউ আর থাকবে না। কেউ আমাদের হিংসা করবে না। আমাদের অনিষ্ট করবে না। তপোবনের মতো এক আশ্রম করে বসবাস করব। আমি শস্য ফলাব। মারিয়া নদী থেকে জল আনবে।

এ সময় ওরা পাতার ভিতর খস খস শব্দে চমকে উঠল। না, কেউ কাছে নেই। একটা উইলো ঝোপের নীচে এক জোড়া খরগোশ উঁকি মেরে ওদের তিনজনকে দেখছে।

সুমন বলল, দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর চোখে ওরা আমাদের দেখছে। আহা কী মজা! জানো মারিয়া, তুমি সেই রাজপুত্রের গল্প জানো?

মারিয়া বলল, আমি আর কোনও রাজপুত্রের গল্প শুনতে চাই না সুমন। আমি পাগল হয়ে যাব।

আর সে সুমনকে উৎসাহিত করার জন্য বলল, সুমন, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমি তোমার সঙ্গে যাব সুমন।

অনেকদিন পর বনবাস থেকে ফিরে ভালবাসার মানুষ যেভাবে চোখ তুলে যুবতীকে দ্যাখে, সুমন তেমনি দেখতে থাকল মারিয়াকে। মারিয়ার এমন সুন্দর মুখ একেবারে ভয়ে নীল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে এত ভালবাসো মেয়ে! আমার যে আর কিছু লাগে না। আমি যে এখন কত সহজে মরে যেতে পারি। বড় তুচ্ছ মনে হচ্ছে সব। এমন ভালবাসা পেলে মরেও সুখ। সুমন চিবুক ধরে বলল, তাকাও মারিয়া, আমাকে দ্যাখো। তুমি যুবতী হলে আমার ভারতবর্ষে চলে এসো। আমি তোমাকে নদীর তীরে নিয়ে যাব। শরতে কাশফুল ফুটলে আমি তুমি কাশের বনে হারিয়ে যাব।

মারিয়া কিছুতেই তাকাচ্ছে না। ঝর ঝর করে কাঁদছে। যত কাঁদছে, তত সুমনের সেই এমিলের

মতো ফুল ফোটাবার আগ্রহ জন্মাচ্ছে। নদীতে জল নেই। আকাশে মেঘ নেই। সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। আমার এই মৃত্যু মারিয়া তোমাকে কালো মানুষের প্রতি সহৃদয় করে তুলবে। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলাম এক সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে। তোমাকে আমি তা দিয়ে চলে যাব। ঠিক এমিলের মতো, হাতে সেই চাঁপাফুল। ঝরনার জল। জল ছড়িয়ে দেব গাছে, মাঠে মাঠে, আবার সেই মরুভূমি শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। আমার মৃত্যু যদি তোমাদের পাষাণ-প্রাচীরে ফুল ফোটায়, সে ফুল ফুটুক না! আমি তো এক সামান্য মানুষ। আমি মরে যেতে পারি, কিন্তু পালাতে পারি না।

বার্ট এবার রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ল, তুমি কি সুমন আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে!

বার্টের চিৎকার এইসব বনাঞ্চলে প্রতিধ্বনি তুলছে কেবল। বৃদ্ধ উড পর্যন্ত এই চিৎকার দূর থেকে শুনতে পাচ্ছেন। তিনি এখনও ঠাহর করতে পারছেন না, কোথায় এবং কতদূরে মারিয়া এবং ওজালিও। কে এমন নদীর ঢালুতে থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে। উড যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গাছপালার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করছেন।

নফর নিগ্রো যুবকেরা দূরে দূরে রয়েছে। কাছে আসবার তাদের কোনও অধিকার নেই। যতক্ষণ মারিয়া কিছু না বলছে ততক্ষণ কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা সেই বার্টের চিৎকার, হে ইন্ডিয়ান, শুনতে পেয়ে মারিয়ার নির্দেশের প্রতীক্ষাতে আছে। পেলেই ছুটে আসবে। বার্ট সুমনকে এতটুকু নড়াতে পারল না। সে বলল, বার্ট, আমি তোমার কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না।

মারিয়ার দিকে তাকালে দেখল, সে কেমন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আর কী স্বর্গীয় সুষমা ওজালিওর মুখে! দেবদূতের মতো চোখ মুখ করে রেখেছে। কোনও মালিন্য নেই, মৃত্যুর জন্য শঙ্কা নেই, যেন জীবনে তার নতুন সূর্য উঠছে। সকালের সূর্য গাছ ফুল পাখির ভিতর থেকে উঠে আসছে।

বার্ট আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না। নিশ্চিত বিপদ জেনেও কোনও উত্তেজনার চিহ্ন নেই সুমনের মুখে। যেন ওর সামনে এক বড় মাঠ, তাকে এখন এই মাঠ পার হতে হবে। সে অন্য দিকে তাকাচ্ছে না। সোজা খামারবাড়িতে ফেরার জন্য হাঁটছে। বার্ট এই যুবকের এমন দুর্জয় সাহস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছে না। সে জানে এতক্ষণে হয়তো গুডুই শহরে খবর পৌঁছে দিয়েছে।

দূরে গুডুই তেমনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। চার পাশে অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি উঠছে। কখনও দ্রুত, কখনও ধীর, কখনও কারা অরণ্যের অন্য প্রান্তে ঘোড়ায় কদম দিচ্ছে মতো। এই খবর পৌঁছে দেবার জন্য—এক কালো মানুষ এসেছে, গায়ে সাদা রং মেখে, দূর দেশ থেকে এসে নীল রক্ত অসম্মানিত করে গেছে। এই অরণ্যের ভিতর সেই মানুষ দ্যাখো কী শান্তশিষ্ট। ভালবাসার চেয়ে বড় আর কী আছে।

বার্ট ভাবল, ভারোদি খবর পাওয়া মাত্র সেই সব পুষে রাখা ডালকুত্তা ছেড়ে দেবে। এসব ব্যাপারে পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিতে নেই। দিলেই ওদের কাছে মনুষ্যজাতি এক, অপরাধের ব্যাপারে সাদা কালো সব এক, স্থানীয় আইন একটু শক্ত বলে লঘু শাস্তি হতে পারে, নাও হতে পারে, কে কার খবর রাখে তখন। বরং ভাল ভারোদির ডালকুত্তা ছেড়ে দেওয়া। ওর মাংস, রক্ত হাড় সব চুষে চেটেপুটে খেয়ে হজম করে বসে থাকবে। পুলিশ যখন খবর পাবে তখন পেটের ভিতর রক্ত মাংস হাড়, সরেজমিনে পুলিশকে অনুসন্ধান করতে হলে কুকুরের পেটে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং এসব কাজ ভারোদি গোপনেই করে থাকে। এত বড় সংস্থার অজস্র এই গুপ্তহত্যা কেউ আজ পর্যন্ত হদিস করতে পারেনি। লাশ শুধু গুম নয়, একেবারে কুকুরের পেটে চালান, হজমশক্তিতে প্রাণী জগতে কুকুরের তুলনা হয় না। মারিয়া তখন কাছে থাকবে না। মারিয়াকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সুমন হাঁটতে হাঁটতে বলল, মারিয়া, এত তুমি ভেঙে পড়ছ কেন? তাকে সব খুলে বললে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বলবেন না। তিনি তো মায়ের জাত। আর তুমি তো জানো আমার মা নেই। কেউ নেই। তোমরাই আমার সব। আমি তোমাকে এভাবে ফেলে চলে গেলেও খুব অসম্মানের কথা।

একটু থেমে বলল, কারণ কিছু লতাপাতা সরিয়ে পথ করে দিতে দিতে বলছে, তা ছাড়া আমি সামান্য এক যুবক। আমি মরে গেলে কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু পালিয়ে গেলে, একজন ভারতীয় পালিয়ে গেছে বলা হবে। এত বড় অসম্মানের দায় নিয়ে পালাতে পারি না।

এবার সে বার্টের দিকে মুখ ফেরাল। বলল, এমন একটা ব্যাপার তোমার জীবনে ঘটলে তুমিও পালাতে পারতে না বার্ট।

বার্ট বুঝল, ওদের হাতের শেষ তুরুপের তাসটিও গেছে। তবু শেষ চেষ্টা। কারণ মারিয়ার চোখমুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, যেন বধ্যভূমিতে সুমনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, মারিয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন একটা হত্যাকাণ্ডে মারিয়া যথার্থই পাগল হয়ে যাবে। বার্ট পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুমন বলল, বার্ট, তুমি একবার মারিয়ার দিকটা দ্যাখো।

সুমন মারিয়ার দিকে তাকাতেই কেমন ফের বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

মারিয়া সুমনের হাত নিজের হাতে নিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। তাকে আর এগুতে দেওয়া চলে না। সে বলল, সুমন, আর দেরি কোরো না। আমাদের সঙ্গে নীচে নেমে এসো।

এই বলে সে নদীর ঢালু জমিতে চোখ রাখল। নীচে গম যব খেত অথবা অন্য কোনও শস্যক্ষেত্র হবে, এত উপর থেকে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব শস্যক্ষেত্রের ভিতর মারিয়ার অদৃশ্য হবার বাসনা। তারপরে নদী, নদীর জল, উপরে নীল আকাশ এবং ওপারে গভীর বন। কোথাও কোনও পাখি করুণ স্বরে ডাকছে। এই ঘাস ফুল মাটি এত বেশি চুপচাপ যে সামান্য কীট-পতঙ্গের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এই মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে সহসা কেন জানি, সুমনের মৃত্যুকে বড় সুন্দর মনে হল। সহজ মনে হল। এত বড় জীবন নিয়ে সে কী করবে, তার আর কে আছে! জীবন বড় কঠিন। সুমনের ভিতরে যে সামান্য মৃত্যুভয় ছিল, তাও কেন জানি, সহসা একেবারে উবে গেল। সুমন বলল, মাছ ধরতে এসে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বার্ট এবং মারিয়া এমন উদাসীনতা আর সহ্য করতে পারছে না।

সুমন বলল, বেশ হয় বার্ট, আমরা নদীর ওপারে চলে যাব। বনের ভিতর তুমি, আমি, মারিয়া কুঁড়েঘর তৈরি করে থাকব। মারিয়া আমাদের বেঁধে-বেড়ে খাওয়াবে।

যেন সুমনের বলার ইচ্ছা, প্রায় রাম-লক্ষ্মণের মতো সীতাকে নিয়ে বনবাসে চলে যাওয়া। তপোবনে থাকবে। পঞ্চবটি বনে অথবা সরযূনদীর পাড়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পাবে, এক হরিণশিশু ক্রমে বড় হতে হতে সোনার হরিণ হয়ে গেছে। সুমনের চোখ দেখলে মনে হয়, সে এখন সেই সোনার হরিণের সন্ধানে আছে।

এই সবল এবং তাজা প্রাণকে রক্ষা করার জন্য বার্টের যথার্থই শেষ চেষ্টা।

তুমি কিছু নিয়ে পালাচ্ছ না। একে কাপুরুষের মতো পালানো বলে না। অন্যায় ভাবে তোমাকে হত্যা করবে ওরা। তুমি নিরুপায়। অকারণ এই হত্যা। সেজন্য তুমি পালাচ্ছ।

সুমনের কেন জানি অনেক মহান উক্তির কথা মনে পড়ছে। সে ইচ্ছা করলে সেসব বলতে পারত। কিন্তু সেসব না বলে সে শুধু বলল, তাই পালানোর ভিতর কিছুই সম্মানের থাকে না। পালানোটা পালানোই। ওর বেশি কিছু নয়।

সুমন এবারও মারিয়ার মুখ দেখল। ওর ক্লিষ্ট মুখের দিকে আর যথার্থই তাকানো যাচ্ছে না। অথচ সুমনের ভেতরের মানুষটা, ধূসর প্রান্তরে যেখানে বৃষ্টি হয়নি কতকাল, শস্য ফলে না কত কাল, সব গাছ-গাছালি মরে গেছে কতকাল, যেখানে ফুল ফোটাতে বলছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বড় হাস্যকর মনে হয় তখন। সুমন আর মারিয়ার দিকে তাকাতে পারল না। তাকালে সেও ভেঙে পড়বে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, এসো। আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে।

মিস্টার উডও ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন। তাঁকে দেখে সুমন বলল, মিস্টার উড, এবার আমাদের ফিরতে হবে। আজ আর মাছ ধরা হবে না। গুডুই ঘোড়ায় চড়ে শহরে চলে গেছে। ওকে আমরা একটা জরুরি খবর দিতে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। দরকার হলে গাড়ি চালাবেন।

অসহায় মারিয়া মিস্টার উডকে অনুসরণ করল। সুমন আগে হাঁটছে। সে-ই যেন এখন সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার উড কোনও প্রশ্ন করতে পারছেন না। মাছ না ধরে ফিরে যাওয়া হচ্ছে! কী এমন ঘটনা ঘটল যে মাছ না ধরে ফিরে যাওয়া হচ্ছে, এমন একটা ছুটির দিন, আনন্দের দিন, একেবারে নিরানন্দময় হয়ে গেল কেন এবং মারিয়াই-বা এত বিষণ্ণ কেন, সুমন এত উৎফুল্ল কেন, তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মারিয়া ট্যালডনের এমন কিছু হয়েছে যা গোপনীয় থাকার কথা, সেজন্য তিনি

কোনও প্রশ্ন পর্যন্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না। সুতরাং তিনি সুমনের কথা মতো শুধু গাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে থাকলেন।

সুমন গাছ-গাছালির ভিতর অদৃশ্য হবার আগে শেষ বারের মতো পিছনের দিকে তাকাল। হাত তুলে বার্টকে বিদায় জানাল।

বার্ট সুমন যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সুমনকে দেখছিল। এক প্রচণ্ড অহমিকা এই তরুণ যুবকের। ভিতরে ভিতরে সে পাথরের মতো শক্ত। হায় যুবক, তুমি কী করতে যাচ্ছ, তুমি জানো না তোমার কী কুৎসিত ভাবে মৃত্যু ঘটবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমেন!

বার্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ভারতবাসীর জন্য আর কী করা যায়, কী করলে এই তরুণ যুবককে বক্ষা কবা যেতে পারে, ভাবতেই মনে হল, একমাত্র উপায় এখন জাহাজে ফিবে যাওয়া। একমাত্র উপায় ক্যাপ্টেনকে দিয়ে এই খবর থানায় লিপিবদ্ধ করা। এ ছাড়া অন্য উপায়েব কথা তাব মনে এল না। সে জানত, এই খবর থানায় লিপিবদ্ধ করলে কোনও কাজে না আসতে পারে, কারণ কোথায় যেন সব কিছুর ভিতর শ্বেতকায় মানুষের প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। তবু একমাত্র জাহাজেব ক্যাপ্টেন ভবসাস্থল। শেষ চেষ্টা। এবার নদীর ওপারে উঠে যেতে হবে। নদী পার হতে হবে। তাবপর নির্জন বনভূমি পাব হয়ে গেলে ছোট গ্রাম কোলন, সেখানে তার মামাতো বোনের বাড়ি। সে মামাতো বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। সকালের দিকে কী করা যায়, একমাত্র নদী থেকে চুরি কবে ট্রাউট মাছ ধরা যেতে পাবে, সেজন্য সে এসেছিল, নদীর জলে মাছ ধরতে। তারপর এমন বিস্ময়কব পবিস্থিতি। সে এবাব হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু পাহাড় ধরে নেমে যেতে থাকল। তারপর নদীর ঢালুতে নেমে যেমন এক সিংহশাবক দৌড়োয়, তেমনি সে ছুটতে থাকল। পাথরের পর পাথর সে লাফ দিয়ে পার হল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে, কাবণ নদীর জলে বড় বড পাথর, ঠিক যেন ঝরনাব জল নেমে যায়, সে সেইসব ঝবনাব জল পাব হয়ে ওপারে উঠে গেল। তাবপব ছুটতে থাকল গ্রামের দিকে। অনেক দূবে ছোট্ট নিগ্রোপল্লি। তাবপর বড় হাইওয়ে। বোনের বাড়িতে মোটর-বাইক। বাইকে একবার চড়ে বসতে পাবলে নিমেষে সামনের সব গাছপালা দ্রুত সরে যেতে থাকবে। সে মুহূর্ত বিলম্ব না কবে দ্রুত গ্রামে উঠে যাবাব জন্য ছুটে চলল।

আঠারো

ফেবাব পথে সুমন মারিয়াকে ঠিক সেই আগের মতো নানা রকমেব দেশ-বিদেশের গল্প বলছিল। কখনও পুরাণের গল্প বলছিল। রামায়ণ মহাভারতের গল্প। এমন বনভূমি দেখলে কেন জানি কেবল সীতাব বনবাসের কথা মনে হয়। সরযূ নদীর কথা, রাবণ বধের কথা গল্প-প্রসঙ্গে বলল। অথবা যেন এক সোনাব হরিণ বনের ভিতরে ছুটে বেড়ায়। সে সোনার হরিণের কথাও উল্লেখ করল। রামায়ণে বর্ণিত সোনার হরিণ, পঞ্চবটি বন সবই যেন চোখের উপর ভাসছে। মাবিয়াকে দেখলে এখন সীতার বনবাসের কথাই মনে হবে। সে গল্প বলে মারিয়াকে অন্যমনস্ক করতে চাইল, ফুল ফোটাতে চাইল। মাবিয়ার বিষণ্ণ করুণ মুখ দেখতে কষ্ট হচ্ছে।

বৃদ্ধ উড চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছেন। সুমন একটু ঝুঁকে উডকে প্রশ্ন করল, মনে হয় এতক্ষণে গুডুই পৌঁছে গেছে।

উড জবাব দিল না। শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল কথায়।

মুহূর্তে ভাবোদির কঠিন মুখ ভেসে উঠল চোখে। শক্ত গোল গোল চোখ। ভিতরে ভিতরে সে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে দ্রুত অন্যমনস্ক হতে চাইল। চাঁপা ফুলগাছটির কথা মনে করার চেষ্টা কবছে। এমিলের কথা ভাবছে। এক মানুষ এমিল, বন্ধ্যা অনুর্বর জমিতে ফুল ফোটানোর জন্য কেবল ছুটছে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন হয়। কেমন সব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এগিয়ে যাওয়া। সত্যের মুখোমুখি হওয়া। সুমন সেজন্য খুব সহজ থাকতে পারছে। সে নানা রকমের গল্প বলে, যেন সে মারিয়াকে নিয়ে কোন দূব দেশে ভ্রমণে বের হয়েছে, যেন মারিয়া তার কত কালের আপনজন, এখন মাবিয়া বালিকা নয়,

যুবতী প্রায়, সুমনের দিকে অপলক তাকিয়ে দেখছে। যত দেখছে সুমনকে, তত আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে। এবং এক সময় গাড়ির ভিতর মারিয়াকে খুব পীড়িত মনে হল। মারিয়া গাড়িতে মূর্ছা যাচ্ছে।

সুমন উডকে বলল, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। মিস্টার উড, এখানে কোনও জলাশয় আছে?

উড একটা বড় জলাশয়ের পাশে গাড়ি থামাল। সুমন গাড়ি থেকে নেমে কিছু জল নিয়ে এল। মারিয়ার মাথায় মুখে জল ছিটিয়ে দিল। রুমালে জল ভিজিয়ে মুখের চারপাশটায়, কী নরম ঘাড়, গলা, কী মসৃণ ত্বক এই মেয়ের, কী সুন্দর বড় বড় চোখ, যেন ঘুমিয়ে আছে, শিশুর মতো অসহায় সেই মুখের দিকে তাকাতেই আবেগে সুমনের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

চোখে-মুখে সামান্য জল, একটা ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে, ঝিরঝিরে এই ঠান্ডা বুঝি মেয়ের প্রাণে সামান্য উত্তাপ সঞ্চার করছে, মারিয়া জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। মূর্ছা এখনও কাটেনি। সুমন মারিয়ার মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল, আর যত দ্রুত গাড়ি ছুটছে, তত চারপাশে যেন অসংখ্য সীতা, স্বর্ণসীতা হয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য নদী মরুভূমিতে হারিয়ে যাচ্ছে। সুমন তার মায়ের জীবনের কথা ভেবেও কষ্ট পাচ্ছিল। এমন সুন্দর লাবণ্যময় সংসারে ঈশ্বর তার জন্য কোনও আশ্রয় রাখেনি। মারিয়া তার কোলে ঘুমিয়ে আছে মনে হয়।

সদর-দরজা দিয়ে গাড়ি ঢোকার মুখে সুমনের বুকটা আবার কেঁপে উঠল। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। সে তাড়াতাড়ি মারিয়াকে আর-একবার দেখে নিল। এই মুখ দেখলে সব কিছুর বিরুদ্ধে যা কিছু অন্যায় এবং জীবনে যা কিছু শ্রেয়, তার জন্য সে সংগ্রাম করতে পারে। সুমন ফিস ফিস করে বলল, মারিয়া, তুমি আমার পাশে আছ, পাশে থাকলে আমি সাহস পাই। আমার কেন জানি কেবল, কিছুতেই ভয় থাকে না মারিয়া। সে ভাবল, লুকিয়ে একবার চুমু খাবে কি না। কী সুন্দর চোখ, চোখে বার বার চুমু খেতে ইচ্ছা হল।

প্রাসাদের ঝাড়লণ্ঠনগুলি তখন দুলছে। ভারোদি গাড়ি-বারান্দায় পায়চারি করছেন। গুডুই একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে বাড়িটার শুধু অন্ধকার। এই গাড়ি-বারান্দায় আজ শুধু আলো। ভিতরে বড় হলঘরটার সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। গাড়ি-বারান্দার নীচে সেই কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড় এবং বারান্দার ভিতর সামান্য পরিসরে গাড়িটা এনে পার্ক করালেন উড। এখানে সামান্য অন্ধকার আছে বলে গাড়ির ভিতরটা দেখা যায় না।

পার্টির চার-পাঁচ জন সভ্য ঘরের ভিতর মদ্যপান করছে। ভারোদি স্থির থাকতে পারেনি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ম্যানদের জানিয়েছে, হায় ঈশ্বর, আমার কপালে শেষ পর্যন্ত এই ছিল। ফোনে বিস্তারিত জানালে ওরা ওদের আস্তাবলের মাঠ থেকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছে। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ি-বারান্দার পরে সেই বড় মাঠ, মাঠে যে কিছু ঘোড়া এই রাতেও নরম ঘাস চেটেপুটে খাচ্ছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তা টের পাওয়া যায়। এক ছায়া-ছায়া ভাব। ছায়ার মতো অস্পষ্ট ঘোড়াগুলো এখন মাঠে চরছে। ওদের ঘাস খাবার শব্দ এবং কানে মশা মাছি বসলে কান পত পত করে নাড়ছে, এমন কিছু শব্দে উড প্রমাদ গুনছে। কে সেই মানুষ, যাকে পার্টি আজ এই পাষাণ প্রাচীরে নিক্ষেপ করবে। কুকুরগুলো পর্যন্ত অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে। কেবল কোথাও থেকে ইশারার অপেক্ষা। কী যেন এক রহস্য এই বাড়ির চারিপাশে, প্রায় ভুতুড়ে বাড়ির মতো চুপচাপ নিঃশব্দ। কোথাও চামচিকের আর্তনাদ, সকলে তখন চকিতে চোখ তুলে দেখল গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে থেমে আছে।

যারা মদ খাচ্ছিল তারা সব ফেলে ছুটে এল। একপাশে অন্ধকারে সোজা হয়ে ওরা দাঁড়াল। ওদের গলায় লাল রুমাল। কোমরে কাউবয়দের মতো বেল্ট এবং খাপে রিভলবার। কালো রঙের পোশাক ওদের। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। একটা লোক এত বেশি ঢক ঢক করে মদ খেয়েছিল যে পাশে বসে সে এখন বমি করছে। মাথায় ওদের লম্বা নীল রঙের টুপি। দূরে ভারোদি দাঁড়িয়ে সব দেখতে দেখতে গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন। মারিয়া ফিরে এসেছে। খবর নিতে হবে, সেই ছোকরা কোন দিকে পালিয়েছে। তখন এইসব ম্যানরা ঘোড়া নিয়ে, কুকুর নিয়ে ছুটবে। বনের ভিতর শিকারি খরগোশের পিছনে যেমন ছোটে, তেমনি এই ম্যানরা ছুটবে। নিমেষে, সে দ্রুত যত পালাবার চেষ্টাই করুক ওরা ওকে পাকড়ে ঠিক যেমন কাঁধে এক হরিণছানা ঝুলিয়ে নিষাদ ঘরে ফেরে, তেমনি ওরা ফিরবে। সেই

ভংলি মানুষটার উদ্দেশে খবর নেবার জন্য জানলায় মুখ বাড়াতেই আশ্চর্য, এতটুকু ভয় নেই শঙ্কা নেই, স্থির প্রায় দেবদূতের মতো শান্ত পুরুষ ধীরে ধীরে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে। মুখে চোখে এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। হাসি-খুশি, সেই যেন এক বালক বনের ভিতর ফুল তুলতে গিয়ে পথ হারিয়েছে, তেমনি এই তরুণ পথ হারিয়ে আশ্রয়ের নিমিত্ত এই প্রাসাদে এক মূর্ছিত প্রাণ নিয়ে ঢুকে পড়েছে। সে মারিয়াকে কাঁধে ফেলে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাচ্ছে। পাশে ভারোদি, যেন অপরিচিত ভারোদিকে সে চেনে না এই বাড়িঘরে সে প্রবাসী মানুষ, দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে।

ভারোদি আর সহ্য করতে পারল না। সে চিৎকার করে উঠল, ইউ হেল।

সুমন হাসল। বলল, সব হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। মারিয়া ভয়ে মূর্ছা গেছে। এক্ষুনি ভাল হয়ে উঠবে। ওকে রেখে আসতে দিন।

এই বলে সে আর দাঁড়াল না। মারিয়ার যেদিকে ঘর সেদিকে এখন আলো নেভানো, এবার সে ধীরে ধীরে হেঁটে গেলে সব আলো জ্বলে উঠল। আলো জ্বলে উঠলে, সে ফিস ফিস গলায় ডাকল, মারিয়া, আমি মরে গেলে তুমি আমার নামে একটা এপিথাপ গড়ে দিয়ো। সেখানে রোজ দুটো ফুল দেবে। একটা মোমবাতি জ্বেলে দিয়ো। দোহাই তোমার, মাকে বোলো যেন কুকুর দিয়ে আমাকে না খাইয়ে দেয়। সেই যে খামারবাড়িতে গির্জা আছে তোমাদের এবং যেখানে তোমাদের ওপোসামের বাচ্চাটা রাতে চুক চুক করে দুধ খায়, তার পাশে কী সবুজ অরণ্য। তার ভিতর আমাকে রেখে দিতে বোলো। তুমি বড় হলে মোমবাতি জ্বালিয়ো। আমার সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না মারিয়া। এই আমার ভাল। আমি তোমার কাছে থেকে যাব। আমার মা নেই, বাবা নেই। সংসারে আমার তুমি বাদে আর কেউ নেই।

উত্তেজনায় ভারোদির হাত পা কাঁপছিল। তিনি ফের চিৎকার করতে গিয়ে কেমন গলায় কাঠ কাঠ একটা শুকনো ভাব অনুভব করলেন। ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বুঝি এমন দৃশ্যে তিনিই মূর্ছা যাবেন। কী অর্বাচীন এই তরুণ। কোথায় প্রাণ রক্ষার্থে পালাবে, বনবাদাড়ে হারিয়ে যাবে, ভয়ে শশকের মতো চোখ করে রাখবে। না তা না, তাজা প্রাণ বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে মারিয়ার ঘরের উদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছে। যেন গর্বের অন্ত নেই, অহমিকার শেষ নেই, দ্যাখো, আমি এক যুবক তোমার এই পাষাণ প্রাচীরে আলো জ্বালাতে এসেছি। তোমার সব ছিল, গাছপালা, রোদ, পাখি, মাঠ এবং অরণ্য কিন্তু ফুল ফুটত না পাখি ডাকত না। গাছ মৃত, জমি বন্ধ্যা। জাদুকরের পালিত পুত্র আমি আমার নাম এমিল, আমি এই বনে ফুল ফোটাতে এসেছি। বস্তুত ভারোদি সুমনের এই নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে আরও বেশি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছুটে গেলেন। এবং দরজার মুখে বাধা দিলে সুমন বলল, আর একটু সময় দিন। ওকে রেখে আসি। আমি কথা দিচ্ছি, কোথাও পালাব না।

সুমন মুহূর্ত দেরি করল না। যেদিকে মারিয়ার ঘর, ধীরে ধীরে সেই দিকে আবার হাঁটতে শুরু করল। পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। সুমন সন্তর্পণে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। সাদা মখমলের মতো নরম বালিশ। পা দুটো সোজা করে দিল। চুলগুলি ঠিক করে দিল। একটা নীল রঙের সিল্কের চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তুমি আমাকে রোজ একটা ফুল দেবে মারিয়া। মোমবাতি সন্ধ্যায় জ্বেলে দেবে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মারিয়া আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

দরজার কাছে এসে ফের কী যেন মনে পড়ে গেল সুমনের। মারিয়াকে একটা কথা বলা হয়নি। সে ফের শিয়রে হাঁটু গেড়ে বসল সোনালি চুলে যেন কত কালের সূর্য অস্ত যায়। যেন কতকাল ধরে ফুল ফোটার জন্য সূর্য কিরণ দিচ্ছে। চুলের ভিতর সব মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে মুখ থেকে চুল সরিয়ে বলল, তোমাকে যা বলা হয়নি, তুমি যে অনেক বড় হয়ে গেছ, চুপিচুপি বলে যাচ্ছি, মারিয়া, তুমি যুবতী হয়ে গেছ।

সে আর দেরি করল না। কারণ সদলবলে ওরা এখন এখানে ছুটে আসবে। কী পবিত্র এই চোখ-মুখ। যদি এই পবিত্রতা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। সে কপালে হাত রেখে তা স্পর্শ করতে চাইল।

তখন মনে হল করিডরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সে দ্রুত দরজা পার হয়ে সেই করিডরে ছুটে গেল এবং ভারোদির সামনে দাঁড়াল। স্থির অবিচল। সে ধীরে ধীরে বলল, এতক্ষণে আপনি সব জেনে গেছেন।

বলে সে ভারী ক্লান্ত এমন এক মুখ-চোখ নিয়ে সামনের সোফাতে বসে পড়ে সকলকে ডাকল, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

ভারোদিকে কেমন তোতলামিতে পেয়ে বসেছে। মৃত্যুভয় না থাকলে প্রাণে আসে এক দুর্জয় সাহস, সেই সাহস সকলকে কেমন ভীত করে তুলছে। সুমন বলল, দিনটা ভারী চমৎকার ছিল। মাছ আমরা ঠিক ধরতাম। কিন্তু বার্ট যত নষ্টের গোড়া, সে বলল, তুমি ইন্ডিয়ান, তুমি এটা কী করেছ! আচ্ছা বলুন, আমরা জাহাজি মানুষ। কতকাল পরে মাটি পেয়েছি! কী সুন্দর দিন, আপনাদের ওপোসামের বাচ্চাটা কী চুকচুক করে দুধ খায়! আশ্চর্য। জানেন, জায়গাটা আমার কেন জানি, আমাদের রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটির বনের মতো মনে হয়েছে। আপনি রামায়ণের নাম শোনেননি। কী সুন্দর বই। আমাদের মহাকাব্য। আবার এলে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতাম। আমার মা যখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সব প্রেরণা হারিয়েছিলেন, তখন দেখেছি এই কাব্য মাকে কী অনুপ্রাণিত করেছে। বিকেল হলেই সুর ধরে রামায়ণ পাঠ আমার অভ্যাস ছিল। যেমন এই ধরুন বাইবেল...।

এ কি পাগল না আর কিছু! ভারোদি আশ্চর্য হয়ে দেখছে। একনাগাড়ে কী সব বকে যাচ্ছে। যার কিছু অর্থ ধরতে পারছে, কিছু পারছে না। সবই কেমন তার অনায়াসলব্ধ। সরল বালকের মতো মুখ তুলে ভারতবর্ষের গল্প বলছে!

বুঝলেন, মারিয়া বড় হলে একবার ইন্ডিয়ায় যাবে বলেছে। আমি তো তখন আরও বড় হয়ে যাব। আমি ওকে বলেছি আমাদের একটা নদী আছে, নাম—গঙ্গা নদী। নদীর পাড়ে বসে আমরা হাওয়া খাব। নানারকমের গল্প করব।

কিন্তু ভারোদি কোনও কথা বলছে না।

আচ্ছা, আপনি গোমড়া মুখ করে রেখেছেন কেন? আমাকে কি এক্ষুনি উঠতে হবে? আমার যে কী অপরাধ আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে চলুন।

কিন্তু সুমন দেখল, গুড়ুই নিস্পলক। ভারোদির চক্ষু স্থির। আর ভারোদির দলটা সেই থেকে মদ্যপান করে চলেছে।

যদি তাড়াহুড়া না থাকে তবে শুনুন। বার্ট কী বলে জানেন, বলে, আমি কালো মানুষ। কালো মানুষ বলে পালাতে বলছে। আচ্ছা, কালো মানুষদের কি কোনও অধিকার নেই, এই যেমন ধরুন ভালবাসার অধিকার। আপনি তো মা, মায়েরা এসব ভাল বলতে পারে। মায়ের প্রাণ কি কখনও কঠিন হয়? আমার মা তো কারও দুঃখ দেখলেই কেঁদে ফেলতেন। মায়েরা তো সন্তানের দুঃখে শুধু কাঁদে জানি। আপনি মারিয়ার জন্য, অথবা এই যে আমি চলে যাব জাহাজে, আর হয়তো কোনওদিন দেখা হবে না, অথচ দেখুন যতদিন এখানে ছিলাম একবারও মনে হয়নি, আমি এখানে আগন্তুক। আপনার বাৎসল্য আমাকে মায়ের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। বার্ট বলল, পালাতে। পালালে আপনি কষ্ট পেতেন না? আপনি বলুন! এ কী! আপনি কোনও উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমার সত্যি এখন খারাপ লাগছে।

আর কোথায় পালাব বলুন?— বলে সুমন উঠে দাঁড়াল। ভারোদির কঠিন মুখ ওকে এতটুকু ঘাবড়ে দিচ্ছে না। যেন সে অনেকদিন পর তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে এসেছে। তাদের সঙ্গে দেশ-বিদেশের গল্প করছে।

গুড়ুই এসে আপনাদের কখন খবর দিল যে, আমি স্প্যানিশ নই? আমি ভারতীয়, বাঙালি। আপনার কাছে নিগ্রোদের সামিল। কখন বলল?

ভারোদি সুমনের এমন সব কথায় ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে নিজেকে কঠিন রাখার নিমিত্ত খুব সহজ গলায় বলার চেষ্টা করল, ওজালিও, ইউ মাস্ট ডাই।

কিন্তু গলাটা কাঁপছে বলতে। এ কী হল তাঁর? কথা বলতে গিয়ে কেমন আটকে যাচ্ছিল।

গুড়ুই বিস্মিত।

আপনি উত্তেজিত হবেন না ভারোদি। আপনার শরীর খারাপ করবে।

বলে সুমন কাছে এগিয়ে গেল। এবং পায়চারি করার ভঙ্গিতে ভারোদির চারপাশে ঘুরতে থাকল। বলতে থাকল, লুজান বলে একটা গ্রাম আছে। বার্ট এবং মারিয়া ইচ্ছা করলেই সেখানে আমাকে পৌঁছে

দিতে পারত। ভাবতে খারাপ লাগল। জানেন, আমাব কেন জানি কেবল জলতেষ্টা পাচ্ছে। আমি জল খাব। এক গ্লাস ঠান্ডা জল হলেই হবে।

সে জল খেল। তাবপব একটু থেমে বলল, জানেন আজই কেন জানি আমাব মনে হল আমাব মা আত্মহত্যা কবেননি, মাকে আমার আত্মীয়টি মেবে ফেলেছেন। বাস্তায় আমি যখন মাবিয়াব চোখে-মুখে জল দিচ্ছিলাম, তখন কেবল আমাব মায়েব কথা মনে পড়েছে। মা'র জন্য আমি আজ যেভাবে কেঁদেছি, কোনওদিন এমন কবে কাঁদতে পাবিনি। আপনাকেই আমি এসব বলতে পাবি। আমাব আব কে আছে বলুন'

বলে, কেমন নদীব মতো প্রবহমান এক স্রোতে সে গা ভাসিয়ে দিল। তাব আব কিছু চাইবাব নেই। জাহাজে ফিবে যেতে ইচ্ছে নেই।— কোথায় যাব' এই ভাল হল, কী বলেন। এখানে, আপনাদেব মাটিতেই থেকে গেলাম।

পালানোকে আমি খুবই অসম্মানজনক ভাবি। মৃত্যুভয় সকলেবই কম-বেশি থাকে। আমাবও আছে। যখনই মৃত্যুভয় আমাকে গ্রাস কবতে আসছে, ঠিক তখনই সেই জাদুকবেব পালিত পুত্রেব মুখ স্মবণ কবাব চেষ্টা কবি। আমি সাহস ফিবে পাই। আমাব আব ভয় থাকে না। গাছটা থেকে ফুলটা তুলে আনাই আসল কথা। এমিল নামক এক বালক গাছে গাছে, মাঠে মাঠে কেবল ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে। আমাব ইচ্ছা, এই যে আপনাব হাতে তৈবি কঠিন প্রাচীব, যেখানে কতকাল শ্যাওলা জমে আছে, সেখানে সামান্য অন্তত ফুল ফুটুক। সামান্য, এই ধরুন শ্যাওলা জাতীয় ফুল ফুটলেই আমি খুশি। আমাব মৃত্যুটা মাবিযাব প্রাণে খুব বড হয়ে ফুটে থাকবে তবে।

সুমন এবাব নিজেব দিকে তাকাল, এই যে সে, এমন সব কথা বলে যাচ্ছে, এমন দামি এবং মূল্যবান হবফেব মতো কথা, কে বলাচ্ছে তাকে দিয়ে এসব' বার্ট' সামাদ না সুচাক' না মাবিয়া' সে বলল, এবাব আপনি ইচ্ছা কবলে আপনাব লোকদেব ডাকতে পাবেন। তাবা আমাকে নিয়ে যা খুশি কবতে পাবে এখন। আমি সবটুকু আশা কবি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পেবেছি। এব চেয়ে বেশি ভাল করে বোঝাতে পাবব না। কাবণ আমি জাহাজি মানুষ। বোধবুদ্ধি এমনিতেই মাটি পেলে আমাদেব কমে যায়।

বলে সুমন সজল এবং অকপট চোখ কবে ফেলল, নির্বোধ ভাবোদিব অন্তবাত্মা সেই সজল এবং অকপট চোখ দেখে স্থিব থাকতে পাবল না। শুধু দুটো হাত প্রসাবিত কবে দিলেন। সামান্য এই তরুণ নাবিক সমুদ্র থেকে কী এক সঞ্জীবনী সুধা আহবণ কবে এনেছে। মৃত্যুকে এমন তুচ্ছ ভাবছিল। তিনি কিছুতেই স্থিব থাকতে পাবছিলেন না। মৃত্যুকে এত বড় কবে ভাবা যায় ভাবোদি আগে জানতেন না। আব কিছু না হোক মাবিয়া তো তাকে ভুলতে পাববেন না। তিনি ভিতবে ভিতবে সন্তান-বাৎসল্যে পীড়িত হচ্ছিলেন। এই ঘুবে ফিবে কথা, বামায়ণ গানেব মতো সবল বাক্য ভাবোদিব কঠিন আত্মাকে কোমল এবং প্রবহমান নদীব স্রোতেব মতো আবেগ-বিহ্বল কবে তুলল। তিনি পাগলেব মতো ডাকলেন, গুডুই গুডুই।

গুডুই কাছে এলে বললেন, এই নিষ্ঠুব নাবিকটিকে জাহাজে পৌঁছে দাও। আব ওকে বলে দাও সে যেন আব এখানে না আসে।

বলে বোধ হয় তিনিও মূর্ছা যাচ্ছিলেন। সুমন ধবে ফেলল এবং সোফাতে বসিয়ে দিয়ে বলল, যদি অনুমতি কবেন, যাবাব আগে একবার মাবিয়াকে দেখে যাব।

সুমনেব দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। কিছু বললেন না। শুধু হাত তুলে অনুমতি দিলেন যাবাব। সুমন লাফিয়ে লাফিয়ে মাবিয়াব ঘবেব দিকে ছুটছে। এই প্রথম সে একেবাবে আপনজনেব মতো এই প্রাসাদেব অলিন্দে ছুটে বেড়াতে থাকল, ঘুবে বেডাতে থাকল। মাবিয়াব ঘবে ঢুকে দুষ্টু বালকেব মতো মাবিয়াকে সুডসুডি দিল। মাবিয়া সহসা চোখ মেলে তাকাল। বিশ্বাস কবতে পাবছে না ওজালিও তাকে এমনভাবে জডিয়ে ধবতে পাবে। সে স্বপ্নেব ভিতবে ফেব ডুবে গেল। সুমন আব স্থিব থাকতে পাবল না। সে এই প্রথম আবেগে জড়িয়ে ধবল মাবিয়াকে, তাবপব মূর্ছিত কোমলপ্রাণেব ঠোঁটে খুব আস্তে চুমু খেল এবং বলল, মাবিযা, মাই বিলাভেড। মাই ডিয়াব লেডি

সে ওকে ধীবে ধীবে জডিয়ে ধবল। মনে হয় দেখে, মেয়ে ভীষণ ঘুমোচ্ছে। যেন এক বাজকন্যা সোনাব কাঠি রুপাব কাঠি মাথায় পায়ে বেখে ঘুমোচ্ছে। সুমন মাবিয়াকে জাগাবাব চেষ্টা কবল না। ধীবে

ধীরে বের হয়ে এল। মারিয়ার পরিচারিকা সুমনকে হলঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সুমনের মনে হল এই সেই বাড়ি আর বড় পাথরের পাঁচিল, পাথরের ঘরে বড় বড় সব কুকুর এবং সেই প্রাসাদ, একদা এখানে পারিবারিক দাসব্যবসা ছিল, পাথরের ঘরে নিগ্রো যুবতীরা ডিম পাড়ার মতো সন্তান প্রসব করে চলে যেত, এই সব সন্তানের বিক্রিতে হাজার হাজার ডলার, ভারোদির প্রাসাদের মতো বাড়ি, ঝাড়-লণ্ঠন এবং শোবার ঘরে জর্জিয়ান আয়না তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাইরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পপলার গাছে শব্দ এবং বসন্তের রঙিন ফুল উড়ে উড়ে কোনও নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছে। রাত হয়ে গেছে বলে ফুল দেখা যাচ্ছে না। দুটো-একটা পাপড়ি সুমনের মাথায় উড়ে এসে পড়ছে। সদর-দরজায় পৌঁছাতেই সেসব ফুলের সৌরভ তাকে কেমন আকুল করে তুলল। আর গুড়ুই এই প্রথম সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল, আপনার জন্য স্যার গাড়ি প্রস্তুত।

সুমন হাত নেড়ে গুড়ুইকে ধন্যবাদ জানাল।

শহরের সব চেনা হয়ে গেছে গুড়ুই। একা হেঁটে চলে যেতে পারব। তুমি যেতে পারো।

এই বলে সে অদ্ভুত কায়দায় হাত নাড়তে নাড়তে বস্তুত এই বাড়িকে উদ্দেশ করে বিদায় জানাল। কাল জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কাল রাতে তাদের জাহাজ সমুদ্রে নেমে যাবে। তারপর সেই অসহায় যাত্রা। নীল জল এবং নীল আকাশ। মাঝে মাঝে ঝড়। কোনও কোনও সময় টাইফুন এবং তিমি মাছের আর্তনাদ অথবা কেবল স্বপ্নের ভিতর এক মুখ, প্রিয় ভালবাসার মুখ মাঝে মাঝে চোখের উপর ভেসে উঠলে সুমন বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। ক্রমে সব চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। জানালাতে প্রিয় মারিয়া অন্যমনস্ক হলে বুকের ভিতর এক অসীম ব্যথা সময়ে-অসময়ে টের পাবে।

সুমন হাঁটতে হাঁটতে উইচ-ককের পথে নেমে এল। কত সব বিচিত্র কথা, মারিয়ার সানপাখির কথা এমন গল্প বুঝি হয় না, পৃথিবীর কোনও প্রান্তে হয়তো মারিয়ার সানপাখিরা এখনও বসবাস করছে। সে যেন ইচ্ছা করলে এই সব পাখি, জীবন বিপন্ন করে এখন ধরে আনতে পারে। সে উইচ-ককের পথে নেমে যাবার সময় দেখল শহরের সর্বত্র আলো গান এবং স্কাইলার্ক ফুলের সমারোহ। সে ক্লান্ত এবং অবসন্ন। এখন কোনওরকমে জাহাজে উঠে চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়া।

ঠিক বন্দরের মুখে মনে হল কে ওকে অনুসরণ করে আসছে। পেছনে সে কার গলা পেয়ে অবাক হল।

স্যার, আমি যাচ্ছি।

সুমন পিছন ফিরে তাকাল। দেখল গুড়ুই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গুড়ুই নিঃশব্দে ওর সঙ্গে এতটা পথ অনুসরণ করেছে। সে ফের বলল, আপনার আর কোনও ভয় নেই স্যার। আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারায় থাকছি। আপনি তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে পড়ুন।

সুমন ক্লান্ত এবং অবসন্ন। সুমনের পাশে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে যেন এখন তাজা এক প্রাণ। সে উজ্জ্বল সুমন। সে বলল, গুড়ুই, তুমি!— বলে হাত চেপে ধরল, তুমি আমার রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছ!

গুড়ুই বলল, স্যার, মাদাম আমাকে অনুসরণ করতে বললেন।

সুমন সেই ম্যানদের মুখ দেখতে পেল। যারা ন্যাশনাল পার্টির সভ্য। ভারোদির এই দুর্বলতায় ওরা নিশ্চয় মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সুমনকে পথে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। সুমন এবার গুড়ুইয়ের হাত ছেড়ে দিল। বলল, বিদায় বন্ধু।

গুড়ুই দাঁড়িয়ে থাকল, সুমন আস্তে আস্তে বন্দর-পথে নেমে যেতে থাকল। দূরে অশ্বশালার পাঁচিলে হয়তো এখন কোনও ফুল ফুটছে। কোনও গির্জায় হয়তো ঘণ্টা বাজছিল। কিছু হেরনপাখি হয়তো রাতের আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্রে অথবা মোহনায় চলে যাবে। সুমন মাথার উপর সেই সব পাখির শব্দ শুনতে পেল। দু' পাশে জাহাজ সারি সারি। চিমনিতে ধোঁয়া উঠছে। ক্রেনের নীচে অস্পষ্ট অন্ধকারের ভিতর সুমন হেঁটে যাচ্ছিল। সে জাহাজে ওঠার সময় পায়ে কোনও শক্তি পাচ্ছে না। কী যেন সে রেখে এসেছে সেই প্রাসাদের মতো বাড়িতে, প্রাণের চেয়ে মূল্য যার অধিক, নরম কোমল এক ভালবাসা সে ফেলে এসেছে পিছনে। সে তার বেদনা ভুলে থাকার জন্য চারিদিকে চোখ মেলে আকাশ নক্ষত্র এবং দূরের বনাঞ্চলে সেই গির্জার ক্রস আবিষ্কারের আশায় রেলিং-এ মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিন্তু কিছুতেই সেই ভালবাসাব মুখ সে ভুলে থাকতে পাবছে না। হয়তো মাবিয়া জেগে গুপ্তহত্যাব কথা ভেবে ফেব মূর্ছা যাবে। গুডুইকে অন্তত বলে দেওয়া উচিত ছিল মূর্ছা ভাঙাব সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বচবাচবেব সর্বত্র যে শুভ-বার্তা আছে, সেই শুভ-বার্তাব কথা যেন বলা হয়, মাবিয়াকে যেন বলা হয় ঘাস, ফুল, মাটিব মতো অথবা পবস্পব আমাদেব ভালবাসাব মতো আব বড় কিছু নেই, মহৎ কিছু নেই।

জাহাজ-ডেকে কোনও জাহাজি ছিল না। সমুদ্র থেকে এখন আব কোনও ঠান্ডা বাতাসও উঠে আসছে না। সুতবাং স্থিব আলোব ভিতব জাহাজ-ডেকে নিঃসঙ্গতা শুধু। ঝিঁঝি পোকাব শব্দেব মতো একমাত্র এক দ্রুত শব্দ ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসছে। কোনও মানুষেব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ফোকসাল থেকে পর্যন্ত অন্ধকাব। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। কেবল এখন মেজ মালোমেব কেবিনে আলো জ্বলছে। তিনি হয়তো মদ গিলছেন আব একাই তাস খেলছেন। ফলকাব কাঠ সব পেতে দেওয়া হয়েছে, ওপবে ত্রিপল এবং কিল আঁটা। জাহাজ বোঝাই হয়ে গেছে বলে গ্যাংওয়েব সিঁড়িটা এখন তত খাড়া নয়। কোয়ার্টাব-মাস্টাব উইংস-এব আলো জ্বেলে দিতে বোধহয় ভুলে গেছেন, টুইন ডেকেব উপব সেজন্য আবছা অন্ধকাব। এবং সেই অন্ধকাবেব ভিতব যেন একটা লোক ভূতেব মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সুমন পিছিলেব দিকে উঠে যাবাব সময় সহসা মানুষটাব কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মানুষটাকে দেখলে মনে হবে বাজ-পড়া মানুষ। এত স্থিব এবং অপলক যে বোঝা দায় মানুষ না মানুষেব ছায়া অন্ধকাবে মিশে আছে। মানুষটা যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে তা পর্যন্ত টেব পাওয়া যাচ্ছে না।

সুমন ক্লান্ত এবং ক্লিষ্ট। সুমন নানা কাবণে আজ বিপর্যস্ত। অথবা যে বিজয় সে কবে এসেছে, যে অলৌকিক শক্তি তাকে ভিতবে সাহস জোগাচ্ছিল, এখন সব মনে হলে তা মূর্ছা যাবাব মতো অথবা উচ্ছিত এক প্রাণ সে এবং সাবাদিনেব অভিযান আব দুঃসহ যাত্রা, কী হয় কী না হয় আব সে নিজেব সঙ্গে সংগ্রামে নিজেই লিপ্ত, বিপর্যস্ত মানুষ, সে কিছুতেই আব দাঁড়াতে পাবছিল না ডেকেব উপব। সে চলছিল। এমন সময়ে এই অন্ধকাবেব অস্বস্তিকব ছায়াটা নড়ছে না, ওকে দেখে কথা বলছে না একা এক তীবেব দিকে তাকিয়ে পপলাবেব শাখা-প্রশাখাব শব্দ শুনছে কি কাঁদছে, কি ভৌতিক কিছু দেখে পাথব হয়ে গেছে বোঝা দায়। সুতবাং সে চিৎকাব না কবে পাবল না তুমি কে? অন্ধকাবে কে তুমি?

আমি সামাদ।— ঠান্ডা গলায় অন্ধকাব থেকে মানুষটা জবাব দিল।

এত বাতে তুই এখানে একা? এখনও তুই ডেক-এ জেগে আছিস?

সামাদ জবাব দিল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।

সুমন পাশে দাঁড়াল, কী দেখছিস?

কিছু না।

চিঠি এল দেশ থেকে?

সামাদ জবাব দিল না।

আমি যা বলছি, শুনতে পাচ্ছিস?

আমাকে?

তবে আব কাকে।

বল।

বলছি, এবাবে নীচে চল, বাত তো অনেক হল।

তুই এতক্ষণে মাবিয়াব কাছ থেকে ফিবলি?

দেখে কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে একটা স্বপ্ন থেকে উঠে এসেছিস।

তাই। নীচে আয়। স্বপ্নটাব কথা বলা যাবে।

তুই যা। আমি পবে নামছি।

সুমন নেমে গেল। সামাদ নামল না। সে ঘাড় গুঁজে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। কোনও কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কেবল কী যেন মনে খেলা কবে বেড়াচ্ছে। এক নিদারুণ ঘটনা ঘটে যাবে জাহাজে। সকলে বিস্মিত হবে জেনে, টিন্ডাল বহমান ওব বিরুদ্ধে তবে এমনভাবে জাল বিছিয়েছে। তুমি বহমান মিথ্যা তালাকনামা আমাব হস্তাক্ষবেব উপব লিখে সালিমাব বাপকে

জমি-জিরাত দিয়ে হাত করবে ভাবছ? মিঞা, আমার নাম সামাদ! দু' হাত কচলে ছুঁড়ে-ফুড়ে দিতে চাইল যেন। তারপর কী দেখে চিৎকার করে বলল, কলজে উপড়ে নেব!

ওর হাত-পা শক্ত হয়ে আসছিল। ডেক-এ সে একা, ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে, দূরে সমুদ্র থেকে হাওয়া ওঠায় গাছে গাছে শন শন শব্দ। ওর ওই চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। সে এখন এই ডেকের উপর কেন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা দায়। কেন এমন ভাবে তাকাচ্ছে বোঝা দায়। সে নিজের গলা টিপে ধরল, গলা টিপে যেন পরখ করল কতটা টিপলে টিন্ডাল চিৎকার করতে পারবে না, তারপর টিন্ডাল রহমানের মৃত চোখের দৃশ্য দেখতে পেয়ে কেমন উল্লাসে ফেটে পড়ল।

অথচ সারাদিন এই হারমাদ মানুষ সামাদ কোনও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেনি। সে যত দিন যাচ্ছে জাহাজে তত সকলের সঙ্গে হাসি-মশকরা কম করছে। কথা কম বলছে। তত সে নামাজের ব্যাপারে আচার নিয়ম রক্ষা করে যাচ্ছে। সে এখন আর বাথরুমে উলঙ্গ হয়ে স্নান করে না। বরং টিন্ডাল রহমান যদি দশ মিনিট মোনাজাত করার ভঙ্গিতে বসে থাকে, সে থাকে কুড়ি মিনিট। সে ধীর স্থির এবং সুবোধ বালক যেন। এমনকী নবির চিঠি পাবার পরও সে উত্তেজিত হয়নি। সুচারু জানতে চেয়েছিল, চিঠিতে কী লিখা আছে। সামাদ সুচারুর কথার জবাব সব সময় এড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ সেই তাণ্ডব, ভয়ংকর তাণ্ডবের সম্মুখীন হবার আগে যেমন গাছপালা স্থির এবং অচঞ্চল থাকে, সামাদ তেমনি অচঞ্চল। শুধু একা থাকলে বোঝা যায় সামাদ ভিতরে কত অস্থির হয়ে পড়েছে, কত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সে জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছিল। সে ক্রমাগত এক প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখ অন্ধকারে বুলিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো ওর চোখ ঝলকাচ্ছিল। সময় এবং সুযোগ বুঝে আহত জন্তুর মতো লাফিয়ে পড়বে।

সামাদকে ফিরতে না দেখে সুচারু ফের সিঁড়ি ধরে ডেক-এ উঠে এল। বলল, কী রে, কতক্ষণ দরজা খুলে রাখব? আমাদের ঘুম পায় না?

সামাদ বলল, যাচ্ছি।

সুচারু দাঁড়িয়ে থাকল।

তুই যা না।

তুই না নামলে আমি নামছি না। সুমন তো আবার বন্দরে কী সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।

তাই বুঝি! চল তো ও কী বলে শুনি।

যেন ওর ভিতরের আগুনটা সহসা নিভে গেছে এমন এক ভাব দেখাল। অথবা বলা যায় সামাদের চোখে যে আগুনটা লুকিয়ে আছে, ইচ্ছা করেই সে আগুনের উপর সামান্য সময়ের জন্য জল ছিটিয়ে দিল। সামাদ নীচে নেমে গেল এবং ফোকশালে ঢুকে বলল, কী রে? ধরা পড়ে গেলি?

সুমন হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সে কাত হল এবং বলল, ধরা পড়ে গেলাম।

তারপর?

সুমন বলল, বাকিটা কাল বলব।— বলে সে ঘুমের জন্য হাই তুলতে থাকল।

খুব ঘুম পাচ্ছে?

খুউব।— সুমন হাত-পা গুটিয়ে চোখ বুজল।

সুতরাং সামাদ উপরের বাংকে উঠে শুয়ে পড়ল। সুচারু একটা বই হাতে নিয়ে শুয়েছে। বই পড়তে পড়তেই ওর ঘুমোবার অভ্যাস। সুচারু ঘুমোলে সামাদ বাতি নেভাবে। সুমন ফের পাশ ফিরে শুল এবং পাশ ফিরতেই সারাদিনের সব নাটকীয় ঘটনা বন্দরে এক এক করে মনে পড়তে থাকলে মনে হল আসলে তার উপর এমিল ভর করেছিল। সে সুমন ছিল না। সে ভিতরে ভিতরে কেমন শিহরন অনুভব করল। এই সুমন যেন মারিয়ার চোখের উপর, ওর মায়ের চোখের উপর প্রতীকী মানুষ হয়ে জাদুকরের পালিত পুত্রের অভিনয় করে এল। সে এখন বুঝতেই পারছে না কী করে এত বড় একটা দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করল। বুঝি অন্য কোনও শক্তি এবং সাহস, অথবা ভালবাসার নিদর্শন রেখে যাবার জন্য সে সহসা এক মহান নায়ক, সে সহসা নদীর উৎসে ঝরনার মতো নির্মল এবং অলৌকিক কিছু করে ফেলেছে। সে এবার চোখ বুজল। চোখ বুজলেই এক কোমল মুখ, ফুলঝুরির মতো চার পাশে ফুটে উঠতে থাকল যেন। মারিয়া ওর সামনে শত সহস্র মুখ হয়ে গেছে। বলছে, তুমি আমায় নিয়ে চলো, সামনের বনে হারিয়ে গিয়ে তপোবন সৃষ্টি করি।

সামাদ এবার উঁকি দিল নীচে। সুচারু ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমন চোখ বুজে পড়ে আছে। সে নবির চিঠিটা খুলল। নীচে কাঁপা হস্তাক্ষরে গোটা তিন লাইন লিখেছে সালিমা। বড় অসহায় সেই হস্তাক্ষর, যেমন বলির পাঁঠা ফুলের মালা পরে হাড়িকাঠে বাঁধা থাকে, তেমন এক মুখ সালিমার ভেসে উঠল, হস্তাক্ষরের ভিতর সামাদ সালিমার সেই করুণ মুখ দেখে 'হায় আল্লা' এবং পারলে যেন ধরণী, গাছপালা, বৃক্ষ এবং জাহাজের মাস্তুল সে ভেঙে দেয় অথবা অন্ধকারে কেমন চিৎকার করার বাসনা। কারণ সালিমার হস্তাক্ষরে দূরবর্তী কোনও বাতিঘরের মতো আলো নেই, বড়-টিন্ডাল রহমান এক অতিকায় ঝড় হয়ে গেছে এবং বাতিঘরের সব কলকব্জা নষ্ট করে দিচ্ছে। বাতিঘরে শুধু অন্ধকার। যদি কখনও জ্যোৎস্না ওঠে, তবে মনে হবে বাতিঘর একা, এক ভুতুড়ে অবয়ব নিয়ে বেঁচে আছে। তার দূরবর্তী জন্মভূমিতে এখন সালিমার অস্তিত্ব এক ভুতুড়ে অবয়ব শুধু, স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। সালিমা কী করবে, কোথায় যাবে, পানিতে ডুবে মরেও যেতে পারে। বড়-টিন্ডাল রহমান সালিমার বাপকে লিখেছে, সামাদ তালাকনামা করেছে। সাক্ষী সাবুদ আছে। ওর হস্তাক্ষরে সই আছে। তালাকনামা রহমানের কাছে রয়েছে। দেশে ফিরলেই সালিমার বাপের হাতে সেই তালাকনামা তুলে দেবে। নবি আরও লিখেছে, সালিমার বাপ চোখে-মুখে অন্ধকার দেখত, যদি না বড় টিন্ডাল লিখত, আল্লার কুদরতে সব হবে মিঞা! ডর নাই। সালিমার কষ্ট হয় এমন দুনিয়া আল্লা সৃষ্টি করে নাই। আমার যা কিছু আছে, সবই তার জানিবা। সালিমাকে চিঠিপত্র লিখতে বারণ করিবা। শয়তানের কাছে কোনও চিঠি দিতে নাই, চিঠি লিখলেই গুনাগার হইতে হইবে জানিবা।

সুতরাং সামাদের সব চিঠি সালিমার বাপ নষ্ট করে দিয়েছে। সালিমাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়নি। চিঠি লিখতে দেয়নি। দূরে পোস্টাপিস। সপ্তাহে একদিন ডাক আসে। সালিমার বাপ ডাক আসার দিন বাড়িতে বসে পাহারা দিত, সামাদের চিঠি এলে নষ্ট করে ফেলত। সালিমার বাপ অজ্ঞ মানুষ, কী লেখা থাকে ওর জানা নেই। সালিমা প্রিয়জনের খত না পেয়ে ক্রমে আকুল হতে থাকে। মানুষটা তাকে তালাক দিয়েছে, মিথ্যা কথা। ফসল যদি না ফলত, নদীর জল যদি শুকিয়ে যেত এবং শীতকালে যদি ওলাওঠা হয় অর্থাৎ দুর্বৎসর হলে, যুবতী গাভীর বাচ্চা না হলে, এমন সব অলক্ষুনে ঘটনা ঘটলে সে বিশ্বাস করতে পারত, এ সালে তার নামে তালাকনামা লেখা আছে। কিন্তু কী যব গমের ফসল! নদীতে কী নির্মল জল! এবং পরবের দিনে কত বড় উৎসব হাটে-মাঠে এবং গ্রামে গ্রামে। তেমন সময়ে মিঞা আমারে তালাক দিলা! কী কসুর আছে কও? দু'বেলা আঁখিতে পানি ঝরে তোমার জন্য, আমার যদি এই কসুর হয়, তবে মিঞা বলছি, তোমার জন্য আঁখি আমার কাঠ হয়ে যাবে। পদ্ম হয়ে পানিতে আর ফুটে উঠবে না।

সামাদ আর স্থির থাকতে পারল না। সফরে-সফরে রহমান যেমন তালাক দিয়ে এসেছে, এ সালেও সেই তালাক এবং এ সালে তবে যথার্থই ইতর মানুষটা তার বিবির দিকে হাত বাড়িয়েছে। এত দিনের সংশয় তবে যথার্থই সত্য হয়ে উঠেছে। সাদা কাগজটা তবে সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। বদ, ইতর, ভণ্ড রহমানকে সে গলা টিপে ধরার জন্য দু' লাফে দরজা পার হয়ে সিঁড়িতে উঠে গেল। সিঁড়ির মুখে টিন্ডালের ফোকশাল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকল, দরজা খোল!

তারপর কে কার দরজা খোলে! কে কার তাণ্ডব দ্যাখে! দরজার উপরে সামাদ লাথি মারতে থাকল। হারমাদ মানুষ এই সামাদ। লাথিতে লাথিতে দরজা ভেঙে ফেলল। হারমাদ সামাদ একটা গোটা দৈত্য হয়ে গেছে। যে মানুষটা সফরে-সফরে তালাক দিয়ে নূতন বিবি ঘরে আনে, যার কচি-কাঁচা যুবতী পেলে মাথা ঠিক থাকে না, সেই টিন্ডাল, বড়-টিন্ডাল সালিমার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

তুমি জানো না মিঞা—

বলে সামাদ যেমন পোলো থেকে শোল মাছ তুলে আনে, তেমনি দু'হাতে টিন্ডালের গলা টিপে ধরে হাওয়ায় ঝোলাতে থাকল আর চিৎকার করতে থাকল, আমার কাগজ কোথায় মিঞা? আমার সই করা সাদা কাগজটা কোনখানে কও। তুমি কী লিখে রেখেছ কও।

ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো শরীরটাকে দোলাচ্ছে, আর বলছে সামাদ, কী লিখছ সেখানে? সালিমার বাপকে জমি-জিরাতের লোভ দেখাও হারামি, ইতর? শুয়োরের বাচ্চা, ইবারে ক তুই, তর কেমন লাগে?

ইদ্রিশ দেখল সামাদের দু'হাতের ভিতর একটা বড় শোলমাছের মতো কালো জীব দুলছে। সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

তোমরা কে কোনখানে আছ রে মিঞা, দ্যাখো আইসা দরিয়ার পানিতে একটা খুন খারাবি হৈয়া গ্যাল। হায় হায় কেউ আসে নারে! আমি কী করমু রে!

গভীর রাত। জাহাজিরা যে যার ফোকশালে ঘুমিয়ে আছে। শুধু ইঞ্জিনের একটানা শব্দটা ক্রমান্বয় ভেসে আসছিল। আর কোনও শব্দ ছিল না। তারপর সহসা এই কাণ্ড। জাহাজিরা সকলে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। সামাদ বড়-টিণ্ডালকে টেনে হিঁচড়ে উপরে নিয়ে ডেক-এ আছড়ে ফেলল, পয়সার এত গরম মিঞা! দে শালা বেজন্মার বাচ্চা, আমার কাগজটা দে।

ডেকের উপর এবার লড়াইটা জমে উঠেছে। দিন দিন এই জাহাজে বড়-টিণ্ডাল রহমানের সঙ্গে সাধারণ ডেক-জাহাজি সামাদের যে আক্রোশ ছিল, জাহাজ ছাড়ার আগে যেন সেই আক্রোশ তাণ্ডব হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ রহমান ঘুমের চোখে কিছু বুঝতে না পারায় সামাদ যতটা তাড়াতাড়ি ওকে কাবু করে ফেলেছিল, ডেকের উপর উঠে তত সহজে কাবু করতে পারছে না। কারণ রহমান, যদিও তার বয়স তিনকুড়ি হবে, সে তুলনায় সামাদের আর কত বয়স, এই বিশ হতে পারে, বাইশ হতে পারে, আবার বত্রিশও হতে পারে, সেই সামাদ শক্তসমর্থ মানুষ রহমানের সঙ্গে খুব সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। তবু এক সময় পাগল-প্রায় হুংকার দিল, সে যথার্থই এবার মেরে ফেলবে রহমানকে! ডেকের উপর আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। জাহাজিরা সকলে ছুটোছুটি করছে ডেক-এ। ইদ্রিশ চিৎকার করছে। ইঞ্জিন-সারেং ছুটে গেছে বড়-মিস্ত্রির কাছে। বড়-মালোম, মেজ-মালোম ছুটে এসেছেন। হেনরি ছুটে এসেছে। সুচারু কী করবে বুঝতে পারছিল না। সে নীচে গিয়ে সুমনকে তুলল। শিগগির আয় সুমন। সামাদ বড়-টিণ্ডালকে মেরেই ফেলবে বুঝি। ওকে নিবস্ত করা যাচ্ছে না।

সুমন ধড়ফড় করে উঠে বসল। সামাদের এই প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সে বিরক্ত হয়ে বলল, বেশ ভাল ছিল ক'দিন, আবার কী হল?

দেরি করলে খুন হয়ে যাবে বড় টিণ্ডাল।

সুমন ছুটে বের হয়ে গেল। সুচারু পিছনে। সকলে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। সামাদ একটা ধারালো স্লাইস ঘোরাচ্ছে মাথার উপর। সে চিৎকার করছে, তার সামনে এখন যে যাবে তার মৃত্যু যেন অনিবার্য। সে রহমানকে আধমরা করে পায়ের নীচে ফেলে রেখেছে। এ সময় কাপ্তান পর্যন্ত কোনও নির্দেশ দিতে পারছেন না। একমাত্র সুমন এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে অথবা সুচারু। ওরা একই ফোকশালে থাকে, সুতরাং সকলে ওদের আশায় থাকলে দেখা গেল সুচারু ছুটে যাচ্ছে। সেই অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছে, কারণ সামাদ এত দ্রুত ঘুরাচ্ছিল স্লাইস যে মনে হয় সে একটা বড় থাম হাতে নিয়ে অবলীলাক্রমে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সুমন একটু নিচু হয়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল। স্লাইসটা তখনও মাথার উপর বন্ বন্ করে ঘুরছে।

সুচারু সহসা একটা হাত ধরতেই স্লাইসটা ছিটকে গিয়ে দূরে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হুড়মুড় করে এগিয়ে যাওয়া, সামাদ পাগল-প্রায় স্লাইস ঘোরাচ্ছিল। সে এখন নিস্তেজ। ওকে সকলে ঘিরে ফেলেছে। জাহাজিরা ভাবছিল, দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা সামাদকে পাগল করে দিয়েছে, অথবা অন্য কিছু, সুতরাং ওকে আর একা এভাবে রাখা যায় না। দড়িদড়া দিয়ে যেমন বন্দরে জাহাজ এলে বেঁধে ফেলা হয়, ঠিক সেভাবে ওকে সকলে বেঁধে ফেলতে চাইল।

সুমন চিৎকার করে উঠল, সামাদ!

সুচারু পিছন থেকে বলল, আমাদের তুই মেরে ফেলবি, সামাদ! তুই কি পাগল হলি।

পাগল!— সামাদ শুধু হাতে রুখে দাঁড়াল।

সুমন বলল, টিণ্ডাল-চাচা, ওঠেন।

খবরদার!— সে পা দিয়ে চেপে রেখেছে টিণ্ডালের গলা।

কিন্তু উঠবে কে! ওর মাজা প্রায় ভেঙে দিয়েছে সামাদ। কিছু জাহাজি এবার পিছন থেকে ছুটে এসে সামাদকে ধরে ফেলল। ওরা রহমানের পক্ষে বলে দড়িদড়া যেন ওদের হাতে ঠিক করা ছিল। জন্তু-জানোয়ার যেমন খাঁচায় লাফাতে থাকে এবং ছুটতে থাকে সব ফেলে সামাদ তেমনি লাফাতে

অথবা ছুটতে চাইল। কোথায় ছুটবে সামাদ? জন্তু-জানোয়ারের মতো জোরজার করে বেঁধে ফেলল। বলল, পাগলামি করবার জায়গা পেলে না মিঞা!

সুমন বলল, ওকে নিয়ে আপনারা কী করছেন!

সুচারু খেপে গেল, কী হচ্ছে এটা!

ডেক-সারেং বলল, এই হবে।

কেন হবে?

জাহাজটা মানুষের জন্য, পাগলের জন্য নয়।

সে এবার বড়-মালোমের দিকে তাকাল। বড়-মালোম পর্যন্ত ডেক-সারেঙের কথায় যেন সায় দিচ্ছেন! সুচারু সামাদ কেমন গুম হয়ে গেল।

টিন্ডাল যেন এতক্ষণে শ্বাস ফেলতে পেরে ডেকের উপর ইদ্রিশের কাঁধে ভর করে দাঁড়াল। বলল, শালার বাপ পাগল, ব্যাটা পাগল হৈব না তো, কী হৈব?

সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে থাকল। টিন্ডালের ক্ষতস্থান থেকে এখন ইদ্রিশ আলি রক্ত ধুয়ে দিচ্ছে।

সামাদ কেমন অসহায় বোধ করে একেবারে বোবা বনে গেল। ওর চোখ দেখলে মনে হয় সে দূরের কোনও জলাশয়ে তার প্রাণপাখিকে ডুবে মরতে দেখছে। সে কথা বলছে না, প্রায় মৃতের মতো ডেকের উপর পড়ে আছে। কিছু লোক ধরাধরি করে ওকে নীচে নিয়ে গেল। যেন ওর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সামাদ চোখ বুজে ছিল। ওর হুঁশ ছিল না।

কী করুণ এই দৃশ্য! সুমন এবং সুচারুর মনে হল, কী এক নিদারুণ রহস্য জড়িয়ে আছে গোটা ব্যাপারটাতে। কেন এমন সব তাণ্ডব সামাদ জাহাজে বাধাচ্ছে, কেন সে সহসা হারমাদ মানুষের মতো জ্ঞানগম্য হারিয়ে ফেলে, বোঝা দায়। সে কিছুই খুলে বলছে না. কেবল 'আমার সাদা কাগজটা টিন্ডাল,' এই উচ্চারণ করছে। কী সে কাগজ! কী এমন অমূল্য ধন সেই সাদা একটুকরো কাগজ, বড়-টিন্ডাল লুকিয়ে রেখেছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কাপ্তান এখন বোট-ডেকে উঠে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা তাঁর। এইসব সমুদ্রযাত্রায় তিনি কত ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন, জাহাজ চলছে চলছে, ঝড় নেই, কোনও দেওয়ানি নেই, দু'দিন বাদে বন্দর অথচ সহসা খবর রটে গেল, কশপের ঘরে একুশ টাকার নাবিক আত্মহত্যা করেছে। কেন এই আত্মহত্যা? রহস্যটা কেউ ধরতে পারল না। জাহাজ বন্দরে বাঁধা। আলো সব জ্বেলে দেওয়া হয়েছে ডেক-এ। বন্দরে হয়তো কোনও উৎসবের দিন তখন। অথচ জাহাজিরা বোট-ডেকে ছুটে এসেছে, মেজ-মালোম জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আবার হয়তো জাহাজ দেশে ফিরছে। জাহাজিরা পেটি বদনা ঠিক করে ফেলছে, বন্দর এলেই নেমে পড়বে, বিবির জন্য সওদা, খুশবু, আতর, মরিশাসের কাঠের হাতি, বুনো সাইরিসের কম্বল, শীতের দিনের মনোরম কামিজ—এমন সময় কিনা এক জাহাজি মাস্তুলে উঠে, রং লাগাতে গিয়ে পাখি হয়ে উড়াল দিল মাস্তুল থেকে। তারপর নীচে, একেবারে নীচে খোলকার ভিতর মানুষটা ছাতু হয়ে গেল। এমন সব কত ঘটনার তিনি সাক্ষী। সুতরাং কাপ্তান যখন সারেঙের মুখ থেকে শুনতে পেলেন, সামাদ তার উপরওয়ালার সঙ্গে জাহাজে উঠেই বিবাদ, শুধু বিবাদ নয়, এক ধরনের অশ্লীল সব ছবি লুকিয়ে রাখত, টিন্ডালকে বিব্রত করার জন্য অহেতুক বচসা করত, একটা সাদা কাগজের কথা বলত, তখন থেকেই মনে হচ্ছিল, সামান্য গোলমাল আছে মাথায়। কী সাদা কাগজ, সামান্য সাদা কাগজের জন্য সেই যে বন্দর থেকে বন্দরে টিন্ডালের পিছনে লেগে আসছে, কিছুতেই থামছে না। তা ছাড়া ইদানীং অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একা একা কথা বলত, এমন দৃশ্য জাহাজিরা কেউ কেউ দেখেছে। যে মানুষ এমন হয়ে গেছে তাকে আর খোলামেলা রাখা যায় না। এখন শুধু বেঁধে ফোকশালে ফেলে রাখা, আর সময় এবং সুযোগমতো দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

ওর দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা আসার পরই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সামাদ। সুমন, সুচারু নীচে নেমে দ্রুত সেই চিঠি খুঁজতে থাকল। কারণ চিঠিটাতে কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। চিঠিটা ওরা বেশি সময় নিয়ে খুঁজল না, কারণ দেখল চিঠিটা সামাদের বাংক থেকে উড়ে এসে নীচে পড়ে আছে। এবার ওরা দু'জনে সন্তর্পণে চিঠিটা পড়ল। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। নবির চিঠিটাতে স্পষ্ট

এমন সব কথা লেখা আছে। দেশে রহমান টিন্ডাল সালিমার বাপকে জানিয়েছে সামাদ তালাকনামা করেছে। আর সেই তালাকনামা রহমানের কাছে আছে। অবাক। তালাকনামা কেন? প্রাণের চেয়ে যে যুবতীর স্মৃতি অধিক,যে সালিমার নাকে নথ, পায়ে মল এবং চোখে যার স্বপ্ন ভাসে তার নামে তালাকনামা। তারা আবার নীচেরটুকু পড়ল। লেখা আছে তালাকনামা রহমান দেশে ফিরলে সালিমার বাপের হাতে পৌঁছে দেবে। রহস্যটা এবার আরও জট পাকাল।

সুচারু নিবিষ্ট মনে কেবল চিঠি থেকে কী যেন উদ্ধার করতে চাইছে। সাদা কাগজে কী আছে। সামাদের হস্তাক্ষরে দস্তখত আছে। কেন এই দস্তখত। তবে কি সেই দস্তখত করা কাগজে রহমান মিথ্যা তালাকনামা করে সামাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে? সালিমার বাপকে জমি-জিরাতের লোভ দেখিয়ে সালিমাকে শেষ বয়সে সাদি করতে চাইছে। কিন্তু বড় টিন্ডাল বয়সে বুড়ো, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। সমুদ্রে বোধ হয় এই শেষ সফর। তা ছাড়া এমন একটা ঘটনা, সামাদই বা এত চেপে যাচ্ছে কেন? জীবনমরণ প্রশ্নের সামিল, সামাদ এত কথা বলে বিবি সম্পর্কে, কী অসুবিধা বাকিটুকু বলতে।

পাশের ফোকশালে সামাদকে রাখা হয়েছে, ওরা শেকল খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। সুমন শিয়রে বসে বলল, তোর চিঠিটা পড়লাম।

সামাদ বড় বড় চোখে তাকাল। চিঠিটা পড়াতে ওর যেন কী সর্বনাশ হয়ে গেছে।

তোরা কেন পড়লি? তোদের কী দরকার ছিল পড়ার? তোরা আমার এত বড় সর্বনাশ করলি কেন?

আমরা দেখেছি বলে তোর কী হয়েছে?

সামাদ সেই বদ্ধ অবস্থায়ও কেমন ছটফট করতে থাকল।

আমি সালিমাকে তালাকনামা দেইনি। রহমান মিথ্যা করে আমার দস্তখত করা কাগজে তালাকনামা লিখে ফেলেছে। তোরা দেখে ফেলেছিস, জানাজানি হয়ে গেল। আমার কী হবে? আমি মরে যাব সুচারু। আমি আমি. ।

এটা কী করছিস। তুই মাথা ঠান্ডা কর, সামাদ। তুই কেন দস্তখত করা সাদা কাগজ দিতে গেলি?

সে তার কলকাতার অসুখের কথা বলল। দেশের বড়-টিন্ডাল রহমানের তখন একেবারে রহমান রহিম চেহারা। সবটা সে খুলে বলল। অসুখে রহমান অনেক টাকা দিয়ে ফেলেছিল। সামাদ বড় দুর্বল ছিল, সাদা কাগজে দস্তখত দিয়ে বলেছিল বাকিটা লিখে নেন বড়-টিন্ডাল। লেখার লোক ছিল না কাছে, সময়মতো লিখে নেবার কথা থাকল, তারপর মনে হলে সামাদ বারবার এক কথা বলে এসেছে, আমার সাদা কাগজ মিঞা, বড়-টিন্ডাল এক কথা বলে এসেছে, ওটা নাকি ওর হারিয়ে গেছে। সন্দেহ, ক্রমে সংশয় এবং নবিব এই চিঠি। তালাকনামা জানাজানি হয়ে গেলে সব গেল। সামাদ সন্তর্পণে কাগজটা উদ্ধার করতে গিয়ে কেমন মাথা গরম করে ফেলল। সামাদ কাটা কাটা কথা বলছিল, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুকটা উপরের দিকে ঠেলে তুলছে। সব কথা একসঙ্গে বলতে পারছিল না। ওরা ওর সেই অস্পষ্ট কথা থেকে প্রায় মোটামুটি ধারণা করে ফেলল। সামাদ এখন অসহায় জন্তুর মতো পড়ে পড়ে আর্তনাদ করছে। সালিমার সেই কাতর চোখ ওকে ভিতরে ভিতরে পাগল করে দিচ্ছে।

সামাদ বলল, দোহাই তোদের, তোরা আমার হাত-পায়ের গিঁট খুলে দে।

একটু চুপচাপ থাক।— সুচারু বলল।

আমি কী করব?— হায় হায় করে উঠল সামাদ।

তোকে কিছু করতে হবে না। বাকিটা আমরা করছি।

ডেকে উঠে সুমন বলল, কাউকে কিছু বলা যাবে না।

কী বলা যাবে না?

এই তালাকনামার কথা। অথচ সাদা কাগজটা বড়-টিন্ডালের কাছে ঠিক আছে। ওটা বের করতে হবে।

বলা যাবে না কেন? সারেংকে সব খুলে বলতে হয়।

শরিয়তি মতে একবার লেখা হয়ে গেলে, লেখা হয়ে গেলে কী রে, যদি রাগ করে বিবিকে, 'যা শালি, তোকে এক তালাক, দু' তালাক, তিন তালাক বাইন তালাক' বলে ফেলে তবে ব্যস, তালাক হয়ে গেল।

আর এতে সামাদের দস্তখতের উপব শালা বড়-টিন্ডাল খুব সুন্দর করে তালাকনামা লিখে নিয়েছে। যদি সারেং কিংবা অন্য জাতভাই ব্যাপারটা জেনে ফেলে আর কিছু করার থাকবে না। সালিমা ওর বিবি থাকবে না।

কিন্তু ইদ্রিশ আলি তো জানে ব্যাপারটা।

সে জানে, সেও ব্যাপারটাকে গোপন রেখেছে। কেবল বড়-টিন্ডাল আর ইদ্রিশ আলি এটা করছে, এটা যে ষড়যন্ত্র, ধরা পড়বে ভয়ে ওরা চুপচাপ।

সুচারু বলল, শালা বুড়ো বয়সে লবেজান বিবির জন্য...।

শোন, মাথা ঠান্ডা রেখে আমাদেরও এগুতে হবে।

তা হলে কী করা যাবে এখন!

চল হেনরির কাছে। ওকে সব খুলে বলা যাক।

সুমন যেতে যেতে বলল, এজন্য সামাদ গোপনে কাগজটা উদ্ধাবেব আশায় ছিল। ওব মনে একটা সংশয় ছিল, কিন্তু সে সংশয়ের কথা কাউকে খুলে বলেনি। এতদিন পর নবির চিঠিতে ওর সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওরা এবার উভয়ে হেনরিব কেবিনে ছুটে গেল। হেনরি অফিসাব মনুষ। ওদেব আপনজন, ওকে খুলে বলতে পাবলে বাকিটা সে নিশ্চয়ই করবে। সুচাক হেনরিকে সব খুলে বলল, বুঝলে হেনরি, এ নিয়ে পিছিলে হইচই করা যাবে না। জানাজানি হয়ে গেলে সামাদেব সর্বনাশ হয়ে যাবে। টিন্ডালেব কাছ থেকে গোপনে কাগজটা উদ্ধার করতে হবে। ওকে যদি ধরে চ্যাংদোলা করে আজ রাতে তোমার ঘরে তুলে এনে কুপিয়ে কাটার ভয় দেখাই, অথবা এই ধরো ওকে যদি আমরা সমুদ্রে গেলে বোট-ডেকে চেপে ধরি, অন্ধকার সমুদ্রে ফেলে দেব, ভয় দেখাই তবে কেমন হয়।

সুচারুর মাথায় এখন কিছুই আসছিল না। ওর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। সামাদের চোখে এখন একটা মাত্র মুখ নক্ষত্রেব মতো জ্বলছে। সে মুখ সালিমার। তার ফের মনে হল, এই একটিমাত্র মুখই সামাদের বাতিঘব। সে স্থিব থাকতে পারছে না, পায়চারি করছে। কী করা যায়, তিন বন্ধুতে ভাবছে। লিজাব মুখ কেবল এ সময় মনে পড়ছিল। লিজা, তার লিজা, কতদিন ধরে সেই লিজাকে ফেলে দূব দূব দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রবার্ট সুচারু যেন লিজার মুখেই সালিমাকে আবিষ্কার করে বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমাদের এক প্রাণ আছে, ভালবাসার প্রাণ, সংসার-সমুদ্রে সেই প্রাণ ডুবে মরলে আর কী থাকে, এখন আর কী করণীয়, কিছুতেই ভেবে উঠতে পারল না!

হেনরি কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে থাকল। তাবপর পোর্ট-হোল খুলে দিয়ে বলল, কিন্তু ইদ্রিশ আলি জানে ব্যাপারটা। সে তো সেখানে সাক্ষী হিসাবে সই করতে পারে। সে দেশে গিয়ে ওব জাতভাইদের বলে দিলে...।

একটা লোক ইচ্ছা করলে মিথ্যা বলতে পারে হেনরি। কাগজটা উদ্ধাব করতে পারলে কে তার তোয়াক্কা রাখে! একশো লোক বললেও সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

হেনরি বলল, এত বড় কাজ আমরা তিনজনে পারব না। এসো, মেজ-মালোমকে বলি, বড়-মালোমকে সব খুলে বলি।

এই বলে হেনরি মেজ-মালোমকে ডেকে তুলল। বলল, বড়-টিন্ডালেব ফাঁসি হওয়া উচিত।

ঘটনা সব শুনে বড়-মালোম, মেজ-মালোম ছুটলেন কাপ্তানের কাছে।

মাস্টার, আপনার কাছে নালিশ আছে।

এত রাতে নালিশ।

সামাদকে বেঁধে রাখলে স্যার অন্যায় করা হবে।— এবং সব খুলে বললে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, স্কাউন্ড্রেল!

কী করা যায় ভাবছি!— বড়-মালোম চিন্তিত মুখে বললেন।

সারেংকে ডাকাও।

সারেংকে ডাকালে সব ফাঁস হয়ে যাবে। ওর জাতভাইরা জানবে, তালাকনামা তবে টিকে যাবে।

তবে তোমরা কী করতে চাও? স্মিথ, জন, তোমরা বলো কী করতে চাও?

ভোর হলে আপনি টিন্ডালকে ডাকবেন। বলবেন কাগজটা ওর কাছে আছে, কাগজটা না দিলে

রাতের অন্ধকারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। টিন্ডাল ভিতু মানুষ, ভয়ে দিয়ে দিতে পারে।—বড়-মালোম এসব বললেন।

আরে না, অত ভিতু মানুষ তোমরা ভাবছ কেন? ভিতু মানুষ হলে অত বড় স্কাউন্ড্রেল হয় না। তা ছাড়া ভোরের জন্য বসে থাকা যায় না। সামাদের হাত-পা খুলে দাও। টিন্ডালকে ডাইনিং রুমে ডাকাও। আমি নীচে এক্ষুনি নেমে যাচ্ছি।

জাহাজে হইচই পড়ে গেল ফের। জাহাজিদের ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। ডেক-সারেং এবং ইঞ্জিন-সারেংকে ভীত দেখাচ্ছে খুব। এই রাতদুপুরে এসব কী কাণ্ড জাহাজে! কী হয়, কী না হয়, কাপ্তানকে সকলের যমের মতো ভয়। কাপ্তান ডেকেছে শুনে, টিন্ডাল রহমান আবগারি দারোগার মতো মুখ করে ফেলল। সে যেন এখন সামনে সব ভূত দেখতে পাচ্ছে। সে দাঁড়াতে গেলে তার হাঁটু কাঁপছে, এক ফোকশালে নিবাস ইদ্রিশ আলির, সে তাকে বলল, হা রে ইদ্রিশ, কাপ্তান আমাকে ডাকল ক্যান?

সুচারু দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, যান, গেলেই জানতে পারবেন।

সুমনের দিকে বড় বড় চোখে কটমট করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এই-ই এত সব করিয়েছে পারলে যেন সে এখন সুমনের গলা কামড়ে ধরতে চায়।

সারেং এসে এক ধমক লাগাল, এখনও বসে আছ তুমি!

আমি কী করুম রে সারেং সাব! আমার ডর করতাছে।

এত রাতে এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে জাহাজিরা সকলে তাজ্জব বনে গেছে। হাত-পা খুলে দেওয়া হয়েছে সামাদের। সামাদকে এবার ফোকশালে নিয়ে গেল সুমন। দরজা বন্ধ করে দিল। সামাদকে শান্ত রাখার জন্য সে নানাভাবে, সেই যেমন পিতা সন্তানকে সমুদ্রে হয়তো ঝড় হবে, তাণ্ডব হতে পারে, যে তাণ্ডবে জাহাজডুবি হলে পিতা-পুত্র সাঁতার কাটতে কাটতে দূরের কোনও পাহাড়ের উপর আলো জ্বলতে দেখে, যেমন পিতা পুত্রকে বেঁচে থাকার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে, সুমন সামাদকে নানাভাবে, কীভাবে বলা যায়, যেন কত ভাবে, সে যেন সেই এক গল্পের এমিল, যার ফুল ফোটানো কাজ, পাহাড়ে বন্দরে ফুল ফোটানোর কাজ, জাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের মতো সে এবার সামাদের জীবনে ফুল ফোটাতে চাইল। নানা কথায়, সালিমার নানা প্রসঙ্গে যেমন যব-গম গাছ দেখলে সালিমা ছুটতে ভালবাসত, তেমনি সব গল্প বলে সামাদের জীবনে ফুল ফোটাতে চাইল।

টিন্ডাল ডেকের উপর ওঠার সময় চেঁচামেচি করছে। সুমন সম্পর্কে সে খিস্তি করছে। সকলে মিলে ছোঁড়াটার মাথা খাচ্ছে। কী এক সামান্য ঘটনা নিয়ে সে কাপ্তানকে পর্যন্ত নালিশ দিতে সাহস পাচ্ছে। সারেংও সুমনের উপর এখন সন্তুষ্ট নয়। কারণ সুমন রহমান সম্পর্কে সারেংকে নালিশ দিতে পারত, তা না একেবারে কাপ্তানের কাছে হাজির। সে নিজের দল ভারী করার জন্য ডেক-সারেংকে সঙ্গে ডেকে নিল। কশপ গেল সঙ্গে। ওরা রহমানের হয়ে বলবে।

কিন্তু ডাইনিং রুমের দরজায় যেই কাপ্তান, সারেং, কশপ এবং ডেক-সারেংকে দেখতে পেলেন, তিনি তেড়ে গেলেন তাদের। বড়-মালোম ওদের চলে যেতে বললেন। কারণ সংগোপনে কাজটা সারতে হবে। এলিওয়েতে এমনকী একজন পাহারাদার রেখে দেওয়া হল, যেন এসব কথা দু'কান না হয়। মেজ-মালোম বাইরে পায়চারি করতে থাকলেন। রহমানের চোখ-মুখ এখন শুকনো দেখাচ্ছে। মানুষটা শয়তানের বাচ্চা, ইতর এবং নোংরা। সে ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপতে থাকল। কারণ টিন্ডাল জেনে ফেলেছে কাপ্তান এখন তাকে কী বলবে। কাপ্তান ওর চোখ-মুখ শক্ত করে রেখেছেন। শক্ত চোখে-মুখে রহমানকে দেখছেন। কাপ্তানের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে রহমান কেঁদে উঠল, সাব, আমার কোনও কসুর নাই।

বড়-মালোম দৃঢ়গলায় প্রশ্ন করলেন, কাগজটা কোথায় রেখেছ?

কাগজটা কোথায় হারিয়ে গেছে স্যার।

স্কাউন্ড্রেল!— কাপ্তান শক্ত গলায় বললেন। জাহাজের অতি তুচ্ছ ঘটনার মতো শেষে বলেছিলেন, ভেবেছি, জাহাজ সমুদ্রে গেলে তোমাকে হারিয়া করে দেব।

কাপ্তানের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প টিন্ডাল শুনেছে। কাপ্তান জাহাজে দু'বার মধ্য-সমুদ্রে নাবিকদের বিদ্রোহ দমন করেছেন। আর এ তো সামান্য একজন নাবিকের অসদাচরণ। অন্ধকার রাতে

দু'-চারজন মিলে সকলের অলক্ষে জলে ফেলে দেওয়া। সে এবার বসে পড়ল।

সাব, আমি কিছু জানি না।

বোধহয় রাগে দুঃখে বড়-মালোম পাছাতে লাথি মেরেই বসতেন, কিন্তু সুমন উঠে গেল বলে, যেন সামান্য সময় পেলেন, দেখি কী হয় ভাব এবং তিনি টিন্ডালকে সময় দিলেন, যদি সুমন বুঝিয়ে-সুজিয়ে হাত করতে পারে। সুমন কাছে গিয়ে বলল, চাচা, বাড়িয়ালা খুব খেপে গেছে। আর দেরি করলে সত্যি আপনাকে বাঁচানো যাবে না। আপনি দেশের কথা মনে করুন, আপনার কত ফসলের জমি, আপনার কত প্রতিপত্তি। সামান্য একটা কাগজের জন্য দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দেবে সে কেমন কথা। সালিমা আপনার নাতনির বয়সি। ভেবে নেন না নাতনিকে নিয়ে একটু রঙ্গরস করেছেন। সামাদটা পাজি, বোকা। আপনার রঙ্গরসের কথা সে বুঝতে না পেরে হইচই করত। আপনি যে রঙ্গরস করার জন্য তালাকনামা লিখে ফেলেছেন সে কথা জাহাজে আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। কাগজটা দিলে সামাদকে ডেকে এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলা হবে।

টিন্ডালের চোখ থেকে সেই দুরারোগ্য ব্যাধির মতো স্বপ্নটা ক্রমে ক্রমে মরে আসছে। প্রায় সবকিছু হয়ে গিয়েছিল, পাগল প্রতিপন্ন করতে পারলে বড় সহজে সে সালিমাকে ঘরে তুলে আনতে পারত, কিন্তু যা তেজি মেয়ে, বাপকে ভয় দেখিয়েছে, কিছু হলেই নদীর জলে ডুবে মরবে। কাপ্তান ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। তিনি ডাইনিং হলে প্যায়চারি করছেন, যেন যথার্থই দেরি করলে আর রক্ষা নেই। কাপ্তান এবার আহত বাঘ যেমন, সহসা দু' পা উপরে তুলে আক্রমণের আগে হাওয়া আঁকড়ে ধরে, তেমনি দু' হাত উপরে তুলে প্রায় যেন ছুটে আসছেন।

সঙ্গে সঙ্গে টিন্ডাল বলে উঠল, সাব, দিচ্ছি।

বলে সে তার নীল পাজামা পাগলের মতো খুলে ফেলল, নীচে কোমরে বাঁধা ছোট্ট লাল রঙের কাপড়ের ব্যাগ, ব্যাগের ভিতর রুপোর কৌটো এবং সে কৌটোয় সামাদের প্রাণপাখি বন্দি করে রেখেছে। কাগজটা যথার্থই যেন সামাদের প্রাণ, সে প্রাণ টিন্ডাল এতদিন রুপোর কৌটায় লুকিয়ে রেখেছিল। সুমন দেখল, উপরে লেখা তিন তালাকের কথা। নীচে সাক্ষী হিসাবে ইদ্রিশ আলির সই এবং আরও নীচে, সামাদের হস্তাক্ষরে সই।

সুমন হেনরিকে বলল, সামাদকে এখানে নিয়ে আসছি। ওর সামনে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলছি।

টিন্ডাল পাজামা খুলে পাগলের মতো হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। ওর সেই দুরারোগ্য ব্যাধি কিছুতেই চোখ-মুখ থেকে মুছে যাচ্ছে না। সে অসহায়। ঝড়ে আহত পশুর মতো মুখ করে বসে আছে। কাপ্তান না বললে সে যেন যেতে পারছে না।

সুচারু এল। সামাদ এল। সামাদকে একদিনেই বড় পাংশু দেখাচ্ছে। সে কোনওদিকে তাকাচ্ছে না। ওর চোখে আর কোনও আলো নেই, সে যেন প্রায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুচারু ওকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে।

সুমন ডাকল, সামাদ, দ্যাখ তো এই তোর সেই সই করা কাগজটা কি না?

সামাদ উবু হয়ে বসল। তারপরে নুয়ে থাকল কিছুক্ষণ কাগজটার উপর। সে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সে চোখের কাছে নিয়ে একেবারে চোখের সামনে, পারলে যেন লেখাটা গিলে খায়, সামাদ অন্ধের মতো কাগজের উপর দৃষ্টি বুলাতে থাকল। তারপর সরল বালকের মতো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সামাদ। কাগজটা সে হাতে নিয়ে সরল অকপট মানুষের মতো বসে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে ফের তার সেই প্রিয় গ্রাম্য ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল, মাঠ পার হলে বড় এক অশ্বত্থ গাছ। গাছের নীচে ছোট নদী। নদীতে এখন আর কত জল! নদীর ওপারে ঘর। কালবৈশাখী উঠলে সালিমা ওর ঘরে গোরু-বাছুর নিয়ে যাবার জন্য নদী পার হয়ে, যেন ছোট নদীটি পার হচ্ছে, ছোট এক বালিকার মতো নদী পার হয়ে মাঠে ওর সেই গাভী-সকলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর ঝড়, কী ঝড়! সেই ঝড়ের ভিতর পড়ে সে পথ হারিয়ে অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় যুবকের জন্য অপেক্ষায় আছে। ঝড় থামলেই সেই যুবক নদী ধরে নৌকোয় উঠে আসবে।

সামাদ চোখ বুজে বলল, আমি নদী সমুদ্র পার হয়ে আজ হোক কাল হোক তোর কাছে পৌঁছবই সালিমা। প্রাণপাখিটা আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

সামাদ চোখের জল মুছে ফেলল। কাগজটা সুমনকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুমন কাগজটা ছিঁড়ে উত্তরের হাওয়ায় ছেড়ে দিতেই সেই কাগজ চক্রাকারে বকের মতো পাখা মেলে রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে মিশে গেল। যেই না মিশে যাওয়া, যেই না হইচই করে ছুটে-যাওয়া ফোকশালের দিকে, তখন এক অলৌকিক মানুষ জাহাজে উঠে এসেছে, আপনারা কে আছেন, কোথায় আছেন, একবার জলদি আসুন। এই শহর থেকে দূরে, অনেক দূরে, দৌড়ে গেলে প্রায় রাত কাবার, মোটরে গেলে দু' ঘণ্টার মতো, এক বনের ভিতর নৃশংস এক ঘটনা ঘটছে। সেই ঘৃণা। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা। ক্ষতবিক্ষত। এক পাগল ছেলে সেই ঘৃণাকে উপেক্ষা করে, কী কঠিন সাহস কী অবলীলাক্রমে সে সবকিছু উপেক্ষা করে সমস্ত জাতির সম্মানের জন্য লড়ছে। সেই প্রাণকে উপেক্ষা করা যায় না। সকলে একযোগে আমাদের লড়তে হবে। যা সত্য এবং যা ধর্ম তাই আমাদের সকলকে অকপট করবে। সুমনকে বোধহয় এতক্ষণে ক্ষত বিক্ষত করে সেইসব নৃশংস কুকুর চেটেপুটে খাচ্ছে। কোনও পুলিশ কেন, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষমতা নেই সেই হত্যার কোনও হদিশ খুঁজে বার করে। আমরা ইচ্ছা করলে এখনও কিছু করতে পারি। কুকুরের মুখ শুঁকলে তাজা মানুষের রক্তের গন্ধ পাওয়া যাবে। কালো মানুষের রক্ত কি মূল্যহীন! কী অধার্মিক এই যুক্তি! কুকুরের ভোজে একমাত্র সে রক্ত পানীয়ের মতো ব্যবহার হতে পারে।

জাহাজের যে যেখানে ছিল, ডেক-এ ছুটে এসেছে। চারপাশে গোল হয়ে শুনছে। কোনও ধর্মযাজক যেন একনাগাড়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছে। কাপ্তান বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। বার্ট বলছে, বন থেকে ওরা সুমনকে ধরে নিয়ে গেছে।

বার্ট ফের বলল, আপনারা যদি এক্ষুনি কোনও ব্যবস্থা না করেন, আমাদের সেই জাদুকরের পুত্রকে আর পাওয়া যাবে না।

সুচারু ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠল, জাদুকরের পুত্র এখানে।— বলে সামাদ এবং সুচারু সুমনকে কাঁধে তুলে নিল, এই এখানে বার্ট।

বার্ট দেখল প্রায় জাদুর সামিল, ওদের ভিতর সুমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখ মুখ মুছে প্রথম চারিদিকে তাকাল, সারাটা পথ ছুটে এসে ওর সংজ্ঞা হারানোর কথা, কিন্তু সেই তরুণ যুবকের নির্ভীক মুখ এতটা পথের কষ্ট জিশুর জলপানের মতো আন্তরিক রেখেছে। সে ডেকের উপর উঠে সারাটা পথের উত্তেজনা প্রকাশ করার জন্য প্রায় চিৎকার করে ডেকময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল, আর যখন যথার্থই সুমন ডেক-এ প্রায় জাদুর খেলা দেখিয়ে দিল তখন কেমন যেন সে সব কিছুর ভিতরই ঈশ্বরের এক অপার মহিমার প্রকাশ দেখতে পেল। কী এমন গুণ, কী এমন সাহস, কী এমন ভালবাসা, যা সেই নৃশংস পরিবারের রোষ থেকে তাকে রক্ষা করেছে। প্রায় এক রাজপুত্র বুঝি। সব পাথর হয়ে গেছে। হাতে তার সোনার কাঠি। সে কাঠির স্পর্শে সব পাথরে প্রাণ দান করছে। সে এবার চিৎকার করে বলল, সুমন, সে সোনার কাঠি আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

সুমন বলল, আমার ফোকশালে এসো।— বলে সে বার্টকে তাদের সেই ছোট ফোকশালে নিয়ে গিয়ে বলল, এখানে সেই সোনার কাঠি।— বলে সে বার্টের বুকে হাত রাখল।

হিয়ার!— বার্ট তার বুকে হাত রাখল।

ইয়েস মাই ফ্রেন্ড। আমাকে দেখে ভারোদির পর্যন্ত মূর্ছা যাবার উপক্রম।— সে সবটা খুলে বলল।

সত্যি!— বার্ট বড় বড় চোখে সুমনকে দেখতে থাকল। তারপর কেমন আবেগে সে সুমনের গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, আমাদের একজন ঠিক তোমাদের মহাত্মার মতো নেতা গড়ে উঠছেন। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি হয়তো তোমার সেই এমিলের মতো মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে চলে গেছেন। আমার স্ত্রীর কাছে আমি চলে যাব। আমাদের ইচ্ছা, দেখি না, আমরা তো সামান্য মানুষ, আমাদের ক্ষমতা সামান্য সুমন, আর আমরা কীই-বা করতে পারি! তবু সেই মহীয়সী মহিলার সঙ্গে যদি জাদুকরের পুত্রের কাছে চলে যেতে পারি, কখনও যদি আমাদের মতো সামান্য মানুষের তাঁর বিন্দুমাত্র দরকার হয়। ফুল ফোটানোর কাজে লেগে যেতে পারলে জীবন সার্থক, কী বলো সুচারু!— সে সুচারুর দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল।

সুচারু বলল, বোসো। চা করে আনছি।

বার্ট কোথায় যেন এক ফল্গু নদী আবিষ্কার করেছে। সাহেবের সে নদী তার অন্তরে ঝড় তুলেছে। সে এই ফোকশালে ধর্মযাজকের মতো প্রিচ করছিল যেন। সে বলল, এই যে অহিংসা কথাটা, কথাটার ভিতরই যেন কেমন এক জাদু আছে। কী বলো সুমন? আমি অত্যাচার সব সহ্য করব কিন্তু আঘাত করব না। আমার মহীয়সী মহিলা আমাকে চিঠিতে বারবার লিখেছেন, বার্ট, আমরা কেবল পথ হাঁটছি। আমরা আলবামা রাজ্য থেকে একদা এক শান্তির মিছিল নিয়ে পায়ে হেঁটে ওয়াশিংটনে চলে যাব। সেই মিছিলে শুধু কালো মানুষ থাকবে না, মানুষের অধিকার-রক্ষার্থে সাদা মানুষেরা পর্যন্ত সেই মিছিলে যোগদান করবে। চিঠিতে কত সুন্দর সুন্দর আশার কথা লিখেছে। লিখেছে তুমিও চলে এসো। আমাদের এই মহৎ উৎসবে জীবন উৎসর্গ করো। মানুষের অসম্মান আমরা এই কালো মানুষেরা আর বয়ে বেড়াব না।

সুচারু চা করে দিলে সকলে চুপচাপ চা-টুকু খেল। তারপর বার্ট সকলের উদ্দেশে হাত তুলে দিল ঈশ্বর উপর, হাত তুলে সকলের শুভ হোক, মঙ্গল হোক এমন কথা বলতে চাইল। তারপর ওরা তিনজন গ্যাংওয়ে পর্যন্ত হেঁটে এলে বার্ট বলল, ভোরে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে?

সামাদ বলল, দিচ্ছে।

বার্ট এবার নেমে গেল। ক্রমে বন্দরের অন্ধকারে বার্ট অদৃশ্য হয়ে গেল, ওরা পরস্পর পরস্পরকে দেখল দেখতে পেল ভুবনময় এক আলো আলোর উৎস চোখের ভিতর। হৃদয়ের ভিতর। এখন ওরা এত কাছাকাছি যে শরীরের উত্তাপ পর্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছে। দূরে শুধু পপলার বৃক্ষসকল মর্মর শব্দ করছে আর মনে হয় কোনও গভীর বনে একটা ওপোসামের বাচ্চা সারারাত ধরে দুধ খাচ্ছে। আকাশে শত নক্ষত্র অথবা অদৃশ্য এক জগতে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভরা লক্ষ কোটি মানুষ নিরন্তর আপন বৃত্তে ফুটে আছে। ওরা তিনজনই সেই রহস্যভরা ভুবনে টিন্ডাল, চার্টকলের বড় সাহেব এবং সুমনের সেই মানুষটির মুখে যেন নিদারুণ ক্লেশ ফুটে উঠেছে দেখতে পেল। নির্মল জল সেখানেও প্রয়োজন। সুমনের বলার ইচ্ছা ছিল, এমিল, তুমি একবার সেখানেও জল বহন করে নিয়ে চলো।

উনিশ

পরবর্তী ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

জাহাজ তখন সমুদ্রে। যখন রাত হয়, ডেক-এ যখন জ্যোৎস্না থাকে তখন এক মানুষ রেলিং এ এসে চুপি চুপি দাঁড়ায়। চারিদিকে শুধু সমুদ্রের গর্জন, ঢেউ। কখনও কখনও নিরিবিলি শান্ত সমুদ্র। জলের ভিতর ফসফরাস মাঝে মাঝে যেন এক অলৌকিক রহস্য বয়ে আনে, তার আলোর ভিতর দূরের এক মুখ ভেসে উঠলেই জানালায় সেই বিষণ্ণ মুখ, আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে মারিয়া যেন কী খুঁজছে। সুমন কিছুতেই সেই মুখ, বড় বড় চোখ এবং সোনালি চুলে সূর্যাস্ত ভুলতে পারে না। একা একা দাঁড়িয়ে রাত জ্যোৎস্নায় বারবার অসীম সমুদ্র আকাশ, এবং নক্ষত্র দেখতে দেখতে কেমন পাগলের মতো হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত গভীর হলে কখনও সুচারু আসে, সামাদ আসে এবং দেখতে পায় দূরে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে সুমন। অথবা সে যেন আকাশের কোনও পরিচিত নক্ষত্র দেখতে দেখতে আকুল। ওর সেই আকুল চোখ দেখলে সুচারু সামাদের কান্না পায়। ওরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কিছু বলে না। কোনও কোনও রাতে হেনরি এসে বলে, সুমন, রাত হয়েছে অনেক। এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো।

ওরা ওর হাত ধরে ফোকশালে নিয়ে আসে। চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে। রাত গভীর হয়। ক্বচিৎ কোথাও সমুদ্রপাখির আর্ত চিৎকার, ইঞ্জিনের শব্দ, আর মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া। তখনই ওর মনে হয় মারিয়া সহসা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। জানালার কাচ খুলে আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তার জাহাজি মানুষটি এখন কোন সাগরে আছে কে জানে। সুমন আর স্থির থাকতে পারে না। ভিতরে ভিতরে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। তারপর কেন জানি মনে হয় কোনও না কোনও দিন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে থাকুক, মারিয়া তার ফুল ফল নিয়ে চলে আসবে। সে শুয়ে পড়বার আগে আলো নিভিয়ে দেয়।

॥ বিশ ॥

আরও খবর, বার্ট লংমার্চের দিনে বড় সড়কে হাজার লক্ষ সাদা কালো নারী-পুরুষের ভিতর ভারোদি ট্যালডনকে দেখেছে। পিছনে মারিয়া। মারিয়া ট্যালডন যুবতী। যেন গির্জায় যাচ্ছে এমন চোখ-মুখ তার। বার্ট হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, সে তোমাকে কোনও চিঠি দেয়?

মারিয়া ধীরে ধীবে বলেছে, না।

তুমি ওর কোনও খবরই রাখো না?

না।

সে পাগল হয়ে গিয়েছে। দেশে ফিবে যায়নি।

মারিয়া কিছু বলল না। শুধু বিশাল জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জাহাজ থেকে আফ্রিকার কোনও এক বন্দরে সে নেমে গেছে। কেউ কিছু জানে না, খবর রাখে না।

বার্ট কথা বলতে বলতে এগুচ্ছে। লংমার্চ এবার একটা বড় নদী পার হয়ে যাচ্ছে। হাজাব-হাজাব ফেস্টুন উড়ছিল।

ধ্বনি প্রতিধ্বনি

এক

এভাবে ওরা শেষ পর্যন্ত দ্বীপটায় পৌঁছে গেল। ওরা বোট সোজা টেনে তুলে ফেলল ওপরে। তারপর দ্বীপটার দিকে তাকাল। দ্বীপটা খুব একটা মায়াবী কিছু না। আর দশটা দ্বীপে যেমন গাছপালা, অরণ্য পাহাড় আর নির্জনতা থাকে, এ দ্বীপেও তেমনি কিছু রয়েছে। সামনে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে বালিয়াড়ি। ইতস্তত নানা বর্ণের নুড়ি-পাথর ছড়ানো। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। দূরে ছোট ছোট ঝোপ, কিছুটা ভেতরে উঠে গেলে বাঁদিক ঘেঁষে ঘন বনজঙ্গল। পেছনে পাহাড়ের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে।

জেনি স্থির থাকতে পারছে না। সে বোট থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমেছিল। সে দৌড়ে কিছুটা বালিয়াড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেছে। তারপর দূরবিনে যত দূর সামনে দেখা যায় দ্বীপটার, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। মনে হচ্ছে দ্বীপের পশ্চিমদিকে একটা ঘন দীর্ঘ ইউক্যালিপটাসের বন আছে। যদিও স্পষ্ট নয় দূরত্বের জন্য, এমন সরল বৃক্ষের বন দেখে ইউক্যালিপটাসের কথাই মনে এসেছিল।

থম্পসন, রিচার্ড, আর্চি বোট ওপরে তুলে ফেলেছে তৎক্ষণে। দড়িদড়া, তাঁবু খাটাবার খুঁটি, রিচার্ড গুছিয়ে সব তুলে আনছে। থম্পসন পাইপে আগুন দিতে দিতে কী যেন দেখল দ্বীপটায়। সে তারপর দাঁড়িয়ে গেল। খুঁটিগুলো পুঁতে ফেলা দরকার। কিন্তু কোথায় সুবিধা হবে সে ঠিক করতে পারছে না। হেঁটে হেঁটে একটা ভাল জায়গা খুঁজছিল সে।

ওদের এখন অনেক কাজ। যেমন এরা দুটো তাঁবু সঙ্গে এনেছে। একটাতে থাকবে জেনিফার, অন্যটাতে ওরা তিনজন। এ অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি লেগেই থাকে, সেজন্য তাঁবুর চারপাশে নালা কেটে দিতে হবে। সকালে একটা জাহাজ ওদের মাঝদরিয়ায় বোটে নামিয়ে দিয়ে গেল। রোদ বেশ চড়া। সমস্ত আকাশটাতে কচি বাতাবি লেবুর রং। এবং সূর্য বেশ ওপরে উঠে এসেছে। ওরা শীতের দেশের মানুষ, এমন গরম আবহাওয়া সহ্য হওয়ার কথা না। সুতরাং প্রথমেই হাত লাগিয়ে তাঁবু খাটিয়ে ফেলা দরকার। অন্তত রোদের ভয়ংকর তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

থম্পসন বলল, রিচার্ড, এখানে তবে খুঁটি পুঁতে দিচ্ছি।

রিচার্ড পোড়া চুরুট মুখ থেকে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। সে উবু হয়ে বসে দেখল, তারপর বলল, দাও। তুমি কী বলো?— বলে সে আর্চির দিকে তাকাল।

জেনিফার কোথায় যাচ্ছে! অচেনা জায়গায় জেনিফার একা একা এতদূরে হেঁটে যাচ্ছে কেন! মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে! আর্চি রিচার্ডের দিকে না তাকিয়েই বলল, আমার ভাই কিছু বলার নেই। সব সময় গোলমাল ঠেকছে, শেষে কিছু হলে বলবে, তুমিই তো বলেছিলে!

আর্চি এসব বলে রিচার্ডকে এড়িয়ে যেতে চাইল।

রিচার্ড বলল, জল এখানে গড়াবে ভাল। বৃষ্টি হলে জল আটকাবে না। এ অঞ্চলে দ্বীপগুলোতে পোকামাকড়ের খুব উপদ্রব। আরও ওপরে তাঁবু খাটানো যেত। কিন্তু ঝোপ জঙ্গলের ভেতর কীট পতঙ্গের বসবাস বেশি।

থম্পসন কারও কথার ওপর ভরসা না করে ঠাস ঠাস করে খোঁটায় বাড়ি মারতে থাকল। প্রায় দশটা

খোঁটার দরকার। মাঝখানে লম্বা খুঁটি, চারপাশে মজবুত দড়ি দিয়ে খোঁটায় তাঁবু বেঁধে ফেলল। যে-কোনও সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে বেশ টেকসই মনে হচ্ছে এখন তাঁবুদুটো। এবং রোদে পুড়ে যাচ্ছিল শরীর। আর্চির রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু জেনিফার কেন যে এত দুঃসাহসী হয়ে উঠছে! সে ডাকল, জেনিফার!

জেনিফার বলল, আসছি।

একা একা এতদূর যাবে না।

আচ্ছা।

বেশ দূর থেকে জেনিফার কথা বলছিল। আশ্চর্য রকমের একটা ধ্বনি উঠছে। প্রতিধ্বনি বাজছে দ্বীপের কোনও গোপন গুহায়। গলার আওয়াজে গোটা দ্বীপটাই গমগম করছে। আর্চি ভয়ে সামান্য আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তুমি আর যাবে না!—আর্চি বেশ জোর গলায় বলতে চাইল।

যাচ্ছি—না--আ।

ফিরে এ —সো --ও।

তখন থম্পসন হাত ঝেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পখাটে জেনিফারের শোবার জায়গা করে ফেলল। ওদের তাঁবুতে তিনটে আরও ক্যাম্পখাট পেতে দেখল ঠিক আছে কি না। রিচার্ডকে ডেকে বলল, দ্যাখো ঠিক আছে কি না?

আর্চি দৌড়ে এসে তখন বলল, থম্পসন আপনি কী!

থম্পসন বুঝতে না পেরে বলল, কেন? বেশ তো হয়েছে।

জেনির তাঁবুটা এত দূরে করলেন কেন?

খুব দূর কোথায়!— রিচার্ড থম্পসনের হয়ে কথা বলল।

বেশ দূর। জেনি ভয় পাবে।

তুমি যে কী আর্চি! এত ভয়ের কী?

তাঁবুর ভিতর আর্চি দাঁড়িয়ে কথা বলতেও স্বস্তি পাচ্ছে না। জেনিফার যদি আরও এগিয়ে যায়, তবে ঠিক ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাবে। সে বলল, দ্যাখো, যা ভাল মনে করো করবে।

বলে, বের হয়ে যাবে এমন সময় রিচার্ড বলল, সেই প্রথম থেকে জ্বালাচ্ছে! কে আসতে বলেছিল? কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি।

আর্চি বলল, বুঝবে না। বুঝবে না হে ছোকরা। তোমার বোনের মাথা ঠিক থাকলে আসতাম না। এখন দেখছি তোমাদের সবারই মাথা খারাপ। ঠিক আছে, দেখি আবার কোথায় গেল!

আর্চি তাঁবুর বাইরে বের হয়ে দেখল, জেনিফার কাছে কোথাও নেই। সামনে কিছু কাঁটাঝোপ, তারপর কিছু গাছপালা, যে-কোনও সময় যে কেউ হাতে তুলে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে প্রায় দৌড়াতে থাকল। বালিয়াড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে থাকল।

থম্পসন হাসল সামান্য। বলল, বুঝলে!

রিচার্ড একটা চার্ট বের করে দেখছে তখন। আসলে দ্বীপে তারা ঠিক ঠিক মতো আসতে পেরেছে কি না, এটাই সেই দ্বীপ কি না, যদি না হয়, বোটে পাশের কোনও দ্বীপে খুঁজতে হবে ক্যাবটকে। সে খুব নিবিষ্ট মনে ঝুঁকে চার্ট দেখছিল।

থম্পসন বলল, কী বুঝলে?

রিচার্ড বলল, জেনি গেল কোথায়?

কোথায় আবার যাবে! কখন বোটে নামিয়ে দিয়েছে তুমি, বোঝোও না।

অঃ। — বলে রিচার্ড ফের চার্ট দেখতে দেখতে বলল, মনে হয় আমরা ঠিকই এসেছি।

আমার দেখা আছে। তোমরা এখন দ্যাখো।

থম্পসন যেহেতু সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ, সেজন্য বেশ ধীর স্থির। এবং প্রায় ও:: ওপরই ভার আছে সব দেখে শুনে রাখার। সে আছে বলেই জেনিকে ওর বাবা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু সেই সুদূর কার্ডিফ থেকে আর্চির ভাবসাব, সে-ই সব। জেনিফারের জন্য উদ্বিগ্ন হবার অধিকার তারই আছে।

থম্পসন বাচাল নয় বলে খুব একটা ধমকও দিতে পারে না। তা ছাড়া কর্তার মেয়ের হবু বর। সুতরাং সে চুপচাপ আর্চির বাড়াবাড়ি সহ্য করে যাচ্ছে।

এই যেমন তাঁবু আর-একটু কাছে হলে খুবই লাগোয়া হয়ে যেত। জেনিফার সেটা কিছুতেই বরদাস্ত করত না। জেনিফারকে বললে এমন ধমক লাগাবে যে, থম্পসন না হেসে পারবে না। বেচারা।

রিচার্ড বলল, তা হলে এ দ্বীপটা থেকেই আমাদের কাজ শুরু হবে বলছেন।

তাই তো হওয়া উচিত।

বলে সে ঝুঁকে চার্টের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। খালি গা। খাকি হাফ-প্যান্ট, সাদা কেডস পরে যতটা পারা যায় হালকা হয়ে নিয়েছে থম্পসন। এমনিতেই গোলগাল মানুষ, মাথায় বড় চকচকে টাক —টাকটি বেকে বড় কোনও সম্বল নেই। তার কাজকর্মেও কোনও অবহেলা থাকে না। সে বেশ ধীরে সুস্থে ভেবেই ঠিক করেছে সব। সে বোট থেকে একটা পেটি তুলে আনল। টুকিটাকি সব জিনিসে ভর্তি। পেনসিল, কম্পাস, ব্লেড, রবার, টুথপেস্ট, ব্রাশ এবং নীলরঙের কাগজ। সে একটা পেনসিল তুলে কম্পাসের কাঁটা সেট করে বোঝাল, দ্যাখো না, ফানাফুতি থেকে এ দ্বীপটার দূরত্ব প্রায় একশো ছ' মাইলের মতো।

এই দ্যাখো।— বলে আবার কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়ে বলল, এলিস দ্বীপটাও পড়ছে এর ঠিক সরলরেখার ভেতর। কিছু হেরফের বুঝতে পারছ?

রিচার্ড একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে ভাল করে চার্টটা পেতে দিল। যদি কিছু সংশয় থাকে তবে ভালভাবে তা নিরসন করে নেওয়া ভাল।

থম্পসন বলল, তোমরা দেখছি সবাই খাওয়ার কথা ভুলেই যাচ্ছ। এসব নিয়ে বিকেলের দিকে বসলে ভাল হত না।

রিচার্ড চার্ট-ম্যাপ মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল ওরা ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ-ক্যাসেল থেকে উত্তর-পুবে তেরো দিনের দিন এখানেই কোথাও ঘটনাটা ঘটেছিল। উনিশশো বাহান্ন সালের জুনের মাঝামাঝি সময় সেটা। ক্যাপ্টেনের লগবুক থেকে আরও জানা যায়, রাত তখন আটটা, ডাইনিং হলে ডিনার সাজানো, সবাই একসঙ্গে খাওয়ার নিয়ম। বিশেষ করে রাতে জাহাজের ক্যাপ্টেন ডিউটি অফিসারদের বাদে অন্য কাউকে অসময়ে উপস্থিত হতে দেখলে ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। প্রথম খবরটা দিয়েছিল, মেসরুম বয়। স্টুয়ার্ডকে বলেছিল, ওরা নেই। ডাইনিং হলে সবাই হাজির, কেবল সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার চ্যাটার্জি, থার্ড ইঞ্জিনিয়ার এফ্রাইম ক্যাবট তখনও আসেনি। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ডকে খোঁজ করতে বলেছিলেন। স্টুয়ার্ড বলেছিল, ওরা কেবিনে নেই স্যার।

ক্যাপ্টেনের মনে হয়েছিল, বোধহয় ইঞ্জিন-রুমে বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে। তা ছাড়া থার্ডের ওয়াচ। কোনও কারণে সেকেন্ডেরও ওয়াচ শেষ করে উঠে আসতে দেরি হচ্ছে। সুতরাং খেয়ে দেয়ে নির্ভাবনায় উঠে গিয়েছিলেন ওপরে। তিনি বুঝতেও পারেননি ইতিমধ্যে যা ঘটার ঘটে গেছে।

রাত দশটায় জাহাজ শেষ পর্যন্ত থামিয়ে দিতে হয়েছিল। না নেই, একেবারেই নেই

সব খুঁজে দেখা হয়েছিল। ইঞ্জিন-রুম, বয়লার-রুম, বাংকার, পুপ-ডেক, ফরোয়ার্ড ডেক, কেবিন এমনকী ক্রু-দের আস্তানায় সবাই ছুটোছুটি লাগিয়েছিল। ওয়াচে নেই, ব্রিজে নেই, তবে কোথায়। ক্যাপ্টেন, অফিসাররা ছুটোছুটি লাগিয়েছে। এবং উদ্বিগ্ন চোখে-মুখে ওরা সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে যখন পেল না জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ঝড় সাইক্লোন কিছু নেই, শান্ত সমুদ্র নীল আকাশ, এমন নয় ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! তখন ওরা ঠিক কিছু একটা নিজেরাই করেছে। কথাটা মাথায় এল না কারও কেন? জাহাজে এমন সব অসংগতি যে একেবারে কখনও না দেখা গেছে তা নয়। কিন্তু দু'জন একসঙ্গে মিলেমিশে, যদিও ক্যাপ্টেন লক্ষ করেছে, জাহাজে ওরা দু'জন পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিল। বন্দরে-বন্দরে ওরা একসঙ্গে বেড়িয়েছে, একসঙ্গে মাতাল হয়েছে, কোনও কঠিন অশান্তি কাজ দু'জনে ভাগাভাগি করে সেরে ফেলেছে, তারপর শিস দিতে দিতে দু'জনই একসঙ্গে বন্দরে বেড়াতে বের হয়েছে।

ক্যাপ্টেন লগবুকে আরও লিখে রেখেছিলেন, শেষবারের মতো রাত আটটা নাগাদ জাহাজে তাদের

দু'জনকেই দেখা গেছে, বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে। দু'জনই যেন দিগন্তে কিছু দেখছে। জাহাজ আর তাদের তবে কি ভাল লাগছিল না! কিন্তু পাগল না হলে মাঝদরিয়ায় জাহাজ ছেড়ে কেউ পালায়! অথবা আত্মহত্যা করার বাসনা দু'জনের একসঙ্গে হয় কী করে? ক্যাপ্টেন সারারাত সার্চ-লাইট জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন। বোট নামিয়ে দিয়েছিলেন, যতদূর দেখা যায় দিনের বেলায় দূরবিনে এবং অহোরাত্র সার্চ-লাইট জ্বালিয়েও যখন কিছু করা গেল না, তখন জাহাজিদের সাক্ষী রেখে লগবুকে রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা লিখে রেখেছিলেন। লগবুকে তার অনুসন্ধানের এক বিরাট ফিরিস্তি পর্যন্ত দেওয়া আছে। সেসব রিচার্ড বোধহয় আর স্পষ্ট মনে করতে পারে না। ছ' বছর আগে সেই নিষ্ঠুর রহস্যজনক অন্তর্ধানের খবরের সঙ্গে লগবুক ফিরিস্তির নকল পেয়েছিল একটা। নকলটাও সঙ্গে আছে তাদের। জেনির ব্যক্তিগত সুটকেসে সেটা সে রেখে দিয়েছে। কখন কী কাজে লেগে যাবে ভেবে জেনি কিছুই ফেলে আসেনি।

এ নিয়ে প্রথম দু' দেশের কাগজে বিস্তর হইচই হয়েছিল। তারপর যা হয়ে থাকে ধার্মিক নাগরিকেরা অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পুরনো কথা বেশিদিন মনে থাকে না। রিচার্ড এবং তার বাবা ভেবেই ফেলেছিল ক্যাবট আর ফিরে আসবে না। কেবল জেনি তখন বলত, না বাবা, তোমরা এমন বোলো না। সে আসবে। সে ঠিক আসবে।

পরিবারে, প্রথমদিকে বছর দুই ক্যাবটের কথা কোনও প্রসঙ্গে উঠলেই জেনি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলত। পরিবারে জেনির এই শোকে সান্ত্বনা দেবার মতো কিছু ছিল না। জেনি তখন নানাভাবে খবর নিয়েছে, কখনও জাহাজঘাটায় গিয়ে বসে থেকেছে, কখনও একা কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশে বসে ক্যাবটের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে গেছে। জেনি ধীরে ধীরে তারপর ভেবেই ফেলেছিল, ক্যাবট আর ফিরে আসবে না। আর্চি নামে সঙ্গের ভদ্রলোকটি সেই সুযোগে মেলামেশা করতে পছন্দ করছে। জেনি মনস্থির করতে পারছিল না। সে আর্চির কাছে আরও সময় চেয়ে নিচ্ছিল। ক্যাবট অথবা ওর বন্ধু মিস্টার চ্যাটার্জির এমন রহস্যজনক অন্তর্ধান সে প্রথম থেকেই অবিশ্বাস করে আসছিল।

আসলে সে ক্যাবটকে দারুণ ভালবেসে বিয়ে করেছিল। ভালবাসা বললে ঠিক হবে না, সে ক্যাবটকে গির্জার ছায়ায় যখন দেখেছে, যখন দেখেছে গাছের নীচে অথবা ক্যাবট যখন যেভাবে হেঁটে গেছে, কী বড় রাস্তায়, কী বড় মাঠে, সর্বত্র ক্যাবটের ভেতর ছিল রাজার মতো এক ভাব। সে ক্যাবটকে সবকিছুর বিরুদ্ধে হেঁটে হাতের নাগালে পেয়েছিল। একজন সামান্য নাবিককে বিয়ে করবে ভাবতেই যেন ঘটনাটা ভীষণ অহমিকাতে লেগেছিল জেনির বাবার। জেনি তখন বলত, আমি মরে যাব বাবা, তবু ক্যাবটকে না ভালবেসে পারব না।

দুই

আর্চি তখন বালিয়াড়ির শেষ প্রান্তে এসে গেছে। কিছু ঝোপঝাড় সামনে। জেনিফার কাছে কোথাও নেই। সে কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল। ডাকল, জেনিফার, তুমি কোথায়?

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ঝোপঝাড় পার হয়ে গেলে সেই বনভূমির গাছপালা। কিছুটা অভ্যন্তরে ঢুকে ডাকল, জেনিফার, জবাব দিচ্ছ না কেন?

আর তখনই জেনিফারকে দেখা গেল। কিছুটা বিরক্ত। এক মুহূর্ত কাছছাড়া করতে চায় না। কীসের আকর্ষণে আর্চি এমন করে কে জানে! বাইরে এসে বলল, কী হয়েছে?

কোথায় গেছিলে!

কোথায় আবার যাব। এখানেই তো ছিলাম।

ডাকছি, সাড়া দিচ্ছ না।

আর্চি, তুমি এত অবুঝ কেন বলো তো? আমি মানুষ না!

আর্চি কী ভেবে সামান্য লজ্জা পেল।

ও আচ্ছা।

এবং মনে পড়ে গেল, জেনিব তাঁবুব কাছাকাছি একটা বাথকম কবা দবকাব। একটা বাড়তি তাঁবু আছে। তাঁবুটাকে বাথকমেব কাজে লাগানো যায় কি না দেখতে হবে। তা না হলে এতদূবে আসা জেনিব পক্ষে খুবই কষ্টেব হবে। সে জেনিফাবকে বলল, বালি তেতে উঠেছে। সাবধানে এসো।

জেনিফাব আর্চিকে ফেলেই দৌড় লাগাল। ঠিকমতো দৌড়াতে পাবছে না। বালিতে পা ডেবে যাচ্ছে। আর্চি ছুটে এসে হয়তো হাত ধবে সাহায্য কবতে চাইল। জেনিফাব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল আমি পাবব, ধবতে হবে না।

এবং সে আর্চিব চেয়েও দ্রুত চলে এল তাঁবুব কাছে। বিচার্ড এবং থম্পসন বোট থেকে সব পেটি টেনে নামাচ্ছে। অধিকাংশ পেটিতে আছে বান্নাব জিনিসপত্র, কনড বিফেব বড় বড় টিন। আলু টমাটো আপেল, দুটো পেটিতে পুবনো দামি মদ। বাঁধাকপি, ফুলকপি সামান্য এনেছে। শসা, কমলালেবুব পেটি দুটো জেনিফাবেব কেবিনেই বেখে দেওয়া হল। থম্পসন জেনিফাবকে ডেকে বলল, দেখে নাও। ঠিক আছে কি না দেখে নাও। অসুবিধা হলে বলো।

জেনিফাব ওব তাঁবুব ভেতব ঢুকে ভাবী খুশি হয়ে উঠল। কত অল্প সময়ে থম্পসন সব হাতেব কাছে সাজিয়ে ফেলেছে। হালকা ক্যাম্পখাটে সুন্দব বিছানাটাও পাতা। এসব কাজ এসে সে ই কববে ভেবেছিল। এই সংসাব গুছিয়ে বসাব দায়িত্বটা তাবই থাকা উচিত। কিন্তু থম্পসন পবিবাবেব পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, তাব এই কাজটুকু না দেখলে বিশ্বাস কবা যায় না। ঘামে ভিজে গেছে। পিঠে বেশ ঘামাচি হয়ে গেছে। দুটো-একটা ফোঁড়া পর্যন্ত গবমে বেব হয়েছে। জেনিফাব এবাব কিছুটা শাসনেব গলায় বলল আপনি একটা কিছু গায়ে দিন। গা তো আপনাব বোদে পুড়ে যাচ্ছে।

পাবা যাচ্ছে না।

সে বলতে চাইল, গবমে জামা শবীবে বাখা যাচ্ছে না। গেঞ্জিও না। এই বেশ এখন সবচেয়ে আবাম। কোথায় কবা যাবে? সমুদ্রেব জলে আব স্নান হয না। এবং আবও সব দবকাবি কাজ তাও না সেবে বিশ্রাম নেবে না। যেহেতু জেনিফাব এই প্রৌঢ় মানুষটিকে শিশুবয়স থেকে দেখে আসছে ভাবী কষ্ট কাসে অসুবিধা মুখ ফুটে না বললেও টেব পায়। সেজন্য সে আব বেশি কিছু বলতে সাহসই পেল না। তাব তখন থম্পসনেব বিশ্বস্ততা দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আর্চিকে দেখেই বিচার্ড হেঁকে উঠল হাই।

আর্চিও হাত তুলে দিল।

পেলে?

সে তা কবছে বুঝতে পেবে কিছু বলল না আর্চি।

হাবিয়ে যায়নি তো?

মাথা কোবো না বিচার্ড। কপালে কী আছে আমবা কেউ এখন কিছু বলতে পাবছি না।

বিচাড বলল, হাত লাগাও। অত ঘুবে বেড়ালে চলবে না।

আর্চি বলল, আমাদেব আর্মস ঠিক আছে তো?

লাকটা কী।

খুব কাছ থেকে বিচার্ড আর্চিকে এই প্রথম লক্ষ কবছে। আগে মাঝে মাঝে দেখেছে। জেনিফাব সহ আর্চিকে চায়েব টেবিলে নেমন্তন্ন কবেছে। ব্যস, ওই পর্যন্ত। ঠিক ঠিক কী ধবনেব মানুষ আর্চি এই প্রথম টেব পেল বিচার্ড। খুব স্বার্থপব মনে হচ্ছে। যেন সে এখানে বেড়াতে এসেছে। অথবা সব সময় জেনিফাব কোথায় যায়, কী কবে, হাবিয়ে না যায়, এসব লক্ষ বাখাই কাজ তাব। অথচ এমন একটা অভিযানে সবসময় সব কাজ মিলেমিশে না কবলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এটা কেন যে টেব পায় না আর্চি।

আর্চি তখন সত্যি ফায়ার আর্মসেব পেটিটা খুঁজছে। সে বোটে উঠে গেছে। তন্নতন্ন কবে খুঁজছে। না পেয়ে লাফিয়ে নীচে নেমেছে। দৌড়ে তাঁবুব ভেতব ঢুকে এটা ওটা টেনে সবিয়ে দেখছে। না দেখে মন ঘাবড়ে যাচ্ছে। পেটিটা ভুলে জাহাজেই থেকে গেল না তো আবাব! এদেব দুঃসাহসিকতা কখন কী কবতে পাবে, তাব নেই। সবসময় সতর্ক থাকা দবকাব। যদি এখনই কোনও কিছু ঘটে যায় তখন কী হবে! সে বাইবে এসে দেখল, তাঁবুব ছায়ায় বিচার্ড ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। চুরুট খাচ্ছে। ওব মুখ-চোখ

দেখে আর্চি কিছু বলতে সাহস পেল না। গোপনে সে জেনির তাঁবুর পাশে ছুটে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, জেনি।

এখন ভেতরে এসো না।

দ্যাখো তো তোমার ঘরে ওগুলো আছে কি না!

ওগুলো মানে!

আরে, আমার ফায়ার আর্মস। তোমাদের কী থাকল গেল, আমার কিছু আসে যায় না। আমারটা আমাকে দিয়ে দাও।

এখন ওসব দিয়ে কী হবে?

কিছু হোক না হোক আমারটা দাও। তোমাদের মতো অবিবেচক হলে আমার একদম চলবে না।

সে বলল, মিস্টার থম্পসনকে বলো! তিনি রেখেছেন।

ওই বুড়ো লোকটার জিম্মায় রেখেছ সব! তা হলেই হয়েছে।

সে দেখল থম্পসন উবু হয়ে বোট থেকে আরও কী সব তুলে নিচ্ছে। একটা বড় নোঙর। মোটা হাসিলে বাঁধা। গেরাফিটা সে টেনে এনে বালির ভেতর গেঁথে দিচ্ছে। এবং থম্পসনকে দেখলেই বোঝা যায় কত সতর্ক সে সব দিকে।

রোদের ভেতর ঘোরাও যাচ্ছে না। আর্চির শার্টপ্যান্ট ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। জুতোর ভেতর বালি ঢুকে কচকচ করছে। এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হবে সে সত্যি ভাবতে পারেনি। তাঁবুগুলো আরও ওপরে নিয়ে গেলে কী যে ক্ষতি ছিল! তারপরই মনে হল, না, ধন্যবাদ থম্পসনকে। অত ওপরে যাওয়া ঠিক হবে না। খুব অসুবিধায় পড়লে মুহূর্তে বোট জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে কিছুতেই নাগাল পাবে না। বুড়ো থম্পসনের ওপর সে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। মনে মনেই থম্পসনের বুদ্ধির তারিফ করল। খুলে বললে পায়া ভারী হতে কতক্ষণ! সে কাছে গিয়ে বলল, মিস্টার থম্পসন, আপনার জানা আছে আর্মসগুলো কোথায়?

ওই তো।— বলে বোটের এক কোনায় কাঠের একটা বাক্স দেখিয়ে দিল।

এদের নির্বুদ্ধিতার শেষ নেই। আর্চি মনে মনে ফের চটে গেল। প্রথমেই যা করা উচিত, সযত্নে তুলে রাখা এটা। সব সময় নজর রাখা। অনায়াসে কোনও দুর্বৃত্ত যদি নিয়ে নেয় তখন হাত কামড়ালেও কিছু হবে না। সে না বলে পারল না, না, আপনাদের দিয়ে কিছু হবার জো নেই।— বলেই লাফিয়ে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর টেনে নামাতে গেলে থম্পসন বলল, একা পারবে না আর্চি। একটু থামো। আমি ধরছি।

সে থম্পসনের কোনও কথা গ্রাহ্য করল না। ডালা খুলে ওর নিজেরটা বের করে নিল। কিছু কার্তুজ তুলে নিল। এবং অসভ্যের মতো কার্তুজ পুরে বন্দুক ছুড়তে থাকল হাওয়ায়। রিচার্ড, জেনি দৌড়ে এসে আর্চির পাগলামি দেখে থ। কী বলবে বুঝতে পারছে না। জেনি না পেরে বলল, আর্চি, তোমার কি মাথা খারাপ!

আমার থোড়াই মাথা খারাপ। যদি মাথা খারাপ হয় তোমাদের।

আর্চি খুব গম্ভীর গলায় বলল, বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে! ওটা ওখানে এভাবে ফেলে রেখেছ, তোমরা কি মনে করো না কিছু একটা হয়ে গেলে দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে! তোমার বাবাকে কী বলব তখন!

জেনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসায় পায়ে কিছু পরে আসতে পারেনি। বালি তেতে গেছে বলে সে পাও রাখতে পারছে না। লাফিয়ে বোটে উঠে গেল এবং বলল, রাখো সব। তুমিই দেখছি সবার মাথা খারাপ করে দেবে।

রিচার্ড গম্ভীর গলায় বলল, কথা নেই বার্তা নেই, দিনদুপুরে ছেলেমানুষের মতো বন্দুক ছুড়ছে।

আর্চি খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল, আরে, বোঝো না কেন! গোলাগুলি ছুড়ে বুঝিয়ে দিলাম আমরা খুব একটা অসহায় নই। বরং বলতে পারো ওয়ার্নিং। ওয়ার্নিং টু দ্যাট বাগার্স।

থম্পসন কিছু বলল না। সে তার মতো কাজ করে যেতে থাকল। রিচার্ড বলল, জেনি, তুমি সামলাও। আমরা কিছু জানি না।

জেনি বলল, আর্চি, বন্দুক রেখে দাও। ছেলেমানুষি কোরো না।

আর্চি অবোধ বালকেব মতো তাকিয়ে থাকল।

বলছি বেখে দাও।

আর্চি গুটিসুটি হয়ে বসল। তাবপব বেখে দিল।

নেমে এসো।

আর্চি নেমে গেল।

আর্চি খুব আদুবে ছেলে। অনেক সম্পত্তিব উত্তবাধিকাবী। এবং তাব বাবাব খুব পছন্দ আর্চিকে। এমন বিনয়ী ছেলে আজকাল খুব কম দেখা যায়। আর্চিকে ওব চেয়ে বাবাব বেশি পছন্দ। ওব যে খুব পছন্দ না, তা নয়, কাবণ আর্চি সত্যি বিশ্বস্ত, ভালমানুষ, সামান্য ভিতু স্বভাবেব আব যেটা সবচেয়ে বড দোষ, জেনিকে দেখলে পাগলেব মতো আবোল-তাবোল বকে। সবই অবশ্য ভালবাসাব কথা। এক বছব নেহাত কম সময় নয়। এক বছব ধবে আর্চিকে বেঁধে বেখেছে। কিছুই দেয়নি প্রায় এবং সে কুকুবেব মতো তাব ধৈর্যেব পবীক্ষা দিতে এসেছে এখানে। জেনিব প্রতি কত বিশ্বস্ত তাব প্রমাণ বাখতে চায় যেন।

আর্চি বলল, ঠিক আছে বেখে দিলাম। কিছু ঘটলে আমি দায়ী থাকব না বাপু।

বিচার্ড মেজাজ ঠিক বাখতে না পেবে বলল, তোমাকে কেউ দায়ী কববে না। যত সব বাজে ব্যাপাব।

আর্চি এবাব হেডে গলায় চিৎকাব কবে উঠল, বাজে ব্যাপাব কে বলেছে? ক্যাবট? এখানে কী আছে কিছুই জানি না। কোনও জলদস্যুব যে এটা আস্তানা নয় তাব প্রমাণ তোমাদেব হাতেব কাছে আছে? ... দিচ্ছ না কেন? তোমাব ক্যাবট কবে মবে ভূত হয়ে গেছে?

জনি দু'চোখ ঢেকে বলল, দোহাই আর্চি আব তাকে অসম্মান কোবো না। এটাই শেষ বাবেব চেষ্টা। ... ভাল হয়ে যাও আর্চি।

ক্যাবটেব কথা মনে হলেই জেনি খুব বিষণ্ণ হয়ে যায়। তখন একা একা থাকতে তাব খুব ভাল লাগে। ... তাব পাশে ছায়াব মতো আর্চি। তাকে কিছুতেই একা থাকতে দিচ্ছে না। অন্তত এখানে আসাব ... আর্চি সঙ্গে আসুক সে মনে মনে চায়নি। বাবাকে বলে, জোব কবে আর্চি দলেব সঙ্গে এসেছে। ... তাকে কিছুতেই একা থাকতে দিচ্ছে না। একা কোথাও ছেড়ে দিচ্ছে না। সে আর্চিব কাছে কেবল ... চাইছিল।

জেনিব আশা ছিল আবও কিছু দিন পাব কবে দিতে পাবলেই ক্যাবটেব কথা ভুলে যাবে। ক্যাবট ... ওব মনপ্রাণ জুড়ে থাকবে না। ইদানীং মনেও হয়েছিল সে ধীবে ধীবে ক্যাবটকে ভুলে যাচ্ছে। ... বটেব কথা আব তেমন মনে হচ্ছে না। সে নাচ-ঘবে আর্চিব সঙ্গে বেশ দু'চাব দিন জোব নেচেছিল ... । সে ফেব দ্রুত গাডি ছোটাতে পাবছিল। সে কখনও-কখনও পাল্লা দিয়ে মদ খেয়েছে ক্যাবটকে ... থাকাব জন্য। এখন আব তত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে কিছুতেই আব হেবে যাচ্ছে না। ঠিক ... ই কিনা কোনও এক বিখ্যাত পত্রিকাব সংবাদ বিচিত্রায় উদ্ভব ভাবে স বাদদাতাব পব পব কিছু ... তাব নাওয়া-খাওয়া সব বন্ধ কবে দিল।

পত্রিকাব খবব ফানাফুতিব দক্ষিণে যেসব নির্জন দ্বীপ, যেখানে মানুষেব কোনও বাস নেই, যেখানে ... যাত্রীবা বাব বাব ঘুবে এসেছে এবং দেখেছে— দ্বীপেব পব দ্বীপ, নানাবকম পাথব, গাছপালা, ফুল ... বচ্ছপ, শঙ্খ, মাছ এবং নানা বর্ণেব প্রজাপতি, সেখানে একজন মানুষ কখনও কখনও একটা উঁচু পাথবেব মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে। আদিগন্ত সমুদ্র, নীল জল, অ্যালবাট্রস পাখি দেখতে দেখতে সে কখনও ... মুগ্ধ হয়ে যায়। তখন খেয়াল থাকে না তাব, অনেক দূব থেকে যেসব জাহাজ গভীব সমুদ্রে মাছ ... যায় অথবা যেসব জাহাজ অস্ট্রেলিয়াব উপকূল থেকে, নেরু, কাকাতিয়া ওসানিক দ্বীপপুঞ্জে ... আনতে যায়, তাবা দূববিনে ওকে দেখে ফেলছে। চুলদাড়িতে মুখ ঢাকা তাব। শবীবে তাব কখনও কখনও পোশাক থাকে না। আবাব কেউ কেউ দেখেছে সে পবে থাকে ষোড়শ শতাব্দীব জলদস্যুদেব পোশাক। সে চুপচাপ একটা পাথবেব মূর্তিব মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কাছে গেলেই সে ... দ্বীপমালাব ভেতব অদৃশ্য হয়ে যায়। দেখা যায় না আব এবং খুঁজে বেব কবা যায় না।

তখনই মনে হল থম্পসন সবাইকে ডাকছে, এসো কিছু খেয়ে নেয়া যাক। তাবপব আমাদেব কাজ ... কোনও জলাব সন্ধান খুঁজে বেব কবা। এখানে এটাই প্রথম জরুবি কাজ আমাদেব।

তিন

থম্পসন বন্দুক কাঁধে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

রিচার্ড তাঁবুর ভেতর থেকে বলল, সঙ্গে গেলে হত না!

তোমরা একটু বিশ্রাম করো। বেশি দূর যাচ্ছি না। মনে হয় কাছে কোথাও পেয়ে যাব।

এরা আসার আগে দ্বীপগুলির ভূ-প্রকৃতি, গঠন এবং পরিবেশ সম্পর্কিত একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে এসেছে। অধিকাংশ দ্বীপগুলোই মৃত আগ্নেয়গিরির মুখ। কোনও কোনওটা প্রবালদ্বীপ। এবং কোথাও ঠিক প্রস্রবণ অথবা জলাশয় মিলে যাবে। খাবার জল ট্যাংকভর্তি আনা হয়েছে। এমন একটা গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় মাঝে মাঝে শরীর ঠান্ডা জলে চুবিয়ে নিতে না পারলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে সবাই। তার সঙ্গে থম্পসন চায় দ্বীপের ভেতর ঢুকে এর গাছপালা, বন্যতা কী রকম গভীর একবার দেখে নিতে।

তখনই মনে হল ওপাশের তাঁবুটাও নড়ছে। থম্পসন দেখল জেনি বের হয়ে আসছে। পাতলা কটনের শার্ট পরেছে। কালো রঙের ট্রাউজার পরেছে। এবং নীল রঙের চশমা চোখে। খাঁ খাঁ রোদ্দুরে জেনির বের হওয়া থম্পসনের পছন্দ নয়। আর্চি খেয়ে-দেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন উষ্ণতায় লোকটার ঘুম আসে কী করে! ঘুমিয়ে আছে, না ঘুমের ভান করে পড়ে আছে! রিচার্ড খেপিয়েছিল আর্চি খেয়ে-দেয়ে একবার ঘুরে এসো তো দ্বীপটার ভেতর থেকে। কোথাও কোনও জলাশয়, ঝরনা আবিষ্কার করতে পারো কি না দ্যাখো তো।

যেতে হবে ভয়েই হয়তো সে নাক ডাকাচ্ছে। কিন্তু জেনি কেন এ অসময়ে! সে বলল, জেনি, এই রোদ্দুরে বের হচ্ছ কেন?

আপনার সঙ্গে যাব ভাবছি।

আর্চি বলল কে যাবে?

রিচার্ড বলল, তা হলে ঘুমোওনি!

বাব্বা, যা গরম। মানুষ পাগল না হলে মরতে এখানে আসে!

তারপরই বেশ গম্ভীর গলায় বলল জেনি যাবে না।

খুবই অর্থহীন। রিচার্ডের করুণা হয়। জেনি আদৌ গ্রাহ্যই করবে না। এখন যা হবে, যতই রোদ হোক জেনি ঠিক রওনা হবে।

জেনি বলল দাঁড়িয়ে আছেন কেন থম্পসন, চলুন।

জেনি শিকারের সু পরে নিয়েছে। এবং হিপ পকেটে জেনি রিভলবারটা নিতে ভোলেনি। থম্পসন বলল, তুমি গেলে আর্চিও সঙ্গে যেতে চাইবে। আমি চাই না তুমি যাও।

আর্চি যাবে না।

আর্চি মাথায় হ্যাট পরে ছুটে এসেছিল কিন্তু জেনির শক্ত মুখ দেখে আর কিছু বলতে সাহস পেল না। দাঁড়িয়ে গেল।

থম্পসন, জেনি ধীরে ধীরে উঠে যেতে থাকল। থম্পসন হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরেছে। মাথায় একটা তালপাতার টুপি। জেনিও তালপাতার টুপি পরে নিয়েছে। আর্চি তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। যতক্ষণ না ওরা দ্বীপের গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেল সে চেয়ে রইল।

থম্পসন বলল, জেনি, তোমার কি সত্যি মনে হয় লোকটা ক্যারট?

কে তবে হবে বলুন থম্পসন!

তা হলে চ্যাটার্জি বলে ওর বন্ধুকেও দেখা যেত। একজন না হয়ে দু'জন হওয়া উচিত ছিল।

এসব কথা আবার নতুন করে উঠছে কেন?

নতুন করে উঠছে কেন? আমাদের এখানে বিশ-বাইশ দিন থাকতে হবে। দ্বীপটা মনে হচ্ছে বেশ বড়। পাঁচ-সাত মাইল তো হবেই। তুমি কী বলো!

ভেতরে না ঢুকলে বোঝা যাবে না।

নতুন করে উঠছে কেন? কারণ আমরা খুব ভেবেচিন্তেই এখানে এসেছি। অনুসন্ধান করে এটা জানা

গেছে, এই দ্বীপগুলোর কাছাকাছি ওরা নিখোঁজ হয়েছিল। কিন্তু নিখোঁজ হয়েছিল কেন? যদি নিখোঁজ হয় তবে দ্বীপে এসেই বা থাকবে কেন? দ্বীপে এলে একজনই বা থাকবে কেন? তারা দ্বীপে পড়ে থাকছে কেন?

জেনি হেঁটে যাচ্ছিল, আর গাছপালার ভেতর ক্রমে যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনও রাস্তা নেই। কোথাও বড় বড় পাথর, আবার মসৃণ ঘাসের মাঠ, আবার লতাগুল্মে ভরা কাঁটাঝোপ। থম্পসন ধারালো ছুরি দিয়ে দরকার মতো ডালপালা কেটে সামনে ঢুকে যাবার পথ করে নিচ্ছে। অদ্ভুত সব পাখি, ছোট, আরও ছোট, কোনওটার রং হলুদ নীল সবুজ, কোনওটা বেশ বড় এবং চোখ কাচপোকার মতো গভীর। থম্পসন-জেনিকে দেখে কেউ কেউ উড়ে পালাচ্ছে। জেনি তখন বলল, আমি কিছুই ঠিক জানি না। তবু লোকটা কে, কেন এখানে একা পড়ে আছে, না দেখা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। ওরা যদি ভাসতে ভাসতে দ্বীপে উঠে আসে আর যদি দ্বীপের মায়ায় জড়িয়ে যায়।

থম্পসন বলল, একেবারে হাওয়া নেই দেখছ?

মনে হয় আমরা ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছি।

আরে, ওই দ্যাখো।

জেনি দেখল, অদ্ভুত পাথরের একটা দেয়াল খাড়া চার-পাঁচ ফুটের মতো, লম্বায় কতটা বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্রমে রাস্তা কেমন অগম্য হয়ে উঠছে। থম্পসন বলল, বেশিদূর ঢোকা যাবে না। অন্যদিকে দেখা দরকার।

জেনি চারপাশে তাকাল। চারপাশের ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দৃষ্টি আটকে গেছে। কোথায় এসে পড়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে বলল, চিনে ফিরতে পারবেন তো থম্পসন।

দেখা যাক।

প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক হেঁটেছি।

আমরা কিন্তু খুব একটা দূরে আসিনি।

কী করে বুঝলেন।

সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছ না?

ওঃ। কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

চলো বরং ফেরা যাক।

কিন্তু বলছিলেন, ঝরনা—জলাশয়—।

আরে দ্যাখো দ্যাখো।

ওরা তখনই দেখল, পাঁচিলের ওপাশটাতে পাথরের দেয়াল অনেকটা দূরে চলে গেছে।

থম্পসন জেনিকে দেয়ালের ওপর টেনে তুলল। একটা ফুট তিনেক চওড়া ফিতার মতো পাঁচিলটা জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে মনে হচ্ছে।

থম্পসন বলল, পারবে হেঁটে যেতে?

হ্যাঁ, পারব।

মনে হয় অনেকটা দূরে যাওয়া যাবে। কেমন লম্বা সাঁকোর মতো মনে হচ্ছে না।

কিছুটা এসেই হঠাৎ জেনি চিৎকার করে উঠল, ওই দেখুন কী দেখা যাচ্ছে।

অনেক দূরে একটা মানুষের মতো। থম্পসন বলল, আমরা কি ওপরে উঠছি? দূরবিনটা নিয়ে এলে না কেন?

এবং ভাল করে দেখে বুঝল, ওটা আর কেউ নয়, আর্চি।

থম্পসন বুঝল জেনি ক্যাবটের কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গোলমাল করে ফেলছে। সে বলল, তুমি আর্চি তাঁবুতে থাকতে ভরসা পায়নি। পিছু পিছু চলে এসেছে। দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারছ না। ভাল করে লক্ষ করো।

জেনি কেমন সত্যি লজ্জা পেল। বলল, বুঝলেন বাবা কত বড় ভুল করেছে।

এখন বুঝতে পারছি। চলো আমরা পাঁচিল থেকে নেমে পড়ি। তবে আর দেখতে পাবে না।

পাঁচিলের দু পাশ সাত ফুট গভীর। কোথাও আরও বেশি। থম্পসন একটা লতা ধরে ঝুলে

পড়ল। তারপর লতাটা ছুড়ে দিয়ে বলল, দ্যাখো পারো কি না।

আর তখনই মনে হল, একপাল খরগোশ ফর ফর করে পাঁচিল টপকে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য সবই সাদা খরগোশ। এবং দেখল মাথার ওপর সব বড় বড় গাছের ডাল সূর্যালোক ঢুকতে দিচ্ছে না। কেমন ঠান্ডা। এবং গরম আদৌ আর তীব্র নয়।

থম্পসন বলল, কী দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? পারছ না?

দাঁড়ান দেখছি।

বলে সেও ঝুলে নেমে গেল থম্পসনের পায়ের কাছে। এবং মনে হচ্ছে কোনও একটা রাস্তার মতো সামনে। কেউ যেন হেঁটে যায়। থম্পসন নুয়ে কী যেন তুলে দেখল। কতকালের শুকনো পাতা, মরা ডাল, পাখির মল পচে ভারী উর্বরা এবং দেয়ালের খাঁজে খাঁজে সে দেখতে পেল, সমুদ্রপাখিদের ডিম। থম্পসন বলল, দেখছ, প্রকৃতির কী করুণা! দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে সব ডিম দেখছ?

জেনি কেমন বালিকার মতো দুটো ডিম তুলে দেখল সন্তর্পণে। আবার জায়গা মতো রেখে বলল থম্পসন, কী সুন্দর দেখতে ডিমগুলো!

আর তখনই ফের জেনির চিৎকার।

থম্পসন, দেখুন, ওটা কী! বলের মতো। নড়ছে। আঁশ বড় বড়।

থম্পসন বলল, জেনি, ওটা প্যাংগোলিন। বুঝতে পারছ না? ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

বলেই থম্পসন ওটার গায়ে পা দিয়ে সামান্য ঠেলা দিতেই শুয়োরছানার মতো ছুটে পালাল। তারপর থম্পসন বলল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সামনে দেখছ, কত বড় একটা টিলা।

ওটার ওপরে উঠে দেখি না!

পারবে না, ভীষণ খাড়া।

জেনি কেমন জেদি হয়ে পড়ছে। সে বলল, পারব। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। যতটা পারা যায় দেখতে ক্ষতি কী।

প্রথমে কিছুটা বেশ ভালভাবেই ওঠা গেল। কতকালের শ্যাওলা পাথরের গায়ে। শ্যাওলায় পা রাখা যাচ্ছে না। পিছলে যাচ্ছে। জেনি, থম্পসনের কাছ থেকে ছুরিটা চেয়ে নিল, যেখানে একদম পা রাখা যাচ্ছে না চেঁচে ফেলল। তারপর আরও ওপরে ওঠার জন্য সে কেমন মরিয়া হয়ে গেলে থম্পসন বাধা না দিয়ে পারল না।

ওঠা যাবে না। কাল আমাদের তৈরি হয়ে আসতে হবে। জেনি, পাগলামি করার সময় এটা নয়। ভেবেচিন্তে সব কাজ করতে হবে।

জেনি বলল, টিলার মাথায় উঠে যেতে পারলে অনেকটা দেখা যেত দ্বীপের। তা ছাড়া ওই যে দিগন্তে দেখছেন মেঘের মতো একটা পাহাড়, ওটা কি দ্বীপের ভেতর আছে বলে মনে হয়!

থম্পসন দেখতে পাচ্ছিল না।

জেনি বলল, এখানে আসুন, দেখতে পাবেন।

পা টিপে টিপে থম্পসন এগিয়ে গেল। দিগন্তে চোখ তুলে দেখতেই থম্পসন হেসে ফেলল।

ওটা তুমি বুঝতে পারছ না কী!— বলে নেমে জায়গামতো ঠিক হয়ে দাঁড়াল। ওটা সমুদ্র। কখনও সমুদ্র দূর থেকে নীল পাহাড়ের মতো দেখায়।

জেনি আবার দেখল। বার বার সে এত ভুল করছে কেন! সে চোখ মুছে দেখল, স্থির গম্ভীর সেই উদাস নিরেট নীল শূন্যতা সত্যি সমুদ্র। গাছপালার ফাঁকে মনে হয় দ্বীপের দিগন্তে পাহাড়। সে বলল, বেরিয়ে পড়লে কত রকমের অভিজ্ঞতা হয় থম্পসন। না দেখলে তো এসব বিশ্বাস করা যায় না। দ্বীপটা কি সত্যি মায়াবী! দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে কি কোনও ঘোরে পড়ে যেতে হয়!

সে কেমন সামান্য ভয় পেয়ে বলল, আমি কিন্তু থম্পসন বুঝতে পারছি না দ্বীপের কোথায় আছি।

মাথার ওপর ডালপালা নিয়ে একটা মরা গাছ। যেন এই সেদিন গাছটা মরে গেছে। বজ্রপাতের জন্য হতে পারে। অথবা মনে হয় প্রকৃতির কোনও নিপুণ কারিগর গাছটার পাতা, ছাল সব তুলে নিয়ে গেছে। এটা কী গাছ! বেশ সুন্দর গন্ধ। দারুচিনি গাছ-টাছ হবে না তো! সে বলল, থম্পসন, একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন!

থম্পসন বলল, সামনের গাছটাব কথা বলছ।
হ্যাঁ।
গাছটা কোনও মবা গাছ। তুমি কী ভাবছ?
দাকচিনি গাছ নয় তো।
দাকচিনি অত বড হয় না।
কিন্তু কী সুন্দব গন্ধ কাঠে।
চন্দন জাতীয় গাছ-টাছ হবে।
বলে থম্পসন গাছটা শুঁকে বলল, চলো আজ আব এগুনো ঠিক হবে না। ফিবতে ফিবতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কাজেব কাজ কিছুই হল না।
ফেবাব সময় থম্পসন ফেব সেই জায়গাটায় উবু হয়ে কী দেখল। বনেব ভেতব একটা অস্পষ্ট পথেব মতো। বলল, কাল ওদিকে না গিয়ে, দেখছ—
বলে মাথা সোজা কবে দিল জেনিব।
মনে হচ্ছে না, কাবও চলাচলেব এটা পথ?
জেনি বলল, চলুন না একটু এগিয়ে দেখা যাক।
থম্পসন বলল, সাহস পাচ্ছি না। কোথায় নিয়ে যাবে পথটা কে জানে।
জেনি বলল আমি তো আছি।
থম্পসন হাসল জোবে।
সত্যি তুমি যে আছ ভুলেই গেছিলাম।
মেয়েটাব সোনালি চুল, নীল চোখ, আশ্চর্য মায়াবী মুখেব দিকে তাকিয়ে থম্পসনেব ভাবী কষ্ট হল। বাবটকে কতটা ভালবাসে, জেনিকে না দেখলে বিশ্বাস কবা যায় না, তবু থম্পসন শেষ পর্যন্ত জেনিব কথায় বাজি হতে পাবল না। তাব বিচাব-বুদ্ধিতে এই বাস্তাটাব কোনও কূট বহস্য থাকতে পাবে। কিংবা সাধাবণ কোনও প্রাণীব এটা যাতায়াতেব পথও হতে পাবে। সবচেয়ে যা ভয় ভেতবে ঢুকে গেলে পাশেব ফিতেব মতো পাঁচিলটা চোখেব ওপব অদৃশ্য হয়ে যেতে পাবে। দ্বীপেব বাইবে যাবাব জন্য ও একমাত্র ওটাই তাব নিশানা।
সে বলল কাল সকালে দেখা যাবে।
জেনি তাকাল থম্পসনেব দিকে। থম্পসন বাবাব সিনিয়ব সেক্রেটাবিদেব ভেতব একজন। বাড়িতে সম্পর্কটা তাদেব আংকেলেব মতো। সে এখন অনুনয় কবলে তিনি হয়তো বাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু বাবা বলে দিয়েছেন, জেনি, থম্পসন ওখানে গার্জিয়ান মনে বেখো। আব থম্পসনকে বলে দিয়েছিল, কোনও অশকাবা দেবে না। তুমি বিচাব-বিবেচনা মতো যা ভাল বুঝবে কববে। আমাব তো ইচ্ছেই ছিল পুলিশ বন্ধুদেব বলতে ওবা তো হেসে উডিয়ে দিয়েছে। পত্রিকা বিক্রিব একটা ধান্দা। তবু জেনি আমাব একমাত্র মেয়ে, সে যদি মনে কবে শেষ না দেখে আর্চিকে কথা দেবে না তবে শেষটা দেখে যাওয়াই ভাল।
এবং জেনি সেদিনই সকালে ফোন কবেছিল, একুশ বাবি স্ট্রিট, লণ্ডনে। ক্যাবটেব জাহাজ কম্পানিব হেড-অফিস ওটা।
জেনি ফোন কবে বলেছিল, আপনাদেব তো অনেক জাহাজ দক্ষিণ-সমুদ্রে ঘুবে বেড়ায়।
বেডায না ঠিক। মাল নিয়ে যাওয়া-আসা কবে।
ওই হল। আচ্ছা মনে আছে ছ'বছব আগে আপনাদেব কোম্পানিব দু'জন ইঞ্জিনিয়াব হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়।
বিলক্ষণ মনে আছে।
মিস্টাব ক্যাবটকে নিশ্চয়ই স্মবণ করতে পাবেন।
তা অবশ্য পাবছি না।
আপনাবা মনে কবতে পাবছেন না তাকে। তাজ্জব।

রেকর্ডপত্র দেখলে হয়তো মনে হবে। তবে ফানাফুতি দ্বীপের কাছে আমাদের দু'জন বিশ্বস্ত ইঞ্জিনিয়ার জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সেটা আমাদের অনেকদিন মনে থাকার কথা।

তাদের একজন ক্যাবট, আমার স্বামী।

অঃ আচ্ছা।

আপনারা সংবাদ-বিচিত্রায় খবরটা দেখেছেন?

কীসেব খবর বলুন তো।

বাবে। ফানাফুতি থেকে শ-খানেক মাইল দূরে আজকাল একজন মানুষকে দেখা যায়।

তা হবে। লক্ষ করিনি।

আপনাদেব উচিত ছিল লক্ষ করা। তা যাক এখন যেজন্য ফোন করছি, আমাদের একটা জাহাজের দরকার। ফানাফুতির কাছে আমরা নেমে যাব। আপনাদের জাহাজ নিশ্চয়ই সেসব রুটে এখনও যাওয়া-আসা করে।

আপনি একটু ধরুন।

তারপর জেনি অধীব আগ্রহে কিছুক্ষণ ধরে রেখেছিল। এবং একসময় সে ঠিক ফের খবর পেয়ে গেল। বলল, দেখুন ১৪ মে একটা জাহাজ নিউ-ক্যাসেল থেকে ছাড়ছে। ফানাফুতি, ওসানিকাতে যাচ্ছে। যদি ওটা না ধবতে পারেন আগস্ট মাসেব মাঝামাঝি সেই জাহাজটাই ফিরে আসছে। তবে সেইলের তারিখ ঠিক বলতে পারব না। আমাদের এজেন্ট-অফিস বলতে পারবে।

ফোনে হেড-অফিস আবও জানিয়েছিল, ওদেব অধিকাংশ জাহাজই এখন দক্ষিণ-সমুদ্রে। সাউথ পেসিফিকে ঘুবে বেড়াচ্ছে। জেনি ইচ্ছে করলে কার্ডিফের রাউদ ইঞ্জিনিয়ার ডক থেকে একটা জাহাজ পেতে পারে। জাহাজটা যাচ্ছে ক্যারিবিয়ান-সি হয়ে। জাহাজটা মিসিসিপিতে ঢুকে নিউ-পোর্টে বাংকাব নেবে। পোর্ট অফ সালফার থেকে নেবে গন্ধক। তারপর পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে পেসিফিকে দীর্ঘ একমাস একনাগাড়ে যাত্রা। ডুনেডিনে মাল খালাস।

জেনি সামান্য বাধা দিয়ে বলেছিল, ডুনেডিন কোথায়?

ওটা নিউজিল্যান্ডের একটা পোর্ট। তারপর খালি জাহাজ সোজা যাচ্ছে নিউ-ক্যাসেল। জাহাজে গেলে এভাবে যেতে পারেন। আর বি ও এসির ফ্লাইট ধবলে সোজা সিডনি। সিডনি থেকে থ্রু ট্রেন। নিউ ক্যাসেল পৌঁছানোব ওইটাই সহজ উপায়।

লোকটা আরও বলল, নিউ-ক্যাসেল থেকে ফানাফুতিব কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে যেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। সঙ্গে বোট রাখলে ভাল হয়। জাহাজ দ্বীপের কাছে বোট নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের খাতিরে জেনি আর্চিকেও ফোন করেছিল। এবং বলেছিল, আর্চি, দক্ষিণ-সমুদ্রে আমি ক্যাবটকে খুঁজতে যাচ্ছি। একটা খবরে খুব বিচলিত বোধ করছি।

এই বলে সে পত্রিকার সংবাদ-বিচিত্রার কথা উল্লেখ করেছিল।

বাবাকে জানিয়েছি। তিনি তো শুনে খুবই ভেঙে পড়েছেন। এমন একটা অভিযানে যাব শুনে তাঁব আহার-নিদ্রা গেছে। কিন্তু তুমি তো জানো আর্চি, ক্যাবটকে আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। নিশিদিন সে আমার পাশে একটা ছায়ার মতো ঘোরে।

বিকেলের দিকে বেশ একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। সমুদ্রের তরঙ্গমালা বেশ উত্তাল। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে এটা এক আলাদা পৃথিবী হয়ে গেল। কেমন অন্য একটা গ্রহের মতো মনে হচ্ছে। সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই। আর্চি কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে বন আর বালিয়াড়ির সীমায় দাঁড়িয়ে পাগলের মতো পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে জোরে চিৎকার কবছিল, জেনি, তোমরা কোথায়?

রিচার্ডও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তার কিছু কাজ আছে বলে সে আর্চির মতো নিরর্থক বনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সন্ধ্যা হতেই একটা গভীর নীল অন্ধকার দ্বীপটাকে গ্রাস করে ফেলল। কৃষ্ণপক্ষ বলে আজ অমাবস্যা কি না জানার জন্য ডাইরি খুলে দেখল, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। তবে কৃষ্ণপক্ষে দ্বীপে থাকতে হয়নি, এই যা রক্ষে। দু'-চার দিন গেলে সন্ধ্যার অন্ধকারটা এমন কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে উঠবে না। সমুদ্র, নক্ষত্র এবং দ্বীপের গাছপালা বাদে দৃশ্যাবলী বলতে প্রায় কিছুই

নেই। সে বিকেলের দিকে কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিল। তাতে আগুন দেওয়ার কাজটা সেরে ফেললেই মোটামুটি আজকের মতো বিশ্রাম। যদি দ্বীপে ওরা পথ হারিয়ে ফেলে, তবে আগুন দেখে ঠিক চিনে আসতে পারবে। সে কিছুটা পেট্রোল ঢেলে বেশ একটা বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বসল। আগুনটা সারা রাত তারপর ধিকি ধিকি জ্বলবে।

আগুনটা জ্বেলে ভালই করেছে। থম্পসন সোজা বালিয়াড়িতে নেমে আসতে পারল। থম্পসনকে দেখে আর্চি ভীষণ ক্রুদ্ধ। সঙ্গে জেনি নেই কেন। জেনি যে পেছনে আসছে সে রাগের মাথায় সেটা খেয়ালই করেনি। রেগে গেলে আর্চির স্বভাব বকর-বকর করা।

এটা কি ভাল হচ্ছে আপনাদের? আপনারা কী ভেবেছেন। আপনারা কি জানেন না, জেনির বিপদ আপদ হলে আমার আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে। তা ছাড়া বুড়ো মানুষটাকে গিয়ে কী বলব। আর জেনি, তোমার কাণ্ডজ্ঞানের খুবই অভাব আছে জানি। না থাকলে এখানে মরতে আসতে না। তাই বলে রাত করে ফেরা, অচেনা একটা দ্বীপে এভাবে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমি একদম পছন্দ করছি না।

থম্পসন এবং জেনি উভয়ে ক্লান্ত। ওরা কিছুই শুনছে না। সোজা হেঁটে চলে আসছে। আর্চি বন্দুক হাতে ওদের সঙ্গে প্রায় ছুটছিল। যত ছুটছিল তত ওর মেশিনটা বেশি ঘুরছে। এক সময় জেনি আর না পেরে বলল, থামো আর্চি। থামো। তোমাকে কিছু বলতেও খারাপ লাগে।

তারপর জেনি সোজা সমুদ্রের ভেতর বড় একটা পাথরে উঠে হাত মুখ ধুল। এবং বিচার্ডের বুদ্ধিবৃদ্ধি প্রখর, সে তার ছোট যমজ ভাইটাকে আগে প্রায় আমলই দিত না কিন্তু এই অভিযানে বিচার্ড সঠিক বিবেচনা করে কাজ করছে। সে জেনির তাঁবুর পাশে বেশ মসৃণ একটা পাথর কোথেকে খুঁজে এনে রেখেছে। সে খুব সামান্য জল দিয়ে ফের হাত মুখ ধুয়ে একটা ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে পড়ল। কে কোথায় কে কী করছে দেখার সময় নেই। তাঁবুর ভেতর থেকে দুটো বিয়ারের বোতল বের করে গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে ডাকল থম্পসন, আগে খেয়ে নিন। ভীষণ তেষ্টা।

বিচার্ড বলল, কিছু দেখলে?

জেনি গ্লাসটা তুলে সামান্য খেল। তারপর কেমন আরামে চোখ বুজে ফেলল। কিছু বলল না।

খুবই পরিশ্রম গেছে। থম্পসনের গ্লাসটা তাঁবুর বাইরে এনে ডাকল বিচার্ড, আসুন মিস্টার থম্পসন।

আর্চির দিকে তাকিয়ে বলল, যাও, বসে এখন গেলোগে।

আর্চি জানে এটা সন্ধ্যার মৌজ। যদিও খুব বেশি মাতাল হওয়ার ব্যাপারে নিষিদ্ধ নিয়মকানুন আছে। ইচ্ছে করলেই খুশিমতো গিলতে পারবে না। সে গ্লাসের সবটা ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে বাকিটা বোতল থেকে উপুড় করে নিল। জেনি হুঁ হা কিছু বলছে না। বনের গভীরে যেমন এক স্তব্ধতা বিরাজ করছিল, জেনির ভেতরেও যেন সেই স্তব্ধতা।

বিচার্ড অগত্যা থম্পসনকেই জিজ্ঞেস করল, কী দেখলেন?

দাঁড়াও, যাচ্ছি।

বলে পোশাক ছাড়তে ভেতরে চলে গেল। হালকা একটা প্যান্ট পরে পুরো খালি গায়ে সে বের হয়ে এল। যদিও পুরো খালি গায়ে থাকার অভ্যাস কোনওদিনই নেই, খালি গায়ে থাকা অসভ্যতাও বটে, সে তবু গরমের জ্বালায় কিছু গায়ে দিল না। কিন্তু বাইরে এসে বেশ ঠান্ডা অনুভব করল। সমুদ্র থেকে একটা মিষ্টি ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে।

বিচার্ড ফের বলল, কিছু দেখলেন?

দেখেছি। তবে কোনও ঝরনা কিংবা হ্রদ-টদ পাওয়া যায়নি।

কতটা ভেতরে ঢুকেছিলেন?

বেশ অনেকটা। আশ্চর্য, জানো বিচার্ড দ্বীপের ভেতর অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড দেখলাম।

বিচার্ড আর-একটা ফোল্ডিং চেয়ার তাঁবুর ভেতর থেকে টেনে বের করে আনল। বলল, কী দেখলেন।

আস্তে বিচার্ড। জেনি শুনতে পাবে।

ভয় টয়ের কিছু।

ভয়-টয় কি না জানি না। তবে দ্বীপে কেউ আছে এটা বোঝা গেছে।

সত্যি আছে বলছেন?

মনে হচ্ছে আছে। একটা গাছে তিনটে অক্ষরের মতো দেখলাম।

জেনি দেখেছে?

জেনিকে ইচ্ছে করেই কিছু দেখাইনি।

অক্ষরগুলো কী?

বুঝতে পারছি না। তবে ইংরেজি নয়।

রিচার্ড একটা ব্লেক-হার্ড ভাঙছে তখন। পুরনো দামি মদ।

সে এক পেগের মতো ঢেলে থম্পসনকে দিল। থম্পসন সবটাই গলায় ঢেলে সামান্য আমেজ পেল শরীরে। বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের আলো মাথার টাকে প্রতিবিম্ব ফেলেছে।

থম্পসন বলল, আর মনে হল মানুষের একটা পায়ে-হাঁটা পথও আছে।

রিচার্ডের কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বলল, কী করে সম্ভব! কোনও অসভ্য জংলির পক্ষেও তো থাকা এখানে নিরাপদ নয়। একজন শিক্ষিত সভ্য মানুষ থাকবে ভাবতে পারি না।

তবু আছে। আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু আসছে-যাচ্ছে না।

জেনিকে কী বলেছেন?

জেনি তো আজই পথটা ধরে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল। বারণ করলাম। বললাম, দ্বীপের কোনও বড় আকারের জীব-টিবও যাওয়া-আসা করতে পারে। বেলা পড়ে আসছে। বরং কাল ঢুকে দেখা যেতে পারে।

আর্চি তখন জেনির মুখোমুখি বসে আছে। জেনির সামনে একটা ফোল্ডিং ছোট আকারের এনামেলের টেবিল পাতা। একদিকে জেনি, অপরদিকে আর্চি। জেনি কোনও কথা বলছে না। চুপচাপ সন্ন্যাসিনীর মতো চোখ বুজে আছে। একটু খাচ্ছে, আবার চোখ বুজে পৃথিবীর কোনও গোপন গভীরতায় ডুবে যাচ্ছে যেন। আর্চি সুবোধ বালকের মতো জেনির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রিচার্ড উঠে গিয়ে তাঁবুর ভেতর লণ্ঠন জেলে দিয়ে এল। এভাবে সমুদ্রের গর্জন আর আকাশের নক্ষত্রমালার ভেতর এক আশ্চর্য আধিভৌতিক রহস্যময়তায় ডুবে যাচ্ছিল তারা।

থম্পসন ফের বলল, তবে শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না রিচার্ড। যদি ক্যারট না হয়, অন্য কেউ হয়, যার ভাষা আমরা জানি না, বুঝি না, যদি সত্যি একদিন দেখা দেয়, তখন আমাদের কী হবে জানি না। ভাবতেই খুব ভয় লাগছে। হ্যাঁ, আর মনে রাখবে, পালা করে জেগে থাকা দরকার হবে। যতটা ভেবেছিলাম নিরাপদ জায়গাটা আসলে তা নাও হতে পারে। একটা গাছ দেখলাম, গাছটার সব চেটেপুটে খাওয়া। ছাল পাতা কিছু নেই। এমনিতে মনে হয় শুকনো বাজ পড়া, কিন্তু ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরে দেখলাম জ্যান্ত। ফেরার পথে আরও ওরকমের তিন-চারটা গাছ দেখেছি। খুব বড় নয়, জলপাই গাছের মতো বড়সড়। কীসে এভাবে খায় বুঝতে পারছি না।

আর্চি এদিকটায় আসছে না দেখে রিচার্ড নিশ্চিন্ত। সে এলে এত সব কিছু বলা যেত না। রিচার্ড বলল, তা হলে বেশি রাত করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হবে।

থম্পসন দু'হাত কচলে হাত ওপরে তুলে দিল। বড় রকমের হাই উঠছে। রিচার্ড বলল, আজ আর আপনার জাগতে হবে না। পালা করে আমি আর আর্চিই জেগে থাকব।

দেখছ কত জোনাকি।

রিচার্ড দেখল, যেন দ্বীপটায় আগুন লেগেছে। অজস্র জোনাকি পোকা দল বেঁধে উড়তে উড়তে এদিকে ধেয়ে আসছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল জীবন্ত সব কবরের মানুষ প্রাণ খুলে দ্বীপের মাথায় নাচানাচি করছে। ওরা দেখতে দেখতে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেল। অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দ্বীপ থেকে ধেয়ে আসছে।

ওরা কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখল, আর একটাও জোনাকি নেই। উড়ে উড়ে কোথায় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। বালিয়াড়িতে শুধু ব্রেকারের শব্দ। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। ভাঙছে, আবার নেমে যাচ্ছে।

অন্ধকাব ঘন হয়ে উঠলে শুধু বালিয়াড়িতে দেখল অজস্র ফসফবাস কৃমি কীটেব মতো কিলবিল কবছে।

কোনও নির্জন দ্বীপে বাত কাটাবাব অভিজ্ঞতা এদেব কাবও নেই। সমুদ্রেব গর্জন ব্যতিবেকে আব কোনও শব্দ নেই। শোঁ-শোঁ আওয়াজ সেই আদি অনন্তকাল থেকেই যেন কেবল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাতেব খাবাব বলতে সামান্য আলুসেদ্ধ কবে নিল। গ্রিন পিজ সেদ্ধ এবং চিজ। আব ফলেব ভেতব একটা কবে আপেল। ভেড়াব মাংসেব বোস্ট. যাব যেমন খুশি স্পাইস কেটে নিয়েছে। এবং খাবাব পব বিচার্ড বাদে যে যাব তাঁবুব ভেতব ঢুকে গেল। বিচার্ড বন্দুক কাঁধে বাইবে পাহাবায বসে বইল। মাঝে মাঝে আগুনে কাঠ ফেলে দিচ্ছে। খুঁচিযে আগুনেব তেজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা চুরুট খেযে কিছুক্ষণ সে দূবেব অস্পষ্ট বনেব পাশটায়ও হেঁটে এল। এদিকটায হেঁটে সে বুঝল দ্বীপটা যত নির্জন ভাবা যায় ঠিক ততটা নির্জন নয়। ববং জমকালো পোশাকে দ্বীপটা আকাশেব নীচে গর্বেব সঙ্গেই বেঁচে আছে। এবং এব অভ্যন্তবে সব নানাবর্ণেব পাখিদেব বাস, তাদেব মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকাব শোনা যাচ্ছিল। আব একবাব তো বিচার্ড থমকে দাঁড়িযে গেল। বিদ্যুতেব মতো কোনও একটা জন্তু ছুটে পালাচ্ছে। পেছনে কেউ তাড়া কবছে না তো।

সে নেমে আসাব সময় দেখল দূবে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রথমে কী কববে ভেবে পেল না। অন্ধকাবেবও একটা আলো এই প্রথম সে টেব পেল। সবাই তাঁবুতে, একা একজন মানুষেব অস্পষ্ট অবয়ব দেখে সে নিজেকে গাছেব আড়ালে বেখে কিছুটা এগিযে গেল। এবং আবও কিছুদূব সে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকল। তাবপব আবও কাছে যেতেই অবাক জেনি চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে আছে। কেমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

বিচার্ড হিস হিস গলায় ডাকল জেনি তুমি?

জেনি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। বুকে ক্রস ঝুলছে সোনাব। অন্ধকাবেও সেটা চকচক কবছে।

বিচার্ড জেনিকে এবাব ধবে নাড়া দিল জেনি জেনি।

জেনি চোখ মেলে তাকাল। বলল বিচার্ড, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে

কেন কী হযেছে।

কেউ এসেছিল।

কে আসতে যাবে?

এসেছিল বিচার্ড। মাত্র ঘুম লেগে এসেছে, কেউ যেন আমাকে ডাকল জেনিফাব যাবে।

আর্চি নয় তো।

আর্চিব গলা তো আমি চিনি।

কে ডাকল তবে।

মনে হয ক্যাবট। হুবহু ওব গলায় লোকটা কথা বলছিল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললাম। কেউ নেই। বাইবে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল দূবে কেউ হেঁটে চলে যাচ্ছে। কেমন ঘোবেব ভেতব পড়ে এতদূব হেঁটে চলে এসেছি। কিছুই আব দেখতে পেলাম না। কিছু আব মনে কবতে পাবছি না।

কোন দিকে গেছে বলতে পাবো।

না।

বিচার্ড টর্চ জ্বেলে বালিয়াড়িতে পায়েব ছাপ পড়েছে কি না দেখল। কেউ হেঁটে গেলে ঠিক পায়েব ছাপ পড়বেই। ওবা জেনিব পায়েব ছাপ কেবল দেখতে পাচ্ছে। ছোট ছোট। কোনও পুরুষ মানুষেব পায়েব ছাপ দেখতে পেল না। কিছু কাঁকড়া, স্টাব ফিশ, শঙ্খ এলোমেলো ছড়ানো। যে কোনও দ্বীপে এলে প্রথমে যা চোখে পড়ে এদিকটা তাব থেকে এতটুকু ব্যতিক্রম নয়।

বিচার্ড বলল, জেনি, ধৈর্য ধবো। এভাবে ঘোরেব ভেতব পড়ে গেলে কাজেব কাজ কিছু হবে না।

তুমি এটা ঘোব বলছ।

তবে কী। দ্যাখো না, তুমি যে পথে হেঁটে এলে, কিংবা চাবপাশে তাকাও, দ্যাখো।

পাশে সে টর্চেব আলো ঘুবিযে ঘুবিয়ে দেখাল, কোথাও ছাপ আছে। এলে বালিয়াড়িতে পায়েব ছাপ পড়ত না।

জেনিফাব নির্বাক তখনও। সে বিচার্ডেব কথা বিশ্বাস করতে পাবছে না। স্পষ্ট ওব মনে হয়েছে তাঁবুব

বাইরে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল প্রথম। একবার কি দু'বার ডেকেছিল। তারপর তাঁবুর ভেতর ঢুকে ওকে নাড়া দিয়েছিল। এতটা কখনও ঘোরের ভেতর হয় না। তবু যখন রিচার্ড বলছে মেনে নেওয়াই ভাল। এবং যখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কেমন একটা আতঙ্ক সারা শরীর বেয়ে ওপরে উঠে আসতে থাকল। যদি নিশির ডাকের মতো কিছু হয়! সে যত দ্রুত সম্ভব রিচার্ডের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে চারপাশে আলো ফেলতে থাকল। বালিয়াড়িটা সাদা চাদরের মতো পড়ে আছে, পাশে সব পাথরের ঢিবি গাছপালা। এবং বড় একটা গাছের ডালে আলো ফেলতেই দেখল, দুটো চোখ। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, আলোটা স্থির হয়ে আছে।

রিচার্ড ঝুঁকে দেখল। চোখদুটো জ্বলছে না তো। ডালপালার ভেতর কিছু আছে এবং কিছুক্ষণের ভেতরই লাফ দিয়ে জন্তুটা অন্তর্হিত হলে রিচার্ড অভয় দিয়ে বলল, চলো, ওটা একটা বানর। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

জেনি ফিরে চলল। মনের ভেতর কেমন একটা আশংকা বার বার পাক খেয়ে উঠছে। রাতে আবার যদি আসে। সে তাঁবুতে ফিরে আর ঘুমোতে পারল না। আলো জ্বেলে ঠায় বসে থাকল। একবার স্টোভ জ্বেলে কফি করে নিল। এখন আর্চির পাহারা দেবার কথা। এক কাপ কফি সে আর্চিকেও দিল।

আর আর্চি তাঁবুর ভেতর ঢুকে বেরই হতে চায় না। সে বলল, তোমার চোখ-মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে জেনিফার।

জেনি বলল, ঘুম আসছে না।

আর্চি বলল, এখানে থাকা খুব কি জরুরি মনে করছ?

না থেকে যাবটা কোথায়! জাহাজ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

তুমি ঘুমাও। বাইরে তো আমি আছি।

সেই ভাল। বাইরে থাকো। দেখি ঘুম আসে কি না।

আর্চি বাইরে বের হয়ে গেলে সে শুয়ে পড়ল। কোনও সাড়া-শব্দ না পায় আর্চি, সে মটকা মেরে পড়ে থাকল। আর্চিকে সব বলাও যাচ্ছে না। সে তবে ঘোর আপত্তি জুড়ে দেবে। রাতেই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। কাউকে আর ঘুমোতে দেবে না।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কিট কিট শব্দ কোথাও থেকে ভেসে আসছিল। ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো মনে হচ্ছে। রাত কত, সে একবার ঘড়িতে দেখল। ক্যাবট যদি হয়, কেমন টান অনুভব করল ফের। একটা নির্জন দ্বীপে আটকা পড়ে গিয়ে কীভাবে বেঁচে আছে কে জানে! সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না, ভাবনা-চিন্তায় তার মাথাটাই ঠিক নেই। কেবল ভাবছে সে ঠিকই আছে, আর সব বেঠিক।

রাতটা এভাবে নির্বিঘ্নে কেটে গেল। সকাল হল। চা করে এনে থম্পসন ডাকাডাকি করল। জেনি ঘুম জড়ানো গলায় বলল, আপনারা খান, আমার উঠতে একটু দেরি হবে। সকালের দিকেই চোখদুটো লেগে এসেছে।

এবং নিশ্চিন্তে যখন ঘুমিয়ে আছে, সাদা চাদরে শরীর ঢাকা, ঠান্ডা হাওয়ায় নেশার মতো ঘুম লেগে আছে চোখের পাতায়, তখন একটা হুড়োহুড়ির শব্দ। আর্চিকে রিচার্ড ধমকাচ্ছে। বোধ হয় টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। আর্চি কিছুতেই যেতে চাইছে না।

অগত্যা জেনিফারকে উঠতেই হল। বাইরে এসে দেখল মুখ গোমড়া করে আর্চি বসে আছে। জেনিফারকে দেখেই রিচার্ড বলল, কিছুতেই যাবে না আমার সঙ্গে। বলছে, ওকে নাকি আমরা মেরে ফেলার মতলবে আছি।

জেনি খুব আদরের গলায় বলল, কী হয়েছে আর্চি!

দ্বীপের ভেতর যেতে বলছে। সারারাত একদম ঘুমোতে পারিনি। লম্বা হয়ে ঘুম দেব ভাবছি, না থম্পসনের অর্ডার, একবার ঘুরে দেখে এসো। থম্পসন বলছে, পায়ের ছাপ দেখে এসেছে। ওগুলো নাকি আমাদের পায়ের ছাপ নয়।

জেনির বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। সে বলল, আমি যাচ্ছি রিচার্ড। আর্চি থাকুক।

রিচার্ড বলল, তা হলে আর্চি আমরা তিনজন আপাতত যাচ্ছি। তুমি পাহারায় থাকো। খাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

আর্চি বলল, একা এখানে থাকব।

আব কী কবা যাবে।

জেনিফাব থাকলে থম্পসন থাকবে, আমি থাকলে কেউ বুঝি থাকতে পাবে না?

বিচার্ড এত বিবক্ত যে একটা কথা বলতে আব পাবল না। থম্পসন সমুদ্র থেকে স্নান সেবে এসেছে। স সামান্য মিষ্টি জলে শবীবটা ধুয়ে নিল। একজন প্রকৃত অভিযানকাবীব মতো তাব চলাফেবা। থম্পসন বলল, আর্চি, জেনিকে একা বেখে যেতে সাহস পাচ্ছি না। তুমি একা থাকলে ভয়েব কী?

জেনি একা থাকলে ভয়েব, আমি বুঝি একা থাকলে ভয়েব নয়। আমি বুঝি মানুষ না।

থম্পসন গেঞ্জি গলিয়ে দিচ্ছিল শবীবে। সে আর্চিব কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল, সত্যি তো একা থাকলে তুমি ভয় পাবে, যা লম্বা লম্বা পায়েব ছাপ দেখে এলাম।

জেনিফাব বলল, সত্যিই কি দেখেছেন?

ওদিকটায়, তুমি দেখবে?

জেনি থম্পসনেব সঙ্গে দৌড়ে গেল। ওবা অনেকটা দূবে এসে দেখছে বালিয়াড়ি থেকে একজন মানুষ যেন ধীবে ধীবে উঠে যাচ্ছে, ছাপগুলো সত্যি খুব স্পষ্ট। জেনি পায়েব ছাপ অনুসবণ কবে এগিয়ে যেতে থাকল। কিছুটা দূবে গিয়ে বালিয়াড়ি আব নেই, শুধু ঘাস, ঘন কাশ ফুলেব একটা পুবো উপত্যকা। দূবে তাঁবুগুলো চোখেই পড়ছে না। এতটা দূবে দু'জনেই নিবস্ত্র অবস্থায় এসে ঠিক কবেছে কি না বুঝতে পাবছে না। তবু জেনিফাব কেমন আকুল হয়ে উঠছে। যেন আব কিছুদূবে গেলেই তাকে দেখতে পাবে। সে যে এমন নিবস্ত্র, থম্পসন যে খালি হাতে আছে, কিছুই মনে থাকল না। বলল ঠিক এদিকটায় কোথাও সে গেছে।

এমনভাবে কথা বলল, যেন কাছেই গেছে। সে আমাকে চিনতে পেবেছে। বনেব আড়াল থেকে সে কখনও দেখে ফেলেছে। কিন্তু যদি সে-ই হয়, সোজা ছুটে আসছে না কেন? উদ্ধাবকাবী দলেব মতো ভাবছে না কেন? পালিয়ে পালিয়ে থাকছে কেন। মনটা আবাব সহসা ভাবী বিমর্ষ হয়ে গেল জেনিব। স্যাবট সবসময়ই একটু লাজুক, গম্ভীব, কোথাও কি সে জেনিব কাছে কোনও বড়বকমেব অপবাধ কবে ফেলেছে। দেখা হলেই সব খুলে বলতে হবে। অথবা অনুসন্ধানে সব প্রকাশ হয়ে যাবে দ্বীপে।

কী এমন হতে পাবে যাতে কবে সে দ্বীপটায় স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে। দ্বীপটায় কি কোনও অলৌকিক কিছু আছে, অথবা মায়া। দূব থেকে দ্বীপটা দেখেই কি সে আব তাব বন্ধু সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা কখনও-কখনও মানুষকে পাগল কবে দেয়। সে কি তখন উন্মাদেব মতো কী কবতে যাচ্ছে জানত না? চ্যাটার্জি তো খুব ধীব স্থিব মানুষ। তাব পক্ষে দ্বীপেব মায়ায় উন্মাদ হয়ে যাওয়াব ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যে তাব স্ত্রীব প্রতি ভীষণ বিশ্বস্ত ছিল। ক্যাবট তো সব বলেছে। ওভাবে গেলে জেনিফাব চ্যাটার্জিকে কতবাব বাড়িতে আমন্ত্রণ কবে খাইয়েছে। দিনেব পব দিন দুই বন্ধু এবং জেনিফাব মিলে ইংলন্ডেব দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে বেড়িয়েছে। একদিনেব জন্যও চ্যাটার্জিকে চঞ্চল হতে দেখেনি।

সংবাদ বিচিত্রায় দ্বীপে শুধু একজনকেই দেখা গেছে, দু'জন মানুষ কখনও একসঙ্গে দেখা যায়নি। স্যাবট আছে, চ্যাটার্জি নেই, ভাবতেও কেমন একটা সংশয়েব গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যদি ওদেব কেউ হাঙবেব পাল্লায় পড়ে থাকে, কেউ একজন হয়তো আব দ্বীপে উঠেই আসতে পাবেনি, আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এতসব সংকট একসঙ্গে মাথায় জড়ো হলে যা হয়, জেনি পাগলেব মতো উপত্যকাব ভেতব ঢুকে গেল। কাশেব জঙ্গল বলে খালি পায়ে থম্পসন ভেতবে যেতে পাবছে না। ঘাসেব খোঁচা লাগছে। দু একটা জায়গা কেটেও গেছে। থম্পসন বলল, আর যাবে না।

কিন্তু কাব কথা কে শুনছে? ওব পায়ে বাবাবেব শু। সে সহজেই কাশেব উপত্যকা পাব হয়ে যাচ্ছিল। বিচার্ডেব কথা যদি সত্যি হয়, তবে ঠিক কোনও ঘোবে ফেব পড়ে গেছে জেনি। না হলে এভাবে কেউ এগিয়ে যায় না। থম্পসন ইচ্ছে কবেই বিকট চিৎকাব কবে উঠল, জেনি যাবে না। ওদিকে কিছু নেই। এইমাত্র যেন কেউ দৌড়ে গেল ঢিবি পাব হয়ে।

কোনদিকে।

ওই যে দেখছ, দ্যাখো না!

জেনি লোভে পড়ে ফিরে এলে বলল, এসো। আর যাবে না।

আপনি যে বললেন।

বলতে পারো মিথ্যে কথা বলেছি। না হলে তোমাকে ফেরানো যেত না।

তারপর কেমন ধমকের গলায় বলল, অত উতলা হবে না। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। একদিনও যায়নি। তোমরা এমন আরম্ভ করেছ যে কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। সে যদি রাতে এসে থাকে, আজও আসবে। বরং আজ আমাদের দিনের বেলাটা তাঁবুতেই থাকা উচিত। রাতে চারজনই জেগে থাকব। কেউ ঘুমোব না।

ফিরে এসে থম্পসন বলল, যদি জেনির কথাই সত্যি হয় রিচার্ড, তবে বনের ভেতর ঢুকে আর কাজ নেই। বরং সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটো। খাও-দাও। ঘুমোও। রাত দশটার পর সবাই একসঙ্গে জেগে থাকা যাক। যদি সে সত্যি আসে।

আর্চি খুব খুশি। বলল, সেই ভাল।

রিচার্ড বলল, যখন বলছেন তাই হোক।

চার

দ্বীপের সকালটা যথার্থই মনোরম। অনেক দূরে মাঝ-সমুদ্রে সব বড় বড় ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে। দুটো-একটা পাখি উড়ে এসে ঢেউয়ের মাথায় বসে থাকছে। যতক্ষণ না ঢেউটা বালিয়াড়িতে এসে আছড়ে পড়ছে পাখিটা নড়ছে না। কী করে টের পায় এবারে ঢেউটা ভেঙে বালিয়াড়িতে নীল চাদরের মতো ছড়িয়ে পড়বে। তার আগে উড়ে যায় এবং অন্য ধাবমান ঢেউয়ের মাথায় গিয়ে বসে পড়ে। বেশ খেলাটা জমে উঠেছে পাখিদের। বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে জেনিফার। ওর চুলে রিবন বাধা। পোশাক খুবই সামান্য। সাদা ব্রেসিয়ার, কারুকাজ করা জাঙ্গিয়া। ক্যাবটের সঙ্গে যে কতবার কত বিচে এভাবে শুয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর রঙিন ছাতা, নীচে পাতলা টিনের চেয়ার টেবিল, বিয়ার, কিছু কাজু বাদাম। একসঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে কত গভীরে চলে গেছে দু'জন, আবার ভেসে উঠেছে। এবং এমন কত বিচিত্র ঘটনা ক্যাবটের সঙ্গে তার জড়িয়ে আছে। কিছুতেই কিছু ভোলা যায় না।

সে বালিয়াড়িতে চিত হয়ে শুয়ে আছে। একটু দূরে রিচার্ড, আর্চি সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটছে। বাঁ দিকে কিছু বড় পাথরের চাঁই। অদ্ভুত গড়ন। ওপরে বেশ আরামে চুপচাপ নিশিদিন বসে থাকা যায়। পর পর এমন সব পাথর সমুদ্রে এবং বালিয়াড়িতে অজস্র। যে কোনো পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে পোশাক খুলে ফেলতে পারে। এবং সকলে যে যার মতো সেইসব দূরের পাথরগুলোর আড়ালে চলে গেছিল। থম্পসন তাঁবুতে দুপুরের খাবার তৈরি করছে। থম্পসনই ওদের ছুটি মঞ্জুর করেছে। বলে দিয়েছে, ওরা কে কতটা দূর একা একা যেতে পারে একবার দেখা যাক।

জেনি চুপচাপ শুয়ে আছে। আকাশের সঙ্গে সে তার ডোভারে ফেলে আসা আকাশটার মিল খুঁজে পায়। সমুদ্রের সঙ্গেও একটা মিল আছে। বালিয়াড়ি এবং ক্রমে সব দ্বীপটাই মনে হল, কোথাও না কোথাও সামান্য মিল রেখে দিয়েছে। কেবল ঢেউয়ের ওপর পাখিদের এই খেলাটা জীবনে ও দেখেনি। সে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। যদি ক্যাবট এসে একসময় পাশে বসে পড়ে। এমন সব রোমহর্ষক কল্পনা করতেও তার ভাল লাগছে। যদি সমুদ্রে ডুব দিয়ে সহসা ভেসে ওঠার মুখে দেখতে পায়, দূরে ক্যাবট নেমে আসছে এবং জেনির যে কী হয়েছে, আজগুবি সব ভাবনা ধীরে ধীরে মগজে গেঁথে যাচ্ছে। যত গেঁথে যাচ্ছিল, তত অস্থির হয়ে উঠছে।

অথচ দ্বীপে পৌঁছানোর আগে জেনিই ছিল থম্পসনের এক নম্বরের পরামর্শদাতা। এখানে আসার আগে সে এ ব্যাপারে খুব একটা হইচই করাও পছন্দ করেনি। ইচ্ছে করলেই কাগজগুলোতে ফলাও করে অভিযানের কথা লিপিবদ্ধ করে আসতে পারত। অভিযানে যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের ছবি ছাপাতে পারত। আর্চির এমন একটা ইচ্ছে খুবই ছিল। শেষ পর্যন্ত জেনির পীড়াপীড়িতে হয়ে ওঠেনি

সে গোপনেই যেতে চায়। সঙ্গে থাকছে বাবার সিনিয়র সেক্রেটারি থম্পসন, যমজ ভাই রিচার্ড এবং আর্চি। দু'-একটা কাগজ ইতিমধ্যেই কী করে টের পেয়ে ছেঁকে ধরেছিল জেনিকে। জেনি বলেছে, আপাতত আমরা নিউ-ক্যাসেলে বেড়াতে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে কি না দ্বীপে ঠিক নেই। মিথ্যে খবর ছাপিয়ে শোরগোল তুলতে একদম রাজি না।

থম্পসন জেনির মতে সায় দিয়েছিল। জেনির ইচ্ছানুযায়ী ওরা সোজা প্লেনে সিডনি এসেছে। তারপর রেলে নিউ ক্যাসল। কোথায় বোট ভাড়া পাওয়া যায়, সিম্যান-হাউসগুলোয় খোঁজখবর, থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত, জেনি প্রায় সবটাই দেখেশুনে করেছে। বোট ভাড়া নিয়ে ক্রিপসো কোম্পানির সঙ্গে দর কষাকষি করতেও ছাড়েনি। স্টিভেডর বোজাবিওর কাছ থেকে ফর্দমতো সব চেক করে তুলেছে জেনি। কিছুতেই কোথাও এতটুকু ভুল করেনি। দ্বীপগুলো সম্পর্কিত কিছু ভূ-বিজ্ঞানের বই সিডনির পিগমিলান হাউজ থেকে কিনেছে। কিছু চার্ট-ম্যাপ সে জোগাড় করেছিল, লন্ডনের সালসবেরি থেকে। তারা যখনই সিডনি অথবা নিউ-ক্যাসেলে বিকেলে বেড়াতে বের হয়েছে, আরও কোনও খবর সংগ্রহ করা যায় কি না ভেবে ক্যাটালগ সব চেয়ে নিয়েছে। নিউ-ক্যাসেলের রেলইয়ার্ডের পাশে মোটর-বোট কোম্পানিরও খোঁজ এনেছিল জেনি। জেনির পরামর্শ মতোই, সস্তাদামে বোট ভাড়া করে জাহাজে তুলে ফেলা হল। মাঝ রাস্তায় ওরা বোট থেকে নেমে যাবে ঠিক থাকল। এবং জাহাজ যখন ওসানিক দ্বীপপুঞ্জমালা থেকে বোঝাই হয়ে ফিরবে, তখন ওরা মাঝ-সমুদ্রে ফের বোট ভাসিয়ে চলে আসবে। তারপরে উঠে যাবে জাহাজে। আসা-যাওয়া, মাল বোঝাই-এর ফাঁকে সময় মাত্র বিশ বাইশ দিন। বিশ বাইশ দিনে সব দ্বীপগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে। জেনি সেই মতো থাকার তাঁবু, আহার, কার কতটা দরকার হবে হিসেব করে নিয়েছে। সেই জেনি দ্বীপে আসতে না আসতেই গোলমাল বাধিয়ে বসছে। থম্পসন যেন সামান্য বিপাকেই পড়ে গেছে জেনিকে নিয়ে। সে তাঁবুর ভেতর বসে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছিল না। মাঝে মাঝে বাইরে এসে দেখছে, জেনি আছে কি না। কোথাও আবার না চলে যায় একা একা।

জেনি তখন ধীরে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছিল। অনন্ত উদার আকাশের নীচে সমুদ্রে জেনিকে সত্যি নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। মেয়েটাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন। বালিকা বয়সে কর্তার ভারী ন্যাওটা ছিল। এখনও কর্তা তাকে অফিসে পর্যন্ত নিয়ে আসত। পাখির পালকের টুপি পরতে তখন ভালবাসত মেয়েটা। সব কিছু জানার আগ্রহ ছিল খুব। চেম্বারের দরজা খুলে বলত, মে আই কাম ইন! থম্পসন ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিত, আদর করত। একটু বয়স হতেই আর দেখা যেত না। কলেজের দিনগুলোতে জেনির সেই চঞ্চলতা আর ছিল না। নিজের ভেতর কেমন মগ্ন হয়ে থাকার স্বভাব গড়ে উঠেছিল। আসলে পালিয়ে পালিয়ে বোধহয় তখনই চুটিয়ে প্রেম করছিল ক্যাবটের সঙ্গে। মনে আছে ক্রিসমাসের কী একটা ফাংশানে প্রথম সবার সামনে ক্যাবটকে নিয়ে সে আসে। খুব সুন্দর এবং সুপুরুষ যুবক। জেনির নির্বাচন দেখে থম্পসন খুশিই হয়েছিল। যদিও পরে কর্তার গোসা এই নিয়ে। জেনির এই রুচিকে তিনি পছন্দ করেননি।

হাই প্যানে ওনিয়ন পুড়ে যাচ্ছে। থম্পসন ফের ভেতরে ঢুকে গেল। আর ওরা ফিরে আসতে না আসতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। আকাশ কত অল্প সময়ে ভার হয়ে যায়, বৃষ্টি আসে দ্বীপগুলোতে না এলে বিশ্বাস করা যায় না। ঝোড়ো বাতাস নেই। কেমন দম বন্ধ ভাব। আর অঝোরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। ওরা তিনজনই বৃষ্টির জলে ভাল করে গা ধুয়ে নিল। এবং আকাশ পরিষ্কার হতেও সময় লাগল না। আর্চি খেয়ে উঠে সিগারেট ধরাতে বাইরে বের হয়ে বলল, আকাশ আবার পরিষ্কার। চাঁদ উঠে গেছে।

তাঁবুর চারপাশে নালায় জল জমে আছে। বালিতে জল শুষে নেবার কথা। অথচ সবটা জল শুষে নেয়নি, একটা ফড়িং নালায় জলে পড়ে আর উড়তে পারছে না। আর্চি বেশ মজা উপভোগ করছিল ফড়িংটার কাণ্ড দেখে।

রিচার্ড বলল, এখন লম্বা ঘুম।

আর্চি বলল, কী আরাম!

বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা কমে গেছে। ওরা যে যার তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল। থম্পসন জলচৌকি বের

করে আনল বাইরে। তাঁবুর দাওয়ায় বসে দ্বীপটার কোন দিক থেকে খোঁজা আরম্ভ করা যাবে ভাবনা-চিন্তা করতে থাকল।

লম্বা ঘুম দিয়ে রিচার্ড যখন তাঁবুর বাইরে এল, তখন বেলা পড়ে গেছে। দ্বীপের গাছপালা বালিয়াড়িতে লম্বা ছায়া ফেলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সব পাখি উড়ছে দ্বীপটার মাথায়। উড়তে উড়তে গোল হয়ে যাচ্ছে। তারপর সরলরেখার মতো একটা লম্বা ছায়া ফেলে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিনটা সাংঘাতিক বড় মনে হচ্ছে জেনির কাছে। কতক্ষণে রাত হবে, রাত হলে ক্যাবট নিশ্চয়ই আজও আসবে। তারপরই মনে হল, যদি ক্যাবট না হয়, অন্য কেউ হয়, কিন্তু গলার স্বর তো ঠিক ক্যাবটের মতো। সে বালিয়াড়িতে পায়চারি করছিল। থম্পসন যখনকার যা, দিয়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে সামান্য মদও দেওয়া হল। রাতে নিরামিষ। সজাগ থাকা, সতর্ক থাকা, যতটা সম্ভব মাতলামো পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। সন্ধ্যার সময় ওরা দিগন্তে বড় রকমের একটা নক্ষত্র দেখতে পেল। তারপর নিপুণ এক কারিগর তুলিতে বুলিয়ে দিল সামান্য অন্ধকার। পশ্চিমের সমুদ্রে লাল আভা মরে যেতে না যেতেই তৃতীয়ার চাঁদ দ্বীপের মাথায় উঠে এল। হালকা মসলিনের মতো জ্যোৎস্না। এখন যে কোনও পঞ্চম ব্যক্তিই এ দ্বীপে হঠকারী। ওরা চুপচাপ বসে থাকল না। আগুনটা আরও বড় করে জ্বেলে দিল। যেন দু'-তিন মাইল পর্যন্ত আলোটা কোনও সভ্য মানুষের হাতছানি। দ্বীপে কেউ যদি সত্যি থেকে থাকে, যদি সভ্যতায় ফিরে যেতে চায়, আলো দেখেই সে ছুটে আসবে।

আর্চির সেই কটুবাক্য আবন্ত হয়ে গেছে ফের। রাতে মদের পরিমাণ কম দেখেই বোধহয় মাথা খারাপ।

আচ্ছা জেনি, তোমার কি কখনও বিশ্বাস হয়?

হয়।

দু'দিন তো পার করলে। ক্যাবট থাকলে আসত না!

জেনি কোনও ভূমিকা বাদেই বলে ফেলল, রাতে এসেছিল।

কে এসেছিল?

সে।

রিচার্ড, তোমার বোন পাগল হয়ে যাচ্ছে, আমি কিচ্ছু জানি না।

থম্পসনের ভাল লাগল না কথাটা। সে বিরক্ত হয়েই বলে ফেলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

এসেছিল আপনারা কেমন আছেন বুঝি জানতে!

থম্পসন বুঝতে পারল আর্চিও ঠাট্টা করছে রাগে পেয়ে।

জেনি বলল, থম্পসন, আপনি কিছু মনে করবেন না।

আরে, না না।

কিছুক্ষণ পর আর্চি বিরক্ত হয়ে উঠে যাচ্ছিল। তারপর তাঁবুতে গিয়ে শুয়েও পড়েছিল। রিচার্ড ছুটে গিয়েছিল টেনে তুলবে বলে। থম্পসন বাধা দিল। বলল, কী হবে জাগিয়ে? তোমাদেরও মনে হয় ঘুম পাচ্ছে। গিটারটা নিয়ে এসো না বাজাই।

গিটার এনে দিলে বুড়ো থম্পসন বেশ কায়দা করে নাচতে থাকল আর গাইতে থাকল। জেনি হেসে ফেলেছিল, থম্পসনের কাণ্ড-কারখানা দেখে। তবে থম্পসন কি বুঝতে পেরেছিল, দিন যত যাচ্ছে জেনি বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে? আর্চি তো পায়ের ছাপের কথা বিশ্বাসই করল না। এহেন সময়ে আর কী করা যায়! রিচার্ড আর জেনি মিলে ডুয়েট গাইতে থাকল। আর্চি এবার বাইরে এসে হাতজোড় করে বলল, ঘুমোতে দাও, প্লিজ, একটা মানুষ এখনও সুস্থ আছে দ্বীপে, না ঘুমোতে দিয়ে তাকে আর পাগল করে দিয়ো না। দোহাই তোমাদের ঈশ্বরের।

ওরা সবাই আরও জোরে গাইতে থাকল।

আর্চি বলল, চললাম!

যাও না।— রিচার্ড গলা বাড়িয়ে বলল।

যাব। ঠিকই যাব।— বলে সে জেনির দিকে তাকাল।

জেনি, তুমি তো ওদের মতো অবুঝ নও। তুমি কেন এখনও না ঘুমিয়ে আছ?

কোনও কথা নেই। ওরা তিনজন নাচছে। যেন এখানে এমন একটা রাতে কেউ সত্যি বাজনার মতো চলে আসবে অথবা যাতে ঘুম না পায়, বোধহয় যে-কোনও ভাবে সতর্ক থাকছে।

আর্চি এবারে খুব বুদ্ধিমানের মতো বলল, হল্লা করলে শিকার থোড়াই জুটবে। সে তো তোমাদের মতো আর বুদ্ধু নয়।

রিচার্ড বলল, আর্চি, রাত বেশি হয়নি। তুমি অযথা চিল্লাচ্ছ। ঘুমিয়ো না বলছি। ঘুমোলে তোমাকে ফেলে পালাব।

আর যায় কোথায় বাছাধন। যত থম্পসন বলে, এবার আমাদের খুব সতর্ক হয়ে যেতে হবে কারণ রাত দশটা বেজে গেছে, যদিও দ্বীপে রাতের কোনও পরিমাপ নেই, কিন্তু গভীরতা রাতের টের পাওয়া যায় পশুপাখির বিচরণ দেখে, ডাক শুনে। সুতরাং এ সময়ে হয়তো সে বেড়াতে বের হয়।

থম্পসন বলল, আর্চি, তোমার তো জেগে থাকার কথা না।

আর্চি আমতা আমতা করে বলল, আপনারা জেগে থাকবেন, আমি কী করে এক যাত্রায় পৃথক ফল ভাল না।

রিচার্ড হা হা করে হেসে উঠল।

তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে গেছে। কোনও শব্দ নেই। ওরা সতর্ক হয়ে গেছে খুব। জেনি টিনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। দু'দিনেই কী করে কিছু কীট-পতঙ্গ এসে হাজির হয়েছে এখানে। আলোতে ওরা উড়তে উড়তে জেনির মাথায় শরীরে বসে যাচ্ছে। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে কেউটা কি ঠিক সত্যি এসেছিল তো, স্বপ্নে এমন কিছু দ্যাখেনি তো। সবার দুর্ভোগের জন্য সেই দায়ী। নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হচ্ছে। থম্পসনের আন্তরিকতায় কখনও ভারী লজ্জিত কখনও মুগ্ধ। আর ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে।

সারারাত ওরা জেগে শেষরাতের দিকে প্রথমে রিচার্ড, তারপর থম্পসন আর্চি এবং শেষে জেনি ঘুমোতে গেল ভেতরে। কেউ পাহারায় থাকল না। দ্বীপে কেউ থাকলেও এদিকে আসবে না। আসতে সাহস পাবে না। রোদ উঠলে হঠাৎ থম্পসন জেনির তাঁবুর কাছে ছুটে গিয়েছিল। বলেছিল জেনি, আমরা যখন গতকাল দ্বীপে গেছিলাম তুমি কাউকে দেখেছিলে।

হ্যাঁ সে তো আর্চি।

স এবার আর্চিকে ডেকে তুলে বলল, তুমি ওদিকে যে কাশফুলের উপত্যকা আছে কখনও গেলে?

না গেলে যাব না? আপনারা বনের ভেতর চলে যাচ্ছেন, কিছু হলে? ওদিকটায় গিয়েছিলাম বই কী।

থম্পসন বলল, বৃষ্টি হয়ে গেছে। না হলে দেখা যেত খালি পায়ের ছাপ, না জুতোর ছাপ।

জেনির দিকে তাকিয়ে বলল, মনে করতে পারছ?

যতদূর মনে করতে পারছি জুতোর দাগ।

এবার আর্চির জুতোর ছাপ স্পষ্টই বোঝা গেল। জেনি ঘোরের ভেতরই পড়ে গেছিল। অযথা এত চিন্তায় খুব দরকার নেই। তা ছাড়া ওরা তো দ্বীপটা সম্পর্কে মোটামুটি সবরকমের খবরই নিয়ে এসেছে। এমন কোথাও দ্যাখেনি যে দ্বীপগুলোতে হিংস্র প্রাণীর বাস আছে, বিষধর সাপ আছে, অথবা আদিবাসীও কিছু নেই। যদি শুধু একজনই হয়, তবে দেখা যাক না খুঁজে, যদি সে থাকে একদিন না একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে। না দেখা হলেও ভাববার কিছু নেই। আর্চিকে বিয়ে করার আগে জেনির কিছুটা সান্ত্বনা থাকবে। দ্বীপে বিশ-বাইশ দিন থাকা নিতান্ত বিফলে যাবে না।

সংশয়টা তবু একেবারে গেল না। কারণ দ্বীপের অস্পষ্ট হাঁটা পথ অথবা গাছে-গাছে কিছু লিপি দিক থেকে থম্পসনকে এখনও সামান্য বিড়ম্বনার ভেতর রেখেছে। সকালে সে সবাইকে নিয়ে বেরিয়েছিল বোটে ঘুরে দেখবে দ্বীপটা। দ্বীপটার সংলগ্ন আরও সব ছোট ছোট দ্বীপ আছে, সেখানেও যাবে। কিন্তু যাবার সময় একেবারে তাঁবু খালি রেখে যেতে পারল না। রিচার্ডকে পাহারায় রেখে ওরা ভেসে গেল। দ্বীপটা সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখল। দক্ষিণ দিকে খুব উঁচু সব পাথরের দেয়াল, পাহাড়ের মতো একেবেঁকে চলে গেছে। সেখানে উঠে কেউ দাঁড়ালে সমুদ্রের অনেক ভেতর পর্যন্তও স্পষ্ট দেখার কথা। ওরা কিছুই দেখল না। পশ্চিম দিকটাতে বসবাসের জায়গা থাকতে পারে।

ওরা একটা ছোট দ্বীপে নেমে দুপুরের আহার সেরে নিল। যেহেতু বালি অথবা পাথরময় জায়গা, খুব ঘন জঙ্গল হতে পারেনি। অনায়াসে ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে যাওয়া-আসা যায়। একটা দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে সময়ও বেশি লাগে না। বোটেরও খুব দরকার হয় না। জোয়ারের সময় ডুবে যায়, আবার ভাটার সময় জেগে যায় চারধারেব জায়গাগুলো।

যত ওবা ঘুবে ঘুরে দেখছে তত সাহস বেড়ে যাচ্ছে। এক ধরনের অতিকায় প্রজাপতি দেখতে পেল একটা দ্বীপে। দুটো-একটা প্যাংগোলিন, এক রকমের পাখি দেখল চকরাবকরা, ওরা সবুজ বনভূমিতে কুটির নির্মাণ করে থাকে। পাতার তৈরি খুব ছোট ঘর, বিচিত্র ফুল চালে গোঁজা—এমন সব অদ্ভুত পাখিদের খবর ওরা আগেই পড়ে জেনেছে। না হলে, ছোটখাটো কোনও লিলিপুট শ্রেণির লোক এখানে হয়তো বসবাস করছে এমন ভাবতে পারত।

আর যা আছে, সেই অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপদের আনাগোনা। ওদের দেখেই ঝুপঝাপ জলে পড়ে যাচ্ছে। গাছের ডালে পাখিদের বাসা। তাদের বিচিত্র কলরব দ্বীপগুলোকে খুব তাজা রেখেছে বোঝা যায়। জেনি ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। বড় দ্বীপটাতেই ভাল করে খোঁজা দবকার। আর যেটা সবচেয়ে বেশি ভাবনার কারণ হয়েছে, দ্বীপে ক্যাবট অথবা অন্য যে-কেউ থাকুক না কেন, ওদের আগুন দেখে, অথবা আর্চিব ছেলেমানুষি বন্দুক ছোঁড়া দেখে টের পাওয়া উচিত, লোকগুলো উদ্ধারকারীর ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু তিনদিনেব মাথায়ও যখন কিছু ঘটল না, তখন নিশ্চিতই জেনি ঘোবে পড়ে ক্যাবটকে দেখেছে। আসলে মাথাটাই গোলমাল কবছে তার।

পাঁচ

তাঁবুতে ওবা ফিরে এল বিকেলেব দিকে। দুটো খবগোশ শিকার করেছে আর্চি। সে বালিয়াড়িতে নেমেই ছাল-চামড়া তুলে লোহাব বড়ে গেঁথে আগুনে সেঁকতে বসে গেল। খুব খুশি আর্চি। মাঝে মাঝে জেনিকে বলেছে, বাকি ক'টা দিন শুধু শিকার আর জ্যোৎস্নায় বসে মাংসের রোস্ট, দামি মদ, বেশ একটা ভ্রমণে বেব হওযাব মতো এবং উপভোগ করার সামিল।

বড় লোভী দেখাচ্ছিল আর্চিকে। সে একফাঁকে বিয়ের উৎসবে কী ধরনেব মেনু করার দবকার জেনিকে জিজ্ঞেস কবে জানতে চাইল।

জেনি খুব উদাস। সে শুনছে না. টিনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সমুদ্রে কিছু ডলফিন বোটেব মতো গা ভাসিয়ে রেখেছে। থম্পসন আগামীকাল দ্বীপটার কোনদিকে যাওয়া হবে তার মোটামুটি একটা চার্ট তৈবি করছে। সে তার গুরুদায়িত্বের কথা ভুলতে পাবে না। শেষ পর্যন্ত দেখা হবে। জেনিকে ম্রিয়মাণ দেখলে খুবই খারাপ লাগে।

সে কথায় কথায় বলছিল, বুঝলে জেনি, আগামীকালই সেই পথটায় যাব। ভেবো না।

জেনি বলল, কিন্তু থম্পসন, ক্যাবট যদি সত্যি থাকত, না এসে কিছুতেই পারত না।

মানুষের স্বভাব কখন কী ভাবে পাল্টে যায় কেউ বলতে পারে না, জেনি; দ্বীপে থেকে থেকে সে হয়তো তার পুবনো কথা সবই ভুলে গেছে। সে হয়তো আসলে বন্য হয়ে গেছে। সভ্যতার লাগাম সে তো শুনেছি কোনওদিনই পবতে চাইত না।

জেনি উঠে এসে থম্পসনেব সামনে দাঁড়াল।

অবশ্য ক্যাবট প্রায়ই সমুদ্রের আশ্চর্য সব দ্বীপের গল্প করত। একবার মনে আছে, ও বলেছিল—

থম্পসন অধীব আগ্রহে তাকিয়ে আছে যদি কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু জেনি কিছু না বলে ফিরে যাচ্ছে।

সে ডাকল, জেনি।

জেনি বলল, ওটা তো কথাব কথা। ওই কথাব কোনও মানে থাকতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।

কী বলেছিল?

জেনির ম্লানমুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল।

বড়ই অবুঝ ছিল ক্যাবট, কখনও-কখনও ওর ছেলেমানুষিতে আমি খুব অবাক হতাম। ক্যাবট বলত, কত সব দ্বীপ আছে, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের কোথায় কত রকমের দ্বীপ আছে, সব বর্ণনা দিত! বলত, এখানে আর মানুষ থাকতে পারবে না। ভেবেছি তোমাকে নিয়ে একটা নির্জন দ্বীপে চলে যাব। তারপর...

তারপর কী?

তারপর ওর ইচ্ছে ছিল...

কী ইচ্ছে ছিল?

সেসব বলা যায় না।

থম্পসন জানে, ক্যাবট ওই ধরনেরই মানুষ। নাবিকদের এমনই স্বভাব হওয়ার কথা। সে আর জেনির কথায় বেশি গুরুত্ব দিতে চাইল না। বরং ঢিলেঢালা মেজাজ রোস্টের গন্ধ পেয়ে সহসা তাজা হয়ে গেল। নাক টেনে বলল, গ্র্যান্ড। আর্চিকে আমাদের এজন্যই ভাল লাগে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি হাজির করার মতো বিষয়বুদ্ধি একমাত্র আর্চিই রাখে। সে আর্চির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

জেনি বুঝতে পারছে নিয়তিতাড়িত রমণী সে। আর্চি ব্যতিরেকে কোনও গত্যন্তর নেই। আর্চি এমনিতে ভীষণ সুপুরুষ, যেমন লম্বা তেমনি শক্ত-সমর্থ মানুষ। কেবল মুখের আদলে কথায় বার্তায় সামান্য বোকামি আছে। ওটা না থাকলে ক্যাবটের চেয়ে সে খুব একটা ফ্যালনা হত না।

জেনি এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে যেতে থাকল। সে একা একা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। গাছের ছায়ায় কিছু দূর হেঁটে যেতে ওর কষ্ট হল না। থম্পসন অথবা রিচার্ড দেখছে, জেনি ক্রমশ মনমরা হয়ে যাচ্ছে। অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই। আবার ঠিক ফিরে আসবে। ঘুরে ফিরে যদি দেখতে চায় দেখুক।

যখন দ্বীপে আবছা মতো অন্ধকার নেমে এল, দেখা গেল, জেনি একা একা ফিরে আসছে। আর্চি চারটা রোস্ট বড় প্লেটে ভাগ ভাগ করে রেখেছে। জেনি এলেই খেতে বসে গেল। জেনি যে অনেকক্ষণ কাছাকাছি ছিল না রোস্টের গন্ধে টেরই পায়নি।

ছয়

বেশ নির্বিঘ্নে রাতটা কেটে গেল তাদের। খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল রাতে। পর্যাপ্ত মদ গিলেছিল আর্চি। রিচার্ডও সামান্য মাতাল হয়েছিল। থম্পসন পরিমাণ মতোই খাচ্ছে। জেনি প্রায় কিছুই খায়নি। সবাই বেশ ঘুমিয়েছে। অনেক দিন পর গভীর ঘুম। উঠতে উঠতে আর্চির বেলা হয়ে গেছে। থম্পসন বোটে চলে গেছে। রিচার্ড ফিরে আসছে। জেনি কিছু দূর হেঁটে গেল। প্রথমে কাঁটাঝোপ, পরে ঝোপ জঙ্গল এবং কিছু গাছপালার ভেতরে ঢুকে গেলে কেউ আর জেনিকে দেখতে পাবে না। সে একটা নিরিবিলি গোপন জায়গা চায় এখন। সে ভেতরে ঢুকে বালিয়াড়ির দিকে তাকাল। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। এদিকটায় সে কখনও আসেনি। তার বসে পড়তে এতটুকু সংকোচ হল না। সে ডালপালার ফাঁকে দেখল বোট থেকে রিচার্ড ও আর্চি কী বয়ে আনছে। বোধ হয় জলের পিপে। চারপাশটা ঘুরে দেখার শখ দিন দিন বেড়ে উঠছে। কী প্রবল ঢেউ বালিয়াড়িতে। পাশের বড় বড় পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর তার সাদা ফেনা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আকাশে উড়ছে। এবং অতীব এক নির্জনতা। ক্যাবট সব সময় এমন নির্জন জায়গা পছন্দ করত। বলত, কী আরাম, তুমি আর আমি। পোশাকের বাহুল্য থাকবে না। সেই প্রথম মানব-মানবীর মতো দ্বীপে ঘোরা-ফেরা করব। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই।

ওর ভারতীয় বন্ধুটিও তাই। ক্যাবটের কথায় সায় দিয়ে বলত, সমুদ্রে কোথাও ছোট্ট দ্বীপ-টিপ দেখলে আপনাদের কথাই মনে হয়। আমরা আছি, আপনারা নেই ভাবতে বড় খারাপ লাগে।

চ্যাটার্জি ওদের পরিবারে ছিল নিজের মানুষের মতো। ভীষণ লাজুক। স্ত্রীর কথায় মানুষটা ভারী লজ্জিত হয়ে যেত।

জেনির কাছে ওদের দু'জনেরই ছবি আছে। যতই ওরা বন্য হয়ে যাক, ছবি না থাকলেও সে ঠিক ঠিক চিনতে পারবে। কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

কিছুটা দূরে এসে জেনি হঠাৎ দেখল দ্বীপটা ক্রমে সিঁড়ির মতো নেমে গেছে। মনে হচ্ছে ভেতরে নীল জলের একটা হ্রদ আছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কেমন ঝিলমিল মরীচিকার মতো ভেসে যাচ্ছে, কখনও দলে দলে মানুষের মিছিল ভেসে যাচ্ছে মনে হয়, কখনও মনে হয় ওরা সব সেই প্রাচীন গন্ধ-হরিণের পাল, কেবল ধেয়ে যাচ্ছে। মরীচিকার বোধহয় কোনও মায়া থাকে। কেবল ভেতরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে। কী সব হলুদ বন। সেদিনের মতো এতটুকু অগম্য নয়। সহজেই পাথর লাফিয়ে ঘাস মাড়িয়ে ভেতরে চলে যাওয়া যায়। সে বুঝতে পারছে না, সেদিন তবে ওরা কোন দিকটায় গিয়েছিল! বোধহয় এটাই দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবার বন। দূরে দূরে ঘন সবুজের ছায়া। সেই প্রাচীন পাথরের ঢিবি একটাও নেই। কেবল মনে হচ্ছে সামনে অসংখ্য দারুচিনি গাছ। এভাবে তার হেঁটে যেতে যেতে কেমন নেশায় পেয়ে গেল। দ্বীপটা সত্যি বড় নিরীহ। সত্যি বিশাল কোনও সাপখোপ নিয়ে সে ভয়াবহ হয়ে নেই। সেই অসংখ্য কচ্ছপ পাথরের ফাঁকে অথবা মাটি পেলেই ডিম পেড়ে সমুদ্রে নেমে যায়। কচ্ছপের ডিম খেয়েই দু'জন মানুষ এই দ্বীপে অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। দূরে দূরে যেসব বনজঙ্গল আছে সেখানে আছে নানারকমের ফলের গাছ। নারকেল গাছও দুটো-একটা যেন দেখতে পেল। পায়ে পায়ে খরগোশ। এক রকমের বাঁদর ডালপালাতে, গায়ের রং সবুজ। কোথাও ঠিক ঝরনা থেকে মিষ্টি জল, খরগোশ, কচ্ছপের ডিম, উড়ুক্কু মাছ এবং সে বই পড়ে আরও জেনেছে জোয়ারের সময় বড় বড় গলদা চিংড়ি জলজ ঘাসের সঙ্গে দ্বীপের চারপাশে ভেসে আসে। আর আলো জ্বালবার জন্য শঙ্খ মাছের চর্বি জমিয়ে রাখলেই হয়ে গেল। ওরা তখন পৃথিবীর যে কোনও প্রাচীন সম্রাটের চেয়ে ধনী। থম্পসন, রিচার্ড যতই নিরাশ হয়ে পড়ুক, সে আশা ছাড়ছে না।

চারদিনের মাথায় সাতসকালে আর্চি আর রিচার্ড জল রাখার পিপেগুলো বোট থেকে নামিয়ে রেখেছে কেন সে বুঝতে পারছে না। জাহাজ থেকে সঙ্গে প্রচুর জলও এনেছে। যদি দ্বীপে শেষ পর্যন্ত কোথাও জল পাওয়া না যায়। তা ছাড়া কেমন জল, বিষাক্ত কি ভাল, তারা ঠিক জানে না। শুকনো খাবার কম পড়বে বলে মনে হয় না। কর্নড বিফের টিন পর্যাপ্ত। টিন-ফিশ আছে। চিজ বাটার, পাউরুটি কী নেই সঙ্গে! এগুলো অবশ্য তার ভাবনার নয়। থম্পসনই দেখছে। কিন্তু থম্পসন এভাবে নিরাশ হয়ে পড়লে সবকিছুই অর্থহীন। প্রচুর জল, আহার, মদ থাকল কি গেল তার আসে যায় না।

সহসা খস খস শব্দে সে চমকে পেছন ফিরে তাকাল। কিছু নেই। হাওয়ায় গাছের ডালপালায় সামান্য গুলঞ্চ ফুলের লতা দুলছে। সে আবার ফিরে যেতে পারবে কি না দেখার জন্য কিছুটা পেছনে আসতেই বালিয়াড়ি তেমনি ভেসে উঠল চোখে। সে কিছুদূর ঢুকেই পর পর চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। সহজেই সে চিহ্নগুলো দেখে বুঝতে পারবে কোথায় কোন দিকে যাওয়া দরকার।

সকালে থম্পসন কাজ করে যাচ্ছে আর আর্চিকে খেপাচ্ছে। জেনি বনটার ভেতর সেই কখন গেছে এখনও ফিরছে না। আর্চি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। এমন মুখ দেখলেই থম্পসনের হা হা করে হাসতে ইচ্ছে করে। আর্চি একেবারে কাজে মন দিতে পারছে না। সে মাঝে মাঝেই বনটার দিকে তাকাচ্ছে। জেনি কেন যে কিছুটা জল ভেঙে দ্বীপের ওদিকের বনটাতে উঠে গেল। সোজা উঠে না গিয়ে অতদূর যাবার কী দরকার! গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরে যাচ্ছে জেনি। কখনও জেনির পা দেখা যাচ্ছে, কখনও শরীর আবার শুধু গাছপালার ফাঁকে মুখ। তার পর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনই আর্চির মুখ ফ্যাকাসে। এটা যে কী করছে জেনি! থম্পসনের সঙ্গে কাজে হাতও মেলাতে পারছে না আর। তবু করে যেতে হয়। কাজ করছে আর গজ গজ চলছে সারাক্ষণ মুখে।

না, এটা ঠিক না। এভাবে একা একা হেঁটে যাওয়া ঠিক না। দ্বীপটার যতই ভালমানুষি থাকুক।

শেষ পর্যন্ত সে আর পারল না। চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে জেনি যে দিকে গেছে ছুটে গেল।

জেনি, ডার্লিং, প্লিজ ওদিকে যাবে না। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বের হব। তুমি ফিরে এসো।

কোনও সাড়া নেই। খুব সাহসও নেই ভেতরে ঢোকার। তবু সে কিছুটা ভেতরে ঢুকে ডাকছে, জেনি ফিরে এসো। পথ হারিয়ে ফেলতে পারো।

কী এমন আছে, জেনি দেখে বেড়াচ্ছে। এগুলো খুব বাড়াবাড়ি মনে হয় আর্চির। এর জন্য মাঝে মাঝে সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। জেনি সেই যে জঙ্গলের দিকটায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর দেখা যাচ্ছে না। বোকার মতো জেনি যে এটা কী করছে। যতই থম্পসন বলুক, বিচার-বিবেচনায় কিছুই থাকার কথা নয় কেবল কিছু শব্দ গাছে গাছে, কে কবে এসে গেছিল, আবার চলেও যেতে পারে, চলে যাওয়াই স্বাভাবিক, সুতরাং পুতু পুতু করার কিছু নেই। পুতু পুতু করার কিছু নেই মোটেই যে ঠিক, কে বলবে। কেউ যে সত্যি নেই তারই বা ঠিক কী। বোকার মতো জেনি যে এটা কী করছে। জেনির বোধ হয় ঠিক হুঁশ নেই। না হলে একা এভাবে কেউ একটা অপরিচিত দ্বীপের ভেতর হারিয়ে যায়। ফিরে আসার পথ গুলিয়ে ফেললে কী হবে। আর বলিহারি থম্পসন বিচার্ড, কী বিবেচক মানুষ তোমরা। দুপুরের খাবার হচ্ছে। আমার মাথা হচ্ছে। তা ছাড়া ভেতরে কী আছে না আছে, তবে যদি সেই মানুষ আদিমতা নিয়ে সত্যি বেঁচে থাকে তবে তবে কী হবে। আর্চি শিউরে উঠল। চুল দাড়িতে মানুষটার মুখ ঢাকা। আর জেনি কী সুন্দর, কী লম্বা। সাদা জ্যোৎস্নার মতো নরম শরীর। সোনালি চুলে নীল চোখের মণিতে আশ্চর্য সুষমা তার জেনি জেনি, তুমি আমার আকাশে একটা মাত্র নক্ষত্র জেনি। পাগলামি কোরো না— বলে জেনি যে দিকটায় ঢুকে গেছে, ছুটে যেতে গিয়ে দেখল আদৌ ছোটা যায় না। নিবিড় গাছপালার ভেতরটা অরণ্য। দু'হাত বাড়িয়ে ওকে আটকে দিয়েছে। সে ভয় পেয়ে অযথা ফের দু'বার শূন্যে গুলি ছুঁড়ে দিল।

সহসা এভাবে আর্চিকে দূরে গুলি ছুঁড়তে দেখে রিচার্ড ঘাবড়ে গেল। থম্পসন বলল, কী ব্যাপার রিচার্ড আর্চি দৌড়াচ্ছে, গুলি ছুঁড়ছে?

বুঝতে পারছি না।— সেও কিছুটা দূরে ছুটে গেল। তারপর চিৎকার করে ডাকল, আর্চি। আর্চি।

আর্চি ফিরছে না। তবে জেনির কি কোনও বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে সব ফেলে ওরাও ছুটতে থাকল। ওরা চলে যাচ্ছে বেশ অনেকটা পথ। এদিকটায় এলে ছোটমতো একটা লেগুন পার হতে হয়। লেগুনের জল ভারী পরিষ্কার। পায়ের পাতা ভেজে না। ওরা পার হয়ে গেল লেগুন। এবং অন্য একটা দ্বীপের মতো লাগছে। দ্বীপের গাছপালার ভেতর ঢুকেই ওরা দেখতে পেল জেনি দূরে একটা পাথরে চুপচাপ বসে আছে। সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে জমি নীচে নেমে গেছে। আর ছোট মতো জলাশয়। হ্রদের পাড়ে জেনি বসে জলে বোধহয় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে। হ্রদের পাড়ে সুন্দর মতো সবুজ উপত্যকা, অনেকটা দূরে সেই পাহাড় শ্রেণির পাদদেশে গিয়ে মিশেছে। পাথরে বসে চুপচাপ সকালের রোদে ঘাস, প্রজাপতি এবং জলে ফড়িঙের ছায়া দেখতে দেখতে কেমন আনমনা হয়ে গেছে জেনি।

রিচার্ড ছুটে গিয়ে আর্চির হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল। বলল, কী হচ্ছে এসব।

আরে বোঝো না, জেনি একা এত ভেতরে গিয়ে বসে আছে কোথাও যদি সত্যি সেই শয়তানটা কোথায় থাকে, জেনিকে দেখলে সে কিছু করে ফেলতে পারে। সেজন্য গুলি ছুঁড়ে আমার ভয় দেখালাম। জঙ্গলে থাকতে থাকতে মাথাটা যে জানোয়ারের মতো হয়ে যায়নি কে জানে। বার বার গুলি ছুঁড়ে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার আমরা খালি হাতে নেই।

ওরা ততক্ষণে জেনির কাছাকাছি এসে গেছে। আর্চির দিকে মুখ না তুলেই বলল জেনি, কোন শয়তানটার কথা বলছ।

আরে, ওই যে দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের একটা দানব না দৈত্যকে মাঝে মাঝে হাজি মানুষেরা দেখে ফেলে। আসলে কোনও সভ্য মানুষ কি কখনও এভাবে নির্জন দ্বীপে বছরের পর বছর থাকতে পারে। ওটা শয়তান। শয়তান না হলে যায় না।

আমি তার খোঁজেই আছি আর্চি। ক্যাবট আমার দৈত্য-দানব যা হোক তবু সে আমার ক্যাবট।

সে ক্যাবট হতেই পারে না। তুমি যে কী না জেনি, তুমি ভীষণ বোকা। বোকা না হলে এভাবে কেউ আসে। ওঃ কী সুন্দর দিন এখন কার্ডিফ ক্যাসেলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কী মনোরম। পত্রিকাগুলোর এমন সব গুজব ছড়িয়ে কী লাভ বুঝি না। মানুষকে এরা একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না।

ওরা সবাই জেনির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আর্চি বকর-বকর থামাচ্ছে না। রিচার্ড বুঝতে পারছে হ্রদের জল ভারী নির্মল। দূরে জল পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোনও ঝরনা থেকে জল পড়ছে। রিচার্ড

দৌড়ে চলে গেল। গাছপালা খুব একটা কিছু নেই। সহজেই সে ওপারে উঠে বলল, কোথা থেকে জল এসে পড়ছে দ্যাখো। এবং সে হেঁটে গিয়ে কিছুটা দূরে একটা উষ্ণ প্রস্রবণের খোঁজ পেয়ে গেল। সামান্য জল তুলে মুখে দিয়ে বুঝল ভারী মিষ্টি জল। দ্বীপে কোনও মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য এই জলই যথেষ্ট। বরং সত্যি যদি কেউ থাকে, এদিকটায় দিনরাত নজর রাখলেই মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। তবে দ্বীপটা কোথায় কতদূর বিস্তৃত সেটাই বুঝতে পারছে না তারা।

থম্পসনও দেখছিল সব। আগেব পথটা ভাবী গোলমেলে। এখানে সেটা নেই। ঝোপ-জঙ্গল কম। কেবল পাথর আর শ্যাওলা। দূরে দূরে বনবাজিনীলা। কেমন মায়াবী লাগছে সকালের রোদে। কিছু কীট পতঙ্গের আওয়াজ। কোনও জন্তু-জানোয়ারেব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী একটা খরগোশও দেখতে পেল না। কিছু কাঁকড়া, ছোট ছোট মাছ এবং সবুজ শ্যাওলা দেখতে পেল হ্রদেব জলে। সে ঘুরে ঘুরে একটা জায়গায় এসে থমকে গেল। একটা ঘাটের মতো। রোজই কাবা আসে। আর্চিকে ডাকতেই বলল, দ্বীপেব জন্তু-জানোয়াবেবা এদিকটায় নেমে জল খায়। অবাক হবার কী আছে?

হতেও পারে। থম্পসন আব কিছু বলল না।

রিচার্ড ফিবে এসে বলল, সকালে কিছু পেটে পড়েনি। এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে আর্চির খুব কষ্ট হবে।

রিচার্ড এই বলে সামান্য উল্লাসেব সঙ্গে ঠাট্টা কবল আর্চিকে। আর্চি সিগাবেট ধরিয়েছে। ঠাট্টা গায়ে মাখছে না। সে কাবও দিকে বিশেষভাবে তাকাচ্ছে না। জেনিকে পাহারা দেওয়া, সব সময় সতর্ক থাকা যেন ওর কাজ। সে একটু খস খস শব্দ হলেই হাঁটু গেড়ে বন্দুক হাতে বসে পড়ছে। জেনি তখন হাসবে কি কাঁদবে, বুঝতে পাবছে না।

আসলে এটা একটা দ্বীপ কি অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। ওরা ফিবে আসার সময় সামান্য ঘোরাপথে এসে দেখল সমুদ্র ভেতবে ঢুকে দক্ষিণে হারিয়ে গেছে। জল খুবই কম। এবং থম্পসন বুঝতে পাবল জোয়াবের সময় এই দ্বীপটাই অনেকগুলো দ্বীপ হয়ে যায়। জোয়ার নেমে গেলে দ্বীপটা আবাব একটা হয়ে যায়। এবং সেদিনেই বিকেলে আবিষ্কার করা গেল জল নেমে যাবার সময় অসংখ্য ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ ডাঙায় আটকে যায়। মাছ সংগ্রহ করাব কাজটা খুব সহজ। থম্পসন ফেরার সময় বেছে বেছে কিছু ভাল জাতের সার্ডিন এবং দু'গন্ডা ম্যাকরল নিয়ে এলে আর্চি আনন্দে থম্পসনকে জড়িয়ে ধবল। রাতে শুধু ফ্রাইপ্যানে মাছ ভাজা আর জ্যোৎস্নায় বসে মদ্যপান।

জ্যোৎস্না আকাশে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত থাকবে। জেনিকে নিয়ে একবাব বনের অভ্যন্তরেও ঘুরে আসা যাবে। কেমন এক নতুন জীবন, আর্চিব মতো মানুষও মাছগুলো দেখে দ্বীপটার পেছনে কিছু ভাল ভাল বিশেষণ জুড়ে দিতে চাইল।

কিন্তু আর্চি জেনির মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। এমন ভোজের ব্যাপারে জেনিব কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। এখানে আসার পর জেনি একবারও হাসেনি, জোরে কথা বলে না। চুপচাপ, নিমগ্ন এক ভাব। সে তাকিয়ে বুঝল, জেনিব মনটা কাছে কোথাও নেই। দ্বীপের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি। কেমন অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে কিছুটা। আগের মতো উজ্জ্বল নয়। কথায় কথায় সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিহাসপ্রিয়তা যার স্বভাবে মজ্জায় ছিল, সে চুপচাপ অন্তহীন ভাবনায় ডুবে গেলে খারাপ লাগে বই কী! যে করেই হোক জেনিকে স্বাভাবিক রাখা দরকার। সে নানাভাবে জেনিকে ইংলন্ডের সমুদ্র উপকূলের সুন্দর বর্ণনা দিতে থাকল। সেই ডোভার পার হয়ে যে নির্জন একটা গ্রাম আছে, গ্রামেব নাম এলফিন, সেখানে মাঝে মাঝে দ্বীপের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল রোদ ওঠে। কেউ খবর রাখে না। কেবল আর্চিই খবর রেখেছে এ আর কী বোদ, এ আব কী সজীবতা, এখানে কী আর ফড়িং, প্রজাপতি, প্রকৃতির বিলাস আছে! সেই গ্রামে চারপাশে সমুদ্রের জল খেলা করে বেড়ালে, রং-বেরঙের পোশাক পবে যখন সব সুন্দব সুন্দর শিশুরা বেলাভূমিতে নেমে আসে, তখন সমুদ্রের কী যে আশ্চর্য মহিমা!

রিচার্ড শুনতে শুনতে ভারী বিরক্ত বোধ করছে। বলল, থামো তো আর্চি।

থম্পসন বলল, কাল কীভাবে কাজ আরম্ভ করব দ্যাখো।

থম্পসন তার পরিকল্পনা মতো একটা জায়গা দেখিয়ে বলছে, ওই যে দেখছ, দ্যাখো না, দূববিনে দ্যাখো, ডানদিকে লম্বা একটা গাছ সবার ওপবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে না, গোল গোল পাতা? ঐ দ্বি

তো দূরবিনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দেখে নাও, কেমন একা দ্বীপে মহামহিম হয়ে আছে। জেনি উঠে দাঁড়াও, না দাঁড়ালে দেখতে পাবে না। ঠিক বুঝতে পারছ তুমি? আর্চি, রিচার্ড কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? সেখানে আমরা কাল যাব।

কিন্তু থম্পসন যখন দেখল জেনি টিনের চেয়ারে তেমনি মাথা হেলিয়ে বসে আছে, কোনও উৎসাহ নেই, তখন কেমন খেপে গেল। বলল, কী হয়েছে তোমার জেনি! এখানে এসেই দিন দিন ভেঙে পড়ছ। রহছ তো চেষ্টা কম করছি না। সব না দেখে আমরা যাব না। হেস্ত-নেস্ত কিছু একটা হবেই। ওই যে দেখো, দেখছো তো! কাল না যেতে পাবলে, অন্তত দশদিনের মাথায়ও সেখানে আশা করি যেতে পাবব।

আর্চি বলল, তার আগেই জেনি পালাবে। বলবে, হয়েছে। যত সব গুজব। জেনি কী বলে।

রিচার্ড বলল, জাহাজ না এলে কেউ ফিরতে পারছি না, এটা অন্তত সবার মনে রাখা দবকার।

আর্চি তাঁবুর ভেতর থেকে আব-একটা টিনের চেয়ার বের করে নিল। তারপর ভারী আবামে বসে পড়াব মতো বলল, ফিবতে না পারি তো কী হয়েছে! দেখছ না কেমন সব কচি খবগোশবা দৌড়াচ্ছে। কিছু মেবে নিলেই হবে। তারপর আগুনে ঝলসে রোস্ট—আহা বিচিত্র সুখ। দ্বীপে না এলে এ সুখেব খবর পেতাম না। কী আরাম—পুরনো মদ, জ্যোৎস্না রাত, সমুদ্রের বাতাস, আকাশের নক্ষত্র, আব জেনি, জেনি...

সে ঠোঁট চাটতে থাকল। ভাঙা রেকর্ডের মতো জেনি শব্দটা গলায় ঘড় ঘড় করতে থাকল তাব। থম্পসন বুঝতে পারল আর্চিব ভাঙা বেকর্ড থামবে না। সে এবাবে উঠে দাঁড়াল। কিছুটা বক্তৃতার কায়দায় বলে গেল, মানুষ এ দ্বীপে থাকলে আমরা নানাভাবে বুঝতে পাবব। অবশ্য সে ক্যাবট অথবা ব্যানার্জি নাও হতে পারে। তবু যখন অভিযানে আসা গেল, তখন আপনারা মনে রাখবেন, মানুষ আলো জ্বালবে। আগুন জ্বেলে তার খাবার তৈরি করবে। ধোঁয়া অথবা আগুন দেখে বুঝতে পারব দ্বীপে মানুষেব বাস আছে। তিন-চার দিন হয়ে গেল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে কখনও মানুষেব মল-মূত্রেব গন্ধেও আমরা টের পেতে পারি দ্বীপে মানুষ আছে। কাল সকাল থেকেই পুরোদমে কাজ আরম্ভ কবব ভাবছি। বাতে সব ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। ঝোলা ক্যামেরা, ফ্লাস্কে গবম কফি, দূরবিন এবং খুব পবিশ্রান্ত মনে হলে সামান্য মদ। সুতরাং শুধু শুধু রাজা-উজিব মেরে লাভ নেই। কাজের কাজ কিছু কবা দবকার। জেনি, তুমি কিছুই আজকাল খাচ্ছ না। ওঠো। মাছগুলো কাটাকুটির ভার তোমার। ওঠো। এসে কি এখানে ভয় পেয়ে গেলে?

আর্চি সুযোগ বুঝে ক্যামেরা বাগিয়ে বলল, দাঁড়াও। একটা ছবি তুলি। আপনাবা দাঁড়িযে যান। একটু সরে জেনি। এই বিচার্ড, তুমি ভাই খুব ভাল। আমাদের একটা ছবি তুলে দাও। এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীর কোথাও আর পাওয়া যাবে না। কী সুন্দর শেষ বেলার বোদ!

জেনি কিছু বলল না। যেভাবে দাঁড়ালে আর্চি খুশি হয়, ঠিক সেভাবে সে দাঁড়িয়ে গেল। রিচার্ড ছবি তুলে দিল দু'জনের।

পরদিন সকালে সেই খুব দূরের গাছটার উদ্দেশে ওরা রওনা হয়ে গেল। গতকাল যে হ্রদটা ওরা আবিষ্কার করেছিল তাব পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বিচার্ড সহসা থমকে দাঁড়াল। বলল, কী গন্ধ!

আর্চি দৌড়ে এসে বলল, কীসেব গন্ধ।

চর্বি, চর্বি-পোড়া গন্ধ।

আর্চি নাক টেনে বলল, কোথায়!

জেনি কেমন ঘাবড়ে গেছে। সে জেনির দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? যদি ক্যাবট এখানে থেকে অসভ্য জংলি হয়ে যায় তবে আমরা তাকে ক্ষমা করব না। সে শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

থম্পসনও বাতাস কোন দিক থেকে আসছে, বাতাসের সঙ্গে যদি সত্যি চর্বি-পোড়া গন্ধ ভেসে আসে, অথচ দু'বার নাক টেনে কিছুই টের পেল না, রিচার্ড বাজে বলার লোক নয়। সে বলল, তোমরা সবাই এত গোলমাল করছ কেন? সবাই বসে পড়ো। আড়াল করে ফেলো নিজেদের।

জেনি চুপচাপ উঁকি দিয়ে দূরের পাহাড়ে তখন কিছু যেন লক্ষ করছে। কেবল আর্চি অবাক। ওবা সবাই মিলে এত কী দেখছে! কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। গাছগুলোর মাথায় রোদ পড়ে এক ধরনের

সবুজ সোনালি রং। ক্বচিৎ দুটো-একটা পাখির আওয়াজ। এবং অনেক দূরে এক অতি দ্রুত ধাবমান জন্তুর ডাক। হরিণ-টরিণ হতে পারে। আর কেবল সারি সারি গাছের কাণ্ড, শুকনো ঝরা পাতা. লতাপাতায় ঢাকা শুধু সেই আদিমতা। আর পেছনে পাথরের পর পাথরের টিবি। ভেতরে বোধ হয় সব লম্বা গুহা-পথ আছে। মানুষের সেখানে কিছুতেই ঢোকার সাহস থাকার কথা নয়।

আর্চি খুব পাণ্ডিত্য ফলাতে চাইল। বলল, ও কিছু নয়। তোমরা এসো।

রিচার্ড বলল, তোমরা কেউ চর্বি-পোড়া গন্ধ পাচ্ছ না!

আর্চি নাকটা উঁচু করে দিল।

যত্তো সব! তোমাদের হয়েছে কী! কোথায় গন্ধ! একেবারে বাজে ব্যাপার। দ্বীপে এসে সবাইকে কেমন তোমাদেব ভূতে পেয়ে গেছে।

আর তখনই জেনি উঠে দাঁড়াল। স্থির গলায় বলল, জানো রিচার্ড, আমি তাকে দেখেছি।

কী বলছ যা তা!— আর্চি বাধা দিল কথায়।

রিচার্ড বলল, কোথায়?

ওরা সবাই এবার আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে। একটা বড় পাথবের ওপর সব ক'জন দাঁড়িয়ে। থম্পসন কোনও গন্ধ পায়নি। রিচার্ড না পেলে কিছু বলার মতো মানুষ না। সে ভীষণ সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে।

জেনি ফের বলল, সত্যি সে গাছপালার ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল।

কখন?— থম্পসন নেমে একটা পা পাথরে রেখে বন্দুকে ভর করে কথাটা বলল।

কাল। কাল যখন চুপচাপ বসে ছিলাম, মনে হল হ্রদটার ওপাশে গাছপালাব অভ্যন্তরে সে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের সাড়া পেয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

থম্পসন বুঝল, সেই এক ব্যাপার। ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। সে আব এ নিয়ে খুব নিরাশ কবল না জেনিকে। কী জানি আবার এমন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মাথাটা বিগড়ে যায় কি না। সে কিছু বলে তাকে দ্বিধায়ও ফেলে দিতে চাইল না। বলল, ক্যাবট হলে ঠিকই আসবে। তুমি চিন্তা কোরো না জেনি

আর্চি খুব ক্রুদ্ধ গলায় এগিয়ে গেল।

আপনি কী থম্পসন! এখানে আপনিই প্রাজ্ঞ মানুষ। কী করে বুঝলেন, ক্যাবট হলে ঠিকই আসবে? আসলেই তাকে আসতে দিচ্ছে কে? সে কি আর আগের মানুষ আছে!

থম্পসন চোখ টিপে দিল। আর্চি বুঝল ছেলেভুলানো ব্যাপার চলছে। সে খুব দবাজ গলায় বলল বেশ, তুমি জেনি যদি মনে করো, আমরা থাকলে ওর আসতে অসুবিধা হয়, তবে একা-একাই ভেতরে ঢুকে যাবে। আমরা কেউ থাকব না। কী জানি সত্যি হয়তো আছে ক্যাবট।

রিচার্ড ততটা হালকা ভাবে ব্যাপারটাকে দেখল না। সে বলল, তুমি তাকে দেখেছ!

দেখেছি।

আর্চির চোখ আবার ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। সত্যি নয় তো আবার!

রিচার্ড বলল, কেমন দেখতে?

স্পষ্ট দেখতে পাইনি।

জামা টামা গায়ে ছিল?

বোধহয় আলখাল্লার মতো কিছু!

কী করে বুঝলে একটা আলখাল্লার মতো কিছু?

বাতাসে নড়ছিল' সবটা দেখা যায়নি। কিছুটা দেখেছি।

গাছের পাতা-টাতা নয়তো?

হতেও পাবে। কিছুই স্পষ্ট বলতে পারছি না।

মুখ কামানো?

না, চুল-দাড়িতে ঢাকা।

আর্চি ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, থম্পসন, আমি পাগল হয়ে যাব। কী বলছে শুনছেন! পাগল হলে আপনারা কেউ পার পাবেন না।

থম্পসন খুব শান্ত গলায় বলল, ঘাবড়াবে না আর্চি। তোমরা সবাই এমন করলে কী করি বলো তো।

না, বলছিলাম পাগল হওয়া কি বিচিত্র কিছু?

রিচার্ড জেনিকে তখনও জেরা করছে, আগে বলোনি কেন?

দেখে কেমন মায়া।

আর্চি এবার চিৎকার করে উঠল।

সব বাজে ব্যাপার! সব ঘোর। ওঃ কেন যে আসা! জেনি, তুমি স্বাভাবিক হও। এমন আজেবাজে বকলে আমার মাথা সত্যি ঘুরে যাবে।

রিচার্ড আরও পীড়াপীড়ি করতে থাকলে জেনি বলল, দেখছ তো আর্চিটা কী লাগিয়েছে। বরং এ সম্পর্কে আর কোনও কথা না হওয়াই ভাল।

বলে জেনি চুপ করে গেল। আর কিছু বলল না।

ওরা চুপচাপ হাঁটতে থাকল। জেনি আর কিছু বলতে রাজি না হওয়ায় আর্চির রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। ছেনালিপনার শেষ আছে। কিন্তু জেনি যা করছে তাতে ছেনালিপনাও হার মানে। সে রাগে-দুঃখে বলে ফেলল, তোমাকে সব বলতে হবে। আমরা সব শুনব।

জেনি ততোধিক শক্ত হয়ে গেল। বলল, না, বলব না।

একশোবার বলবে। না বললে তোমাকেই জ্যান্ত পুঁতে রেখে যাব।

জেনি কিছু বলল না। এতটা অবিবেচক আর্চি, সে আগে কখনও টের পায়নি। একটা সত্যাসত্যের মুখোমুখি এসে আর্চির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে বলল, আর্চি, তোমার যদি সত্যি খুন করার ক্ষমতা থাকত, তবে এতদূরে ক্যাবটকে খুঁজতে আমি আসতাম না।

রিচার্ড খুব বেশি কিছু বলতে পারছে না। বাবা আর্চির পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব সজাগ। আর্চিটা দেশে ফিরে সাতকাহন করে বললে বাবা দুঃখ পাবেন। সেজন্য সে আর্চির মুখের ওপর কড়া কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

আর্চি ভেতরের উত্তেজনা সামলাতে না পেরে বলল, রিচার্ড, তুমি তো পুরুষ মানুষ! তুমি কী করে যে চর্বির গন্ধ পাও বুঝি না। সব বাজে মিথ্যা। কী যে ভুল করেছি তোমাদের সঙ্গে এসে।

তারপর জেনির দিকে তাকিয়ে কেমন শীতল হয়ে গেল। খুব ঠান্ডা গলায় বলল, জেনির এমন বিপদের দিনে আমি পাশে না থাকলে আর কে থাকবে! তবে তুমি জেনি, লক্ষ্মী, একটু স্বাভাবিক না থাকলে ক্যাবটকে আমরা খুঁজে বের করতে পারব না।

আচ্ছা রিচার্ড!— সে রিচার্ডের দিকে না তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি করে বলো তো, চর্বির গন্ধ পেয়েছ কি না।

রিচার্ড কী বলবে! বললেই তিক্ত শোনাবে। সে কিছু বলল না, থম্পসনের সঙ্গে সে আগে আগে হেঁটে যেতে থাকল। আর্চি তবু রিচার্ডকে ছাড়ল না। সে দৌড়ে ওর পাশে হেঁটে গেল কিছুক্ষণ। তাকাল এদিক-ওদিক। শেষে ইতস্তত গলায় বলল, চর্বির গন্ধ রিচার্ড মনের ভুল। সব সময়, এই ধরো যখন আমরা দেশ থেকে বের হব বলে ভেবেছি, তখন থেকে জেনি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ভুগছে। জেনি কত কিছুর গন্ধ পেতে পারে। তাই বলে তুমি! তুমিও জেনির মতো হয়ে যাচ্ছ!

এত কথা রিচার্ডের ভাল লাগছিল না। ধমক লাগাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বয়সে বড় মানুষটা। তা ছাড়া এই জনমানবহীন দ্বীপে কোনও কারণেই মাথা গরম করা চলে না। হাঁটার সময় ওরা কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ছে। রিচার্ড মনে মনে গন্ধটা সন্দেহজনক নয় কিছুতেই ভাবতে পারছে না। বালিয়াড়িতে নেমে আসতে আসতে সূর্য ডুবে গেল।

জেনি এমন বিস্ময়কর সূর্যাস্ত দেখে কেমন মুগ্ধ হয়ে গেল। যতদূর চোখ যায় আদিগন্ত সমুদ্র আর নীল নেই। কিছুটা রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। পাখিদের দ্বীপে ফেরার সময়। ঝাঁক-ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে। কালো নীল সবুজ বিন্দু বিন্দু পাখির ঝাঁক ক্রমে মাথার ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল। সমুদ্র তার নীলের ভেতর সেই গাঢ় আগুনের উত্তাপ যেন শুষে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে আকাশ এবং দিক-দিগন্তের চক্রবাল ধূসর হয়ে উঠছে। দুটো-একটা নক্ষত্র দেখা যেতে থাকল। দ্বীপের মাথায় হেলে আছে জ্যোৎস্না একটা অতিকায় করবী গাছের মতো। এটা বোধহয় পঞ্চমী তিথি, বেশিক্ষণ দ্বীপে জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে

থাকতে পারবে না। সরে যাবে। যামিনী সামান্য বাড়লেই ফের অন্ধকারে ডুবে যাবে দ্বীপ। তখনই দেখা গেল নীল জলে অজস্র ফসফরাস জ্বলছে। বালিয়াড়িতে মনে হয় লক্ষ কোটি মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ আবার তুলে নিয়ে যাচ্ছে নিমেষে। আশ্চর্য এক বাজিকরের খেলা চলছে দ্বীপটায় নিয়ত।

সমুদ্র শান্ত বলে অনায়াসে বালিয়াড়ির সমুদ্রের ভেতর অনেকটা হেঁটে যাওয়া যায়। পায়ের পাতা ডুবতে বেশ সময় লাগে। সে কিছুটা সমুদ্রের ভেতর চলে গেল। চারপাশে জল, ছোট ছোট মাছ পায়ের পাতায় ঠোকরাচ্ছে। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছিল জেনির। সে পরে আছে ট্রাউজার। লতাপাতা-আঁকা জ্যাকেট। অথবা তখন জলের রঙের মতো তার নীল চোখে কোনও দূরাগত পাখির ডানার ছায়া, বোধহয় সেখানে এখনও ক্যাবট জেগে আছে। স্মৃতিতে ক্যাবটের কোনও পুরনো ছবি, যা বার বার ভীষণ নতুন মনে হয়, খেলা করে বেড়ালে সে দেখল, আকাশে আর একটা পাখিও নেই। সবাই ভাসতে ভাসতে কখন আকাশে অজস্র নক্ষত্র হয়ে গেছে। জেনিফার কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল এমন সব পাখিদের নক্ষত্র হয়ে যেতে দেখে। সে আর এগোতে পারল না। সমুদ্রের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল।

আর্চি তখন ডাকল, জেনিফার!

জোরে ডাকলে অনেক দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে। সেখানেও যেন তখন কেউ ডাকে, জে—নি—ফা -র।

আবার আর্চি ডাকল, জেনিফার, এদিকে এসো!

সেই দূরের পাহাড়িশ্রেণি থেকে ফের প্রতিধ্বনি, জে-নি—ফা—র, এদিকে এসো!

ঠিক এমন একটা সময়ে ক্যাবটের স্মৃতি, ওর দুষ্টুমি, ছেলেমানুষি সব মনে পড়লে হু হু কান্নায় জেনি কেমন ভেঙে পড়ল। পেছনে দ্বীপের কোথাও ক্যাবট দাঁড়িয়ে তাকে যেন ডাকছে, জেনিফার, আমি আছি, এখানেই আছি। চ্যাটার্জি আর আমি একসঙ্গে থাকি। আমরা এই দ্বীপের বর্ণমালায় মুগ্ধ হয়ে গেছি জেনি। কোথাও আর যেতে পারিনি।

সাত

পরদিন সকালে ওরা ফের বোট নিয়ে বের হয়ে পড়ল। কারণ মোটর-বোট দূরের দ্বীপটায় তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। চারপাশের দ্বীপগুলোই আগে ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। পরে এই মূল দ্বীপে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। কোনও মানুষকে তার বন্য স্বভাব থেকে উদ্ধার করা খুবই কঠিন কাজ! থাকতে থাকতে বন্য হয়ে গেলে ধরা না-ও দিতে পারে। স্মৃতিবিভ্রম ঘটতে পারে। কী যে ঘটেছিল স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। কোনও হত্যা খুন, তাও না। তবু থাকলে আগের মতো সভ্যই আছে এটা আর ভাবা যাচ্ছে না। থাকলে এতদিনে সে চলে আসত। তখন মনে হচ্ছে আসলে ক্যাবট আর স্বাভাবিক নেই। সে এতগুলো লোক দেখে নিতান্ত ভয় পেয়েছে বলে আসছে না। সে যাই হোক, খোঁজাখুঁজির পর ওরা ফিরে আসবে মূল দ্বীপে। আজকের মতো থম্পসন তাঁবু পাহারায় আছে। কেউ না থাকলেও ক্ষতি নেই। দু'-একবার সবাই তাঁবু ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে, খোঁজাখুঁজি করে ফিরতে রাত হয়েছে, কিছুই এদিক-ওদিক হয়নি।

সব দ্বীপগুলোর প্রকৃতি প্রায় একরকমের। সেই পাথর মাটি আর হলুদ রঙের ফুলে ভরা এক রকমের ঘাস। প্রায় দ্বীপের মাঝখানে মিষ্টি জলের হ্রদ। এবং মনে হয় এগুলো অসংখ্য আগ্নেয়গিরির মৃত মুখ। কোনওটা বেশি প্রবালের। প্রবালের দ্বীপ দেখলেই চেনা যায়। বড় বড় গাছ প্রবালদ্বীপে বড় একটা দেখা যায় না। চারপাশে সেই ঘন জঙ্গল আবার উর্বর ভূমিও আছে, নারকেল গাছ দুটো-একটা চোখে পড়ছে। এবং এমন সব ফুল-ফলের গাছ, যা তারা একেবারেই চেনে না। আসলে এগুলো সবই গোলাপজামের গাছ, চালতা গাছ, বনকরবী, নিশিগন্ধা। ঘুরে ঘুরে ওরা দেখল কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন নেই।

ফেরার পথে দেখল, ঠিক দুটো দ্বীপের মাঝখানে সমতল জায়গা। সমুদ্রের জল উঠে আসছে, নেমে যাচ্ছে। ঢেউগুলো প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ছে। জল যাবার সঙ্গে মাছগুলো সরে যেতে পারছে না

পাথরের এমন একটা সমতল জায়গায় রুপোলি এমন মাছেদের ছড়াছড়ি দেখে জেনিফার সহসা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা মাছও ধরতে ইচ্ছে হল না। বরং ওদেব দেখে সে বুঝল, এরা এখানেই সেই প্রাচীনকাল থেকে লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। তার মাছ ধবার আদৌ উৎসাহ নেই।

কিন্তু আর্চি, আরে আরে দেখেছ, বলেই হামাগুড়ি দিয়ে সেই সমুদ্রের উপত্যকাতে মাছ ধবতে আবম্ভ করে দিল। সে যতটা পারল মাছ তুলে নিল বোটে। আর্চির এত লোভ জেনিফারকে সত্যি কেমন ভাবী উদাসীন করে ফেলল।

ওরা পর পর আরও সব দ্বীপে ঘুরে বেড়াল।

সেই একরকমের গাছপালা পাহাড় মাটি ফুল। খরগোশেরা দলে দলে ছুটে বেড়ায়। ওরা মানুষ দেখলে ঠিক ভয় পায় না। তার জন্য খুবই সহজে মারা পড়ছে আর্চির হাতে। আর্চি ফেবার সময়, খবগোশ, কচ্ছপ যখন যা পায় সামনে মেরে বোটে তুলে নেয়। বেশ আর ক'টা দিন। মহা আনন্দ। আর আছে সেই সব পাখিদের ফিরে আসা। অযথা আর্চি বন্দুক ছুড়ে ওদের নামিয়ে আনে। নিষ্ঠুবতার শেষ থাকে না। সে খুশিমতো পাখিদের মেরে ফেলে রাখে জঙ্গলে। কচ্ছপ মেরে কখনও ফেলে দেয় সমুদ্রের জলে। জীবজন্তু হত্যা করার প্রচণ্ড উন্মাদনায় ওকে পেয়ে বসেছে। খরগোশের পালে বন্দুকের ছবরায় অজস্র খরগোশ মরে থাকে। মরে যাবার আগে ওদের পাগুলো তিব তির কবে কাঁপে। পাশে দাঁড়িয়ে আর্চি ভীষণ আহ্লাদে চিৎকার করে ওঠে, কী রে? কেমন লাগছে মরে যেতে।

জেনিফাব তখন না বলে পারে না, আর্চি তোমার কষ্ট হয় না!

আর্চি ক্রমে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। যত দিন যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে, জেনি একা একা ঘুবতে পছন্দ করে। কথা বললে কোনও জবাব দেয় না। জেনিফারের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সে একদম সহ্য করতে পাবে না। গলায় গলায় হাত ধরে হাঁটতে ইচ্ছা করে, জেনি কিছুতেই হাঁটবে না। তার খেপে যাবাব যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

বোধ হয় এজন্যেই সে অকারণ সব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে দ্বীপে। এক সকালে সে উঠেই বড় একটা বাঁদর মেরে নিয়ে এল দ্বীপ থেকে। সে দ্বীপের কীট-পতঙ্গ, গাছের ডাল-পালা, ফুল-ফল, লতা-পাতা যখন সামনে যা পাচ্ছে নষ্ট করে ফেলছে। সে বুঝে ফেলেছে, বড়ই নিবাপদ এইসব দ্বীপগুলো। পত্রিকার সংবাদ বিচিত্রা কত অলীক, ক'দিনেই টের পেয়ে গেল। জেনি দুটো-একটা কথা যা বলেছে সবই ঘোরে পড়ে। সুতরাং বাকি ক'টা দিন খাও দাও ঘুরে বেড়াও। সে অযথা গুলিগোলা খুব নিঃশেষ করে দিল। রিচার্ড এ নিয়ে গজগজ করছিল। থম্পসন আর কিছু বলে উসকে দিতে চাইছে না জেনির থাকল কি গেল, আসে-যায় না।

এবং সে রাতেই!...

চারপাশে তখন শুধু সাদা জ্যোৎস্না। সমস্ত বনভূমি জুড়ে শুধু কীট-পতঙ্গের আওয়াজ। স্থির মায়াবী ছবিব মতো হয়ে আছে দ্বীপটা। এবং সেই এক মরীচিকার রহস্য। সামনে সমুদ্র, সাদা জ্যোৎস্না নীল জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তাঁবুর কথাবার্তা কানে আসছে। আর্চি আগুনে খরগোশের মাংস ঝলসে নিচ্ছে। রিচার্ড মাখন বের করছে। আস্ত মাংসের পেটে-পিঠে মাখানো হবে। তারপর সামান্য গোলমবিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হবে। জেনিকে আর্চি দু'বার খেতে ডেকে গেছে। বলে গেছে এমন সুন্দব বাত পৃথিবীতে বড় একটা মানুষের আসে না। একে উপভোগ করা দরকার।

এমন বাত সত্যি উপভোগ করার মতো। আর্চি, থম্পসন এবং রিচার্ড বাস্ত সেজন্য। বেশ চাক চাক করে টমেটো কাটছে রিচার্ড। শসা কেটে রেখেছে লম্বা করে। গোল কবে কেটেছে পেঁয়াজ। আস্ত একটা খরগোশেব রোস্ট বড় প্লেটে। ওতেই চারজনের পেট ভবে যাবে। কিছু গ্রিনপিজ সেদ্ধ। আব ইচ্ছেমতো মদ।

জেনি সামান্য খেয়ে চলে এসেছে। ওরা তখনও খাচ্ছে। রাত খুব একটা বেশি হয়নি।

ওবা খাচ্ছে দাপটে। চিৎকার-চেঁচামেচিও করছে মাঝে মাঝে। আগের মতো কেউ আর একেবারেই সতর্ক নেই। বেশি খেলে রিচার্ডের ভীষণ চিৎকাব করার স্বভাব। থম্পসন বেশি খেলে গুম মেরে যাবে। সে তখন কিল চড় ঘুসি পর্যন্ত হজম করে ফেলতে পারে। আর আর্চি বেশি খেলেই মেয়েলি গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মানুষের ভেতরে যে কী আছে! জেনিফার ভেবে পায় না। ক্যাবটেব কথাই ধবা

যাক না, যে জাহাজে পাগলের মতো দিন কাটিয়ে দিত, কখন জাহাজ হোমে ফিরবে, কখন দেখতে পাবে জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে জেনিফার, সেই ক্যাবট কথা নেই বার্তা নেই নিখোঁজ হয়ে গেল! নিখোঁজ না স্বেচ্ছানির্বাসন? আর তো বেশিদিন নেই!

জেনিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে। আগের মতো আর তার তেমন উদ্যম নেই। চুপচাপ বসে থাকতেও ভাল লাগছে না। সারাদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। সবকিছুই একঘেয়ে লাগছে। সামান্য পায়চারি করতে করতে বনটার কাছে চলে এসেছে কখন টের পায়নি। আর বনটার কাছে আসতেই কেমন প্রলোভনে পড়ে গেল। সে ক'দিন থেকে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না বলে, সব কিছুই সহজ স্বাভাবিক। আসলে মাথাটা বোধ হয় এখন তেমন ক্যাবটের চিন্তায় অস্থির থাকে না। সে সাহসী হয়ে উঠেছিল। আসলে সে মরীচিকাই দেখেছে। কোনও আলখাল্লা অথবা চুল-দাড়িতে ভরা কোনও মুখ সে দ্যাখেনি। তা না হলে এতদিন থাকল, দ্বীপের হেন জায়গা নেই খুঁজে দ্যাখেনি, আর দেখা গেল না কেন! সে এমন সব ভেবে সহজেই দ্বীপের ভেতর একা ঢুকে গেল। আজকাল কাছাকাছি জায়গাগুলো খুব চেনা এবং পরিচিত। তবু রাতে একা কখনও খুব ভেতরে ঢোকেনি। ক্যাবট ওকে একা দেখলে রাতে যদি সাহস পায় কাছে আসতে। এতদিন ওদের গুলিগোলা ছিল, অবশ্য ক্যাবট কী করে জানবে সব শেষ, নানারকম ভাবনা আবার জেনির মাথায়। জেনিফার কেবল তার রিভলবার ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল। গাছপালার ছায়ায় পাতার খসখস শব্দে হেঁটে বেড়ালে মনে হয় পেছনে কেউ অনুসরণ করছে। সে দু'বার পেছন ফিরে দেখেছে। কেউ নেই। কবুতরের মতো সাদা জ্যোৎস্না ডিমে তা দিচ্ছে এখানে-সেখানে।

কিছুটা ঘুরতে-ফিরতেই মনে হল, এখানে কিছুদিন থাকলে কেউ আর সত্যি ফিরে যেতে চাইবে না। ক্যাবটের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে তার প্রিয় গান ডুয়েট গাইত। নিরিবিলি জ্যোৎস্নায় সে বেশ ধীরে ধীরে পায়ে তাল দিয়ে একটা গান গাইল। কত সব তুচ্ছ ঘটনা জীবনের, সব এক-এক করে মনে পড়ছে। ওর আর কোনও দুঃখ থাকল না। সে ক্যাবটকে যথেষ্ট খুঁজে গেল। আর তখনই মনে হল পেছনে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে। আর্চির লোভ ভীষণ। সে হয়তো নেশার ভান করে ছিল। আসলে ওকে বনের ভেতরে ঢুকে যেতে দেখেই সেও পায়ে পায়ে পিছু নিয়েছে। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকাতেই জেনির সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। সাদা জ্যোৎস্নায় বনভূমির অন্ধকারে ষোড়শ শতাব্দীর সেই জলদস্যু সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মতো চোখ। ভারী লেনসের চশমা। চুল-দাড়িতে মুখ ঢাকা। পায়ে বাদশাহি আমলের নাগরাই জুতো।

সে এতটুকুই দেখতে পেয়েছিল। তারপর মাথা ঝিমঝিম করছিল, পা টলছে জেনির। সে জানে, হিপ পকেটে ওটা আছে, কিন্তু হাঁটু ভেঙে আসছে ক্রমশ। পা তুলে ছুটতে পারছে না। চিৎকার করে বলতে চাইল, তুমি কে! তুমি কে! কিছুই বলতে পারল না। বোধ হয় টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিল। কেউ ধরে ফেলল। এবং সেই আশ্চর্য সুপ্তির ভেতর সে টের পেল, তাকে কাঁধে ফেলে মানুষটা নীচে নেমে যাচ্ছে। জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সে চোখ খুলে তাকালে সেই জলদস্যু ভারী নরম গলায় বলছে, জেনিফার, তুমি মূর্ছা গেছিলে।

গলার স্বর ভীষণ ঠান্ডা। জেনি বলল, তুমি কে! তুমি ক্যাবট কি না বলো! তা না হলে চিৎকার করব। কিছুই অস্পষ্ট অন্ধকারে বুঝতে পারছি না।

সে তেমনি শীতল গলায় বলল, জেনিফার!

লোকটা অসভ্য আদিম, অথবা অন্য কোনও গ্রহের লোক! শুধু একটা কথাই ভাঙা রেকর্ডের মতো বলছে, জেনিফার।

আর্চির সেই চিৎকার করে 'জেনিফার' ডাকা থেকে কি এই নির্বাসনে থাকা মানুষটা জেনে নিয়েছে তার নাম জেনিফার!

জেনিফার বলল, তুমি কে বলো! আমি চিৎকার করব বলছি। তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?

সে বলল, জেনিফার, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না!

ক্যাবট! ক্যাবট তুমি! এসো দেখি। এসো, কোথাও পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়াও, দেখি। টর্চ, টর্চ, আমার একটা টর্চ চাই।

সে বলল, জেনিফার, আমি ক্যাবট নই।

তবে তুমি কে? হা ভগবান! লোকটা আমাকে নিয়ে কী করছে! বলছে সে ক্যাবট নয়!

জেনিফার, ভয় পাবে না। আমি কোনও অনিষ্ট করব না তোমার। চলো, তোমাকে দিয়ে আসি।

জেনিফার বলল, যেতে হবে না। নিজেই চিনে যেতে পারব।

যেতে পারবে না জেনিফার। কোথায় আছ তুমি জানো না।

স্বপ্ন স্বপ্ন। জেনিফার নিজের গায়ে চিমটি কেটে দিল। লাগছে। একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। লোকটা উবু হয়ে বসে পড়ল। বলছে, জেনিফার, কী পাগলামি করছ!

তুমি কে বলো! ক্যাবট কোথায় বলো! জেসাস আপনি আমাকে আব সামান্য সাহস দিন। লোকটাকে ভাল করে দেখি। লোকটা আমাকে ঠকাতে চাইছে। মিথ্যে কথা বলছে।

মাথা থেকে এবার টুপি খুলে ফেলল লোকটা। কোঁকড়ানো চুল। ঘাড়ের কাছে প্রাচীন সম্রাটদের মতো চুল থাক-থাক করা। জ্যোৎস্নার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে লোকটা এবং তেমনি সামনে দাঁড়িয়ে জেনিফারকে দেখছে। এতটুকু উত্তেজনা নেই, কোনও অধীরতা নেই। পবম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মতো যেন সেই সুপুরুষ।

জেনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, রিচার্ড! থম্পসন! দ্বীপে বলেছিলেন কেউ নেই, এই যে দেখুন! বলেছেন ঘোরে পড়ে গেছি, আসুন, দেখে যান। এবারে কিছুতেই ছাড়ছি না। তুমি যেই হও, ভাল করে সব জেনে নেব।

সেই মানুষ তখন খুব রাশভারী গলায় বলছে, তুমি ডাকাডাকি করলে আমাকে চলে যেতেই হবে। প্লিজ, ওদের কাউকে এভাবে ডাকবে না।

কেন কেন! আপনি যদি সত্যি ক্যাবট না হন, বলুন। আমি চলে যাব। আপনি কি সত্যি কোনও খবর দিতে পারেন ক্যাবট কোথায়, এখানে সে এসেছিল কি না? আমবা তার সব খবর চাই। প্রথমে আপনি সত্যি করে বলুন। আপনি বাইরে আসুন। এমন কোনও পাথর নেই, যেখানে দাঁড়ালে আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাই? আপনি যাই ভাবুন, কিছুতেই ছাড়ছি না!

বলেই সে তার হিপপকেট থেকে কিছু বের করে একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

আসার সময় ওটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।

জেনিব হাত শিথিল হয়ে গেল।—কিছু নেই! না তেমনি আছে?

সে দ্রুত চেম্বার খুলে দেখল, সব ঠিক আছে।

এবার কেমন শক্ত গলায় সে বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

কোথায়?

তাঁবুতে। ওখানে রিচার্ড, থম্পসন, আর্চি আছে।

আচ্ছা, রিচার্ড তো তোমার যমজ ভাই?

জেসাস আমাকে সাহস দিন। লোকটা আমাকে নিয়ে তামাশা করছে। রিচার্ডকে পর্যন্ত সে চেনে।

থম্পসন আগের চেয়ে মোটা হয়েছে। টাকটা ভারী সুন্দর।

জেনি কেমন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, তুমি যেই হও, জেসাস আমাকে আর সামান্য সাহস দিন। শেষবারের মতো মোকাবিলা করার সাহস দিন। আমি কেমন সব গুলিয়ে ফেলছি। ক্যাবটের মুখ ভুলে যাচ্ছি কেন! ওর স্বর কথাবার্তা সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি কী যে করি।

মানুষটা বলল, উতলা হবে না জেনি!

তবে কেন বলছেন না আপনি কে! আমাকে রক্ষা করুন। কিছু চাই না। যদি কিছু ভুল করে থাকি ক্যাবট

আমি ক্যাবট নই। আমাকে চেনা উচিত ছিল তোমার।

চ্যাটার্জি!

সে চুপ করে গেল।

সেই চশমা মোটা লেন্সের! চ্যাটার্জি, তুমি চ্যাটার্জি, আমার মাথাটা কেমন করছে আবার।

সে হাত বাড়িয়ে চ্যাটার্জিকে ছুঁতে চাইল। জেনিফার কেমন স্তব্ধ হতবাক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

সুপুরুষ মানুষটি বলল, জেনি, বোসো।
না না, আমি বসব না। ক্যাবট কোথায়?
সব বলব।
না না, আমার দেরি করার সময় নেই। বলো, ক্যাবট কোথায়?
জেনি যদি অধীব হও, তবে চলে যাব।
চ্যাটার্জি, তুমি ভুল করছ।
জেনিফার, ওটা রেখে দাও। কেন শুধু শুধু ছেলেমানুষি করছ?

কেমন লতাগাছটির মতো নেতিয়ে পড়ল জেনিফার। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। সত্যি আর এক বিন্দু ক্ষমতা নেই শরীরে। এমন আকস্মিকতায় পড়ে যাবে, সত্যি একদিন এভাবে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে একজন প্রিয় জলদস্যুর সামনে, সে ভাবতে পারেনি। মানুষের এইসব সময়ে কত রকমের গোলমাল হয়। ভুল বকতে থাকে। সে একটা কথাও বেফাঁস বলেনি। বরং সত্যি আবিষ্কারেব মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যখন পাওয়া গেল জোরজার করা খুব একটা সমীচীন হবে না। সে চ্যাটার্জিকে ফের বলল, তোমরা এত নিষ্ঠুর চ্যাটার্জি।

চ্যাটার্জি পাশে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসেছে। সে জেনিফারের কথায় সামান্য হাসল। ওর জলদস্যুর পোশাক, মোটা লেন্সের চশমা এবং লম্বা দাড়ি-গোঁফ এতটুকু ভয়াবহ লাগছে না। টুপিটা পাশে রেখে দিয়েছে। কিছু বলছে না।

তোমরা আমাদের এতদিন ভুলে থাকতে পারলে!
চ্যাটার্জি আঙুল তুলে দূরেব কী একটা দেখাতে চাইল।
ওটায় উঠতেই দেখি নিচুতে দুটো তাঁবু।
কবে দেখলে?
যেদিন এলে।
ক্যাবট সঙ্গে ছিল?
চ্যাটার্জি আবার চুপ মেরে গেল।—দ্বীপটা কেমন লাগছে তোমার?
ভাল না।
তোমার সঙ্গে আর-একজন কে?
আর্চি।
লোকটা ভাল না।
তোমরা খুব ভাল বুঝি! ক্যাবটের কাছে আমার কী অপরাধ চ্যাটার্জি? তুমিই বলো। কী? কিছু বলছ না কেন?
চ্যাটার্জি ফের চুপ মেরে গেল।
আচ্ছা, তুমি ক্যাবটের কথায় এলেই চুপ করে থাকো কেন! বলো আমি তো মানুষ! কিছু না বলে আমাকে টর্চার করছ।

তারপর মনে মনে ভাবল, ক্যাবট কি সত্যি দ্বীপে নেই! হতেই পারে না। দু'জনের একজন থাকলে অন্য জনও থাকবে। সে মনে করার চেষ্টা করল ক্যাবটের অনুপস্থিতিতে কখনও কারও কাছে খুব একটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল কি না! সে এমন কোনও ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে না। দ্বীপেব কিছু কীট-পতঙ্গের আওয়াজ, পাতা-পড়ার শব্দ, কখনও কোনও পাখির কলরব। তারপর নিঝুম, দূরে কেমন ঝিল্লির মতো জ্যোৎস্না পাহাড়ে বার বার ধাক্কা মারছে। মাথার ওপর অজস্র লতাগুল্ম। আকাশে কিছু মেঘের ভেসে যাওয়ার ছবি।

জলদস্যুর পোশাকে চ্যাটার্জি তাব পাশে বসে রয়েছে। নিরীহ, স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেন অনেকদিন পর দু'জন নর-নারীর দেখা হয়েছে অপরিচিত জায়গায়। এর চেয়ে বেশি কিছু না। চ্যাটার্জিকে দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

চ্যাটার্জি বলল, কী করে খবর পেলে জেনিফার?
পত্র-পত্রিকা থেকে।

ওবাই বা কী কবে জানল।

মাছ ধবাব নৌকা, দূবেব জাহাজ তোমাদেব কাউকে কখনও দেখতে পেত। নির্জন দ্বীপে কোনও মানুষ না থাকাবই কথা। কিন্তু তোমাদেব কাউকে না কাউকে দেখে ওবা খুঁজতে আসত। অথচ খুঁজে পেত না।

বছবখানেক ধবে এই একটা উৎপাত। কিছু জেলেডিঙি শীতেব সময় এখানে থেকে গেছে। মাছ ধবাব একটা ভাল জায়গা এটা। ওবাই বুঝি খবব দিযেছে?

বোধ হয় তাই। ওবা খুঁজে পেত না।

পাওযা কঠিন।

চ্যাটার্জি, তোমবা কোনদিকটায় আছ, কী খাও? বেঁচে আছো কী কবে?

চ্যাটার্জি বলল, আছ ক'দিন?

জাহাজ না ফেবা পর্যন্ত আছি। ক্যাবটকে নিযে যেতে এসেছি। ওকে একবাব ডাকো না। দেখি। কেমন ছেলেমানুষেব মতো আবদাব জেনিব।

চ্যাটার্জি বলল, থম্পসনেব সঙ্গে আশালাতা অঞ্চলে একবাব ঢুকে গেছিলে।

আশালাতা, সে আবাব কোথায়?

দ্বীপেবই একটা অংশেব নাম।

আশালাতা, সে আবাব কেমন নাম।

সবই আমাদেব দেওয়া। কখনও কোথাও গেলে ক্যাবটকে বলতে হয়, কোথায় গেছিলাম। নামিতে ছিলাম না ডিহি-সাঁতবাগাছি, না আজুঘানিতে, বলতে হয় সব। এই জায়গাটাব নাম বেল ফুলাবি। যখন গবম পড়ে, এই জায়গায় এসে দুপুবে শুযে থাকি। বেশ ঠান্ডা থাকে জায়গাটা। খুব গবমেও কেমন শীত ভাব থাকে ঠান্ডা পাথবে।

ক্যাবট কেমন আছে চ্যাটার্জি?

ভাল আছে। আমাব চেয়ে সুখে আছে।

জেনিফাব তীব্র দুঃখে কাতব হল। অভিমানে চোখে জল এসে গেল। তাকে সেই সুদূব দেশে ফেলে ক্যাবট এত ভাল থাকতে পাবে সে কিছুতেই বিশ্বাস কবতে পাবল না।

তুমি ঠিক বলছ না চ্যাটার্জি।

জেনিফাব।

সেই ঠান্ডা গলা। শীতল ববফেব মতো চোখ চ্যাটার্জিব।

জেনিফাবেব ভয কবতে থাকল, চ্যাটার্জি, প্লিজ এভাবে আমাকে ডাকবে না।

জেনিফাব, আব দেবি কবা ঠিক হবে না। চলো বাইবে দিয়ে আসি

আমি যাব না। ক্যাবটেব সঙ্গে দেখা না কবে যাব না। সে কতটা ভাল আছে জানতেই এসেছি।

ওবা ভাববে।

ভাবুক। ওদেব নিয়ে আমাব কোনও মাথাব্যথা নেই।

তোমাব না থাকলেও আমাব আছে।

চ্যাটার্জি।

আক্রোশে ফেটে পডল জেনিফাব।

কেন এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন। আমবা কী কবেছি। এখানে আব কে কে আছে? কোনও নাবী, কোনও রূপসীকে লুকিয়ে বেখে মজা লুটছ তোমবা? তোমবা স্কাউন্ড্রেল।

জেনিফাব।

দোহাই চ্যাটার্জি, একবাব ক্যাবটেব কাছে নিয়ে চলো, আব কিছু চাই না। স্পষ্ট দুটো কথা বলব তাকে। এক নম্বব, তাকে আমি নিতে এসেছি, জীবন সংশয় করে এসেছি, সে যাবে কি না। যদি আমাব প্রেম ও বিশ্বস্ততাব অভাব থাকে, সে খুলে বলুক। ওব মুখ থেকে শুনতে চাই।

জেনিফাব।

আবাব সেই ঠান্ডা গলা।

বলো।

তুমি খুব স্বার্থপর। একবার তো বললে না আমি কেমন আছি।

জেনিফার সেই আকাশ, ভাসমান মেঘমালা, কিছু নক্ষত্র দেখতে দেখতে মাথা নিচু করে ফেলল বলল, তুমি ভাল নেই চ্যাটার্জি।

চ্যাটার্জি ভীষণ দ্রুত হা হা করে হেসে উঠল। এমন তীব্র হাসির শব্দে সব পাখিরা জেগে গেল বনের। খরগোশেরা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল ঘাসের উপত্যকা। 'আমি খুব ভাল আছি, খুব ভাল আছি' বার বার বলতে বলতে ক্রমে ধাবমান এক অশ্বের মতো বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল

জেনি ভয় পেয়ে ডাকল, চ্যাটার্জি, আমি জানি না, তুমি কেমন আছ, সত্যি জানি না, চ্যাটার্জি, আমি যদি পৃথিবীতে কোনও বিশ্বাসী রমণীর ভূমিকায় জীবন যাপন করে থাকি, তবে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি এখানে এই গভীর বনাঞ্চলে একা ফেলে গেলে তোমার পাপ হবে। সত্যি বলছি তোমার পাপ হবে।

চ্যাটার্জি আবার ফিরে আসতে থাকল। ডালপালার শব্দে জেনি টের পাচ্ছিল, সে আবার ফিরে আসছে।

কাছে এসে বলল, চলো কোনও কথা না আর। আছ তো কিছুদিন। দ্বীপটায় আমি বাদে তোমার আর কিছু ভয়ের নেই। পারো তো কাল এসো।

দেখা হবে বলছ?

দেখা হবে।

কোথায় আসব?

যেখানে আজ এসেছিলে।

ক্যারট থাকবে?

অধীর হবে না জেনি।

ক্যারটকে বলবে আমি ওর খোঁজে এসেছি।

বলব।

কী বলে ক্যারট আমাকে বলবে তো?

সব বলব। সব। এক এক করে সব বলব।

এবং কিছু দূর এগিয়ে যেতেই জেনি দেখল চ্যাটার্জি সহসা থমকে দাঁড়িয়েছে। নুয়ে কিছু একটা হাতে তুলে নিল।

দেখেছ! দ্যাখো। - বলে সে একটা মরা খরগোশ চোখের সামনে তুলে ধরে বলল এসব কে করছে লোকটা! কার ওপর তার এত রাগ!

জেনিফার কিছু বলতে পারল না। কী বলবে বুঝতে পারছে না। বোকার মতো এখনও ভাবছে সবই মরীচিকা নয় তো! ওর ধীরে ধীরে কথা বলার স্বভাব। সবই মিলে যাচ্ছে। ওর শরীর ছুঁয়ে দেখেছি সেই পুরু লেন্সের চশমা! ক্যারটের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু। একই সঙ্গে ওরা কতবার সফরে গেছে হয়েছে। ওর গলার স্বর আগের মতোই আছে। সে মানুষের কিছু খারাপ করতে পারে না। সে অত্যন্ত নিরীহ, নিরপরাধ।

এবারে চ্যাটার্জি কিছু ডালপাতা সাফ করতে থাকল। মাটি খুঁড়ে ফেলল নখ দিয়ে। লম্বা অতিকায় নখে সহজেই অনেকটা গর্ত করে ফেলল। আগে লক্ষ করেনি, চুল-দাড়ির মতো নখও বড় বড়। অতি প্রাচীন সবুজ শ্যাওলার মতো নিরেট একটা পাথর। আবেগ নেই। দুঃখ নেই। কিঞ্চিৎ বরং উদাসীন সে খরগোশটাকে ভীষণ যত্নের সঙ্গে মাটির অভ্যন্তরে নামিয়ে দিল। তারপর থাবড়া দিয়ে সব মাটি চাপিয়ে দিল খরগোশটার ওপর।

জেনিফার দেখল, সুপ্রাচীন একটা দৈত্য হাঁটু গেড়ে সামান্য একটা খরগোশকে ঠিক কোনও প্রিয়জনের মতো কবর দিচ্ছে।

আট

বিচার্ড হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূবে চলে এসেছিল। সাদা জ্যোৎস্নায় নির্জন বালিয়াড়িতে মাতাল হবাব মতো বড আব কিছু নেই। বেশ টলছে শবীব। কতদূব অস্পষ্ট সেই প্রবহমান সমুদ্র, তাব ঢেউ, তাব নিচে বযেছে কত সব বিচিত্র জলজ জন্তু। ইংলন্ডেব উপকূলে কোনও প্রেযসীব কথা এ সময় খুব মনে পড়ছে। বিচার্ড এ সময় কাবও কাবও মুখ ভেবে সুখ পাচ্ছে। কে কোথায়, আর্চি কী কবছে, থম্পসন কোথায়, কিছুই প্রায খেয়াল নেই। সবাই মর্জিমাফিক কাজ-কাম কবে যাচ্ছে। খুব একটা কর্তব্যপবায়ণও কেউ নেই। জেনি তো খুশিমতো বনটাব ভেতব ঢুকে গেল। কখন ঢুকে গেল, ক'টা বাজে, ঘাডতে সময় দেখেই সে কেমন আঁতকে উঠল। তখন সাতটা বাজে। এখন ঘড়িতে দশটা দশ। এত সময় একা সে কী কবছে? ফিবেও আসতে পাবে। সে তো আব সব সময় বনটাব দিকে চেয়ে নেই। ফিবে না এলে আর্চি কখন হইচই বাধিযে দিত।

তবু একটা সংশয়, যতই নিবাপদ ভাবুক, দ্বীপটায় কিছু বহস্যময় ঘটনা যে একেবাবেই ঘটে যাবে না কে বলতে পাবে। সে জেনিব জন্য কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পডল। হাতেব গ্লাসটা শেষ কবে উঠে দাঁড়াল সে। কিছুটা হেঁটে মনে হল তাঁবু ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। বালিয়াডি ক্রমে কেমন সরু হয়ে আসছে। এবং বুঝতে পাবল সে উল্টোমুখে হাঁটছিল। ওদিকে গেলে সেই লেগুনটা পডবে। আব কিছুদূব হেঁটে গেলেই জল নামাব শব্দ। জোয়াবেব সময জল দ্বীপেব নিচু ঢালু জাযগায নেমে যায়। ভাটাব সময় সব শুকনো। আসলে জল নামাব শব্দেই বোধ হয সজাগ হয়ে গেছিল সে। বুঝতে পেবেছিল ঘুবে আব কিছুটা এগোলে তাঁবু দুটো দেখা যাবে না।

জ্যোৎস্নায সাদা বালিযাড়িব প্রান্তে তাঁবু, তাব লণ্ঠন খুবই ভৌতিক লাগছে। আব জোবে বাতাস বইছে। আলো মাঝে মাঝে নিবু নিবু হয়ে আসে, তখন তাঁবুদুটো কোনও ববফেব দেশে এস্কিমোদেব মতো মনে হয, যেন চাবপাশে শুধু ববফ, এবং মাঝে দুটো ইগলু। সে নিজেবে কেমন একটা ববফদেশেব নিবাসী ভেবে হাঁটতে থাকল। লম্বা পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। বালিতে পা বসে যাচ্ছে। এত যে বাতাসে ঢেউ আছড়ে না পডলে বালিব কিচ কিচ শব্দ অনাযাসে টেব পাওয়া যেত। সে টেনে তুলে নিচ্ছে। এবং তাঁবুব পাশে এসে দেখল বালিযাডিতে চিত হযে পডে আছে আর্চি। একেবাবে যেন সংজ্ঞাহীন মানুষেব মতো। মাতাল লোকটাকে সে টেনে তুলতেই আবাব মনে হল থম্পসন তাঁবু থেকে বেব হয়ে আসছে।

বিচার্ড।

এত জোবে ডাকছিল যে, অনেক দূব থেকে শোনা যাবে। সে বলল, এই তো আমি।

থম্পসন জোবে ডেকেই চলেছে বিচার্ড। বি চা র্ড।

কী হচ্ছে এসব।

বিচার্ড। বি চা র্ড।

বিচার্ড বুঝল, একেবাবে বেহেড মাতাল।

সে এবাব তাকিয়ে বলল, কী হযেছে।

তুমি কে?

বিচার্ড।

বিচার্ড বলে আমাদেব সঙ্গে কেউ আসেনি।

বিচার্ড বলল, ভেতবে যান। শুযে পড়ুন গে।

আর্চিব গলা এতই জডানো যে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সে আচ্ছা ঝামেলায় পড়ে গেছে। আর্চিব ভেতবে ঢুকিয়ে দিয়েছে, থম্পসনকে ধবে আনতে যাচ্ছে, তখন আর্চি সমুদ্রেব দিকে ছুটে যাচ্ছে। বলছে, জেনি কেন ফিবে এল না। জবাব চাই। কর্তাকে সব বলে দেব। তোমবা মাতলামি কবাব জাযগা পেলে না।

বিচার্ড সব ফেলে জেনিব তাঁবুব দিকে ছুটে গেল। পর্দা তুলে দেখল, জেনি ফেবেনি। বা ঘুমিযে নেই। এত বাতে সে সত্যি ফেবেনি ভাবতেই কেমন কর্কশ গলায় ডাকল, থম্পসন, জেনি আসেনি।

আর্চি সেই জড়ানো গলায় বলল, মজা বের হয়ে যাবে। কর্তাকে সব বলে দেব থম্পসন, কেউ পাব
পাবে না।

থম্পসন যতই মাতাল হোক রিচার্ডের হাঁকাহাঁকির গুরুত্ব বুঝে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিকমতো পা
ফেলতে পারছে না। দুটো আলগা পা নিয়ে সে ঠেলেঠুলে জেনির তাঁবুর সামনে কোনওরকমে দাঁড়াল।
বলল, চলো। দেখি।

তিন মাতালের এখন অন্বেষণের পালা। ওরা উঠে যাচ্ছে। আর্চি মুখ লম্বা করে ঘোড়ার মতো
চিৎকার করছিল, জেনি, জেনি! সব সময় মনে হচ্ছে আর্চি 'জেনি জেনি' করছে। গলা কি ভেঙে গেছে
আর্চির! আর অতদূর থেকে কেন চিল্লাচ্ছে! বনটার কাছে যাওয়া দরকার। অতদূর থেকে চেঁচালে কে
শুনতে বসে আছে!

রিচার্ড বলল, এত পেছনে কেন থম্পসন?

যাচ্ছি।

আর্চি আবও পেছনে পড়ে থাকছে। সে দু'পা এগোলে এক পা পিছিয়ে যাচ্ছে। আর কী যে হয়েছিল
তার, একেবারে নিদেনপক্ষে বোতলটা শেষ না করে দিলেই বুঝি চলত না? কাব যে দিব্যি খেয়ে সে
উঠে পড়ে লেগেছিল, যত জেনি ওকে পাত্তা দিচ্ছে না তত সে মরিয়া হয়ে উঠছে। এবং বুঝতে পারে
আর্চি তার স্বভাবের জন্যই জেনিকে নিজের করে নিতে পারবে না। অনুকম্পায় বেঁচে থাকার মতো দুঃখ
কী আর আছে! এত সব মনে হলেও শঙ্কা দূব হচ্ছে না। বার বারই মনে হচ্ছিল, একটা লম্বা হাত বনের
অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসবে এবং মাল খালাসের মতো তুলে নেবে ভেতরে। রিচার্ড খুব গম্ভীর
গলায় ডাকল, আসুন। পা চালিযে আসুন।

যা মাতাল হয়ে আছে সব। লম্বা হাতটা যদি সত্যি এগিয়ে আসে সে সবে গিয়ে আর্চিকে ধরিয়ে
দেবে। তারপর, তারপর থম্পসন আব সে দৌড়াবে সমুদ্রের দিকে। বোট নিয়ে ভেগে পড়বে।

আর তখনই জেনির গলা পাওযা গেল। সাদা জ্যোৎস্নায় প্রায় আবির্ভাবেব মতো মনে হচ্ছে। সে
কাছে এসে বলল, কী হচ্ছে এসব? ইস, সব কটা মাতাল! মাতলামি করছ সবাই!

আর্চি অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকল।

রিচার্ড বলল, তুমি এতক্ষণ কী করছিলে ভেতরে?

জেনি জবাব দিল না। হেঁটে নেমে যেতে থাকল।

আর্চি সাহস পেয়ে গেছে। সে জেনিকে ধরাব জন্য ছুটতে থাকল। ছুটতে গিয়ে দু'বার পড়ে গেল।
বালি ঝেড়ে নিল হাঁটু থেকে। ফের দৌড়ে কাছে গিয়ে বলল, কী করছিলে এতক্ষণ, বলতে হবে।

জেনি বলল, আর্চি, রাত হয়েছে।

রিচার্ড এবং থম্পসন খুব হালকা হয়ে গেল। ভেতরে কোনও আর শঙ্কা নেই। সবার পেছনে ওরা
লা লা করে গান গাইতে গাইতে নেমে আসছে। আর্চি জেনির পাশাপাশি হাঁটার চেষ্টা করছিল, একবার
এত খাড়া পড়ে গেল যে, জেনি ফেলে চলে আসতে পারল না। বলল, ধরো।

তাবপর একজন রুগ্ণ মানুষেব মতো আর্চিকে তাঁবুতে পৌঁছে দিল। বলল, যাও ঘুমোওগে। কোনও
সাড়া-শব্দ যেন না পাই।

বিচার্ড ও থম্পসন ভেতবে ঢুকে দেখল, আর্চি ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আছে। চোখদুটো খোলা। রিচার্ড
কথা বলতে গেলে, মুখে আঙুল দিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে। এতটা ভালমানুষ হয়ে গেছে দেখে রিচার্ড
হেসে ফেলল। থম্পসন বলল, বেশি খাওয়া হয়ে গেল। বেশি খেলে আমার আবার ঘুম আসে না
কেবল বক বক কবতে ইচ্ছে করে।

আর্চি থম্পসনকে বলল, চুপ! ঘুমোচ্ছে।

থম্পসন খুব গরম অনুভব করছে। সে ক্যাম্প-খাটটা বাইরে টেনে বের কবে আনল। এবং সোজা
হাত-পা মেলে দিল খাটে।

লণ্ঠন নিভিয়ে রিচার্ডও শুয়ে পড়েছে।

আর্চি পাশ ফিরল। বলল, রিচার্ড, দেখছ তোমার বোনের কাণ্ড।

রিচার্ড বলল, ঘুমোও। সকালে বোলো।

কী সাহস দেখেছ! তুমি এত করে বললে, কেন এত দেরি, কিছু বলল তোমাকে!

রিচার্ড বলল, বকবক করতে হয় বাইরে যাও।

আর্চি সটান উঠে পড়ল। বলল, সেই ভাল। ক্যাম্প-খাটটা টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। থম্পসনের পাশে খাট রেখে শুতে যাবার সময়ই শুনল ঘড় ঘড় শব্দ। নাক ডাকছে থম্পসনের। এত বড় আকাশের নীচে একা! ওরে বাপস! সে ফের ক্যাম্প-খাটটা টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। রিচার্ড চিৎকার করে উঠল, কী হচ্ছে এসব? একবার বাইরে, আবার ভেতরে!

আর্চি অন্ধকারে কী ফেলে দিল। হুড়মুড় করে কিছু গড়িয়ে পড়ছে।

রিচার্ড টর্চ জ্বেলে উঠে বসল।

কী হচ্ছে আর্চি!

আর হবে না। এই যে শুয়ে পড়লাম।

একটা ডিশ এবং দুটো কাপ উলটে পড়েছে। কাঠের পেটি থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙেনি। বালির জন্য প্রায় সব কটা আস্তই আছে। রিচার্ড ওগুলো তুলে রেখে শুয়ে পড়ার সময় ভাবল, খুব গরম। থম্পসন বাইরে শুয়ে ভালই করেছে। সে ক্যাম্প-খাট টেনে নিয়ে গেল বাইরে। তারপর সোজা সে-ও পা ছড়িয়ে দিল খোলা আকাশের নীচে।

অন্ধকারে আর্চির ভয় করতে থাকল। অন্ধকারে কারা সুড়সুড়ি দিতে আসছে আর্চিকে। আর্চি আবার খাটসহ বাইরে এসে ওদের পাশে শুয়ে পড়ল। ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হল মাথার ওপরের আকাশটা নেমে আসছে! সমুদ্রটা এগিয়ে আসছে! সে ফের গা ঢাকা দেবার জন্য তাঁবুর নীচে খাট নিয়ে চলে গেল। আবার ভয়, সুড়সুড়ি, আবার বাইরে। সারারাত আর্চি এভাবে ঘর-বার হল। জেনি ছাড়া কেউ জানল না এটা। একমাত্র জেনি তাঁবুর বাইরে টিনের চেয়ারে ওপাশের আড়ালে বসে আছে। তার ঘুম আসছে না। দ্বীপটা তার সব কেড়ে নিয়েছে।

নয়

সকালে সবাই আবার অভিযানে বের হবে বলে ঠিকঠাক হয়ে নিচ্ছিল। ব্রেকফাস্ট করে নিল তাড়াতাড়ি। পোশাক পরে নিচ্ছে। অভিযানে যাবার আগে সবাই গামবুট পরে নেয়। আর্চি বাইরে গামবুট পায়ে গলিয়ে দিচ্ছিল, আর ডাকাডাকি করছিল, জেনি, তোমার হল! আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে। দেরি হলে ফেলে চলে যাব।

জেনির তখনও ঘুমই ভাঙছে না। রোদ উঠে গেছে কত। চা ঠান্ডা হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট তেমনি পড়ে আছে। আর্চি তাঁবুতে ঢুকে বলল, এ কী! তুমি এখনও শুয়ে আছ! ওঠো।

জেনি পাশ ফিরে শুল।

রিচার্ড! জেনি উঠছে না।

উঠছে না তা আমি কী করব?

জেনিকে তবে ফেলে যাবে? জেনি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

আসলে সকালে উঠেই রিচার্ডের মনে হয়েছিল এমন একটা নির্জন দ্বীপে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। কী গরম। তবু রক্ষা, বিকেল পড়তেই সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বাতাস উঠে আসে। গায়ে জামা রাখা যাচ্ছে না। থম্পসনের পিঠে দুটো-একটা ফোসকা ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। আর ক'টা দিন। এখন মানে মানে দ্বীপটা ছেড়ে যেতে পারলে হয়! সব কিছুর মূলে জেনি। ওর জেদ প্রবলভাবে তাড়া না করলে ওদের আসতে হত না। সে জেনির ওপর সকালেই ভারী অপ্রসন্ন বোধ করছিল।

আর্চি বলল, জেনি, শুনছ?

জেনি একবার খেঁকিয়ে উঠল, কী? ঘুমোতে দেবে না?

সারারাত ঘুমোওনি?

আমি যাব না, বলে দাও।

একা থাকবে?

কী হবে থাকলে? তুমি যাও আর্চি। আর একটা কথাও না।

ঠিক আছে, যাচ্ছি। ভেবে দ্যাখো, আমাদের ফিরতে কিন্তু রাত হবে।

কিন্তু যখন রিচার্ড শুনল, জেনি সত্যি যাবে না, সে তাঁবুতে পড়ে পড়ে সারাদিন ঘুমোবে, তখন আর কিছু ভেবে লাভ নেই। সে থম্পসনের দিকে তাকিয়ে বলল, হল?

থম্পসন বুঝতে না পেরে বলল, কী হল?

জেনির কৌতূহল মিটে গেছে।

আর্চি অবোধ বালকের মতো হেসে উঠল।

আগেই বলেছিলাম, যত সব গুজব। আদরে আদরে মেয়েটার মাথা খেয়েছে কর্তা। কেউ আসে! লোকে শুনলে পাগল বলত আমাদের। থম্পসন, আপনার প্রশ্রয়েই এত হয়েছে।

থম্পসন বলল, ওর শরীর ভাল না-ও থাকতে পারে।

আর্চি দৌড়ে চলে গেল। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, জেনি, তোমার কি শরীর খারাপ?

ওহো! কী জ্বালাচ্ছে। চোখের পাতা এক করতে দিচ্ছে না।

আমি কী বলছি শুনতে পাচ্ছ!

জেনি এবার উঠে বাইরে বের হয়ে এল।

আর্চি, দোহাই তোমার! আমার জন্য এত না ভাবলেও চলবে।

কিন্তু থম্পসনকে এগিয়ে আসতে দেখেই বলল শরীরটা ভাল নেই। আপনারা যান। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

আর্চি গজ গজ করছিল।

সারাদিন ঘুমোবে। সন্ধ্যা হলেই বনে ঢুকে যাবে। কী যে আছে বুঝি না।

রিচার্ড কিছু না বলে একা একা উঠে যেতে থাকল। থম্পসন বলল, তা হলে আর্চি তুমি থাকো আমরা যাচ্ছি।

জেনি তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে বলল, থম্পসন, ওকে প্লিজ নিয়ে যান।

আর্চি কেমন গোলমালে পড়ে গেছে। জেনির যখন ইচ্ছে সে চলে যাবে মনস্থ করল। যেদিকে দু'চোখ যায়। দ্বীপটায় সে হারিয়ে যাবে ভাবল। সারাজীবন সে কেবল জেনির জন্য ভেবেছে, জেনি তার জন্য কিছু অন্তত ভাবুক। সত্যি সে হারিয়ে যাবে। জেনির ঘুমের প্রাবল্য বের করে না দিচ্ছে তো তার নাম আর্চি নয়।

এবং সন্ধ্যায় সত্যি দেখা গেল থম্পসন, রিচার্ড ফিরছে, আর্চির পাত্তা নেই।

জেনি কোনও কিছুই লক্ষ করেনি। সারাটা দিন সে কেবল শুয়ে বসে কাটিয়েছে। ভেতরে কত রকমের শঙ্কা, উদ্বেগ। কখন সন্ধ্যা হবে। কখন দ্বীপটায় জ্যোৎস্না উঠবে। এবং ক্যাবটের কথা, ক্যাব এই দ্বীপেই আছে। কোথায় কীভাবে আছে, সব জানতে পারবে আজ। সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। চোখে মুখে আশ্চর্য অধীরতা। প্রবল এক আকর্ষণ এই দ্বীপটার অভ্যন্তরে রয়ে গেছে, সে কাউকে টের পেতে দেয়নি। আর্চি ফিরল কি না, আর্চি কোথায় অথবা আর্চি বলে কোনও হবু বর তার সঙ্গে এসেছে সে মনেই করতে পারল না। কেবল মস্তিষ্কের কোষে কোষে ক্যাবটের সব মধুর স্মৃতি, অকপট ভালবাসা জেনিকে এতদূর নিয়ে এসেছে। জেনি নিমগ্ন হয়ে আছে নিজের ভেতর।

থম্পসনও লক্ষ করল না। আর্চি এতক্ষণ সঙ্গেই ছিল। বনের শেষাশেষি আসতেই সে আর তাকে দেখতে পায়নি।

রিচার্ড ফিরে এসেই ঝোলাঝুলি ফেলে ক্যাম্প-খাটে বসে পড়ল। আর্চির জন্য তারও ভাবনা কম।

বেচারা আর্চি কিছুক্ষণ একা বসে থাকল। কিন্তু রাত সামান্য গভীর হতেই সর সর করে উঠল কিছু সে তাকাল। না কিছু না, হুড়মুড় করে কী সব ভেঙে পড়ছে! সে চারপাশে ফের তাকাল। অথচ কিছুই দেখতে পেল না। একটা প্রবল অন্ধকার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। কী, ওটা, ভাবতেই দেখল গাছপালা ভারী নিঝুম, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। আকাশে খণ্ড-মেঘ কোথা থেকে অতিকায় ছেঁড়া ঘুড়ির মতো ভেসে যাচ্ছে! গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল। বনের গাছপালা খুবই ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

জ্যোৎস্না ঢেকে গেল মেঘে। আর বেশি রিস্‌ক নেওয়া যাচ্ছে না। মান-অভিমান এমন একটা বিশ্রী দ্বীপে ঠিক জমবে না। দেশে ফেরা না পর্যন্ত সমুচিত শাস্তি সে জেনিকে দিতে পারছে না। তা ছাড়া কর্তব্যবোধের খাতিরেও সে এতটা করতে পারে না। জেনির মতো তারও রাগে-দুঃখে মাথা খারাপ হলে চলবে কেন! মাথা ঠান্ডা রাখতেই হবে। এত সবের পর আর থাকা ঠিক সমীচীন মনে করল না সে। চোঁ দৌড়। বালিয়াড়িতে কিছুটা এসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর, এই যেন ঘুরে বেড়িয়ে এল, সে ওদের মতো আদৌ ভিতু নয়, এমন কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য হেলে-দুলে হাঁটতে থাকল। কে দেখল, কে দেখল না, দেখবার সময় নেই।

আর্চি এসে দেখল, ওরা তিনজন গোল হয়ে খেতে বসেছে। আর্চি নেই, অথচ ওরা বেশ খাচ্ছে। আর্চিকে দেখেই রিচার্ড বলল, হাত-মুখ ধুয়ে বসে পড়ো।

সে এতক্ষণ কোথায় ছিল একবার কেউ জিজ্ঞেসও করল না।

টেবিলে সবাই খাচ্ছে। থম্পসন বলে দিল, মাত্রাতিরিক্ত কেউ খাবে না। কাল যা দেখালে সবাই!

থম্পসন পরিমাণ মতো দিতে থাকল। জেনি পেগ খানেক খেয়ে বলল, আর না। আমি উঠছি।

রিচার্ড লক্ষ করছে জেনিকে। সারাদিনে জেনির সঙ্গে আজ ওর একটা কথাও হয়নি। এমনকী থম্পসনের সঙ্গেও বোধ হয় খুব কম। আর্চিকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল।

সমুদ্রের ঠান্ডা বাতাস ভারী মনোরম। তাঁবুর ভেতরে বাতাস বেশ সজোরে বইছে। তাঁবুর ভেতরে জেনি আজ প্রথম ট্রানজিস্টার-সেটে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের খবরাখবর নিল। এবং খবর শুনল। কিছু গান। এতদিন পর থম্পসন দেশের মানুষদের গান, কথিকা, সংবাদ শুনে খুবই মনমরা হয়ে গেল। দেশের জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল তার।

জেনি তাঁবুর ভেতর কান খাড়া করে রাখল। তখনও আর্চিটা বকবক করছে। রিচার্ডের গলা পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। থম্পসন বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। জেনি একবার উঁকি মেরে দেখল। রিচার্ড, থম্পসন, আর্চি ক্যাম্প-খাট বাইরে টেনে এনেছে। থম্পসন ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। আর্চি পায়চারি করছে। রিচার্ড বসে রয়েছে এখনও। ওরা না শুলে বের হতে পারছে না। ঘড়িতে দশটা দশের মতো। সে থাকবে তো? রিচার্ড এবং আর্চির ওপর সে ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কিছু বলতে পারছে না। তাঁবুর ভেতরে উসখুস করছে কেবল।

এক সময় মনে হল সব নিঝুম হয়ে গেছে। সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন শোনা যাচ্ছিল কেবল। কিছু জেলি ফিশ ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঢেউ ওদের অনেকটা ওপরে তুলে দিয়ে গেছে, আর নিয়ে যায়নি। রোদে সকালে শুকিয়ে মরে পড়ে থাকবে। সে এইসব দেখতে দেখতে যখন বুঝল সবাই সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাঁবুর পর্দা ফেলে উঠে গেল। খুব সন্তর্পণে, কেউ টের না পায়। জেগে গেলেও বুঝতে পারবে না ভেতরে জেনি আছে কি নেই। ভাববে জেনি ঘুমিয়ে আছে।

বনটার কাছাকাছি আসতে সময় লেগে গেল। ঝুঁকে ঘড়ি দেখল। এগারোটা বেজে গেছে। সে যদি ফিরে গিয়ে থাকে, যদি মনে করে থাকে কিছুই আর গোপন নেই, থম্পসন রিচার্ড সব জানতে পেরেছে এবং একটা কুমতলব আছে, তাহলে সে আর এখানে না-ও আসতে পারে। এতসব ভাবতে ভাবতে ভেতরে ঢুকে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। সে গামবুট পরে থাকে বলে পায়ের নীচে কী পড়ছে না পড়ছে, খুব একটা খেয়াল করছে না। কেবল দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে।

একটা গাছের আড়াল থেকে কেউ বলল, ওদিকে না। এদিকটায়।

সে পেছন ফিরে দেখল। সামনে, আশেপাশে সব জায়গায়, কেউ নেই। কোথা থেকে বলছে বুঝতে পারছে না। আবার গলা পাওয়া গেল, পাথরটা টপকে এসো।

পাথর উঁচুমতো। সে কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেলেই বুঝল যতই চেনা জগৎ মনে হোক, আসলে চেনা নয়। সব হিজিবিজি ব্যাপার আছে এই বনটাতে। কিছুটা গোলকধাঁধার মতো। এক চালেই অনেক কাছে চলে যাওয়া যায় বালিয়াড়ির। আবার ঠিকমতো চাল পড়লে, সোজা অনেক গভীরে দ্বীপের বুকে যাওয়া যেতে পারে। সে পাথরটার মাথায় উঠে দেখল, নীচে মানুষটা ঘাসের উপত্যকায় বসে আছে। এই উপত্যকায় ওরা আরও একদিন এসেছিল যেন। সময় লেগেছিল অনেকটা। আজ কত সহজে সে কত কাছে পেয়ে গেল উপত্যকাটা।

জেনি নীচে লাফ দিয়ে নেমে গেল। মানুষটা সত্যি রূপবান হয়ে গেছে দ্বীপে থাকতে থাকতে। সে পরে আছে সুন্দর নীলরঙের প্যান্ট আর হাওয়াইন শার্ট! পায়ে কেডস জুতো। ঠিক আগের মানুষ যেন চ্যাটার্জি। নখগুলো বড় করে তবে রাখা কেন? চুল-দাড়ি এত বড় রাখা কেন! অথবা এত সুন্দর নীলরঙের পোশাক মানুষটা পায়ই বা কোথায়! সে কাছে যেতে একটা বন্য গন্ধও পেয়ে গেল শরীরে। কেমন বেমানান! সে কিছুক্ষণ চ্যাটার্জিকে কেবল দেখল। কথা বলতে ভীষণ আড়ষ্ট বোধ করছে। ভেবেছিল ক্যাবট না এসে পারবে না। অথচ ক্যাবট নেই। সে একা এসেছে। চ্যাটার্জির কোনও দুরভিসন্ধি নেই তো? দ্বীপে থাকতে থাকতে কতরকমের বন্যস্বভাব গড়ে উঠতে পারে।

সে ভেতরে ঢোকার আগেও দেখে নিয়েছে, হিপপকেটে ঠিকঠাক আছে ওটা। এবং এজন্যই সে অনায়াসে চলে আসতে পাবে। চ্যাটার্জিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁবুতে ফিরে তার মনে হয়েছে, খুবই দুঃসাহসেব কাজ এটা তার। এতটা নিরাপদ ভাবা ঠিক না। সে আজ স্থির করে এসেছে, চ্যাটার্জিকে বাধ্য করবে তাঁবুতে নিয়ে যেতে। এবং তারপর যা হয়, যে-কোনওভাবে শেষ খবর জেনে নেবে ওর কাছ থেকে। সারারাত সারাদিন সেজন্য এতটুকু তার ঘুম হয়নি। বিকেলের দিকে মাথাও ধরেছিল। ট্যাবলেট খেয়ে এখন ভাল আছে।

চ্যাটার্জিও জেনিকে দেখেই এগিয়ে গেল। বলল, কী ব্যাপাব? অত দূরে দূবে কেন? ভয় টয় পাচ্ছ না তো?

না।

এমন সুন্দর দ্বীপে কোনও ভয় নেই জেনিফাব! এখানে কেউ অবিশ্বাসের কাজ করে না। অবিশ্বাসের কাজ করলে এ দ্বীপে ভয় পেতে হয। তুমি দ্বীপে ঘুবে বেড়ালেই বুঝতে পারবে।

লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে। এবং ওব কথা শুনলে সহজেই যেন নির্ভর করা যায়। সে বলল, তুমি জানো আমরা ক্যাবটকে খুঁজতে এসেছি। আজ তোমার সঙ্গে ওর কাছে যাব।

কোথা থেকে হাত বাড়িয়ে সে টুপি টেনে দিল মাথায়। সেঁটে দিল টুপিটা! ওর লম্বা চুল এবং দাড়ি সন্ত মানুষের মতো। শরীরের রং আশ্চর্যভাবে সবুজ ঘাসের মতো হয়ে গেছে। গতকাল উত্তেজনায় মাথায় এতসব সে লক্ষ করেনি। সে টর্চ নিয়ে এসেছে। টর্চ জ্বেলে একবার অনুনয় কবল জেনি, তোমার মুখটা ভাল করে দেখতে চাই চ্যাটার্জি।

বলে টর্চের আলো ফেলতেই মনে হল বড় শান্ত মুখ। কোনও বড় জায়গায় যখন মানুষ পৌঁছে যায় তখন মানুষের মুখ এমন থাকে। গির্জায় কোনও বয়স্ক ফাদারের মতো মনে হচ্ছে তাকে। চুল-দাড়ি নীল রঙেব হয়ে গেছে। অথবা জ্যোৎস্নায় এমনও দেখাতে পারে। তাছাড়া সমুদ্র আকাশ হ্রদের সর্বত্র যখন নীল রঙের ছড়াছড়ি তখন এমন একটা পৃথিবীতে বসবাস করতে করতে যে মানুষটাও আশ্চর্য সুষমা নিয়ে বেড়ে উঠবে বিচিত্র কী! জেনিফার মুখ নিচু করে বলল, ওর কাছে নিয়ে চলো। তুমি যা চাইবে দেব।

চ্যাটার্জিও যেন কিছুটা ইতস্তত করল। তারপর বলল, যাবে, চলো।

জেনি কত কিছু যে বলতে চাইছে। অথচ আবেগে একটা কথাও স্পষ্ট হল না তার। অঝোরে কান্না আসছে। সে যাচ্ছে। তাব কাছে যাচ্ছে! দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, দীর্ঘদিনের এক স্বপ্ন লালন করে রেখেছে। আসলে পৃথিবীতে কিছু অকস্মাৎ হারিয়ে গেলে বুঝি তার মূল্য বেড়ে যায়। ক্যাবট হারিয়ে গিয়ে আরও বেশি নিজের হয়ে গেছে। ক্যাবটের সামনে সে কী ভাবে দাঁড়াবে, ক্যাবট তাকে দেখলে আগের মতো ছুটে আসবে তো! সেই জাহাজঘাটায় বহু দূর থেকে হাত তুলে দেওয়া, জাহাজ ভিড়লে ছুটে যাওয়া, তারপর পরস্পর কিছুক্ষণ সংলগ্ন হয়ে যেন বোঝা, তুমি আগের মতোই আছো তো, না কোথাও কোনও কষ্ট গোপন করে যাচ্ছ। আরও কত সব ঘটনা ঘটতে পারে। সে কি তার বন্ধুর মতো দাড়ি-গোঁফ রেখেছে, তার হাতের নখও কি পাশের মানুষটির মতো বড় বড়, অথবা সে যদি কোনও জলদস্যুর পোশাক পরে থাকে তবে কেমন দেখাবে! সে কত যে এমন প্রশ্ন করতে চাইছে মানুষটিকে। অথচ মানুষটি চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। কেবল যেন অনুসরণের কথা, আর কিছু না। সে একবার তবু বলে ফেলল, চ্যাটার্জি, ক্যাবট কি তোমার মতো চুল-দাড়ি রেখেছে, তোমরা কি সত্যি বন্য হয়ে গেছ?

সে শুধু বলল, দ্যাখো হোঁচট খাবে! পথ দেখে চলো। এদিকটায় তোমরা একবার দুটো-একটা গাছ

দেখেছিলে। ওই যে পাঁচিলের মতো পাথরটা, ও জায়গায় তোমরা একবার এসেছিলে। এখানে সেই পথটা। কিছুটা হেঁটে গেলে তোমার আর কোনও অসুবিধা হবে না।

তুমি সেদিন এখানে ছিলে?

ছিলাম।

গাছগুলো কী রকম শুকনো!

এ সময় গাছগুলোর পাতা ঝরে যায়। ছাল খেয়ে ফেলে জন্তুতে।

কী জন্তু?

দেখতে প্যাংগোলিনের মতো। আসলে ওগুলো প্যাংগোলিন নয়। গাছের ছাল খেয়ে বেঁচে থাকে।

আচ্ছা, গাছে গাছে কিছু নাম লেখা!

মানুষটা এবার কেমন তিক্ত গলায় বলল, এতসবও দেখে ফেলেছ?

সে বলল, কেন? কোনও অন্যায় হয়েছে? তোমরা লিখে রাখবে, আমরা দেখতে পারব না?

চ্যাটার্জি তাকাল জেনির দিকে। যেন ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। এবং মনে হয় সে মেয়েদের এমন প্রশ্নে অভ্যস্ত নয়। অথবা এরা সব পারে। সব রকমের দুঃসাধ্য কাজ। একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে যতটা কঠিন, তাদের কাছে তত সহজ!

এখানে গাছপালা বড় নয়, জঙ্গল গভীর নয়। গাছগুলো ওক গাছের মতো। ওরা ক্রমে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কীট-পতঙ্গের আওয়াজ সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে উঠে আসছে এবং আরও ভেতরে ঢুকে গেলে মনেই হল না, এটা দ্বীপ। গাছপালার ভেতর ওরা দু'জন, চারপাশে মায়াবী জ্যোৎস্না। কে বলবে দ্বীপে এমন সব সুন্দর জায়গা আছে। যেমন মানুষেরা ইচ্ছা করলেই এখানে আবাস তৈরি করতে ফেলতে পারে। জেনিফার জানে না, এইসব লতাগুল্মের এক মনোরম ঘ্রাণ আছে। ঘ্রাণ মোহ তৈরি করতে পারে। পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের পক্ষে দ্বীপে বেঁচে থাকা কত জরুরি হয়ে পড়তে পারে সামান্য এই বন্য ঘ্রাণ তার সাক্ষী। জেনিফার নাক টেনে বলছে, কী সুন্দর গন্ধ! তোমার শরীরের, না গাছের?

চ্যাটার্জি সামান্য হাসল।

এভাবেই সেই প্রথম থেকে উত্তর অথবা দক্ষিণ-সমুদ্রে আবাস তৈরি করেছে মানুষেরা। জেনিফার বোধ হয় সে খবর রাখে না। জায়গাটাকে খুব অকিঞ্চিৎকর ভাবা জেনিফারের খুব বোকামি হচ্ছে। বিশেষ করে সে এই দ্বীপটার এতটুকু নিন্দা সহ্য করতে পারে না। যদিও জেনিফার এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু বলেনি।

পায়ের নীচে কত পুরনো সব ঘাস, পাতা, নুড়ি-পাথর, মরা ডাল মাড়িয়ে ওরা যাচ্ছিল। যেন শেষ হচ্ছে না। জেনিফার বার বার বলছে, আর কতদূর!

চ্যাটার্জি বলল, পা চালিয়ে হাঁটো।

কিছুদূর এসে সোনালি লতার বন পার হল একটা। তারপর জেনিফার দেখল, সামনে উঁচুমতো হলুদ রঙের একটা পাহাড়। সেখানে সাদা সাদা কী দেখা যাচ্ছে! কাছে গেলে বুঝল থোকা থোকা সব সাদা ফুল ঝুপড়ির মতো উঁচু-নিচু অনেকটা দূর পর্যন্ত। ফাঁকে ফাঁকে অতিকায় সব ক্যাকটাস দাঁড়িয়ে আছে। আর সমুদ্রের নীচে ঝিনুকের ভেতর যেমন নির্জনতা থাকে, তেমনি নির্জনতা।

জেনিফার বলল, আমি আর হাঁটতে পারছি না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছি না।

চ্যাটার্জি বলল, কোথাও নিয়ে যাচ্ছি।

চ্যাটার্জি, কিছু হলে আমি কিন্তু তোমাকে খুন করব।

হাসতে হাসতে বলল চ্যাটার্জি, কোরো।

জেনিফার একটা পাথরে বিশ্রাম নেবার সময় বলল, চ্যাটার্জি, তোমরা সত্যি নিষ্ঠুর। ছ'বছর কী করে একটা দ্বীপে থাকলে!

থেকে দ্যাখো না! ছ'টা বছর কত কম সময় মনে হয়।

তুমি থাকো। ক্যাবটকে নিয়ে...

তারপর কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস টের পেল কারও। জেনি তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল এবার। দীর্ঘ নিশ্বাসে বুকে তার কেমন ভয় ধরে গেল।

তারপরও ওরা হাঁটছিল।

চ্যাটার্জি কোনও কথা বলছিল না। কথা বলার অভ্যাস কমে গেছে। জেনি লক্ষ করেছে কখনও-কখনও মানুষটা কথা বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। ভাষা খুঁজে পায় না। সেই প্রাণবন্ত মানুষ আর নেই। অজস্র কথাবার্তা, ঠাট্টা-তামাশা একেবারেই যেন ভুলে গেছে। যতটুকু কথা বলার দরকার সেইটুকু গুছিয়ে বলছে। এমন গভীর বনে কোনও নারী-সংসর্গ এতটুকু চঞ্চল করছে না তাকে। আগের মতো আর ছেলেমানুষটিও নেই। গম্ভীর প্রকৃতির আলাদা মানুষ।

অথচ জেনি জানে না গভীর রাতে যখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে, এই মানুষটা জেগে যায়, তখন শোনা যায় সে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে তার বন্ধুকে। বোধহয় কথাবার্তার অভ্যাসটা এভাবেই রক্ষা করছে তার।

সুন্দরী জেনিফার বলল, তোমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে না? দেশের কথা?

চ্যাটার্জি স্রেফ বলল, না।

কিছুই মনে পড়ে না?

না না।

বিরক্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়ছে কেন! জেনিফার ফের বলল, বউয়ের কথা মনে হলে তো খুব মুখ গোমড়া করে রাখতে। বলতে, আর ভাল লাগছে না, কবে যে দেশে ফিরব!

তখন জেনিফার কত রকমের হাসি-ঠাট্টা করত তার স্ত্রীকে নিয়ে। ক্যাবট দেশে গেলেই চ্যাটার্জি তার অতিথি। ক্যাবট বোধহয় বুঝতে পারত কষ্টটা কোথায় জাহাজি মানুষের। ঠিক সেও যখন কলকাতায় যেত, চ্যাটার্জির বাড়িতে হইচই দুই বন্ধুতে। চ্যাটার্জির স্ত্রী দু'হাতে একজন বিদেশি মানুষকে সেবা-যত্ন করত।

বন্য মানুষটা মাঝে মাঝে দেখছিল জেনিফারকে। সুন্দরী জেনিফার, ক্যাবটের বিশ্বস্ত স্ত্রী। ক্যাবটও মনে-প্রাণে স্ত্রীর প্রতি ভারী বিশ্বাসী ছিল। জাহাজি জীবনে যা স্বাভাবিক, একটুকুতেই বেচাল হওয়া ক্যাবটের তা ছিল না। ভারী ধীর-স্থির মানুষ ক্যাবট। চ্যাটার্জি তার বন্ধুকে নিজের মতো করে নিতে পেরেছিল। লম্বা সমুদ্রসফরেও সে আর ক্যাবট জাহাজে সাধারণ ডাঙার মানুষের মতো সংসারী মানুষ। তবু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল।

জেনিফার বলল, তুমি কথা বলো চ্যাটার্জি। কথা না বললে কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে সব।

তবু তখন মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে, ঝোপঝাড় পার হয়ে যাচ্ছে, বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে যাওয়া যায়, কেবল মসৃণ পাথরের ওপর দিয়েই অনেকটা হেঁটে যাওয়া যায়, কোনও গোপন জায়গা ওরা বেছে নিয়েছে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই অগম্য, অথবা এমন কোনও চিহ্ন সব আছে, কিংবা সংকেত, যা দেখে সে সহজেই তার আস্তানায় ফিরে যেতে পারছে, কারণ জেনি এখন বুঝতেই পারছে না কোনটা পূর্ব পশ্চিম, কোনটা উত্তর-দক্ষিণ— সে কেবল পেছনে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে, তখন ফের না বলে পারল না, তোমার বউয়ের কী যেন নাম?

সে বলল, সরমা।

এই বললে কিছু মনে নেই!

তারপর ঘড়ি দেখে বলল, বারোটা পাঁচ। প্রায় এক ঘণ্টার মতো হেঁটেছি। সরমার জন্য তোমার কষ্ট হয় না?

সে বলল, হয়। আবার ভুলে যাই।

তবে চলো আমাদের সঙ্গে। কথা দাও।

কথা বললে কথা বাড়ে। এসব প্রসঙ্গ উঠুক সে চায় না। ধীরে ধীরে বলল, থাক না এসব কথা ক্যাবটের খোঁজে এসেছ, তাকে দ্যাখো পাও কি না।

পাব না কেন বলছ?

চ্যাটার্জি গুন গুন করে কী গাইছে এখন। পাগল নাকি! একেবারে যখন-তখন মতিগতি পালটে ফেলছে। বোঝাই যায় না কিছু। সে বলল, তাকে আমার পেতেই হবে চ্যাটার্জি। তাকে না নিয়ে যাব না।

বেচারা!-- ওর মুখ থেকে ফসকে বের হয়ে গেল কথাটা।

কে বেচারা! কাকে বলছ?

চ্যাটার্জি শুধু বলল, এসো।

আমি আর যাব না। তুমি কিছু করতে চাও!

জেনিফার!

সেই ঠান্ডা গলা। অন্য মানুষ। একেবারে স্থির অবিচল পাথরের মতো। আব এক পা নডছে না। কিছুটা সংলগ্ন হয়ে বলল, এসে গেছি। ভয় পেও না। ক্যাবট আমাদেব খুব কাছে কোথাও আছে। ডাকলেই সাড়া দেবে।

সে এবার ক্যাবট বলে চিৎকার করতে থাকল।

ক্যাবট, তোমার বউ জেনিফার তোমাকে খুঁজতে এসেছে। তুমি কোথায়?

আমি এখানে! চ্যাটার্জি নিজেই তার হয়ে জবাব দিল। তারপর জেনিফাবেব দিকে তাকিয়ে বলল, শুনলে কী বলছে!

জেনিফার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল এমন ভণ্ডামিতে। সে ছুটে এসে মানুষটাব সামনে দু'হাত ছড়িয়ে দিল। তারপর ওর জামা ধরে যেন ওর চুল-দাড়ি যা আছে ছিঁড়ে ফেলবে এমনভাবে ঝাঁকাতে থাকল। চিৎকার করে বলল, দোহাই চ্যাটার্জি, তুমি রসিকতা কোরো না। সব সহ্য হয় তোমাব

সে তখন তেমনি ঠান্ডা গলায় বলল, সে তোমাকে ভুলে গেছে।

জেনিফার পাগলের মতো বলল, না না, মিথ্যে কথা। মিথ্যা কথা বলছ। সে আমাকে ভুলে যেতে পারে না।

সে অসহায় রমণীর মতো হু হু করে চ্যাটার্জিব বুকেব ওপব কান্নায ভেঙে পডল। চ্যাটার্জি এখন যে কী কবে! কিছুটা সান্ত্বনা ব্যতিরেকে কোনও উপায় নেই। সে মাথায হাত বেখে বলল, ঠিক ঠিক কিছু মনে কবতে পারি না। মনে করতে ভালও লাগে না।

ক্যাবটও ঠিক তোমার মতো?

সে আরও বেশি, জেনিফাব। দেখলে তো ডাকলাম, সাড়া দিল না। সে তোমাকে চিনতেই পাববে না। এসো। আর সামান্য সাহস সঞ্চয় কবো।

জেনিফাব এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। কী বলবে বুঝতে পাবছে না। সে এত অধীর যে দু' হাটু ভেঙে আসছে। মানুষটা একটা দেয়াল থেকে পাথব সরাতেই ভযংকব গুহাপথেব মতো কী ভেসে উঠল। তারপর আর তার জ্ঞান ছিল না। সকালের দিকে মনে হল কেউ তাকে ডাকছে। রিচার্ডেব গলা, জেনি, কত আর ঘুমোবে! কখন উঠবে, মুখ ধোবে, ব্রেকফাস্ট কববে! সে এখানে আছে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনটা জীবনের সত্যাসত্য, মুহূর্তে গুলিযে ফেলল। সংজ্ঞা হাবাবার পব মানুষটা তাব এতটুকু ক্ষতি করেনি। কাঁধে ফেলে এতটা পথ হেঁটে এসেছে ফেব। বেখে গেছে। তার দু'চোখ জলে ভরে গেল।

দশ

সকাল থেকেই ভীষণ ঝোড়ো বাতাস বইছিল। আকাশ ঘোলা। জোয়াবেব সময় তাঁবুর কাছাকাছি জল এসে যায়। ঝোড়ো বাতাসের জন্য ঢেউগুলো প্রবল হয়ে উঠছে। বাতাসে ভীষণ জলকণা উড়ছিল। থম্পসনের মনে হল তাঁবু আরও ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার। প্রচণ্ড ঝড়ের ভেতর ঢেউগুলো তাঁবুর ওপর এসে আছড়ে পড়তে পারে। জোয়ার এবং ঝড়ের প্রাবল্য এই প্রথম একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে।

শত ডাকাডাকিতে জেনি উঠছে না। বাতাসের গতি ক্রমে বাড়ছে। তাঁবুতে পত পত শব্দ হচ্ছে। এবং গুমগুম আওয়াজ। রিচার্ড শঙ্কা বোধ করছে। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলতে হবে। তাঁবু আরও ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার। স্টোভ জ্বালানো যাচ্ছিল না। তবু থম্পসন কোনওরকমে তাঁবুর ভেতর গবম জল করে রেখেছে। আলুতে সামান্য চিজ মিশিয়ে নিয়েছে। একটা করে আপেল প্রত্যেকের ভাগে। সবারই খাওয়া শেষ। জেনি তবু উঠছে না।

অগত্যা রিচার্ড বলল, জেনি, আকাশের অবস্থা ভাল না। ওঠো। তাঁবু ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

ওরা প্রথমে নিজেদের তাঁবু খুলে ফেলল। তাঁবু এবং দড়িদড়া যা কিছু আছে, অবশিষ্ট খাবারের পেটি সব টেনে নিয়ে যেতে থাকল। তখন জেনি উঠে বাইরে এল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে সফেন ঢেউ আকাশ ঢেকে সামনে এসে আছড়ে পড়ছে। জল কেবল ফুলে-ফেঁপে উঠছে ক্রমশ। এই সাতসকালে এমন একটা অবস্থা হবে দ্বীপে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এবং প্রবল সাইক্লোন ওঠার আগে যা যা করা দরকার থম্পসন বিচার-বিবেচনা মতো করে যাচ্ছে। কিছু শুকনো কাঠ পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছে। কারণ প্রচণ্ড শীত পড়ে যেতে পারে। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া দ্বীপটাতে। সহজেই প্রবল ঠান্ডা নেমে আসতে পারে। হাতের কাছে সব কিছুই ঠিকঠাক রাখা দরকার। ওরা টেনে টেনে উঠে যাচ্ছে, যতটা পারা যায়, যতটা ওপরে উঠে যাওয়া যায়। ওদের আগেই এসব ভাবা উচিত ছিল। আর্চি থম্পসনের একটা বড় রকমের এটি আবিষ্কার করতে পেরে খুশি। সবই বলা যাবে কর্তাকে। বিশ্বাসী লোকের বুদ্ধিসুদ্ধির তারিফ করা যাবে তখন।

আর্চি খুব খাটছে। রিচার্ডের চুল উসকো-খুসকো। সেও দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। তাঁবুর খোঁটা পোঁতা হয়ে যাচ্ছে। যতটা পারা যায় ভেতরে শক্ত করে পুঁতে দিচ্ছে। দিয়েও আশ্বস্ত হতে পারছে না। ঝড় কতটা প্রবল হয়ে উঠবে বোঝা যাচ্ছে না। তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে না যায়! এটা হয়ে গেলেই জেনির তাঁবু ভেঙে ফেলতে হবে। যতটা সম্ভব দৌড়ে কাজ করছিল সবাই। এতসব দেখে জেনিও কাজে লেগে গেল। ওর সোনালি চুল হাওয়ায় উড়ছে। গাউন সামলাতে পারছে না। উড়ে ছিঁড়ে ফিরে যেতে চাইছে। সে কোনওরকমে সব সামলে, কাপ-ডিশগুলো সন্তর্পণে পা টিপে টিপে নিয়ে যাচ্ছে। ঝড় তাকে আদৌ আকুল করছে না। বরং সে বেশ খুশি। ভিজে ভিজে বালিকার মতো ছুটোছুটি লাগিয়েছে। রাতের সব ঘটনা কখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে তার।

তুমুল হুলুস্থুল চলেছে আকাশে বাতাসে সমুদ্রে। দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তু সব অঝোর বর্ষণে ভিজছে। ঝড়ের দাপটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ডালপালা। শেকড়-বাকড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুৎপ্রবাহ। বজ্রপাত হচ্ছে কোথাও। প্রকৃতি রসেবশে উত্তাল প্রেমিকের গোপন খেলা দেখে মুগ্ধ। শেষে বোটটাও ভাসিয়ে নিয়ে এল ওরা সবাই। জলে ঝড়ে সহজেই চারজন মিলে অনেকটা ওপরে তুলে ফেলতে পারল। শেষমেষ ঢেউ ওদেরও কিছুক্ষণের জন্য বালিয়াড়িতে চিতপাত করে ফেলে দিয়ে সরে গেল। গেরাফি অনেক ওপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে থম্পসন। সেটা মাটিতে পুঁতে দিতেই মনে হল শেষ। সবাই তাঁবুর ভেতরে তখন। জেনি নিজের তাঁবুতে সব খুলে ফেলল। এবং দিনটা কতক্ষণে শেষ হবে, ঝড়-ঝঞ্ঝা। সে গ্রাহ্য করে না। দুপুরে খেতে বসেই রিচার্ড লক্ষ করল, জেনি খুব কৃশকায় হয়ে গেছে যেন। চোখ টানছে। ক্লান্ত চোখ-মুখ। যেন কোনও এক অতীব পীড়ন চলছে অভ্যন্তরে। অথচ এই যে সারা সকাল হাত মিলিয়ে ওরা কাজ করেছে, জেনিকে এতটুকু দুঃখী মনে হয়নি। রিচার্ড এক চামচ সুপ মুখে দিয়ে হাতটা মুছে নিল ন্যাপকিনে। তারপর ফের তাকাল আর্চির দিকে। খাবার সময় আর্চি ভীষণ মনোযোগী মানুস। সে লক্ষই করল না, জেনির কিছু একটা হয়েছে। এবং যেন হঠাৎই হয়েছে। সে বলল, জেনি, তুমি কি রাতে ঘুমোও না!

জেনির ভেতরটা চমকে উঠল। কিন্তু স্বাভাবিক গলায় বলল, ঘুমোই তো।

তবে চোখ এত টানছে কেন! যেন কত রাত না ঘুমিয়ে আছ।

আর্চি তাড়াতাড়ি ঠোঁট ন্যাপকিনে সামান্য মুছে নিল। তাকাল ভাল করে। শেষে আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলল, ঠিক ঘুম হচ্ছে না। হবে কী করে! নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত। তাই বলে না ঘুমিয়ে থাকা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না। ভুল তো মানুষেরই হয়। থম্পসন কী বলেন?

ভুল মানুষেরই হয়।— থম্পসন দু' টুকরো আলুভাজা মুখে পুরে দিল।

জেনি অল্পস্বল্প খাচ্ছে।

আর্চি বলল, একবার আমরা বুঝলে জেনি, তুমি ভেবো না, মেয়েদের কোনও গৌরব গাঁথা এটা। আসলে মেয়েরা এমনিতেই পুরুষের চেয়ে জেদি হয়। সেটি ভাল। জেদ কখনও-কখনও মানুষকে খুব বড় করে দেয়।

রিচার্ড এতটুকু শুনছে না। আগের কথার সঙ্গে পরের কথার কোনও মিল নেই। ফাঁকা সব দার্শনিক

কথাবার্তা আরম্ভ করলেই রিচার্ড বুঝতে পারে লোকটা কত বড় আহাম্মক। এমনিতে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু যেভাবে কথাবার্তা শুরু করেছে, একেবারে বাইবেলের পাতায় গিয়ে না-ফেলে দেয়। নোয়ার প্লাবনে ওর কোনও চোদ্দোপুরুষ একটা ভেড়া নিয়ে গেছিল, বাইবেলের পাতায় তাও খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। সে বলল, জেনি, তোমার কি মনে হয় ঝড় আরও বাড়বে?

আর্চি বলল, ওহে যুবক, আমার নিবাস সমুদ্রের কাছাকাছি। আমাকে জিজ্ঞেস না করে জেনিকে জিজ্ঞেস করার মানে?

জেনি বলল, রিচার্ড, আমি উঠছি।

তারপর রেনকোট জড়িয়ে সে বালিয়াড়িতে বের হয়ে গেল। আর্চি কোনও মেরুদেশের তুষারঝড় আরম্ভ হয়েছে ভাবল। তুষারঝড়ে কোনও রমণীর একা বের হওয়া কতটা উচিত, একবার থম্পসনের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করে নিল। থম্পসন নির্বিকার। তাঁবুর ভেতর জল ঢুকে যাচ্ছে। সে পা উঠিয়ে বসল। তারপর এই ঝড়-বাদলায় খাওয়াটা বেশ জমে উঠেছে। এক কাপ কফি করে দেওয়া হয়েছে সবাইকে। জেনি কফিটা না খেয়েই উঠে গেল।

ঝড়-বাদলায় দ্বীপের চেহারা পালটে গেছে। ঘোলা জলের মতো অন্ধকার। তাঁবুর ভেতর লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিতে হয়েছে। থম্পসন চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তাস দাবা খেলার এটা বেশ প্রকৃষ্ট সময়। কিছুই সঙ্গে আনেনি। সে ছেলেবেলাতে স্কুলে আঁককাঠি খেলত। অনেক দিন পর মনে হল ছেলেবেলার খেলাটা খেলা যায়। সে কাপ-ডিশ নামিয়ে রাখার সময় রিচার্ডের দিকে তাকাল।

রিচার্ড, খেলবে নাকি?

রিচার্ড থম্পসনের কথায় বিস্মিত হল। সে চুরুট জ্বালিয়ে বেশ জুতসই হয়ে মাত্র ক্যাম্প-খাটে বসেছে, তখনই খেলার কথা। কী খেলা যায়? খেলার জন্য তাস অথবা দাবা কিছুই আনা হয়নি। এমনকী লুডো, ক্যারাম। এমনভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে কখনও কল্পনাই করতে পারেনি। থম্পসন বাসন-কোসন ধুয়ে রেখেছে। জেনিকে দেখা যায়নি। তাঁবুতে ঢুকে গেছে বোধ হয়। একা একা থাকতেও পারে। বেশ চারজনে গোল হয়ে বসে থাকা, গল্পগুজব কথা ভাবী মনোরম। জেনিটা জীবনকে উপভোগ করতে জানে না। সে খাটে শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, কী খেলবেন ভাবছেন? বরং রেডিয়ো শুনবেন?

ঝড়ের দাপটে রেডিয়ো খুব গড় গড় করছে। স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর্চি রেডিয়োটা ফের বন্ধ করে দিল। এখন তিনজন মানুষ আর প্রকৃতি যদৃশ মাতাল। বেলা পড়ে আসতেই দ্বীপটা ঘন ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল। ঝড়ের বেগ বেড়েছে মনে হল।

জেনি রেনকোট ঝুলিয়ে রেখেছে তাঁবুতে। গামবুট জোড়া খাটের নীচে। আসলে রেনকোট রাতে দরকার হতে পারে। ওদের তাঁবু থেকে সন্ধ্যার পর চেয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে এখন পরে আসা ভাল হয়েছে। নিজের জিম্মায় রেখে দেওয়া। টর্চটা জ্বালিয়ে দেখল, সব ঠিক আছে। তবু একবার তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে আকাশের অবস্থা দেখে নিল। এত ঘন বর্ষণ যে পাশের তাঁবুটা স্পষ্ট নয়। যতটুকু সময় হাতে পাওয়া যায়, শুয়ে থাকা দরকার। ঘুম আসছে না। ভোররাতের দিকে সামান্য ঘুম এসে গেছিল। এতেই সে অবাক হয়েছে। কত বড় উদ্বেগের ভেতর সময় কাটছে, কী যে উত্তেজনা, এবং এজন্যই বোধহয় সে টের পাচ্ছে না, ভেতরে কত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে। থম্পসন বোধহয় গিটার বাজাচ্ছে। বেশ লাগছিল। এবং কোনও কাউবয় বড় মাঠে তার ছাগল-ভেড়া নিয়ে ঝড়ে পড়ে গেছে, ঠিক তেমনি একটা সুর বাজাচ্ছিল থম্পসন। সে কান পেতে শুনতে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। একটা লণ্ঠন হাতে ভিজতে ভিজতে আর্চি এসে ডেকেছিল, জেনি, রাতের খাবার রেডি। এসো।

সে ওদের তাঁবুর ভেতরে গিয়ে অবাক। এই রাতে থম্পসন কত রকমের খাবার তৈরি করেছে। গরম ভাপ উঠছে। সব প্লেটে ঢাকা। একটা নতুন বোতল ভাঙা হয়েছে। সবারই প্রচণ্ড খিদে। জেনিরও বেশ খিদে পেয়েছে। এবং খাবারের গন্ধটা ওর খিদে আরও বাড়িয়ে দিল।

আর্চি বলল, ভারী মজা। আ!

বলে সে দু' হাত ওপরে তুলে দ্বীপটার সুখটুকু অনুভব করতে চাইছে। আর মাত্র সাত-আট দিন,

তারপরই সুইট হোম। সে বেশ ঢক ঢক কবে গলায় বোতল থেকে কিছুটা ঢেলে মুখ-চোখ তেরিয়া কবে ফেলল।

জেনি বলল, এত খাবার কে খাবে?

আর্চি বলল, যা খাবার, একাই খেতে পারি।

থম্পসন বলল, বাদলার দিনে আব তো কিছু করার নেই।

জেনি ভাবল, সত্যি! থম্পসনের কিছু না-কিছু কবা চাই। সারা বিকেল সে তবে নানারকমের মেনু তৈরি করেছে। এবং ভীষণ আন্তবিকতাব সঙ্গে এখন সব সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে। জেনি বলল, আপনি পারেনও।

তারপরই সহসা খুব চিন্তান্বিত মুখে বলল, যা আছে বাকি ক'টা দিন চলবে তো?

খুব খুব।— সোল্লাসে আর্চি লাফিয়ে উঠল।

রিচার্ড বলল, হয়ে যাবে।

আর্চি দাঁড়িয়ে তার প্লেটে যতটা পাবল তুলে নিল। চাক চাক খরগোশেব মাংস ভাজা। খবগোশেব কিডনির চচ্চড়ি। একটা ডিশে অল্প পবিমাণ গ্রিনপিজ সেদ্ধ। মাংস খেয়ে খেয়ে খুব একটা জিভে স্বাদ না-থাকলে দুটো-একটা গ্রিনপিজ মুখে ফেলে দেওযা।

জেনি বলল, আমাকে অল্প দিন। এত খেতে পারব না।

আর্চি বলল, খাও খাও। জীবনে সুযোগ মানুষেব খুব কমই আসে। ভাগ্যিস এসেছিলাম।

জেনি নিজেব প্লেটে কিছুটা বেখে বাকিটা আর্চিব প্লেটে তুলে দিল। সে তাব গ্লাসে সামান্য মদ ঢেলে বোতলটা সবিয়ে দিল। কে কতটা খাচ্ছে কি খাচ্ছে না দেখাব সময় যেন নেই। আর্চি বলল, খুব ঘুম পাচ্ছে।

জেনি বলল, খুব।

থম্পসন বলল, তোমবা খাও। আমি আসছি।

বলে সে একবাব তাঁবুব বাইবে ভিজতে ভিজতে চলে গেল।

একটাই বেনকোট থম্পসন ভিজে-ভিজেই পায়চারি করল বালিয়াড়িতে। সমুদ্রের দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে টাকটা সম্পূর্ণই ভিজে গেল। ভেতরে এসে গা মুছে বলল, বেশ ঠান্ডা পড়েছে।

আর্চি বলল, কিছু দেখলেন?

থম্পসন বলল, না। আব ক'টা দিন। তোমাদের সবাইকে নিয়ে মানে মানে ভেসে পড়তে পাবলে হয়।

বিচার্ড বুঝতে পাবল, থম্পসন আবাব কোনও সংশয়ে পড়ে গেছে। সে বলল, কী দেখতে গেছিলেন?

এমনি গেছিলাম।

জেনি থাকায় কি কিছু বলছেন না! জেনি খেয়ে উঠে গেলে রিচার্ড ফের বলল, আপনি আমাকে গোপন কবছেন কেন?

থম্পসন হেসে ফেলল।

আবে, তেমন কিছু নয়। জলটা বাড়ছিল। দেখে এলাম কতদূর উঠে এসেছে।

আর্চি বলল, দ্বীপটা ডুবে যাবে না তো!

বিচার্ড অন্য সময হলে হয়তো বলত, যেতেও পারে। কিন্তু আবহাওয়া ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে। জোয়ার প্রবল হলে কতটা কী হয় তাবা জানে না। আব জোয়ারে বছরের কোনও-কোনও সময় দ্বীপটা ডুবেও যায় কি না জানা নেই। সে তাই আর্চিব প্রতি খুব রুষ্ট হয়ে কথা বলতে পারল না। বরং থম্পসনকেই ফেব বলল, কতটা উঠে এসেছে?

আর্চি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, সকালে দেখব না তো সমুদ্রে ভেসে গেছি' ঘুমিয়ে থাকলে মানুষ মবা!

থম্পসন বলল, আর্চি, তুমি এত ভিতু কেন বলো তো?

আমি ভিতু! সত্যি কথা বললে মানুষ ভিতু হয়? বরং আপনাদের প্রশংসা করা উচিত। আগে থেকেই অ্যালার্মিং বেল বাজিয়ে দিচ্ছি।

জোয়ার কতক্ষণ থাকে!

বলে থম্পসন দেখল তাঁবুর নীচে কী একটা গলা বাড়িয়েছে। বালিয়াড়িতে আগেই দেখে এসেছিল ওটা। অসংখ্য কচ্ছপ দ্বীপটায় উঠে যাচ্ছে। কচ্ছপের গলা দেখে সে বলল, ওই দ্যাখো!

এবং আর্চি সহসা দেখেই লাফিয়ে খাটে উঠে পড়ল।

থম্পসন বলল, কচ্ছপ।

এবং মানুষের কোলাহল পেয়ে কচ্ছপটা দৌড় লাগাল। থম্পসন তাঁবুর দড়িদড়া ফের টেনে দেখল একবার। কিছু ছোট ছোট পাথর তুলে আনল। রিচার্ডও বের হয়ে গেল। ওরা জেনির তাঁবুর পাশেও বড় বড় পাথর তাঁবুর তলানিতে জমিয়ে দিল। ঝড়-বাদলায় কখন কী তাঁবুর ভেতর ঢুকে যাবে— অথবা কোনও অক্টোপাস, সমুদ্র থেকে জলচর জন্তুরা ঢেউয়ের আঘাতে সহজেই ওপরে উঠে আসতে পারে। সতর্ক থাকা দরকার।

থম্পসন বাইরে থেকেই বুঝেছে, জেনি লণ্ঠন জ্বালিয়ে কিছু পড়ছে। বোধহয় দ্বীপের ভূ প্রকৃতি সম্পর্কিত সেইসব বই। থম্পসন একবার হেসে বলল, ভয়ের কিছু নেই জেনি।

জেনি ভেতর থেকেই বলল, বৃষ্টিতে আর ভিজবেন না। খাওয়া হয়েছে?

এবার গিয়ে বসব।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। বেশি রাত জাগবেন না। অসুখে পড়ে যাবেন।

আচ্ছা।

বেশ চড়া গলায় কথা বলতে হচ্ছিল উভয়কে। সমুদ্রের প্রবল গর্জনে না হলে শোনা যাচ্ছিল না। ওরা চলে গেলে জেনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। কাল রাতে সে দ্বিতীয়বার মূর্ছা গেছে। এমন কী দেখছিল মূর্ছা যাবার মতো! কোনও ভয়ংকর কিছু সে মনে করতে পারছে না। সারাটা দিনই সে কেবল ভেবেছে তবে সে মূর্ছা গেল কেন! প্রথমবার মূর্ছা যাবার মতো ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার? অনেক করেও দৃশ্যটা সে মনে করতে পারছে না। একটা গুহামুখের সামনে ভুবন চ্যাটার্জি তাকে নিয়ে হাজির করেছিল। ভুবন কথাটা তার এই প্রথম মনে পড়ল। চ্যাটার্জি বলেই সে ডাকত। কিন্তু ওর নাম ভুবন। পদবি চ্যাটার্জি। ক্যাবট প্রথম পরিচয়ের সময় সব খুলে বলেছিল। ভুবন কথাটা সে ভুলেও ভুল করে। আবার মনে পড়ায় কেমন নিজের কাছেই অবাক হয়ে গেল। এবং এই ভুবন ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল, ভুবন তাকে একটা গুহামুখের সামনে বলেছিল, দেখতে পাচ্ছ?

সে দেখেছিল, ঠিক যেমন একজন জাদুকর বায়োস্কোপের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভুবনও তেমনি বাক্সটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাক্সের ডালা খুলে ওর শরীরটা কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়ে বলেছিল, দেখো।

একটা ছিদ্রপথে চোখ রেখেছিল জেনি। সেই গুহামুখের ওপরে অদ্ভুত সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা। দেখেই মূর্ছা গেছিল। সুন্দর ফুলের উপত্যকা দেখে কেউ মূর্ছা যায় সে কেমন ব্যাপার! তবু তার চেয়ে বেশি কিছু সে মনে করতে পারছে না। না আরও কিছু, যা একেবারেই অবচেতন মনে ডুবে আছে। ওর মনে পড়ছে একটা পাথর তুলতেই কোথাও যেন ঢুকে গেছিল তারা। বাইরে থেকে সহজেই পাথর অথবা পাহাড়ের গা মনে হয়, সামান্য সমান্তরালভাবে এগিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সরু একটা গোপন পথ আছে। ভেতরে ঢুকে গেলেই সেই সুন্দর উপত্যকা। ফসলের জমি, ফুলের গাছ, ফলের গাছ সব আছে। আসলে ওটা গুহামুখ মনে হলেও এখন বুঝতে পারছে ভেতরে ঢুকে যাবার গোপন রাস্তা। ভুবনের সুন্দর নিবাস অলক্ষে কিছু উলটপালট করে দিচ্ছে না তো।

তারপরই মনে হল জ্যোৎস্নায় অত সব স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে কি ভুবন কিছু জানে? ভুবন রহস্যময় পুরুষ! ভুবন কি অলৌকিক কিছু করতে পারে? ইচ্ছেমতো কারও সংজ্ঞালোপ করে দিতে পারে। যত ভাবছে, তত সে আকর্ষণ বোধ করছে। ক্যাবট কতদূরে থাকে! ক্যাবট কেন দেখা দিচ্ছে না! ভারী গণ্ডগোলে পড়ে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। একসময় এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, সে

ডাকাডাকি শুরু করে দিত, থম্পসন আপনারা দ্বীপটাকে যত নিরীহ ভাবছেন, আসলে দ্বীপটা তেমন নিরীহ নয়। এর ভেতরে এক গোপন খেলা চলছে। সেটা কী আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।

আর মানুষের কী যে হয়, মানুষ কি কখনও নির্জনতায় নিজের অতীত সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন হয়ে যেতে পারে? কী ঘটনা ঘটেছিল, কিছুই ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। এবং সে স্থির করে নিচ্ছে কীভাবে আজ ভুবনের মুখোমুখি হবে। সে কিছুতেই সংজ্ঞা হারাবে না। ক্যাবট নিশ্চয়ই ছায়ার মতো দূরে থাকে। তার প্রিয় বন্ধুকে দিয়ে সব বোধহয় জেনে নিচ্ছে। ছ' বছরে জেনি কতটা কী ঠিক আছে না-জেনে ক্যাবট দেখা করবে না ভেবেছে।

তারপর ভাবল, যদি এই ঝড়-বাদলার রাতে সে ওদের ডেকে বলে, এখানে একজন মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে ভুবন। ভুবন চ্যাটার্জি। ক্যাবটের ভারী বিশ্বস্ত বন্ধু। বিশ্বস্ত কথাটা মানুষ কত দিন নির্বিচারে মেনে চলতে পারে। আর সে যে এতদূরে এসেছে, ক্যাবট যে তার প্রিয়তম পুরুষ সেটাই বা কতটা ঠিক। জেনি নিজের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে দেখছে, আসলে সে নিজেও খুব একটা ভাল চেনে না নিজেকে। ক্যাবটের চেয়ে নিজের অভ্যন্তর আরও জটিল।

সে একসময় বুঝল, পাশের তাঁবুতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আজ প্যান্ট-শার্ট পরল না। ঠিক রমণীর মতো তার সবচেয়ে দামি গাউন পরে নিয়েছে। রেনকোট চাপিয়ে, মাথায় টুপি সেঁটে নিল। টর্চ নিয়েছে। পকেটে সেই লোড করা আটত্রিশ বোরের রিভলভার। বাইরে এসে বুঝল বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি এবং হাওয়ার জোর প্রবল তেমনই। সে চেপেচুপে ধীরে ধীরে উঠে যেতে থাকল। এমন ঝড়ের ভেতর ভুবন আসবে তো? সে কিছুদূর গিয়েই সহসা থমকে দাঁড়াল। ভুবন বালিয়াড়ির কাছেই অপেক্ষা করছে চোরের মতো। একটা চামড়ার বর্ষাতি গায়ে। গোড়ালি পর্যন্ত লুটাচ্ছে। মাথায় চামড়ার লম্বা টুপি। টর্চ মেরে একবার দেখে নিল, সত্যি ভুবন কি না। মুখে অল্প বৃষ্টির ছাট।

ভুবন বলল, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

জেনি হাঁটতে হাঁটতে বলল, না ঘুমোলে বের হই কী করে?

ভুবন বলল, ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। জলে ডুবে গেছে। পূর্ণিমার জোয়ারে দ্বীপের অনেকটা ডুবে যায়। তোমাকে আজ একটু কষ্ট করতে হবে।

জেনি বলল, ভুবন!

ভুবন বলল, তুমি মেয়ে ভারী ভিতু।

সমুদ্রে প্রবল ঝড়, উত্তাল হাওয়া, দশ-বিশ গজ দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। জেনি বুঝতে পেরেছিল বালিয়াড়ির ওপর দিয়েই ওরা হেঁটে যাচ্ছে। সে বলল, ভুবন, আজ ক্যাবটের সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না।

ভুবন খুব সহজ ভাবেই বলল, সে হবে।

এত সহজ কথাটা ভুবন এই দু'দিন বলেনি কেন! কাছে থেকে ভুবন কি নিঃসংশয় হয়েছে, জেনি আগের জেনিই আছে। আচ্ছা বাবা, তোমরা কী বোকা বলো তো! আগের জেনি না থাকলে কী দায় এখানে আসার! সে বলল, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

ভুবন বলল, ঝড়-বাদলায় দ্বীপটার চেহারা পালটে যায়। পৃথিবীর কোথায় একটা দ্বীপ, কোথায় একটা সমুদ্র চারপাশে ফুঁসছে, দ্যাখো দ্বীপটা তেমনি অবিচল— কিছুই যায় আসে না, কী প্রবল ঢেউ আকাশ সমান উঁচু হয়ে আসছে। দ্বীপের কাছে মাথা কুটে মরছে। দ্বীপটার এতটুকু যদি আবেগ থাকে!

জেনি ভুবনের গা ঘেঁসে হাঁটছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, আর কুয়াশার মতো জলকণা বাতাসে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, টর্চ জ্বেলেও কোনও সুবিধা হচ্ছে না, বরং ভুবনের কাছে লেগে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে তার। সে ভুবনের কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। ধীরে ধীরে ভুবন খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। আগের মতো হঠাৎ-হঠাৎ গলা ঠান্ডা করে ফেলছে না।

ওরা সেই কাশের উপত্যকায় এসে গেছে। এবং ভেতরে ঢুকেই মনে হল প্রচণ্ড খাদ সামনে। ভুবন হাত ধরল জেনির। বলল, পা রাখো নীচে।

আমরা কোথায় নামছি ভুবন?

আঃ, কী চিৎকার করছ! হড়কে গেলে দু'জনেই পড়ে যাব অতলে।

আশ্চর্য তো, একটু হাওয়া লাগছে না।

ডানদিকে বড় একটা পাথরের দেয়াল আছে।

আচ্ছা ভুবন...

কথা বলবে না! অন্যমনস্ক হলে বিপদ হতে পারে।

তুমি তো ধরে রেখেছ!

তবু ভয় আছে।

পূর্ণিমা বলেই অন্ধকার তত গভীর নয়। আকাশে মেঘের তোলপাড় তেমনি চলছে। ওরা ক্রমে নেমে যেতে থাকল। এটা দ্বীপের কোথায়, কীভাবে আছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। এবং ভুবন খুব সন্তর্পণে পা বাড়াচ্ছে, কিছুটা নেমে যাচ্ছে, তারপর টর্চের আলোতে সিঁড়ির মতো জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে। কোথায় কী ধরবে, পা রাখবে, সব। ভুবন কিছুতেই নীচে টর্চ ফেলছে না। কোনও খাদের ভেতর নেমে যাচ্ছে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল। যেন ওপরের আকাশটাই ধীরে ধীরে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কিছুটা নেমে ভুবন টর্চ ফেলতেই দেখল, জল নেমে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল। বলল, জুতো খুলে নাও।

কিছু হবে না।

বলে জেনি নেমে গেল। বেশ জোরে জল নামছে। কোথাও কোনও উপত্যকা থেকে জলের ধারা নেমে আসছে এখানে।

একটা ডাল সরিয়ে দিল ভুবন। তারপর গাছ থেকে একটা লতা কেটে নামাল, নালার ওপারে ছুড়ে দিয়ে বলল, ধরো।

একপ্রান্তে জেনি, অন্যপ্রান্তে ভুবন। লতা ধরে নালাটা পার হয়ে গেলে ভুবন বলল, তোমার কিছু হলে ক্যাবটকে মুখ দেখাব কী করে!

জেনির বুকটা ছাঁত করে উঠল। এত যে কষ্ট, এত যে পরীক্ষা, কীসের জন্য! এতই মহানুভব যখন, আগে দেখা হলে কী ক্ষতি ছিল! আর তখনই সে দূরে ল্যাম্পের আলো দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, আলো আলো।

ভুবন নির্বিকার। সে বলল, খুব পিছল জায়গা। সতর্ক থেকো। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর যদি এভাবে কোনও নির্জন দ্বীপে আলো দেখা যায়, যে-কোনও অভিযানকারী মানুষের বুক অধীর হয়ে ওঠে। অন্ধকারে আলোর কী মহিমা! জেনি নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। আবার মূর্ছা যাবে না তো? এত কাছে সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষটি। অথচ কোনও ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, ক্যাবট, তুমি কোথায়? ক্যাবট! ক্যাবট।

জেনি, অধীর হবে না।

জেনি আর কোনও কথা শুনছে না। সে ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে ছুটতে চাইছে। ঝড়-বাদল এবং প্রাকৃতিক কোনও সংকট তাকে বাধা দিতে পারছে না।

ভুবন দৌড়ে গেল। তারপর জেনির হাত ধরে ফেলল।

জেনি, শান্ত হও। প্লিজ।

আমার হাত ছাড়ো বলছি।

ভুবন হাত ছেড়ে দিল। আর তখন জেনি দেখছে সেই আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে নিমেষে।

ভুবন!— বলে চিৎকার করে উঠল।— তুমি কে? তুমি মানুষ না অন্য কিছু জানি না। ভুবন, আমাকে এমন মায়ার খেলায় ফেলে দিচ্ছ কেন!

ভুবন বলল, এদিকে এসো।

আবার যেই না ভুবনের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে, আলোটা সুদূরে নীহারিকার মতো ফুটে উঠেছে।

জেনি বলল, ওই তো!— বলেই যখন ছুটবে, ভুবন অতি কষ্টে বলল, এটা বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জনতম জায়গা। মানুষের বসবাসের পক্ষে এমন নিরিবিলি নির্জন জায়গা আর কোথায় আছে জানি না। এবং বড় বড় গাছের ভেতর প্রাচীন কোনও নগরীর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে যেন। কোনও প্রাচীন সভ্যতা ছিল কি না এটা কে জানে।

পাথরের এক বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। সামনে কিছুটা গেলেই

একটা বড় গুহামুখ। দেয়ালে লম্ফ বাখার কুলঙ্গি। জেনি ক্যাবটকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

ক্যাবট কোথায়? ক্যাবটকে ডাকো।

ক্যাবটও কোথা থেকে ছুটে আসছে না। প্রতিমুহূর্তে আশা করছে, ক্যাবট গুহার অন্ধকার থেকে বে- হয়ে আসবে। অথবা ক্যাবট পেছনে এসে দাঁড়াবে। বলবে, জেনি, জেনিফার।

ভুবন এবার বলল, ভিতবে এসো।

জেনিফার গুহার ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।

সে বলল, কোনও ভয় নেই। এসো। ভিতরে ঢুকে দ্যাখো আমরা দু'জনে কীভাবে বেঁচে আছি।

জেনিফার ভেতরে ঢুকলে ভুবন বলল, এখানে আমি থাকি। এই আমার রান্নার জায়গা।

বড় লম্বা মসৃণ ঘরের মতো মনে হচ্ছে ভেতরটা। বোঝাই যায় না পাহাড়ের গুহামুখ মানুষের জন্য এমন নিরিরিলি একটা আবাস তৈরি করে রাখতে পারে।

ভুবন বলল, আগে এত মসৃণ ছিল না। পাথর ঘসে ঘসে মসৃণ করেছি। একজন সভ্য মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, সব আছে। কেরোসিনের স্টোভ, চিনেমাটির প্লেট, নরম পাতার বিছানা।

জেনি এত কথা শুনতে চায় না। কিছু শুনতে চায় না। সে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। পাথরের কিলে লম্বা সেই জলদস্যুর পোশাক ঝুলছে।

জেনি নিশ্বাস বন্ধ করে দেখে যাচ্ছে সব। যা আছে শুধু একজনার। ক্যাবটের কিছু আছে কি না বলছে না।

এই যে কাঠেব বাক্সটা দেখছে, ওটায় বসতে পারো। ফানাফুতি থেকে এটা এনেছি। জিরিয়ে নাও

ক্যাবটের এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না যাতে দু'দণ্ড আরও বেশি অপেক্ষা করতে পারে। জেনিফার ভুবনের এমন নিস্পৃহ কথাবার্তা আব সহ্য করতে পারছে না। সে আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলল ভুবন, তোমার খোঁজে আমি এত বড অভিযানে আসিনি।

ভুবনেব চোখে বিষণ্ণতা নেমে এল। সে বলল, জানি।

জেনি বলল, তোমার বন্ধুকে ডাকো। বিশ্বাসঘাতক সে। দেখুক, আমার জীবন কত অতিষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভুবন লম্ফেব আলোটা আরও সামনে নিয়ে গেল জেনির। তুলে ধরল। জেনিব মুখ এই প্রথম আলোতে ভাল করে দেখে নিতে চাইল। জেনি আলোটা সহ্য কবতে না পেরে মুখ ঢেকে দিল।

ভুবন বলল, জেনি, তুমি এত ভালবাসো ক্যাবটকে! ছ'বছর পরও কেউ একজনের অপেক্ষায় এভাবে থাকতে পাবে!

ভুবন, আমি আর পাবছি না। তুমি সত্যি কথা বলো ভুবন। আমি পাগল হয়ে যাব। ক্যাবট ক্যা...ব. .ট।

সে পাগলের মতো সেই দেয়ালেব ভেতর ছুটে বেড়াতে থাকল। দেয়ালে দু'হাতে দুম দুম কিল লাথি মাবতে থাকল। যেন ক্যাবট এই দেয়ালের কোথাও গোপন ঘরে লুকিয়ে আছে। সে মাথা ঠুকলে ঠিক বের হয়ে আসবে। গলা ছেড়ে ডাকতে থাকল, আমি জেনিফার, ক্যাবট!

ভুবন তাড়াতাড়ি লম্ফ রেখে ছুটে গেল। জোর করে ধরে তুলে আনল।

আমি মরে যাব ভুবন!

মাথায় কোথাও লেগেছে। রক্তপাত সামান্য হচ্ছে।

ভুবন বলল, জেনি, বুঝতে পারি তোমার কী কষ্ট! ঠিক একদিন এমন কষ্টই কেমন আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। সে কপালে সামান্য কোথা থেকে পাতা এনে রস লাগিয়ে দিচ্ছে।

তুমি বসো। কফি করছি। খাও।

ভুবন খুব যত্ন নিয়ে কফি করছে। আর অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। যেন সব কথা ওর না শুনলে সে ভোজবাজির মতো ক্যাবটকে বের করে দেবে না।

এই দ্যাখো না!— বলে সে একটা লম্বা পোশাক দেখাল। সে নিজের পোশাক যা পরে আছে তাও

দেখাল। বলল, এমন পোশাকে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।

সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। যেন কতদিন সে কথা না বলে আছে। জেনিফারকে পেয়ে একজন কথা বলার লোক কতদিন পর পেয়ে গেছে যেন। ক্যাবট সম্পর্কে সে স্পষ্ট কিছু বলছে না।

ওঃ, আমরা যখন এখানে প্রথম এলাম। সে কী ভীষণ কষ্ট! ক্যাবটের কাছে কেবল একটা লাইটার ছিল। সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে আর কিছু সঙ্গে আনতে পারিনি। কী করি! আগুন ক'বার জ্বাললেই লাইটারের আয়ু ফুরিয়ে যাবে। না না, আর একটা ছিল। ছোট্ট ছুরি। তুমি তো জানো এটা ক্যাবটের গরিব গোছাতে থাকত।

বলেই সে ক্যাবটের লাইটার এবং ছুরিটা কুলুঙ্গি থেকে তুলে আনল। বলল, চিনতে পারছ? তুমি ঘেমে যাচ্ছ জেনিফার। গরম লাগছে। রেনকোটটা খুলে ফেলো! দাও আমাকে।

সে রেনকোটটা ঝুলিয়ে ফের কাছ থেকে বলল, কী? দুটোই ক্যাবটের মনে হচ্ছে তো।

জেনিফার সব চিনতে পারছে। কাঠের বাক্সটায় সে একজন তীর্থযাত্রীর মতো বসে আছে। অভিব্যক্তিশূন্য মুখ। দামি লাইটারটা সে ক্যাবটকে ইয়র্ক থেকে কিনে দিয়েছিল। ছুরিটা ক্যাবটের খুব প্রিয়। সে এটা কিনেছিল এডেন থেকে। ভুবন নিজেও খুব যত্ন নিয়ে দেখছে অনেকদিন পর। জেনিফারের দিকে ভাল করে তাকাচ্ছে না। এই দুটো জিনিসই ছিল তার সেই প্রথম দিকের সহোদর। অনেকদিন পর জেনিকে দেখানোর জন্য বের করেছে।

জেনিফার ঠিক বুঝতে পারছে না রেনকোট খুলে ফেলার পর ভুবন কেন আর তার দিকে একেবারেই তাকাল না। সে নিজের দিকে তাকিয়েই ঘাবড়ে গেল। পাতলা গাউন, এবং এত মিহি যে শরীরের রং ফুটে বের হচ্ছে। ঠিক আব্রু রক্ষা হচ্ছে না। ভুবনের এটা ছিল চিরদিনের স্বভাব। একটুকুতেই ভারী সে লজ্জা বোধ করত। ভুবন নিরাময় ঈশ্বরের মতো সব অবহেলা করে যাচ্ছে। যেন কী প্রচণ্ড অহংকার তার, লোভ-লালসা সে অবহেলায় জয় করেছে। জেনি আর কোনওরকমেই লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না। সে দু'হাত তুলে বলল, ভুবন, গল্প থামাও। আমাকে তুমি কী পেয়েছ! সে কোথায় বলো! বলো বলছি। এক দুই তিন দশ গুনব এভাবে। না বললে সব শেষ করে দেব তোমার। ভণ্ডামির শেষ থাকা উচিত ভুবন!

লোকটা কী। সে কি বিশ্বাস করছে না, কিছু করতে পারে তার বিশ্বস্ত বন্ধু-স্ত্রী। সে কি জেনেছে, সবটা না জানা পর্যন্ত কিছু করতে পারবে না এই বিদেশিনী। অথবা সে কি জানে এমন সুপুরুষ একাকী মানুষকে কোনও নারী কখনও এত নির্জনতায় খুন করতে পারে না। কেমন সাধুপুরুষের মতো বলে যাচ্ছে, জেনিফার, তখনকার দিনগুলো সত্যি ভীষণ কষ্টের ছিল আমাদের। তোমার সব শোনা উচিত। আগুন জ্বেলে রাখার জন্য সমুদ্রে ডুবে শঙ্খমাছ ধরে আনতাম। সে ভীষণ এক অহংকারী খেলা। একটা মাছ আর আমি। জলের নীচে সেই মাছ আর আমি। তার পেট চিরে চর্বি সংগ্রহ করতাম। জলের নীচে খেলাটা বেশ জমে উঠত। মাঝে মাঝে জীবন সংশয় করে খেলা। চর্বিতে শুকনো লতা জ্বালিয়ে রাখা নিশিদিন। এখন তো সেসব কিছু লাগে না। দেখলে তো দেশলাই জ্বেলে স্টোভ ধরালাম। একটা সেই ডিঙি ভেসে চলে এসেছিল এদিকে। তাতে দু'জন মানুষ শুকিয়ে কাঠ। আমার যা ধারণা, ওরা পথ ভুল করে গভীর সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। হয়তো বা এটাই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা। যখন একটা নতুন দ্বীপ মানুষের অহংকারী খেলায় মেতে উঠেছে তখন দুটো-একটা মানুষ ঝড়ে পড়ে পথ ভুল করবে সে আর বিচিত্র কী!

কফির জলটা ফুটছে। কথা বলতে বলতে সে ভুলে যাচ্ছে কেটলিটা নামানো দরকার। সে তার গল্প খুব নিবিষ্টভাবে বলে যাচ্ছে।

বুঝলে, ডিঙিটা হ্রদের জলে ডুবিয়ে রাখি। ছোট ডিঙি। হালকা। মাসে-ছ'মাসে ডিঙিতে পাল তুলে চলে যাই; উত্তরে শ'খানেক মাইলের মতো গেলে ফানাফুতি দ্বীপ, এলিস দ্বীপ। দ্বীপ থেকে মধু, শস্য বলতে ধান যব নিয়ে যাই। বিনিময়ে শীতের পোশাক, তেল, মশলা, সাবান, দরকারি যা কিছু নিয়ে আসি। এলিস দ্বীপে ফসফেটের খাদ আছে। সেখানে জাহাজ যাওয়া-আসা করে। তোমরা তো তেমন একটা জাহাজেই এসেছ দেখলাম।

জেনিফার বলল, ভুবন, আমার কিছু শুনতে ভাল লাগছে না। কফি আমি কিছুতেই খেতে পারব না।

তুমি তো জানো ক্যাবট আমার সব। আমার অহংকার সে। তুমি আমাকে রক্ষা করো, প্লিজ!

ভুবন ভারী লেন্সের চশমাটা খুলে জামায় মুছল। তারপর আবার পরল। চশমা ব্যতিরেকে ভুবন প্রায় কিছুই দেখতে পায় না। সে এবার চশমাটা কেড়ে নেবে ভাবল। কিন্তু ভুবনের চোখের দিকে তাকিয়ে সে কেমন বেদনা বোধ করল।

ভুবন এবার সহজ গলায় বলল, ওর গলা এতটুকু কাঁপল না।

জেনি, ওকে আমি খুন করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে জেনিফার শক্ত হয়ে গেল। ওর মনে হল মানুষটা অধার্মিক। ক্রমে নিষ্ঠুরতার এক কঠিন ইচ্ছা ওর সারা অবয়বে জড়িয়ে যেতে থাকল। সে নিশ্বাস বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। পেছন ফিরে বসে আছে ভুবন। কাপে কফি ঢালছে। নাড়ছে। সে কী করতে পারে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখছে না পর্যন্ত। এক নিষ্ঠুর প্রতিশোধ-স্পৃহায় উঠে দাঁড়াল সে। নিশ্বাস বন্ধ করে পকেট থেকে বের করে নিল রিভলবারটা। তারপর সে সোজা তাকিয়ে মাথা বরাবর গুলি ছুড়তে গিয়েই থেমে গেল। চোখ থেকে কী করে চশমাটা খুলে পড়েছে মেঝেতে। সে চশমাটা হাতড়াচ্ছে। বলছে, দ্যাখো তো জেনি, চশমাটা কোথায় ছিটকে পড়ল?

এ সময় মাথায় গুলি করলে সেও অধার্মিক হয়ে যাবে। একজন অন্ধ মানুষকে কিছুতেই খুন করা যায় না। জেনি চশমাটা বাঁ হাতে তুলে দিয়েই সরে দাঁড়াল! তখন ভুবন ভীষণ কাতর গলায় বলছে, ক্যাবট তোমার আমার প্রতি খুব অবিশ্বাসের কাজ করেছে। ওকে খুন করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না জেনি।

এগারো

তখন কড়াৎ করে দুটো বাজ পড়ল দ্বীপের কোথাও। লম্ফের আলোটা কেঁপে গেল। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারল গুহামুখে। গাছ থেকে অবিরাম বৃষ্টি ঝরার শব্দ টুপটাপ। ওরা কেউ আর কোনও কথা বলছে না। জেনিফার কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসে থাকল। চোখ টাটাচ্ছে। সে কিছুতেই ভুবনকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ক্যাবট কোনও অবিশ্বাসের কাজ করতে পারে না। ওকে আমি শৈশব থেকে জানি ভুবন, বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু বলতে পারল না। সে সরল বালিকার মতো ভুবনকে শুধু দেখতে থাকল।

জেনিফার উঠে দাঁড়াল। বলল, ভুবন, আর কিছু বলছ না কেন?

জাহাজেই টের পেলাম, সে আর আগের ক্যাবট নেই। তুমি তো জানো জেনি, দুর্ভাগ্য বলো, সৌভাগ্য বলো, সব সফরে সে আর আমি একসঙ্গে জাহাজে উঠতে পারতাম না। আবার এও তো ঠিক, অধিকাংশ সফরে সে আর আমি একই জাহাজের সেকেন্ড, থার্ড। আমি যখন সুদূর মিসিসিপিতে সে তখন হয়তো কলকাতায়। সরমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আর সুস্থ ছিল না।

তোমার বউ সরমা!

সরমা!

ক্যাবট সরমাকে...

জেনি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না! নেটিভ একটা মেয়েকে... কিন্তু সরমাকে তুমি দ্যাখোনি। সরমার মতো মেয়ে হয় না। তার কেন যে এমন দুর্মতি হল বুঝি না! অথচ দেশে ফিরে কিছু টের পাইনি। কেবল বলেছিল, ক্যাবট এসেছিল। একদিন ওকে ডেকে এনে খাইয়েছে। আমার ভাল লেগেছিল শুনে। তোমাদের সবারই খবর নিয়েছি। ক্যাবটকে চিঠি লিখেছিলাম, এবারকার জাহাজে যাতে দু'জনে একসঙ্গে উঠতে পারি। ক্যাবট না থাকলে জাহাজটা আমার কাছে ভারী নিষ্প্রাণ হয়ে যেত! সফর শেষ হতে চাইত না।

ভুবন কফি এগিয়ে দিল, খাও।

কফি হাতে নিয়ে জেনিফার বসে থাকল। ক্যাবট নেই, শোক প্রবল হচ্ছে না কেন? সে চিৎকার করে

বিলাপ করতে পারছে না কেন? চোখ জলে ভার হয়ে আসছে না কেন? পৃথিবীতে যে মানুষটা তার এত প্রিয়জন, সহসা সে কেন এত সাধারণ মানুষ হয়ে যাচ্ছে? বুকের ভেতর তবে এতদিন কী এমন প্রবল দুঃখ পাথরের মতো ভার হয়ে ছিল? দুঃখটা কী? সে নিজের সঙ্গে যখন এভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছে তখনই ভুবন আবার বলল, জাহাজেই টের পেলাম! নিউ-ক্যাসেলের ঘাট থেকে জাহাজ ছেড়েছে। সারাদিন কাজ ছিল। সামান্য মেরামতের কাজের দরুন ক্যাবট নীচ থেকে দুপুরে উঠতে পারেনি। এজেন্ট-অফিস থেকে শেষ ডাক এসেছে। ক্যাপ্টেন ডেকে আমার চিঠি দিলেন, তারপর কী ভেবে বললেন, ক্যাবটের একটা চিঠি আছে, ওকে দিয়ে দিয়ো। ওপরে হাতের লেখাটা মনে হল সরমার। তা হলে সরমা ক্যাবটকে চিঠি দিয়েছে! সংশয় করার কোনও কারণ নেই। দিতেই পারে। নিজের চিঠিটা খুলে পড়লাম। কিছু সাংসারিক কথাবার্তা! সে ক্যাবটকে যে চিঠি দিয়েছে, কোনও উল্লেখই করেনি। কেমন ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

জেনি চুপ করে শুনছে। অভিযানে এসে সব খুঁটিনাটি তার জানা উচিত। ক্যাবটের এই বহুসাময় অন্তর্ধানের পেছনে সঠিক ব্যাখ্যা তার হাতে থাকা দরকার। সে ভুবনকে বাধা দিচ্ছে না।

চিঠিটা পড়ে মাথা গরম হয়ে গেল, জেনি! সরমা ক্যাবটকে তার শরীর সম্পর্কে এত খোলামেলা চিঠি দিতে পারে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। চিঠিটা পড়েই মনে হল সরমা আর আমার কথা ভাবে না। সরমা আর-একজনকে সবই দিয়ে দিয়েছে।

জেনি!— সে এই বলে জেনির দিকে তাকাল।— মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কিছু আছে, থাকতে পারে, এখন আর বিশ্বাস করি না। সব শুনে এ মুহূর্তে ক্যাবট তোমার কতটা প্রিয়জন মনে হয়?

কিছুই ভাবতে পারছি না ভুবন। তুমি বলে যাও। ক্যাবট আমার প্রিয়জন, কত প্রিয় তোমাকে কী বলে বোঝাব! তোমার বিদ্রুপ আর সহ্য করতে পারছি না ভুবন!

আমি বুঝি! তোমার কষ্টটা বুঝি! বিশ্বাসের ভিত ধসে গেলে মানুষকে কতটা সংকটে পড়তে হয় জানি। তোমার সব কিছুর জন্য আমি দায়ী।

ভুবন, তারপর কী করলে?

শুনলে খারাপ লাগবে।

বলো। চুপ করে থাকলে কেন?

ক্যাবটকে বুঝতে দিইনি। কিছুই বুঝতে দিইনি। চিঠিটা রেখে দিলাম। জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি কতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। ক্যাবটকে আট-দশটা দিন আরও বেশি কাছে কাছে রাখলাম। মাঝে মাঝে তোমার কথা ওকে বলেছি। কেমন উদাসীন থাকত। সরমা প্রসঙ্গে এলেই ওর হয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা। সে বলত, ভুবন, মধ্যযুগের মানুষ হলে সরমার জন্য ডুয়েল লড়া যেত। খুব জোরে হাসতাম। সে বুঝতেই পারত না, ভেতরে ভেতরে কতটা নৃশংস হয়ে গেছি। এতটুকু সহ্য করতে পারলে, সেও রক্ষা পেত, আমিও রক্ষা পেতাম। এই নির্জন দ্বীপে বনবাসী হয়ে থাকতে হত না।

জেনি বলতে পারত, তুমি দেশে ফিরে গেলে কে আর ধরছে! কিন্তু সে ভুবনকে বাধা দিতে চায় না। ভুবন বলুক। ক্যাবট কতটা খারাপ সে জানতে চায়। ক্যাবটের প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহা ভুবন কীভাবে মিটিয়েছে জানতে চায়। ভেতরে ভেতরে সেও কেমন নৃশংস।

ভুবন বলল, কী? কফিটা খাও! ঠান্ডা হচ্ছে।

জেনি কফিতে চুমুক দিল।

ফাঁক খুঁজছিলাম। ক্যাবটও থাকবে না, আমিও থাকব না। তারপর মনে হল, বোকামি। শুধু ক্যাবটই থাকবে না। সরমার ছেনালিপনা রক্তে এমন হুল ফোটাতে পারে, খারাপ কথা বলে ফেললাম, আমার যে কী হয় জেনি, ছ'বছরেও সেই যুবতীর কথা মনে হলে মুখ শক্ত হয়ে যায়। মানুষের এটা যে কী রোগ। সরমার জন্য আমার কোনও টান নেই। অথচ চিঠিটার সেই সব অক্ষরগুলো এখনও মাথার ভেতর পাথরের হরফ হয়ে গেঁথে গেছে। তুমি বর্শার ফলকে কখনও হরিণশিশুকে বিদ্ধ করেছ? অথবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছ? সরমার চিঠিটা আমার কাছে ছিল তেমনি। অথচ একটু সহজভাবে মেনে নিলে, কিছুই ক্ষতি ছিল না আমার। একজন নারী একজন পুরুষকে ভালবাসতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কেন যে মনে হয়েছিল, ক্যাবট দুশ্চরিত্র, সরমা আরও বেশি।

যেন ভুবন যাত্রার আসরে নায়ক। জেনি দূর থেকে দেখতে এসেছে।

সময় পেলেই ক্যাবটের ঘরে পড়ে থাকি। সরমার সব চিঠি ওর লকার থেকে খুলে বের করলাম। তারপর আমার ছুটি। তখন শুধু কোনও গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া। রাতের দিকেই বোট-ডেক খালি থাকে। ঠেলে ফেলে দিলে কেউ টের পাবে না। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দে, সে পড়ে যাবার সময় চিৎকার করলেও ব্রিজে যারা আছে জানতে পারবে না। লাইফ-বোটের পেছনটাই উৎকৃষ্ট জায়গা। এবং জায়গাটা নির্বাচন করতেই আমার দু'দিন সময় লেগেছিল। তারপর পকেটে সবক'টা চিঠি, ওর চাবি, এবং দু' গ্লাসে সামান্য মদ নিয়ে দুই বন্ধুতে সমুদ্রে পা ঝুলিয়ে গল্প করা। নক্ষত্রলোকের খবরাখবর নিতে ক্যাবট ভারী ভালবাসত। সে পৃথিবীর সঙ্গে ওই সব নক্ষত্রলোকের পারস্পরিক সম্পর্ক, জলবায়ু, আর এন এ এবং ডি এন এ বিষয়ক কথাবার্তায় এত বেশি মশগুল হয়ে যেত যে মনেই হত না, সে জাহাজের একজন নাবিক। তাকে প্রাণের উৎস সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য জানাব বললাম। বই পড়ার নেশা জাহাজে উঠেই হয়েছে। জাহাজের এই নিঃসঙ্গতা বই পড়ে সহজেই সরিয়ে রাখতাম তুমি জানো। বেশ একটা তর্কযুদ্ধে দু'জনে যখন মশগুল, তখনই জলে ফেলে দিলাম। সে পড়ে যাবার সময় আমায় ধরে ফেলল। একসঙ্গে সমুদ্রে ভেসে গেলাম। কেউ টের পেল না। একটা কাকপক্ষী জানতে পারল না। মানুষ তার সব হারিয়ে না ফেললে এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমার বিশ্বাসী বন্ধু ক্যাবট, সতীসাধ্বী স্ত্রী সরমা মুহূর্তে পোকার সামিল হয়ে গেল। ক্যাবটকে চুবিয়ে খুন করার সময় একবার যদি নাড়িতে এতটুকু টান বোধ করতাম জেনি, কিছুতেই এত বড় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তবে ঘটত না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। যদি ক্ষমা করতে না চাও, ধরিয়ে দিতে পারো। সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। সব খুলে বলব। দোষ স্বীকার করব।

তারপর আর একটা কথা বলল না ভুবন। মাথা গুঁজে বসে থাকল। ভুবন কি কাঁদছে?

জেনি বলল, ভুবন, কফিটা ফের গরম করে নিচ্ছি। দেশলাই কোথায় রেখেছ? তোমার কফিটাও দেখছি ঠান্ডা হয়ে গেছে।

জেনি উঠে দাঁড়াল। তারপর স্টোভ জ্বেলে সসপেনে সামান্য গরম করে নিল কফি। দুটো কাপে ঢেলে ভুবনকে একটা কাপ এগিয়ে দিল। ঘড়ি দেখল। রাত একটা। নিশীথে জেগে থাকা এবং খুন-খারাবির খবর কেমন রোমাঞ্চকর। জেনি কিছুতেই ক্যাবটের শোকে বিহ্বল হতে পারছে না আর। ওর শীত করছে।

ভীষণ শীত করছে ভুবন।

ভুবন শুকনো কাঠ উনুনে ফেলে দিল। তারপর আগুন ধরতেই উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল শীতল ঘরটায়। জেনি বলল, বাঁচালে।

ওরা দু'জনই আগুনে হাত সেঁকতে থাকল।

অবিরাম বর্ষণ বাইরে। ঠান্ডা বাতাস। ঝড় এবং বিদ্যুতের প্রচণ্ড হট্টগোল। ভুবন অনায়াসে বলল, সমুদ্রে ওকে চুবিয়ে মেরেছি জেনি।

আঃ।— জেনি একটা আর্ত চিৎকার করে উঠল।

জেনি, জেনি!

বলো।

ভয় পেলে?

না। তুমি বলে যাও।

ভুবন কাঠ এনে আবার ফেলে দিল।

খুব ধোঁয়া হচ্ছে ভুবন।

ভুবন ফুঁ দিয়ে আগুনটা জ্বালিয়ে দিল।

এত শীত করছে কেন?

বেশ ঠান্ডা পড়েছে। তুমি কিছু গায়ে দাও।— বলে সে কাঠের বাক্স থেকে একটা লম্বা জলদস্যুর পোশাক খুলে দিল।

জেনি সুন্দর মতো পোশাকটা পবল। বলল, এগুলো তুমি পাও কোথায়?
বানিয়েছি।
কী সুখ!
বেঁচে থাকাব জন্য মানুষ নিজেই কিছু কবে নেয় জেনি। এমন একটা দ্বীপে আমাব কেন জানি বাজাব মতো বাঁচতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পোশাক পবাব পব মনে হল ফানাফুতিব দর্জিটা বাজাব পোশাক বানাযনি। সে আমাকে জলদস্যুব পোশাক তৈবি কবে দিযেছে। তোমাকে বেশ লাগছে দেখতে।
জেনি বলল, ভাল লাগছে বলছ?
খুব।
জেনিব চোখদুটো কড কড কবছে। ধোঁযায নয় অথবা কোনও প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে কি না বুঝতে পাবছে না। প্রতিশোধ কাব ওপব! কে সেই মানুষ! ভুবন না ক্যাবট সে বলল, ভুবন তুমি পাবলে?
মানুষ সব পাবে জেনি। দ্বীপে থেকে এটা আবও ভাল কবে বুঝেছি। আমাব কোনও কষ্টই হয় না। বরং দ্বীপেব গাছপালা, পাখ-পাখালি, খবগোশ আব নিত্যদিন ফুল ফুটে থাকা, এই সব কিছুব জন্যই মাযা। একটা গাছ মবে গেলে পর্যন্ত দুঃখ পাই।
জেনি বলল, ভুবন, তোমাব বন্ধুকে ক্ষমা কবেছ নিশ্চযই।
এখন আব কিছু ভাবি না। কেবল সবমাব কথা মনে হলেই মাথাটা গোলমাল হযে যায়। তখনই ছুটে বেড়াই চাবিদিকে। জলদস্যুব পোশাক পবে ফেলি। কোনও টিলাব ওপব দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখি সমুদ্রে। ধীবে ধীবে মাথাব গোলমালটা সেবে যায় তখন।
আমাকে দেখাবে?
ভুবন কিছু বলল না।
কী কিছু বলছ না কেন?
অনেক দূব থেকে কোথাও যেন ড্রাম-বাদকেবা প্যাবেড কবে যাচ্ছে। গুম গুম আওয়াজ।
জেনি বলল, দ্বীপটা ডুবে যাবে না তো?
না।
আমবা তাঁবু ফেলেছি যেখানটায?
না।
কীসেব শব্দ?
উপত্যকাব জল ছাদেব ওপব দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। জল পড়াব শব্দ।
এতক্ষণ শুনতে পাইনি কেন?
ক্যাবট তোমাব মন-প্রাণ জুড়ে ছিল।
এখনও আছে।
না নেই। থাকলে শুনতে পেতে না।
ভুবন!
বলো।
তুমি দ্বীপে তবে সত্যি—
খুবই একা।
কেন তবে বললে, আমরা দু'জন ভালই আছি? কেন বললে ক্যাবটেব সঙ্গে দেখা হবে?
ভুবন তাকাল জেনিফাবেব দিকে। বলল, সে আছে।
মবে গেলে মানুষ থাকে কী কবে?
তবু আছে।
তোমাব মাথায় গোলমাল নেই তো ভুবন!
ভুবনেব মুখে সেই ছেলেমানুষি হাসি। দুষ্টু বালক ধবা পড়ে গেলে ঠিক যেভাবে হাসে। সে বলল, না গোলমাল নেই। থাকলে সব তোমাকে বলতে পাবতাম না। সমুদ্রে যখন ওকে চুবিয়ে মাবি তখন

কেবল সাক্ষী কিছু আকাশের নক্ষত্র, নীল জল এবং ছোট ছোট কিছু মাছ। হাঙরেরা তেড়ে আসতে পারে। কিন্তু কিছুই মাথায় ছিল না। সে আমাকে, আমি তাকে ধরার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম জেনি। ক্যাবট ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। তুমি জানো সহজেই তাকে কাবু করা আমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যখন সত্যি মরে গেল, জলে ভেসে যাচ্ছিলাম, দেখি সে আমাকে জড়িয়ে রেখেছে। আমিও ডুবে যাচ্ছিলাম। ডুবে গেছিলাম। সকালে সংজ্ঞা ফিরলে দেখি একটা দ্বীপের মতো বালিয়াড়িতে পড়ে আছি। পাশে ক্যাবট, ঠিক বন্ধুর মতো আমাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। মাথা গোলমাল থাকলে এত সব হুবহু কথা বলতে পারতাম না।

শীত কি দ্বীপে আবও প্রবল হয়ে উঠছে! কিছুক্ষণ আগেও তো ঘাম ছিল। তবে দ্বীপের প্রকৃতি কি এই রকমের? জেনি বলল, এত ঠান্ডা কোত্থেকে আসছে? হাড় ফুটো করে বরফের কুচি ভেতরে কেউ ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভুবন।

ভুবন বলল, ঠান্ডা পড়েছে। আগুনটা ভাল লাগারই কথা। তুমি ঘামছিলে, এখন শীতে হা হা করে কাঁপছ। রক্তের নষ্ট প্রভাব এটা। সংজ্ঞা ফিরে এলে ক্যাবটকে খুন করেছি ভাবতেই এমন একটা প্রবল শীত ভেতর থেকে নাড়ি বেয়ে উঠেছিল জেনি। এটা কী করলাম! এমন নির্জন দ্বীপে আমি একা। কেউ নেই। শুধু ক্যাবট। মবা মানুষটাও আমাব তখন সহকারী ফের। তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারিনি। মানুষের পক্ষে একা থাকা কত কঠিন সেদিন টের পেয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গেই থাকুক। শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে দু'জনেই থেকে গেলাম। সে মাটির নীচে, আমি মাটির ওপরে। মরে গিয়েও সে আমাকে ছেড়ে দিল না।

ভুবন বলল, যখনই ভয় লাগে, ঝড় ওঠে, অথবা কোনও সমস্যায় পড়ে যাই, ডাকি, ক্যাবট কী কবব? সে উত্তর দেয়। সে সব বলে দেয়। সাহস ফিরে পাই। বেঁচে থাকাব জন্য যা যা করণীয় করে ফেলি। কখন ফসল বুনব, কোথায় কী গাছ লাগাব, পরামর্শ করে নি। দুই বন্ধুতে মুখোমুখি বসে তখন আমাদের কত কথা হয়।

জেনি কিছুটা তিক্ত গলায় বলে উঠল, সরমাকে নিয়ে তোমাদেব কথা হয় না?

ভুবন বলল, না। কথা হয় না।

আমাকে নিয়ে?

না। তাও হয় না।

তোমাদের কী কথা থাকে এত!

কত কথা থাকে! কথা বলতে বলতে দু'জনেই আবার কখনও চুপ হয়ে যাই। কিছুই কথা থাকে না তখন। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি। সমুদ্র দেখি। পাখিদের ফিরে আসা দেখি। ক্যাবট বলে তখন, কী খাবে রাতে? কী রান্না করলে? সবই তাকে বলতে হয়। না বললে ভীষণ রাগ করে।

জেনি বলল, মাথা তোমার সত্যি ঠিক নেই ভুবন!

ভুবন বলল, বা রে ঠিক থাকবে না কেন। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর কথা হবে না? সে নেই বলে কি তার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না? সে কী বলবে তাও তো জানি।

জেনির ভেতরটা কেমন নড়ে যাচ্ছে। সে বলল, তা হলে আমি যে এসেছি সে ঠিকই বুঝেছে।

বুঝতে পারবে না! মানুষ মরলেই কি শেষ হয়ে যায়?

তারপর বলল, এসো দেখবে।

গুঁড়ি মেরে দু'জনই বের হয়ে এল ভেতর থেকে। বাঁ দিকে পাথরের পর পাথর সাজানো। বেশ নেমে যাবার মতো ধাপ! কিছুটা এগিয়ে গেলে লেবুবন। বনের শেষ প্রান্তে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ভুবন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, এখানে সে আছে।

বলে দুটো পাথরের ফাঁকে সবুজ গালিচার মতো এক টুকরো জমি দেখিয়ে বলল, এই তার সমাধি কথা বলার সময় এদিকের পাথরটায় আমি বসি, ওই পাথরটায় ক্যাবট। মাঝখানের চিলতে জমিতে তখন ঘাস, ঘাসে ফুল, কত প্রজাপতি উড়ে আসে। দিনের বেলায় এসো, সব দেখতে পাবে। ঝড়-বাদলায় ঠিক বোঝা যায় না।

জেনি বলল, তুমি ভিজে যাচ্ছ ভুবন। টুপিটা ভাল করে টেনে দাও।

ভুবন বলল, আগে সমাধির ঠিক নীচেই ছিল সমুদ্র। দু'বছরে ক্রমে দ্বীপটা অনেক বড় হয়ে গেছে। দ্বীপটা ক্যাবটকে আরও ভালভাবে মুড়ে নিচ্ছে। দ্বীপটা যেন ক্যাবটকেই বেশি ভালবাসছে। খুব হিংসে হয়।

মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। জেনিফার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে। ভুবন বলল, রাতে যখন শুয়ে থাকি, সমুদ্রের গর্জন শুনি, তখন ডেকে বলি, ক্যাবট, কেমন আছ?

জেনিফার চোখ বুজে আছে তখন। আকাশ সমুদ্র এবং প্রকৃতির কূট খেলা শিরা উপশিরায় কোনও ড্রাম বাদকের মতো মার্চ করে যাচ্ছে। জেনি চোখ বুজেই বলল, সে কিছু বলে না?

বলে।

কী বলে?

ভাল আছি।

জেনিফার বলল, তোমাকে সে কিছু বলে না?

বলে।

কী বলে?

ভুবন, কেমন আছ?

তুমি কী বলো ভুবন?

ভাল আছি।

জেনিফার তেমনি চোখ বুজেই বলল, না ভুবন, তুমি ভাল নেই। ভাল থাকতে পারো না। তোমাদের মাঝখানে আর কেউ না থাকলে তোমরা ভাল থাকতে পারো না। জোর করে ভাল থাকার কথা আমায় শুনিয়ে লাভ নেই।

প্রকৃতির কূট খেলা শরীরে ড্রাম-বাদকের মতো দ্রুত মার্চ করে যাচ্ছে। শীত অথবা ঠান্ডা প্রায় ধীরে ধীরে জেনিকে কাহিল করে ফেলছে। সে ভুবনের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, আমরা ভাল আছি ক্যাবট।

আমার খুব শীত করছে ভুবন।

দু'হাতে সে ভুবনের গলা জড়িয়ে ধরল সহসা।

কী শীত!— সে ভুবনের ভেতর যেন ঢুকে যেতে চাইছে।

ভুবন কেমন অসহায় বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না জেনি কী চায়। ঠিক কী চায়। তবু কেন যে মনে হল জেনি ওর সব অহংকার মুছে দিতে চায়। সে ভীষণ একটা পাপ কাজ করেছে। পৃথিবীতে হত্যার মতো পাপ আর কী আছে! দ্বিতীয়বার সে আর কিছু করতে চায় না। ভয় পেয়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

জেনিফার!

জেনি পাগলের মতো সেই সমাধির পাশে ভুবনের গায়ে লতার মতো জড়িয়ে গেল।

জেনিফার, তুমি কী করছ! তুমি ফিরে যাও। ক্যাবটের কাছে আমাকে ছোট করে দিয়ো না।

সে পোকামাকড়ের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল জেনিকে। তারপর সেই গুহার দিকে যেতে থাকল।

জেনিফার ফুঁসছে। সে দৌড়ে গেল। সামনে দাঁড়াল। অসতর্ক মুহূর্তে ভুবনের চশমাটা কেড়ে নিল। ভুবন চারপাশে ঘোলা-ঘোলা দেখছিল। এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

জেনি বলল, হাত ধরো।

ভুবন জেনির হাত ধরল।

একজন অন্ধ মানুষের মতো ভুবনকে গুহামুখে পৌঁছে দিয়ে বলল, তোমাদের কাউকে আমি ক্ষমা করব না।

ভুবন বলল, জানি।

জেনিফার এবার ভাল করে চশমাটা মুছে নিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সে ভিতরে ঢুকে বলল, এসো।

ভুবন অন্ধমানুষের মতো হাতড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।
নাও।— বলে চশমাটা পরিয়ে দিল।
ভুবন চশমা পরে জেনিকে দেখল। জেনি বলল, ভুবন, তুমি কিছুই দেখতে পাও না?
না।
কেউ নেই, বাকি জীবনটা চলবে কী করে?
জানি না।
জেনিফার আর কিছু বলল না। শুধু বলল, কাল আসব। চলো আমাকে দিয়ে আসবে।

বারো

সকালে রোদ উঠলে আর্চি দেখল, জেনি ঠিক আগের জেনি। বেশ বেলা করে তার আজকাল ঘুম ভাঙে। সবার ব্রেকফাস্ট হয়ে যায়, জেনি তবু তাঁবু থেকে বের হয় না! মাঝে মাঝে ডেকে সারা হয়। কখনও উত্তর পায়, কখনও পায় না। কেউ ওজন্য আর কিছু বলে না!

জেনি খেতে বসে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। ভারী স্বাভাবিক। যাক, শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে ওর ভূত নেমেছে। জেনি যখন-তখন দ্বীপে একা একা নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়ায়। সে দ্বীপ থেকে সব ছোট ছোট রং-বেরঙের পাখি ধরে আনে। অথবা যেন পাখিরা এই দ্বীপে জেনিকে চিনে ফেলেছে। সে হাতে তালি বাজালে দ্বীপ থেকে সব পাখিরা উড়ে চলে আসে। মাথার ওপরে ওরা খেলা করে।

কখনও সে পাখিদের সূর্যাস্তে সমুদ্রে উড়িয়ে দেয়। অথবা সমুদ্রে ঠিক যেন মাছের মতো নেমে যায়। সব রুপোলি মাছেরা তখন জলে পায়ে পায়ে গন্ধ শুঁকে বেড়ায় জেনির। এমন উর্বরা ভূমিতে একজন নারীর কত যে দরকার ওরা বুঝি তখন টের পায়। কেউ তাকে ভয় পায় না। ওর ভেতরে কী যে হয়েছে! মাঝে মাঝে বালিয়াড়িতে ছেলেমানুষের মতো ছুটে বেড়ায়। মানুষের ভেতরে কী যে এক খ্যাপা বাস করে! সমুদ্রের ঢেউ পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে তার। জেনিকে তখন সত্যি রহস্যময়ী নারীর মতো লাগে।

দু'-একদিনের ভেতরই জাহাজটা চলে আসবে। ওরা সকাল থেকেই দূরবিন নিয়ে বসে থাকে। জাহাজটা দূরে এগিয়ে আসছে দেখতে পেলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে নেবে সব। এবং বোট জলে ভাসিয়ে দিয়ে দেখেছে, সব ঠিকঠাক আছে কি না। পাঁচ-সাত মাইলের মতো দূরে জাহাজটা নোঙর ফেলে দাঁড়াবে। সুতরাং এখন শুধু খাওয়া, রেডিয়ো শোনা, আর দেখা, কখন আসছে জাহাজটা।

সময় যখন আর ফুরোয় না, গিটার বাজায় থম্পসন। ওরা নাচে। হল্লা করে। দেশে ফিরে গিয়ে খবর হয়ে যাবে তারা। যদিও থম্পসন খুব প্রচার চায় না। কাগজগুলো তো মুখিয়ে আছে।

এক সকালে ওরা সত্যি সত্যি দেখল, আসছে। এগিয়ে আসছে একটা সাদা রঙের জাহাজ। ওরা তাড়াতাড়ি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করে দিল। আর্চি তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল, জেনি, তুমি কী! এখনও ঘুমোচ্ছ? জেনি, জেনি!

সকালের খাবার তাড়াতাড়ি তিনজনে মিলেই করে নিয়েছে। জাহাজে উঠে কখন খেতে পাবে কে জানে। আর যা যা বেশি সবই এদিক-ওদিক ফেলে রাখল। নেবার মধ্যে পোশাক-আসাক, তাঁবু এবং কাঠের পেটি। জলের সব পাত্রগুলো পড়ে থাকল। এসব নিয়ে আর কী হবে? জেনি উঠছে না কেন!

আর্চি বলল, কাণ্ডটা দেখেছ রিচার্ড!

থম্পসন তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, জেনি, কী করছ? এত ঘুমোয়! জাহাজ এসে কখন নোঙর ফেলেছে!

কিন্তু সাড়া না পেয়ে হতবাক হয়ে গেল।

রিচার্ড এসে দাঁড়াল। ডাকল। না, কোনও সাড়া নেই। সে ভেতরে ঢুকে দেখল তাঁবু ফাঁকা। জেনি নেই। সে বাইরে এসে বলল, জেনি বোধ হয় ওদিকটায় গেছে।— বলে বনটার দিকে আঙুল দেখাল।

ওদিকটায় যেতেই পাবে। সকালে বিকেলে একবাব-না-একবাব যেতেই হয়। কিন্তু আর্চি বলল, কাল সকালে উঠেছি। গেলে দেখতে পেতাম না।

ওবা এবাব ঘড়ি দেখল। এবং ঘণ্টাখানেকেব মতো পাব হয়ে গেলেও যখন দেখা গেল না, আর্চি দৌড়ে গেল বনটাব দিকে। ডাকল, জেনিফাব।

থম্পসন বলল, কী যে মুশকিলে পড়া গেল।

বিচার্ড বিবক্তিতে মুখ ভাব কবে আছে। সে বলল, চলুন দেখি ভেতবটায়।

কিন্তু অনেকটা হেঁটেও হদিশ পাওয়া গেল না। এমন বিড়ম্বনাব ভেতব পড়ে বিচার্ড কী কববে বুঝতে পাবছে না। সে বলল, থম্পসন, জাহাজে খবব পাঠানো দবকাব।

থম্পসন বলল, জাহাজ তো দেবি কববে না, তবে কী কববেন?

থম্পসনেব মুখ শুকিয়ে গেল। কাল বেশ বাতেও গুন গুন কবে গান গাইছিল জেনি। সে যখন বাতে শুতে গিয়েছিল, আলো জ্বলছিল জেনিব তাঁবুতে। সহসা এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। কর্তাকে গিয়ে কী বলবে? এবং এভাবে আর্চি জেনিব সব আঁতিপাঁতি কবে খুঁজতে গিয়ে দেখল, একটা সামান্য চিবকুট। লেখা আছে, ক্যাবট এই দ্বীপমালায় কোথাও থাকে। ওব কাছে যাচ্ছি। খুঁজে নিজেদেব এবং আমাব বিড়ম্বনা আব বাড়াবেন না।

আর্চি চিৎকাব কবে উঠল, মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। বিচার্ড, দ্যাখো তোমাব বোনেব কাণ্ড। বিচার্ড, এখন আমি কী কবব।

থম্পসন চিবকুটটা দেখল। গোটা গোটা অক্ষবে লিখেছে জেনি। একটুকু আড়ষ্টতা নেই। জেনিফাব শেষ পর্যন্ত ক্যাবটকে খুঁজে পেয়েছে। ক্যাবট তা হলে দ্বীপগুলোব কোথাও থাকে। সে কি ঠিক জেনিব সঙ্গে কখনও দেখা কবেছে? সভ্য-সমাজেব প্রতি তাব এত বিবাগ। সে ফিবে যাবে না, জেনিও সেজন্য এই দ্বীপে থেকে গেল। এমন অর্বাচীন পৃথিবীতে কেউ থাকতে পাবে। জেনি কি পাগল হয়ে গেল। থম্পসন বলল, বিচার্ড, আমাব কী কবণীয় বলো।

কী বলব? হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে থম্পসন।

মুখ দেখাব কী কবে।

আর্চি গালাগালি শুরু কবে দিয়েছে।

থম্পসন, আপনি পাব পাবেন না।আমি এব একটা হেস্ত নেস্ত না কবে যাব না। আপনাবা যান। যা খুশি করুন।

জাহাজ থেকে দু'বাব সাইবেন বেজে উঠল। ওদেব তাড়াতাড়ি কবতে বলছে। আব ঠিক সেই মুহূর্তে অনেক দূবে একটা টিলাব ওপবে দেখল, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ওবা একা নয়। দু'জন। বিচার্ড বলল, দেখুন। দেখুন ঘুবে।

আর্চি পাগলেব মতো দৌড়াচ্ছে। কিন্তু পাহাড়গুলোব এমনই গোপনতম শ্রেণিবিন্যাস, কাব ক্ষমতা পৌঁছে যায়। যেন জেনিফাব দেখা দিল একবাব। পাশে কেউ। সুস্পষ্ট নয়। জেনি সত্যি তবে ক্যাবটকে খুঁজে পেয়েছে?

বিচার্ড বলল, আব দেবি না। এখানে পড়ে থাকতে পাবে জেনি, মাথা ঠিক নেই। দুটোই পাগল। পুলিশ না ফিবে কিছু কবা যাবে না।

আর্চি দেখল ভোজবাজিব মতো ওবা অন্তর্হিত হয়ে গেছে চোখেব ওপব থেকে। জেনি বোধ হয় গহনতম কোনও গভীব অবণ্যে ঢুকে যাবাব আগে একবাব সবাইকে দেখা দিয়ে গেল।

ওবা এবাব শেষবাবেব মতো বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকল, জেনি, জেনিফাব। পাগলামি কোবো না, ফিবে এসো।

তখন দূবে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি, জেনিফাব, ফিবে এসো।

আর্চি ডাকল, জেনি।

প্রতিধ্বনি— জে নি।

বিচার্ড ডাকল, জেনিফাব । প্রতিধ্বনি, জে নি ফাব।

এভাবে শুধু বাব বাব এই বালিয়াড়িতে, সমুদ্রে, পাহাড়ে এবং ঘন বনাঞ্চলে এক অমোঘ

ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। জেনিফারকে ওরা আর কোথাও খুঁজে পাবে না। খুঁজে পেলেও বুঝি আর চেনা যাবে না। লতাগুল্মে ঢাকা সে আর-একটা নতুন দ্বীপ হয়তো। দ্বীপের চারাগাছে কথা আছে ফুল ফুটবে।

অরণ্যের ভেতর তখন ভুবনকে গাছেব মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে জেনি। জেনিফার গাছটায় কেমন লতার মতো বড় হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে বড় হতে হতে সারা শরীরে সবুজ এক ঘ্রাণের জন্ম। ক্রমে ওরা দু'জনে মিলে নতুন একটা অরণ্য। ভুবন বুঝতে পারছে সে আর জেনিকে ফিবিয়ে দিতে পারে না। সমুদ্রে নতুন দ্বীপ অথবা অবণ্য এভাবেই জন্ম নেয়। ভুবন এবার ডাকল, জেনি.. ফা...র।

জেনিফাব সাড়া দিল, ভু...ব.. ন।

দূবে জাহাজটা ক্রমে বিন্দুবৎ হযে যাচ্ছে। বালিয়াডিটা খাঁ খাঁ কবছে বড্ড।

গম্বুজে হাতের স্পর্শ

এক

ওরা জাহাজের মুখ লাইট-হাউজের বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল। এখন সূর্য মাথার ওপর। আর জাহাজের চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ি সব দ্বীপ, কোনওটা উটের মতো, আবার কোনওটা প্রাচীন জন্তুর মতো মুখ হাঁ করে সমুদ্রের ওপর ভেসে রয়েছে। কোনও দ্বীপকে দেখে মনে হয়, ছাতা মাথায় দিয়ে কোনও মানবী একেবারে উলঙ্গ হয়ে আছে সমুদ্রের বুকে। বিচিত্র এইসব দ্বীপ, ছোট ছোট। মনে হয় খেলনা মাফিক। দ্বীপের পাশ কেটে কেটে জাহাজটা বন্দরের দিকে এগুচ্ছে। জাহাজিরা, যাদের হাতে কাজ নেই, যারা আর ওয়াচে নামবে না, কারণ জাহাজ বন্দর ধরছে বলে ওয়াচ যাদের ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তারা রেলিং-এ ঝুঁকে এইসব খেলনার মতো পুতুলগুলো নিয়ে নানা রকমের রসিকতা করছিল।

পাথরের মানবীর মাথায় ছাতা, ঝড়-বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো জাহাজিরা সেই মানবীর পাশ কাটিয়ে যেতেই সবাই বলল, দ্যাখ দ্যাখ, এই দ্বীপের পাহাড়টা কেমন একটা মেয়েমানুষের মতো হয়ে আছে।

কেউ কেউ বলল, জলে নেমে যাব নাকি শালা! চুমু খেয়ে আসব।

কেউ বলল, এতটা জল ভেঙে না হয় ওঠা যাবে দ্বীপে, কিন্তু ওর শরীর বেয়ে কাঁধে চড়ে বসতে শালা তোমার কোমর ভেঙে যাবে।

পুলক শুধু কিছু বলল না। যতক্ষণ জাহাজটা পাশ দিয়ে গেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বন্দর থেকে বেশি দূর নয়। ডানদিকে তাকালে লাইট-হাউজ। এই লাইট-হাউজ রাতে জাহাজের উদ্দেশে আলো ফেলে এবং নানা রকমের বয়া বাঁধা আছে, বয়ার আলোগুলো প্রায় মালার মতো এইসব দ্বীপের চারপাশ বেষ্টন করে আছে। কারণ দ্বীপের নীচে পাহাড়, বস্তুত অতল সমুদ্র থেকে এইসব পাহাড় সমুদ্রের ওপর অগ্রভাগ ভাসিয়ে কেমন দুষ্টু বালকের মতো ডুব দিয়ে আছে। জাহাজের কাপ্তেনকে পাইলটের সাহায্যে সন্তর্পণে জাহাজ চালিয়ে নিতে হয়। পাইলটের প্রতিটি পাহাড়ের অগ্রভাগ চেনা। এই কাপ্তেনের পক্ষে কোনও দিনই সম্ভব হত না জাহাজ চালিয়ে নেওয়া, বন্দর থেকে পাইলট উঠে এলে তবে তার রক্ষা।

উলঙ্গ মানবীর মতো যে পাহাড়টা জলের ওপর ভেসে রয়েছে ওর নাম ডিভাইন লেডি। ছুটির দিনে, অথবা রবিবারের বিকেলে, যদি সমুদ্রে ঢেউ অথবা ঝড় না থাকে, তীর থেকে এইসব পাহাড়ে ছোট ছোট স্কিপে অনেকে চলে আসে। ছোট ছোট ফার্ন জাতীয় গাছ, ওপরে নীল আকাশ, নীচে নীল সমুদ্র। এবং এমন উদার আকাশের নীচে বসে বড় ইচ্ছা করে দু'হাতে হাত নিয়ে অথবা প্রিয়তমের মুখ দেখতে দেখতে এইসব নির্জন নিরিবিলি পাহাড়ে সময় কাটিয়ে দিতে। যারা আসে তারা প্রায় যুবক-যুবতী। এখানে এলে সবাই সাদা রঙের স্কার্ট পরে আসে। একটা সংস্কার আছে এ দেশের মানুষের। এখানে খ্রিস্টের জন্মদিন পালনের সময় কেউ অন্য রঙের পোশাক পরে না। এইসব ছোট ছোট দ্বীপ শুধু প্রেম-ভালবাসার জন্য। প্রেম-ভালবাসা মানেই বিশুদ্ধ একটা ব্যাপার এবং সাদা রং তার প্রতীক।

এত সব নতুন জাহাজিরা জানবে কী করে? সবচেয়ে যে প্রাচীন নাবিক জাহাজি ইমাদুল্লা, সে এসব বলছিল। নতুন জাহাজিরা নিবিষ্ট মনে শুনছিল সব। ওরা ক্রমে নানা রকম গল্প-গাথার ভিতরে দেখল,

বন্দরে জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে, এখন আর সেই সব পাথরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। কারণ বড় একটা পাহাড়, নাম ওর লায়ন রক, সব এখন ঢেকে দিয়েছে।

পুলক কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যান্য জাহাজিরা যখন সেই মূর্তি দেখে নানা রকমের রসিকতা করছিল, অথবা খিস্তি-খেউড়, তখন সে চুপচাপ সেই আশ্চর্য পাহাড়ের অগ্রভাগ নিবিষ্ট মনে দেখেছে। প্রকৃতি কী বিস্ময়করভাবে এই সমুদ্রের ওপর একটা নীল রঙের পাথর দিয়ে এক যুবতীকে এঁকে রেখেছে। বিরাট এই যুবতীর শরীর কী মসৃণ মনে হয়েছে। স্বর্গীয় সুষমা যেন মুখে। দূর থেকে চোখ-মুখ স্পষ্ট নয় খুব। আদৌ চোখ-মুখ আছে কি না এবং দূর থেকে সেই মানবী যে নীল রঙ গায়ে মেখে জাহাজিদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছিল, তা কতটা নীল, অথবা কাছে গেলে আদৌ মসৃণ কি না ত্বক, এবং চোখের মণি কালো কি না, বা দূর থেকে পাহাড়টাকে যতটা যুবতী মনে হয় কাছে গেলে তার কতটা ঠিক ঠিক শরীর নিয়ে বেঁচে আছে জানার জন্য সে এ সময় ইমাদুল্লাকে খুঁজল। কারণ সে ইমাদুল্লাকে ওদের সামনে কোনও প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করলেই বলত, আবার শালা পুলক খেপে গেছে।

সে নিরিবিলি কোনও জায়গায় খুঁজছিল ইমাদুল্লাকে। ইমাদুল্লা এই বন্দরে এবার নিয়ে সাতবার এসেছে। ইমাদুল্লা এ বন্দরে একবার প্রায় এক নাগাড়ে অনেক দিন ছিল। স্ট্রাইক জাহাজিদের এবং সরফাই হবে জাহাজে, সরফাই হলে দেখা গেল জাহাজের বয়লার বসে গেছে। বয়লার মেরামত এবং অন্যান্য কাজ সারতে সারতে জাহাজটা এক নাগাড়ে অনেক দিন কাটিয়ে দিল। তখন শীতকাল ছিল না। গ্রীষ্মকাল, আকাশ পরিষ্কার, আপেলের বাগানে মরশুম লেগেছে, চারপাশে যত সব গাছ-গাছালি আছে সবার ডালে ডালে পাতায় পাতায় কী সুষমা! পাহাড়ের নীচে যেসব পথ আছে, সে পথে কত হরেক রকমের দোকানি নানা রকমের ফুল নিয়ে বসে থাকত। এখন শীতকাল, কী তীক্ষ্ণ শীত, হিমেল হাওয়া। জাহাজিরা প্রায় প্রত্যেকেই হাতে দস্তানা পরে কাজ করছে। সেই গ্রীষ্মকালে শীত ছিল না, আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে এবং সমুদ্রে ঢেউ ছিল না বলে ইমাদুল্লা স্কিপ ভাড়া করে এইসব দ্বীপে চলে এসে বিকেল এবং অনেকদিন রাত কাটিয়ে গেছে। ইমাদুল্লা বলেছে, এক আজব নগরী, মনে হবে তুমি জ্যোৎস্না রাতে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর ঘুমিয়ে আছ অথবা জেগে আছ।

সে প্রশ্ন করল, ইমাদুল্লা, সেই মানবীর মুখ তুমি ভাল করে দেখেছ?

ইমাদুল্লার চোখ কেমন প্রথম হতবাক হয়ে গেল। সে কী বলবে ভেবে পেল না। বস্তুত, সমুদ্রের কাছে এসব খেলনা হলেও ওর কাছে এসব ছোটখাটো লম্বা পাহাড়ের সামিল অথবা মূর্তিগুলো এত বেশি অতিকায় যে সে নীচে গিয়ে দাঁড়ালে প্রায় কোনও অতিকায় পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে এমন মনে হত তার। স্পষ্ট সব কিছু দেখা যেত না। সে পায়ের নখগুলির ধার দেখেছে এবং নখগুলি বাজপাখি-প্রায়, যেন হাতির দাঁতের চেয়ে মোটা। এবং সেই পাহাড়টায় অর্থাৎ যে পাহাড়ের অগ্রভাগ সমুদ্রের ওপর মানবীর মতো ভেসে রয়েছে, সেখানে সে গিয়ে উঠলে দেখতে পেত, বড় এক মাঠের মতো বেদি এবং বেদি এত মসৃণ যে হাঁটতে গেলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। মূর্তির পা দুটোর চারপাশে সে ঘুরতে পারত না। কারণ পাহাড়টা মাঝখানে প্রায় ঘাগরার মতো হয়ে আছে। দূর থেকে যতটুকু উলঙ্গ মনে হয় কাছে গেলে তাও মনে হয় না। ওপরের দিকে তাকালে মনে হয় মুখটা আকাশের দিকে নিবদ্ধ। সে চোখদুটো অথবা মুখ দেখতে পায়নি। সুতরাং ইমাদুল্লা ওর কথার জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না। একবার ভাবল, সে বলবে দেখেছে। সে ওর শরীর বেয়ে সেই সত্তর-আশি ফুট ওপরে উঠে দেখে এসেছে। বস্তুত সেখানে সেই মানবীর শরীর বেয়ে ওঠা যায় না, এবং এত খাড়া যে-কোনও সময় পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। একমাত্র যখন এই অঞ্চলে তুষার-ঝঞ্ঝা বয়, এবং ক্রমে ঝঞ্ঝা কমে এলে তুষারপাত হতে থাকে, তারপর ক্রমে বরফ পড়তে থাকলে চারপাশের সমুদ্রে বরফ জমে যায়, অতি উৎসাহী যুবক-যুবতীরা তখন শোনা যায় সাইকেলে সমুদ্রের ওপর বরফ ভেঙে এইসব দ্বীপে চলে আসে। এবং পাতলা মই বেয়ে ওপরে উঠে যায়। পড়ে গেলেও হাত-পা ভাঙার ভয় থাকে না। তুষারপাতের জন্য নরম কোমল একটা দু'-তিন ফুটের আস্তরণ চারপাশে থাকে। ওদের পক্ষে সম্ভব হলেও ইমাদুল্লা মই পাবে কোথায়? সে তাই চোখ দেখতে পায়নি। সে শোনা কথাই বরং পুলককে নিজের চোখে দেখে এসেছে এমনভাবে যেন বলে দিল।

চোখ নেই পুলক।

সে ধীরে ধীরে এ কথাটা বলল। ইমাদুল্লার বয়স এখন অনেক। কত বয়স সে নিজেও জানে না। দলিতে ওর একটা বয়সের হিসাব আছে, সেটা মনগড়া হিসেব। চাকরির জন্য হিসেব। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় সে এখন খুব সিরিয়াস। বরং এতক্ষণ যারা ওর পাশে ছিল, যেমন গঙ্গা, আলতাফ, ওরা সবাই যা জানতে চাইত, এই পুলক তার চেয়ে একেবারে আলাদা। ওরা ফিসফিস করে বলে গেছে, তুমি চাচা কেন যেতে সেখানে আমরা জানি।

কেন!

ওরা কিছু না বলে দাঁত বের করে হাসত।

ইমাদুল্লা বলত, বেকুফ। আমার কি সে বয়স আছে?

তখন কি তুমি আর এখনকার মতো বুড়ো-হাবড়া ছিলে?

তোরা জানিস না, তোরা যা জানিস না তা আমাকে বলতে আসিস না। আমি যে বয়সে জাহাজের কাজ নিয়ে আসি, সেটা তোদের এখনকার বাপের বয়স।

ওরা বুঝতে পেরেছিল, চাচা রেগে যাচ্ছে। সুতরাং রেগে গেলে চাচা যা তা বলে দেয়। ওরা চলে গেলেই এসেছিল পুলক। জাহাজ ঘাটে বাঁধা হচ্ছে। জেটি-বয়রা এখন হল্লা করছে। এবং ক্রেনগুলোর ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। দিন ছোট বলে মাথার ওপরে যে সূর্য ছিল, নিমেষে তা সমুদ্রের ওপাশে হেলে পড়েছে। এবং এক সময় সমুদ্রে ডুবে গেছে। মনে হয় না দিন এত ছোট হতে পারে। এখন ওদের অন্ধকারে এই নিশীথে কাজ করতে হবে। চারপাশে নানা রকমের আলো এবং জেটির ওপর আলোর মালা। জাহাজের সব আলো জ্বালা হয়নি বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং ডেকের ওপর অন্ধকার। এই অন্ধকারেই জাহাজিরা ছুটে ছুটে কাজ করছে। হাসিল ফেলে দিচ্ছে। ওয়ার পিন ড্রাম ঘুরছে। উইনচে স্টিমের শব্দ। পুলকের ওয়াচ নেই। সে ইঞ্জিন-রুমের জাহাজি। ওদের ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ইমাদুল্লা। সামনে সেই লায়ন রক, রকের ওপারে সেই ডিভাইন লেডি এবং বিচিত্র সব পাহাড়ের শীর্ষ ভাগ আর ডানদিকে সেই লায়ন রকে লাইট-হাউজ সমুদ্রের ওপর। আলোটা বৃত্তাকারে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে এখন। যতক্ষণ জাহাজ বন্দরের দিকে ঢুকবে সেই লাইট-হাউজটা পথ দেখাবে।

ইমাদুল্লা বলল, লেডির মুখ-চোখ কিছুই নেই পুলক।

এবার ইমাদুল্লা কেমন সরল কথাবার্তা বলতে থাকল। একবার আমি রাত কাটিয়েছিলাম। কেউ কেউ রাত কাটাতে যায়। আমারও শখ হয়েছিল। এখান থেকে ধরো প্রায় মাইল দশেক হবে। এই দশ মাইল আমাদের জাহাজ কী ধীর গতিতে এসেছে বুঝতেই পারছ। স্কিপ নিয়ে গেলে ঘণ্টা খানেকের পথ। যদি তোমার পথটা চেনা থাকে। না চেনা থাকলে তুমি এমন সব দ্বীপের গোলমালে পড়ে যাবে যে সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। তখন তোমার মনে হবে, সমুদ্রের সেই আদি প্রেতাত্মা তোমাকে ঘুরিয়ে মারছে।

প্রাচীন নারিকেল গন্ধ রয়েছে এই ইমাদুল্লার গায়ে। পুলক যত বন্দরে গেছে, সে এই ইমাদুল্লার সঙ্গেই যা কিছু বন্দর সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছে। কারণ পুলক জাহাজে উঠে আসার পর থেকেই বড় বিষণ্ণ। সে বেশি কথা বলে না। জাহাজ থেকে আজকাল বেশি নামে না। বন্দরে যায় না। মেয়েমানুষ জাহাজে এসে বিরক্ত করলেও সে ফুর্তি করতে রাজি হয় না। বরং সে তার ফোকশালের দরজা বন্ধ করে রাখে। কিছু বই নিয়ে এসেছে সঙ্গে। ইংরেজি, বাংলা, সেগুলো সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। পয়সা হলে সে বন্দর থেকে দুটো-একটা বই কিনে নিয়ে আসে। এবং কোনও কোনও বন্দরের সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করলে একা নেমে বাসে চড়ে দূরে চলে যায়। কোনও পাহাড়ের নীচে, পাথরের গায়ে সে একটা নাম লিখে আসে। নামটা বড় ওর প্রিয়। নামটা একটি সুন্দর বাঙালি মেয়ের। সে লম্বা এবং যার লাবণ্য ভরা শরীর। সে সাদা জমি আর লাল রঙের পাড় দেওয়া শাড়ি পরতে ভালবাসে। সে মেয়ের নাম নন্দিনী। নন্দিনী, আমি এখন একটা পাহাড়ের কোলে এক গাছের নীচে বসে আছি। সে গাছের কাণ্ডে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে এমন লিখে রাখে। অথবা পাথরের গায়ে লিখে রাখে ছোট্ট দুটো কথা—নন্দিনী, আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

নতুবা অন্য সময় জাহাজে সে বড় বিষণ্ণ। সে কাজ করে। সে কাজ আর কাজের ভিতর ডুবে থাকে।

সে সেই পাঁচ বছর আগে এক নিস্তব্ধ দুপুরে ঘরছাড়া হয়েছিল, আজও সে তাই আছে। তার বয়স যদি তখন বিশ থাকে, এখন তার পঁচিশ হয়েছে। সে যদি তখন নন্দিনীকে ভালবেসে থাকে, সে এখন তাকে তবে স্বপ্নের ভিতর নিয়ে গেছে। নন্দিনী, মেয়ের নাম নন্দিনী। নন্দিনী, বড় সুন্দর তুমি। তোমার চোখ এই দূর দেশেও আমি বর্ষার দিনে অথবা তুষারপাত হলে পোর্ট-হোলে স্পষ্ট মনে করতে পারি।

তা হলে ওর চোখ নেই ইমাদুল্লা চাচা!

না?

মুখ নেই?

না।

তবে কী আছে?

কী আছে জানি না। পায়ের কাছে দাঁড়ালে ওর চোখ-মুখের কথা তোমার মনেও আসবে না।

এত সুন্দর?

এত সুন্দর পুলক!

রাতে যে থাকলে, কী দেখলে?

দেখলাম নিশীথে সেই বাতিঘরের আলো এসে বার বার সেই মূর্তির ওপর কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাচ্ছে। তারপরে আবার ঘুরে ঘুরে কী যেন দেখছে সমুদ্রে, ফের এসে আলোটা মূর্তির ওপর থেমে থাকছে। একটা আশ্চর্য রকমের মায়া তৈরি হয় তখন। তুমি সেটা দেখার জন্য সারারাত সেই মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে থাকবে।

তুমি একবারই গেছ চাচা?

একবারই। আর যেতে পারিনি। কারণ তারপর যতবার এসেছি সে শীতকালে। চারপাশে তুষারপাত। সমুদ্রের ওপর বরফ পড়তে থাকে। বরফ ভাসতে থাকে। সমুদ্রে বরফ একেবারে পাটির মতো বিছিয়ে না গেলে যাওয়া খুব রিস্ক। আর যেতে পারিনি।

এবার শীতকালে এসেছি আমরা।

সুতরাং তোমাব যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে যেতে পারবে না। এটা জুন মাসের প্রথম। জুলাই মাসের শেষাশেষি এখানে সমুদ্রের জল বরফ হয়ে যায়। ততদিন জাহাজ এখানে থাকবে না। থাকলে তুমি আমি এক রাতে সাইকেল জোগাড় করে দেখে আসব।

বুড়ো মানুষ তুমি। তোমার কষ্ট হবে যেতে।

যাওয়ার একটা নেশা আছে। সেই কবে একবার দেখেছি, এখনও চোখের ওপর দৃশ্যটা যেন ভাসছে।

পুলক ইমাদুল্লাব চোখ দেখে টের পেল, সে যাবেই। পুলক ভাবল, এক রাতে যাওয়া যাবে। যারাই আসে তারা এই দৃশ্য না দেখে বড় যায় না। পুলক মনে মনে সেখানে যাবে স্থির করল। যদি জাহাজ ততদিন এ বন্দরে না থাকে, তবে সে একটা স্কিপ ভাড়া করে যাবে। সেখানে সে ধারালো ছুরি দিয়ে নন্দিনীকে লিখবে, আমি এখানেও এসেছিলাম। নিশীথের জ্যোৎস্নায় আমি সারারাত তোমাকে প্রত্যক্ষ করেছি।

দুই

বন্দরের চারপাশটা এখন নির্জন। শীতের রাত বলে এই নির্জনতা আরও ভয়াবহ। দূরে গির্জায় ঘণ্টা বাজছে এবং হু হু করে ঠান্ডা শীত দক্ষিণ মেরু থেকে অথবা পাহাড় থেকে নেমে আসছে। বন্দরের বাড়িঘর ছোট ছোট। খুব বড় অট্টালিকা চোখে পড়েনি। অধিকাংশ কাঠের বাড়ি। লাল নীল রঙেব কাঠ দিয়ে যেন বাড়িগুলো তৈরি। শীতের রাতে ওদের কাচের জানালায় শিশিরের টুপটাপ শব্দ কান পাতলে শোনা যাবে। এই ঠান্ডায় ডেক-এ কেউ নেই। যে যার মতো ফোকশালে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে এবার। তখন মনে হল বন্দরের পথ ধরে কেউ একটা লণ্ঠন হাতে এদিকে নেমে আসছে।

পুলক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল। শীতে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ফোকশাল গরম রাখার জন্য যে সামান্য ব্যবস্থাটুকু আছে তা পর্যন্ত ঠান্ডা মেরে গেছে। জাহাজিরা যে যার ফোকশালে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ছে। কেবল ইঞ্জিন-ভাণ্ডারির কাজ শেষ হয়নি। সে মেসরুমে বসে কিছু খাবার ছড়গলাচ্ছে এখন।

এই শীতের রাতে মেজ-মালোম গেছেন কিনারে। কাপ্তান নিজের ঘরে বসে এখন হয়তো বাইবেল পড়ছেন। এবং কোয়ার্টার-মাস্টার গ্যাংওয়েতে বসে ভাবছিল সেই লণ্ঠনের আলো এদিকে নেমে আসছে কেন? এই শীতে নির্জন এই জেটিতে এমন আলো কেমন ভয়াবহ। দূরের সমুদ্র তেমনি শান্ত। কেবল সেই ঠান্ডা হাওয়া! কারণ তুষারপাত আরম্ভ হবার আগে এমন একটা ঝোড়ো ঠান্ডা হাওয়া এই সব উপকূলে বইতে থাকে। যারা মেষপালক যারা তৃণভূমিতে মেষের পাল অথবা গোরুর পাল নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এই ঝোড়ো হাওয়া বইতে দেখলেই তাদের জীবজন্তু নিয়ে শহরের কাছে চলে আসবে এবং যার যা কিছু আছে যেমন মেষ, গোরু, বাছুর সব কিলখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে যে যার দেশে চলে যাবে। এই শীতের রাতে, কোনও উৎসব না থাকলে এমন নির্জন এক জেটিতে কেউ নেমে আসে না। অথচ একটা লণ্ঠন ক্রমে শেষ ক্রেন পার হয়ে এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে।

পুলক চায়ের জল গরম করতে ওপরে উঠে এসেছে। সে দেখল লণ্ঠন হাতে কে এখন গ্যাংওয়ের সিঁড়ি ধরে জাহাজের ওপরে উঠে আসছে। ওরা ফসফেট নিয়ে এসেছে জাহাজে। লণ্ঠন হাতে এজেন্ট-অফিস থেকে কেউ আসবে না। আর যখন জেটিতে তেমন অন্ধকার নেই, তখন কেউ হাতে লণ্ঠন নিয়ে জাহাজে উঠে আসতে পারে ভাবাই বিস্ময়ের। সে জল গরম না করে ওভারকোটের কলারটা উঁচু করে দিল। এবং যে স্কার্ফটা গলায় জড়ানো আছে সেটা মাথায় তুলে ডেক ধরে হাঁটতে থাকল। ওর মনে হল সেই লণ্ঠন হাতে মানুষটা কোয়ার্টার-মাস্টারকে কী যেন বলছে।

ডেকের যমুনাবাজুর উইংস-এ একটা লাল মতো আলো জ্বলছে। সে আলোটার নীচে এসে দাঁড়াল। এবং এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যার হাতে লণ্ঠন তিনি একা নন। পিছনে কেউ যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা শেডের মতো জায়গায় ওরা দাঁড়িয়ে কী বলাবলি করছিল, সে কৌতূহল আর নিবৃত্ত করতে পারল না। কারণ লণ্ঠন হাতে যখন, নিশ্চয়ই কোনও কিনারার মানুষ হবে। যেন কিছু হারিয়েছে ওরা। এই জাহাজে ওরা তা খুঁজতে এসেছে।

সে আরও দু'পা এগিয়ে গেল। জল বসিয়ে এসেছে উনুনে। জলটা গরম হয়ে পড়ে যেতে পারে। এই শীত যে একটু চা না খেতে পারলে শরীর গরম হবে না। দাঁত প্রায় শক্ত হয়ে আসছে। এবং এবার শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে। পুলক সামনে যেতেই দেখল একজন প্রায় বৃদ্ধা গোছের মানুষ এবং অন্যজন যুবতী কি কিশোরী এই সামান্য আলোর ভিতর বোঝা যাচ্ছিল না। বৃদ্ধার হাতে লণ্ঠন। যেন প্রায় অনেকদূর থেকে হেঁটে এসেছে এমন চোখ-মুখ এবং ক্লান্ত। কিশোরী মেয়েটি কোনও কথা বলছে না। সে তার ঠাকুমার কথা শুনছে।

কোয়ার্টার-মাস্টার সিরাজ ভাল ইংরেজি জানে না। এবং সে ওদের কথা ঠিকমতো ধরতে পারছে

কোয়ার্টার-মাস্টার পুলককে দেখেই বলল, এরা এই জাহাজে কিছু বোধহয় খুঁজতে এসেছে।

পুলক বলল, গুড ইভিনিং মাদাম। আপনারা এই ঠান্ডায় জাহাজে?

বৃদ্ধা বললেন, তুমি মিস্টার একটা খবর দিতে পারো?

কী খবর বলুন?

এই জাহাজটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে তো?

এটা কোথা থেকে ঠিক এসেছে আমি বলতে পারব না মাদাম।

বৃদ্ধা কেমন বিস্ময়ের চোখে তাকাল। মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে তার ঠাকুমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ঠাকুমার ছায়া ওর শরীরে আবছা অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সেই মেয়েটি ওর দিকে এখন কেমনভাবে তাকাচ্ছে পুলক বুঝতে পারছে না। সেও এমন একটা কথায় বিস্মিত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছে না। জাহাজের ওপর এই লণ্ঠন দুলতে দেখে যারা জাহাজের শেষ ধোয়ামোছার কাজ করে ফিরছিল তারা পর্যন্ত এদিকটাতে জড়ো হতে লাগল।

পুলক বলল, মাদাম, আপনাকে আমি কোনও মশকরা করছি না।

পুলকের এই স্বভাব। সে সহজে কোনও কিছু ব্যাপারে স্থির না হয়ে কিছু প্রকাশ করে না। সে বলল মাদাম, জাহাজটা ইংরেজদের। কলকাতা থেকে জাহাজি নিয়েছে। আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে বের হয়েছি সেই দশমাস আগে। কিছুদিন আগে আমরা গিনিতে ছিলাম। তার আগে সেন্টিসে। সূর্য মাথার ওপর উঠলে আমরা জাহাজ ছেড়ে গেছিলাম ওসানিক আয়ার্ল্যান্ডে। কত দেশ ঘুরে আমরা এখানে এসেছি ভারতবর্ষ থেকে এ জাহাজ আসেনি। জাহাজ ইংরেজদের। আমরা জাহাজ নিয়ে আপনাদের বন্দরে এসেছি ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে।

বৃদ্ধা এবার কিছু বলতে চাইলে পুলক বলল, এই শীতে আপনি বড় কষ্ট পাচ্ছেন। যদি কিছু না মনে করেন, আমাদের ফোকশালে এসে বসতে পারেন। আপনার সব কথা শুনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি।

বৃদ্ধা এবার লণ্ঠন তুলে পুলকের মুখ দেখল। লণ্ঠনটা তুলতেই আলোর কিছু অংশ সেই মেয়ের মুখে গিয়ে পড়েছে। যা এতক্ষণ অস্পষ্ট ছিল এবং এতক্ষণ যা রহস্যময় ছিল। এখন পুলক এবং অন্যান্য জাহাজিদের চোখে একেবারে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এত সুন্দর এবং বিষণ্ন মুখ সে পৃথিবীর কোনও বন্দরে যেন দ্যাখেনি। সে এতক্ষণ যে সরল সহজভাবে কথা বলছিল, মেয়েটির মুখ দেখেই সে আর তেমন সরল সহজ থাকতে পারল না। সে কেমন নিজের ভিতর গুটিয়ে গেল। কোথায় যেন তার এমন একটা মুখ দ্যাখা। বড় চেনা চেনা। সে যেন কবে কোন পাথরের গায়ে এমন একটা মুখের ছবি এঁকে রেখেছিল। সে আর সেজন্য কিছুই বলতে পারল না। কেবল বলল, আমি সব আপনাকে বলতে পারব না। আমাদের জাহাজে ইমাদুল্লা চাচা আছে। তার কাছে আসুন সে আপনাদের সব সমস্যা শুনলে নিশ্চয়ই সমাধানের একটা সূত্র বের করে দিতে পারবে।

পুলক, গঙ্গা, জিয়া হায়দর সবাই সেই দুইজন আগন্তুকের সঙ্গে নিজেদের ফোকশালের দিকে হাঁটতে থাকল।

আকাশ পরিচ্ছন্ন। বোধ হয় এটা কৃষ্ণা চতুর্দশী হবে। নতুবা আকাশের নক্ষত্র এত উজ্জ্বল কেন প্রায় ঝলমল করছে সারা আকাশ। শীতের রাতেই আকাশ সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন থাকে, পুলকের এমন মনে হল ডেক-এ দাঁড়িয়ে। মেয়েটি বড় ধীরে ধীরে হাঁটছে। মেয়েটা তার ঠাকুমার জন্য এত ধীরে হাঁটছে কি না জানে না, না ওর স্বভাবই এমন, পুলক ডেক পার হতে গিয়ে তা ধরতে পারছে না। সে নীচে সিঁড়ি ধরে নামবার আগে জিয়াকে বলল, কেটলির জলটা ফুটছে কি না দেখতে। এবং না ফুটলে সে যেন আরও দু'কাপ জল দিয়ে দেয়। যারা আগন্তুক এসেছে তাদের জন্য এই দু'কাপ। তবে আর ভিন্ন করে চা বানাতে হবে না।

সিঁড়ির মুখে এলে পুলক বলল, এমন খাড়া সিঁড়ি ভাঙতে আপনার কষ্ট হতে পারে। আমার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

এই বলে সে তার শক্ত কাঁধ বাড়িয়ে দিল।

ইমাদুল্লা চাচা জাহাজের বড় টিন্ডালের কাজ করে, তার ফোকশালে সে একা। ইঞ্জিন-সারেঙের ফোকশাল পার হলেই ইমাদুল্লা চাচার ফোকশাল। পুলক এবং গঙ্গা, যমুনাবাজুর মোহন সবাই এসে গেল নীচের টুইন-ডেকে। ওরা ওকে ইমাদুল্লার ফোকশালে ঢুকিয়ে দিল।

ইমাদুল্লা তখন তামাক খাচ্ছিল। সে দেশ থেকে আসার সময় এক টিন রাব আর এক বস্তা তামাকের পাতা এবং কিছু বেনারসের জর্দা পাতার আরক সঙ্গে নিয়ে আসে। আর সঙ্গে আনে গড়গড়ার নল রুপোর বাঁধানো গড়গড়া, এক ডজন কলকে। কারণ ঝড় উঠলে জাহাজ বড্ড দোলে। সে তার কলকেটাকে সুতোয় বেঁধে রাখে। এবং ঝুলিয়ে রাখে বাংকের নীচে। খুব বেশি দোল খেলে জাহাজে উল্টে পাল্টে যায় সব। কলকে ছিটকে গিয়ে অন্য কোনওখানে দু'খানা হয়ে ভেঙে পড়ে থাকে। ইমাদুল্লা বড় প্রাচীন আর হিসেবি জাহাজি। সে কত ধানে কত চাল হয় জানে। কতদিনের সফরে ক'টা কলকে দরকার তার জানা। ব্যাংক লাইনের সফর হলে কবে ঘরে ফেরা যাবে তার ঠিক থাকে না। কেবল সমুদ্র এবং সমুদ্র, এবং বালিয়াড়ি, দ্বীপপুঞ্জ চারপাশে, অথবা শীতের দেশে বরফ পড়ছে তো পড়ছেই। এসব সবই জানা আছে ইমাদুল্লার। সে দু'মাসে একটা কলকে, এই হিসাবে এক ডজন কারণ ব্যাংক লাইনে

হলেই বিশ-বাইশ মাসের সফর না হয়ে যায় না। সেই ইমাদুল্লা বেশ শীতের ভিতর কম্বল গায়ে চুপচাপ প্রায় নামাজের ভঙ্গিতে বসে তামাক টানছিল, তামাক টানা শেষ হলেই কলকেটা উপুড় করে রাখবে। বালিশে তিনটি থাপ্পড় মারবে, মেরে চারপাশের যত কিছু আছে সব বন্ধন করে দেবে, কারণ ইমাদুল্লার বয়স যত বাড়ছে তত জিন পরি অথবা ভূত-প্রেতের ভয় বাড়ছে। আর এই সব জাহাজে কত কিছু থাকে, সে নিশীথের জ্যোৎস্নায় কতদিন এমন সব বিচিত্র জাহাজের গল্প করেছে যে কাপ্তানের চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেছে ভয়ে। সেই সব গল্প সময় পেলেই পুলককে বলে। অথবা অন্যান্য জাহাজিদের হাতে যখন কাজ থাকে না, ডেকের কাজ শেষ, সাফ-সুতরোর কাজ শেষ, অথচ এজেন্ট-অফিস থেকে জাহাজ ছাড়ার কোনও নির্দেশ আসছে না—তখন আর কী করা, ডেকের ওপর বসে মাদুরে শুয়ে বসে থাকা অথবা এই ইমাদুল্লা চাচার সেই সব পুরনো সফরের অভিজ্ঞতার কথা শোনা—শুনতে শুনতে কাপ্তান তো কাপ্তান, বুড়ো মানুষ, জোয়ান মানুষ, মায় পুলক, যে শিক্ষিত নাবিক, জাহাজে যার সংস্কার বলতে কিছু নেই, যে ভয়ংকর সৎ এবং সাহসী, সেই মানুষের পর্যন্ত ভয়ে টেঁসে যাবার অবস্থা।

সুতরাং পুলক ওদের যে কী ভেবেছিল! ওরা কি জাহাজে আদৌ মানুষ হিসাবে এই শীতের রাতে এসেছে! সে অবাক, কারণ এতক্ষণে যেন মনে হচ্ছে লণ্ঠন নিয়ে আসার কী কারণ থাকতে পারে! ইমাদুল্লা চাচা সব জানে। সব বোঝে। সে দেখলেই সব টের পেয়ে যাবে।

ইমাদুল্লা চাচা ওদের দেখেই চিনে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি নল ফেলে উঠে দাঁড়াল, আরে আপনি!— বলতেই সেই বৃদ্ধা লণ্ঠন তুলে ওর মুখ দেখল।

তুমি ইমাদুল্লা না?

জি, আমি ইমাদুল্লা।

যাক বাঁচা গেল।

বলে হাতে স্বর্গ পাবার মতো সে বাংকের ওপর বসে পড়ল। একটু থেমে বলল, তুমি অনেকদিন পর এদিকটায় এলে তবে।

আজ্ঞে তাই। আপনার শরীর ভাল?

বৃদ্ধার মাথায় কালো ঝালরের ক্যাপ ছিল। সে ওটা খুলে ফেলল। সারা মাথায় সাদা চুল। হাতে সাদা ফ্লানেলের গরম দস্তানা। পায়ে রাবারের হাঁটু পর্যন্ত জুতো। এবং গায়ে লম্বা লেদার জ্যাকেট। ইমাদুল্লা এবার দরজার পাশে মুখ তুলতেই দেখল একজন সুন্দর মতো মেয়ে চুপচাপ নাবিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম সে বুঝতে পারেনি মেয়েটিকে। কার সঙ্গে মেয়ে এই রাতের জাহাজে উঠে এসেছে? সে বিস্ময়ের চোখে তাকাতেই বৃদ্ধা কী বুঝতে পেরে বলল, আরে তুমি ওকে চিনতে পারছ না!

ইমাদুল্লার চোখ সামান্য সংকুচিত হল। সে বলল, না। ঠিক চিনতে পারলাম না মাদাম ইলিয়া।

আমাদের ব্রাউস!

ব্রাউস! এত বড় হয়ে গেছে?— বলেই সে যেমন লাফ দিয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়, তেমনি সে সহসা নিস্তেজ হয়ে বসে পড়ল, সেই কবে এসেছি।

বলে সে মিনমিনে গলায় বলল, কত বছর আগে!

সে কর গুনে হিসাব করে বলল, তা তেরো বছর হয়ে গেছে। তখন ব্রাউস শিশু। কত বছর বয়েস ছিল মাদাম ইলিয়া তখন ব্রাউসের?

চার বছর হবে।

ভুলে গেছি সব। কত সহজে মাদাম ইলিয়া আমাদের সময় পার হয়ে যায়।— ইমাদুল্লা কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বে ডুবে গেল যেন।

পুলক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা যে রহস্যজনক নয়, এখনই ইমাদুল্লা সব খুলে বলবে তাকে এবং খুলে বললে সে সবটা বুঝতে পারবে, কারণ এই ইমাদুল্লা যেন সব জানে, বোঝে, কোন সমুদ্রে কী জল। সে প্রায় পুলকের কাছে ঈশ্বরের সামিল, তবু ইমাদুল্লা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছে এবং সাদাসিধে মানুষের মতো গল্প করছে দেখে পুলক মনে মনে রাগ না করে পারল না। সে-ই নিয়ে এসেছে ওদের ইমাদুল্লা চাচার কাছে, অথচ চাচা এখন ওর দিকে একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত, এরা কারা পরিচয়

করিয়ে দিচ্ছে না, এবং কেন রাতে লণ্ঠন নিয়ে এই জাহাজে উঠে এসেছে, যেন উঠে আসাই স্বাভাবিক, না এলেই বরং সেই রাতে ওদের খুঁজতে বের হতে হত, এমন মুখ নিয়ে চাচা ওদের সঙ্গে কথা বলছে। এমনকী পুলককে কোনও কথা বলছে না পর্যন্ত।

পুলক ভাবল, ধুস শালা, কাম কী দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের ফোকশালে গিয়ে সে শুয়ে পড়বে এমন ভাবল এবং সে এইটুকু ভেবে দরজা অতিক্রম করতেই কড়া গলা চাচার, পুলক কোথায় যাচ্ছ, ওদের জন্য কিছু গরম কফি। একবার ভাণ্ডারিকে ডাকলে হয়।

পুলক ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, বলল, ইনি হচ্ছেন মাদাম ইলিয়া আর এ হচ্ছে ত্রাউস মিলান। এরা ইলিয়া পরিবারের মানুষ। এবং এই ইলিয়া পরিবারের সাত পুরুষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিল। এদের আচারে ব্যবহারে কিছুটা ভারতীয় সংস্কৃতি আছে। এ মাসটা ওদের পরিবারের মৃত্যুমাস। এই মাসেই হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় সকলেই ওদের মারা গেছেন। এরা গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসে। এবং এই শহর থেকে কিছু দূরে ছোট্ট এক পাহাড়ের মাথায় ওদের ছবির মতো বাড়িটা দেখলে বাড়িটাকে না ভালবেসে পারবে না।

একটু থেমে ইমাদুল্লা বলল, আমাদের পুলক। পুলক বসু। বছর পাঁচেক হল জাহাজি হয়েছে। এ বন্দরে প্রথম সৎ, সাহসী এবং বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কেন যে ছোকরা জাহাজে মরতে এল বুঝি না। তোমরা তো জানো আমাদের দেশটা এখন ভাগ হয়ে গেছে। এই বছর সাত-আট হল ভাগ হয়েছে কী? খবর রাখো না।

ইলিয়াকে সামান্য সংকুচিত দেখাল।

তোমরা ভারতবর্ষে ছিলে। যুদ্ধের সময় চলে এসেছ। ত্রাউসের বয়স তখন বোধহয় বছর খানেক। আমি এলাম বছর তিনেক বাদে। আমাদের কনভয় তোমাদের ভেড়ার মাংস, আপেল আর গম নেবার জন্য এসেছিল। সে একটা দিন গেছে!

ইলিয়া বলল, তা গেছে।

ইমাদুল্লা বলল, তখন আমরা ছিলাম একদেশের মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ। এখন পুলক হিন্দুস্থানের আর শালা আমি পাকিস্তানের। আমার শালা বড় বিদঘুটে স্বভাব, বড় বেশি কথা বলি। তা পুলক দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? কী রে গঙ্গা, বেশ যে দেখছিস শালা! যা যা। শুয়ে পড় গে। এখানে ভিড় জমাবি না।

পুলক বলল, চাচা, চায়ের জল গরম করেছিলাম।

তবে ওই চা-ই করে দাও। কী মাদাম, আর কিছু! কিছু শুকনো বিস্কুট দিতে পারি। পনির দিতে পারতাম, কিন্তু ব্যাটা স্টুয়ার্ডকে এখন পাওয়া যাবে না। সে শালা ঠিক কিনারায় নেমে গেছে।

মাদাম ইলিয়া বললেন, না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এক্ষুনি উঠব।

আপনার যেতে কষ্ট হবে না! বেশ দূর। সেখানে এই রাতে ওকে একা নিয়ে যাবেন?— বলে ইমাদুল্লা ত্রাউসের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আমাদের গাড়ি আছে।

তখন কিন্তু আপনাদের গাড়ি ছিল না।

ত্রাউসের বাবা লাইট-হাউজে কাজ পেয়েছে। সে সরকার থেকে একটা গাড়ি পায়। বলেই কী বলতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল মাদাম ইলিয়া।

ইমাদুল্লা এবার যা বলবে বলে ভেবেছিল, মাদাম ইলিয়ার রুগ্না কন্যা অর্থাৎ ত্রাউসের মা'র খবর নেবার জন্য মুখ বাড়াতেই চা নিয়ে এল পুলক। এই শীতের রাতে চা-টুকু এত বেশি লোভনীয়, এত বেশি ভাপ উঠছে যে, ইমাদুল্লা সেই গরম চায়ে হাত রেখে হাত গরম করতে চাইল।

ত্রাউস এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। পুলক এমনিতেই বিষণ্ণ থাকে, কথা কম বলে। ঠিক ইমাদুল্লার বিপরীত। অনেকক্ষণ থেকে পুলক একটা কথাই ভাবছে, এরা জাহাজ বাঁধতে না বাঁধতেই কেন ডেকে এসেছে। এবং সে ইমাদুল্লাকে দেখে ঠিক টের পেয়েছে, সে গোটা ব্যাপারটা জানে। তাই ওর মুখে কোনও বিস্ময়ের রেখা ফুটে নেই। ওরা চলে গেলেই যেন ইমাদুল্লা সব খুলে বলবে।

পুলক আলগা করে চা ঢেলে দিল ত্রাউসের কাপে। হাত খুব বেশি গোলাপি রঙের এবং নীল

শিরা-উপশিরা সব ভাসমান, আর এইসব দৃশ্য ওর দস্তানার ভিতর থেকে প্রায় ফুটে বের হবার মতো। ত্রাউস ডান হাতের দস্তানা খুলে ফেলেছে। না খুলে ফেললেও সে যেন ধরতে পারত কত উজ্জ্বল আর নীল রঙ নিয়ে এই শরীর এই সমুদ্রের তীরে এক পাহাড়ের ছায়ায় অথবা আপেলের বাগানে বড় হচ্ছে। চোখ বড় বড়। চুল বব করে কাটা। পায়ের পেশি নরম। এবং যেমন লম্বা তেমনি ডিমের মতো মসৃণ মুখখানিতে বড় বড় চোখদুটো প্রায় প্রতিমার মতো। সে বসে ছিল। ওর দু'হাত সামনে। ওর সাদা রঙের পোশাক গায়ে। কোমরে লাল রঙের বেল্ট আঁটা। পায়ে সাদা চামড়ার জুতো। নীল রঙের মোজা। এক আশ্চর্য সুষমা নিয়ে মেয়েটা চুপচাপ বসে আছে। কথা বলছে না। পুলকের ইচ্ছা হল একবার কথা বলে। অথচ সে যে কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

এখন অন্যান্য জাহাজিরা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কোনও দূরের গির্জায় রাত আটটার ঘণ্টা পড়ছে। বেলা চারটা না বাজতেই রাত নেমেছিল ডেক-এ। এখন তাই ওরা যেন গভীর নিশীথে জাহাজটার ভিতর সকলে ডুবে আছে। মেয়েটা একটা কথাও বলছে না। বিষণ্ণ প্রতিমার মতো এই ফোকশালের চারপাশটা দেখছে। স্টিয়ারিং ইঞ্জিনের শব্দ নেই। কেমন নিঃসাড়ে জাহাজটা এ বন্দরে পড়ে আছে।

অথচ ওরা যে কেন এসেছে পুলক বুঝতে পারছে না। লণ্ঠনটা বাংকের নীচে নিবু নিবু করে রাখা হয়েছে। ওদের ওঠারও কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইমাদুল্লা বলল তখন, ওর মা কেমন আছে?

বৃদ্ধা কোনও জবাব দিলেন না। চোখ মুছে ফেললেন, এই বয়সে কেবল কোনও দুঃখের কথা মনে হলেই কান্না আসে তার। ইমাদুল্লা কী টের পেয়ে বলল, সেই রোগেই গেছে?

ইলিয়া ঘাড় নাড়ল শুধু। ত্রাউস কোনও কথা বলছে না দেখে ইমাদুল্লা ইলিয়ার দিকে তাকাল।

এও তাই।

এত অল্প বয়সে!

তাই দেখছি। এখন আর কিছু ভাবি না। যা হবার হবে। এটা তো বংশানুক্রমিক। এমন হয়ে আসছে বাব বাব। আমার বড় ছেলেকে তো ভারতবর্ষের মাটিতে রেখে এসেছি। ভেবেছিলাম এই দেশের জল হাওয়া হয়তো কোনও প্রতিরোধের কাজ করতে পারে। কোথায়! ছোট ছেলেটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। মেয়ে-জামাই সঙ্গে ছিল। ভাবলাম, যাক অন্তত মেয়েটা বাঁচবে।

ইমাদুল্লা বলল, তোমার দাদা এবং কাকা দু'জনই তো এমন একটা রোগে গেছেন বলেছিলে।

কবে থেকে যে চলে আসছে জানি না। এই এক বিষণ্ণ হয়ে যাওয়া। দিন রাত কী যে এক বিষণ্ণতা কাজ করে জানি না।

তুমি তো দীর্ঘদিন বেঁচে গেলে!

আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না ইমাদুল্লা।— কেমন দুঃখের গলায় কথাটা বলল ইলিয়া।

ইমাদুল্লা বলল, আমাদের কবে যেতে হবে?

কালই।

যদি জাহাজ না ভিড়ত আজ?

ইলিয়া চুপ করে থাকল। কয়েক বছর থেকে এটা হয়েছে। গত বছর একটা জাহাজ কোচিন থেকে এসেছিল এ সময়ে, তার আগের বছর সব মাসেই কোনও না কোনও জাহাজ এসেছে, কিন্তু জুন মাসে কোনও জাহাজ আসেনি। ফলে কাউকে বলাও হয়নি।

কোনও ভারতীয়কে খাওয়াতে পারেনি বলে খুব খারাপ গেছে বছরটা।

ইলিয়া লণ্ঠনের আলো উসকে দিল। তারপর উঠে পড়ার সময় বলল, কখন যাচ্ছ?

সকাল-সকালই চলে যাব ছুটি নিয়ে। সঙ্গে এই ছোকরা নাবিককে নিয়ে যাব। কেমন হবে?— বলে সে ত্রাউসের দিকে তাকাল।

ত্রাউস কোনও উত্তর করল না। ইলিয়া বলল, বুঝতে পারছ। এখন আর চেষ্টা করি না কিছু। রোজ গির্জায় যাই সঙ্গে নিয়ে।

ওরা চলে গেলে পুলক প্রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলল, এরা কারা, কেন এসেছে, কীসের জন্য যেতে হবে কিছুই জানালে না চাচা।

এখন ঘুমোতে যাও। কাল সকালে যখন যাব তখন সব বলা যাবে।

এত আলো থাকতে এই লণ্ঠন হাতে এখানে আসা!

সবই বলা যাবে। রাত হয়েছে। সারেঙের ঘুম ভাঙলে রেগে যাবে। চুপচাপ শুয়ে পড়ো গে। সকালে আবার ছুটি নিতে হবে।

পুলক জানে, এখন আর ইমাদুল্লা চাচা কোনও উত্তর দেবে না। গঙ্গা, আলতাফ এবং অন্যান্য জাহাজি যারাই ছিল, বলল, চাচা, আমরাও যাব। আমাদের ফেলে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

পুলক ডেকের ওপর উঠে গেল। ক্রেনের নীচে ওরা এখন হাঁটছে। ক্রমে ওরা জেটি পার হয়ে গেল। এটা জুন মাস। এই মাস এবং মাস শেষ হলে ক্রমে এই দ্বীপে তুষারপাত আরম্ভ হবে। জাহাজ ততদিন থাকবে কি না সে জানে না। ব্রাউসের একটা অসুখ আছে। মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। সে ডেকের ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে ভাবল, তুষারপাতের পর যখন সমুদ্র বরফে ঢেকে যাবে একবার তাকে নিয়ে যাবে সেই মূর্তিটার কাছে। ওরা দু'জনে সেখানে চুপচাপ বসে থাকবে। পাঁচ বছর পর এই প্রথম সে কেন জানি ব্রাউসকে দেখে ফের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

তিন

শহরের ঠিক নীচে যে পথটা অকল্যান্ডের দিকে গেছে সেই পথে যেতে হবে। ওরা বাসে চেপে বসল। এখন শীতকাল বলেই পাইনের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। আপেলের বাগানে যারা কাজ নিয়ে এসেছিল ওরা এখন ছুটিতে চলে গেছে। বড় বড় কোল্ড স্টোরেজগুলো এখন সব ভেড়ার মাংস অথবা নানারকম ফলমূলে ভরে উঠবে। এই বন্দর থেকে গম, কাঁচা মাংস, ডিম এবং ফলমূল রপ্তানি হবে।

আর এই দেশে বরফ পড়ার আগে জাহাজগুলো সব ভেড়ার মাংস, গম অথবা আপেল নিয়ে তাড়াতাড়ি সমুদ্রে পাড়ি জমাবে। তা না হলে বরফ পড়লে চারপাশ বন্ধ। জাহাজগুলো বরফে আটকা পড়ে যায়। তখন একমাত্র বরফ-কাটা কলের সাহায্যে এইসব জাহাজ গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ওরা যখন বের হচ্ছিল বন্দর থেকে তখন চারপাশে যত জাহাজ রয়েছে, সবগুলোতে একসঙ্গে মাল উঠছে। বিশ্রাম নেই। বিরাম নেই। ক্রেনগুলো ঘড়ঘড় শব্দ করছে। ওরা এই সব দেখে ভেবেছিল জাহাজ মাল বোঝাই হতে খুব সময় নিলে পনেরো-ষোলো দিন। তার আগে জাহাজ যে রসদ নিয়ে এসেছে সেসব নামাতে হবে। এইসব দিন এক সঙ্গে গুনলে বড জোর জাহাজ এক মাসের মতো এই বন্দরে। ওরা এ দেশের বরফ পড়া দেখতে পাবে না। পুলক যেতে যেতে বলল, চাচা, তোমার কি মনে হয় আমাদের জাহাজের দড়িদড়া তুলতে তুলতে বরফ পড়বে না?

ইমাদুল্লা বলল, এখন কথা নয়। চারপাশটা দ্যাখো। কী সুন্দর দেশটা।

মানুষগুলো আরও সুন্দর, বাসের মেয়ে-কন্ডাক্টার ভারী মজার গল্প বলছিল যেতে যেতে। ওদের বাসটা সমুদ্রের পাশে পাশে যেন ছুটছে। বাঁ দিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ি জমি, উপত্যকা এবং সুন্দর সুন্দর কটেজ, ফার্ম হাউস, তেলের পিপে, নীল রঙের গাছ এবং পাইনের ঘন জঙ্গল। এসব দেখে পুলকের কেন জানি আর কথা বলতে ইচ্ছা হল না। এখানে এই সব বনে জঙ্গলে নেমে গেলে হত। বনে জঙ্গলে যে সব বড় বড় কৌরি-পাইন আকাশের দিকে মাথা তুলে কত কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম সেসব কান্ডে সুন্দর করে লেখা— নন্দিনী, আমাদের এ বাদে কোনও গত্যন্তর ছিল না। কারণ তুমি আমার সম্পর্কে কাজিন হও। আমাদের ধর্মে তোমার আমার ভালবাসা অবৈধ। তোমার বিয়ের দিনে আমি কী খেটেছিলাম! এমনভাবে মনপ্রাণ দিয়ে আর কোথাও আমি কাজ করতে পারিনি। বিয়েবাড়ির হই চই কখন থেমে গেছে, আমি কখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন তোমাদের বাসর, এসব কিছুই টের পাইনি নন্দিনী। কেবল সকালে দেখেছিলাম আমার শরীরে কে একটা গরম চাদর দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল। টের পাচ্ছিলাম ভোররাতের দিকে আমার সামান্য শীত করছে। টের পাচ্ছিলাম কেউ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। গোটা বাড়িটাতে তখন ক্লান্তি। সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন। টের পাচ্ছিলাম আমার কপাল থেকে কে চুল সরিয়ে সামনে মুখ নিয়ে আসছে। বুঝলাম তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস। আমাকে ঘুমের ভিতর বড় কাতর করছিল। আমি তবু জেগে যাইনি। জেগে

গেলে আমি যেন আমার এতদিনের ভালবাসার সম্মান রাখতে পারতাম না।

সে ভাবল, এত সব কি লেখা যায় একটা গাছের কান্ডে! কিন্তু সে যেখানেই গেছে কিছু না কিছু পাথরে অথবা গাছের কাণ্ডে লিখে এসেছে। যেন সে বলতে চেয়েছিল, নন্দিনী, আমার এ ভালবাসা নিরন্তর সুষমা বয়ে বেড়ায়। আমি গাছে গাছে পাতায় পাতায় কত কথা লিখতে চাই। এসব তোমাকে বললে, তুমি হয়তো আমাকে ছেলেমানুষ ভাববে। বলবে, বড় আবেগধর্মী মানুষ আমি। তবু বলি, কেন য. আমি পৃথিবীর যত বন্দরে গেছি, তোমার আমার কথা লিখতে ভালবাসি। তোমার আমার কৈশোরের প্রেম গাথা, অথবা নদীর পাড়ে ছোটা, কাশবনে হারিয়ে যাওয়া, সূর্যাস্তে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফেরা এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তোমাদের বাড়িতে যেদিনটিতে চলে আসি, তোমার সেই সুন্দর চোখের হাসি কেন জানি এখনও আমি ভুলতে পারি না। যা আমি বন্দরে বন্দরে পাথর এবং পাহাড়ের গায়ে লিখে বেড়াচ্ছি। আমার মনে হয় এই যে আমাদের ভালবাসার পৃথিবী, যেখানেই গেছি শুধু মনোরম দৃশ্য, এই যেমন এখন এক মনোরম দৃশ্যের ভিতর আমরা ত্রাউসের কাছে যাচ্ছি। ত্রাউসকে দেখে আমার মনে হয় সেও তেমন এক পৃথিবীর সন্ধানে আছে। তাকে সেই পৃথিবীটা কেউ এনে দিতে পারছে না। সে ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে বিষণ্ণ হয়ে গেলেই আজ হোক কাল হোক সে মরে যাবে। কেন যে সে এমনভাবে মরে যাবে বুঝি না। আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি। এই মাসে ওরা প্রতিদিন দু'জন ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। অন্তত প্রতিদিন না হলেও একদিন খাওয়ানো চাই। কারণ ওদের পূর্বপুরুষরা সকলেই ভারতবর্ষের মাটিতে সমাহিত হয়েছেন।

সে ভাবল, ত্রাউস বড় সুন্দর নাম।

সে দেখল বাসটা ছোট্ট পাথরের পাহাড়, কোনও গাছগাছালি নেই, তার নীচে থেমেছে। চাচা হাতে ইশারা করে ডাকল। সে নামার সময় দেখল, ওরা সুন্দর একটা ছবির মতো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ভদ্রলোক ইমাদুল্লাকে দেখেই ছুটে আসছে। যেন কত আপনার জন কত দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে। পথের ডান পাশে বালিয়াড়ি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সমুদ্রের গর্জন আসছে। নীল রঙের সমুদ্র বালিয়াড়ি পার হলে। আর বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের ছোট্ট পাঁচিল যেন ওপাশের মরুভূমি সদৃশ উপত্যকা থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করছে। বাড়িটা কাঠের। দু'পাশে সবুজ ঘাসের লন এবং নুড়ি বিছানো পথ, চার পাশে গোলাপের কেয়ারি। এত বড় গোলাপ ফুল পুলক কোনও দিন দ্যাখেনি। আর বাসটা রাস্তার ওপর। সাদা রঙের বাস। জানালায় ত্রাউসের মুখ দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধা গাড়িবারান্দায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সবই ছবির মতো। ওপরে আকাশ, নীচে বালিয়াড়ি, সমুদ্র, এবং সবুজ রঙের গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ের নীচে লাল রঙের বাড়ি। ইমাদুল্লা বলল, যিনি আসছেন তাঁর নাম মগো মিলান। ত্রাউসের বাবা হন তিনি।

মিলান হ্যান্ডশেক করল। ওদের আগে আগে হাঁটতে থাকল। সামনের গোল মতো বারান্দায় উঠে বসতেই বৃদ্ধা ইলিয়া ছুটে এলেন। কী খুশি সে! বারান্দায় লাল কার্পেট পাতা। সবুজ রঙের বেতের চেয়ার। ফুলদানিতে সব বিচিত্র ফুলের গাছ। মিলানের সঙ্গে ইমাদুল্লা পুলককে পরিচয় করিয়ে দিল। মিলানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব অমায়িক আর আবেগপ্রবণ। খুব মনে হয় হাসতে পারে। মনেই হয় না মিলানকে দেখে যে তার মেয়ে ত্রাউস সেই নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে ধরা পড়েছে। ইমাদুল্লা মিলানকে ঠিক আগের মতোই খুশি দেখে বলল, তোমার লাইট-হাউজে আমরা একদিন বেড়াতে যাব ভাবছি।

খুব আনন্দের কথা।

তোমার ডিউটি কখন থাকে?

ও ঠিক থাকে না। আমাদের সুবিধা মতো ভাগ করে নিই। মাসখানেকের ছুটিতে আছি।

তোমাদের সেই বড় মিসলটোস লতার গাছটা দেখছি না?

ত্রাউসের মা যে বছর মারা যায় সে বছর গাছটাও মরে গেল।

ত্রাউসকে একবার ডাকো দেখি। দেখি মুখখানা।

একেবারে কথা বলে না।

কথা বলে না কেন?— এবার পুলক প্রশ্ন না করে পারল না।

মিলান কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইমাদুল্লার দিকে তাকাল। ইমাদুল্লা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে পুলকের কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু বলল, তুমি যাও না পুলক, ত্রাউস কী করছে দেখে এসো।

মিলান চায়, মিলান কেন, যারা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত তারাই জানে ইলিয়াদের বংশে এই দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমান্বয়ে পুরুষানুক্রমিক চলে আসছে, সকলেরই যে হয় তা না, তবু অধিকাংশ যুবক-যুবতীকে এমন একটা রোগে পেয়ে বসলে, দিনের পর দিন চুপচাপ, হাসে না, কথা বলে না, প্রাণে বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্য যেন নেই, সব কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে, কখনও এভাবে আত্মহত্যা, কখনও খাওয়া কমে আসে, কখনও এক অজীর্ণ রোগ দেখা দেয় এবং এভাবে এক অতি নাটকীয় মৃত্যু এই ইলিয়া পরিবারের মানুষদের জন্য প্রতীক্ষা করে। সুতরাং মিলান চায়, মিলান কেন, সকলেই চায় এই যে দুঃখটা ত্রাউসকে এক ঘোরতর বিপদে বন্দি করে রেখেছে তা থেকে যেভাবে পারা যায় মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হোক। মিলানেরও সায় ছিল কথাটাতে। পুলকের বাঙালি চেহারা সুন্দর, চুল ব্যাকব্রাশ করা। নাকটা একটু চাপা, চোখের চেয়ে ভ্রু প্রশস্ত। এবং উঁচু লম্বা মানুষ পুলক। চোখ দেখলে মনে হয় সেও কোনও বিষণ্ণতায় ডুবে থাকতে ভালবাসে।

ইলিয়া এসে বলল, পুলক, ভেতরে এসো।

পুলক ভিতরে ঢুকতেই দেখল কাঠের পাটাতন কী মসৃণ। এ ঘরে একটা কালো রঙের কার্পেট দেওয়ালের নীচটা কালো রঙের, ওপরে মেজেন্টা রঙের। দেয়ালে সারি সারি ফোটো এবং উত্তরের দেয়ালে একটা তৈলচিত্র। ইলিয়া ছবিগুলো দেখাচ্ছিল এবং ওদের জন্ম-সাল, মৃত্যু-সাল সম্পর্কে নানারকমের কথা বলছিল। এখান থেকে ইলিয়াকে দেখা যায়। পুলক একবার এই রোগ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইলে ইলিয়া হাত তুলে ঠোঁটে ইশারা করল। বলল, তুমি কিছু বোলো না। অসুখের কথা কিছু বোলো না। এতে ত্রাউস আরও ঘাবড়ে যেতে পারে। ওর যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে আমরা তার সঙ্গে ব্যবহার করি।

অথবা পুলক যেন আরও প্রশ্ন করলে জানতে পারত, এই রোগ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কম বৈঠক হয়নি। এমনকী সুদূর সাইন্টিফিক ইনস্টিটুট অফ ওকলাহামা অন মেডিসিন এই পারিবারিক রোগ সম্পর্কে রিসার্চ করে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। সুতরাং এই বংশ সবই ভবিতব্য ভেবে এখন ত্রাউসের মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে।

অথচ ত্রাউস কী সুন্দর! কী চোখ তার! হাত কী মসৃণ! এবং চুপচাপ থাকে বলেই শান্ত আর বড় স্থির মনে হয়। এভাবে বছর পার হয়ে যাবে। নতুন বছর আসবে, আপেলের বাগানে আবার লোকজন ফিরে আসবে। নতুন পাতা গজাবে গাছে গাছে, কী বিচিত্র বর্ণের সব ফুল ফুটবে পাহাড়ি সব উপত্যকায় এবং ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উপত্যকার ওপর উড়ে উড়ে সমুদ্রের সব ছোট ছোট দ্বীপে হারিয়ে যাবে। ত্রাউস জানালায় বসে সব দেখবে। উপত্যকার ওপাশে সূর্য ওঠা দেখবে। সূর্যাস্ত দেখবে সমুদ্রে সমুদ্রপাখিদের কলরব শুনতে শুনতে ত্রাউস কেমন নিজের মনের ভিতর ডুবে যাবে। মায়ের মৃত্যুর দিন মনে পড়বে ত্রাউসের। মাও ঠিক এমনি এক জানালায় বসে থাকতেন। সারাদিন তার মুখে অদ্ভুত এক অলৌকিক প্রচ্ছন্ন হাসি ভেসে থাকত ঠোঁটে। যেন এই যে পৃথিবী দেখছ, বড় অনিত্য এবং এই যে গাছ এবং এই যে গাছ ফুল পাখি দেখছ বড় কাব্যময় অথচ সবই কত কম সময়ে পৃথিবী থেকে ফুরিয়ে যাবে। এবং এইভাবে দেখতে দেখতে ত্রাউসের মনে হত মায়ের মৃত্যুদিনটি। মা চুপচাপ শুয়ে আছেন যেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা মুখ। পা দুটো দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য রকমের সাদা মনে হয়। সেও মায়ের মতো শুয়ে থাকবে। পা দুটো আশ্চর্য রকমের সাদা দেখাবে।

আর তখন পুলক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, ত্রাউস!

ত্রাউস তাকাল না। সে যেমন চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে সমুদ্র অথবা বালিয়াড়ি দেখছিল, তেমনি অপলকে দেখছে।

সে বলল, তুমি কী দেখছ বালিয়াড়িতে?

ত্রাউস চুপচাপ। নিঃশব্দ।

সে বলল, তুমি কখনও দূর সমুদ্রে গেছ?

ত্রাউস হাতটা এনে এবার কোলের কাছে রাখল।

সে বলল, জানো ব্রাউস, আমরা পৃথিবীর সব সমুদ্র দেখেছি।

ব্রাউস নিজের হাত দেখল এবার। যেন বিরক্ত হচ্ছে পুলকের কথায়।

সে আবার বলল, ব্রাউস, একটা অদ্ভুত পাথরের মূর্তি আছে না তোমাদের এখানে?

ব্রাউস নিজের ফ্রকটা টেনে দিল। ফুল ফল আঁকা ফ্রক। ইলিয়া ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। অন্দিকের ফায়াব প্লেসে আগুন জ্বলছিল। ইমাদুল্লা এবং মিলান বারান্দায় বসে থাকতে পারেনি। কাচে মোড়া বারান্দা এবং চারপাশটা কাচ দিয়ে ঢাকা। ঠান্ডা হাওয়া এতটুকু ঢুকতে পারছে না। ঘরে ঘরে ফায়াব প্লেস। আজ সব ক'টা ফায়ার প্লেসেই আগুন দেওয়া হয়েছে। লোকজন আবও আসবে। ইলিযা কিচেনে এখন কী সব করছে। টিন-ফুড খোলাখুলি হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে ডুনেদিন থেকে এসেছে ব্রাউসের পিসি। সে এখন ইলিয়াকে কিচেনে সাহায্য করছে।

পুলক ব্রাউসের পাশে এবার একটা চেয়ার টেনে বসল। সে বলল, জানো ব্রাউস, আমাদের দেশটা ঠিক তোমাদের উল্টো। এখন তোমাদের শীতকাল। আর আমাদের দেশে এখন গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকাল।

পুলকেব ভাল লাগছে কথা বলতে। কারণ এই মাত্র ব্রাউস ওর দিকে একবাবের জন্য চোখ তুলে তাকিয়েছে। এবং সেই অলৌকিক প্রচ্ছন্ন হাসি ঠোঁটে। সকলে যখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত, চিন্তান্বিত, তখন ওর ঠোঁটে এই প্রচ্ছন্ন হাসি প্রায় জীবন সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টাব অথবা তামাশাব সামিল।

পুলক বলল, পিছনে যে পাহাড়টা আছে, ওর ওপাশে কী আছে, বন, মাঠ, না তৃণভূমি?

ব্রাউস এবাব উঠে দাঁড়াল।

পুলক বলল, তুমি কি আমাকে বেহায়া ভাবছ!

ব্রাউস কেমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

তা না হলে উঠে যাচ্ছ কেন?

আশ্চর্য ব্রাউস নিঃশব্দে ওর পাশে বসে পড়ল। আর আশ্চর্য পুলক এখন মেয়েটির সঙ্গে এত কথা বলছে কী করে! এত কথা তাব বলতে ভাল লাগছে কেন! সে সহসা কী ভেবে, ইলিয়া যখন যাচ্ছিল, সে বলে ফেলল, ব্রাউস বড় ভাল মেয়ে। ওর কোনও অসুখ নেই।

ইলিযা এই আগন্তুকের কথা শুনে সামান্য না হেসে পারল না। পুলককে সে ইশাবায় কাছে ডেকে নিয়ে গেল। যেখানে ইমাদুল্লা বসেছিল, সেখানে এসে সে ফিসফিস কবে বলল, ওর অসুখেব কথা ওব সামনে আবার বলছ কেন?

পুলক কেমন বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন এক সরল তরুণী, শান্ত স্থির এবং ধীর মেয়ে চুপচাপ আছে বলেই একটা অসুখ হয়েছে ভাবতে হবে, এ কেমন কথা! সে কিছু কৌতুক জানত। কারণ সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে নন্দিনীর বাবার কাছে মানুষ হয়েছে। নন্দিনীর মা কোনওদিন পুলককে ভাল চোখে দ্যাখেনি। সে বড় অবহেলায় মানুষ হয়েছে। নন্দিনীই ওকে যা কিছু মর্যাদা দিয়েছিল এবং সে কত বড় কৌতুক জানে, বিয়ের সময় তা টের পাওয়া গেল। অথবা যখন নন্দিতার বাবা সম্বন্ধ দেখতে গেল পুলককে নিয়ে, পুলকের ব্যবহারে, সেই এক কৌতুককর ব্যবহার, যা দেখে নন্দিনীর শাশুড়ি পর্যন্ত হেসে ফেলেছিল। পুলক নানারকম কৌতুকে অথবা জাদুতে বরযাত্রীদের হাসাতে হাসাতে নিজের দুঃখ চেপে রেখেছিল। এখানেও সে এক সামান্য মানুষ, অসামান্য হাত পা ছুঁড়ে, নানারকমের জাদু দেখিয়ে একবাব যদি মেয়েটাকে বালিয়াড়িতে টেনে নিয়ে যেতে পারত। সে বলল, ইমাদুল্লা চাচা, ওর মায়ের কী বোগ হয়েছিল?

মিলান এখন কাছে নেই। সে বাজারে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ইমাদুল্লা এবং পুলক স্রেফ বাংলায় কথা বলছে। ইমাদুল্লা বলল, ওর মা'র বিষণ্ণতা দেখা দেয়, ক্রমে হাত পা শুকিয়ে আসে। এবং রাতে বহস্যজনক মৃত্যু ঘটে।

ওব বাবার সে অসুখ হতে পারে?

ওব বাবার হবে না। কারণ ইলিয়ার বংশের সে কেউ নয়।

তা হলে ব্রাউসের মামা অথবা ইলিয়ার বাবা, কাকা কিংবা তাদের ঠাকুর্দা এমন রোগে মরেছে?

সবাই যে মরে তা ঠিক নয়। অধিকাংশ এভাবে মারা যায়।

কোনও প্রি-কশান নেওয়া যায় না?

ওদের হয়ে অনেক বিশেষজ্ঞরা ভাবছে।

কেন এটা হয়?

কী করে বলব? পাগলের বংশে কেউ না কেউ পাগল যেমন হয়, আমার মনে হয় এও তেমনি।

ত্রাউসের কিন্তু চোখ-মুখ বলছে সে ভাল আছে।

তুমি ডাক্তারি করতে কবে শিখলে?

আমার বিশ্বাস কবতে ইচ্ছা করছে না ত্রাউস মরে যাবে।

বিশ্বাস না হলে, থেকে যাও। চোখের ওপব দেখতে পাবে কী ভাবে মরে যাচ্ছে ত্রাউস।

ঠাট্টা রাখো চাচা।

পুলক কেমন শক্ত গলায় কথাটা বলে ফেলল।

কিন্তু ইমাদুল্লা ওর এই ধমকে কান দিল না। সে হা হা করে হেসে পরিবেশটাকে একটু হালকা করতে চাইল। তা না হলে কী করে প্রমাণ পাবে যে ত্রাউসের অসুখ হয়েছে।

পুলক আর কথা বলতে পাবল না। সে কাচের জানালায় মুখ রাখল। দূরে সমুদ্রের প্রবল ঢেউ বালিয়াড়িতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ওর ভিতরটা কেন জানি হু হু করে উঠল।

সে বলল, কী করে ভাল করা যায়?

কেউ যদি ওকে সরল কথায় আবার জীবনেব ভিতর ফিরিয়ে আনতে পাবে।

তার মানে?

তার মানে, যতদিন আছে বেঁচে থাকো ভালভাবে। হাসো, গাও, ছুটে বেড়াও। সমুদ্র দেখলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং সাঁতাব কেটে নীল আকাশের নীচে ঝিনুকের মুক্তো খোঁজো।

ঠিক করে বুঝিয়ে বলো।

জীবনের বড কাজ হচ্ছে মুক্তো খোঁজা। সেটা পেতেও পারো, আবার সারা জীবন খোঁজা বৃথাও হতে পারে। অথচ এই খোঁজার ভিতর একটা বাঁচার রহস্য আছে। ত্রাউসের কাছে সে রহস্যটা মরে গেছে।

কেন এমন হয়?

কোনও না কোনও ভাবে সে জেনেছে, এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এর থেকে ওর নিস্তার নেই। ওর মা গেছে, মায়ের মাসি গেছে, দাদু গেছে ঠিক এই একটা রোগে। তবে রোগটার আক্রমণ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপর বেশি। এ পরিবারের মেয়েদের সেজন্য সহজে কেউ বিয়ে করতে চায় না। যৌবন ভালভাবে আসতে না আসতেই ওরা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ইমাদুল্লা একটু থেমে বলল, এটা বংশগত রোগ। এই এক মেলানকোলিয়া, কী যে ভীষণ মেলানকোলিয়া এদেব পরিবারের কোনও কোনও মানুষকে পেয়ে বসে ভাবা যায় না।

এমন সময় ত্রাউসের বাবা ফিরে এল। সঙ্গে যেন কেউ আছে। বোধহয় ওর লাইট-হাউজের কোনও কর্মী। ওরা এসেই মুরগি নামিয়ে দিল চার-পাঁচটা। সব ছোলা মুরগি। বড় বড। ছোলা বলে মুরগি না টার্কি বোঝা যায় না দূর থেকে। কাছে এলে ইমাদুল্লা বুঝতে পারল, ওগুলো মুরগি। সে নিজে উঠে গিয়ে ওদের কাজে হাত লাগাল। এবং এভাবে কত সহজে আপন হওয়া যায়। ইমাদুল্লা বেশ নিজের মানুষের মতো আজ ওদের ভোজের নিমন্ত্রণে দেখাশোনা করতে লাগল, পুলক একা একা কী ভাবতে ভাবতে ওদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল বার বার ত্রাউসের কাছে ফিরে যেতে কিন্তু সে এ সময় কেন জানি বেশি সময় ত্রাউসের কাছে বসে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়, এমন ভাবল। কেউ কিছু মনে করতে পারে। একমাত্র ইমাদুল্লাই জানে এ পরিবার সম্পর্কে। সে গত সফরে অনেকদিন ত্রাউসের বাবার সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। ওদের একটা খামারবাড়ি আছে, সেখানে নানা রকম পশুপালন হয়, নানা রকমের ফলের গাছ আছে, আর বড় বড় পুকুরে নানা রকমের লিলি ফুল ফুটে থাকে। ইমাদুল্লা এত বড় খামার দেখে লোভে কিছুদিন জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে থেকে গেল। এবং প্রায় এই পরিবারের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেল। সুতরাং সে, কী রান্না হচ্ছে, বাড়ির পেছনে যেসব পারসিমন গাছ ছিল তার সুমিষ্ট গন্ধ কেমন বাতাসে ভেসে বেডাচ্ছে, সে যে একটা গাভীর বাচ্চা হতে দেখে

গিয়েছিল এবং বাচ্চাটার নাম সে তার দেশের একটা নদীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেই গাভী এখন কোথায়, ক'টা তার বাচ্চা, কত পরিমাণ দুধ দেয়, না কি কিলখানাতে তারা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে, কারণ এতদিনের সেই বাচ্চা গাভী হয়ে প্রায় বুড়ো হতে চলল, সে বোধহয় এখন বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ত্রাউসের বাবার কাছে সেসব খবরও নিচ্ছে। আর এ সময়েই ভেড়ার মাংস রোস্ট হচ্ছে সে বুঝতে পারছে। কারণ এই রোস্টের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সে এবার পিছনের দিকে তাকাল। দেখল তেমনই স্থির এবং অচঞ্চল ত্রাউস। ত্রাউসকে কেন যে সঙ্গে করে গতরাতে জাহাজে নিয়ে গিয়েছিল ইলিয়া, সে বুঝতে পারল না।

আর তখন ইলিয়া বারান্দায় এসে এমন ঠান্ডায় ওভারকোটের পকেটে হাত রেখে সদরে পুলককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝল, পুলক এখানে হোমলি ফিল করছে না। ইলিয়ার এটা ভাল লাগল না। সে সাধারণত অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য নানা রকম ইনডোর গেমের বাবস্থা করে রাখে। যেমন ইমদুল্লা খেয়ে-দেয়ে তাস খেলতে বসবে। যাদের তাস অথবা দাবা পছন্দ নয়, তাদের জন্য নানা রকমের লাল নীল রাবারের রিং এবং ছোট্ট একটা কাঠের স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডে যে যতবার রিং গলাতে পারবে ততবার সে একটা করে পেনি পাবে। আর পেনিগুলো পর পর সাজানো থাকে। ওপরের পেনি থেকে নিতে হবে। যদি পেনিতে ষষ্ঠ জর্জের মাথা থাকে তবে সে আরও দশটা পেনি পাবে, যদি পেনিতে আবু পাহাড়ের ছবি থাকে তবে তাকে দশটা পেনি ঘুরিয়ে দিতে হবে। এই এক খেলায় বেশ মজা আছে। সমুদ্র থেকে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাবে। গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা দুলবে। শীতের সূর্য উঠতে উঠতে আকাশের অন্য প্রান্তে হারিয়ে যাবে। মেয়ে এবং ছেলেদের, এই যারা সদ্য যুবক হচ্ছে অথবা যুবতী হবে, তাদের কাছে খেলাটা খুব প্রিয়। কিন্তু এখানে পুলকের সমবয়সি কেউ নেই। ত্রাউস আছে। সে তো চুপচাপ থাকে। পুলক ইচ্ছা করলে ত্রাউসের সঙ্গে গল্প করতে পারে। ত্রাউস যে একেবারে কথা বলে না, এখনও তেমন হয়নি। সময় সময় ত্রাউস হাসে পর্যন্ত। সেটা মুহূর্তের জন্য। এবং ইলিয়া যেমন ত্রাউসকে পারিবারিক উৎসবে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে তেমনি পুলককে ত্রাউসের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে ত্রাউস সামান্য সময় হয়তো মনে মনে খুশি থাকবে। তা ছাড়া আর কী করা! ত্রাউসের এই ব্যবহারে কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই। কার দায় পড়েছে একা একা নিশিদিন বক বক করে যাবে, ত্রাউস কোনও কথা বলতে চাইবে না। ওরা মাঝে মাঝে ত্রাউসকে নিয়ে সুদূর তৃণাঞ্চলে চলে যায়। সেখানে সব সুন্দর সুন্দর পাখি দক্ষিণ-সমুদ্র থেকে উড়ে আসে ডিম পাড়বে বলে। তৃণভূমির পাশে পাশে ঘর বাঁধে। ত্রাউসকে একবার সেই সব পাখির ডিম অন্বেষণে তারা নিয়ে গিয়েছিল। আর জাতীয় উৎসবে, মেলায়, জাদুঘরে এবং কার্নিভেলে ইলিয়া এই ত্রাউসকে নিয়ে ঘুরেছে। কিন্তু ত্রাউস যে কে সেই! সে এবার পুলকের সামনে এসে দাঁড়াতেই পুলক সামান্য স্বভাবসুলভ হাসি হাসল।

তুমি ভিতরে এসে বসো। এই ঝোড়ো হাওয়া ভাল না। তোমার ভীষণ ঠান্ডা লেগে যাবে।

পুলক ইলিয়ার সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

তুমি যদি কিছু মনে না করো—বলে ইলিয়া পুলকের মুখের দিকে তাকাল।

পুলক আর হাঁটল না। সে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তুমি যদি ত্রাউসের সঙ্গে বসে গল্প করতে—

পুলক কী বলবে ভেবে পেল না। সে আবার চুপচাপ ওভারকোটের কলার টেনে হাঁটতে থাকল।

জানি তোমার একা বক বক করতে ভাল লাগবে না।

না না, ভাল লাগবে।— সে সহসা কেমন চিৎকার করে কথাটা বলল।

আমাদের কথা, পুলক, ফুরিয়ে গেছে! যা যা দেখেছি, যা যা জানি জীবন সম্পর্কে, সব ওকে বলে দেখেছি, সে আগের মতোই আছে। তুমি জাহাজি মানুষ। কত দেশ এবং মানুষের গল্প তুমি জানো। যদি এসব বলে সামান্য সময় ওকে অন্যমনস্ক রাখতে পারো। যতটা সময় পারবে, ততটা সময় সে বাঁচবে।— বলে ইলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যি সে জাহাজি মানুষ। পাঁচ বছরে সে বিচিত্র দ্বীপ, পাহাড়, সমুদ্র এবং বিভিন্ন বন্দর দেখেছে। বিচিত্র দেশের নরনারী দেখেছে। তাদের কাম ভালবাসা প্রেম দেখেছে। কোনও শুষ্ক মরুভূমিতে একটা অদ্ভুত ফার্ন গাছ দেখেছে। এবং সেখানে হলুদ রঙের ফুল দেখেছে। সেই ক্যাকটাস জাতীয় গাছে বিরল

হলুদ রঙের ফুলের মতো এই ত্রাউস। সেই ফুল চুপচাপ পৃথিবী থেকে ঝরে যাবে, তার স্বাদ আহ্লাদ কেউ চেটেপুটে খাবে না, ভাবতেই ওর কেন জানি নন্দিনীর মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে। এখন সেই পৃথিবীতে নন্দিনী তার স্বামীকে জানালার পাশে দাঁড় করিয়ে নিশ্চয়ই চুমু খাচ্ছে।

পুলক ধীরে ধীরে ত্রাউসের পাশে বসার সময় বলল, মাদাম ইলিয়া, একটা কথা বললে কিছু মনে করবেন না?

না।

ত্রাউসকে ফাদার কখন বাইবেল শোনাতে আসেন?

সন্ধ্যার সময়।

সময়টা একটু পাল্টানো যায় না?

কেন বলো তো।

এইসব কিছু একটু বদলে দেখুন না। আমি ভেবেছি আজ সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে বেলাভূমিতে একটু বসব।

সে তো হবে না।

পুলক কেমন যেন বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাবল। সে আর কিছু বলছে না দেখে ইলিয়া এবার বলল, বিকালে তুমি আর ত্রাউস বালিয়াড়িতে গিয়ে বসতে পারো। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

পুলক বলল, একটা কথা বললে আপনি কিছু মনে করবেন না?

কী কথা?— বলে ইলিয়া ময়দার হাতটা খুঁটতে থাকল।

আপনি লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিলেন জাহাজে। ত্রাউস কি ভয় পায়, সামান্য অন্ধকারকে ভয় পায়?

আবার ইলিয়া ওকে চোখে ইশারা করল। যেন বলার ইচ্ছা, এখানে এসব কথা নয়। দক্ষিণের দিকের ঘরটায় এসো, সব বলি।

এখানেই আপত্তি পুলকের। সব কিছু বদলে না দিতে পারলে হবে না। আর পুলক কেমন কিছুটা একরোখা হয়ে গেল। সে যেন এই মেয়ের যাবতীয় দুঃখ সারিয়ে তুলবে। কেন এমন হয় মানুষের মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছা হয় পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ মুছে দিতে। সে ত্রাউসের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ত্রাউস কিন্তু আমার কথা শুনে একবার হেসেছিল মাদাম।

পুলক এত বেশি ভালমানুষ যে ইলিয়া ওর এমন কথা শুনে না হেসে থাকতে পারল না। সামান্য একটু হেসেছে বলেই গোটা মেলানকোলিয়া ওর সেরে যাবে, আবার হাসি খুশি, ঠিক সেই বছর দুই আগের ত্রাউস হয়ে যাবে, এমন ভাবছে পুলক।

সে বলল, তুমি এসো। জাহাজ থেকে সময় পেলেই এসো। যতক্ষণ খুশি গল্প করবে ত্রাউসের সঙ্গে

মনে মনে বলল, আমি ত্রাউসের সেই হাসিটুকু লুকিয়ে দেখেছি। দীর্ঘদিন ত্রাউস যেন এভাবে হাসেনি। তোমার চোখে চোখ রাখলে সে যদি হাসে, সে যদি স্বাভাবিক হয়, তুমি ভারতবর্ষের মানুষ জাদুকরের দেশ ওটা, যদি কোনও অলৌকিক ক্রিয়ায় তুমি ওকে ভাল করতে পারো... যেমন মানুষ সমুদ্রে ডুবে গেলে কুটোগাছটি ধরার জন্য ব্যাকুল হয়, এই ঝড়ের দরিয়াতে ইলিয়া তেমনি আকুল।

সে বলল, আমি যাচ্ছি পুলক। ত্রাউস, এ আমাদের আপনার লোক। তোমার পূর্বপুরুষেরা সবাই ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে তারা এখনও আছেন। সেই দেশ থেকে এই মানুষ সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে এসেছে। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

পুলক এখন ত্রাউসকে দেখছে না। বৃদ্ধার ছলছল দুটো চোখ দেখে মনে মনে কেমন সে নিজেই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধার সেই লণ্ঠন হাতে ডেকের ওপর মুখখানা ওর চোখে ভেসে উঠল। লণ্ঠন হাতে তিনি গিয়েছিলেন ত্রাউস ভয় পায় বলে। সামান্য অন্ধকারে পড়ে গেলেই ত্রাউস চিৎকার করে ওঠে অন্ধকারটাকে মনে হয় ত্রাউসের মৃত্যু। সেজন্য সব সময় চারপাশে নানারকমের বাতি জ্বালানো থাকে এ বাড়ির চারপাশে।

রাতে সে বুঝতে পারল, এ বাড়ির যেদিকে তাকানো যায়, সর্বত্র নানা রঙের আলোর ডুম জ্বলছে ইলিয়ার পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর। সেসব বিক্রি করে এখানে একটা বড় খামার করেছে। হাজার পাঁচেক

ভেড়ার একটা পাল আছে। কয়েক হাজার বিঘা ওদের তৃণভূমি আছে। সব আয় যেন এখন এই মেয়েকে রক্ষা করার জন্য। কেবল আলো আর আলো। যে এত আলো ভালবাসে, যার এত আলোর শখ, সে কেন অন্ধকারের ভয়ে মরে যাবে?

রাতের বেলা সে জাহাজে ফিরে যাবার আগে ব্রাউসের কাছে গিয়ে বলল, আমরা যাচ্ছি ব্রাউস। কাল বিকেলে আবার আসব।

ব্রাউস মাথা নিচু করে রেখেছিল। সে পুলককে মুখ না তুলেই বলল, তোমার সমুদ্রে কোনও সোনালি দ্বীপ নেই?

আছে।

কিন্তু আর কোনও কথা নেই ব্রাউসের মুখে। ব্রাউসকে চুপচাপ দেখে পুলকই বলল, তুমি সেই দ্বীপে যাবে নাকি?

ব্রাউস আর জবাব দিল না। পুলক বার বার চেষ্টা করল জবাব পেতে কিন্তু কিছুতেই কোনও জবাব পেল না। যেন চাঁদ মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আবার মেঘের ভিতর ডুব দিয়েছে।

চার

জাহাজে ফিরে যখন পুলক নিজের ফোকশালে ফিরে যাচ্ছিল, যখন জাহাজে প্রায় সকলেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, ইমাদুল্লা দরজার তালা খুলছে, তখন মনে হল কেউ তাকে ডাকছে। পুলক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ইমাদুল্লা তালা খুলতে খুলতে ওকে ডাকছে। এতক্ষণ ওরা দু'জন একসঙ্গে ছিল, ওরা এক বাসে ফিরে এসেছে। নানা রকমের কথা হয়েছে দু'জনার ভিতর, তারপরও কী কথা থাকতে পারে ভেবে পেল না। সে সিঁড়ি ভেঙে ইমাদুল্লার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ইমাদুল্লা প্রশ্ন করল, খুব ঘুম পেয়েছে?

পুলক বলল, তা পেয়েছে।

তবে যাও। কাল বলব।

খুব জরুরি কিছু বলবে?

না। জরুরি তেমন কথা কিছু নয়।

তবে?

যাও না এখন। কাল বলব।

এখন শুনে গেলে তোমার আপত্তি আছে চাচা?

আপত্তি থাকবে কেন? তবে বোসো। আমি ওপর থেকে আসছি।— বলে ইমাদুল্লা শরীর থেকে ওভারকোট এবং মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে বাংকে ফেলে দিল। তারপর গট গট করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। মানুষটা যে বুড়ো হয়েছে, চলায় বলায় কিছুতেই তা ধরতে দেবে না। একেবারে তাজা মানুষের মতো সব সময় ব্যবহার।

পুলক আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এমন কী জরুরি কথা যা বলতে বেশ সময় নেবে। কারণ এখন ইমাদুল্লা বাথরুমে গেছে। সে নীচ থেকেই তা টের পেয়েছে। দরজার খুটখাট শব্দ হচ্ছিল। ঝোড়ো হাওয়া যে ক্রমে বাড়ছে বোঝা যাচ্ছিল। সে চুপচাপ পোর্ট-হোলে মুখ রেখে বসে দেখল, ইমাদুল্লা দরজা ঠেলে ঢুকছে। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে বলছে, ব্রাউস তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?

বলেছে।

কী বলেছে?

বলেছে সমুদ্রে কোথায় সোনালি দ্বীপ আছে?

কথাটা শুনে তুমি কী ভেবেছ?

কী আবার ভাবব! একটা কথা বলেই ও চুপচাপ। বললাম, ব্রাউস, তুমি যাবে সোনালি দ্বীপে? আমি নিয়ে যাব।

তুমি খুব বোকা আছ। তুমি ওর কথা থেকে বুঝি ভেবেছ সে সোনালি দ্বীপে যেতে চায়।

আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছে।

যদি নিয়ে যেতে পারো ভাল।

কিন্তু তুমি আমাকে ডাকলে কেন? কী বলবে বলছিলে?

ইলিয়া বলেছে, ত্রাউস তোমার সঙ্গে কথা বলছিল। কী কথা বলেছে তারা শুনতে পায়নি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, কী এমন কথা বলেছে।

ও, এজন্য ডেকেছিলে!

হুঁ। তবে ওরা তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল।

পুলক হাঁ করে তাকিয়ে আছে ইমাদুল্লার দিকে। সে একটু বেশি খেয়েছে আজ। রাতে সামান্য ককটেল ছিল। পুলক এসব পান করে না। ওর অভ্যাস নেই। শীতের জন্য মাঝে মাঝে সে যেটুকু খায়, তা প্রায় ওষুধের মতো। সুতরাং ওরা যখন ককটেল পার্টিতে মত্ত ছিল, তখন পুলক কাচের জানালায় ত্রাউসের সামনে বসে ওর সুন্দর চোখের মণিকোঠায় অথবা হৃদয়ের গভীরে কী ব্যঞ্জনা আছে ধরার চেষ্টা করছিল।

ইমাদুল্লা দেখল, পুলক ওর সম্পর্কে ইলিয়া অথবা মিলান কী জানতে চাইছে তার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করছে না। সুতরাং সে নিজেই বলতে থাকল, বললাম খুব ভাল ছেলে। বন্দর এলে জাহাজিদের যে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে সেটা ওর একেবারেই নেই। খুব শান্ত প্রকৃতির ছেলে।

আর কিছু বলোনি।

বলেছি, বন্দর এলেই সে বিকালে বাসে শহরের চারপাশটা দেখে বেড়ায়। রবিবার অথবা কোনও ছুটির দিন পেলে সে বাসে কবে দূরে দূরে চলে যায়। বন অরণ্য এবং নির্জন উপত্যকায় সে চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসে।

বাবা! তুমি দেখছি চাচা আমাকে একজন কবি করে ফেলবে। ওরা বলল না, ছোঁড়াটার মাথায় কবিতার বাতিক আছে কি না!

তা বলেনি। তবে আমিই বলেছি, সে জাহাজে বসে পালিয়ে পালিয়ে কবিতা লেখে।

এ্যাঁ! তুমি বলছ কী, আমি কবে কবিতা লিখলাম?

মিথ্যা বলছ কেন পুলক? আমি সব জানি। তোমার অসুখের সময় তোমার সুটকেস খুলে কিছু টাকা বের করে দিতে হয়েছিল। তুমি তখন বাংক থেকে উঠতে পর্যন্ত পারতে না। আমি সব দেখেছি।

পুলক বলল, কী করব চাচা, একঘেয়ে এই জাহাজ একেবারে ভাল লাগে না। তাই পালিয়ে পালিয়ে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

এ সবের জন্য আমি তোমায় ডাকিনি। আমার কথা শুনে ওদের তোমার ওপর অদ্ভুত একটা বিশ্বাস এসে গেছে। ছুটি হলে তুমি ওখানে চলে যেয়ো। ত্রাউসের সঙ্গে গল্প করলে ইলিয়া এবং ত্রাউসের বাবা খুশি হবে।

পুলক ইমাদুল্লার ঘর থেকে বের হয়ে এল। দু'পাশেই ফোকশাল। মাঝখানে সিঁড়ি নেমে এসেছে টুইন-ডেক থেকে। এবং একটা সিঁড়ি আপার-ডেক পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন ওর ঘুম আসবে না। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে। নতুবা ওর এখন চুপচাপ বাংকে শুয়ে না থেকে রেলিং-এ দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় এবং বাতিঘরের আলো দেখার ইচ্ছা। কিন্তু প্রবল ঠান্ডার জন্য তার আর ওপরে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে নিজের ফোকশালে নেমে গেল। সেখানে ডান দিকের বাংকে গঙ্গা, নীচে সূর্য এবং ওপরের বাংকে সে থাকে। এই শীতে এখন কম্বলের নীচে ঢুকে যেতে পারলে বড় মনোরম। অথচ কেন জানি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নন্দিনীকে আজ একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

পাঁচ বছর আগে নন্দিনীর (ঠিক বিয়ের পর পরই) স্বামী একটা চিঠি দিয়েছিল পুলককে। চিঠিটা ওদের হানিমুনের চিঠি। সে লিখেছিল, দাদা হানিমুনটা যে কোথায় করি, একবার ভেবেছি পুরীতে চলে যাব। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে আমি আর নন্দিনী। নন্দিনীর ইচ্ছা সে খুব ছুটবে বালিয়াড়িতে। আমি তার পিছু নেব। নন্দিনী যখন ছুটে ছুটে আর পারবে না, খপ করে ওর আঁচলটা ধরে ফেলব এবং সে বালিয়াড়িতে পড়ে যাবে, কী মজাটাই না হবে। অবশ্য আমার ইচ্ছা কোনও পাহাড়ে যাই। দূরে, যেসব

পাহাড়ে নির্জন কোনও কুঠিবাড়ি আছে এবং নানাবকমেব গাছপালা আছে, কাচেব ঘব আছে আব নানাবকমেব ক্যাকটাস আছে, সাবাদিন আমি এবং নন্দিনী খুশিমতো কেবল গাছপালাব ভিতব ছুটব।

পুলক অবশ্য এই ছোটাব ভিতব নন্দিনীব উলঙ্গ শবীব প্রত্যক্ষ কবত। যেন তাব ভালবাসাব পোষা পাখিকে শিকাবী বেড়াল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সে তখন আব স্থিব থাকতে পাবত না। নন্দিনী, নন্দিনী, বিযেব পব আমি কেমন আছি একটা চিঠি দিযে জানলে না।

নন্দিনীব বব অবশ্য আবও কিছু লিখেছিল। হানিমুনেব জন্য ওব কোনও সোনালি যব অথবা গমখেতেব কথাও মনে হয়েছে। কোনও সমতলভূমিতে কোনও পাহাড়ি উপত্যকাতে যেখানে যব গম হয় সেখানে চাষি মানুষেবা পবিশ্রম শেষে ঘবে ফিবে আসে, কুপি জ্বেলে বউয়েব মুখ দ্যাখে এবং ছোট্ট নদীতে কোনও নৌকা গেলে তাব যে গান দূব থেকে ভেসে আসে, তেমন এক নীবব নিভৃত পল্লিতে স নন্দিনীকে নিযে হানিমুনেব জন্য জায়গা নির্বাচন কবতে চায়।

চিঠি পাওযাব পব পুলক দুদিন ঘুমোতে পাবেনি। সে ছটফট কবেছে। সে যে কত মহিমান্বিত জীবন নিযে বেঁচে আছে তা দেখাবাব জন্যই যেন চিঠিব জবাব দিযেছিল শেষ পর্যন্ত। চিঠিতে সেই নন্দিনীব বব দায়সাবা ভাবে লিখেছিল। আশা কবি নন্দিনী ভাল আছে।

অথচ সে চিঠিতে সে যে কিছু লিখতে চেয়েছিল কিন্তু কী যেন এক অভিমান ওকে নিয়ত কুবে কুবে খাচ্ছে, যাব জন্য যেন-তেন প্রকাবে চিঠিব জবাব দেওয়া। নন্দিনী প্রায় সমবযসি, কিছু সে বড, এই ছব দুই বয়সেব বড হবে। নন্দিনীব কোনও ভাই-বোন নেই। সংসাবে এই আত্মীয়টিই ওব যা কিছু দাবদাবেব অংশীদাব ছিল। সে কত কিছু লিখতে পাবত, নতুন জীবন কেমন লাগছে ওব কথা সুসময়ে মনে হয় কি না কিন্তু সে কিছু লেখেনি। কেবল লিখেছে, যেখানেই যাবেন হানিমুনে নন্দিনীব শবীবেব প্রতি যত্ন নেবেন।

তাবপবই সে কেমন উদাসীন হযে গেল। মাঝে মাঝে কোনও বেল স্টেশনে দাঁড়ালে মনে হত নন্দিনী একা চলে আসবে, দবজায সে দাঁড়িযে থাকবে এবং পুলককে দেখলেই ছুটে এসে বলবে তুমি এমনভাবে ছেড়ে দিলে আমাকে, আমাব কিছু ভাল লাগছে না। আমি চলে এসেছি পালিযে।

কত বাত সে না ঘুমিযে জানালায বসে বযেছে। যেন দূবেব মাঠে কেউ তাব জন্য ছুটে আসবে। সে হাপাতে হাঁপাতে বলবে, তোমাব মতো নিষ্ঠুব মানুষ বাপু আমি দেখিনি। তুমি কী কবে আমাকে দেখে আছ। আমিও পাবলাম না বাপু। চলে এলাম পালিয়ে।

এভাবে কতদিন, কতবাত বিনিদ্র কাটলে ওব কবিতা লিখতে ইচ্ছা হত। কত কাল সে একা জানালায বসে কাটিযে দিযেছে, সে বৃষ্টিব বাতে হাতে জল ধবত। এবং কল্পনায সেই ঠান্ডা জল দুহাতে মেখে দিত নন্দিনীব গালে। মনে হত খুব ঝড় উঠেছে। আকাশ কালো মেঘে উথাল-পাথাল কবছে। সে এবং নন্দিনী একটা ফাঁকা মাঠে হাত ধবাধবি কবে দাঁড়িযে আছে। ঝড়েব দাপটে নন্দিনীব চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে। এবং পুলকেব কোঁচা লুটিযে পড়তে পড়তে ঝড় আবাব তুলে নিচ্ছে ওপবে। ঘন ঝাপসা এবং আধা আলো-অন্ধকাবে ওবা প্রবল বর্ষণে ভিজে ভিজে মাঠময ঘুবে বেড়াচ্ছে।

কোনও কোনও দিন চুপচাপ বসে থাকলে জানলায বাখা মাথাটা কেমন ফাকা মনে হত ওব। অসহ্য লাগত সব কিছু। এবং সে ছটফট কবত ভিতবে ভিতবে। ছুটে যাবাব ইচ্ছা হত। ওকে জোব কবে ধবে এনে কী যেন কবাব ইচ্ছা হত। নন্দিনীব বব ওব চেয়ে কত বড। প্রায দশ বছবেব। নন্দিনীব বব তবু পুলককে দাদা বলে ডাকে। পুলক এসব ভেবে একদিন হা হা কবে হেসেছিল জানালায বসে। নন্দিনী আব কোনওদিন আব তাব মেসবাড়িতে দেখা কবতে এল না।

তাবপব তাব এই নিরুদ্দেশে চলে আসা। জাহাজে জাহাজে কাজ। তাব যা বিদ্যা সে জাহাজে মোটামুটি একটা কেবানিব চাকরি পেতে পাবত। কিন্তু কেন জানি সেই যে অভিমান নিয়ে সে জাহাজেব কাজে হযে বেব হয়ে এল এবং আব তাব যেন কোনও ব্যাপাবেই মোহ নেই। এবং নন্দিনীকে ফেব দেখা হলে সে যা যা বলত, এখন ঠিক সেসবই এই সব দূবেব বন্দবে সমুদ্রেব কোনও নির্জন দ্বীপে, কোনও গাছেব জঙ্গলে এবং কোনও নীল উপত্যকায় লিখে বাখে। লিখে বাখতে বাখতে মনে হয় পৃথিবীব যাবতীয় সৌন্দর্য নন্দিনী ওব শুষে নিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম মনে হল ব্রাউস আব-এক মেয়েব

নাম, যে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে, যে সমুদ্রের সোনালি দ্বীপ আছে কি না জিজ্ঞাসা করেছে কারণ সবারই জীবনে একটা সোনালী দ্বীপ চাই, সেটার জন্য সবাই ছুটে মরছে। নন্দিনী কি তার সোনালি দ্বীপ আবিষ্কার করে ফেলেছে? চিঠি লিখে এসব জেনে নেবে এমন ভাবল। সে সেজন্যই আর শুতে গেল না। নীচের বাংকটা খালি। এখানেই সবাই কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্য এসে বসে। একটা পুরনো ম্যাট্রেস পাতা আছে। সে ওপরের আলোটা জ্বেলে রাখল না। ঘুম ভেঙে গেলে সবাই চেঁচামেচি করবে। সেজন্য সে নীচের আলোটা জ্বেলে হাতের দস্তানা খুলে লকার থেকে কাগজ এবং কলম বের করে লিখতে বসে প্রথমেই লিখল,

সুচরিতাষু,

তোমাকে সহসা একটা চিঠি লিখে ফেলছি। তুমি কেমন আছো জানি না। এ চিঠি পেয়ে তুমি কী ভাববে তাও জানি না। তবু আমাকে কেন জানি লিখতে হচ্ছে। অনেক কথা লিখব বলে বসেছি। তুমি সব কথা মনে করে রেখেছ কি না জানি না। কিন্তু আমি একা এবং সমুদ্রের মতো আমি নিঃসঙ্গ বলে মনে করে রেখেছি। তুমি হয়তো ভুলে গেছ সব।

এইটুকু লিখেই সে কেমন আর লেখার কিছু পাচ্ছে না। কেন জানি ওর মনে হচ্ছে নন্দিনী এখন একা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনের মাঠ ফাঁকা। মাঠে কত সবুজ গাছপালা ছিল, নিমেষে সব মুছে গিয়ে রুক্ষ মাঠ চোখের ওপর ভেসে উঠেছে।

তা হলে কি নন্দিনীর কাছে এখন আর জীবনের রহস্য বলে কোনও পদার্থ নেই? পাঁচ বছরে ওর মানুষটি ওর সব চুরি করে নিয়েছে। ওর যা কিছু ছিল, গর্ব করার মতো যা কিছু ছিল, সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সে হাই তুলল এবার। কাল খুব সকালে উঠতে হবে। সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। এবং পোর্ট হোলে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

পাঁচ

আজ ঝোড়ো হাওয়াটা তেমন নেই। সকাল থেকেই ডেকের জাহাজিরা বোট-ডেকে উঠে গেছে। ডেক-টিন্ডাল ব্রিজের ছাদে উঠে সি-ওয়াটার ভালবগুলো খুলে দিচ্ছে। নীচে হোস পাইপে জল মারছে জাহাজিরা। আকাশ পরিচ্ছন্ন। এখনও সূর্য ওঠেনি। আটটা বেজে গেছে। সূর্য উঠতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে যাবে। ওদের ওয়াচ সাতটা থেকে। তখন ডেক-এ যথেষ্ট অন্ধকার থাকে। তখনও মনে হয় রাত আছে এবং নীল লাল আলো বন্দরের চারপাশে জ্বলতে থাকে। এবং এই ঠান্ডায় যারা বন্দরে কাজ করতে আসে তারা কেউ কেউ শুকনো ডাল, অথবা ঘাস পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে রাখে ক্রেনের নীচে পুলক রেলিং-এ দাঁড়িয়ে সেই আগুনের ভিতর ব্রাউসের মুখ যেন দেখতে পেল।

গতকাল সে গিয়েছিল ব্রাউসের বাড়িতে। ওর বাবা বাড়ি ছিল না। ওর ঠাকুমা একটা ছোট মোয়ার দিয়ে সামনের লনে ঘাস ছেঁটে দিচ্ছিল। একটা বেতের চেয়ারে ব্রাউস বসেছিল। সমুদ্র থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে। ওকে দেখেই ইলিয়া ছুটে এসেছিল। এবং ভিতরে নিয়ে বসাতে চাইলে ও বলেছিল, এই তো বেশ। আপনি একটু বিশ্রাম নিন। মোয়ার দিয়ে আমি ঘাস কেটে দিচ্ছি।

ইলিয়া বলেছিল, তা কী করে হয়?

কেন হবে না!

তুমি বরং ব্রাউসের সঙ্গে গল্প করো। আমি তোমার জন্যে কফি করে আনছি।

না মাদাম ইলিযা। আমি এলে, আপনি যদি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তবে আর আসব না।— বলে সে আর দেরি করেনি। মোয়ারটা টেনে টেনে এক কোনায় নিয়ে গিয়েছিল। এবং চাকাগুলো অ্যাডজাস্ট করে সে এমন নিখুঁতভাবে ঘাস কেটেছিল যে ইলিয়া দেখে অবাক।

ইলিয়ার হাতে কোনও কাজ থাকে না বিকেলে। সে তার বাগানে পড়ে থাকে। বাগানের মাঝখানে ব্রাউস স্থির অপলক বসে আছে। প্রায় দেবীর মতো চোখ-মুখ তার। বিষণ্ণ প্রতিমা এই ব্রাউস। এবং যারাই গাড়িতে অথবা বাসে এসে এখানে নেমে যায়, দেখতে পায় এক বৃদ্ধা এক সুন্দরী কিশোরীকে

বসিয়ে রেখেছে গোলাপের বাগানে এবং নিজে কখনও গাছের পাতা ছেঁটে দিচ্ছে, কখনও কথা বলছে ব্রাউসের সঙ্গে।

আচ্ছা ব্রাউস, এই গোলাপটা কত ইঞ্চি হবে বলো তো? এটার রং কালো হল কেন! এই যে লাল রঙের গোলাপ এটাকে বলে এডিনবরার গোলাপ। তোমার দাদু আনিয়েছিলেন। কী সুন্দর!

কখনও পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী? এখন কি গাছগুলোর ডাল ছেঁটে দেওয়ার সময় হল? এই তো শীতকাল এসে গেল। এখন বরং গোড়ায় কিছু এমনিয়া দিয়ে দি। কী বলিস ব্রাউস?

ইলিয়া কাজ করছিল আর অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল। সে যখন ঘরে থাকে, তখনও সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞেস করে যাবে, কী রে ব্রাউস, এখন কি এই নীল রঙের পর্দা মানাবে? আমি ভাবছিলাম এখন তো বসন্তকাল এসে যাচ্ছে, হলুদ রঙের পর্দা করে দিলে কেমন হয়? তোর কী মত? তা হলে দিতে বলছিস!

যখন সব কিছুই ভবিতব্যের সামিল তখন সে ব্রাউসের সঙ্গে তুই-তুকারি করে। আবার যখন মনে হয়, না বেঁচে যাবে, ভবিতব্য বলে কিছু নেই, চেষ্টা, মানুষের অনন্ত চেষ্টায় কী না হয়, তখন ইলিয়া বলবে, ব্রাউস, এবার আমরা পামার হিলসের জলপ্রপাতের পাশেই যে সুন্দর ঘাসের ঘর আছে, তোমার জন্যে সেই ঘর ভাড়া করব।

কিন্তু ব্রাউসের কাছ থেকে কোনও সাড়া থাকে না। সে যেমন চুপচাপ বসে থাকে তেমন চুপচাপই বসে থাকে, যেন সে দূরের সমুদ্র-গর্জন শুনতে পাচ্ছে। ব্রাউস তখন আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে যায়।

পুলক সারাটা বিকাল কাজ করেছে বাগানে। ইলিয়া ঘরে কফি করেছে' দু' টুকরো মটন স্যান্ডউইচ এবং একটু পনিরের সঙ্গে গাজর সিদ্ধ করে এনে দিয়েছে পুলককে। কী সুন্দর সুন্দর সারি সারি গোলাপের গাছ। লনের চারিদিকটায় গোলাপের কেয়ারি করা বাগানগুলো থেকে এবার সব পাতা ঝরে যাবে। ফুল ফুটবে না। বরফ পড়ার আগে যেন ইলিয়া দু'হাতে এইসব গাছগুলোকে পরিচর্যা করছে। এবং যখন বরফ পড়তে শুরু করবে, তখন এইসব গাছগুলো বরফের গাছ হয়ে যাবে। আশ্চর্য রকমের সাদা হয়ে যাবে চারপাশটা। কাচের জানালায় বরফ পড়ে নকশি কাঁথার মাঠ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে সেখানে ব্রাউস তার সরু সুন্দর আঙুলে দাগ কেটে কেটে বুঝি লিখবে, আগামী বসন্তে আমি মরে যাব পুলক।

গত বিকেলে সে নানাভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিছুক্ষণ সামনা-সামনি দু'জন বসেছিল। গরম জ্যাকেট গায়ে ব্রাউসের। হাতে সবুজ রঙের দস্তানা এবং সাদা রঙের ফ্রকে একটা পাখি। গাছটার কোনও পাতা নেই। অথচ পাখিটা গাছে বসে রয়েছে।

পুলক গাছ, পাখি, ফ্রকের সাদা রং, হাতের দস্তানা এবং বিষণ্ণ মুখ দেখে বলেছিল, ব্রাউস, তুমি বলেছিলে সোনালি দ্বীপে যাবে। সেটা কবে যেতে চাও? আমি নিয়ে যাব।

অথবা সেই সব কৌতুক এখন এখানে করা চলে কি না! সে ভাঁড় সাজবে, এবং যেমন একজন কমেডিয়ান সকল দর্শককে হাসায়, সে তেমনি কোনও হাসির গল্প বলে হাসাবে। হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে কি না দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল পুলক এবং 'মাই লেডি' বলে কিছু বলতেই ব্রাউস বলেছিল, পুলক, তুমি বোসো। তুমি দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়লে আমার ভয় করে।

পুলক বলেছিল, আমার সঙ্গে তবে এসো। আমি হাত-পা নাড়ব না। আমরা বালিয়াড়িতে গিয়ে বসব। তোমাকে পেনির খেলা দেখাব।

আমার ভাল লাগে না কিছু।

কেন ভাল লাগে না?

জানি না। আমার কিছু ভাল লাগে না।

পুলকের সঙ্গে এত কথা বলছে, এমন সব কথা, একেবারে আপনার জন যেন এই পুলক। সে বলল, তুমি কখনও কোনও সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গেছ ব্রাউস?

কী করে যাব বলো?

আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে তেমন এক দ্বীপে চলে যাই। নানা রকমের রঙিন গাছপালা রোপণ করব। যেখানে যত ছোট ছোট রবিন পাখি আছে—অথবা মুনিয়া—সব ছেড়ে দেব আকাশে।

পুলক খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছে এখন। যেন সে নাবিক নয়। এক বালক, সরল বালক সে যে কীভাবে আরম্ভ করবে কথা, এবং কী কী কথায় ব্রাউস আনন্দ পাবে, ওর ভিতরে যে গ্লানি দেখা দিয়েছে সেটা সরে যাবে, এমন কী কথা আছে পৃথিবীতে, এমন কী রহস্য আছে জীবনে বেঁচে থাকার যা এই মেয়ের প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে।

তখন ব্রাউস বলল, বরফ পড়লেই বাবা আমাকে লাইট-হাউজে নিয়ে যাবে। ঠাকুমাকে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু তিনি যাবেন না।

তারপরই মনে হল কী দেখে, 'অঃ ইলিয়া চলে আসছে', যেন ইলিয়াকে দেখে ফের গম্ভীর হয়ে গেল ব্রাউস।

আহা নিমেষের জন্য পুলক দেখেছিল একেবারে স্বাভাবিক মুখ। সে বলল, ব্রাউস। তারপর কী বলো! আমি তোমার কথা সব শুনব।

পুলক এমন আগ্রহভরে তাকিয়েছিল যে ব্রাউস বলল, পুলক, আমার কিছু ভাল লাগে না। আমি মরে যাব ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

কেন তুমি মরে যাবে!

কেন যে মরে যাব জানি না।

তোমার কী কষ্ট ব্রাউস?

আমার কী কষ্ট। আমাব কষ্ট এই যে সুন্দর সব ফুলের গাছ, বরফ পড়লেই তারা সব ঝরে যেতে থাকবে। কিছুই গাছে থাকে না। সব ঝরে যায়। আমার বড় কষ্ট হয় পুলক। কোনও কষ্টের ছবি দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। শবীর আমার ঠান্ডা হয়ে আসে, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে, যেমন আমার মা ঠান্ডা হতে হতে ক্রমে মরে গেলেন।

এটা তোমাব অহেতুক ভয় ব্রাউস।

তুমি পুলক দেখছি ডাক্তারেব মতো কথা বলছ।

না না, আমি ডাক্তার নই। আমি সামান্য জাহাজি।

ডাক্তারেব কাছে গেলেই বলবে এটা তোমার মনের রোগ ব্রাউস। আমার মনের রোগ তো, আমার মামারা, মা এবং দিদিমার বোন, তার মা সবাই এভাবে মরে গেল কেন পুলক?

পুলক এ কথার জবাব দিতে পারছিল না। সে চুপ করে ছিল।

সন্ধ্যা নামার আগেই সব আলোগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। সে কেন জানি ভাবল, ব্রাউসকে একবার কোনও অন্ধকারেব সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। অন্ধকারকে ওর বড় ভয়। সে অন্ধকারে গেলেই অযথা সারাক্ষণ চিৎকার করে, আমি যাব, তোমরা কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে! আমি বাড়ি যাব

শুধু ব্রাউস কেন, ওর মা এবং ওদের যার যার এমন একটা রোগ দেখা দেয় তাদের জন্য অন্ধকার বড় ভয়াবহ।

ইলিয়া একসময় ফাঁক বুঝে কাছে এসে বলেছিল, পুলক, ব্রাউস আজ আমার কাছে খাবার চেয়ে খেয়েছে। পুলক, তারপরই আবার সেই ব্রাউস। ওর মা'র মতো জানালায় বসে যেন সমুদ্র-গর্জন শুনছে। তুমি যতদিন এ বন্দরে আছো একবার অন্তত এসো। ইমাদুল্লাকে আসতে বোলো।

সে বলেছিল, বলব মাদাম ইলিয়া। আমি নিশ্চয়ই আসব।

সে নিশ্চয়ই আব যাবে কি? যেন এই যাওয়া এখন আর ওর হাতে নেই। যে-কোনও কারণেই হোক ব্রাউস ওর কথায় কেমন সাড়া দিচ্ছে। আব সেও কোনওদিন জীবনে এমন বাহবা অথবা সে যে একবার এক দূরবর্তী ভালবাসার ভিতর আচ্ছন্ন ছিল, ক্রমে যেন এই ব্রাউস তা কেড়ে নিচ্ছে। সে চিঠি লিখতে পারেনি। সে এখন কতক্ষণে বারোটা বাজবে, কতক্ষণে দুটো খেয়ে জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে চলে যাবে কিনারায়, সেই আশায় আছে।

গতকালও সে হাফ ছুটি নিয়েছিল। ইমাদুল্লাকে সারেং ভয় পায়। সে ইমাদুল্লাকে দিয়ে ছুটি করিয়ে নিয়েছে। সারেং এখন কাজের চাপ কম বলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ এখন এ অঞ্চলে দুটো না বাজতেই সূর্য হেলে যায়। চারটা না বাজতেই রাত। সে যে কী করে ওকে নিয়ে যাবে সেই দ্বীপে যেখানে সেই এক পাহাড় মাথা উঁচু করে একেবারে মানবী সেজে সমস্ত আকাশে তুরে ফুঁড়ে ভালবাসার

ছবি এঁকে দিচ্ছে, সে যে কী করে নিয়ে যাবে তাকে সেই ভালবাসার দ্বীপে! কোথায় স্কিপ পাওয়া যাবে এখন? ইমাদুল্লা চাচা সব জানে। সে হাঁটতে থাকল ডেক ধরে। ওর কাজ ইঞ্জিনে। তেলের ট্যাংকগুলো পরিষ্কার করতে হবে। সে দাঁড়িয়ে থেকে করাবে। যারা কাজ করবে, ট্যাংকের ভিতর নেমে যাবে, তারা সকলেই চলে গেছে বোট-ডেকের ওপর। সেও সেখানে যাচ্ছে। যাবার আগে একবার ইমাদুল্লার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত।

ভাল মন্দ যাই হোক এমনই মানুষের স্বভাব, কিশোরী মেয়ে মরে যাচ্ছে শুনে, আর যে এমন সুন্দর এবং সজীব, তার কেন যে সহসা হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে, আর মরে যাব মরে যাব করে! সে ভেবে পায় না, সে মনুষ্য বলে তার কাছে মনে হয় এক অতীব শক্তি আছে। আর যখন তার কেউ নেই, তার এক ভালবাসার জন সেও পাঁচ বছর আগে ওর চেয়ে দশ বছরের বড় মানুষের হাত ধরে চলে গেল, কী খুশি কী খুশি সে! একটা চিঠি পর্যন্ত দিয়ে এখন জিজ্ঞাসা করে না, তুমি কেমন আছো?

আমি ভাল আছি নন্দিনী। আমি এখন এই জাহাজে রয়েছি। আমার এখন যেন প্রাণপণ লড়ে যাওয়া, সেই যে মেয়েটা মরে যাবে বলে বসে আছে, তার ভিতর প্রাণ সঞ্চার করা। ইমাদুল্লা চাচার কাছে ওরা জেনেছে, আমি বড় ভালমানুষ। ওদের বিশ্বাস দেখে আমার আরও ভাল হতে ইচ্ছা করছে।

তুমি বলবে, পুলক তুমি কী বোকা, কী বোকা! আমি বলব, এই যে পাশে সমুদ্র রয়েছে, সামনে দ্বীপ রয়েছে, ওপরে আকাশ রয়েছে আর ক্রেন পার হলে বন্দর রয়েছে, সব মিলে এখন আমি, আমাব আমি। আমার আমিকে কখনও এত বড় মনে হয়নি! ভিতরে আমাব একটা জিদ জন্মে গেছে, জিদ না বলে প্রত্যয়ই বলা ভাল। ব্রাউসের কোনও রোগ নেই। ওদের ওটা ভালবাসার রোগ। এ বয়সে এমন একটা রোগ সহজেই হতে পারে।

তুমি বলবে, কী বোকা, কী বোকা, কী বোকা পুলক! বিজ্ঞানের যখন এমন জয়যাত্রা, চাঁদে মানুষ যাচ্ছে, তখন তুমি এক হাতুড়ে বৈদ্য, মনের কথা কী বা জানো। তুমি বললে কিনা, এটা বয়সে হয়, এসব রোগ। এবং বাপু আমি তো কোথাও শুনিনি এ রোগে মানুষ মরে যায়। আমিও মরে যাইনি। তোমার সম্বন্ধ ঠিক করে আসার পর কতদিন আর কথা বলতে পারিনি। আমিও জানালায় কেমন কিছুদিন পাগলেব মতো বসেছিলাম। এখন সেসব মনে হলে বড হাসি পায়। আর শেষে নন্দিনী হাসতে হাসতে যেন বলছে, বিজ্ঞান যেখানে লড়তে পারল না, তুমি তো ফুঁ। বস্তুত তুমি ব্রাউসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছ পুলক। জাহাজে তুমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পাববে না। সে তোমাকে কেবল টানছে।

দিনটা বেশ উজ্জ্বল ছিল। রোদ উঠছে সকাল থেকেই। এ সময় রোদ থাকার কথা নয়। ঝড় বৃষ্টি অথবা তুষারপাত হবাব কথা। অথচ এখনও তুষারপাত হচ্ছে না। কনকনে ঠান্ডা ডেকের ওপর। সারাটা দিন হিমেল হাওয়া বইবে। সূর্য সব সময় দিগন্তরেখায় থাকছে। ছায়া বড় লম্বা হয়ে পড়ছে। এবং দিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পুলক ইমাদুল্লার কাছ থেকেই কোথায় স্কিপ ভাড়া পাওয়া যেতে পারে জেনে নিল। সে চাচাকে বলল, তুমি যাবে? তুমি গেলে বড় ভাল হয়।

ইমাদুল্লা বলেছিল, কেন? তোর ভয় হয়?

ভয় না। তবে!

তবে কী?

এতদূরে যাব!

দূর কোথায়? তুই যদি পাল তুলে দিস তবে ঘন্টা দেড়েকের পথ, আর যদি মোটর-বোটে যাস, তবে আরও কম সময়। যাবি আর আসবি।

পুলক বলেছিল, ভেবেছিলাম একাই যাব।

একা গেলে তুমি চিনে নাও যেতে পারো।

এজন্য সঙ্গে ব্রাউসকে নিচ্ছি।

ব্রাউস তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?

যাবে বলছে।

বলছ কী! ব্রাউস কথা বলছে তোমার সঙ্গে!

খুব। কেবল কথা আর কথা। আমরা একবার ওদের বাড়ির পেছনে যে পাহাড়টা আছে সেখানে গেছিলাম। সে আমার সঙ্গে ছুটে ছুটে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল।

খুব গুল ছাড়ছ।

ঠিক আছে তুমি চলো একদিন। কবে যাবে বলো?

ইমাদুল্লা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ওদের সেই পুরোহিত মানুষটি আসছে?

আসছে। তবে সন্ধ্যায় নয়। সকালে। ব্রাউস এখন সেসব শুনতে চাইছে না। সে বিকাল হলেই ছটফট করতে থাকে। সদরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি কখন যাব সেই প্রতীক্ষায়।

বলছিস কী! এ যে একেবারে জাদুর সামিল।

বোধহয় তাই।

কী করে হল?

কী করে হল জানি না চাচা, তবে প্রত্যেক দিন আমি ওকে ওদের যেসব জায়গা দেখার মতো সেখানে নিয়ে গেছি। ওদের গাড়িতে গেছি। নানা রকমের গল্প বলেছি। আমাদের দেশের বর্ষাকালের কথা বলেছি। নদী নালার গল্প বলেছি, আমি যে একটি মেয়েকে ভালবাসতাম এবং সে যে বিয়ের পর আমার আর কোনও খোঁজ নেয় না সব খুলে বলেছি: সব সময় কিছু বলে যাওয়া। সে শুনুক আর নাই শুনুক, দু'হাতে তালি বাজানো। সে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলে, কোনও পাইনের ছায়ায় আমি হাত ধরে বলেছি, ব্রাউস, তুমি কী সুন্দর। পৃথিবীর কত বন্দরে গেছি, কত সমুদ্র পার হয়ে গেছি কিন্তু কোনওদিন তোমার মতো এমন সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখিনি। অথবা কখনও চাচা আমি আর ব্রাউস উইলো ঝোপে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। সে আর আমি পাশাপাশি। মনেই হয়নি আমি এ বন্দরে জাহাজি হয়ে এসেছি। আবার চলে যাব। কেবল ওর চোখের দিকে তাকালে আমার কেন জানি মনে হয়েছে, ওর ভিতর আবার প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। সে ভাল হয়ে যাবে।

ইমাদুল্লা বলল, সে তো ভাল হয়ে গেছে দেখছি।

না, ভাল হয়ে যায়নি।

সব স্বাভাবিক, ভাল হয়ে যায়নি মানে!

একটু চুপ করে থাকলেই আবার কেন জানি মৃত্যুভয়টা এসে তাকে গ্রাস করে। সে চিৎকার করতে থাকে তখন, পুলক আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। আমি মরে যাব। তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চলো। আমি ওকে সন্ধ্যার আগে যেভাবেই হোক বাড়ি পৌঁছে দিতাম। সে জানালার কাছে বসত। কিছুতেই আর কথা বলতে চাইত না।

ইমাদুল্লা বলল, তবে তোর মনে হয় একেবারে সেরে ওঠেনি?

মনে হয় আদৌ সারেনি।

ইলিয়া কী বলছে?

তুমি আসার পর ওকে খুব খুশি-খুশি দেখছি।

আর কী বলছে?

তুমি চলে গেলেই জানি সে যেমন ছিল তেমনি হয়ে যাবে।

ইমাদুল্লা বলল, তবে আর ওকে নিয়ে যাবি কী করতে? বরং তুই একা চলে যা। সারেং খুব রাগারাগি করছে। তুই কাজ-ফাজ না করে যাস, সারেং চেল্লাচেল্লি করছে।

পুলক কথা বলল না। পরে সে বলল, আজ যাব। আর যাচ্ছি না।

পুলক বারোটা না বাজতেই ইঞ্জিন-রুম থেকে চলে এল। সাধারণত জাহাজ বন্দরে এলে হাতে কাজের চাপ কম থাকে। সে তার করণীয় কাজটুকু খুব তাড়াতাড়ি খেটে-খুটে করে নিল। বাথরুমে স্নান করল গরম জলে। সে চন্দন সাবান মেখেছে। সে সুন্দর সাদা রঙের টাই এবং ব্লু নেভি সার্জের স্যুট পরেছে। সে মাথায় ফেল্ট ক্যাপ পরেছে। ওভারকোট কাঁধে ফেলে যেন কাপ্তান অথবা মেজ-মিস্ত্রি দেখতে না পায়, প্রায় পালিয়ে পালিয়ে সে বন্দরে নেমে এসেছে।

তাড়াতাড়ির মাথায় সে ভালভাবে খেতে পারেনি পর্যন্ত। ব্রাউসকে নিয়ে সে সেই দ্বীপে দিনমানে

যাবে এবং দিনমানে ফিরে আসবে। সন্ধ্যা হলেই, অন্ধকার নামলেই চিৎকার করবে ত্রাউস। সে অন্ধকারকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। অন্ধকারই মৃত্যুর আর-এক রূপ, এমন হয়তো সে ভেবে থাকে।

ত্রাউসের বাড়ি যেতে গেলে দেরি হবে। সেজন্য ঠিক ছিল ত্রাউসের বাবা গাড়ি করে আসবে। ত্রাউস যে ক'দিন আনন্দে থাকে থাকুক। আর এই মেয়েকে বিয়ে করবে কে। এখন অবশ্য ত্রাউসের বাবা মনে করতে পারে না, ত্রাউসের মা কি আগেই অসুখে ভুগছিল। সব লুকিয়ে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে ভেবেছিল, যদি সে নতুন জীবন পেয়ে সেরে ওঠে। এমন দেখা গেছে অবশ্য কেউ হয়তো অসুখের আক্রমণের মুখে বিয়ে-থা দিলে ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হতে হতে অসুখের কথা ভুলে গেছে। ত্রাউসের বাবা অবশ্য এখন মনে করতে পারে না কিছু। যতদূর মনে আসে, ত্রাউস পেটে আসার পরই তার স্ত্রী কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। এবং ভয়, মৃত্যুভয়, শরীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে, সেটা ওরা ক্রমে শুনে আসছে পারিবারিক ভাবে। এবং বর্তমানে এভাবে উত্তর-পুরুষদের অবশ্য নানা রকম সতর্কতার ভিতর রাখা হয়, এত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি মন দুর্বল হয়, যা মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য, মেয়েরা এভাবে মরে যায়। বেশি বয়সে জানলে খুব একটা ভয় থাকে না। ইলিয়া এই পারিবারিক দুর্ভাগ্যের খবর বেশি বয়সে পেয়েছিল।

সুতরাং ত্রাউসের বাবাই গাড়ি চালিয়ে চলে আসবে। পার্কে যাবার পথে ওরা একটা কাফেতে বসে থাকবে। কফি খাবে। এবং সময় দেওয়া আছে, ঠিক সময় মতো পুলক চলে যাবে। মেয়েটা যে ক'দিন এই ভারতীয় জাহাজির সঙ্গে হাসে গায়, যে ক'দিন সামান্য হাসিখুশি থাকে, সে ক'দিনই ওর কাছে উপরি পাওনা। কেউ তো বড় আসে না এ পরিবারে। রোগটা সংক্রামক কি না কে জানে। যার জন্য প্রায় একটা লোকালয় বিহীন জায়গায় ইলিয়া বাড়িটা নির্মাণ করেছে।

পুলক বাস থেকে পার্কের পাশে নামল। সেখান থেকে ওকে সামান্য সময় হাঁটতে হবে। এখন ঘড়িতে একটা বাজতে দশ মিনিট। সূর্য এখন দক্ষিণ দিগন্তরেখায়। বেশ নরম আলো। ঠান্ডা এবং কনকনে হাওয়া বলে সে টাইটা আরও এঁটে নিল গলায়। জ্যাকেট সে গায়ে দিয়েছে, নীচে। এবং ইচ্ছা হল এ সময়ে জোর হাঁটে। জোরে হাঁটলে ঠান্ডা ভাবটা বেশি সময় থাকে না। সে জোরে হেঁটে যেখানে সমুদ্র একটা ছোট্ট লেগুন সৃষ্টি করেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। নানা রঙের স্কিপ। লাল হলুদ রঙের। সাদা রঙের স্কিপ বাঁধা সিঁড়িটার পাশে। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেলে স্কিপ। দু'পাড়ে পাব, কাফে এবং কার্নিভেল। প্রতি শনিবার এখানে কার্নিভেল বসে। সে ডানদিকের কাফে থেকে ত্রাউসের সাড়া পেল। একটা বড় নীল রঙের ছাতার নীচে সে এবং তার বাবা বসে রয়েছে। সামনে সমুদ্র। দু'পাশে কিছু ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। ছোট ছোট কাঠের ঘর লাল নীল রঙের। কাচে মোড়া দরজা জানালা। ভিতরে মানুষগুলো পানাহার করছে বোঝা যাচ্ছে।

ত্রাউস বলল, কী? এত দেরি কেন?

দেরি কোথায়?— বলে সে ঘড়ি দেখল।

ত্রাউসের বাবা বলল, কী বলব? কী খাবে?

এখন কিছু খাব না।

তা কী করে হয়? তোমার জন্য আমরা বসে আছি। এখানে সবাই খেয়ে নেব।

এমনই একটা কথা ছিল। অথচ পুলক সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খেয়েছে বলে ভাল করে পেট ভরে খেতে পায়নি। সে যে খেয়ে এসেছে সে কিছুতেই বলল না। সে বলল, ঠিক আছে, আপনাদের পছন্দ মতো বলুন।

তা কী করে হয়?

ত্রাউস বাধা দিল কথায়। এই ত্রাউসকে দেখলে কে বলবে, ত্রাউসের কিছু অ্যাবনরমাল ব্যাপার আছে। কী খুশি আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে! দ্বীপগুলোতে যাবার জন্য এইসব স্কিপ। এবং দুপুরে বের হয়ে যাবে বলে অনেকেই এসেছে। ওরা সবাই এখন এইসব রেস্তোরাঁতে খাবে এবং দ্বীপে বসে খাবার জন্যে কিছু টিফিন নেবে সঙ্গে। ত্রাউসের মুখ দেখে মনে হল, সেও কিছু নিয়ে নেবে। পুলক খাবারের দাম দিতে চাইল। মিলান ভীষণ রাগ করে বলল, তুমি কি মনে করো আমি খুব গরিব?

পুলক আর কোনও কথা বলতে পারল না। সে কেমন আমতা-আমতা করতে থাকল। আর এই ন দেখে ত্রাউস হা হা করে হেসে উঠল। মিলান মেয়ের এমন হাসি দেখে এই নাবিকের জন্য কেমন মমত বোধ করল।

ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। ত্রাউসের বাবা ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ত্রাউসকে একটা সংক্ষিপ্ত পথের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে ওর বাবা। যাবার সময় কিছু খাবারও দিয়ে দিয়েছে। দ্বীপে বসে খাবে। পুলক মোটর-বোট চালাতে পারে। সে হাল ধরে বসে থাকল। ওপরে ত্রাউসের বাবা হাত তুলে ওদের বিদায় জানাল।

পুলক এবং ত্রাউস লেগুন ধরে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। দু-পাড়ে পাহাড়। পাহাড়ি পথ। খুব দ্রুত গতিতে স্কিপটা ছুটছে। দিগন্তে সূর্য বলে ওদের মুখে সূর্যের আলো পড়ছে না। ত্রাউসের মাথায় রুমাল বাঁধা। হাওয়ায় ত্রাউসের রুমাল উড়ছে এখন। সে একটা লাল প্লাস্টিকের বেল্ট এঁটে নিয়েছে মাথায় ওর মুখটা ডিমের মতো দেখাচ্ছে।

ত্রাউস বলল, পাহাড়টার নাম কী, জানো?

পুলক বলল, তুমি আমার দিকে মুখ করে বসো ত্রাউস।

এ পাহাড়টার নাম প্যিয়ারা পাহাড়। এখানে একরকমের গাছ পাওয়া যায় যার কোনও পাতা হয় না।

পুলক বলল, তুমি বলেছিলে আমি কোনও সোনালি দ্বীপ দেখেছি কি না? তোমাকে সোনালি দ্বীপে নিয়ে যেতে পারি কি না? এখন আমরা সেখানেই যাচ্ছি।

যাঃ, সেটা সোনালি দ্বীপ হবে কেন? পুলক, তুমি ঠিক কথা বলছ না।

আমরা যখন দ্বীপের পাশ দিয়ে আসছিলাম তখন কিন্তু দ্বীপের রংটা হুবহু সোনালি ছিল।

এখন তো শুধু ঝোড়ো হাওয়া।

এইটুকু বলার সময়ই ওদের স্কিপটা বাঁক নিল। এবং ওরা এসে সমুদ্রে পড়ল। ঝোড়ো হাওয়া বলে বড় বড় ঢেউ উঠছে। ঢেউ কেটে স্কিপটা রাজহাঁসের মতো দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে।

ওরা পিছনে সামনে এখন এমন কত স্কিপ দেখছে। জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী দ্বীপগুলোর উদ্দেশে বের হয়ে পড়েছে। কারণ সময় শেষ হয়ে আসছে। জুলাই-এর মাঝামাঝি সময় আর আবহাওয়ার এ অবস্থা থাকবে না। তুষারপাত আরম্ভ হবে। পেঁজা তুলোর মতো তুষার উড়বে আকাশে। মনে হবে অজস্র কাশফুল যেন হাওয়ায় উড়ছে। তখন এই সব বাড়িঘর, গাছপালা সব তুষারে ঢেকে যাবে। সমুদ্রের জল বরফ হয়ে যাবে। সেই সব দ্বীপে পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেল চালিয়ে চলে যাওয়া যেতে পারে। তবে অনেকে যায় না। কারণ বিপদের আশঙ্কা থাকে। আর প্রচণ্ড ঠান্ডায় অনেকে ঘর থেকে বেরই হতে চায় না। প্রায় নির্বাসনে রয়েছে বন্দরটা, এমন মনে হয় তখন।

ত্রাউস বলল, এখন ঝোড়ো হাওয়া, এরপরই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামবে। সূর্য উঠবে না। এমন সুন্দর দিন আর পাবে না পুলক। আমি হয়তো আর কোনওদিন এমন সুন্দর দিন দেখতে পাব না। আগামী শীত আসতে না আসতে আমি মরে যেতে পারি।

পুলক এবার গম্ভীর গলায় ডাকল, ত্রাউস।

ত্রাউস চোখ তুলে তাকাল।

তুমি এমন বললে আমি আর কোনওদিন তোমার কাছে যাব না।

আর বলব না পুলক।

কেন তোমার এসব মনে হয়?

আমার এমন মনে হলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

তুমি এই মনে হওয়াটাকে ভুলে যেতে পারো না!

পারি না। কিছুতেই পারি না। আমি লুকিয়ে আমাদের পরিবারের মৃত্যুর লিস্টটা দেখেছি। তাদের মৃত্যুর আগেব ছবি দেখেছি। কী যে চেহারা হয়ে যায় তখন! একেবারে কঙ্কাল। কী কুৎসিত! ভাবতে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমিও মরার আগে দেখতে তেমন হয়ে যাব।

বলে ত্রাউস কেমন বিষণ্ণ চোখে সমুদ্র দেখতে থাকল।

পুলক দেখল, বড় ঝামেলায় পড়া গেছে। সে ভেবেছিল অন্তত এই সুন্দর দিনে ত্রাউস সব ভুলে

থাকবে। সে এবার বাধ্য হয়ে বলল, ত্রাউস, তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো।

রাগ করবে না?

না।

যদি এটাই ঠিক থাকে তুমি মরে যাবে, তুমি আর এই দ্বীপে আসতে পারবে না, তবে এই দিনটাকে ভাল করে দেখে নাও। তুমি কী সুন্দর ত্রাউস! কতবার এই এক কথা বলেছি, অথচ যখন বলো, তুমি বাঁচবে না, আমার ভাল লাগে না। আমরা তো কেউই বাঁচব না। তুমি যদি দিন গুনে থাকো, তবে আমি বছর গুনছি। ঠিক না?

ত্রাউস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তবে আমার কি উচিত এই ভেবে বিমর্ষ হয়ে থাকা?

ত্রাউস মাথা নেড়ে এবারেও সম্মতি জানাল।

আজ অন্তত এমন সুন্দর দিনটা তুমি এসব ভেবে নষ্ট করে দিয়ো না।

নষ্ট করে দেব না।

ঠিক বলছ তো?

ঠিক বলছি।

আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছ?

ত্রাউস হেসে দিল, মাথায় হাত দিয়ে কেন?

মাথায় হাত রেখে কিছু বললে সেটা মানতে হয়। না মানলে আমার খারাপ হবে।

তবে আমি তোমার মাথায় হাত রাখব না পুলক। আমি তো তখন আমার ভিতর থাকি না। এতে আমার নিজের কোনও হাত নেই পুলক। শুধু বলতে পারি, চেষ্টা করব।

ত্রাউস এবার মুখোমুখি এসে বসল। মাথায় হাত রাখল পুলকের। ধীরে ধীরে বলল, আমি চেষ্টা করব পুলক।

তারপর চোখ নীচে নামিয়ে বলল, সেটা আরও ধীরে এবং কোমল গলায়, তুমি আমায় এত ভালবাসো পুলক?

পুলক জবাবে কিছু বলল না। সে হাত তুলে দেখাল, ওই দ্যাখো আমরা এসে গেছি। দ্বীপগুলো দেখে সে আনন্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছয়

এটা সেই দ্বীপ। এর পাশ দিয়েই ওদের জাহাজ গিয়েছিল। এমন অনেক দ্বীপ এখানে ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। নানা রকম ওদের চেহারা। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য যে মাটি আছে তাতে সবুজ ঘাস। নানা রকম ঘাসের ফুল এবং ছোট ছোট ঝোপ আছে। জাহাজ থেকে শুধু পাথরের দ্বীপ বলেই মনে হয়েছে। চারপাশে সমুদ্র বড় বড় ঢেউয়ের ভিতর আছড়ে পড়ছে। এবং কোনও কোনও ঢেউ এমন উঁচু হয়ে আসছে যে, জলটা সেই নারী মূর্তির পা ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

পুলক দ্বীপে নেমেই স্কিপটা টেনে ডাঙায় তুলে দিল। ওরা এখন সেই নারী মূর্তিটার দিকে হাঁটছে। পুলকের ইচ্ছা যদি এই মূর্তির গা বেয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য যত সে কাছে গেল তত দেখতে পেল, ঠিক যেন নারী মূর্তি পাথর, মসৃণ পাথর, পাহাড়ের চূড়োর মতো ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে। সে বলল, ত্রাউস, এখনও একে আমি ঠিক কোনও ডিভাইন লেডি ভাবতে পারছি না। একে যদি দু'ডাল নিয়ে দু'দিকে কোনও মৃত গাছ বলে ভাবি, ক্ষতি কী! তুমি দ্যাখো ওকে ইচ্ছা করলে এমনও ভাবতে পারি।

ত্রাউস বলল, এসব বলার আগে আমাদের একটা ভাল জায়গা বেছে নিতে হবে। নতুবা পরে কিন্তু জায়গা পাবে না। নির্জন নিরিবিলি জায়গা।

পুলক বলল, তার মানে?

দেখবে সবাই এসে জায়গা বেছে নিচ্ছে।

কী রকম জায়গা!

যেখান থেকে সমুদ্র ওরা দেখতে পাবে। পাশে ঢিবি থাকবে একটা। ওরা পাশাপাশি শুয়ে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না।

বলেই ত্রাউস পুলকের দিকে তাকাল। ত্রাউসের মুখে কোনও রেখা ফুটে উঠছে না। অন্তত এমন কথায় পুলক ভেবেছিল, ত্রাউস নিশ্চয়ই লজ্জা পাবে।

আমাদের সেসবের কি দরকার আছে! আমরা কেবল দ্বীপটা ঘুরে দেখব।

কিন্তু যখন পরিশ্রান্ত হবে, তখন? তখন নিরিবিলি বসে আমরা ওদের মতো একটু কথা বলব না।

সে ঠিক কথা। কিন্তু কী আশ্চর্য, পুলক ওর মুখে এমন কোনও রেখা ফুটে উঠতে দেখছে না, যা দেখলে ভাবা যায় ত্রাউস পুলককে নিয়ে ঠিক সব যুবক-যুবতীরা যেজন্যে এখানে আসে, তেমনি সেও এখানে সেজন্য চলে এসেছে। বরং ত্রাউসকে দেখলে মনে হয়, তার মনে কোনও পাপ নেই। সবল যুবতী, ঠিক যুবতী বলা যায় না ত্রাউসকে বরং তরুণী বলা ভাল, সব কিছু রহস্যময় হওয়ার কথা, অথচ যার কাছে কোনও রহস্য এখন জেগে নেই। ওর ইচ্ছেমতো যদি কাজ হয়, সে এখন যা চাইছে তেমন যদি হয়, তবে হয়তো ওর মনে আবার বাঁচার ইচ্ছা জেগে উঠবে। সব কিছু ওর জন্য যে ঠিক হয়ে নেই কোনও নির্ধারিত সময়ে যে ও মরে যাচ্ছে না, এ বোধ থেকে ওকে নিষ্কৃতি দিতে পারলে প্রায় এই দ্বীপের ভিতর ভালবাসার নিমিত্ত ঘুরে বেড়ানোর সামিল হবে। সে বলল, ঠিক আছে। চলো। তুমি আর কবে এখানে এসেছিলে?

ঠাকুমার সঙ্গে এসেছি বার দুই। আমরা দ্বীপের এদিকটাতে আসিনি। শুনেছি এখানে এসেই একটা জায়গা বেছে না নিলে বসার ঠিক জায়গা পাওয়া যায় না।

বলে সে একটা ছোট্ট বনঝোপ দেখতে পেল। এবং নীচে সমুদ্র। একটা পাহাড়ের খাঁজে জল একেবারে টলটল করছে। ত্রাউস এখানে তার চুলের রিবন খুলে ছোট্ট ডালে বেঁধে রেখে বলল, চলো এবার।

তার মানে!

এখানে এসে কেউ আর বসবে না। এই লাল রিবন দেখলেই বুঝতে পারবে, আজকের বিকেলের জন্য জায়গাটা দখল হয়ে আছে।

যারা মাথায় রিবন বেঁধে আসে না?

তারা কোট অথবা স্কার্ফ ফেলে রাখে। তারপর দ্বীপটা ঘুরে দ্যাখে। এখন আমরাও দ্বীপটা ঘুরে দেখব।

ওরা যখন পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছিল অথবা ওরা যখন নানা রকম ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছে তখন আরও সব স্কিপ দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় এসে লাগছে।

এটা এক আশ্চর্য দ্বীপ। এখন রোদ সোনালি রঙের। দ্বীপটা প্রায় সোনালি হয়ে গেছে।

পুলক দেখল, ওরা যেদিন জাহাজে যাচ্ছিল ঠিক সেদিনের মতো আবহাওয়া। ত্রাউসকে সে বলল এই তো তুমি সোনালি দ্বীপে এসে গেছ ত্রাউস। আচ্ছা ত্রাউস, দূর থেকে কিন্তু কিছুতেই বোঝা যায় না এটা নারীমূর্তি নয়। জলের নীচ থেকে একটা পাহাড় মাথা তুলে যে সূর্য ওঠা দেখছে, কিছুতেই বোঝা যায় না।

ত্রাউস বলল, পুলক, এমন একটা দ্বীপে এসে তোমার কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে না?

পুলক জানে এটা ইমাদুল্লার কাজ। সে বলল, তোমাকে চাচা ঠাট্টা করে বলেছে।

ঠাট্টা কী করে বলব? তুমি যেভাবে এমন একটা দ্বীপে আমাকে নিয়ে আসতে পারলে, আমার বাবা এসে তোমার স্কিপে আমাকে তুলে দিয়ে গেলেন, ভাবতেই অবাক লাগে। এখন বলছ পাহাড়টা সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল। সূর্য ওঠা দেখবে বলে সেই যে জলের ওপর ভেসে উঠল আর ডুবতে পারল না। তুমি আমার বাবাকে, আমাকে, দিদিমাকে এভাবেই মুগ্ধ করেছ পুলক।

পুলক হাত টেনে বলল, খুব দেওয়া হচ্ছে!

দেওয়া কী আবার। যা সত্যি তাই বলছি।

আমি কবিতা লিখি, কেন যে লিখি জানি না। এগুলো আদৌ কবিতা কি না তাও জানি না। তোমাকে ইংরেজি করে কবিতার ভাবার্থ বলে দিতে পারি। তুমি বলতে পারবে এগুলো কবিতা হয়েছে কি না।

পুলক, তুমি আমাকে কবিতার মাস্টার ভাবলে শেষ পর্যন্ত।

কেন ভাবতে অসুবিধা কী। তোমার এমন বয়স যে এ সময়েই তো কবিতার সঠিক মানে ধরা যায়। এমন একটা বয়সে কবিতা ভাল না লাগলে আর কি ভাল লাগবে? যদি যথার্থই কবিতা হয় তবে তোমার ভাল লাগবেই।— বলে পুলক দ্বীপের ঝোপ জঙ্গল পার হয়ে সমুদ্রের কিনারে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে ওরা উপকূল বরাবর দক্ষিণ দিকে লাইট-হাউজ দেখতে পেল।

ছুটি ফুরোলেই বাবার সঙ্গে আমি লাইট-হাউজে ফিরে যাব।

সেখানে তুমি সময় কাটাও কী করে?

আমি এখন বাবার সঙ্গেই থাকি। দিদিমার কাছেও মাঝে মাঝে চলে আসি। আমার অসুখটা হওয়ার পর বাবা আর স্কুলে যেতে দেন না। বরফ পড়তে শুরু করলে বাবার সঙ্গেই থেকে যাব।

তোমার তো বছর খানেকের ওপর হল এমন হয়েছে।

তার আগে স্কুল ছুটি হলে যখন বাবার কাছে চলে যেতাম তখন আমার বড় আনন্দের দিন ছিল। বলে সে পুলকের দিকে তাকাল, চলো এখানে না বসে আমাদের জায়গায় গিয়ে বসি।

ওরা ফিরে যাবার সময় ত্রাউস বলল, যখন গ্রীষ্মকাল আসত, পাহাড়ের নীচে আমি মযদার সঙ্গে ইস্ট পাখির খাঁজে রেখে আসতাম। বড় চিংড়ি মাছ এসে জমা হত। ছিপ ফেলে কত মাছ ধরতাম। কোনও কোনও বিকেলে ঘাসের ওপর বসে থাকলে দেখতে পেতাম ছোট বড় সব কচ্ছপেরা সমুদ্রের ওপর পা ভাসিয়ে রাখছে। ওদের কোনও ভয়-ডর ছিল না। কিছু শুশুক মাছ ভেসে আসত। ঝোড়ো হাওয়া হলে সমুদ্র থেকে ঢেউয়ের সঙ্গে উড়ুক্কু মাছ এসে দ্বীপের ঘাসের ভিতর রুপোর কাঠির মতো ছড়িয়ে পড়ত। আমি কুড়িয়ে নিতাম।

ওরা এতক্ষণে ওদের সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে ফিরে এসেছে। ত্রাউস পুলককে বলল, সারাদিন জাহাজে কাজ করেছ। আবার এখানে এবং দ্বীপে ঘোরা, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি একটু শোবে? বলে সে লম্বা জ্যাকেট খুলে পাথরের ওপর বালিশের মতো করে বলল, তুমি একটু শোও, কী সুন্দর সমুদ্র! কী ঢেউ দ্যাখো! কেমন জলের ঝাপটা এসে নীচের পাহাড়ে ধাক্কা মারছে।

পুলক বলল, তোমার কোটটা নষ্ট হবে ত্রাউস। বরং এসো তোমার সেই লাইট হাউজের গল্প শুনি। শুনি তোমার গল্প, সেই যে মেয়েটা তোমাকে ভালবাসত।

মেয়েরা বড় সহজে সব ভুলে যায় ত্রাউস।

না। ওরা সহজে ভোলে না। তুমি ওর ঠিকানা দিয়ো। আমি একটা চিঠি দেব।

সত্যি! কী লিখবে?

লিখব একজন ভালবাসার মানুষ সারা পৃথিবীতে কেবল তোমার নাম লিখে বেড়াচ্ছে।

এ কথা লিখতে যেয়ো না। যদি ওর স্বামী জানতে পারেন তবে ওর পক্ষে অসম্মানের হবে। তুমি বরং লিখো তোমার দাদাটি বড় স্বার্থপর মানুষ। সে কারুর কথা বেশিদিন মনে রাখে না।

ত্রাউস এবার নিজেই পুলকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। ওর মসৃণ ঘাড়ের অংশ এত সাদা এবং কোমল যে পুলক না তাকিয়ে পারল না। ওর সুন্দর স্তন ফ্রকের ওপর ভেসে রয়েছে। হাতে ওর সোনার আংটি। দামি পাথরের আংটিটা সোনালি রোদে চকচক করছে।

ত্রাউস বলল, এটা আমার মায়ের আংটি। দ্যাখো কী সুন্দর।— বলে পুলকের কোলে সে হাতটা রাখল। হাতের আংটিটা ভাল করে দেখুক এমন যেন ওর ইচ্ছা।

পুলক দু' হাতে ওর হাতটা চোখের সামনে এনে বলল, ভারী সুন্দর তোমার আংটিটা।

ত্রাউস বলল, এখানে আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না পুলক।

সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে।

আর ওই দ্যাখো।— বলেই পিছনের দিকে তাকাবার জন্য ত্রাউস পুলককে অনুরোধ করল।

আশ্চর্য ওরা দেখছে সেই নারীমূর্তি ওদের উপর যেন ঝুঁকে আছে। এখানে বসলে যে পেছনের

পাহাড়ের আড়ালে সেই বিরাট মূর্তি উঁকি দিয়ে ওদের এই বসে থাকা দেখতে পাবে ওরা ভাবতেই পারেনি।
পুলক বলল, তোমাকে আমাকে পাহারা দিচ্ছে।
পাহারা দেবার কী আছে আমাদেব!
কত কিছু আছে। তুমি জানো সব ব্রাউস। জেনেও তুমি জানো না এমন মুখ করে রাখছ।
আমি তো মরে যাব। এসব জেনে আর আমার কী হবে।
পুলক খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, তুমি কিন্তু ব্রাউস বলেছিলে, কিছুতেই আর এমন কথা বলবে না।
আমার ভুল হয়ে গেছে পুলক।
পুলক আর কোনও কথা বলল না।
আমার সত্যি ভুল হয়ে গেছে।
পুলক এখন সামনের সমুদ্র দেখছে। কিছু সমুদ্রপাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পুলক যেন সমুদ্রপাখি দেখছে।
তোমার অমঙ্গল হবে পুলক। আমি যে কী করে ফেললাম!
পুলক আরও কেমন চোখ-মুখ অসহায় করে রাখল।
পুলক, এখন আমি কী করব? আমি কী করলে তোমার কিছু হবে না?
পুলক ওকে অন্যমনস্ক করার জন্যে বলল, দ্যাখো কত পাখি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।
তোমার মাথায় হাত বেখে আমি শপথ করেছিলাম, আমি এমন আব কবব না।
পুলক ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ব্রাউস পুলকের গালে হাত দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকল।
পুলক বললে, আর বোলো না। তবেই ঠিক হয়ে যাবে। ভুল তো মানুষেরই হয়। যেমন তুমি আজগুবি একটা ভুলের মাশুল গুনছ।
সেটা কী?
সেটা তোমার এই রাত দিন ভাবা মরে যাবে, মরে যাবে।
এটা একটা ভুল ভাবনা আমায় বলছ!
তা না হলে কী!
আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।
কখন হয়?
সন্ধ্যা হলেই। ভয় পেলেই। মৃত্যুর কথা মনে হলেই। সেই ছবির মুখ মনে পড়লে।
আমাদের দেশে মানুষ মবে গেলে তাকে পোড়ানো হয় জানো?
জানি।
যত বীরপুরুষই হোন যে একবার শ্মশানে সেই মানুষের পোড়া বিশীর্ণ মুখ-চোখ দেখবে, ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারবে না। মেজাজটা ভীষণ খারাপ হযে থাকবে। তার জন্য সে যদি ভাবে সে তো মরে যাবে অথবা আমরা যদি ভাবি মরে গেলে এভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, তবে তো আর বাঁচা যায় না।
জানি না পুলক আমার কেন এমন হয়। আমি তোমার পাশে এখন শুয়ে ঘুমোব। আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।
পুলক বলল, আমার হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ো।
ব্রাউস হাঁটুতে মাথা রেখে ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে দিল। ওর পায়ে সাদা রঙের জুতো। হাতে সাদা রঙের দস্তানা ছিল, আংটি দেখাবার জন্য সেই যে খুলে রেখেছে আর পরেনি। দু'হাত সে বুকের কাছে রেখেছে।
তুমি আবার জাহাজ নিয়ে কোথায় চলে যাবে!
তুমি ভাল হলেই দেখবে আবার আমি ফিরে আসব।

সত্যি?

সত্যি।

ব্রাউস এবাব পাগলের মতো লাফ দিয়ে উঠে ওর ঠোঁটে জোরে চুমু খেতে থাকল এবং ক্রমে দু'জন এই পাহাড়ের খাঁজে পৃথিবীর এক নতুন স্বাদ, আহা কী যে সুখ, পবিত্র সুখ এত দিন ব্রাউসেব জন্য অপেক্ষা করছিল! কেমন সুন্দর দৃশ্য এই শবীরে। এত যে ঠান্ডা, পুলক ওভারকোটে ঢেকে, এই ঠান্ডায় পবিত্র এক রমণীয় কামনা-বাসনায় ডুবে গিয়ে ডাকল, ব্রাউস, আবার আমি এ দ্বীপে তোমাব জন্য ফিবে আসব।

কেমন ঘুম আসার মতো চোখে সে ব্রাউসকে বুকের কাছে টেনে নিতে নিতে আবেশে চোখ বুজে ফেলল। আর ব্রাউস ছোট একটা রঙিন পাখির মতো ওর বুকের ভিতর ডুবে যেন সহসা জলের নীচে টুপ করে হারিয়ে গেল। ওরা পরস্পর কেউ আর এখন কোনও কথা বলতে পাবছে না। এত নিবিষ্ট যে মনেই হয না সমুদ্র ওদের সব দেখে ফেলেছে।

সাত

এভাবেই এক ভারতীয় জাহাজি বিকেল বেলা হলে বন্দরে নেমে যেত। ইমাদুল্লা দেখতে পেত মাস্টে একটা পাখি বসেছে। পাখিটা সেই পাখি, যে তার প্রিয় পুরুষ-পাখিটিকে সমুদ্রে হাবিয়ে একা এই জাহাজেব পেছনে পেছনে উড়ে এসেছে। এবং যতদিন জাহাজ থাকবে একবাব এসে এই সমুদ্রপাখিটা এই মাস্টের ওপর কিছুক্ষণের জন্য যেমন বসে থাকে আজও তেমনি বসে থাকল।

এবার আর এই বন্দবে রোদ উঠছে না। এখন তাড়াতাড়ি এ বন্দব থেকে নোঙব তোলা দবকাব। কারণ গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নেমে গেছে। আকাশ সব সময় মেঘাচ্ছন্ন। ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় কেউ আব ডেকেব ওপর উঠতে পারছে না।

এসব দিনেও সেই ভারতীয় জাহাজি রেনকোট গায়ে দিয়ে কোথায যায়। ইমাদুল্লা জানে, সে যায় ব্রাউসেব কাছে। খবব এই যে ব্রাউস পুলককে না দেখে থাকতে পারে না, পুলক ব্রাউসকে না দেখে থাকতে পারে না। কোনটা ঠিক খবর কেউ এ কথা বলতে পারছে না। ফিরতে ফিরতে বাত হয়ে যায় পুলকেব। সে ডেকের ওপরে উঠেই মাস্টের মাথায় পাখিটা বসে আছে কি না লক্ষ কবে। পাখিটা থাকলে সে তাকে প্রথমে উড়িয়ে দেয়। ঝড়ে এই পাখির পুরুষ-পাখিটা সমুদ্রে মবে গেছে। মাস্টে বসে থাকলেই সে যেন টের পায় পাখিটা নিজের জন্য কোনও পুরুষ-পাখি এখনও ঠিক কবে উঠতে পারেনি। পারলে সে মাস্টে এসে বসে থাকত না। সে প্রথম হাতে তালি বাজালেই পাখিটা উড়তে ব্যস্ত করে এবং সেই সব ছোট দ্বীপে, যেখানে পাখিরা এখন ডিম পাড়তে এসেছে, সেখানে চলে যায়। পুলকেব ধারণা ওইসব দ্বীপে না গেলে সে কোনও পুরুষ-পাখি খুঁজে পাবে না।

ইমাদুল্লা টের পায়, এই এল এবাব পুলক। ডেকের ওপর তালি বাজলেই সে টেব পায় পুলক অনেক রাত কবে ফিরে এসেছে।

পুলকেব এত রাত হয়ে যায় কেন একদিন সে এমন জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমার পুবনো সেই সব জাদুর খেলা ওকে দেখাচ্ছি।

ইমাদুল্লার এতদিনে মনে হল, পুলক কিছু জাদুর খেলা জানত। যেমন সে সহজেই এক পয়সাকে দু'পয়সা করে ফেলত। সে নাকে হাত দিলে পয়সা, দেয়ালে হাত দিলে পয়সা, যেখানে সে হাত রাখবে সেখান থেকেই পয়সা উঠে আসবে। খেলাটা সে জাহাজে প্রথম প্রথম দেখিয়েছে' সুতরাং ইমাদুল্লা ভাবল, এখন তবে সে ব্রাউসকে সেসব খেলা দেখাতে রাত করে ফেলেছে।

খ্রিস্টেব কী একটা উৎসব ছিল সেদিন। খেতে বসেছে। সকালেব দিকে সামান্য তুষারঝড় হয়ে গেছে। শহরেব বাগানগুলোতে কিছু কিছু তুষারকণা ঝরছে। গোলাপ গাছগুলোতে একটাও পাতা নেই। সব যেন মরে যাবে। ব্রাউস আবার কেমন দুঃখী মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার সেই বিষণ্ণতা ওর চোখে। এখন

প্রচণ্ড ঠান্ডা বলে কোথাও বের হতে পারছে না। ব্রাউসের বাবা কাল ব্রাউসকে নিয়ে লাইট-হাউজে চলে যাবে। আর দেখা হবার কথা নয়, কারণ সেখানে পুলক এখন যেতে পারবে না। এখন সমুদ্রের জল বরফ হতে মাত্র আরম্ভ করেছে। ওরা বরফ-কাটা জাহাজে যাবে সমুদ্রে। সমুদ্রের জল ভাল করে শক্ত হয়ে গেলে লাইট-হাউজ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে। ব্রাউস চলে যাচ্ছে বলে মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে পারে।

খেতে বসেই সে একটা ঠেলা খেল ব্রাউসের কাছ থেকে। পুলক তাকাল বড় বড় চোখে। তার মতো শক্ত এবং কঠিন মানুষকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে দেওয়ায় সে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকটা লক্ষ করতেই বুঝল, ইলিয়া ঈশ্বরের প্রার্থনা করছে। সে নিচু হয়ে গব গব করে খেতে আরম্ভ করেছিল, ইলিয়ার প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে আব খেতে পারল না। সে মুখে এক টুকরো ভেড়ার মাংস নিয়ে বসে রয়েছে এবং এই টেবিলে সকলে যেমন প্রার্থনা করছে চোখ বুজে সেও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

ব্রাউস ওর এমন ভঙ্গি দেখে না হেসে পারল না। কারণ প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলেও ব্রাউস দেখতে পেল, সে চোখ বুজে আছে। ব্রাউস কনুই দিয়ে আবার ঠেলা দিলে সে ধড়ফড় করে জেগে ওঠার মতো ব্রাউসের দিকে তাকাল।

বস্তুত পুলকের এ সবই কৌতুক। এবং সে আজ এই দিনে কিছু কিছু কৌতুককর হাসি অথবা কথা বলে, যেন আব তো দেখা হবে না, সুতরাং নিজের যা কিছু গুণাগুণ সব ব্রাউসকে দেখিয়ে দেওয়া। সে চলে গেলেই ব্রাউস আবার বিষণ্ণ হয়ে যাবে। সে ব্রাউসকে এত করেও বুঝি ভাল করতে পারল না। বস্তুত ব্রাউসকে ভাল করার চেয়েও ওর কাছে এখন ব্রাউস যদি সামান্য সময়ের জন্য বিষণ্ণ হয়ে যায় ওব ভিতরটা কেমন বেদনায় মুষড়ে ওঠে।

এখন প্রার্থনার সময়, খাওয়ার সময় নয়। প্রার্থনা শেষে খেতে হয়। কনুইয়ের ঠেলায় ব্রাউস পুলককে এমন বোঝাতে চেয়েছিল। কারণ সকলেই যখন ভোজ্যদ্রব্য সামনে রেখে প্রার্থনা করছে তখন তুমি কেন খাচ্ছ! ভোজ্যদ্রব্য বলতে গ্রিনপিজ সেদ্ধ। আস্ত বাচ্চা ভেড়ার রোস্ট। বড় একটা কেক। এবং সুপ জাতীয় কিছু, ডাল অথবা মাংসের ঝোল। এবং সেই খামার থেকে আনা পুরনো সঞ্চিত দামি মদ। পুলক ভেবেছিল, বুড়ি এবার সকলকে খেতে বলছে। সে নিচু হয়ে দু' চামচ গ্রিনপিজ এবং সামান্য পনির সহ নরম রোস্ট থেকে মাংস ছিঁড়ে খাবার লোভে মুখে পুরে দিতেই ব্রাউস ঠেলা দিয়েছিল কনুই দিয়ে। ডেকে বললে অপ্রস্তুত হবে পুলক। সে কনুইতে ঠেলা মেরে সজাগ করে দিয়েছিল। ইলিয়া খেতে বলে নি, এখন প্রার্থনা করতে বলেছে, পুলক ঠেলা খেয়ে এসব টের পেয়েছিল। সুতরাং সে মাথা নিচু করে সাপ যেমন ব্যাং গিলে বসে থাকে তেমনি সে লজ্জায় চোখ-মুখ বুজে বসে ছিল। কিন্তু পরে ঠেলা খেয়ে সে এমন চোখ-মুখ করে তাকাল যে ব্রাউস হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

মিলান টেবিলের ওপাশে খাচ্ছে। সে মেয়ের এই হাসি দেখে ভাবল, যে এমন হাসতে পারে, সে আর বিষণ্ণতায় ভুগতে পারে না। সে পুলককে প্রশ্ন করল, তোমাদের জাহাজ আর কতদিন আছে?

সে বলল, বলতে পারব না স্যার। কবে যে জাহাজ ছাড়ছে কাপ্তানও বলতে পারবে না।

কেন?

এজেন্ট-অফিস থেকে এখন পর্যন্ত খবরই এল না। আমরা এখান থেকে কী নিয়ে কোথায় যাব?

বরফ পড়লে আমাদের লাইট-হাউজে চলে এসো। তুমি যদি অকল্যান্ডের বাসে পিয়াদ্রোতে নামো তবে মাইল পাঁচেকের মতো পথ। বরফ পড়লে হেঁটে মেরে দিতে পারো পথটা।

কিন্তু ব্রাউস বলল, বাবা, ও যদি ঠিক মতো চিনে যেতে না পারে। বরফ যেখানে পাতলা, সেখানটা ভেঙে জলে ডুবে যাবে।

মিলান বলল, তা ঠিক। তুমি সাবধানে যাবে। খুব রিস্কি যাওয়া।

ব্রাউস বলল, না পুলক, তোমাকে যেতে হবে না।

এইটুকু বলতেই ব্রাউসের বুকটা ভীষণ মুচড়ে উঠল। এবং বাবাকে তার কেন জানি আজ বড় স্বার্থপর মনে হল।

আর সেদিনই প্রথম পুলক জাহাজে ফিরেছিল টালমাটাল হয়ে। সে ভীষণ মদ্যপান করে ফিরেছে সে মাস্টের নীচে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকল। ইমাদুল্লা জেগে আছে। কারণ বন্দরে তুষারঝড় আরম্ভ

হয়ে গেছে। এখনও ছোকরাটা ফিরে এল না। সে উঠে গিয়ে দেখল পুলক মাস্টের নীচে চুপচাপ গুঁড়ি মেরে এই ঠান্ডায় বসে রয়েছে। ওর হাত-পা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখে-মুখে কেমন একটা প্রশান্তি ফুটে উঠেছে।

ইমাদুল্লা বলল, এখানে বসে বসে কী করছ?

সে জড়ানো গলায় বলল, পাখিটা মাস্টে আছে, না উড়ে গেছে?

অথবা সে যেন বলতে চাইল, চাচা, আমাকে ওরা একটা পেনি দিয়েছে। সেই পেনিটা ছিল কেকের ভিতর। কেকটা খেতে গিয়ে পেনিটা গলায় কেমন আটকে গেছে। তারপর যেমন আমি ইচ্ছা করলে ওক দিয়ে গলা থেকে পেনি তুলতে পারি, এক পেনি, দু' পেনি, তেমনি করে কেবল সারাক্ষণ আমি খেলা দেখালাম ওক দিয়ে গলা থেকে পেনি তোলার।

ব্রাউস কি হেসেছে!

একটু থেমে ফিসফিস গলায় বলল, আসার পথে দেখি ব্রাউস ওর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। একা। কাছে গেলাম। দেখলাম চোখে জল ব্রাউসের। সে একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জানো চাচা, আমার কান্না-ফান্না ভাল লাগে না। কান্না দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। ওকে হাসাবার জন্য সেই পেনিটা গিলে ফের ওক দিলাম ওর সামনে। ওক দিতেই জিভে পেনিটা। আবার ওক, ফের একটা পেনি জিভে। প্রতি ওকে একটা পেনি, ওর কোঁচড়ে এতগুলো পেনি দিলাম। কিন্তু যাকে কত অবহেলায় হাসিয়েছি, সে আমার পেনির খেলাটা দেখে হাসল না। আরও জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। চাচা, আমি জানো কান্না-ফান্না সহ্য করতে পারি না। তাই একটু খেয়েছি। আচ্ছা, একটু টেনেছি বলে কি দোষ করেছি?

না, কোনও দোষ করোনি। ডেক-এ দাঁড়ানো যাচ্ছে না। দেখছ কেমন তুষারপাত হচ্ছে। বলে ঠেলতে ঠেলতে সে ওকে নিয়ে ফোকশালের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে বলল, তুমি কি মরে যাবে ভেবেছ!

কেন এ কথা বলছ চাচা! আমি মরে যাব কেন?

এই তুষারপাতে কেউ বের হয়? আর ওদেরই বা কী আক্কেল তোমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিল।

ওদের দোষ দিয়ো না মাইরি। ওরা আমাকে জেটিতে ছেড়ে গেছে। ওরা চলে গেলে আমি কী করব ভেবে পেলাম না। জানো, ব্রাউস কাল ওর বাবার সঙ্গে লাইট-হাউজে চলে যাচ্ছে।

ইমাদুল্লা কথা বলছে আর ওর জামাকাপড় খুলে দিচ্ছে। ভিতরে এখন প্রত্যেক ঘরে ইলেকট্রিক হিটার জ্বালানো। সুতরাং পুলককে একেবারে নাঙ্গা করে দিল ইমাদুল্লা। তারপর ওর পাজামা, একটা গেঞ্জি, ফুলহাতা ফ্লানেলের জামা গায়ে দিয়ে ওর বাংকে শুইয়ে দিল। অন্যান্য জাহাজিরা এসে ভিড় করেছিল, কিন্তু ইমাদুল্লার এক ধমকে যে যার ফোকশালে চলে গেল।

সারারাত বন্দরে তুষারঝড়টা ছিল। ভোরের দিকে তুষারঝড়টা আর থাকল না। এখন ক্রমে বরফ পড়ছে। সমুদ্রের জল পর্যন্ত বরফ হয়ে যাবে। এজেন্ট-অফিস থেকে কী মাল বোঝাই হবে কোনও খবরই দিচ্ছে না। এবং যেভাবে তুষারঝড় শেষে বরফ পড়তে শুরু করেছে তাতে করে এই বন্দরে অনেকদিন আটকা পড়ে থাকতে হবে। বিকেলের দিকে পুলক কোত্থেকে একটা স্কিপ নিয়ে জাহাজের পাশাপাশি ভিড়িয়ে দিল। সে ডাকল, ইমাদুল্লা চাচা, দ্বীপে যাবে?

ইমাদুল্লা রেলিং-এ উঁকি দিল ডাক শুনে। কে ডাকছে। এখন আর তুষারঝড় হচ্ছে না। বাইরে বের হওয়া তেমন কষ্টকর নয়। সে উঁকি দিতেই দেখল পুলক জাহাজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডেকের ওপর থেকে বলল, কোথায়?

লায়ন রকে।

কেন?

পাখিটা আর জাহাজে আসছে না। পাখিটা কেমন আছে দেখতে যাব।

পাখি দেখার তোমার এত গরজ কেন বাপু বুঝি না।

তুমি না গেলে আমি একাই যাব। দেখে আসি পাখিটা কেমন আছে।

লায়ন রক তো অনেক দূরে।

বোটে যেতে হাফ অ্যান আওয়ার।

সে কম করেই বলল, যেন সে এখন এ বন্দর সম্পর্কে ইমাদুল্লার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে,

এক-দেড় ঘণ্টার আগে যেতে পারবে না।

তা লাগলে আর করার কী আছে? তোমার সেই যে ডিভাইন লেডি। ডিভাইন না ছাই। দু' ঠ্যাংয়ালা একটা গাছের মতো।

ইমাদুল্লা দেখল, একদিনে পুলক কেমন একটু বেয়াড়া হয়ে গেছে। এ সময় সমুদ্রের অবস্থা ঠিক থাকে না। কোথাও বরফ ভাসতে পারে। এবং বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। জীবন বিপন্ন করে কী দরকার যে যাওয়ার বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল, পুলক, তুমি মরে যাবে। এখন সমুদ্র ভয়াবহ। কখন কী হবে বলতে পারো না।

সে কোনও কথাতেই আর কর্ণপাত করল না। বিকেল হলেই ছুটি। কাজ নেই একেবারে জাহাজে। সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কারও দেখার নেই। সে কাজের সময় উপস্থিত থাকলেই হল। সুতরাং ইমাদুল্লা কিছু বলতে পারল না। একবার ভাবল, ত্রাউসের কাছে যাবে কিন্তু ত্রাউসও নেই। সে তো বরফ কাটা জাহাজে আজ সকালে লাইট-হাউজে চলে গেছে।

আট

পুলক খাঁড়ি থেকে একটা স্কিপ ভাড়া করে নিল। সে আজ একা। সেদিন ত্রাউস ওর সঙ্গে ছিল। অথচ ত্রাউস্ নেই। বরং সেই দ্বীপে গেলে লাইট-হাউজটা দেখা যায়। সে মেজ-মালোমের কাছ থেকে দূরবিনটা চেয়ে নিল। অর্থাৎ এই যে ছুটির দিন, এই ছুটির দিনে যে কী করে সেই দ্বীপে যাওয়া যায় এবং গিয়ে অনেক দূর থেকে দূরবিনে ত্রাউসের মুখ অথবা সেই পাখিটা, যা ছিল এতদিনের নিত্য সহচর। অর্থাৎ পাখিটা প্রথম জাহাজে এসেছিল তার পুরুষ-পাখিটাকে নিয়ে। তখন ঝড় সমুদ্রে। সে তার পুরুষ-পাখিটার সঙ্গে এসেছিল। পুরুষ-পাখিটা খুব সম্ভবত রুগ্ন ছিল, উড়তে পারত না, তাকে প্রায় সময় মাস্টে বসে থাকতে দেখা যেত। এবং মেয়ে-পাখিটা জাহাজের চারপাশ থেকে অথবা সমুদ্রের ঢেউ থেকে ছোট ছোট ফ্লাইং ফিশ ধরে আনত। এবং মাস্টে বসে দু'জনে বেশ খেত। অথচ এত করেও একদিন দেখা গেল পাখিটা বেঁচে থাকল না। সকালে সবাই দেখল মাস্টের নীচে পুরুষ অ্যালবাট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে।

এবং এভাবে এক মায়া, মায়া বেড়ে যায়। জাহাজিদের নিঃসঙ্গ সমুদ্রযাত্রায় পাখিটা অদ্ভুত এক প্রিয়জনের ভূমিকা নিল। জাহাজিদের কাজ থাকে না ওয়াচের পর। ওরা পাখিটাকে তখন খাওয়াতে ভালবাসত। নানারকমের ফলমূল, কখনও মাংস এবং মাছ পাখিটার জন্য মাস্টের গোড়ায় রেখে দিলে সে ঠিকঠাক খেয়ে যেত। পাখিটা উড়ে আর সমুদ্রে যেত না। মাঝে মাঝে জাহাজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নীল জলের ওপর এক মায়াবী খেলা সৃষ্টি করত।

পাখিটার জন্য পুলকেরও ভীষণ মায়া ছিল। সে তো পাখিটাকে যেন আলাদা করে ভাবত না। পাখিটা তার কাছে নন্দিনীর মতো অসহায় ছিল। অথবা ওর মনে হত বেশ হয় যদি সে পাখিটার ডানায় এক টুকরো কাগজ আটকে দেয় এবং লিখে দেয়— নন্দিনী, আমার এ ভালবাসা নিরন্তর সুষমা বয়ে বেড়ায়। এখন সে পাখিটাকে পেলে যেন আরও লিখে দিত, ত্রাউস বড় সুন্দর নাম।

ত্রাউস লাইট-হাউজে চলে যাবার পর তার কিছুই ভাল লাগছিল না। সে কেমন একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। কাপ্তান অথবা মেজ-মালোমকে সে ভয় পাচ্ছে না। মেজ-মিস্ত্রিকে সে কেমন একটু অবহেলা করছে। কারণ ওর এভাবে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। তবু সে ছোট এবং কমবয়সি বলে তাকে নানা ভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু সে যেন বড় বেশি সুযোগ নিয়ে ফেলছে। নিজের মনেই সে কেমন সামান্য নিজেকে অপরাধী ভাবল।

পুলকের বোট ছিল সাদা রঙের। দুপুরের দিকে যে গুঁড়ি-গুঁড়ি তুষারপাত ছিল, এখন সেটা নেই। এই দু'দিনেই কেমন সমুদ্রের চেহারা পালটে গেছে। মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফেনার মতো ঢেউ উঠছে।

অথচ সাদা ভাবটা ভেঙে যাচ্ছে না। এবং ক্রমে এরাই জমতে জমতে বরফ হয়ে যাবে। কিনারে যেসব গাছপালা আছে সব ক্রমে কেমন নেড়া হয়ে গেল। আশ্চর্য ঝোড়ো হাওয়া আর বড় বড় ঢেউ। ওর স্কিপটা জাহাজ থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ইমাদুল্লা জাহাজে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে রেলিং-এ ঝুঁকে আছে। স্কিপটা বেশ এঁকেবেঁকে ঢেউয়ের মাথায় একবার হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। এখনও এসব অঞ্চলে চোরাস্রোত সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে ওঠেনি। ভয়ংকর সব চোরাস্রোত। এই সব চোরাস্রোতে পড়ে গেলে সাধ্য কী পুলক স্কিপের স্টিয়ারিং ঠিক রাখে। চোরাস্রোত সম্পর্কে ওকে কিছুটা যেন বলে দেওয়া উচিত ছিল।

ঝোড়ো বাতাসের জন্য ইমাদুল্লা বেশি সময় ডেকে দাঁড়াতে পারল না। জাহাজে এখন তেমন কোনও কাজ নেই। জাহাজের যা কিছু রং করা বাকি ছিল, এই যেমন ডেক, মেসরুম, ফরোয়ার্ড-পিকের চার নম্বর ডেরিক, সবই রং করা হয়ে গেলে বাকি থাকে শুধু সব দড়াদড়ি তুলে রাখা। এখন জাহাজিরা আফটার-পিকে সব দড়াদড়ি বাঁধছে। ওয়ার পিন ড্রামের হাসিল পালটে দিচ্ছে। কাজ না থাকে তো খই ভাজা। এমনই একটা ব্যাপার এখন জাহাজে চলছে। অথচ জাহাজটা কেন যে বন্দর ছাড়ছে না বোঝা যাচ্ছে না। যেভাবে ক্রমে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাতে কবে বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল। তবে কি কাপ্তান খবর পেয়েছে, সমুদ্রে এক ভয়ংকর সাইক্লোন ওঠার সম্ভাবনা আছে। সব না দেখে জাহাজ ছাড়া ঠিক হবে না।

ইমাদুল্লা এবার সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এল। ওর ফোকশাল থেকে পোর্ট হোল দিয়ে সমুদ্র তেমন ভালভাবে দেখা যায় না। তবু সে অবাক, পোর্ট-হোলের নীল কাচে বিন্দুমতো একটা সাদা রঙের দৃশ্য ভাসতে দেখল। প্রথম সে বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। সমুদ্রের জল নীল বলে কাচটা কেমন সব সময় নীল রঙের হয়ে থাকে। সেখানে সাদা এই বিন্দু কী ভাসছে। সে কাছে গেল। হাত রাখল। এবং আশ্চর্য সে দেখল, অনেক দূরের পুলকের সাদা রঙের বোটটা এখনও এই পোর্ট হোলের কাচে ছায়া ফেলছে। অনেক দূরে অথচ ছায়া, কেমন মায়া বেড়ে যায় এভাবে তার। পুলকের জন্য সে আশ্চর্য এক বেদনায় এখন ভার করে রাখে। ব্রাউসের ভালবাসায় ছেলেটা কেমন হয়ে গেল।

এবং এভাবে ইমাদুল্লা জানে জাহাজি মানষের অনেক দুঃখ। এভাবে একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রার পর ঘরের কোনও ছবি, আপেলের গাছ, সূর্য ওঠা পাহাড়ের ওপর, জাহাজিদের পাগল করে দেয়। আর এ তো মেয়ে। আশ্চর্য নাম, ব্রাউস। লম্বা। হাত-পা লাবণ্যে ভরা। নীল চোখ। সোনালি রঙের চুল। চোখে মায়া। চোখ খুব খুলে তাকায় না ব্রাউস। মুখ নিচু করে বসে থাকার অভ্যাস। এমন এক মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে পুলক। কেমন একটা ভয় এখন ইমাদুল্লাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই যে ওর যাওয়া, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো দ্বীপে দ্বীপে, সবটাই কেমন যেন পুলক আবেগের বশে করছে। জাহাজিদের এই আবেগ ভাল না।

এই আবেগ জাহাজিদের ভাগ্যে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দেয়। যেমন এই পুলক এখন ইচ্ছা করলে এমন সব অঘটন ঘটাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে যে সামান্য মৃত্যু বড় তুচ্ছকর ঘটনা। সে যাচ্ছে শায়ন রকে। সেখানে লালবর্ণের পাথর। এবং উঁচু নিচু দ্বীপে নানারকম পাখির বাস। সে যাচ্ছে এই মাস্টে বসে থাকা পাখিটার অনুসন্ধানে। ওটা কোনও ঘটনাই নয়। কারণ সে জানে এই যে পুলক বের হয়ে গেল, দ্বীপে যাবে বলে চলে গেল, সেটা শুধু ব্রাউসকে দেখবে বলে। সে যদি সেই দ্বীপে নেমে ওঠে ব্রাউসের বাবা যে দ্বীপে থাকে সেটা সে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে যদি দক্ষিণের দিকের দ্বীপটায় হেঁটে হেঁটে চলে যায় তবে খুব কাছে চলে যাবে। এবং খাড়া পাহাড়ের উত্তরের দিকটা তবে খুব চোখে পড়বে।

ইমাদুল্লা বুঝতে পারল না পুলক সোজাসুজি ব্রাউসের দ্বীপে চলে যাচ্ছে না কেন। কেউ তো ওকে বারণ করেনি। সে তো অনায়াসে চলে যেতে পারে। পাখি দেখার নাম করে যাবার কী দরকার?

কিন্তু ইমাদুল্লা জানে না, এক ভীষণ অভিমান পুলককে কেমন খাপছাড়া করে দিচ্ছে। ব্রাউসের সোজাসুজি বলা, না পুলক তুমি যাবে না, এই যে তারা তোমাকে যেতে বলছেন, এটা ঠিক না, বাবা তোমার কথা কিছু বিবেচনা করছেন না, বাবা কেবল তাঁর মেয়ের দিকটা দেখছেন, তিনি জানেন, তুমি গেলেই আমি ভীষণ খুশি থাকব, তিনি জানেন তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে তার লাভ, এমনকী আমার

ভয় হয়, বাবা তোমাকে কোথাও নিয়ে রেখেও দিতে পারেন, বাবা যে এখন কী পারেন না ভাবতে পারছি না, তিনি তোমার চেয়ে আমার কথা বেশি ভেবেছেন, বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি অনায়াসে আসতে পারবে দ্বীপে, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হলে অর্থাৎ, এমন সব পাতলা আবরণ থাকে বরফের বোঝাই যায় না, পা দিলে পাতলা কাচের মতো মুড়মুড় করে ভেঙে যাবে এবং নীচে ডুবে গেলে চোরাস্রোত, তুমি যে সমুদ্রের ভিতর কোথায় হারিয়ে যাবে কেউ জানবে না। পুলক তুমি এলে এভাবে এলে আমি বড় দুঃখ পাব।

তখন মেয়েটা পুলককে অত কিছু বলেনি, শুধু বলেছে, তুমি আসবে না পুলক। পুলক সেজন্য চেষ্টা করে এমন একটা দ্বীপের কাছাকাছি থাকবে যেখান থেকে চুরি করে ব্রাউসকে দেখা যায়।

পুলক এবার পিছন ফিরে তাকাল। সে আর তার জাহাজের মাস্তুল দেখতে পাচ্ছে না। সে এখন বুঝতে পারছে বেশ দূরে চলে এসেছে। লায়ন রক এবং পাশাপাশি দ্বীপগুলো ক্রমশ বড় লাগছে এদিকটাতে বরফ জমছে না। কিনারায় সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে জমে যাচ্ছে। এবং এই সব পাশাপাশি দ্বীপগুলোর চারপাশে বরফ জমে থাকতে পারে। কী ঠান্ডা! সে হাতে দস্তানা পরেছে। সাদা চামড়ার দস্তানা। মাথায় মাংকি ক্যাপ। এবং লম্বা ওভারকোট। পায়ের নীচে সালদেরাজ। সাদা রঙের মোজা আর সাদা রঙের জুতো। তারপর গামবুট নিয়েছে। প্রয়োজন হলে বরফেব ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় অথবা দ্বীপে যদি কোথাও কোনও জলাভূমি থাকে সে সেসব অনায়াসে পাব হয়ে যাবে।

সে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে রয়েছে। প্রায় মোটর-বোটটা রাজহাঁসের মতো সমুদ্রের জল কেটে উড়ে যাচ্ছে। কিছু সমুদ্র-পাখি ওর বোটের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। লেগুনের দু' পাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। যত সমুদ্রের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, তত দু'পাশের পাহাড় নানারকম গাছপালা নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। বেশ লাগছিল পুলকের। পাখিটার নাম করে সে বের হয়ে পড়ল। চারপাশটা ভীষণ নির্জন কেবল মোটর-বোটের একটা বিশ্রী শব্দ। বরফ পড়বে বলে অথবা তুষারপাতের সময় ভেবে মানুষেরা খুব একটা কেউ আর বোটে সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে যাচ্ছে না। সে যাচ্ছে, কারণ তার সব বলতে নন্দিনী নামের মেয়েটি কোনও এক আশ্চর্য সকালের মতো তার কাছে আবার এসে যেন হাজির। ব্রাউসকে সে কেন জানি পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে ভেবে ফেলেছে।

সে যখন দ্বীপটায় ঢুকে গেল তখন সূর্যাস্তের সময়। সকাল-সকাল সূর্যাস্ত হচ্ছে। এখানকার বিকেল বেশিক্ষণ থাকে না। অথবা সকাল শেষ হলেই বিকেল আরম্ভ হয়ে যায় এমন ভাব। সূর্য দিগন্তরেখায় ঘুরে ঘুবে অস্ত গেলে একটা অদ্ভুত আলো, এবং স্নিগ্ধ ভাব এই দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে থাকে। পুলক বোট একটু ওপরে তুলে ফেলল। চারপাশটায় সমুদ্রের স্রোত ঘুরে ঘুরে নেমে যাচ্ছে বলে জল জমতে পাবেনি। অথবা এ অঞ্চলে কোথাও উষ্ণপ্রবাহ আছে সমুদ্রের, যা কোনও কোনও দ্বীপের চারপাশটাকে সব সময় নীল করে রাখে। যত ঠান্ডাই নেমে আসুক না কেন কখনও কেউ এসব দ্বীপের চাবপাশটায় বরফ জমতে দেখবে না। বোধহয় এই দ্বীপটাও তেমন কিছু একটা হবে। এমন সব গাছ রয়েছে দ্বীপে যে সে হেঁটে যেতে গেলে গাছগুলো ওর কোমরের নীচে পড়ে থাকে। কোথাও সে একটা বড় গাছ দেখতে পেল না। দ্বীপে গেলেই হাজার হাজার পাখি ওর মাথার ওপর উড়তে লাগল। ওরা টের পেয়েছে, এই সব মানুষের অপোগণ্ড এসে ওদের ডিম চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু তুষারপাতেব সময় ওরা ডিম প্রসব করে না বলে এখন পাখিরা তেমন ভয়াবহ নয়। অন্য সময় হলে ওরা ওকে তাড়া পর্যন্ত কবত।

তারপর সে সামনের দুটো ছোট ঢিবি পার হয়ে গেলে দেখল, পাখিগুলো আবার যার যার আস্তানায় ফিবে গেছে। সে দু'পাশেই বাসা দেখতে পাচ্ছে। বাচ্চা পাখিগুলো পাথরের খাঁজ থেকে ছোট ছোট গর্ত থেকে মুখ বের করে ওকে দেখছে, সে পাখিদের এমন আস্তানা কখনও দেখেনি। সব গোল বালির গর্ত। নানাবর্ণের নুড়ি পাথর এবং কিছু খড়কুটোয়। আর এমনভাবে খড়কুটোগুলো ভাঁজ করা যে দেখলে মনে হবে ঠিক পাটি বোনার মতো বোনা।

কিন্তু যা পুলককে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করল, এই সব পাখিরা কোথায় যে মলমূত্র ত্যাগ করে কোনও মলমূত্রের গন্ধ সে পেল না। মনে হয় ভীষণ পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। কেউ ধুয়ে মুছে রেখে গেছে তারপর সে আরও কিছু দূর হেঁটে গেল, দেখল একটা সমুদ্রের ভীষণ পাতলা ঢেউ এই দ্বীপের ওপর

দিয়ে ক্রমে ভেসে যাচ্ছে। ওর পায়ের পাতা ভিজে গেল। পাখিগুলো কী করে যে টের পায় এসব, সে জানে না। সব পাখিরা নিমেষে হাওয়ায় পাখা গ্লাইড করতে থাকল। ছোট ছোট পাখিরা, যাদের ওড়বার বয়স হয়নি, ওদের জন্য প্রত্যেক বাসার কাছে একটা হাঁটু সমান পাথর। জলটা উঠে এলেই ছোট ছোট পাখিরা কোনওরকমে উড়ে গিয়ে পাথরটায় বসে পড়ে। যখন শীতকাল তখনই হয়তো এমনটা ঘটে। সে ভাবল, ইমাদুল্লা চাচাকে বলে সব জেনে নেবে। এবং সেই জল ওদের মলমূত্র ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়।

এখন পুলক আর কিছু ভাবছে না। সে যাবে দক্ষিণের দ্বীপটাতে। সেখানে গেলে সে লাইট-হাউজের আলো পড়ছে সমুদ্রে, দেখতে পাবে। এখন সূর্যাস্তের সময়। এখন ত্রাউসের বাবা আলো জ্বালবে না। আর একটু পরে হয়তো সে এ পাহাড় থেকেই ডায়নামোর শব্দ পাবে, খুব নির্জন বলে, সমুদ্রের শোঁ শোঁ বাতাস, এবং তুষারপাতের জন্য পাতলা মেঘেরা পর্যন্ত আকাশের নীচে নেমে আসতে পারছে না, তখন সে শুনতে পাবে অনেক দূর থেকে মৃদু একটা শব্দ, প্রায় কম্পনের মতো ব্যাপারটা, সে টের পাবে এখন সিঁড়ি ধরে ত্রাউসের বাবা ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠিক ঠিক আলো ফেলছে কি না, অথবা কোনও গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখা দিলে যে ভয়াবহ কঠিন মুখ ত্রাউসের বাবা করে রাখবে, সেটা যেন সে এখানে দাঁড়িয়েও টের পাবে।

পুলক যেতে যেতে একবার সেই পাখিটার নাম করে ডাকল। কারণ জাহাজে ওরা পাখিটার একটা নাম দিয়েছিল। যেমন সবারই জাহাজে কোনও না কোনও নাম থাকে, তেমনি পাখিটারও একটা নাম ছিল। পাখিটাকে ওরা ডাকত কপিলা বলে। বাঙালি জাহাজিদের দেওয়া নাম সাহেব-সুবো অফিসারেরা ধরতে না পারলে ওরা সবাই মিলে কপিলা মানে কী ইংরেজিতে তার কী ব্যাখ্যা করা যায়, এমন একটা সমস্যায় পড়ে গেলে একসময় সবাই সমুদ্রের নিকষ ঘন কপিশ রঙের মেঘ দেখে যেন মানেটা ধরতে পেরেছিল। কেউ আর শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। সবাই একসঙ্গে জাহাজ থেকে ডেকে উঠেছিল— ক... পি... লা। একসঙ্গে এমন শব্দের এক উচ্চারণ সারা জাহাজময় ডেকময় এবং সমুদ্রে আশ্চর্য ভালবাসা নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। এখন যেন তেমনই তেমনই একটা গভীর রং অর্থাৎ সে যদি জোরে ডেকে ওঠে— ক... পি.. লা, সেই এক নিদারুণ দুঃখ এবং বেদনার কথাই ধরা পড়বে। পুরুষ-পাখিটার জন্য কপিলার সেই বড় বড় চোখ এবং বিষণ্ণতা এখনও যেন ধরতে পারে। এবং নিজের ভিতর তেমন এক দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকলে গভীরে ডুবে যেতে সব সময় ভাল লাগে। সে এই যে জোরে জোরে ডাকছে— ক... পি... লা, এই যে দ্বীপের ভিতর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে ক. . পি...লা, ক... পিলা, সারা দ্বীপময় এক করুণ চেনা শব্দ— ক... পি.. লা, এবং কোথাও সাড়া নেই যার, কারণ পাখিটাকে জাহাজে নাম ধরে ডাকলে কাছে আসত, ডাকত, অর্থাৎ কথা বলার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, এখন তার এতটুকু আভাস নেই। সে ভেবে পেল না কেন এমন হয়, পাখিটা হয়তো ভয়ে ডাকতে পারছে না, ওর পুরুষ-পাখিটা তাকে ধমক দিচ্ছে এবং এভাবেই সারা দ্বীপময় এক মেয়ে, নাম যার নন্দিনী এবং যে শৈশবে ছিল তার একমাত্র সঙ্গী, ভালবাসার মানেটা তখনও স্পষ্ট নয়, অথচ একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার ভিতর আশ্চর্য এক ভালবাসার সুষমা আছে, যা ধরা যায় না, অথচ ছোঁয়া যায়, এমন সুষমার ভিতর সে এখন পাখিটাকে দেখতে চায়।

আর তখনই দেখল দ্বীপের শেষে সেই লাইট-হাউজের পাহাড়। পুলক দেখল, সমুদ্র থেকে খাড়া পাহাড়টা উঠে গেছে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছে এবং এদিকটা খুব উঁচু বলে সে নীচ থেকে দেখতে পায়নি, সামনের কিছুটা বনঝোপ এবং টিলা পার হলেই ফের সমুদ্র, সমুদ্রের ওপাশে একটা পাথরের দেয়াল একেবারে খাড়া অনেক ওপরে উঠে গেছে। এমনকী সেই পাহাড়ে এতটুকু খাঁজ নেই যে একটা সমুদ্রপাখি যেখানে বাসা বানাতে পারে। সে তার জায়গা থেকে এতটুকু নড়তে পারল না।

পৃথিবীতে এমন সব সুন্দর জায়গা ঈশ্বর সৃষ্টি করে রেখেছেন! এখানে সে সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ দেখতে পেল না। ইচ্ছা করলে সে সাঁতরে যেন সামনের পাহাড়টায় উঠে যেতে পারে। সে চারপাশটা ভাল করে দেখছে, বাঁ দিকে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে কোনও গাছপালা নেই। কেবল বালি। এবং বালির সঠিক কী রং ধরা যাচ্ছে না। কারণ বালি, গাছপালা এবং দ্বীপের সব স্বাভাবিক রং এই সূর্যাস্তে এখন স্বপ্নবৎ দেখতে। অথবা সে যেন কোনও রঙিন ছায়াছবির নায়ক। সে এই দ্বীপে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর সে আর যা দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। সে সেদিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে যতটা কাছে মনে হচ্ছে পাহাড়টা ওপরের দৃশ্য দেখে, তত কাছে নয় পাহাড়টা, বরং বেশ দূর। সে চোখে এবার দুরবিনটা তুলে ধরল। ঠিক, যা আন্দাজ করেছে তাই।

নয়

এভাবে একটা রাত কেটে গেল ব্রাউসের। ভাল ঘুম হয়নি রাতে। বাবা বুঝতে পারছিলেন, ব্রাউস সারারাত ঘুমোয়নি। কেমন কেবল এপাশ-ওপাশ করছে। মাঝরাতে বাবা উঠে একবার ব্রাউসের শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ব্রাউস এপাশ-ওপাশ না করে খুব ভাল মেয়ের মতো ঘুমের ভান করে থেকেছে। কারণ সে চায় না তার জন্য বাবা কোনও কষ্ট পাক। সে যদি না ঘুমোয়, বাবা চিন্তা করবে। বাবার চোখ মুখ দেখলে সে সকালে টের পায়, বাবা ভীষণ কিছু ভাবছে। সে বাবাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। কিন্তু তারপরই মনে হল বাবাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসলে কাল রাতে সে ঘুমোতে পাবল না কেন? বাবা ওর শিয়রে এসে দাঁড়ালে ওকে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হল কেন? সে তখন কেমন উদাস হয়ে যায়।

এবং এই উদাসীনতা সে টের পায় জীবনের পক্ষে খুব খারাপ। আজ আর অন্যদিনের মতো সে বাগানের ভিতর হেঁটে বেড়ায় না। রেলিং-এর ধারে এসে ফুলের সব গাছপালায় কী সব নূতন কুঁড়ি এসেছে সে আজ খুঁজে দ্যাখে না। বারান্দার ডেক-চেয়ারে চুপচাপ কেবল বসে থাকতে ভাল লাগে।

বাবার ডিউটি সকাল ছ'টায়। বাবা যখন বের হয়ে গেছেন তখন অন্ধকার ছিল। এখন এখানে সকাল হতে সাড়ে আটটা। তখন দিগন্তে কিছুটা চাঁদের ফ্যাকাসে আলো নিয়ে সূর্য উঠে আসে। মনে হয় শীতের জন্য সূর্য ঠিক কিরণ দিতে পারছে না। এবং কখনও সূর্যের উত্তাপ আছে বোঝা যায় না। বাবা আসবেন ন'টায়। তখন ঘণ্টাখানেকের মতো টিফিন। বাবা এসেই খুব তাড়াতাড়ি প্যানট্রিতে ঢুকে যাবেন। বেসিনে সব কাপ-প্লেট ধুয়ে সামান্য মারমেলেডের সঙ্গে রুটি, কিছু গ্রিনপিজ সেদ্ধ এবং দুটো বিস্কুট— এই দিয়ে টিফিন। একটা আপেল, কিছু আঙুর থাকবে সঙ্গে। বেশ এই দিয়ে ওদের টিফিন হয়ে গেলে আবার এই কোয়ার্টারে কেমন নির্জনতা। এখানে এসে ওর ভাল লাগছে না। সে ইচ্ছা করলে দিদিমার কাছে থাকতে পারত। কিন্তু সে টের পায় বাবা ওকে ছাড়া থাকতে পারে না বেশিদিন। ছুটি নিয়ে বাবা চলে যান তাঁর কাছে।

সে এখন ভীষণ একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। ওদের কোয়ার্টার পার হলে বোসানদের কোয়ার্টার এবং পরে চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো। বাংলোটা খালিই পড়ে থাকে সবসময়, তিনি মাঝে মাঝে ইন্সপেকশানে এলে এখানে ওঠেন। ব্রাউসের জন্য তিনি মাঝে মাঝে অন্তত সব লতানে গাছের চারা নিয়ে আসেন। তখন ব্রাউস খুব লতাপাতায় অথবা গাছে ফুল ফুটানো পছন্দ করত। এখন সেসব তার ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগছে না। এক দিনেই তার মনে হয়েছে অনেক দিন হল এখানে এসেছে। কেমন একা-একা ভাব। এই পাহাড় এবং দ্বীপ তার একসময় কী ভাল লাগত! অথচ অসুখটা তাকে আক্রমণ করলে সে কেমন হয়ে গেল। তখন পৃথিবীর যাবতীয় মায়া তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। আবার একটা মায়া ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল প্রাণে। সেটা যে কেন সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে ক্রমে আবার কোথাও যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

ব্রাউস দেখল বাবা পার্লারে ক'টা গোলাপ ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে। তুষারপাতের সময় গোলাপের রং ঠিক থাকে না। কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। এবং পাপড়ি ঝরে যাচ্ছিল। এবার বোঝাই যায়. সে যেমন শরীরের ভিতর এক আশ্চর্য শীতলতায় ভুগে ভুগে মরে যাবে, তেমনি এই গোলাপ গাছগুলো। সবই নেড়া নেড়া। বাবা মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন প্যানট্রি থেকে। সে বুঝতে পারছে বাবা যতক্ষণ থাকবেন ঠিক এভাবে কথা বলে যাবেন।

বুঝলে ব্রাউস, বিকেলে তোমাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাব।

বারান্দায় ব্রাউস মাথায় হাত রেখে নীচের সমুদ্র দেখছে। সেখানে কেউ নেই। ঠান্ডা বলে কেউ

জমে যাচ্ছে না। বারান্দা চারপাশটা কাচে ঢাকা। কাচে এখন নানারকমের নকশা তৈরি হবে। যত শীত পড়বে, ঠান্ডা বাড়বে, তত কাচে বরফ জমে ছোট ছোট লতাপাতায় গাছ তৈরি হবে। এবং এটা একটা খেলা ছিল ত্রাউসের। সে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কাচ থেকে সব লতাপাতা তুলে ফেলত অথবা মুছে দিত। আবার সকাল হলে সে দেখতে পেত কারা সব একদল ভেড়ার পাল কাচের ভিতর ছবির মতো এঁকে দিয়ে গেছে। সে আবার মুছে দিত, সেখানে সে ফের পরদিন দেখত একটা ছোট্ট পাহাড়ের ছবি। এভাবে সারাটা শীতের সময় যখন কেবল বরফ জমে আছে, চারপাশটা কী আশ্চর্য সাদা এবং গাছে একটা পাতা নেই, তুষারপাতের রিনরিন শব্দ, তখন সে এই দ্বীপটায় একটি সোনালি রঙের ফ্রক গায়ে দিয়ে স্কি করে বেড়াত। তার কাছে সারা দ্বীপটা বরফ পড়ে তখন মায়াবী এক দেশ। সে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে, এ উপত্যকা থেকে সে উপত্যকায় ঘুরে বেড়াত। এবং কখনও দিগন্তরেখায় পলাতক সূর্যের আলো এসে সহসা উঁকি মারলে, নীল জলের চারপাশে একটা রুপোলি রাজকন্যার দেশ যেন। সে, তার বাবা, বোসান, তার মা বাবা এ রাজ্যের নিবাসী। আর আছে এক বুড়ো। সে এখান থেকে কোথাও যায় না। তার কাজ নেই। তবু সে কাজ করে।

কারণ এই বুড়োর সারাটা জীবন এই দ্বীপে কেটে গেছিল। তার বাবা-মা এসেছিল লাইট-হাউজের কিপার হয়ে। মা-বাবার পর সে এবং তার স্ত্রী। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার ফাঁকে এখানে আসত। এবং ছুটি কাটিয়ে আবার চলে যেত। এভাবে দিন গেলে বুড়োর বয়স বাড়ে। ছেলেমেয়েরা বিয়ে-থা করে আর আসে না। স্ত্রী মারা গেছে সমুদ্রে ডুবে। এটা কি আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা? বুড়ো বোধহয় এখনও সেটা আবিষ্কার করতে পারেনি। ওকে সকাল হলেই দেখা যাবে হাতে লাঠি, সে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কখনও সে একটু প্যান্ট তুলে জলের পাতা ভিজিয়ে বালিতে হেঁটে হেঁটে যায়। দেখলে মনে হবে সে এবং আর-একজন পাশাপাশি হাঁটছে। বুড়োর চোখে-মুখে তেমন একটা ভাব থাকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় সে কথা বলছে, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে। বোঝা যায় বুড়োর এটা স্বভাব। সে হাঁটতে হাঁটতে তার স্ত্রীর সঙ্গে বলছে। অনেক ভালমন্দ কথা, ভালবাসার কথা। বুড়োর সব জানা আছে এই লাইট-হাউজ সম্পর্কে। ত্রাউসের বাবা অথবা বোসানের মা-বাবা কেউ ঠেকে গেলেই বুড়ো লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। দুটো নাট-বোল্ট ঠেলে ঠেলে জেনারেটরের ভিতর কী উঁকি দিয়ে দেখে তারপর প্যাঁচ টেনে দিলেই গড গড় করে মোটরটা ঘুরতে থাকে। এক-এক সময় ত্রাউসের বাবা অথবা বোসানের মা-বাবা ভাবত, ওটা বুড়োরই কাণ্ড। বুড়ো ওদের বেকায়দায় ফেলার জন্য রাতে চুরি করে ওপরে উঠে যায় এবং কোথায় কী করে আসে। এখন আর তারা তেমন ভাবে না, কারণ মনে হয় কোথাও একটা ভুতুড়ে ব্যাপার আছে এই দ্বীপে, সেজন্য মাঝে মাঝে সব অন্ধকার হয়ে যায়। তখন কী ভয় সবার! দ্বীপের ওপাশটায় একটা যেন আলো দেখা যায়। সমুদ্রস্রোতে ফসফরাস ভেসে আসতে পারে, ফসফরাস ভেসে এলেও এতটা আলো হওয়া স্বাভাবিক না, ফসফরাসে কোনও কেমিকেল মিশে কিছু একটা হয়ে থাকতে পারে, বুড়োটা তখন একমাত্র হাসতে হাসতে সব ঠিক করে দেয়। স্বাভাবিক করে দেয়।

বুড়োটার সেজন্য ওদের ঘরে বাঁধা বরাদ্দ। ও ত্রাউসের বাবার কাছে, বোসানের মা বাবার কাছে এক বেলা করে খেতে পায়। সেই বুড়োটার জন্যও ত্রাউসের একটা মায়া ছিল। সে-ই দ্বীপটা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানে। কোথায় কোন পাথরের খাঁজে কী চার ফেলে রাখলে কী মাছ উঠবে, সে বলে দিতে পারে। অথবা কখন সব বড় বড় কাঠ ভেসে যাবে সমুদ্রের স্রোতে এবং সেসব এনে কিনারে ফেলে রাখা অথবা কখন কোন জাহাজের আসার সময়, স্রোতে কী সব ঝিনুক কোন কোন ঋতুতে ভেসে বেড়াবে, সব সে জানে। এই দ্বীপটার প্রত্যেকটা গাছ, কাঁটালতা এবং পাথর তার চেনা। কেউ একটা পাতা ছিঁড়লে পর্যন্ত বলে দিতে পারে, গাছটায় একটা পাতা কম।

সুতরাং এমন যখন একটা মানুষ আছে দ্বীপে, তখন তার খারাপ থাকবার কথা না। অথচ সেই অসুখটা না কি অন্য কিছু কেমন তাকে পাগল পাগল করে রাখছে। সে বাবার সঙ্গে খুব অন্যমনস্কভাবে খেল। বাবা মাঝে মাঝে খেতে খেতে ওকে দেখছে। সে বাবাকে কাজে সাহায্য করার জন্য নিজে কাপ প্লেট বেসিনে রেখে দিল। সে বাবাকে বলল, তুমি যাও। আমি সব ঠিক করে রাখছি।

মিলান খুব আশ্চর্য হল। মেয়ে তাকে কাজে সাহায্য করছে। এটা ঠিক ছিল ওর আগের স্বভাব। কিন্তু

এমনটা ওর বেশিক্ষণ থাকে না। আবার চোখ কখন সাদা এবং বিষণ্ণ হয়ে যাবে। খেতে বসে মিলান পুলকের গল্প করছিল। ওর খুব প্রশংসা করছিল। পুলকের জাহাজ কবে ছাড়বে ঠিক নেই। বোধহয় বরফ গলে না গেলে যেতে পারবে না। বরফ গলে না গেলেও যেতে পারে, কারণ বরফ-কাটা কল এসে ওদের পথ করে দিতে পারে। কী হবে, না হবে, এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু পুলক এলে ভালই হত। মিলান না বলে যেন পারল না, আমি গিয়ে একদিন ওকে নিয়ে আসি। সোজা পথটা দেখিয়ে দিলে সে চলে আসতে পারবে।

ব্রাউস বলল, সে আসবে কী করে? এখানে এলে মোটর-বোট ভাড়া করতে হবে। রোজ রোজ ? এভাবে পয়সা খরচ করে আসবে কেন বাবা?

কথাটা সত্যি। পুলক জাহাজি মানুষ। খুব একটা ভাল রোজগার ওর নেই। আর সে বলতেও পারে না, যা লাগে আমি দেব পুলক, তুমি আসবে। বরং ভাল ছিল, যে ক'দিন সে জাহাজে আছে সে ক'দিন ওকে ওর দিদিমার কাছে রেখে দেওয়া। কিন্তু মিলন জানে শীতকাল এলে ব্রাউসের দিদিমাকে আরও শীর্ণ দেখায়। একটা কষ্টকর কাশি ওকে সারাক্ষণ শুইয়ে রাখে। তা ছাড়া কখন সহসা বরফ পড়তে শুরু করবে, লাইট-হাউজের সঙ্গে কিনারার যোগাযোগ থাকবে না, তখন ব্রাউসকে লাইট-হাউজে নিয়ে আসা মুশকিল। এবং যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ব্রাউস, তাকে দীর্ঘ করে কী লাভ, এমন একটা ভাবনাও তাকে পেয়ে বসে। তবু এ সকালে ব্রাউসের সুন্দর মুখ এবং তাজা ভাব ফের ওকে কেমন ঘরের দরজা জানালা খুলে দিতে বলল। সে ব্রাউসের কাছে গিয়ে ডাকল, ব্রাউস।

ব্রাউস নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। সে খুব সুন্দরভাবে কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে মুছে তুলে রাখছে। ব্রাউস নীল রঙের রিবন বেঁধেছে চুলে। ঘরের হিটারটা সে আর-একটু বাড়িয়ে ঘরের উত্তাপ বাড়িয়ে নিয়েছে। ওকে দেখলে মনে হয় ওর অস্বাভাবিক শীত। এবং এই শীতের ভিতর পড়ে গেলেই মিলান ভেবে নেয় মেয়েটার সময় আর বেশি নেই। সে নানারঙের গরম জামা ব্রাউসের জন্য হ্যাঙারে সাজিয়ে রাখে, যখন যেটা খুশি ব্রাউস পরতে পারে। ব্রাউস খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। ও যে ওকে ডাকল, ব্রাউস যেন শুনতে পায়নি, এবং মনে হচ্ছিল ব্রাউস গুন গুন করে গান গাইছে। সে কি ভেবে ফেলেছে, বাবা আজ হোক, কাল হোক, পুলককে আনতে যাবে!

মিলান বলল, আমি যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে আসতে পারো।

ঠিক সেই আগের মতো কথা। কারণ ব্রাউসের মা যখন অসুস্থ তখন ব্রাউস খুব ছোট। ঘরে মা'কে যন্ত্রণা করবে ভেবে মিলান ব্রাউসকে সঙ্গে নিয়ে যেত। ওর তো তখন কোনও কাজ নেই। কেবল মেশিনঘরের সব কলকব্জা অথবা মিটারগুলো দেখা। গেজে টেমপারেচার দেখা। কখনও গরম জলের সারকুলেটিং ঠিক আছে কি না দেখা। ব্রাউস তখন সিঁড়ি ধরে কখনও লাইট-হাউজের মাথায় উঠে যেত। ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি। যেন শেষ নেই। কতদিন ব্রাউস ভেবেছে সে বুঝি আর শেষ সিঁড়িটার নাগাল পাবে না। ওর খুব ভয় লাগত তখন। সে ডাকত, বাবা, আমার ভয় লাগছে।

মিলান নীচ থেকে বলত, ভয় কী? আমি তো এখানে আছি।

এমন শব্দ পেলেই ব্রাউস আবার সাহস পেত। সে শেষ সিঁড়িটায় উঠে গেলে দেখতে পেত কাচের ঘর। বড় হেডলাইট। কেবল ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। দিনের বেলা আলো ফেলার কাজ থাকত না বলে কেমন মরা-মরা অথবা নির্জীব মনে হত। রাতে এই বড় হেডলাইট, পাশাপাশি দুটো হেডলাইট একটা বন্ধ থাকলে অন্যটা ঘুরে ঘুরে অনেক দূরে আলো ফেলে জাহাজের কেবল ক্রমান্বয় পথ দেখিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা ব্রাউসের কাছে ম্যাজিকের মতো মনে হত। এবং সেখানে দাঁড়ালেই ব্রাউসের চারপাশে কত সব দ্বীপ, দ্বীপের পাহাড়, পাখিদের উড়ে যাওয়া সমুদ্রে চোখে পড়ত। সে সেখানে দাঁড়িয়ে একবার একটা নতুন দ্বীপ দেখে অবাক হয়ে গেছিল। কখনও সে ওটা দ্যাখেনি। অথচ আশ্চর্য কী করে ওটা যে ভেসে এল। বেশ বড় কচ্ছপের পিঠের মতো গোল গোল আর ঢেউ খেলানো। যেন একের পর এক দ্বীপের বাহার। এখানটায় এমনভাবে পাথর ভেসে ওঠে কী করে?

সে ডেকেছিল, বাবা!

মিলান ব্রাউসের গলায় কেমন একটা ভয়ের স্বর শুনে ছুটে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেছিল। সে

য়েতেই ত্রাউস বলেছিল, বাবা, দ্যাখো কেমন দ্বীপটা জলের ওপর ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। এমন কী করে হয় বাবা?

মিলান দেখেই টের পেল। আবার অনেক বছর পর আর-একটা তিমির ঝাঁক নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে এদিকটায় চলে এসেছে। সে বলল, এগুলো এখানে থাকবে না। ওরা আবার চলে যাবে। পরপিদ্ দ্বীপের মানুষেরা নিশ্চয়ই আবার উত্তর সাগরে তিমি শিকারে বের হয়েছে। বের হলেই এরা টের পায়। পাহাড় অথবা পাথরের খাঁজে পিঠ ভাসিয়ে লুকিয়ে থাকে।

ত্রাউস বলেছিল, ও দ্বীপটা কত দূর?

অনেক দূর। এই ধরো শ' চারেক মাইল হবে।

ত্রাউসের কেমন মনটা হালকা হয়ে গেছিল। যাক, তবে এরা এদের খোঁজ পাবে না। এবং এরা যে কেন এখানে না থেকে আবার ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে!

এই সব স্মৃতি তার মনে হলেই সে ভাবে, পুলক এলে এবার সেই সব মাছের গল্প করবে। তিমি মাছেরা কেমন ঝাঁক বেঁধে থাকে এবং সে আশা করে, ঠিক হুবহু বর্ণনা দিতে পারবে মাছের। পুলক এলে বুড়ো দাদুর কাছে নিয়ে যাবে। লাইট-হাউজের মাথায় যে কাচে ঘেরা ব্যালকনিটা আছে সেটা দেখাবে। এবং কোথায় পাহাড়ের খাঁজে রুপোলি চাঁদা মাছ ধরা যায় এবং কোথায় সিঁড়ির মতো একটা পাথর সমুদ্রের ভিতর নেমে গেছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে।

এভাবে এক আশা আশা-কুহকিনী মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকার। না থাকলে বেঁচে সুখ থাকে না ত্রাউসের জীবনে কোনও আশা ছিল না। আশা যতই কুহকিনী হোক, আশা নিরাশা থেকে বাঁচায়। প্রবণা মানুষের এভাবে আসে।

পুলক আসবে, এলে সে এ ঘরে পুলককে নিয়ে হিটারের পাশে বসবে। এবং সে বসে বসে দ্বীপের সব নানা রকমের গল্প বলে যাবে। বলবে, আমি তোমাকে নিয়ে সেই লাইট-হাউজের ব্যালকনিতে বসে থাকব। দুটো ইজিচেয়ার থাকবে, আহা পুলক, গ্রীষ্মের দিন হলে দেখতে পেতে চারপাশটা কী সবুজ। দেখতে পেতে কত রং-বেরঙের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেতে নানা রকমের উড়োক্কো মাছের খেলা। ঝড়ের সময় আমাদের বালিয়াড়িতে কত সব উড়োক্কো মাছ। একেবারে মনে হয় সকালবেলায় বালিয়াড়িতে ওর সাদা ফুল হয়ে ফুটে আছে। তখন সবার কী আনন্দ! কে কত কুড়োতে পারে। একবার বাবা আমি দু' ঝুড়ি মাছ কুড়িয়েছিলাম। মা তখন বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে থাকত। মাছগুলো দেখে মা কেমন আরও ভয় পেয়ে গেছিল। মাছের চোখে মরার ছবি খুব কষ্টের বুঝি।

এমন মনে হলেই সে ভাবে, না, সে পুলককে আসতে বারণ করে ভালই করেছে। পুলকের সোজাসুজি আসার পথ, বরফ পড়লে একটা পেয়ে যাবে। মাইল দশেকের মতো পথ তাকে বরফের ওপর দিয়ে চলে আসতে হবে। বরফ মাত্র জমতে আরম্ভ করেছে। এবং এভাবে সমুদ্রের ওপর বরফ জমতে জমতে অনেক দূর এগিয়ে এলে এই দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসবে, পুলক একটা সাইকেল ভাড়া করে চলে আসতে পারে। কিন্তু সেই ভয়টা, যা তাকে মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়, পুলক তো জানে না কোথায় কতটা বরফ জমেছে।

যারা এ দেশের মানুষ তারা টের পায়। তারা অনেকে বরফ পড়ে গেলে সাইকেলে বড়শি নিয়ে মাছ ধরার জন্য বের হয়ে পড়বে। সামনে যত দূর দেখা যায় সমুদ্রের ওপর ভাসমান বরফ। এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট গর্ত, সেখানে নীল জল। মাছেরা সেখানে শ্বাস ফেলার জন্য আসে। তেমন একটা ছোট গর্তের পাশে বসে বড়শি ফেললে ছোট ছোট সারডিন মাছ, সবাই বেশ এক ঝাঁক মাছ ধরে ঘরে ফিরে যেতে পারে। খুব মিষ্টি খেতে এসব মাছ। ওরা বরফের রং দেখে কোথায় বরফ মোটা হয়ে জমেছে, আর কোথায় বরফ পাতলা কাচের মতো, বুঝতে পারে।

সে তার জানালায় বসে কেমন নিরাশ হয়ে গেল। এত সব ভাবনা সব মিছে। পুলক এখানে আর কখনও আসবে না। ভিতরে যে ছোট একটা পাখির মতো প্রাণ আছে, প্রাণটা কেমন কষ্ট পাচ্ছে। সে বাবাকে একটা কথারও জবাব দেয়নি। বাবা বের হয়ে যাচ্ছেন। সে বলল, বাবা, আমি যাব।

মিলান বারান্দায় এসে একটা ডেক-চেয়ারে বসে পড়ল। ত্রাউসকে পোশাক পালটে নিতে হবে। সে নিশ্চয়ই তার মোটা পুলওভার পরে নেবে। সে মোটা সাদা উলের মোজা পরে নেবে। বরফ ভাল করে

পড়ছে না বলে একটা কাদা-কাদা ভাব এখনও আছে। ওকে গামবুট পরে নিতে হবে। এবং সব ব্যাপারেই ত্রাউসের ভিতর একটা আকাঙ্ক্ষা জাগছে ভেবে সে কেমন খুব খুশি হয়ে উঠল। কারণ পুলক। পুলক এসে ওকে ভীষণ আকাঙ্ক্ষার ভেতর ফেলে দিল। তবে এই পুলককে সে যদি কোনও ভাবে এই দ্বীপে আটকে ফেলতে পারে তুমি পুলক এখানে থেকে যেতে পারো। তুমি থেকে গেলে ত্রাউস বেঁচে যাবে। পরক্ষণেই মনে হল, না, তা হয় না। ত্রাউসের মাকেও সে যখন ঘরে আনে, ভেবেছিল, কোনওদিন সেই ভীষণ রোগটা আক্রমণ করলে এক অতীব আকাঙ্ক্ষার ভিতর ফেলে ওকে নীরোগ করে তুলবে। পরে দেখেছে সে আর হয় না। কাছাকাছি থাকলে, দীর্ঘদিন কাছাকাছি থাকলে একঘেয়েমি আসে। পরস্পরের প্রতি কৌতূহল মরে যায়। এই পুলক এখানে থাকলে এটা হবে। পুলক ত্রাউসের কাছে ভীষণ দূরের মানুষ। দূরের বলে এবং নাগালের বাইরে বলে, ত্রাউস এখন পুলককে নিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে, মিলান কেন যে ভাবল, এ স্বপ্নটাকে যে-কোনও ভাবে তার বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে পারলে ত্রাউস বেঁচে যাবে। ত্রাউসের মৃত্যু তাকে চোখের ওপর দেখতে হবে না।

বেশ সেজেগুজে ত্রাউস বের হয়ে এল। কাছেই লাইট-হাউজে উঠে যাওয়ার রাস্তা। বেশ পাথর কেটে কেটে বড় লম্বা গম্বুজের মতো করে রাখা হয়েছে। সে এখন বাপের সঙ্গে সারাদিন সেখানে থাকবে। দুপুরে বাবা আসবে খাবার নিতে। এবং খাবারটা ত্রাউস কনট্রোলিং টাওয়ারে বসেই খাবে। ভারী মজা লাগে। এবং ওর ইচ্ছা, যদি পুরোপুরি বরফ পড়ে যায় এবং একদিন যদি সত্যি সত্যি পুলক চলে আসে, তবে ওকে নিয়ে এখানে উঠে আসবে। অনেক দূর থেকে কেউ যদি এখন ওকে দ্যাখে তবে দেখতে পাবে, পাহাড়ের মাথায় একটা ছোট মতো দেয়ালে সে ঝুলে আছে। এবং নীচ থেকে যে কেউ চিৎকার করে উঠতে পারে, ত্রাউস, এভাবে দাঁড়াবে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে। গড়িয়ে পড়ে গেলে তুমি বাঁচবে না। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। ত্রাউস, তুমি ওভাবে হাঁটবে না। এই, এই, একেবারে ফাঁকা জায়গায় তুমি ঝুঁকে আছো। কী করছ ত্রাউস? নীচে সমুদ্র। পাহাড় থেকে খাড়া পড়ে গেলে তুমি একটা রঙিন ফানুসের মতো উড়ে যাবে।

কিন্তু কেউ তো দূর থেকে টের পায় না বস্তুর কাচের দেয়াল ঘেরা জায়গায় ত্রাউস দাঁড়িয়ে আছে। এত পাতলা কাচ যে মসৃণ জলের মতো। অনেক দূরে লায়ন রকের একটা দ্বীপে পুলক যে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, এবং চিৎকার করলেও সে এতদূর থেকে কেউ টের পাবে না, ত্রাউস, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি এভাবে আমাকে আর ট্রাপিজের খেলা দেখাবে না। আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে।

পুলক বুঝতে পারেনি, ত্রাউস একটা মসৃণ জলের মতো পাতলা কাচের ভিতর এখন মোমের পুতুল হয়ে গেছে। দূরবিনটা ওর হাতে কাঁপছিল। মেয়েটার অসুখ অথবা আত্মহত্যার বাসনা। সে যে কী করবে বুঝতে পারছে না এখন। ক্রমে অন্ধকার নেমে আসছে। সে বোট নিয়ে যেতেও পারছে না। এবং গেলে এদিকটা এত বেশি খাড়া যে কিছুতেই সে অতদূরে উঠে যেতে পারবে না। আর ছোট স্কিপটাকে খুব বেশি মনে হলে সাদা উড়োক্কো মাছের মতো দেখাবে। একটা মাছ ঝড়ে মরে গিয়ে সমুদ্রের জলে ভেসে উঠেছে। অত ওপর থেকে তার চেয়ে বেশি কিছুই বোঝা যাবে না।

দশ

ইমাদুল্লা বসে বসে তামাক টানছিল। এখনও পুলক ফিরে আসেনি। সে স্কিপ নিয়ে লায়ন রকে গেছে। যারা অন্য জাহাজি তারাও কেউ কেউ ফিরে আসেনি, ওদের জন্য ইমাদুল্লা ভাবছে না। ওরা গেছে কিনারায়। শহরে কেউ কেনাকাটা করতে গেছে, কেউ ফুর্তি করতে গেছে। যত তুষারঝড়ই হোক, ওরা ঠিক সময় হলে ফিরে আসবে। কিন্তু পুলকের ফিরে আসাটা এই রাতে কঠিন। প্রায় আটটা বেজে চলল, এখনও আসছে না। রাত আটটা অনেক রাত। অন্ধকারে সে স্কিপ ঠিক ঠিক চালাতে পারবে কি না, সেও ভাবনা। যেসব বরফ মাত্র জমতে আরম্ভ করছে সেখানে ধাক্কা-ফাক্কা খেলে একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। এই রক্ষে ওর স্কিপে অর্থাৎ মোটর-বোটে আলো আছে। সে আলো ফেলতে ফেলতে আসবে।

আর তখন কেউ জানে না, পুলক ওর মোটর-বোট নিয়ে বাতিঘরের ঠিক নীচে বসে ছিল। অর্থাৎ ওর যা ভাবনা, যদি মেয়েটা কিছু করে ফেলে, এসব ভাবনা কেন যে হয়, হতে পারে মেয়েটা মা'র মতো ক্ষরে মরে নাও যেতে পারে, তবু ভালবাসার এক নিরন্তর বেদনা আছে, যা সহজে মুছে দেওয়া যায় না।

এবং অনেক পরে যখন পুলক দেখল, না সেখানে এখন বাতিঘরে আলো জ্বলছে, নিশ্চয়ই এখন তবে ব্রাউস ঘরে ফিরে গেছে। ওদিকটায় যাবার সে কোনও পথ খুঁজে পেল না। সে ভেবেছিল সমুদ্র লেগুনের মতো দুটো পাহাড়ের ফাঁকে ঢুকে গেছে কিন্তু কাছে গেলে দেখল, না কোথাও ফাঁক নেই ওদিকে যাবার। একমাত্র পথ সেই ঘুরে, ঘুরে যেতে গেলে সারা রাত লেগে যাবে। পশ্চিমে যেতে হবে মাইল পঞ্চাশের মতো। তা ছাড়া বিকেল থেকেই হাওয়াটা জোর উঠছে। চারপাশে নানারকম দ্বীপের মালা ছড়িয়ে আছে বলে ঢেউ তেমন প্রবল নয়। এবং ক্রমে ক্রমে রিনরিন কাচের শব্দের মতো তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেলে সে স্কিপের মুখ বন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দিল।

ইমাদুল্লার তামাক টানা শেষ হলে সে হুঁকোটা নীচে রেখে দিল। সে এ সময় কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। পাখিটার নাম করে পুলক চলে গেছে। পাখিটার জন্য তার আশ্চর্য মায়া থাকা স্বাভাবিক। সেই সব রকের কাছাকাছি একটা রকে বাতিঘর। কিন্তু ইমাদুল্লা জানে সেখানে যাওয়া সহজ নয়। তবু যদি সে নিজে যেত, একটা সহজ পথ আবিষ্কার করা যেত। এ অঞ্চলে সে একবার প্রায় বছর খানেকের ওপর ছিল। তখন ছিল যুদ্ধের সময়। ওরা এখানে আটকা পড়েছিল। দেশে ফিরতে সে প্রায় বুড়ো হয়ে যাবার মতো। ইমাদুল্লা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে গেল। এবং রেলিং-এ ভর করে দাঁড়ালে দেখল শুধু অন্ধকার। কিছু জাহাজ লেগে আছে। নানারকমের লাল নীল আলো মাস্টে অথবা ডেরিকে। এবং ডাইনিং হলে কোথাও ব্যান্ড বাজছে। হয়তো কোনও জাহাজের কাপ্তান এই শীতের রাতে পার্টি দিচ্ছেন।

যখন এত সব সমারোহ জাহাজে, যখন আকাশ নীল অথচ সমুদ্রে এক গভীর অন্ধকার, এমনকী জলে ফসফরাস জ্বলছে না, তখন স্বাভাবিক কারণে ভয় পাবার কথা। ইমাদুল্লা সারেংকে ডেকে বলল, পুলকটা তো এখনও ফিরল না সারেং সাব।

সারেং সাব মাদুর পেতে নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ পড়া শেষ। এখন ইমাদুল্লার এমন উদ্বিগ্ন মুখ দেখে কেমন বড় বড় চোখে তাকালেন তিনি। বললেন, ঠিক চলে আসবে।

যদি না আসে!

না এলে কী করতে পারি আমরা?

এটা অবশ্য ঠিক, জাহাজ থেকে কেউ যদি সরে পড়ে তবে কাপ্তান অথবা সারেং সাব কী করতে পারে। ওরা খুব বেশি হলে একটা এজেন্ট-অফিসে খবর দেবে। একজন নাবিক মিসিং। তার বেশি কিছু ওরা করবে না। তারপর যা কিছু দায়দায়িত্ব এজেন্ট-অফিসের। ওরা স্থানীয় থানা-পুলিশের সাহায্য নেবে। তখন জাহাজ গভীর সমুদ্রে, হয়তো-বা অন্য বন্দরে ওরা আর খবরও পাবে না, ওদের সেই ছোট্ট জাহাজির খবর কী।

সারেং তবু নির্ভয় দেবার মতো বলল, দ্যাখো ঠিক চলে আসবে।

ইমাদুল্লার আর কী করার আছে? তবু এই ছোট্ট জাহাজির জন্য ওর কী একটা মায়া গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। প্রায় বছর পার হতে চলল ওরা একই জাহাজে আছে। যখন প্রথম কলকাতা বন্দরে পুলককে দেখতে পায় তখন কী অবাক ইমাদুল্লা! পুলক বাবু-মানুষ। এমন মানুষের এ সব কাজ সাজে না যেন কার ওপর এক ভীষণ অভিমানে দেশ ছেড়ে জাহাজে কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে।

অথবা এও হতে পারে পুলকের ভিতর এক কোমল প্রাণ আছে। ওর চোখে আশ্চর্য মায়া আছে, চোখ তুলে তাকালে কেউ সহজে অবহেলা করতে পারে না। যত কঠিন প্রাণ হবে, এক সময় না এক সময় পুলকের কাছে এলে সহজ হয়ে যেতে হবে। সারাক্ষণ সে জাহাজে সবার এমন একটা মানুষ হয়ে গেছে যা বড় বেশি কাছের এবং ভালবাসার।

পুলক এবার বোটের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল।

ঠিক পাহাড়ের ওপর তখন বাতিঘরের সবাই দাঁড়িয়ে আছে। যেমন নানা রকমের বিস্ময়কর ঘটনা এই দ্বীপগুলোতে নানাভাবে ঘটে থাকে অথবা কিংবদন্তী আছে— এটা ছিল এক আদিবাসী রাজার

দেশ। এই যে সমুদ্র এবং দ্বীপমালা সব জুড়ে ছিল তার রাজত্ব। মূল ভূখণ্ডে সে যেতে পারত না। তাকে বনবাসী করে রাখা হয়েছিল। ইংরেজ অধিবাসীগণ এই মূল ভূখণ্ড দখল করে নিলে রাজার আর থাকে কী? সে চলে এসেছিল এখানে। তারপর শোনা যায় এক প্রবল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব দ্বীপ ধুয়ে নিয়ে যায়। কেউ বাঁচে না। কেবল রাজা তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এই বাতিঘরের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল কারণ তখন এই পাহাড়টাই ছিল সবচেয়ে উঁচু। সে ধুয়ে মুছে যায়নি। রাজার কেউ থাকল না। দু'-চারজন পুরুষ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কাজ চলে কিন্তু জীবন চলে না। ওরা তারপর বড় একটা মতিহাব কাঠের নৌকায় ফিজির দিকে চলে গেছিল। এবং বোধহয় এই অভিশাপ আছে, এখানে আর কেউ বসবাস করতে পারবে না। অথবা কিংবদন্তীর জন্য মানুষ আর এইসব দ্বীপে বাড়িঘর করে বসবাস করে না। ফলে এমন নির্জন সব দ্বীপ। এবং কিছু পাখির ডাক। কেবল ভয় এক, কখনও না কখনও এখানে বসতি গড়ে উঠলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। এভাবে আরও সব বিচিত্র উপকথা জুড়ে এইসব দ্বীপমালা বিচিত্র এক জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়। এবং অন্ধকার রাতে ওদের চোখে অদ্ভুত একটা আলোর রেখা খাড়া পাহাড়ের নীচে দেখা গেলে ওরা বুঝতে পারল না, এই তুষারঝড়ের ভিতর এবং দুর্যোগে কার এখানে আসার সাহস। ওরা কাচের ভিতর থেকে দেখছিল বলে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। বাতিঘরের কাচে জলকণা লেগে লেগে সব অস্পষ্ট করে দিচ্ছে, কিন্তু কাচ মুছে দিলে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, মনে হয় সমুদ্রের কেউ পথ হারিয়ে ফেলেছে। এমনও হতে পারে যারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় তাদের কেউ এইসব দ্বীপপুঞ্জের ভিতর পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

অথচ ওদের করার কিছু ছিল না। এমন খাড়া পাহাড়ের নীচে নামে সাধ্য কার? ওদের দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ব্রাউসের কেবল বারবার মনে হয়েছে, এ অন্য কেউ নয়। ঠিক পুলক। পুলক জাহাজ থেকে পালিয়ে এখানে এসে গেছে। সে যে এখন কী করে! এখান থেকে সে যত জোরেই চিৎকার করে ডাকুক, এত নীচে তার গলার আওয়াজ পৌঁছোবে না।

বোট ঘুরিয়ে দেবার সময় মনে হল পুলকের, একটা-দুটো পাথর পাহাড়ের গাছপালার ভিতর সিঁড়ির মতো দেখা যাচ্ছে। সে এবার টর্চ জ্বেলে আরও কাছে গেল। সেই রাজা কি এমন একটা গুপ্ত সিঁড়ি করে রেখে গেছিলেন, দ্বীপ থেকে পালাতে হলে, এই পথে সমুদ্রে নেমে যাওয়া যাবে? কেউ জানে না কারণ এমন খাড়া পাহাড়ের নীচে কারও আসার দরকার হয় না। পুলকের মতো আর এমন কে পাগল আছে। পুলক বোটটাকে একটা ছোট গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর গাছপালা ফাঁক করে টর্চ মারতেই মনে হল সে যা ভেবেছে ঠিক তাই। এভাবে পাথরের পর পাথর ভেঙে প্রায় কোনও স্বর্গের সিঁড়ি কে তৈরি করে রেখেছে। এবং অনেকটা উঠে এলে মনে হল হঠাৎ সেই সিঁড়ি থেমে গেছে। সে আর কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। আর পঞ্চাশ গজের মতো উঠে গেলেই দ্বীপের মাথায় সে উঠে যেতে পারবে। ওর মনে হল সেটা সে আর পারবে না। এমন একটা রিস্ক নিয়ে সে উঠে এল। যখন লাইট-হাউজের আলো ঘুরে ঘুরে পড়ছে তখন জায়গাটা আর অন্ধকার থাকছে না। বেশ দিনের বেলার মতো ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে।

পুলক বসে পড়ল একটা পাথরে। তাকে আবার নেমে যেতে হবে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না এমন অন্ধকারে ফিরেই বা যাবে কী করে? তার মনে হল, একটা মেয়ে মরে যাবে ভেবে যখন সে তাকে নানা ভাবে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে তখন সে নিজেই কেমন বোকার মতো আর-একটা অসুখে পড়ে গেল। সে এখানে আসবে না বার বার ভেবেছে। বার বার মনে হয়েছে, অথবা অভিমান হয়েছে বার বার ব্রাউসের ওপর। সে কেন যে এমন অভিমানের ভিতর পড়ে গেল। ওর তো এমন হবার কথা নয়। সে এসেছিল এখানে সেই পাখিটাকে দেখবে বলে এবং এখন সে বুঝতে পারছে ভীষণ এক জটিল আবর্তে পড়ে গিয়ে তার আর পাখি দেখা হল না। সে ব্রাউসের যতটা কাছাকাছি থাকবে ততই যেন সে খুশি থাকবে।

সে বুঝতে পারে এখন আর তার নেমে যেতে পর্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে না। আর ওঠার জায়গা নেই অথবা সে নেমেও আর যেতে পারছে না। কারণ নামার সময় নীচের দিকে তাকালে তার কেমন মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তার তো পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস কোনওদিন ছিল না। এত অন্ধকারে নামা যায়! কিন্তু যখন আলো এসে ঘুরে-ফিরে যায়, বাতিঘরের আলো এসে দিনের মতো করে ফেলে, তখন সে নীচের দিকে

ঃ কাতে পাবে না। জোবে চিৎকাব কবে উঠতে ইচ্ছা হয় তাব, ত্রাউস, আমি এখন কী যে কবি।
তবু দিনেব বেলা সে সন্তর্পণে নেমে যেতে পাববে। হঠাৎ-হঠাৎ আলো পড়ে ওব চোখ ঝলসে দেবে
, সে এই যে বসে বয়েছে, চাবপাশে নানা বর্ণেব গাছ, পাতা নেই গাছে, এবং ঝড়েব দাপটে ডালপালা
দব ঝুলছে ভীষণভাবে, আর সে বসে আছে একা, একা বসে থাকা ছাড়া কী আব উপায়, তবু তাব একা
ন্স থাকতে ভাল লাগছে, ওপাশেব উপত্যকা ত্রাউস এখন নিশ্চয়ই জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ওব
গাযে সাদা বঙেব ফ্রক। ফ্রকে কী সব সমুদ্রেব হিজিবিজি নীল ঢেউযেব ছবি। ওব হাতে সোনালি
দস্তানা। পায়ে সে মোজা পবেছে সাদা বঙেব। ও চুলে আজ কোন বঙেব বিবন বেঁধেছে? বোধহয়
নজ বঙেব। ওব জানালাব কাচে তুষাবপাতেব শব্দ। ঠান্ডা, এমন ঠান্ডায পুলক ভাবল, সে মবে যাবে।
শুধু তবাক, ওব পোশাক, এই যেমন শালদেবাজ নীচে, ওপবে গবম প্যান্ট, মোজা পায়ে, মোটা
সোলেব জুতো আব গামবুট এবং গলায় কমফর্টাব, মাথায় মাংকি ক্যাপ খযেবি বঙেব দস্তানা ওব
হাতে তবু কী শীত। পাথবেব ছাদ মাথাব ওপব। তুষাবঝড়েব ঝাপটা তেমন লাগছে না।
পুলক সাবা বাত এখানে একটা পাথবে হেলান দিয়ে বসে থাকল। ওব চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে।
পাশেই সেই বোধহয় নীলবর্ণেব উপত্যকা। উপত্যকায় এক আশ্চর্য মেযেব বাস। যাব চোখ নীল বঙেব,
মুখে সুন্দব হাসি সে ফুটিয়ে তুলেছে এবং যে আজ হোক কাল হোক এই উপত্যকায ছুটে বেড়াবে
ওব সঙ্গে।

পুলকেব কোনও দুঃখ ছিল না। সে ফিবে যেতে পাবছে না বলে তাব কোনও দুঃখ নেই। সে এমন
একটা পাহাড়েব ছাদ আবিষ্কাব কবতে পেবেছে ভেবে খুশি। এখানে এসে সে প্রতিদিন বসে থাকবে।
এখানে এলেই দ্বীপেব বর্ণমালা তাব কাছে নানা বং নিয়ে ফুটে উঠবে। সে ভাবে এখানেই আছে
বুঝি সেই ছোট্ট মেযেটি। এখানে সে এলে বুঝতে পাববে, সে ত্রাউসেব কাছ থেকে খুব একটা দূবে
নেই। যতদিন ববফ ভাল না কবে পড়ছে ততদিন এভাবে অন্তত তাব বিকেল এবং বাত কাটিয়ে দিতে
পাবলে কোনও কষ্ট থাকবে না। সে খুব ভোবে বোট দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিলে ঠিক কাজেব সময়ে
জাহাজ ডেকে হাজিব থাকতে পাববে। তবে আব তাকে নিয়ে কোনও কথা উঠবে না। সে বেশ যে
কদিন আছে এভাবে কাটিয়ে দিতে পাবলে আবাব একটা নাম, গাছে গাছে পাতায় পাতায় অথবা
এই বন্দবেব ছোট্ট পাইন গাছে সে লিখে বাখতে পাববে, ত্রাউস বড় সুন্দব নাম, খুব সুষমা তাব।
আমি আব ত্রাউস এক বিকেলে সমুদ্রেব পাড়ে পাড়ে অনেক দূব হেঁটে গেছি। এমন সব কত কথা যে
লিখে বাখবে ভাবছে। তাব তখন বিস্ময়েব সীমা থাকবে না। সে নিজেব ভিতব নিজেই এক সুন্দব
জগৎ সৃষ্টি কবে ফেলবে। সেখানে কে বড়, নন্দিনী না ত্রাউস, তখন টেব পাবে না। সবাই তাব বড়
আপন মনে হবে।

পুলক পাথবে মাথা বেখে দুটো পা সামনে ছড়িয়ে দিল। কিছু লতাপাতা তাব মুখ ঢেকে বেখেছে।
দূবে আকাশ অস্পষ্ট। সে লতাপাতাব ভিতব থেকে কেন জানি আজ আকাশে একটা মাত্র নক্ষত্রকে
জ্বল হয়ে জ্বলতে দেখল। ওব চোখ অপলক এবং এভাবে সে জানে না কখন ঘুম জড়িয়ে আসে সাবা
শবীবে। লতাপাতাব ভিতব আশ্চর্য এক মানুষ এক গভীব দ্বীপপুঞ্জেব ভিতব ঠিক একটা পাখিব মতো
ঘুমাচ্ছে।

এগাবো

সমুদ্রে কী হয না হয় বোঝা দায়।

ক্রমে শীতকালেব তুষাবঝড় এ বন্দবেব গাছপালা বৃক্ষ পত্রহীন পুষ্পহীন কবে দিল।

প্রতি বিকেলে, অবশ্য বিকেল না বাত বোঝা দায়, কাবণ কতদিন থেকে আব সূর্য উঠছে না, কেবল
ঝড়ো ঠান্ডা হাওয়া, প্যাচপ্যাচে তুষাবপাত এবং ছাই বঙেব একটা অন্ধকাব চাবপাশে ঝুলে আছে,
এই অন্ধকাবেব ভিতব পুলক স্কিপ ভাড়া কবে চলে যাচ্ছে সেইসব দ্বীপে। পাখিবা এখন শীতেব ভিতব
সব সেখানে ডিম পাড়ছে না। পাখিবা আব শীতেব জন্য উড়তে পাবছে না। পাথবেব খাঁজে খাঁজে

ওরা ঘর তৈরি করছে কেবল। শীতকালটা তার ভিতর কাটিয়ে দিতে হবে। পুলকের ধারণা সেইসব দ্বীপে ওর পাখিটা উড়ে গেছে। সে এখন জাহাজে ফিরে এমনই রোজ বলছে। সে যে রাতে সেই ছাদের মতো পাহাড়ের নীচে নিজেই একটা পাখি হয়ে বাস করছে সেটা সে কিছুতেই বলছে না।

পাখিটার নাম করে রোজ রোজ জাহাজে কাজ শেষ হলেই পুলক চলে যাচ্ছে। ওর সব জমানো টাকা পয়সা বোটভাড়া দিতে দিতেই শেষ হয়ে গেল।

খুব সকালের দিকে পুলক ফিরে আসত।

এলেই ইমাদুল্লা বলত, রাস্তাটা খুঁজে পেলি?

না চাচা।

এসব দ্বীপে এখন যাবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরফ পড়লে যেতে পারতিস। কিন্তু তাও রিস্ক।

বরফ তো পড়ছে।

এখনও তেমন ভাল করে বরফ জমেনি। তুই একদিন আমাকে নিয়ে চল।

যাবে চাচা? সত্যি!

গেলে মন্দ হয় না।

রোববার দেখে চলো।

সেই ভাল হবে।

ত্রাউসের দিদিমার কাছে গিয়ে রাস্তাটা জেনে এলে পারতিস।

আমার খুব খারাপ লাগে। ওরা কী ভাববে!

কী ভাববে আবার? খারাপ ভাববে কেন?

পুলক চুপ করে থাকল। এখন কাজের সময়। সে ইঞ্জিনে চলে যাবে। ইঞ্জিন-ঘরে তেমন কাজ নেই এখন। তবু এদিক-ওদিক দেখে কিছু কাজ বের করে নিতে হয়। কাজ করতে হয়। সে টিফিনে এসে ফের ইমাদুল্লা চাচাকে বলল, আজ বিকেলে যাবে ত্রাউসের দিদিমার কাছে?

চলো।

তারপর ইমাদুল্লা কী ভেবে বলল, বুড়ি কি বাড়ি আছে! সে শীতকালে নিজের বাড়িতে চলে যায়।

তবু ওরা বিকেলে সেখানে গেলে দেখতে পেল বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। গেটে বড় তালা ঝুলছে। বাড়িটা কেমন নিঃসঙ্গ এবং মুহ্যমান হয়ে আছে।

পুলক বলল, একটা চিঠি লিখলে হয় না?

কাকে?

ত্রাউসকে?

দিতে পারিস। কিন্তু সে তো রাস্তাটার খবর দিতে পারবে না।

লাইট-হাউজে কারও যেতে হলে কী করে যায় এখন!

সে তো তোমার স্যান্টিস থেকে রসদ যায়। সেখানে থেকে বোট ভাড়া পাওয়া যায়। সেটা তো এখানে নয়। এইসব দ্বীপের পুবে স্যান্টিস। আমরা আছি পশ্চিমে। আমাদের কাছে দ্বীপগুলো স্যান্টিসে যেতে পাঁচিলের কাজ করে থাকে। যাওয়া যায় না।

ইমাদুল্লা টের পাচ্ছিল, পুলক এখন অস্থির হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত বোধহয় ত্রাউসের বাবা অথবা দিদিমা বুঝতে পেরেছিল, পুলক যতই ওকে স্বাভাবিক করে তুলুক, তাকে নিরাময় করতে পারবে না অথবা ভেবেছিল, খুব কাছাকাছি থাকলে আকর্ষণ বাড়ে। ওরা হয়তো ত্রাউসকে সেজন্য সেই দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইমাদুল্লা এসব ভেবে বলল, যতসব আজেবাজে চিন্তা। ত্রাউসের মঙ্গল কীসে হবে না হবে সেটা ওরাই ভাল জানবে। পুলক অথবা সে কেন যে অযথা চিন্তা করছে।

তবু মনে হল যাবার আগে একবার দেখা করা দরকার। কারণ দেখা হলে ত্রাউস খুব আনন্দ পাবে। ইমাদুল্লাও আনন্দ পাবে, এইসব দ্বীপের ভিতর সে যত হেঁটে বেড়াবে তত তার মনটা খুশি হয়ে উঠবে। জাহাজের একঘেয়েমি কাজ কী যে নিদারুণ, কখনও এইসব দ্বীপে নেমে গেলে টের পাওয়া যায়।

ওরা যখন ফিরছিল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ট্রলিবাসের মাথায় কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না

গড়গড় করে বাসটা বের হয়ে গেল। ওরা বাসটা চলে গেলে রাস্তা পার হল। এখনও কিছু কিছু লোক রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। পাবগুলোতেই এখন বেশি ভিড়। শীতের জন্য সবাই মদ খেতে ঢুকে গেছে।

রাস্তার ঠিক মোড়ের পথটা পিকাকোরা পাহাড়ের দিকে গেছে। একটা মুসকোদাইন লতার গাছ বাড়িটার সামনে ঝুলে রয়েছে। আর বাড়িটাতে এখনও যখন একটা কাচ খোলা তখন মনে হচ্ছে কেউ বের হয়ে আসছে। আসলে লোকটা রাস্তা অতিক্রম করার জন্য পাঁচিল ঘেঁষে আসছিল, দেখলে মনে হবে সামনের বাড়ি থেকে লোকটা বের হয়েছে। সামনে কাস্টম-হাউসের ঝুল-বারান্দা থেকে আলো এসে পড়ছে। লাইট-পোস্টের আলোগুলো খুব জোরালো নয়। এই আলোটার জন্যই মিলান টের পেল, ইমাদুল্লা আর পুলক কিনার থেকে জাহাজে ফিরছে।

ইমাদুল্লা এবং পুলক যাকে ভেবেছিল, বাড়িটা থেকে বের হয়ে এসেছে, আসলে সে বাড়ি থেকে যে বের হয়ে আসেনি, সে যে পুলকের খোঁজে জাহাজে গেছিল, মিলানকে আবিষ্কার করতেই তা ধরা গেল।

মিলানকে দেখে ওরা উভয়ে ভীষণ অবাক। সে এল কী করে?

মিলান বলল, যাক বাঁচা গেল। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হল।

ইমাদুল্লা বলল, চলো জাহাজে।

পুলক কেমন লাজুক মুখ করে রেখেছে। এমনিতেই সে সবাইকে মান্য করে থাকে খুব। ব্রাউসের বাবা বলে সে খুব বেশি মান্য করছে। সে যেন ওদের কেউ নয়, কোনও সম্পর্ক নেই, এমনভাবে হাঁটছে।

ইমাদুল্লা বলল, জাহাজে হঠাৎ!

ব্রাউস পুলককে নিয়ে যেতে বলেছে।

তুমি এলে কী করে?

জিপে।

জিপে!— ইমাদুল্লা অবাক।

স্যান্টিস থেকে এসেছি জিপে।

তা হলে কখন রওনা হতে হয়েছিল?

দেড়টা-দুটো হবে।

ইমাদুল্লা বলল, পুলক গেলে আসবে কী করে?

পরশুদিন স্যান্টিস থেকে এখানে একটা গাড়ি আসার কথা আছে। আমরা তাকে গাড়িতে তুলে দেব।

ইমাদুল্লা বলল, দু'-তিন দিন একনাগাড়ে ছুটি পাবে বলে তো মনে হয় না।

তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।

সত্যি সেটা হয়ে গেছিল। মিলান ইঞ্জিন-সারেংকেও খুব অনুরোধ করল এ ব্যাপারে। সব খুলেও বলল। মেয়েটা বাঁচবে না ঠিক, তবু যে ক'দিন মনটা একটু ভাল থাকে।

ইমাদুল্লা বলল, তুমি তো ইচ্ছা করলে পুলককে রেখে দিতে পারো।

পুলক তখন কাছে ছিল না। যেন বড়দের কথায় ছোটদের থাকতে নেই, সে তার ফোকশালে বসে আছে। এবং যেমন কিছু বইপত্র উলটে-পালটে দেখার স্বভাব, তেমনি দেখছে। রাত বাড়ছে। ঝোড়ো হাওয়া নেই। চারপাশের পোর্ট-হোল বন্ধ। চারপাশে গ্যাস পাইপ খোলা। প্রচণ্ড ঠান্ডায় ওর হাত পা সাদা হয়ে গেছিল, এখন এই সময়ে শরীর বেশ তাজা মনে হচ্ছে। সে যদি যায় তবে ব্রাউসের বাবার সঙ্গেই যাবে। নিশ্চয়ই ব্রাউসের বাবা কাল আবার আসবে।

মিলান হাসল। যেন বললে এমন শোনাত, সে হয় না। আমার সব জানা আছে। সেই যুদ্ধের ঠিক পর ব্রাউসের মা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমার সঙ্গে গির্জায় ওর ছবি, সাদা পোশাকে আমাদের ছবি দেখলে তুমি ইমাদুল্লা অবাক হয়ে যাবে। কী সুন্দর ছিল ব্রাউসের মা। ওর মুখের সেই পবিত্রতা আমি এখনও ভুলতে পারি না। এবং ভিতরে যে এত বড় একটা রোগ পুষে রেখেছে কে জানে! ওর আত্মীয়স্বজনেরা তো ভাবল ব্রাউসের মা নিরাময় হয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রথম ভালবাসাবাসির দিনগুলি ব্রাউসের মাকে ভীষণ তাজা করে রেখেছিল। তারপর আমাদের দিনগুলো তো আর

নিত্য-নূতন চমকে ভরে থাকে না, লাইট-হাউজের একঘেয়েমি, এই সকালে বের হয়ে যাওয়া, ন'টায় এসে টিফিন, আবার একনাগাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ, তারপর লাঞ্চ এবং আবার পাঁচটা পর্যন্ত বাতিঘরে কাজ, এসবের ভিতর এক বিস্ময়কর একঘেয়েমি এবং রাতে আমার আর কী সম্বল। কাছে টেনে নিলেই কেমন আঁতকে উঠত। চোখ ওর নীল হয়ে যেত ভয়ে। এবং এভাবে এই দুঃখ ভিতরে জেগে গেলে ত্রাউসের মাকে আর বাঁচানো গেল না। ঠিক এখন ত্রাউসের চোখ-মুখ দেখলে আমার এমন মনে হয়।

পরদিন মিলান পুলককে নিয়ে জিপে চলে গেল।

রাস্তাটা ভারী মনোরম ছিল। নানারকম পাহাড় কেটে উঁচু নিচু পথ। যাবার সময় মিলান পিয়াদ্রোতে একটু বিশ্রাম নিল। সেখানে সে পুলকের সঙ্গে সামান্য কফি আর বিস্কুট খেল। দুপুরে বোসানের মা ওদের খাবার ঠিক করে রাখবে। বোসানের বাবা-মা ত্রাউসের বাড়িতে আজ খাবে। এবং এটা বোধহয় আর-একটা মৃত্যুবার্ষিকী। অবশ্য কেউ খুলে বলছে না। মিলানও খুলে বলছে না, আজ ওর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী। ত্রাউসও গেলে বলবে না, পুলক এই দিনে আমার মা মারা যান। যেন মৃত্যুর এই ভয়াবহ ছবি সবাই ভুলে থাকতে চায়। সবাই জানে অথচ সবাই গোপন করে রাখে। এবং গোপন না করলে সব খোলামেলা হয়ে গেলে একসময় স্মৃতিতে ডুবে যাওয়া এবং এমন হলে বিকেল থেকেই হয়তো আবার দেখা যাবে, ত্রাউস একটা কাচের জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাই এভাবে গোপনে একটা মৃত্যুবার্ষিকীর উৎসব করে ফেলে।

রাস্তার দু'পাশে সব গাছপালা যা পুলক চিনতে পারে না। মিলান গাড়ি চালাচ্ছে। সে কিছু কাজুবাদাম পাশে রেখেছে। একটা-দুটো করে কথাবার্তা বলার ফাঁকে খাচ্ছে। পুলকও মাঝে মাঝে দুটো-একটা তুলে নিচ্ছিল। সে যে ত্রাউস যাবার পর সব ক'দিন পাহাড়টার পেছনে একটা গোপন স্থানে রাত কাটিয়েছে এবং এক ভীষণ আকর্ষণ, যেন পুলকের তর সইছে না, সে লায়ন রক থেকে দুরবিনে দেখেছে ত্রাউস মাঝে মাঝেই লাইট-হাউজের কন্ট্রোলিং টাওয়ারে উঠে ট্র্যাপিজের খেলা আরম্ভ করে দেয় এবং দিলেই ভয়। সে যেন আজ কেবল বলতে যাচ্ছে, দোহাই ত্রাউস, তুমি আমাকে এভাবে ভয় দেখিয়ো না। এভাবে ভয় দেখালে রাতে আমি ঘুমোতে পারি না। তোমার জন্য দ্বীপের পাশে পাহারায় থাকি। যেন তুমি পড়ে গেলেই আমি তোমাকে ধরে ফেলতে পারব।

আশ্চর্য সব ভাবনা। পুলকের জাহাজে ফিরে এলেই মনে হত, আবার ত্রাউস ট্র্যাপিজের খেলা বোধহয় আরম্ভ করে দিয়েছে। সে জাহাজে কিছুতেই কাজে মনোযোগ দিতে পারত না। কখন সারেঙ বলবে, টাস্টু অর্থাৎ ছুটির ঘণ্টা পড়বে এবং সে সবসময় ঘড়ির দিকে চোখ তুলে রাখলে টের পেত বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজছে এক দুই তিন, সে ঘণ্টার শব্দ শুনে কেমন প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর সারাজীবন লড়ে যাবে এমন ভাবত আর তখনই মনে হত, নন্দিনী একটি মেয়ের নাম। নন্দিনী একটি ভালবাসার নাম। নন্দিনী তারপরে কী যে অস্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকে। শীতের ভিতর এসব মনে হলে ওর কপালে ঘাম দেখা দিত।

পুলক বলল, আর কতদূর?

বেশ দূর। সামনে একটা ব্রিজ পার হতে হবে।

পুলক ব্রিজ পার হবার সময়ই মিলান বলল, খুব দূরে মেঘের মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ?

সামনে না পেছনে?

পেছনে।

ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনটা।

পুলকের মনে হল সেই নীল উপত্যকা, যেখানে সে ত্রাউসের হাত ধরে ছুটে বেড়িয়েছে। ত্রাউসের সাদা হাত, ঠিক সাদা নয়, গোলাপি রং, সে হাতে হাত রাখলেই রংটা গোলাপি হয়ে যেত, ভিতরে তার প্রাণের খেলা, এমন মনে হলে পুলকের আর ইচ্ছা করছে না পেছনে তাকাতে। ওরা ডানদিকে লাইট-হাউজ ফেলে আরও সামনে চলে যাচ্ছে। বড় বেখাপ্পা জায়গায় এই বাতিঘর। পুলক ঠিক ভেবে পায় না, এমন একটা জায়গায় সরকার বাতিঘরটা কেন করলেন!

মিলান বলল, দ্বীপটা খুব তোমার পছন্দ হবে।

পুলক একটা চুইংগামের প্যাকেট খুলে সামনে রাখল। সে একটা ট্যাবলেট মুখে পুরে চুষতে থাকল। সে বলল, ত্রাউসের দ্বীপটা ভাল লাগে না?

একসময় ও দ্বীপটাকে খুব ভালবাসত। স্কুল ছুটি হলেই চলে আসত। আর যেতে চাইত না। কিন্তু তারপর...।

মিলান যেন খুব ভালভাবে চারপাশটা দেখে এখন গাড়ি চালাচ্ছে।

এমন মুখ দেখলেই কেন জানি বলতে ইচ্ছা হয়, আপনি ভাববেন না, ত্রাউস ঠিক ভাল হয়ে যাবে। ত্রাউসের ভিতর আমি সেই ভালবাসার সুষমা আবিষ্কার করে ফেলেছি। এ মেয়ে সহসা অকারণ মরে যেতে পারে না। সে অথচ কিছু না বলে কেবল বলল, দ্বীপের মাথায় যে বাতিঘরটা আছে ওখানে কি কেউ ট্রাপিজের খেলা দেখায়?

মিলান এমন কথা শুনে খুব অবাক চোখে তাকাল।

পুলক না তাকিয়েই বুঝতে পারল, মিলান এখন ওকে খুব অপলক চোখে দেখছে। সে বলল, লায়ন রকের পিছন দিককার একটা দ্বীপে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। দূরবিনে কন্ট্রোলিং টাওয়ারে চোখ রাখলে আমার কেন জানি মনে হত ত্রাউসের মতো একটা মেয়ে কেবল দুলছে। সে আত্মহত্যার জন্য বারবার রেলিং-এ ঝুঁকতে দেখেছে মেয়েটাকে, এমন বলল না।

মিলান বলল, সেখানে ত্রাউস মাঝে মাঝে যায়। ওর ভাল না লাগলেই যায়।

এখন কি সে সেখানে গিয়ে বসে রয়েছে?

থাকতে পারে।

পুলকের বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বলল, ওকে ওখানে যেতে দেবেন না। জায়গাটা আমার খুব ভয়ের মনে হয়।

মিলান বলল, ভয়ের কী আছে?

এত উঁচু থেকে ও যদি পড়ে যায়!

মিলান একটা চুরুট ধরাচ্ছিল তখন। সে গাড়িটাতে তেমন স্পিড দিতে পারছে না। পুলক তাকে ভয়ের কথা বলছে। কী ভয় থাকতে পারে সে বুঝতে পারছে না। সামনের একটা বড় টিলা ঘুরে সোজা পথে উঠে যাবার সময় কেমন একটু অবসর পেয়ে বলল, অত উঁচু থেকে সে পড়তে পারে না।

পুলক আর কী বলবে? খুব বিশ্বাস ত্রাউসের উপর। দুর্ঘটনার ব্যাপারটাকে আদৌ আমল দিচ্ছে না। পুলক দেখছিল তখন দু'পাশেই পাহাড়। বেশ এঁকে বেঁকে গাড়ি দ্রুত ছুটছে। সে দুম করে বলে দেবার মতো বলে ফেলল, দুর্ঘটনা কখন ঘটে কেউ বলতে পারে না।

সে ঠিক।

তবে?

তবে ওখানে কী করে সেটা ঘটবে? গোটা কন্ট্রোলিং টাওয়ার দামি কাচে মোড়া।

কাচের ভিতর ত্রাউসকে এত স্পষ্ট দেখা যাবে কী করে!

খুব দামি কাচ। ভীষণ পাতলা। মনে হবে জলের মতো মসৃণ।

পুলক আর কিছু বলতে পারল না। সে কেমন বোকার মতো বসে থাকল। সে কী যে বোকা! সে সারারাত একটা পাহাড়ের ছাদে কাটিয়ে দিয়েছে। পাহারা দেবার মতো ব্যাপারটা। আসলে সে বুঝতে পারছে না নিজের ভিতরই আছে এক আশ্চর্য ভালবাসার খেলা। সে খেলা আরম্ভ হলে রক্তের ভিতর কষ্টকর তাড়না। এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয় না। নন্দিনী তাকে এভাবে ছুটিয়ে মেরেছে। এখন ত্রাউস। সে বলল, এবার আমরা বোধহয় এসে গেছি?

এসে গেছি।

কারণ পুলক সমুদ্রের ধারে নানারকম ছোট ছোট বোট দেখতে পেল। কিছুটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হয়। ওর জানা নেই সমুদ্রের ওপর বরফ জমতে থাকলে কীভাবে হাঁটা যায়। সে এখানে কিছুটা রপ্ত করে নেবার মতো বরফের ওপর সন্তর্পণে হেঁটে বেড়াল। যাতে সে পড়ে না যায়, পা-টা স্লিপ না করে সে সেজন্য বেশ কায়দা-মাফিক হাঁটতে থাকলে মিলান হাত তুলে ইশারা করল। বোট রেডি। এবার আমরা দ্বীপে পৌঁছে যাব।

পুলক একটা সাদা ফ্রক-পরা মেয়েকে সামনের দ্বীপে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝতে পেরেছিল, এটা সেই দ্বীপ, যেখানে ত্রাউস নামে একটি মেয়ে তার আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনছে। সে বোট দাঁড়িয়ে হাত তুলে দিল।

দ্বীপে তখন বেশ হাওয়া ছিল। মেয়ের চুল হাওয়ায় উড়ছে। হাতে তার নীল রঙের দস্তানা। পায়ে সাদা রঙের জুতো। সাদা রঙের গরম মোজা। এবং গরম ফারের কোট হাঁটু পর্যন্ত। একটা মোমের পুতুলের মতো ত্রাউসকে দেখাচ্ছে।

আর তখন ছিল নীল সমুদ্রে অজস্র ঢেউ। কী উঁচু উঁচু ঢেউ এবং বেশিদিন ঢেউ থাকছে না। বরফে জমে গেলে সমুদ্র, আশ্চর্য নীরবতা বিরাজ করবে চারপাশটায়। তখন তুষারঝড়ের শব্দ মাঝে মাঝে দূরবর্তী কোনও পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভীষণ এক কঠিন খেলায় মেতে যাবে। তখন ত্রাউস কীভাবে বেঁচে থাকে এই দ্বীপে পুলক ঠিক বুঝতে পারে না।

বারো

ইমাদুল্লা বলল, বুঝলে সারেং সাব!

সারেং সাব ঠিক বুঝতে না পেরে পিছন ফিরে তাকাল।—আমাকে কিছু বলছ!

বলছিলাম জাহাজিদের কপালে কতরকমের দুঃখ লেখা থাকে।

সারেং সাব ইঞ্জিনেব লোক। সে ইঞ্জিন-সারেং। তার দোস্তি বয়লারের সঙ্গে। এখন তো অনেক জাহাজ অযেলে চলে। আবাব বেশ কয়েকটা মোটর ভেসেলও কোম্পানি কিনেছে। বয়স হয়েছে যেহেতু, সেজন্য সে জানে এই বয়লারগুলি কী যে কসবি! কয়লার জাহাজেই তিনি বেশি কাজ করেছেন। কয়লাব জাহাজে কাজ কবলে অনেক দুঃখ লেখা থাকে কপালে। সে কী ভেবে বলল ঃ থাকে।— বলেই সে কেমন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, তা হঠাৎ এমন কথা!

না বলছিলাম, এটাই জাহাজিদেব ভাগ্য।

একবার একটা বয়লার কিছুতেই স্টিম দেয় না, গেজে স্টিম কিছুতেই দুশো দশের ওপর তুলতে পারছি না আর দরিয়াতে তেমনি দেওয়ানি, কী যে কষ্ট, দেওয়ানি দেখলেই বয়লারটা কেমন ভয় পেয়ে যেত। ছোট-টিন্ডাল তো একদিন ফায়ারম্যানকে পাছায় লাথি মেরে দিল। ছোট-টিন্ডালের নালিশ বয়লারটাকে কেন বাগে আনতে পারছে না আগয়ালা। সে কী করবে কও...

ইমাদুল্লা বুঝল কথা বলতে বলতে দ্যাশের কথা বাইর হইয়া গ্যাছে। সে হেসে দিল। বলল, সারেং সাব, কষ্ট অনেকরকমের। আমি বলছিলাম পুলকের কথা।

বয়সের দোষ ইমাদুল্লা। বয়সের দোষ।

ইমাদুল্লা বলল, ছোকরাটা এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল! কিছু বলাও যায় না। অথচ সারাটা জীবন কষ্ট পাবে।

তা পায়। জাহাজিদের এমন একটা দুঃখ কখনও না কখনও পেতেই হয়। কবে আবার পুলক এ বন্দরে আসতে পারবে কেউ জানে না। আর আসবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না। অথচ দ্যাখো কী দুঃখ কপালে। জাহাজ ছাড়ার সময় ডেক থেকে লাফ দিযে না সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আবার আত্মহত্যা করে!

এবং এভাবে সারেং সাব তার নাবিক-জীবনে কতবার কতভাবে এমন সব ঘটনা দেখেছে, সেসব এখন এক দুই করে যেন বলে যেতে থাকবে। আর ব্যাপারটা হবে তার কাছে মামার বাড়ির মাসিক খবরের মতো। সুতরাং এখন সারেং সাবের দার্শনিক মুখ-চোখ দেখতে হবে ভেবেই ইমাদুল্লা বলল, তবু যা হোক আপনার চেষ্টায় সে জাহাজ থেকে দুটো দিন ছুটি পেল।

এমন কথায় চিড়া ভিজবে কি ভিজবে না, ইমাদুল্লা বুঝতে পারল না। সে যে কথাটা বলবে ভেবে রেখেছিল অর্থাৎ সে এবার নিজেও দু'-তিন দিনের ছুটি চায়। তার ইচ্ছা যখন পুলক গেছে দ্বীপটাতে তখন সেও দু'-একদিন থেকে আসে। অবশ্য এখন নয়, বরফ যখন বেশ জমে যাবে তখন। সে ভাল

সাইকেল চালাতে জানে। সে পুলকের সঙ্গে ঘুরে আসবে, এবং পুলকের যা স্বভাব, বরফ পড়লে সে ঠিক একা একা বের হয়ে যাবে।

ইমাদুল্লা কেন এমন ভাবছে এখন বুঝতে পারছে না। এই বয়সে ওর তো ববফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাবার শখ থাকার কথা না। সে কি সেই দ্বীপটায় অথবা যেখানে ডিভাইন লেডি আছে সেটা আর-একবার দেখবে বলে যেতে চাইছে? সেখানে ওর ঠিক পুলকেব বয়সে এমন কোনও স্মৃতি জুড়িয়ে নেই যে, না গেলে মনটা খাঁ খাঁ কববে। সে মেসরুমের ভিতর দাঁড়িয়ে নানাভাবে নিজেব এই ছুটি নেবাব ইচ্ছা এবং ভিজা কথায় চিডা ভেজে কি না, এসবের ভিতব আশ্চর্য হয়ে গেল ভেবে জাহাজে থাকতে থাকতে কখন এই পুলক তার সন্তানের মতো হয়ে গেছে। ওব ভয় কখন ছেলেটা না ওর কাছ থেকে দুরে সরে যায়। অথবা যা সব রাস্তাঘাট এবং যেভাবে এ অঞ্চলেব আবহাওয়া ক্রমে খারাপেব দিকে যাচ্ছে তাতে করে পুলকের সবচেয়ে দুঃসাহসিক যাত্রার সময় তাব সঙ্গী হওয়া দবকার।

সে বলল, সারেং সাব, একটা কথা ছিল।

সাবেং সাব ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে। সে মেসরুমের দরজা বন্ধ কবে রেখেছে। গ্যালি থেকে উনুনেব গন্ধ আসছে বলে ঘরটা সামান্য গরম। এখন আর নীচে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এখানেই চা আব রুটি খেয়ে নেবে। ন'টার বেল পড়লে আবার ইঞ্জিন-রুমে নেমে যেতে হবে।

সাবেং সাব বলল, কী কথা?

দু'দিনের ছুটি আমারও দবকাব।

তোমাবও কি শেষ পর্যন্ত.

সাবেং সাব, আমারও শেষ পর্যন্ত কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পাবছি।

মবেছ তবে। এই বুড়ো বয়সে...

বুডো বয়সে আমার এমনটা হবে বুঝতে পারিনি।

সাবেং সাব বলল, সে হয়ে যাবে। মেজ-মিস্ত্রিকে বললেই হযে যাবে। কিন্তু কী বলে ছুটি নেওয়া যায় বলো তো!

কেন, যা হয়েছে আমার!

মেয়েটা কে? জাহাজে কখনও এসেছিল?

ইমাদুল্লা হেসে দিল। তারপব বলল, সব কথা সবসময বলা যায না সাবেং সাব। আমার এমন দুর্বলতাব কথা আপনি নাই জানলেন।

তা তুমি পাবো। তোমার ঘরে তো কেউ নেই। বিবি ব্যাটা সব খেয়ে বসে আছো।

ইমাদুল্লা অপরাধীর মতো মুখ কবে রাখল।

সে বলব। তোমার জন্য না হয় বলে দুটো দিন ছুটি কবিয়ে নেওয়া যাবে।

ইমাদুল্লা বলল, আমার জন্য যেভাবেই হোক এটা কবিয়ে নিতে হবে।

তারপর কেমন ইতস্তত করে আরও কিছু বলবে বলে এগিয়ে গেলে সাবেং সাব বলল, তোমার শরীরটা খুব ভাল দেখাচ্ছে না। তোমার কি জ্বরটর হয়েছে? —বলে কপালে হাত রাখল সারেং সাব।

না, জ্বরটর কিছু হয়নি।

তবে চোখ-মুখের এমন অবস্থা কেন? ক'দিন কাজের এমন চাপ গেছে কাবও দিকে মুখ তুলে দেখাব সময় পাইনি।

ক'রাত ভুল ঘুম হয়নি।

সাবেং সাব কেমন খেপে গেল।— বুড়ো বয়সে মরণের কাঠি কানে বাঁধছ মিঞা।

ইমাদুল্লা কিঞ্চিৎ হাসল। তারপর বলল, যাই হোক কেউ যেন না জানে সারেং সাব।

সাবেং সাব নীচে নামবে না, অথচ এমন কথা শুনে আর মেসরুমে দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কী যে হয় মানুষের! কোথায় কী করে যে মানুষ এভাবে জাহান্নামে নেমে যেতে পারে! সে বলল, ঠিক আছে, কাউকে বলব না।

এই বয়সে ইমাদুল্লার চোখে-মুখে ঘুম না থাকবার কথা নয়। তবু যে কেন রাতে কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। এই ছেলেটা কোথায় থাকে রাতে! একবার ভেবেছিল সারেংকে দিয়ে কাপ্তানের কাছে

নালিশ জানাবে, ছেলেটা এভাবে খারাপ আবহাওয়ায় সারাটা রাত কোথায় থাকে, আপনি কাপ্তান ব্যবস্থা করুন। এবং কাপ্তান ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তিনি জানেন এইসব জাহাজিদের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দরে এলে একটু এলোমেলো স্বভাবের হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আবার বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে পড়লেই এক ভীষণ একঘেয়েমি। এই একঘেয়েমি সমুদ্রযাত্রা থেকে রক্ষা করাও তার কাজ। জাহাজিরা খুব একটা মারাত্মক কিছু করে না বসলে কাপ্তান কিছুতেই নাক গলাতে চান না। কাজের সময় হাজির থাকলেই তিনি খুশি। আর এই পুলকের পক্ষে তো খুবই সুবিধাজনক কিছু কিছু ঘটনা জাহাজে ঘটেছে। কারণ সে তো খুব ভাল ছেলে, কাজে আন্তরিক। সে ভালভাবে ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করেছে। অনেক বই পড়েছে। অনেকদিন সে দেখেছে পুলক বোট-ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেজ-মিস্ত্রির সঙ্গে কীসব দামি দামি কথা বলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। সে এতসব কথা বোঝে না, তবু সে জানে অথবা বোঝে মেজ-মিস্ত্রির ভীষণ ভাল লাগে পুলকের কথা শুনতে। চোখে-মুখে মেজ-মিস্ত্রির খুব একটা আন্তরিকতা থাকে তখন। এবং ইমাদুল্লার পুলককে বড় মানুষ ভাবতে কষ্ট হয় না তখন।

পুলক এইসব ছুটির ব্যাপারে সারেং সাবের চেয়ে কম যায় না। সে ইচ্ছা করলে মেজ-মিস্ত্রিকে দিয়ে ছুটি করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, কাজের সময় পুলক ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খায় না। আর ওর মুখে চোখে খুব একটা উদাস ভাব অথবা বিষণ্ণতা ঝুলে থাকে বলে জাহাজিরা ওর হাতের কাজটুকু সেরে ফেলতে ইতস্তত করে না।

কিন্তু ইমাদুল্লার হয়েছে জ্বালা। সেই যে কলকাতা বন্দরে উঠেই সে বলেছিল, চাচা, সফরে যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখে দিন কেটে যাবে, তখনই ইমাদুল্লার মনে হয়েছিল এমন বাবু-মানুষ লেখাপড়া জানা মানুষ জাহাজের এমন কাজে কেন! অবশ্য ভদ্রা জাহাজ থেকে কিছু কিছু বাঙালিবাবু আসছে। ইমাদুল্লার স্বভাবই তখন ছিল এমন, ওরা হিন্দু বাঙালি ছেলেদের বাঙালিবাবু বলত। তবু সে যেন ওসব বাঙালিবাবুদের সঙ্গে এ বাঙালিবাবুর একটা বড় রকমের তফাত খুঁজে পেয়েছে।

আর বন্দরে বন্দরে কত প্রশ্ন পুলকের। চাচা, এটা কেন হল, ওটা কেন হচ্ছে না। চাচা, তোমার সঙ্গে আমার এক জায়গায় একটা বড় রকমের মিল আছে, তোমারও দেশে কেউ নেই, আমারও নেই, সমুদ্রই আমাদের ঘর, দেশ বন্দর যা কিছু বলো। দেশে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারি না। কেমন সমুদ্র কেবল টানে।

সমুদ্র কেবল টানে কথাটা ওর ভিতরেও কাজ করে থাকে মাঝে মাঝে। সে যেন বুঝে ফেলেছিল ঠিক ইমাদুল্লার নসিবের মতো পুলকের নসিব হয়ে গেল। দেশে গিয়ে আর পুলক কখনও ঘর বেঁধে কিনারায় কোনও কাজ খুঁজে থেকে যেতে পারবে না। কিছু সময় পার হলেই ওর চোখে-মুখে সমুদ্রের জন্যে বিষণ্ণতা জাগবে। ওর মনে হবে, অনেকদিন হয়ে গেল, সে সমুদ্রে পাল তুলে যাচ্ছে না। নোনাজলের কী এক ভীষণ মায়া আছে।

এই মায়ায় সেও জড়িয়ে পড়েছে জাহাজে। জাহাজে এটা হয়। কত সব জায়গা থেকে জাহাজিরা আসে। কারও বাড়ি সুদূর আরাকানে, কেউ ভোলা সন্দীপের লোক, কেউ আবার মেদিনীপুর থেকে এসেছে, নোয়াখালির মানুষই জাহাজে বেশি থাকে। এ জাহাজে ইমাদুল্লা গুনে দেখেছে সংখ্যায় সারেং সাবের দেশের লোকই বেশি। সাধারণত এটা সারেং সাব নোয়াখালির মানুষ বলে শিপিং অফিসের মাস্টার থেকে বেছে বেছে বেশি করে নোয়াখালির লোক নিয়েছে। ইমাদুল্লা নিজের বাড়ি কোথায় এখন যেন সঠিক জানে না। সে কবে কলকাতায় এসে যে থেকে যায়, আর দেশে ফেরার ইচ্ছা হয় না, এবং স্মৃতিতে দেশের কথা সে খুব একটা বেশি মনে করতে পারে না, আর পারে ছোট বিবি, নাকে নোলক পরে থাকত তার বিবিটা, পাছাপেড়ে শাড়ি পরতে খুব পছন্দ করত, সফর থেকে ফিরে গেলেই বিবি পেটি থেকে খুঁজে বের করত তার শাড়ি, সেমিজ আর চোখে সুরমা দেবার শখ ছিল ভীষণ। কোনওবার ভুলে সুরমা না নিলে বিবি মুখ ভার করে রাখত। সেই বিবির এক ছেলে, ছেলে এবং বিবি মহামারীতে গেলে, সে আর কিছু মনে করতে পারে না। সে তখন সফরে ছিল। সমুদ্র-সফরে জাহাজিদের এমন খবর এলে যা হয়, কেবল ডেক-এ পায়চারি করা, জাহাজ থেকে ফেরার কোনও পথ থাকে না। সে জাহাজে তার শোক দুঃখ, সমুদ্র আর পাহাড় অথবা দ্বীপ দেখতে দেখতে, কখন ভুলে গেছিল। যখন

কলকাতায় ফিরে আসে লোকটা আদৌ বুঝি ছিল না কী যে হয়েছিল মনে, সে এখন ভেবে পায় না, কেন যে আর দেশে ফিরেই যায়নি। কেবল দেশের লোক এলে সে তাদের সঙ্গে কথা বলে ওর খুঁটিনাটি জানতে জানতে কেমন উদাস হয়ে গেছে। তারপর সে বেশ ছিল। কোনও মায়া অথবা বন্ধনে সে বাঁধা ছিল না। জাহাজে একসঙ্গে থাকতে থাকতে একটা মায়া গড়ে ওঠে তবে যেন এটা ঠিক তেমন ব্যাপারও নয়। সে পুলকের জন্য ক' রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। খারাপ আবহাওয়ায় সন্তান সমুদ্রে গেলে যেমন চিন্তা, ইমাদুল্লাকে তেমনি পেয়ে বসেছে। সে খুব সকাল হলেই সেজন্যে রেলিং-এ দাঁড়িয়ে থাকত। এবং যখন দেখতে পেত পুলক বোটে ফিরে আসছে, ওর বুক থেকে একটা পাষাণ-ভার নেমে যেত যেন। পুলক কী করে যে এই জাহাজে তার সন্তানের মতো হয়ে গেল।

তেরো

ওপাশ থেকে দ্বীপটাকে দেখলে যা মনে হয় এপাশটায় তার বিপরীত। পুলক লায়ন রক থেকে দ্বীপটাকে দেখেছিল এবং এত খাড়া পাহাড় যে সে ভাবতেই পারেনি স্যান্টিসের মুখে দ্বীপটা ঢালু। অনেকটা দেশের বাড়িতে সে সরস্বতী পুজোয় যে পাহাড় নির্মাণ করত তেমনি। ঠাকুরের পেছনটা একেবারে খাড়া, তারপর ধীরে ধীরে নদী পাহাড় বন সমতলভূমি। সে সামনের বেলাভূমিতে নেমে এমনই ভেবেছিল। এবং ত্রাউসের আশ্চর্য দেবীর মতো মুখ তার দেশের বাড়িতে কোনও শীতের সকালে দেবী প্রতিমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। যেন এই সমুদ্র আকাশ এবং পেছনের শীতের পাহাড় না থাকলে ত্রাউসকে ঠিক বোঝা যেত না। সে ত্রাউসের কাছে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে গেল। দেখে বোঝাই গেল না, সে এতদিন পর ত্রাউসকে দেখে কতটা খুশি।

ত্রাউসের যেমন স্বভাব, একটু বয়সি মেয়ের মতো কথা বলার বাতিক, স্বভাবে একটু ভারী-ভারী। এখনও কখনও খুব গম্ভীর মনে হয় সেজন্য অথবা ওর অসুখটাবই বুঝি এমন স্বভাব, একটু বয়সি হয়ে যাওয়া। সে পুলককে হ্যান্ডশেক করার সময় বলল, রাস্তায় কোনও অসুবিধা হয়নি তো?

অসুবিধা হবে কেন? কী সুন্দর রাস্তা। খুব প্লেজান্ট জার্নি। দু'পাশের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কী করে আমরা আসছিলাম।

মিলান তখন বোটটা বেলাভূমির ওপর টেনে তুলছে। দুটো বোট। ছোট এবং বেশ চওড়া বোটে পাল খাটাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে। বোটের মোটর কোনও কারণে মাঝ-সমুদ্রে বিগড়ে গেলে পাল উড়িয়ে সহজেই এ দ্বীপে চলে আসা যায়। স্যান্টিস থেকে সমুদ্রপথে কত সহজ আসা। ওরা যদি স্যান্টিসে জাহাজের নোঙর ফেলত, তবে শেষ ক'টা দিনও সে অনায়াসে রোজ একবার বিকেলে এই দ্বীপ থেকে ঘুরে যেতে পারত। স্যান্টিস থেকে বেশ দূর অথচ যাতায়াতে খুব সুবিধা।

একটা বোট কাজে বের হয়ে গেলে আর একটা স্ট্যান্ড বাই থেকে যায়। কারণ কত কারণে স্যান্টিসের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখতে হয়। বরফ জমছে ধীরে ধীরে, খুব বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বোট চালিয়েছে মিলান। যখন সে ত্রাউসকে নিয়ে এসেছিল, সঙ্গে ছিল লটবহর। বরফ-কাটা কলের জাহাজ এদিকটায় কী কারণে এসেছিল। সেই জাহাজে আসার দরুন ত্রাউস ঠিক জার্নির মজাটা টের পায়নি। সে বলল, তুমি ভীষণ লাকি।

তা বলতে পারো।

মিলানের আসতে দেরি হবে, কারণ সে বোট বাঁধাছাদা করে আসবে। একটা ছোট পাহাড়ের শেষ দিক সমুদ্রের জলে নেমে গেছে। বোটটাকে টেনে বালিয়াড়িতে তুলে সেখানে সে ফেলে রাখল। এখন কিছু কিছু ঝড়, উত্তর থেকেই আসার কথা। এই পাহাড়ের আড়ালে বোট ফেলে না রাখলে ঝড় দড়িদড়া ছিঁড়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এসব কাজ সারতে মিলানের বেশ দেরি হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছে ধীরে ধীরে ত্রাউস এবং পুলক হাঁটছে। পুলককে খুব লম্বা লাগছে কেন জানি আজ। বোধহয় পুলক ওভারকোট পরেছে বলে এমনটা লাগছে।

পুলক হাঁটতে হাঁটতে বলল, কেমন আছ?

ভাল।
ভাল আমারও মনে হচ্ছে।
কী করে বুঝলে?
যখন দাঁড়িয়ে ছিলে তখনই বুঝলাম এটা ত্রাউসের দ্বীপ। তুমি ভাল না থাকলে দাঁড়িয়ে থাকতে না
কেন লাইট-হাউজটা দেখতে পাওনি?
লাইট-হাউজ দেখার আগে তোমাকে দেখে ফেলেছি।
ত্রাউস এমন কথায় ম্লান হাসল।
তুমি হাসছ?
হাসব না তো কী করব?
সত্যি বলছি তোমাকে আমি আগে দেখেছি।
এত বড় লাইট-হাউজটা আগে চোখে পড়ল না।
জানি না কেন এমন হয়।

সত্যি জানা যায় না এমন কেন হয়। এখানে আসার পর ত্রাউস দু'দিন না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেই আবার অসুখটা ভিতরে জেগে যায়। যেন চারপাশে তার মৃত্যুভয়। একটা সাদা মরুভূমি, জল নেই বাতাস নেই, শূন্য আকাশ, আর চারপাশে সে চাপা আর্তনাদ শুনতে পায়। কেবল সবাই হাঁটছে, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু হেঁটে যাচ্ছে। মরীচিকার মতো জলের রেখা খুব দূরে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও আবার সব কেমন মিলিয়ে যায়। ত্রাউসের বেঁচে থাকার সামগ্রী অথবা উত্তেজনা সবই কেমন নিমেষে মিলিয়ে যায়, আব সহসা সব শূন্য হয়ে গেলে সে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তাকে কেমন জানি বরফের দেশে একটা পত্রপুষ্পহীন গাছের মতো মনে হয়।

ত্রাউস বলল, কাল সকাল থেকেই আবার তাজা হয়ে গেলাম। তুমি আসছ।
ঠাট্টা করছ?

যদিও এটা ঠাট্টা নয় পুলক বোঝে তবু স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং এমন সব কথার ভিতর নিয়ে যেতে হবে, যা তাব কাছে খুব আনন্দের। ওব বোধ বুদ্ধি সব স্বাভাবিক করে দিতে পারলেই সে সেই মেয়ে কোনও হেমন্তেব রোদে দাঁড়িয়ে থাকা বালিকার ছবি। পুলক বলল, আবার কবে আসব জানি না।

কেন, জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে।
দেবে। আজ হোক কাল হোক জাহাজ তো ছেড়ে দেবেই।
ত্রাউস বলল, তুমি থাকবে এ দ্বীপে?
থাকলে তুমি ভাল হয়ে যাবে?
আমার মনে হয় আমি ভাল হয়ে যাব।
পুলক বলল, সে হবে-খন।
ত্রাউস কী বলবে ভেবে পেল না।
আমি জানি এমন কথায় তুমি কষ্ট পাচ্ছ।
আমার আবার কষ্ট কীসের!
তোমার অভিমান আমি ঠিক ধরতে পারি।
পুলক!—ত্রাউস কেমন দৃঢ় গলায় এবার কথা বলল।
বলো।
কেন আবার এলে?
জানি না।
না, ঠিক জবাব দেবে।
তোমাকে দেখতে।
আর কিছু না?
না।
পুলক, তুমি বলতে চাও আমি কিছু বুঝি না?

পুলক বলল, কেন বুঝবে না? তোমার তো বয়স হয়েছে। এ বয়সেই তো মেয়েরা সবকিছু বেশি বুঝতে পারে।

তবে তুমি থেকে যাবে না কেন? বাবাকে বললে তিনি রাজি হবেন। এখানে তুমি থেকে গেলে সব তিনি করে দেবেন।

পুলক বলতে চাইল, তবে তুমি আর ভাল হবে না। কিন্তু বলার মুখে সে ভাবল, এমন বলাটা ঠিক হবে না। তাকে এসব বুঝতে দিতে নেই। আর পুলক তো জানে এমন একটা শীতের দেশে সে বেশিদিন সুস্থ থাকতে পারবে না। অথবা তার মনে হয় সে যে এখানে ছুটে এসেছে, এটা শুধুই তাব ভিতরের অহংকারের জন্য। সে এ মেয়ের কতটা ভাল চায় ঠিক বুঝতে পারছে না। অথবা এখানে থেকে গেলে বোধহয় খুব স্বার্থপরের মতো ব্যাপারটা হয়ে যাবে। তবে তুমি একটা অসুস্থ মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ। মিলান এমন ভাবলে, সে যে পুলক এবং তার কাছে যে মনে হয়, ভালবাসাব সুষমা থাকা দবকার, সব অর্থহীন হয়ে যাবে। সেটা সে বুঝতে পারে। নন্দিনী তাকে এটা শিখিয়েছে। আজীবন নন্দিনী একটা নাম, ভালবাসার নাম তার কাছে।

পুলক এবাব একটা সরু রাস্তায় ঢুকে যাবার সময় বলল, সে ভেবে দেখা যাবে।

তাবপর আর একটু এগিয়ে গেলেই বাংলো টাইপের ঘব দেখিয়ে ব্রাউস বলল, ওই যে আমাদের বাড়ি।

পুলক পিছনে তখন তাকিয়ে দেখল সমুদ্র আব দেখা যাচ্ছে না। ওরা দ্বীপটার ভিতর ঢুকে গেছে।

তাবপর এ দ্বীপে ক'টাদিন, কী যে দিন, পুলক ভেবে পায় না, এমন দিন কবে সে উপভোগ করেছে।

সকাল হলে সে ওই ঘরে কাপ-প্লেটের শব্দ পেত। পায়ের ঠিক নীচে হিটারটা জ্বলছে। তার একটা কেমন বিনরিন শব্দ কানে আসত। সে কম্বলের নীচ থেকে উঁকি দিলেই দেখতে পেত, জানালা দিয়ে সামনেব সবকিছু খুব অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আছে, সকাল হয়েছে, তবু কেমন অন্ধকার কাটেনি। কখন মিলান কাজে বের হয়ে গেছে টেরও পায়নি। ব্রাউস ওর জানালায় চা এবং একটু পবিজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত সকালে যে ব্রাউস উঠে পড়ে আজকাল।

ব্রাউসেব স্বভাব, ঘর খুলে দিলেই হিটারটা কমিয়ে দেওয়া।

তুমি এমন গরমে থাকো কী কবে!

পুলক চা খেতে খেতে বলত, আমার তবে শীত যাবে না শবীর থেকে।

ব্রাউস বলত, তুমি ভীষণ শীতকাতুবে মানুষ বাবা।

তুমি বড় হলে একবার ভারতবর্ষে তোমাকে নিয়ে যাব।—পুলক বলত।

সত্যি?

তখন দেখবে তুমি কেমন গরমে ছটফট করবে।

তাই বুঝি!

আমি তখন বলব কী গরমকাতুরে তুমি বাবা।

ব্রাউস বেশ জোরে হেসে দিত।—তোমার তো আমাকে জব্দ করাই কেবল কাজ।

যা, কবে তোমাকে আমি জব্দ করলাম?

করছ না! সেদিন করলে না? পেনি গিলে গিলে আমাকে জব্দ করলে না!

সেটা তো একটা খেলা।

আমার কাছে তোমার আসাটাও খেলা।

তখন আর যেন পুলক কথা বলতে পারত না। মেয়েটার মুখ খুব বিষণ্ণ দেখাত। এ বিষণ্ণতার মানে অন্যবকম। তার খুব কষ্ট হয় এবং এই বিষণ্ণতা ব্রাউসকে যথার্থই নিরাময় করে তুলবে। সে বলত, খেলা অবশ্য তুমি বলতে পারো।

তা ছাড়া কী বলব? আমি আর কবে বড় হব ভাবছ?

আরও বড় না হলে ঠিক তুমি আমার দেশে যেতে পারছ না।

সবই কথার কথা, ব্রাউস বুঝতে পারে। সে দু'দিনে দেখেছে একবারও বাবাকে পুলক তার থাকার ইচ্ছাটা প্রকাশ করেনি। এবং ব্রাউস কেমন অভিমান ভরে আর কথাটাকে মনেও করিয়ে দেয়নি। যার

স্বভাব এমন, বন্দরে বন্দরে যে ঘুরে বেড়াবে এবং এভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যার নেশা, তাকে সে আর কীভাবে আটকে রাখতে পাবে?

ছুটি বলেই ভীষণ আলস্য শরীরে। পুলক তক্তপোশ থেকে কিছুতেই নামতে চাইত না। পায়ের নীচে কম্বল, কম্বলটা খুব দামি এবং কী যে মিহি, মনেই হয় না পশমের তৈরি। ত্রাউস পরে থাকত লম্বা আলখাল্লার মতো স্লিপিং গাউন, সে পরত ডোরাকাটা পাজামা। ওর পা-হাত তার ভিতর বের হয়ে থাকলে ভীষণ ভাল লাগত দেখতে। ত্রাউস চুরি করে ওর মুখ দেখত, হাত-পা দেখত। পুলক একটু অন্যমনস্ক হলেই অপলক দেখত ত্রাউস। কী যে শরীরে ওর আশ্চর্য এক ঘ্রাণ থাকে, প্রায় সবুজ লতাপাতার মতো ঘ্রাণ, কিন্তু শীতের সময়ে যখন তুষারপাত শুধু, বরফের কুচি সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও বড় বড় বরফের শিলা ভাসমান, তখন এমন সবুজ লতাপাতার গন্ধ নানারকম বিস্ময় তৈরি করবে—আশ্চর্য কী!

আশ্চর্য কী পুলক যে বলবে, তুমি ত্রাউস ক্রমে বড় হবে, আমি জাহাজি মানুষ, ঘুরে ঘুরে তোমার বন্দরে আসব, তুমি ক্রমে বড হবে, আমি ঘুরে ঘুরে বারবার এ বন্দরে এসেই দেখতে পাব তুমি বড় হয়ে যাচ্ছ, যুবতী হয়ে যাচ্ছ। বুঝি সুন্দর এক জলছবির মতো ঘরবাড়িতে বেশ নানারকম ফুল ফোটাচ্ছ কেউ আসবে দেখতে, কারও আসার কথা আছে, আজ অথবা কাল আসবে, যখন আসবে বলে গেছে তখন সে নিশ্চয়ই আসবে, তোমার সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা বিকেল হলেই খেলা করবে এবং গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল তুলে রাখবে, মানুষটা যদি রাতে অথবা সন্ধ্যায় আসে, সে তো এসেই চুপচাপ থাকবে না, বাগানে হই-হুল্লোড় আরম্ভ করে দেবে, ছোট ছোট শিশুদের সোনালি চুলে চুমো খাবে। নানা দেশ থেকে সে সংগ্রহ করে রাখবে কতরকমের টফি এবং শিশুদের জন্য এইসব টফি সে যখন তার বিচিত্র রঙের ব্যাগ থেকে তুলে দেবে তখন তুমি ত্রাউস বুঝতে পারবে, ভালবাসার মানে কত গভীর আমাকে তুমি আর যাই বলো, এই দ্বীপে আটকে যেতে বোলো না। দ্বীপেব ভিতর আটকে গেলে ভালবাসার আর কোনও দাম থাকে না।

ওবা পাশাপাশি বসে থাকত দু'জন, দ্বীপের সকাল হওয়া দেখত, এবং কখনও সেই খেলা, যেন ত্রাউস এক আশ্চর্য রূপবতী কন্যা অথবা সেই যে গল্পে মধুমালা সেজে বসে থাকা আজীবন, এই দ্বীপে তারা কাছাকাছি থাকাব বাসনায় যতটা পারত ঘনিষ্ঠ হত। ভীষণ দামি মনে হত জীবন এবং এমন সময় সব, যা কিছুতেই যেন শেষ হয়ে না যায়, শেষ হয়ে গেলেই সবকিছুর জন্য আবার আকাঙ্ক্ষা।

সকাল হলেই বালিয়াড়িতে অজস্র পাখি উড়ে আসত। সমুদ্রের জলে সামান্য ঢেউ থাকে গাছপালা ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে বোঝা যেত। কেমন প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমি-প্রায়, বরফ পড়ে গেলে দ্বীপের লাবণ্য কমে যায়। কর্কশ, মরা কাকেব মতো দ্বীপটা সমুদ্রে শুধু পড়ে থাকে।

সেই মরা দ্বীপে বিকেল হলেই দেখা যেত একটা তাজা ছেলে একটা রুগ্ন মেয়েকে ছুটিয়ে মারছে দ্বীপে গাছপালা কম বলে, কেবল পাথর, নানাবর্ণের নুড়ি এবং ছোট ছোট ঝোপ, যা এখন ঝোপ বলে চেনা যায় না, কিছুটা কাঁটা গাছের মতো, আব কিছুদিন বাদেই ওগুলো সাদা বরফে ঢেকে যাবে, এবং ঝড উঠলে কাচের মতো ঝরে পড়বে সব, যেন মনেই হয় না পৃথিবী কখনও এভাবে ঘুমিয়ে থাকতে পারে। স্থির এবং স্থবির এক দ্বীপের উপত্যকায় ওবা ছুটে ছুটে এই দ্বীপমালাকে জাগিয়ে রাখছে। সেই বুড়ো মানুষটা ছিল ওদের সঙ্গী। সে তো প্রায় দ্বীপের রাজার মতো।

কারণ সে দিন-ক্ষণ দেখে বলতে পাবত, কোন মাছ কোন জলে অথবা কোন সময়ে পাথরের গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াবে। সে তাদের নিয়ে যেত, একেবারে যেখানে দ্বীপের একটা দিক, সিঁড়ির মতো কিছুটা নেমে গিয়ে তারপর সোজা খাড়া নেমে গেছে সমুদ্রে, এই আট-দশ ফুটের মতো খাড়া, ওরা ওপরে বসে হাঁটু মুড়ে তিনজনেই উঁকি দিয়ে থাকত। এবং বুড়ো মানুষটা শামুকের জিভ আলাদা আলাদা করে কেটে নিত। জিভের রং সাদা। ছোট ছোট চাকতিব মতো কেটে সে ঠিক জলে ছন্দ তোলার মতো এক দুই করে ফেলে যেত। তারপর সহসা দেখা যেত, নীল জলে সাদা চৌকো মতো শামুকের মাংস নেমে যাচ্ছে, সেগুলো খাবার জন্য চোরেব মতো নীল জলের গভীর থেকে পাথরের দেয়াল বেয়ে বড় বড় গলদা চিংড়ি উঠে আসছে। বুড়ো মানুষ নানারকম কায়দা জানে। সেও চোরের মতো কিছুটা দূবে একটা ছোট জাল, এই দু' ফুটের মতো জাল, যার রং একেবারে নীল, জলে বোঝা যায় না, জলের সঙ্গে মিশে

ছে এবং চোরের মতো যত চিংড়ি একটা-দুটো উঠে আসছে সে ওটা জালের ভিতর টেনে আনছে। তারপর কী এক আশ্চর্য কায়দায় সে জল থেকে তাজা বড় চিংড়ি একটা দুটো তিনটে, কারণ সে জানে কোনও কোনও দিন এই মাছগুলোর খিদের তাড়নায় এত বেশি ছটফট করতে থাকে যে শামুকের ভিতর মাংস অতীব সুস্বাদু, ওরা যেন সব ছুটে এসে দলে দলে ধরা দিতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বুড়ো মানুষটা জানে, সব ধরে ফেললে অথবা সে চালান দিলে, বন্দরে এই দ্বীপের যে আলাদা একটা সুখ আছে অর্থাৎ সে এবং এই দ্বীপের মানুষেরা একটু আলাদা জাতের মানুষ, খুব একটা প্রয়োজনের বেশি তাদের কিছু লাগে না, গুনে গুনে সুতরাং সাতটা চিংড়ি। তারপরই বুড়ো মানুষটা আবার অন্যরকম হয়ে যায়। ম্যাকরেল মাছের ঝাঁকের মতো সে কেমন এই দ্বীপের ভিতর ভেসে থাকে। বোঝাই যায় না এই দ্বীপে একজন বুড়ো মানুষ বেঁচে আছে।

বুড়ো মানুষটা তাদের বিকেলে আর-একটা খেলা দেখাতে নিয়ে গেল। সে বলল, পুলক, গরমের সময় এলে দেখাতে পারতাম, এখন এই শীতে নামতে ভীষণ ভয় লাগে। বুড়ো মানুষের শরীরে একদম ঠান্ডা সহ্য হয় না। কিন্তু তুমি কবে আসবে—

সে যেন পুলককে একজন ভিনদেশি মানুষ পেয়ে তার যা কিছু জানা ছিল দ্বীপ সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে।

সে বলল, ওখানে ওটা কী আছে?

একটা ভাঙা জাহাজ।

জাহাজই বটে। তবে কবেকার তোমার জানা নেই?

না। আমার মনে হয় ওটা এক-দেড়শো বছর আগের ব্যাপার।

এখানে ফেলে রেখেছে কেন?

বসন্তকালে অনেক দূরের মানুষেরা দেখতে আসে।

পুলক বুঝতে পারল, দ্বীপের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য স্থানীয় সরকার এটা এখানে রেখেই দিয়েছে, শুধু মাস্তুলের ওপরটা ভেসে আছে নীল জলে।

আমি তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে যেতাম পুলক। নীল জলে তুমি এই পাহাড়ের গায়ে যতই নীচে নেমে যাবে মনে হবে, অতলে এক পাতাল রাজার দেশ আছে। তোমাকে সেখানে নিয়ে গেলে কী সুন্দর বাজনা শুনতে পেতে।

পুলক বলল, সমুদ্রের নীচে কারা বাজনা বাজায়?

আমারও ভীষণ এ ব্যাপারটা একসময় বিস্ময়কর মনে হত।

ক্রাউস বলল, আমি ভাল হয়ে গেলে দাদুর সঙ্গে হাতে পায়ে মাছের ডানা লাগিয়ে পিঠে অক্সিজেনের বোতল এঁটে নেমে যাব। দেখে আসব সে দেশটা।

পুলক বলল, বাজনাটা কারা বাজায়? কেমন শুনতে?

তুমি বিঠোফেনের ফিফথ্‌ সিমফনি শুনেছ?

না।

সেই ঝড় আসছে, ভেড়ার পালের চিৎকার, রাখাল বালকদের ছুটোছুটি, ঝড় বৃষ্টি, স্টরমি নাইট। অথবা সেই প্যাস্টোরেলের দৃশ্য ভেসে ওঠে মনে।

পুলক ঠিক ঠিক বুঝতে পারল না বলে বুড়োর দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ।

তেমন অর্কেস্ট্রা। আমার বুকটা কাঁপত। সারাজীবন ওটাই আমরা শুনতে পাই।

পুলক দেখেছিল সেই বুড়ো মানুষটার মুখ-চোখ ভীষণভাবে ছোট হয়ে আসছে। বলতে বলতে চোখ বুজে ফেলছে। বুড়ো মানুষটার একটা ছাই রঙের ওভারকোট গায়ে এবং মাথায় কালো রঙের টুপি। সে টুপিটা এখন বগলে রেখেছে। হাতের লাঠিটা সে পাশে ফেলে রেখেছে। ওর প্যান্ট তালিমারা কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। সে বলল, আমি মাছের ডানা লাগিয়ে সমুদ্রের জলে নেমে যেতাম। তখন আমাদের কী বা বয়েস। আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমরা এই দ্বীপে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব জলের নীচে নানারঙের পাথর দেখে বেড়াতাম। তখন জাহাজের মাস্তুল জলে ভেসে ছিল না। ওটা আরও গভীর জলে ছিল। আমার স্ত্রীই ওটা আবিষ্কার করে ফেলে। তারপর জাহাজের নীচে একটা দ্বীপ জেগে উঠলে মাস্তুলটা ক্রমে ওপরে উঠে আসে।

বলেই সেই বুড়ো মানুষটা বড় হাই তুলছিল। খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সে ওভারকোটের কলার দিয়ে তার কান এবং গলা ভাল করে ঢেকে বলল, একদিন বিকেলে আমার স্ত্রী বলল, জানো সমুদ্রের নীচে কারা আশ্চর্য সিমফনির সুর তোলে।

আমি বলেছিলাম, যাঃ! কী করে হবে!

বলেই বুড়ো কিছু গুঁড়ো মুখে ফেলে দিল। বোধহয় পাতাটা নেশার কাজ করে। পাতা গুঁড়ো করে সে একটা ডিবেতে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে গুঁড়োটা দাঁতের ফাঁকে লাগিয়ে রাখলে চোখ আরও ছোট হয়ে আসে।

সে বলল, আমার বউ ছিল ভারী একগুঁয়ে।

হঠাৎ এমন কথা শুনে পুলক খুব ঘাবড়ে গেল' বউ সম্পর্কে কোনও নিন্দামন্দ হয়তো এক্ষুনি আরম্ভ করবে। আর বুড়ো হলে যা হয়, এমন সব কথা বেমক্কা বলে দিতে পারে যে কান গরম হয়ে ওঠে লজ্জায়। অথচ এই বুড়ো মানুষেরা কত সহজেই সব অশ্লীল কথা বলে দিতে পারে। যেন ব্যাপারটা কিছুই না। ডাল ভাত মেখে খাওয়ার মতো ব্যাপার।

সে বলল, জানো পুলক, ওর একটা শেষদিকে নেশা হয়ে গেছিল।

পুলক বুঝতে পারল, এমন কিছু একটা বুড়ো বলবে যার জন্য প্রস্তুতির দরকার। এবং পুলক তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে বলল, তুমি খাবে।

সে সিগারেট পেয়ে কেমন সব ভুলে গেল। বলল, বুঝলে সেই ১৯১১ সালে একটা জাহাজ ফিজি থেকে এসেছিল। তখন একজন নাবিক আমাকে একটা চুরুটের বাক্স দেয়। চুরুটগুলো ছিল সোনালি প্যাকেটে মোড়া। আমার খেতে কেমন কষ্ট হয়েছিল। আমার ঘরে শো-কেসে ওগুলো সাজিয়ে রেখেছিলাম। একজন বিদেশি মানুষ কিছু দিলে খেয়ে ফেলতে নেই। ওটা রেখে দিতে হয়। খুব স্মৃতি কাজ করে তখন। স্মৃতির ভিতর ডুবে থাকাও একটা নেশা।

পুলক বুঝেছিল, বুড়ো মানুষটার সঙ্গে কথা বলার লোকের খুব অভাব, সে যে-কোনও কথাই অতি আরামে অনেকক্ষণ বলে যেতে পারে। আর আশ্চর্য এতটুকু একঘেয়েমি মনে হয় না।

বুড়ো মানুষটা চোখ বুজে কী মনে করার চেষ্টা করল এবার। খুব গভীরে ডুবে যাবার মতো, তারপর দুই চোখ মেলে প্রায় আর্কিমিডিসের সূত্র আবিষ্কারের মতো বলে উঠল, হ্যাঁ পেয়েছি। ওর এই নেশা কেন সেটা মনে করতে পেরেছি।

বুড়ো মানুষটা বলল, দ্বীপে থাকতে থাকতে একটা একঘেয়েমি আসে। আমরা কতদিন এই দ্বীপের একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য উলঙ্গ হয়ে থেকেছি সারাদিন। আমরা জীবনে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছি নানাভাবে। আমরা দু'জনে মাছের ডানা হাতে পায়ে লাগিয়ে সমুদ্রে নেমে যেতাম। আমরা একবার একটা বিরাট হাঙরের পাল্লায় পর্যন্ত পড়ে গেছিলাম। আমাদের দু'জনের হাতেই বর্শা ছিল। বিষ মাখানো থাকত। কাছে এলে ঠিক মতো ছুড়ে দিলেই বেটা শেষ। এবং এ ব্যাপারে বিশ্বাস করো ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি সাহসী হয়। ও না থাকলে সেদিন জল থেকে উঠে আসতে পারতাম না।

বুড়ো মানুষটা দেখল তখন ব্রাউস খুব গা লাগিয়ে বসেছে। শীতের জন্য ব্রাউস মাথার চুল এবং মুখ কমফর্টার দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে। বুড়ো মানুষটার বোধহয় খুব শীত করছিল। সে একটা মাংকি ক্যাপ পকেট থেকে টেনে বের করে মাথায় জড়িয়ে দিল। তারপর বলল, তখন এই দ্বীপের রাজা অথবা রানি বলতে আমরা। ছেলেদের এখানে রাখতাম না। ওরা থাকলে দ্বীপের রাজা-রানি সেজে ঘুরে বেড়াতে আমাদের অসুবিধা হত।

তারপর পুলকের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ মজা আছে। যেমন একঘেয়েমি আছে তেমনি মজা আছে। যদি কোনওদিন পারো, একটা দ্বীপে একা একটি মেয়েকে নিয়ে থাকবার চেষ্টা করবে। শুধু ভাল লাগবে না, অনেক অনেক কিছু পাবে, ঠিক সভ্য জগতে থাকলে যা তুমি বুঝতে পারবে না।

পুলক ঠিক এর মানে বুঝতে না পেরে বলল, বুড়ো কর্তা, আপনি খুব সুখী মানুষ।

সুখী, হ্যাঁ তা বলতে পারো।

খুব সুখী না হলে এ দ্বীপে আপনি একা থাকতে পারতেন না।

হ্যাঁ তা ঠিক, যা বলছি ঠিক। তবে, সেই যে নেশা, সিমফনি শোনার নেশা। কোনও কোনওদিন

ঘরে কাজ পড়ে গেলে বিকেলে আমার নামা হত না। কন্ট্রোলিং টাওয়ারে উঠে আসার পথে সে ডিয়ে থাকত। গ্রীষ্মকাল। খুব রোদ চারপাশে। গাছে গাছে নানা বর্ণের পাখি। আর সমুদ্রের নীল জল। আমার বউ তখন আদিবাসী মেয়ের মতো একেবারে দ্বীপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। বগলে তার ...র ডানা। হাতে সবুজ রঙের বর্শা। চুল খোলা। নীল আকাশ আর এমন উদার সমুদ্রে দৃশ্যটা কেমন ... বুঝতেই পারছ।

পুলক দেখল, ত্রাউসের মুখ ভীষণ লাল হয়ে গেছে। সে পুলকের দিকে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত। ... অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

ত্রাউস অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তখন আপনি না নেমে থাকতে পারতেন।

না। পারতাম না।— বলে বুড়ো মানুষটা কেমন চুপ হয়ে গেল।

তবে।— ত্রাউস যেন বলে খুব বোকা বানিয়ে দিয়েছে বুড়ো মানুষটাকে।

সেই যে বলছিলাম—

বলে বুড়ো মানুষটা তার লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বোলাল। মাথায় সাদা চুল ঘাড় পর্যন্ত। কী ঘন চুল। ...ক ক্যাপ পরেছে বলে মাথাটা ঢাকা। ঘাড়ের কাছে কেবল কিছু চুল দেখা যাচ্ছে। বিকেল বলে ...টা অন্ধকার ভাব চারপাশে। সূর্য তো এখন আকাশে দেখাই যায় না। কেবল কুয়াশার মতো এক ...নের ভেজা আবহাওয়া। ওরা লেদার জ্যাকেট পরেছিল বলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এবং বুড়ো ...টা বেশ যেন নির্ভাবনায় বলে যাচ্ছে। শীতের পরোয়া এতটুকু করছে না।

বুড়ো মানুষটা বলল, তুমি কখনও পুলক সমুদ্রের নীচে মাছের ডানা লাগিয়ে নেমেছ?

না।

আবার যখন আসবে এ বন্দরে, ত্রাউসকে নিয়ে জলের ভেতরে নেমে যাবে।

পুলকের মনে হল সত্যি ভারী মজার ব্যাপার। মাছের ডানা লাগিয়ে যেন সে এবং ত্রাউস গভীর ...লে নেমে যাচ্ছে ক্রমে। পিঠে অক্সিজেনের সিলিন্ডার বাঁধা। ত্রাউসের খালি গা। আর সাদা হাত পা। ...লে সেই সাদা হাত পা কেমন রুপোলি মাছের মতো মনে হয়। এবং নীল জলে খেলা ঘুরে ঘুরে ... দুটো মাছের মতো এই এক খেলা। সে চোখ বুজলে টের পায় ত্রাউস এখন মনে মনে কী যেন ...ছে। জলের নীচে মাছের ডানা লাগিয়ে পুলকের পাশে পাশে একটা রুপোলি মাছ হয়ে ঘুরতে ...ছে। অথবা গভীর জলে, লাল পাথরের পাহাড়, কত রকমের শামুক স্টার ফিশ, স্পঞ্জ এবং জলজ ...স ঘাসের ভিতর হারিয়ে গিয়ে অথবা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল ... দূরে সরে পুলক নামে এক তরুণ যুবকের সঙ্গে বুঝি মেলামেশা। এবং ঘন হয়ে এলে ওর চোখ ...ময় কামনা-বাসনাতে ভরে যায়। পুলক তাড়াতাড়ি কেমন ভয়ে চোখ খুলে বলল তারপর বুড়ো ...।

তারপর, কতদিন কত ভাবে কোথা থেকে সেই সিমফনিটা আসে খোঁজার জন্য আমরা রোজ ...কালে সমুদ্রের জলে নেমে যেতাম। যেখানে ওটা বাজত, তার পাশে দুটো মাছের মতো ঘুরে ...তাম। কেন এমনটা হয়, জলের নীচে কোনও শব্দ হবার যখন কথা না, তখন কেন এমন হয়।

বলে সে একটু সময় চুপ করে থাকল।

ক্রমে আমরা দুটো পাহাড়ের ফাঁকে একটা ফাটল আবিষ্কার করে ফেললাম। এবং ভিতরে মনে হল ভীষণ অন্ধকার। খুব ভয় করছিল, আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কেবল বেজে যাচ্ছে। যত ভিতরে ঢুকে ...চ্ছি তত কানের কাছে একেবারে সেই দ্রুততালে শব্দ ওঠানামা করছে। এবং অন্ধকারে, পুলক, বিশ্বাস ...রো একটা পাথরের সাদা দেয়াল আবিষ্কার করে ফেললাম। মনে হয় পাতাল থেকে সেটা বেশ ...সো উঠে এসেছে। বড় বড় গোলাকার জাফরি কাটা, যেন হাজার সূর্য সেঁটে আছে দেয়ালে। সেই ...য়ালের জাফরি কাটা ঘুলঘুলি দিয়ে যা দেখলাম, ভাবা যায় না।

ত্রাউস এবং পুলক কথা বলছে না।

ত্রাউস ভেবে পেল না, এতদিন পর এমন একটা রহস্যময় জীবনের কথা পুলকের কাছে কেন বলে ...খ। এতদিন এই দ্বীপে আছে ত্রাউস অথবা রোসানের মা-বাবা, তার বাবা কেউ এসব জানত না। ...জন বিদেশি মানুষ ওর কাছে সমুদ্রের খবর জানতে চাইলে যেন খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখানো, পুলক

তুমি জানো না, পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর কত সব আশ্চর্য জায়গা গড়ে রেখেছেন। ঈশ্বরের মহিমা দেখার জন্য খুব বেশিদুর যেতে হয় না এমন বলার ইচ্ছা বুঝি। অথবা বলার ইচ্ছা, তুমি সারা পৃথিবী ঘুরে ঈশ্বরের যে মহিমাটুকু আবিষ্কার করেছ, আমি এই দ্বীপে তার চেয়ে অনেক বেশি আবিষ্কার করে ফেলেছি।

পুলক কেমন অধীর হয়ে প্রশ্ন করল, কী দেখলেন?

দেখলাম, ওপাশে সূর্যের আলো সমুদ্রের জলে বেশ তেরচা হয়ে পড়েছে।

জলের নীচে ডুব দিয়ে কী করে দেখতে পাচ্ছেন এসব?

আমরা যেখানটায় গেছি সেটা দ্বীপের লায়ন রকের কাছাকাছি। পাহাড় ওখানে খাড়া। সমুদ্রের চোরাস্রোত সেখানে আছে। এবং বৃত্তাকারে অজস্র পাথরের দেয়াল সেখানে এবং সূর্যের আলো সমুদ্রের ওপরে, তবে ঠিক আলো বলা যায় না, সবুজ আভায় স্পষ্ট সব মাছেদের খেলা, সেই চোরাস্রোতে ঘুরে ঘুরে দেয়ালের পাশে মনে হয় হাজার ম্যাকরোলের ঝাঁক বৃত্তের মতো ওঠানামা করে আশ্চর্য এক সিম্ফনি তৈরি করছে। এমন দৃশ্য, যেটা এখন ঠিক আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না, অথচ কী আশ্চর্য মহিমা ঈশ্বরের, তিনি তার জন্য কত সব বিচিত্র উপাদান রেখে দিয়েছেন, এমন একটা ঈশ্বরের ঘর আবিষ্কার করার পর ওর রোজ সমুদ্রে নেমে যাবার বাতিক হয়ে গেল।

রোজ?— পুলক বিস্ময় প্রকাশ করল।

রোজ। আমার রোজ নামা হত না। কাজ থাকত হাতে। এখনকার মতো অত আরামের চাকরি ছিল না। একার ওপর ভাব ছিল বলে, ওকে কিছু কাজকর্ম শিখিয়ে নিয়েছিলাম। সে বেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যেতে পারত। বড় ভাল মেয়ে।

তারপরই দুম করে বলে দেবার মতো বলে ফেলল, এক বিকেলে ও আর উঠে এল না। আমি সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, সামা। শুধু সমুদ্র-গর্জন শুনতে পেলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যখন ডেকেও কোনও সাড়া পেলাম না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঠিক একটা মাছ হয়ে দ্বীপের চারপাশে খুঁজে বেড়ালাম। না কোথাও সে নেই।

বৃদ্ধ এবার একটু দম নিল বলতে।

মেয়েদের যেন কী একটা আছে পুলক। ঠিক চেনা যায় না।

সে ফের বলল, আমি ওকে সারারাত খুঁজেছিলাম। সারারাত আমি সেই পাথরের দেয়ালে ওকে খুঁজেছি। লাল নীল পাহাড়ের ফাঁকে খুঁজেছি। তখন লায়ন রকে পাখিদের ডিম দেবার সময়। গ্রীষ্মকালে জাহাজ এসে ভিড়ত দ্বীপগুলোতে। পাখিদের ডিমের একটা বড় ব্যবসা পেরু সরকারের সঙ্গে তাদের ছিল।

বৃদ্ধ বলল, দ্বীপটা অনেকদূর। দ্বীপের মাথায় বসে এখানকার কন্ট্রোলিং টাওয়ার কত ছোট দেখায়। দূরবিন না হলে মানুষ আছে কি না বোঝা যায় না। অথচ সামা কেন যে সেই সিমফনি শুনতে একা একা রোজ চলে যেত। মাছেরা বড় বেশি চঞ্চল হয় পুলক।

এসব কথার কোনও অর্থ ধরতে পারছে না পুলক। তিনি বলে যাচ্ছেন, সে শুনে যাচ্ছে। বুড়ো হলে বলতে বলতে যেমন কথা গুলিয়ে ফেলার স্বভাব মানুষের তেমনি হয়তো কিছু একটা হচ্ছে। সে সেজন্য বাধা দিয়ে বুড়োর মনে কষ্ট দিতে চাইল না।

ত্রাউস অপলক এই দ্বীপের চারপাশটা এখন দেখছে না। ও চেয়ে আছে অনেক দূরে একটা ছোট্ট মোটর-বোটের দিকে। সন্ধ্যার আকাশ পরিষ্কার থাকলে ওরা সাদা জ্যোৎস্নায় মোটর-বোটে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

বুড়ো তখন পাশের লাঠিটা খুঁজছিল। পুলক লাঠিটা এগিয়ে দিলে সে উঠে দাঁড়াল। বাঃ বেশ লোক তো। হাফ বলে চলে যাচ্ছে। সবটা বলছে না। পুলককে কেমন বিরক্ত দেখাল।

বুড়ো মানুষটা তখন বলল, সকালবেলাতে ওকে বেলাভূমিতে খুঁজে পেয়েছিলাম। ওকে যেন কারা বেশ সুন্দরভাবে শুইয়ে রেখে গেছিল। যখন আমি সমুদ্রের নীচে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন কারা তাকে পাহাড়ের নীচে রেখে গেল। মৃত্যুর কোনও কষ্ট মুখে ছিল না। সে চোখ বুজে হেসে হেসে এ দ্বীপ থেকে চলে গেল। কে বা কারা তাকে হত্যা করেছিল জানি না। না এটা নিজের জন্য আত্মহত্যা, বুঝি না।

বুড়ো মানুষটা ফিসফিস গলায় বলল, মেয়েদের তুমি আর যাই কোরো ওদের বিশ্বাস কোরো না।

অথচ দ্যাখো—

বলে বুড়ো মানুষটা আকাশের দিকে লাঠি তুলে বলে গেল, পৃথিবীতে এই মেয়েটির মুখ এখনও চোখ বুজলে টের করতে পারি। মনে হয় সে আছে আমারই পাশে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। বলি, তুমি সামা সিমফনি শোনার নাম করে কোথায় যেতে? তুমি কি সাঁতরে সাঁতরে অন্য দ্বীপে উঠে যেতে? যেখানে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে রেখে যেত, অথবা যেসব হার্মাদ মানুষেরা আসত ডিমের ব্যবসা করতে, তাদের তুমি কাছের পাশ দিয়ে কখনও যেতে দেখেছিলে? অথবা ওরা, ওরা কি দেখেছিল, এক ভুবনমোহিনী রূপ বালুভূমিতে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? অথবা এক রুপোলি মাছ রোজ রোজ কোথায় যায়? ওরা তোমাকে জলের নীচ থেকে তুলে নিয়ে গেছে!

আবার কখনও বুড়ো মানুষটার আর্তনাদ, তুমি সামা কি আমাকে প্রতারণা করে সেই সিমফনির সুর শোনার নামে অন্য কোনও যুবকের প্রলোভনে পড়ে গেছিলে! সে তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দ্বীপে নিয়ে গেল, অনেক হার্মাদ তোমার শরীর থেকে ঈশ্বরের মতো মহিমময় ভালবাসা শুষে নিল। কোনটা। বলো। বলো সামা।

বুড়ো লোকটা নীচে নেমে যাবার সময় বলল, এ মৃত্যুর রহস্য আমি এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। তুমি তো নানা দেশে যাও, নানা জনে কথা বলো, বলে দেখবে তো কে কী বলে।

কেমন কিছুটা পাগলের মতো হাসতে থাকল এবং সে নেমে যাবার সময় বলল, এই এক আশ্চর্য সিমফনি আছে মানুষের মনে। তার মায়া তুমি আমি কেউ কাটাতে পারি না। বুড়ো হয়ে গেছি, এখনও একা সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াই। মনে হয় একজন কেউ খুব দ্রুততালে, কখনও খুব আস্তে আস্তে আবার কখনও নিরিবিলি এক আশ্চর্য সিমফনির সুর তুলে যাচ্ছে ভুবনময়। তুমি আমি সেখানে, পুলক, কিছু না। আমাদের ভাললাগা মন্দ লাগা নিরর্থক। তবু আমরা হাঁটি, কেবল হাঁটি, সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে, পাহাড়ের ছায়ায়, গাছের নীচ দিয়ে হেঁটে যাই। পৃথিবীকে যে তখন কত ভালবাসি নিজেও টের পাই না।

ক্রমে বুড়ো মানুষটা নীচে নেমে গেলে পুলক কী কারণে যে বুঝে ফেলেছিল, সে কিছু করতে পারে না এসব জন্য। সে শুধু ব্রাউসকে সঙ্গ দিতে পারে। মানুষটার কথা শুনে মনে হল, পৃথিবীর কোথাও, অন্য কোনও গ্রহলোকে ব্রাউসের জন্য কেউ সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখে গেছেন সেখানে সে তো কেবল একজন জাহাজি। তার কী আর করার আছে। সে খুব নীরবে ব্রাউসের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আবার এলে তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের নীচে নেমে যাব। কোথায় সেই ফিফথ সিমফনিটা বাজানো হচ্ছে দেখে আসব।

চোদ্দো

হমাদুল্লা বিকেল থেকেই জাহাজ-ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকেল বলতে এখানে কিছু নেই। সারাটা দিনই আকাশ ঘোলাটে, সারাটা দিনই কেবল রিনরিন করে কাচের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে মতো। দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুক্ষণের ভিতরই পোশাক সাদা হয়ে যায়। সেটা ঝেড়ে না ফেললে শরীর ভারী হয়ে যাবে। সে দাঁড়িয়ে আছে। আজই পুলকের আসার কথা। এবং সকালেই আসবে বলে কথা ছিল। আবহাওয়া খারাপ বলে হয়তো আসেনি। কিন্তু আজ না এলে সারেং সাব এই নিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। মেজ-মিস্ত্রির কাছে নালিশ যাবে এবং জাহাজে ডিসিপ্লিন বলতে একটা ব্যাপার আছে। সে সকাল থেকেই খুব উদ্বিগ্ন ছিল।

রোববার হলে জাহাজে কোনও কাজ থাকে না। জাহাজটা কয়লার জাহাজ বলে একটা বয়লার চালু রাখতে হয়েছে। এবং দু'জন মাত্র আগয়ালার ওয়াচ। আর সবাই ফোকশালে শুয়ে বসে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে। যা হয় জাহাজে, ছুটির দিনে ফোকশালে কেউ প্রায় থাকতেই চায় না। বিকেল হলেই কিনারায়। কিন্তু আজ কেউ বের হচ্ছে না। বাঙালির হাড়ে এমন কনকনে শীত ভীষণ লাগছে। যার যত গরম পোশাক ছিল সবাই সব বের করে ফেলেছে। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে কেউ আর উঁকি দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে না।

হমাদুল্লা দেখল কালো কোটের ওপর বেশ গুঁড়িগুঁড়ি বরফের গুঁড়ো উড়ে বেড়াচ্ছে। সে সব ঝেড়ে

ফেলল না। সে এবার গ্যাংওয়ের দিকে হাঁটতে থাকল। শীত এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা বলে জাহাজের কাজকর্ম যেন তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেছে। যারা জেটিতে ছিল, তাদের এক-একজন হেঁটে হেঁটে শহরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কেবল পিকাকোরাতে যাবার যে পথটা, তার মোড়ে একটা বড় পাব আছে, সেখানে কিছু মানুষের ভিড়। এবং সি-ম্যান মিশনেও কিছু ভিড় থাকতে পারে। পাবে লোকেরা লাইন দিয়ে বিয়ার খাচ্ছে, সি-ম্যান মিশনে জাহাজিরা চলে গেছে। এই শীতের বিকেলে বসে থাকলে হাত-পা যেন আরও অসাড় হয়ে যায়। এই শীতের বিকেলে কঠিন এক পীড়া মানুষের মনে বিশেষ করে এইসব জাহাজিদের মনে উঁকি দিলে স্থির থাকা যায় না। সারেং সাব অনেকক্ষণ থেকে দেখছে ইমাদুল্লা ডেক-এ বেশ সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। এই বয়সে কিনারায় নেমে যাবার শখ। শীতের বিকেলে ইমাদুল্লা আর দশটা কম বয়সের নাবিকের মতো হয়ে যাচ্ছে।

সারেং সাব গ্যালিতে এসে এটা লক্ষ করেছিলেন। ভাণ্ডারি মাংস বসিয়েছে। বেশ একটা ভাজা মাংসের গন্ধ। জেটিতে ক্রেনগুলো কেমন নিরিবিলি দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে সমুদ্র। সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ নেই। সব কেমন শান্ত এবং সীমাহীন নিস্তব্ধতা।

সারেং সাব ডেকে নেমে গেলেন। ইমাদুল্লার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, টিন্ডাল।

কী সাব?— কারণ ইমাদুল্লা না দেখেও বলতে পারছে কে এসে ওকে ডাকছে।

এই ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে! কিনারায় যাবে ভাবছ?

ও না এলে একবার নেমে দেখে আসতে হয়।

ওর আসার কথা আছে!

আজই আসবে কথা আছে।

টিন্ডাল যেমন রহস্যের গলায় কথা বলে থাকে এখনও তেমন বলতে গিয়ে বুঝতে পারল, সে গলায় তেমন রহস্য ধরে রাখতে পারছে না। সে বলল, ভাল লাগছে না। খুব চিন্তায় আছি।

তুমি ওকে জাহাজে নিয়ে এলে কিন্তু কথা উঠবে।

কেন কথা উঠবে!

উঠবে না!— বলে সারেং ইমাদুল্লার পাশে গিয়ে রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়াল।

টিন্ডাল এখন কেন জানি, না বলে পারল না, অর্থাৎ খোলাখুলি না বললে যেন ঠিক বলা হবে না। সে বলল, সারেং সাব, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি পুলকের জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

তোমার ভারী স্বভাব খারাপ টিন্ডাল।

তা খারাপ। এটা আমাদের হয়।

তুমি টিন্ডাল একা মানুষ। তোমার তো এমন হওয়ার কথা না।

আমারও তাই মনে হত।

তুমি কতকাল থেকে সমুদ্রে সফর করে বেড়াচ্ছ। তুমি তো জানো জাহাজের দিনগুলি মুসাফিরের মতো অনেকটা।

এতদিন তাই ভেবেছিলাম।

জাহাজ ছেড়ে দিলেই কেউ কারও কথা আর মনে রাখে না।

তাই মনে হত।

তুমি কোথাকার একটা বাচ্চা ছোকরার জন্য এমন করছ!

সাব, আপনি কী ভেবেছেন আমি জানি না। তবে ছেলেটার জন্য আমার ভারী কষ্ট হয়।

সারেং সাব এখন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি জানেন জাহাজে অনেক রকমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ইমাদুল্লার স্বভাব উলটো। সে ছেলেটাকে কেমন নিজের সন্তানের মতো ভেবে ফেলে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বললেন, ইমাদুল্লা, আমি ভুল বুঝেছিলাম।

ইমাদুল্লার মনে হল কথাগুলি এই ঠান্ডার দিনে খুব বেমানান। এই জাহাজে, আর দীর্ঘ সফর পরে জাহাজ কোথায় যাবে যখন জানা নেই এবং এমন একটা তুষারপাতের সময় খুব বেমানান এইসব ভাল ভাল কথা। সে বলল, আমি ওর বাপ নই সারেং সাব। এলে ভেবেছি ওর আগাপাশতলা চাবকাব।

ইমাদুল্লার কথায় সায় দিয়ে সারেং সাব বললেন, আজ না এলে মেজ-মিস্ত্রিকে যে কী বলি! কাপ্তানের ...ন উঠলেই বা কী হবে!

সারেং সাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইমাদুল্লা বলল, আমার মনে হয় কোনও কারণে আটকে গেছে।

এখন তো কোনও তুষারঝড় নেই। সারাটা দিন তবু বলব বেশ আবহাওয়া ভাল ছিল। এমন তুষারঝড় ... এখানে লেগেই থাকে।

এমনও হতে পারে সে আর আসবে না সাবেং সাব।

তবে তো একটা কেলেঙ্কারি হবে। থানা-পুলিশ হবে।

সে তো আপনার ভাবনাব কথা না।— ইমাদুল্লা কেমন আবার পুলকেব পক্ষে টেনে কথা বলতে থাকল।

সারেং সাব আর কথা না বলে চলে যাচ্ছিলেন। বেশ কষ্ট হয়েছেন মনে হচ্ছে। এবার একটু ...ষামোদের মতো করে বলা যেন, সাবেং সাব, আর একটা দিন, না এলে আমি নিজেই ওকে নিয়ে আসব। ...পনি জাহাজিদের জন্য কত না কবে থাকেন, এটা তো সামান্য কাজ।

কেমন ভিজে গেলেন সারেং সাব। তিনি বললেন, তুমি আর ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না। ভিতরে চলে ...সো।

একটু কিনাবায় নেমে খোঁজ নিয়ে আসব। ব্রাউসের দিদিমা যদি ফিবে আসে।

তাঁব তো আসার কথা না এখন।

কাল রাসেল বলল, আসার কথা আছে। বাড়ি বিক্রির ব্যাপাবে কথা হচ্ছে। কিছু দলিল-দস্তাবেজের ...জে এখানে কিছুদিন ফের এই শীতের দিনেও তিনি থেকে যাবেন।

বাড়িটা বিক্রি করে দিলে বছরে একবার-দু'বার যে ভারতীয়দেব খাওয়াবাব একটা আয়োজন কবেন, ...টা কোথায় করবেন?

বন্দরের কাছেই একটা বাড়ি কেনাব কথা হচ্ছে ওঁদের। ওঁর বয়স হযে যাচ্ছে। এতদূর থেকে আসা ওঁর পক্ষে খুব কষ্টকর। এই বন্দরের কাছে কোথাও থাকতে চান এখন।

সুতবাং সারেং সাব উঠে গেলেন। তিনি একটা নীল বঙেব টুপি পবেছিলেন। গলায় কমফর্টাব। গায়ে ... মোটা সোয়েটার, নীচে ফ্লানেলের জামা। তাব নীচে মনে হয় হাতকাটা সোয়েটাব, দুটো গবম গেঞ্জি। ...কে এই পোশাকে খুব বেঢপ দেখাচ্ছিল।

সাবেং সাব উঠে গেলে ইমাদুল্লা গ্যাংওয়েতে নেমে কেমন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকল। ওব কেমন ... লাগছে। পুলক যদি এখানে পালিয়ে থেকে যায় তবে জাহাজে ওব নিঃসঙ্গতা ভীষণ বাড়বে। এবং এটা ... কেন হয়, সে তো এমন ছিল না!

এবং যা সে ভেবে পায় না, এই সফরের প্রথম দিনগুলোতে পুলকই ছিল একঘবে মতো। অথচ জাহাজ ... সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছিল, যত বছবের পর বছর অতিক্রম করে যাচ্ছিল, এই পুলক এক অসাধাবণ আকর্ষণ ...শি করে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে। এই সফরে আরও চাব-পাঁচজন বাঙালি হিন্দু নাবিক সে কাছে পেয়েছে। ওদের সঙ্গে আর-দশটা সাধারণ নাবিকের সে কোনও তফাত খুঁজে পায়নি।

শিশু একবার মনে আছে, পুলক, সেটা বোধহয় কার্ডিক বন্দরে হবে, ঠিক এমনি শীত, এবং জাহাজিদেব ... অভ্যাস, যেন নিদারুণ অভাবী মানুষ, শীতের ভিতবও সামান্য সুতির জামাকাপড় পরে শহরের রাস্তায় ...ফেবা। এবং এটা যেন ওদেব স্বভাব, উপরি পাওনা হিসেবে ফাউ পেয়ে যাবে, এমনি একটা ফাউ পাবার ...ভে ওদের জাহাজি মকবুল শীতের রাস্তায় হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছিল, কী শীত! কী ঠান্ডা! ...নকটা আরও বেশি দেখানোব মতো করে যাওয়া, যদি কোনও ধার্মিক মহিলা দয়া করে গায়ের ওপর ...কোট ছুড়ে দেয়। এই দয়া পাবার লোভে যখন মকবুল যাচ্ছিল এবং পুলক ফিরছিল ইমাদুল্লার সঙ্গে, তখন ...স্তায় মোড়ে ঘটনাটা ঘটে গেল। মেমসাব একটা ওভারকোট ছুড়ে দিয়ে গেলে একেবারে লুফে নিল ...কবুল।

আব তখন পুলকের চিৎকার, সে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়েছে ওভারকোটটা, সে হঠাৎ ছুটে যাচ্ছে, মকবুল ...ক. ওর দানের ওভারকোটটা এমন করে বাঙালিবাবু ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল কেন! ইমাদুল্লাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। সেও পুলকের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। ওর তো পাগলামি স্বভাব। ইমাদুল্লা কাছে ...লে দেখল, একজন যুবতী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে ইংরেজিতে কী বলে যাচ্ছে। এবং ইমাদুল্লা

এমন মুখ-চোখ কখনও পুলকের দ্যাখেনি। পুলককে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ইমাদুল্লা বলল, ওকে তুই ওভারকোটটা ফেরত দিলি!

দিলাম। ও হারামজাদা কোথায়?

মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চলুন।

বলে টানতে টানতে সে ইমাদুল্লাকে নিয়ে গেল। ওর সামনে গিয়ে ওর কলার চেপে ধরল। তারপর টানতে টানতে একটা ট্যাক্সির ভিতর। এবং সোজা জাহাজঘাটায়। একটা কথাও পুলক ট্যাক্সিতে বলেনি। ইমাদুল্লা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছিল।

জাহাজে উঠে সকলকে সে জড়ো করেছে। তারপর ডেক-সারেং, ইঞ্জিন-সারেংকে ডেকে বলেছে, আপনারা ভেবেছেন কী? আমাদের কোনও ইজ্জত নেই!

মকবুল বলেছে, ওরা দিলে আমি কী করব!

তোর পেটি খোল দেখি।— পুলক হুংকাব দিয়ে উঠেছে।

পেটিতে অনেক গরম জামা। সবই সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। সে একটাও ব্যবহার কবছে না এবং কলকাতায় ফিরে গিয়ে সব বিক্রি করার তালে ছিল।

এই হচ্ছে পুলক। আবার সে দেখেছে পুলককে, কোথাও গেলেই সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, চুপচাপ থাকে। কথা বলে না। নিজের বাংকে বসে কবিতা লেখে। একদিন কী একটা কাজে সে পুলকের সঙ্গে বচসা পর্যন্ত করে ফেলেছিল। সে বলেছিল, বাঙালিবাবু, তুমি এটা বুঝবে না।

আর কী রাগ পুলকের। বাঙালিবাবু মানে? আপনারা কী? আপনারা বাঙালি নন!

তারপব কেন জানি ইমাদুল্লার মনে হয়েছে সে বাঙালি, অথচ নিজেকে সে এটা ভাবতে পাবছে না, কোথাও একটা কষ্ট হচ্ছে। ওব দেশে তো বাংলা ভাষার জন্য কারা প্রাণ পর্যন্ত দিল। সেই থেকে ছেলেটা ওর কাছে কেন জানি আপনার মনে হতে থাকল। যেন চোখে আঙুল দিয়ে সে কিছু সব সময় সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছে। সে সেই থেকে ছেলেটাকে সন্তানের মতো বোধহয় ভালবাসতে শুরু করেছিল।

ওর হুঁশ হল সে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে। ইচ্ছা করলে এখান থেকে বাসে ব্রাউসের দিদিমার কাছে ঘুরে আসা যায়। সে ঘড়ি দেখল। সে এখন গেলে রাত নটার ভিতর ফিরতে পারবে।

একটা বাসের জন্য সে অপেক্ষা করার চেয়ে ভাবল একটা রিং করবে কি না। অনেকদিন কোনও খোঁজখবরও নেওয়া হয়নি। সে পাশে একটা টেলিফোন বক্সের ভিতর ঢুকে বলল, হ্যালো হ্যালো।

ওপার থেকে যে কথা বলছে সে ব্রাউসের দিদিমা। বুঝতে কষ্ট হল না। সে বলল, আমি ইমাদুল্লা বলছি

তোমরা আর আসছ না কেন?

আপনি তো দেশের বাড়িতে গেছিলেন।

আবার চলে এসেছি। ক'দিন থাকব।

খবর আগেই পেয়েছি, আপনি একটা কাজে আবার ফিরে এসেছেন।— সে বাড়ি বিক্রি করার কথাটা বলল না।

তা একটু কাজ পড়ে গেল। তুমি কাল পুলককে নিয়ে চলে এসো।

সে তো জাহাজে নেই। ব্রাউসের কাছে গেছে।

সে তো আজই বিকেলে ফিরে এসেছে। ব্রাউসের বাবা আমাকে রিং করে কিছুক্ষণ আগে জানাল।

সে ফিরে এসেছে?

কেন তুমি জানো না!

আমি জাহাজ থেকে সন্ধ্যার আগে নেমে গেছি।

সন্ধ্যার পরে হয়তো সে জাহাজে উঠে গেছে।

ইমাদুল্লা ফিরে এসে দেখল, পুলক তার লকার থেকে কী সব টেনে বের করছে। ইমাদুল্লা খুব সন্তর্পণে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে সে টের পায়নি। সে তার সব বইপত্র বের করে ফেলেছে এবং বইগুলোর পাতা উল্টে উল্টে দেখছে। একটা দেখা হয়ে গেলেই পাশে রেখে আবার আর-একটা দেখছে। এমনি দেখতে দেখতে সে খেয়ালই করছে না ইমাদুল্লা ওর পেছনে প্রায় দশ-বারো মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাশের

...কে যে ছিল অর্থাৎ নবীন, সে কিছু বলতে গেলে ইমাদুল্লা ঠোঁটে আঙুল রেখে কিছু বলতে বারণ করল।

এবং শেষে ইমাদুল্লা দেখল, পুলকের হাতে একটা ছবি। ছবিটা পুলক বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ছবিটা ওর আরও কম বয়সের। মনে হয় সে তখন স্কুলে পড়ত। স্কুলে পুরস্কার-টুরস্কার হাতে নিয়ে ছবিটা। বেশ তাজা এবং সপ্রতিভ। ছবিটাতে পুলক ধুতি পরে আছে। এবং মাঝখানে তখন তার সিঁথি ছিল। একেবারে নিরীহ বাঙালি ছাত্রদের যেমন মুখ হয় তেমনি। পুলক ছবিটাকে একপাশে ধরে ধীরে ধীরে রুমালে মুছে আলোতে দেখতেই মনে হল কেউ ওর পিছনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, চাচা, তুমি?

ইমাদুল্লা বলল, ছবি দিয়ে কী হবে?

পুলক কেমন লজ্জায় পড়ে গেল।— এই এমনি।

ইমাদুল্লা বলল, এত রাত হল কেন।

ব্রাউস এসেছিল সঙ্গে।

ইমাদুল্লা বুঝতে পারল, যতক্ষণ এক সঙ্গে থাকা যায়।— ব্রাউস আজই চলে যাবে?

আজ বোধহয় থাকবে। কাল সকালে চলে যাবে।

ও আছে কেমন?

ভাল।

ওর বাবা?

ভাল আছেন।

ব্রাউসকে জাহাজে নিয়ে এলি না কেন? দেখতাম।

ওর দেরি হয়ে যাবে।

আমার কথা কিছু বলে?

খুব।

কেমন কাটল?

খুব ভাল। তোমার মতো একটা মানুষ ওই দ্বীপে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমি বরফ পড়লেই চলে যাব চাচা।

এই ছেলেটা ব্রাউসের মায়ায় জড়িয়ে গেল। খুব কষ্ট পাবে। ওর মুখ দেখলেই ইমাদুল্লা টের পায়, তবে এক আশ্চর্য ভালবাসার সুষমা নিয়ে ছেলেটা আজ হোক কাল হোক বন্দর ছেড়ে চলে যাবে। আবার সেই যেমন গাছের কাণ্ডে, পাথরের গায়ে এবং জেটির দেয়ালে অথবা দূরগামী জাহাজের খোলে লিখে যেত নন্দিনী একটি মেয়ের নাম, ভালবাসার নাম, তেমনি সে লিখে যাবে, ব্রাউস একটি ভারী সুন্দর মেয়ে। সে মরে যাবে কথা ছিল, সে এক দীর্ঘ বালুবেলায় হেঁটে যেতে ভয় পেত এবং মরে গেলে থাকে কী এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা মেয়ের— সে আরও লিখে যাবে, ব্রাউস ভারী সুন্দর নাম। তার কাছে আমার আরাব আরাব কথা আছে।

ইমাদুল্লা বলল, খেয়ে এসেছিস তো! না হলে ভাণ্ডারিকে বলে দিচ্ছি তোর মিল দিতে।

পুলক বলল, আমরা সবাই একটা রেস্তোরাঁতে খেয়ে নিয়েছি। খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও চাচা।

ইমাদুল্লা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে পুলক ভাবল, সে আরও একজনের নাম এইসব পাহাড়ে অথবা নদীর পাড়ে যে সব গাছপালা বৃক্ষ আছে সেখানে লিখে রাখবে। আমার প্রিয় চাচা ইমাদুল্লা একটি আশ্চর্য মানুষের নাম।

পনেরো

এবারে পুলক জাহাজে থাকত না। সকাল হলেই বের হয়ে পড়ত। সে ছুটি নিয়ে চলে যেত।

কাপ্তান পর্যন্ত সব শুনে কেমন ওর ওপর সদাশয় মানুষের মতো ব্যবহার করতে থাকলেন। অন্য নাবিকদের মতো ওর ওপর কড়াকড়ি থাকল না। জাহাজ যাবার কথা ব্রাজিলে। সেখানে ভিক্টোরিয়া পোর্ট বলে একটা ছোট বন্দর আছে। সেখান থেকে আকরিক লোহা নিয়ে সোজা জাপানে। অথচ কেন যে দেরি

হচ্ছে! এজেন্ট-অফিসের অন্য কিছু ইচ্ছা থাকতে পারে। আবার শোনা গেল একটা জাহাজ আসছে ক্যারেবিয়ান দ্বীপগুলো হয়ে। যারা সেই জাহাজের জাহাজি তাদের সঙ্গে এদের বদলা-বদলি হবে। কারণ দীর্ঘদিন হয়েছে, এরা সফরে বের হয়েছে। এতদিন একসঙ্গে রাখা যায় না। দেশে পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। যে কোনও কারণেই হোক এজেন্ট-অফিস কিছু স্থির করতে পারছে না। জাহাজে কিছু মাল ওঠার কথা। কী মাল এখন বোঝাই হবে, ব্রাজিলে গেলে এক মাল, জাহাজ দেশে গেলে অন্য মাল, সুতরাং নানা কারণে সমুদ্রে বরফ জমে যাওয়ার সময় হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

জাহাজে এখন নাবিকেরা শীতে বসে বসে শুধু কাঁপছে। গ্যাসের উত্তাপে আর ফোকশাল গরমে রাখা যাচ্ছে না। যেখানে হাত দেওয়া যাচ্ছে ভীষণ ঠান্ডা। ফলে ওরা ঘর ছেড়ে গ্যালিতে এসে ভিড় করত গ্যালির উনুনে গনগনে আঁচে ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হচ্ছে। বেশ একটা গন্ধ থাকলে ওরা নাক টেনে টেনে কথা বলত। অর্থাৎ ওরা কথাও বলত, মাংসের ঘ্রাণও নিত।

তখন পুলক দ্বীপের সব পাথরে অথবা পাহাড়ের বুকে বরফ পড়া দেখত। তুষারঝড়ের ভিতর সে ছুটোছুটি করত কী যেন এক পাখি মিলে গেছে, ভালবাসার পাখি, সে তাকে এ বন্দরে এসে ভালবেসে ফেলেছে।

সমুদ্রের জল যত বরফ হয়ে যাচ্ছে তত তার দ্বীপে ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্কিপ নিয়ে আর কোথাও বের হতে পারছে না। সে জাহাজ থেকে একেবারেই এখন বের হতে পারছে না। ওর চোখে আবার বিষণ্ণতা। কবে কীভাবে যে আবার সে যাবে। চারপাশের সমুদ্র এখন আর নীল নয়। একেবারে সাদা মসৃণ চাদরের মতো লম্বা সীমাহীন আকাশের দিকে চলে গেছে। সে বোট থেকে উঠে দেখার চেষ্টা করল কতদূর পর্যন্ত বরফ পড়েছে। কিন্তু সে কিছু বুঝতে পারছে না বলে মাস্তুলের ডগায় উঠে দূরবিন দিয়ে দেখল, বেশ ধীরে ধীরে সমুদ্র ক্রমে বরফে জমে যাচ্ছে। সে ভাবল, কাল খুব সকালে উঠে সাইকেল জোগাড় করবে। এবং বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দেখে আসবে কতটা আর ফারাক আছে লাইট-হাউজের সঙ্গে।

এবং এভাবে সে এক সকালে সবার অলক্ষে একটা সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। খুব সকালে ছুটির দিন বলে কিনারায় কিছু মানুষজনকে পর্যন্ত সে দেখল বের হয়ে পড়েছে বরফের ওপর। ওরা মাছ ধরার জন্য যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গর্ত। গর্তে সমুদ্রের জল। জলে সমুদ্রের সেই ছোট ছোট মাছ শ্বাস ফেলতে আসে। এবং এমন একটা ছোট্ট গর্ত অথবা কুয়োর মতো পেয়ে গেলে বেশ মজা। যতখুশি বড়শি ফেলে মাছ ধরো। অনেক সব গর্ত আছে বরফের ভিতর যেখানে সমুদ্রের জল আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছে। এবং যা দেখলে মনে হবে, এটা কোনও দ্বীপের ওপর দিয়ে যাওয়া নয়, অথবা উপত্যকার উপর দিয়ে, এটা যাওয়া হচ্ছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। এই ছোট ছোট গর্ত দেখলেই আরোহীকে একটু সাবধানে সাইকেল চালাবার কথা কেউ যেন বলে দেয়। কোথাও জল জমেনি এখনও। পাতলা সরের মতো কাচের ছাদ গড়ে উঠছে। এমন একটা জায়গায় পড়ে গেলেই শেষ।

পুলকের কথা ছিল ইমাদুল্লাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন তো শুধু আবিষ্কারের পালা। সে রাস্তাটা খুঁজতে বের হয়েছে। ইমাদুল্লা বুড়ো মানুষ। এমন কঠিন শীত সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। সে পরে নিয়েছে কালো রঙের পোশাক। সাদা বরফের ওপর সে ক্রমে বিন্দুর মতো হয়ে যাচ্ছে। এমন সাদা হয়ে যায় একটা দেশ তার জানা ছিল না। আর সে রাতে উঠেও দেখেছে একটা আলো থাকে দিগন্তরেখায়। এবং খুব একটা অন্ধকার কিছুতেই মনে হয় না, দিনের বেলায় সে যদি কখনও সূর্যোদয় দেখে, মনে হবে, এটা একটা সৌভাগ্যের মতো। বরফের ওপর সূর্যোদয়ের ছটা সে পৃথিবীর কোনও বন্দরে গিয়ে দেখতে পায়নি।

পুলক এসব জায়গার নাম তেমন ভাল জানে না। দূরে সেই ডিভাইন লেডির দ্বীপ, অথবা যে দ্বীপে ওঁদের মাস্তুল থেকে পাখিটা উড়ে গেছে সেই দ্বীপ। আরও বাঁদিকে লাইট-হাউজ। সে বুঝতে পারল বেশ কাছে চলে এসেছে। এবং কিছুটা গিয়েই দেখল, আর যাওয়া যাবে না। পাতলা সরের মতো এদিকটা। পা রাখলে ঝুরঝুর করে ভেঙে যাবে, বরফের রং দেখলে এসব টের পাওয়া যায়। বরফ সাদা থাকে না। কেমন নীল জলের আভা ভেতর থেকে ফুটে বের হতে থাকে। সে এখানে এসেই কেমন হতাশ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। চারপাশে এক ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। সে এখানে বসে যেন দূরের লাইট-হাউজে ব্রাউস কী করছে সব টের পাচ্ছে। ওর ব্যাগে সামান্য রুটি-মাংস ছিল। সে সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে সেটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খেতে থাকল। এই শীতের দেশে ভীষণ খিদে পায়। গতকালের

...-মাংস লকারে রেখে দিয়েছিল। একটা প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। ওব চুল উড়ছিল। ...কাশ আজ পরিচ্ছন্ন। রোদ উঠতে পারে। রোদে এতটুকু উত্তাপ নেই এবং বোদ উঠলে যেন শীতটা ...।

এই ভয়ংকর নিস্তব্ধতার ভিতর শুধু থেকে থেকে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। এবং এটুকু না থাকলে বুঝি ...লক ভয় পেত। জলে সামান্য ঢেউ। ঢেউ গর্জন করলেও এক অসাধাবণ নিস্তব্ধতা টের পাওয়া যায়। দূরে ... সব দ্বীপ। এবং দ্বীপগুলো সব সাদা। এমনকী সে দূরবিন চোখে লাগালে দেখল দ্বীপের ডিভাইন লেডি ... পোশাকে বেশ মনোরম সেজে বসে আছে।

এবং এভাবে এই শীতের দেশের মতো অথবা বরফের ওপর যে পবিত্রতা জেগে আছে তার মতো সে ...য়েদের ভেবে থাকে। ব্রাউসকে সে এভাবে ভেবে থাকে। নন্দিনীকে এভাবে ভেবে এসেছে। পৃথিবীর ...তীয় সৌন্দর্য মেয়েরা বয়ে বেড়ায়। সে বলল, হে উত্তুরে হাওয়া, তুমি এবাব একেবারে থেমে যেতে ...রো না? তুমি থেমে গেলেই বরফ আরও কঠিন হবে। সামনের জল নীল থাকবে না। আমি আব ইমাদুল্লা ... সাইকেল চালিয়ে সে দ্বীপটায় অনায়াসে চলে যাব।

আব-একটু সামনে পা টিপে টিপে হেঁটে যাওয়া যায় কি না, সে এবাব দেখবে। যেন শেষ পর্যন্ত না দেখে ...লে সে শান্তি পাবে না। এক পা হেঁটেই কতটা বরফ জমেছে জুতোর টো দিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখাব তার ...ভাব। সে বরফের অবস্থা দেখে সাহস পায় না। মুখে এত ঠান্ডা লাগছে যে মনে হচ্ছে সব অবশ হয়ে ...ছে। সে বুঝতে পারল, এই ববফেব ওপর সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পাববে না। ওকে ভীষণভাবে ... ছুটে চলাফেরা করা দবকাব। নয় তো বাঙালিবাবুর রক্ত-মাংস একেবারে জমে নিমেষে ববফ হয়ে ...বে।

সে এবাব ববফের ওপর খেলা করে বেড়াতে থাকল। সার্কাসে যেমন একজন সাইকেল খেলোয়াড় ঘুরে ... খেলা দেখায়, সে তেমনি এমন একটা নির্জন জায়গায় সাদা ববফেব ওপব কালো পোশাক পবে বৃত্তের ... ঘুবে ঘুবে খেলা দেখাতে থাকল। বেশ শরীব গরম হযে যাচ্ছে। বেশ এক নীল আকাশেব নীচে সাদা ...ফেব ওপর এবং অপরিচিত এক জায়গায় তার খেলা দেখাতে ভাল লাগছে। এসব দেশেব সে উদ্ভিদেব ... জানে না, ফুলের নাম জানে না, সবই প্রায অপরিচিত, অথচ তাব কেন যে সব এত আপনাব মনে ... পবিচিত মনে হচ্ছে। যেন সে কতকাল আগে এমন ববফের দেশে চলে এসেছিল, এভাবে সে এই ...ফেব ওপর সাইকেল চালিয়ে যেত এবং সঙ্গে থাকত একটা সাদা ব্যাগ, ব্যাগেব ভিতব ফলমূল এবং ...বারেব জন্য যাবতীয় সামগ্রী। সে এভাবে এমন একটা দেশে, চারপাশে যখন শুধু পাইনেব জঙ্গল, অথবা ... পাইনের গাছ, তখন ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজিয়ে ছোট লাল-নীল কাঠেব ঘব সরু বাস্তা ধরে পাব হয়ে ..., বাস্তাব দু'পাশে সব নেড়া উইলো গাছেব ঝোপ, এবং বেশ কাযদা কবে সে ঘুবে ঘুবে সাইকেল ... যেত, যেন গাছের ডালে শরীব লেগে গেলে বৃষ্টিব মতো টুপটাপ বরফেব কণা শবীরে না ঝরে ...। সে যেত এভাবে, যেতে যেতে বুঝি তার একটা বড় উপত্যকা মিলে যেত। সে দেখতে পেত আশ্চর্য ... গোল গম্বুজের মতো বরফের ঘরে ব্রাউস দাঁড়িয়ে আছে। সে পরে আছে সাদা সাটিনের ফ্রক। সাদা ...বব কোট। নীল বঙের জুতো। একটা সাদা হরিণ ওব পায়ের কাছে শুয়ে আছে। একটা শ্লেজগাড়ি ...ছে। যেন সে গেলেই সাইকেলটা ইগলুতে ঢুকিয়ে এই সাদা হবিণেব গলায শ্লেজগাড়ি জুড়ে ব্রাউস ...লককে নিয়ে এক বরফের উপত্যকাব সন্ধানে চলে যাবে। যেখানে বরফ কত প্রাচীন কাল থেকে শুধু ...ছেই। যেখানে ববফ গলে না, প্রাচীন লতাগুল্ম মিলে এক অতীব সমারোহ। সেখানে ব্রাউসেব ফারের ... পালকের টুপি এবং তার সুন্দব মিনা করা গম্বুজে হাতেব স্পর্শ, ব্রাউস নিশ্চযই তখন চোখ বুজে ...বে। এমন কঠিন ঠান্ডায় এর চেয়ে মনোরম কিছু থাকবে না। সাদা বলগা হরিণটা পর্যন্ত তখন ...লফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

ব্রাউস হরিণটা দেখতে দেখতে বলবে, আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

পুলক যেন বলছে, এমন সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের আর কী সম্বল আছে?

তারপর সেই এক খেলা, ঘুরে ঘুবে খেলা, এবং গম্বুজে হাতের স্পর্শ, এই স্পর্শ রক্তে নানা বর্ণেব ছবি ...কে রাখে। তারপর কেবল খেলা, আবর্তের মতো শরীরের ভিতর রক্ত-কণিকাবা নীল নক্ষত্রের মতো ...ছুটি করে দিলে প্রাণের ভিতর সেই আশ্চর্য মহিমা টের পাওয়া যায়। পুলক ঘুরে ঘুরে প্রাণের ভিতর

সেই আশ্চর্য মহিমা টের পাচ্ছে। এবং সে জাহাজের দিকে এবার ফিরে যাবে ভাবতেই দেখল, তার পুরা... বন্ধু সেই শীতের পাখিটা ঠিক ওর মতো মাথার ওপর গ্লাইড করে একবার উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে যাচ্ছে বরফের ওপর পাখিটাব প্রতিবিম্ব ভীষণভাবে অলৌকিক মায়াজাল সৃষ্টি করছে।

তার মনে হল ফিরে যেতে যেতে, ব্রাউসের সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয় নয়। কারণ চোখ বুজলেই ... ব্রাউসকে নিয়ে নানাভাবে সেই প্রাচীনকাল থেকে, যখন মানুষ আগুন জ্বালতে জানত না, যখন মানুষ ... থেকে পশুপাখি শিকার করে কাঁচা মাংস খেত, সেই কাল থেকে সে তার পাশাপাশি চলে আসছে। কারণ চোখ বুজলেই মনে হয় সে কখনও কালাহারিতে, অথবা কখনও সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে। কালো মেয়ে ব্রাউস কী যে সুন্দব সিংহ শাবক ধরে এনেছে বন থেকে, বাপের সঙ্গে সে গেছে, পিছনে কাঁধে টাঙ্গি পুলক হাঁটছে, আবার সব দ্বীপগুলো এই যেমন সব মনোরম দ্বীপ আছে পৃথিবীর চারপাশে ছিটিয়ে, সেখানে সে দেখেছে এই মেয়েকে, বাপের সঙ্গে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরছে। বড় বড় মাছেব সঙ্গে মেয়েটার তখন খেলা। অথবা দক্ষিণ-সমুদ্রে যারা তিমি শিকার করে বেড়ায়, যেন ব্রাউস সেখানে হাতে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। ওর চুল নীল রঙেব। এবং পিঠের নীচে এসে চুলটা এলিয়ে পড়েছে একেবারে নয়। কী একটা আদিমতা আছে তিমি শিকারের সঙ্গে। মেয়েটাকে তার জ্ঞাতিভাইরা শিকারের শুভাশুভের জন্য দেবী বানিয়ে বাখত। হাতে এক ধরনের সবুজ গোল পাতা। পাতায় তিমিব চর্বি, শুকনো লতা চর্বি থেকে ঝুলে পড়ছে। সেখানে আগুন জ্বলছে। যতক্ষণ না মাছটাকে সবাই টেনে টেনে কিনারায় আনতে পাবছে, ততক্ষণ মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে আলো জ্বালিয়ে। সে কতভাবে যে ব্রাউসকে জীবনের চাবপাশে অথবা মহাজীবনে অর্থাৎ এই সৌবলোকেব চাবপাশে যেখানে যখন তার যেভাবে অস্তিত্ব থাকে মেয়েটা যেন আছে তার পাশে পাশে। এমন মনে হলে পুলকের ভিতরটা আশ্চর্য এক ভালবাসাব সুষমায় ভবে যায়। যেখানেই ব্রাউস থাকুক, নন্দিনী থাকুক, তার আসে যায় না। মনে হয় ওরা আছে পাশাপাশি। ... চোখ বুজলেই ওদের ছুঁতে পায়।

ষোলো

তখন জাহাজেব নাবিকেরা ঠান্ডায় বসে বসে কাঁপত। নাবিকেরা তেমন উত্তাপ পেত না ফোকশালে। এভাবে শীতে বাঁচা যায় না, স্ট্রিম পাইপ ঠিক মতো কাজ করছে না, অথবা প্রচণ্ড ঠান্ডা বলেই ঠিক মতো গবম বাখতে পাবা যাচ্ছে না ফোকশালগুলো। এ নিয়ে একদিন জাহাজিদের সঙ্গে দুই সাবেঙেব বচসা হয়ে গেছে। অথচ সারেংবা এজন্য দায়ী। জাহাজিদের সুখ-সুবিধা সব ওদের দেখাব কথা। অথচ ওবা মেজ-মালোম অথবা কাপ্তানেব ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। না বলেই বলছে, এখন আব এব চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

জাহাজিবা ফোকশালে বসে ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপত বলে প্রায় সবাই গ্যালিতে জড়ো হত। গনগনে আঁচ উনুনে। ওরা চাবপাশে গোল হয়ে বসে থাকত। কাচের দরজা দিয়ে বাইরেব পৃথিবী দেখা যেত। এক আকাশের প্রচণ্ড তুষাবপাতেব ছবি ওদের কাছে কঠিন কিছু মনে হত। অর্থাৎ ওরা ভাবত এভাবে বেশিদিন বাঁচা যায় না। জাহাজ কবে যে নোঙর তুলবে। এবং যা শোনা যাচ্ছে, বরফের দিনগুলো শেষ না হলে কিছুই হচ্ছে না। এভাবে একটা আবাম আছে, কারণ কাজকর্ম থাকে না, জাহাজে কিছু বোঝাই হচ্ছে না, সাফ সুতরোর কাজটাও কম, যাদের ফলগুা বেঁধে জাহাজের আগিল রং করার কথা ছিল, এমন তুষাবপাতে কাপ্তান তা পর্যন্ত করতে বারণ করে দিয়েছে। ফলে শুধু এখন মাস্তুলে নিশান উড়ছে। জাহাজিবা খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে। আর দেশে ফেরার জন্য পাগল হযে যাচ্ছে। কবে কীভাবে যে একদিন ওরা দেশে পৌঁছে যাবে এমন কেবল ভাবছে।

তখন একমাত্র পুলক জাহাজে থাকত না। সে দ্বীপের সব পাথরে অথবা পাহাড়ের বুকে ববফ পড়া দেখত। ব্রাউসের কাছে যাবার জন্য সে বরফ কতদূর এগোচ্ছে, আর কতদূর গেলে সে প্রায় লাফ দিয়ে একটা জলা পার হয়ে ব্রাউসের দ্বীপ পেয়ে যাবে, সে এজন্য একা একা, কখনও ইমাদুল্লাকে নিয়ে বরফের ওপর সাইকেল চালিয়ে একটা নির্মল সাদা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াত। তুষারঝড়ের ভিতর ছুটোছুটি করত, কী যেন এক পাখি মিলে গেছে, ভালবাসার পাখি, যার কেউ নেই, কোনও সম্বল নেই, ভালবাসা...

নেই, সে তাকে পর্যন্ত ভালবেসে ফেলেছে এই বন্দবে এসে।

তাবপব একদিন পুলক দেখতে পেল, উপকূল থেকে লায়ন বকেব এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ববফে একেবাবে ঢেকে গেছে। সব কিছু এখন নিশ্চল হয়ে গেছে। ইমাদুল্লা এবং তাব জাহাজ সাদা ববফে আটকে গিয়ে যেন স্থির হয়ে গেল। ক্রেনগুলো মাথা তুলে সাদা একবাশ তুষাবপাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বুড়ো সান্তাক্রজ সাবি সাবি অর্থাৎ ভোজবাজিব জন্য বুড়ো মানুষটা এখন খুব বেশি লম্বা হয়ে গেছে এবং সাবি সাবি নকল গোঁফ নিয়ে বেশ যেন মজা কবছে সমুদ্রেব সঙ্গে। জেটিতে দু' ফুটেব ওপব ববফ পড়েছে। চাবপাশে ববফেব খেলা। যেদিকে তাকানো যায় ববফে ধু ধু কবছে মাঠ ঘাট। পাহাড়, লাল নীল কাঠেব বাড়িঘব সব ঢেকে এক মায়াবী জগৎ সৃষ্টি কবে ফেলেছে।

যখন এমনভাবে ববফ সমস্ত পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে, দূবেব পাইনগুলো যখন নীল নীল এবং চাবপাশে অনাম নিস্তব্ধতা তখন জাহাজিবা শুনতে পেল, ঠিক জাহাজেব নীচে কেউ ক্রিং ক্রিং কবে বেল বাজাচ্ছে।

ইমাদুল্লা বুঝতে পাবল, পুলক আজও বোধহয় একটা সাইকেল কিনাব থেকে ভাড়া কবে এনেছে। এখন সাইকেল চালানো ভীষণ কঠিন। তেলকালিতে এমন শক্ত হয়ে যায়, প্যাডেলেব সঙ্গে চেন এমন এঁটে যায় যে ভীষণ কষ্ট, তবু সে একদিন বাস্তাটা খুঁজে বেব কবাব জন্য পুলকেব সঙ্গে গেছে। ওবা যেতে যেতে জায়গাতে একটা চিহ্ন বেখে এসেছে যখন পুলক একা যাবে, যাতে সে পথ ভুল কবে সীমাহীন কোনও অঞ্চল অথবা কালাহাবিব মতো ভূভাগে না হাবিয়ে যায়। এভাবে কোনও চিহ্ন কিছুটা পব পব বেখে না গেলে পুলক একদিন ঠিক পথ খুঁজে পাবে না। এবং এটাই ছিল ইমাদুল্লাব বড ভয়।

পুলক এখনও বাজাচ্ছে। ইমাদুল্লা বুঝতে পাবল সে জাহাজেব কাউকে ডাকছে। যেহেতু জাহাজেব মাল খালাস হয়ে গেছে, যেহেতু জাহাজেব সিঁড়ি গ্যাংওয়েতে ভীষণ খাড়া, সে কিছুতেই সাইকেলটা নিয়ে জাহাজে উঠে আসতে পাবছে না।

ইমাদুল্লা বেলিং-এ ঝুঁকে দেখল পুলক অভিযাত্রীব মতো পোশাক পবেছে। পায়ে গামবুট। হাতে চামডাব দস্তানা। মাথায় উলেব টুপি। গলায় কমফর্টাব। লম্বা ওভাবকোট। নীচে শালদেবাজ। শীত থেকে সে কেবল তাব মুখ ঢেকে বাখতে পাবছে না। কখন যে জাহাজ থেকে সে নেমে গেছে।

পুলক বলল, যাচ্ছি।

বাজই এমন বলে। আজও সে এমন বলছে। কিন্তু ইমাদুল্লা জানে লায়ন বকেব সঙ্গে যে ববফেব মাঠ আছে তাব মাঝখানটাতে কখনও জল জমে ববফ হয় না। কিছুটা বোধহয় উষ্ণ স্রোত আছে নীচে। ফলে সেখানে কিছুটা জায়গা জল, জলেব ওপব দিয়ে বড ববফেব খণ্ড ভেসে যায়।

ও জায়গাটাব সম্বন্ধে কিছু খবব নিলি?

নিয়েছি।

ববফ কি সেখানে জমবে?

না।

তবে আজও একা একা সমুদ্রে সাইকেলে ঘুবে বেড়াবি?

পুলক বলল, না। তুমি এসো না নীচে।

ইমাদুল্লা নীচে নামলে বলল, কাল অনেকটা বপ্ন কবে ফেলেছি।

কী বপ্ন কবেছিস?

লাফিয়ে লাফিয়ে পাব হওয়া।

মানে?

মানে এই তোমাব প্রথম সাইকেলটা পাশে বেখে একটু সময় অপেক্ষা কবা। দেখা যাবে বেশ নিরন্তব ভেসে যাবাব মতো বাশি বাশি ববফেব খণ্ড ভেসে আসছে। আব বেশ খেয়াল কবে দেখলাম একটা থেকে আব একটাব দূবত্ব এক গজ দু' গজেব বেশি নয়। খুব বেশি দূব হলেও ক্ষতি নেই। একটু সময় একটা ববফেব টুকবোব ওপব দাঁড়িয়ে থাকলে, ঠিক আব-একটা কাছে চলে আসবেই। এভাবে এক-দুই কবে লাফিয়ে লাফিয়ে ঠিক ওপাশেব দ্বীপটায় চলে যাওয়া যাবে।

হ' আল্লা। তুই কি পাগল?

পুলক চুপ কবে থাকল।

লাফ দিয়ে একটা থেকে আর-একটাতে না যেতে পারলেই একেবারে নীচে!

তা হলে সাঁতার কাটব।

এই শীতে?

পুলক বলল, কী যে ভাল লাগে! তুমি চলো না চাচা।

ইমাদুল্লা কী ভাবল, আমাকে যেতে বলছিস?

না থাক। তুমি বুড়ো মানুষ। কখন শীতে কাঠ হয়ে যাবে। আমি তখন ঝামেলায় পড়ে যাব।

এবং এভাবে কে জানে, কোথায় কার আকর্ষণ কীভাবে তৈরি হয়। ইমাদুল্লা জানে পুলক ভীষণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে। সে ইচ্ছা করলেই সব বন্ধ করে দিতে পারে। সারেংকে বলে কাপ্তানকে বলে সব বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সে যখন তার সেই যুবতী বিবির কথা মনে করতে পারে, তার চোখ ভেসে ওঠে কেমন সে দুর্বার হয়ে যায়। এমন নিবিড় সুষমা জীবনে কার কতবার আসে সে জানে না। এজন্য সে যেখানেই যাক, ইমাদুল্লার সায় আছে। ওকে বাধা দিলে খুব স্বার্থপরের মতো কাজ হবে। ইমাদুল্লা বলল আল্লা তোর সহায় হোক।

সে আর কিছু বলতে পারল না। কেমন আনমনে সে জাহাজের দিকে হাঁটতে থাকল। সে ফিরে তাকাতে সাহস করল না পর্যন্ত।

তবু যাবার ইচ্ছা ছিল ইমাদুল্লার। কিন্তু ইমাদুল্লা জানে কিছুদুর গেলেই সে হাঁপিয়ে পড়বে। এবং তাকে নিয়ে পুলক ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যাবে।

প্রথম দিকে ইমাদুল্লা ভেবেছিল, এ বন্দরে পুলক প্রথম এসেছে। সুতরাং সে ভালভাবে জানে না কীভাবে কোথায় যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে এই একা একা ঘুরে বরং পুলকই ইমাদুল্লাকে সঠিক রাস্তায় কোনও দ্বীপে নিয়ে যেতে পারে। সে এ বন্দরের কোথায় কী, কীভাবে বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে হয় এবং কোথায় সমুদ্র কাচের মতো পাতলা বরফে ঢেকে আছে সব টের পায়।

তা সত্ত্বেও ইমাদুল্লা বলেছিল, চারিদিকে বরফ পড়ছে। তুই মরে যাবি পুলক।

এইসব বললেই যেমন পুলক জাদুর খেলা দেখায় তেমনি সে জাদুর খেলা দেখিয়ে ইমাদুল্লাকে বিব্রত করে তুলেছিল। সে বলেছিল, ব্রাউস কি আর বেশিদিন বাঁচবে মনে হয়?

পুলক হেসেছিল। এমন হাসি ইমাদুল্লা ওর মুখে অনেকদিন দ্যাখেনি।

ইমাদুল্লা ডেকে উঠেই ফের কেমন চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে আফটার-পিকের দিকে ছুটে গেল।

তুই পাগল পুলক! বরফের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেলে তুই নির্ঘাত মারা পড়বি।

পুলক কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মতো বলল, অনেকেই তো সারডিন মাছ ধরতে যাচ্ছে।

পুলক এক পা বরফে ঠেকিয়ে অন্য পা প্যাডেলে রেখে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে এমন জবাব দিয়েছিল।

ইমাদুল্লা আফটার-পিকে এবার ঝুঁকে দাঁড়াল। অনেক নীচে পুলক। জোরে না বললে বুঝি শুনতে পাবে না। সে বলল, ওরা জানে কোথায় পাতলা কাচেব মতো বরফ, কোথায় কঠিন। তুই যতই ঘুরে বেড়াস এক সফরে সেটা তোর জানা সম্ভব না।

পুলক ঠিক একই ভাবে হাসল।

তারপর যা হয়, পুলক জাহাজে নেই, একা একা এই জাহাজে সময় কাটে ইমাদুল্লার, সে নামাজ পড়ার পর মাদুরটা পাট করে রাখে, সে খেয়ে পুলকের খাবার ওর লকারে রেখে দেয় এবং মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট উপেক্ষা কবে দাঁড়িয়ে থাকে ডেক-এ, পুলক কখন ফিরছে। সে না ফিরলে জাহাজে সে কেমন দুঃখী মানুষ বনে যায়।

তারপরই একসময় দেখতে পায় গ্যাংওয়েতে কেউ টলতে টলতে উঠে আসছে। ক্লান্ত, অথচ চোখে-মুখে ভীষণ উত্তেজনা। কোনও নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের মতো চোখ-মুখ। ইমাদুল্লাকে সব বলতে না পারলে সে যেন ছটফট করবে এমন ভাব।

ইমাদুল্লা তাড়াতাড়ি লকার থেকে খাবার বের করে দিলে সে বাংকে বসেই খায়। খুব খিদে। সে কতটা পথ পার হয়ে এসেছে, অথবা কতটা সে পরিশ্রম করেছে, ওর খাওয়া দেখলে টের পাওয়া যায়। সে ভীষণ গব গব করে খেতে থাকলে ইমাদুল্লা বলে, ব্রাউস খেতে বলেনি?

বলেনি আবার! এক গাদা খেয়েছি। ওর বাবা ঝিনুকের স্যুপ ভীষণ ভাল রান্না করে।

কিন্তু যেভাবে খাচ্ছিস!

বেশ অনেকটা পথ। এত ঠান্ডা অথচ সাইকেল চালালে কিছু মনে হয় না।

তারপর সে রুটির সঙ্গে দু' টুকরো ভেড়ার মাংস চিবুতে চিবুতে বলল, ওঃ কী গ্র্যান্ড রাস্তা! আসার সময় জ্যোৎস্না উঠে গেছে। সাদা। সাদা বরফ, সাদা জ্যোৎস্না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঝোড়ো ঠান্ডা বাতাস আর বৃষ্টি তার ভিতর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি।

সে একটু থেমে বলল, অর্থাৎ সে ঢক ঢক করে জল খেল এক গ্লাস, তারপর বলল, জানি না, চাচা এটা কীসের মায়া! আমি ব্রাউসের জন্য যাচ্ছি, না এই দ্বীপ, তার বরফ পড়া, সাদা জ্যোৎস্না, সমুদ্রের ঠান্ডা বাতাস আমাকে আকর্ষণ করছে, কোনটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এবং মানুষের ভিতর বুঝি, চাচা, এক আশ্চর্য অহংকার থাকে, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যকে শুষে নেবার অহংকার। কী যে হয় জানি না, আমি এমন একটা রাস্তা আবিষ্কার করে ফেলেছি যার ভিতর নিয়ে গেলে তুমিও রোজ রোজ তার আকর্ষণে ঘরে থাকতে পারবে না।

পুলক অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে যাওয়ায় ইমাদুল্লা হাসল।

পুলক খুব লজ্জা পেয়েছে এমনভাবে বলল, ব্রাউস এখন আর, চাচা, বলে না, সে আগামী শীতে অথবা বসন্তে মরে যাবে।

ওর শরীর ভাল হয়েছে?

খুব ভাল। ও আর আমি সারাটা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই।

তুই থেকে যা না। কেউ তো নেই তোর।

সহসা এমন কথা শুনে পুলক ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, সে হবে'খন।

পাশাপাশি ফোকশালগুলোতে তখন সবাই ঘুমোচ্ছে। পোর্ট-হোল বন্ধ বলে বাইরের হাওয়া ঢুকছে না। মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং ইঞ্জিনের শব্দ আসত—কক্ কক্। এখন জাহাজের চারপাশে বরফ পড়ে শক্ত হয়ে গেছে বলে ইঞ্জিনটা পর্যন্ত শব্দ করছে না। অদ্ভুত নীল আলোয় ওরা দু'জন জাহাজি চুপচাপ মুখোমুখি বসে আছে।

ইমাদুল্লা বলল, তুই থাকলে ব্রাউস বেঁচে যাবে।

পুলক উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। সে দরজাটা আর-একটু টেনে দিয়ে বলল, অনেক রাত হয়েছে চাচা, ঘুমোতে যাও।

ইমাদুল্লার ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। সে যেমন বসেছিল, যেন এভাবেই সে বসে থাকবে এখানে, সে উঠবে না, সে কথা না নিয়ে উঠবে না, এবং পুলকের কেন জানি এই অহেতুক কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। সে বলল, চাচা, তুমি তো প্রাচীন নাবিক। মানুষের ভাললাগা মন্দলাগার ব্যাপারটা তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো। আমার থেকে যাওয়ার ব্যাপারে এত ভাবছ কেন?

ইমাদুল্লা উঠে যাবার সময় শুনল, ধীরে ধীরে কেমন শুকনো গলায় পুলক বলছে, কাছে থাকলে মানুষের দাম থাকে না চাচা। দাম না থাকলে, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা মরে গেলে, সেই এক বরফের দেশ মানুষের মনে উঁকি মারবে। তখন মানুষ বেঁচে থেকেও মরে যায়।

ইমাদুল্লা ওর হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বুঝতে না পেরে বলল, জাহাজ আর বেশি দিন থাকছে না। বরফকাটা কল এসে জাহাজ সমুদ্রে নিয়ে যাবে।

পুলক বলল, বেশ হয়। কবে যে আমরা এখান থেকে যাব!

এরপর ইমাদুল্লা চলে গেলে কেন যে সারারাত পুলক আজ ঘুমোতে পারল না, এত ঠান্ডা চারপাশে অথচ ওর কপালে কেমন ঘাম দেখা দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। বরফ পড়ে গেলে যা হয়, শীত তেমন থাকে না, বরফ পড়ার আগে কনকনে শীতটার মতো এ ঠান্ডা তেমন কষ্টকর নয়। পোর্ট-হোল দিয়ে সে সারারাত জেগে জেগে সেই লাইট-হাউজের দ্বীপটা কেবল দেখে গেল। দ্বীপের শক্তিঘরটা সে দেখল। কন্ট্রোলিং টাওয়ারের আলোটা যখন পুবে ঘুরে যায় তখন মনে হয় ওর মতো সেখানে ব্রাউসও এখন একা জেগে বসে রয়েছে। কাচের জানালায় ওর মুখ। সামনে সমুদ্র। উষ্ণ স্রোত আছে বলে জল নীল, কেবল মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড মুক্তোর মতো নীল বরফের খণ্ড জলের উপর নানারকম ছবি তৈরি করে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় বুঝি ব্রাউস চোখ বুজলে টের পায় সেই আশ্চর্য মানুষটা কেবল লাফিয়ে

সারাজীবন এক বরফের উপত্যকা থেকে অন্য বরফের উপত্যকায় চলে যাচ্ছে। কখনও সে সেখানে সবুজ ঘাস অথবা গাছপালা বৃক্ষ জন্মালে কেমন লাগে দেখতে, একদণ্ড দাঁড়িয়ে তা দেখছে না।

সতেরো

এভাবে জাহাজের একজন নাবিক নিশিদিন বরফের ওপর ঘুরে বেড়াত। জাহাজ থেকে ছুটি পেলেই অথবা কাজ না থাকলে সে তার ভাড়া করা সাইকেলটা নিয়ে বের হয়ে পড়ত। কখনও দেখত, রাস্তার ওপর মানুষেরা কাজ করছে, বরফ সরাচ্ছে। আবার দু'দিন পর যা ছিল তাই। কেবল সমুদ্রে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে যেন সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যায়। কোনও কষ্ট হয় না। মসৃণ পিচের রাস্তার মতো প্রায়। সে বেশ অভিযাত্রীর মতো সমুদ্রে নেমে গেলে নানাবকম লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। ওরা সবাই বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে, এবং ওরা সমুদ্রের চার-পাঁচ ক্রোশ ভিতরে ঢুকবে। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে যাবে। কালো পোশাকে ওদের এক-একজনকে দূর থেকে মনে হয় এক-একটা পেঙ্গুইন, খুব সংগোপনে সেই ছোট জলের গর্তে যেন শিকারেব আশায় ঝুঁকে আছে।

এভাবে সে চলে যেত। যেতে যেতে দেখতে পেত, বেশ রসিক একজন বুড়ো মানুষকে। সে পড়ত তার যাবার পথে। পথটায় এসে সে যখন দেখত বুড়ো মানুষটা খুব নিরিবিলি মাছ ধরছে, তখন সে সাইকেলের বেল বাজাত না। মাছেরা শব্দ পেলে চলে যায়। বুড়ো মানুষটা মাছ জলের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলে ভীষণ দুঃখ পাবে। তাই পুলক যত তাড়াতাড়িই থাকুক, যখনই দেখবে সে এসে গেছে বুড়ো মানুষটার কাছে তখন সে আর সাইকেলে থাকবে না। পায়ে হেঁটে পাশ কাটিয়ে যাবে। কখনও মাছ না জমলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবে। কিন্তু ফেরার পথে তাকে সাইকেল থেকে নামতে হয় না। তখন রাত্রি হয়ে যায়। রাতের প্রথম দিকে তখন জ্যোৎস্না থাকে বলে ব্রাউসকে আর কন্ট্রোলিং টাওয়ার থেকে ঘুরিয়ে ঘুবিয়ে বরফের ওপর আলো ফেলতে হয় না। সে বেশ চাঁদের আলোয় পথ চিনে ফিবে আসতে পাবে। তখন সে একা। কখনও কখনও নীরবে সেই দিগন্ত-বিস্তৃত বরফেব মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে এক অত্যাশ্চর্য জীবনের ছবি সে দেখতে পায়। এবং ভালবাসার ব্যাপারটা যেন মহিমময় ঈশ্বরের ভীষণ কৌতুক। এটা মরে গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না। সে এভাবে ববফের ওপর সাইকেল চালিয়ে যায়। কন্ট্রোলিং টাওয়াব থেকে ব্রাউস দাঁড়িয়ে যতক্ষণ চোখ যায় দ্যাখে। জ্যোৎস্না রাত বলে বেশিদূর দেখা যায় না। পুলক আরও অস্পষ্ট হয়ে গেলে জ্যোৎস্না বাতে ব্রাউস একটা বোতাম টিপে উলটোদিকে আলো ফেলে দেখতে পায়, সে যাচ্ছে, ববফের ওপর দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। তার মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, পায়ে গামবুট। সারা শরীর ওভারকোটে ঢাকা। হাতে সেই চামড়ার দস্তানা। সে মাঝে মাঝে যাবার সময় হাত তুলে দেয়, আমি আবার আসব। হাত তুলে ইশারা করলে ব্রাউস এমন বুঝতে পারে। টাওয়ারের আলো না পৌঁছালে আকাশের নক্ষত্রেরা তাকে কখনও কখনও আলো দেয়।

এভাবে যখন দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল, একরাতে ইমাদুল্লা দেখল জাহাজে পুলক ফেরেনি। সে এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠেছে, সে এ সময় একবার বাথরুমে যায়। যাবার সময় দেখতে পায় পুলক দুটো মোটা সাদা কম্বলে শরীর ঢেকে ঘুম যাচ্ছে। ওর স্বভাবটা ভাল না। সে কম্বল গায়ে রাখে না। ইমাদুল্লার স্বভাব বাথরুম থেকে নেমে সিঁড়ির ডানদিকে একবার উঁকি দেওয়া। খুব ধীরে ধীরে দরজাটা খোলে। চোরের মতো সন্তর্পণে ঢুকে যাবার স্বভাব ভিতরে। তারপর পুলকের শরীরে কম্বল না থাকলে শরীরটা ভাল করে ঢ'কতে ঢাকতে নিজের সঙ্গে নিজে গজগজ করতে থাকে কিছুক্ষণ। কেন যে সে এমন হয়ে যাচ্ছে!

ইমাদুল্লা ভিতরে ঢুকে দেখল, পুলকের লকার বন্ধ, বিছানা খালি। একটা বই খোলা পড়ে আছে। খুব অগোছালো মানুষ সে। বাংকের নীচে নোংরা জামাকাপড়। কবেকার কে জানে! সে ওকে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে এসব দেখে ফেলল। তারপর ইমাদুল্লা নিজের ফোকশালে এসে ঘড়ি দেখল। এখন রাত প্রায় একটা বাজে। মাঝ রাত। আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই সকাল হয়ে যাবে। সে জাহাজে কেন এল না। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। সে যদি থেকেও যায়, পালিয়ে থাকতে হবে। এজেন্ট-অফিস ওর ওপর সার্চ-ওয়ারেন্ট বের করবে। কাপ্তান নিজের দায়িত্বে তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। সে নানাভাবে ব্যাপারটাকে ভাবল।

দূরদেশে পাশাপাশি জাহাজিরাই আত্মীয়ের মতো। খোঁজ-খবর সব তারাই করে থাকে। ইমাদুল্লা এই ছেলেটিকে ঠিক জাহাজির মতো কখনও ভাবে না। পুলক সুখে-দুঃখে তার ভীষণ কাছাকাছি মানুষ। ওর মুখ চোখ দেখলেই এখন এটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ভীষণ উদ্বিগ্ন চোখ-মুখ ইমাদুল্লার।

এমন শীতে সহজে কেউ উঠতে চাইবে না। মুখ কান কম্বলে ঢেকে সবাই ঘুম যাচ্ছে। হাত-পা ইমাদুল্লার বরফের মতো ঠান্ডা। ওকেই একবার ওপরে যেতে হবে। যদি মেসরুমে পুলক শীতের জন্য ঘুমোতে না পেরে চা করতে বসে যায়। এ ছাড়া যমুনাবাজুতে সে একবার যাবে। যমুনাবাজুর বাথরুমগুলো তার দেখা হয়নি। এই ভেবে ভাল করে গলা মুখ ঢেকে ওপরে উঠে দেখল মেসরুম অন্ধকার। গ্যালিতে কেউ নেই। গ্যালিতে উনুনের আঁচ নিভে গেছে। চারপাশটায় কী যে কনকনে শীত! সে কেমন নুয়ে নুয়ে এবং কিছুটা লাফিয়ে গঙ্গাবাজুর দিকে গেল। বাথরুম খোলা। কেউ নেই। কোথায় আর যেতে পারে! কখনও কখনও জাহাজিদের এসব অসুখ দেখা দিলে গভীর রাতে ডেক-এ পায়চারি করতে দেখা যায়। ডেক-এ আবছামতো অন্ধকার। বয়স হলে যা হয়। ইমাদুল্লার মনে হল সে চোখে কম দেখছে। আর ডেক-এ বরফ জমেছে বলে সে খুব দ্রুত হেঁটে যেতে পারছে না। বোট-ডেকে একটা বড় আলো জ্বলছে। এবং এক নম্বর ফলকায় গঙ্গাবাজুর ডেরিকেও একটা আলো। এসব আলো এই শীতের রাতে তেমন যেন অন্ধকার দূর করতে পারছে না। সে প্রথম ঠিক চিফ কুকের গ্যালিতে এসে ফিস ফিস গলায় ডাকল, পুলক? পুলক আছিস? আমি তোর ইমাদুল্লা চাচা।

কোনও শব্দ নেই কোথাও। কেবল সমুদ্রের সেই কনকনে শীতের বাতাস এবং বাতাসে ডেরিকের আলো দুলছে। আলো দুললে যা হয়, ক্রমে ইমাদুল্লার ছায়াটা একবার বড় হয়ে যাচ্ছে, আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের ছায়া এভাবে বড় হয়ে যায় অথবা ছোট হয়ে যায় অস্পষ্ট রাতে তার বুঝি জানা ছিল না। সে বলল, আমি এখন কী করি!

সে যেন নিজের ছায়াগুলোকে লক্ষ করে বলছে, তুই যে বেইমান থেকে গেলি, এখন বুঝতে পারছি তোমার কী কষ্ট।

এবং ইমাদুল্লার কেমন যেন একটা আর্তস্বর চারপাশে এভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে বলল, আমি জানতাম, তুই একদিন ঠিক জাহাজে আর আসবি না। অথচ আমার সঙ্গে কী তঞ্চকতা! না, আমি থাকব না এখানে, খুব কাছাকাছি থাকলে ভালবাসার সুষমা বেঁচে থাকে না।

এবং সেই পুত্রের মুখের মতো মুখ পুলকের ভেসে উঠলে সে ভীষণভাবে আঁতকে উঠল।

কে!

আমি ইমাদুল্লা, সাব।

এই রাতে তুমি এখানে কী খুঁজছ?

কিছু না, সাব।

মেজ-মিস্ত্রি তবু ইমাদুল্লার কাছে এসে টর্চ মারল মুখে। সে দেখল বুড়ো মানুষটা শীতে নীল হয়ে যাচ্ছে। মেজ-মিস্ত্রি কেমন ধমক দিলেন, তুমি ইমাদুল্লা, এ জামা-কাপড়ে ওপরে উঠে এসেছ? তুমি তো মরে যাবে।

ইমাদুল্লার গলার স্বর কেমন বুজে এল বলতে গিয়ে।

সাব, পুলক ফোকশালে নেই। ওকে খুঁজছি।

বাথরুম দেখেছ?

সব দেখেছি সাব।

তবে বোধহয় দ্বীপটায় থেকে গেছে।

থেকে গেলে আমাকে বলে যেত।

কোনও অসুবিধা আছে।

কিন্তু সকালে না ফিরলে ভীষণ ঝামেলা হবে।

মেজ-মিস্ত্রি জানেন ঝামেলাটা কে করবে। তিনি বললেন, সে দেখা যাবে।

অথচ সকাল গেল, দুপুর হয়ে গেল, পুলক এল না। এভাবে আর চুপচাপ বসে থাকা যায় না। ইঞ্জিন-সারেং, ডেক-সারেং, ইমাদুল্লা এবং অন্যান্য জাহাজিরা এ নিয়ে মেসরুমে কী করা যায় শলাপরামর্শের

জন্য বসে গেল। কেউ কেউ এটা আদৌ গুরুত্ব দিল না। থেকে গেলে কী আর করার আছে! এজেন্ট-অফিস যা করার করবে।

সারেং বলল, আরে সে তো তোমাদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সফর কাটিয়ে গেছে, সুখে দুঃখে তোমরা ওর কাছ থেকে অনেক উপকার নিয়েছ, এখন এমন বললে চলবে কেন।

কেউ বলল, কাপ্তানকে খবরটা দিয়ে দেওয়া ভাল।

ইমাদুল্লা ভীষণ বিব্রত বোধ করতে থাকল। কাপ্তানের কাছে রিপোর্ট হওয়া মানেই পুলক ব্ল্যাক-লিস্টেড হয়ে যাবে। যতক্ষণ রিপোর্ট না যায় ততক্ষণই যেন তারা পুলকের জন্য অপেক্ষা করতে পারবে। অথচ ইঞ্জিন-সারেং ভীষণ তাড়াতাড়ি করছে এ ব্যাপারে। সে না জানিয়ে গেছে। দায়িত্ব আর নিজের কাঁধে রাখতে চাইছে না।

এবং এভাবে একসময় কাপ্তানের কাছে খবর গেল, বোট-ডেকে মাস্তার। জাহাজের সবাই সারি সারি ওপরে দাঁড়িয়ে গেছে। কাপ্তান দু'পাশে জাহাজিদের রেখে একবার পুবে, আবার পশ্চিমে হেঁটে যাচ্ছেন। এইসব নাবিকদের তিনি কলকাতা বন্দর থেকে নিয়ে এসেছেন। এদের আবার নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছানো তাঁর দায়িত্ব। কোনও কারণে মাঝ-সমুদ্রে অথবা কোনও নাবিক হারিয়ে গেলে সব দায়-দায়িত্ব তাঁর। এবং তারও একটা জাহাজিনলি আছে, সেখানে সেও কখনও কখনও ব্ল্যাক-লিস্টেড হয়ে যায়। আর তিনি যেহেতু ধর্মভীরু মানুষ, ঈশ্বরের ঘরে ব্ল্যাক-লিস্টেড হবার সম্ভাবনা বেশি ভেবে একটা সঠিক খোঁজের তাঁর দরকার। তিনি বললেন, সে কোথায় রোজ রোজ যায়?

ইমাদুল্লা বলল, সাব, ও লায়ন রকে যায়।

কাপ্তান চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, এখন লায়ন রকে কেউ যেতে পারে না।

সে তবু যায় সাব।

কাপ্তান বললেন, অ্যাবসার্ড।

সেকেন্ড অফিসার বলল, আমিও শুনেছি যায়।

এবার কাপ্তান যেন আরও সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।—তোমরা যা জানো না, সেটা বোলো না।

সে তো এসে এমন বলেছে সাব।—ইমাদুল্লা কাঁচুমাচু মুখে বলল।

তোমরা জানো না এ সময়ে লায়ন রকের সঙ্গে পিয়াদ্রোঁতের কোনও যোগাযোগ থাকে না।

বরফ পড়ে যায় বলে. ।

কাপ্তান থামিয়ে দিলেন। বললেন, খুব কঠিন। নানারকমের বরফ, ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। স্রোতে নেমে যাচ্ছে। তুমি যে জলে সাঁতার কাটবে তাও পারবে না। বরফের ধাক্কায় একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। প্রায় ফার্লং-এর মতো পথ পার হওয়া দায়। মানুষের অসাধ্য সেই স্রোত পার হয়ে যাওয়া।

বলে তিনি কী ভাবলেন, তারপর কেন জানি মনে হল, হয়তো যেতে পারে, ভালবাসা মানুষের কাছে ঈশ্বরেব মতো পবিত্র হয়ে গেলে সে সব পারে। এবং তিনি বললেন, আজ বিকেলেই খোঁজ নিতে হয়।

ইমাদুল্লার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে কোথায় যেতে!

ইমাদুল্লা ঠিক বুঝতে পারল না বলে মেজ-মিস্ত্রি বুঝিয়ে বললেন।

ইমাদুল্লা বলল, ইলিয়া পরিবাবের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ ঘটেছিল। আমরা সেখানে যেতাম।

কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ইমাদুল্লা একটু ভাল বাংলো বলার চেষ্টা করে।

কাপ্তান সাক্ষী-সাবুদ রেখে সব লগবুকে নোট করে নিলেন। সে কোথায় যেত, কখন যেত, কবে থেকে এমন হয়েছে এবং বিস্তারিত লগবুকে নোট করে নিয়ে তিনি সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন। কিছু কিছু খবর তার আগেও এসেছে, তিনি জানেন জাহাজি মানুষের সমুদ্রের ভয়াবহ দিনগুলো এভাবে বন্দরে এলে সহজ হয়ে যায়। কোনও কারণেই কাপ্তান বাধা-নিষেধের বেড়াজালে কাউকে আটকে রাখতে চান না। যা কিছু সমুদ্রের নিঃসঙ্গতা এভাবে বন্দরে এলে সেবে যায়। সুতরাং তার যে এসব ব্যাপারে সায় থাকে না, তা না, তবু একেবারে নিরুদ্দেশে গেলে একটা জবাবদিহির ব্যাপার থাকে। এজন্য বোধহয় কাপ্তানকেও খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

পুলক বিকেলেও ফিরে এল না বলে ইমাদুল্লা একবার ইলিয়াকে ফোন করবে ভাবল। সকালেও সে দু'-তিনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই কানেকশান পায়নি। এখন আবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

অথবা সোজা চলে যাওয়া। আবার তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে বলে বাস কখন যাচ্ছে কখন যাচ্ছে না কেউ ঠিক বলতে পারছে না। এখন চারপাশে অজস্র পেঁজা তুলোর মতো রাশি রাশি কুচি বরফ উড়ছে অথবা শরতের কাশফুলের মতো এই বন্দর-শহর বরফের কুচিতে ছেয়ে আছে। ডেকের ওপর উঠলেই বিন্দু বিন্দু এইসব বরফকুচি ঝরে পড়বে ওভারকোটে। ইমাদুল্লা এই ঝড় মাথায় করে বের হয়ে পড়ল। সঙ্গে গেল গঙ্গা এবং যমুনাবাজুর দু'জন ডেক-জাহাজি। সে কিছুতেই কোনও কানেকশান পেল না।

ইমাদুল্লা জানে এখন কাপ্তান বন্দরে ডায়েরি করবে। আজ করবে না। আজ রাতটা দেখে সে কাল ভোরে ডায়েরি করবে। জাহাজ আগামীকাল বিকেলে ছাড়ছে। বরফকাটা কল এসে গেছে। ওপাশে ওটা বরফের স্তূপের দাঁড়িয়ে এখন ফুঁসছে।

ইমাদুল্লা বাস পেল না। একটা জিপ যাবে ওয়েলিংটনে। ওরা বাজারের কাছে জিপটার মালিককে ওদের এই ভয়ংকর বিপদের কথা জানালে লিফ্‌ট দিতে রাজি হল। এবং যখন ওরা ইলিয়ার বাড়িতে পৌঁছেছে তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বরফ পড়ছে বলে, সব জানালা দরজা বন্ধ। গোলাপ গাছগুলো চেনা যাচ্ছে না। ক্রিসমাস ট্রির মতো মনে হচ্ছে। বাইরে বড় আলো জ্বালা। ওরা গাড়িবারান্দায় উঠে প্রথমে কোট খুলে সব বরফের কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল। তারপর দরজার কড়া নাড়তেই খুলে গেল। যেন ইলিয়া এতক্ষণ কারও আসার অপেক্ষায় বসে আছে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সেই মানুষ তার এসে গেছে এমনি দ্রুত সে দরজা খুলে মুখ বাড়াল। ইমাদুল্লাকে দেখে বলল, আমি তোমাদের অপেক্ষাতেই বসে রয়েছি। কিছুক্ষণ আগে লাইট-হাউজ থেকে ফোন এসেছে।

ইমাদুল্লা খুব ব্যস্ত গলায় প্রশ্ন করল, কী বলেছে ফোনে?

পুলক রোজ যেত। গতকালও যাবার কথা। কিন্তু যায়নি।

আমরা তো পুলকের খোঁজে এসেছি। সে গতকাল বের হয়েছে। আজও ফিরে যায়নি জাহাজে। কাপ্তান খাতায় নাম তুলেছেন।

ইলিয়া বলল, সে রোজ যেত। মিলান বারবার বারণ করেছে, যা রাস্তা বরফের, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! এখন সমুদ্রে বরফের অবস্থা একেবারে ভাল না।

আমরাও তাই ভাবছি। কিন্তু কাপ্তানের ধারণা সে কারও সঙ্গে পালিয়েছে।

ইলিয়া বলল, সারাটা বিকেল সে হইচই করত ত্রাউসের সঙ্গে। লাইট-হাউজের নীচে একটা পাথরে বসে ওরা দু'জন কেবল বরফ পড়া দেখত।

ইমাদুল্লা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। বলল, কী বলেছে ফোনে?

বলেছে, ত্রাউস সারারাত ঘুমায়নি। পাগলের মতো একবার নীচে নেমে এসেছে, আবার লাইট-হাউজের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেছে। সারারাত লাইট-হাউজের আলো ফেলে বরফের উপর ওকে খুঁজেছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে না?

না। তবে বিকেলে সামান্য রোদ উঠলে দূরে ওরা একটা কী বিন্দুর মতো দেখতে পেয়েছে। ত্রাউস ওর বাবা বলেছে জাহাজে যেন খোঁজ নিই। সে জাহাজে বারবার কানেকশান চেয়েও পায়নি। তারপর আমাকে ফোন করেছে। যাক ভাবছিলাম। কিন্তু দ্যাখো আবার দিনটা কী খারাপ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে বসে ছিলাম যদি তোমরা কেউ ওর খোঁজ নিতে আসো।

ইমাদুল্লা ভাবল, পুলক নানারকম কৌতুক করতে ভালবাসত। অথবা খেলা, জাদুর খেলা, যা দেখে জাহাজে সবাই বেহদ্দ। এখন কি পুলক তবে বরফের নীচে জাদুর খেলা দেখাচ্ছে? সে জীবন পণ রেখে খেলা দেখাতে গেল। ত্রাউস তার বিষণ্ণতা নিয়ে বসে থাকত, কখন সেই মানুষ আসবে তার। যে সারাটা বিকেল দ্বীপে ছুটে বেড়াবে এবং ওর সুন্দর চোখ দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে যাবে। তুমি পুলক জীবন পণ করে খেলা দেখাতে গেলে। তুমি এক পেনিকে দশ পেনি করে দিতে পারতে জানতাম। তুমি কি শেষ পর্যন্ত আর ওকে খেলা দেখিয়ে খুশি করতে পারোনি? একঘেয়ে ঠেকত? শেষ পর্যন্ত ওকে খুশি করার জন্য নতুন খেলার সন্ধানে ছিলে? বরফের নীচে ত্রাউসকে তাই তুমি মাছের খেলা দেখাতে চাইলে?

ইমাদুল্লার এখন আর কিছুই ভাবতে ভাল লাগছে না। সে, গঙ্গা, ডেক-জাহাজি দু'জন এবং মেজ-মালোম সকলে মিলে পা টিপে টিপে হাতে টর্চ নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে। ওরা সমুদ্রের ওপর হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের নীচে শক্ত তিন-চার ফুট ঘন বরফ। নীচে নীল জল। আশেপাশে সেই ফোকর বরফের। পুলককে

ওদের খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। কারণ প্রায় ফার্লং-এর মতো পথ আগে পুলক এক ভাঙা বৃত্তের ভিতর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাইকেলের অধিকাংশ জলের ভিতর। শুধু হ্যান্ডেলটা বরফে আটকে আছে। নতুবা ওটাও তলিয়ে যেত এবং সাইকেলটা দেখেই বুঝল বরফের নীচে পুলক আটকা পড়েছে। একটা তির্যক আলো স্থির হয়ে আছে বৃত্তের ওপর। ইমাদুল্লার শরীরেও আলোটা এসে দু'বার পড়ল। ইমাদুল্লা হাত নেড়ে সংকেতে জানাল, পাওয়া গেছে। কী পাওয়া গেছে কিছু বলতে পারল না। ইমাদুল্লা ঠান্ডায় ডুবে বরফের ভিতর থেকে পুলককে খোঁজার চেষ্টা করলে মেজ-মালোম বাঁধা দিলেন। বললেন, ইমাদুল্লা, তুমি তবে মাছ হয়ে যাবে। অনর্থক খোঁজা। ওর সাইকেলটা বরং তুলে নাও।

লাইট-হাউজের সেই বাতি বড় আশ্চর্য সুন্দর করে রেখেছিল এই সমুদ্রকে, যেন এক বরফের উপত্যকা এই উপত্যকায় ওরা সকলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সকলেই সেই পরশপাথরের সন্ধানে আছে। মনে হল ত্রাউস কন্ট্রোলিং টাওয়ার থেকে ওদের দেখছে। এবং সারা উপত্যকাময় সে বাতিঘরের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। বোধহয় পুলক এখন জলের তলায় বরফের ছাদে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ত্রাউসকে কী খবর দেওয়া যায়, ইমাদুল্লা ভাবছিল। কাল জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কে আর খবর রাখে, পুলক এক সামান্য জাহাজি বরফের নীচে হারিয়ে গেছে। জাহাজ ছাড়ার আর বেশি দেরি নেই। সকাল হলেই ওরা চলে যাচ্ছে বন্দর ছেড়ে। দেশেও পুলকের কেউ নেই। সুতরাং যতদূর পারা গেল আলোর ভিতর হাঁটতে হাঁটতে ওরা লায়নরকের সামনে চলে গেল। ইমাদুল্লা হাতে ইশারা করে জানাল, পুলককে পাওয়া গেছে। সে যে সমুদ্রের নীচে জাদুর খেলা দেখাচ্ছে, সে কথা ইমাদুল্লা গোপন করে আবার ফিরে আসতে লাগল। আকাশ পরিষ্কার। সামান্য কাক-জ্যোৎস্না এখন এই বরফের ওপর। আশ্চর্য নীরব এক প্রশান্তি নেমে এসেছে চারপাশে ইমাদুল্লার কেন জানি কিছুতেই এই বরফের উপত্যকা ছেড়ে এখন যেতে ইচ্ছা করছে না।

উপসংহার

কোনও ভারতীয় জাহাজ সেই দ্বীপে গেলে, বিশেষ করে সেই শীতকালে, এক যুবতী তার স্বামীকে নিয়ে জাহাজ-ডেকে উঠে আসে আজকাল। এবং বড় বড় চোখে তাকায়। সে যেন জাহাজে কাকে খুঁজতে আসে তাঁকে না পেলে সে একজন ভারতীয়কে রোজ রাতের আহারে নিমন্ত্রণের সময় বড় বড় চোখে সেই এক আশ্চর্য ভারতীয় সম্পর্কে গল্প করতে করতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

এর সঙ্গে কিছু সংস্কারও তার জন্মে গেছে। যেমন তার ঠাকুমা লণ্ঠন হাতে জাহাজ-ডেকে রাতে উঠে যেত, সেও তেমনি যখন জেটিতে আসে লণ্ঠন হাতেই আসে। যেন এটা তাদের পারিবারিক সম্মান দেখানো সেই ভারতীয়টির প্রতি। নিমন্ত্রিত অতিথি এই লণ্ঠন হাতে জাহাজ-ডেকে উঠে আসার মানে জানতে চাইলে যুবতী মৃদু হাসে। কথা বলে না। নিজের এই সংস্কারের কথা, সম্মান দেখানোর কথা কাউকে বলে সেই মানুষটিকে ছোট করতে চায় না। কারণ সে বুঝি বেঁচে আছে তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। সে যে বলে গেছে, সে আবার এ দ্বীপে আসবে।

মানুষের ধর্ম

শেষ রাতে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরছে।

দীর্ঘদিন সমুদ্র পরিক্রমণের পর জাহাজ এবং জাহাজিরা লেগুনের মুখে বন্দরের আলো দেখতে পেল। আর তুষারঝড়ের জন্য জাহাজিরা রেনকোট গায়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করছে, ওরা দড়িদড়া ফেলে দিচ্ছে নীচে। জেটিবয় সেইসব দড়িদড়া অথবা হাসিলের সাহায্যে জাহাজ বন্দরে বাঁধছে। মেজ-মালোমকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না, তিনি দু' হাত তুলে বিচিত্র এক ভঙ্গিতে ডেক-জাহাজিদের দড়িদড়া হাপিজ অথবা আবিয়া করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্ট-হোলে উঁকি দিল। শেষরাতে জাহাজ বন্দর ধরছে, জাহাজ সেই কবে পূর্ব-আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। তারা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপমালা অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখেছে। ওরা সেই দ্বীপের ঝাউগাছ এবং অপরিচিত গাছ-গাছালি দেখে চিৎকার করার সময় মনে করত, জাহাজ বুঝি আর কোনওদিন বন্দর ধরবে না। শুধু সমুদ্র, নীল জল, নীল আকাশ আর হয়তো কচিৎ কোথাও সমুদ্রের চিড়িয়াপাখি, দূরে কখনও ডলফিনের ঝাঁক...। পাঁচ নম্বর সাবের মনে হত জাহাজ ওদের নিয়ে অন্তহীন এক সমুদ্রে যাত্রা করেছে। ওরা বন্দরে কোনওদিন পৌঁছতে পারবে না, জাহাজ ওদের সঙ্গে তঞ্চকতা করছে।

সুতরাং এই তুষারঝড়ের ভিতরও জাহাজিদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। মেজ-মালোম প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করতে জাহাজিদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সামনে পাহাড়, আলো, মাটি এবং মানুষের বসতি। ওখানে কোথাও রমণীদের গৃহ আছে। মেজ-মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইতে থাকলেন। তুষারঝড়ের জন্য ওঁর কণ্ঠ ভয়ংকর কঠিন মনে হচ্ছিল আর তুষারঝড়ের জন্য সব পোর্ট-হোল বন্ধ। কাচের ভিতর থেকে এখন অন্যান্য জাহাজিরা বন্দর দেখছে। বন্দরটা ছোট অথচ খুব মসৃণ মনে হচ্ছিল। ক্রমশ আলো ফুটছে, ক্রমশ তুষারঝড় কমে আসছিল। আর এক-এক করে সব আলো, পথের এবং জেটির এসময় নিবে যেতে থাকল। দূরের গির্জায় তখন ঘণ্টা বাজছে, তখন জাহাজিরা ডেকের উপর উঠে এল এবং সকলে রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ছে। আবেগে উত্তেজনায় জাহাজিরা বন্দরের সকল ঘাস-মাটি-ফুলকে ভালবাসার কথা জানাল।

বন্দরের প্রথম দিন এবং রবিবার। জাহাজিদের ছুটির দিন। ওরা হইহই করে আকাশ পরিষ্কার হলেই নেমে যাবে। শুধু তুষারঝড়ের জন্য ওরা বিরক্ত। জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্ট-হোলে বারংবার হাত রেখে ঝড়ের সঙ্গে তুষারকণা পরখ করছিল। মনে হচ্ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাস ক্রমশ কমে যাবে, যেন ওর ইচ্ছা এই ঠান্ডা বাতাস থেমে গেলেই সে তাঁর প্রিয় তামাকের পাইপটি মুখে পুরে যুবতীর সন্ধানে বের হয়ে পড়বে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ আয়নায় মুখ দেখল। ভয়ংকর মুখ অবনীভূষণের, কালো নিগ্রো-সুলভ চেহারা। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু জাহাজি অবনীভূষণকে বাঙালি বলে চেনাই যায় না। অবনীভূষণ শক্ত মানুষ। অবনীভূষণ লম্বা আর অবনীভূষণের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। অবনীভূষণ মাকে দেখেছে, বাবাকে দেখেনি। 'অবনীভূষণ জারজ'—আয়নায় মুখ দেখার সময় পাঁচ নম্বর সাব কথাটা আয়নার প্রতিবিম্বকে উদ্দেশ করে উচ্চারণ করল। এত দীর্ঘ ঋজু চেহারা অবনীভূষণের, আর এত বড় চোখ এবং মুখ অবনীভূষণের,

আর এত লম্বা থাবা অবনীভূষণের যে যুবতীরা কোনও বন্দরেই অবনীভূষণকে পছন্দ করে না।

ডেক-এ সামান্য কাজ অবনীভূষণের। ফরোয়ার্ড-ডেকে দু' নম্বর মাস্টের নীচে উইনচ-মেশিনের লিভার প্লেট আলগা হয়ে গেছে, ওটা সারতে হবে। রবিবার তবু ওকে এই সামান্য কাজটুকু করতে হবে। বয়লার স্যুট পরে অবনীভূষণ ডেক-এ বের হয়ে গেল। চারিদিকে পাহাড়। তুষারঝড় কমে গেছে বলে আকাশ পরিচ্ছন্ন, লেগুনের জল সামান্য সবুজ রঙের, আর দুরে দুরে সব পাহাড় ক্রমশ উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে সব পরিচ্ছন্ন লাল নীল কাঠের রং-বেরঙের বাড়ি, ইতস্তত বড় বড় প্রাসাদ এবং ঠিক সেতুর অন্য পাড়ে বড বড় কিছু স্কাইস্ক্র্যাপার। লেগুনের দু' পারেই শহর। ঠিক লৌহ আকরিকের গুদামখানার বিপরীত দিকের সেতুর ব্যালকনিতে অবনীভূষণ মানুষের ভিড় দেখল। সূর্য আলো দিচ্ছে সামান্য। খুব নিষ্প্রভ এই আলো কোনও উত্তাপ সৃষ্টি করতে পাবছে না। অবনীভূষণ লেদার জ্যাকেটের ভিতরও হু হু করে শীতে কাঁপছিল। সামান্য উত্তাপের জন্য পাঁচ নম্বরকে খুবই কাতর মনে হচ্ছে।

অবনীভূষণ হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে নিজের বাংকে শুয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো কিছু নগ্ন ছবির উপর চোখ রাখতেই শুনতে পেল এলিওয়েতে কে বা কারা যেন পায়চারি করছে। মেজ-মালোমের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি খুব দ্রুত এবং জোরে হাসছেন। বোধহয় খুব সকাল-সকাল তিনি যুবতী সন্ধানের জন্য বের হয়ে পড়ছেন। অবনীভূষণেরও ইচ্ছা হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে, যখন পোর্ট-হোল দিয়ে অন্য তীরে তিমি শিকারের জাহাজ ভিড়তে দেখা যাচ্ছে, যখন দূরে কোথাও এক তৈলবাহী জাহাজ বাঁধা হচ্ছিল, যখন আর কিছু হাতের সামনে করণীয় নেই অথবা 'ট্যানি টরেন্টো' 'ট্যানি টরেন্টো' এই এক বিশ্রী শব্দ কানের কাছে ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে, তখন মেজ-মালোমের মতো টিউলিপ গাছের নীচে যুবতী সন্ধানে বের হয়ে পড়াই ভাল। এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবনীভূষণ জাহাজ থেকে সকাল-সকাল নেমে যেতে পারল না। সে রাতের জন্য অপেক্ষা করল। কারণ দিনের বেলায় এই চেহারা বড় ভয়ংকর। রাতের বেলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে অথবা নিয়ন আলোর ভিতর, ফেল্ট ক্যাপের ভিতর আর বৃহৎ ওভারকোটের জন্য সামান্য মানুষের মতো মনে হয় ওকে। সুতরাং হাত পা শক্ত করে সে বাংকেই পড়ে থাকল। শরীরের ভিতর ভয়ংকর কষ্ট এবং উত্তেজনা। বন্দরে এলেই কষ্টটা বাড়ে। বন্দর ধরলেই এইসব জাহাজিরা অমানুষের মতো চোখ-মুখ করে ঘোরাফেরা করতে থাকে, কী যেন এক সোনার আপেল ওদের হারিয়ে গেছে, সেই আপেলের জন্য, সেই সোনার হরিণের জন্য ওরা সবসময় মাটি পেলেই দ্রুত ছুটতে চায়। অবনীভূষণ দ্রুত ছুটতে চাইল।

সন্ধ্যার সময় জাহাজের স্টারবোর্ড-সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে গেল সে। সেখানে প্রিয় বন্ধু ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস উইলিয়াম উড থাকেন। সে দরজায় কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকে বলল, এ কী? তুমি এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ! বের হবে না?

উড বলল, ভয়ংকর ঠান্ডা।

অবনীভূষণ বলল, অন্তত সিম্যান মিশানে চলো। সেখানে জুটে যেতে পারে।

সুতরাং ওরা উভয়ে সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ংকর বড় বেঢপ জুতো পায়ে অবনীভূষণ গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজ-মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ-মালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে (বয়সে চল্লিশের মুখোমুখি) নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালি ব্লাউজের উপর ফারের লম্বা মতো কোট গায়ে। ওর কোমরে মেজ-মালোমের হাত। যেন চুরি করে তিনি এক যুবতীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছেন। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। তীক্ষ্ণ শীতের ভিতর এই সামান্য উত্তাপটুকু অবনীভূষণকে অস্থির করে তুলল। মেজ-মালোমকে সে 'গুড ইভনিং সেকেন্ড' বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। জেটির উপর দিয়ে ক্রেনের নীচে লম্বা লম্বা পা ফেলে উডের সঙ্গে হাঁটছে।

গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, আর কিছুদিন গেলে এখানে হয়তো তুষারপাত হবে। অথবা তুষার পড়ার আগে শীত মাটিতে শেষ কামড় বসাচ্ছে। বাগানের আপেল গাছগুলোকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, চেরিফলের গাছগুলো মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সব অপরিচিত গাছ-গাছালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে বলে কোনও গাছই চেনা যাচ্ছে না, ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে, পাইন হতে

শহর, এমনকী বার্চ গাছও হতে পারে। এই শীতে পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় কাচের জানলার ভিতর পরিবারের যুবক-যুবতীদের মুখ, অ্যাকর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য কোনও লোকসংগীত অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে। ইতস্তত দু'পাশে বার এবং পাব-এর পর সেই সব কার্নিভাল। সদর দরজার উপর একটা লোক হাঙরের মুখোশ পরে নানাভাবে জাহাজিদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে। ওরা কার্নিভালে ঢুকল না। ওরা ক্রমশ পাহাড়ের উতরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর ওরা দেখল, হরেক রকমের রমণীরা মুখে ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে, স্থানীয় কোনও উৎসব হবে হয়তো, মেয়েরা মাথায় রুমাল বেঁধে শহরের বড় কবরখানার দিকে হাঁটছে। অবনীভূষণের এ সময় ইচ্ছা হচ্ছিল ওর বড় থাবা দিয়ে ঠিক একটি পাখি ধরার মতো কোনও যুবতীকে ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলতে।

ভোরের তুষারঝড়ের চিহ্ন এখনও এইসব পাহাড়ে এবং ছবির মতো বাড়িগুলোর মাথায় লেগে আছে। কোথাও দেখল, কাচের ঘরে সুন্দরী যুবতী পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর দু'পাশে হরেক রকমের দৃশ্য এবং অবনীভূষণ এখন উন্মাদ, সে হন্যে হয়ে যুবতী সন্ধান করছে। এইসব জাহাজিদের আনন্দ দানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অশালীন পোশাকে নানা বয়সের যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে। ওরা এক-এক করে সকলে নাচের আসরে নেমে পড়ছে। স্টেজের উপর একদল লোক কালো পোশাক পরে ব্যান্ড বাজাচ্ছে। ইগল পাখির মতো মুখওয়ালা বাঁশির শব্দ বীভৎস এবং উৎকট মনে হচ্ছিল। পাশের কাউন্টার কাচ দিয়ে মোড়া, সেখানে মেয়েরা মদ বিক্রি করছে। জাহাজিরা কিউ দিয়ে মদ গিলছিল। অবনীভূষণ এবং উড উভয়ে মদ খেল এক গ্লাস করে। ওদের পার্টনার নেই, বিশেষ করে অবনীভূষণ এইসব নাচ এতদিনেও রপ্ত করতে পারেনি। সুতরাং অবনীভূষণ আর-এক গ্লাস মদ নিয়ে পাশের সোফাতে বসে মাংসের পুরের সঙ্গে মদটুকু খেয়ে ফেলল। বাকি মাংসের পুরটুকু সে চেখে চেখে চেটে চেটে খাচ্ছিল আর রমণীরা এই যে নেচে চলেছে, এই যে সুন্দর শরীর এবং উটের মতো মুখটি তুলে নেচে বেড়াচ্ছে, এই যে রমণীরা ঘোড়ার মতো পা ফেলে এক দুই করে সামনে পিছনে পিছনে সামনে যাচ্ছে আসছে, তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ছিল। ফলে অবনীভূষণ ল্যালা-খ্যাপার মতো চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে সহসা আবিষ্কারের মতো দেখে ফেলল দুই সুন্দরী যুবতী যেখানে মদের কাউন্টার ঠিক তার বিপরীত দিকের টেবিলে বসে উল বুনছে। অবনীভূষণ মুখ নিচু করে চুপি চুপি উডের হাত ধরে ওদের দিকে গিয়ে সরে বসল। তারপর চোখ-মুখ টান টান করে বলল, গুড ইভনিং ম্যাডাম এবং পাশে বসে পরিচিত হবার ভঙ্গিতে বলল, এম ভি সিটি অফ গ্লাসগো। সে তার জাহাজের নাম বলল ওদের।

মেয়ে দু'জন ওকে স্বাগত জানালে সে কাউন্টারে আবার মদের অর্ডার দিয়ে বলল, ছবির মতো এই শহর।

মেয়ে দু'জনকে ভিন্ন ভিন্ন অলীক স্বপ্নের কথা বলে অথবা সমুদ্রের গল্প বলে ভেজাতে চাইল।

অবনীভূষণ দামি সিগারেট বের করে ওদের একটি করে দিতেই ওরা এসে ওর ঘাড়ের উপর পড়ার মতো ভান করল, সো নাইস!

কোনও অলৌকিক ঘটনার মতো অবনীভূষণের সিগার কেস, সিগারেট কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওরা।

অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়েটিকে বলল, ইউ লাইক ইট?

বলে সে ওর সম্মতির অপেক্ষা করল না, সে চুল-সোনা মেয়ের হাতে যৌতুকের মতো সিগারেট কেস তুলে ধরার সময়ই কাচের জানালায় মুখ বার করে পাহাড়ের উতরাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলো দেখল। আকাশ পরিচ্ছন্ন বলে, পথঘাট শুকনো বলে, পার্কের টেবিল বেঞ্চে এখন সব যুবক-যুবতীরা বসে নিশ্চয়ই গল্প করছে। অবনীভূষণ এবার উডের দিকে তাকাল, উড তন্ময় হয়ে নাচ দেখছে। সে অবনীভূষণ অথবা চুল-সোনা মেয়েকে লক্ষ করছে না। সুতরাং অবনীভূষণ উডকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, চল এবার উঠি। প্রায় ঠিক করে ফেলেছি।

এবার অবনীভূষণ যুবতী দু'জনকে উদ্দেশ করে বলল, চলুন অন্য কোথাও।

যুবতী দু'জন পরস্পর মুখ দেখল। তখন ব্যান্ড বাজছে উঁচু পর্দায়, তখন সার্কাসের ঘোড়ার মতো পা ফেলে এই নাচের ভিতরই কেউ কেউ বেলেল্লাপনা করছিল। নাচতে নাচতে কোনও এক ফাঁকে দেয়ালের পাশে অথবা সামান্য অন্ধকারের ভিতর পরস্পর পরস্পরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গির

ছবি। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। যুবতীরা সব উটের মতো মুখ তুলে কেবল চুমু খাচ্ছে, কেবল সার্কাসের হাতির মতো পা মুড়ে বসে পড়তে চাইছে। অবনীভূষণ আবার বলল, চলুন কোথাও।

অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়ের হাতে নরম চাপ দিল।

ব্যান্ড বাজছে, হরদম বাজছে। সামনের কাউন্টারে ফের দু'-একজন করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছে। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর-সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দু'জন নাবিককে হারিয়েছে, এমন গল্পও করল। ওরা গল্প করার সময় পাশের হিটার থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল এবং গর্ভিণী তিমির প্রসব সম্পর্কে রসিকতা করছিল।

ভিড় কাচঘরে ক্রমশ বাড়ছে। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর এবং মৃত বৃক্ষের মতো কিছু পাইন গাছ, তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু লম্বা এক হারপুনার হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাচঘর অতিক্রম করে কাউন্টারের সামনের লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কী বলছে অবনীভূষণ সব লক্ষ করছিল। আগের দলটা এতক্ষণ হইচই করছিল মদ খেতে খেতে, কিন্তু হেই উঁচু লম্বা হারপুনারকে দেখে ওরা শিশু সন্তানের মতো হয়ে গেল। আর তখন কে বা কারা যেন সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে—ট্যানি টরেন্টো... ট্যানি টরেন্টো... আমাদের বন্ধুবর হারপুনার এবার উত্তর-সাগর থেকে গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে।

উঁচু লম্বা লোকটার টেবিলে সকলে এক এক করে গোল হয়ে বসে গেল। সেই যুবতী দু'জন পর্যন্ত উঠে যেতে চাইল। অবনীভূষণ কিছুতেই আব স্থির থাকতে পারছে না। সে এবার বিদ্রূপ করে বলতে চাইল, হ্যাঁ গো সতীর দল, তোমরা আমাদের ফেলে যাচ্ছ! সে বিরক্ত হয়ে এবার উডকে বলল, উড, তুমি তো বলতে পারো বুঝিয়ে। তোমার সুন্দর মুখ দেখে...।

উডের কথা যুবতী দু'জন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শুনল। ওরা চুল ঘাড়ে ফেলে উলের কাঁটা ব্যাগের ভিতর ভরে সেই চৌকোমুখ এবং গামবুট-পরা ভদ্রলোক, যে গর্ভিণী তিমি শিকার করে এইমাত্র উত্তর-সাগর থেকে ফিরেছে, তার টেবিলের দিকে হাঁটতে থাকল। অবনীভূষণ মদ খেয়েছে। ওর শরীর সামান্য টলছিল। অবনীভূষণেব ভিতবে ভিতরে এক অপরিসীম তৃষ্ণা, সে পাগলের মতো চুল-সোনা মেয়ের হাত ধরে ফেলল। কারণ সে যেন সেই চৌকোমুখ হারপুনার, মাথায় যার হাঙরের হাড়ের টুপি, যে বিশ্রী এবং যে ওখানে বসে কটু গন্ধের তামাক টানছে, যার চেহারা দেখলে মনে হয় মেয়েমানুষ সামান্য বস্তু, তার দৃষ্টি একেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। সে রাগে-দুঃখে চুল-সোনা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে, হারপুনার ব্যক্তিটি ও তার দলবল লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সামনে পথ আগলে দিলে। অবনীভূষণ ক্ষিপ্ত এক জানোয়ারের মতো গর গর করে উঠল। মনে হল সেই দলবল অবনীভূষণকে এলোপাথাড়ি মেরে যাচ্ছে।

বাইরে সাদা আলোর ভিতর নাক মুছতে গিয়ে অবনীভূষণ দেখল সামান্য রক্ত নাকের ডগায় জমাট বেঁধে আছে। ভিতরে তখন সেই যুবতী হারপুনারের সঙ্গে রসিকতা করছিল এবং হাসছিল। কাচের ভিতরে সব স্পষ্ট। সুতরাং অবনীভূষণ আর সহ্য করতে পারছে না। সে ফের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে উড হাত চেপে ধবে বলল, অবনী, তুমি বেশ জোরে হারপুনারকে মেরেছ। লোকটা পেটে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গল গল করে মদ বমি করছে।

অবনীভূষণের ঝুটঝামেলা করার আর ইচ্ছা থাকল না। এবং এখানে আর যুবতী অনুসন্ধান করা নিরর্থক ভেবে ওরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সেতুর দুই পাশে, লোহালক্কড়ের কারখানার দেওয়ালের ছায়ায় এবং যেখানে সব তিমি মাছের চর্বি সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় পিপের সারি সেইসব অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে একসময় শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে গেল।

অবনীভূষণ চড়াই-উতরাইয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় উডকে উদ্দেশ করে বলল, আজ এই শীতে সতীর দল গেল কোথায়?

তখন উড সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলল, ওই দ্যাখো অবনী, লাইট-পোস্টের নীচে যেন দু'জন মেয়ে শিস দিচ্ছে।—বলে উড দূরের লাইট-পোস্টের দিকে হাত তুলে নির্দেশ করল।

অবনীভূষণ বলল, চলো তবে।

শীতের রাত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনীভূষণের মনে হল ওরা শীতে জমে যাবে ক্রমশ। মনে হল

ওরা যুবতী দু'জনকে বেশিদূর আর অনুসরণ করতে পারবে না। অথবা মেয়ে দু'জন এই শীতের রাতে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, দূরে দূরে সব পুলিশের বুটের শব্দ এবং ট্রলি বাসের আলো আর পথে পড়ছে না, শহর ক্রমশ যেন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে। উড পর্যন্ত জোরে হাঁটতে পারছিল না।

একসময় ওরা এবং যুবতী দু'জন শো-কেসের সামনে মুখোমুখি পড়ে যেতেই উড ঝুঁকে বলল, আস্তানা কত দূর?

দু'জন বলল, সরি।

বোধহয় অবনীভূষণের লম্বা চেহারা এবং হাতের বড় বড় থাবা ওদের আতঙ্কিত করেছে।

অবনীভূষণ বলল, সামান্য সময়।

যুবতীরা শক্ত হয়ে গেল। বলল, না। ওরা বরং উডকে সঙ্গে নিতে চাইল।

উড বলল আমরা দু'জন। একা যেতে পারি না।

অবনীভূষণ এবার মরিয়া হয়ে বলল, মেয়ে, এই লম্বা কোটের পকেটে করে নিয়ে যাব তবে কেউ টেরটি পাবে না।

তারপর অবনীভূষণ চারিদিকে তাকাল যেন যথার্থই সে এই দুই যুবতীকে পকেটে পুরে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।

এবার যথার্থই ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ার জন্য ছোট সরু গলি অতিক্রম করে নেমে যেতে চাইল। পথ আগলে অবনীভূষণ তার দুই হাতের বড় থাবা দেখাল। সে হাতদুটো অঞ্জলির মতো করে রাখল, তৃষ্ণার জল আর কে দেবে? সে যেন বলতে চাইল কথাটা। এবং সে এই নিঃসঙ্গ রাতের আঁধারে উচ্চস্বরে সেই ট্যানি টরেন্টো, ট্যানি টরেন্টো শব্দের মতো চিৎকার করে নগরীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে শোনাতে চাইল, হায় অবনীভূষণ, এই তৃষ্ণার জল তোমাকে আর কে দেবে।

তারপর অবনীভূষণ সেই যুবতী দু'জনকে উদ্দেশ করে যেন বলল, আমি তোমাদের সব দেব, তোমরা আমাকে সামান্য স্পর্শ দাও। সামান্য উত্তাপ দাও।

ওরা উত্তর করল না। বড় রাস্তার উজ্জ্বল আলোর নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর অবনীভূষণ শুনতে পেল সেই আগের মতো দূরে কারা যেন হেঁকে যাচ্ছে, ট্যানি টরেন্টো ট্যানি টরেন্টো উত্তর সাগর থেকে এক হারপুনার এক গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে। অবনীভূষণ দুর্গের পাশে পাশে হেঁটে গেল। সর্বত্র যেন সেই একই ট্যানি টরেন্টো, ট্যানি টরেন্টো শব্দ। সে দু কান চেপে শীতের ঠান্ডায় ট্যাক্সির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে নিজের জাহাজের নাম, ডকের নাম বলে শরীর এলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল হাতে পায়ে বড় ব্যথা, সে ঘাড় নাড়তে পারছে না, পরাজিত এক সৈনিকের মতো গ্লানিতে ডুবে গেল।

গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন পাঁচ নম্বর সাব এবং এক অ্যাপ্রেন্টিস উড হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙছে। ওরা ফেরার পথে প্রচুর মদ গিলেছে ওরা সিঁড়ি ধরে সোজা হেঁটে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং কোয়ার্টার মাস্টার ওদের দু'জনকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন।

উড স্টারবোর্ড-সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

অবনীভূষণ বালকেডে ভর করে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল। স্তিমিত আলো এলিওয়েতে। সে বড়-মিস্ত্রি এবং মেজ-মিস্ত্রির কেবিন পিছনে ফেলে যেতেই মনে হল পায়ের সঙ্গে কী যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। সে যত পা আলগা করতে চাইছে ততই পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এবার নুয়ে পায়ের নীচে হাত দিয়ে দেখল একটা কালো রঙের গাউন। সে আলোর ভিতর নাকের কাছে সেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলগা করে ঘ্রাণ নেবার সময় দেখল সামনে মেজ-মালোমের কেবিন, কেবিনের দরজা খোলা, মেজ মালোম বাংকে উপুড় হয়ে মরার মতো পড়ে আছেন। ঘরে সেই বিকেলের যুবতী নেই। মেজ-মালোম এক হাতে কোনওরকমে প্যান্টটা কোমর পর্যন্ত তুলে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন। অবনীভূষণ বলল— শালা মদ খেয়েছে।

রাগে গাউনটা দরজা দিয়ে মেজ-মালোমের মুখের উপর ফেলে দিল। মেজ মালোমের এখন মুখ ঢাকা

এবং শরীর প্রায় উলঙ্গ। সে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মেজ-মালোমের কেবিন। তারপর ইঞ্জিন-ঘরের সিঁড়ির মুখে নিজের কেবিনের দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল ভিতর থেকে কে যেন বন্ধ করে রেখেছে। সে রাগে দুঃখে অপমানে দরজার উপর ভীষণ জোরে লাথি মারল। দরজা খুলছে না। সে তার অবসন্ন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে বলল, বাস্টার্ড। সে গাল দিল, সোয়াইন। সে তারপর বাংলা ভাষায় খিস্তি করে ভিতরে ঢুকে বিস্মিত! সে চোখ গোল গোল করে দেখল, সেই বিকেলের যুবতী ওর বাংকে আশ্রয় নিয়েছে। এবং অসহায় বালিকার মতো চোখ। যুবতীকে এখন বুনো কাকের মতো শীর্ণ মনে হচ্ছে অথবা গর্ভিণী শালিখের মতো রোঁয়া ওঠা। সে কী করবে ভেবে পেল না। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে বলল, কী গো, একেবারে বাঘের মুখে!

যুবতী কিছু বলল না। চোখে-মুখে ভয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। যেন এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, সব হয়ে গেছে, হয়ে যাবে ভাব। ঝড় এবং জীবনের আর্তনাদ কোথাও থেমে থাকছে না। যুবতী তবু ধীরে ধীরে বাংক ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বলল, সরি মিস্টার।

সে তার শীর্ণ হাত বালিশের উপর রেখে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল।

অবনীভূষণ যুবতীটিকে পড়ে যেতে দেখেই বুঝল, সেই বিকেল থেকে বাঁদরের হাড় চুষে চুষে যুবতীর এক কঠিন অসুখ, এক কঠিন স্থবির অসুখ, যা এতক্ষণ অবনীভূষণকে এই শহবময়, নগরময় এবং দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বারংবার ঘুরিয়ে মারছে। অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি যুবতীকে ধরে ফেলল। না হলে বাংক থেকে যেন পড়ে যেত মেয়েটি, হাত-পা কেটে মাথায় আঘাত লাগতে পারত। যুবতীর পড়ে যাবার মুখে কম্বলটা শরীর থেকে সরে গিয়েছিল। অবনীভূষণ দেখল আঁচড়ে-কামড়ে যুবতীর শরীর মেজ-মালোম ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। লজ্জা নিবারণের জন্য অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি ফের কম্বলটা শরীরে তুলে দিল এবং শুয়ে পড়তে বলে ঘড়িতে সময় দেখল—একটা বেজে গেছে, এখন ওকে সামান্য শুশ্রূষা করলে সামান্য সময়ের জন্য এই বন্দর শুভ-বার্তা বহন করবে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ দরজা ভেজিয়ে চিফ কুকের গ্যালি পর্যন্ত হেঁটে গেল। নেশার ঘোর কী করে যেন একেবারে কেটে গেছে এবং ভিতরের সব হতাশা ক্রমশ নিরাময় হচ্ছিল। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। সে গরম জল করে যুবতীর শরীর ভাল করে ধুয়ে সামান্য শুশ্রূষার পর বলল, আমার জন্য সামান্য খাবার আছে। ইচ্ছা করলে আমরা দু'জনে ভাগ করে খেতে পারি।

যুবতী কষ্ট করে হাসল।

আপনি আমাকে বরং একটু সাহায্য করুন।

অবনীভূষণ বলল, কী করতে হবে?

সেকেন্ড অফিসারের ঘর থেকে দয়া করে আমার পোশাকটা এনে দিন।

অবনীভূষণ মেজ-মালোমের ঘর থেকে পোশাকটা এনে দিলে মেয়েটি বলল, আমাকে দয়া করে বন্দরে নামিয়ে দিন। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে আমি ঘরে চলে যেতে পারব।

বেশ চলুন। —বলে তুলে ধরতেই মনে হল যুবতীর মাথা ঘুরে গেছে। সে বসে পড়ল।

আপনি বন্দরের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হতে পারবেন না। বরং এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

আমার ভয় করছে মিস্টার, সে আবার আসতে পারে।

অত্যন্ত কাতর চোখে অবনীভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

আপনি ঘুমোন, আমি বরং দরজায় পাহারা দিচ্ছি।

যুবতী আর কথা বলতে পারল না। চোখ জলে ভার হয়ে গেছে।

আর অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘদিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন।

বলে অবনীভূষণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ংকর ঠান্ডার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতিঘর দ্বীপে, সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল, তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মানিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই। সুতরাং সে উঠল না এবং এই দুঃখকর রাত্রি জীবনের প্রথম আলোর পথ বলে মনে হল অবনীভূষণের।

বিজন

সমুদ্রে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথম ইলশেগুঁড়ি, তারপরে জোরে। জোরে বৃষ্টি নামল। মাস্তুলের গা বেয়ে বৃষ্টি ডেক ভিজাল। এখন ফলকা ভিজছে। গ্যালির ছাদ থেকে ব্রিজের ছাদ, চার্টরুমের ছাদ সব ভিজছে। ধোঁয়াশা-ঘন ভাব বৃষ্টির। সেলিম ফোকশালে কাশছে। বৃষ্টি, সমুদ্র এবং জাহাজ সেলিমের বুকের যন্ত্রণায় কাতর হল না। বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে। সমুদ্রে তরঙ্গ। জাহাজ নীল জলে নোনা রঙে সাঁতার কাটছে। ফোকশাল যখন খালি, বাংকে যখন কেউ নেই, জাহাজিরা যখন ডেক-এ দড়িদড়া টানছে, তখন কম্বলের নীচে শুয়ে বিড়ি ধরানো যাক। সে বিড়ি ধরাল এবং কম্বলের নীচে বিড়ির ধোঁয়াকে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর কম্বলটা দিয়ে গোটা ধোঁয়াকে চেপে ধরে দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। কেউ সিঁড়ি ধরে নামছে না। সে নিশ্চিন্ত হল। অথচ পোর্ট-হোলের কাচে সমুদ্র এবং আকাশের প্রতিবিম্ব। সেলিম কাচে নিজের প্রতিবিম্বও দেখল। চোখদুটো ওর পালক ওঠা মুরগির মতো। চোখদুটো পোর্ট হোলের কাচে আকাশ এবং সমুদ্রের মতো স্বচ্ছ হতে পারেনি। সাদাটে অথবা বরফ-ঘরের চার-পাঁচ মাসের বাসি গোস্তের মতো। সেলিম কাশির সঙ্গে রক্তের দলাটা কোঁত করে করে গিলে ফেলল এবার।

দুপুর থেকে শুনে আসছে উপকূল দেখা যাচ্ছে। সকলে ডেক-এ চিৎকার করছে, কিনারা দেখা যাচ্ছে। সকলে উপরে হল্লা করছে। সেলিম কোনওরকমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল, সেও মাটি দেখবে, মাটি দেখে উত্তেজিত হবে, কিন্তু সিঁড়ির মুখেই সারেঙের ধমক, কোথায় যাচ্ছ মিঞা! মরণের দাওয়াই প্রাণে বাঁধতে চাও? সেলিম ভয়ে ফের ফোকশালে নেমে এসেছিল। সে বাংকে শুয়ে সব যেন ধরতে পারছে, যেন কিছু সমুদ্রপাখি ফলকায় বসে ভিজছে। পাখিরা ফলকায় একদা বসতের মতো আশ্রয় নিয়েছে। উপকূল দেখে অথবা দ্বীপ দেখে ওরা উড়ছে। এমত ভেবে সেলিম কাশল। সমুদ্রপাখিরা হয়তো এতক্ষণে উড়ে গেছে। ওর জানার ইচ্ছা হল ওরা আকাশে উড়ছে, না দ্বীপের পাশাপাশি কোথাও উড়ছে। আর কেন জানি এইসময় বারবার ওর বিবির কথা মনে হচ্ছে। বিবির মুখে সুখের ইচ্ছা, শখের ইচ্ছা। সেলিমের শরীরে যন্ত্রণা, বুকে যন্ত্রণা। সে যেন বলতে চাইল, এবার আমরা ফিরব, বিবি। ছোট ঘরে তুই তোর খসমের মুখ দেখবি। জাহাজ এবং সমুদ্র উভয়ই আমাদের বিনাশ করতে পারেনি। আমি ফিরব, ফিরব। আমরা ফিরব। খতে এমন একটা প্রত্যয়ের কথা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে সেলিমের।

দীর্ঘ সফর, নোনা পানির অশ্লীল একঘেয়েমি এতদিন ওকে দেশে ফেরার জন্য মাতাল করতে পারেনি। সেলিম ওয়াচ করেছে, ফোকশালে এসে শুয়েছে, হাত-পা ছড়িয়ে, অশ্লীল চিন্তা করতে করতে সমুদ্রের বুকে ঘুম দিয়েছে, অথবা হিসাবের কড়ি গুনে, সফর শেষ হতে কত দেরি, এইসব ভেবে স্থান-কাল-পাত্রের কিংবা বন্দরের বেশ্যামেয়ের হিসাবের কড়ি গুনেছে। গুনতে গুনতে ওর একদিন কাশি উঠল। এবং এই করে জ্বর। বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে জ্বর বেড়েছে। শরীর ভেঙেছে। এক বন্দরে কাপ্তানের কাছে আর্জি পেশ করেছে, সাব, একবার হাসপাতালে যাব। কাশির দমকে আর বাঁচছি না। মনে হচ্ছে, মরে যাব।

এই নিয়ে অন্য ফোকশালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, এ বন্দর নিয়ে পাঁচ বন্দর হবে অথচ সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সেই কবে ফ্রি-ম্যান্টেল বন্দরে ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল, আর নয়, আর জাহাজে রাখা চলবে না। বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ অবস্থায় জাহাজে রাখা নিরাপদ নয়।

সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সে কাশছে। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলেই কোঁত করে ঢোক গিলছে। কিছুদিন থেকে এটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সে সকলকে বলছে, কাশির ব্যামোটা তেমন নয়, ওটা ছেড়ে যাবে। কোম্পানি দামি দামি ওষুধ দিচ্ছে। দিচ্ছে বলেই এবং বাড়িওয়ালা গা করছে না দেখে সেও বুঝেছে ওটা ধীরে ধীরে সেরে যাবে। কাশি যখন বেশি হয় তখন সেলিম অপরাধের কথা ভাবে, নিজের অপরাধের কথা। বিবিকে নিয়ে অথবা বন্দরে দেখা কোনও মেয়েকে নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকে অশ্লীল ধারণায় অথবা অশ্লীল আবেগ মেখে শরীরে উত্তাপ সঞ্চারের বৃথা চেষ্টা না করলেই হত। অথচ রক্ত কম উঠলে ওষুধে কাজ করছে এমত ভেবে সে খুশি হয়। ওর ইচ্ছা ওর কঠিন রোগের কথা কেউ না জানুক, কেউ না ভাবুক সে বিচ্ছিরি রোগে ভুগে মরে যাবে। অথচ প্রত্যয়ের ঘোরে এই ভেবে খুশি সে ঘরে ফিরবেই। বিবি তার খসমের মুখ দেখে উজ্জ্বল হবেই। এ শরীর সে কিছুতেই সমুদ্রে অথবা বিদেশ-বন্দরে রেখে যেতে চাইছে না। সে সকলকে শুধু জিজ্ঞেস করছে, জাহাজ কবে ফিরবে? কবে আমরা ঘরের বন্দর পাব?

জাহাজিরা কেউ বলেছে, সিডনি থেকে পুরানো লোহা নিয়ে জাহাজ যাবে জাপানে।

কেউ বলেছে, গম নিয়ে তেলবাড়ি।

সেলিম এইসব খবরে বিষণ্ণ হয়েছে। খুব অসহায় ভঙ্গিতে পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দিগন্তরেখায় নিজের দেশকে খুঁজেছে। কখনও অপলক সমুদ্র দেখেছে। জলের নীল বিস্তৃতি দেখেছে।

সেলিম স্থির করল কাপ্তানকে শেষবারের মতো বলবে, আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন, মাস্টার। ঘরে ফিরে আমি বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। জাহাজে আমি মরব না। সমুদ্রে আমি মরব না। বিদেশ-বন্দরে আমি মরব না।

শুয়ে শুয়ে সেলিম এইসব ভেবে উত্তেজিত হতে থাকল।

তখন সিঁড়িতে শিস দিচ্ছে বিজন। সেলিম শুয়ে শুয়ে শুনছে। এ কেবিন সে কেবিন সে উঁকি মারল। ইঞ্জিন-পরিদাররা ঘুমোচ্ছে। ইঞ্জিন-পরিদাররা (যারা চারটা-আটটার পরিদার) গল্প করছে। বিজন লক্ষ করল শিস দিতে দিতে, সতেরো মাস সফর ওদের ক্লান্ত করতে পারেনি। বিষণ্ণ করতে পারেনি। জাহাজটা আরও যদি সতেরো মাস সমুদ্রের নোনা জল ভাঙে, যদি আরও সতেরো মাস বন্দরে না ভিড়ায়, তবু নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে জাহাজ চালিয়ে যাবে। বিজন দ্বিতীয় সিঁড়ির মুখেই শুনল, সেলিম কাশছে। কাশির জন্য দম নিতে পারছে না। বিজন আর শিস দিল না। প্রতিদিনের মতো সে ফের সেলিমের জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সে ফোকশালে ঢুকে বলল, এবার কাপ্তান সাহেবকে বল হাসপাতালে দিতে। এভাবে আর কতদিন বাংকে পড়ে থাকবি। রাতে জাহাজ বন্দর ধরবে।

সেলিম মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরাল। চোখদুটোতে নোনা পানি অথবা আকাশের রং নয়, কালো রং নয়, অথবা বেতফলের মতো রংও নয়, অথচ আশ্চর্য এক রং ধরেছে যা দেখলে সকলের ভয় হবে। এবং মায়া হবে। সকলের মনে হবে, সেলিম রহমানে রহিম হওয়ার জন্য শরীর স্থির করতে চাইছে। এবং বাংকের সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন অদৃশ্য হতে চাইছে।

বিজন বলল, বলিস তো আমরা সকলে মাস্তার দি। সারেংকে বলি মাস্তার দিতে। এভাবে আর কতদিন ভুগবি? জ্বর কাশি ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

সেলিম সহসা উঠে বসল। তারপর আশ্চর্যরকমের স্নিগ্ধ এবং করুণাঘন মুখ করে হাসল। তারপর ফের আক্ষেপ করার মতো বলল, বিজন রে, তোর মতো যদি একটু ইংরেজি বুলি জানতাম, তবে আমার সব হত। সারেং আর কাপ্তান কী বুদ্ধিই করেছে খোদাই জানে। তুই সকলকে বলে-কয়ে মাস্তার দে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে বাঁচি।

বিজন এই বাংকে বসে কী করে যেন বুঝল সেলিমের রোগ নিয়ে জাহাজে ষড়যন্ত্র চলেছে। সে ভেবে অবাক হল, কেন সে সারেংকে বলল না, ওকে এবার অন্য ঘরে রাখতে হবে আর অন্য উপায় নেই, অথবা কেন যে সে মেজ-মালোমকে ডেকে একবার চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা বলতে পারেনি এতদিন! সেও আজ পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্র দেখল। তারপর উপকূল। উপকূলে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। সেলিমের মুখ পাণ্ডুর। জাহাজটা চলছে এবং সেলিমের শরীর নড়ছে। সেলিমকে দেখলে আত্মহননের কথা মনে হয়। বিজন বাংক থেকে ওঠার সময় সেলিমকে ফের লক্ষ করল। ওর কম্বলের ভেতর থেকে

... বের হচ্ছে। সে হাসল। সেলিমও হাসল। ওরা পরস্পর দুঃখটুকু ধরতে পেরে ফের দু'জনেই ...মনস্ক হতে চাইল। বিজন দরজা ধরে বের হচ্ছে। সারেঙের ঘরে উঁকি মেরে সে দেখল, তিনি নেই। ...কশালে নেই। নিশ্চয়ই মেজ-মালোমের কেবিনে অথবা ফরোয়ার্ড-পিকে আছেন। বিজন ডেকের ... দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল।

...ন্দরে জাহাজ ভিড়বে বলে সারেং ডেক-কশপের কাছ থেকে দড়িদড়া সব বুঝে নিচ্ছে। বিজন ... অতিক্রম করে কশপের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একবার দাঁড়াল। বড়-মালোমের পোর্ট-হোলে ... দিল। বড়-মালোম কেবিনে নেই। বিজনের ইচ্ছা হল বড়-মালোমকে বলতে, আপনার জাহাজে ... একটা কঠিন রোগ পুষে রাখছেন, সেলিমকে হাসপাতালে দেওয়া হবে না, দেশে পাঠানো হবে ... কোম্পানির টাকা বাঁচানো হবে, অন্যান্য জাহাজিরা পর্যন্ত নিরাপদ নয়—এমতাবস্থায়ও আপনারা ... করে মদ গিলতে পারছেন: আশ্চর্য! সে ভেবে আশ্চর্য হল। সে হাঁটল।

...স সারেংকে বলল, চাচা, চোখ বুজে আর কতদিন থাকবেন?

সারেং ফিসফিস করে বলল, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বেশ তো আছ। সফর করছ। তোমার ... কোনও অসুবিধা করছে না কোম্পানি।

...সলিমের মুখ দিয়ে কফের সঙ্গে রক্ত উঠছে। আপনি জানেন এটা অন্যান্য জাহাজিদের পক্ষে কত ...কর। তাছাড়া দেখছি সেলিম বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। এ নিয়ে পাঁচ বন্দর হল অথচ কোনও ...রেই ওকে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করছেন না।

সব ...নি বাপু। সব বুঝি বাপু। অথচ জেনেশুনেও চুপ করে আছি। বাড়িওয়ালার ইচ্ছা নয় সেলিম ...সপা...লে থাকুক। কোম্পানির অযথা এত খরচ করাতে বাড়িয়ালা রাজি হচ্ছে না।

...বে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

... একজন করে তখন অন্য জাহাজিরাও ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ওরা শুনছে। ওরা সারেঙের ... দেখছে। বিজনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেই লঘু পরিহাসজনিত অথবা হালকা সুরের শিস দেওয়া ... কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমুদ্রের উদার নীল বিস্তৃতিতে ওরা কয়েকজন কেমন অসহায়ের ... ডেকে পদচারণা করেছে। ইঞ্জিনের শব্দ, সমুদ্রের তরল ঠান্ডা হাওয়া ওদের নিঃশব্দ এই ...টুকুকে নিদারুণ দুঃখময় করে তুলছে।

...াত্রিতে সব জাহাজিরা যখন একত্রিত হল, একমাত্র আটটা-বারোটার পরিদাররা যখন নীচে ... কাজ করছে, যখন ওরা সকলে শুনল, জাহাজ বন্দর ধরবে সকাল দশটায়, রাতে আর ... বোট আসছে না, ডেক-জাহাজিরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, তখন ওরা বিজনের ঘরে জড়ো ... বলল, আমরা সকলে একযোগে বিদ্রোহ করব। আমরা সকলে জাহাজ চালাব না। কাপ্তান আসুক, ... সারেং, ইঞ্জিন-সারেং আসুক, কেউ আমাদের নড়াতে পারবে না। আমাদের কথা শুনলে আমরা ... কথা শুনব। সেলিমকে হাসপাতালে পাঠালে অথবা দেশে পাঠালে আমরা কাজে যাব। জাহাজ ...ব।

...জন বলল, জাহাজি বলে আমরা গোরু-ভেড়া নই।

...ন্যজন বলল, জাহাজি বলে আমরা বিনা নোটিশে মরব তেমন দাসখত দেওয়া নেই।

...চ দেবনাথ বলল, বিজন, এটা নিয়ে তোমার ক' সফর জাহাজে?

...জন বিস্মিত হল। দেবনাথ ভালভাবেই জানে এটা ওর ক'নম্বর সফর। ভালভাবেই জানে প্রথম ... সে কোন কোম্পানির কোন জাহাজে কাজ করেছে। তবু দেবনাথ যখন এমন একটা প্রশ্ন করল ... দেবনাথ যখন খুব জরুরি ভেবে ওকে প্রশ্নটা করেছে তখন একটা যথোচিত উত্তর দেওয়াই ...সংগত। সে বলল, তুমি তো জানো দেবনাথ, এটা আমার দু' নম্বর সফর।

...খনও তুমি ঠিক জাহাজি হওনি।

...রপর কী ভেবে বিজনকে দেবনাথ অন্য ফোকশালে নিয়ে গেল। এখানে কেউ নেই, কেউ থাকে ... জাহাজিরা এখানে কাজে যাওয়ার আগে জামাকাপড় ছাড়ে। ঘরটা একেবারেই খালি। দেবনাথ ... থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এবং বলল, তুমি এর মধ্যে থেকো না। শেষে সকলে বেঁচে যাবে, ... তুমি মারা পড়বে। কাপ্তান তোমার নলি খারাপ করে দেবে। তখন তোমার পিছনে ওরা কেউ

দাঁড়াবে না। আমি ওদের ভালভাবে চিনি।

বিজন কথা বলল না। চুপ করে দেবনাথের পরামর্শ শুনল। শেষে জবাব দিল, কিন্তু সেলিম যে মরে যাবে!

মরে যাবে তো তুমি কী করবে? তোমার উপর টিন্ডাল আছে, সারেং আছে, ওরা দেখছে না, তুমি দেখে কী উপকারটা সেলিমের করবে? এটা মাত্র তোমার দু'সফর। অনেক দেখবে, কিন্তু জাহাজে বিদ্রোহ করলে চলবে না।

তার জন্য কোনও প্রতিকারের দাবি আমরা তুলব না।

দেবনাথ খুব অভিজ্ঞ লোকের মতো বলল, বম্বের নৌ-বিদ্রোহের আমি আসামি। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম। তোমাকে মাস্তার দিতে বারণ করলাম। তা ছাড়া আমি এই সব জাতভাইদের চিনি। ওরা শেষ পর্যন্ত তোমার কথা কেউ বলবে না। ওরা ওদের জাতভাইদের কথা বলবে, সারেঙের কথাই শুনবে। মাঝখান থেকে তুমি ব্ল্যাক-লিস্টেড হবে।

বিজন আর-কোনও কথা না বলে দরজা ঠেলে বের হয়ে এল। সে দেখল, সকলে ওর ঘরে তখনও পরামর্শ করছে। সকলে উদগ্রীব হয়ে আছে। বিজনকে দেখে ওরা বলল, চল, মাস্তার দি বোট-ডেকে।

বিজন দেবনাথের কথাগুলো আর-একবারের জন্য ভেবে নিল। আর-একবারের জন্য সকলের মুখ দেখল। সকলের মুখ ভয়ানক হয়ে উঠেছে। বিজন বুঝতে পারল, এই সমস্ত মুখের ছবি মিথ্যা হবার নয়। ওরা কখনই ওকে অন্ধকার পৃথিবীতে ঠেলে দেবে না। বিজন দৃঢ় গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখন সারেং নীচে নেমে এসে ডাকল, ইসকান্দার, সামসুদ্দিন, রহমান, শোভান।

ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে একান্ত বশংবদের মতো বের হয়ে যাচ্ছে। সারেং বলল, কাপ্তান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই ঘটনায় বিজন খুব ভেঙে পড়ল। এবং অসহ্য উত্তেজনায় ভুগতে থাকল। প্রচণ্ড শীতের ভিতর সে ওর নিজের ঘরে পায়চারি করছে। দেবনাথ উপরের বাংকে শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। পোর্ট-হোল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে বলে বিজন কাচটা বন্ধ করে দিল। সারেঙের সেই রক্তচক্ষুর কথা মনে হল এবং ভাবল কত সহজে সব নাবিকদের নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সে এই ফোকশালে, এই ঠান্ডায় পায়চারি করতে করতে ধরতে পারছে। ধরতে পারছে সারেং ওদের কী বলছে এবং কী বলে ওদের ভয়ানক প্রত্যয়কে ভেঙে দিচ্ছে। সেলিম এখনও কাশছে তার ফোকশালে, ফোকশালের অন্য বাসিন্দা কোরানশরিফ পাঠ করছে বাংকে। সে পায়চারি করতে করতে সব শুনল। জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে বলে স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে কোনও শব্দ নেই। সব কেমন নিঃসঙ্গ, সব কেমন নিঃশব্দ যেন। ডেক থেকে সারেঙের কথা ভেসে আসছে। সকলকে সারেং জোর গলায় কথাগুলো বলল। বলে ওদের ভয়ানক বিদ্রোহের আগ্রহ মুছে দিল। সারেং ওদের বলল, তোরা তো জানিস কলকাতা বন্দরে চল্লিশ হাজার নাবিক খোদা হাফেজ বলত, এখন কিছু কিছু লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে শুরু করেছে। তোরা যদি বাঙালিবাবুদের কথায় মাতিস, তোরা যদি জাহাজে বিদ্রোহ করিস, তবে তোদের চল্লিশ হাজার চল্লিশে নামতে আর বেশি দেরি নেই।

এক সময় কাপ্তান সারেংকে ডেকে পাঠালেন।

ব্রিজ থেকে কাপ্তান বললেন, কী বলছে সব?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজি এবং হিন্দিতে ডেক-সারেং বলতে থাকল, সব গুড, সাব। সব ঠিক হ্যায়। জাহাজি লোক ভেরি গুড, সাব। বাঙালি বাবুলোক নো গুড, সাব। বাঙালি বাবুলোক গিভস ট্রাবল। বাঙালি বিজন, ইয়েস বিজন তেইশ রুপায়াকা খালাসি, ও তো সাব রিংলিডার আছে। দুটো-চারটে ইংলিশ স্পিকিং আছে, সাব। প্যাসেন্টকে লিয়ে কুচ ফাইট দেনে মাংতা। লেকিন নাও অলরাইট, সাব। বিগ বিগ টক লেকিন নো জব। ভেরি লেজি বাগার।

সারেং এই পর্যন্ত বলে পায়ের কাছে থুথু ফেলল। ফের মুখ তুলতেই দেখল বাড়িয়ালা নিজের কেবিনে ঢুকে গেছেন। কেবিনে পেয়ালা পিরিচের শব্দ। নীচে অফিসার-গ্যালারিতে চিফ কুক আগুন পোহাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সে এখানেও থুথু ফেলল।

সমুদ্রে সূর্য উঠছে। একদল পাখি উড়ছে আকাশে। দূরে ইতস্তত জাহাজ নোঙর করা। অনেকগুলো

অতিক্রম করে পাইলট-শিপ। অনেকগুলো জেলেডিঙি এই শীতের ভোরেও মাছ ধরতে বের হয়েছে। আকাশ নীল, সমুদ্র নীল। জাহাজের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্র উপকূলে উঠে যাচ্ছে। উপকূলের স্কাই-স্ক্র্যাপারগুলো ম্যাচবাক্সের মতো মনে হচ্ছে। এই সব দেখার জাহাজিরা ডেক-এ দাঁড়াল। অথবা দড়িদড়া টানার জন্য ডেক থেকে টুইন ডেকে নেমে যাচ্ছে। এখন দড়িদড়া টানছে। হাসিল নীচে নামিয়ে দিতে চাইছে। মেজ মালোম গলুইয়ে চলে এসেছেন। মালোম ফরোয়ার্ড-পিকে চলে গেছেন। বিজন হাসিল কাঁধে বড় মালোমের পিছনে ছুটছে। তিনটে বোট এসেছে, পাইলট এসেছেন। পাইলট ডেক থেকে বোট ডেকে এবং ব্রিজে উঠে গেলেন।

বড় মালোম বললেন, গতকাল তুমি জাহাজিদের উত্তেজিত করেছিলে?

বিজন হাসিল পায়ের নীচে রেখে বলল, হ্যাঁ, স্যার। করেছিলাম।

আমি খুশি হয়েছি শুনে। বড়-মালোম কশপকে স্টোর-রুমে যেতে বলে এই কথাগুলো বিজনকে বললেন।

ওদের ভিতর আর কোনও কথা হল না। একদল জাহাজি ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে গেছে। ওরা ওয়্যার ড্রাম ঘুরাচ্ছে, ওরা উইনচ চালাচ্ছে। তারপর হাপিজ-হাবিয়া এই ধরনের কিছু শব্দ। বিজন এবং জাহাজিরা প্রায় আধঘণ্টা ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে কাজ করল, কিছু কাঁচা খিস্তি করল। কাজ শেষ নীল উর্দি ছেড়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল ডেক-এ। কেউ নীচে নামল না। খাঁড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। দু'পাশে পাথরের পাহাড়, অতিকায় তিমি মাছের মতো কালো কালো সব পাথর। পাথরের গায়ে। কুৎসিত এই সব পাথরের পাশে ছোট ছোট অনেক রকমের ঝাউ জাতীয় গাছ। পাতাগুলো শীতের হাওয়ায় কাঁপছে। নীচে সব নৌকো বাইচ হচ্ছে। দু'পাশের জনতা চিৎকার করছে। এই সব দৃশ্য ওরা সকলে মাটির গন্ধ নিতে চাইল এবং এই জনতার মতো উন্মত্ত হতে চাইল। এই সব দৃশ্য দেখে বিজন জাহাজি যন্ত্রণার উপশম খুঁজছে।

অথচ বিজন দীর্ঘ দু'সফরে প্রকৃত জাহাজির মতো বাঁচতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হয়েছে। পরিবারের কিছু সংস্কার, বিশেষত ধর্মের, সে কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। এখনও বিফ খাবারে এলে সে ভাল ভাবে খেতে পারে না। দেবনাথের মতো গোমাংস ভক্ষণে তৃপ্তি নেই। জাহাজিদের প্রচণ্ড রকমের ইতর জীবনকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ এইসব ইচ্ছাগুলো ওকে মাঝে মাঝে টানে। তখন সে কাঁচা খিস্তি করে, শিস দেয়, অযথা ফোকশালে বসে রঙের টব বাজায় এবং কাপ্তান ও তাঁর পারিষদদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে।

বিজন একদা কিছু লেখাপড়া করেছিল অর্থাৎ গ্রামের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করেছিল। অন্য দশটা অসামাজিক ছেলে ছোকরার মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসিতে নাম লেখায়নি। বেঁচে থাকার জন্য এবং এই জীবনকে আরও দীর্ঘ করার জন্যই জাহাজের কাজ, জাহাজি হওয়া। 'হালিশহর' এবং 'ভদ্রা'র ট্রেনিং শেষ করেছে একদা, জাহাজের প্রথম সফরে দুনিয়া দেখেছে এবং ইংরেজি বুলিতে রপ্ত হয়েছে। জাহাজি হয়ে উপরি পাওনা হিসাবে চটপট পরিবেশকে মানিয়ে চলার স্বভাব এবং দেহজ আবেগধর্মিতার জন্য মানুষের ভাল করার সুকোমল বৃত্তির কিছু সংস্কার সহজে পেয়ে গেছে। সেজন্য সেলিমকে কেন্দ্র করে একটি অশেষ দুঃখ ওকে এখনও মাঝে মাঝে উত্তেজিত করছে। খাঁড়ির সঙ্কীর্ণতা এবং মানুষের এই আনন্দ সেই অশেষ দুঃখকে যেন আরও বাড়িয়ে দিল। সে বড় মালোমকে বলল, কত দিন থাকব এখানে স্যার?

যেন তার জাহাজ ভাল লাগছে না।

বড়-মালোম বললেন, বলতে পারছি না। ইঞ্জিন রুমে ইন্সপেকশান আছে।

সারেং বলল, সবফাই হবে জাহাজে। জাহাজ বন্দরে বসবে।

ঠিক তখনই বিজন দেখল দু'জন জাহাজি সেলিমকে ধরে ধরে বোট ডেকে তুলছে।

কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে সেলিম বলল সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন। সারেং ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথাটা অনুবাদ করে শোনাল।

কাপ্তান বললেন, আমিও তাই চাইছি। হাসপাতালে দিলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়বে না। জাহাজ এখান থেকে তোমার দেশেই যাচ্ছে।

এই বলতে গিয়েই দেখলেন কাশির সঙ্গে সেলিমের মুখে রক্ত। সকলের সামনে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে সে এখানেও কফটা গিলে ফেলল। কাপ্তান ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন। তা হলে অসুখটা অনেক দূর গড়িয়েছে। কোম্পানির ওষুধ এবং ইঞ্জেকশন কোনও কাজে আসেনি। তিনি সারেংকে ডেকে বললেন, ওকে সকলের সঙ্গে রাখা চলবে না। ওকে ওপরে তুলে আনো এবং কোনও খালি কেবিনে ফেলে রাখো। ওর ভাতের থালা এবং মগ ভিন্ন করে দাও। তোমরা কেউ ওর জিনিসপত্র ব্যবহার করবে না।

কাপ্তান সারেংকে অন্যত্র নিয়ে কথাগুলো বললেন। বললেন, সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে সেলিম টিবি রোগে ভুগছে। যে ক'টা দিন বাঁচে, এ জাহাজেই বাঁচুক।

তারপর তিনি সেলিমের সামনে এসে বললেন, জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই তোমাকে কোম্পানির ডাক্তার দেখানো হবে। আশা করছি তুমি শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে। 'ঈশ্বর তোমায় করুণা করুন' এই বক্তব্যে তিনি স্বয়ং জেসাস-এর মতো চোখ বুজলেন।

বাড়িয়ালার এই পাদ্রিসুলভ চেহারাতে সারেং বিমুগ্ধ হল। পির-পয়গম্বরের মতো তিনি হয়তো কোনও ওক্তে সারেংকেও দোয়া জানাবেন। সে এবারে বলল, সাব, ইউ ফাদার। ইয়োর শিপ, ইউ ম্যান, ইউ সি সাব এভরিথিং।

সারেং এই সব বলে এই মুহূর্তে দোয়া ভিক্ষা করছে। অর্থাৎ সেলিমের প্রতি বিগলিত করুণার অংশীদার হতে চাইছে।

বিজন ডেক-এ কাজ করতে করতে সব দেখল। সে জাহাজ জেটিতে বাঁধতে দেখল। বন্দরের পথ ধরে সব শহরবাসীরা সামনের ঝুলন্ত ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। কিছু টিনের শেড অতিক্রম করে মাঠ। সে দেখল সেলিমকে ডেকের উপর দিয়ে দু'জন লোক সেই খালি কেবিনটায় নিয়ে যাচ্ছে। সেলিম সেখানে থাকবে, সেখানে খাবে, সেখানে শোবে। বিজন এও বুঝল যেন সেলিম আর বেশি দিন বাঁচবে না। জাহাজের ওই ঘরটাতেই অন্য দিন বিজন এবং অন্যান্য কয়েকজন জাহাজি মিলে কিছু পাথর, দুটো বড় গানী-ব্যাগ যত্ন করে এক কোনায় রেখে দিয়েছিল। জাহাজে মৃত্যু হলে সমুদ্রে এই সব পাথর এবং গানী-ব্যাগ দিয়ে সলিলসমাধি দেওয়া হবে। দেহজ আবেগ-ধর্মিতার জন্য ওর সুকোমল বৃত্তিরা ওকে ফের অশেষ যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। শরীরটা ওর স্থির। সে এখন কফ চুরি করে গিলে খাচ্ছে না। এখন সে নীচের পাত্রে কফ ফেলছে। এবং সঙ্গে কিছু রক্ত পুঁজ ফেলছে। পোর্ট-হোল দিয়েই বিজন কথা বলল, বিকেলে ভাবছি কিনারায় যাব। তোর জন্য কিছু আনব কি?

কী আর আনবি? মুখে আমার বিস্বাদ শুধু।

কিছু কমলা, কিছু আপেল?

সে অনেক দাম। অত দামের ফল আনবি না। আমার টাকার বড় দরকার, বিজন। দেশে ফিরব শরীরের চিকিৎসা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে। ওদের জন্য ঘর করতে হবে। জমি করতে হবে। ঘর জমি হলে জাহাজে আর সফর দেব না। জমি-জিরাত দেখে, বিবি বাচ্চা দেখে আল্লার ঘরে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

বিজনের মুখে বিষণ্ণ হাসি। পোর্ট-হোলের কাচ বন্ধ করে দেবার সময় সে ইচ্ছে করেই সেলিমের শরীর থেকে জোর করে চোখ তুলে নিল। ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভিতর যে মুখ, যে মুখে একদা বসন্ত হয়েছিল, যে শরীর বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, সেই মুখ, শরীর এবং দাড়ি ওর চোখের সামনে মৃত অক্টোপাসের মতো পচা দুর্গন্ধময় ফুলো ফুলো শব হয়ে যাচ্ছে। সে জোর করে পোর্ট-হোলের কাচ বন্ধ করে দিল এবং ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

ভোর থেকেই সমুদ্র থেকে হাওয়া উঠে আসছে। ঠান্ডা হাওয়া। বিকেলে সে হাওয়ার গতি আরও বাড়ল। প্রচণ্ড শীতে বিজন ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল এবং কোনও রকমে ম্যাচটা বের করে সিগারেট ধরাল। এখানে হয়তো দু'দিন পর বরফ পড়বে, সে ভাবল। প্রচণ্ড শীত মাটির শেষ উত্তাপটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। দূরে পাইন গাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। গাছগুলো ক্রমশ হালকা করছে শরীর তারপর একদিন এই শীতের দৃশ্য প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রস্তরীভূত হবে যেন পাইন গাছগুলো। পাখিরা এ দেশে থাকবে না। ওরা অন্য দেশে পালাবে। ওরা অন্য দেশে ঘর বাঁধবে।

...শিব মতো আকাশ। বোদেব উত্তাপশূন্য হলদে বং জাহাজেব উপব ছায়া ফেলে অনেক দূব চলে ...ছ পাইনেব শাখা-প্রশাখায় পাখিব বাসাগুলো ঝুলছে। বোদ সেখানেও যেন চুবি কবে উত্তাপ ...চ্ছে। তাবপব জেটি অতিক্রম কবে পথ। সে পথেব মেয়েপুরুষদেব দেখতে দেখতে নীচে নেমে ...ল। একটি বাদাম গাছেব নীচে দাঁড়াল। এখানে দুটো পথ। সে কোন পথে যাবে চিন্তা কবল দাঁড়িয়ে। ...র্ঘ সমুদ্রযাত্রাব পব বন্দব ধবলে এক অনন্য সুখেব সন্ধান সে পায় এই মাটিব স্পর্শে। বাদাম ...ছেব নীচে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ মাটিব স্পর্শ নিল। সামনে শুধু শহব। ইট কাঠ। মাটিব কোনও গন্ধ ...ই সেখানে। সেখানে শুধু যানবাহন, কিছু পাইনেব ছায়া, পথেব দু'পাশে অথবা এভিন্যুব মোড়ে মোড়ে ...লো জ্বলছে—কাচেব ঘব, মাংসেব দোকান, বেস্তোবাঁ, কাফে, পাব। কোথাও ডেইজি ফুলেব প্রদর্শনী ...ব আবও পিছনে সমুদ্রেব খাঁড়িব অভ্যন্তবে নৌকা বাইচ। এই সব ভাল লাগলেও মাটিব স্পর্শেব ...তো সুখপ্রদ নয় যেন এবা। সে হাঁটছে। এই মানুষেব ভিড়ে মাটিব গন্ধেব জন্যে হাবিয়ে যেতে ভাল ...গছে। সে দেবনাথেব সঙ্গে বেব হয়নি। দেবনাথ জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই কোনও পাব অনুসন্ধান ...বে প্রথমে পেট ভবে অন্তত বিয়াব খাবে এবং মাতলামো কবে সমুদ্রেব অশেষ যন্ত্রণা কিছু সময়েব ...না ভুলে থাকবে। কোনও পাব অথবা কুকুবেব বেসে না গিয়ে এখন শুধু এই সব সুন্দবী বমণীদেব ...ন্য বিজনেব হাবিয়ে যাওযা। সে এই ভিড়ে হাবিয়ে যেতে চায়। কেমন এক অশ্লীল শবীবী চিন্তায় ...ত সে ওদেব সঙ্গে কথা বলে সুখ পায়। অথচ সে ওব দেহজ কামনাকে রূপ দেবাব ভঙ্গিটুকু এখনও ...ষ্টা কবে আবিষ্কাব কবেনি। মূলত সে ভাল ভাবেব জাহাজি হয়ে বাঁচতে চায়।

...ে একটা দোকানে ঢুকে কিছু ফল কিনল সেলিমেব জন্যে। মেয়েটি ও হাতে ফলেব প্যাকেট দিয়ে ...হা নোয়াল এবং হাসল। বিজন একগুচ্ছ মিমোসা ফুল দেখেছিল মিসিসিপি নদীব তীবে, কোনও ...তী ওকে ফুলেব গুচ্ছটি দিয়েছিল এ মেয়েব হাসি সেই যুবতীকে স্মৃতিব কোঠায় এনে দিল।

সে ফলেব দাম দিয়ে প্যাকেট হাতে বাস্তায় নেমে এল। ফেল্ট হ্যাটটা আব-একটু টেনে দিল ...লেব উপব। এবং ওভাবকোট টেনে পথেব ভিড়, বিশেষ কবে পথেব সব সুন্দবী বমণীদেব দেখতে ...তে ঝুলন্ত ব্রিজেব বেলিং-এ এসে দাঁড়াল। সমুদ্র থেকে এখন তেমন জোবে হাওয়া উঠে আসছে ... সে এখানে দাঁড়িয়ে তা টেব পেল। দুটো খোলা গাড়িতে পুরুষ বমণীবা হাসতে হাসতে বন্দব থেকে ...বে উঠে যাচ্ছে। দু'জন যুবক-যুবতী পবস্পব কোমব ধবে হাঁটছে। সে দেখল, ওবা দু'জন নেমে যাচ্ছে ...ং নীচে নেমে ব্রিজেব থামেব আড়ালে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট দেখল ওবা দু'জনই শবীবে শবীব মিলিয়ে ...বাব জন্য উন্মাদ হয়ে উঠছে। কোনও আড়ালেব চিন্তাও ওদেব মাথায় নেই। এই সব দেখে বিজন ...তে পাবছে না। সস্তায় কিছু মদ এবং সস্তায় যৌন সংযোগেব তাড়নায় সে বিব্রত হয়ে পড়ল। ...হটিংগেল ধবে বাত যাপনেব ইচ্ছায় সে পীড়িত হতে থাকল। অথচ যেমন কবে প্রতি বন্দবে এ ইচ্ছাব ...ন্ম হয়েছে এবং যেমন কবে প্রতি বন্দবে এ ইচ্ছাব মৃত্যু কামনা কবেছে আজও তেমন ধাবণাব বশবর্তী ...য়ে সে হাঁটতে থাকল। ভাল ভাবেব জাহাজি হতে গিয়ে সে গোলাপি নেশা কবে জাহাজে ফিববে ...বল।

সে জাহাজেব সিঁড়ি ধবে উপবে উঠে এল। সেলিমেব ফোকশালে দবজা বন্ধ। দবজাব সামনে সে ...ড়াল। ডাকল, সেলিম, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

সেলিম উঠে দবজা খুলছে। সে বাইবে দাঁড়িয়ে বুঝতে পাবছে দবজা খুলতে সেলিমেব খুব কষ্ট। ...ে সেলিম দবজা খুলবে এবং ওকে একটু ওব পাশে বসতে বলবে। দু'দণ্ড গল্প কবতে চাইবে। ...শেব গল্প, জোত-জমিব গল্প। বিবি-বাচ্চাব গল্প। অথবা মাছ এবং বনমুবগি ধবাব গল্প। অথবা ...াকালে কোড়া পাখি ধববাব সময় ধানখেতেব আলে কেমন কবে নৌকোয় ঘাপটি মেবে পড়ে ...কতে হয় তাব গল্প। তখন দেখলে মনে হবে সেলিম যেন এ জাহাজে কোড়া ধবছে। কোড়া শিকাব ...বছে।

দবজা খুললে সে ফলগুলো সেলিমেব হাতে দিয়ে বলল, তোব জন্যে এনেছি।

এতগুলো!

বিজন একটু হেসে বলল, ভয় নেই। এবাবেও তোব কাছে টাকা চাইব না। আমি তোকে খেতে ...লাম।

বিজন বাইরে এসে দাঁড়ালে সেলিম বলল, কোনও খবর পেলি? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কবে ছাড়ছে?

ঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। এজেন্ট-অফিস থেকেও কোনও খবর আসেনি। বড়-মালোম শুধু বললেন জাহাজে সরফাই হবে। কাল সব সাহেব-সুবোরা আসবেন। ইঞ্জিন-রুমে মেরামতের কাজ অনেক অনেক। জাহাজ এখানে কত দিন বসবে কাপ্তান নিজেও বলতে পারেন না।

এবার চুপি চুপি সেলিম বলল, জানিস, কাপ্তানকে আমি বললাম, সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে গেলেই আমি ভাল হয়ে উঠব। কাপ্তান বললেন, সেজন্যেই তো তোমাকে হাসপাতালে দিচ্ছি না। একবার হাসপাতালে গেলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়তে চাইবে না। তার অনেক আগে তুমি দেশে পৌঁছে যাবে।

বিজনের বলতে ইচ্ছা হল, তা ঠিকই যাবি। তার অনেক আগেই যাবি।

সে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। সারেং এবং কাপ্তান মিলে সেলিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে আর কোনও কথা বলতে পারল না সেলিমের সঙ্গে। সেলিমের বিষণ্ণ দৃষ্টি ওকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে ডেক-এ এসে নামল। কী মানুষটা কী মানুষ হয়ে গেল, ভাবল। সে সিঁড়ি ধরে ফের উপরে উঠছে। সমস্ত জাহাজে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা। জাহাজের উপরে এখন যেন কেউ জেগে নেই। কিছু কিছু জাহাজি বন্দরে নাইটিংগেল ধরতে বের হয়ে গেছে, তাদের ফিরতে দেরি হবে যারা শুধু নেশা করে ফিরবে তারা একটু বাদেই ফিরবে। বিজন গলুই ধরে হাঁটল। সে এখানে রেলিং-এর পারে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরাল। অন্য জেটিতে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু শব্দ। নীল আরশির মতো আকাশ। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্রগামী জাহাজের আলো দেখল। কাল ভোরে এ জাহাজের মাল নামতে শুরু করবে। অন্ধকার রাত থেকে সব লোক উঠে আসবে ডেক-এ। ওরা কাজ করবে, গ্যালির আগুনে ওরা হাত-শরীর গরম করবে। আর ওই বাংকে পড়ে পড়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে কাশবে সেলিম।

ভোরবেলায় বিজন ইঞ্জিন-ঘরে নেমে গেল। তখন সমস্ত ফলকায় কাজ হচ্ছে। উইনচ-ড্রাইভার সিগারেট ধরাবার ফুরসত পাচ্ছে না। ক্রেন-মেশিন চালকেরা টুপি মাথায় নীচের ফলকায় উঁকি মারছে ফলকায় ফলকায় সব কুলিদের কোলাহল। এজেন্ট-অফিস থেকে ক্লার্ক এসেছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মেজ-মালোম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এক ফলকা থেকে অন্য ফলকায়। পাঁচ ফলকায় পাঁচজন লোকের মুখে হাবিয়া-হাপিজ শব্দ। মাল জাহাজ থেকে উঠছে, ফের বন্দরে নেমে যাচ্ছে।

এই সব দৃশ্যগুলো এখন জাহাজের ডেক এ ঝুলছে।

গ্যালিতে ভাণ্ডারি নেই। বাটলারের ঘরে সে রসদ আনতে গেছে। ব্রিজে কাপ্তান পায়চারি করছেন মেজ-মিস্ত্রি নীচে নেমে গেছেন। বড-মিস্ত্রি এইমাত্র হাই তুলতে তুলতে টর্চ হাতে নীচে নামছেন। বন্দর থেকে সব কিনারার লোক উঠে আসছে। ওরা ডেক অতিক্রম করে ইঞ্জিন-রুমে নেমে গেল। বড-মিস্ত্রি ওদের নিয়ে সব ইঞ্জিন-রুমটা ঘুরলেন। বয়লারের ঘর দেখালেন। ছ'টা বয়লারের ট্যাংক-টপ, চর টানেল-পথ, কনডেনসার, এমনকী স্মোক-বক্সগুলো পর্যন্ত। তারপর ওরা বাংকারে-বাংকারে ঘুরল বিজন অন্ধকারে কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখল। ওরা উপরে উঠে যাচ্ছে। সে ওদের দেশীয় ইংরেজি কথাগুলো কিছু কিছু ধরতে পারছে। জাহাজ এখানে বসবে অনেক দিন, এমনই ওরা যেন বলল। যেন বলল, জাহাজে অনেক কাজ, জাহাজডুবি হয়নি জাহাজিদের সৌভাগ্য।

বিজন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা পোর্ট-সাইডের বয়লারের নিচু অংশ। হাঁটু পর্যন্ত ছাই জমে আছে এখানে। নীচে কিছু পুরনো বেলচে, শাবল, র‍্যাগ, স্লাইশ। কিছু ফায়ার-ব্রিজের প্লেট। ওপরের আলোটা নেই। এখানে অন্ধকার। সে এখান থেকে ইঞ্জিন-কশপের ঘরে উঠে গেল। ডেক-কশপের জন্য দুটো তামার প্লেট চাইল। তারপর সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই বন্দরের একজন শ্রমিক বলল, গুড মর্নিং, মিস্টার।

ইয়েস, গুড মর্নিং।

বিজন বুঝল লোকটি কাজের ফাঁকে ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে চায়। লোকটি হয়তো সস্তায় সিগারেট কিনতে চায়।

লোকটি ফের বলল, ইউ গ্যান্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস।

দেবনাথ গ্যান্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস।

দেবনাথের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে দেখে বিজন বিস্মিত হল।

লোকটি তবে এই সব খবরও রাখে। কারা ভারতীয়, কারা পাকিস্তানি।

বিজন হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। শ্রমিকটি ওর পিছু পিছু এল। এবং পকেট থেকে একটি ইউক্যালিপটাসের বোতল বের করে বলল, ইটস ফর ইউ।

বিজন এবারেও আশ্চর্য হল। দামি এই অয়েলটুকু পেয়ে বিজন খুব খুশি হল। বলল, কাম অন। কত দাম দিতে হবে?

কোনও দাম নেই। আমাকে এক শিশি সরষের তেল দেবে। দেবনাথও দেবে বলেছে। তেলটা আমি মাথায় দিচ্ছি। ইন্ডিয়া থেকে জাহাজ এলেই আমি এ তেলের জন্য ডেক-এ কাজ নিয়ে উঠে আসি। তেল সংগ্রহ করি এবং তেলটা মাথায় দি। রাতে আমার ভাল ঘুম হয়।

ওরা সেলিমের কেবিন অতিক্রম করার সময় সেলিম পোর্ট-হোলের ভিতর থেকে কয়েদির মতো উঁকি দিল। সেলিম বাংকে বসে পোর্ট-হোল দিয়ে এই সব মানুষদের কাজ দেখছে। হাবিয়া-হাপিজের শব্দ শুনছে। ড্যারিক উঠতে-নামতে দেখছে।

এইমাত্র এই পথ দিয়ে বড়-মালোম গেলেন। দুটো মেয়ে গেল, বোধ হয় বড় মিস্ত্রির ঘরে অথবা মেজ-মিস্ত্রির বাংকে। সে এখানে বসে দূরের পাইন গাছ দেখতে পেল। এবং পোর্ট-হোলের কাচ দিয়ে বড়ুয়াকেও চলে যেতে দেখল।

শ্রমিকটি বলল, ম্যান ইজ সিক?

সে বলল, ইয়েস, সিক। টিবিতে ভুগছে।

টিবিতে ভুগছে। হাসপাতালে দিচ্ছে না! বড় আশ্চর্য।— যেন শ্রমিকটি ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল।

বড় আশ্চর্য!— বিজন হাঁটতে থাকল। লোকটি ওর পাশাপাশি হাঁটছে। সে বলল ফের, এ নিয়ে পাঁচ বন্দর ঘোরা হল। কাপ্তান এত দিন হাসপাতালে দেবেন দেবেন করছিলেন, এখন শুনতে পাচ্ছি দেওয়া হবে না। জাহাজ দেশে ফিরবে। সেও দেশে ফিরবে।

এ সব দেখেও তোমরা চুপ করে আছ!

বিজন দেখল লোকটি যেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করে সকলকে জানাতে চাইছে, জাহাজে একজন জাহাজি টিবিতে ভুগছে অথচ ওকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে না, কাপ্তান কোম্পানির টাকা বাঁচাচ্ছে। আপনারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।

শ্রমিকটিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। পাশের অন্যান্য কুলিদের সে ঘটনাটা খুলে বলল। ওরা সকলে একত্র জমা হচ্ছে। ওরা এই নিয়ে জটলা পাকাতে চাইছে যেন। ওরা যেন বলতে চাইছে, তোমরা নাবিক, তোমরা এই সব সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বন্দরে নিয়ে যাও, ঝড়ের দরিয়া পার করে জাহাজের কোম্পানির প্রতিপত্তি বাড়াও, আর তোমাদের চিকিৎসা হবে না, তোমাদের জন্য হাসপাতালের বন্দোবস্ত থাকবে না, কোম্পানি বেইমানি করবে, তোমরা ভেড়ার মতো ঘাস খাবে, সে ঠিক কথা নয়। তোমরা বিদ্রোহ করো। সে বিদ্রোহে আমরা যোগদান করব। তোমাদের একতার অভাব, আমাদের একতা ইচ্ছা করলে ধার নিতে পারো। দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

ভিতর থেকে লম্বা লোকটি বের হয়ে বিজনকে বলল, ইউ বেটার গো টু মিস্টার ট্রয়। তিনি সিম্যান ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ঠিকানা—পাঁচ কলিন স্ট্রিট, স্টেশনের পাশ দিয়ে যে বড় এভিন্যুটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে। তাঁকে পেলে ঘটনাটা খুলে বলবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিজন ওদের ধন্যবাদ জানাল। এবং কেবিনে ঢুকে লোকটিকে এক বোতল সরষের তেল দিয়ে বলল, ইউ হ্যাভ ডান এনাফ। আমি আজই মিস্টার ট্রয়ের কাছে যাব।

অথচ সে দেবনাথের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল, এই সব আবেগধর্মিতার লক্ষণগুলো ভাল না। সেলিমের উপকার করে তোর কী আখের হবে, এমত ভাব দেবনাথের মুখে। সুতরাং স্পষ্টতই দেবনাথ যেতে রাজি হল না।

বিকেল। শীতের বিকেল। চারটে না বাজতেই শীতের সমুদ্রে অলস সূর্য ডুব দিচ্ছে। গাছগুলো নেড়া-নেড়া। ইউক্যালিপটাসের পাতা খসে পড়ছে। আকাশ থেকে যেন শীতের তুষার ঝরছে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাত-পা জমে যাবে ভাব। বিজন হাতের দস্তানা টেনে দিল। টুপিতে কপাল ঢেকে দিল। তারপর ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। সমুদ্র থেকে শীতের হাওয়া ফের উঠে আসছে।

ইচ্ছা হল বন্দরে নেমে ট্যাক্সি করার। ইচ্ছা হল দু'শিলিং আপেল কেনার। এবং ইচ্ছা হল এডিনবুরা টিন-কাঠের ঘরের ভিতর ঢুকে দু'দন্ড জুয়াখেলার। তবু সেলিমের জন্য আপাতত হাঁটতে থাকল। ধীরে ধীরে হেঁটে গেলে ঝুলন্ত ব্রিজ অতিক্রম করতে পনেরো মিনিট, সিম্যান-মিশান বাঁয়ে রেখে রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করতে অনধিক পনেরো মিনিট, তারপরই চড়াই পথে উঠতে গিয়ে কলিন স্ট্রিট মিলবে। নাম্বার ফাইভ কলিন স্ট্রিট। মনে মনে নম্বর মুখস্থ করার মতো উচ্চারণ করল কথাটা এবং দুটো সুন্দরী মেয়েকে রমণীয় হতে দেখে শিস দিয়েও ফেলল। এবং যদি ওরা প্রশ্ন করে ওর শিস শুনে তুমি সিম্যান?

সে বলবে, ইয়েস।

যদি বলে, ইন্ডিয়া থেকে এলে?

সে বলবে, ইয়েস।

যদি বলে, তুমি গান জানো?

সে বলবে, ইয়েস।

তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো?

সে বলবে, ইয়েস।

সুতরাং ওর গান, খেলা এবং এই শঠতা সবই ইয়েসের কোঠায় পড়বে।

বিজন নিজের মনেই হেসে ফেললে। সুন্দরী রমণীরা এখন ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে উঠে যাচ্ছে। ব্রিজের রেলিং ধরে কিছু মেয়েপুরুষ গুঞ্জনে মশগুল। অথচ সুন্দরী রমণীরা ওকে দেখেও প্রশ্ন করল না। ওর শিস দেওয়ার অর্থকে ব্যতিক্রম বলে ভাবল না। সুতরাং সে জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে ফেলে নীচে নেমে একটি চলন্ত ফলের দোকান থেকে দু'শিলিং-এর আপেল কিনল। তারপর বুলফাইটের বিজয়ী মাটাডরের মতো এই সব সুন্দরী রমণীদের এবং সুন্দর পুরুষদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে গেল। বের হয়ে যাচ্ছে। সে হাঁটছে। এখন যেন সহসা মনে হল সেলিম পীড়িত। সে বাংকে শুয়ে রক্ত তুলছে মুখে। দেশে একমাত্র পিসিমা বেঁচে আছেন, তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। আজও বয়স্কা সুন্দরী রমণীদের দেখলে সে তার মাকে স্মৃতির কোঠায় সংগ্রহ করতে পারে। সে সামনের বয়স্কা সুন্দরী রমণীকে প্রশ্ন করল, উড ইউ হেলপ মি? আপনি কি আমাকে কলিন স্ট্রিটে যেতে সাহায্য করবেন?

বয়স্কা সুন্দরী রমণী বলল, তুমি কি স্ট্রেঞ্জার?

সে বলল, ইয়েস। আমি সেলর।

এ বন্দরে প্রথম এলে?

ইয়েস, এই প্রথম এসেছি।

ইওর কানট্রি?

বিজন দেশের নাম করল।

অল রাইট। তুমি এসো। তুমি গ্যান্ডিম্যান।— তুমি ভাল লোক আছ, এমন ভাব যেন বয়স্কা সুন্দরী রমণীর চোখে।

বিজন শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল। সে দীর্ঘস্থায়ী আলাপে রাজি হল না। নতুবা এদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংশয় আর দুঃসহ রকমের প্রশ্নের মুখে পড়ত, এখনও দুর্ভিক্ষ আছে? এখনও মহামারী হয়? এখনও সন্ন্যাসীরা গাঁজা খেতে খেতে ধর্মালোচনা করেন? এখনও হিমালয়ের বুকে নাক জাগিয়ে সাধু মহান্তরা বরফের নীচে ঈশ্বর-উপাসনা করছেন?

প্রায়ই সে এই সব ক্ষেত্রে চটপট উত্তর দেবার ভঙ্গিতে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এবং কিছু বলে পবিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। সত্য-মিথ্যা, যে কোনও প্রকারে। এ সব ক্ষেত্রে সে কখনও নিজেকে ছোট করবে না। নিজেকে, নিজের দেশকে ছোট করার ইচ্ছা তার কোনও দিন হয়নি।

একদা ভিক্টোরিয়া বন্দরে একজন ব্রেজিলিয়ান-গার্ল বলেছিল, তোমার চোখ বড় গভীর, তোমার চোখ কবিতার মতো।

সে বলেছিল, আমি যে কবিতা লিখি।

একদা একটি চিলি-কন্যা বলেছিল, তোমার কোমর খুব সরু। তোমার এই দীর্ঘ কোমল চেহারা নর্তকের মতো।

সে বলেছিল, একদা আমি ব্যালেতে নাচতুম।

বিজন এই সব ভাবনার ভিতর এভিন্যু ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। বেল-স্টেশন অতিক্রম করে সে ডানে মোড় ঘুরল। এখানে সে কিছু ফুলের গাছ দেখল। মিমোসা ফুলের গুচ্ছের মতো এই সব ফুলেরা গাছে ঝুলছে। যারা পথ ধরে যাচ্ছে, ফুলেরা তাদের শরীরের উপর ঝরে পড়ছে। বিজনের ব্ল্যাক কোটের রঙে জাফরি রং ধরাল। সে অনেকক্ষণ এই সব গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। চারদিকে নিয়ন আলো, কাচের ঘরে আলো জ্বলছে। এই আলোর ভিড়ে এই সব শ্বেতাঙ্গ রমণীদের বিজনের বড় ভাল লাগল। ওর আর ইচ্ছে হচ্ছে না এক পা নড়তে। ওর ইচ্ছে নেই এখন কলিন স্ট্রিটের ওই নম্বর বাড়িতে ঢুকে নীরস আলোচনায় ডুবে যেতে। তার চেয়ে বরং এই ভাল। বিদেশি এই সব মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড সাগরের দুঃখকে ভুলে এই সুখ-দুঃখে ডুবে যাওয়া।

অথচ সে দাঁড়াতে পারল না। বন্দরে সেলিম, ওর কাশি, ওর নিরীহ মাছের মতো চোখ বিজনকে তাড়া দিচ্ছে। বিজন ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বড় হলঘরটায় ঢুকে গেল। গায়ে পিতলের প্লেটে লেখা—পাঁচ, কলিন স্ট্রিট। পাথরের উপর খোদাই করা সাইনবোর্ড। লেখা আছে—ন্যাশনাল সিম্যান ইউনিয়ন। নীচে লেখা রয়েছে—জাহাজিরাও আপনার আমার মতো মানুষ।

এই সব বড় বড় হরফে বড় বড় কথা পড়তে পড়তে বিজন হলঘরে ঢুকে গেল। পাথরের দেয়ালে বড় বড় সব ছবি ঝুলছে। পায়ের নীচে মসৃণ পাথরে ওর প্রতিবিম্ব সচল। মসৃণ পাথরে ওর চেহারা আয়নার মতো ধরা পড়ছে। বিজন সন্তর্পণে হাঁটল। সন্তর্পণে পাথরের আরশিতে নিজের মুখ দেখল, এখন অন্য কোনও মুখ অথবা অন্য কোনও শব্দ এ হলঘরে ভেসে উঠছে না। সে বিস্মিত হল। পাথরের দেয়ালে কিছু তৈলচিত্র। কিছু দামি আলো এবং এইমাত্র পালিশ-করা জুতোর রঙে এই সব দেয়াল, এই সব ছবি। সে একবার ভাবল, বরং চলে যাওয়া যাক। বরং কাল দেবনাথকে বলে-কয়ে একসঙ্গে আসা যাবে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে বিজন ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। অথচ সে এখন দেয়ালের কিছু কিছু তৈলচিত্র চিনতে পারছে। ওরা শেক্সপিয়ার, টলস্টয় এবং আরও সব মনীষীদের পাশে ট্যাগোর—জন্ম ১৮৬১ মৃত্যু... কী একটা সালের নাম। ট্যাগোর... তারপর জন্ম মৃত্যুর কথা ভেবে ওর কিঞ্চিৎ সাহস পেল। সে চারিদিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। উত্তরের দিকে পাথরের দেয়ালের একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। এবং একজন প্রৌঢ় বের হয়ে আসছেন। তিনি যেন কোনও যক্ষপুরী থেকে উঠে আসছেন। সে তাঁকেই কোনও রকমে প্রশ্ন করল, মিস্টার ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

প্রশ্ন করে ট্যাগোরের ছবির প্রতি ফের নজর ফেলে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গৌরব বোধ করল।

ভদ্রলোক বললেন, দরজা ঠেলে ভিতরে যান। ওঁর স্টেনো এলবি আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করুন।

শেষে ভদ্রলোক ওকে গুডবাই ভঙ্গিতে বিদায় জানালেন।

বিজন একান্ত বশংবদের মতো দরজা ঠেলতেই ভিতর থেকে জবাব এল, কাম ইন, কাম ইন!

বিজন এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কোনও মুখ দেখতে পাচ্ছে না অথচ অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতো কেউ ওকে বিচলিত করছে। যেন সে দেয়াল-ঘেরা কোনও যক্ষপুরীতে এসে ঢুকেছে। সেখানে দেয়ালের ভিতর থেকে একটি নারীকণ্ঠের জবাব, কাম ইন, কাম ইন। এবং সে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বলেই দেখতে পেল মেয়েটি টেবিলের উপর ঝুঁকে কাজে ব্যস্ত। সে একবারও চোখ তুলে দেখছে না। দেখল না কে এল কে গেল সে দেখল না। সে হাত তুলে ইশারায় ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বলছে। ছোট ছোট কবিডরের মতো এই একফালি ঘরে একটি টেবিল সহ মেয়েটিকে খুব ভিন্নধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

সে চেয়াবে বসে ইতস্তত দেয়ালে নজব দিতেই দেখল মেয়েটিব দেয়ালেব কীলকেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেন উপস্থিত। ববীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্মিত হাসিতে এই সব অতিথি অভ্যাগতদেব আপ্যায়ন কবছেন ছবিটি হাতে আঁকা বলেই বিজনেব মনে হল। কোনও ছবিব যেন নকল। এইটুকু দেখে এবং ভেবে বিজনেব বিচলিত ভাবটুকু কেটে গেল। সে বলল, মিস্টাব ট্রয় থাকলে দেখা কবতাম।

এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল। একজন সুপুরুষ বিদেশি যুবাকে দেখল। যুবাকে দেখে চোখে ওব নির্লজ্জ ভাব। চোখেব পাতা পডছে না। বিজনকে দেখে লেজাবে হিসাব কষছে এমন ভাব চোখে চোখেব পাতা পডছে না, দৃষ্টি এমন দৃঢ, আত্মপ্রত্যয়ে গভীব। এই নির্লজ্জ ভাবটুকু বিজনেব ভাল লাগে না। বস্তুত বিজন খুব আডষ্ট বোধ কবছে।

তিনি তো নেই। তোমাব কী দবকাব আমাকে বলে যাও। তিনি এলে বলব।

বিজন বলল, প্রয়োজন আমাব অনেক। তোমাকে আমাব প্রয়োজনেব কথা অনেকক্ষণ ধবে শুনতে হবে।

শুনব।

সব ঘটনাই মিস্টাব ট্রয়কে কিন্তু বলতে হবে।

এলবি হাসল। এলবি বিদেশি যুবাকে ফেব কৌতূহলেব চোখ নিয়ে দেখছে। এবং সেই পূর্বেব মতো দৃষ্টি, যা বিজন সহ্য কবতে পাবছে না। সে এলবিকে সাধাবণ যুবতীব মতো দেখে খুশি হতে চাইল।

এলবি বলল, তুমি বলো, আমি নোট কবছি।

নিজেব ভুলটুকু বুঝতে পেবে বিজনও হাসল।

তোমাকে নোট নিতে হবে না। মুখে বললেও চলবে। ঘটনাটা হচ্ছে পার্থ বন্দবে '

এলবি এ সময়ে বাধা দিল বিজনকে, জাহাজটাব নাম বলো। তোমবা কোন কোম্পানিব ক্রু কোন দেশ থেকে এসেছ সব বলতে হবে।

জাহাজেব নাম এস/এস টিবিড ব্যাংক'। আমবা ইন্ডিয়া থেকে এসেছি।

তাবপব?

বিজন জাহাজেব সব ঘটনা, সেলিমেব বর্তমান অবস্থা, এমনকী সাবেং এবং কাপ্তানেব গোপন ষড়যন্ত্রেব কথাও খুলে বলল। বিশেষ কবে মেয়েটিব স্বাভাবিক আগ্রহে সব খুলে বলতে পাবল। এখন সে আব কোনও আডষ্টতায় ভুগছে না। এখন সে ববীন্দ্রনাথকে দেখে বীতিমত উত্তেজিত হতে পাবছে সে এবাব একটু ঝুঁকে বলল, এব একটা বিহিত কবতেই হবে দযা কবে। নতুবা বেচাবা বিনা চিকিৎসায় মাবা পডবে। বেচাবাব ঘবে বিবি আছে। ছোট একটি মেয়ে আছে। ওবা সব ওবই পথ চেয়ে বসে আছে।

এখন বিজনকে দেখলে কে বলবে, এ জাহাজি বিজন। কে বলবে এ বিজন কথায় কথায় শিস দেয় কথায কথায মিথ্যা কথা বলে বিদেশি বমণীকুলে বাহবা নিতে চায়। বিজনেব চোখ-মুখ মানুষেব ভাল কবাব প্রবৃত্তিতে বস্তুতই সজল হযে উঠছে এখন।

এলবি বলল, নিশ্চিন্ত থাকো। মিস্টাব ট্রয এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। জাহাজিদেব ভাল কবাই আমাদেব কাজ।

বিজন ওঠবাব সময ফেব ববীন্দ্রনাথকে দেখল এবং অদম্য কৌতূহলকে চাপতে না পেবে বলল আমবা ট্যাগোবেব দেশ থেকে এসেছি। তোমবা ট্যাগোবেব ভক্ত দেখছি। দেখি তোমবা এখন আমাদেব জন্য কতটা কি কবতে পাবো।

তুমি ভাবতবর্ষেব লোক? কিন্তু ভাবতবর্ষ তো বিবাট দেশ। এখানে পাঁচ বছব আছি। ভাবতবর্ষ থেকে আসা কিছু কিছু জাহাজিদেব সঙ্গে আমাব আলাপ হযেছে। অথচ দুর্ভাগ্য ওবা কবিব ছবি দেখে কোনও কৌতূহল প্রকাশ কবেনি। বিশ্রী ধবনেব পোশাক পবে ওবা এখানে এসেছে। চেযাবে না বসে মেঝেতে বসে পডেছে। শীতে দেখেছি ওবা ভয়ানক ভাবে কাঁপত।

বিজন বলল, ওবা এখনও আছে। জাহাজে গেলে তুমি ওদেব এখনও দেখতে পাবে।

এলবি বলল, ভাবতবর্ষেব লোক ভাবতে তোমাকে কষ্ট হয।

বিজন বলল, মাপ করবে। যাবা তখন ছিল এখনও আছে। তাদেব জাহাজি জীবনেব এক বিচিত্র অধ্যায় আছে। ওবা আসছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ অঞ্চল থেকে। ওবা অজ্ঞ। চাষি পবিবাব থেকে আসছে।

বিজন ভাবল, এইসব জাহাজিদেব জাতীয় পোশাকেব প্রতি এলবিব তীব্র ঘৃণা। বস্তুত লুঙ্গি এবং কাঁধে গামছা ফেলে এইসব জাহাজিদেব বড় বড় এভিন্যু ধবে হাঁটা এবং নিজেদেব ভাবতবাসী বলে পবিচয় দেওয়া এলবিব কাছে বিশ্বকবিবই যেন অবমাননা। সেজন্য বিজনেব দুর্লভ ইংবেজি বলাব ক্ষমতা এবং উজ্জ্বল বিদেশি পোশাক, উপবন্তু কবিব প্রতি শ্রদ্ধাটুকু এলবিকে বিজন সম্বন্ধে অভিভূত কবছে। বস্তুত এলবি ভাবতবর্ষেব দাবিদ্র্যকে সহ্য কবতে পাবে না। আজও পাবছে না। ওব চোখে মুখে এই সব যেন ধবা পডছে।

বিজন বলল, ওবা অজ্ঞ নিবক্ষব বলেই ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওদেব কোনও কৌতূহল নেই।

এলবি সহসা বলল, বাবা কবিকে ইউবোপে দেখেছেন। তুমিও কবিব দেশেব লোক। তুমি কবিকে দেখেছ?

সহসা এই প্রশ্নে বিজন কিঞ্চিৎ বিব্রত হযে পড়ল। ওব জাহাজি মনটা ধীবে ধীবে ওব অস্তিত্বকে গ্রাস কবছে। সে বলল, নিশ্চয়ই। নিমতলা থেকে বটতলা বেশি দূব নয। নিমতলাব কাছেই জোড়াসাঁকো। আমাব ছেলেবেলায ওই পাডায কত খেলতে গেছি। কতদিন আমবা কবিকে দেখে প্রণাম কবেছি। তিনি তখন প্রায় অচল।

তুমি ওঁকে প্রণাম কবেছ! তুমি ওঁকে স্পর্শ কবতে পেবেছ!

বিজন বিনযেব আধাব হয়ে গেল। বিজন বলল, কবি আমাদেব আশীর্বাদ কবতেন। বলতেন, ভাল হবে, দেশেব দুঃখ দূব কববে।

এলবি ফেব আশ্চর্য এক শ্রদ্ধাব ভঙ্গিতে বলল, তুমি ওঁকে স্পর্শ কবতে পেবেছ প্রণাম কবতে পেবেছ!

বিজন দেখল এলবিব চোখদুটো শ্রদ্ধায় গভীব হযে উঠছে। এলবি একবাব ঘাড় ফিবিয়ে ববীন্দ্রনাথেব ছবি দেখল, একবাব বিজনকে দেখল। কবিব খুব নিকটেব একজন যুবাকে স্পর্শ কবাব একটু ইচ্ছায় সে হাত বাডিযে দিল। যেন বলতে চাইছে—তুমি বিজন, তুমি কবিকে স্পর্শ কবেছ, তুমি কবিব দেশেব, ঘবেব লোক। এলবিব মনে এই সব ভাবগুলো কাজ কবছে।

এলবি বলল, বাবা তখন ইউবোপে ছিলেন। বাবা কবিকে ইউবোপে দেখেছেন। বাবা মাকে এবং আমাকে বলতেন, হি ইজ এ সেন্ট, জাস্ট অ্যাজ পিটাব অব পল। বিজন সেই ঋষিপুরুষদেব আশীর্বাদ পেযেছে। এলবি বিজনেব আবও ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

এলবি বলল, তোমবা আব কত দিন থাকবে এ বন্দবে?

প্রায মাস দুই। জাহাজ এখানে মাস দুই বসবে। ড্রাইডক হবে। মেবামত হবে।

সহসা এলবি বলে বসল, আমাব একটা অনুবোধ তোমায় বক্ষা কবতে হবে।

বিজন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু সে বলল, বলো, বাখব। যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চযই বাখব।

তোমাব কাছে আমি ট্যাগোবেব কবিতা কবিব ভাষায় শুনতে চাই। আমাব অনেক দিনেব ইচ্ছা। যখন থেকে ট্যাগোবেব কবিতাব সঙ্গে প্রথম পবিচিত হই তখন থেকে ইচ্ছা, তোমাব দেশে যাব, ভাবতবর্ষকে দেখব। কবিব শান্তিনিকেতন দেখব। আমি এইজন্য প্রথম থেকেই টাকা জমিযে আসছি। কবিব কবিতা তাঁব ভাষায় শুনব, কত দিনের ইচ্ছা আমাব!

তাব জন্য কী আছে, সেলিমেব ঝামেলাটা চুকে যাক। তাবপব একদিন তোমায় শোনানো যাবে।

এলবি চোখ বুজল। যেন ববীন্দ্রনাথকে, তাঁব দেশকে, বিজনকে অনুভব কবাব জন্যই চোখ বুজল। বিজন এই আবেগধর্মিতায় বিমুগ্ধ হল না। ববং পীডিত হল। সাহিত্যেব অ-আ-ক খ সম্বন্ধে যাব কোনও স্পৃহা নেই, তাকেই এই নিদারুণ সত্যে টেনে আনাব কী যে অর্থ, বিজন বুঝতে পাবল না। তবু সে ভাবল, হাতে অনেক দিন, পবে ভেবে যা হয় কিছু একটা বলা যাবে।

বিজন এবাব উঠতে চাইল এবং বলল, তোমাব নামটা জানা হল না।

এলবি বলল, আমাকে সকলে এখানে এলবি বলেই জানে। পুরো নাম সিসিল এলবার্টি। তুমি এলবার্টি বলেও ডাকতে পারো।

এলবি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল, আমি তোমায় কবিতা শোনাব। ট্যাগোরের কবিতা।

বিজন ভাবল, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

এ সময় এলবি ওর সামনে এসে দাঁড়াল এবং হ্যান্ডশেক করল। তারপর প্রশ্ন করল, জাহাজ তোমার কোন ডকে নোঙর ফেলেছে?

সাউথ-ওয়ার্ফে।

বিজন এবার দৌড়ে পালাবার মতোই হলঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেল এবং অযাচিত ভার থেকে যেন মুক্ত হল।

ডেক-এ তখন পুরোদমে কাজ চলছে। ইঞ্জিন-রুমেও। ইঞ্জিন-রুমে বড় বড় প্লেট সব স্ক্র্যাপ করা হচ্ছে। বড় বড় সব অক্সিজেনের সিলিন্ডার নামানো হচ্ছে। ফলকায় ফলকায় কাজ, জাহাজিরা রং করছে ফানেলে, বোট-ডেকে। একজন-দু'জন করে সকলে উঁকি মেরে যাচ্ছে সেলিমের কেবিনে। বিজন গতকালের ঘটনার কথা কাউকে বলেনি, সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। শুধু আজ সে কিনারার লোকদের ডেকে সেলিমের অবস্থা দেখাচ্ছে। দেখাল, এইখানে সেই লোকটি থাকে তাকে তোমরা দেখে যাও।

প্রচণ্ড শীত এবং হাওয়ার জন্য জাহাজিদের হাতে কাজ তেমন সরছে না। ওরা ফানেলের উপর ঝুলে অথবা বোটের উপর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে গ্যালিতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ নিয়েছে। শক্ত হয়েছে ওরা এবং রাত্রির কোনও আকস্মিক যৌন ঘটনার কথা ফলাও করে বলে কোনও জাহাজি বাহবা নিতে চাইছে।

বিজন নীচে দাঁড়িয়ে ফানেলে যে রং করতে উঠে গেছে তার দড়িদড়া ঢিল দিয়ে অথবা শক্ত করে বেঁধে রেখে কাজে সাহায্য করছে। আকাশ তেমনি আরশির মতো। বন্দরের পাইন গাছ থেকে তেমনি পাতা ঝরছে। এ শীতেও ইঞ্জিন-টিন্ডাল পুরনো কোট গায়ে লুঙ্গি পরে নীচে নেমে গেল। জেটি ধরে হাঁটতে থাকল। গতরাতেও ইঞ্জিন-টিন্ডাল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরে নেমে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরের পথ ধরে শহরে উঠে গেছে। পুরনো বাজারে গিয়ে দু'শিলিং দাম দিয়ে পুরনো জামা কাপড় কিনেছে। জাহাজিরা আফ্রিকার বন্দরে অথবা ফিজি দ্বীপে ওগুলো বিক্রি করবে। গতরাতে ফেরার পথে টিন্ডাল শীতে যখন আর হাঁটতে পারছিল না, যখন সস্তায় যৌন সংসর্গের দায়িত্ব পালন করে আর হাঁটতে পারছিল না, তখন বুড়ি মেমসাব গাড়ি থেকে এই বুড়ো টিন্ডালকে একটা দামি ওভারকোট দয়াপরবশ হয়ে ছুড়ে দিয়েছিল। ভোরে সে দামি ওভারকোটটা জাহাজিদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। বলেছে, শীতে রাস্তায় কাঁপছিলাম, বুড়ি মেমসাব দিয়ে দিল। গতকাল এই সব ভারতীয় নাবিকদের কথাই দুঃখ করে বলছিল এলবি। বিজন ফানেলের নীচে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন-টিন্ডালকে শহরে উঠে যেতে দেখছে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়ছে।

বিজন ফানেলের পাশ থেকে অন্য জাহাজিকে উদ্দেশ করে বলল, মকবুল, দেখলি ইঞ্জিন-টিন্ডালের কাণ্ড! আজও এই ভোরে শীতের ভিতর লুঙ্গি পরে বন্দরে নেমে গেল। দেশের জাত-মান সব ডুবাচ্ছে। তোরা কিছু বলতে পারিস না ওকে?

বিজন দেখল মকবুলের মুখেও এমত ইচ্ছা, শীতের রাতে নীলরঙের পায়জামা পরে ছেঁড়া কোট গায়ে বের হয়ে যাওয়া, পথে দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট পাওয়া এবং কোনও পুরুষ অথবা মহিলার দাক্ষিণ্য গ্রহণ করা। বিজন ভাবল, শীতের রাত, রাস্তায় বরফ পড়ছে, তবু নীল মার্কিন কাপড়ের জামা পায়জামা শরীরে এঁটে এই সব জাহাজিদের ভিড় কিনারায়। এই সব জাহাজিরা ভারতবর্ষ থেকে আসে। বড় গরিব, বড় নিঃস্ব। এই সব জাহাজিদের ইংরেজ কোম্পানির মালিকেরা কলকাতা বন্দর থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের খেতে দেওয়া হয় বাসি গোরুর মাংস, ডাল ভাত। মাঝে মাঝে বাঁধাকপির তরকারি দিয়ে কোম্পানি বদান্যতা দেখায়। এইসব জাহাজিরা বন্দরে লুঙ্গি পরে, ছেঁড়া ওভারকোট গায়ে শীতের রাতে ঘন-আঁধারে বুড়ি মেমসাবদের খুঁজে বেড়ায়। দাম যত কমে হয়, জিনিস যত নীরস হয় ক্ষতি নেই, তবু যৌন সংসর্গটুকু রক্ষা করতেই হবে। তখন বিদেশে এলবির মতো রমণীরা ভারে

ওরা অসভ্য, ওরা বর্বর। একদা পৃথিবীর সব বন্দরগুলোতে কলকাতা বন্দরের এই সব নাবিকেরা ঘুরে বেড়িয়েছে। পৃথিবীর সব বন্দরে বন্দরে ভারতবর্ষকে ওরা নোংরা নিঃস্ব প্রতিপন্ন করেছে। আজও করছে। অথচ বিজন ভাবল এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। যত দিন এরা থাকবে, ইঞ্জিন টিন্ডালের মতো এই সব লোকগুলোও থাকবে।

বিজন এই সব ভেবে এত বিরক্ত এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, কখন মকবুল ফলক্কার দড়িতে ঢিল দিতে বলেছে, কখন ইটন এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ করে হাসছে, বিজন তার কিছুই ধরতে পারেনি।

ইটন বলল, গুড মর্নিং।

বিজন বলল, ইয়েস, গুড মর্নিং।

তারপর ওরা লক্ষ করল জাহাজে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা, অনেকগুলো মোটরগাড়ি এসে গেটের থেমেছে। সব লম্বা চৌকো মুখওয়ালা লোকেরা জাহাজে উঠে আসছে। ডেকের উপর সব খালাসিরা, কিনারার লোকগুলো হাত তুলে আকাশ দেখছে। ইটনও আকাশ দেখল, বিজনও আকাশ দেখল। দেখে বিস্মিত হচ্ছে। ইটনের মুখ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, ইটন বলছে কেমন, কাণ্ড হল তো? ফানেলের চূড়ায় ঝুলে মকবুল প্রশ্ন করল, আকাশে এরোপ্লেনটা কী লিখছে রে?

বিজন দেখল একটা এরোপ্লেন আকাশটাকে স্লেটের মতো ব্যবহার করছে। গ্যাস দিয়ে বড় বড় হরফে ভোরের খবর দিচ্ছে। 'দি ডেইলি হেরাল্ড'-এর খবর। হয়তো উড়োজাহাজটা ভাড়া করা, কিংবা নয়ই। বিজন দুটো বড় খবরের পর পড়ল দি শিপ এস/এস টিবিড ব্যাংক উইল বি ব্ল্যাক ব্যানড ফর সেলিম

মকবুল ফানেল থেকে বিরক্ত করছে। মকবুল বার বার প্রশ্ন করছে আকাশে জাহাজটা কী লিখছে রে।

বিজন এই সব পড়ে অধীর হয়ে উঠছে। সে মকবুলকে বলল, সেলিমকে এক্ষুনি হাসপাতালে না দিলে জাহাজের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিম্যান ইউনিয়নের সেক্রেটারি এই হুমকি দিয়েছেন।

ইটন বলল, কাল রাতে এখান থেকে যারা কাজ করে ঘরে ফিরেছে তারাই ইউনিয়নে খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বিজন ভাবল, সব যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। এখন জাহাজে খুবই লোকের ভিড়। সকলে কাজ ফেলে দিয়ে ব্যাপারটা দেখছে। কোম্পানির এজেন্ট পর্যন্ত জাহাজে উঠে এসেছেন। মিস্টার ট্রয় এবং আরও অনেক সব লোক। ক্লার্করা এসেছেন। ওরা প্রথমে ব্রিজে উঠে গেল। কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গেল সকলে। কাপ্তানকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তিনি এই খবরে প্রথমে খুবই অধীর এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন। দুই সারেংকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে এ খবর ইউনিয়নে পৌঁছে দিয়েছে? কার এমন হিম্মত? সেলিমের দরজা কে খুলেছিল? ওর পোর্ট-হোল কেন বন্ধ ছিল না?

এই সব প্রশ্নের শেষে তিনি দেখলেন, স্বয়ং এজেন্ট এবং অন্যান্য সব দায়িত্বশীল কর্মচারীরা ওর ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না, এত উত্তেজিত। তবু এই সব দায়িত্বশীল কর্মচারীদের দেখে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মিস্টার ট্রয় নানা রকম প্রশ্ন করে ওঁকে আরও বিব্রত করে তুলেছেন। বিজন, ইটন এবং মকবুল, পরে দেবনাথ পর্যন্ত ফানেলের গুঁড়িতে এসে সন্তর্পণে কাপ্তানের কেবিনের সব খবরগুলো শুনছিল। ওরা শুনে বলল, শালা ঠিক জব্দ হয়েছে এত দিনে।

বিজন মনে মনে এলবিকে ধন্যবাদ জানাল। এলবির লম্বা চোখ এবং ডিমের মতো মুখের গঠন ওর চোখে এখন প্রীতির জোয়ারে ভাসছে। ওর কালো চুলে মনোরম গন্ধ, বিজন গতকাল তা টের পেয়েছে। গতকালের অসহিষ্ণু ভাবটুকু আর ওর ভিতর নেই। এলবিকে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলে খুশি হবে এমত ধারণায় বোট-ডেকে এবং নীচে ভিড়ের ভিতর এলবিকে খুঁজল। এবং খুঁজতে থাকল। অথচ এলবিকে যেই বোট-ডেকে উঠে আসতে দেখল, বিজন তাড়াতাড়ি মাস্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

এলবি, মিস এলবার্টি এবং সিসিল এলবার্টি—যে কোনও নামেই ওকে ডাকা চলে। সে যদি এই

নামে ডাকে নিশ্চয়ই এলবির সাড়া পাবে। এলবি এখন দু'নম্বর বোটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কাপ্তানের ঘরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বিজন সব দেখেও এলবিকে গুড মর্নিং বলতে পারল না কৃতজ্ঞতা জানাতে পারল না। এলবির সঙ্গে যে-কোনও পরিচয়ই এ মুহূর্তে এ জাহাজে মারাত্মক। কাপ্তান তাঁর বিরক্তি ভাবটুকু কলকাতা বন্দর পর্যন্ত পুষে রাখবেন। সারেং সেই ভাবটুকু কলকাতা পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন। তারপর এক শুভদিনে বিজনের নলিতে লাল দুটো দাগ পড়বে। বিজন ব্ল্যাক-লিস্টেড হবে।

সুতরাং সে এলবিকে দেখে আত্মগোপন না করে পারল না। এলবিকে দেখেই মাস্টের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এলবি সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সে যেন কোনও জাহাজিকে প্রশ্ন করছে, বিজন কোথায় কাজ করছে?

বিজন আঁতকে উঠল। সে ধীরে ধীরে টুইন-ডেকে নেমে গেল এবং দু'লাফে ফলকা পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে নিজের ফোকশালে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে অন্য জাহাজিদের বলে দিল কেউ ওকে যদি খোঁজ করে তবে যেন বলা হয় সে জাহাজে নেই। বন্দরে নেমে গেছে।

তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাংকে বসে হাঁপাতে থাকল।

কী সর্বনাশ! বিজন ভাবল। বিজন নিজের ভুলের জন্য নিজেই খেপে গেল। গতকাল যা ওর সবচেয়ে বেশি বলা দরকার ছিল, এলবিকে তাই বলা হয়নি। ওর উচিত ছিল বলা, এ খবর তোমাদের আমি পৌঁছে দিলাম-এ কথা যেন জাহাজের কেউ না জানে। তবে আর গরিবের চাকরিটা থাকবে না। সেলিমের সঙ্গে তবে আমিও মরব। অথচ সেই কথাটাই এলবিকে বলা হয়নি।

এলবি এদিকে এসে দেবনাথকেও প্রশ্ন করল, বিজন কোথায়?

দেবনাথ ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, বিজন তো এখানেই ছিল।

বলে ইতস্তত এদিক-ওদিক চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, চলো কেবিনে। বোধ হয় সে সেখানেই আছে।

নীচে নামবার আগে এলবিকে নিয়ে দেবনাথ একবার গ্যালিতে বিজনকে খুঁজে দেখল। তাকে ওরা সেখানে পেল না।

সেলিম স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। সেলিম কাঁদছে। সারেং বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে। বলছে, ভাল হয়ে গেলেই কোম্পানি তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কাঁদছিস কেন? ভালর জন্যই তোকে হাসপাতালে দিচ্ছে।

বিজন এই বাংকে বসেও যেন টের পাচ্ছে, এইমাত্র সেলিমকে ধরাধরি করে নীচে জেটিতে নামানো হল। সেলিম কাঁদছে। সে বলেছিল, বিবির কোলে মাথা রেখে মরবে। সে বলেছিল, আমার দেশের মাটিতে আমার কবর হবে। সে কথাগুলো বিজনকে বলেছিল। ওর খুব দুঃখ হচ্ছে এ সময় সে কাছে থাকতে পারল না, বলতে পারল না, রোজ আমি যাচ্ছি। বিকেলে যাব। তুই ভয় পাবি না। তুই ভাল হয়ে উঠবি। বলতে পারল না, তখন দরজাটা, কে যেন ঠেলছে। সে এই বাংকে বসে দেবনাথের গলার শব্দ পেল। দেবনাথ বলছে, এই, দরজা খোল। দরজা বন্ধ করে ভিতরে কী করছিস?

বিজন দরজা খুলতেই এলবিকে দেখতে পেল। এলবি দেবনাথের একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিজন বলল, গুড মর্নিং।

তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

কেন, এখানেই তো ছিলাম।

এখানেও খুঁজেছি।

বিজন বিব্রত হয়ে পড়ল।

এলবি ভিতরে ঢুকে বলল, ট্রয়কে কিন্তু সব কথাই খুলে বলতে পেরেছি।

বিজন ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলল, বোসো।

ছোট ঘর, সোফা নেই। একটা ইজিচেয়ার আছে, কিন্তু পাতবার জায়গা নেই। ওরা তিনজন এমত কথায় হাসল।

এলবি বলল, আমি বেশিক্ষণ বসব না। হাতে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেরি হয়ে গেল। ওরা হয়তো এতক্ষণে চলে গেছে। সেলিমকে রয়েল হাসপাতালে রাখা হচ্ছে। আশা করছি বিকেলে ওকে দেখতে যাবে। যেতে অসুবিধা হলে, আমার ওখানে চলে যেয়ো, সেখান থেকে আমি তোমায় নিয়ে যাব।

বলে সে আর বসল না। তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

ওরা দু'জন ফোকশালে বসে এলবির পায়ের শেষ শব্দটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেতে শুনল। দেবনাথ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল বিজনের। বলল, কী করে এ মেয়েকে ধরলি?

বিজন গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং সে এ ব্যাপারে আদৌ উচ্ছল হল না। আদৌ মুখর হল না। সে জবাবে শুধু বলল, পথে আলাপ।

তারপর ওরা দু'জনে চুপচাপ। গ্যালিতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। ওরা সেই গন্ধ নীচে বসে পেল। ওরা দু'জন কথা বলল না, তখন এক এক করে সকলে এসে নীচে নামছে। যে যার হাত-মুখ ধুল। প্লেট-মগ ধুল। এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। ওরা ভোরের এই আকস্মিক ঘটনায় বিস্মিত হয়েছে, খেতে বসে সকলে এমত ভাব প্রকাশ করতে চাইল।

বিজন এই শীতের বিকেলে ডেক-এ এসে দাঁড়াল। ওর পোশাক এবং মুখের কমনীয়তায় শীতের রং অথবা সমুদ্রের রং। ওর শরীরের রঙে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। শীতের দেশ ঘুরে এবং সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় শরীরের রং কমনীয় হতে হতে কোন এক ভোবে বিজন যেন বিদেশির মতো কথা বলতে শিখল।

সে রেলিং-এ দাঁড়িয়ে দেখল দুটো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে এসে নোঙর করেছে। সে ফানেলের রং দেখেই বুঝল আমেরিকান জাহাজ। এবং হয়তো কোনও বিকেলে ভেড়ার মাংস অথবা ফলের বদলে বোঝাই হয়ে অন্য বন্দরে পাড়ি দেবে।

শেষে অন্যান্য অনেক জাহাজির মতো সেও সেলিমের রুগ্ন ফোকশাল অতিক্রম করে গ্যাংওয়ে ধরে বন্দরে নেমে গেল। অন্যান্য দিনের মতো সে আজ সাধারণ জাহাজি হয়ে পথ ধরল না। সবকিছু দেখেই সে চোখ ফেরাল না। সে চলতে থাকল। একজন স্থায়ী বাসিন্দার মতো সে এই ঝরা পাইনের পথ ধরে শহরে উঠে যাচ্ছে। ঝুলন্ত সেতু অতিক্রম করে বন্দরের সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে সে উঠে গেছে। সেই পাঁচ কলিন স্ট্রিট ও সেই মেয়ে এলবি। সে নির্দিষ্ট আস্তানায় উঠে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। মোটরে বসে এলবি এবং ওর ইউনিয়নের হলঘর, ওর চিলতে ঘরটুক.. এলবি সুন্দরী, সে সুখে আছে... এলবির চোখ গভীর, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় . এলবিকে মনে মনে সুন্দরী বিদেশি রমণী এবং আপনার মতো করে দেখার এক সবিশেষ কৌতূহলে সে পীড়িত হতে থাকল। এবং সহসাই শুরু করতে পারল, এলবি যদি বাতিকগ্রস্ত রুগির মতো ফের বলতে থাকে, তুমি ট্যাগোরের কান্ট্রি থেকে এসেছ, তুমি কবির কাছের লোক, তুমি কবিকে দেখেছ সুতরাং তুমি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও, তুমি আমাকে বাংলা ভাষা শেখাও। আমি মূল কবিতার রস পেতে চাই। তা হলে তা হলে! সে শরীরের আড়ষ্টতায় এমত উচ্চারণ করে কেমন জড়বৎ বসে থাকল, সে ড্রাইভারকে বলতে পারল না, তুমি বন্দরে চলো, পাঁচ কলিন স্ট্রিট গিয়ে আমার দরকার নেই।

হলঘরের দরজায় বিজন এলবিকে দেখতে পেল। বিজন ট্যাক্সি থেকে নামল ফুটপাথে। এলবি সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। ওরা পরস্পর অভিবাদন জানাল। তারপর উভয়ে মোটরে চড়ে সেলিমকে দেখতে রয়েল হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। শীতের সন্ধ্যা। এলবির হাতের দস্তানা লাল রঙের। মোজা বেগুনি রংয়ের। বব-করা ব্লন্ডচুলে দুটো প্রজাপতি-ক্লিপ। গলায় সরু সোনার চেনে পাথর বসানো। হলদে স্কার্ট, লাল জ্যাকেট শরীরে। শীতের সন্ধ্যায় এলবিকে এইসব পোশাকে ভীষণ তীক্ষ্ণ মনে হল।

শহরের বড় রাস্তা ধরে ওরা চলেছে। আপাতত ওরা কোনও কথা বলছে না। বিজন শহর দেখছে। বড় রাস্তা, সুতরাং বড় বড় সব কাচ-মোড়া আসবাবপত্রের, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের,

পোশাকের অথবা মোটরের দোকান। ভিন্ন ভিন্ন সব বিজ্ঞাপন ঝুলছে। এলবি দুটো-একটা ক... বলছে এখন। শহরের এইসব দোকানের এবং কোন মুল্লুক ধরে কীভাবে রয়েল হাসপাতালে যাচ্ছে এইসব খবর দিয়ে নিঃশব্দ ভাবটুকু অতিক্রম করছে।

এলবি বলল, জাহাজ তবে অনেকদিন থাকল।

তা থাকল।

প্রায় দু' মাসের মতো হবে।

তা হবে।

পাশের পত্রিকাটা তুলে বিজনকে দেখাল। সামনে মোড় ঘুরতে হবে। নীল বাতি জ্বলছে ... সুতরাং এলবি দু'হাতেই পত্রিকাটা বিজনের হাতে তুলে দিল।

খবরটা পড়েছ?

আকাশে দেখেছি এবং পড়েছি। আচ্ছা এলবি...

বিজন একটা প্রশ্ন তুলে ধরার ইচ্ছায় ঘাড়টা বাঁকাল।

আচ্ছা এলবি, তোমাদের ভিতর থেকে কেউ তো বলেনি এ ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত? পত্রিকা... তেমন খবর নেই তো!

বিজন পত্রিকাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এল। সে খুঁটিয়ে সবটুকু পড়ল। এব... এলবির মুখ দেখে যেন বুঝতে পারছে বিজনের জড়তায় এলবি পীড়িত হচ্ছে।

এলবির কঠিন মুখ সহসা নানা রঙে ক্রমশ নরম হচ্ছে। বিজন, তুমি পাকা জাহাজি হওনি। তুমি... দেখছি মিস্টার ট্রয়কে খুব কাঁচা লোক ভেবেছ। পত্রিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এ ব্যাপারে আমরা কিনারার কুলি লোকদের উপর বেশি নির্ভর করেছি। কথা কী জানো, এখানকার মতো এ... জোরালো ইউনিয়ন পৃথিবীর কম বন্দরেই আছে। পাঁচ কলিন স্ট্রিটে পাঁচ বছর থেকে আছি। এ... ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে জড়ালে কাপ্তান অন্য বন্দরে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ...

ওদের গাড়ি হাসপাতালের দরজায় এসে থামল। গাড়ি পার্ক করে পার্কবোর্ডে নাম লিখে ও... সদর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিজন দেখল, দুটো বৃত্তের মতো বাগান দু'পাশে রেখে উঠে যাচ্ছে। এলবি ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে সিট নম্বর এবং ব্লক নম্বর দেখে নিল। তারপর নম্বর মিলিয়ে ওরা একসময় সেলিমের বিছানার পাশে পৌঁছে গেল।

এলবি বলল, গুড ইভনিং। তোমাকে এখন ভাল দেখাচ্ছে।

বিজন সেলিমের বিছানার পাশে বসে ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, এমন ভেঙে পড়েছিস কেন? আমি রোজ বিকেলে তোকে দেখতে আসব। জাহাজ এখানে অনেকদিন থাকবে। আশা করি ততদিনে তুই ভাল হয়ে উঠবি।

সেলিম পাশ ফিরে শুল। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। বুকে কষ্ট, হাতে-পায়ে যন্ত্রণা। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। এলবি কিছু ফল এনেছিল সঙ্গে। সেলিমের টেবিলে ফলগুলো রাখল। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। সেলিম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে এমন ভাব ওর চোখে-মুখে। অথচ এইসব যন্ত্রণার ভিতরও সেলিম হাসল। একজন ডাক্তার, দু'জন নার্স ওর পাশে এসে এখন দাঁড়িয়েছে। ওরা ওর শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করল। ওরা সেলিমকে বাঁচবার জন্য উৎসাহিত করল।

এলবি একজন সিস্টারকে প্রশ্ন করল, কাল নিশ্চয়ই প্লেট নেওয়া হচ্ছে?

আজ রাতেই হবে। ট্রয় সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

এলবি সিস্টারের প্রতি ধন্যবাদসূচক কথা বলে মাথা নোয়াল।

বস্তুত বিজন এই অসুস্থ পরিবেশে সহজ হতে পারল না। এই অসুস্থ পরিবেশের ভিতর সেলিমকে দেখে সে আহত। সব যুবতী নার্সরা শরীরে অ্যাপ্রন জড়িয়ে ধীরে ধীরে অথচ সত্বর পা ফেলে শরীরে সংযমী ভাবটুকু রক্ষা করে ঘোরাফেরা করছে। ওরা মহীয়সী রমণী হওয়ার ইচ্ছায় দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাসে রত। অথচ হতে পারছে না অথবা বিজন ওদের মহীয়সী রমণীরূপে দেখার চেষ্টা করছে না। সে এলবির মতো একজন নার্সের সঙ্গে আলাপ করতে চাইল। আলাপ করে জানতে

হল, এই যে তোমবা তোমাদেব মুখ মোমেব মতো সাদা নিষ্পাপ কবে বেখেছ, এমত তোমবা পাপ অথবা ককণাঘন কি না।

উঠে পডল। সব ভিজিটাবেব শেষে ওবা প্রশস্ত পথ ধবে বড় বড় সব চত্বব পাব হয়ে সিঁড়ি উপবে উঠে, ফেব সিঁডি ধবে নীচে নেমে হাসপাতালেব সদব দবজায় এসে হাজিব হল। এলবি চলো, একটু ঘুবে আসি। একটু ইউনিভার্সিটিব সামনেব পার্কটায বসব। একটু গল্প কবব। বাত হলে তোমাকে জাহাজে পৌঁছে দিয়ে বাডিতে ফিবে যাব।

গাডিব ভিতব বসে বিজন প্রশ্ন কবল, সেলিম শিগগিবই ভাল হয়ে উঠবে, কী বলো?

নিশ্চযই।

খুব জোব দিয়েই যেন এলবি কথাটা বলল।— সেলিম ভাল হযে উঠলে, তুমি আমি সেলিম গ্রামে যাব। সেখানে আমাব বাবা মা থাকেন। বাবা তোমাকে পেলে কিছুতেই ছাডতে চাইবেন না। তোমাকে পাশে বসিযে কেবল কবিব কবিতা শুনতে চাইবেন।

বলে এলবি মোটবে স্টার্ট দিল এবং জোবে জোবে বিশুদ্ধ সংগীতেব মতো কবিতা উচ্চারণ কবল

When the warriors came out first from
their master s hall where had they hid
their power? Where were their armour
and their arms?
They looked poor and helpless and
the arrows were showered upon them
on the day they came out from their
master s hall
When the warriors marched back
again to their master s hall where did
they hide their power?
They had dropped the sword and
dropped the bow and the arrow peace
was on their foreheads, and they had
left the fruits of their life behind them
on the day they marched back again to
their master s hall '

কবিতা আবৃত্তি কবাব সময আবাব সেই ভাবটুকু এলবিব মুখে —তুমি কবিব দেশেব ছেলে তুমি কবিকে দেখেছ, প্রণাম কবেছ, তোমাব ঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতা আবৃত্তিতে অশেষ আনন্দ। তখন মোটব ছুটছে তখনও এলবি কবিতা আবৃত্তিব সঙ্গে মোটব চালাচ্ছে। শহবেব সব ছোট বড দোকান, বোশনাই আলো, থিয়েটাব-হল অতিক্রম কবে ওবা পশ্চিমেব দিকে চলেছে। এলবি ফেব বিশুদ্ধ গতেব বাসিন্দা হয়ে যেন প্রতিধ্বনি কবল, পিস ওয়াজ অন দেয়াব ফোবহেডস। অথচ বিজনেব পাশে এখন নিষ্ঠুবতাব চিহ্ন। সে এলবিব এই সাহিত্য-প্রীতিতে পীডিত হচ্ছে। যেন বলাব ইচ্ছা— বাপু জাহাজি মানুষ, আমাব ইতস্তত মিথ্যা বলাব নিদাকণ অভ্যাস আছে। সাহিত্য-প্রীতি ওকালে ছিল না আমাব, এখনও নেই।

এলবি বিজনেব দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমবা এসে গেছি। আমবা এখানে বেশিক্ষণ বসব জলপাই গাছেব নীচে বসে তুমি কবিব কবিতা বলো। আমি শুনি।

বিজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে বলতে চাইল, আমি কবিব কবিতা আবৃত্তি করতে পাবব

না। জাহাজি মানুষের কবিতা কণ্ঠস্থ করে লাভ নেই। এই নীরস জীবনে সততার আশ্রয়ে বাঁচ নিরর্থক।

তবু এলবি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলবিকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করছে। এলবি যেখানে বসল, সে সেখানেই বসে পড়ল। এলবির প্রতি বিদ্রূপের ইচ্ছায় অথবা মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় নিরন্তর সে কঠিন। এলবি এখন কোনও কথা বলছে না। এলবি ঘন হয়ে বসল। এলবি বস্তুত বিজনকে কবির প্রতীকীতে অনন্য করে রাখতে চাইল।

বিজন মরিয়া হয়ে শিশু-বয়সে পড়া কোনও কবিতার কথা মনে করতে পারল। (দশম শ্রেণিতে কবির কবিতা সে কিছু পড়েছে। কিন্তু এখন বিধির বিধানে তাও মনে করতে পারছে না। তা ছাড়া ঘটনাটা এমত শীঘ্র ঘটবে সে তাও ভাবতে পারেনি।) সে আবৃত্তি করল। ওর কণ্ঠ মসৃণ বলে কবির আবৃত্তির বিশুদ্ধ ভঙ্গিটুকু এলবিকে আপ্লুত করল।

বিজন টেনে টেনে আবৃত্তি করছে—

> "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
> কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
> রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
> শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

ওরা পরস্পর কথা বলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ওঁরা উভয়ে যেন গম্ভীর এবং ঘন উভয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিশুদ্ধ ইচ্ছায় পরস্পর মহৎ ভাবটুকু রক্ষা করছে।

বিজন এলবির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীতে বাঁচবার ইচ্ছায় এও বলল, গাড়িতে যে কবিতা আমাকে শোনালে এ কবিতা তারই মূল ভাষা।

বিজন ভাবল, বন্দরে আমি এলবির চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঁচব।

তারপর এলবির গাড়ি থেকে একসময় বিজন জাহাজে উঠে ফোকশালে ঢুকে দেখল, দেবনাথ বাংকে ঘুমিয়ে আছে। অন্যান্য কেবিনেও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক শীতে সব জাহাজিরা কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজে ঘুমোচ্ছে। সে ফোকশালে দাঁড়িয়ে কিছু কাশির শব্দ শুনল দু'-একজন জাহাজির আলাপ শুনল। এই শীতে উপরে উঠে হাত-মুখ ধুতে ইচ্ছা হল না কোনওরকমে লকার থেকে খাবারটা বের করে খেয়ে নিল। তারপর ঠান্ডা জলে কুলকুচা করে পোর্ট-হোলে মুখ ধুল এবং বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় হাত-পা সটান করে দিল। অথচ ঘুম এল না। ঘুম আসছে না। বিজন অন্য ফোকশালে ফের কিছু জাহাজির আলাপ শুনছে। এখন হয়তো এলবি ঘরে ফিরে অন্য কবিতা আবৃত্তি করছে। এই বাংকেও সে এলবির কাছে মিথ্যার মুখোশের জন্য ছটফট করছে। অথচ সে স্পষ্ট হলে সাময়িক যন্ত্রণা, দুঃখ এবং নিষ্ঠুরতার গ্লানিকে ধৈর্য ধরে লালন করতে হত না, এই করে সে এক মিথ্যার জন্য হাজার মিথ্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

ওর ইচ্ছা হল একবার দেবনাথকে ঘটনাটা খুলে বলে। সাহিত্য-প্রীতি এবং স্পৃহা দেবনাথের যথেষ্ট আছে। বরং সে দেবনাথকেই সঙ্গে নেবে। অথবা দেবনাথকে প্রশ্ন করে জানবে, ওর কাছে কবির কোনও বই অথবা কোনও কবিতা কণ্ঠস্থ... যদি থাকে তবে... তবে...সে নিঃসংশয় হতে পারছে না তবু। দেবনাথ! দেবনাথ! সে যেন ডেকেই উঠল। মনে মনে ওর এই ডাক এবং এলবির সরল বিশ্বাস, দুটো চোখের ঘনিষ্ঠতা, সব মিলিয়ে ওর চোখে জ্বালা। ওর ঘুম আসছে না। এলবি 'পাখি সব করে রব' ইংরেজি হরফে লিখে নিতে চেয়েছিল। সে হয়তো এইসব মুখস্থ করে অন্য কোথাও আবৃত্তি...কিংবা বাহবা... কিন্তু বিজন বলেছে তখন শরীরটা ভাল নেই। আবার কাল হবে। আবার সে ছলনাকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চাইল। এলবির ঘনিষ্ঠতা, সঙ্গ এবং দু'দণ্ডের আলাপ থেকে বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতায় সে বাঁচতে চাইল না। বিশেষত এই বিদেশিনীর কাছে স্পষ্ট হওয়ার দরুন কোনও পরাভবকে স্বীকার করার দরুন, কোনও গ্লানিকে সহ্য করতে পারত না। অপমানবোধটুকু বিজনের অসামান্য। সেজন্য এই মিথ্যার মুখোশে আপাতত জাহাজি ভাবটুকু রক্ষা করতে পেরেছে ভেবে সে খুশি।

ভোরবেলায় জাহাজে অনেক কাজ। সালফেট নামানো হচ্ছে। হাবিয়া-হাপিজ হচ্ছে ফলকায় ফলকায়। ভোরে আজ সূর্য উঠল না। আকাশ মুখ গোমড়া করে আছে। সমুদ্রের বাতাস পর্যন্ত। বন্দরের পাইন গাছে কোনও পাখি বসে নেই। শীতের জন্য ওরা কোথাও চলে যাচ্ছে। শীতের জন্য এইসব জাহাজিরা হি হি করে কাঁপছে। ওরা সাবান-জল নিয়ে আজ ছুটে ছুটে কাজ করতে পারছে না। ওরা স্থাণুর মতো নীল উর্দির ভিতর গুটিয়ে আসছে। ওরা পুরানো জামা-কাপড় সব আফ্রিকার বন্দরে বিক্রি করে এখন পস্তাচ্ছে। শীতের কষ্ট ভয়ানক কষ্ট।

পাশের জাহাজে কীসের যেন শোরগোল। পাশের জাহাজের নাবিকেরা পোর্ট সাইডের ডেকে জড়ো হয়েছে। ওরা রেলিংয়ের উপর ঝুঁকেছে। ওদের সকলের চোখ বন্দরের জলের উপর। এই জাহাজের নাবিকেরা ঘটনাটা ধরতে না পেরে গলুই-এ জড়ো হয়েছে। মেজ-মালোম অন্য জাহাজিদের ডেকে ঘটনার কথা জানতে চাইলেন। ওরা সকলে এখন খবরটা শুনছে। পাশের জাহাজের তিন নম্বর মিস্ত্রি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটা তারপর আরও বিস্তৃত হল। বন্দরের সব লোক জমেছে। এ শীতেও কিছু লোক জলে নেমে অনুসন্ধান করছে তিন নম্বর মিস্ত্রিকে, কিন্তু মিস্ত্রিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইংল্যান্ডে ওর স্ত্রী অ্যাডালট্রি কেসে জড়িয়ে পড়ছে, এই খবরটা এখন জাহাজিদের মুখে মুখে।

ভোরের এইসব সাত-পাঁচ ঘটনায় বিজন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওর মনে নেই এবং মনে পড়ছে না কাল এক রমণীয় পরিবেশে কোনও এক সুন্দরী যুবতীর পাশে মরিয়া হয়ে মিথ্যার পসরা খুলেছিল। মনে পড়ছে না আজও এমত ঘটতে পারে। একজন জাহাজির আত্মহত্যা এবং সালফেটের ... আর এই প্রচণ্ড শীত ওকে ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিলকুল বিপরীত ধারণার বশবর্তী করেছে। সে ... কেবল মৃত্যুই শ্রেয়, মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। পিস ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেডস —সে এ কথাও ভাবল। ... মের কপালে শান্তির রেখা ফুটে উঠেছে হয়তো। এলবির সেই মুখ, সেখানেও একদিন শান্তির ... নামবে, কবিতা আবৃত্তির সময় এলবির সেই গভীর দৃষ্টি সেই দৃঢ় অথচ প্রীতিপূর্ণ চোখ সে ... এ দাঁড়িয়ে নিঃস্ব পাইনের আঁধারে সহসা যেন দেখল। এলবি তাকে ভালবাসতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতো করে ভালবাসতে চায়। বিজন যেন এখন কবির প্রতীকীতে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় ... হয়ে উঠল। সে ডাকল, দেবনাথ, দেবনাথ নীচে এসো, কথা আছে। বিকেলের কথা রাখার জন্য ... নীচে সিঁড়ি ধরে ফোকশালে ঢুকে গেল।

তুমি তো অনেক বই এনেছ সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কোনও বই আছে তোমার কাছে? এইসব ... ইচ্ছা হল।

সে দেবনাথের কাছেই একটা খাতা পেয়ে গেল। সে তিক্ত বিস্বাদে খাতার পাতা উলটাচ্ছে। সে ... বার করে একই কবিতা পড়ল। পড়ে মুখস্থ করল। সে পড়ল—

> "জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
> ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।"

বিকেলে গাড়ি নিয়ে এলবি বন্দরে হাজির। বন্দরে সে বিজনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিনারার ... নাবিকরা এখন জাহাজের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছে। ওরা সকলে এলবিকে অভিবাদন জানাল। ... গ্যাটার-মাস্টার তখন খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন বিজনকে। বিজন একবার গলুই-এ উঠে উঁকি দিয়ে এলবিকে দেখল। সে একবার আবৃত্তি করল সিঁড়ি ধরে নামার সময়। সে একবার সেলিমের হাসপাতালের দৃশ্যে, পরে এই কবিতার সুরে এবং আরও পরে পোশাকের ভিতর ঢুকে গিয়ে অম্লান ... ইচ্ছায় শিস দিতে থাকল।

নীচে নেমে ওরা উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। বিজন মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করল, সেই নির্দিষ্ট কবিতা, সেই সুরে, সেই নিঃস্ব অথচ ভরা কোটালের মতো আবেগধর্মিতায়। অথচ এলবিকে জানতে দিল না মনে মনে সে এখন কবিতা আওড়াচ্ছে। মনে মনে সে এখন কবিতার সেই বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বেঁচে আছে। সে সেলিমের পাশে বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বসবে। সে সেলিমের

মাথায় হাত বুলিয়ে বিশুদ্ধ শান্তি দেবে। বলবে, তুই ভাল হয়ে উঠবি। বলবে, নার্সকে গ্রেট কী বলছে? আর কতদিন সেলিমকে এখানে থাকতে হবে?

গাড়িতে ওরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলল। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, এমনকী রয়েল হাসপাতালে দু'জন ভাবতীয় মেয়ে নার্স ট্রেনিং-এ আসছে এ খবরও দিল এলবি। ওর বাবা পাশে যাচ্ছেন। মা এবং বাবা হয়তো যাওয়ার পথে একবার এখানে এসেও যেতে পারেন। কারণ এলবি বিজন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে দিয়েছে। সুতরাং বাবা আসছেন, মা আসছেন।

এলবি গাড়ি চালাবার সময় একবার হাতের ঘড়ি দেখল। যেন আজ হাতে কিছুটা সময় বেশি আছে। খুব বিশেষ তাড়া নেই কাজের। গাড়ির গতি সাধারণ। এলবি খুব খুশি হয়ে কথা বলছিল বলছিল, আশা করি সেলিমের ভাল খবরই আমরা পাব।

ওরা হাসপাতালে কিন্তু শুনল অন্য কথা। ট্রয় সেলিমের কাছে এলবির নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন। এলবি চিঠিটা পড়ল। এলবিকে এখন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বিষণ্ণতা বিজনেও সংক্রমিত হল।

এলবি বলল, সেলিমের মেজর অপারেশন হবে। বাঁদিকের ফুসফুসটা বাদ যাবে।

এলবি এইসব কথা হাসপাতালের সিঁড়ি ধরে নামার সময় বিজনকে শোনাল।

বিজন বিছানায় বসে সেলিমের সঙ্গে রঙ্গতামাশা করেছিল। দেশে ফিরলে সেলিম বিবিকে প্রথম কোন জাহাজি বন্ধুর গল্প শোনাবে, প্রশ্ন করতে বিজন জানতে চেয়েছিল আরও অনেক সব কথা বিজন সব যেন মনে করতে পারছে না।

অন্যান্য দু'-একজন জাহাজিও ওর পাশে বসেছিল। সারেং বলে পাঠিয়েছেন তিনি কাল এসে দেখে যাবেন। বিজন সেলিমের বিছানায় শেষ সময়টুকু পর্যন্ত কাটাতে পেরে খুশি। তারপর ভিজিটারদের শেষ ঘণ্টা পড়ল। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সেলিমের অস্ত্রোপচারের কথা শুনল। এবং এই শুনে বিজনের কেমন অন্যমনস্কতা বাড়ছে। এলবি গাড়িতে বসে লক্ষ করছে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় বিজন খুব ভেঙে পড়ছে। এলবির এখন বিজনকে উত্তেজিত করার ইচ্ছা। জাহাজি বিজন কেমন মফস্বলের মেয়েমানুষ বনে যাচ্ছে।

ওরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কটায় ঢুকে গেল, যেখানে মিমোসা ফুলেরা ঝরে গেছে, যেখানে রেস্ট-রুমে বসে যুবক-যুবতীরা সব শরীরী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, যেখানে বাটারকাপ ফুল ফুটে একদা সুন্দরী রমণীর টুপির পালকের মতো উদ্ধত হতে হতে শীতের তাড়নায় মলিন হয়ে গেছে. তার ভিতর দিয়ে জলপাইয়ের ঘন বন পার হয়ে ইউক্যালিপটাসের ঘন আলো-আঁধারে ওরা বসে পড়ল। পাতার আড়ালে আড়ালে সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলো। আলোর ছায়া। জাফরি-কাটা রং ওদের শরীরে, মুখে। ওরা এ সময় পরস্পর মুখ তুলে তাকাল।

বিজন বলল, সেলিম আমার সঙ্গে দু'সফর ধরে কাজ করছে। দু' সফর ধরে ওর সঙ্গে উঠে বসে কখন যে আমরা একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছি জানি না। এখন বুঝতে পারছি ওর অভাবটা জাহাজে আমার কত বড় হয়ে বাজছে।

তারপর ওরা এইসব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলোয় অথবা মনের আরও সব নীল ইচ্ছায় প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে, তারপর সেই কবিতার জগতে ফিরে আসা, কবিতার জগতে ডুবে যাওয়া, ইতিহাসের মৃত নায়কের মুখের মতো ছবি হয়ে বসে থাকা এবং অবশেষে নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে মনে মনে অচঞ্চল থাকার বাসনা, এমন একদিন হয়নি, অনেকদিন হয়েছে। ওরা পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। এলবি বিজনকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওর হাতের আঁকা ছবি দেখিয়েছে। তারপর কোনও রেস্টুরেন্টে অথবা নীল আকাশের নীচে বসে সেলিমের অস্ত্রোপচারের দিনের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়েছে।

একদিন এলবি বলল, বাবা-মা কাল আসছেন।

জিলং এখান থেকে কত দূর? —প্রশ্ন করেছিল বিজন।

খুব বেশি দূর নয়। গাড়িতে ঘণ্টা চারেকের রাস্তা।

কীসে ওঁরা আসবেন?

ট্রেনে আসা যায়। বাবা মোটরে আসছেন। খুব প্লেজান্ট জার্নি।

তারপর একটু থেমে এলবি আবার বলল, ওঁদের সঙ্গে আলাপে তুমি খুশি হবে।

আমার সঙ্গে আলাপে ওঁরা খুশি হবেন তো?

এলবি হাসল।

দু'দিন পর এলবি ওর বাবা-মার সঙ্গে বিজনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ওঁরা বিজনকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য তোমাকে আমাদের ভিতর পেয়েছি। পরম সৌভাগ্য, এলবি এ সময় খবর দিয়ে তোমার কথা জানিয়েছে। আমরা সকলেই কবির খুব ভক্ত। তুমি তাঁর দেশের লোক। তুমি ওঁর স্পর্শলাভ করেছ এবং আমরা তোমার সঙ্গলাভ করেছি ভেবে খুশি।

এলবির বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিজন সত্যি খুশি। ভদ্রলোক অমায়িক। ভদ্রলোক গুণ উচ্ছল অথচ কথাবার্তায় খুব সংযত। বিজনের মুখ থেকে কবির কবিতা শোনার একান্ত ইচ্ছা ওদের। বিজন পরপর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করল।

ওঁরা খুশি হয়ে বললেন, তুমি আমাদের কথা দাও ডিনারে একদিন উপস্থিত থাকবে। আমরা খুব আনন্দিত হব তোমার উপস্থিতিতে।

দিন স্থির করুন, আসব।

কিন্তু একটা কথা। —চার্লটন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরালেন এবং টেবিল ঘুরে এসে বিজনের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা তোমাকে চাইনিজ ডিশ দেব। খুব মনোরম খেতে। কিন্তু...।

এলবি এবার আর-একটু প্রকাশ করল।

বাবা চায়নাতে অনেকদিন ছিলেন। অ্যামব্যাসিতে কাজ করতেন। সুতরাং বাবা কোনও ভদ্রলোককে ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেই তাঁকে চাইনিজ ডিশ দিতে ভালবাসেন।

চার্লটন আবার আরম্ভ করলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে কবির দেশের ছেলে তুমি, বলতে গেলে ঘরের ছেলে। সুতরাং কবি কী খেতেন এবং খেতে ভালবাসতেন, নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। মেনুতে টাগোর-ডিশও একটা থাকবে, কী বলো? তার প্রিপারেশনের ভার তোমার উপর। কী কী লাগবে বলে দাও, আমি সব সংগ্রহ করে রাখব। আগামী শনিবার ছুটির দিনে আমরা এখানে ফের আসব।

এবার তিনি থামলেন। পাশে মিসেস চার্লটন উল বুনতে বুনতে লাফিয়ে উঠলেন, বড় চমৎকার হবে। এলবির পিসিকে বললে হয়।

তারপর আরও দু'-একজনের নাম তিনি বলে গেলেন।

বিজন বলল, রান্নাতে আমি অভ্যস্ত নই। দেবনাথ বলে একজন জাহাজি আছে, সেও বাঙালি, সে ভাল রাঁধতে জানে। ওকে নিয়ে আসব।

এলবি টেবিলের উপর খাতা রেখে বলল, কী কী সংগ্রহ করতে হবে বলো।

কিছুই দরকার হবে না। কারণ মশলাপাতি তুমি এখানে কোথাও খুঁজে পাবে না। সরষের তেলও বোধহয় নেই। দেবনাথকেই বলব সব সংগ্রহ করতে। পারো তো কিছু ডিম, মাংস এবং ভেজিটেবল সংগ্রহ করে রেখো, তাতেই চলবে।

এলবি দীর্ঘদিন পর আজ সকলকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাল। বিজন দেখল আগুনের মতো রং এলবির, সাদা স্কার্ট এবং হলুদ জ্যাকেট থেকে সেই রং যেন চুঁইয়ে পড়ছে। বাইরে শীতের ঠান্ডায় যেন তুষার ঝরছে। ওরা তিনজন আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিসেস চার্লটন উনুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন। চার্লটন চিনদেশের গল্প করছেন এখন। সে-দেশের রীতিনীতির গল্প করছেন। এলবি এখন আর পিয়ানো বাজাচ্ছে না। চেয়ারে বসে সেও বিদেশের গল্প শুনছে। সহসা এইসব কথার ভিতর বিজন যেন দেখল ওরা সকলে একই পরিবারভুক্ত লোক হয়ে শীতের রাতে উনুনের পাশে আগুন পোহাচ্ছে। মনে হল বাংলাদেশেরই কোনও পরিবারের ভিতর বসে বসে যেন ঠাকুমার গল্প শুনছে।

দেবনাথ এবং বিজন সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেল। ছুটির দিন। এই শীতের ভিতরও শহরের সব যুবক-যুবতী ছুটি ভোগ করতে দলে দলে বের হয়ে পড়েছে। ওরা সব রেস্তোরাঁয়,

পাব-এ অথবা পার্কে কিংবা শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। দেবনাথ এবং বিজন হেঁটে যেতে যেতে সব টের পাচ্ছে। ওদের হাতে ছোট ব্যাগ, ট্যাগোর ডিশের জন্য যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা ওরা ওরা গল্প করতে করতে অথবা অযথা উচ্ছল হতে হতে হাঁটছে।

ওরা বন্দর ফেলে জনসন রোড ধরে ছোট্ট পাহাড়টায় উঠে গেল। এখানে ছোট ছোট কাঠের ঘর নীল অথবা হলুদ রংয়ের। দরজায় নীল রংয়ের পালিশ। বাড়ির সংলগ্ন ছোট ফুলের বাগান, সবজির বাগান। প্রচণ্ড শীতের জন্য বাগানে কোনও ফুল অথবা সবজির চিহ্ন নেই। গোলাপেরা শুধু কুঁড়ি মেলার চেষ্টা করছে। ওরা দ এর মতো পথে, কখনও সিঁড়ি ভেঙে, কখনও ঘুরে ঘুরে এলবির ছোট নীল আস্তানায় গিয়ে হাজির হল। প্রথমেই ছোট কাঠের দরজা। সংকীর্ণ ফুটপাতের বাঁপাশের থামটায় লেখা 'শান্তির নীড়' তামার প্লেটে খুব চকচক করছে। সদর দরজার উপর আইভিলতার গুচ্ছ। পাতা নেই, শুধু লতাগুলো দুলছে। ভিতরে বাঁপাশে মুরগির ঘর। ডানপাশে ফুলের বাগান 'এল' অক্ষরে পথ। পথের দু'পাশে নানা রকমের সামুদ্রিক পাথর। অন্যপাশে কোমর-সমান কাঠের রেলিং-এ কিছু প্রজাপতি বসে আছে। চার্লটন এবং মিসেস চার্লটন বের হয়ে এসে ওদের অভিবাদন জানালেন। বললেন, গতকালই আমরা এসে গেছি।

এলবিও সেজেগুজে বের হল। যেন ফুলের মতো এই শীতের হালকা রোদে ফুটে উঠল। এলবি ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। বিজন দেবনাথের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। এলবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেবনাথকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। এই ওর বাড়ি, এখানে সে থাকে, এই ওর ঘর, এখানে সে রাঁধে, এই ওর ইজেল, এখানে সে ছবি আঁকে। দেবনাথ সব ঘুরে ঘুরে দেখল। এলবির একটি বিশেষ রুচি আছে এ বোধ ওর এখন জন্মাচ্ছে। ঘরে সব বড় বড় ক্যানভাস। নানা রঙের ছবি।

ওরা এসে পাশের ঘরটায় বসল। চার্লটন কতকগুলো ছোট ছোট কাঠি এনে পাশে রাখলেন মসৃণ করার জন্য কিছু সিরিশ কাগজ। তিনি সকলকে কাঠিগুলো দেখালেন, এগুলো রাইস-স্টিক তারপর দু' আঙুলের ফাঁকে কাঠি চেপে ধরার কায়দাকানুন শেখাতে থাকলেন দেবনাথ এবং বিজনকে। দেখালেন, কী করে স্টিক ধরতে হয়, কী করে মুখে ভাত তুলতে হয়। একটা খালি চিনেমাটির বাসনও রাখলেন সামনে। ছোটখাটো একটা ডেমনস্ট্রেশন দিলেন।

দেবনাথ এইসব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। সে ঘড়ি দেখল। এখন দশটা বাজে। এখনও এলবি টেবিল সাজাচ্ছে। কখন রান্না হবে এবং কখন খাওয়া হবে এই ভেবে সে উষ্মা প্রকাশ করল।

একটি ঘরকেই এলবি কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করে নিয়েছে। এ ঘর থেকে সে ঘরে যাওয়ার একটি মাত্র খোলা পথ। একটি মাত্র দরজা। দরজায় পাল্লা নেই। দরজায় চাইনিজ সিল্কের দামি পর্দা। পর্দা সরালেই ঘরটা স্পষ্ট। পর্দা সরালেই ধবধবে বিছানা স্পষ্ট। দেবনাথ পর্দা সরিয়ে সব দেখল। বারান্দার দক্ষিণদিকে চিলতে রান্নার জায়গা। পরে বাথরুম, পাশে ছোট একটি লনের মতো জায়গা। সেখানে গরমের দিনে ইজিচেয়ার নিয়ে বসা যায়। সেখানে একটি ভাঙা ইজেল এখনও রেলিঙের সংলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ছুটির দিনে এলবি সেখানে ছবি আঁকে।

ওরা উঁচু জায়গায় বসে বন্দর দেখল। বন্দরের জাহাজ দেখল। এখানে বসে অসীম সমুদ্রের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের নীচে সারি সারি ছবির মতো ঘর, ছবির মতো মানুষেরা হাঁটছে দেবনাথ চারপাশটা চোখ মেলে দেখল।

দেবনাথ ফের ঘড়ি দেখে বাংলাতে বিজনকে বলল, ওরা কি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খালি-পেটে রাখার ব্যবস্থা করছে নাকি! এখন বাজে সাড়ে দশটা, অথচ রান্নার কোনও আয়োজনই করছে না।

বিজন বলল এলবিকে, সব জোগাড় আছে তো?

অর্থাৎ এই কথা বলে বিজন রান্নার প্রসঙ্গে আসতে চাইল।

এলবি ফুলদানিতে কিছু সংগ্রহ-করা ফুল ভরে দিল। তারপর বিবাহিত রমণী-সুলভ চোখে বিজনকে দেখল এবং বলল, সবই এনেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না। রান্নাঘরে ঠিক আমরা এগারোটায় ঢুকব। এবং আশা করছি ঠিক বারোটায় রান্না শেষ করতে পারব। ট্যাগোর-ডিশের কী কী মেনু হবে? —এলবি দেবনাথকে প্রশ্ন করল।

দেবনাথ বলল, মেনু বেশি করতে হলে অনেক সময়ের দরকার হবে।

বস্তুত দেবনাথ ডিমের ঝোল অথবা মাংসের ঝোলই ভাল রান্না করতে পারে। মাংসের ঝোল করতে বেশি দেরি হবে বলে সে বলল, রাইস এবং এগ-কারি।

এলবি বলল, রাইস তো চাইনিজ ডিশেও থাকবে। সুতরাং একমাত্র এগ-কারি।

একসময় দেবনাথ এবং চার্লটন রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। দেবনাথ সঙ্গে করে গুঁড়ো মশলা এনেছে। এলবি দেবনাথকে সিদ্ধ ডিমের কৌটা খুলে বড় বড় কিছু ডিম বের করে দিল। মিসেস চার্লটন এবং হেলেন ওঁদের সকলকে কাজে সাহায্য করলেন। গ্যাসের উনুনে আতপ চালের ভাত হল। এই ভাত রান্নার কৌশলটুকু আয়ত্ত করে চার্লটন এখন গৌরব বোধ করছেন। তিনি ভাত রান্নার সময় গল্প করছিলেন—কোথায়, কখন এবং কী কৌশলে তিনি এই দুর্লভ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। অন্তত হাজারবার সেই নির্দিষ্ট চাইনিজ মহিলাটিকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন। জানালেন, ভদ্রমহিলা খুব হৃদয় দিয়ে তাঁকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছেন।

এলবি কৌটা থেকে কিছু কর্ন-বিফ বের করে দিল। মিসেস চার্লটন ময়দার ডেলা গোল করে সেই কর্ন-বিফ ভিতরে ভরে দিচ্ছেন। সেগুলো জলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। এ সময় ভয়ানক উৎকট গন্ধে বিজন ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে চলে এল এবং অনেকক্ষণ ধরে একা একা পায়চারি করল।

এক ঘণ্টার ভিতরেই প্রায় সব হয়ে গেল। রাতে ছোট একটা ভেড়ার বাচ্চা রোস্ট করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু ওটাকে ফের চর্বি মাখিয়ে গরম করে নেওয়া হল। গ্রিন পিজ সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। কিছু স্যালাড, স্যান্ডউইচ। ইতিমধ্যে ট্রয় এসে গেছেন, টনি এসে গেছে, এলবির পিসিও এসে পড়লেন। এবং অন্যান্য আরও দু'-একজন অপরিচিত ব্যক্তি, যাঁরা সকলেই চার্লটন অথবা মিসেস চার্লটনের বন্ধু পর্যায়ের। ওঁরা ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন জানালেন এবং পরিচিত হলেন।

খাবার টেবিলে ওঁরা সকলে সকলকে সাহায্য করলেন। খেতে বসার আগে এলবি বলল, আমরা ভগবানের পৃথিবীতে নিত্য দুটো আহার্য গ্রহণের সময় সকলে প্রার্থনা করব, বেচারি সেলিম আরোগ্য লাভ করুক।

সকলে দাঁড়ালেন এবং মিনিট দুই কাল সেলিমের নিরাময়ের জন্য অধোবদনে থাকলেন। তাঁরা সকলে প্রার্থনা করছেন। এলবিকে যথার্থই এখন কোনও বাঙালি আটপৌরে গৃহিণীর মতো মনে হচ্ছে।

খেতে বসেই খুব উৎসাহের সঙ্গে চার্লটন ভোজ্যদ্রব্যের ফিরিস্তি দিলেন প্রথম। কিছু রাইস-স্টিক পরস্পর পরস্পরকে দিলেন। প্রথমেই চিনেমাটির বাসনে কিছু ভাত এবং আধসিদ্ধ মাংসপুর, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো চার্লটন সকলকে পরিবেশন করলেন। এবং কাঠির সাহায্যে সকলকে খেতে অনুরোধ জানালেন। এইসব আধসিদ্ধ মাংসপুর, ভাত কাঠির সাহায্যে মুখে তুলতে গিয়ে বিজন ওয়াক তুলতে তুলতে বলে ফেলল, যথার্থই চমৎকার আপনার এই চাইনিজ ভোজ্যদ্রব্য।

সঙ্গে সঙ্গে চার্লটন মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, বলেছি না, ওরা তারিফ করবে। চিন ভারতবর্ষ পাশাপাশি দেশ। সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ওরা প্রায় এক।

দেবনাথ ছোট ছোট চোখে চার্লটনকে দেখল। ইচ্ছে হল ডিশের সবগুলো ভোজ্যদ্রব্য চার্লটনের মুখে ছুঁড়ে দেয়। অথচ সেও বলল, ভেরি নাইস।

দেবনাথ এবার ট্যাগোর-ডিশের এগ-কারি সকলকে পরিবেশন করল। সে জানত, লঙ্কার গুঁড়োটা একটু বেশিই পড়েছে। সে জানত, ঝাল খেয়ে ওঁদের জিভ টাটাবে। সে বিদ্রুপ করে বলল, ট্যাগোর ঝাল একটু বেশি খেতেন।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাল চার্লটনের মাথায় উঠে গেল। চার্লটনের মাথায় টাক, তিনি তালুতে ঠান্ডা হাত রাখলেন। ঝাল খেয়ে অন্য সকলের ঠোঁট কুঞ্চিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে। সকলে মাথায় ঠান্ডা হাত রাখলেন। সকলে জল খেলেন প্রচুর। এবং গাদা গাদা চিনি খেলেন। চোখ সকলের ভারী হয়ে উঠেছে, লাল হয়ে উঠেছে। ওঁরা তবু কোনওরকমে উচ্চারণ করলেন, গ্র্যান্ড! ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যান্ড!

দেবনাথ এবং বিজন ভাতের সঙ্গে ডিমের ঝোল বেশ তৃপ্তি করেই খেল। ওরাও বলল,

ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যান্ড। তারপর ওরা কাঠি দিয়ে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করল। কিছু খেল, কিছু নষ্ট হল। তারপর স্যান্ডউইচ, গ্রিন পিজ এবং ল্যাম্ব-রোস্ট খেয়ে ওরা খুশি হতে পারছে। ওদের এখন সেই ত্রাহি-ত্রাহি ভাবটুকু নেই। শেষে কফি খেয়ে ওরা সকলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। সকলের মুখ দেখে মনে হবে এখন এইমাত্র টেবিলে বড় রকমের একটা ঝড় বয়ে গেছে।

বিকেলে স্টেশন-ওয়াগনে মিস্টার এবং মিসেস চার্লটন জিলঙের উদ্দেশে রওনা হলেন। ট্রয় ও অন্যান্য দু'-একজন আগেই চলে গেছেন। এলবির পিসি গেলেন এইমাত্র। যাওয়ার আগে দেবনাথ এবং বিজনকে ওঁর ঘরে একদিন নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

এরপর এলবি বিজন এবং দেবনাথকে নিয়ে হাসপাতালে গেল। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ওরা তিনজন যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন দেবনাথ বলল, এবার আমি যাই। জাহাজে আমার একটু দরকার আছে।

গাড়ির ভিতর এলবিকে আজ একটু উচ্ছল বলে মনে হল। এলবি বলল, দেখবে, সেলিম ভাল হয়ে উঠবে। ওকে আজকে খুব ভাল দেখাচ্ছিল। সে নিজে এখন উঠতে নামতে পারছে। এখন অপারেশন হলে বাঁচি।

বিজন বলল, আমিও আশা করছি। আমরা একসঙ্গে দেশে ফিরতে পারব। একসঙ্গে ফিরতে পারলে খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে।

এলবি কথা বলল না। এলবি সন্তর্পণে ওর মুখ দেখল। বিজনের মুখে যেন এখন আর কোনও যন্ত্রণার ছবি নেই। যেন সে এমত ঘটনায় যথার্থই আনন্দিত হবে। এলবি স্টিয়ারিং-এ বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ওরা আবার জাফরি-কাটা আলো এবং পাতার ছায়ায় এসে বসল। বিকেল থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইছে না। ওরা আজ পাশাপাশি বসল না। ওরা মুখোমুখি বসল। এলবি আজ ইচ্ছা করেই পরপর চার-পাঁচটি কবিতা শোনাল বিজনকে। আর বিজনকে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোনও অনুরোধ করল না, এমনকী বিজন কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে তাও লক্ষ করল না। এবং এই কবিতা-আবৃত্তির সময়েই এলবির একটু মদ খেতে ইচ্ছে হল। বলল, তুমি একটু মদ খাবে, বিজন।

সে রাতে উভয়ে মদ খেয়েছিল। অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়নি। পরস্পর গোলাপি নেশায় উন্মত্ত হয়নি। তবু কেন জানি বিজন ঘাস থেকে উঠতে পারছিল না। সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওর দস্তানা খুলে যাচ্ছে। পেটের ভিতর এক দুরন্ত যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। সে বলল, এলবি, আমি আর পারছি না।

এলবি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজনকে তুলে ধরল এবং ধীরে ধীরে মোটরের ভিতর এনে শুইয়ে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে বিজনকে নিজের খাটে শুইয়ে দিল এবং ফোন তুলে ডায়াল করল। বলল, ক্যারল আছেন? ড. ক্যারল। প্লিজ ফাইভ বাই এইট নটিংহিল। পেশেন্ট সিরিয়াস।

ডাক্তার বিজনকে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, কনস্টিপেশনের জন্য এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। দু'দিনেই ভাল হয়ে উঠবে। দু'রকমের পিল থাকল। এখন একটা খাইয়ে দিলেই ব্যথাটা কমে আসবে। পেটে একটু গরম জলের সেঁক দিতে পারেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেছেন। এলবি বিজনকে বলে দু'মিনিটের জন্য বাইরে গেছে। বিজন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দেয়ালের সব ছবি দেখল। বড় বড় সব ক্যানভাসে নানা রংয়ের ছবি। কবির ছবি দেওয়ালে। হলুদ রঙের দেওয়াল। এলবির হাতে আঁকা কবির এই ছবি যেন বিজনকে বিদ্রূপ করছে। যেন বলছে, বাপুরা, যা হোক তোমরা আমাকে নিয়ে তামাশা করলে! বিজন এই যন্ত্রণার ভিতরও প্রথম দিনের কথা ভেবে অনুতপ্ত। বস্তুত সে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওর প্রথম দিনের ইচ্ছাকৃত তামাশার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

এলবি ঘরে ফিরেই বিজনের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল। তারপর জল এনে পিল খাইয়ে দিয়ে হট-ওয়াটার ব্যাগে পেটে সেঁক দিতে থাকল। অধীর আগ্রহে সারারাত জেগে ওর পাশে বসে থাকল। ভোররাতের দিকে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে বিজন যেন মুক্তি পেল। বিজন পাশ ফিরে এলবির সেই আন্তরিক এবং প্রীতিপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে বলল, এলবি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।

এলবি ওর কপালে হাত রাখল শুধু। কোনও কথা বলল না। বিজন ওর চোখ দেখেই বুঝল, বুঝতে পারছে, এ মুহূর্তে ওকে নিরাময় করে তোলার কী আকুল ইচ্ছা এলবির চোখে।

ভোরের দিকে বিজন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং ঘুম ভাঙতে ওর দেরি হল। জানালার রোদ ওর বিছানায় এসে নেমেছে। এলবি বাইরের ঘরে আছে। কাকে যেন ফোন করল এইমাত্র। বিজন বিছানায় শুয়ে সব ধরতে পারছে, এলবি জাহাজে ফোন করে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলছে, ওর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর দিচ্ছে এবং সঙ্গে চার-পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য ফোনে আবেদন পেশ করছে।

এলবি এ ঘরে এসে দাঁড়ালে বিজন ভাবল, কী দরকার আর থেকে? শরীর আমার ভাল হয়ে গেছে। বেশ সুস্থ বোধ করছি। বরং আজ জাহাজে চলি। কিন্তু এলবির মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারল না কথাগুলো। চোখে ওর সারারাত অনিদ্রার অবসাদ। শরীরে ক্লান্তি। এলবি ওর কপালে হাত রেখে বলল, খুব ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে যা হোক।

তাই নাকি!

তা নয়তো কী! একটু মদ খেলে তো অমনি ঘাসে লুটিয়ে পড়লে।

তুমি তো জানো এলবি, ওটা মদের জন্য হয়নি। ওটা জাহাজে কাজ করার পর থেকেই হচ্ছে। মাঝে মাঝেই হত, কিন্তু এমন কঠিন হত না।

একটু থেমে বিজন বলল, বরং এখন জাহাজে চলি।

তুমি কি পাগল, বিজন! ক্যারল তোমাকে পুরো পাঁচদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাপ্তানকে এইমাত্র খবর দিলাম। তিনি খুব ভাল মানুষের মতো বললেন, সেজন, কী আছে। নিশ্চয়ই ও পাঁচদিন ছুটি পাবে।

তুমি তো ছুটি নিলে। কিন্তু এখানে থাকার অর্থই হচ্ছে তোমাকে অসুবিধায় ফেলা।

আমার কোনও অসুবিধা হবে না। পাশের ঘরে আমি থাকব। যখন যা দরকার আমাকে বলবে।

বিজন পুরো পাঁচ রাতই ওর ঘরে থাকল।

পাঁচ রাতে ওরা পাশাপাশি ভিন্ন ঘরে শুয়ে জানালায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে দেখতে অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। অথবা ঘুমিয়ে পড়ার ভান করত। এলবি বালিশের নীচে দুটো হাত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে কী যেন বারবার খুঁজত। কী যেন বালিশের নীচে ওর হারিয়ে গেছে। তখনও এলবি রাতের প্রজাপতিদের বিছানার চারপাশে দেখত। ওর প্রতীক্ষার জগতে সেইসব প্রজাপতিরা উড়ে উড়ে একদা অবসন্ন হত এবং সকালের দিকে ওরা ঘুমিয়ে পড়ত। কোনও কোনও রাতে এলবি এই শীতেও জানালা খুলে রাতের প্রজাপতিদের শরীর থেকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই ঘন রাতে এবং শীতের রাতেও ওর শরীর মধুর এক উত্তেজনায় অধীর হয়েছে। বাঙালি এক নাবিকের শরীরে কবির যুবা শরীরী বৃত্তিকে স্পর্শ করার ইচ্ছায় সে সহসা কাতর হত। আর বিজন নিজেকে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ভেবে সহজ ইচ্ছার বৃত্তিতে কঠিন তাড়নায়ও ডুব দিতে পারল না। দেয়ার আড়ালটুকু ওদের দু'জনকে সেজন্য পরস্পর মহৎ করে রাখল।

জাহাজে ফিরে এসে বিজন প্রথম রাতে অনিদ্রায়, দ্বিতীয় রাতে অসহিষ্ণুতায় ভুগে সারাদিন কাজ করার অজুহাতে ডেক-এ পড়ে থাকল। দু'দিন এলবি ইউনিয়নের কাজে শহর ছেড়ে অন্যত্র থাকছে ট্রয়ের সঙ্গে। দু'দিন দেখা-সাক্ষাতের কোনও সুযোগ নেই। বিকেল কাটছে হাসপাতালে। পরবর্তী সময়টুকু আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। খুব নিঃসঙ্গ ভাব জাহাজে। কেউ থাকছে না। বন্দরে নেমে সকলে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এইসব দেখে সে আর পারছে না, সহজ ভাবটুকু রক্ষা করতে পারছে না।

বস্তুত বিজন এক অহেতুক ঈর্ষায় পীড়িত হচ্ছে। ট্রয়কে কেন্দ্র করে এই ঈর্ষার জন্ম। এলবি শহরে না থাকায় সব কিছু তার কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছিল। সে কেমন বিচলিত। রাগে দুঃখে অথবা বলা যায় অভিমানে সে দেবনাথের সঙ্গে গোপনে সস্তায় একটু মদ এবং সস্তার একটু যৌনসংযোগরক্ষার্থে সেজন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু .মুখের ভাবটুকু সকল সময়ের জন্য সরল নিঃস্বার্থ এবং যৌনজীবনে নিষ্পাপ, যেন এই মহৎ পৃথিবীতে অশ্লীল হবার মতো কিছুই নেই। বিজন দেবনাথের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আর কত দূর তোমার রাতের আস্তানা?

অথচ বিজন রাতের আস্তানায় দর করতে গিয়ে দেখল যুবতী সব সময়ের জন্য চোখদুটো কোটরাগত করে রেখেছে। প্রতিদিনের যৌন অত্যাচারে গালে অশ্লীল টোল। নগ্ন চেহারায় জাদুকরের লাঠির মতো ভেলকি। এবং সমস্ত শরীরে কীসের যেন দাগ, যেন অত্যাচারের অশ্লীল উল্কি পরে নিত্য জাহাজি যন্ত্রণার সাক্ষী থেকেছে। পাশাপাশি দুটো চোখ—এলবির চোখ, এলবির প্রীতিপূর্ণ চোখ... সে পারল না। সে নগ্ন হয়ে নাচতে পারল না রাতের আস্তানায়। মদের গোলাপি নেশা ছুটে গেলে সে যথাসম্ভব সত্বর ছুটে পালাল।

সে জাহাজে ফিরে দেখল ডেক খালি। কোনও জাহাজির সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেকের উপর ইতস্তত কিছু আলো জ্বলছে। একটা বেড়াল এ শীতেও অফিসার-গ্যালিতে খাবার খুঁজছে। বিড়ালটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। সে আরও এগিয়ে গেল। সে শুনল ডেক-ভাণ্ডারি মদ খেয়ে নীচে হল্লা করছে। নীচে নেমে দেখল সকল জাহাজিদের দরজা বন্ধ। দু'-একজন জাহাজি এখনও ফেরেনি তারা আর এ রাতে ফিরবে না। সে ধীরে ধীরে নিজের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবনাথ আগে ফিরে এসেছে। ফোকশালের ভিতর লকারের শব্দ। বুঝি দেবনাথ লকার খুলছে। বুঝি দেবনাথ বাংকে বসে খাচ্ছে। বিজন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল, আমি পারিনি, দেবনাথ। আমি পারিনি। মেয়েটির শরীর দেখে আমার করুণা হল।

এই করুণার কথা ভেবে যখন সে ক্ষতবিক্ষত তখন দেবনাথ খেতে খেতে বলছে, এলবি এসে এই বাংকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গেছে তোমার জন্য।

তুমি কী বললে?

বললুম, রাতের আস্তানায় গেছে।

দেবনাথ! —সে চিৎকার করে উঠল। ইচ্ছা হল দেবনাথের গলা টিপে ধরতে। বিজন লক্ষ করল দেবনাথ দু'জনের ভাত একাই গিলছে। ওর নেশা এখনও প্রকট। সেজন্য দেবনাথের হাত কাঁপছে এবং গোল গোল চোখে সে বিজনকে দেখছে।

বললাম, তুমি এলবিকে ঠকিয়েছ। তুমি রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখিসব করে রব' শুনিয়েছ। বললাম, তুমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসেছ। কোনও এক কলোনিতে পিসিমার ঘরে থাকো। তোমার বাড়ি বটতলায় নয়। সুতরাং বটতলা থেকে নিমতলা কাছেও নয়।

আর কিছু বলল না দেবনাথ। ফের ভাত খাচ্ছে। অথবা বললে যেন এরকম শোনাত—বিজন আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি। তুমি এমন প্রীতিপূর্ণ চোখের স্নেহচ্ছায়ায় বন্দরের দিনগুলো কাটাবে, তুমি বস্তুত একজন কবির মতো বাঁচতে চাইবে, সে আমার সহ্য নয়।

সে বলল, কবির প্রতীকী হয়ে তুমি এলবির কাছে বেঁচে আছ, আর আমি জাহাজি হয়ে বেঁচে আছি, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি, আমি পারিনি, আমি পারিনি। ঈর্ষার তাড়নায় আমি একটু বেফাঁস হয়েছি।

বিজন বাংকে শুয়ে পড়ল। কোট-প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল। এ মুহূর্তে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে এলবির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে বাংকে শুয়ে আজ যথার্থ জাহাজি কায়দায় রাত যাপন করল।

সকালে জাহাজের কিছু কাজ—দেয়ালে রং করা, দেয়াল সাবান-জলে পরিষ্কার করা, সেসব কাজগুলো আজ নিখুঁতভাবে করল। সে ইচ্ছা করেই এলবিকে ভাবল না। সে ইচ্ছা করেই কাঁচা খিস্তি করল আজ। ভোরবেলায় দেবনাথ ওর পাশে সুস্থ হয়ে দাঁড়ালে, বলল, আমাকে ছোট করে কী লাভ হল, দেবনাথ?

দেবনাথ ওর দুটো হাত ধরে বলল, বিজন, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। গত রাতে আমার বড় ভুল হয়েছে। গত রাতে টাকার অভাবে আমার রাতের ইচ্ছাটুকু পূরণ হয়নি। বাধ্য হয়ে সস্তায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে নেশা করেছি। মাতাল হয়ে জাহাজে ফিরেছি। ফিরে তোমার বাংকে এলবিকে দেখেই স্থির ধরতে পারিনি। আমি ওকে টেনে তুলেছিলুম। এলবি বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তোমাকে দুশমন বলে ভেবেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, বিজন।

বলে দেবনাথ যথার্থই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ওর পাশে দাঁড়াল।

বিকেলে বিজন হাসপাতালে গেল। সেলিমের অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। সেলিম ভাল হয়ে উঠছে। সেলিম ফের জাহাজি হয়ে একই সঙ্গে হয়তো ঘরে ফিরতে পারবে। এইসব ভাবনায় দেবনাথ এবং বিজন পথ চলছিল। দেবনাথ বলল, এলবির কাছে তোর একবার যাওয়া উচিত।

কোন মুখে যাব, বলো?

আমার বড় ভুল হয়ে গেল, বিজন!

ওরা পরস্পর তাকাল। ওরা পরস্পর হাত ধরে হাসপাতালে উঠে গেল।

সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় ভাবল, এলবি যদি আসে, এই হাসপাতালে এলবি যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে, যদি বলে, বিজন, তুমি কি যথার্থই রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখিসব করে রব' শুনিয়েছ, তুমি কি যথার্থই কবিকে নিয়ে তামাশা করেছ, তখন, তখন সে কী উত্তর দেবে! এইসব ভেবে বিজন, হাসপাতালে ভয়ে ভয়ে, সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল। এবং যখন দেখল সেলিমের বিছানার পাশে কেউ পাশে নেই তখন সে এক অহেতুক আনন্দে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেল।

সেলিমের শরীরে এখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেলিম এমত দুর্বল যে, কথা বলতে পারছে না। বিজন ওর পাশে বসল এবং বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করল।

বন্দরে বিজন এলবিকে এড়িয়ে বাঁচতে চাইল। সামনে পড়লেই ধরা পড়বে অথবা কলিন স্ট্রিট ধরে হাঁটলেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা। সে সেজন্য জাহাজ থেকে কম নামল, বন্দর ধরে শহরে উঠল না এবং বড় বড় পথ ধরে পায়চারি করল না। সে শুধু বিকেলে হাসপাতালে গেল। এবং একদিন সেলিম বলল, সেলিম তখন ভাল হয়ে উঠছে, সেলিম তখন কথা বলতে পারছে, বলল, এলবি রোজ ভোরে আসেন।

জাহাজে সারাদিন কাজের পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিজন রেলিং-এ এসে ভর করে দাঁড়াত তখন ওর মনে পড়ত নটিংহিলের সেই ছোট্ট কাঠের ঘর, সেই ছোট অক্ষরে লেখা 'শান্তির নীড়', সেই ইজিচেয়ারটা এবং পাশের ভাঙা ইজেলটার কথা। মনে পড়ত ওর কবিতা-আবৃত্তির কথা। এলবি 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতা যেন ওকে বারবার শুনিয়েছে। সে যেন এখন এই রেলিং-এ দাঁড়িয়ে সব কবিতাই স্পষ্ট মনে করতে পারছে। ওর একান্ত ইচ্ছা, এলবি যদি আসত, যদি সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করত, যদি বলত, তুমি কবিতার মতো না বেঁচে, জাহাজির মতো বাঁচলে। অথচ সে এল না। একদিন গেল, দু'দিন গেল, দু'সপ্তাহ গেল, অথচ সে এল না। পাইন গাছগুলো তখন পাতা মেলতে শুরু করেছে। পাখিরা সব আবার ফিরে এসেছে, গাছে গাছে তারা কোলাহল করছে। বসন্তের আগমনে এই ধরণী যেন উচ্ছল যুবার মতো অথবা গর্ভবতী তরুণীর মতো বয়সি হতে চাইছে। অথচ এলবির আর দেখা নেই।

বন্দরে যতদিন যেতে থাকল তত বিজন এলবির কাছে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করল। তত সে ভেঙে পড়ল। তত সে নিঃসঙ্গবোধে পীড়িত হতে থাকল। জাহাজ ছেড়ে দেবে ক'দিন পর। সেলিম ভাল হয়ে উঠছে। 'যে সেতুবন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেলিমকে কেন্দ্র করে, সেলিম জাহাজে ফিরে এলে সেটুকুও শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনও এক ভোরে জাহাজে খবর এল, কাপ্তান হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা করছেন, ডেক-এ ফের উদ্বেগ-উত্তেজনা, সারেং ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাহাজিরাও ব্রিজের নীচে অপেক্ষা করছে, ওদের চোখে পরস্পরের প্রতি সংশয়ের দৃষ্টি, তখন কাপ্তান ব্রিজে দাঁড়িয়ে বলল—সেলিম ইজ ডেড, সেলিম মৃত।

বিকালে সব জাহাজিরা জাহাজ থেকে নেমে গেল। ঘন কুয়াশায় শীতের রং ফ্যাকাসে। শীতের শেষে ওরা কোনও তুষারঝড়ের মতো ভোরের রোদে ডুবে গেল, গলে গেল। ওরা হাসপাতালের দরজায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মৃত নাবিকের শরীর নিয়ে শবযাত্রার ইচ্ছায় উন্মুখ হয়ে থাকল। ওদের অবয়বের ইচ্ছা যেন এই, আমরা এই সন্ধ্যায় সকলে কবরভূমিতে নেমে যাচ্ছি। আমরা নেমে যাচ্ছি, আমরা নেমে যাব। আমরা মরে যাচ্ছি। আমরা মরে যাব।

শহরবাসীরা নাবিকের শবযাত্রার পথে ভিড় করল। একদল বিদেশি লোক জাহাজি পোশাকে কোনও নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকের মতো পা ফেলে হাঁটছে। জানালায় যুবতী আরশির

আলোতে সেই শবযাত্রীদের দেখে মুখ ঘোরাল। কিছু স্বজাতীয় দেখল সেই শবানুগমনে। এলবি কফিনের বাঁপাশে পথ দেখিয়ে চলছে। ট্রয় এবং কিছু জাহাজি শ্রমিক কফিনের আগে আগে চলছে ভারতীয় নাবিকেরা পিছনে। বিজন সকলের পিছনে। ওরা নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছে। ওরা সকলে শহর অতিক্রম করে ক্রমে পাহাড়ের উতরাইয়ে নেমে গেল। ওরা সকলে আজ কোনও কথা বলল না। কত নিঃসঙ্গ, কত নিঃশব্দ এই যাত্রা! ওরা পরস্পর অপরিচিতের মতো ব্যবহার করল যেন অথবা এই শোকাবহ ঘটনায় ওরা পরস্পর সাময়িক বেদনায় বিমূঢ়। এলবি পর্যন্ত কোনও কথা বলে বিজনকে কিংবা অন্যান্য জাহাজিদের সমবেদনা জানাল না। এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল না অথবা না-দেখার ইচ্ছায় সর্বদা কফিনের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। অথবা এলবির প্রত্যাশা এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, সে বিজনকে ফের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারল না, সেলিম দেখবে ভাল হয়ে উঠবে।

কবরভূমির সদর দরজা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। বিজন ছোট-বড় সব বেদি দেখতে পেল গির্জার মতো ছোট-বড় কবরের দেওয়াল দেখতে পেল। অনেক সুখ-দুঃখের এপিটাফ চোখে পড়ল সেলিম এখন কফিনে শুয়ে আছে। সেলিমের স্ত্রী এখন হয়তো দরজায় বসে মেয়েটাকে আদর করছে। অথবা মেয়েকে খসমের খবর দিয়ে সুখ পাচ্ছে। সেলিমের কবর এখানেই হল। সে বিবির কোলে মাথা রেখে মরতে পারল না। এইসব ভেবে বিজনের অশেষ দুঃখ। তবু একবার এলবিকে বলার ইচ্ছা, কিছু বলার ইচ্ছা, শোকাবহ ঘটনার কথা বলে কবিকে স্মরণ করার ইচ্ছা, ওর সেই কবিতা-আবৃত্তির ইচ্ছা, পিস ওয়াজ অন হিজ ফোরহেড।

সেলিমের কবরের উপর প্রথম এলবিই মাটি দিল। সকলের শেষে বিজন মাটি দিতে গিয়ে অসহায় মানুষের মতো কেঁদে উঠল। এই মাটিটুকু দিয়ে সে আজ কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ এমন ভাব প্রকাশ করল। এলবি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিজন শেষ মাটিটুকু কবরের উপর চাপড়ে চাপড়ে দিচ্ছে এবং কাঁদছে। সে যেন এই মাটির স্পর্শ ছেড়ে উঠতে পারছে না। উপরে আলো জ্বলছে শীতের কুয়াশা আলোর ডুমটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। সকলে একে একে কবর ছেড়ে চলে যাচ্ছে সকলেই যেন এই মৃত্যুতে দুঃসহ এক যাতনায় পরস্পর কথা বলতে পারছে না। পরস্পর সান্ত্বনা দিতে পারছে না। সকলেই মাথা নিচু করে পাহাড়ের ঢাল ধরে চড়াইয়ে উঠে যাচ্ছে।

এলবি ডাকল, বিজন, ওঠো। সেলিমকে বহু চেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না। মৃত্যুরই জয় হল। প্রভুকে ওর কথা বলো। ওর আত্মার শান্তি কামনা করো।

এলবি বিজনকে টেনে তুলল। ওরা পরস্পর তাকাল। তারপর হাত ধরে কবরভূমি ফেলে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে সমুদ্রের ধারে এসে বসল। এলবিই বিজনকে এই অসীম সমুদ্রের আধারে বসতে অনুরোধ করল।

অন্য তীরে সব বড় সমুদ্রগামী জাহাজ। ওরা এপারে নির্জন জায়গায় বসে শোকটুকু ভুলতে চাইল। এলবি বিজনকে এই মৃত্যুশোক ভুলে যেতে অনুরোধ করল। এলবি ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলে বিজনের শেষ দুঃখটুকু মুছে দিতে চাইল, মুছে দেবার ইচ্ছায় ওকে শেষ পর্যন্ত নটিংহিলের ছোট কাঠের ঘরে নিয়ে এসে বলল, এ ঘর তোমার। তুমি এখানে থেকে যাও। যেন আরও বলতে চাইল তোমার জাহাজি নিঃসঙ্গতাটুকু আমি, আমি সব দিয়ে ভরে তুলব।

বিজন মনে মনে ভাবল, মূলত আমি নষ্টচরিত্রের মানুষ। ফলত তুমি আমায় এ ঘরে রেখে শান্তি পাবে না। বিশেষত কবির প্রতীকী হয়ে দীর্ঘদিন আমি বাঁচতে পারব না। আমার জাহাজি চরিত্র আমাকে সমুদ্রের মতো অশান্ত করে রেখেছে। বন্দরে বন্দরে চরিত্র নষ্ট করে বেড়াতে না পারলে আমার জাহাজি চরিত্রের শান্তি নেই।

বিজন বলল, আশা করেছিলাম তুমি একদিন অন্তত অভিযোগ করতেও জাহাজে আসবে।

এলবি বলল, ভোরে সেলিমকে দেখে, সারাদিন অফিসে কাজ করে, বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

বস্তুত উভয়ে এক দুর্বিনীত অভিমানে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করতে পারেনি এলবি জলপাইগাছের নীচে বসে যত আশাহত হয়েছে তত এক ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঘরে ফিরে মাতাল

ঈশ্বরের ইচ্ছায় জানালায় নক্ষত্র গুনেছে। যখন একান্ত উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেনি তখন কবির কবরের নীচে বসে একের পর এক কবিতা উচ্চারণ করে এক অশেষ আনন্দে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ঈশ্বরের মতো ইচ্ছায় বিজনকে কবিতার মতো সুস্থ করে তোলার প্রবৃত্তিতে এলবি এতদিন ছটফট করত। কবির নামে 'পাখি সব করে রব' এবং জাহাজিদের বারের আস্তানা উভয়ই দুশ্চরিত্রের লক্ষণ জেনেও সে ঠিক থাকতে পারেনি। বিজনকে রমণীয় স্মৃতির অন্তরে বাঁচিয়ে রাখার বাসনায় সে গর্ভবতী হতে চাইল।

এলবি বলল, তিনমাস ধরে তোমাকে পেয়ে কোনও নাচঘরে যেতে ভুলে গেছি। তুমি এমত ভাবে আপনার করে রেখেছ।

এলবি যেন মনে মনে বিজনকে অনুরোধ জানাল, বিজন, তুমি যদি নষ্ট চরিত্রের মানুষ হতে চাও, তবে আমায়ও নষ্ট চরিত্রের করে রেখে যাও। আমি আর এমত ভাবে বাঁচতে পারছি না। দেয়ালে কবির ছবি, আমরা নীচে বসে এমত ভাবছি, আমরা পরস্পর প্রীতির সম্পর্কে বাঁচছি. তুমি আমার আরও ঘন হয়ে বসো, আমার এতদিনের যৌন আদর্শকে ভেঙে দাও. তোমার হাতে আমি নষ্ট চরিত্রের হয়ে বাঁচি। তোমার স্পর্শে কবির স্পর্শ এমত ভাব নিয়ে বাঁচি।

এলবি ফের বলল, তুমি থেকে যাও, বিজন।

বাকিটুকু বলতে পারল না।

বাকিটুকু এলবির চোখে ধরা পড়ল—এ পৃথিবীতে বিজন ব্যতীত এলবি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ভুগবে। এ পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এক রূপকথার মতো যুবকের ঘন গভীর প্রীতির সম্পর্ক এলবিকে চিরকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে।

বিজন ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকল। সে কোনও কথা বলল না। এলবি দাঁড়াল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘন হয়ে দাঁড়াল এবং বিজনের শীর্ণ ঠোঁটে ধীরে ধীরে নুয়ে চুমু খেল। বিজন এই ঘটনায় একটুকু উত্তেজিত হল না, বরং সে কেমন ঠান্ডা হতে হতে একসময় ইজিচেয়ারের সঙ্গে যেন মিশে গেল। বস্তুত বিজন কবির প্রতীকীতে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মতো শিথিলতায় অথবা কবির প্রতি ঠান্ডা ভাবায় এই ঘন চুম্বনে কোনও যৌন সংযোগের উত্তেজনা পেল না। বরং সে এলবির প্রতি করুণাঘন হল। এলবির মাথায় হাত বুলিয়ে ঈশ্বরের মতো বলল, আবার যদি এ বন্দরে আসি, তোমার ঘরে আসব। জাহাজি মানুষের মতো আসব।

বস্তুত বিজন নিজের সহজ সত্তায় এলবির ঘরে বাঁচবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াল।

বিজন বলল, কাল ভোরে আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি ভোরে যেয়ো।

এলবি উত্তর দিতে পারল না। সে খাটে পড়ে বালিকাসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিজন বুঝল, এ সময় কোনও কথা বলে এই আশাহত বিদেশিনীকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। সে সেজন্য অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে থাকল এবং ওকে কাঁদতে দিল।

অনেকক্ষণ পর,যখন বিজন দেখছে এলবি আর কাঁদছে না, বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তখন ওর হাত ধরে টেনে তুলল এবং বলল, চলো. জাহাজে তুমি আমায় পৌঁছে দেবে।

মোটরে বসে বিজন ভাবল, সেলিম এবং তুমি উভয়ে আমার আত্মার আত্মীয়। দু'জনকেই আমি এ বন্দরে ফেলে যাচ্ছি। হয়তো পৃথিবীর অন্য কোনও এক বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়বে। সেখানে সেলিমের মতো কোনও পাইনের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি তোমার জানালায় সেদিন আত্মার গভীরে যে অজ্ঞাত দুঃখের স্পর্শটুকু পাবে, সে আমারই! তখন তুমি জানালায় বসে এই সমুদ্রকে দেখে কবির কবিতা আবৃত্তি কোরো। সে কবিতার ভিতর আমরা, এইসব মৃত নাবিকেরা ঈশ্বরকে খুঁজব।

বিজন বলল, এলবি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। এভাবে চুপচাপ গাড়ি চালালে আমার খুব কষ্ট হয়।

এলবি কথা বলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কবিতা আবৃত্তির সময় দেখল, এই শহরের পথের সব আলোগুলো এখনও জেগে আছে। ইতস্তত দুটো-একটা গাড়ি ওদের অতিক্রম করে বের হয়ে যাচ্ছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশের বুটের শব্দ, পুলিশ টহল দিচ্ছে। দোকানের শো-কেসে আলো

জ্বলছে না। এলবি এই ঘন রাতে বিজনকে কোনও কথাই বলতে পারল না, সে ভেঙে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে শেষ প্রিয় কবিতাটি সে আবৃত্তি করে বিজনকে বিদায় জানাল—

'Art thou abroad on this stormy night
on thy journey of love, my friend? The
sky groans like one in despair.

I have no sleep to-night. Ever and
again I open my door and look out on
the darkness, my friend!

I can see nothing before me. I
wonder where lies thy path!

By what dim shore of the ink-black
river, by what far edge of the frowning
forest, through what mazy depth of
gloom art thou threading thy course
to come to me, my friend?'

টুপাতি চেরী

নশতিয়া দ্বীপ থেকে ফসফেট নিয়েছে জাহাজটা। জাহাজ আগামী দশ দিন পাশাপাশি ওসানিক পুঞ্জ সকল অতিক্রম করে অনবরত জল ভাঙবে। দশ দিন জাহাজিরা মাটি দেখতে পাবে না, তেরো স সফরে যেমন এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল ভেঙে পৃথিবী প্রদক্ষিণ রছে তেমনি এই দশ দিনও শুধু জলই দেখবে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র এবং রাতের আঁধারে অন্য হাজের আলো।

তখন বিকেলের ঘন রোদের রং জেটিতে, ফসফেট কারখানার প্রার্থনা হলের গম্বুজে এবং দূরে দূরে রেল গাছের ছায়াঘন চত্বরে অথবা শ্রমিকদের ভাঙা কুটিরে, আকাশ অথবা নীলের গভীরতায় মগ্ন। এত্রজলের নীল অথবা সবুজ ঘন রঙের ছায়া সাহেবদের বাংলোগুলো উজ্জ্বল করে রেখেছে। কিছু শ্রমিক বিকেলের আনন্দ হিসেবে ছোট ছোট স্কিপ নিয়ে বড়শি নিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেল। এবং তারা জাহাজের পাশ দিয়ে গেল। গলুইতে জাহাজিরা ভিড় করে আছে। যেখানে দ্বীপের পাশে সমুদ্রে রের মতো, যেখানে ফার্ন জাতীয় গাছ সমুদ্রের হাওয়ায় নড়ছে, সেখানে দ্বীপের সব শিশুরা অযথা নাচল, গাইল, কখনও সমুদ্রের জলে নেমে স্নান করল অথবা সাঁতার কাটল. এই সব দৃশ্যের জাহাজটা ছাড়বে। গলুইতে জাহাজিরা ভিড় করে থাকল। মাস্টে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জাহাজ এমত ভাবের কালো বর্ডার দেওয়া নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রিজে কাপ্তান, বড় মালোম। ওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার এখনও পাহারা দিচ্ছে। সিঁড়ি এখনও জেটি থেকে তোলা হয়নি, অথচ বাজ শেষ। ডেক, ফলকা সব জল মেরে সাফ করা হয়েছে। হ্যাচ ত্রিপল এবং কাঠের সাহায্যে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবু মেজ মালোম সারেংকে ডেকে গলুইতে চলে এলেন না, কিংবা ওয়ার ড্রাম ঘুরিয়ে বললেন না, হাসিল হাপিজ। বললেন না, তোমরা জাহাজিরা এসো, আমরা বন্দরের ভুলে সমুদ্রে যাত্রা করি।

সমুদ্রের শান্ত নিবিড়তার ভিতর দ্বীপের পাহাড় ঘরবাড়ি, কারখানা এবং এই সব দ্বীপের রমণীরা সকলে যেন রাজকন্যার মতো জেগে সারা রাত ধরে, মাস ধরে, এমনকী বৎসর, যুগ যুগ নও এক রাজপুত্রের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। সুপারি গাছ, নারকেল গাছ এবং উষ্ণদেশীয় সকল শ্রেণির রূপে দৃশ্যমান। সুমিত্র, জাহাজি সুমিত্র, সেজন্য বিকেলে পথে ঘুরতে ঘুরতে কখনও এ অরণ্য ঢুকে কাগজিলেবু সংগ্রহ করত। দু'পা এগিয়ে গেলে ওপাশে সমুদ্র, ধারে ধারে বিস্তীর্ণ য়াড়ি। সুমিত্র প্রায়ই বালিয়াড়িতে চুপ হয়ে, বালুচরের সঙ্গে ঘন হয়ে এই দ্বীপের নিবিড়তায় মগ্ন ত।

প্রস্থে দৈর্ঘ্যে তিন গুণিত চার মাইল পরিমিত স্থানটুকু জুড়ে এই দ্বীপ। কিছু সমতল ভূমি, কিছু তশ্রেণি। দ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবদের বাংলোসকল, পার্ক, বিদ্যালয় এবং ক্লাব-ঘর। সমটুকু জুড়ে শ্রমিকদের নিবাস। পাহাড়ের উপর যেখানে কৃত্রিম উইলো গাছের সংরক্ষিত অঞ্চল হ, যেখানে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এবং দ্বীপসকলের প্রধান কর্তার অবস্থিতি, তার ঠিক নীচে স্য জলের হ্রদ। পাথুরে সিঁড়ি নীচে বালিয়াড়িতে গিয়ে নেমেছে। ছোট নীল হ্রদ অতিক্রম করার হাতে সুমিত্র কোনও দিন সিঁড়ির নীচে বসে থাকত। এই সমুদ্রের বুকে মার্বেল পাথরের রূপশিল্প সুমিত্রকে রূপকথার গল্প স্মরণ করিয়ে দিত। সেখানে একদা সুমিত্র এক যুবতীকে

আবিষ্কার করল। যুবতী উইলো গাছের ছায়ায় হ্রদের তীরে বসে ভায়োলিন বাজাত।

সুমিত্র জাহাজ-রেলিং-এ ভর করে গতকালের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে। সে দীর্ঘ সময় সিঁড়িতে বসে ছিল এই ভেবে—যুবতী হয়তো এই পথ ধরে অপরাহ্নবেলায় অন্য অনেকের মতো সমুদ্রে নেমে আসবে। যুবতীর প্রিয়মুখ দর্শনে সে প্রীত হবে। কিন্তু দীর্ঘ উঁচু পাহাড়শ্রেণির ফাঁক দিয়ে যুবতীর মুখ স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং অন্য অনেক দিনের মতো ভায়োলিনের সুরে মুগ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে কোনও গত্যন্তর ছিল না তার। প্রতিদিনের প্রতীক্ষা তার কখনও সফল হল না। এবং সেই সব নিষিদ্ধ এলাকায় যেতে পারত না বলে সমুদ্রে যুবতীর প্রতিবিম্ব দেখে গল্পের ডালিমকুমার হয়ে বাঁচবার স্পৃহা জন্মাত। আহা, আমি ওর চোখে স্পষ্ট হলুম না গো। যখন জাহাজিরা শ্রমিকদের বস্তিতে পুরনো কাপড়ের বিনিময়ে যৌন-সংযোগটুকু রক্ষা করত, তখন সুমিত্র পাথরের আড়ালে বসে উদাস হবার ভঙ্গিতে আকাশ দেখত।

সূর্য এখন সমুদ্রে ডুবছে। নীল সমুদ্রের লাল রং এখন পাহাড় এবং পাহাড়শ্রেণির উপত্যকা সকলকে স্নিগ্ধ করছে। ছোট ছোট স্কিপগুলো ঘরে ফিরছে। ক্লাব-ঘরে ব্যান্ড বাজছে। জেটিতে অনেক মানুষের ভিড়। সুন্দরী রমণীরা, আর পাহাড়ের সব বাসিন্দারা যুবতীকে জাহাজে তুলে দিল। সকল জাহাজিরা গলুইতে ভিড় করে থাকল। সেই যুবতী, চঞ্চল দুটো চোখে, গ্যাংওয়ে ধরে উঠে আসছে। সন্ধ্যার গাঢ় লাল রং যুবতীকে সুমিত্রর চোখে রহস্যময়ী করে তুলছে।

এবার সব ডেক-জাহাজিরা দু'ভাগ হয়ে আগিল পিছিলে চলে গেল। উইনচ হারিয়া-হাপিজ করল হাসিল। ড্যারিক নামানো হল। যুবতীর বাপকে দেখা গেল কাপ্তানের ঘরে। কিছু কিছু জেটির লোক ডেক এ উঠে এসেছিল। ওরা সিঁড়ি তোলার আগে নেমে গেল। যুবতীর বাবা নেমে গেলেন। তারপর জাহাজ ধীরে ধীরে তীর থেকে সরতে থাকল। রুমাল উড়ল অনেক জেটিতে, যুবতী কেবিনে ফিরে যাওয়ার আগে সন্ধ্যার গাঢ় রঙের গভীরতায় ওই দ্বীপের ছবি দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল এই তার দেশ, এত সুন্দর এবং রমণীয়।

কেবিনে ঢুকে যুবতী টুপাতি চেরী দেখল কাপ্তান-বয় সব কিছু সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। চেরী আয়নায় মুখ দেখল, তারপর লকার খুলে রাতের পোশাক পরে বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য দরজা অতিক্রম করতেই মনে হল জাহাজটা দুলছে এবং মাথাটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। চেরী আর উপরে উঠল না। সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। নরম সাদা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। চেরী এখন সমুদ্র এবং আকাশ দেখছে।

দরজায় খুব ধীরে ধীরে কড়া-নাড়ার শব্দে চেরী প্রশ্ন করল, কে?

আমি কাপ্তান বয়।

এসো।

আপনার খাবার।—বলে সযত্নে টেবিল সাজাল।

চেরী বলল, এক পেয়ালা দুধ, দুটো আপেল।

আর কিছু?

না।

আপনার কষ্ট হচ্ছে মাদাম?

না।

উপরে উঠবেন না? বেশ জ্যোৎস্না রাত। বোট-ডেকে আপনার জন্য আসন ঠিক করা আছে।

না, উপরে উঠব না।

বয় চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, শোনো!

কাপ্তান-বয় কাছে এল। বলল, তুমি কাপ্তানকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

জি, আচ্ছা।

কাপ্তান-বয় দরজা টেনে চলে গেল।

তখন ফোকশালে-ফোকশালে সকল জাহাজিরা চেরীকে কেন্দ্র করে মশগুল হচ্ছিল। সকলে ওর চোখ-মুখ দর্শনে সজীব। এবং চেরী যেন এই নিষ্ঠুর জাহাজে সকল জাহাজিদের নিস্তরঙ্গ জীবনে এক

স্বপ্নের সুন্দরী। আর এমন সময় ডেক সারেং এলেন, ইঞ্জিন-সারেং এলেন। তাঁরা দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা উপরে যাও, বোট-ডেকে মাস্তার দাও।

জাহাজিরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল সকলে। ওরা বোট-ডেকে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। সারেং ওদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা, বাপুরা, ওঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ যাবে না। কাপ্তানের বারণ আছে। জেনানা মানুষ, কাঁচা বয়েস, তার উপর আবার শুনছি রাজার এবং তিনি নাকি আমাদের কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি।

সুমিত্র হাসল।

বললেন চাচা। উনি তো কাকাতিয়া দ্বীপের প্রেসিডেন্টের মেয়ে।

সারেং বললেন, ওই হল। যে রাজা, সে ই প্রেসিডেন্ট।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। অল্প জ্যোৎস্না সমুদ্রে এবং জাহাজ-ডেকে। জাহাজিরা গরম বলে সকলে ফোকশালে গিয়ে বসল না। ওরা ফলকার উপর কেউ তাস, কেউ দাবা নিয়ে বসে গেল। দু'-একজন অসভ্য ইঙ্গিত করতেও ছাড়ছে না। এ ধরনের কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত বলে সুমিত্র রাগ করল এবং হাসল। দীর্ঘ দিনের সমুদ্রযাত্রায় সে ক্লান্ত এবং হতাশ, জাহাজে চেরী ওঠে আসায় সব জাহাজিরাই যেন প্রাণ পেয়েছে। মালবাহী জাহাজে কখনও যা ভাবা যায় না।

সুমিত্র ভাবল, সেই মেয়ে, হ্রদের তীরে বসে বেহালা বাজাত পাথরের আড়ালে বসে হ্রদে প্রতিবিম্ব রহস্য আবিষ্কারে সে মত্ত থাকত যার প্রতিবিম্ব সমুদ্রের কোনও রাজপুত্রের ইচ্ছাকে সকরুণ করত, অথবা সেই প্রাসাদের ছায়া, ঘন বন, সমুদ্রের পাঁচিল এবং উঁচু পাথরের সব দৃশ্য সুমিত্রকে গল্প মনে পড়িয়ে দিত, যেন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে যাচ্ছে শুধু পাতালপুরীতে দ্রব্য, যেন প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কোনও জন-মনিষ্যির গন্ধ নেই, ফুলেরা, গাছেরা, পাখিরা এবং সকল পাথর হয়ে আছে। হ্রদের তীরে খুব নিচু উপত্যকা থেকে সুমিত্র যত দিন দূর থেকে চেরীকে দেখেছে তত দিন পাতালপুরীর দৃশ্যসকল কাকাতিয়া দ্বীপের সকল দৃশ্যমান বস্তুসকলের উপর এক ইচ্ছার ঘর তৈরি করে চলে গেছে।

এখন জাহাজিরা সকলে বাংকে শুয়ে পড়েছে। সুমিত্রও দরজা বন্ধ করে কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল। এই বাংকে শুয়ে পর্যন্ত চেরীর কথা ভাবছে, চেরী হয়তো শুয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ধরে গ্যাংওয়েতে উঠে আসছিল চেরী, সুমিত্র তাকে কাছ থেকে দেখেছিল। বড় বড় চোখ মেয়েটির, বাদামি রঙ চোখের রঙ ঘন গভীর এবং সমস্ত শরীরে প্রজাপতির মতন হালকা গড়ন, যেন ঈশ্বর তাঁর সবটুকু যত্ন দিয়ে তৈরি করেছেন।

জাহাজ এখন সমুদ্রে। তীর দেখা যাচ্ছে না, কোনও দ্বীপ অথবা প্রবালবলয়। ভোরের সূর্য উঠছে সমুদ্রটাকে দু'ফাঁক করে সহসা যেন সূর্যটা আকাশে উঠে গেল। ডেক জাহাজিরা এ সময় জল মারছে। এবং অন্য অনেক জাহাজি ইতস্তত রঙের টব নিয়ে মাস্টে, ড্যাবিকে বং দেবার ফলকায় ফলকায় হাঁটছে। সুমিত্র ভোরে উঠে ওয়াচে যাবার আগে গ্যাংওয়েতে চোখ তুলে দিল। সেখানে নেই। বোট-ডেক খালি। ব্রিজে ছোট-মালোম দূরবিন চোখে লাগিয়ে দূরের আকাশ দেখছে।

সুমিত্র ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাবার আগে দু'খানা মতো রুটি খেল, জল খেল। চা খেল। অন্যান্য অনেক মতো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, গত রাতে চেরী কেবিনে শুয়ে সারারাত ঘুমিয়েছিল, না গরমে কেবিনের দরজা খুলে গভীর রাতে ডেক-এ বসে সমুদ্র এবং আকাশের নিরাময় ভাবটুকু লক্ষ করে নিরাময় করছিল।

সুমিত্র ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাওয়ার সময় দেখল ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস চুরি করে টুপাতি চেরীর হোলে উঁকি দিচ্ছে। সুমিত্ররও এমন একটা ইচ্ছা যে না হচ্ছে, তা নয়। তারও না দেখি না-দেখি পোর্ট-হোলের কাচ অতিক্রম করে চেরীর অবয়ব দর্শনে খুশি হবার ইচ্ছা। কিন্তু পোর্ট-হোলের মুখি হতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ইঞ্জিন রুমে নেমে কশপের ঘর থেকে তেল মেপে ইঞ্জিনের পিস্টনগুলোতে তেল ঢালতে থাকল। শেষে যখন উপরে উঠবে তখন নিশ্চয়ই চেরী কেবিনে পড়ে থাকবে না, সমুদ্র এবং আকাশ

দেখার জন্য নিশ্চয়ই বোট-ডেকে উঠে পায়চারি করবে, সে এমত চিন্তাও করল।

ওয়াচ শেষে অন্য পরিদারদের ডেকে দিল সুমিত্র। ইঞ্জিন-রুম থেকে সোজা না উঠে, স্টোক-হোল্ড দিয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল, প্রত্যাশা—চেরী যদি ব্রিজের ছায়ায় বোট-ডেকে বসে থাকে। সে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এই ইচ্ছায় যথার্থই বোট-ডেকে উঠে গেল। যখন দেখল ব্রিজের ছায়ায় চেরী কেন কেউই বসে নেই, তখন সুমিত্র কেমন বিচিত্র এক অপমানবোধে পীড়িত হতে থাকল।

সুমিত্র স্নান করার সময় ভান্ডারিকে বলল, মানুষের কত রকমের যে শখ জাগে চাচা।

বাতিজাব হ্যান মনের দশা ক্যান?

এই কিছু না।

সুমিত্র মনে করতে পারল, ইঞ্জিন-রুমে সে যতক্ষণ ছিল, সব সময়টা উপরে ওঠার জন্য মনটা ছটফট করেছে। যেন চেরীর সঙ্গে কী এক আত্মীয়-সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। সে মনে মনে এই বোধের জন্য না হেসে পারল না।

এ ছাড়া সুমিত্র পর পর দু'দিনের জন্য একবারও চেরীকে বোট-ডেকে অথবা গ্যাংওয়েতে এমনকি ডাইনিং-হলেও দেখল না। যুবতী এই জাহাজে উঠেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। দশদিনের সমুদ্রযাত্রা দু'দিনের নিঃসঙ্গতাকে এই অদৃশ্য যুবতী তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলছে, সকল জাহাজিরাই মনে মনে এমন ভাবছে। এ দু'দিন চেরী জাহাজ-ডেকে একবারও বের হল না। সুতরাং সুমিত্র যতবার ইঞ্জিন রুমে নেমেছে, ততবার চেরীর কেবিনের পাশে এসে একবার থেমেছে। সে পোর্ট-হোলের কাচ অতিক্রম করে চেরীর কেবিন প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করত। কিন্তু পোর্ট-হোলের ঘন কাচের ভিতর দিয়ে চেরীর কেবিন সব সময় অস্পষ্ট থাকছে। কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মেসরুমমেট অথবা মেসরুম বয় এদিকে আসছে না। বুড়ো কাপ্তান-বয় চেরীকে দেখাশোনা করছে। অফিসাররা পর্যন্ত জাহাজে চুপ মেরে গেছেন। যত জাহাজটা চলছে তত যেন নাবিকরা সব ঝিমিয়ে পড়ছে। চেরী দরজা খুলল না, ডেক এ বের হল না, পায়চারি করল না। অফিসারসকল প্রতিদিন ডেক-সাজগোজ করে বসে থাকলেন অবসর সময় একটু আলাপ এবং বন্ধুত্ব করার আশায়-সবই বৃথা। কখনও কখনও ছোট-মালোম দরজা পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। তারপর সমুদ্রের নির্জনতা ভোগ করে এক সময় কেবিনে ঢুকে সস্তা সব ক্যালেন্ডারের ছবি দেখে ভয়ানক অশ্লীল আবেগে ভুগতেন।

সমুদ্রে নীল নোনা জল, আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। খুব গরম পড়েছে। উষ্ণমণ্ডলের এই আবহাওয়া জাহাজিদের ফোকশালে বসতে দিচ্ছে না। ওরা শুতে পারছে না গরমে। ওরা উপরে উঠে ফলকাতে মাদুর বিছিয়ে সেজন্য অধিক রাত পর্যন্ত তাস খেলছে। কেউ জাল বুনছে মাস্টের আলোতে। জাহাজটা চলছে, জ্যোৎস্না রাত। সমুদ্রে অকিঞ্চিৎকর তরঙ্গ এবং সহসা সমুদ্র থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে এসে জাহাজিদের সুখ দিচ্ছে। এবং প্রপেলারটা অনবরত ঝিঁঝি পোকার করুণ আর্তনাদের মতো কেঁকাচ্ছে। খুবই ধীর গতিতে জাহাজটা চলছে, দৃশ্যমান বস্তু বলতে এই নক্ষত্রের আকাশ এবং সমুদ্র। গরমে কাপ্তান ব্রিজে পায়চারি করছেন। দুটো-একটা আলো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রে। দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখন হয়তো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছে।

সুমিত্র জাহাজিদের বলল, আচ্ছা ব্যাপার তো! দু'দিনের ভেতর একবারও যুবতীকে ডেকে দেখা গেল না! এ যে দেখি চাচারা তোমাদের বিবিদেরও হার মানাচ্ছে!

ডেকের বড়-টিন্ডাল বলল, তোমাদের ভয়েই বার হচ্ছে না।

আমরা খেয়ে ফেলব নাকি?

বড় বাকি রাখবে না।

সুমিত্র দেখল তখন বুড়ো কাপ্তান-বয় এদিকেই আসছে। সে এসে ওদের পাশেই তাস খেলা দেখতে বসে গেল।

সুমিত্র বলল, রাজকন্যার খবর কী চাচা?

আর বলবেন না দাদা। রাজকন্যাকে দেওয়ানিতে ধরেছে। রাত থেকে মাথা তুলতেই পারছে না শুধু বিছানায় পড়ে থাকছে।

রাজকন্যা কিছু বলছে না তোমাকে?

আমি বুড়োমানুষ, আমাকে কী বলবে দাদা।
অন্য জাহাজি প্রশ্ন করল, মাথা একেবারেই তুলতে পারছে না?
কাপ্তান-বয় বলল, পারছে। বিকেলে দেখেছি কেবিনেই পায়চারি করছে। মনে হয়, কালতক ... এ ঘুরে বেড়াতে পারবে।
জাহাজটা তখন তেমন দুলছে না। ওরা ফলকার উপর বসে গল্প করছে। জ্যোৎস্নার আলোতে ... মুখ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। গ্যালিতে মাংস সিদ্ধ করছে ভান্ডারি। উইন্ডস-হোল ধরে নীচ থেকে ...জিদের কথা ভেসে আসছে। এবং সেখানেও চেরী-সংক্রান্ত কথাবার্তাতে ওরা নিজেদের কঠিন ...তের দুঃখকে ভুলতে চাইছে।
সুমিত্র সকল জাহাজিদের খবরটা দিল, কাল টুপাতি চেরী ডেক-এ বের হবে। পরদিন ...টা বারোটার ওয়াচে সুমিত্র ইঞ্জিন-রুমে নেমে কশপের ঘর থেকে তেল মেপে নিল। ক্যানে ভর্তি ... সে ইঞ্জিনের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে। একটু নুয়ে মেশিনের ভিতর ঝুঁকে পড়ল। তারপর ক্যানের ...ল উঠাল, নামল এবং সে ঘুরে ঘুরে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে সে ক্যান উঠাল, নামাল। অন্য ...নও দিকে তাকাতে পারছে না। সে যেন বুঝতে পারছে উপর থেকে সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। সে ... ইঞ্জিনিয়ার এবং কাপ্তানের গলা শুনতে পাচ্ছে। সুতরাং এ সময়ে কোনও অন্যমনস্কতা রাখতে ...। এ সময়ে সে তেলয়ালা সুমিত্র। তাকে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে। তাকে ছোট টিন্ডাল বড়-টিন্ডাল ... হবে। বড় মিস্ত্রির চোখে যেন কোনও অন্যমনস্কতা ধরা না পড়ে এবং সে যেন জীবনের ঋণ ...দায়ে পরিশ্রমী তেলয়াল' সুমিত্র। সুতরাং সে ভীষণভাবে বড় ধরে মেশিনের ভিতর ঝুঁকে কাজ ...তে থাকল। থামের মতো সব মোটা পিস্টন বডগুলো উঠছে নামছে, ক্র্যাংকওয়েভগুলো ঘুরছে ...এবং এই সব ভয়ানক শব্দে উপরের কণ্ঠসকল ঢেকে যাচ্ছে। তবু সে এ সময়ে কোনও রমণীর ... শুনতে পেল এবং চোখ না তুলেই বুঝল বড় মিস্ত্রি আর কাপ্তান চেরীকে নিয়ে ইঞ্জিন রুমে নেমে ...ছে। সিলিন্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে রেসিপ্রকেটিং ইঞ্জিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় মিস্ত্রি তাকে ...বিত বলছেন।
সুমিত্র যেখানে কাজ করছে, সেটা ইঞ্জিনের তৃতীয় স্তর। দ্বিতীয় স্তরে চেরী এবং কাপ্তান। চেরী ...টা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুমিত্র একবার চেরীকে সহসা দেখে ফেলল। চেরী ...ভার পরিদর্শন করে সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নামছে। ওরা সুমিত্রর পাশ দিয়ে যথাক্রমে নীচে নেমে ... সুমিত্র নিজের পোশাকের দিকে তাকাল, নীল কোর্তা ওকে মোল্লা মৌলবি বানিয়ে রেখেছে। ... নীচে নেমে যাচ্ছে। মেশিনের হাওয়ায় ওর চুলগুলো উড়ছে। গায়ে সাদা সিল্কের ফ্রককোট। ... নেভি ব্লু স্কার্ট। সুমিত্র নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে দেখল, বড়-মিস্ত্রি এবং কাপ্তান চেরীকে ...নের মতো দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে সুমিত্রর দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে, এরা ইন্ডিয়ান। কোম্পানি ওদের ...তা অথবা বোম্বাই বন্দর থেকে তুলে নেয়। খুব কম পয়সায় ওরা বেশি কাজ দেয়।
বড় মিস্ত্রি অনেকটা পাদ্রিসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, বেচারা।
সুমিত্র লজ্জায় মেশিনের ভিতর আরও ঝুঁকে পড়ল। চেরী ওর মুখ না দেখে ফেলে, এমত ইচ্ছা ...ল সুমিত্রর।
সুমিত্রর এখন যেন কত কাজ। সে ঘুরে ঘুরে ইঞ্জিনের সকল স্থানে তেল দিল। চেরী হেঁটে যাচ্ছে, ... ফিরেও তাকাচ্ছে না, চেরী পোর্ট-সাইডের বয়লার ককের সামনে দাঁড়াল। বড়-মিস্ত্রি বলল, এটা ...ডেনসার। সার্কুলেটিং পাম্পের সাহায্যে জল ফের বয়লারে চলে যায়।
...র চেরী এবং বড়-মিস্ত্রি ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা গল্প করছে। সে তাকাল না। লজ্জায় ...চে সে টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু চেরীর চোখদুটো বড় গভীর এবং ঘন। সুমিত্র টানেলের ... এসে প্রপেলার-শ্যাফটের একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চেরীকে আড়াল থেকে দেখতে ...। চেরী ওকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর শরীরের বাদামি রং, হালকা পোশাক প্রজাপতির মতো যেন ...ও উড়ে বেড়াচ্ছে।
চেরী এভাপরেটারের পাশ দিয়ে যেতেই সেই গোপনীয় চোখদুটোকে আবিষ্কার করে ফেলল। চেরী ... দুটো ডাগর চোখ (ঠিক যেন ঠাকুমার গল্পের রাজপুত্রের মতো) রাক্ষসের দেশে চেরীকে দেখে

দুঃখিত হচ্ছে। এই সব ভেবে একটু অন্যমনস্কতায় ভুগে যখন আবার চোখ তুলল চেরী, তখন দেখতে পেল চোখদুটো সেখানে নেই, অন্যত্র কোথাও সরে গেছে।

ভয়ে সুমিত্র এক পাশে সরে দাঁড়াল। সে তেল দিল ইতস্তত এবং কাপ্তানকে টুপাতি নালিশ দিলেও যেন বলতে পারে, না মাস্টার, আমি শুধু ইঞ্জিনেই তেল দিচ্ছি। টুপাতি এ সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল লজ্জায়, সংকোচে সুমিত্র চোখ তুলতে পারছে না। সে প্লেটের সঙ্গে অথবা এই সব যন্ত্রের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে। চেরী এখন সুমিত্রর কোঁকড়ানো চুল, শরীরের বাদামি রং দেখছে। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে তেল দিতে যাবার সময় সুমিত্র শুনল টুপাতি যেন ওর সম্বন্ধে কী বলছে।

সুমিত্র ফোকশালে এসে কাপড় ছাড়ল, কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলল না। উপরে উঠে স্নান করল কোনও কথা বলল না। খেতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠল। অন্য তেলয়ালা বলল, কী হয়েছে রে? মুখটা খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

সুমিত্র উত্তর করল না।

অনেকে এমত প্রশ্ন করলেও সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। সে বাংকে বসে অযথা সিগারেট খেল, অযথা কতগুলি ইংরেজি পত্রিকার সস্তা অশ্লীল ছবি দেখল এবং কোনও দুঃসহ ভয়ে সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ইঞ্জিনের ভিতর থেকে সেই চোখদুটো যেন এখনও ওকে তাড়া করছে। বার বার মনে হচ্ছে চেরীর প্রতি চোখের এই স্পর্শকাতরতা সুখকর নয়। পোর্ট-হোলে সুমিত্রকে উঁকি দিতে দেখেছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে চেরী। কাপ্তানকে নালিশ দিয়েছে হয়তো।

আর বিকাল বেলাতেই বুড়ো কাপ্তান-বয় এল পিছিলে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। সুমিত্র বাংকে শুয়ে ছিল, ঘুম আসছে না। সেই চোখ কেবল চেরীকে অনুসরণ করছে। কাপ্তান-বয় সারেঙের ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, সারেং সাব, বাড়িয়ালার ঘরে সুমিত্রর ডাক পড়েছে।

সুমিত্র শুনল, কাপ্তান-বয় এই সব কথা বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুনল, সারেং সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে এবং ওর ঘরের ভিতরও সেই শব্দ। সুমিত্র ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল।

সারেং ডাকল, এই সুমিত্র ওঠ। বাড়িয়ালা তোকে ডাকছে।

সুমিত্র উঠে বসল, আমাকে যেতে হবে সারেং সাব?

কী করি বল? বাড়িয়ালা যে যেতেই বলল।

আমি কিছুই করিনি সারেং সাব।

সুমিত্র অপরাধবোধে পীড়িত হতে থাকল। বার বার নামতে উঠতে পোর্ট-হোলে সহসা কখনও চোখ রেখেছে এবং এক তীব্র কৌতূহল ওকে বার বার এই বৃত্তিতে প্রলুব্ধ করেছে।

সুমিত্র লকার খুলে সাদা জিনের প্যান্ট পরল, জ্যাকেট গায়ে দিল, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে সারেং সাবকে বলল, চলুন।

সে সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় দৃঢ় হবার চেষ্টা করল। কেউ প্রশ্ন করলে না। কারণ, বাড়িয়ালা একমাত্র জাহাজিদের অপরাধের জন্য তাঁর ঘরে অথবা ডাইনিং-হলে ডেকে থাকেন। সুতরাং সকল জাহাজিরা সুমিত্রকে দেখল সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে। সুমিত্র যেন ওর অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন, সে সেজন্য চোখ তুলল না। সে এখন অন্য কোনও জাহাজিকেই দেখছে না। জাহাজটা যে চলছে এ বোধও এখন সুমিত্রর নেই। উষ্ণমণ্ডলের গরম কমে যাচ্ছে, বিকেল হতেই ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব ডেকে, সুমিত্র ডেক ধরে যাবার সময় তাও অনুভব করতে পারল না। সে সারেঙের সঙ্গে বোট-ডেক পার হয়ে ব্রিজে উঠে যাবার সিঁড়ি ধরে কাপ্তানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ওরা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। ভিতরে বুড়ো কাপ্তানের সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট শব্দ। সারেং ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে এবং কোনও রকমে গলা সাফ করতেই কাপ্তান দরজা খুলে বের হলেন। তিনি ওদের দেখে বললেন, সারেং, তুমি কেন? তোমাকে তো ডাকিনি!

হুজুর, কাপ্তান-বয় যে বলল—

আরে না না, সুমিত্র হলেই চলবে। আমাদের সম্মানীয়া যে যাত্রীটি যাচ্ছেন, তিনি একবার ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এতক্ষণ সুমিত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু বাড়িয়ালার এই সব কথায় সে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, মাস্টার, আমি যাব?

তুমি একবার পাঁচ নম্বর কেবিনে যাবে। যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন যেতেই হবে।

সুমিত্র ইচ্ছা করলে বোট-ডেক অতিক্রম করে টুইন-ডেকে নেমে অফিসার গ্যালি ডাইনে ফেলে পাঁচ নম্বর কেবিনের দরজায় হাজির হতে পারে, অথবা অ্যাকোমডেশন-ল্যাডারেরই একটা অংশ ডাইনিং হলে নেমে গেছে, সেই সিঁড়ি ধরে নামলেও চেরীর দরজা। একটু ঘোরা পথ অথবা খুব কাছের পথ, কোনটা ধরে যাবে ভাবছিল, ভাবছিল চেরীর সহসা এই ইচ্ছা কেন? পাথরের আড়াল থেকে চেরী ওকে নিশ্চয়ই দেখেনি, কারণ সেখানে সুমিত্রর অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল। সে সিঁড়ি ধরে টুইন-ডেকে নেমে দেখল কমলা রঙের রোদ ডেক-এ, কিছু নীল তরঙ্গ জাহাজের চারপাশটায়। পিছিলে জাহাজিরা অনেকে নমাজ পড়ছে। সে নেমে আসার সময় তাদেরও দেখল।

ডেক-কশপ বলল, কী রে সুমিত্র, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, কাপ্তান তোকে কিছু বলেছে?

সুমিত্র কোনও উত্তর না করে এলিওয়েতে ঢুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়তে থাকল।

ভিতর থেকে কাপ্তান-বয় বলল, কে?

আমি চাচা, সুমিত্র।

ভিতরে এসো। ভিতরে এসো।

সে পা টিপে টিপে কেবিনে ঢুকল। সে দেখল, কাপ্তান-বয় লকার, টিপয় এবং অন্য সব বাংকের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে। চেরীর বাদামি রঙের ঘাড়ে আঙুরফলের মতো রঙ ধরছে। চেরী ঘাড় গোঁজ করে বাক্সের ভিতর কী যেন খুঁজছে।

কাপ্তান-বয় বলল, সুমিত্র এসেছে মাদাম।

সুমিত্র দেখল সেই আঙুরফলের মতো ঘাড় খুব সন্তর্পণে যেন নড়ছে। যেন বেশি চঞ্চল হতে নেই, উচ্ছল হতে নেই। সে দেখল সুমিত্রকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবং যত ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েছিল তার চেয়েও ধীরে ঘাড় ফেরাল।

ওকে বসতে বলো।

সুমিত্র পাশের ছোট্ট ডেক-চেয়ারে বসল।

চেরী তখনও বাক্সের ভিতর কী যেন খুঁজছে। সে বলল, বয়, তুমি যেতে পারো।

সুমিত্র বাংলায় বলল, চাচা, আপনি চলে যাচ্ছেন!

মেয়েমানুষকে এত ভয় দাদা? ফোকশালে তো খুব হইচই করতে!

সুমিত্র জবাব দিতে পারল না। সে চুপ করে বসে থাকল। কাপ্তান-বয় দরজা বন্ধ করে চলে গেল। সুমিত্র এ সময় উঠল এবং দরজা কিঞ্চিৎ খুলে দিল। সে নীচে ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অথবা সুমিত্রর মুখে উষ্ণবলয়ের শেষ উত্তাপ-চিহ্ন... সে চুপ করে বসে পড়ল ফের। পোর্ট-হোলের কাচ খোলা, উপরে পাখা ঘুরছে এবং দরজা দিয়েও কিছু হাওয়া প্রবেশ করতে পারছে, তবু সুমিত্র ঘেমে নেয়ে উঠল। যত সে দৃঢ় হবার চেষ্টা করছে, তত যেন ওর মুখে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার ছোপ লাগছে। তত সে অসহায় বোধ করল নিজেকে।

এতক্ষণ পরে চেরী মুখ ফেরাল। শরীরে হালকা গাউন, ব্রেসিয়ার স্পষ্ট। চেরী দু'হাঁটু ভাঁজ করে বাংকে বসল। সুমিত্রর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, পোর্ট-হোলে রোজ উঁকি মারতে কেন?

আর উঁকি মারব না মাদাম।

কেন উঁকি দিতে তাই বলো।

দীর্ঘ দিন সফর করছি। দেশে জাহাজ ফিরছে না, কেবল জল আর জল।

একটু বৈচিত্র্য চাইছ?

আজ্ঞে...।

সুমিত্র আর-কিছু প্রকাশ করতে পারল না। ভয়ে এবং বিষণ্ণতায় আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। ওর

পায়ে সুন্দর জুতো, নেলপালিশ নখে, সুগোল হাঁটু পর্যন্ত পা... সে নিচু করে রেখেছে মুখ, তবু ওর সব যেন দেখতে পাচ্ছে সুমিত্র। গাউনের শেষ প্রান্তে লতার গুচ্ছ, পায়ের কোমল ত্বকে কেবিনের আলো সে আর পারছে না, সে বলল, মাদাম, আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করুন।

তুমি তো ভারতবর্ষের লোক সুমিত্র?

সুমিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল এবং চোখ তুলে এই প্রথম চেরীর চোখদুটো খুব কাছে থেকে দেখল। এত উজ্জ্বল, এত প্রাণবন্ত চোখ সে যেন এই প্রথম দেখল। শালীনতার তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব চেরীকে, চেরীর চোখদুটোকে কঠিন করে তুলেছে। সুমিত্র চেরীকে সহ্য করতে পারছে না। সে বলল, আমি উঠি।

চেরী এবার অদ্ভুত রকমে হেসে উঠল, তুমি ভয়ানক ভিতু সুমিত্র। শুনেছি সম্রাট অশোক দিগ্‌বিজয়ে বের হয়েছিলেন। সেই ভারতবর্ষের ছেলে তুমি!

সুমিত্র এবার একটু হালকা বোধ করল এবং ভাল করে কেবিনের চারপাশটা দেখে নিল। এতক্ষণ পরে সে ধরতে পারছে এই কেবিনে ফুলেল তেলের গন্ধ, বিদেশি দামি সেন্টে অথবা কোথাও ধূপ দীপ অনবরত জ্বলে জ্বলে চেরীকে, ওর পোশাককে রূপময় করেছে। বাংকের উপর ভায়োলিন। দেয়ালে সুন্দর ক্যালেন্ডার। সমুদ্রে ঢেউ। বাইরে ঢেউ ভাঙার শব্দ। নীচে ইঞ্জিন-ঘরের আওয়াজ এবং চেরীর চোখদুটোতে দ্বীপপুঞ্জের কমলালেবুর গন্ধ। চোখদুটো কমলালেবুর মতোই সজল।

চেরী কাপ্তান-বয়কে দিয়ে দু'কাপ কফি আনাল। চেরী ইচ্ছা করেই দূরত্ব ভেঙে দেবার চেষ্টাতে এক কাপ কফি খেতে অনুরোধ করল। সুমিত্র এরপর ভারতবর্ষের কোনও রাজপুত্রের মতোই দৃঢ় হল এবং বলল, আপনি আমায় কেন ডেকেছেন মাদাম?

সুমিত্রর দৃঢ়তাটুকু কেন জানি চেরীর ভাল লাগল না। যে মানুষটা কিছুক্ষণ আগেও ইঞ্জিনে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, যার চোখদুটো তাকে দেখে ভয়ে বিব্রত ছিল, সে সহসা এমত দৃঢ় ইচ্ছায় প্রকট হবে অথচ চোখে কোনও করুণার চিহ্ন থাকবে না, অবাধ্য যুবকের মুখভঙ্গিতে বসে থাকবে, চেরী এতটা সহ্য করতে পারছে না। সে ফের প্রশ্ন করল, পোর্ট-হোলে উঁকি দিয়ে কী দেখার চেষ্টা করতে বলো?

মাদাম, আমার সম্বন্ধে আপনি খুব বেশি ভাবছেন।

একবার নয়, দু'বার নয়, অনেকবার পোর্ট-হোলে উঁকি দিয়েছ তুমি। ভেবেছ, পোর্ট-হোলের কাচ মোটা বলে আমি কিছু দেখতে পাইনি? সি-সিকনেসে ভুগছিলাম, নতুবা কাপ্তানকে দিয়ে তক্ষুনি ডেকে পাঠাতাম।

সুমিত্র মাথা নিচু করে আগের মতো করে বসে থাকল।

পরে জেনেছি তুমি ইন্ডিয়ান সুমিত্র।

টুপাতি একটা বালিশ টেনে কোলের উপর চেপে বলল, কফি ঠান্ডা হচ্ছে। খেয়ে নাও।

সুমিত্র ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। খুব আদর-যত্নে এই মেয়েটি প্রতিপালিত, সে তাও ধরতে পারছে। সে একবার ভাবল, কাপ্তানকে বলে দেয়নি তো অসভ্যের মতো চুরি করে সে চেরিকে দেখত। সুমিত্র কেমন শুকনো মুখে কফি গিলতে থাকল। বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পথ ধরেই আর ইঞ্জিন-রুমে আসব না। আপনি দয়া করে কাপ্তানকে শুধু কিছু বলবেন না। আমি সব করব। আপনি যা বলবেন সব করব।

সে কেমন আড়ষ্ট গলায় এই সব বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। কারও দিকে তাকাল না। সোজা ফোকশালে গিয়ে বাংকে শুয়ে ভয়ংকর অপমানবোধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকল।

চেরী বাংকেই চুপ করে বসে থাকল। সুমিত্রর পায়ের শব্দও এক সময় মিলিয়ে গেছে। পোর্ট-হোলের কাচে এখন আর কোনও প্রতিবিম্ব ভাসছে না। এতক্ষণ এই কেবিনে সুমিত্রর চোখ মৃত এবং সাদা ছিল, এতক্ষণ চোখদুটোতে যেন নিঃসঙ্গ ভূতের আতঙ্ক, এই সব ভেবে চেরী নিজের উপরই বিরূপ হতে থাকল। সে সুমিত্রকে কোনও কৌশলেই যেন আয়ত্তে আনতে পারছে না। অথচ দু'দিনের দেওয়ানি চেরীকে যখন এই কেবিনে মৃত্যুর মতো শক্ত করে রেখেছিল, তখন পোর্ট-হোলের কাচে কোনও এক যুবকের চঞ্চল চোখ, জীবনের প্রতীক যেন... যেন দর্পণ, তাকে নিয়ত রাজপুত্রের মতো করে রেখেছে। ঠাকুমার গল্পের স্মৃতি এই কেবিনে কোনও এক যুবকের শরীরে রূপ পাচ্ছিল—রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, এক রাজ্য আক্রমণ করে অন্য রাজ্যে, কত গাছ, কত পাখ-পাখালি,

বন-বাদাড় অতিক্রম করে যাচ্ছে—আহা, ভারতবর্ষের রাজপুত্রেরা ঘোড়ায় চড়ে একদা রাজকন্যা খুঁজতে বের হত, গল্পে রাজপুত্রের চোখ যেমত এই বয়স পর্যন্ত অনুসরণ করেছে চেরীকে—এই জীবনে সেই চোখ, সেই মন এতক্ষণ ক্লান্ত ঘোড়ার মতো পা ঠুকে ঠুকে নিঃশেষ হয়ে গেল। চেরী অনুভব করল, বেচারি।

বস্তুত টুপাতি চেরী শৈশবের রূপকথার রাজপুত্রের চোখকেই যেন পোর্ট হোলে প্রত্যক্ষ করেছিল। ...খানিতে মাথা তুলতে পারছে না, শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং সারাদিন বাংকে পড়ে থাকা, ...রাদিনের ভিতর পোর্ট-হোলের ঘন কাচে সুমিত্রর চোখদুটোই এক অসামান্য রূপকথার রাজত্ব, সুখ ও আনন্দ এই দেয়ালে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ঠাকুমার কোলে শুয়ে রাজপুত্রের গল্প শুনতে শুনতে ...রী ঘুমিয়ে পড়ত, সে রাজপুত্রের চোখদুটো জীবনের এতদিন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে আসছে, পোর্ট হোলে সহসা সেই চোখ-দুটোকে যেন আবিষ্কার করেছে চেরী এবং প্রত্যক্ষ করেছে।

রাত্রিবেলায় সুমিত্র ওয়াচে নামার সময় অন্য পথ ধরে গেল।

ওয়াচ থেকে উঠে আসবার সময় কশপ বলল, কাল রাজকন্যা তোমাকে কী বলল সুমিত্র?

সুমিত্র জবাব দিল, আমার দেশ কোথায় কী নাম, এই সব নানা রকমের কথা। সব মনে নেই।

সাহেবদের ফেলে তোমার দিকে এমন নজর!

কী করি! রাজকন্যার মর্জি বোঝা দায়।

বিকাল বেলায় সুমিত্র দেখল চেরী ডেক-এ বসে আছে। উল বুনছে। পাশে ছোট মালোম বসে, ...ই গল্প করছেন। ডেক-অ্যাপ্রেন্টিসরাও সেখানে আছে। বেশ গুলজার বলতে হবে। সে পিছিলের ...তের নীচ থেকে সব দেখল। রঙিন কাগজের মতো মখমলের পোশাক চেরীর সমস্ত শরীরে জড়ানো। ...যের গোড়ালি পর্যন্ত গাউনের শেষ প্রান্ত ঝুলছে। চুলের গুচ্ছ খোঁপার মতো জড়ানো। ঘাড়ের মসৃণ ...ক কমলা রঙের রোদ, চুলের সোনালিগুচ্ছ এই সমুদ্রের নীল নির্জনতাকে ভেঙে দিচ্ছে। সুমিত্র ...লতে ঢুকে, গ্যালির জানালা দিয়ে প্রায় আড়াল থেকেই চেরীকে দেখতে থাকল। অন্যান্য ...হাজিরাও সেখানে এসে ভিড় করছে। ওর এই ভিড় ভাল লাগছে না। ওর মনে হল ফের জাহাজি ...সংতা ওকে জড়িয়ে ধরছে। এই মনোরম বিকেল, কমলা রঙের রোদ এবং ছোট-মালোমের উপস্থিতি কেন জানি তাকে কেবল পীড়া দিচ্ছে। সে গ্যালি থেকে বের হয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে ...কশালে ঢুকে বাংকে শুয়ে পড়ল। এক অহেতুক ঈর্ষার জন্ম হচ্ছে মনে। সে বাংকে শুয়ে চেরীর ...সামান্য রূপে দগ্ধ হতে থাকল।

কাপ্তান বয় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সুমিত্র, আবার যে ডাক পড়েছে পাঁচ নম্বর কেবিনে।

সুমিত্র বলল, কেন, চেরী তো বোট-ডেকে বসে আছে দেখে এলাম।

এখন আর নেই। কেবিনে ঢুকেই বলছে, সুমিত্রকে আসতে বলো।

কী ফ্যাসাদে পড়া গেল চাচা!

কোনও ফ্যাসাদ নেই। আল্লাতায়লা ঠিক করবে। খুশি হয়ে চলে যাও।

কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিত্র প্রথমে অনুমতি নিল, পরে ঘরে ঢুকে ডান দিকের বাংকে বসল। চেরী সুমিত্রর জন্য প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাব চোখে মুখে।

সেও সুমিত্রর পাশে বসে পড়ল এবং বলল, জাহাজে কত দিন ধরে কাজ করছ?

এই নিয়ে দু'সফর।

যাত্রী-জাহাজে কোনও দিন চড়োনি?

না, মাদাম।

তাই তুমি জানতে না অন্যের কেবিনে কখনও উঁকি দিতে নেই।

পোর্ট-হোল দিয়ে কেবিন অস্পষ্ট বলে আমিও আপনার কাছে অস্পষ্ট, এই ভেবেছি। আপনি ঘরের অন্ধকারে পড়ে থাকতেন, আমি বাইরের আলোতে থাকতাম। সে কথাটা তখন আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি।

তবে বলো আমাকে দেখার জন্য চুরি করে উঁকি দিতে?

সুমিত্র মাথা নিচু করে রাখল আগের মতো।

হুঁ, এ তো ভাল কথা নয়, সুমিত্র।
সুমিত্র মাথা তুলছে না। সুমিত্রর চোখে-মুখে ফের অপরাধবোধ জেগে উঠছে।
এই সব জাহাজে তোমার কাজ করতে ভাল লাগে?
না, মাদাম। কাজ করতে ভাল লাগে না।
তোমার দেশ ভারতবর্ষ, কত বিরাট আর কত অসামান্য দেশ!
আজ্ঞে, মাদাম।
ঠাকুমার কাছে তোমার দেশের রাজপুত্রদের গল্প শুনেছি। সমুদ্রের ধারে ঠাকুমা আমাদের তোমা দেশের রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন।
এই সব কথা বলে চেরী উত্তেজিত হল অথবা কেমন উত্তেজিত দেখাল চেরীকে। চেরী বলল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথায় তোমার কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।
কোন কথায় মাদাম?
তোমাদের সস্তায় নেওয়া হয়। যেন অনেকটা গোরু-ভেড়ার মতো ভাব।
ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন মাদাম। আমরা তাঁদের কাছে—
এই সব লোকদের আমি ঘৃণা করি।
সুমিত্র এবার কথা বলল না। সব কিছুই রহস্যময় মনে হচ্ছে। চেরীর সকল কথাই কেমন অসংলগ্ন সুমিত্র বুঝল না চেরী যথার্থ কাকে ঘৃণা করছে। সুতরাং সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল এব চেরীর অসামান্য রূপে বিহ্বল হতে থাকল।
আমি কাপ্তানকে ধমক দিতে পারতাম। কিন্তু দিইনি। এতে তোমাদের আরও বেশি অপমান করা হবে।
একটু থেমে চেরী ফের বলতে থাকল, কাপ্তান এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ইঞ্জিন-রুমের সব কিছু দেখালেন। তোমাদের দেখালেন, যেন তোমাদের বাদ দিলে ইঞ্জিন-রুমের একটা ইঞ্জিনকেই বাদ দেওয়া হল।
মাদাম, আমরা নাবিক। এর চেয়ে বড় অস্তিত্বের কথা ভেবে আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না।
তার চেয়ে বড় কথা তুমি ভারতবর্ষের ছেলে। বুদ্ধদেব, গাঁধী, রবীন্দ্রনাথ তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।
আপনি দেখছি ভারতবর্ষের প্রতি খুব অনুরক্ত।
আমি একটি মহান জাতির প্রতি অনুরক্ত।
এখন চেরীকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তে জাহাজে বিপ্লব শুরু করে দিতে পারে।
আমি উঠি মাদাম। ওয়াচের সময় হতে বেশি দেরি নেই।
যেন চেরী শুনতে পেল না, যেন খুব অন্যমনস্ক। চেরী আবেগের সঙ্গে বলতে থাকল, সুমিত্র, আমি ভারতবাসী। আমার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য করতে এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিরল না। তোমাকে দেখে আমি তবে খুশি হব না, তোমার অপমানে আমি আমার অপমান ভাবব না।
সুমিত্র ফের স্মরণ করিয়ে দিল তার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। অথচ চেরী এতটুকু কর্ণপাত করছে না কথায়। এবং সেজন্য সুমিত্র চেরীর সকল কথার ভিতর নষ্ট-চরিত্রের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছে। এই বিষণ্ণ আলাপ সুমিত্রকে চেরী সম্বন্ধে আদৌ কোনও কৌতূহলী করছে না। সুমিত্র মৃত চোখ নিয়ে বসে থেকে সকল কিছুকে বিরক্তিকর ভেবে পোর্ট-হোলের কাছে ঠান্ডা হাওয়ার গন্ধ নিতে সহসা উঠে দাঁড়াল।
সুমিত্র চলে যাচ্ছে। দরজায় এক পা রেখে দেখল চেরী কথাবার্তায় এখন নরম এবং সহজ হয়ে উঠেছে। চেরীর মুখ প্রসন্নতায় ভরা। যেন প্রগাঢ় স্নেহ এই জাহাজি মানুষটির জন্য সে লালন করছে। সুমিত্র নির্ভয়ে দরজা টেনে দিতে শুনল, চেরী ভিতর থেকে বলছে, ঠাকুমা আমাদের সকলকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ভারতবর্ষের রাজপুত্রদের গল্প করতেন।
ভয় অথবা বিষণ্ণতা এ ক'দিন ধরে সুমিত্রকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, চেরীর শেষ আলাপ, প্রগাঢ় স্নেহবোধ সুমিত্রকে নতুন জীবন দান করছে। সে ডেকের উপর দিয়ে প্রায় ছুটে এল। হালকা শিস দিল ফোকশালে নামার সময়।

চেরী বাংকে বসে থাকল। ভয়ানক একঘেয়ে এই সমুদ্রযাত্রা, চেরীর ঠাকুমার স্মৃতি মনে পড়ল। সেই সব রাজপুত্রদের ঘোড়াসকলকে মনে পড়ল। অথবা রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটোয় সোনার ভ্রমরে...যেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে, রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে...চেরী এই কেবিনে উঠে দাঁড়াল। অথবা নির্জন দ্বীপে রাজকন্যা নিদ্রিত, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, ছুটছে...চেরী ঠাকুমাকে স্মরণ করতে পেরে এই সব ভাবল। সেই সব মনোরম বিকেলের কথা তাব মনে হল। যেন সুমিত্রকে দেখেই স তার কৈশোর-জীবনের কথা মনে করতে পারছে। বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধারে, ছোট ছোট ম ছুবা খেলছে। সমুদ্রের ধারে ওরা ছুটোছুটি করছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বসে আছেন, যেন যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে, তাঁর পিতৃপুরুষের দেশকে, দেখছেন। তখন অ্যান্টনি নারকেল গাছ থেকে ডাব কেটে দিচ্ছে সকলকে। ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। ওরা ডাবের জল খেতে খেতে ঠাকুমার পাশে বালুর উপর শুয়ে পড়ল। তখন সমুদ্রে সূর্য ডুবছে। নির্জন পাহাড়ি দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল এবং ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমার-মতো-রূপকথার গল্প আরম্ভ করে চেরীর মুখ টিপে বলতেন, তোর জন্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকটুকে রাজপুত্র ধরে আনব। চেরীর সেই কৈশোর-মন ঠাকুমার কথা যথার্থই বিশ্বাস করে এক রঙিন স্বপ্নে ঠাকুমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত।

চেরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পোর্ট হোলের কাচ খুলে দিল। পরদা তুলে দিল, অথচ সেই চোখদুটোকে আর খুঁজে পেল না। যতক্ষণ সুমিত্র এই বাংকে বসে ছিল, যতক্ষণ গল্প হল পোর্ট-হোলের চঞ্চল চোখদুটোর গোপনীয় ভাব সুমিত্রর চোখে-মুখে ফিরে এল না। কেমন নিষ্প্রভ, কেমন পাথরের মতো চোখ নিয়ে এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে থাকল সুমিত্র। সুতরাং সকল দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্য পোর্ট-হোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভায়োলিনটা বাজাতে থাকল চেরী। উপরে নীচে, সামনে পিছনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, শুধু নীল সমুদ্র এবং মনে হল সমুদ্রে রূপকথার রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এবং সেই সব দ্বীপপুঞ্জের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের চেরী পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে দেখল ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রে সুমিত্রর পাশাপাশি ছুটতে পারছে না। জীবনের প্রথম লগ্নে ভারতবর্ষের এক সুপুরুষ যুবাকে, যুবার কোমল চোখদুটোকে পরম অপার্থিব বস্তু ভেবে চেরী কেমন প্রীত হতে থাকল। চেরী, সেই দিঘির (ঠাকুমার বর্ণিত রূপকথা) সিঁড়িতে সুমিত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেন রাজপুত্র-কোটালপুত্র নামছে, নামছে। মানিকের আলোয় দিঘির সিঁড়ি ধরে রাজকন্যার দেশে নামছে। নিঝুম পুরী, কোনও শব্দ নেই, লোক নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই, নিঃশব্দ ভাব। সোনার গাছ। গাছে হীরা-পান্নার ফল। সোনার ঝরনা, সোনার পাখি। একই গাছের ডালে নাচ এবং গান। রাজপুত্র গান শুনতে শুনতে নাচ দেখতে দেখতে সদর দেউড়ি পার হয়ে সাত দরজা ডাইনে ফেলে অন্দরের রূপকাঠিতে হাত বুলাল। এখানে ছোট নদী বইছে, সুবর্ণরেখা নদী। নদী ধরে পদ্ম ভাসছে, কখনও হীরা, কখনও মাণিক্যের। এবং রাজপুত্র চন্দনকাঠের পালঙ্কে রাজকন্যাকে দেখল। এই সব গল্প শুনে টুপাতি চেরী বলত, আমরা কোনও দিন ইন্ডিয়ায় যাব না ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলতেন, বড় হলে যাবে। দেখবে তখন কত রাজপুত্র তোমাদের খুঁজতে বের হয়েছে।

চেরী যেন এই বয়স পর্যন্ত কোনও রাজপুত্রকে অনুসন্ধান করে সহসা পোর্ট-হোলের কাচে তাকে আবিষ্কার করেছে।

ছোট বড় ঢেউ উঠছে সমুদ্রে। দূরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলফিনরা, ফ্লাইংফিশের ঝাঁক বর্শার মতো ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। দুটো-একটা দ্বীপ, দুটো-একটা আগ্নেয়গিরি আকাশ লাল করছে। দ্বীপে ছোট ছোট পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। জলে, লাল নীল হলুদ রঙের মাছ। তখন সূর্য উঠছে।

আবার বিকাল। সূর্য পাটে বসেছে। পোর্ট-হোলের ঘন কাচে কোনও চোখ ধরা দিচ্ছে না। টুপাতি দেখল, সুমিত্র আর এলিওয়ে ধরে ইঞ্জিনে নামছে না। অথবা ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসছে না। অভিমানে টুপাতির চোখে জল আসতে চাইল।

সেই বিকালে ছোট-মালোম এসে বললেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে চা খাই।

চেরী বলল, ক্ষমা করবেন মিস্টার। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

পরদিন ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন কাপ্তান। বললেন, আজ আপনি আমাদের গেস্ট। আমরা সকলে একসঙ্গে ডাইনিং-হলে খাব।

চেরী বলল, বেশ হবে।

বুড়ো কাপ্তান উঠলেন। চেরী প্রশ্ন করল, আর ক'দিন বাদে বন্দর ধরবে ক্যাপ্টেন?

তিনি কী হিসাব করে একটি তারিখের উল্লেখ করলেন এবং কাপ্তান কী ভেবে ফের বললেন, সন্ধ্যায় ডাইনিং-হলে একটু নাচ-গান হোক—এই আমার ইচ্ছা।

বেশ হবে।

আপনি অংশগ্রহণ করলে বাধিত থাকব।

অংশগ্রহণ করব।

ভারতীয় জাহাজিটি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করছে?— কাপ্তান কথাপ্রসঙ্গে যেন এই কথাগুলো বললেন।

কোথায় করছে!— চেরী এই বলে বড় বড় হাই তুলল।

ছোঁড়া ভারী বেয়াদপ দেখছি।

ভয়ানক।— আবার হাই তুলল চেরী।

দাঁড়ান, ঠিক ব্যবস্থা করছি।

তা করুন।— সে কেবল হাই তুলতে থাকল।

এবার আমি আসি।

আচ্ছা।

তখন ঘড়িতে সাতটা বাজল। আটটা-বারোটা ওয়াচের জাহাজিরা বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা ফ্যানেলের পাশ দিয়ে স্টোক-হোলডে নেমে যাবে এমন সময়ে কাপ্তান-বয় ছুটে এল। বলল, সুমিত্রকে বাড়িয়ালা তাঁর কেবিনে ডাকছে।

সুমিত্র এই ডাকে ভীত অথবা সন্ত্রস্ত নয়। চেরীর চোখে যে স্নেহ দেখেছিল, নিশ্চয়ই তা বেইমানি করতে পারে না। অন্য কোনও কারণে অথবা সারেঙের কানভারী কথা—এমন সব ভেবে সে অ্যাকোমডেশন-ল্যাডার ধরে ব্রিজ অতিক্রম করে কাপ্তানের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা ছিল বলে কাপ্তান তাকে দেখতে পাচ্ছেন। কাপ্তান যেন চার্ট-রুমে কোনও মানচিত্র দেখছেন এমন চোখে সুমিত্রকে দেখে এক সময় বললেন, তুমি এই জাহাজে কোল-বয়ের চাকরি করতে?

ইয়েস মাস্টার।

আমি তোমাকে ফায়ারম্যান করেছি?

ইয়েস স্যার।

তারপর ইফাতুলা কার্ডিফে নেমে গেল বলে তুমি গ্রিজার হলে?

ইয়েস স্যার।

ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার! বেয়াদপ পাজি, ন্যাস্টি হেল!— কাপ্তান চিৎকার করতে থাকলেন।

সুমিত্র নীচের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সুমিত্র বুঝতে পারছে না। ওর বেয়াদপি কোথায় এবং কখন ঘটেছে। তবু স্বীকার করাই ভাল। নতুবা কাপ্তান এখনই লগ-বুক এনে খচ খচ করে হয়তো লিখবেন, সুমিত্র, অ্যান ইন্ডিয়ান সেলর ডাজ নট ক্যারি আউট হিজ জব।

সে বলল, ইয়েস মাস্টার, আর কোনও দিন বেয়াদপি হবে না।

তাহলে কোনও দিন বেয়াদপি করবে না বলছ?

না মাস্টার, কোনও দিন করব না।

ফের কোল-বয় হবার যদি ইচ্ছা না থাকে, চেরীকে যথাযথ সম্মান দেখাবে।

সুমিত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কাপ্তানের কথামতো যখন ব্রিজ পার হয়ে সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে নেমে এল, যখন দেখল সকল জাহাজিরা নেমে যাচ্ছে স্টোক-হোলডে, তখন উত্তেজনায় অধীর হতে হতে সে বাংলায় অশ্লীল সব কথাবার্তা বলল চেরীকে উদ্দেশ করে এবং এ সময় তার একটু মদ খাবার শখ জাগল।

বিকেল বেলা চেরীর ঘরে ডাক পড়তেই সুমিত্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। এক মুহূর্ত দেরি করল না। অথবা সাজগোজের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াল না। সে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখল, চেরী

ভয়ানক ভাবে সাজগোজ করে বসে আছে। কোলের উপর ভায়োলিন। প্রসাধনের তীব্র তীক্ষ্ণভাব সুমিত্রকে যেন সুচতুর যৌনবিলাসী হতে বলছে। চেরীকে সে দেখল। মখমলের পোশাক দেখল এবং নগ্ন ভঙ্গিতে বসে ঠোঁটে বিদ্যুৎ খেলতে দেখল। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে, পায়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন আড়ষ্ট ভঙ্গি।

সুমিত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, কোনও কথা বলল না।

এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।

সুমিত্র কোথায় বসবে ঠিক করতে পারল না।

ডেক-চেয়ারটাতে বোসো সুমিত্র।

সুমিত্র খুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসল।

অমন পুতুল-পুতুল ভাব কেন? কোনও সজীবতা নেই চলাফেরাতে। কেবিনে ঢোকবার আগে পোর্ট-হোলের চোখদুটো কোথায় রেখে আসো?

আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম। সেই চোখদুটো কিছুতেই আর সংগ্রহ করতে পারছি না।

কেন, কেন পারছ না?

আজ্ঞে, কাপ্তান অযথা ধমকালেন।

চেরী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অযথা হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা কাপ্তানের পাল্লায় পড়েছ।

ইয়েস মাদাম। আপনি কিন্তু ওকথা আবার কাপ্তানকে বলবেন না।

কাপ্তানকে তুমিও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না?

সুমিত্র জিব কাটল।

তা হয় না মাদাম। আমাদের কাপ্তান খুব ভাল লোক। অন্য জাহাজের কাপ্তান ভারতীয় জাহাজিদের সঙ্গে সাধারণত কোনও কথাই বলেন না। সব সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় কাপ্তান সকল জাহাজিদের নাম জানেন। তাছাড়া নাম ধরে ডেকে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করেন। আমি কিছু ইংরেজি জানি বলে তিনি খুব খুশি আমার উপর। এই জাহাজে কোল-বয় হয়ে উঠেছি, তাঁর দয়ায় এখন আমি গ্রিজার। জাহাজিদের এর চেয়ে বড় উন্নতি এত অল্প সময়ে নেই।

তবে বলতে হয় কাপ্তান তোমাকে খুব ভালবাসেন?

হ্যাঁ মাদাম।

আমি ভায়োলিন বাজাই, কই, কোনও দিন তো বললে না আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছা হয়, ভাল লাগে?

কথার আকস্মিক পরিবর্তনে সুমিত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাহসে কুলায় না মাদাম।

সাহসে কুলায় না, না ইচ্ছা হয় না?

সুমিত্র এবারও জিব কাটল। চোখে পোর্ট-হোলের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল।

যদি অভয় দেন তো বলি।

সুমিত্র আবার ভাবল কোনও বেয়াদপি করে ফেলছে না তো! সে বলল, না থাক মাদাম।

কেন থাকবে? তুমি বলো। অভয় দিচ্ছি।

সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আপনার বাজনা শুনেছি, দিঘির পাড়ে ইউলোগাছের ছায়ায় বসে রোজ বিকেলে ভায়োলিন বাজাতেন।

তুমি লুকিয়ে এত সব করতে?

কিছু মনে করবেন না মাদাম। আমরা সেলার। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দরে এলেই একটু বৈচিত্র্য খুঁজি। কেউ মদ খায়, কেউ...।— চুপ করে গেল সহসা।

না থাক।

চেরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, ডাইনিং-হলে নাচ-গান হবে। তুমি এসো।

সুমিত্র জবাব দিল, সে হয় না মাদাম। জাহাজিদের অত দূর যাবার সাধ্য নেই।

চেরী বলল, আমি যদি কাপ্তানকে অনুরোধ করি?

মাদাম, আপনি জাহাজে আর চার-পাঁচ দিন আছেন। আপনি নেমে গেলে জাহাজিরা, অফিসারবা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।

চেরী চুপ করে থাকল। অন্যমনস্ক ভাবেই ছড় চালাল ভায়োলিনের তারে। এই সুর সুমিত্রর সেই পরম অপার্থিব চোখদুটিকে যেন খুঁজছে।

ছোট-মালোম এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই শব্দে সুমিত্র উঠে দাঁড়াল।— আমি তবে আসি মাদাম...

বোসো।— ছোট-মালোমকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি যাচ্ছি। একটু দেরি হবে।

চেরী এবার সুমিত্রকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি রোজ এই পথ ধরে নামবে সুমিত্র, কথা দাও।

আপনি দুঃখ পাবেন মাদাম। আমার চোখদুটো ফের বেইমানি করতে পারে।

না, কথা দাও।

এই পথ ধরেই নামব। কথা দিলাম।

চেরী বসে ছিল চুপচাপ। সুমিত্র চলে গেছে। ছোট-মালোমও চলে গেছেন। সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজাব দেরি নেই। সে বাংক থেকে নেমে জামা-কাপড় বদলাল। সে তার দামি ইভনিং-পোশাক পরে আয়নায় প্রতিবিম্ব ফেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এ সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। চেরী প্রশ্ন করল, কে?

আমি, ক্যাপ্টেন স্মিথ।

হয়ে গেছে আমার। আমি যাচ্ছি।

বলে চেরী ভায়োলিন হাতে বের হল। কাপ্তানের সঙ্গে চলতে থাকল। ওরা ডাইনিং-হলের দিকে যাচ্ছে। যেসব অফিসারদের, ইঞ্জিনিয়ারদের ওয়াচ নেই, তারা পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছে। চেরী ঢুকলে সকলে উঠে সম্মান দেখাল চেরীকে। মালবাহী জাহাজের ছোট ডাইনিং-হল, অল্প পরিসরে কয়েকজন মাত্র পুরুষ। ঘরে নীল আলো। বাটলার, কাপ্তানের আদেশমতো এই ছোট্ট ঘরটিকে বিচিত্র সব রঙিন কাগজে এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেয়ার-টেবিলের জেল্লায় জলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছে। চেরী কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকল।

কাপ্তান একটু ইতস্তত করে বলল, সমুদ্রের দিনগুলোতে কোনও আনন্দ নেই মাদাম। সুতরাং স্বল্প আয়োজন থেকেই যতটা আনন্দ নিতে পারি।

আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি কাপ্তান। সেটা আপনাকেও ভেবে দেখতে বলি।

বলুন।

এই ছোট্ট ঘরে না হয়ে খোলা ডেক-এ হলে ভাল হয় না?

কাপ্তান এবারও একটু ইতস্তত করল।

আপনি জাহাজিদের এ আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?

মন্দ কী! আমার কিন্তু মনে হয় সেই ভাল হবে। ডেক-এ সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। সমুদ্রে ঢেউ নেই এমন সুন্দর দিনে...।

তাই হবে।

সুতরাং চার নম্বর ইঞ্জিনিয়ার দৌড়ে গেল ডেক-এ। ডেকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, ড্যারিকে, মাস্টে সবুজ-লাল-নীল আলো জ্বেলে দিল। শতরঞ্চ পেতে সকল জাহাজিদের বসতে বলা হল। তারপর কাপ্তান নিজেই বলতে থাকলেন, আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস টুপাতি চেরীর সম্মানার্থে এই আনন্দের আয়োজন। আমাদের সমুদ্রের দিনগুলো খুবই নিঃসঙ্গ। সুতরাং সকলেই আজ খোলা মনে আনন্দ করব। এবং এই সম্মানীয়া অতিথির প্রতি নিশ্চয়ই অশালীন হব না।

অফিসারদের জন্য কিছু চেয়ার, কাপ্তান একপাশে এবং তার ডাইনে রেলিং-এর ধারে চেরী বসল। সমুদ্রে ঢেউ নেই বলে জাহাজ বিশেষ দুলছে না। একটু-একটু শীত লাগছে। জাহাজিরা চারপাশে বসে আছে। চেরী সহজ হয়ে দাঁড়াল, প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, আমরা আজ সকলে পরস্পরের বন্ধু। আসুন, আমরা আজ সকলে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি।

এই কথায় সকলে উঠে দাঁড়াল। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশ দেখতে থাকল।

তারপর ছোট-মালোম চেরীর অনুমতি নিয়ে গান গাইলেন, লেটস লভ মাই গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড কিস হের..।

মেজ-মিস্ত্রি তাঁর ছোট্ট ক্যানারি পাখিটা খাঁচাসহ টেবিলের উপর রাখলেন। শিস দিয়ে পাখিটাকে নানা রকমের অঙ্গভঙ্গিতে নাচালেন। সকলে হেসে গড়াগড়ি দিল।

কাপ্তান কিটসের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সকলকে।

একটু বাদে এলেন জাহাজের মার্কিন সাব। মুখোশ পরে চারিধারে বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছেন, তিনি যেন কী খুঁজছেন, অথবা কী যেন ওর হারিয়ে গেছে। শেষে কাপ্তানের কাছে এসে বললেন, দিস ম্যান, মাই ফ্রেন্ড, দিস ম্যান ইজ দি রুট অফ অল ইভলস। সুতরাং আসুন, ওকে খতম করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই।

বলে তিনি তাঁর লাঠিটা কাপ্তানের মাথায় তুলে ফের নামিয়ে আনলেন, না, মারব না।

তিনি বড় রকমের দুটো হ্যাঁচ্চো দিলেন।

লাঠিটা আপনারা নিয়ে নিন।— বলে ক্লাউনের কায়দায় লাঠিটা উপরে ছুঁড়ে ফের ধরে ফেললেন। এবারও সকলে না হেসে পারল না।

ইঞ্জিন-রুমে যাদের ওয়াচ ছিল, তারা উপরে উঠে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছে। সুমিত্র সকলের পিছনে বসে আছে। ব্রিজে ঘণ্টা বাজল। এখন সাতটা বাজে। সুতরাং আর আধঘণ্টা এখানে থাকা যাবে। সুমিত্র উঠি-উঠি করছিল, এ সময় চেরী বলল, এবার সুমিত্র আমাদের একটু আনন্দ দিক।

কাপ্তান বললেন, সুমিত্র গান গাইবে।

স্যার, আমাদের গান আপনাদের ভাল লাগবে না।

না সুমিত্র, ঠিক কথা বলছ না। আমরা এখানে কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নই। শুধু একটু আনন্দ, সে যেমন করে হোক। একটু আনন্দ, আনন্দ করো।

সুমিত্র একটি সাধারণ রকমের বাংলা গান গেয়ে শোনাল।

এ সময় ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস এল পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা শুয়ে বসে চলল। এবং সব শেষে চেরী ওর দীর্ঘ দিনের অভ্যাসকে ভায়োলিনের তারে মূর্ত করে তুলে সকলকে আনন্দ দিল।

তারপর রাত নামছে, ডাইনিং-হলে কাঁটা-চামচের শব্দ। সেখানে বাটলার এবং অন্যান্য বয়সকল ছোটাছুটি করে পরিবেশন করল। সকলে মদ খেল অল্পবিস্তর। চেরী মদ খেয়ে মাতাল হল আজ।

রাত দশটা বেজে গেছে। চেরী নেশাগ্রস্ত শরীরে কেবিনের ভিতর ডেক-চেয়ারে বসে আছে। সুমিত্র সকলের পিছনে চুপচাপ বসে ছিল। উইংস থেকে একটি আলোর তির্যক রেখা এসে ওর চোখে পড়েছে। চেরী ক্ষণে ক্ষণে সুমিত্রকে দেখছিল। দুটি পরস্পর গোপনীয় দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় লজ্জায় আনত হল। চেয়ারে বসে চেরী সেই চোখদুটোর কথা ভেবে পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। পর্দা সরিয়ে দিল। ঘুম আসছে না। এ সময় সুমিত্রকে ডেকে পাঠালে হত।

বয়, বয়!

দরজায় পায়ের শব্দে চেরী উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল। শরীর টলছে।

বয়, আজ সুন্দর রাত। বয়, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

মাদাম, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ুন। গ্লাসে জল রেখে গেছি।

বয়, তুমি জানো আমি ভারতীয়?

জি, না।

জেনে রাখো আমি ভারতীয়। বড় দুঃখ, বয়, আমরা আর সেই দেশে যেতে পারব না। বয়, একটা কথা বলব তোমাকে। কিন্তু সাবধান, কাউকে বলবে না।

মাদাম, আপনার শরীর ভাল নেই। শুয়ে পড়ুন।

বয়, সুমিত্র কিন্তু রাজপুত্র হতে পারত। ওর চোখ, মুখ, শরীর খুব সুন্দর।

মাদাম, সুমিত্র যে রাজার ঘরেরই ছেলে। ভাগ্যদোষে—

চেরী এবার কিছু বলল না। সে ধীরে ধীরে উঠে পোর্ট-হোলে মুখ রাখল।

তুমি যাও, বয়।

মাদাম, দরজাটা বন্ধ করে দিন।— কাপ্তান-বয় বের হয়ে যাবার সময় এ কথাগুলো বলল।

চেরী পোর্ট-হোল থেকে যখন দেখল কাপ্তান-বয় ঘরে নেই, ওর পায়ের শব্দ এলিওয়েতে মিশে গেছে এবং যখন মনের উপর শুধু সুমিত্রই একমাত্র দৃশ্যমান, তখন দরজা বন্ধ না করে নীচে ইঞ্জিন-রুমে নেমে সুমিত্রর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই ভাল। চেরী দরজা খুলে বাইরে বের হল। ইঞ্জিন-রুমে নামার মুখেই দেখল সুমিত্র তেলের ক্যান নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

এই যে, মাদাম!

সুমিত্র, তোমার ওয়াচ শেষ?

না মাদাম, পিছিলে যাচ্ছি, স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে তেল দিতে।

রাত এখন কত?

এগারোটা বেজে গেছে, মাদাম।

জাহাজে আর কারা এখন জেগে থাকে সুমিত্র?

অনেকে মাদাম। অনেকে। ব্রিজে ছোট-মালোম, ইঞ্জিন-রুমে তিন নম্বর মিস্ত্রি, স্টোক-হোলডে চারজন ফায়ারম্যান, তিনজন কোল-বয়, কম্পাস ঘরে কোয়ার্টার-মাস্টার, ফরোয়ার্ড-পিকে কোনও ডেক-জাহাজি।

তুমি এত কষ্ট করতে পারো সুমিত্র!

এখন তো কোনও কষ্টই না মাদাম। যখন কোল-বয় অথবা ফায়ারম্যান ছিলাম সে কী কষ্ট!

তুমি আমার ঘরে আসবে সুমিত্র?

আপনার শরীর ভাল নেই মাদাম। আমি আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছি।

কারণ চেরীর এই উচ্ছৃঙ্খল ভাবটুকু ভাল লাগছে না সুমিত্রর। সে চেরীর অন্য কোনও অনুরোধ রাখল না। সে চেরীকে ধরে বলল, আসুন।

কোথায় সুমিত্র?

কেবিনে।

আমার ভাল লাগছে না।

ভাল না লাগলে তো চলবে না মাদাম।

তুমি কেবিনে বসবে, বলো?

বসব।

তোমার ফের ওয়াচ ক'টায়?

ভোর আটটায়।

চেরী কেবিনের দিকে না গিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালে সুমিত্র বলল, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। রাতদুপুরে জাহাজিরা দেখলে বলবে কী?

কী বলবে সুমিত্র?

কী আবার বলবে! আসুন।

ধমকের সুরে কথাগুলো বলল সুমিত্র। তারপর জোর করে চেরীকে কেবিনে ঠেলে দিতেই শুনতে পেল, চেরী বলছে, ভাল হচ্ছে না সুমিত্র। আমি মাতাল বলে কিছুই বুঝতে পারছি না ভাবছ। কাল ঠিক কাপ্তানকে নালিশ দেব দেখো। আমার উপর জোর খাটালে ঈশ্বর সহ্য করবেন না।

ফের সুমিত্র নিজের অবস্থা বুঝে খানিক বিব্রত বোধ করছে। এমত ঘটনার কথা কাপ্তানকে বললে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। অথবা মনে হল বৃদ্ধ কাপ্তানকে খবর দেওয়া যায়, চেরী ডেকের অলিগলিতে ঘুরতে চাইছে, চেরী মদ খেয়ে মাতাল এবং চেরীর এই সময় যৌনেচ্ছার বড় ভয়ানক সখ। কিন্তু দেখল যে রাত গভীর। ফরোয়ার্ড-পিক থেকে ওয়াচ করে ডেক-জাহাজি হামিদুল ফিরছে। ওয়াচের ঘণ্টা বাজছে ব্রিজে। সুতরাং বৃদ্ধ কাপ্তানকে এ সময় ডেকে তোলা নিশ্চয়ই সুখকর হবে না। বরং কাপ্তান-বয়ের খোঁজে গেলে হয়, যথার্থ উপকার এ সময় তবে হতে পারে। সে আরও কিছু

ভাবছিল তখন চেরী ওর হাতটা পিছন থেকে খপ করে ধরে ফেলল। বলল, দোহাই সুমিত্র, আমাকে একা ফেলে যেয়ো না। ভয়ানক ভয় করছে।

সুমিত্র ছোট-মালোমের কথা মনে করতে পারল। প্রতি দিন ওয়াচের শেষে অথবা রাতের নিঃসঙ্গতায় ভুগে ভুগে এই দরজার ফাঁকে চোখ রাখার জন্য উপস্থিত ছোট-মালোম এই দরজায় হাত রেখে বলত, বোট-ডেকে বড় সুন্দর রাত।

চেরী বলত, আমার শরীরটা যে ভাল যাচ্ছে না থার্ড।

আমরা এখন একটা নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাদাম।

সেটা আমার দ্বীপের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি সুন্দর হবে না থার্ড।

চেরী কত দিন এমন সব কথা বলে প্রাণ খুলে হাসত।—তোমাদের থার্ড আচ্ছা বেহায়া, সুমিত্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় কেবিনে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দি। বেচারা!

চেরী ভয়ানক টলছিল। সে এখন এক হাত বাংকে রেখে অন্য হাতে সুমিত্রের কলার চেপে বলছে, মাই প্রিন্স।

মাদাম, আপনি কী সব বলছেন!

আমি ঠিক বলছি সুমিত্র। আমি ঠিক বলছি। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও সুমিত্র, নতুবা আমি জোরে জোরে চিৎকার করব। বলব, প্রিন্স প্রিন্স। একশোবার বলব। সকলকে শুনিয়ে বলব। তুমি কী করবে? কী করতে পারছ?

ভয়ে সুমিত্র কাঠ হয়ে থাকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল, চুপ করুন মাদাম, চুপ করুন। আপনার ঈশ্বরের দোহাই।

সুমিত্র দেখল কেবিনের পোর্ট-হোল খোলা। ফরোয়ার্ড-পিকে কোনও জাহাজি যদি এখন এই সময় ওয়াচে যায়, চোখ তুলে দেখলে ওদের দু'জনকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে তাড়াতাড়ি পোর্ট-হোলের কাচ বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, ক্যালেন্ডারটা উড়ছে। সে সন্তর্পণে পোর্ট-হোল দিয়ে কিঞ্চিৎ মুখ বার করে যখন দেখল কেউ এ পথে আসছে না, বারোটা-চারটের পরিদাররা সব ইঞ্জিন-রুমে নেমে গেছে এবং শেষ ওয়াচের পরিদারদের চিৎকার স্টোক-হোলড থেকে উঠে আসছে, তখন দ্রুত পোর্ট-হোলের কাচ এবং লোহার প্লেট উভয়ই বন্ধ করে দিয়ে চেরীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং বাংলায় বলল, বেশ্যা। তারপরের খিস্তি উচ্চারণ না করে মনে মনে হজম করে ফেলল। তবে অভ্যস্ত ইংরেজিতে উচ্চারণ করল, মাদাম, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

বোসো সুমিত্র।

সুমিত্র পূর্বে এ কেবিনে যে সংকোচ নিয়ে, যে ভয় এবং মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসত, আজও তেমন দু'হাতের তালুতে মাথাটা রেখে কেমন অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকল। সে এ মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না। চার ঘণ্টা ওয়াচের পর ক্লান্ত শরীরটাকে যখন ফোকশালে নিয়ে যাবে ভাবছিল, যখন স্নান সেরে শরীরের সকল ক্লান্তি উত্তাপ দূর করবে ভাবছিল, তখন চেরীর এই মাতাল ইচ্ছা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মতো ক্রমশ ওকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

চেরী বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্নান সেরে নিতে পারো সুমিত্র।

সুমিত্র যেহেতু একদা এই সব কেবিনের দেয়াল সাবান-জল দিয়ে পরিষ্কার করেছে, যেহেতু ওর সব জানা, সুমিত্র সুতরাং উত্তর করছে না।

চেরী বাংক থেকে উঠে ওর পাশে বসল। বলল, মাই প্রিন্স।— বলে সুমিত্রর কপালে চুমু দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ল।

সুমিত্র উঠে দাঁড়াল এবং বলল, মাদাম, আপনি পাগল।

চেরীর পা দুটো টলছে এবং চোখদুটো তেমনি মায়াময়।

সুমিত্রর এই অপমানসূচক কথায় চোখদুটো কেমন সজল হয়ে উঠল। নীচে ইঞ্জিনের শব্দ। আরও নীচে সমুদ্র অতল থেকে যেন ফুঁসছে। চেরী বলল, আমি ভারতবর্ষে যাব সুমিত্র। তুমি নিয়ে চলো। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিছনে নিয়ে কেবল ছুটবে, ছুটবে—কোথাও পালিয়ে যাবে।

চেরীর সেই রাজপুত্রের কথা মনে হল। সেই রাজকন্যার কথা মনে হল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভা

অতিক্রম করে দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠন পরিত্যাগ করে আঁধারের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। মুক্তোর ঝালর, দ্বারীরা হাঁকছে, অথচ নিকটবর্তী কোনও জলাশয়ে প্রতিবিম্ব রাজপুত্রের। সকলের অলক্ষে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছে। চেরীর এই সব কথা মনে হলে বলল, তুমি পারো না সুমিত্র তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পারো না!

সুমিত্রকে উদাস দেখে ফের বলল, পারো না তুমি? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতবর্ষে?

মাতাল রমণীকে খুশি করার জন্য সুমিত্র বলল, নিয়ে যাব।

তোমার দেশের গ্রাম মাঠ দেখব সুমিত্র!

সুমিত্র সহজ ভাবে কথা বলতে চাইল, ফুল দেখবে না? পাখি দেখবে না?

ফুল দেখব, পাখি দেখব।

আমার দেশের আকাশ দেখবে না? আকাশ?

আকাশ দেখব, নক্ষত্র দেখব।

সাপ বাঘ দেখবে না? সাপ বাঘ? বিধবা বউ, যুবতী নারী?

এই সব বলতে বলতে সুমিত্র কেমন উত্তেজিত বোধ করছিল। সে মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমি সব দেখাতে পারি। কিন্তু দেখাব না। তুমি নেশায় টলছ। নিজের সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও, সুতরাং সব দেখালে অন্যায় হবে।

প্রথমটায় চেরী ধরতে না পেরে বলল, কী বললে?

চেরীর চোখদুটো তারপর সকল ঘটনার কথা বুঝতে পেরে ছোট হয়ে এল।

কাপুরুষ!— চেরী সুমিত্রর মুখের কাছে এসে কেমন একটা থু শব্দ করে দরজার পাট সহসা খুলে দিল।

গেট আউট, ইউ গেট আউট!— এমন চিৎকার শুরু করল চেরী যে সুমিত্র পালাতে পারলে বাঁচে। সুতরাং সুমিত্র ছুটতে থাকল। সে ডেক ধরে ছুটে এসে পিছিলে উঠে দেখল পরিদারেরা সকলে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এই সব কথা গোপনে লালন করে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুঃখবোধ করল।

তখন চেরী পোর্ট-হোলের প্লেট খুলে দিল। কাচ খুলে দিল। সে শরীরটাকে বাংকে এলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় দরজায় শব্দ, কড়া নাড়ছে কে যেন। ধীরে ধীরে এবং সন্তর্পণে। অথবা চোরের মতো। সে বুঝতে পারছে, কারণ চট করে শরীরের মাতাল ভাবটা কেটে গেছে পোর্ট-হোলের ঠান্ডা হাওয়ায় এবং নিজের বেলেল্লাপনার রেশটুকু ধরতে পেরে লজ্জিত, কুণ্ঠিত। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। বলল, কে?

আমি মাদাম।

আপনি কে?

আমি থার্ড।

আজ তো আকাশে নক্ষত্র নেই। আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি।

এই সব কথার ভিতর চেরীর মাতাল মন ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হচ্ছে। এতক্ষণ প্রায় সকল বস্তুকে সে দুটো অস্তিত্বে দেখছিল—দুটো ক্যালেন্ডার, দুটো লকার, চারটে বাংক এবং এমনকী সুমিত্র পর্যন্ত দুটো অস্তিত্ব নিয়ে ওর পাশে বসে ছিল। পোর্ট-হোলের ঠান্ডা হাওয়ায় সবকিছুই মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। যেন সবই এখন এক অখণ্ড বস্তু। তবু থার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, চলুন কাপ্তানের ঘরে। রাতদুপুরে কেমন জ্বালাতন করছেন টেরটি পাবেন।

এতক্ষণ মাদাম, দয়া করে আপনার কেবিনে কে ছিলেন?

চেরী বিদ্রুপ করে বলল, কেন, আপনি নিজে!

তারপর দরজাটা মুখের উপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীছেলের মতো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু সুমিত্র নিজের বাংকে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। সুমিত্রর মনে পড়ল মাতাল রমণী যদি দরজা খুলে শুয়ে থাকে, যদি থার্ড সেই ফাঁকে বেড়ালের মতো সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে এবং চুরি করে চেটে

মাংসের স্বাদ নিতে নিতে যদি.. ভাল নয়, ভাল নয় সব—এমত ভেবে সে ডেকের উপর উঠে কাপ্তান-বয়ের দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, চাচা, অ চাচা, একটু উঠুন।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয়ের সারাদিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু একান্ত নিজস্ব। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবং দু'-এক ডাকে সাড়া পেল না সুমিত্র। সুমিত্র বার বার ধীরে ধীরে ডাকল, চাচা, অ চাচা।

সে জোরে ডাকতে পারছে না, কারণ পিছনে মেসরুমমেট এবং মেসরুমবয় থাকে। তারপর ...নের স্কাইলাইট পার হলে ফানেল। ফানেল অতিক্রম করে অ্যাকোমডেশন-ল্যাডার, যা ধরে ...নের ঘরে উঠে যাওয়া যায়। জোরে ডাকাডাকি করলে বৃদ্ধ কাপ্তানের ঘুম পর্যন্ত ভেঙে যেতে ...। সুতরাং ধীরে ধীরে সে কড়া নাড়তে থাকল।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয় এক সময় দরজা খুললে বলল, চেরীর দরজা বন্ধ করে আসুন চাচা। মদ খেয়ে ...নেক মাতলামি করছে।

তাড়াতাড়ি কাপ্তান-বয় গায়ে উর্দি চাপিয়ে নীচে ছুটল। গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। কাজেই সে ধীরে ... ঠেলে ঠেলে দেখল, দরজা খোলা এবং খুলে যাচ্ছে। চেরী বাংকের উপর বসে ক্যালেন্ডারটা ...ছে নিবিষ্ট মনে। কাপ্তান-বয়ের কোনও আওয়াজই চেরী যখন শুনতে পাচ্ছে না তখন দরজাটা বন্ধ ... দেওয়াই ভাল। কিন্তু কী ভেবে ঘরের ভিতর ঢুকল কাপ্তান বয়। টিপায়ে খাবার জল রাখল, ...পর পিতৃত্বের ভঙ্গিতে বলে উঠল, মাদাম, শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে। এখন প্রায় একটা ...জে।

চেরী বড় বড় হাই তুলছে। সে কম্বলটা নীচে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কাপ্তান-বয় দাঁড়িয়ে ছিল। ... কাত হয়ে শুয়ে ক্যালেন্ডারটা দেখছে। ওর পোশাকের গাঢ় রঙের ভাঁজ এখন আর নেই। চোখে ...দের চিহ্ন। কেমন এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ওর সমস্ত অবয়বে। কাপ্তান বয় কম্বলটা ওর শরীরের উপর ...য়ে দিয়ে বাইরে এল। দরজা টেনে সন্তর্পণে তালা মেরে দিল। ডেকে বের হয়ে দেখল ঠাণ্ডায় ...ত্র তখনও পায়চারি করছে।

কাপ্তান-বয় কাছে এসে বলল, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলাম।

...ক, বাঁচা গেল।—এইটুকু বলে সুমিত্র পিছিলের দিকে উঠে যেতে থাকল।

...বেলায় জাহাজিরা সাবানজল নিয়ে কেবিনের দেয়াল ধুতে অথবা ফলক্কা বেঁধে নীচে নেমে অদৃশ্য ...চাইছে। তখন চেরী বিছানায় উঠে বসল। দরজা বন্ধ দেখল। সে গত রাতের কিছু কিছু ঘটনার ... স্মরণ করতে পারছে। সুমিত্র, জাহাজি সুমিত্রর প্রতি চেরীর বলতে ইচ্ছা হল, গত রাতের ঘটনার ... আমাকে ক্ষমা করো সুমিত্র। এই জাহাজ, সমুদ্রের নিঃসঙ্গতা এবং তোমার পাথরের মতো শরীরের ... অথবা অচঞ্চল উপস্থিতি আমাকে নিয়ত তীব্র তীক্ষ্ণ করছে। আমাকে অস্থির, চঞ্চল করছে। অথচ ... কখনও পুতুলের মতো শরীর নিয়ে, কখনও একান্ত বশংবদের চিহ্ন শরীরে এঁকে আমার কেবিনে ... কাল অতিক্রম করার হেতু আমি ক্রমশ এক অস্থির নিয়তির ইচ্ছায় কালক্ষয়ের বাসনায় মগ্ন। ...শোরের স্বপ্ন তোমার অবয়বে কেবল রূপ পাচ্ছে। আমার প্রিয়তম দ্বীপে এমত ঘটনা ঘটলে কী হত ...নি না, আমার বাবা বর্তমান, তিনি আমাকে কী বলতেন জানি না এবং তোমার উপস্থিতি আমাকে ...কারে নিদারুণ চঞ্চলতার জন্মদানে আমার সম্মানিত জীবনকে বিব্রত করে কেন জানি না, তবু তুমি ...নও এই কেবিনে এসে দাঁড়ালে আমি অধোবদনে লজ্জিত থাকব। তারপর চেরী উচ্চারণ করল, গত ...তের ঘটনার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো সুমিত্র।

রাতের বিড়ম্বনার জন্যই হোক অথবা অন্য কোনও কারণে সুমিত্র ভোররাতের দিকে শরীরে ভীষণ ... অনুভব করতে থাকল। পাশের বাংকে অনাদি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর যেহেতু চারটে-আটটা ... যেহেতু এক্ষুনি তেলয়ালা হাফিজদ্দি ওকে এসে ডেকে তুলবে, সুতরাং জলতেষ্টাতে কষ্ট পাওয়ার ... ওকে ডাকা ভাল।

সুমিত্র ডাকল, অনাদি, ও অনাদি। একটু উঠে জল দে ভাই।

এই রাতে জল চাওয়ায় অনাদি আশ্চর্য হল। সে বলল, উঠে খেতে পারিস না?

শরীরে ভয়ানক কষ্ট।

কেন, কী হল।

মনে হয় জ্বর এসেছে।

অনাদি তাড়াতাড়ি উঠে কপালে হাত রেখে দেখল জ্বরে সুমিত্রর শরীর পুড়ে যাচ্ছে। সে জল দিল সুমিত্রকে। তারপর বলল, রাত একটা পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলি রে?

সুমিত্র উপরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

কী করছিলি?

চেরীকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

চেরী তোকে কিছু বলেছে?

না।

জাহাজে তোর ভালই কাটছে।

সুমিত্র জবাব দিল না। সুমিত্র কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ভোরের দিকে সারেং ঘরে ঢুকে বলল, কী রে বা, অসুখ বাধাইছ?

না, তেমন কিছু নয় চাচা। মনে হয় ফ্লু গোছের কিছু। মেজ-মালোমের কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দেন চাচা।

সারেংকে চিন্তিত দেখাল। ওর পরি কে দেবে এখন এমতই কোনও চিন্তা যেন সারেঙের মনে। সুতরাং সে একজন ফালতু আগওয়ালাকে ডেকে সুমিত্রর পরি দিতে বলে গেল এবং যাবার সময় বলে গেল, পরিতে সুমিত্রর আজ যেতে হবে না এবং এখুনি কোন কয়লায়ালাকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এমন কথাও জানাতে পেরে সারেং যেন খুশি। তবে সুমিত্র যেন ডেক-এ উঠে ফের ঠান্ডা না লাগায়, বেশি হাঁটাহাঁটি না হয় সেজন্য সারেং শাসনের ভঙ্গিতেও কিছু কথা বলে গেল। বিশেষত ভাতের জন্য ভাণ্ডারিকে পীড়াপীড়ি করলে নির্ঘাত পরি দিতে হবে এই সব কথার দ্বারা সারেং সকলের উপরে, সে-ই জাহাজের সব খালাসিদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমন এক ধারণার ভিত্তিতে সারেং মেজ-মিস্ত্রির মতো ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল, যেন ইঞ্জিনিয়ার হাঁটছে।

সুমিত্র শুয়ে ছিল, সে পরিদারদের ওঠানামার সঙ্গে ধরতে পারছে, এখন ক'টা বাজে। পোর্ট-হোল খোলা ছিল, কিন্তু সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে না। উপরের ঘরে টিন্ডালের তামাক কাটার শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ফোকশালে কোনও জাহাজি এখন নামাজ পড়ছে। তা ছাড়া সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশি আজ। জাহাজটা কিঞ্চিৎ বেশি দুলছে যেন।

মুখটা ওর বিস্বাদ লাগল। সে এক মগ চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে এখন। ভাণ্ডারি এক মগ চা এনে দিলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে সমস্ত শরীর কম্বল ঢেকে শুয়ে থাকবে, তারপর যদি ভীষণ ভাবে ঘাম হয় শরীরে তবে নিশ্চয়ই শরীরটা ঠান্ডা হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ থেকে সে মুক্তি পাবে।

চেরী কেবিনে বসে চায়ের সঙ্গে স্যান্ডউইচ, কিছু ফল এবং মাখনের স্বাদ এতবার চেখেও যখন তৃপ্তি পেল না, যখন আটটা-বারোটার পরিদাররা সকলে নেমে গেছে ধীরে ধীরে, অথচ সুমিত্র নামছে না, দূরে সমুদ্রের বুকে সূর্যের ম্লান আলো তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে এবং তরঙ্গসকলকে আলোকিত করছে, কিছু উড়ুক্কু মাছ তেমনি ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটছে, ছোট-মালোম দূরবিনে আকাশ এবং সূর্যের অবস্থান প্রত্যক্ষ করছেন, তখন চেরীর মনে হল ডেক-ছাদের ছায়া ধরে একটু হেঁটে এই জাহাজের রেলিং-এ ভর করে সুখ এবং শান্তিকে খুঁজলে হয়। সমুদ্রের উপর জাহাজের প্রপেলার জল কেটে যাচ্ছে, জলে ফসফরাস জ্বলছিল, সূর্যের ম্লান আলোর জন্য সে কিছুই দেখতে পারছে না। অন্ধকার থাকলে এখন যেন ভাল হত। ফসফরাস জ্বলছে, এই সব দেখে গত রাতের মতো ঘোর উত্তেজনায় ভুগতে পারত। রাতের নিঃসঙ্গতায় এখানে চেরী কতবার এসে ভর করে দাঁড়িয়েছে। রেলিং-এ ঝুঁকে ফসফরাস জ্বলতে দেখেছে। কখনও সুমিত্র থাকত, কখনও থাকত না। একদিন সে সুমিত্রকে খুশি করার জন্য বসেছিল নেমে সোজা আমাদের প্রাসাদে গেলে না কেন? সুমিত্র তুমি...।

সুমিত্র এই সময় কোথায়! ডেক-সারেং এক নম্বর ফলকার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। জাহাজিরা সাবানজল নিয়ে মাস্টের উপর উঠে হাসি-ঠাট্টায় মশগুল। চেরী তখন ডাকল, সারেং, সারেং!

ডেক-সারেং দৌড়ে এলে চেরী বলল, সুমিত্র কোথায়? সে তো এখনও নীচে নামেনি। ওর তো টো-বারোটা ওয়াচ।

সারেং জবাব দিল, মাদাম, ওর অসুখ হয়েছে।

চেরী অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, যাঃ!

জি মাদাম। আপনাকে আমি মিথ্যা বলতে পারি?

ওকে কে দেখাশুনা করছে?

কে করবে মাদাম? সময় তো কারও হাতে নেই। সকলেই কাজ করছে। ও জ্বরে কাতরাচ্ছে।

তোমরা ওকে দেখতে পারো না। জ্বর হয়েছে...একলা ফেলে.

তা দেখি, মাদাম।

সারেং নিজের দোষ কাটাবার জন্য বলে গেল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মাদাম। ইঞ্জিন-সারেং মেজ মালোমের কাছ থেকে ওষুধ এনেছে।

তারপর চেরীর মনে পড়ল এই মালবাহী জাহাজে সেবা-শুশ্রূষার কোনও ব্যবস্থা নেই। জাহাজিদের জন্য ভাল ওষুধ নেই। কোনও ডাক্তার নেই। সাধারণ রকমের অসুখে মেজ মালোমই ওষুধ দেন। সাধারণ রকমের অসুখে প্রয়োগ করার মতো কিছু ওষুধপত্র এই জাহাজের কোনও এক প্রকোষ্ঠে রক্ষিত আছে। কাপ্তানের উপর, কোম্পানির উপর চেরীর রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকল। অথচ চেরী ফোকশালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। গত রাতের ঘটনাসকল চেরীকে সংকুচিত করছে। যেন এই মুখ সুমিত্রকে দেখানো চলে না। যেন সুমিত্রর ফোকশালে ঢুকলে সে দুঃখবোধ করতে পারে। গত রাতের দুঃসহ অপমানের কথা নিশ্চয়ই সে ভুলে যায়নি। সুতরাং কী ভেবে চেরী নিজের কেবিনে ঢুকে গেল এবং ফল তুলে নিল হাতে এবং কাপ্তান-বয়কে ডেকে বলল, যাও, সুমিত্রর কেবিনে এই ফলগুলি রেখে এসো। কিছু বললে বলবে, বাটলার দিয়েছে। অন্য কোনও কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় দরজার চৌকাঠ পার হলে চেরী বলল, জ্বর কত এবং কেমন আছে দেখে আসবে।

কাপ্তান-বয় এলিওয়েতে হাঁটছিল এবং শুনতে পাচ্ছে, ওকে বেশি নড়াচড়া করতে বারণ করবে। শুয়ে থাকে যেন, অন্য কোনও কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। কারণ তখনও চেরী নানা রকমের নির্দেশ দিচ্ছে।

কম্বল গায়ে না থাকলে দিয়ে দেবে।

কাপ্তান-বয় সব শুনে হাসল। বস্তুত চেরী আভিজাত্য-বোধে ফোকশালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। কাপ্তান-বয় বুঝল, চেরীর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ডেক-ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল, দূরে কেবিনের দরজাতে ভর করে চেরী অপলক চোখে কাপ্তান-বয়ের মুখে কোনও খবরের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। কাপ্তান-বয় এবার সত্বর ছুটে গেল। কারণ ওরও চেরীর দুঃখবোধে মনের কোণে এক স্নেহসুলভ ইচ্ছার রঙ করুণ হয়ে উঠছে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কাপ্তান-বয়। নীচের ফোকশালগুলি সবই প্রায় খালি। কিছু কিছু জাহাজি ডেকে গল্প করছে। ওরা দেশের গল্পে, বিবিদের গল্পে মশগুল। প্রতিদিনের মতো ফলঞ্চা বেঁধে কেউ কেউ জাহাজে রং করছে। কাপ্তান-বয় প্রতিদিনের এই সব একঘেয়েমি দৃশ্য দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। সুমিত্রর শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রাখল। ডাকল, সুমিত্র, ওঠ বাবা।

এই সময় ঠান্ডা হাত উত্তপ্ত কপালে, সুমিত্রর মনে হল বড় প্রীতিময় এই জাহাজিদের সংসার। দীর্ঘদিনের সফরে কাপ্তান-বয়কে আপনজনের মতো করে দেখতে গিয়ে চোখে জল এল। সে ডাকল, চাচা!

কেমন আছ?

শরীরটা বড় ব্যথা করছে।

একটু নুনজল এনে দেব? গরম জল?

গরম জল ভাণ্ডারি দিয়েছে।

কী খেলে?

কিছু না। ভাবছি ভাত খাব না। শরীরটা খুব ঘামছে। মনে হয় ভাল করে ঘাম হলে শরীরটা খুব ঝরঝরে হবে।

যখন কাপ্তান বয় দেখল শরীরে কোনও উত্তাপ নেই এবং যখন বুঝল ফ্লু গোছের কিছু হয়েছে, তখন আর বেশি দেরি করল না। পকেট থেকে আপেলগুলো বের করে দিয়ে বলল, নাও খাও। খাবে। কী খেতে ভাল লাগে বলবে। বিকেলে এনে দেব।

তারপর সুমিত্রকে একটু বিস্মিত হতে দেখে বলল, বাটলার দিয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাবার মতো কিছু হয়নি।

সুমিত্রর শরীরে কম্বল টেনে দিয়ে কাপ্তান বয় বাইরে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে উঠছে। সুমিত্র শুয়ে শুয়ে উপরে কাপ্তান বয়ের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনতে পেল। ওর পোর্ট হোলটা খোলা নেই থাকলেও সে আকাশ দেখতে পেত না। মাল বোঝাই জাহাজ। সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে পোর্ট হোলটাকে ঢেকে ফেলছে। সমুদ্রের এই জল দেখে গত রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে সুমিত্র। চেরীর যৌন ইচ্ছা এবং প্রগলভতা ওর মনে এখনও কামনার জন্ম দিচ্ছে। অথচ সে পারছে না। বার বার এই আত্মঘাতী ইচ্ছা ওকে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে, রাতে চেরীর কেবিন থেকে ফিরে এসে এই ফোকশালে দীর্ঘ সময় পায়চারি করেছে এবং সকল দগ্ধ যৌন ইচ্ছার প্রতি উগ্র প্রকাশের জন্য বার বার জাহাজিসুলভ খিস্তি করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে।

বিকালে সুমিত্রর জ্বরটা থাকল না। বাংকে বসে সে শরীর তার এখন নিরাময়, নিরন্তর এই বোধে খুশি। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে একটা বেঞ্চিতে বসল। সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শরীর প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে এবার ধীরে ধীরে চার নম্বর ফলকা অতিক্রম করে ডেক ছাদের নীচ দিয়ে এলিওয়ে পথটাকে দেখল সেখানে কোনও পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে না। সেই মুখ নরম ঘাড় আর তার কোমল মন সুমিত্রর নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত শরীরের জন্য বড় প্রয়োজন। এবং গত রাতের 'বেশ্যা' এই শব্দটি গ্লানিকর সুতরাং উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া প্রয়োজন। তারপর এই মুহূর্তে নিচে রে আলোক দেবে ক্ষোভ থেকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া গেলে মন্দ কী? সে ভাবল, সুতরাং আজ রাতে চেরীর দরজার পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। এবং গৃহপ্রবেশের দিনে গিন্নিমার মতো একবার যৌনসংযোগ ঘটাবে এই নিরন্তর ইচ্ছার জন্য সে এবার ডাকল, ভাণ্ডারি চাচা আমাকে এক মগ চা দিন।

ভাণ্ডারি উঁকি দিল গ্যালি থেকে। জাহাজিরা ঘরে ফেরার মতো একে একে সকলে পিছিলে জমছে সকলের হাতে বালতি টব ছিল। ওরা হাত পা বং কেরোসিন তেলে মুছে নিচ্ছে। ওরা এবার স্নান করবে নামাজ পড়বে এবং আহার করবে। তারপর সমুদয় কাজ সেরে ওরা গিয়ে বেঞ্চিতে বসে নানারকম কথাবার্তায় ডুবে ডুবে জল খাবে। সুমিত্র ওদের সকলকে দেখল। ওরা সকলে ওকে এক প্রশ্ন করল তোমার শরীরটা কেমন আছে এ বার। এই সব বলে ওরা ফোকশালে নেমে গেলে ভাণ্ডারি বলল চা কড়া করে দেব?

তাই দাও।

সুমিত্রর এখন আর কিছু করণীয় নেই। সুতরাং পা ঝুলিয়ে বসে থাকল। শরীরে সমস্ত দিনের সঞ্চিত গ্লানি এই সমুদ্র এবং এক কাপ চা দূর করে দিল। সে এবার জাহাজের অলিগলি না খুঁজলে সোজা দিগন্তে নিজের দৃষ্টিকে নিযুক্ত করে গ্রাম দেশ বাড়ির চিন্তা, সেখানে কী মাস, কী ফুল ফুটছে অথবা কোন ঋতু হতে পারে দুর্গাপূজার সময় হতে কত দেরি শেফালি ফুল ছড়ানো উঠোন অথবা বৃষ্টি বৃষ্টি এবং জাহাজে থেকে থেকে বাংলা দেশের মাস কালের হিসাব ভুলে গেল সুমিত্র। অথবা এই সব চিন্তার দ্বারা দেশের আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকল সুমিত্র।

ডেক সারেং বলল, তবিয়ত কেমন?

ভাল চাচা। জ্বরটা মনে হয় সেরে গেছে।

কী খেয়েছিলে?

চাপাটি খেলাম চাচা।

ভাল করেছ।

বাত্রে দেখ বাটলারকে বলে একটা পাউরুটি সংগ্রহ করতে পারি কি না।

অনাদি উঠে এল। সে বলল এখানে বসে শরীরে ঠান্ডা লাগানো হচ্ছে?

ডেক-জাহাজিরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ইঞ্জিন অথবা ডেক-সারেঙের ঘরে আলো জ্বলছে না তখন ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি ধরে চোরের মতো পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকল।

ডেক-এ উঠতেই শীত-শীত অনুভব করল সুমিত্র। অস্ট্রেলীয় উপকূলের যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত শীতটা যেন বাড়ছে। তত সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে আসছে। আজও সে ডেক-এ এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। মাস্টের আলোগুলি ভূতের মতো রাতের আঁধারে দুলে দুলে ভয় দেখাচ্ছে। ব্রিজে ছোট-মালোম পায়চারি করছেন, ওঁর এখন ওয়াচ নিশ্চয়ই। সুমিত্র আড়াল থেকে দেখল সব এবং খুশি হল। ছোট মালোম পাশের কেবিনে থাকেন। সুতরাং চেরীর কেবিনে কোনও শব্দ হলে পোর্ট-হোল দিয়ে উঁকি মারতে পারেন। সে উত্তেজনায় দাঁড়াতে পারছিল না, চুলোয় যাক ছোট-মালোম, সে ছুটে গ্যালিওয়ে পথে ঢুকে গেল। এবং চেরীর দরজার উপর ভর করে ছোট ছোট আওয়াজে ডাকতে থাকল, মাদাম, মাদাম! আমি এসেছি। দরজা খুলুন!

যেন বলার ইচ্ছা, আমি যথার্থই কাপুরুষ নই। আপনাকে বেশ্যা বলে নিরন্তর আমি দগ্ধ। আমরা সকলেই উনুনের তাপ চুরি করে শরীর গরম করছি। আপনি দরজা খুলুন মাদাম।

চোরের মতো সুমিত্র কড়া নাড়তে থাকল। রাত বলে ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রকট। সুতরাং এখন কেউ সুমিত্রর কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাবে না। কেউ এদিকে এলে সে ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাবার মতো ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বড় মালোমের ঘর পর্যন্ত খোলা নেই। সে আবার কড়া নাড়তে থাকল এবং এ সময়েই দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। চেরীর পায়ের শব্দ ভিতরে। চেরী দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, কে! কে?

আমি সুমিত্র, মাদাম।

সে আর কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। সে উত্তেজনায় অধীর। শরীরের প্রতি লোমকূপে সমস্ত দিন ধরে উত্তাপ সঞ্চিত এবং যেন ভোরের ক্লান্তি সকল উত্তাপকে এখন ফের অবসন্ন করতে চাইছে। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত গা পুড়ে যাচ্ছে। গলা ভয়ে শুকনো কাঠ। সে কোনও রকমে গলা বেড়ে আবার ডেকে উঠল, মাদাম, আমি সুমিত্র।

দরজা খুললে চেরী দেখতে পেল সুমিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে। কেবিনের আলোয় মুখের বিন্দু সকল ঝলমল করছে। সুমিত্রর চোখের নীচে কালি পড়েছে, বিশেষ করে গত রাতের সেই যুবকটিকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। চেরী এবার সুমিত্রর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল। পাখা খুলে দিয়ে বলল বসো।

ইজিচেয়ার ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চেরী। তারপর ধীরে সুস্থে বাংকে বসে বলল, এত রাতে!

সুমিত্র চেরীর কণ্ঠে গত রাতের কোনও ইশারাকেই খুঁজে পেল না। এত রাতে! এই শব্দ দ্বারা চেরীর আভিজাত্য বোধ অথবা প্রথম রাতের অভিযোগের মতো তুমি কেন এই কেবিনে, কী ইচ্ছা শরীরে মনে কাজ করছে, তুমি আমায় মাতাল রমণী ভেবে থাকলে অসহ্য। এবং আতঙ্কে সুমিত্র চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, দুই ঠোঁটে চেরীর ফুল ঝরছে। এইসব দেখে সুমিত্রর বলতে ইচ্ছা হল, মাদাম আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করবেন না। ঘুম গভীর হওয়ার জন্য চোখ আপনার ভারী ভারী। মুখটা বেশ ভরে উঠেছে।

চেরী বিছানা থেকে উঠে প্রসাধন করেনি বলে মুখে কোনও কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই, বিশেষ করে পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিলে চেরীর চুল উড়তে থাকল। সমুদ্রের হাওয়াতে তাজা আপেলের মতো চুলে গন্ধ ছড়াতে থাকল। আর তখনই চেরী সুমিত্রর একটা হাত নিজের হাতে স্থাপন করে।

কী হচ্ছে মাদাম, আমি যে আর পারছি না। আপনি স্পষ্ট হোন গত রাতের মতো, আমি কাঁপছি জ্বরে নয় আবেগে।

চেরী ওর হাতের নাড়ি দেখল এবং হাতটা পূর্বের মতো যথাস্থানে স্থাপন করে বলল, জ্বর নেই।

সুমিত্রর মুখ চোখ নৈরাশ্যবোধে পীড়িত হতে থাকল। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, এই দেহ নিয়ে আজ আপনি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন অথবা শরীরে সংস্থাপন করে কোলাহল পূর্ণ জীবনের কোনও কালকে অমৃতময় করে রাখতে পারেন, আমার কোনও আদর্শ নেই, আমি জাহাজি। তখন চেরী সহসা

...র কাছে নেমে হাঁটুগেড়ে বসল। বলল, গত কালের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত সুমিত্র। মন ... আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম।

...পর চেরী কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে থাকল। অথচ তখন সমুদ্রের কোনও ... উঠছে না। স্থির কোনও আবেগ চেরীকে মথিত করছে না। চেরী পাশের বাংকে উঠে যাচ্ছে এবং ... জীবের মতো ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সমীহ। সে বলল, রাত জেগে থাকলে শরীর খারাপ করবে। ... ঘুমোও।

... শুতে ইচ্ছা হচ্ছে না মাদাম। ঘুম আসছে না।

... কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে না তো?

...।

...ছু বলবে?

...রী দেখল সুমিত্রর চোখদুটো জ্বলছে। সমস্ত শরীর থেকে কামনার আবেগ গলে গলে পড়ছে। ...রে তাকাতে পারছে না, যেন অবসন্ন সৈনিক কুয়াশার অন্ধকার ঢেকে পথ খুঁজে খুঁজে অবিরাম ... হেঁটে কোনও আশ্রমে উপস্থিত। পানীয় জলের মতো যুবতীর চোখ এবং উদগ্র বাসনা নিরন্তর ...চ্ছে। সে ফের ডাকল, মাদাম, আপনার শরীর ভাল তো?

...সুমিত্র নিজের উপরে এবার যত রাগ, সে যথাযথভাবে বলতে পারছে না, বাতে এ ঘরে শয়ন ... বাসনা মাদাম, কাপুরুষোচিত সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে চাই কিন্তু সে শুধু বলল আপনি ফুল ...বাসেন মাদাম?

...ভালবাসি সুমিত্র।

...পাখি?

...খি ভালবাসি।

...আর ফুল, পাখি কিছুই ভাল লাগছে না মাদাম।

...কেন?

... জানি। এই জাহাজ কেবল উচ্ছৃঙ্খল হতে বলছে।

...মিত্র!— খুব দূর থেকে যেন চেরীর গলা ভেসে আসছে। গলা আবেগে কাঁপতে থাকল।

... আকে কিছু বলবেন মাদাম?

...মি উচ্ছৃঙ্খল হলে আমার যে কিছু থাকল না।— নিজের সতীত্ব প্রমাণে চেরী যেন মরিয়া হয়ে উঠল। ... না। আপনি ভুল বুঝবেন না মাদাম। আমি যত্নের সঙ্গে সব পরিহার করে চলছি মাদাম। অথবা ...তে পারেন, চলার চেষ্টা করছি।

সুমিত্র, কখনও যদি সময় অথবা সুযোগ পাই আমি ভারতবর্ষে যাবই।

ভয়ানক গরিবের দেশ। রাজপুত্রেরা এখন ফুটপাথে হেঁটে বেড়াচ্ছে মাদাম।

চেরী নিজেও তার ইচ্ছার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। এক কৃত্রিম আদর্শ উভয়কে ...চিত করে রাখছে। অথবা এও বলা যেতে পারে, চেরী ব্যবহারে কেবলই মাতৃসুলভ হয়ে উঠছে। ...সুমিত্রর কপালে হাত রেখে বলল, সারাটা দিন আমার কী যে গেছে!

সুমিত্র আর পারছে না। সুতরাং মাথাটা ইজিচেয়ারের উপর আরাম করার জন্যে স্থাপন করল। যেন ...চ্ছে সুমিত্র এবং দেখলে মনে হবে মৃত। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড়। সে যেন আর দাঁড়াতে ...ছে না। সে হেঁটে যেতে পারছে না ফোকশালে, দেখলে এমনই মনে হবে সুমিত্রকে। দীর্ঘ সময় ... চেরীও চুপ করে শুয়ে থাকল বাংকে। এখন ওরা উভয়ে পরস্পর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে প্রথম ...ন কে হবে, কে প্রথম যৌন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করাবে এমনই কোনও ... প্রতিযোগিতায় মত্ত। চেরী শুয়ে শুয়ে সুমিত্রর অবয়বে সেই রাজপুত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনে আর স্থির ...তে পারল না। সে খ্রিস্টের নাম স্মরণ করে ডাকল, এসো সুমিত্র।

চেরী আবার ডাকল, সুমিত্র এসো। নীল আলো জ্বলছে, দ্যাখো।

সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। এমনকী ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ল না। যেমন শিথিল শরীর নিয়ে পড়ে ছিল ...মনি পড়ে থাকল।

সুমিত্র, সুমিত্র।

চেরী বাংক থেকে নেমে সুমিত্রর ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে দেখল, সুমিত্র যথার্থই ঘুমিয়ে পড়েছে। যে আবেগ এবং ইচ্ছা এতক্ষণ ধরে বাজিকরের মতো অভিভূত করে রেখেছিল, সুমিত্রর অসহায় মুখ দেখে সেই রং জলের মতো নির্মল হল। চেরী সন্তর্পণে কাছে গিয়ে কম্বলে পার্শ্বশরীর ঢেকে দিয়ে কেবিনের নীল আলোর ছায়ায় ভারতবর্ষের রাজপুত্রের মুখ দেখতে দেখতে রাত ভোর করে দিল। বাইরে আলো ফুটে উঠছে। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিতেই বাইরের ঠান্ডা হাওয়া এই কেবিনের সকল ঘটনাকে প্রীতিময় করে তুলছে। চেরী বাংক থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে পোশাক পালটাল। শেষে কাপ্তান-বয়কে খোঁজে ডেকে বের হয়ে গেল। ডেক-ছাদের নীচে এসে দাঁড়াতেই দেখল দুটো নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। সবুজ এক প্রান্তর, এই ভোরের মিষ্টি আলো, এবং দিগন্তের ফাঁকে সূর্য উঠছে, শুধু রক্তিম আকাশ— কেবিনে সুমিত্র ঘুমোচ্ছে, চেরীর বুক ঠেলে কেমন এক কান্নার চিহ্ন ঠোঁটে মুখে ফুটে উঠল। দূরের দ্বীপ থেকে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে, সবুজের গন্ধ এই জাহাজের ফাঁক-ফোকরে যত অন্ধকার আছে সব নির্মল করে দিচ্ছে। দ্বীপের পাখিসকল জাহাজটাকে দেখে চক্রাকারে উড়তে থাকল। নীল রঙের পাখিরা আর আকাশের চারধারে সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপেব সকল পাখিরা কোনও এক নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। চেরী ভাবল, এই দ্বীপের কোনও গুহায় তার এবং সুমিত্রর জন্য একটু আশ্রয় মিলতে পারে না! একটু আশ্রয়ের জন্য মাটির কাছে তার প্রার্থনা ঈশ্বর আমার কী হবে!

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

কফি। দু'কাপ।

ধীবে ধীরে জাহাজটা দ্বীপদুটোকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সূর্যের আলো দ্বীপের সব অপরিচিত গাছেব ফাঁক দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। জনহীন এইসব ছোট ছোট দ্বীপ কত কাল থেকে এমন নিঃসঙ্গ কাটাচ্ছে কে জানে। দ্বীপের ঝোপ-জঙ্গলের পাশে সুমিত্র এবং তার জন্য যদি কোন তপোবন থাকত, যদি একফালি বোদ সেই কুটির সংলগ্ন উঠোনে এসে পড়ত এবং সারাদিন পর সমুদ্র থেকে ঘরে ফিরে এসে সুমিত্র ওকে জড়িয়ে যদি জীবনের স্বাদ গ্রহণ করত! কত রঙিন স্বপ্ন দেখল চেরী, কত আকাঙ্ক্ষার কথা, বিচিত্র সব শখ সারাদিন ধরে ডেক-পাটাতনে ভেবে কখনও অন্যমনস্ক, কখনও বেদনায় বাংকে শুয়ে শুয়ে স্মৃতিকে ধরে রাখার স্পৃহাতে এক নির্দিষ্ট যুবকের পায়ের শব্দ শুনতে চায়।

তখন সুমিত্র চোখ খুলে দেখল এই কেবিন। গভীর ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটুকুর জন্য বুঝতে পারল না কোথায় এবং কীভাবে, সে দেখল এই কেবিন ওর পরিচিত। তারপর একে একে বিগত রাতের ঘটনার কথা স্মরণ করে সে ফের আতঙ্কিত হল। দিনের আলো পোর্ট-হোল দিয়ে কেবিনে গলে গলে পড়ছে। চেরী ঘরে নেই। সুতরাং মনে ভিন্ন ভিন্ন সব অগোছালো চিন্তা জট পাকাচ্ছে। অথবা রাত হলেই এমন সব অসুখের ঘোরে সে ভুগছে। নিজের এই অপরিণামদর্শিতার জন্য সে দুঃখিত হল। তারপর চেয়ার থেকে সন্তর্পণে উঠে ডেকে এসে দেখল, চেরী দূরের দ্বীপসকল দেখছে। চেরী খুব ঝুঁকে আছে রেলিং-এ। সে তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে বিছানায় শুয়ে রাতে চেরীকে কোন কোন সংলাপে জৈব ক্ষুধা মেটাবাব স্পৃহা জানিয়েছিল, কোন কোন শব্দ মনের ইতর চিন্তা প্রকাশে উন্মুখ ছিল এই সব ভাবতে গিয়ে চোখ-মুখ প্রচ্ছন্ন বিষাদে মগ্ন। সে রুগ্ন পুরুষের মতো কম্বল টেনে বাংকে শুয়ে পড়ল।

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

এই যে!

আপনার কফি দেওয়া হয়েছে।

দু'কাপের মতো?

হ্যাঁ, মাদাম।

চেরী তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকবে ভাবল এবং সুমিত্রকে হাত-মুখ ধুতে বলবে বাথরুমে। তারপব একসঙ্গে কফি খেতে খেতে সুস্থ সব গল্প, ওর দেশ বাড়ি এবং অন্য অনেক সব খবর নিতে হবে— কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখল, কেবিন ফাঁকা। সুমিত্র নেই। তারপর সে দেখল পোর্ট-হোলের কাচ খোলা। সে এবার কফির সবটুকু বেসিনে ঢেলে দিল। একটু এগিয়ে গিয়ে কাচ এবং লোহার প্লেট দিয়ে

পোর্ট-হোল বন্ধ করে দিল। যেন সুমিত্রর কোনও প্রতিবিম্ব ভাসবে না এবং লজ্জায় আর অধোবদনও হতে হবে না। নিজের এই দুর্বলতাকে পরিহার করার জন্য আজ ভাল ভাবে স্নান করল। সুমিত্রকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা রকমের পত্রপত্রিকা খুলে বসল বাংকে। মনের বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাগুলোকে সংযত করতে গিয়ে বার বার সে হোঁচট খাচ্ছে। কোথায় যেন কী বিশাল পাথরের বোঝা হয়ে সুমিত্র মনের উপর চেপে বসে আছে। চেরী আর পারছে না। চেরী নিজেকে রক্ষার জন্য দরজা খুলে তাড়াতাড়ি কাপ্তানের কেবিনে ছুটে গেল। বলল, আপনার এই বারান্দায় একটু বিশ্রাম নিতে চাইছি।

যতক্ষণ খুশি।

বারান্দার ডেক-চেয়ারে বসে সমুদ্র দেখতে থাকল চেরী। এখানে সুমিত্র নেই, শুধু সমুদ্র, শুধু ঢেউ। কিছু পারপয়েজ মাছ। কিছু মেঘ হয়েছে আকাশে। কাপ্তান নীচে আছেন। তিনি দূরবিন চোখে রেখে সমুদ্র দেখলেন। চেরী উঠে দাঁড়ালে কাপ্তান ওর হাতে দূরবিন দিয়ে বললেন, দেখুন, দূরে একটা তিমি মাছ দেখতে পাবেন।

চেরী কিন্তু দূরবিন চোখে রেখে সুমিত্রর দিকে চেয়ে থাকল। পিছনের রেলিং-এ সুমিত্র ঝুঁকে আছে, সে বোধহয় প্রপেলারের শব্দ কান পেতে শুনছে। চেরী দূরবিনটা কাপ্তানের হাতে ফিরিয়ে দিল। সুমিত্রকে আর দেখা যাচ্ছে না এবং সে খুশি হওয়ার ভান করে কাপ্তানকে পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, আশা করছি দু'দিন বাদেই আমরা সিডনি পৌঁছাব।

আপনার সমুদ্রযাত্রা ভাল লাগছে না বোধহয়?

চেরী কথা বলল না।

ভাল লাগবে কী করে! যাত্রী-জাহাজে যেতে পাবলে এতটা অসুবিধা হত না।

চেরী বলল, কাল বিকেলটা বেশ লাগল।

তা বটে।

আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে ক্যাপ্টেন।

আপনার কথাও আমাদের মনে থাকবে। কাল আপনার ভায়োলিনের সুর অপূর্ব লাগছিল।

কাপ্তান, এবার কিন্তু কথাটা খোশামোদের মতো মনে হল।

না মাদাম, আপনি বিশ্বাস করুন। সকলেই আপনার প্রশংসা করছে। সুমিত্র ভারতীয়, সে পর্যন্ত বলল, মাস্টার, সফরের কথা আমরা সকলেই মনে রাখতে বাধ্য হব। তারপর সে আপনার কথায় এল।

চেরীর বলতে ইচ্ছা হল, আর কিছু বলেছে, আর কিছু? কিন্তু সম্মানিত জীবনের কথা ভেবে সে ওই প্রগাঢ় ইচ্ছাকে জোর করে থামিয়ে দিল।

কাপ্তান চেরীর নিকট থেকে কোনও উৎসাহ না পেয়ে চার্টরুমে ঢুকে গেল এবং নিজের কাজ করতে থাকল।

চেরী ব্রিজে পায়চারি করছে। একবার উইংসটার পাশে ঝুঁকে অথবা কখনও কম্পাসটার সামনে এসে (যেখানে কোয়ার্টারের মাস্টার স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে) নিজেকে বারবার আড়াল দিল। সুমিত্রকে আর দেখাই যাচ্ছে না। সুমিত্র পিছিলে কোথাও নেই। সে অ্যাকোমডেশন-ল্যাডার ধরে নেমে বোট-ডেক পার হয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সুমিত্র এখন ইঞ্জিন-রুমে, সে হাতঘড়িতে সময় দেখে এমত ধারণা করল। এবং কেন জানি অপার বিষণ্ণতা চেরীকে গ্রাস করছে। এবার দু'হাত তুড়ে চেরীর যেন বলবার ইচ্ছা, কে আছ তোমরা এসো, সুমিত্র নামে এক ভারতীয় যুবক আমার জীবন নিয়ে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমাকে রক্ষা করো!

সুতরাং বিকেলে জোর করে নিজেকে কেবিনে আবদ্ধ করে রাখল। সুমিত্র যে ক'বার ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠেছে নেমেছে, প্রত্যেকবার চেরীর দরজা, পোর্ট-হোল বন্ধ দেখেছে। বিকেলবেলাতে সুমিত্র কাপ্তান-বয়কে প্রশ্ন করল, চাচা, রাজকন্যার দরজা-জানলা যে সব বন্ধ!

কী জানি, মেয়েমানুষের মর্জি বোঝা দায়। আমাকে বলল, ঘুমালে ডেকো না। বারোটার সময় দরজার কড়া নাড়লাম, খাবার দিতে হবে, কোনও সাড়াশব্দ নেই। কাপ্তানকে বললাম, তিনি বললেন, বোধহয় ঘুমোচ্ছে, সুতরাং বাটলারকে বলে দাও যেন খাবারটা গরম রাখার ব্যবস্থা রাখে। ও আল্লা, নীচে নামতেই দেখি হই-হল্লা বাধিয়ে দিয়েছে।

সুমিত্র বলল, কাপ্তান আচ্ছা রাজকন্যার পাল্লায় পড়েছে।

তা হবে। কিন্তু কাল রাতে তোমার কথাই বার বার বলছিল।

কেন? কেন?

না, থাক। ও সব আমার বলা বারণ আছে।

বলে কাপ্তান-বয় টুইন-ডেকে নেমে গেল।

এবং এ সময় সুমিত্র দেখল চেরী সান্ধ্য-পোশাকে টুইন-ডেক অতিক্রম করে এদিকেই আসছে. সুমিত্র অন্যান্য সকল জাহাজিদের সঙ্গে কথা বলছে, চেরীকে দেখছে না, এমত ভাব ওর চোখে-মুখে। চেরী অ্যাফট-পার্টে চলে আসছে। সুমিত্রর গলা শুকনো শুকনো ঠেকছে। চেরী অ্যাফট-পার্টে উঠে সুমিত্রর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুমিত্রর দিকে তাকাল না, অথবা কথা বলল না। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে জাহাজ-ডেকে। সুতরাং সকলে সরে দাঁড়াল। চেরী স্টারবোর্ডসাইডের ডেক ধরে এক নম্বর, দু'নম্বর ফলকা পার হয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র পাশের জাহাজিকে বলল, চেরীকে খুব শুকনো লাগছে, না চাচা?

জাহাজে চড়লে প্রথম সকলেরই একটু শরীর খারাপ হয়। সুখী ঘরের মেয়ে। তা, একটু শুকনো লাগবে।

সুমিত্র এইসব কথা শুনল না। সে পিছিল থেকে নড়ছে না। সে চেরীকে ফরোয়ার্ড-ডেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। চেরীর মুখ শুকনো, সেই হেতু একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব সুমিত্রর মনে। চেরী চুপচাপ চলে যাচ্ছে, গেল। সুমিত্র স্থাণুবৎ। এই প্রথম একজন পরিচিত যুবতীর জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ করছে এবং যতবার অস্বীকারের ইচ্ছায় দৃঢ় হয়েছে ততবার এক দুর্নিবার মোহ সুমিত্রকে উত্তেজিত করে করে এক সময় নিদারুণ প্রেমে ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছে।

সুমিত্র অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে সহসা দেখল, ডেক এবং অন্যত্র সকল স্থান আলো আলোময় করে জাহাজ গতিশীল। সে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে ডেক ধরে নেমে গেল। সে হাঁটতে থাকল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। অথচ এক সময় সে নিজেকে দেখল চেরীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেরীর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতরে কোনও আলো জ্বলছে না। চেরী অন্ধকারে শুয়ে আছে চুপচাপ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়ল।

ক্লান্ত গলায় ভিতর থেকে প্রশ্ন করল চেরী, কে?

আমি, সুমিত্র।

সুমিত্র ভিতরের শব্দে বুঝল চেরী খুব দ্রুত কাজ সকল সম্পন্ন করছে। আলো জ্বালছে, প্রসাধন করছে। সব কিছুতেই ত্রস্তভাব। সুমিত্র এ সময় এতটুকু ভীত হল না।

চেরী দরজা খুলল। চোখে ভয়ানক ক্লান্তি, তবু সুমিত্রর হাত ধরে এনে ভিতরে বসাল।

আপনাকে আজ ভয়ানক অসুস্থ মনে হচ্ছে। কাল রাতে বুঝি এতটুকু ঘুমোননি?

সুমিত্র, আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না। কাল আমি ঘুমোতে পারিনি।

আমি দেখছি মেজ-মালোমের কাছে ওষুধ পাওয়া যায় কি না।

না সুমিত্র, তুমি বোসো। ঘুমোতে পারছি না বলে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

কিন্তু আপনার চোখের কোল যে ভয়ানক ফুলে উঠেছে।

সব সেরে যাবে। তুমি বোসো। একটু কফি খাও।— চেরী দরজায় গলা বের করে কাপ্তান-বয়কে ডাকল।

কফি খেতে খেতে চেরী প্রশ্ন করল, তোমার কে কে আছে সুমিত্র?

কেউ নেই।

কেউ নেই?

না।

মা?

না।

বাবা?

না।

আত্মীয়স্বজন?

সুমিত্র এবারেও ঠোঁট ওলটাল।

কী করে এমন হল?

সব দাঙ্গাতে মারা গেছে।

ঈশ্বর!— চেরী আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। অনেকক্ষণ নির্জনে বসে থাকার মতো চুপচাপ বসে থাকল পরস্পর। দীর্ঘ সময় ওরা হতবাক হয়ে থাকল।

সুমিত্রই কথা বলল, আমি না ডাকতেই এসেছি বলে রাগ করেননি তো?

সুমিত্র, আমি খুব খুশি হয়েছি, খুব।

আপনার শুকনো মুখ দেখে আমার আজ কেন জানি বারবারই মনে হল, এই জাহাজে আপনি আমার মতোই একা। আমার মতো আপনারও কেউ নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ধরনের কষ্টে পীড়িত হতে থাকলাম। শেষে বিশ্বাস করুন, কে যেন জোর করে আপনার দরজায় আমাকে এনে হাজির করল।

এইসব কথায় চেরী আবেগে প্রগাঢ় হল। সমস্ত শরীরে এক অদৃশ্য কম্পন। সে তার সকল দৃঢ়তা, সকল প্রত্যয়, সকল সম্মানিত জীবনের আলো গানু পরিত্যাগ করে সুমিত্রর দু'হাত চেপে ধরল। কিন্তু আবেগের প্রগাঢ়তায় কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। বলতে পারল না, মাই প্রিন্স। আমার আশৈশবের রাজপুত্র। সে মাথা নত করে সুমিত্রর মুখোমুখি বসে থাকল। নিমজ্জমান তরীর মতো জীবনের এক প্রবল মাধ্যাকর্ষণে ক্রমশ গভীর সমুদ্রে ওরা মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। এবং এক সময় সুমিত্র যখন চোখ তুলল চেরীকে দেখবার জন্যে, তখন চেরী অবাক হতে হতে দেখল, সেই চোখ, সেই বিষণ্ণ চঞ্চল চোখ কাচের জানালায় প্রতিবিম্ব হয়ে ভাসছে। কত ইচ্ছাই না চেরীকে এ সময় বিব্রত করেছে, কিন্তু কোনও ইচ্ছার সফলতাকেই অমৃতময় বলে মনে হল না, সুতরাং চেরী সুমিত্রর প্রিয়মুখ দর্শনে শুধু বিহ্বল হতে থাকল।

রাত্রির বিষণ্ণ আলোতে চেরীকে সুখী করার জন্যে সুমিত্র বলল, তোমাকে যদি রাজা-রানির গল্প বলি, তুমি খুশি হবে?

চেরী শুধু চেয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে।

পরদিন ভোরে সুমিত্র টুপাতির কেবিনে ঢুকে বলল, তোমার সময় হবে?

চেরী বলল, আমার হবে, তোমার হবে কি না বলো?

আমার আজ থেকে কোনও ওয়াচ থাকবে না।

কেন?

কাপ্তান সারেংকে বলে পাঠিয়েছে, আজ এবং কালকের জন্যে অন্য কাউকে দিয়ে ওয়াচ চালিয়ে দিতে।

সুমিত্র আজ বেশ আরাম করে দুটো পা বাংকের উপর তুলে দিয়ে বসল, তারপর ঠাকুমার মুখে শোনা চম্পা এবং আর-দুই সখীর গল্প করে চেরীকে আনন্দ দিল। গল্পটা বলতে বেশি সময় নিল না সুমিত্র। বারোটার পর সাহেবদের লাঞ্চ। চেরী খাবে তখন। সুমিত্র এগারোটা বাজতেই উঠে গেল।

বিকেলে বোট-ডেকে গল্প করতে এসে সুমিত্র দেখল চেরী বসে বসে ঘুমে ঢুলছে। সে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর কী ভেবে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ব্রিজে কাপ্তানের গলা পেল।

সুমিত্র, গুড আফটারনুন!

গুড আফটারনুন, মাস্টার।

কাল আমরা বন্দর পাব।

কখন স্যার?

সন্ধ্যায়।

চেরী এখনও চোখ তুলছে না, অথবা ওদের দেখছে না।

কাপ্তান বলল, বেশ সমুদ্রযাত্রা আমাদের। কোনও ঝড় নেই, সমুদ্র একেবারে শান্ত।

মাস্টার, আকাশ খুব পরিষ্কার।

দশটা রাতেই ডেক-এ জ্যোৎস্না। মাদাম কী বলেন?— চেরীকে উদ্দেশ করে কাপ্তান ব্রিজ থেকে কথা বলতে চাইল।

চেরী মুখ না তুলে এক ধরনের সম্মতিসূচক শব্দ করল।

সুমিত্র চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, সুমিত্র, কাল আমরা বন্দর পাব?

আশা করছি।

বন্দরে এক আত্মীয়া এবং এক বন্ধু আসবেন আমাকে নিতে, তুমি তাদের সঙ্গে পরিচয় করবে না?

নিশ্চয়ই করব। কী রকম আত্মীয়া হন তাঁরা?

একজন পিসিমা। অন্যজন পিসেমশাইয়ের দাদার ছেলে। একটা মোটর-কোম্পানির পরিচালক।

তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বলো তো আর একটা গল্প শোনাই। খুব আনন্দ পাবে।

না, আর রূপকথা নয়। এবার জীবনের কথা বলো। আমি জাহাজে থেকে নেমে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

হবে, খুব কষ্ট হবে।

তোমাকে অযথা মন্দ কথা বলেছি।

এ কথা এখন আর ভাল শোনাচ্ছে না।

হয়তো আর দেখাই হবে না কোনও দিন। অথচ...

দেখা হবে না কেন? জাহাজে যখন কাজ করছি, তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে।

সুমিত্র, তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে না তোমার জন্য আমার কষ্ট হবে কি না?

তোমারও হবে।

সুমিত্র পাশেই বসে পড়ল। বলল, বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

এই কথা শুনে চেরী ভীষণভাবে ভেঙে পড়ছিল। অথচ সুমিত্রকে দেখে মনে হল না যে, চেরীর বিদায়বেলাতে কোনও দুঃখবোধে পীড়িত হবে। চেরী বলল, আমার কেবিনে এসো।— বলে, সে হাঁটতে থাকল।

একটু বোসো না, এই সমুদ্রকে তোমার ভাল লাগছে না?

এখনই সন্ধ্যা হবে। চলো, কেবিনে নীল আলো জ্বেলে তোমার গল্প শুনব।

একটা অনুরোধ করলে রাখবে?

বলো। যা বলবে আমি সব করব।

আমাকে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাবে?

শোনাব। কেবিনে চলো।

কেবিনে নয় চেরী। এই বোট-ডেকে। খোলা আকাশের নীচে বসে।

তাই হবে।

এখন রাত নামছে সমুদ্রে। ফরোয়ার্ড-পিকে পাহারা দিতে দু'জন জাহাজি চলে গেল। ব্রিজে পায়চারি করছেন মেজ-মালোম। ওরা লাইফবোটের আড়ালে বসে আকাশ দেখল, নক্ষত্র দেখল। পরস্পর গল্প করতে করতে এক সময় ঘনিষ্ঠ হল এবং পরস্পর হাতে হাত রেখে সমুদ্রের গর্জন শুনল যেন যথার্থই কোনও রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে... ছুটছে। চেরী এ সময় গর্ভিণী তিমির মতো উদগ্র আবেগে ছটফট করতে থাকল।

চেরী ভায়োলিন বাজাতে বাজাতে বলল, কেমন লাগছে সুমিত্র?

শীতের নদীতে কাশফুলের রেণু উড়ছে। প্রজাপতি উড়ছে যেন এবং শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে নতুন বউ। কলের গান বাজছে নৌকার পাটাতনে। দুটো ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে তখন চরের কাশবনে প্রজাপতি খুঁজে বেড়াচ্ছে-– টুপাতি চেরীর বেহালার বাজনা সুমিত্রর মনে সে রাতে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করেছিল।

তারপর অধিক রাতে যখন পরস্পর বিদায় জানিয়েছিল কেবিনে, চেরী সুমিত্রর চোখদুটোতে চুমু খেল, যে চোখদুটো দীর্ঘকাল ধরে চেরীকে অনুসরণ করে ফিরছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জাহাজিরা জমি দেখার চেষ্টা করল। আকাশের কিনারায় কোনও দ্বীপ অথবা মাটির রেখা ভেসে উঠছে কি না দেখল। ওরা খবর পেয়েছে, জাহাজ বিকালে নোঙর ফেলবে। এবং রাতে পাইলট-জাহাজ এসে বন্দরে জাহাজ টেনে নেবে। সুতরাং জাহাজিরা মন দিয়ে কাজ করল, ডেক-এ, ফলকায়, অথবা ড্যারিকে। ফানেলে কেউ রং করল। চেরী একবার ডেক-এ বের হয়ে সকল কিছু দেখে কেবিনে ঢুকে গেছে। এবং সুমিত্র এই ভোরেও বাংকে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কাপ্তান-বয় এল এ সময়। ফোকশালে ঢুকে ডাকতে থাকল সুমিত্রকে।

সুমিত্র একটা বড় রকমের হাই তুলে বলল, তারপর চাচা, নতুন কিছু খবর আছে?

কাপ্তান যে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।

সুমিত্র ব্রিজে গেলে কাপ্তান বলল, বিকালে পাইলট ধরবে জাহাজ। সুতরাং তখন থেকে তুমি আর চেরীর কেবিনে যাবে না। পাইলট-জাহাজে ওর আত্মীয়স্বজন আসার কথা আছে।

কিন্তু স্যার...।

আমি সব বুঝি সুমিত্র। মনে রেখো, তুমি জাহাজি। কত বন্দরে কত ঘটনা ঘটবে। তোমাকে যে একটু দৃঢ় হতে হবে।

সুমিত্র ব্রিজের একপাশে দাঁড়িয়েছিল, আকাশ তেমনি পরিষ্কার। জাহাজিরা সকলেই বন্দরের জন্য উদগ্রীব। যত বন্দরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ, তত জাহাজিরা উৎফুল্ল হচ্ছে। সুমিত্রর মনে একটা দুঃসহ কালো মেঘের অন্ধকার নেমে আসতে থাকল। সে ধীরে ধীরে ব্রিজ থেকে নেমে এল। চেরীর কেবিন অতিক্রম করার সময় ইচ্ছা করেই আজ আর পোর্ট-হোলে চোখ তুলল না সে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ক্লান্ত বোধ করল নিজেকে। ফোকশালে ঢুকে নিজের বাংকে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

বুড়ো কাপ্তান-বয় এসে সুমিত্রর পাশে বসল।

কিছু খবর আছে চাচা?

না। আমি বুঝি কেবল তোমার দুঃসংবাদই বয়ে আনছি?

তেমন কথা কি আমি বলছি?

কী জানি বাপু, কেবল খবর আর খবর!

চেরী কী করছে চাচা?

ছোট একটা বই সারাদিন ধরে পড়ছে।

আমার কথা কিছু বলছিল?

না।

সুমিত্র পাশ ফিরে শুল। কোনও প্রশ্ন করার ইচ্ছা নেই। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা হচ্ছে। বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে কোনও পাব-এ ঢুকে মদ খাওয়ার শখ হচ্ছে।

বিকেলে সুমিত্র উপরে উঠে গেল। আফটার-পিকের রেলিং-এ ভর করে দাঁড়াল। দূর সমুদ্রে পাইলট-জাহাজটা যেন উড়ে চলে আসছে। এ সময় চেরীকে দেখার প্রত্যাশা করল সুমিত্র। চেরী ওর আত্মীয়ের জন্য গ্যাংওয়েতে অপেক্ষা করবে। অথচ চেরী নেই। চেরী এখনও কেবিনে পড়ে আছে। সুমিত্র দেখল পাইলট জাহাজ থেকে ওর আত্মীয়া-পিসি এবং সেই যুবক উঠে আসছে। হাতে বড় বড় দুটো গোলাপের কুঁড়ি। পাইলট সকলের শেষে উঠে এল। কাপ্তান ওদের সকলকে সঙ্গে করে এলিওয়েতে ঢুকে গেলেন। সুমিত্র এই সব দেখে কোনও দুঃখবোধের জন্য একটা দীর্ঘশ্বাসকে সঞ্চিত রাখল।

সুমিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তান-বয় এবং মেসরুমমেটের সব কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশাপাশি অন্যান্য জাহাজিরাও এসে ভিড় করেছে। জাহাজিরা সুমিত্রকে কোনও প্রশ্ন করছে না। এই সব ঘটনা ওদের সকলকেই অল্পবিস্তর দুঃখ দিচ্ছে। তখন ওরা সকলেই দেখল চেরী এবং ওরা দু'জন, কাপ্তান, বড়-মিস্ত্রি, পাইলট ডেক ধরে হাঁটছে। সুমিত্র তাড়াতাড়ি জাহাজিদের ভিতর নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলল। সে চেরীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চেরী সমুদ্রযাত্রায় যেন খুবই দুর্বল। এখন ওরা পরস্পর

বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ওরা নেমে গেল। সুমিত্র চেরীকে দেখতে পাচ্ছে না এখন। সে ফের নীচে নেমে বাংকে শুয়ে পড়ল।

চেরী চোখ তুলে এই জাহাজের ডেক-এ কিছু অন্বেষণ করতে গিয়ে গলায় এক দুঃসহ আবেগের কান্না অনুভব করল। কোথাও কোনও অমৃতের চিহ্ন নেই। চোখদুটো সজল হতে হতে এক রুদ্ধ আবেগে চেরী ভেঙে পড়ল। এই ঘটনায় প্রিয়জনেরা উদ্বিগ্ন, ভাবল, শারীরিক কুশলে নেই চেরী। ভাবল, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর প্রিয়জন-দর্শনে কোনও পরিচিত আবেগের জন্ম হচ্ছে শরীরে। কাপ্তান নিজেও এই বিচ্ছেদটুকু লালন করতে পারলেন না। তিনি ইচ্ছা করে পাইলটের সঙ্গে জাহাজ-সংক্রান্ত কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কাপ্তান-বয় যখন বকশিশ নিয়ে উঠে আসছিল, চেরী সন্তর্পণে তাকে কাছে ডাকল। একটি চিরকুট দিল, গোলাপের কুঁড়িদুটো দিল, অথচ কোনও নির্দেশ দিল না। তারপর চেরী পাইলট-জাহাজের পাটাতনে নেমে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মুহ্যমান। কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না যেন, যেন এক রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটে ছুটে সমুদ্র অতিক্রম করছে এবং হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে চেরীর দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে।

কাপ্তান-বয় ফোকশালে ঢুকে বলল, এই নাও তোমার বকশিশ।

বলে গোলাপের কুঁড়িদুটো এবং চিরকুটটি পাশে রাখল।

সুমিত্র বলল, পাইলট-জাহাজটা কত দূর গেছে?

অনেক দূর।

সুমিত্র এবার চিরকুটটি পড়ল।

যখন আমি বুড়ো হব সুমিত্র, যখন নাতি-নাতনিদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে রূপকথার গল্প করব, তখন বলব ভারতবর্ষের সেই রূপকথার রাজপুত্র সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে কাকাতিয়া দ্বীপের রাজকন্যাকে খুঁজতে বের হয়েছিল। বলব, ঘোড়ায় চড়ে নয়, রথে চড়ে নয়, জাহাজে চড়ে। বলব, কাকাতিয়া দ্বীপের রাজকন্যাকে খুঁজে বের করেছিল, ভালবেসেছিল, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি নিয়ে হাত বদলেছিল, কিন্তু রুপোর কাঠি ইচ্ছে করেই শিয়রে রাখার চেষ্টা করেনি।

শেষে তার কোনও এক প্রিয় কবির দুটো লাইন লিখেছে,

Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

সুমিত্র উপরে উঠে রেলিং-এ ভর করে দাঁড়াল। দূরে পাইলট-শিপ অস্পষ্ট। ক্রমশ তীরের দিকে চলে যাচ্ছে। মনে মনে সেই লাইনদুটো আবৃত্তি করতে গিয়ে বুঝল, পৃথিবী অমৃতময়। চেরী অমৃতময়। দুঃখ এবং বেদনার কিছুই নেই। পিছনে এ সময় কার হাতের স্পর্শে সে ঘুরে দেখল কাপ্তান ওর পিঠে হাত রেখেছেন। বলছেন, আমার কেবিনে এসো সুমিত্র। আজ আমি তোমাকে খ্রিস্টের গল্প শোনাব।

ঈশ্বরীর থাবা

অবনীভূষণ, বিজন এবং সুমিত্রর দীর্ঘদিন জাহাজে কেটে গেছে। অবনীভূষণ এখন প্রৌঢ়। বিজন, সুমিত্র উত্তর-ত্রিশের যুবক। ওরা সফরে ক্রমশ এক প্রাচীন নাবিকের গন্ধ মেখে বন্দর থেকে বন্দরে, এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে এবং এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে ঘুরছে। তারপর একই জাহাজে ওরা তিনজন একদা দূর সমুদ্রযাত্রায় বের হয়েছিল। সে রাতও তুষারঝড়ের রাত ছিল। সে ঘটনার সাথী অবনীভূষণ ছিল, বিজন ছিল এবং সুমিত্র ছিল। শুধু এ ঘটনা অথবা কাহিনি একা এক অবনীভূষণের থাকছে না, বিজনেরও থাকছে না, এমনকী সুমিত্রেরও নয়। এ ঘটনা অথবা কাহিনি ওদের সকলের এবং সকল মানুষের।

ফোকশালে সকলেই প্রায় ঘুমোচ্ছিল। কারণ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর এই বন্দরের আলো-ঘর-বাতি সবই কেমন মুহ্যমান ও তুষারঝড় হচ্ছে। সুতরাং জাহাজিরা বন্দর দেখে খুশি হতে পারল না। ওরা ডেকে পায়চারি করতে করতে বন্দরের গল্প করল না। ওরা শীতে অবসন্ন, ওরা কম্বল মুড়ি দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকল।

বিজন গ্যাংওয়ের পথ ধরে ফিরছিল। গ্যাংওয়েতে তুষারঝড়টা মুখোমুখি লাগছে। সুতরাং সে হাঁটতে হাঁটতে চিফ কুকের গ্যালিতে চলে এল। হাত-পা সেঁকল এবং চা করে আবার সেই শীতের থাজ্যে ঢুকে জাহাজটাকে পাহারা দেবার সময় দেখল, দূরে কোথাও কোনও আলোর রেখা ফুটে উঠছে না। তুষারঝড়ের জন্যে সব কেমন অন্ধকারময়। বসে বসে সে ঝড়ের শব্দ শুনল, সমুদ্র দূরে গর্জন কবছে। জাহাজটা নড়ছিল। যেন জাহাজটা হাসিল ছিঁড়ে এবার ছুটবে অথবা জাহাজের শরীরে এক রকমের শব্দ যা বিজনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে। মাস্টের আলোগুলি দুলছিল, সে দেখতে পেল। বন্দরের আলোগুলো অস্পষ্ট, বরফের কুচি ওদের অস্পষ্ট করে রেখেছে। সে হাতের দস্তানাটা এবার আরও টেনে দিল।

জেটিতে কোনও লোক চলাচল করছে না। ক্রেনগুলো দৈত্যের মতো যেন এই জেটির সবকিছু তুষারঝড়ের ভিতর পাহারা দিচ্ছে। উইংস-এর আলো জ্বলছে না। শুধু জাহাজটা নড়ছিল। এত দিনের এই সমুদ্রযাত্রা এবং প্রপেলারের শব্দ, ইঞ্জিন-রুমের শব্দ, তারপর সমুদ্রের ঢেউ— সবই কেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সবই কেমন রাতদুপুরে মাঠের নির্জনতায় ডুবে যাওয়ার মতো। সে এবার ধীরে ধীরে উঠল। বসে থাকলেই শীত বেশি করছে। সে পায়চারি করতে লাগল। এবং ডেক পার হলে গ্যালি, পরে সব জাহাজিদের ফোকশাল। বিজন এত দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল না। সে পোর্ট-হোলের কাচের ভিতর দিয়ে বড় মিস্ত্রির কেবিন দেখল। ওর ঘরে নীল লাল মিশ্রিত এক ধরনের আলো। বড়-মিস্ত্রি অবনীভূষণ এত রাতেও একটা বই পড়ছেন। অশ্লীল সব বই এবং নগ্ন সব ছবি দেওয়ালে দেওয়ালে। বড়-মিস্ত্রি জাহাজ নোঙর করলে ঘন ঘন রেলিং-এ ভর করে দূরে কিছু যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন। প্রত্যাশা যেন কিছুর। অন্ধকার জেটিতে কিছু আবিষ্কারের জন্য পাগল। বিজন বলেছিল, স্যার, বন্দরে কেউ নেই। খালি।

কেউ নেই!— কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

যথার্থই কেউ নেই স্যার।

অবনীভূষণ চোখের চশমা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে কথাটা অবিশ্বাস করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ডেসির আসার কথা অথচ ডেসি এল না। তিনি বিড় বিড় করে তুষারঝড়কে ধিক্কার

দিচ্ছিলেন। ডেসি এলে এই জাহাজ মনোরম, বড় কামুক গন্ধ এই জাহাজের অলিগলিতে, নোনা জলের ঘন রং অথবা সমস্ত বিস্বাদ সমুদ্রের ডেসি একা সামলাত। ডেসি এলে ওর ঘরে রাত যাপনের প্রশ্ন উঠত। অন্যান্য সফরের মতো বন্দরের দিনগুলো নির্দিষ্ট ঘরে সুখ পেত। এত দুঃখময় এই জাহাজ, জাহাজি জীবন এমন ন্যক্কারজনক এবং বেশ্যামেয়েরা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হচ্ছে না, কী অনাবশ্যক দিন— শুধু তুষারঝড়, বরফের কুচি উড়ছে, আর রাত বলে, আলো কম বলে সমস্ত শহরটা অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকছে। দূরে ইতস্তত কোনও কুকুরের চিৎকার, গির্জাতে ঘণ্টা বাজছে এবং অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি যাচ্ছে, জেটিতে একটা মাতাল পুরুষকে পর্যন্ত দেখা গেল না। কী অবিশ্বাস্যভাবে নসিব বদলা নিতে শুরু করেছে। ডেসির জন্য এই প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে বড়-মিস্ত্রি রেলিং-এ ভর করে প্রতীক্ষা করছিলেন। উত্তেজনায় শরীর অধীর হচ্ছিল। কারণ উত্তর অঞ্চলের অন্য বন্দরে ডেসির চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল— চিফ, জাহাজ তোমার ভিড়বে রাতে। যত প্রতিকূল অবস্থাই হোক না, আমি উপস্থিত থাকব জেটিতে। তোমাকে নিয়ে ঘরে ফিরব।

চিঠিতে সে ওর বেড়ালের জন্য বড়-মিস্ত্রিকে কড মাছের চর্বি আনতে লিখেছিল।

বড়-মিস্ত্রি অশ্লীল পুস্তকের ভিতর থেকে ডেসির তলপেটের গন্ধ নিচ্ছিলেন যেন। এবং এ সময়ে পোর্ট-হোলে প্রতিবিম্ব পড়তেই তিনি প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি স্যার। সুখানি।— বিজন বলল।

অবনীভূষণ শান্ত গলায় বললেন, সুখানি, আমাকে একটু চা খাওয়াবে ভাই? রাত অনেক হল। ঘুম আসছে না। আর এই রাতে বয়দের জ্বালাতন করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিজন ফের চিফ কুকের গ্যালিতে ঢুকে গেল। চা করল। তারপর চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দরজাতে দাঁড়িয়ে ডাকল, আপনার চা এনেছি স্যার। দরজা খুলুন।

বড়-মিস্ত্রি ভিতর থেকে বললেন, দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এসো।

বিজন দরজার ভিতর ঢুকে দেখল, নীল কাচের গ্লাসে এখনও লিকার পড়ে আছে। সে টিপয়তে চা রাখল, তারপর বের হতে শুনল, তিনি ডাকলেন, সুখানি।

সুখানি কাছে গেলে বললেন, কোথাও কেউ নেই?

না স্যার।

কোনও ঘরে কেউ আসেনি?

না স্যার।

যথার্থ কথা বলছ?

হ্যাঁ স্যার। কোনও কেবিনে কেউ আসেনি।

কাপ্তানের ঘর?

ঘর ফাঁকা স্যার।

ঠিক আছে, যাও।

বড়-সাব অবনীভূষণ বসে বসে চা খেলেন। রাত এখন কত? কাচের ঘরে ঘড়ির কাঁটা নড়তে দেখলেন। রাত বারোটা বেজে গেছে। সমুদ্রে এবার একনাগাড়ে কত দিন? দশ মাসের উপর হবে। হোম থেকে কবে বের হয়েছেন, কত কাল আগের যেন সেইসব দিন, সেইসব বন্দর এবং স্ত্রীর কালো দুটো চোখ এখন পোর্ট-হোলের কাচে দৃশ্যমান। শরীরে তার যৌবন নিঃশেষ অথচ প্রেমটুকু আলোক-উজ্জ্বল দিনের মতো। সবই তিনি স্মরণ করতে পারছেন অথচ ডেসি এল না, ডেক-ছাদে কার পায়ের শব্দ। তিনি এবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন। কারণ বাইরে তখনও তুষারঝড় হচ্ছে।

বিজন তুষারঝড়ের জন্য চিফ স্টুয়ার্ডের কেবিন এবং এলিওয়েয় ফাঁকটাতে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ফাঁকটুকু থেকে গ্যাংওয়ে স্পষ্ট। ওর শরীরে এখন ঠান্ডা হাওয়া লাগছে না। জাহাজ কত দিন পর বন্দর পেল অথচ দুর্যোগের জন্য জাহাজিরা কিনারায় নামতে পারছে না। কাল সকালে এবং অপরাহ্নবেলায় যখন জাহাজিরা একে একে জাহাজ খালি করে বন্দরে রমণী সংসর্গের জন্য নেমে যাবে, যখন ওরা কিংস পার্কে অথবা সান্তাক্রুজের চূড়ায় উঠে শহর দেখবে তখন... তখন বিজনের বড় ইচ্ছা এই ঠান্ডায়

কোনও যুবতীর উত্তাপ, তখনই বিজন পাশের কেবিনে বড় পরিচিত শব্দ শুনল। শব্দটা কামোদ্রেক। শব্দটা শরীরী, সে স্থির থাকতে পারছে না। সে ধীরে ধীরে দরজায় কান পেতে শুনতে চাইল, কিছুই শোনা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট। সে এ সময় অধীর যুবকের মতো দেয়ালে হাত রাখল।

বিজন এই ফাঁকটুকুতে দাঁড়িয়ে শান্তি পাচ্ছে না। পোর্ট-হোলের কাচে মুখ রাখা যাচ্ছে না। লোহার প্লেটে বন্ধ কাচ সর্বত্র এক গোপনীয়তা রক্ষা করছে। সে এই কেবিনের একটা রন্ধ্রপথ খোঁজার জন্য খুব সন্তর্পণে দেয়াল হাতড়ে বেড়াতে লাগল। দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করতে গিয়ে বুঝল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে এবং বাইরে আলো বলে বিজন বুঝতে পারছে না, বিজন এবার বাইরের আলো নিভিয়ে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করতেই দেখল পোর্ট-হোলের উপরে যেখানে স্টিম-পাইপ আছে, তার পাশে গোলাকার ছিদ্রপথ। সে তাড়াতাড়ি টুলটা গ্যাংওয়ে থেকে নিয়ে এসে মই বয়ে ওঠার মতো উঠল। মুখটা কিঞ্চিৎ ভিতরে ঢুকিয়ে দেখল ওরা দু'জনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওরা উভয়ে রাতের প্রথম প্রহরে বোধহয় যৌন সুখে মুখর ছিল। এখন শান্তি। এখন ঘর এবং ঘরণীর মতো ওদের মুখচ্ছবি। কোনও অপরাধবোধের চিহ্ন নেই মুখে। যেন কত দীর্ঘদিনের আলাপ, যেন কত দীর্ঘদিনের প্রেম এবং সহিষ্ণুতা ওদের গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজন কম্বলের নীচে ওরা নগ্ন এমন এক ছবির কথা চিন্তা করে টুল থেকে নেমে পড়ল। ওর ওয়াচ শেষ হবে এখন। সুতরাং এই নগ্নতা কিংবা যোনিদেশ কল্পনায় তৃপ্তি নেই, এতে শুধু উত্তেজনা বাড়ে। মেয়েটির রুক্ষ চুলে সুমিত্রর মোটা শক্ত হাত। অন্য হাতটি কম্বলের নীচে নড়ছিল, কম্বলের নীচে মেয়েটির তলপেটের কাছাকাছি কোথাও ইঁদুরের মতো ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা যেন শরীরের সকল কুশল-চিন্তার কথা ভুলে সারারাত যৌন সংযোগে মগ্ন থাকলে সকল সুখের আকর... বিজন আর ভাবতে পারল না, সে তাড়াতাড়ি টুলটা হাতে নিয়ে কেবিনের পাশ থেকে সরে গিয়ে কিঞ্চিৎ ছুট দিল। সে ছুটতে ছুটতে বড়-মিস্ত্রির কেবিনের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বলতে চাইল, স্যার, আমি... আমি যথার্থ কথা বলিনি।

এখন বড়-মিস্ত্রি দরজা খুললে বলতে হবে স্টুয়ার্ডের ঘরে চটুল রমণী স্টুয়ার্ডকে পতিব্রতা ভার্যার মতো প্রেম এবং সুখ বিতরণ করছে। সুতরাং কাল ভোরে আপনার দরজার পাশ দিয়ে একজন চটুল রমণী উঁচু হিলের জুতো পরে এবং নিতম্বে রস সঞ্চার করতে করতে জেটিতে নেমে যাবে, তারপর আমি অভিযোগের করুণ বিষোদ্গারে জর্জরিত হব, সে ঠিক নয় স্যার! সুতরাং সকল ঘটনার কথা খুলে বলাই ভাল।

সে ডাকল, সাব।

কে বাইরে?— কম্বলের ভিতর থেকেই বড়-মিস্ত্রি চোখ পিট পিট করে তাকাতে থাকলেন।

আমি স্যার। সুখানি।

ঘরে এসো। শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।

বিজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এবং বলল, স্যার, আমি যথার্থ কথা বলিনি।

যথার্থ কথা বলোনি! তবে আস্তে বলো। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। বড় ঠান্ডা হাওয়া আসছে। বাইরের তুষারঝড়টা মনট্রিলের দিকে যাচ্ছে না তো, অথবা ভ্যানকুবার থেকে জাহাজ আসার কথা ছিল, ওরা কিছু মেয়ে আমদানি করতে পারে হয়তো।

না স্যার। সেসব কথা আমি বলছি না। আমাদের জাহাজে এই ঝড়ের মধ্যেও একজন মেয়ে উঠে গেছে। মেয়েটা চিফ স্টুয়ার্ডের কেবিনে আছে।

এমত কথায় বড়-মিস্ত্রি অবনীভূষণের চোখ গোল হয়ে উঠল। ওঁর বাসি দাড়িগুলি লম্বা হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, এই ঝড়ের রাতে!

আজ্ঞে স্যার।

ভাল কথা নয়।

নয় স্যার।

তুমি দেখলে?

আজ্ঞে দেখলাম স্যার। টুলের উপর উঠে উঁকি দিয়ে দেখতে হল ঘুলঘুলিতে।

ওরা কী করছে?— অবনীভূষণ ঢোক গেলার মতো মুখ করে থাকলেন।

বিজনকে কিঞ্চিৎ লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই স্যার।

তুমি তো খুব স্বার্থপর লোক হে। আমি একটু দেখতে যাব ভাবছি আর তুমি কিনা বলছ আমাকে একা ফেলে চলে যাবে।

আমার ওয়াচ শেষ হতে দেরি নেই স্যার।

আরে চলো।

বলে তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বললেন, দেখা যাক না ঘটনাটা কেমনভাবে ঘটছে। বুঝলে সুখানি, ডেসি নামে একটি মেয়ে আমার কেবিনে আসার কথা ছিল। সেজন্য আমার ঘুম আসছে না। আর ডেসি মেয়ের মতো মেয়ে বটে। ডেসি বেশ্যামেয়েদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির। সে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে পারে। এক-এক রাতে পাঁচটা-সাতটা লোককে সে হজম করতে পারে।

তাই বুঝি স্যার!— সুখানিকে এ সময় ভয়ানক বোকা বোকা লাগছিল।

একে দেখে কেমন মনে হল?

স্যার, ওরা এখন শুয়ে আছে। তবে ঘুমোয়নি। ঘুমোলে কম্বলের নীচে স্যার ইঁদুর নাচত না।

রাত গভীর এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। এলিওয়ের দরজা বন্ধ। ঝড়টা ভিতরে ঢুকতে পারছে না। অথচ বাইরে ভয়ংকর শব্দে যেন আকাশ ফেটে পড়ছে। যেন জাহাজের মাস্তুল এবার ভেঙে পড়বে। ওরা দু'জনে সন্তর্পণে ইঞ্জিন-রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল, উভয়ে হেঁটে যেতে থাকল। পাশের কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। অবনীভূষণ খুব মদ টেনেছিলেন বলে গতিতে শ্লথ ভাব। অথবা বয়সের ভারে ঠিকমতো যেন হেঁটে যেতে পারছেন না। অবনীভূষণ বালকেড ধরে ধরে হাঁটছিলেন। শরীরের ওজন ভয়ানক, হাত-পা শক্ত এবং নিবিড় এক মদিরতা ওঁকে এই গতির ভিতর আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে।

বড়-মিস্ত্রি চলতে চলতে খুব আস্তে এবং জড়ানো গলায় বললেন, আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। এতবার ইঞ্জিন-রুমে নামা-ওঠা করি তবু পেটটা নিচু হচ্ছে না। আপদ!

হ্যাঁ স্যার, আপদ।

পেট মোটা থাকলে এই সব ঘটনায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তৃপ্তি নেই।

বিজন ভাবল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে এত কথা বলছে। কারণ সুখানি জানত দিনের বেলাতে বড়-মিস্ত্রি অবনীভূষণ গোমড়ামুখো। কোনও কথা নেই, তিনি চুপচাপ ইঞ্জিনে নেমে যান অথবা বাংকে শুয়ে শুয়ে অশ্লীল সব বই পড়েন। অথবা ব্রিজের নীচে ছোট একটা ডেক-চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে দূরের বন্দর, পাইন গাছ এবং সমুদ্র দেখেন। কোনও কথা বলেন না, কোনও হাসি-ঠাট্টা করেন না জাহাজিদের সঙ্গে। তখন তিনি যথার্থই বড়-মিস্ত্রি জাহাজের।

বিজন একটু থেমে বলল, স্যার, টুলটা নিয়ে আসি। টুলটা না নিলে ঘুলঘুলিতে মুখ রাখা যাবে না।

কেবিনের আলো এবং একটি ক্যালেন্ডারের পাতায় সুন্দর এক হ্রদের দৃশ্য অথবা এলিওয়ে পার হয়ে অন্য অফিসারদের কেবিন, স্টোর-রুম এবং ডাইনিং-হল অতিক্রম করে চিফ স্টুয়ার্ডের ঘর, বাংকে বেশ্যা রমণীর সুন্দর চোখ, সবই কৌতূহলোদ্দীপক। সে আগে আগে চলতে থাকল। কোনও কথা বলল না। অন্য কেবিনে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না।

বিজন ফিস ফিস করে বলল, এসে গেছি।

সে টুলটা বালকেডের পাশে সন্তর্পণে রাখল। বলল, এবারে উঠুন স্যার।

সে আঙুল দিয়ে ঘুলঘুলি নির্দেশ করে দিল।

আমাকে উঠতে সাহায্য করো।

বড়-মিস্ত্রি অবনীভূষণের শরীর ভয়ানক রকমের মাতাল। তিনি কুকুরের মতো উত্তেজনাতে হাঁসফাঁস করছেন।

বিজন এলিওয়ের আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইরে ঝড় এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। সুতরাং ওদের কথাবার্তার শব্দ ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বড়-মিস্ত্রি ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। ওদের মুখ এখন বীভৎস রকম দেখাচ্ছে।

বিজন বলল, স্যার, এক কাজ করবেন?

এখন কোনও কাজের কথা নয়, সুখানি তুমি বড় বেশি কথা বলো।

বিজন কোনও জবাব দিল না অথচ মনে মনে গাল দিল।

দ্যাখো সুখানি, আমার ভাড়া করা স্ত্রী যদি কাল জাহাজে আসে, তুমি আবার এসব ঘটনার কথা বলে দিযো না। মেয়েটি খুব সুন্দর। বছর পাঁচেক আগে নাইট ক্লাবে ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুঝলে সুখানি, তুমি তো মদ খাও না, অথচ মেয়েমানুষের শরীর পেলে পেটুকের মতো কথাবার্তা বলো।

বিজন বলল, স্যার, আপনি আমার ওপরওয়ালার ওপরওয়ালা। আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে ভয় হয়।

সুখানি, আবার তোমার সেই বেশি কথা!

সুতরাং ভয়ে ভয়ে বিজন টুলটা ধরে রাখল। এলিওয়ে অন্ধকার বলে ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না।

আমাকে টুলে উঠতে সাহায্য করো।— ফের ধমক দিলেন বড়-মিস্ত্রি।

চিফ টুলের উপর উঠে সেই ঘুলঘুলিতে চোখ রাখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি এই হালকা টুলে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। শরীর টলছিল। তিনি একটি শক্ত টুল অন্বেষণ করলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, শক্ত টুল নেই সুখানি? •

আছে স্যার। কশপের ঘরে একটা শক্ত টুল আছে। কশপকে ডেকে তুলব?

না, দরকার নেই। বেশি হইচই কোরো না, সকলে কুকুরের মতো এখানে এসে ভিড় করবে। এবং কাপ্তান জানলে রাগ করবেন।

বড-মিস্ত্রি এবার টুল থেকে নেমে পড়লেন। ফিস ফিস করে বললেন, বরং তুমি দ্যাখো ওরা কী কবছে। যা দেখবে, সব বলবে। কিছু লুকোলে আমি ধরতে পারব।

বিজন টুলের উপর উঠে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। গরম হাওয়া ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। স্টুয়ার্ড এবং মেয়েটি সন্তর্পণে এখন কী যেন লক্ষ করছে। খবগোশের মতো ভীত চোখ নিয়ে কী যেন দেখছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ওদের শরীরে কোনও আবরণ নেই। ওরা পরস্পর কী বলছে ধবতে পাবছে না বিজন।

বিজনকে কিছু বলতে না দেখে বড়-মিস্ত্রি খেপে গেলেন।

সুখানি, তুমি নেমকহারাম, পাজি।

তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, তুমি নিজে সব দেখছ অথচ আমাকে কিছু বলছ না।

স্যাব, ওরা এখন উঠে বসল।

তারপর সুখানি?

ওরা বোধহয় টের পেয়েছে।

মেয়েটি দেখতে কেমন সুখানি?

রোগা স্যার। মেয়েটি এখন আবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল।

চিফ স্টুয়ার্ড তখন ভিতরে মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলছিল, মর্লিন, কারা যেন বাইরে কথা বলছে। যদি টেব পায় তবে নিশ্চয় হামলা করবে।

মর্লিন উঠতে চাইল না। বলল, শরীর আর দিচ্ছে না। বাইরে ঝড়, নতুবা চলে যেতাম, সুমিত্র।

সুমিত্র খুব দুঃখের সঙ্গে একটা হাত ওর স্তনের নীচে রাখল এবং কাছে টানল। বলল, এলিওয়েতে এখনও যেন কারা চলাফেরা করছে। কথা বলছে। অনেকক্ষণ থেকে এটা হচ্ছে। দরজা খুলে দেখব?

এই সুখানি, হারামজাদা। তুমি আমাকে বাগে পেয়ে খুব কলা দেখাচ্ছ হে।

স্যার, ওরা কিছু করছে না।

নিশ্চয় করছে। তুমি আমায় মিথ্যা কথা বলছ।

ভেতবে মেয়েটি বলল, না, আমার শরীর ভাল নেই সুমিত্র। ঠান্ডায় জমে গেছিলাম। এই ঘর আমাকে উত্তাপ দিচ্ছে। আমি আজ আর-একটি লোককেও সামলাতে পারব না।

সে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। চিফ স্টুয়ার্ড সুমিত্র হাঁটু ভাঁজ করে রাখা মেয়েটার নিতম্বের

নীচে এবং বুকে হাত রেখে ঘন হয়ে শুতে চাইল। অথচ শান্তি পাচ্ছিল না। সে ফের উঠে বসল। পোর্ট-হোল খুলে সমুদ্রের গর্জন শুনতে চাইল। ওর শরীর নগ্ন। ঠান্ডা হাওয়া ওকে কাঁপিয়ে তুলছে। স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি রাতের পোশাক পরে বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে শুনল, বাইরে চেঁচামেচি, সুতরাং সে একটা হাই তোলার চেষ্টা করল।

স্যার, আমি মিথ্যা বলছি না।

তুমি আলবত বলছ।

খুব আস্তে অথচ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন বড়-মিস্ত্রি।

বিজন মরিয়া হয়ে বলল, বলেছি তো বেশ করেছি।

বেশ করেছ! তুমি বেশ করেছ! আচ্ছা...

এইটুকু বলে বড়-মিস্ত্রি কড়া নাড়লেন, স্টুয়ার্ড, দরজা খোলো। আমি বড়-মিস্ত্রি।

কিন্তু ভিতর থেকে কোনও শব্দ হল না বলে তিনি ফের বললেন, আমি। স্টুয়ার্ড, আমি কোনও হামলা করব না। তুমি বললে আমি তিন সত্যি করতে পারি।

তুষারঝড়ে সকলকেই নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা অতিক্রম করার পর এই বন্দর, বন্দরে আলো অথবা কোনও রাস্তার নীচে বেশ্যা রমণীর আপ্যায়ন ওদের জন্য প্রতীক্ষা করল না। বড়-সাহেবের ডেসি আসেনি, সুখানি বাইরে গিয়ে একটু মদ গিলতে পারেনি অথবা রমণীর মুখদর্শন যেন কত কাল পর, কত দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নোন জলের চিহ্ন মুখে, রমণীর নরম নরম মখ এবং চাপ চাপ আস্বাদন সবই কোন অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত।

এই দিকের কেবিনগুলি ফাঁকা! স্টুয়ার্ডের একমাত্র কেবিন, পরে ডাইনিং হল, সামনে গেস্টরুম অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য, ডেকের নীচে মাংসের ঘর, তারপর সোজা সব ফাঁকা কেবিন, কারণ এই শীতের অঞ্চলে কোনও যাত্রী আসেনি। সুতরাং কোনও মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। স্টুয়ার্ড এসব জেনেই মেয়েটিকে অন্ধকার জেটির উপর থেকে তুলে সিঁড়ি ধরে জাহাজে নিয়ে এসেছিল, কারণ সে জেটি থেকে তখন দেখেছে গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার নেই, সুতরাং এটাই উপযুক্ত সময়। সে সময়ের সদ্ব্যবহার করেও কোনও ফল লাভ করতে পারল না, এত সতর্কতা তবু সব কেমন ফাঁস হয়ে গেল। চিৎকার এবং হামলা আরও বেশি হতে পারে ভেবে সে দরজা খুলে দিল। ভয়ানক শীত এই এলিওয়ের অন্ধকারে। কেবিনের আলোতে সে বড়-মিস্ত্রির পাথরের মতো চোখদুটো দেখল। এই সময় চিফ স্টুয়ার্ডকে অদ্ভুত রকমের তোতলামিতে পেয়ে বসল।

বড়-মিস্ত্রি কেবিনের ভিতর ঢুকে গেলেন। বললেন, আমি তিন সত্য করছি, স্টুয়ার্ড, আমি কোনও হামলা করব না। আমাকে একটু সুখ দাও। আমি তবেই চলে যাব।

কেমন বেহায়া এবং নির্লজ্জ ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন বড়-মিস্ত্রি। তিনি ধমকের সুরে বিজনকে ডাকলেন, এসো। নচ্ছার সব জাহাজি! এটা তোমার বাড়ি নয় সুখানি! এখানে মা বাবা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে আসবে না, এসো। সামান্য যোনিদেশ দেখার যখন ইচ্ছা হয়েছে, দেখে যাও।

সুখানি ভাল ছেলের মতো বড়-মিস্ত্রিকে অনুসরণ করল। সে কেবিনের ভিতর ঢুকল না। সে দরজার একটা পাল্লা ধরে উঁকি দিল মাত্র। স্টুয়ার্ড সব কিছু দেখছে। ভয়ে ওর তোতলামি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বড়-মিস্ত্রির চোখদুটো চক চক করছে এবং হননের ইচ্ছাতে একাগ্র। জানোয়ারের মতো উদগ্র লালসা মুখে, অবয়বে। সে দেখল, বড়-মিস্ত্রি চেয়ার টেনে বসেছেন, দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন ছবি এবং এই বাংকের অন্য পাশে মর্লিন, ওর কোমল ত্বকের গন্ধ অথবা মুরগির মতো নরম কলজের উত্তাপ বড়-মিস্ত্রিকে এতটুকু অন্যমনস্ক করছে না। সে ঘরের ভিতর নিমন্ত্রিত অতিথির মতো বসে থাকল।

মর্লিন কম্বলের ভিতর থেকে উঁকি দিল। ওর সোনালি চুল বালিশের উপর, ওর নীল চোখ শান্ত। বড়-মিস্ত্রির বিদঘুটে শরীর ক্রমশ পাশবিকতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। মর্লিন কম্বলের ভিতর এসব দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। সে অন্য একটি মুখ দেখল দরজার পাশে। সে মনে মনে বড়-মিস্ত্রিকে উদ্দেশ করে বলতে চাইল, ম্যান, আমি জানি তোমাকে নিয়ে কোন কোন ভঙ্গিতে ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করলে তুমি দু'বার তিনবার অত্যধিক চারবার... কিন্তু শরীর ভাল নেই, বড় কষ্ট এই শরীরে, শরীর মুখ বিবর্ণ এবং ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণায় ভুগছি। তুমি আজকের মতো রেহাই দাও। এই দুর্যোগ যাক, বসন্ত আসুক

তখন তোমার কত টাকা, আমার কত গতর সব দেখাব। অথচ মর্লিন কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে ওর শরীর কেবল গুটিয়ে আসতে থাকল।

সুখানি দেখল, বড়-মিস্ত্রি কেমন পাগলের মতো করছেন। পোশাক আলগা করার সময় তিনি দরজা খোলা কি বন্ধ পর্যন্ত দেখছেন না। সুতরাং সুখানি নিজেই দরজাটা টেনে দিল।

বড়-মিস্ত্রি দুটো শক্ত হাত সোনালি চুলের ভিতর ঠেসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন। তিনি মর্লিনের চুলের ভিতর মুখ গুঁজে দিলেন। মর্লিন মৃতপ্রায় পড়ে ছিল। বড়-মিস্ত্রি কম্বলটা শরীর থেকে বাঁ হাতে ঠেলে দিলেন। ঠোঁটদুটো নীল, বিবর্ণ। ঠোঁটদুটো কামড়ে দেবার সময় দেখলেন, মর্লিন কেমন সাপের মতো পিছলে যাচ্ছে। অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলছে, ম্যান, আমাকে মেরে ফেলো না। আমি আর পারছি না।

মর্লিনের মুখ থেকে তখন থুথু উঠছিল। বাইরে ঝড়, মাস্টের আলোগুলো দুলছে। মেসরুমে বাতি জ্বলছিল। মনসুর আসবে এ সময়। ওর এখন ওয়াচ। মনসুরকে ডাকতে হবে। যতক্ষণ না ডাকবে ততক্ষণ মনসুর শুয়ে থাকবে। সুতরাং সুখানি বিরক্ত হচ্ছে। বড় বেশি সময় নিচ্ছে বড়-মিস্ত্রি। সুখানি দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখল বড়-মিস্ত্রি বড় বেশি বেহুঁশ। সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মর্লিনের শরীর থেকে সুখানি বড়-মিস্ত্রিকে শক্ত হাতে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে এনে বলল, আপনি দাঁড়ান। বেশি ইতরামি করলে ভাল হবে না।— বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বড়-মিস্ত্রি অবনীভূষণ অসহায় পুরুষের মতো স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখলে কাণ্ডটা? কাল আমি ওকে দেখব।

স্টুয়ার্ড বলল, বড় দুর্বল স্যার। শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমি জাহাজে তুলে এনেছি। টাকা তো মুফতে দেওয়া যায় না। তাই রয়ে-সয়ে একটু সুখ নিচ্ছিলাম।

ওরা দু'জনই চুপচাপ বালকেডে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত বিচলিত ভাবে কথা বলতে থাকল, স্যার, এটা অত্যাচার হচ্ছে ওর উপর। একটা রুগ্ন মেয়েকে দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

তার জন্য আমি কী করতে পারি?— বলে তিনি এলিওয়েতে পায়চারি করতে থাকলেন। অন্ধকার এলিওযেতে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সেই থেকে থেকে আগের মতো সমুদ্রগর্জন ভেসে আসছে। তুষারঝড়ের গতি কমছে কি বাড়ছে, অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে বড়-মিস্ত্রি টের করতে পারলেন না। তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, সুখানি বড় দেরি করছে।

স্টুয়ার্ডের দিকে এখন নজর বড়-মিস্ত্রির। স্টুয়ার্ড এখনও কিছু বলছে না।

তোমার নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছা করছে ভিতরে?

স্যার, আপনার কথার উপর আমার কথা বলা সাজে না।

বড-মিস্ত্রি ভাবলেন, এবার কড়া নাড়বেন দরজার। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। বিজনকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। চোখ-মুখ উদ্বিগ্ন। বলল , স্যার, ঘরে মদ আছে? মেয়েটা কেমন করছে স্যার। বড় নিস্তেজ, একটু মদ দিলে হত।

সুমিত্র বলল, স্যার, আমি আগেই বলেছি এত ধকল সে সহ্য করতে পারবে না।

বড-মিস্ত্রি চিৎকার করে বলতে চাইলেন, তুমি একটা অমানুষ, সুখানি। অথচ বলতে পারলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি একটা পশু, তুমি পশু সুখানি।

স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করিনি।

কিছু করোনি।

না স্যার, শুধু আদর করছিলাম। কিন্তু কেবল দেখছি মুখ থেকে ওর থুথু উঠছে সাদা সাদা ফেনার মতো। আমি বার বার আলোতে মুখ দেখলাম। জল দিলাম খেতে। খেল। ফের ওরকম হতেই দরজা খুলে দিয়েছি। আপনারা আসুন।

স্টুযার্ড কথা বলতে পারছিল না। বড়-মিস্ত্রি বিমূঢ়। নেশা কেটে যাচ্ছে। এবং তিনি এই সময় সারিবদ্ধ উট দেখলেন, ওরা মরুভূমির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারিবদ্ধ উটের দলটা একটা নগ্ন মানুষকে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শুধু। মানুষটার হাত-পা বাঁধা। তিনি প্রায় চিৎকার দেবার ভঙ্গিতে

বললেন, ওদিকের দরজা বন্ধ করে দাও। আলো নেভাও বাইরের। স্টোর থেকে মদ নিয়ে এসো।

ওরা ভিতরে ঢুকে বাংকের পাশে দাঁড়াল। সবুজ গাউনটা পাশ থেকে তুলে মর্লিনের কোমর পর্যন্ত টেনে দেওয়া হল। সুখানি পায়ের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। মর্লিনের বড় বড় চোখদুটো স্থির। বিবর্ণ। হাতদুটো বুকের উপর। মুখের রং জলের সঙ্গে গলে গেছে। সাদা এবং অদ্ভুত এক অবয়বের মুখ যা দেখলে ভয়-ভীতি ক্রমশ মানুষকে গ্রাস করে।

বড়-মিস্ত্রি বললেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে সুখানি।

স্টুয়ার্ড বলল, যথার্থই মরে যাচ্ছে মর্লিন?

বড়-মিস্ত্রি পুনরাবৃত্তি করলেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে সুখানি।

সুখানি বলল, কোনও ডাক্তার...?

ও বাঁচবে না। ডাক্তার ডাকলে সকলে ধরা পড়ে যাব।

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল, স্যার, আমরা ওকে মেরে ফেললাম!

বড়-মিস্ত্রি ধমক দিলেন, আস্তে কথা বলো। এত বেশি বিহ্বল হবে না। পোর্ট-হোল খুলে দ্যাখো ঝড়ের গতি কী রকম?

এবং বড়-মিস্ত্রি এই নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যেন বলতে চাইলেন, এতটুকু পাশবিকতা যে সহ্য করতে পারে না তার মরাই উচিত।

সুখানি পোর্ট-হোলের কাচ সন্তর্পণে খুলে মুখ গলাবার চেষ্টা করল। বাইরে ঝড়। এবং জলের উপর অন্ধকার। দূরে সমুদ্রের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা জাহাজ দেখল সে বাইরে। জাহাজটা লকগেট দিয়ে বন্দরে ঢুকছে। সে সমুদ্রের বুকে পাহাড়টা দেখল, আলো, ঘরবাড়ি দেখল। জাহাজটা এখন এখানেই নোঙর ফেলবে। সে জাহাজিদের হারিয়া-হাপিজের শব্দ এবং যাত্রীদের কোলাহল এই পোর্ট-হোল থেকেই শুনতে পেল। সে বলল, ঝড় কমে যাচ্ছে স্যার।

তারপর বলল, পাশে একটা জাহাজ নোঙর ফেলছে।

বড়-মিস্ত্রি হাঁটু গেড়ে বসলেন মর্লিনের পাশে। ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বড়-মিস্ত্রি ভিতবে খুব কষ্ট অনুভব করছিলেন। ভয়ানক কষ্টবোধে তিনি সুখানির কোনও কথা শুনতে পাচ্ছেন না। স্টুয়ার্ড স্টোর-রুমে গেছে মদ আনতে, তিনি ভাল করে মর্লিনের শরীর ঢেকে বসে আছেন। একটু মদ খেলে যদি উত্তেজনা আসে। অথবা বাঁচবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর ইচ্ছা হল মেজ-মালোমকে ডেকে এই ঘটনার কথা, ওষুধের কথা অথবা কোনও বুদ্ধির জন্য... তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না। স্টুয়ার্ড এ সময় মদ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল, মদটুকু ঠোঁটের কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

স্টুয়ার্ড বলল, কী হবে স্যার!

বড়-মিস্ত্রি বললেন, জানতে পারলে ফাঁসি হবে।

এই ধরনের কথায় চোখ গোল হয়ে উঠল স্টুয়ার্ডের। সে দ্রুত বলে চলল, আসুন, তবে ওকে পোর্ট-হোল দিয়ে জলে ফেলে দিই স্যার। কেউ টের পাবে না।

ওকে ভাল করে মরতে দাও। তা ছাড়া বাইরে যাত্রী-জাহাজ এসে থেমেছে।

এখন অনেক রাত স্যার। আসুন একে জেটিতে ফেলে আসি।

গ্যাংওয়েতে সুখানি মনসুর আছে। এই সব ঘটনা কাক-পক্ষীতে টের পেলে পর্যন্ত কপালে দুঃখ থাকে।

কী হবে স্যার? আগে এমন ঘটবে জানলে মর্লিনকে তুলে আনতাম না স্যার। কী কুক্ষণে এই বন্দরে এসেছি। ঝড়, ঝড়, শুধু ঝড়।

ওদের ভিতর নানা ধরনের কথা হচ্ছিল। এবং এইসব বিচিত্র-সংলাপ ওদের তিনজনকেই সাময়িকভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে নির্বিকার করে রাখছে। এ সময় ওরা তিনজনই ওর পাশে বসল। বড়-মিস্ত্রি বললেন, এসো, আমরা তিনজনই ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকি। ওর মৃত্যু আমাদের জানুর উপর সংঘটিত হোক।

এমত এক আবেগদীপ্ত কথায় অবনীভূষণ চোখ বুজলেন। তাঁর মনেই হল না শরীর থেকে যেসব

গাহাজি যন্ত্রণা নেমে এই মেয়েটির দুর্বল শরীরে গরল ঢেলেছে তারা এখনও একই শরীরে বিদ্যমান। তিনি যেন কোনও এক উপাসনা-গৃহে বসে আছেন এমনই এক গভীর প্রত্যয়ের চোখ। তিনি বললেন, এসো, ওকে আমরা শান্তিতে মরতে দিই। কারণ আমরা জানি না ওর নিকট-আত্মীয় কেউ আছেন কি না, আমরা কোনও পুরোহিতকেও ডাকতে পারছি না, সুতরাং ঈশ্বরের নাম আমরাই স্মরণ করব। আর এই কেবিনই আমাদের উপাসনা-গৃহ।

কেবিনের নীল দেয়ালে একটা মাকড়সা অনবরত নীচ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওদের তিনজনের কোলেব উপর মর্লিনের মুখ, শরীর। দেয়ালে পা ঠেকে আছে। মর্লিনেব শরীর কম্বলে আবৃত। র‍্যাকে ওব ওভারকোট। হাতের দস্তানা নীল রঙের। চোখদুটো মর্লিনের ক্রমশ সাদা হয়ে আসছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওরা তিনজনই এই মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ভাবছিল। ওরা দেখল চোখদুটো সাদা হতে হতে একেবারে স্থির হয়ে গেল। একটা ঢেকুরের মতো শব্দ, তারপর মৃত্যু।

ওবা মর্লিনের মৃত শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড়-মিস্ত্রি পায়চারি করলেন কেবিনে। দেয়ালে শরীর বেখে মর্লিনের মুখ দেখছিল সুখানি। সে একটু হেঁটে গিয়ে কম্বল দিয়ে মর্লিনের মুখটা ঢেকে দিল। স্টুয়ার্ড দেয়ালে টাঙানো নগ্ন চিত্রের ক্যালেন্ডার থেকে, আজ কত তারিখ, কী মাস, কী বছর এবং বন্দরের নামটা পর্যন্ত তুলে আনল। স্টুয়ার্ড, বড়-মিস্ত্রি এবং সুখানির নির্বিকার ভঙ্গি দেখে দুঃখিত হল। সে বলল, স্যার, সারা রাত আমরা মড়া আগলে পড়ে থাকব?

বড়-মিস্ত্রি কী ভেবে যেন দরজা খুললেন এবং বাইরে যাবার উপক্রম করতে সুখানি হাত চেপে ধবল, স্যার, আপনি আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন?

তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না সুখানি। মর্লিনের জন্য বাইরে একটু জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি।

সুখানি বলল, দরজা বন্ধ করে দেব স্যার?

দাও।

বড-মিস্ত্রি এলিওয়ে ধরে হাঁটতে থাকলেন। গ্যাংওয়েতে মনসুর বসে আছে। তিনি গ্যাংওয়েতে নেমে যেতেই মনসুর উঠে দাঁড়াল এবং আদাব দিল। তিনি লক্ষ করলেন না ওসব। তিনি জাহাজময় ঘুরে জেটিতে, জেটির জলে মর্লিনকে ফেলে রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন। তিনি কোথাও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি দেখলেন, সর্বত্র এক নিদারুণ নিরাপত্তার অভাব। তিনি দেখলেন, সর্বত্র যেন কে জেগে আছে, ওঁদের এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এ সময়ে ওঁর ফের মদ খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু এ সময় মদ খাওয়া অনুচিত কারণ মর্লিনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তিনি তারপর দেখলেন ডেকের উপর থেকে একটা শুকনো পাতা উড়ে উড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, মর্লিনের শরীরে কোনও কোনও আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান... মর্লিন একবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল অথবা পাশবিকতার চিহ্ন এখনও ওর শরীরে বিদ্যমান কি না অথবা সুখানি এবং স্টুয়ার্ড ওর শরীরে মাংস ভক্ষণের মতো কোনও উদ্‌গার নিক্ষেপ করেছে কি না, যা ওদের তিনজনকেই গ্রাস করবে। তিনি ছুটতে থাকলেন, তিনি তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, স্টুয়ার্ড, দরজা খোলো, স্টুয়ার্ড। স্টুয়ার্ড!

কেবিনের দরজা খুললে তিনি ঝড়ের মতো ঢুকে মর্লিনের শরীর থেকে কম্বল তুলে নিলেন। ওর শরীরের শেষ আবরণটুকু খুলে ঝুঁকে পড়লেন শরীরের উপরে। সুখানি এল, স্টুয়ার্ড এল। বড়-মিস্ত্রি চিবুকের নীচে হাত রেখে বললেন, এই দাঁতের চিহ্ন কার?

সুখানি অত্যন্ত সংকুচিত চিত্তে বলল, স্যার আমার। মর্লিনের সামনে মিথ্যা বলে পাপ আর বাড়াতে চাই না।

বড-মিস্ত্রি তীক্ষ্ণ চোখে মর্লিনকে দেখতে লাগলেন। সুখানির কথার সঙ্গে নিজেও বিড়বিড় করে বললেন, শরীরের এসব চিহ্ন দেখে পুলিশ ধরে ফেলবে।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে!

আমাকেও নেবে।— বড়-মিস্ত্রি একবার সুখানির দিকে তাকালেন।

সুখানি বলল, বড় অমানুষিক।

স্টুয়ার্ড বলল, এই তুষারঝড় এজন্য দায়ী।

বড়-মিস্ত্রি বললেন, পুলিশের ঘরে আমাদের বিচার হওয়াই উচিত। সুতরাং এসো, ওকে এখন আর কোথাও নিক্ষেপ না করে এখানেই ফেলে রাখি।

এই সব কথা বলার পর সকলে দাঁড়িয়ে থাকল। সকলে পরস্পরকে চোখ তুলে দেখল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, যা হয় তাড়াতাড়ি করুন।

সুখানির সঙ্গে তোমার এখানেই ফারাক। এসব কাজ তাড়াতাড়ি হয় না।

তাড়াতাড়ি হয় না?

না, হয় না।

স্যার, আপনি ঠিক কথা বলেছেন।

আমাদের এখন ভাবতে হবে কোনও অপরাধই আমরা করিনি। এখন শুয়ে পড়লে ঘুমোতে পারব এমন একটা মনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। যদিও আমরা জানি মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং বোসো।

বড়-মিস্ত্রি ফের বললেন, একটু কফি হলে ভাল হত। সুখানি কী বলছ?

তা মন্দ নয় স্যার।

স্টুয়ার্ড কিন্তু বের হতে চাইল না। কারণ ওর ভয় কফি আনতে গেলেই ওরা এই কেবিন ছেড়ে চলে যাবে এবং ভোরবেলায় যখন সব জাহাজিরা, তখনও অন্ধকার থাকবে ডেকে, তখনও সূর্য ভাল করে আকাশের গায়ে ঝুলবে না, সকল জাহাজিরা ডেক-ছাদ অথবা ইঞ্জিনে নেমে যেতে যেতে শুনবে স্টুয়ার্ডের ঘরে একটি তরুণীর মৃতদেহ, কম্বলের নীচে স্টুয়ার্ড মৃতদেহটিকে আগলে রেখেছিল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমার মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

তারপর ওদের উত্তর করতে না দেখে বলল, স্যার, আসুন মর্লিনকে পোর্ট-হোল দিয়ে জেটির জলে ফেলে দি।

যখন লাশ ফুলে ফেঁপে জলের উপর ভেসে উঠবে, যখন দাঁতের কামড় দেখে তোমার দাঁতের চিহ্ন নেবে, তখন?

কোথাও কোনও উপায় নেই?

আপাতত দেখতে পাচ্ছি না।

সুখানি বলল, বড় বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

বড়-মিস্ত্রি অন্যমনস্কভাবে মর্লিনের দস্তানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

স্টুয়ার্ড যেন খেপে গেল, স্যার, আমার কেবিনে এসব হচ্ছে। আপনারা আমাকে জপাতে চাইছেন আপনারা যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য না করেন আমি একাই ওকে বয়ে নিয়ে যাব।

স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি কম্বলের ভিতর থেকে মর্লিনকে তুলে কাঁধে ফেলল তারপর দরজা দিয়ে বের হতেই বড়-মিস্ত্রি ওর হাত চেপে বলল, তুমি কি খেপে গেলে?

স্টুয়ার্ড এবার কেঁদে ফেলল, স্যার, আপনারা এ ঘটনাকে আমলই দিচ্ছেন না। আমাকে আপনারা ধরিয়ে দিতে চাইছেন। ঘরে আমার স্ত্রী আছে, সন্তান-সন্ততি আছে।

এইসব কথায় তিনি যথার্থই অভিভূত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখ মুখ উদ্‌বিগ্ন। এবং অবিবাহিত জীবনের কিছু সুখ-দুঃখের কথা স্মরণ করতে পেরে যেন বলতে চাইলেন, স্টুয়ার্ড তুমি আমি সকলে এক সরল পাশবিকতার মোহে আচ্ছন্ন। কখনও ঘরে, কখনও উঠোনে এবং দূরের যব গমখেতের ভিতর নগ্ন শরীর আমাদের শুধু কামুক করে তোলে। অথবা এই জাহাজ আমাদের কত দীর্ঘ সময় সমুদ্র এবং আকাশের ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে, শুধু নোনা জল. কখনও প্রবালদ্বীপ এবং নির্জনতা, জাহাজে অস্থির ইঞ্জিনের শব্দ, দেয়ালের উলঙ্গ সব ছবি আমাদের নিরন্তর নিষ্ঠুর করে রাখছে। সুতরাং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দর এবং রমণীর দেহ স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। মর্লিন মরে গেছে। এসো, ওর শরীর আমরা সযত্নে রক্ষা করি। বন্দরে ঝড়। এ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত। দেশটাতে এখন শীতের শেষ-কুয়াশা লেগেই থাকবে। ডেসি এমন দিনে আসবে না।

এতক্ষণ সকলকে চুপচাপ থাকতে দেখে সুখানি মর্লিনের চুল মুঠোর ভিতর তুলে বলল, স্যার, দেখুন, এই সোনালি চুল কী অপূর্ব!

সুখানি ভাবল, কী ভাবে আর কথা আরম্ভ করা যায়। স্টুয়ার্ড ভয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছে। সুখানি দুঃখিতভাবে বলল, এই সোনালি চুলে মর্লিন স্যার সুগন্ধী তেল মাখত। গন্ধটা কিন্তু এখনও জীবিত মেয়েদের মতো।

তারপর সে একটা ঢোক গিলে বলল, স্যার, আপনি পর্যন্ত ভয়ে টেঁসে গেলেন! কথা বলছেন না, চুপচাপ বসে মর্লিনের হাতের দস্তানা আপনার শক্ত হাতে গলাবার চেষ্টা করছেন।

স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ করে বলল, এসো, তোমাকে লাশটা নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছি।

বড়-মিস্ত্রি বাংক থেকে নেমে পোর্ট-হোলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের ভিতর থেকে পাশের জাহাজ স্পষ্ট। কাচ খুলে দিলে জাহাজিদের শব্দ পেলেন। যাত্রী-জাহাজ বলেই সেখানে মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি পোর্ট-হোলে মুখ রেখে ভাবলেন, এই পোর্ট-হোল দিয়ে লাশটাকে হারিয়া করে দেওয়া যাক। স্টুয়ার্ডের ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আর ভাল লাগছে না। বস্তুত বড়-মিস্ত্রি নিজেও এই মৃতদেহ নিয়ে কী করা যাবে ভেবে উঠতে পারছেন না। তাঁব মাথার ভিতরও শূন্যতা এসে আশ্রয় করেছে। তিনি পোর্ট-হোলে মুখ রেখেই বললেন, স্টুয়ার্ড, সুখানি, মর্লিনকে কাঁধে নাও। তাড়াতাড়ি পোর্ট-হোল দিয়ে গলাবাব চেষ্টা করো।— বলে তিনি পাগলের মতো পোর্ট-হোলটাকে টেনে টেনে ফাঁক করবার চেষ্টা কবতে থাকলেন।

সুখানি বলল, স্যার, আপনারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বড়-মিস্ত্রি গোল-গোল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তবে আমরা কী করতে পারি সুখানি? সমস্ত জাহাজ ঘুরে দেখলাম মর্লিনকে কোথাও রাখা যাচ্ছে না। যেখানেই রাখতে যাব, সেখানেই ধরা পড়ে যাচ্ছি।

তাবপর তিনি থেমে থেমে বললেন, আহা, ওকে যদি সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারতাম! সমুদ্রে ফেলে দিলে কোনও চিহ্নই পাওয়া যেত না।

সুখানি বলল, স্যাব, তবে আসুন, ওকে বরফ ঘরে রেখে দি। ভেড়া-গোরুর সঙ্গে পড়ে থাকবে। কেউ টের করতে পারবে না। জাহাজ সমুদ্রে গেলে ওকে ফেলে দেওয়া যাবে।

বড-মিস্ত্রির কপাল কুঁচকে উঠল। তিনি আড়চোখে সুখানির দিকে চাইলেন। যেন সুখানি এখানে একমাত্র বুদ্ধিমান এবং স্থিরচিত্ত পুরুষ। সুতরাং তিনি ওর উপরই নির্ভর করতে পারেন এমত এক নিশ্চিন্ত মত পোষণ করছেন মনে মনে। তিনি বললেন, স্টুয়ার্ড কী বলে?

স্টুযার্ড কোনও কথা বলছে না। সুখানি ওদের দু'জনকে অনুশাসনের ভঙ্গিতে বলল, তবে আর দেরি করে লাভ নেই। ওকে কাঁধে তুলে নেওয়া যাক।

মর্লিনের হাত পোর্ট-হোলে গলানো ছিল এবং মাথাটাও। পোর্ট-হোল থেকে ওর শরীর ঝুলে পড়ছিল। স্টুয়ার্ড ওর কোমর একটু উপরে তুলে রেখেছে। বড়-মিস্ত্রি ডানদিকে দাঁড়িয়ে মর্লিনের তলপেটের নীচে হাত রেখে স্টুয়ার্ডকে ধরে রাখতে সাহায্য করছিলেন।

ওর তিনজনে মিলে মর্লিনকে বাংকে শুইয়ে দিল। ওরা প্রথমেই দরজা খুলে দিল না। সুখানি এখন মাঠে দাঁড়িয়ে কোন সেনাবাহিনীকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে। সে বলল, স্যার, দরজা খোলার আগে আমাদের কানও পেতে শুনতে হবে, বাইরে কোনও শব্দ হচ্ছে কি না। তারপর দরজা খুলে একজনকে ডাইনিং-হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি আসে তবে শিস অথবা হাতের ইশারা। ইতিমধ্যে মর্লিনকে রসদ-ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করে ছাদের ঢাকনা খুলে মর্লিনের লাশ নীচে হারিয়া করে দিলেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি। সেই রাজ্যটা চিফ স্টুয়ার্ডের একান্ত নিজস্ব। এবং আশা করব জাহাজ যত দিন না বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে যায় তত দিন স্টুয়ার্ড মর্লিনকে আগলে বাখতে পারবে।

বলে সুখানি স্টুয়ার্ডের কাঁধে চাপ দিল।

ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। অ্যাকোমডেশান-ল্যাডার ধরে ডেক-ছাদে উঠে যাওয়ার পথটাতে বড়-মিস্ত্রি কড়া নজর রাখছেন। তা ছাড়া ডাইনিং-হলের পথটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। বড়-মিস্ত্রি

এলিওয়েয় আলো নিভিয়ে পাহারাদারদের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন বাইরে ঝড় নেই বললেই হয়। ইঞ্জিন-রুমে কোনও ফায়ারম্যান হয়তো ওয়াচ দিতে নেমে যাচ্ছে, বুটের ঠক ঠক শব্দ সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নীচে— তিনি সন্তর্পণে অন্ধকার থেকেই বললেন, এবার তোমরা রসদ-ঘরে ঢুকে যাও, কেউ নেই।

সুখানি মর্লিনের মাথার দিকটা ধরেছিল। স্টুয়ার্ড পায়ের দিকটা ধরে বাইরে নিয়ে এল। তারপর রসদ-ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ডাকল, স্যার, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এলিওয়েয় আলো জ্বেলে দিন।

ওরা ধীরে ধীরে মর্লিনকে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। টেবিল থেকে কাচের ডিশ এবং অন্যান্য সব পানীযের পাত্র তুলে অন্য স্থানে রেখে দিল। এই ঘরে অন্যান্য দরজা খুললে জাহাজিদের রসদ, নীচে রসদ-ঘর, ভিন্ন ভিন্ন রকমের সব সবজি এবং সবজির গন্ধ আসছে এই ঘরে। ওরা এ সময় মর্লিনের শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ল।

স্টুয়ার্ড বলল, কম্বল দিয়ে ঢেকে দি।

বরং ওর গাউনটা নিয়ে এসো।

মর্লিনের নগ্ন শরীর ভয়ানক কুৎসিত দেখাচ্ছে। বড় টেবিলের উপর ওর শরীর মৃত ব্যাঙের মতো— হাত-পা দুটো শীর্ণ এবং চুলের সেই গন্ধটা তেমনি ফুর ফুর করে উড়ছে। চোখদুটো এখনও শুধু স্থির। ওর বুকের পাঁজর স্পষ্ট। স্তনের সর্বত্র মাতৃত্বের চিহ্ন ধরা পড়ছে। স্টুয়ার্ড এবার কেমন শিউরে উঠল। এই শুকনো স্তনের আশেপাশে সহসা সে দেখল, জঠরে নিমগ্ন কোনও শিশু যেন হাত বাড়াচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি কম্বল এনে ওর শরীর ঢেকে দিল।

ওরা এখন সকলেই কথা কম বলছে। বড়-মিস্ত্রি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নীচে হারিয়া করে দেওয়া যাক তবে। তাড়াতাড়ি বরফ-ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

স্যার।— স্টুয়ার্ড ডাকল।

বলো।

আপনি স্যার আমাদের ওপরওয়ালা। আপনি আমাদের সাহস দিন।

যেন এই পশুবৎ আচরণ অথবা নিষ্ঠুর ইচ্ছার দ্বারা প্রহৃত এই যুবতীর সকল অস্তিত্বের করুণা ক্রমশ জাহাজের ঘুলঘুলিতে মুখ রাখছে। দেয়ালে ওদের ছায়া পড়ছিল। সুখানি কেমন বিকৃতভাবে একটা ঢোক গিলে বলল, আমি নীচে নেমে যাচ্ছি। আপনারা উপর থেকে ওকে জলদি হারিয়া করুন। এই বিসদৃশ ঘটনা চোখে আর দেখা যাচ্ছে না।

বড়-মিস্ত্রি নীচের ঢাকনা খুলে দিল। নীচের ঘরগুলো অন্ধকার। সুখানি সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার আগে নীচের আলো জ্বেলে দিল। স্টুয়ার্ড হাঁটু গেড়ে বসল। নীচের ঘরগুলোতে ভয়ানক ঠান্ডা। আলু, পেঁয়াজ এবং শাক-সবজি এখান থেকে কিছু কিছু চোখে পড়ছে। বরফের ঠান্ডা স্রোত সুখানিকে ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে। সব কিছু ক্লান্তিকর। সে এবার উপরের দিকে তাকাল। বড়-মিস্ত্রি হাতের ইশারায় তাকে ডাকছেন।

ওরা তিনজন বড় টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ওরা তিনজন মাথায়, কোমরে এবং পায়ে হাত রাখছে। বড় বড় চিনেমাটির বাসন টেবিলের নীচে, কাবার্ডে টি-সেট সাজানো। মাদক দ্রব্য পানের নিমিত্ত সব পাতলা কাচের পাত্র ইতস্তত সজ্জিত। বড়-মিস্ত্রি অন্যমনস্ক ছিলেন। পা সরিয়ে আনার সময় কিছু কাচের পাত্র ভেঙে নীচে গড়িয়ে পড়ল। কাচ ভাঙার শব্দ, টেবিলের উপর বড় দর্পণে তিনজনের প্রতিবিম্ব, মর্লিনের শক্ত শরীর— সবই ভীতিপ্রদ। মর্লিন ওদের দিকে যেন শক্ত চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। সুতরাং নিরন্তর এক পাপবোধ ওদের তীব্র তীক্ষ্ণ করছিল।

ওরা এবার মর্লিনকে কোলের কাছে নিয়ে শব-বাহকের মতো সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার সময় সন্তর্পণে ছাদের ঢাকনা টেনে খুব ধীরে ধীরে, যেন এতটুকু আওয়াজ না হয় অথবা মর্লিনের গায়ে আঁচড় না লাগে, ওরা মর্লিনকে এ সময় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছিল। অথচ মর্লিনের শরীর মুরগির মৃত ঠ্যাঙের মতো কদর্য এবং কঠিন। এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা ওদের তিনজনকেই ভাবপ্রবণ করে তুলছিল।

মর্লিনের মুখ থেকে সব রং মুছে গেছে। চোখে টানা কাজলের চিহ্ন তখন চোখের নীচে এবং ভ্রূ ব

আশেপাশে লেগে আছে। পুতুলনাচের নায়িকার মতো চোখ-মুখ। ওরা মর্লিনকে দরজার সামনে শুইয়ে দিল। বরফ-ঘরের তালা খুলে দিল স্টুয়ার্ড, বড় বড় সব মাংস, গোরু ভেড়া শূকর এবং গোটা গোটা ধড় হুকের মধ্যে ঝুলছে। অথবা বড় বড় সব টার্কির মাংস, সোঁদা গন্ধ সর্বত্র, প্রচণ্ড ঠান্ডা এই বরফ-ঘরে। ওবা তিনজনই ভিতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি মর্লিনকে একপাশে রেখে একটা ত্রিপলে ঢেকে বের হয়ে পড়ল। দরজা টেনে সিঁড়িতে ওঠার মুখে প্রথম কথা বলল স্টুয়ার্ড, স্যার, কাল ভোরে যখন চিফ কুক বসদ নিতে আসবে, কী বলব?

বসদ দেবে।

ওরা ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে রসদের ওজন দ্যাখে। দরজাটা খোলা থাকলে দেখে ফেলার ভয় আছে।

দরজা বন্ধ রাখবে।

দরজা সব সময় বন্ধ রাখলে সন্দেহ করতে পারে। কারণ মেসরুমমেট গোস্ত কেটে এনে ওজন করে দেয়।

মেসরুমমেটকে ভোরবেলায় অন্য কাজ দেব। রসদ ভাল দেবে, ওজন বেশি দেবে। সবাই খুশি থাকবে তবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

স্টুয়ার্ড তবু সিঁড়ি ধরে উঠল না। সে বরফ-ঘরের দিকে পিছন ফিবে তাকাল।

সে নড়ছিল না। সে বিড় বিড় করে কী সব বকছিল। সে দরজাটার সামনে হেঁটে গেল। দরজা খুলতেই দেখল পা-টা মর্লিনের খালি। সে ত্রিপল দিয়ে পা-টা ঢেকে দরজা বন্ধ করে তালাটা লাগাল। তালাটা টেনে দেখল ক'বার। যখন দেখল তালাটা ঠিকমতো লেগেছে, কোথাও কোনও গোপন বিশ্বাসভঙ্গ উঁকি দিয়ে নেই অথবা যখন সবই অতি সন্তর্পণে সংরক্ষিত হল... আর কী হতে পারে, স্টুয়ার্ড এই সব ভেবে সন্দেহের ভঙ্গিতে বলল, স্যার, এটা আমার ভাল লাগছে না। অর্থাৎ এখন মনে হচ্ছে যেন স্টুয়ার্ড নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণ পর মনে হল, বড়-মিস্ত্রির, গলাটা শুকনো ঠেকছে। এতক্ষণ পর একটা চুরুটের কথা মনে হল। তিনি চুরুটে আগুন দিয়ে বললেন, কেন, কী হতে পারে?

সুখানি মুখ বিকৃত করে বলল, ওর কথা বাদ দিন স্যার।

সুখানি, যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

বেশ। চুপ করে থাকলাম।

স্টুয়ার্ড বলল, আর-একবার নীচে নামলে হয় স্যার।

কেন? আবার কেন?

দেখতাম কোথাও কিছু পড়ে থাকল কি না।

স্টুযার্ডকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। যেন এই হত্যার জন্য ওকে সকলে দায়ী করে সবে পডছে। সে বলল, স্যার, ধরা পড়লে আমি সকলের নাম বলে দেব। কাউকে ছাড়ব না। আপনারা সকলেই ওকে শামডেছেন।

বড-মিস্ত্রি ধমক দিলেন, স্টুয়ার্ড, তোমার মন অত্যন্ত ছোট।

স্যাব, আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন না। আপনারা কাল থেকে যদি এমুখো না হন তবে কী করতে পাবি!— স্টুয়ার্ডের গলায় কান্না ভেসে উঠল।

সুখানি পায়ের নখ দিয়ে ডেকের কাঠে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছিল। বড়-মিস্ত্রি স্টুয়ার্ডের মুখ দেখছেন। সে মুখ বিবর্ণ। তিনি এবার স্টুয়ার্ডের হাত ধরে বললেন, রাতে আমরা কোথাও যাব না স্টুয়ার্ড। ছাদের নীচে বরফ-ঘরে মর্লিনের পাশে বসে থাকব। কোনও ভয় নেই তোমার।

ওরা তিনজনই এবার যার যার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। স্টুয়ার্ড নিজের কেবিনের দবজা খুলে দিল। দরজার পাল্লাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দরজা বন্ধ করতে যেন সাহস করছে না। ওর ভয় করছে। এতদিনের জাহাজি-জীবন, অথচ কখনও এমন নিষ্ঠুর ঘটনার সে সাক্ষী থাকেনি।

বড-মিস্ত্রি কিছু বলতে পারছেন না। তিনি খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

সুখানি বলল, শুয়ে পড়ো স্টুয়ার্ড। রাত আর বেশি নেই।

সুখানির ঘর ডেক পার হলে। সে ফোকশালে থাকে। জাহাজের শেষ দিকটাতে জাহাজিদের জন্য

অনেকগুলো ঘর। সুখানি এবং ডেক-কশপ সেখানে থাকে, পাশাপাশি বাংকে।

সুতরাং সুখানি বাইরে এসে দেখল, রাত শেষ হয়ে আসছে। সুখানি হাতের দস্তানা খুলে ফেলল। রাত শেষ হচ্ছে। বরফ পড়ছে না। ঝড় নেই। এক শান্ত নীল রং জাহাজের শরীরে যেন লেপটে আছে। কুয়াশা নেই। সুতরাং শহরের আলো স্পষ্ট। আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। যেসব জাহাজ উষ্ণ স্রোতে সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়েছিল ওরা একে একে ফিরে আসছে। সে এই শীতের ভিতর রেলিং-এ ভর করে দাঁড়াল। রাতের সব ঘটনা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। দেশ-বাড়ির কথা মনে হল। স্ত্রীর কথা মনে হল, সন্তান-সন্ততি অর্থাৎ এক সুনিপুণ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবে এই জাহাজি-জীবনকে ধিক্কার দিতে থাকল। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ হৃদয়ের ঘরে সব মরে গেছে, কারণ এই মৃত্যুজনিত বেদনা সুখানিকে আড়ষ্ট করছে না, মর্লিন মরে গেছে, জাহাজের অন্যান্য জাহাজিরা ঘুমে মগ্ন, শুধু ওয়াচের জাহাজিরা জেগে ওয়াচ দিচ্ছে। যদি পুলিশ খোঁজ করতে আসে, যদি এই হত্যাজনিত দায়ে একটা লম্বা দড়ি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে, সুখানি ভয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল এবার। তারপর আরও সব ভয়ংকর দৃশ্যের কথা ভেবে সে চুপি চুপি স্টুয়ার্ডের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা চালাল। এক দুরারোগ্য ভয় সুখানিকে নিঃসঙ্গ পেয়ে জড়িয়ে ধরছে।

সে স্টুয়ার্ডের কেবিনে এসে দেখল, দরজা খোলা। পাল্লা ধরে স্টুয়ার্ড আগের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, এই! এই! হচ্ছে কী?

এবং মনে হচ্ছে বজ্রজনিত মৃত্যু। সুখানি ওকে নাড়া দিল বারবার। এবং স্টুয়ার্ডকে টেনে নিল বাংকের কাছে, তারপর ধমক দিয়ে বলল, কী হচ্ছে এটা! এমন ভিতু লোকের জাহাজি হওয়া চলে না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। এমন করবে তো খুন করব।

সুখানি ঘুরে গিয়ে বড়-মিস্ত্রির কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। কেবিনের দরজা খোলা। বড়-মিস্ত্রি একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছেন। শরীরে কোনও জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুখানি ডাকল, স্যার, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

বড়-মিস্ত্রি টেবিল থেকে নড়লেন না। দরজাটা টেনে দাও সুখানি। বড়-মিস্ত্রি টেবিল থেকে মাথা তুললেন না। মর্লিনের সাদা চোখ ওঁকে তখনও অনুসরণ করছে যেন। তিনি কেবিনে পায়চারি করতে থাকলেন। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পায়চারি করার ইচ্ছা। ভোরের বাতাসে পাখিরা যখন উড়বে, যখন কোথাও কোনও হত্যা অথবা রাতের দুর্ঘটনাজনিত দুঃখ মাস্তুলের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন বড়-মিস্ত্রি বাংকে শুয়ে ঘুম যাবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু অধিক সময় তিনি পায়চারি করতে পারলেন না। তিনি বাংকে শুয়ে পড়লেন।

সুখানি ডেক ধরে হেঁটে চলে গেল। সে নিজের ফোকশালে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকল। আলো জ্বালল না। দরজা বন্ধ করে পোর্ট-হোল খুলে সামনে মুখ রেখে বসে থাকল। রাতের সব পাখিদের দেখে ইতস্তত ছড়ানো নাবিকদের সব ছবি দেখে এবং দূরের জেটিতে একটি শিশুর কান্না শুনে ওরও মর্লিনের জন্য কষ্ট হতে থাকল।

ওরা তিনজন জাহাজের তিনটি ঘরে পোষা পাখিদের মতো ঘুমোচ্ছিল। বরফ-ঘরে মর্লিন। ত্রিপলে শরীর ঢাকা পড়ে আছে। অন্যান্য কেবিনে দীর্ঘদিন পর রাতের এই প্রহরটুকুকে জাহাজিরা আস্বাদন করছে। ঠান্ডার জন্য সকলেই কেমন কুঁকড়ে ছিল। কোয়ার্টার-মাস্টার গ্যাংওয়ের ওয়াচ শেষ করে ফোকশালে ফিরে আসছে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে সকলে রেলিং-এ ভর করছে, জেটি অতিক্রম করে শহরের বাস ট্রাম এবং রমণীদের প্রিয়মুখ... তারপর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন এক জীবন... আহ' এই দেশ, মাটি, পাব, নাইট ক্লাব, সুখ শুধু সুখ, উলঙ্গ এক চিন্তা সব সময়ের জন্য, জাহাজিরা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর সুখ নামক উলঙ্গ এক নগরে হাঁটছে যেন।

ওরা তিনজন পোষা পাখির মতো স্বপ্ন দেখল।

বড়-মিস্ত্রি স্বপ্নের কোলাহলে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখে অনেক দূর চলে যেতে থাকলেন। তিনি দূরে সব চিনার গাছ দেখলেন, আকাশ দেখলেন, অথবা দেখলেন পাইন আপেলের নীচে সুন্দরী রমণীগণ নগ্ন হয়ে বসে আছে। তিনি বড় বড় চিনার গাছ ফাঁক করে চলে যাচ্ছেন। ডেইজি ফুলের গন্ধ কোথাও

এবং সামনে সেই উলঙ্গ নগর। তিনি পোশাক পরিত্যাগ করে সেই নগরে প্রবেশ করে কেবল হ্যাঁচ্চো দিতে থাকলেন।

বড়-মিস্ত্রি স্বপ্নের ভিতর বিগত জীবনের কিছু মহত্তম ঘটনা দেখতে পেলেন।

সুখানি স্বপ্ন দেখল, একটা উট মরুভূমি থেকে নেমে আসছে। ওর সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক উলঙ্গ নারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বরফ-ঘরে ছাল তুলে নেওয়া গোরু অথবা শূকরের মতো দেখাচ্ছে রমণীকে। উট দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এক মরূদ্যানে প্রবেশ করল। সামনে নীল হ্রদ। হ্রদের জলে উট নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী প্রাণ পাচ্ছিল। যখন খেজুর গাছের পাতাগুলো সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন সুখানি দেখল যুবতী সেই উটের পিঠে বসে এবং হাজার হাজার পুরুষ সেই যুবতীর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হচ্ছে। যুবতী বসে বসে প্রেমের আধার থেকে কণামাত্র বিতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখানি ফের যখন উটটিকে দেখল তখন স্বপ্নের ভিতর উটটি চলাফেরা করছিল, উটের পায়ে দড়ি এবং দড়িতে রমণীর শরীর আবদ্ধ। সেই এক ঘটনা বার বার চোখের উপর পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সুখানি স্বপ্নের ভিতর শেষ পর্যন্ত এলবিকে দেখল। এলবির সকরুণ চোখ এবং কান্না স্বপ্নের অলিগলি থেকে বের হয়ে আসছে।

আর স্টুয়ার্ড একটা মৃত কৃমি হয়ে বাংকে পড়ে ছিল। নড়ছিল না। সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। অথচ ওর স্বপ্নে একটা তাজা গোলাপ ফুল ফুটে ছিল সব সময়। চেরি নামক এক যুবতীর মুখ সেই ফুলের ভিতর থেকে বার বার উঁকি দিচ্ছে। সে শুয়ে শুয়ে ঢোক গিলল। ওর স্বপ্নের শেষটুকুতে ছিল একটি পুরুষ-অশ্বের নীচে শুয়ে একটি নগ্ন যুবতী বার বার সহবাসের চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে।

তারপর জাহাজে ভোর হল। সকলেই উঠে পড়ল একে একে। এখনও জাহাজ-ডেকে অন্ধকার আছে। সারেং সকলকে বলল, টান্টু।

ওরা উপরে উঠে এল। ওরা জল মারতে আরম্ভ করল ডেক-এ। ইঞ্জিনের জাহাজিরা ইঞ্জিন-সারেঙের সঙ্গে নীচে নেমে গেল। বয়লারের স্মোকবক্স পরিষ্কার করার জন্য কয়েকজন কোলবয় তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। মেজ-মিস্ত্রি একবার নীচে নেমে ব্যালেস্ট পাম্পের আশেপাশে টর্চ মেরে কী যেন অনুসন্ধান করে গেছেন, উপরে এখন ডেক-জাহাজিরা ডেকে জল মারছে। রাতে যে তুষারঝড় হয়েছিল, জল মেরে তার শেষটুকু যেন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। একটু বাদে আলো ফুটবে। এবং রোদ উঠবে।

ডেক-জাহাজিরা গাম-বুট পরে জল মারছিল। হিমেল হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। জেটি অতিক্রম করলে বালিয়াড়ি। এ দেশে এবার বসন্ত আসছে। বালির চরে নতুন ঘর উঠছে। কার্নিভেল বসবে। গাছের পাতাসকল কুঁড়ি মেলেছে। ডেক-জাহাজিরা এই শীতের ভিতর রোদের উষ্ণতার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তীরের দৃশ্যসকল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার গ্লানি মুছে দিচ্ছিল।

ঠিক এ সময়ে স্টুয়ার্ড দরজা খুলে দেখল, ভোর হয়ে গেছে। ওর স্বপ্নের কথা মনে হল এবং মনে হল ভাণ্ডারি, চিফ কুক আসবে রসদ নিতে। তারপর গত রাতের মর্লিন, মৃত্যু এবং হত্যাজনিত দায়, সবকিছু ওকে ফের গ্রাস করতে থাকল। সে বাথরুমে গেল না, চোখ-মুখ ধুল না, রসদ-ঘরের ঢাকনা খুলে তরতর করে নীচে নেমে গেল। বরফ-ঘরের দরজা খোলার আগে ভাবল, বড় বড় ভাল গোস্ত বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে মেনুর কথা ভাবল। কী মেনু হবে এমত একটা আন্দাজ করে দরজা খুলতেই সে ভয়ে এবং বিস্ময়ে হতবাক। দেখল, মর্লিনের মুখ খোলা। মর্লিনের মৃত সাদা চোখ ওকে দেখছে। সে সেই ছোট ত্রিপলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখল পা বের হয়ে থাকছে। সে টানাটানি করল অনেকক্ষণ। কিন্তু পা মাথা একসঙ্গে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে পারল না।

স্টুয়ার্ড একা বলে হুক থেকে গোস্ত নামাতে দেরি হচ্ছিল। ওর কষ্ট হচ্ছিল খুব। কী করবে, কী না করবে ভেবে উঠতে পারছে না। একটা অস্পষ্ট আশংকা ওকে সব সময় বিব্রত করছে। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। ছাদে পায়ের শব্দ। ভাণ্ডারি, চিফ কুক নেমে আসছে। ওদের শব্দ পেয়ে সে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে বসে পড়ল। মর্লিনকে টেনে টেনে বরফ-ঘরের বালকেডের পাশে নিয়ে গেল। স্টুয়ার্ড দেখল, ওর অনাবৃত দেহের রং এবং এই বাসি গোস্তের রং হুবহু এক। সে ঝুলানো ষাঁড়-গোরুর ভেতর থেকে দেখল ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সে কেমন মাথার ভিতর যন্ত্রণাবোধে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। সে দু'বার

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে ভূতের মতো নতুন এক বুদ্ধির আশ্রয়ে চলে গেল, কপিকলটাকে এগিয়ে এনে মর্লিনকে পায়ে গেঁথে হুকে ঝুলিয়ে দিল। সে নীচে বসে সব দেখতে দেখতে ভাবল, এই অনাবৃত শরীরের রং নিয়ে মর্লিন এখন গোরু-ঘোড়া হয়ে গেল। দরজা থেকে মর্লিনের অস্পষ্ট শরীরের রং এবং আকার আধপোড়া শূকরের মতো দেখাচ্ছিল। স্টুয়ার্ড বুঝল, এই ঘরের দেয়াল, ছাদ এবং হুকের সর্বত্র একই রকমের লাশ। সে দরজার ভিতর দিয়ে ঝোলানো গোস্তের সঙ্গে মর্লিনের এতটুকু প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছে না। সে এবার কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারল। রসদ বের করে অন্যান্য দিনের মতো কম বেশি করার স্পৃহাতে মেসরুমমেটকে ডেকে আলু-কপির ঘরে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে ঢুকে গেল।

অন্যান্য দিনের মতো চিফ কুকের সঙ্গে স্টুয়ার্ডের বচসা হল না রসদ নিয়ে। চিফ কুক উলটেপালটে গোস্ত দেখল। ওরা রসদ নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ডেক-ভাণ্ডারি এবং ইঞ্জিন-ভাণ্ডারিও রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেল। স্টুয়ার্ড সকলকে দুটো করে আলাদা ডিম ঘুষ দিয়েছে। চিফ কুককে আলাদা অক্সটেল দিয়েছে। সকলেই মোটামুটি খুশি। ওরা সকলে রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেলে স্টুয়ার্ড ফেব বরফ-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো চামড়া ছাড়ানো গোরু ভেড়ার লাশ অতিক্রম করে মর্লিনের পিঠ এবং মাথার ডান দিকের অংশটা অস্পষ্ট এক শূকরের মাংসের মতো। টার্কির পেটেব দিকটার মতো নিতম্বের ভাঁজ। এই ঘরে মর্লিন শূকর-ভেড়া অথবা গোরুর মতো শরীর নিয়ে এখন হুকে ঝুলছে। শুকনো স্তন এবং অন্য কিছু দেখার জন্যই সে এবার ভিতরে ঢুকে মুখোমুখি দাঁড়াল। মর্লিনেব তলপেট সংলগ্ন মুখ, সোনালি চুলে এখনও তাজা গন্ধ, অথচ মর্লিনকে মরা মাংস ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। সে পেটের নীচে হাত বুলোতে থাকল অন্যমনস্কভাবে।

যে ভয়টা নিরন্তর কাজ করছিল স্টুয়ার্ডের মনে, এ সময় সেই ভয়টা কেটে যাচ্ছে। সে বলল, মর্লিন, আমরা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

সে প্রদক্ষিণ করার মতো মর্লিনের শরীরটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখল। সে বলল, এই নিষ্ঠুরতার জন্য গতকালের তুষারঝড় দায়ী।

অথচ মনে হল, নিরন্তর সে তার অপরাধবোধকে দূরে রাখার স্পৃহাতে এমন সব কথা বলছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল, শুধু মাংস ভক্ষণে তৃপ্তি থাকে না মর্লিন।

তারপর সে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজে দৈনিক কাজ জাহাজিরা করে নিচ্ছে। সারাদিন কাজ। দিন ছোট বলে রাতের কিছু অংশও ওদের কাজের ভিতর ঢুকে গেল। সারাদিন কাজের পর এক সময়ে বড়-মিস্ত্রি, স্টুয়ার্ড এবং সুখানি একত্রে বসে ছিল। ওরা কোনও কথা বলেনি। কারণ রাতে একই দুঃস্বপ্ন এসে এদের জড়িয়ে ধরবে ওরা জানত।

ওরা প্রতি রাতে জাহাজের কেবিনে দুঃখী জাহাজির মতো বসে থাকত।

একদিন ওদের পোর্ট-হোলের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় সুখানি বলল, বড়-সাব, বাইরে রোদ উঠেছে।

বড়-মিস্ত্রি বললেন, সুখানি, চলো, মর্লিনকে দেখে আসি।

স্যার, ওভাবে মর্লিনকে আমি দেখতে পারব না। স্যার, বরং আমাদের পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া ভাল। এভাবে মৃতদেহের উপর কুৎসিত আচরণ করে জাহাজে আমি বাঁচতে পারব না। রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। যেখানে যখন থাকছি মর্লিন মৃত পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমার সামনে শুধু ঈশ্বরের থাবা। যেখানে থাকছি সেখানেই গলা টিপে ধরতে চাইছে।

বড়-মিস্ত্রি দেখছেন, ধীরে ধীরে ওরা তিনজন ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

বড়-মিস্ত্রি বললেন, রাতে আজকাল একই স্বপ্ন দেখছি, আমার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন। মৃত। চোখ-মুখ পচে গেছে।

সুখানির!— চোখ-মুখ লাল। ওর শরীর বাংকের উপর হিংস্র থাবা নিয়ে বসে আছে।

বড়-মিস্ত্রি স্টুয়ার্ডকে বললেন, স্টুয়ার্ড, মর্লিনকে সন্ধ্যার পর শুইয়ে রাখবে। আমি আর সুখানি

শহর থেকে ফুল নিয়ে আসব। ওর পোশাক যেন পরানো থাকে। আমরা মর্লিনকে ভালবাসার চেষ্টা করব।

সুখানি।— তিনি সুখানির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমার মনে হয় যদি যথার্থই আমরা মর্লিনকে ভালবাসতে পারি, যদি মনে হয় মর্লিনের শরীর প্রীতিময়, তখন আমাদের পাপবোধ নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হবে। কারণ আমরা সকলেই একদিন এরকম ছিলাম না। আমরা ঘুমোতে পারব। সারারাত কঠিন দুঃস্বপ্ন আমাদের আগলে থাকবে না।

সুখানি বলল, বরং আমাদের জীবনেও কিছু কিছু মহত্তর ঘটনা আছে যা মর্লিনকে ফুল দেবার সময় বলতে পারি।

পাঁচটা না বাজতেই জাহাজ-ডেকে রাত নেমে এল। বাইরে ঠান্ডা। শীত যাবার আগে যেন বন্দরটাকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভোরের রোদটুকু এবং আকাশের পরিচ্ছন্নতা এই শীতকে তীব্র তীক্ষ্ণ করেছে। ওরা তিনজন গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। ওরা ওভারকোট পরেছিল, মাথায় ফেল্ট-ক্যাপ ছিল ওদের। বড়-মিস্ত্রি হাতে একটা স্টিক রেখেছে।

সুখানি সহসা বলল, স্যার, স্টুয়ার্ডের ফিরে যাওয়া উচিত। মর্লিনকে জাহাজে একা ফেলে রাখা উচিত হয়নি। অন্য কেউ যদি ওকে আবিষ্কার করে ফেলে?

বড-মিস্ত্রি বললেন, আরে না! তুমিও যেমন, স্টুয়ার্ড ফাঁক পেলেই ওখানে ঘুর ঘুর করবে এবং ধরা পড়াব সুযোগ করে দেবে।

এ সময় ওরা সমুদ্রের ধারে ধারে কিছু পুরুষ এবং রমণী দেখতে পেল। জেটির জাহাজগুলো অতিক্রম করে ছোট এক মাঠ, কিছু টিউলিপ ফুলের গাছ। বার্চ জাতীয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওবা হেঁটে যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে সব লাল নীল রঙের বাড়ি। সমুদ্রের জল বাতাসের সঙ্গে উঠে আসছে। ইতস্তত ভিন্ন ভিন্ন পাব এবং নাইট ক্লাবের লাল বিজ্ঞাপন। অন্য দিন হলে স্টুয়ার্ড এইসব নাইট ক্লাবে ঢুকে যেত, ওদেব উলঙ্গ নাচ দেখে সারারাত কামুক হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। সুখানি, পাবের ধারে অথবা রাস্তার মোড়ে পালকের টুপি পরে সং দেখানোর মতো যারা দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের একজনকে বগলে চেপে বালিয়াড়িতে নেমে যেত, কিন্তু আজ ওরা তিনজনই শুধু দেখছে, ওরা ভাল ফুল কেনার জন্য পথ ধরে হাটছে।

বড-মিস্ত্রি স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ করে বললেন, মর্লিনকে জেটির কোন জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিলে?

জেটিব তিন নম্বব ক্রেনের নীচ থেকে।

সুখানি স্টুয়ার্ডকে পুলিশের মতো জেরা করে বলল, সে তখন কী করছিল?

একজন জাহাজিকে সুখ দিচ্ছিল।

কতক্ষণ ধরে?

খুব শীত। সময় আমি হিসাব করিনি।

তুমি ওকে কী বললে?

আমি একটু সুখ চাইলাম।

উত্তরে সে কী বলল?

ওরা উঁচু-নিচু পথ ধরে হাঁটছিল। ওরা শহরের বাজার দেখার জন্য এবং ফুল কেনার জন্য উঠে যাচ্ছে। বড়-মিস্ত্রি চলতে চলতে লাঠি ঘুরাচ্ছিলেন, যেন তিনি কুকুরের দৌড় দেখতে যাচ্ছেন। হত্যাজনিত কোনও ভয়ই ওদের এখন নেই, এমত চোখ-মুখ ওদের সকলের।

সে বলল, একটু গরম দাও আমাকে, নইলে শীতে মরে যাব।

বড-মিস্ত্রি ধমকের সুরে বললেন, সুখানি, আমরা এই বন্দর-পথ ধরে কোথায় যাচ্ছি?

স্যার, ফুল কিনতে।

কিন্তু গোটা পথটা ধরে তুমি একটা পেটি-দারোগার মতো কথা বলছ!

বড-মিস্ত্রিকে খুশি করার জন্য সে বলল, আজ ভোরেও স্যার কাগজ দেখলাম। শহরের কর্তৃপক্ষ মর্লিন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শহর থেকে একটি মেয়ে গায়েব হয়ে গেল অথচ...

স্টুয়ার্ড নাকের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করল। এবং বলল, নিরুদ্দিষ্ট কলামটা দেখেছিলে?

হ্যাঁ, দেখেছিলাম বইকী। ওতে আছে, এক ভদ্রমহিলার একটি কুকুর নিখোঁজ। কুকুরের যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে দশ হাজার পাউন্ড পুরস্কৃত করা হবে। স্যার, চলুন একটা কুকুর ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাই।

ওরা একটা পথের মোড় ঘুরল। এই পথটা একটু অন্ধকার। ওরা ক্রমশ সমুদ্র থেকে দূরে সরে আসছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে না আর। বাতাসের সঙ্গে তেমন জলীয় কণাও নেই। আগন্তুক তিনজনকে শহরের পুরুষ ও রমণীগণ দেখছিল। নীল আলো, হিমেল হাওয়া এবং পথের বাস-ট্রামের শব্দ, নাইট ক্লাবের সংগীত, কাফে, বার মিলে একটা রহস্যের অন্ধকার এই পথটার ভিতর ঢুকে স্তব্ধ হয়ে আছে। ওরা এখানে থামল। একটা বাড়ির ভিতর থেকে কিছু কুকুরের চিৎকার ভেসে আসছে। ওরা দেখল, উপরে লেখা আছে 'কুকুর ভাড়া পাওয়া যায়'।

ওরা এক সময় একটা সরু লেগুনের পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। উঁচু-নিচু পথ। সমুদ্র বড় সন্তর্পণে খুব সরু পথ করে শহরের ভিতর ঢুকে গেছে। গতবার ডেসি এবং বড়-মিস্ত্রি এখানে নৌকা বাইচ দেখতে এসেছিলেন। ডেসিকে নিয়ে বড়-মিস্ত্রি কী কী ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, নৌকা বাইচ দেখার পর লেগুন অতিক্রম করে এক নির্জন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একটি বার্চগাছের নীচে অথবা দূরের সব পাহাড়শ্রেণি পার হলে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের গ্রাম্য এক পাবে সারা দিন মাতলামি এবং অন্য অনেক সব ছোট ঘটনার স্মৃতি ভিতর থেকে বেয়ে বেয়ে উঠে আসছিল।

বড়-মিস্ত্রি, সুখানি এবং স্টুয়ার্ডের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন, কারণ যে সেতুটা এই লেগুনাকে সংযুক্ত করছে সেখানে হরেক রকম যুবক-যুবতী লেগুনের জলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে এবং প্রেম নিবেদন করছে। দূরে পাহাড়শ্রেণি, মাথায় লাল নীল অজস্র আলো। লেগুনের নীল জলে সরু সক স্কিপ বাঁধা। ছই আছে এবং অনেকটা ঘরের মতো, যেখানে ইচ্ছা করলেই কোনও বেশ্যা রমণীকে নিয়ে রাত কাটানো যায়। ডেসি এবং বড়-মিস্ত্রি অনেকবার এই সব স্কিপে রাত কাটিয়েছেন, ওদের দু'জনকে আজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসি যাচ্ছে আর রোজ রোজ তিনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন, এ কথাও জানালেন। নির্মল এই আকাশ, মাথার উপর পাহাড়শ্রেণির অজস্র আলো এবং দূরের কোনও গ্রাম্য পাবের কিশোরী এক বালিকার মুখচ্ছবি, বড়-মিস্ত্রিকে প্রাণ খুলে কথা বলবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল।

বড়-মিস্ত্রি বললেন, কী ফুল কিনবে?

ওরা তখন সেতু অতিক্রম করে নীচে বাজারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সুখানি বলল, রজনীগন্ধা দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যাবে না।

সুখানি একটা ফুলের নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল। অথচ কিছুতেই সে নামটা স্মরণ করতে পারল না। ফুলগুলি এ অঞ্চলে পাওয়া যায়, ঠিক রজনীগন্ধারই মতো। ফুলগুলির গায়ে মোমের রং অথবা যেন কচি আঙুরের স্তবক এবং সুগন্ধময়। সে ভাবল, সেইসব ফুলের স্টিক কিনে নেওয়া যাবে।

ওরা বাজারে ফুলের গলিতে ঢুকে গেল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমবা ব্যবহারে যথার্থই মানুষের মতো হবার চেষ্টা করব। আমরা মদ খাব না এই ক'দিন।

এটা ভাল প্রস্তাব বটে।— বড়-মিস্ত্রি মাথা নাড়লেন।

ওরা ফুল নিয়ে জাহাজে উঠে গেল এক সময় এবং ভালবাসার অভিনয় করার জন্য নাটকের প্রথম অঙ্কের গর্ভে ঢুকে গেল।

কেবিনে ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। দেয়ালের সাদা রং কেবল এই কেবিনে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। ওরা পরস্পর কিছুক্ষণেব জন্য অপরিচিতের মতো মুখ করে বসে থাকল। ওয়াচের ঘণ্টা পড়ছে। সারাদিন জেটিতে যে চঞ্চলতা ছিল, রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে আসছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করছে। আকাশ তেমনি পরিষ্কার। এই জাহাজের বুকে নক্ষত্রের আলো এসে নামছে।

তিনজন নাবিক বসে থাকল। রাতের নিঃসঙ্গতার জন্য বসে থাকল। ওরা মর্লিনের জন্য মর্লিনের পাশে দুঃখ লাঘবের জন্য বসে থাকল। ওরা আগের মতোই চুপচাপ। দূর থেকে আগত সমুদ্র-গর্জন শোনার জন্যই হোক অথবা এই জাহাজের কোনও কক্ষে রমণীর মৃত শরীর হুকে ঝুলছে, রমণীর ঘর-সংসার, ওদের দুঃস্বপ্ন-সকল, মানুষ এক নির্লজ্জ ইচ্ছার তাড়নাতে ভুগছে, এই সব চিন্তা, তারপর সমুদ্র অতিক্রম করে সেই প্রিয় সংসার এবং মাঝে মাঝে পুলিশ নামক এক জন্তুর ডাক, ওরা ভয়ে পরস্পর এখন তাকাতে পারছে না।

স্টুয়ার্ড বলল, আসুন স্যার, একসঙ্গে নামি। একা নামতে ভয় করছে।

স্টুয়ার্ড হাতের দস্তানা বের করল বালিশের ভেতর থেকে। ওভারকোট নিল এবং জুতো জোড়া বের করার সময় সুখানি চিৎকার করে উঠল, স্টুয়ার্ড একটা বাসকেল। স্যার, সে মর্লিনকে হুক থেকে নামায়নি। আমি যাব না স্যার। আমার বীভৎস দৃশ্য সহ্য হবে না।

বড়-মিস্ত্রি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো হাসলেন। বললেন, ওটা বীভৎস বললে চলবে কেন সুখানি?

স্টুয়ার্ড বলল, আপনিই বলুন স্যার।

বড়-মিস্ত্রি ফের বললেন, আমরা এই মানুষেরা বীভৎস স্থানটুকুর জন্যই লড়াই করছি। সংগ্রাম করতে পারো অথবা লোভ, লালসা, চরম কুৎসিত বস্তুটির জন্য আমাদের কামুক করে রাখে।

এবার বড়-মিস্ত্রি সুখানিকে দু'হাতে ঠেলে রসদ-ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, তুমি যদি পা দুটো উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে দ্যাখো, কী দেখবে সুখানি? একটা মুখের মতো অবয়ব দেখবে, নাক দেখবে, গহ্বর দেখবে। শুধু চোখ নেই। কবন্ধের মতো অথবা অন্ধ বলতে পারো। আর অন্ধ বলেই সকল অত্যাচার সহ্য করছে। অন্ধ বলেই এত কুৎসিত, এত ভয়ানক এবং আমাদের এত ভালবাসা।

রসদ-ঘরে আলু-পেঁয়াজের গন্ধ। ডিমের শুকনো গন্ধ। বাসি বাঁধাকপির গন্ধ মলমূত্রের মতো। সুখানি ফুলগুলি এবার বুকে চেপে ধরল। স্টুয়ার্ড বরফ-ঘরের দরজা খুলে বড়-মিস্ত্রিকে দেখাল, কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার?

বড় মিস্ত্রি যথার্থই কিছু দেখতে পেলেন না। সারি সারি হুকে বড় বড় ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। ভেড়া এবং শূকর। টার্কির শরীর পর্যন্ত। সব এক রং। এক মাংস এবং শুধু ভক্ষণের নিমিত্তই তৈরি। তিনি নিজেই এবার ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, মর্লিন, মর্লিন কোথায় স্টুয়ার্ড!

ওরা একটি টেবিল সংগ্রহ করে মর্লিনকে সযত্নে তার উপর রেখে দিল। পোশাক পরানো হল। পায়ে জুতো এবং ফুলগুলি ওর মাথার কাছে রেখে ওরা বসে থাকল নির্বোধের মতো। বড়-মিস্ত্রি পায়ের কাছটায় বসে আছেন। দু'পাশে সুখানি এবং স্টুয়ার্ড। ওরা মর্লিনের মুখ দেখছিল। যত ওরা মৃত মুখ দেখছিল তত ওদের এক ধরনের আবেগ গলা বেয়ে উঠে আসছে। ওর প্রতি আচরণে এতটা নির্বোধ না হলেও চলত, এমত এক চিন্তার দ্বারা ওরা প্রহৃত হচ্ছে। বড়-মিস্ত্রিই বললেন, এই মৃত রমণীর কাছে আমাদের জীবনের এমন কী মহত্তর ঘটনা আছে যা বলতে পারি?

তিনি এইটুকু বলে উঠে দাঁড়ালেন, এমন কী ঘটনা আছে জাহাজি-জীবনে, যা বলে এই তীক্ষ্ণ বিষণ্ণতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?

সুখানি বলল, ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে।

এইটুকু বলে চিবুকে হাত রাখল সুখানি। কিছুক্ষণ কী যেন দেখল সমস্ত ঘরটার ভিতর। পাশে একটা ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। এবং মাঝে মাঝে ওর শরীরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে যেন। সে বলল, আমরা সকলেই জীবনের কোনও না কোনও মহত্তম ঘটনা বলব। চিরদিন আমরা এমন ছিলাম না।

স্টুয়ার্ড বলল, মহত্তম ঘটনা বলতে পারলে ফের আমরা ঘুমোতে পারব।

বড় মিস্ত্রি পায়ের কাছটায় বসলেন আবার।

স্টুয়ার্ড দেখল ওদের সকলের চোখ ধীরে ধীরে কোটরাগত হচ্ছে। চোখের নীচে এক ধরনের অপরাধবোধের চিহ্ন ধরা পড়ছে। সে সুখানিকে বলল, আচ্ছা সুখানি, আমার চোখের নীচে কালি পড়েছে?

আয়নায় দেখো। আমার তো মনে হয় তোমারই সবচেয়ে বেশি।

সুমিত্র বড়-মিস্ত্রি অবনীভূষণকে উদ্দেশ করে বলল, স্যার, কাপ্তান আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোনও অসুখ করেছে স্টুয়ার্ড? তোমাকে খুব পীড়িত দেখাচ্ছে!

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আবার বলোনি তো, রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। কেমন এক অশরীরী পাপবোধ চারধারে ঘোরাফেরা করছে। বলোনি তো?

আমি পাগল নাকি স্যার! আমি এমন কথা বলতে পারি?

সুখানি এবার কঠিন গলায় বলল, তুমি পাগল। আলবত পাগল। পাগল না হলে একটা রুগ্ন বেশ্যা মেয়েকে কেবিনে কেউ তুলে আনতে পারে?

স্যার, আপনি বলুন।— নালিশের ভঙ্গিতে বলল সুমিত্র।

সুখানি, তুমি বেশ্যা বলবে না। মর্লিন বেশ্যা হলে তোমার মা-ও বেশ্যা।

বড়-মিস্ত্রি তার মাকে বেশ্যা বলেছে, বিজন ভাবল। সে সুখানি জাহাজের আর অবনীভূষণ বড়-মিস্ত্রি জাহাজের। সুতরাং বড়-মিস্ত্রির বিজনের মাকে বেশ্যা বলার এক্তিয়ার আছে। সুতরাং বিজন চুপচাপ বসে থাকল। কোনও জবাব দিল না। নির্বোধের মতো তাকাতে থাকল ফের ঘরের চারদিকে।

সুমিত্র আর দেরি করতে চাইল না। সে বলল, স্যার, আমার জীবনে একটা মধুর ঘটনা আছে। অনুমতি দিলে বলতে পারি।

বলবে?— অবনীভূষণ অদ্ভুতভাবে ঠোঁট চেপে কথাটা বললেন।

হ্যাঁ স্যার, আগেই বলে ফেলি। আগে আগে যদি একটু ঘুমোতে পারি।

বলো।

সুমিত্র গল্প আরম্ভ করার আগে মর্লিনের মুখের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ল। বলল, এই মুখ দেখলে, স্যার আমার শুধু চেরির কথা মনে হয়। তখন জাহাজে স্যার তেলয়ালার কাজ করতাম।

বিজন এবার উঠে দাঁড়াল।

আমি সুখানি জাহাজের, তা ছাড়া আমি স্যার এই তিনজনের ভিতর সকলের ছোট। আমাকে সকলের আগে বলতে দেওয়া হোক।

বলে সেও মর্লিনের মুখের কাছে ঠিক স্টুয়ার্ডের মতো ঝুঁকে পড়ল। সে বলল, এই মুখ দেখলে শুধু এলবির কথা মনে হয়। তখন স্যার আমাদের জাহাজ অস্ট্রেলিয়াতে।

সুমিত্র চিৎকার করে উঠল, বেয়াদপ!

বড়-মিস্ত্রি দেখলেন, ওরা ঝগড়া আরম্ভ করছে। তিনি বললেন, বরং গল্পটা আমিই বলি।

বলে তিনি আরম্ভ করলেন, শেষ রাতের দিকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরেছে। আমি তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব। আমাদের জাহাজ সেই কবে পূর্ব-আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। আমরা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ, বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখছি। সুতরাং দীর্ঘদিন পর এই বন্দর পেয়ে তুষার-রাতেও আমাদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। আমাদের মেজ-মালোম উত্তেজনায় রা-রা করে গান গাইছিলেন।

অবনীভূষণ কিছুক্ষণ থেমে সহসা বলে ফেললেন, এ কী স্টুয়ার্ড, তুমি বাসি বাঁধাকপির মতো মুখ করে বসে আছ কেন? শুনছ তো গল্পটা?

কী যে বলেন স্যার।

বুঝলে, তোমাদের অবনীভূষণও বিকেলের দিকে সাজগোজ করে তুষারঝড়ের ভিতরই বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ংকর বড় বেঢপ জুতো পরে অবনীভূষণ গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজ-মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ-মালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালি ব্লাউজের উপর ফারের মতো লম্বা কোট গায়ে।

তুষারঝড়, সুতরাং গাছের পাতা সব ঝরে গেছে। আর পাতা ঝরে গেছে বলে কোনও গাছই চেনা যাচ্ছে না। ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে, পাইন হতে পারে, এমনকী বার্চ গাছও হতে পারে। আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধু ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস উড ছিল। শীতে পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল-নীল

রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় জানালার ভিতর পরিবারের যুবক-যুবতীদের মুখ, অ্যাকর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য লোকসংগীত তোমাদের অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে।

বড়-মিস্ত্রি এবার সুখানিকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার সব হুবহু মনে পড়ছে। নাচ-ঘরে অবনীভূষণ দু'জন যুবতীকে একলা দেখতে পেল।

তখন ব্যান্ড বাজছে, হরদম বাজছে। মদের কাউন্টারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছিল। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর-সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দু'জন নাবিককে হারিয়েছে এমন গল্পও করল। ভিড় সেই কাচঘরে ক্রমশ বাড়ছিল। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর আর মৃত বৃক্ষের মতো কিছু পাইন গাছ, তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাচঘর অতিক্রম করে কাউন্টারের সামনে লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কী বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ করছিল। হারপুনার সেই যুবতী দু'জনকে উদ্দেশ করে হাঁটছে। অথবা তোমাদের অবনীভূষণের মনে হচ্ছিল যেন কে বা কারা সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে, ট্যানি টরেন্টো... ট্যানি টরেন্টো...

রাত ক্রমশ বাড়ছিল। গল্প ক্রমশ জমে উঠছে। মর্লিনের সাদা মুখ এবং পায়ের নীচে বসে বড়-মিস্ত্রি সব দেখতে পাচ্ছিলেন। এখন যেন আর সেই মুখ দেখে অবনীভূষণের এতটুকু ভয় করছে না। তিনি এবার প্রিয় মর্লিনকে উদ্দেশ করেই যেন গল্পটা শেষ করলেন, অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর তিনি এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছেন। বুঝলে মর্লিন, তোমার এই বড়-মিস্ত্রি সেই জাহাজে আবদ্ধ যুবতীকে উদ্দেশ করে বলেছিল; আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন, আমি বাইরে তুষারঝড়ের ভিতর বসে আপনার পাহারায় থাকছি। বলে তোমার বড়-মিস্ত্রি দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ংকর ঠান্ডার ভিতর পা মুড়ে বসেছিল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন... দ্বীপের স্বপ্ন... বড় এক বাতিঘর দ্বীপ, সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী, জাহাজের মাস্তুলে তোমাদের অবনীভূষণ 'মানুষের ধর্ম' বড় বড় হরফে এই শব্দ ঝুলতে দেখল। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল, তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মানিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই।

বড়-মিস্ত্রি জীবনের সেই মহৎ গল্পটুকু পুনরাবৃত্তি করে সকলকে দুঃখিত করে রাখলেন। মর্লিনের মৃত শরীরে এবার ওরা ফুল রাখল। এবং ওরা যথার্থই এখন এই মাংসের ঘরে সেই যুবতীকে প্রত্যক্ষ করল।

সুখানি, বড়-মিস্ত্রি ফুল রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে স্টুয়ার্ড দরজা বন্ধ করে ফিরছে। ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। খোলা ডেক-এ দাঁড়াল। এই উদার আকাশ এবং শহরের নীল লাল আলো এবং সাগর দ্বীপের পাখিরা কেবল ডাকছে। ওরা এখন সমুদ্রের সিঁড়ি ভেঙে আকাশের তারা গুনতে থাকল যেন এবং এ সময়েই ওরা ঘরে ফেরার জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওরা নির্জন ডেক ধরে যে যার আশ্রয়ে চলে গেল। পরস্পর কোনও কথা বলল না। বলতে পারল না।

এরা বন্দরে নেমে সোজা মার্কেটে চলে গেল। পথের কোনও দৃশ্যই ওদের আজ চোখে পড়ছে না। লাল ফুলের জন্য ওরা সন্ধ্যা না হতেই দোকানে ভিড় করল। ওরা আজও তিন গুচ্ছ ফুল নিয়ে জাহাজে ফেরার সময় কোনও পাব-এ ঢুকে একটু মদ খাবার জন্য আকুল হল না। মর্লিন এক তীব্র পাপবোধের দ্বারা ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

স্টুয়ার্ড নিজের কেবিনে চোখ টেনে আরশিতে দেখল। চোখের নীচটা টেনে টেনে দেখল। রুগ্ন পীড়িত ভাবটা কমেছে কি না দেখল। বড়-মিস্ত্রির চোখ দেখল। বড়-মিস্ত্রিকে কিঞ্চিৎ সতেজ মনে হচ্ছে।

বড়-মিস্ত্রির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল. স্যার, আমাকে আগের চাইতে সুস্থ মনে হচ্ছে না?

সুখানি বলল, মোটেই না।

বড় মিস্ত্রি বললেন, আমাদের তিনজনকেই গত রাতের চেয়ে বেশি সুস্থ মনে হচ্ছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নামবার সময় শুনল, দূরে কোথাও একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। ওদের মুখে

খড়কুটো। ওরা আসন্ন ঝড়ের আগে ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণে রত। সুখানি সিঁড়ি ধরে নামবার সময় পাখিদের মুখে খড়কুটো দেখল। স্টুয়ার্ডের চোখে, সেই পাখিদের ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণ। কেবল বড়-মিস্ত্রি শুনলেন, পাখিরা পাখায় রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বিষণ্ণ সুরে কাঁদছে।

স্টুয়ার্ড একধারে ফুলগুলি রেখে মর্লিনের মুখটা ঠিক করে দিল। তারপর গাউনটা টেনে পায়ের নীচটা পর্যন্ত ঢেকে দিল। তারপর বাসি ফুলগুলো যত্ন করে সরিয়ে দেবার সময় বলল, মনে হয় আমরা আমাদের প্রিয়জনের পরিচর্যা করছি। আমাদের এত যত্ন মর্লিন বেঁচে থাকলে পেত।

সুখানি বলল, আচ্ছা স্যার, এসব করার হেতু কী? কী দরকার এই ফুল সংগ্রহের? কী দরকার প্রতি রাতে এভাবে... আমাদের বৈজ্ঞানিক মন?

বড়-মিস্ত্রি বাধা দিয়ে বললেন, মৃতের প্রতি সম্মান জানাতে হয় সুখানি। মর্লিনকে এখন এত সুন্দর মনে হচ্ছে, যত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, ওকে আমরা এখন যত ভালভাবে দেখতে পারছি...

স্টুয়ার্ড মাঝপথেই বলে ফেলল, মর্লিন যে সত্যের জোরে বেঁচে ছিল এত দিন, মরে গিয়ে সেই সত্যকে সে আবিষ্কার করল, কী বলেন স্যার? আর সেজন্যই বোধহয় ওকে আমরা এত ভালবেসে ফেলেছি।

সুখানি বলল, কী সব বলছ পাগলের মতো!

বলে সে মর্লিনের শক্ত হাত-পাগুলিকে ঠিক করে দিল। চুলগুলি যত্ন করে গুছিয়ে দিল। তারপর টেবিলটাকে প্রদক্ষিণ করার সময় ষাঁড়-গোরু অথবা শুকরের মাংস ঝুলতে দেখে জীবন সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল। সে চেয়ারে বসে মর্লিনের পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুম যাবার ভঙ্গিতে হাত-পা টানা দিতে গিয়ে বুঝল, এই শরীর এক মলমূত্রের আধার। অথচ মর্লিনের চোখ পাথরের মতো। বড়-মিস্ত্রি মর্লিনকে নিবিষ্ট মনে দেখছেন, স্টুয়ার্ড গল্প আরম্ভ করেছে।

সে বলল, তখন আমি জাহাজের তেলয়ালা সুমিত্র।

সে বক্তৃতার কায়দায় বলল, স্যার, আপনি আছেন, নচ্ছার সুখানি আছে আর এই সম্মানীয়া অতিথি, আমাদের এই মহত্তর ঘটনার স্মৃতিমন্থনই আশা করি আমাদের সুস্থ করে তুলবে।

সুখানি বলল, তা হলে বুঝতে পারছ মাথাটা আর ঠিক নেই।

চুপ রও বেয়াদপ! তুমিই সব নষ্টের গোড়া।

বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সে কিছু বলতে পারছিল না, ওর কষ্ট হচ্ছে বলতে। সে আবেগে কাঁপছিল। সে ধীরে ধীরে বিগত জীবনে চেরি নামক এক রাজকন্যার গল্প শোনাল। তার আর চেরির গল্প। জাহাজি-জীবনের অপূর্ব এক প্রেম-ভালবাসার গল্প।

স্টুয়ার্ড গল্প শেষ করে মর্লিনের মাথার কাছে দাঁড়াল এবং ওর চোখদুটোতে চুমু খেল। বলল, আমাদের ছোট এবং স্বার্থপর ভেবো না, মর্লিন।

সারা ঘরময় সুখানি এখন কোনও মাংসের শরীর দেখতে পাচ্ছে না। দূর থেকে আগত কোনও সংগীতের ধ্বনি যেন এই ঘরে বিলম্বিত লয়ে বেজে চলেছে। সে থেকে থেকে কবিতার লাইন দুটো বার বার আবৃত্তি করল। এবং এই আবৃত্তির ভিতরেই সে এলবিকে স্মরণ করতে পারে।

ওরা তিনজন আজও ফুল রাখল মর্লিনের শরীরে। ওরা উঠে যাবার সময় কোনও বচসা করল না। ওরা কোনও সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছে যেন এমত এক চোখ-মুখ সকলের।

বন্দরে এটাই শেষ রাত ছিল। ভোরের দিকে জাহাজ নোঙর তুলবে। ওরা তিনজন প্রতিদিনের মতো বসল। প্রতিদিনের মতো বাসি ফুলগুলি মর্লিনের শরীর থেকে তুলে ভিন্ন জায়গায় রাখল।

বড়-মিস্ত্রি দু'হাত প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। সুখানি দীর্ঘসময় ধরে উপাসনার ভঙ্গিতে বসে থাকল। সে তখন চোখ বুজে একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে গল্পটা আরম্ভ করতে চাইছে।

সুখানি বড়-মিস্ত্রিকে উদ্দেশ করে বলল, তখন স্যার আমার নাম ছিল বিজন। তখন আমি সুখানি হইনি।

বলে গল্পটার ভূমিকা করল।

তারপর আস্তে আস্তে বিজন এক অব্যক্ত বেদনার গল্প শোনাল। জাহাজের বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে শুনল বিজনের গল্প। এক সময় বিজন গল্প শেষ করে অবসন্ন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সে তখন মর্লিনের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে। সে যেন এই কপালের কোথাও কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

বড়-মিস্ত্রি এত অভিভূত যে, গল্প শেষ হবার পরও তিনি কিছু সময় ধরে বিজনের মুখ দেখলেন। তিনি বিজনকে মর্লিনের কপালে নুয়ে পড়তে দেখে বললেন, কী দেখছ সুখানি?

সুখানি বড়-মিস্ত্রির কাছে এল এবং বলল, Peace is on her forehead। Peaceকে অন্বেষণ করছি স্যার। মর্লিন সারাজীবন ঝড়ের নৌকা বেয়ে এখন গভীর সমুদ্রে বৈতরণী পার হচ্ছে।

এইটুকু বলে বিজন পুনরায় এলবির সেই কবিতাটি একটু অন্যভাবে আবৃত্তি করল—

> She had dropped the sword and
> dropped the bow and the arrow; peace
> was on her forehead, and she had
> left the fruits of her life behind herself
> on the day she marched back again to
> her master's hall.

জাহাজ ছাড়বার সময় ওরা তিনজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল। শীতের প্রকোপ কমে গেছে। সুখানি, স্টুয়ার্ড এবং অন্যান্য সকল জাহাজিরাই বন্দর থেকে চোখ তুলে নিল। বন্দর ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বন্দরের আলো ঘর বাতি সবই একে একে সমুদ্রের ওপাশে হারিয়ে গেল। আবার ওরা, সকল জাহাজিরা, দীর্ঘ দিন এই সমুদ্রে রাত যাপন করবে। ওবা বন্দরের জন্য আকুল হবে ফের। এবং মাটির স্পর্শের জন্য হবে ভয়ংকর উদ্বিগ্ন।

বড়-মিস্ত্রি ডেক ধরে হেঁটে ডেক-কশপের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমাকে কিছু তক্তা দাও কশপ। কবাত, হাতুড়ি, বাটালি দাও। কিছু পেরেক লাগবে। সব আমার ঘরে রেখে এসো।

বড-মিস্ত্রি এবং স্টুয়ার্ডের কোনও ওয়াচ ভাগ নেই বলে ওরা খুশিমতো নীচে নেমে যেত। ওরা সন্তর্পণে সকলের আড়ালে সেই কাঠ, পেরেক নীচে নিয়ে গেল। বড়-মিস্ত্রি কানে পেনসিল গুঁজে সেই প্রায-অন্ধকার রসদ-ঘরে কাজ করতেন। তক্তাগুলোকে পালিশ করে উজ্জ্বল করে তুলতেন মাঝে মাঝে. ওরা গান করত নীচে। দুঃখ এবং বেদনায় সেই গান সমুজ্জ্বল। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের ঘর অথবা স্ত্রী-পুত্রদের কথা বলত। ওরা বলত, আমরা যথার্থই মানুষ, ঈশ্বর!

বড-মিস্ত্রি বলতেন, আমার বড় ছেলেটা জলে ডুবে মারা গেল! দুঃখ আমার অনেক স্টুয়ার্ড।

স্টুযার্ড বলত, কী আশ্চর্য স্যার, আমরা মর্লিনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি দেখুন।

সুখানি এসব কথায় থাকত না, সে চুপচাপ একটু ফাঁক পেলেই রসদ-ঘর অতিক্রম কবে বরফ-ঘরে ঢুকে যেত। মাঝে মাঝে বলত, দেখেছেন স্যার, মর্লিন অবিকৃতই আছে। মনে হয় মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে।

বড-মিস্ত্রি বললেন, কফিনে কিছু কারুকার্য করলে ভাল হত।

স্টুযার্ড বলল, স্যার. ধর্মযাজকদের কাজটুকু কে করবে?

সুখানি বলল, কেন? আমরাই করব। পৃথিবীতে আমরা তিনজন বাদে মর্লিনকে আর কে এত ভালবেসেছে। এই জাহাজে কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। মর্লিনকে জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগ দিয়েছি। ধর্মযাজকের কাজ আমরাই করব। আমরা তিনজন ওর শববাহক হব। আমরা তিনজন ওর পরম আত্মীয় এবং আমরা তিনজনই ওর ধর্মযাজক।

সুখানি কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাগুলি উচ্চারণ করল। তারপর গজকাঠি দিয়ে কফিনের মাপ দেখে বলল, ইচ্ছে হচ্ছে এই কফিনের পাশে একটু জায়গা নিয়ে শুয়ে থাকি। আর উঠব না। সব সুখ-দুঃখ প্রিয় মর্লিনের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাক।

রাতে বড়-মিস্ত্রি বললেন, আমার কাজ শেষ। এসো, এখন আমরা ওকে কফিনের ভিতর পুরে দি।

সুখানি অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল, স্যার, আজ থাক। আসুন, আজও আমরা গোল হয়ে বসি।

মর্লিনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা বড় নিঃসঙ্গ মনে হবে। জাহাজটা বড় অসহায় লাগবে।

এই সব কথার সঙ্গে এত দ্রুত কান্নার আবেগ উথলে উঠল সুখানির গলাতে।— ঘরে আমার স্যার কেউ নেই। এলবিকে পরিত্যাগ করে আর কোথাও নোঙর ফেলতে পারিনি। প্রিয় মর্লিন আমাকে একটু আশ্রয় দিয়েছিল যেন। স্যার, ওকে এত তাড়াতাড়ি ফেলে দেবেন।

বড়-মিস্ত্রি বললেন, আমারও ভাল লাগছে না হে।

স্টুয়ার্ড বলল, আজকে থাক। কালই ওকে গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

পরদিন ওরা তিনজন যখন রাত গভীর, জাহাজিরা কোথাও কেউ জেগে নেই, শুধু ওয়াচের জাহাজিরা ইঞ্জিন-রুমে এবং ব্রিজে পাহারা দিচ্ছে, যখন সমুদ্র শান্ত, যখন আকাশে অজস্র তারা জ্বলছিল এবং দূরে কোথাও কোনও তিমি মাছের দল ভেসে যাচ্ছে অথবা ডলফিনের ঝাঁক এবং এক কাক-জ্যোৎস্না নীল জলের উপর, জাহাজটা রাজহাঁসের মতো সাঁতার কাটছে, তখন শববাহী দলটি গ্যাংওয়েতে কফিন রেখে সব বাসি ফুলগুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। ওরা মর্লিনের জুতো এবং গাউন নিক্ষেপ করল, তারপর হাতের দস্তানা। ওরা এসব ফেলে দেবার সময়ই কাঁদছিল। ওরা কাঁদছিল। তিনজন নাবিকের চোখ থেকে জল কফিনের উপর পড়েছিল। সমুদ্র এবং বন্দর যাদের ঘর এবং এইসব বেশ্যামেয়েরা যাদের ঘরণী সেই সব রমণীদের উদ্দেশে তিনজন নাবিক যেন চোখের জল ফেলছিল। ওরা পরস্পর দুঃখে এতই কাতর, ওরা এত ব্যথিত, ওরা কান্নার আবেগ সামলানোর জন্য রুমাল ঠেলে দিচ্ছিল মুখে। ওরা প্রিয় মর্লিনের কফিন কাঁধে তুলে ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে ফেলে দেখল, আস্তে আস্তে প্রিয় মর্লিন জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে। ওরা তখন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নার আবেগে এলবির উচ্চারিত সেই কবিতাটিই আবৃত্তি করল—

"When the warriors came out first from
their master's hall, where had they hid
their power? Where were their armour
and their arms?
They looked poor and helpless, and
the arrows were showered upon them
on the day they came out from their
master's hall.
When the warriors marched back
again to their master's hall where did
they hide their power?.
They had dropped the sword and
dropped the bow and the arrow; peace
was on their foreheads, and they had
left the fruits of their life behind them
on the day they marched back again
to their master's hall."

সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ

আশঙ্কা সত্যি হলে যা হয়, সবাই মুষড়ে পড়ল। সবাই বলতে ডিনা ব্যাংকের সব জাহাজিরা।

এস এম ডিনা ব্যাংক। ব্যাংক-লাইনের লজ্‌ঝড়ে জাহাজ। জাহাজটার অপবাদেরও শেষ নেই। নানা গুজব। ফলে নানা অশুভ আতঙ্ক জাহাজিদের মনে ওড়াওড়ি করতেই পারে। কলকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়লেই শোরগোল, এসে গেছে! মাস্তারে কেউ দাঁড়ায় না। জাহাজটা শয়তান, মাথা খারাপ, কোথায় কোন সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে থাকবে কেউ বলতে পারে না। তখন কাপ্তান, চিফ অফিসার, রেডিয়ো অফিসার পর্যন্ত বেকুফ। সবই তো ঠিক আছে, চার্ট, কোর্স-লে, কম্পাসের কাঁটা, তবু এত বড় গোলমাল! মাথায় হাত।

সেই জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। কোথায় কোন অজানা সমুদ্রে যাচ্ছে জাহাজিরা ঠিক জানে না। মাটি টানার কাজে জাহাজটা কোন সমুদ্রে যাবে তারা সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না।

আশা ছিল, তারা এবার দেশে ফিরতে পারবে। বিশ-বাইশ মাসের সফর, খুবই লম্বা সফর, জাহাজ দেশে ফিরে যাবারই কথা। অথচ কী যে হল, জাহাজ আবার মাটি টানার কাজ নিয়ে বসল। মন খারাপ হতেই পারে।

সুহাস পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে খবরটা পেল। ইদানীং চার্লিকে নিয়ে, জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই সে জেটিতে নেমে যায়। চার্লিকে নিয়ে পিকাকোরা পার্কে বেড়াতে গেছে, ফিরতে একটু রাতই হয়েছে, জাহাজে উঠেই খবরটা শুনে সেও বেশ দমে গেল।

আসলে চার্লির যে কী হয়েছে সে ঠিক বোঝে না। এক দণ্ড তার কাছ-ছাড়া হতে চায় না। চার-পাঁচ মাস ধরেই সে এটা লক্ষ করছে। চার্লির তাড়াতেই তাকে বের হতে হয়।

একসময় তো চার্লি ছিল দুরন্ত এবং খুবই চঞ্চল। ইদানীং চার্লি এত শান্ত স্বভাবেরই বা হয়ে যাচ্ছে কেন, সুহাস ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। খুবই অনুগত তার। বিশ-বাইশ মাসে চার্লি জাহাজেই অনেক লম্বা হয়ে গেছে। কাপ্তানের পুত্র চার্লিকে বালকই বলা চলে। সুহাসও জাহাজে উঠে এসেছে, দাড়ি-গোঁফের আভাস ফুটে ওঠার মুখে। চার্লির সঙ্গে বন্ধুত্ব, খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায় সমবয়সি ছেলেটি তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেই পারে।

জাহাজে একসঙ্গে থাকার ফলে চার্লির কিছু বাজে স্বভাবও গড়ে উঠেছে। যখন-তখন তাকে দাঁড়াতে বলবে। চার্লি কতটা লম্বা হয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে মাপবে। দাঁড়াতে বললে না দাঁড়িয়েও উপায় থাকে না। শত হলেও কাপ্তানের পুত্র। আগে ছিল এক ধরনের উপদ্রব, এখন আর-এক ধরনের। সবই সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। পিকাকোরা পার্কে এক-দু'দিন যাওয়া যায়, তাই বলে রোজ রোজ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কার ভাল লাগে। কিন্তু চার্লি নাছোড়বান্দা। কত রকমের বুনো ফুলের নাম যে সে জানে। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজে দেখার বাতিক। সঙ্গে না গিয়েও উপায় থাকে না। বারবার বুঝিয়েছে, দ্যাখো চার্লি, আমি একজন সামান্য নাবিক, তোমার এটা উচিত কাজ হচ্ছে না। তার উপর জাহাজে নেটিভদের খুব যে ভাল চোখে দেখা হয় না, তাও বুঝতে চেষ্টা করো। অফিসার-ইঞ্জিনিয়ারদের চোখে লাগতেই পারে। তোমার বাবা পছন্দ না-ও করতে পারে।

কে শোনে কার কথা।

দেখা মাত্র চিৎকার, হাই।

সে হাই করতে পারে না। খুব সতর্ক পায়ে হেঁটে যাবার স্বভাব সুহাসের।

ইঞ্জিন-সারেংও বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, বাপু, তোমার বয়েসটা ভাল না। কেন যে মরতে এলে জাহাজে!

তিন নম্বর সুখানি মুখার্জিদা তো চটে লাল।

আবার গেলি? মরবি বলে দিলাম। বড়লোকের বাচ্চা বাঁদর হয় জানিস? ডাকলেই যেতে হবে। কোথায় যাস? কিছু বলে যাস না!

তা তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারেন। ভাল করে দাড়ি-গোঁফ না গজাতেই জাহাজে উঠে এলে তো ভয়ের। নাবালক না হোক, সাবালক হয়ে গেছে বলেই কি সবাইকে অগ্রাহ্য করা যায়! নতুন সফর, জাহাজ তো ভাল জায়গা না, কিনার আরও খারাপ জায়গা। চার্লির সঙ্গে সুহাসের মেলামেশার ব্যাপারে তারা আগে বেশ ত্রাসে পড়ে যেতেন। ইদানীং আর যেন তাঁরাও কিছু মনে করেন না। কাপ্তানেরও সায় থাকতে পারে। সে যাই হোক, জাহাজ অজানা সমুদ্রে যাচ্ছে শুনে চার্লিও কেমন যেন বিপাকে পড়ে গেল।

ইঞ্জিন-সারেং কলকাতার ঘাটে জাহাজে ওঠার সময় বারবার বলেছেন, দ্যাখ পারবি তো! শেষে কোথাও ভেগে যাবি না তো?

সে বলেছে, পারবে। বলেছে, কোথাও ভেগে যাবার তার ইচ্ছে নেই। তার মাসোহারা পেলে বাবা-মা ভাই-বোনদের অন্নজলের সংস্থান হবে। এবং সে যে কাজকর্ম ভালই পারছে সারেং সাবের বুঝতে সময় লাগেনি। বিশ-বাইশ মাসে সারেং সাব তো ভালই টের পেয়েছেন। তাকে না হলে তো এখন ফাইভারের এক দণ্ড চলে না। উইনচ মেরামতে সে ওস্তাদ হয়ে গেছে।

আজ পিকাকোরা পার্ক থেকে ফেরার সময়ই সুহাস কেমন যেন বিপদের সংকেত পেয়েছিল। সিম্যান মিশন থেকে কিছুটা এগোলেই জেটি। পরপর চার-পাঁচটা জাহাজ ভিড়ে আছে। জেটির আলো বেশ ম্রিয়মাণ। চিমনির রং দেখে কোন কোম্পানির জাহাজ চিনতে অসুবিধা হয় না। সে আর চার্লি পাশাপাশি হাঁটছিল। ছায়া তাদের ক্রমে লম্বা হয়ে আবার কখনও খাটো হয়ে কখনও মিলিয়ে যাচ্ছিল। চার্লির মন ভাল নেই। কী দেখে চার্লি এতটা ত্রাসে পড়ে গেছে সে বুঝতে পারছে না।

সে তো তেমন কিছু দ্যাখেনি! অথচ চার্লির আর্ত চিৎকারে সে পিকাকোরা পার্কে কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেছিল। চার্লির যে মাঝে মাঝে কী হয়।

গোটা জেটি খাঁ খাঁ করছে। ডিনা ব্যাংক একটা বিশাল তিমি মাছের মতো ভেসে আছে জেটির পাশে। জাহাজটার দীর্ঘশ্বাসও যেন সুহাস শুনতে পেয়েছে। মাল টেনে টেনে আর পারছে না। ক্লান্ত। জেটিতে পড়ে থেকে যেন হাঁসফাঁস করছে। তার এত গা ঘেঁষে হাঁটছিল যে মনে হয় সেই অদৃশ্য আতঙ্ক চার্লিকে তখনও অনুসরণ করছে। তারা কেউ কোনও কথা বলতে পারছিল না। জাহাজের সিঁড়ির কাছে প্রায় তারা দৌড়ে গেছে। জাহাজে উঠে হাঁপাচ্ছিল চার্লি।

অবশ্য আর্ত চিৎকারে সুহাস লক্ষ করেছিল, দূরে গাছের আড়ালে একটা ছায়া অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন পিকাকোরা পার্কে ভ্রমণার্থীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও জটলা, কোথাও ছবি তোলার হিড়িক। বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব মহীরুহ। যত্রতত্র আলোর ভিতর জঙ্গলে মায়া-কাননের আভাস। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে কিছুটা ছিল অন্যমনস্ক।

কী হল? কী হল চার্লি? পালাচ্ছ কেন?

দেখছ না! দেখতে পেলে না। লোকটা ফের আমাদের পিছু নিয়েছে।

আরে, কত লোক বেড়াতে আসে। আড়াল থেকে আমাদের অনুসরণ করার কী আছে বুঝি না।

তুমি বুঝবে না সুহাস। তোমাকে বলেও লাভ নেই। চলো উঠি।

প্রায় তার হাত টেনে বন-জঙ্গলের ভিতর ছুটতে চেয়েছিল চার্লি।

সুহাস না বলে পারেনি, কেউ আমাদের অনুসরণ করছে ভাবছ?

জানি না। যাবে, না দাঁড়িয়ে থাকবে?

এই তোমার মন্দ স্বভাব চার্লি। মাথায় কিছু ঢুকলেই হল। আরে, এখানে কে আমাদের অনুসরণ করতে পারে? আমরা বেড়াতে আসি। আমাদের কাছে গুচ্ছের টাকাপয়সাও নেই, আর লোক পেল না তোমাকে অনুসরণ করছে!

জানো, লোকটার লম্বা গোঁফ-দাড়ি বাবরি চুল, আর পাথরের মতো হিমশীতল মুখ। দূর থেকে আবছা মতো, তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

কচু ঘুরছে!

সুহাস ফের বলেছিল, গোঁফ থাকলে, পাকা বাবরি চুল থাকলে বুঝি বেড়াবার শখ থাকে না!

সুহাস!— সেই এক আর্ত চোখ চার্লির। সুহাস কেন যে আর না উঠে পারেনি!

চার্লি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল সুহাসের কথা শুনে। সে ঠিক বুঝিয়ে বলতেও পারছে না। সুহাস তাকে পাত্তা দিতে না-ই পারে। সুহাস জানেই না, এই লোকটাই পার্ল হারবারে, পোর্ট অফ সালফার-এ তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করছে। শরীর দেখা যায় না। শুধু কোনও কিছুর আড়ালে মুখটা বের করে রাখে। আগে সে এতটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পরপর তিনবার তিন বন্দরে লোকটাকে সে আবছা অন্ধকারে লক্ষ করেছে যেন। চকিতে মুখটা ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেছে।

কৌরি-পাইন গাছ এত দীর্ঘজীবী হয় আগে সুহাস জানত না। এই দুর্লভ গাছ দেখার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটকও আসে। তাদের কেউ হতে পারে। তারাও এই গাছ দেখার লোভে পিকাকোরা পার্কে আসে। তা ছাড়া বিশ-বাইশ দিন হল তাদের জাহাজ নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে নোঙর ফেলেছে।

সালফার বোঝাই জাহাজ খালি করতে সময় একটু বেশি লাগে। সালফারের উগ্র ঝাঁজে নাক-চোখ জ্বালা করত। সারা ডেকময় সালফার উড়েছে। প্রায় কুয়াশার মতো বাতাসে ঝুলে থাকত সালফারের গুড়ো। এজন্যও চার্লি সুহাসকে নিয়ে কিনারায় নেমে যেত। কাজ-কাম শেষ হলেই চার্লি সুহাসকে নিয়ে কিনারায় নেমে যাবার জন্য ছটফট করত।

সব সাফসোফ করে জাহাজ তকতকে এখন। আবার নোঙর তোলার সময়, যে-কোনওদিন ২৪ ঘণ্টার ফ্ল্যাগ উড়তে পারে। জাহাজ কোথায় ভেসে পড়বে কেউ জানে না। কাপ্তানও না। এজেন্ট-অফিস থেকেই নোটিশ আসবে, সুতরাং জাহাজ কোথায় যাবে কাপ্তান না-ই জানতে পারেন। জানতে পারলে চার্লিই খবরটা আগে পেত। সে দু'-একবার যে চার্লিকে বলেনি তাও নয়। চার্লির সাফ কথা, সে কিছুই জানে না। সারেং থেকে কোলবয়, সবাই সুহাসকে ধরত। তাদের ধারণা, চার্লির সঙ্গে যখন এত ভাব, তখন সে-ই সবার আগে খবরটা দিতে পারবে। কারণ সবারই ওই এক আতঙ্ক, জাহাজটাকে কোম্পানি না আবার দক্ষিণ-সমুদ্রেই ফেলে রাখে।

দক্ষিণ-সমুদ্রে ফেলে রাখলে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কেন যে এত স্বস্তি পায়, সুহাস ঠিক ভাল জানে না, উড়ো খবর যে কিছু তার কাছে না আছে তা নয়, জাহাজটার অশুভ প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যই দক্ষিণ-সমুদ্রে ফেলে রাখা। সুহাসের তখন হাসি পেত। জাহাজের আবার কোনও অশুভ প্রভাব থাকে সে বিশ্বাস করতে পারত না। গুজব আসলে। গুজবে সে কান দেয়নি— এই যে গুজব, জাহাজটাকে কিছুতেই হোমের দিকে উঠতে দেবে না, দক্ষিণ-সমুদ্রেই ফেলে রাখা হবে, যে-কোনও উপায়ে, মাটি টানার কাজ তা-ই সই। ফসফেট বোঝাই করে অস্ট্রেলিয়ার নানা বন্দরে খালাস করার কাজ, সেটা ক'মাসের জন্য তাও সে ঠিক জানে না। সিঁড়ি ভেঙে জাহাজে ওঠার মুখে সুখানিই খবরটা দিয়েছে।

কে বাপজান? সুহাস!

চার্লি তার সঙ্গে। চার্লিকে দেখে সুখানি উঠে দাঁড়িয়েছে। সালাম জানিয়েছে। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, আল্লা মেহেরবান। জাহাজ মাটি টানতে যাচ্ছে। হয়ে গেল।

কেমন হতাশ গলায় সুখানি আমজাদ কথাটা বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

চার্লি এদের কথা বুঝতে পারে না। সে সুহাসের দিকে তাকিয়ে আছে। কী বলছে সুখানি। জাহাজের কি কোনও খারাপ খবর আছে? সুখানির মুখে কেমন আতঙ্ক, চার্লিও টের পেয়েছিল।

টের পেতেই পারে। চার্লিও ভাল নেই। চার্লি গুম মেরে আছে সেই কখন থেকে। চার্লি আগেও গুম মেরে যেত। পার্ল হারবারে, পোর্ট অফ সালফারে সে তা লক্ষ করেছে। কিন্তু তাকে কখনও বলেনি, দ্যাখো দ্যাখো, ওই দ্যাখো। তারপর চার্লির কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন ঠেকছিল।

কৌরি-পাইনের ছায়ায় তারা বসে। সেই হাজার হাজার বছর আগের কোনও সভ্যতার কথা ভাবা,

যেমন তিন-চার হাজার বছর আগেকার গাছ হলে মনে তো হবেই, তখন কুন্তী-দময়ন্তী-মন্দোদরীরা যুবতী ছিল, তখনকার সেই সব মানুষ, রথ, ঘোড়া, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, সত্যবতীর কথাও মনে হত। প্রাচীন গাছের বয়সের সঙ্গে তার নিজের দেশের কথা মনে হত, গাছটা তখন চারাগাছ, এবং কোনও নদীতে ধীবরের নৌকায় সম্রাটের উপগত হবার বাসনা জাগছে এসব মনে হত তার। কারণ এই গাছ যেন রামায়ণ-মহাভারতের সময়কার গাছ। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে থাকার মধ্যেও মজা। সে গাছগুলির কাণ্ডে হাত বুলিয়ে দিত, গাছগুলোর এত বয়স হয় কী করে এমনও মনে হত, তবে যা বিশাল, আর এই মহীরুহ এত ডালপালা মেলে এগমন্ট পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে যে অবিশ্বাসও করতে পারত না।

গাছের বয়স কীভাবে নিরূপণ করা যায় তাও সে জানে না। অবিশ্বাস করবে কীসের ভিত্তিতে। এক-একটা শেকড় তিমি মাছের পিঠের মতো উঁচু হয়ে আছে। গাছের কাণ্ডে প্লেট ঝোলানো, গাছ একটা প্রাণ, সেখানেই সে এটা টের পেয়েছিল। নিউজিল্যান্ডারদের গাছের প্রতি বোধহয় মায়া-মমতা একটু বেশি। কী যত্ন গাছের! পিকাকোরা পার্কের কৃত্রিম খালে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চার্লির সঙ্গে গাছের নীচে বসে থাকা ছিল অধিক মনোরম। চার্লিও চুপচাপ বসে থাকত। কখনও সে তার দেশ-বাড়ির গল্প করত। তাদের বাড়িটার পাশে যে নানা বুনো ফুল ফুটে থাকে তাও সে বলত। অথচ আজ চার্লি লোকটাকে দেখার পরই বলেছে, জাহাজে চলো সুহাস। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

পিকাকোরা পার্কে তারা রোজই বেড়াতে যায়। কাজ-কাম হয়ে গেলে ছুটি। জাহাজ বন্দর ধরলে, কাম-কাজের চাপও কম থাকে। সমুদ্রেই মেরামতির কাজগুলো সেরে ফেলতে হয়। বিশেষ করে উইনচ-মেশিন, জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই উইনচগুলির উপর বেশি চাপ পড়ে। পুরনো জাহাজ, আর তার উইনচ-মেশিন কতটা ভাল হতে পারে! ঝড়ের সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে পড়লে নোনাজলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডেক, স্টিম-পাইপ থেকে স্ট্যাপার নোনা জলে ক্ষতবিক্ষত। নাট-বল্টু জ্যাম হয়ে থাকে। কাজেই উইনচে মেরামতির কাজ সারা সফর লেগেই থাকে, এই কাজটা করে করে এত হাত পেকে গেছে যে সে নিজেও ইচ্ছে করলে একাই পারে উইনচ মেরামতির কাজ সামলাতে। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে শুধু দেখা, কোনও মেশিন গড়বড় করছে কি না। এবারে তার কপাল ভালই বলতে হবে, ডেরিকে মাল নামানোর সময় একটা উইনচও গড়বড় করেনি। সে কাজ থেকে বেশ তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে যেত। আর সব লক্ষ রাখত চার্লি? কাজ শেষ হলেই সে হাজির। তার তাড়াতেই স্নানটান সেরে সেজেগুজে বের হয়ে যেত। বেশ শীত, সকালের দিকে কখনও কুয়াশা থাকে। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার এবং পাহাড়ি শহরটার নানা উপত্যকায় যেমন কাঠের লাল নীল রঙের বাড়ি আছে, তেমনি আছে অজস্র আপেলের বাগান। তারা কখনও পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হয়ে আপেল বাগানেও গিয়ে বসে থাকত।

সুহাস দেখল, চার্লি দাঁড়িয়েই আছে। যাচ্ছে না। সুখানির মুখ ব্যাজার। কী কারণ মুখ ব্যাজার করে থাকার! সে অগত্যা বলল, জাহাজ দক্ষিণ-সমুদ্রেই শেষে মাটি টানার কাজ নিল। কালই জাহাজ ছাড়ছে।

চার্লি যেন অন্য কোনও দুঃসংবাদের আশা করেছিল। হোমে ফেরার জন্য চার্লি যে উদ্গ্রীব হয়ে নেই বোঝা যায়। তার তো বাবা ছাড়া কেউ নেই। সে জাহাজে ভেসে বেড়ালেও যা, হোমে ফিরলেও তাই। জাহাজটাকে দক্ষিণ-সমুদ্রে ফেলে রাখা হবে, এতে এত বিচলিত হবার কী আছে চার্লি বুঝতে পারছে না। অথবা এও হতে পারে, সেই ত্রাস তাকে তাড়া করছে, দ্যাখো দ্যাখো সুহাস। সে তো দেখেছে, তিমি মাছের মতো উঁচু ঢিবির আড়ালে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

চার্লির কেবিন ঠিক অ্যাকোমডেশন-ল্যাডারের নীচে। ব্রিজে ওঠার মুখে উইংস-এর তলায়। পরপর দুটো কেবিন, একটায় সে থাকে। পাশেরটায় তার বাবা বুড়ো কাপ্তান মিলার থাকেন। তিনি হয়তো ব্রিজ থেকেই দেখেছেন, চার্লি ফিরছে। সঙ্গে সেই ভারতীয় নাবিকটি। প্রায় তারা সমবয়সি বলে তিনি তার সঙ্গে চার্লির ঘোরাফেরা মেনে নিয়েছেন। তাকে তিনি মাঝে মাঝে লক্ষও করেন, কিংবা সারেং সাবই হয়তো বলেছে, ছেলেমানুষ সাব, চার্লির সঙ্গে না আবার মারামারি শুরু হয়ে যায়!

চার্লি নিজেও তো সুবোধ বালক নয়। যখন-তখন এর ওর পেছনে লাগার স্বভাব। যদি কিছু হয়ে যায়, নিজগুণে ছেলেটাকে ক্ষমা করে দেবেন।

চার্লি যাচ্ছে না দেখে সুহাস বলল, যাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? মনে হয় তোমার বাবা উপরে অপেক্ষা করছেন।

চার্লি ইতস্তত করছিল, তারপর কী ভেবে সুহাসের দিকে তাকাল। শেষে বলল, কেবিনে পৌঁছে দাও সুহাস।

আরে, বলছে কী!

পোর্ট-সাইড ধরে কয়েক গজ গেলে অফিসার্স গ্যালি। গ্যালির মুখেই এলিওয়ে। ওতে ঢুকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেই চার্লির কেবিন। এটুকু রাস্তা একা যেতে ভয় পাচ্ছে চার্লি! এমন কী হল! এর আগেও দু'-একবার যে চার্লিকে কেবিনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়নি তা নয়। যেমন পার্লহারবারে এবং লস এঞ্জেলসেও চার্লিকে দু'-একবার পৌঁছে দিয়েছে। অবশ্য তখন চার্লি তাকে কখনও বলেনি, লোকটা আমার পিছু নিয়েছে। মরতে একটা লোক চার্লির পিছনে লাগবে কেন? চার্লি তো কারও পাকা ধানে মই দেয়নি! অবশ্য জাহাজে উঠে চার্লি তাকে বিপাকে ফেলার যে চেষ্টা করেনি তাও নয়। উইনচের গোড়ায় তেলজুট রেখে সে কাজে ঝুঁকে পড়েছে, আর তখনই দেখেছে, তার যে সামান দরকার সেটাই টবে নেই। হাতুড়ি-বাটালি উধাও। আরে, গেল কোথায়! হারালে কশপ তার মাথা ভাঙবে। সে হন্যে হয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে চার্লি তার দিকে তাকিয়ে মজা উপভোগ করছে। চার্লির সঙ্গে তখন তার কথা বলারই সাহস ছিল না, অথচ গায়ে পড়ে ভাব। ছেলেটা তার এটা-ওটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলছে। চার্লি অবশ্য পরে বলত, তুমি আমাকে দেখলে পালাও কেন বলো তো?

পালাত কী আর সাধে! ইঞ্জিন-সারেং পই পই করে বলেছেন, সাবধান, কাপ্তানের ব্যাটার পাল্লায় পড়ে যাস না। জান খতরা করে দেবে।

তা যে পারে, জাহাজে উঠেই টের পেয়েছিল। জাহাজেই যেন চার্লি লম্বা হয়ে গেল। বড় হয়ে গেল। অনায়াসে বোট-ডেক থেকে দড়িদড়ায় ঝুলে ফলকায় লাফিয়ে নেমে যেত চার্লি। অনায়াসে দক্ষ জাহাজির মতো দড়িদড়ায় ঝুলে মাস্তুলের ডগায় উঠে যেতে পারত। একবার তো দড়িদড়ায় ঝুলে পলকে তার কাঁধে পা রেখে উড়ে গেল সামনে। তারপর রেলিং টপকে কোথায় যে পালাল! চার্লির উপর রাগ করতেও পারে না। সামান্য জাহাজির কোনও রাগ-অভিমান থাকলে চলবে কেন? তাই যতটা পারত এড়িয়ে চলত। ঝড়ের সমুদ্রে একদিন তো দেখল হিবিং লাইনের উপর দিয়ে তারের খেলা দেখাবার মতো হেঁটে যাচ্ছে। তাকে দেখলেই সাপের পাঁচ পা যেন দেখে চার্লি। মাস্তুলের ডগায় উঠে ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে। যেন এসব দেখিয়ে চার্লি বাহবা পেতে চাইত। কিন্তু সুহাস সাড়া দিতে পারত না। সামান্য একজন জাহাজির পক্ষে চার্লিকে বাহবা দিলেও অপমান করা হতে পারে। সেই চার্লি ইদানীং এত শান্ত স্বভাবের হয়ে যায় কী করে সুহাস বুঝতে পারে না।

চার্লি প্রায়ই এখন বোট-ডেকে অবসর সময়ে হয় আপনমনে ইজেলে ছবি আঁকে, নয় ডেক-চেয়ারে বসে বই পড়ে। কখনও এত গম্ভীর হয়ে যায় যে সুহাস কাছে ভিড়তেই সাহস পায় না।

কখনও তার মনে হয় দুরন্ত ছেলেটা চোখের সামনে কত দ্রুত নির্জীব হয়ে গেল! তার আফসোস, এই তো সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে গেলেই চার্লির কেবিন, রাতও খুব একটা বেশি হয়নি, তা ছাড়া জাহাজে উঠে আসার পর তো কোনও ভয় থাকারও কথা না। অথচ কেবিনের দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে না দিলে সে যেতে পারছে না। এখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ধুস, ভাল লাগে!

অগত্যা সুহাস আর কী করে। ভাবল কেবিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সে পিছিলে চলে যাবে।

তারপরই সে টের পেল, ডেকে একমাত্র সুখানি ছাড়া আর কেউ নেই। জাহাজিরা যে যার মতো ফোকশালে ঘাপটি মেরে আছে। একজনও উপরে নেই। জাহাজ মাটি টানার কাজে যাচ্ছে বলে যেন গোটা জাহাজটার মাথায় বাজ পড়েছে।

সুহাস কিছুটা বিচলিত গলায় বলল, সুখানি সাব, আমরা তো দক্ষিণ-সমুদ্রেই আছি।

সুখানি সাব কেমন ক্ষোভের গলায় বললেন, আরে বাপজান, দক্ষিণ-সমুদ্র কি এতটুকুনি জায়গা? পুকুর ডোবা! দুনিয়ার কোনা-খামচিতে কত কিসিমের দরিয়া ঘাপটি মেরে আছে তার খবর রাখো?

সে সত্যি খবর রাখে না। জাহাজের পয়লা সফরে এত খবর রাখাও যায় না, জায়গায় জায়গায়

সমুদ্রের নানা কিসিমের নাম! নাম না-জানা থাকলে অজানা সমুদ্র হয়ে যায়। অবশ্য জাহাজিদেরও এই আশঙ্কা ছিল, জাহাজ দেশে না ফিরে মাটি টানার কাজে লেগে যেতে পারে। মাটি টানার কাজ থেকে নিষ্কৃতি কবে মিলবে তাও কেউ জানে না। ইচ্ছে করলেই বিদ্রোহ করা যায় না। জাহাজে সাইন করার পর, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কাপ্তানের মর্জি, কোম্পানির মর্জি। কোম্পানি ইচ্ছে করলে সব পারে, সমুদ্রে ফেলে রাখতে পারে, দেশে ফিরিয়ে নিতে পারে। জোর-জুলুম করবে! করলেই সি ডি সি চৌপাট, লাল দাগ পড়ে যাবে। ব্যাংক-লাইনের জাহাজ তো মিলবেই না, অন্য কোম্পানিগুলিও সি ডি সি দেখলে আঁতকে উঠবে। হুজ্জোতি করে জাহাজ থেকে নেমে গেছে, আর কেউ নেয়। যা পরিস্থিতি, জাহাজ এমনিতেই পাওয়া কঠিন, দেশে ফিরলে পাঁচ-সাত মাস লেগে যায় ফের জাহাজ পেতে। জাহাজে বিদ্রোহ করলে রক্ষা আছে! মেজাজ যে ভাল নেই কারও, ডেক খালি দেখেই সুহাস টের পেল। চার্লিও গ্যাংওয়ে থেকে নড়ছে না। তাকে কেবিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে কিছুতেই যাবে না! কী যে বিপাকে পড়া গেল! সে খেপে গিয়ে বলল, আরে, কেবল দক্ষিণ-সমুদ্র বলছেন, সেটা কোথায় জানেন না! জাহাজে সফর করতে করতে চুল পেকে গেল!— কেমন অধৈর্য হয়ে পড়েছে সুহাস।

নেরুদ্বীপে জাহাজ যাচ্ছে।

সুহাস কোথায় কোন সমুদ্রে নেরুদ্বীপ জানে না। সেখানে যেতে কতদিন লাগবে তাও জানে না। জাহাজিরা দেশে ফেরার জন্য আকুল। নিজের অভিজ্ঞতায় সে তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে। তবে জাহাজে চার্লি থাকায় তার সময় কেটে যায়। খুবই দরাজ দিল। মুখ ব্যাজার করে রাখলে এখনও চার্লি তাকে নানা মজার খেলা দেখায়। তার সঙ্গে কিনারায় যেতে না চাইলে, মাস্তুলের ডগায় উঠে ভয় দেখায়, দেব ঝাঁপ!

সে ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেবার অঙ্গভঙ্গি করে। এটা চার্লির কাছে খেলা হতে পারে, তবে তার কাছে এটা কোনও জীবন-সংশয়ের ব্যাপার মনে হয়। অগত্যা বলতেই হয় চিৎকার করে, ঠিক আছে, যাব! তোমার সঙ্গেই কিনারায় নামব। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো নেমে এসো তো।

চার্লিও টের পায় তার জন্য সুহাসের টান গড়ে উঠেছে। সে নেমে এলে সত্যি দেখতে পায় ফলকায় বসে সুহাস সমুদ্র দেখছে। সমুদ্র আর তার অনন্ত জলরাশি সুহাসকে কেমন অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।

চার্লির দুষ্টুমি তখন, গার্লফ্রেন্ডের জন্য মন খারাপ?

আমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই চার্লি।

সত্যি বলছ?

সত্যি। তোমাকে মিথ্যা কথা বলে আমার কী লাভ!

এতে চার্লি কেমন খুশি হয়। চার্লি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেও। নীলচোখ ছেলেটার চুল ছোট করে ছাঁটা, মোটা টুইলের অদ্ভুত ঢোলা শার্ট ঢোলা প্যান্ট পরনে। চার্লি এত ঢোলা জামা-প্যান্ট পরে কেন সে বোঝে না। পায়ে কেডস্ জুতো। মোজা সাদা রংয়ের। লম্বা ঢ্যাঙা, আর-একটু মাংস লাগলে চার্লিকে বড় সুন্দর মানাত।

সেই চার্লি দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে কেবিনে কিছুতেই ঢুকবে না। কেমন আতঙ্ক চোখে-মুখে। কী যে ব্যাপার সে বুঝছে না। চিফ অফিসার এদিকে আসছেন। বোধহয় চার্লির দেরি দেখে, চিফ অফিসারকে কাপ্তান নীচে পাঠিয়েছেন। তা জাহাজে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে আসতে হলে ট্রামে ফিরে আসতে হয়। কোথাও ট্রাম বেলাইন হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেক প্রায় তাদের দেরি হয়ে গেছে। বাপের মন মানবে কেন?

চিফ অফিসার এসে বললেন, এত দেরি ফিরতে?

চার্লি বলল, তা একটু দেরি হয়েছে।

আর কিছু বলল না চার্লি।

চার্লি ইচ্ছে করলে চিফ অফিসারের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে যেতে পারে। তাছাড়া চিফ অফিসার সুহাসকে পাত্তা দেন না। চার্লির সঙ্গে এত লেগে থাকাও তিনি বোধহয় পছন্দ করেন না। একজন নেটিভ ছেলেকে কে আর পছন্দ করে! চার্লি যে করছে, কিংবা চার্লি যে তার সঙ্গে মেলামেশা করছে, একসঙ্গে জাহাজঘাটায় নামছে, উঠে আসছে, এই নিয়েও অফিসার মহলে, ইঞ্জিনিয়ার মহলে কথা উঠতে পারে।

তবে বোধহয় চার্লির এ ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে। কাপ্তান মিলারও জানেন, চার্লিকে খেপিয়ে দিলে রক্ষা নেই, জাহাজে তো কাজের শেষ নেই, তার উপর ছদ্মবেশী ছেলের নানা হুজ্জোতির বিড়ম্বনায় জড়িয়ে পড়তে কে চায়। শাসনও করে থাকতে পারেন। তবে চার্লি যদি বলে, জাহাজের এই ছেলেটি আমার কাছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত। আমার কোনও ক্ষতি হয় সে এমন কাজ কখনওই করতে পারে না। তাকে তোমরা অযথা হেনস্থা করলে জাহাজ ছেড়ে চলে যাব।

এসব অবশ্য সুহাসের নিজস্ব ধারণা। চার্লি তার সঙ্গে জাহাজ ঘাটে লাগলে কিনারায় ঘুরে বেড়ায়, এটাই তার কাছে বড় অহংকার। আর এর জন্য সব জাহাজিরাই তাকে সমীহ করে। সে পড়াশোনায়ালা আদমি। তার রুচিবোধ আছে, জাহাজিরা এমন ভাবতেই পারে। তার সহকর্মীরা কিংবা ওপরয়ালা সাবেং টিন্ডালও প্রায় সময়ই তার ফোকশালে হাজির হয়।

দে বাপজান, খতটা লিখে দে। দে বাপজান, খতটা পড়ে দে।

দেশ থেকে চিঠির বান্ডিল জাহাজঘাটায় এলে সে নাম ধরে সবাইকে ডাকে। রহমতুল্লা খান, এই নিন আপনার চিঠি। এই করে চিঠি বিলি থেকে পড়ে দেওয়ার কাজটা তার। চিঠির জবাবও সে লিখে দেয়। তার জাতভাই হরেকিষ্ট, অধীর, সুরঞ্জনরা অবশ্য তার এতটা প্রভাবে ক্ষুব্ধ হতে পারত, তবে সে চার্লির প্রিয়জন। ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। তারাও তাকে এজন্য হয়তো পছন্দ করে।

সুহাস বলল, চার্লি, তুমি বড়-মালোমের সঙ্গে চলে যাও। আমি যাচ্ছি।

না।

রাগে ক্ষোভে সুহাসের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কী ছেলে রে বাবা! জাহাজে উঠেও আতঙ্ক! আতঙ্ক না জেদ! তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে, চার্লি যেন গ্যাংওয়েতেই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে। মাথা গরম হয়ে যায় না!

সে অগত্যা চার্লিকে তার কেবিনের দরজায় পৌঁছে দিল। চার্লি লক খুলে দরজা ঠেলে দিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। উঁকি দিয়ে কী দেখল। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কী ভেবে চোখ তুলে বলল, যাও!

চার্লির চোখে যেন কী আছে। স্বাভাবিক মনে হয় না। টানা-টানা চোখ। চোখে ধার আছে। কুহকও বলা যায়। কী যে আকর্ষণ চোখের চাহনিতে, সুহাস স্থির থাকতে পারে না। কিছুটা করুণ মুখ করে তাকিয়ে থাকলে কার না খারাপ লাগে। বড় ধূসর দূরবর্তী ছবি ভেসে ওঠে চোখে। সুহাস তখন কিছুটা চার্লির জন্য অস্থির বোধ করতে থাকে।

সুহাস বোট-ডেক পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নামল। টুইন-ডেক পার হয়ে পিছলে উঠে দেখল, দূরে কেবিনের দরজায় চার্লি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিঘ্নে ডেক পার হয়ে আসতে পারল কি না সুহাস, যেন দূরে দাঁড়িয়ে চার্লি তাই লক্ষ করছে।

এটা সুহাসের নিজস্ব এলাকা। ডেকের নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল, পর পর সব ফোকশাল। সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে পোর্ট-সাইডের ফোকশালগুলিতে থাকে ইঞ্জিন-জাহাজিরা। স্টাবোর্ড-সাইডের ফোকশালগুলিতে থাকে ডেক-জাহাজিরা। পিছিলে উঠে এলে সুহাস নিরাপদ, এমন ভাবতেই পারে চার্লি। এখানেই সুহাসের জাতভাইরা থাকে, তার দেশের জাহাজিরা থাকে, এই এলাকায় সুহাসের কেউ ক্ষতি করতে সাহস পাবে না ভেবেই বোধহয় চার্লি কেবিনের ভিতর ঢুকে গেল। চার্লি কি জাহাজে কোনও খুন-খারাপি হতে পারে এমন আশঙ্কা করছে! তার কেমন ভয় ধরে গেল। সে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নীচে নামার সময় দেখল, প্রায় সব ফোকশালের দরজা বন্ধ। কেমন একটা দম বন্ধ অন্ধকার, কারও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচণ্ড শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যও দরজা বন্ধ করে রাখতে পারে। ফোকশালের সিঁড়িতেই টের পেল শীতে সে নিজেও ঠক ঠক করে কাঁপছে। শীতে না আতঙ্কে বুঝতে পারছে না। আর তখনই দেখল একটা ছায়া মতো লম্বা মানুষ ওভারকোট গায়ে সিঁড়ি ধরে ডেক-জাহাজিদের ফোকশালের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত রাতে কে ফিরল কিনার থেকে সে বুঝতে পারল না।

রাতে সুহাসের ভাল ঘুম হল না। সারাটা রাতই সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছে। জাহাজ বিশমার্ক সি-তে যাচ্ছে বলে সবাই ক্ষুব্ধ। হতাশ। বংশীকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভাবনা। সুহাস রাতে ফিরে টের

পেয়েছিল, পিছিলে বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিং ভেঙে ফেলেছে কেউ। লাথি মেরে ইঞ্জিন-সারেঙের দরজা আলগা করে দিয়েছে। জংলি উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। রাতে দু'-একজন জাহাজি চুপি চুপি তার সঙ্গে দেখাও করে গেছে। সে হুঁ-হাঁ কিচ্ছু বলেনি। কেবল তাদের অভিযোগ শুনেছে। আসলে চার্লির সঙ্গে তার বেশ দহরম-মহরম আছে ভেবেই তারা এসেছিল। সে তাদের সঠিক খবর দিতে পারবে। চার্লি তাকে যে কোনও খবর দেয়নি তারা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। নেরুদ্বীপ কোথায় এটাও তারা সঠিক জানে না। বিশমার্ক সি-তে অসংখ্য প্রবালদ্বীপের ছড়াছড়ি। একমাত্র নিউগিনি, নিউব্রিটেন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া তারা অন্য কোনও দ্বীপের নামও জানে না। তারই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ-টিপ নেরুদ্বীপ হবে এমনই তারা ভেবেছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে জিরো ডিগ্রি থেকে বিশ ডিগ্রির মধ্যে অসংখ্য এমন দ্বীপ আছে। ডেক-টিন্ডাল বলে গেছে, সে গত সফরে রাবাউল এবং গ্রিন আয়ার্ল্যান্ড গেছে। বিশমার্ক সি-তেই যে এই দ্বীপগুলি আছে তারা না বললে সুহাস জানতে পারত না। কিন্তু তারা কেউ নেরুদ্বীপের নাম শোনেনি। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ-টিপ হবে। প্রায় বিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিশমার্ক সমুদ্র। এত অসংখ্য দ্বীপ যে অধিকাংশ মানচিত্রেই তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। নিউগিনি দ্বীপটা অবশ্য বিশাল। ডেক-টিন্ডাল বলেছে, প্রায় বোর্নিও সুমাত্রা দ্বীপের সমগোত্র।

সুহাস সমুদ্রের প্রায় কিছু জানে না। তবে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও দ্বীপের নাম সে জানে। থাইল্যান্ডের কাছাকাছি দ্বীপগুলি। সে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ-টাস করে জাহাজে উঠেছে বলে নামগুলি তার চেনা। নিউ-প্লাইমাউথ থেকে কত দূরে এই দ্বীপগুলি তার জানা নেই। এক-দু' হপ্তা কিংবা তার বেশি, তবে জাহাজ সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বলা যাবে না কত দিনের রাস্তা। কেউ বলছে দশ-বারোদিন লেগে যাবে। আবার কেউ বলছে, জাহাজের মর্জি, তেনার মর্জি না হলে সেখানে যাওয়া খুবই কঠিন। তিনি যেতে পারেন। নাও যেতে পারেন। বিশমার্ক সি-তে ঘুরিয়েও মারতে পারেন। অজানা সমুদ্র পেলে জাহাজটা নাকি দুরন্ত স্বভাবের হয়ে যায়। মজা পেয়ে যায়। তার এই স্বভাবের কথা কম বেশি সব জাহাজিরাই বিশ্বাস করে। ডিনা ব্যাংক আবার খেপে গেছে এমনও রব উঠে যায় জাহাজে।

কাজেই জাহাজ দেশে না ফিরে অজানা সমুদ্রে ভেসে গেলে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে! বংশী উন্মাদের মতো আচরণ করতেই পারে। তা ছাড়া জাহাজিরা দেশে ফেরার জন্য উন্মুখ। বন্দরে কেউ কেউ চিঠিও লিখেছে, সম্ভবত ফ্রিম্যান্টাল থেকে গম বোঝাই হয়ে জাহাজে দেশে ফিরবে। মানুষের বাড়িঘর কত প্রিয়, চিঠি লিখে দেবার সময় সুহাস হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে। এত দীর্ঘ সফর, মনে হয় কোন অতীতে তারা জাহাজে উঠে এসেছিল, কোন অতীতে তারা পরিবার-পরিজনের সান্নিধ্য পেয়েছে, আবার কবে পাবে, কিংবা কে জানে জাহাজটা আর আদৌ ফিরবে কি না, জাহাজটা সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। লোহা-লক্কড়ের দামে জাহাজ বিক্রি করা গেল না, জাহাজ স্ক্র্যাপ করা গেল না, জাহাজটাকে স্ক্র্যাপ করার কথা উঠলেই বিপাকে পড়ে যেতে হয়। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বিপাকে পড়ে যায়, এমনকী দু'-দু'বার দৈব দুর্ঘটনারও শিকার হয়েছে তারা। অপমৃত্যু থেকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিছুই বাদ যায় না।

সুহাস বাংক থেকে উঠে পড়ল। অধীর কখন থেকে ডাকছে, এই ওঠ। চা ঠান্ডা হয়ে গেল। কী পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস?

অধীর, বংশীদা আর সে একই ফোকশালে থাকে। বিশ-বাইশ মাস একসঙ্গে থাকলে মায়া জন্মে যায়। বংশীদার কথা ভেবে তার খারাপ লাগছিল। সবে বিয়ে করে সফর করতে বের হয়েছে। বউয়ের কথা ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তার দোষও দেওয়া যায় না।

রাতে সে দু'-একবার যে বংশীদাকে লক্ষ না করেছে তা নয়। কিন্তু বংশীদা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে চিত হয়ে। মুখ-মাথাও কম্বলে ঢাকা। জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বালা। অস্পষ্ট হয়ে আছে সব। এমনও মনে হয়েছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে তো! মরার মতো কেউ এভাবে পড়ে থাকলে ভয় হবার কথা। সে সতর্ক পা ফেলে বাংকের কাছে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে অবাক। ঠিক টের পেয়েছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে বলেছে, কী হল, কী দেখছিস!

সে কিছু বলতে পারেনি। এভাবে সামান্য কারণেই কেন যে সে আতঙ্কে পড়ে যায় কে জানে, যদি বংশীদা তার নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে কিছু করে বসে। যেমন সে চার্লিকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময়ও আতঙ্কে টেরই পায়নি শীতের কামড় কত তীব্র।

এত ঠান্ডা যে কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু সে ভোরে উঠে দেখল, বংশীদার বাংক খালি। না উঠেও উপায় নেই। ডেক-এ মেলা কাজ। অধীর চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার সময় বলল, রাতে আব কোনও গণ্ডগোল্ করেনি। তুই তো ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমাচ্ছিলি। সারেং সাব দরজা ফাঁক করে একবার দেখে গেছেন। তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস ভেবে ডাকেননি।

সুহাস তাড়াতাড়ি চা-টুকু শেষ করে বাংক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। নীচের বাংকে পা রেখে পায়ে চটি গলাল। একটা কম্বল টেনে গায়ে দিল, তারপর সারেঙের ফোকশালে উঠে গেল। কেন তিনি এসেছিলেন জানা দরকার। কে জানে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে তিনি যদি কাপ্তানের কাছে চলে যান, তবে আব-এক কেলেংকারি। বংশীদাকে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে। বংশীদা লাথি মেরে সাবেঙেব দবজা আলগা করে দিয়েছে। অজানা সমুদ্রে জাহাজ যাচ্ছে শুনে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেনি। তোয়াজ কবলে তিনি তুষ্ট হন। দরকারে বংশীদাকে ধরে নিয়ে যাবে। বংশীদা বললেই হল, মাথা ঠিক বাখতে পাবিনি, আর হবে না। বংশীদাই বা কোথায়! সাবেং সাবের ফোকশালের দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ। স্যাবোর্ড-সাইডের ফোকশালগুলিতে থাকে ডেক-সারেং এবং ডেক-হাজিরা। যদি ডেক-সারেঙের ঘরে থাকেন। উঁকি দিয়ে দেখল, না ডেক-সারেং, না ইঞ্জিন-সারেং। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। আবার বচসা শুরু হয়েছে। সারেং সাব চুপচাপ বসে আছেন। কোনও কথার জবাব দিচ্ছেন না। শুধু বলছেন, আমি কী করব? আমি কি বাড়িয়ালা? সব বাড়িয়ালার মর্জি। মাস্তার দিতে হয় তাঁর কাছে দাও!

একই ভাঙা বেকর্ড শুধু বাজছে।

কেউ বলছে, আপনি জানেন, জাহাজটা নিজের কবরখানায় যাচ্ছে?

তিনি চুপ।

আপনি জানেন, বিশমার্ক সি-তে কত জাহাজের কঙ্কাল সমুদ্রেব তলায পড়ে আছে?

তিনি চুপ।

আপনি বলুন, জাহাজে মেয়েমানুষ আসে কোত্থেকে!

এই তো সুহাস, ওকে বলুন না, সেও দেখেছে, মধ্যরাতে বোট-ডেকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুহাস সারেঙের পক্ষ নিয়ে বলল, বাজে কথা! আমি কিচ্ছু দেখিনি।

আবার মিছে কথা!— গ্যালি থেকে ভাণ্ডারি চিৎকার করতে করতে ছুটে এল।

সাবেং সাব খুবই একা পড়ে গেছেন। সব জাহাজিরাই ক্ষুব্ধ হযে উঠেছে। একা বংশীদাকে দায়ী কবতে পারবেন না। সে কিছুটা যেন আশ্বস্ত গলায় বলল, চোখের ভুলও তো হতে পারে।

এখন চোখের ভুল বলছিস সুহাস! তুই ভয়ে বোট-ডেক থেকে নেমে এসেছিলি না, হাঁপাচ্ছিলি না?

সে বলল, আসলে, মাথা ঠিক ছিল না। কী ঝড়! দাঁড়াতে পাবছিলাম না। বোট-ডেক পর্যন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঢেউ না আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই ত্রাসে ছুটছি। গভীর রাতে কত শুনশান থাকে বোট-ডেক তোমবা তো জানোই। চোখের ভুলে দেখতেই পারি। আর দেখলেই দোষের কী আছে? তার জন্য চাচাকে দুষছ কেন?

জাহাজটা ভাল না। লতু মিঞা হাত তুলে চেঁচাচ্ছে। জাহাজটা ইবলিশ, জাহাজটা জিন পরির আখড়া। ভাগাড়ে যাবার আগে মিঞাবিবি তামাশা দেখাচ্ছে। মিঞা এতদিন একলা জাহাজিদের তাড়া কবেছে, এবারে বিবি হাজির। হয়ে গেল!

সুহাস লতু মিঞাকে বলল, কী আজেবাজে বকছ চাচা? তোমার কি মাথা খারাপ?

মাথা খারাপ না হলে শালা কোন বেজন্মার বাচ্চা এ জাহাজে সফর দেয়। ডেক-কশপ লতু মিঞা বেশি কথা বললে থুথু ছিটায়। কাছে দাঁড়ানো যায় না। সুহাসের মুখেও এসে পড়েছে। সে বাথরুমে ঢুকে মুখে জল দিল। বংশীদা কোথায়? জাহাজের এক নম্বর গ্রিজার বংশীদা কি সুরঞ্জনের ফোকশালে গিয়ে বসে আছে? কিংবা সুরঞ্জন মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দেওয়ায় উপরে উঠে আসেনি?

গ্যালি থেকে হাতে দা নিয়ে বের হয়ে এল ভাণ্ডারি ইমতাজ। যা মাথা গরম, কী না কবে বসে! সে

এগিয়ে গিয়ে দেখল, কাঠও বের করছে ভাণ্ডারি। ডেক-এ গোস্ত কাটতে বসবে। সে হাঁড়িতে ডালসেদ্ধ বসিয়ে হাতের কাজ সেরে নিচ্ছে। আর গজ গজ করছে। সুহাস বুঝতে পারছে, রাতের জের এখনও মেটেনি। সে লতু মিঞার দিকে তাকিয়ে বলল, মিঞা-বিবিকে এত ভয় কেন চাচা? সবাইকে গোরে যেতে হয়।

লতু মিঞা কেমন মিইয়ে গেল কথাটাতে। বলল, আরে বাবু, জিন-ফেরেস্তা বলে কথা! ভাঙা জাহাজে ফেরেস্তা আসে না, জিনেরাই ঘোরাফেরা করে। বরফ-ঘরে গোরু-বাছুরের গোস্ত ঝুলছে। দু' ফালা করে রেখেছে গোরু-ভেড়া। সেখানে মরা মেয়েমানুষ আসে কোত্থেকে বল?

সুহাস কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেল। মরা মানুষ তো গোরু-ভেড়ার সঙ্গে ঝোলে না। ঘোরে না পড়লে এমন দেখাও যায় না। ঘোরে পড়েই দেখেছে কিছুতেই বোঝানো গেল না। বাটলার আহামদ ডারবানের ঘাটে পালাল। ঠিক পালাল বলে চলে না, কী যে দেখল বরফ-ঘরে সেই জানে, রসদ নিতে গেলেই আহামদ বলে, ওরে বাপজান, ওদিকে যাস না। মরা মেয়েমানুষ ঝুলতাছে।

সে নিজেও যায় না। কাউকে ঢুকতেও দেয় না। তারপর কাপ্তানের ধমক খেয়ে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল, সাহাব, আমার কসুর নাই। মেমসাব বরফ-ঘরে উলঙ্গ হয়ে ঝুলতাছে। দু'পায়ে হুক গেঁথে বরফ-ঘরে ঝুলে আছে। মাথাটা নীচে, পা উপরে। হুকে উনি মেহেরবানি করে ঝুলতাছেন। আমারে কয়, কী কেমন আছ, মিঞা? ডর নাই, গোস্ত যা লাগে নাও, আমি তো থাকলাম।

আসলে জাহাজে থাকলে নানা কুসংস্কারে এমনিতেই ভুগতে হয়। লজ্ঝরে জাহাজ হলে তো কথাই নেই। কাপ্তান পর্যন্ত খেপে গিয়ে নীচে নেমে এসেছিলেন। রসদ-ঘরের চারপাশে সবাই হামলে পড়েছিল। সুহাসও উইনচ-মেশিন ফেলে ছুটে গিয়েছিল, কিছুতেই বরফ-ঘরের চাবি আহামদ কাউকে দেবে না। রসদ-ঘরের নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে হয় বরফ-ঘরে, উপরের ঘরটায় নানা কিসিমের র‍্যাক, র‍্যাকে জ্যাম জেলি আপেল কলা টমেটো সস থরে থরে সাজানো। চাল ডাল ময়দার বস্তা, তেলের টিন, চা চিনি টোবাকো আর নীচে নেমে গেলে সবজির পাহাড়—বাঁধাকপি ফুলকপি, ভ্যাপসা পচা গন্ধ, ডাঁই মেরে ফেলে বাখা হয়েছে। তার সামনে বরফ-ঘরের লম্বা দরজা। সাদা রং বার্নিসে চকচক করছে। খুললে ছালচামড়া ছাড়ানো গোরু-ভেড়ার লাশ।

সুহাসও দেখেছিল। গোরু-ভেড়ার লাশ ছাড়া কিছু সে দেখতে পায়নি। কাপ্তান সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, কোথায় কে ঝুলছে? আহামদকে ডাকো!

সবাই একে একে উঠে আসছিল, বরফ-ঘরে ছালচামড়া ছাড়ানো ঝুলন্ত সব গোরু-ভেড়া-মুরগি দেখে সুহাসের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তবু সে দ্যাখেনি কোনও নারীর সাদা পাণ্ডুর লাশ সেখানে ঝুলছে। আহামদ ডারবানের ঘাটে সত্যি পাগল হয়ে গেল। সে কিছুতেই আর বরফ-ঘরে নামত না। কাউকে রেশনের গোস্ত বিলি করত না। অগত্যা চিফ কুকের উপর ভার। চিফ কুক কাজটা করত ঠিক, তবে সে একা বরফ-ঘরে ঢুকত না। গন্ডায় গন্ডায় ছালচামড়া ছাড়ানো আস্ত গোরু-ভেড়া ঝুলতে থাকলে কে না অস্বস্তিতে পড়ে যায়' সেকেন্ড কুককে সঙ্গে নিত। আর জাহাজ দুলতে থাকলে সমুদ্রে তারাও বেশ দোল খায়। শক্ত আংটায় গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কপিকলে টেনে তোলা হয়েছে। ওজন মেপে রেশন দেওয়ার কাজটা চিফ কুকের ওপরই বর্তে গেল। আহামদকে কিছুতেই আর বরফ-ঘরে পাঠানো গেল না। সে গেলেই নাকি দেখতে পায় কোনও নগ্ন নারীর সাদা পাণ্ডুর শরীর গোরু-ভেড়ার সঙ্গে ঝুলছে। মাথা নীচের দিকে। এসব খুব কাছে না গেলে নাকি বোঝা যায় না। এমনিতে চোখে পড়ার কথা না। কারও দেখারও কথা না। এত ছালচামড়া ছাড়ানো গোরু-ভেড়ার মধ্যে একজন উলঙ্গ মেমসাবকে আবিষ্কারও করা যায় না। মাংসের রং এক রকমের। এমনকী নিতম্ব এবং পা সবই মুরগির পেটের মতো অথবা ঠ্যাং-এর কাছাকাছি। এসব বর্ণনা আহামদেরই। আর কেউ তো কিছু দ্যাখেনি।

সুহাস ডেক ধরে ছুটে আসছিল, এমন আজগুবি কথা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। সবাই তো গেছে বরফ-ঘরে, কেউ তো উঠে এসে বলেনি, না আছে। থাকবে কোত্থেকে? কার দায় পড়েছে, গোরু-ভেড়ার সঙ্গে নারীর লাশ ঢুকিয়ে দেবার! সেও বলেছে, আহামদ পাগল হয়ে গেছে।

সে ডেক ধরে ছুটে যাবার সময় বলেছে, শিগগির যাও, দ্যাখো গে বাটলার পাগল হয়ে গেছে।

বরফ-ঘরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কাপ্তান জোরজার করে ওর কেবিনে আটকে রেখেছে।
আর তখনই শুনেছিল, কেউ ডাকে।
কে?
সে দেখল এক নম্বর ফলকায় বসে বসে দাঁত খুঁটছে তিন নম্বর সুখানি। সুহাস মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে, কারণ জাহাজে সুখানির কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিজে কাপ্তান, চিফ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ডিউটি। তিন নম্বর সুখানিই বলতে গেলে মুরুব্বি তাদের। তিনি তাকে ডাকছেন, সুহাস, শোন।
সুখানি অর্থাৎ মুখার্জিদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।
সবাই নেমে বরফ-ঘর দেখে এলেও তিনি নামেননি। যেন এটা তাঁর কাছে কোনও খবরই নয়। এই জাহাজ ছাড়া তিনি অন্য জাহাজে সফরও করেন না। জাহাজের পুরো হাল-হকিকত দু'জন জানে, একজন ইঞ্জিন-সারেং, অন্যজন তার এই মুখার্জিদা।
সে কাছে গেলে বলেছিলেন, কে পাগল হয়ে গেছে?
আহামদ বাটলার। নীচে গেলে না! কাপ্তান তো সবাইকে বলেছেন, দেখে এসো বরফ-ঘরে কী আছে? কে কী আবিষ্কার করতে পারো চেষ্টা করে দ্যাখো। বাটলার বললেই বিশ্বাস করতে হবে কেন? আমাদের নিজেদের চোখ আছে, দৃষ্টি আছে, অনুভূতি আছে, দ্যাখো যদি আহামদ সত্যি ঠিক কিছু বলে থাকে।
মুখার্জিদা বললেন, তিনি প্রাজ্ঞ মানুষ, বলতেই পারেন।— তারপর সহসা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুই কী দেখলি!
ধুস। দেখা যায়! আমার তো মাথা ঘুরছিল। বরফ-ঘরে উঁকি দিয়েই দৌড়।
মুখার্জিদা ফের প্রশ্ন করেছিলেন, তবে বুঝলি কী করে আহামদ বাটলার পাগল হয়ে গেছে? সে মিথ্যে কথা বলেছে?
কাপ্তান যে বললেন।
তিনি বলতেই পারেন। তাঁকে তো জাহাজটা নিয়ে সমুদ্রে চষে বেড়াতে হয়। বাটলারের কথা সত্য হলে কেউ বরফ-ঘরের মাংস খাবে! মেয়েছেলে লাশ হয়ে থাকলে বরফ-ঘরের গোস্ত কেউ খেতে পারে।
কী বকছ মুখার্জিদা। ওখানে মেয়েমানুষ আসতে পারে বলো! লাশ হয়ে মাথা নীচে রেখে ঝুলে থাকতে পারে! কেউ তো দেখল না। কার মুরোদ আছে মেয়েমানুষের লাশ ওখানে গুঁজে দেয়।
কেন দেখল না বুঝিস না? ভিতরে ঢুকতে কারও সাহসই হয়নি।
তা নাও হতে পারে, দরজায় উঁকি দিলেই দেখা যাবে তাও ঠিক না। প্রায় দশ-বারো গন্ডা গরু-ভেড়া ঘরটায় গোস্ত হয়ে ঝুলছে। গোরু-ভেড়ার কবন্ধ বলা যায়। বীভৎস দেখতে। উৎকট ভাপসা গন্ধ। মাসখানেকের রসদ একসঙ্গে তোলা হয়েছে, মাসখানেক বাদে আবার রসদ উঠবে। বরফ-ঘরের বাসি গোস্ত সবার জন্য বরাদ্দ। যে যা খায়। মটন খেলে মটন। বিফ খেলে বিফ। এত লাশের মধ্যে আর-একটা লাশ খুঁজে পাওয়া যে সহজ না তাও সে বিশ্বাস করে। কিন্তু কাপ্তান ছাড়ার পাত্র নন। তিনি সব গোরু-ভেড়া-মুরগি বরফ-ঘর থেকে টেনে বাইরে এনে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোথায় লাশ বলো?
বলেছিলেন সবাইকে। আহামদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি এমনও বলেছিলেন।
সব শুনে মুখার্জিদা বলেছিলেন, সে সত্যি তবে জাহাজে আছে। ভাবতে ভালই লাগছে। জাহাজ ছেড়ে যেতে চাইছে না? কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না। কী মজা!
কেমন বালকের মতো মুখার্জিদা হাসছিলেন। মুখার্জিদার কথাবার্তায় সে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।
কী বলছ? মুখার্জিদা, তুমি হাসছ? এসব বিশ্বাস করো?
দ্যাখ সুহাস, জাহাজে সবে সফরে বের হয়েছিস। জাহাজ বড় খারাপ জায়গা। কিনার আরও খারাপ জায়গা। কোথায় কে কী দেখে ফেলবে কেউ বলতে পারে না। আহামদ যা দেখেছে, আজগুবি বলে

উড়িয়ে দিস না। আহামদ দেখতেই পারে। এককালে বরফ-ঘরে একটা মেয়ের লাশ সত্যিই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি তো আজকের না। এই জাহাজেই আমার বারো-চোদ্দো সফর হয়ে গেল। আমি জানি বলেই বললাম।

সে কেমন বিচলিত বোধ করছিল। মুখার্জিদা টোবাকো জড়াচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে। এত বড় এক কাণ্ড হয়ে গেল, তিনি সেখানে গেলেনই না। তিনি তাঁর মতো মনোযোগ দিয়ে সাদা কাগজে টোবাকো জড়িয়ে জিভে লেপটে দিলেন। তারপর দু' আঙুলে টিপে টিপে সোজা সরল সিগারেট মুখে পুরে লাইটারে আগুন ধরালেন। হুস করে টেনে চোখ বুজে ফেললেন।

তুমি জানো, বরফ-ঘরে লাশ ছিল কখনও?

ছিল। আমি জানি বলেই বললাম।

কী করে সম্ভব!

অসম্ভবই বা কী করে হতে পারে বুঝি না। টানা দেড় মাস সমুদ্রে। মন্ট্রিলে জাহাজ। তুষারঝড়। জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার হন্যে হয়ে আছেন, তাঁর বান্ধবী এলেই শরীর গরম করা যাবে। তুষারঝড়ে পাইন গাছের একটা পাতাও ছিল না। সে অনেক কথা। যা এখন। কিছুই অবিশ্বাস করতে নেই, জাহাজে উঠেছিস, জাহাজির মতো অদৃষ্টকে মেনে নে। আহামদের এটা অদৃষ্ট। পাঁচ-সাত বছর বাদে সেই লাশকে আহামদ ঠিক আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমরা তো ভেবেছিলাম, যাক, সমুদ্রে যখন গোপনে ফেলে দেওয়া গেল, তখন আর ভাবনার কী! অথচ দ্যাখ সে ফিরে ফিরে জাহাজে আসে। ঠিক জায়গায় ঝুলে থাকে। বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়া আছে তোর? বিক্রমাদিত্য রাজার কথা মনে আছে? ওই আর কী! গল্প তো এমনিতেই তৈরি হয় না। কিছু না কিছু সত্য থেকেই যায়।

লতু মিঞার মুখে বরফ-ঘরে লাশের কথা শুনে সেই মুখার্জিদাও উপরে উঠে এসেছেন। তাঁকে বেশ তাজা লাগছিল, তিনি ভিড়ের মধ্যে থাকেন না, গণ্ডগোলেও থাকেন না। ডারবানের ঘাটেই তাঁকে দেখে এটা সুহাস টের পেয়েছিল! বরফ-ঘরে গিয়ে সবাই উঁকি দিলেও তিনি উঁকি দেননি। তাঁর বিশ্বাস আহামদ দেখতেই পারে। লতু মিঞার কথায়ও তাঁর সায় আছে। তবে সায় থাকলেও এসব নিয়ে কোনও উত্তেজনা তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বললেন, একদম গণ্ডগোল না। সাবেংকে ভাল মানুষ পেয়ে কাল থেকে হুজ্জোতি চলছে। মিঞা-বিবিকে নিয়ে পড়লে লতু মিঞা! কাজ-কাম নেই! সারেং সাব, আপনি ওকে কাজে যেতে বলুন। ঘোঁট পাকাচ্ছে। এই সুহাস, তুই সত্যি বোট-ডেকে মেয়েমানুষ দেখেছিস?

সে বলল, না, আমি কিছু দেখিনি।

দেখলেই দোষ কোথায়? যে যার মতো থাকে। কেউ তো ক্ষতি করেনি।

এতদিন জাহাজে লুকেনারের প্রেতাত্মা একাই বিরাজ করত। জাহাজে উঠলে নানা গুজব এমনিতেই ওড়াউড়ি করে। জাহাজটা প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার। লুকেনার সাহেবের জাহাজ, তাঁর নৌবহরের তিনটি জাহাজের এটি একটি। তিনি জলদস্যু ছিলেন, এবং লুণ্ঠন গৃহদাহ ধর্ষণ কিছুই বাদ ছিল না তাঁর। দরকারে কোরাল সি-তে আত্মগোপন করে থাকতেন। পর্তুগিজরা যা করত একসময়। তাঁর দাপটে কোরাল সি কিংবা বিশমার্ক সি-তে কোনও জাহাজ ঢুকতে সাহস পেত না।

জাহাজিদের বিশ্বাস, সেই জলদস্যু লুকেনার সাহেবের হাড় প্রোথিত আছে এই জাহাজে। মাঝে মাঝে তাঁকে গভীর রাতে ফরোয়ার্ড-পিকে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা গেছে। প্রাচীন নাবিকেরা লুকেনার সাবের প্রেতাত্মার কবলে পড়লে কারও যে রক্ষা থাকে না, এমন গুজবও ছড়াতে কসুর করে না। তিনি এতদিন একা ছিলেন, কেউ কেউ এবারকার সফরে মধ্যরাতে কোনও নারীকে দেখে ফেলায়, তিনি আর একা নন এমন ভাবতেই পারে। লতু মিঞা ভাবতেই পারে, এবারে মিঞা-বিবি একসঙ্গে সফর করছেন।

মুখার্জিদা উপরে উঠে আসায় লতু মিঞা কিঞ্চিৎ মিইয়ে গেছে। কারণ মানুষটা একটু ভিন্ন গোত্রের। সবাই মিলে-মিশেই থাকে। মানুষ থাকবে, ভূত থাকবে না, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। বেঁচে থাকার এই একটা মজা। গোরে গেলে মানুষও থাকে না, ভূতও থাকে না। তা আছে যখন থাক। ওই নিয়ে এত হুজ্জোতির কী আছে! জাহাজ তো একদিন ঘাটে লাগবেই, তখন যে যার মতো নেমে পড়বে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাতে যখন আসবে, কেউ কি সারেং সাবকে ভাগ দেবে!

মুখার্জিদা বললেন, বংশীকে দেখছি না।

কে যেন বলল, ও নীচে শুয়ে আছে।

কাজে যাবে না?

কে জানে!

তখনই বংশীব গলা পাওয়া গেল, এই যে আমি। কিছু দরকার আছে?

মুখার্জিদা বললেন, মাথা গরম করিস না। যা কাজে যা। সারেং সাবকে নিয়ে পড়েছিস কেন। তিনি কী কববেন? কাপ্তানেরও কিছু করার নেই। আমরা কোম্পানির গোলাম। সাইন করার সময় সেটা তো ভাবোনি। ব্যাংক লাইনের সফর, লম্বা সফর, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কত কিছু তো জাহাজে ওঠার সময় মনে হয়েছে। এখন জাহাজের নামে অপবাদ ছড়াচ্ছ, লজ্জা করে না।

আরে বলে কী।

অপবাদ ছড়াবার কী হল!

মুখার্জিদার মুখে এমন কথা শুনে সুহাস তাজ্জব। যেন বরফ-ঘরে মেয়েছেলেব লাশ ঝুলে থাকতেই পাবে, বোট-ডেকে মধ্যরাতে তিনি একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠেও আসতে পাবেন, লুকেনার সাব মাঝে মাঝে জাহাজের মায়া কাটাতে না পেবে জ্যোৎস্না রাতে ফরোয়ার্ড-পিকে দাঁড়িযে থাকতেও পাবেন, সেজন্য জাহাজটার নামে অপবাদ ছড়ানো কেন। জাহাজেরও মেজাজ-মর্জি বুঝতে হবে। তবে তো একজন পাক্কা জাহাজি।

নাও, হয়ে গেল।

কেউ আব কথা বলতে পারছে না।

ভাণ্ডাবি দা দিয়ে গোস্ত কোপাচ্ছে। সে শুনছিল সব। সে বোধ হয় আর পারল না, সে উঠে দাঁড়াল। বলল, মুখার্জিবাবু, জাহাজ তাব নিজের গোরে যাচ্ছে, দেখে নেবেন।

এ কথা বলছ কেন?

জাহাজটা তো ওখানেই বিচরণ করত। সরকাব বাহাদুর লুকেনাব সাবকে আটক করাব চেষ্টা কবলে ওই দবিয়াতে আত্মগোপন করে থাকত, এটা কি জানেন।

মুখার্জি বললেন, জানি!

তবে।

ভাণ্ডাবি ফেব বসে পড়ল। গ্যালিতে দুটো উনুন জ্বলছে। জাহাজিরা যে যার রেশন থেকে চা চিনি কন্ডেনসড মিল্ক বেব কবে চা বানিযে নীচে নেমে যাচ্ছে। কেউ কেউ কাজে যাবাব জন্য পোশাক পালটে উঠে আসছে। তারা জানে, কিছু করার নেই। সুরঞ্জন জাহাজের ফায়ারম্যান। সে চা করে দু' কাপ চা মুখার্জি এবং সুহাসকে দিল। হিমেল ঠান্ডা উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। কম্বলেও শীত যাচ্ছে না সুহাসের। গাযেব কাপ কম্বলেব তলায় নিয়ে শরীব গরম করছে। একটু বেশি শীতকাতুরে হলে যা হয়। তারও যে বাড়িঘবে ফেরার জন্য মন খাবাপ বুঝতে দিচ্ছে না। জাহাজটা গোরে যাচ্ছে বলায় শীতটা যেন আরও বেশি কামড় বসাচ্ছে শরীরে। জাহাজ যাচ্ছে সেই সমুদ্রে, যেখানে ভয়ংকর জলদস্যু লুকেনার আত্মগোপন কবে থাকতেন।

মুখার্জিদা ফের বললেন, যেখানেই যাক, আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর অদৃষ্টে থাকলে দেশে ফিরেই গোরে যেতে পাবো মিঞা। কে আটকাবে? শেষ পর্যন্ত গোরে যেতে হয় না এমন কেউ আছে! আসলে তোমরা দেশে ফেরার জন্য নানা অজুহাত সৃষ্টি করছ। পয়গম্বরের মতো কথা বলছ মিঞা। সব জেনে বসে আছ!

ভাণ্ডাবি চুপ।

সে গ্যালিতে ঢুকে গেল। জাহাজিরা কাজ সেরে আটটায় ফিরে আসবে। চর্বিভাজা রুটি খাবে। সে ময়দা মাখতে বসে গেল।

মুখার্জিদের কথায় কাজ হয়েছে।

এত উচাটনে থাকা ঠিক না। মনমেজাজ খারাপ হতেই পারে। তাই বলে, ডিনা ব্যাংক গোরে রওনা হয়েছে কথাটা কাবও ভাল লাগল না। কেউ বলতেও পারে না জাহাজের পরিণতিব কথা। অযথা

উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আহামদ বাটলার আতঙ্কে দেখে থাকতে পারে লাশ, এবং সে যে দেশে পালাবার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেনি তাই বা কে বলতে পারে। কার কী পরিণতি কেউ বলতে পারে না। পিছিলে ধীরে ধীরে গুঞ্জন থেমে গেল। সুহাস কাজের পোশাক পরে উঠে দেখল যে যার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। তার উইনচে কাজ। কশপের ঘরে তেল জুট হাতুড়ি বাটালি নিতে চলে গেল।

জাহাজে জল মারা হচ্ছে। ডেক ধোয়া-মোছার কাজ চলছে। ফলকার কাঠ তুলে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপলে ঢেকে কিল এঁটে দেওয়া হচ্ছে। বড়-টিন্ডাল ওয়াচে নেমে গেলেন। সঙ্গে তিনজন ফায়ারম্যান, দু'জন কোলবয়।

জাহাজের দুটো বয়লারে নতুন করে আগুন দিতে হবে। স্টিম তুলতে হবে। তাদের ব্যস্ততার শেষ নেই।

সুহাস দেখল, ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন কাপ্তান। সঙ্গে চিফ অফিসার। তাঁরা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছেন। সারা জাহাজ ঘুরে দেখবেন। ডেরিক ফলকা, হাসিল ঠিকঠাক আছে কি না, বাঁধাছাদার কাজে কোনও ত্রুটি থাকল কি না কিংবা ডেক-এ কোনও ময়লা জমে আছে কি না, দেয়ালে কোথায় রং চটে গেছে, সব দেখে উঠে যাবেন।

সুহাস তাড়াতাড়ি উইনচে ঝুঁকে পড়ল। পাঁচ নম্বর সাব তার কাছে নাট খোলার জন্য হাতুড়ি বাটালি চাইছেন। সে ঝুঁকে হাতুড়ি এগিয়ে দেবার সময় শুনতে পেল ফাইভার বলছে, তোমাদের ওদিকটাতে শুনলাম খুব গণ্ডগোল। এক নম্বর গ্রিজার নাকি সারেংকে মারতে গিয়েছিল!

সে বলল, বাজে কথা।

বাজে কথা! হতে পারে। বাজে কথা হলেই ভাল। শুনলাম, তুমি নাকি মধ্যরাতে জাহাজে মেয়েমানুষ দেখতে পাও। তা দেখতেই পারো। সবাই দ্যাখে। সমুদ্রে এলে রোগটা বাড়ে। যখন তখন মাথায় মেয়েমানুষ পেরেক পুঁতে দেয়। যা জাহাজ!

সুহাস কী যে বলে! তা দেখেছে, একবারই, তখন জাহাজ লৌহ আকরিক বোঝাই হয়ে ক্যারেবিয়ান সি-তে। সাইক্লোন, ডেক ধরে ফোকশালে যাওয়া মানা। টানেল-পথ খুলে দেওয়া হয়েছে তখন, সেই একবার, বোট-ডেক ধরে নামতে গিয়ে প্রায় ঢেউয়ের তোড়ে সুহাস উড়ে যাচ্ছিল। তখনই মনে হয়েছিল, অন্ধকারে বজ্রপাত। কোনও নারী বোট-ডেকে ছুটে বের হয়ে এসেছে। কড় কড় করে আকাশ চিরে ফালা ফালা বিদ্যুতের ফণা। এমন বিক্ষুব্ধ ঝড়ের রজনীতে কে যায় বোট-ডেক পার হয়ে! কার এত সাহস!

সে ঢোক গিলে বলল, আচ্ছা ফাইভার, লুকেনারকে তুমি কখনও দেখেছ? তোমারও তো তিন-চার সফর।

লুকেনার! মানে, সি-ডেভিল লুকেনার! সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। সে তো প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ গেল, তোমরা এখন স্বাধীন, সে এখনও আছে নাকি!

জাহাজিরা যে বলে, অনেকেই তাকে দেখতে পায়।

তা পেতে পারে। লুকেনারের গুপ্তধনও পেয়ে যেতে পারে তারা। যে যেমন ভাবে। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা এই গুপ্তধনের লোভেই তো জাহাজটা কিনেছিল।

কী বলছ?

তাই তো গুজব।

কোথায় সেই গুপ্তধন?

তোমাকে বলব কেন?

না মানে।

আরে বোঝো না, জাহাজের খোলে কত রিপিট মারা। ইস্পাতের চাদর কত জায়গায় কাটা দেখেছ কাটে আর জোড়া লাগায়। রিপিট মেরে দেওয়া হয়। গ্যাস-কাটার দিয়ে কেবল কাটা-ছেঁড়া করা হচ্ছে। কীসের খোঁজে?

কে করছে?

কে করছে জানব কী করে! খোলে নামলে বুঝতে পারো না কত তাপ্পি মারা। তাপ্পি মারতে মারতে

আসল জাহাজটা আর নেই। হাড় ক'খানা আছে। হাড়ের ভিতর যদি গুপ্তধন থাকে। তা থাকতেই পারে! তিনি এবং তাঁর গুপ্তধন, ভাবা যায় না।

সুহাস জানে, ইস্পাতের চাদরে জং ধরে যায়। সমুদ্রের নোনাজলে চাদর খয়ে যায়। ফুটোফাটা হয়ে যেতে পারে। ড্রাইডকে মেরামতির কাজ চলে। ইস্পাতের চাদর নতুন বসিয়ে দেওয়া হয়, রিপিট কবা হয়। জাহাজ পুরনো হয়ে গেলে এসব করতেই হয়, তবে এই লক্করমার্কা জাহাজ এত পুরনো যে মেবামত করতে গিয়ে তাপ্পি মারা ছাড়া আর উপায় কী। জাহাজটা বড় বন্দরও ধরতে পারে না। ধরতে পাবে না না, ধরতে দেওয়া হয় না। যেন পালিয়ে পালিয়ে ঢোকে, পালিয়ে পালিয়ে বের হয়ে যায়। জাহাজি আইনে এমন পুরনো জাহাজ তো কবেই বাতিলের পর্যায়ে পড়ে যাবার কথা, কেন যে বাতিল হচ্ছে না, তাও বোঝে না। বড় রহস্য।

আব তখনই দেখল, চার্লি বোট-ডেক থেকে তরতব করে নেমে আসছে। এখন আব তাকে অবাক কবে দেবার জন্য জাহাজের দড়িদড়া ধরে একেবারে বোট-ডেক থেকে লাফিয়ে ফলকায় নেমে আসে না। চার্লি এখন সিঁড়ি ধরেই নেমে আসে। তাকে উইনচে দেখতে পেযেই হয়তো ছুটে এসেছে। পবনে সেই বয়লার সুট, হাতে দস্তানা চামড়ার। পায়ে কেডস জুতো এবং তাব সর্বাঙ্গ বড বেশি ঢাকা। এই ঠান্ডায় সে কাবু হলেও চার্লি বিন্দুমাত্র কাবু নয়। সাদা টুইলেব বয়লার সুট চামড়ার মতো ঘাড গলা শরীব ঢাকা।

সে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জানো কাল্ল না আর-এক কাণ্ড। ম্যাককে কে সিঁডিব মুখে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ভাগ্যিস লাগেনি। কিছু একটা হলে কী যে হত।

কখন?

বাতে।

কে ঠেলে ফেলে দিল!

সেই তো। কে যে ঠেলে ফেলে দিল।

ম্যাক চুপচাপ। সে হাঁ হুঁ কিছু বলছে না। সে উইনচেব ভিতব মাথা গলিয়ে দিচ্ছে। উইনচের আডালে ফাইভাব অর্থাৎ ম্যাক যে আড়ালে লুকিয়ে শুনছে চার্লি বিন্দুমাত্র তা টের পেল না।

জাহাজ ছাডতে ছাড়তে সাঁঝ লেগে যাবে।

নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে চাব-পাঁচটি জাহাজ জেটিতে ভিড়তে পাবে, জেটি না পেলে বয়াতে বাঁধা থাকে জাহাজ। জেটি খালি হলেই বয়াতে বাঁধা জাহাজটা জেটিতে ভিডবে।

বন্দবটা দেখতে কিছুটা হ্রদের মতো, দু'দিকে তার বালিয়াড়ি এবং পাহাড়, পিছনেব দিকে বড বড় বোলডার ফেলে সমুদ্র থেকে আলগা করে নেওয়া হয়েছে, সমুদ্রের ঢেউ সেই সব বোলডাবে এসে আছড়ে পড়ছে, ভিতবে ঢেউয়ের কোনও তাণ্ডব নেই। আসলে বোলডার ফেলে কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি করে এই বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে। ডেক-এ দাঁড়ালে সামনে জেটি। জেটি পার হয়ে একদিকে নির্জন বালিয়াড়ি, জেটি ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলে সিম্যান মিশন। মিশন পার হয়ে ট্রাম ডিপো। শহরটা পাহাডের উপত্যকাতে, অধিকাংশই কাঠের বাড়ি লাল নীল রঙের। সামনে ফুলের বাগান। বড বড় গোলাপ এবং তুচ্ছ করার মতো ডেইজি ফুল।

চার্লির খুব ইচ্ছে ছিল, বুনো ডেইজি ফুল সুহাসকে দেখায়। বুনো ফুল যে এই সব দামি গোলাপ কিংবা ডেইজি ফুলের চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ, সুহাসকে না দেখাতে পারলে শান্তি পাচ্ছিল না। সে জাহাজে উঠে এসে সুহাসকে নানা বর্ণের বুনো ফুলের খবর দিয়েছে। চার্লির এই সব বুনো ফুলের প্রতি কেন যে এত আগ্রহ সুহাস বুঝতে পারে না। পিকাকোরা পার্কে নানা কিসিমের বুনো ফুলও আছে, যেমন গ্রেপেডেড কৌরি ফুলের খোঁজ পেয়েছে এখানে। রাফ ব্রেজিং স্টার দেখে তো সুহাস সত্যি অবাক। গাছগুলি পাট গাছেব মতো, তবে বেশ লম্বা পাতা, ঠিক সবুজ রঙের নয়, নীল রঙের। ফুল হলুদ রঙের। সূর্যমুখী ফুলের মতো দেখতে। তবে সূর্যমুখীর অনেক পাপড়ি, এতে এত পাপড়ি নেই, কিছুটা হালকা আর নরম, সুহাস হাত দিয়ে দেখতে গেলেই হা হা করে উঠেছে চার্লি, আরে করছ কী। হাত দিলেই পাপড়ি সব ঝবে যাবে। বড় সোহাগি ফুল। ধোরো না। ফুল দেখতে হয়, ছোঁওয়ার যে এত কী দরকার তোমার, বুঝি না বাপু।

পিকাকোরা পার্কে ঢুকলেই জঙ্গল এবং রাস্তা। দু'পাশে রাজ্যের সব বুনো ফুলের চাষ, মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের চত্বর, সবুজ ঘাস, তবে চার্লি বলেছে, এগুলি ঘাস মনে করার কোনও কারণ নেই, এও এক ধরনের বুনো ফুল। বোতাম ফুলের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ এবং চত্বর জুড়ে তার চাষ। সহজেই গিয়ে বসা যায়, মখমলের গদির মতো বসলে দেবে যেতে হয়। সে দেখেছে চার্লি তাকে নিয়ে পার্কের এ মাথা ও মাথা ঘুরেছে, কতরকমের বুনো ফুল আছে তাও বলেছে, দু'হাজার রকমের তো বটেই। তার ঠাকুরদা সামান্য একজন চাষি থেকে এই বুনো ফুলের ব্যবসা করে প্রায় ছোটখাটো ধনকুবের হয়ে গিয়েছিলেন তাও সুযোগ পেলে বলেছে।

একদিন তো অবাক। আরে, সামনে যেন আগুন ধরে গেছে এমন মনে হয়েছিল, অন্তত কাছে না গেলে সে টেরই পেত না, আগুন নয়, ফুল।

চার্লি বলেছিল, টল ব্লেজিং স্টার।

কিছুটা ঝুলঝাড়ার বাঁশের মতো লম্বা। তবে বাঁশের শুধু ডগায় নয়, গোটা গায়েই গুচ্ছ গুচ্ছ পাটের লাছি রং করে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। হাওয়া দিলে নুয়ে পড়ে। তিন-চার একর জুড়ে এই ফুলের সমারোহ দেখলে প্রথমে মনে হতেই পারে সারা মাঠ জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

চার্লি নানা বন্দরে পাহাড়-টাহাড় পেলেই উঠে যেত তাকে নিয়ে। বুনো ফুল দেখাবার এত আগ্রহ কেন চার্লির সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চার্লি কি মনে করে সে যা ভালবাসে, সে যাতে আগ্রহ বোধ করবে, সুহাসও তাই ভালবাসবে, আগ্রহ বোধ করবে। সে কোনও বুনো ফুল দেখে আগ্রহ প্রকাশ করলে চার্লি বাচ্চার মতো তার হাত ধরে টেনে বলবে, আরে তোমাকে বুনো ডেইজি দেখাতেই পারলাম না। কী যে খারাপ লাগছে!

তারা কৌরি-পাইন গাছগুলির নীচে বসে ঠিক করত, কোনদিকে যাওয়া যাবে অর্থাৎ পার্কটার নানা পথ এবং গভীর বনজঙ্গলে যেন ফুলটা লুকিয়ে আছে। ফুলটা ফুটে আছে কোথাও, তবে কোথায়, তারা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না। চার্লি বিশ্বাসই করতে পারত না, এত বুনো ফুলের সংগ্রহ আছে পার্কটায় অথচ বুনো ডেইজি নেই কেন? চারপাশে আলোর ছড়াছড়ি, মানুষজনেরও ভিড়। ইতস্তত সব রেস্তোরাঁ, পাব, ফল বিক্রির দোকান, জুয়া খেলার ব্যবস্থা সবই আছে। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজতে গিয়ে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। বাবা জানেন, সুহাস সঙ্গে আছে। সুহাস সম্পর্কে বাবার কী ধারণা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। নেটিভ ছেলেটির তিনি খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সারেংও বলেছে, খুবই মাথা-ঠান্ডা ছেলে। কাজকর্মে আগ্রহ আছে খুব। তবে মনে হয় ভিতু স্বভাবের। একা বন্দরে নেমে যেতে সাহস পায় না। তা ছেলেমানুষ, সাহস না পেতেই পারে।

চার্লি যে খুব শান্ত স্বভাবের নয় এবং পারিবারিক রুচিবোধ চার্লিকে কিছুটা অহংকারী করে রেখেছে বাবা ভালই জানেন। দেরি হয়ে যাওয়ায় খুব চিন্তার কারণ হতে পারে চার্লির মনেই হয়নি। কিন্তু কে যে তাকে অনুসরণ করছে তাই সে বুঝতে পারছে না। কেন এই অনুসরণ, যদি তার ছদ্মবেশ কেউ খুলে দিতে পারে এজন্য যে তার পরিবারের লোকজন কোনও ষড়যন্ত্র করছে না, তাও সে সঠিক জানে না। সে সারারাত এসবই ভাবছিল। অনুসরণকারী কখনওই খুব কাছে আসে না, দূরে থাকে। এবং রাত হয়ে গেলেই তাকে দেখতে পায়, অস্পষ্ট আলো-আঁধারে সে উঁকি দেয় এবং সুযোগ বুঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজতে গিয়ে এটা তার মনে হয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসা উচিত ছিল জাহাজে। কিন্তু সময় পাবে না, তারপর তারা কোথায় যাবে তাও জানে না। পিকাকোরা পার্কের গাছগাছালি সম্পর্কে একটি বইও সে কিনেছে, তাতে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে সব। বুনো ডেইজি ফুলও দেখা যায়, তবে খুব কালেভদ্রে। এখানকার জল-হাওয়া ঠিক সহ্য হয় না বলে গাছ বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

আসলে সেই বন্দর শৈশব এবং পারিবারিক গির্জা এবং সমাধিক্ষেত্রটি তার খুবই প্রিয়। বিশাল এক পাহাড় এলাকা কিনে ঠাকুরদা নিজের পছন্দমতো বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন। সকালে বিকেলে সেই বনভূমিতেই অধিকাংশ সময় তার কেটে গেছে। সে লাফিয়ে পার হয়ে যেত বৃষ্টির জমা জল কিংবা কাঁটাগাছ। সে ফুল তুলতেও ভালবাসত। বেটসি দূরে বসে তাকে সব সময় পাহারা দিতেন। বেটসি ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিচারিকা।

রাফ ব্লেজিং স্টার ফুলের সঙ্গে টল ব্লেজিং স্টার ফুলের তফাত কত, তাও সে বুঝিয়েছে সুহাসকে।

সুহাসের মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি যে না ঘটত তা নয়, বিরক্ত হত। ভাবত হয়তো চার্লি বুনো ফুলের নামে পাগল, শহরটার কোথাও ঘুরে দেখাই হল না। বংশীদা, মুখার্জিদারা সিম্যান মিশনেই পড়ে থাকত। কাড়ি কাঁড়ি বিয়ার গিলত, আর যে যেমন পারে, যেমন মুখার্জিদা ভাল মাউথ-অর্গান বাজায়, সুরঞ্জন বাউল গান গাইতে পারে, তারা দু'জন তো ডায়াসে উঠে নেচে গেয়ে নাবিকদের আমোদ-আহ্লাদেরও সঙ্গী হয়েছে। চার্লিকে নিয়ে একদিনই গিয়েছিল মিশনে। চার্লির একদম ইচ্ছে নেই, তবু সুহাস জাবজাব করলে না গিয়ে পারেনি। সেদিন একটা লোক অদ্ভুত সব ভেল্কি দেখাচ্ছিল, সে বলছে, আর কে আসতে চান? আসুন, উঠে আসুন। বোধহয় চার্লি এবং সে দু'জনই প্রায় বলতে গেলে বাচ্চা নাবিক জাহাজের। নজর এড়ানো কঠিন। লোকটার ভেল্কি দেখানো শেষ, সে কখনও রুমাল থেকে আট-দশটা পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছে, কখনও দু'জগ জল খেয়ে সবটা আবার উগরে দিচ্ছে, এই সব খেলা থেকে একসময় একজন নাবিককে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যা নাস্তানাবুদ করল, এতে চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পেতে পারে, চার্লি বলেছিল, লোকটা হিপনোটাইজ করতে পারে। তোমাকে ডাকলে কিন্তু যাবে না।

সুহাস যাবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু যখন একজন নাবিককে যা খুশি তাই করাচ্ছে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে তাই করছে, শিস দিতে বললে শিস দিচ্ছে, নিলডাউন হতে বললে নিলডাউন হচ্ছে, তখন সুহাসের মনে হয়েছিল, নাবিকটি আসলে লোকটিরই কোনও সাকরেদ হবে। একই জাহাজে গজ করে হয়তো। শিখিয়ে-পড়িয়ে না নিলে কেউ এমন তামাশা দেখাতে পারে বিশ্বাস হয় না। কান ধরে জিভ বার করে ডায়াস থেকে নেমে দর্শক আসনগুলি পার হয়ে আবার উঠে এলে হাসির ফোয়ারা! এতে সুহাস অপমান বোধ করেছিল এবং সেও উত্তেজিত হয়ে ডায়াসে উঠে যাবার সময় দেখেছিল চার্লি তার হাত চেপে ধরেছে। বলেছে, একদম যাবে না। চলো বলছি। হাসির খোরাক হতে খুব ভাল লাগে বুঝি।

সেই একদিনই মিশনে, আর তার যাওয়া হয়নি। চার্লি রাস্তায় বলেছিল, লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি?

কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছ না? তোমার কী হয়েছে বলো তো? কেমন মাঝে মাঝে চুপসে যাও। সিম্যান মিশন থেকে বের হয়ে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছ না।

আরে না, ভাবছিলাম, ভাগ্যিস লোকটার পাল্লায় পড়িনি।

পড়লে কী হত?

পড়লে কান ধরে নিলডাউন হতে হত। তোমার সত্তাকে গিলে ফেলত। হিপনোটাইজ সাংঘাতিক কিছু, তা জানো? দেখলে না, লোকটাকে যেই বলল, গায়ে জামা কেন?

সুহাস বলল, দিলে না তো যেতে। আসলে লোকটাকে সে জাহাজ থেকেই ধরে এনেছে। শিখিয়ে-পড়িয়ে তামাশা দেখিয়ে গেল। সবাইকে বোকা বানিয়ে গেল। কাল একবার আসবে নাকি?

না। আমার ভাল লাগছে না। দেখলে না, জামা গায়ে কেন, কী গরম। জামা গায়ে রাখা যায়! সঙ্গে সঙ্গে দেখলে না নাবিকটি এই ঠান্ডায় জামা খুলে ফেলে ওর পায়ের কাছে রেখে দিল। হিপনোটাইজড না হলে এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় কেউ জামা খুলে ফেলতে পারে?

সুহাস ট্রাম-রাস্তার দিকে হাঁটছিল। কিন্তু চার্লি আর এগুতে সাহস পায়নি। বলেছিল, চলো জাহাজে ফিরে যাই।

সুহাস বাধ্য হয়েছিল বলতে, তুমি না হয় ছবি আঁকতে বসবে। তোমার অকুপেশান যে কতরকমের ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন ছবি এঁকেই সময় কাটিয়ে দিতে পারো। আমি কী করব?

দেখবে বসে বসে।

অগত্যা সে শেষে চার্লির সঙ্গে জাহাজেই ফিরে এসেছিল আর আসার সময় রাস্তায় সহসা চার্লি যে কেন এমন বিদঘুটে কথা বলল, সে বুঝল না।

সুহাস, জামা খুলতে বললে তুমি খুলতে?

কেন খুলতে যাব? জামা খুলে ফেললে আমার ওস্তাদি থাকল কোথায়? তবে তো আমিও তার

অনুগত দাস হয়ে যেতাম। হিপনোটাইজড হয়ে যেতাম। অত সোজা না বুঝলে।

ঠিক খুলিয়ে ছাড়ত! ভাগ্যিস যেতে দিইনি। কে জানে, তোমার হেনস্থা দেখে আমিও না ডায়াসে উঠে যেতাম।

চার্লির মুখে আশ্চর্য হতাশা ফুটে উঠেছে কথাগুলি বলতে গিয়ে।

কী হত তা হলে? চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যেত?

কী হত তোমাকে বোঝাব কী করে? কী হত না তাই বলো।

কী করবে জাহাজে ফিরে? চলো বেলাভূমিতে গিয়ে বসি। কাছেই তো জাহাজ। এত ভয় পাও কেন বুঝি না।

আমার কিছু ভাল লাগছে না।

চার্লি হাঁটছিল জাহাজের দিকে। সিম্যান মিশন থেকে বের হবার সময় তারা দুটো আপেল কিনেছিল। সুহাস দাঁতে কামড়ে আপেল ভেঙে নিচ্ছে। চার্লির যেন খেয়ালই নেই, সে আপেল খাচ্ছে না, এক হাত পকেটে। চার্লির মিষ্টি মুখ ব্যাজার হয়ে গেলে বড় খারাপ লাগে। তার দিকে মাঝে মাঝে চার্লি এমন অপলক তাকিয়ে থাকে যে কেমন বিব্রত বোধ করে সুহাস। লোকটাকে খুবই চেনা লাগছে চার্লির। কেন লাগছে? লাগলে চিনতে পাবছে না কেন? জাহাজের নাবিকরা বিকেল হলেই নেমে যায়। জাহাজ আসছে, ভিড়ছে, মাল খালাস করছে, জাহাজ আবার চলে যাচ্ছে। জেটিতে নামলে তো লোকারণ্য। রাস্তায় দেখা কোনও লোক হতে পারে, আর এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তারই বা কী আছে। সেও মনে করাব চেষ্টা করল, কোনও গুঁফো লোকের কথা মনে করতে পারে কি না। গোঁফ-জোড়া এত বিশাল যে দু'দিকে দুটো সরীসৃপের লেজ যেন ঝুলে পড়েছে। সে শত চেষ্টা করেও কারও সঙ্গে লোকটার মিল খুঁজে পেল না। পিকাকোরা পার্কের ক'জন প্রহরী গোঁফ রাখে, জাহাজের মেসরুমমেট গোঁফ রাখে, মাউরি উপজাতীয় দু'জন যুবক এই জেটি থেকে মাছ ধরতে যায়, তাদেরও লম্বা গোঁফ আছে। তা গোঁফ থাকলেই চেনা-চেনা মনে হবে কেন, চেনা-চেনা মনে হলে চিনতে পারছে না কেন এভাবে কাঁহাতক চুপচাপ হাঁটা যাবে! সে বেগে গিয়ে বলেছিল, চার্লি, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

সেদিনই কেবিনে চার্লি বলেছিল, এসো, তোমাকে বুনো ডেইজি ফুল দেখতে কেমন, ছবি এঁকে দেখাই।

চার্লিব ছবি আঁকাব হাত সত্যি ভাল! কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে সে সেই ওস্তাদ গুঁফো লোকটিব মুখ এঁকে ফেলল। হুবহু এক। তারপব গোঁফের উপর সাদা রং বুলিয়ে দিয়ে বলল, চিনতে পাবছ?

এ তো তোমার বাবার মুখ মনে হচ্ছে।

চার্লি খেপে গেল, আমার বাবার মুখ!

না, মানে কপালের দিকটা তোমার বাবার মতো, চোখের নীচেটা সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ববেব মতো।

চার্লি কেবিনের দবজা ঠাস করে খুলে চিৎকার করে উঠেছিল, বের হয়ে যাও। বের হয়ে যাও বলছি। ইয়ার্কি মারা হচ্ছে!

সুহাস দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে যাচ্ছি। আমি নীচে নেমে গেলাম। দেখি কাউকে যদি সঙ্গে পাই, জাহাজে বসে থেকে কী হবে? আমার খোঁজে কিন্তু আবার ফোকশালে ছুটবে না। গেলে পাবে না। সারেং শুনলে গোলমালে পড়ে যাবেন, ছেলেটা একা একা কোথায় বের হয়ে গেল! তুমি বা অন্য কেউ সঙ্গে না থাকলে তার ধারণা, রাস্তা চিনে ফিরতে পারব না। বুড়ো মানুষটাকে চিন্তায় ফেলে দেবে না।

নামবে না। জাহাজ থেকে নামবে না।— কড়া হুকুম চার্লির।

সে যে কী করে! আসলে সে চার্লির মর্জি না হলে জাহাজ থেকে নেমেও যেতে পারবে না। ফোকশালে গিয়ে কী করবে! একা একা কাঁহাতক ভাল লাগে!

সে খেপে গিয়ে বলেছিল, আঁকতে গেলে বুনো ডেইজি ফুল, এঁকে ফেললে একটা গুঁফো লোক! চমৎকার হাত তোমার মাইরি!

চার্লি কেন যে রাগে ফুঁসছে বুঝতে পারছে না। সে তো চার্লির বাবাকে অপমান করতে চায়নি। যা

নে এসেছে, অকপটে বলেছে। তবে থুতনির দিকটা না ববেব মতো, না কাপ্তানেব মতো। সে শুধু বলল, কোথাও গোঁজামিল আছে তোমাব ছবিটাতে। সে যাই হোক আমি ইচ্ছে কবে তোমাব বাবাকে অপমান কবিনি। অকপটে বলছি, আমাব মনে হয়েছে কোথায় যেন কপালেব দিকটা তোমার বাবাব মতো। ম্যাককে ডেকে জিজ্ঞেস কবতে পাবো, সবাব চোখ সমান নয, কে কী দেখে ফেলবে, আবিষ্কাব কবে ফেলবে বলা কঠিন। চোখেব দোষও হতে পাবে। আমি ঠিক নাও বলতে পাবি।

তাবপবই সুহাস বলেছিল, দেখি, ম্যাক আছে কি না।

চার্লি আব পাবল না। বেগে-মেগে সুহাসকে কেবিনেব ভিতব টেনে নিয়ে গেল। দবজা বন্ধ কবে দিল। তাবপব ফোঁস ফোঁস কবে কাঁদতে থাকল।

আমাকে নিয়ে সবাই মজা কবতে চায়। আমাকে কেউ মানুষ ভাবে না। আমি মবে যাব দেখো।

আবে, এসব আবোল-তাবোল কী বকছে চার্লি। সুহাস পড়ে গেল মহাফাঁপবে। সে মজা কববে কেন? ম্যাক মানে ফাইভাবকে ডেকে দেখালে সে বলে দিতে পাবত হযতো আঁকা ছবিব মুখটা কাব মতো দেখতে। সে মজাও কবেনি, ইযার্কিও মাবেনি। তাবপবেই মনে হল, অসময়ে ম্যাক তাব কেবিনে থাকবে কেন? তাব বুকপকেটে যতই গির্জাব ছবি থাকুক, তাব স্ত্রীব ছবি থাকুক, সে তাব বন্দবেব বান্ধবীকে নিযে যে মজা লুটতে বেব হযে গেছে তাতে কোনও সংশযেব অবকাশ নেই। সে অগত্যা বসে থাকল।

চার্লি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কবে কাঁদল কিছুক্ষণ। তাব অনুযোগ, তাকে কেউ বুঝতে চায় না। কেউ তাকে ঠিক বোঝে না। সে বুনো ডেইজি ফুল এঁকে দেখাতে পাবত, কিন্তু লোকটাকে চেনা চেনা মনে হওয়ায় একবাব এঁকে দেখল, সে কে? হুবহু এই এঁকে ফেলাব যে জন্মগত প্রতিভা চার্লিব আছে ছবিটা দেখলে অবিশ্বাসেব কাবণ নেই। তাবপব গোঁফজোড়া মুছে দিতেই মুখটা এমন গোঁজামিল হয়ে যেতে পাবে সুহাসও ভাবতে পাবেনি। আসলে কিছুক্ষণেব দেখা কোনও মানুষকে হুবহু মনে বাখাবও কাবণ নেই। তাব এই নিযে এত অশান্তি হবে জানলে কিছুতেই চার্লিব কেবিনে ঢুকত না।

চার্লি নিজেই পবে উঠে গেছিল। বেসিনে মুখ ধুযে তোযালে নিযে মুখ মুছেছিল। বড সন্তর্পণে সে তাব তোযালে দিয়ে কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বেখেছিল, ভিতবে চার্লিব এত কী কষ্ট সুহাস বুঝতে পাবে না। পলকে হাসতে পাবে, কাদতে পাবে, এটা সে আগেও টেব পেয়েছে। কিন্তু লোকটাকে নিযে এত মাথা খাবাপ কবাব কী হেতু থাকতে পাবে সে কিছুতেই বুঝতে পাবছিল না।

তোযালেটা মুখ থেকে সবাতেই সুহাস দেখল, চার্লি হেসে ফেলেছে। তবে কি এই কান্না তাব নাকান্না? এও তো আব-এক বিভ্রম।

সে বলল, আমি উঠছি চার্লি।

বোসো না।

না, যাই।

চার্লি সার্ভিস-রুমে বিং কবছে। তাব মানে এখুনি কাপ্তানবয হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে।

এলও।

চার্লি বলেছিল, দু'কাপ কফি।— তাব দিকে তাকিযে বলেছিল, কিছু খাবে?

সে ঘাড় নেড়েছে।

চার্লি বং-তুলি দিযে ছবিটা মুছে দিল। বলল, আমাব যে কী হয়! লোকটাকে কেন এত ভয পেলাম, সে তো সত্যি খেলা দেখাতে পাবে। সত্যি হিপনোটাইজ কবতে পাবে। মজাব খেলা। অথচ লোকটাকে নিযে আমাব দুশ্চিন্তাব শেষ ছিল না। নির্দোষও হতে পাবে। তোমাকেও কষ্ট দিলাম।

এই দ্যাখো।— বলে সে আর-একটা কাগজ লকাব থেকে বেব কবে ইজেলে লটকে দিল। পিন গুঁজে দিল, তাবপব বলল, বুনো ডেইজি ফুল আঁকছি না। মাথাটা পবিষ্কাব নেই। ঠিক আঁকতে না পাবলে ফুলটাকে অসম্মান কবা হবে। ববং দ্যাখো।— বলে সে কয়েকটা আঁচড় বুলিয়ে দিল তুলিতে। তাবপব বং। বড সবুজ একটা গোল কুমডোব মতো কী আঁকছে। কুমডোব গায়ে শুঁয়োপোকাব মতো লোম এঁকে দিচ্ছে, সবুজ নীল এবং ব্রাউন কালাব দিয়ে সে যে একটা ক্যাকটাস আঁকছে সুহাসেব বুঝতে কষ্ট হল না। তাবপব তুলি জলে ভিজিয়ে লাল বং দিয়ে কুমডোটাব মাথায় লাল-হলুদ মেশানো একটা

পদ্মফুল এঁকে ফেলল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যারেল ক্যাকটাস।

বাঃ! দারুণ তো দেখতে।— সুহাস সত্যি অবাক হয়ে গেছে ক্যাকটাসটা দেখে।

চার্লি বলল, বড় দুর্লভ জাতের ক্যাকটাস। বড়লোকদের কাছে আমার ঠাকুরদা শুধু এই ক্যাকটাস বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। আন্তরিকতা থাকলে জানো সুহাস, মানুষ সব পারে। সামান্য খামার তার, গোরু মোষ ভেড়া খামারে, কিছু টিলার মালিক তিনি, এলাকাটা ঊষর বলে শুধু ঘাস জন্মায়। ফসল ফলে না, ঢিবিগুলো বছরের অধিকাংশ সময় পাথর আর বুনো লতাপাতায় ঢাকা। তাঁর কী মনে হত কে জানে, ঘোড়ায় চড়ে কখনও তিনি দূর দূর পাহাড় অঞ্চলে চলে যেতেন, যেখানে যে দুর্লভ ফুল খুঁজে পেয়েছেন, সংগ্রহ করেছেন। ফুল ফুটিয়েছেন, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, ঢিবিগুলিতে সেই বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এমন এক আশ্চর্য বনভূমি গড়ে তুলেছিলেন, দেখলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে না যাওয়ার উপায় নেই। এবং এই করে তাঁর বুনো ফুল আর ক্যাকটাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন জানো, যুদ্ধ চলছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করছে। মিত্রপক্ষের সেনারা হটছে। মার খাচ্ছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিউগিনির সব দ্বীপগুলি জাপানিরা দখল করে নিয়েছে। আর আমার ঠাকুরদা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় স্নো বাটার কাপ ফুল পাওয়া যেতে পারে। কোথায় স্মুদ অ্যাসটার জন্মায়, কোথায় পাওয়া যাবে প্রেইরি ওয়াইলড রোজ, কোথায় পাওয়া যাবে ডেজার্ট স্পুন। আরিজোনা অঞ্চলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষটা যখন তাঁর পাহাড়, টিলাকে সাজিয়ে ফেলছেন, যুদ্ধ তখন টোকা মারছে ঘরের দরজায়। মানুষটার হুঁশ নেই।

সুহাস অবাক হয়ে শুনছিল। এই এক স্বভাব চার্লির, কথা বলতে শুরু করলে থামতে জানে না। কে বলবে চার্লি পলকে কাঁদতে পারে, হাসতে পারে? তাকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তার ঠাকুরদার গল্প বলার সময় সে কী যে ভাবত, বোধ হয় আরও কিছু মনে করার চেষ্টা করত।

বেটসি আমাকে ঠাকুরদার গল্প বলত, কত গল্প তাঁর। একবার আলপাইন অঞ্চলের দুর্লভ জাতের কচ্ছপ সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। মানুষ এই করে একজন ছোটখাটো ধনকুবের হয়ে যেতে পারে ভাবা যায় না। দুর্লভ জাতের এই বুনো ফুলের চাষ তুমি আমাদের দেশের ঊষর অঞ্চলগুলি ঘুরে বেড়ালেই টের পাবে সুহাস। গাড়ি ছুটিয়ে টেকসাসের গ্রামাঞ্চল পার হয়ে যাবার সময় দেখতে পাবে ব্ল্যাক-আইড সুসান ফুলের ছড়াছড়ি। তোমাকে তারা দুলে দুলে অভিবাদন জানাচ্ছে। কী যে মজা লাগে না। ঠাকুরদার কথা ভেবে তখন আমার চোখে কেন যে জল চলে আসে। আমি কী বোকা না, সুহাস! কত অকারণে কাঁদতে পারি।

না না, অকারণে কারও কান্না পায় না। আমি তো ভাবি না। তোমার ঠাকুরদা সত্যি গ্রেটম্যান বলব।

চার্লি তুলি জলে ভিজিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে শুকিয়ে নিচ্ছে। সে তার ইজেল ভাঁজ করে দেয়ালের হুকে সেঁটে দিচ্ছে। কাজগুলি এত যত্নের সঙ্গে করে যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ঠাকুরদার গল্প করছিল। গ্রেটম্যান বলায় সে খুবই খুশি। আর জাহাজে কে আছে, চার্লির এত কথা মন দিয়ে শুনবে! সুহাস টের পায়, এজন্যই চার্লি তাকে এত পছন্দ করে। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বলে ফেলে। জাহাজে কাকে পছন্দ করে, কাকে করে না, তাও অনায়াসে বলে ফেলতে পারে।

সেই চার্লি ঠাকুরদার গল্প বলতে শুরু করলে থামতে চায় না।

তোমার ঠাকুরদার তখন কত বয়েস?

তা অনেক, আমি ঠিক জানি না।

তোমার বাবা তখন কোথায়?

বাবা-কাকাকে ঠাকুরদা একদম পছন্দ করতেন না।

তারপর চার্লি কী ভাবল কে জানে! তার দিকে এক পলক তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে! পারিবারিক কথা একজন নেটিভ ছোকরাকে বলা ঠিক হবে কি না তাও ভাবতে পারে। কিন্তু সুহাস জানে, চার্লির কোনও দ্বিধা থাকার কথা না। বিশ-বাইশ মাসে তার অনেক প্রমাণ সে পেয়েছে। অত্যাচারও কম করেনি। সে কথা বলত না বলে রাগে ফুঁসত। একজন সাহেব ছোকরার সঙ্গে সে কী কথা বলবে! তা ছাড়া কাপ্তানের পুত্র, এমনিতেই নানা আতঙ্ক, পান থেকে চুন খসলেও বিপদ, কে চায় আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনতে?

জানো, আমার বাবা-কাকা ঠাকুরদার দুঃখ বুঝল না। ক্যাথলিকরা একটু বেশি পিউরিটান হয়। তাঁর নিজস্ব গির্জা, সমাধিক্ষেত্র সব কলুষিত হোক চাইতেন না।

ধর্মস্থান কেউ কখনও কলুষিত করতে পারে! কী জানি, কীভাবে করতে পারে জানি না। ঈশ্বরকে কেউ ছোট করতে পারে।

চার্লি মাথা নিচু করে বলেছিল, বাবা-কাকা দু'জনেই ডিভোর্সি বিয়ে কবেন। তোমাকে বলা ঠিক হল কি না জানি না। কিন্তু সুহাস, তোমাকে ছাড়া কাউকে বলতেও পাবব না।

আরে না না।— সুহাস উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, চলো বাইবে গিয়ে বসি। গুঁফো লোকটাকে দেখে তোমার মন ভাল নেই।

বাবা-কাকাকে ঠাকুরদা অধার্মিক ভাবতেন।

সুহাস দরজা খুলে বের হবার মুখে বলল, ডিভোর্সি বিয়ে করলে ভাবতেই পাবেন। পিউবিটানদের এই একটা দোষ, বুঝলে! তাঁরা সহজে কিছু মেনে নিতে পারেন না। আমার পিসিকেও দেখেছি, কিছুতেই স্বপাক ছাড়া খাবেন না। বিধবা মানুষ। অসুস্থ। তবু তিনি তিনবার স্নান করবেন। সব সময় অশুচিভাব। দরজার বাইরে যেন তাঁকে অশুচি করার জন্য সব মানুষজন উঠে পড়ে লেগেছে।

চার্লি বোধ হয় এতে কিছুটা মর্মাহত। সে যে ঠাকুরদাকে কিছুতেই ছোট কবতে চায় না। সে হঠাৎ বলে বসল, তাই বলে একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে হাজির হলে ঠাকুরদার মনে হবে না, তাব সুপুত্র দুটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে!

তোমার ঠাকুরদা তাই বুঝি ভাবতেন!

ভাববেন না তাঁর এত যত্নে গড়ে তোলা স্বপ্ন দুটি ছেলেই তছনছ কবে দিলেন! বাবা তো বেগে চলেই গেলেন ওয়েলসে! বউ-ছেলেপিলে পড়ে থাকল দেশে।

তুমি তখন কোথায়?

আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, বোধহয় ওখানে।

সুহাস বোট-ডেকে এসে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। বোটেব আড়ালে বসায় সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া সবাসরি তার গায়ে লাগছে না। চার্লি তার পাশে বসে আকাশ দেখছে। একটাও কথা বলছিল না। আকাশে নক্ষত্রমালা। আর শহরের বাড়িঘরেব আলো দু'জনকেই বড় বেশি অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল।

চার্লি সহসা নির্জনতা ভেঙে দিয়ে বলেছিল, আমার কেউ নেই সুহাস। রেগে-মেগে কিছু বলে ফেললে তুমি কিন্তু রাগ কোরো না।

কেন, তোমার মা!

না, তিনি বেঁচে নেই। জন্মাবার দু' বছরের মধ্যেই তাঁকে হারিয়েছি। বাবা কার্ডিফে এলেন, মা আসতে রাজি হলেন না। তিনি ইস্ট টেকসাসে ক্যাডো লেকের এক বাগানবাড়িতে থেকে গেলেন। সেখানে বেটসি, আমি আর মা। আমার বৈমাত্রেয় দিদিরা, দাদারা, নিজের দিদিরা কোথায় যে কে ছিটকে পড়ল কিছুই জানি না সুহাস।

ধীরে ধীরে সুহাস টের পাচ্ছিল, চার্লির মধ্যে গোপন কষ্টের শেষ নেই। এবং এই সব দুঃখ-কষ্ট সে একদম সহ্য করতে পারে না। যার এত প্রভূত সম্পত্তি, সে কেন জাহাজে ঘুরে বেড়ায়, তাও মাথায় আসে না। কিংবা কাপ্তান কেন দু' সফরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছেন তাও সে জানে না। চার্লির তো এখন লেখাপড়ার সময়। স্কুল, খেলাধুলা, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ি করে হুসহাস বের হয়ে পড়া, কত কিছুই যে চার্লির শোভা পেত। সে তা না করে জলে-জলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শেষে যা বলল, তাতে সুহাস স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

চার্লি অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় বলল, নিজের বলতে বেটসিকে জানতাম। জাহাজে আসার আগে তিনিও মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তবে দুর্ঘটনা না খুন এটা এখনও আমার মাথায় আসছে না।

সুহাস বলতে পারল না, খুন যদি হয়, কে খুন করেছে? তোমাদের দেশের আইন তো খুব জোরালো। পুলিশও খুব বিশ্বস্ত। তারা এই দুর্ঘটনার কোনও কিনারা করতে পারেনি।

কিন্তু সে কিছুই বলতে পারেনি।

আজ আবার তাকে ডেকে নিয়ে চার্লি বলছে, ম্যাককে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে?

সুহাস যে কী করবে! সে তো একা এই জাহাজে। এমনিতেই কত উপদ্রব। তার উপর চার্লির বাড়তি সংশয় তাকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তবু কেন যে ভাবল, ম্যাকের কেবিনে তার যাওয়া দরকার।

সকালে ম্যাকের কেবিন খালি। ম্যাক নেই। বাইরে থেকে দরজা লক করা। ম্যাক না-ও থাকতে পারে। তবে চার্লির ধারণা ছিল, ম্যাক সকালে উঠে হাঁটতে পারবে না। পায়ে জোর লেগেছে। হয়তো কেবিনেই শুয়ে আছে। সে যে পড়ে গেছে সিঁড়ি ধরে কেউ জানে না। সুহাসের ধারণা, তার পড়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। মদ খেলে হুঁশ থাকে না। রোজই তো প্রায় ধরতে গেলে এক কাণ্ড। সেজেগুজে বিকেলে নেমে যায়। ফেরে অনেক রাতে। এসেই জাহাজের সিঁড়ির নীচে চিল্লাতে থাকবে, হাই কোয়ার্টার-মাস্টার! হাই সুখানি।

কোয়ার্টার-মাস্টার অর্থাৎ সুখানি যিনিই গ্যাংওয়েতে পাহারায় থাকুন, ঠিক টের পান মক্কেল হাজির। তাকে তখন ধরে তুলে আনতে হবে। ধরে তুলে না আনলে সিঁড়ির নীচে জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। নয় ঘুর ঘুর করবে। সিগারেট খাবে। আর যত জাহাজি খিস্তি আছে আওড়াবে। আর মাঝে মাঝেই হল্লা, হাই সুখানি! হাই কোয়ার্টার-মাস্টার! তারপর যখন তাকে হাত ধরে তুলে আনা হবে, টলতে টলতে হ্যান্ডশেক করবে। বলবে, থ্যাংক ইয়ো গুডম্যান। ভেরি গুডম্যান। কিছুক্ষণ আগে সুখানির বাপ-মা উদ্ধার করেছে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কে বলবে। তারপর কেবিনের দেয়াল ধরে ধরে দরজাটি খুলে ইঁদুরের মতো নিজের গর্তে লুকিয়ে পড়বে। এত গেলে যে সিঁড়ি ধরে উঠে আসার ক্ষমতা থাকে না। ইচ্ছে করলে যে পারে না তাও নয়, তবে আতঙ্কিত। যদি পড়ে যায়। সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে জাহাজের তলায়। যতই আষ্টেপৃষ্ঠে গিলুক, সে খেয়ালটি বাবুর ষোলো আনা। সুহাস সকালে কাজে বের হয়ে এমন সাত-পাঁচ ভাবছিল। ম্যাককে কেবিনে পাওয়া গেল না। সুহাস কী ভেবে বলল, মাতাল লোক পড়ে যেতেই পারে।

ম্যাকের কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সুহাসের আরও মনে হল, ম্যাক হয়তো ফিরেই চার্লির কেবিনে ঢুকতে চেয়েছিল, মাতালদের স্বভাব সে জাহাজে উঠে ভালই টের পেয়েছে। তাকে ঠেলে কেউ ফেলে দিয়েছে, খুবই অবান্তর কথা। চার্লিরও এটা বোঝা উচিত ছিল। থার্ড কিংবা ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে ঢুকেও মাতলামি করতে পারত। দরজা বন্ধ দেখে হয়তো বোট-ডেকে উঠে গেছে।

সে বলল, ম্যাক সুস্থ ছিল তো?

চার্লি পকেট থেকে চিপিং করার হাতুড়ি বের করে নীচে ঠুকছিল। হাতুড়িটা একটু তার আলগা হয়ে গেছে। সে সুহাসের কথা যেন বুঝতে পারেনি।

না, বলছিলাম, সুস্থ ছিল তো?

সুস্থ থাকবে না কেন?

তুমি দেখছি চার্লি জাহাজে থাকো না! কিচ্ছু জানো না মতো কথা বলছ?

আরে, কাল ম্যাকের জন্মদিন গেছে।জন্মদিনে সে কিছু খায় না। সকালেই তো বলল, আজ আর বের হচ্ছি না। সারাদিন বাইবেল পড়ব। কত সুন্দর সুন্দর কথা বলল। বলল, গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট। দেখবে আমরা শিগগিরই হোমে ফিরে যাব।

তা হলে বলছ, কাল ম্যাক জাহাজ থেকে নামেনি?

তাই তো মনে হচ্ছে। মুখে গন্ধ-টন্ধ পেতাম না!

যা চিজ, নেশা না করে থাকার পাত্র!

চার্লির এই এক দোষ, তার কথায় সায় না দিলেই গুম হয়ে যায়। ম্যাক জন্মদিন পালন করেছে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে। সারাদিন ঘরে স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের ছবি সামনে রেখে বসে ছিল। সে জাহাজে জন্মদিন এভাবেই পালন করে থাকে। দেশেও। সেদিন সে সব ব্যাপারেই সাত্ত্বিক, সুহাসকে বিশ্বাস করতেই হবে।

আর কী বলল?

বলল, লুক আপ দেয়ার ইনটু দ্য স্কাই, হাই এভার ইয়ো। বলল, গড ইজ অলমাইটি অ্যান্ড ইয়েট ডাজ নট ডেসপাইজ অ্যানিওয়ান।

ম্যাক তো দেখছি সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো কথা বলছে। তাকে আমরা অপছন্দ করব কেন? একটু বেশি মাতাল ছিল না তো?

তার মানে!

মানুষ বেশি হতাশ হলে এসব কথা বলে। তখন মাথায় ঈশ্বরচিন্তা আসে। কিছু তো করার থাকে না। কিন্তু গেল কোথায়?

জানি না!

রাগ করছ কেন? নীচে নেমে যায়নি তো!

তারপরই মনে হল, ওয়াচ ভাগ হয়ে গেছে। যে যার ওয়াচে হয়তো নেমে গেছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে ওয়াচ শুরু হয়। অন্তত ইঞ্জিন-জাহাজিদের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। আটটা-বারোটায় ওয়াচ দিতে যদি নেমে যায় ইঞ্জিন-রুমে! সে পোর্ট-সাইডের দরজা খুলে ইঞ্জিন-রুমে ঝুঁকে দেখল। ম্যাককে দেখতে পেল না। সিঁড়ির নীচে বিশাল এলাকা জুড়ে ইঞ্জিন-সিলিন্ডার। অতিকায় দানবের মতো সিলিন্ডার। তার পেটের ভিতর থেকে থামের মতো বিশাল তিনটা পিস্টন বড় নেমে গেছে। গ্রিজার বহমত তেল দিচ্ছে। কিন্তু ম্যাককে দেখা গেল না। সে সিঁড়ির আর দু' ধাপ নীচে ঝুঁকে দেখল, সিলিন্ডার কলামে হেলান দিয়ে ম্যাক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপরই মনে হল, ম্যাকের তো ইঞ্জিন-রুমে নামার কথা নয়। ওয়াচ ভাগ হলে নীচে তার ডিউটি পড়ে না। তবে কারও হয়ে যদি ওয়াচ দেয়? সুহাস দৌড়ে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ম্যাক এখনও ভগবত চিন্তা করছে। ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে না। আমি যাচ্ছি।

চার্লি দাঁড়িয়ে থাকল।

এটা চার্লির স্বভাব। চার্লি তার কথা ঠিক বুঝতে পারে না, না কি ঠিকই সব বোঝে? সে যে বিদ্রূপ করছে ম্যাকের ঈশ্বরচিন্তার ব্যাপারে, ঠিকই টের পেয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি দুর্বলতা কম-বেশি সবারই থাকে। চার্লিরও আছে। জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। মাটি মানে ফসফেট। অজস্র পাহাড়, দ্বীপ এবং লেগুনের ছড়াছড়ি কোরাল সি-তে। সমুদ্রটা নাকি কত জাহাজের কবরভূমি, অন্তত বিশাল এই এলাকায়, অর্থাৎ বিশমার্ক সি এবং কোরাল সি-তে শত শত জাহাজ সমুদ্রের অতলে হারিয়ে গেছে। নিখোঁজ হয়ে গেছে। হাড়গোড় ছাড়া তাদের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সামুদ্রিক মাছেরা ঘোরাফেরা করছে চারপাশে। নানা জাতের মাছেরা দাঁত সাফসোফ করছে, মাছেদের ক্লিনিং সেন্টার হয়ে গেছে জাহাজগুলি। অতিকায় বান মাছের আড্ডা। কুমিরের মতো মুখ দেখতে সব হাজার হাজার বান মাছ কিলবিল করছে জাহাজের ফলকায় কিংবা ইঞ্জিন-রুমে। আর তখন কিনা, ঈশ্বর নিয়ে ঠাট্টা! বিশমার্ক সি কে তো জাহাজের গণকবর বলা হয়। অবশ্য গণকবর বলা যাবে কী করে? তা বলাও যেতে পারে। জাহাজ ডুবলে মানুষও ডুববে। পাঁচ-সাত হাজার করে সেনা জাহাজ, মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। সুতরাং গণকবরও বলা যায়। নিষ্ঠুর যুদ্ধ এই রকমেরই হয়ে থাকে। দ্বীপের দখল নিয়ে লড়াই, ফ্লাই বোট থেকে এয়ার ক্যারিয়ার, কী না ডুবেছে! ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান গোঁত্তা খেয়ে পড়েছে সমুদ্রে, তারপর বুড়বুড়ি তুলে ডুবে গেছে। এত কথা সুহাসের জানার কথা নয়, রাতে এই নিয়েই বায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল জাহাজিরা। ছোটখাটো বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তবে দমন করা গেছে। ইঞ্জিন-সারেং খুবই ঠান্ডা মাথার লোক। তিনি বেইজ্জত হয়েও মাথা গরম করেননি। জাহাজ যাচ্ছে বিশমার্ক সি-তে জনকবরে কিংবা গণকবরে। জাহাজের কবরভূমিকে জনকবর আর লোকজনের কবরভূমিকে গণকবর বলাই সমীচীন ভাবল। অন্তত জাহাজিদের মাথাব্যথার কারণ এটাই। তখন ঈশ্বর নিয়ে ঠাট্টা চার্লি সহ্য করবে কেন। তা ছাড়া চার্লির ত্রাসও কম না, কেন এই ত্রাস সে জানে না। কে তাকে অনুসরণ করতে পারে সুহাস বোঝে না। চার্লি চুপি চুপি তাকে ডেকে এনেছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি জানা যায়, ম্যাক কোনও অনুসরণকারীকে দেখেছে কি না। কিংবা সেই অনুসরণকারী যদি হয়? পিকাকোরা পার্কে দেখা লোকটা সেই কি না। কিংবা সিম্যান মিশনের সেই গোঁফওয়ালা লোকটা কে, সে যদি চেনে।

অবশ্য চার্লি তাকে কিছুই খুলে বলেনি। ম্যাক পড়ে যেতেই পারে, পা ফসকেও পড়ে যেতে পারে, কিন্তু এত নিশ্চিন্ত কী করে যে, সে পা ফসকে পড়ে যায়নি, কেউ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? কার এত দায় পড়েছে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য! জাহাজ নিজেই যখন ডুবতে যাচ্ছে, অন্তত জাহাজিদের কথাবার্তায় এমনই মনে হয়েছে তার, তখন আগ বাড়িয়ে একজনকে ঠেলে ফেলে দেবার কী দরকার, জাহাজ তো যাচ্ছে বিশমার্ক সি-তে, তার জনকবরে। এমনিতেই ডুববে।

গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট, এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ত্রাসের কী থাকতে পারে? সুহাস অবশ্য প্রবলভাবে ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস করে না। তাই বলে এই নয় যে সে রাতে একা বরফ-ঘরে নেমে যেতে পারবে। কারণ ওটাও একটা জীবজন্তুর কবরখানা। কিংবা মানুষের ক্ষুধা কত প্রবল। হাজার লক্ষ গোরু বাছুর মুরগি হজম করে দিচ্ছে প্রতিদিন, এই শরীরের দিকে তাকালেও মনে হয় জীবজন্তুর কবরখানা। তা সে বাইশ মাসে গোটা দশেক আস্ত ছাগল তো হজম করেছেই। দৈনিক রেশনে এক পোয়া মটন পেলে, বিশ-বাইশ মাসে কটা ছাগল লাগতে পারে? অন্তত সে চার্লিকে এটুকু বোঝাতে পারলেও আশ্বস্ত হতে পারত। গণকবর বলো, জনকবর বলো সব জায়গাতেই আছে। পিছু ধাওয়া করলেও শেষ পর্যন্ত কবরের দিকেই মানুষ ধাওয়া করে। ঘাবড়াবার কী আছে?

চার্লি কথাই বলছে না।

ধুস, ভাল লাগে! সে হাঁটা দিল।

যাবে না বলছি!

সুহাস ফিরে তাকাল। আর তখনই দেখল সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার বব এদিকটায় আসছে। খুবই কড়া ধাতের মানুষ। এক ধমকে ফাইভার জামা-প্যান্ট খারাপ করে ফেলে। চোখ ভাঁটার মতো, বেঁটেখাটো মানুষ, সব সময় তেলে-বেগুনে ফুটছে। একজন সাধারণ নেটিভ জাহাজির ঔদ্ধত্য তিনি পছন্দ নাও করতে পারেন। অফিসার্স কেবিনের এলিওয়েতে কেন? বেয়াদপির সীমা থাকা উচিত। তাঁকে দেখলে কেন যে সুহাসেরও হৃদকম্প উপস্থিত হয় সে জানে না। চুরুট নিভে গেছে বলে তিনি দাঁড়ালেন, চুরুট ধরিয়ে নেবার জন্য লাইটার জ্বালালেন না, কাজকর্ম ফেলে চার্লির সঙ্গে বেয়াদপ ছোকরা কী করছে, করতে পারে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে তা আঁচ করতে চাইলেন। সে কিছুই বুঝল না। মানুষটি সারেঙের প্রায় ধর্মাবতার। সারেং তার ধর্মাবতার। সুতরাং ফল ভোগ করতে হতে পারে ভেবেই সে আরও দ্রুত হেঁটে উইনচে যাবার জন্য পা বাড়াল। আর তখনই চার্লি যা করে, ছুটে এসে হাত টেনে ধরল। বলল, কোথায় যাচ্ছ?

সে এলিওয়ের দিকে না তাকিয়েই বলল, উইনচে।

তবু হাত ছাড়ছে না চার্লি। সে বিরক্ত হয়ে বলল, সেকেন্ড দেখছে।

কী ভেবে হাত ছেড়ে দিল চার্লি। সুহাস দেখল, সেকেন্ড ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাচ্ছেন! এলিওয়েতে কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু চার্লির উপস্থিতি ছাড়া আর কিছু নেই। মাথা দেয়ালে কাত করে দিয়েছে। ভঙ্গিটা জিশুর ক্রুশবিদ্ধ ছবির মতো। চার্লি এত সুন্দর দেখতে, আরও বড় হলে সোনালি দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেলে জিশুর প্রায় যেন প্রতিচ্ছবি হয়ে যাবে। সে ওয়ার পিন ড্রামে ঝুঁকে পড়ল।

জাহাজ ছেড়ে দেবে। তীর্থযাত্রীর মতো সবাই যে যার সামান ঠিক করে নিচ্ছে। কত দূরের যাত্রা। কারপেন্টার ঘুরছে ডেকে। হাতে পেতলের জল মাপার স্টিক। সে নোট নিচ্ছে, কতটা আর জলের প্রয়োজন। জলের ট্যাংকগুলি সবই প্রায় ইঞ্জিন-রুমের খোলের তলায়। সে জলের পরিমাপ টুকে নিচ্ছে।

কেউ বসে নেই। ডেরিক নামানো হয়ে গেছে। ডেক-জাহাজিরা মাস্তুলে উঠে গেছে। কেউ ফলঞ্চা বেঁধে জাহাজের কিনারায় ঝুলে পড়েছে। বারোটা-চারটা ওয়াচেই জাহাজ ছাড়বে। চারটে বাজতে না বাজতেই সাঁজ লেগে যাবে। সেকেন্ড নেমে গেল ইঞ্জিন-রুমে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারও নেমে যেতে পারেন। জাহাজ ছাড়ার আগে সব একবার ভাল করে দেখে নেওয়া। জল এবং জ্বালানি দুটোই জাহাজের প্রাণ। সুহাস বিশ-বাইশ মাসের সফরে এটা ভালই টের পেয়েছে। মাঝদরিয়ায় জল নেই, কয়লা নেই, ভাবাই যায় না।

খালি জাহাজ। ফলকা স্টিক ব্রুম দিয়ে সাফ করে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ঝকঝকে তকতকে জাহাজ। যেখানটায় রং চটে গেছে, সেখানে রং লাগানোর কাজ থেকে যায়। সারা সফরে সে দেখেছে, ডেক-জাহাজিরা রং করেই যাচ্ছে, একদিকে করছে অন্যদিকে রং চটে যাচ্ছে। নোনা হাওয়ায় রং বড় তাড়াতাড়ি খেয়ে যায়। সারাদিন চিপিং চলছে, তেলজুট দিয়ে লোহার পাত মোছা হচ্ছে। কেরোসিন তেলে সিরিশ কাগজ ডুবিয়ে রেলিং ঘষা হচ্ছে। দু'-চার হপ্তা যেতে না যেতেই বেলিং নোনা হাওয়ায় জং ধরে যায়। জাহাজে কাজের অন্ত থাকে না।

এই এক মুশকিল। বন্দর ছেড়ে যাবার আগে জাহাজিরা চায়, আর-একবার ডাঙায় নেমে যদি ঘুরে আসা যেত! ডাঙা যে কত প্রিয় নাবিকদের! বন্দর ছেড়ে যাবার সময় প্রায় সবাই উঠে আসবে ডেক-এ। যতক্ষণ বন্দর দেখা যাবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ক'দিনেই ডাঙার মানুষজনের সঙ্গে দোস্তি হয়ে যায়। কোথায় কতদূরে এইসব দেশ, মানুষজন, পাহাড়, সমতল ভূমি এবং কত সব বিচিত্র গাছপালা, ফুল ফল পাখি মানুষের কাছে কত প্রিয় ডাঙা ছেড়ে না গেলে বোঝা যায় না। যে যাব মতো সামান্য আশ্রয় খোঁজে। ঘরবাড়ির মতো বাঁচতে চায়। ফুল-ফলের দোকানে ঢুকলে সুন্দরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। শারীরিক সম্পর্কই বড় কথা নয়, একটুখানি বসে যাওয়া, একটু অন্তরঙ্গ আলাপ এবং মানুষজন যদি কেউ দেশ-বাড়ির খবর নিতে চায় অকপটে তারা সব বলে ফেলে। কখনও উপহার দেয়, কখনও উপহাব তারাও পায়। ম্যাক তো বন্ধুত্ব হলেই একটি মুখোশ উপহার দেয়। কেউ ভাল টোবাকো দেয। কিছু স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আসা, কিছু রেখে আসা।

সুহাস টেব পেল, সেও এই টানে উপরে উঠে এসেছে। প্রপেলার নড়ে উঠলেই সে ফোকশাল থেকে দৌড়ে উপরে উঠে এসেছিল। জাহাজের নোঙর তোলা হচ্ছে, জাহাজের আগিলে চিফ অফিসাব দাঁড়িয়ে আছেন। পিছিলে সেকেন্ড অফিসার। জাহাজ বাঁধাছাদার কাজ যেমন কঠিন, জাহাজ নোঙব তুলে ফের ভেসে পড়ার কাজটাও কম কঠিন না। ডেক-জাহাজিরা দুটো দল হয়ে গেছে। ডেক-সাবেং পিছিলে, ডেক-টিন্ডাল আগিলে। বন্দর থেকে হাসিল আলগা করে দেওয়া হচ্ছে, সব সাংকেতিক কথাবার্তা। হাত তুলে দিলে হাসিল ঢিল দেওয়া হচ্ছে। নামিয়ে দিলে হাসিল গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কম্পাতেব কাছিগুলিও গুটিয়ে রাখা হল। প্রপেলার ঘুরছে। স্টিয়াবিং-ইঞ্জিনের কক কক শব্দ। জাহাজটা ভেসে পড়ল। জাহাজটা ক্রমে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। লায়ন রকেব পাশ দিয়ে জাহাজ যখন গভীব সমুদ্রে নেমে এল, তখন দূরের শহরটা মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে। দিগন্তে অজস্র নক্ষত্র ফুটে আছে। মনে হয় আশ্চর্য এক দেশ পেছনে ফেলে তারা সমুদ্রে নেমে গেল। সহসা সজাগ হয়ে যাওয়ার মতো, সুহাস টের পেল, চার্লি চুপচাপ তার পাশে জাহাজেব একটা বিটে বসে আছে। কখন এসে সে বসল টেবই পায়নি। চার্লি কথা না বলে থাকার পাত্র না। এতক্ষণ চুপচাপ তার পাশে বসে আছে, সে খেয়ালও করেনি। সবার মতো বন্দরের জন্য যে টান গড়ে ওঠে, বন্দর ছেড়ে গেলে যে বিচ্ছেদ গড়ে ওঠে, তারই বেদনাতেও সেও কেমন মগ্ন ছিল। এভাবে সে কত বন্দর ফেলে এসেছে পিছনে, সামনে আবও কত বন্দব পাবে, কিংবা মাটি টানার কাজে যেখানেই সে যাক, ডাঙার খোঁজ পাবেই। চার্লি কি তাব উপব এখনও বাগ পুষে রেখেছে? অথবা রাগ দেখাবার জন্যেই তার পাশে এসে বসেছে, অথচ একবারও বলেনি, সুহাস, তোমার ঠান্ডা লাগছে না! কনকনে শীতে একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে থাকলে ঠান্ডায় কষ্ট পাবাব কথা। সে এটা ভালই বোঝে। আসলে সে ঠান্ডায় উপরে উঠলে সবসময় কম্বল গায়ে দেয়। শুধু কাজেব সময় সে জাহাজি পোশাক পরে বের হয়। কিনারায় গেলে সে গরম কোট-প্যান্ট পবে। তার মাত্র একটাই গরম প্যান্ট, গরম কোট। তাও কার্ডিফের সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। খুব সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল। তাকে নাকি কোট-প্যান্ট পরলে খুব সুন্দর লাগে দেখতে।

এত শীত যে, চার্লিও গরম পুলওভার, তার উপর জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে। পায়ে গরম মোজা এবং শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে আজ যথেষ্ট জামাকাপড় গায়ে বেখেছে। রাগ যে পুষে রেখেছে, এতেই সে আবও বেশি টের পায়। সুহাস শীতে কষ্ট পেলেও তাব কিছু যেন আসে যায় না। রাগ না থাকলে, ঠিক বলত, আরে, তুমি মানুষ না! এই ঠান্ডায় গায়ে কিছু না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ ডেকে? যখন তখন তার উপব এত অভিমান কেন পুষে রাখে চার্লি, সুহাস কিছুতেই ভেবে পায় না।

এত ঠান্ডা যে সামান্য সোয়েটাবে শীত যাবার কথা না। সেও চার্লিকে দেখে না দেখার ভান করল।

ডেকের সর্বত্র আলো জ্বালা। মাস্তুলের দু' দিকে দুটো আলো জ্বলছে। চিফ কুকের গ্যালির মুখে আলো বোট-ডেকে, উইংস, এলিওয়েতে আলো। পোর্ট-সাইডের ছাদের নীচে সার সার আলো। অন্ধকার ন যে সে চার্লিকে দেখতে পাবে না। অন্ধকার নয় যে চার্লি সুহাসকে দেখতে পাবে না। দু'জনই দেখছে দু'জনকে। অথচ নিরুত্তাপ।

শহর আর দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজ দুলছে। জাহাজ ধেয়ে চলেছে। উপর-নীচে যেদিকে চোখ যায়, কিছুই দেখা যায় না। কেমন আচ্ছন্ন এক আধিভৌতিক সমুদ্রে তারা যেন যাত্রা করেছে। আকাশ কিছু নক্ষত্র নিয়ে বিরাজ করছে ঠিক মাস্তুলের মাথা পার হয়ে অনেক উপরে সেই সব নক্ষত্র নড়াচড়া করছে তাও ঠিক। তবু মনে হয় ন তখন জাহাজে পিচিং শুরু হয়েছে বলে, এই আকাশ এবং নক্ষত্রমালা স্থির থাকতে পারছে না। চার্লি উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে থাকল। সে বোধহয় তার কেবিনে উঠে যাচ্ছে। চার্লির এই অবোধ অভিমান মাঝে মাঝে সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তার কী দোষ, সেকেন্ড তাকে পছন্দ করে না। সেকেন্ড সাবেংকে ডেকে অভিযোগ করলে তখন কী হত! অভিযোগ করতেই পারেন, কাজ ফেলে চার্লিব সঙ্গে আড্ডা জাহাজে কি এজন্য রাখা হয়েছে? চার্লির পক্ষে যা শোভন, তার পক্ষে তা কত অশোভন বুঝতে শিখবে না। রাগ করলেই হল!

সে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

তাবপর ভাবল, শত হলেও চার্লি কাপ্তানের পুত্র। তার ঠাকুরদা ছোটখাটো ধনকুবেব। সে একজন সামান্য মাইনের ইঞ্জিন-রুমের কর্মী। তার কথা ছিল কয়লা টানার। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে তাকে উইনচ মেরামতের কাজে রাখা হত না। ফাইভারের হেলপার। এখন তো সে নিজেই উইনচের যন্ত্রপাতি খুলে মেরামত করতে পারে। দরকারে ফাইভার তাকে দিয়ে আবও সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করায়। সফব শেষে কাপ্তান যদি কোনও প্রশংসাপত্র দেন, তবে সে অন্য জাহাজেও কাজটা পেয়ে যেতে পাবে। বছর পাঁচেকের অভিজ্ঞতার পর সে পরীক্ষায় বসলে, জাহাজে সে ফাইভার হয়ে যোগ দিতে পাববে তাও জানে। অন্তত নিজের আখেরের কথা ভেবেই তোয়াজ করছে চার্লিকে। চার্লি না থাকলে তাকে সারা সফব কয়লা টেনেই মরতে হত। কোনও অদৃশ্য হাত অন্তরালে কাজ করছে, এবং সে যে চার্লি ছাড়া কেউ নয় এটাও সে বোঝে। নিজের গরজেই চার্লিকে তোষামোদ করে চলা দরকার। সুযোগ জীবনে বেশি আসে না এও সে বোঝে।

চার্লিকে ধরার জন্যে সে ছুটে গেল। হালকা পাতলা চার্লি যেন বাতাসে ভর করে হেঁটে যাচ্ছিল তাকে দেখলে মনে হয়, সে ভাল নেই। কোনও অশুভ আত্মার প্রকোপে পড়ে গেছে। অন্তত হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হয়। কাকে দেখে সে এত ভয় পায় বোঝে না। কত লোকই তো পিকাকোনা পার্কে বেড়াতে আসে। তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করছে টের পায় কী করবে। না কি কোনও মানসিক বিকার? চার্লিব হাঁটার ধরন একদম পছন্দ হচ্ছিল না। ভাগ্যিস চিফ কুকের গলা পাওয়া যাচ্ছে। চিফ কুকের গ্যালিব পাশে সিঁড়ি। সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে যাওয়া যায়, আবার নীচে এলিওয়েতে ঢুকেও কিছুটা হেঁটে ওপরে ওঠার সিঁড়ি পাওয়া যায়। চার্লি এলিওয়েতে ঢুকে যাবে, না চিফ কুকের গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে, বুঝতে পারল না।

সে ডাকল, চার্লি।

চার্লি যেন ঘোরে পড়ে হাঁটছে।

সে ফের ডাকল, চার্লি।

হুঁশ ফিরে আসার মতো তার দিকে চার্লি ঘুরে দাঁড়াল।

কিছু বলবে?— সুহাস বলল।

না।

সুহাস এবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কখন এসে বিটে বসে থাকলে টেরই পাইনি।

পাওনি ভাল।

চার্লি আর কথা বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না।

সুহাস বলল, সত্যি তোমাকে আমি দেখতে পাইনি। ম্যাক কিছু বলল?

কী বলবে?

সে দেখেছে কি না, কে তাকে ঠেলে ফেলে দিল। সে মনে করতে পারছে কি না? সেকেন্ড তাড়া করলে আমি যেতাম। তুমি তো তার সঙ্গে দেখা করতে পারতে। ওর কি পা ভেঙেছে?

জানি না।

দেখা হয়নি তার সঙ্গে?

না!

কাটা কাটা কথা শুনতে কাঁহাতক ভাল লাগে। চার্লির এই স্বভাব। সে যে তার উপর ক্ষোভ পুষে রেখেছে কথাবার্তার ধরন দেখেই টের পাচ্ছে। তবু আখেরের কথা ভেবে যতটা পারা যায় তোয়াজ করা।

যাবে ম্যাকের কেবিনে?

বাবা পছন্দ করেন না, যখন-তখন যার তার কেবিনে ঢুকি।

অঃ।— সে আর কী বলবে।

আমি যাব? জিজ্ঞেস করব? কে তাকে ফেলে দিল, সে দেখেছে কি না, মনে করতে পারছে কি না?

না। তোমাকে আর জড়াতে চাই না।

আমাকে জড়াতে চাও না মানে। কিছু বুঝছি না।

চার্লি এই বাচ্চা নাবিকটির চোখ-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে কিছুটা যেন ঠান্ডা মেরে গেল। বলল, ভাল গরম পোশাকও নেই তোমার। কী যে খারাপ লাগে! ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখে পড়লে কে দেখবে! ডেকে দাঁড়াবে না। কী শীত!

বলে চার্লি সিঁড়িতে উঠে গেলে সে বোকার মতো নীচে দাঁড়িয়ে থাকল।

চার্লি বোট-ডেকে উঠে তার জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল নীচে। বলল, এটা পরবে। কখনও যদি দেখি ঠান্ডায় ডেক-এ উঠে এসেছ কম্বল গায়ে দিয়ে, রক্ষা থাকবে না কিন্তু! কী বিশ্রী লাগে। গায়ে আজ তাও নেই।

সে যেন সাহস পেয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল, বোট-ডেকে উঠলেই ব্রিজ থেকে সব দেখা যায়। সেখানে যে কাচের ঘরে সুখানি কিংবা চিফ-অফিসারের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে নেই কে বলবে! রাত খুব একটা হয়নি, তবু কাপ্তান কিছু মনে করতে পারেন। ডাইনিং হলে নিশ্চয় মিউজিক শুরু হয়ে গেছে। মিউজিক বেজে উঠলেই যে যার মতো ডাইনিং হলে রাতের আহার পর্ব সারতে যায়। চার্লিও যাবে। তাকে এ সময় বিরক্ত করা আর ঠিক হবে না হয়তো। সে নীচে থেকেই জ্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়েই বলল, আর ক'টা তো দিন। তারপর তো গরম পড়ে যাবে। ইকুয়েডরের কাছাকাছি জাহাজ ঘোরাঘুরি করবে। দরকারে না হয় কিনে নেব।

চার্লি আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ পুষে রাখতে পারল না। সে নীচে নেমে এল। এই নাবিকটির এত আত্মমর্যাদা সে যেন কখনও টের পায়নি। তার গুচ্ছের পোশাক। দুটো-একটা কাউকে দিলে বাবা খুশিই হবেন। তার মায়া-দয়া আছে ভাবতে পারেন। মানুষের মায়া-দয়া থাকা দরকার, অন্তত বাবা তাকে তাঁর ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে এমনই বলেন, তিনি নির্যাতিতদের কথা বলতে গিয়েও তাই বলেন। কিন্তু সুহাস যে জ্যাকেটটা ফিরিয়ে দিল তাকে।

তারপর মনে হল চার্লির, জ্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে সত্যি অপমান করেছে সুহাস। আসলে ক্ষোভ থেকে। তুমি সুহাস টানা সেই থেকে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে আছ, বোধগম্যি বলে কিছু কি নেই। এও হতে পারে, ঠান্ডা সম্পর্কে সুহাসের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার জানাবার জন্যেই জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে দিয়েছে। তারপর খেয়াল হয়েছে, কাউকে এভাবে অপমান করা যায় না। না কি সে সকালের ক্ষোভ এই রাতে সুযোগ পেয়ে মিটিয়ে নিল। আর চুপ করে থাকতে পারে।

চার্লি ফের সিঁড়ি ধরে নেমে এল। সুহাস বুঝতে পারল না, চার্লি নেমে আসছে কেন। তার তো কেবিনে ফিরে যাওয়ার কথা। ডাইনিং হলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে তার সামনে লাফ দিয়ে নামল। তারপর কেন যে বলল, প্লিজ আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও সুহাস। আমার ভয় করে।

বোট-ডেক এলাকাটা ক্রমে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। রাতে তারও বোট-ডেকে উঠলে গা শির শির করে। বোট-ডেকে একা সে ঘুরে বেড়াতে সাহস পায় না। আসলে, এখানেই কেউ কেউ গভীর রাতে দেখেছে এক নারী চুপচাপ বোটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। সেও দেখেছে ঝড়ের রাতে বরফ-ঘরে আহামদ বাটলার তাকে ঝুলতে দ্যাখে। কেউ দেখেছে, ডেক-এ তাকে রাখা হয়েছে। মাথার এবং পায়ের কাছে লাল গুচ্ছ ফুল। কফিনে সে শুয়ে আছে। বয়লার-রুমে কেউ আর একা নেমে যায় না। রাতে দল বেঁধে নামে। বোট-ডেক পার হয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে চিমনি নেমে গেছে। কেউ একা চিমনির গোড়ায় উঠে বসে থাকে না। বয়লার-রুম থেকে সবাই উঠে না এলে বোট-ডেক পার হয়ে যায় না। চার্লি ভয় পেতেই পারে। অশরীরী আত্মার ঘোরাফেরাকে সবাই ভয় পায়।

সে বলল, চলো।

উপরে উঠে চার্লি হেঁটে গেল। সেও হেঁটে গেল। চার্লি দরজা খুলে প্রথমে উঁকি দিয়ে কী দেখল যেন কেউ বসে থাকতে পারে ভিতরে।

সুহাস বাহবা নেবার জন্য বলল, আরে, কেউ নেই। ঢুকতে ভয় পাচ্ছ কেন? এই দ্যাখো। এসো এসো না! কই, কোথায় কী আছে! দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের কেবিন এভাবে কেউ দ্যাখে। তুমি যে কী যেন চোর-টোর ভিতরে লুকিয়ে আছে।

চার্লি আর পারল না, বলল, সুহাস, লোকটা জাহাজে উঠে এসেছে।

কোন লোকটা?

সেই অনুসরণকারী।

কোথায় দেখলে?

পোর্ট-হোলে। আবছা অন্ধকারে দেখলাম। ধারালো হিংস্র চোখ। সাদা বাবরি চুল। দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। সেই একরকম। শুধু মুখটাই দেখা যায়।

কেমন হতাশ গলায় কথাগুলি বলতে গিয়ে চার্লি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মেসরুমে খেতে বসে সুহাস খেতে পারল না। মুখার্জিদা, বংশী, অধীর, সুরঞ্জন আর সে মিলে এক বিশু। যদিও জাহাজে সে কোনও ওয়াচ দেয় না, যে যার ওয়াচ মতো বিশু ভাগ করে নেয়, বাঙালিবাবুদের এক বিশু হবে, জানা কথা, ওয়াচ আলাদা হলেও। বিশুর গোস্ত ডাল ভাত সবজি ভাণ্ডারি আলাদা ভাগ করে রাখে। বাঙালিবাবুরা একসঙ্গে খেতে উপরে উঠলেই বিশুর ভাগ করা খাবার গ্যালি থেকে ভাণ্ডারি ঠেলে দেবে। মুখার্জিদা সবার ডিশে ভাত ডাল-সবজি এবং মাংস যা লাগে দেন। নিজেরটাও নেন। তারপর মেসরুমে খাবার পর্ব শুরু হয়ে যায়। সুহাস না খেয়ে উঠে যাওয়ায় মুখার্জিদা বললেন, কী রে খেলি না? কী হয়েছে তোর?

খেতে ইচ্ছে করে না।

মুখার্জিদা বললেন, কী হয়েছে বলবি তো।

সুহাস সবার সামনে কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। সে কী ভেবে বলল, তুমি কি এখনি নীচে গিয়ে শুয়ে পড়বে?

শুয়ে পড়ব? কেন!

না, এমনি।

মুখার্জিদা বললেন, তোর শরীর কি খারাপ!

না, ঠিকই আছে। খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা খাও।

বলে সে তার ডিশ ধুয়ে নীচে নেমে গেল। তাড়াতাড়ি কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। আহামদ বাটলার বরফ-ঘরে কেন যে দেখল একটা মেয়েমানুষের লাশ ঝুলছে! সেই থেকেই তো জাহাজে যত ঝামেলা। বোট-ডেকে সেও দেখে ফেলে, এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ঘোর থেকে দেখেছে। সব সময় ভৌতিক আতঙ্ক তাড়া করলে রাতে সে কোনও ঘোরে পড়ে দেখে ফেলতেই পারে। মুখার্জিদা তো বললেন, তুষারঝড়ে কোন এক নারী বন্দর এলাকায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। গাছের পাতা ঝরে গেছে। শীতের কামড়ে নারী একা নির্জন বন্দরে খোঁজাখুজি করেছে কোনও নাবিকের। নাবিকেরা যে

সবে জাহাজে উঠে গেছে। তুষারঝড়ে বন্দর এলাকা মৃতপ্রায়। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সুখানিও ফিরছে জাহাজে। ডিনা ব্যাংকের সুখানি।

সেই সুখানি কি মুখার্জিদা নিজে? না অন্য কেউ?

মুখার্জিদাকে সে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। এত দীর্ঘ সফরেও বিন্দুমাত্র বেচাল হননি। জাহাজ থেকে নেমে দরকারে কেনাকাটা করেছেন, আবার জাহাজে উঠে এসেছেন। তিনি তাদের অভিভাবকের মতো। কেউ বেচাল হলেও তিনি তাকে রেয়াত করেন না। জাহাজি বলে কি তোদের ইজ্জত নেই? যা খুশি তাই করে বেড়াবি? দেশের ইজ্জত নেই? তোরা তো দেশের নাম ডোবাবি দেখছি।

ডারবানের ঘাটে মুখার্জিদা তবে কেন বললেন, না, আহামদ ঠিকই দেখেছে। বরফ-ঘরে লাশ দেখা বিচিত্র নয়। আহামদ ভিতু স্বভাবেরও নয়।

মুখার্জিদাকে শুধু বলবে, সত্যি করে বলো, কেন দেখে ফেলতে পারে। যা নেই, তা নিয়ে আমরা ভাবি না। ভূত-টুতও দেখি না। শ্মশানে গেলে ভয়, কারণ শ্মশানে মানুষ পোড়ানো হয়। গাছের নীচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে রাতে, কারণ গাছে কেউ ঝুলে পড়েছিল বলে। সব ভূতেরই একটা পূর্ব ইতিহাস থাকে। বরফ-ঘরে লাশ আহামদ বাটলার দ্যাখে কী করে? সে কি জানে, লাশ সেখানে কোনও কালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল? না জানলে দেখবে কেন? দেখতেই পারে বলছ। তুষারঝড়, বন্দর এলাকা নির্জন, জাহাজিরা দীর্ঘ সফরের পর বন্দর পেয়েছে! বেচাল হতেই পারে। বন্দরে মেয়েমানুষ না পেলে নিঃস্ব বোধ করতেই পারে। সুখানির কপাল ভালো, তুষারঝড়েও সে টের পেয়েছিল, লোহালক্কড়ের গুদাম পার হয়ে শেডের নীচে এক নারী শীতে কাঁপছে। বাড়ি ফেরার কোনও সুযোগ নেই তার। তারপর .

তারপর ধরা যাক, মুখার্জিদা তাকে তার নিজের কেবিনে এনে ওম দিয়েছে। তারপর ধরা যাক, মেয়েটির খবর পেয়ে জাহাজের বড়-মিস্ত্রিও হাজির। আর কে? আর কে ঢুকেছিল? মুখার্জিদা সেই যে চুপ মেরে গেল আর রা করছে না।

সেটা কে?

সে কি বাটলার নিজে? বরফ-ঘর, রসদ-ঘর বাটলারের এক্তিয়ারে। বাটলার সঙ্গে না থাকলে লাশ বরফ-ঘরে ফেলে রাখা মুশকিল। সুহাস নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

আমি কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না মুখার্জিদা। চার্লিকে কে অনুসরণ করছে? সে কে? চার্লির চোখ-মুখ হতাশ। সে তো তার বাবাকে সব খুলে বলতে পারে। বলছে না কেন বুঝছি না। চার্লি কতটা ভেঙে পড়েছে, জানো না। কিছু বলাও গেল না। সে কেবল বলছে, তুমি যাও, আমার জন্য তোমার কোনও বিপদ হয় চাই না। যাও বলছি।

তারপর আর থাকা যায়!

এসব সাত-পাঁচ চিন্তায় সে ঘুমোতে পারছিল না। চালু জাহাজে শুধু প্রপেলারের শব্দ ভেসে থাকে। কেমন গুম গুম আওয়াজ। জাহাজ ওঠা-নামা করছে। এবং সে জানে উপরে উঠলে ধূসর এক অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। সে যদি গভীর রাতে ডেক-এ উঠে যায়, তবে কি অনুসরণকারী টের পাবে, চার্লির কেবিন পাহারা দিতে যাচ্ছে? এটা কি ঠিক হবে? তার তা ছাড়া কী করণীয়? চার্লির ঠাকুরদা তার বাবা-কাকাকে পছন্দ করত না। এটুকু জানে। চার্লির মা নেই। বেটসি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। দুর্ঘটনা না খুন? চার্লির সন্দেহ খুন। বেটসিকে খুন করে আততায়ীর কী লাভ, সে জাহাজেই বা উঠে আসবে কেন? ভুতুড়ে আতঙ্ক থেকেও চার্লি যে ঘোরে পড়ে যায়নি কে বলবে? একের পর এক সব গুজব জাহাজটায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মালবাহী জাহাজে বোট-ডেকে মেয়ে উঠে আসবে কী করে?

তারপর কখন চোখ লেগে আসছিল, টের পায়নি সুহাস। সহসা মনে হল বাংকে কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে দিচ্ছে। সে আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে দেখল, মুখার্জিদা ফোকশালে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় তাকে উপরে যেতে বলছেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। চোখ ঘষে কম্বল সরিয়ে বাংক থেকে নীচে নেমে গেল। তারপর সিঁড়ি ধরে অনুসরণ। মুখার্জিদা আগে। সে পেছনে। গভীর রাত। বারোটা-চারটার ওয়াচ দিতে যাবেন মুখার্জিদা। গ্যালির পাশে পিছিলের বেঞ্চিতে বসে বললেন, তোর কী হয়েছে বল তো?

সে তার সংশয়ের কথা বলল।

তুমিই বলো, আহামদ বাটলার বরফ-ঘরে লাশ কী করে দেখতে পায়? সেখানে কোনও লাশ দেখা গেছে, কিংবা ছিল, এমন গুজবের শিকার হতে পারে সে। ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস নেই মুখার্জিদা। মানুষ মরে গেলে কিছুই থাকে না। তাই বলে আমি তেমন সাহসীও নই। ভূতের ভয় আমারও আছে। বোট-ডেকে এত রাতে একা যেতে বললে, হাত-পা আমার অসাড় হয়ে যাবে। তুমি তো বোট-ডেক ধরেই যাবে। তোমার ভয় করে না?

না।

তবে তুমি কেন বললে, দেখতেই পারে।

শোন সুহাস, জাহাজে কাজ করতে উঠলে নানা সংস্কারে ভুগতে হয়, প্রাচীন নাবিকেরা একটু বেশিই সংস্কারে ভোগে। এটাই তাদের রোগ বলতে পারিস। তুই হঠাৎ এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন বুঝি না। ভয় করলে রাতে একা ওদিকটায় যাবি না। তোর তো ওয়াচও নেই যে বয়লার-রুমে নেমে যেতে হবে কিংবা ব্রিজে উঠে যেতে হবে। রাতে ফোকশাল ছেড়ে যাবারই বা কী দরকার। তুই এত ঘাবড়ে গেলি কেন বুঝি না।

না, তুমি বলো, কেন আহামদ বাটলার দেখতেই পারে বললে। তুমি কেন একথা বললে?

মুখার্জিদা শেষে যা বললেন, তাতে সুহাসের মনে হল মানুষটিকে সে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে। বললেন, আমিই সেই সুখানি। আমিই খবর দিয়েছিলাম বড়-মিস্ত্রিকে। বড়-মিস্ত্রি বান্ধবী না আসায় মুষড়ে পড়েছিলেন। বার বার খবর নিচ্ছিলেন তাঁর বান্ধবী এসেছিল কি না। এলে যেন তাঁর কেবিন দেখিয়ে দেওয়া হয়। বার বার খবর নিচ্ছিলেন, অন্য কারও কেবিনে কেউ এসেছে কি না। বলেছিলাম, সাব, বাটলারের ঘরে একজন এসেছে।

আহামদ বাটলার।— সুহাস না বলে পারল না।

না, আহামদ নয়। অন্য বাটলার। নামটা নাই জানলি। বড়-মিস্ত্রি ছিলেন অবনীভূষণ। বাঙালি। বাঙালি বড়-মিস্ত্রির সঙ্গে সেই প্রথম এবং শেষ সফর। বাঙালি বড়-মিস্ত্রি জাহাজে ক'টা আছে বল। বাঙালি বলেই তার সঙ্গে আমাদের দোস্তি ছিল। বড়-মিস্ত্রি বললেন, চল তো দেখি, বাটলার কেমন মাল তুলে এনেছে। বললাম, সাব, রোগা, শীতে কাতর। চোখ-মুখ বসা। খদ্দের পায়নি। বন্দরে বোধ হয় আটকা পড়ে গেছে। আমি তুলে আনিনি। বাটলার তুলে এনেছে। দেখার কি দরকার আছে?

তুমি মানুষ না সুখানি। বসে থাকতে পারছ। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তোমার কি মাথা খারাপ আছে?— আমাকে এক ধমক বড়-মিস্ত্রির। এরপর আর থাকা যায় বল? সঙ্গে গেলাম। তুষারঝড় বইছে বলে এলিওয়েরে সব দরজা বন্ধ। যে যার কেবিনে পড়ে ঘুমাচ্ছে, নয় মদ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পোর্ট-হোল খুলে বাইরের তুষারঝড় দেখার চেষ্টা করছে। এলিওয়েরে ভিতর কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। প্রায় বলতে পারিস ভুতুড়ে নৈঃশব্দ। জাহাজে আমরা ছাড়া কেউ জেগে নেই। ইঞ্জিন-রুমে শুধু একজন ফায়ারম্যান। আর কেউ নেই। বয়লার একটা চালু রাখতেই হয়। জেনারেটর চালু রাখতে গেলে বয়লার চালু না রেখে উপায়ই বা কী। কেবিনগুলো না হলে গরম থাকবে কী করে? ডাইনিং হল পার হয়ে গেলাম। একটা টুলে উঠে বাটলারের পোর্ট-হোলে উঁকি দিলাম।

মুখার্জিদা থামলেন। একটা সিগারেট ধরালেন, আসলে মানুষ কখন কী করে বসবে এক দণ্ড আগেও সে তা জানে না। তা না হলে আমার কী দরকার ছিল একটা ঘুলঘুলি খোঁজার? ছিলাম বেশ, গ্যাংওয়েতে বসে ছিলাম, মাথায় গরম টুপি, ওভারকোট গায়ে বসে ছিলাম। কেন মরণ হবে বল, বড়-মিস্ত্রি বলল, আর উঠে চলে গেলাম? বড়-মিস্ত্রি পাগলের মতো বলছেন, কী দেখতে পাচ্ছ সুখানি?

শুধু কম্বল স্যার।

আর কিছু না?

না।

মেয়েটা কী করছে?

কম্বলের নীচে শুয়ে আছে।

বাটলার কী করছে?

বাটলার মেয়েটাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। ওম দিচ্ছে।

এখনও ওম দিচ্ছে? ডিম ফুটবে কখন?

শীতের রাত সাব। ডিম ফুটতে সময় তো লাগবেই।

ইয়ারকি! আমরা জলে ভেসে এসেছি! ডাক শুয়োরের বাচ্চাকে। বল, বড়-মিস্ত্রি এসেছে।

সাব, এটা কি ভাল দেখাবে!

আরে, তুমি তো ডাঙার মানুষের মতো কথা বলছ। তুমি মানুষ না সুখানি। সরো।

কী বলব সুহাস, প্রায় পা টেনে বড-মিস্ত্রি আমাকে নামিযে আনলেন। আমি আব কী কবি। টুলের উপব উঠে তিনি ঘুলঘুলিতে কী দেখলেন, না দেখতে পেলেন না জানি না, বেঁটেখাটো মানুষ, তার উপব বেটাট বপু, কিছু না দেখারই সম্ভাবনা, তাবপর প্রায় টলতে টলতে নেমে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুখানি, ডাক বাটলারকে। শালা ছোটলোক!

সাব, এটা কি ঠিক হবে? আপনি বড-মিস্ত্রি বলে যা খুশি কবতে পারেন না। আসলে জানিস সুহাস বড-মিস্ত্রিরও হুঁশ ছিল না। মাতাল হয়ে আছে। বান্ধবী না আসায় খেপে আছে ষাঁড়েব মতো। কথা নেই বার্তা নেই দবজায় লাথি। এবং বিশাল বপু নিয়ে ঢুকে গেল। চোরেব মতো আমি পেছনে। বাটলার আমতা-আমতা কবছে। মেয়েটা অসুস্থ বলছে। কে শোনে কার কথা। কাতব প্রার্থনা মেয়েটাব, ম্যান, আমি সকালেই চলে যাব। আমাকে টানাহ্যাঁচড়া কববেন না। বাটলাবও বলল, স্যাব, ওব শবীর সত্যি ভাল নেই। চোখ-মুখ দেখছেন না।

সুহাসের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বললেন, ডিমফোটা পাখির বাচ্চাব মতো। বোঁয়া ওঠা। চিঁ চিঁ কবছে। বড-মিস্ত্রি, তারপব আমি। আমরা তিনজন, তাবপর সব চুপ। মেয়েটাব মুখ থেকে লালা ঝবছে। তোকে বললাম, বড কষ্ট আছে ভিতরে। দেখছিস তো আমি জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারি না। নামলেও বেশিক্ষণ বন্দরে ঘুরতে পাবি না। রাতে সে আমাকে আজও তাড়া কবে। তবে কাউকে বলতে যাস না। বললে আমি স্বীকার কবব না। যদি বলিস, এটাও তো খুন। এটা তো ধর্ষণ। সব স্বীকার কবব। জাহাজে উঠে যাবা উল্কি পরে তাদের ধারণা জাহাজেব ভূত-প্রেত তাদেব তাড়া কবে না। আমাব ধাবণা একটু অন্য রকম। বলতে পারলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয় এমন ভাবি। মন হালকা হয়। ভূত-প্রেতেব ভয় থাকে না।

ভূত-প্রেতেব ভয় না থাকতে পারে। মানুষের ভয় তো থেকেই যায়। ধবা পডলে না? লাশ গায়েব কবলে কী কবে?— সুহাস প্রশ্ন করল।

সে এক ঝামেলা। যাই রে, সময় হয়ে গেছে।

বলেই তিনি উঠলেন। ডেক-এ নেমে গেলেন।

সুহাস পারে। সে বলল, খুন-জখম করে রক্ষা পেলে কী করে?

আমবা কি খুন করতে চেয়েছি বল? তুই আসছিস কেন?

বলবে তো কী কবলে?

মুখার্জিদা হাঁটছেন ডেক ধরে। এত বাতে ডেক-এ হেঁটে গেলে বুটের শব্দ ওঠে। কিন্তু ইঞ্জিন-রুমের ঝকব ঝকর শব্দে সব ঢেকে গেছে। সুহাস বোট-ডেকে ওঠার মুখে সিঁডিব পাশে দাঁড়িয়ে গেল। বোট-ডেকে উঠতে চায় না। কারণ, এত রাতে বোট-ডেক পার হয়ে একা টুইন-ডেকে নেমে যাওয়া তাব পক্ষে কঠিন।

মুখার্জিদা বললেন, জানতাম ধরা পড়ব। হুঁশ ফিরে এসেছে। আমরা কী আব কবি! কী যে এক বিপদে পড়ে গেলাম! আমরা ভাগতে চেয়েছিলাম। বাটলার বুঝুক। সে ছাড়বে কেন? যেখানেই ফেলে বাখি ধরা পডে যাব। দাঁতের কামড। কার দাঁতের কামড়? নখের আঁচড়! কার নখের আঁচড়। টের পেলাম কেউ রক্ষা পাব না। জলে ফেলে দিলে দু'দিন বাদে ভেসে উঠবে। কী করি! বাটলারকেই বললাম, তোমার বরফ-ঘরে ঝুলিয়ে রাখো। আমরা সাহায্য করলাম। লাশ বসদ-ঘরে টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর বরফ-ঘরে হুকে পা গেঁথে ঝুলিয়ে দিলাম। গোরু-ভেড়ার লাশের মধ্যে মেয়েটা হাবিয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। বরফ-ঘর খুললে কী কুয়াশা ভিতবে জানিস তো? বাটলারকে দেখালাম, দ্যাখো সব কবন্ধ। মেয়েটাও কবন্ধ হয়ে গেছে। জীবনে এত নিষ্ঠুর কাজ করেছে

তোর মুখার্জিদাকে দেখে মনে হয়! ভাল-মন্দ জানি না, যা মাথায় এসেছিল তাই করেছি। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে মধ্যরাতে কফিনে পুরে, কিনার থেকে ফুল কিনে একেবারে সাজিয়ে তিনজনে কফিনটা ঠেলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলাম।

সুহাস বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মুখার্জিদা কত অকারণে বকাঝকা করেন, তারা কিছু মনে করে না। অকপট স্বভাবের। তাই বলে জীবনের এমন গোপন খবর ফাঁস করে দেয়! না কি বানানো গল্প? এমনও হতে পারে গল্পটা তার শোনা, নিজের নামে চালিয়ে দিলেন। এতে তো বাহবা দেওয়া যায় না, না কি তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভাববার কী আছে, তোর মুখার্জিদা তো থাকলই। সুবিধা-অসুবিধার কথা বলবি। মুখার্জিদাকে খুব ভাল মানুষ ভাববার কারণ নেই।

মুখার্জিদা বললেন, কী রে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? যা। একা যেতে পারবি? না পিছিলে দিয়ে আসব?

তুমি কি আহামদকে বলেছিলে?— সুহাস সিঁড়ির রেলিং-এ ঝুঁকে জানতে চাইল।

কী বলেছিলাম?

এই মানে মেয়েটার কথা।

আর বলিস না, আহামদ জাহাজে উঠে এত রোয়াবি করত, কী বলব রাগ ধরে গেল। জিন-পরি আবার কী! সব নাকি গুজব। সে এসব নাকি বিশ্বাসই করে না। লুকেনারেব কথাও না। জাহাজটাব যে কখনও-কখনও মাথা খারাপ হয়ে যায় তাও বিশ্বাস করে না। সি-ডেভিল লুকেনারকে সে পাত্তাই দিল না। আরে যার যা, ভাবলে অপবাদ, না ভাবলে অলংকার। ডিনা ব্যাংকের নাম শুনলে কার না কলজে চমকায়? ডিনা ব্যাংকের জাহাজি। সোজা কথা। ডিনা ব্যাংকে সফর করেছ। তা হলে তো আর আটকানো যাবে না। নলি যত খারাপ হোক, নিয়ে নেবে। এটা জাহাজের যশ বলতে পারিস। জাহাজ নিজের মর্জিমতো চলে বলতেই আহামদ খেপে গেল। হাতে উল্কি আমার, হরেকৃষ্ণ লেখা, উল্কি নিয়ে রসিকতা করল। আমাকে কী বলল জানিস, না হলে সুখানি, সারা জীবন হুইল ঘুরিয়ে মাথাটা নাকি আমার খারাপ হয়ে গেছে। দিলাম ডোজ।

কী বললে তাকে?

বললাম, আহামদ, রোয়াবি দেখাবে না। তোমার কেবিনে মেয়েমানুষের লাশ পড়ে ছিল। বরফ-ঘরে লাশ গায়েব করে বাখা হয়েছিল। বেশি রোয়াবি করলে ডিনা ব্যাংক সহ্য করবে না। সে তোমার ঘরে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে পারে, বরফ-ঘরে ঝুলেও থাকতে পারে। ঘাড় যখন মটকাবে বুঝতে পারবে। হয়ে গেল।

মুখার্জিদা!

বল।

জাহাজে তবে কিছু একটা আছে বলছ?

থাকতেও পারে, নাও পারে। মনে করলে আছে, মনে করলে নেই। যে যেমন বিশ্বাস করবে। যা. দাঁড়িয়ে থাকিস না। ভয়ের কিচ্ছু নেই, আমি গেলাম। আতঙ্কে মানুষের কী ভয় আহামদকে দিয়ে বুঝেছিস! অযথা আতঙ্কে পড়ে যাস না।

সে আর না বলে পারল না, জানো চার্লিকে কে অনুসরণ করছে। পোর্ট-হোলে লোকটা নাকি দাঁড়িয়ে ছিল।

চার্লি!

আরে, কাপ্তানের পুত্র!

চার্লি নামটা তার কাছে যত চেনা, মুখার্জিদার কাছে তত চেনা না। সবাই কাপ্তানের ব্যাটা বলে, কেউ কেউ ছোট-সাব বলে। জাহাজে নামে কেউ কাউকে বড় চেনে না। যে যা কাজ করে সেই নামে চেনে। কাপ্তান, সেকেন্ড-মেট, চিফ-মেট, ডেক-সারেং এমন কত কিসিমের কাজ যে জাহাজে থাকে। মুখার্জিদা জাহাজের তিন নম্বর সুখানি। তারাই ক'জন হিন্দু নাবিক মুখার্জিদা, মুখার্জিদা করে। চার্লি বলায় মুখার্জিদা প্রথমে ধরতে পারেননি, কার কথা বলছে। কাপ্তানের পুত্র বলায় নামটা মনে পড়ে থাকতে পারে। তিনি কিঞ্চিৎ অস্বস্তির গলায় বললেন, তা চার্লিকে অনুসরণ করতে জাহাজে উঠে এল ! তুই জানলি কী করে? জাহাজে আমরা ছাড়া আর কে আছে? গোনাগুনতি লোক, সবাই সবাইকে চেনে, বাইরের লোক জাহাজে উঠে আসবে কী করে? কোথায় লুকিয়ে থাকবে?

চার্লি তো বলল।

চোখের ভুল।

জানো পিকাকোবা পার্কে একদিন চার্লি লোকটাকে দেখেছে।

ধুস, যত্ত আজগুবি কথা। যা, কেন যে মরতে এরা জাহাজে উঠে আসে। চার্লি আর লোক পেল না, তোকে বলতে গেল। জাহাজে ওর বাবা আছেন, তাঁকে বলুক, কে তাকে অনুসরণ করছে তিনি খোঁজ নেন। তোর কী দায়! আর তোকে বলে কী লাভ? ওটা ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে তাও বুঝি না। মেয়েদের মতো চি চি করে কথা বলে। কেন যে ওটার পেছনে ঘুর ঘুর করিস তাও বুঝি না।

সুহাস বুঝল, এতে তো হিতে বিপরীত হয়ে গেল। চার্লিকে মেয়েছেলে বলতেও মুখে আটকাল না। এর ঘুর ঘুর করাও মুখার্জিদার পছন্দ নয়। সে যে কী করে! চার্লি যদি জানতে পারে মেয়েছেলে বলে তাকে মুখার্জি ঠাট্টা করেছে, তবে আর রক্ষা আছে! চার্লি খেপে গেলে সব করতে পারে। মুখার্জিদা না হবার সকালে ঝামেলা পাকান। আরে, শুনছ মিঞারা, ওরে শুনছিস বাঙালিবাবুরা, জাহাজে নতুন মেমান হাজির। চার্লি দেখেছে, মেমান ঘোরাফেরা করছে। রাত হলেই মেমান হাজির হবে। আহামদ গুল্লারের পর চার্লির পালা। তার পোর্ট-হোলে নাকি মেমান উঁকি দিয়েছে।

সুহাস কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, কাউকে কিন্তু বোলো না।

বললে কী হবে?

উপহাসের পাত্র হয়ে যাবে চার্লি। কী দেখতে কী দেখেছে, আর সে খবর জাহাজে ওড়াউড়ি শুরু করলে কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারবে! ডিনা ব্যাংকে আবার গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে না! মাঝসমুদ্রে জাহাজিরা বেগড়বাই করলে কাপ্তান খেপে যাবেন না!

তা অবশ্য ঠিক।

বলে মাথা নাড়লেন মুখার্জিদা। মুখার্জিদাকে কিছুটা এখন সন্ত মানুষের মতো মনে হচ্ছে। নীল কম্বলের গরম প্যান্ট, হাতে উলের দস্তানা, গায়ে লম্বা কম্বলের ওভারকোট, মাথায় ফ্লানেলের টুপি। এখানে ঠান্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আসছে সমুদ্র থেকে, এবং অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যায় সমুদ্র তার প্রজস্র ঢেউয়ের ফণা নিয়ে পাক খাচ্ছে। গোঙাচ্ছে। যেন অতলে, অসীম অনন্ত জলরাশি দ্রুত পাক খেতে খেতে উপরে উঠে আসছে, আবার তলিয়ে যাচ্ছে। টোপ গেলার মতো জাহাজটাকে অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু পারছে না, কচিতে বাধছে বলে। পুরনো লজঝড়ে জাহাজ, তার সঙ্গে এত সব অপদেবতা জাহাজে, গিলে কতটা হজম করতে পারবে, সেই ভয়ও থাকতে পারে।

অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা কেন যে সুহাসের মগজে কামড় বসায় বোঝে না। হাওয়ায় জলকণা উড়ে আসছে। দিগন্তে কিংবা মাথার উপর নীল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। সমুদ্রে বিচরণকারী এই নিঃসঙ্গ জাহাজটির জন্যও তার মায়া হয় কেন বোঝে না। সমুদ্রের সঙ্গে জাহাজটা লড়ালড়ি চলছে সেই করে থেকে। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্র। গভীর সমুদ্রে এলে সুহাস এটা বেশি টের পায়। অনন্ত এক রাক্ষসের মতো নানা রহস্যে এই জাহাজ এখন টালমাটাল। কী হবে কে জানে।

আমি যাই দাদা।

যা।

সুহাস হাঁটা দিলে ফের ডাকলেন মুখার্জিদা।

শোন।

সে দাঁড়াল।

মুখার্জিদাই তার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, লোকটাকে চার্লি দেখেছে! তুই দেখিসনি তো?

না।

তবে এমন আতঙ্কে পড়ে গেলি কেন? কিছু খেলি না!

সুহাস কী করে বোঝাবে, চার্লি হতাশায় কতটা ভেঙে পড়েছে। চার্লি তাকে প্রায় ঠেলে কেবিন থেকে বের করে দিয়েছে। চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে এবং তা কেন সে কিছু জানে না। সে জড়িয়ে পড়ুক চার্লি এটা চায় না। বিশ-বাইশ মাসে চার্লির গভীর এক বন্ধুত্ব জন্মে গেছে তার প্রতি সে বোঝে। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা যত সহজে তাকে বলতে পারে, চার্লি তার নিজের বাবাকেও

তত সহজে বলতে পারে না। ম্যাককে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? সে কে? কেন ম্যাককে ঠেলে ফেলে দিল। ম্যাকের কী অপরাধ! গভীর কোনও ষড়যন্ত্র হচ্ছে না সে বুঝবে কী করে? ম্যাকের উপর ষড়যন্ত্রকারী এত হিংস্র হয়ে উঠছে কেন। নির্বিরোধ নির্ভেজাল মানুষ। অবসর সময়ে সে ছাঁচ বানায়, কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোশ বানায়। জীবজন্তু থেকে মানুষের মুখ কিছুই বাদ যায় না। বন্দরে বন্দরে সে মুখোশ বিক্রি করে। কখনও উপহার দেয়। তাকে সবাই যেন মনে রাখে এটা সে চায়। এমনকী সে তার বান্ধবীদের ঘরেও একটা করে মুখোশ রেখে আসে। উপহার দেয়। আর অবসর সময়ে বোট-ডেকে বসে সে চার্লির সঙ্গে দাবা খেলে। তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আততায়ী খুন করতে চায়নি, কে বলবে

সুহাস জানে ম্যাকের কথা বলে লাভ নেই। মুখার্জিদা সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন তার সংশয়ের কথা। কারণ ম্যাক বন্দর থেকে ঘোর মাতাল হয়ে ফেরে। সে পা ফসকে পড়ে যেতেই পারে। এই নিয়ে তার সংশয়ের কথা শুনলে মুখার্জিদা হাসাহাসি করতে পারেন। সে ফের বলল, আমি যাই।

যা।

সুহাস পিছিলে উঠে এল। আর তার কেবলই মনে হচ্ছিল, অন্ধকারে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে দু'বার পেছনে তাকাল। দেখছে, মুখার্জিদা দূরে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ রাখছেন সে ঠিকমতো পিছিলে উঠে যেতে পারছে কি না। পিছনে তাকিয়ে কোনও অনুসরণকারীকে খোঁজার সে চেষ্টা করছে মুখার্জিদা না আবার টের পান! তার কোনও ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু কি ভেবে তিনি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন! কেউ নেই। শুধু মাস্তুলের আলো, গ্যালির আলো ওঠানামা করা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এমনকী ফলকার উপরেও কেউ দাঁড়িয়ে নেই। তবে মনে হয় কেন, অদৃশ্য সেই শত্রুর নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও শব্দ যেন গায়ে লাগছে। এটা যে আতঙ্ক থেকে হচ্ছে টের পেতেই গা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল পিছিলে।

আর তখনই মনে হল উইন্ডস-হোলের আড়ালে কে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। জাহাজের এখানে-সেখানে উইন্ডস-হোলগুলো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার যে-কোনও একটার আড়ালে একজন মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে পড়তে পারে। যদি ইঞ্জিন-রুম কিংবা বয়লার রুম থেকে কেউ উঠে আসে, আসতেই পারে, গ্যালি থেকে চা বানিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং সে কেন এভাবে উইন্ডস-হোলের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে! কে সে! কী যে হয়, তার দেখার বাসনা কে সে?

সে ফলকার উপর দিয়ে যমুনাবাজুর দিকে ছুটে গেল। যেন যে-কোনও উপায়ে দেখা দরকার, কেউ সত্যি সেখানে গোপনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে কি না। অবাক, কেউ নেই! তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছে। কেউ নেই। শুধু কোনও জাহাজির পরিত্যক্ত একটি রঙের টব দেখতে পেল। চোখের ভুল কি না, বোঝার জন্য আগের জায়গায় সে ফিরে এসে বুঝল খুবই ঠকে গেছে। ঢেউয়ে জাহাজ দুলছে, জাহাজ দুললে সবই দোদুল্যমান। ছায়া লম্বা হয়ে যায়। ছায়া অদৃশ্যও হয়। রঙের টবটি সেই কুহক সৃষ্টি করছে। টবটি সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র রেখে দিল সুহাস। ছায়া লম্বা হয়ে গেলে জেগে ওঠে, কিংবা ছায়া অদৃশ্য হলে যে ভুতুড়ে ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে এটা সে ভালই টের পেল। নিজের এই বোকামির জন্য কিছুটা লজ্জিত। আর তখনই মুখার্জিদা হাজির, হ্যাঁরে, তুই ছুটে গেলি কেন? কী খুঁজছিস?

সে বলল, না কিছু না। রঙের টবটা কে যে রেখে গেল। অন্ধকারে হোঁচট খেলে কী যে হত? ফলকার দুটো কাঠই খোলা।

সকালে চার্লি তার বয়লার সুট পরে ডেক-এ বের হয়ে এল। হাতে আপেল। কামড়ে খাচ্ছে। লোকটাকে খোঁজা দরকার। সে এলিওয়েতে নেমে এল। যার সঙ্গে দেখা, তাকেই গুডমর্নিং বলে লাফিয়ে ডেক-এ নেমে গেল। এবং সে জানে সুহাস উইনচে চলে আসবে, সে এজন্য কশপের ঘরে ঢুকে গেল। তার কাজ-কাম বিশেষ ভাগ করা থাকে না। সে খুশিমতো কাজ করে, তাকে কিছু করতে দেখলে সবাই খুশি হয়। সে উইনচে চলে যাবে এবং সেখানে সে সুহাসকে পাবে।

তা ছাড়া রাতে তাঁকে যে অবস্থায় দেখে গেছে তাতে সুহাসের দুশ্চিন্তা হবারই কথা। এমন দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না, রাতে সে এত ভেঙে পড়েছিল। তার কেন যে মনে হল, সুহাসকে সব খুলে

বলা দরকার। কিন্তু সুহাস কীভাবে নেবে কে জানে! এমনিতেই সেই হিমশীতল কঠিন মুখের কথা শুনে সুহাস কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। দু' দিন হল সুহাসকেও সে স্বাভাবিক দেখছে না। কেমন গুম মেরে গেছে! শুধু যে সুহাস একা গুম মেরে গেছে তাও নয়, প্রায় সব জাহাজিরা। বিশমার্ক সি-ব নামেও কম অপবাদ নেই। প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজও সেই সমুদ্রে ডুবে গেছে। এমন সুরক্ষিত জাহাজ ভুল করে মিত্রপক্ষের মাইন ফিল্ডের উপর গিয়ে পড়বে কেউ ভাবেইনি। কারণ প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটা তো মিত্রপক্ষের সেনা নিয়ে লস এঞ্জেলস থেকে যাত্রা করেছিল। তারিখটাও তাব মনে আছে। বিশমার্ক সি ব সে কিছু মানচিত্র দেখেছে চার্টরুমে। প্রেসিডেন্ট কলিজের নাড়ি-নক্ষত্রও লেখা আছে। আসলে জাহাজটা ছিল লাক্সারি জাহাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাহাজটাকে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়। জাহাজটা রওনা হয়েছিল ২৬ অক্টোবর ১৯৪২। নিউ হেব্রিডস দ্বীপপুঞ্জমালার এসপিরিতো সান্তু দ্বীপের সামরিক বন্দরে ভিড়বার কথা। জাহাজটা ঘায়েল হল মার্কিন সেনাদের পুঁতে রাখা মাইনসে। কী করে এটা হল, মার্কিন সেনাধ্যক্ষরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না, কারণ তাদের নির্দেশেই জাহাজ তার গতিপথ স্থির করে নিচ্ছিল। এটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজও নয়, কোথায় কী আত্মরক্ষার্থে পেতে বাখে হয়েছে, তাও তাদের নখদর্পণে। কোনও অদৃশ্য অশুভ প্রভাবেই জাহাজটা ডুবে গেল সমুদ্রে। মার্কিন সেনাধ্যক্ষরাও এমন বিশ্বাস কবতেন সে সময়ে।

সেই সমুদ্রে তারা মাটি টানাব কাজে যাচ্ছে। জাহাজিদেব মন ভাল না থাকারই কথা। প্রেসিডেন্ট কলিজ জলের তলায় ডুবে আছে তারা জানে না! তবে তারা জানে অসংখ্য জাহাজ এবং সামবিক বিমানের কবরভূমি সেই সমুদ্র। কলিজ তো হারবাব থেকে বেশি দূরেও ছিল না। যে ক'জন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদেব সাক্ষাৎকারের বিবরণও দেওয়া হযেছে। এঁদেব মধ্যে ফার্স্ট-লেফটেন্যান্ট ওয়েব থমপসন ছিলেন। তিনি বলেছেন, সহসা তীরের কাছে ছোট্ট আলোব ঝলকানি দেখতে পেলাম। আমাদেব সংকেত পাঠানো হচ্ছে, ডেনজার অ্যাহেড। অর্থাৎ আমরা বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে যাচ্ছি। ভাল করে সংকেত বুঝতে-না-বুঝতেই মনে হল সমুদ্র আমাদের সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রু-দেব কিছু কবণীয ছিল না। জাহাজ যেন নিজের খুশিমতো ধেয়ে যাচ্ছে। ওটা যে মিত্রপক্ষের মাইনফিল্ড আমাদেরও জানা ছিল। তবু জাহাজের উপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাবপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রায পাঁচ হাজাব সেনা নিয়ে জাহাজটা সমুদ্রের অতলে চোখেব সামনে ডুবে গেল। লাইফ-জ্যাকেট পরার সময় পাওয়া যায়নি। বাবার ডাইরিতে খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা মানচিত্র থেকেই সে এ তথ্য উদ্ধাব করেছে। ডাইরিটা বাবা চার্টরুমে নিজের লকারে রেখেছেন। কেন রেখেছেন সে অবশ্য তার কিছুই জানে না। এত যত্ন কেন তাও সে জানে না।

জাহাজ মাটি টানাব কাজে যাচ্ছে শুনে জাহাজিরা ভাল নাই থাকতে পারে। সুহাসকে সে কলিজের খবব দেয়নি। কে জানে সে যদি জাহাজিদের কলিজ নিয়ে গল্প করে তবে নিশ্চিত যে তারা আরও বেশি ভেঙে পড়বে। জাহাজে একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে। ফলে জাহাজিরা খুবই নিষ্প্রাণ। সে ডেকে নেমে এটা আজ আরও বেশি টের পেল। এত উৎপাত কার ভাল লাগে!

কশপেব ঘর থেকে সে চিজেল নিল। ছোট্ট হাতুড়ি নিল। কিছুটা রং বার্নিশ। সে চিপিং করবে কোথাও। বসে গেলেই হল। জাহাজেব ছাল-চামড়া নোনা হাওয়ায় নোনা ঢেউয়ে অনবরত ছাড়িয়ে নিচ্ছে, চিপিং করে যেখানে খুশি রং বার্নিশ লাগানো যায়। কশপ তাকে দেখলে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। রাশি রাশি চিজেল হাতুড়ি র‍্যাক থেকে টেনে নামাতে থাকে। তখন তার খুব হাসি পায়। এরা বড়ই ভিতু স্বভাবেব। না হলে এভাবে মাটি টানার কাজেও যেতে পারত না। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরাও খুশিমতো জাহাজটাকে আঘাটায় ফেলে রাখতে পারত না। এরা আছে বলেই পারছে।

সহসা কোথা থেকে ঘন কুয়াশা ধেয়ে এল। আবছামতো হয়ে আছে সব। এটা হয়, সে মাঝে মাঝে শীতেব সমুদ্রে এমন হতে দেখেছে। চারপাশে জলরাশি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। দু'-তিন জোড়া অ্যালবাট্রস পাখি জাহাজের পেছনে উড়ছে। জাহাজ বন্দর ছাড়লেই পাখিগুলি উড়তে শুরু করে। জাহাজের সঙ্গে পাখির যেন কোনও যোগসূত্র আছে। কুয়াশায় ঢেকে যাওয়ায় পাখি এবং নীল জলরাশি আব দেখা গেল না। সব অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে। চার্লি কশপের ঘর থেকে উঠে ইঞ্জিন-রুম পার হয়ে চলে গেল উপরে। কোথায় কোন উইনচে সুহাসের কাজ সে জানে না। বোট-ডেকে উঠে গেলে বোঝা

যাবে। ফরোয়ার্ড-ডেকেও থাকতে পারে, আবার আফটার-ডেকেও থাকতে পারে। চার্লি বোট-ডেকে উঠে দেখল সামনে পেছনে কেউ নেই। ঘড়ি দেখে বুঝল, সে আজ খুব সকাল-সকাল কাজে বের হয়ে গেছে। পিছিলে নাবিকদের জটলার মধ্যে দেখল সুহাস বসে আছে। নীল জামা, নীল প্যান্ট পরনে। শীতের কামড় কমে আসছে বোঝা যায়। জাহাজ যাচ্ছে নর্থ নর্থ ওয়েস্টে। যত উপরে উঠে যাবে জাহাজ তত শীত কমে আসবে। আর চার-পাঁচদিন, বেশি হলে এক সপ্তাহ শীত থাকবে, তারপর উষ্ণ সমুদ্রে জাহাজ ঢুকে গেলেই হাই ফাই করতে শুরু করবে সবাই। রোদে ডেক তেতে থাকবে, কখনও ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে যাবে জাহাজ, অথবা জ্যোৎস্নারাতে দেখতে পাবে ফলকায় নাবিকরা মাদুর পেতে বসে আছে রঙের টব সাজিয়ে কেউ নেচে নেচে গান করছে।

চার্লি নাবিকদেব ভিড়ে দৌড়ে যেতে পারত। কিন্তু আজ কেমন তার সংকোচ হল। সুহাসটা যে কী, সে তো দেখতে পাচ্ছে বোট-ডেকে সে দাঁড়িয়ে আছে। সুহাসের তো উচিত, তাকে দেখেই ছুটে চলে আসা। কেন যে আসছে না! সে হাই করে আজ ডাকতেও পারল না।

সুহাস এদিকেই উঠে আসছে। চা-চাপাটি খেয়ে কাজে বের হয়ে পড়ারই সময় এটা। ছুটি সেই বারোটায়। জামার আস্তিনে মুখ মুছতে মুছতে বোট-ডেকের নীচে এসে হাত তুলে দিল। তারপর বলল, জানো সুহাস, আমি ভেবেছি লোকটাকে খুঁজে দেখব। আমার সঙ্গে আসবে। লোকটা এই জাহাজেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে মনে হয়।

চোখের ভুল চার্লি, কাল এটা টের পেলাম।

চোখের ভুল বলছ! তার মানে। তুমি আমাকে কি খুব বোকা ভাবছ?

মনে হয়। না হলে উইন্ডস-হোলের পাশে কে অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে পাব কেন? গিয়ে দেখি রঙের টব।

তারপর কেমন উত্তেজিত হয়ে বলল, মাথায় তোমার পোকা ঢুকে গেছে চার্লি, তোমাকে কেউ অনুসরণ করছে! ডাঙায় তবু বিশ্বাস করা যায়, জাহাজে উঠে আসতে পারে কখনও? ধরা পড়বে না।

চার্লি বলল, আমাদের কেউ নয় তো!

সুহাস কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, কার দায় পড়েছে, বুঝি না। কেন করবে বলো? আমরা জাহাজে কাজ করতে এসেছি, কেউ তো গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। যদি ধরো উঠেই আসত, সে কেন এতদিন গোয়েন্দাগিরি করল না? তা ছাড়া আমি বুঝিও না, তোমার পেছনে লেগে কী লাভ। সব কিছুর তো যুক্তি থাকবে। মুখার্জিদা তো বলল, মানুষ ভয় পেলে অনেক কিছু দেখে ফেলে। বনের বাঘে খায় না জানো, মনের বাঘেই খায়। আহামদ বাটলার না হলে দেখে ফেলে, বরফ-ঘরে লাশ ঝুলছে! লোকটা তো ত্রাসে পড়ে উন্মাদই হয়ে গেল।

চার্লি সুহাসের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ওরা ফরোয়ার্ড-ডেকে নেমে গেল। সুহাস জানে মুখার্জিদা জাহাজে অনেক সফর দিয়েছেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর কথার দাম আছে। তা ছাড়া আহামদ বাটলারকে ভয় না পাইয়ে দিলে বরফ-ঘরে লাশ ঝুলছে কখনই দেখতে পেত না।

সুহাস ঠাট্টা করে বলল, তুমি উল্কি পরলে পারতে।

উল্কি!— চার্লি সহসা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল।

বা রে দেখছ না, জাহাজে বুকে পিঠে হাতে উল্কি নিয়ে কত জাহাজি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মুখার্জিদার হাতেও উল্কি আছে জানো। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হাতে লিখে রেখেছেন। তিনি কখনওই বিশ্বাস করেন না, কোনও অপদেবতা তাকে কাবু করতে পারে। ছুঁতেই তাকে ভয় পায়। তাকে দেখলে ত্রিসীমানায় অপদেবতারা আসে না। আমার আর কোনও ভয় নেই।

তোমার কোনও ভয় নেই?

না।

হাত ঝেড়ে সুহাস যেন সাফসুফ হয়ে গেল।

চার্লি পকেটে হাত দিয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে আছে। সুহাসের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। সে কি বলতে চায়, আসলে ঘোরে পড়ে দ্যাখে একটা হিমশীতল পাথরের মতো মুখ তাকে অনুসরণ করছে' তাকে কি সাহস জোগাচ্ছে? মন থেকে হাবিজাবি চিন্তা দূর করে দিতে বলছে?

মুখার্জি জানে?
কী জানেন।
এই জাহাজেও সে উঠে এসেছে।
জানেন।
ম্যাককে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে জানে?
না জানেন না। কেউ উঠে এসেছে শুনেই এমন মজা করতে শুরু করলেন, আর বলি। আমার খবরদের কাজ নেই। সবার সামনে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা শুরু করবে। জানো মুখার্জিদাই কিন্তু ওরবান বন্দরে বলেছিলেন, পাবে, আহামদ বাটলার লাশ দেখতেই পাবে। আবার সেই মানুষটাই লেছেন, সব ঘোরে পড়ে হয়। কী যে কখন বলেন। তবে উইন্ডস-হোলের পাশে ছুটে না গেলে বুঝতে পারতাম না, ভয় মানুষকে কতটা কাবু করে রাখে। গভীর রাতে বোট-ডেক থেকে নেমে আসার সময় মনে হচ্ছিল, অনুসরণকারী আমাকেও অনুসরণ করছে। কী আতঙ্ক, ভাগ্যিস মুখার্জিদা বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাগ্যিস আমাকে ছুটে যেতে দেখে তিনিও ছুটে এসেছিলেন। না হলে কী যে হত।
চার্লি বলল, উঙ্কি পরলেও রেহাই পাব না। আমি জানি সে আছে। সে জাহাজেই উঠে এসেছে। আচ্ছা সুহাস তুমিই বলো, জাহাজ ছেড়ে দেবার আগে দেখলেও না হয় কথা ছিল। লায়ন রকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে জাহাজ। পোর্ট হোল খুলে রকটা দেখছি। সমুদ্রের শেষ ডাঙা। তুমিও নিশ্চয় দেখছিলে। সবারই তো শেষ ডাঙা দেখার কৌতূহল থাকে। কী থাকে কি না বলো।
থাকে।
ডাঙা দেখা কি অপরাধ?
অপরাধ হবে কেন?
অপরাধ নয় যখন চুরি করে দেখছিলাম না। মানে আমি বলতে চাইছি, লুকোচুরি খেলছি না। মানে কোনও আতঙ্কও ছিল না। আতঙ্কে কোনও ঘোরেও পড়ে যাবার কথা না। মগজ আমার যথেষ্ট তাজা ছিল। চোখ খারাপ না। তখন যদি দেখি পোর্ট হোলে পাথরের মতো নিষ্ঠুর চোখ, তুমি স্থির থাকতে পারতে।
না পারতাম না। দেখলে সত্যি পারতাম না। আচ্ছা চার্লি, সে ব্যাটা জাহাজে থাকবে কী করে? কোথায় পালিয়ে থাকবে?
আমিও তো তাই ভাবছি।
আমাদের কেউ হলে চিনতে পারতে।
সেই তো। মাথায় আসছে না। দাড়ি গোঁফ বাবরি চুল কার আছে? সারেঙের দাড়ি-গোঁফ আছে। পাকা দাড়ি-গোঁফ। চুলও সাদা। তিনি কেন আমার পোর্ট হোলে উঁকি দেবেন। তা ছাড়া তাঁর তো বাবরি চুল নেই। দাড়িও কোঁকড়ানো নয়। লোকটা যে কে? মুখ দেখে লোকটা কে বুঝতে পারছি না। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝাও কঠিন।
মালবাহী জাহাজে বাইরের কোনও লোক থাকার কথা না। সেই ডেক-সারেং, ইঞ্জিন-সারেং, ডেক টিন্ডাল, ইঞ্জিন-টিন্ডাল, সুখানি, গ্রিজার, আর সব সাধারণ জাহাজি। আর আছে বাটলার, মেসরুম-বয়, মেসরুম-মেট, কাপ্তান-বয়, চিফ কুক। এ ছাড়া রেডিয়ো অফিসার, কারপেন্টার, চিফ মেট, সেকেন্ড মেট, থার্ড মেট, পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার। ফাইভার ম্যাক আর সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা কমবয়সি। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের তারা। আর তো জাহাজে সব বুড়ো হাবড়ার দল।
ফাইভার উইনচে চলে এসেছে। সুহাসও উইনচের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কী করি বলো তো?
আমার সঙ্গে এসো।
ফাইভারকে বলে নাও। রাগ করতে পারে।
চার্লি ছুটে ফাইভারের কাছে চলে গেল। বলল, সুহাসকে নিয়ে নীচে যাচ্ছি। যদি ছেড়ে দাও।
ফাইভারের বিগলিত মুখ। সে বলল, নিশ্চয় যাবে। কেন? যেতে চাইছে না?
তুমি না বললে যাবে না বলছে।
ফাইভার হেসে দিল। বলল, খুব অনুগত দেখছি আমার। এই ছোকরা, যাও। চার্লি কী বলছে, শোনো।

তারপর তারা দু'জনেই ছুটে কয়লার বাংকারে নেমে গেল। সিঁড়িতে লাফিয়ে নামছে, লাফিয়ে উঠে আসছে। কয়লার বাংকারে কয়লা টানছে হাফিজ। পোর্টসাইড বাংকারে কয়লা টানছে আবেদালি।

তারা লম্ফ তুলে ক্রস বাংকারও খুঁজল। কয়লার পাহাড়। নীচে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে কয়লা বেলচা এবং হাতে-ঠেলা গাড়ি। কেউ নেই। হাফিজ আবেদালি দু'জনই অবাক, সুহাস কাপ্তানের ব্যাটাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে কেন? সিঁড়িতে ওঠার সময় সুহাস বলল, নেই। আমার মনে হয় লায়ন রকে নেমে গেছে। তোমাকে শেষবারের মতো দেখে গেল।

ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টার কী হল!

জাহাজ থেকে লাফিয়ে সমুদ্রে কেউ পড়তে পারে? পড়লে প্রপেলার টেনে নেবে না!

শোনো, আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না, সত্যি তুমি বলো, কেন একটা অচেনা ভুতুড়ে লোক তোমার পোর্ট-হোলে উঁকি দেবে? কী কারণ থাকতে পারে? জাহাজে এত লোক থাকতে বেছে বেছে তোমার পোর্ট-হোলেই দাঁড়াল? পিকাকোরা পার্কে তোমাকেই দেখল? কী জানি মাথায় আমার কিছু আসছে না।

সুহাস, লোকটা আমাকে লস এঞ্জেলস থেকে অনুসরণ করছে। আবছা অন্ধকারে ভেসে ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। কেন যায় বলো?

লস এঞ্জেলস থেকে বলছ! কই আগে তো বলোনি!

চার্লি কেমন আর জোর পাচ্ছে না। সে বলল, ফলকার ভিতর বসে থাকতে পারে। টানেল-পথে যদি থাকে।

যেন আছেই। অন্তত যেভাবে হাঁটছে চার্লি এবং খুঁজছে তাতে সংশয়েরও কারণ থাকতে পারে না। অগত্যা সে না বলে পারল না, তোমার বাবাকে বলছ না কেন? তিনি তো এক দণ্ডে সব ফয়সালা করে দিতে পারেন, আছে কি নেই দেখতে পারেন। সবাইকে মাস্তারে দাঁড়াতে বলতে পারেন। খুঁজে দেখতেও বলতে পারেন। তাঁকে তুমি কেন যে বলছ না, বুঝছি না।

চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বলল, যাও, যাও বলছি। তোমাকে খুঁজতে হবে না। একাই খুঁজব, একাই খুঁজে বের করব। বাবাকে কেন বলছি না, কৈফিয়ত দিতে হবে!

সে চলে যাচ্ছিল। ফের ডাকল চার্লি, ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ জানতে না পারে আমরা তাকে খুঁজছি।

আর তখনই ডেক-এ হল্লা। কে ডেরিক চাপা পড়ে থেঁতলে গেছে! বংশী চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে, সব ভাঙবে। সব যাবে। আমাদের রেহাই নেই। বাঁচতে চাও তো, জাহাজে আগুন ধরিয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও। নইলে কেউ রক্ষা পাবে না। জাহাজ আমাদের শেষ করে দেবে। ঝড় নেই ঝাপটা নেই, ডেরিক কে ভাঙে! বোঝো না মিঞারা? মরবে, সব শালারা মরবে। জাহাজে কাউকে রেহাই দেবে না। সমুদ্রের শয়তান জাহাজে উঠে এসেছে।

পাগলের মতো ফলকার উপর দাঁড়িয়ে বংশী চিৎকার করছে। মুখার্জিদা ছুটে গেছেন তাকে সামলাতে। আর সবাই ছুটে যাচ্ছে ফরোয়ার্ড-পিকে। ডেরিক কি ফাইভারের মাথায় ভেঙে পড়ল? সুহাসও ছুটতে থাকল।

দেখা যায় না!

ডেরিক ওয়ার পিন ড্রামের উপর ভেঙে পড়েছে। ফাইভার থেঁতলে গেছে পুরোপুরি। ড্রামটার উপর ফাইভার ঝুলে আছে। হাত-পা অসাড়। মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

কাপ্তান থেকে সব অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা ঘিরে রেখেছেন জায়গাটা। ডেক-সারেং, ইঞ্জিন-সারেং অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁদের তলব হবে।

কাপ্তান ডেরিক খসে পড়ল কী করে, বোধহয় ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

জটলার মধ্যে সুহাস দাঁড়িয়ে ছিল। মর্মান্তিক দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। একবারই উঁকি দিয়ে দেখেছে, তারপর আর পারেনি। শরীর গোলাচ্ছে। সে চার্লিকে খুঁজল। চার্লি কোথাও নেই। যদি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে! সেখানেও দেখল নেই। চার্লি কি তার নিজের কেবিনে হতাশ হয়ে গিয়ে

শুয়ে পড়ল? মাত্র কিছুক্ষণ আগে তারা এখানে ছিল। সে ওয়ার পিন ড্রামের উপর ঝুঁকে ফাইভারের কাছে অনুমতি নিয়েছে। তখন ডেরিক ভেঙে পড়লে ফাইভারের মতো তার অবস্থা হত। অথবা চার্লি যদি তাকে ডেকে নিয়ে না যেত, তার কী হত ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার মতো অবস্থা। যেন স্রেফের জন্য সে প্রাণে বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস চার্লি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, সে আর চার্লি জাহাজের সর্বত্র লোকটাকে খুঁজছে। ইঞ্জিন-রুমে সেকেন্ডের ওয়াচ, চার্লির সঙ্গে নীচে নেমে আসায় তিনি খুবই বিরক্ত। ভয়ে ভয়ে ইঞ্জিন-রুম সে পার হয়ে গেছে। চার্লি পকেটে টর্চও নিয়েছিল। এমনকী যা মাথাখারাপ অবস্থা চার্লির, তাতে চার্লি যদি বিলজে নেমে যেত, জলের ট্যাংকগুলির ভিতর ঢুকে যেত, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তন্ন তন্ন কবে খুঁজেছে। মাঝে মাঝে সে বিবক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার মাথা খারাপ চার্লি। জাহাজে এভাবে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে, না সাহস পায়?

এখন মনে হচ্ছে, চার্লি তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। সে ডেকে না নিলে খতম। চার্লির প্রতি এ কারণে কৃতজ্ঞতাও কম নেই।

দেখলি।— মুখার্জিদা ফিরে এসে বললেন।

দেখলাম।— কেমন হতাশ গলায় সুহাস উত্তর দিল।

বয়লার-রুম থেকেও লোকজন ছুটে চলে এসেছে। কাজ ফেলে আসা খুবই অনুচিত কাজ। ইঞ্জিন-সারেং ধমক দিলেন ছোট-টিন্ডালকে, যাও মিঞা, নীচে যাও। কাজকাম ফেলে উঠে এলে। সব নসিব।

মুখার্জিদা বললেন, বেচারা।

তারপর কেমন আর্ত গলায় বললেন, আমি তো ভাবলাম তুই থেঁতলে গেছিস। ওখানে তো তোরই কাজ করার কথা।

সুহাসের ভাল লাগছে না। তার মাথা ঘুরছে। সে বসে পড়ল। তাব বাবা-মা'র মুখ মনে পড়ল। গত জন্মেব পুণ্যফল এমনও সে ভাবল।

এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা তারা ভাবতেই পারছে না। সবাই বিচলিত। কেউ কেউ সর্ষেফুল দেখছে। বংশীদাকে দেখেই মনে হয়েছে এটা। সুহাস ফলকার কাঠে হেলান দিয়ে বসে আছে। টোপাস হাজিব। ডেক-জাহাজিরা দড়িদড়া বেঁধে ফাইভারের উপর থেকে বিশাল থামের মতো পড়ে থাকা লোহার ডেরিক, উইনচ চালিয়ে তুলে নিচ্ছে। জাহাজ ওঠানামা কবছে বলে ফাইভাবের হাত দোল খাচ্ছিল। মাথাও। তাকালেই চোখে পড়ছে। চিফ কুক সেকেন্ড কুক থেকে কাবপেন্টাব কেউ বাদ নেই। কেউ কথা বলছে না।

ফাইভারকে কফিনে ভরার আগে সে দেখল, চিফ মেট তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছেন। পকেট হাতড়াচ্ছেন। বুকপকেট থেকে টোবাকো এবং পাইপ বের হল। নীচের পকেট থেকে দুটো ছোট চিজেল এবং হাতুড়ি, না আর কিছু না। টোবাকোর পাউচে থাকতে পারে। কাপ্তানকে একবার বললে হয়, সাব খুঁজে যদি দেখতেন। অবশ্য পরে সবই জানতে পারবে। তবে চার্লির এভাবে আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। তার একবার এখানে এসে দাঁড়ানো উচিত। ফাইভার তো তার সঙ্গে দাবা খেলত। একজন বান্ধব ছিল জাহাজে তার।

সে মনে মনে বলল, এটা কি উচিত কাজ। তোমার মন খারাপ হতেই পারে। আমরা কি খুব ভাল আছি! দাবা খেলার সময় তো তোমার পাশে বসলে খেপে যেত। তোমার পাশে বসি, ফাইভার পছন্দ করত না। কই, আমি তো না এসে পারিনি। সে আর না পেরে উঠে দাঁড়াল। যদি কেবিনে থাকে, সে এসে দেখল, কেবিনের দরজা বন্ধ। তা সবার কেবিনই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। সে খুটখুট করে আওয়াজ করল দরজায়। তারপর বলল, আমি সুহাস। তুমি কী চার্লি। একবার ফাইভারকে দেখলে না। সে কফিনে শুয়ে আছে।

ভিতর থেকে কোনও সাড়া নেই। তা হলে কি চার্লি ভিতরে নেই? আশ্চর্য, গেল কোথায়!

আর ফেরার সময় দেখল, চার্লি ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখছে অপলক। মুখ কেমন রক্তশূন্য। চার্লি তা হলে ব্রিজে ছিল! কাজের ঘেরাটোপে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল! ব্রিজ থেকে সামনের মেনমাস্ট এবং চারটে উইনচই দেখা যায়। মাস্তুলের তলা আরও স্পষ্ট। এমনকী কে কে

সেখানে ছুটে গেছে, তাও সে দেখতে পেয়েছে। চার্লি তাকে দেখে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। রেলিং ধরে কিছুটা নেমে থমকে দাঁড়াল।

আমাকে খুঁজছিলে?

ভাবলাম তুমি কোথায়?

ব্রিজে ছিলাম।

একবার যাবে না ম্যাককে দেখতে?

না।— স্পষ্ট উত্তর।

যাওয়া উচিত।

তুমি আমাকে যেতে বলছ?

এমন ঠান্ডা গলায় কথা বলছে যে সে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে বলার কে? সে বললে যাবে, না বললে যাবে না, এটাও যেন কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুহাসের পক্ষে। তা ছাড়া চার্লিকে তার ধন্যবাদ জানানো দরকার। কিন্তু এটা খুবই স্বার্থপরের মতো আচরণ করা হবে। চার্লি এতে ক্ষুব্ধ হতে পারে, সুহাস, তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ, বলতেই পারে। ম্যাক আমাদের মধ্যে আর নেই শোক করার সময়। শোক করার সময়ে কেউ নিজের কথা ভাবে না। এমন বলতেই পারে। অবশ্য চার্লি হয়তো জানে না, শোকের সময়ই মানুষ নিজের কথা বেশি ভাবে, নিয়তির কথা বেশি ভাবে, যাই হোক চার্লিকে এসব কথা বলার কোনও অর্থ হয় না। চার্লি নিজে না গেলে তার বলাও উচিত হবে না, তোমার কিন্তু ম্যাকের পাশে একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

তারপরই মনে হল, সে তো চার্লিকে খুঁজছিল, ম্যাকের পকেটে তার স্ত্রীর সেই প্রিয় ছবিটি আছে কি নেই। ম্যাক আর তার স্ত্রী গির্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটা তাকেও দেখিয়েছে। এই নিয়ে হাসাহাসি কত। তার সরল বিশ্বাসের প্রতি সুহাসের কিছুটা অবজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ কেন যে মনে হল ওটা পকেটে থাকলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হত না ম্যাক। না হলে সে ভাববে কেন, ওটা পকেটে আছে কি নেই? ম্যাককে রাতে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, সে কে? উইনচে কাজ করতে এসে তাও সে ভুলে গিয়েছিল, তার বলাই হয়নি, ম্যাক, তুমি তাকে দেখেছ? তুমি জানো কে তোমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ইস্, সে এতটা লঘু করে দেখবে বিষয়টা ভাবেইনি। অথচ রাতে এই নিয়ে তার কী না ত্রাস গেছে!

এটাই তার দোষ। তার কেন, সব মানুষের। দিনের বেলায় যেন কোনও ত্রাস থাকার কথা না। সারা জাহাজে কাজকর্মের ব্যস্ততা, কেউ একদণ্ড চুপচাপ বসে নেই। যে যার মতো কাজে ব্যস্ত। ডেক-জাহাজিরা কেউ চিপিং করছে, কেউ রং করছে, কেউ জল মারছে। মাস্তুলের উপরে উঠে গেছে কেউ, দড়িদড়া গোছাতে কেউ ব্যস্ত। বাটলার ডাইনিং হল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, গ্যালিতে রান্নার ঝাঁঝ। মনেই হয় না জাহাজে কোনও অশুভ প্রভাব থাকতে পারে। সকাল হলেই সে হালকা হয়ে গিয়েছিল, ম্যাককে একবার জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল যে, তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, না সে পা ফসকে সত্যি পড়ে গেছে।

জাহাজে এটা অশুভ প্রভাব থেকে হচ্ছে, না, কোনও আত্মগোপনকারী আততায়ীর কাজ।

চার্লি বলল, চলো নীচে।

চার্লি নীচে নামার সময় বলল, আমাকে খুঁজছিলে কেন?

ম্যাকের পকেটে ছবিটা আছে কি না যদি দেখতে।

কী হবে?

কী হবে জানি না। আমার তো মনে হয় ম্যাক আঁচ করতে পেরেছিল!

আঁচ করতে পেরেছিল, আঁচ করতে পারলে কি উইনচে মরতে যাবে স্ত্রীর ছবি পকেটে নিয়ে!

সুহাস বুঝল, বুঝিয়ে লাভ নেই। চার্লি বুঝছে না, সত্যি যদি ত্রাসে পড়ে গিয়ে থাকে ম্যাক, তবে স্বাভাবিক কাজকর্মগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠবে। সাধারণত জাহাজে কাজ করার সময় কিংবা জাহাজে ঘুরে বেড়াবার সময় সে স্ত্রীর ছবি সঙ্গে রাখে না। জাহাজটা তো তাদের কাছে বাড়িঘরের মতো। কিনারায় নামলেই সে ছবিটা সঙ্গে রাখত। তার মাও তো সঙ্গে ঠাকুরের বেলপাতা

দিয়েছে। কাজে নামার সময় কি সঙ্গে নেয়? নেয় না। সে ঠাকুরের বেলপাতা কিনারায় নেমে যাবার সময়ও সঙ্গে নেয় না। কারণ বালিশেব নীচে আছে, বালিশেব নীচে থাকলেই সে বেশি নিরাপদ। সারাদিন সে যেখানেই থাকুক, রাতে ঠাকুরদেবতার বেলপাতা মাথায় নিয়ে শুয়ে থাকতে পারে। ঠাকুবদেবতার প্রতি তার তেমন আগ্রহ না থাকলেও ঠাকুবের ফুল-বেলপাতাকে কেন যে অগ্রাহ্য করতে পারে না! তার কোনও ভয় থাকাব কথা না। এও আর-এক উল্কি পবে থাকার মতো। ম্যাকের হাতে কিংবা বুকে, অথবা পিঠে কোথাও কোনও উল্কি আঁকা ছিল না। কাপ্তানের হাতে মা মেরিব ছবি আছে। সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের হাতে সে গির্জার ছবি দেখেছে। কেউ জিশুর মুখ উল্কিতে এঁকে নিয়েছে বুকে, যে যেমন বিশ্বাস করে থাকে। ম্যাক যদি বাতে টের পায়, কেউ তাব পিছু নিযেছে, তবে সে পকেটে স্ত্রীব ছবি রেখে দিতে পারে। জাহাজও নিরাপদ নয় ভাবলে কাজের সময়ও পকেটে বেখে দিতে পাবে। তবে সুহাস এসব ভেঙে বলতে চায় না। একবার দেখা দবকাব, ম্যাকেব কেবিনে যদি কিছু পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটা নিছকই দুর্ঘটনা, না কোনও পরিকল্পিত হত্যা, না জাহাজের অশুভ প্রভাবে এটা হয়েছে, তাব বোঝা দরকার। কারণ সে আঁচ কবতে পারছে যদি পরিকল্পিত হত্যা হয়, তবে সেও জড়িয়ে আছে। একা ম্যাক নয়, অথবা ম্যাক অকারণে শিকার হয়েছে, সে বেঁচে গেছে। কিংবা দু'জনকেই সবিযে দেবার তালে আছে অদৃশ্য ঘাতক।

কফিনে তখন পেরেক পোঁতা হচ্ছিল। তার শব্দ কানে আসছে। বড় বিশ্রী লাগছে। সাবা জাহাজ কাঁপিযে দিচ্ছে হাতুড়িব শব্দ। কাবপেন্টাব দাঁতে চেপে রেখেছে কফিনেব কাঠ মাপার দড়ি। সবাই ইতস্তত দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কেবল ইঞ্জিন-রুমে যারা আছে তারা উঠে আসেনি। কোনও নাবিককে সলিল-সমাধি দেবার কী প্রক্রিয়া সে ঠিকঠাক জানে না। জাহাজটা সত্যি অজানা সমুদ্রেব দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, না থেমে আছে, বোঝা যায় না, ঠিক সামনে অথবা জাহাজের কিনারায় গিয়ে না দাঁড়ালে। প্রপেলারের শব্দে টের পায় সে, জাহাজ যাচ্ছে। পিছিলে দাঁড়ালে টেব পাওয়া যায় প্রপেলার নীল জলেব নীচে পাক খেতে খেতে অস্থির। এমনিতে চাবপাশে তাকালে মনে হয় শুধু অসীম অনন্ত জলবাশি, আব কিছু না। মনেই হয় না জাহাজটা দাপিযে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে। যেন থেমে আছে। জাহাজটা এব একজন নাবিককে সলিল-সমাধি দেবার জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে। কিছু উড়ন্ত মাছেব ঝাঁক চোখে পড়ে যায়। তীব্র বর্শা-ফলকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে, আবার জলেব তলায় হাবিযে যাচ্ছে। কিছু ডলফিনেব ঝাঁক দূরে অদূরে ভেসে বেড়াচ্ছে। আব মনে হয় আজ সমুদ্র বড়ই শান্ত, তাব কোনও তাপ নেই। এমনকী জলপায়রার ঝাঁকও আর চোখে পড়ছে না, তাবা তীবের কাছাকাছি কোথাও আবার ফিরে গেছে। শুধু বিশাল দু'জোড়া অ্যালবাট্রস পাখি উড়ে আসছে। মানুষেব অন্তিম সময় কীভাবে কাটে দেখাব জন্য এক জোড়া পাখি মাস্তুলের ডগায় এসেও বসেছে। তারা পাখায় ঠোঁট গুঁজে বিশ্রাম নিচ্ছে, দেখলে এমন মনে হতেই পারে।

সুহাস দেখল চার্লি তার বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং কী যেন খোঁজাখুঁজি করছে। কারণ সে ম্যাকের টোবাকোর পাউচ হাতে নিয়ে কিছু যে খুঁজছে বুঝতে অসুবিধা হল না। যাক, জানা যাবে, স্ত্রীর ছবি ওতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কি না ম্যাক।

ম্যাকের গায়ে নতুন কাপড় পরাবার আগে টোপাস শরীরের রক্ত নোনা জলে ধুয়ে দিল। ডেকের রক্তও সে নোনা জলে সাফ করেছে। অন্তত ডেকের কোথাও আর রক্তের দাগ নেই। রক্ত কি কখনও খুনেব গোপন রহস্য তুলে ধরতে পারে! এত পরিষ্কারই বা করা হচ্ছে কেন? থাক না, কাঠে কিছু রক্তেব দাগ লেগে থাকলেও ম্যাক জাহাজে আছে এমন ভাবা যেতে পাবত। তাও রাখা হবে না। টোপাস নিখুঁতভাবে ডেক পরিচ্ছন্ন করে তুলছে।

টোপাস কাজ দেখাচ্ছে এমনও মনে হল সুহাসের। আর তখনই চার্লি এসে খবর দিল, আছে।

সুহাস বলল, ওটা তোমার কাছে রেখে দিয়ো।

চার্লি টোবাকোর পাউচটা সামান্য আলগাভাবে ধরে আছে। কারণ এটা যে কোনও মৃত মানুষের পকেট থেকে কিছুক্ষণ আগে উদ্ধার করা হয়েছে, চার্লির পাউচটি ধরে রাখার কায়দাতেই তা টের পেল সুহাস। খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছে না। এতেও তো রক্তের দাগ লেগে আছে। এটা যে সে তার কেবিনে নিয়ে যেতে পারবে না, নিয়ে গেলেও রাতে ঘুমাতে পারবে না, চার্লিব ভাবভঙ্গিতেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

চার্লি কী ভেবে বলল, না, রাখা যাবে না। আমার ঘরে রাখতে পারব না। তা ছাড়া দেবে কেন রাখতে?

কার কাছে থাকবে?

ওর কেবিনে রেখে দেওয়া হবে। যা ম্যাকের ছিল, সব কিছুই তার কেবিনে রেখে দেওয়া হবে।

ম্যাকের কেবিনে থাকলেও সুহাসের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এটি পরিকল্পিত হত্যা হয়ে থাকে, তবে ম্যাকের কেবিন থেকে ছবিটা চুরি যাওয়াও বিন্দুমাত্র অসম্ভব না। তা ছাড়া ছবিটার সঙ্গে দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে এমনই বা ভাবছে কেন? তবে ম্যাক স্বাভাবিক ছিল না এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। হয়তো কিছু আঁচ করেছিল।

সুহাস বলল, চাবি কার কাছে থাকবে?

যেমন থাকে, চার্টরুমে থাকবে।

সব চাবিগুলি চিফ মেটের এক্তিয়ারে। কেউ চাবির গোছা ঝুলিয়ে রাখে। ডুপ্লিকেট চাবির সবগুলিই কেবিনের নম্বর অনুযায়ী বোর্ডে রেখে দেওয়া হয়। এখন থেকে সব কেবিনেরই একটি মাত্র চাবি বোর্ডে ঝুলে থাকলেও ম্যাকের থাকবে দুটো চাবিই। কারণ চাবিটা কোথায় ম্যাক রেখেছে তা নিয়ে খোঁজাখুঁজি হবে। ম্যাকের কেবিনেও ঢোকা হবে। কেবিনে তার কী কী আছে তারও তালিকা করা হবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে চাবিটার। চাবিটা খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি।

সহসা জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল।

জাহাজ সত্যি থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তিন নম্বর সুখানি ছাড়া কেউ এখন জাহাজে কর্তব্যরত নয়। এমনকী ইঞ্জিন-রুম থেকেও সবাই উঠে এসেছে। সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বয়লার-রুমেও কেউ নেই। কয়লার বাংকারও খালি।

চিফ মেট ডেক-সারেংকে ডেকে কী বললেন। সুহাস শুনতে পায়নি। জাহাজ ডিউটির সময় অফিসারদের ইউনিফর্ম পরে থাকতেই হয়, যাঁরা ডিউটি দিচ্ছেন না, তাঁরাও যে যার ইউনিফর্ম পরে নেমে এসেছেন। সেই ব্যস্ততা আর যেন কারও মধ্যে নেই। কারণ সুহাস যখনই দ্যাখে, দেখতে পায় গট গট করে এক-একজন অফিসার অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন, উঠে যাচ্ছেন। কেউ সুস্থিয়ালা নয়। চলাফেরায় অত্যন্ত মেজাজি সবাই। তারা কেউ নেমে এলেই বুটের খটাখট শব্দ শুনতে পায়। নেভি ব্লু সার্জের তৈরি ঝকঝকে দামি পোশাক। মাথায় সাদা অ্যাংকারের টুপি, পায়ে সাদা বুট, পদমর্যাদা অনুসারে কারও কোটে একটা দুটো তিনটে সোনালি স্ট্রাইপ। সাধারণ জাহাজিদের পোশাক বলতে, নীল রঙের কম্বলের প্যান্ট আর সোয়েটার। তবে আজ সবাইকেই নীল রঙের টুপি পরতে হয়েছে। সেও পরে এসেছে। আর সবাই কেমন সুস্থিয়ালা, সহসা সবাই যেন মিইয়ে গেছে।

কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে গেল। ডেক-সারেং মুসলমান জাহাজিদের নামাজ পড়ার ইঙ্গিত দিলেন। তারা সবাই একদিকে। মুখার্জিদা তিন নম্বর সুখানি বলে ব্রিজ থেকে নেমে আসতে পারেননি। সে দেখল, মুখার্জিদা তাকে হাতের ইশারায় কী যেন বলতে চাইছেন। সুরঞ্জন অধীরও তাকাল। তারা জাহাজের বাঙালিবাবু। অর্থাৎ হিন্দু জাহাজিরা সবেমাত্র জাহাজের লাইনে আসছে, তাদের সারেং থেকে টোপাস ডাক-খোঁজ করার সময় বাঙালিবাবু বলেই ডাকে। মুখার্জিদা হয়তো বাঙালিবাবুদেরও এই সময় কিছু করণীয় থাকে এমন বোঝাতে চাইছেন। বংশীদাও চায় না ম্যাকের অন্ত্যেষ্টিতে কোনও খুঁত থাকুক।

এমনিতেই বংশীদার ধারণা, জাহাজটা বিশমার্ক সি-তে আসলে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অজানা সমুদ্রে। তার আতঙ্কে খুবই ফাঁপরে পড়ে গিয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করছে বংশীদা। তার কাছে মানুষ মরে গেলে আর জাত থাকে না। সুতরাং অন্ত্যেষ্টির সময় তার ধর্মমতে কিছু না করলে বাঙালি নাবিকেরা বিপাকে পড়ে যেতে পারে। অশুভ প্রভাবে তারা পড়ে যেতে পারে। ছিল লুকেনার, আর ছিল বরফ-ঘরের সেই লাশ, এবারে ম্যাকও তাদের প্রভাবে চলে গেল। অন্তত তার অন্ত্যেষ্টিতে হিন্দু ধর্মমতে কিছু না করতে পারলে খুবই ঝামেলার আশঙ্কা। কী ভেবে যে বংশীদা একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে কফিনের কাঠে রাখার সময় বলল, ম্যাক, এই আমাদের রীতি। আমরা শবদাহ করি। মুখাগ্নি করি। আমরা যা জানি, সেইমতো সবার হয়ে তোমার মুখাগ্নি করলাম, তোমার আত্মার মুক্তি হোক। শান্তি হোক।

সবশেষে ডেক-অফিসাররা, ইঞ্জিনিয়াররা ম্যাকের কফিনের পাশে দাঁড়ালেন। কাপ্তান প্রার্থনা করলেন, মে গড আওয়ার ফাদার শোয়ার ইউ উইথ ব্লেসিং অ্যান্ড ফিল ইউ উইথ হিজ গ্রেট পিস। ভারী সব পাথরে ভর্তি কফিনটি এবার অফিসাররা কাঁধে তুলে নিলেন।

তাঁরা হাঁটছেন।

তারাও হাঁটছে পিছু পিছু।

ফরোয়ার্ড-পিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ম্যাককে। শেষে ধীরে ধীরে রশি বেঁধে কফিনটি জলে ছেড়ে দেওয়া হল। সবাই শেষবারের মতো দেখল অনন্ত সমুদ্রের গর্ভে ম্যাক অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে।

চার্লি দৌড়ে চলে আসছে।

সুহাস দেখল, মুখার্জিদাও নেমে এসেছেন। তাঁর ডিউটি শেষ। তিনি নেমে বললেন, যাক, ম্যাককে বুদ্ধি করে আগুনে ছুঁইয়ে দেওয়া গেল। বংশী কোথায়?

সুহাস বলল, আসছে।

বংশীদা কাছে এলে মুখার্জিদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, যাক একটা কাজের কাজ করেছিস। আমার তো মাথায় আসছিল না কী করা যায়। ম্যাক অপঘাতে মারা গেল। তার আত্মার সদ্গতির বড়ই দরকার ছিল। তুই যে বুদ্ধি করে আগুনে ছুঁইয়ে দিয়েছিস, তুই না থাকলে হত না। আমি তো ইশারায় বললাম, আমাদের পক্ষে কিছু একটা করা দরকার। কেউ বুঝতেই পারছে না। যাক, তোমরা সবাই সোজা বাথরুমে চলে যাও। আমিও যাচ্ছি। আগুনে হাত সেঁকে ফোকশালে ঢুকবে। জাহাজে আছ বলে নিজেদের দিগ্‌গজ ভাববে না। যা খুশি তাই করে পরে পস্তাবে না।

কাজেই স্নান-টান করা দরকার। ম্যাকের কেবিনে যাওয়া দরকার। চার্লি যদি ম্যানেজ করতে পারে। চার্লিকে ডেকে সুহাস বলল, একটা কাজ করতে পারবে?

চার্লি বুঝতে পারছে না, কী কাজ।

চার্লিকে বলাও যায় না কাজটা কিছুই না, তবে কেবিনে ঢুকে দেখা দরকার। সে তার স্ত্রীর ছবি জাহাজে কাজের সময় পকেটে রাখত না। আজ কাজে আসার আগে সেটা নিল কেন? এতে তার মতিভ্রম প্রমাণিত হয়। তুমি কিছু বুঝতে পারছ, কী বলতে চাইছি? মতিভ্রম বলা বোধহয় ঠিক হল না, সে ভেবেছে, জাহাজেও সে নিরাপদ নয়। কিনারায় নিরাপদ নয় বলেই তো পকেটে ছবিটা রাখত। কিন্তু জাহাজে কেন?

আসলে ছবির সঙ্গে কেবিনের এই একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। ম্যাক ছবিটার কথা সবাইকে বলেছে। যদি জাহাজের কেউ হয়ে থাকে, তবে সেও জানে ছবিটা সম্পর্কে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। এবং এই ছবিটা পকেটে থাকা মানে, সে তবে সত্যি কিছু আঁচ করেছিল। জাহাজে সে নিরাপদ নয় বলেই সঙ্গে ছবিটা নিয়েছিল। ছবিটা সবাইকে দেখিয়েছিল। গির্জার ছায়ায় দুই নারী পুরুষ এবং ছবির মতো সব ফুল, পাখিরাও রয়েছে। মুখে নারীর পবিত্র হাসি। গির্জার মতোই তারা পবিত্র। তার শিশুরাও বাদ নেই। তারাও সঙ্গে আছে। অন্তত শিশুদের কথা ভেবে ঈশ্বর তাকে সব দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবেন এমন সে ভাবতেই পারে। তারা তো কোনও দোষ করেনি। যদি কখনও এই মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন ছবিটা রাখা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাহাজে তবে ম্যাক নিরাপদ ছিল না। ছবিটা চুরি হয়ে গেলে কোনও প্রমাণ থাকবে না। কারণ ছবিটার মধ্যে ম্যাকের ঈশ্বর-বিশ্বাসের এবং দৈব থেকে আত্মরক্ষার এক সবিশেষ কৌতূহল থেকে গেছে। সুতরাং ছবিটা যাতে হস্তান্তর না হয়, চুরি না যায় সেটা দেখা দরকার।

চার্লি বলল, কী কাজ করতে বলছ? বলে আর কথা বলছ না। চুপ করে আছ। কী ভাবছ কেবল?

না মানে বলছিলাম, কাপ্তান ম্যাকের কেবিনে কখন ঢুকবেন বলতে পারো?

জিজ্ঞেস করব।

আমাকে খবর দিতে পারবে?

কী হবে খবর দিয়ে?

যেতাম একবার। যদি সঙ্গে থাকি তিনি কি রাগ করবেন?

রাগ করাই তো স্বাভাবিক।

তা হলে তো মুশকিল।

শোনো সুহাস, আমার মন-মেজাজ ভাল নেই। তোমরা ভাবছ আমি ঘোরে পড়ে দেখি। তোমার মুখার্জিদা আমাকে নিয়ে তামাশা করেন। তবে বলে রাখছি, আমি ভাল বুঝছি না।

আরে, মুখার্জিদার কথা বাদ দাও। বললাম, লোকটার চুল সাদা, বললাম, গোঁফ সাদা অথচ লোকটার শরীর অত্যন্ত মজবুত। অন্তত আবছা অন্ধকারে দেখলে তাই মনে হয়। তিনি কী বললেন জানো? জাহাজে সবাই নানা কিসিমের লোক দেখে বেড়াচ্ছে, চার্লি শেষে একজন গোঁফয়ালা বাবরি চুলয়ালা জোয়ান মানুষকে দেখছে! কেন তোর মতো বোট-ডেকে কোনও সুন্দরীকে দেখতে পারে না। চার্লিটা সত্যি অপদার্থ।

চার্লি গুম মেরে গিয়ে বলল, দাঁড়াও কোয়ার্টার-মাস্টারকে দেখাচ্ছি মজা।

এবার চার্লি কেন যে মুখার্জিদা বলল না, কোয়ার্টার-মাস্টার বলল, বুঝতে অসুবিধা হল না। সে যে কাপ্তানের পুত্র এটাই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে। তা মজা দেখাতে পারে। চার-পাঁচ মাস আগেও মজা দেখাতে পারত। ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারত। সহসা দড়িতে ঝুলে সুখানির কাঁধে পা রেখে রেলিং ধরে ফেলতে পারত। এখন যে ইচ্ছে করলে পারবে না, তা কে বলবে? নিমেষে কাজটা করে ফেলে সে। বুঝতেই দেয় না কাঁধে পা রেখে রেলিং টপকে মেসরুম পার হয়ে দ্রুত ছুটে গেল কে?

চার্লি রেগে গেলে পারে। মুখার্জিদার উপর খেপে গেলে সে মজা দেখাতেই পারে। এমনিতেই জাহাজে নানা জটিলতা, চার্লিও ভাল নেই। খেপে গিয়ে আবার কী ঝামেলা পাকাবে ভেবেই বলা আরে, মুখার্জিদার কথা ধরতে নেই। কখন কী মুড বোঝা মুশকিল। কখনও অপদেবতায় বিশ্বাস থাকে না, কখনও অপদেবতার ভয়ে আগুনে হাত সেঁকে ফোকশালে ঢুকতে বলে। মুখার্জিদাকে কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তাঁর কথারও কিছু ঠিক নেই।

চার্লি বলল, তুমি কখন বললে তাকে, আমি লোকটাকে দেখতে পাই?

সকালে কাজে যাবার সময় বললাম।

এসব কথা কেন বলতে যাও বুঝি না সুহাস। সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়বে।

না। মুখার্জিদা বলেছেন, কাউকে বলবেন না। তিনি শুধু বললেন, ম্যাকের মুখোশগুলি দেখা দরকার।

কী বলছ? মুখোশ দেখে কী হবে?

আমিও বুঝছি না। মুখোশ দেখে কী হবে? ম্যাক তো চলেই গেল। দ্যাখো যদি মুখোশ পাও, ম্যাকের মুখোশগুলি তাকে দেখাতে পারো কি না। ওতে কী হতে পারে আমিও বুঝছি না। মুখার্জিদা আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় আছেন কেন তাও বুঝছি না। বললেন, আমি তো ভাবলাম তুই থেঁতলে গেছিস।

রাতেই মুখার্জিদার মাথায় কী পোকা ঢুকে গেল কে জানে! বিছানাপত্র নিয়ে পাশের একটা পরিত্যক্ত ফোকশালে উঠে এলেন। একটা মজবুত বাংক ছাড়া কিছুই নেই। আর আছে একটা লকার। পোর্ট-হোলের কাচ ভাঙা। ঝড়-ঝাপটায় জল পর্যন্ত ঢুকে যায় ঘরে। এমন একটা ফোকশালে কেউ থাকতে পারে। মুখার্জিদা লকারটা সাফসোফ করছেন। সারেঙের কাছে গেলেন একবার। যদি লকারটার চাবি থাকে। সারেং বলেছেন, খুঁজে দেখতে হবে।

তিনি ফিরে এসেছেন। লকারটা খোলা পড়ে থাকে। নোংরা জামাকাপড়ও পড়ে আছে কার, তিনি জামাকাপড় তুলে বললেন, এগুলি কার? নিয়ে যেতে বল।

সুহাসকেই বলা, কারণ সুহাস সেই থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে না বলে পারল না, এভাবে এক কথায় সুরঞ্জনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসার কোনও মানে হয়? জানোই তো ওর চ্যাংড়ামি স্বভাব। ফোকশালে আছেটা কী, থাকবে?

মুখার্জিদা কোনও কথারই জবাব দিচ্ছেন না। শুধু বললেন, বকর বকর করবি না। যা বলছি কর

দ্যাখ, কোন বাবু তার নোংরা জামাকাপড় এতে রেখে দিয়েছেন। নিয়ে যেতে বল।

সুরঞ্জন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। সুহাস সুরঞ্জনের দরজায় গিয়ে বলল, তোর জামা-প্যান্ট নিয়ে আয়। যা খেপে আছে, সব না পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। কী হয়েছে? মুখার্জিদা তোমার ফোকশাল থেকে চলে গেল?

জিজ্ঞেস কর না কী হয়েছে! কী বলেছি আমি? শুধু বললাম তুমি সবই বেশি বোঝো। তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তুমি মিছে কথার ওস্তাদ। ব্যস। খেপে লাল।

এত সামান্য কথায় খেপে যাবার মানুষ নন মুখার্জিদা। সারেং-টিন্ডাল কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসে অনুরোধ করেছে, আরে, একসঙ্গে থাকলে কথা কাটাকাটি হবে, ঠোকাঠুকি হবে, আবার মিলমিশও থাকবে। অযথা মাথা গরম করবেন না সুখানি। ন্যাড়া বাংকে শোবেন কী করে? ম্যাট্রেস নেই, ধুলকালিতে কী হয়ে আছে। পাশের দুটো বাংকই নড়বড়ে। বুড়ো মানুষের নড়া দাঁতের মতো কেবল খটর খটর করছে। অসুবিধা হলে সুহাসের ফোকশালে চলে যান। ওদের তো একটা বাংক খালি।

সারেং সাব বুঝিয়েছেন, টিন্ডাল, ভাণ্ডারি কেউ বাদ যায়নি। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ, ভাঙবেন তো মচকাবেন না। তাঁর এক কথা, মানুষ না, বুঝলেন সেদিনের যোগী ভাতেরে কয় অন্ন! আমি নাকি ডগ-ওয়াচ মিড-ওয়াচও বুঝি না।

ওবা বোঝে? এই সুরঞ্জন, তুই তিন নম্বর সুখানিকে কী বলেছিস?

সারেং তেড়ে গিয়েছিলেন সুরঞ্জনদের ফোকশালে। অধীরই সুরঞ্জনের হয়ে বলল, দেখুন সারেং সাব, এমন কিছু হয়নি, যাতে মুখার্জিদা হড়বড় করে সব নামিয়ে বলতে পাবেন, ব্যাটারা থাক, আমি চললাম।

ডগ-ওয়াচ মিড-ওয়াচ নিয়ে কী কথা কাটাকাটি হতে পারে? অবশ্য এখন কিছু বললে মুখার্জিদা আরও তেতে উঠবেন। অবসরমতো অধীরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে। সে সুরঞ্জনকে বলল, দেরি করিস না, শিগগির তোর জামাকাপড় নিয়ে যা। তোরই মনে হয়।

সুরঞ্জন সোজা ঢুকে লকার থেকে জামাকাপড় নিয়ে গেল। যেন মুখার্জিদাকে চেনেই না। মুখার্জিদাও কোনও কথা বললেন না। সুরঞ্জন চলে গেলে বললেন, তোফা। বেশ জব্দ। চ্যাংড়ামি আমার সঙ্গে! থাক তোরা। জাহাজে জায়গার অভাব।

বলেই সুহাসের দিকে তাকালেন, যা তো একবার। ওদের বল গে লকার থেকে আমার রেশনের চা চিনি যেন বের করে দেয়। আমার দুটো হ্যাংগার আছে। ও দুটোও নিয়ে আসবি।

এমন করছে মুখার্জিদা যেন সুরঞ্জনের ফোকশালে তাঁর ঢোকাও পাপ। কিছুতেই ঢুকবেন না। বিশাল লেদাব সুটকেসটা লকারের মাথায় রেখে দিয়েছেন আগেই। সুহাস হ্যাংগার দুটো নিয়ে আসার সময় কেষ্ট বলল, দাদার গামছা। গামছা ফেলে গেছে।

তোমার গামছা দাদা।

হ্যাঁ, গামছাটা ফেলে এসেছি। দে।— গামছাটা নিয়ে মুখার্জিদা বললেন, দ্যাখ তো আমার আর কিছু পড়ে থাকল কি না।

বলে তিনি সুটকেস নামিয়ে খুলে কী দেখলেন, আর যেন মনে মনে কী অঙ্ক কষছেন।

সুহাস বলল, তোমার এক জোড়া মোজা পড়ে আছে।

রেখে দে।

আচ্ছা, কী হয়েছে বলবে তো?

কিচ্ছু হয়নি। তুই কী বলেছিলি?

কী বলব?

কী বলব! খুব আনন্দে আছ দেখছি। সব ভুলে যাও। বলেছিলাম না, ম্যাকের ডুপ্লিকেট চাবিটা যদি হাত করতে পারিস?

কখন বললে? আর বললেই পাওয়া যাবে কেন? চাবিটা তোমাকে দেবে কেন? চাবি দিয়ে কী করবে?

সত্যি তো চাবি দিয়ে কী হবে! খুবই যেন বোকার মতো কথা বলে ফেলেছেন। কী ভেবে বললেন,

যা উপরে, পারিস তো এক কাপ চা খাইয়ে যেতে পারিস। এখন আমি শুয়ে পড়ব। যা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামবে বলে মনে হয় না।

আর তখনই ছলাত করে এক ঝটকা সমুদ্রের জল পোর্ট-হোল দিয়ে ভিতরে এসে পড়ল। মেঝের কিছুটা ভিজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে মুখার্জিদা উঠে পড়লেন। ছেঁড়া জামা-প্যান্ট দলা পাকিয়ে ঠেসে দিলেন পোর্ট-হোলে। উপস্থিত-বুদ্ধি এত প্রখর দাদার যে সুহাস কিছুটা অবাকই হয়ে গেল। আরও অবাক হল দেখে, নিশ্চিন্তে দাদা শুয়ে পড়েছেন বাংকে। বুকের কাছে হাত জড়ো করে রেখেছেন আর পা নাচাচ্ছেন। দু'হাতের আঙুল নাচাচ্ছেন। এই সব মুদ্রাদোষ দাদার কাছে। সে তা ভালই জানে। কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে তার মধ্যে এই মুদ্রাদোষগুলি দেখা দেয়। হঠাৎ উঠে বসে বললেন, শোন, চার্লি আর কী বলল? চার্লি যা, বলবে সব বলবি। কিছু গোপন করতে যাস না। ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফেরার সময়ে দ্যাখেনি ডেরিক তোলা আছে?

ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফিরে আসার সময়ও দ্যাখেনি? কে দ্যাখেনি? কী দ্যাখেনি? ডগ-ওয়াচের কথা উঠছে কেন! সুহাস পাশের বাংকটায় বসতে গেলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সুহাস উঠে পড়ল। বাংকটা ঠেলে তুলল কিছুটা। নীচে সামান্য সাপোর্ট দিতে পারলে বাংকটা ব্যবহার করা যেত। ঘরে কিছু নেই, সাপোর্ট দেবার প্রশ্নই আসছে না। সে মুখার্জিদার পায়ের দিকে গিয়ে বলল, পা ওঠাও। বসব।

মুখার্জিদা পা তুলে নিলেন।

জাহাজ খুবই ওঠা-নামা করছে। ঝড়ের দাপট রাত যত গভীর হবে তত বাড়বে মনে হল। সুরঞ্জন হঠাৎ দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় খটাস করে বালতি মগ রেখে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফোকশালের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। ঝড় প্রবল হচ্ছে বোঝা যায়। কারণ মাথার উপরে ছাদের মতো জায়গাটায় তাদের গ্যালি। গ্যালিতে হুড়মুড় করে কী পড়ল।

মুখার্জিদা উঠে পড়লেন।

বললেন, দেখলি তো!

সুহাস বালতি মগ দুটো ধরে ফেলল। কী কর্কশ শব্দ! আর স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কক কক। সব পেনিয়ান জোড়াতালি দিয়ে হালটাকে ধরে রেখেছে যেন। যে-কোনও মুহূর্তে পেনিয়ান চুরমার করে দিতে পারে ঝড়ের দাপট। সে মগটা বালতির ভিতর রেখে লকারের এক কোনায় রেখে দিল। কিছুটা চালু বলে, বালতিটা জাহাজের দুলুনিতে একটু-আধটু নড়ল, তবে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেল না।

সুহাস বলল, ডগ-ওয়াচ নিয়ে পড়লে কেন বুঝি না। কার ওয়াচ ছিল?

আরাফতের ওয়াচ গেছে।

ডেক-জাহাজি আরাফত ডগ-ওয়াচ থেকে ফেরার সময় তবে দেখেছে, ডেরিক নামানোই ছিল। এত রাতে ওয়াচ দিয়ে ফেরার সময় কারও কি খেয়াল থাকার কথা ডেরিক তোলা আছে, না নামানো আছে? কী জানি।

সুহাস বলল, ঠিক দেখেছে তো?

তাই তো বলল।

এত দুলছে জাহাজটা যে লকারের উপর লেদার সুটকেসটা পর্যন্ত নড়ানড়ি শুরু করে দিয়েছে। ভাঙা বাংকগুলির রড, রেলিংও দোল খাচ্ছে। মাথার উপর না পড়ে সুটকেসটা নামিয়ে রাখা দরকার। মেঝেতে জল গড়াগড়ি খাচ্ছে, রাখবে কোথায়? এমন একটা বসবাসের অযোগ্য ফোকশালে মুখার্জিদা থাকবেন কী করে সে বুঝতে পারছে না। গলা বাড়িয়ে ডাকল, মগড়া আছিস?

টোপাস মগড়া পাশের একটা ফোকশালে একা থাকে। গাঁজা খায় রাতে। তার গন্ধ এত তীব্র যে ফোকশালের ভিতর ঢোকে কার সাধ্য। সঙ্গে দু'জন মহাবীরের ছবি। সাধুসন্ত সে বলে না। বলে, মহাবীর। সে রোজ স্নান-টান সেরে দুটো ফটোতেই সিঁদুর লেপে দেয়। এটাই তার পূজা-আর্চার ঢং। তার ফোকশালে ঢুকলেও সে রাগ করে। ঘরেই থাকে তার ঝাঁটা-বালতি। সারাদিন কনুইয়ে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাজ করুক না করুক, ঝাঁটা-বালতি যতক্ষণ তার হাতে আছে ততক্ষণই সে ডিউটি দিচ্ছে।

নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে সাড়া দেবে না, সুহাস ভালই জানে। অথচ মেঝের জল মুছে না নিলে

ফোকশালে পা দেয়া যাবে না। সে তার চটি যেদিকটায় জল গড়ায়নি সেদিকে ঠেলে দিয়েছে। মুখার্জিদার জুতো এবং চটিজোড়াও সে সরিয়ে রেখেছে। অবাক মগড়া এক ডাকেই সাড়া দিয়েছে। সে এসে কী দেখল, তারপর ছুটে গেল তার ফোকশালে। শুকনো কাপড় দিয়ে মেঝেটা মুছে দেবার সময় বলল, গতিক ভাল বুঝছি না দাদা। পাঁচ নম্বর সাব বেঘোরে জানটা খতরা করে দিল। ডেরিকে মাথা ফুটে গেল সাহেবের। ডেরিক তো তোলা থাকে না।

মুখার্জিদা বললেন, ভর ধরেছে, ব্যাটা নেশা করতে ভুলে গেছিস। ভাল মানুষ সেজে বসে আছিস।— তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলি টোপাসও বোঝে, কোথাও গোলমাল আছে।

কোথাও যে গোলমাল আছে সেও বোঝে। না বুঝলে চার্লিকে বলবে কেন, ম্যাকের কেবিনে একবার যেতে পারলে ভাল হত। অথচ সে ভেবে পায় না, কেবিনে কী খোঁজাখুঁজি করবে? ছবিটা নিয়ে শিবঃপীডারও কী কারণ থাকতে পারে, তাও সে সঠিক বুঝল না। আসলে ছবিটা পকেটে রাখায় তার মনে হয়েছে ম্যাক হয়তো জানত, কে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু আতঙ্কে বলতে পারেনি। দৈবনির্ভর জীবন। এমন পাকা হিসাবই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। সফরে বের হলে ছবিটা সঙ্গে নিয়ে বের হয়। জাহাজিদের দুর্যোগের শেষ থাকে না। হয়তো ভেবেছিল, ভয় কী, সে তো তার বিশ্বাসমতো কাজ করে যাচ্ছে। দেখাই যাক না, উৎপীড়নকারী কতটা বাড়তে পারে।

সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। ঝড়ের দাপটে জাহাজ যেন সত্যি বেঘোরে পড়ে গেছে। বিদ্যুতের ঝলকানিও টের পাচ্ছে। মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো। মুহুর্মুহু কড়মড় করছে বজ্রবিদ্যুতের আর্তনাদ। সে রেলিং চেপে বসে আছে। কারণ সব সময় জাহাজের উথাল-পাথালে ব্যাঙের মতো লাফাতে কার ভাল লাগে? জাহাজ সমুদ্রে নেমে এলেই মোদো মাতালের মতো হাঁটতে হয়। সবসময় মনে হয় একটা দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যায় না। আর দুর্যোগ দেখা দিলে আরও কঠিন ডেক ধরে হেঁটে যাওয়া।

মুখার্জিদা চুপ। কী যেন ভাবছেন। সুরঞ্জন খবর দিয়ে গেল, খানা রেডি। ওদের বিশু নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখার্জিদা এবং সুহাস যেন খেয়ে নেয়।

সুহাসের দিকে মুখার্জিদা তাকিয়ে বললেন, যা তো।— বলে তাঁর ডিশ এবং গ্লাস লকার থেকে বের করে দিলেন। সুরঞ্জনদের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ। বেশ চলছে যা হোক।

সে বলল, এসো, খেয়ে নেবে।

নিয়ে আয় না।

যাওয়া যায় বলো? কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে সব যাবে। এসো না।

কোনওরকমে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মুখার্জিদা বললেন, চার্লিকে নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না। তুই ওর সঙ্গে বেড়াতে যাস কেন? গোরারা ভাল হয় না জানিস? চার্লি তোর এত প্রাণের বন্ধু হয় কী করে?

চার্লিকে নিয়ে তার মাথাব্যথা না থাকারই কথা। তবু চার্লি তাকেই সব বলে, চার্লি তার বিপদ-আপদের কথাও ভাবে। কেউ যদি বলে, থাক, তোমাকে আর জড়াতে চাই না, খারাপ লাগে না। সে জড়াবে কেন? তার সঙ্গে কারও শত্রুতাও থাকার কথা না। তার ঠাকুরদাও ধনকুবের নন, তা ছাড়া সে কোনও পাহাড়ি এলাকায় বুনো ফুলের উপত্যকাতেও একা মানুষ হয়নি। বেটসি বলে তার কোনও পিসিও ছিল না। মোটর-দুর্ঘটনায় সে মারাও যায়নি। চার্লি তো বলল, মোটর-দুর্ঘটনা না খুন, সে বুঝতে পারছে না!

সে থালা-গ্লাস ধুয়ে এনে তার লকারে রেখে দিতে গেল।

মুখার্জিদার থালা-গেলাসও ধুয়ে এনেছে। সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠাও ঝকমারি। কেবল ঝাঁকাচ্ছে। পড়ে যেতেই পারে। তবু সে খুব সন্তর্পণে সব কাজ সেরেছে। মুখার্জিদার বারোটা-চারটা ওয়াচ। সে ঘড়িতে দেখল নটা বাজে। রাত নটায় ঝড় না থাকলে জাহাজিরা ডেক-এ বসে এখন চিল্লাচিল্লি করত। তাস পেটাত। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না বলে সবাই শুয়ে পড়েছে। ঠিক সাড়ে এগারোটায় টান্টু। দু'নম্বর সুখানি নেমে আসবে ব্রিজ থেকে, যাদের ওয়াচ আছে তাদের জাগিয়ে দেবে। মুখার্জিদার এখন শুয়ে পড়ার কথা। ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু উঠতে গেলেই এক কথা, বোস না।

সে চলে যেতে পারছে না। বসতে বলছেন, অথচ চুপ করে আছেন। হঠাৎ মুখার্জিদা পাশ ফিরে শুলেন। তার দিকে তাকালেন।

তোর কি মনে হয় তুই টার্গেট?

একথা বলছ কেন?

না, যেভাবে ভেঙে পড়ছিলি। তুই তো লোকটাকে দেখিসনি?

না।

তুই না দেখলে ঘাবড়ালি কেন?

জাহাজে কোনও অজ্ঞাত লোক উঠে এসেছে শুনলে ভয় লাগে না?

জাহাজে উঠে এসেছে, উঠুক না।

সে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, চার্লি তো তাই বলল। কাকে সে খুঁজছে। লোকটা তাকে অনুসরণ করছে। তোমাকে তো বলেছি।

মুখার্জিদা উঠে বসলেন, তোর পোর্ট-হোলে কেউ উঁকি মারছে কি?

না, তা অবশ্য মারেনি।

তবে তুই এত ঘাবড়ে গেলি কেন?

যেন কথা বের করতে চাইছেন। সুহাস বলল, তুমিই তো বলছ, ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফিরে আসার সময়ও পরিদার দ্যাখেনি, ডেরিক তোলা আছে। তোমার হলে বুঝতে।

ধুস, কিচ্ছু বুঝছিস না। সে ভোররাতের ব্যাপার। তুই তো ঘাবড়ে গেছিস, লোকটা চার্লির পোর্ট-হোলে অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছিল তাই শুনে। সে তো গেল রাতে।

গেল রাতেই তো সব একের পর এক কাণ্ড জাহাজে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত কিছু ঘটে গেল।

দ্যাখ সুহাস, আমি এত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই। সোজাসুজি বল, পোর্ট-হোলে চার্লি দেখেছে, তুই দেখিসনি?

না বললাম তো।

তোর খেতে ইচ্ছে হল না কেন।

চার্লি বিপদে পড়ে গেলে আমি ঘাবড়ে যাব না? কাপ্তানের ব্যাটারই যদি এত আতঙ্ক থাকতে পারে আমারও যে থাকবে না, হয় কী করে? আমিও তাকে দেখে ফেলতে পারি। সে কেন উঠে এল তাই বুঝছি না।

চার্লি আর কিছু বলেছে?

বলেছে।

কী বলেছে বল?

চার্লির ঠাকুরদা একজন ধনকুবের।

ধনকুবের মানেই তো পাপ আছে বংশে। জানিস না, দেয়ার ইজ ক্রাইম বিহাইন্ড এভরি ফবচুন। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। চার্লিকে ছাড়বে কেন?

ধুস, তোমার গোয়েন্দাগিরি আমার ভাল লাগছে না। কী জানতে চাও বলো তো? ধনকুবের হলেই পাপ আছে ধরে ফেললে? ওর ঠাকুরদা তেমন মানুষই নন। মানুষটা অদ্ভুত প্রকৃতির। কোথায় মার্কিন মুল্লুকের উষর অঞ্চলে চার্লির ঠাকুরদা বুনো ফুলের চাষ করে বড়লোক হয়ে গেল। পাপ থাকবে কেন?

বুনো ফুল?

তাই তো বলল।

কত রকমের ক্যাকটাস। সব দুর্লভ ক্যাকটাস। রমরমা ব্যবসা। মুখার্জিদা কেন যেন এই অনুসরণকারীর সঙ্গে কোনও পাপের সম্পর্ক খুঁজছেন। তার ভাল লাগল না।

সে বলল, জানো, যখন যুদ্ধ ওদের দরজায় করাঘাত করছে, তখন মানুষটা তার সব পাহাড়ি এলাকায় বুনো ফুলের চাষ করে যাচ্ছে। সারা আমেরিকায় এখন বড়লোকদের শৌখিন ক্যাকটাস বলতে ব্যারেল ক্যাকটাস। ওর ঠাকুরদা ফুল ভালবাসত। বুনো ফুলের চাষ করেই বড়লোক হওয়া যায়, ওব ঠাকুরদা তাব প্রমাণ।

তারপর থেমে বলল, চার্লি তার মা'র কথা মনে করতে পারে না। যে নিগ্রো রমণীর কাছে মানুষ। তিনিও বেঁচে নেই। মোটর-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। চার্লির বাবা ছাড়া কেউ নেই।

থাম থাম! মোটর-দুর্ঘটনা বলছিস! বুঝতে দে।

মুখার্জিদা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সে কথা বলতে গেলেই থামিয়ে দিচ্ছেন হাত তুলে। সে মুখার্জিদার এই গাম্ভীর্যে হেসেই ফেলল। আর-এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, ভাবল।

আমি উঠব।

উঠবে ভাবছ, ডেরিক ভেঙে মাথায় পড়বে না! বোসো। উঠলে তো চলবে না। তুমিও জড়িয়ে গেছ বুঝতে পারছি। আমরা থাকতে তোমার কিছু হলে দেশে গিয়ে মুখ দেখাব কী করে?

আমি জড়িয়ে গেছি বলছ!

আলবত জড়িয়ে গেছ। তুমি আর বাচ্চা গোরাটার সঙ্গে ঘুর ঘুর করবে না। ধনকুবের মানেই রহস্য, বুঝলে? চার্লির আর কে কে আছে জানিস?

বলল তো।

কী বলল, আরে চুপ করে থাকলি কেন? এবারে হাসতে পারছ না কেন? যা উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দে। কে আবার কান পেতে থাকবে।

সুহাস দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। ওর সত্যি গা শির শির করছে। অনুসরণকারী যদি এখানেও অন্ধকারে নেমে আসে। সে বলল, ধুস, দিলে সব মাটি করে। রাতে ঘুমাতে পারব না।

সবে শুরু। কত রাত না ঘুমিয়ে থাকতে হয় দ্যাখ। একদম ঝেড়ে কাশছিস না। আমি তোর কোনও ক্ষতি করব ভাবছিস? আমার দায় পড়েছে। ডগ-ওয়াচেও ডেরিক তোলা ছিল না। তার মানে তার পরের ওয়াচে কাজটা কেউ করেছে। কবে দেখেছিস সমুদ্রে অকারণে ডেরিক তোলা থাকে? বন্দরে ঢোকার আগেও ডেরিক তোলা হয় না। বন্দরে ভিড়লে মাল তোলার জন্য ডেরিক তোলা হয়। কম ওজনের মাল নামানোর জন্য কে আর কোম্পানির পয়সা খরচ করে! শালা খচ্চর কোম্পানি, দেখছিস একবারও বন্দরের ক্রেন ব্যবহার করেছে! কুনজুস। ডেরিকেই সব মাল হারিয়া করে দিতে পারলে কোম্পানির পয়সাও বাঁচে, কাজেরও সুনাম হয়। হাবড়া কাপ্তান সব বোঝে, বুঝলি। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা খুশি হলে আরও দু'-চার সফর। দু'হাতে টাকা রোজগার।

তারপরই মুখার্জিদা কেমন চুপসে গেলেন। কী খুঁজছেন।

কোথায় রাখলাম?

কী খুঁজছ!

টোবাকোর প্যাকেট!

ও ঘরে পড়ে নেই তো?

না। দ্যাখ তো জামার পকেটে আছে কি না।

সুহাস উঠে গিয়ে জামার পকেট খুঁজল। বালিশের পাশে খুঁজল। নেই।

কোথায় রাখলাম! বোস, আসছি।— বলেই মুখার্জিদা দ্রুত নেমে গেলেন বাংক থেকে। কম্বল জড়িয়ে গায়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন।

কোথায় যাচ্ছ?

জবাব দিচ্ছেন না।

সে দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, আরে, উপরে যাচ্ছ কেন?

বলছি না বসে থাকতে। আসছি।

সে বসে থাকল। ঝড়ের মধ্যে কোথায় উঠে গেলেন? উপরে তো এখন ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে। টোবাকোর প্যাকেট খুঁজতে কেন যে এই দুর্মতি! রাতে তাঁকে ওয়াচে যেতেই হবে। তখন বর্ষাতি গায়ে যাবেন। এখন গেলে তো ভিজে চুপসে যাবেন। অথচ সে নড়তে পারল না। যেন সিঁড়ি ধরে উপরে গেলেই অনুসরণকারীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। ফোকশালে বসে থাকতে বলে গেছেন। সে উঠতেও পারছে না। একবার অধীর কিংবা সুরঞ্জনকে ডেকে বললে হত, ঝড়ের মধ্যে কোথায় যে বের হয়ে গেল! এত রাতে বলতেও বাধছে। দরজা বন্ধ করা। কারণ ঝড়ের জন্য দরজা খোলা রাখা যাচ্ছে

না। দরজা লক করে দিতে হচ্ছে। ডাকাডাকি করলে সবাই জেগে যাবে। বারোটা-চারটার পরিদাররা বিরক্ত হতে পারে। তারা পরি অর্থাৎ ওয়াচ দিতে যাবে বলে যে যতটা পারছে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

সে বুঝতে পারে ভয় বড় সংক্রামক ব্যাধি। সে এই ফোকশালে বসেও থাকতে আর সাহস পাচ্ছে না। উপরে উঠে যেতেও ভয় পাচ্ছে। সারেঙের দরজাও বন্ধ। এবং তার ফোকশালের দরজা খুলে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু এই অসময়েও মুখার্জিদা টোবাকোর প্যাকেট খোঁজার জন্য যে কেন উপরে উঠে গেলেন, সে বুঝতে পারল না।

নিজের ফোকশালে ঢুকে শুয়েও পড়তে পারছে না। ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা। সে যে কী করে।

আর তখনই মুখার্জিদা নেমে এলেন।

কোথায় গেছিলে?— সে না বলে পারল না।

হাতের টোবাকো প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, পেয়েছি।

তারপর সহসা প্রশ্ন, বুনো ফুল তোকে দেখছি ছবি এঁকে দেখিয়েছে চার্লি!

কেউ তো জানে না! সে তো একাই ছিল ঘরে। আর কেউ তো ছিল না। সুহাস অবাক।

সে বলল, জানলে কী করে?

মুখার্জিদা একটা কাগজ মেলে ধরলেন।

কোথায় পেলে?

তা দিয়ে কাজ কী? এটা কী ফুল?

ব্লেজিং স্টার।

তোর মনে আছে দেখছি।

কোথায় পেলে বলছ না কেন? ইস্, এর জন্য উঠে গেলে? আমাকে বললেই পারতে। আমার লকারে আরও আছে।

তোর লকার আমি খুলিনি। যাক গে, খুবই সুন্দর দেখতে। কী লম্বা আর সুন্দর ফুলগুলি।

বুনো ফুল দেখতে সত্যি সুন্দর।

বুনো ফুলের বোটকা গন্ধও আছে।

কে বলল?

বলবে কে! বোঝা যায়। একটু বেশি মাখামাখি থাকলে বুনো ফুলের গন্ধও পাওয়া যায়। মেয়েমানুষের গন্ধ!

মিছে কথা! একটা ফুলেরও গন্ধ নেই।

আছে আছে। টের পাস না। জাহাজে এই ফুল মনে হয় উড়ছে। যাক গে, আন্দাজে ঢিল মেরে লাভ নেই। বুনো ফুলের গন্ধ কেউ কেউ পায়। তুই পাস না বলে কি সবাইকে ভেড়া ভাবিস! যা শুয়ে পড় গে।

সুহাস ভেবে পেল না, মুখার্জিদা কি তাকে নিয়ে তামাশায় মেতেছেন, না সত্যি আঁচ করেছেন বেঘোরে পড়ে তার জানও খতরা হয়ে যেতে পারে। সে কেমন শুকনো মুখে বলল, জানো চার্লির সংশয় বেটসিকে কেউ খুন করেছে।

তোফা! এতক্ষণ ঝেড়ে কাশছিলি না কেন? তাই বল।

খুবই রহস্যজনক, অথচ গত সফরে মনেই হয়নি। চার্লির জাহাজে উঠে আসার পেছনে কোনও রহস্য থাকতে পারে। রাতের ওয়াচে মুখার্জি স্টিয়ারিং-হুইলের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই ভাবলেন। কাপ্তানের আদুরে ছেলে উঠে আসতেই পারে। আর বজ্জাতের ধাড়ি। এমন দুরন্ত ছেলেকে কিনারায় রেখে এসে কাজেকর্মে স্বস্তি পাওয়া কঠিন। চার্লির কে আছে, কে নেই, তাও জানার কোনও সুযোগ ছিল না। পর পর দুটো সফরেই চার্লি জাহাজে আছে। পর পর দুটো সফর একই জাহাজে তিনিও আছেন।

গত সফরে ইঞ্জিন-সারেং নিয়াজিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। চার্লি জাহাজে উঠে আসার পর নানা

উপদ্রবে পড়ে যেতে হয়, কারণ কার পেছনে লাগবে ঠিক কী, যতটা পারা যায় চার্লি সম্পর্কে নানা হুঁশিয়ারির শেষ ছিল না। বাপের আদরে মাথাটি গেছে। মা নেই, কোনও এক দূর-সম্পর্কের পিসির কাছে মানুষ, সেই পিসিও গত হওয়ায় কাপ্তান নিরুপায় হয়ে সঙ্গেই নিয়ে এসেছেন। তাঁর কেন, সবারই কাছে, চার্লির জাহাজ উঠে আসার কারণ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

সুহাস জাহাজে না থাকলে এই নিয়ে তাঁর মাথা ঘামাবারও কারণ ছিল না।

তাবা আছে এখন ওশিয়ানিয়া অঞ্চলে। এই অঞ্চলে হাজার হাজার দ্বীপের ছড়াছড়ি। অস্ট্রেলিয়াকে বলা যেতে পারে সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ। তারা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ফসফেট আমদানি করবে। বেশ ছিল, আর ক'মাস পরই হয়তো মাটি টানার কাজ শেষ হয়ে যেত। দেশে ফিরে যেতে পারত নির্বিঘ্নে। কিন্তু ফাইভারের আকস্মিক মৃত্যুর পেছনে যেমন রহস্য দানা বাঁধছে, তেমনি চার্লির অনুসরণকারীও কম রহস্যময় নয়। বেটসি খুন হয়েছে, বেটসি মানে চার্লির পরিচারিকা, মা নেই আগেই জানা ছিল, বেটসির খুন হওয়া অবশ্য সংশয়ের পর্যায়ে আছে, কারণ চার্লি ঠিক জানে না, দুর্ঘটনা না খুন। যেমন ম্যাকের মর্মান্তিক মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত, না কোনও পরিকল্পিত হত্যা, কারণ ডেরিক যেই তুলে রাখুক, তার যে মতলব ভাল ছিল না, বুঝতে পারছেন মুখার্জি।

উইনচ চালিয়ে ডেরিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কপিকলের সাহায্যে কাজগুলি হয়ে থাকে। একজন লোকের পক্ষে এভাবে ডেরিক তুলে ফসকা-গেরোয় বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। ডেরিক যার নির্দেশেই তোলা হোক, তারা ছিল দু'জন। এবং কোনও দূর-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখা হয়েছিল। কার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব?

ডেক-টিন্ডাল লতু মিঞা এবং কিছু ডেক-জাহাজি উইনচ চালাতে জানে। ডেরিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেকেন্ড মেট কিংবা চিফ মেটের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে কেউ হাতও দিতে পারে না। সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার বব নিজেও উইনচ চালিয়ে দেখে নেন, ডেরিক ঠিকমতো কাজ করছে কি না। যদি ভুলবশত ডেরিক তোলা থাকত, তবে কারও চোখে পড়বে না হয় কী করে।

মুখার্জি টের পাচ্ছেন খুবই জটিল অঙ্ক। ম্যাককে হত্যা করে কার কী উপকার হল? সুহাস কেন এই জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে? সুহাস সাধারণ জাহাজি, সে ধনকুবেরের নাতিও নয় যে, খুন-টুন করে ঠাকুরদার বিশাল সম্পত্তি গ্রাস-টাস করা যাবে।

ঝড়বৃষ্টির দাপট চলছে। এত ঝাপসা, সামনে কিছুই দেখা যায় না। থার্ড মেট মাঝে মাঝে কম্পাসের রিডিং দেখছেন। থার্ড মেট পায়চারি করছিলেন। কারণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা টানা চার ঘণ্টা খুবই কঠিন। দু'বার চা খেয়েছেন। মুখার্জিই চা করে এনেছেন গ্যালি থেকে। ঝড় প্রবল হওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ডেক-এ। বাতিগুলো জাহাজের তেমন জোরালো নয়। ইঞ্জিন-রুমের সঙ্গে মাঝে মাঝে থার্ড মেটের সাংকেতিক কথাবার্তা চলছে। কত নট বেগে ঝড়ের দাপট চলছে, লগবুকে নোট করছেন। নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে বোঝা যায়।

পাশে চার্টরুম। চা করে নিয়ে আসার সময় চার্টরুমের দরজা যে খোলা নয়, লক্ষ করেছেন মুখার্জি। চার্টরুমেই চাবি থাকে সব কেবিনের। কী যে অজুহাত সৃষ্টি করা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না মুখার্জি। কী করে চার্টরুমে ঢুকে ম্যাকের কেবিনের চাবিটি হস্তগত করা যায়, কারণ ম্যাকের কেবিনে ঢুকে মুখোশগুলো দেখতে পারলে ভাল হত। জাহাজে ম্যাক কাকে কাকে মুখোশ উপহার দিয়েছে, এটাও জানা দরকার।

এসব কাজে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। রহস্যের জট খোলা চাট্টিখানি কথা নয়। কিছু ক্রাইম থ্রিলার পড়ে এটা তিনি টের পেয়েছেন। কম কথা, সহসা উলটোপালটা প্রশ্ন করে ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দেওয়া। কোনও সুযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো, বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না, সব গুজবের পেছনেই কোনও না কোনও ঠান্ডা মাথার আকস্মিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে। গুজবের মাথাও কেটে দেওয়া যায় না। প্রায় রক্তবীজের বংশধর, একটা থিতিয়ে এলে আর-একটা গজিয়ে ওঠে। লুকেনার থেকে মেয়েমানুষের লাশ এবং বোট-ডেকে কখনও কখনও আবছা অন্ধকারে নারীর ঘোরাফেরার কোনও হেতু থেকে নানা গুজব যে সৃষ্টি করা হচ্ছে না কে বলবে!

তবে গুজব, লুকেনার এই জাহাজে শুধু নয়, তাঁর তিনটি জাহাজেই মাঝে মাঝে দেখা দেন। সিওল

ব্যাংক, টিবিড ব্যাংক এবং এই ডিনা ব্যাংকের এককালের অধীশ্বর এভাবে গুজবের মধ্যেই বেঁচে আছেন, তিনি তাও বুঝতে পারেন। লাশ দেখে আহামদ পাগল হয়ে যায়নি, আতঙ্কে ব্যাটা পাগল হয়েছে।

এটা তো হতেই পারে, সারাক্ষণ কেবিনে মরা লাশ আছে ভাবলে, কার না ত্রাস সৃষ্টি হয়! কেবিনের পোর্ট-হোল দিয়ে যে বাইরের সমুদ্র দেখা যায় তখন তাও মনে থাকে না। লাশ বরফ-ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, এমন খবরে আহামদ সারাক্ষণ শুধু লাশের কথাই ভেবেছে।

চার্লিও যে আতঙ্কে পড়ে যায়নি মুখোশের, কে বলবে? সে কি কোনও বুড়ো মানুষকে শৈশবে দেখলে ভয় পেত? কিন্তু মুশকিল চার্লির সঙ্গে এসব নিয়ে কথাবার্তা বলা মেলা ঝঞ্ঝাট। একমাত্র সহায় হতে পারে সুহাস: সুহাসকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করা যাবে এই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হতেই তিনি দেখলেন, ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। তিনি দ্রুত হুইলের জিম্মায় থার্ড মেটকে রেখে সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন। এখন তার কাজ সেকেন্ড মেটকে জাগিয়ে দেওয়া। তার কেবিনের দরজায় টোকা মেরে বলা, উঠুন, আপনার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। তারপর দ্রুত ডেক পার হয়ে ফোকশালে ফোকশালে খবর দেওয়া— বলা, টান্টু। এক নম্বর ওয়াচের পরিদাররা এবারে উঠে পড়ো। জাগো।

এক নম্বব পরিদারদের জাগিয়ে ফের ব্রিজে উঠে গেলেন তিনি। এবং ওয়াচ শেষে নেমে এলেন বোট-ডেকে।

মুখার্জি বোট-ডেকে নেমে কেন যে চার্লির কেবিনের পেছনে চলে এলেন নিজেও বুঝলেন না। মাথায় কি কোনও চিন্তাভাবনা কাজ করছিল, সহসা সব যেন ভুলে গেছেন, এই ভেবে থতমত খেয়ে গেলেন। তারপরই মনে হল, আসলে পোর্ট-হোলের পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে যেতে চান। ঝড়-ঝাপটায় টলে টলে হাঁটতে হয়।

দু'নম্বর বোটের পাশ দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিতে থাকলেন। চার্লির কেবিনের পেছনটায় চলে গেলেন তিনি। ফুট চার-পাঁচ দূরে লোহার রেলিং বুক সমান উঁচু। দাঁড়াতে গেলে, এক ঝটকায় ঢেউ ভাসিয়ে নিতে পারে। ঢেউ এত প্রবল। তা ছাড়া জাহাজ যেভাবে ওঠানামা করছে, তাতে করে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। উইংস-এর আলো ঠিকমতো পড়ছে না। কেবিনের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। হাতডেও কিছুর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তবু কোনও রকমে দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হচ্ছে না বুঝেও, মনে হল তাঁর সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এই ঝড়-ঝাপটায় কেউ চার্লির কেবিনের পেছনে হাঁটা-চলা করতে পারে, অবিশ্বাস্য! তবু তিনি রেলিং ধরে হাঁটছেন। একবার দেখা দরকার পোর্ট-হোলের সামনে দাঁড়িয়ে। চার্লি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ভোররাতের ঘুম সবারই কম-বেশি প্রিয়।

তিনি এবার সোজা কিছুটা এগোতে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। রেলিং ধরে ফেলে আত্মরক্ষা করা গেল। ফের এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পারছেন না। পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দেখতে চান, যে মানুষটা অনুসরণকারী সে দীর্ঘকায় কি না! কিংবা কত দূরত্বে দাঁড়ালে কেবিন থেকে চার্লি সেই মুখ দেখতে পারে, এসব দেখার কৌতূহলেই আসা। এদিকটায় তাঁর আসার দরকার হয় না। আসেনও না

তিনি দেখতে পেলেন পোর্ট-হোলে পর্দা ঝুলছে এবং ভিতরে আলো জ্বালা। আসলে চার্লি কি জেগে আছে, না ভয়ে কেবিনের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে! পোর্ট-হোলে পরদা টানানো, এটা মুখার্জির অনুমানের বাইরে। পরদা ফেলা থাকলে সেই হিমশীতল মুখ সে দেখতে পায় কী করে! তা ছাড়া কারও পোর্ট-হোলেই পর্দা ঝোলে না। এটা তো মালবাহী জাহাজ। যাত্রী-জাহাজ হলে তবু না হয় কথা ছিল শালীনতা রক্ষার্থে যাত্রী-জাহাজে পর্দা ঝুলতেই পারে। মালবাহী জাহাজে এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা

মালবাহী জাহাজে এ ধরনের শালীনতার প্রশ্নই আসে না। সাধারণত পোর্ট-হোলগুলি উঁচুতেই থাকে। কেবিনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভিতরে কী আছে না আছে দেখার কথা না। দেখতে হলে টুলের দরকার। কিন্তু আশ্চর্য চার্লির কেবিনের পোর্ট-হোল বেশ নিচুতেই বলা যায়। যাওয়া-আসার পথে নীল কাচের ভেতরে কেবিনের সব কিছুই আবছা দেখা যেতে পারে। ভিতরে আলো জ্বালা থাকলে তো কথাই নেই।

তবে এদিকটায় কারও আসার কথা নয়। একেবারে বোট-ডেকের একপাশে পর পর দুটো কেবিন

কেবিনের পেছনে কয়েক ফুট মাত্র, কাঠের পাটাতন। জাহাজে কাঠের পাটাতনে মাঝে মাঝে হলিস্টোন মাবা হয়ে থাকে। ঝড়-জলে-বৃষ্টিপাতে কাঠের পাটাতনে শ্যাওলা পড়ে যায়। হলিস্টোন মেরে পাটাতন ঘষে ঘষে মসৃণ রাখার কাজগুলি ডেক-জাহাজিরাই করে থাকে। এদিকটায় যে বেশ কিছুকাল কাঠের ডেক বালি আর পাথরে ঘষা হয়নি বুঝতে মুখার্জির অসুবিধা হল না। পা পিছলে যাচ্ছিল, খুব সতর্ক পায়ে হাঁটাহাঁটি করে তিনি কিছু মাপজোক নিতে ব্যস্ত।

আসলে লোকটা লম্বা না বেঁটে, লোকটা যদি চার্লির পোর্ট-হোলে এসে দাঁড়ায় তবে সে কতটা দীর্ঘকায় হতে পারে, এমন কিছু চিন্তাভাবনা মাথায় কাজ কবছিল বলেই একবাব যেন দেখে যাওয়া।

কিছুটা গা-ঢাকা দেবার মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। অঝোরে বর্ষণ চলছে। সমুদ্রেব অন্ধকারে পাতলা বিবর্ণ ছাই বঙেব নীলাভ জলবাশি পাক খাচ্ছে। এখানে আব দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হবে না। বুনো ফুলের ঘ্রাণ তো আর এভাবে পাওয়া যায় না। যদি তাই হয়, তিনি কেমন কিছুটা বেকুফই হয়ে গেলেন ভেবে।

মাঝে মাঝে তাঁর কেন যে মনে হয়, চার্লিব গায়ে বুনো ফুলের গন্ধও লেগে আছে। ঘ্রাণশক্তি তাঁব একটু প্রবল। তবে মনে হয়েছে, সাহেবেব বাচ্চা চার্লি, চান-টান কবে না, নোংবা থাকাব স্বভাব এবং সহসা এই সেদিনও তিনি চার্লিব শবীবে উত্তেজক গন্ধ পেয়ে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। চার্লিব শবীব থেকে গন্ধটা উঠছে, না অন্য কোথাও থেকে, চার্লি প্রায় তার নাকেব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তিনি হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন ব্রিজে। জাহাজে নানা কিসিমেব পতাকা ওড়ে। পতাকাগুলি ভাঁজ কবছিলেন। চার্লি তার নাক ঘেঁষে হেঁটে যাবাব সময়ই বুনো ফুলের গন্ধ। নারীব শবীরে কোথায় কী ঘ্রাণ থাকে তাঁর তো জানতে বাকি নেই। শবীবেব ভাঁজে ভাঁজে নানা কিসিমেব ঘ্রাণ। চার্লিব শবীবে বুনো ফুলেব গন্ধ পেয়ে কিছুটা তিনি হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। জাহাজে শেষে সত্যি মেয়েমানুষ উঠে এল। চার্লি জাহাজেই বেড়ে উঠছে। যত বড হচ্ছে তত বেশি যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে।

জাহাজিদের অবশ্য এই এক দোষ। শবীবে মেয়েমানুষের গন্ধ শোঁকাব স্বভাব। পুরুষ হলেও। সুন্দব বালক কিংবা যুবা হলে তো কথাই নেই। কারণ সমকামিতা জাহাজে সংক্রামক ব্যাধি। সেই ব্যাধিতে তিনি কি আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এখন ঠিক আব তা অনুমান করতে পাবছেন না। তা না হলে গন্ধে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন কেন। নাবীর মধ্যে ঘ্রাণেব সুবাসেব চেয়েও এই উত্তেজক গন্ধ জাহাজিদেব শুধু প্রিয় নয়, দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে যায়। আজ কেন জানি না তিনি পর্দা ঝুলতে দেখে এটা আবও বেশি অনুমান কবতে পাবছেন। সারা মাসকাল সমুদ্রেব নোনা হাওয়ায় বসবাসেব ফল। খ্যাপা কুকুবেব মতো ছুটে মবা। বং বার্নিশেব গন্ধ ছাপিয়ে বুনো ফুলেব গন্ধ ভেসে ওঠে। বিকৃত রুচি থেকে হতে পাবে, কী যে কাবণ এটা এখনও তাঁব কাছে অনুমান-সাপেক্ষ। আবাব ভাবলেন, তিনি সেই গন্ধে পাগল হয়ে আছেন।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। পুব আকাশ ফবসা হয়ে উঠছে। ভিজে জবজবে এবং জুতো মোজা সব ভিজে গেছে তাঁর। বোট-ডেক থেকে লাফিয়ে সিঁড়ি ধবে নেমে এলেন। ছুটতে ছুটতে টুইন-ডেক পার হয়ে আসছেন। পিছিলের ছাদেব নীচে এসে বেনকোট টুপি খুলে গ্যালিতে উঁকি দিলেন। শীতে কাঁপছেন। যদিও ঠান্ডা কমে আসছিল, তবু ঝোড়ো হাওয়ায শীতের কামড় আবাব বেড়ে গেছে। এত সকালে কারও ওঠার কথা না। গ্যালিতে ভাণ্ডাবি থাকতে পাবে। এ সময়টায় ভাণ্ডাবি উনুনে আঁচ দেয়। একটু চা হলে খাসা হত। কে করবে!

ভাণ্ডাবি মুখার্জিবাবুকে দেখে অবাক। চাবটায় ডিউটি শেষ। এখন বাজে পাঁচটা। জামা-কাপড় ছাড়েননি। ভিজে জামা-কাপড়ে বেঞ্চিতে বসে আছেন। একে একে জাহাজিরা সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে। গোসলখানায় ঢুকছে। কেউ কেউ গ্যালিতে ঢুকে হাতের তালুতে ছাই নিয়ে দাঁত মাজছে। ভাণ্ডারি খুব ব্যস্ত। উনুনে আঁচ উঠলে গরম জলের কেটলি বসিয়ে দিতে হবে। গ্যালি ধোওয়া-মোছার কাজ শেষ। বাসি পবিত্যক্ত আনাজ-তরকারি সব টিনের মধ্যে মজুত করা। টিন তুলে নিয়ে সমুদ্রেব জলে ফেলে দিল অভুক্ত অবশিষ্ট খাবার। দুটো অ্যালবাট্রস পাখি কোথা থেকে সাঁ সাঁ করে উড়ে আসছে। পাখা মেলে ভেসে যাচ্ছে। তারপব জলে ঝাঁপিয়ে অভুক্ত খাবাব ঠোঁটে নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের জলে।

মুখার্জি সোজা সিঁড়ি ধবে তাঁর নিজেব ফোকশালে নেমে যেতে পারতেন। তিনি গেলেন না। তাঁর

পক্ষে অবশ্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হচ্ছে না। তাঁর তো এখন শুয়ে পড়ার কথা। ভোরের ঘুমটা আজ ইচ্ছে করেই মাটি করে দিলেন। ঝড়ের দাপট কমে আসছে। তবু তাঁর কেন যে মনে হয় এক কাপ চা খেতে পেলে ভাল হত। কাকে বলবেন, ভাণ্ডারিকে বললে হয়। ভাণ্ডারি কি তাঁর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে চায়ের ব্যবস্থা করবে? তারপরই মনে হল, আঁচ উঠতে সময় লাগবে। বলেও লাভ নেই। নীচে নেমে গিয়ে পোশাক ছেড়ে ফেলাই ভাল।

আসলে বুনো ফুলের গন্ধ জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই রহস্যটাই বা কী করে ফাঁস করা যায়। বুনো ফুলের গন্ধেই তিনি ছুটে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজের মধ্যে ছিলেন না। ভাণ্ডারিই বলল, আরে মুখার্জিবাবু, দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন। সব তো ভিজে জবজবে। ঠান্ডায় যে কাবু!

এই রে। ধরা পড়ে গেলেন বুঝি। চারটায় ওয়াচ শেষ। চারটায় ফোকশালে নেমে যাবার কথা। বাথরুমে ঢুকে হাতে-মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়ার কথা, তা না, তিনি কোথা থেকে অসময়ে, এই সংশয় ভাণ্ডারির মনেও উঁকি দিচ্ছে।

তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে নীচে নেমে গেলেন। সুহাসের সামনে পড়ে গেলে আর এক কেলেঙ্কারি।

দাদা, তোমার এত দেরি! কোথায় ছিলে?

জাহান্নামে ছিলাম, বুঝলি! কোথায় ছিলে! দ্যাখ তোর কপালে কী আছে!

যেন সুহাসের উপরই সব তিক্ততা গিয়ে পড়ল।— কী দরকার বুঝি না, চার্লির সঙ্গে ঘোরার। বাবু, তুমি বোঝো না কী চিজের পাল্লায় পড়ে গেছ! তুই কি আহাম্মক? আমি গন্ধে টের পাই, আর তোর সঙ্গে এত মাখামাখি, কিছু টের পাস না! তোর নাকে গন্ধ লেগে থাকে না! নোনাজলে ঘুরলে এমন গন্ধে তো পাগল হয়ে যাবার কথা!

না, এখন আর এসব নিয়ে ভাবনা নয়। লম্বা টানা ঘুম। জামা-প্যান্ট খুলে এক কোনায় ফেলে রাখলেন সব। রেনকোট হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর গামছায় শরীর মুছে পাতলুন আর জামা গলিয়ে কম্বলের নীচে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। উঠে ফের দরজা বন্ধ করলেন। শরীর টাল হয়ে গেছে। শুয়ে পড়তেই তাঁর এটা মনে হল। মুখে শরীরে কম্বল চাপা দিয়ে চোখ বুজলেন। কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করছেন, কাউকে কিছু বলা যাবে না। এই বুনো ফুলের গন্ধ কেবল তিনিই টের পেয়েছেন, এমন ভাবলে ভুল করা হবে। অনুসরণকারী যে আগেই টের পায়নি কে বলবে? অনুসরণকারী জাহাজের কেউ হবে। সে কে?

ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার?

থার্ড?

না সেকেন্ড?

সেকেন্ড তো খুব রাশভারী মানুষ। চার্লির অভিভাবক গোছের। কারণ চার্লিকে মাঝে মাঝে তিনি শাসনও করে থাকেন। কারপেন্টার, কাপ্তান মেসরুমমেট বুড়োমানুষ। কাপ্তান-বয়ই একমাত্র চার্লির ঘরে যখন-তখন ঢুকতে পারে। বুড়োকে কিছু বলাও মুশকিল। কাপ্তানের কানে গেলে সেও সুহাসের মতো জালে জড়িয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া কিছুই তো নিশ্চিত নয়। দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, এই যোগফলের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া। বুনো ফুলের গন্ধ, পোর্ট-হোলে পর্দা, অনুসরণকারী কেউ আছে, আছে না আতঙ্কে চার্লি সেই এক বুড়োর মুখ দেখতে পায়। তিনি কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন না।

সত্যি যদি বুনো ফুলের গন্ধ চার্লির গায়ে লেগে থাকে, সবসময় না হলেও মাঝে মাঝে যে গন্ধটা পাওয়া যায়, এমন ভাবলেও তাঁর আর সিদ্ধান্তে ভুল থেকে যাচ্ছে। কাপ্তান চার্লিকে যত্রতত্র যেতে দেবেন কেন! সুহাসের সঙ্গে ঘুরতে দেবেন কেন। কাপ্তান যদি নেহাত দায়ে না পড়েন, দায়টা কীসের? ডেরিক তুলে রেখে তিনি কি সুহাসকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন? ইচ্ছে করলে তো তিনি চার্লিকে দেশেও পাঠিয়ে দিতে পারতেন। অথচ তার কিছুই করছেন না। চার্লি জাহাজে আছে, বড় হয়ে উঠছে. এসব কি কাপ্তানকে বিন্দুমাত্র ভাবায় না!

চার্লি তার অনুসরণকারীর কথা একমাত্র সুহাসকেই জানিয়েছে! সুহাস কী করবে! সে ছেলেমানুষ

চার্লি আর নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজে পেল না। বাপ তো তার জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি না পারলে কে পারবেন। সুহাস কে? চার্লি সুহাসকেই কেন বলে। সুহাস কী, তাকে সব ভেঙে বলছে না, আবে বুঝছিস না গাধা, যত সরল অঙ্ক ভাবছিস, পর্দা ঝুলতে দেখে মনে হল অঙ্কটা তত সরল নয়। তুই তো সোজা বলে দিতে পারতিস, তোমার বাবাকে বলছ না কেন! আমি কী করতে পারি? খুব ভুল করছ চার্লি, বলতে পারতিস। ভয়ে আতঙ্কে কাবু। রাতে আলো না জ্বালিয়ে ঘুমোতেও ভয় পাও, তখন কিনা একজন সামান্য জাহাজিকে বলছে, আর কেউ যেন না জানে।

না, কিছুই মাথায় আসছে না।

অনুসরণকারী কাছে থাকে না।

অনুসরণকারী দূরে থাকে।

কাছে থাকলেও আবছামতো অন্ধকার থেকে উঁকি মারে।

প্রথম দেখা দরকার, সত্যি উঁকি মারে, না ভূতগ্রস্ত চার্লি?

যাকগে। জাহাজের পরিণতি খুব যে ভাল না তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। জাহাজে আরও কোনও বড় ধরনের নাটক হতে পারে। শুধু চেষ্টা করে যাওয়া।

দুপুরে মেসরুমে খেতে বসে মুখার্জি দেখলেন, সুহাস খুবই অন্যমনস্ক। এই সময়টায় সবার সঙ্গে দেখা হয়। বারোটা থেকে একটা, এক ঘণ্টা ছুটি। সবাই খেতে আসে মেসরুমে। বেশ গ্যাঞ্জাম চলে। যারা বারোটা-চারটার ওয়াচ দিতে যায় স্টোক-হোলডে কেবল তারাই হাজির থাকে না। এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে তারা ধীরেসুস্থে নীচে নামে। সুবঞ্জনের দেখা পাওয়া গেল না। অধীর, হরেকেষ্ট, মুখার্জি, সুহাস পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। সুহাস কিছু বলছে না।

মুখার্জি বললেন, আর একটু ডাল নে। এত শুকনো খাচ্ছিস! গলায় আটকে যাবে যে। —বলে তিনি ডেকচি থেকে এক হাতা ডাল দিলেন সুহাসকে।

ইস্ কী করছ! এত আমি খেতে পারি না। তোমার লাগলে নাও না।

আর তখনই সুহাস বিষম খেল।

জল খা।

বেশ জোরে বিষম খেয়েছে। কাশছে। কথা বলতে পারছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অধীর জলের গ্লাস এগিয়ে দিল মুখের কাছে। জল খেয়ে যেন স্বস্তি পেল সুহাস। মুখার্জি বললেন, বাড়ির জন্য মন খারাপ?

সুহাস বলল, হ্যাঁ, মন খারাপ। আর কী জানতে চাও বলো।

সুহাস মুখার্জিদার উপর যেন খুবই বিরক্ত। মুখার্জি বুঝলেন না, হঠাৎ খেপে গেল কেন সুহাস? খারাপ কিছু বলেননি! বাড়ির জন্য মন খারাপ হতেই পারে। কতকাল হয়ে গেল, জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরবাড়ি, মা-বাবা এবং নদী থাকলে, নদীর জন্য মন খারাপ হতেই পারে। তবে কেন সুহাস খেপে গেল তাঁর উপর?

সুহাস কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে নেমে গেলে মুখার্জিও পিছু নিলেন। হাত ধরে টেনে বললেন, কী হয়েছে বল তো।

কী হবে আবার। তুমি শেষে এই! তুমি চার্লিকে ভয় দেখাচ্ছ। বেচারা ভয়ে কাবু। তুমি চার্লির পোর্ট-হোলে ঘোরাঘুরি করছ! চার্লি টের পেয়েছে।

টের পেয়েছে! কী করে টের পেল?

বলল তো, ভোররাতে সে আবার এসেছিল।

দ্যাখ সুহাস।—বলেই বোধহয় চিৎকার করে উঠতেন। কী ভেবে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, বুঝেশুনে কথা বলবি। চার্লি বলেছে, আমি ঘোরাঘুরি করছি।

চার্লি দেখলে তো বলবে।

মুখার্জি কেমন মিইয়ে গেলেন।

কে দেখেছে?

আমি।

তুই দেখেছিস?

হ্যাঁ দেখেছি। না দেখলে বলব কেন? ঝড়ের রাতেও কামাই নেই? পোর্ট-হোলে পর্দা ফেলা ছিল বলে রক্ষা। পর্দা তুললেই তোমাকে দেখতে পেত। কী করছিলে বলো তো। কেন বেচারাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ? তুমি জানো, আতঙ্কে মানুষের কী হয়। আহামদ বাটলারকে ভাগালে। চার্লিকে ভাগাতে চাইছ। কী করছিলে, বলো। চুপ করে আছ কেন? বেচারা কাঁদো-কাঁদো মুখে হাজির, জানো সুহাস, সে এসেছিল। ভয়ে কাঠ।

মুখার্জি বুঝল, এতটা বোকামি না করলেই পারতেন। পায়ে বুটজুতো, ঠক ঠক শব্দ হতেই পারে চলাফেরার সময়। আসলে গোয়েন্দাগিরি কাজটা যে সোজা না, এতে তিনি টের পেয়ে গেলেন। কাঠের ডেক-এ জুতোর শব্দ উঠতেই পারে। চার্লি টের পেয়ে আলো জ্বেলে বসে ছিল। শৌখিন গোয়েন্দারা কী করে যে এত তৎপর হয় তাঁর মাথায় আসে না।

মুখার্জি এবার আলটপকা বলে ফেললেন, বাজে একদম বকবি না। আমি মরতে যাব কেন ওখানে।

সুহাস বলল, আমি তো দেখলাম, ঝাপসা অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে তুমি বোট-ডেক থেকে নেমে আসছ। কী করছিলে? পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে অন্ধকারে সিঁড়ি ধরে, নামার সময়ও দেখেছিলাম, কেউ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির মুখে। আতঙ্কে তোমার কথা মনেই হয়নি। ওভারকোট পরে এত রাতে জাহাজে সিঁড়ি ধরে কে আর নামতে পারে, তুমি ছাড়া?

তুই বললি, কোয়ার্টার-মাস্টার মুখার্জি ঘোরাঘুরি করছে?

আমার দায় পড়েছে! শুধু বললাম, ও কিছু না। মনের ভুল। কেউ আসেনি। তুমি প্লিজ চার্লির পেছনে লাগতে যেয়ো না। বেচারার মা নেই। এত খারাপ লাগে ভাবলে! তোমার মায়াদয়া নেই। ধরা পড়লে কী হবে বলো তো?

গাধা কি আর গায়ে লেখা থাকে! যা, যা পারিস করবি। যখন লেগেছি, দেখব চার্লি কত জলের মাছ। আর তোকেও বলে দিচ্ছি, যদি ফাঁস করে দিস সব, তোর নিস্তার নেই। যা করছি, তোমার ভালর জন্য করছি মনে রেখো। জাহাজে আর-একটি ডেরিক পড়ুক চাই না! মনে রাখিস চার্লি আর যাই হোক ছেলে নয়। এত কাছে থাকিস গন্ধেও টের পাস না মেয়ে না ছেলে? দেখতে দেখতে জাহাজে তো বিশ-বাইশ মাস হয়ে গেল।

আনাড়ি আর কাকে বলে। ফোকশালে ঢুকে নিজের উপরই খেপে গেলেন মুখার্জি।

তুই শেষে আমার পেছনে লাগলি! কার জন্য করছি!

আর রাগের মাথায় আবোল-তাবোল বকে গেলেন।

চার্লি কত জলের মাছ, চার্লি ছেলে না মেয়ে, গন্ধ শুঁকে টের পাস না বলাটা খুবই কি অযৌক্তিক।

তা ছাড়া তাঁর তো দাড়ি গোঁফ নেই, পাকা চুলও নয় তাঁর, চোখ পাথরের মতো হিমশীতলও নয়, তবে কেন সুহাস তাঁকে সন্দেহ করছে? কী যে বিশ্রী ব্যাপার, গাধাটাকে বুঝিয়েও লাভ নেই, একবার ডেকে বললে পারত, আরে চার্লিকে নিয়ে আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই, তাকে তাড়াতেও চাই না, আমার কেন যে মনে হয়েছে, চার্লির শারীরিক গঠনে এতটুকু পুরুষালি ভাব নেই। ওর হাঁটাচলা দেখে আগেই সংশয় ছিল, এখনও সংশয় আছে, তবে তাই বলে নির্ঘাত সে মেয়ে এটা বলাও সম্ভব না। আর কেউ টের পায়নি, কে বলবে! নিশীথে বোট-ডেকে গভীর অন্ধকারে কে সে নারী! ভয়ে আতঙ্কে, ঘোরে পড়ে—না, মানি না। বোট-ডেকে তুই তো নিজেই একবার দেখেছিলি, দেখে দৌড়ে পালিয়েছিলি, গন্ধটাও কম রহস্যজনক নয়, তবে এখনও কিছু ঠিক জানি না। ফুল ফুটলে গন্ধ বের হবেই। বুনো ফুলের গন্ধ বড় উত্তেজক।

তাঁর এখন ওয়াচ। তিনি ওয়াচে যাননি। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে জুড়িদার সোলেমান মিঞাকে বলেছেন বদলি দিতে, পরে দরকারে তিনিও বদলি খাটবেন। প্রায় অখণ্ড অবসর। কিন্তু খেতে বসে এমন একটা গণ্ডগোলে পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেননি। হয়তো কাজে উঠে গেছে সুহাস। তবু একবার

দবজা খুলে সিঁড়ির মুখে উঁকি দিলেন, সুরঞ্জন নেমে আসছে। ইশারায় ডাকলেন, সুরঞ্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, কেউ দেখে ফেললে ভাববে, এই তোমার বাক্যালাপ বন্ধ! বিশেষ করে সুহাস টের পেলে আরও সংশয়ে পড়ে যাবে। এসব নাটকের অর্থ কী জানতে চাইবে। সুরঞ্জনের ফোকশাল থেকে বাগারাগি করে তবে বের হয়ে এলে কেন? দিব্যি তো ভাব দু'জনে।

সুরঞ্জন নিচু গলায় বলল, বাবু কাজে যাননি। শুয়ে পড়েছেন। সারেং ডাকতে এসেছিলেন, সাফ জবাব, শরীর ভাল নেই।

মুখার্জি আর কী করেন। সুরঞ্জনকে পাশ কাটিয়ে সুহাসেব ফোকশালে উঁকি মারলেন। সুহাস কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সত্যি নির্বাসনে আছে যেন ছেলেটা। সমবয়সি প্রাণের বন্ধুটির ভিতরেই আসল রহস্য এমন শুনে ঘাবড়ে যেতেই পারে। রহস্যের উৎস চার্লি নিজেই জানতে পারলে বেকুফ হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী। সূত্রটি ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন গোলমাল পাকিয়ে ফেলবেন বুঝতেই পারেননি। শখের গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে নিজেই এখন আঁখে জলে। কম কথা, পর্যবেক্ষণ, উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে ফেলা এবং একসময় সঠিক সূত্রেব সন্ধান। একেবারে অঙ্ক কষার সামিল, সব নিজেই শুবলেট করে দিলেন। ববং সুহাসকে সত্যি কথা বলে ফেলাই ভাল। তিনি ডাকলেন, সুহাস, কাজে গেলি না?

সুহাস মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে মাথা তুলে দেখল। আবার শুয়ে পড়ল।

ফোকশালে কেউ নেই। দবজা বন্ধ করে সব খুলে বললেন।

হঠাৎ সুহাস উঠে বসল।

তাই বলে প্রাণ হাতে করে এমন কাজ কেউ করে।

সময় নেই। তুই চিন্তা কবিস না। আমার ধারণা, চার্লিব খুবই বিপদ সামনে। অনুসরণকারী জাহাজেই আছে, তোর কথায় এটাও টেব পেলাম। কিন্তু কেন? ধর চার্লি যদি মেয়ে হয়, হতেই পাবে, কাবণ চার্লি বড় হয়ে উঠছে। চার্লির চোখ-মুখ দেখে টের পাই, শরীর দেখে বোঝার উপায় থাকে না, কিন্তু চার্লির চুল একটু বড় হলেই দেখেছিস, কাপ্তান নিজেই কেটে দেন, কদম ছাঁট। চুল ছাঁটা নিয়ে কাপ্তানকে কী হুজ্জোতি পোহাতেও হয়, তাও তো দেখেছিস। চার্লিকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কয়লাব বাংকাবে গিয়ে পর্যন্ত পালিয়ে থাকে। তুই চার্লিকে কিন্তু কিছু বলতে যাস না। চার্লি ঠিকই দেখেছে। পোর্ট-হোলে কেউ দাঁড়িয়েছিল, লোকটাকে না দেখতে পেলে টেরই পেত না, শেষ বাতের অন্ধকারে কেউ তাব পোর্ট-হোলের পাশে ঘোরাফেরা করছে। কোনও ঘোর কিংবা আতঙ্ক থেকে নয়, সত্যি সে দেখেছে। দেখেছে বলেই আমার হাঁটাহাঁটিও টের পেয়েছে। রহস্যটা তবে খুবই দুর্ভেদ্য।

সুহাস বলল, জানো, ম্যাকের কেবিনে সাতটা মুখোশ পাওয়া গেছে।

মুখার্জিদা শুনে হাসলেন, সাতটা নয়, আটটা মুখোশ। একটা মুখোশেব সে হিসাব রাখেনি। সেই মুখোশটাই খুঁজে বের করা দরকাব।

সুহাস অবাক।

তুমি জানলে কী করে?

জানি। এখন চেপে যা।

জাহাজে উঠে ম্যাক একুশটা মুখোশ বানিয়েছে। কাকে কাকে দিয়েছে ডাইবিতে তাও লেখা আছে। কিন্তু একটা মুখোশের হিসাব নেই। কাকে দিয়েছে মুখোশটা, তার নাম লেখা নেই।

হিসাব ঠিকই আছে। তবে মুশকিল, জাহাজে সে কাকে কাকে মুখোশ বিলিয়েছে তার হিসাব থাকলেও একটা মুখোশের হিসাব নেই। কেন, কাকে দিয়েছে, তার নাম লেখা নেই কেন, বোঝা দবকাব। মুখোশটা এমন কাউকে দিয়েছে যাকে সে প্রকৃতই ভয় পায়।

আচ্ছা, মুখোশ নিয়ে পড়লে কেন বলো তো?

পোর্ট-হোলে যেই দাঁড়াক সে মুখোশ পবে দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষটা মাঝারি হাইটের। সন্দেহ করতে গেলে অনেককেই করতে হয়। মুখোশ না পরলে ধরা পড়ে যেত।

মুখোশ পরে কেন? ওকে দেখার জন্য মুখোশ পরতে হবে কেন?

কেন পরতে হয় জানতে পারলে তো হয়েই যেত। সারাদিন যাকে ডেক-এ দেখা যায়, রাতে তাকে

কেবিনে দেখার এত আগ্রহ কার হতে পারে! তা ছাড়া এমন কোনও কারণ আছে, চার্লির পোর্ট-হোলে উঁকি না দিলে বোঝা যাবে না বলেই উঁকি দিয়েছিল। তোদের অনুসরণ করেছে কিনারায়। সাঁজ লাগলে কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছে। ঝাপসা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখেছে, চার্লি তোকে নিয়ে কী করে। তা না হলে আর অন্য কী কৌতূহল থাকতে পারে? সেও হয়তো গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে গেছে কিছু।

সুহাস কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। মুখার্জিদার কথা শুনে আবিষ্ট হয়ে গেছে। অযথা রাগারাগি করেছে। মুখার্জিদাকে অত্যন্ত নীচ মনের ভেবেছে। কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করেছে। আর এখন সত্যি যেন মুখার্জিদা চার্লির পরিত্রাতা। তারও। ম্যাকের কেবিনে কখন গেল, কখন ঘাঁটাঘাটি করল! কখন এত হিসাব মাথায় নিয়ে বের হয়ে এল! রাতে কি তবে হুইলের কাজ ফেলে এই করে বেড়িয়েছেন? থার্ডমেট মানুষটি কড়া ধাতের নন। সুখানিদের সঙ্গে তার কথাবার্তাও হয়। দেশ-বাড়ির গল্প পর্যন্ত করেন। চুরুট মুখে থাকলে, প্রসন্ন থাকেন। আর মাঝে মাঝে নৈশ প্রহরীতে চা পেলে ছেলেমানুষের মতো আহ্লাদে আটখানা।

কিন্তু মুখোশ পরে দাঁড়ালে বোঝা যাবে না! মুখোশ পরেছে বোঝা যাবে না!

নাও যেতে পারে। সব মুখোশ ক'টাই নারী পুরুষের মুখ। কী সজীব! সহসা দেখলে তো মনে হবে জীবন্ত মানুষের মুখ। রঙের কত অসাধারণ জ্ঞান থাকলে এটা হয়, কত নিপুণ কারিগর হলে এমন মুখোশ তৈরি করা যায়, হাতে নিয়ে না দেখলে বোঝার উপায় থাকে না। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটাও দেখলাম।

তা হলে কি সিম্যান মিশানে এটাই কেউ পরে খেলা দেখিয়েছে? গিরগিটি গোঁফের মুখোশটার মতো, হুবহু একরকম, জানো!

খেলা, কীসের খেলা!— মুখার্জিদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আর বোলো না, তোমরা তো যেতে। আমার যাওয়া হয়ে উঠত না সিম্যান মিশানে। একদিন মনে নেই সুরঞ্জন গান গাইল, ওই যে কী গান, অধীর রঙের টব বাজাচ্ছিল, আর বংশীদা গানটা শুনে চটেমটে লাল, মনে নেই, আর বংশীদার পিছনে লাগলে তো সুরঞ্জনরা ওই গানটাই গায়।

প্রবাসে যখন যায় লো সে। বলি বলি বলেও বলা হল না।— মুখার্জি গানের কলিটা ধরিয়ে দিলেন সুহাসকে।

সুহাস বলল, হ্যাঁ, তো—যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে। আমায় নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে—টপ্পা গান গাইল্। হাততালি কুড়াল।

সেদিন সিম্যান মিশানে গিরগিটি গোঁফের লোক দেখলি কোথায়! মুখোশ পরে খেলা দেখালে সবাই টের পেত লোকটা মুখোশ পরে আছে। যতই মিশে থাক মুখের সঙ্গে ধরা পড়তই। তবে তোরা আনাড়ি, তোদের কথা আলাদা। বল, কী বলছিলি।

সেদিন কেন দেখব?

কবে দেখলি?

মুখার্জিদার কপাল কুঁচকে গেল। সুহাসের উপর কিছুটা যেন বিরক্ত। তিনি বংশীর বাংকে ধপাস করে বসে পড়লেন। বংশীদার ওয়াচ চলছে, অধীরেরও। তাবা ফোকশালে নেই। চারটে না বাজলে ইঞ্জিন-রুম থেকে কেউ উঠে আসতে পারবে না। তা ছাড়া চারটে-আটটার ওয়াচের লোকেরা দিবানিদ্রা দিচ্ছে। ওঠার সময় হয়নি, ডেক-জাহাজিরা কাজেকর্মে টুইন-ডেকে না হয় আফটার-পিকে ঘোরাঘুরি করছে। নীচের ফোকশালগুলি প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে সুহাস দরজা ফাঁক করে কী দেখে দরজা বন্ধ করে অধীরের বাংকে মুখোমুখি বসে বলল, জাহাজ ছাড়ার দুদিন আগে তোমাদেব খুঁজতে মিশানে ঢুঁ মেরেছিলাম।

তারপর?

তারপর দেখি, তোমরা নেই। চলে আসছিলাম।

তারপর?

এত তারপর তারপর করলে পারব না। আমার কিছু কেন মনে আসছে না? গোলমাল পাকিয়ে ফেলছি। তোমরা ছিলে, না ছিলে না, না কিচ্ছু মনে করতে পারছি না।

মুখার্জিদা যে নিবিষ্টমনে কিছু ভাবছেন, তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। নিবিষ্টমনে কিছু ভাবলে বুড়ো আঙুলটার নখ কামড়ান। আর মাঝে মাঝে থু থু করে জিভ থেকে কী বের করার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, এখনই ঘাবড়ে গেলে চলবে? এ যে বাবা অনেক ঘাটের জল ঘোলা করবে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। দ্যাখ তারপর, মনে করতে পারিস কি না। ম্যাক কি মুখোশ পরে খেলা দেখাচ্ছিল?

একটা লোক ডায়াসে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। তবে ম্যাক কি না জানি না।

কীসের ম্যাজিক?

সুহাস সব খুলে বলল।

জামা খুললে কী হত বল তো! চার্লি তো খাপ্পা। বলল, এই ঠান্ডায় কেউ জামা খুলতে পারে! লোকটা জাহাজিটাকে কী কাবু করে ফেলল। যাই বলছে, করে যাচ্ছে। কান ধরে ওঠ বোস পর্যন্ত।

থাম। আমি অত শুনতে চাই না। চার্লি বলল, জামা খুলে ফেললে কী হত?— মুখার্জির এক ধমক।

হ্যাঁ, তাই তো বলল। আমি যদি জাহাজিটার হেনস্থা সহ্য করতে না পেরে উঠে যেতাম, আর আমাকে নাস্তানাবুদ করলে চার্লির সহ্য হবে কেন, সেও উঠে যেত, আমরা দু'জনেই তার শিকার হতাম।

চার্লি তোকে খুবই ভালবাসে। কেন যে বাসে, যাকগে, সেন্ট পার্সেন্ট না হলেও ফিফটি-ফিফটি ধরে নিতে পারিস। সন্দেহটা আমার অমূলক নয়। আরও কেউ ঘোরাঘুরি করছে। সে কে বুঝতে পারছি না। ম্যাক নিজেই নয় তো!

চার্লি আমাকে সত্যি ভালবাসে। সকালে তো ওর ব্রেকফাস্ট থেকে কলা আপেল পর্যন্ত দেয়। ম্যাক সম্পর্কে সুহাসের যেন কোনও কৌতূহল নেই।

দেখেছি।— বলে ঠোঁট টিপে হাসলেন মুখার্জি।— দু'জনে খুব মশগুল হয়ে খাও। খাওয়াটা ভাল। তবে দেখবে ধরা পড়ে না যাও।

দিলে কী করব বলো! না খেলে রাগারাগি করে। মুখ গোমড়া। ভয়ে ভয়ে খাই। আবার কোনও উপদ্রবে ফেলে দেবে।

শুধু ভয়!— মুখার্জি কেমন ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেন। তারপর উঠে পড়লেন।

উঠছ কেন? বোসো না। চা করে আনছি।

জাহাজিদের এই এক প্রলোভন। চায়ের নামে পাগল। যে যার চা নিজে বানিয়ে খায়। যাদের বিশু একসঙ্গে তাদের একজন ঠিক করা থাকে। সে-ই গ্যালি থেকে চা বানিয়ে নীচে নিয়ে আসে। তাদের বিশুতে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। সব কটা ঘাড় বাঁকা, না পারব না। অধীরকে বলো। না, পারব না, কেষ্টকে বলো। তারপর তোষামোদ করে কাউকে রাজি করাতে হয়। চা চিনি কনডেনসড মিল্ক নিয়ে সে তখন উপরে উঠে যায়।

আর এই সময় সুহাস নিজেই চা বানিয়ে খাওয়াতে রাজি। মুখার্জি খুব খুশি। বললেন, সিগারেট থাকলে দে।

সপ্তাহে রেশনে ক্যাপস্টেনের কুড়িটা করে পাঁচটা বড় প্যাকেট পায় তারা। সুহাস সিগারেট খায় না। সে রেশন থেকে খুব কমই সিগারেট তোলে। কোনও কোনও বন্দরে কিনারার লোকদের কাছে সিগারেটের খুব চাহিদা তখন সে তার সিগারেট কাউকে তুলতে দেয় না। বুনোসাইরিসে সে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে প্রায়ই গুচ্ছের আপেল, আঙুর কিনে আনত। একবার তো দুটো ক্যাপস্টেনের প্যাকেট পেয়ে একজন বুড়ো মতো মানুষ দামি একটা কম্বলই তাকে উপহার দিল। এসব কারণেই বন্দর বুঝে সিগারেট তোলে, না হয় তার রেশনের সিগারেট সুরঞ্জনই তোলে।

সে বলল, দাঁড়াও, আছে কি না দেখি।

লকার খুলে একটা আস্ত প্যাকেটই পেয়ে গেল সুহাস। বলল, রেখে দাও। আমি তো খাই না।

তারপর বলল, জানো ম্যাকের সেই ছবিটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। চার্লি ম্যাকের কেবিনে খুঁজে দেখেছে।

কীসের ছবি?— অবাক মুখার্জি।

দাঁড়াও, চট করে চা-টা করে আনছি। বলছি সব।

সুহাস কেটলি চা চিনি কনডেনসড মিল্ক নিয়ে উপরে উঠে গেল। গ্যালিতে ভাণ্ডারি নেই। মেসরুমে মাদুর পেতে শুভে আছে। আঁচ পড়ে গেছে কিছুটা। সে তাড়াতাড়ি কেটলিতে জল ঢেলে উনুনে বসিয়ে দিয়ে গ্যালির ফোকরে গলা বাড়িয়ে বলল, অ ভাণ্ডারি চাচা, তোমার আঁচ কিন্তু পড়ে যাচ্ছে।

ভাণ্ডারি কাত হয়ে শুল। বলল, খুঁচিয়ে ক'টা কয়লা দিয়ে যা বাপজান।

সে কেন যে আজ সবার অনুরোধই রক্ষা করছে। কেমন যেন সাহস পেয়ে গেছে। মুখার্জিদা তার সঙ্গে আছে, অন্তত মুখার্জিদা যেভাবে ঝড়ের মধ্যে গেলেন এবং যেভাবে ম্যাকের কেবিন ঘাঁটাঘাঁটি করছেন তাতে সে আর একা নয়, চার্লি সে আর মুখার্জিদা, তিনজনে মিলে ম্যাকের হত্যাকাণ্ডের একটা কিনারা ঠিক করে ফেলতে পারবে। মুখার্জিদার উপর তার এই অগাধ বিশ্বাসের হেতুতেই বোধ হয় মন আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠছে। সে চা করে, উনুন খুঁচিয়ে ক'টা কয়লা দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। কাপ বের করে মুখার্জিদাকে দিল, নিজেও চুমুক দিল চায়ে। তারপর বলল, আরে, যে ছবিটা ম্যাক কিনারায় গেলে পকেটে রাখত। তোমাকে তো বলেছি। কী খারাপ লাগছে না ম্যাকের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। বেচারা।

থাম। ম্যাককে নিয়ে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। নিজের কথা ভাব। ম্যাকের অদৃষ্ট। আর অপঘাতে মরার বিষয়টা বেশি মনে না রাখাই ভাল। আমরা কেউ ভাল নেই, মনে রাখিস। যেখানে যাচ্ছি কেবল শুনছি ম্যাক, তার বউ, ছেলেপিলে। আরে, আমাদেরও তো বাড়িঘরে কেউ আছে। ম্যাকের নিষ্ঠুর মৃত্যু একদম আমি সহ্য করতে পারছি না। তারপর—না। ঠিক আছে আমি উঠছি। ছবি পাওয়া যায়নি, কোথাও আছে। ছবিটা পকেটে নিয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে, ম্যাক জানত, তার বিপদ হতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না। ছবিটা সরিয়ে ফেলারও কোনও কারণ নেই। মাথাটা আমার ঘোলা করে দিস না।

ওঠার সময় মুখার্জি বললেন, তোর কি শরীর সত্যি ভাল নেই! কাজে গেলি না কেন? কাজে না গেলে চলবে। কাজে না গেলে ভাববে না, ম্যাকের মৃত্যু তোকে কাহিল করে ফেলেছে? ম্যাকের মৃত্যুতে তুই মুষড়ে পড়েছিস? আর কেউ তো কাজ নাগা করেনি। কাজ না করলে জাহাজ চালু থাকবে কী করে? এতে শত্রুপক্ষ টের পাবে না, তুই কিছু আঁচ করেছিস? তুই ভয় পেয়ে গেছিস? এসব ক্ষেত্রে ভয় পেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় মনে রাখিস। যা কাজে যা। ম্যাকের পর তুই নির্ঘাত টার্গেট, টের পেলে অদৃশ্য আততায়ী সাবধান হয়ে যাবে এটা কি বুঝিস!

সুহাসের মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেল। আতঙ্কে গা শির শির করছে। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নেওয়া দরকার। না হলে মুখার্জিদা ভাববে ভিতু, কাপুরুষ। মরার ভয়ে আগেই মরে ভূত। তা ছাড়া মুখার্জিদা যখন জীবনের এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন, সে পারবে না কেন! কারণ খ্যাপা সমুদ্রে জাহাজের এত কিনারায় অন্ধকারে বিচরণ করা খুব সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ না। যে কোনও সময় ছিটকে পড়তে পারতেন এবং দরিয়ায় হাপিজ হয়ে যেতে পারতেন, সেই মানুষের সামনে তাকে দুর্বল হলে চলবে কেন? এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন জীবনের, আর সে টার্গেট এমন অনুমানের ভিত্তিতেই মুখ কালো করে ফেললে রাগ হবে না মুখার্জিদার?

সে বলল, ধুস, বাদ দাও। শোনো তোমাকে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

খুব তো রাগ দেখিয়ে বিষম খেলি। এখন আবার এত কথা কেন।

সুহাস কিছুটা যেন লজ্জায় পড়ে গেছে তার আচরণের জন্য। সে সহজ হতে পারছিল না। মুখার্জিদার সিগারেট শেষ। মুখার্জিদা নিজেও পরি দিতে যাননি, নিশ্চয়ই তার মাথার মধ্যে রহস্যের জট পাকিয়ে গেছে। তাঁকে বললে বুঝতে পারবেন, উইন্ডস-হোলের আড়ালে, অন্ধকারে কে রঙের টব রেখে দিয়েছিল। সকালে সে উঠে দেখেছিল, রঙের টবটা নেই। হ্যাচের দুটো কাঠ তোলা। অন্ধকারে রঙের টবে হোঁচট খেলে হ্যাচের খোলে যে কেউ গড়িয়ে পড়তে পারত। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাতু। জোর বেঁচে গেছে।

জানো মুখার্জিদা, আমার মনে হয় রঙের টবটা কেউ ইচ্ছে করেই রেখে দিয়েছিল। অন্ধকারে এমনভাবে রেখে দিয়েছিল মনেই হবে না উইন্ডস-হোলের ছায়ায় একটা রঙের টব আছে। আমার তো বোট-ডেক থেকে যমুনাবাজু দিয়েই নামার কথা। তুমি বললে বলে গঙ্গাবাজু ধরে গেলাম।

কবে?

আরে, তুমি ছুটে নেমে এলে না বোট-ডেক থেকে, আমি কী দেখে দৌড়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল অনুসরণকারী আমার গায়ে নিশ্বাস ফেলছে।

মুখার্জিদা বললেন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার মনেই নেই।

সকালে গিয়ে দেখি, টবটা নেই। লক্ষ করার কথা না। কিন্তু ম্যাকের মৃত্যু যেন সত্যি পাখা বিস্তার করছে। সব মনে পড়ছে। যমুনাবাজু ধরে গেলে টবের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র ছিল না। পাশেই মরণ ফাঁদ। ছিটকে হ্যাচের মধ্যে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। কে যে রাখল টবটা।

কাঠ তোলা ছিল বলছিস?

তাই তো দেখলাম। কে ত্রিপল তুলে দুটো পাটাতন সরিয়ে রেখেছে। কার কাজ! যে কেউ বিপদে পড়তে পারত। রক্ষা ছিল পড়ে গেলে, বলো।

তা বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে খোলে পড়ে গেলে কী হয়, সেটা অনুমান করেই মুখার্জিদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, তুই যে এত রাতে আমার সঙ্গে উঠে গিয়েছিলি ঠিক কেউ লক্ষ করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মরণ-ফাঁদ তৈরি করে রেখেছিল মনে হয়। যাকগে, আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা কেউ হয়তো পছন্দ করছে না। একজন অভিজ্ঞ জাহাজি তোর পেছনে আছে সে টের পেয়েছে।

তারপর হঠাৎই খেপে গেলেন মুখার্জিদা, তোর এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, কই আগে তো বলিসনি। এত বড় খবরটা চেপে রেখেছিস!

চেপে রাখব কেন? আমার মনেই হয়নি, আমি কিছু ভাবিওনি। তুমি যে বললে, আমিই টার্গেট, তাই মনে পড়ে গেল।

তুই টার্গেট, আমি বলতে যাব কেন? আমি বলেছি তুই নির্ঘাত টার্গেট টের পেলে অর্থাৎ যদি তুই টার্গেট হোস, হতেও পারিস, নাও পারিস। সবই অনুমান। রঙের টবটা যেই রেখে দিক, সে তোমার ভাল যে চায় না, এটা বুঝতে কি কোনও অসুবিধা আছে! অন্য কোনও কারণেও রাখতে পারে অথবা পড়ে থাকতে পারে। যাই হোক তোর কাছে কলম-টলম থাকলে দে তো।

সুহাস লকার থেকে কলম বের করে দিলে বললেন, চিঠি লেখার প্যাডটা দে।

সে প্যাডও বের করে দিল।

পাশে বোস।

সে বসল।

মুখার্জিদা হঠাৎ কলম প্যাড নিয়ে পড়লেন কেন সে বুঝল না। প্যাডের উপর পাঁচটা মহাদেশকেই এঁকে ফেললেন। বুঝে নিতে হয়, কোনটা কোন মহাদেশ, ঠিক অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পুবে গোলমতো একটা প্রায় বৃত্ত রচনা করে বললেন, এই যে দেখছিস জায়গাটা, এটাই ওশিয়ানিয়া, হাজার হাজার ছোট বড় দ্বীপের ছড়াছড়ি। দ্বীপগুলিকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় বুঝলি? যেমন মেলানেশিয়া।

প্যাডের উপর গোলমতো একটা বৃত্ত এঁকে জায়গাটা তিনি দেখালেন। তারপরই প্রশ্ন করলেন, জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিস? পড়িসনি? বলিস কী? তাঁর কবিতা এটা, বুঝলি? আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে। হয়তো ভোরের কাক হয়ে, এই কার্তিকের নবান্নের দেশে—তিনিই কোনও কবিতায় যেন লিখেছিলেন, মালয় সাগরে, মেলানেশিয়ার কথা তাঁর মনে হতে পারে, পাশের সমুদ্রটা মাইক্রোনেশিয়া আর উপরের দিকটায় আছে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি। বিস্ময়ের শেষ নেই! ইস্টার দ্বীপের নাম শুনেছিস? গালাপেগাস? শুনিসনি? অবশ্য আমরা তার অনেক নীচে ঘোরাঘুরি করব। কোরাল সি-তেই যাচ্ছি। বিশমার্ক সি-তেও যেতে পারি। নেরুদ্বীপে যাচ্ছি বোর্ডে লিখেছে কিন্তু আমার মনে হয় না নেরুদ্বীপে জাহাজ যাবে। যাবে কাকাতিয়া কিংবা ওসানিয়া দ্বীপে। ফসফেটের পাহাড়, দ্বীপগুলিতে নানাদেশের জাহাজ ফসফেট নিতে আসে। তবে খুব বেশি জাহাজ দেখা যায় না। সব বন্দরেই প্রায় জেটি বলতে কিছু নেই। জাহাজ নোঙর ফেলে রাখে। টাগবোটে মাল এলে পিপেগুলি তুলে ঢেলে নেওয়া হয়। যজন্য এত সব বলা, এই এলাকায় যে-কোনও জাহাজ যদি গা-ঢাকা দেয়, কারও সাধ্যি নেই খুঁজে বার করে। কত সব লেগুন আছে, লেগুনের ভিতর ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকা যায়। শোনা যায় সি-ডেভিল

লুকেনার এই সব অসংখ্য দ্বীপের কোনও একটাতে আত্মগোপন করে থাকতেন। এমন সব দ্বীপ আছে চাষবাসের খবরই রাখে না, এমন সব অনেক দ্বীপ আছে যেখানে একটা গাঁয়ের ভাষা অন্য গাঁয়ের মানুষেরা বোঝে না। পাশাপাশি গাঁয়ের ভাষা আলাদা। কোনও দ্বীপ গড়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির কালো লাভায়। প্রবালদ্বীপেরও ছড়াছড়ি। শুধু কঠিন পাথর আর ক্যাকটাস। দুর্লভ সব কচ্ছপ। প্রাগৈতিহাসিক কালের পাখি জীবজন্তু। যুগ যুগ ধরে এই সব অজানা ভূখণ্ড ছিল জলদস্যুদের গুপ্ত আস্তানা। প্যালিকানও দেখতে পাওয়া যায়। আরও কত সব বিচিত্র পাখি। সিন্ধুঘোটকও দেখতে পাবি ভাগ্যে থাকলে। তবে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল বলেই গুপ্তধনেরও আশা রাখে কেউ কেউ। মাটি টানার কাজ আসলে অছিলা। তারা আসলে অনেকেই আসে গুপ্তধনের খবরাখবর সংগ্রহ করতে। দ্বীপের বুড়ো মানুষদের কাজে লাগায়।

একটু থেমে মুখার্জিদা বললেন, আমাদের কাপ্তানও জাহাজ নিয়ে এদিকটাতেই ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন। কেন কে জানে!

তবে কি কাপ্তান গুপ্তধনের খোঁজে যাচ্ছেন!— বলতে গিয়ে সুহাসের কপাল কুঁচকে গেল। কিছুটা যেন সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

লোকটা কি পাগল! এখানে কোন দ্বীপে কোন জলদস্যু কী গুপ্তধন রেখে গেছে খোঁজা কি চাট্টিখানি কথা! আমার মাথায় কিছু আসছে না দাদা।

মুখার্জিদা বললেন, আস্তে। দু'কান হলে তুমিও শেষ, আমিও শেষ।

সুরঞ্জনের সঙ্গে কথাবার্তা সব রাতের পরিতে। তাঁর এবং সুরঞ্জনের একই সময়ে পরি। বারোটা-চারটা। সুরঞ্জন স্টোকার, পরি তার স্টোক-হোলডে। তিনি সুখানি, পরি তাঁর হুইল-রুমে। ব্রিজ থেকে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেই চিমনি। যা কিছু গোপন কথাবার্তা চিমনির আড়ালে দাঁড়িয়ে। সুরঞ্জন স্টোক-হোলডে নেমে যাবার আগে চিমনির গোড়ায় বসে থাকে। মুখার্জি ব্রিজে উঠে যাবার সময় ঘড়ি দেখে বলে দেন, ক'টায় সুরঞ্জনকে উঠে আসতে হবে। দু'জনেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। মধ্যরাতে জাহাজ নিঝুম। ইঞ্জিন-রুম আর ব্রিজ ছাড়া কেউ জেগে থাকে না। ঘোর মাতালের মতো জাহাজ টলতে টলতে ভেসে যায়। ডেক-এ, ব্রিজে কিছু আলো জ্বালা থাকে, মাস্তুলের আলো দুটো খুবই উজ্জ্বল। আর সব কেমন নিস্তেজ। সেই আলো-অন্ধকারে তারা চিমনির আড়ালে গোপন পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে।

গিরগিটি গোঁফের মুখোশটা নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। মুখার্জিদার সাংকেতিক কথাবার্তা থেকে সুরঞ্জন টের পেয়েছে তার সঙ্গে মুখার্জিদা গিরগিটি গোঁফের মুখোশ নিয়ে কথাবার্তা বলতে চান। চিমনির গোড়াতে সুরঞ্জন বসে সিগারেট টানছিল। মুখার্জিদা এখনও আসছেন না। তার জুড়িদাররা সবাই একে একে নীচে নেমে যাচ্ছে। সুরঞ্জন সবার শেষে নামে। কোল-বয় দু'জনও নেমে গেল। মনুকে নিয়ে মুশকিল। মইনুদ্দিন, সে সুরঞ্জনের কিছুটা চেলা গোছের। বয়সের ফারাক খুবই। তবু সুরঞ্জনকে দাদা দাদা করে।

দাদা, তুমি বসে থাকলে!

যা। যাচ্ছি।

মশলা আছে?

মশলা মানে টোবাকো। সুরঞ্জন পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিল। বলল, মশলা নেই।

মনু বলল, ম্যাচেস দাও।

সুরঞ্জন সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আগুনটা এগিয়ে দিল। বলল, দেশলাই নেই।

তবু মনুর নামার লক্ষণ দেখা গেল না। যতক্ষণ উপরে বসে থাকা যায়। খোলামেলা হাওয়ায় বসে থাকতে সবারই ইচ্ছে হয়। কয়লার বাংকার তো অন্ধকূপের সামিল। হাওয়া-বাতাসের বড় টানাটানি। টন টন কয়লার পাহাড়। পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ বেলচায় কয়লা ভরতে হয় গাড়িতে, কষ্ট তো হবেই। কয়লার ধুলোয় বাংকারে নিশ্বাস ফেলাও কঠিন। সুট ভরতেই দম বের হয়ে যায়। নীচে

নেমেই হাড্ডাহাড্ডি কাজ। দানবের মতো ফার্নেসগুলো আগুন উগরে দেবে। ফায়ারম্যানরা ফার্নেস থেকে আগুন টেনে নামাবে আর কোল-বয়রা জল মারবে, ধোঁয়া, আগুন, জলের হুড়োহুড়ি। উইন্ডস-হোলের নীচে না দাঁড়ালে শ্বাস নিতেও কষ্ট। মনু নীচে নামার আগে দম নিচ্ছে। সহজে নড়বে বলে মনে হয় না। সুরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, বসে থাকলি কেন? যা নীচে যা। ছোট-টিন্ডালকে বলবি, আমার নামতে একটু দেরি হবে।

বারোটা বাজতে আর পাঁচ-সাত মিনিট বাকি। মধ্যরাতের পরি। পরিদাররা ছাড়া মধ্যরাতে জাহাজে কেউ জেগে থাকে না। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। অষ্টমীর চাঁদ এইমাত্র দিগন্তে টুপ করে ডুবে গেল। সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন ছাড়া আর কিছুই যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মনু চিমনির গোড়ায় বসে আছে দেখতে পেলে, মুখার্জিদা সোজা হুইল-রুমে সিঁড়ি ধরে উঠে যাবেন। কারণ সবাই তো জানে, মুখার্জির সঙ্গে সুরঞ্জনের বাক্যালাপ বন্ধ। ডগ-ওয়াচ নিয়ে কথা কাটাকাটির পর মুখার্জিবাবু ফোকশালই ছেড়ে দিলেন।

মনু নেমে যেতে থাকল। চিমনির জালিতে সুরঞ্জন বসে আছে। একটা পা সিঁড়ির রডে। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নীচে স্টোক-হোলড। ফার্নেস ডোর খুলে দিলে আগুনের হলকায় সাবা স্টোক-হোলড ঝলমল করে উঠল। উপরে এখনও ঠান্ডা আছে। নীচে বলতে গেলে আগুনের নরক। কোথাও হাত দেওয়া যায় না, দিলেই হাতে ফোসকা পড়ে যায়। সুরঞ্জন কয়লা মেরে মেরে এতই মজবুত যে তার আগুন কিংবা কয়লা নিয়ে কোনও ত্রাস নেই। সে কুঁড়ে নয়, একাই দু'জনের কাজ সামলাতে ওস্তাদ। এজন্য টিন্ডাল তাকে খুবই সমীহ করে। দেরি করে নামলেও কৈফিয়ত দিতে হয় না। এটাই তার সুবিধা।

সুরঞ্জন দেখল একটা ছায়া লম্বা হয়ে আবার বেঁটে হতে হতে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুখার্জিদা বোধহয় আসছেন আর কারও এ সময় বোট-ডেকে উঠে আসার কথা না। কাজ ছাড়া বোট-ডেকে ঘোরাঘুরি করলেও অপরাধ। কারও সাহসই হবে না অকারণে বোট-ডেকে উঠে আসার। ব্রিজ থেকে কেউ যদি তাকে অনুসরণ করে থাকে। ব্রিজে দেখল কেউ নেই। চিমনির আড়ালে যদি কেউ থাকে, ঝুঁকে দেখে নিল। যমুনাবাজুর লাইফ-বোট দুটোর আড়ালে, না, কেউ নেই। সে নিশ্চিন্তে দেখা করতে পাবে। এত রাতে বোট-ডেকে শলাপরামর্শ করার যে নিশ্চিত জায়গা নয়, সে ভালই বোঝে। গঙ্গাবাজুর দিকে দুটো কেবিন। কেবিন দুটোরই দরজা বন্ধ। কাপ্তান শুয়ে পড়েছেন। দশটা বাজলেই তিনি নিজের কেবিনে চলে যান। তার ঘর খুবই সাদামাটা। কেবল মাথার উপর ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মূর্তি ছাড়া একটা লকার, একটা র‍্যাক এবং র‍্যাকে সব চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা বই। ডেক-জাহাজিদের কাছেই খবর পেয়েছে সুরঞ্জন। কেবিন রং করার সময় তারা দেখেছে সব।

মুখার্জিদা খুবই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিঁড়ি ধরে উঠে গেলেন। তবে এখুনি নেমে আসবেন। কারণ কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁকে উঠে যেতেই হবে। সুরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে আছে। তিনি তা যে বিলক্ষণ টের পেয়েছেন, তাঁর হাত তোলার ভঙ্গি থেকেই সে বুঝে ফেলেছে। সে চিমনির ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে ফেলল। কেবিন থেকে যদি বাড়িয়ালা বের হয়ে আসেন, তবে ঝামেলা হতে পারে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে কৈফিয়ত চাইতে পারেন। চিফ তখন সেকেন্ডকে তলব করবে। সেকেন্ড তলব করবে ইঞ্জিন-সারেংকে। তিন নম্বর পরির স্টোকার কেন কাজ ফেলে বোট-ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিমনির অন্ধকারে বসেছিল কেন। এ ধরনের কৈফিয়ত কাপ্তান চাইতেই পারেন। তাকে নিয়ে হুজ্জোতি শুরু হয়ে যেতে পারে জাহাজে। যতটা সতর্ক থাকা যায়।

মুখার্জি নেমে এসে খুবই সন্তর্পণে তাকে চিমনির আড়াল থেকে ডেকে নিলেন। তারা যমুনাবাজুর লাইফ-বোটের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে সরে পড়া দরকার। কারণ থার্ড মেট দেরি দেখলে মুখার্জিকে খুবই অদায়িত্বশীল ভাবতে পারেন।

দু'জনেই এখানে কথাবার্তা বলতে পারে সহজে। সমুদ্রের গর্জন এবং ইঞ্জিনের গুম গুম আওয়াজে তাদের কথাবার্তা কারও কানে যাবার কথা না। কাছাকাছি কেউ জেগেও নেই।

মুখার্জি বললেন, শোন সুরঞ্জন, গিরগিটি গোঁফের মুখোশটি নিয়ে আবার একটা ঝামেলায় পড়া গেল। ওটা পরে নাকি সিম্যান মিশানে কে ম্যাজিক দেখিয়েছে।

যাঃ, হতেই পারে না।— সুরঞ্জন একবাক্যে সব উড়িয়ে দিল। বলল, তুমি বুঝছ না কেন, ডায়াসে কেউ মুখোশ পরে খেলা দেখাচ্ছে, আমরা তা জানি না। মুখোশ পরলে বোঝা যেত না। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটা তো ম্যাকের কেবিনে পড়ে আছে।

কিন্তু চার্লি যে বলল, দেখেছে।

সুহাস?

সুহাসও বলল, দেখেছে।

কবে?

জাহাজ ছাড়ার দু'দিন আগে। গোঁফো লোকটা হিপনোটাইজ জানে। সবাইকে হিপনোটাইজ করল, কেউ বুঝতে পারল না, লোকটা আসলে মুখোশ পরে আছে বুঝতেই পারেনি কেউ।

গোটা হলসুদ্ধু হিপনোটাইজ করা কি সোজা কথা? কী জানি আমি কিছু বুঝছি না দাদা। নানা দেশের জাহাজি, কে কী খেলা দেখাল, গান গাইল, গিটার বাজাল মনেও করতে পারছি না। ম্যাকের ঘরে সেই মুখোশটাই পরে আছে বলল চার্লি?

তাই তো বলল। আমার বিশ্বাসই হয় না, ম্যাক এ কাজ করতে পারে। কেন করবে বল। তাকে তো একদিনও স্বাভাবিক দেখিনি, কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে ফেরে। কোনও দুরভিসন্ধি থাকলে, একজন মানুষের পক্ষে রোজ রোজ বেহুঁশ হয়ে ফেরা অসম্ভব। তবে কখন কোথায় মদ গেলে আজও বোঝা গেল না। কেবিনে বসে মদ গেলে বলেও শুনিনি। ম্যাকের মদ গেলার ধনদও কম তাড়া করছে না। তারপরই মুখার্জি বললেন, তুই দেখেছিস মুখোশটা?

দেখেছি।

চাবিটা দে। চার্টরুমে রেখে দিতে হবে।— বলে দ্রুত চাবিটা পকেটে পুরে মুখার্জি বললেন, চার্লি নাকি হল থেকে বেরিয়েই বলেছে লোকটাকে সে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।

সুরঞ্জন বলল, এমনও তো হতে পারে ম্যাকের কেবিনে চার্লি মুখোশটা দেখেছে। মুখোশটা দেখে সে ভয়ও পেতে পারে। গোঁফজোড়া ঝুলে আছে। তারপর হয়তো সে মুখোশটার কথা ভুলে গেছে। মুশকিল কী জানো, গাবদা লোকরা ঝুল গোঁফ রাখলে দেখতে একইরকম লাগে। লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে মানে, সেই মুখোশটার কথা চার্লির মনে হতে পারে। মুখোশ ঠিক বোধ হয় বলা উচিত না, ওই কিম্ভূতকিমাকার মুখ তার অবচেতন মনে ছায়া ফেলতে পারে। লোকটাকে তাই চেনা মনে হতে পারে। কোনও মানসিক দুর্বলতা থেকে যে নয় কে বলবে। বুঝতেই পারছ চার্লি আগের চার্লি নেই। পাঁচ-সাত মাসে কী ছেলেটা কী হয়ে গেল। এত বিনয়ী আর ভদ্র, ভিতু স্বভাবেরও হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। ম্যাকের মৃত্যুরহস্য খুঁজে বের করা কঠিন। আর আমার তো মনে হয় এসব ঝামেলায় আমাদের জড়িয়ে পড়াও ঠিক হবে না। দুর্ঘটনা ভাবলেই ক্ষতি কী।

মুখার্জিদা খেপে গেলেন, তুই কী রে। এর মধ্যে থ্রিল আছে না। যদি জাহাজের কেউ হয় ধরা পড়বেই। সে জাল বিছিয়ে যাচ্ছে। জালে কে পড়বে, তুই, সুহাস না চার্লি, এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমিও হতে পারি। ম্যাক গেল, তারপর কে যায় দ্যাখ।

মুখার্জিদা টবের প্রসঙ্গও তুললেন।

তবে জাহাজ যাচ্ছে। বিশমার্ক সি-তে। যারাই যায় তারা একবার জলদস্যুদের ঘাঁটি খুঁজে বেড়ায়। তারা কোথায় যে তাদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখে হারিয়ে গেল কেউ জানে না। সি-ডেভিল লুকেনার যে বাড়িয়ালাকে কোনও প্রলোভনে ফেলে দেয়নি কে বলবে? তিনি জাহাজে উঠলে ঠিক মাটি টানার কাজে এদিকটায় নেমে আসবেনই। জাহাজি সারেংরাও বলেছে, এই এক দোষ ব্যাংক লাইন কোম্পানির। বাড়িয়ালা কোম্পানির এজেন্ট হয়েও যে কাজ করছে না কে বলবে?

কে যেন উঠে আসছে। বোট-ডেকে কে উঠে আসতে পারে? হামাগুড়ি দিয়ে বোটের নীচে মাথা আড়াল করে মুখার্জি বললেন, কেউ না। শব্দটা নীচে উঠছে। এলিওয়েতে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। বাটলারের ঘরের দিকে মনে হয়।

মুখার্জি বললেন, শোন আমার যা যা মনে হয়েছে। ভেবে ভেবে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—আমরা মনে

বাখিস প্রফেশনাল নই, আমাদের ভুলচুক হবেই। কী করে যে এত সূত্র পেয়ে যায় গোয়েন্দারা, তাও বুঝি না। গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে পড়ে মনে হয়েছে, সমাধানের অঙ্কটা মাথায় আগেই রেখে দেওয়া হয়। লেখক তারপর নানা বাহানা সৃষ্টি করেন। কাহিনির জায়গায় জায়গায় লাঠি ফেলে রেখে যান। তারপর সব কুড়িয়ে নেন। নিজের খুশিমতো পটভূমি সৃষ্টি করেন, তারপর রহস্যের জাল একে একে ভেদ করেন। জালটা নিজেই বুনে ফেলেন, তারপর নিজেই খোলেন। বিস্তর পড়াশোনাব দরকার হয়। অথবা কল্পনা। শালা, ওই দুটোর একটাও আমাদের নেই। নিরেট জাহাজি। সারাজীবন তুই বয়লারে কয়লা হাঁকড়ালি আর আমি স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গেলাম। সুহাস তো এ ব্যাপারে আরও নবিশ।

তারপর মুখার্জি পকেট থেকে কী বের করে দেখালেন, এটা কী?

এ তো দেখছি শোনপাটের সরু দড়ি।

দেখেছিস হলুদ রং, একেবারে মাস্তুলের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কিনেছে। মাস্তুলের নীচে কিছুটা পড়ে ছিল। তুলে রেখেছি। জাহাজের কত গেরো জানিস তো। ফসকা গেরোই কত রকমেব, ডেক-জাহাজি কেউ সঙ্গে আছে মনে হয়। ফিতে টানলেই গেরো আলগা। ডেরিক হুড়মুড় কবে পড়ে গেছে। কাজেই দুর্ঘটনা নয় ধবে নেওয়া যায়।

সুরঞ্জন দড়িটা হাতে নিয়ে দেখছে। দড়িটা কাছিতে তবে জড়ানো ছিল। সুরঞ্জন সহসা প্রায় লাফিয়ে উঠল যেন, তা হলে বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজটা করা হয়েছে। মাস্তুলেব আড়াল থেকে দড়ি টেনে কেউ কাজটা করেছে ভাবছ!

ভাবনা ছাড়া কী সম্বল বলো? আততায়ী সুহাস এবং ম্যাককে খুন করাব জন্যই জালটা পেতেছিল। সুহাস বেঁচে গেল চার্লি তাকে ডেকে নিয়ে গেল বলে।

না, বুঝছি না কিছু!— সুরঞ্জন হতাশ হয়ে গেল।

আমি যা সিদ্ধান্তে এসেছি, ভেবে দ্যাখ ঠিক কি না। প্রমাণ করা যদিও কঠিন, তবু এটা মনে হচ্ছে, এক নম্বর, চার্লি যে-কোনও কারণেই হোক জাহাজে আত্মগোপন করে আছে। বাধ্য হয়ে থাকতে পারে, অথবা নিজেব কোনও সমূহ বিপদ থেকে আত্মবক্ষার জন্য কাপ্তান চার্লিকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। সেটা কী হতে পাবে জানি না। দু'নম্বব, চার্লির ঠাকুরদা ধনকুবের, দুই ছেলের সঙ্গেই তাঁব বনিবনা ছিল না। চার্লিব বাবা-কাকা দু'জনেই ডিভোর্সি বিয়ে কবেন। গুচ্ছের বাচ্চাকাচ্চাসহ। তারা কোথায়! ধনকুবের যদি তিনি সত্যি হয়ে থাকেন, চার্লির বাবাকে জাহাজে পড়ে থাকতে হচ্ছে কেন? তিনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? তিন নম্বর, চার্লি ছেলে নয়, মেয়ে।

মেয়ে বলছ!

হ্যাঁ, তাই বলছি। সে কারও সঙ্গে মেশে না। পুরুষের ছদ্মবেশে আছে। নাবালক ছিল এতদিন, অসুবিধা ছিল না। জাহাজেই চার্লি বড় হয়ে গেল। খবরটা একটু লেটে বুঝেছি। তার আগেই কেউ টের পেতে পারে। ম্যাকের সঙ্গে চার্লির ভাব ছিল। অবসর সময়ে দাবা খেলত। চাব নম্বর, চার্লির কেবিনে সুহাস ছাড়া সে-ই ঢুকতে পারত। সুহাস ছাড়া ম্যাকই ছিল চার্লির কাছের লোক। ম্যাক টের পেয়ে গেছে ভেবেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা হলে সুহাসের কী হবে?

সুহাসকে এ সময়ে সরিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। পাঁচ নম্বব, ধুবন্ধর আরও কেউ চার্লিকে অনুসরণ করছে। তার কেবিনের পোর্ট-হোলে উঁকি মারছে। পোর্ট অফ সালফার থেকেই ঝামেলা। সুহাসেব সঙ্গে এমন কোনও আচরণে যদি অনুসরণকারী টের পায় চার্লি কিশোরী বালিকা তবে তার জটিল অঙ্ক মিলে যাবে ভেবেছে।

ভুল তোমার সিদ্ধান্ত। বাদ দাও তো। তাই যদি হয় লোকটা একদিন অন্ধকারে জাপটে ধরতে পারে, এত কষ্টের কী দরকার। টিপেটুপে দেখলেই টের পেত মেয়ে না ছেলে।

মুখার্জি ব্যাজার মুখে বললেন, আহাম্মক আর কাকে বলে? জাহাজে বাড়িয়ালা হল গে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি কী না করতে পারেন! জানিস ভয় শুধু না, নসিব একেবারে আন্ধা করে দিতে পারেন তিনি। সংশয় থেকে সব হয়। বোধ হয় কোনও সংশয়ও আছে, যদি সত্যি চার্লি মেয়ে না হয়ে ছেলেই হয়, তখন কী হবে? অন্ধকারে জাপটে ধরলে কী হয় বোঝো না? সুহাসকে দিয়ে বুঝছ না? বড়-টিন্ডাল

অন্ধকার বাংকারে সুহাসকে জাপটে ধরতে গেল, আর সুহাস ছুটে পালাচ্ছিল। সারেং সাব শুনে সবার সামনে বড়-টিন্ডালকে খড়মপেটা করলেন। সবাই টিন্ডালের মুখে থুথু ছিটাল। বড়-টিন্ডালকে দেখলে ওর জাতভাইরা এখনও থু থু ফেলে। কত মাস আগের ঘটনা, এখনও কেউ ভুলতে পারছে না। জাহাজি বলে কি ইজ্জত নেই?

তা হলে উঠি।

সুরঞ্জন উঠতে চাইলে মুখার্জি বললেন, সব গোয়েন্দার দেখছি একজন সহকারী থাকে, সেক্রেটারি থাকে, বিশ্বস্ত চাকর থাকে, আমার শালা কিচ্ছু নেই। এত বেছে তোকে সহকারী নিয়োগ করলাম গোপনে, আর তুই কথায়-কথায় সব ঝেড়ে ফেলতে চাস। কোনও নিষ্ঠা নেই। নিষ্ঠা না থাকলে বড় হওয়া যায় না জানিস? যাই বলি, উড়িয়ে দিতে চাস। একজন সহকারী সব সময় ধৈর্য সহকারে শুনবে। বোঝার চেষ্টা করবে, সব আদেশ মাথা পেতে নেবে। দুটো-একটা প্রশ্নও যে করবি না, তা বলছি না। তবে সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর আশা করবি না। কী বুঝলি?

সব প্রশ্নের সব সময় উত্তর আশা করব না।

হ্যাঁ, তাই। টিপেটুপে দেখতে গেলেও ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকে, বোঝার চেষ্টা করবি। পোর্ট অফ সালফার থেকে অনুসরণকারী চার্লির পেছনে লেগেছে। চার্লি তার বাবাকে কিছুই বলছে না। কেন বলছে না বল?

আমি কী করে বলব?

কোনও কারণে বাবার প্রতি চার্লি বিশ্বাস হারিয়েছে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না। বাবাকে সে বোধহয় খুব গ্রাহ্য করে না। কাপ্তানও তার পুত্র বলো, মেয়ে বলো, চার্লিকে ভয় পায়। শাসন করার অধিকার তিনি হারিয়েছেন।

সুরঞ্জন হাই তুলে বলল, তোমার ধারণা।

হাই তুলছিস? তুই কী রে? এত বড় বিপদে হাই তুলতে পারলি?

আচ্ছা বলো তো, হাই উঠলে কী করব? তুমি অযথা রাগ করছ। টিন্ডাল হয়তো চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিয়েছে, আমি যাই।

টিন জোগাড় করেছিস?

করেছি।

যা বলেছিলাম ঠিকঠাক করে যাচ্ছিস?

মনে তো হচ্ছে।

চিমনির গোড়ায় এসে সুরঞ্জনের কী মনে হল কে জানে, সে ডাকল, মুখার্জিদা।

মুখার্জি ফিরে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

টিন কিন্তু পাইনি। একটা রঙের টব পেয়েছি। ওতে চলবে না?

চলবে। কোথায় রেখেছিস?

আমার বাংকের নীচে। কেউ দেখলে ভাববে ময়লা ফেলার জন্য রেখেছি। ভাল করিনি?

তোর তো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, এই তো সহকারী! এখন ছাপ-টাপ পাওয়া গেলেই বোঝা যাবে তিনি কে। সবার জুতো ভাল করে লক্ষ করবি। খালি পায়ে কেউ নিশ্চয়ই পোর্ট-হোলে উঁকি দিতে যাবে না।

নিশ্চয় করে কিছু বলা যাবে না দাদা।

কেন?— মুখার্জি হতবাক হয়ে গেলেন।

আরে, জুতো পরে গেলে ডেক-এ কেউ হাঁটছে বোঝা যাবে না?

কেন? যদি ক্যাম্বিশের জুতো পরে যায়? যেতেই পারে। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস জাহাজে কারও থাকে না। ভয় কখন কী কোথায় ফুটে যাবে। মগড়াকে বলেছিস, সকালে জল মেরে ঝাঁটা মেরে পরিষ্কার করে দিতে?

বলেছি। মগড়া রাজি হয়েছে। তবে শর্ত আছে।

কী শর্ত দিল?

আমাকে গাঁজা-ভাং ধরতে হবে।

তার মানে?

কার্ডে যা পায়, হয় না। নেশা-ভাঙে টানাটানি পড়ছে। নাম লেখাতে পারলে কিনার থেকে সে বেশি মাল কিনতে পারবে। আমিও রাজি। একগাল হেসে বলল, কোই দিককৃত নেই হবে বাবু।

সাবাস। ওকে দিয়ে জুতো চুরি করাতে হবে। যদি ছাপ-টাপ পাওয়া যায়। পোর্ট-হোলের কাছে আটা-ময়দা যাই হোক ছড়িয়ে রাখলে হারামির ব্যাটা যাবে কোথায়? ঠিক পায়ের ছাপ দেখা যাবে। কাব জুতোতে আটা-ময়দা লেগে আছে দেখা শুধু। মগড়ার তো সবার কেবিনে ফ্রি পাসপোর্ট। এক পাটি জুতো গায়েব করতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

কিন্তু সব বৃথা। যথা নিয়মে গ্যালি থেকে আটা-ময়দা চুরি করে সুরঞ্জন গোপনে চার্লির পোর্ট-হোলের পাশে ডেকের উপর ছড়িয়ে রাখে, যথানিয়মে মগড়া জল মেরে ঝাঁটা মেরে খুব সকালে ধুয়ে দেয়। কিন্তু জুতোর ছাপ, নিদেনপক্ষে কোনও পায়ের ছাপ পড়ে না। সুরঞ্জন রোজ রোজ রাতে কাজটা করার সময় খুবই সন্তর্পণে হাঁটা-চলা করে। ক্যাম্বিসের জুতো পরে হাঁটাচলা করলে টের পাওযার কথা না। টের পেলে মুখার্জি জানতেন। সুহাস ঠিক এসে বলত, রাতে কে আবার হাঁটাহাঁটি কবছে।

মুখার্জি ভেবে পেলেন না বোকার মতো কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কি না। কেন যেন মনে হচ্ছে ম্যাক নেই বলে অনুসরণকারীও নেই। আবার এমনও হতে পারে অনুসরণকারী তার চেয়েও ধড়িবাজ। ফাঁদ পেতে তাকে ধরা কঠিন। সে টের পেযে গেছে হয়তো জাহাজে তার পিছু নিয়েছে কেউ।

দিন যায়। জাহাজও যায়। জাহাজ তো এখন বেশ হেলেদুলে যাচ্ছে। জাহাজে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা আর ঘটছে না। সুহাসও কোনও খারাপ খবর দিচ্ছে না। চার্লিকে দেখলে সুহাস আগের মতো ছুটে যেতে পারছে না। চার্লির এটা ছদ্মবেশ, যদি সত্যি মেয়ে হয়, কিছুটা যেন তার হতভম্ব অবস্থা। এমনকী একদিন চার্লি পিছিলে চলে এসেছিল, ডাকাকাকি কবেছে, সুহাস অধীরকে দিয়ে বলে পাঠিযেছে, সে পিছিলে নেই।

পিছিলে নেই তো গেল কোথায়?

চার্লি বড়ই অধীর হয়ে উঠছে সুহাসের জন্য। যদি কোনও খবর-টবব থাকে। মুখার্জি নিজেই সুহাসকে ডেকে বললেন, যা না, দ্যাখ না কেন খুঁজছে। কোনও খবর-টবর যদি পাস। মুখোশটার হদিস পাওযা গেল না। দুটো মুখোশ দেখা গেছে থার্ড মেট আর ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ারের কেবিনে। একটা মুখোশ একজন পাদ্রির, আর-একটা মুখোশ এক বালকের। হিমশীতল পাথরের মতো ঠান্ডা চোখের মুখোশটার তো কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি চার্লি খোঁজ-টোঁজ পেয়ে যায়।

নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে। তুমিও চেষ্টা করেছ। চার্ট-রুম থেকে চাবি চুরি করে যার তার কেবিনে ঢুকে খুঁজেছ। কিছু পাওয়া যায়নি। চার্লি তো দিব্যি খোশমেজাজে আছে। বললাম, চার্লি, আর ইউ গার্ল? সোজা জবাব, নো নো, মি বয়। সবটাই এখন আমার প্রহসন মনে হচ্ছে।

সুহাস কাজে যাবে বলে জামা-প্যান্ট পালটাচ্ছিল। মুখার্জি বাংকে বসে আছেন। এ তো আরেক গভীর গাড্ডা। তাঁর মাথাখারাপ অবস্থা।

তুই বললি, চার্লি, আর ইউ গার্ল!

বলব না কেন? সে যদি আন্তরিক হয়, তবে আমাকে বলতে বাধা কোথায় বলো? কই বলল না তো, মি গার্ল। তাব তো উচিত সব খুলে বলা। তোমরাই কেন ভাবছ, চার্লি বালিকা, বুঝছি না। মি বয়! বলে হাউ হাউ কান্না। কী বলল জানো, আমরা নাকি সবাই মিলে তাকে নিয়ে মজা করছি। মজা আমরা করছি না চার্লি করছে? কোথায় সে কখন কাকে দেখছে, আর তার ভয়ে জড়সড়। নাটক বুঝলে। উইনচে আর কাজে যাচ্ছি না।

কোথায় কাজ করছিস তবে?

ইঞ্জিন-রুমে। তেল জুট সিরিশ নিয়ে রেলিং ঘষামাজা করছি। এখন তো মনে হচ্ছে, আমিই তামাশার পাত্র হয়ে গেলাম।

আরে গাধা, তুই বলতে গেলি কেন, তুমি কি মেয়ে? তোর কি মাথায় কিছু নেই।— বলে মুখ ভ্যাংচালেন মুখার্জি।

কেন তুমি যে বললে ফিফটি-ফিফটি?

এখন আর ফিফটি-ফিফটি বলছি না। সেন্ট পারসেন্ট ধরে রাখ।

ধরে রাখতে হয় তোমরা রাখো। আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমি যাচ্ছি। আর কিছু বলার আছে।

কাজে গেলেই কি রেহাই পাবি? চার্লিও যে তোর উপর অভিমানে কেবিন থেকে বেরই হচ্ছে না এটা কি তোর একবারও মনে হয়েছে! তোকে দেখতে না পেলে তো চার্লি সব অন্ধকার দ্যাখে, এটা বুঝিস?

সুহাস লকার খুলে কী খুঁজল। পেয়েও গেল। ওটা ছুঁড়ে দিল মুখার্জিদাকে। বলল, এই নাও, দ্যাখো কী লেখা আছে। ওটা চার্লি আমাকে দিয়েছিল, তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। কলিজ বলে একটা জাহাজডুবির ঘটনা এতে লেখা আছে। চার্লি তার বাবার ডাইরি থেকে উদ্ধার করেছে।

মুখার্জি পড়ে চমকে গেলেন। কাপ্তান ডাইরিতে লিখেছে কলিজ কবে ডুবেছে, কী তারিখ, কেন ডুবল, মিত্রপক্ষের মাইনফিল্ড, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪২ সাল, আরও কিছু খবর। তিনি পড়তে পড়তে কেমন রুদ্ধশ্বাসে বললেন, এত বড় খবরটা তুই অবহেলায় ফেলে রেখেছিস? তুই কি বুঝতে পারিস না, কাপ্তান জাহাজটার খোঁজেই ঘোরাঘুরি করছেন।

কোনও খবরই আমার কাছে আর গুরুত্ব পাবে না। চার্লি ডেকে বের হচ্ছে না, আমার উপর অভিমান করে নয় বুঝলে? চার্লি অসুস্থ। তাই বের হতে পারছে না। শুয়ে আছে। কাপ্তান-বয়কে দিয়েই চার্লি খবরটা পাঠিয়েছে। সঙ্গে আমাকে কেবিনে যেতেও বারণ করে দিয়েছে। বুঝতেই পারছ তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কোনও মূল্য নেই। চার্লি যে অসুস্থ তারও খবর রাখো না। কাপ্তান জাহাজটার খোঁজে আসুন আর মাটি টানার কাজে আসুন আমার কিছু যায় আসে না।

কী হয়েছে?

আমি কী করে বলব? কাপ্তান-বয় বললেন, চিন্তা করার কিছু নেই। ও হয়। ক'মাস ধরেই নাকি হচ্ছে। দু'দিন হল উঠতে পারছে না।

উঠতেই পারছে না, এত অসুস্থ!

বলল তাই। তাকে কাপ্তান এবারে ডাক্তার দেখাবেন। ঘাটে জাহাজ লাগলেই।

সে সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে চাইলে হাত ধরে ফেললেন মুখার্জি। টেনে ফোকশালে ঢুকিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, খুবই দুরারোগ্য ব্যাধি, মাঝে মাঝে যখন হয়, সহজে সারবে বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর থুতনি নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, অসুখটা খুবই কঠিন দেখছি। মুখ ব্যাজার করে রাখিস না, ভগবানকে ডাক ভাল হয়ে যাবে।—বলে তিনি মুচকি হাসলেন।

জাহাজ আর ঘাটে লাগছে! ঘাটই খুঁজে পাচ্ছে না হারামির বাচ্চারা। সারাদিন চোখে দূরবিন লাগিয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন। মর ঘুরে। রাস্তাঘাট চেনে না, জাহাজের মতিগতি ভাল না, কোথায় নিয়ে এসে ফেলল রে বাবা! আঠারো দিন হয়ে গেল! কথা ছিল না বারো-চোদ্দোদিনের মাথায় ডাঙা পাওয়া যাবে! কোথায় ডাঙা?

বংশী তেলের ক্যান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করছে। এইমাত্র উপরে উঠে কেন যে তার মেজাজ বিগড়ে গেল কেউ বুঝতে পারছে না। চেঁচামেচি শুনে সবাই উপরে ছুটে এসেছে! বংশীর আবার কী হল! মাঝে মাঝেই বংশী খেপে যায়। অনিশ্চয়তা শুধু বংশীকেই কাবু করে ফেলেনি, সবাই যেন তার শিকার। সত্যি তো এতদিন তো লাগার কথা না, জাহাজ কি তবে সমুদ্রে নিজের খুশিমতো বিচরণ করছে? জাহাজ কি সত্যি অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেল?

ইঞ্জিন-সারেং স্টোক-হোলডে নেমে গেছেন। তিনি উপরে থাকলে বংশীকে ধমক-ধামক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করতে পারতেন। যা মুখে আসছে বলছে বংশী, কুত্তার বাচ্চারা ভেবেছে কী! আমরা মানুষ না? দেব জাহাজে আগুন লাগিয়ে। কার সাধ্য আছে রোখে।

ভাণ্ডারি বলল, বংশীদা আগুন দেব? নিয়ে যাও।

বংশী আরও খেপে গেল। তেড়ে গেল ভাণ্ডারিকে।

মিঞা, তোমরা কি মানুষ না? তোমাদের ঘরবাড়ি নেই।

এ সময় মাথা গরম করে লাভও নেই। সত্যি তো আঠারো দিন হয়ে গেল। ডাঙার দেখা নেই। ডাঙা পেলেও কিছুটা স্বস্তি। তাঁর চেঁচামেচিতে ডেক-জাহাজিরাও জড়ো হয়েছে। এটা ঠিক, জাহাজ কোথায় আছে না আছে কোনও খবরই তারা পায় না। জানেও না, কী হচ্ছে না হচ্ছে। তারা জাহাজের নাটবল্টু ছাড়া কিছু না। আর পিছিলে চেঁচামেচি করলে, কে শোনে। কুত্তার বাচ্চা বলে গাল দাও, আগুন লাগাও, কেউ শুনতে আসছে না। আর উত্তেজনা কিংবা গোলমাল যতই হোক, সারেং যতক্ষণ নালিশ না দিচ্ছে, তাঁর কোনও গুরুত্ব থাকে না।

মুখার্জি উঠে এসেছেন। তিনি ক্যানটা তুলে পিছিলের বেঞ্চিতে রেখে দিলেন। ডেক-এ চিত হয়ে শুয়ে আছে বংশী। যেন সে আর কাজে যাবে না। পরি ছেড়ে চলে এসেছে। ভাঙুক সব। সব লন্ডভন্ড হয়ে যাক। ইঞ্জিনের পিস্টন রডে, ক্র্যাংক-ওয়েভে, সর্বত্র তেল খাওয়াতে হয়। না হলে ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়ে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। টানা আঠারো দিন জাহাজ চলছে। ইঞ্জিনের বিরাম বিশ্রাম বলে কিছু নেই। মবিল ঠিকমতো জয়েন্টে না পড়লে গাঁটে গাঁটে ব্যথা। তারপর অবশ। খুবই জরুরি কাজ। মুখার্জি মাথার কাছে গিয়ে বললেন, ওঠ। যা নীচে।

না, যাব না।

জাহাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দেব। যা বলছি।

যাব না, যাব না। কেউ কিছু বলবে না। দেখতে পাচ্ছ না, আমরা মানুষ না, কী ভাবছ তোমরা? তুমি না সুখানি, কই বলতে পারছ জাহাজ কোথায়? জানো কিছু? কোন সমুদ্রে জাহাজ বলতে পারো?

জানি।

কোথায় জাহাজ?

আগে কাজে যা। তোর একার ঘরবাড়ি বিবি-বাচ্চা পড়ে নেই মনে রাখবি। জাহাজ অজানা সমুদ্রেও ঢুকে যায়নি। অজানা সমুদ্র বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। আমাদেরও ঘরবাড়ি আছে। দেশে বউ আছে। রাস্তায় ছেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চিঠি পেলে মা'র কাছে দৌড়ে যায়। চিঠি চিঠি, সারা কলোনিতে খবর রটে যায়, দেবু মুখার্জির চিঠি এসেছে।

চিঠিই সব নয় দাদা! বুঝছ না কেন! তোমরা কেন বলছ না, জাহাজ দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। কেন বলছ না, বলো! তোমাদের মতলব ভাল না, বুঝি না মনে করো!

সবাই রাজি হবে? টাকা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। ছেলেমানুষি করিস না। আমাদের অপদস্থ করিস না। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। এতকাল জাহাজে চাচাদের রাজত্ব ছিল। মুখ বুজে সব সহ্য করে আসছে। কোনও গোলমাল পাকায়নি। তোরা উঠেই গোলমাল পাকালে কোম্পানি পছন্দ করবে কেন? বাঙালিবাবুদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছিস। ওঠ। কই সুহাস তো তোর মতো ভেঙে পড়েনি! দামড়া কোথাকার! বিয়ে করে জাহাজে উঠতে কে বলেছিল! উঠলি কেন! যা নীচে।

মুখার্জি হাত টেনে তুলে বসালেন বংশীকে। তারপর মবিলের ক্যান হাতে ধরিয়ে বললেন, মেয়েমানুষের অধম!

জোর করে তুলে প্রায় ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলেন পিছিল থেকে।

বংশী হেঁটে চলে যাচ্ছে। মুখার্জি জানেন, কিছু করার নেই। বাড়িওয়ালার মর্জি না হলে জাহাজ হোমে ফিরবে না। জাহাজে কি বড় রকমের কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তারা সাধারণ জাহাজি, অধিকাংশ নিরক্ষর, তাদের নামও নেই জাহাজে। সুখানি, টিন্ডাল, সারেং ছাড়া ডাক-খোঁজও করেন না অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা। সাদা চামড়ার ইজ্জত কত, জাহাজে উঠলে বোঝা যায়। বন্দরের রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে, ম্যান কোথায় যাচ্ছ? এতদিন এক জাহাজে থেকেও সম্পর্ক দুই মেরুর। তারা বাসিন্দাও দুই মেরুর। খানাপিনা সব আলাদা। তারা কী খায়, সাদা চামড়ার লোকগুলি খোঁজ রাখে না। তারাও ডাইনিং হলে লাঞ্চ কিংবা ডিনারে কী পরিবেশন করা হয় জানে না। তারা মাদুর পেতে খায়। আর ডাইনিং হলে ডিনারের সময় মিউজিক বাজে। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠনও টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

অতিথি-অভ্যাগত বন্দরে লেগেই থাকে। মেসরুমমেট, মেসরুম বয়, কাপ্তান-বয়, স্টুয়ার্ড থেকে চিফ কুক সব খিদমতগার। তাদের সম্বল ভাণ্ডারি। ডেক-ভাণ্ডারি, ইঞ্জিন-ভাণ্ডারি। অসুখ-বিসুখে সেকেন্ড মেট দাওয়াই দেন। অব্যবস্থার চূড়ান্ত। তার উপর বংশীর এই বিদ্রোহ, সুহাসের নির্বুদ্ধিতা, মুখোশের রহস্য, ম্যাকের মৃত্যু, বুনো ফুলের গন্ধ, সি-ডেভিল লুকেনার থেকে কলিজ জাহাজ ক্রমে রহস্যকে গভীর করে তুলেছে।

মুখার্জি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, চার্লি কেন বাবার ডাইরি থেকে প্রেসিডেন্ট কলিজ নামে জাহাজটির খবর সুহাসকে পাচার করল? বাবার কোনও বিপদ হতে পারে কিংবা তার বাবা যে মাটি টানার নামে প্রবালদ্বীপগুলি ঘুরে বেড়াবার অছিলা খোঁজেন, এমনও প্রমাণ এতে কি থাকতে পারে। প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি আগে ছিল প্রমোদ-তরণী। যুদ্ধের সময় জাহাজটি মার্কিন সরকার বাজেয়াপ্ত করে। চার্লির ঠাকুরদা সেই জাহাজের যদি মালিক কিংবা অংশীদার হন। কলিজ জাহাজ কোথায় ডুবেছে তারও উল্লেখ আছে পাচার করা খবরটিতে। চার্লি কি নিজের জীবন বিপন্ন, এমন আশঙ্কা করছে?

ফোকশালের সিঁড়িতে সুহাসের সঙ্গে দেখা। সে কেন কাজ ফেলে পিছিলে এসেছিল জানেন না। সুহাস সিঁড়িতে উঠে ফের নেমে এল, মুখার্জিকে বলল, দাদা, তুমি বুঝলে কী করে বুনো ফুলের ছবি এঁকে চার্লি আমাকে দেখাচ্ছিল!

হঠাৎ তোর এই অবান্তর প্রশ্ন কেন বুঝছি না!

না, বুঝলে কী করে?

বুনো ডেইজি ফুল দেখাবার জন্য কিনারায় চার্লি তোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখিয়েছে?

না।

আবার দেখাতে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য যদি খুঁজে পায়। ডেইজি ফুল দেখাবার তার এত শখ কেন বুঝি না। আসলে সে কিছু দেখাতে চায়, তবে বুনো ডেইজি ফুল নয়, তুই বোকা বলে বুঝতে পারছিস না। এবারে তো অসুস্থ। গিয়েছিলি কেবিনে?

যাব কি না বুঝতে পারছি না। চার্লি তো বারণ করেছে।

যদি যাস, কলিজ জাহাজের আর কোনও খবর যদি পারিস নিবি।

পরে কী ভেবে বললেন, না থাক। কোনও খবরেই কৌতূহল দেখাবি না। চার্লি নিজে থেকে বললে শুনবি। হুঁ হাঁ এই পর্যন্ত। তোকে কোনও মন্তব্য করতে হবে না।

তারপর ঘড়ি দেখলেন, কী করা যায়, বংশীর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে। চোখে তন্দ্রার মতো এসেছিল। দিল ভেঙে! কিছু ভাল না লাগলে পিছিলের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকা যায়। আর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙাভাঙির খেলা, দিগন্তব্যাপী অসীম সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি জীবনের নানা খুঁটিনাটি তুচ্ছতা সহজেই দূর করে দেয়। কিনার কালই দেখতে পাওয়া যাবে। তারা নিউ হেবরিডস দ্বীপপুঞ্জ পার হয়ে এসেছে, কাছে কোথাও কোনও প্রবালদ্বীপে জাহাজ ভিড়বে। অফিসারদের কথাবার্তা থেকে তিনি এমন বুঝেছেন। প্রমোদ-তরণী, যুদ্ধের কাজে শেষে সামরিক দপ্তর ব্যবহার করতে পারে, চার্লির ঠাকুরদা হয়তো অনুমানই করতে পারেননি। প্রমোদ-তরণীতে তিনি যে নিজেও এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেননি, কে বলবে! লুকেনারের অগাধ ধনসম্পদের কথা দ্বীপবাসীদের মুখে প্রায় কিংবদন্তীর সামিল। জনশ্রুতি, পাহাড়ের খাঁজে কোনও মৃত আগ্নেয়গিরির বুকে ধনসম্পদ লুকানো আছে। অথবা এও মনে করা হয়, ধনসম্পদের খোঁজ পেয়ে গেলেই আকস্মিক দৈব-দুর্ঘটনা। কেউ ফিরে আসতে পারে না। রাক্ষুসে হাঙরেরা খেয়ে হজম করে ফেলে অথবা দেখা যায় জাহাজ এবং সব নাবিকেরা মৃত। পরে দেখা যায়, জাহাজ খালি এবং মৃত মানুষগুলির কোনও খোঁজই পাওয়া যায় না। চরায় আটকে পড়ে থাকে জাহাজ।

তবে কোথায় এমন সব আজগুবি ঘটনা ঘটছে কেউ বলতে পারে না। যে-কোনও দ্বীপ কিংবা পাহাড় আর আদিবাসীদের গুরুত্ব এজন্য অসীম। যারা এই ধনসম্পদ উদ্ধারে যায় তারাই হারিয়ে যায়, বিষয়টা গোঁজামিলের ব্যাপার। কারণ জনশ্রুতির ল্যাজা-মুড়ো এক করা সবসময়ই কঠিন। এই বিশমার্ক সি এবং কোরাল সি-তে অজস্র জাহাজের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। তবে অধিকাংশই দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের শিকার। চরায় জাহাজ উঠে গেছে, বনজঙ্গল গজিয়ে গেছে জাহাজের চারপাশে এমন দৃশ্য সে নিজেও দেখেছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধে নিউগিনি থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এলাকা ছিল প্রবল উত্তপ্ত। জাপ বাহিনী নিউ ব্রিটেন দ্বীপের রাবাউলে পাঁচটি এয়ারস্ট্রিপও তৈরি করে ফেলে। বিশাল নৌ-বহর। নিউগিনির মোরসবি দ্বীপে মিত্রশক্তির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। মিত্রশক্তিকে পিছু হটতে হয় বাধ্য হয়ে এবং কোরাল সি-তেই প্রথম মিত্রশক্তি বড় ধরনের জয়লাভের পর যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ জাপ বাহিনীর ক্রমে কমে আসতে থাকে। প্রায় এক লক্ষ জাপ সেনা হয় যুদ্ধবন্দি, নয় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যায়। সঙ্গে অজস্র জাহাজ উভয় পক্ষের। বোমারু বিমান শয়ে শয়ে। ভাবতে গেলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এই এলাকা এখন কত শান্ত নিরীহ! শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর পারপয়েজ মাছের ঝাঁক। কখনও বড় অ্যাঞ্জেল মাছের ঝাঁক। অজস্র বিষাক্ত মাছেরও ছড়াছড়ি। এই এলাকাটি ভয়াবহ নানা কারণেই। তিনি এখানে আরও ঘুরে গেছেন বলেই জানেন। মাছে মাছি না বসলে খাওয়ার উপযুক্ত বলে ধরা হয় না। মাছেব এই বিচিত্র লীলাভূমিতেই জাহাজ এখন ঢুকে গেছে। ব্যাপ্ত মহীসোপান পাব হয়ে অনন্ত মহাসাগর। আবার তারই বুকে সিন্দুর টিপের মতো সবুজ কিংবা মেরুন বঙেব দ্বীপ ঝলমল করে ওঠে। কখনও মনে হয় দূর থেকে সবুজ পান্নার মতো দ্বীপটি ভেসে আছে। লাল বালুকাময় দ্বীপ থেকে কালো লাভায় তৈরি এই অজস্র দ্বীপমালায় বিচিত্র সব পাখি, কুমিব, কচ্ছপ থেকে প্যালিকান, কী নেই! বংশীটা কেন যে ভাবতে পারছে না, এই যাত্রা তাদের কোনও দুঃসাহসিক অভিযানেব সামিল। ভাবলে বাড়িব জন্য এতটা হতাশ হয়ে পড়ত না।

সুহাস সহসা যেন মনে করিয়ে দিল, কী ভাবছ বলো তো। আমাকে কেবল দেখছ। কথা বলছ না। এত কী দেখার আছে আমাকে বুঝি না। তুমি কিছুতেই বলছ না।

বুনো ফুল এঁকে তোকে কেন দেখাচ্ছিল জানতে চাইছিস তো?

আবে না। বুঝছ না কেন, চার্লি ব্লেজিং স্টার বলো, ওয়াটার লিলি বলো, নিজেব শখ থেকেও আঁকতে পারে।

শখ থেকে আঁকা ছবি ময়লার ঝুড়িতে কেউ ফেলে রাখে!

কেন? পারে না?

না, পারে না। আমি তো ব্রিজ থেকে বিকেলেব ডিউটি সেরে নামার সময় দেখতে পেলাম, গুচ্ছেব কাগজ, নানা রঙিন ফুল আঁকা। নিশ্চয় তোকে ফুলগুলি চেনাবার জন্যই এঁকেছিল। চেনা হয়ে গেলে আব সে ফুলেব দাম থাকে! বাজে কাগজ হয়ে যায় না? কাপ্তান-বয় নিশ্চয়ই ওর বিছানাব নীচে থেকে কুড়িয়ে ওগুলো ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে রেখেছিল। সেই থেকেই অনুমান। ঝট কবে বলে ফেলতে পেরেছি। চার্লি তোকে ফুলও এঁকে দেখিয়েছে। ডেইজি ফুল কিন্তু সেখানে এঁকে দেখায়নি। এত সুন্দর আঁকতে পারে! চার্লির সত্যি অশেষ গুণ, অথচ নির্দোষ সরল .

এই বলে থামলেন। ছেলে বলবেন না, মেয়ে বলবেন? আহাম্মকটা তো মেয়ে বলায় চটেই লাল। তিনি বললেন, চার্লির অকপট সারল্য ছবিগুলিতে ধরা যায়। আবার ছবিগুলিব মধ্যে কোথাও যেন ক্রোধ ফুটে উঠেছে। আগ্নেয়গিরির সুপ্ত লাভার মতো। কাগজগুলি সব রেখে দিয়েছি।

তাবপর কী ভেবে চুপ করে গেলেন। কাগজগুলি সব রেখে দিয়েছি বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। তিনি বললেন, কাগজগুলি রেখে দিয়েছিলাম, তবে আর দরকার নেই। তুই নিয়ে নিতে পারিস।

আমি নিয়ে কী করব?

তা অবশ্য ঠিক। কাগজগুলি রেখে দিয়েছি বললে সুহাস যে চার্লিকে বলবে না, দাদা কাগজগুলি রেখে দিয়েছে, কেন রেখে দিয়েছে, কোথায় যে ফুলে বিষাক্ত পোকার বাস থাকে কে বলতে পারে?

তিনি যেন আঁকা ছবিগুলির ব্যাপারে কোনও গুরুত্বই দিতে চাইছেন না। শুধু বললেন, বুঝতে পারছিস আমি যা ভাবি তা ঠিকই ভাবি।

সুহাস ক্রমেই মানুষটার প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তিনি নীচে নেমে যাচ্ছেন। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এখন যেন তাঁর আর কারও সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। সোজা ফোকশালে গিয়ে শুয়ে পড়বেন দরজা বন্ধ করে। বংশীদা আবার গোলমাল শুরু করেছে খবর পেয়েই উপরে ছুটে এসেছিলেন।

বংশীদার চোখ-মুখ দেখলেও তার আজকাল ভয় হয়। হতাশ চোখ। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ কমে গেছে! ধরেই নিয়েছেন দেশে আর তাদের ফেরা হবে না। কখনও কখনও কাজে যেতেই চান না। ঠেলেঠুলে পাঠাতে হয়। কাজের পোশাক পরে উপরে উঠে গিয়ে বসে থাকেন। ঠেলেঠুলে কাজে পাঠানো কত ঝামেলা সে এক ফোকশালে থেকে বুঝেছে।

মুখার্জিদাও যেন বংশীকে নিয়ে উচাটনে আছেন। বংশী যতক্ষণ কাজে নেমে না যাচ্ছে, তিনি নিশ্চিন্তে শুতেও যেতে পারেন না। চার ঘণ্টা ডিউটি, আট ঘণ্টা বিশ্রাম। ব্রিজ থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে চা খান পিছিলের বেঞ্চিতে বসে। এই করতেই করতেই সকাল হয়ে যায়, তারপরও তিনি আটটা পর্যন্ত জেগে থাকেন, বংশীদা কাজে না নামা পর্যন্ত বড় অস্বস্তি তাঁর।

হতেই পারে। কারণ দেশভাগের পর কলকাতা বন্দর খালি হয়ে যাবার কথা। জাহাজিরা সব পূর্ব-পাকিস্তানের। কোম্পানির জন্মকাল থেকেই তাঁরা কাজ করে আসছেন। ব্যাংক লাইন, ক্লক লাইন, সিটি লাইন, বি আই কোম্পানি— সর্বত্র তারা, তাদের বাপ, নানা এবং আরও আগে যাঁরা ছিলেন, একেবারে যেন বংশগত এই ধারা। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় তারা ভিনদেশি। এত বড় বন্দর তো ভিনদেশিদের উপর ভরসা করে ফেলে রাখা যায় না। ভারতীয় নাবিকেরা উঠে আসতে শুরু করায় তারা বিপাকে পড়ে যেতেই পারে। ভাল চোখে দেখার কথাও না। রুজি-রোজগারের প্রশ্ন। পেটে হাত পড়লে তো সংঘর্ষ বাধবেই। কাজে-কামেও তারা খুব পটু। তুলনায় ভারতীয় নাবিকেরা কিছুটা কামচোর, কোম্পানিগুলির দোষও দেওয়া যায় না। বংশীর জন্য ভারতীয় নাবিকেরা ফেরে পড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাতেই মুখার্জিদা ভুগছেন।

যেন ভারতীয় নাবিকদের যশ-অপযশের দায় মুখার্জিদার মাথায় কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙলেও তিনি বাথরুমে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি দেবেন। দেখবেন, বংশীদা আছে কি নেই? কেউ থাকলে বলবেন, কাজে গেছে?

গেছে।

ব্যস, যেন আর কিছু জানার তাঁর আগ্রহ নেই। কাজ ফেলে ইদানীং মাঝে মাঝে চলেও আসেন বংশীদা। একজন গ্রিজারকে মাঝে মাঝে উঠে আসতেই হয়। স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনে মবিল দিতে পিছিলে আসতেই পারে। পিছিলের বেঞ্চিতে বসে চা সিগারেট খাওয়াও যায়। কিন্তু বংশীদা স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের ঘরে না ঢুকে নিজের ফোকশালে নেমে যান। তারপর বাংকে চিতপাত হয়ে শুয়ে থাকেন। তাড়া না দিলে তাঁকে নড়ানো যায় না। এই এক উটকো ঝামেলা বংশীদাকে নিয়ে। কখনও চোখ জবাফুলের মতো লাল, বাংকে মটকা মেরে পড়ে থাকেন। ঘুম-টুম যেন সব গেছে তাঁর।

সুহাসের মাঝে মাঝে ভয়, কিছু না শেষে একটা করে বসেন। জাহাজিদের মানসিক অবসাদ দেখা দিলে খুব আতঙ্কের। মুখার্জিদাও ভাল নেই। অথচ কী করে যে বুঝে ফেললেন, চার্লি তাকে বুনোফুলের ছবি এঁকে দেখিয়েছে, কোনটা কী ফুল, কত কিসিমের ফুল যে হয়, চার্লির সঙ্গে পিকাকোরা পার্কে ঘুরে না বেড়ালে জানতেই পারত না। সব ফুল তো আর সব জায়গায় ফোটে না। না ফুটুক, সে ফুলগুলি এঁকে দেখাতে পারলেই খুশি। সে একা ছিল কেবিনে। দরজা বন্ধ ছিল। কেউ জানার কথা না। অথচ মুখার্জিদা টের পেয়ে গেছেন।

চার্লি অসুস্থ, খবরটা তিনি জানেন না বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সে ডাকল, মুখার্জিদা।

মুখার্জি খেয়ালই করেননি, সুহাস তাঁর পিছু পিছু ফোকশালে এসে ঢুকেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। খুশি না। কাজ ফেলে গুলতানি। যা উপরে যা। হয় এমন কিছু ভাবছিলেন, নয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে তাঁর। সুহাস বলবে কি বলবে না ভাবছিল।

মাঝে মাঝে মুখার্জিদার গম্ভীর মুখ দেখলে সমীহ না করে উপায় থাকে না। দীর্ঘকায় মানুষটির মুখে-চোখেও আভিজাত্য আছে। মুখার্জিদা তাঁর বাংকে বসে বালিশ চাদর ঠিক করছিলেন অথচ তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

আমি যাই দাদা।—কেমন ভয়ে ভয়ে বলল সুহাস।

তামাশা দেখতে এসেছিলি?

কীসের তামাশা বলছ?

তবে যাই বলছিস কেন? চোরের মতো আমার ফোকশালে ঢোকা কেন! কতবার বলেছি, যখন-তখন না বলে ঘরে ঢুকবি না, মনে থাকে না।

সুহাস বিস্ময়ে থ। তিনি কখনও বলেননি, তাঁর ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা বারণ। তা ছাড়া মানুষটা অন্যের কথা নিজের বলেও চালিয়ে দিতে ওস্তাদ।

সে বলল, ঠিক আছে।

ঠিক থাকলে তো ল্যাটা চুকেই যেত। ঢুকেছিস কেন? কী বলতে এসেছিস সোজা বলে ফ্যাল। সারারাত ঘুমাই না। দিনেও যদি চোখ বুজতে না পারি মেজাজ ঠিক থাকে।

বলেই শুয়ে পড়লেন। গরম পড়ে যাওয়ায় জামা গায়ে রাখা যায় না। কী ভেবে উঠে বসলেন। জামা খুলে পকেট হাতড়ালেন, সিগারেট লাইটার বের করে শুয়েই সিগারেট ধরালেন। বললেন, যা বলতে হয় বলে ফ্যাল, তোরা সবাই এক-একটা চিজ।

এরপর আর কিছু বলা যায়?— সুহাস উঠে পড়ল।

যাচ্ছিস কোথায়?—তিনি সিগারেট টানতে টানতে নিবিষ্ট মনে আগুনটা দেখছেন। লাইটারের আগুন। লাইটার নেভাতে যেন ভুলে গেছেন তিনি।

না, আমি বলছিলাম—

না, আমি বলছিলাম বলে কোনও কথা থাকতে পারে না। বল, বলছিলি, চার্লি অসুস্থ খবরটা সত্যি আমি জানতাম কি জানতাম না? ফুলের কথা বলায় বিভ্রমে পড়ে গেছিস। কী? তাই তো?

সুহাস তাজ্জব।

কী রে? চুপ মেরে গেলি।

তুমি কি জ্যোতিষী জানো।

ওসবে বিশ্বাস নেই। কিছু ঘটনা ঘটলে আরও কিছু ঘটনা ঘটে। সবকিছুরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে। জ্যোতিষীরা যা করে, এই যে চট করে মুখ দেখে, হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, কোষ্ঠী গণনা, কিছু কিছু ফলেও যায়। আরে মানুষের রোগ, শোক, ব্যাধি, মৃত্যু তো থাকবেই, অশান্তিও থাকে। দুর্ঘটনাও ঘটবে। সব মানুষের জীবনেই এগুলি থাকে। এগুলো যে কেউ বলে দিতে পারে। কেউ কেউ একটু বেশি পারে। চর্চা করলেই পারে। আসলে মিলুক না মিলুক, সৌভাগ্যের কথা কে না শুনতে চায়। এব উপরই সব। ধরে নে আমি কিছু চর্চা করছি। আমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাবি না।

সুহাস সব শুনে বলল, তুমি তবে জানতে চার্লি অসুস্থ? অথচ না জানার ভান করে বললে, অভিমানে সে কেবিন থেকে বের হচ্ছে না।

না, জানতাম না।

এত জানো, আর এটা জানতে না? ওর কেবিনের পাশ দিয়ে তো কাজে যাও।

যাই, তবে চার্লি এখন আমার মাথায় নেই। চার্লি সুস্থ না অসুস্থ তা নিয়েও মাথা ঘামাবার দরকার মনে করছি না।

চার্লি অসুস্থ। কী হয়েছে কিছু জানো?

বললাম তো, না।

কাপ্তান-বয় যে বলল, মাঝে মাঝে হয়।

এবার কেন যেন না উঠে পারলেন না মুখার্জিদা, তার দিকে তাকালেন। তারপর কেমন হাসিমুখে বললেন, আরে বন্ধু, বয়ঃসন্ধিক্ষণের দোষ। বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে কষ্ট পাচ্ছে। দেখলাম তো কাপ্তান-বয় হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে চার্লির কেবিনে ঢুকছে। এতে চার্লি অসুস্থ হয় কী করে! প্রকৃতির নিয়ম। কোমরে তলপেটে কত জায়গায় ব্যথা হতে পারে। সবার যে হয় তাও না। তবে কারও কারও হতেই পারে।

চার্লি তবে অসুস্থ নয় বলছ?

অসুস্থ, তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ঘাড় তুলে ছোট্ট একটা রঙের খালি কৌটো খুঁজছিলেন তিনি। সুহাস তাড়াতাড়ি বাংকের নীচ

থেকে খালি কৌটো এগিয়ে ধরলে ছাই ঝাড়লেন আগুনের। সে উঠেও পড়তে পারছে না। অসুস্থ, তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয় কেন, সে বুঝছে না। এই যে বললেন, খুব দুরারোগ্য ব্যাধি, সহজে ছাড়ছে না, কখন কী বলেন নিজেও বোধহয় মনে রাখতে পারেন না। অসুস্থ হলে তো দেখতে যাওয়াই রীতি। তার সঙ্গে চার্লির এত ভাব, অথচ সেই চার্লিই খবর পাঠিয়েছে, সে যেন না যায়। কী যে খারাপ লাগছিল।

মুখার্জিদা বললেন, খুব একা একা লাগছে না রে।

কেন মুখার্জিদা তাকে একথা বলছেন, তাও সে বুঝছে না। চার্লি কাছে থাকলে কী করে সময় কেটে যায় টের পায় না সে, এটা অবশ্য ঠিক। চার্লির যে কত রকমের প্রিয় গাছ আছে, কত রকমের যে তার শখ ছিল, সে ঘোড়ায় চড়তে পারে, কখনও-কখনও ঘোড়ায় চড়ে বনভূমির পর বনভূমি পার হয়ে যেত। তার পড়াশোনার জন্য শিক্ষয়িত্রী আসত বাড়িতে, ভাঙা লজ্ঝড়ে ফোর্ড গাড়িতে আসত। চার্লি নাকি তার পড়ার ঘর থেকেই দেখতে পেত, গাড়িটা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছে। তার তখন নানা কূটবুদ্ধি গজাত।

পড়তে আর কার ভাল লাগে, জঙ্গল থেকে কখনও সে শুঁয়োপোকা পাতায় করে টেবিলের উপর রেখে দিত। ব্যস, দেখামাত্রই লাফ, পুয়োর ডেভিল! আর সঙ্গে সঙ্গে মিসকে খুশি করার জন্য বলত, মিস, লেট মি গেট ইয়ো সাম কফি। সঙ্গে সঙ্গে নাকি চার্লির প্রতি এত প্রসন্ন হয়ে উঠত যে, তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, পোকামাকড়ের দোষ কী বলো। তারা তো ঘুরে বেড়াবেই। যা জঙ্গল আর কাঁটাগাছের পাহাড়! যেন পোকাটা ভুল করেই প্রাসাদের মতো বাড়িটার কোনও কক্ষে কাঁটাগাছের তাড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢুকে গেছে। তখন নাকি চার্লির বেদম হাসি পেত। হাসি সামলাবার জন্য ছুটত পাশের ঘরে।

চার্লি তোর খুব কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে এটা কি টের পাস? চার্লি এত কী কথা বলে তোর সঙ্গে তাও বুঝি না।

মুখার্জিদা সিগারেটের আগুন খালি কৌটোয় ঘষে নিভিয়ে দেওয়ার সময় যেন কিছুটা স্বগতোক্তি করলেন।

সুহাস কী বলবে ঠিক যেন ভেবে পেল না। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাডো লেকের চারপাশে চার্লি ঘুরে বেড়াত। কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাও বুঝতে পারছে না। এতটুকু ছেলে ঘোড়ায় চড়তে পারে কখনও! অবিশ্বাসও করা যায় না। দড়িদড়ায় ঝুলে যেভাবে ফলকা থেকে বোট-ডেক কিংবা কখনও দড়ির মই বেয়ে যেভাবে দ্রুত টাগবোটে নেমে গেছে, তাতে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। মেপল আর সাইপ্রাস গাছের জঙ্গল। ভিতরে ঢুকলে রাস্তা খুঁজে বের করাই কঠিন। তবে চার্লি নাকি জানত, নীচের হাইওয়ের মোড়ে যে বুড়ো থাকে, জর্জ মরিস না কী যেন নাম বলেছিল, সে মনে করতে পারে না, ওই বুড়োর ছোটমতো ধাবাই ছিল তার শেষ গন্তব্যস্থল।

সেখানে গেলেই বুড়ো বের হয়ে আসত। তার ভাঙা গ্যারেজ পাশে। ট্রাক নিয়ে ড্রাইভাররা হাইওয়ে ধরে সেতু পার হয়ে কোথায় যে চলে যায়, ট্রাক-ড্রাইভারদের সম্পর্কেও তার ছিল অশেষ কৌতূহল। বুড়ো মানুষটা শীতের ঠান্ডায় জমে গেলেই বলত, কফি উইথ হুইস্কি? চার্লি বলত, নো নো, নো হুইস্কি, ওনলি কফি। ঘোড়ার জিন ধরে রাখত সে। বুড়ো মানুষটা ঘোড়া একদম পছন্দ করত না। বুড়ো কফি নিয়ে কাউন্টারে উঁকিঝুঁকি মেরে বলত, ওয়েল নাইস বয়, গেট ইট। বুড়ো কিছুতেই নাকি তার প্রিয় স্প্যানিশ ঘোড়াটির কাছে ঘেঁষত না। সে তখন নাকি হা হা করে হেসে উঠত। বলত, ইয়ো লাভ ট্রাকারস। নট মি। বুড়ো লোকটা নাকি প্রথম জীবনে ছিল মেষপালক, তারপর রাস্তার দিকনির্ণয়গুলিতে রং করত। সারা টেকসাস, নিউ মেক্সিকো তার ঘোরা। গমের মজুত গোলাতে কিছুদিন কেরানিরও কাজ করেছে। তবে তার এখন ধাবাটিই প্রিয়। ধাবার চারপাশে বুনো ফুলের বাগানটি চার্লির উপহার দেওয়া। বুড়োর এজন্য নাকি কৃতজ্ঞতারও শেষ ছিল না। একা সারাদিন ধাবা সামলায়। শীত-বসন্তে কখনও কোনও ট্রাকার যত রাতই হোক, বুড়োকে দ্যাখেনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুহাস বলল, কত কথা বলে, কী বলব? কোনও মাথামুন্ডু নেই। ওর ঠাকুরদা নাকি টেকসাস ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার ক্লাবের পাইয়োনিয়ার ছিলেন।

টেকসাস! বলিস কী! সে তো ভয়ংকর জায়গা!

তাই তো বলে!

টেকসাস শব্দটি মুখার্জির মাথায় কেমন পেরেক পুঁতে দিল। সুহাস দেখছে, মুখার্জিদা বিড়বিড় করে বকছেন, টেকসাস! টেকসাস!

কী হল তোমার!

লোমহর্ষক!

টেকসাসের সঙ্গে লোমহর্ষক শব্দটি কেন যে ত্বরিতে জুড়ে দিলেন মুখার্জিদা! মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, ভাল না, ভাল না। টেকসাস মোটেই ভাল জায়গা নয়।

টেকসাসে তুমি গেছ?

কেউ যেতে পারে না। দস্যু-তস্করদের দেশ। অপহরণ, খুন-জখম জলভাত। প্রেম করতে চাইলে শেষ পর্যন্ত ফুল ফুটবে না। তার আগেই অপহরণ। খুঁজতে গেলে মরবে। সাঁ করে বুকের মধ্যে অরণ্যের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে তরবারির খোঁচা।

তারপরই কী ভেবে বললেন, ঘোড়ায় চড়া তাদের প্রিয় নেশা। চার্লি কি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে! তার মানে, চার্লির ঠাকুরদা কি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন?

ঠাকুরদা জানতেন কি না জানি না। তবে চার্লি খুব ছোট বয়েস থেকেই ঘোড়ায় চড়তে পটু।

রক্তের দোষ। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার পায়োনিয়ার না ছাই! দস্যুবৃত্তি। স্রেফ দস্যুবৃত্তি। ঘোড়ার পিঠে বস্তা বস্তা স্বর্ণপিন্ড। ঘোড়া ছুটছে। পাহাড়ি পথে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি চার্লির ঠাকুরদা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা পাহাড়ের উপত্যকা জুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলেছেন। চোখ বুজলেই টের পাই।

কী যে বলছ, বুঝছি না। এত নাটক করছ কেন, তাও বুঝছি না।

তুই বুঝছিস না, আমি কি সব বুঝছি? চার্লি কী করে টেকসাসের হয় বুঝি না! ওর বাবা তো কার্ডিফ না হয় লন্ডন থেকে জাহাজে ওঠেন। আমি তো ভেবেছিলাম, চার্লিরা ওয়েলসের লোক, মানে ইংরাজ। খাঁটি বাজার জাত। এখন দেখছি রক্তেই দোষ থেকে গেছে।

টেকসাস কোথায় বলবে তো?

টেকসাস মানে, হলিউডের খুন জখম দাঙ্গা ধর্ষণের ছবি। সে দেখা যায় না। তুই তো মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার্সের ছবি দেখিসনি, হলিউডের ঘোড়াগুলি ছুটতে থাকলে মনে হবে, তোর ঘাড়ে এসে বুঝি পড়ল! প্রথমবার তো' মেট্রোতে ছবি দেখতে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে প্রায় দৌড়ে পালাচ্ছিলাম। দুর্ধর্ষ খুনি কাউবয়দের ওখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। টেকসাস হল সেই দেশ, বুঝলি! চার্লি কি ঘোড়ায় চড়ে একাই ঘুরে বেড়াত?

তাই তো বলল। বেটসি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল বলে তো জানি না। জর্জ মরিসের কথা অবশ্য মাঝে মাঝে বলে। ট্রাকারদের সঙ্গে মরিসের নাকি খুব ভাব। বুড়ো মানুষ। খুবই সজ্জন।

ট্রাকার মানে?

ট্রাক ড্রাইভার-টাইভার হবে। তবে চার্লি ট্রাক-ড্রাইভার বলে না। ট্রাকারই বলে।

বুড়ো লোকটা কী করত?

ছোট্টমতো স্টপ অফ ছিল তার। ওই ধাবা-টাবা গোছের, হাইওয়ের ওটাই শেষ ধাবা। তারপর নদী পার হয়ে পাহাড় আর পাহাড়, গিরিখাত, উপত্যকা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাক চালিয়েও বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

চার্লি তা হলে অজ্ঞাতবাসে ছিল বলছিস?

না, অজ্ঞাতবাসের কথা বলেনি।

এটা অজ্ঞাতবাস ছাড়া কী? গাধা কি আর গায়ে লেখা থাকে। তাদের বাড়ির আশপাশে লোকজন ছিল কি না জানতে হয়, জায়গাটা শহর না গ্রাম, জানতে হয়। ওর ঠাকুরদা ফুলের কারবারি। অফিস-কাছারি, লোকজন থাকবে না।

বুড়ো লোকটাকে ছাড়া আর কাউকে চিনত বলে জানি না। ও না বললে কী করব? বানিয়ে বলতে হবে। যেভাবে জেরা করছ, যেন আমিই আসামি, ম্যাককে ডেরিক ফেলে খুন করেছি!

তুমি খুন করেছ না অন্য কেউ খুন করেছে, পরে ঠিক হবে। তবে চার্লির রিপোর্ট ঠিক নয়। কলিজ জাহাজডুবিতে পাঁচ হাজার মার্কিন সেনাই তলিয়ে গেছে, মিছে কথা। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। কেবল পাঁচজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। চারজন ক্রু এবং স্বয়ং কাপ্তান। তারা জলের তলায় নিখোঁজ, না অন্য কোনও রহস্য আছে বুঝছি না।

সুহাসের মেজাজ খিচড়ে গেল। মুখার্জিদা গুল মারছেন না তো! বলতেও পারছে না, যা খুশি বলে যাচ্ছ, চার্লির দায় পড়েছে মিথ্যে রিপোর্ট দিতে। ডাইরিতে যা পেয়েছে, তাই টুকে দিয়েছে। তার বাবার ডাইরি হাতানো কী কঠিন যদি বুঝতে, তাও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাও যদি খুনের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলেছে, প্রমিজ, ইউ উইল মেনশান দিস টু নো ওয়ান।

মুখার্জিদা শুয়ে আছেন। তাঁর সেই চিরাচরিত মুদ্রাদোষ, পা নাচাচ্ছেন। চোখ বুজেই কথা বলছেন। যেন কত দুশ্চিন্তা মাথায়। রহস্য উন্মোচন বোগাস। সে উঠতে যাচ্ছিল।

মুখার্জিদা বললেন, উঠছিস কেন? বোস। চার্লির টুকলিফাই রিপোর্টে দেখছি, জাহাজডুবির দু'-একজনের সাক্ষাৎকারও আছে। ফলস ইন্টারভিউ। অবশ্য এটা আমার ধারণা। জাহাজের উপর কাপ্তান এবং ক্রু-দের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, বিশ্বাসযোগ্য নয়। অশুভ প্রভাবে পড়ে হয়েছে, বিশ্বাস করতে পারছি না। কোনও যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ না কে বলবে!

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের মাথা গরম। বাংকে ঘুসি মেরে বলল, ও কী আজেবাজে বকছ! তুমি কি কলিজ জাহাজে ছিলে? সব কিছুতেই বাহাদুরি, তুমি নিজে বরফ-ঘরে মেয়েমানুষের লাশ পর্যন্ত ঝুলিয়েছ— এভাবে মিছে বাহাদুরিতে কী লাভ তোমার! আজেবাজে কথা বলে কী লাভ হয় তোমার! ঘরে কি নেশা-টেশা করছ! বাটলার, কাপ্তান-বয়ের সঙ্গে তো দোস্তি খুব। এসব রোগ তো আগে ছিল না!

মুখার্জি রা করছেন না। যেন তিনি সুহাসের কথা শুনে মজা উপভোগ করছেন।

আমার যে কী মুশকিল!—সুহাস নিরাশ গলায় বলল।

কী মুশকিল?

চার্লি যে ব্যাজার মুখে বলল, সুহাস প্লিজ! তার তো একজন অনুসরণকারী এমনিতেই জাহাজে উঠে এসেছে, তার উপর যদি খবর পাচার হয়ে যায়, কাপ্তানের ডাইরি থেকে, ধরা পড়ে যাবে না! ধরা পড়লে বাপের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? সে তো একমাত্র আমাকেই সব বলে! বলাটা কি দোষের?

মুখার্জি হাই তুলে বললেন, মোটেই দোষের না।

জানো, আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, কাউকে বলব না। নট এ লিভিং সোল, নো ওয়ান। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড।

সুহাসের চোখে-মুখে হতাশা। মিথ্যা রিপোর্ট নিয়ে না আবার মুখার্জিদা ঝামেলা পাকান!

মুখার্জিদার এতে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হল না। যেন চার্লিই আসামি। চার্লি জল ঘোলা করার জন্য কলিজ সম্পর্কে মিথ্যা খবর রটাবার চক্রান্ত করছে। মুখার্জিদা হেসে ফেললেন। খুব কাবু ছোঁড়া। বললেন, বল্দা আর কারে কয়! যা সত্য তাই কইলাম চাঁদু। বোঝলা?

সুহাস বুঝল, নিজের দেশজ ভাষাটি ব্যবহার করে তাকে মুখার্জিদা আরও উপহাসের পাত্র করে তুলছে। সে রেগেমেগে বের হবার মুখে শুনল, মুখার্জিদা বলছেন, আমিও কথা দিচ্ছি কেউ জানবে না, নো ওয়ান, নট এ লিভিং সোল। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। চার্লি ঠকেছে। চার্লির কোনও দোষ নেই। ডাইরিতে তা-ই আছে। যা পেয়েছে, তাই দিয়েছে। কাপ্তানের চাতুরি হতে পারে অথবা প্রাথমিক খবর যেরকম হয় আর কী! উল্টাপাল্টা। পরে আরও খবর-টবর নিয়ে হয়তো জেনেছেন, যাঃ আমিও শালা বুদ্ধু, তোর কি আর কিছু বলার আছে?

না।

তা হলে যা। কী যে মুশকিলে ফেলে দিস না, বুঝি না। চার্লি জলে পড়ে গেলে তুইও জলে পড়ে যাস। চার্লি খারাপ কিছু করতে পারে না, এমন ধরেই নিয়েছিস। এসব লাইনে থাকলে সবাই সন্দেহভাজন বুঝলি? চোখ তো আমার দুটো। দেখার চেয়ে বোঝার ব্যাপারটা গুরুতর। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার মতো। সিঁড়িটাই খুঁজে পাচ্ছি না। কলিজ জাহাজ নিয়েই বা এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না। আর সত্যি কলিজ জাহাজের খোঁজে তিনি যাচ্ছেনও কি না, ঠিক জানা নেই। সব তো অনুমান-নির্ভর।

সুহাস উপরে উঠে যাচ্ছে। সুহাসের পায়ের শব্দ পেলেন মুখার্জি। যত দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে সুহাস লাফিয়ে উপরে উঠে যায়, তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। যেন ক্লান্ত কোনও বুড়ো মানুষ উপরে উঠে যাচ্ছে। বেচারা খুবই ধন্ধে পড়ে গেছে। ডেরিক যে তার মাথায়ও একদিন ভেঙে পড়বে না, বিশ্বাস কবতে পারছে না।

তিনি লাফিয়ে নীচে নামলেন, তারপর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেন। ঘুমের বারোটা বেজেছে, ঘুম আর আসবে না। সুহাসকে ভয়ের মধ্যে রাখা আদৌ ঠিক হবে না। যাও খবর পাচ্ছিলেন, তাও যাবে। চার্লি না বললে তিনি তো জানতেনই না, টেকসাস অঞ্চলে এক বনভূমিতে চার্লি বড় হয়ে উঠেছে। ঘোড়ায় চড়ে বনভূমির পর বনভূমি পার হয়ে গেছে। বাড়িটা কীরকম? প্রাসাদ, না বাংলো টাইপ? পাহাড়ের মাথায় ওঠার রাস্তা পাকা, না কাঁচা? পাথর ফেলে সিঁড়ির মতো করে নেওয়া হয়নি তো? তিনি তো কিছুই জানেন না। চার্লি তাঁর সঙ্গে কথাও বলে না, কেউ-বা বলে রাজার জাত, অহংকার থাকতেই পারে। ট্রান্সমিশান-রুমে একদিন ঢুকতে গিয়ে বেকুফ, রেডিয়ো অফিসারের গম্ভীর গলা, কী চাই? প্রায় ট্রেসপাসারসের দায়ে অভিযুক্ত হতে যাচ্ছিলেন আর কী।

তিনি পিছিলে উঠে দেখলেন, সুহাস ডেক-এ নেই, মেসরুমে নেই। গ্যালিতে যদি থাকে, সেখানেও নেই। ইঞ্জিন-রুমে ঢুকে গেছে। সেখানে তাকে পাকড়াও করা যায়। তবে মুখার্জির পক্ষে ইঞ্জিন-রুমে ঢোকা উচিত হবে না। তিনি তো ইঞ্জিন-রুমের কেউ না। তার কী কাজ থাকতে পারে তবে ইঞ্জিন-রুমে! সেকেন্ডের ওয়াচ চলছে। নীচে তিনি আছেন। তাঁকে দেখলে অসময়ে সুখানি ইঞ্জিন-রুমে কেন ভাবতেই পারেন।

সাত-পাঁচ ভেবে পিছিলের বেঞ্চিতে বসে থাকলেন মুখার্জি। আর সমুদ্রে কিছু দেখার চেষ্টা কবছেন। এই সমুদ্র নীল হাঙরের সাম্রাজ্য। এদিকটায় সমুদ্রে অনেক চোরাস্রোত আছে, আর অজস্র প্রবাল-প্রাচীর চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট নীচে গাছের শেকড়-বাকড়ের মতো ছড়িয়ে আছে। কত সব বিচিত্র বকমের সামুদ্রিক জীব থেকে গাছপালা সমুদ্রের তলায় ঘন বনাঞ্চল তৈরি করে রেখেছে। উপর থেকে তা বোঝারই উপায় নেই।

তিনি কেন যে ভাবতে ভাবতে সেই অতল সাম্রাজ্যের রহস্যেব মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন বুঝতে পাবছিলেন না। হাজার লক্ষ বছর কি তার চেয়েও বেশি সময় ধরে প্রবাল সঞ্চিত হতে হতে ওইসব প্রাচীর গড়ে উঠছে, ভাঙছে, ডুবছে, সমুদ্রস্রোতে ভেসে যাচ্ছে, বিচিত্র জলজ প্রাণীর বিশাল সাম্রাজ্য সমুদ্রের নীচে যেন লুকিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। প্রাচীরগুলি সরীসৃপের মতো যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। নানা প্রজাতির মাছ, নানা রং তাদের, বর্ণ-ছটায় পাগল হয়ে চক্রাকারে ঘুরছে স্রোতের গভীরে।

আর তখনই কেন যে মনে হল, সুহাসকে আসল কথাটাই বলা হল না।

অবশ্য এখনই বলা ঠিক হবে না, তাও ভাবছিলেন। কারণ বললেই সুহাস ফাঁপরে পড়ে যেতে পারে।

বাথরুমের ভিতর থেকে কেউ যেন উঁকি দিয়ে তাকে দেখল!

কে লোকটা?

তিনি দেখলেন, লতুমিঞা বেসিনে হাত-টাত ধুয়ে এদিকে আসছে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে সে বলছে, বসে আছেন মুখার্জিবাবু! ঘুমোলেন না? মন খারাপ?

তা আজকাল চুপচাপ বসে থাকলেই সবার মনেই এই ধন্ধ দেখা দেয়। ভাল নেই কেউ। মুখার্জিবাবুও বোধহয় ভাল নেই।

তাঁর কি ষষ্ঠেন্দ্রিয় ক্রমে সজাগ হয়ে উঠছে? না হলে লতুমিঞাকে এড়িয়ে যাবেন কেন? আর তখন মনে হল, দড়ি টানার ব্যাপারে অথবা ডেরিক তুলে রাখার ব্যাপারে লতুমিঞার হাত থাকতে পারে এমন

একটা সংশয় তাঁর আছে। যে-ই ডেরিক তুলে রাখুক, একা তুলতে পারেনি। অন্তত দু'জনের দরকার। দু'জনের মধ্যে কখনও-কখনও কেন যেন লতুমিঞার মুখ ভেসে উঠত তিনি বুঝতে পারতেন না।

লতুমিঞা হোস পাইপ ফেলে রেখে এসেছে ডেক-এ। এদিকটায় তার আসারও কথা না, যমুনাবাজুতেই উঠে আসার কথা। ওদিকটাতেই তাদের গ্যালি। কিংবা ফোকশালে দরকার-টরকাব থাকলে যমুনাবাজু দিয়েই ঢোকার কথা, তবু কেন যে তাঁকে দেখে গেল লতুমিঞা, বুঝতে পারলেন না।

তিনি ডাকলেন, চাচা, শোনো।

লতু উঠে এল ফের।

আচমকা বলে ফেললেন, বাটলারের সঙ্গে লাইন আছে তোমার।

লতুর মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

তিনি বললেন, শোনো চাচা, রসদ-ঘর থেকে চুরি-চামারি হচ্ছে। মালের বোতল হাপিশ। কিনার আসছে, পয়সা কামাবার ধান্দা করছ শুনতে পেলাম।

লতুমিঞা বলল, তোবা, তোবা।

সে কান ধরল, জিভ কাটল। বলল, আমার কোনও কসুর নাই। ঝুট বাত। বাটলারের সঙ্গে আমার লাইন নেই, আল্লার কসম।

মুখার্জি সহসা হেসে ফেললেন, লতুমিঞা, এত ঘাবড়ে যাও কেন বলো তো? লাইন থাকলে দোষের কী আছে? আরে সব চিজ মাঙ্গা, বাটলার তো মাল সরাতেই পারে। ফাঁক করে দিতে পারে। দ্বীপের লোকজন নৌকায় এলে কিছু মাল তো রাতের অন্ধকারে হাপিশ করা হয়েই থাকে। তুমি না থাকো, আর কেউ থাকবে।

সে আমি জানি না, কে আছে! আমারে জড়াবেন না।

কেমন বিমর্ষ মুখে লতুমিঞা তাকাল মুখার্জির দিকে। বলল, কিছু শুনছেন?

শুনলাম, ডজনখানেক মালের বোতল হাপিশ। বাটলার হিসাব দিতে পারছে না।

মিথ্যে কথা মুখার্জিবাবু। হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেবে। কার ঘরে ক'বোতল হজম হয়, বাটলারই ভাল জানে। পানি মেশালে ধরে কার সাধ্য!

কাপ্তান-বয় তো মিঞা খবরটা রাখে।

কী খবর?—কশপ আমতা আমতা করে কিছুটা কাশল।

একটা পেটি পাওয়া গেছে, কেউ বোধহয় সরাবার তালে ছিল। ছিল কশপের স্টোর-রুমে, এখন ওটা কাপ্তান-বয়ের ঘরে পাচার।

ধরা পড়েছে কেউ?

না। কাপ্তান-বয়কে বলে দিয়েছি, পেটি তোমার ঘরে কেন? সে জবাব দিতে পারেনি। সে তো বলল, সে কিছু জানে না। তাকে নাকি অপদস্থ করতে চায় কেউ। তারই কারসাজি। তুমি পেছনে নেই তো? মিঞাসাব, তোমার স্টোরে পেটি আসে কোত্থেকে?

আমি কিছু জানি না মুখার্জিবাবু। আল্লার কসম।

মুখার্জি বেশ রগড় বাধিয়ে দিতে পেরেছেন। সুহাসেরও অভিযোগ কাপ্তান-বয়, বাটলারের সঙ্গে এত দোস্তি কেন? দোস্তিটা যে করতে হয়েছে কেন, বুঝবি পরে। মগড়াই খবরটা দিয়েছিল, মুখার্জিবাবু, তাজ্জব বাত! পেটি দেখলাম কশপের স্টোর-রুমে। সেই পেটি সরে গেল কাপ্তান-বয়ের ঘরে। কী করে যায়!

কীসের পেটি?

কীসের পেটি আবার? মালের পেটি, মুখার্জিবাবু।

তাই বুঝি!

এটা যে বাটলারের কাজ বুঝতে অসুবিধা হয় না। রসদ-ঘরের তালাচাবি তার জিম্মায়। কার হিম্মত আছে সরায়! তিনি বাটলারকে ধরেছিলেন, কাপ্তান-বয়কেও ধরেছেন, কশপকেও বাজিয়ে দেখলেন। কাপ্তান-বয়ের মুখ সেই থেকে চুন। জানাজানি হয়ে গেল কী করে? কে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে? কাপ্তান-বয় তাকে দেখলেই তোষামোদ করছে এখন, মুখার্জিবাবু, লাগবে?

না। লাগবে না। আমি খাই না।

লাগলে বলবেন।

সুতরাং লতুমিঞা মাল পাচারের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও কাপ্তান-বয় আছে। একবার মালের পেটি সবিয়েছে যখন, তা আর রসদ-ঘরে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

মগড়া ডেক ধরে হেঁটে আসছে। কনুইতে বালতি-ঝাঁটা। সেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ওবেব্বাস! দূরে কী দেখছে মগড়া।

মুখার্জিরও চোখ গেল। দূরের সমুদ্রে সবুজ একটা গোলাকৃতি কিছু ঘুরছে। সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে উঠছে, কোনও অতিকায় সমুদ্রদানব ঘোরাফেরা করছে যেন। আশ্চর্য, সেই জল কিছুটা প্রাচীরের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। জাহাজে শোরগোল পড়ে গেল। কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। কী ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সবাই প্রায় বোট-ডেকে নয় পিছিলে এসে জড়ো হয়েছে। চার্লিকেও দেখা গেল বোট-ডেকে দূরবিন চোখে। আরে, সুহাসও দাঁড়িয়ে আছে চার্লিব পাশে। বড্ড গা চাটা স্বভাব সুহাসের। তিনি চটে গেলেন। আব তখন সুহাসও কী দেখে ছুটে আসছে পিছিলেব দিকে।

সুহাস চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে, হাঙরের ঝাঁক। উড়ন্ত পাখিগুলি ঝাঁকটাকে তাড়া কবে নিয়ে যাচ্ছে।

পাখিগুলি কত বড আর কী বং বোঝা যায় না। রোদের জন্য চোখ টাটাচ্ছে। এই গরমে সমুদ্রের জলও উষ্ণ হয়ে উঠছে। সুহাস কেবল বলছিল, দানব, বিশাল হাঁ, চার-পাঁচ হাত উঁচুতে লাফিয়ে উড়ন্ত পাখি গিলে জলে ঝপাস করে পড়ছে। পাখিবাও ছাডছে না। জলপাযরা নয়, অতিকায় অ্যালবাট্রসই হবে। পাখিদের সঙ্গে হাঙরের খণ্ডযুদ্ধ। পাখিগুলি ধাবালো ঠোঁটে হাঙরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

নিমেষেই গোলাকার প্রাচীরের মতো সবুজ বৃত্তটি জলে মিশে গেল, পাখিদেব ওড়াউড়িও নেই। শান্ত সমুদ্র। হাঁপাতে হাঁপাতে মুখার্জির পাশে বসে পড়ল সুহাস।

মুখার্জি জানেন, ব্লু-সার্কের রাজত্ব পার হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এতে হুড়োহুড়ির কী থাকতে পারে তিনি বুঝলেন না। সবাই উঠে এসেছে। এমনকী চার্লিও অসুস্থ শরীব নিয়ে বেব হয়ে এসেছে।

চার্লি কিছু বলল তোকে?—মুখার্জিদা ওর ঘাডে হাত রেখে এমন প্রশ্ন কবলেন।

না তো। কী বলবে?

তিনি দেখলেন, অনেকেই ঘোবাঘুরি কবছে পিছিলে। এখানে বলা ঠিক হবে না। কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন।

না, বলছিলাম, হাঙর বুঝলি না খুবই রাক্ষুসে মাছ। উড়ন্ত পাখি জলে লাফিয়ে ধবে ফেলতেই পাবে। পাখিগুলিও কম যায় না, ঠুকরে হাঙরের মাংস খাবলে-খুবলে খেয়েছে।

তাই তো দেখলাম।—সুহাস বলল।

দ্যাখো। দেখে শেখো। নিবীহ পাখিরাও সুযোগ পেলে হাঙরেব মাংস খুবলে খায়। হাঙরের ঝাঁককেও তাড়া করে নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রে যখন ভেসে পড়েছ শিশিরে আব ভয় কী! আমার সঙ্গে এসো সোনা, কথা আছে।

সুহাস বিরক্ত হয়ে বলল, আবার নাটক!

মুখার্জি হেসে দিলেন। বললেন, আয় এদিকে।

তাবপর নীচে নিয়ে গেলেন সুহাসকে। বললেন, আট নম্বর মুখোশটার খোঁজ পাওয়া গেছে।

আট নম্বর মুখোশ!

আরে, যে মুখোশটার হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না। একুশটা মুখোশের একটা কার কাছে আছে, আমরা কি জানতাম!

সুহাস বললে, সকালে তো কিছু বলোনি! এখন বলছ! আট নম্বর মুখোশ কাকে উপহার দিয়েছিল, কিছুই তো ম্যাক লিখে রাখেনি। সব ক'টার লিখে রেখেছে, একটার লেখেনি কেন?

সেই তো রহস্য! কেন লিখে রাখেনি ম্যাক! সব ক'টা মুখোশের নামও আছে, কাকে দিয়েছে তাও লেখা আছে। যেগুলি দেয়নি, দেয়ালে আছে, একটা মুখোশ কম। হিসাবে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা পাওয়া গেছে! তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কী করতে হবে?

ওটা পরে রাত বারোটায় চার্লির পোর্ট-হোলে গিয়ে একবার উঁকি দিতে হবে।

আমি।

হ্যাঁ, কেন। ভয় পাচ্ছিস?

চার্লি পোর্ট-হোলের পরদা খোলা রাখে না।

সে ব্যবস্থা হবে।

সে ব্যবস্থাও করে রেখেছ! না না, আমি পারব না। মুখোশ পরে চার্লির পোর্ট-হোলে কিছুতেই দাঁড়াতে পারব না। রাতে পোর্ট-হোলে এমনিতে গিয়ে দাঁড়ালেও চিৎকার করে উঠতে পারে। আব মুখোশ পরে গেলে কী যে হবে, না ভাবতে পারছি না। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না।

না গেলে তো বোঝা যাবে না। হিমশীতল ঠান্ডা পাথরের চোখ আছে কি না মুখোশে, ওটা না পবে গেলে তো বোঝা যাবে না।

মুখোশটা নিয়ে সুহাস সত্যি ঘোরে পড়ে গেল। সে রাজি হয়নি। তার পক্ষে পোর্ট-হোলে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর মুখোশটা মুখার্জিদা পেলেন কী করে। কোথায় আছে? মুখার্জিদার লকারে। তিনি নিজেই কি তবে অনুসরণকারী? এ তো আর এক রহস্য! চার্লির কেবিনের পাশে শেষ রাতে হাঁটাহাঁটি করেন কেন। একবার তো ধরা পড়ে গেলেন। অথচ তখন এমন অভিনয় যে তার কোনও সংশয়ই ছিল না মুখার্জিদার উপর। তিনি মাপজোক করে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কতটা দূরত্বে দাঁড়ালে পোর্ট-হোলের বরাবর মুখ ভেসে ওঠে। অনুসরণকারী লম্বা না বেঁটে না মাঝারি মাপের, সেই রাতে তাও নাকি তাঁর ইচ্ছা ছিল দেখার। ঝড়ের রাতে সুযোগ বুঝেই প্রাণ হাতে করে কাজটা সেরেছেন।

কিন্তু এ কেমন কথা, মুখোশটা কার, তিনি তা জানেন না। কোথায় আছে তাও 'তিনি মুখ ফুটে বলছেন না। আছে তো দেখাও। তাও দেখালেন না। বললেন, আছে, যথাসময়ে দেওয়া হবে। তুই রাজি না হলে মুশকিল। বলে তিনি চিবুক চুলকাতে থাকলেন। সহ্য হয়। তুমি নিজেই আসলে অনুসরণকারী? তোমাকে চিনতে বাকি আছে! গুজব ছড়াচ্ছ বেহুঁশ রমণীকে পর্যন্ত ধর্ষণ করতে পারো, তোমার মুখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে! এখন সাধুপুরুষ! আমার সাধুপুরুষ রে! চার্লিকে বলে দেওয়াই ভাল— জানো, অনুসরণকারীর খোঁজ পাওয়া গেছে। তোমাকে ভয় দেখিয়ে জাহাজ-ছাড়া করতে চায়। পাবে, আহামদ বাটলারকে জাহাজ-ছাড়া করে ছাড়ল না! তুমি কি চার্লি বিশ্বাস করতে পারো, তিন নম্বব কোয়ার্টার-মাস্টারের ষড়যন্ত্র? বুঝিও না বাপু, জেদের মাত্রা কেন শেষে এতদূর গড়ায়!

জিন-পরি বিশ্বাস করে না আহামদ। করতে নাই পারে। তাই বলে এভাবে পিছু লাগা! আহামদ বাটলাব ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেই দেখতে পায় সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে কোনও নারী যেন চিত হয়ে পড়ে আছে বাংকে। সে ত্রাসে ছুটে বের হয়ে গেলে অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি। তিনি ঢুকে যান। চাদব, কম্বল, বিছানা লন্ডভন্ড করে অদৃশ্য হয়ে যান। লোকজন ঢুকে কিছু দেখতে পায় না। কোথায় সাদা চাদরে ঢাকা মরা মানুষ? আর আহামদ বাটলার তোমারও-বলিহারি যাই, চাদরটা সরিয়ে দেখবে না, সত্যি না ফলস্ মেরে গেছে কেউ! বালিশ কম্বল সাজিয়ে মরা মানুষের ছলনা করে গেছে কেউ!

ছাল-চামড়া তোলা গোরু-ভেড়ার কবন্ধ দেখতে দেখতে শেষে তুমি বরফ-ঘরেও মেয়েমানুষেব লাশ দেখে ফেললে! আতঙ্কে কী না হয়! বুদ্ধি-বিবেচনা কাজ করবে না। ভোঁতা মেরে গেলে!

না, কিছু ভাল লাগছে না। সে উপরে উঠে গেল। তেলের টব, সিরিশ, জুট সব জমা দিল কশপেব স্টোরে। পাঁচটায় ছুটি। কাল জাহাজ ধরছে। সব আনন্দ মাটি। ডাঙায় নেমে ঘোরাঘুরির আনন্দও মাথায় উঠেছে। সে বাথরুমে ঢুকে স্নান-টান সেরে নীচে নেমে গেল। শুয়ে পড়েছে বাংকে। তারপরই মনে হল, চার্লি তাকে যেতে বলেছে। চার্লি কত সরল অকপট, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে, তাও এরা জানে না।

ইউ আর সো জেন্টল। চার্লি তার গা ছুঁয়ে যখন কথাটা বলে, গা তার শির শির করে। সেই চার্লিকে নিয়ে উপহাস! সে নাকি চার্লির পোষা কুকুর! খারাপ লাগে না?

অধীর তো খেপে গিয়ে রাস্তা রুখে দাঁড়িয়েছিল, চাকর-বাকরের মতো চার্লির সঙ্গে নেমে যাস. লজ্জা করে না!

না, লজ্জা করে না।

সুরঞ্জন তো একদিন কোন বন্দরে যেন বলেই ফেলল, জানিস সবাই তোকে চার্লির পোষা কুকুর ছাড়া কিছু ভাবে না।

আর কিছু না ভাবলেই হল। সুহাসও ছেড়ে কথা বলেনি।

আরে, পোষা কুকুর হলে গায়ে হাত রেখে বলতে পারে, ইয়োর টাচ ইজ সো জেন্টেল আই ফিল ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট, অ্যাজ ইফ টাইম হ্যাড স্টপড, অ্যান্ড অল দ্য ডার্কনেস ইজ গন।

চার্লির এমন সুন্দর কথাবার্তায় তার যে কী হয়, ওরা কী করে বুঝবে!

চার্লি কত ভদ্র এরা মেশে না বলে জানে না। বংশীদার খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেয়। বংশীদা ডিপ্রেশানে ভুগছে তাও জানে। বংশীদার কথা উঠলে বলবে, বেচাবা। সদ্য বিয়ে করে সফরে কেউ বের হয়।

অদ্ভুত সব কথাও বলে চার্লি, জানো তো, বিয়েটা হল ঈশ্বরের পবিত্র সিদ্ধান্ত। বিয়েটা হল, সিং এ নিউ সং টু দ্য লর্ড। সিং ইট এভরি হোয়ার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্লড। সিং আউট হিজ প্রেইজেস।

এমন ঈশ্বর-বন্দনা যেন নিষ্পাপ চার্লির মুখেই মানায়। সবসময় চার্লির সব কথার অর্থও সে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না কী বলতে চায় চার্লি। তবু বোঝে, তার গা ছুঁয়ে দিলে চার্লি টের পায়, সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

এসব কথার অর্থ কি বোঝে অধীর? বুঝলে কখনও বলতে পাবে সুরঞ্জন, লজ্জা করে না, তু করলেই ছুটে যাস। তুই কী রে।

চার্লি তার মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ পায়, বলে কী লাভ! বললেই মজা করতে পাবে। উপহাসও।

কী বললি, বিয়েটা হল সিং এ নিউ সং টু দ্য লর্ড।

হ্যাঁ, তাই তো।

এত টুকুস টুকুস কথা কে শেখায় রে?

কে আবার শেখাবে? আমি বুঝি না মনে করো? বংশীদার বিয়ে করেই জাহাজে উঠে আসা উচিত হয়নি। বউটার কষ্ট, বংশীদার কষ্ট। চার্লি ঠিক বোঝে। বিয়েটা কত পবিত্র ব্যাপার চার্লি না বললে টেরই পেতাম না। ঈশ্বরের উপর পরম বিশ্বাস, সে তো তার অনুসরণকারীকেও ভয় পায় না। না হলে বলতে পাবে, গড হ্যাজ মেড এভরিথিং ফর হিজ পারপাসেস, ইভিন দ্য উইকেড ফর পানিশমেন্ট।

কখন যে অধীর-সুরঞ্জনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কীভাবে যে চার্লির প্রসঙ্গ চলে আসে, সে বুঝতে পারে না।

আবার চার্লি।

শোন সুহাস, চার্লিকে বলবি, হিউম্যান বিইংস আর অ্যানিমেল, জাস্ট দ্য সেম অ্যাজ এ ডগ অব এ কাউ। বংশীকে জোরজার করে হলেও কিনারায় নামাতে হবে। সর্বরোগহর বিষহবি বুঝলি! ওকে এ ছাড়া নিরাময় করা যাবে না। কী সব কথা।

গরম পড়ায় ফোকশালে থাকা যাচ্ছিল না। সে চুপচাপ শুয়ে থাকায় অধীর-কেষ্টরা ফাঁপবে পড়ে গেছে।

তারা তো জানে না, মুখার্জিদা কী বলে গেছেন! মুখোশটা পরে গভীর রাতে একবাব উঁকি দিতে হবে চার্লির পোর্ট-হোলে। সে সোজা বলেছে, যেতে পারবে না, উঁকি দিলে নিজেই সে অনুসরণকারী হয়ে যাবে। মুখার্জিদার কী মতলব কে জানে!

অধীর, কেষ্ট তাকে মনমরা দেখেই তাতাতে চেয়েছিল। সে কারও কথা আমল দেয়নি। চার্লিকে নিয়ে ঠাট্টা করায় সে আরও খেপে গেছে।

এমন জঘন্য চিন্তা-ভাবনা চার্লির মাথাতেই আসবে না। হিউম্যান বিইংস আর অ্যানিমেল! শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। চার্লি কত ভাল, কী করে বোঝাবে! চার্লিকে কেউ খাটো করলে সে কষ্ট পায়। ধর্মভীরু শান্ত স্বভাবের চার্লি। তা তো হবেই, মা নেই, শৈশবে প্রকৃতি বন জঙ্গল পাহাড়ে একা বড় হয়ে উঠেছে।

গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি আর পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটি ছাড়া তার তো কেউ আর সঙ্গী ছিল না। সমাধিক্ষেত্রের পাশেই তাদের নিজস্ব গির্জা। চারপাশে যতদূর চোখ যায় রেড মেপলের জঙ্গল। দূরে পাহাড়শীর্ষ কখনও বরফে মাখামাখি। চার্লি তো ঈশ্বরের মহিমা বেশি টের পাবেই। আর ওই স্টপ অফের বুড়ো মানুষটা। বুড়ো মানুষটাই হয়তো তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলত। বুড়ো মানুষেরা তো ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি থাকেন।

না হলে চার্লি বলতে পারে, দ্য লর্ড লাভস দোজ হু হেট ইভিল। হি প্রটেকটস দ্য লিভস অফ হিজ পিপল অ্যান্ড রেসকিউজ ফ্রম দ্য উইকেড।

চার্লির এই আত্মবিশ্বাসই সম্বল। বোট-ডেকে অপদেবতার উপদ্রব জেনেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। পোর্ট-হোলে হিমশীতল পাথরের মতো ঠান্ডা চোখ দেখেও অবিচল থাকতে পারে। না হলে চার্লিও আহামদ বাটলারের মতো পাগল হয়ে যেত। জাহাজ ছেড়ে পালাত। এত উপদ্রবের পরও চার্লি সকালে স্বাভাবিক। বরং চার্লির কথা শুনে সেই ঘাবড়ে যেত, আবার কে পোর্ট-হোলে ঘোরাঘুরি করছে, হাঁটাহাঁটি করছে।

সে ঘাবড়ে গেলে চার্লি হেসে বলত, হি প্রটেকটস। ভয় কী!

এটা কত বড় সাহসের জায়গা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল।

চার্লির জন্য, না ঈশ্বরের মহিমা টের পেয়ে, সে বুঝতে পারল না।

কোথায় যাচ্ছিস?

সে ওপরে ওঠার সময় মুখার্জিদা সিঁড়িতে দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন।

উপরে।

উপরে কোথায়?

চার্লির কাছে।

এখন যাবি না, আয়।

না, যাব। ছাড়ো।

পাগলামি করিস না। সোনা আমার লক্ষ্মী ছেলে। মাথা গরম করলে চলে!

ছাড়ো হাত। আমি পোষা কুকুর!

কে বলেছে, তুই পোষা কুকুর!

সবাই তো বলছে।

কার পোষা কুকুর?

জানি না। হাত ছাড়ো বলছি।

পাগলামি করিস না।

মুখার্জিদা ওর হাত কিছুতেই ছাড়ছেন না। যেন এখন কোথাও গেলেই সব তার ভন্ডুল হয়ে যাবে। সে বলল, আমি পারব না বলে দিলাম।

ঠিক আছে তোকে যেতে হবে না। আয় আমার সঙ্গে। মুখোশটা দেখবি বলেছিলি!

বলেই সতর্ক চোখে চারপাশে তাকালেন মুখার্জিদা। সে আর কী করে! মুখোশটা দেখারও আগ্রহ আছে তার। সে মুখার্জিদার কেবিনে ঢুকে বলল, কোথায় পেলে?

কী কোথায় পেলাম?

মুখার্জি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, পাব। আজকেই পাবার কথা। মুখোশটার কথা বলছিস তো?

মুখার্জিদার কথার কোনও খেই পাচ্ছে না সুহাস। এই বললেন, মুখোশটা দেখবি বলছিলি, আয় আমার সঙ্গে। আর এক্ষুনি বলছেন, কী কোথায় পেলাম? মুখোশটার কথা বলছিস?

হঠাৎ সুহাস খেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, আমাকে নিয়ে আর কত তামাশা করবে!

মুখার্জি দ্রুত উঠে গেলেন। সুহাসের মুখ চাপা দিলেন হাতে। জোরজার করে ধরে ফেললেন, যেন না হলে সে এক্ষুনি দরজা খুলে ছুটে পালাবে।

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, মাথা ঠান্ডা রাখ। অযথা উত্তেজিত হোস না। কে কোথায় আছে জানি

না। তুই বুঝতে পারছিস না কত বড় বিপদ আমাদের সামনে।

সুহাসের বিপদ না বলে, আজ প্রথম বললেন, আমাদের বিপদ। এতে সুহাস কিছুটা যেন দমে গেল। সে ঘামছিল। উত্তেজনায় মুখ-চোখ লাল। হাওয়া-পাইপ সুহাসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কেলেঙ্কারি করতে যাস না। আমাকে তুই অবিশ্বাস করছিস, আমি বুঝি। কিন্তু হাতের কাছে কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না।

সে বলল, তুমি অযথা মুখোশ নিয়ে পড়েছ। লোকটা মুখোশ পরে চার্লিকে তাড়া করবে কেন বুঝি না। সে তো আবছা অন্ধকারে থাকে। তার চুল সাদা, দাড়ি গোঁফ আছে, অস্পষ্ট অন্ধকারে এমন টের পেয়েছে চার্লি। মুখোশ পরার কী দরকার। এমনিতেই অনুসরণ করতে পারে। মুখোশ পরার দরকার হবে কেন?

তা অবশ্য জানি না। মগড়া বলেছে, সে জানে কোথায় আছে মুখোশটা। আমাকে দেখিয়ে আবার জায়গারটা জায়গায় রেখে দিয়েছে। কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলছে না। বলেছে, সে আমাকে দিতে পারে, তবে ওটা আবার ওকে ফেরত দিতে হবে।

সুহাস কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, মগড়ার এত সাহস। চার্লির ঘরে তো সকালে বাথরুম পরিষ্কার কবতে মগডা এমনিতেই যায়। তার দরকার কি পোর্ট-হোলে উঁকি দেবার? চার্লি কেবিনে কী কবছে না করছে এত আগ্রহ কেন তার! তুমি শেষে আমাকে মগড়া হতে বলছ!

মুখার্জিদা কথা বলছেন না! শুধু ঠোঁটে আঙুল রেখে সতর্ক করে দিচ্ছেন, আস্তে। সে যতটা পারছে নিম্নস্বরে কথা বলছে ঠিক, তবে উত্তেজনায় মাঝে মাঝে নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে। কেবল বলছে, শেষে মগড়াকে লেলিয়ে দিলে!

তিনি যেন কারও আসার প্রত্যাশায় আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও সূর্য ডোবেনি, পোর্ট-হোলে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। তবে ঘরে আলো জ্বালিয়ে না রাখলে ঘর অন্ধকার। বারবার সিড়িতে কাবও পায়ের শব্দ পেলেই দরজা খুলে তিনি উঁকি দিচ্ছেন, তারপর ফের হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে। তার কথার কোনও জবাব দিচ্ছেন না।

সুহাস টের পাচ্ছে, মুখার্জিদা অস্থির হয়ে পড়েছেন। হাতের মুঠো শক্ত হচ্ছে, আবার আলগা হচ্ছে, সব তার অজান্তে। তাঁর কোনও গূঢ় অভিসন্ধি নেই তো? সুহাসের যে কী হয়, মাঝে মাঝে মুখার্জিদাকেই ভয় পেতে শুরু করে। সে এই অবস্থায় কোনও আর প্রশ্ন করতেও সাহস পাচ্ছে না। চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছে। চার্লি মেয়ে না ছেলে, এই রহস্য এত গোলমাল পাকিয়ে ফেলতে পারে সে ভাবতেই পারে না। যেন এই রহস্যটা জানাজানি হয়ে যাওয়া মারাত্মক কোনও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার তো মনে হয়নি কখনও, তবে খুবই ঢিলেঢালা শক্ত টুইলের শার্ট পরে, আর সবসময় কেমন অস্বস্তির মধ্যে যেন চার্লি চলাফেরা করে। জাহাজেই এটা হয়। যেন শরীরে তার জামা এঁটে বসে যাচ্ছে, এমন আতঙ্ক। জামা টেনে ঢিলেঢালা বাখার জন্য, কিছু মুদ্রাদোষ গডে উঠেছে চার্লির। হাঁটা-চলার সময় এটা সে বেশি লক্ষ করেছে। বয়লার সুট, কিংবা যাই পরে বের হোক চার্লি, তাকে ঠিক যেন মানাচ্ছে না, সে কলার টানছে, জামার হাতা টেনে দিচ্ছে, বগলের দু'দিকের জামা টানছে, প্যান্ট টানছে, এগুলি যে কোনও অস্বস্তি থেকে গড়ে উঠতে পারে তার মনেই হয়নি। অথচ চার্লি তো সোজা বলে দিয়েছে, মি বয়। তারপর আর কী কথা থাকতে পারে? তারপরও মুখার্জিদারা ভাবেন কী করে যে, চার্লি মেয়ে, ছেলে নয়।

আর তখনই সহসা কে নেমে এল সিঁড়ি ধরে। মুখার্জিদা দ্রুত উঠে গেলেন। দরজা সামান্য ফাঁক করে যেমন দেখছিলেন এতক্ষণ, তেমনি দরজা সামান্য ফাঁক করতেই একটা হাত এগিয়ে এল। কাগজে মোড়া কিছু। এবং দ্রুত ওটা দিয়ে যেন কেউ অদৃশ্য হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে যে দেখবে, তারও সময় পেল না। মুখার্জিদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। কাগজের মোড়কের ভিতর কী আছে জানার যেন বিন্দুমাত্র তাঁর স্পৃহা নেই। মোড়কটা তাঁর কোলের মধ্যে পড়ে আছে।

সুহাস প্রকৃতই বিধ্বস্ত। কে দিল! কার হাত? মুখার্জিদা কিছু বলছেন না। সে কথা বলতে গিয়ে

দেখল, গলা বসে গেছে কেমন। সে গলা খাঁকারি দিল। গলা খুস খুস করছে। যেন গলার কফ আটকে আছে। কোনওরকমে গলা পরিষ্কার করে বলল, কে দিয়ে গেল?

জানি না। দেখতে হয় দ্যাখ। এক্ষুনি ওটা আবার ফেরত নেবে।

হাতে নিয়ে দেখতেও কেমন আতঙ্ক। কী দেখতে পাবে কে জানে।

সে কোনওরকমে হাত বাড়াল।

হাত তাঁর কাঁপছে।

মুখার্জিদা বললেন, বড্ড নার্ভাস দেখছি।

তিনি নিজেই কাগজের মোড়কটা খুলে দেখালেন। সুহাস পাশের বাংকে উবু হয়ে দেখতে গেলে বললেন, পাশে বো'স। দেখেছিস কেমন ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মুখ! এই দ্যাখ, হাতের কী নিপুণ কাজ। মাথার দিকে দুটো কব্জা লাগানো আছে। বাবরি চুল। পরে দেখাচ্ছি।

বলে ভাঁজ করা মুখোশের সামনের দিকটা মুখে এবং পেছনের দিকটা মাথার পেছনে ফেলে তার দিকে তাকাতে থাকলেন। ঈশ্বরের পুত্র কে বলবে। চোখদুটো যেন শীতল হয়ে গেছে। তার গা শির শির করতে থাকল। মুখার্জিদাকে কেন যে একটা দানবের মতো দেখাচ্ছে!

মুখার্জি মুখোশটা পরেই কথা বলতে থাকলেন, চার্লিকে গিয়ে দেখানো দরকার এটাই কি না! চার্লিব পোর্ট-হোলে উঁকি দিলে টের পাওয়া যেত এই মুখোশটা দেখেই সে ভয় পেয়েছিল কি না! এমনও তো হতে পারে ঘোরে পড়ে কিছু দেখেছে ও! এমন তো হতে পারে, জাহাজে ওঠার সময়ই চার্লির কোনও আতঙ্ক ছিল। কোনও বুড়ো মানুষের আতঙ্ক।

সুরঞ্জন একা বোট-ডেকে অপেক্ষা করছে।

গভীর রাত। পরিষ্কার আকাশ। অজস্র নক্ষত্রের ওড়াউড়ি আকাশে। পৃথিবী কেমন নির্জন হয়ে আছে। সমুদ্র আপন মহিমায় বিরাজ করছে চারপাশে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব কিছু।

জ্যোৎস্নার এহেন দৃশ্য দেখতে কার না ভাল লাগে! সুরঞ্জনেরও ভাল লেগে গিয়েছিল। সে ভুলেই গেছে মুখার্জিদার জন্য তার এখানে অপেক্ষা করার কথা। রেলিং-এ ঝুঁকে সে সিগারেট খাচ্ছিল।

তারপর কেন যে মনে হল, এই চন্দ্রকিরণ জাহাজের সঙ্গে রওনা হয়েছে ডাঙার দিকে। কে একা পড়ে থাকতে পারে সফেন সমুদ্রে। কার ভাল লাগার কথা? জাহাজ যেখানে যাবে চন্দ্রকিরণও যাবে সেখানে।

তা হলে চলো, আমরা তো ডাঙায় যাচ্ছি, তুমিও না হয় সঙ্গে থাকবে। না না, কোনও অসুবিধা হবে না। তারপরই সুরঞ্জন হেসে ফেলল। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় জ্যোৎস্না এবং সমুদ্রও যে বন্ধু হয়ে যায় সে টের পেল।

চিমনির আড়ালে সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেটটা সমুদ্রে টোকা মেরে উড়িয়ে দিল। তাকে রোজই এভাবে আজকাল অপেক্ষা করতে হয়। আর-একটা সিগারেটও শেষ। এখনও মুখার্জিদা কেন যে আসছেন না!

সবাই জানে সুরঞ্জনের বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই মুখার্জিদার সঙ্গে। একসঙ্গে এজন্য মধ্যরাতে ডেকেও উঠে আসে না তারা। আগে-পরে করতেই হয়, কে আবার দেখে ফেলবে। দেখে বলবে, বাজে কথা, দু'জনকেই তো দেখলাম পাশাপাশি ডেক-এ হেঁটে যাচ্ছেন কিংবা পিছিলেও দেখা গেছে। কেউ তো কাউকে এড়িয়ে চলছে না।

এই ক্যামোফ্লেজ কাঁহাতক রক্ষা করা যাবে তাও সে জানে না। কখন না সামনা-সামনি 'মুখার্জিদা শোনো' বলে ডেকে ওঠে। সতর্ক থাকতেই হয়। হয় মুখার্জিদা এসে এখানটায় অপেক্ষা করেন, নয় সে। অন্তত দু'জনের দেখা না হওয়া পর্যন্ত একজনকে অপেক্ষা করতেই হয়।

শুধু পরিতে উঠে আসার সময় কে আগে যাচ্ছে, দরজার টোকা শুনলে টের পাওয়া যায়।

আজও ভেবেছে, মুখার্জিদা হয়তো আগেই উপরে উঠে গেছেন। মধ্যরাতের জাহাজ বড় বেশি

একা। ডেক-এ কিংবা বোট-ডেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি করলেই টের পাওয়া যায়, কেউ কোথাও নড়ানড়ি করছে। তার এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করারও হেতু থাকতে পারে না। কারও চোখে পড়লে, প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে, এত রাতে বয়লার-রুম থেকে উঠে আসা কেন। কী দরকার এখানটায়?

তাদের বসার জায়গা তিন নম্বর বোটের পাশটাতে। সে ইচ্ছে করলে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু মুশকিল, এতই আড়াল-আবডাল যে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। কেউ দেখে ফেললে হইচই শুরু হয়ে যেতে পারে। ওখানটায় বসে এত রাতে কী করছিলে!

হঠাৎ তার ঘাড়ে একটা হাত চেপে বসল। সে খুব দ্রুত সরে দাঁড়াতে দেখল, মুখার্জিদা।

ঘাবড়ে গেছিলি।

হঠাৎ যমুনাবাজু ধরে উঠে এলে? আমি তো গঙ্গাবাজুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা কবছি।

দু'জনেই হামাগুড়ি দিয়ে বোটের আড়ালে চলে গেল। মুখার্জিদা চিমনির আড়ালে বোধহয় কোনও কথা বলতে চান না।

হামাগুড়ি দেবার সময়ই সুরঞ্জন বলল, খবর কী?

খবর ভাল না।

কাল যে বললে জাহাজের অন্তত একটা রহস্যের কিনারা করা যাবে মনে হচ্ছে। রহস্যটা টেব পেলে পথ পরিষ্কার। সিঁড়িটা খুঁজে পাবে। খুব তো খুশি ছিলে। শিসও দিলে। এখন বলছ, খবর ভাল না।

কী করে খবর ভাল হবে বল। অর্বাচীন নির্বোধ হলে আমি কী কবতে পারি?

বলে তিনি হাঁটুর কাছে প্যান্ট টেনে একটু সহজ হয়ে বসতে চাইলেন। অর্বাচীন নির্বোধ না হলে বলে, আর ইউ গার্ল? ওকে কি আমি বলেছি, চার্লি বয় না গার্ল খোঁজ করতে। নিজেব গলায় ফাঁস পরতে চাইলে আমি কী করব। এটাই তো জাহাজের সবচেয়ে বড় রহস্য। দুম কবে বলে ফেললি, আর ইউ গার্ল। বল, রাগ হয় না। বললেই চার্লি স্বীকার করবে শি ইজ এ গার্ল। কখনও করে। এখন তো মনে হচ্ছে কিছুই করতে পারব না। চার্লি সতর্ক হয়ে যাবে না। কিংবা চার্লিকে যিনিই বাধ্য করেছেন ছেলের পোশাকে থাকতে, তিনি কি খবরটা পেয়ে যাবেন না?

সুরঞ্জন হাঁটুর উপর হাত রেখে সামান্য কাত হয়ে শুল। কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে শুনছে। সে মুখার্জিদার কথাও বুঝতে পারছে না। চার্লি মেয়ে না ছেলে প্রশ্নটা আবার মাথায় পেরেক পুঁতে দিচ্ছে কেন তাঁর। এই না কলিজ জাহাজের রহস্যটা খুব জটিল মনে হয়েছে। তা ছাড়া ছেলের পোশাকে থাকাটাও অস্বাভাবিক ভাবছে কেন? জাহাজে শুধু একজন মেয়ে আর সব দামড়া, বিশ-বাইশ মাসে সব অমানুষ, অ্যানিমেল টের পেলে বন্য হয়ে উঠবে না। ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতি জাহাজে কত তুমি নিজেই জানো। সেই আতঙ্কেও ছেলে সাজিয়ে রাখতে পারে। এত সুন্দর দেখতে, কী ধাবালো চোখ-মুখ, আর পাতলা, যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় পাখি। হাঙরেরা টের পেলে পাখির ডানা ভেঙে দেবে সহজ কথা। তছনছ করে দেবে। ছিড়ে-ফুঁড়ে খেতে পারে।

সুরঞ্জন বলল, না, কিছু বুঝছি না! খবর ভাল না বলছ কেন? মগড়া যায়নি?

গেছে।

সুহাস দেখল?

দেখেছে।

কিছু বলল?

মগড়াকে সন্দেহ করছে।

সুরঞ্জন উঠে বসল।

মগড়াকে। কী যে বলো। এত বুদ্ধু। মগড়ার সাহস হবে!

সাহস হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু মগড়া তো বলছে না, কার কাছে মুখোশটা আছে! ও তো বলছে না, মুখোশটা সে পায় কোথায়। রাখে কোথায়। কিছু বললেই এক কথা, নিখোঁজ মুখোশটা নিয়ে জলে পড়ে গেছিলে, তাই দেখালাম। জাহাজেই আছে। জাহাজে থাক না থাক বড় কথা নয়। আসলে মুখোশটা পরে চার্লিকে অনুসরণ করবে কেন?

তোমার কী মনে হয়?

আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা ঠিক চার্লি মেয়ে না ছেলে যদি কেউ প্রথম টের পায়, তবে সে মগড়া। বাথরুম সাফসোফ আর কে করে? গঙ্গাবাজুর কেবিনগুলিতে সে-ই ভোরে কড়া নাড়তে পারে। চার্লি গঙ্গাবাজুতেই থাকে। মগড়া টের পেতেই পারে। ডেক-টোপাস ধরিয়া ওদিকে যায় না। বাথরুমে চার্লির অসতর্ক মুহূর্তে সে কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

সেটা কী?— সুরঞ্জন আর-একটা সিগারেট ধরাবার সময় প্রশ্ন করল।

কী, আমি জানি না। চেপে ধরতে হবে। কোথায় ধরা যায় বল তো? চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিলে উপায় আছে! সে বলবে না, মুখার্জিবাবু বুলছে, আমি ছোটাসাহেবের কেবিনে টুঁড়ে বেড়াচ্ছি! তিনি সাব না মেমসাব—আচ্ছা, আজব বাত বুলছে। হামার কি আর কৈ কামওম নেই!

সুরঞ্জন কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

মুখার্জি বললেন, থেমে গেলি কেন?

না বলছিলাম, এ বয়সে তো মেয়েদের পাছা ভারী হয়। বুক ঢেকেঢুকে রাখাও তো সহজ নয়।

পাছা ভারী না পাতলা, আমি হাত দিয়ে দেখেছি, না তুই! যা ঢোলা প্যান্ট-শার্ট পরে, পাশবালিশের খোল, মনে হয় গায়ে বস্তা চাপিয়ে রেখেছে। কার বোঝার সাধ্য আছে পাছা ভারী না পাতলা? কে সন্দেহ করবে বুকে দুটো কুসুমকলি ফুটছে?

ফুটছে মানে?

ফুটছে মানে, ফুটে উঠছে।

কত দিন এটা সম্ভব? তা ছাড়া ধরো এই যে অসুস্থ, যদি ডাক্তার দেখায় সেখানে তো কারও কোনও জারিজুরি থাকবে না। ধরা পড়বেই।

মুখার্জির মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাবল সুরঞ্জন ঠিকই বলেছে। কাপ্তান-বয় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। ইতিমধ্যেই আতঙ্কে পড়ে গিয়ে কিছু পাচার করে ফেলেছে। একটা ম্যাপ এবং কিছু বই। কিছু চিঠিপত্র। দুটো-একটা রেখে বাকি সব ফেরত দিয়েছে। কাপ্তান-বয়কে বুঝতেই দেয়নি, সব তিনি ফেরত দেননি। এখন সে-ই তাঁর বড় আড়কাঠি। সে-ই পারবে। কাপ্তান ঘরে না থাকলেও সে যখন-তখন ঢুকতে পারে কেবিনে। কাপ্তানের একমাত্র অনুগত এবং বিশ্বস্ত। মানুষটি যে খুব খারাপ তাও না। ভাল মানুষই বলা চলে। তবে কিছুটা অর্থলিপ্সা আছে। তাতেই ফেরে পড়ে গেল। পাছে মুখার্জিবাবু থার্ড মেটের কানে লাগিয়ে দেয়, রসদ-ঘর থেকে পেটি পাচার, সেই আতঙ্কে জো-হুজুর হয়ে আছে। এখন তো আরও বেশি হাতের মুঠোয়। আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়েও দিয়েছেন। যাবে কোথায়। এই যে, বলে চিঠিপত্র মেলে ধরলেই চুল খাড়া হয়ে যাবে। কাপ্তানের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কার মারফত পাচার হল! আর এক সংশয় এবং কাপ্তান-বয় সেই ভয়ে কাবু।

শোন, যদি জাহাজে ডাক্তার উঠে আসেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু খবর-টবর চেষ্টা করলে পেয়ে যেতেও পারি। তবে কতটা সুবিধে হবে তাতে বুঝি না। প্রেসক্রিপসান, ওষুধ, এ থেকেও ধরা যেতে পারে। অবশ্য ধরা যাবেই এমন কথা নেই। যিনি এত চতুর তাঁর পক্ষে, কখনই ঢিলেঢালা কাজ করা সম্ভব নয়। তোর কাজ, জাহাজ লাগলে কিনারায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়া। দ্বীপটায় জেটি নেই, জাহাজ বয়াতেই বাঁধা থাকবে। নৌকা ছাড়া পারাপারের আর কোনও সুযোগ নেই। জায়গাটা তোর প্রথমে চিনে রাখা দরকার। মানুষজন বলতে দ্বীপের কিছু বাসিন্দা। মাছের কিছু আড়ত আছে। কিছু স্টিমার লঞ্চ ভাড়া খাটে। আর সব নৌকা, উকন গাছের কাঠে তৈরি। আমাদের কভুই গাছের মতো দেখতে গাছগুলি। হয়তো কভুই গাছই, এরা উকন বলে। খুব শক্ত কাঠ। কাঠের গোলা আছে অনেকগুলো। পাকা রাস্তা। সমুদ্রটাকে ঘিরে রেখেছে। কোম্পানির নিজস্ব শহর এলাকায় রাস্তাটা ঢুকে গেছে। জীবিকা বলতে মাছ ধরা, না হয় ফসফেট কোম্পানির কুলি-কামিনের কাজ। মানুষগুলো দেখতে বেঁটেখাটো, তামাটে রং। ভারতীয়দের সঙ্গে চেহারায় খুব মিল। তবে কাফ্রিদের মতো লোকজনও আছে। চাষ-আবাদের অভ্যাস বিশেষ নেই।

কী খায় তবে?

পাশের দ্বীপগুলোতে চাষ-আবাদ হয়তো হয়, দু'-চার মাইল, কিংবা পাঁচ দশ কি আরও বেশি দূরে দূরে অজস্র দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে আমিও সব ভাল জানি না। জাহাজ ভিড়লেই নেমে যাবি।

নামলেই টের পাবি, নানা লোক কানের কাছে ফিসফাস কথা বলছে। জলদস্যুদের কথাও বলবে। তাদেরই বংশধর তারা ঘরে নিয়ে যেতে চাইবে। জলদস্যুদের বংশলিপি থেকে কিছু নথিপত্রও গোপনে দেখাতে পারে। যদি প্রলুব্ধ করা যায়! কী সব হিজিবিজি লেখা, একটা বর্ণও উদ্ধার করা সম্ভব না, কী ভাষা তাও জানা যায় না। ঘুরতে গিয়ে গুপ্তধনের লোভে এ ধরনের চক্রে পড়ে না যাওয়াই উচিত। জান-মান নিয়ে টানাটানি, সুযোগ পেলেই হল।

হেঁটেই ঘোরাঘুরি করা যাবে?

হেঁটেই পারবি। বন্দর এলাকাতে কিছু মানুষজনের ঘরবাড়ি, হোটেল। সাইকেল ভাড়া নিতে পারবি। টাট্টু ঘোড়ারও চল আছে। পয়সা বেশি খরচ করতে পারলে আরবি ঘোড়াও মিলতে পারে। দ্বীপের ভিতরে ঢুকে যাবার মুখে কিছু আস্তাবল আছে। সাইকেল চালাতে জানিস?

জানব না কেন?

জানলে ভাল। সাইকেলে কিছু অসুবিধাও আছে। দ্বীপের বন্দর এলাকাতেই সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। বেশি দুর যেতে পারবি না। ঝোপজঙ্গল, পায়ে হাঁটা পথ। উঁচু-নিচু এলাকা। পাথর আব পাথর। সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাগুলিতেই কিছু বসতি আছে। সবচেয়ে সুবিধা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারলে।

দ্বীপটাব এত বিবরণ কেন দিচ্ছেন মুখার্জিদা, সুরঞ্জন বুঝতে পারল না। জীবনেও ঘোড়ায় চড়েনি। এমনকী কখনও ঘোড়া দেখলেই মনে হয়েছে, হয় কামড়ে দেবে, না হয় লাথি মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাবে। ঘোড়া গোরু ষাঁড় তার কাছে সমান। সাইকেলই নিরাপদ। বন্দর ছেড়ে আর যাবেই বা কোথায়?

তুমি দ্বীপটা ঘুরে দেখেছ?

দেখেছি। আবার দেখিওনি।

সাইকেলে?

না। ঘোড়ায় চড়ে বসতে পারলে কোনও ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম, ওরা সঙ্গে লোক দেয়। পরে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে বেশ মজা। একা একা যত দূরেই যাও, কেউ দেখার নেই। তবে গাঁয়ের কাচ্চা-বাচ্চারা ঝামেলা পাকায়। ঘিরে ধরে। ক্যাপস্তান, ক্যাপস্তান বলে চিৎকাব, কান ঝালাপালা করে দেবে। পয়সা চাইবে। রুটি চাইবে। উলঙ্গ। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে পেট শ্রীঘট।

সুন্দরীদের দেখা পাওয়া যাবে না?

সুরঞ্জন দ্বীপটার কথা শুনে সুন্দরীদের কথা না ভেবে পারেনি। পাথর, পাহাড, কচ্ছপ আর নানা জাতের পাখির ওড়াউড়ি, তার ভিতর কোনও জঙ্গলে, কোনও কুটির নির্মাণ করে যদি কেউ থেকে যায়, কে জানে, কে আছে। মুখার্জিদা ঘোড়ায় চড়ে কী খুঁজে বেড়াত।

মুখার্জিদা কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না। সুন্দরীদের কথায় বিরক্ত হতে পারেন। এত লঘু করে দেখলে হবে কেন? গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সুন্দরীদের কথা আসে কী করে!

আরে? কী হল! কথা বলছ না কেন?— সুরঞ্জন কনুইতে গুঁতো মারল মুখার্জিকে।

আরে, আমি ঠাট্টা করলাম। আচ্ছা বলো, আমরা কি ভাল আছি! মেজাজ খিঁচে থাকলে কী করব? উটকো এক ঝামেলায় আবার জড়িয়ে পড়ছি। সুন্দরীদেব কথা ভাবলে মন হালকা হয় বোঝোই তো। বলো কী বলছিলে?

না, কোনও কথা না।— মুখার্জি কাত হয়ে বোট-ডেকে শুয়ে আছেন। একেবারে গুম মেরে গেছেন।

আচ্ছা বাবা, দোষ হয়েছে।

বলে সুরঞ্জন মুখার্জির সামনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল। বলল, যা যা বলছ সবই তো করছি। এত টেনশান আর কাঁহাতক সহ্য হয়। চার্লি মেয়ে, এই এক টেনশান। জাহাজ কবরে যাচ্ছে, এই এক টেনশান। বংশীদার পাগলামি বেড়ে যাচ্ছে, জাহাজ কবে দেশে ফিরবে কে জানে। তার উপর আমরা যেন সত্যি কেউ খুন হতে যাচ্ছি। মুখোশ তো তাড়া করছেই। কলিজ জাহাজ আর এক বাঁশ!

সুরঞ্জন হঠাৎ যেন মুখার্জিকে কোনও সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছে, আচ্ছা দাদা, ম্যাকের ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ভাবতে পারছ না। পারলেই নিশ্চিন্তি। মুখোশ-টুখোশ বাজে ব্যাপার। কেউ অনুসরণকারী, বাজে ব্যাপার। তোমার মাথায় দুশ্চিন্তাও থাকে না তাহলে, ডেরিক কে তুলে রাখল, কে খুন করল, ভুলভালও

তো হতে পারে! ভুলে ডেরিক হয়তো নামানোই হয়নি। লজ্‌ঝরে জাহাজের কোথায় নিরাপদ বলো! আজ এটা ভাঙছে, কাল ওটা খুলে যাচ্ছে, ডেরিক মাথায় ভেঙে পড়তেই পারে। এই তো শুনলাম বয়লার চকও নাকি কিছুটা বসে গেছে। কোনদিন যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সব! দাও, জাহাজটাতে আগুন লাগিয়ে, ভূতের গুষ্টিসুদ্ধ পুড়ে মরুক। বংশীদা ঠিকই বলে, আগুনের কাছে সব ভূত জব্দ।

থাম!— মুখার্জিদা গম্ভীর গলায় বললেন, ভূতের কোনও দায় নেই, ভূতের মাথাও পরিষ্কার না। সে কারও অনিষ্ট করে না। ভয়টা মানুষ-ভূতের। ভয়টা গুজবের। গুজবের কান-মাথা থাকে না। গুজব শুনতেও ভাল লাগে, বিশ্বাস করতেও ভাল লাগে। না হলে আমার কী দরকার ভিনা ব্যাংকের কোন সফবে কারা বরফ-ঘরে একটা মেয়েকে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তাদের দোসর হয়ে যাওয়ার? গুজব চাউর হয়ে গেলে কিছু তো মিছে কথা বলতেই হয়। এতে গুজব আর মিথ্যা থাকে না, সত্য হয়ে যায়। অলৌকিক হলে তো কথাই নেই! ভিতরের দিকে ঢুকে সেবারে বি-সেভেনটিন বোমারু বিমানও দেখলাম একটা। পড়ে আছে। গোঁত্তা খেয়ে ভেঙে পড়ে আছে। দ্বীপের লোকেরা বলল, দুষ্ট হাওয়ার কাজ।

সুরঞ্জন ফের একটা সিগারেট ধরাল। সে উত্তেজনা বোধ করছে। কিছুই তো জানে না। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এই সব এলাকায় সে আসেওনি। দুষ্ট হাওয়ার কথাও কখনও শোনেনি।

খাবে নাকি?— বলে একটা সিগারেট মুখার্জিদার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, আমরা কি তবে দুষ্ট হাওয়ার চক্রে জড়িয়ে পড়ছি।

কী জানি! তোর মাথায় তবু যা হোক সুন্দরীরা নাচানাচি করে। আমার তো শালা সুহাসের কথা ভেবে ঘুমই আসে না। কেউ দ্বীপে মরে পড়ে আছে, তা দুষ্টু হাওয়ার কাজ। হয়ে গেল! না আছে পুলিশ, না আছে প্রশাসন বলতে কিছু! কিছু হলে তার কৈফিয়তও কেউ তলব করবে না।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে মুখার্জি বললেন, মুশকিল কী, কেউ অবিশ্বাস কববে না। বিমানটা দেখে আমারও মনে হয়েছে, হতেও পারে। মনে হয় ইভিল উইন্ডস সত্যি হয়তো আছে। ভাঙা বিমানটাব গায়ে দেখলাম, আলকাতরা দিয়ে লেখা, হয়তো বিমানের ক্রু এবং পাইলট অলৌকিক উপায়ে বেঁচে গিয়েছিলেন, বিমানের গায়ে লিখে রেখেছেন, ইট ওয়াজ দ্য ব্ল্যাকেস্ট অফ ব্ল্যাক নাইটস, দ্য ওয়ার্স্ট ইভিল ওবেদার আই হ্যাভ এভার সিন ইন মাই লাইফ।

দ্বীপবাসীরা মড়ক লাগলে ভাবে না তো দুষ্ট হাওয়ার কাজ।

ভাবে। যেমন যুদ্ধের সময়টায় তারা দুষ্ট হাওয়ার কবলেই পড়ে গেছে এমন ভাবত। যারা বেঁচে আছে তারা তো তাই বলে, ঘোস্ট অফ ওয়ার। যুদ্ধের সব ভূতেরা দ্বীপের যেখানে-সেখানে লুকিয়ে পড়েছে এমনও ভাবে।

বলে মুখার্জিদা হুস করে সিগারেটে জোর টান দিলেন একটা।

সুরঞ্জন বলল, যুদ্ধের ভূত জঙ্গলে দেখেছ?

দেখেছি! তবে জঙ্গলে নয়। সমুদ্রে। অতল জলে সে ফুটে আছে।

দেখতে কেমন?

একটা ফুলের মতো!

কী বলছ?

যা দেখেছি তাই তো বলব। বানিয়ে বলে কী লাভ! দ্বীপটার বেলাভূমি জুড়ে এখানে-সেখানে অদ্ভুত সব ছোট ছোট পাহাড় আছে। একেবারে গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড় মনে হবে। সমুদ্রের জল থেকে ভেসে উঠছে,আবার জোয়ার এলে ডুবে যাচ্ছে। পাহাড়ের খাঁজে সমুদ্রের জল ভারী স্বচ্ছ। পঞ্চাশ-ষাট ফুট গভীরে বিমানের একটা মুন্ডু দেখেছিলাম। ককপিট নানা রঙের স্পাঞ্জে ঢেকে গেছে। মনে হয় গভীব জলে পাহাড়ের গোড়ায় সবুজ লাল নীল একটা ফুল ফুটে আছে। না দেখলে বিশ্বাসই কবা যায় না যুদ্ধের ভূত সমুদ্রের নীচে কত সব কুহেলিকা সৃষ্টি করতে পারে! দ্বীপের মানুষজন এইসব দেখিয়ে পয়সা-টয়সাও চায়।

সুরঞ্জন বলল, যুদ্ধের ভূত বলছ কেন? ভূত আসে কোত্থেকে? যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ বলো।

সব দেখার পর ঘোস্টস অফ ওয়ার না বললে যেন দ্বীপগুলিকে ছোট করা হয়। মুখার্জি দু'-হাত উপরে তুলে বললেন, মারাত্মক সব দৃশ্য। দ্বীপের যত্র-তত্র ভাঙাপোড়া সব মিলিটারি ছাউনি। দ্বীপটাব

চারপাশে বিশাল বিশাল এয়ারস্ট্রিপ অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে গেছে। মরা এয়ারস্ট্রিপ ধরে দূরের বনজঙ্গলে সহজে হারিয়ে যাওয়া যায়।

সুরঞ্জন বলল, যুদ্ধ তো কবেই শেষ। বারো-চোদ্দো বছরের কথা। এয়ারস্ট্রিপের আশপাশে মানুষজনের বসতি গড়ে ওঠেনি।

কোথাও উঠেছে, কোথাও খাঁ খাঁ করছে সব। যতদূর চোখ যায়, রেন ফরেস্ট, কোথাও পাহাড়ি ক্যাকটাস। কোথাও কোনও প্যালিকান পাখি আবার উড়ে এসে ঘরবাড়ি বানাবার চেষ্টা করছে।

প্যালিকান পাখি দ্বীপে নামলে দেখতে পাব?

তা জানি না। তবে দেখা যায়। বড় বড় কচ্ছপও দেখতে পাওয়া যায়। সব দ্বীপে নয়। কোনও কোনও দ্বীপে। প্রাগৈতিহাসিক জীবেরাও ঘোরাফেরা করে। সব শোনা কথা।

দু'জনই চুপচাপ। কেউ আর কথা বলছে না।

মুখার্জি নীরবতা ভেঙে বললেন, বিশ্বাসই করা যায় না, এই সেদিন এখানে যুদ্ধের তাণ্ডব চলছিল। দ্বীপগুলিতে কামানের গর্জনে কান পাতা যেত না। সব এখন অতীতের গর্ভে। দ্বীপের লোকজন যে যার মতো যুদ্ধশেষে যেখানে যা পেয়েছে, বাড়ির সামনে ডাঁই করে রেখেছে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন। তবু মানুষ হারিয়ে যায় না। বেঁচে থাকে। ঘরে ঘরে ইস্পাতের হেলমেট। তাতে খাবার জল ধরে রাখে কেউ। কেউ বাসন-কোসনের মতো ব্যবহার করে। মৃত সৈনিকদের পরিত্যক্ত হেলমেট ভূতের কথা বড্ড বেশি মনে করিয়ে দেয়। সামান্য জনবিরল জায়গাতেই অন্ধকারে গা ছমছম করে। মনে হয় জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে কেউ। যুদ্ধের বিভীষিকা সহজেই গ্রাস করতে পারে। সতর্ক থাকা ভাল।

তারপর ফের দু'জনেই চুপ হয়ে গেল। কেমন কঠিন হয়ে উঠছে দু'জনেরই মুখ। নিরাপদ নয় তারা, কেন যে এমন ভাবছে। পরির কথা মনে থাকল না। সমুদ্রের সোঁ সোঁ গর্জন আর ইঞ্জিনের শব্দ মিলে কেমন সব ভুতুড়ে গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে মাথার ভিতর।

অগত্যা সুরঞ্জনই বলল, আচ্ছা, মগড়াকে সত্যি সন্দেহ করা যায়?

যেতে পারে। মাপজোকের হিসাবে কোনও গোলমাল নেই। মাঝারি হাইটের মানুষের পক্ষেই সম্ভব রেলিং-এর উপর উঠে ঝুঁকে পড়া। পোর্ট-হোলের মুখোমুখি হতে গেলে মাঝারি হাইট না হলে অসুবিধা আছে। চার্লির পোর্ট-হোলে গিয়ে দাঁড়ালে এটা বোঝা যায়। তবে এটাও সংশয়, মগড়া যাবে কেন? যদি যায়ই, ধরে নেওয়া যাক, গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে গেছে, কৌতূহল কিংবা আবিষ্কার, যাই ভাবিস, সে যদি ধরা পড়ার ভয়ে মুখোশ পরে যায়ই, তা সে সামান্য বোতলের লোভে ফাঁস করবে, বিশ্বাস করতে মন চায় না। বোতলের লোভে এমন আহাম্মকের মতো কাজ করতে পারে, নিজের বিপদের কথা ভাববে না!

তাও বটে!— সুরঞ্জন পায়ের নখ খুঁটছে।

আবার দু'জনেই চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। সমুদ্রের জ্যোৎস্নায় জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

সুরঞ্জন সহসা কী ভেবে বলল, চার্লির অনুসরণকারীর কথা কি মগড়া জানে? মানে চার্লি তার পোর্ট-হোলে মুখোশ দেখতে পায়, মগড়া কি জানে?

জানলে উঁকি দিতে সাহস পায়! চার্লি জানেই না ওটা মুখোশ। ওর ধারণা কোনও বুড়ো মানুষ তার পিছু নিয়েছে। পোর্ট-হোলে উঁকি দিচ্ছে। মগড়া ধরা পড়ে না যায়, মুখোশটা পরে উঁকি দিতে পারে। মেয়েমানুষের গন্ধ—ঠিক থাকে কী করে। টের পেলে মগড়া কেন, জাহাজসুদ্ধু চার্লির পোর্ট-হোলে ঢুকে যেতে পারে। মগড়াকে দোষ দিয়ে কী লাভ! যেতেও পারে, নাও পারে। গেছে তার প্রমাণ কোথায়! মুখোশের খোঁজ দিয়েছে বলে, সে-ই অনুসরণকারী কিছুতেই প্রমাণ হয় না।

সুরঞ্জন বলল, তা অবশ্য ঠিক।

মুখার্জি কোনও সাড়া দিল না।

খুব সকালে জাহাজিরা যে যার মতো উঠে পড়েছে। রেলিং-এ ঝুঁকে আছে। চিৎকার—কিনারা দেখা যাচ্ছে। চেঁচামেচি।

সবার ঘুম ভেঙে গেল। কেউ আর নীচে থাকতে পারেনি। যেন কতকাল শুধু জল আর জল, ডাঙা

দেখার আকর্ষণ কী গভীর, এদের চোখে-মুখে তা বড় বেশি প্রকট। দ্বীপের ছড়াছড়ি, একেবারে গা ঘেঁসে যাচ্ছে জাহাজ, গাছগাছালি সব চোখে পড়ছে। কোনও দ্বীপে ঘন সবুজ অরণ্য। অথবা কোনও দ্বীপে পাথরের খাড়া পাহাড়, যেন এই মাত্র সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠেছে দ্বীপটা। আকাশ মেঘলা। শেষ রাতে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ফলকার ত্রিপলে ছোপ ছোপ জলের দাগ লেগে আছে এখনও। আর অজস্র পাখির ওড়াউড়ি। ঢেউয়ের মাথায়ও পাখিরা নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে।

এভাবে সাত-আটটা দ্বীপ জাহাজ দু'পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে গেল। দ্বীপগুলিতে কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে রাতের বেলা হলে জাহাজিরা টের পেত বসতি আছে কি নেই। দ্বীপে আগুন জ্বলত। ঘরবাড়ি থাকলে জঙ্গল ফুঁড়ে আলো ভেসে উঠত। কাজেই মানুষজন থাকতেও পারে, নাও পারে। জঙ্গলের ভিতর যে বাড়িঘর বানিয়ে লোকালয় গড়ে ওঠেনি, কে বলবে: এমন সুন্দর নির্জন নিরিবিলি দ্বীপে মানুষের চিহ্ন থাকবে না, হয়? যেন জাহাজের যে-কেউ সুযোগ পেলে নেমে পড়ত। জাহাজে আর ফিরত না। বন্দিজীবন কাঁহাতক আর ভাল লাগে! সমবয়সি কোনও নারী আর শস্যক্ষেত্র কিংবা মিষ্টি জলের হ্রদ থাকলে তো কথাই নেই। মানুষের এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না।

চার্লিও ডেক-চেয়ারে বসে আছে। সে চোখে দূরবিন লাগিয়ে দ্বীপগুলি দেখছে। দেখাই স্বাভাবিক, কী দেখছে, সুহাস অবশ্য বুঝতে পারছে না। ছুটেও যেতে পারছে না। তার প্রতি মুখার্জিদা থেকে প্রায় সবারই কম-বেশি নজর। তা ছাড়া চার্লি যদি সত্যি মেয়ে হয়, সে তো কোনও মেয়ের সঙ্গেই কখনও ঘনিষ্ঠ হয়নি। এত কথাও কেউ তার সঙ্গে বলেনি। কী করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও ভাল জানে না। ভাবতে গিয়ে সত্যি সে বিপাকে পড়ে গেল।

আচ্ছা, মেয়ে হলে চার্লি বলত না! এত কথা বলে, সে তার আসল পরিচয় যে লুকিয়ে রেখেছে, তাই বা বলবে না কেন! পছন্দ-অপছন্দ সব কথাই বলে। সে তো ভেবেই পায় না, কেন অস্বীকার করবে সে মেয়ে নয়। অথচ মুখার্জিদা এক-এক করে যেভাবে বলে যাচ্ছেন, সব প্রায় ঠিকঠাক ফলে যাচ্ছে। এটা যদি সত্যি হয়! কারও চাপে সে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। সে তো কোনও ক্ষতি করেনি তার। ক্ষতি করতেও পারবে না। জীবন সংশয় হলেও না। কী যে আছে চার্লির মধ্যে ভেবে পায় না। কিশোরী সে। তার শরীর শিরশির করছিল ভাবতে গিয়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে চলে যায়, যে যাই বলুক, তাতে তার কিচ্ছু আসে যায় না। চার্লি তার কোনও ক্ষতি করতে পারে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। এই একটা ধন্ধ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তবে অকারণে যাওয়াও যায় না। গ্যালিতে চর্বিভাজা রুটি হচ্ছে। তার গন্ধ ছড়াচ্ছিল। চা যে যার কাপে ঢেলে নিচ্ছে। সুরঞ্জন তাকেও এক কাপ চা দিয়ে গেছে। ডাঙা দেখলেই এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আর দেশে ফিরে গেলে কী না জানি হবে। দূর থেকে চোখে ভেসে উঠবে নদীনালার দেশটা, ঢাকের বাদ্যি বাজতে শুরু করবে ভিতরে।

ঢাকের বাদ্যি এখনও কম বাজছে না। কাজের নামে বের হয়ে পড়া গেলে বাঁচা যেত। ঘড়ি দেখল, সে ইচ্ছে করলে কাজের অছিলায় কশপের কাছে চলে যেতে পারে। সারেং তাকে বলে দিয়েছেন ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মেরামতির কাজ করতে হবে। কোথায় করতে হবে জানে না।

চার্লি এখনও কিছু বলছে না। জাহাজ থেকে চার্লি নেমে যেতে পারবে কি না, তার শরীর ভাল নেই অসুস্থ, নাও নামতে পারে। একা একা দ্বীপে ঘুরতে তার ভাল লাগবে না। সুরঞ্জন কিংবা মুখার্জিদা তাকে আজকাল সঙ্গেও নিতে চান না। খারাপ জায়গায় গিয়ে তোর কী হবে! আমরা খারাপ জায়গায় যাচ্ছি। মুখার্জিদা আসলে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই বাহানা সৃষ্টি করেন। চার্লির সঙ্গে ঘোরাফেরায় বাবুর রাগ।

রাগ কি এক কারণে? মুখার্জিদার কোনও কথাই গ্রাহ্য করছে না। মুখোশ পরেও যেতে রাজি হয়নি। মুখার্জিদা খুবই গুম মেরে গেছেন। দরজা বন্ধ করে ফোকশালে কী যে সারাদিন করে! দরজায় কড়া নাড়লে বিরক্ত হন। তার সঙ্গে কথা বলাও প্রায় যেন বন্ধ। মগড়াকে নিয়ে পড়েছেন। মগড়া মুখোশ পরে সত্যি পোর্ট-হোলে উঁকি দিয়েছে কি না, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। কিংবা গেলেও তিনি চেপে গেছেন। চার্লিকে বললে হত, তুমি একদম ভয় পাবে না। মগড়ার মাথা খারাপ আছে। তারই কাজ।

তারপর ভাবলেই সে কেমন গুটিয়ে আসে। কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার সত্যি যদি সে হয়? চার্লি

জেনেশুনে তাকে জড়াবে না, সে তো বলল, তুমি যাও সুহাস। তোমাকে আর জড়াতে চাই না।

মুখার্জিদাকে বলবে কি না বুঝতে পারল না। জড়াতে চাই না কথাটা তো ভাল না। বিপদের গন্ধ আছে কোথাও।

বিকেলে জাহাজ নোঙর ফেলে দিল। বাঁধা-ছাঁদার কাজও শেষ। সে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। দড়ির সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। চার্লি আগেই রেডি। সে নেমে গেছে। দুপুরে কত কথা হল, এখানে কোথায় আস্তাবল আছে, ঘোড়া আছে, ইচ্ছে করলে সে চার্লির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখতে পাবে।

ঘোড়া!

হ্যাঁ, কেন? তুমি অবাক হচ্ছ কেন?

আমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব। পড়ে মরি আর কী।

সে দেখা যাবে।

চার্লি আর কোনও কথাই তার শুনতে চায়নি। চার্লি অসুস্থ, অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘোড়ায় চড়া ঠিক হবে না শুনে ক্ষিপ্ত।

আমি অসুস্থ, কে বলেছে।

না রে, কেবিন থেকে বের হলে না, চুপচাপ কেবিনে শুয়ে থাকলে তিন-চারদিন। কিছু না হলে কাজে বের হতে না?

আমার কিচ্ছু হয়নি।

বলে ফিক করে হেসে ফেলেছিল। জামা-প্যান্ট অভ্যাসবশে একটু বেশি টানাটানি করছিল চার্লি।

সারেং সাব ঝুঁকে চিৎকার করে উঠলেন, এই কোথায় যাচ্ছিস? কখন ফিরবি? মুখার্জিবাবু জানে?

চার্লি নৌকায় টাল সামলাচ্ছিল। দেশি নৌকা, পাটাতন নেই। দু'জন লোক, খালি গা, মাথায় ক্যাম্বিশের টুপি, পরনে হাফ-প্যান্ট, তালিমারা, তামাটে রঙের, চুল কোঁকড়ানো এবং ঠোঁট ভারী, ওরা বঠায় চাড় দিচ্ছে। জাহাজের নীচে অপেক্ষা করছিল, কেউ যদি যায় কিনারায়।

চার্লি বুকে হাত রেখে কী ইশারা করল সারেংকে। যেন বলতে চাইল, আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কার্যাটার-মাস্টারকে বলে দেবে। তারপর দেখা গেল অধীর, কেষ্ট ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ছে, কোথায় যাচ্ছিস।

জানি না।— সুহাস হাত তুলে বলল।

ক্রমে নৌকা দূরবর্তী হচ্ছে। চারপাশে টাগবোট আর দেশি নৌকা। কিনারায় দুটো মোটর-বোট এগিয়ে যাচ্ছে। গ্যাংওয়েতে সিঁড়ি না ফেলতেই ওরা নেমে যাওয়ায় সবাই অবাক। দড়ির সিঁড়ি ধরে নামা নয় সহজেই। পিছিলে কেউ আগেই নেমে গেছে। সে কে?

মুখার্জি খবরটা পেয়ে ছুটে এলেন উপরে, কী বলব বলুন?— সারেং সাবের দিকে তাকিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন।

সারেং সাব বললেন, বাড়িয়ালা কেন যে এত আসকারা দিচ্ছে ছোটসাবকে, বুঝি না। জাহাজে বাঁধা ছাঁদার কাজ তো ভালভাবে শেষও হয়নি, দড়ির সিঁড়ি কে লটকে দিল পিছিলে।

মুখার্জি বুঝলেন, সুরঞ্জনের কাজ। তার নেমে যাবার কথা। কখন গ্যাংওয়েতে কাঠের সিঁড়ি নামানো হবে, সেই আশায় সে বসে থাকেনি। কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বন্দর এলাকা খুব বড় নয়, ঘিঞ্জিও নয়। ফসফেট ছাড়া আর কিছু বাইরে যায় বলেও মনে হয় না। নারকেলের ছোবড়া কিছু যায়। ছোট ছোট টাগবোট ভর্তি করে লঞ্চ টেনে নিয়ে যায় পাশের কোনও দ্বীপে। শহর বন্দর সবই আছে, জেটিও আছে সেখানে। দ্বীপটা বোধহয় খুব দূরেও নয়। শহরটার নাম মাদাং, দ্বীপের নাম কী যেন, মনে আসছে না। তারপরেই মনে পড়ল, বাগবাগ দ্বীপ, স্থানীয় লোকেরা বাগবাগে যায় চাল আটা ময়দা চিনি কিনতে। এখানেও পাওয়া যায়, তবে মাঙ্গা। বাগবাগ থেকেই দ্বীপের বাসিন্দারা সস্তায় সব কিছু কিনে আনে। নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে যায়। নানা কিসিমের মাছ। মাছের বদলে তারা চাল আটা ময়দা চিনি এমনকী জামাকাপড় জুতো তুলে আনে। সকাল-সন্ধ্যায় লঞ্চ ছাড়ে। অবশ্য চার-পাঁচ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। লোকজন বেড়েছে। মোটর-বোট সংখ্যায় তো অনেক। মোটর-বোট কিংবা স্টিমারে মাদাং যাওয়া যায়—

জাহাজ টাল খাচ্ছে না, কারণ দ্বীপের ছড়াছড়ি বলে, সমুদ্রের ঢেউ বেশি মাথা তুলতে পারে না। আর প্রবাল-প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে ঢেউয়ের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় বোধ হয়।

এসব ভাবতে ভাবতে মুখার্জির মনে হল, তিনি খুবই ঠকে গেছেন। কাপ্তান-বয়ের কথা তবে ঠিক নয়। চার্লির তো বের হবার কথা নয়। অসুস্থ। তারপর কেন যে সহসা তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, বোঝা গেল না। শিস দিতে দিতে নীচে নামার সময় দেখা গেল অধীরের সঙ্গে। অধীর বলল, নেমে গেল, ছোঁড়ার ভয়ডর নেই দেখছি।

তিনি তাঁর জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন। যেন নিশ্চিত জেনে গেছেন কিছু এবং তখনই তার মন বিমর্ষ হয়ে গেল। গাধাটার বুদ্ধি-সুদ্ধি কম। কী না আবার ঝামেলা পাকায়। তবে চার্লি যতক্ষণ কাছে থাকবে, কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। কী ভেবে তিনি আর নীচে না নেমে সোজা ডেক পার হয়ে মেসরুমমেটদের আস্তানায় উঁকি দিলেন। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, না, কাপ্তান-বয় ঘরে নেই। কাপ্তানের ঘরে যদি যায়, অপেক্ষা করতে হবে।

কী ভেবে ইতস্তত এলিওয়েতে ঢুকতে গিয়ে মনে হল, কোথাও থেকে তেল-জুট পোড়া গন্ধ আসছে। ধোঁয়াও দেখতে পেলেন নীচে, কোল-বাংকারে। এখন তো কারও ডিউটি নেই বাংকারে। ডিউটি থাকলেও তেল জুট পোড়া বিশ্রী গন্ধ উঠবে কেন। সিঁড়ি ধরে বাংকারে ঢুকে অবাক। বংশী। চুপি চুপি কয়লার বাংকারে ঢুকে তেল-জুটে আগুন লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কী করছিস! মরবি নাকি!

ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। বাংকারের বাইরে বের করে বেলচায় চেপে তেল-জুটের আগুন থেঁতলে দিলেন। চেঁচামেচি করলেন না, কারণ লোকজন জড়ো হলে কেচ্ছা। বংশী কি চায়, সবাই পুড়ে মরুক? সে কি সত্যি জাহাজটাতে কয়লার বাংকারে আগুন ধরিয়ে দেবার কথা ভাবছে।

কী যে করা! বংশীকে চোখ রাঙিয়েও লাভ নেই। কিছুটা তোষামোদের গলায় বললেন, তোরা সবাই মিলে পাগলামি করলে কী করি বল তো। আয়। ছেলেমানুষী করিস না। কত বড় বিপদ হতে পারত বুঝিস? কয়লার গ্যাসে আগুন ধরে গেলে রক্ষা আছে! কেউ বাঁচবে।

বংশী কোনও কথার জবাব দিল না। সে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। যতক্ষণ না বংশী পিছিলে উঠে গেল তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সুরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। এ তো একেবারে সত্যি খেপে গেছে। পরিণতির কথা ভাবল না। আর তখনই কাপ্তান-বয় নেমে এসে বলল, মুখার্জি সাব, অসময়ে?

শোনো।

কিছুটা আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, চার্লি কি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল!

জি সাব।

জি সাব রাখো। কী হয়েছিল বলো তো।

তা বলতে পারব না। কোমরের নীচে হটওয়াটার ব্যাগ নিয়ে শুয়ে থাকত। ব্যথায় কাতর মুখ। কাপ্তান মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। শুধু বলছেন, চাইল্ড, মাই চাইল্ড। আর তো কিছু জানি না।

এক্ষুনি তো বের হয়ে গেল! কাপ্তান জানে?

জানে। বলেই গেছে। সুহাস সঙ্গে যাবে শুনেই বললেন, যাও। বেশি রাত কোরো না। সরাইখানায় ঢুকে মাছভাজা-টাজা খেতে বারণ করলেন।

ইস্, তাঁরও ভুল হয়ে গেছে। সুহাসকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। অভিজ্ঞ জাহাজিরা জানেন। বন্দরে নামলেই দু'পাশে নানা কিসমের সরাইখানা, লম্বা লম্বা তাজা মাছ ঝুড়িতে। লাফাচ্ছে। যে-কোনও একটা চাইলেই আস্ত ভেজে দেবে। টেকচাঁদা মাছ খুবই সুস্বাদু। বড় গলদা চিংড়িও পাওয়া যায়। তবে মুশকিল টেকচাঁদা মাছ কম সরাইখানাতেই পাওয়া যায়। শোলের পোনার মতো দেখতে লম্বা লাল বেলেমাছও পাওয়া যায়। তাও সুস্বাদু। তবে পয়সার লোভে বিষাক্ত মাছও এরা ভেজে দেয়।

তা সামান্য দাস্তবমি পরে হলে, কী খেয়ে হয়েছে বোঝা মুশকিল, সেই ভেবেই চালিয়ে দেওয়া। যারা জানে, তারা ঠিকই ধরে ফেলে। সুহাসকে বলে দেওয়া উচিত ছিল, মাছভাজার গন্ধে মজে যাস না। বরফ-ঘরের বাসি পচা মাংস খেয়ে খেয়ে কিনারায় নামলে মেজাজও ঠিক রাখা যায় না। লোভে পড়ে যেতেই হয়। টাটকা মাছভাজার গন্ধ, মাথা ঠিক রাখা দায়।

যাঁরা জানেন, সঙ্গে একটি রুপোর কয়েন রাখেন।
কয়েনটি ছুঁড়ে দাও মাছে, মাছ বিষাক্ত হলে কয়েনটি সঙ্গে সঙ্গে নীল হয়ে যাবে। অন্তত খুব বিষাক্ত মাছের ক্ষেত্রে এটা ঘটবেই।
তা হলে কি ধরে নিতে হবে, চার্লি যতক্ষণ সুহাসের সঙ্গে আছে, নিরাপদ। ম্যাকের খুনের পেছনে কার কী মোটিফ তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। চার্লি সংশয়ের উর্ধ্বে এমনই বা ভাবেন কী করে?
না, আবার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।
যদি চার্লি নিজে না খায়?
যদি চার্লি সুহাসকে খাওয়ায়?
বিষয়টা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। চার্লি যে তাকে ছাড়া জাহাজ থেকেই নামছে না। যেখানে যাচ্ছে, সঙ্গে নিচ্ছে। পোষা গ্রে-হাউন্ড। যেন জীবন দিয়ে সুহাস লড়বে, দরকাবে গলা কামড়ে ধরবে প্রতিপক্ষের। চার্লিকে সন্দেহ করা ঠিক না। তবে দড়িটার কী হবে? দড়িটা তো সে কাছে রেখে দিয়েছে। অনুমান, দড়ির বাকি অংশ জাহাজেই আছে। এই ধরনের দড়ি ক্যামোফ্লেজ করতে পারে মাস্তুল কিংবা ডেরিকের সঙ্গে। মাস্তুল, ডেরিক, চিমনির রং হলুদ। চিমনির উপবে কালো বর্ডার দেওয়া। তাঁর মনে হয়, আরও কেউ দড়ির ফাঁসে জড়িয়ে যাবে। একজনকে দিয়ে শেষ হচ্ছে না। ম্যাক কি টের পেয়েছিল চার্লি মেয়ে, তার জন্যে কি মাথায় ডেরিক ফেলে মেবে ফেলা হল?
ভাবতে ভাবতে মুখার্জি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কাপ্তান-বয়কে বললেন, ঠিক আছে যাও। চার্লি ভাল আছে জেনে খুব ভাল লাগল।
কাপ্তান-বয় চলে যাচ্ছিল, মুখার্জি ডাকলেন।
শোনো।
কাপ্তান-বয় ফিরে এলে বললেন, বিফ এক্সপ্লোরাবে বাড়িয়ালা কবে যাবেন জানো?
বিফ এক্সপ্লোরারে! সেটা আবার কী বাবু?
এই একটা জাহাজ। দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলে আছে।
মাটি টানাব কাজে আসেনি!
না।
মুখার্জিবাবু এত খবর পান কী করে। সে বুঝল, আসলে চিঠিপত্র কিছু সে পাচাব করেছে। তবে খুব জরুবি চিঠিপত্র নিশ্চয় নয়। কারণ এগুলো বিছানাব নীচে ছিল, দিতে অসুবিধা হয়নি। তা থেকে মুখার্জিবাবু জানতে পারেন। সে বলল, মাটি টানার কাজে আসেনি তো তবে মরতে এল কেন।
কেন মরতে এল, আমিই বা জানব কী করে? কোথায় নোঙর ফেলে আছে তাও জানি না। নাম শুনে তো মনে হয়, প্রবাল-প্রাচীর নিয়ে গবেষণার কাজে-টাজে এসেছে। সঙ্গে ডুবুরি নিশ্চয় থাকবে। এ দিককার প্রাচীরগুলো তো সব আট-দশ ফ্যাদম জলের তলায়।
কোনও বাহানা নয় তো!
বাহানা বলছ কেন?
সঙ্গে ডুবুরি আছে বলছেন।
থাকতে পারে। আছে বলিনি। কাপ্তান রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন কথা আছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম।
কাপ্তান-বয় লেখাপড়া জানে না তাই রক্ষে। সে বিফ এক্সপ্লোরারের নামই শোনেনি। চিফ মেট সেকেন্ড মেটের সঙ্গে যদি যাওয়া টাওয়া নিয়ে কথা হয়, তা ভেবেই প্রশ্ন করা। কিন্তু সত্যি সে কিছু জানে না।
এমন একটা পরিস্থিতি যে, তিনি না বললে কাপ্তান-বয়ের যেন নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই। তিনি বললেই যাবে, নতুবা স্ট্যান্ড-বাই। একেবারে নিথর। ঘামছিল খুব। কাপ্তান-বয় কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। বেঁটেখাটো মানুষ, বয়সও হয়েছে, বুড়োই বলা যায়, সাদা উর্দি গায়, এবং দেখলে মনে হবে বড়ই নিষ্পাপ মুখ।
মাল পাচার করবে কখন?
কাপ্তান-বয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ভয় নেই। কেউ জানবে না। তা জাহাজে আসা তো দুটো বাড়তি পয়সার কামানোর জন্য। আবার কবে জাহাজ পাবে তাও জানো না। যা মুফতে রোজগার করা যায়! সুযোগ পেলে আমিও করতাম।

এতে যেন কাপ্তান-বয়ের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে বলল, জি সাব, কী যে বলেন। আপনি করতে যাবেন কেন! আমরা গরিব-গুরবো মানুষ।

মুখার্জি হেসে ফেললেন। তাঁকে কি সাব বলছে তোষামোদ করার জন্য?

আমি খুব বড়লোক ভাবছ!

না, তা না। আপনারা ছোট কাজ করতেই পারেন না। আপনাদের তো জানি।

আপনাদেব বলতে কাপ্তান-বয় বাঙালিবাবুদের কথা বলতে চাইছে। ফেরে পড়ে আসা। দেশ থেকে না তাড়ালে, উদ্বাস্তু না হলে, জাহাজে কে উঠত!

ঠিক আছে যাও। দেখবে খুঁজে। আসল চাবিটা কিন্তু এখনও হাতছাড়া। চাবিটার কোনও ডুপ্লিকেট নেই মনে হচ্ছে। খুঁজে দ্যাখো, যদি পাও দেবে। আমিও খুঁজছি।

কাপ্তান-বয়ের মনে ধন্ধ, কাপ্তানের কেবিনে কী আছে না আছে মুখার্জিবাবু কি জানেন? আমি খুঁজে দেখছি বলায় মনে হল, মুখার্জিবাবু কি নিজেও গোপনে ঢুকে যান? ফাইভারের মৃত্যু, আহামদ বাটলারের জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়া, মুখার্জিবাবুর খোঁজাখুজি, কী একটা জাহাজ কোথায় নোঙব ফেলে আছে, সবই নানা ধন্ধ সৃষ্টি করছে। জাহাজটার নিজের অপবাদের শেষ নেই, সে আফসোসেব গলায় বলল, গতিক ভাল লাগছে না। কী যে হবে! মাটি টানার কাজ কবে শেষ হবে কিছু জানেন?

তা আট-দশ মাস ধরে বাখো। সুযোগ যখন এসে গেছে, সহজে কি কাপ্তান নড়বে? মনে তো হয় না।

কাপ্তান-বয় মুখ কালো করে ফেলল। মুখার্জির বলার ইচ্ছে হল, মুখোশটার খবরই রাখো না মিঞা। চার্লিকে কেউ অনুসরণ করছে তাও জানো না। জানলে নিশ্চয় বলতে, সাহেবের পোর্ট-হোলে নাকি কে উঁকি দিয়েছে। এখন কে কোথায় আবও উঁকি দেয় দ্যাখো! তিনি আর দেরি করলেন না। বোট-ডেক থেকে নেমে আসার সময় দেখলেন, জাহাজিরা যে যার ফোকশাল থেকে সেজেগুজে কিনারায় নেমে যাচ্ছে। সুরঞ্জনকে পাঠিয়ে কোনও লাভ হল কি না এ মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারছেন না। চার্লি নিজেই নেমে গেছে। ডাক্তার এবং ওষুধের দোকান, প্রেসক্রিপশান, ওষুধের রশিদ এগুলি সংগ্রহ কবাব কাবণেই পাঠানো। চিনে রাখা। কিন্তু খোদ রোগী নিজেই কিনারায় গেছে। তার কেন যে মনে হয়েছিল, মেয়েলি সংক্রান্ত অসুখের চিকিৎসা কোনও কারণেই কাপ্তান অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে—এই যেমন নিউ-ক্যাসল, অথবা জিলং বন্দরে করাবেন না, চার্লি ধরা পড়ে যেতে পারে, সে মেয়ে। ছেলে সাজিয়ে রাখতে চাইলে, ডাক্তার দেখাতে গেলে বিপদে পড়তে পারেন কাপ্তান। ছোটখাটো বন্দরে, নেটিভ ডাক্তারদের ততটা হয়তো ভয় থাকার কথা না। ফাঁস হবার কম আশঙ্কা।

এইসব আগাম আশঙ্কা তাঁর মাথায় কাজ করলেই সব গুবলেট করে ফেলেন তিনি। সুবঞ্জনকে পাঠিয়েও কোনও লাভ হল না। তবে এলাকাটা চিনে রাখতে পারলে আখেরে যে লাভ হবে না তাও বলা যায় না। আসলে সেজন্যই তো পাঠানো। নেমে গিয়ে সুরঞ্জন ভালই করেছে। তার কথার গুরুত্ব দিতে শিখেছে, এতে তিনি খুশি। নীচে নেমে সুহাসের ফোকশালে দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখলেন, বংশী তাড়াতাড়ি কী গোপন করার চেষ্টা করছে। কিছু ভাল না লাগলে স্ত্রীর ফটো লুকিয়ে দেখাব প্রবণতা গড়ে উঠেছে বংশীর। কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে স্ত্রীর ছবি লুকিয়ে দেখে। নজর দিলে বউ তাব অসতী হয়ে যাবে, জাহাজিরা মেয়েমানুষ দেখলে কী ভাবে, তার তো জানতে বাকি নেই। জাহাজে মেয়েমানুষের ছবি সাংঘাতিক ব্যাপার, আর সে যদি কচি ডাবের শাঁস হয়, রক্ষা আছে? বংশী এটা ভালই বোঝে।

মুখার্জি বললেন, বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলি!

না না। আমি কিছু দেখিনি। কোনও কথা বলিনি। সত্যি বলছি। তুমি যাও। আমি কিছু লুকিযে ফেলিনি, বিশ্বাস করো।

আমি দেখব না। যত খুশি দ্যাখ। কথা বল। বললাম, কিনারায় যা। হালকা হতে পারবি। কিছুতেই নড়বি না। খারাপ হলে বউকে মুখ দেখাবি কী করে!

বংশীর চোখ লাল হয়ে উঠছে। জবা ফুলের মতো চোখ। মুখার্জি বুঝলেন, তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা বংশী সহ্য করতে পারছে না। দরজা টেনে বের হয়ে এলেন তিনি।

তখনই মগড়া উঁকি দিচ্ছে তার ফোকশালের ভিতর থেকে। মুখার্জির কী মনে হল নিজেও জানেন না, কিছুটা যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েই চলে গেলেন ফোকশালের ভিতর। নীচে কেউ নেই। সুযোগ। দরজা বন্ধ করে মগড়ার চুল ধরে মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন, শুয়োর, হারামি, মনে করিস আমি কিছু বুঝি না। মনে করিস অন্ধকার থেকে উঁকি দিলে ছোটসাব দেখতে পাবে না। বল শুয়োর, কেন পোর্ট-হোলে গিয়েছিলি? কাপ্তান তোর গলা কাটবে। বাঁচতে চাস তো বল।

সোজাসুজি আক্রমণ! মগড়া হাউমাউ করে উঠলে তিনি গর্জে উঠলেন, চুউপ। একদম চুউপ। পায়ে পড়ছিস কেন! বল গিয়েছিলি কি না? মুখোশটা পরে গিয়েছিলি কি না? একদম হারিয়া করে দেব। বল, বল।

হা বাবু, গেছিলাম। জেনানা'আদমি আছে বাবু, জাহাজে জেনানা ঘুমতা হ্যায়। মাথা বিলকুল খাবাপ হোগিয়া। বাবু, আমার কসুর আছে বাবু।

মুখোশটা চুরি করেছিলি?

নেহি বাবু।

তবে?

বাতিল গোসলখানায় সাফ করতে গিয়ে মিলে গেছে বাবু!

বাতিল গোসলখানা!

ওই বাবু পাথরউথর হ্যায় না, কফিনভি হ্যায়। কোমড মে থা। লিয়ে আসি।

নিউ-প্লাইমাউথে নেমে গিয়েছিলি জেনানাব গন্ধে?

নেহি বাবু। ও ঝুট বাত।

পার্ল-হারবারে, লস এঞ্জেলসে?

নেহি বাবু। ওভি ঝুট বাত আছে।

তবে আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখোশটা ব্যবহার করে? সে কে। সুযোগ বুঝে মগড়া সেখান থেকে নিয়ে আসে। আবার জায়গারটা জায়গায় রেখে দেয়। যার মুখোশ সে টের পায় না।

খবরদার, আর কখনও যাবি না। মনে থাকবে? যদি যাস, তবে ম্যাকের মতো তোর জানও খতরা হয়ে থাকবে। কী বুঝলি?

জান খতরা হয়ে যাবে!

চল, মুখোশটা কোথায় আছে দেখাবি।

প্রায় হাত ধরে টানতে টানতে মুখার্জি মগড়াকে ধাক্কা মারতে মারতে সিঁড়ি ধরে উপবে তুলে নিয়ে গেলেন।

কেউ টের পেতে পারে ভেবে উপরে উঠে মগড়ার হাত ছেড়ে দিলেন মুখার্জি। ধস্তাধস্তি হলে জাহাজিরা ছুটে আসতে পারে। মুখার্জিবাবুকে সবাই কম-বেশি সমীহ করে। মগড়াকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, এমন কৌতূহলও দেখা দিতে পারে। উপরে উঠে মুখার্জি একেবারে সাদাসিধে মানুষের মতো খুব সতর্ক গলায় বললেন, বেইমানি করবি তো তোর লাশও গায়েব হয়ে যাবে।

মুখার্জি আর দেরি করলেন না। কিনারায় তারও নেমে যাওয়া দরকার। বাতিল বাথরুমে ঢুকে তিনি যা দেখলেন, তারপর আর জাহাজে চুপচাপ বসে থাকারও কোনও অর্থ হয় না। সুরঞ্জনের সঙ্গে তার এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার। কিনারায় না নেমে গেলে কথাবার্তা বলা মুশকিল।

গ্যাংওয়েতে ডিউটি পড়ে যাবে তাঁর। ফোকশাল আর পিছিলে গ্যাঞ্জাম চলবে। কাজ-কামের চাপ থাকবে না বিশেষ। সুরঞ্জনকে একা পাওয়ার সুযোগই পাওয়া যাবে না। একমাত্র কিনারায় নেমে খুশিমতো আলোচনা করতে পারবেন।

পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো, কী করা যায়, এমন সব চিন্তা-ভাবনার সূত্র থেকেই মন স্থির করে ফেললেন, দেখা যাক, কিনারায় নেমে সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করা যায় কি না! সাইকেলে আর কতদূর যাবে। ঘুরে ফিরে জাহাজে ফেরার রাস্তাতেই সে নেমে আসবে। তা ছাড়া যদি সময় পান তিনি নিজেও আস্তাবল থেকে এক-দু'শিলিং দিয়ে ঘোড়া পেয়ে যেতে পারেন। দ্বীপের উঁচু জায়গায় উঠে গেলে দূরে কোথাও যদি রিফ এক্সপ্লোরার জাহাজটিকে আবিষ্কার করা যায়।

কিনারায় নেমে কাঠগোলার দিকে হেঁটে যেতে থাকলেন। মাছের আড়তগুলি সমুদ্রের ধাবে। কিনারায় নেমেই মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। বাতাসে গন্ধ ভেসে আসছে। সমুদ্রের কিনারায় মাইলখানেক কি তারও বেশি হবে জায়গা জুড়ে বালিয়াড়ি। নারকেল গাছ আর ঝাউ গাছের ছড়াছড়ি। গাছগুলির জন্য মাছের আড়ত চোখে পড়ছে না।

কিছুটা ভিতরে ঢুকলেই সরাইখানা। এবং চার-পাঁচ বছরে এত বদলে গেছে যে মনে করতে পারলেন না, কোনদিকে গেলে আস্তাবল, কিংবা সাইকেল ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

বাজারের দিকটায় ঢুকে তিনি অবাক। ফুলকপি বাঁধাকপি থেকে সব রকমের তরিতরকারি। এবং দোকানে দোকানে ফলের প্রাচুর্য। আপেল আঙুর থেকে নাশপাতি খেজুর—কী নেই! দ্বীপের ঢালু জায়গায় স্কুল-হাসপাতালও চোখে পড়ল। দালানকোঠার ছড়াছড়ি।

দ্বীপটার বন্দর এলাকা আগের মতো আর ছোট নেই। বেশ কিছু নতুন পাকা রাস্তাও তাঁর চোখে পড়ল। পিদগিন ভাষায় নানা সাইনবোর্ড দোকানের মাথায়। ইংরাজি হরফ বলে তাঁর পড়তে অসুবিধা হয় না।

স্থানীয় লোকদের পিদগিন ভাষা অর্থাৎ আধখ্যাঁচড়া ইংরাজি কথাবার্তা দুর্বোধ্য। তারা তাঁর কোনও উপকার করতে পারবে বলেও মনে হল না। তবু দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, সাইকেল কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়! কিংবা আস্তাবলগুলি কোনদিকে উঠে গেলে পাওয়া যাবে?

নৌকা থেকে নেমে কিনারায় কিছুটা হেঁটে গেলে পাকা রাস্তা। আগে এদিকটায় ফাঁকা ছিল, কিনারায় উঠেই টের পেয়েছিলেন। অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সমুদ্রের ধারে এবারে অজস্র ঝুপড়ি উঠে যাওয়ায় রাস্তাটা খুঁজে পেলেন না। হেঁটে যাচ্ছিলেন। পাকা রাস্তায় উঠে গেলে সব চিনতে পারবেন। একসময় পাকা রাস্তাটা ঠিকই আছে দেখতে পেলেন। ওই তো ডানদিকের পাহাড়টা। সমুদ্র থেকে নাক জাগিয়ে রেখেছে! জলের নীচে যুদ্ধবিমানের মুন্ডু হয়তো আগের মতোই পড়ে আছে।

নানা ইশারায়ও কাজ হচ্ছে না। মুখার্জি বোঝাতেই পারছেন না, আস্তাবলগুলি কোনদিকে? বেঁটেমতো সব লোকজন, তামাটে রং, চুল খাড়া। নাক থ্যাবড়া উঁচু দুই-ই আছে। বেঢপ সাইজের মানুষজন, বুক কোমর সব এক মাপের। এবং বাচ্চারা আগের মতোই দোকানের সামনে ভিড় করছে। কিন্তু জাহাজিদের দেখে ছুটে আসছে না। ঘিরেও ধরছে না তাঁকে। কাপস্তান কাপস্তান বলে চিৎকারও করছে না। কাজে সবাই এতই ব্যস্ত যে কে দ্বীপে এসে নামল, কে জাহাজে উঠে গেল তার প্রতিও তাদের বিশেষ নজর নেই।

মুখার্জি জানেন পিদগিন ভাষা প্রবালদ্বীপগুলির নিজস্ব ভাষা নয়। ইংরাজির জগাখিচুড়ি বলা যায়, তারা কাজ চালিয়ে নেয় এই ভাষায়। বিশ-বাইশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে কাজ চালিয়ে নেবার মতো এই একটাই ভাষা। ইংরাজি আর অস্ট্রেলীয় ইতর ভাষার এক জগাখিচুড়ি অনুকরণ। সেবারে ফিলের সঙ্গে আলাপ না হলে এত কথা জানতেও পারতেন না। দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে গিয়ে ফিলের কথা মনে পড়ে গেল।

ফিলের ওখানে একবার যাওয়া দরকার। সুযোগমতো ঘুরে আসা যাবে। ক্রোশ দশেক দূরে নির্জন এক টিলাতে তাঁর ডেরা। উকন গাছের ছায়ায় সাদা বাড়িটা বড়ই রহস্যজনক মনে হয়েছিল। দ্বীপের একটা পরিত্যক্ত অঞ্চল কেন তিনি বেছে নিয়েছেন তা জানারও কৌতূহল হয়নি! তিনি একজন যুদ্ধ-পলাতক সৈনিক হতে পারেন, এটাও তাঁর মাথায় আসেনি। ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর নিজস্ব আস্তাবলে বেশ বড় দুটো ঘোড়াও আছে। মুরগির খামার, কিছু শস্যক্ষেত্র এবং বাড়িটার ভেতরে বিশাল সব কাচের জার, নানা সামুদ্রিক জীব-জন্তুর আখড়া।

ফিল একা থাকেন।

একা কেন?

আসলে জাহাজের নানা দুর্গতি মুখার্জিকে ফিল সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে যাচ্ছে। পিদগিন ভাষায় দোকানের নাম-টাম চোখে ভেসে না উঠলে হয়তো ফিল সম্পর্কে এত কথা তাঁব মনে হত না। মনেই পড়ত না, আরে, এই দ্বীপেই তো সেই মানুষটিকে দেখেছেন তিনি।

তিনি কি এখনও আছেন!

থাকবেন না, যাবেন কোথায়!

ফিল যে একা থাকেন, সেবারেই টের পেয়েছিলেন মুখার্জি। কিছু স্থানীয় লোক তার বান্দা, এও মনে হয়েছিল। সামান্য সরষের তেল উপহার পেয়ে ফিল কী খুশি! কে যে তাঁকে বলেছে, সরষের তেল মাথায় মাখলে সুনিদ্রা হয়। সামান্য তেলের জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা ঘোড়া ছুটিযে এসেছিলেন। তা হলে ফিল কি অনিদ্রায় ভুগতেন! কেন!

আসলে জাহাজিরাই খবর দেয়। বিশেষ করে বাঙালি জাহাজিরা সবষের তেল মাথায় মাখে দেখেই কিনাবায় মানুষজনের নানা প্রশ্ন, মাথায় এই তেল! আর তার উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ বলতে যেন সব বাঙালি জাহাজিরাই ওস্তাদ। একেবারে ঘুমের বিশল্যকরণী। মাখো আর সুনিদ্রা যাও। ফিল সেই সুনিদ্রাব আশাতেই জাহাজে উঠে এসেছিলেন।

এক বোতল সবষের তেলের বিনিময়ে ফিলের সঙ্গে তাঁব বন্ধুত্ব। তিনি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। জাহাজেও উঠে আসতেন। তাঁদের সঙ্গে খানাও খেযেছেন। বাঙালি রান্নার-তারিফও কবেছেন। মুখার্জিও গেছেন তাঁর ডেরায়। ডেরা না প্রাসাদ এই মুহূর্তে কেমন গুলিয়ে ফেললেন মুখার্জি। প্রাসাদের অন্ধকার দেয়ালে তিনি ডুবুরির পোশাকও ঝুলতে দেখেছেন।

তিনিই তাঁকে বলেছিলেন, দ্বীপগুলির ভাষার কোনও মাথামুন্ডুও নেই। কোরাল সি-তে সাতশোবও বেশি ভাষা। অধিকাংশ ভাষার হরফ পর্যন্ত নেই। এই দ্বীপের লোক অন্য দ্বীপেব লোকদেব ভাষা একদম বোঝে না। ফলে পিদগিন ভাষাই এদের সম্বল। কম-বেশি সব দ্বীপের লোকেবাই বোঝে।

ফিল তাঁর পিযানোটা দেখিযে বলেছিলেন, বিগ ফেলা বক্কাস।

মানে?

ফিল হেসে বলেছিলেন, টিদয়ালা সেম সার্ক—ইয়ো হিটিম, হি ক্রাই আউট।

ফিল আমি কিছু বুঝছি না। পিয়ানো বিগ ফেলা বক্কাস হতে যাবে কেন?

ফিল তাঁকে জডিযে ধরেছিলেন, রেগে যাচ্ছ কেন! পিযানো বললে বুঝবে না। দ্বীপের লোকজন 'বিগ ফেলা বক্কাস' বললে বুঝবে।

আবও বুঝিয়ে বলাব জন্য ফিল বিস্তারিত করলেন তাঁব ব্যাখ্যা, এ বিগ বকস—উইদ টিদ অল দ্য সেম সাইজ, অ্যান্ড ইফ ইয়ো হিট, ইট মেকস এ নয়েজ! কী বুঝলে মুখার্জি?

দাকণ তো? পিয়ানোর জন্য এত খরচ?

লোকটির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুখার্জি সরাইখানাগুলির বিজ্ঞাপন পডতে থাকলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা—স্পাক ম্যান ইনা কামিন। কী হতে পারে? স্পাক কথাটা গালাগাল তিনি জানেন। হয়তো বোঝাতে চাইছে, ইনটকসিকেটেড পার্সনস উইল নট বি অ্যাডমিটেড। অস্ট্রেলীয় স্পার্ক অথবা স্পার্কি শব্দ থেকেই স্পার্ক কথাটার উৎপত্তি, এও ফিল তাকে বুঝিয়েছিলেন। নেশাগ্রস্ত লোকদের অস্ট্রেলিয়ানরা স্পার্ক অথবা স্পার্কি বলে গালাগাল দেয়, ফিল না বললে মুখার্জি জানতে পারতেন না। আসলে পিদগিন ভাষায় সামান্য ইতরবিশেষে বোঝায়, স্পার্কম্যান হি নো কাম ইন।

তিনিই বলেছিলেন, পাপুয়া নিউগিনি থেকে নিউ হেব্রিডস দ্বীপগুলির সর্বত্রই এই এক অসুবিধা মুখার্জি।

মুখার্জির মনে হল, ফিলের সঙ্গে তার দেখা করা খুবই জরুরি।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জির মাথায় খেলে গেল, জনৈক অ্যালেন পাওয়ারের লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিব বয়ান। অ্যালেন কাপ্তান মিলারকে কিছু খবর দিয়েছেন চিঠিতে। চিঠিটা লেখা বোথ-বে হারবার থেকে। সামরিক দপ্তরের লোক বোধহয়। অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন কলিজ জাহাজ সম্পর্কে। জাহাজটি কবে কোন তারিখে বাজেয়াপ্ত করা হয়, প্রমোদ-তরণীর খোলনলচে পালটে কবে

জাহাজটিকে ট্রুপ ট্রানসপোর্ট ক্যারিয়ারে পরিণত করা হয়, তার খুঁটিনাটি তথ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেভেনথ মিলিটারি মিশানে জাহাজটি ডুবে যায় তার খবরও আছে। জাহাজডুবির তারিখ, সাল, এস পিরিতু সান্তু থেকে কতটা নর্থ ইস্টে জাহাজডুবি হয়েছে তারও উল্লেখ আছে।

মুখার্জির মাথায় এগুলিই তাড়া করছে।

অথচ আসল খবরের উপর তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি। ফিলের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গেই তো তার দেখা হয়। সবার স্মৃতি মনে রাখাও কঠিন। জাহাজি জীবনে সারা পৃথিবী চষে বেড়ালে ফিলের মতো অসংখ্য চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যেতেই পারে। দ্বীপে নেমে পিদগিন ভাষার সাইনবোর্ড দেখেই ফিলের কথা বোধ হয় মনে পড়ে গেল।

শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ।

শি মানে তবে কলিজ! কলিজ জাহাজ!

পলকে পড়ে চিঠিটি কাপ্তান-বয়ের হাতে ফেরত দিলেও মুখার্জির ঠিকই মনে পড়ছে, অ্যালেন লিখেছেন, 'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ' এটা তাঁর কথা না। একজন ডুবুরির কথা।

ডুবুরিটি কে? সে কি ফিল!

কিন্তু চিঠিতে ফিলের নাম তো ছিল না। জাহাজেরও নাম ছিল না। ডুবুরির নাম ফিলিপ। ফিলিপ আর ফিল কি একই ব্যক্তি? মাথাটা কেমন ঝন ঝন করে উঠল।

'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ' নোটস ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার।

অসি ডাইভার আবার কী!

ডাইভার ডুবুরি বোঝা যায়।

কিন্তু 'AUSSIE' খুবই গোলমেলে ব্যাপার। আমেরিকান হলেও কথা ছিল। এই 'অসি' শব্দটাই তাঁকে কাঁবু করে ফেলায় বোধ হয় আর শেষ পর্যন্ত এগোতে সাহস পাননি। 'অসি' নিয়ে বিড়ম্বনার খুব দরকার আছে বলেও তাঁর মনে হয়নি শেষে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আসল রহস্য সেখানেই।

'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ' নোটস ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দ্য স্পেল অফ দ্য লাকসারি লাইনার টুয়েলভ ইয়ার্স এগো অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অফ দ্য রেক।

ফিলিপ যদি ফিল হয়, 'অসি' যদি অস্ট্রেলীয় হয় আর লাকসারি লাইনার যদি কলিজ হয়, তবে তবে—

তারপর থতমত খেয়ে মুখার্জি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, তবে কী?

তবে কাজ কিছুটা এগুবে। বুঝলে বুদ্ধু!

নিজে এতটা বুদ্ধু এই প্রথম যেন টের পেলেন মুখার্জি। হাসলেন আপন মনে। নিজেকে বুদ্ধু বলায় খুশিই হতে পেরেছেন। কাপ্তান রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন, ফিলিপের কাছেও যেতে পারেন। আটঘাট বেঁধেই যে কাপ্তান এগোচ্ছেন বুঝতে কষ্ট হল না তাঁর।

হাঁটতে হাঁটতে একটা টিলার মাথায় উঠে এসেছেন। রাস্তার পাশে বাগান, কুঁড়েঘর. মুরগি, কুকুর। কুকুর তাড়া করতে পারে। কিছু বস্তিও পার হয়ে গেলেন। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে মা। বিশ-বাইশ বছরের যুবতী। কোনও সংকোচ নেই। মুখার্জি সেদিকে তাকালেন না। সুরঞ্জনকে খুঁজে না পেয়ে কিছুটা হতাশ। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তবে কোনও জাহাজ দেখা গেল না। তাঁদের জাহাজ খাঁড়ির ভেতরে। কাছেই। নেমে গেলেই হল। আর কোথায় খোঁজা যায়? মোষের কিছু গাড়ি যাচ্ছে সার বেঁধে। কিছু সাইকেল আরোহী চেঁচাচ্ছে গাড়িগুলি রাস্তা জ্যাম করে রেখেছে বলে।

খুবই অন্যমনস্ক মুখার্জি। তিনি হাঁটছেন। জাহাজে ফিরে যাবেন কি না ভাবছেন! তখনই মনে হল কে যেন তাঁকে ডাকছে। এদিক-ওদিক তাকালেন। তালপাতার টুপি মাথায় সুরঞ্জন চায়ের দোকান থেকে উঠে আসছে। বাবু তবে হাওয়া খাচ্ছেন! মশগুল হয়ে গেছে কিছু যুবতীর পাল্লায় পড়ে। কারণ দোকানগুলো সবই মেয়েরা চালায়। লুঙির মতো পোশাক, আর পাতলা ফ্রক পরে থাকায় সুরঞ্জন বোধ হয় যুবতীকে ছেড়ে নড়েনি। কথাবার্তাও হয়ে যেতে পারে। কিছুটা ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, এখানে বসে কী করছিলি!

টুপি খুলে মাথা চুলকাতে থাকল সুরঞ্জন। কোনও কথা বলছে না।
সাইকেল পাসনি?
না।
ওরা কোন দিকে গেল জানিস?
কাবা?
চার্লি, সুহাস।
চার্লি সুহাসকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে।
কোথায়?
যাবে? এসো।
না।
শোনো মুখার্জিদা, ছোঁড়া মরবে বলে দিলাম। দু'বার পড়ে গেছে। জাপটে ধরে থাকে ঘোড়ার পিঠ। আব ঘোড়াও বলিহারি, পা ছুঁড়ছে। চার্লি ঘোড়ার লাগাম ধরে বশে আনার চেষ্টা করছে। এক লাফে চড়ছে, আবার নেমে পড়ছে। পাদানিতে পা, জিনে পেট ঠেকিয়ে অদ্ভুত কায়দায় উঠেই আবার নেমে পড়ছে। বুঝলে না সুহাসকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে! লাগাম ধরে সুহাস ঘোড়া টেনে নিয়ে যেতেই ভয় পাচ্ছে। দামড়া কোথাকাব। লজ্জা করে না, তুই ক্লী রে! পড়ে গেলি। হাত পা ভেঙে পড়ে থাকবে বলে দিলাম।
মুখার্জি এদিক-ওদিক কী দেখলেন। তারপর বললেন, আমার সঙ্গে আয়।
যেতে যেতে বললেন, চার-পাঁচ বছবে দেখছি দ্বীপটার বেশ উন্নতি হয়েছে। আগের মতো মনে হয় বাস্তাঘাট খুব দুর্গম নয়। দোকানগুলিতে এত ভিড়ও দেখিনি। ফসফেট কোম্পানি দেখছি স্থানীয় লোকদেব অভাব-অভিযোগেব দিকে বেশ নজর দিয়েছে। এটা খুব ভাল ব্যাপার।
বলেই হাত ধবে টেনে বসিযে দিলেন সুবঞ্জনকে। ওবা বাতিঘবের পেছনটাতে নিজেদের আড়াল কবে ফেলল।
মুখার্জি বললেন, দ্যাখ কে যাচ্ছে!— আঙুল তুলে দেখালেন।
সেকেন্ড। সেকেন্ড কোথায় যাচ্ছে!
দেখা যাক।— বলে মুখার্জি বললেন, মাথার টুপিটা দে।
সুবঞ্জন টুপিটা এগিয়ে দিল।
দাড়া। আমি আসছি।
কোথায় যাবে?
তুই দাঁড়িযে থাক। আমি আসছি। যাবি না কিন্তু।
পাতার টুপি পরলে স্থানীয় বাসিন্দা একেবারে। তবে রোদ তেতে নেই। কিংবা রোদে চাঁদি ফাটাবও কথা না। রোদ থেকে আত্মবক্ষার জন্যই পাতাব টুপি পরাব চল। রাতেও পাতার টুপি পরে স্থানীয় লাকজন হাটবাজার করে কিংবা অফিস থেকেও ফেবে। কিছুটা স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো সুযোগ সুবিধে নেবার জন্যই যেন মুখার্জি মাথায় পাতার টুপি সেঁটে দিলেন। দ্বীপেব লোকজনের মতো হাঁটতে লাগলেন।
সূর্য হেলে গেছে সমুদ্রে। ডুবেও গেল। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে কিছুটা নীলবর্ণ ধাবণ করল। খাড়ির পাশে বিদ্যুতের আলো ঝকমক করে উঠল। জ্যোৎস্না উঠেছে। দুটো ছোট টিলা পার হয়ে নীচে নেমে যেতেই টের পেলেন মুখার্জি, সেকেন্ড যেন সতর্ক হয়ে গেছে। গাছের অন্ধকাবে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখার্জি জঙ্গলের ভিতর বসে পড়লেন। খানিক দূরে চার্লি আর সুহাস। দুটো ঘোড়া। দু'জন স্থানীয় লোক সঙ্গে। আর পাথরেব আড়ালে তিনি দেখলেন, সেকেন্ড সহসা অদৃশ্য।
ঝোপ জঙ্গল ফাঁক করে মুখ কিছুটা জাগিয়ে বাখলেন তিনি। নিশ্চয় সুহাস এবং চার্লিকে তিনি অনুসবণ কবছেন। কাছে কোথাও আছে। সেকেন্ড কী করে, দেখা দরকার। হাতের কাছে এমন সুযোগ পাওয়া যাবে তিনি কল্পনাই করতে পারেননি।
জাহাজ থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন, মগড়ার উদ্ভট খবর দিতে। মগড়া তাকে বাতিল বাথরুমে

নিয়ে দেখিয়েছে কোথায় সে মুখোশটা রাখে। কোথায় সে মুখোশটা পায়। একটা বাতিল কমোডে মুখোশটা উলটো পিঠে বসিয়ে রাখা হয়। কমোডের সাদা রঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না, উলটো পিঠে বুড়ো মানুষের মুখোশ আঁকা আছে। মগড়া বলেছে, মুখোশটা সে কখনও-কখনও দেখেছে কমোড থেকে কেউ নিয়ে যায়। কে নিয়ে যায় সে অবশ্য জানে না। বাতিল-ঘরের চাবি চার্ট-রুমে থাকে। দরকারে সে নিয়ে আসে ঘরের ঝুলকালি সাফ করার জন্য।

মুখার্জি হামাগুড়ি দিতে থাকলেন।

কাছে যাওয়া দরকার। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট নয়।

বাতিল-ঘর থেকে কখনও উধাও হয়ে যায় মুখোশটা। মগড়ার কৌতূহল ছিল। সে চার্লির বাথরুমে ঢুকে টের পেয়েছে সব। লুকিয়ে জাহাজে নারী দেখার বাসনা কার না হয়! লোভে পড়েই ঘোরাঘুরি। চার্লির অনিষ্ট করার কথা সে কখনও ভাবে না। প্রায় পায়ে পড়ে এই ধরনের স্বীকারোক্তির পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, আর ধরবি না। ধরলে পিটিয়ে ছাল-চামড়া তুলে নেব।

তিনি হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় গজ দশেকের মতো এগিয়ে গেলেন। আর স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সাপের মতো গর্ত থেকে মুখ বার করে কেউ চার্লিকে দেখছে। চার্লির সঙ্গে সুহাসের আচরণ লক্ষ করছে বোধ হয়। তার মুখে সেই মুখোশ। মুখার্জি স্তম্ভিত।

একবার মনে হল হাত বাড়িয়ে মুখোশটা মুখ থেকে টুক করে তুলে নিলে কেমন হয়? বেইজ্জত করার সুযোগ পেয়ে হাত বেশ নিশপিশ করছে। কারণ এত কাছে কেউ আছে সেকেন্ড টেরই পায়নি। কেমন আবিষ্ট হয়ে গেছে যেন। কী দেখছে এত। কাপ্তানের চর নয় তো? কাপ্তান কি অদৃশ্য জায়গা থেকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেকেন্ডকে? কাপ্তানের নির্দেশেই যদি কাজটা করে থাকে সেকেন্ড? ভাবতেই তিনি কেমন গুটিয়ে গেলেন।

তা হলে চার্লির অনুসরণকারী এই!

টুক করে মুখোশ খুলে নেবার কথা আর মুখার্জির মাথায় থাকল না। দ্রুত টিলা থেকে নেমে এলেন। সুরঞ্জনকে পেলে হয়! বড় একা মনে হচ্ছে। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। সুরঞ্জন যদি মেয়েটার নেশায় পড়ে যায়! দোষও দেওয়া যায় না। লাইনের মেয়ে বলেই মনে হয়। গত সফরে জাহাজ থেকে নামলে ঘিরে ধরেছিল এক দঙ্গল মেয়ে। যুবতী প্রৌঢ়া বালিকা সব বয়সের।

একজন তো প্রায় নাবালিকা। তবু তাঁর জামা ধরে টানছিল।

মুখার্জির হাসিও পাচ্ছিল, আবার এক ধরনের মজা। তাকে হাসতে দেখেই বাচ্চা মেয়েটা একেবারে জোঁকের মতো লেগে ছিল। সে না পেরে বলেছিল, তুমি কিছু বোঝো এসবের! তুমি পারবে?

আশ্চর্য, সেই ছোট্ট বালিকার চোখে কী ক্ষোভ, যেন তাকে অপমান করা হয়েছে! সে তেরছা চোখে বলেছিল, আই নো দিস লাইন।

খুবই গর্বের সঙ্গে কথাটা বলেছিল। তারপর ছুটে পালিয়েছিল বস্তির দিকে। অশ্লীলতার চূড়ান্ত।

মুখার্জি দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন।

এবারে আর তারা যেন নেই। ম্যাজিকের মতো লাইনের মেয়েরা সব উধাও। সুরঞ্জনের কপাল ভাল বোধ হয়, পেয়ে যেতেও পারে। তবে পেয়ে গেলে মুশকিল, তিনি সত্যি ত্রাসে পড়ে যাবেন। সুরঞ্জনকে এখন সেখানে না পেলে মুশকিলে পড়ে যাবেন।

না, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি কিছুটা ত্রাসে পড়ে গেছেন এমন ভেবেই যেন সুরঞ্জন বলল, তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন? এসো বসি।

পাশের দোকানে নিয়ে বসাল তাঁকে। মুখার্জি দরদর করে ঘামছেন।

কী হল বলবে তো!

সেকেন্ড।

সেকেন্ড কী? সেকেন্ড অনুসরণকারী?

সত্যি। সেকেন্ডই তো ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেকেন্ড ছাড়া কে আর ওখানে সাপের মতো ফণা তুলে বসে থাকবে?

তিনি আর কোনও কথা বলতে পারছেন না। কিছুটা অবোধ বালকের মতো তাকিয়ে আছেন। কিছু যে ভাবছেন বোঝাই যায়।

কী হল তোমার?

কী যে হয়নি তোকে কী করে বোঝাই। সেকেন্ড এত কাছে থেকে কেন দ্যাখে? লুকিয়ে কেন দ্যাখে। মুখোশ পরে কেন দ্যাখে। তিনি তো ইচ্ছে করলেই চার্লির কাছে গিয়ে বলতে পারতেন, আরে তোমরা। দেখি তো আমি পারি কি না? বলে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানাটানি করলেও অশোভন হত না। এ যে খুবই অশোভন মনে হচ্ছে। চার্লি মেয়ে না ছেলে বোঝার জন্য আড়ালে হাঁটাহাঁটি করারই বা কী দরকার! কত বড় অফিসার! তার এক ধমকে আমাদের কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যায়, আব তিনি কিনা—না, ভাবতে পারছি না। তোর কী মনে হয়?

সুরঞ্জন বলল, তুমি কি সেন্ট পার্সেন্ট সিয়োর চার্লি মেয়ে?

সেন্ট পার্সেন্ট।

সুরঞ্জন কিছু ভাবছে। ভাবলে সে দু'আঙুলে ঠোঁট চেপে ধরে তার। মাঝে মাঝে ঠোঁটেব নীচে হাত বুলায়।

সেন্ট পার্সেন্ট হলে তো সেকেন্ডকে লেলিয়ে দিতেই পারে কাপ্তান।

লেলিয়ে দিতে পারে মানে?

চোখে চোখে রাখা আর কী। দামড়াটাও আমার মনে হয় শুঁকে শুঁকে ঠিক ধরে ফেলেছে, চার্লি মেয়ে। আড়াল-আবডাল পেলে কার আর মেজাজ ঠিক থাকে। চার্লি জড়িয়ে ধরলে সাহস আছে না কবতে পারে। বুনো ফুলের গন্ধে কে না পাগল হয় বলো।

পাগল হলে শেষ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ বিনাশ। আর এক ফাইভার। আফসোসের শেষ থাকবে না।

ফাইভারের খুনের দৃশ্যটা যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন মুখার্জি। ওযার পিন ড্রামের উপর ঝুলে পড়ে আছে। মাথা থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে।

সুবঞ্জন বলল, কেক দেবে? কেক দিতে বলি দুটো?

টিনের খুপরি ঘর বলে হাওয়া বাতাস কম। তবে বেশ ঠান্ডা। বিজলি আলো আগে এদিকটায় ছিল না, টিম টিম করত লণ্ঠনের আলো, বড় দোকানে হ্যাজাক কিংবা ডে-লাইট জ্বলত, এখন সবই কত পালটে গেছে। জুন-জুলাই মাস। শীতকাল শুরু বোধহয়, এই হেমন্তের হাওয়াব মতো মেজাজি ঠান্ডা হাওয়া, বেশ আরামদায়ক, কেক হলে মন্দ হবে না।

মুখার্জি বললেন, নে।

ওদের কেক দিয়ে কাউন্টারের দিকে চলে গেল যুবতী। অন্য সময় হলে কত কথা বলত তারা, মেযেটির কাছ থেকে দ্বীপের নানা খবরও নিত, কিন্তু আজ তারা এসব কিছু ভাবতেই পাবছে না।

সুবঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়ে দু'হাত ঝেড়ে কেমন কিছুটা মুক্ত হয়ে যাবার মতো বলল, মুখোশেব বহস্য বের করা গেল, তবে কি তোমার মনে হয় মুখোশটা সেকেন্ড চেয়ে নিয়েছিল ফাইভারেব কাছে? ফাইভার কি জানত, মুখোশটা যে সেকেন্ডকে দেওয়া গেল, ডাইরিতে তার নাম লেখা চলবে না?

যমের মতো জাহাজে সেকেন্ডকেই ভয় করত ফাইভার। যখন-তখন সেকেন্ড ফাইভারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে, পায়ের উপর জুতোর চাপ দিচ্ছে। ফাইভারের সহনশীলতাব পবীক্ষা। ফাইভারের কাজের ত্রুটি থাকত বলে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারত না। অথচ সেকেন্ড ঠিক ত্রুটি খুঁজে বের করত। মেজাজ গরম করে ফেলত। অমানুষিক নির্যাতন। চোখে দেখা যায় না।

মুখার্জি শুধু 'হুঁ' উচ্চারণ করলেন।

মুখার্জি আলগা করে এক টুকরো কেক মুখে ফেলে বললেন, আট নম্বর মুখোশের তবে এই পবিণতি। যাকগে, এখন কী করবি বল? আমার তো মনে হয় চার্লিকে সোজাসুজি বলা দরকার, সুহাসের জীবন বিপন্ন। হয় তোমার ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে হবে, নয় সুহাসের সঙ্গে তোমার মেলামেশায় আমরা বাধা দেব। দরকারে কাজ বন্ধ করে দেবার হুমকি দেওয়া যেতে পারে।

ওতে কি কাজ হবে?—সুরঞ্জনের মধ্যে কেমন দ্বিধা দেখা গেল। তারপর কী ভেবে বলল, চার্লি

যে মেয়ে, ফাইভার কি টের পেয়েছিল তোমার মনে হয়?

নির্ঘাত টের পেয়েছে। আর তোকে বলে রাখি, ফাইভার নিজেও জানত। রাতে গোপনে ডেরিক তুলে রাখতে সেও যেতে পারে। তবে এটা যে তার মাথায় ভেঙে পড়বে সে আঁচ করতে পারেনি। পকেটে তার বউয়ের ছবি, সুহাস ঠিকই ধরেছে, পকেটে ছবি নিয়ে সে কখনও জাহাজে ঘোরাঘুরি করেনি। কাবণ জাহাজই তার নিরাপদ জায়গা মনে হয়েছে। কিন্তু সেদিন সকালে সে জানত কেউ খুন হবে। ডগওয়াচের শেষে সে-ই গোপনে ডেরিক তুলেছে কারও নির্দেশে। নিজের পকেটে ছবিটা রেখেছে আতঙ্কে।

তিনি কে?

আমি জানি না, তিনি কে! তবে আমি জানি, আমাদের মতো আরও অনেকে টের পেয়ে গেছে চার্লি মেয়ে। আমি নিজেও বুঝেছিলাম চার্লি মেয়ে। চার্লির কথাবার্তা, চাউনি, সুহাসের দিকে তাকালে সহজেই তাকে ধরা যায়, একজন পুরুষ কখনও পুরুষের দিকে ওভাবে তাকায় না। মেয়েলি চাউনি, কান্নি মেরে দেখা মেয়েদের স্বভাব, হাঁটা-চলায়ও বোঝা যেত। তোকে খুলেই বলছি, আমিও মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়তাম। গোপনে খুঁজে দেখতাম, ওরা কোথায় যায়, কী করে। চার্লির প্রতি সুহাসেব আকর্ষণ প্রবল। ভাল লাগছিল না। নিষ্পাপ ছেলেটা বেঘোরে মারা পড়বে শেষে।

তুমি দেখেছ কিছু? ওরা কিছু করছিল।

না, কিছুই দেখিনি। ছেলেমানুষের মতো সুহাস গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। বুনো ফুলের খোঁজে গেছে। ছবি এঁকে দেখাত, কখনও সে নিবিষ্ট মনে চার্লির ছবি আঁকা দেখেছে সবল শিশুর মতো। চার্লির ছবির হাত খুবই সুন্দর, অবাক হবারই কথা। নির্দোষ মেলামেশা।

তা হলে আর এত ভাবছ কেন?

ভাবছি। কেন যে ভাবছি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।—মুখার্জিকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

সুবঞ্জন বিল মিটিয়ে দেবার সময় বলল, মুখোশটা সেকেন্ড নিজের কেবিনে রাখল না কেন? বাতিল-ঘরটায় ফেলে রাখল কেন? কী মোটিফ মনে হয়?

তেমন কিছু না। এ নিয়ে ভাববার কারণ আছে বলে মনে হয় না। সেকেন্ড মনে করতে পাবে মুখোশের কথা চাউর হয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি হতে পারে। কাপ্তান নিজেই সর্বত্র খুঁজে দেখতে পাবেন। সেকেন্ড সেই আতঙ্কে হয়তো রাখেনি। বাতিল-ঘরে রেখে দিয়েছে।

তুমি যে বলছ, কাপ্তান সেকেন্ডকে চার্লির পেছনে লাগিয়েছেন?

মুখার্জিদা খেপে গেলেন, বোঝার চেষ্টা করবি। না বুঝে কিছু বলবি না। লেলিয়ে দিয়েছেন কি বলেছি? সংশয়েব কথা বলেছি, লেলিয়ে দিতে পারেন বলেছি।

তবে এখানে একটা গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে না?

গণ্ডগোল কি একটা? চার্লি কিছুই তার বাবাকে বলছে না, বললেও কাপ্তান ঢোক গিলে হজম করছেন। মুখোশের কথা জাহাজে চাউর হয়ে যাক, চান না। এতে তাঁর নিজেরও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে।

বিপদ? কীসেব বিপদ?

তা তো জানি না। শোন, কাল সকালেই আমি বের হয়ে যাচ্ছি। জাহাজে ফিরতে রাত হয়ে যেতে পারে। তোরা সাবধানে থাকবি। বংশীকে ভাল ঠেকছে না। উন্মাদ হয়ে গেছে। বাংকারে আগুন লাগাবার চেষ্টা করছিল। নির্বোধ। কয়লায় আগুন ধরে গেলে রক্ষা আছে। ব্যাটা নিজেও পুড়ে মরতে পারে। জাহাজে আগুন ধরিয়ে সব অপদেবতাদের নাকি ভাগাতে চায়! জাহাজটা জ্বলে গেলে অপদেবতারাও সব পুড়ে মরবে। বোঝো এবার কী নিয়ে আমরা জাহাজে আছি! তবে কাউকে বলতে যাস না। বংশীকে নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। বাতিল-ঘরটায় বংশীকে নির্বাসনেও পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। এত বড় অপরাধের শাস্তি জাহাজে কী, আমি নিজেও জানি না।

সুবঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, মজার ব্যাপার! মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন, আবার পেছনে লোকও লাগিয়ে রেখেছেন। কী রাগ হচ্ছে না। তার সঙ্গে কলিজ জাহাজের সুড়সুড়ি, গুপ্তধন, সি-ডেভিল লুকনোর—আছি বেশ।

কলিজ জাহাজে কোনও গুপ্তধন যদি থাকে! থাকা অস্বাভাবিক না। এই গুপ্তধনের খোঁজে কাপ্তান মিলার রিফ এক্সপ্লোরারে হয়তো যাবেন। নিউ-প্লাইমাউথেই খবর পেয়েছিলেন হয়তো, রিফ এক্সপ্লোরার প্রবাল-সমুদ্রের তলদেশে গবেষণার কাজ চালাতে যাচ্ছে। খবরেব কাগজে যে-কোনও অভিযানের কথাই ফলাও করে প্রচারিত হয়। ছবি-টবিও প্রকাশ করা হয়।

কাপ্তান মিলার যোগাযোগ করে হয়তো জেনেছেন, জাহাজডুবিব জায়গাতেই তারা অনুসন্ধানের কাজ চালাবে। সঙ্গে পাঁচজন ডুবুবি এবং গবেষণাগারও থাকছে। অ্যালেন পাওয়ারের চিঠিটি আব-একবার ভাল করে দেখা দবকার। ফিল কলিজ জাহাজেব ধ্বংসাবশেষই বা পাহাবা দিচ্ছে কেন! যাই হোক কলিজে এমন কোন গুপ্ত ব্যাপাব আছে যা ফিলিপ এবং কাপ্তান মিলার দু'জনেই জানেন।

বেশ রাত হয়ে গেছে ফিরতে। সুরঞ্জনকে আগে নৌকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন মুখার্জি। জাহাজে একসঙ্গে উঠে যাওয়া বিপজ্জনক। সুরঞ্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। নাটকটা জমেও গেছে। কাজেই তিনি পরের নৌকায় জাহাজে উঠে এলেন। সুহাসকে সব বলা দবকার। চার্লিকেও।

চার্লিও কোনও বড় রকমের ষড়যন্ত্রের শিকাব। মুখার্জি এটাও কেন যে না ভেবে থাকতে পারছেন না! একটি স্বাভাবিক জীবনকে এভাবে অস্বাভাবিক করে রাখাব কী হেতু থাকতে পারে? চার্লিকে বলা দবকার, সেকেন্ড মুখোশ পরে তোমাকে অনুসরণ করছে। কেন করছে? সে তো এমনিতেও অনুসরণ কবতে পারত। মুখোশের দরকার হচ্ছে কেন? সামনাসামনি পড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবাব ভয়। তাই কি কখনও হয়? কত রকমের অজুহাত সৃষ্টি কবা যায়। মুখোশ পরাব দরকাব হচ্ছে কেন! লোকটা কি কোনও বিকৃত রুচির শিকার!

কী কারণ! খুলে বলো চার্লি। নিশ্চয় কিছু জানো তুমি, বলছ না। কেন বলছ না, কেন বলতে পাবছ না? বিফ এক্সপ্লোরারে কি তুমি যাচ্ছ? যাচ্ছ মানে, কাপ্তান কি তোমাকে সঙ্গে নেবেন? নিলে খুব ভাল হয়। দ্যাখো চার্লি, অকপট না হলে আমবা কিছুই করতে পারব না। তাবপব কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। চার্লিকে জেরা কবার কোনও অধিকারই নেই তাঁর। তিনি জাহাজেব সামান্য কোয়ার্টাব-মাস্টার। তার উপর নেটিভ ইন্ডিয়ান। চার্লি সাহায্য না চাইলে তিনি আগ বাড়িয়ে কিছুই কবতে পাবেন না।

সুহাস পারত। সে তো গ্রাহ্যই কবছে না। এমনকী চার্লি সম্পর্কে কোনও খববও আব দিচ্ছে না। উলটে তাঁকেই সন্দেহ করছে। কী যে করা।

জাহাজে উঠে ফোকশালে ঢুকে গেলেন মুখার্জি। রাত বাবোটা থেকে সকাল আটটা একটানা গ্যাংওয়েতে ওয়াচ দেবেন। ডেক-সারেং বাজি হয়েছেন। রাত জাগতে কার আব ভাল লাগে! তাব দু'জন জুড়িদার। তারাও খুশি। হঠাৎ মুখার্জিবাবুর মাথায় পোকা ঢুকে গেল কেন, তাবা ভেবে পাচ্ছে না হয়তো। যাই হোক এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে সুহাসেব সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাঁর ফোকশালে ডেকে পাঠালে সুহাস দৌড়ে চলেও আসবে।

তিনি নীচে নেমে দেখলেন, ডেক-জাহাজিরা অনেকেই জাহাজে ফেরেনি। বংশী কোথায়! বংশীও তো নেই। সে গেল কোথায়? ছোট-টিন্ডাল বলল, বংশীকে নিয়ে অধীব কিনাবায় গেছে।

ঘড়ি দেখলেন তিনি। রাত ন'টা বাজে। সুহাস কোথায়! সেও কি কিনার থেকে ফিরে আসেনি? এত বাত কবছে ছোকরা! সবাই না ফিরলে হাত-মুখ ধুয়ে রাতের খাওয়াও সারা যাচ্ছে না।

অধীর বংশী সিঁড়ি ধরে তখন নেমে আসছে। বংশী ফিরে আসায় কিছুটা যেন হালকা হতে পারলেন, সুহাস ফিরে এলে উদ্বেগ আরও কমে যাবে।

ফোকশালে তিনি ঢুকে কিনারার পোশাক খুলে ফেললেন। পাতার টুপিটা মাথায় আছে। ওটা খুলে হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। সুযোগ বুঝে টুপিটা সুরঞ্জনকে ফিবিযে দিতে হবে। না দিলেও সুরঞ্জন কিছু মনে কববে না। টুপিটা বরং রেখেই দেবেন ভাবলেন। প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন। দরকাবে সুরঞ্জন না হয আর-একটা পাতার টুপি কিনে নেবে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

তিনি উঁকি দিলেন।

ডেক-টিন্ডাল এবং দু'জন ডেক-জাহাজি কিনার ঘুরে এল। একজনের মাথায় একটা বস্তা।

তখনই দেখল, সুরঞ্জন আর সুহাস সিঁড়ি ধরে একসঙ্গে নামছে।

খেতে বসে পাতে শাক পেয়ে সবাই খুশি। কিনার থেকে কেউ শাক তুলে এনেছে। মাংস কেউ ছুঁয়েও দেখল না। টাটকা মাছের ঝোল, হোক না সামুদ্রিক মাছ, তবু টাটকা শাক-সবজি মাছ খাওয়ার আনন্দই আলাদা। সবার একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল। নীচে নামার সময় মুখার্জি সুহাসকে ইশারায় তার ঘরে যাওয়ার কথা বলে গেলেন।

দরজা খোলাই ছিল। তবু সুহাস একবার টোকা দিল।

মুখার্জি বললেন, আয়।

সুহাস ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মুখার্জিদার কড়া হুকুম, দরজা খুলে কোনও কথা নয়। দরজা বন্ধ করে কথা।

সে বলল, হঠাৎ ডাকলে?

বোস। কথা আছে।

সুহাস বলল, আমারও কথা আছে।

কাগজের প্যাকেটটি মুখার্জি দেখতে পাননি। মুখার্জিকে অবাক করে দেবার জন্য হাত পেছনে রেখে সুহাস কথা বলছিল। পরে কাগজের প্যাকেটটি এগিয়ে দিল।

কে দিল!—মুখার্জি কিছুটা অবাক।

তারপর বললেন, কী আছে এতে?

কী আছে খুলে দ্যাখো না। কলিজ নিয়ে তো তোমার মাথা খারাপ। কলিজ-রহস্য—খুলে দ্যাখো না।

তিনি প্যাকেটটি উলটে-পালটে দেখলেন। বিশ্বাসই হচ্ছে না। কলিজ-রহস্য সুরাহা করার জন্য তাকে কেউ কিছু দিতে পারে! বললেন, কে দিল?

চার্লি। চার্লি হাতের কাছে যা পেয়েছে দিয়েছে। তোমার যদি কাজে লাগে?

চার্লি আমাকে দেখতে দিয়েছে, না তোকে।

আচ্ছা ফিচেল লোক তো তুমি! তুমি এত জেরা করছ কেন বলো তো! চার্লি তো সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। সে আমাকে দিল কি তোমাকে দিল, কী আসে যায়!

যাক, তবে সুহাসের তার প্রতি আর কোনও সংশয় নেই। চুউপ বলায় সুহাস খুবই খেপে ছিল। ছোঁড়ার মাথা ঠান্ডা হয়েছে।

খামের ভিতরে একগাদা ছবি। কলিজ জাহাজের ছবি। জাহাজটা ডুবছে, তার ছবি। অসংখ্য সেনা সিঁড়ি বেয়ে আত্মরক্ষার জন্য নামছে, সাঁতার কাটছে, লাইফবোট দুলছে ঢেউয়ে। উদ্ধারকার্যের এমন যাবতীয় ছবি দেখতে দেখতে সহসা মুখার্জির মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল। বললেন, চার্লি এই সব ছবি বইপত্র কোথায় পেল?

জানি না। কিছু বলেনি। ঘোড়ায় চড়তে পারছি না বলে খেপে আছে। কথা বন্ধ। আমি আনাড়ি. আমার কিছু হবে না। যা মুখে আসে বলল। দ্যাখো না।

বলে সে তার হাত পা জামা প্যান্ট টেনে দেখাল। ছাল-চামড়া উঠে গেছে। সে চেষ্টা করছে। চার্লি সহজে ছাড়ছে না এও বুঝতে পারলেন মুখার্জি। খুশি হলেন। বললেন, হয়ে যাবে।

জানো, উঠে বসতে পারছি। কিন্তু ঘোড়া কদম দিলেই কেমন মাথা ঘুরতে থাকে। কেবল মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেলাম।

ও ঠিক হয়ে যাবে। আমারও হত। সাইকেল আর ঘোড়া, একবার চড়ে বসতে পারলে ঠিক তরতর করে পালে হাওয়া লেগে যায়।

সুহাস কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলতে গিয়ে, জানো, চার্লি না বাতাসের আগে ছুটতে পারে। ইস, কোনও ভয়ডর নেই। ঘোড়াটার পেটে গুঁতো মারলেই হল। লাগাম ধরে কোনদিকে কীভাবে টানলে খুশিমতো ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাও দেখাল। আচ্ছা, তোমরাই বলো, এক-দু'দিনে হয়!

মুখার্জি পাতা উলটে যাচ্ছেন। আর ছবি দেখে বলছেন, কলিজ জাহাজে দেখছি একটা বিশাল লাউনজও আছে। প্রমোদ-তরণীর খোলনলচে পালটে ফেললেও লাউনজ দেখছি অক্ষত রেখেছিল।

আরে দেখছিস? এই সুহাস, দ্যাখ লাউনজের দু'পাশে দুটো গ্রিক দেবীর মূর্তি। ঘোড়ার পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুই নারী। লাউনজের ছবিটা দেখেছিস। বলে সুহাসের সামনে এগিয়ে ধরলেন ছবিটা।

প্রমোদ-তরণীর লাউনজে ফুর্তিফার্তাও চলত। জোড়ায় জোড়ায় সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষ। কারও চোখে চশমা, হাঁটুর উপর সংবাদপত্র। পায়ের উপর পা তুলে বসে আছেন। কেউ একা নিবিষ্ট মনে তাস খেলছেন। ওদিকটায় দ্যাখ, থামের আড়ালে নারী-পুরুষ কত ঘনিষ্ঠ, টেবিলে টেবিলে হুইস্কি, শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, আর মাথার উপর দুই নারীমূর্তি আর একশিঙ্গি ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়ার আবার শিং হয় কখনও!

ঘোড়াটা দেখেছিস? আরে দ্যাখ না!

দেখেছি।

এটা আবার কী রকম ঘোড়া! ঘোড়ার কখনও শিং থাকে? তাও আবার একটা শিং।

সুহাস ছবিটা দেখে বলল, এটা ঠিক ঘোড়া নয়। চার্লি তো বলল, ওটা গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত এক রকমের একশিঙ্গি অশ্বাকৃতি কল্পিত জন্তুবিশেষ। ওটা ঠিক ঘোড়া নয়।

লাউনজের ছবিটা খুবই আকৃষ্ট করছে মুখার্জিকে। তিনি ঝুঁকে দেখছেন। সুসজ্জিত বিশাল কক্ষ, কারুকাজ করা থাম, আলোর বাহার। নাচের আসর বেশ জমে উঠেছে। ছবিটা দেখলে এমনই মনে হবার কথা। চারপাশে সম্ভ্রান্ত পোশাকে নরনারীর নানা ভঙ্গিমার ছবি। কার্পেটের নীল রংটাও যেন খুব তাজা। থামের আড়ালে এক জোড়া দম্পতি উঁকি দিয়ে কী যেন দেখছে। তাঁর কেন যে মনে হল একশিঙ্গি ঘোড়া তাদের কোনও কারণে কৌতূহল উদ্রেক করছে। শিল্পীর তারিফ করতেই হয়। নেহাতই ছবি, না কোনও ফলক অথবা ঢালাইয়ের কাজ করা কোনও ভাস্কর্য, বোঝা কঠিন। নারী দু'হাত মেলে দিয়ে যেন ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়ে যেতে চাইছে।

কোনও দুর্মূল্য ভাস্কর্য কি না কে জানে!

আসলে চার্লির বাবা কাপ্তান মিলার হয়তো সুযোগ খুঁজছিলেন। সমুদ্রের তলায় কলিজ জাহাজে অনুসন্ধান চালাতে হলে ডুবুরির দরকার। খুবই ব্যয়সাপেক্ষ বলে রিফ এক্সপ্লোরারকে দিয়ে যদি কাজটা ফাঁকতালে করিয়ে নিতে পারেন। আর কিছু না পারলেও কলিজ কতটা জলের তলায় এবং ডাঙা থেকে কত দূরে, কীভাবে জলের তলায় ডুবে আছে তার মোটামুটি একটা হিসাব পেয়ে যেতে পাবেন।

আর যদি কোনও গুপ্তধন কিংবা দুর্মূল্য ভাস্কর্য উদ্ধারের ব্যাপার থাকে তা হলেও রিফ এক্সপ্লোরারের সাহায্য নিতে পারেন। তারপরেই মনে হল অত বোকা নন তিনি। গুপ্তধন উদ্ধারে তিনি তার নিজের লোকজনের উপরই বেশি নির্ভর করবেন। প্রাথমিক কাজটুকু সেরে নেওয়ার জন্য তিনি রিফ এক্সপ্লোরারে হয়তো যাচ্ছেন।

তবে কলিজ জাহাজের সঙ্গে চার্লির অস্বাভাবিক জীবনযাপনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে এটা কিছুতেই তাঁর মাথায় আসছে না।

তবু যা হোক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পাওয়া গেল।

তারপরেই কী ভেবে মুখার্জি সুহাসকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, তোকে এগুলি চার্লি দেখতে দিল কেন?

বলল, কলিজ জাহাজের খবর চেয়েছিলে, এগুলি পেলাম। চার্লি তো আর কিছু বলল না, আগেও তো দিয়েছে।

চার্লি জানে খবরটা আমার জানা দরকা'র? তোর নয়?—মুখার্জি পাতা উলটে যাচ্ছেন কাগজটার, তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

তা জানে কি না জানি না। বললাম না, চার্লি ভাবে, নিশ্চয়ই আমার কোনও জরুরি দরকার আছে।

দরকারটা কীসের, এমন প্রশ্ন চার্লির মনে উদ্রেক হবে না! হঠাৎ কেন কলিজ নিয়ে পড়লি, তার সংশয় হবে না। কোনও প্রশ্ন না করেই তোকে দিয়ে দিল। তার বাবার বিপদ হতে পারে। ধরা পড়লে যে আরও দু'-একটা খুন হবে না জাহাজে কে বলতে পারে?

সুহাসের মুখ বড় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। সে কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, তা হলে দিয়ে দাও। সকালেই

ফেরত দেব। বলব, না আমার কোনও দরকার নেই। কলিজ নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই বললেই হবে।

মুখার্জি হেসে ফেললেন, তোর না থাকলেও তার আছে। আর তুই যতই মনে করিস, আমাকে ভাল জানে না, মুখ চেনা, আর দশটা জাহাজির মতোই হয়তো আমাকে ভাবে, আমি কিন্তু তা মনে করি না। চার্লি জানে জাহাজে আমরা সংখ্যায় বেশি। শুধু বেশি নয়, সংখ্যায় প্রায় আমরা ওদের দশগুণ। কোনও বিপদে তোর পেছনে আমরা সবাই আছি এটা সে ভালই বোঝে। তোর পেছনে থাকা মানে, চার্লির বিপদেও আমবা আছি। এটাও সে ভালই বোঝে। তুই যাই নিয়ে আসিস না কেন, সে বোঝে, একা তুই দেখছিস না, আবও কেউ কেউ দেখছে। মুখে বলতে হয় বলা, দ্যাখো সুহাস, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। টের পেলে সাংঘাতিক কিছু যে ঘটে যেতে পারে না সে তা ভালই জানে। তোকে সাবধান করে দিযে আসলে ইঙ্গিতে সবাইকে সাবধান করে দেয়। বুঝলি কিছু?

সুহাস জবাব না দেওয়ায় তিনি তার দিকে তাকালেন। সুহাস এত জটিল ব্যাপার-স্যাপার ভাল বোঝেও না। সে খুবই কাতর হয়ে পড়ে। মুখ দেখলে মায়া হবারই কথা। তখন মুখার্জির খুব খারাপ লাগে। সুহাস যে খুব ঘাবড়ে গেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তবে একেবারে আনাড়ি সুহাসকে তিনি ভাবতে পারেন না। ম্যাকের পকেটে স্ত্রীর ছবিটাই তার প্রমাণ। সুহাসই বলেছিল, উইনচে কাজ করতে যাবার সময় সে তার স্ত্রীর ছবি রাখবে কেন বলো? নিরাপদ জায়গায় সে কখনও স্ত্রীর ছবি রাখে না। ভিতু স্বভাবের কি না জানি না, তবে ছবিটা পকেটে থাকায় আমার মনে হয়েছে, জাহাজে কিছু ঘটছে এমন আঁচ করছিল।

মুখার্জি হাওয়া-পাইপ ঘুরিয়ে দিলেন। বেশ ঠান্ডা লাগছে। উঠে গিয়ে লকার খুললেন। লকারে সব রেখে দিলেন যত্ন করে। বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। জিজ্ঞেস করবি অ্যালেন পাওয়ার বলে কাউকে চেনে কি না চার্লি। চিনলে, সে কবে কখন তাকে কোথায় দেখেছে? অ্যালেন কাপ্তানকে চিঠি দেয়। তাকে দেয় কি না, তাও খবর নিবি। অ্যালেন তার আত্মীয় কি না, কিংবা অ্যালেন তার বৈমাত্রেয় ভাই-ভগিনীপতিদের কেউ যদি হয়! নামটা মনে থাকবে তো? যদি মনে করতে না পারে বলবি, বোথ-বে-হারবার থেকে অ্যালেনের চিঠি আসে। কলিজ সম্পর্কে সে অনেক খবর রাখে। মনে হয় মার্কিন সামরিক দপ্তরে কাজ-টাজ করে।

একটু থেমে বললেন, মনে থাকবে তো নামটা?

অ্যালেন পাওয়ার।

বেশ তো মনে রাখতে পারিস। ম্যাকের পকেটে স্ত্রীর ছবিটা রাখার ব্যাপারে তোর ধারণাই সত্য। তোর বুদ্ধিব সত্যি তারিফ করতে হয়। ম্যাক জানত, ডেরিক কারও মাথায় ভেঙে পড়বে। সে নিজে গিযেছিল ডেরিক তুলতে। গভীর রাতে ডেকে তখন অন্ধকার। লগবুক ঘেঁটে দেখলাম, জেনারেটার অচল, স্ট্যান্ড-বাই জেনারেটারও চালু করা যায়নি। লগবুক ঘেঁটে উদ্ধার করেছি। অন্ধকারেই কাজটা সারা হয়েছে। শোনপাটের হলুদ রঙের দড়ির বাকি অংশটা পাওয়া গেছে। ওতে রক্তের দাগ আছে। অন্ধকারে ছুরি দিয়ে দড়ি কাটতে গিয়ে হাত-ফাত কেটেছে মনে হয়। রক্তে মাখামাখি দড়িটা। খুনি হাতে খুবই বড় রকমের চোট পেয়েছে।

দড়ির বাকি অংশটা কার কাছে আছে?—সুহাস না বলে পারল না।

যেখানেই থাক ঠিকই আছে। যে রেখে দেবার সে ঠিকই রেখে দিয়েছে। বেচারা ম্যাক জানতই না সে তার নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। খুব খারাপ লাগে ভাবলে।

সুহাস বলল, ম্যাককে খুন করে কী লাভ!

লাভ কী জানি না, তবে ম্যাক টের পেয়ে গেছিল, চার্লি মেয়ে।

হয়তো চার্লির আচরণে আততায়ী টের পেয়েছে, নয়তো চার্লি তার বাবাকে কোনও নালিশ দিয়েছিল। আচ্ছা, হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কাউকে কখনও দেখেছিস?

নালিশ কেন? হাতে ব্যান্ডেজ। কিছু বুঝছি না।

বলতে পারে, ম্যাক যখন-তখন আমার কেবিনে ঢুকে পড়ছে। আরও কিছু বলতে পারে। চার্লির সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। কিন্তু কোথায় কীভাবে কে নজরদারি চালাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না।

শেষে খুনের সূত্র খুঁজতে গিয়ে নিজেই না আবাব হজম হয়ে যাই।

সুহাস বলল, আচ্ছা, তুমি কী বলো তো! ম্যাক অসময়ে ডেরিক তুলতে কেন যাবে! তার কী দরকার?

সে কি আর নিজে গেছে? তাকে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় তিনি তাব ওপরওয়ালা। এমন ওপরওয়ালা যাকে যমের মতো ভয় পেত ম্যাক। অন্ধকাবে ডেরিক তোলার কী মানে, ফসকা গেরো দেবার কী মানে সে সবই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার হুকুম পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুধু তাই না। হুকুম গোপন করারও শর্ত ছিল বোধ হয়।

সুহাস সহসা খুবই অধীর হয়ে পড়ল, আচ্ছা কী বলছ বলো তো, জেনেশুনে সকালবেলায় সে ডেবিকের নীচে গিয়ে তবে কাজ করতে পারে! হয় কখনও? সে তো জানে, যে-কোনও সময় ডেরিক পড়ে যেতে পারে মাথায়।

সে জানে, তবে সে ভাবেইনি, তাব মাথায় ডেরিক খুলে পড়বে। হ্যাঁ, সংশয় ছিল, কখন না খুলে পড়ে! পকেটে ছবিটা রেখেছিল।

তাহলে আমি খুন হতে যাচ্ছি, ম্যাক টেব পেয়েছিল?

মনে হয়।

সহসা সুহাস চিৎকার করে উঠল, কেন? কেন আমি খুন হতে যাব? আমি কী করেছি? আমার কী দোষ!

মুখার্জি ওকে টেনে বসালেন। জাহাজ নোঙব ফেলে আছে বলে নিঝুম। একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনার কথা। সিঁড়ি ধরে কেউ নেমে এলেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। দুপদাপ শব্দ। উপরের ছাদে হাঁটাহাঁটি করলেও টের পাওয়া যায, এমন এক করুণ নৈঃশব্দেব ভিতব এই চিৎকার করে ওঠা কতটা মারাত্মক হতে পাবে সুহাস যদি বুঝত।

দোষ তোমার চার্লির প্রেম। চার্লি তোমাকে ভালবাসে।

প্রেম বলছ কেন? আবার চার্লি! চার্লি মেয়ে তোমরা ধরেই নিয়েছ?

নিয়েছি। তোকে রক্ষা করাব উপায় চার্লিই বাতলাতে পাবে। ইচ্ছে করলে চার্লিকে তুই অ্যাভয়েড করতে পারিস। কিন্তু চার্লি ছাডবে না। তোকে না দেখলে তাব মাথা খাবাপ হয়ে যায়। কিছুটা মনে হয় হিস্টিরিয়াগ্রস্থও হয়ে পডতে পারে। ঝড়ের বাতে গভীব বাতের অন্ধকারে যে নারী ডেকে বেড়াতে পাবে সে যে তার অবদমিত ইচ্ছার প্রকোপে ঘোবে পড়ে যায়। সে তার অবচেতন সত্তায় প্রস্ফুটিত হতে চায়। সে তো জানে না আসলে সে কী কবছে! সে কিছু করে বসলে বলারও থাকবে না।

কিছু কবে বসলে মানে?

সে মেয়েদের পোশাক পরে তোব কেবিনে গট গট করে নেমে আসতে পাবে। চিৎকার করে বলতে পাবে, মি গার্ল সুহাস। আমাকে ষডযন্ত্রকাবী জোর কবে ছেলে সাজিয়ে বেখেছে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে এতদিনের সতর্কতা সব যাবে। এবং তার জন্য বড খেসাবতও দিতে হতে পারে যারা তাকে জোব করে মেয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

তুমি কী বলছ!

ঠিকই বলছি। আমার মাথার মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া চলছে। তোকে ছাডা তারা চার্লিকে শান্তও রাখতে পারবে না। কোনও দুর্ঘটনায় তোর মৃত্যু হলে চার্লি শোকে মুহ্যমান হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কাউকে দায়ী করতে পারবে না, সেজন্য বার বার ফাঁদ পাতা হতে পারে। তোর ক্ষতি করা সহজ কাজ না ষডযন্ত্রীরা ভালই বোঝে।

সুহাসের গলা খুবই নির্জীব শোনাল।

তা হলে ঘোড়ায় চড়া আমার ঠিক হবে না বলছ?

কেন ঠিক হবে না!

ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যদি মরে-টরে যাই?

ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অত সহজে কেউ মরে না। আর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যদি সত্যি মারা যাস, তবে তোর মরাই ভাল।

চার্লির সঙ্গে একা বের হতে কি বারণ করছ?

না, তা করব কেন?

কী করি বলো তো?

কিচ্ছু করতে হবে না। যা বলছে করে যা। আমাদের লোক তোর পিছনে পাহারায় থাকবে।

কে?

কে জেনে লাভ কী? থাকছে। থাকবে। চার্লি কেন, কোনও দুরাত্মাও বুঝতে পারবে না, তারা তোমায় অনুসরণ করছে। আমিও এক সময় করেছি।

জানি।

তারপর থেমে বলল, মুখোশধারী তবে তুমি?

না।

তবে মগড়া।

না।

তবে কে?

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব। সাবধান, কেউ যেন না জানে। চার্লিও না। মুখোশের সূত্র ধরেই আমরা এগোচ্ছি।

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব! সে কিছুতেই কেন জানি বিশ্বাস করতে পারছে না। মানুষটা দাম্ভিক চাপা স্বভাবের। তাদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলেনি। সারেংকেই ডেকে কাজ বুঝিয়ে দেয়। গঙ্গাবাজু ধরে হেঁটে এলে সেকেন্ড, জাহাজিরা যমুনাবাজু ধরে হাঁটতে থাকে। বেঁটেখাটো মানুষ, চোখ পিংলা, চুল পাতলা, সব সময় মনে হয় অদ্ভুত রাশভারী। সেই লোক এমন একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত, ভাবতেও খাবাপ লাগছে। সে উঠে পড়ছিল।

মুখার্জি বললেন, হাতে সময় নেই। চার্লি তার কাকার কোনও খবর রাখে কি না। রাখলে কোথায় আছেন তিনি। কী নাম? কী কাজ করতেন? সব জেনে নিবি।

চার্লির কাকা রাচেল জাহাজডুবিতে মারা গেছেন।

জাহাজডুবি। কোথায়? কবে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছেন মুখার্জি। তিনি স্থির থাকতে পারছেন না।

কোথায় মারা গেছেন! জাহাজের নাম কী!

তা জানি না।

কোন সমুদ্রে?

তাও জানি না।

তার নাম কি ফিল?

তাও জানি না। বলে তো আঙ্কল রাচেল। ফিল হবে কেন?

তবে কী জানিস? ঘণ্টা জানিস! এত করে বললাম, সব খবর নিবি। আমরা কী করব? একমাত্র তুই পারিস, তোর কাছেই চার্লি সব বলে। তার কাকার নাম জানতে হয় না? বুঝলি না, তার বাবা-কাকাকে সম্পত্তি থেকে তার ঠাকুরদা বঞ্চিত করেছেন। ত্যাজ্য পুত্র। এত বড় সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে! সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য একটা কেন, দশটা খুন করতে পারে। আমার মনে হয়, ক্ষমতা-পাগল আর অর্ধ-পাগল মানুষেরা সব পারে।

সুহাস উঠতে যাচ্ছিল, মুখার্জি বললেন, শোন, তোর জেনে রাখা ভাল। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার কোনও মনোমালিন্য হয়নি। ইচ্ছে করেই দু'জনে মিলে নাটক করেছি। আলাদা ফোকশালে না থাকলে গোয়েন্দাগিরি করার অসুবিধা হচ্ছিল। সুরঞ্জনকে ডাকি।

সুহাস বলল, এত রাতে ডাকবে? শুনলাম তুমি নাইটওয়াচ নিয়েছ। টানা আটঘণ্টা রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে না? একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে।

ও তোকে ভাবতে হবে না। সারাটা দিন ছুটি। রাত বারোটার আগে জাহাজে ফিরলেই হল।

দবকারে ওয়াচে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। আমার অভ্যাস আছে। দাঁড়িয়েও ঘুমোতে পারি। ঢুলে সারাক্ষণ বসে ঝিমোলে এত রাতে কে টের পাবে! টানা বারো-চোদ্দো ঘণ্টা কিনারায় ঘুবে বেড়াতে পারব। কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তারপরই কী ভেবে মুখার্জি বললেন, এবারেও কি চার্লি তোকে নিয়ে বুনো ফুল খুঁজে বেড়াবে? ঘোড়ায় চরা শেখাচ্ছে কীসের মতলবে?

সুহাস বলল, এখানে নাকি ঘুরে বেড়াতে হলে হয় সাইকেলে না হয় ঘোড়ায়। অন্য কোনও যানবাহনের সুবিধা নেই নাকি। চার্লি তো সাইকেল চালাতে জানে না। আমিও না। ঘোড়ায় উঠে কদম দিতে শিখলেই প্রায় শেখা হয়ে যায়। আবও কত কথা বলল, ঘোড়ার পিঠে চেপে বসতে পারলে সে নাকি কখনও বেইমানি করে না। চেপে বসাটা জানা দবকাব। বাকিটা ঘোড়া নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ছুটবে, ঝোপজঙ্গল ডিঙিয়ে যাবে, কিছুতেই ঝেড়ে ফেলবে না পিঠ থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরবে, তবু না।

মুখার্জি হাসলেন। বললেন, আমি অশ্ব-বিশাবদ নই। আমি জানব কী কবে! চার্লিব বাপ ঠাকুরদা ঘোড়ায় চড়ে মানুষ। সে আমার চেয়ে ভাল জানবে। গত সফরে কোনওবকমে টানাহ্যাঁচড়া কবে শিখে ফেলেছিলাম। এ সফরে দেখা যাক কতটা পারি।

তারপর থেমে বললেন, চার্লিকে এখুনি মুখোশধাবীব নাম বলা ঠিক হবে না, সে ঘাবড়ে যেতে পারে। চার্লি কি আজ কিছু টের পেয়েছে?

না তো! কী টের পাবে?

বব মুখোশ পরে আজও জঙ্গলে বসে ছিল। টের পায়নি?

বলছ কী! আমি তো দেখলাম, মগড়া জঙ্গল থেকে নেমে যাচ্ছে। ডাকতেই ছুটে পালাল।

কলিজ জাহাজডুবির জায়গাটার নাম সহসা মুখার্জি গুলিয়ে ফেললেন। তালপাতাব টুপি মাথায়। রোদ বেশ প্রখর। তিনি ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে যাচ্ছেন। বাস্তার দু'ধাবে কিছু বসতি আছে দেখতে পেলেন।

এদিকটায় দুটো টিলা ছিল, হয়তো ফসফেট কোম্পানি টিলার সব মাটি সরিয়ে নিয়েছে। দ্বীপেব এই একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় লুণ্ঠন হচ্ছে বলা চলে। টিলা দুটো দেখতে পেলেন না। বাস্তায় সাব সাব ঘোড়ায় টানা মালগাড়ি দেখতে পেলেন। কাঠের বাক্সমতো, ফসফেট বোঝাই হয়ে খাঁড়ির দিকে যাচ্ছে। বাঁশের জঙ্গল দু'পাশে, অনাবাদি জমিগুলিতে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে।

ঘাসের জমিগুলি পার হয়ে তিনি দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন ভাবলেন। জায়গাটার নাম কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। ঘোড়ার লাগাম টেনে পকেট থেকে ডাইবি বের করলেন।

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে থাকা সহজ না। অভ্যাস না থাকলে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। তবু তিনি ডাইরির পাতা উলটে দেখলেন, জায়গাটার নাম এসপিরিতো সান্তু। সান্তু জায়গাটা কোথায়? কাছে কোথাও কি? তিনি মনে করতে পারলেন না, ফিলের বাড়ির টিলায় দাঁড়িয়ে কাছে কোথাও কোনও দ্বীপ দেখতে পেয়েছিলেন কি না!

সামনে কিছুটা জলাভূমি। সমুদ্রের জল ভাটার সময় এখানে হাঁটুব উপর থাকে না। ক্রোশ খানেক জলাভূমি সহজেই পার হয়ে যাওয়া যায়। তারপর কিছুটা চড়াই, পাথরের মালভূমিব মতো জায়গাটা। ক্যাকটাস আর সব নাম না জানা গাছ। আখের চাষ হয় এদিকটাতে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে তিনি সেবারে মাইলের পর মাইল আখের চাষ দেখেছিলেন। আখের জমিগুলির পাশ দিয়ে উঠে গেলে ঘণ্টাখানেকের পথ।

সমুদ্র বাঁদিকে পড়ে থাকল। কাছাকাছি কোথাও জাহাজ দেখতে পেলেন না। মোটর লঞ্চে মাদাং যাচ্ছে কিছু যাত্রী এবং পণ্য। দুটো ঘোড়াও লঞ্চে দেখতে পেলেন। এই অঞ্চলের একমাত্র যানবাহন এখনও ঘোড়া। তবে এবারে তিনি রাস্তায় ফসফেট কোম্পানির গাড়ি দেখতে পেয়েছেন। দ্বীপটার যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখে ভালই লাগছিল। আখের জমিগুলি পার হতেই দেখলেন, রাস্তার পাশে তামার ফলকে লেখা—গো আপ, ওঃ মাই ওয়ারিয়ার্স এগেনস্ট দ্য ল্যান্ড অফ মেরাথাইম অ্যান্ড

এগেনস্ট দ্য পিপল অফ পিকো। তামার ফলক দেখে মুখার্জি কিছুটা অবাক হলেন। কীসের সংকেত এটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। যেন কেউ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ফলকে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে। গেল সফরে তামার এই সাইনবোর্ডটা ছিল কি না মনে করতে পারছেন না। ফলকের নীচে মাইলের হিসাব। খাঁড়ি থেকে দূরত্ব বোঝাতে চাইছে, না ফিলের প্রাসাদের দূরত্ব এই ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখার্জি তাও বুঝতে পারছেন না।

পাশে সুন্দর কাঠের গির্জা, কিন্তু কোনও লোকালয় আছে বলে মনে হল না। নীচে যতদূর চোখ যায়, বিশাল সব গাছের অরণ্য। একেবারে দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে। সহসা কেন যে মনে হল হয়তো এখান থেকেই ফিলের এলাকা শুরু।

এদিকটায় রাস্তা বেশ চওড়া। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। মসৃণ। যুদ্ধের সময়কার, না নতুন, তাও বুঝে উঠতে পারছেন না। ফিলের নির্দেশ মতোই সেবারে তিনি গিয়েছিলেন।

সমুদ্রের কিনারা ধরে যাবে। সমুদ্রের ধারে আমার বাড়ি। রাস্তা হারিয়ে ফেললে সমুদ্রের দিকে চলে যাবে। অলওয়েজ অ্যাট লেফট—মনে রাখবে। সমুদ্র বাঁদিকে থাকলে রাস্তা হারাবার ভয় থাকবে না।

এই দ্বীপগুলির সৌন্দর্য এমনিতেই মুগ্ধ করে, কিছু সারস পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দুটো ইগল পাখিও দেখতে পেলেন। কাক, চড়াই এবং শালিখ পাখিও ওড়াউড়ি করছে। জঙ্গলে এক ধরনের ছোট্ট নীল রঙের বাঁদর ছুটোছুটি করছে। নানা জাতের সরীসৃপও আছে। তবে রাস্তায় কিংবা জঙ্গলে তাদের দেখা পাওয়া গেল না। প্রাগৈতিহাসিক জীবের উত্তরসূরি এরা, ফিল তাকে এমনই বলেছিলেন। তিনি এই টিলাটায় উঠেও দেখলেন, সমুদ্রে তাঁর বাঁদিকেই আছে।

নীচে পাহাড় সোজা নেমে গেছে, দূরে কোথাও বড় জাহাজ চোখে পড়ছে না। রিফ এক্সপ্লোরার জাহাজটির কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর সামনেই আবার একটি তামার ফলক, লেখা-- শাউট উইদ জয় বিফোর দ্য লর্ড, ওবে হিম গ্ল্যাডলি, কাম বিফোর হিম, সিংগিং উইদ জয়।

আশ্চর্য, এ তো অদ্ভুত কথাবার্তা! কে লিখে রেখেছেন? কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ, না সরকার থেকে এমন সব ঈশ্বর-ভজনার কথা প্রচার কবা হচ্ছে, তিনি বুঝতে পারছেন না। এই দ্বীপগুলি ব্রিটিশদের। সরকার মনোনীত একজন কমিশনারের অধীন। নিউ ক্যাসেলে তার অফিস। তবে সবই শোনা কথা। দু'-আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে বসে দ্বীপগুলি শাসন করাও কঠিন। অসংখ্য এমন সব কত দ্বীপ আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পদচিহ্নই পড়েনি।

তিনি যত এগুচ্ছেন তত ফলকের সংখ্যাও ক্রমে বেশি দেখতে পাচ্ছেন। ফলকগুলি ঝক ঝক করছে। তামার না পেতলের, এটা অবশ্য তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে অনুমান করতে পারছেন না। একটা পাথরের উপর বসানো ফলকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাত দিলেন। তবে তামার না পেতলের, বোঝা গেল না।

তিনি কি রাস্তা ভুল করলেন, গত সফরে এ ধরনের কোনও ফলক কি চোখে পড়েছে! কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তাঁর জলতেষ্টা পাচ্ছে, বোতল খুলে জল খেলেন। এখানে মিষ্টিজলের অভাব। শীত আসছে, বোধহয় কিছুটা হেমন্তের কাছাকাছি ঋতু। তবু রোদ প্রখর। তাঁকে আবার ফিরতে হবে বলেই সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন। কিছু লোকালয় পার হয়ে গেলেন।

এদের জগাখিচুড়ি ইংরাজি না বুঝলেও ফিলের কথা বলায় সবাই যে কীভাবে সাহায্য করবে, কেউ কুর্নিশ পর্যন্ত করছে তাকে। পারলে তাকে আপ্যায়ন করে ঘরেও নিয়ে যেতে চাইছে। মিস্টার ফিল নামটার বোধ হয় খুব আর পরিচিতি নেই, তবে খাঁটি গোরা সাহেব এবং পাদ্রিবাবা বলতেই লোকগুলি তার ঘোড়ার পেছনে ছুটতে থাকল।

বাড়িগুলি অধিকাংশ কাঠের। মাথায় টালির ছাউনি। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ। প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখানে নতুন করে মানুষ যেন নতুন প্রেরণার উৎস থেকে ঘরবাড়ি বানিয়ে, চাষ আবাদ করে একটি ছিমছাম পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইছে। মুখার্জি সেবারে ফিরে বেডরুমে পাদ্রির পোশাকও আবিষ্কার করেছিলেন।

ফিল কি তবে ধর্মযাজক!

তিনিই কি এইসব বাণী প্রচার করছেন ঈশ্বরের। হাজার-হাজার মাইল ব্যাপ্ত সমুদ্রে কি তিনি সেই

কোনও সন্তের মতো নীল লণ্ঠন হাতে নিয়ে দুর্গম পথ পরিক্রমায় বের হয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে অ্যালেন পাওয়ার বর্ণিত ডুবুরি মানুষটির সঙ্গে ফিলের সম্পর্ক কোথায়? দেয়ালে ডুবুরির পোশাক ঝুলতে দেখেই তিনি দু'জনকে এক লোক ভেবে গুলিয়ে ফেললেন? নিজের এই অবিবেচক চিন্তা-ভাবনার প্রতি তাঁর কিছুটা করুণা হল। অকারণ সময় নষ্ট করা যায় না। তবু ভাবলেন, একবার যখন এসেই গেছেন, দেখা করে যাওয়া ভাল। তা ছাড়া ফিলের খুবই প্রভাব আছে, বিপদে ফিলকে দরকার হতে পারে।

এই বিপদের মুহূর্তে জাহাজ ছেড়ে আসা তাঁর ঠিক হয়নি এমনও ভাবলেন। এলেনই যখন, সঙ্গে এক বোতল সরষের তেল নিয়ে এলে ফিল যৎপরোনাস্তি খুশি হতেন। নাভিনিদ্রা কাকে বলে সেবারে মুখার্জি বুঝিয়ে দেবার সময় দেখেছেন, খুব আগ্রহ নিয়ে ফিল সব শুনছেন। ফিল তাঁর নোটবুক বের করে তেল ব্যবহারের মুদ্রাগুলিও লিখে রেখেছিলেন। এই তামাশার কথা ভাবলেও খারাপ লাগে।

আসলে শিশুর সদ্য দাঁত ওঠার মতো। সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষ। রাজার জাতকে কব্জায় পেলেই বেকুফ বানিয়ে তখন তিনি খুবই আনন্দ পেতেন।

লিখুন। মুখার্জি বলেছিলেন, নাভিনিদ্রা হল ভারতীয় কুম্ভক।

কুম্ভক কী?

কুম্ভক মানে এক ধরনের আসন। যোগবল তৈরি করার জন্য আসনটির ব্যবহার হয়ে থাকে। নাভিনিদ্রা প্রায় তাঁর সমগোত্র। তেল ব্যবহারের পদ্ধতি লিখে নিন। ঠিক দ্বিপ্রহরে স্নানের আগে—স্নান টান রোজ করা হয় তো?

ফিল বলেছিলেন, হয়।

অবগাহন স্নান কাকে বলে জানেন?

ফিল বলেছিলেন, না।

পুকুর কিংবা নদীর জলে কোমর পর্যন্ত নেমে যেতে হবে। দ্বীপে নদী আছে?

নেই।

হ্রদ আছে?

আছে।

বাড়ির কাছাকাছি?

কাছেই।

কোমরজলে নেমে ডুব দেবেন। ডুব কাকে বলে জানেন তো। যাকে বলে অবগাহন স্নান।

জানি। তবে অবগাহন স্নান কী জানি না।

ডুব মানে বেদিং। তাকেই অবগাহন বলে।

মুখার্জির খাপছাড়া ইংরাজি থেকে সাধ্যমতো বোঝার চেষ্টা করেছিলেন ফিল। অবগাহন কাকে বলে তাও হয়তো বুঝে নিয়েছিলেন।

মুখার্জি বলেছিলেন, স্নানের আগে বাঁ হাতে এক গণ্ডুষ সরষের তেল। তারপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সহযোগে, সেই তেল প্রথমে নখাগ্রে, পরে নাভিমূলে, তারপর নাসিকা এবং কর্ণকুহরে—বাকি তেল তালুতে দেবার সময় বলতে হবে, ওম ব্রাহ্মণেভ্য নম।

ব্রাহ্মণেভ্য নম মানে?

ব্রহ্ম থেকে জাত যিনি, তাঁকে প্রণাম।

আসলে জাহাজে থাকলে বিদেশের বন্দরগুলিতে খাঁটি গোরা সাহেবদের সঙ্গে মজা করার বাতিক সব নাবিকদেরই থাকে। সাহেবদের সঙ্গে রগড় করার জন্য কিছুটা তরলমতি হয়ে গিয়েছিলেন মুখার্জি। সেই বাতিক থেকেই একজন খাঁটি গোরা সাহেবকে বাগে পেয়ে যা খুশি মুখে আসে গড়গড় করে বলে গেছেন। ফিল চলে যাবার পর সে কী তাঁর অট্টহাসি। কিন্তু তাজ্জব মুখার্জি।

দু'দিন বাদেই হাজির হয়ে বলেছিলেন ফিল, মুখার্জি, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। আমার নাভিনিদ্রা হচ্ছে। কী করে সকাল হয়ে যায়, টেরই পাচ্ছি না। শরীর ঝরঝরে। জড়তা থাকে না। এ তো আশ্চর্য

যোগবলের কথা বাতলে গেলে। আচ্ছা, নাভিনিদ্রায় কি মানুষ হাওয়ার উপর ভেসে থাকে? মানে বলছি শরীর কি বিছানা থেকে উপরে উঠে যায়?

যেতে পারে। তবে আপনি খাঁটি সরষের তেল যোগাড় করবেন কী করে? আমার জাহাজ তো ছেড়ে দেবে, কবে আসব জানি না। আর আসাই হবে কি না তাও জানি না। মাদাঙে খোঁজ করলে চবি ব্যবসায়ীরা তেল আনিয়ে দিতে পারে।

এইসব মজার কথা ভেবে মুখার্জির এখন বেশ খারাপ লাগছে। মানুষটিকে তাঁর কত দরকার, কে যে কখন বিপত্তারিণী হয়ে দাঁড়ায় কেউ বলতে পারে না। ফিল ঠিকই খোঁজ রাখে খাঁড়িতে কোন দেশের জাহাজ ভিড়েছে, তার যথেষ্ট লোকবল আছে।

তিনি সকালেই আশা করেছিলেন, মোটর-লঞ্চ কিংবা ঘোড়ায় চড়ে ফিল তাঁর জাহাজের খোঁজে চলে আসবেন। কিন্তু না আসায় তাঁর আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবেই তিনি বের হয়ে পড়েছেন, অথচ আসল জিনিসটিই তিনি ফিলের জন্য আনতে ভুলে গেছেন। ফিল ছেলেমানুষের মতো তবে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। 'ইউ আর সো কাইন্ড' বলে হ্যান্ডশেক করে একেবারে প্রাসাদের নানা অলিন্দ পার হয়ে নিজের ছোট্ট এবং দীনজনের বাসোপযোগী ঘরটায় তাঁকে টেনে নিয়ে যেতেন।

একজন খাঁটি গোবা সাহেব এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে আছে কীসের আশায়? ভাবতে গেলে বড় বিস্ময় লাগে।

অ্যালেন পাওয়ারের চিঠির বক্তব্যও খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ। কী এমন গ্র্যান্ড যে তাঁর জাদুর টানে একজন মানুষ দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারেন না। কলিজ জাহাজের গুপ্তধনের খবব কি ফিলিপ রাখতেন? ডুবুরির পোশাক পরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন! যদি মিলে যায়!

কাপ্তান-বয়কে দিয়ে চিঠিগুলি ফের পাচার করার দরকার আছে। তখন ততটা গুরুত্ব দেননি। গুরুত্ব দেননি বললে ঠিক হবে না। কাপ্তানের অগোচরে চিঠিগুলি আনা হয়। ধরা পড়লে চরম সর্বনাশ। চিঠিগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বেচারা কাপ্তান-বয় মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখার্জির খুব খারাপ লাগছিল।

ফিল ফিলিপ হতে পারে, কিংবা ফিলের কথা সেই মুহূর্তে তাঁর মাথায়ও ছিল না। নামটাও হয়তো ভুলে গেছিলেন ফিলের। পিদগিন ভাষায় জগাখিচুড়ি ঝামেলাতেই পলকে নামটা মগজে ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিরও গুরুত্ব বুঝে ফেলেছেন। ফিল ফিলিপ হলে? ইস্, তিনি আর ভাবতে পারছেন না!

ঘোড়া দুলকি চালে কদম দিচ্ছে।

মাথায় ফিল।

ফিলের ঘবে তিনি একটি বড় মানচিত্রও দেখেছিলেন, বিশাল মানচিত্রের উপবে লেখা ব্যাটেল গ্রাউন্ডস অফ দ্য পেসিফিক। তখন কিছুই তাঁর খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহ হয়নি। এত বড় মানচিত্রে ফিল কী খুঁজে বেড়ান? তিনি মাঝে মাঝে সারারাত এই মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করে দিতে পারেন, এমনও বলেছেন।

সত্যি রহস্য। জাহাজে চার্লি আব এই দ্বীপে ফিল। চার্লি তো বলেছে, তাঁর কাকা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ।

আবার সামনে পেতলের ফলক।

উই লিভ উইদিন দ্য শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটারড বাই দ্য গড, হু ইজ অ্যাবাভ অল গডস।

পরের ফলকেও লেখা—লর্ড, থ্রো অল দ্য জেনারেশানস ইয়ো হ্যাভ বিন আওয়ার হোম, বিফোব দ্য মাউনটেনস ওয়্যার ক্রিয়েটেড, বিফোর দ্য আর্থ ওয়াজ ফর্মড, ইয়ো আর গড উইদাউট বিগিনিং অর এন্ড।

ফলকের লেখাগুলি পড়তে পড়তে মুখার্জি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। জন্মের আগেও তিনি। পরেও তিনি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগেও তিনি, পরেও তিনি। নিরবধি কালের আগেও তিনি, শেষেও তিনি। ফলকগুলি পড়তে পড়তে তাঁর মনে হচ্ছিল চৈতন্যময় এক জগতের ওপার থেকে কেউ যেন ইশারায় এইসব বাণী প্রচার করে যাচ্ছে।

তিনি যতটা দুর্বল বোধ করছিলেন ফলকের লেখাগুলি পড়তে পড়তে, তা আর থাকল না। সত্যি

এক অজ্ঞাত ইচ্ছের সূত্র ধরে তাঁর জীবন। তাঁর কেন, সবার। সুহাসকে তিনি রক্ষা করতেও পারেন, নাও কবতে পারেন। সবই পূর্ব-পরিকল্পিত। ফলকের লেখাগুলি তাঁকে মুহূর্তে দৈববিশ্বাসী করে তুলেছে।

এটা মুখার্জি বুঝলেন, এতে যেমন খারাপ হতে পারে, আবার ভালও হতে পারে। সব সময় দুশ্চিন্তা, মনে হয় তিনি একা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি সত্যি আব একা নন। আরও একজন আছেন, যিনি জন্মের আগেও থাকেন, পরেও থাকেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে পড়ছেন।

প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। এবং চারপাশের বনজঙ্গল পার হয়ে যাবার সময় মনে হল, কাছেই কোথাও ড্রাম বাজছে। নাচ-গান হচ্ছে। দূরে গাঁয়ের কোথাও উৎসবে নাগবা টিকারা বাজছে।

পাহাড়ের মাথায় অদ্ভুত এক অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। যে ইগল পাখিটা মাথার উপব উড়ে আসছিল, সেটা এখন মাথার উপর পাক খাচ্ছে। দ্বিতীয় ইগল পাখিটা সমুদ্রে ছোঁ মেরে একটা বড় বাইম মাছ তুলে আনছে। মাথার উপর গাছের ডালে এসে বসল। ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

তিনি ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ইগল পাখিটা আর তাঁকে অনুসরণ করছে না। সামনে সেই ফিলের সাদা রঙের বাড়ি। নীচে একটা ছোটখাটো বন্দরও দেখতে পেলেন। লোকলস্কর, তেলের পিপে, বাদাম তোলা কাঠের নৌকা, দেশি নৌকা, মোটর-বোটের ছড়াছড়ি। বড বড ঝুড়ি, কাঠেব পেটি তোলা হচ্ছে স্টিমারে।

গত সফরে তিনি এসব কিছুই দেখতে পাননি। চারপাশে লোকালয় গড়ে উঠেছে, বাজার, চায়েব দোকান পর্যন্ত। ঘোড়াটার লাগাম ধরে হেঁটে কিছুটা যেতেই ছুটে আসছে কেউ। ভিনদেশি মানুষ হয়তো টের পেয়েছে লোকটা। কেন এখানে, কী চাই, কাকে চাই, জানার জন্য ছুটে আসতেই পারে।

নির্জন দ্বীপে সবাই সবাইকে চেনে। তিনি অপরিচিত এবং ভিনদেশি, মাথার উপব ইগল পাখিটা এতক্ষণ তাঁর ভিতর গভীর সংশয়ের উদ্রেক করেছে। ইগল পাখিটা ফিলের প্রাসাদ পাব হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাঁকে পৌঁছে দিল, না তিনি ফিলের সাম্রাজ্যে ঢুকে গেছেন এমন খবব পৌঁছে দিল।

কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। এখনও ফিলের প্রাসাদের দিকটা বেশ নিরিবিলি। নানা প্রজাতিব পোকামাকড় চোখে পড়ল একটা দোকানে। নানা শেকড়-বাকড়েবও। ফুল-ফলেব বীজও রাখে দোকানি। আশ্চর্য, খরিদ্দার বিশেষ নেই। নীচে সমুদ্রের বেলাভূমিতে যত লোকজন, উপরে ঠিক ততটাই যেন জনশূন্য, বেলা পড়ে আসছে।

ফিলের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে দ্রুত ফিরে না গেলে যথাসময়ে জাহাজঘাটায় পৌঁছতে পাববেন না। বেশ চিন্তিত মুখে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার ফিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বলে মুখার্জি ডাইরির পাতা থেকে একটি চিরকুটে তাঁর নাম এবং জাহাজের নাম লিখে দিলেন।

লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিবে এল। গাট্টাগোট্টা বেঁটে তামাটে রঙের পুরুষ। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু, ল্যাটিন আমেরিকানদের মতো দেখতে।

লোকটি বোবা কি না তাও বোঝা গেল না। কারণ তাঁকে লোকটি কোনও প্রশ্নও কবেনি, এমনকী চিরকুট দিলেও না। সে সোজা হেঁটে চলে গেছে।

এমনও হতে পারে, ভিনদেশি লোক দেখা করতে এলে একমাত্র ফিলের সঙ্গেই দেখা কবতে আসেন, লোকটি হয়তো তা ভালই জানে। হাফপ্যান্ট পরনে। মাথায় লালরঙেব বেল্ট বেঁধে রেখেছে। চুল বড় বড়। বেল্ট বেঁধে চুল সামলাচ্ছে। কিছুটা ডাকাত-ডাকাত চেহারা।

বাড়িটা বেশ একটা বড় টিলার মাথায়। আগে সোজা উঠে যাওয়া যেত। তবে কষ্টকর ছিল। এখন ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হবে কিছুটা পথ। পাশেই পর পর দু'-তিনটে আস্তাবল।

সামান্য ক'টা পেনি দিলেই আস্তাবলে ঘোড়া রাখা যায়। তিনি আস্তাবলে তাঁর ঘোড়ার জিম্মা দিয়ে ফিরতেই দেখলেন, সিঁড়ি ভেঙে ফিল দ্রুত লাফিয়ে নেমে আসছেন। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই। লম্বা দাড়ি। পরনে হলুদ রঙের একটা লুঙি। একেবারে স্থানীয় লোকদের পোশাক পরেই তিনি এত দ্রুত নেমে আসবেন, মুখার্জি অনুমানই করতে পারেননি। ফিল কত বদলে গেছেন!

ফিল কাছে এসেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যেন ভাষা নেই ফিলের। তাঁর সঙ্গে ফিলের দেখা হতে পারে আর কখনও, হয়তো আশাই করেননি ফিল। ফিলকে নিয়ে সেবারে তামাশায়

মজে যাওয়ায় কিছুটা অপরাধবোধও কাজ করছিল মুখার্জির ভিতর। ফিল যতটা স্বাভাবিক হতে পারছেন, তিনি ততটা হতে পারছেন না। তিনি টের পেলেন, ফিলের আলিঙ্গনে যথেষ্ট উষ্ণতা আছে।

তাঁদের পরস্পর দেখা হয়ে যাওয়াটা যেন খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। ফিল হড়হড় করে কথা বলে যাচ্ছেন, কবে জাহাজ এল? আর বোলো না, আমি তো জানিই না, তোমার জাহাজ খাঁড়িতে ঢুকে গেছে? কতদিন আছ?

যাক, আমাকে মনে রেখেছ! এই যথেষ্ট। ভুলে যাওনি দেখছি।

খুব ভাল। আমি তোমাকে মনে রেখেছি, না তুমি আমাকে মনে রেখেছ! একদম সময় পাই না, আমারই তো উচিত ছিল কোথাকার জাহাজ, কারা আছে। কত জাহাজই তো আসছে, খবর নিতে নিয়ে নিরাশ। তুমি সেই কবে এসেছিলে, চাব-পাঁচ বছর তো হয়ে গেল।

ফিল লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। যাকে দেখছেন, তাঁকেই বলছেন, মিস্টার মুখার্জি ডিন ব্যাংকের কোয়ার্টার-মাস্টার।

মুখার্জি উঠে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। রাত হয়ে গেলে রাস্তা চিনে যাওয়া কষ্টকর। অবশ্য রাতে জ্যোৎস্না থাকবে দ্বীপে, এই যা ভরসা। আলিঙ্গনের বহর দেখেই মনে হয়েছে, ফিল সহজে ছাড়ছেন না।

তিনি যে তাঁর বাড়িটায় সর্বত্র এক বিশাল অ্যাকোরিয়াম গড়ে তুলতে চান, মুখার্জি সেবারই টের পেয়েছিলেন। সব সময় ব্যস্ত সব মানুষজন। কাঠ, কাচ, রজন, এনামেলেব পাত নিয়ে ঠক ঠক করে দেয়াল জুড়ে বিশাল লম্বা সব অ্যাকোরিয়াম গড়ে তুলেছেন ফিল। ফিলের এই এক নেশা। নেশা এখনও যে নেই কে বলবে! অ্যাকোরিয়ামের পাশে নিয়ে দাঁড় করাবেন। টানা হলঘরের মতো বিশাল সব জলাধার। কৃত্রিম প্রবাল-প্রাচীর জলাধারের ভিতর এবং নানা প্রজাতির মাছ। সমুদ্রের তলাকার দুর্লভ সব প্রবালের গাছপালা এবং শ্যাওলা আশ্চর্য সব বর্ণচ্ছটা তৈরি করছে নীল জলেব ভিতর।

প্রাসাদর অভ্যন্তরে গেলে মনে হয় সমুদ্রের তলদেশে কোনও প্রবাল-প্রাচীরের পাশ দিয়ে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। গতবার এসব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সহজে ছাড়তেই চাইতেন না। মাছগুলির নাম থেকে কোন মাছের কী স্বভাব তাও বলেছেন। তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্যটিকে ঘুরিয়ে দেখাতে না পারলে তিনি স্বস্তি পান না।

ফিল যে একজন ডুবুরি এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাকার কথা নয়। তবে ফিল আসলে ফিলিপ কি না, তাই তিনি জানতে এসেছেন।

তিনিই সেই কিপার অফ দি রেক কি না, যদি হন, তবে কলিজ সম্পর্কে খোঁজখবব পাওয়া সহজ হবে। কেন তাঁর জাহাজের কাপ্তান মিলার কলিজের ধ্বংসাবশেষের খোঁজে এখানে এসেছেন তাও জানা যাবে। এজন্য কলিজ সংক্রান্ত সব পেপার-কাটিংও সঙ্গে রেখেছেন।

ফিল তাঁকে নিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবার সময়ই মনে হল, বসার ঘরের এক কোণে কারা চুপচাপ বসে আছে।

আরে, এ যে জাহাজের চিফ মেট আব সেকেন্ড মেট! ঠিক খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন কাপ্তান!

তিনি কিছুটা চমকে উঠলেন। তাকে এখানে দেখলে ওপরয়ালাদের নিশ্চয় খুশি হবার কথা না। ফিল তাঁর হাত ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন, একবার ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

মুখার্জি নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন। পলকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন বলে রক্ষা। পেছন থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হবে। তাদের জাহাজের একজন কোয়ার্টার মাস্টারের এত বড় আস্পর্ধা, জাহাজ ছেড়ে একা এতদূরে চলে এসেছে, ভাবতেই পারে! তিনি কোনওরকমে ভিতরে সেই কাচের জলাধারগুলি পার হয়ে বললেন, ফিল, তোমার জন্য কারা অপেক্ষা করছেন!

বাদ দাও। তোমার জাহাজ থেকেই এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কী খাবে বলো?

ফিল, কিছু মনে কোরো না। আমি কিন্তু ভুলে গেছি। রাস্তায় এসে মনে হল।

কী ভুলে গেছ?

সরষের তেল।

ওহো! মুখার্জি, তোমার তেল মাদাং থেকে আসছে। মাদাঙে প্রায়ই ভারতীয় নাবিকেরা আসে।

ওজন্য ভেবো না। তুমি যা উপকাব কবেছ! তুমি হয়তো ভাবছ, সেটা কি— ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? আমাব ঘবে এসো।

তোমাব পিয়ানোটা আছে? বলতে, বাতে কিছু ভাল না লাগলে পিয়ানোতে সুব তোলাব চেষ্টা কবতে।

আছে। তবে দবকাব হয় না।

সেই মানচিত্রটা?

আছে। তাঁব সামনে আব দাঁড়িয়ে থাকি না।

ওবা কেন এসেছে কী চায়, কিছু বলল?

বলেছে। ওবা কলিজ জাহাজেব খোঁজ নিতে এসেছে। আমি কিছু জানি কি না। কে এক অ্যালেন পাওয়াব নাকি লিখেছেন, ফিলিপ নামে এক ডুবুবি কলিজেব কিপাব অফ দ্য বেক! কী সব আজগুবি কথা বলো তো! আমাব কী দবকাব একটা ডুবন্ত জাহাজেব পাহাবাদাব হয়ে বেঁচে থাকাব? বোকাবা এসব ভাবে।

খুবই অকপট কথাবাতা।

তা হলে তুমি ফিলিপ নও!

কেন ফিলিপ হলে কি তোমাব সুবিধে হয়? ফিল আব ফিলিপ তফাতই বা কী! আসলে কী জানো, আমি কেউ নই। না ফিলিপ, না ফিল।

ফিলেব হেঁয়ালি কথাবার্তা মুখার্জিব ভাল লাগছে না। তাঁকে ফিবতে হবে। ফিলেব বেশভূষা সন্ত মানুষেব মতো। এই ফিলকে তাঁব চিনতেও কষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন, ফিল, আমবা খুবই বিপদেব মধ্যে আছি। জাহাজে নানাবকম জটিলতা দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় আমাদেব ফিফথ ইঞ্জিনিয়াব মাবা গেছেন। খনটুন নয় কে বলবে!

প্রাসাদেব এদিকটায় ফাঁকা জায়গা। একটি টিনেব চালাঘব। ফিল মাথা নুয়ে ঘবে ঢোকাব সময় বললেন, দুষ্ট লোকেবা মনে কবে দে ক্যান হাইড দেয়াব ইভিল ডিডস অ্যান্ড নট গেট কট।— বলে ফিল হা হা কবে হাসলেন।

তাবপব ফেব বললেন দে লাই অ্যাওয়েক অ্যাট নাইট টু হ্যাচ দেয়াব ইভিল প্লটস—ইনস্টিড অফ প্ল্যানিং হাউ টু কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম বং। এসো। কতদিন পব দেখা। কেমন আছ? তোমাকে খুবই অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে। কী ব্যাপাব বলো তো? তুমি তো খুবই আমুদে লোক ছিলে!

সামান্য গ্রিনপিজ সেদ্ধ, দু' কাপ কফি বেখে গেল নিনামুব বলে লোকটি। এদিকটা নিনামুব সামলায় মনে হয়। বাবান্দায় কাঠেব একটি টুল। ছোট দুটো টিপয় এনে বাখা হয়েছে।

ঢালু জমি অনেক নীচে নেমে গেছে। এবং সেখানে চাষ আবাদ, যত দূব চোখ যায় চাষেব জমি এবং গাকটবেব ধোঁয়ায় কেমন কুযাশাচ্ছন্ন হয়ে আছে জায়গাটা।

ফিল বললেন, খুন ভাবছ কেন?

সে অনেক কথা।

মুখার্জি কফিতে চুমুক দিলেন। তাবপব বললেন, তোমাব কি সময় হবে? একবাব জাহাজে আসা দবকাব। তুমি ফিলিপ কি না জানতে আমিও এসেছি। কলিজ জাহাজ সম্পর্কে তুমি যদি কিছু জানো? সান্তু এখান থেকে কতদূব? তোমাব এখান থেকে সান্তু যেতে হলে কীসে যাওয়া যায়?

সে যাওয়া যাবে। যেতে চাও, নিয়ে যাব। বেশি দূব নয়। ওদিকেব টিলাটা দেখছ, ওখানে উঠে গেলে দেখা যায়।

আচ্ছা ফিল!— বলে একটা সিগাবেট ধবালেন মুখার্জি, রিফ এক্সপ্লোবাবেব কোনও খবব বাখো? কাছাকাছি কোথাও আছে মনে হয়। কলিজ জাহাজ সম্পর্কে খোঁজ নিতে তিনি সেখানেও যোগাযোগ কবতে পাবেন। দ্যাখো ফিল, আমবা নিরুপায় বলেই তোমাব কাছে এসেছি। কাপ্তানের পুত্র চার্লিও বহস্য। তোমাকে আমি বিশ্বাস কবতে চাই।

ফিল মুচকি হাসলেন। বললেন, এই হল গে মুশকিল, বুঝলে মুখার্জি, কেউ বিশ্বাস কবতে চায় না, হাউ শর্ট ম্যানস লাইফস্প্যান। ভাল কাজ না কবলে লাইফ ইজ এম্পটি। অল উইল ডাই। হু ক্যান

রেসকু হিজ লাইফ ফ্রম দ্য পাওয়ার অফ গ্রেভ। এসব ভাবলে মাথায় দুষ্টবুদ্ধি থাকে না। স্বার্থপরতা থাকে না। শুধু ভাল কাজের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তোমাব কুম্ভক আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমার এজন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর যাই করি অবিশ্বাসের কাজ করব না। করে লাভও নেই। আমি ফিল, আমার আগেও কেউ ছিল না, পরেও কেউ নেই। ফিলিপকে নিয়ে তোমার চিন্তাব কোনও কাবণ নেই। কলিজ নিয়েও না। গুজব মানুষকে কীভাবে বিচলিত করতে পারে, কীভাবে মানুষকে অমানুষ কবে দেয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

মুখার্জিব এত কথা ভাল লাগছিল না। তিনি শুধু বললেন, তা হলে তুমি ফিলিপ নও? কলিজ সম্পর্কে কিছু জানো না?

ফিল চুপ করে থাকলেন।

বলো চুপ করে আছ কেন?

মুখার্জি, কেন আমাকে বিরক্ত করছ? আমি সব ভুলে গেছি। মরীচিকা সব। সব মরীচিকা। সমুদ্রেব নীচে পাহাড়ের তলদেশ খুঁজে বেড়ালে ধীরে ধীরে উপরের আকাশ এবং নক্ষত্র কত রহস্যময় দেখায় তুমি জানো না।

মুখার্জিব মনে হল, ফিল কোনও দুবারোগ্য ব্যাধি থেকে যেন এখন মুক্ত। সে তাঁব পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করতে চায় না। কলিজের কথা উঠলেই মুখ ব্যাজার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হেসেও দিয়েছেন। বলেছেন, শোনো মুখার্জি, হ্যাপি আর দোজ হু আব স্ট্রং ইন দা লর্ড, হু ওয়ান্ট অ্যাভব অল এলস টু ফলো, হিজ স্টেপস। আমি তাঁকে সমুদ্রের নীচে প্রথম খুঁজে পাই। পরে গভীর নিদ্রাব মধ্যে।

মুখার্জি বললেন, উঠছি। যদি পাবো এসো।— বলে তিনি উঠে দাঁড়ালে ফিল বললেন, এসো।

তারপব তিনি কাছের সমুদ্র অতিক্রম কবে অন্য একটি রাস্তা ধরে যাবাব মুখেই আঁতকে উঠলেন। দেয়ালে সেই গ্রিক নারীমূর্তি, এবং একশিঙ্গি ঘোড়া। কলিজেব সেই বিশাল ভাস্কর্যটি এখানে অতি যত্নেব সঙ্গে রক্ষিত আছে। মুখার্জি বললেন, এটা কী, এটা কী ফিল! এটা তুমি কোথায় পেলে?

দেয়ালে চালচিত্রের মতো গেঁথে দেয়া গ্রিক দেবীদেব সামনে এগিযে গেলেন ফিল। কী দেখলেন। তারপর বললেন, তোমার পছন্দ।

মুখার্জিও পাশে গিযে দাঁড়িয়েছেন। কিছুটা বুদ্ধি লোপ পাবার মতো পরিস্থিতি তাঁব। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন সহজেই। কারণ তিনি এখন আর ফিলের বন্ধু নন। তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন সত্যসন্ধানী। ভাস্কর্যটি দেখে এতটা অবাক হবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। এটা কোথায় পেলে, বলাও উচিত হয়নি।

ফিল গ্রিক দেবীদের দিকে তাকিয়ে তখনও অপলক দেখছে।

কী? পছন্দ তোমাব?

দারুণ দেখতে।

ফিল কি বলবে, গ্রিক দেবীদের নিয়ে যাও। যেভাবে কথা বলছে। পছন্দ! পছন্দ হলে নিযে যাও যেন বলল বলে।

মুখার্জি বললেন, দেবী প্রতিমা। দুর্গা ঠাকুরের মতো লাগছে।— দুর্গা ঠাকুর সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যাও সঙ্গে।

তারপরই ফিল কেন যে তাঁকে একা রেখে কোনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আসছি বলে কোথায় গেল! শেষে এলেনও ঠিক। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তের মতো ফিল বললেন, হাউ ওয়াভারফুল টু বি ওয়াইজ, টু আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস! গভীর নিদ্রা মানুষকে শান্তি দেয়, সুখ দেয়। আমার চোখ খুলে গেল মুখার্জি। এই নাও মুখার্জি। তোমার প্রণামি। —বলে একটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁর হাতে দিলেন।

মুখার্জি বললেন, না, না। কী পাগলামি করছ ফিল!

রেখে দাও। বিপদে-আপদে কাজে আসবে। কখন কোথায় ঝামেলায় পড়বে কে জানে। মুদ্রাটি স্থানীয় লোকদেব দেখালেই তোমাকে মান্য করবে। কিছুটা ঋণশোধ বলতে পারো।

টনটন কবছে। যেন চেপে বসেছিল, পাবছিল না, চার্লির সহ্য কবাব ক্ষমতাও যেন লোপ পাচ্ছে। কেমন অসাড হয়ে যাচ্ছে। চার্লি কোনও বকমে টলতে টলতে কেবিনে ঢুকে দবজা লক কবে দিল। হাঁসফাঁস কবছে, আব পারছে না। জামা খুলে নীচে ফেলে দিল। লাথি মেবে সবিযে দিল জামাটা। পটাপট ব্রেসিয়াবের ফিতে টেনে খুলে ফেলল।

বিডবিড কবে বকছে চার্লি। আই উইল বিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি।

শবীব থেকে ছাল-চামড়া তুলে নেবাব মতো ব্রেসিয়াব টেনে চিৎকাব কবে উঠল, নো মি বয়।

ব্রেসিয়াব বিছানায় ছুঁডে দিল। প্যান্ট টেনে খুলে ফেলল। আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পাবত। না, দেখতে ইচ্ছে কবে না। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে। ব্রেসিয়াব থেকে স্তন ফেটে বেব হয়ে আসছিল। সব খুলে ফেলায় হালকা আবাম। জ্বালা কবছিল। ব্রেসিয়াব খুলে ফেলাতেই ভাঁজ কবা কমালগুলি নীচে ছডিযে-ছিটিযে পডে গেল। সে বিছানায় গডিয়ে পডল। শবীবে যেন তাব আব বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। সে ভাবী আবাম বোধ কবছে। হালকা। তবু ভিতবেব জ্বালা মবছে না।

নো মি বয়।

এই এক আচ্ছন্নতা তাব শৈশব থেকে। সে আজ কী যে কবে ফেলল। কেমন হুঁশ হাবিয়ে ফেলেছিল। সে বালিশ আঁকড়ে মুখ গুঁজে দিল। তাব শবীব থব থব কবে কাঁপছিল। তাব কোমব থেকে উকব ছবি আয়নায় ভেসে উঠছে। যেন সে সত্যি বড অসহায়। বিছানায় পডে থাকাব ভঙ্গিমাটুকু বড কৰুণ।

অনেকটা পথ সে সুহাসকে ঘোড়ায় চাপিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে। সে আব পাবছিল না। সুহাসেব ঘাড়ে লেগেছে। মেবেই ফেলত। সে কী কবেছিল, মনে কবতে পাবছে না। যেন সে তাব ঘোব থেকে আত্মবক্ষাব জন্য প্রাণ খুলে হাউ হাউ কবে কাঁদতে পাবলে বাঁচত। কাঁদতে পাবছে না। ছটফট কবছে। কেন কাঁদতে পাবছে না।

সে উঠে বসল। তাব যে এখনও সম্পূর্ণ হুঁশ ফেবেনি বোঝাই যাচ্ছে।

সে দেযালে হেলান দিয়ে দাঁডিযে আছে। নাভিমূলে নবম উলেব মতো সোনালি উষ্ণতাব জন্য এতটুকু তাব আতঙ্ক নেই। সে যেন ইচ্ছে কবলে এখন দবজা খুলে ডেক ধবেও ছুটে যেতে পাবে। কী কববে বুঝতে পাবছে না। আচ্ছন্ন ভাবটা যে কাটেনি, সে তা এখনও টেব পাচ্ছে না। টেব পেলে, সত্যি হাউ হাউ কবে কেঁদে ফেলতে পাবত। দেয়াল ধবে বসে পডতে পাবত। এবং শবীব উবু কবে নিজেব এই আতঙ্ক থেকে আত্মবক্ষাব জন্য আবও বেশি কুশলী হতে পাবত।

সে কিছুই কবছে না। সে কেবল ভাবছে, কেন সে নির্জন পাহাডি উপত্যকায় ঘোডা ছুটিয়ে দিয়েছিল।

কোনও ফুল।

নিশ্চযই বুনো ফুল।

সে দেখতে পেল দূবে মাইলেব পব মাইল জুডে ব্লুস্টেম ঘাসেব ছড়াছড়ি।

সে চিৎকাব কবে উঠেছিল, সুহাস, সামনে দ্যাখো। দিগন্ত জুডে আমাব ঠাকুবদা ঘাসেব বীজ বুনে গেছেন। দ্যাখো কী সুন্দব সবুজ আব নীল স্বচ্ছ সৌন্দর্য আকাশেব নীচে খেলা কবে বেডাচ্ছে। ব্লুস্টেম ঘাসেব ডগায় সাদা ফুল। দ্যাখো সুহাস তিনি কত সুন্দব ছিলেন। তিনি তাঁর জাহাজে এই সব দ্বীপেও ঘুবে গেছেন। ডবোথি ক্যাবিকো জাহাজে ইস্টাবের ছুটিতে, অথবা কোনও প্রমোদ ভ্রমণে যাত্রী নিয়ে বেব হযে পডতেন সমুদ্রে। আমাব ঠাকুবদাকে বুঝতে চেষ্টা করো।

ওঃ কী দাৰুণ অভিজ্ঞতা। ঘাসগুলির ভিতব ঘোডা হেঁটে যাচ্ছে। সে আব সুহাস পাশাপাশি দুই অশ্বাবোহী। সে দেখতে পাচ্ছে সুহাস খুবই মুগ্ধ হয়ে গেছে এমন এক উপত্যকায় নেমে এসে। সুহাস যত মুগ্ধ হযে যাচ্ছে তত দুলকি চালে ঘোডাব উপব থেকে সে বলছে, ডবোথি ক্যাবিকোব ছবি আছে আমাদেব দেয়ালে। কী বিশাল জাহাজ। শি ওয়াজ অ্যা গ্র্যান্ড শিপ। দেয়াল জুড়ে তাব বেপ্লিকা। দেখলে চোখ জুডিয়ে যায় সুহাস। আমাব ঠাকুবদা তবে এখানেও এসেছিলেন।

সুহাস তাব দিকে যেন তাকাল, এগুলো তো কাশফুল। ব্লুস্টেম বলছ কেন বুঝি না।

সুহাস, না না, তুমি কাশ বলবে না। ওতে আমাব ঠাকুবদাব অমর্যাদা কবা হবে। তিনি আমাকে কত

ভালবাসতেন জানো না। তিনি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমাকে দিয়ে গেছেন।

আচ্ছন্ন অবস্থায় বোধ হয় চার্লি হুবহু সব মনে করতে পারছে। কারণ সেই উপত্যকার নীচে নির্জন বালিয়াড়িতে যা ঘটে গেল, সে ভাবতে পারছে না, অথচ সে নিজে কেন যে দেয়াল ছেড়ে নড়তে পারছে না! কোনও নগ্ন নীরব বর্ণমালার সৌন্দর্য তার চেয়ে প্রবল কি না সে এখনও কিছুই বুঝছে না।

কারণ সে কখনও নিজেকে দ্যাখে না। দেখতে তার ভাল লাগে না। দেখলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সে হালকা আরাম বোধ করছে এখন, ফ্রি ফ্রম অল বাইন্ডিংস, এ যে এক জাদুকরের স্পর্শে সে জেগে যাচ্ছে, বোঝায় কী করে।

সুহাস, দ্যাখো দ্যাখো।

সুহাস তাকাল।

সে আঙুল তুলে দূরে দেখাচ্ছে কেনিফ্লাওয়ার। পাথরের খাঁজে খাঁজে ফুটে রয়েছে।

আমাদেব পাহাড়গুলিতে কেনিফ্লাওয়ারের ছড়াছড়ি। আহা, আমি যদি কখনও সেই সব উষব অঞ্চলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম! এসো, ওদিকে না। সব আছে, সুহাস, বুনো ডেইজি ফুল দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে কী করি!

সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

এমন সুন্দর উপত্যকায় ঘাস পাথব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারা এত দূবে নিরিবিলি কোনও উষব অঞ্চল আবিষ্কার কবতে পারবে, সে আশাই করতে পারেনি।

সে কেবল বলছিল, অন আইদার সাইড নিয়ার টাইলার, গোল্ডেন কোবিওপসিস স্ট্রেচ অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান সি।

কিছুটা দূরে, ঘাসের ভিতর ঢুকে সে বলেছিল, ওই দ্যাখো নীচের দিকটায় এমন অজস্র গোল্ডেন কোবিওপসিস ফুটে আছে।

তাবপব বলতে গিয়ে যেন গর্বে বুক ফুলে যাচ্ছে চার্লির।

অবশ্যই এটা আমার ঠাকুরদার পক্ষেই সম্ভব সুহাস। তুমি জানো সুহাস, দাদুর এই বুনো ফুল, অ্যাট্রাক্টস গ্রোয়িং নাম্বার অফ ভিজিটার্স, হু কাম টু সি আওয়াব স্প্রিং ওয়াইলড-ফ্লাওয়ার্স। আই হ্যাভ নেভার ফবগটেন দ্যাট গিফট অফ মাই চাইল্ডহুড। সিনস দেন ইট হ্যাজ বিন মাই জয়। ইয়েস, দিস ইজ ওনলি মাই জয়— কী করে যে তোমাকে বোঝাব! তুমি জানো সুহাস, ওযাইলড-ফ্লাওয়ার্স অফ আওয়াব উডল্যান্ড ইন এপ্রিল মেক দ্য এয়ার হেভি উইদ সেন্ট।

সে আবও কিছুটা নেমে গেছে তখন।

সুহাস তাকে ডাকছে।

চলো ফিবি। কতদূরে চলে এসেছি। বাস্তা চিনে ফিবে যেতে পাবব না।

পারব। তুমি সুহাস জানো না অ্যাটামাসুক লিলি কী আশ্চর্য সুন্দব! জানো, এ ওম্যান হু পুলস ইট আপ বাই দা রুট উইল সুন বিকামস প্রেগন্যান্ট। একটা আস্ত লিলি, গাছ থেকে তোলা কত কঠিন তুমি জানো না। এই অ্যাটামাসকু লিলি ব্লুমস কুইকলি আফটার স্প্রিং রেইনস। সেই দুর্লভ জাতের লিলি কখন ফুটবে, সেই আশায় দম্পতিরা তাঁবু খাটিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। সামান্য দূরে এসেই তোমার ভয় ধরে গেল! তুমি কী সুহাস! দুর্লভ লিলি ফুল খুঁজে পাই কি না দেখি! ঠাকুরদা এত সব ফুলের বীজ বুনে গেছেন, আর তিনি তাঁব উত্তরাধিকারের জন্য দুর্লভ লিলি ফুল এখানে রোপণ কবে যাবেন না, হয়! এসো প্লিজ সুহাস। এখনও তো সূর্য অস্ত যায়নি সমুদ্রে। এখনও তো কচ্ছপেরা উঠে আসেনি সমুদ্র থেকে। এখনও তো পাখিরা ওড়াউড়ি করছে মাথার উপর। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন!

সুহাস অনেক পেছনে পড়ে গেল কেন! সে কি আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না?

সে কি জাহাজে ফিরে যেতে চায়?

না, না, জাহাজে আমার একদণ্ড মন টেকে না। এই টিলা পার হয়ে আরও কতদূর যাওয়া যায় এসো না, দেখি। মানুষ তো এভাবেই বের হয়ে পড়ে। কখনও একা। কখনও দু'জনে। আমরা তো একা নই। তবে নেমে আসতে সাহস পাচ্ছ না কেন! সে সুহাসকে উজ্জীবিত করছে, ডোন্ট হাইড ইয়োর লাইট, লেট ইট শাইন ফর অল।

তাব আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে। সে সব মনে কবতে পাবছে। দেয়াল থেকে সবে গিয়ে বিছানায বসল। হাতে ভব কবে যেন বসে আছে।

সে সুহাসকে বলতে চাইছে, লেট ইয়োব গুড ডিডস গো ফব অল টু সি, অ্যান্ড ফব মি অলসো সুহাস। বনেজঙ্গলে তুমি দেখতে পাচ্ছ না কী সুন্দব সব ফুল ফুটে আছে। ফুল তুমি ভালবাসো না? সুহাস, আমি আব পাবছিলাম না। আমাব কোনও দোষ দিযো না সুহাস। এটা আমাব আবও হয়েছে। বিশ্বাসই কবতে পাবি না আমি মেযে। আমাব যে কী হয়! ভেতবে আমাব কষ্ট বাড়ে। স্থিব থাকতে পাবি না। আচ্ছন্ন হযে পড়ি। এবং সর্বত্র যেন হাহাকাব—কী যে কবি! আমি প্রাণপণ চেষ্টা কবছি, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কবো, প্রাণপণ চেষ্টা কবেছি পাবিনি। বুনো ডেইজি ফুল দেখবাব আগ্রহে আমি সত্যি পাগল হযে যাচ্ছিলাম।

অদৃশ্য এক জগতে ঢুকে যাচ্ছিলাম।

সব পোশাক খুলে ফেললাম।

তুমি বাগ কবলে আমাব আব দাঁড়াবাব জায়গা থাকবে না।

তুমি ডাকছিলে, চার্লি, তুমি কোথায়?

বনজঙ্গলে ঘোড়া ছুটিযে তুমি ডাকছিলে, চার্লি, এ কোথায তুমি আমাকে এনে ছেড়ে দিলে! আই হ্যাভ লাভড ইযো ভেবি ডিপলি।

না, আমি আব স্থিব থাকতে পাবিনি। উত্তেজনায অধীব হযে পড়েছিলাম।

সত্যি বলছি, আমি অনুভব কবলাম, গড হ্যাভ মার্সি অন আস।

আমি অনুভব কবলাম আমাব বিকশিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেবল বলছিলাম বেন্ট ডাউন অ্যান্ড হিযাব মাই প্রেযাব ও লর্ড, অ্যান্ড অ্যানসাব মি ফব আই অ্যাম ডিপ ইন ট্রাবল।

তুমি ডাকছিলে চার্লি, প্লিজ ফিবে এসো। আমাদেব জাহাজে ফিবতে হবে।

আমাব কোনও হুঁশ ছিল না। আমি থব থব কবে কাঁপছিলাম। শবীব থেকে সব জামা কাপড় খুলে ফলতে থাকলাম। তুমি চেষ্টা কবো, আমাকে খুঁজে দ্যাখো আমি কে?

পাথবেব উপব চুপচাপ বসেছিলাম, সূর্যাস্তেব সময় যেভাবে বসে থাকে জলকন্যাবা, আমাব কেন যে চুপচাপ ঠিক সেভাবে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল জানি না। আমি তো জানি না, হাউ টু অ্যানসাব। কী কবে সাড়া দিতে হয আমাব কিছুই জানা নেই। কেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই পাথবেব উপব কোনও ছবিব মতো আমাব অস্তিত্ব, বিশ্বাস কববে না, সমুদ্রেব ঢেউ এসে আমাব পায়েব কাছে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রেব জলকণায় আমি ভিজে যাচ্ছিলাম।

আমাব কী যে ভাল লাগছিল! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বনজঙ্গল, অসীম সমুদ্র, অনন্ত জলবাশি, কিছুই দৃশ্যমান নয। কেমন এক নীল নীহাবিকাব মধ্যে আমি ঢুকে যাচ্ছি। কোনও প্রাণীজগতেব সাড়া পাচ্ছি না। আমি জানি না, ঈশ্বব এব চেয়ে বেশি অনুভবেব মধ্যে কখনও আমাকে নিযে যেতে প্যাবেন কি না। আমি তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু, যেন বলছ, ফব আই অ্যাম দ্য লর্ড, আই ডু নট চেঞ্জ।

কেন এমন হয জানি না।

পেছনে পাথবেব উপবে ঘোড়াব পাযেব শব্দ পেলাম সুহাস। ইস, তুমি বুঝবে না ভিতবে যেন অনন্তলোক উদ্ভাসিত হযে উঠছে। বসন্তকালে কোনও সানফ্লাওযাব যে অনুভবে বিকশিত হতে থাকে। আমিও তাই হচ্ছিলাম। অধীব হয়ে পড়েছি। আমাব মাথা এলিয়ে পড়ছে। এক হাতে ভব দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছি। এবং আমাব সেই প্রিয বুনো ডেইজি ফুলটিকে লজ্জাব হাত থেকে আত্মবক্ষাব জন্য আবৃত কবছি। যেন তুমি খুঁজে না পাও। যেন তুমি খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হও। বালকেব মতো সবল নিষ্পাপ চোখে তুমি আমাকে আবিষ্কাব কবো, এ ছাড়া সত্যি বলছি কিছু চাইনি সুহাস।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি এব চেয়ে বেশি কিছু চাইনি।

মনে হচ্ছিল অশ্বখুবেব প্রতিধ্বনি ধীবে ধীবে এগিযে আসছে। পাথব জ্বলে উঠছে খুবের আঘাতে। আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম। নড়বাব শক্তি ছিল না। কেউ সাহায্য না কবলে, কেউ জাগিয়ে না দিলে বোধ হয আমাব এই আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পাবাব উপায় ছিল না।

তুমি অবাক বিস্ময়ে নিশ্চয়ই আমাকে দেখছিলে। তুমি বিশ্বাস করতে পারছিলে না, চার্লি, জাহাজের সেই দুরন্ত বালক, কখনও সমুদ্রের ধারে জলকন্যা হয়ে যেতে পারে!

আমি টের পাচ্ছিলাম, তুমি প্রথমে এসে পেছনে দাঁড়ালে। কিছুটা বিব্রত। বিশ্বাস করতে পারছ না। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালে। নতজানু হলে। সত্যি জীবন্ত কেউ কিনা তোমার সংশয় হচ্ছিল। এমনকী তুমি একটা কথা বলতে পারছিলে না।

আমি বললাম, ওয়ান নাইট আই ওয়াজ স্লিপিং, মাই হার্ট ওয়েকেনড ইন অ্যা ড্রিম। আই হার্ড দ্য ভয়েস অফ মাই বিলাভেড।

তুমি আমার গায়ে হাত দিলে।

যেন কোনও মর্মরমূর্তির গায়ে হাত দিচ্ছ। তোমার হাত শির শির করে কাঁপছিল।

অথচ কোনও কথা না।

তুমি নতজানু হয়ে আমার কী সব দেখছ।

আমি চোখ মেলে তাকাতে পারছি না।

শুধু শুনলাম, আই হিয়ার দ্য ভয়েস অফ মাই বিলাভেড। হি ইজ নকিং অ্যাট মাই ডোর।

তুমি শুধু বললে, ওপেন টু মি। প্লিজ আনল্যাচ দ্য ডোর। প্লিজ রাইজ আপ, মাই লাভ, মাই ফেয়ার ওয়ান।

সুহাস আমার সব তছনছ হয়ে গেল।

আই জাম্পড আপ টু ওপেন দ্য ডোর।

আমি তোমাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলাম। আই অ্যাম সিক উইদ লাভ।

আমি তোমার চুলের গন্ধ নিলাম।

তুমি আমার শরীরে কী খুঁজে বেড়াচ্ছ বুঝতে পারছি। কোমল নরম উলের উষ্ণতা ক্রমে বুনো ডেইজি ফুল হয়ে ফুটে উঠল। তুমি মুগ্ধ বালকের মতো কী করবে ভেবে পাচ্ছিলে না। শুধু জড়িয়ে রেখেছিলে। আমরা তো জানি না দ্য ওসেনস, হাউ দেয়ার ওয়েভস অ্যারাইজ ইন ফিয়ারফুল স্টর্ম। আচ্ছন্ন না থাকলে আমি কখনই পারতাম না। আর যখনই আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছিল, চিৎকার করে উঠলাম, নো মি বয়।

তুমি আমাকে জড়িয়ে রেখেছ।

তুমি বললে, ফর আই হ্যাভ বিন আউট ইন দ্য নাইট অ্যান্ড অ্যাম কভারড উইদ ডিউ।

তুমি আমার কোমর জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসলে এবং নাভিমূলে গাল রেখে বুনো ডেইজি ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে গেলে। আমি নড়তে পারছিলাম না। তারপর কী করতে হয় কিছুই যে জানি না।

তখন পিছিলে শোরগোল।

সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। ঘাড়ে চোট লেগেছে। ঘাড় নাড়াতে পারছে না। সে যে খুব অস্বস্তি বোধ করছে তার আচরণেই টের পাওয়া যাচ্ছে। চার্লি তাকে ফোকশালে রেখে ছুটে কেবিনে চলে গেছে।

সবাই উঁকি দিয়েছে। কী হল? কী করে পড়লি?— এসব নানা প্রশ্ন। তার এক কথা, পড়ে গিয়ে লেগেছে। তার এক কথা, দ্যাখো তো মুখার্জিদা ফিরল কি না। কোথায় যে যায়! দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় সুহাসের মুখ খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

বংশী বলল, কোথায় আর যায় বোঝো না।

বংশী বাংকে বসে পা দোলাচ্ছে। উপরের বাংকে শুয়েছিল। নীচের বাংক ছেড়ে দেওয়ায় তাকে উপরে উঠে যেতে হয়েছে। সে-ই সারেং সাবকে খবর দিয়েছে, সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে জখম। নুনজলের সেঁক দেওয়া হচ্ছে। অধীর বাংকের পাশে একটা টুল নিয়ে বসে গেছে। সুহাসের ঘাড় ফেরাতেও কষ্ট। সে কেবল বলছে, এখনও এল না। রাত তো কম হয়নি।

মুখার্জিদা না ফেরায় তার যেন আতঙ্ক বেড়ে গেছে। খুবই ঘাবড়ে গেছে মনে হয়। সুরঞ্জন আর মুখার্জিদা একই সঙ্গে বের হয়ে গেছে।

জাহাজে মাল তোলা হচ্ছে। ইঞ্জিন-রুমে কাজেব চাপ নেই বললেই হয়। টানা আট ঘণ্টা একজন কবে ফায়াবম্যান নীচে থাকলেই হল। এখন কিছু হালকা কাজ ফায়াবম্যানদেব কবতে হয। কাজেব চাপ কম বলেই মুখার্জিব সঙ্গে বেব হযে যেতে পেবেছে সুবঞ্জন। বন্দবে এসে একটা মাত্র বয়লাব চালু বাখা হয। জাহাজ চালানো বাদেও নানা খুচবো কাজ থাকে, একটা বয়লাব সেজন্যই চালু বাখা হয়। জেনাবেটাব, জেনাবেল সার্ভিস পাম্প, উপবেব ট্যাংকগুলিতে জল তোলাব কাজ। বন্দবে এলেও জাহাজে কাজ থেকে যায়। সুবঞ্জনেব অবসব এখন অনেক। মুখার্জিদাব সঙ্গে যেতেই পাবে।

অস্বস্তিতে সে শুযে থাকতে পাবছে না। একবাব উঠে বসছে। আবাব শোবাব চেষ্টা কবছে। ঘাড় ভাল কবে ফেবাতেও পাবছে না। সাবেং সাব চেঁচামেচি শুরু কবে দিয়েছেন, আমাব কথা কেউ শোনে। এখন কিছু হলে কোথায় যাব।

কিনাবায লোক নেমে যাওয়ায় জাহাজে ভিডভাট্টা কম। সকাল থেকেই টাগবোটে মাল আসছে। বড বড তামাব পিপে ভর্তি ফসফেট। ডেবিকগুলো সব তুলে দেওয়া হয়েছে। ডেবিকে মাল তোলা হচ্ছে। সাবা ডেক-এ ফসফেটেব গুঁডো। কিনাবায় লোক নেমে গেলে জল মেবে সাফ কবা হয়েছে। ফলকাব কাঠও ফেলাব কাজ থাকে। বৃষ্টিবাদলা হলে ফসফেট গলে যাবে সব। নানা ঝামেলাব মধ্যে সুহাস ঘোডা থেকে পডে গিয়ে নতুন ঝামেলা পাকাল, কাপ্তানকে বিপোর্ট কবা দবকাব। সুহাস কিছুতেই বাজি না। মুখার্জিদা না এলে কিছু হবে না।

সাবেং এতেও ক্ষুব্ধ।

আবে, মুখার্জিবাবু কি তোব ওপবযালা? ভালমন্দ দেখাব কী দায় তাব? কিন্তু ওই এক গেবো, কাপ্তানেব পুত্রটি সুহাসেব গায়ে এঁটোলিব মতো কামডে বযেছে। সেজন্যই যত আবও ঝামেলা। তিনি না যে কবেন।

মুখার্জিদা বোধহয় গ্যাংওয়েতেই খববটা পেযেছিলেন। তিনি ছুটে এসেছেন। তিনি তো ভাল নেই। ন্যাকেব হত্যাবহস্য শুধু নয, কলিজ জাহাজেব বহস্য তাঁব মধ্যে সমান বিভ্রান্তি সৃষ্টি কবেছে। মুখোশেব হদিস পেয়ে গেছেন, কে মুখোশ পবে চার্লিকে অনুসবণ কবছে তাও তিনি জানেন, কিন্তু কেন এই অনুসবণ, একজন নাবী যদি জাহাজে থাকেই তাব জন্য মুখোশ পবে ঘুবে বেডাবাব কী দবকাব? তিনি হাপাতে হাঁপাতে এসে পাশে বসলেন, তাবপব কোনও প্রশ্ন না কবে চোটপাট শুরু কবে দিলেন।

আমবা কি তোব চাকব? তুই আব চার্লি এয়াবস্ট্রিপ পাব হযে কোনদিকে গেলি? চার্লিব লাগেনি তা! ঘোডা থেকে পডে গেলি? দেখি।

বলে তিনি ঘাডে হাত দিতে গেলে সুহাস প্রায় আর্তনাদ কবে উঠল, লাগছে।

খুব লাগছে?

ঘাড তো ঘোবাতে পাবছি না।

তাবপব আশ্বাস দেবাব ভঙ্গিতে মুখার্জি বললেন, সেবে যাবে।

বংশীব দিকে তাকিয়ে বললেন, তোব খাওয়া হযেছে? না হলে খেয়ে নে। আমাব দেবি হবে। বসে থাকিস না। অধীবেব দিকে তাকিয়েও সেই এক কথা।

বসে থাকলি কেন। যা। সুহাসেব খাবাব নীচে দিযে যা।

বংশী অধীব বেব হয়ে গেলে, দবজায় মুখ বাডিযে বললেন, থাক, সুহাসেব খাবাব নীচে পাঠাতে হবে না। হবেকেষ্টকে ডেকে দে।

বলে দবজা বন্ধ কবতেই দেখলেন, সুহাস উঠে বসেছে। সে শুধু বলল, ঘাডে লেগেছে। তবে ঘাবডাবে না। সেবে যাবে। চার্লি মেয়ে। তোমার কথাই ঠিক।

মেয়ে। মানে ওম্যান!— তাহলে তাঁব বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

ইয়েস ওম্যান। তোমাব কথাই ঠিক। সেন্ট পার্সেন্ট ঠিক। তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন। যেন ভূত দেখছ। না, আমাব খুব লাগেনি, বলছি তো সেবে যাবে।

তিনি ধীবে ধীবে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিছু ডেক-জাহাজি খবব পেয়ে সুহাসকে দেখতে এসেছে। মুখার্জিদা খুবই বিবক্ত। বললেন, ভাল আছে। যাও ভিড বাড়াবে না।

উঠে গিয়ে দবজা বন্ধ কবে বললেন, চার্লি শেষে তোব কাছে ধবা দিল।

আমি জানি না দাদা! আমার কাছে ধরা দিল কি দিল না বলতে পারব না। কিন্তু, বলে লজ্জায় সুহাস কিছুটা বিচলিত বোধ করল। কী করে বলা যায়? নারী যদি জলকন্যা হয়ে যায়, যদি পাথরের উপর বসে থাকে, নিরাবরণ হয়ে থাকে তার কথা সে একজন বয়স্ক লোকের সামনে বলে কী করে! কিছুটা আমতা আমতা গলায় বলল, তোমরা কি আমাদের ফলো করছিলে!

করছিলাম তো। দেখি তোরা দু'জনেই সহসা উধাও। ব্যাটা সুরঞ্জন সাইকেল নিয়ে ঢুকবে কী করে। আমি একাও যেতে পারছিলাম না। কোপটা যে কার উপর পড়বে বুঝতে পারছি না।

কোপটা আমার উপরই পড়েছে। চার্লি না থাকলে মেরেই ফেলত।

দাঁড়া। আমাকে ভাবতে দে।— বলে তিনি পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের উপর ঠুকলেন। কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, আমার ঘরে যেতে পারবি? ধরব?

না, না, ধরতে হবে না।

সুহাস পায়ে চটি গলিয়ে বাংক ধরে উঠে দাঁড়াল। মনে হয় কোমরেও কিছুটা চোট পেয়েছে। কিন্তু সে যে এত শান্ত হয়ে আছে কীভাবে তাও বুঝতে পারছেন না মুখার্জি।

সুহাসকে দেখে মনে হচ্ছে তার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। যে কোনও আতঙ্ককে সহজে তুচ্ছ করতে পারে, অন্তত তার কথাবার্তা এত স্বাভাবিক, এবং তিনি যে আশঙ্কায় ভুগছিলেন, আজ তার একটা তরে মহড়া হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, পড়ে-টড়ে লাগেনি বলছিস? হেঁটে যেতে পারবি তো?

পারব।— বলে সুহাস কোনও রকমে পা টেনে টেনে মুখার্জির ফোকশালে ঢুকে গেল।

মুখার্জিদা বললেন, সুরঞ্জনকে ডাকি। সুরঞ্জন বোধহয় খবরটা পায়নি।

ডাকো। ওর জানা দরকার।

মুখার্জিদা সুরঞ্জনের ঘরে গিয়ে দেখলেন, নেই। বোধহয় ডেক থেকে নামেনি। মনু জাল বুনছে। তাকেই বলে এলেন, সুরঞ্জনবাবুকে বলবে, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

তিনি যে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে আছেন তাও বোঝা গেল। কারণ সিগারেটে আগুন দিতে ভুলে গেছেন। দেশলাইটা পকেটে রেখে দিয়েছেন। সিগারেট টানতে গিয়ে টের পেলেন আগুন ধরাননি। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে এ পকেট সে পকেট হাতড়াচ্ছেন। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে দেশলাই বের করলেন, কিন্তু সিগারেট ধরালেন না। হাতের দু' আঙুলে সিগারেট, মাঝে মাঝে মুখ মুছছেন হাতে। এগুলো মুখার্জিদার দুর্বলতার লক্ষণ সে আগেও টের পেয়েছে। বাংকে বালিশটা মুখার্জিদাই টেনে বললেন, বসে থাকতে কষ্ট হলে শুয়ে পড়।

না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি ভেবো না।

কী হল বলবি তো!

চার্লির ধারণা তার ঠাকুরদা এই দ্বীপটায়ও বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন। জাহাজটার নাম ডরোথি ক্যারিকো না কারকার কী যে বলল মনে করতে পারছি না। ওর ঠাকুরদার প্রমোদ-তরণীর নাম নাকি ওরকমেরই ছিল!

তারপর?

তারপর এক-একটা ফুল দেখছে আর কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছে। কাশের জঙ্গলে ঢুকে বলছে ওগুলো নাকি ব্লুস্টেম ঘাস। বলো কী বলি! বুনো ফুলের মধ্যে চার্লি নাকি নিজেকে ফিরে পায়। এক-একটা ফুল আবিষ্কার করছে, আর বলছে, সুহাস, আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফট অফ মাই চাইল্ডহুড! বলো কী বলি! ফুলগুলি জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে!

সুহাস বুঝতে পারছে, মুখার্জিদা অস্থির হয়ে পড়ছেন। অধৈর্যের চূড়ান্ত। কিন্তু সবটা না বললে বুঝবেন কী করে?

সে বলল. জানো, ক্রমে কেমন আচ্ছন্ন হতে হতে আমার কথা ভুলে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাকছি, চার্লি সাড়া নেই। ঘাসের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছি, নেই। ঘাসের মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল! ঘোড়াটাকেও দেখতে পেলাম না। ছুটলাম। ঢালু জমি পার হয়ে পাথরে লাফ দিয়ে নামতেই দেখি দূরে পাথরের গায়ে সমুদ্র লেগে আছে। বড় বড় ঢেউ আছড়ে

ড়ছে। আব মানুষেব অবয়বে কেউ বসে আছে দেখতে পাচ্ছি। যত এগিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, সে চোখেব সামনে বড হয়ে উঠছে। ঘাবড়ে গেছি।

সুহাস বলতে গিয়ে ঢোক গিলল।

জ্যান্ত মৎস্যকন্যা। ভয়ে হয়তো পালাতাম। দেখি ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। সাহস ফিবে পেলাম। কিন্তু পাশে জামা-প্যান্ট পড়ে আছে। আব তখনই ডেকে উঠলাম, চার্লি। ওব জামা-প্যান্ট তো আমি চিনি। কোনও সাড়া নেই।

তাবপব?

আবাব ঢোক গিলল। সবিস্তাবে বলতে পাবল না। শুধু বলল, ওব হাত ধবে তুলে আনলাম। বললাম, কী ছেলেমানুষি কবছ! চার্লি, প্লিজ, কে দেখে ফেলবে! তুমি ওম্যান। তুমি গার্ল! ছিঃ ছিঃ, শগগিব জামা-প্যান্ট পবো। কিছুতেই পববে না। জোবজাব কবে পবিয়ে দেবাব সময় ঠাট্টা কবে বলেছি, দেন ইয়ো আব এ গার্ল। সঙ্গে সঙ্গে চার্লি আর্তনাদ কবে উঠল, নো মি বয়।

আব তখনই একটা লোক যমদূতেব মতো কোত্থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল। দেখি, দেখি

সে কেমন তোতলাতে থাকল।

কী দেখি!— মুখার্জিদা জানাব জন্য অস্থিব হয়ে উঠছেন।

সেই গুঁফো লোকটা। নিউ-প্লাইমাউথ বন্দবেব সিম্যান মিশনে যে হিপনোটাইজ কবেছিল।

মুখার্জিদা উত্তেজনায় অস্থিব হয়ে উঠছেন।

ঘোড়া থেকে নেমেই আমাকে ঘুষি মেবে ফেলে দিল। উঠতে পাবছিলাম না।

সুহাস হাঁপাচ্ছে। কিছুটা দম নিয়ে বলল, আমি নিজেই বিশ্বাস কবতে পাবছি না, কী কবে ঘটে গেল সব। চার্লি চোখেব পলকে ঘোডাব পিঠে লাফিয়ে বসল। মনে হল চার্লি বুঝি পালাচ্ছে। না, চার্লি পালাচ্ছে না। সোজা ঘোডাব পিঠে দাঁড়িয়ে গেল। বুটেব ডগায় লোকটাব মাথায় বিদ্যুৎ বেগে লাথি কষাল। হুমডি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। চার্লি লাফিয়ে নেমে এল, আমাব মাথা তখনও ঘুবছে। উঠতে পাবছি না। শিশুব মতো বগলে নিয়ে ঘোডায় তুলে ছুটতে থাকল। বলতে বলতে সুহাস শিউবে উঠছে। টিলাতে উঠে দেখছি, লোকটা নীচে উঠে দাঁড়িয়েছে। মবে যাযনি। খোঁড়াচ্ছে।

টিলাব উপব থেকে চার্লি চিৎকাব কবে বলছে, আই উইল বিওযার্ড ইয়োব ইভিল, উইদ ইভিল। নাথিং ক্যান স্টপ মি।

জঙ্গলেব মধ্যে চার্লি নিমেষে আমাকে নিয়ে অদৃশ্য হযে গেল।—সুহাস ফেব হাঁপাচ্ছে। যেন দম পাচ্ছে না।

বুনো ডেইজি ফুল খুঁজে পেলি!— মুখার্জি সিগাবেট ঠুকছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসেব মুখ আশ্চর্য সুষমায ভবে গেল। মুখ নিচু কবে বলল, পেয়েছি।

আব কিছু?

সুহাস কেন যে লজ্জায় কিছুতেই মাথা তুলতে পাবছে না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, এই প্রথম চার্লি স্বীকাব কবেছে, সে নাবী। বলেছে, আই অ্যাম স্লিম টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড। আই নিড ইয়োব হেলপ সুহাস। আই নো দ্যাট ওয়ান ডে ইয়ো উইল কাম অ্যান্ড হ্যাভ মার্সি অন মি।

মুখার্জি খুবই বিচলিত। সঙ্গে সাফল্যেব সুখও অনুভব কবছেন। তিনিই ঠিক। শি ইজ ওম্যান। আই অ্যাম স্লিম, টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড চার্লিব অকপট স্বীকাবোক্তি।

তিনি দেখলেন, সুহাস ফেব শুযে পড়েছে। পাশ ফিবে শুয়ে আছে। আর কোনও কথা বলছে না। সুহাস যে খুবই ভেঙে পড়েছে বোঝা যায। আশঙ্কা শেষে এভাবে সত্যি হবে তিনি বিশ্বাস কবতে পাবছে না। তাঁব কী অপবাধ তাও সুহাস বোধ হয় বুঝতে পাবছে না। খুবই ঘাবডে গেছে। ঘাবডে যাওয়াই স্বাভাবিক। তা হলে নিউ-প্লাইমাউথ থেকেই সুহাসকে খুন কবাব চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

না হলে ফলকাব পাশে খালি টব অন্ধকারে বেখে দেবে কেন! ডেকের অন্ধকাবে কিছু পড়ে থাকলে অভিবিতে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক। সুহাস যে তাব সঙ্গে গভীব বাতে বোট-ডেকে উঠে গেছে তা কেউ লক্ষ বেখেছে। সে যে ফেবাব সময় যমুনাবাজু ধবে নীচে নেমে আসবে তাও চক্রান্তকাবীব জানা।

ভাগ্যিস যমুনাবাজু ধরে নামেনি। গঙ্গাবাজুতে নেমে এসেছিল। কেউ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে ভেবেই তো সুহাস ছুটে গিয়েছিল। না গেলে বুঝতেও পারত না, অদৃশ্য চক্রান্তকারী সুহাসের জন্য মরণফাঁদ সৃষ্টি করে রেখেছে। অন্ধকারে হোঁচট খেলে নির্ঘাত সে ফলকার নীচে জাহাজের খোলের মধ্যে পড়ে যেত। দুটো কাঠও খুলে রেখেছিল ফলকার। ঠিক খালি টবটার পাশেই। পড়ে গেলে সুহাস ছাতু হয়ে যেত।

সুহাসকে এখন বেশি জেরা করাও ঠিক হবে না। অথচ জেরা না করলে বুঝতেও পারবেন না, অ্যালেন পাওয়ার সম্পর্কে কিছু জানা গেল কি না। চার্লির প্রসঙ্গ তোলা যায়। চার্লি ছিল বলে সে রক্ষা পেয়েছে বললে সুহাস খুশিই হবে। সুরঞ্জনটা কী করছে! তাকে সব বলা দরকার। সুহাসকে একা ফেলে রেখেও যেতে মন চাইছে না। সুহাস তাঁর খুবই অনুগত আর বিশ-বাইশ মাসে সম্পর্ক কত গভীর হয়ে যায় সে জানে। জাহাজ থেকে নেমে যে যার লটবহর নিয়ে বিদায় জানাবার সময় সবারই চোখ ছল ছল করে ওঠে। কবে দেখা হবে কি দেখা হবে না। অথচ জাহাজে সুখে-দুঃখে দিন কাটিয়ে ঘরে ফেরার সময় বোঝা যায় কী গভীর টান! কেউ কেউ বুকে জড়িয়ে কেঁদেই ফেলে। জাহাজি জীবনে এই এক জ্বালা।

তিনি উঠে গিয়ে দরজায় ডাকলেন, অধীর আছিস?

তিনি ডাকলে সাড়া না দেওয়ার কথা নয়। অধীরও কি উপরে বসে আছে? আশ্চর্য অধীরের ফোকশালে গিয়ে দেখলেন, সে নেই, সুরঞ্জনের ফোকশালও ফাঁকা। চারজন জাহাজি ফোকশালের চারটে বাংকে থাকে। কেউ নেই। গেল কোথায় সব! রাত দশটা বাজে। ঘড়ি দেখে টের পেলেন। সুহাসের ফোকশালে শুধু বংশী শুয়ে আছে। যা করে থাকে, স্ত্রীর চিঠি না হয় ছবি দ্যাখে। তাকে দেখেও যেন দেখল না।

অধীর নেই দেখছি!

বংশী শুয়ে থেকেই বলল, কোথাও গেছে।

বংশীকে বলেও লাভ নেই। তিনি পর পর সব ফোকশাল খুঁজে কাউকেই দেখতে পেলেন না এমনকী ডেক-সারেং ইঞ্জিন-সারেঙের ঘরও খালি। অগত্যা নেমে এসে বংশীকে বললেন, আমার ফোকশালে গিয়ে শুয়ে থাক। দরজা বন্ধ করে যাস।

তিনিও দরজা বন্ধ করে সুহাসের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছিলেন। সেই ফাঁকে সবাই ঘর খালি রেখে কোথাও উঠে গেল! জাহাজে এমন কী হল, ফোকশাল খালি করে সবাই উপরে উঠে গেছে! কী ব্যাপার! সাংঘাতিক কিছু কি ঘটে গেল? কেউ কি আবার কোনও দুর্ঘটনার শিকার? মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল। ফোকশাল সব খালি হয়ে গেলে, জাহাজটা যে কী সাংঘাতিক ভুতুড়ে-ভুতুড়ে মনে হয় এই প্রথম টের পেলেন তিনি।

বংশী গেল কি না কে জানে! সুহাসকে একা ফেলে উপরে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ফের নিজের ফোকশালে ঢুকে দেখলেন, বংশী তার কথা রেখেছে। সে পাশের বাংকটায় বসে আছে।

শোন বংশী। আমি উপরে যাচ্ছি। আমি ফিরে এলে যাবি।

একা সুহাসকে ফেলে যাবি না বলতে পারতেন। কিন্তু বললেন না। কী দরকার? এতে সুহাস আরও কাতর হয়ে পড়তে পারে। যতই বলুক তার কিছু হয়নি, কিংবা সে ভয় পায় না, সব রকমের দুর্যোগের মুখোমুখি হওয়ার সাহস সে রাখে—বলতে হয় বলে বলা। তা ছাড়া কিছু একটা হয়ে গেলে হাত কামড়াতে হবে।

ওর যা লাগে দিস। তোর খাবার দেবে সুহাস?

সুহাস উঠে বসার চেষ্টা করলে বললেন, উঠছিস কেন?

বাথরুমে যাব।

বংশী, যা। ওকে ধরে নিয়ে যা।

ধরতে হবে না। একাই যেতে পারব।

পারবি তো? পড়ে-টড়ে যাবি না তো?

না না। তুমি কেন যে এত উতলা হয়ে পড়ো বুঝি না! ভালই তো আছি।

সহসা খেপে গেলেন, ভাল আছিস তো গুম মেরে গেলি কেন! উঠতে পারছিস না, তবু বলছিস পারবি!

পারব। দ্যাখো না!— বলে সন্তর্পণে সে উঠে বসল। বাংকের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর বের হয়ে গেলে মুখার্জি বংশীকে বললেন, সঙ্গে যা। সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। যাই বলুক, গায়ে মাখবি না।

বংশী উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজায় দাঁড়াতেই তিনি ছুটে গেলেন ডেক-এ। আর আশ্চর্য, দেখলেন ঠিক বোট-ডেকের নীচে জাহাজিদের জটলা! ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জাহাজিরা।

সামনে পেলেন গ্যালির ভাণ্ডারি ইমতাজকে। বললেন, কী হল চাচা? তোমরা সবাই এখানে! সুরঞ্জন কোথায়?

তা তো জানি না।

বুকটা ধক করে উঠল।

জটলার মধ্যে ঢুকে বললেন, কী হয়েছে? সুরঞ্জন কোথায়?

সুরঞ্জন বের হয়ে বলল, শুনছ?

যাক, সুরঞ্জনের কিছু হয়নি। কিছুটা যেন হালকা হতে পেরেছেন।

কী হয়েছে?

কী আর হবে! বাপ-ব্যাটাতে লেগে গেছে!

বাপ-ব্যাটা?

আরে, চার্লি খেপে গেছে! ঘর থেকে সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। জামা-প্যান্ট লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে। পোর্ট-হোল দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে সব। একবার নাকি প্রায় উলঙ্গ হয়ে বের হয়ে আসছিল। কাপ্তান বোট-ডেকের সব আলো নিভিয়ে দিয়েছেন! অন্ধকারে কী হচ্ছে বোঝাও যায় না। চিফ মেট সেকেন্ড মেট সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। কাউকে ওদিকে যেতে দিচ্ছেন না। যা মুখে আসছে গালাগাল দিচ্ছে চার্লি। কাপ্তানকে কী বলেছে জানো? চিৎকার করতে করতে ছুটে গেছে কাপ্তানের কেবিনে। হুল্লোড। কাপ্তান একটা চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে চার্লিকে কেবিনে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা লক করে দিয়েছেন। ভাগ্যিস অন্ধকার! কেচ্ছা। কেউ টের পায়নি।

মুখার্জি বললেন, অন্ধকার কোথায়? জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্নায় বোঝা যাবে না?

সে তো জানি না।

কাপ্তান-বয় কোথায়?

ওর কেবিনে। কেউ বের হতে পারছে না। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে। বোট-ডেকে কাউকে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। চার্লি খেপে গেল কেন বলো তো?

চার্লি তার বাবাকে কী বলেছে বলবি তো!

আমি কি শুনেছি? কাপ্তান-বয় এসে বলল, জানেন, এমন ভাল মানুষের কপালে এই দুর্গতি! শত হলেও তোর বাবা, গুরুজন, তাকে বলতে পারলি, ইয়ো ক্রেজি ওল্ড গোট!

ও এটুকু! আর কিছু বলেনি?

স্টিংক কী, দাদা!— একপাশে ডেকে নিয়ে সুরঞ্জন মুখার্জিকে প্রশ্ন করল।

স্টিংক!

তাই তো বলল কাপ্তান-বয়। চার্লি নাকি বাবার দরজায় লাথি মেরে বলেছে, ইয়ো স্টিংক!

স্টিংক মানে তো দুর্গন্ধ।

দুর্গন্ধ!

তাই তো জানি! কাপ্তান-বয় শুনল কী করে!

সে কাপ্তানের কেবিনে কোনও কাজে গিয়েছিল বোধ হয়।

আর অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা কোথায়?

সব ক'টা তটস্থ। যে যার কেবিনে চুপচাপ বসে আছে। কাপ্তান একবার ব্রিজে, একবার চার্টরুমে, একবার নিজের কেবিনে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছেন। আচ্ছা, কাপ্তেনের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? যাকে সামনে পাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। বাস্টার্ড সোয়াইন বিচ বলতেও মুখে আটকাচ্ছে না!

যাক, তা হলে চার্লি রিভোল্ট করতে চাইছে! এদিকে খবর রাখিস, সুহাসকে আজ মেরেই ফেলত।
কে মেরে ফেলত।
সে কে জানি না। তারই প্রতিক্রিয়া এখানেও চলছে কি না জানি না। কী যে হবে!
সুরঞ্জন বলল, চার্লি?
না, চার্লি না। চার্লিকে অযথা আমাদের সন্দেহ করা ঠিক হয়নি!

জাহাজিরা যে বোট-ডেকের ছাদের নীচে জটলা করছে, নিশ্চয় কাপ্তান টের পাননি। টুইন-ডেকে নামার সিঁড়ির ঠিক কাছে না গেলে বোঝা যায় না, সেখানে জাহাজিদের কোনও জটলা আছে। মাঝে মাঝে কাচ ভাঙার শব্দ তারা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাতুড়ি দিয়ে দড়াম দড়াম দরজায় কেউ মারছে। কে মারছে, কাপ্তান না চার্লি, বোঝা যাচ্ছে না।

জাহাজিরা ফলে চিফ কুকের গ্যালির ছাদের নীচে নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। মুখার্জি ডেক-এ ছুটে আসার সময় শুধু দেখেছেন সেকেন্ড মেট বোট-ডেকেব রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, জাহাজিরা ডেক-ছাদেব নীচে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিনিও বোধ হয় বেশ বিচলিত। জাহাজের সর্বময় কর্তা যদি অস্থির হয়ে পড়েন, তবে জাহাজিরাই বা ঠিক থাকে কী করে!

অথচ আর কোনও টুঁ শব্দ হচ্ছে না। কেউ কেউ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরেও পড়ছে। ইঞ্জিন-সারেং চিফ কুকের গ্যালিতে বসে আছেন। তিনিও বুঝতে পারছেন না, কেন চার্লি এত খেপে গেল! কেন কাপ্তান পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়েছেন? ঘোর দুর্যোগে সমুদ্রে যিনি এত অবিচল থাকেন, তাঁব এমন কী হল যে, এক দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারছেন না!

আর তখনই মনে হল ঠিক সিঁড়ি ধরে কে নেমে আসছেন, চিৎকার করতে করতে বলছেন, লিসন মাই ফেইথফুল সেলরস, লিসন ক্লোজলি টু মাই প্রেয়ার, হিয়ার মাই আরজেন্ট ক্রাই? আই উইল কল টু ইয়ো হোয়েনেভার ট্রাবল স্ট্রাইকস, অ্যান্ড ইয়ো উইল হেলপ মি।

মুখার্জি থ। কাপ্তান দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন বোট-ডেকে। এমন নিরুপায় মানুষ মুখার্জি যেন জীবনেও দেখেননি! তাঁর চকচকে পোশাক আজ নোংরা মনে হচ্ছে। অন্তহীন এক অবাজকতার শিকার যেন তিনি। জাহাজের অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা কেউ যেন তাঁর নয়। একমাত্র বিশ্বস্ত তাঁর এই নিবক্ষর অর্ধশিক্ষিত জাহাজিরা।

বোধ হয় কাপ্তান পিছিলে উঠে যেতেন। অন্তত তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসার ভঙ্গি দেখে মুখার্জির এমনই মনে হয়েছিল! তিনি ঘোর দুর্যোগে পড়ে গেছেন। দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও এই অবিচল মানুষটিকে বোঝা যায় তাঁর রাশ-আলগা হয়ে গেছে। অথচ তিনি পিছিলে ছুটে গেলেন না। ডেক ছাদের নীচেই জাহাজিরা গা ঢাকা দিয়ে আছে টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

সবাই একে একে সরে পড়তে থাকলে, তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মুখার্জি যাচ্ছেন না।

মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাপ্তানকে দেখছেন।

তাঁর সুন্দর চকচকে সাদা পোশাকে কীসের দাগ?

চার্লি কি কফির পেয়ালা ছুঁড়ে মেরেছে কাপ্তানকে? আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি! এই কি তবে সেই রিওয়ার্ড? কাপ্তান কি তবে চার্লির সেই নিশ্চিত ইভিল, কফির কাপ ছুঁড়ে মেরে বুঝিয়ে দিল!

না, মাথায় কিছু আসছে না। তবে সেকেন্ড কে? সে মুখোশ পরে অনুসরণ করে কেন? কাপ্তানের চর! চর হলে এ সময় তাকে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না কেন! চর হলে কেন তিনি তার নাবিকদের সম্বোধন করলেন, লিসন মাই ফেইথফুল সেলরস, লিসন ক্লোজলি টু মাই প্রেয়ার..

প্রেয়াব কথাটাই বা বললেন কেন?

তাঁব আদেশ জাহাজে শিবোধার্য। সমুদ্রে ফাঁসিব হুকুম দিলেও। তবে কেন তিনি চার্লি কিংবা সুহাসেব পেছনে চব নিযোগ কববেন? সুহাস যদি তাঁব পথেব কাঁটা হয, জাহাজ থেকে নামিযে দিতে পাবেন। দেশেও পাঠিয়ে দিতে পাবেন। চার্লিকেও পাবেন।

তবে পাবছেন না কেন?

তাঁব এই কাতব প্রার্থনা কী যে করুণ! মুখার্জিব নিজেবই খাবাপ লাগছিল। চার্লি তাঁকে অসম্মান কবতেই বা সাহস পায় কী কবে! ইযো ক্রেজি ওল্ড গোট, ইয়ো স্টিংক—বাবাকে এভাবে কুৎসিত কথাবার্তা বলা কত অশোভন চার্লি বুঝবে না? চার্লি বুঝবে না, সে তাব বাবাকে খাটো কবলে নিজেই খাটো হয়ে যায?

এটা কি কোনও আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে? অবদমিত আকাঙ্ক্ষাব আগ্নেযগিবি লাভাব মতো বিস্ফোবণ ঘটাচ্ছে! চার্লিব কাছ থেকে এমন অস্বাভাবিক আচবণ তিনি যেন কিছুতেই আশা কবেননি। চার্লি কি মনে কবে তাব এই নিগ্রহেব মূলে তাব বাবা? এটাও তো ঠিক, চার্লিকে ছেলে সাজিয়ে বাখা কেন? কী দায পড়েছে একজন পিতাব, তাব কন্যাকে অকাবণে এই নিগ্রহেব মধ্যে ফেলে বাখাব! না, তিনি কিছুই বুঝছেন না।

মুখার্জি পিছিলে ফিবে এলে সবাই ঘিবে ধবল।

সুবঞ্জন মেসরুমে ঢুকে গেছে। ভাণ্ডাবিকে কিছু বলছে হয়তো। খাবাব সব ঠান্ডা। গবম কবেও নিতে পাবে খাবাব। তাব ধাবণা, সবাব খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সে দেখল, খাবাব প্রায় সব পড়েই আছে। কেউ খায়নি তবে। তাব পছন্দ হচ্ছিল না, মুখার্জিদা বক বক করুক।

সে একবাব সিঁড়ি ধবে নীচেও নেমে গেল। সুহাস নেই। খালি ঘব। সবাই ডেক-এ উঠে গেছে, সুহাস যাযনি কেন? সে বুঝতে পাবছে না, সুহাস কোথায থাকতে পাবে! তাব কী হযেছে তাও জানে না। মুখার্জিদাব দবজা ঠেলে দিতে দেখল, সুহাস ক্ষিপ্ত। গজ গজ কবছে। বলছে, কাবও সাড়াশব্দ নেই, না মুখার্জিদাব, না সুবঞ্জনেব! খিদেয় পেট চোঁ চোঁ কবছে।

সুবঞ্জন বলল, উপবে চলে আয। ওদিকে তোমাব তামাশা জমে উঠেছে। পবে বলা যাবে। আমি যাচ্ছি। বংশীদা খেযেছ?

বংশী ঘাড নেড়ে বলল, খেয়েছে।

উপবে উঠে বুঝল, মুখার্জিদাকে সবাই এখনও জেবা কবছে। কাপ্তান চিৎকাব কবে কী বলছিল, জানতে চাইছে। মুখার্জিদা বেঞ্চিতে বসে বলছেন, তোমবাই আমাব বিশ্বস্ত জাহাজি। বিপদে তোমবাই আমাব সব। কাপ্তান শেষ পর্যন্ত হাত তুলে যা হোক স্বীকাব কবলেন।

এই কথা কেন মুখার্জিবাবু?

তা তো জানি না।

চার্লি খেপে গেল কেন? কাপ্তান খেপে গেল কেন?

সাবেং ধমক দিলেন, মুখার্জিবাবু কী কবে বলবেন কাপ্তান খেপে গেল কেন? কাপ্তান কি তাঁকে ডেকে বলেছেন, মুখার্জি চার্লি খেপে গেছে। পাবো তো আমাকে উদ্ধাব কবো। তোমবাও যা জানো তিনি তাব চেয়ে বেশি জানবেন কী কবে?

সুবঞ্জন আব পাবল না। খিদে পেলে সে মাথা ঠিক বাখতে পাবে না। মুখার্জিদা না এলে খেতেও পাবছে না। অথচ মুখার্জিদা যেন মজা পেয়ে গেছেন, তাঁব কথাবার্তা শুনে মনে হয, জাহাজে এটা এমন কিছু ঘটনা নয! যখন কিছুই তেমন ঘটনা নয, তবে বকবক কবছ কেন? দেবি কবছ কেন? খেয়ে নাও। যেন খুবই লঘু চিত্ত। তিনি বললেন, আবে কী দেখতে কী দেখেছে!

না, মানে, ছোটসাব নাকি মেয়েদেব পোশাকে বেব হযে এসেছিল? কয়লায়ালা হাফিজেব খুব বগড আমি শাড়ি পবে ঘুবে বেড়ালে বখশিস দেবে?—বলে সে লুঙ্গিটা মাথায় তুলে সবাব সামনে কোমব দুলিযে ঘুবে গেল। সামনে সাবেং সাবকে দেখেই জিভ কেটে এক দৌড়।

জাহাজিদেব মধ্যে বেশ বগড জমে উঠেছে। বাপ-ব্যাটাব লড়ালড়ি, বোঝো এবাব! ঘবে ঘবে যে যাব মতো কেচ্ছাও ছড়াচ্ছে। ওপবওয়ালাবা বেইজ্জত হলে কে না খুশি হয়! বড রকমেব কোনও দুর্যোগেব আভাস থাকতে পাবে এব মধ্যে তাবা ভাবতেই পাবে না। চার্লি যে কিনাব থেকে আকণ্ঠ

মদ্যপান করে ফেরেনি, কিংবা কোনও নারী সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার আছে এমনও চাউর হয়ে গেল। কেউ তো বলল, সুহাসকে তো চার্লিই ফোকশালে দিয়ে গেছে। দু'জনেই টলছিল। জাহাজ হোমে ফিরছে না বলে খেপে ছিল, মদ্যপান করে ঝাল মেটাল।

কেউ বলল, সুহাসও কিনার থেকে ফিরেই শুয়ে পড়ল। ঘোড়া ল্যাং মেরেছে। আরে, কার ল্যাং খেয়ে জব্দ কে জানে! মুখার্জিবাবু তো কাউকে ফোকশালে ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না।

মুখার্জিব কানেও উড়ো কথা ভেসে আসছে। তিনি গা করছেন না। জাহাজিদের তো কিছুই সম্বল নেই, এতে যদি মজা পায়, পাক না! তিনি নীচে নামার মুখেই দেখলেন, সাবেং হন্তদন্ত হয়ে পিছিল থেকে ছুটে আসছেন।

মুখার্জিবাবু।

তিনি ঘাড় ফেরালেন।

মেজ-মালোম।

কোথায়?

কী বলছে বুঝতে পারছি না। মেজ-মালোম সুহাসকে খুঁজছে মনে হয়। আপনি দেখুন কথা বলে।

মেজ-মালোম মানে সেকেন্ড মেট। মানে সেকেন্ড অফিসার। এত রাতে এদিকে! সুহাসকেই বা খুঁজছে কেন? তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। দৌড়ে গেল, ইয়েস স্যার। বলুন।

সুহাসেব নাম ঠিক বলতে পারছেন না। কেবল বলছেন, দ্যাট ইয়াং সেলর, আই মিন সাঁস।

সাঁস নয়! সুহাস।

ইয়েস সাঁস।

মুখার্জি আর ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা না করে বললেন, ওর তো শরীব ভাল নেই। নীচে যাবেন?

দিস ইজ দ্য মেসেজ।— বলে তিনি একটি খাম ধরিয়ে দিলেন। কাপ্তান নিজে লিখেছেন। সারেংকে ডেকে বললেই পাবতেন। মেসেজ পাঠালেন কেন? আশ্চর্য তিনি দেখলেন, নাম এবং নীচে মাস্টাব অফ দ্য শিপ লেখা। উপরে লেখা, আই নিড ইয়োর হেল্প। তারপর লিখেছেন, ওনলি এ ফুল ডেসপাইজেস হিজ ফাদারস অ্যাডভাইস, এ ওয়াইজ সন কনসিডারস ইচ সাজেসান! চার্লিকে তুমি বোঝাও।

ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। ও যাচ্ছে।

সেকেন্ড মেটকে চিবকুটটি ফেরত দিলেন না মুখার্জি। চার্লি কথা শুনছে না। চার্লি অবুঝ। চার্লি সুপুত্র নয়। এমন অভিযোগ দায়েব করা হয়েছে। যদি সুহাস তাঁর পুত্রের মতিগতি ফেরাতে পাবে। তাঁব হাসি পাচ্ছিল। এত কাণ্ডেব পব একজন সাধাবণ জাহাজিব কাছে এতটা নতি স্বীকারও কেমন খাবাপ লাগল। সুহাস গিয়ে কী কববে? সুহাসকে একা ছেড়ে দেওয়াও যায় না। এটা আদেশের পর্যায়ে না পড়লেও পরোক্ষে যেন তিনি সুহাসকে এখুনি যেতে বলছেন। বাবা হয়ে মেয়ের কাছ থেকে কী করে পুত্রের আচরণ আশা করেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। খুবই রহস্য।

নীচে নেমে দেখলেন আবার ভিড়। এত খারাপ লাগে! নানা প্রশ্ন, সেকেন্ড মেট পিছিলে কেন এসেছিলেন, কাকে খোঁজাখুঁজি কবছেন, কে সে!

তিনি সোজাসুজি বললেন, সুহাস। সুহাসকে কাপ্তান তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কথাটা শুনেই সুহাস বলল, আমাকে?

হ্যাঁ, তোমাকে।

সুরঞ্জন বলল, ছেলে বদমাইশি করল, আর টানাটানি সুহাসকে নিয়ে।

মুখার্জির কিছু ভাল লাগছে না।

আবে মিঞারা, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখানে কি তামাশা! সার্কাসও নয়, জন্তু জানোয়াবও উঠে আসেনি। যাও।— বলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সুরঞ্জনকে সব খুলে বললেন। বসে পড়লেন। মাথাটা তাঁর বেশ ধরেছে। বসে কপাল টিপছেন। কোনও কথা বলছেন না।

সুরঞ্জন বলল, ভেঙে পড়লে চলবে? কিছু বলো!

সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, রেডি হয়ে নে। আজ কপালে আমাদের দুর্ভোগ আছে। এই অধীব

ওব জুতো পালিশ করে দে তো। মোজা ভাল না থাকলে বের করে দিচ্ছি।— বলে তিনি আলমারি খুলে একটা পাট করা সাদা শার্টও বের করে দিলেন।

সুরঞ্জন বলল, আমার তো মনে হয় কাপ্তানকে সব খুলে বলা দরকার।

কী খুলে বলবে?— চোখ-মুখ কুঁচকে গেল মুখার্জির।

এই যে জাহাজে যা যা ঘটছে!

কী ঘটছে?— মুখার্জি বিরক্ত।

তাহলে বলা উচিত হবে না?

না।

কিন্তু আজকে যা ঘটল?

না, তাও না!

সুরঞ্জন সুবিধে করতে না পেরে বলল, যা খুশি করো, আমার কিছু বলার নেই। আরে, তিনিই তো সব। তিনি জানবেন না! এমন তো নয়, আমরা তাঁকে নালিশ দিতে পারি।

মুখার্জি কেমন নিরাশ। তিক্ত গলায় বললেন, তোর দেখছি সত্যি মাথাটা গেছে। চিরকুটে কী লিখেছেন দেখার পরও বলছিস আজকের ঘটনা তাকে বলা দবকার। চার্লি কি জানে না? বলার দরকাব থাকলে সে-ই বলবে! আর যাই করুক চার্লি সুহাসের কোনও ক্ষতি হয় এমন কাজ করতে পারে না। যদি মনে করে সুহাসেব কিংবা তার ঘোব বিপদ সামনে তবে দরকারে বলতেই পারে। আবার বলতে নাও পাবে। চার্লি তার বাবাকে নির্ভবযোগ্য না মনে কবলে বলতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই কোনও অশনি-সংকেত দেখা দিতে পাবে বললে।

সুহাস জোর পাচ্ছে না। সে সেজেগুজে বসে থাকল। তাব যেন উঠতে ইচ্ছে করছে না। কোমরে ব্যথাটা আছে। ঘাডেও। সত্যি যেন ফ্যাসাদে পড়ে গেছে।

সুবঞ্জন খেপে গিয়ে বলল, হয়েছে ভাল, মেয়ে আব বাবা দু'জনেবই এক কথা—আই নিড ইয়োব হেল্প। জাহাজে আব কাউকে পেলি না? সেদিনের ছেলে, সে তোদেব কতটা সাহায্য কবতে পারে!

সুহাস উঠে দাঁড়ালে মুখার্জি বললেন, অধীরকে ডাক সুবঞ্জন। তুই, অধীব বোট-ডেকের দুই সিঁড়ির আডালে বসে পাহারা দিবি। অধীব ফরোয়ার্ড-ডেকের দিকে, আর তুই আফটার-ডেকের দিকে। সুহাস কাপ্তানের কেবিন থেকে বের হলে লক্ষ রাখবি।

সুহাসেব মুখে ব্যাজার হাসি, আমার কি ফাঁসি হবে! যা করছ! যেন আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারার মতলব আছে কাপ্তানেব।

মুখার্জি বললেন, কাপ্তানেব না থাক, আব কারও থাকতে পাবে। মার খেয়েও লজ্জা হয় না? এক ঘুষিতে কাত! পালটা ঘুষি চালাতে পাবলি না? শেষে এক অবলা তোকে উদ্ধাব করে নিয়ে এল!

সুহাস বেব হবাব মুখে বলল, আচমকা সবাই মারতে পারে কিছু বুঝে ওঠার আগে। কে কতটা সাহসী আমারও জানা আছে।

কিছুটা তুচ্ছ কবতে শিখছে, এটা ভাল। মুখার্জি এমন ভাবলেন। অন্তত সুহাস নিজেকে সামলে নিয়েছে।

মুখার্জি বললেন, গ্যাংওয়েতে থাকব। সুরঞ্জন বিপদের গন্ধ পেলে দেরি করবি না। আমিও বোট-ডেকের নীচে আছি।

সুহাস বোট-ডেকে উঠে গেল। কাপ্তানের কেবিনের পাশে চিফ মেট সেকেন্ড মেট অপেক্ষা কবছেন। সে ঢুকেই অভিবাদন কবল। তার গলা শুকিয়ে উঠছে। বুক কাঁপছে। কিন্তু সে যতটা পারছে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। তিনি কী বলবেন সে জানে না। কেন ডেকেছেন তাও জানে না। যদি আজকের ঘটনার কথা জানতে চান, কিংবা চার্লি যা বলছে তা কতটা ঠিক, কতটা কী গোপন করেছে, এসব কারণেও ডাকতে পারেন। সে দেখল, তিনি পিছন ফিরে বসে আছেন। সাদা হাফশার্ট হাফপ্যান্ট পবনে, ঘরে বিশাল র‍্যাক, ভারী ভারী সব বই, নীল রঙের ক্যালেন্ডার, সাদা বিছানা, সবুজ সোফা, লাল কার্পেট, মাথার উপরে জিশুর মূর্তি। ফুলদানিতে গোলাপগুচ্ছ।

তিনি তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, গড ব্লেসেস গুড ম্যান, অ্যান্ড কনডেমস দ্য উইকেড।

তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। চার্লি আজ আবার অস্বাভাবিক আচরণ করছে। কেন করছে জানি না। তুমিই পারো তাকে সামলাতে। আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করি। দ্যাখো তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে পার কি না। চেষ্টা করতে আপত্তি কী?

সুহাস ফের অভিবাদন জানিয়ে বের হবার মুখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার দিকে তাকালেন না। চাবিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওকে আটকে রাখা হয়েছে। কী অবস্থায় আছে জানি না। দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছি না। দ্যাখো সে আবার যেন কেবিন থেকে ছুটে বের হয়ে না যায়। চার্লি তোমাকে পছন্দ করে। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। চার্লির কোনও ক্ষতি হয় নিশ্চয়ই তুমি চাও না আমিও চাই না। আমাদের দু'জনেরই এ জায়গাটায় দুর্বলতা আছে।— বলে তিনি দরজার কাছে এসে চিফ মেট সেকেন্ড মেটকে ইশারায় চলে যেতে বললেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

শেষে আবার সেই বোট-ডেকে সে একা। বোট-ডেকের আতঙ্ক এক নারী—যে রাতে, কিংবা রাত শুনশান হয়ে গেলে রেলিং-এ চুপচাপ গোপনে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যে বরফ-ঘরের ভূত নয়, সে যে চার্লি, আজ আর সুহাসের বিশ্বাস করতে কোনও দ্বিধা থাকল না। ছদ্মবেশের খোলস চার্লির বোধ হয় অসহ্য ঠেকে। তাকে দেখার জন্য অস্থিরও হয়ে পড়তে পারে। কতকাল থেকে চার্লি তাঁর কাছে বুনো ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে যে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। পারেনি। যার জন্য ফুটে থাকা নিভৃতে, সে-ই যদি দৌড়ে পালায় ক্ষোভ জ্বালায় ছটফট করতেই পারে, ভুতুড়ে কাণ্ড ভাবে, তবে অপমানে জ্বলে উঠতেও পারে।

চার্লির কোনও দোষ নেই।

কেন যে মনে হল চার্লি বড় নিঃসঙ্গ একা। এবং কিছুটা বোকা। সে তো মুখ ফুটে বলতে পাবত, মি গার্ল সুহাস। সে কেন স্বীকার করত না? চার্লি বোট-ডেকে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থেকে যে তাকে আতঙ্কে ফেলে দিত তখন বুঝতে পাবত না।

সে ব্রিজ দেখল, কেউ নেই। কোথাও থেকে আচমকা কেউ নেমে এলে প্রস্তুত থাকা ভাল। কিনারায় ঘরবাড়ির আলো পাহাড়ের ওপাশে কোম্পানির শহর, সেখান থেকেও আলোর উৎস উঠে আসছে পাহাডের মাথায়। চিমনির পাশের আলোটা বাতাসে দুলছে।

সে চাবিটা হাতে নিয়ে দেখল। তার তাড়াতাড়ি চার্লির কেবিনে ঢুকে পড়া দরকার। তবে সে জানে, সুরঞ্জন অধীর সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে। নীচের কেবিনগুলো থেকে কেউ বের হলে তারা দেখতে পাবে। কেবল এলিওয়েয়ের সিঁড়িটায় তারা নজর রাখতে পারবে না। ওটা ভিতরের দিকে। এলিওয়ে থেকে সিঁড়িটা বোট-ডেকে উঠে এসেছে। সাহেব-সুবোরা এই সিঁড়িটাই বেশি ব্যবহার করেন। সেই দিকটায় সে নিজেই নজর রাখছে।

ইস্! কী করেছে!

পায়ের নীচে সব কাচভাঙা। কাপ প্লেট ডিশ জলের গ্লাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। চাদর তোয়ালে, কাটা ছেঁড়া ম্যাট্রেসের ছড়াছড়ি। দরজার সামনে যাওয়াই কঠিন। সে নিচু হয়ে ম্যাট্রেস সরিয়ে দেবার সময় দেখল, ফালা ফালা করে কেটে ফেলেছে ম্যাট্রেসটা। আর তখনই ঘাড়ের উপর কার নিঃশ্বাস।

সে চমকে গেল।

সে অতর্কিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখল, কাপ্তান-বয় সামনে। তাকে ইশারায় কোথাও যেতে বলছেন।

কতদূর যেতে হবে, বুঝতে পারল না সুহাস। কাপ্তান-বয় বুড়ো মানুষ। তিনিও যেন ভাল নেই। তার চোখ-মুখ দেখে সুহাসের এমনই মনে হল।

কিছু বলবেন!— খুব সতর্ক গলায় কথাটা বলল সুহাস। কেউ যেন শুনতে না পায়। এত রাতে মানুষটার জেগে থাকাও বিচিত্র ব্যাপার।

যাই হোক সুহাস সব শুনে আশ্বস্ত হল। খারাপও লাগছে।

কাপ্তান-বয় বললেন, আমি আছি। ছোটসাব কিছুই খায়নি। কোন সকালে খেয়ে বের হয়েছেন, মুখে কিছু দেওয়াই গেল না। যদি পারেন, ওকে কিছু খাইয়ে যাবেন। যখন যা দরকার বলবেন। চিমনির আড়ালে আমি আছি। ডাকলেই পাবেন।

ভাঙা কাচ, ছুঁড়ে ফেলা জামা-প্যান্ট ডিঙিয়ে সুহাস চার্লির দরজার সামনে চলে গেল। দরজায় কান পাতল। যদি কোনও সাড়া পাওয়া যায়। না, ভিতরে একেবারে চুপ। ভিতরে সে নড়াচড়া করছে না। দরজা খুলে কী দেখবে তাও জানে না। চার্লি যদি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকে। কাপ্তান যদি কন্যার ছদ্মবেশ ধরা পড়ায় খুন-টুন করে ফেলে রাখেন। কত রকমের বীভৎস চিন্তা যে মগজে জট পাকিয়ে তুলছে।

দরজা খুলতেই ভয় পাচ্ছে সে।

তার হাত কাঁপছিল।

লক খুলে ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক করতেই অবাক, এ কী? ঘরে যে কেউ নেই! সে ছুটে পালাবে ভাবছিল, আর তখনই দেখল নীল কার্পেটে দু'খানি পা দেখা যাচ্ছে। মাছরাঙার মতো সুন্দর লাল নীল রঙের কোনও উর্বশীর পা। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক পা বাড়িয়ে সে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করবে তারও যেন সাহস নেই। চার্লির যদি কিছু হয়, তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। খাটের আড়ালে চার্লি পড়ে আছে। ভিতরে ঢুকলে কী দেখবে কে জানে!

তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সে জোর পাচ্ছে না। তবু কোনওরকমে দরজা লক করে খাটে ভর করে দাঁড়াল। পা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তারপর কীভাবে পড়ে আছে চার্লি সে জানে না। দরজা খোলার পর তো চার্লির উঠে বসার কথা। তার ঘরে কে ঢুকে গেছে, সে কে দেখবে না! তা হলে কি চার্লির হুঁশ নেই? চার্লি নিজেই কিছু করে বসেনি তো। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কিছু একটা করে বসতেই পারে।

সে জোরে শ্বাস ফেলল। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সে চোখ বুজে আছে। আতঙ্কে। কী না শেষে দেখতে হয়!

আতঙ্ক। কাপ্তান তাকে কেন পাঠাল? চার্লি যদি খুন হয়? তাকে যদি তিনি জড়িয়ে দিতে চান! দৌড়ে পালাবে কি না তাও ভাবছে। তারপরই মনে হল, না, সে পালাতে পারবে না। চার্লিকে ফেলে সে কোথাও যেতে পারবে না। খুন হলেও না। চার্লি নিজে কিছু করে বসলেও না। তাকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দিলেও না।

আরও কত কথা যে মনে হচ্ছে! জাহাজডুবির পর কোনও জলমগ্ন নারীকে সে উদ্ধার করার জন্য যেন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। খাটের ওপাশে লম্বা হয়ে পড়ে আছে চার্লি। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ আড়াল করা। সে পাশে গিয়ে বসল। তার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে, কেন চার্লির সাড়াশব্দ নেই, কেন চার্লি উঠে বসছে না?

সে ডাকল, চার্লি!

সে আর পারছে না। মুখের কাছে হাত নিয়ে গেল। হাত তার কাঁপছে। সে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা টের পেল শরীরে। মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল! পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল চার্লিকে।

চার্লি তাকে অপলক দেখছে!

চার্লি তাকিয়েই আছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, সুহাস এত রাতে তার কেবিনে ঢুকে যেতে পারে। কী করে ঢুকল? কীভাবে? দরজা লক করা বাইরে থেকে। চার্লি ফের চোখ বুজে ফেলল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুহাস চার্লিকে ঝাঁকিয়ে বলতে থাকল, চোখ বুজে ফেললে কেন? আরে, আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না! দ্যাখো, এই, এই!—চার্লি সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। উঠে বসল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

সুহাস স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেয়েরা কান্নাকাটি করলে কীভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় সে জানে না। সে বসে থাকল বোকার মতো। কেবিনের এ কী লন্ডভন্ড অবস্থা! আলমারি খোলা। ভিতর থেকে যা পেয়েছে হাতের কাছে, সব ছুঁড়ে ফেলেছে। খাটের বিছানা চাদর বালিশ সব। তারপর দরজা লক করে দিয়ে গেলে, সে কাঁদতে কাঁদতে কখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। সে কিছুতেই হাঁটু থেকে মুখ তুলছে না। আজ সে প্রসাধনও করেছিল বোঝা যায়। সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেও সে তার দামি গাউন, স্কার্ট, ফারের কোটে হাত দেয়নি।

সুহাস ভাঙা-ফ্রেম, ছবি এবং যত্রতত্র ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে থাকল। দরজার বাইরে

এসেও জামা-প্যান্ট-কোট সব তুলে নিল। আলমারির ভিতর ভাঁজ করে রেখে দিল। আসলে সে চায় চার্লি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। চার্লি যে খুবই বিশ্রী কাণ্ড করে বসে আছে টের পাক।

ঘরের ভিতরও এখানে-সেখানে কাচের টুকরো পড়ে আছে। চার্লির খালি পা, হাত-পা কাটতে পারে। সে না বলে পারল না, ওঠো। দ্যাখো, আরে করছ কী? হাত-পা যে কাটবে! খাটে বোসো। আগে সব জড়ো করে বাইরে নিয়ে যাই, নীচে কিছু এখন নামবে না।

চার্লি খাটে উঠে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ভাঁজ করে বসে থাকল। যেন ঘরের আসল মানুষটি ঘরে ফিরে এসেছে। আব তার ক্ষোভ নেই। সে যা বলবে তাই করবে।

যাও, হাত-মুখ ধোও। কী ছিরি হয়েছে মুখের দেখেছ?

চার্লি উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। চোখে-মুখে জল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখও দেখল।

সুহাসের এক দণ্ড সময় নেই। সে তার ঘাড়ের ব্যথাও যেন আর টের পাচ্ছে না। দবজা খুলে বেব হবার সময়ই চার্লি ছুটে এল। বলল, কোথায় যাচ্ছ সুহাস?

এই প্রথম কথা বলল চার্লি। যেন তাকে ফেলে রেখে গেলে সে ভয় পাবে। অবোধ বালিকার মতো আবদার, না, তুমি কোথাও যাবে না।

আবে, যাচ্ছি না। কী করে রেখেছ কেবিনটা। সব তো ছুঁড়ে-ফুঁড়ে তেজ দেখালে। রাতে শোবে কীসে? আসছি।

বলে সে দবজা বন্ধ কবে চিমনির আড়ালে চলে গেল। কাপ্তান-বয় উইন্ডস-হোলে হেলান দিয়ে বসে আছে, হয়তো সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। সুহাস তাড়াতাড়ি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, চাদর বালিশ ওয়াড দিন। ম্যাট্রেস আজকের মতো চালিয়ে দিচ্ছি। কাল পালটে দেবেন।

বলেই এক দৌড়ে দরজা ফাঁক কবে উঁকি দিল। চার্লিকে বলল, আমি এখানেই। ওদিকে পোর্ট-হোলে কিছু ছুঁড়ে ফেলোনি তো? তোমার যে কী হয় বুঝি না! বাবাকে এভাবে কেউ গালাগালি করে? তিনি তোমার গুরুজন না!

সুহাস চার্লির কেবিনে ফের ঢুকে গেলে কাপ্তান-বয় বাইরে সব রেখে গেল। চাদর বালিশ ওয়াড। সুহাস সব তুলে নিয়ে এল। দরজা খোলা রাখতে পারছে না, যদি সে টের পেয়ে যায় চার্লি মেয়ে, তবে আর-এক কেলেঙ্কারি। কাপ্তানের কী কবে এত বিশ্বাস তার উপর সে কিছুই জানে না! না কি সে জানে তাব কাছে চার্লি ধরা দিয়েছে। বিশ্বস্ত থাকার মূল্যও কম না, এমনই মনে হল তার। কী যে জাঁতাকলে পড়া গেল! আগে চার্লি, তার বাবা ছিল জাঁতাকলে, এখন সেও জড়িয়ে গেল! এর কী পরিণাম তাও বুঝতে পারছে না। চার্লির আচ্ছন্ন ভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যে তাকে ভিড়িয়ে দেওয়া, এটা বুঝতেও তাব অসুবিধা হচ্ছে না। এখন ভালয়-ভালয় চার্লিকে স্বাভাবিক কবে তুলতে না পারলে ঘোব বিপদে পড়ে যেতে পারে।

সে চার্লির টেবিল পরিষ্কার করে সাদা চাদর বিছিয়ে দিল। চিনেমাটির জগে জল বাখল। প্লেটে খাবাব ঢাকা। প্লেট সাজিয়ে বলল, খেয়ে নাও চার্লি। খাওয়া নিয়ে রাগ করতে হয়! জানো তো আমাব বাবা বলতেন, বোকারা রাগ চেপে গেলে না খেয়ে থাকে। আমার বাবা জানো বোজ নদীতে স্নান কবেন। নদীতে স্নান করলে পুণ্য হয় জানো! দু'মাইল রোজ হেঁটে যান নদীতে স্নান করবেন বলে। তোমাব ঠাকুরদা কত দূর দেশে চলে গেছেন বুনো ফুল খুঁজতে। আমার বাবা কত নদীর মোহনায় গেছেন ডুব দিতে। আসলে জীবনে সবাই পুণ্য অর্জন করতে চায়।

সে চার্লির দিকে তাকিয়ে বলল, এসো খাবে। বোসো। তোমাকে খাইয়ে আমিও যদি কিছুটা পুণ্য অর্জন করতে পারি।

বলে হাসল সুহাস। চার্লি খেতে বসে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আচ্ছা, এভাবে কান্নাকাটি করলে ভাল লাগে! কাল আমরা আরও দূরে চলে যাব। আমাদের দেখতে হবে না দ্বীপের আর কোথায় তোমার ঠাকুরদা বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন? সব কি আমাদের দেখা হয়েছে, তুমিই বলো? তুমি এত সুন্দর তোমার ঠাকুরদার পুণ্যফলে, বোঝো না? তোমার কি মাথাগরম করা সাজে? এতে তোমার ঠাকুরদা খাটো হয়ে যাচ্ছেন না!

আমরা কিন্তু সারাদিন ঘুরে বেড়াব।—সেই এক অবোধ আবদার যেন বালিকার। চার্লি তাকিয়ে আছে।

নিশ্চয়। আসুক না সেই লোকটা! মজা দেখাব।

চার্লি ফের শক্ত হয়ে গেল। মুখ তার কঠিন হয়ে গেল।

এই রে, এ সময় বোধহয় এসব কথা বলা ঠিক হল না। সে বলল, জানো, ফিল বলে এখানে একটা লোক আছে, সে নাকি সেই প্রেসিডেন্ট কলিন্স জাহাজের কিপার অফ দি রেক হয়ে আছে। তার ওখানেও না হয় দরকারে ঘুরে আসা যাবে। আমাদের মুখার্জিদার সঙ্গে খুব ভাব। দ্বীপের আসল কর্তা নাকি তিনি। তাঁর খুব প্রভাব দ্বীপে। তাঁর ঘরে বিশাল সব কাচের জারে প্রবাল-পাহাড়ের নানা রঙের ছবি। বিশাল হলঘরে ঢুকলে নাকি মনে হয় সমুদ্রের তলদেশে ঢুকে যাচ্ছে সবাই। এ কী? খাচ্ছ না কেন? খাও। ইচ্ছে করলে আমরা কাল সমুদ্রের তলদেশেও ঘুরে বেড়াতে পারব।

তুমি খেয়েছ?

কখন!

ঘাড়ে খুব লাগেনি তো? কাছে এসো।

সুহাস কাছে গেলে বলল, ফুলে আছে দেখছি।

তা থাক। তুমি খাও।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। এত খেতে পারব না। তুমি আমার পাশে বোসো।

কে বলবে এই চার্লি কিছুক্ষণ আগে তার বাবাকে কটুকথা বলেছে। কী হয়েছিল! চার্লি তার বাবার উপর এত খেপে গেল কেন? কী কারণ? সে তো ফেরার সময় থেকেই ফুঁসছিল। চার্লিকে কত কিছু প্রশ্ন করার আছে। ওর কাকা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। কোন জাহাজ! কোন সমুদ্রে! চার্লি কখনও তার শৈশবে কোনও বুড়ো মানুষের মুখ দেখে ভিরমি খেয়েছিল কি না, আততায়ী যদি সেসব খবর রাখে? সে ভিরমি খেলে, কী খুঁজত আততায়ী? তার শরীর? চার্লিকে তার ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছে, যদি তাই হয় তবে কাপ্তান তাকে জাহাজে নিয়ে উঠেছেন কেন? অপহরণের ভয়ে? চার্লির আর দিদিরা কোথায় থাকে? তার ভাইদের খবরও মুখার্জিদা নিতে বলেছেন। অ্যালেন পাওয়ার সম্পর্কেও। কিন্তু সুহাসের যে কী হয়, এখন তাকে এসব প্রশ্ন করা যায়?

বরং চার্লি যে তার শৈশব ফেলে এসেছে তার টুকরো টুকরো ছবির কথা মনে করিয়ে দিলে সে খুশি হবে।

চার্লি কাঁটা-চামচে মাংসের টুকরো মুখে দিচ্ছে। ম্যাস্ট পটেটোজ চামচে তুলে মুখে দিচ্ছে, কখনও কাঁটা-চামচে মাংসের টুকরো মুখের কাছে এনে তাকিয়ে থাকছে। খাবে কি না যেন বুঝতে পারছে না। আসলে চার্লি এখনও অন্যমনস্ক। সে বোধহয় কিছু বলতে চায়, অথচ বললে যদি সুহাসের বিপদ হয়, কিংবা এমন কোনও প্রিয়জনের বিপদ হতে পারে, সে যা চায় না। অন্ধকূপ থেকে সে যেন বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চার্লিকে মুখোশটার কথা বলা যেত। সে বলতে পারত, ববের কাজ। মগড়াও উঁকি দিয়েছে। দড়িরও খোঁজ পাওয়া গেছে। কে আততায়ী, মনে হয় শিগগিরই ধরা পড়বে। আসলে ডেরিক ফেলে আমাকে সরিয়ে দেবারই চক্রান্ত ছিল। টব রেখে, ডেরিক ফেলে, শেষে আচমকা আক্রমণ করে, তবে আমি আর আগের মতো ভিতু নই। মুখার্জিদা যা বলছেন, ঠিক মিলে যাচ্ছে। জাহাজে সবার আগে মগড়া টের পায় তুমি মেয়ে। তারপর মুখার্জিদা, আর কে অবশ্য জানি না। সেকেন্ড হতে পারে, তবে মুখার্জিদা এখনও সেকেন্ডকে জড়াতে পারছেন না বোধহয়। বিকৃত রুচি থেকেও হতে পারে। কিন্তু গিরগিটি গোঁফের লোকটা যে আবার কোথা থেকে উদয় হল! তার কী মোটিফ, সে কি জাহাজেরই কেউ? তুমি সব খুলে না বললে জানাও যাবে না। মুখার্জিদা বারবার বলছেন, চার্লিকে নিয়ে বসা দরকার। আরও যে বিপদ সামনে তাও টের পেয়েছেন: ফিলের কাছেও গেছেন।

তুমি কী ভাবছ বলো তো। কী ভাবছিলে?

আরে না, কিছু না। তুমি খাও।

বলে সুহাস নিজের অন্যমনস্কতা আড়াল দেবার জন্য বলল, আমাদের তো স্টিফ গোল্ডারউড দেখাই

হল না। তুমি বলেছিলে না, ফুলগুলি দলা-পাকানো তুলোর মতো দেখতে? লাল নীল সবুজ হলুদ ফুলে গাছ ছেয়ে থাকে। নানা বর্ণের কাচপোকা ওড়াউড়ি করে বলছিলে। প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে বেড়ায় তার উপর! বিচিত্র বর্ণের সব প্রজাপতিতে গাছটা এত ঢাকা থাকে, আসল ফুল খুঁজে বের করাই কঠিন বলেছিলে। ও! দারুণ মজা হবে খুঁজে বের করতে পারলে। বুনো ফুলের এই সৌরভে পাখিরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে বলছিলে। যদি খুঁজে পাই না, বীজ তুলে নেব। আবার যে দ্বীপে যাব, তুমি আমি সেই বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেব। কী মজা হবে না! জানো, বুনো ফুলের গন্ধ থাকে আমি জানতামই না। মুখার্জিদাই বললেন, থাকে। তুই টের পাস না। মুখার্জিদা এত সব টের পায় কী করে বুঝছি না।

যেন অবাধ্য শিশুটিকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। অন্তত সুহাসের আচরণে তাই প্রকাশ পাচ্ছিল। সেও যে কেন এত আগ্রহ বোধ করছে, পেট না ভরলে যেন সেই আধপেটা খেয়ে থাকছে।

চার্লি মাথা নিচু করে আবার ডাকল, সুহাস!

বলো।

আমরা কোথাও যদি চলে যাই।

কোথায়?

কোথাও। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকছি। ভয় পাবে?

ধুস, তুমি থাকলে ভয় পাব কেন?

আমরা অনেক দূরে চলে যাব। কেউ জানবে না সুহাস। তুমি যাবে তো?— চার্লি তাব দিকে তাকাচ্ছে না। প্লেটের খাবার ঘাঁটছে চামচে।

নিশ্চয়ই যাব। তুমি বললে না গিয়ে পারি! আমার আর কে আছে?

আমাবও তো আর কেউ নেই।

কেন, তোমার বাবা।

চার্লি মাথা নিচু করে বসে থাকল।

আরে কী হল! খাও। বললাম তো যাব।

তাবপর চার্লি নিজের মনেই যেন বকছে, গড সেভ মি। দ্য ফ্লাডস হ্যাভ রাইজেন। ডিপার অ্যান্ড ডিপাব আই সিংক। আই অ্যাম একজস্টেড।

সুহাস শুনতে পাচ্ছিল না। কেমন বিড়বিড় করে বকছে চার্লি। সুহাস মাথায় হাত রেখে বলল, অকাবণ কেন কষ্ট পাচ্ছ বলো তো! আমরা তো আছি। তুমি সব খুলে না বললে বুঝব কী কবে? তুমি একা নও। তুমি বিশ্বাস করো, তুমি একা নও। আমরা আছি না! খাও। ভেবো না।

চার্লি সুহাসের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল, তারপব চামচ দিয়ে খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকল।

তুমি একা নও, বলছি তো। বিশ্বাস করতে না চাও, দেখবে সবাইকে ডাকলে এক্ষুনি চলে আসবে। আমি জানি তোমার উপব প্রচণ্ড নিগ্রহ চলছে। কেন এই নিগ্রহ, আমবা তো কিছুই জানি না চার্লি। না জানলে কী করে বুঝব, তোমাব জন্য আমাদের কী করা দবকার? দেখছ না তোমার বাবা পর্যন্ত বলছেন, মাই ফেইথফুল সেলব ..

সুহাস। —চার্লি তাব দিকে তাকাল। যেন বুঝতে চাইছে, সুহাস সত্যি তাকে স্তোকবাক্য বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে, না পরম আন্তরিকতা থেকে তাকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে।

কী বুঝল কে জানে, সুহাসের চোখে যে আর্তি ফুটে উঠেছে, এতে সে বোধহয় কিছুটা সহজ হতে পারছে। বলল, আই অ্যাম ওনলি উইপিং অ্যান্ড ওয়েটিং ফর মাই গড টু অ্যাক্ট।

তোমার ঈশ্বর আশা করি তোমাকে রক্ষা করবেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার পাশে সবসময় থাকবেন। তুমি খাও। তুমি না খেলে যে আমি শান্তি পাচ্ছি না। এটা তুমি বুঝতে পারো না! তুমি না খেয়ে থাকলে আর জলগ্রহণ করব না বলছি। খাও।— সুহাস ধমক দিল।

এমন কথায় চার্লি যেন আরও ভেঙে পড়ল। হাউ হাউ করে কাঁদছে। বলছে, সুহাস, আই ক্যান নট ইভিন কাউন্ট অল দোজ হু হেট মি উইদাউট কজ। দোজ হু প্লট টু পানিশ মি, দো আই অ্যাম ইনোসেন্ট। দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিশড ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু।

তুমি কোনও দোষ করোনি, তবু তোমাকে শাস্তি পেতে হবে? কেন! তুমি অকপট হও চার্লি। কে

সে গিরগিটি গোঁফের লোকটি? কে সে? সে কেন মিশনে হিপনোটাইজ করছিল একজন নাবিককে? নাবিকটিকে তুমি চেনো? তাকে তো আমরা জাহাজে দেখিনি। এক গাল দাড়ি লোকটার! দূর থেকে বোঝারও উপায় ছিল না। সে কি ম্যাক! ফলস দাড়ি গোঁফ পরে লোকটার বান্দা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল ডায়াসের কাছে যাওয়া। এত ভড়কে গেলে, কিছুতেই কাছে যেতে দিলে না। হাত ধরে টানতে টানতে মিশন থেকে বের করে আনলে।

চার্লি কিছু বলছে না। কাঁদছে আর খাচ্ছে। সে না খেলে সুহাস জলগ্রহণ করবে না ভয়েই যেন খাচ্ছে। প্রচণ্ড বিষম খেল খেতে গিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে খেলে বিষম তো লাগবেই। সে কাশছিল। মুখের খাবার ছড়িয়ে পড়ছে। সুহাস তাড়াতাড়ি মুখের কাছে জলের গ্লাস নিয়ে গেল। বলল, শিগগির জল খাও। নাও হয়েছে, আর খেতে হবে না।

বলে সে এঁটো বাসন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বের করে রাখল। চাদরও বাইরে বের করে দিল। দরজা সামান্য ফাঁক করে পিঠে ঠেস দিয়ে প্লেট ডিশ সব রেখে দিল। সুহাস জানে, কাপ্তান-বয় সব নিয়ে যাবে।

সুহাস বলল, ওঠো।

রুমালে মুখ মুছে চার্লি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারছে না। খুবই ভেঙে পড়েছে। সুহাস তাকে ধরে নিয়ে গেল বিছানার কাছে। সে শুয়ে পড়লে, পা দুটো তুলে গায়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে চার্লি। তাকে একা ফেলে রেখে যেতেও মন চাইছে না। শিয়রে বসে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল, তুমি যে বলতে হি প্রটেক্টস! তোমার সব বিশ্বাস তছনছ হয়ে গেল কী করে? তোমাকে শাস্তি দিলে রক্ষা পাবে সে? তুমি তো বলতে, হি উইল সেভ ইয়ো ফ্রম ইয়োর এনিমিজ।

চার্লি সুহাসের দু' হাত জড়ো করে নিল বুকের কাছে। বলল, আই নো, হি প্রটেক্টস। আই নো পাওয়ার বিলঙস টু গড। আই ট্রাস্ট ইন দ্য মার্সি অফ গড ফরেভার অ্যান্ড এভার।

তবে তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ কেন বুঝি না! তোমার বিশ্বাসের দাম থাকবে না! তোমার কেউ কখনও ক্ষতি করতে পাবে বলো।

চার্লি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক হয়ে গেলেই চার্লির মধ্যে বোধহয় সাহস ফিরে আসে। সে সহজ হয়ে যায়। সরল অকপট কথাবার্তা। তখন সে শরীরে তার শক্তিও ফিরে পায়।

সুহাস ইজেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার দেখছি সেই মুখের ছবি আঁকছ, কী ব্যাপার বলো তো? পরপর মুখের ছবি?

চার্লি এক টানে আবও ক'টা নিখুঁত মুখ এঁকে ফেলল। মুখগুলি পিনে গেঁথে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল।

তুমি চেনো একে?— চার্লি একটু সরে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এ কে? এ কে? এই লোকটা কে।

পিছু পিছু সুহাসও। চার্লি যেন প্রদর্শনী করছে।

সুহাস সব ছবির মুখই চিনতে পারছে। সব অফিসার-ইঞ্জিনিয়ারদের মুখ। শুধু একটা মুখ ঠিক চিনতে পারছে না। মুখটা কার বুঝতে পারছে না। নিউ-প্লাইমাউথে এই মুখের ছবিটাই বোধহয় আঁকতে চেয়েছে। বারবার কেন একই মুখ, একই ছবি? চার্লি কেন এভাবে একটি মুখে এত রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে?

সে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

চার্লি তার রঙের বাক্স বের করে পাশের টেবিলে সাজিয়ে রাখছে।

তুমি চিনতে পারছ না?

কথা বলছে চার্লি আর কাজ করছে। কাপে জল নিল। তুলি ভেজাল। চার্লি কী করতে চায়? কেন এত রাতে ওই পাগলামি? সে কিছুটা বিব্রত। অস্বস্তিও হচ্ছে। কোনওরকমে চার্লিকে স্বাভাবিক করে তোলাই তার কাজ। সে অনায়াসে বলতে পারে, রাত হয়েছে, এবারে শুয়ে পড়ো। আমারও তো জানো শরীরটা ভাল নেই। কিন্তু বলতে পারছে না। আবার যদি গুম মেরে যায়? সব তছনছ করে ফেলে? ঝামেলার তবে শেষ থাকবে না।

আর সুহাস কী দেখছে?

চার্লি কালো কালিতে মুখে লম্বা গিরগিটির গোঁফ এঁকে দিতেই চমকে গেল সে। আরে, এই লোকটাই তো বেলাভূমিতে তাকে আক্রমণ করেছিল। এই লোকটাই। দূর থেকে দেখলে মুখোশ সামনে থেকে দুরাত্মা। চার্লি কি তাকে শনাক্ত করতে চায়? সে কে, বারবার মুখ এবং গোঁফ এঁকে শনাক্ত করতে চায়?

দূর থেকে দেখলে এক রকমের, কাছ থেকে দেখলে আর-এক রকমের? সুহাস বলল, কে তিনি?

চার্লি গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ শক্ত হয়ে গেল। বলল, প্রোসরপিনা।

প্রোসরপিনা! সে আবার কী বস্তু? কে সে? প্রোসরপিনা কি কারও নাম! না কোনও ভৌতিক রহস্য চার্লিকে তাড়া করছে?

সুহাস আর কোনও প্রশ্ন করতে পারছে না। লোকটা কি তবে জাহাজেই আছে? এ তো সেকেন্ডের মুখও নয়। কাপ্তানের মুখও নয়। এ আবার কে জাহাজে হাজির? মুশকিল, সাহেব-সুবোদের মুখ সবসময়ই তাকে গোলমালে ফেলে দেয়। জাহাজে উঠে সে যে কতবার কতজনের মুখ গুলিয়ে ফেলেছে! প্রায় দু'-তিন মাস লেগে গেল মুখগুলি চিনতে। প্রথমে সে কেন যে তফাত বিশেষ কিছু খুঁজে পেত না! পরে সবাইকে চিনতে পারত। তবে ভিড়ের মধ্যে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখলে সে এখনও শনাক্ত করতে পারবে না। তিনি কেবিন থেকে বেরই হন না। তাঁকে সে একদিনই দেখেছিল। জাহাজের চিফ, তিনি শুধু কেবিনে বসে থাকেন, মদ্যপান করেন, তাস খেলেন, তাস তোলেন, আর বন্দর এলে রাতে নেমে যান। কী যে দরকার জাহাজে লোকটার, এমনও মনে হত!

পরে অবশ্য সে বুঝেছিল, না, লোকটির সত্যি দরকার আছে। জাহাজ সমুদ্রে। ইঞ্জিন-রুমে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের ওয়াচ। সহসা সে দেখেছিল দ্রুত তিনি নেমে আসছেন, সেকেন্ড সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছে। না, কোনও কথা না, টর্চ মেরে কী দেখিয়ে ফের দ্রুত উপরে উঠে গেলেন। সেকেন্ড ইঞ্জিন-রুমে পাহারায় থেকেও যা টের পাননি, তিনি তাঁর কেবিনে বসে তা ধরতে পারেন। ইঞ্জিনের শব্দ এতই ভাল জানা, তালগোল পাকালে শব্দ থেকে ত্রুটি ধরে ফেলার এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার জন্যই বোধহয় তিনি চিফ। সুহাস দেখেছিল, ব্যালেস্ট পাম্পের নাটবল্টু আলগা।

তবে কি চিফ? তিনি তবে প্রোসরপিনা?

সুহাস না বলে পারল না, কে প্রোসরপিনা?

জানি না সুহাস। আই হিয়ার এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।

কী বলছ?

ইয়েস, আই হিয়ার।

চার্লি কি মাঝে মাঝে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার কথার জবাব দিচ্ছে না। চার্লি তাকে নিয়ে গেল বাথরুমে। পোর্ট-হোল খুলে অদূরের অন্ধকারে একটি উইন্ডস-হোল দেখিয়ে বলল, মধ্যরাতে সে আসে। আমাকে শাসায়। বলে, দ্য প্ল্যান্ট নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ, সো ইগনোর হিম।

সে কে? কাকে ইগনোর করতে বলছে।

চার্লি সত্যি যেন ভূতগ্রস্ত!

তার কথার জবাব দিচ্ছে না। বলছে, দ্যাখো উইন্ডস-হোলের একটা পাইপ বাথরুমে ঢুকেছে। উইন্ডস-হোলের মুখটিকে সে চোঙের মতো ব্যবহার করে। সে জানে, সেখানে কথা বললে আমি তার কথা শুনতে পাব। সে আমাকে শাসায়, হি ইজ ব্লাইন্ড গাইড লিডিং দ্য ব্লাইন্ড অ্যান্ড বোথ উইল ফল ইন্টু এ ডিচ।

সুহাস জানে অদূরের উইন্ডস-হোলের মূল পাইপটি ক্রমে বাংকারে ঢুকে গেছে। তারই কোনও শাখা-প্রশাখা চার্লির বাথরুমে! মুক্ত বায়ু প্রবেশের এই ব্যবস্থাটি তাকে কিছুটা হতবাক করে দিল।

আর কী বলে?

গেট অ্যাওয়ে ফ্রম হিম, হি ইজ এ স্যাটার্ন।

সে কে! কেন বলছ না সে কে? না, আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। তুমি তাকে চেনো না! তিনি কি চিফ?

না।

তবে কে? তিনি কি সেকেন্ড?

না না।—চার্লি চিৎকাব কবে উঠতে গেলে সুহাস বুঝল, আবাব সে ভুল কবছে। সে বলল, ঠিক আছে। এসো।

চার্লিব হাত ধবে বাথরুম থেকে টেনে বের কবে আনল।

চার্লি তখনও বলে যাচ্ছে, সে শাসায়, আই হিয়াব এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।

না, আর কোনও প্রশ্ন কবা ঠিক হবে না। মেঘেব ওপাব থেকে যে কণ্ঠস্বব শুনতে পায় তাকে আব কী বলা যায়। তবু কেন যে না বলে পাবল না, তিনি কি তোমাব বাবা?

সহসা চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তুমি কী সুহাস। আমি কি বাবাব মুখে গোঁফ এঁকেছি?

সুহাস বলল, না।

তুমি তো সব মুখগুলিই চেনো, চেনো কি না বলো? পবপব চিনতে পাবছ না।

চার্লিব চোখে-মুখে হতাশা। তাবপব মুখগুলিব আবও কাছে গিয়ে বলল, চিফেব মুখ কোনটা, কে চিফ।

কেন এই যে। গোলগাল ফুটবল।

চার্লি বলল, আমি কি চিফেব মুখে ফলস গোঁফ এঁকেছি, না জুলপি?

না, তা অবশ্য আঁকোনি। সত্যি ভুল হয়েছে। গোঁফ তো ওটাব এঁকেছ।

চার্লি বলল, তা হলে দেখে নাও ফেব।—যেন পবীক্ষা নিচ্ছে সুহাসেব। দেখে নাও বলে গোঁফজোড়া সাদা বং দিয়ে মুছে দিল। তাবপব সুহাসেব দিকে তাকিয়ে বলল, চিনতে পাবছ?

চেনা-চেনা লাগছে। দেখেছি কোথাও। তবে কে ঠিক মনে কবতে পাবছি না। আচ্ছা, তোমাব বাবা একে আমাদেব পেছনে লেলিয়ে দেননি তো?

জানি না। মনে হয়, না। কাবণ তাঁব জানা দবকাব তোমাব ক্ষতি হলে তাব আবও বড় ক্ষতি হবে। মনে হয় তিনি তা ভালই জানেন।

বলে চার্লি বিছানায় পড়ে সহসা খামচে ধবল বালিশটা। মুখে প্রচণ্ড তিক্ততা। আবার সেই চিৎকাব, আই উইল বিওয়ার্ড ইয়োব ইভিল, উইথ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি।

চার্লি, ফেব পাগলামি শুরু কবলে। চলে যাচ্ছি। শোনো এভাবে চলে না। সব খুলে বলো তোমাব বাবাকে, এই কী নিজে ফুঁসছ, অথচ কাউকে কিছু বলছ না। না কি তোমাকে ভূতে পায় মাঝে মাঝে? কিছু বুঝছি না।

হ্যাঁ পায়। বেব হয়ে যাও। আমাকে ভূতে পায়। আমি ভূত।

আবে, আমি কি তাই বলেছি নাকি? কিন্তু তুমি যে বলছ, মেঘেব ওপাব থেকে কণ্ঠস্বব শুনতে পাও।

উইন্ডস হোলে মুখ বেখে কথা বললে তা শোনা যায়। একটা পাইপ আমাব বাথরুমে, অন্য পাইপটা গেছে ক্রস-বাংকাবে। বাথরুমে এসো। দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি।

কোথায়?

বাইবে যাচ্ছি। উইন্ডস-হোলে মুখ ঢুকিয়ে কথা বললে মেঘেব ওপাব থেকে কণ্ঠস্বব ভেসে আসছে কি না বুঝতে পাববে।

ঠিক আছে। আমি শুনতে চাই না। আমবা কী কবতে পাবি বলো?

কিছুই না।

তুমি কি জানো, মুখোশটা পাওয়া গেছে? বুড়ো মানুষেব মুখোশ নয়। জিশুব মুখ। আবছা অন্ধকারে বুড়ো মানুষেব মনে হয়।

চার্লি বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। শক্ত করে সুহাসেব হাত ধবে বেখে বলছে, জানি।

জানো? বলছ কী।

সুহাস, তখন যে আমি সেই বুড়োমানুষটাকেই দেখতে পাই। মুখোশ পবে অনুসবণ যেই করুক, তাকে ভয় পাই না।

বলছ কী? অনুসবণকাবীকে ভয় পাও না?

না।

সেই বুড়োমানুষটি কে? কে তিনি!

তিনি আমার ঠাকুরদা জোহানস মিলার।

সুহাস হতভম্ব। চার্লিকে তবে কোনও অনুসরণকারী তাড়া করছে না! তাড়া করছে তার ঠাকুরদা। ভারী তাজ্জব ব্যাপার! ঠাকুরদা তো চার্লিকে তার উত্তরাধিকার করে গেছেন। সেই ঠাকুরদাই আবার তাড়া করছে। চার্লির কি মাথার কোনও গোলমাল আছে? ঠাকুরদার অপ্রশংসা করলেও চার্লি অখুশি। অথচ সেই ঠাকুরদার তাড়া তাকে এই নিগ্রহে ফেলে দিয়েছে। তবে তার বাবাকে গালমন্দ করল কেন? নিগ্রহের হেতু যদি কেউ হয় তবে তো সেই বুড়োমানুষটা!

অথচ জঙ্গল পার হয়ে যখন তাকে নিয়ে ছুটছিল, তখন তো চার্লি ভয়ংকর হিংস্র হয়ে উঠছিল। চোখ জ্বলছিল তার। ঘোড়ার পিঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাও তাকে কাবু করে ফেলছে। তার সেই ভয়ংকর চিৎকার এখনও যেন সে শুনতে পাচ্ছে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ দ্য ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি। এসব কথারই বা অর্থ কী? যদি তার উপর কোনও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার না থাকে তবে এভাবে আচমকা কলার টেনে আততায়ী ঘুষিই বা মারল কেন! আবার চার্লিই বলছে, তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাবে না। চোখের সামনে এত বড় সংঘাত হবার পরও চার্লির কী করে বিশ্বাস, সে নিরাপদ!

কিন্তু এ মুহূর্তে কিছুই বলা আর সম্ভব নয়। চার্লির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে দরজা খোলা রেখে যেতে পারে না। চার্লিকে এ অবস্থায় বোঝাতেও পারে না, ফলকার পাশে টব রেখেছিল শিকার ধরার জন্য, ডেরিক খুলে দিয়েছিল তাকে খুন করার জন্য। আচমকা ঘুষি মেরে তাকে শেষ করে দেবার চেষ্টাও তো করেছে! তবু কেন চার্লি বলছে, সে নিরাপদ? তার গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাবে না। কাপ্তানের সাহস না থাকলে কার এত সাহস তার গায়ে হাত দেয়!

চার্লি কি তাকে সাহসী করে তুলতে চায়? খুনের আতঙ্কে সে কাবু হয়ে পড়লে চার্লি কি খুব দুর্বল বোধ করবে!

চার্লি তো সুহাসের বিপদ টের পেয়েই শাসিয়েছিল, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি। সেই তো জাহাজে ফিরে তার বাপের কেবিনে তেড়ে গিয়েছিল। যা মুখে আসে বলেছে।

চার্লিই তো বলেছিল, তোমাকে জড়াতে চাই না সুহাস। তুমি যাও।

জড়াতে চাই না কেন বলেছিল! চার্লি তবে সব জানে। চার্লি চারপাশ থেকে কেমন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে বোধহয়। চার্লি নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। তাকে নিয়ে চার্লি পালাতে চায়। দুর্বল মুহূর্তে চার্লি নিজেকে সামলাতে পারেনি। তার অর্থ তো একটাই দাঁড়ায়, চার্লি জানে তার রক্ষার আর কোনও উপায় নেই। কোনও দ্বীপে নিখোঁজ হয়ে গেলে কেউ আর তাদের খোঁজ পাবে না। তার ক্ষতিও করতে পারবে না।

চার্লি তার দু' হাত নির্ভয়ে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। চোখ বুজে আছে। সে কেন যে তার হাত সরিয়ে নিতে পারছে না! সে ইচ্ছা করলেই নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে না। আবার চার্লির মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এই নিরুপায় মেয়েটির জন্য সে সব করতে পারে। তার কাছে চার্লি ছাড়া সব অর্থহীন। সারা শরীরে চার্লির আশ্চর্য সুষমা। হাতে পায়ে মুখে এবং নাভিমূলে। স্তনের আশ্চর্য আকর্ষণে মুখ ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। একজন ধনকুবেরের বংশধর কত সহজে সব ফেলে তার সঙ্গে চলে যেতে চায়, নিখোঁজ হয়ে যেতে চায়। পাতার কোনও কুটির নির্মাণের কথা বলে, শস্য বোনার কথা বলে, সমুদ্রে ডুবে মাছ ধরার কথা বলে, আবার আগুন জ্বেলে আকাশের নীচে বসে থাকার কথা বলে। সে মাথা পাতলেই তারা যেন বের হয়ে যেতে পারে। সে মাথা পাতলেই চার্লি কোনও দ্বীপে ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারে।

সে কেমন বোকার মতো চার্লির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। চার্লির বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, আমি যাব, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, চলে যাব। আমরা দু'জনেই তোমার ঠাকুরদার ইচ্ছেকে সম্মান জানাব। আমরা দু'জনেই বুনো ফুল হয়ে ফুটে থাকব। কথা দিচ্ছি চার্লি। যখন বলবে, যখন বুঝবে, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

বলে এই প্রথম চার্লিকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলল।

আসলে এইসময় তার বাবা-মা'র মুখ মনে পড়ছে। বাবা তো সে ফিরবে বলে কত রাত ঘুমায় না। তার গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে চিঠির আশায়। কবে সে ফিরবে।

সুহাস নিজেকে সামলে নিল। তার ঘন চুলে চার্লি দু'হাত শক্ত করে চেপে রেখেছে। সারা শরীর চার্লির থরথর করে কাঁপছে। এতটা ভেঙে পড়া বোধহয় উচিত হয়নি। নিজেকে সামলে সে উঠে দাঁড়াল।

চার্লি যে এখনও স্বাভাবিক নয় তার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কে অনুসরণকারী, চার্লি যেন জানতে চায় না। এই অনুসরণকারীকেই তো সারা জাহাজে সে আর চার্লি খুঁজে বেড়িয়েছে। মুখোশ সম্পর্কেও তার কেন জানি কোনও আগ্রহ নেই। মুখোশটা পাওয়া গেছে বলা ঠিক হল কি না, তাও বুঝতে পারছে না। মুখার্জিদা তো বারবার বলেছেন, কিছুই যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। যা ঘটছে দেখে যাও। বুড়ো মানুষের মুখ তাড়া করতে পারে মুখার্জিদা যেন এমনও বলেছিলেন। মানুষটাকে কেন যে খুবই প্রাজ্ঞ মনে হল তার। মুখার্জিদার কথাই ঠিক, বুড়োমানুষের মুখই তাকে তাড়া করছে। অনুসরণকারী আর কেউ নয়। অনুসরণকারী তার সেই মৃত ঠাকুরদা। খুবই ভৌতিক ব্যাপার। যে মরে যায় সে কেন অনুসরণ করবে? মানসিক বিভ্রম থেকেই কি চার্লির এই নিগ্রহ? মুখোশ এবং অনুসরণকারীকে ঠাকুরদার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছে। চার্লির ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার। তা হলে সে আর ঘোরে পড়ে যাবে না। ঘোরে পড়ে গেলেই ঠাকুরদা, ঘোরে না পড়ে গেলেই অনুসরণকারী! তখন সে তাকে নিজেও খুঁজতে বের হয়। মুখার্জিদাকে সব খুলে বলা দরকার। তিনি চার্লির আচরণ থেকে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।

সে বলল, চার্লি, আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

তুমি যাবে!

যেন সুহাস চলে গেলে জলে পড়ে যাবে চার্লি।

কত রাত হয়েছে! বুঝছ না ওরা ডেকের অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। তুমি কিন্তু তোমার বাবার কথা শুনবে। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই অস্বস্তিতে আছেন। হুট করে মেয়ে সেজে কেবিন থেকে বের হয়ে যাবে না। যা ছিলে তাই আছ, থাকবে। দেখি না শেষ পর্যন্ত রহস্য কতটা গড়ায়।

আমি তো মেয়ে।— চার্লি উঠে বসল।

জানি।

তবে কেন আমি গাউন পরে বের হতে পারব না বলো?

কেন, তুমি যে বলতে, নো মি বয়। হঠাৎ মেয়ে সাজার এত শখ কেন!

আমি তো আর কাউকে ভয় পাই না।

কী বলছ চার্লি? ভয় পাও না? কীসের ভয়ে তবে বলতে, নো মি বয়।

চার্লি কিছুটা যেন সম্বিত ফিরে পাচ্ছে। বলল, ঠিক আছে। মি বয়।

চার্লিকে কি আবার ভয়ের জুজু তাড়া করছে!

সুহাস বলল, শোনো, মন দিয়ে শোনো। মালবাহী জাহাজে জানোই তো মেয়ে থাকে না। কাপ্তানই একমাত্র তার স্ত্রী অথবা প্রিয়জনকে নিয়ে উঠতে পারেন। তুমি সেই সূত্রেই উঠে এসেছ। মনে রাখবে জাহাজের নাবিকরা সব খেপে আছে। তাদের মাথার ঠিক নেই। কতকাল তারা ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে থাকতে পারে! তারা যদি জন্তু হয়ে যায় রক্ষা আছে! সমুদ্রের একঘেয়েমি থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাহাজিরা কত কিছু করে থাকে। আমাদের ইমতাজ মিঞা তো শাড়ি পরে, বুকে ফলস পরে কতদিন ফোকশালে-ফোকশালে নেচে বেড়ায়। গুনাইবিবি সেজে গান গায়। নাচে। এতে কেউ রাগ করে না। বরং মজা উপভোগ করে। কেউ টব বাজায়, কেউ থালা বাজায়। পিছিলে গুনাইবিবির গানও হয়। আসব বসে যায়। গান হয়, ও চাচা, আমারে যে করবেন বিয়া, মায়রে করবেন কী! সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে পড়ে। কোমর বাঁকিয়ে আঁচল উড়িয়ে নাচে। বাড়িঘরের কথা ভুলে থাকে!

সুহাস দরজা খোলার আগে বলল, মেয়ে সেজে বের হলে ভাববে না, তুমিও সং সেজে মজা করছ? সেটা কি ভাল দেখাবে?

বের হব না বললাম তো।—চার্লির মুখে লজ্জার হাসি।
ভয় পাবে না?
না।—বলেই হঠাৎ উঠে সুহাসকে চুমু খেল।
হি প্রটেকটস।—সুহাস বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।
চার্লিও যেন দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছে। সেও বলল, হি প্রটেকটস।—দরজা লক করে দিল চার্লি।
দরজা খুলে বের হয়ে সুহাস ভূত দেখার মতো কাপ্তানকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তিনি তবে সব শুনেছেন। তিনি তাঁর কেবিনে শুয়ে পড়েননি। কখন এলেন? ধরাচুড়ো-পরা পাথরের মতো স্থির। যেন চোখের পলক পড়ছে না। দরজা বন্ধ ছিল, সব কি তিনি শুনেছেন? এমনকী নিখোঁজ হয়ে যাবার পরিকল্পনা? তার বুক ধড়াস করে উঠল।
কাপ্তান বললেন, মাই বয়, হি ইজ ওককে?
ইয়েস স্যার। ও কে।
মেনি থ্যাংকস।—বলে তিনি তাঁর কেবিনের দিকে হেঁটে চলে গেলেন। আর তখনই সে দেখতে পেল উইন্ডস-হোলের পাশ থেকে একটা ছায়া উইংস-এর তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। উইন্ডস-হোলে কান পেতে রাখলে কি চার্লির কেবিনের কথা সব শোনা যায়?
ইস্, এত বোকা সে!
তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।
কিন্তু তখন তো মনে হয়েছিল তিনি অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছেন। তার কথাবার্তায় কাতর অনুনয়-বিনয়, অগাধ বিশ্বাস আছে বলেই তাকে চার্লির কেবিনে পাঠাচ্ছেন, যদি সে পারে চার্লিকে শান্ত করতে। শেষে এই গুপ্তচরবৃত্তি! অদৃশ্য ছায়া। না, মাথায় আসছে না। কেমন সে অসাড় বোধ করছে। তার এক পা হেঁটে যাবার ক্ষমতা নেই। চার্লির দরজায় কান পাতলে ভিতরের কথাবার্তা কি শোনা যায়? সে কি খুব জোরে কথা বলছিল! অন্তত ইঞ্জিন চালু থাকলে সে দেখেছে, দরজায় কান পাতলে ভিতরের কোনও কথাবার্তাই কানে ভেসে আসে না। সমুদ্রের গর্জন আর ইঞ্জিনের শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। বন্দরে কিছুই থাকে না। না সমুদ্রের খ্যাপা আর্তনাদ, না ইঞ্জিনের কঠিন ধাতব শব্দ। একেবারে শান্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নীরব বন্দর এলাকা। শুধু হাওয়ায় চিমনির আলোটা দুলছে।
তার গলা শুকিয়ে উঠছে।
সে দৌড়ে বোট-ডেক থেকে নেমে যেতেই দেখল, সুরঞ্জন, অধীর, মুখার্জিদা ছুটে এসেছেন।
সে হাঁপাচ্ছে।
সে প্রচণ্ডভাবে ঘামছিল।
কী হল!— মুখার্জিদা ফিস ফিস করে বলছেন।
সুহাস বলল, জল খাব। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।
অধীর দৌড়ে চিফ কুকের গ্যালি থেকে জল নিয়ে এলে, সুহাস ঢক ঢক করে সবটা জল খেয়ে বলল, চলো।
ডেকের উপর দিয়ে চারটে ছায়া আবছা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে।
মুখার্জিদা বললেন, কথা বলছিস না কেন?
কী বলব বলো!
চার্লি তার বাবাকে তেড়ে গেল কেন? তোকে ডেকে পাঠাল কেন? অধীর তো বলল, তুই চার্লির কেবিনে ছিলি!
সবই ঠিক। ছিলাম।
চার্লি কিছু বলল?
অনেক কথা। এখানে বলা ঠিক হবে না। কে কোথায় আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ করছে বোঝা মুশকিল তোমাদেরও আমাকে দেখেই দৌড়ে আসা উচিত হয়নি।
মুখার্জিদা বললেন, কী করব? সেই যে ঢুকে গেলি আর পাত্তাই নেই। চার্লির কেবিনে তোকে পাঠাল কেন?

চার্লিকে শান্ত করতে।

আর কিছু না?

আর কিছু না বলব কী করে? কী মতলব বুঝছি না।

সে হেঁটে যাচ্ছে। মুখার্জি পাশে হাঁটছেন। সুরঞ্জন অধীর পেছনে। কিছুটা সুহাসকে পাহারা দেবার মতো করে তারা পেছনে রয়েছে যেন।

সুহাস খুবই দ্রুত হাঁটছিল। মুখার্জিদাও পা মিলিয়ে সঙ্গে দ্রুত হেঁটে আসছেন। ডেক একেবারে খালি। গ্যালির দরজা খোলা। মেসরুম, বাথরুমে কেউ নেই। এত রাতে থাকার কথাও না। কেবল ইঞ্জিন-সারেং তার কেবিনে জেগে আছেন। শত হলেও তিনি এদের সবার ওপরওয়ালা, জাহাজিদের বিপদে-আপদে তার দায় থেকেই যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি দরজা খুলে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাপ্তান সোজাসুজি তাকে কিছু না জানিয়ে সুহাসকে ডেকে নেওয়ায় অস্বস্তিও আছে ভেতরে। তাদের দেখেই তিনি বললেন, এত রাত করে ফেললি! কী ব্যাপার?

মুখার্জি বললেন, ও কিছু না।—সারেংকে এড়িয়ে যাবার জন্যই কথাটা বলা।

ও কিছু না বলছেন কেন মুখার্জিবাবু! ছেলেটা সেই কখন গেল কাপ্তানের ঘরে, ফিরল এতক্ষণে! ঘুম আসে!

সারেংকে আশ্বস্ত করার জন্যই যেন বলা, চার্লি কী আরম্ভ করেছে দেখছেন তো! বাপকে যা তা গালাগাল করছে। সুহাসের সঙ্গে চার্লির দোস্তি আছে বলেই ডেকে পাঠিয়েছেন। তরলমতি, খুবই চঞ্চলমতি বালক। বাবাকে মানে না। কী কখন করে বসবে, সুহাস বুঝিয়ে যদি শান্ত করতে পারে! আর কিছু না!

শান্ত হল?

মুখার্জিদা বললেন সুহাসকে, কী রে? মেজাজ পড়েছে?

পড়েছে।

যাক! মুশকিল, সব পুত্রই ডানা গজিয়ে গেলে বাপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চায়। যাক গে। মেজাজ শান্ত হলেই ভাল। কাপ্তান ব্যাটাকে নিয়ে খুবই ফাঁপড়ে পড়েছেন।—বলে তিনি তার ফোকশালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আর মুখার্জি অবাক! নীচে নেমে দেখছেন, কেউ ঘুমায়নি। সবাই যে যার ফোকশালে বসে আছে। এটা যে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার জাহাজে, একজন সাধারণ জাহাজিকে এত রাতে খোদ কাপ্তান ডেকে পাঠিয়েছেন, ভাবাই যায় না। কী এমন ঘটল, সুহাসের এত কী বরাতজোর যে কাপ্তান খোদ তাকে ডেকে পাঠাতে পারেন। সে ফিরে আসায় সবাই ফের মুখার্জির ফোকশালে জড়ো হয়েছে। জানতে চাইছে, কেন ডেকে পাঠিয়েছিল?

তিনি সারেংকে যা বলেছেন, তাদেরও তাই বলে বিদায় করলেন। বললেন, তোমরা সবাই দেখছি আহাম্মক। আরে, চার্লি সুহাসের সঙ্গে বের হয়ে যায় দ্যাখো না। মতি স্থির নেই ছোকরার। যদি কিছু আকাম-কুকাম করে আসে, সুহাসই ভাল বলতে পারবে। এতে তোমরা ঘাবড়ে গেলে কেন বুঝি না। যাও। শুয়ে পড়ো গে। রাত কত হয়েছে টের পাও না! সুহাসকে এত রাতে বকশিশ দিতেও ডাকতে পারে না, আর তিরস্কারের কথা তো আসেই না। জাহাজে সারেং থাকতে সুহাসকে তিরস্কার করতে পারে কাপ্তান। এমনই বা ভাবলে কী করে! সারেং আমাদের মুরুব্বি। তাকে ডিঙিয়ে ঘাস খেলে সহ্য করব কেন?

এরপর আর আশ্বস্ত না হয়ে উপায় কী? যে যার মতো সিঁড়ি ধরে ফোকশালে ঢুকে গেল। হরেকেষ্টও চলে গেল। তার পরি আছে বয়লার-রুমে। বারোটা-চারটা পরি। খুব তাড়াহুড়ো নেই বলে দেরিও হয়ে গেছে। সুহাস না ফেরায় সেও অস্বস্তিতে ছিল। একটা বয়লার চালু। একজন ফায়ারম্যান আর একজন কোল-বয়ই যথেষ্ট। দুশোর মতো স্টিম রাখলেই চলে যায়। স্টিম নেমে গেলেও ব্যস্ততার কিছু থাকে না। ক' বেলচা কয়লা মেরে দিলেই হল।

মুখার্জি হরেকেষ্টকে তাড়া লাগালেন, যা যা। দেরি করিস না। এই অধীর, তুই জেগে থেকে কী করবি? যা শুয়ে পড় গে।

পচ্ছেন। কী ভেবে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা নিজে ধরালেন, একটা সুবঞ্জনকে দিলেন। তারপর সিগারেট মুঠো করে হুস করে পরপর দুটো টান মেরে প্রায় চোখ বুজে ফেললেন।

চোখ খুলে বললেন, এটা একটা পয়েন্ট। তবে এর অন্য দিকটাও ভাবার দরকার আছে।

তখনই সুহাস বলল, তোমাদের আর-একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দ্যাখো এর সঙ্গে চার্লির প্রাণও বিপদ জড়িয়ে আছে কি না। আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। চার্লিই কিন্তু তার ঠাকুরদার উত্তরাধিকারী হবে।

হয়নি।—সুবঞ্জন প্রশ্ন না করে পারল না।

তা তো জানি না। বলল, আমাকেই ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছেন।

চার্লি জানল কী করে সে ঠাকুরদার সব পাবে? কিংবা তাকে দিয়ে গেছেন। শোনা কথার দাম কী। চার্লির সব কথা মেনে নেওয়াও যায় না। বিশ্বাসও করা যায় না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে কে কখন কী বলছে তার দামও দেওয়া যায় না।

মুখার্জি বললেন, এগুলি পরে ভাবা যাবে।

সুবঞ্জনের কোনও কথারই গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

সুবঞ্জন কিছুটা চটে গেল, এত বড় একটা খবর তুমি গুরুত্বই দিচ্ছ না। তুমি কী। খুব সোজা অঙ্ক। আসলে অপহরণের ভয়ে কাপ্তান মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন, যদি বড় কোনও ষড়যন্ত্র টের পান, নিয়ে আসতেই পারেন। আসলে দেখা দরকার চার্লি প্রকৃতই সম্পত্তির মালিক কি না। আর এজন্যই কাপ্তান চার্লিকে নিয়ে জাহাজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এর ভিতর অন্য কোনও ষড়যন্ত্র নেই কে বলবে? জাহাজ তো ভাল জায়গা নয়। জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে মেয়েটা যে বড় হয়ে যাবে তিনি জানতেন। জাহাজে একটা ডবকা ছুঁড়ি ঘুরে বেড়ালে তোমরা কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারতে। বলো পারতে তোমরা?

মুখার্জি বললেন, একটা ডবকা ছুঁড়িকে ছেলে সাজিয়ে রাখা কি কোনও শাস্তির পর্যায়ে পড়ে? টাইমবিঙ ছেলে সাজিয়ে রাখলে চার্লি বলবে কেন, দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিশড ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু। মনে রেখো চার্লি কখনও কিন্তু হি বলেনি, দে বলেছে। হি বললে একজনকে ভাবা যেত। হি বললে আমরা তার বাবাকে শনাক্ত করতে পারতাম। হি যখন নয় তখন তারা বেশ কয়েকজন। তারা সব ক'জনই চায় চার্লির শাস্তি। এই তারা কে কে হতে পারে? তার বাবা, তার দিদিরা, তার ভাইয়েরা এবং তার নিখোঁজ কাকাও থাকতে পারেন। চার্লি বলেছে, জাহাজডুবিতে তিনি নিখোঁজ। আমার মনে হয় চার্লি তাও ঠিক বলেনি।

মুখার্জি ছাই ঝেড়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, আমি কি ক্লিয়ার?

সুবঞ্জন বলল, তুমি কি ভাবছ তার কাকা জাহাজডুবিতে মারা যাননি?

মুখার্জি বললেন, মারা গেছেন কি যাননি বলা এখন ঠিক হবে না। তবে সবই চার্লির শৈশবের ঘটনা। মনে রাখবে, চার্লি চাহাজে উঠে এসেছে ঠিক তার বয়ঃসন্ধিকালে। নিশ্চয়ই এমন কোনও বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন কাপ্তান, যাতে তাঁর স্বার্থে চার্লিকে তুলে না এনে পারেনি। স্বার্থ নানারকম হতে পারে। এক, অপহরণের ভয়। দুই, ব্ল্যাকমেল। তিন, খুন। সবকিছুই সম্ভব। তবে চার্লি সব ঠিক জানে না। জানে না এজন্য, সে একজন পরিচারিকার কাছে মানুষ। পরিচারিকা যা বলেছেন, সে তা বিশ্বাস করেছে। ম্যাক এবং সেকেন্ডের আসল পরিচয় কী? তারা কি তার আত্মীয়? অথবা চার্লির আত্মীয়দের এজেন্ট? ম্যাক মানে আমাদের ফাইভার দেখেছিস সেকেন্ডকে কী তোয়াজ করত? সেকেন্ড তাকে যখন-তখন নিগ্রহ করত। সে কিছু বলত না। সাধারণত জাহাজে ফাইভারদের কপালে সব সময়ই এই নিগ্রহ থাকে। সেকেন্ড তার মাথার উপর। তার হুকুমই শেষ হুকুম। এসব আমরা জানি। তোমরা কি কেউ বলতে পারো, ম্যাকের কিংবা সেকেন্ডের হাতে দুর্ঘটনার সময় কিংবা পরে কোনও জখমের চিহ্ন ছিল? দড়ির একটা অংশে রক্তের দাগ আছে। তবে সব আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সুবঞ্জন বলল, গোলমাল কি তোমার এক জায়গায়? তুমি ধরেই নিয়েছ, সেকেন্ড জঙ্গলের দিকে গেছে বলে জঙ্গলে মুখোশ পরে সে-ই বসেছিল। কী? ঠিক বলছি কি না দ্যাখো।

বলে যা।—বলে মুখার্জি দু' আঙুলে নিজের চোখ চেপে রাখলেন। অর্থাৎ যেন মনোযোগের কোনও অভাব না ঘটে।

কিন্তু সুহাস কী বলেছে? এই সুহাস, বল না।

মুখার্জি বললেন, জঙ্গল থেকে মগড়া উঠে এসেছিল। ডাকতেই ছুটে পালাল। কী সুহাস, তাই তো?

তা হলে তুমি নিশ্চিত হও কী করে, সেকেন্ড জঙ্গলে বসে ছিল মুখোশ পরে? শুধু মাথা দেখেছ। তাও দূর থেকে। তাও আবার জ্যোৎস্নায়।

মুখার্জি মাথা ঝাঁকালেন, ঠিক ঠিক।

তোমার আর-একটা সিদ্ধান্তও ভুল।

সুবঞ্জন আর কথা বলছে না।

কী ভুল বলবি তো?—মুখার্জি রেগে যাচ্ছেন।

ম্যাকের আততায়ীকে প্রায় যেন শনাক্তই করে ফেলেছ। কেননা ম্যাক সেকেন্ডকে যমের মতো ভয় পেত। সেকেন্ড ম্যাককে নিয়ে গিয়ে ডেরিক তুলেছে। সেকেন্ডের হাতে কিন্তু কোনও ক্ষত নেই। সেকেন্ডই খুনি এমন সিদ্ধান্ত চট করে নিতে যাইনি। তবে চার্লি মেঘের ওপার থেকে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়? ছবি এঁকে সে গুঁফো লোকটাকেই শনাক্ত করছে। কিন্তু লোকটাকে সুহাস চিনতে পাবল না কেন?

সুহাস বাধা দিল, না না। আমি দেখেছি তাকে। জাহাজেই দেখেছি মনে হয়। তবে ঠিক মনে কবতে পারছি না তিনি কে?

তোর উচিত ছিল সুহাস, সব ক'টার মুখেই গিরগিটির গোঁফ এঁকে দেখা। তোর কাছে কোনও মুখই বিশেষ তফাত মনে হয় না। তবে চার্লি একজনকে ঠিক শনাক্ত করেছে আমার মনে হয়। সেকেন্ডকে নিয়ে আর পড়ে থাকা বোধহয় ঠিক হবে না। আরও কেউ। কিংবা আরও অনেকে।

মুখার্জি ছাই ঝেড়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, চার্লি কিছুতেই বলল না, কে মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে থাকে। উইন্ডস-হোলে মুখ রেখে কথা বলে। এ তো আচ্ছা ঝামেলা। তোর কি মনে হয়নি সুহাস, দ প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ, ইগনোর হিম। কাকে ইগনোর কবাব কথা বলছে? তোর মাথায় কি কিছু নেই! কবে থেকে শাসাচ্ছে তাও জানতে হয়।

সুহাস বলল, অত আমার মাথায় আসেনি। আমাকে তোমরা কী পেয়েছ বলো তো? কবে থেকে শাসাচ্ছে চার্লি না বললে জানব কী করে? চার্লিকে তো বললাম, তিনি কি সেকেন্ড? সে তো স্রেফ বলল, না, সেকেন্ড নয়। তার বাবাও না।

মুখার্জি হতাশ গলায় বললেন, নাও এবার! আমরা কী করতে পারি? তবে বলে রাখি, এই সিদ্ধান্তটা বোধহয় আমার ভুল নয়। চার্লির কাকা সম্ভবত বেঁচে আছেন। এবং এই দ্বীপেই আছেন। দেখি কী কবা যায়। রক্তমাখা বাকি দড়িটাও খোঁজা দরকার।

তবে কে?—সুরঞ্জন সংযম হারিয়ে চিৎকার করে উঠল, চার্লিকে কে শাসায়, চার্লি কি জানে না মনে করিস? উইন্ডস-হোলের পাশ থেকে শাসায়। উইন্ডস-হোলের একটা শেকড ওর ঘরে ঢুকে গেছে। বোট-ডেকে উইন্ডস-হোলের ছড়াছড়ি।

মুখার্জি বললেন, সত্যি তো বোট-ডেকে উইন্ডস-হোল কি একটা?

সুহাস বলল, চার্লির বাথরুমের পোর্ট-হোল থেকে দেখা যায়। সুটের মুখে পাটাতনের পাশে। দু' নম্বর বোটের কাছে।

সুরঞ্জন মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, কী সব বলছে! শোনো। সে চার্লির ঘর থেকে বের হবাব সময়ও নাকি দেখেছে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কেউ। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলে না তো চার্লি?

মুখার্জি বললেন, প্রেতাত্মা হোক, খুনি হোক, অপহরণকারী হোক, কেউ রেহাই পাবে না। দেখি না কতদূর যেতে পারে!

আসলে সুহাসকে সাহস দেবার জন্যই বলা। কারণ সুহাসের উপর দিয়ে যে ঝড় যাচ্ছে তাতে সেও আবার না কিছু একটা করে বসে! মুখ ওর কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

তুমি উঠছ কেন?—সুহাস না বলে পারল না। কথা যেন শেষ হয়নি। কথা শেষ না করেই মুখার্জি

উঠে চলে যাচ্ছেন। ঠিক কাজ করছেন না। গ্যাংওয়েতে তার ডিউটি। এত রাতে কেউ গ্যাংওয়েতে নেমে দেখবেও না সুখানি জাহাজ পাহারা দিচ্ছে কি না। ডিউটি দিচ্ছে কি না। সবাই তো চার্লি আর কাপ্তানকে নিয়ে তটস্থ।

মুখার্জি বললেন, আসছি। পেচ্ছাপ করে আসছি। অনেকক্ষণ থেকে চেপে আছি।

সুহাস বলল, জানো কেবিন থেকে বের হতেই কাপ্তান বললেন, হি ইজ ওককে, মাই বয়?

আমি আসছি।—বলে তিনি দরজা খুলে উপরে ছুটে গেলেন। আর কেন যে মনে হল সিঁড়ির অন্ধকারে কেউ আগে লাফিয়ে উঠে গেল। চোখের ভুল নয়তো? হতে পারে। সে যাই হোক, হালকা হয়ে নীচে নেমে বললেন, কী বলছিলি? হি ইজ ওকে মাই বয় বলল?

তা না বলে উপায়?

সামান্যক্ষণ কী ভেবে মুখার্জি বললেন, না, বলছিলাম তিনি কি তবে জানেন, চার্লি নিতান্ত তোর একজন বন্ধু, তার বেশি কিছু না?

মুখার্জি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, না, তুমি কিছু জানো না। তিনি হি বললে, তোমার কাছে চার্লি হি। তিনি শি বললে চার্লি তোমার কাছে শি। ভুল যাতে না করো, হি বলে তা বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক আছে, সুরঞ্জন যা। ঘুমিয়ে নে। কাল সকালে বের হচ্ছি। আমার ফিরতে রাত হবে। সুহাস, তুই যাবি? কাল তো আমাদের ছুটি আছে। চার্লিকে নিতে পারিস। একদিন ফিলের ওখানে সবাইকে যেতে বলেছে। ওর ইচ্ছে এখানকার সব কিছু ঘুরে-ফিরে দেখি। একা তোদের ফেলে রেখে মন যেতে চাইছে না। তুই বললে, চার্লি নিশ্চয়ই যাবে। গেলে ফিল খুবই খুশি হবেন।

সুরঞ্জন যাবে না?—সুহাস না বলে পারল না।

ও তো ঘোড়ার ল্যাং খেতেই শিখল না। নিয়ে যাই কী করে? সাইকেলে যাওয়া যায় না। ঘাড় কোমব তোর ঠিক আছে তো?

সুহাসের দিকে চোখ সরিয়ে মুখার্জি এমন প্রশ্ন কবলেন।

সে দেখা যাবে।—সুহাস ঘাড় কোমর নিয়ে গ্রাহ্য করল না।

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু সতর্ক থাকবি। আর শোন, বাটলারকে আমার নাম করে বলবি—

তারপর কী ভেবে বললেন, না থাক, আমিই যাব।

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুইও যা। আমার ফোকশালে থাকার দরকার নেই। নিজের ফোকশালে চলে যা। দরজা লক করে শুয়ে পড়। যতটা পারিস ঘুমিয়ে নে।

কিন্তু সকালে কেন যে মত বদলালেন মুখার্জি কিছুই বোঝা গেল না। কিনারার লোকজন আজ উঠে আসছে না কেউ। মালও তোলা হবে না। রবিবার। ছুটির দিন। সকালেই এসে জাহাজের নীচে একটা মোটর-বোট লাগল। মোটর-বোট থেকে এক ঝুড়ি গলদা চিংড়ি, গোটা আটেক পুরুষ্ট মুরগি আর আখ, আনারস, নারকেলসহ নিনামুর হাজির। মুখার্জি বললেন, আরে তুমি? কী ব্যাপার? ফিলের কাণ্ড দ্যাখো। আমি যেতে পারব না বলে করেছে কী। এত মাছ। ও সারেং সাব, শিগগির আসুন।

সারেং সাব খবর পেয়েই উপর উঠে এসেছেন। সব দেখে তাজ্জব। কে পাঠাল?

দেখুন ফিলের কাণ্ড!—বলে ঝুড়ির ঢাকনা খুলতেই জ্যান্ত চিংড়ি সব লাফিয়ে পড়তে থাকল। মুরগিগুলি কোকর কো ডেকে উঠল। জাহাজিরা সবাই ছুটে এসেছে। ফিল কে? ফিলের কথা তারা জানতে চাইল। মানুষটি তার বিদেশি অতিথির সম্মানার্থে তার নিজস্ব খামার থেকে সব পাঠিয়েছে। বেগুন, টম্যাটো, পটল, ঝিঙে কিছুই বাদ নেই। ফিল খুবই সজ্জন ব্যক্তি, এমন বললেন মুখার্জি। এমনকী থলেতে কাঁচা লঙ্কা পর্যন্ত। গন্ধরাজ লেবু। ফিল তবে সবই মনে রেখেছে।

আগের এক সফরে মুখার্জির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে জাহাজে বাঙালি খানা খেয়ে খুশি হয়েছিল ফিল। আসলে এই দ্বীপের এবং অন্যান্য দ্বীপগুলিতে চাইনিজ রান্নার চল আছে। ভারতীয় রান্নারও।

ফিল মনে রেখেছে। মুখার্জি ডালের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু খেতে ভালবাসেন।

লোকটার মগজ এত সাফ, অথচ ফিল কিংবা ফিলিপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, সব হেঁয়ালি কথাবার্তা। সে জিশুর বার্তা ঘরে-ঘরে, দ্বীপে পৌঁছে দিচ্ছে। এবং বসতি মানুষজনের বাড়িয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপগুলিতে। এ ছাড়া সে কিছুই যেন মনে রাখতে চায় না। তিনি ফিলের মিশনারি কাজকর্ম দেখে খুশি হলে যেন খুবই আনন্দ হবে তাঁর। সেজন্যই হাতে সময় নিয়ে বারবার তাঁকে ফিলের ওখানে যেতে বলেছেন।

আজই যাবেন ঠিক করেছিলেন। যাওয়া হল না। যাওয়া কতটা ঠিক হবে ভেবেই যাননি। তাঁর হাতে অনেক কাজ, এখনই একবার যাওয়া দরকার বাটলারের ঘরে। বন্দরে এলেই বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে জাহাজের একটি মোটামুটি সবকিছুর তালিকা পৌঁছে দিতে হয়। শুল্ক বিভাগ এখানে নামেমাত্র থাকলেও তাঁরা নিয়মনীতি মেনে চলেন। তালিকায়, জাহাজে কী আছে, কতজন ক্রু, তাদের নাম-ঠিকানা, অফিসার-ইঞ্জিনিয়ারদের নাম-ঠিকানা সই সব খবরই থাকে। চিফ মেটের কাজ হলেও বাটলার নানা ব্যাপারে চিফ মেটকে সাহায্য করে। এখন তাঁর কাজ একটি তালিকা হাতানো। অন্তত অফিসার-ইঞ্জিনিয়ারদেব নাম-ঠিকানা তাঁর দরকার।

অবশ্য এতে তিনি কাজ কতটা উদ্ধার করতে পারবেন জানেন না। দেখাই যাক না, অফিসাব-ইঞ্জিনিয়ারদের আসল পরিচয় কী। তারা টেকসাসের লোক, না সত্যি ওয়েলসেব লোক, তাও বোঝা যাবে। টেকসাস কিংবা অন্য যেখানকারই হোক, যদি তারা ওয়েলসের ঠিকানা দেয়, তা হলেও কিছু করণীয় নেই। দিতেই পারে। তারা ভারতীয় জাহাজি বলে, মার্কিন মুলুক থেকে অফিসার-ইঞ্জিনিয়ার নেবে তেমন ভাবাও ঠিক না। আবার নিতেও পারে। নানা সংশয়ে পড়েই বাটলারের কাছে যাওয়া।

নিনামুরকে যাওয়ার আগে বললেন, আমার ঘরে এসে বোসো। আরে এসো। তোমার কর্তাকে এক বোতল সরষের তেল দেব। নিয়ে যাবে।

নিনামুর কিছুতেই বাংকে বসবে না। সুহাস সুরঞ্জন এবং সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেও নিনামুর খুব সহজ হতে পারছে না।

কর্তার সঙ্গে ওঠা-বসা করেন, সে কী করে এমন মানুষের বিছানায় বসতে সাহস পাবে? লাল বেল্টটি মাথায় ঠিক বেঁধে রেখেছে। তবে আজ সে লুঙ্গি পরেনি। হাফপ্যান্টও নয়। পারিপাট্য আছে জামা-কাপড়ে। ভেট নিয়ে এসেছে, মালিকের সম্মান বলে কথা। মুখার্জির কথাবার্তাও খুব ভাল বুঝছে বলে মনে হয় না। সে উসখুস করলে মুখার্জি বললেন, ঠিক আছে যাও।

বলে ফিলকে একটা ছোট্ট চিঠিতে জানালেন, তিনি হাতে সময় নিয়ে যাচ্ছেন। দরকারে তিনি দু'-একদিন থাকতেও পারেন। সঙ্গে জাহাজের আরও দু'-একজন যেতে পারে এমনও ইঙ্গিত দিলেন চিঠিতে। নিনামুরকে বললেন, বোটে অপেক্ষা করো। আমাকে কিনারায় নামিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর তিনি আর দেরি করলেন না। কারও সঙ্গে তাঁর কথা বলারই সময় নেই যেন। দেয়ালে ছোট্ট আয়না ঝুলিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দাড়ি কামানো দরকার মনে হল। চিৎকার-চেঁচামেচিরও কমতি নেই।

এই অধীর, গরম জল দিয়ে যা। আমার ব্রাশ কোথায় গেল? কিছুতেই জায়গারটা জায়গায় থাকে না।

জাহাজিদের এই দোষ। জামা-কাপড় থেকে পেস্ট, সাবান, যে যার মতো তুলে নেয়। কারও দেখার দরকার হয় না। এই নিয়ে বচসাও হয়, আবার মিটেও যায়।

সে ছুটে গিয়ে মুখার্জিদার শেভিং ক্রিম থেকে ব্লেড সব নিয়ে এল। কাপে করে গরম জল রেখে গেল। সুহাস তখনও ঘুম থেকেই ওঠেনি। ছুটির দিনে সবারই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। কাল রাতে সুহাসের ঘুমও বোধহয় ভাল হয়নি। সকালের দিকে ঘুমিযে পড়তে পারে। সুরঞ্জনকে ডেকে বললেন, তোরা চা খেয়ে নিস। ওকে ডাকতে যাস না। আমি যাচ্ছি। আজ তো ভোজ। দারুণ।

তুমি ফিরবে কখন?

কাজ হয়ে গেলেই ফিরব।

কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না। কখন ফিরবে বলে যাবে না। মুরগিগুলো কী হবে? ডবকা ছুঁড়ির মতো ঠ্যাংডিগুলি লাফাচ্ছে। পিছিলে দ্যাখোগে কী গ্যাঞ্জাম। আর তুমি বের হয়ে যাচ্ছ! সারেং সাব কেবল বলছেন, কী হবে না হবে মুখার্জিবাবু বলে যাবেন না!

জুতো ব্রাশ করতে করতে বললেন, যাচ্ছি হরসাগামে। ফিরতে বারোটা-একটা বেজে যেতে পারে। সারেং সাবকে বলবি, ডেক-জাহাজিদেরও যেন খেতে বলা হয়। সবাই মিলে খাওয়ার মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে। জাহাজিরা কেউ যেন বাদ যায় না।

হঠাৎ হরসাগামে যাচ্ছ?

যাচ্ছি কাজ আছে বলে। সব সময় কৈফিয়ত!

সুরঞ্জন আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সকালবেলায় এত কী জরুরি কাজ যে, তিনি হরসাগামে চললেন! সেখানে সব আস্তাবল পর পর। আস্তাবলে গিয়ে কী হবে? তারপরই চকিতে এই তাড়াহুড়োর ব্যাপারটি ধরে ফেলল। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে হলে রেজিস্ট্রি খাতায় সই করতে হয়। ঠিকানা দিতে হয়। কাল কে কে ঘোড়া নিয়ে গেছে, কী নাম, ঠিকানা কী, হয়তো খোঁজ নিতেই চললেন তিনি।

সবাইকে বোকা ভাবে! সুরঞ্জন গজ গজ করছে। আসলে আজকের সকালটা সত্যি মনোরম। মুখার্জিদা না থাকলে কেমন ম্যাড়মেড়ে, কিছু ভাল লাগে না। মুখার্জিদা না থাকলে যা পরিস্থিতি জাহাজে তাতে আতঙ্কের কারণ থাকে। তার কেন যে মন সায় দিচ্ছিল না, মুখার্জিদা এ সময় বের হোক।

সে না বলে পারল না, এত বোকা ভাবছ! তোমার মাথা তো সাফ জানতাম। গুঁফো লোকটার হদিস খুঁজতে যাচ্ছ! ভাবছ তুমিই বুদ্ধিমান। আর সবাই নির্বোধ। ধূর্ত লোকেরা ক'পা হাঁটতে হয়, ক'পা পিছোতে হয় ঠিকই জানে। জাহাজের ঠিকানা কখনও দেয়! দিলে ধরা পড়ে যাবে না!

মুখার্জি সুরঞ্জনের দিকে বেশ তারিফ করার চোখে তাকালেন। একজন হবু গোয়েন্দার সহকারী যদি তার কর্তার গতিবিধি আঁচ না করতে পারে তবে আর তাকে দরকার হবে কেন?

তিনি বললেন, দেখতে দোষ কী! নামগুলি টুকে আনব ভাবছি।

কিছু পাবে না বলে দিলাম। যাচ্ছ যাও। তবে কোনও কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

শোন সুরঞ্জন, আমরা সামান্য জাহাজি, এখানে কোনও পুলিশ-ফাঁড়ি নেই। খবর দিতে গেলে সেই মাদাং। আমরা কে যে, আমাদের অভিযোগ তারা শুনবে! কাপ্তান ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই। যেই খুন করুক, সময়টা ঠিক বেছে নিয়েছে। পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, কাপ্তান ছাড়া কেউ নেই। খুন না দুর্ঘটনা—তিনি ছাড়া কারও কথা কানে তুলবে না। কাপ্তানের কাছে যাব! যাওয়া ঠিক হবে। এত সব কাণ্ড ঘটছে জাহাজে, তারপরও কি তাকে বিশ্বাস করা যায়! মাই ফেইথফুল সেলর। জানা আছে কত ফেইথফুল, নাটক বুঝলি!

মুখার্জি সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে উঠে যাবার মুখে ছোট-টিন্ডাল বলল, সারেং সাব ডাকছে।

তিনি যেতে যেতেই বললেন, আরে, ডাকাডাকির কী আছে! তাঁর কথামতোই সব হবে। তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সারেং সাব আমার চেয়ে কি কম বোঝেন? মেনু কী হবে তাঁর কাছে জেনে নাও।

কারণ মুখার্জি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ থেকে নেমে যেতে চান। নিনামুরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। সে ঠিক গ্যাংওয়ের সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। একবার বাটলারের ঘরেও উঁকি মেরে যেতে হবে। ফালতু ডাকাডাকি কার এ সময় ভাল লাগে?

আর তখনই হরেকেষ্ট ছুটে এসে তালপাতার টুপিটা দিল।

রোদে বের হচ্ছ। সুরঞ্জন পাঠিয়ে দিল।

এই এক স্বভাব তাঁর। তাড়া থাকলে ভুলের অন্ত থাকে না। টুপিটার খুবই দরকার। ডেকে এসেও মনে হয়নি। বেশ কড়া রোদ উঠেছে। চারপাশে যতদূর চোখ যায় দ্বীপটা রোদে ঝলমল করছে। তিনি পকেট হাতড়ে কী খুঁজলেন—না, আছে। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার নিতে ভুল করেননি। প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে বাটলারের কেবিনে গিয়ে টোকা মারলেন।

পর পর সব কেবিন। বাটলারের কেবিনটা সবার শেষে। আগের দুটো কেবিনে, দু'জন মেসরুম বয়, দু'জন মেসরুমমেট ভাগাভাগি করে থাকে। পরের কেবিনটাতে থাকে চিফ কুক, সেকেন্ড কুক। মাঝখানের রাস্তা পার হয়ে কাপ্তান-বয়ের কেবিন। তারপর বাটলারের কেবিন। কেবিনে কেউ নেই।

ছুটির দিনেও এদের বিশ্রাম নেই। যে যার কাজে নেমে গেছে। বাটলার আছে কি না? তবু টোকা মারতেই দরজা খুলে বাটলার এক গাল হেসে বলল, মুখার্জিবাবু, কী ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু না। একটা কাজ করতে হবে।

বলুন।

তোমাকে এই যে তালিকা দেওয়া হয় না, জাহাজে রসদ কী আছে না আছে, ক্রু, অফিসার কতজন কী নাম, ঠিকানা—তালিকার একটা কপি আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে।

এক্ষুনি দরকার? দরকার তো দাঁড়ান। দেখছি খুঁজে।

খুঁজে রেখে দিয়ো। আমি বিকেলে এসে নেব।

বাটলারের সঙ্গে কথা বলে দুটো উইন্ডস-হোল পার হয়ে চিমনির গোড়ায় এসে মুখার্জি হতবাক সামনে স্যুটের মুখে কে উবু হয়ে আছে। কয়লার স্যুট। কয়লা ফেলার মুখ এটা। তিন ফুটের বর্গাকৃতি একটি পাটাতন তুলে দিলেই মুখটা গঙ্গাবাজুর বাংকারে প্রায় বিশ-বাইশ ফুট নীচে ঢুকে গেছে। হাতির শুঁড়ের মতো বিশাল চোঙওলা মুখ ওখানে ঢুকিয়ে দিলেই ঘণ্টা চার-পাঁচেকের মধ্যে বাংকার কয়লার পাহাড় হয়ে যায়। সেই স্যুটের মুখে কে উবু হয়ে আছে? পড়ে গেলে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে। কাজ নেই, কাম নেই, এখান থেকে কয়লা তোলার কথাও নেই। তোলা হলেও মই লাগিয়ে তোলা যেতে পারে। খরচ বেশি। কোম্পানি এত দরাজ! মাথায় মুহূর্তে নানা সংশয় উঁকি দিতেই ভাবলেন, একবার দেখাই যাক না, কে সে!

অবাক—চার্লি! উইন্ডস-হোলের পাশে পাটাতন তুলে চার্লি ঝুঁকে কী দেখছে!

মুখার্জিকে দেখে কিছুটা যেন বিব্রত বোধ করছে চার্লি।

মুখার্জি বললেন, গুডমর্নিং চার্লি।

চার্লি মুখার্জিকে দেখে আদৌ খুশি নয়। বিশেষ করে এই অসময়ে। মুখ গোমড়া। তবু সাড়া দিল গুডমর্নিং।

মুখার্জির সব মনে পড়তেই মুখে মজার হাসি খেলে গেল। আই অ্যাম স্লিম, টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড। চার্লি সত্যি ফুল-ব্রেস্টেড। তার ঘাড় গলা দেখে আর এটা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। চুলও তার বড় হয়ে গেছে। বেশ কোঁকড়ানো চুল। দেবী-প্রতিমার মতো মুখখানি ঝলমল করছে। চার্লি এখানে কী করছে! সাদা বয়লার সুট পরনে। একবার জোক করতেও ইচ্ছে হল, আর ইউ গার্ল? কিন্তু তিনি অত্যন্ত সংযত গলায় বললেন, এভাবে কেউ ঝুঁকে দ্যাখে! নীচে কি কিছু পড়ে গেছে! কী খুঁজছ? এত ঝুঁকে দেখছ, পড়ে গেলে কী হবে?

কিছু না। পড়ে যাব কেন?

চার্লি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। প্রায় বিশ-বাইশ ফুট নীচে বাংকার। অন্ধকারে কিছু দেখা যাবারও কথা নয়। এদিকটায় আর কাউকে দেখা গেল না। অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা কিনার দেখা গেলে পাশের রেলিং-এ এসে ঝুঁকে দাঁড়ান। এই রাস্তাটায় অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররাই হাঁটাহাঁটি করেন। আর এই উইণ্ডস-হোলের পাশে মধ্যরাতে কি সে এসে স্যুটের পাটাতনে দাঁড়ায়।

চার্লি দ্রুত পাটাতন তুলে স্যুটের মুখ বন্ধ করে সরে পড়ল। একটা কথাও বলল না।

যাক, চার্লি আবার আগেকার চার্লি। সুহাসের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি কাজে লেগেছে। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। চার্লিকে দেখেই মনে পড়ে গেল, আরে সুহাসকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। একা কতদিক সামলাবেন বুঝতেও পারছেন না। রেলিং-এ ঝুঁকে হাতের ইশারায় নীচে নিনামুরকে জানিয়ে দিলেন, তিনি আসছেন। কারণ এখুনি তাঁকে একবার ফোকশালে ফিরে যেতে হবে। একটু দেরি হবে। বেচারা নীচে বোটে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। সবই তিনি গোলমাল করে ফেলেছেন। গ্যাংওয়েতে পরির সময় মাথা এত পরিষ্কার থাকে, আর ফোকশালে ঢুকে গেলেই সব ভুলভাল হয়ে যায়। গণ্ডগোলের মূলেও ফিল। সাতসকালে ভেট পাঠানোতে তিনি তাজ্জব।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছিলেন ডেক ধরে। সুরঞ্জন পিছিলে বসে আছে, সে বুঝতেই পারছে না, কিনারায় গেলেন না কেন মুখার্জিদা। ফিরে আসছেন কেন! আবার কি কিছু ফেলে

গেলেন? বেঞ্চিতে আর বসে থাকা যায় না। সে নেমে মুখার্জিদার দিকে এগিয়ে গেল, কী ব্যাপার? ফিরে এলে! কিনারায় গেলে না।

মুখার্জিদা তাকে ইশারায় সঙ্গে আসতে বললেন, মেসরুম পার হবার মুখে দেখলেন মুরগি হালাল করতে বসে গেছে কয়লাআলা হাফিজ। সে মুরগির নলি কেটে হাতে চেপে রাখছে। দৃশ্যটা দেখতে তাঁর ভাল লাগছিল না। খেতে বসলেও দৃশ্যটা মনে পড়বে। খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। যে-কোনও নৃশংস ঘটনাই তাঁকে পীড়নে ফেলে দেয়। তিনি সিঁড়ি ধরে তরতর করে নামার সময়ই বললেন, সুহাস উঠেছে? সুহাসের সঙ্গে জরুরি কথা আছে। ও উঠেছে কী!

সুরঞ্জন বলল, উপরে তো দেখলাম না। উঠেছে বলে মনে হয় না। কী দরকার?

আয় না!

সুহাসের ফোকশালে উঁকি দিতেই মনে হল, সে উঠেছে ঠিক, তবে কেমন মনমরা। মুখার্জিদাকে দেখেও দেখল না। কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না মুখার্জিদা উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে।

সুরঞ্জন বলল, দেখছ ছোঁড়ার কাণ্ড! আরে তোর হল কী? আমাদের এত দেখার কী দরকার হল? তুইও বংশী হয়ে গেলি শেষে!

সুহাস অগত্যা কী করে! বলল, কিছু বলবে?

আয়। নেমে আয়! মুখ ধুসনি। চা-ও খেলি না। চুপচাপ ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছিস। আমি তো ভাবলাম, ঘুমে কাতর।

মুখার্জি বললেন, দেরি করিস না। হাতে সময় নেই।

সুহাস জামা গলিয়ে মুখার্জিদার ফোকশালে ঢুকলে তিনি বললেন, আচ্ছা, চার্লির কাছে তার পরিবারের কোনও অ্যালবাম আছে? অনেকেই তো সঙ্গে নিয়ে আসে। মন-মেজাজ খারাপ হলে অ্যালবাম খুলে মা-বাবা ভাই-বোনদের ছবি দ্যাখে। বিয়ে করলে বউয়ের। ছেলেপুলে থাকলে তাদের।

মুখার্জিদা বসছেন না। দাঁড়িয়েই আছেন, সুরঞ্জন বলল, এর জন্য ফিরে এলে! কখন যাবে, ফিরবে কখন!

সুহাস বলল, ম্যাকের অ্যালবাম দেখেছি। সে দেখাব। কিন্তু চার্লি তো কোনও অ্যালবাম খুলে তার প্রিয়জনদের ছবি দেখায়নি।

সুরঞ্জন ফুট কাটল, দেখাবে কী, প্রিয়জন থাকলে তো দেখাবে!

মুখার্জিদা সুরঞ্জনের কথা গ্রাহ্য করলেন না। শুধু বললেন, আজই খোঁজ করবি, যদি অ্যালবাম থাকে। ডরোথি ক্যারিকো—কী নাম যেন জাহাজটার—যাই হোক, জাহাজটার কোনও নিজস্ব গাইডবুক যদি থাকে। ওর ঠাকুরদা ব্যবসা ভালই বুঝতেন। ব্যবসা রমরমা কী করে করতে হয় তাও জানেন। ডরোথি ক্যারিকোর ছবি, লাউঞ্জের ছবি, কিংবা দ্রষ্টব্য কিছু যদি থাকে জাহাজের তার ছবি গাইডবুকে থাকতেই পারে। চার্লির কাছে না থাকলেও তার বাবার গোপন লকারে থাকতে পারে। চার্লিকে খুঁজে দেখতে বলবি। কলিজ জাহাজের খোঁজে যদি সত্যি আসেন, তবে সঙ্গে ডরোথি ক্যারিকোর গাইডবুকটিও সঙ্গে রাখবেন। কলিজ জাহাজের সঙ্গে ডরোথি ক্যারিকোর মিল কতটা, কি আদৌ কলিজ জাহাজ ডরোথি ক্যারিকো কি না বুঝতে গাইডবুকটি তার দরকার, বুঝলি কিছু! মাথায় গেছে!

সুহাস মুখার্জির বালিশ টেনে বাংকে শুয়ে পড়েছে। কিছুই যেন তার শোনার আগ্রহ নেই। কেমন উদাস হয়ে গেছে।

জবাব না দিলে কার না রাগ হয়!

আরে, দেখছ ছোঁড়ার কাণ্ড! আবার শুয়ে পড়ল! এমন চোখে তাকাচ্ছে আমাকে যেন চিনতে পারছে না। কী রে? তোর হয়েছেটা কী! ফের শুয়ে পড়লি! চোখে-মুখে জল দিলি না। চা খেলি না। কত বেলা হয়েছে। ওঠ বলছি। না উঠলে লাথি মেরে তুলে দেব!

সুহাস বলল, আমি কিছু করতে পারব না। আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমিই বরং চার্লিকে বলে যাও। কাপ্তান কিছু মনে নাও করতে পারে। দেখলে না রাতে তার বিশ্বস্ত জাহাজিদের লেকচার মারল।

আমি বলতে পারলে তোকে সাধব কেন?

সুরঞ্জন বলল, চার্লি কি পাববে। আব গাইডবুক, কীসের গাইডবুক! ডরোথি ক্যারিকো কি শহর ঐতিহাসিক জায়গা, তার গাইডবুক থাকবে!

মুখার্জির দেবি হয়ে যাচ্ছে। জামার আস্তিন টেনে ঘড়ি দেখলেন, তোরা বুঝছিস না। ডরোথি ক্যারিকো প্রমোদ-তরণী। ধনকুবেরের বাচ্চারাই ফুর্তিফার্তা করতে বের হয়ে যেত। টাকা উড়ত। নাচা গানা, সাঁতার কাটা, তাব লাউঞ্জ সবই বিজ্ঞাপনের ভাষায় অতি চমৎকার। ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণের জন্য গাইডবুক থাকতেই পাবে। দেখিস না বিমা কোম্পানিগুলির কত সুন্দর সুন্দর গাইডবুক থাকে। কোথায় কী সুযোগ সুবিধা, গাইডবুক না থাকলে ভ্রমণার্থীরা আকর্ষণ বোধ করবে কেন?

সুহাস বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কথার গুরুত্ব বুঝতে চাইছে না। সুরঞ্জনও যেন পাত্তা দিচ্ছে না তাঁর কথা, গাইডবুক শেষে তোমাকে গাইড করবে! হয়েছে বেশ!

এই সুহাস, এত মনমরা হলে লাথি মেরে সত্যি জলে ফেলে দেব। ওঠ। যা বলছি শোন।

সুহাস বালিশ থেকে মুখ না তুলেই বলল, ঠিক আছে চার্লিকে বলব। এখন যাও তো!

উপরে ওঠার সময় দু'জনেই লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। মুখার্জি, সুরঞ্জন। এটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙা, দু'পাশের রড ধরে কখনও সিঁড়িতে পা না রেখেই নীচে আসা সড়াত করে, একেবারে জলভাত। ওঠার মুখে মুখার্জি বেশ চিন্তিত। দ্বিধা-দ্বন্দ্বও কম না। না বলে পারলেন না, সুহাসের কী হয়েছে বলতে পারিস? কিছুই গা করছে না!

আরে, বুঝছ না? নাবী! নারী এখন তার যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে আছে। স্লিম, টল, ফুল-ব্রেস্টেড হয়ে আছে। যেদিকে ছোঁড়া তাকায়, চার্লি এখন তার দেবীরূপেণ সংস্থিতা। মাথা ঠিক রাখতে পাবে? তুমি হলে পারতে? চাপ সৃষ্টি করে লাভ নেই। মাথা খারাপ, রাতে ছোঁড়া অকাম-কুকামও করতে পারে। দেখছ না, ক্লান্তি মুখে। অলস। রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি বোঝাই যায়।

আর তখনই নীচে থেকে হাঁকছে সুহাস, মুখার্জিদা, শোনো। ও মুখার্জিদা।

ওরা মেসরুম পাব হয়ে পিছিলে ঢোকার মুখেই সুহাসের চিৎকার শুনে ছুটে গেল নীচে।

সুহাস দরজাব বাইরে দ্বিতীয় সিঁড়িব পাশে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে।

কী হল?

শোনো।

না, এখন আমাব শোনার সময় নেই।

শোনোই না।

হয়তো খুবই জরুরি খবর। সুহাস তো মাঝে মাঝে এভাবেই কলিজ জাহাজের কাগজপত্র তাব মুখেব উপর ছুঁড়ে দিত। যদি ডবোথি ক্যারিকোর ছবি-টবি চার্লি আগেই তাকে দিয়ে থাকে, এসব ভাবতে ভাবতে নীচে ছুটে গেলেন।

কী বল!

ভিতরে এসো না!

তবে খুবই গোপন খবর।

মুখার্জি ভাবলেন, যা হোক ছোঁড়ার মাথা ঠিকই আছে। সুরঞ্জনও ঢুকে গেছে। কী খবর কে জানে। খবরের মূল সূত্রগুলি তো সুহাসই জোগাড় করে দেয়। না হলে জানতেই পারত না, চার্লির মা নেই। চার্লি ধনকুবেরের নাতি, বেটসির দুর্ঘটনা, চার্লিকে তার ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছে! এমনকী প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটিরও প্রাথমিক রিপোর্ট সুহাসই সংগ্রহ করেছিল। এত সব মাথায় যখন মুখার্জির কাজ করছে, তখন সুহাস যা বলল!

কী বললি!— রেগে আগুন মুখার্জি।

না, বলছিলাম, চার্লিকে বোট-ডেকে দেখলে?

এজন্যে ডেকে আনলি?

না, বলছিলাম যদি দেখে থাকো।

ডেক-এ থাকলে কী হবে! এই হারামজাদা, তুই নিজে উঠে দেখতে পারিস না, চার্লি বোট-ডেকে.

না তার কেবিনে? আমার কী দায় পড়েছে চার্লি কোথায় আছে দেখার।

মুখার্জি সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কী কবব বল? যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। বোঝো। ধুস শালা, যাবই না। যা হয় হোক! চার্লি শেষে তোর মাথাটিও খেল!

সুরঞ্জন বলল, অযথা রাগ করে লাভ নেই। আমি বুঝি কী হয়!

বলে সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল, যা, ওপরে যা। নিজের চোখে দেখে আয়, দেবীদর্পণে সংস্থিতো কেমন আছেন!

সুহাস কিছুটা বিব্রত বোধ করছে। এজন্য মুখার্জিদাকে ডেকে আনা উচিত হয়নি। বোকার মতো ভেবে উচাটন এভাবে ধরা পড়ে যাবে বুঝতেই পারেনি। মুখ ব্যাজার করে বাংকে বসে পড়ল।

আর কী যে মায়া বেড়ে যায়! মুখার্জি নিজের ক্ষোভ সহজেই হজম করে বললেন, চার্লি বেশ স্বাভাবিক আছে। তুই-ই দেখছি অস্বাভাবিক আচরণ করছিস। যা উপরে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা-চাপাটি হচ্ছে খেয়ে নে। ফিল কত কিছু পাঠিয়েছে। এত বড় বড় গলদা চিংড়ি। মুরগি। ফিস্টি হচ্ছে। ফুর্তি কর। গুম মেরে কেবিনে পড়ে থাকিস না। সব গুলি মেরে ফুর্তিফার্তা করতে শেখ। চার্লিকে দেখলাম বোট-ডেকে সুটের পাটাতন তুলে ঝুঁকে কী খুঁজছে। আমাকে গুডমর্নিংও বলেছে। ভালই আছে, এখন তুমি ভাল না থাকলেই আমাদের বিপদ। যত সব ঝামেলা!

সুহাস চোখে মুখে জল দিল। দাঁত মাজল। ফোকশালে নেমে আয়নায় মুখ দেখল। তার দাড়ি কামাতে হয় না। ঈষৎ নীলাভ দাড়ি গালে, সমুদ্রের জল হাওয়ায় গায়ের রং খুলে গেছে। নোনা হাওয়ার গুণ। মনেই হয় না, রাতে না ঘুমিয়ে সে খুবই কাহিল। সে তবে জোর পাচ্ছে না কেন? উপরেও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এক অজানা আতঙ্কে, না চার্লির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাকে সামলাবে কী করে, কারণ চার্লি যদি সত্যি জোরজার করে, আচ্ছন্ন অবস্থায় চার্লি ভালও ছিল না, এখন তার যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, কীভাবে তাকে গ্রহণ করবে সে জানে না।

কেমন কুহক মনে হয়। গত রাতের ঘটনা কেন যে এখনও তার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। চার্লির কাশের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া, তার খোঁজাখুঁজি, চার্লির সমুদ্রস্নান, সাঁতার কাটা, এবং ক্লান্ত শরীর টেনে এনে পাথরে জলকন্যার মতো বসে থাকা সবই যেন এক কুহেলিকা। কেবিনে খুবই অবিন্যস্ত পোশাকে চার্লির পড়ে থাকাও সে কেন যে সহ্য করতে পারছে না। চার্লির উলঙ্গ শরীরে সে তার গোপন বুনো ডেইজি ফুলটিও দেখে ফেলেছে। চার্লির সব দেখে ফেলার পর সে কিছুটা গুটিয়েও গেছে। আর সে আগের মতো নেই। ভিতরে তার ঝড় উঠে গেছে। কী করবে! দরজা খুলে কাপ্তানকে দেখার পর ভয়ে সে হিম হয়ে গিয়েছিল, চার্লি জানে না, তার বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে হয়তো সব শুনেছেন। সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মাও

চার্লি তাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চায়।

কোথায় কতদূরে সে জানে না। প্রকৃতই সে যেতে চায়, না আচ্ছন্ন অবস্থায় যা ভাবে, তাই প্রকাশ করে ফেলে, সে বুঝতে পারছে না। কীভাবে চার্লির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তাও বুঝতে পারছে না। মুখার্জিদার কথামতো কাজ না করলেও খেপে যাবেন। প্রমোদ-তরণীর খবর দিতে বলে গেছেন। শুধু কি ডরোথি ক্যারিকো, সেই লোকটা কে? চার্লি নিশ্চয়ই তাকে চেনে। না হলে বলে কী করে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল নাথিং ক্যান স্টপ মি। কোনও অজ্ঞাত অপরাধী যে লোকটা নয়, লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা রাখে চার্লি, এমনও মনে হয়েছে তার। আসলে নির্জন বালিয়াড়িতে মার খাওয়ার পর থেকে সে কিছুতেই তার হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

মাঝে মাঝে সে তার অবসাদ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। পারেনি। চার্লির কেবিনে সে ঢুকে বুঝেছিল, সে শক্ত না থাকলে চার্লি আরও ভেঙে পড়তে পারে। তাকে সাহস জুগিয়েছে। যা বলেছে, তাতেই সায় দিয়েছে। কোনও কারণেই চার্লি হতাশ হয়ে পড়ুক সে চায়নি। যেন জাহাজ তার শেষ বন্দর পেয়ে গেছে, দড়িদড়া গুটিয়ে শুধু নেমে পড়া।

বুনো ফুলের গন্ধে সেও আচ্ছন্ন, কিন্তু তাকে শক্ত হতেই হবে। ঘরে সে পায়চারি করছিল, মাঝে মাঝে বের হয়ে আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল।

অধীর চা আর চার-পাঁচ টুকরো মেটেসেদ্ধ রেখে গেছে। চাপাটি রেখেছিল। চাপাটি খেল না। চা মেটেসেদ্ধ খেয়েছে। উপরে সবাই গুলতানি করছে বোঝা যায়। দৌড়ঝাঁপও টের পাওয়া যাচ্ছিল। বড় গামলা এনে কেউ রাখছে। তার শব্দও সে নীচে বসে টের পাচ্ছিল। উপর থেকে নেমেও আসছে অনেকে। তাকে ডাকাডাকি করেছে। সে ওপরে ওঠার কোনও মেজাজ পায়নি। সে কেন যে এভাবে জড়িয়ে পড়ল!

না, আর দেরি করা ঠিক হবে না। যা হয় হবে, চার্লির কেবিনে না যাওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। চার্লি একবার খোঁজ নিতে আসতে পারত। বোধহয় কোনও অসুবিধা আছে তার। বরং সে গেলে দৃষ্টিকটু দেখাবে না। কাপ্তান এত রাতে বিশ্বাস করে চার্লির কেবিনে পাঠাতে পারেন যখন...।

সে উঠে গেল উপরে। মেসরুমে সবাই ব্যস্ত। গামলায় মুরগির মাংস, বড় বড় গলদা চিংড়ি ছাড়ানো নারকেল কোরা। সরু চাল বেছে একটা গামলায় আলাদা রেখে দেওয়া। বিরিয়ানি হবে হয়তো। কনডেনস মিল্কের কৌটো সাজানো। পায়েস হবে হয়তো। অথচ তার কিছুতেই আগ্রহ নেই। সে এমনকী মেসরুমে চুপি দিয়েও দেখল না। সহসা কেন সবই এত অর্থহীন হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে না।

সুরঞ্জনও বসে গেছে। আলুব খোসা ছাড়াচ্ছে। সুহাস বাবু সেজে উঠে আসায় রসিকতাও কবল, এই যে আমাদের গেস্টের যা হোক পাত্তা পাওয়া গেছে। চললি কোথায়!

আসছি।— বলে সুহাস সুরঞ্জনকেও এড়িয়ে গেল।

আরে, যাচ্ছিস কোথায়?

সুরঞ্জন আলুর খোসা হাতে নিয়েই ছুটে এল।

কোথাও না।

কোথাও না মানে!

বোট-ডেকে যাচ্ছি।

সুরঞ্জন বলল, বোট-ডেকে যাচ্ছ যাও, সেখানে জমে যাবে না। ফিবে এসে কাজে হাত লাগা। দেখছিস না এলাহি ভোজ হচ্ছে! বসে থাকলে চলবে? তোমার তো আমবা কেউ নই। একবাব বলতেও পারো না, চার্লির কাছে যাচ্ছ? চার্লির কাছে গেলে কি আমরা খেয়ে ফেলব? একেবারে ভেড়া বনে গেলি! আমাদেব কোনও দাম নেই!

সুহাস হাসল। গায়ে মাখল না। এটাও এক ধরনের ক্যামোফ্লেজ করে রাখা, কারণ সুরঞ্জন সবই জানে। ঠাট্টা হোক, গম্ভীর চালে হোক কিংবা দবদ দিয়েও হোক, তার ত্রিশঙ্কু অবস্থার কথা টের পেয়ে মুখার্জিদাকে বলেছে, দেবীরূপেণ সংস্থিতা। সুহাসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তোমার হলে কী কবতে! অযথা গালমন্দ কবছ।

সুহাস যে খুবই অন্যমনস্ক তার হাঁটার ভঙ্গি দেখেই টের পাওয়া যায়। সে উঠেও গেল। সিঁড়ি ধবে বোট-ডেকে উঠে চার্লিব কেবিনে কড়া নাড়ল। চার্লি নেই। লাইফবোটেব পাশে ডেক-চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে চার্লি। হাতে তার একটা সদ্য আঁকা ক্যাকটাস। সামনে ইজেল। এত সব ঘটে যাবাব পবও চার্লি ছবি আঁকার কথা ভাবতে পারে? তার কিছুটা অবাক হবারই কথা। চার্লি কি বুনোফুলের ছবি আঁকতে পারলে সব দুঃখ ভুলে থাকতে পারে? প্রায় নিঃশব্দে সে চার্লির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি ছবিটা দেখতে দেখতে কেমন মজে গেছে। ক্যাকটাসটা ডালপালা মেলে দিয়েছে। বিশাল দুটো বঙিন পাথর এনামেল রঙের, কোথাও খয়েরি এবং হলুদ রঙের সমাবেশে। ক্যাকটাসের ডালে আশ্চর্য নীল সাদা দুটো ফুল। নীচে লিখে রেখেছে ব্ল্যাক চোল্লা। ক্যাকটাসটা এত সজীব! আর ঊষর অঞ্চলেব আভাস ফুটিয়ে তুলেছে মাত্র কয়েকটা রেখা টেনে। আব সব পাশে পাথরেব খাঁজে খাঁজে রঙিন ফুলেব বাহার। কোনটাব কী নাম নীচে কিছু লেখা নেই।

সুহাস ডাকল, চার্লি!

চার্লি মুখ ঘুরিয়ে সুহাসকে দেখল। ছবিটার দিকে তাকাল। তারপর থেমে থেমে বলল, অল মাই লাইফ আই হ্যাভ লাইকড ওয়াইলড-ফ্লাওয়ারস। কিছু ভাল লাগছে না সুহাস। কী যে করব! মাথা কেমন করতে থাকে। বসে বসে এই কিছু করা। তুমি কি কিছু বলবে?

ছবিটা দেখি।

চার্লির গুণগ্রাহী সে। বলল, দারুণ এঁকেছ। সারা উষর অঞ্চলে ফুল ফুটিয়ে রেখেছ দেখছি। দারুণ! এটা আমি নেব। দেবে তো? উষর অঞ্চলে সব সময় ফুল ফুটিয়ে রাখা তো খুবই কঠিন।

দেব না কেন। সত্যি তুমি নেবে?— যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না সুহাসের কথা।

আসলে সুহাস কিছুটা নিজেও স্বাভাবিক থাকতে চায়। এসব কথা বলার জন্য এখানে সে আসেনি। তার তো খবর নেবার কথা ডরোথি ক্যারিকোর কোনও ছবি আছে কি না। তাদের পারিবারিক অ্যালবামের খবরও নিতে বলেছে।

চার্লি উঠে দাঁড়াল। তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, লাগছে?

সামান্য। সেরে যাবে। চিন্তা কোরো না । ভিতরে যাবে?

ছবিটা নিয়ে সে সুহাসের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে গেল। সুহাস ভিতরে ঢুকলে চার্লি বলল, মুখার্জি বের হয়ে গেল কেন?

সুহাস পাশের সোফায় বসে বলল, হরসাগামে যাবে বললেন। কী যে করছেন! তবে সবই তো দেখছি মিলে যাচ্ছে। মুখার্জিদা আগেই টের পেয়েছিলেন, তুমি মেয়ে। আমার বিশ্বাস হত না। তিনি তো ঠিকই বলেছেন। মুখোশটার খবর কিছু রাখো?

না।— চার্লি ছবিটার চার কোনায় পিন গেঁথে দিচ্ছে।

মুখার্জিদা ধরে ফেলেছেন। সেকেন্ড মুখোশটা পরে অনুসরণ করত। এখানেও করছে। মুখোশ পরবার দরকার কেন আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। তবে মগড়াকে নিয়েও বোধহয় সংশয় আছে। আচ্ছা কাল যা হল, লোকটা কি তোমার চেনা?

না না, আমি কাউকে চিনি না।

কেমন ভীতবিহ্বল গলায় চার্লি চিৎকার করে উঠল। তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

তুমি ভয় পাচ্ছ কেন। আমরা আর একা নই। বুঝতে চেষ্টা করো। তোমার চোখ-মুখ কেন এত বিহ্বল দেখাচ্ছে? কী কারণ খুলে বলো। মুখার্জিদা তো বললেন, তুমি সব কিছু বলছ না। কেন বেটসি খুন হয়েছে ভাবছ? কেন বুড়ো মানুষের মুখ দেখলে তুমি ভিরমি খাও? বুড়োমানুষের মুখ তোমাকে তাড়া করে, তিনি কি তোমার পিছু নিয়েছেন? সেকেন্ড কি জানে, বুড়োমানুষের মুখ দেখলে ভয় পাও! তোমাকে ভয় দেখিয়ে তার কী লাভ!

সুহাস, আমাকে কেন পীড়ন করছ? প্লিজ, আমাকে পীড়নে ফেলে দিয়ো না। মাথা ঠিক রাখতে পারি না। আমি চাই না, তুমি ছাড়া আর কেউ জানুক, আই অ্যাম টল, স্লিম অ্যান্ড ফুল-ব্রেস্টেড। তুমি আমাকে ইচ্ছে করলে রক্ষা করতে পারো। আমি ভয় পাই সুহাস, দ্য টাইম ইজ কামিং, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ হিয়ার, হোয়েন ইউ উইল বি স্ক্যাটার্ড, ইচ ওয়ান রিটার্নিং টু হিজ ওন হোম—লিভিং মি অ্যালোন।

কেন তুমি এত একা বোধ করছ? কেন তোমাকে একা ফেলে সবাই চলে যাবে! দেশে ফিরে গেলে তোমার বুনো ফুলের সাম্রাজ্যে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারবে। ইস্, কী মজা হবে!

কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য চার্লি বলল, সকালে কী খেলে!

খেয়েছি। ফিল তার খামার থেকে চিংড়িমাছ মুরগি পাঠিয়েছে। পিছিলে ভোজ হচ্ছে। মেটেসেদ্ধ, এক কাপ চা।

চার্লি ফোন করল সার্ভিস-রুমে।

কাপ্তান-বয় এলে বলল, দু'গ্লাস ব্ল্যু চেরিজ জুস।

চার্লি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইছে।

সুহাস তবু নাছোড়বান্দা।

আমি একা কেন টের পাব, ইয়ো আর ফুল-ব্রেস্টেড? সেই লোকটাও তো দেখেছে। তুমি নারী সেই গুঁফো লোকটাও জানে।

চার্লির যেন গা কাঁটা দিয়ে উঠল। জলে ডুবে যাবার মতো দু'হাতে যেন কোনও অবলম্বন খুঁজছে। সে বসে পড়েছে বিছানায়। খুব ঘামছে। কোনওরকমে যেন বলল, সুহাস, আজ কিন্তু আমরা বের হচ্ছি না। বাবা বিকেলে বের হয়ে যাবেন। তুমি চলে এসো।

কোথায় যাচ্ছেন?

রিফ এক্সপ্লোরারে।

তোমাকে বলেছেন, রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন? তিনি একা যাচ্ছেন, না সঙ্গে কেউ যাচ্ছে?

চিফ মেট যাবেন। সেকেন্ড মেটও যেতে পারেন। ওখানে তাঁরা ডিনারে যোগ দেবেন।

রিফ এক্সপ্লোরার জাহাজটির খবর মুখার্জিদাও জানেন। এত খবর তিনি আগে থেকে পান কী করে জাহাজে সমুদ্রতলের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। হয়তো কলিজ জাহাজের খোঁজখবর করতেই যাওয়া। ডিনার যে বাহানা নয়, কে বলবে? সুহাস স্রু চেরিজ জুসের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে ফের কী ভেবে রেখে দিল। যেন এখুনি না বলতে পারলে পরে ভুলে যেতে পারে।

সে বলল, কলিজ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো চার্লি? না মানে ছবি-টবির কথা নয়। জাহাজের লাউঞ্জের ছবি, কলিজ ডুবছে তার ছবি দেখিয়েছ। তার আগের ছবিও। কেবিন, লাউঞ্জ, এলিওয়ে বিলোডেকের ছবি পর্যন্ত। আমি বলতে চাই, কলিজ সমুদ্রের তলায় ডুবে যাবার পর কোনও অনুসন্ধানকারী দল ছবি-টবি জলের নীচ থেকে তুলে নিয়ে যায়। যত গভীরই হোক, তিন-চারশো ফুট জলের নীচেও শুনেছি স্বচ্ছ কাচের মতো সব পরিষ্কার। ছবি তোলা কঠিন না। অবশ্য আমি সঠিক কিছু জানিও না। সম্ভব কি অসম্ভব তাও জানি না।

চার্লি বলল, আমিও কী জানি! বই-টই পড়ে যতটুকু জেনেছি। শুধু এটুকু জানি, কলিজ ওয়ানস এ লাকসারি লাইনার অ্যান্ড দেন এ ওয়ার-শিপ, হ্যাজ বিকাম অ্যা মিউজিয়াম অফ ওয়াবস গ্রেট ওয়েস্ট

সুহাস বলল, কলিজ কত টনের জাহাজ জানো? তুমি যা দিয়েছিলে তাতে বোধহয় কত টনের জাহাজ উল্লেখ ছিল না।

দাঁড়াও।— বলে চার্লি দরজা খুলে বের হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল না। সুহাস ঘরে আছে, দরজা বন্ধ করার দরকারও নেই। কোথায় বের হয়ে গেল, তাও বুঝল না। সে তার বাবার কেবিনে যেতে পারে। সে স্বাভাবিক থাকলে বাবাও তার কেমন নিরীহ গোবেচারা মানুষ। ভদ্র, শান্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী।

সুহাস ভাবল, ডরোথি ক্যারিকো সম্পর্কে এক্ষুনি কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পেতে পারে। বিপদের গন্ধ পেলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। জাহাজ সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই বিশেষ করে কোনও বিশাল জাহাজ সমুদ্রের অতলে ডুবে গেলে তার কী চেহারা দাঁড়ায়, বছরের পর বছর সমুদ্রগর্ভে ডুবে থাকলে নোনাজলে জাহাজ ক্ষয় পেতেই পাবে, তারপর একদিন সব ঝুর ঝুর করে যে ঝরে যাবে না তাও তো বলা যায় না, সমুদ্রগর্ভে বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ-একশো বছর পর জাহাজের কী পরিণতি হয় জানার কৌতূহল থেকেই যেন সে কলিজের পরিণতি জানার আগ্রহ বোধ করছে।

চার্লি খুব উৎসাহ নিয়ে উঠে গেছে। সুহাসের এত আগ্রহ, চার্লি স্থির থাকে কী করে! সে হয়তো খুঁজছে। তার বাবা যদি কেবিনে থাকেন তিনিও তাকে সাহায্য করতে পাবেন। তবে কলিজ সম্পর্কে কোনও সংশয় সামান্য একজন জাহাজির মনে কেন উদ্রেক হতে পাবে এমন অবিশ্বাস একজন দুঁদে কাপ্তান অনুমান না-ও করতে পাবেন।

চার্লিকে যে এতটা মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, চার্লি যার এত বশীভূত, তাকে খুশি রাখার জন্য তিনি চার্লিকে সাহায্য করতে পারেন। আর, তখনই কেন যে মনে হল রাতে দরজা খুলে তো সে তাঁকেই দেখেছিল, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেই সি-ডেভিল লুকেনারের মতো। হিমশীতল চেহারা। ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন, মেনি থ্যাংকস। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছিল।

মূর্ছা গেলেও খুব অস্বাভাবিক মনে হত না। কে জানে, সি-ডেভিল লুকেনারের প্রেতাত্মা যদি সত্যি কাপ্তানের উপর ভর করে তবে তো তিনি সহজেই টের পাবেন, কলিজ সম্পর্কে এত খবর নেবার উৎসাহ কেন!

চার্লি ঢুকেই বলল, আছে। সব আছে। ছবিগুলি রিফ এক্সপ্লোরারই পাঠিয়েছে। এই দ্যাখো! কী খুশি চার্লি। ছবিগুলি একটা বড খামের ভিতর।

সুহাস বলল, জাহাজটা কত টনের?

বাবা তো বলেন, আটাশ হাজার টনের।

সে তো বিশাল জাহাজ।

সুহাস অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

সুহাস তাকিয়েই আছে।

ছবিগুলি দ্যাখো।— বলে চার্লি টেনে খাম থেকে বের করছে।

সুহাস বলল, কলিজ কি তোমাদের প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকোর চেয়ে বড়।

না। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজও আটাশ হাজার টনের। এত বড় জাহাজ, খুব কমই ছিল। দাদু তার সব উজাড় করে জাহাজটা তৈরি করেছিলেন। কী ছিল না জাহাজে? বার, ক্যাসিনো, বলরুম, সুইমিং পুল, লাউঞ্জ—সব। লাউঞ্জে ছিল দুর্লভ গ্রিক রোমানশৈলীতে তৈরি মূর্তিভাস্কর্য। আচ্ছা, তুমি মিকেল-এঞ্জেলোর নাম শুনেছ?

না।

র‍্যাফেলের নাম?

তিনি আবাব কে?

চার্লির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু কোনও অবজ্ঞা নয়। যেন এই সরল নিষ্পাপ তরুণের পক্ষে পৃথিবীর আর কোনও নামই মহার্ঘ নয়, সে ছাড়া। চার্লি ছাড়া তাব কাছে সব নামই অর্থহীন। চার্লি বলল, যদি কখনও রোমে যাও দেখতে পাবে হেলেনিসটিক প্রথায় তৈরি অপূর্ব সব মিউজেসের মূর্তি—সক্রেটিস, সোফোক্লিস আরও সব নাম। আমিও মনে রাখতে পারি না।

চার্লি তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তাকে দেখছে। কোনও মিউজিসের মূর্তির মতো কি তাকে দেখাচ্ছে! না হলে এ মেয়েটা এত অবাক হয়ে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে কেন?

সুহাস চার্লির এই অপার কৌতূহলে কেমন মজে গেল। বলল, তুমি কোথায় দেখলে এ সব?

রোমে। রোমে না গেলে জানব কী করে! জাহাজ সিসিলিতে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সব ঘুরে ঘুরে দেখেছি। পৃথিবীর যত জায়গায় যাও, যত শিল্পকীর্তিই দ্যাখো না, রোমে না গেলে সব অর্থহীন। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। এথেন্সের ভাস্কর অ্যাপোলোনিয়াসের মূর্তিটি তোমাকে দেখাব। বোবগিজ গ্যালারিতে তোমাকে নিয়ে যাব। দ্য রেপ অফ প্রোসরপিনা—

বলেই চার্লি কেমন কাঁপতে থাকল। তার শরীর থর থর করে কাঁপছে।

এই, এই চার্লি! চার্লি! কী হল তোমার? রেপ বলছ কেন। প্রোসরপিনা কী? আমি কিছু বুঝছি না। তোমার চোখে জল কেন! মূর্তিটিতে কী আছে? আরে, কথা বলছ না কেন। তোমার যে মাঝে মাঝে কী হয়!

চার্লি বলল, দানব।

আর কিছু বলল না।

দানব! কে সেই দানব!

জানি না।— চার্লি গুটিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, একজন সুকুমারীকে রেপ করাব সময় মুখের কী চেহাবা হয়, না দেখলে বুঝতে পারবে না।

বাদ দাও তো! আমি রোমে যেতে চাই না। রোমে গিয়ে আমার কী হবে? আমাকে দেখাতে হবে না। রোমে গিয়ে কাজ নেই।

তুমি না দেখলে যে বুঝতে পারবে না, কী কুৎসিত জঘন্য আর বীভৎস দানব অসহায় এক কুমারীকে উলঙ্গ করে দিয়ে কাঁধে ফেলে পালাবার চেষ্টা করছে। তুমি না দেখলে কুমারীর সেই অসহায় করুণ আর্তনাদ যে বুঝতে পারবে না সুহাস। মূর্তির আসল মানে আমার মনে নেই। কোঁকড়ানো চুলের ভিতর গভীব অতলে মুখগহ্বর, সিংহের মতো মুখ। চোখে আগুন। মূর্তির সামনে আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম। একটা কুকুর পায়ের নীচে বসে ঘেউ ঘেউ করছে। দেখা যায় না। নরক।

সুহাস কথার মোড় ঘোরাতে চাইছে। কিন্তু কেন যে সে চার্লিকে আর আয়ত্তে আনতে পারছে না! চার্লি অবিন্যস্ত হয়ে উঠছে যেন। গেল বুঝি সব! সে বলল, আর কী কী দেখলে?

যাকগে।— চার্লি বোধহয় দৃশ্যটা ভুলতে চাইছে। সে বলল, জানো অ্যাপোলোনিয়াসের মূর্তিটির মজবুত শরীর এবং গঠন মিকেল এঞ্জেলোকে এতই অভিভূত করেছিল, পোপের কথায়ও তিনি কান দেননি। পোপ শিল্পীর মূর্তির গঠন পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হতে বলেছিলেন। তাঁর এক জবাব, হয় না।

তারপরই চার্লি বলল, তুমি দাঁড়াও।

সে দাঁড়ালে চার্লি দরজা লক করে দিল।

চার্লি সুহাসের গা থেকে জামা খুলে নিচ্ছে। তারপরে সে প্যান্ট খুলতে চাইলে সুহাস বলল, না না! ছিঃ! এটা কী করছ! কী পাগলামি শুরু করলে।

কেমন কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি। সে কি জ্যান্ত কোনও মিউজেসের মূর্তি দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠছে? সে কি অস্থির হয়ে উঠছে? মূর্তিটি সামনেই আছে, খুলে দেখলেই হল! শুধু সুহাস রাজি হলেই তার দুঃখ থাকবে না।

প্লিজ সুহাস। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। তুমি নিষ্পাপ থাকবে। আমি শুধু মূর্তিটি তোমার মধ্যে আবিষ্কার করতে চাই।

সুহাস আর বাধা দিল না। চার্লির কথামতো ঘাড় বাঁকিয়ে হাত শক্ত করে রাখল বুকের উপর। ওর জানুদেশের পেশি ফুলে উঠল। নাভিমূলের নীল নরম উলের উষ্ণতা ভেদ করে সে সজীব হয়ে উঠতে চাইল কোনও গ্রিক দেবতার মতো। তার হাসিও পাচ্ছিল। এই এক মজা চার্লির সঙ্গে। যেন সে চার্লির সঙ্গে মজা করছে। মজা করছে বলেই স্বাভাবিক থাকতে পারছে। তার শরীরে চার্লি যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তার সুড়সুড়ি লাগছিল।

আসলে চার্লি তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে কোনও গ্রিক মূর্তির সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুড়সুড়ি দিচ্ছে মনে হবে। আলতো হাতে তাকে স্পর্শ করছে। শিল্পী যেমন মূর্তিটির সৌন্দর্য যাচাই করে, চার্লি প্রায় অনুরূপ ভাবভঙ্গি করে যাচ্ছে। আর এত গম্ভীর যে, হাসলেও অপরাধ হয়ে যাবে।

চার্লি তার বাঁ হাত উপরে তুলে দিল। কলের পুতুলের মতো সে যেন চার্লির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাত নীচে নামিয়ে বলল, না না, এভাবে না! তুমি কী! কিছু বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে।

কিছুটা সরে গিয়ে ফের বলল, ডান কাঁধ উঁচু কেন। আর একটু নামাও। আর একটু। ঠিক আছে।

পেশি শক্ত করো।— চার্লি পেশি টিপে দেখল।

হচ্ছে না।

চার্লি বাঁ পাটা সরিয়ে দেবার ইশারা করল।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। নড়বে না।

চার্লি তার স্কেচ করছে।

সুহাসের হাত-পা ধরে যাচ্ছে। এতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? কী যে করে!

স্কেচ শেষ করে চার্লি উঠে দাঁড়াল। সুহাসকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। বলল, হ্যালেলুজা! থ্যাংক ইয়ো, লর্ড। হাউ গুড ইয়ো আর!

সুহাস জামা-প্যান্ট পরে ভাবল, পাগল। সত্যি পাগল। কী যে হয়!

তবু সুহাস সৌজন্য-রক্ষার্থে বলল, খুশি!

কেন যে হঠাৎ মুখ নিচু করে ফেলল চার্লি! কেমন এক সঙ্কোচ এবং লজ্জায় সে সুহাসের দিকে তাকাতে পারছে না। বিহ্বল হয়ে পড়ার মতো। সুহাস ডাকল, চার্লি কী হল?

কিছু না।— চার্লি বোধহয় আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। বলল, দেখবে না?

কী দেখাতে চাইছে চার্লি? আবার কি সে চায় সেই নির্জন বালিয়াড়ির মতো সে চার্লির সব কিছু দেখুক। সুহাস উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছে। আর তখনই চার্লি তার স্কেচটি সুহাসের সামনে মেলে ধরল। সুহাস বুঝল, চার্লি চায় তার সব স্কেচ সুহাস দেখুক। সে অন্য কিছু দেখাতে চায় না।

সুহাস লজ্জায় পড়ে গেল, খুব সুন্দর। দারুণ। আমি এত সুন্দর দেখতে, বিশ্বাস হয় না।

ধুস, সুন্দর না ছাই!— বলে এক ঝটকায় স্কেচটি কেড়ে নিলে সুহাস বলল, রাগ করলে!

না না। রাগ করব কেন? তুমি কী সুন্দর, সুহাস তুমি জানো না।— বলে সে চলে গেল লকারের সামনে। লকার খুলে তুলে রাখল স্কেচটি। লকার বন্ধ করে বলল, এসো দেখবে।

সুহাস চার্লির পাশে বসলে, খাম থেকে রিফ এক্সপ্লোরারে তোলা ছবিগুলি বের করে দেখাতে থাকল।

সুহাস বলল, কলিজকে তো চেনাই যায় না। এত বনজঙ্গল গজিয়ে ফেলেছে শরীরে। আমি তো ভাবলাম বারো-চোদ্দো বছরে নোনা লেগে জাহাজ ঝুরঝুর হয়ে গেছে।

চার্লিও বোধহয় অবাক। ছবিটি দেখতে দেখতে বলল, আসলে জানো সুহাস, ডেথ ডু নট প্রিভেইল আন্ডার দ্য সি ফর ডিকেডস। তাই না? না হলে জাহাজের গায়ে বনজঙ্গল গজিয়ে যাবে কেন! অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য কলিজ হ্যাড ডাইড, দ্য সি হ্যাড বিগান টু গিভ ইট এ নিউ লাইফ। কী, ঠিক বলছি না।

ঠিক ঠিক। সমুদ্র তার নিজের মতো করে সব বাঁচিয়ে রাখে।

চার্লি বলল, দেখছ না, জাহাজের গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কত সব রং-বেরঙের স্পঞ্জ। ঘাসে কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে আছে। জাহাজ নিজেই এখন প্রবাল-প্রাচীর। যুদ্ধের লিভিং মনুমেন্ট। দ্য শিপ হ্যাভ বিকাম এ রিফ, এ ফেস্টিভ গার্ডেন হোম ফর থাউজেন্ডস অফ ক্রিয়েচারস। কত সব মাছের ঝাঁক—উড়ছে, ঘুরছে, ফিরছে, নেচে বেড়াচ্ছে।

চার্লি কথা বলছে, আর মাঝে মাঝে সুহাসকে চুরি করে দেখছে। সুহাস ছবিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

চার্লি যেন সুহাসকে সজাগ করে দেবার জন্য সামান্য ঠেলা মেরে বলল, কী দারুণ লাগছে দ্যাখো, ডেক-এ সেই বুনো ফুলের ছড়াছড়ি।

সুহাস মজা করে বলল, সমুদ্র দেখছি তোমার মতোই গোপন প্রেমিক। তোমার মতোই বুনো ফুলের জন্য পাগল।

ধ্যাত!

আরে রাগ করছ কেন!

দ্যাখো না। কী সুন্দর, না? খাঁজকাটা পদ্মপাতা অসংখ্য। দ্যাখো চিত্রকরের সব তুলির টান—ওঃ করুণ। কত সব ক্যাকটাস। জলজ ঘাসের ছবি এটা। দ্যাখো না! মনে হয় না সমুদ্রের নীচে আগুন ধরে গেছে!

তাই তো! দেখি দেখি!— বলে সুহাস চার্লির বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল। ছবিগুলি চার্লির হাতে।

সুহাস ছবিগুলি দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে যে ছলনা করে চার্লির কাছ থেকে গোপন খবর আদায় করার তালে আছে ভুলেই গেছে।

সুহাস বলল, তারিফ করতে হয়। ক্ষমতাও আছে। সমুদ্রের এত গভীরে ডুবে যায় কী করে! কী ভাবে সমুদ্রের অতল থেকে এমন সব সুন্দর দুর্লভ ছবি তুলে আনে ডুবুরিরা! হোক না ডুবুরি। আচ্ছা, যদি হাঙর তাড়া করে!

হাঙর তাড়া করে কি না, আমি কি জানি? আমাকে কি বলেছে, হাঙর তাড়া করলে ডুবুরিরা কী ভাবে আত্মরক্ষা করে? এমন সব কথা বলো না, যেন আমি সবজান্তা।

চার্লির অকপট কথাবার্তায় সুহাসের খুবই খারাপ লাগছে, ছলনা করে চার্লির কাছ থেকে কি গোপন খবর সে উদ্ধার করতে পারবে? যা দিয়েছে, সরল বিশ্বাসেই সুহাসের হাতে তুলে দিয়েছে। কোনও কপটতা ছিল না। তবে চার্লি এখনও নিজেকে রহস্যাবৃত করে রেখেছে। কেন রাখছে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। এতটা ধরা দেবার পরও কেন বলে, দ্য টাইম ইজ কামিং, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ হিয়ার। কেন বলে, ইচ ওয়ান রিটার্নিং টু হিজ ওন হোম—লিভিং মি অ্যালোন।

ইট ইজ হিয়ার! হিয়ার বলতে কি জাহাজ বোঝাতে চায়, না টেকসাসের ক্যাডো লেক বোঝাতে চায়? লিভিং মি অ্যালোন বলতে কি সে তার সেই বনবাসে ফিরে যাবে? নিঃসঙ্গ একাকী জীবন তার! ইচ ওয়ান বলতে কি পরোক্ষে তাকেই বলতে চায়, সেও তাকে ফেলে চলে যাবে। সেই নিঃসঙ্গ জীবনে বুনো ফুলের পৃথিবী ছাড়া আর কেউ থাকবে না? শুধু বনজঙ্গল, ঊষর অঞ্চল আর বুনোফুলের রাজত্বে চার্লিকে কি নির্বাসনে রাখা হবে?

চার্লি যে তার পাশে বসে একের পর এক ছবি দেখিয়ে যাচ্ছে খেয়ালই নেই। কত কথা বলছে। সে হুঁ হাঁ এই পর্যন্ত, ছবি নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না।

চার্লি হঠাৎ ছবিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার বলো তো? ভাল লাগছে না। ছবিগুলি তুমি দেখছ না কেন?

আরে, দেখছি তো! কী যে করো না!

সুহাস হাঁটু গেড়ে ছবিগুলি তুলে নিচ্ছে। জড়ো করছে ছবিগুলি।

আমি ঠিকই দেখছি।— সুহাস নিস্পৃহ গলায় বলল।

ছাই দেখছ! আমি কিছু বুঝি না মনে করো? তুমি পছন্দ করছ না। কী সব সুন্দর ছবি, আর তুমি কেমন আগ্রহ হারিয়ে ফেলছ। খারাপ লাগে না বলো।

ছবিগুলো কে দিল?

বললাম না, রিফ এক্সপ্লোরার ছবিগুলি বাবাকে প্রেজেন্ট করেছে। তাদের ডুবুরিরা ছবিগুলি তুলে এনেছে। কতবার এক কথা বলব!

হ্যাঁ, তাই তো! আচ্ছা, ছবিগুলির মধ্যে লাউঞ্জের কোনও ছবি নেই তো?

লাউঞ্জ!

আরে, তুমি আগে কলিজের ছবি দিয়েছিলে না? বা রে! মনে করতে পারছ না, জাহাজের লাউঞ্জে দুই গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য আর একটা একসিঙ্গি ঘোড়া, এবারে কি ডুবুরিরা তার কোনও ছবি তোলেনি? ডুবুরিরা কি লাউঞ্জের ছবি তোলেনি? জাহাজের এত সব ছবি দেখলাম, কই এবারে তো লাউঞ্জের ছবি দেখলাম না। দেখতে ইচ্ছে হয় না! সমুদ্রে ডুবে গিয়ে লাউঞ্জের কী পরিণতি! তোমার ঠাকুরদা বুনো ফুল ভালবাসতেন, লাউঞ্জে নিশ্চয়ই বুনো ফুলের রাজত্ব হয়ে গেছে। তুমিই তো বলেছ সমুদ্রের গভীরে মৃত্যু বিরাজ করে না! বলোনি! সমুদ্র আবার তাকে নিজের মতো সাজিয়ে তোলে। প্রবাল-প্রাচীর গড়ে দেয়। কলিজ জাহাজের লাউঞ্জটি যে এখন সমুদ্রের লিভিং মনুমেন্ট হয়ে নেই কে বলবে! বলো! এখন কথা বলছ না কেন, চুপ করে আছ কেন? দুর্লভ সব ভাস্কর্যে লাউঞ্জটি সাজিয়েছিলেন তোমার ঠাকুরদা কী ঠিক বলছি কী না! সমুদ্র তার ইচ্ছেমতো নিশ্চয়ই লাউঞ্জটি জলের অতলে সাজিয়ে রেখেছে, নানা রঙিন স্পঞ্জে কিংবা শ্যাওলাব রাজত্ব গড়ে উঠেছে, কই কোনও ছবিতেই তাব কোন সাক্ষ্য নেই!

নেই! দেখেছ ভাল করে?

দেখেছি!

চার্লি তাব ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরল। কোনও গূঢ় চিন্তা মাথায় এলে চার্লির এটা অভ্যাস। তাব দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা যে বললেন, সব ছবি এতে আছে। কলিজ জাহাজটির খোঁজ রিফ এক্সপ্লোরার আগেই পেয়েছে। শুধু সমুদ্রে কলিজই তো ডুবে নেই, আরও কত জাহাজ, বোমাক বিমান। বাবাকে তো চিঠিতে কলিজ সম্পর্কে জানিয়েছে, অ্যাজ উই ডোউব থ্রো ফরটি ফিট, দেন ফিফটি ফিট, দেন সিক্সটি ফিট অফ সিলটি ওয়াটারস দ্যাট সিমড লাইক টেপিড শ্যাম্পু, উই কুড শি হাব লাইং অন হার সাইড, লাইক এ মর্টেলি উন্ডেড বার্ড কাম টু ফাইনাল রেস্ট অন এ কোরাল স্লোপ।

চিঠিটা দেখাতে পারো!— সুহাসের মধ্যে ফের গুপ্তচরবৃত্তি কাজ কবছে।

কোথায় বাবা রেখেছেন, জানব কী করে? আচ্ছা, দাঁড়াও বাবাকে জিজ্ঞেস করি।

বলে ছুটতেই সুহাস তার হাত ধরে ফেলল। বলল, থাক, যেতে হবে না। কী হবে চিঠি দিয়ে? তোমার কথাই যথেষ্ট। তবে কী জানো?— বলে দম নিল সুহাস, এত ছবি তুলেছেন, লাউঞ্জের ছবি তোলেননি বিশ্বাস হয় না।

আমি তোমার সঙ্গে একমত।— চার্লি সুহাসকে সমর্থন করায় কিছুটা যেন সে লঘু হতে পারছে।

চিঠিটা কবে দিয়েছে, আই মিন চিঠিটি তোমার বাবা কবে পেয়েছেন?

কাল। কাল মানে দুপুরে যখন বের হচ্ছি তখনই দেখলাম, জর্জ লুমিস হাজির। রিফ এক্সপ্লোরারের ফোটো বিশেষজ্ঞ। দুর্লভ এবং দুর্মূল্য ছবিগুলি পাবার পরই বাবার মাথা গরম হয়ে গেল! পাগলের মতো জাহাজে কী বিশ্রী কাণ্ড! ভাবতেও লজ্জা হয়। রাতে তো দেখলে।

সুহাসেব বলার ইচ্ছে হল, তুমিও কম যাওনি। কিন্তু বসল না।

আসলে ছবিটি তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। লাউঞ্জের রহস্য তবে সেই ছবিতে ধরা পড়েছে। তিনি পাগলের মতো যা তা করে এখন হয়তো ডিনারের নাম করে নিজে স্বচক্ষে কিছু দেখতে চান। তাই রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন।

সুহাস বলল, ডরোথি ক্যাবিকোর উপর কোনও বই-টই মানে প্রচার-পুস্তিকার খবর কিছু রাখো?

চার্লি বলল, এখন লাগবে? এনে দেব! আছে। ডরোথি ক্যারিকোব উপর ঠাকুরদা নিজেই একটা বই লিখেছেন। কারণ জাহাজটি তো তাঁর জীবন এবং বাণী। এনে দেব?

চার্লি তার বাবার কেবিন থেকে বইটি এনে সুহাসের হাতে দিল।

সুহাস বোট-ডেক থেকে ছুটে আসছে। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজেব ওপর যখন বইটা পাওয়া গেছে, তখন আর ভাবনা কী! মুখার্জিদা শুনে খুবই খুশি হবেন। চার্লি তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছে।

কী সুন্দর দিন!— চার্লি তাকে বিদায় জানাবার সময় এমনও বলেছিল।

সে বোট-ডেক ধরে হেঁটে এলে চার্লি কেবিনে ঢুকে গেল।

সুহাস দারুণ মেজাজে আছে। মুখার্জিদা কলিজ জাহাজের গুপ্ত রহস্য বোধহয় এবাবে ঠিক আবিষ্কাব কবে ফেলবেন। কাপ্তানের ঘোরাঘুবি কেন এই সমুদ্রে, তাও ধরা যাবে। কলিজ জাহাজটিই যে আসলে প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকো, এ-ব্যাপারে তারও বিন্দুমাত্র যেন সন্দেহ নেই। দুই গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য অথবা একসিঙ্গি ঘোড়াই তার প্রমাণ।

যাই হোক, বইটি চার্লির ঠাকুরদার নাকি জীবন এবং বাণী। এই জীবন ও বাণী হাতে পেলে মখার্জিদা কী করেন দেখা যাক। মুখার্জিদা সব শুনে খুবই খুশি হবেন. যাক, কাজের কাজ করলি একটা। তুই তো খুবই বুদ্ধিমান দেখছি। দুঁদে গোয়েন্দারাও এত সহজে কাজটা উদ্ধার করতে পারত না।

আসলে মুখার্জিদার প্রশংসায় সে কেন যে এত খুশি হয়—সাবাস সুহাস, কী খাবি বল, এই চা লাগা। যেন সুহাস দিগ্বিজয় করে ফিবে এসেছে।

আবও কত কথা বলার আছে। চার্লি বলেছে, সবাই যে যার মতো ঘবে ফিরে যাবে, শুধু চার্লি একা পড়ে থাকবে। এসব কথায় গোয়েন্দা গন্ধ থাকতে পারে। অন্তত চার্লিব বিপদ না হয়, এসব ভেবেই সব খুলে বলা দরকার।

কেন চার্লি নিজেকে এত নিরুপায় ভাবছে, সে বুঝতেই পারছে না। অবশ্য নানা ঝামেলা পাকাচ্ছে জাহাজে, দিন দিন জাহাজ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, এখন যেন মুখার্জিদা ছাডা এই বহস্যেব কিনারাও কেউ করতে পারবে না।

সে আর কিছুই গোপন করবে না, তাই বলে তার শবীব থেকে চার্লি জামা-কাপড খুলে নিয়ে ছবি এঁকেছে, কিছুতেই বলতে পারবে না। তার নুড এঁকেছে, ঠিক আঁকা নয়, কিছুটা যেন স্কেচ কবে রাখা, পবে স্কেচটি অবলম্বন করে হয়তো কোনও বড কাজে হাত দেবে।

সে যাই হোক, এখন শুধু মুখার্জিদা আর পিছিলে ভোজ, আর কাপ্তান, চিফ মেট থাকছে না, ওঃ এটাও তো গুরুত্বপূর্ণ খবর। কাপ্তান, চিফ মেট রিফ এক্সপ্লোবাবে যাবেন, ফিবতে অনেক রাত হবে। কেন যাচ্ছেন রিফ এক্সপ্লোরাবে, জাহাজটা কোথায় নোঙর ফেলে আছে তাও সে জানে না। মুখার্জিদা হযতো জানেন। তার তো রিফ এক্সপ্লোরার নিয়ে মাথাব্যথা থাকাব কথা না। কলিজ জাহাজের অনেক ছবি সে দেখেছে, তবে লাউঞ্জেব ছবিটি পাওয়া যায়নি। মুখার্জিদাকে সব বলা দরকার।

আসলে সে কাজ অনেকটা হাসিল করে ফিরতে পাবছে বলেই মনটা ফুরফুবে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল যেন।

আর তখনই ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় নেমে আসার মুখে কে যেন ডাকল, ম্যান, ফলো মি!

ফলো মি!

কাকে বলছে!

কে বলছে!

সে কিছুটা থতমত খেয়ে গেল।

কেমন হিমশীতল কণ্ঠস্বর।

আবার কেউ বলছেন, ম্যান, ফলো মি!

না, ডেক-এ কেউ নেই। সহসা এক দঙ্গল উৎক্ষিপ্ত মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হতে পারে। সে বুঝতেই পারছে না, কার কণ্ঠস্বর, কোথা থেকে ভেসে আসছে।

সে পা বাড়াতে গেলেই আবার সেই শীতল কণ্ঠ, ম্যান, ফলো মি।

কে সে!

চারপাশে তাকাতে থাকলে আবার সেই শীতল কণ্ঠস্বর, আই অ্যাম হিয়ার।

আশেপাশে কেউ নেই। কয়েক কদম হেঁটে গেলে চিফকুক-গ্যালি। গ্যালিতে দু'জন কুক, থাকতেও পারে, নাও পারে। অন্তত সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার এমনই মনে হল। ডেক পার হয়ে কিছুটা দূরে পিছিলের দিকটায় উৎসবের মেজাজ। লোকজন ভর্তি। অথচ তাকে কেউ বলছেন, ম্যান, ফলো মি অফিসাররা এভাবে লস্করদের সঙ্গে কথা বলেন। জাহাজের সেও একজন লস্কর। তাকে ছাড়া আর কাকে বলতে পারে। কেউ তো আর আশেপাশে নেই।

আবাব হিমঠান্ডা কণ্ঠস্বব, লুক হিয়ার।

সে দেখল, অদুরে এলিওয়েয়র অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট। কিছুই ঠিক অনুমান করা যায় না। দিনদুপুরেও আলো জ্বালা না থাকলে বেশ অন্ধকার থাকে। সেই আবছা অন্ধকার থেকে তিনি তাকেই যেন ডাকছেন। কেন ডাকছেন। ভিতরে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল, তার কেমন ভয় ধরে গেল।

কিছুই ভাল করে বুঝতে পাবছে না।

সে একজন জাহাজি বলেই অনুসরণ করা দরকার। সে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যেও আছে। অথচ সে জানে, একজন দক্ষ জাহাজি কখনও ভয় পায় না। সব কাজেই দরকারে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ছুটিব দিনেও জরুরি কাজকর্ম থাকলে কোনও অফিসার প্রয়োজনে তাকে ডাকতেই পারেন। শুধু সেই কণ্ঠস্ববটি তার কেন জানি চেনা মনে হচ্ছে না। অবশ্য সে সবার কণ্ঠস্বর ভাল চেনেও না। বিশ-বাইশ মাস সফবে ক'টাই বা কথা হয়েছে কাব সঙ্গে এক চার্লি ছাড়া। কাজকর্ম সাবেংই বুঝিয়ে দেন। কার কোথায় কাজ কবতে হবে তিনিই ভাল জানেন।

সে কেমন কিছুটা ঘোরে পড়ে যাচ্ছিল।

সে এলিওয়েব দিকে হাঁটছে।

লোকটি কে?

সেকেন্ড!

থার্ড ইঞ্জিনিয়াব!

না চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

সে তো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। লম্বা টুপিতে মুখের আংশিক ঢাকা। তার আগে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাচ্ছেন। বেশ অন্ধকাবই মনে হচ্ছে। ইঞ্জিন-রুমেও কোনও আলো জ্বালা নেই স্কাইলাইটেব ফাঁকে সামান্য আলো ফুটে উঠলেও লোকটির টুপি এবং বয়লার সুট ছাড়া কিছুই যেন দৃশ্যমান নয়। আট-দশ কদম আগে তিনি ইঞ্জিন-রুমের সিঁড়িতে নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছেন।

সেও নেমে যাচ্ছে।

তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?

কী কাজ ইঞ্জিন-রুমে?

সে একজন সাধারণ জাহাজি। তার প্রশ্ন করার কোনও অধিকার নেই। সে বলতেও পারছে না, স্নান খাওয়া হয়নি। সবাই হয়তো অপেক্ষা কবছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি খুবই ক্ষুধার্ত।

সে সিঁড়ির গোড়ায় থামল।

তার হাঁটু অবশ হয়ে আসছে। কেমন এক ঘোর রহস্যময়তা সৃষ্টি করছে যেন কোনও এক কাপালিক।

ইঞ্জিন-রুমে এখন কাকপক্ষীও নামে না।

শুধু ব্যালেস্ট পাম্পের কিট কিট আওয়াজ।

শুধু চালু বয়লাবের স্টিমককে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। দানবের মতো জাহাজের মূল ইঞ্জিনটি হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছে। অজস্র স্টিম পাইপ, একজস্ট পাইপের ছড়াছড়ি, সিলিন্ডারের ভিতর সব ঢুকে গেছে

ওপরে স্মোক-বক্সের ডালা খোলা।

স্মোক-বক্স পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছুটির দিন বলে কেউ কাজে আসেনি।

সে সব চিনতে পারছে। এখানেই তো কতদিন সে নেমে এসেছে। ইঞ্জিন-কশপের ঘর থেকে হাতুড়ি বাটালি নিয়েছে। নাট-বল্টু নিয়েছে। অথচ আজ এত অচেনা মনে হচ্ছে কেন! প্রবল আতঙ্ক কেন ভেতরে

কেমন তাকে কিছুটা বোবায় ধরে ফেলেছে।

ঘুমের মধ্যে তার এটা হয়। সে সব কিছু দেখতে পায়। কেউ তাকে জলে ডুবিয়ে মারছে, অথচ সে কিছু বলতে পারছে না। কেউ তাকে পাহাড়শীর্ষ থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, অথচ কিছু বলতে পারছে না। কেউ তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য ঠেলেঠুলে নিয়ে যাচ্ছে, বোবায় ধরলে এটা তার হয়, সে কিছুই বলতে পারে না। সব বুঝতে পারে অথচ বলতে পারে না।

সে অবশ্য কিছু বুঝতেও পারছে না। আর ইঞ্জিন-রুমে আলো জ্বালা না থাকলে এমন হতকুচ্ছিত দেখায় ইঞ্জিন-রুম, তাও জানত না। দানবের মতো ইঞ্জিনের পিস্টন রডগুলো ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে আছে। থামের মতো ঝকঝকে পিস্টন রড অন্ধকারে ক্র্যাংক-ওয়েভের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সে যে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ধরে ছুটে পালাবে তাও উপায় নেই। কারণ বোবায় ধরলে হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তার ক্ষমতা থাকে না। সে মরণপণ চেষ্টা করে ঠিক, তবু পালাতে পারে না। ঘুম ভেঙে গেলে টের পায় ঘামে সে ভিজে গেছে।

আর তখনই তার মনে হল তিনি নুয়ে কী খুঁজছেন।

এই ফাঁকে...।

আর তখনই সেই শীতল কণ্ঠ যেন তাকে মনে করিয়ে দিল, এ সন অনার্স হিজ ফাদার, এ সারভেন্ট অনার্স হিজ মাস্টাব। পালাবে না।

সে বলতে পারত, না স্যার, পালাচ্ছি না।

আধিভৌতিক রহস্যটি তবে টেবও পায়, সে পালাতে চায়। সে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে চায়। তাব আর জোব থাকে কী করে।

দীর্ঘ প্রপেলার-স্যাফট অন্ধকাবে হাবিয়ে গেছে। টানেলে কোনও আলো জ্বালা নেই। সেদিকে সে তাকাতে পারছে না। যেন এক বিশাল গুহাপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো পাথরের কোনও গোপন কক্ষ চিবে। যেদিকে তাকাচ্ছে শুধু কুহকের বেড়াজাল। সব চেনা, অথচ অন্ধকার কী ভয়াবহ করে রেখেছে। বিশাল সব বয়লাব দাঁড়িয়ে আছে পর পর। বয়লারগুলির ওপাশে কেউ থাকতে পারে। সেখানে আলো জ্বালা থাকতে পারে। বয়লারেব পাশ দিয়ে যাবার বাস্তায়ও ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। যেন এ মুহূর্তে তাব নড়বারও ক্ষমতা নেই।

জেনাবেটারের পাশে সুইচবোর্ড। কালো রাবারের মোটা তারে প্লাগ সুইচে ঢুকিয়ে দিতেই তিন নম্বর বয়লারের শেষ মাথায় প্লেটের ওপব আলো জ্বলে উঠল। তার সাহস ফিরে আসছে ঠিক, তবু যেন বলছেন, এ সারভেন্ট অনার্স হিজ মাস্টার। জাহাজে ওঠার আগে এটাই ছিল তাঁর মন্ত্রগুপ্তি। অন্তত টি. এস ভদ্রা জাহাজে প্রশিক্ষণ নেবার সময় কানে কানে সেকেন্ড অফিসার চ্যাটার্জি এই মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাব বিবেকও তাকে তাড়া করছে। সে কিছুতেই তার প্রভুকে অসম্মান করতে পাবে না।

কিন্তু তিনি কে?

সেকেন্ড?

চিফ? বা অন্য কেউ? সে মুখ দেখতে পাচ্ছে না কেন?

তিনি নিজেই বিশাল প্লেট কেন টানাটানি করছেন।

পাশে একটা বালতি, কিছু জুট।

আপনাকে সাহায্য করতে পারি।— বলে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে আবার চিৎকার, নো। ইউ ওনলি ফলো মি।

অর্থাৎ আমি না বললে হাত দেবে না। সামনে যাবে না। আমার মুখ দেখারও চেষ্টা করবে না।

তাকে কী করতে হবে তিনিই বলে দেবেন।

কোথায় তিনি তাকে কাজ দেবেন।

এই অসময়ে, কখনও তো কাজ হয় না। সে শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলছে। আর ক্রমে সেই ঘোর তার বাড়ছে।

ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে তাব এমন হয়।

বালতি জুট দেখে সে বুঝতে পারছে না তিনি কী চান। তাঁর সামনে যেতেও তিনি বারণ করছেন বালতি জুট থাকলে কী করতে হয় সে জানে না তাও নয়। কিন্তু একা কী করে সম্ভব!

তিনি বললেন, ম্যান, কাম অ্যালং।

সে কাছে গেলে তিনি ছিটকে দূরে সরে দাঁড়ালেন।

আঙুল দিয়ে তাকে ইশারা করছেন।

অর্থাৎ তাকে জাহাজের খোলে নেমে যেতে বলছেন। ইঞ্জিন-রুমের তলায় খোলের মধ্যে অজস্র জলের ট্যাংক। ট্যাংকেব দেয়ালে অজস্র ম্যানহোল। একটা ট্যাংক থেকে অন্য ট্যাংকে যাবার রাস্তা খুবই অপবিসব। উবু হয়ে বসাও যায় না! হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় সাঁতার কাটার মতো ট্যাংক থেকে ট্যাংকে ঢোকা যায়, উপরে উঠে আসার একটাই রাস্তা। সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঠুলি পরানো আলোটা খোলের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছেন।

শুধু বললেন, গো অ্যাহেড।

কোথায় কতদূব? নামাব সময় বালতি জুট তার হাতে ধবিয়ে দিলেন। শ্যাওলার ট্যাংক পিছল হয়ে আছে, পা ফসকে যাচ্ছে, কোনও রকমে নুয়ে খোলের ভিতর নেমে গেলে তিনি মুখ বাড়ালেন না। মাছ ধরার মতো পাড়ে যেন উবু হয়ে বসে থাকলেন।

সে জানে, আসলে এটা একটাই বৃহৎ জলাধার। ভাগ ভাগ করে অজস্র লোহার প্লেট তুলে দেওয়া হয়েছে। সব প্লেটেই একটা থেকে আর-একটায় ঢোকার ম্যানহোল। সে পিছলে যাচ্ছিল। উপর থেকে দড়ি ছাড়ার মতো ঠুলি পরানো আলোটা সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

উপর থেকে হাঁক আসছে, লুক, দ্য লাস্ট ওয়ান।

অর্থাৎ শেষ প্রান্তে চলে যেতে বলছেন তিনি। সেখানে কি এই মানুষটি পাচার কবার জন্য কোনও নিষিদ্ধ বস্তু রেখে দিয়েছেন। রেখে যে দেয় না, তা নয়। তবে বিশ-বাইশ মাসে এমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড কখনও দ্যাখেনি। তাকে এত বিশ্বাসই বা কেন! আবার মনে হচ্ছে, তিনি বলছেন, কী? ঠিক আছে?

সে বলল, আমি কী করব স্যার? কী কাজ? তলানির নোংরা জল তুলতে হবে?

কোনও সাড়া নেই।

আমি একা! সে বলতে পাবত।

তার জামা-প্যান্ট শ্যাওলায়, জং ধরা নোংরা জলে বিশ্রী রং ধবে গেছে। হাতে পায়ে মাথায় জলের বিশ্রী দাগ। এবং সে ক্রমে কেমন এই পচা তলানি জলের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট বোধ করছে।

পাম্প করে নোংবা জল ফেলে দিলেও তলানি সামান্য পড়ে থাকে। জুট দিয়ে মুছে তুলতে হয় জল। চিপে চিপে জল বালতিতে রাখতে হয়। আট-দশ জন জাহাজি কাজটা তুলতে পাবে। তাকে একা এখানে ফেলে রাখা হয় কেন? তার কী দোষ! সে জানে জাহাজিদের কঠিন শাস্তি দিতে হলে এটাই সহজতম পন্থা।

আর তখনই মনে হল, মধ্যরাতে চার্লির দরজার বাইরে তিনিই কি দাঁড়িয়েছিলেন? না, সেই মধ্যরাতের প্রেতাত্মা! উইন্ডস-হোলের আড়ালে অদৃশ্য এক ছায়ার মতো গোপনে অন্ধকাবে যে মিলিয়ে গিয়েছিল। সে যেন শুনতে পাচ্ছে, তিনি বলছেন, মেনি থ্যাংকস ইয়ংম্যান।

কাপ্তান তাকে এখানে শেষে শাস্তি দিতে নিয়ে এলেন? তার ঘোর বাড়ছে। সে কেমন ঘোলা ঘোলা দেখছে সব কিছু। আলোর ঠুলিটা হাতে আর ধরে রাখতে পাবছে না। হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকে কোনও রকমে বালতিতে জল চেপার সময় মনে হল, এক হ্যাঁচকায় আলোটা কেউ টেনে নিয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল। সে লাফিয়েও আলোর তারটা ধরতে পারল না। হারিয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ব্ল্যাকেস্ট অফ দি ব্ল্যাক নাইটস।

সে একেবারে বুঝি অন্ধ হয়ে গেল। সে হাতড়াতে থাকল, চিৎকার করতে থাকল, আমার কী দোষ? আপনি তো আমাকে ডেকে নিলেন! সে দুমদাম লাথি মারতে থাকল দেয়ালে, চিৎকার করে বলল, চার্লি, আমি শেষ।

লোকটি তখন সবল ভাষায় তাঁর আক্রোশের কথা বুঝিয়ে দিলেন, দাঁত চেপে ট্যাংকের মুখে ঝুঁকে

বললেন, ইয়ো স্যাটার্ন। ইয়ো আর এ ডেঞ্জারাস ট্র্যাপ টু মি।

তারপরই প্লেট পড়ার শব্দ। প্লেট টেনে মুখটা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর আর কারও সাড়া নেই।

প্লেট পড়ার শব্দও শোনা গেল।

কেমন এক পৃথিবীর গোপন অন্ধকূপে তাকে ফেলে আততায়ী সরে পড়ল।

সে কে?

কাপ্তান?

না অন্য কেউ?

সেকেন্ড?

না অন্য কেউ?

কে সে?

সি-ডেভিল লুকেনার নয়তো? লোকটার মাথা নেই, মুখ নেই, ঘাড়-গলা, হাত-পা কিছুই নেই। যেন আছে শুধু পোশাকের খোল। অশরীরী। কিছুতেই সে তার মুখ দেখতে পেল না কেন? টুপিব নীচে শুধু অন্ধকাব। হাত-পা কি দেখেছে! মনে করতে পারছে না। যেন বয়লার সুট আর টুপি ছাড়া তার আব কিছুই ছিল না। শরীরও না। কে তবে প্লেট তুলল? কোনও দুষ্টু আত্মার কাজ। তা হলে সত্যি কি তিনি সি-ডেভিল লুকেনার? বংশীদা কি তবে ঠিক! সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। বরফের কুচি ঢুকে যাচ্ছে হাড়ে। কে জানে কে সেই অপদেবতা! তার ক্রমে শরীর ববফ হয়ে যাচ্ছে। জলে গড়াগড়ি যাচ্ছে, চেষ্টা কবছে বেব হবাব। আর যত সেই অপদেবতার আতঙ্ক তাকে গ্রাস করছে, তত জলে গড়াগড়ি খেতে খেতে সহসা স্থবির হয়ে গেল। চিতপাত হয়ে পড়ে আছে জলে, ডাঙায় পড়ে থাকা মৃত মানুষেব মতো।

জাহাজে জল তোলাব তোড়জোড় শুরু হচ্ছে তখন। দুটো জলের ট্যাংকার জাহাজেব পাশে টাগবোটে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে জল নেওয়া হবে। বার-বার ডেক-সাবেং তাড়া দিচ্ছিল, কী ব্যাপার, মুখার্জিবাবু কিনাব থেকে এখনও ফিবছেন না? কখন পাত পড়বে তোমাদের?

ইঞ্জিন-সাবেং বললেন, চলে আসবে। আপনারা না হয় বসে যান!

আব তখন মুখার্জি ফিবছেন নৌকায়। জাহাজে উঠে আসছেন। নৌকার মাঝিকে পয়সা দিয়ে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি ধরে উঠে আসছেন। অকাবণ ঘুরে মরা। কিছুই পাওয়া যায়নি। ঘুরে মরাই সাব। আস্তাবলগুলির কোথাও তিনজন ছাড়া আর-কারও ঠিকানা ডিনা ব্যাংকেব দেওয়া নেই। একটা স্টিমার পার্টি এসেছে, তাদেব অনেকে ঘোড়া ভাড়া করেছে। তা ছাড়া অজস্র নাম, শুধু তিনি খুঁজেছেন, ডিনা ব্যাংক থেকে কে কে আস্তাবলে গেছে? তিনি, সুহাস আর চার্লি ছাড়া আব কেউ ডিনা ব্যাংক থেকে ঘোড়া ভাড়া করেনি।

সুবঞ্জন ঠিকই বলেছে, এত বোকা ভাবছ কেন? সে জানে, কোনও কারণেই সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখা চলবে না। যাব এতটা সাহস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে চার্লিকে অনুসরণ করতে সাহস পায়, সে কখনও রেজিস্ট্রি খাতায় তাব নাম রাখে, কিংবা জাহাজের নাম?

মুখার্জিকে উঠে আসতে দেখেই সুরঞ্জন বলল, ওই তো আসছে। মাথায় যে কী চাপে!

তবু সুবঞ্জন ভাবল, যদি কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়ে যায়। তার স্নান সারা। তামার বিশাল ডেকচিতে দুধে চাল দেওয়া হচ্ছে। চালের গুঁড়ো পাওয়া গেলে অবশ্য সিন্নি হত। কারণ মুসলমান জাহাজিবা পায়েসেব চেয়ে চালের গুঁড়ো, দুধ, জাফরান, লবঙ্গ, কিসমিস, বাদাম দিয়ে সিন্নি বেশি পছন্দ করে। সিন্নির সবই ভাল, তবে নুন দেওয়া মুখার্জি পছন্দ করেন না। বাটলারও খাবে। মেসরুমমেটদের বলা হয়েছে। বাটলার বিরিয়ানির মশলা রসদ-ঘর থেকে পাঠিয়েছেন। খুবই উল্লাস সবার। মাদুর পেতে তাস খেলছে অনেকে।

মুখার্জি দৌড়ে পিছিলে উঠে এলেন। টুপি খুলে মাথা চুলকালেন। উঁকি দিলেন দরজায়, রান্নার কতদূর! বিরিয়ানির সুঘ্রাণ। জিভে প্রায় জল এসে গেল। ইঞ্জিন-সারেং সব তদারক করছেন মেসরুমে বসে। মুখার্জিবাবু ফিরেছেন শুনে তিনি উঠে গেলেন। বললেন, গেলেনই যখন কিছু শালপাতা আর

মাটির গ্লাস নিয়ে এলে পারতেন। তা হলে মেমানরা আপনার আরও খুশি হতে পারত, সুখ্যাতি হত ফিল সাহেবের।

মুখার্জি বললেন, এখানে শালপাতা কোথায় পাব?

সারেং বললেন, আছে। দ্বীপে সবই পাওয়া যায়। যাক গে, তাড়াতাড়ি নীচে যান। একটা তো বাজে। কখন গোসল করবেন, খাবেন?

মুখার্জি নীচে নেমে গেলে দেখলেন, সবারই প্রায় স্নান সারা। মাথা আঁচড়ে থালা-গ্লাস নিয়ে বসে আছে। মুখার্জিদা ফিরছেন না বলেই পাতে বসা যাচ্ছে না। সারেং দু'বার সুহাসেরও খবর নিয়েছেন, সুরঞ্জনের এক কথা, ওর কথা বলবেন না। ছোঁড়া বোট-ডেকে গেলে আর ফিরতেই চায় না। মরুক গে আরে, জাহাজে তোব পেছনে কে এত লেগে থাকবে। আমরা খেয়ে নেব। তোর জন্য বসে থাকতে বয়ে গেছে।

মুখার্জি সারেংকে ডেকে বললেন, সবাব তো একসঙ্গে জায়গা হবে না। এক লপ্তে পাত পেতে খাওয়ার জায়গা তো নেই, লোক তো কম না।

তা অনেক। প্রায় ষাটজন তো হবেই। সারেংও জানেন। প্রথম ব্যাচে বসার জন্য বংশীও উঠে যাচ্ছিল। মুখার্জিকে দেখেই বলল, এই যে গুরু, এসে গেছ?

বলে হাঁটু গেড়ে বসল।

পা দু'খানা দেখি। গড় হই। বিরিয়ানি সোজা কথা? তোমার অশেষ গুণ। দাও দেখি। জাহাজে ভোজ দিলে, সোজা কথা।

শুধু পা দু'খানি দিলে হবে? তোব যে আরও কত ব্যামো আছে।— বলে পা দু'খানা উপরে তুলে দিতেই বংশী পা মাথায় বেখে বলল, আবার কবে খাওয়াচ্ছ?

মুখার্জি বললেন, হবে। যা তাড়াতাড়ি। খেয়ে নে। শেষে কম পড়লে ঠকে যাবি।

মুখার্জি সুহাসকে দেখছেন না। আবেদালি লুঙি পবে গেঞ্জি গায়ে বেশ ফিটফাট হয়ে খেতে উপবে যাচ্ছে। ফার্স্ট ব্যাচে বসে যাবাব তার তাড়া। মুখার্জি তাকে দেখেই বললেন, সুহাস কোথায়?

আবেদালি জানে না কিছু। সে বলল, দাঁড়ান দেখছি।

বংশীব ফোকশালে উঁকি দিয়ে বলল, মুখার্জিবাবু সুহাসের খোঁজ করছেন।

হরেকেষ্ট বলল, উপরে আছে হয়তো।

কিন্তু সে তো সকাল থেকেই সুহাসকে দ্যাখেনি। সে মুখার্জিব ঘরে গিয়ে খবরটা দিতেই মাথা গবম করে ফেললেন তিনি।

তার মানে। সে সকাল থেকে কোথায় তোমরা জানো না? সকাল থেকে বেপাত্তা। অধীর, সুরঞ্জন' সুহাস কোথায়?

না, আর বসে থাকা যায় না। উপরে ওঠার মুখে যাকেই পেলেন, সুহাস কোথায়?

মনুব সঙ্গে দেখা। সেও বলল, সকাল থেকে তো দেখছি-না।

ওপরে উঠে সুরঞ্জনকে পেয়ে গেলেন।

সুহাস কোথায়?

কোথায় আবাব! যেখানে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। কোথায় থাকতে পারে বোঝো না।

তাব মানে? এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব! বেলা কত হয়েছে? ওর জন্য কে বসে থাকবে।

সেই তো। বাবু ফিটফাট হয়ে চার্লির কেবিনে গেলেন। সেই কখন! কী রোয়াব। আমাকে পাত্তাই দিল না!

পাত্তা দিল না? চার্লির ঘরে এতক্ষণ কী করছে?

কী করছে সে-ই জানে। আমি যেতে পারব না। তোর সামান্য বুদ্ধিসুদ্ধি নেই! তুই জমে গেলি' সময়জ্ঞান তোর থাকবে না। সবাই বসে থাকবে, এটাও বুঝলি না? ছোঁড়া স্বার্থপর, বুঝলে? কার জন্য করছ? এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।

সারেং সাব এসে বললেন, মুখার্জিবাবু চিংড়ি মাছ রেখে দিলাম। একদিনে সব শেষ করে কী হবে? বাটলারকে বললাম, মাছগুলো বরফ-ঘরে রেখে দিতে। কাল ভাবছি—

মুখার্জির মাথা গরম। কেমন অসহিষ্ণু, তার কোনও কথা শুনতে ভাল লাগছে না, তবু সারেং সাব সবার মুরুব্বি। অবজ্ঞাও করা যায় না। দায়সারা গোছের জবাব, ঠিক আছে। ভাল করেছেন।

কাল বুঝলেন, মুগের ডাল, গন্ধরাজ লেবু, চিংড়িমাছের মালাইকারি...।

মুখার্জি বললেন, সব তো বুঝলাম, আপনার ছোকরা জাহাজির যে পাত্তা নেই!

ছোট-সাবের কেবিনে গেছেন। ওই তো সুরঞ্জন বলল।

এবার মুখার্জির অসহিষ্ণুতা যেন চবমে। গেছে যখন, যান এবাব। ডেকে আনুন। কে যাবে মরতে ওখানে? আমাদের তো কাজ ছাড়া বোট-ডেকে গেলে সাহেবদের জাত যায়।

এত দেরি হবার তো কথা না। ডরোথি ক্যারিকোর কিছু ছবির খবর নিতে বলেছিলেন। ছোঁড়া কি জালে সত্যি জড়িয়ে গেল? খুবই অসহায় বোধ করছেন। সে তো জানে, ফিল তার খামার থেকে কত কিছু পাঠিয়েছে। ভাল-মন্দ খাবার লোভও আছে। জাহাজের একঘেয়ে খানা কাবই বা ভাল লাগে? ভোজের কথা ভেবেও তো তার চলে আসার কথা! এল না কেন? কে যাবে ডাকতে?

এই সুরঞ্জন, যা না! বাবুকে একবাব মনে করিয়ে দিয়ে আয়। আমরা সবাই বসে আছি।

সুরঞ্জন ইতস্তত করছিল। কারণ চার্লির কেবিনে যাওয়া মানেই সেও লক্ষ্যবস্তু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যা হচ্ছে জাহাজে, সে ঠিক কিছু বুঝতে পারছে না। তার কেমন যেন ভয় কবছে।

মুখার্জি আর পারলেন না।

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

সুরঞ্জন মুখার্জিদাব অভিমান বোঝে। কেউ কম স্বার্থপর নয় ভাবতেই পাবে। সে বলল, তুমি চানে যাও। আমি যাচ্ছি। সেই কখন বের হয়েছ, ফিরেও স্বস্তি নেই। আমি যাচ্ছি।

আব সুবঞ্জন কেবিনে নক কবতেই শুনতে পেল, কে?

আমি স্টোকাব সুবঞ্জন। সুহাস কী করছে? সবাই বসে আছে ওর জন্য। মুখার্জি পাঠালেন।

দড়াম কবে দরজা খুলে গেল।

সুহাস?

হ্যাঁ, ও তো আপনার কেবিনে সকালে এল।

সুহাস! সে তো কখন চলে গেছে। — চার্লি ঘড়ি দেখে বলল।

চলে গেছে?

হ্যাঁ। আমি তো বোট-ডেক থেকে দেখলাম সিঁড়ি ধরে নামছে।

পিছিলে নেই।

নেই!— চার্লি বলল, সত্যি নেই! না না, আছে। পিছিলেই আছে। আমি নিজে দেখেছি সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। ভাল কবে খুঁজে দ্যাখো। দু'ঘণ্টা হবে, সে যাবে কোথায়?

বলে দবজা ঠাস কবে বন্ধ করে সেও সুরঞ্জনেব পেছনে ছুটতে থাকল। যেন আগুনের ভিতর ছুটছে চার্লি। দাউ দাউ কবে জ্বলছে। সুহাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে প্রবল যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।

চার্লি ছুটে আসছে দেখতে পেয়েই মুখার্জি প্রমাদ গুনলেন। কিছু একটা হয়েছে। তিনি ছুটে গেলে সুবঞ্জন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সুহাস বোট-ডেকে নেই।

গেল কোথায়!

মুখার্জি চার্লির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তাকে সামলানো কঠিন। পিছিলে নেই, বোট-ডেকে নেই, গেল কোথায়?

দ্যাখো চার্লি, ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি তো বিশ্বাস করো, হি প্রটেক্টস। তার তো কোনও অপরাধ নেই। গোলমাল বাধালে জাহাজে অনাসৃষ্টি হতে পারে। কেউ রক্ষা পাবে না। আগে খুঁজে দেখা দবকার। তবে পিছিলে নেই। তবু চলো, দেখাই যাক। পিছিলে খুঁজে দেখতে ক্ষতি কী?

সুরঞ্জন মুখার্জির পেছনে পেছনে ছুটছে। চার্লিও। কেন যে চার্লি নিজেকে কিছুতেই শান্ত রাখতে

পারছে না, স্থির হতে পারছে না। সুহাসকে নিয়ে তার কেন যে সবসময় এত আতঙ্ক! সারেং সাব ওদের উঠে আসতে দেখেই তাজ্জব। সঙ্গে আবার কাপ্তানের ব্যাটা। গোলমেলে কিছু কি না কে জানে। ফাইভার মারা যাবার পর থেকেই মুখার্জিবাবু কেমন উচাটনে পড়ে গেছেন।

মুখার্জিকে তিনি বললেন, পেলেন?

না। চার্লিব কেবিন থেকে কখন চলে এসেছে! গেল কোথায়, বুঝতে পারছি না।

কোথাও গেছে। বাথরুমে নেই তো?

সারেং নিজেই বাথরুমের দিকে গেলেন। বললেন, সকাল থেকেই তো নেই।

মুখার্জি দাঁড়ালেন না। নীচে নেমে গেলেন। সবাইকে এক প্রশ্ন, সুহাসকে দেখেছ?

না। সকাল থেকে দেখিনি।— হাফিজ বলল।

মুখার্জি অধীরকে ডাকলেন, তুই একবার দেখে আয় তো বাংকারে আছে কি না!

মুখার্জি বুঝতে পারছেন না কী করবেন। সারেংকে সব খুলে বলা ঠিক হবে কি না তাও মাথায় আসছে না। সারেং সাব ভাবতে পারেন, গোলমালটা কোথায়! কাপ্তান তো সুহাসকে স্নেহ করেন। না হলে এত রাতে ডেকে পাঠাতে পারেন? সব খুলে বলাও যায় না। চার্লি যে ওম্যান, প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। চার্লি যে বিপদের মধ্যে আছে, তাও প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। চার্লিকে মুখোশ পরে অনুসরণও করছে, সুহাসকে দু'-দু'বার খুন করাব চেষ্টা হয়েছে— এসব তো তাঁরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না। সুহাসেব জন্য এতটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়াটাও ওদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। বলতে পারে, গেছে কোথাও। কিনারায়ও নেমে যেতে পারে।

তবে একা সে বের হয় না। সারেংই বারণ করে দিয়েছেন, এখনও জাহাজ চিনতে সময় লাগবে। কিনাবা চিনতে সময় তো লাগবেই। তবু আজকালকার ছোকরা, কে কার কথা শোনে।

সুরঞ্জন, অধীর কোল-বাংকারে ছুটে গেল। ওখানে নিয়ামত আছে। স্টোক-হোলডে নিয়ামতেব ডিউটি। আড্ডায় যদি মেতে যায়!

মুখার্জি ফোকশাল, বাথরুম এমনকী বোট-ডেকে উঠে গেলেন। চার্লি যেন আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে বলল, একবার ইঞ্জিন-রুমে গেলে হত! ইঞ্জিন-রুমে নেমে কী হবে, মুখার্জি বুঝতে পারছেন না। তাকে তো কোনও ডিউটি দেয়া হয়নি। দিলে সারেং সাব জানবেন না হয়! তার আগে দেখা দরকার ফলকাগুলি। ফলকার কাঠ খোলা রেখে কেউ যদি জাল পেতে রাখে। তিনি সামনে-পেছনে চারটা ফলকাই দেখলেন। ফলকার কাঠ খোলা নেই। ফলকা ত্রিপল দিয়ে কিল এঁটে রাখা। মাল বোঝাই হচ্ছে। বৃষ্টি-বাদলায় ভিজে গেলে মাল নষ্ট হতে পারে। এমনকী বাতিল হয়ে যেতেও পারে। সারেং সাব বাথরুমে ঢুকে গেলেন। চার্লি মুখার্জিকে কেবল বলছে, তোমাদের কিছু বলে যায়নি! গেল কোথায়?

না। আমি তো এইমাত্র ফিরলাম।

চার্লির চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে, সুহাস, তুমি কোথায়? কোথাও তুমি ঠিক আছ। সাড়া দিচ্ছ না। কিন্তু এত অধীর হয়ে পড়লে মুখার্জি বিরক্ত হবেন। সে চিৎকার করে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। দু'-একজন অফিসার-ইঞ্জিনিয়াবও বের হয়ে এসেছেন। চার্লিকে প্রশ্ন, কী ব্যাপার! জাহাজ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছ!

চার্লি শুধু বলল, সুহাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপব নিজেকে সামলে নিচ্ছে। এই দোষ চার্লির, একটুতেই ভেঙে পড়ে। মুখার্জি বারবার বলছেন, ধৈর্য ধরতে হবে চার্লি! যাবে কোথায়? জাহাজেই আছে।

কোথায় আছে!— প্রায় দাঁত চেপে নিজেকে সামলে বলল, কখন সামান্য ব্লু বেরিজ জুস খেয়েছে। সবে ডাইনিং হল থেকে ফিরছি। শুনি সুহাস পিছিলে নেই। কোথায় যেতে পারে! কেন যাবে! বলো, কেন সে জাহাজ থেকে নেমে যাবে! জাহাজে থাকলে, কোথায় থাকতে পারে!

আমিও তো বুঝতে পারছি না! কী বলব!

চার্লিকে যে আর শান্ত রাখা সম্ভব না, মুখার্জি নিজেও বুঝতে পারছেন। তিনিও তো ভাল নেই। চার্লির কথার জবাব দিতে গিয়েও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন।

অধীব সুবঞ্জন ছুটে এসে বলল, না, স্টোক-হোলডে নেই।

নিয়ামত বলল, গেছে কোথাও। গিয়ে দ্যাখো বাছাধন হয়তো এতক্ষণে পিছিলে হাজিব।

মুখার্জি বললেন, কোল-বাংকাবগুলি দেখেছিস?

দেখেছি।

ক্রশ-বাংকাবে দেখলি।

ওখানে তো দবজা সিল করা। খোলা হয়নি।

মুখার্জি ভাবলেন, সব খুলে দেখা দবকাব হবে। যদি কিছু হয়েই যায় লাশ পাচাব কবতে দেওয়া হবে না। আগুন জ্বলবে। কেউ বেহাই পাবে না। তিনি নিজেও কতটা অস্থিব হয়ে পডছেন, এতেই টেব পেলেন। বিচলিত হলে চার্লিকে ধবে বাখা যাবে না। সে কী কবে বসবে কে জানে।

বংশী ছুটে আসছে।

সে এসেই বলল, কী হযেছে বলো তো।

এই আব-এক ঝামেলা। তাকে কিছু বলাও যাবে না। মুখার্জি বললেন, কিছু না। তুই যা। তোব খাওয়া হয়েছে?

কিছু না বলছ কেন। আমি আহাম্মক ভাবছ। তোমবা আহাম্মক। তোমবা মনে কবো আমি বুঝি না। সুহাসকে খুঁজছ। আমি বলছি না, জাহাজে কিছু একটা আছে। সুহাস তাব পাল্লায় পড়ে গেছে। তাকে তোমবা কোথাও খুঁজে পাবে না। বললাম, মিলিয়ে নিয়ো। ফাইভাব গেল, কাপ্তান নাটক কবল, কীসেব নাটক— চার্লিকে বলে দ্যাখো না, সে কী দেখতে পায়। চার্লি, তুমি সত্যি কবে বলো, বোট-ডেকে মেয়েমানুষ দেখা যায় কি না। কে ডেবিক তুলে বাখে? শয়তান। জাহাজে সমুদ্র-শয়তান উঠে এসেছে। কাপ্তানেব উপব শয়তান ভব কবেছে। হাবামিব বাচ্চাবা পাব পাবে ভাবছ।

মুখার্জি আব পাবলেন না।

কী হচ্ছে।

কিছু হচ্ছে না। যা হচ্ছে, তোমবা সবাই জানো। মুখ খুলছ না। আগুন লাগিয়ে দিলে বুঝবে।

মুখার্জি এবাব তেডে গেলেন, একদম বাজে কথা না। যা শুয়ে পড গে। বউযেব ছবি বেব কবে দ্যাখ গে। আমাকে জ্বালাবি না। বেশি বাড়াবাড়ি কববি তো চ্যাংদোলা কবে জলে হাবিয়া কবে দেব।

মুখার্জিব তডপানিতে বংশী কিছুটা মিইয়ে গেল, বিড়বিড় কবে বকছে, আমাব কী? গেলে সবাই যাবে। জাহাজে ডুবলে কে আব বক্ষা পায়। এক-দু'জনেব উপব দিয়ে গেল ভেবেই তেনাবা খুশি। আবে, দ্যাখো কী হয়। তবে আমিও ছাড়ব না বলে দিলাম। আমি জানি, কিছু একটা হবে। শুয়োবেব বাচ্চা কাপ্তানকে কী কবে টাইট দিই দ্যাখো না। জাহাজ নিয়ে ঘুববে শয়তানেব বাজত্বে? ঘোবা বেব কবে দেব।

মুখার্জি এখন কী যে কবেন। কাকে সামলান। চার্লি তাডা দিচ্ছে, নীচে নেমে গেলে হয়। চার্লি বাধহয় আব পাবছে না। সে ছুটে যাচ্ছে। কে জানে কেবিনে-কেবিনে সে লাথি মেবে দবজা খুলতে বলবে কি না। এতটা ভেঙে পড়াও ঠিক না। যদি কিনাবায় যায়ই, যেতে পারে না, তাও তো বলা যায় না। তাঁব দেবি দেখে কে জানে যদি সে খুঁজতে চলে যায়। তবে একা যাবে এমনও ভাবতে পাবেন না। কিনাবায় নেমে গেলে ঠিক সুবঞ্জন অথবা চার্লিকে বলে যেত। কাউকে না বলে যাবার মতো অদায়িত্বশীল সে তো নয়। তবু একবাব খাঁডিব জলে নৌকা কিংবা মোটব-বোটগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কিনাবায গেলে ফেবাব সময হযে গেছে। তাঁকে, চার্লিকে জাহাজেব বেলিং-এ দেখলে হাতও তুলে দিতে পাবে।

না, কিছু না। কেউ কোনও বোটে হাত তুলে দিচ্ছে না।

পালতোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে।

মোটব-বোটে কাপ্তান, চিফ মেট, সেকেন্ড মেট নেমে গেলেন। দূবে স্টিমাব পার্টিব লোকজন হইচই কবে ফিবছে। বোটে পাল তুলে অনেকে খাঁড়ি পার হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। কেবল সুহাসেব পাত্তা নেই।

কোথায় যাচ্ছেন কাপ্তান? মুখার্জি বিস্মিত।

চার্লি, তোমার বাবা কোথায় যাচ্ছে জানো?

রিফ এক্সপ্লোরারে যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

চার্লি নিজেও আর বোধহয় বিশ্বাস রাখতে পারছে না মুখার্জির উপর। যেন মুখার্জি নেহাতই সামান্য ঘটনা ভাবছেন। এতটা উতলা হবার কিছু নেই। কিন্তু চার্লি তো জানে কী হতে পারে! সে তো ভেবে পাচ্ছে না, কারণ তার রক্তে যে সেই এক প্রবল ঈশ্বরে বিশ্বাস, হি প্রটেক্টস। সে তো মরিয়া হয়ে উঠতে পারছে না শুধু ঈশ্বরের কথা ভেবে! সে তো সিনার হতে চায় না। সে যতই বলুক, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি— কিন্তু পারছে কই! পারলে সুহাসের জীবন বিপন্ন হত না। তবু শেষ পর্যন্ত সে লড়বে। সে ছুটছে। ইঞ্জিন-রুমে দৌড়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে নেমে যাচ্ছে। যদি সুহাস কোথাও পড়ে-টড়ে থেঁতলে যায়। কিংবা প্রতিহিংসা, এবং সুহাসকে যদি সত্যিই শেষ করে দেয়। কত কুকথা যে মনে হচ্ছে তার! দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি আপরুটেড।

সে নেমে গেলে মুখার্জিও নেমে গেলেন। অন্ধকার ইঞ্জিন-রুম। মুখার্জি আলোগুলি সব জ্বালিয়ে দিলেন। পাগলের মতো ডাকছে চার্লি, সুহাস, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যানসার মি। সুহাস, তুমি কোথায়! সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কোনও সাড়া নেই।

মুখার্জি টানেল-পথটায় ছুটে গেলেন, ডাকলেন, সুহাস আছিস? সুহাস!

আরে, থাকলে তো তিনি দেখতেই পেতেন। ছেলেমানুষের মতো ডাকাডাকি করছেন কেন তিনি নিজেও বুঝছেন না!

চার্লি লিস্‌জে টর্চ মেরে দেখছে। আর ডাকছে, সুহাস, তুমি কোথায়? কেন সাড়া দিচ্ছ না? মুখার্জি, সুহাসের সাড়া পাচ্ছি না কেন।

আবার আর্তকণ্ঠে ডাকছে। অভয় দিচ্ছে যেন। বলছে, ইফ এভরিওয়ান এলস ডেজার্টস ইয়ো, আই ওন্ট সুহাস।— বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মুখার্জি আর পারলেন না।

কী হচ্ছে চার্লি!

আমি জানি না মুখার্জি, আমি কিচ্ছু জানি না। ও সাড়া দিচ্ছে না কেন!

আচ্ছা, এত ভেঙে পড়লে চলবে? তারপর কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, কেন এসব হচ্ছে! তুমি বুঝতে পারছ না, বাব বার সুহাসকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কে করছে! তুমি সব জানো! বলো, কে করছে? সুহাসের কিছু হলে আমি তোমাকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। কেউ রেহাই পাবে না। সে যত বড় সি-ডেভিলই হোক।

চার্লি কিছুই বলছে না। নিরুপায় বালিকার মতো শুধু কাঁদছে। বসে আছে হাঁটু গেড়ে। টর্চ পড়ে আছে প্লেটে।

আমি জানি না কিছু। আমাকে তুমি কিছু বলবে না।

তুমি চেনো তাকে?— মুখার্জি ইঞ্জিন-রুমে চার্লিকে একা পেয়ে জেরা করছেন।

তুমি তাকে জানো। না হলে কেন বললে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল উইথ ইভিল। কেন বললে বলো? তুমি তাকে চেনো! কী অসুবিধা তোমার! কেন তুমি তোমার বাবাকে ক্রেজি ওল্ড গোট বলে গালাগাল দিলে বলো? কেন তুমি মুখ আঁকলে গোঁফ আঁকলে?

আমি জানি না, কিচ্ছু জানি না মুখার্জি।

বেটসি খুন হয়েছে কেন?

তাও আমি জানি না।

কিছুই জানো না। এটা বুঝছ না সব গণ্ডগোলের মূলে তুমি! সেটা কী! বলো, চুপ করে আছ কেন? তুমি মেয়ে! ছেলের পোশাক পবে ঘুরে বেড়াও। তা বেড়াতেই পারো। কিন্তু তুমি কি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সব দেখতে পাও? তোমার কাকার কথা মনে করতে পারো? আংকল র‍্যাচেলকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে? তোমাদের বুনোফুলের সাম্রাজ্য পার হয়ে কোনও স্টপ অফে ট্রাকারদের সঙ্গে কারও কি দোস্তি ছিল! তোমার দাদা, তোমার দিদিরা কোথায়? তাদের নাম তুমি জানো না বিশ্বাস করতে

হবে! তোমার ঠাকুরদা সব তোমাকে দিয়ে গেছেন। তোমার শত্রু থাকবে না ভাবছ কী করে! কী? ঠিক বলছি?

চার্লি বলল, সুহাসকে তো সব বলেছি।

তুমি বলেছ, সেও আমাদের সব বলেছে, যাব জন্য তুমি দায়ী নও, অথচ তোমাকে তার দায় বহন কবতে হচ্ছে। দায়টা কী? বলো। তোমাকে কোনও অনুসরণকারী তাড়া কবছে না, তাড়া করছে তোমার ঠাকুরদা। কেন তাড়া করছে? তা হলে এত খোঁজাখুঁজি কেন? জাহাজেও অনুসরণকারী উঠে আসে কী কবে? সুহাসকে নিয়ে কাকে খুঁজতে বের হয়েছিলে? যদি সত্যি সে অনুসরণকারী হয়, কেন সে তোমাকে অনুসরণ করছে? হাজার প্রশ্ন। তোমার ঠাকুরদা কেন জাহাজে উঠে আসবেন? তিনি বেঁচে নেই। তিনি কী করে এই জাহাজে উঠে আসতে পারেন? এতে কি মনে করতে পারি না, তুমি মানসিকভাবে সুস্থ নও? অথবা কি মনে করতে পারি না, তোমার কোনও অজ্ঞাত পাপ আছে?"অজ্ঞাত পাপের তাড়নায় তুমি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো? বলো? কথা বলছ না কেন? সুহাস সাড়া দিচ্ছে না। আমরা তাকে আর কোথায় খুঁজতে পারি? অপেক্ষা ছাড়া আমাদের আর কী কবণীয় থাকতে পারে? চার্লি অকপট হও। প্লিজ। কাঁদলে চলবে। তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? চার্লি, শক্ত হও। আমি জানি সুহাসের কিছু হলে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। কিন্তু আমাদের শক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বুঝে দ্যাখো, তোমার বাবা তোমাকে জাহাজে তুলে এনেছেন, জাহাজে নিয়ে বছরের পব বছর ঘুরছেন। জাহাজেই তুমি বড় হয়ে গেলে। কেন? তাঁর কি কোনও দুরভিসন্ধি আছে? তাঁব কিংবা আর কারও? তুমি তো বলেছ, ইভিন কাউন্ট অল দোজ হু হেট ইয়ো উইদাউট কজ। তুমি বলেছ, তাঁরা ইনফ্লুয়েন্সিয়েল ম্যান। দোজ হু প্লট টু পানিশ ইয়ো, দো ইউ আব ইনোসেন্ট। দে ডিমান্ড দ্যাট ইয়ো বি পানিশড ফর হোযাট ইয়ো ডিড নট ডু। তারা তোমাকে কী শাস্তি দিতে চায়! সব খুলে না বললে কিছু করা যাবে না। আমরা চেষ্টা করছি, আমার মনে হয় তুমি সবাইকে চেনো। তোমার কাকার নাম নিশ্চয়ই জানবে। বলো, জানো কি না?

আংকেল বাচেল বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে আমার এই দুর্গতি কিছুতেই হত না মুখার্জি।— চার্লি রুমালে মুখ চেপে কথা বলছে।

আচ্ছা, আংকেল রাচেলকে দেখলে চিনতে পাববে।— মুখার্জির চোখে প্রত্যাশা ফুটে উঠছে।

বুঝতে পারছি না। আবছা মনে আছে।

কবে তাকে শেষ দেখেছ?

আমি খুবই ছোট। এই চার-পাঁচ বছরের। যুদ্ধে যাবাব আগে তিনি ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা কবতে এসেছিলেন। ঠিক চিনতে পারব কি না জানি না।

মুখার্জি কিছুটা দম নিলেন যেন, যুদ্ধে তিনি কবে যোগ দেন?

যোগ দেন কবে বলতে পাবব না। আমার এখন মাথাও ঠিক নেই। সুহাস কোথায়! সে কোথাও আছে। সাড়া দিচ্ছে না।

যেখানেই থাকুক খুঁজে বের কবব। চলো উপরে উঠি। ফিলের কাছে আজ একবার যেতে পারবে?

সুহাস কোথায়? ফিল বলছ কেন? সুহাসকে ফেলে আমি কোথাও যাব না। কোথাও না।

সুহাসকে ফেলে আমিও যাব না। কথা দিচ্ছি। তাকে খুঁজে পেলেই আমরা যাব। তাকে আমরা ঠিক খুঁজে বের করব। যেখানেই থাকুক। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াবে না।

আসলে মুখার্জির কেন যে মায়া হল, এত অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা যে নারীর, তার প্রতি আর কতটা নিষ্ঠুর আচরণ করা যায়? তিনি তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের জন্যও কেমন কিছুটা অনুতপ্ত। মুখার্জি চার্লির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, অবোধ কন্যাকে তিনি মাঝে মাঝে দেশে গেলেও এভাবে আদর করেন।

আর জাহাজে যেতে হবে না বাবা।

না, আর যাই!

কিনারায় কোথাও কাজ খুঁজে নাও।

ঠিক কাজ খুঁজে নেব। ভালই লাগে না তোদের ছেড়ে থাকতে। আমাকে ছেড়ে তোদের থাকতে কষ্ট হয়, আমার বুঝি হয় না?

আজ চার্লিকে দেখে নিজের মেয়ের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।

সুহাসকে খুঁজতে গিয়ে চার্লিকে এভাবে একা পাওয়া যাবে মুখার্জি আশাই করতে পারেননি। ইঞ্জিন-রুমের সিঁড়িতে সবাই একে একে নেমে আসছে।

এক প্রশ্ন, পাওয়া গেল?

মুখার্জি বললেন, না।

চার্লি হেঁটে চলে যাচ্ছে। বয়লার-রুম পার হয়ে পাগলের মতো দু'হাত মুখে রেখে চিৎকার করছে, সুহাস, তুমি কোথায়? সুহাস, উত্তর দাও। সুহাস—

আসলে এই আর্তডাক কোনও নিবিড় এবং নিরুপম উপাসনার মতো। চার্লি সিঁড়ি ধরে বাংকারে ঢুকে যাচ্ছে। সে কাউকে বিশ্বাস করছে না?

সুহাস, সুহাস!

আসলে এক নারী তার প্রিয়জনকে জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রে যেন ডুবে যেতে দেখছে।

চার্লি যদি কিছু একটা করে বসে!

বার বার সে বলছে, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড।

এই পৃথিবীর শেষেও সে সুহাসেব সঙ্গে আছে। ভাবতে গিয়ে তাঁর মতো অভিজ্ঞ জাহাজির চোখেও জল এসে গেল।

তিনি চার্লির পেছনে ছুটছেন। চার্লি একদণ্ড দাঁড়াচ্ছে না। সামনে রঙের টব পড়ল, লাথি মেরে উড়িয়ে দিল। সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে লাফিয়ে। সে কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। দৌড়ে যমুনাবাজুর কয়লার বাংকারে ঢুকে গেল। সুটের মুখে টর্চ মেরে ঝুঁকে দেখল। সুটের গর্তে কয়লার মধ্যে যদি চিতপাত হয়ে পড়ে থাকে। গঙ্গাবাজুর বাংকারে ঢুকে গেল। সেখানেও টর্চ মেরে দেখল, যদি পড়ে থাকে।

তারপর কয়লাব পাহাড়ে টর্চ মেবে দেখল। সে ছুটে যাচ্ছে। জাহাজের সবাই হাজির। কাপ্তান জাহাজে নেই, কেউ যেন এই উদ্‌ভ্রান্ত ছেলেটিকে নিরস্ত করতে পারবে না। এমনকী মুখার্জিও ভয় পেতে শুরু করেছেন। চার্লি ঘামছে। তেলঘামে মুখ চক চক করছে। বিস্ফাবিত চোখ। দেবী তাঁর রণচণ্ডী-রূপ নিতে শুরু করেছেন। চোখে বিন্দুমাত্র অশ্রু নেই। ঝিমধরা ভাব চোখে-মুখে। দেবী ফলকায় ফলকায় ছুটে গেলেন। কাঠ ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকলেন। কারপেন্টারকে ডেকে তার ঘর খুলতে বললেন।

কোথাও তাকে আটকে বাখা হয়েছে।

কারপেন্টার চার্লির রুদ্রমূর্তিতে ভয় পেয়ে মুখার্জিকে বলল, কিয়া মাংতা বাবু?

আবে, আগে তোমার স্টোর খুলে দেখাও।

কারপেন্টার দৌড়ে চাবি নিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে কাঠ, র‍্যাঁদা, বাটালি, হাতুড়ি যা কিছু সামনে পেল ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেক-এ। তারপর বের হয়ে ক্রশ-বাংকারে নেমে দুমদাম দরজায় লাথি মারতে থাকল।

মুখার্জি বসে পড়লেন।

তিনি আর কিছুই ভাবতে পারছেন না।

তিনি তবু চার্লির কাছে গিয়ে বললেন, এটা কী হচ্ছে? সব ভাঙচুর করছ! সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ'

তিনি ছুটে গেলেন, থার্ড মেটের কাছে। বললেন, একটা বিহিত করুন। আপনারা হাঁ করে দেখছেন?

থার্ড মেটও খেপে আছেন। সোজা জবাব, মাথা গরম ছোকরা। বাপই সামলাতে পারে না, আমাদেব দায় পড়েছে। যা খুশি করুক। আবে, একজন নেটিভকে নিয়ে তোর এত মাথা গরম করার কী আছে' কোথাও গেছে। আসবে।

থার্ড মেট তো ভালমানুষ! তিনিও নেটিভ বলে গালাগাল দিচ্ছেন! এই বর্ণবিদ্বেষও একটা যে হেতু হতে পারে, এই প্রথম টের পেলেন মুখার্জি।

তিনি বুঝতে পারছেন, জাহাজে চার্লিকে শুধু সুহাসই সামলাতে পারে। আর কেউ পারে না। কারও সাধ্য নেই। সবাই তামাশা দেখতে বোট-ডেকে, ফলকায় জড়ো হয়েছে। এ ছাড়া তারাও যেন নিরুপায়।

কী যে হবে!

জাহাজে লন্ডভন্ড অবস্থা।

চার্লি কারও সঙ্গে আর কথা বলছে না। চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। সে বোট-ডেকে ছুটে আসছে কেন?

ইঞ্জিন-সারেং দলবল নিয়ে ক্রশ-বাংকারের দরজা খুলতে গেছেন। মুখার্জিবাবুই বলেছেন, খুলে দেখান। চার্লি কাউকে বিশ্বাস করছে না। সুহাস গেলই বা কোথায়! কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। চার্লি বোধহয় জানে।

আর এ সময়ই বোট-ডেকে ছোটাছুটি শুরু হয়েছে। চার্লি কাপ্তানের কেবিনে ঢুকে গেছে। চার্ট-রুম থেকে চাবি এনে দরজা খোলারও যেন তর সইছে না। সে লক ভেঙে দিল চিজেল আর হাতুড়ি মেরে। কেউ সামনে যেতে সাহসই পাচ্ছে না। কেন লক দুমড়ে-মুচড়ে লাথি মেরে কেবিনের দরজা খুলছে, তাও বুঝতে পারছেন না মুখার্জি! মুখার্জি কেন, কেউ না। সবাই তটস্থ। জাহাজে এ কী অনাসৃষ্টি শুরু হল, আর তখনই দেখা গেল চার্লি বের হয়ে আসছে। হাতে বাপের নিরাপত্তার আগ্নেয়াস্ত্র। পিস্তল তুলে সে হেঁটে যেতেই অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা যে যার কেবিনে ঢুকে দরজা লক করে দিয়েছে। চার্লি নীচে নেমে গেল। এলিওয়েতে রেডিয়ো অফিসারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঠান্ডা গলায় চার্লি বলল, মিস্টার উইলিয়াম ডু ইয়ো নো হোয়াই আই হ্যাভ কাম! আই অ্যাম হিয়ার টু টেল ইয়োর ফেট! তারপর সহসা চিৎকার করে উঠল চার্লি, এখন কী হবে? স্কাউন্ড্রেল!

বলেই দুমদাম দরজায় লাথি মারতে থাকল চার্লি। মুখার্জি এলিওয়েতে কী ঘটছে বুঝতে পারছেন না। তিনি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখার্জি বুঝলেন, এই সুযোগ। চার্লির হাতে পিস্তল দেখে যে যার মতো পালাচ্ছে। মুখার্জি কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গোপন চাবিটির খোঁজে সব লন্ডভন্ড করে দিচ্ছেন। না, পাওয়া যাচ্ছে না, কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। র‍্যাক থেকে সমুদ্র-সংক্রান্ত সব বই টেনে নামালেন। ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন সব। লকার টানাটানি করেও ফল হচ্ছে না। কাগজপত্র যা পাচ্ছেন, জড়ো করছেন। কোথায় রাখেন! উপরে জিশুর মূর্তিটা। টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে ওটা টেনে নামালেন। কেন যে তাঁর মনে হচ্ছিল, ঈশ্বরের মুখ মুখোশ হয়ে গেলে সাংঘাতিক হয়। দেশ ভাগ হয়। হাজার লক্ষ মানুষ গৃহহারাও হয়। ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ কিছুই বাদ যায় না। তিনি জিশুর মূর্তিটির ভেতর কিছু আছে টের পেলেন। ফাঁপা। ভিতরে কিছু আছে। দুমড়ে-মুচড়ে আছাড় মেরে মূর্তিটি ভেঙে ফেলতেই, ইউরেকা!

মুহূর্তে কাজ সেরে ফেললেন মুখার্জি। সেই গুপ্ত লকার থেকে যা কিছু চিঠিপত্র, ছবি, ডরোথি ক্যারিকোর গাইড-বুক, দলিল-দস্তাবেজ, এবং তাঁর কিছুই খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই, এইসব কাগজপত্র থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। সামান্য চিরকুটটি পর্যন্ত যত্ন করে ফাইলবন্দি করে ফেললেন। আর মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি মেরে দেখছেন, কেউ যদি কোনও অদৃশ্য জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তিনি জানেন না, নীচে এলিওয়েতে কী হচ্ছে।

তবে খুবই ত্রাসে পড়ে লোকজন ছোটাছুটি করছে, এবং এক বিধ্বংসী আচরণের সাক্ষ্য এখন এলিওয়েতে চলছে, চলুক। ভেবে লাভ নেই। সুহাসের যাই হোক, তিনি এই সুযোগ নষ্ট করতে পারেন না। একটা হেতু আছে, যা চার্লি জানে, অথচ প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। অফিসাররাও জানতে পারেন, কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। নানা দুশ্চিন্তায় তাঁর এখন মাথা ঠিক না থাকার কথা। অথচ খুবই ঠান্ডা মাথায় কাজ সেরে বের হয়ে পড়লেন। কাপ্তান কেবিনে ঢুকে যাই দেখুক, পুত্রের কাণ্ড ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। কারণ কাপ্তানের নিরাপত্তার জন্য যে আগ্নেয়াস্ত্রটি, সেটিও যখন খোয়া গেছে, তখন আর তাঁর বিষদাঁত কতটা প্রখর হতে পারে!

মুখার্জি কাপ্তানের কেবিন থেকে বের হয়ে দেখলেন, বোট-ডেকে কাকপক্ষীটি নেই। তিনি নীচে নেমে দেখলেন পিছিলে সবাই জটলা করছে। ডেকের দিকে কেউ যেতে সাহস পাচ্ছে না। তাঁর এখন কিছুই দেখার সময় নেই। ছুটে আসার মুখে সবাই বলল, শিগগির যান। চার্লি দরজায় দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে। মার্কনি সাব দরজা লক করে ভিতরে ঘাপটি মেরে আছেন। চার্লি পাগল হয়ে গেছে। চার্লি মার্কনি সাবের দরজার সামনে হামলা করছে!

মুখার্জি কেমন আচমকা ধাক্কা খেলেন। লোকটিকে তো জাহাজে প্রায় দেখাই যায় না। দিনরাত ট্র্যান্সমিশান রুমে পড়ে থাকে। তার মুখটিও যেন তাঁদের ভাল চেনা নেই। তিনি এই খবরে অন্যসময় হলে খুবই বিপাকে পড়ে যেতেন, এখন তাঁর কাছে সবই অর্থহীন। যিনিই সেই ইভিল হোন, সুহাসকে উদ্ধার করতে না পারলে সেই অদৃশ্য শত্রুর শাস্তির যেন আর গুরুত্ব থাকে না। তিনি জানেন, তবু চার্লি থেকে যাবে। চার্লির গায়ে হাত দেবার সাহস কারও নেই, তাও এই দুর্দিনে জানা হয়ে গেছে। সে যদি খুন-টুনও করে বসে, তবু সে যেন রেহাই পেয়ে যাবে। এত যার দাপট, সুহাসের কিছু হলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবে না, কে বলতে পারে।

চার্লিকে শত্রুমুক্ত করতে পারলেও তাঁর একটা যেন সান্ত্বনা থাকবে। তিনি দ্রুত নীচে নেমে গেলেন। ফোকশালের দরজা খুলে লকারে ফাইলটি রেখে ভাল করে টেনে দেখলেন লকার। তারপর দরজা বন্ধ করে লক করে দিলেন। দরজা ঠেলে দেখলেন, নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, যত রাতই হোক, তাঁকে আজ সব কাগজপত্র ফিলের জিম্মায় পৌঁছে দিতে হবে। মানুষটি যে প্রকৃতই ধার্মিক, ঘোড়ায় চড়ে বসলেই টের পাওয়া যায়। মানুষের বসবাস কত সুন্দর হয় তাঁর এলাকায় না ঢুকলে বোঝা যায় না।

এসব ভাবনা যে কেন মাথায় আসছে! অন্তত আর-একবার শেষ চেষ্টা। তিনি সুরঞ্জন অধীরকে নিয়ে ছুটতে থাকলেন। চার্লিকে স্বাভাবিক করে তুলতেই হবে। সুহাস তো বলেছে, চার্লি খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে পাপকে ভয় পায়। তার এই পাপবোধই এতদিন তাকে রক্ষা করে আসছে। সে কিছুই করতে পারছে না। প্রতিশোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকতেও সে নিজেকে কষ্ট দিয়েছে, ঈশ্বরের পৃথিবীতে বুনো ফুল হয়ে ফুটে থাকার জন্য সে শাস্তি মাথায় পেতে নিয়েছে। সে জানে, তার ঠাকুরদার ইচ্ছেই এটা।

চার্লি সুহাসকে বলেছে, ওয়ান ডে, ইন এ ভিশান, গড টোল্ড হার সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন হার লাইফ। চার্লিকে তিনি নাকি বলেছেন, প্রতীক্ষা তোমাকে একদিন বুনো ফুলের সৌন্দর্য প্রদান করবে। চার্লি নাকি ঘুমের মধ্যে এসব দেখতে পায়। সে নাকি তাঁর ঈশ্বরকে বার বার প্রশ্ন করে, হাউ অফেন শুড আই ফরগিভ হিম হু সিনস এগেইনস্ট মি? সেভেন টাইমস? ঈশ্বরের জবাব, নো, সেভেনটি টাইমস সেভেন। সুহাসই বলেছে, চার্লির কী যে সব অদ্ভুত ধারণা মুখার্জিদা।

মুখার্জি ছুটছেন। অধীর সুরঞ্জনও ছুটছে সঙ্গে।

চার্লি কিছু করে বসতে পারে। হাতের কাছে কাউকে না পেলে নিজেকেও শেষ করে দিতে পারে।

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মুখার্জির। শেষে মার্কনি সাব। মুখোশ, অনুসরণকারী, ডেরিক তুলে রাখা কার কাজ হবে। সেকেন্ড কি সত্যি নির্দোষ? তিনি যে সেকেন্ডকে দেখলেন, লাইটহাউজের পাশে. মগড়াকেও দেখেছে সুহাস। মগড়ার এত সাহস।

তিনি ডাকছেন, চার্লি, চার্লি। প্লিজ চার্লি, পাগলামি করবে না। ওয়েট ফর সেভেনটি টাইমস সেভেন।

চার্লি মার্কনি সাবের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাথি মারছে দরজায়।

মুখার্জি চার্লির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ধস্তাধস্তি করে চার্লি পেরে উঠছে না। কেবল বলছে, বেটার ইউ কিল মি মুখার্জি। আই উড র‍্যাদার বি ডেড দ্যান এলাইভ!

চার্লি, প্লিজ লিশ্‌ন। তুমি জানো, হি প্রটেক্টস।

সঙ্গে সঙ্গে চার্লির সারা শরীরে ঠান্ডা হিমেল স্রোত নেমে আসছে। সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। গায়ে জোর পাচ্ছে না। বসে পড়ছে। পিস্তলটা হাত থেকে আলগা হয়ে গেল।

তার যেন আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। দেয়ালে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলছে, ওঃ লর্ড, হাউ লং মাস্ট আই কল ফর হেল্‌প বিফোর ইউ উইল লিশ্‌ন?

সহসা চার্লি চুপ মেরে গেল। কী যেন খুঁজছে।
চারপাশে তাকিয়ে বলল, কে ডাকে?
সবই স্বগতোক্তি।
ইজ দ্যাট হোলি স্পিরিট?
কী বলছে?— চার্লির চোখে-মুখে ত্রাস।
হি সিংকস বিনিথ দ্য ওয়েভ! অ্যান্ড ডেথ ইজ ভেরি নিয়াব।
সে চিৎকার করে উঠল, না না।
আর তখন ইঞ্জিন-রুমে ধুন্ধুমার কাণ্ড। নিয়ামত নাকি দেখেছে, খোলের ভিতর থেকে এক অপদেবতা উঠে আসছে। লোমের মতো শ্যাওলা গজিয়ে গেছে অপদেবতাব সাবা গায়ে। কোনও বকমে নিয়ামত জান বাঁচিয়ে উপরে উঠে এসেছে। ডেক-এ এসে কিছু বলার চেষ্টা করল।
গোঙানির মতো শোনাল।
ভূ-ভূ-ত।
তারপরই ধড়াস করে ডেকে পড়ে গেল। মুখে গ্যাঁজলা উঠছে।
ইঞ্জিন-রুমে ভূত!
ইঞ্জিন-রুমে অপদেবতা।
শ্যাওলা গজিয়ে গেছে শবীবে। সাবা জাহাজে তোলপাড়। নিয়ামতেব চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। বোকার মতো সবাইকে দেখছে। চোখ আগেব মতোই ঘোলা-ঘোলা। সে আবার পালাতে চাইছে। কখনও বলছে, জিন। কখনও বলছে, শ্যাওলায় ঢেকে আছে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না। জাহাজের খোল থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। মাথা তুলে দিচ্ছে, খোল ফুটো কবে উঠে আসছে। এমন সব কথাবার্তা। খুবই অসংলগ্ন, কোনও মাথামুন্ডু নেই।
কখনও বলছে, কবন্ধ।
মুখার্জি নিজেও কেমন কিছুটা বিচলিত। জাহাজে তবে সত্যি কি একটা কিছু আছে? চার্লি ওদেব কথাবার্তা বুঝতে পারছে না। সে হাঁ কবে তাকিয়ে আছে। চার্লি নিজেও মধ্যরাতে কী সব শুনতে পায়।
সে মুখার্জিকে বলছে, অ্যানি ডিজহনেস্ট গেইন অব ব্লাডশেড।
না না। কোনও ব্লাডশেড নয়। ইঞ্জিন-রুমে অপদেবতা উঠে আসছে। সমুদ্রের তলা থেকে খোল ফুটো করে উঠে আসছে শ্যাওলায় ঢাকা শবীর। কী জানি কী হচ্ছে জাহাজে, জানি না।
হঠাৎ চার্লিব কী হল কে জানে, মাই গ্লিটারিং সোর্ড বলতে বলতে ইঞ্জিন-রুমেব দিকে ছুটতে থাকল। আর সবাই অবাক। একজন সমুদ্র-দানব, সত্যি যদি দানব হয়ে থাকে, জাহাজিদের কুসংস্কারের তা অন্ত নেই, তারা এমন বিশ্বাস করতেই পারে, এমন খবরে চার্লির মাথায় কী কবে সহসা জেগে যায়, মাই গ্লিটারিং সোর্ড? চার্লির মাথায় কি দুষ্টু আত্মা ভর করে আছে? মুখার্জি ছুটে যেতে চাইলে, বংশী এসে জাপটে ধরল। কোমর ধবে ঝুলে পড়ল।
দাদা, যাবে না। পায়ে পড়ি। তুমি গেলে আমাদের কেউ থাকবে না। যাবে না দাদা! দোহাই যাবে না। আমি তো জানি, সে দেখা দেবেই। সে যখন উঠে আসছে কাউকে রেহাই দেবে না।
মুখার্জি এক ঝটকায় বংশীকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ছুটতে থাকলেন। সুবঞ্জন এবং সবাইকে ইশাবায় ডাকলেন। তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছেন অন্ধকার ইঞ্জিন-রুমে।
না, নীচে আর কেউ নামতে সাহস পাচ্ছে না। ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাবার দরজায় সবাই শুধু উঁকি মারছে। নীচে তারা দেখল, মুখার্জি সিলিন্ডারের তলায় নেমে যাচ্ছেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারে।

পঁচিশ-ত্রিশ ফুট নীচে স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। আলো জ্বালা নেই।
বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকারই বলা যায়।
এমনকী নীচে তারা কারও সাড়াশব্দও পাচ্ছে না। তারা হা-হুতাশ করছে। কী কববে বুঝতে পারছে

মুখার্জি নীচে নেমে জেনারেটরের পাশে এসে অবাক, আবার কেউ সুইচ অফ করে দিয়েছে। কার কাজ?

তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। চার্লি কোথায় গেল? ইঞ্জিন-রুমেই তো নেমে এসেছে। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। জাহাজটায় কি তবে সব প্রেতাত্মা উঠে এসেছে! চার্লি নিমেষে উধাও। গ্লিটারিং সোর্ড কে! চার্লি কি তাকে চেনে! তবে কি বংশীর কথাই ঠিক! জাহাজে কিছু একটা আছে! সে চার্লিকেও খেল, সুহাসকেও খেল! ম্যাককে তো আগেই খেয়েছে।

মুখার্জির সারা গায়ে লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুইচ জ্বেলে দিতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। জীবনেও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। দিন যত যাচ্ছে, সত্যি সব ভয়াবহ হয়ে উঠছে। আর তখনই মনে হল, তিন নম্বর বয়লারের কাছে কারা যেন নড়াচড়া করছে। কে যেন বলছে, আমি ধরছি। উঠে এসো।

চার্লির গলা।

না, আছে। আবও কেউ আছে। তিনি তাঁর দৃঢ়তা ফিরে পাচ্ছেন। মুহূর্তে তিনি তাঁর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়েছে বুঝতে পারলেন।

কাছে গেলে দেখতে পেলেন সব। নিয়ামত ভয় পেতেই পারে। সত্যি শ্যাওলায় ঢাকা এক কবন্ধ। মাথায় মুখে শরীরে শ্যাওলা ভরতি। চার্লি শ্যাওলা তুলে সাফসুফ করছে। কেউ যেন সারা সকাল ধরে জলের তলায় চুবিয়ে ইঞ্জিন-রুমের পাটাতনে সুহাসকে ফেলে রেখে গেছে। সুহাস বসে আছে, কিছুটা স্থবির। মায়ের মতো চার্লি তাকে জাপটে ধরে রেখেছে এক হাতে। অন্য হাতে গা থেকে মাথা থেকে শ্যাওলা সাফ কবছে। তা হলে চার্লির গ্লিটারিং সোর্ডেব এই অবস্থা!

চার্লি সুহাসকে নিয়ে এতই নিমগ্ন ছিল, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাও টের পাচ্ছে না। কিংবা পায়নি। পেলেও তাব যেন কিছুই আসে যায় না। সে জানে, হি প্রোটেকটস। এই বিশ্বাস তাকে দুর্বল হতে দেয়নি। যদিও সে কিছুক্ষণ আগে তার সেই ঈশ্বরের প্রতি সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, এখন আব সে তা বোধহয় মনে করতে পারছে না।

মুখার্জি ওদের মাথার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

চার্লির তখনও যেন হুঁশ ফেবেনি।

মুখার্জিব স্তম্ভিত প্রশ্ন, কী কবে হল! কী হয়েছে!

চার্লি এবাব তাকাল। সে সুহাসকে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই যেন পড়ে যাবে। দেখল, মুখার্জি এসে গেছেন।

চার্লির যেন আর ভাবনা নেই। বলল, কী করে হল জানি না। কিছু বলছে না। অল দিস টাইম আই ওয়াজ লুকিং ডাউন, আন্‌এবল টু স্পিক এ ওয়ার্ড। দেন সামওয়ান, হি লুকড এ ম্যান, টাচড মাই লিপস। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলি। আই ওয়াজ টেরিফাইড বাই হিজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড হ্যাভ নো স্ট্রেংথ। কাউকে ডেকে বলতে পাবিনি সুহাস জলের তলা থেকে উঠে আসতে পেরেছে। আমি নিজেও ভাল ছিলাম না!

উপরে ইঞ্জিন-রুমের দবজায় ভিড়। সুরঞ্জন নেমে আসতে চাইছে জোরজার করে। কিন্তু তাকে কেউ নামতে দিচ্ছে না। কিছু একটা আছে। কিছুই দেখা যায় না। তিন নম্বর বয়লার, কনডেনসার আর উপরের অতিকায় সিলিন্ডাব সব অদৃশ্য করে রেখেছে। কেউ বুঝতেই পারছে না, চার্লি কিংবা মুখার্জি ইঞ্জিন-রুমের কোথায় আছে? এমনকী কারও সাড়াশব্দও নেই। নীচে এত অন্ধকারই বা কেন! যেন যে-ই নামবে, তাকেই ইঞ্জিন-রুমের অন্ধকার গিলে ফেলবে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ নীচে নেমে যে ইঞ্জিন-রুমের আলো জ্বেলে দেবে, তারও যেন সাহস নেই।

সুরঞ্জনকে আটকে রাখাই দায়। সারেঙের হুকুমও সে অগ্রাহ্য করে নেমে যেতে চাইলে, ইমতাজ, হাফিজ, আরাফত, বংশী তাকে জাপটে ধরে আছে। নামলেই শেষ। ইঞ্জিন-রুমে হাপিজ।

তোর কি মাথা খারাপ? দেখছিস না, যে নামছে, সে-ই নিখোঁজ। চার্লি গেল, মুখার্জিও গেলেন। সুহাস বোধহয় তার আগেই গেছে। নিয়ামতের নসিব, খুদার কুদরতে পার পেয়ে গেল।

সাবেং বললেন, আল্লা মুবারক।

মুখার্জি তখন বললেন, উঠতে পারবি? ধরব?

সুহাস কোনও রকমে হাত তুলে দিল।

সে খানিকটা বিশ্রাম চায়। যেন বলতে চাইল, একটু দম নিতে দাও।

চার্লি তখনও বলে চলেছে, দেন হি টাচড মি এগেইন অ্যান্ড আই ফেল্ট মাই স্ট্রেংথ ইজ রিটার্নিং।

চার্লি ফের বলল, গড লাভস হিম ভেরি মাচ। আমাকে তিনি যেন বললেন, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড। কাম ইয়োরসেলফ, বি স্ট্রং, ইয়েস স্ট্রং।

মুখার্জির দিকে তাকিয়ে কিছুটা অনুনয়ের ভঙ্গিতে চার্লি বলল, হি ক্যান হার্ডলি ব্রিদ। ওকে একটু সুস্থ হতে দাও মুখার্জি।

মুখার্জি এবার নিজেও বসে গেলেন শ্যাওলা সাফ করার জন্য। অন্ধকারে ভাল বোঝাও যাচ্ছে না। তাঁর মনে হল, আরে, একটা আলোও তো জ্বালা নেই! তিনি দৌড়ে যাবার সময় কী যেন মাড়িয়ে দিলেন।— সাপের মতো পায়ে কিছু জড়িয়ে গেল। একটু ঝুঁকে গোড়ালির কাছে হাত দিলেন। সেই রবারের মোটা বিদ্যুতের তারটি পড়ে আছে। টেনে আনলেন। জলের ট্যাংক কিংবা বিলজ অর্থাৎ ইঞ্জিন-রুমের অন্ধকার জায়গাগুলি সাফ করার জন্য তারের ঠুলি পরা আলোটার দরকার হয়। তা হলে কি সুহাসকে কেউ জলের ট্যাংকগুলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে প্লেট চাপা দিয়ে সরে পড়েছে? সে কে?

তিনি দৌড়ে এসে সুইচগুলো সব অন করে দিলেন। মুহূর্তে গোটা ইঞ্জিন-রুম আলোকিত হয়ে উঠল। আর তখন উপরে হল্লা। খুবই ভুতুড়ে কাণ্ড। কে জ্বালাল আলো তাও এতক্ষণ পর? কে সে? নীচের কিছুই দৃশ্যমান নয়। সেই অতিকায় সিলিন্ডার আর কনডেনসার সব আড়াল হয়ে আছে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারছে, ছুটে পালাচ্ছে।

ইঞ্জিন-রুমে যে মুখার্জি এবং চার্লি আছে এটা জাহাজিদের মাথাতেই নেই। তারা বিশ্বাসও করে না। তিনজনকেই গিলে খেয়েছে ইঞ্জিন-রুম। নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত জাহাজিরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাসও করে থাকে। সেই এক কথা, কিছু একটা আছে। সি-ডেভিল লুকেনারই হোক, আর সেই বরফ-ঘরের মেয়েমানুষের লাশই হোক, তারাই যত কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। কে মরতে যাবে!

সুরঞ্জন অধীরকে ডেকে বলল, তোরা কি সবাই পাগল হয়ে গেলি? চল নীচে দেখা দরকার। চার্লি, মুখার্জিদা কোথায় গেলেন?

সুরঞ্জনের আর সাহস নেই, একা ইঞ্জিন-রুমে নেমে যায়। ভূতের আতঙ্ক বড়ই সংক্রামক ব্যাধি। অধীর সঙ্গে না থাকলে সেও একা নেমে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ সিঁড়ির মুখে উঁকি দিয়ে সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। আতঙ্ক হবারই কথা।

কিছু হলে মুখার্জিদা এতক্ষণে উঠে আসতেন। চার্লি উঠে আসত। অথবা মুখার্জিদা তাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। ইঞ্জিন-রুমে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। কেবল সেই ব্যালেস্ট পাম্পের কিট কিট শব্দ, না হয় স্টিম ককগুলি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছে। সেই কখন নেমে গেল! আর কারও পাত্তা নেই!

অধীর বলল, আজব ব্যাপার!

চার্লি বলল, আমি ধরছি, ওঠো।

মুখার্জি বললেন, উঠে যেতে পারবি?

পারব তো বললাম। দ্যাখো না।

চার্লি আর মুখার্জিদার উপর ভর করে হাঁটছে সুহাস। জামা-প্যান্টে লাল হলুদ ছোপ ছোপ দাগ। জামা-প্যান্টে জলের পচা গন্ধ। দম বন্ধ করে মারার মতলবে ছিল কেউ। সে কে? অথচ এখন কোনও প্রশ্ন করাই ঠিক নয়। চার্লিও চাইছে না, কারণ ক্লান্ত অবসন্ন আর এতই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে সুহাসকে, চার্লি মাঝে মাঝে অজানা আতঙ্কে যেন অস্থির হয়ে উঠছে।

তখনই কেন যে চার্লি কাতর গলায় বলল, মুখার্জি, তুমি আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে না তো?

মুখার্জি কঠিন গলায় দাঁত চেপে বললেন, এখনও বলছি, সুহাসের কিছু হলে, তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারব। শুধু তোমাকে নয়, সবাইকে।

সুহাস এত অবসন্ন, তবু কেন যে না বলে পারল না, ওর কী দোষ? চার্লি কী করেছে? তুমি ওকে পুড়িয়ে মারতে চাও!

বেচারা।

তাদের দেখতে পেলে, হাজার প্রশ্ন। ভিড়। তামাশা। সুহাস তামাশার পাত্র হয়ে যাক তিনি চান না। মুখার্জি ফের আলো নিভিয়ে দিলেন। বললেন, সিঁড়িতে বোস। উঠতে দম পাবি না। সিঁড়িতে দু'জন একসঙ্গে পাশাপাশি ওঠা যাবে না।

সুরঞ্জন হরেকেষ্ট অধীরও ভুতুড়ে আলো-অন্ধকারে তাজ্জব হয়ে গেল। ইঞ্জিন-রুমে নিজের খুশিমতো যা খুশি তাই করছে। কখনও আলো, কখনও অন্ধকার তার। ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। তারা নেমে যেতে সাহস পেল না। ডেক-এ উঠে গেল। সত্যি ইঞ্জিন-রুমে কিছু আছে।

বংশী ফলকায় বসে হাসছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

কী রে, হিম্মত গেল কোথায়? উঠে এলি কেন? যা, নাম! মজা বোঝ।

মুখার্জি বললেন, চার্লি, তোমার অনেক কাজ। ভেঙে পড়বে না। আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মাথা ঠিক রাখতে পারো না। তোমাকে নিয়েও কম আতঙ্ক না। তোমার বাবা তো যা করলেন! জুজু না দেখলে কেউ এত ঘাবড়ায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি জাহাজিদের কাছে...। ইফ অ্যানি ট্রাবল— ট্রাবলটা কী! তুমি জানো, কেন তিনি তাঁর ফেথফুল সেলরদের প্রত্যাশা করছেন।

চার্লি সাড়া দিচ্ছে না।

যাক গে, তুমি আমাকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না। হয় বিশ্বাস করতে পারছ না, নয় সাহস পাচ্ছ না। তুমি নিজেও বুঝতে পারো না, আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারো। শোনো বাপের কেবিন তো লন্ডভন্ড করে রেখেছ। আলো থাকুক, না থাকুক, কিছু আসে যায় না। ইঞ্জিন রুমটাকে ভুতুড়ে করে রাখার দরকার আছে। আলো ইচ্ছে করেই নিভিয়ে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। এই সুহাস!

বলো।

উঠতে পারবি? সিঁড়ি ভাঙতে পারবি? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না তো?

আর একটু বসি।

চার্লি, তুমি উপরে যাও। কারপেন্টারকে ডেকে বলো কেবিনে নতুন লক যেন লাগিয়ে দেয়। এক্ষুনি। আমি সুহাসকে নিয়ে উপরে যাচ্ছি। ভয় নেই, ওকে না নিয়ে উপরে যাব না। কথা দিচ্ছি।

চার্লি কিছুটা ক্ষোভের গলায় বলল, আমাকে কী করতে বলছ?

উপরে উঠে যেতে বলেছি। কেবিনের লক পালটে দিতে বলেছি। মন দিয়ে শোনো। কারপেন্টারকে বলবে, কেউ যেন না জানে, অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররাও ভাল নেই। তোমার রণচণ্ডী মূর্তিতে তারা ঘাবড়ে গেছে। কেউ বের হচ্ছে না। সবাই দরজা বন্ধ করে বসে আছে। এটা একটা সুযোগ। কেবিনে ঢুকে যেন তিনি কিছু বুঝতে না পারেন।

চার্লি দ্রুত সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছিল।

এত বাধ্য।

মুখার্জি অবাকই হয়ে গেলেন।

তবে মুখার্জিকে বিশ্বাস করছে। আস্থা ফিরে এসেছে। ভাল! এটাই চান।

চার্লি!

সিঁড়ির ধাপ থেকে ঝুঁকে সাড়া দিল চার্লি, ডাকছ?

এদিকে নয়। ওদিকে। স্টোক-হোলডে চলে যাও। স্টোক-হোলডের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে সোজা বোট-ডেকে। মনে হয় কারপেন্টারও তার কেবিনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। উপরে না গেলে অবশ্য কিছু বুঝতে পারবে না।

চার্লি দৌড়ে নেমে এল। সে স্টোকহোলডে ঢুকে যাবার জন্য ছুটলে তিনি বললেন, বুঝতে পারছ, এখন বাপের কেবিনটির কী ছিরি করে রেখেছ! এই নাও।

বলে তিনি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দিয়ে বললেন, যেখানে ছিল, রেখে দেবে। এটাও নাও। ধরো।

চাবিটি হাতে নিয়ে চার্লি কী করবে বুঝতে পারল না।

মুখার্জি বললেন, তোমার বাবার। জিশুর মূর্তির মধ্যে ছিল। মূর্তিটি তুলে রাখবে। মাথাটি আলগা বসিয়ে দেবে। চাবিটি ভেতরে রেখে দেবে।

আবার ছুটছিল চার্লি।

আরে, এত ছটফট করছ কেন? সব টেনে হিঁচড়ে ফেলেছ। র‍্যাক থেকে বই কিছুই বাদ দাওনি দেখছি। আচ্ছা, আচ্ছন্ন হলে কী করে ফেলো কিছুই মনে থাকে না? সবই দেখছি ভুলে যাও। বাবার লকার মরতে খুলতে গেলে কেন? চাবিটি রাখার আগে লকারটি বন্ধ করে রাখবে। কী? মনে থাকবে?

থাকবে।

এই তো চার্লি, কী সুন্দর তুমি। চার্লি কত ভাল, কেউ বুঝলই না। চার্লি সব পারে। আর দেরি নয়। বি কুইক।

চার্লি অন্ধকারে বয়লারের পাশ দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তখনই তিনি সুহাসের হাঁটুর কাছে ঝুঁকে বসলেন। বললেন, কী হয়েছিল বল! বলতে কষ্ট হলে, থাক।

না, মানে—

সুহাস যেন অতিশয় রুগ্‌ণ। ক্ষীণকণ্ঠ। তবু যা বলল, যা বুঝতে পারলেন, তাতে তাঁরও গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। অশরীরী। সুহাস তার মুখ দ্যাখেনি। মাথায় চ্যাপ্টা টুপি। টুপির অন্ধকারে মুখ ঢাকা।

দিনদুপুরে এমন কাণ্ড ঘটলে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে? ট্যাংকগুলি খুব একটা ব্যবহারও হয় না। সমুদ্রে দীর্ঘ পাড়ি দিতে হলে এদিককার ট্যাংকগুলিতে জল নেওয়া হয়, খাবার জলের ট্যাংক আলাদা। বয়লারে মিষ্টি জলের টানাটানি পড়তে পারে, এভাপরেটর চালিয়েও জল জোগানের ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থাকলে ট্যাংকগুলিতে জল নেওয়া হয়। এক-দু'বার সাফ করা যে না হয় তাও না, তবু সুহাসকে এই জলের ট্যাংকগুলিতে এক অশরীরী ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

প্লেট ফেলে দেবার আগে সুহাস স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে, ইয়েস ইউ আর এ ডেঞ্জারাস ট্র্যাপ টু মি। কাপ্তান নিজে তো তখন মোটর-বোটে। স্বচক্ষে দেখা! ট্যাংকগুলির অজস্র গলিঘুঁজি। আলো নিবিয়ে দিলে মৃত্যুফাঁদ, অশরীরী তাও জানে। মগজ ঠান্ডা না থাকলে বের হয়ে আসা একজন দক্ষ জাহাজির পক্ষেও কঠিন।

তোর হুঁশ ছিল না!

না। কেন যে মনে হল, অন্ধকারে কিছুই নাগাল পাচ্ছি না, কেবল হাতড়াচ্ছি। ম্যানহোলে ঢুকে একটার পর একটা ট্যাংক পার হচ্ছি, আলো নিভিয়ে দিলে হঠাৎ মনে হল, সবই অন্ধকার। নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি না। তারপর আর হুঁশ ছিল না।

তারপর?

তারপর কিছু জানি না। আলো জ্বলছে না কেন?

দরকার আছে।

মুখার্জি যত দূর সম্ভব জেনে নিতে চান। জানাজানি হয়ে গেলে হুড়মুড় করে জাহাজিরা সবাই নেমে আসবে। গোলমাল বাধবে। খুবই গুপ্ত খবর, আর-কেউ জানুক তিনি চান না। সুরঞ্জনকে পরে বলা যাবে। অধীরকেও। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না, সুহাসের হুঁশ ফিরল কখন। কখন সে শ্যাওলায় মাখামাখি হয়ে প্লেট ঠেলে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করল। তারা তো ডাকাডাকি কম করেনি! সুহাস কি শুনতে পায়নি? সুহাস কি তখন বেহুঁশ হয়ে জলের তলানিতে পড়ে ছিল?

টের পেলি কখন? হুঁশ ফিরল কখন?

আমি যে কী শুনতে পাচ্ছিলাম!

কী শুনতে পাচ্ছিলি? কেউ কি তোকে ডাকাডাকি করছিল? আমি চার্লি দু'জনেই তো খোঁজাখুঁজি করে গেছি। একবারও মনে হয়নি, খোলের মধ্যে জলের ট্যাংকে তুই পড়ে থাকতে পারিস। কী শুনতে পাচ্ছিলি?

মনে করতে পারছি না। কে যেন ডাকছিল, সুদূর থেকে কে যেন ডাকছিল। যেন অন্য জন্মের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

কী শুনতে পাচ্ছিলি?

সুহাস সিঁড়িতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ভিজে জামা-প্যান্ট আর অজস্র শ্যাওলা লাল নীল, শরীরে শুকিয়ে উঠছে। সে ক্রমে এক বিচিত্র বর্ণের মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। ইঞ্জিন-রুমের আবছা অন্ধকারেও তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। কিন্তু তাতে মুখার্জি বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ছেন না। অন্য জন্মের খবরটা কী জানা দরকার। অন্য জন্ম বিষয়টাও তো খুবই গোলমেলে।

কে ডাকছিল?—মুখার্জি অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

মনে করতে পারছি না। কিছুটা খালি মাঠে অন্ধকার রাতে কোনও নিখোঁজ বালকের বাবা যদি নাম ধরে ডেকে যায়—

তোর বাবার কণ্ঠস্বর?

না না। আমার বাবা হবে কেন? আমি কেন মনে করতে পারছি না কে ডেকে গেছে!

সুহাস দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজ করে বসে থাকল। সে কিছুই যেন মনে করতে পারছে না। কে ডেকে গেল। কে তিনি! গভীর রাতে হাতে লণ্ঠন নিয়ে কেউ যেন মাঠ পার হয়ে চলে গেল।

তার বাবা। মানে কতদিন দেশ থেকে তারা চিঠিও পায়নি। বাবা কি তাকে সাহস জুগিয়ে গেছেন? তুমি খুঁজে দ্যাখো। ঘুলঘুলিতে মাথা গলিয়ে দাও। সামনের দিকে এগিয়ে যাও! বারবার চেষ্টা করো। তুমি শেষ প্রান্তে আছ। একবার ভুল হতে পারে, দু'বার, তিনবার, চারবার হতে পারে। চেষ্টা করো সামনেই তোমার বাতিঘর। দূরে দ্যাখো, ওই যে দূরে, মাথার উপরে কত বড় আকাশ। সমুদ্রের জল তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি হেরে যাচ্ছ কেন? আবার। আবার জলে ডুবে যাচ্ছ কেন? বাতিঘরের আলো দেখতে পাচ্ছ না! সেখানে গেলে সব মিলবে। আহার, উত্তাপ, আশ্রয়।

তাকে বয়লারের দিকে যেতে হবে সে জানে।

বারবার কে যেন ডাকছে।

কেউ ডাকছে, অথচ মনে করতে পারছে না। না ডাকলে তার হুঁশ ফিরত না। সে কে?

মুখার্জি খুবই বিব্রত বোধ করছেন।

সুহাস হাঁটুর ভেতর সেই যে মাথা গুঁজে বসে আছে, কিছুতেই মুখ তুলছে না। সে মনে করতে পারছে না।

কেউ না ডাকলে সে সাহসও পেত না।

কী রে, কে ডাকল মনে করতে পারছিস না?

হঠাৎ সুহাস কেমন ভেঙে পড়ার মতো বলল, আমার বাবা ডাকবে কেন? অতদূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর কী করে ভেসে আসবে? কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি তো ভালই ছিলেন। নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরেও তাঁর চিঠি পেয়েছি। শুধু জানতে চেয়েছেন, আমি সাবধানে চলাফেরা করি কি না। জাহাজে ফিরতে যেন রাত না করি। কবে জাহাজ ফিরছে, দেশে কবে ফিরব, এছাড়া তার তো আর কোনও খবর থাকে না।

তবে সে কে? তোর বাবা ভালই আছেন। দুশ্চিন্তা করিস না।

আর তখনই সুহাসের মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। সে মনে করতে পারছে। অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বাস দেখা দিল।

জানো, আমাকে কেউ ডাকছিল। সুহাস, ইফ এভরিওয়ান ডেজার্টস ইয়ো আই ওন্ট সুহাস! জানো আমাকে কেউ বলেছিল, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্লড।

মুখার্জি বললেন, সে তোমার পাশে আছে এটুকুই এখন আমাদের সান্ত্বনা।

তারপরেই মনে হল, চার্লি কতটা পারবে! পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সে সুহাসের জন্য কতটা যেতে

পাববে। নিরুপায় দুই তরুণ-তরুণীর হয়ে তিনিও কতটা লড়তে পারবেন জানেন না। তবু তাঁকে শক্ত হতে হবে। সুহাস এবং চার্লিকেও। কেন এত দুর্বল হয়ে পড়ছেন! চার্লি না ডাকলে সুহাসের বোধহয় আর হুঁশও ফিরে আসত না। চার্লিই তাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আই অ্যাম উইদ ইয়ো, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ালর্ড। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় আর কী খবর থাকতে পারে।

বাড়ির কথা তাঁর মনে পড়ছে। স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। ছেলেমেয়ে, ঘরবাড়ি এবং পৃথিবীর এই যে দূবতম প্রান্তে তিনি ভেসে বেড়াচ্ছেন সেও সেই এক টানে। আছি, আমরা আছি, যত দূরেই ভেসে বেড়াও আমরা আছি। কেন যে চার্লির এই সামান্য ইচ্ছের কথা, আজ তাঁকে এত দুর্বল করে দিচ্ছে! মেয়েটার কথা ভেবে চোখে জল এসে গেল।

মেয়ের মুখ মনে পড়ে যাওয়ায়, না চার্লির অসহায় জীবনের কথা ভেবে তাঁর চোখে জল, তিনি বুঝতে পারছেন না।

এ কী? তুমি কাঁদছ দাদা!

কোথায়?

ফ্যাচ ফ্যাঁচ করছ কেন!

ওঠ। পারবি?

পাবব।

শেষে অশরীরীর পাল্লায় তুইও পড়লি! বংশী হলেও না হয় বুঝতাম। মগড়া হলেও না হয় কথা ছিল। লেখাপড়া শিখে ঘণ্টা কবলি? মুখার্জি যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটা ধূর্ত। চার্লি মার্কনি সাবেব দবজায়ই বা ছুটে গেল কেন! মার্কনি সাব জাহাজে আছে বোঝাই যেত না। হয় ট্র্যানসমিশান-রুম, না হয় নিজের কেবিন, কিনারায় সে নেমে গেলেও ধরা মুশকিল, কে নেমে গেল। একবার ট্র্যানসমিশান-রুমের দরজায় উঁকি দিতে গিয়ে ধমকও খেয়েছেন। নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে ট্রেসপাসারসের দায়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

ধরব?

না না, ধরতে হবে না। উঠছি তো।—সুহাস বিরক্ত।

একে ওঠা বলে। আরে, আমরা তো আছি। এত ঘাবড়ে গেলি কেন? লোকটার হাত পা মুখ কিছুই চোখে পড়েনি?

না। মনে করতে পারছি না। দড়ি ছাড়ার মতো অদৃশ্য সুতোয় জামা-প্যান্ট-টুপি ঝুলে ঝুলে ইঞ্জিন-রুমে নেমে এল।

তোব সঙ্গে কথাও বলল?

বলেছে তো।

বেশ করেছে। বারবার বলেছি, তোকে সারেং ছাড়া কোথাও কেউ কাজ দিতে পারে না। তিনি তোর মুরুব্বি। তাঁর কথা তোর একবার মনে হল না? এদের কথা শোনার জন্য তো জাহাজে উঠে আসিসনি। এবা কে? আমরা এদের চিনি না। ডাকল আর নেমে গেলি!

জানো, আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম! আমার কোনও বোধ-বুদ্ধি কাজ করছিল না।

হিপনোটাইজড। আবার বসে পড়লি কেন? কী হয়েছে? আরে, তুই তো এখনও স্বাভাবিক নোস দেখছি। বংশীর কথাই আমাকে ঠিক ধরে নিতে হবে? জাহাজে একটা কিছু আছে! আমি বিশ্বাস করি না। বারবার বলছি, গুজবে কান দিবি না। জাহাজটা পুরনো, ঠিক। ভাঙা লজ্‌ঝরে, ঠিক। সি-ডেভিল লুকেনার বলেও কেউ থাকতে পারেন। তাই বলে তুই অশরীরীর পাল্লায় শেষে পড়ে যাবি? গুজবের শিকার হবি? মানুষ মরে গেলে কিছু থাকে? জাহাজেও তুই নিশির ডাক শুনতে পেলি?

আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমার যে কী হয়।

মারব এক লাথি। মরে যা। তোর মরে যাওয়াই ভাল। একটা মেয়ে যা পারে, তুই তাও পারিস না? সে তো লাফিয়ে নেমে এল। স্টিয়ারিং সোর্ড বলে চিৎকার করতে করতে নেমে এল। স্টিয়ারিং সোর্ডের এই পরিণতি! অশরীরীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তুলে আনল তোকে। তোর লজ্জা হয় না? শরীর কেমন করছে! গুঁফো লোকটার ঘুসি খেয়েও লজ্জা হয় না? তোর মরে যাওয়াই উচিত।

আসলে তিনি আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান সুহাসের মনে।

দুষ্ট আত্মা বলে কিছু নেই। থাকে না। মানুষ মরে গেলে শেষ। তোকে চার্লিই বারবার ডেকে বলেছে, সুহাস ইফ এভরিওয়ান ডেজার্টস ইয়ো, আই ওন্ট। চার্লিই বলেছে, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড! আর তুই ভাবছিস, অশরীরী! অশরীরী কখনও বলতে পারে, ইয়ো আর আ ডেনজারাস ট্র্যাপ টু মি। বল, সে কোন অশরীরী, যে তোকে খুন করতে চায়? তার তুই কী ক্ষতি করেছিস, বল।

সুহাস বলল, সেই তো! আমাকে খুন করে তার কী লাভ।

লাভ-অলাভ পরে হবে। হাঁট। ওঠ। না উঠতে পারলে আমিই তোকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব। ভেবেছিস কী? সবাই মিলে জ্বালাতে শুরু করলি। বংশী, তুই, নিয়ামত, সেও তো ভূত দেখে ছুটে গেছে। তুই প্লেট ঠেলে উঠে আসছিলি, অন্ধকারে ভূত ভেবে সে ছুটে গেল। ডেক-এ গিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। মুখে গ্যাঁজলা। ভূত এবার কে কীভাবে দেখে ফেলে বুঝতে পারছিস! চার্লি ছুটে না নেমে এলে তোকে তুলেও আনা যেত না। তোর যে ফের কিছু হত না, অশরীবী তোকে আবার প্লেটেব ভিতব ঠেসে দিয়ে চাপা দিত না, প্লেট চাপা দিয়ে নাচানাচি করত না, কে বলতে পারে! বল, মেয়েটাব কথা ভাববি না।

তাবপব ফেব বিড়বিড় কবে বকছেন, চার্লিবও হয়েছে মরণ। গ্লিটারিং সোর্ড না ছাই। ভোঁতা মাল। এত কিল খেয়ে কেউ হজম করে! রুখে দাঁড়ায় না? রুখে দাঁড়াবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছিস। ভোজ, বিরিয়ানি, পায়েস—সব মাটি। সবাই না খেয়ে আছে তোর জন্য।

আমার খুব খিদে পেয়েছে।

ঠিক আছে, খিদে পেয়েছে যখন বুঝতে পারছিস, ধীরে ধীরে উঠে যা। চুপচাপ হেঁটে যাবি। কেউ জিজ্ঞেস করলে কোনও কথা বলবি না। অশরীরী টেনে নিয়ে গেছে বললে খুন করব বলে দিলাম। কিচ্ছু হয়নি। ট্যাংকে পিছলে পড়ে গেছ। উঠতে পারছিলে না। আমি তুলে এনেছি। কী? মনে থাকবে তো?

ইঞ্জিন-রুমে মরতে কেন এলাম, কেউ যদি জানতে চায়? আজ তো ছুটি।

তাও তো ঠিক, মুখার্জি ভেবে পাচ্ছিলেন না, সুহাসের এই দুর্গতির কথা কীভাবে চাউর করা যায়। ওর জামা-প্যান্ট, মুখ, চুল শ্যাওলায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভূতের মতোই দেখতে। তাঁর নিজেরও মাথায় আসছিল না। তারপর এত খোঁজাখুঁজি, কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, শেষে মুখার্জি সাব নিজে নেমে আস্ত ভূত টেনে তুলেছেন ডেক-এ। ছোটাছুটিও শুরু হয়ে যেতে পারে। মুখার্জি আর মানুষ নেই, তিনিও ভূত হয়ে গেছেন ভাবতে পারে সবাই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না যে! বংশীব যে এক কথা, ভূত কে নয় দ্যাখো। কাকে বিশ্বাস করবে! জাহাজ নিজেই যে ভূত নয়, ভুতুড়ে জাহাজ নয়, কে বলবে।

ইঞ্জিন-রুমে আলো দপ করে জ্বলছে, দপ করে নিভছে।

ইঞ্জিন-রুমে কিছু একটা আছে। সে খুশিমতো আলো জ্বালায়-নেভায়। কেউ নেই দরজার মুখে। মুখার্জি হাঁটছেন।

মুখার্জির মাথা গরম। ভূত বিষয়টাই এত বেআক্কেল যে, বলতে হলে সব খুলে বলতে হয়। উঠে গেলে সবাই দৌড়ে আসবে, না পালাবে, তাও বুঝতে পারছেন না। তিনি নিজেও ভাল ছিলেন না। জাহাজে কী যে সব হচ্ছে কেবল ভাবছিলেন।

কী ভেবে বললেন, দাঁড়া, আসছি।

তারপর ডেক-এ উঠে দেখলেন, পিছিলে সবাই জটলা করছে। তাঁকে দেখে অনেকেই ছুটে আসছে। সবাই না। শেষে মনে হল অনেকেও না। কারণ, কেউ কেউ কিছুটা এগিয়েই আবার ফিরে গেছে। কেবল সুরঞ্জন অধীর ফিরে যায়নি। সারেং সাবও এগিয়ে আসছেন। কিছুটা সংশয়ের গলায় তিনি বললেন, ইঞ্জিনে কে যে আলো জ্বালাচ্ছিল-নেভাচ্ছিল।

মুখার্জি বললেন, কেন? আমি জ্বালাচ্ছিলাম।

তাই বলি, কে জ্বালায়। এদিকে তো সবার এক কথা। জাহাজ ছেড়ে দেবে। কিনারায় নেমে যাবে। কী যে করি! জাহাজে বংশী ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। ভুতুড়ে জাহাজে কেউ থাকতে রাজি না।

কে বলে? কোন শুয়োরের বাচ্চা বলে নেমে যাবে?

বংশী ছুটে বের হয়ে বলল, আমি বলছি।

নিয়ামত ছুটে এসে বলল, আমি বলছি। ভুতুড়ে জাহাজে আমরা থাকব না।

ধুস, যাও মাথা ঠান্ডা করে গোসল-টোসল করে খানা খাওগে। সারেং সাব, পাত পেতে ফেলতে বলুন। সুহাস আসছে। জলের ট্যাংকের ফুটোতে ওর লকারের চাবি পড়ে গিয়েছিল। খুঁজে পাচ্ছিল না। আহাম্মকের কাণ্ড আর কাকে বলে।

পেয়েছে খুঁজে?

পায়, বলুন? কিছুতেই উঠে আসছিল না। বললাম, খানা রেডি, সবাই বসে আছে, তুই কী রে! তোকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। পরে না হয় খুঁজে দেখা যাবে।

তারপর ইঞ্জিন-রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, এই সুহাস, বললাম না, পরে খুঁজে দেখা যাবে। আয়। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

সুহাস উপরে উঠে এলে বললেন, অবস্থাটা বুঝুন। চাবির খোঁজে তিনি পাতালে ঢুকে গিয়েছিলেন। চাবিটা এখন পেলে হয়!

সুহাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মুখার্জিদার কথাবার্তা কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

মুখার্জির দম ফেলার সময় নেই। তিনি ছুটছেন। সারেং সাবও ছুটে গেছেন।

আরে, কোথায় যাচ্ছেন? গোসল কখন করবেন?

তিনি দূর থেকেই হাত তুলে বললেন, আসছি। সবাইকে বসিয়ে দিন। আমার জন্য বসে থাকবেন না।

তাঁর এখন দরকার চার্লির খোঁজখবর নেওয়া। চার্লি একদণ্ডে তাঁর এতটা অনুগত হয়ে যাওয়ায় তিনি খুশি। চার্লিই পাবে। বাপের কেবিনে ঢুকে চার্লি কতটা কী করতে পারছে, নিজের চোখে না দেখতে পেলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। লক লাগানো হয়েছে কি না। অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা কে কী করছে। ধরা পড়ে না যান। কত সব চিন্তা মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

বোট-ডেকে উঠে দেখলেন, চার্লি তাঁর কথামতোই কাজ সেরে ফেলেছে। কারপেন্টার নতুন লক লাগিয়ে দিয়েছে। কাপ্তানের কেবিন কেউ খুলে সব তছনছ করে গেছে, দেখলে মনেই হবে না। চার্লি বোট-ডেকে নেই। তাই কেবিনে থাকতে পারে। নক করতেই চার্লি দরজা খুলে মুখ বাড়াল।

সব ঠিক আছে?

আছে।

অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা বের হয়েছিল?

না। বের হয়নি। দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

ভাল। কোনও ভাবনা নেই। সুহাস ভাল আছে। শোনো, তাকে তুমি জলের ট্যাংক থেকে তুলে এনেছ, কাউকে বলতে যাবে না।

তোমাদের ওদিকে আমি একবার যেতে পারি?

চার্লির কী কাতর অনুনয়! সে যে তার কেবিনে বসে সুহাসের জন্য ছটফট করছে, বুঝতে কষ্ট হল না। চার্লি স্বাভাবিক না থাকলে এভাবে কথা বলতে পারত না। এমনকী চার্লি হয়তো ভেবেছে, এত সব ঘটে যাবার পর পিছিলে ছুটে যাওয়া তিনি পছন্দ নাও করতে পারেন। সাত-পাঁচ ভেবেই দরজা বন্ধ করে বসে আছে ভিতরে।

তাঁর বেশি কথা বলার সময় নেই। তিনি শুধু বললেন, না, এখন না। সময় হলে বলব। বরং দেখে নাও আমাদের কর্তারা কে কী করছেন কেবিনে।

বলেই তিনি সোজা বাটলার, মেসরুমমেটদের কেবিনের দিকে ছুটে গেলেন। সব দরজা বন্ধ। নক করতেই বাটলার মুখ বাড়াল দরজা খুলে। সন্তর্পণে। ভূত দেখার মতো কাউকে দেখে ফেলবে, এমন ফ্যাকাসে মুখ। মুখার্জিবাবুকে দেখে খানিকটা স্বস্তি। বলল, চার্লি নাকি খেপে গেছে? পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে!

না না! কে বলেছে?

ইঞ্জিন-রুমে ভূত! ইঞ্জিন-রুমে লীলাখেলা তেনার?

ধুস, যত বাজে কথা।

নিয়ামত যে ভূত দেখে উঠে এল!

আরে বাটলার সাব, বুঝছ না, সবার মেজাজ বিগড়ে আছে! কাঁহাতক কতদিন সমুদ্রে পড়ে থাকা যায়! সব খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে। বাহানা। স্রেফ বাহানা।

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বাটলারের। মুখার্জি বললেন, যাও। পিছিলে চলে যাও। সবাইকে বোলো, চার্লির মেজাজ পড়েছে। সে ঘরে বসে ছবি আঁকছে। ভয়ের কিছু নেই।

আসলে জাহাজে ফের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক, যেন কিছুই হয়নি, রেডিয়ো অফিসারের দরজায় নক করলে কেমন হয়! কেন যে মনে হচ্ছে, মুখোশ, অনুসরণকারী সব ভাঁওতা। নতুন করে ছক সাজাতে না পারলে আততায়ীর হদিশ পাওয়া যাবে না। হাতে কি তার ব্যান্ডেজ বাঁধা? কিন্তু সাহস হল না। তাঁর আস্পর্ধা সহ্য নাও করতে পারেন। তখনই বাটলার একটা খাম বাড়িয়ে দিল। বলল, নিন ধরুন। সবার নাম ঠিকানা আছে।

তিনি সব ভুলে গেছেন-মতো বললেন, নাম ঠিকানা? কার?

বা রে, একটা তালিকা চাইলেন না?

অ। একদম ভুলে গেছি। দাও।

আর তিনি দেরি করলেন না। মেসরুমমেট থেকে কাপ্তান-বয়কে খবর দিয়ে এলেন, সবাই চলে যাও। খানা রেডি। দেরি কোরো না। ইস্, তিনটে বেজে গেল। কখন খাবে?

তিনি ফিরে এসে দেখলেন, সুহাস তার বাংকে বসে আছে। সে খেতে যায়নি। সুরঞ্জন গেছে উপরে। তার খাবার আনতে। সে এখনও বেশ কাহিল। কিন্তু মুখার্জি বিরক্ত। আলাদা খাওয়ার কী হল বুঝলেন না। ঘরে ঢুকে বসতেই সুহাস বলল, যাও, বসে থাকলে কেন? চান-টান করবে না?

যাচ্ছি। তুই বসে আছিস কেন? তুই উপরে যা। ওখানে খাবি। নীচে খাবার নিয়ে আসার কী হল?

আমি তো বললাম। সুরঞ্জন কিছুতেই শুনল না।

ইস্, ওর মাথা এত মোটা। আরে, তুই না আমরা সহকারী? বুঝতে পারছিস না সুহাস নীচে খেলে কথা হবে না। যা যা চলে যা। সবার সঙ্গে খেয়ে নে। আমি যাচ্ছি।

বলেই তিনি বংশীর লকার টেনে তেল নিলেন হাতে, মাথায় মাখলেন। গামছা কাঁধে ফেলে উপরে চলে গেলেন। এক দণ্ড সময় নষ্ট করা মানে আততায়ী আরও এক ক্রোশ রাস্তার ফারাক সৃষ্টি করে ফেলবে। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কাপ্তান ফিরে এলে কী হবে তিনি জানেন না। কানে তাঁর কথা উঠবেই। সারা জাহাজ তোলপাড়, চাপাচুপি কতটা আর কাঁহাতক দেওয়া যাবে। সংশয় দেখা দিলে কাপ্তান খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিতে পারেন। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাতে পারেন। এতসব আতঙ্ক থেকেই তিনি ঠিক সাঁঝ লাগার মুহূর্তে অধীর সুরঞ্জনকে তাঁর ফোকশালে ডেকে পাঠালেন। সব বলে শেষে বললেন, এই হল চার্লির স্লিটারিং সোর্ডের পরিস্থিতি। আমাকে বের হতে হবে। ফিলের কাছে যাচ্ছি। আমার ধারণা ফিল এবং চার্লির আংকেল রাচেল একই ব্যক্তি। মিলিটারি ট্রানসপোর্ট শিপ প্রেসিডেন্ট কলিজের নিখোঁজ পাঁচজনের সে একজন। চার্লির ঠাকুরদার প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকো জাহাজটিই মার্কিন সামরিক দপ্তরে ঢুকে প্রেসিডেন্ট কলিজ হয়ে গেছে মনে হয়। কাপ্তান তাঁরই খোঁজে এসেছেন।

সুরঞ্জন অধীর সব শুনে স্তম্ভিত। অশরীরী, ডেঞ্জারাস ট্র্যাপ, জলের ট্যাংক, ফিল, কলিজ জাহাজ, মুখোশ, চার্লির ঠাকুরদার মুখ, সব মিলে কেমন এক রহস্যের ধোঁয়াশা ক্রমে কাবু করে ফেলছে তাদের। তারা একেবারে নির্বাক। অশরীরী কে সে? সুহাসকে ডেঞ্জারাস ট্র্যাপ বলছে কেন? কাপ্তান জাহাজে ছিলেন না। কে সে তবে?

কত প্রশ্ন।

মার্কনি সাবের দরজায় হামলা।

চার্লির গড়াগড়ি, কান্না, বেটার ইয়ো কিল মি, আই উড র‍্যাদার বি ডেড দ্যান অ্যালাইভ। সুরঞ্জন কিছুই বুঝতে পারছে না।

ফিলকে সন্দেহ করছেন। কেন? কিছুই ভেঙে বলছেন না। ফিলকে সুরঞ্জন দ্যাখেনি। শুধু মুখার্জিদার

মুখ থেকে সব শোনা। ফিলকে মনে হয়েছে প্রকৃত একজন ধর্মযাজক। মিশনারি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন দ্বীপে। হাসপাতাল, স্কুল এবং দ্বীপের সব প্রাচুর্যের হেতু ফিল। একজন গরিব মানুষের মতো তাঁর জীবনযাপন। ফিলকে দ্বীপবাসীরা ঈশ্বরের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে। সেই ফিলই চার্লির আংকেল, মুখার্জিদার এমন অনুমানের কী ভিত্তি, তাও বুঝতে পারছে না।

সে মাথা নিচু করে বসে আছে। অধীরও বোকা-হাবার মতো দেখছে মুখার্জিদাকে।

ফিল মুখার্জিদার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আজ তার কাছেই যাবেন। উপকারীর ঋণ স্বীকারের আশায় কাপ্তানের ঘর থেকে পাচার করা কাগজপত্র সঙ্গে নিচ্ছেন। ফিলের কাছে জিম্মা রাখবেন। এত আস্থা মুখার্জিদার! সে যে নতুন উপদ্রব সৃষ্টি করবে না কে জানে!

মুখার্জি বললেন, কী রে, রা নেই কেন? তোদের সঙ্গে তবে পরামর্শ করছি কেন? তোদের ডেকে পাঠালাম কেন? তোরা কোনও কথা বলছিস না!

সুরঞ্জন মুখ তুলে তাকাল। মুখার্জিদাকে দেখল। আবার মাথা নিচু করে দিল। বলল, কী বলব দাদা! মাথায় কিছুই আসছে না। ভাবছি তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে কি না। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হত। এতটা রাস্তা রাতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তো সোজা কথা না। রাস্তা হারিয়ে ফেললে কী করবে? কিংবা যদি অন্ধকার থেকে ভূত-টুত উঠে আসে! এই দ্বীপে যুদ্ধের ভূত তো এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে দেখছি।

ভূত কারও ক্ষতি করে না। ভূতের ভয়ে মরছিস! তোরাও তবে সবাই বংশী নিযামত হয়ে গেলি? অশরীরী কখন দেখা যায়? ঘোর সৃষ্টি হলে। নিজের উপর আস্থা হারালে। আর মনে রাখবি, এই যে রহস্য, এটা মনে হয় নিতান্তই পারিবারিক। এঁরা কেউ অপরাধ জগতের লোক নয়। ফেরে চক্রে সব ভূত হয়ে যাচ্ছে। ফেরে-চক্রে খুন হচ্ছে। বর্ণবিদ্বেষও যে কাজ করছে না কে বলবে? একজন নেটিভ ইন্ডিয়ান শেষে ধনকুবেরের নাতনিকে কবজা করে ফেলল! সহ্য করবে কেন? কী যে হেতু, ফিলের কাছে না গেলে বোঝা যাবে না।

মুখার্জি কী ভেবে বললেন, আমি ঠিক বলছি। সুহাসের মধ্যে চার্লি কোনও ঐশ্বর্যের খোঁজ পেয়েছে। সুহাসের মধ্যে চার্লির এই মহিমা আবিষ্কারই রহস্যের হেতু নয় কে বলবে? চার্লি না হলে বলতে পারে, আই অ্যাম উইদ ইউ, ইভিন দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড। বল? বলতে পারে?

সবই তো বুঝলাম দাদা। কিন্তু চার্লিকে তার ছদ্মবেশ থেকে বের করে আনা যে খুবই কঠিন।

কঠিন বলেই তো চেষ্টা করছি। সোজা হলে কার দায় পড়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে পড়ার? রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি। দ্বীপটা খুব ছোট নয়। দু'-আড়াই হাজার বর্গমাইল তো হবেই। পাঁচ-সাত হাজার লোকের বসবাস। দুর্গম অঞ্চলে হারিয়ে গেলে বেরিয়ে আসাও কঠিন। আর সত্যি যদি নিশির পাল্লায় পড়ে যাই, তবে তো আরও মজা। দেখা যাবে একই চক্করে সারা রাত ঘোরাফেরা। জাহাজের এই পরিস্থিতি। অজানা দ্বীপে জঙ্গলে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। এমনিতেই গা ছমছম করতে পারে। আরে, আমিও তো মানুষ!

বলছিলাম—

বলে ঢোক গিলল অধীর।

কী বলছিলি?

কাল সকালে গেলে পারতে না?

সকালে গেলে খুশি হতে পারতাম। কিন্তু?

কাপ্তান যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠে আসবেন। রিফ এক্সপ্লোরার থেকে ডিনার সেরে ফিরতে কতটা আর রাত হতে পারে? সুহাসকে ডাক তো! কী করছে?

সুরঞ্জন বলল, শুয়ে আছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। কেমন মিইয়ে গেছে।

মিইয়ে গেলে তো চলবে না। বিপদে ভেঙে পড়লে চলে! প্রতিপক্ষ তবে জোর পাবে না? ডাক। ওর সঙ্গে কথা আছে। ডরোথি কারেকার না ক্যারিকো, ছাই মনেও রাখতে পারি না, পাঠালাম তো, কী খবর আনল কে জানে!

সুহাস ভিতরে ঢুকে বলল, আমায় ডাকছিলে দাদা?

দরজাটা বন্ধ করে দে। মুখ এত চুন করে রেখেছিস কেন? কাছে আয় দেখি। যা দেখালি!—বলে তিনি গায়ে হাত দিতেই সুহাস ককিয়ে উঠল। বলল, লাগছে।

লাগছে? তা লাগুক। ছাল-চামড়া উঠে গেছে? যাক। পুরো ছাল-চামড়া খসিয়ে নেয়নি তোমার চোদ্দো গুষ্টির ভাগ্য! বোস। ডরোথি ক্যারিকোর খবর কিছু পেলি?

চার্লি তো দিল। কোথায় ফেলে এলাম!

কী দিল?

আরে, একটা বই। বলল, ডরোথি ক্যারিকোর ছবি-টবি আছে। লাউঞ্জের ছবি আছে। লাউঞ্জ, সুইমিং পুল, টেনিস খেলার মাঠ সবই নাকি জাহাজটায় ছিল। বইটা নাকি তার ঠাকুরদার জীবন এবং বাণী।

কোথায় সেটা? কোথায় ফেলে এলি?

মনে করতে পারছি না।

ইঞ্জিন-রুমে নামার সময় হাতে ছিল?

ছিল।

বইটা দেখছি হাপিশ! বোঝো এবার, আমরা বেড়াই ডালে ডালে, তেনারা বেড়ান পাতায় পাতায়।

একবার দেখে আসব ইঞ্জিন-রুমে?

একা নামতে পারবি?

সুহাসের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

পারবি না জানি। ওটা নেইও। এত খোঁজাখুঁজি, বইটা কোথাও পড়ে থাকলে চোখে পড়ত না। দাঁড়া দেখি।

বলে তিনি লকার খুলে কী সব টেনে নামাবার সময় বললেন, চার্লির কেবিনে সারা সকাল কী করছিলি? কখন গেলি?

তিনি নিজেই গজগজ করছেন।

ডরোথি ক্যারিকোর লাউঞ্জের ছবিটা যে খুব দরকার। ওটা দেখলে বুঝতে পারতাম কলিঙ্গ জাহাজের সঙ্গে মিল-অমিল কতটুকু। ওটা হাতের পাঁচ। কোথায় পাই এখন?

কিছু কাগজপত্র টানাটানি করতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল। সুরঞ্জন হাঁটু মুড়ে বসল। কাগজগুলি জড়ো করতে থাকল।

মুখার্জির সময় নেই হাতে। তিনি কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, আর নানা প্রশ্ন, কিছু তিনি খুঁজছেন, তবু কথার কামাই নেই।

চার্লি আর কী বলল? কেবিনেই চার্লিকে পেলি?

না, ও তো ছবি আঁকছিল। আমি গেলে কেবিনে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ কবল। রোমে কী সব ছবি দেখে বেড়িয়েছে বাপের সঙ্গে, তার গল্প করল। প্রোসরপিনা না কী যেন নাম ঠিক মনে করতে পারছি না, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফেল কত সব শিল্পীদেরও নাম বলল, আমি তাদের নাম জানি কি না। বলল, সে আমাকে রোমে নিয়ে যাবে।

প্রোসরপিনাটা কী?

ওটা একটা ভাস্কর্য। ভয়ংকর ভাস্কর্য। চার্লি তো তাই বলল। কোনও দানব এক সুকুমারীকে টেনে বুকের কাছে তুলে নিচ্ছে। প্রায় উলঙ্গ করে ফেলেছে। দানবের শরীরটা মানুষের মতো, মুখটা সিংহের মতো। মূর্তিটির নৃশংস মুখ দেখে চার্লি নাকি ভিরমি খেয়েছিল। একটা কুকুর মূর্তিটির পায়ের কাছে বসে আর্ত চিৎকার করছে।

মুখার্জি বললেন, গুঁফো লোকটার সঙ্গে দেখছি খুব মিল আছে। হিপনোটাইজ বিষয়টা বড়ই গোলমেলে, কে জানে কী হচ্ছে জাহাজে!

পকেট হাতড়াতে থাকলেন মুখার্জি।

কী খুঁজছ?

আরে, বাটলার দিল। তালিকা।

কীসের তালিকা?

ধুস, কিছু ঠিক থাকছে না। কোথায় রাখলাম।

তারপর লকারে উঁকিঝুঁকি মারলেন উঠে, পেয়েছি।

খাম খুলে মুখার্জি দেখলেন, সব ঠিক আছে কি না। সবার নাম আছে কি না। আছে, কাপ্তান থেকে থার্ড মেট, চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে ফিফ্থ ইঞ্জিনিয়ার, রেডিয়ো অফিসার, কারপেন্টার, কেউ বাদ নেই। ডেক-জাহাজি, ইঞ্জিন-জাহাজিরাও কেউ বাদ নেই। নাম, বাড়ির ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা সব সুন্দর হস্তাক্ষরে বাটলার কপি করে দিয়েছে। কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় মনে হল, শেষবারের মতো মগড়াকে বাজিয়ে দেখা দরকার। তাঁর সব সিদ্ধান্তগুলি যে সঠিক নয়, রেডিয়ো অফিসারের দরজার সামনে চার্লিকে হামলা করতে দেখে টের পেয়েছেন।

মুখোশ হয় দু'জন পরে ঘুরে বেড়ায়, নয় তিনজন। মগড়া, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার, এখন হাজির বেডিয়ো অফিসার। সেকেন্ড সত্যি মুখোশ পরে সেদিন জঙ্গলে বসে ছিল, না অন্য কেউ, একবার মগড়াকে বাজিয়ে দেখা দরকার। কারণ সেকেন্ডকে তিনি দেখেছেন ওদিকটায় যেতে, তিনি পরে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যও হয়ে গিয়েছিলেন। মাইলখানেক রাস্তা অদৃশ্য থাকাব পর সেকেন্ড কোনদিকে চলে গেছে জানেন না। তারপর গভীর জঙ্গল, গাছপালা এবং মাঠ। অন্য কেউ যদি হয়? মগড়াকে ডেকে ফের ধাঁতানো দরকার।

মগড়াকে একবার ডাক তো?—মুখার্জি কাগজপত্র দেখছেন, কিছু খুঁজছেন। গাইড-বইও আছে ডরোথি ক্যারিকোর। সবই খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বের হয়ে যাবার আগে অন্তত মুখোশটির যদি কিনারা করতে পারেন, কারণ চার্লি তো বলেছে, সে তার ঠাকুরদাকে দেখতে পায়। ঠাকুবদা তাকে অনুসরণ করছে। মুখোশ-টুখোশ সে আর কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না।

মগড়া ঢুকল বলির পাঁঠার মতো। মগড়াকে সুরঞ্জন টেনে নিয়ে এসেছে বলির পাঁঠা যেভাবে টেনে নিয়ে আসে। বোঝাই যায়, মগড়া জাহাজের কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই ঘাবড়ে গেছে। বিচলিত। কাল থেকে জাহাজে যা উৎপাত চলছে।

মুখার্জি চোখ তুলে মগডাকে দেখলেন, হাতের ইশারায় বসতে বললেন, এতসব কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকলে যা হয়, খুবই খাপছাড়া কথাবার্তা মুখার্জির। বললেন, মগড়া, আর যাস না। বারবার বলছি। তোর কু স্বভাব ছাড়।

মগড়া বলল, আমি কোথাও যাই না বাবু।

ফের মিছে কথা বলছিস?

না বাবু, সাচবাত বুলছি।

বুলে কি পার পাবি?

তিনি সুরঞ্জনকে বললেন, সিগারেট দে।

সিগারেট দিয়ে বললেন, ধরিয়ে দে।

সুরঞ্জন সিগারেট ধরাল। নিজেও নিল একটা। দাদার দু'হাতই কাগজপত্র খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। সে সিগারেটটা ঠোঁটে গুঁজে দিলে তিনি ফের কথা বলতে থাকলেন। দু' ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটা নড়ানড়ি করছে কথা বলার সময়।

তা হলে ধরে নিতে হবে সাচবাত। তুই একবারই উঁকি দিয়েছিলি চার্লির পোর্ট-হোলে! আর দিসনি! চার্লি টের পেয়েছে, মুখোশ পরে তার পোর্ট-হোলে কেউ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। খুন। খুন বুঝিস? রেডিয়ো অফিসার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল বলে রক্ষা। তবে আর যাই বল তোকে রক্ষা করতে পারছি না। মুখোশটা তোর লকারে আছে। তুই চার্লির পিছু নিয়েছিস পোর্ট অফ সালফার থেকে। গায়ের রংটি তো বাবু তোমার কাফ্রিদের মতো। মুখ তো তোমার প্রোসরপিনা। প্রোসরপিনা বুঝিস?

মগড়া হতাশ হয়ে পড়ছে।

ধরা পড়ে গেছিস। সত্যি কথা বল, সুহাস তোকে যদি বাঁচাতে পারে। সুহাস বলতেই পারে, চার্লি, ওকে তুমি ক্ষমা করে দাও, মাথা খারাপ লোক, বোধবুদ্ধি কম। সে তোমার কোনও অনিষ্ট করতে চায় না। আজ চোখের উপর দেখলি পিস্তল নিয়ে ঘুরতে। তারপর তখন তুই কী করবি, সেটা তোর ইচ্ছে। তোর ভালর জন্য বললাম। এখনও সময় আছে। বাতিল বাথরুমে ওটা দেখিয়ে ভেবেছিলি পার পাবি!

মুখার্জি জানেন, চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সত্য-মিথ্যা তিনি কিছু জানেন না। তিনি জানেন শুধু মগড়া তাকে বাতিল বাথরুমে নিয়ে মুখোশটা দেখিয়েছে, যেন সে আর কিছুই জানে না। কৌতূহল থেকে সেও একবার মুখোশ পরে পোর্ট-হোলে উঁকি দিয়েছে। কৌতূহল থাকতেই পারে, মালবাহী জাহাজে পরি-হুরির মতো দেখতে কেউ যদি ঘুরে বেড়ায় কেবিনে, তবে মাথা ঠিক রাখাও দায়।

তিনি হাতে সিগারেটটা নিয়ে ছাই ঝাড়লেন। বললেন, দেখাটা দোষের না। সুযোগ পেলে আমরাও উঁকি দিতাম। চার্লি সাহাব না মেমসাব তুই-ই প্রথম টের পেয়েছিলি। তোকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। এখন কথা হচ্ছে, কী কববি? খুন হবি, না বেঁচে থাকবি? ম্যাক তো চলে গেল। তুইও চলে যাস আমরা চাই না।

আর সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে মুখার্জির পা জড়িয়ে ধরতে গেল মগড়া। কোনও কথা বলছে না। বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। সে কী বলছে, বোঝাও যাচ্ছে না। তবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, মগড়াই মুখোশ পরে জঙ্গলে বসে ছিল। সে-ই মুখোশ পরে যেত। সর্বত্র সে। সুহাস আর চার্লি বনে-জঙ্গলে ঢুকে গেলে তার লোভ হত। গায়ের রং আর মুখের জন্য কাছাকাছি থাকলে বিশেষ সুবিধে হত না। ধরা পড়ে যেত। মগড়াব কথাবার্তায় তাও বোঝা গেল। নারী-পুরুষের লীলাখেলা দেখার লোভেই সে এমন একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে ফেলেছে।

সুরঞ্জন বলল, একদম হাউমাউ করবি না। আস্তে। যা ওঠ। মুখোশটা এনে দাদাকে দে।

মগড়া বের হয়ে গেল, সুরঞ্জনও সঙ্গে বের হয়ে গেল। মগড়া কেমন জড়বুদ্ধি। সে তার লকারে চাবি পর্যন্ত ঢোকাতে পারছে না। লকার থেকে মুখোশটা বের করতেও সাহস হচ্ছে না। আতঙ্কে চোখ-মুখ লাল। সুরঞ্জন নিজেই ওটা নিয়ে দাদার ফোকশালে ঢুকে যাবার সময় বলল, তোর যাতে কোনও অনিষ্ট না হয় আমরা দেখছি। মুখার্জিবাবুকে তো জানিস। মাথা গরম লোক। সবার সামনে বেইজ্জত করলে তোর কিছু বলাব থাকত?

মগড়া সুরঞ্জনের পাও জড়িয়ে ধরতে চাইল।

কী হচ্ছে, ছাড। যা, বের হ ঘর থেকে।

সুরঞ্জন বলল, এই নাও। তবে দাদা একটা কথা বলি। যদি মনে কিছু না কবো।

বলে ফেল। কিছু মনে করব না। তার আগে যে মগড়াকে আবার ধরে আনতে হবে।

সুরঞ্জন উঠে চলে গেল।

মগড়া এলে মুখার্জি বললেন, মুখোশটা তুই পেলি কোথায়? ম্যাক কি মুখোশটা তোকে দিয়েছে?

নেহি বাবু।

তবে? মুখোশ আসে কী কবে?

তারপর মগড়ার কথা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, মুখোশটি সে চুরি করেছে। ম্যাক খোঁজ-খবর যে না করেছে তা নয়। তবে মাতাল লোকের যা হয়, বেহুঁশ অবস্থায় কাউকে মুখোশটা দিয়েছে, নাম মনে রাখতে পারেনি। তারপর সুরঞ্জনের দিকে না তাকিয়েই বললেন, বলে ফেল। দেখছিস তো খুঁজে পাচ্ছি না। কিছু খুঁজছি বুঝতে পারছিস! কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়।

কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি দেখে সুরঞ্জনও খুব একটা সাহস পাচ্ছে না। কারণ তারা সবাই এখন দর্শক মাত্র। কারও কিছু বলার থাকলে অন্য সময়ে বললেই ভাল হয়।

এত সব বুঝেও সুরঞ্জন না বলে পারল না, দাদা, তোমার সিদ্ধান্তগুলি কিঞ্চিৎ লঘুপাকের হয়ে যাচ্ছে না?

লঘুপাক বলছিস? সামান্য গুরুপাক দরকার?

তাই তো বুঝতে পারছি না, বলছ এক, ঘটছে অন্য। ম্যাকের মৃত্যু নিয়ে সিদ্ধান্তগুলির কথা ভেবে

দ্যাখো, তুমি কী বলেছিলে, মনে করতে পারছ? মুখোশ তার কোনও ওপরওয়ালাকে দিয়েছে, যাকে লোক বাঘের মতো ভয় পায়।

ভুল সিদ্ধান্ত মানছি। আরে বুঝিস না, ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড। খুনের অকুস্থল একটা। কিন্তু তার রাস্তা অনেক। সব রাস্তাগুলি ধরে হেঁটে না গেলে বুঝবি কী করে অকুস্থলে কারা কোন রাস্তায় ঢুকেছিল?

না, বলছিলাম, ডরোথি ক্যারিকো নিয়েই বা পড়লে কেন? প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকোই প্রেসিডেন্ট কলিজ ভাবছ কীসের ভিত্তিতে? সন্দেহ সেকেন্ডকে, এখন দেখছি বেডিয়ো অফিসার। সন্দেহ বুড়ো মানুষের মুখোশ নিয়ে, এখন দেখছি সেটা দাঁড়িয়ে গেছে গিরগিটি গোঁফেব মুখোশ! শেষ পর্যন্ত এত লঘুপাক সহ্য হবে তো?

হবে।—বলেই তিনি ফের ইউরেকা!

বললেন, পেয়েছি!

কী পেয়েছ?

এই সেই ফোটো, রিফ এক্সপ্লোবারেব তোলা। কলিজ জাহাজের লাউঞ্জ থেকে কেউ পাচার করেছে।

সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী দেখছিস?

ফাঁকা। বিশাল গ্রিকদেবীর দুই মূর্তি আর একশিঙ্গি ঘোড়ার দেয়ালটা ফাঁকা। মনে হয় কলিজ জাহাজ থেকে কেউ সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

এটা কী!— বলে তিনি আর-একটি বই এগিয়ে দিলেন। তিনি যে কাপ্তানের ঘর থেকে কাগজপত্র তুলে এনেছেন, ফোটোগুলি তাবই ভেতর আছে তবে!

সুহাস অধীব সুরঞ্জন ঝুঁকে দেখল, গাইড-বুকটিতে ডরোথি ক্যারিকোর অসংখ্য ছবি জাহাজের। পাতা ওলটাতে গিয়ে সবাব চোখ আটকে গেল। ডরোথি ক্যারিকোর লাউঞ্জ হুবহু কলিজেব মতো। সেই তিনটি কারুকাজ কবা বিশাল থাম পরপর। দেয়ালের কারুকার্য এক। সেই ডানদিকের দেয়ালে দুই গ্রিকদেবী এবং একশিঙ্গি ভাস্কর্যটি শোভা পাচ্ছে।

চার্লির পাচাব করা কলিজের ছবি তাদের কাছে আছে। ছবিটি বের কবে মিলিয়ে দেখলেন। না, ভাবা যায় না।

মুখার্জি গম্ভীর।

সিদ্ধান্তগুলি বোধহয় খুব একটা লঘুপাকের নয়।

সুরঞ্জন চুপ। বেকুফ বলতে গেলে।

সুহাস বলল, জানো, বিফ এক্সপ্লোরার থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। জাহাজের ডুবুরিরা কলিজের ভিতর ঢুকে অনেক ছবি তুলে এনেছে। কাপ্তানকে ছবিগুলি দিয়ে গেছে। আমাকে সব দেখিযেছে চার্লি। কেবল লাউঞ্জেব ছবিটা কেন যে খুঁজে পেল না বুঝতে পারলাম না।

রহস্য!— বলে থেমে গেলেন মুখার্জি।

চার্লি তো বলল, জাহাজটা নাকি ষাট-সত্তর ফুট গভীর জলে ডুবে আছে। মরটেলি উন্ডেড বার্ডের মতো কাত হয়ে আছে। জলের নীচে বারো বছরে কলিজ জানো, হ্যাভ বিকাম এ রিফ, এ ফেস্টিভ গার্ডেন হোম ফর থাউজেন্ড ক্রিয়েচারস। ওর ঠাকুরদার ইচ্ছেই পূর্ণ হল দেখছি।

দ্যাখো, ঠাকুরদাব আরও কত ইচ্ছে আছে!

বলেই মুখার্জি তুরুপের তাসের মতো তিনটে ছবিই পাশাপাশি বিছিয়ে দিলেন। আঙুলে ছবিগুলি পটাপট ছুঁয়ে বললেন, প্রথম ছবিটা কলিজের লাউঞ্জ, দ্বিতীয় ছবিটা ডরোথি ক্যারিকোর, তৃতীয় ছবিটা বিফ এক্সপ্লোরারের, সম্প্রতি তোলা। তিনটি ছবিই এক, শুধু শেষের ছবিটার দেয়াল ফাঁকা। ডানদিকের দেয়াল। ভাস্কর্যটি নেই। সম্ভবত চুরি গেছে।

থেমে মুখার্জি বললেন, সেভেনথ মিলিটারি মিশানের প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি আগে প্রমোদ-তরণী ছিল তা বোধহয় তোমাদের মনে থাকতে পারে। খোল-নলচে পালটে মিলিটারি ট্রানসপোর্ট শিপ কলিজ। শুধু লাউঞ্জটি অক্ষত রাখা হয়েছিল, তাও তোমরা জানো। কাপ্তান-বয়কে দিয়ে পাচার করা কাগজপত্র থেকে আমরা তা জেনেছি। কী? কোনও গড়বড় আছে? থাকলে বলবে। বুঝতে

পারছ সিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই লঘুপাকের নয়। প্রমোদ-তরণীটি যে ডরোথি ক্যারিকো, ছবি তিনটি তার প্রমাণ! অ্যাম আই রাইট?

অধীর বিস্ময়ের গলায় বলল, এত জলের নীচে জাহাজটাকে খুঁজে পেল কী করে? কত জাহাজ তো এই দরিয়ায় ডুবে আছে। আর চুরি করাও তো কঠিন। লোহার দেয়াল কেটে ছবিটাকে পাচার করা হয়েছে। কার কাজ?

সুরঞ্জন বলল, কারও কাজ নিশ্চয়ই। না হলে গ্রিকদেবীরা যাবেন কোথায়।

মুখার্জি কাগজপত্র ভাঁজ করছিলেন। তাঁর আর কথা বলার সময় নেই। ঘড়ি দেখলেন, ছ'টা বাজে। বের হয়ে পড়তে হবে। একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেওয়া দরকার সব। কাগজপত্রগুলি এখন এতই মূল্যবান যে তিনি কিছুই খোয়াতে চান না। সুরঞ্জনকে বললেন, দ্যাখ তো কারও কাছে চটের থলে-টলে পাস কি না!

চটের থলে!

আরে, এগুলি নিয়ে যাব, গ্যাংওয়েতে দেখতে চাইলে কী করব? চটের থলে থাকলে বলা যাবে, জামাকাপড় আছে।

সুরঞ্জন চটের থলের খোঁজে বের হয়ে যেতে চাইলে মুখার্জি অধীরকে বললেন, তুই যা। যাবার আগে আর-একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একেবারে ফালতু লোক ভাবছিস, এটাই দুঃখ। স'বধানে থাকবি। সুহাসকে কোথাও একা ছাড়বি না।

আর কী বলার থাকতে পারে? তিনি পা নাচাতে থাকলেন।

সুরঞ্জনের মনে হল দিগ্বিজয়ে বের হচ্ছেন, পা তো নাচাবেনই। এদিকে যে আমরা একা পড়ে থাকছি, সেটা কি বুঝছ! তবে সে কিছু বলল না।

মুখার্জি চটের থলে কিংবা কাপড়ের ব্যাগ এসে গেলেই উঠে পড়বেন, আর কী বলা যায়! সহসা মনে হল বংশীকে অনেকক্ষণ হল দেখছেন না।

বংশী কোথায়?

দাঁড়াও, দেখে আসছি।

বলে সুরঞ্জন বের হয়ে গেল। ফিরেও এল মুহূর্তের মধ্যে। বলল, বংশী মগড়া ধুনুচি নিয়ে ঘুরছে। ডেকে উঠে গেছে। ইঞ্জিন-রুমের দরজায় ধূপ-ধুনো দেখাতে গেছে। গোটা জাহাজ ঘুরে আসবে বলে গেছে।

এটা ভাল। মনে শান্তি থাকলেই হল।

সুরঞ্জন বলল, দ্যাখো, আমি তোমার সহকারী। কিছু বললে কষ্ট পাও চাই না। তবে তোমার যাওয়ার কারণটা শুধু পাচার করা কাগজপত্র রক্ষার্থে ভাবলে খুব তুখোড় গোয়েন্দার কাজ মনে হবে না। ফিলই চার্লির আংকেল রাচেল ভাবছ কোন সুবাদে!

কোন সুবাদে? পিদগিন ভাষার সুবাদে। ওই দ্বীপে আরও একবার ঘুরে গেছি। ফিলের কথা মনেই ছিল না। চার-পাঁচ বছর আগেকার কথা। তারপর কত বন্দর, কত দেশ, জায়গাটার নামও ভুলে গিয়েছিলাম। পিদগিন ভাষার বিজ্ঞাপন না পড়লে মনেই পড়ত না, ফিল এই দ্বীপেই থাকেন। ফিল আর ফিলিপ, ধন্দ। চিরকুটে লেখা, চিরকুটটা অবশ্য কাপ্তান-বয় পাচার করেছিল, চিরকুট না বলে চিঠি বলাই ভাল, বোথ-বে হারবার থেকে জনৈক অ্যালেন পাওয়ার লিখেছে, ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দ্য স্পেল অফ দ্য কলিজ টুয়েলভ ইয়ার্স এগো, অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অফ দ্য রেক। পলকে কেন যে ফিলের কথা মনে পড়ে গেল। ওর ঘরে ডুবুরির পোশাক দেখেছিলাম।

থেমে বললেন, বুঝলি কিছু?

বলে যাও।

এক নম্বর, কলিজ সম্পর্কে কাপ্তানের আগ্রহ। চিঠিটা তার প্রমাণ। দু' নম্বর, কে ফিলিপ, যে বারো বছর ধরে ডুবন্ত জাহাজের প্রহরী হয়ে আছে? ফিল যদি ফিলিপ হয়? তিন নম্বর, কলিজ সম্পর্কে খোঁজ-খবর করার কথা শুধু চার্লির বাবা মিলার বংশের কারওর। ওটাতে এমন কিছু আছে, কিংবা ছিল,

যার জন্য মিলার বংশের কাছে জাহাজটা খুঁজে বের করা দরকার হয়ে পড়েছে। চার্লির বাবা ছাড়া কার আর এত গরজ!

তা হলে তুমি ভাবছ, ফিল অসি ডাইভার নয়?

না। ফিল ফিলিপও নয়। ফিল অস্ট্রেলিয়ানও নয়। ফিলই আসলে চার্লির আংকেল রাচেল। কলিজ জাহাজটা সে-ই ডুবিয়েছে। অন্তর্ঘাত। জাহাজটার উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, মাইনফিল্ডে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, হয়? জাহাজে এমন কিছু বংশগৌরব কিংবা ধরো গুজব, এই গুপ্তধন-টনের আর কী, তোকে কী করে বোঝাই, শুধু বুনো ফুলের সাম্রাজ্য বিস্তারে এত বড় প্রমোদ-তরণী নিয়ে ইস্টার দ্বীপ থেকে শুরু করে গ্যালাপ্যাগাস, হাইব্রিডস দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে বেড়াতে পারে কেউ, কোনও গোয়েন্দাই বোধহয় বিশ্বাস করবে না। জাহাজে কোনও যে গুপ্তধন ছিল না কে বলবে? শুধু ভাস্কর্যটি সরিয়েছে, বিশাল চোরা-কুঠুরিতে আর কী ছিল? চোরা-কুঠুরি কখনও খালি থাকে? ভাস্কর্যটি তুলে নিয়ে যাওয়ায় পেছনের চোরা-কুঠুরিও দেখতে পেলি রিফ এক্সপ্লোরারের সম্প্রতি তোলা ছবিতে। কার কাজ?

সুরঞ্জন ব্যাজার মুখে বলল, কার কাজ আমি কী করে বলব?

ফিলের কাজ। ফিলের প্রাসাদে ভাস্কর্যটি খুব যত্নের সঙ্গে দেয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বিশাল জায়গা জুড়ে দুর্গা প্রতিমার মতো ঝলমল করছে।

সুরঞ্জন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, জেনেশুনে সিংহের গুহায় উঁকি মারতে যাচ্ছ!

দেখি না কী হয়! দস্যু কবি হয়ে যেতে পারে, আর রাচেল সন্ন্যাসী হতে পাবে না? রাচেলকে দেখে বুঝেছি, সরষেতে শুধু ভূত থাকে না, ভগবানও থাকে। তেলের গুণ বলতে পারিস।

এত রাতে তাই বলে? মনে সায় পাচ্ছি না।

ভয়ের কী আছে! এই দ্যাখ না!— বলে পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করে দেখালেন। বললেন, ফিল দিয়েছে। প্রণামী। বিপদে-আপদে মুদ্রাটি আমাকে রক্ষা কববে বলেছে।

ওরা চারজনই মুখার্জিদার সঙ্গে ডেক-এ উঠে গেল। মুখার্জিদা ডেক-সারেঙের অনুমতি নিতে গেলেন। রাতে ফিরবেন না, কখন ফিরবেন তাও জানেন না। ডেক-সারেংকে না বলে গেলে কথা হবে।

মুখার্জিদা ছুটে আসছেন। বোঝা যায় মুখার্জিদা তুখোড় ম্যানেজ-মাস্টার। জাহাজের দায়-দায়িত্ব কারও কম না। হুট করে জাহাজ থেকে নেমেও যাওয়া যায় না। বিশেষ করে রাতের বেলা।

গ্যাংওয়েতে নেমে নৌকায় ওঠার সময় হাত তুলে দিলেন। উপরে চোখ যেতেই দেখলেন, চার্লি রেলিং-এ ভর করে তাঁকে দেখছে। চার্লিকেও তিনি হাত তুলে বাই করলেন। এবং নৌকা কিনারায় গেলে লাফিয়ে কিনারায় উঠে গেলেন তিনি। এখন সোজা আস্তাবলের দিকে যেতে হবে। কিনার থেকেও আবছা দেখতে পেলেন অধীর, সুরঞ্জন, সুহাস, কেষ্ট তখনও রেলিং-এ ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে বোট-ডেকে চার্লিও। যতক্ষণ দেখা যায় মুখার্জির মনটা কেন যে ভারী হয়ে গেল। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলি টিম টিম করে জ্বলছে।

দেখা যাক, চার্লির ছেলে সেজে থাকার পেছনে আসল রহস্যটা কী? ফিল যদি সত্যি চার্লির আংকেল রাচেল হয়ে যায়! কত যে ভাবনা, তিনি আশা করছেন পাচার করা কাগজপত্র থেকে কিছু অন্তত সূত্র খুঁজে পাবেন। এইসব চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে হাঁটলে দূরের রাস্তাও কাছের হয়ে যায়। আস্তাবলের সামনে তিনি। ঘোড়ার দাম-দর। রাতে ঘোড়া ছাড়তে রাজি না কেউ। আস্তাবলগুলি প্রায় ফাঁকা, রাতের দিকে ঘোড়াগুলি ফিরে আসে। ভাল ঘোড়া একটাও পেলেন না। পেলেও অশ্বরক্ষক ছাড়তে রাজি না। কী করা। একবার মুদ্রাটি বাজিয়ে দেখলে হয়।

মুদ্রাটি পকেট থেকে তুলে হাতের তালুতে রাখলেন। অশ্বরক্ষক যেন ভূত দেখছে। মুদ্রাটি অশ্বরক্ষকের নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে ফের অত্যন্ত কৌশলে লুফে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল। একেবারে নতজানু। ঘোড়াটিকে আদর করে বাইরে বের করতেই মুদ্রাটি তিনি পকেটে পুরে ঘোড়াটির লাগাম ধরে ফেললেন। লাফিয়ে উঠে গেলেন পিঠে। বেশ তাজা এবং বলিষ্ঠ ঘোড়া। মুদ্রাটির যথার্থই জোর আছে।

সাদা রঙের ঘোড়াটি কদম দিচ্ছে।

শহরের মানুষজন দোকানপাট পার হয়ে গেলেন। কাঠের গুদাম পেছনে পড়ে থাকল। লাইট-হাউজ পার হয়ে গেলেই বনজঙ্গল পাকা সড়কের দু'পাশে। কিছুটা এই রাস্তায় যাবেন, পরে বাঁদিকে উঠে যাবেন, দুটো টিলা পার হয়ে যেতে হবে। জ্যোৎস্না গাছপালায় মাখামাখি হয়ে আছে, কারণ টিলার উপরে তিনি দেখলেন গোলাকার বিশাল বৃত্তের মতো চাঁদটি আকাশে ঝুলে আছে। সমুদ্রের এই এক কুহক, পাশে সমুদ্র এবং বাঁদিকে, কাবণ ফিল বলে দিয়েছেন অলওয়েজ লেফ্‌ট, সমুদ্র সবসময় চাঁদকে বড় করে দেখায়।

কিছুটা পথ এসে মনে হল, সমুদ্রের গর্জন আর শুনতে পাচ্ছেন না। তিনি ফের উঠে যেতে থাকলেন সন্তর্পণে। দ্বীপের এদিকটায় মাটি তুলে নিয়ে যাওয়ায় নানা আকারের খাদ সৃষ্টি হয়েছে। রাতে মানুষজনের কোনও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না। যতই জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি মাখামাখি হয়ে থাকুক, খাদগুলি ঘাসের আড়ালে ডুবে আছে। পড়ে গেলে অশ্ব এবং তার আরোহী দুই-ই জখম হবে।

ইচ্ছে করলেই ঘাস মাঠ, লোকালয় পার হয়ে যাবার জন্য তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারছেন না। তাঁর একটাই নিশানা। সমুদ্রের ধারে ধারে সবসময় তুমি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবে। রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দে। পাথরের চত্বর শুধু মাইলের পর মাইল। ক্যাকটাস এবং স্টোন বার্ড নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় পাখির কলরব ছাড়া কিছুই যেন তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

মাথার উপর বড় বড় গাছের ছায়া, গাছগুলি উকন হতে পারে। পাইন, মেপল হতে পারে, রাতের এই নিঝুম জ্যোৎস্নায় চেনা মুশকিল। দ্বীপের বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত। দ্বীপে আখ আনারস হয়, আবার আঙুরের চাষও হয়। পাথরের সাম্রাজ্য-বিস্তারও কম নয়, ঘাসের জঙ্গলও মাইলের পর মাইল। আবার মেপল গাছেরও ছড়াছড়ি। উষ্ণমণ্ডল থেকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের গাছ-গাছালি জীবজন্তু সবই দ্বীপগুলিতে যে কী করে সহাবস্থান করে বেঁচে আছে বুঝে উঠতে পারেন না। এমন এক বিচিত্র দ্বীপে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় শেষে নেমে এলেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কারণ যেদিকেই যাচ্ছেন, সমুদ্রের সাড়াশব্দ নেই।

সঙ্গে একটি টর্চ আছে। সুরঞ্জন ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ঘড়ি দেখলেন, প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘোড়াব পিঠে, আশ্চর্য এখন পর্যন্ত কোনও লোকালয় চোখে পড়ল না। যতদূর চোখ যায় শুধু নিরন্তর আকাশ আর মাঠ এবং অরণ্য। এমনকী তিনি এয়ারস্ট্রিপও খুঁজে পেলেন না। অন্তত একটা পেলেও তাঁর ভরসা থাকত। কারণ এয়ারস্ট্রিপগুলির মাথাও সমুদ্রের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এভাবে এত রাতে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাও কষ্ট। এবং গাছের ডালপালা হাওয়ায় দুলছে। বেশ জোরে হাওয়া বইছে, তিনি টর্চ মেরে গাছের ডালে কী খুঁজলেন, কোনও পাখির কলরব যদি শুনতে পান। যেন এতে সাহস ফিরে পাবেন। মানুষ-বর্জিত এক বিশাল প্রান্তরে নেমে এসেছেন। তাঁর ঘাম হচ্ছিল। রুমালে ঘাম মুছে বসে আছেন ঘোড়ার পিঠেই। দেখা যাক, বলে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। পাহাড়ের মতো কিছু সামনে একটা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। ঘাসের ভিতর জোনাকিরা ওড়াউড়ি করছে। কীট-পতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

অনেকটা পথ তিনি নেমে এলেন। কোনদিকে যাচ্ছেন, চাঁদের অবস্থান দেখে দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। এখনও চাঁদ আকাশের গায়ে হেলে আছে। শুক্লপক্ষের রাত। আজ পূর্ণিমা, কারণ ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ আকাশে ঝুলছে না। ক্রমে রাত বাড়ছে।

ক্রমে তিনি একটা দেয়ালের মতো লম্বা পাথরের প্রাচীর দেখতে পেলেন। সামনে এগোবার আর কোনও পথ নেই। পাঁচিলটি খুবই খাড়া। পাঁচিলের পাশ দিয়ে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মধ্যযামিনী। ভয়ংকর দাপাদাপি চলছে জঙ্গলে! কারা দাপাদাপি করছে? টর্চ জ্বালতেই দেখতে পেলেন বীভৎস দু' জোড়া চোখ। আকৃতি ডাইনোসরদের। সত্যি প্রাগৈতিহাসিক জীব, তবে আকারে বড় নয়। তিনি তারপর আরও দ্রুত নেমে যেতে থাকলেন আর শুনতে পেলেন সমুদ্রের বিশাল গর্জন। কিন্তু সমুদ্র তাঁর ডানদিকে বিরাজ করছে। তিনি বুঝতে পারলেন ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তাটি ভুল করে ফেলেছেন।

ডানদিকে সমুদ্র পড়লে ফিলের প্রাসাদে যাওয়া যায় না, এটা তিনি ভালই বোঝেন। দ্বীপের কোনও দুর্গম অঞ্চলে নেমে এসেছেন। কিছুটা অস্থিরও হয়ে পড়েছেন, কী করবেন, কোনও লোকালয় পেলেও রক্ষা। তারও উপায় নেই। ঘোড়া ছুটিয়ে উপরে যাবার পথও বন্ধ। কারণ পাশেই খাড়া পাহাড় এবং

সমুদ্র। পাহাডেব পাশে ফুট দশেক উপত্যকা, আব তাব অনেক নীচে সমুদ্র। ঘোড়া দু' পা তুলে দাঁড়িয়ে গছে। এগোলেই নীচে সমুদ্রেব জলে পড়ে যেতেন।

হঠাৎ তাঁব মাথায় কী যে বুদ্ধি খেলে গেল' ঘোডাব মুখ ফিবিয়ে দিলেই সমুদ্র বাঁদিকে পড়বে। এত কন যে ভাবছেন' ভাবা মাত্রই লাগাম টেনে ঘোড়াব মুখ ঘুবিয়ে দিলেন ঠিক, কিন্তু আশ্চর্য ঘোড়াটি আব কিছুতেই নড়ছে না। যেন বিপদেব গন্ধ পাচ্ছে। নীচে পড়ে গেলে উঠে আসা যাবে না। জোবজাব কবে ক' কদম এগিয়ে যেতেই মনে হল, পাহাডেব বিশাল দেয়াল মাথাব অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সামনে এগোবাব আব বাস্তা নেই। নীচে খাদেব মতো, সেখানে সমুদ্রেব ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

বোধহয় তিনি ভুলই কবে ফেলেছেন, তবু ভবসা, কাছে সমুদ্রটি আছে। আবাব ঘোডাব মুখ ফিবিয়ে দিযে ডাইনে সমুদ্র বেখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কাছে কোথাও কোনও পাথবেব উপত্যকাব খোঁজ পেলে ঘোডাব পিঠ থেকে নেমে পড়বেন, এবং চিতপাত হযে শুয়ে পড়বেন, কাবণ শবীব আব দিচ্ছিল না। দু'দিন ধবে জাহাজে যা চলছে' আশা ছেড়েই দিযেছেন। জ্যোৎস্নায় নিস্তব্ধ প্রহবীব মতো সমুদ্রেব ধাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িযেও থাকলেন। অজানা অচেনা দ্বীপে বাস্তা হাবিয়ে ফেললে মাথা ঠিক থাকে না।

একা না বোকা, সুহাসকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তা হলে এতটা নিরুপায় ভাবতে পাবতেন না নিজেকে। কিছুটা যেন কী কবা যায এই গোছেব যাত্রা। অনেকটা বাস্তা এগিয়েও এসেছেন, মধ্যযামিনীই বলা যায, আব হঠাৎই মনে হল সমুদ্রে কাবা দাপাদাপি কবে বেডাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল ভেড়াব পাল বিশাল প্রান্তবে অথবা একদল হাবিযে যাওয়া গাভী সমুদ্র পাব হযে উঠে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বাললেন। জ্যোৎস্নায় সবকিছুবই আভাস পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখা যায় না। টর্চ জ্বালতেই চক্ষুস্থিব। হাজাব হাজাব ব্লু সার্ক সমুদ্রে দাপাদাপি কবে বেডাচ্ছে। ঘুবছে ফিবছে। লাফ দিয়ে উপবে উঠছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে চলেছে। একটা আব-একটাব ঘাড়ে মাথা তুলে দিচ্ছে। সমুদ্র এখানে খাড়িব মতো ক্রমে ভিতবে ঢুকে যাচ্ছে। এদিকটায এত ঝাঁকে ঝাঁকে নীল হাঙবেবা কোথা থেকে ঢুকে গেল' আব তখনই কী দেখে তাজ্জব হযে গেলেন। সমুদ্র থেকে বিশাল পিবামিডেব মতো একটা ছায়া ভেসে উঠছে ধীবে ধীবে। তাঁব আব বিন্দুমাত্র সাহস থাকল না। ঘোডা থেকে তিনি যেন গড়িয়ে পড়ে যাবেন।

এমন আশ্চর্য দৃশ্য জীবনেও দেখেননি। রুপোলি বঙেব কুয়াশাব মতো পাহাডটা মাথা তুলে দিচ্ছে সমুদ্র থেকে। ক্রমে বড হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণেব মধ্যে বিশাল আকাব ধাবণ কবতে থাকলে তাঁব বক্ত হিম হযে গেল। আব তখনই মনে হল গুঁড়ি মেবে জঙ্গল থেকে দু'জন প্রায় অদৃশ্য ব্যক্তি লতাপাতায় ঢাকা উঠে এল। এবা কাবা? তাঁব দিকে এগিযে আসছে। তিনি ভাবলেন, দেখাই যাক না, এইসব অপদেবতাব পাল্লায় পড়তে হতে পাবে ভেবেই ফিল বোধহয তাঁকে স্বর্ণমুদ্রাটি উপহাব দিয়েছেন।

তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পিঠে তাব দুটো আদবেব থাপ্পড় মাবলেন, যেন বলা, তুমি আব আমি, ওবা আসছে। ওবা কাবা জানি না। কাবণ টর্চ জ্বালাতেও ভয় হচ্ছে। তাবা আমাকে নিশ্চয়ই দেখেছে। টেব পেয়ে ছুটে আসছে।

কাছে এসেই বুনো ঘোড়া ধবাব ল্যাসো ছুঁড়ে দিল। এবং তিনি জড়িয়ে গেলেন। তাঁব কোমবে ল্যাসোটি আটকে গেছে, কী নিখুঁত ছুঁড়ে দেবাব ভঙ্গি।

জোবজাব কবে কোনও লাভ নেই, তাবা কী চায় দেখাই যাক না। তাবা তো দ্বীপেবই কেউ হবে এবং ফিলেব প্রভাব-প্রতিপত্তি এইসব দ্বীপে এত বেশি প্রবল যে তাঁকে ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কঠিন। দ্বীপেব মানুষেবা সবল অকপট। বাহাজানি, ছিনতাই, চুবি-চামাবি তাবা জানে না। সবল অকপট হলে যা হয়, খুব ধর্মভীরু। কিন্তু তাবাও যদি ইঞ্জিন-রুমেব সেই অদৃশ্য অপদেবতাব কেউ হয়? কেউ তাব উপব যে সতর্ক নজব বাখছে না, তাবই বা ঠিক কী? এত গোপনে সুহাসকে ইঞ্জিন-রুম থেকে তুলে এনেও শেষ পর্যন্ত বেহাই পেলেন না। তাঁব বাড়িঘব, ছেলেমেয়ে এবং নাবীব মুখ মুহূর্তে চোখেব উপব

ভেসে উঠল, তারা জানেই না, কিছুক্ষণের মধ্যে বড় রকমের হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

দূরে একটা আলো জ্বলছে।

সেই ভেসে ওঠা পাহাড়শীর্ষ থেকেও একটা আলো যেন এপারে সাংকেতিক ভাষায় কাউকে খবর পাঠাচ্ছে, তিনি আক্রান্ত হতে হতে যতটা পারছেন চারপাশ দেখে নিচ্ছেন। যদি দৈবের বশে বেঁচে যান, তবে ফিলকে সব খুলে বলা যাবে। এখন একমাত্র কোনও দৈবই যেন তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

আর আশ্চর্য, লোক দু'জনের একজন আর কেউ না, নিনামুর!

সে মুখার্জিকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। বলল, স্যার আপনি?

তুমি এখানে?

সে কিছুটা তোতলাতে লাগল। বলল, না, আপনি আজ্ঞে আপনি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কর্তা তাঁবুতে আছেন। আজ তো ফুলমুন স্যার। কিন্তু কী করি, ওদিকে যাবার কারও হুকুম নেই। সকাল না হলে, আজ্ঞে আপনি, এই পাহাড়ে কেন, না মাথায় আমার আসছে না।

নিনামুরের যেন ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

মুখার্জি বললেন, তোমার কর্তা তাঁবুতে কী করছে?

নিনামুর একটা কথাই ঘুবে-ফিরে বলছে, আজ ফুলমুন, কর্তা তাঁবুতে আছেন। বের হবেন।

মুখার্জি এবার তাঁর মুদ্রাটি বের করে নিনামুরকে দেখালেন। বললেন, ওকে গিয়ে দেখাও। বলো গে, আমি তার কাছেই যাচ্ছিলাম। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ডানদিকে সমুদ্র পড়ছে দেখেই বুঝেছি, সাবা রাত সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে হবে। বলবে, খুব জরুরি কথাবার্তা আছে।

নিনামুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ সে কর্তার কাছে গিয়ে এখন সব খুলে বলতে পাববে। ফুলমুনের রাতে তারা পাহারায় থাকে। জোয়ার-ভাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই দুর্গম এলাকাতে কখনও কেউ আসে না। তবু কর্তার সতর্কতার শেষ নেই। নিজের কিছু লোকজন নিয়ে তার কর্তা বিকেলেই বের হয়ে পড়েন। তাদেব একটাই কাজ, চারপাশে লক্ষ রাখা। জাহাজি সাহেবকে কর্তা খুবই মান্য করেন, তোতোমেরি পাহাড়ে জোয়ারের জল নেমে গেলে একটি বিশাল দরজা আবিষ্কার করা যায়। কেউ জানে না। জানেন কর্তা আর তারা। সে দৌড়ে চলে গেল। ফিরেও এল। এসে সেই নতজানু হওয়ার কায়দায় মুখার্জিকে অভিবাদন জানাল।

মুখার্জি ঘোড়া থেকে নেমে পাথরে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কিছুটা দূরে পিরামিড-সদৃশ পাহাড়টি ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে এবং খুবই কাছে চলে আসছে যেন। অদ্ভুত কাণ্ড। পাহাড়ের জেগে ওঠার দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। সমুদ্রে দাপাদাপি চলছে অজস্র হাঙবের। ফিলেব প্রাসাদে যাবার রাস্তায় কখনও মনে হয়নি, এইসব এলাকায় নীল হাঙরের উপদ্রব থাকতে পারে। পূর্ণিমা রাতে প্রজননের হেতুতে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর ঢুকে গেছে কি না কে জানে। গভীর জলে তারা বিচরণ করে তিনি জানেন। তবে কি জল এখানে খুবই গভীব? কী যে রহস্য বুঝতে পারছেন না। চাঁদের আলোয় পাহাড়টা রুপোলি হয়ে গেছে যেন। এবং পাহাড় থেকে নানা রঙের বিদ্যুৎছটা বেব হয়ে আসছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। ভুতুড়ে পাহাড়-টাহাড় ছাড়া এভাবে জেগে ওঠার কার দায় পড়েছে তিনি তাও বুঝতে পারছেন না। কিছুটা বেকুবের মতো দৃশ্যান্তর দেখতে দেখতে তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীর আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে।

নিনামুর সামনে এসে না দাঁড়ালে তাঁর কী গতি হত তিনি জানেন না। কারণ নিনামুর এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না এমন দুর্গম অঞ্চলে এত রাতে ফিল তাঁব লোকজন নিয়ে নেমে আসতে পারে। ফিলের কী কাজ থাকতে পারে! রহস্য ঘনীভূত হচ্ছিল. পিরামিড-সদৃশ পাহাড়ে ফিল কী খুঁজে বেড়ায়? যদি খুঁজে বেড়ায় সেটা কি কোনও অলৌকিক কিছু'

নিনামুর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটির লাগাম ধরে আগে আগে যাচ্ছে নিনামুর। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে, ফিলের কী ইচ্ছে, এমন সব চিন্তাভাবনায় কিছুটা তিনি বিমূঢ়। পাহাড়ের মাথায় লাল আলোটা দুলছে। যেন সবসময়ই কোনও পাহারাদার এই পাহাড়ের মাথায় বসে থাকে হাতে লাল লণ্ঠন নিয়ে। বিপদসংকেত পাঠাচ্ছে মনে হয়।

বাঁদিকে পাহাড়, ডানদিকে সমুদ্র, কিছুটা দূরে। জ্যোৎস্নারাত বলে বোঝা যাচ্ছে না, কতটা দূর সেই

অলৌকিক পাহাড়। ভাটার টানে জল নেমে যাচ্ছে, উঁচু-নিচু অজস্র প্রবালদ্বীপের অভ্যন্তরে এই অলৌকিক মহিমা দেখার জন্যই কি ফিল ফুলমুনের রাতে এখানে নেমে আসে? এ কি কোনও ঈশ্বর-মহিমা উপলব্ধির জায়গা?

আর তখনই মনে হল, ফিল তাঁকে সাহস দিচ্ছে। দূর থেকে ডাকছে, মুখার্জি, ভয়ের কিছু নেই! সাহস হারিয়ো না। আমরা এখানে আছি। এত রাতে, এই দুর্গম অঞ্চলে ঢুকে গেলে কী করে? ঠিক রাস্তা হারিয়েছ!

ফিল কি অন্তর্যামী?

তিনি রাস্তা হারিয়েছেন তাও জানেন। তারপরই মনে হল, নিনামুরকে তিনি হয়তো বলেছেন, ফিলের প্রাসাদে যেতে গিয়ে এই ফ্যাসাদ।

ফিল ছুটে আসছে। নিনামুর ঘোড়াটি নিয়ে তাঁবুর পাশে চলে গেল। ঠিক তাঁবু নয়। অস্থায়ী আস্তানা গোছের। হয়তো জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবে থাকে জায়গাটা। এজন্য এখানে বোধহয় ফিল স্থায়ী আস্তানা তৈরি করতে পারেনি। ফিলের সঙ্গে আরও সব লোকজন আছে, তারা ফিলের খুবই অনুগত বোঝা যায়। সঙ্গে তাদেরও টর্চ এবং লম্ফ আছে। একটা ছোট জাল এবং হলুদ রঙের কাচের জারও দেখলেন। কাচের জারে কালো রঙের একটি বিচিত্র আকারের মাছ। দেখলেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয়।

ফিল বললেন, স্টোন ফিশ। নাম শুনেছ?

মুখার্জি বললেন, না।

খুব বিষাক্ত। মাছটি সামনের পাহাড়ে যাবার রক্ষী আমাদের। সামনের পাহাড়টায় যাব। ওটাই আমার ঈশ্বরের ভাণ্ডার। তুমি কি যাবে? আমার ঈশ্বরের ভাণ্ডারটি দেখে আসতে পারতে।

না না। তোমরা যাও। আমি অপেক্ষা করছি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। শেষে এমন দুর্গতি হবে জানতাম না। ভাগ্যিস তোমাদের দেখা পেয়ে গেলাম।

ফিল একটি টিনের চেয়ারে বসে ছিলেন। মুখার্জি কাছে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুখার্জিকে বসতে বললেন। মুখার্জি বসলেন না। আর বাড়তি কোনও চেয়ার নেই বলে ফিল দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মুখার্জির সঙ্গে। পেছনে পাথরের ঝোপজঙ্গল থেকে কীট-পতঙ্গের আওয়াজও ভেসে আসছিল। জায়গাটায় কোনও সমুদ্র-গর্জন নেই। অথচ নীচে কয়েক পা হেঁটে গেলেই সমুদ্র, ভাটার টানে জল নেমে যাচ্ছে বোঝা যায়।

ফিলের লোকজন ভূতের মতো ছায়া হয়ে যেন বিচরণ করছে।

এমন আজগুবি দৃশ্য অথবা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবেন, তাঁর মনেই হয়নি। অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কী করে সম্ভব, কোনও পাহাড় জলের তলা থেকে ফুলমুনে ভেসে ওঠে? তিনি কি সুস্থ আছেন? আতঙ্কে যে তাঁর চৈতন্য লোপ পায়নি কে বলবে। তাই সব আজগুবি দৃশ্য চোখে ভেসে উঠছে। স্বাভাবিক নন তিনি, এমনও ভাবলেন। যা দেখছেন, মরীচিকা হতে পারে। চিমটি কেটে দেখলেন, লাগে। কথাবার্তায় স্বাভাবিক হতে পারছেন না কিছুতেই। কিছুটা বিমূঢ় অবস্থায় সব যেন দেখে যাচ্ছেন। ফিল প্রশ্ন করলে জবাবে হুঁ-হাঁ করছেন। ফিল চাইছে তাঁকে সঙ্গে নিতে। তিনি রাজি হতে পারছেন না। কে জানে, ফিল এই সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে তামাশাও দেখতে পারে। পাহাড়টাকে জলের তলায় হাঙরেরা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে এমনও মনে হল তাঁর। বিষাক্ত মাছটি তাদের রক্ষী। তাই বা কী করে হয়? আর কাচের জারে, জলের মধ্যে মাছটি চোখে ভেসে উঠলেই গায়ে তাঁর কাঁটা দিচ্ছে কেন?

ফিল তখন যেন মন্ত্র জপ করছেন। কারণ মুখার্জি দেখতে পেলেন, এই পাহাড়শীর্ষের আলোটি আর লাল নেই, হলুদ, তারপর সবুজ হয়ে যাচ্ছে।

চেষ্টা করছেন মুখার্জি ফিল কী বলে শোনার, অ্যান্ড ইয়েট ও মাই লর্ড, ইয়ো আর আওয়ার ফাদার। উই আর দ্য ক্লে অ্যান্ড ইয়ো আর দ্য পটার।

মুখার্জি কেমন সম্মোহিত হয়ে পড়ছেন।

ফিল তখনও বিড় বিড় করে বকছেন, দ্য কনজিওমিং ফায়ার অফ ইয়োর গ্লোরি উড বার্ন ডাউন দ্য ফরেস্টস অ্যান্ড বয়েল দ্য ওসেনস ড্রাই।

মুখার্জি দেখলেন, ফিলের পার্শ্বচরেরাও সেই ঈশ্বর ভজনায় যোগ দিয়েছে। তারা সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে।

তারপর ফিল বলছেন, ইয়ো ওয়েলকাম দোজ হু চিয়ারফুলি ডু গুড, হু ফলো গডলি ওয়েজ। প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই অফারিং।

বলেই ফিল কী নির্দেশ দিলেন, তাঁর একজন পার্শ্বচর দৌড়োতে থাকল, এবং জলের মধ্যে নেমে যেতে থাকল, হাঙরের ঝাঁক ভেসে বেড়াচ্ছে, আর আশ্চর্য, লোকটি হাঁটুজলে নেমে যেতেই সব অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি দেখছেন, লোকটির হাতে সেই হলুদ রঙের জাল এবং তার ভিতর কাচের জার থেকে মাছটিকে জলের ভিতর জালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আশ্চর্য, মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল। ফিল এসব কী করছে?

ফিল যেন ফের স্বাভাবিক হয়ে গেল। বলল, চলো, আমি যাচ্ছি। তুমি গেলে খুশি হব। ঈশ্বরের অপার মহিমা গেলে টের পাবে। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না।

ফিল তারপর কী হুকুম করল, কে জানে! দুটো ঘোড়া এনে কারা যেন সামনে হাজির করল। ফিল বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? ঈশ্বর আমাকে এতটা দেবেন বুঝতে পারিনি। পাহাড়টির চমকপ্রদ ঘটনায় তুমি বিহ্বল বুঝতে পারছি। আসলে জোয়ার-ভাটার ব্যাপার। এত সব অজস্র দ্বীপে জোয়ারের জল উঠে এলে এমন সব অনেক দ্বীপ আছে ডুবে যায়, আবার জল নেমে গেলে ভেসে ওঠে। এটি গুপ্ত পাহাড়, ফুলমুনে এখানে আসি। বিশাল দরজাটি জল নেমে গেলে হাঁ করে থাকে। আমরা ঘোড় নিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারি।

সামান্য ঠেলা মেরে বলল, মুখার্জি, তুমি না একজন ভারতীয়! তোমার এত যোগবল থাকতে এতটা বিচলিত হওয়া সাজে না। উঠে পড়ো। দেখছ না, নীলবাতিটা জ্বলে গেছে। একদম সময় নেই। উঠে পড়ো। এটা তাঁরই ইচ্ছে, না হলে তুমি এখানটায় মরতে আসবে কেন!

মুখার্জির বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। ফিলের ইচ্ছেই যেন তাঁর ইচ্ছে। তিনি ঘোড়ায় চেপে বসতেই ফিল নেমে যেতে থাকল। আগে সেই মানুষটি হেঁটে যাচ্ছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল হাঙরের ঝাঁক লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে বোধহয়, কারণ কাছাকাছি কোনও হাঙরের ঝাঁক তিনি দেখতে পেলেন না, পেলেও তারা আট-দশ ফুট দূরে থাকছে, ভেসে উঠেই ডুবে যাচ্ছে।

ফিল বলল, গুপ্ত পাহাড়ে ঢোকার এটাই একমাত্র রাস্তা। কোনও খাড়া প্রবাল-প্রাচীর এখানে আছে। পাঁচ-সাতশো ফুট জলের তলা থেকে উপরে উঠে এসেছে। সবই তাঁর ইচ্ছে। কী বলো?

ফিল বলল, পেছনে পেছনে আসবে। সাবধান, এদিক-ওদিক হলে গভীর জলে পড়ে যাবে। স্রোতের টানে ভেসেও যেতে পারো।

মুখার্জি কোনও কথাতেই সাড়া দিতে পারছেন না। ফিল বলেই চলেছে, দ্য লর্ড ইজ গুড। হোয়েন ট্রাবল কামস হি ইজ দ্য প্লেস টু গো!

জলে ছপ ছপ শব্দ, জলের ঘূর্ণি, মৃদুমন্দ বাতাসে জলের ঢেউ, অদূরে হাঙরের ঝাঁক, হুটোপাটি তাদের, ফিলের কথা প্রায় কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না। ফিল তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যত পিরামিড-সদৃশ ছায়াটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তত জলকল্লোলে ভেসে যাচ্ছিলেন। ব্যাগটি ফেলে এসেছেন নিনামুরের কাছে, এই দুশ্চিন্তাও তাঁকে গ্রাস করেছে। ফিল বেশ জোরে জোরে কথা বলছে, প্রায় চিৎকার করে, তিনি জবাব না দেওয়ায় সহসা ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে বললেন, হোয়াট আর ইয়ো থিংকিং, মুখার্জি!

মুখার্জি বললেন, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!

বেশি দূরে না। সামনে। এসে গেছি।

মুখার্জি বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হাঙরেরা ছুটে আসছে দ্যাখো।

আসবে না। সি, দ্য মেসেঞ্জার কাম রানিং ডাউন দ্য গেট উইদ গ্ল্যাড নিউজ।

তিনি দেখতে পেলেন সামনেই পাথরের দরজা। ফিল মাথা নিচু করে ঢুকে গেল। মুখার্জিও মাথা নিচু করে দিলেন। জলের ছপ ছপ শব্দ আর নেই। অন্ধকার গুহাপথ। ফিল ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। তার এখন অনুসরণ করা ছাড়া যেন উপায় নেই। কালো চকচকে পাথরের গা বেয়ে জল

ডাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হুঁশিয়ারি। এ এক যেন গর্ভগৃহে ঢুকে গেলেন মুখার্জি।

ফিল প্রায় ছুটছে। সামনে দুটো লম্ফ নিয়ে দু'জন ছুটছে। আঁকাবাঁকা সরু গুহাপথ, খুবই দ্রুত কাজ করতে হবে, অন্তত ফিলের ব্যস্ততা দেখে তাও টের পাচ্ছেন।

তাঁকে ফিল নানা কথা বলে আশ্বস্ত করছে, নতুবা ফিলকে অনুসরণ করারও ক্ষমতা থাকত না। টুং শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। পাথরের দেয়াল ভেদ করে এই শব্দ কোথা থেকে বের হয়ে আসছে, কখনও ঝম ঝম, যেন নৃত্য করছে কেউ, পাথরের গভীর থেকে গভীর, কখনও বাসন ঝনঝন করে পড়ে যাবার মতো শব্দ। সামনে শুধু লম্ফর আলোতে টের পাচ্ছেন, মাথা নুয়ে না ছুটলে দেয়ালে মাথা ঠেকে যেতে পারে, ফিল তাকে নিয়ে অজস্র গলিঘুঁজি পার হয়ে যাচ্ছিল। ইঁদুরের গর্তের মতো আঁকাবাঁকা, কোথাও জল ঝমঝম করে তোড়ে নেমে আসছে। জুতো জামা সব ভিজে যাচ্ছিল। তারপর বেশ প্রশস্ত পথ। দেয়াল অনেক উঁচু এবং কোনও বিশাল বারান্দার মতো মনে হচ্ছে। পাথরের গা থেকে প্রস্রবণধারা, জল পাথরে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। আর তার ভিতর থেকে ফিলের বিশ্বস্ত অনুচরেরা ডুবে ডুবে কী তুলে আনছে। আর যা দেখলেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বেশ কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা এবং ছোটো ছোট হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল পাথর। মুখার্জি জানেন না, এইগুলি নিছক পাথরই না অমূল্য রত্নরাজি।

এভাবে আরও পাঁচ-সাতটি জলপ্রপাতের ভিতর গিয়ে তার অনুচরেরা জলে ডুবে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে। পাথরে গলিখুঁজি অজস্র। কোনওটায় ইঁদুরের মতো ঢুকে যাচ্ছেন, ইঁদুরের মতো বের হয়ে আসছেন। ফিল নির্লিপ্ত। একটি কথাও বলছে না। ঈশ্বরের মহিমা টের পেলে মানুষের মুখে যে প্রশান্তি জাগে ওঠে, ফিলের মুখে সেই প্রশান্তি। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে বটে, তবে কোনও কথা না। এমনকী তাঁর দু'জন অনুচরের মুখেও আহ্লাদে আটখানা ভাব নেই। নিছক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার মতো স্বভাব।

বার বার ফিল ঘড়ি দেখছে কেন?

মুখার্জি আর না-বলে পারলেন না ফিল, আমি কিছু বুঝছি না। তুমি কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ?

গুপ্তধন! না না।

তারপরেই কেমন প্রার্থনার ভঙ্গিতে ফিল বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করছে, মাই লর্ড মাই হোলি ওয়ান, ইউ হু আর ইটারনাল।

না কিছু বুঝছেন না! জনশ্রুতির ল্যাজা মুড়ো এক করা যায় না। মুখার্জি না-ভেবে পারছিলেন না, এই গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে বিশাল সব সমুদ্রদানব। কত জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত নাবিক হারিয়ে গেছে। রক্তমাংসে সমুদ্রের জল লাল হয়ে গেছে, জাহাজ হারিয়ে গেছে কোনও এক অদৃশ্য অশুভ প্রভাবে, এমন সব জনশ্রুতির পেছনে তবে কি পিরামিড সদৃশ জলের অভ্যন্তরে গোপন করে রাখা পাহাড়টি সি ডেভিল লুকোনোরে? তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছে ভাবতে গিয়ে। অজস্র ফোকর দেয়ালে। অনেক দূর থেকে আসছে কোনও মুদ্রার গড়িয়ে যাওয়ার ধ্বনি। কোনও প্রশ্ন করার ক্ষমতাও মুখার্জির ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

যখন তাঁরা ফিরে এলেন, গুহাপথের মুখে জল তখন যেন কিছুটা বেড়েছে। মুদ্রাগুলি কার কাছে, তারও যেন কোনও সতর্কতা নেই। ফিলের এত সব বিশ্বস্ত মানুষদের দেখেও অবাক। সেই মানুষটি, যার হাতে ক্ষুদ্র একটি হলুদ রঙের জাল এবং যে আগে আগে যায় জালটি জলে ভাসিয়ে, যার ভিতর সাঁতার কেটে বেড়ায় বিষাক্ত স্টোন ফিশ, তারই বা এত কী মহিমা, তিনি বুঝতে পারছেন না।

বোধ হয় জোয়ার শুরু হয়ে গেছে।

বোঝাই যায়, ঘোড়ার প্রায় পেটের কাছে জল উঠে এসেছে। দরকারে লাফিয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতেও হতে পারে। সাঁতরে সমুদ্র পার হওয়ার দরকার হতে পারে, কিন্তু এতই প্রবল জোয়ার-ভাটার হিসাব যে পাড়ে উঠে না এলে মুখার্জি টের পেতেন না। জলের গুম গুম আওয়াজ ভেসে আসছে। অজস্র রূপ ভাসিয়ে জোয়ারের জল ফুলে-ফেঁপে উঠছে, এ এক যেন কোনও জাদুকরের দেশ থেকে উঠে আসা।

ফিল এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক, তার কথাবার্তা শুনে এটা টের পেলেন মুখার্জি।

তা হলে মুখার্জি, কী বুঝলে?

কিছু না।

ঠিক কিছু অনুমান করতে পারছ?

না, না আমি কিছু অনুমান করতে পারছি না। নিনামুর, এদিকে এসো। ব্যাগটি কোথায় রাখলে?

যেন এতক্ষণে মুখার্জি তাঁর জাহাজের দুর্দৈবের কথা মনে করতে পারছেন। ফিলের সঙ্গে তাঁর যে জরুরি দরকার।

সকালে এলে না কেন?

ফিল, তোমার প্রাসাদে ফিরতে কি সকাল হয়ে যাবে?

কেন? যখনই ফিরি না কেন, তোমার কি তাড়া আছে?

না তাড়া নেই, তবে দেরিও করতে পারব না। তুমি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছ?

গুপ্তধন বলছ কেন? আমার কাছে এটা তাঁরই ইচ্ছে। দ্বীপগুলি দেখে বুঝছ না? তিনি না দিলে কোথায় পেতাম? তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে গুপ্তধন ভাবাই স্বাভাবিক। বোসো। নিনামুর!

তিনি নিনামুবকে ডাকলেন, বললেন, দ্যাখো, কী পাওয়া গেছে, ওগুলো নিয়ে চলে যাও। আমরা সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পরে রওনা হচ্ছি। কফি হোক মুখার্জি। এত চুপচাপ কেন বলো তো! এবারে তুমি যেন কেমন মনমরা হয়ে গেছ?

মুখার্জি ভাবলেন, আরও কী হয়ে যাই দ্যাখো। তবে বললেন না। শুধু বললেন, হাঙরের ঝাঁকের ভিতর দিয়ে এভাবে যাওয়া যায়, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। তুমি কি কোনও জাদু জানো?

তা জাদু বলতে পারো। স্টোন ফিশের জাদু। বিষাক্ত মাছটি জলের তলায় ঘোরাঘুরি করলে হাঙরেরা পালাতে থাকে। মাছটার গা থেকে লালা ছড়িয়ে পড়ে। অস্বাভাবিক সেই লালার গন্ধে পাগল হয়ে যায় হাঙরেরা, মৃত্যুভয় তাড়া করে তাদের।

কিন্তু এত কম জলে।

কম কোথায়? সাত-আটশো ফুট খাড়া প্রবাল-প্রাচীরটি দুটো দ্বীপের মধ্যে সেতু-বন্ধনের কাজ করছে। যে জানে, সে জানে।

মনে হয় তুমিই রাস্তাটা আবিষ্কার করেছ?

ডুবুবিদের অনেক কিছু জানতে হয়। অভিজ্ঞতাও মানুষকে কত কিছু যে শেখায়!

তা হলে তুমি ডাইভার?

বলতে পারো।

ফিল, অকপট হও।

তোমার সঙ্গে কবে অকপট ছিলাম না?

ফিল, তুমিই ফিলিপ?

ফিলিপ বলে কেউ কেউ জানে।

তবে তুমিই কি কলিজ জাহাজের কিপার অফ দ্য রেক?

ইয়েস। প্রেসিডেন্ট কলিজ। জানো মুখার্জি, মানুষ যখন শুধু নিজেকে ভালবাসে তখন তারা নানা আতঙ্কে থাকে। মানুষ যখন সবাইকে ভালবাসে, গাছ ফুল পাখি কীট-পতঙ্গ, তখন তার নিজেকে নিয়ে আর ভয় থাকে না। তুমি আর কী জানতে চাও? সেই ভাস্কর্যটির কথা? আমি জানি, তুমি কেন দুই গ্রিক নারীমূর্তি দেখে আঁতকে উঠেছিলে! কলিজ জাহাজ থেকে ওটি আমি তুলে এনেছি। এর মূল্য স্থির করা কঠিন। এথেন্সের বিখ্যাত ভাস্কর অ্যাপোলোনিয়াসের তৈরি। যুদ্ধবিগ্রহে গ্রিক ভাস্করদের কত অমূল্য ভাস্কর্য যে নষ্ট হয়েছে, চুরি গেছে, লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে, তার খবরই কেউ রাখে না। ছবিটির নীচে তার নাম খোদাই করা আছে। নাও, কফি খাও। তোমার মুখ ব্যাজার দেখলে এত খারাপ লাগে! সকালে এলে না, কী যে খারাপ লাগছিল, এত করে বললাম, দু'-একদিন থাকো, ঘুরে দেখাই সব। তোমার সময়ই হচ্ছে না।

সকালেই জাহাজে খবর রটে গেল, চার্লি নিখোঁজ। চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাপ্তান-বয় হন হন করে হাঁটছেন। কাপ্তান, চিফ মেট নেমে আসছেন বোট-ডেক থেকে।

সবার এক প্রশ্ন, জাহাজে এ কী অরাজকতা শুরু হল?

বোটে মাস্তার পড়ে গেল। কাজকাম ফেলে সবাই বোট-ডেকে হাজির। সেকেন্ড মেটের হুকুম, কিনারার কোনও লোক জাহাজে উঠবে না। জাহাজে মাল ওঠা-নামার কাজ বন্ধ।

টাগবোটগুলি ফিরে যাচ্ছে।

যারা উঠে এসেছিল, তাদেরও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুহাস অস্থির হয়ে উঠছে। মাস্তারে সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, না দাঁড়িয়ে উপায় নেই, কাপ্তানের হুকুম, সে কী করবে বুঝতে পারছে না, চার্লির তো এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা না।

তবে চার্লি ভাল ছিল না।

ভাল আর কবে ছিল!

রাতে সে একবার কেবিনে নক করলে দরজা খুলে উঁকি দিয়েছিল চার্লি। চোখ-মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখলে ভয় হবার কথা। দরজা খুলে তাকে ভিতরে ঢোকার রাস্তাও করে দিয়েছিল। চার্লির ঘরে পর পর ক'টা অদ্ভুত ছবি টাঙানো। মনে হয় সে সারা বিকেল-সন্ধে ছবিগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অন্য দিনের মতো ছবিগুলি দেখে সুহাসের কোনও মন্তব্য সে যেন আশা করেনি। তাকে দেখে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, কথা বলতে গেলেই চার্লির গলা ধরে যাচ্ছে।

কী হয়েছে, বলবে তো।

কিচ্ছু হয়নি।

তোমার বাবা এখনও ফেরেননি?

না। ফিরবেন, সময় হলে ফিরবেন।— কাটা কাটা কথা।

কিছু ভাল লাগছিল না, মুখার্জিদা ফিলের কাছে গেছেন। দ্বীপের রাস্তা ঘাটও তো ভাল না। চিন্তা হয় না বলো। তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। মনে হয় মুখার্জিদা আততায়ীকে এবার ঠিক কব্জা করতে পারবেন।

কোনও কথা শোনার যেন চার্লির কোনও আগ্রহ নেই।

এত রাতে বোট-ডেকে গিয়ে সুহাস অন্যায় করেছে। চার্লির কথাবার্তায় ক্ষোভের আভাস ছিল।

তোমার কোনও শিক্ষা হবে না দেখছি। কেন আসো! আর আসবে না। এত রাতে বোট-ডেকে কখনও আসবে না।

ঠিক আছে। আসব না।

বলে দরজা খুলে বের হতে চাইলে খপ করে হাত ধরে ফেলেছিল। তারপর নানা কথা, একেবারে স্বাভাবিক। সে খেয়েছে কি না জানতে চেয়েছে। মুখার্জি ঠিক ফিরে আসবেন, ভেবো না— এই বলে আশ্বস্ত করেছে। বলেছে, ইট হ্যাজ বিন মাই জয় টু লার্ন দ্য ডাইভারসিটি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। নিউ মেক্সিকোর ডগউড, ভারজেনিয়ার রডোডেনড্রন, নিউ ইংলন্ডের ব্লু ফ্ল্যাগস থেকে প্রেইরির গোল্ডেন রড কিছুই বাদ ছিল না।

হেসে বলেছিল, আই অ্যাম নট এ বোটানিস্ট, আই অ্যাম জাস্ট অ্যান এনজয়ার। তবে জানো কোনও বন্য প্রান্তরে ঢুকলেই, আই ফিল এ সেনস অফ আরজেনসি। কী বলো? সবারই দরকার না, জীবনের চারপাশে থাকুক কোনও সুন্দর ল্যান্ডস্কেপস? সবুজ গাছপালা জীবনে কত দরকার, তাই না! ইফ উই ডোন্ট, উই মাইট ফরফিট হিজ প্রেসাস হেরিটেজ।

সে বলেছিল, উঠছি।

আরে বোসো না! জানো আমার ঠাকুরদার খুব আক্ষেপ, বিশ হাজার রকমের বুনো ফুলের মধ্যে তার নাকি সংগ্রহ ছিল মাত্র দু' হাজার আটশোর কিছু বেশি। জানো টেকসাসেই পাঁচ হাজার রকমের বুনো ফুল আছে। ঠাকুরদা কী বলতেন জানো, উই লিভ ইন দ্য শ্যাডো অফ ডিজাস্টার। তিনি জানো, জন মুরের খুব ভক্ত।

জন মুর? সে কে?

জন মুরের নাম জানো না? দ্য ফার্স্ট গ্রেট আমেরিকান অ্যাডভোকেট ফর ওয়াইলডারনেস। ভেরি পপুলার রাইটার অ্যান্ড ন্যাচাবেলিস্ট। ওঃ সুহাস, আমি যদি ক্যাডো লেকে ফিরে যেতে পারতাম, সঙ্গে তুমি? দারুণ! দারুণ মজা হত!

সেই মেয়েটা কথা নেই বার্তা নেই, নিখোঁজ!

মাস্তারে সবার সঙ্গে সেও দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সুরঞ্জন, অধীর। সবার মুখ গম্ভীর। সুরঞ্জন মাঝে মাঝে তার কাঁধে হাত রেখে যেন সাহস দিয়ে যাচ্ছে। এইসময় ভেঙে পড়লে চলবে না সুহাস। চার্লি কোথায় যেতে পারে? চার্লিকে কিডন্যাপ করা হয়নি কে বলবে? কাপ্তানের চাতুরি হতে পারে। তিনি জানেন, তার সর্বস্ব গেছে। ডরোথি ক্যারিকোর গুপ্তধন গেছে, মুখার্জিদার ইনস্টিংক্ট প্রবল। না হলে তিনি কিপার অফ দ্য রেকের কাছে ছুটে যাবেন কেন? কাপ্তান দ্যাখ আরও কী চাল চালে! ভেঙে পড়িস না।

তারা কেউ নডতে পাবছে না। হুকুম না হলে বোট-ডেক থেকে কারও নেমে যাবার সাধ্য নেই। সবারই মুখ চুন। দু'লাইনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ডেক আর ইঞ্জিন-জাহাজিরা। দুই সারেং চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন। কাপ্তান, চিফ মেট নেমে গেলেন কখন। তারা পিছিলে গেছেন, কাপ্তানের সঙ্গে চিফ মেট সেকেন্ড মেট থার্ড মেটও নেমে গেছেন। ওদের মাস্তারে, দাঁড় করিয়ে রেখে চার্লিকে তাবা বোধ হয় জাহাজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

অধীর বলল, বংশী কোথায়?

তারপরই দেখা গেল বংশী লাইন ছেড়ে দিয়ে উইন্ডস-হোলে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আছে এই যথেষ্ট। বংশী সারেং, টিন্ডাল এমনকী মুখার্জিদাকেও আজকাল পাত্তা দিচ্ছে না। কাপ্তান, চিফ মেট সবাইকে তারা নিগ্রহের কারণ ভাবছে। বংশী আসায় সুরঞ্জন কিছুটা নিশ্চিন্ত।

শুধু তাদের একজন মাস্তারে নেই। মুখার্জিদা।

কাপ্তান নাম ডাকতে পারেন। কাজের সময় জাহাজ ছেড়ে যাবার হুকুম নেই। কাজ থেকে ছুটি মিললে যে যেখানে খুশি যেতে পারে, ময়ফিলও করতে পারে, কোনও রমণীকে নিয়ে তখন জাহাজে উঠে এলেও দোষের না, কিন্তু কাজের সময় জাহাজে মুখার্জি নেই কেন? কাপ্তান এমন অভিযোগ অনায়াসে তুলতে পারেন। কোথায় গেল! খোঁজো তাকে! সেই নরাধম, যদি কাপ্তান অভিযোগ কবেন, চার্লিকে তিনিই কিডন্যাপ করেছেন!

সুরঞ্জন বলল, মুখার্জিদা কখন ফিরবেন, কিছু বলে গেছেন তোকে?

যদি সুহাস কিছু বলতে পারে।

সুহাস ভাল নেই। কে ফিরল, না ফিরল তা নিয়েও তার মাথাব্যথা নেই। সে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই আছে। সে কারও কথাই মনে করতে পারছে না।

সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেডাচ্ছেন কাপ্তান। চার্লি গেল কোথায়? থার্ড মেট সঙ্গে। হাতে একগোছা চাবি। কেবিনগুলি খুলছেন, বন্ধ করছেন। ইঞ্জিন-রুমে নেমে গেলেন। টর্চ জ্বেলে দেখলেন। স্টোক-হোলডে ঢুকে গেছেন। কয়লার বাংকারে। না, চার্লি জাহাজের কোথাও লুকিয়ে নেই।

তিনি শেষে বোট-ডেকে উঠে সব অফিসাব-ইঞ্জিনিয়ারদেরও মাস্তারে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সবাই হাজির।

তিনি যে ব্যাকুল, তার চলাফেরাতে টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তার মাথাতেও বোধহয় কিছু নেই, কোথায় থাকতে পারে চার্লি, এমনও ভাবতে পারেন। বিচলিত এবং অস্থির হয়ে পড়লে যা হয়, ছুটে যাচ্ছেন চার্লির কেবিনে, আবার দরজা টেনে চলে আসছেন, ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন বোঝা যায়। এবার সবার নাম ধরে ডাকছেন, জাহাজে কে আছে কে নেই।

দেখা গেল, মুখার্জি নেই।

চিৎকার করে ডাকলেন, ডেক-সারেং।

ডেক-সারেং ছুটে গেলেন, গুডমর্নিং হুজুর।

কোথায় মুখার্জি?

তিনি জানেন, মুখার্জি কিনারায় গেছেন। রাতে ফিরবেন না বলে গেছেন। সুতরাং মুখার্জিদা জাহাজে নেই কিনারায় গেছে, রাতে ফেরেননি! এর চেয়ে বেশি কিছু জানেনই না।

কোথায় গেছে?

কথা আছে তো হুজুর হরসাগামে যাবে। তারপর কোথায় গেছে জানি না।

ডেক-সারেং ভয়ে কাঁপছেন। অভিযোগ তার বিরুদ্ধেও উঠতে পারে, তুমি ডেক-সারেং, জানবে না, কে কোথায় গেছে, কখন ফিরবে? জাহাজে কামকাজ করে চুল পাকিয়ে ফেলেছ, এমন বেআইনি কাজ হয় কী করে?

কোথায় তার ডিউটি? কখন তার ডিউটি?

রাতে। গ্যাংওয়েতে।

সারেং সাব রীতিমতো নার্ভাস। কারণ কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করলেন।

তার মানে, রাতে কেউ তবে গ্যাংওয়েতে পাহারায় ছিল না! কে নেমে গেল, উঠে এল হিসাব নেই।— তিনি চিৎকার করে উঠলেন দু' হাত উপরে তুলে, আই নিড ইয়োর হেলপ।

সারেংকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, কী করতে আছ জাহাজে? কেন আছ? চার্লি কোথায় জবাব দাও। কে তাকে অপহরণ করেছে জবাব দাও!

সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি। শীতল চোখ তার, মৃত মানুষের মতো চোখ, সাদা ঘোলাটে, তিনি এগিয়ে আসছেন। সুহাস হতবুদ্ধি। তার মনে হচ্ছিল দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

সুবঞ্জন বলল, শালা যত্তসব নাটক। চার্লি জাবজ সন্তান, না হলে জাহাজ ছেড়ে পালায়? কথা রাখে না? কার সঙ্গে পালাল? কাপ্তান কী ভেবেছে? এই তোর 'সুহাস, আই অ্যাম অ্যালং উইথ ইয়ো, ইভিন টু দি এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড'? সবই দেখছি নাটক। কার কথা বিশ্বাস করব? জারজ সন্তান না হলে এত বড় নাটক করতে পারে না। শেষে আমাদের ফাঁসিয়ে গেল। হাবামজাদি ইতর মেয়েছেলে।

সুহাস আর পারছে না। সে সুরঞ্জনকেই ঘুসি মেরে বসল।

খবরদার! চার্লিকে অসম্মান করলে মেরেই ফেলব।

আরে, করছে কী ছোঁড়া? হাতাহাতি? তাও খোদ কাপ্তানের সামনে? মাথাটি গেছে, কিচ্ছু নেই। নিজের পরিণামের কথাও ভাবছে না। ছোঁড়া যে মরবে!

সব জাহাজিরা প্রায় ছুটে যাবে ভাবছিল। কাপ্তান সুহাসের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। জুতোর গট গট শব্দ উঠছে। পুরো ইউনিফরম পরা। কতটা বিভীষিকা, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করছে না। ইঞ্জিন-সারেং খুবই বিব্রত বোধ করছেন। সুরঞ্জন ঘুসি হজম করে গেছে। কারণ সে তো জানে, চার্লির কোনও নিন্দে-মন্দ সহ্য করার ক্ষমতা সুহাসের নেই। চার্লি নিখোঁজ, আর তখন সে চার্লিকে কুৎসিত কথা বলে অপমান করেছে। লাইনের শেষ মাথায় বলে তার কথা কারও কানে যাবার কথা না। সুহাস এক ঘুসি মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে ইচ্ছে করলে চার্লির সম্মান-রক্ষার্থে গোটা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

সুরঞ্জনের কোনও অভিযোগ নেই। সে রাগও করেনি, তার উচিত হয়নি এভাবে সব না জেনেশুনে চার্লিকে খাটো করে দেখা। সুহাস না পাগল হয়ে যায়! হয়নি কে বলবে?

তখনই সুহাসের সামনে চিৎকার, হাই!

সুহাস মাথা তুলে একবার শুধু সোজাসুজি তাকাল। তারপর মাথা নামিয়ে নিল।

চার্লি কোথায়?

জানি না।

জানো। আমি বলছি, জানো। ইউ নো।

জানি না, জানি না।— সুহাস চিৎকার করে উঠল।

মিছে কথা। সব ক'টাকে দড়িতে ঝোলাব! আনসার মি, সে কোথায়? চার্লির ঘরে রাতে ঢুকে কী করছিলে? আনসার মি। সে কিছু বলেছে তোমাকে?

বলেছে।

কী বলেছে?

জীবনের চারপাশে থাকুক সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। সে গাছপালা ভালবাসে। বলেছে, ইট হ্যাজ বিন হাব জয় টু লার্ন দ্য ডাইভারসিটি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। সে ফুল ভালবাসে। সে গাছের সঙ্গে, পাহাড়েব সঙ্গে, নদীর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। বনজঙ্গলে তার ঘুরে বেড়ানো নেশা। বলেছে, শি ইজ ওনলি এনজয়ার। কোনও বন্য প্রান্তরে ঢুকলেই শি ফিলস এ সেনস অফ আরজেনসি।

হোয়াট!

ইয়েস, শি ইজ ওনলি এনজয়ার।

ইউ হেল, শি ইজ ওনলি এনজয়ার?

ইয়েস স্যার, শি ইজ... নট হি।

কাপ্তানের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জোঁকের মুখে নুন ঢেলে দেবার মতো সবাই দেখল তিনি গুটিয়ে গেছেন। তাঁর যেন হেঁটে যাবারও ক্ষমতা নেই। একজন নেটিভের এত আস্পর্ধা তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। শি, নট হি। সব জাহাজিদেরই মনে হল সুহাসের দুঃসাহসই বলতে হবে। কাপ্তানের বাচ্চাটি যে পুত্র নয়,কন্যা, শি বলে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই তাকে হি বলাতে পারেনি। মুখে মুখে তর্ক। কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা রাখে সুহাস, সুরঞ্জনও বিশ্বাস করতে পারছে না। সিঁড়ি ধরে কোনওরকমে যেন ব্রিজে উঠে যাচ্ছেন কাপ্তান।

অভয় দেবার জন্য সুহাসের কাঁধে ফের হাত রাখল সুরঞ্জন।

সুহাস কাঁধ থেকে সুরঞ্জনের হাত নামিয়ে দিল। সে যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চার্লি নিরুপায় না হলে জাহাজ ছেড়ে পালাত না। কোথায় কোন বনজঙ্গলে হারিয়ে যাবে, ইস্, সে যদি তখন চার্লির কথায় সামান্য গুরুত্ব দিত! চার্লির এমনিতেই বনজঙ্গলের নেশা আছে। একবার বুনো ফুলেব জঙ্গলে কিংবা আখের জঙ্গলে ঢুকে গেলে তাকে নড়ানো যেত না। আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফট অফ মাই চাইল্ডহুড। কত কথা বলত। তাকে যেন হাত-পা বেঁধে জাহাজে ফেলে রাখা হয়েছে। বনজঙ্গলের ভিতর চার্লির স্বাভাবিক সৌন্দর্য কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার চোখ ফেটে জল বেব হয়ে আসছে।

তখনই কাপ্তান আবার নেমে আসছেন ব্রিজ থেকে। তাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। জাহাজিদের সামনে এতটা বিচলিত হয়ে পড়া বোধ হয় তাঁর ঠিক উচিত হয়নি। ব্রিজে উঠে গেলেই চারপাশের কিনাব। বনজঙ্গল পাহাড় চোখে পড়ায় তিনি নিজেকে হয়তো সামলে নিতে পেরেছেন।

চিফ মেট হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, রেডিয়ো অফিসার মাস্তারে আসেনি। সে কোথায়!

সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার দৌড়ে গেল।

উইলিয়াম কোথায়?— খুঁজছে।

সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ঘাড় ফিরিয়ে কী দেখলেন, সত্যি তো উইলিয়াম আসেনি। ভাগ্যিস কাপ্তানেব চোখে পড়েনি। উইলিয়াম কি জানে না বোট-ডেকে মাস্তার দেবার হুকুম হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক হলে যা হয়। জাহাজে কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না। যতটুকু দরকার, তার বেশি না। সে হয়তো খববই রাখে না। তিনি চিমনি পার হয়ে ট্রানসমিশান-রুমের দিকে গেলেন। তারপর কেবিনে। কেবিনের দবজা বন্ধ। ডাকলেন, উইলিয়াম কী করছ? এই উইলিয়াম!

সাড়া নেই।

জোরে দরজা ধাক্কালেন।

না, সাড়া নেই। সেকেন্ড আব মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে ছুটে এলেন। চিফকে বললেন, দরজা বন্ধ, উইলিয়াম বোধ হয় কেবিনে নেই।

মাস্তারে রেডিয়ো অফিসার আসেননি। এবার সব জাহাজিদেরই নজরে পড়ল, মার্কনি সাব মাস্তাবে আসেননি। কেন মার্কনি সাব এলেন না, কোথায় তিনি, এবং কাপ্তানের কাছে খবর যেতেই থার্ড মেটকে সঙ্গে নিয়ে কেবিনে গেলেন। ডুপ্লিকেট চাবির গোছা থেকে নম্বর মিলিয়ে কেবিনের চাবি বের করতেও যেন পারছিলেন না।

ইয়ো পুওর ডেভিল!— বলে কাপ্তান কেড়ে নিলেন চাবির গোছা। চাবি খুঁজে দরজার লক আলগা করতেই দেখলেন, না, কেউ নেই। সবাব ধারণা, মার্কনি সাব যদি কিছু একটা করে বসেন। কাপ্তান দ্রুত

ঘরে ঢুকে গেলেন, জাহাজিরা মাস্তার ভেঙে ছুটে আসছে। এখন যা পরিস্থিতি, কার কখন কপালে কী ঘটবে কেউ যেন বলতে পারে না। চিফ মেটের ধমক খেয়ে সবাই থমকে গেল।

মার্কনি সাব ট্রানসমিশান-রুমে নেই। কেবিনে নেই। কোথায় গেল? তিনি কিনারায়ও নামেন না।

আবার তোলপাড়। বোটের মাস্তার ডিসমিস করে দেওয়া হয়েছে। জাহাজিরা যে যার মতো ভেবে নিচ্ছে। কিনারার আকর্ষণে বন্দরে জাহাজ ভিড়লে যখন-তখন জাহাজিরা নেমে যায়। মার্কনি সাব আর চার্লি দু'জনে মিলেই তবে ভেগেছে। কাপ্তানের পুত্রটির চরিত্র-দোষও আছে। কারণ তারা দেখেছে, বন্দর এলে সুহাসকে নিয়ে খারাপ জায়গায় যেত।

কত যে গুজব চাউর হয়ে যেতে থাকল।

অধীর বলল, আপনি জানেন, চার্লি সুহাসকে নিয়ে খারাপ জায়গায় গেছে?

দু' নম্বর সুখানি বলল, দ্যাখো বাবু, জাহাজে কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেল। সব বুঝি। বন্দর এলে রোজ নেমে যাবার নেশা কেন বোঝো না? কীসের নেশা? জাহাজিবা পাগল হয় কীসের নেশায়? সুহাসকে কত বারণ করেছি, বাপজি যাস না। গোরাদের সঙ্গে মিশিস না। জাত ধর্ম আছে! যা পায় তাই খায়। জন্মের ঠিক আছে গোরাদেব! আমরা জানি না মনে কবো? বিধর্মী, বেজাত, মা বোন মানে না, তার সঙ্গে তুই মিশে গোল্লায় যাচ্ছিস। মুখার্জিবাবুকে পই পই কবে বলেছি, বাঙালিবাবুকে সামলান, শেষে কী আকাম-কুকাম করে বসবে! শত হলেও বয়সের দোষ, বোঝেন না? কে শোনে কার কথা! কাপ্তানের ব্যাটা কার পাল্লায় পড়ে দ্যাখো দেশান্তরি হয়েছে।

অধীর বুঝল, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আর এ সময় বংশীর উদয়, সে পা টিপে টিপে হাঁটছে। পিছিলে উঠে আসার সময় সিঁড়ির রেলিং ঝাঁকিয়ে দেখছে, নডবড়ে রেলিং-এ হাত রেখে উঠতে গিয়ে যদি জখম হয়। এমনকী সিঁড়িও ভাঙছে পা টিপে টিপে। সে কেবল বলছে, ভাল না, কিছুই ভাল না। বলা যায় না কোথায় কে কখন হাপিজ হয়ে যাবে। আসলে জাহাজে হাপিজের পালা শুরু। শয়তান জাহাজটারই কাজ। গিলে খাচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। কী মজা! বুড়া জানে দাঁত উঠেছে, কারে খায়, কে যায় দ্যাখো। সুহাস দেখছি বেপরোয়া, আরে তুই শয়তানের পাল্লায় পড়ে গেছিস! তোকে ইঞ্জিন-রুমের ট্যাংকে কে চুবিয়েছে? তোরা মনে করিস আমরা কানা? আমার চোখকে ফাঁকি দেয় কোন শালা? হজম করতে পারল না। কাপ্তানেব ব্যাট' ইঞ্জিন-কমে নেমে গেল। হজম হয়ে গেল নিজেই।

বংশীর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে রোজ ধূপ-ধুনো দিচ্ছে। যে-কোনওভাবে এ যাত্রা রক্ষা পেলে সে আব যে জাহাজে উঠছে না, বার বার কসম খেয়েছে। সুতবাং অধীব নেমে গেল নীচে। সুরঞ্জন সুহাসকে নিয়ে আগেই নীচে নেমে গেছে। চার্লি শেষে মার্কনি সাবের সঙ্গে ভেগে গেল? তার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

সে নেমে দেখল, সুহাস মুখার্জিদার বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছে. সুরঞ্জন পাশের বাংকে দু' হাতে মাথা রেখে বসে আছে। মুখার্জিদা না থাকলে কত অসহায় তারা, দু'জনের বসে থাকা, শুয়ে থাকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। চার্লি আব মার্কনি সাবকে নিয়ে নানা কথারও ওড়াউড়ি।

সুহাস উঠে দরজা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়ল। বাইরের ওড়াউড়ি কথাবার্তা সে সহ্য করতে পাবে না। চার্লির রহস্যময় অন্তর্ধানের হেতু কি সে? চার্লি কি বুঝেছিল জাহাজে থাকলে তার নিগ্রহ বাড়বে? সে না থাকলে সুহাসের ক্ষতি করার কেউ চেষ্টা করবে না। সুহাসকে বাঁচাবার জন্যই কি চার্লি নিখোঁজ হয়ে গেল? না এটা অপহরণ? মার্কনি সাব চার্লিকে অপহরণ করে ভেগে গেলেন?

চার্লিকে নিয়ে জাহাজের রহস্যটাও বোঝা যাচ্ছে না, সুহাস উঠে বসল। জামা গায়ে দিল, প্যান্ট পবল। জুতো পরার সময় সুরঞ্জন আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

জামা-প্যান্ট-জুতো পরে কোথায় বের হচ্ছিস?

দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

আব তখনই মনে হল, সিঁড়ি ধরে কেউ নেমে আসছে। কে। মুখ বাড়িয়ে অধীর দেখল সারেং সাব। তাঁর হাতে একটা লম্বা কাগজ। কাগজটা দেখিয়ে বললেন, কাপ্তানের হুকুম, সুহাসকে আটকে রাখতে হবে।

সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লা মুবারক। চিন্তা করিস না। আমি তো জানি তুই কোনও

খারাপ কাজ করতে পারিস না। কাপ্তান, চিফ মেট বাইরে নেমে গেছেন। মাদাঙে খবর দিয়েছেন। পুলিশ-ফাঁড়িতে যাবেন।

সুহাস বসে পড়ল।

আমি কী করেছি!

কী করেছিস জানি না। হুকুম তামিল করলাম। আমার কোনও কসুর নেই।

আর তখনই কেন যে সুহাসের মনে হল, চার্লিকে কেউ জোর করে মোটর-বোটে তুলে নিচ্ছে। তাকে নিয়ে দ্বীপ থেকে পালাচ্ছে। চার্লি পাগলের মতো যেন চিৎকার করছে। মার্কনি সাবের মুখও সে ভাল চেনে না। কেবল একটা অতিকায় বীভৎস মানুষের শরীর তার সামনে নাচানাচি করতে থাকল।

সে ভেঙে পড়ল, মুখার্জিদা, চার্লিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

অধীর সুরঞ্জন বলল, এত ভেঙে পড়লে চলে?

প্রিয়জন নিখোঁজ হয়ে গেলে দুর্ভাবনার শেষ থাকে না। শত্রুও যা ভাবতে পারে না, প্রিয়জনের জীবন-আশঙ্কায় মনের মধ্যে তা উঁকি দেয়। সুহাস সত্যি ভেঙে পড়েছে। জাহাজ থেকে যে নেমে যাবে, খোঁজাখুঁজি করবে, তারও উপায় আর থাকল না।

সুহাস নিজের ফোকশাল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। কাপ্তান কি পাগল হয়ে গেলেন? শেষে সুহাসকে তিনি সন্দেহ করছেন ! সুহাস কখনও পারে? এতটা তার ক্ষমতা আছে? সুহাস চার্লিকে কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে একবার ভেবে দেখলেন না! সামান্য একজন জাহাজির কী ক্ষমত', তিনি তো ভালই জানেন।

কেন যে মুখার্জিদার উপর তার রাগ গিয়ে পড়ল, সুরঞ্জন বাংকে থাপ্পড় মেরে বলল, বোঝো এখন। চার্লি-রহস্য উদ্ধারে গেলে, আর সেই চার্লিই নিখোঁজ! তাকে নিয়ে মার্কনি সাব ভেগে গেছে। অপহরণ, না ভাব-ভালবাসা কিছুই বুঝছি না।

জাহাজে কাজকাম বন্ধ থাকলে যা হয়, সর্বত্র গুলতানি, চার্লিকে নিয়ে কারও দুর্ভাবনা নেই। উৎপাত গেছে, রক্ষা পাওয়া গেল, এমনও ভাবছে কেউ। কেউ দেশ-বাড়ির গল্পে মেতে গেছে। জল্পনা-কল্পনারও শেষ নেই। এবারে কাপ্তান জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হবেন। তার তো আর কেউ থাকল না।

দুপুরের খাবার সুরঞ্জন নীচে নামিয়ে আনল। অধীর, কেষ্ট, সুরঞ্জন খাচ্ছে। সুহাসকে খাওয়ানো গেল না।

অধীর বলল, না খেলে চলবে? আর মুখার্জিদাই বা কীরকম? ফেরার নাম নেই! তারা বার বার উপরে উঠে রেলিং-এ দাঁড়িয়ে দেশি নৌকাগুলি দেখছে, মোটর-বোটে যদি আসেন। কিনারার রাস্তায়ও চোখ গেছে। তবে মানুষজনের ভিড়ে এত দূর থেকে তাঁকে আলাদা করে চেনার সুযোগ কম।

কী যে তারা করে! সুহাস চুপচাপ পড়েই আছে। তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তারা বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে, ঘাবড়ে গেলে চলবে? দ্যাখ মুখার্জিদা কী খবর নিয়ে আসে। চার্লিরও প্রশংসা করছে। চার্লি তাকে আগলে রেখেছিল, চার্লি না থাকলে কী যে হত। আরে, তুই বুঝছিস না, চার্লির তুই গ্লিটারিং সোর্ড? সোর্ডটি সে সহজে হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না। নে ওঠ। খা।

কত কথাই না বলছে তারা। সারেং সাবকে বলাও যাচ্ছে না, দেখুন গে সুহাস কিচ্ছু মুখে দিচ্ছে না। সারেং সাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন।

চার্লি তোর কে হয়? বল!— আবার বলতে পারেন, ভয় ধরে গেছে। চার্লি নেই, মার্কনি সাব নেই, আবার কে থাকবে না, এই আতঙ্ক! চার্লি ঠিক ফিরে আসবে। মার্কনি সাবও। কোথাও কিনারায় হয়তো বিনা নোটিসে নেমে গেছে। ঘাবড়ালে চলবে!

বংশীর যেন পোয়াবারো। তার কথাই ঠিক। ভুতুড়ে জাহাজ। ঘরে ঘরে উঁকি দিচ্ছে। সঙ্গে লতিফ। দু'জনেই বলছে, মুখার্জিবাবু মিছে কথা বলেছে, চাবি খোঁজা হচ্ছিল। বুঝছেন না মিঞারা, সুহাসকে জাহাজের শয়তান ট্যাংকে ঢুকিয়ে মারতে চেয়েছিল। পারেনি। স্রেফ ধাপ্পা মুখার্জির। জানে বাঁচতে চান তো জাহাজ ছেড়ে দিন! চার্লি কেন পালাল বুঝছেন না? কোন আতঙ্কে মার্কনি সাব হাওয়া? অদৃশ্য সেই শয়তান লুকেনার। তার আতঙ্কে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে সব। বোট-ডেকে মধ্যরাতে নারী আসে

কোত্থেকে? আহামদ বাটলার বরফ-ঘরে লাশ দ্যাখে কী করে! বলেন আপনারা! আবার কে নাকি এক বুড়ো মানুষ, বরফের মতো সাদা দাড়ি, মরা মানুষ হেঁটে বেড়ায়। কখনও শুনেছেন, জাহাজে মরা মানুষও উঠে এসেছে? দিনের বেলায় ঘাপটি মেরে থাকে, রাতে ঘুরে বেড়ায়। এই হারামজাদা মগড়া, বল, তুই তো জানিস!

মগড়া ছুটে পালাল।

না না, আমি কিছু জানি না। আমি কিছু দেখিনি।

এইসব নানা উপদ্রবের মধ্যে মুখার্জি যখন জাহাজে উঠে এলেন, তখন প্রায় গভীর রাত।

আর তিনি ফিরতেই হল্লা। পিছিলে লোকজন জমে গেছে। কে আগে খবরটা দেবে। তাঁকে ফোকশালে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাঁকে ঘিরে রেখেছে সবাই। যার যা খুশি বলে যাচ্ছে, কাপ্তান তাঁর খোঁজ করেছেন, সুহাস কাপ্তানের মুখে মুখে তর্ক করেছে, মার্কনি সাব নিখোঁজ, সবাই এক-এক করে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। প্রাণে বাঁচতে হলে তাদেরও জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে, না হলে রক্ষা নেই, ঘোঁট তবে ভালই পাকিয়েছে বংশী!

মুখার্জি সাব সবাইকে আশ্বস্ত করলেন, ঠিক আছে, জাহাজ ছাড়তে চাও তো সবাই মিলে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তিনি দেখলেন, ভিড়ের মধ্যে সুহাস সুরঞ্জন অধীর কেউ নেই। চার্লি নিখোঁজ কেন? এ তো আর এক বিড়ম্বনা। মার্কনি সাব নিখোঁজ। চার্লি-রহস্য, কল্লিজ-রহস্য, গুপ্তধন-রহস্য, সবই যে তিনি জেনে এসেছেন। তার সব আনন্দ চার্লির নিখোঁজ হওয়ার খবরে বৃথা হয়ে গেল। তিনি সহসা কেন যে খেপে গেলেন, বাস্তা ছাড বংশী! রাস্তা ছাড় বলছি! যা ঘরে যা। বাইরে ফের দেখেছি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। ঘোঁট পাকানো হচ্ছে!

তার আর কথা বলতেও ভাল লাগছিল না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন, সুহাস শুয়ে আছে। অধীর-সুরঞ্জন সুহাসকে পাহারা দিচ্ছে।

মুখার্জি দরজা বন্ধ করে জামা-প্যান্ট ছাড়লেন। বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ফিরলেন। কারও সঙ্গে আর যেন একটা কথাও বলবেন না। বাংকে বসে শুধু বললেন, জাহাজে তবে সত্যি অরাজকতা শুরু হয়ে গেল।

সুরঞ্জনকে বললেন, সময় নেই, সংক্ষেপে বল।

সুরঞ্জন যা জানে বলল, চার্লি হাওয়া! মার্কনি সাব হাওয়া!

অধীরকে বললেন, তোব কী বলার আছে?

অধীর যা জানে বলল।

সুহাসের দিকে তিনি তাকালেন না। তাকালেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। আরে, তুই কী? এখন শুযে থাকার সময়? ঘর থেকে তোর বের হওয়া নিষেধ! কে মানে? লাথি মেরে ভেঙে দিতে পারলি না সব? শুয়ে আছিস! জলগ্রহণ করিসনি! তুই মানুষ। মেয়েটা কোথায়, কে নিয়ে ভেগে গেল, মার্কনি সাবের যে চক্রান্ত নয় কে বলবে? কত ধনসম্পদের মালিক চার্লি জানিস!

কিন্তু তিনি জানেন, মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই।

বল সুহাস? তারপর?

চার্লি ফুলের কথা বলেছে।

আর কী বলেছে?

তার ঠাকুরদার কথা বলেছে। দেয়ালে ফের ছবি এঁকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

থেমে গেলি কেন? তারপর, কুইক!

তারপর আর কিছু জানি না।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জি টর্চটা নিয়ে বোট-ডেকে ছুটলেন। সুটের মুখ পাটাতন ঢাকা আছে কি নেই, চার্লি সুটের মুখে ঝুঁকে এত কী দেখত? ঘর থেকে বের হবার সময় সুরঞ্জন বলল, একা যাবে না।

বলে সে-ও উঠতে গেলে এক ধমক, ওখানে কি তামাশা? যাচ্ছি চুপচাপ। সঙ্গে যেতে চান!

মুখার্জি উঠে যাবার সময় দেখলেন, এখনও জাহাজিরা অনেকে জেগে আছে। সবার মুখ ব্যাজার।

কী যে হচ্ছে জাহাজে! টর্চটা আড়াল করে উঠে গেলেন। ডেক-এ উঠে দেখলেন, শুনশান। একটা পাখি পর্যন্ত মাস্তুলে বসে নেই। ফলকাগুলি সব খোলা পড়ে আছে। এখানে-সেখানে ফসফেট তোলার পিপে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জাহাজের লন্ডভন্ড অবস্থা। এলিওয়েতে আলো জ্বলছে, কিন্তু কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না। চিফ কুকের গ্যালিতেও কেউ নেই। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে চার্লির দরজা খুলতেই অবাক। একের পর এক ছবি দেয়ালে। ছবিগুলি দেয়াল থেকে তুলে নিলেন। কাজে লাগতে পারে। একটা বান্ডিল বগলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। কেবিনের পাশেই উইন্ডস-হোল, তার পাশে সুটের মুখ, সেই ছোট্ট পাটাতন। কয়লা ফেলার সময় পাটাতন তুলে নেওয়া হয়। তারপর খোলের তলায় বাংকারগুলিতে কয়লা হুড়হুড় করে পড়তে থাকে।

তিনি খুব সন্তর্পণে কাজ সারছেন। টর্চ জ্বালতেই দেখলেন, ক'টা পেতলের ছোট বল যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পেতলের বলগুলি কুড়িয়ে নিলেন। পাটাতন বন্ধ। এবং সংশয় থেকেই তাঁর এই অনুসন্ধান। চার্লি কি শেষ পর্যন্ত...

না, ভাবতে পারছেন না। হাঁটু মুড়ে পাটাতন আলগা করে এক হাতে ধরে রাখলেন, ডান হাতে পকেট থেকে টর্চ বের করে বাংকারের খাদে ফোকাস মারতেই শরীর হিম হয়ে গেল।

সুটের তলায় বিশ-পঁচিশ ফুট গভীরে একটা লোক মরে পড়ে আছে। আরে, এটা কী দেখছেন! কে যেন তার পাশে এসে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে সুটের মুখে। ঝুঁকে দেখছে।

কে? কে?

বংশী ছুটছে।

আবার মরেছে, জাহাজে আবার মরেছে। জাহাজে আবার খুন।

সে ডেক-এ নেমে পাগলের মতো দু' হাত তুলে ছুটতে গেলে মুখার্জি খপ করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন।

খবরদার, চিল্লাচিল্লি করবি তো ঘুসি মেরে সব ক'টা দাঁত খসিয়ে দেব। বাড়াবাড়ি করলে তোকেও খুন করে জাহাজে পুঁতে দেব।

সুরঞ্জন আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সুহাসও তাড়া লাগাচ্ছে, কোথায় ছুটে গেল দ্যাখ। কখন তো গেল! আসছে না কেন?

অধীর পায়চারি করছিল। সিঁড়ি ধরে নেমে এলে বোঝা যাবে, সবাই সিঁড়িতে শব্দ শোনার অপেক্ষা করছে।

সুরঞ্জন বলল, যা না উপরে। গিয়ে দ্যাখ।

আমি পারব না। ভয় করছে।— ভয়ে কাঠ অধীর।

তবে বোস এখানে। আসছি।— বলেই সুরঞ্জন ডেক-এ উঠে দেখল প্রায় শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ। মুখার্জিদা বংশীর চুল ধরে টেনে আনছেন। বংশী হাতে-পায়ে ধরেও রেহাই পাচ্ছে না।

লোক খেপানো হচ্ছে? আমাকে ফলো করা হচ্ছে? হতভাগা! কোনও আর কাজ নেই, আমার পেছনে লাগা! বল যা দেখেছিস, ভুলে যাবি। কাকপক্ষী টের পেলেও রেহাই নেই।

সুরঞ্জনকে দেখে আরও খেপে গেলেন তিনি, আরে, আমি তো যাচ্ছি। আমার পেছনে তোরা জোঁকের মতো লেগে আছিস!

তুমি বংশীকে নিয়ে পড়লে?

মুখার্জি বংশীকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, যা। বেঁচে গেলি।— তারপর সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল।

এইসময় আরও দু'-চারজন জাহাজি বের হয়ে এসেছিল, ওদিকে যেন কীসের গোলমাল।

কোথায়?— মুখার্জি স্রেফ ধোয়া তুলসীপাতা সেজে গেলেন, মিঞাসাবরা সবারই দেখছি এক দশা। তিল পড়লে তো তাল হয়ে গেল। গোলমাল ছাড়া কানে কিছু যাচ্ছে না।

কে যেন ওদিকটায় আবার মরেছে, জাহাজে আবার খুন, চিল্লাচ্ছিল।

এরকম শোনা যায়। যান! নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন গে! আমি তো ডেক-এ ছিলাম, কোথাও গোলমাল হলে টের পেতাম না!

তা অবশ্য ঠিক। কী যে হচ্ছে মুখার্জিবাবু! রাতে একা ডেক-এ উঠে আসতেও গা শির শির করে। কী সব হচ্ছে বলুন তো!

মুখার্জিদা অদ্ভুত কথা বললেন, কিছু তো হচ্ছেই। না হলে গা শির শির করবে কেন? পোকামাকড়ও তো হাঁটাহাঁটি করছে না যে গা শির শির করবে।

কয়লার সুটে কেউ মরে পড়ে আছে, এটাই মুখার্জির সান্ত্বনা। সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মনে হল চার্লি নয় তো! চার্লিকে কেউ খুন করে ফেলে রাখেনি তো? জাহাজ থেকে দু'জন নিখোঁজ, চার্লি আব উইলিয়াম। দু'জনই দু'জনকে তাড়া করতে পারে। অথচ তাঁর কেন যে মনে হচ্ছিল, চার্লি শেষ পর্যন্ত তার দুরভিসন্ধি কাজে লাগাল। উইলিয়ামকে জালে জড়িয়ে সুটের গর্তে ফেলে দিল! মন প্রসন্ন ছিল, অন্তত চার্লির কিছু হয়নি ভেবে। চার্লির অভিসন্ধি তিনি ধরে ফেলেছেন বলেই তো ছুটে গিয়েছিলেন! উইলিয়ামের দরজায় পিস্তল নিয়ে হামলার পরই তো তাঁর মনে হয়েছে চার্লি তাকে ছেড়ে দেবে না। উল্টোটা হতে পারে। অত উঁচু থেকে টর্চের আলোতে বোঝাও মুশকিল। তিনি কেমন দমে গেলেন। জোর পাচ্ছেন না। দু' বাত ধরে চোখের পাতা এক করতে পারেননি। শরীব আর দিচ্ছে না।

তবু তিনি ডেক-এ উঠে দম নিলেন। এখন একমাত্র উপায় গঙ্গাবাজুর বাংকারে ঢুকে যাওয়া। গঙ্গাবাজুর বাংকাব ফাঁকা। তা না হলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হইচই শুরু হয়ে যেত। যমুনাবাজুর বয়লার চালু রাখা হয়েছে, যমুনাবাজুব বাংকাবে কোনও কোল-বয় কয়লা ফেলছে, সে জানেই না গঙ্গাবাজুর বাংকাবে সুটে একটা লোক মরে পড়ে আছে। জানলে জামা-প্যান্টও নষ্ট কবে ফেলতে পারে। গভীর বাত, চার্লি নিখোঁজ, উইলিযাম নিখোঁজ, কে জানে স্টোকার আর কোল-বয ভয়ে জড়সড় হয়ে বযলার-কমে বসে আছে কি না! তিনি সুরঞ্জনকে বললেন, তুই যা। আমি আসছি।

কী যে মাথায় থাকে! হঠাৎ-হঠাৎ কী হয় তোমাব বলো তো?

যা না! বললাম তো আসছি। তবে প্রশ্ন কবতেই পাবিস। তুই আমাব সহকারী বুঝি! এই একটু কাজ, যাব আব আসব।

আমি দাঁড়াচ্ছি। তুমি যাও।

ঠিক আছে।

বলে সতর্ক নজর রেখে ফেব বোট-ডেকে উঠে গেলেন। চিমনির গোড়া ধরে নামছেন। টর্চ জ্বালছেন না। কম পাওয়ারের আলো নীচে জ্বলছে। স্টোক-হোলডে ঠিক দু'জন পবিদাব গা লাগালাগি করে বসে আছে। ভয়ে কেউ কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে না।

সহজেই তিনি গঙ্গাবাজুর বাংকাবে গোপনে ঢুকে যেতে পারলেন। গভীব অন্ধকাব। সত্যি যেন ব্ল্যাকেস্ট অফ দি ব্ল্যাক নাইটস। টর্চ জ্বালালেন। কয়লার পাহাড় পার হয়ে সুটের মুখে যাবাব আগে কেমন গা ছমছম করতে থাকল। আব এগোতে সাহস পাচ্ছে না। টর্চের আলো নিভিয়ে দিলেই যেন তাঁকে মৃত লোকটা উঠে এসে জাপটে ধরবে। আর তখনই যেন পাশে তাঁর কেউ নিশ্বাস ফেলছে। ভয়ে হাত থেকে টর্চটা পড়েই যেত। যদি বংশী হয়? ভেবেই সাহস পাচ্ছেন। আলো জ্বেলে দেখলেন, তার পিছু পিছু সুরঞ্জনও নেমে এসেছে।

তুই!

কী ব্যাপার বলো তো?

দেখবি?

কী দেখব?

সুটের ভিতর উঁকি দিয়ে দ্যাখ না! যদি চিনতে পারিস!

বলে তিনি সুটের মধ্যে টর্চ জ্বালতেই সুরঞ্জন আতঙ্কে মুখার্জিকে জড়িয়ে ধরল। চোখ বুজে ফেলেছে। প্রায় দলা পাকিয়ে গেছে। মুখ অক্ষত। বাঁ হাতটা ছড়ানো।

সুরঞ্জন বলল, দাঁড়াতে পারছি না। শিগগির চলো।

চিনতে পারলি?

না। মানে ঠিক বুঝছি না। জাহাজে তো কোনও গুঁফো লোক নেই।

আমি চিনতে পারছিলাম না। যাক চার্লি নয়। ইস্, কী যে গেছে! চল উঠি। তা হলে গিরগিটি গোঁফের মুখোশ এই!

সুরঞ্জন পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। সে দৌড়ে আগে চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার পার হয়ে সন্তর্পণে বোট-ডেকে উঠে এল। হামাগুড়ি দিতে থাকল। মেসরুমমেটদের কেবিনে আলো জ্বালা। সবাই আজ যে যার কেবিনে ফোকশালে এত রাতেও আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। সবার মধ্যে ত্রাস।

তারা মাথা নিচু করে দৌড়ে ডেক পার হয়ে এল। তারপর ফোকশালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে পড়ল। দু'জনই বেদম হাঁপাচ্ছে।

তারা কথা বলতে পারছে না। অধীর বার বার বলছে, কী হল। হাঁপাচ্ছ কেন? কোথায় গিয়েছিলে?

মুখার্জি হাত তুলে দিচ্ছেন। কথা বলছেন না। দম নেই কথা বলার। হাত তুলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

সুরঞ্জন এতক্ষণে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে কৌতূহল দমন করতে পারছে না। বলেই ফেলল, লোকটা কে?

মুখার্জি চান না, সুহাস জেনে ফেলুক, জাহাজে আর-একটি খুন হয়েছে। তবে খুনি খুবই কাঁচা কাজ করে ফেলেছে। পাটাতন হড়কে উইলিয়াম সুটে পড়ে গেছে। জাল পাতা থেকে হড়কে যাওয়া সবই ঠিক ছিল। লোহার পাতে পেতলের বল সাজিয়ে পাটাতন বসিয়ে দিলে যেই পা দিক হড়কে সুটের পাতালে পড়ে যেতে পারে। তবে সব ঠিকঠিক করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। খুনি জানে কখন পড়েছে। কারণ পোর্ট-হোল থেকে সে গোপনে হয়তো নজর রেখেছে। পড়ার সময় উইলিয়াম চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি। বিনা মেঘে প্রায় বজ্রপাত বলা চলে। খুনি ফের পেতলের বলগুলি সরিয়ে পাটাতন পেতে না রাখলেই পারত। আসলে সে হয়তো চায়নি, আর কেউ খুন হোক। পাটাতন খোলা থাকলে যে কেউ জখম হতে পারত অন্ধকারে। পা দিলেই পাতালে। পেতলের বলগুলিও সব কুড়িয়ে নেবার বোধহয় সময় ছিল না। অকুস্থলে পেতলের বল পড়ে থাকলে তদন্তকারী যে সহজেই সূত্র পেয়ে যেতে পারে তাও বোধহয় খুনির মনে হয়নি।

আরে কিছু বলছ না কেন?— সুরঞ্জন অস্থির হয়ে উঠছে।

কেউ না।— বলে, চোখ টিপে দিলেন মুখার্জি। মুখে কপট গাম্ভীর্য।

তোর এই এক দোষ সুরঞ্জন, উঠল বাই তো কটক যাই। একজন সহকারীর এত অস্থিরতা ভাল না.

সুহাস অধীর কিছুই বুঝতে পারছে না। বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

মুখার্জি বললেন, সময় নেই। এই যে সুহাসবাবু, জামা-প্যান্ট পরে নিন। আপনার অনেক দায়িত্ব। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে চলবে না। এক্ষুনি আপনাকে বের হয়ে পড়তে হবে। আমার এদিকে মেলা কাজ। ফিলকে খবরটা দিতে হবে। খুব জরুরি। চার্লি নিখোঁজ, ফিলকে জানানো দরকার।

ও বের হবে কী করে? কাপ্তানের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে।— অধীর কিছুটা অস্বস্তির গলায় বলল।

নিষেধাজ্ঞা! দ্যাখ নিষেধাজ্ঞার কী হয়। পরে ফ্যাল, বসে থাকিস না। আমাদের এখন খোঁজা দরকার। চার্লিকে কোনও কারণে সত্যি যদি কেউ অপহরণ করে থাকে? করতেই পারে। আমরা যাচ্ছি ডালে ডালে, তারা হাঁটছে পাতায় পাতায়। চার্লির বনজঙ্গলের নেশা আছে বলেই ধরে নিতে হবে সে জঙ্গলে চলে গেছে, একজন হবু গোয়েন্দারও সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বিশ্বাস করা কঠিন। কাপ্তানের এটা যে আর-একটা জালিয়াতি নয় কে বলবে? মেয়েটা জালিয়াতির শিকার। যাকগে, ওসব পরে ভাবা যাবে। তবে সাবধানের মার নেই।

মুখার্জি এবার সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন, একটা কথা বলি, দ্বীপটা বেশ বড়ই। ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তাও তোর জানা নেই। পথভ্রষ্ট হতে পারিস। দু'-চারদিনের রাস্তাও ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। দ্বীপটার মানুষজন ধর্মভীরু। চুরি ছিনতাই ডাকাতির ভয় নেই। সরল অকপট মানুষ তারা। পরিশ্রমী। চার্লি জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেও তার ক্ষতির আশঙ্কা নেই কিন্তু অপহরণের কেস হলে চার্লির বিপদ।

তিনি থেমে বললেন, মুশকিল চার্লির, সে ধরা পড়বেই। জঙ্গলে পালিয়ে থাকলে আজ হোক, দু'দিন পরে হোক। মনে রাখিস চার্লি বাজার জাত। জঙ্গলে কেউ দেখে ফেললে দেবী-টেবি ভেবে পুজো-আর্চা

করবে না তাও বলা যায় না। ফিলকে দেখে বুঝেছি। আর ফসফেট কোম্পানির গোরারা সংখ্যায় নগণ্য। তারা দ্বীপটার লোকালয়ে প্রায় যায় না বললেই চলে। আর সেখানে ডানাকাটা পরি যতই দুর্গম অঞ্চলে চলে যাক, একদিন সে ধরা পড়ে যাবেই। ফিলকে শুধু বলবি, মুখার্জি পাঠিয়েছেন। আর এটা রাখ।

বলে পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রাটি বের করে তার হাতে দিলেন।

ফিলকে বলবি, সে যেন নজর রাখে। একটাই আতঙ্ক, চার্লিকে না কেউ অপহরণ করে।

সুরঞ্জন বলল, দু' লাইন লিখে দিতে পারছ না?

দিচ্ছি।— বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। লকার খুলে চার্লির ঘর থেকে সংগ্রহ করা ছবিগুলি তুলে রাখলেন।

শোন, সব বোটে, দেশি নৌকায়, খাঁড়ির মুখে, স্টিমারে সর্বত্র ফিল যেন নজর রাখে। তার লোকজন খবর পেয়েই বের হয়ে পড়বে। সে চার্লিকে আমাদের চেয়ে বেশি ভাল জানে। একরোখা মানুষ। চোটপাট করলে ঘাবড়ে যাবি না। স্বর্ণমুদ্রাটি তোর কাজে লাগবে। রাস্তায় কিংবা বনেজঙ্গলে এটি তোকে রক্ষা করবে। আর সব সময় মনে রাখবি সমুদ্র বাঁদিকে। রাতের বেলা, গাছপালা পাহাড়ের আড়ালে সমুদ্র লুকিয়ে থাকলেও তার ফোঁসফোঁসানির শেষ নেই। অহরহ গজরাচ্ছে। চুলটা আঁচড়ে নে। জ্যোৎস্নারাতে ঘোড়াও বেশ কদম দিতে পারে।

মুখার্জি প্যাড বের করে দু' ছত্তর লিখে দিলেন, ফিল, সুহাস যাচ্ছে। তুমি তাকে দেখতে চেয়েছিলে। দেখাও হবে, কাজও হবে ভেবে পাঠালাম। চার্লি কোথায় চলে গেছে।

নিখোঁজ কথাটা লিখতে কেন যে মুখার্জির কলম সরল না! মেয়েটার মুখে কেন যে বার বার তিনি নিজের আত্মজাকে দেখতে পান! কলম তাঁর থেমে গেল। সুহাস যেন তাঁর আত্মজ। না হলে এত ঝকমারিতে বোধহয় নাকই গলাতেন না।

জুতোর ফিতে বাঁধলি না?

সুহাস যেন বের হয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে।

মুখার্জি বললেন, মেয়েটা তোমার জন্যই মনে রেখো সাঁতারজলে নেমে গেল। তুমি দ্যাখো হাঁটুজলে নামতে পাবো কি না। পিছিলে নৌকা আছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দড়ির সিঁড়ি ফেলা আছে। যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। এই সময়। আশা করি পারবে। আমরা কেউ যাচ্ছি না। মনে রাখবে সব জাহাজে মুখার্জিদা থাকবে না। বাবা-মাও কারও চিরদিন থাকে না। একা এসেছ একা যাবে।

সুহাস বেব হয়ে গেলে কিছুটা বিষণ্ণ মুখার্জি। তিনি কি সব আঁচ করতে পারছেন? জেনেশুনে কি সুহাসকে বাঘের খপ্পরে ফেলে দিলেন? অধীর সুরঞ্জন কখনও মুখার্জিদাকে এতটা দুর্বল হয়ে পড়তে দ্যাখেনি। কী হল, কেন পাঠালেন, কেন বললেন একা এসেছ একা যাবে? এত রাতে কেন সুহাসকে জাহাজছাড়া করলেন? সকালে গেলে কী হত! সকালে গেলে কতটা আর সময় নষ্ট হত! সবার নজরে পড়ে যেতে পারে ভেবেই হয়তো অজানা অচেনা দ্বীপে সুহাসকে চার্লির খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। সুহাসের জীবন,কি এখনও তবে জাহাজে বিপন্ন হতে পারে? কী জানি কিছুই বুঝছে না সুরঞ্জন অধীর। তারা চুপচাপ বসে আছে। দু' হাতে মাথা রেখে মুখার্জিদা কিছুটা শোকাহত মানুষের মতো বসে আছেন। কারও মুখে রা নেই।

অগত্যা কী করা!

সুরঞ্জন বলল, এভাবে বসে থাকলে চলবে? বলছ হাতে একদম সময় নেই। ফিলের কাছে গেলে কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে ফিল তোমার গুরুভাই। তোমার কোনও ঠাকুর দেবতা আছে বলেও তো জানি না। মরা লোকটা কে তাও বলছ না!

লোকটা মার্কনি সাব। লোকটা সেই মেঘের ওপারের কণ্ঠস্বর। লোকটা উইন্ডস-হোলে গোঁফের মুখোশ পরে চার্লিকে শাসাত। আসলে যার গোঁফ-দাড়ি নেই সে যদি লম্বা গোঁফ জুলফির ছদ্মবেশে থাকে, তবে ধরবেটা কে? দ্যাখ আর অবান্তর কথা বলবি না।

যাক, মুখার্জিদা সামলে উঠেছেন। সুরঞ্জন খোঁচা দিয়ে ভুল করেনি। মুখার্জিদা যেন কিঞ্চিৎ লজ্জাই পেয়েছেন। অন্তত তাঁর এই দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তিনি বোধহয় চাইতেন না। সুহাসের জন্য মানুষটার মধ্যে বিশ-বাইশ মাসে এত মায়া গড়ে উঠতে পারে মুখার্জিদার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ায়

তারা টের পেয়েছে। কাঠখোট্টা স্বভাবের মানুষ বলেই তারা মুখার্জিদাকে জানে। কিন্তু মার্কনি সাব, গোঁফ, সবই কেমন তার মাথা গুলিয়ে ফেলছে।

অধীর বলল, তোমার খাবার চাপা আছে। খেয়ে নাও।

আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তোরা সবাই খেয়েছিস? বংশী!

খেয়েছি।— অধীর বলল।

সুরঞ্জনের খেদোক্তি, হয়েছে বেশ, তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে না। সুহাসকেও জলগ্রহণ করানো গেল না। সারাদিন কিছুই খায়নি বলতে গেলে। তাকে হুট করে কিনারায় পাঠিয়ে দিলে?

যাক, কষ্ট আছে তবে। চার্লির জন্য মন পুড়ছে। এটা দরকার ছিল। একদিন না খেলে কিছু হয় না।

তারপর তিনি সতর্ক গলায় বললেন, মার্কনি সাব মানে উইলিয়ামকে নিয়ে আর-কোনও কথা না। কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে। আমরা যেন কিছু জানি না। আর আগেই বলেছি বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না। বিনা কারণে গুজবও রটে না। লুকেনারের গুপ্তধন আছে। এখনও এটা আমার কাছে স্বপ্ন না মরীচিকা বুঝতে পারছি না। পাহাড়টা জোয়ার-ভাটায় ভাসে ডোবে। অজস্র ফাঁক-ফোকব। কোথা দিয়ে জল ঢুকছে, কোথা দিয়ে বের হচ্ছে বোঝাই কঠিন। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পাহাড়ে একটা দরজা উঁকি দেয়। দরজাব ভেতরে ঘোড়ায় চড়ে ঢোকা যায়। লুকেনারের গুপ্তধন, না অন্য কিছু, জানি না। ফিল অবশ্য বলেনি, সে বলে, ঈশ্বরের ভাণ্ডার। মানুষের সেবার জন্য ঈশ্বরই নাকি তাঁকে এই ভাণ্ডারেব খোঁজ দিয়েছেন। এখন বুঝে দ্যাখ, অবিশ্বাসও করতে পারি না। সারাক্ষণ পাথবের পাহাড়ে ঝম ঝম শব্দ। ঝন ঝন কবে কী বাজছে। টুং টাং সেতাবের আওয়াজ, মনে হয় জলের স্রোতে সেই গুপ্তধন নড়ানড়ি করছে। দু'-চারটে গড়িয়ে নেমে আসছে। জলের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় পডছে। শুধু কুড়িয়ে নেওযা। পাহাড়েব গায়ে এখানে-সেখানে খোবা। পাথরের খাদ। জল জমছে, জল উপচে পড়ছে। নদী থেকে ডুবে ডুবে তামাব পযসা তোলাব মতো। দু'-একটা স্বর্ণমুদ্রা ডুবলেই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে নূপুরেব ধ্বনি।

তিনি যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন তাও বললেন। অধীর সুরঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে শুনছে। জাহাজেব খোলে একটা মরা মানুষ পড়ে আছে, তার কথাও ভুলে গেছে।

পাহাড়টা কোথায়?— সুরঞ্জন না বলে পারল না।

মুখার্জি বললেন, পাহাড়টা কোথায় জানি না। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। পিবামিডের মতো দেখতে। হাঙরেব ঝাঁক পাহাড়টাকে ঘিরে রেখেছে। যাক সেসব কথা, এখন তোদের কিছু জরুবি কথা জানা দবকার। আমি যদি না থাকি, ধর আমার যদি কিছু হয়, হবেই এমন বলছি না, তবু সতর্ক থাকা দরকাব। কাপ্তান আমাকে ছেড়ে দেবেন না।

তিনি বাংক থেকে নেমে লকাব খুলতেই কিছু কাগজপত্র বাইরে গড়িয়ে পড়ল। কাগজগুলি তোলাব সময় শুধু বললেন, মহিষাসুর বধ পালা সাঙ্গ। ম্যাকের হত্যাকারী কিংবা চক্রান্তকারীও শেষ। ছবিগুলি দেখে বোঝ। মা আমার রণচণ্ডী রূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁরই বিভূতি। তিনি তো জাহাজ থেকে হাওয়া। তা দুর্গতিনাশিনী তিনি, ভয়েব কী আছে?

বলে কাঠে তিনি কয়েকটি ছবি পব পব পিন পুঁতে দেবার সময় বললেন, আগেই বলেছি, দেবী তাব ছবিতে বুনো ফুল এঁকে দেখাত। মনে আছে বোধ হয় তোদের।

ছবিগুলি ওলটাবার সময় বললেন, সুহাসকে দেখাত। নিজেও এঁকে দেখত। ডালপালায় কখনও কাঁটার মধ্যে কিংবা মাকড়সার জালে ছিন্নভিন্ন প্রজাপতিও এঁকেছে। ছবিগুলিতে কখনও ক্রোধ ফুটে উঠত, কখনও সুষমা। মনে আছে তোদের?

যেন তিনি দম নিচ্ছেন। বললেন, চক্রান্তকারী উইলিয়াম। সেকেন্ডকে অযথা সন্দেহ করেছি। উইলিয়াম এবং ম্যাক দু'জনেই। ডেরিক তারাই শেষ রাতে তুলে রেখেছিল জাহাজ অন্ধকার কবে দিয়ে। তার হাতে ক্ষত থাকলেও লুকিয়ে গেছে। তাকে হয়তো হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধারই দরকার হয়নি। কাল লাশ তোলার সময় দেখতে হবে।

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, মুখোশ পরে মগড়া ঝোপে-জঙ্গলে বসে থাকে জানব কী

করে বল! ধাতানি না দিলে ব্যাটা স্বীকারও করত না। চার্লি, পিস্তল, তাকে খুঁজছে চার্লি, সুহাসই তাকে বক্ষা করতে পারে, কত কিছু বললাম। তবু কি মচকায়! অথচ সেকেন্ডকে সন্দেহ করেছি। লাইটহাউজ পার হয়ে গেছি। তুই তো দেখেছিস লাইটহাউজের জায়গাটা খুবই গোলমেলে। কোন ফাঁকে ঝোপে ঢুকে বসে আছে বুঝব কী করে? সেকেন্ডকে বাতিঘর পার হয়ে যেতে দেখেই আমি কিনা বোকার মতো জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।

অধীর বলল, মগড়ার সত্যি মাথা খারাপ।

সুরঞ্জন বলল, মাথা খারাপ কী ভাল ভেবে লাভ নেই। পাস্ট ইজ পাস্ট। কী হয়রানিটা করল।

মুখার্জি বললেন, মগড়াকে আমি থ্যাংকস দিচ্ছি। মুখোশের তাড়া না খেলে চার্লি-রহস্য বোধহয় উদ্ধারও হত না। শুধু কি চার্লি-রহস্য, যাক গে, কী যেন বলছিলাম?

অধীর কিন্তু মগড়ার মোটিফ বুঝতে পারছে না। সে তো সব জানে না। কিছুটা জানে।

সে বলল, মাথা খারাপ না হলে, কী মোটিফ তার?

মুখার্জি বললেন, মোটিফ একটাই। জঙ্গলে চার্লি-সুহাস কী করে? বুনো ফুল দেখতে যায় কেন? ওরা দু'জনে জঙ্গলে যদি ফুর্তিফার্তা করে, দেখে সুখ আর কী। নেশা। ব্যাটার গায়ের যা রং, আর মুখের যা চেহারা, যত দূরেই থাক, চার্লি ঠিক টের পেত, কোনও নেটিভ তাকে ফলো করছে। ধরা পড়ে যেত। মুখোশ পরে চতুর হতে গেছে। সামনাসামনি পড়ে গেলে রক্ষা থাকত? সহজেই চার্লি চিনে ফেলত।

তারপরই মুখার্জি বললেন, বাজে কথা থাক। মগড়া আমাদের কোনও ইস্যু নয়।

মুখার্জি তাঁব লকারেব দরজা খোলার সময় বললেন, ও হ্যাঁ, ডেরিক তোলার কথা বলেছিলাম। তোরা যে কী! খেই হাবিয়ে ফেলছি। লকারের দরজাই বা খুললাম কেন? এত জট একসঙ্গে খোলা কঠিন। ডেবিক ম্যাক আর উইলিয়াম তুলে রেখেছিল। দড়িটা প্রমাণ। দড়িটার একটা অংশ রক্তাক্ত। আততায়ীর হাত খুঁজলে ক্ষতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। কাল লাশ তোলার সময় লক্ষ রাখতে হবে।

এই দ্যাখ।— বলে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে দেখালেন। ডাইরি থেকে রসিদ বের করে দেখালেন।

ডেক-কশপের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তোরা তো জানিস ডেক-কশপ মাল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। মগড়া খবরটা দেয়, সেই থেকে ডেক-কশপ, কাপ্তান-বয়, বাটলার আমার বান্দা বলতে পারিস। তবে শেষ উপকারটা করেছে কাপ্তান-বয়।

ডেরিকের কথা কি শেষ?— সুরঞ্জন বলল।

না, শেষ নয়।

তবে হুট করে লং জাম্প মারছ কেন?

না বলছিলাম, কাপ্তান কিন্তু ডেরিক তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়।

আবার হাই জাম্প! দড়িটা কে নিল, কে দিল বলবে না।

দড়িটা ডেক্-কশপ সাপ্লাই করেছে। ঠিক সাপ্লাই বললে ভুল হবে। নিউ-প্লাইমাউথের শিপিং ট্রান্সপোর্ট এন্টারপ্রাইজ থেকে কেনা। জাহাজে যারা মাল সরবরাহ করে তারাই এ ধরনের দড়ি সাপ্লাই কবতে পারে। রসিদে নাম আছে কোম্পানির। দড়িটা কীভাবে হাতাল বলতে পারিস? সোজা। ডেক-কশপ বলিস, ইঞ্জিন-কশপ বলিস, সাহেব সামনে দেখলেই ভূত দ্যাখে। কাকে দিয়েছে ডেক-কশপ ঠিক মনে রাখতে পারেনি। এ তো তোর ইঞ্জিন-কশপের হাতুড়ি বাটালি হ্যাকস নয়, স্টোরে ফের ফেরত দিতে হবে। দড়িদড়া খরচখরচা জাহাজে সবসময় হয়েই থাকে। লেখাপড়াও জানে না। অভিজ্ঞতার জোরে কাজ চালিয়ে যায় বুঝতেই পারিস।

তুমি আবার বল গোলের বাইরে মারছ দাদা। কাপ্তান জড়িত নয় বললে কী সূত্রে! সুরঞ্জন ছবিগুলি ভাঁজ করতে করতে কথা বলছে।

নয়, তার কারণ লগবুক। কাপ্তান লগবুকে শো-কজ করেছেন সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে। দুটো জেনারেটারই অচল হয় কী করে? কে আছে জাহাজে। ম্যাক যে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটারের তার-ফার আলগা করে শট-সার্কিটের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে, সেকেন্ড জানবে কী করে! ডগ-ওয়াচেই কাজটা সারা হয়েছে। কারণ ডগ-ওয়াচেই জাহাজের আলো নিভে গিয়েছিল। ব্রিজে ইমারজেন্সি লাইট

জ্বলছিল বলে আমি ঠিক টের পাইনি। ইঞ্জিন-রুমে যখন ধস্তাধস্তি, টর্চ নিয়ে ছোটাছুটি, তখন ম্যাকের পাত্তা পাওয়া যায়নি। তাকে সেকেন্ড খেপে গিয়ে পরে লাথি মেরেছিলেন।

ম্যাকের সত্যি বাড়াবাড়ি।। ব্যাটা এত রাতেও মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকতে পারে। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে পারে?

মদ ম্যাক ছুঁতই না।— মুখার্জির কথায় সুরঞ্জন অধীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

মদ ছুঁতই না! বলছ কী? নিজের চোখে দেখা, মাতাল হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় টলছে।

ক্যামোফ্লেজ। যে মদ খায়, যে অ্যালকোহলিক, জন্মদিনে সে মদ স্পর্শ করে না, হয় না বুঝলি? সিম্যান মিশনেও দেখেছি, আড্ডা দেয়, নাচে, কিন্তু বারে ঢোকে না।

যা বাব্বা! এ তো আর এক কেলো।— অধীর কিছুরই থই পাচ্ছে না মতো বোকা বনে গেল।

মাতলামি করে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও গণ্ডগোলে সে নেই। সে মুখোশ বানিয়েছে একুশটা। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটার জন্যই বাকি বিশটা মুখোশ। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটা দেখতে হুবহু উইলিয়ামের মুখের মতো। গোঁফের জন্য প্রায় মুখের অর্ধেকটা হাপিশ। চার্লিকে মুখোশটা উপহারও দিতে চেয়েছিল। আসলে উইলিয়ামের মুখের সঙ্গে গোলমাল সৃষ্টি করা আর কী। উইলিয়াম নকল গোঁফ লাগিয়ে চার্লিকে অনুসরণ করলে, মনে করতেই পারে একটা মুখোশ তাড়া করছে। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটাই তুরুপের তাস। সে নকল গোঁফ পরে গিরগিটি গোঁফের মুখোশ হয়ে যেত।

বলে তিনি এক জোড়া লম্বা গোঁফ এবং জুলপি লকার থেকে বের করলেন। ছোট্টমতো শিশি। এক জাতীয় আফ্রিকান গাছের আঠা। গোঁফ টানাটানি করলেও উপড়ে আসবে না। জল দিলে আপনি আলগা হয়ে যায়। শিশিটা ওর লকারে আছে। গোঁফ জোড়া এবং জুলপি পরে তিনি সুটের গর্তে পড়ে আছেন। অধীরকে নিয়ে দেখাতে পারিস। যা না, দেখে আয়।

আরে আমরা দেখে করবটা কী? গোয়েন্দার সহকারী বলে শেষে আমার গলা কাটা যাবে।— অধীব কিছুই দেখতে রাজি না।

মুখার্জি বললেন, যা খুশি করবি। আমার কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার দিলাম। ভালমন্দ সব এখন তোদেব উপব।

অধীব না পেবে বলল, কাপ্তান কি তবে ধোয়া তুলসীপাতা? লগবুক দেখে খুশিমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে! কাপ্তান শো-কজ করেছে? কাপ্তান জড়িত না থাকলে জেনারেটবের গণ্ডগোল নিয়ে শো-কজ করত না ভাবছ? ডেরিক তোলার ব্যাপারে কাপ্তানের কোনও দুরভিসন্ধি নেই বললেই হল।

মুখার্জি বললেন, দ্যাখ অধীর, আমি কিন্তু কখনওই বলিনি কাপ্তান ধোয়া তুলসীপাতা। ধোয়া তুলসীপাতা হলে ফিলের কাছে এত ছোটাছুটিরও দরকার ছিল না। যাকগে আমি যতটুকু বুঝেছি, তোরা খুবই অধীব হয়ে পড়ছিস! মাথা তোদেরও ঘুরছে। গোলের মুখে যতই ছুটছি, তোরা মিসপাস করে গুবলেট কবে দিচ্ছিস। তবে নাচতে যখন নেমেছি ঘোমটা খুলে ছাড়বই।

সে যা খুশি ছাড়ো। আমাদের কিছু বলার নেই। জাহাজে একটা মানুষ মরে পড়ে আছে, ভেবেই নিয়েছ উইলিয়াম। কী বলব বলো! গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি। উইলিয়ামের গোঁফ কবে ছিল।

উইলিয়ামই। ওটা ওর ছদ্মবেশ। বিশ্বাস না হয়, ঠিক কি না, কাল লাশ তোলাব সময় দেখে নিলেই হবে। উইলিয়ামকে নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন নয়।

কে তাকে খুন করল?

দেবী, দেবী দুর্গতিনাশিনী।

শোনো মুখার্জিদা, তোমাব দুর্গতিনাশিনীকে নিয়ে থাকো। আমরা উঠছি। কে সুহাসকে ট্যাংকের টবে নিয়ে চুবিয়েছে?

মুখার্জিদা কোনও জবাব দিচ্ছেন না। ছবিগুলি সব উলটে-পালটে দেখে পরপর পিন দিয়ে ভাল কবে দেয়ালে আটকে দিলেন। লকার খোলা। নিজের জিনিসপত্র বলতে কিছু নেই, কেবল আজেবাজে কাগজে ভরতি। সব ছোট-বড় ছবি আঁকা আর্ট পেপার।

তিনি আর কোনও কথা বলছেন না। ছবিগুলি টাঙিয়ে দিতেই অধীর সুরঞ্জন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, এ

কীরকম ছবি? কোনওটা ফুলের, কোনওটা মুখের, কোনওটা শুধু জামা-প্যান্ট-টুপি পরা অদৃশ্য মানুষের ছবি।

চার্লির ছবি সম্পর্কে বোধ হয় তিনি এবার নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করবেন। সুরঞ্জন অধীর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

এটি দেখছিস? ফুলের ছবি। কী সুষমা! নীচে কী লেখা? আটামাসকু লিলি। চারপাশে গাছপালা! এক জোড়া দম্পতি লিলিটার পাশে বসে আছে। নীচে কী লেখা আছে— প্র্যাগন্যান্ট।

এটি একটি আগুনের ছবি। সারা মাঠ জুড়ে মনে হয় আগুন জ্বলছে। নীচে কী লেখা আছে? টল ব্লেজিং স্টাব। যতদুর চোখ যায় শুধু ফুল। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে নারী এবং পুরুষ। কোথায় যাচ্ছে তারা যেন জানে না।

আর এ ছবিটা দ্যাখ। চার পাপড়ির ফুল। ফুলের কোরকে মাকড়সার জাল। প্রজাপতি আটকে গেছে। ছটফট করছে। চার্লি ছবিটার নাম দিয়েছে, মেক্সিকান হ্যাট। সম্ভবত ফুলের নামে ছবির নামকরণ করেছে।

তারপরই আর-একটি ছবি টাঙিয়ে দিলেন। মানুষের মুখ। নীচে কী লেখা?

উঠে আয়। পড়ে দ্যাখ।

কীসের ছবি?

ওটা তো গিরগিটি গোঁফের মুখোশ!— সুরঞ্জন দেখে আঁতকে উঠল।

এবারে দ্যাখ। ছবিটার গোঁফ সাদা রং দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। কার মতো লাগছে দেখতে?

আগেকার ছবিটার মতো।

মানে উইলিয়ামের মতো। মানে মার্কনি সাবের মতো। নীচে কী লেখা আছে?

ইয়ো শ্যাল বি কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট।

কী হল, ঘাবড়ে গেলি কেন? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী বলায় তো তোরা খেপে বোম। অত সহজে আমরা ছাড়ছি না, আমাদেরও কাপ্তান ছাড়ছে না। আমাকে উপহাস করা? হাই তোলা! বোঝ এবার! দ্যাখ শেষ ছবিখানা!

বলে তিনি লম্বামতো কাগজটা আগের ছবির ওপরই টাঙিয়ে দিলেন। চারকোনায় চারটে পিন পুঁতে দিতেই কেমন অতিকায় অদৃশ্য এবং ভয়ংকর প্রেতাত্মা ছবিতে ভেসে উঠল। টুপি, জামা, প্যান্ট সাদা। মুখ দেখা যাচ্ছে না, হাত-পা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জামা-প্যান্ট-টুপির ভিতর মানুষটা অদৃশ্য। মুখার্জি বললেন, ভাল করে দ্যাখ।

হাতে কালো গ্লাভস। মুখে কালো ছায়া। পায়ে কালো মোজা। সুরঞ্জন ভূত দেখার মতো তাকিয়ে আছে।

এই সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মা।

বলে, তিনি গ্লাভস এবং পোশাকটি লকার থেকে খুলে দেখালেন। বললেন, কাপ্তান-বয় সাহায্য না করলে অন্ধকারেই থাকতাম। জাহাজে ফেরার সময় প্যাকেটটা হাতে তুলে দিল। কে নাকি তাকে দিয়ে গেছে আমাকে দেবার জন্য। গ্যাংওয়েতে দিয়ে গেছে। কোথায় পেল জানি না।

নীচে কী লিখেছে সুহাসের দুর্গতিনাশিনী, পড়ে দ্যাখ।

ওরা ফের ঝুঁকে পড়ল, লেখা আছে, আই উইল পুট অ্যান এন্ড টু অল উইচক্র্যাফট।

বুঝলি কিছু? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী কাজটি সেরে হাওয়া। এখন ঠেলা সামলাতে হবে আমাদের। সুহাসকে ভাগিয়ে দিয়ে আপাতরক্ষা করা গেল। পরে কী হবে জানি না। চার্লি যে মেয়ে, জানাজানি হয়ে গেছে। কাপ্তানের মাথা ঠিক নেই। চার্লিকে খুঁজে না পেলে আমাকে সুহাসকে তিনি শেষ করে দিতে পারেন। প্রতিশোধ-চরিতার্থে মানুষ সব করতে পারে। সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে খুনের অপরাধে মাস্তুলের দড়িতে লটকে দিতে পারেন। মনে রেখো সমুদ্রে কাপ্তানই সব। তাঁর অসীম ক্ষমতা। আইন-আদালত তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এখন সুহাস ফিলকে খবর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারে, সে ফিরে এলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। ফিল খবর পেলে চার্লিকে অপহরণ করা খুবই কঠিন।

এক নিরুপায় নৈঃশব্দ্যের ভিতর তারা চার্লির আঁকা ছবিগুলি ভূতগ্রস্তের মতো দেখছিল। মুখার্জি বাংকে বসে আছেন। সুরঞ্জন অধীর ছবিগুলি দেখুক। কোথাও আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই চার্লি উইলিয়ামকে খতম করে ভেগেছে। সুহাসকে এভাবে রক্ষা করা ছাড়া তার বোধহয় আর-কোনও উপায়ও জানা ছিল না। চার্লি

জাহাজ ছেড়ে দিয়ে সুহাসকে বিপদমুক্ত করে গেল, এমনও ভাবলেন মুখার্জি। সে না থাকলে সুহাসের শত্রুপক্ষও থাকে না, চার্লি ভালই জানত। অনেকের গলায় কাঁটা ফুটে থাকার কারণ সে।

আজ সমুদ্র থেকে ঝোড়ো হাওয়াও উঠে আসছে না। এই গভীর রাতে তারা তিনটে মাত্র প্রাণী জাহাজে জেগে আছে। কাপ্তান, চিফ মেট, সেকেন্ড মেট কিনার থেকে ফেরেননি। হয়তো কোনও হোটেলে রাত্রিবাস কিংবা মাদাং থেকে ফেরার কোনও স্টিমার ধরতে পারেননি। সকাল হলে সবাই দেখবে সুটের মুখ খালি। পাটাতন সরানো। তিনি ইচ্ছে করেই পাটাতন তুলে রেখে এসেছেন। নয়তো কেউ জানতেই পাববে না সুটের গর্তে উইলিয়াম মরে পড়ে আছে। ফুলে ফেঁপে পচা দুর্গন্ধ না উঠলে টের পাবার কথা না। পাটাতন তুলে রেখে এসেছেন, পাটাতন তোলা দেখলেই সংশয় দেখা দিতে পারে। ছোটাছুটি শুরু হতে পারে।

আর তখনই মনে হল, দরজার ওপাশে কেউ যেন দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনছে। ছুটে গিয়ে খটাস করে দরজা খুলতেই অবাক, বংশী। মেজাজ খিঁচড়ে গেল। এ তো আচ্ছা ঝামেলা!

আবার! তোর চোখে ঘুম নেই? দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছিস! একা ফোকশালে থাকতে ভয় লাগলে সুরঞ্জনের বাংকে গিয়ে শুয়ে থাক।

দাদা গো, আমরা তবে কেউ বাঁচব না। কাপ্তান সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে আমাদের ফাঁসি দেবে। কী গো কিছু বলছ না কেন? আমরা তবে দেশে ফিরতে পাবব না!

আর মাথা ঠিক রাখা যায়? সব যজাবে। মুখার্জি যে কী করেন! বংশীর চোখ লাল। চুল উসকো-খুসকো। কত রাত যেন ঘুমোয়নি। কষ্টও হয়। তিনি বললেন, আস্তে। পাগলামি করিস না। আমি তো আছি। অত সোজা। যা শুয়ে পড়গে।

বংশী বলল, শুয়ে পড়তে বলছ। যাই তবে। শুয়ে পড়ি। কিন্তু আমার যে ঘুম আসে না।

আসবে। আমরা তো আছি। যা লক্ষ্মী ভাইটি।

বলতেই বংশী নিজের ফোকশালে ঢুকে গেল।

বলল, দরজা বন্ধ করে শোব?

বন্ধ করে শুয়ে পড়াটাই উচিত।

বাইরে থেকে খুলে যদি কেউ ঢোকে?

তবে দে চাবিটা। বাইরে থেকে লক করে দিচ্ছি।

বলতেই মুখার্জি দেখলেন, দরজার চাবিটা পরম বিশ্বাসে মুখার্জির হাতে তুলে দিল বংশী। মায়াও হয়। সবই শুনে ফেলতে পারে। অধীর সুহাস ফোকশালে না থাকায় বোধহয় ঘাবড়ে গেছে। একা থাকতে পারছিল না। উঠে এসেছে। হয়তো সব কথাই শুনেছে, কাপ্তান যে ছেড়ে কথা কইবে না, সামনে মুখার্জির সমূহ বিপদ তাও কান খাড়া করে শুনতে পারে, কী যে শেষ পর্যন্ত হবে, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। বংশীর দরজা লক করে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

বললেন, ভাল না। বংশী দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে! যেখানে আমি, বংশী সেখানে। তাকে সত্যি ভূতে তাড়া করছে। একেবারে শিশুর মতো আচরণ। যাকগে, সব ভবিতব্য।

সুরঞ্জন বলল, বংশীকে এ ঘরে নিয়ে এলে হত না?

না। তোমাদের কিছুই বলা হয়নি। চার্লি-রহস্যও না। প্রেসিডেন্ট কলিজই প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকো। তার লাউঞ্জের ছবি দেখে আগেই টের পেয়েছি। রিফ এক্সপ্লোরারের পাঠানো ছবি দেখে বুঝেছি, লাউঞ্জের ভাস্কর্যটি খোয়া গেছে। কার কাছে ভাস্কর্যটি আছে তোমরা জানো। তবে রহস্য আরও গভীর। রক্ষা পেতে চাইলে সব ভাল করে জেনে নাও।

মুখার্জি কেন যে কিছুটা অন্যমনস্ক!

কী ভেবে বললেন, ভাস্কর্যটি দামি না অদামি আমাদের জেনে লাভ নেই। এত সব কথা বলতে আমার ভালও লাগছে না। ফিলই চার্লির নিখোঁজ কাকা। ফিল অকপটে সব স্বীকার করেছে। প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকোর সে-ই কাপ্তান। প্রেসিডেন্ট কলিজেরও। গুজব, চার্লির ঠাকুরদা জোহানস মিলার গুপ্তধন খুঁজে

পান। গুজব, তিনি তাঁর প্রমোদ-তরণী নিয়ে গুপ্তধনের খোঁজে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ থেকে নাউরো, এলিস, ইস্টার, ফোনক্স, রাবাউল পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। অসংখ্য দ্বীপে তাঁবু ফেলেছেন, গুটিয়েছেন। প্রমোদ-তরণীর যাত্রীরা যখন দ্বীপে ফুর্তিফার্তায় মগ্ন, তিনি তখন ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। দ্বীপের বুড়োদের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করেছেন, এমন সব গুজব যখন চাউর হয়ে যাচ্ছিল, বলেছি না, বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না, গুজবে দুই পুত্রেরও মাথা খারাপ! গুজবের শিকার দু'জনেই। এই গুজবই কাল হল দু'জনের। ফিল, মানে রাচেল প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি অন্তর্ঘাতে ডুবিয়ে দিল। যেখানে জাহাজটি ডুবিয়ে দিল, জল কম। মাত্র ষাট-সত্তর ফুট। অনেক ভেবেচিন্তেই কাজটা সে করেছে। সে বিশ্বাস করত, বাবার গোপন ধন-সম্পদ কলিজের কোথাও রক্ষিত আছে।

মুখার্জি থামলেন। তারপর আবার কী কী বলা দবকার কিছুতেই যেন মনে করতে পারছেন না।

ফিল পেয়েছে গোপন ধন-সম্পদ?— অধীরের প্রশ্ন।

না পায়নি। সে শুধু পেয়েছে ভাস্কর্যটি। কলিজ জাহাজ থেকে ভাস্কর্যটি খোয়া যায় দেখেছিস ছবিতে। ফিলের প্রাসাদে ভাস্কর্যটি দেখে অবাক! সন্দেহ থাকে না সে-ই ছদ্মবেশী অসি ডাইভার। কিপার অফ দি রেক।

কী বলছ? ফিল অসি ড্রাইভার, কই কখনও তো বলোনি!

বলিনি, অনেক কিছুই বলিনি। তা হলে আর গোয়েন্দাগিরি কেন? কাপ্তান-বয়কে সালাম, সে না থাকলে এই রহস্যের সূত্র ধরার ক্ষমতা আমার চোদ্দো গোষ্ঠীরও ছিল না। ও খববটা দিল বলেই, কাপ্তানকে ফাসাবার মতো হাতে অস্ত্র গেল। আরও কিছু দিচ্ছি। আমি না থাকলে দরকারে কাজে লাগাবে।

ফিলই কি তবে অদৃশ্য আততায়ী? সে সুতো টানছে?— সুরঞ্জন প্রশ্ন কবল।

ধুস। তোরা যে কী! সে কেন আততায়ী হতে যাবে?

না, বলছিলাম, সে-ই কি ম্যাককে খুন কবিয়েছে?

ম্যাককে খুন কবেছে উইলিয়াম। কতবাব এক কথা বলব! বলছি না, অন্ধকাবে দড়ি কাটতে গিয়ে হাতে ক্ষত সৃষ্টি করেছে! সেই ডেবিক ফেলাব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তার এক হাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। উইলিয়াম ম্যাক এবং সুহাস দু'জনকেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। সংশয় ছিল বলেই, ম্যাক কাজের সময় তাব শিশুদের ছবি পকেটে রেখে দেয়। এতে আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারি ম্যাক জানত। ফসকা গেরো। ম্যাকও উইনচের তলায় থাকবে। আতঙ্ক থাকতেই পারে। ছবি পকেটে থাকলে ম্যাক নিরাপদ ভাবত।

তারপরেই কেমন হতবাক হয়ে সুরঞ্জনের দিকে তাকালেন, তুই এতটা নবিশ! কী করে ভাবতে পাবলি ফিল এই খুনের সঙ্গে যুক্ত? ফিল কি জাহাজে ছিল!

না, মানে, কোথায় বীজের অঙ্কুর জন্মায়, কোথায় গাছ তার ডালপালা মেলে দেয়, খুঁজতে গেলে ফিলকে সন্দেহ না করাবও কারণ নেই। রেষারেষি বলো, ক্ষোভ বলো, ধন-সম্পদ বলো, সব তো ডরোথি ক্যাবিকোর গুপ্তধন নিয়ে।

না, শুধু গুপ্তধন নিয়ে নয়। ডরোথি ক্যারিকোতে কোনও গুপ্তধনই ছিল না। বড় বড় মেহগিনি কাঠের পেটি উঠতে দেখে জাহাজে ফিল, ফিল বলব না, রাচেল বলব, বাপের কাজকর্মে ধন্দে পড়ে যায়। কারুকাজ কবা দামি কাঠের পেটিতে কী তোলা হচ্ছে? নির্ঘাত হিরে-জহবত। সোনা দানা।

অধীর বলল, যখন এত যত্ন, তখন হিরে-জহরত পেটিতে আছে আমি দেখলেও ভাবতাম।

কিছুই ছিল না। ছিল তামার ফলক। তাতে লেখা— জোহান্স মিলার যা বিশ্বাস করতেন। মানুষের ধর্মই হল অমূল্য সম্পদ। পেটিতে তিনি সব ফলক তুলে নিয়েছিলেন, সব দ্বীপে ফলকগুলি পুঁতে আসবেন বলে, ঈশ্বব সর্বত্র বিরাজমান। ফলকে এমনই সব সাধু বাক্য লেখা আছে বুঝলি? ফিলের প্রাসাদে যাওয়ার বাস্তায়ও পাঁচ-সাতটা ফলক দেখেছি। অবিশ্বাস করারও কারণ থাকতে পারে না। সে পেটিগুলি দেখিয়েছে। এখনও আট-দশ পেটিতে তামার ফলক পড়ে আছে। ফিল দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। বাপের স্বভাব পেয়েছে। বুনো ফুলের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে আসে। জনহীন দ্বীপে মানুষের বসতি গড়ে তুলছে। লোকজনের টানাটানি। তুই থাকতে চাইলে তোকেও জায়গা দেবে। চাষবাস থেকে আহার, আশ্রয়, উত্তাপের ব্যবস্থা কববে। গির্জা বানাচ্ছে। স্কুল গড়ছে। তার এক দণ্ড ফুরসত নেই। সব খুলে বললে, ফিল কী বলল জানিস? এসব নোংরা কাজে আমাকে জড়িয়ো না। সে জাহাজেও আসতে চাইল না।

নোংরা কাজ বলছে কেন ফিল?

বলছি। সব গুলিয়ে দিস না। দ্যাখ যত বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তার আড়ালে একজন নারী। কী, ঠিক কি না বল? রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, ট্রয়ের যুদ্ধ বলিস, সেখানে হয় সীতা, দ্রৌপদী না হয় হেলেন। রাইট?

রাইট। অক্ষরে অক্ষরে সত্য।— অধীর সমর্থন করল।

জাহাজেও চার্লি। ম্যাক আর উইলিয়াম দুই ভায়রাভাই। ওরা একমাত্র লুসিয়ানার লোক। এখন বলবি লুসিয়ানাটা আবার কোথায়। লুসিয়ানার নিউপার্থে দু'জনেরই বাড়ি। চার্লির দুই ভগিনীপতি। দু'জনই উগ্র বর্ণ-বিদ্বেষী। বলতে পারিস এত খবর কে দিল? বাটলারের খামটা থেকে নাম ঠিকানা পেয়েছি। রাচেল, মানে ফিল দেখে বলল, সে কাউকেই চেনে না। তবে উইলিয়াম এবং ম্যাকের পুরো নাম দেখে সে বুঝতে পারে তাদের বাড়ির জামাই। জানিসই তো যম জামাই ভাগনা কেউ নয় আপনা।

সুরঞ্জন বলল, একটু চা করে আনি? গলা তোমার শুকিয়ে গেছে।

আনবি? আন। তবে কাপ্তান তাদের চিনতেন বলে মনে হয় না।

কী কারণ?— অধীর হাতের আঙুল মটকাচ্ছে। ঘুম নেই চোখে। চোখও জ্বলছে। খুবই বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো পা-ও নাচাচ্ছে।

চার্লি শেষ বয়সের, বুঝলি? কাপ্তান জাহাজে জাহাজে। জামাইদের সঙ্গে দেখা দু'-একবার হলেও পনেরো-বিশ বছরে মনে রাখার কথা নয়। তিনি তো তখন পাগলা কুকুর। বাপের ধন-সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। বাপ উইল করেছেন, তাঁর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি তিনি ন্যাশনাল ওয়াইলডফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টারকে দান করে যাচ্ছেন। একটাই শর্ত, তাঁর পুত্রদের যদি কারও পুত্রসন্তান হয়, তবে উইলটি বাতিল বলে গণ্য হবে। বোঝ এবার। পুত্রদের তো দিলেনই না, নাতনিদেরও বঞ্চিত করলেন। চার্লির দিদিবা তো ছিল। তারা খাপ্পা।

থেমে বললেন, ছিল। তবে এটাই একমাত্র দোষ বলতে পারিস চার্লির ঠাকুরদার। নারীবিদ্বেষী। যৌবনেই তাঁর স্ত্রী পলাতক। পুত্রদের অধার্মিক কাজকর্মে বুড়ো ক্ষিপ্ত। মুখ দেখতেও রাজি ছিলেন না। ফিল শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ায় বুড়ো কিছুটা নরম হয়েছিলেন, তবে সম্পত্তির কানাকড়ি দিতেও রাজি হলেন না। প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকোর কাপ্তানের কাজটি দয়া করেই যেন ডেকে দিলেন।

এসব কে বলল?

কে বলবে? ফিল।

গুল ঝাড়ছ।

ওঠ। গুল ঝাড়ছি! ফিলকে দেখিসনি। ফিলকে আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। কাপ্তানের চিরকুটটি না দেখলে মনেই হত না, ফিল বলে কারও সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওর প্রাসাদে নিয়ে গেছে। ভাল পিয়ানো বাজায়, ধর্মসংগীত গায়। বলেছি না সরষেতে শুধু ভূত থাকে না, ভগবানও থাকে। সামান্য সরষে তেল, তার কৃতজ্ঞতা এত ভাবা যায় না।

অধীর বলল, দৈব সহায় তোমার দেখছি! ঘানিতে ভূত পিষে তেল বের করে ভগবান পেয়ে গেছ। বাহাদুরি আছে তোমার! একেবারে দরকারে সব হাতের কাছে হাজির। গোয়েন্দাগিরির দাম কোথায়? চিরকুট থেকে ফিল। ফিল থেকে লুকেনারের গুপ্তধন। চিরকুটে শুধু অসি ডাইভারের উল্লেখ ছিল, না আরও বেশি কিছু! তার মানে ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়ে দেন।

মুখার্জি বিরক্ত হতে পারতেন। এখনও ঠাট্টা-তামাশা। আর সহ্য হল না। বললেন, দেখবি?

লকার খটাস করে খুলে চিরকুটটা দেখালেন, কী লেখা আছে? বোথ বে হারবার থেকে জনৈক অ্যালেন পাওয়ার কী লিখেছে দ্যাখ কাপ্তানকে।

অধীর সুরঞ্জন দু'জনেই ঝুঁকে পড়ল। দেখল লেখা আছে, শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ডশিপ— নোটস ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দি স্পেল অফ দি লাকজারি টুয়েলভ ইয়ার্স এগো অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অব দি রেক।

কে দিল চিরকুটটি?— অধীর বলল।

যে-ই দিক। কী বুঝলি? ডুবন্ত জাহাজ কে পাহারা দেয়? ডুবন্ত জাহাজের খোঁজে কে আসে? কোনও রহস্য নিশ্চয় থেকে যায়। এই রহস্য-তাড়িত হয়েছিলাম বলেই এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছি। এই রহস্য থেকেই কলিজের আবিষ্কার। চার্লি পাটাতন তুলে উঁকি দিয়ে কী দেখে? এই রহস্যই টেনে নিয়ে গেছে বোট-ডেকে। চার্লির সঙ্গে সুহাসের এত গা মাখামাখি কেন, এই রহস্যই টেনে নিয়ে গেছে কিনারায়। বুনো ফুলে ঘ্রাণ আছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সব দৈব নয়, বুঝলি।

তা হলে বলছ, দুই ভগিনীপতি জানত যে চার্লি মেয়ে?

জাহাজে ওঠার আগে সংশয় ছিল। কারণ চার্লির জন্মের আগে তার ঠাকুরদা উইলটি প্রকাশ করেন। লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট অফ জোহান্স মিলার। উইলের কপি আমার কাছে আছে। কাপ্তান জানেনই না এখনও, তাঁর মূল্যবান কাগজপত্র সব চুরি গেছে। তবে টের পাবেন। উইলের কপিটি তোরা দ্যাখ। পড়। বুঝতে না পারলে বলব। আমিও সব জায়গায় বুঝতে পারিনি! ফিল বুঝিয়ে দিয়েছে। কাপ্তান ফিরে এলে ধরা পড়বই।

এবারে ঢোক গিলে সুরঞ্জন বলল, চা করে আনি। তারপরে বের করবে। এ তো চমকপ্রদ নাটক। তুমি যে দেখছি শার্লক হোমসের বাবা! তাঁর ভূমিকাটি ভালই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চা না খেয়ে তোমার উইল দেখতে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারি। তুমি কি তা চাও?

বললাম তো চা করে আন।

বের করবে না। আমি এলে বের করবে।

বের করছি না। যা তো।

সিঁড়ি ধরে কিছুটা উঠে গিয়েই সুরঞ্জনের মনে পড়ল, সুটের তলায় লোকটা মরে পড়ে আছে। সে একা ডেক-এ যেতে সাহস পেল না। তার ফিরে আসার সময়, হঠাৎ মনে হল বংশী ভিতরে গোঙাচ্ছে। সে নেমে এসেছিল অধীরকে সঙ্গে নিয়ে উপরে যাবে বলে, আর বংশীর দরজাতেই তাকে থেমে যেতে হল। বংশীর কী হল আবার! ছুটে এসে বলল, মুখার্জিদা, বংশী—।

বংশী কী?

বংশী গোঙাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। দরজা পার হয়ে বংশীর ঘর খুলে অবাক। বংশী কম্বল গায়ে দিয়ে হি হি করছে। শীতে কাঁপছে। এত গরমে বংশীর এই পরিস্থিতি দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল। ব্যাটা ভয়ে জুজু। ভয়ে কাঁপছে। তবু তিনি গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। না জ্বর-টর হয়নি। একা সে কিছুতেই ফোকশালে থাকতে রাজি না। আতঙ্কেই মরে যাবে। কী করেন!

অধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ইচ্ছে হয় বল। তোর কী ইচ্ছে হত?

না, মাথা গরম করে লাভ নেই।

তিনি পাশের ফোকশালে ঢুকে কেষ্টকে সন্তর্পণে ডেকে ওঠালেন। বললেন, আয়।

কেষ্ট কিছুই বুঝতে পারছে না! সেও ভাল নেই।

মুখার্জিদা বললেন, বংশীর পাশের বাংকে শুয়ে থাক। বোধহয় জ্বর আসছে। তিনি বললেন না, সুটের তলায় মরা মানুষ পড়ে আছে দেখে ভয়ে কাবু। আতঙ্কে ব্যাটা কম্বলে মুখ মাথা শরীর ঢেকে শুয়ে আছে।

সুরঞ্জন বাইরে এসে বলল, অধীর, চল না উপরে!

তা হলে এইসব বীর ভারতবাসী নিয়ে আমার জাহাজে যাত্রা। হয়েছে ভাল! যা অধীর। তারপর কিছু হলে দোষের ভাগী। সব দৈব! দৈব যখন, ডেকে উঠতে ভয় পাচ্ছিস কেন? মারব এক লাথি।

মারো দাদা। সব মারতে পারো। বাধা দেব না।

মুখার্জি নিজের ফোকশালে ঢুকে আবার শুয়ে পড়লেন। চা এলে উঠবেন। পাচার করা উইলের কপিটি বালিশের তলায় রেখে দিলেন। ওরা নিজের চোখে দেখুক। মূল উইলের কপিটি কী করে কাপ্তান সংগ্রহ করেছেন তিনি জানেন না। তবে যে এত বড় জালিয়াতি করতে পারে তার পক্ষে সব সম্ভব। চার্লি যে ছেলে নয়, মেয়ে, চার্লিকে জাহাজে তুলে নিয়ে আসার পরও বোধহয় কাপ্তান নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ফিলের ধারণা, সে বেটসিকে খতম করে দিতে একজন ট্রাকারকে ভাড়া করতেই পারে।

চা নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে ঢুকল সুরঞ্জন। অধীর গায়ে-গায়ে। যেন এমন পরিস্থিতি, একলা পড়ে গেলেই উইলিয়ামের প্রেতাত্মা তাকে ছুঁয়ে দেবে।

মুখার্জি বললেন, দ্যাখ, জাহাজে ভূত-টুত নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না! মধ্যরাতে বোট-ডেকে নারী! এখন বুঝতেই পারছি তিনি কে? তিনি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া চার্লি, বুঝতে কি কোনও অসুবিধা আছে! বেকুফের মতো সবাই জাহাজটাকে দুষছে। জাহাজটা দোষ পেয়েছে। আহমদ পালাল। ব্যাটা, দেখবি তো কম্বল তুলে, কী আছে বাংকে! মরা মানুষের আর কাজ নেই, হেঁটে গিয়ে আহমদের নরম বিছানার লোভে শুয়ে না পড়লে যেন ঘুম হবে না! সুতরাং ঘোর থেকে সব হয় বুঝতেই পারছ। ঘোরে পড়েই আহমদ বরফ-ঘরে মেয়েমানুষের লাশ ঝুলতে দেখে। ঘোর বড় বিষম বস্তু। এক ধরনের মানসিক রোগ এটা, বুঝিস?

সব বুঝি দাদা। না বুঝলেও আর তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছি না।— অধীর বড়ই কৃতজ্ঞ যেন মুখার্জির উপর।

এই ঘোরে পড়েই আদ্যাশক্তি মহামায়া বুড়ো মানুষের মুখ দেখতে পায়। মুখোশ না, সে দ্যাখে তার ঠাকুরদার মুখটি তাকে অনুসরণ করছে। সে আসলে মেয়ে, কিন্তু বাপের চাপে ছেলে সেজে আছে। ডাঙায় থাকলে যদি ধরা পড়ে যায়, তার জন্য জাহাজে জাহাজে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন কাপ্তান।

কে বলল ঠাকুরদার মুখ তাকে অনুসরণ করছে? আমরা তো জানি না।— প্রায় সমস্বরে অধীর সুরঞ্জন একসঙ্গে বলে উঠল।

কে বলবে বুঝিস না! কে বলতে পারে? কাকে চার্লি বিশ্বাস করে সব বলত?

শেষে চার্লি তার ঠাকুরদার পাল্লায় পড়ে গেল! সুহাসকে নিয়ে চার্লির তবে এত খোঁজাখুঁজি কেন?

খোঁজাখুঁজির অজুহাতে সুহাসকে হয়তো ডেরিকের নীচ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ ডেরিক পড়বেই সে হয়তো জানত। অবশ্য এটা আমার ধারণা। আবার এমনও হতে পারে, পোর্ট-হোলে গভীর রাতে মুখোশটি দেখে মনে হয়েছে, কেউ তাকে ঠাকুরদার মুখোশ পরে ভয় দেখাচ্ছে না তো! শোন, বোঝার চেষ্টা করবি। চার্লি মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদের শিকার হত। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তখনই সে ঝোপ-জঙ্গলে মুখোশ উঁকি দিলে ভাবত কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে পোর্ট-হোলেও দেখেছে, মধ্যরাতে মুখোশ। বন্দরে খোঁজাখুঁজি করে বের করা কঠিন। কিন্তু জাহাজে? খুব সোজা। সে তো মুখোশ ভাবত না। বুড়ো মানুষ ভাবত। জাহাজে বুড়ো মানুষটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেল না। এক কথা বার বার বলতেও ভাল লাগে না। তোরা তো জানিস সব।

জানলেও রহস্য থেকে যায়। তারপর আর খোঁজাখুঁজি করল না কেন?

করল না, সে ধরেই নিয়েছিল, তার ঠাকুরদাই ঘুরে ফিরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। অন্য কেউ নয়। কারণ চার্লি জানত, তাকে কেন্দ্র করে পরিবারে একটি বড় পাপচক্র গড়ে উঠেছে। ঠাকুরদাকে সে ঠকিয়েছে। ঠাকুরদা বড় লেটে বুঝতে পারেন। চার বছরের চার্লি বাথরুম থেকে উলঙ্গ অবস্থায় ছুটে যাকে দেখেছিল, সে তার ঠাকুরদা। বেটসি ছুটে গেছে, সামলাতে পারেনি। মহামায়ার মায়াপাশে সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ। পক্ষাঘাত। যতদিন বেঁচে ছিলেন, চোখ বরফের মতো শীতল। বীভৎস। মায়াপাশে বদ্ধ চার্লির ঠাকুরদা বাক্‌রহিত। চার্লি এমনিতেই তার ঠাকুরদাকে যমের মতো ভয় পেত। এটা বেটসির চক্রান্ত বলতে পারিস। ঠাকুরদাকে দেখলেই ভয়ে পালাত। কাছে থাকত না। অবশ্য তিনি ক্যাডো লেকের প্রাসাদে কমই যেতেন। গেলে বেশিদিন থাকতেনও না। বুনো ফুলের নেশায় যুদ্ধের মধ্যেও দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ থেমে বললেন মুখার্জি, কী? তোদের কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?

না, দাদা।

নারীর মূলাধারটিই শেষে বুড়োকে আহাম্মক বানিয়ে দিল। তিনি এত বড় আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নাগপাশে বদ্ধ হয়ে গেলেন। পক্ষাঘাত। দেবীর এই মহিমাটুকু এখানে শেষ করতে পারলে বোধহয় ভাল হত।

থেমে বললেন, লম্বা সাদা দাড়ি, চুল বড়। সাদা চুল আর দাড়ি কিন্তু পক্ষাঘাতে কাবু হয় না। হয় কি?

বোধহয় হয় না।

বোধহয় বলছিস কেন?

অধীর বলল, আমি কোনও পক্ষাঘাতের রুগি দেখিনি, কী করে জানব, পক্ষাঘাতে চুল দাড়ি বাড়ে না কমে?

তোদের এটাও জেনে রাখা ভাল, মূলাধারটিকেই আমাদের মুনিঋষিরা দেবী বলেছেন, বিশ্বরূপেণ সংস্থিতা বলেছেন। খুবই উচ্চমার্গের কথা। আর কাপ্তান মিলার কী করলেন, তাকেই অপমান করলেন। খাটো করলেন।

মুখার্জিদা লকারে আবার কী খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন। আসলে তিনি জানেন, তাঁর সহকারীদের সব দেখিয়ে রাখা ভাল। তিনি একটি চিঠি বের করলেন।

এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়।

কয়েক ছত্রে মেয়েলি হস্তাক্ষরে চিঠি।

ওরা পড়ে বলল, কে লিখেছে?

কেন, বুঝতে পারছিস না?

বেইসি?

বেইসি নয়, বেটসি। কী লিখেছে পড়লি!

অধীর পড়তে লাগল, চার্লি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে যায়। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে মেয়েদের পোশাক পরে বের হয়ে যায়। সব প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, যতই বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াক, কার নজরে কখন পড়ে যাবে। এভাবে তাকে রাখা আর নিরাপদ ভাবছি না। আমার শাসন একদম গ্রাহ্য করে না। ধরা পড়ে গেলে সমূহ বিপদ। তাকে বার বার বুঝিয়েছি, প্রেইজ দ্য লর্ড। হাউ গুড ইট ইজ টু সিং হিজ প্রেইজেস। হাউ ডিলাইটফুল অ্যান্ড হাউ রাইট। সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না। বুঝিয়েছি, এটাই তোমার নিয়তি। জালিয়াতিব শাস্তি কত কঠিন তুমি জানো না। তোমার বাবা জালিয়াতির মামলায় জড়িয়ে পড়বেন। নিজেকে সংশোধন করো। শুধু তোমার ঠাকুরদার এস্টেটই বেহাত হবে না, তোমার বাবারও জেল জরিমানা হবে। কোনও কথাতেই কর্ণপাত করছে না। আপনি অনুগ্রহ করে জানান, এমত অবস্থায় এই নির্জন জঙ্গল প্রাসাদে আমার কী করণীয়?

সুরঞ্জন বলল, তা হলে বলতে হয় দেবী স্বমহিমায় আবির্ভূতা হলেন।

অধীর বলল, দেবী আর ছদ্মবেশে থাকতে রাজি হলেন না।

মুখার্জি চিঠিটি ভাঁজ করে আবার কী বের করার সময় বললেন, চার্লির জন্ম থেকে চূড়াকরণে সর্বত্র কারচুপি। ষোলো বছরে ষোলোকলা পূর্ণ। সেই ষোলো বছরের ষোলোকলা পূর্ণ করার জন্যই চার্লিকে জাহাজে তুলে আনা। কোনওরকমে ষোলোটা বছব পার করে দেওয়া। তারপরই কাপ্তান চার্লির সোল একজিকিউটাব। একুশ বছর বয়সে চার্লি সম্পত্তির মূল অধিকারী। অর্থপাগল মানুষ এত বড় এস্টেট হাতছাড়া হয়ে যাবে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তিনি জালিয়াতির আশ্রয় নিলেন। এমন চতুর লোক এত বড় একটা কাঁচা কাজ করতে পারে ভাবাই যায় না। দেবী কখনও স্বরূপে প্রকাশিত না হয়ে পারেন বল!

পারে না।

তা হলে বুঝতে পারছিস, সুহাসকে কেন তিনি প্রশ্রয় দিতেন?

চার্লিকে শান্ত রাখতে।

সবই তো বুঝিস দেখছি। জাহাজে উঠে দেখিসনি, রোজ চার্লি একটা না একটা আপদ সৃষ্টি করত। সারা জাহাজ ছুটে বেড়াত। দড়িদড়ায় ঝুলে বাপের মাথায় পা রেখে ব্রিজে উঠে যেত। ল্যাং মেরে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ফেলে দিত। আরও কত আপদ। সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। চার্লিকে দেখলে সবাই পালাত। সবই তো দেখা। কেবল সুহাস সামনে পড়ে গেলে শান্ত হয়ে যেত। ফিরে যেত মুখ নিচু করে। চোখ নামিয়ে নিত। কাপ্তান সুযোগ পেয়ে গেলেন। কার্য উদ্ধারে সুহাসকে ভাবলেন, সাময়িক হাতিয়ার। তাকে তিনি সরিয়ে দেবার কথা ভাবতেই পারেন না। কী? আমি ঠিক বলছি?

বলে সুরঞ্জনের দিকে তাকালেন। তারপর সেই চরম নিদর্শনটি বের করলেন বালিশের তলা থেকে।

আমি পড়ে যাচ্ছি, শুনে যা। লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট অফ জোহান্‌স মিলার, ক্যাডো লেক,

টেকসাস। ডেটেড দিস টুয়েলভথ ডে অফ জুন, নাইনটিন থার্টি সেভেন। নীচে সলিসিটারের ঠিকানা, ফ্র্যাংক ওরেলস, স্টানফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া।

মুখার্জি সহসা উঠে গিয়ে লকারে ফের কী খুঁজলেন, একটা চিরকুট, মেলে ধরলেন, এতে কি কিছু বোঝা যায়? আমি ঠিক ধরতে পারছি না। মনে হয় মিডওয়াইফ ডক ক্যাথির হস্তাক্ষর। যিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে চার্লিকে পুত্রসন্তান বলে ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি এবারে চিরকুটটি মেলে ধরলেন, ছেঁড়া কাগজও কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দিয়েছেন। মাত্র দুটো লাইন— ডক ক্যাথি অর দ্য মিডওয়াইফ, নিউ হু হি ওয়াজ, দ্য আইডিয়া দ্যাট এ্যা ম্যান মাইট বি সামবডি এলস অল হিজ লাইফ অ্যান্ড নেভার বি অ্যাওয়েয়ার অফ ইট— অসম্পূর্ণ, আগেও কিছু নেই পরেও কিছু নেই।

কোথায় পেলে!— সুরঞ্জন অধীর এর অর্থ সঠিক ধরতে না পেরেও চার্লি যে জালিয়াতির শিকার ভাবতে আর দ্বিধা করল না।

তারপরই মুখার্জি দু'জন সাক্ষীর বয়ান এবং তাদের নাম পড়ে গেলেন। একজন জর্জ মরিস, ক্যাডো লেক, এবং অন্য জন খোদ উইলি বেটসি।

কী লেখা আছে? পড়, শুনি।

মুখার্জিদা চোখ বুজে থাকলেন।

সুরঞ্জন পড়ছে, সাইনড বাই দি সেইড জোহান্‌স মিলার অ্যাভাব নেমড টু বি হিজ লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট ইন দি প্রেজেন্স অফ আস...।

মনে রাখবি উইল কিন্তু একটি জন্মের আগে এবং অন্যটি চার্লির জন্মের পর। প্রথম উইলে লেখা, অ্যানি গ্র্যান্ডসন, দ্বিতীয় উইলে লেখা, মাই গ্র্যান্ডসন জন মিলার।

এখানে কী লেখা আছে, পড়।

ইন কেস মাই সেইড টু সনস ডু নট হ্যাভ অ্যানি সনস দেন অ্যান্ড ইন সাচ কেস মাই সেইড এস্টেট উইল বি গিভেন টু ন্যাশনাল ওয়াইলড-ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টার, সানফ্রানসিসকো।

অ্যাম আই রাইট! কাপ্তান মিলার প্রথম উইলের ভিত্তিতে মিডওয়াইফ ডক ক্যাথি এবং স্ত্রী ক্যালির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চার্লিকে পুত্রসন্তান ঘোষণা করে নিজের পিতৃদেব জোহান্‌স মিলারকে ধোঁকা দেন। প্রতারণা, জালিয়াতির শাস্তি স্টেটগুলোতে এক-একরকম। টেকসাসে কী শাস্তি হয় আমার জানা নেই। তবে ফিল বলেছেন, আদালতে প্রমাণিত হলে নির্ঘাত দশ বছরের জেল। উইল বাতিল। তা হলেই বুঝতে পাবছ, চার্লিকে খুঁজে না পেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

এটা বোধহয় চার্লির আঁকা শেষ ছবি।— লকার থেকে ছবিটা বের করলেন।

তোরা তো জানিস ময়লা ফেলার ঝুড়ি থেকে চার্লির সব পরিত্যক্ত ছবি আমি রাতের অন্ধকারে সংগ্রহ করতাম। তোদের বলেছি, ছবিগুলিতে ক্রোধ এবং সুষমা দুই-ই ফুটে উঠত। এটা অবশ্য চার্লির কেবিন থেকে তুলে এনেছি। দেয়ালে টাঙানো ছিল। বোধহয় চার্লির এটাই শেষ ছবি।

তিনি যত্নের সঙ্গে ছবিটা দেয়ালে গেঁথে দিতে থাকলেন।

আকারেও বড় ছবিটা। চার্লির প্রোসরপিনা। সিংহের মতো মুখ, এক সুকুমারীকে উলঙ্গ করে বাঁ হাতে জাপটে ধরেছে। ছবিটা রোমের আর্ট গ্যালারিতে দেখে সে একবার ভিরমিও খেয়েছিল। অবশ্য তোরা দেখতে পাচ্ছিস ছবিটাতে চার্লি খুব বেশি কালো রং ব্যবহার করেছে। দূর থেকে দেখলে নিশীথের গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু টের পাওয়া যায় না। এমনও নয় ছবিটা সেই প্রোসরপিনার নকল। কাছে এলে বুঝতে পারবি, অন্ধকারে উইন্ডস-হোলে হেলান দিয়ে সুটের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। লম্বা টুপি মাথায়। গায়ে কালো পোশাক। হাত পা মুখ স্পষ্ট নয়। সুটের পাটাতনে সে এসে গভীর রাতে দাঁড়াবেই, চার্লি জানত।

তা হলে কী বুঝলি?

হাত পা মুখ স্পষ্ট নয়।— অধীর দেখে বলল।

চার্লি পেতলের বলগুলি জোগাড় করেছে উইনচের বাতিল স্ট্যাপার থেকে। উইলিয়ামকে সে চিনতে পেরেছে। যতই গিরগিটি গোঁফ পরে ছদ্মবেশ ধারণ করুক, সুহাসকে ঘুষি মারার সময় সামনাসামনি দেখে চিনে ফেলেছে। মিশনে দেখেছিল দূর থেকে, চিনতে পারেনি। ঘোড়ার পিঠে উঠে চিৎকার করে উঠেছিল,

আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল। নাথিং ক্যান স্টপ মি। কেউ পারেওনি। অ্যাম আই রাইট!
রাইট।— সুরঞ্জন বলল।
তা হলে সূত্রটা কী? ম্যাক আর উইলিয়াম শ্বশুরের জাহাজে উঠে এসেছিল উড়ো খবরের ভিত্তিতে। যদি সত্যি চার্লিকে আবিষ্কার করা যায়। সমুদ্রের ধারে আবিষ্কারের কাজটি সম্পূর্ণ হাসিল। ম্যাক আর উইলিয়াম দু'জনই ব্ল্যাকমেল করে সম্পত্তির অংশ আশা করতে পারে, কাপ্তান না মানলে, আদালতগ্রাহ্য অপবাধ, উইল বাতিল। অ্যাম আই রাইট? নানা দিক ভেবেই তারা উঠে এসেছিল। কেন চার্লিকে নিয়ে জাহাজে ঘুরছেন মিলার?
উইল বাতিল বলছ কেন?— সুরঞ্জনের সোজা প্রশ্ন।
মুখার্জি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি কি কোনও বড়রকমের পয়েন্ট মিস করে গেছেন? এত সহজ বোধগম্য কারণগুলি তো এদের না বোঝার কথা না।
তিনি বললেন, ফের আর-একবাব চার্লি রহস্যের পয়েন্টগুলো পবিষ্কার কবাব চেষ্টা কবছি। বোঝাব চেষ্টা করবি।
বলে তিনি তাঁর ছড়ানো আঙুলে এক-একটা পয়েন্ট ছুঁয়ে যেতে থাকলেন।
এক— চার্লির ঠাকুরদা জোহান্‌স মিলার চার্লির জন্মের আগে যে উইলটি করেন, চার্লিব জন্মেব পব তা ফের পালটান। ওটাই জোহান্‌স মিলারের লাস্ট টেস্টামেন্ট। আগের উইলে তিনি তাঁব গ্র্যান্ডসনকে সম্পত্তি দান করে যান। গ্র্যান্ডসন না থাকলে সম্পত্তির মালিক ন্যাশনাল ওয়াইলড-ফ্লাওয়াব বিসার্চ সেন্টাব। তোমরা নিশ্চয়ই জানো চার্লিব নিজেব দিদিরা তখন বড় হয়ে গেছে। যে যাব মতো উড়ে গেছে। চার্লির তখন জন্মই হয়নি।
অধীর বলল, তা হলে দুটো উইল।
মুখার্জি ধমক দিয়ে বললেন, দুটো উইল হয় না বুঝলি। উইল একটাই। শেষ উইলটি আদালতগ্রাহ্য। প্রথম উইলটি আমাদের কাপ্তান ফাঁস কবে জানতে পারেন, তাঁর কোনও পুত্রসন্তান থাকলে সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবেন। এখন তোরা আমাকে প্রশ্ন করতে পাবিস, দুটো উইলের কথা বলছি কেন তবে? কাপ্তান চার্লিকে পুত্র বলে ঘোষণা করেন প্রথম উইলের ভিত্তিতে। কিন্তু পবের উইলে কী আছে? তাতে দেখছি সরাসরি সব বিষয় সম্পত্তি চার্লিকে লিখে দিয়েছেন তার ঠাকুরদা। সঙ্গে একজন সোল একজিকিউটারও নিযুক্ত করে গেছেন। চার্লি, তাব বাবা-কাকাদের মতো উচ্ছন্নে না যায়, সেজন্য ঠাকুরদা তাব বড় পুত্রকেই সোল একজিকিউটার নির্বাচিত করে যান। তবে চার্লি অপঘাতে মারা গেলে, অপহরণ কিংবা নিখোঁজ হলে অথবা উন্মাদ হয়ে গেলে ঠাকুরদার সব বিষয় আশয় চলে যাবে ওয়াইলডফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টারের হাতে। আশা করছি প্রথম উইল এবং দ্বিতীয় উইলেব বয়ানের তফাত কোথায় কতটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। গোলমালও থাকার কথা না।
না। খুবই অকাট্য যুক্তি দাদাব।— ঘাড় কাত করে সুরঞ্জন অধীর দু'জনেই মেনে নিল।
এত উজবুক তোরা! কোনও গোলমাল নেই ভেবে ফেললি! গোলমালটা কোথায় বুঝলি না! সব সময় মাথায় বাখবি, জোহানস মিলার তাঁর লাস্ট টেস্টামেন্টে সব বিষয়-আশয় গ্র্যান্ডসন চার্লিকে দিয়ে গিয়েছেন। প্রতিটি বাক্যের প্রথমে কিংবা শেষে তিনি গ্র্যান্ডসন কথাটা উল্লেখ করেছেন। মাই গ্র্যান্ডসন জন মিলাব। চার্লির আসল নাম জন মিলার। একবারও বলেননি, শুধু জন মিলার। সব শর্তের শেষে তিনি লিখেছেন, মাই গ্র্যান্ডসন। কোথাও কি লেখা আছে গ্র্যান্ডডটার?
বলে তিনি তাঁর ফাইল থেকে উইলের পাচার করা কপিটি খুলে পড়তে দিলেন। বললেন, খুঁজে দ্যাখ কোথাও শুধু জন মিলার লেখা আছে কি না?
কিছুটা দেখে উলটে-পালটে সুরঞ্জন বলল, ঠিক আছে বলে যাও।
কপিটি মুখার্জিকে ফেরত দিলে তিনি বললেন, বুঝতে পারছিস আমার সিদ্ধান্তগুলি খুব একটা লঘুপাকের নয়।
বাব বার এক কথা বলছ কেন বলো তো?— অধীর বিরক্তি প্রকাশ না করে পারল না।
বাট আসলে শি ইজ এ গ্র্যান্ডডটার। নট গ্র্যান্ডসন। যদি প্রমাণ হয় উইলের মূল শর্তটিই উপেক্ষিত, জন মিলাব ইজ নট এ সন, বাট এ ডটার, তা হলে ঠাকুরদার লাস্ট টেস্টামেন্ট ফালতু হয়ে যায় না? ষড়যন্ত্র,

কারচুপি, জালিয়াতি মামলার আসামি কাপ্তান এবং তার ছদ্মবেশী পুত্র দু'জনেই— এমন প্রমাণ করা কি আদালতে খুব একটা কঠিন কাজ হবে?

আদৌ কঠিন হবে না। জলবৎ তরলং হয়ে সোজা জেলখানার অন্ধকারে।

মুখার্জি খুবই তৎপরতার সঙ্গে বলে গেলেন, আর এই কারণেই ব্ল্যাকমেলের সূত্রপাত। সংশয়, কাপ্তান তাঁর পুত্রকে নিয়ে জাহাজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? দিদিরা তো খাপ্পা। ভগিনীপতিরাও। কিছু একটা আছে। উইলিয়াম, ম্যাক দু'জনেই উঠে এসেছিল, চার্লির সঙ্গে ম্যাকের ঘনিষ্ঠতাও এই কারণে। আঁচ করতেও পারে, নাও পারে। তবে আঁচ করতে পেরেছিল মনে হয়। চার্লিকে নিয়ে কোনওরকমে দেশে ফিরে যাওয়া। অপেক্ষা, কখন উত্তরাধিকার চার্লির উপর বর্তায়। বর্তালেই মামলা ঠুকে দেওয়া মহামান্য আদালতের কাছে। মাই লর্ড, জন মিলার আদপেই জোহান্স মিলারের গ্র্যান্ডসন নয়, চার্লি জোহান্স মিলারের গ্র্যান্ডডটার। চার্লির দফা-রফা। কাপ্তানের হাতকড়া। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

না।

মাথায় তোদের কিছু নেই। চার্লির দফা-রফা হলে কী হচ্ছে? বিষয়-আশয়ের কি কোনও নিষ্পত্তি হচ্ছে? উইল বাতিল হলে স্থিতাবস্থা অথবা ন্যাশনাল ওয়াইলড-ফ্লাওযার রিসার্চ সেন্টার বিষয়-আশয়ের মালিক হতে পারে, তা কোর্টের ডিসিশান। ফলে উইলিয়াম আরও একটি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ডেরিক ফেলে ম্যাককে নিকেশ করে দেওয়া হল। সুহাস থাকলে, সেও যেত। একে ঢিলে দুই পাখি। হল না। বার বার ফাঁদ পেতে সুহাসকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মধ্যরাতে উইন্ডস-হোলের মুখে চিৎকার করে চার্লিকে শাসাত, দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ। আর চার্লি ছেলেমানুষ, এটা তোদের মনে রাখা দরকার। তাকে ব্ল্যাকমেল করাও সহজ। কিন্তু লোকটা জানতই না, চার্লি সরল সোজা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলেও কত সাংঘাতিক হতে পারে। ভালবাসার মহিমা যে ঈশ্বরের চেয়েও প্রবল! কিছুই সে তখন ভ্রুক্ষেপ করে না। প্রোসরপিনা যে উইলিয়াম, বুঝতে কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে? জালিয়াতির ভয় দেখিয়ে বাপ-ব্যাটাকে কাবু করাও সহজ।

উইলিয়াম ব্ল্যাকমেল করে চার্লিকে তার তাঁবে রাখতে চেয়েছিল। পরিকল্পনাটি নিখুঁত এবং ভয়ংকর। তাঁবে রাখতে পারলে গাছেরও খাবে, তলারও কুড়াবে। একজন তরুণীর পক্ষে এটা কত বড় মর্মান্তিক বিভীষিকা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। চার্লির কাছে উইলিয়াম সেই প্রোসরপিনা হয়ে গেল। একজন দানব কোনও সুকুমারীকে রেপ করছে। দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলেই চার্লি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। সুহাস ছাড়া আর কে আছে জাহাজে, উইলিয়ামের কাছে ডেনজারাস ট্র্যাপ হতে পারে? সুহাসের সঙ্গে চার্লি পালিয়ে গেলে ওর যে সর্বনাশ? আমও গেল, ছালাও গেল। একজন নেটিভের এতটা বেয়াদপি সে সহ্য করবে কেন? কী আমি ঠিক? ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ, যৌন লালসায় মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। দানব হয়ে যায়। প্রোসরপিনা হয়ে যায়। উইলিয়াম তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। যা বলছিলাম, তার আগেই জাল পাতা হল। কেন? ম্যাক জানত, চার্লি মেয়ে। ম্যাকের কথার উপর ভিত্তি করে জালটা পাতা হয়েছিল। মরবে, তবে খুন বলে গ্রাহ্য হবে না। নেহাতই দুর্ঘটনা। চার্লি যে ফাঁদ পাতল, মরবে, তবে খুন বলে গ্রাহ্য হবে না। দুর্ঘটনা। পাটাতন হড়কে লোকটা পড়ে গেছে। টিট ফর ট্যাট। অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেত। যাকগে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। আইন-আদালত ভাল বুঝিও না। যা বুঝি তাই বললাম। ঠিক-বেঠিক জানি না। কী বলছিলাম?

মাথা চুলকোতে থাকলেন মুখার্জি।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ডেক-কশপ লতু মিঞা স্বীকার করেছে ম্যাক কী দরকারে তার কাছ থেকে একটা খালি রঙের টব চেয়ে নিয়েছিল। নেটিভটার বাড়াবাড়ি তাদের পছন্দ হচ্ছিল না বোধহয়। সুহাসের সঙ্গে চার্লির মেলামেশা দু'জনেরই চোখের বিষ। উগ্র বর্ণ-বিদ্বেষীরা কী করতে না পারে! ফিল তো বলল, উইলিয়ামের পূর্বপুরুষ নিগ্রো রমণীদের দিয়ে ব্রিড করাত। হাঁস মুরগি পালন— ডিম ফুটে বাচ্চা হলে বড় করা, তারপর বিক্রি। ক্রীতদাস প্রথা বেআইনি হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায় রমরমা। নিগ্রো রমণীদের ক্ষেত্রটি অনুর্বর হয়ে গেলে খামারের কাজে লাগাত। অন্তত আট-দশটি নিগ্রো যুবককে পরিবারটি গাছে ঝুলিয়ে চামড়া তুলে হত্যা করেছে। নিউপার্থের এই পরিবারটির কুখ্যাতির কথা লুসিয়ানার নিগ্রোদের এখনও দুঃস্বপ্ন। এরা দু'জনেই সেই পরিবারের। দু'জনেরই এক পদবি, লিনচার। উইলিয়াম লিনচার। ম্যাকি লিনচার।

অধীব সুবঞ্জন দু'জনেই উঠে গিয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বলল, তিনিই তবে আমাদেব মেঘনাদ? মেঘেব ওপাব থেকে কথা বলতেন? চার্লিব এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড?

ইযেস। উইলিয়াম বোজ মধ্যবাতে বেব হয়ে অন্ধকাবে উইন্ডস-হোলে ঠেস দিযে দাঁড়াত। পাইপ টানত। শাসাত, দ্যা প্লান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়াব ফাদাব শ্যাল বি রুটেড আপ।

কী জঘন্য! সত্যি ভাবা যায় না।— সুবঞ্জন বলল।

মুখার্জি বললেন, ছবিটাব নীচে চার্লি কী লিখেছে দ্যাখ।

লিখেছে, গড ক্রিয়েটেড অল ক্রিয়েচার্স অ্যান্ড অলসো উইকেড টু বি পানিশড।

এবপব আব কোনও সংশয় আছে তোদেব, পাটাতনেব নীচে চার্লি ছাড়া কে আব পেতলেব বল সাজিয়ে বাখতে পাবে? এবাব শুয়ে পড় গে। সুহাস এসে কী খবব দেয় দ্যাখ। কাপ্তানও ফিবে আসবেন। লকাবে পাচাব কবা কাপ্তানেব কাগজপত্র থাকল। ফিলেব কাছে কপি আছে। মনে হয় না কাপ্তান সহজে পাব পাবেন।

অধীব সুবঞ্জনেব ওঠাব কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মুখার্জি বললেন, এখনও কি তোদেব কোনও সংশয় আছে?

অধীব মাথা চুলকে বলল, না বলছিলাম সুহাসকে অন্ধকাব ইঞ্জিন রুমে নিযে গিযে কে চুবিয়ে মাবতে চেযেছিল? সুহাস তো বলল, কোনও অদৃশ্য প্রেতাত্মা। তাব নাকি মুখ হাত পা কিছুই সে দেখতে পায়নি।

মুখার্জি যেন কিছুটা হাঁপিয়ে উঠছেন। তা উঠতেই পাবেন। দু'দিন ধবে যা ধকল যাচ্ছে! বিছানায় শুয়ে শুধু বললেন, আব শবীব দিচ্ছে না। কত বাত যেন ঘুমাই না। কিছুতেই কিছু বুঝতে চাস না। তবে জেনে বাখ কাজটা উইলিযামেব। শেষ পর্যন্ত না পেবে ট্যাংকেব জলে দম বন্ধ কবে সুহাসকে খুন কবতে চেযেছিল। কী নিষ্ঠুব, বল? পাবে। এবা সব পাবে। বক্তে দোষ থেকে গেছে।

অধীব বলল, কেউ তো দ্যাখেনি তাকে? তুমিও না। চার্লিও না। সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান কবছ!

না, না, ক্রিযা-প্রতিক্রিযা নয়।

প্রায় উঠে বসেছিলেন মুখার্জি। তাবপব শুয়ে পডলেন। তোবা ওব কেবিনে গেলে দেখতে পাবি চার্লিব ঠাকুবদাব জীবন ও বাণী বইটি উইলিয়ামেব কেবিনে পড়ে আছে। চার্লি বইটি সুহাসকে দিযেছিল। বইটি আমাব খুব দবকাব। ইঞ্জিন রুমে নামাব সময বইটি যে সুহাসেব হাতে ছিল বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে? বইটি পবে খুঁজে পাওযা যাযনি। কে নিল! সুহাস বইটি আমাকে দিতে পাবেনি। চার্লিব কাছ থেকে সে চেয়ে এনেছিল। তাবপব সে তো কিছুই মনে কবতে পাবছিল না। ইঞ্জিন-রুম থেকে দাদাশ্বশুবেব বইটি উইলিয়াম তুলে নিযেছে।

তুমি দেখেছ উইলিযামেব কেবিনে আছে?

না, দেখিনি। এটা অনুমান। ঠিক অনুমানও বলতে পাবিস না। এ প্লাস বি হোল স্কোযাব কী হয়?

অধীব বলল, এ স্কোযাব প্লাস টোযাইস এ বি প্লাস বি স্কোয়াব।

এও তাই। দেখে আসতে পাবিস। বইটি কোথায যাবে? ইঞ্জিন-রুমে সুহাস উইলিয়াম ছাড়া আব কে ছিল যে বইটা নিতে পাবে! জাহাজ তো এখন বাপ মা মবা অনাথ। গিয়ে দেখে আয না। ওব কেবিন তো খোলা আছে।

ওবে বাব্বা। ওদিকে যেতেই পাবব না। মেবে ফেললেও না।

তবে চল দেখে আসি। সূত্রটি ঠিক কি না?

তিনি যাবাব সময় বললেন, ফবোযার্ড-ডেক ধবে যাওয়াই ভাল। কাবও চোখে পডবে না। তবে কেউ বাইবে নেই। খুব সতর্ক থাকাবও কিছু নেই।

তিনি উইলিযামেব কেবিন ঠেলা মাবতেই খুলে গেল। খোলাই ছিল। তাব টেবিলে অধীব সুবঞ্জন দেখল, সত্যি ডবোথি ক্যাবিকো নামে বইটি পড়ে আছে। ভিতবে আলো জ্বালাই ছিল। এখন পর্যন্ত কেউ নেভায়নি।

এটা এখানে আসে কী কবে?

অধীর সুরঞ্জন মুখার্জির পায়ে গড় হতে গেল, তুমি সত্যি গুরুদেব!

ওরা বের হয়ে আসার সময় দেখলেন সব শুনশান। এমন মৃত জাহাজে হেঁটে বেড়াতেও আতঙ্ক হচ্ছে। কে আগে যাবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি।

মুখার্জি সিঁড়ি ধরে নামার সময় বললেন, তা হলে বুঝলি, অদৃশ্য আত্মা কিংবা প্রেতাত্মার কাজ নয়। সি-ডেভিল লুকেনারেরও কাজ নয়। আসলে আমরা নিজেরাই কখন ডেভিল হয়ে যাই, কখন হোলি স্পিরিট হয়ে যাই, জানতে পারি না। যত দোষ সব অপদেবতাদের!

ওরা ঘরে ঢুকে গেলে অধীর দরজা বন্ধ করে দিল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। সুরঞ্জন বলল, আমিও খাব।

বলে সেও ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেল। তারপরই বলল, আচ্ছা, তোমার মনে আছে, চার্লি কিন্তু বলেছিল, তার জন্মাবার আগেই ঠাকুরদা গত হয়েছেন। কেন বলল, বলো তো?

আরে বুঝছিস না কেন? চার-পাঁচ বছরের স্মৃতি তার মনে থাকার কথা না। শুধু হিম শীতল, দাড়ি গোঁফয়ালা একটা মৃতপ্রায় লোককে দিনের পর দিন দেখেছে, স্টাডিরুমে পড়ে আছে। চার্লি সেদিকে যেতই না। ভয়ে ভিরমি খেত। বড় হলে নিশ্চয়ই বেটসি বুঝিয়েছে, সে জন্মাবার আগেই তার ঠাকুরদা মারা গেছে। চার্লির দোষ নেই।

কিন্তু দড়িটা কে টানল?

কে টানবে? উইলিয়াম! উইন্ডস-হোলগুলিই ছিল তার ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র। সে সহজে তার কেবিন থেকে বের হত না। আমরা কখনও ওর এলাকায় যেতে পারতাম না। নিষিদ্ধ এলাকা। তাকে আমরা এই জাহাজে কে ক'বার দেখেছি বল! সে তার কেবিনে খাওয়া-দাওয়া করত। কেবিন আর ট্রান্সমিশন-রুম। ওর শ্বশুর চিনত না, চেনার কথা নয়। গোটা পরিবারটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পনেরো-বিশ বছর ধরে কেউ কারও খোঁজ রাখত বলে মনে হয় না!

না, বলছিলাম, তবে কাপ্তান কেন মাই ফেইথফুল সেলর বলে লেকচার ঝাড়লেন?

শেষদিকে তিনি টের পেয়েছিলেন। বিশেষ করে চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বাপকে গালাগাল দেবার সময় উইলিয়াম সম্পর্কে নালিশও দিতে পারে। উইলিয়াম যে কাপ্তানের পুত্রটিকে শাসাচ্ছে, তাও বলতে পারে। ব্ল্যাকমেল করতে পারে। এগুলি কিন্তু কোনও রহস্যের মধ্যেই পড়ে না। অযথা আমাকে আর প্রশ্ন করে জ্বালাতন করিস না। মনটা ভাল নেই। সুহাস না আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলে! বড় দুশ্চিন্তা মাথায়।

ওরা দু'জনেই চুপ।

কী আর বলা যায়?

তিনি যা বলছেন, সবই তো মিলে যাচ্ছে। কেবল মুখোশ নিয়ে মগড়ার ধোঁকা ছাড়া আর কিছুতেই তিনি বোকা বনে যাননি।

ওরা বসেই আছে।

অগত্যা মুখার্জি বললেন, কাপ্তান শেষদিকে টের পেয়েছিলেন মেয়ের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে এবং জাহাজে তাঁর প্রতিপক্ষ উঠে এসেছে। বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মাথাও ঠিক থাকতে না পারে। মাই ফেইথফুল সেলর নিয়ে তোদের মাথা ঘামানোর কী দরকার পড়ল বুঝছি না।

তারা উঠে পড়ল।

যেন দরজা খুলতেও ভয় পাচ্ছে।

তখনই মুখার্জি ডাকলেন, মনে রাখিস এটাও দুর্ঘটনা। চার্লিকে খুনি ভাবিস না। আত্মরক্ষার্থে শুধু নয়, সুহাসকে উইলিয়াম আজ হোক কাল হোক খতম করতই। চার্লি ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে মনে করে, উইলিয়াম সিনার। সে মনে করে, সিনারকে শুধু সে সাতবারই ক্ষমা করেনি। আরও বেশিবার করেছে। তা না হলে সেভেনটি টাইমস সেভেনের কথা বলত না। চার্লিই বা কোথায় চলে গেল। কী যে খারাপ লাগছে! তবে আবার বলে রাখছি, এই ঈশ্বরবিশ্বাসী মেয়েটিকে নিয়ে কাপ্তান যা করলেন, কিছুতেই তিনি পার পেতে পারেন না!

পার পেলেনও না। সকালেই জাহাজে খবর এল, কাপ্তান মাদাঙে গুরুতর অসুস্থ। চিফ মেট ফিরে এসেছেন। জাহাজে ফিরেই লাশ নিয়ে ফের থানা-পুলিশ। পুলিশও এসে গেল। দুর্ঘটনা ছাড়া আর কী হতে

পারে। লাশ সুটের নীচ থেকে কপিকলে টেনে তোলা হচ্ছে। জাহাজিরা সব বিভ্রান্ত। লোকটিকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কিনারার লোক কি না কে জানে! কয়লার কালি মাখা মুখে জল ঢেলে দিতেই গৌফ আলগা এবং উইলিয়াম হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সুরঞ্জন দেখল বাঁ হাতে ক্ষতের দাগ। বীভৎস শরীর। মুখার্জিদা আসেননি। পুলিশও জেরা করল, সাক্ষীগোপালের মতো। তারপর নৌকায় লাশ নিয়ে চলে গেল।

সারেঙের নজর পড়ল, জাহাজে সবাই আছে, সুহাস নেই। ছেলেটির প্রতি তাঁব মাযা আছে। ভদ্র ছেলে। কোনও কারণে মাথা গরম করতে শেখেনি। না পেরে মুখার্জিবাবুকে তিনি বললেন, সুহাসকে দেখছি না। সে কোথায়?

কিনারায় গেছে। মনে হয় বিকেলে ফিরে আসবে। কাজে পাঠিয়েছি।

সারেং চলে যাচ্ছিলেন, মুখার্জিবাবু দৌড়ে গেলেন, চার্লিব কোনও খবব পাওয়া গেছে?

না।

শুনলাম, কাপ্তান গুরুতর অসুস্থ।

ঠিকই শুনেছেন। চিফ মেট কাপ্তানের কাজকর্ম দেখবে। মাদাঙে যাবার সময় কাপ্তান সংজ্ঞা হারান। হাসপাতালে আছেন। কোম্পানি তাঁকে দেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

চার্লির কী হবে? কোনও খোঁজই যে পাওয়া গেল না। ছেলেকে ফেলে চলে যেতে পাবছেন?

সারেং বললেন, কাপ্তানের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বোধহয় পক্ষাঘাত।

মুখার্জি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন সুহাস ফিবে এলে হয়। চার্লি ফিবে এলে হয়। জাহাজেব সব অপদেবতা বিনাশ। ওবা ফিরে এলেই তাঁর আব কোনও অস্বস্তি থাকছে না।

কিন্তু এল না।

বিকেলেও এল না।

বাতেও ফিরল না। সকাল হযে গেল। মুখার্জিবাবু না পেরে ছুটে গেলেন ফিলেব কাছে। ফিল তো অবাক। বললেন, সুহাস তো আসেনি। বাস্তা গোলমাল করে ফেলেনি তো?

তিনি গেলেন আস্তাবলে। খোঁজ নিলেন, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ডিঁনা ব্যাংকেব দু'জন জাহাজি ঘোড়া নিয়ে গেছে। দু'দিন হল তাদেব পাত্তা নেই। ঘোড়ারও না। খাতায় দেখলেন, সুহাস, চার্লি একদিন হেবফের। কে কোনদিকে যে চলে গেল!

গেল কোথায় ছেলেটা? রাস্তা হারিয়ে ফেলল? কী করেন! ফিলের কাছে ফের গেলেন। দু'দিন হয়ে গেল পাত্তা নেই। ফিল শুনে বললেন, চলো দেখি।

ফিল তাঁর লোকজনকে খবর পাঠালেন। না, কোথাও খোঁজ নেই। না চার্লির, না সুহাসের।

মুখার্জি পাগলেব মতো খুঁজছেন। রোজ ঘোড়া নিয়ে চলে যান। টিলায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। সামনে যতদূব চোখ যায় ঘাসেব প্রান্তর না হয় ঝোপজঙ্গল। সঙ্গে কোনও দিন সুরঞ্জন না হয় অধীব থাকছে। নিনামুর এবং স্থানীয় লোকজনও থাকছে।

রোজ একবার ফেরার সময় আস্তাবলে খবব নেন। কোনও খোঁজ যদি থাকে। একদিন বনজঙ্গলে ঘুরে ফেবার সময় জানতে পারলেন, ঘোড়া দুটো ফিরে এসেছে।

কোথা থেকে ফিরে এল?

তাঘড়ি টিলার নীচে ঘোড়াদুটো ঘাস খাচ্ছিল!

তা হলে চার্লি আর সুহাস ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে। মুখার্জি তাঘড়ি টিলায় গেলেন। সারা সকাল দুপুর রোদ মাথায় করে টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফিলও সঙ্গে আছে। ফিল বলল, চলো মুখার্জি। এভাবে সাবাদিন রোদে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি।

আসলে মুখার্জির কেন যে মনে হত সঙ্গে লোকজন আছে বলেই সুহাস ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। একা থাকলে লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে দু'জনেই উঠে দাঁড়াতে পারে। হাত তুলে দিতে পারে। তিনি এভাবে একা একা দিনের পর দিন টিলায় দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চার্লি, ব্লু স্টেম ঘাসের জঙ্গলে সুহাসকে নিযে যদি পালিয়ে থাকে? থাকতেই পারে। সমুদ্রে ঝিনুকের মাংস আর লেবুর রস, দুই উপাদেয় খাদ্য। সমুদ্রের ধারে-ধারেও ঘুবে বেড়ালেন।

সুরঞ্জন বলত, চলো। ফিরি।

মুখার্জি বলতেন, তোরা যা, আমি যাচ্ছি। এমন সুন্দর বুনো ফুলের উপত্যকায় ওরা থাকবে না হয় না।

গায়ে জ্বর নিয়ে ঘুরছ। তুমিও দেখছি শেষে বিছানা নেবে। চলো প্লিজ।

মুখার্জি ভাবতেন, ফুল ফুটবেই। যেখানেই ফুটুক, তিনি তাদের ঠিক দেখতে পাবেন। সুহাস এতটা বেইমানি করবে না। একবার অন্তত দেখা করে বলবে না, দাদা, আমার জন্য ভেবো না, আমি ভালই আছি? চার্লি অন্তত একবার দূর থেকে হাত তুলে বলবে না, হি প্রটেক্ট, আমাদের জন্য ভেবো না, সুখানি? কিন্তু কারও পাত্তা নেই। এত বেইমান তোরা।

মুখার্জি এবার বিছানা নিলেন।

ফিল দেখতে এলেন। বললেন, কী ঝড়টা না গেছে!

ডাক্তার সঙ্গে। ডাক্তার শুধু বললেন, বিশ্রামের দরকার।

তাঁকে সুরঞ্জন অধীর জাহাজ থেকে কিছুতেই আর বের হতে দিচ্ছে না। এমনকী সিঁড়ি ভেঙে উপরেও উঠতে দিচ্ছে না। ডাক্তার বারণ করে গেছেন।

একদিন এসে সুরঞ্জনই খবর দিল, দাদা, জাহাজ দেশে ফিরছে। নিউক্যাসেলে মাল খালাস করে সোজা বাড়ি।

মুখার্জি যেন খুশি হতে পারলেন না। ব্যাজার মুখে বললেন, ছেলেটা পড়ে থাকল। চার্লি পড়ে থাকল।

সুরঞ্জন বলল, আমার মনে হয় সব খবর রাখে। জাহাজ ছাড়ার আগে দু'জনেই উঠে আসবে।

মুখার্জির কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

জাহাজ ছেড়েও দিল।

মুখার্জি বললেন, আজ আর আমাকে বাধা দিস না।

বলে তিনি একাই উপরে যেতে চাইলে, সুরঞ্জন বলল, ধরছি। ওঠো, এত দুর্বল হয়ে গেলে কেন বলো তো? যেন সর্বস্ব খোয়া গেছে তোমার!

মুখার্জি হাসলেন।

তারপর জাহাজ ছেড়ে দিল। সমুদ্রে পড়ল। দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সবাই রেলিং-এ ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যতক্ষণ দ্বীপটা দেখা যায়। ধীরে ধীরে দ্বীপটা সরে যেতে থাকল। মুখার্জি চোখের পলক ফেলছেন না। আর তখনই মনে হল, টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দূরে দুই মানব-মানবী হাত নাড়ছে। মুখার্জিও অতি কষ্টে হাত নাড়লেন। অন্ধকার নেমে আসছে। পাখির ওড়াউড়ি চারপাশে। সবাই ডাঙায় ফিরছে।

সুরঞ্জন হাত ধরে বলল, এবার চলো। অন্ধকারে কিছুই তো আর দেখা যাচ্ছে না। কী দেখছ?

মুখার্জি ওঠার সময় বললেন, ফুল ফোঁটা দেখছি। বুনো ফুলের রাজত্বেই চার্লি শেষে সুহাসকে নিয়ে থেকে গেল। ধর আমাকে।

ধর।— বলেও চুপচাপ বসে থাকলেন মুখার্জি। ডেক ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখনও দ্বীপের বিন্দু বিন্দু আলো দূরে নীহারিকার মতো রহস্যময়। আকাশ নীল। সমুদ্রগর্জন শুনতে পাচ্ছেন। নক্ষত্রমালায় টের পাচ্ছেন নদী নারী নির্জনতার ছবি। সুহাস দ্বীপে তবে চার্লিকে নিয়ে থেকে গেল!

এই অসীম অনন্ত জলরাশির ভিতর জাহাজের গতি ক্রমে বাড়ছে। তিনি বসেই আছেন। এক সময় দেখলেন, দ্বীপের সব বিন্দু বিন্দু আলো নক্ষত্রমালার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে। দ্বীপটিকে আলাদা করে আর চিনতে পারছেন না। বুক তাঁর কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। সুহাস এখন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। ভাবতেই তিনি নিজেকে আর শান্ত রাখতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেল। বাবা তার পুত্রের ফেরার অপেক্ষায় আছে। মা তার গাছের নীচে। অপেক্ষা, কবে তার চিঠি আসবে। কবে পুত্র বাড়ি ফিরবে। মা-বাবা তো বোঝে না, বুনো ফুলের গন্ধ টের পেলে কেউ আর বাড়ি ফেরে না। যে যার মতো নদী নারী নির্জনতার খোঁজে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সমুদ্রযাত্রা

কার্ডিফে আমরা বিশ-বাইশ দিন ছিলাম। না কি তারও বেশি! এতকাল পব ঠিক মনেও করতে পারছি না। আমাদের জাহাজ তো কার্ডিফ বন্দরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাল খালাস করার জন্য জাহাজ ছিল ড্রাই-ডকে আর আমরা পোর্টের কাছাকাছি লম্বা একটা টিনের চালায় উঠে গেছিলাম। তিন-চারদিন ছিলাম।

না। বোধহয় আরও বেশি।

স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। ঠিক মনে করতে পারছি না। অস্বস্তি হচ্ছে ভেবে, ড্রাই-ডক কবাতে কত দিন সময় লাগার কথা। সাতদিন, দশদিন, না দু'দিনেই শেষ করা যায় কাজটা।

অবশ্য তিন দশক আগে একরকম, এখন অন্যরকম। আমি ছিলাম কয়লা জাহাজের নাবিক। জাহাজের তিনটে বয়লার হাইমাই করে সমুদ্রে রাক্ষসের মতো কয়লা গিলত। এখন তো শুনছি, কয়লায় আর জাহাজই চলে না। হয় মোটর ভেসেল, নয় ডিজেলে চলে।

আমাদের সময় মোটব ভেসেলে নাবিকের কাজ পাওয়াটা সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল।

আর আমার তো ছেঁড়া কপাল। পড়বি তো পড়বি এমন জাহাজে, যার সব কিছু লজ্‌ঝরে। বোট-ডেকে উঠতে কতবার যে বেলিং খসে পড়েছে। ডেবিক ভেঙে পড়েছে। ইঞ্জিন-রুম চিপিং কবতে কবতে হয়রান হয়ে গেছি। কখনো বালকেডে চিপিং করার সময় দেখি ফুটো। সমুদ্রের নীল জল দেখা যায়। দৌড়ে উঠে গেছি ইঞ্জিন-রুম থেকে। আসানুল্লাকে খবর দিয়েছি। তিনি ছুটে গেছেন মেজ-মিস্ত্রি লেসলির কেবিনে। মেজ-মিস্ত্রি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এসেছেন। অন্ধকারে টর্চ মেরে দেখে আবার দু' লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সোজা বড়-মিস্ত্রির কাছে। বড়-মিস্ত্রি কাপ্তানের ঘরে। কাপ্তান ইঞ্জিন-রুমে নামছে, নাবিকেরা জড়ো হয়েছে টুইন-ডেকে। আতঙ্কে সবার মুখ কালো। কারণ ফুটো দিয়ে জল ঢুকে যেতেই পারে।

কশপ, আসানুল্লা আর লেসলি তিনজনে মিলে কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে বলে গেলেন, নো চিপিং। সাদা খড়ি দিয়ে দাগ কেটে দিলেন। জাহাজ বন্দরে না ভেড়া পর্যন্ত চিপিং বন্ধ। চকখড়ির দাগ দেওয়া জায়গাটার দিকে যেতেও তখন ভয় করত। জং ধরে ভিতরে খেয়ে গেছে। বালকেডের প্লেট খুলে আবার লাগানো এবং আমার যতদূর মনে আছে ড্রাই-ডকের সময়ই কাজটা সেরে ফেলা হয়েছিল।

দিনক্ষণের হিসাব দূরে থাকুক, রাস্তার নাম, বাড়ির নাম, ক্যাসেলের নাম কিছুই মনে নেই। মনে রাখার বাসনাও ছিল না। একজন অভাবী তরুণের কাছে জীবন তখন ছিল ভারী ক্ষুধার্ত।

সুতরাং কতদিন ছিলাম কার্ডিফে সঠিক বলতে পারব না। আমাদের ভাঙা জাহাজের দুর্গতি দেখলে আমার চোখেই জল চলে আসত। একবার তো পোর্ট-মেলবোর্নে টানা তিন মাস। বড় বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার, দিনরাত হাতুড়ির ঘা, খোলের প্লেট কেটে নতুন প্লেট বসানো, রিপিট মাবা কত না হঠকারী তাণ্ডব চলত জাহাজটাতে। কেবল দেখতাম খুলে নেওয়া হচ্ছে, কেবল দেখতাম ছেঁড়া কাঁথার ওপর সেলাই-ফোঁড়াই হচ্ছে। ক্রস-বাংকারে মেরামত, বয়লার-চক তুলে নতুন চক বসানো, হুড়মুড় করে কিনার থেকে মিস্ত্রিরা শকুনের মতো খাবলে-খুবলে খাচ্ছে জাহাজটাকে। টানা তিনমাস, না আরও বেশি! না তাও মনে নেই।

এখন আর দিনক্ষণের হিসাব মাথায় নেই। শুধু কিছু ঘটনা, কিছু মুখ এই অপরাহ্ণবেলায় মনে পড়ে কিংবা কোনও দৃশ্য। বড় একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা। জাহাজে উঠে এটা আরও বেশি টের পেয়েছিলাম।

যেমন ড্রাই-ডকের সময় ঘরে বসে গল্পগুজব, বিকেলে বেড়ানো, তখন তো জাহাজিদের হাতে কোনও কাজ থাকে না। খাও দাও ফুর্তি করো। আমার কপালে ফুর্তি বিষয়টা ছিল একটু অন্যরকমের। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মানুষ তাতে শত হঠকারিতা সত্ত্বেও কোনও নারীর ঘরে রাত কাটানো দুঃস্বপ্নের সামিল।

অথচ ইচ্ছে করত। দুরারোগ্য ব্যাধির আতঙ্ক ছিল তীব্র। যে যার মতো বের হয়ে গেলে আমি কার্ডিফ-ক্যাসেলের পাশ দিয়ে হাঁটতাম। সারা বিকেল, কখনও সন্ধ্যা হয়ে যেত, কত উঁচু পাঁচিল পাথরের, মনে হয় গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি প্রাচীন কোনও পুরাতত্ত্ব আমাকে ধাওয়া করত। ফাঁক পেলেই পাঁচিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম। কোনও দোকানে ঢুকে টুকিটাকি জিনিস কিনতাম। কাউন্টারে কোনও যুবতী থাকলে তার সঙ্গে দু'-দণ্ড কথা বলার জন্য বসে থাকতাম, কখন তার হাত খালি হবে। অপ্রয়োজনে ফলের দোকানে ঢুকে ফল কিনতাম, কারণ তরুণী আমারই বয়সি। সে বুঝত কি না জানি না, সে আমাকে দেখলেই হাই করে ডাকত।

একজন গরিব বামুনের ছেলের পক্ষে এটা ছিল বিপজ্জনক খেলা। তবু মনে হত, যাই, বসি, তার ব্যস্ততা দেখি। কথা বলুক না বলুক, কাউন্টারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকারও স্বভাব ছিল আমার। অগত্যা শেষবেলায় কিছু কেনাকাটা, সে ভারী যত্নের সঙ্গে দুটো আপেল দেবার সময় বলত, গুড নাইট সেলর।

অথবা কোনও অপরাহ্ণে বসে থাকতাম কার্ডিফ বন্দরের লাগোয়া পাহাড়ি উপত্যকায়। বসে থাকলে, অনেক জাহাজ এবং দূরের নীল সমুদ্র চোখে ভেসে উঠত। নৌ-বাহিনীর জাহাজ দেখতে পেতাম ঘোরাফেরা করছে। আর রং-বেরঙের হাজার হাজার পাখির ওড়াউড়ি। কিচির মিচির শব্দ, কখনও রাত হয়ে যেত। সমুদ্রে চাঁদ উঠত। নক্ষত্ররা জেগে থাকত মাথার উপরে। কখনও বেশ রাত হয়ে যেত ফিরতে। আসানুল্লা ধমক দিতেন, ব্যাটারে কোনখানে গ্যাছিলা! এত রাইত হইল ফিরতে। মন্দ জায়গায় যাও নাই ত!

আমি হাসতাম। পিতৃতুল্য তিনি। একদিন তো ইঞ্জিন-ভাণ্ডারির উপর খাপ্পা। বাঁধাকপিতে বিফের টুকরো ডুমো ডুমো করে কেটে দিয়েছে।

বনার্জি খাইব কী দিয়া। যাও মিঞা! আলুভাজা কইরা দ্যাও। ডাল আলুভাজা দিয়া খাইব। তুমি কি চাও পোলাডা না খাইয়া মরুক। তুমি খাইতে পারবা রোজ রোজ।

আমরা মাত্র পাঁচ-সাতজন হিন্দু জাহাজি। বিফ খাই না। সপ্তাহে দু'দিন মটন রেশনে থাকে। বাদবাকি দিনগুলি বিফ। আমার হিন্দু সতীর্থরা সবাই পাঁচ-সাত সফর দেওয়া নাবিক। তাদের আটকায় না। আমায় আটকায় কারণ এটাই আমার প্রথম সমুদ্র-সফর।

আসলে আমি কেন এত একা ছিলাম এবং নির্জনতা পছন্দ করতাম এখন বুঝি। হইচই ধাতে একদম নেই। জমিয়ে আড্ডা দিতে পারি না। সংকোচ, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। তবু মানুষের তো কিছু চাই। সমুদ্রে আমার দিনরাত ছিল একটাই ভাবনা, আবার দেশে কবে ফিরে যাব। ফিরতে পারব কি না, এও ছিল ভয়। তাপ্পি মারা জাহাজে উঠেছি, দৈব দুর্বিপাক যেন হাঙরের মতো সব সময় ঘোরাফেরা করত।

ক্রস-বাংকারে কয়লা টানছি, এক চাকা হুইলের গাড়িতে কয়লা ভরছি, ধুলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, শ্বাস নিতে কষ্ট, বারবার বোট-ডেকে উঠে বুক ভরে শ্বাস নিতাম। সমুদ্র দেখতাম বড় নিস্তরঙ্গ। জাহাজ যাচ্ছে, জল কেটে প্রপেলার জাহাজের গতি তৈরি করছে। রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়াতে ভয় পেতাম। পড়ে গেলে প্রপেলার আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। মাংসের টুকরো এবং রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে গভীর সমুদ্র থেকে উঠে আসবে হাঙরের ঝাঁক। তাদের কোনওটার পেটে আমার হাত, আমার পা, কিংবা মুণ্ডু। আমি তাদের পেটের বাসিন্দা হয়ে গেছি এমনও মনে হত কখনও। রেলিং-এ ভর করে দাঁড়াতে ভয় করত।

দেশে ফেরার পর বন্ধুদের একটাই প্রশ্ন, বন্দরে নারীসঙ্গ করেছি কি না।

আমি হাসতাম।

বলে তো লাভ নেই, ইচ্ছে ছিল, পারিনি।

আর বললে, বিশ্বাসই বা করবে কেন? জাহাজে সফর করতে বের হয়ে কোনও নারী-সংসর্গ হয়নি, এটা যেন বন্ধুদের বিশ্বাসের বাইরে। কী করে বলি, আসানুল্লা বলে একজন মাথার উপর ছিলেন জাহাজে। জাহাজে ফিরতে দেরি হলে গ্যাংওয়েতে পায়চারি করতেন। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তেন। আমি ফিরে এলে তার প্রশ্ন, কই গ্যাছিলি? এত রাত করলি!

আর বোলো না চাচা, সামোয়ার পিকনিক গার্ডেনে চুপচাপ বসে ছিলাম।

কী করে বোঝাই ডাঙা মানুষের কত প্রিয়! গাছপালা, পাখি এবং সুন্দরী বালিকাব মুখ আমাকে টানে। জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। ফিরলেই তো রং বার্নিশের গন্ধ। চিফ কুকের গ্যালিতে মাংসপোড়া গন্ধ। আমার যে ওক উঠে আসে।

এমন কথায় তিনি কেন যে খেপে যেতেন বুঝি না। প্রায় তেড়ে মারতে আসার মতো।

কেন মরতে আইছিলা জাহাজে? কেডা কইছিল আইতে! ভাল লাগব ক্যান। কাব ভাল লাগে? তাই বইলা এত রাতে ফিরবি? চিন্তা হয় না?

আচ্ছা চাচা, অযথা রাগ করছ কেন বলো তো!

কই গেলি ক'। আমি ছাড়ুম না। জাহান্নামে যাইতে চাস? ক' তুই। আমি কেবল ঘর-বাব হইতাছি! বাস্তাঘাট ভাল না। তর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হইব? কিছু হইলে..

কী হবে।

কী হয় না জাহাজে! কত দেখলাম! ঘিলু চিবাইয়া খায়। রাস্তা খুঁইজা পায না। পবি-হুরিব দেশ, মাথা ঠিক রাখন সোজা কথা! জাহাজ থাইকা যদি পালানোব চেষ্টা করস পুলিশ দিয়া ধইরা আনমু। আমার নাম আসানুল্লা। আল্লাব বান্দা। তাবে ছাড়া কারে ডরাই ক!

ঠিক আছে, মাথা গরম করবেন না। আমি বের হচ্ছি না। কী? খুশি?

বাইর হইতে বারণ কবছি! মন-মেজাজ বলে কথা! তা ঘুইরা ফিরা দেখবি। ফাঁইসা যাবি না।

জাহাজে দুর্ঘটনার শেষ থাকে না। ওই তো পাশের জেটিতে কে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে গেল। নেশা কবে উঠতে গিয়ে পা হডকে গেছে। আমাদের জাহাজ থেকে দু'জন বেপাত্তা। আসলে জাহাজ বিলাতে এলেই অনেকে পালায়। আমি না আবাব কিছু কবে বসি।

এই বনার্জি, শোন।

কাছে গেলে বললেন, বড-টিন্ডাল তরে কু-পরামর্শ দেয়।

কু-পরামর্শ অবশ্য দেয়। বড-টিন্ডাল অবশ্য ভাবে এটা তার সৎ পরামর্শ। বড়-টিন্ডালের সঙ্গে দেখা হলেই এক কথা, দেশে ফিরা কববাডা কী? বার্মিগ্রামে আমার খালাত ভাই আছে, তার কাছে চইলা যাও। সে হিল্লা কইরা দিব। লেখাপডা জানা পোলা তুমি, একবার যখন আইসা পড়ছ, ফিরা যাওন ঠিক না। বার্মিগ্রাম যে আসলে ব্রিমিংহাম পরে জেনেছিলাম।

ড্রাই-ডকের সময় বড়-টিন্ডাল দু'দিনের ছুটি নিয়ে বার্মিগ্রামে তাব মেমান বাড়িতে ঘুরে এসেছে। মেমান নিজেও এসেছিলেন। কী একটা রেস্তোরাঁর মালিক। বিবি সঙ্গে। মেমসাব। কন্যা সঙ্গে। মেমসাব। টিন্ডাল সাব তাঁব বালিকা ভাইঝিটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন, বামুনের ব্যাটার দশা দ্যাখ।

মেয়েটি তো বাংলা বোঝে না। সে আমার দিকে শুধু তাকিয়েছিল, তার অপরূপ লাবণ্য এবং কালো চুল, গভীর নীল চোখ কোনও মায়াবী দ্বীপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সারাদিন সে আমাকে নিয়ে শহরে ঘুবেছে। কখনওই মনে হয়নি আমি একা। স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়ে মনটা এত খারাপ হয়ে গেছিল, কী বলব, যেন মেয়েটি আমাকে ইশারায় থেকে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে।

ওর কথা আমার মনে হয়।

সে পরেছিল সাদা রঙের ভয়েলের স্কার্ট। লাল রঙের জ্যাকেট। উরু পর্যন্ত নাইলনের মোজায় পরম স্নিগ্ধতা বিরাজ করছিল। আশ্চর্য ঘ্রাণ শরীরে। বিদেশি পারফিউমের এমন মৃদু সৌরভ এর আগে কখনও টের পাইনি।

ট্রেনটা চলে যাবার পরও আমি স্টেশনে চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ আমার মা'র দু'চোখ কোথা

থেকে যেন উঁকি দিয়ে গেল। চারপাশে ভাইবোনেরা দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে, দাদা রে, ফিরবি না? বসেই থাকবি?

সম্বিত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি খেলাম। দেখি আসানুল্লা পেছনে দাঁড়িয়ে।

বললেন, মন খারাপ?

না না।

ওঠ। চল। মন খারাপ করিস না। দেখবি, দেখতে দেখতে দিন কাইটা যাইব।

সেই থেকে তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। বড়-টিন্ডালের সঙ্গে তাঁর অসাক্ষাতে কথা বললেই খেপে যান তিনি।

সম্ভবত আমি কার্ডিফে গেছিলাম জুন-জুলাইয়ে।

দু'-পাঁচদিন বেশ রোদ, হালকা মেজাজ মানুষের, সুন্দর মনে হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। ঘোরাঘুরিও মন্দ চলছিল না। তারপর টানা বিশ-বাইশ দিন সূর্যের মুখ দেখাই গেল না। প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। টিন্ডাল ডাকলেই টের পাই সারেং সাব একবার ঠিক উঁকি দিয়ে গেছেন।

টিন্ডাল বলেছিল, কী রে যাবি? তিন-চার মাস পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া থাকতে হইব। ব্যবস্থা খালাত ভাইসাব করে দিব কইছে।

যদি রোদ থাকত এবং ঝলমলে আকাশ কিংবা এত শীতের কামড় না থাকত হয়তো থেকে যেতাম। আর যখন জানতে পারলাম, সূর্যের মুখ দেখা সৌভাগ্যের সামিল, তখনই মনটা দমে গেল। চোখের উপর তো দেখছি শুধু সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। টানা বিশ-বাইশ দিন এমন দুঃসহ অভিজ্ঞতার পর আর পালাবার ইচ্ছে হয়নি।

বড়-টিন্ডাল তো একদিন খোদ ভাইঝিকে নিয়ে ফের হাজির। জাহাজে মেয়ে উঠে এলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু বড়-টিন্ডাল গোমড়ামুখো মানুষ, বেয়াদপি একদম পছন্দ না। তাঁর ভাইঝি নাজিরা আমাদের সঙ্গে খেল। গল্প করল। জানাল, যদি থেকে যেতে চাই, তার বাবা ব্যবস্থা করে দেবে। তার বাবার লেখা একটা চিঠিও সে আমাকে দিল। তখনই কেন যে শুনতে পাই, দাদা রে, বাড়ি ফিরবি না?

না, আমার পালানো হয়নি।

আসলে মন্দ কপাল। ঘরমুখো মন, এই যে জাহাজে ভেসে পড়েছি শুধু একটি দুর্গত পরিবারকে রক্ষা করার জন্য। অন্তত আমার তখন এমন অবস্থা মুরুব্বির জোর নেই, কলোনিতে থাকি, গরিব মানুষের ঘরে টিউশনি জোটে না, কোনওরকমে আই এ পাশ যুবক, অর্থাভাব, কিছু একটা করতে হয়।

কিছু একটা করতে হয় বলেই জাহাজে উঠে পড়া। তার আগে হালিশহরে ট্রেনিং, ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং, জাহাজে ওঠার ছাড়পত্র, সি ডি সি সংগ্রহ— এতসব করার পর জাহাজ।

পাঁচ-সাত মাসও হয়নি। সেই কবে কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে উঠেছি। যেন কতকাল আগে, যেন কোনও পূর্বজন্মে ঘটনাটা ঘটেছে, এ জন্মে আমি নাবিক, এই অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু টের পাই না। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের যুবক, স্বপ্ন দেখতে ভালই লাগত। জাহাজে উঠে টের পেলাম, বাড়ির কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়বার পর কলম্বো হয়ে ডারবান, কেপটাউন। মাস দুই লেগে গেছিল। একনাগাড়ে মাসখানেক সমুদ্রে, শুধু জল আর জল, ইঞ্জিন-রুম থেকে উঠে আসছি, ওয়াচ শেষ, বিধ্বস্ত। ঝড় সাইক্লোন, ডেকের উপর কয়লা, জাহাজ দুলছে, তবু কয়লা টেনে নিয়ে যেতে হবে ইঞ্জিন-রুমে। কখনও রক্তবমি, নিস্তার নেই। জাহাজে মার-মার কাট-কাট লেগেই থাকত। সি-সিকনেস বড়ই কঠিন আপদ। সব সামলে সমুদ্রে ঘোড়সওয়ার আমি। কখনওই ভেঙে পড়ি না।

কেবল মাঝে মাঝে প্রশ্ন, ডাঙা কবে পাব?

ডাঙার কথা বললেই সারেং সাব মুখ গোমড়া করে থাকতেন। ডাঙা কেন এত মধুর তিনি যেন বুঝতেই পারেন না। ডাঙা মানে তো জাহান্নমে যাওয়া। নেশা, নয় কার্নিভেলে ঘোরা, জুয়ার ঠেকে আটকে পড়া, আর রাতে পরি-হুরির কব্জায়। তার চেয়ে যেন এই অনন্ত অসীম সমুদ্র তার কাছে খুবই পবিত্রতার কথা বলে। পাঁচ ওক্ত নামাজ তিনি সকাল আর সাঁজবেলায় সেরে নেন। সাইক্লোন থাকলে মেসরুমে মাদুর পেতে, না থাকলে ফলকার উপর মাদুর বিছিয়ে তিনি যখন নামাজ পড়েন, মাথায়

কুরুশ-কাঁটায় নকশা তোলা সাদা টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি এবং মুখে সাদা দাড়ি যেন কোনও ফেরেশতা। এই জাহাজ, এই সমুদ্র, এমনকী আরও গভীর নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়া প্রাণীকুলের জন্য তাঁর মোনাজাত আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। ঈশ্বরপ্রীতি হয়তো মানুষকে কোনও বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি হঠকারী যুবক, না ভেবেচিন্তে জাহাজে উঠে পড়ায় তিনি খুশি না।

বুয়েনসএয়ার্স বন্দরে জাহাজ ভেড়াব দিন তিনি আমাকে ডাকলেন। এত বেশি খবরদারি কখনও বিরক্তির কারণ হত। তিনি সোজা বলে দিলেন, জাহাজ ছেড়ে বেশি দূর যাবি না। হারিয়ে গেলে আমি কিচ্ছু জানি না।

হারাব কেন চাচা? আমাকে কী ভেবেছেন।

শোন, কিচ্ছু ভাবিনি। তোব ভালর জন্যই বলছি। কেউ তোর কথা বুঝবে না। একটা লোকও বাংলা-ইংরাজি কিছু বোঝে না!

তার মানে?

লোকগুলো ইংরাজি জানে না. হাতেব ইশারায় কথা বলতে হবে। পাববি? তুইও বোবা, তাবাও বোবা। ভাষা না জানলে এটা হতেই পাবে।

দূর থেকেই মেঘমালা ভেসে ওঠে আকাশেব গায়ে, বুঝি সামনেই বন্দব। প্রথম দিগন্তবেখায় এক টুকরো মেঘ ভেসে থাকে, তারপর জাহাজ যত নিকটবর্তী হয়, ধীবে মেঘ থেকে যেন বৃষ্টির ফোঁটা আলাদা হবাব মতো, বোঝা যায় ঘরবাড়ি. বোঝা যায় জেটি, বোঝা যায় জাহাজ নোঙর করে আছে। প্রথমে মাস্তুল, পরে চিমনি, আরও পরে মানুষজন।

রাতের বেলাতে বন্দবে জাহাজগুলো আলোব মালা পরে থাকে। ঢেউ ওঠে-নামে, জাহাজ ওঠা-নামা করে, আমবা টুইন-ডেকে শুধু দাঁড়িয়ে থাকি। ওয়াচ না থাকলে, সাবা সকাল, অথবা দুপুব. এমনকী গভীর বাতেও উঠে যাই উপরে। সামনে ডাঙা। জাহাজিদেব কাছে এব চেয়ে বড় সুখবর কিছু নেই।

সারাক্ষণ জাহাজের আফটার পিকে, খোলা ডেক-এ, নয় ফলকাব উপর বসে থাকা, তাসেব আড্ডা। কখনও কেউ কেউ কোরান পাঠও করেন। যে যার মতো ডাঙাব প্রত্যাশায় বসে থাকে।

আমারও মন আনচান কবে।

জাহাজ বাঁধাছাঁদা হলে সারেং সাব বলেছিলেন, বসে থাকবি কেন? যা ঘুবে আয়। মন হালকা হবে।

আপনি যে বললেন, কথা বোঝে না কেউ।

বেশি দূরে যাস না। দেবনাথ, বনার্জিরে নিয়ে যা।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাঙায় পা রাখলে জাহাজিদেব আয়ু বাড়ে।

ডাঙায় পা রাখলে জাহাজিদের আয়ু বাড়ে, এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়াব পর কী যে ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমুদ্র উথাল-পাথাল, কলার খোলের মতো বে অফ বেঙ্গলে জাহাজেব পিচিং, তারপর কী অমানুষিক কষ্ট, চার ঘণ্টার ওয়াচ শেষ করতে পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়, কাজ শেষ করতে পারি না, কয়লা টেনে ফেলছি 'সুটে', আর হড়হড় করে নেমে যাচ্ছে। জাহাজের দুলুনিতে মাথা তুলতে পারছি না। তবু 'সুটের' মুখের দিকে সতর্ক নজর। কারণ মুখ থেকে কয়লা নেমে গেলেই, স্টোকহোলডে হাইহাই শুরু হয়ে যায়। তিনটি বয়লার কেবল কয়লা গিলছে। স্টিম পড়ে যাচ্ছে। টন টন কয়লা পুড়িয়েও স্টিম ধরে রাখা যাচ্ছে না। ঝড়ের দরিয়ায় আমার মতো পয়লা সফরের জাহাজির যে প্রাণান্ত হবে, যেন এটা প্রথমে টের পেয়েছিলেন সারেং সাব। কিছুতেই তিনি সঙ্গে নিতে রাজি না। জাহাজ পাচ্ছিলাম না। হাতে 'সি ডি সি' নিয়ে রোজ শিপিং অফিসে 'মাস্তারে' দাঁড়াচ্ছি। জাহাজ আসছে, ক্ল্যান লাইন, সিটি লাইন, বি আই কোম্পানির জাহাজ। জাহাজের সফর সেরে ফেরা জাহাজিরা নেমে যাচ্ছে। নতুন জাহাজি রিক্রুট হচ্ছে। আমিও সেই আশায় মাস্তারে দাঁড়াচ্ছি রোজ। জাহাজের কাপ্তান আমার চোখ-মুখ দেখছে। 'নলি' দেখছে। সমুদ্র-সফরের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। শবীরে বামুনের রক্ত। কিংবা শরীর শক্ত কিংবা ঋজু নয়, যে জন্যই হোক, বুড়ো কাপ্তান কিংবা যুবা চিফ

ইঞ্জিনিয়ার, কারও আমাকে পছন্দ না। পারবে না, ভাল করে দাড়ি গোঁফ ওঠেনি ছেলের, সে আর কতটা কাজ পারবে! বমি-টমি করে অসুস্থ হয়ে পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এমনও ভাবতে পারে। যাই হোক রোজ মাস্তার দেওয়াই সার যখন, এবং মাসখানেক ধরে জাহাজ ধরার আশায় শিপিং অফিসে যাচ্ছি, বুড়ো মানুষটা লক্ষ করে থাকতে পারেন।

তিনিই একদিন ক্যান্টিনে ডাকলেন, এই যে ব্যাডা রোজ আইসা লাভডা কী? পারবা না। জাহাজের মার মার কাট কাট সহ্য করতে পারবা না। দরিয়ার পানি সহ্য হইব না। কেডা তোমারে বুদ্ধি দিছে জাহাজে যাইতে?

কী বলি, বুদ্ধি যে কারও নয়, বুদ্ধিটা যে আমারই এবং উদ্বাস্তু পরিবারটি এ দেশে এসে জলে পড়ে যাবার পব, আমিই যে একমাত্র বাবার সক্ষম পুত্র। তার কাজ বসে থাকা নয়, যা হয় করে কিছু উপার্জন করা, এসব একে একে তিনি জানতে পারলেন।

বলেছিলেন, করবি। জাহাজে উঠলে না-পাক হয়ে যাবি।

না-পাক অর্থ কী পরে বুঝেছিলাম। পাক কথার অর্থ পবিত্র, না-পাক মানে অপবিত্র।

তিনি আরও বলেছিলেন, তোর বয়সটা ভাল না।

আমি তাঁর পাশে বসে থাকতাম। জাহাজের নানাবিধ গল্প বলতেন। বলতেন, তাঁরা চার পুরুষেব জাহাজি। তাঁরা বাঁধা-ধরা সিটি লাইনের সাবেং। তিনি নিজেও আমার বয়সে জাহাজে উঠে এসেছিলেন।

এবং তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমি নাছোড়বান্দা, তখন একদিন বলেই ফেললেন, ঠিক আছে আমার জাহাজ আসছে। ওতে যাবি।

বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপব কী ভেবে বলেছিলেন, জাহাজটা কয়লার জাহাজ। ধকল খুব। পারবি?

আমার তখন এক কথা, পারব।

ওয়াচে তিন টন কয়লা খায় কসবিটা।

ওয়াচ অর্থাৎ চাব ঘণ্টায় তিন টন কয়লা খায়। কসবিটা কে বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয়নি, আসলে জাহাজটিকেই তিনি হয়তো কসবি বলেছেন। কসবি কথাটা মন্দ কথা। এটাও বুঝেছিলাম। জাহাজটাকে তিনি কখনও ইবলিশের বাচ্চা বলে গাল পাড়তেন। যেন জাহাজ না, একটা আস্ত শয়তানের বাচ্চা। এবং দু'জন মাত্র সারেং আছেন, যারা এই শয়তানেব বাচ্চার মেজাজ ঠান্ডা বাখতে পারে।

এমন একটা জাহাজে তিনি আমাকে নিয়ে উঠতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজি হলেও, মুখে তাঁর প্রায়ই দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখতাম। জাহাজিদের ওপরওয়ালা বলতে আসানুল্লা। তার সুপাবিশ থাকলে জাহাজ পেতে অসুবিধা হয় না। শিপিং অফিসে মাসখানেক যাতায়াত করেই তা টেব পেয়েছিলাম।

যেদিন জাহাজ এল, তিনি ডেকে বললেন, ভেবে দ্যাখ, যাবি কি না। পরে দোষ দিতে পারবি না।

বললাম তো পারব।— আমি নিজের ওপর কিছুতেই আস্থা হারাতে রাজি না।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, লজ্‌ঝরে জাহাজ। সারাদিন ঠায় খাটুনি। বন্দরে গেলেও রেহাই পাবি না। স্মোকবক্স পরিষ্কার করতে জান কয়লা হয়ে যাবে।

তাঁর উপর, মাঝে মাঝে, তখন থেকেই আমি বিরক্ত। বড় বেশি ভাবনা। আমি তার কে, এমন মনে হত। এই যে তিনি বুয়েনসএয়ার্স বন্দর ধবার আগে বললেন, যাবি। বের হবি। না বের হলে চলবে কেন? ডাঙায় নামলে জাহাজিদের আয়ু বাড়ে, হাড়ে হাড়ে এটা টের পেয়েছি জাহাজে থেকে। দিনের পব রাত, রাতের পর দিন, শুধু জল আর জল। নীল আকাশ। সমুদ্রে ঝড় থাকুক, সাইক্লোন থাকুক, ইঞ্জিন চালু রাখতেই হবে। চালু রাখতে না পারলেই মরণ। কয়লা টেনে সুটে ফেললে ফায়ারম্যানদের কাজ শুরু। চকাচক বেলচায় কয়লা তুলে মারছে। ফার্নেস-ডোর খুলে দিলেই আগুনের হলকায় মুখ লাল। কয়লা মেরে, র‍্যাগ দিয়ে টেনে, কয়লা উলটে-পালটে আঁচ তোলা। এয়ার-ভালভ খুলে দিলে হাওয়ায় আগুন আরও তখন ঝলসে ওঠে। কেবল বেলচায় কয়লা হাঁকড়ানো— তিনটে বয়লার, তিনটে করে ন'টা ফার্নেস, বয়লারে কয়লা খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আর পোর্ট-সাইডের ক্রশ-বাংকারে টানা

চারঘণ্টা আমার কাজ। লক্ষ জ্বালিয়ে কোনও প্রাচীন গুহাবাসীর মতো অস্পষ্ট অন্ধকারে টানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কয়লা ভরছি গাড়িতে, সুটে এনে ফেলছি। বয়লার থেকে ছাই টেনে ফেললে জল দিয়ে নেভাচ্ছি, অ্যাশরিজেকটারে আবার ছাই তুলে স্টোক-হোলড পরিষ্কার করে দিতে হচ্ছে। ওয়াচ শেষে বিধ্বস্ত। সিঁড়ি ধরে যে বোট-ডেকে উঠে যাব তার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকত না।

এবং এভাবেই বুঝেছিলাম, আসানুল্লা সারেং আমার ভাল চান। কয়লা টানতে টানতে বমি করছি হড়হড় করে, খবর পেয়ে জাহাজের বাংকারে ছুটে এসেছেন, দাঁড়িয়ে থেকেছেন, কখনও নুনজল এগিয়ে দিয়েছেন, নুনজল খেলে সি-সিকনেস কমে, এটা জানি, কিন্তু তিনি অন্য কাউকে ডেকে দেননি। বলেননি, ঠিক আছে, তুই যা। এনামুলকে পাঠাচ্ছি।

কোল-বয় আমরা মাত্র সাতজন।

দু'জন করে আমাদের ওয়াচ।

পোর্ট-সাইডের বাংকারে মনু অর্থাৎ মৈনুদ্দিন। আসলে সে আমার ওয়াচের জুড়িদার।

চারঘণ্টার ওয়াচে যতই আমি বিপাকে পড়ি না কেন, সারেং সাব অবিচল।

তাঁর এক কথা, সব জাহাজে কি আমি থাকব? অভ্যাস হোক।

তিনি চাইতেন, জাহাজে যখন উঠেই পড়েছি, তখন জাহাজের ধকল আমাকে মেনে নিতেই হবে।

অবশ্য জানতাম না, কার পরামর্শে মনু এসে আমার বাংকারে ঢুকে বলত, আরে বনার্জি, সুট যে খালি হয়ে গেছে।

আমি তখন হয়তো ক্লান্ত। অবসন্ন। লোহার বাংকারে বেলচা মাথায় দিয়ে শুয়ে আছি। নীল জামাপ্যান্ট কয়লার ভুসোয় মাখামাখি। মুখ ভুসোকালিতে কয়লা-খাদের মজুরের মতো। কয়লা টানা ছাড়া জীবনে যেন আর কোনও কাজ নেই আমার। এজন্য জন্মেছি, এজন্য বড় হয়েছি, ভাবলে তখন বিপন্ন বোধ করতাম, মাঝে মাঝে নিজের উপর আস্থা হারালেই বেলচা ছুঁড়ে মারতাম কয়লার উপর। তারপর চিতপাত হয়ে পড়ে থাকলেই মনু এসে কয়লা টেনে দিত আমার হয়ে।

আমার খারাপ লাগত। উঠতাম। বলতাম, তুই যা। তোর সুট কে ভরবে!

সে বলত, পয়লা সফরে পারবি কেন? পেটে তোর বিদ্যার জাহাজ, এ কাজ তোকে দিয়ে হয়!

এটা ঠিক, জাহাজিরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। তারা দেশে খত পাঠাবার সময় লেখাপড়া জানা আদমির খুবই কদর দেয়। দু'-একজন চিঠি লেখার মতো বিদ্যা পেটে নিয়ে উঠলে, জাহাজিদের কাছে সে মাস্টার। তার প্রতি আলাদা সম্মান। আমি এজন্য সবার কাছেই সমাদর পেয়ে থাকি। ডেক আর ইঞ্জিন-জাহাজি মিলে যাট-পঁয়ষট্টি জন জাহাজে উঠে এসেছিলাম। অনেক মুখ হারিয়ে গেছে, কিন্তু বড়-টিন্ডাল, ছোট-টিন্ডাল, সারেং সাব কিংবা আমাদের দেবনাথ, অমিয়, হীরেনের কথা মনে করতে পারি। মনু আমার জুড়িদার, তার কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। এতদিন পর কে কোথায় জানি না। কারও খোঁজও রাখি না।

তবে ডাঙা যে জাহাজিদের পরমায়ু বাড়ায়, এটা প্রথম বুঝেছিলাম কলম্বো বন্দরে। রাতের বেলায় নোঙর ফেলল, ভোররাতে নোঙর তুলে ফেলা হল। প্রায় দশ দিন একটানা জাহাজে থেকে ডাঙার জন্য পাগল হয়ে আছি। আমরা জাহাজিরা ডাঙা দেখার জন্য সারারাত জেগেছিলাম ডেক-এ। একমাত্র প্রাচীন নাবিকদের কাছে ডাঙা এবং জল যেন সমান। কিন্তু যারা পাঁচ-সাত কিংবা দশ সফরের জাহাজি তাদের কাছেও ডাঙা পরমায়ু বাড়ায়। তা না হলে কে সারারাত জেগে ডেকের উপর বসে থাকে! কলম্বো থেকে জাহাজে রসদ তোলা হয়েছিল।

জাহাজ নোঙর করা। নামার সুযোগ থাকলেও নিষেধ, কারণ ভোররাতে জাহাজ ছেড়ে দেবে। শুধু বন্দরের দূরবর্তী আলো এবং কখনও কোথাও লোহার পাত পড়ার শব্দ অথবা জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় সাইরেন ছাড়া আর যা শব্দমালা টের পেয়েছি, সে শুধু সমুদ্রের জল এবং তার কল কল আওয়াজ। কিংবা কিছু সমুদ্রপাখির উড়ে যাওয়া, কখনও তারা ডানা মেলে মাস্তুলে বসে থাকলে বাড়ির জন্য মন কী যে খারাপ করত!

বুয়েনসএয়ার্স বন্দরে ঢোকার সময় এটা আরও বেশি টের পাচ্ছি। আফ্রিকার ডারবান কেপটাউন বন্দরে স্রেফ পাঁচদিনের বিরতি।

সেখানে পাটের গাঁট নামানো হয়েছে। ডারবান বন্দরে জাহাজ ভিড়লে আসানুল্লা এসে আমার ফোকশালে উঁকি দিয়ে বলেছিলেন, বনার্জি, উপরে আয়, কথা আছে।

তিনি কখনও তাঁর ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। এমনকী আমাকেও না। কেন এটা করতেন বুঝতাম না। আমাকে উপরে ডেকে নিয়ে আফটার-পিকের পেছনে গেলেন। রেলিং-এ ভর করে দাঁড়ালেন।

তিনি বেশ গুম হয়ে ছিলেন। কথা বলছিলেন না। আমি বললাম, কী হল! ডাকলেন কেন!

তুই আবার ছোট-টিন্ডালের সঙ্গে মিশছিলি!

মিশলে কী হয়?

বড়-টিন্ডাল যে তার সুনজরে নেই, সেটা যেমন বুঝেছিলাম কার্ডিফ বন্দরে গিয়ে, তেমনি ছোট-টিন্ডালও যে তার কোপে পড়ে গেছে, সেটা বুঝেছিলাম ডারবান বন্দরেই।

তা বলবেন তো, কথা বলছেন না কেন? ধুস, বুড়োর যত সব বাতিক! আমি নষ্ট হয়ে না যাই, এই এক ভীমরতিতে তিনি ভুগছেন। এজন্য মাঝে মাঝেই খেপে যেতাম।

শোন।— তিনি মুখে সুপারি ফেলে বললেন, জায়গাটা ভাল না। রাতে বের হস না। ছোট-টিন্ডালের ঘর আছে এখানটায়। ওর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাস না।

ঠিক আছে, যাব না!

না, তোকে যেতে বারণ করছি না। বন্দরের কাছাকাছি থাকবি। ওদিকটায় মাছ ধরতে পাবিস। আমার ছিপ নিয়ে যা, বসে না থেকে দু'-চারটে ম্যাকরল মাছ ধরে আনলে জাহাজে বেশ ভোজ লাগানো যাবে।

আসলে বুঝি, তিনি আমাকে মাছের নেশায় ফেলে দিয়ে ডারবান বন্দরটা পার করে নিয়ে যেতে চান। এটা আমার মনে আছে জাহাজের খাওয়া বড় একঘেয়ে ছিল। সকালে চর্বিভাজা রুটি। দুপুরে ডাল গোস্ত ভাত। বিকালে চর্বিভাজা রুটি। রাতে আবার ডাল, আলুভাজা, গোস্ত। এই ছিল নিত্যদিনের খাবার। বরফঘরের বাসি পচা মাংস বিস্বাদ, কিন্তু এমন যমের খিদা পেত যে শুধু ডাল দিয়েই সব ভাত তোলা হয়ে যেত।

কাজেই জাহাজির' বন্দর পেলে মাছ শিকারেও যায়। যেমন আসানুল্লা সাব জাহাজে ওঠার সময় দুটো আলাদা কাঠের পেটি তুলে এনেছিলেন। একটা পেটিতে জাল তৈরি করার সুতো, আর-একটা পেটিতে কয়েক রকমের ছিপ। ছিপগুলো ছিল মাছ ধরার জন্য এবং তিনি বন্দরে গেলেই ছিপ ফেলে জাহাজের আফটার-পিকে বসে থাকতেন। কখনও ছোট ছিপ। কোন বন্দরে কী ছিপ ফেললে কোন মাছ পাওয়া যায়, তিনি তা এত জানতেন যে আমরা অবাক হয়ে যেতাম।

জাহাজে ওঠার প'র প্রথম ডারবান বন্দরে টের পেলাম, তিনি আমাকে হুকুম করছেন, বনার্জি, যা, বাটলারের কাছ থাইকা লিষ্ঠি মিলাইয়া জিনিসগুলি নিয়া আয়।

বাটলার হাসান খুব সেয়ানা লোক, সে জানে, ডেক-সারেং আর ইঞ্জিন-সারেংকে হাত রাখতে পারলে, জাহাজিদের রেশন মারতে পারবে। গোস্ত ওজনে চুরি করতে পারবে, চিনি, টোবাকো সব চুরি করা সম্ভব শুধু দুই সারেং সাব হাতে থাকলে। এজন্য ইনামও দেয়, যেমন জাহাজের অফিসারদের রেশনেই শুধু ডিম আছে, ডিম নয় শুধু, এক এলাহি ব্যবস্থা খাদ্যতালিকার। ইংলিশ মেনু। সকালে ওরা ব্রেকফাস্ট করার পর প্রায়ই দেখতাম পকেটে আপেল নিয়ে বের হয়ে আসত ডেক-এ। কাজ করত আর আপেলে কামড় বসাত।

তাদের খাওয়াদাওয়ার বহর দেখলে আমাদের জিভে জল আসত। চিফ কুক, সেকেন্ড কুক আট-দশ জন অফিসারের লাঞ্চ ডিনার মেনু মাফিক তৈরি করতে গলদঘর্ম। আর আমাদের ইঞ্জিন-ভাণ্ডারি, ডেক-ভাণ্ডারি এক হাতে সব সামলায়।

মনে আছে অফিসারদের মধ্যে একজনও বাঙালি ছিলেন না। এমনকী ভারতীয়ও নয়। ব্যাংক লাইনের জাহাজে অফিসাররা হোম থেকে উঠতেন। পরে জেনেছিলাম, অধিকাংশই ওয়েলসের বাসিন্দা।

অফিসারদের হরেক রকম খাদ্যতালিকার বহর এবং আমাদের একঘেয়ে খাবার নানা কারণে

জাহাজিদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত। আসানুল্লাই পারতেন সব সামলাতে। এবং এজন্য আসানুল্লাকে হাতে রাখার নৈতিক দায়িত্ব বাটলারের। ডেক-সারেং, ইঞ্জিন-সারেং অফিসারদের মেনু থেকে ফল ডিম আলাদা করে পেতেন। এ ছাড়াও যখনকার যা।

সুতরাং ডারবান বন্দরে আসানুল্লা সাব আমার হাতে যে লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা নিয়ে আয়, সেটা নিশ্চয়ই হরেক কিসিমের খাবার—যেমন, কিসমিস লবঙ্গ জায়ফল। এগুলি কখনও যদি কোনও অনুষ্ঠান হত, যেমন ইদের পরবে বিরিয়ানি করাব জন্য পাওয়া যেত। আমার ধারণা ছিল তেমনই কিছু। কিন্তু আশ্চর্য, আসানুল্লা সাব এসব দিয়ে একসঙ্গে আদা এবং চিনিব গাদ মিশিয়ে জাফরান দিয়ে মাছের চার তৈরি করে বলেছিলেন, বসে যা। পাঙ্গাস মাছ গাঁথতে পাবিস কি না দ্যাখ।

বন্দরের জলে হরেক রকমেব সামুদ্রিক মাছের আড্ডা থাকে। কারণ জাহাজেব উচ্ছিষ্ট খাবার জলেই ফেলে দেওয়া হয়। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ যেমন উঠে আসে, তেমনি ভাল মাছ শিকাবি হলে বড় দু'-চারটে গলদা চিংড়িও কপালে মিলে যেতে পারে। একঘেয়ে খাওযা, বৈচিত্র্য খোঁজাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া ভাতখেকো বাঙালির মাছ যে কী প্রিয় সবারই জানা। বন্দবে জাহাজ ভিডলেই বড়শি নিয়ে কেউ কেউ বসে থাকে। আমিও বসেছিলাম আসানুল্লা চাচার পাশে। মাছ ভিড়লই না।

কাঁহাতক ভাল্লাগে। খোঁট দিচ্ছি, উঠছে না। জাহাজ থেকে বন্ধু নেমে যাচ্ছে দেখেই মনটা দমে গেল।

বলেছিলাম, চাচা, বের হচ্ছি।

তিনি বোধহয় বুঝতে পারছিলেন, মাছ শিকারের লোভ দেখিয়ে আমাকে আর আটকে বাখা যাবে না। শুধু বললেন, যা। তবে একা বের হস না। পাবিস তো মাইজলা সাবেব লগ ধবাব চেষ্টা কব।

মাইজলা সাব অর্থাৎ জাহাজেব সেকেন্ড অফিসার খুবই বসিক মানুষ। জাহাজিদেব নেটিভ বলে ঘেন্না-পেন্না করে না। ববং হাই-হুই কবে একে ডাকে, ওকে ডাকে। দু'-একটা হিন্দি বাতও বলতে পারে। যেমন, খানা মিলে গা। ইন্ডিয়ান কাবি বহুত আচ্ছা।

অবশ্য সে মাঝে মাঝে আমাদের গ্যালিতে এসে প্রায় চুরি করে গোস্তভাত খেতে মজা পেত। তাব দেশোয়ালি ব্রাদার অফিসাবদেব কাছে ধরা পড়ে না যায়, এই ভেবে সবসময ঢতর্ক।

হ্যালো বাবা, প্লিজ লুক দেয়াব।

অর্থাৎ সে আঙুল তুলে কেবিনে ঢোকাব বাস্তাটাব দিকে নজব বাখতে বলত। কেউ বেব হয়ে যদি এদিকে চলেই আসে, তবে মুখ মুছে, প্যান্টে হাত মুছে শিস দিতে দিতে নেমে যাবে। কারণ সে জানত, কাপ্তানের কানে খবব পৌঁছে গেলে আস্ত বাখবেন না। ন্যাস্টিম্যান বলে গালাগালি কববেন।

মনে আছে, সে আমাকে বাবা বলেই ডাকত। কারণ এই সম্বোধনেবও একটা ইতিহাস আছে। কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়ার সময়ই আমাব প্রতি তার কিছুটা সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল। সবার নাম জানারও কৌতূহল আছে। আমার নাম জিজ্ঞেস করতেই বন্ধু বলেছিল, সাহেব, হি ইজ বাবা। হিজ নেম ইজ বাবা। অর্থাৎ আমাব নাম বাবা। সারা সফবই সে আমাকে বাবা বলে ডাকত। খোঁজাখুঁজি কবত, হোয়ার ইজ মাই বাবা?

সেই বাবা যখন ডারবানে জাহাজ ভিড়তেই নেমে পডার জন্য আকুল এবং আমি কোনও ফাঁদে পড়ে না যাই বন্দরে সেই আতঙ্কে আসানুল্লা সাব যখন কাবু, তখন আমার প্রিয় পুত্র অর্থাৎ আমাবই বাবাব বয়সি মানুষটির সঙ্গে যাবার কথা শুনে এক পায়ে খাড়া হয়ে গেছিলাম।

জাহাজ থেকে নামার সময় আসানুল্লা সাব বললেন, সাহেব, ওকে কিন্তু ফেলে এসো না।

নো নো। হি মাস্ট কাম ব্যাক। ডোন্ট বি ওরি।

মনে আছে আমার, ডারবানে তখন হাড়-কাঁপানো শীত। এত শীত যে আমবা দু'জনই ওভাবকোট পরে বের হয়েছিলাম।

বন্দর থেকে জেটি এলাকা পার হয়ে রাস্তায় পড়তেই ছিমছাম ঘরবাড়ি। পার্ক। দৈত্যেব মতো সব নিগ্রো পুরুষ রমণী। কী পুরুষ কী রমণী কারও মাথায় প্রায় চুল নেই বললেই হয়। মনে হয় টাক মাথা। কোঁকড়ানো চুল থাকলেও ঘন নয়, খুবই পাতলা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রোয়া ধান পোঁতার মতো কেউ যেন চুল টাকের যত্র তত্র পুঁতে রেখেছে। শৌখিন নিগ্রো মেয়েদের মাথায় সবারই স্কার্ফ বাঁধা। শীতের জন্যও হতে পারে। আবার টাক আবৃত করার জন্যও হতে পাবে।

এতকাল পর অবশ্য মনে করতে পারছি না, প্রথম দিনই কি না, না দু'-পাঁচদিন পরে তিন নিগ্রো ছিনতাইকারির হাতে পড়েছিলাম! মনে আছে ট্রলি বাসে চেপে ইন্ডিয়ান মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম। যাবার সময় দু'পাশের পার্কে দেখেছিলাম লেখা আছে, নাই ইয়োরোপিয়ান। এগুলো লেখা থাকে কেন পরে জেনেছিলাম। ভাষাটা যে ওলন্দাজ ভাষা তাও সেকেন্ড অফিসারই বলে দিয়েছিলেন। পার্কে, বাসে সর্বত্র এ ধরনের লেখা দেখে ঠিক করে নিতে হবে কার কোথায় জায়গা। কে কোন পার্কে ঢুকতে পারবে, কে ট্রলি বাসের নীচের বা উপরের তলায় উঠে যাবে।

বর্ণবৈষম্য কী প্রবল ক'দিন বন্দরে ঘুরেই টের পেয়েছিলাম।

সাঁজবেলায় আমরা বন্দরে ঢুকব বলে শর্টকাট করতে যাচ্ছি, এদিকটায় কিছু বস্তি অঞ্চল, কালো মানুষের বসবাস, নিজের সঙ্গে কিছুটা যেন আত্মীয়তাও অনুভব করছিলাম, কারণ এ দেশে আমি তাদের সমগোত্রীয়, কাজেই আমার ভয়ডর কম ছিল।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, এদিকটায় না ঢুকলেই হত। তার চেয়ে লিউ স্ট্রিট ধরে চলো যাই।

আমি ঠিক বুঝলাম না, কেন এ কথা তিনি বলছেন। এতদিন কোনও উপদ্রবে পড়িনি। আর তখনই তিনজন নিগ্রো যুবতী। তিনজনই আমাদের চেয়ে উঁচু এবং লম্বা। বিশাল এই তিন যুবতী আমাদের ওভারকোট ধরে বলেছিল, হাউ মুচ।

তার মানে হাউ মাচ। তার মানে কত দাম।

আমরা জানতাম, এই সব বন্দর-শহরে নাবিকরা পুরনো কোট ওভারকোট কিংবা গরম জামাকাপড় বিক্রি করে টু পাইস কামায়। সেকেন্ড অফিসার এমন তিন যুবতীকে পেয়ে খুব খুশি। সে প্রায় দেখলাম মজেই যাচ্ছিল। দু'-একটা ফাজিল কথাবার্তাও হয়ে গেল। আর ঠিক সে সময়ে দুই যুবতী আমাদের এমন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল যে, আমরা বুরবকের মতো কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সাঁঝবেলায় রাস্তার উপর এটা তাদের কোনও আদব কায়দা কি না অন্তরঙ্গ হবার, তাও বুঝছিলাম না, এই যখন অবস্থা তখন তৃতীয় যুবতী হাতের ওভারকোট দুটো টেনে নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। আর বাকি দু'জনও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল।

আমি তটস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এমনিতেই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কোনও অপরিচিত শহরে একা বের হতে একটা অস্বস্তি আছে। দলবেঁধে বের হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। দু'জন আমরা তখন ছুটে পালাচ্ছি। কারণ হাতঘড়ি খোয়া যায়নি, এটাও কম ভাগ্যের কথা না। বন্দরে ঢুকে সেকেন্ড অফিসার বললেন, বাবা, প্লিজ ডোন্ট ডিসক্লোজ ইট টু অ্যানিবডি।

আসলে সেকেন্ড অফিসার চাননি সবার কাছে বোকা বনতে। জাহাজে কে কতভাবে যে ঠকে আসে কিনার থেকে! ডাঙার এমনই মোহ। এবং জাহাজিরাও কেমন অন্ধের মতো আচরণ করে ফেলে যুবতী নারীর সামান্য সঙ্গ পেলে।

এরপর আর আমার ডারবান বন্দরে বের হওয়া হয়ে ওঠেনি। আসানুল্লা সাবের পাশে বসে মাছ ধরায় মনোযোগ দিয়ে ফেললাম। একদিন দুটো বেশ বড় সাইজের গলদা চিংড়ি গেঁথে ফেললাম। ওভারকোট হারিয়ে যে কষ্টে ভুগছিলাম, দুটো চিংড়ি শিকারে তার কিছুটা অন্তত লাঘব হয়েছিল, এখনও তা মনে করতে পারি। তবে বন্দর ছাড়ার আগে এক সকালে একজন নিগ্রো এসে আমার ফোকশালে হাজির। তাকে আমি চিনি। জাহাজ থেকে মাল খালাসের সময় সে এজেন্ট-অফিসের হয়ে শ্রমিকের কাজ করে গেছে। হাসিখুশি মানুষ। ডেকে উঠেই দু'জ্যাব ভর্তি ভাত নিয়ে মুঠো করে খেত আর বলত, ওয়ান ওয়াইফ নো গুড, টু ওয়াইভস গুড, থ্রি ওয়াইভস ভেরি গুড। সে আমার ওভারকোট ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, ডোন্ট মাইন্ড, আই হ্যাভ থ্রি ওয়াইভস।

তবে আমি কেন যে আসানুল্লা সাবের উপর মাঝে মাঝে খেপে যেতাম বুঝতে পারতাম না। আর যারা ইঞ্জিন-জাহাজি আছে, তাদের উপর খবরদারি করায় যেন বিন্দুমাত্র তাঁর ইচ্ছে নেই। কাজ-কাম শেষে কে কোথায় যায়, কোথায় রাত কাটায়, কিছুই জানতে চান না। জানার নিয়মও নয়।

অথচ আমার বেলায় তাঁর ষোলো আনা মেজাজ।

এত রাত করে ফিরলি! কার সঙ্গে গেছিলি! কোথায় গেছিলি! কোথায় গেছিলি বল! চুপ করে আছিস কেন?

আসলে কখনও-কখনও রাত হয়ে যেত। দু'-চারদিন জাহাজি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নেশা করেও ফিরেছি। নেশা করলেই তিনি তাঁর ফোকশালের দরজা বন্ধ করে দিতেন। রাতে খেতেন না। ভাণ্ডারি নীচে নেমে আমার ফোকশালে ঢুকে যেত, বলত, যান বনার্জি, আসানুল্লা সাবেব গোসা ভাঙান গিয়া। ক্যান যে খান, বেততামিজ হতে ভাল লাগে!

পরে কেন যে নিজেরই খারাপ লাগত, বাংক থেকে উঠে পড়তাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ফোকশালে যেতাম। আসানুল্লা সাব একা একটা ফোকশালে থাকেন। একটা কাঠের পেটি বাংকের নীচে। একটা হুকা ঝোলানো বাংকের কোনায়। একটা বড় এনামেলের হাঁড়ি দড়ি দিয়ে বাঁধা। এবং সেটা ছাদের আংটায় ঝোলানো। তাতে রাব ভর্তি। তামাকের বস্তা আছে। বস্তা দিয়ে তামাক পাতা খুব যত্নেব সঙ্গে জড়ানো। লকারে তার কী থাকে জানি না। আমি নেশা করে ফিরলে তার সেদিন কোরান পাঠ শুরু হয়। যেন আমার গুনাহ তিনি কোরান পাঠ করে নষ্ট করে দিতে চান। নামাজ শেষ কবে দুলে দুলে পাঠ শুরু হবে, আর তখনই জাহাজে সবার যত চোটপাট আমার উপর। আর তারা এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিংবা যার সঙ্গে যাই, সেও অপরাধী সাব্যস্ত হত। এমন হয়ে গেল, শেষে কেউ আর আমাকে ডাঙায় সঙ্গে নিয়ে নামতে চাইত না। তাদেরও দোষ নেই। কারণ আসানুল্লা সাব আমার চেয়ে তাদের বেশি তড়পাতেন।

হারামজাদা, বেয়াকুবের দল, নিজেরা জাহান্নামে গেছিস বলে, সেদিনের ছেলেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছিস!

বুয়েনসএয়ার্স বন্দরেও সেই ঘটনা। আমি যেতে চাইলে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না।

আর তখন আসানুল্লা সাব নিজেই হন্তদন্ত হয়ে উপরে উঠে আসতেন।— এই দেবনাথ, বনার্জিরে নিয়া যা!

দেবনাথও ছেড়ে কথা বলে না, দেখুন আসানুল্লা সাব, দেরি-টেরি হলে তেড়ে আসতে পারবেন না।

যা, তোরা মাথা গরম কবিস কেন যে বুঝি না। যা। বনার্জিবে নিযা যা। ডাঙায় ঘুরে বেড়াক। মনটা পবিষ্কাব থাকব।

দেবনাথ বলত, আমি বারণ করেছি! আপনার তড়পানি কে এত সহ্য করে!

যা বাবা। রাগ করিস না, বনার্জিরে নিয়া যা। বনার্জি বসে থাকলি ক্যান যা।

তাবপর আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, কী রে যাবি না! জাহাজে বসে বিকালটা কাটাবি কী করে? একা একা ভাল লাগবে।

শহরটা বড় বেশি সাজানো-গোছানো। আমাদের জাহাজ জেটিতে বাঁধলে টের পেলাম, সামনে গাছের সারি। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ। গাছগুলো আমার চেনা নয়। ওক গাছ-টাছ হবে। নাও হতে পাবে। প্রায় শ-খানেক গাছ সার দিযে লাগানো। গাছের নীচে সব কিনারার লোক এসে জড়ো হয়েছে। জাহাজ থেকে নামলেই শহরে ঢুকে যাওয়া যায়। লেন্দ্রোঅ্যালেন জায়গাটা বেশি দূবও নয়। শহরের জাঁকজমক এলাকা ওটাই। জেটি থেকে আধ কিলোমিটারও রাস্তা হবে না। অনেক বন্দরে গেছি, কিন্তু একেবারে বন্দর বুকে নিয়ে একটা শহর গড়ে উঠেছে, এটা আব কোথাও দেখিনি। কোনও কাস্টম-চেকিং নেই। জাহাজ থেকে নেমে দু'পা হেঁটে গেলেই শহর। কার্নিভেল। আর ফুলের সব দোকান। ফলের দোকান। যখন খুশি নেমে যাওয়া যায়, যখন খুশি ফেরা যায়। আর যুবতীরা এক-একজন যেন মিষ্টি আপেল হাতে নিয়ে হাঁটছে। আপেলের মতোই গায়ের রং। এবং সরস, কী নারী, কী পুরুষ, সবাই কী সুন্দর দেখতে! চোখ নীল, চুল নীলাভ, গায়ের রং গোলাপি এবং রং-বেরঙের স্কার্ট, জ্যাকেট, দামি গাড়ি। বাড়ির পাশে ফুলের বাগান, তকতকে ঝকঝকে।

এই শহরে নেমে না যেতে পারলে আমি মরেই যাব। হঠাৎ খেপে গিয়ে বলেছিলাম, আমি একাই যাব। দেবনাথদা, তোমরা যাও।

আসানুল্লা সাব যেন জলে পড়ে গেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, একা যাবি? তোব এত সাহস। পরি-হুরির দেশ। বাইন্দা রাখলে আমি কিছু জানি না।

আসানুল্লা সাব কখনও তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলেন। রাগ কিংবা ক্ষোভ অভিমান হলেই মাতৃভাষা বের হয়ে পড়ে। তিনি গুম মেরে গেলে বলেছিলাম, ওরা নেবে কেন সঙ্গে বলুন! আমার জন্য ওদের তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসতে হয়। কে আপনার ধমক সহ্য করবে?

দেবনাথ, বঙ্কু, অমিয় চলে যাচ্ছিল। আসানুল্লা সাব তাদের পেছনে ছুটছেন। আমি বসে ছিলাম বিমর্ষ মুখে। আফটার-পিকের বেঞ্চিতে বসে দূরের সমুদ্র দেখছি। গাছগুলি পার হয়ে ছোট্ট মতো পার্কটা পার হয়ে গেলে আবার সমুদ্র। অথচ গাছপালার জন্য দূরের কিছু দেখাও যায় না। ইন্ডিয়া থেকে জাহাজ গেলে যারা পার্কে বেড়াতে আসে, তারা জাহাজে ওঠে, কিছু কেনাকাটাও করে। যেমন, যারা পুরনো জাহাজি, যারা সিটি লাইনের জাহাজে সফর করেছে কয়েকবার, তারাই জানে, ময়ূরের পালক কিংবা কাঠের হাতি চড়া দামে বিক্রি করা যায়।

জাহাজটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য কলম্বো বন্দরে থেমেছিল। নীচে নৌকার ভিড়। কিনারার লোক কাঠের হাতি, কাঠের বুদ্ধমূর্তি কিংবা ময়ূরের পালকে তৈরি পাখা বিক্রি করতে চলে এসেছে নৌকায় করে। যারা জানে, তারা ঠিক কিনে নেয়! এতে যে দু'পয়সা কামানো যাবে বুয়েনসএয়ার্স বন্দরে গেলে তারা তাও জানে। এবং সেইসব জাহাজিরাই আফটার-পিকে বেশ দোকান সাজিয়ে বসার মতো বসে গেছে। স্প্যানিশ নারী-পুরুষদের যে-কোনও কারণেই হোক এই সব ময়ূরের পালক, কাঠের হাতি, কাঠের বুদ্ধমূর্তির প্রতি বিশেষ আগ্রহ আছে টের পেলাম। জোড়ায় জোড়ায় উঠে আসছে। দর-দাম করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি এদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম, আসানুল্লা সাব ফিরে এসেই ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলেন, ওরে, বনার্জিরে দেখছ। গেল কোথায়! অ বনার্জি, গেলি কোথায় বাবা? যা। জামাকাপড পাল্টে নে। শু বুরুশ করে নে। দেবনাথ কিনারায় অপেক্ষা করছে।

আসানুল্লা সাবের এই কাতর ডাক আমাকে খুবই বিচলিত করে তুলত। শেষ পর্যন্ত রাগ পুষে রাখতে পারতাম না। দৌড়ে টুইন-ডেক পাব হয়ে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে যেতাম, ডাকতাম, দেবনাথদা, দাঁড়াও। আমি আসছি!

গাছগুলি পাব হলেই শহরের বড় রাস্তা। ওরা বড় রাস্তায় পড়ার জন্য হাঁটছিল। যেদিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়। কোথাও একটা মেয়ে সাদা ফ্রক আর সাদা প্যান্ট পরে একটা টেনিস বল নিযে পাঁচিলে মাবছে, আবার ফিরে আসছে বলটা, আবার মারছে। শহরের মাথায় রোদ নেমে আসছে। এ দেশের লোকদের কাছে এটা শীতকাল না বসন্তকাল, আমরা ঠিক জানি না। আমাদের কাছে প্রচণ্ড ঠান্ডার দেশ। কোট, প্যান্ট, শালদেরাজ কী নেই? তবু সমুদ্র থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাসে আমরা কুঁকড়ে থাকি। অথচ মেয়েটা একটা স্কার্ট আর ফ্রক গায়ে নিজের মনে পাঁচিলটাব সঙ্গে খেলছে। রাস্তায় কোনও ভিড় নেই। ইতস্তত মানুষের হাঁটাহাঁটি। নর-নাবীদের পোশাকেও বিশেষ বাহুল্য নেই। কটনেব শার্টপ্যান্ট পরে অনায়াসে ঘুরতে পারছে। আমরা পারছি না।

আমি যেখানে যা কিছু দেখি কেমন অবাক হয়ে যাই। নীলচে রঙের বব করা চুল, মুখ আপেলের মতো মসৃণ, শরীরে বোধ হয় আশ্চর্য সুবাস আছে। আমার বয়সি এই মেয়েটা এখানে আছে ভাবতে কেমন অবাক লাগে। ইচ্ছে হত কথা বলি। কিন্তু সাহস হত না। দেবনাথদা ডাকলেন, এই তুই কী বে' কী দেখছিস! কোনও লাভ নেই।

সত্যি কোনও লাভ নেই। তবু দেখার জন্য মনের মধ্যে এমন টান জন্মায় কেন বুঝি না। ওদের পছন্দ হচ্ছিল না।

এই হাঁ করে কী দেখছিস!

দেবনাথদা চিৎকার করে বলল, হারামজাদা কী দেখছ বুঝি না!

আসলে আমি কী দেখছিলাম? ওর স্তন! কারণ ভারী স্তন খেলতে গিয়ে দুলে উঠছিল, ওর থাই এত মসৃণ, যেন হাত দিলে মোমের মতো পিছলে যাবে।

শুধু পিছলে যাবে, না আরও কিছু যেমন জল-জঙ্গলের অন্তর্গত সেই নিদারুণ ভূমি, আমি কি তার

আঁটো প্যান্টের ভিতর সেই আকস্মিক হতচ্ছাড়া তরুণকে খুঁজছিলাম, যার মধ্যে আছে অন্তহীন এক অন্তর্গত খেলা? কেমন যেচে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে যদি খেলতে গিয়ে পড়ে যেত, তাকে তুলে দিতাম। তার এই নমনীয়তা আমাকে আকর্ষণ করতেই পারে।

আর তখনই সাদা বলটা মাথার উপর দিয়ে ফসকে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম। বলটি কুড়িয়ে আবার তার কাছে। বলটি দিলে সে সামান্য হেসে কিছুটা জানু নত করে আমার কাছে বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। আমি নড়ছিলাম না।

দেবনাথদার হুংকার, মর ব্যাটা। হারামজাদা, তুমি শালা ঈশ্বরের পুত্র। কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারে না। তোমার নিন্দা শুনলে আসানুল্লা সাব মাথা ঠিক রাখতে পারেন না।

কী রে, যাবি?

এই যাচ্ছি দাদা।

রাস্তাগুলি এত চওড়া যে ইচ্ছে করলে যেন ফুটবলও খেলা যায়। এটা বন্দরে ঢোকার রাস্তা, গাড়ি-টাড়ি কম। আর তা ছাড়া এই প্রশস্ত রাস্তায় ইচ্ছে করলেই বেগে গাড়ি চালানো যায় না। কারণ সামনে সমুদ্র। বিচের দিকে যারা যায়, তারা এদিকটায় গাড়ি পার্ক করে যায়। পাশের মাঠে বেশ গাড়ির ভিড়।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর থেকে প্রায় গজ দশেক দূরে। এইসব রাস্তাকেই বুলেভার্ড বলে কি না জানি না। মাঝখানে গাছপালার সারি। কোনও গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটে আছে। সমুদ্রের হাওয়ায় ফুলের ওড়াউড়ি ছিল বেশ। কেন যে তরুণীকে ফেলে শহরের ভিতরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কেন যে দাঁড়িয়ে থেকে তার সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছিল! কেমন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল, আর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, আবার একটা বল মিস করলে সুযোগ পেয়ে যাব।

আমি পরেছিলাম কালো সুট। জামার উপর লাল রঙের পুলওভার। আর গলায় আমার স্কার্ফ জড়ানো।

থাক ব্যাটা, দাঁড়িয়ে থাক। রাস্তা হারিয়ে ফেললে আমরা জানি না।

মনে আছে, আমি বলেছিলাম, তোমরা যাও না। একা জাহাজে ঠিক ফিরে যাব। আমার জন্য তোমরা এত ভাববে না বলে দিলাম।

অবশ্য আমি ঠিক রাস্তা চিনে জাহাজে ফিরে এসেছিলাম।

মেয়েটি গেট দিয়ে সেদিন দৌড়ে ঢুকে গেলে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। লোহার গেট, বাড়িটার সামনে কোমর সমান পাঁচিল। সাদা রং করা মনে হয় বাড়িটা। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ফুল-ফলের বাগান। সব বাড়িগুলিই প্রায় দেখতে একরকম। একটা বাড়ি থেকে আর-একটা বাড়িকে আলাদা করা যায় না। কেবল এ বাড়িটার বিশেষত্ব বাগানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। তার সাদা পাতা, সাদা রঙের ডালপালা দেখলেই আমি ঠিক চিনতে পারব, এ বাড়িটার পাশেই কোমর সমান পাঁচিলের সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে টেনিস খেলে। একা একা এই টেনিস খেলারই বা কী মজা, আমি তখন জানতাম না।

ভয় হচ্ছিল। দেবনাথদারা চলে গেছেন। বন্দরের জাহাজ, কিংবা মাস্তুলও অদৃশ্য। চলে গেলে ভাববে পালিয়ে গেছে। এটা একজন ভারতীয় নাবিকের পক্ষে শোভা পায় না এমন মনে হচ্ছিল। অবশ্য জাহাজে যে বন্দরেই গেছি, দোকানে ঢুকলে এটা-ওটা কেনার পর প্রশ্ন করত, কোথা থেকে এসেছ।

বলতাম, ইন্ডিয়া থেকে।

তারপরই বেশ সমীহ জবাব, আই সি ইউ আর গ্যান্ডি পিপল।

ভারতীয় যে আমরা, তা যেন সে সময়ে খুবই গৌণ হয়ে গেছিল। গাঁধী পিপল বলেই যেন খারাপ কাজ শোভা পায় না। আর তখনই ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং-এর সময়কার সেকেন্ড অফিসারের সতর্ক কথাবার্তা শুনতে পাই।

মাই বয়েজ!

তিনি এভাবেই কথা বলতেন।

মাই বয়েজ, তোমরা জানো, স্বাধীন হওয়ায় আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তোমরা জানো, জাহাজে

নাবিকের কাজ যাঁরা করতেন, তারা অধিকাংশই এখন পূর্ব-পাকিস্তানের লোক। মাই বয়েজ, মনে রেখো, তোমাদের কাজ দেখে যেন জাহাজের কর্তাব্যক্তিরা খুশি হন। বেঙ্গলি পিপল, লেজি, বাগার, এ ধরনের একটা ধারণা আছে তাঁদের।

এখানে বলে রাখা ভাল, জাহাজে ওঠার পর সবাই আমাদের বাঙালিবাবু বলতেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যারাই জাহাজে উঠতেন, তারা সবাই মুসলমান। তাদের থেকে আমরা যে আলাদা, বাঙালিবাবু বলে সেটা যেন মনে করিয়ে দিত। এই নিয়ে মনু, ইমতাজ, আমাদের সঙ্গে কতদিন তর্ক করেছে। আমরা বলতাম, তোরা কী? তোরা বাঙালি না? আমাদের বাঙালিবাবু বলিস!

ওরা কিছুতেই এটা মানতে পারত না। তারাও যে বাঙালি মুসলমান, বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা, কিছুতেই বুঝতে চাইত না। আরবি, ফারসিও নয়, এমনকী উর্দুও নয়, বাংলা ভাষা ছাড়া তাদের আর কী আছে, তারা বাঙালি জাতি ভাবতে এত উদাসীন যে মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে বলতাম, তোমাদের, মিঞা, আক্কেল হবে না, কথা বলবে বাংলায় অথচ বাঙালি হতে রাজি না।

কেউ কেউ অবশ্য আমাদের যুক্তি ধরতে পেরে চুপ করে যেত।

বলতাম, পাকিস্তানি-পাকিস্তানি বলে গেলে! এত দেমাক! আর বাংলাদেশটাকে ভাগ করে পাকিস্তান বানালেই হল! খেজুর গাছ আছে, মরুভূমি আছে? আর মরুভূমির দেশটা অনেক দূর জানিস! মুসলমান বলেই তারা তোদের সব, আমরা কেউ নয়! আবার কোনওদিন শুনছি তো— এই বাঙালিবাবু, চা আছে, চিনি আছে, সিগারেট আছে— বললে কোনও সাড়া পাবি না বলে দিলাম।

তারপর এ নিয়ে তর্ক এত প্রবল হয়ে উঠত যে সারেং সাব এসে বলতেন, জাত আবার কী রে? মানুষের গোত্র বিচার মনুষ্যত্ব দিয়ে। তা না থাকলে, বাঙালি হও, পাকিস্তানি হও, কিছু আসে যায় না।

সারেং সাবের সামনে আমরা কেউই তর্ক করতাম না। তিনি বলতেন, যার ইমান নাই, সে হিন্দুও না, মুসলমানও না। সে কাফের, বুঝলি?

তিনি চলে গেলেই, আমেদ খেপে গিয়ে বলত, বুড়োর একমাত্র ছেলেটা লন্ডনে নেমে যাবার পর থেকেই কেমন হয়ে গেছেন। শুনলি তো কথাবার্তা!

আমেদ আমার দিকে তাকিয়ে বলত, তোর বয়সি। জাহাজে সঙ্গে নিয়ে উঠেছিলেন। জাহাজের কাজকাম শিখলে সফরে বের হতে পারবে। আর সফর! বিলাতের ঘাটে সেই উধাও হয়ে গেল, আর কোনও খোঁজ নেই।

সেদিনই আমি টের পেয়েছিলাম, বুড়ো মানুষটি আমি দেরি করলে কেন এত খেপে যান। তিনি কি তার পুত্রের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন? তিনি কি বোঝেন, এই বয়সটাই খারাপ! কী জানি, এতদিন পর জীবনের সেসব রহস্যময়তার কথা ভাবলেও মন কেমন উদাস হয়ে যায়।

যা বলছিলাম, ভদ্রা জাহাজের সেকেন্ড অফিসার বলতেন, মনে রেখো, প্রায় দেশে আমাদের দূতাবাস আছে। তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ থাকে না। তোমরাই হলে আসলে এ দেশের পরিচয়, তোমাদের আচরণে এই দেশ সম্পর্কে বিদেশিরা অনুমান করতে পারবে, ভারতীয়রা গরিব, তবে তাদের শালীন আচরণের তুলনা নেই। তোমরা জংলি নও। তোমরা হলে আসলে ভারতবর্ষের প্রকৃত দূত।

আসল ভারতীয় দূত, এই উক্তি জাহাজে উঠে মনে থাকার কথা না। বিপদে পড়লে মনে পড়ত।

যেমন মেয়েটি না খেলে বল নিয়ে দৌড়ে পালাল। বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল। বুলেভার্ডে মসৃণ ঘাস, গালিচার মতো! খুব যত্ন নেওয়া হয়, ল্যান্ড মোয়ারে কাটা ঘাসে হাঁটলেই বোঝা যায়।

দেখাই যাক না কী হয়!

আমি ঘাসের উপর বসে পড়লাম।

দোতলার কোনও ঘরে কে আলো জ্বেলে দিল। রঙিন কাচের ভিতর এক নারীমূর্তিকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলাম। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেমন সব মরীচিকার মতো, এই আছে এই নেই। কিন্তু বাড়ি থেকে আর কেউ প্রায় বেরই হল না। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি বের হয়ে গেল। আবছা আলোয় টের পেলাম, গাড়িতে সে আছে।

জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।

আমি সাদা টেনিস বল যতবার তার হাতে তুলে দিয়েছি, ততবার সামান্য নত হয়ে বাউ জানিয়েছে। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল।

হাজার-হাজার মাইল দূরে আমি ঘাসের উপর শুয়ে আছি। ছোট ছোট ভাইবোনদের অনাহার থেকে রক্ষা করার এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায়ই ছিল না। জাহাজে কাজ নিয়ে চলে এসেছি। বাবার বিষণ্ণ মুখ মনে পড়ছে। মা'রও।

ঘাসের উপর শুয়ে থাকি। রাত বাড়ে। জাহাজে ফেরার কথা মনে থাকে না। কী যে হয়, দেশ-বাড়ির কথা মনে হলে ছোট ভাইরা যেন তখন চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এক কথা, দাদা রে!

আমি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি।

দাদা রে!

বল।

ফিরবি না! কত রাত হল?

আমার মধ্যে আবার সে জেগে ওঠে, আমি পিতার একমাত্র লায়েক পুত্র। কোথাও পালিয়ে গেলে চলবে না।

আমি উঠে বসি। জাহাজে ফিরে যাই।

গ্যাংওয়ে ধরে উঠে যাবার জন্য সিঁড়ি ভাঙছি। কেমন ক্লান্ত মনে হত নিজেকে। জাহাজ কবে ফিরবে দেশে কেউ বলতে পারে না। কতকাল এভাবে জাহাজ নিয়ে বন্দরে বন্দরে ঘুরব তাও জানি না। জাহাজ সমুদ্রে ভাসলেই আতঙ্ক। সেই ওয়াচ, টন টন কয়লা টেনে নিয়ে যাওয়া, রাশি রাশি ছাই হাপিজ করা, কাজ সেরে ডেকে উঠে এসে স্নান আহার, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া।

কিন্তু কী যে আতঙ্ক ছিল, কিছুতেই ঘুম আসত না।

এই বুঝি উঠে এল, ইঞ্জিন-রুমে যাদের 'পরি' থাকে, তাদেরই কাজ জাগিয়ে দেওয়া, আমা'র দিনের 'পরি' অর্থাৎ ওয়াচ ছিল আটটা-বারোটা। রাতেও আটটা-বারোটা। চার ঘণ্টা করে কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম ঠিক, তবে কী দিনে, কী রাতে, আমার ছিল অস্বস্তি। ওয়াচে যেতে হবে শুনলেই আতঙ্কে মুখ কালো হয়ে যেত।

তবে তিন-চারমাসে রপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। আগের মতো ওয়াচের আতঙ্কে ভুগতাম না। ডাঙা এলে খুশির জোয়ারে ভেসে যেতাম। শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে গেছি, পাহাড়ি বন্দর হলে টিলায় উঠে সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখেছি, আর সব বন্দরেই একটা না একটা মোহে পড়ে গেছি।

ফিরতে বেশি রাত হওয়ায় সারেং সাব মুখ গোমড়া করে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই দেবনাথদারা এসে সব বলেছে। কোনও তরুণীর টেনিস বল কুড়িয়েছি শুনে সারেং সাব নিশ্চয়ই ভেবেছেন ছোঁড়ার না হয়ে গেল! কিন্তু তার জন্য এত রাত তো হবার কথা নয়। রাস্তা হারিয়ে ফেললে বন্দরে ফেরা যাবে না, এই দুশ্চিন্তাও থাকতে পারে।

আমাকে দেখে তিনি কথা বললেন না। আমি ফেরায় তিনি নিশ্চিন্ত দেখে তাও মনে হল না। কেবল সিঁড়ি ধরে নীচে নামার সময় বললেন, তোর খাবার ভাণ্ডারি ঢাকা দিয়ে রেখেছে। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে এবারে উদ্ধার কর।

পরদিন সেজে-গুজে একাই বের হয়ে গেছিলাম। যেন হেঁটে গেলেই দেখতে পাব একটা ইউক্যালিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের পাশে সাদা খাটো ফ্রক গায়ে টেনিস খেলছে কেউ। আবার রোজই কেন যে মনে হত, আজ হয়তো গিয়ে তাকে দেখব না।

ঠিক দূর থেকে দেখলাম গাছটা। কিন্তু কেউ খেলছে না। তবে কি আমার মতো একজন অপরিচিত তরুণের বল কুড়িয়ে দেওয়া পছন্দ নয়?

তা ছাড়া মারধর করবার জন্য দলবল দিয়ে বাড়ির ভিতর সে ঘাপটি মেরে নেই তো? এমনও মনে হত। মনটা দমে গেল। জাহাজে ফিরে যাব ভাবছি। যদি সত্যি গেট খুলে ওরা ছুটে আসে? মেরে ছাল-চামড়া তুলে দিতে পারে। এসব যখন ভাবছিলাম, তখনই দেখি মেয়েটা গাছের নীচ দিয়ে ছুটে আসছে। এক হাতে র‍্যাকেট অন্য হাতে টেনিস বল।

আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। তারপর বলটা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে সার্ভ করতেই আমার সব সংশয়

জল হয়ে গেল। না, আমাকে সে খারাপ লোক ভাবেনি। আমি যে জাহাজি তাও বুঝতে পেরেছে। কারণ আমার চেহারা এবং পোশাকে দূর সমুদ্রের ঘ্রাণ আছে মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল।

সেদিন সে ইচ্ছে করেই দেরি করেছিল, না টানে টানে আমিই সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেছিলাম মনে করতে পারছি না। কেবল মনে আছে দুধে-আলতা রং তার। চোখ কালো, চুল নীলাভ। মুখে তার আশ্চর্য দেবীমহিমা।

সে সেদিন ইচ্ছে করেই বল বেশি মিস করছিল, আর আমি দৌড়ে দৌড়ে বল কুড়িয়ে দিয়ে যখন কৃতার্থ হচ্ছিলাম, তখনই একবার র‍্যাকেটটা বগল দাবা করে আমার দিকে এগিয়ে এল। মিষ্টি হেসে কী বলল, তার এক বর্ণ বুঝলাম না। তবে আমি বললাম, ইয়েস মি সেলর।

কী বুঝল সেই জানে।

আবাব বল নিয়ে সার্ভ করল। পাঁচিলে ঠেকে বল ফিরে আসছে, ডান হাতে বাঁ হাতে সে বল পাঁচিলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। একটা বলও মিস করছে না।

আমি বোবার মতো পাশে দাঁড়িয়ে তার এই মজার খেলা দেখছি।

সে যে কী বলল!

আমার ভাল লাগছিল না। আশ্চর্য সে একটা বলও মিস করছে না। মিস না করলে আমার আর থেকে কাজ কী! আমি তো তার বল কুড়িয়ে দেবার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকি। বোধহয় ভিতরে কোনও অভিমান কাজ করে থাকতে পারে। আমি হাঁটা দিচ্ছিলাম, আর তখনই—হুই। শিস ,দেবার মতো আমাকে উদ্দেশ করে কিছু যেন বলল।

কাছে গেলে দেখি সে র‍্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বলটাও।

আমি যে এ ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি মেয়েটা বোধহয় জানে না। এও ভাবতে পারে সাদা বলেব প্রতি এত যখন আগ্রহ, তখন আমারও খেলার ইচ্ছে আছে। সে আমার হাতে র‍্যাকেট তুলে দিতে এলে সরে দাঁড়ালাম। বললাম, নো নো।

তারপর বললাম, আই নো নাথিং অফ দিস গেমস।

আমার কথা সে কিছুই যে বুঝতে পারছে না, হাবভাবেই বোঝা গেল।

সে আমার হাতে র‍্যাকেট·দেবেই।

আমি খেলব, সে বল কুড়োবে। খুব কাছে থেকে বুঝলাম, সে সবে বালিকা-বয়স পার করেছে। একজন প্রৌঢ়মতো লোক বের হয়ে এলে তাকে কিছু বলল মেয়েটা। সেও আমার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল।

তখনই টের পেলাম, হাতের ইশারায় কিংবা মুখের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে না পারলে মেয়েটা আমার কোনও আগ্রহের কথাই বুঝবে না।

খেলার চেয়ে বল কুড়িয়ে আনার আগ্রহ যে বেশি, বোঝাই কী করে?

এ ছাড়া র‍্যাকেট কী ভাবে ধরতে হয় জানি না। যদিও এটা কোনও সমস্যা নয়, কিন্তু বল ছুঁড়ে মারতে গেলে ফসকে যাবারই সম্ভাবনা বেশি।

খুবই কাঁচা কাজ হয়ে যাবে ভেবে র‍্যাকেটটা কিছুতেই নিচ্ছিলাম না। জোর করে গছাবেই। অজস্র কথাও বলছে, যার এক বর্ণ বুঝতে পারছি না। ওর শরীরে ভারী সুঘ্রাণ। সামান্য হাওয়ায় ওর বব করা চুলে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। যেন, এই যে বালিকা কিংবা তরুণী যা-ই বলা যাক, তার মুখে সামান্য অভিমানও ফুটে উঠতে দেখলাম।

এত নাছোড়বান্দা হলে পারা যায়! যেন খুশি করার জন্যই র‍্যাকেট হাতে সাদা বল মাথার উপর ভাসিয়ে দিলাম। যা হবার তাই হল। কোথায় যে গেল বলটা! ফসকে গেছে। এত জোরে মেরেছিলাম যে র‍্যাকেটও ফসকে গেল হাত থেকে।

আর আশ্চর্য, দেখি মেয়েটা ফুলে ফুলে হাসছে। হা হা করে হাসছে। এত হাসছিল, আমি খুবই

আমার কী!— তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, আমার কিছু না। তোর বাপ-মার কথা ভাবলি না? পালাচ্ছিলি!

আর তখনই মনে হল, কে যেন ডাকছে, দাদা রে, বাড়ি ফিরবি না?

কত দূর দেশে আমার বাবা-মা, আমার ভাই-বোনেরা রয়েছে। আর আমি কবে ফিরব এই অপেক্ষায় আছে। এজেন্ট-অফিস থেকে বাবার নামে মাসোহারা পাঠিয়ে দেয়। জাহাজ ছেড়ে দিলে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি ফিরে এলাম। বাংকে শুয়ে গোপনে অশ্রুপাত। কার জন্য এখন আর সঠিক মনে করতে পারছি না। বাবা-মা, ভাই-বোন, না চেরি!

যাই হোক, জাহাজ ছেড়ে দিলে চুপচাপ গ্যালির পাশে বেঞ্চিতে বসে থাকলাম। যতক্ষণ না বন্দর চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, বসে থেকেছিলাম।

কার্ডিফ বন্দর ছাড়ার সময়ও এক পরিস্থিতি। আসানুল্লা সাব নজর রাখছেন। এমন ভাবলেই আমার মাথা গরম হয়ে যেত আসানুল্লা সাবের উপর। কেবল মনে হত আমার ভাল-মন্দ দেখার এত দায় কে দিয়েছে আপনাকে! আমি জাহান্নামে গেলে আপনার কী! কিছু বললেই চটে যেতাম। এবং মনে হত, তিনি আপদ বিশেষ। জাহাজের কাজকর্ম ছাড়া তাঁর আর কোনও খবরদারি করার কথাও নয়। বন্দরে কে কোথায় রাত কাটায়, জানার তাঁর কোনও অধিকার নেই। আমার বেলায় তাঁর যত নজর। কেমন যেন জেদি হয়ে যাচ্ছিলাম। উচিত শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তিনি কখনও আর আমার ব্যক্তিগত কাজকর্মে নাক না গলান, সেজন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম।

বোধহয় সময়টা জুন-জুলাই। প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। কার্ডিফ থেকে এই বৃষ্টির মধ্যেই খালি জাহাজ নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

কাছাকাছি আর-কোনও বন্দরে জাহাজ ধরছে না।

বুয়েনসএয়ার্স থেকেও আমরা খালি জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। ভিক্টোরিয়া পোর্টে মাত্র দু'দিনের জন্য থেমেছিল। ব্রাজিলের এই বন্দরটি লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। দু'দিনেই লৌহ আকরিকে জাহাজ বোঝাই। সেখান থেকে টানা সমুদ্রে ভেসে গেছি বে অফ বিসকে পর্যন্ত। প্রায় মাসখানেক জাহাজ সমুদ্রে।

কার্ডিফে মাল খালাস। ড্রাই-ডক সারতে বিশ-বাইশ দিন কি বেশি সময় লেগেছিল সঠিক এখন আর মনে নেই।

শুধু মাসখানেক পর আমরা পোর্ট অফ জামাইকা যাব। যেখানে জাহাজের রসদ নেওয়া হবে।

ক্যারাবিয়ান সি-তে দু'-একদিনের জন্য নোঙর ফেলা হবে। জাহাজের চার্টে এমন খবর পেয়ে আমরা বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম কারণ তারপর কোনদিকে কী নিয়ে জাহাজ রওনা হবে, জানি না বলে মন বেশ খারাপ।

এমনিতেই জাহাজটা লজ্ঝরে। সাউথ ওয়েলসের উপকূল থেকে একটানা এতদিন জাহাজটা ভেসে চলতে পারবে কি না সংশয়। প্রায়ই মনে হত জাহাজ বন্দর ধরার আগেই সমুদ্রে ডুবে যাবে। ঝড় সাইক্লোনে পড়লে এটা বেশি মনে হত। এই বুঝি স্টিয়ারিং-ইঞ্জিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কারণ আমাদের ঠিক মাথার উপরেই ছিল হালের যন্ত্রপাতির ঘর। ঝড়ে মাঝে মাঝে উদ্ভট সব শব্দ পেতাম। একদিন তো দৌড়ে উঠেও গেছিলাম—দেখি, না ক্র্যাংক-ওয়েভগুলো ঠিকমতোই কাজ করছে।

আসলে আমরা যাচ্ছি নিউপোর্টে।

তার আগে পোর্ট অফ জামাইকা থেকে শুধু রসদ তোলা।

জাহাজ ছেড়ে দেবার পর কার্ডিফ বন্দরও অদৃশ্য হয়ে গেল। এ যে গভীর সমুদ্রে জাহাজ। আবার সেই ওয়াচ, কয়লা টানা, ছাই হাপিজ করা, চান, খাওয়া, ঘুম। প্রতিদিন একই দৃশ্য, নীল আকাশ। নীল সমুদ্র। কিছু অ্যালবাট্রস পাখি। অনন্ত অসীম এই সমুদ্রযাত্রা কবে যে শেষ হবে তাও জানি না।

বুঝতে পারছি, এবারে আমি একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছি। আসানুল্লা সাবের কাছে নাজিরা

যেন ডাইনি। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম বলে দু'দিন কোনও কথাই বললেন না।

মাঝে মাঝে আসানুল্লা সাবের এমন ছেলেমানুষি দেখে আমার হাসি পেত।

নাজিরা কি আমাকে খেয়ে ফেলবে? আমি কি সত্যি কোনও বন্দরে হারিয়ে যেতে পারি! হারিয়ে গেলে, তাঁর কী! আর যদি আমার ব্যক্তিগত অভিরুচিতে বার বার তিনি হস্তক্ষেপ করেন তবে রাগ হয় না?

জানি না কেন, অনেকের মতো আমিও 'ফুল' নেব জানতে পেবে আবার আসানুল্লা সাব খাপ্পা।

ছোট-টিন্ডাল করিম মিঞা বাংক লাইনের পুরনো জাহাজি। সে অনেক খবর রাখে। কারণ নিউপোর্ট থেকে জাহাজ সালফার বোঝাই হয়ে পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে আবার দূর-সমুদ্রে যাত্রা। পানামা ক্যানেল অতিক্রম করার সময় কে ফুল নেবে, এমন কথাবার্তা আমার কানে এসেছিল। বন্ধুই এসে খবব দিয়েছিল, ছোট-টিন্ডালেব ঘবে যা। ডাকছে।

আমি তখন লকার গোছাচ্ছিলাম। মা শীতে কষ্ট পান বলে একটা কম্বল কিনেছি। সেটা যত্ন কবে ভিতরে গুছিয়ে রাখছিলাম।

'ফুল নেব' এমন খবর যে আসানুল্লা সাবের মাথা খারাপ কবে দিতে পারে আমি জানতাম। অনেক হয়েছে, আর না। ঘোমটাব তলে খ্যামটা নাচ আর ভাল লাগছে না। জাহাজিরা যা, আমিও তাই। অত শুচিবাই জাহাজে উঠলে চলে না।

বন্ধুকে বললাম, যা, আমি যাচ্ছি।

আমার ফোকশালে দুটো বাংক।

উপরের বাংকে থাকত বাহার। সে আসানুল্লার 'ফালতু' ছিল। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোল-বয়। আমাদের সাতজনেব একজন। কারও কঠিন অসুখ-বিসুখ হলে সে তার হয়ে পরি দিত। অন্য সময় আসানুল্লা সাবের ফুটফরমাস খাটত বাহাব।

বাহারের মেজাজ বেশ দরাজ, উঠেই টের পেয়েছিলাম। সে নীচেব বাংকটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। উপরের বাংকে শুলে ঝড় সাইক্লোনে ঘুমোতে বেশি অসুবিধা। বেশি ওঠানামা করে বাংক। সে আমার সুবিধার দিকটা সব সময়ে নজর দিত। আমার টোবাকো কিংবা চিনি রেশনে সেই তুলত। সিগারেট খাওয়াব অভ্যাস ছিল না। সেও ধূমপায়ী ছিল না বলে আমাদের টোবাকো জমে যেত। এবং কিনারায় সে টোবাকো তিন গুণ দামে বিক্রি করে আমার প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিত। এই কবে আমাদের হাতে অতিরিক্ত পয়সা এসে গেছিল। যার জন্য সহজেই একটা দামি কম্বল কিনে ফেলতে পাবলাম। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে কোম্পানির ঘব থেকেও কিছু পয়সা তোলা যায়। সব মিলিয়েই কম্বল কেনার পয়সা জোগাড় হয়ে গেছিল। ফন্দিটা যুগিয়েছিল বাহারই। সেই বাহারই কার্ডিফ বন্দবে হাওয়া হয়ে যাওয়ায় পুরো ফোকশালটা আমার একার দখলে এসে গেছিল।

আমরা তখন মিসিসিপি নদীর মোহনার সামান্য ভিতরে ঢুকে গেছি।

সেই এক ফুলের খবর। করিম টাকা পয়সা তুলছে।

যত শুনি তত নারীসঙ্গ পাবার জন্য মনটা উতলা হতে থাকে! বার বার আসানুল্লা সাব নিষেধ করলেন, ছোট-টিন্ডালের ফাঁদে যেন না আটকে যাই।

কেন যে এটা আসানুল্লা সাবের বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল এখন মনে হলেও কষ্ট পাই।

সে যাই হোক, নিউপোর্টে আমবা নামতে পারলাম না। পোর্ট অফ সালফারেও না। কাপ্তান আসানুল্লা সাবের কাছে খবর পাঠালেন, কিনারায় আমরা যেন কেউ না নামি।

আমেরিকার দক্ষিণ মুল্লুক এটা। বর্ণবিদ্বেষ প্রবল। কিছুদিন হল কালো-সাদায় দাঙ্গা হয়ে গেছে। ভারতীয় জাহাজিদের নামার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল।

এতেও হয়তো মনটা আরও বেশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল। গোপনে ছোট-টিন্ডালের হাতে রেগেমেগে ফুলের দাম পৌঁছে দিলাম।

এত কাছে ডাঙা! জেটি পার হলে বড় বড় তেলের পিপে রোদে ঝলমল কবছে। শহর এলাকা একটু দূরে। তবু বোট-ডেক থেকে নারী-পুরুষের ফারাক বুঝতে পারি। আমরা প্রায় বন্দি জীবন যাপন করছি। কাঁহাতক সহ্য হয়।

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বয়সের দোষে অপমানবোধ প্রখর। আমি হাঁটা দিতেই মেয়েটা এসে পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

না, এতটা আমি আশা করিনি, সমবয়সি এক তরুণ তার খেলা দেখার জন্য একা-একা দাঁড়িয়ে থাকে, এটা তার কাছে কোনও বিস্ময়ের কারণ হতে পারে, কিংবা অ্যাপ্রিসিয়েট করছে তার খেলার, এটাও ভাবতে পারে, সে যা-ই ভাবুক, আমি নড়তে পারলাম না।

সে হাত টেনে আমাকে নিয়ে গেল। কী করে র‍্যাকেট ধরতে হয় দেখাল, কী করে বল ছুঁড়ে দিতে হয় দেখাল। এবং সে আবার হাতে র‍্যাকেট দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল, আমি ঠিক মারতে পারি কি না!

র‍্যাকেটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আর হাসির খোরাক হতে রাজি না। সে দু'হাত নাচিয়ে আমাকে এনথু দিতে চাইছে। আমি যে কী করি!

সে এসে এবার র‍্যাকেটটা আমার হাত থেকে তুলে নিল। কীভাবে ধরতে হয় ফের দেখাল। বল লুফে মারতে হয় কীভাবে, তাও দেখাল। টেনিস র‍্যাকেট এত ভারী তাও আগে জানতাম না। দেখিওনি। খুব বেশি হলে ব্যাডমিন্টন খেলেছি কলেজে। দু'র‍্যাকেটের আকাশ-পাতাল তফাত। কব্জির জোর না থাকলে হয় না।

তারপর আমি আবার মিস করলাম। সে আবার দেখিয়ে দিল। একবার সত্যি লেগে গেল। আর মেয়েটা হাততালি দিয়ে আমাকে চিয়ার্স করল।

এই হল আমার মরণ।

আমাদের জাহাজ বুয়েনসএয়ার্স বন্দরে বোধহয় মাসখানেক ছিল। পাটের গাঁট নামানো, তারপর মাল বোঝাই হবার সময় আচমকা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট।

জাহাজ টানা একমাসই বন্দরে লেগে থাকল। আর ক্রমে আমি চেরির ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। তার নাম চেরি। একদিন সে হাতে করে ফল এনে দেখাল। একবার আঙুলে ফল দেখায়, একবার আঙুল বুকে ঠেকায়। একদিন সে ইশারায় বোঝাল, আমার জাহাজ দেখতে আসবে। কিন্তু আমি যে ফোকশালে থাকি, তা খুবই অপরিষ্কার, তাকে এনে কোথায় বসাব এই দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ। সারা সকাল বাংক পরিষ্কার করলাম। বিছানার চাদর কেচে ফেললাম। নোংরা পোশাক সব লকারের এক কোনায় কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেললাম। আসানুল্লা সাবকে বলে বাংকে রং লাগালাম। বাংকে সাদা রং। তারপর কশপের কাছ থেকে একটা পুরনো কম্বল এনে গালিচার মতো মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম। আমার সাফসুতরোর ব্যাপারে এত মনোযোগ দেখে সব জাহাজিরা বেশ তাজ্জব বনে গেছে।

বনার্জির এই সুমতি! তার তো কিছুই ঠিক থাকে না। হপ্তার পর হপ্তা সমুদ্রে এক জামা-প্যান্ট পরে কয়লা টানি। ঘাম বসে গিয়ে শক্ত খড়খড়ে প্যান্ট। আসানুল্লা সাব দেখলে শুধু প্যান প্যান করেন। বলেন, তোর ঘেন্নাপিত্তি নেই।

বাংকের নীচে-উপরে আমরা দু'জন থাকি। উপরে থাকে বাহারুদ্দিন। ওকে বাহার বলে ডাকি। গরমের সময় সমুদ্রে ফোকশালে হয় গামছা নয় তোয়ালে পরে থাকে। খালি গা। তবে বুয়েনসএয়ার্সের প্রচণ্ড ঠান্ডায় লুঙ্গি পরলেও, ওপরে পুলওভার গায়ে দেয়।

ওকে নিয়েই ঝামেলা। ওর শতরঞ্চি শতচ্ছিন্ন। নানা জায়গায় সেলাই কবা। কৃপণ স্বভাবের। ওব ফুটো কম্বল এবং মোটা কাঁথা এখন কোথায় যে রাখি! একমাত্র আসানুল্লা সাব যদি রাজি হন।

আসানুল্লা সাব রাজি। একজন কয়লাওয়ালার পেটি তার ঘরে রাখা খুব সম্মানের না! তবু মেয়েটি জাহাজে আসবে শুনে আসানুল্লা সাব কেন যে আমার সম্মান-রক্ষার্থে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন! বাটলারের কাছ থেকে ফুলদানি পর্যন্ত চেয়ে আনলেন। এক গুচ্ছ মিমোসা ফুল ফুলদানিতে রাখলাম। প্রায় পূজা-পার্বণের মতো ঘরটাকে সাজিয়ে ফেললাম।

আমরা ইশারায় ততদিন কথা বলতেও শিখে গেছি। দুটো-একটা ইংরাজি সেও জেনে নিয়েছে। সে এলে কফি সার্ভ করা হল। এক প্লেট বিরিয়ানি দেওয়া হল। সে খেয়ে খুব খুশি। সবার সঙ্গে সে ইশারায়

কথা বলার চেষ্টা করেছে। তাকে আমি ইঞ্জিন-রুমে নামিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছি।

সেও আমায় তার গাড়ি করে এক বিকেলে এভিতাতে নিয়ে গেল। এভা পেরনের সমাধিক্ষেত্র দেখলাম। কী শান্ত আর নির্জন! বড় বড় গাছের ছায়ার নায়িকা এভা পেরনের সমাধি। গাড়ি করে দূর দূর থেকে লোক আসে। সেখানে আমি আর চেরি ঘাসের উপর চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। পাখিরা সমুদ্র থেকে উড়ে আসত। যেন এক মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছিলাম চেরির সঙ্গে। তার মা-বাবা একদিন আমাকে জাহাজ থেকে নিয়ে গেল। আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই দেশের বিখ্যাত আপেলবাগান দেখতে বের হয়ে গেলাম।

অথবা কোনও বিকেলে কিংবা সাঁজবেলায় আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে আমার মনে হত, কতদূরে আমি। ঘাসের উপর বসে আমরা কখনও হাতে হাত মিলিয়ে অদ্ভুত এক খেলা খেলতাম। এক দুই পাঁচ, তিন সাত চার, এমন ছিল খেলার হিসাবটা। কোথায় হাতের পাতা পড়বে, কোন দিকে, নীচে না উপরে, না কোমরের কাছে, মাঝে মাঝে ভুল করে ফেললে প্রথম থেকে আবার শুরু করতে হত খেলাটা। এইভাবে এক বিকেলে কেন যে আমার মনে হয়েছিল, এ দেশ ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব না। সে আর কোনও দিন পাঁচিলের পাশে এসে র‍্যাকেট হাতে নিয়ে দাঁড়াবে না, আমিও আর কোনওদিন সাদা বল তার হাতে কুড়িয়ে দিতে পারব না। যখন চেরির জন্য টান ধরে গেছে, ওদেশে থাকারও একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে, চেরিই বলেছিল, ওহ ইন্ডিয়ান!

'ওহ ইন্ডিয়ান' কথাটা এত বেশি গেঁথে গেছিল মনে যে, সে আর আমি তাদের বাগানে ফুলচোর সেজে ছোটাছুটি করেছি কত বিকেলে।

এক বিকেলে গিয়ে দেখলাম, চেরি নেই। সে চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

তারা যা বলে বুঝি না!

কবে ফিরবে! তাও তাদের ভাষা থেকে ধরতে পারি না। কেমন ভেঙে পড়েছিলাম। না বলে কোথায় গেল? কবে ফিরবে? একবারও তো বলেনি! আবার বলতেও পারে, আমিই হয়তো তার ইশারা ধরতে পারিনি। বু লেভার্ডে রোজ গিয়ে বসে থাকি। জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। এ দেশে থাকি, না থাকি, যাবার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

গেটে তালা। দরজা-জানলা বন্ধ। কেউ নেই বাড়িটাতে। আর আমার কেন যে প্রত্যাশা ছিল, যেখানেই থাক, জাহাজ ছাড়ার আগে ঠিক চেরি চলে আসবে। অন্তত ওই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

রোজ যাই। গাছের ছায়ায় বসে থাকি। দূর থেকে কোনও গাড়ি এলে মনে হত বাড়িটার সামনে থামবে। গেট খুলে চেরি তার বাবা মা এবং একজন কাকাও ছিল বোধহয়, তবে সম্পর্কটা সঠিক কী বুঝতে পারিনি।

এভাবে একদিন দেখলাম জাহাজ ছাড়ার নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা আর মাত্র আছি এ বন্দরে। ভোররাতে জাহাজ ছাড়বে।

জাহাজ ছাড়ার আগে কিছু কাজ থাকে, ডেক পরিষ্কার করা, ফলকার কাঠ ফেলে ত্রিপল দিযে ঢেকে দেওয়া, খিল এঁটে দেওয়া চারপাশে—এই সব কাজ যত দেখছি, তত মুখ আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। বিকেলে গেলাম। সাঁঝবেলায় ফিরে এলাম। ভিতরে কেন যে এত ছটফট করছিলাম জানি না। জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা বন্দর ছেড়ে চলে যাব, আর হয়তো জীবনে চেরির সঙ্গে দেখা হবে না, ভাবতেই চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল।

এবং কেমন ঘোরে পড়ে গেছিলাম। মাঝরাতে জাহাজ থেকে পালিয়ে ভেসে যাব ভাবছি এবং ডেক ধরে যাবার মুখেই দেখি পেছনে কে আমাকে অনুসরণ করছে। আসানুল্লা সাব।

কোথায় যাচ্ছিস?

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারা মুখে তিক্ততা। ভেবেছে কী! আমি কোথায় যাচ্ছি, না যাচ্ছি, এতে তার কী দায় থাকতে পারে? আমি মরি বাঁচি, তার কী তাতে আসে যায়।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, আমি যেখানে যাই, আপনার কী তাতে?

আমার সঙ্গে সেকেন্ড অফিসারের কিছুটা দোস্তি আছে জাহাজিরা জানে। তার সঙ্গে ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারি। কারণ আমি এমনিতেই বেশ ফর্সা। জাহাজে উঠে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় রং আরও খুলে গেছে। সাহেবের স্বজাতি বলে চালাতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারি। ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু ওই যত গেরো আসানুল্লা সাব। তার চোখ ফাঁকি দেওয়া কঠিন। আব কিনারায় নেমে যদি শেষে ধরা পড়ে যাই তবে আর-এক কেলেঙ্কারি। সাত-পাঁচ ভেবেই পোর্ট অফ সালফারেও নামা হল না।

আর এতে নিজের ভিতরে সেই চিরন্তন নাবিকের নেশা যে আরও পাক খেয়ে উঠছে বুঝতে কষ্ট হত না। তা না হলে বোধহয় এত মবিয়া হয়ে উঠতাম না।

সালফার নিয়ে আবার পাড়ি দিতে হবে দূর সমুদ্রে। মাসখানেক কি তারও উপব জাহাজ ক্রমাগত সমুদ্রে ভেসে চলবে। কেবল আমরা পানামা ক্যানেলের দু'পাশের ডাঙা দেখতে পাব। এছাড়া শুধু দিনরাত সমুদ্র, নীল আকাশ, ঝড়-জল আর মাঝে মাঝে সমুদ্রপাখিদেব ওড়াউড়ি দেখা।

জাহাজ পোর্ট অফ সালফার থেকে দড়িদড়া খুলে দিল। মোহনা থেকে জাহাজ ভেসে পড়েছে সমুদ্রে। জাহাজের পেছনে সব সমুদ্রপাখি। ডানা সাদা, হলুদ ঠোঁট কবুতরেব মতো দেখতে বিশাল আকারের পাখিগুলি টানা কতদিন যে জাহাজেব পেছনে উড়ে চলবে আমবা জানি না।

কখনও-কখনও দু'-এক জোড়া পাখি আমাদের জাহাজের মাস্তুলে এসেও বসে থাকত। তাদের সঙ্গে আমরা কথাও বলতাম, বেশ আছ তোমরা, তোমার নারী তোমাব পাশেই বসে আছে, উড়ছে। ঢেউয়ের মাথায় বসে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। তোমাদেব হিংসা হয়। এমনই কথাবার্তা হত পাখিরা এসে মাস্তুলে বসে থাকলে।

জাহাজ তখন গভীর সমুদ্রে। খুব একটা ঝড়-ঝাপটা নেই। কাজ সামাল দিতে কষ্ট হয় না। অবলীলায় কাজকাম সেবে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙতে পাবি। উঠতে পারি বোট-ডেকে। শরীর দানবের মতো মজবুত হয়ে উঠেছে। হাত-পায়ের পেশি শক্ত হয়ে গেছে। সমুদ্র আমাকে অজ্ঞাতেই তাব মতো সহনশীল করে নিতে পেরেছে। স্বাধীন হতে শিখিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর কাবও খবরদাবি একদম আব সহ্য করতে পারছি না।

এক রাতে আসানুল্লা আমাকে ডাকলেন। তিনি সেদিন আমাকে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন না। দবজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। খোপকাটা লুঙ্গি পরেন। মাথায় সাদা টুপি। গায়ে ফতুয়া।

তিনি বললেন, তুই নাকি ফুল নিবি বলেছিস!

নেব বলেছি।

আসানুল্লা সাবের মুখ থম থম কবছে ক্ষোভে দুঃখে। তিনি বললেন, তুই নিবি!

হ্যাঁ নেব।

তুই নিবি বলতে পারলি? তোবা আল্লা!— বলে আসানুল্লা সাব দরজা বন্ধ করে দিলেন মুখেব উপব।

নীচে এসে দেখি বন্ধু আমার ফোকশালে বসে চা খাচ্ছে।

বন্ধুকে দেখেই খেপে গেলাম। আসলে আমি আসানুল্লার তল্পিবাহক, আমাব বেশিদুর যাবার ক্ষমতা নেই, কারণ আসানুল্লা সাব যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার ক্ষমতার দৌড় শেষ এবং এসব ভেবেই সে মজা পাচ্ছিল, কিংবা মজা দেখার জন্যই আমার ফোকশালে ঢুকে বসে আছে। বললাম, তুই এখানে কেন!

না, দেখতে এলাম, সাধু-পুরুষেব কী সাধ যায়?

না পেরে বললাম, কেন, ফুল নিতে পারি না!

পারবি না কেন! পারবি। তবে শেষ পর্যন্ত পারবি কি না জানি না। আসানুল্লা সাব মাথার উপর আছেন তো!

সবই কেমন বিদ্রুপের মতো শোনাচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, যা। এখন আমি শোব।

ওপরের বাংক খালি দেখে বন্ধু আমার ফোকশালে চলে আসবে বলেছিল। কিন্তু আসানুল্লা সাব বাজি হননি। রাজি না হবার কারণ পরে বুঝতে পেরেছি। দেশের খত কতজনার আমি লিখে দিই।

দরকারে আসানুল্লা সাবেরও। আমার ফোকশালে অন্য কেউ থাকলে অসুবিধা। খতে কত ব্যক্তিগত কথা থাকে। এসব কথা দশকান হলে মন্দ ব্যাপার। আসানুল্লা সাব সেই ভেবেই হয়তো বন্ধুকে আমার ফোকশালে উঠে আসতে দেয়নি। এখন বুঝতে পারছি, না দিয়ে ভালই করেছেন। ইচ্ছেমত দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে পাবি। পেছনে লাগার কেউ নেই।

তাছাড়া বন্ধু এলে লকারটার ভাগ দিতে হত। জাহাজে আস্ত একটা ফোকশাল, একটা লকার একজন জাহাজির, ভাবাই যায় না। লকারটা পুরো আমার। ওতে আমার কোট-প্যান্ট, কিছু গরম জামাকাপড, রেশনের কনডেনসড মিল্ক, চা, চিনি, আর মা'র জন্য তুষের মতো নরম কম্বলটা আছে।

বন্ধুও দেখি বেশ খেপে আছে। বলল, আসানুল্লা সাবের এটা বাড়াবাড়ি। আমরা কি ভূত! এভাবে পারা যায়!

তারপর বলল, তুই বুঝিয়ে বললে হয়তো রাজি হবে।

আমি আবার কী বুঝিয়ে বলব? কিছু বলতে পারব না। যা।

মাথা গরম করছিস কেন? সবাই আশা করে আছে।

থাকুক। আমি পারব না। ওঠ আমাব বাংক থেকে। ওঠ বলছি। আচ্ছা তুই কী রে?— ঘড়ি দেখে বললাম, দু'ঘণ্টাও নেই, পরিতে যেতে হবে। একটু শুতেও দিবি না।

ওর কেন জানি কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বাংকের নীচ থেকে একটা টব বের করে গবাগুব বাজাতে থাকল। তার গলা ভাল, হঠাৎ এত প্রসন্ন হবার কারণ কী বুঝতে পারলাম না। সে কী ভেবেছে কে জানে, যাই হোক মনে আছে গাইছিল, ও ফুল তুমি ফোটো না ক্যানে, ফুল রে আমাব কেশের চুল।

আসলে গানটি যে বাংলা সিনেমাব, 'কবি' বইয়ের নকল, বুঝতে কষ্ট হল না। গানটি হবে, কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে। সেই সুরেই গাইছিল শুধু শব্দ কিছু, কিছু কেন প্রায় সবটাই পালটে দিয়ে ফুলের লাইনে চলে এসেছে। কেশেব লাইনে আর থাকেনি।

ওর গান শুনে আমিও হেসে ফেলেছিলাম।

তখনই যেন বন্ধু সাহস পেয়ে গেল। বলল, জানিস আসানুল্লা সাব খেপে গেছেন। বলেছেন, না, কেউ জাহাজে উঠতে পারবে না। ছোট-টিন্ডালকে ডেকে ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন।

বুঝলাম, ছোট-টিন্ডাল তালিকায় আমার নাম রেখেই ভুল করেছে! আমি না থাকলে, তালিকাটিতে তার আপত্তি ছিল না। পানামা খালে কে উঠে এল, কে নেমে গেল, তা নিয়েও বোধহয় ভাবতেন না। আসানুল্লা সাব হুকুম জারি করে দিয়েছেন। ক্যানেলে কাউকে তোলা যাবে না।

রাত দশটা বেজে গেছে। রাত বারোটায় আমাব ওয়াচ। বাহার কার্ডিফে নেমে যাওয়ায় আমার ওয়াচ বদল হয়েছে। বন্ধুর কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই? বসেই আছে। উঠছে না! আর তখনই দেখি ছোট-টিন্ডাল দলবল নিয়ে এসে হাজির। আমার মতো ওরাও সবাই ফুলের গাহেক।

যদি আসানুল্লা সাব ক্যানেলে কোনও নারী জাহাজে তোলার অনুমতি না দেন, তবে আমিই তার জন্য দায়ী।

ছোট-টিন্ডাল বলল, এই নাও টাকা। হবে না।

বাদবাকি বলল, কেন হবে না? আসানুল্লা কী ভেবেছে!

আমি বললাম, ঠিক আছে দাও। এবারে আসানুল্লা সাব হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। গিয়ে বলো, বনার্জি ফুল নেবে না বলেছে।

জাহাজ তখন লেমন বে-তে ঢুকবে। আর দু'দিন বাকি। আমি পড়লাম মহাফাঁপড়ে।

ছোট-টিন্ডাল এসে বলল, না, আসানুল্লা সাবের এক কথা, হবে না।

আমিও চোটপাট শুরু করে দিলাম, কেন হবে না? অন্য জাহাজে কী হয়ে থাকে! জাহাজিদেব মেজাজ-মর্জি বুঝতে হবে না? আমি তো ফুল নেব না বলেছি। তবে আর আটকাচ্ছেন কেন!

ছোট-টিন্ডাল বলল, তুই বুঝিয়ে বললে হবে। জানিস গরিবগুরবো মেয়েগুলোর এই একটা উপার্জনের পথ। জাহাজিদের কাছে টিউলিপ ফুল বিক্রি করে কিছু পয়সা রোজগার করে। ওতেই ওদের চলে। দুটো খেতে পায়। জাহাজ দেখলে, কত আশা নিয়ে থাকে।

বিষয়টা আমার কাছে তখনও খুব যে পরিষ্কার ছিল বলতে পারব না। আসলে ভেবেছিলাম, ওবা

ফুল বিক্রি করতে উঠে আসে। জাহাজ প্রশান্ত সাগরে পড়ার আগে আবার নেমে যায়। ফুল নিয়ে ডেক-এ সামান্য রঙ্গ-রসিকতা হতে পারে, কিংবা কারও গরজ থাকলে সহবাসও হতে পারে, তবে এ নিয়ে জাহাজিদের মাথাব্যথা থাকার কথা না। কাপ্তানেরও না। কাপ্তান তো সব সময় চান, জাহাজিরা কিনারায় এনজয় করুক। বরং না করলেই দুশ্চিন্তার, কারণ অনন্ত অসীম সমুদ্রে জীবন হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি, একটু বেচাল না হলে চলবে কেন!

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম। আসানুল্লা সাবের দরজায় টোকা মারতেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। সব শুনে বললেন, যা খুশি কর। আমার কী! ইমান কে কার রক্ষা করে! বন্দরে নেমে কে কোথায় যাস আমার জেনে দরকার নেই। আমার তোদের সঙ্গে কাজ নিয়ে কথা। কাজ পেলেই হল।

আসলে এ ব্যাপারে সারেং সাবেরও কোনও এক্তিয়ার নেই না করার। দীর্ঘ সমুদ্র-সফরে কোনও জাহাজি বন্দরে না নামলেই ভয়। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় কেউ কেউ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়। কিনারায় নেমে ফুর্তিফার্তা না করলে এটা বেশির হবার কথা। তবে জাহাজিদের বলতে গেলে সর্বময় কর্তা আসানুল্লা সাব। তাকে সমীহ না করলে জাহাজিদেরও ইজ্জত থাকে না। তিনি অনুমতি দিতেই সবাই হা হা করে লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। শিস দিল কেউ। কেউ রাতদুপুরে রঙের টব নিয়ে বসে গেল। ডুবাডুব বাজনা আর সমস্বরে গান। মুহূর্তে জাহাজিদের চেহারাই পালটে গেল।

দু'দিন বাদে সাঁঝবেলায় দেখি আসানুল্লা সাব আমার ফোকশালে উঁকি দিয়ে কী দেখছেন! আমি উঠে বসলাম। তিনি সাধারণত জাহাজিদের ফোকশালে ঢোকেন না। উঁকিও দেন না। একমাত্র দবকারে আমার ফোকশালে গলা বাড়িয়ে কথা বলেন। তার দেশে চিঠি লেখার প্রয়োজন হলে এটা করে থাকেন।

বললাম, কিছু বলবেন চাচা?

তিনি বললেন, শুয়ে থাকলি? উপরে উঠে যা। পানামা ক্যানেলে জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে। কী কবে জাহাজটাকে টিলায় তুলে দিচ্ছে দেখবি না!

আমি বুঝি তিনি আমাকে নিয়ে বিশেষ ভাল নেই। তাঁর অহরহ দুশ্চিন্তা। একজন নতুন জাহাজিকে এভাবে দমিয়ে রাখা সুবিবেচনার কাজ কি না তাই নিয়েও ধন্দে পড়ে গেছেন। তাঁর অস্বস্তি বুঝি। বললাম, যাচ্ছি।

তাঁর মুখ ভারী প্রসন্ন হয়ে গেল। বললেন, যা বাবা যা। শুয়ে থাকিস না। শুয়ে থাকলে মন খারাপ থাকে।

আসানুল্লা সাবের কথা ভেবে আমার চোখ জলে ভারী হয়ে গেল।

আসলে শুয়ে ছিলাম ডাঙা দেখলে বাড়িঘরের জন্য মন বড় বেশি খারাপ হয়ে যায়। এতক্ষণ উপরেই বসেছিলাম। দুটো লকগেট পার হবার পর কিছুই কেন জানি ভাল লাগছিল না। একটার পর একটা লকগেটে ঢুকে জাহাজ যেন সিঁড়ি ভাঙছে। জাহাজ উপরে উঠে যাচ্ছে ক্রমে। সামনে বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। পাহাড়ের উপত্যকায় এই কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি জাহাজ পারাপারের জন্য। চারপাশে গাছপালা জঙ্গল নিয়ে ডাঙাজমি দ্বীপের মতো ভেসে আছে।

জাহাজ কাপ্তানের জিম্মায় নেই। জ্যোৎস্না রাত। দূরের জলরাশি এবং পাহাড়ের ছোটখাটো ঢিবি চোখে পড়ছিল। জাহাজ পাইলটের জিম্মায়। সে খাঁড়ি ধরে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল।

ডেকের উপর বসে মনে হচ্ছিল, জাহাজটা যেন পূর্ব-বাংলার বর্ষাকালের নদী মাঠ কিংবা গ্রাম গঞ্জ ফেলে চলে যাচ্ছে। এখানে ওখানে ঝোপ জঙ্গল, টিলা, কলাগাছ, কচুগাছ। বুনো ফুলের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছিলাম ডেক-এ বসে। এই প্রথম দেখলাম জাহাজের সার্চলাইট জ্বলছে।

আর কেন যে সে সময় বাড়ির কথা, মা, বাবা, ভাইবোনের কথা ভেবে চোখে জল চলে আসছিল। মনটা এতই দমে গেছিল যে আর বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নীচে নেমে শুয়ে পড়েছিলাম। আসানুল্লা সাবের বোধ হয় সতর্ক নজর এড়াতে পারিনি। তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে যেতে পারেন।

অগত্যা আবার উঠে যেতে হল। ভাণ্ডারির গ্যালিতে ভিড়। কেউ আর নীচে নেই। একমাত্র ইঞ্জিন-রুমের পরিদাররা নীচে বয়লারে কয়লা হাঁকড়াচ্ছে। জাহাজের স্টিম খুব বেশি দরকার ছিল না। বড় বেশি ঢিমেতালে জাহাজ চালানো হচ্ছে।

উঠে দেখলাম, আমাদের আগে যে জাহাজটা যাচ্ছিল, ওটা সামনের ঝোপ জঙ্গল টিলার ওপাশে হারিয়ে গেছে। কেমন স্বপ্নের মতো দূরাতীত ছবি, মগ্ন হয়ে যেতে হয়।

মেসরুমের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে আছি। আর সব জাহাজিরা আমার পাশে বসে গল্পগুজব করছে। তারা সবাই অপেক্ষা করছে, কখন ফুলওয়ালিরা সব উঠে আসবে।

তারা ফুল দেবে। মাত্র একটি করে টিউলিপ ফুল। ফুল তাদের চুলে গোঁজা থাকে। জাহাজিরা যে যার পছন্দমত ফুল নেবে। মাত্র এক ডলার।

এক ডলার তখনকাব সময়ে বেশ দাম।

আর এ সময়ই দেখলাম লকগেটের দিক থেকে একটা ডিঙিনৌকা ভেসে আসছে।

জাহাজটি থেমেছিল কেন তা অবশ্য তখন জানতাম না। জাহাজটা হঠাৎ স্ট্যান্ডবাই হয়ে গেল।

এখন আর সব ঠিকঠাক মনেও করতে পারছি না। দুটো কারণ থাকতে পারে। হয়তো কাপ্তান, জাহাজিরা নারীসঙ্গ পাক ভেবে থামাবার অনুমতি দিতে পারেন, অথবা দূরবর্তী জাহাজের কোনও সিগন্যালিং থেকে জাহাজ থেমে যেতে পারে। অথবা এই জায়গাটায় এলে কোনও কারণে জাহাজকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হয়।

দেখছি তর তব করে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে কাবা উপরে উঠে আসছে। ডেকেব উপর জাহাজিরা হল্লা জুড়ে দিয়েছে। সবাই প্রায় ছুটছিল। প্রাচীন নাবিকেরা শুধু চুপচাপ বসে ছিলেন। তাঁরা যাননি ববং তাঁরা জাহাজিদেব গালমন্দ করছিলেন।

দেখছি গাউন-পরা ক'জন নারী।

ছোট-টিন্ডালের মাতব্বরি শুক হয়ে গেছে। কেউ বেশি বেলেল্লাপনা করলে ধমক দিচ্ছে।

গাউন পরা ক'জন নারী যেন জাহাজটার প্রাণ। বেশ সাড়া পড়ে গেছে ডেক-এ। ওরা খোলা ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেও বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে গেছি। যারা ফুল নেবে বলে কথা দিয়েছে, তারা বেশ সামনে ঝুঁকে দেখছে। আমার নামও ছিল তালিকায়। তবে নামটা কাটা।

এক-একজন যে যাব ফুল নিয়ে জাহাজের ঘুপচি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমাদেব ছোট-টিন্ডাল মোল্লা, তার চাই সবচেয়ে তাজা ফুল। সে-ই কিনারার লোকের সঙ্গে দরদাম করে এদের তুলে এনেছে। তার হক আছে। সে সবচেয়ে কচি খুকিটির খোঁপাব ফুল তুলে নিতেই মেয়েটা কেমন কুঁকড়ে গেল।

মেয়েগুলো প্রায় সবাই রুদ্দি, ওদের শরীর মুখ দেখে টের পেলাম। মাস্তুলেব আলোতে মুখ স্পষ্ট। ঠোঁট ভারী, চুল কোঁকড়ানো। তামাটে রং। কম বেশি সব নারীরাই মাঝারি বয়সের। দু'-চারজন যুবতী এবং তরুণীও দলে আছে। ওদেব কদর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সবচেয়ে তাজা তরুণীটিকেই ছোট-টিন্ডাল পাকড়েছে।

ছোট-টিন্ডাল হাত ধরতে গেলে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। পছন্দ নয়। সে তার ফুল ফেরত নিতে চায়। খুবই নিয়মের বাইরে বলে বুড়ি মতো মেয়েটা ধমকাচ্ছে।

ছোট-টিন্ডাল বেটেপ। গোলগাল গাট্টাগোট্টা মানুষ। বযস পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই নরম উষ্ণতা যে ছোট-টিন্ডালের পাল্লায় পড়লে তছনছ হয়ে যাবে। খুব খারাপ লাগছিল। ইস্, নাম কেটে দিয়ে কী যে ভুল করেছি! কারণ মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে ভরসা খুঁজছিল। কিন্তু আসানুল্লা সাবের জন্য ভরসা দেবাব মতো ক্ষমতাও আমার নেই। ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে কথা বলে। সবই বুঝতে পারছিলাম। কিছু করার নেই। মনটা দমে গেল। ডেক ধরে ফিরে আসছি। মেসরুম পার হয়ে দেখি আসানুল্লা সাব দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে একা দেখে বেশ আশ্বস্ত।

আসানুল্লা সাব আমার পেছনে সিঁড়ি ধরে নামছেন। কাঠের সরু সিঁড়ি। একজনের বেশি নামা যায় না। তিনি হঠাৎ কেন যে বলেছিলেন, আজও তার রহস্য স্পষ্ট নয়, কারণ আমি তালিকায় ছিলাম না, তবু কেন যে বলেছিলেন, কী রে? পছন্দ হল না!

যেন মজা করছেন। পছন্দ-অপছন্দের চেয়েও আমার মনে হচ্ছিল এরা রুগ্ন। অর্থাভাব প্রচণ্ড। হতদরিদ্র হলে যা হয়। না হলে এত কম বয়সে একজন কিশোরী জাহাজে উঠে আসে! ঠোঁট ভারী হলে কী হবে, ভাবী মিষ্টি দেখতে।

আব এসব সময়ে কেন যে আমাব মা'ব কথা বেশি মনে পড়ত, ভাইবোনদেব কথা বেশি মনে পড়ত, কিছু তখন ভাল লাগত না। বাংকে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

জাহাজটা ভোববাতেব দিকে সামনেব লকগেটে গিয়ে পডবে। এই সাত-আট ঘণ্টা উষ্ণতায় ভবিয়ে বাখবে জাহাজিদেব। শুয়ে শুয়ে এসবই ভাবছিলাম।

আব তখনই দেখি আসানুল্লা সাব নিজেই চলে এসেছেন। মানুষেব মনে কখন যে কী উদয় হয়, কে যে কী ভাবে, না হলে আসানুল্লা সাব আমাকে এসেই বা খববটা দেবেন কেন?

এই ওঠ। মেয়েটা কাঁদছে।

কাঁদছে কেন?

কে জানে! যা একববা। জাহাজে আবাব ঝামেলা না হয।

তাবপব আসানুল্লা সাব নিজেই সব কেন যে খুলে বলেছিলেন তাব মাথামুণ্ডু বুঝছি না। বললেন, ছোট-টিন্ডাল নাছোডবান্দা। মেয়েটা কিছুতেই বাজি নয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আয় তো দেখি। এ তো ভাল কথা না! ছোট-টিন্ডাল বুডিকে শাসাচ্ছে। অফিসাববাও বাদ নেই। নিজেদেব ঘবে লকগেট থেকেই মেয়েমানুষ তুলে নিয়েছে। নেটিভদেব কাণ্ড কাবখানা দেখতে হবে ভয়ে এলিওয়েব দবজা বন্ধ কবে দিয়েছে।

কাছে গিয়ে হতবাক। সত্যি ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। একদম নডছে না। নড়ানো যাচ্ছে না। শত হলেও এসব যৌন অভ্যাস মানুষেব গোপনেই থাকবাব কথা। আব তখন একটা ছোট পবিব মতো মেয়ে যদি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, শেষে আবাব কোন কেলেঙ্কাবিতে পডে যেতে হবে কে জানে! মেয়েটা তাব খোঁপাব ফুল কিছুতেই ছোট-টিন্ডালকে দেয়নি।

আব আশ্চর্য, তখন কিনা আসানুল্লা সাব আমাব দিকে তাকিয়ে বলছেন দ্যাখ তো ফুলটা তোকে দেয় কি না! চেয়ে দ্যাখ।

আমি কেমন বিব্রত বোধ কবছিলাম। আমাব নামে তো কোনও টাকা জমা নেই। আমাব কাছে কোনও ডলাবও নেই। আমি কী কবব বুঝতে পাবছিলাম না।

আসানুল্লা সাবই বললেন, চেয়ে দ্যাখ না! দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

আব অবাক, হাত পাততেই মেয়েটা চুল থেকে ফুল তুলে দিল। লজ্জায় মাথা নিচু কবে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বালিকাব স্বভাব যেমন হয়ে থাকে, সবাব সামনে সে যেন কিছুতেই আব মুখ তুলে তাকাবে না।

খুব কাছ থেকে দেখে বুঝলাম, চোদ্দো-পনেবোও হবে না তাব বযস। ছোট টিন্ডাল খেপে গিয়ে শেষে বুড়িকে নিয়েই অন্ধকাবে হাবিয়ে গেল।

আসানুল্লা সাব বললেন, যা, ফোকশালে নিয়ে যা। বসিয়ে বাখ। ঘাটে নামিয়ে দেওয়া যাবে।

মেয়েটিব আত্মসম্মান বক্ষার্থে তিনি হযতো আব-কোনও বাস্তা খুঁজে পাননি। আমাব উপব দায় চাপিয়ে বেহাই পেতে চান। সাবাবাত তো আমি তাকে ডেক-এ পাহাবা দিতে পাবি না, অগত্যা আফটাব-পিকেব দিকে হাঁটা দিলাম। আফটাব পিকেব উপবে ইঞ্জিন এবং ডেক জাহাজিদেব গ্যালি। সঙ্গে মেসরুম। তাব পাশ দিয়ে কাঠেব সিঁড়ি ধবে নেমে গেলে প্রথমে দু পাশে পডবে ডেক সাবেং সাব এবং ইঞ্জিন সাবেং সাবেব ফোকশাল। এখানেই দুটো বাস্তা দু'দিকে নেমে গেছে। একটা গেছে পোর্ট-সাইডে। স্টাবোর্ড-সাইডে থাকি আমবা ইঞ্জিন-জাহাজিবা। নীচে নামলেই আমাব ফোকশাল।

সে আমাকে অনুসবণ কবছে বুঝতে পাবছি। কী যে কবি! ফোকশালে ঢুকে যেতেই দেখি, সেও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, কী নাম?

ভাঙা ইংবেজিতে কথা বলতে পাবে। বুঝতেও পাবে সব। নাম বলল, লেসি।

এই নাবীব সঙ্গে ইচ্ছে কবলেই এখন যৌন-সংসর্গ কবা যায়। সে তাব খোঁপাব ফুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। নিজেকে দমন কবতে পাবছি না। কী ভেবে এক লাফে সিঁড়ি ভেঙে উপবে উঠে গেলাম। দেখি আসানুল্লা সাব দবজা বন্ধ কবে দিয়েছেন। আমাব উপব মেয়েটিব ভাব চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত, দবজা বন্ধ দেখেই তা টেব পেলাম।

ফোকশালে ঢুকে পড়লাম ফের। বেশ হাঁপাচ্ছি। মেয়েটিও আমার পাশে বসে পড়ল।

আমার হাত-পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে উঠছে। কী যে বিড়ম্বনায় পড়া গেল। জলতেষ্টা পাচ্ছে। কী করব ঠিক করতে পারছি না। তারপরই মনে হল, আমার তো টাকা নেই, যৌন-সংসর্গ করার জন্য কোম্পানির ঘর থেকে ডলারও তুলিনি। নাম কেটে দিয়েছি বলে তার প্রয়োজনও হয়নি। মেয়েটি টাকার বিনিময় ছাড়া আমার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ করবে কেন? যাক, বাঁচা গেল!

বললাম, লেসি, তুমি নীচের বাংকে শুয়ে থাকো। উপরের বাংকে আমি উঠে যাচ্ছি।

লেসি কথা বলছে না। অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী করুণ চোখ-মুখ।

বললাম, চা খাবে?

ঘাড় কাত করে জানাল, খাবে।

বোসো।

লকার খুলে দুধ চিনি চা বের করে উপরে উঠে গেলাম। গ্যালিতে দু' গ্লাস চা বানালাম। তারপব গ্লাসদুটো হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। নামার সময় শুনতে পেলাম, আসানুল্লা চাচা কোরান পাঠ করছেন ফোকশালে। তখনই কেন যেন এক অপার্থিব পৃথিবীর খোঁজ পেলাম ভেতরে। মনে হল শবীবই সব নয়। অর্থের বিনিময়ে কেউ এ কাজ করলে প্রেম ভালবাসা কিংবা জীবনেব বহস্যময উষ্ণতা মবে যায়।

নীচে নেমে ওকে চা দিলাম। পাউরুটি দিলাম। খুব আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। তাব হাঁটুর উপরে গাউন উঠে এসেছিল। সে বার বাব পাতলা গাউন টেনে হাঁটু ঢেকে দেবার চেষ্টা কবছে। চোখের মণিদুটোতে আলো পডায় তাকে বডই মায়াবী মনে হচ্ছিল, কিংবা কোনও দূরবর্তী সংকেত, অথচ আমি তাব সঙ্গে সারাক্ষণ বাড়িঘরের গল্প করলাম।

লেসি জানাল, তার বাবা নেই। মা থেকেও নেই। কোনও এক খামারে কাজ করত। সেখান থেকে নিখোঁজ। মেয়েটির ধারণা, অভাবেব তাড়নাতেই মা কোথাও চলে গেছেন। ভাইবোনদের দুটো পেট ভবে খেতে দেবার জন্য সে এই লাইনে নতুন এসেছে। লোকটাকে দেখে ওর ভয় ধরে গিয়েছিল বলে কাঁদছিল।

সবারই আজ কিছু না কিছু উপার্জন হবে অথচ লেসিকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হবে। লেসিব দুর্ভাগ্যেব কথা ভেবে ভীষণ খারাপ লাগছিল।

আমার নিষ্ক্রিয় কথাবার্তায় লেসি বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল। দরজা খোলা, বাব বার দবজাব দিকে তাকাচ্ছিল।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, তোমার ছোট ভাইটার কত বয়স?

জানি সে আমাব কোনও কথা শুনতে চায় না। শোনার আগ্রহ নেই। ভাইয়ের কী বয়স শোনানোব জন্য জাহাজে উঠে আসেনি। সে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিন না।

না।

কেন না? আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

না।

কেন যে এত একগুঁয়ে হয়ে উঠছিলাম, আজও তার সঠিক ব্যাখ্যা পাই না। ববং হাসি পায় আমাব পাপবোধের কথা ভেবে। না কি তার কোনও ব্যাধি আছে এই ভয়ে কাছে যাইনি! অথচ এত সুন্দব যে নারী, যে যৌন-সংসর্গেব বিনিময়ে পয়সা রোজগার করতে এসেছে, তাকে আমি সত্যি ঘৃণা করছি। তা তো নয়। বরং আমার মনে হয়েছে এমন নারী জীবনে সত্যি দুর্লভ। অথচ আমি কেমন বিপাকে পড়ে গেছি। পাপ-পুণ্য কী, বুঝতে পারছি না। কোম্পানির ঘর থেকে টাকা তুলে বাখলেও হত। অন্তত যৌন-সংসর্গ করি, না করি, হাতে টাকাটা দিতে পারতাম। তাও আমার সম্বল নেই।

লেসিও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বলছে, আমার কোনও অসুখ নেই। মা মেরির দিব্যি।—বলে সে দাঁড়িয়ে গাউন খুলে ফেলতে গেলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

তুমি রাগ করছ?

মুখ না তুলেই বললাম, না।

তবে আমাকে দেখছ না কেন? দরজা বন্ধ করে দিলাম।

সে ফের বলল, না, তুমি দেখছ না। তুমি আমার কিছুই দেখছ না।

প্রায় আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, কেন তবে ফুল নিলে? আমাকে কেন অপমান করলে?—ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

কী বলি! সত্যি, ফুল নেওয়াব অর্থই তো গ্রহণ করা। আমি লেসিব দিকে না তাকিয়েই বললাম, তুমি খুব সুন্দর। গাউনটা পরে ফেলো। আমারও ভাইবোন আছে।

তারপরই লকার খুলে বললাম, দ্যাখো তো কম্বলটা কেমন হয়েছে! শীতের সময় মা'র খুব কষ্ট। শীতে মা কষ্ট পান বলে এটা কিনে নিয়েছি। ভাল হয়নি?

ও দেখে আমার কী হবে?

সে মুখ ফিরিয়ে আরও বিবক্তি প্রকাশ কবে ফেলল। তাবপরই কেমন চিৎকার করে বলাব মতো, কেন ওসব দেখাচ্ছ? আমি তোমার মা'র কম্বল দেখতে জাহাজে আসিনি। প্লিজ। তুমি আমাকে আর খাটো কোরো না!

আমিও কেমন পাগলের মতো বলছিলাম, লেসি, প্লিজ গাউনটা পবে ফেলো। তোমাব দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

লেসি তখনও উন্মত্তের মতো বলে যাচ্ছে, না, না, তুমি আমাকে ঘৃণা কবছ। আমি মনে কবো কিছু বুঝি না! আমাব সত্যিই কোনও রোগ নেই।

সে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে আমাব মা'র কম্বলটা দিয়ে ওর নগ্ন শরীর ঢেকে দিয়ে বললাম, পাগলামি কোবো না। গাউনটা পরে ফেলো।

সে এবার আমার হাত টেনে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। বলছে, আর দেরি নেই। আমাদের নামিয়ে দেবে। শিগগির কবো। আর যাই কবো, তুমি আমাকে প্লিজ ঘৃণা কোরো না।

বললাম, লেসি, আমি তোমার উপার্জনে সাহায্য করতে পারলাম না। দুঃখিত। এটা নাও। তোমাকে দিলাম। ঘৃণা করলে আর যাই করি মা'র জন্য কেনা কম্বলটা তোমাকে দিতে পাবতাম না।

সে কম্বলটা নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধবল।

বলল, সত্যি দিচ্ছ?

হ্যাঁ। কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?

এত দামি কম্বল! আমি যে তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না।

বললাম, কেন ফুল তো দিয়েছ। এর চেয়ে সুন্দর পবিত্র আর কী থাকতে পারে? একজন পুরুষ তো নারীর কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু পেতেও চায় না।

দেখি, লেসি কাঁদছে। কম্বলে মুখ লুকিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে।

এই অপবাহুবেলায় আজকাল মেয়েটির মুখ কেন যে এত বেশি মনে পড়ছে, তাও জানি না। যৌন-সংসর্গ না করলেও সেদিনই জীবনে যৌন-সম্ভোগ কী টেব পেয়েছিলাম। অপরাহুবেলা তাও মনে কবতে পারি।'

সকালের দিকে জাহাজ সমুদ্রে নেমে গেল।

নীচে আমি সারারাত জেগে ক্লান্ত। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পানামা ক্যানেল পার হলেই জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বে, ইচ্ছে ছিল বাকি রাতটুকু না ঘুমিয়ে ডেকে বসে থাকব। প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্যোদয় দেখব। ঘুমিয়ে পড়ায় তা আর হয়ে উঠল না।

ক্যানেল অতিক্রম করার সময়, ইঞ্জিন-রুমে কাজকামের চাপ খুবই কম থাকায়, আমাকে বাংকারে নেমে যেতে হয়নি। মনু একাই দুটো সুট সামলেছে। আমি জানি আমার ওয়াচ বারোটায় ফের শুরু হবে। কাজেই ঘুম থেকে ওঠার কোনও তাড়া ছিল না।

তখনই দেখি কেউ ফোকশালের দরজা ঠেলছে। তাড়াতাড়ি বাংক থেকে নেমে দরজা খুলে দিলে দেখলাম আসানুল্লা সাব দরজায় দাঁড়িয়ে।

কী রে, তোর ঘুম ভাঙে না! কত বেলা হল?

জাহাজ যে ফুলস্পিডে চলছে, তাও টের পেলাম। বারোটায় ওয়াচ, এত সকালে কেউ ফোকশালে ঢুকে গেলে খারাপই লাগে। মাথার উপর স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের ঘর। ঝিক ঝিক শব্দ, এবং জাহাজ ওঠা নামা শুরু করায় আসানুল্লা সাব এত সকালে আমার কেবিনে ঢুকে কী বলছেন, বুঝতে পারিনি।

বললাম, কী হল?

ওঠ। তোকে আজ আর ওয়াচে যেতে হবে না।

এত সদয়।— কিছুটা হতভম্ব হয়ে বললাম, কেন?

কেন আমি বলতে পারব না। উপরে যা। পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি মাস্তুলের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে আজ থেকে কাজ করবি।

এটা আমার কাছে বড় কোনও খবর ছিল না। কারণ এর আগেও সময়ে-অসময়ে আমি পাঁচ নম্বর মিস্ত্রির সঙ্গে উইনচে কাজ করেছি। বাংকারে কয়লা ঠেলার চেয়ে এই কাজটা যে খুবই হালকা, জাহাজিরা সবাই জানে। ইঞ্জিন-রুম অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়াই হয়নি। কোম্পানির টাকা বাঁচাবার ধান্দা। পাঁচ নম্বর একাই উইনচ মেরামতির কাজটা চালিয়ে এসেছেন। নতুন পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি একা এত কাজ সামলাতে রাজি না।

যা হয়, হোমে জাহাজ গেলেই কাপ্তান থেকে সব অফিসার-ইঞ্জিনিয়ার জাহাজ থেকে নেমে যান। নতুন আর-এক দল আবার উঠে আসেন। কার্ডিফ থেকে জাহাজ ছাড়ার পরই আমি টের পেয়েছিলাম, এবারের পাঁচ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার খুবই ঢিলেঢালা লোক এবং কিছুটা কুঁড়ে প্রকৃতির। তাঁর সঙ্গে হেলপার না দিলে কাজ করবে না, এমনও বোধহয় জানিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক হাত-মুখ ধুয়ে উপরে উঠে গেলাম।

কিংবা এও মনে হল, আমার ঘরে যে মেয়েটি রাত কাটিয়ে গেছে, যাকে বিন্দুমাত্র সম্ভোগ না করে মায়ের জন্য কেনা কম্বলটি দিয়ে দিয়েছি, আসানুল্লা সাবের কানে সেই খবর যদি পৌঁছে যায়, তিনি খুশি হয়ে অ্যাপ্রেন্টিসের কাজে লাগিয়ে দিতেই পারেন। যদিও আমার এতে পদোন্নতি হয়েছে বলে ধরতে পারি না, এই ঠেকা কাজ চালিয়ে দেবার মতো সারা সফর যদি উইনচ মেরামত করে যেতে পারি, তবে 'নলিতে' তার উল্লেখ থাকতে পারে। আবার না-ও পারে। কিংবা যদি আসানুল্লা সাব চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে একটা সার্টিফিকেট আদায় করে দিতে পারেন, তাতেও আখেরে আমার ভালই হবে।

আসানুল্লা সাবের প্রতি এতে আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, তবু কেন যে গুম মেরে ছিলাম, আসলে সেই কিশোরী মেয়েটি যে আমাকে তাড়া করছে, বুঝতে কষ্ট হল না। কেন জানি তার মুখ কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কিশোরী মেয়েটি যদি মনে করে থাকে, আমি তাকে সম্ভোগ না করে অপমান করেছি, ভাবতেই পারে, অবশ্য তাকে কম্বল গায়ে জড়িয়ে দেওয়ায় সে খুশিই হয়েছিল। এসব ভেবেও গুম মেরে থাকতে পারি।

তখনই দেখি ওয়াইজার ছুটে আসছে ডেক ধরে। ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস ওয়াইজার। কার্ডিফ থেকে সেও উঠেছে। আমরা সমবয়সি এবং এই এক মাসেই তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সমবয়সি হলে যা হয়। আমরাই জাহাজে কমবয়সি নাবিক।

সে এসে বলল, দারুণ দারুণ।— বলে আমায় হাত তুলে হ্যান্ডশেক করল।

তা হলে কি জাহাজের সবারই কানে কম্বল দানের কথাটা উঠে গেছে? তাও কিনা একজন বেশ্যা মেয়েকে! না হলে আমার প্রতি আজ সবাই এত সদয় কেন?

আমি বললাম, ওয়াইজার, তোমাকে একটা কথা বলব?

আজ আর কোনও কথা না! কাপ্তান খুব খুশি তোমার উপর। কাপ্তান নিজে আসানুল্লাকে ডেকে বলেছেন, শোনো আসানুল্লা, আমাদের জাহাজে ইঞ্জিন-অ্যাপ্রেন্টিস নেই। সফর খুব লম্বা হবে মনে হচ্ছে। তোমাদের ফোকশালের ইয়াং বয়কে, অ্যাপ্রেন্টিসের কাজটা দিয়ে দাও। কাজ শিখুক। ভেরি বাইট বয়। পারবে মনে হয়।

ওয়াইজার কেবল বক বক করছে। থামছে না।

এখন আর তোমাকে ফোকশালে ঢুকে খুঁজতে হবে না। ডেকেই আমরা পড়ে থাকব। সারাটা দিন

ডেক-এ কাজ, প্রথম সমুদ্রযাত্রা আমাদের, দারুণ মজা হবে।

তারপর ফিস ফিস করে বলল, নাইট ওয়াজ ভেরি ইয়াং। কী বলো!

দ্যাখো ওয়াইজার, আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না। মেয়েটি খুবই গরিব। টাকার জন্য সে এমন একটা খারাপ কাজ করবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। দেশে আমারও ভাই বোন আছে।

তবে যাই বলো ব্যানার্জি, বেশ্যা মেয়েদের নিয়ে তোমার এই আদিখ্যেতা আমার পছন্দ না।

পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব ওয়াইজার। পাঁচ নম্বর ডাকছেন।

আমাদের জাহাজের পাঁচ নম্বর আবার বলতে গেলে একটু বেশি বেঁটে। উইনচ-ড্রামের উপর ঝুঁকে, স্ট্র্যাপারের নাগাল পাওয়া তার পক্ষে খুবই কঠিন। উইনচ খোলাখুলির কাজ তাঁরই। আমার কাজ স্ট্র্যাপার পাইপে ঢুকিয়ে নাট আলগা করে দেওয়া, কেরোসিনের টবে নাটবল্টু ভিজিয়ে ন্যাকড়ায় মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া, এর বেশি আমার কাজ থাকার কথা না।

দৌড়ে কাছে যেতেই আমার হাতে তিনি একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলেন। কশপের ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আসতে হবে। যেমন সিরিশ কাগজ, কিছু নানা সাইজের রেশ, এবং নানা গেজের তামার পাত। দুটো ফাইল সঙ্গে। সব নিয়ে এসেছিলাম ইঞ্জিন-রুমে নেমে।

তারপর দেখি, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আমাকে ওয়ার পিন ড্রাম অতিক্রম করে উইনচের একজস্ট পাইপ খোলার হুকুম দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। আমি সহজেই পাইপ খুলে আনলে তিনি খুশিই হলেন।

কাজ শেখার এমন সুযোগ যেন হাতছাড়া না করি, পাঁচ নম্বরের ফুট-ফরমাশ দরকারে যেন তামিল করি, এমন সব উপদেশই খেতে বসে আসানুল্লা আমাকে দিয়ে গেলেন।

আমরা যাচ্ছি নিউ-প্লাইমাউথ। সালফার নিয়ে রওনা হয়েছি পোর্ট অফ সালফার থেকে। পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে চলেছে। প্রায় মাসখানেক সমুদ্রেই আমাদের থাকতে হবে। অবশ্য ঝড় কিংবা সাইক্লোনে পড়ে গেলে আরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

আমার আর ওয়াচে কয়লা ঠেলার আতঙ্ক না থাকায়, শুয়ে পড়লেই ঘুম চলে আসে। আস্ত একটা ফোকশাল আমার জিম্মায়। বঙ্কু আমার ফোকশালে উঠে আসতে চেয়েছিল, আসানুল্লা সাবের হুকুম নেই।

ডেক-এ রোজই বঙ্কুর এক কথা, কী রে? সারেং সাবকে বলেছিলি?

কী যে বলি তাকে! আসানুল্লা সাবকে যে বলিনি, তাও তো নয়। কিন্তু বঙ্কুর বিশ্বাস আমি বললে আসানুল্লা সাব ফেলতে পারবেন না। মুশকিল, বঙ্কু ডেক-জাহাজি, ডেক-সারেং তার মোল্লা। আসানুল্লা রাজি হলেই শুধু হবে না, ডেক-সারেঙেরও অনুমতি চাই।

জাহাজ যাচ্ছিল, ঝড়ও নেই। আকাশ নীল এবং সমুদ্র আরও গভীর নীল। এত রোদ, দুপুরে ডেক-এ কাজ করাই কঠিন। প্রায় ফোসকা পড়ার মতো গরম। পাঁচ নম্বর মাস্তুলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি তার হয়ে নাটবল্টু খুলি, যেখানে মরচে পড়ছে, কিংবা তেলকালিতে জ্যাম হয়ে গেছে পাইপের মুখ, তাই পরিষ্কার করি। এমনকী স্ট্র্যাপার খুলে ফাইলও মারতে হয় আমাকে। তিনি শুধু তামার পাতলা পাত বসিয়ে ফিটিংস ঠিক আছে কি না দ্যাখেন। আমি ক্রমে তাঁর কাছে খুবই জরুরি কাজের লোক হয়ে গেছি।

কোনওদিন কাজ হয়ে গেলে বেশ তাড়াতাড়িই আমাকে ছেড়ে দেন। ওয়াইজারকে খবর দিই, অধিকাংশ সময়ে তাকে ডেকেই পাওয়া যায়। নীল জামা নীল প্যান্ট পরে সে হয় ডেক-টিন্ডালের সঙ্গে, নয় মেজ-মালোমের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকে। জাহাজে দড়িদড়ারই আছে অজস্র রকমের গিঁট, ডেক-টিন্ডালের সঙ্গে বসে সে দড়ির গিঁট দেয়, এটাও যে শিক্ষণীয় কাজ, ওয়াইজার ব্যস্ত থাকলেই বুঝতে পারি। বন্দরে জাহাজ বাঁধাছাদার কাজ থাকলেও ওয়াইজার ব্যস্ত থাকে। আমার ছুটি হয়ে গেলে, সে কোথায় খুঁজি। কারণ সন্ধ্যার দিকে ডেক-এ দু'জনেই বসে যাই দাবা নিয়ে। ওয়াইজারই জাহাজে উঠে দাবা খেলার সব নিয়মকানুন শিখিয়ে আমাকে তার খেলার জুড়িদার করে নিয়েছিল।

কখনও জ্যোৎস্না থাকে ডেক-এ। কখনও থাকে না। মাস্তুলের আলোই তখন যথেষ্ট। হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে অসীম অনন্ত সমুদ্রে ভেসে যেতে যেতে দাবায় খুবই মগ্ন হয়ে পড়ি।

বাড়িঘরের জন্য যে কষ্ট ছিল, ওয়াইজারের সাহচর্যে সহজেই তা কেটে যেতে থাকল। কিছুটা জাহাজি চরিত্র যে আমার মধ্যে গড়ে উঠছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। কখনও শিসসিঁড়ি ভেঙে বোট-ডেকে উঠে যাই। ওয়াইজার আমার জন্য অপেক্ষা করে।

এক বিকেলে আমার স্নান-টান সারা। জাহাজে আগের মতো গরম নেই। জাহাজ ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাওয়ায় রাতের দিকে ঠান্ডা থাকে। বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কখনও সেই সব মুখ উঁকি দেয়। নাজিরা, চেরি এবং সেই কিশোরী মেয়ের মুখ চোখে ভেসে ওঠে। তাকে বেশ্যামেয়ে বলায় ওয়াইজারের সঙ্গে দিন তিনেক কথাও বন্ধ ছিল। ওয়াইজার আমাকে পেছন থেকে জাপটে না ধরলে হয়তো তার সঙ্গে আর কথাই বলতাম না। সে তার বিশ্রী উক্তির জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল। সেদিনও কী হয়েছিল জানি না, একাই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি ওয়াইজারের জন্য।

সমুদ্র শান্তই ছিল। প্যাচপ্যাচে গরমও আর নেই। ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। সূর্য অস্ত গেছে। লাল এবং নীল রঙে মাখামাখি হয়ে আছে সমুদ্র। আফটার-পিকের রেলিং-এ ভর করে সমুদ্র দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি, জাহাজের কোনও ব্যস্ততাই চোখে পড়ছে না। গ্যালিতে ভাণ্ডারি চাচা সবজি কাটায় ব্যস্ত। চাচার হেল্পার নিয়ামত বিশাল হাঁড়িতে পেঁয়াজ রসুন সম্ভারে মুসুরির ডাল নামিয়ে স্টারবোর্ড-সাইডে ছুটে গেল। বড়শি ফেলা আছে, কোনও বড় মাছ-টাছ শিকারের নেশায় নিয়ামত সারাদিনই কাজের ফাঁকে সমুদ্রে বড়শি ফেলে রাখে। ডেক-টিন্ডাল সারা জাহাজে ঘুরে ঘুরে মাস্তুলের আলো জ্বেলে দিচ্ছে। ডেক-জাহাজিরা গুলতানি মারছে পাশের মেসরুমে। তাস-পাশার আড্ডাও আছে। রাত আটটার ওয়াচে যারা পরি দিতে যাবে, তারা নীচ থেকে উঠে এসেছে উপরে। চা চর্বিভাজা রুটি নিয়ে বসে গেছে রেলিংয়ের বেঞ্চিতে।

ওয়াইজার কেন যে আসছে না! কেবিনের দিকটায় যখন-তখন ঢোকা যায় না। কাজ ছাড়া জাহাজিদের কেবিনের দিকটায় ঘোরাঘুরির ব্যাপারেও নিষেধ আছে। ওয়াইজার তা জানে। সে নিজেই এজন্য বিকালে স্নান-টান সেরে বেশ সেজেগুজে বের হয়ে আসে। হাতে থাকে দাবার বোর্ড আর হাতির দাঁতের মিনা করা বরফ-সাদা আর কালো রঙের ঘুঁটি।

খেলা শুরু হয়ে গেলে দু'জনেই চুপচাপ, আমরা যে হাজার-হাজার মাইল দূরে নির্বাসিত হয়ে আছি। খেলায় মগ্ন হয়ে গেলে ভুলে যেতে পারি। খেলায় আমরা কেউ কখনও হারি কিংবা জিতি। তাতে আমাদের দু'জনার মধ্যে উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। তবে আমি যে বেশি হারতেই ভালবাসি, ওয়াইজার তা টের পেয়ে গেছে। আনাড়ি চাল দিলে, সে-ই কখনও বলে দেয়, চালটা না দেওয়াই ভাল, সে বুঝিয়ে দেয় এই চালে আমার কী ক্ষতি হতে পারে।

মাঝে মাঝে যখন কিছুই ভাল লাগে না, দু'জনে ফলকার উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকি। জাহাজ দুলে দুলে ভেসে যায়, কখনও আকাশে জ্যোৎস্না থাকে, নক্ষত্রমালাও বিরাজ করে। কিংবা কখনও জাহাজের পিছু নেওয়া বিশাল অ্যালবাট্রস পাখির পাখা-বিস্তারে মুগ্ধ হয়ে যাই। তখনই ওয়াইজার অদ্ভুত সব কথা বলে আমাকে অবাক করে দিত।

কেন যে আসছে না!

আফটার-পিক থেকে সামনের ডেক পার হয়ে এলিওয়েয়ের সরু করিডর স্পষ্ট। এমনকী লালরঙের কার্পেটে কেউ হেঁটে গেলেও বোঝা যায়, মেজ-মালোম না বড়-মালোম। করিডরের পাশের কেবিনগুলিতেই ডেক-অফিসাররা থাকেন। ওয়াইজার থাকে শেষ দিকের কেবিনে। এত দেরি তো সে কখনও করে না।

নানা ধন্দ দেখা দিচ্ছিল মনে।

আমার সঙ্গে ওয়াইজারের এতটা খোলাখুলি মেলামেশা ইংরাজ অফিসারদের যে খুব একটা পছন্দ নয় জানি। ছোট-মালোম একদিন কথায় কথায় আমার সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশও করেছেন। একজন নেটিভের সঙ্গে এত কীসের মাখামাখি এমনও অভিযোগ উঠেছে। তবে মেজ-মালোম খুবই সহৃদয় মানুষ। তিনি এতে দোষের কিছু আছে স্বীকার করেন না। ওয়াইজার আমার সমবয়সি, আর আমার চলাফেরা এবং কথাবার্তায় তিনি যে খুবই খুশি, তাও বুঝি। ওয়াইজার এবং আমি রেলিং-এ ঝুঁকে

কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়ে গেলে মেজ-মালোমও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। সমুদ্রের নানা কিসিমের গল্পও বলেন। কোনটা হাঙরের সমুদ্র, কোথায় হাজার হাজার ডলফিন ভেসে বেড়ায়, এমনকী সমুদ্রের অতলে পাহাড় এবং আগ্নেয়গিরিরও খবর দেন। অ্যালবাট্রস পাখিদের ওড়াওড়ি কেন জাহাজের পেছনে, তারও ব্যাখ্যা দিতে ভালবাসেন। মাস্তুলে কোনও পাখি বসে থাকলে তাঁর এক কথা, খুব যে ফূর্তি করছ দু'জনে, জাহাজের অতিথিটিকে কিছু অন্তত খেতে দাও!

মেজ-মালোমই যে ওয়াইজারের প্রকৃত ওপরয়ালা তাও জানি। ওয়াইজার তার কথামতোই ডেকের কাজকাম বুঝে নেয়। ডেক-টিন্ডালের ফুট-ফরমাশও ওয়াইজারকে পালন করতে হয়। তাকে তো ডেক-টিন্ডালই হাতেকলমে কাজ শেখাচ্ছে, যেমন দড়িতে নানাবিধ গিঁট, বালকেডে রং, মাস্তুলের ডগায় উঠে ক্রোজনেস্টে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া, ফলকার দেখভাল, সবই ডেক-টিন্ডালের নির্দেশ মতো সে করে থাকে। ডেক-টিন্ডালের আধ-খ্যাঁচড়া ইংরাজি বুঝতে না পারলেই সে ছুটে আসত আমার কাছে। কিংবা ডেক-টিন্ডালই ডেকে পাঠাত আমাকে। আমি তখন টিন্ডালের হয়ে দোভাষীর কাজ করতাম।

আমাদের বন্ধুত্ব বলতে গেলে এই সূত্রেই শুরু। ওয়াইজার অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো!

জাহাজে উঠে সি-সিকনেসে বেশ কিছুদিন কাবুই ছিল। সে তো কবেকার কথা। নতুন করে সি-সিকনেস, না তাও ভাবা যায় না। আমরা যাচ্ছি ডুনেডিন হয়ে নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে। কিছুদিন হল পানামা ক্যানেলও পার হয়ে এসেছি। সমুদ্র শান্তই আছে। জাহাজে বিন্দুমাত্র পিচিংও নেই, ঢেউয়ে জাহাজ গড়াগড়িও যাচ্ছে না, বিকেলের দিকে ডেক-এ অবশ্য আজ তাকে দেখা যায়নি, শুধু ডেকেই তার কাজ থাকবে এটা ভাবাও ঠিক না।

ওয়াইজার কি নিজের কেবিনেই বসে আছে? পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে? দেখতেই পারে। জাহাজে উঠে নানা কারণেই দেশ-বাড়ির জন্য মন খারাপ থাকে। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা ভালও লাগে না। কথা বলতেও না। চুপচাপ কেবিনে বসে থাকতে পারে। আবার ফরোয়ার্ড পিকে গিয়ে বসে থাকতে পারে কিংবা গল্পের বইয়ে যদি ডুবে যায়? একবার গ্যাংওয়ে ধরে ফরোয়ার্ড পিকে গেলে হয় ওয়াইজারকে খুঁজতে। কিংবা চিফ কুকের গ্যালিতে খোঁজ নিলে হয়। মেসরুমমেটরাও খবর দিতে পারে। আবদুল, ওয়াইজারকে চা-পানি দেয় জানি। তারা থাকে বোট-ডেকে।

এতসবই বোধহয় ভাবছিলাম সেদিন। এসব যে কবেকার কথা!

ওয়াইজার না থাকলে বন্ধু দেবনাথের ঘরে গিয়ে বসে থাকতে পারি।

আমার পাশের ফোকশালে তারা থাকে। একটু বেশিমাত্রায় তারা জাহাজি চরিত্রের মানুষ বলে তাদের ঠিক ভাল লাগে না। আমি নতুন জাহাজি। শরীর থেকে পারিবারিক গন্ধ এখনও যায়নি। ওয়াইজারও জাহাজে সবে মাস দুয়েক আগে কার্ডিফ বন্দর থেকে উঠেছে।

সেদিন আকাশে জ্যোৎস্না ছিল মনে আছে। কারণ দূর থেকেই ওয়াইজারকে ফরোয়ার্ড-পিকে আবিষ্কার করেছিলাম। মাস্তুলের আলো জ্বলছে ঠিক, তাতে আলো কেমন নিস্তেজ ছিল। নিস্তেজ আলোতে ওয়াইজারকে দেখা সহজ ছিল না। উইন্ডস-হোলের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে আছে, জ্যোৎস্না ছিল বলেই বোধহয় টের পেয়েছিলাম।

সে কী দেখছে! রেলিং এখানেও আছে। রেলিং-এ ঝুঁকে সে এত কী দেখছে! সেই তো সমুদ্র, জাহাজের শোঁ শোঁ আওয়াজ এবং নক্ষত্রমালায় ডুবে আছে সামনে যতদূর দেখা যায়। কেমন এক রহস্যাবৃত মায়াবী সমুদ্র। ওয়াইজার ওভাবে না দাঁড়িয়ে থাকলে সমুদ্রকে এতটা যেন মায়াবী মনে হত না।

তারপরই কেন যে মনে হয়েছিল, আমাকে এড়িয়ে থাকার জন্য সে যদি এখানে চলে আসে? সে তো জানে, তার দেরি হলে আমি তার কেবিনেও চুপি চুপি চলে যেতে পারি। কাছে গিয়েও সহজে ডাকতে পারলাম না, ওয়াইজার: কিছুটা যেন সংকোচের মধ্যে পড়ে গেছি।

ডেক ধরে হেঁটে গেলে জুতোর শব্দ হবেই। আমার জুতোর শব্দেই ওয়াইজার পেছন ফিরে তাকাল।

তুমি! এখানে!

কী করব, তোমার পাত্তাই নেই। চলে এলাম।

ওয়াইজার ব্রিজের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। বিশাল কাচের ঘরে স্টিয়ারিং-এর পাশে চার্ট

ঝোলানো থাকে। থার্ড অফিসারের ডিউটি চলছে। কিছু একটা হয়েছে। আমার সঙ্গে এত বেশি মেলামেশা থার্ড অফিসার অর্থাৎ ছোট-মালোমের যে পছন্দ নয়, জানি। এই নিয়ে অফিসার-মহলে কথাও উঠতে পারে। কাপ্তানের কানে গেলে তিনি ওয়াইজারকে ডেকে ধমকও দিতে পারেন। এইসব চিন্তা মাথায় কাজ করছে বলেই, ওয়াইজার সহসা ব্রিজের দিকে তাকানোয় আমার মনটা দমে গেল। ব্রিজে এইসময় একটা ডেক-চেয়ারে কাপ্তান চুপচাপ বসে থাকেন। কাচে ঘেরা বিশাল হুইল-হাউজটি আড়াল করে রেখেছে অফিসার কিংবা কাপ্তানকে। তাঁরা আমাদের সহজেই দেখতে পাবেন, কিন্তু আমরা টেরই পাব না, তাঁরা আমাদের লক্ষ করছেন।

কেমন একটা ভয় ধরে গেল। আমি পালাতে গেলাম। কী দরকার ওয়াইজারকে বিপদে ফেলে?

তখনই ওয়াইজার ডাকল, কী হল? চলে যাচ্ছ কেন?

আমি উপরে আঙুল তুলে দেখালাম।

ধুস, কে কী বলবে!— গুলি মারো ইয়ার এমনই যেন বলতে চেয়েছিল থার্ড অফিসার সম্পর্কে।

যাক, তবে কাপ্তানের কানে কথাটা ওঠেনি। তিনি ওয়াইজারকে ডেকে ধমকও দেননি। ব্রিজে কেউ দাঁড়িয়ে নাও থাকতে পারে। শুধু সুখানি একলাই স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকতে পারেন। জাহাজ গভীর সমুদ্রে, অফিসাররা যে যার কেবিনে, কিংবা ডাইনিং হলে, কাজেই আমাদের মেলামেশা নিয়ে কারও চোখ টাটাবার কথা না। নেটিভ বলে সাহেব-সুবোদের যতটা পারি এড়িয়ে চলি। কিন্তু ওয়াইজাবকে কেন যে কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারি না!

ডাকলাম, ওযাইজার।

সে আমার দিকে তাকাল।

চলো, গ্যাংওয়েের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। কেউ দেখতে পাবে না।

তারপর নিজেই কেমন বেকুফ হয়ে গেলাম। ওয়াইজার তো একজন তরুণ যুবা, তার সঙ্গে পালিযে কথা বলার এই স্পৃহাতে খারাপের কী আছে! নিজেকে সংশোধন করে স্বাভাবিক গলায় বললাম, কখন থেকে ভাবছি তুমি আমাদের পিছিলের ফলকায় আসবে। তোমার পাত্তাই নেই। খুঁজতে বের হয়ে দেখি এখানে উইন্ডস-হোলের পাশে দাঁড়িয়ে আছ।

ওযাইজার কেমন ম্রিয়মান গলায় বলল, জেনের খবর ভাল না। মনে হয় ওর কিছু একটা হযেছে।

বন্ধুত্ব হলে যা হয়, জেন সম্পর্কে অনেক কথাই আমি জানি। ওয়াইজার যে ওয়েলসের ছেলে, তাও আমি জানি। কার্ডিফ থেকে রেলে চড়ে যেতে হয়। রাস্তায় কোনও নির্জন স্টেশনে নেমে গেলে তাদের গাঁয়ের খবর পাওয়া যায়। কিছুটা পাহাড়ি এলাকা। একটি বার এবং ডাকঘর ছাড়া তাদের গাঁয়ের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য খবর সে আমাকে দেয়নি। জেন তার গাঁয়ের মেয়ে। স্কুলের পড়াশোনা দু'জনেব একই সঙ্গে একই স্কুলে।

পাকা রাস্তা ধরে গেলে দুটো ছোট শহর ছাড়িয়ে তাদের বাড়ি। সে প্রায়ই ব্লেজিংস্টার নামক এক ধরনের ফুলের কথা বলত। জেনের খুব পছন্দ এই ফুল। ফুলটি খুবই দুর্লভ। বনে-জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ফুলে গন্ধ নেই। আবার আছেও। যে পায়, সে পায়।

অথচ সাদা-লাল এই ফুলগুলি লম্বা। এবং ওরা সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় জেনের চোখ থাকত উপত্যকার বনে-জঙ্গলে। দুটো-একটা ফুলই ফোটে। খুঁজে পাওয়াই কঠিন। যেদিন জেন ফুলটা খুঁজে পেত, খুবই খুশি দেখাত তাকে। এই ফুল খুবই সৌভাগ্যের প্রতীক, এমনও ভাবত জেন।

জেন রাস্তায় সাইকেল রেখে জঙ্গলে ঢুকে গেলে রাস্তায় ওয়াইজার পাহারায় থাকত। রাস্তাটা খুব ভাল না। লোক চলাচল কম। কিছু ছিনতাইবাজের উপদ্রবও আছে। এমন নির্জন নিরিবিলি সবুজ বনভূমিও সারা দ্বীপে খুঁজে পাওয়া কঠিন। জেনের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার মধ্যেও ছিল তার তীব্র আনন্দ।

রোজই যে ফুল পেত জেন, তাও নয়। জেন নানা স্বপ্ন দেখত মনে মনে। ফুলটা পেয়ে গেলে ভাবত, তার স্বপ্ন সার্থক হল। ওয়াইজার তখন সবে উঁচু ক্লাসে উঠেছে। জেনকে নিয়ে সাইকেলে ফেরার সময় বার্চ কিংবা ওক জাতীয় গাছের ছায়ায় দাঁড়াত। পাইনের বনও পার হয়ে যেতে হত গাঁয়ে ঢুকতে গেলে।

এমন এক নিরিবিল্লি প্রাকৃতিক পরিবেশে জেন আর ওয়াইজার একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিল।

সেই জেন এক বিকেলে জঙ্গল থেকে বের হয়ে এল, হাতে ব্রেজিংস্টার। স্কুলের ইউনিফর্ম গায়ে। তারা দু'জনেই যে বড় হয়ে উঠছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ফুলটি জেন সেদিন তার হাতে দিয়ে বলেছিল, দারুণ মজা হবে। তুমি যদি দেখতে চাও দেখাতে পাবি। দেখলে, আমার মতো তুমিও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যাবে।

আমি ওয়াইজারকে না বলে পারিনি, জেন কি সেই মজাব মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে?

ওয়াইজার কিছুটা সম্ভ্রম এবং সংকোচের গলায় বলেছিল, জেন একটি আস্ত খেপি। তার নানারকমের বিশ্বাস, যেমন উইলবেবো চার্চেব মাথায় সে একটি নক্ষত্র দেখতে পায় মাঝে মাঝে। নীল বঙেব সেই নক্ষত্রটির খবর সেই রাখে। রোজ দেখা যায় না। ওই নক্ষত্র দেখলেও সে ভাবে তার দিন ভাল যাবে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওয়াইজার জেনেব মজার জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চায়। এটা যেন অত্যন্ত গোপন বিষয়, আর কাউকে বললে জেনকে খাটো করা হবে।

জেনের খবর ভাল না, ওর বোধহয় কিছু একটা হয়েছে। সেটা কী, কিছুই বলছে না। হয়তো এইটুকু বলেই আমাকে রহস্যেব মধ্যে রেখে দিতে চায়।

আমরা ডেক ধবে হাঁটছিলাম। হাওয়া দিচ্ছে, মাস্তুলেব আলোগুলি দুলছিল। সামান্য পিচিংও শুরু হয়ে গেছে। জাহাজ বেশ দুলছে। আরও বিশ-বাইশ দিনেব আগে বন্দব পাচ্ছি না। কাজ-কামে একরকম থাকি। কাজ না থাকলে সময়ই কাটতে চায় না। জেন ভাল নেই, কথাটাতে কিছুটা কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। জেন কেন ভাল নেই, এত দূবে থেকে জেনের খববও পাবাব কথা না। বন্দর না এলে দেশের চিঠি পাওয়া যায় না, অথচ জেনেব খবব বোধহয় ভাল না— কোনও সংকেত থেকে ওয়াইজার এমন কথা বলতেই পারে। সাবাদিন দেখাও পাইনি, জেনেব কথা ভেবে কেবিনে ওয়াইজাব মনমরা হয়ে বসে থাকতেও পাবে।

তার কী হয়েছে বলবে তো।

ওয়াইজাব বলল, আমি কি জানি তার কী হয়েছে? সারারাত তাব সঙ্গে ঘুবেছি, সেই অ্যালসোবের জঙ্গল, রাস্তায় আমাকে দাঁড করিয়ে ফুল খুঁজতে জঙ্গলে চলে গেছে। কখনও দেখি একটা টিলাব উপর থেকে গডিয়ে পড়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের নীচেই হটব্রো লেগুন। লেগুনে পড়ে গেলে উঠতে পারবে না, জেন সাঁতার জানে না। আমাকে ভয় দেখানোর জন্য সে টিলা থেকে দৌড়ে নামছে কখনও। এত জোবে নামলে যে-কোনও সময় পা ফসকে নীচে পড়ে যেতে পারে। যত বলছি, জেন, প্লিজ এভাবে নামবে না, কে শোনে কার কথা?

জেনের এক কথা।

বলো, আমাকে তোমার সঙ্গে সমুদ্রে নিয়ে যাবে? বলো, বলো।

টিলাব মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। পাবা যায়! সে তো বোঝে না, সমুদ্রে তাকে নিয়ে যাবাব কোনও উপায়ই নেই। তবু জেদ, এক কথা, না নিয়ে গেলে, আবাব টিলা থেকে দৌড়ে নামবে। বাড়ি ফিববে না। কিছু হলে তখন আমাকে সবাই ধরবে।

ওয়াইজার এবার ঠিক গ্যাংওয়ে পার হয়ে দুটো বিট পেয়ে গেল। একটায় সে বসল, আব একটায় ইঙ্গিতে আমাকে বসার কথা বলল।

আমি বসলে বলল ওয়াইজাব অগত্যা কী করি, বললাম ঠিক আছে নিয়ে যাব, জাহাজে কিন্তু দুষ্টুমি করা চলবে না। আমার কথামতো চলতে হবে।

খুউব খুশি। তারপর দেখি, শুধু ঝোপ-জঙ্গলে নড়ানড়ি শুরু হয়েছে। জেন জঙ্গলের ডালপালা ফাঁক করে ছুটছে, তার চাই ব্রেজিংস্টার, জঙ্গলে ঢুকে ওটা পেলেই বুঝবে, আমি মিছে কথা বলিনি, প্রকৃতই তাকে নিয়ে সমুদ্র যাব। আমি ডাকছি. জেন, খুব কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখতে না পেলে ছাদে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তোমাকে খেতে দেওয়া হবে না। তুমি কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে।

আমার দিকে তাকিয়ে ওয়াইজার খুবই কাতর গলায় বলল, তুমি তো জানো ব্যানার্জি, ওর

স্টেপ-ফাদার কারণে-অকারণে কীরকম কষ্ট দেয়। কত রকমের নির্যাতন চালায়। বড়ই দুঃখী মেয়ে।

আমি চুপ করেই আছি। জেনের কথা ভাবলে ইদানিং আমারও কষ্ট হয়। বিমাতার কথা আমরা জানি, কিন্তু বিপিতার কথা আমরা বিশেষ শুনিনি। এটা আমার জেনের জন্য একটা বিশেষ কষ্টের কারণ ছিল।

ওয়াইজার বলল, তারপরই দেখি জেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে সাদা রঙের স্কার্ট, গায়ে লাল রঙের জ্যাকেট। সোনালি চুলের মেয়ে, বড় বড় নীল চোখে আমাকে দেখছে। হাতে সেই ফুল। বলছে, চলো কেবিনে, সমুদ্রে ঝড় ওঠার আগে ঢুকে না গেলে, কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ব ঠিক কী।

স্বপ্নে এত সব দেখছিলে?

স্বপ্ন, সত্যি, না ভৌতিক কিছু, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যানার্জি।

ভৌতিক বলছ কেন ওয়াইজার?

আরে, আমি যে ওকে নিয়ে বের হয়েছিলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। দরজা খুলে এলিওয়ে ধরে ডেক-এ নেমে গেলাম। মাস্তুলের আলোটা দুলছিল। বেশ হাওয়া উঠে আসছে। আকাশ পরিষ্কার। কত নক্ষত্র, জেন ঠিক আবিষ্কার করে ফেলল, তার নীল রঙের নক্ষত্রটি। বালিকার মতো আহ্লাদে চিৎকারও করে উঠেছিল, ওই দ্যাখো, দ্যাখো, এই জাহাজেও নক্ষত্রটি আমাদের মাথায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

কোথায়?

ওই দ্যাখো।

যা হয়, আমি তো জানি না, সে কি দেখাতে চায় কোন নক্ষত্র তার সেই নীল রঙের নক্ষত্র, ওকে তবু প্রবোধ দেবার জন্য মিছে কথা বললাম, হ্যাঁ ওই তো। ঠিক সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে, ওই যে, ঠিক বলছি না?

তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি দেখতে পাওনি, আমাকে তুমি এখনও ছোট খুকি ভাবো।

তারপর ওয়াইজার আর একটা কথাও বলছে না। একেবারে চুপ।

আমি বললাম, কী হল। তারপর কী হল? সমুদ্রে জেন আসতে পারে না। তুমি স্বপ্ন দেখেছ। ভৌতিক হতে যাবে কেন?

তাই বলে দরজা খুলে বের হয়ে এলাম। স্বপ্নে কেউ এতটা ঘোরে পড়ে যেতে পারে!

পারে। তুমি জানো, আমাদের দেশে গভীর রাতে অনেককে নিশিতে পায়। নিশি ডেকে নিয়ে কোনও গভীর অরণ্যে কিংবা নদীর পাড়ে মানুষকে দাঁড়ও করিয়ে দেয়। আমরা শিশুদের নিশির আতঙ্কের কথা বলে শান্ত করে রাখি। আসলে স্বপ্ন থেকেই এগুলো হয়। স্বপ্নের ঘোরে দরজা খুলে বের হয়ে যায়, কেউ যেন তাকে ডাকে।

নিশি বলে কিছু আছে বলছ!

আমি ঠিক কিছু জানি না। আমি তো কখনও নিশির ডাকে রাতে ঘর থেকে বের হয়ে যাইনি। কী করে বলব, আছে কি নেই?

না, তুমি কিচ্ছু জানো না ব্যানার্জি। রাতে জেন আমার কাছে এসেছিল। ঠিক এসেছিল। ওর কিছু হয়েছে। জেনের আত্মা আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। সে একটা ফুলও রেখে গেছে। ফুলটা যে ব্লেজিংস্টার, দেখলেই চিনতে পারবে।

ব্লেজিংস্টার ফুলই দেখিনি জীবনে, চিনব কী করে?

ও, তাই তো! ব্লেজিংস্টার তুমি চিনবে কী করে। আমিও কি ভাল চিনি! জেন দেখাত, তারপর জেন লুকিয়ে ফেলত, কী জানি আমি যদি তার কাছ থেকে ফুলটা কেড়ে নেই। আমি তো জঙ্গলে কখনও ফুলটা ফুটতে দেখিনি। সে-ই কেবল দেখতে পেত, সে-ই তুলে আনত।

ওয়াইজারকে খুবই কাতর দেখাচ্ছে। গোপনে চোখের জলও ফেলছিল বোধহয়। মাস্তুলের আলোতে তা স্পষ্ট ছিল না। সহসা ওয়াইজার আমার হাত চেপে ধরল, এসো আমার সঙ্গে। এসো না!

এ সময়ে তার সঙ্গে না গেলে খারাপ দেখায়। আমি তার সঙ্গে কেবিনে ঢুকতেই বলল, ওই দ্যাখো ফুলদানিতে।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ফুলদানিতে কোনও ফুলই নেই। মেসরুমমেট আবদুল যে ফুল রেখে যায় না, তাও না। সে ওয়াইজারের জামাকাপড় কেচে দেয়। কেবিনে দরকারে চা-কফি-ব্রেকফাস্ট দেয়। সে ফুল রেখেই দিতে পারে। ওয়াইজারের কেবিন সাফ-সুতরো থেকে সাজিয়ে রাখার কাজ আবদুলের। সে যদি ফুলের গুচ্ছ রেখে দেয়, দিতেই পারে, জাহাজে রসদ ওঠার সময় কিছু ফুলও তুলে নেওয়া হয়, এই যেমন গোলাপ, টিউলিপ, লিলি, ম্যাগনোলিয়া, রজনীগন্ধা, যেখানকার যা ফুল। ডাইনিং হলের মিনা করা বড় বড় সাদা চিনেমাটির ফুলদানিতেও নানা রঙিন ফুল দেখেছি। এত সব ফুলের সঙ্গে একটা ব্রেজিংস্টার যদি মিশেই থাকে, কিংবা সেই ফুলটাই যদি আবদুল ওয়াইজারের ফুলদানিতে গুঁজে দিয়ে যায় বলারও কিছু নেই। কিন্তু ফুলদানিতে ফুলই নেই। ওয়াইজারকে বলি কী করে, এখনও তুমি স্বপ্নের ঘোরে আছ। প্লিজ, মাথা খারাপ কোরো না। আবদুলকে দু'কাপ বরং কফি দিতে বলো। সেই ফাঁকে আমরা দাবা নিয়ে বসেও যেতে পারি।

আসলে ফুলদানিতে ফুলই নেই, বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। এতে যে ওয়াইজারের আরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একা কেবিনে থাকে, ভয়ে আতঙ্কে সে কেবিনে থাকতে রাজি নাও হতে পারে। এবং যা হয়, সমুদ্রের একঘেয়েমি থেকে অদ্ভুত সব মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়, সে কেবিনে না থাকতে চাইলে, কাপ্তানের কানে কথা উঠবে, এবং ওয়াইজারের মাথা ঠিক নেই ভেবে সামনের বন্দরে তাকে নামিয়েও দেওয়া হতে পারে।

ফুলদানিতে ফুলই নেই বলা বোধহয় ঠিক হবে না। ওয়াইজারকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, আবদুল ফুল রেখে যেতে পারে। সে তো মাঝে মাঝে বরফঘর থেকে ফুল এনে রেখে দেয়। ফুলের সঙ্গে দু'-একটা ব্রেজিংস্টার জাহাজে উঠে এসেছে মনে হয় রসদের সঙ্গে। ফুলটা খুব সুন্দর বলেই আবদুল লোভ সামলাতে পারেনি।

ফুলটা খুবই সুন্দর। তাই না ব্যানার্জি?

খুব সুন্দর।

ফুলের তারিফ করলে যদি খুশি হয়, তারপরই টের পেলাম, সে কাজের জামা-প্যান্টও পালটায়নি। ওয়াইজার যে সত্যি ঘোরে আছে এতে টের পেলাম।

দাবার বোর্ড হাত বাড়িয়ে নেওয়ার সময় বললাম, তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও। আবদুলকে কফি দিতে বলছি।

ওয়াইজার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। তার হাতে-মুখে যে কালি লেগে আছে তাও টের পেল। সে ভারী কৃতজ্ঞ যেন আমার ওপর। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমে ঢুকে গেল। আর ঠিক সেই সময়ই মনে হল ফুলদানিতে সত্যি একটা সাদা ফুল। লম্বা, কিছুটা ধুতুরা ফুলের মতো, তবে পাপড়ি আলগা, ফুট ফুট লাল সবুজ রং পাপড়িতে। বিস্ময়ে হতবাক। চোখ কচলে কিছুটা কাছে গেলে মনে হল, কই কিছুই তো নেই! খালি ফুলদানি।

এটা অলৌকিক না ভুতুড়ে বিষয়, বুঝতে পারছিলাম না। তবু স্বাভাবিক থাকার জন্য মনের ভুল ভেবে আমরা দু'জনেই দাবা খেলায় বসে গেলাম। আর কেন যে মাঝে মাঝে চোরা চোখে তাকাতে গিয়েই টের পেলাম, ফুলটা সত্যি আছে। এবং ফুলের সুঘ্রাণও পাচ্ছিলাম।

পরদিন ওয়াইজার এসে খবর দিল, জানো ব্যানার্জি, ফুলটা নেই। সকালে উঠে দেখি ফুলদানি খালি। কেউ চুরি করেছে। ধরতে পারলে লোকটাকে আমি খুন করব।

যাই হোক বিশ-বাইশ দিন বাদে আমরা বন্দর পেলে ওয়াইজার ডেক ধরে ছুটে এসে বলল, জানো ব্যানার্জি, মা চিঠি দিয়েছে। তারিখটা তোমার মনে আছে। ২৪ জুলাই। সেদিন বিকেলেই সে টিলা থেকে পা ফসকে পড়ে যায়। তারপর সারারাত তার কোনও হুঁশ ছিল না। পরের দিনও না। তখনই সে আমার কাছে চলে এসেছিল। জেন জ্ঞান ফিরতেই ম্রিয়মান গলায় বলেছে, ওটা কোথায় রেখে এলাম? আমার হাতেই যে ছিল।

ওটা কী?

ওটা ব্রেজিংস্টার। একটা ফুল।

আমি আর কী বলি! বললাম, হবে হয়তো।

আমি ঠিক ভ্রমণবিলাসী মানুষ নই। ভ্রমণে আগ্রহ কম। নিজের গণ্ডি ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগে না। ঘরকুনো স্বভাবের হলে যা হয়। সমুদ্র থেকে ফেরার পর খুব বেশিদূর আর যাইনি। যাওয়ার অজস্র সুযোগ উপেক্ষা করে ভ্রমণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, ইচ্ছে যে করে না তাও না, তবে হয়ে ওঠেনি। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি, পাঁচ-পাঁচটা মহাদেশের কোথাও না কোথাও গিয়েছি। তার সঙ্গে সমুদ্র এবং দ্বীপেব অজস্র ছবি কিংবা বর্ণমালা বলা যায় এমনই গেঁথে আছে স্মৃতিতে যে, মনেই হয়নি. আর-কোথাও গিয়ে নতুন কিছু আরও দেখা যেতে পারে।

আসলে অলস এবং কুঁড়ে মানুষের যা হয়। ফলে আমার যা ঘোরাঘুরি ওই সমুদ্রে। নিছক ভ্রমণেব জন্য সমুদ্রে যাইনি, আহার এবং উত্তাপের খোঁজেই এই যাওয়া। শখের ভ্রমণ এটা যে নয় বুঝি, সামান্য নাবিকের কাজ, উদয়াস্ত পরিশ্রম, এতে শখ এবং শৌখিনতা কিছুই থাকে না।

যাই হোক, পৃথিবী ঘুরে দেখায়, ছোট ছোট অনেক স্মৃতিই যে আশ্চর্য ভ্রমণ হয়ে আছে আমার কাছে, এখন সেটা ভালই বুঝি।

সেবারে নিউ-প্লাইমাউথ বন্দর থেকে মাটি টানার কাজে দক্ষিণ-সমুদ্রে যাওয়ার কথা। কোরাল সি-তে আমরা যাচ্ছি। কোম্পানির নতুন চুক্তি, বছরখানেক ধরে আমাদের জাহাজ এস এস সিওলব্যাংক অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের উপকূলে ফসফেট সরবরাহ করবে।

জাহাজিদেব মন খুবই খারাপ। কবে দেশে ফেরা যাবে কি আদৌ যাবে না এমন নানা উৎকণ্ঠাতে আমরা ভুগছিলাম।

সালফার বোঝাই জাহাজ নিয়ে আমরা নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে এসেছিলাম। মিসিসিপি নদীর কিনাব থেকে জাহাজে সালফার তুলে নেওয়া হয়েছিল। শহরটার নামই পোর্ট অফ সালফার। নদীর পাড়ে ছোট্ট ছিমছাম শহর। দূরে অদূরে অজস্র তেলের পিপে এবং নদীর পাড়ে পাড়ে কিছুদূর 'গেলে আশ্চর্য এক বনভূমি।

নদীর প্রায় মোহনাব কাছে বন্দরটি। জাহাজ বোঝাই হতে আট-দশ দিন লেগেছিল। এক সকালে জাহাজ দড়িদড়া তুলে ছেড়েও দিয়েছিল, তারপর ক্যারেবিয়ান সমুদ্র এবং পানামা ক্যানেল পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগব এবং সোজা প্রায় একমাস জাহাজ চালিয়ে এই নিউ-প্লাইমাউথ বন্দবে এসে হাজির হয়েছিলাম।

সালফাব বোঝাই জাহাজ খালি করতে একটু বেশি সময় লাগে। সালফারেব উগ্র ঝাঁজে নাক-মুখ জ্বালা কবত। সারা ডেকময় সালফার উড়ছে। প্রায় কুয়াশার মতো বাতাসে ঝুলে থাকত সালফারের গুঁড়ো।

উইনচ মেরামতের জন্য সারাদিনই ডেক-এ ছোটাছুটি করতে হত আমাকে। পাঁচ নম্বর ইঞ্জিনিয়ারের দোসর আমি। সারাদিন খাটাখাটনির পর ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস ওয়াইজার কিনারায় নেমে যাবার জন্য ছটফট করত। কাজকাম শেষ করে স্নান সেরে এবং পোশাক পালটে তার কাছে হাজির না হলে সে ডেক থেকে নামত না। আমি আর ওয়াইজার বন্দরে ঘুরে বেড়াতাম।

জাহাজ খালি করতে এখানেও প্রায় পক্ষকাল লেগে গেল। জাহাজ সাফসোফ, ধোওয়া মোছার কাজ চলছে। যে-কোনওদিন চব্বিশ ঘণ্টার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। জাহাজ যে দক্ষিণ-সমুদ্রে যাচ্ছে, কানাঘুষোয় চাউর হয়ে গেছে। কিন্তু কোনও নোটিশ না পড়ায় জাহাজিরা বড়ই দুশ্চিন্তায় আছে। দক্ষিণ-সমুদ্র তো ভাল জায়গা নয়। যদিও দক্ষিণ-সমুদ্রই আসলে কোরাল সি, জাহাজিরা জানেই না। এই হচ্ছে জাহাজিদের নসিব। তারা সব সমুদ্রেরই নামকরণ করে থাকে নিজেদের পছন্দমতো। কোরাল সি-কে তারা দক্ষিণ-সমুদ্র বলেই জানে। সেখানে সব ফসফেট দ্বীপের ছড়াছড়ি। সেই দরিয়ায় যুদ্ধেব সময় জাপ সেনাদের বিশাল নৌঘাঁটি ছিল, তার খবর সব জাহাজিরাই রাখে। আসলে ওটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। শয়ে-শয়ে জাহাজডুবি, জাহাজের সব কংকাল সমুদ্রের গভীরে ডুবে আছে, এবং এমন আতঙ্ক যে তাদের, ওখানে জাহাজ নিয়ে গেলে ফেরা দায়।

ওয়াইজার ছেলেটি আমার বয়সি। ফলে বন্ধুত্ব। আমরা দু'জনই একমাত্র কমবয়সি নাবিক জাহাজে।

সারাদিন কাজকামের পর ছুটি। আমি আর ওয়াইজার একসঙ্গে নেমে যেতাম জাহাজ থেকে। বন্দরটি পাহাড়ি এলাকায়। শহর ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। বন্দর এলাকাতেই ট্রাম পাওয়া যেত।

ট্রামে চড়ে শহরে ঢুকে যেতাম। দালানকোঠা পাহাড়ের ঢালুতে প্রায় নেই বললেই চলে। লাল নীল রঙের কাঠের ঘর-বাড়িই বেশি। আর সব বাড়ির সামনে ফুল গাছের ছড়াছড়ি। অজস্র লাল সাদা গোলাপের ওড়াউড়ি বাগানে লক্ষ করতাম। যাবার সময় কেউ জানালায় দাঁড়িয়ে হাই করলে, আমরা হাত তুলে দিতাম। কখনও কোনও সমবয়সি মেয়ে সুযোগ পেলে ফুলের গুচ্ছও তুলে দিত হাতে। আমরা যে হাজার-হাজার মাইল সমুদ্র অতিক্রম করে তাদের দেশে হাজির হয়েছি, আমাদের চলাফেরা কিংবা আচরণে তারা বোধহয় টের পেত।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় বলে ঠান্ডা কম। সমুদ্র থেকে উত্তুরে হাওয়া উঠে এলেও শীতের আমেজ খুবই উপভোগ্য। অদূরে লায়ন-রকে পাখি উড়ে যেত সমুদ্র পার হয়ে, শহরের পেছনে এগমন্ট হিলের তুষাররেখাও গোচরে আসত। এক আশ্চর্য ছবি হয়ে থাকত বিকেলটা, আমরা দু'জন কমবয়সি জাহাজির কোনওই যে গন্তব্যস্থল নেই, আমাদের চলাফেরায় টের পাওয়া যেত। কোনও সন্ধ্যায় সি-ম্যান ক্লাবেই হয়তো আমরা মজে গেলাম। ক্যান ভরতি বিয়ার, আর নানারকমের ইন্ডোর গেমসের ছড়াছড়ি। কখনও মঞ্চে গান-বাজনারও আয়োজন হত। বারের দিকটায় উঁচু লম্বা এবং একমুখ দাড়ি নিয়ে যে লোকটি কাউন্টার সামলাত তাকে দেখলে মনে হত নির্ঘাত লোকটি একসময় সমুদ্রে তিমি শিকার করে বেড়িয়েছে। তাঁর একটা পা কাঠের।

তার সম্পর্কে আমার কৌতূহলে ওয়াইজার বিরক্ত হয়ে বলত, আরে না না, কোনও উপন্যাসের নায়ক হতে পারে না। সে সামান্য একজন সি-ম্যান ছাড়া কিছু নয়। চলো না, লোকটা কী বলে শুনি।

আমার লোকটাকে দেখলেই ভয় হত। এক থাবড়ায় আমার যে খুলি উড়িয়ে দিতে পারে, তার কাছে আমার মতো অর্বাচীনের যাওয়া সাজে না। এত কৌতূহলও মানায় না। লোকটির মুখ মাউরিদের মতো দেখতে। এই এলাকার এরা উপজাতি এবং এরাই আসলে দ্বীপের আদি অধিবাসী। মাউরিরা অবশ্য এত উঁচু লম্বা হয় না। বেঁটেখাটোই হয় তারা। দোকানে কিংবা রাস্তায় ফল বিক্রির দোকানে অথবা নানা কাজেই তারা জাহাজে ডেকে উঠে আসে— চুল ধূসর, গায়ের রংও ধূসর, বেঁটেখাটো হয়ে থাকে, হাত-পা খুবই মজবুত, কিন্তু এই দীর্ঘকায় মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকে নিজের মতো, ইশাবায় কাজ সামলায়। তাকে কারও সঙ্গে কথা বলতেও দেখিনি।

ওয়াইজারের পাল্লায় পড়েই কাউন্টারে গিয়ে কথা বলতেই অবাক, সে ইশারায় কথা বলছে।

আসলে ওয়াইজারের সঙ্গে আমার বাজি ছিল, লোকটি নির্ঘাত একজন তিমি শিকারি। ওয়াইজারের যুক্তি, ধুস, তিমি শিকারিরা কখনও কাউন্টার সামলায় না। ওদের জাত আলাদা।

বাজি ধরতে গিয়ে হ্যাপা সামলাতে হল। সত্যি লোকটা তিমি শিকারি তো নয়ই, এমনকী কথাও বলতে পারে না। লোকটি বোবা। পকেটে তার একটি নোটবুক এবং পেনসিল। কিন্তু লোকটিব হাতের লেখা দেখে আমরা অবাক। বোবা, তবে জন্মগত দিক থেকে নয়, এটা বুঝতেও অসুবিধা হল না। সেই আমাদের খবর দিল, এই শহরের প্রাচীন বনভূমিটি না দেখে গেলে আমরা আশ্চর্য কিছু মিস করব।

বন্দরে নেমে শহরের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি ঘুরে দেখার প্রবণতা কম-বেশি আমাদের দু'জনেরই আছে।

যেমন, এই বন্দরের ঠিক নীচে একটি সুন্দর বেলাভূমিও আছে। জাহাজঘাটার ঠিক পাশেই। এমনকী সূর্যাস্তের সময় ক্রেনের লম্বা ছায়া সেই বেলাভূমি পার হয়ে সমুদ্রে মিশে যায় এবং শহর থেকে সকালে যেসব সুন্দরীরা নেমে আসে অবগাহনের নিমিত্ত, তারাও সেই ক্রেনের ছায়া সমুদ্রে মিশে না গেলে উঠতে চায় না। সমুদ্রে সাদা জাহাজ এবং দূরে অদূরে অ্যালবাট্রস পাখিদের বিচবণ তাদের সারাদিন মুগ্ধ করে রাখে। ওয়াইজার ছুটির দিনে সেই বেলাভূমিতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। আমি তার পাশে খুবই অনুগ্রহভাজনের ফিসফাস কথা বলতাম। আমরা দু'জনেই যে হোম-সিকনেসে ভুগছি, একটা পাখি উড়ে গেলেও তা টের পেতাম।

তিনি নোটবুকে লিখে আরও জানিয়েছিলেন, গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

ওয়াইজার ইশারায় বলেছিল, গাছ দাঁড়িয়ে থাকবে না তো হাঁটবে?

তিনি হেসে দিয়েছিলেন।

গাছ হাঁটে বলেছি! গাছ হাঁটে না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। একই জায়গায় নিজের মতো বেঁচে থাকে। খ্রিস্টের জন্মের আগে, কিংবা তারও আগে থেকে তারা পৃথিবীর

জলবায়ু ভোগ করছে। কোনও গাছের বয়স তো রোমান সভ্যতার কাছাকাছি। এতকাল বেঁচে থেকে গাছ কি আর গাছ আছে! যাচ্ছ যখন, মনোবাসনা জানিয়ে দিয়ো। যার যা মনোবাসনা, হাতে হাতে ফল পাবে।

তারপর জানিয়েছিল, যত দুর্গম পথ তত তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। সোজাসুজি সহজ রাস্তায় গেলে মাহাত্ম্য যে কমে যায়, বোঝো না! যাও না, গেলেই বুঝতে পারবে, সহজ রাস্তায় গেলে গাছগুলো দেখে অভিভূত নাও হতে পারো। পাহাড়ের ধাপ ভেঙে, জঙ্গল পার হয়ে যাও, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখবে তারা তখন তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কী মনোরম ভঙ্গি, ডালপালা দুলছে, আকাশ ঢেকে রেখেছে ডালপাতার ছায়ায়, বিশাল কাণ্ড, শিকড়গুলো কিছুটা ভেসে আছে, কিছুটা প্রোথিত হয়ে আছে মাটিতে।

ওয়াইজার ওর পরামর্শে যেন কিছুটা বিরূপ। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, মাথায় ছিট আছে। আমরা সোজাসুজিই যাব। পাহাড় ডিঙিয়ে যাই, আর জঙ্গলে হারিয়ে যাই!

আমার কিন্তু তাঁর পরামর্শ খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল। দু'ভাবেই গেছি। ছুটির দিন ছাড়া উপত্যকা পার হয়ে ঘাসের মসৃণ চত্বর অতিক্রম করে, সিঁড়ির মতো পাহাড়ি ধাপ পার হয়ে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাছগুলোর কাছে পৌঁছনো যেত না।

ট্রামে গেলে ঘণ্টাখানেকও লাগত না। আমরা দু'ভাবেই গিয়েছি। বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিংবা উপত্যকার আপেল বাগান পার হয়ে গেছি। সকালে বের হলে দুপুর হয়ে যেত। সঙ্গে খাবার। পাহাড়ের মাথায় গাছের ছায়ায় বসে ডিম পাউরুটি কিংবা আপেল খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

গাছগুলির এত বয়স হয় কী করে, এতকাল বেঁচে আছে কী করে, এমনও মনে হত। গাছের বয়স কীভাবে ঠিক করা হয় তাও জানি না। গাছের কাণ্ডে প্লেট ঝোলানো, তাতে কোন গাছটি কবে জন্মেছে তার ঠিকুজি-কুষ্ঠি দেওয়া আছে। গাছ একটি প্রাণ পিকাকোরা পার্কে গিয়েই প্রথম টের পাই। নিউজিল্যান্ডারদের গাছেব প্রতি মায়া-মমতা একটু বেশি। কী যত্ন গাছের। কাছে যাওয়া যায়, হাত দিয়ে দেখাও যায়, তবে গাছের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় এমন চেষ্টা না করাই ভাল। ডাল, পাতা, ছালবাকল কিছুই সঙ্গে নেওয়া যায় না স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

জাহাজ সাফসোফ হয়ে গেল অথচ দক্ষিণ-সমুদ্রে যাত্রার কোনও উদ্যোগ-আয়োজন নেই। সুতরাং শহরে ঘুরে বেড়ানো, বেলাভূমিতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা অথবা কোনও আপেল বাগানে ঢুকে মাউরি যুবকের সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরার গল্পে মশগুল হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই। জাহাজ কেন যে দড়িদড়া তুলে আবার সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে না তাও জানার উপায় নেই। জাহাজ কবে ছাড়বে, বলতে পারেন একমাত্র কাপ্তান, তিনিও বোধহয়, সঠিক কিছু জানেন না, এজেন্ট-অফিস থেকে নির্দেশ না এলে তার কিছুই করার উপায় নেই।

শহরটায় বড়দিনের উৎসব, বেশ সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে। বাড়িগুলি রঙিন কাগজে আর ফানুসে সেজেগুজে, দেবদারু পাতায় কিংবা গোলাপের রঙিন পাপড়িতে ওড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে। জাহাজেও ভাল-মন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকলেও, দুপুরেব হিমেল হাওয়া তা উড়িযে নিচ্ছে। রাতের আকাশে অনেক তারাও ফুটে থাকে, আলোর মালা পরে থাকে শহরটা। দূরে প্রেস-বেটেরিয়ান চার্চের চুড়ো আলোকমালায় সজ্জিত, রাতে ডেক-এ দাঁড়ালে স্বপ্নময় এক দেশের ছবি চোখে ভেসে ওঠে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি। রেলিং-এ ঝুঁকে শহরের বাড়িঘর দেখি। ওয়াইজার পাশে কখনও থাকে, কখনও থাকে না। এক রাতে দেখি ডেক ধরে কেউ পিছিলের দিকে আসছে। বুড়োমতো কেউ। একা নন তিনি, সঙ্গে তার কেউ আছে। ওয়াইজারই তাঁকে আফটার-পিকের দিকে নিয়ে আসছে।

সে-ই পথ চিনিয়ে যেন নিয়ে আসছে। ওয়াইজারের পেছনে বুড়ো মানুষটি কালো কোট গায়ে. মাথায় কালো টুপি, মাস্তুলের আলোতে সবই খুব স্পষ্ট। পেছনে আরও কেউ যে আছে তাও বোঝা যায়।

ওয়াইজার প্রায় দৌড়ে পিছিলে উঠে এল।

এসেই বলল, এই ব্যানার্জি, ওরা আসছে। ওদের সঙ্গে তুমি কথা বলো।

ওবা কারা কিছুই জানি না, কী কী কথা বলব তাও বুঝতে পাবছি না, কিছুটা বিমূঢ় গলায় বললাম. কারা আসছে?

ক্যাথরিন আর ওব ঠাকুবদা।

কে ক্যাথবিন? কে ঠাকুবদা? তাবা আমাব সঙ্গে দেখা কববেন কেন? কী দবকাব? তখনই দেখলাম পিছিলেব সিঁড়ি ভেঙে তিনি উপবে উঠে এসেছেন। তাব আড়ালে আব-একজন। ডেক-এ তাকে দেখাই যায়নি, দাদুব পেছনে খুব সংকোচেব সঙ্গে জাহাজে উঠে এসে স্বস্তিতেও ছিল না, আমাবই বয়সি, কিংবা তরুণীই বলা চলে। সাদা স্কার্ট এবং নীলাভ জ্যাকেট গায়ে মেয়েটি কিছুতেই বুড়ো মানুষটিব আড়াল থেকে বেব হয়ে যেন আসতে চাইছে না। তখন বাধ্য হয়ে যেন ওযাইজাব না বলে পাবল না, ইনি উইলিয়াম বুচাব, আব—

বলে সে মেয়েটিকে খুঁজে বেডাল এবং দাদুব পেছনে দাঁড়িযে থাকলে যা হয়, কিছুটা লজ্জা এবং সংকোচ তাব। ওযাইজাবই বলল, এবা সবাই ইন্ডিযান, খুব ভাল মানুষ এবা।

জাহাজ যে ভাল জাযগা নয, মেয়েটা হযতো ভালই জানে।

মেয়েটি হ্যান্ডশেক কবাব সময সামান্য হাঁটু নুয়ে দাঁড়াল।

ওযাইজাব বলল, চলো ফোকশালে, কথা আছে।

বাধ্য হযে বললাম, কী ব্যাপাব বলবে তো!

ওযাইজাব বলল, বডদিনে ওদেব বাডিতে তোমবা খাবে।

তাব মানে?

মানে কিছু জানি না। প্রতিবাবই বডদিনে তিনি দু'-তিনজন ভাবতীযকে নেমন্তন্ন কবে খাওয়ান।

তাবপব সবই ভেঙে বলল ওযাইজাব। কাপ্তানই ওঁদেব ওয়াইজাবেব কাছে পাঠিযে দিয়েছেন। এই জাহাজ নোঙব ফেলে আছে, ভাবতীযবা কাজেকামে জাহাজে উঠে এসেছে, উৎসবেব দিনে দু'জনকে নিযে গেলে কাজেব কোনও অসুবিধা হবে না, অবশ্য সেদিন জাহাজেও কাজকাম থেকে ছুটি থাকবে।

কাপ্তান পাঠিযেছেন, আব কিছু আমাদেব বলাব থাকে না। তবু বললাম, ওযাইজাব, তুমি যাবে না?

আমি যাব কেন? তিনি তো ইন্ডিযানদেব খোঁজে এসেছেন, আমাব যাওয়া ঠিক হবে না।

আমাব সঙ্গে বঙ্কু এবং অনিমেষ যাবে ঠিক হল।

উৎসবেব দিন সকালেই ক্যাথবিন এসে হাজিব।

ক্যাথি বলল, আমি তোমাদেব ওয়েস্ট কোস্ট বোড ধবে নিযে যাব।

ক্যাথি নিজেই গাডি চালাচ্ছিল। শহব ছাডালেই বড বাস্তা। এটাই হয়তো ওয়েস্ট কোস্ট বোড।

ক্যাথি বলল, ওই দ্যাখো, এগমন্ট হিলেব চুডো। কী? দেখতে পাচ্ছ!

আমবা কিছুতেই অবাক হতে পাবি না। কাবণ জাহাজ ডেকে দাঁড়ালেই দেখা যায় পাহাড়েব শীর্ষদেশ।

ক্যাথি তাব নিজেব দেশটা যে কত সুন্দব তাবই প্রমাণ দেবাব জন্য চঞ্চল হয়ে পডেছে।

অনিমেষ খুব ডিটো মাবছে।

খুবই সুন্দব দেশ ক্যাথি।

আমাব বলতে ইচ্ছে হল, তুমি আবও সুন্দব।

ক্যাথিব পাশে আমি বসে আছি। তাব শবীবেব উষ্ণতাও টেব পাচ্ছি যেন। সে যে আমাকেই বলছে, যদিও চোখ তাব সামনেব দিকে, আমাদেব নামও বোধহয় তাব মনে থাকছে না, আমাকে ব্যানার্জি বলতে শুধু আটকাচ্ছে না তাব, সহজেই বলতে পাবছে।

আমাদেব ছোট শহরটা এগমন্ট ন্যাশনাল পার্কেব ভিতবে। ডান দিকে ডসন ফলস ফেলে চলে যাচ্ছি। সময থাকলে সেখানে নিয়ে যেতে পাবতাম। ওই যে দেখছ পাহাডেব উপব বাডিটা, ওটা ডসন ফল্‌স টুবিস্ট লজ। ইচ্ছে কবলে ছুটি নিয়ে দু'-একদিন এখানে থেকে যেতে পাবো। তবে এখন খুব ভিড। ফেব্রুয়াবিতে ন'দিন ধবে আমাদেব পাইন ফেস্টিভ্যাল। অবশ্য তোমবা হয়তো তখন এখানে থাকবে না।

বন্ধু বলল, থেকে যেতেও পারি। যা একখানা জাহাজ। লজ্ঝরে জাহাজে কেউ কার্গো তুলতেও রাজি থাকে না। কবে ছাড়বে, কোথায় যাবে কিছুই ঠিকঠাক নেই। মাটি টানার কাজ, তাই সই, তাও জাহাজ ছাড়ার কোনও লক্ষণ নেই।

ক্যাথি খুবই সহজভাবে আমাদের গ্রহণ করায় কোনও আর সংকোচ নেই। তিন-চারদিন আগে আলাপ, কে বলবে। যেন কত নিকটজন ক্যাথি। সে কিছুটা বিহ্বল গলায় বলল, ওহ্, থেকে গেলে কী যে মজা হবে না!

আমি বললাম, ক্যাথি, মিঃ বুচার এলেন না, তুমি একা এলে!

দাদুর কি সময় আছে! খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পৃথিবীর আশ্চর্যতম খাবার তিনি তোমাদের খাওয়াতে চান।

আশ্চর্যতম খাবার, সেটা আবার কী?

ক্যাথি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল হঠাৎ। আশ্চর্য খাবার, সেটা কী— এমন প্রশ্নে সে যেন কাবু। গুছিয়ে ঠিক বলতে পারবে কি না, জানে না। তার কথা বলার ভঙ্গিও এত খটোমটো যে বুঝতে খুবই অসুবিধা হয়।

ভেড়ার বাচ্চার আস্ত রোস্ট। কী পছন্দ?

হয়ে গেল! পোড়া মাংস! রোস্ট মানেই আমাদের কাছে পোড়া মাংস ছাড়া কিছু না। চিফ কুকের গ্যালিতে সকালেব দিকটায় যাওয়াই যায় না। মাংস পোড়াব গন্ধে বমি উঠে আসে। আমাদেব শ্মশানে গেলে যে গন্ধটা পাওয়া যায়, মনে হলেই কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। হয় ভেড়া, টার্কি, না হয় মুরগি, শূকর, আর রোজ বিফ রোস্ট করা হয় চিফ কুকের গ্যালিতে।

আমরা চুপ করেই আছি। ক্যাথি বুঝতে পারছে না, আমরা খুশি, না অখুশি। সে একফাঁকে কান্নি মেরে আমাকে দেখে কী বুঝল, কে জানে, বলল, গ্র্যান্ডফাদার এখন মহাব্যস্ত মানুষ। অতিথিদের জন্য ভেড়ার বাচ্চা রোস্ট, আর তোহেরু স্যুপ। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ওস্টার থেকে তৈরি। অকল্যান্ড থেকে তিনি নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছেন।

তাবপর বলল, তোমাদের এবারে হোয়াইট বেইট না খাইয়েও ছাড়বেন না।

আসলে ঘুরে-ফিরে দেশটাকে দেখার লোভে আমরা যাচ্ছি। যত না খাওয়ার লোভ, তার চেয়ে বেশি লোভ ঘুরে-ফিরে এই দেশটাকে যতটুকু চেনা যায়।

বন্ধু বলল, আর কত দূর?

ক্যাথি বলল, আব বেশি দূর হবে না।

সে ঘড়ি দেখে বলল, মাত্র ঘণ্টা দুই গাড়ি চালিয়েছি। আর আধঘণ্টা লাগবে। আমাদের বাড়িব সামনেও একটা বিশাল কৌবি-পাইন গাছ আছে। তোমাদের খারাপ লাগবে না।

ক্যাথি নিজে থেকেই অনেক খবর দিল, যেমন ছুটির সময় সে মিঃ বুচারের কাছে চলে আসে। এখন তো তার অনেক ছুটি— ক্রিসমাস ডে, বক্সিং ডে, পাইন ফেস্টিভাল সব একসঙ্গে পড়েছে।

ক্যাথি ফের বলল, আমরা ওয়াতেমো ভিলেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ভিলেজ পার হলেই আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে যাব। গুহার ভিতর ঢুকলেই দেখবে বিশাল একটা হ্রদ। মাথায় তার পাথরের ছাদ। মৌমাছির বিশাল একটা চাক, যেন লক্ষ কোটি মৌমাছির গুঞ্জন। আসলে ছাদ স্পঞ্জ পাথরে তৈরি, তার ভিতব থেকে লাল নীল আলো হ্রদের জলে চুঁইয়ে পড়ছে। কোনও আলো ছাড়াই গুহার হ্রদটি এত উজ্জ্বল যে চোখ তোমাদের ধাঁধিয়ে যাবে।

সেখানে না গেলেই কি নয়?— অনিমেষ কেমন ভয়ের গলায় কথাটা বলল।

আমি অনিমেষের মেজাজ কেন যে কিছুতেই বুঝতে পারি না। ব্যাটার কি খাবার লোভ বেশি! খিদে পেলে সে বেশি দেরি করতে পারে না। সকালের ব্রেকফাস্ট না খেয়েই বের হয়েছি। বললেই হয়, কোথাও গাড়ি থামিয়ে কিছু মুখে দিলে ভাল হত।

ক্যাথি অনিমেষের কথায় কোনও পাত্তা দিল না। সে তার কথাই বলছে।

দেখবে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে কত সব মানুষ। মনে হবে একটা রঙিন ছবি দেখছ। গ্লো ওয়ার্মি গ্রুতোতে কয়েক হাজার কোটি লার্ভা পাহাড়ের ছাদে-দেয়ালে জাদুকরের মতো আলোর মালা তৈরি

করছে। এসব দেখার জন্য পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক চলে আসে। কত কাছ দিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের না দেখিয়ে নিয়ে গেলে গ্র্যান্ডফাদার রাগ করবেন।

অনিমেষ ঢোক গিলে বলল, কিছু খেয়ে নিলে হত না।

ক্যাথি এবার গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে রেখে নেমে গেল। পেছনেব হুড খুলে ঝাঁকা ভর্তি নীল কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করে হাতে হাতে দিয়ে দিল। আপেল কেক স্যান্ডউইচ সবই পাওয়া গেল প্যাকেট খুলে ফেললে। বেশ আয়াস করেই খাওয়া গেল। এবং ফ্লাস্কে চা কফি, যার যা পছন্দ।

তারপর গ্লো ওয়ার্ম গুহা ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। হ্রদের জলে নৌকায়ও উঠে গেলাম। মন্দ লাগল না। বিশেষ করে ক্যাথির মতো সরল সহজ একজন মেয়ে কাছে থাকলে সবকিছুই ভাল লাগার কথা।

যাই হোক, রাস্তাতেই ক্যাথি বলল, তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমার গ্র্যান্ডফাদারের এটা বলতে পারো বাৎসরিক কাজ। তিনি তাঁর দেশকে ভুলতে পারেন না। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ব্রিটিশ। ভারতে তাদের সাত-আট পুরুষের বাস। আমার গ্র্যান্ডফাদারেব সব প্রিয়জনই তোমাদের দেশের মাটিতে শুয়ে আছেন। আমার বাবাও। ইন্ডিয়া স্বাধীনতা পেল, গ্র্যান্ডফাদার এখানে চলে এলেন।

আমরা কেমন ক্যাথির এই কথাতে দমে গেলাম। ক্যাথির বাবা নেই। ভারতবর্ষের মাটিতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

তোমার মা?

মা দুনোদিনে আছেন আমার স্টেপ-ফাদারের সঙ্গে।

আমরা আর কেন জানি কথা বলতে পারছিলাম না। এই আমন্ত্রণের সঙ্গে বিষাদের ছোঁয়া আছে। স্মৃতি। ক্রিসমাস উৎসবে কোনও ভারতীয়ের উপস্থিতি সেই প্রিয়জনদেব যেন স্মরণ করার জন্যই।

এর পর আর লঘুভাবে ক্যাথির সঙ্গে কথা বলা যাবে না। আমরা গম্ভীর হয়ে গেলাম।

পাশেই ছোট্ট মাউরি গ্রাম ভনিভুতো। ঠিক বড় রাস্তার উপরে। মাঠে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে একজন মাউরি যুবক। প্রায় চারপাশটা যেন তৃণভূমি। ছোট ছোট কাঠের বাড়িঘব, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কোনও শীর্ণকায় নদী। ওপারে কাঠের পাটাতন। তার উপরে উঠে গেলে প্রায় ফার্লং-এর মতো দূরে দেখতে পেলাম ক্যাথির গ্র্যান্ডফাদার সাদা পোশাকে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।

ক্যাথির গ্র্যান্ডফাদার বাড়িটা করেছেন কিছুটা বনাঞ্চলের ভিতর। বাড়ির পেছনে-সামনে বটগাছের ছড়াছড়ি। ডানদিকে লন, তারপর সেই গোলাপ ফুলের সমারোহ— ফুল ফোটেও অনেক। এ দেশে বাড়ি থাকবে, ফুলের বাগান থাকবে না, ভাবাই যায় না। বিশাল কাঠের পাটাতনের উপর বাড়িটা। সবুজ লতাপাতা আঁকা কার্পেট পাতা ঘবগুলিতে। আমরা কাঠের সিঁড়ি ধরে কিছুটা উপরে উঠে গেলাম। বসার ঘরে এনে ক্যাথি আমাদের বসাল। বুচারসাহেব সাদা উলের পাতলা সোয়েটার গায়ে এসে বসলেন আমাদের পাশে। আমাদের দেশ-বাড়ির গল্প শুরু হবার মুখেই ক্যাথি আমাকে হাতের ইশারায় ডাকল।

তার কাছে উঠে গেলে, সে আমাকে ভিতরের দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে এক দৃশ্য, মা মেরি এবং কোলে জিশু, পাইন গাছের ডাল এবং তাতে অসংখ্য টুনি বালব জ্বলছে। পাইন গাছের আড়ালে একটি ছোট মূর্তি।

ক্যাথি হাঁটু গেড়ে বসল।

সে পরেছে সুন্দর সাদা গাউন। চকমকে পাথরে গাউনে লাল রঙিন কাজ। তাকে খুবই মহার্ঘ মনে হচ্ছিল। সে আমাকে তার পাশে হাত টেনে বসাল। আমরা নতজানু হয়ে বসলাম। হঠাৎ কেন যে কনুই দিয়ে সে আমায় ঠেলা দিল বুঝলাম না।

সে চোখ বুজে আছে। আমি চোখ খোলা রেখেছি। এটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। যাই হোক, আমিও চোখ বুজে ক্যাথির ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করাতে সে বোধ হয় খুবই খুশি। সে

দৌড়ে গিয়ে তার গ্র্যান্ডফাদারকে ডেকে আনল। আমি বসেই আছি চোখ বুজে। এতে ক্যাথির গ্র্যান্ডফাদারও খুব মুগ্ধ। দেবদ্বিজে ভক্তি থাকলে বুড়ো মানুষেরা খুশি হয় আমিও জানি। বন্ধু, অনিমেষ বুড়োর সঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখছে। ক্যাথি আমাকে বাড়ির ভেতরকার ঘরগুলো দেখাচ্ছে. খুবই দামি কাঠের দেয়াল এবং মেহগিনি কাঠের দরজা, জানলা, দেয়ালে দামি সব ছবি, কোনওটায় অশ্বারোহী পুরুষ, কোনওটায় এক বালিকা দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে।

ক্যাথির পিসিরাও এসেছেন। তাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের একদম পাত্তা দিচ্ছে না। নাই দিতে পারে, শত হলেও আমরা নেটিভ, ইংরেজি ভাষাটাও ভাল জানা নেই, তাদের কাছে আমরা অপোগণ্ড ছাড়া কিছুই না। কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নিতে পারি আমরা, ক্যাথির কথাবার্তাও মাঝে মাঝে ঠিক বোধগম্য হয় না। তার উচ্চারণ বিশেষ সুবিধের না, আমাদের কথাতেও নানা গোঁজামিল থাকে, বিশেষ করে আমি ক্যাথির সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারলেও, বুচার কিংবা তাঁর মেয়েদের সামনে কথা বলতে আড়ষ্ট বোধ করি। ভুলভাল ইংরেজি বলতে অনিমেষ, বন্ধু দু'জনেই খুব ওস্তাদ। ওয়াইজার সঙ্গে থাকলে খুবই সুবিধে হত। আফসোস করে লাভ নেই, এখন যত সত্বর লাঞ্চের আয়োজন হয় ততই মঙ্গল। বেলা তো কম হল না। এমনকী এ বাড়িতে যে তিনজন মহামান্য অতিথিকে নিয়ে আসা হল, তাদের কী খাওয়ানো হবে, তারও কোনও ব্যবস্থা দেখছি না। ক্যাথি এখন আমাকে নিয়ে পড়েছে।

এই।

বলো।

চলো, আমরা এখন গির্জায় যাব।

চলো। যেতে হবে যখন, কী আর করা!

গাড়িতে হই হই করে সবাই উঠে পড়ল। বাড়ির কাছাকাছি কোনও গির্জা যে নেই, গাড়িতে উঠে বসতে বলায় তা টের পেলাম। তিনটে গাড়ি, দু'জন মাউরি ড্রাইভার এবং ক্যাথি তার গাড়িটা নিয়ে রওনা হল। আমি আগের মতোই ক্যাথির পাশে। সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না।

যা ইচ্ছে করুক। বিকেলে আমাদের রেখে আসতেই হবে জাহাজে। ঘড়িতে দেখলাম, এগারোটা কুড়ি।

মিনিট কুড়ি গাড়ি চালিয়ে আধা শহরমতো একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে আসা হল। গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। তারপর একটা টিলা পার হয়ে দেখলাম, বিশাল এলাকা জুড়ে একটা মাঠ। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। দূরে শান-বাঁধানো রাস্তার মুখে গির্জা।

মাঠে মেলা গাড়ি এবং মেলার মতো মনে হয় জায়গাটা। এসব মেলাতেই আমাদের দেশে তালপাতার বাঁশি বিক্রি হয়। যদিও আমার হাত ধরে আছে ক্যাথি, সে কি আমার কথাবার্তায় কিছুটা আমাকে নির্বোধ ভেবেছে? রাস্তার ক্যাথি আর গির্জার ক্যাথি যেন একেবারে আলাদা মেয়ে।

ক্যাথি আমার হাত ধরে গির্জার হলে ঢুকে সামনের সিটে বসিয়ে দিল। গির্জার হলে একটি আসনও আর খালি নেই। চেয়ারের ভিতর থেকে একটা বই বের করে নিল। সে ওটা আমার হাতে দিল। সে নিজেও পাশের আসনে বসে আর-একটা ছোট্ট বাইবেল বের করে খুব মনোযোগ সহকারে পাতা উল্টাতে লাগল। সামনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার। মঞ্চের নীচে পিয়ানো, দেয়ালে জিশুর জীবনের নানা কাহিনি ছবিতে ধরা আছে। সুগন্ধ উঠছিল। আমাদের ঠাকুর-দেবতার ঘরে যেমন ফুল এবং চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়। উপাসনালয়ে ঢুকে আমি নিজেও খুব একটি ভাল ছিলাম না। ছিমছাম এক শান্ত পরিবেশ। ধর্মীয় সঙ্গীত বোধ হয় সবাই গাইছে। পকেট-বুকের সাইজে সব বাইবেল, সবার হাতে ধরা। ফাদার কী বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাই পাতা উলটে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছে। আমি এসবের কিছুই বুঝছি না। ক্যাথি যেভাবে বাইবেলের পাতা উলটে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, ঠিক সেই একইভাবে বসে থাকলে সে কনুই দিয়ে আবার একটা ঠোক্কর না দিয়ে পারল না।

কোন পাতায় কী আছে আমার তো কিছুই জানা নেই। দূরের মঞ্চ থেকে ফাদার কী যে বলছেন. কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যাথি ঝুঁকে প্রায় খুবই গোপনে পাতা উলটে দিল।

দেখলাম লেখা আছে পাতার উপর, গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট।

আবার পাতা উলটানোর পালা। পাতা উলটাইনি। ক্যাথি হাতে চিমটি কেটে দিল।

এবারেও ক্যাথি বইয়ের পাতা উলটে দেবার সময় সামান্য ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের কাছে। ক্যাথির চুলে ভাবী মিষ্টি গন্ধ। গভীর নীল চুলের গন্ধ ভগবানেব চেয়ে বেশি কাছের। আমি কিছুটা অস্থির হয়ে উঠলাম।এবারের পাতায় লেখা আছে, উই লিভ উইদিন দ্য শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটাবড বাই দ্য গড, হু ইজ এভাব অল গডস।

ধুস, আমাব কিছু ভাল লাগছে না। কতক্ষণ চলবে এই প্রার্থনাসভা, বুঝছি না। কেউ টুঁ শব্দটি কবছে না। উঠে পড়াও যায় না।

আবার কনুই, আবাব পাতা উলটানো, ইউ আব গড উইদাউট বিগিনিং অব এন্ড। আবাব ঠোক্কব।

ক্যাথির সান্নিধ্য আমার খুবই ভাল লাগছে ঠিক, তবে তাব এই আচরণ আমাব ভাল লাগছে না। যাই হোক প্রার্থনাশেষে সবাই এক সময় বের হয়ে গেল। ক্যাথিও। বাইরে এসে দেখলাম বন্ধু আর অনিমেষ মেলা থেকে বেলুন কিনে হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে। তারা ভেতরেই ঢোকেনি।

আমি ক্যাথির পাল্লায় পড়ে আহাম্মক বনে গেছি, সুড় সুড করে তার পেছনে গির্জায় ঢুকে যাওয়া ঠিক হয়নি। তাবা ঢোকেনি। এইসব গম্ভীর উপাসনা-টনা তাদের ভাল লাগাব কথা না। কিছুটা বিধর্মীর মতো কাজ কবেছি, এতেও তারা বোধ হয় ক্ষুব্ধ।

যাই হোক, ক্যাথি আমাকে শেষ পর্যন্ত ছাড়ল না। কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম। খাওয়াব টেবিলে আবার বিড়ম্বনা। আচ্ছা, ক্যাথিকে কে এত দায় সঁপে দিয়েছে? খাওয়ার টেবিলেও ক্যাথি আমার পাশে। তার যেন জানাই আছে আমি কিছু ভুলভাল করব এবং সে সেটা শুধরে দেবে।

বিশাল টেবিল বড় হলঘরটায় কোত্থেকে যে হাজির। পায়ে চাকা লাগানো। টেবিলে নানা খাবার। চিনেমাটির বাসনে গ্রিনপিজ, ময়েস্ট পটেটোজ, তুহেবো সুপ, ফ্রায়েড চিকেন এবং ভেড়ার রোস্ট। পুডিং কেক এবং আরও নানা রকমারি খাবার মেনুতে, যেগুলিব নাম আমার জানা নেই। আমি ঠিক চিনিই না, কোনটা কী।

খিদেও পেয়েছে খুব। সবাই এসে টেবিলে একে একে বসে গেল। বন্ধু অনিমেষকে নিয়ে আমিও খাবাব টেবিলে গেলাম ঠিক, কিন্তু ক্যাথি এসে আমরা কে কোথায় বসব ঠিক করে দিলে দেখলাম, আমার ঠিক পাশেই তিনি। বুচারসাহেব এবং তাঁর স্ত্রী এক পাশে। খেতে শুরু কবা যাক, ম্যানাবস না জানলে যা হয়, ক্যাথির বাঁ হাতের কনুইটি ফের আমায় একটা খোঁচা মারল। ঠিক কিছু ভুল কবেছি। চোখ তুলে দেখি সবাই মুখ নিচু করে টেবিলে প্রার্থনা করছে। সবাই প্রার্থনা করছে আর আমি গবগব করে মুখে গ্রিনপিজ ঠেসে দিচ্ছি চামচে, খুবই দৃষ্টিকটু বিষয়। প্রার্থনায় এত নিবিষ্ট সবাই যে কেউ আমাব এই বোকামি লক্ষই করেনি। শুধু ক্যাথি ছাড়া। অগত্যা আমিও মাথা নিচু কবে ফেললাম।

তারপর গ্লাসে গ্লাসে ওয়াইন সার্ভ করা হল।

খাওয়া শুরু করব কখন তাই বুঝছি না।

খালি পেটে মদ, তা ছাড়া মদ আমাদের তিনজনের কাছে না হলেও আমার কাছে অস্পৃশ্য বস্তু। নতুন জাহাজি, গা থেকে বাঙালের গন্ধই যায়নি, মদ খাই কী করে?

ক্যাথি জোরাজুরি শুরু করে দিল। জিশুর নামে খেতে হবে। না খেলে টেবিলের অপমান, জিশুর অপমান। কী করা, খেতেই হয়। ক্যাথি নিজে খাচ্ছে এবং আমাকে লক্ষ রাখছে। চোরামি করছি কি না, নীচের গামলায় ফেলে দিচ্ছি কি না। রেগেমেগে শেষে সবটাই চোঁ মেরে খেতে গিয়ে এমন বিষম খেলাম, আর এত গলা জ্বালা করতে লাগল যে, সব উল্টে-পাল্টে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। সবাই ছুটে এল, আমি কেশেই যাচ্ছি, খুব ধীরে ধীরে খাওয়া দরকার, ক্যাথিব মুখ চুন, বুচারও স্বস্তিতে নেই, জল মিশিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, এসব কথাবার্তা কানে এল এবং যখন ফের খেতে শুরু করলাম, তখন কিছুটা দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েই খাচ্ছি বলা চলে। যা দেবে সবই খেয়ে নেব। টেবিলের অপমান হোক এমন কিছু করব না।

কেকটি চামচে কেটে খেতে গিয়েই বিড়ম্বনা। একটা আস্ত পেনি কেকের মধ্যে, দেখতে একটি আস্ত তামার পয়সার মতো। ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়। কেকটির সঙ্গে পেনিটিও মুখে ফেলে দিলাম। পেনিটি পাশে সরিয়ে রেখে আর যাই করা যাক জিশুকে অপমান করা যায় না। কেকের অপমান করা যায় না। কেকের ভিতরে দিয়েছে যখন খেয়ে নেওয়াই উচিত।

আর তখনই ক্যাথি আমার দিকে তাকাল। পুরো কেকটি আমি ততক্ষণে সাবাড় করে দিয়েছি।

সে সামনে হাত পেতে রাখল।

আমি তাকিয়ে আছি ক্যাথির দিকে।

কোথায় রাখলে? দাও।

কী কোথায় রাখব?

পেনিটা।

ওটা তো খেয়ে ফেলেছি। কেকের ভিতর যখন...

আরে ব্যানার্জি, তুমি কী! ওটা স্মৃতি। সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

সঙ্গেই তো নিয়ে যাচ্ছি।— বলে টেবিল থেকে ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে উঠে পড়লাম।

আস্ত একটি পেনি গিলে ফেলায়, আমি কত বড় আহাম্মক ক্যাথি বুঝতে পেরে খেপে গেল বোধ হয়। বলল, চলো, মানে মানে তোমাদের রেখে আসি জাহাজে।

ক্যাথি গাড়ি চালিয়ে জাহাজে পৌঁছে দিল ঠিক, তবে একটা কথাও বলল না।

জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময় শুধু বলল, যেখানেই যাও চিঠি দিয়ো। যেখানেই থাকো ভাল থেকো। এখানে এলে ফের খবর নেবে।

একটা কার্ড আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, যখনই আসবে, ইউ আর ওয়েলকাম। অলওয়েজ ওয়েলকাম।

এই অপরাহ্নবেলায় আমার সব ঠিকঠাক মনে পড়ছে না, ক্যাথি আমাদের জাহাজঘাটায় ছেড়ে দিয়েছিল, না ক্যাথি নিজেও আমাদের সঙ্গে জাহাজে উঠে এসেছিল ঠিক মনে করতে পারছি না। সে যাই হোক, তবে স্মৃতিতে ক্যাথির চলে যাওয়ার দৃশ্যটা এখনও আমার চোখে ভাসে।

নীচে ক্রেনের ছায়ায় গাড়ি, ক্যাথি কিছুক্ষণ গাড়িতে হেলান দিয়ে আমাদের জাহাজটা দেখছিল। কী দেখছিল, জানি না। বন্ধু আগেই ডেক ধরে ফোকশালের দিকে উঠে গেছে। সে আমার উপর খুশি ছিল না। আমি বেশি মাত্রায় খেয়েছি এবং যতক্ষণ ছিলাম, কিছুটা নাকি মাতলামিও করেছি। আসলে আমি জানিই না, কতটা খেলে কী হয়, শরীরে প্রচণ্ড অবসাদ টের পাচ্ছিলাম, রেলিং-এ ঝুঁকে ক্রেনের ছায়ায় কেবল দেখছিলাম, ক্যাথি গাড়িতে হেলান দিয়ে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার নেমে যাব ভাবলাম। ডেক-এ ওয়াইজারকে দেখতে পাচ্ছি না। ফিরে এসে আশা করেছিলাম, ওয়াইজার আমার অপেক্ষায় থাকবে। তারপরই মনে হল, বড়দিনের উৎসবে সে হয়তো কোনও গির্জায় চলে গেছে। এই উৎসবের দিনে একা জাহাজে সময় কাটাতে ভাল লাগে! ওয়াইজার থাকলে, তাকে নিয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যেতে পারতাম, কোনওরকমে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এসেছি ঠিক, তবে ফের খাড়া সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে সাহস পাচ্ছি না।

ক্যাথির সান্নিধ্য আমার মধ্যে এতটা উত্তাপ সঞ্চার করবে বুঝতে পারিনি। টের পেলাম, ক্যাথি ধীরে ধীরে দরজা খুলল, তারপর আরও অতি ধীরে গাড়ি চালিয়ে ক্রমে ক্রেনের ছায়ায় হারিয়ে গেল। সেই অপস্রিয়মাণ দৃশ্যটুকু আমার চোখে এখনও লেগে আছে। আমি যে খুবই আনাড়ি, বেশি মাত্রায় খাওয়ায় আরও ধরা পড়ে গেছি। নিজের বেকুফির জন্য আমার খুবই খারাপ লাগছিল, উচিত ছিল নেমে গিয়ে ক্যাথিকে আমার অনুতাপের কথা জানানো।

ক্যাথি কি দূর থেকে রাতের অন্ধকারে আমাকেই চুরি করে দেখছিল! জেটিতে আলো ছিল ঠিক, জাহাজের মাস্তুলেও আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, তবু আমার কেন জানি মনে হয়েছে আবছা আলোয় ক্যাথি বোধ হয় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সারাদিনে শুধু গির্জায় যতটুকু সময় পেয়েছে, আমার সঙ্গে একা ছিল। তারপর সে আর আমাকে একা পায়নি। জাহাজ থেকে নেমেও

যেতে পারিনি পড়ে যাবার ভয়ে। পড়ে গেলে একেবারে জাহাজের খোলের নীচে।

এমনিতে জাহাজে কার্গো থাকলে সিঁড়ি খাড়া থাকে না। যত কার্গো নেমে যায় তত জাহাজ উপরে ভেসে ওঠে। এজন্যই জাহাজের মাল খালাস হলে সিঁড়ি ধরে সন্তর্পণে উঠতে হয়। আর যারা বেশি মাতাল হয়ে ফেরে তারা সিঁড়ি ধরে উঠতেই সাহস পায় না। আমাদের চার নম্বর ইঞ্জিনিয়ার যতক্ষণ কিনার থেকে ফিরে না আসবে ততক্ষণ তার কেবিন-বয় মতিউর গ্যাংওয়েতে অপেক্ষা করবে। তিনি ফিরলে তাকে ধরে জাহাজে তুলে আনা তার কাজ। এজন্য সাহেবের কাছ থেকে মোটা রকমের বকশিশও আদায় করে থাকে। ওয়াইজার থাকলে আমি নেমে যেতে পারতাম। সে নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করত। আর যিনি জাহাজে অপেক্ষা করে আছেন, আসানুল্লা সাব, তিনি ভাবতেই পারেননি ক্যাথির বাড়িতে ক্রিসমাসের উৎসবে গিয়ে আমি শেষে এমন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসব।

আর তখনই লক্ষ করলাম ডেক-এ গ্যালির দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

গ্যাংওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে অত দূরে কে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা কঠিন। তবু আমার কেন জানি মনে হল, আসানুল্লা সাব ছাড়া তিনি আর কেউ নন। জাহাজে তিনি বাদে আর কেউ যে কিনারায় না নেমে থাকতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সারাদিনের খাটাখাটনির পর জাহাজে কে আর পড়ে থাকতে চায়? প্রায় সবাই যে যার মতো কিনারায় নেমে যায় এবং বেশ রাত করে ফেরে। তা ছাড়া বড়দিনের রাত এমনিতেই নানা মোহ সৃষ্টি করে থাকে।

আমি যে ক্যাথির দাদুর পাল্লায় পড়ে গেছিলাম এটাও বোধ হয় কোনও মোহ থেকে। বড়দিনের খাওয়ার টেবিলে মদ্যপান বোধ হয় অত্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপার। একটু খেয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার উপক্রম হয়েছিল, গলায় তীব্র জ্বালা অনুভব করেছিলাম, এবং প্রচণ্ড বিষম খেয়েছিলাম, এতে বুড়ো মানুষটি বোধ হয় খুবই মজা বোধ করেছিলেন এবং যথেষ্ট হেসেছিলেন, এটাও আমার মনে আছে। অবশ্য ক্যাথি গুম মেরে থেকেছে, আমি ছোট হয়ে গেলে ক্যাথিও যে ছোট হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। খাওয়ার শেষে আবার ড্রিংকস সার্ভ করা হল, আমার উঠে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু টেবিল-ম্যানারসের যদি অঙ্গহানি হয় ভেবেই বসে থাকা। তিনি কিছুটা গ্লাসে ঢেলে বরফের টুকরো ফেলে দিলেন এবং সামান্য জলও মেশালেন। তারপর কী করে খেতে হয়, ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে এবং রেলিশ করে খেলে মেজাজ প্রসন্ন হয়ে যায়, বুচার সাহেব তাও যেন আমাকে শিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরিমাণে খুবই কম, ঠান্ডাও জোর পড়েছে, অন্তত আমার কাছে, আমরা ভারতীয়রা যে সামান্য ঠান্ডাতেই কাবু হয়ে যাই, ক্যাথির পরিবারের সঙ্গে মিশে ওটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। খুবই হালকা পানীয় বলে, ধীরে ধীরে খেতে মন্দ লাগছিল না, বুড়োমানুষটি তার দেশের জলবায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছিলেন। অথবা এ দেশে প্রথম যারা উপনিবেশ স্থাপনে অভিযানে বের হয়ে পড়েছিলেন এবং মাউরি উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের কিছু গল্পে বেশ মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। দেবনাথ, বঙ্কু আমার মতো আনাড়ি নয়, তারা খেতে খেতে বুড়োর গল্প যে রেলিশ করছিল, বুঝতে পারছিলাম।

ক্যাথি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসেছিল। তার দাদু অর্থাৎ বুচারসাহেব আমাকে খাইয়ে মজা পাচ্ছে, এমন একটা সুযোগ বুড়ো বোধ হয় ছাড়তে রাজি ছিল না, আর আমার রক্তকণিকা যে গরম হয়ে উঠছে টের পাচ্ছিলাম, আমি আর আগের আমি ছিলাম না, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং কথাবার্তায় কোথাও বিন্দুমাত্র জড়তা ছিল না। তারপর বোধ হয় ধীরে ধীরে আমার অবস্থা ক্রমে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল, আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক অতিশয় মর্মান্তিক খবর দিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ বড় গরিব দেশ। মিশনারিজরা সেখানে নানা সমাজকল্যাণে যুক্ত, এমনও বলে থাকতে পারি। যাই হোক, ভারতবর্ষকে খাটো করার আমার কোনও অধিকার নেই, বঙ্কু এবং দেবনাথের আচরণে এটা ভালই টের পেয়েছিলাম। ক্যাথির এক পিসি তো বলেই ফেলল, তোমাদের দেশে আমি চলে যাব। তার অগাধ সম্পত্তি। বিধবা ভদ্রমহিলার স্বপ্ন এ দেশে নান হয়ে কুষ্ঠরুগির পরিচর্যা করবেন। ফুটপাথে হাজার হাজাব মানুষ দিন যাপন করে থাকে এবং দারিদ্র অতি মহৎ ব্যাপার, দাবিদ্র না থাকলে নান হবার মতো সুযোগও থাকে না। জিশুর অপার মহিমা,

তিনি কোনও কোনও দেশে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে দারিদ্র জিইয়ে রেখেছেন এবং তার দৌলতে ক্যাথির পিসির জীবনে নান হবার সৌভাগ্য ঘটে যাবে। বোধ হয় এসব কথাই হচ্ছিল। আর আমি খেতে খেতে একবার ক্যাথিকে দেখছিলাম, একবার ক্যাথির পিসিকে দেখছিলাম। পিসি মানুষের সেবার জন্য বড়ই কাতর হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষে তার চলে যাওয়া এখন একান্ত জরুরি যেন।

ক্যাথি সেই থেকে চুপ করে ছিল। সে শুধু শুনছে। এবং আমার আচরণে বিরক্ত হচ্ছে।

সে শেষে না পেরে বলেছিল, ওদের আমি দিয়ে আসছি। এখন বের না হলে ফিরতে বেশ রাত হবে।

ক্যাথির পিসি এত সহজে ছাড়তে রাজি ছিল না। তার ইচ্ছা একবার আমরা তার বাড়ি হয়ে যাই।

ক্যাথি সোজাসুজি না কবে দিল।

এর পর রাস্তায় ক্যাথি আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। আমি হাত-পা ছড়িয়ে সিটে মাথা এলিয়ে দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ক্যাথির কাঁধে গড়িয়ে পড়ছি। সে গাড়ি চালাচ্ছিল, তার গাড়ি চালাতে যে খুবই অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি, একটা আস্ত দামড়া যদি ক্যাথির মতো নবম স্বভাবের মেয়ের কাঁধে মাথা এলিয়ে রাখে, তার যথেষ্ট অসুবিধা হবার কথা, তবে ক্যাথি আমাব আরামে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় তেমন কাজ কখনও করেনি। সারা রাস্তা গম্ভীব মুখে গাড়ি চালিয়েছে। পেছনে বক্কু এবং দেবনাথ বসে আছে, তারাই রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর সম্পর্কে দু'-একটা প্রশ্ন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বাখার চেষ্টা করছিল।

অবশ্য বক্কুর ফোপরদালালিতে ক্যাথি যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছে তাও টেব পেয়েছিলাম!

বক্কু কিছুতেই আমাকে ক্যাথির পাশে বসতে দেবে না। আমাকে পেছনের সিটে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমি নিমরাজি, কী করব, কিছুটা হুঁশ হারালে ক্যাথির উপর আমার কোনও অধিকাব থাকারই কথা নয়, ক্যাথিও বুঝি চায় না আমি তার পাশে বসি, একজন মাতালকে পাশে বসিযে গাড়ি চালানো খুবই কঠিন, এজন্য ক্যাথি হয়তো চায় আমি পেছনের সিটে বসি, এসব ভাববাব সময়ই ক্যাথি আমার হাত ধরে সামনের দরজা খুলে বসিয়ে দিল, সে ঘুরে গিয়ে পাশের দবজা খুলে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে পড়েছিল। তারপর হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিতেই ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে পড়েছিলাম। ক্যাথি আমার সঙ্গে আর-একটা কথাও বলেনি। এমনকী আমার গোটা শরীব তার উপব ঝুঁকে আছে, গাড়ি চালাতে যথেষ্ট অসুবিধা হবার কথা, তবু সে কোনও কথা বলেনি।

ক্যাথি চলে যাওযার পর আমার কেন যে মনে হয়েছিল, জাহাজে এভাবে বেঁচে থাকা বড অর্থহীন। ক্যাথির সান্নিধ্য হাবিয়ে আমি কেমন জাহাজে আরও একা হয়ে গেলাম। মেয়েদের মধ্যে কী যে মায়া থাকে, আমার সম্মানরক্ষার জন্য ক্যাথি সারাক্ষণ আমাকে আগলে রেখেছিল, ভাবতেই কেন যে চোখে জল চলে এসেছিল! ক্যাথির কাছে আমার আর ফিরে যাবার উপায় নেই। তাব বাড়ির রাস্তা চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন রাস্তায় কীভাবে সে আমাদেব নিয়ে গেছে তাও জানি না। যাবার সময় ঘণ্টা দুই লেগে গিয়েছিল, অথচ আসার সময় আধঘণ্টাও লাগেনি, বোধ হয় তার দেশের কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোভে এ রাস্তা ও রাস্তায় সে ঘুরেছে। তা ছাডা তার গাঁয়ের নামও আমার মনে নেই। ডসন ফল্‌স নামটা মনে পডছে। এসবই যখন ভাবছিলাম, দেখি ডেক ধরে তিনি হেঁটে আসছেন। আর বোধহয় গ্যালির দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কবতে পারছিলেন না।

কী যে করি! কাছে এলেই টের পাবেন, আমি আজ সত্যি ভাল নেই। আমার ইমান নেই এমনও ভাবতে পারেন। নেশা করা যে কী সাংঘাতিক অপরাধ, আসানুল্লা সাবকে যে দ্যাখেনি, বুঝতে পারবে না। আমাকে পোকামাকড়-তুল্য ভেবে তিনি দূরে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। অচ্ছুত হয়ে গেছি।

তিনি ফের কিছুক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমাকে কি তিনি দেখতে পাননি? গ্যাংওয়েব এদিকটায় স্পষ্ট নয়, তারপর মনে হল, না, তিনি আমাকে ঠিকই দেখেছেন। বক্কু, দেবনাথ ঠিক তাঁকে খবর দিয়েছে, দেখুন গে সারেং সাব, ব্যানার্জির কাণ্ড। গ্যাংওয়ের দেয়ালে থম মেরে দাঁড়িযে

আছে। বাগে রাখতে পারলেন না? খুব খেয়েছে। বেহেড মাতাল। আমাদের সঙ্গে কিছুতেই আসতে রাজি হল না।

কাজেই জাহাজে উঠে আর লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। ধরা পড়তেই হবে। জাহাজে আমার শুধু ওপরওয়ালাই নন তিনি, আমার অভিভাবকও। এই প্রথম কেন জানি মনে হয়েছিল, প্রকৃতই তিনি আমার পিতৃতুল্য।

খুবই সংকোচ হচ্ছে এগিয়ে যেতে। বকা-ঝকা শুরু হয়ে গেল বলে। নিজের ভিতব গুটিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুতেই কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

আশ্চর্য দেখি, তিনি আমাকে পোকামাকড় ভেবে বিন্দুমাত্র এড়িয়ে গেলেন না। কাছে এসে বললেন, সবার সব সহ্য হয় না বনার্জি। এটা বুঝতে শেখ। সব জাহাজে আমি থাকব না। সব জাহাজে কেউ তোর পেছনেও লাগবে না। তোব ভালর জন্যই বলি। আয়, আমাব হাত ধর। নিজের রাস্তাটা নিজে চিনতে না পারলে আখেরে কষ্ট পেতে হয়।

তিনি আমাকে আব কিছু বললেন না। হাত ধরে ফোকশালে নিয়ে গেলেন। জামাপ্যান্ট খুলে ফেলতে সাহায্য করলেন। জুতো-মোজা খুলে স্লিপাব এগিয়ে দিলেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পবিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। আমি কিছুটা নিস্তেজ হযে পড়ে আছি। দবজাটা যে বন্ধ করব তাবও যেন শক্তি ছিল না। তাবপব যা দেখলাম, তাতে আবও ঘাবড়ে গেলাম। হাতে এক গ্লাস তেঁতুলগোলা জল।

গ্লাসটা হাতে দিয়ে বললেন, খেয়ে ফ্যাল। সব বমি হয়ে যাবে। শবীরটা তোব ঝরঝবে হবে।

কী যে করেন না। ও আমি খাব না।

না খেলে সাবাবাত কষ্ট পাবি। ঘুমাতে পাববি না। অভ্যাস না থাকলে যা হয।

এক রাতে কিছু হবে না।

আব তাবপবই যে কী হল, বমি-বমি ভাবটা আগেই ছিল, এবাবে সত্যি ওক উঠছে। বমি কবে সারা ঘর ভাসিযে দিলাম।

আসানুল্লা সাব, টোপাসকে ডেকে, নিজে বালতি বালতি জল এনে মেঝে পবিষ্কার করতে লাগলেন। টোপাস যেন সাবেং সাবকে সাহায্য কবছে। আমি পড়ে আছি বাংকে। মুখ মুছিয়ে, আমাব শরীবে কম্বল টেনে তিনি বেব হয়ে গেলেন। তাবপব আশ্চর্য। দেখি বগলে বিছানা নিয়ে হাজির। আমাব পাশের বাংকে দবজা বন্ধ করে বিছানা পেতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমাব হুঁশ ছিল।

খুবই কাতর গলায় বললাম, আপনি খাবেন না সাবেং সাব?

না।

আমাব কিছু হবে না। কিছু মুখে দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। উপবে যান। আমার ঘবে শুলে আপনারও ঘুম হবে না। কিছু হলে ডাকব।

এখন ঘুমো। কথা বলিস না।

আমার উপর রাগ করে রাতে না খেলে আমি ঘুমাতে পাবি, বলুন? আমি কি মানুষ না।

ঠিক আছে খাব। তুই আমার জন্য ভাবিস না।

তাবপর কেমন ফেরাস্তার মতো কিছু অলৌকিক কথাবার্তা বললেন, মানুষের জীবনটাই সমুদ্রযাত্রা। ঝড় সাইক্লোন থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে জাহাজডুবি। মনে বাখিস।

বলে তিনি দরজা খুলে উপরে উঠে গেলেন।

এই অপরাহ্নবেলায় চুপচাপ একা থাকলেই তাঁর কথা বেশি মনে হয়। আমার সমুদ্রযাত্রায় তিনি ছিলেন সঙ্গী। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সব তিনি আমার ভাগ করে নিয়েছিলেন। মানুষটা এখন কোথায়, বেঁচে আছেন, না শুয়ে আছেন কবরে, তাও জানি না। তবু চোখ বুজলেই তাঁব মুখ, প্রলম্বিত শ্মশ্রু

এবং সাদা কুরুশ কাঁটার নামাজি টুপির কথা মনে করতে পারি। জীবন যে প্রকৃতই সমুদ্রযাত্রা, যে-কোনও সময় জাহাজডুবির আশঙ্কা থাকে, ধূসর বন্দরের আশায় শুধু অপেক্ষা, এই অপরাহ্নবেলায় তাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জন্ম থেকেই এই এক অলৌকিক যাত্রায় মানুষকে বের হয়ে পড়তে হয়। তাও এখন বুঝি। ক্যাথিও শেষে বোধ হয় এই অলৌকিক যাত্রার খোঁজে এ দেশে সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে এসেছিল। আমাকে খুঁজে বেরও করেছে। তাকে দেখে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। পরিচয় দিলে টের পেলাম তার চোখে-মুখে এক স্বর্গীয মহিমা বিবাজ কবছে। ঈশ্বব সম্পর্কে দুটো-একটা কথা ছাড়া সে আব কিছু বলেনি। টেব পেয়েছিলাম, সে পৃথিবীর অন্য এক খবর পেয়ে গেছে। তাকে নিরস্ত কবতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। সেও কবেকার কথা। কোথায় সে আছে জানি না। লণ্ঠন হাতে কোন বনে-জঙ্গলে সে তাব ঈশ্ববকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাও জানি না।

আশ্চর্য দূরদর্শন

জাহাজ বাঁধাছাঁদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেদিনটায় সাধারণত ছুটি থাকে। ছুটি না দিলেও কিছু বলার থাকে না। কাপ্তানের মরজি, সেকেন্ড অফিসারের মরজি। বন্দরে বাঁধাছাঁদার কাজ সারতে দেড়-দু'ঘণ্টা, কখনও বেশি, জেটি বুঝে বন্দর বুঝে সব। ডেক-জাহাজি, ইঞ্জিন-জাহাজিদের বন্দরে কাজ শুরু আটটায়। বারোটায় এক ঘণ্টার ছুটি। তখন খাওয়া গল্পগুজব, পরে আবার পাঁচটা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ।

কিন্তু এবারের সেকেন্ড অফিসারটি বেশ আমুদে। কাজে তুখোড়, যে-কোনও কাজ সেরে ফেলতে পারলেই ছুটি। কাপ্তান কিংবা চিফ অফিসাবের মরজির তোয়াক্কা করে না। কাপ্তান নিজেও খুব পছন্দ করেন তাকে।

বন্দর ধরলেই ছুটি, ভাবা যায় না।

জাহাজ এবাব ভিক্টোরিয়া পোর্টে ঢুকছে। বুয়েনসএয়ার্স থেকে জাহাজিরা খালি জাহাজ নিয়ে বওনা হয়েছিল। খালি জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া খুবই বিরক্তিকর। সমুদ্র শান্ত থাকলেও জাহাজ এদিক-ওদিক টাল খায়। একটা গাছের গুঁড়ির মতো লাগে জাহাজটাকে। যেন সবাই বিশাল একটা কাঠের গুঁড়ির উপব বসে আছে, ভেসে যাচ্ছে নিরন্তর। সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতে জাহাজ টালমাটাল। জীবন অতিষ্ঠ।

সেই খালি জাহাজ নিয়ে জাহাজিরা ঢুকছে বন্দরে। সামনেই বন্দর। কিন্তু দু'পাশে সব আজগুবি দৃশ্য। বন্দর নেই, শূন্য মাঠের মতো নির্জন পাহাড় দু'পাশে, কিংবা বনভূমিও বলা যায়। খাঁড়ির ভিতরে ঢুকে এতটা পথ, যেন শেষ হতে চায় না, খাঁড়ি এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ডাঙার ভিতর ঢুকে গেছে, অন্তত বিনয় আজ পর্যন্ত দেখেনি। নানা বন্দরে গেছে জাহাজ নিয়ে, চার পাঁচ সফরের অভিজ্ঞতা, অথচ তাজ্জব বনে গেছিল জাহাজ নিয়ে বন্দরে ঢোকার পথে। যেন তারা ক্রমে দু'পাশের সমতলভূমি পার হয়ে দুটো পাহাড়ের ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে। পাহাড় ক্রমে আরও খাড়াই, আরও গভীব বনাঞ্চল, কোথাও কাঁটাঝোপ, কোথাও বিশাল সব গাছ গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছে। ডেক-এ দাঁড়িয়ে যত দূরেই চোখ যাক, পাহাড়ের শীর্ষদেশ চোখে পড়ছে না। অথচ পাহাড়ের কোলে কোথাও মানুষের বসবাস আছে টের পেল। খাঁড়ির জল কখনও গভীর নীল সবুজ খয়েরি আবার আবছা ধূসর হয়ে উঠছে। নীচের দিকটায় নানা বঙের শ্লেট-পাথরেব মতো মসৃণ দেয়াল— সবুজ, নীল, কালো, খয়েরি— যখন যে রং প্রতিবিম্ব ফেলছে, জলে সেই রং ফুটে উঠছে।

সারাটা দিন লেগে গেল অথচ খাঁড়িপথ ক্রমেই যেন দীর্ঘ হয়ে উঠছে। দু'পাশের পাহাড় আর শেষ হচ্ছে না। এত বিশ্রী এবং একঘেয়ে লাগছিল যে কখন বন্দর ধরবে সেই আশায় সবাই রেলিংয়ে ঝুঁকে আছে। সেকেন্ড অফিসাবটিকে আজ বিনয়ের কেন জানি খচ্চর মনে হল। সারেংকে পর্যন্ত।

কেউ বলছে না, ঠিক ক'টায় জাহাজ বন্দর ধরবে! এ কী রে বাবা! এটা কি তামাশা? বন্দর ধরছে বলে তাতিয়ে দিয়ে হাওয়া। সেকেন্ড অফিসার কেবিনের দরজা লক করে শুয়ে আছে, সেদিকটায় জাহাজিরা হুকুম না হলে যেতে পারে না। হারামি সারেং, টিন্ডাল পর্যন্ত রা খসাচ্ছে না। বললেই এক কথা, বন্দরে ধরলে তো দেখতেই পাবি।

এও হতে পারে সারেং-টিন্ডাল জানেই না, খাঁড়িপথ কতটা ডাঙার ভিতর ঢুকে গেছে। এ বন্দরে তারা কেউ আগে নাও আসতে পারে।

ব্যাংক লাইনের কাজ-কারবারই আলাদা। যাত্রাপথের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। যেখানে খুশি ঢুকে মাল তুলে নাও। জাহাজের খোল খালি রেখো না। খালি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে এমনিতেই কোম্পানির লোকসান, তার উপর ব্যাংক লাইনের জাহাজগুলি সমুদ্র চষে বেড়ায় মালের খোঁজে।

এসব কারণেই কাপ্তান জাহাজটা খালি নিয়ে হোমের দিকে উঠে যেতে পারছেন না। কৈফিয়ত দিতে হতে পারে, যেখানে যা পাও তুলে নিয়ে এসো। কয়লা, ফসফেট, সালফাব যা পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া পোর্ট থেকে ঠেসে আকরিক লোহা নেওয়া হবে তেমনই কথা আছে। বুয়েনসএয়ার্সের এজেন্ট-অফিস থেকে কাপ্তান হয়তো এমন নির্দেশ পেয়েছেন, না হলে জাহাজিদের জীবন বিপন্ন করে এত্ত সরু পথে জাহাজ নিয়ে কে ঢোকে! যা ভাঙা লজ্ঝরে জাহাজ, পাহাড়ের দেয়ালে ঠেস খেলেই গেল। ভেঙে চুরমার। একেবারে সলিল-সমাধি। পাথরের দেয়াল এত খাড়া আর মসৃণ, পাড়ে উঠতে পারে সাধ্য কার।

এখন বন্দর ধরলে বাঁচা যায়। মাঝে মাঝে খাঁড়ি এত সরু যে পাহাড়ের দেয়াল ডেক থেকে ছুঁয়ে দেখা যায়। ধীর গতি, জাহাজ যেন নড়ে না। পাহাড়ের গা বাঁচিয়ে জাহাজকে এগুতে হচ্ছে সন্তর্পণে।

জাহাজিদের আরও ক্ষোভ, পাহাড়ের মাথায় বেশ বনজঙ্গল, গভীর বনভূমি সবই আছে, মানুষেব বসতিও থাকতে পারে, অথচ দু'পাশের নিরেট পাথর ছাড়া কিছুই আর দৃশ্যমান নয়। এ তো হারামিব বাচ্চারা আর-এক গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিল, বিনয় অধৈর্য হয়ে শুধু এসবই ভাবছে। আর ছটফট করছে। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে, সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে আসছে। প্রায় সব জাহাজিরা, বিশেষ করে যাবা যুবা, ডাঙায় নামার জন্য যারা অধীর, তাদের ক্ষোভ আরও বেশি।

সকালে পাহাড়ের ভিতরে ঢোকার সময় সেকেন্ড অফিসার এমন হাবভাব দেখাল, যেন রেডি হয়ে থাকো, বন্দরে ঢুকছি। বন্দরে ঢুকছি বললে জাহাজিরা টান টান হয়ে যায়। টান টান হতে পারার মজাই আলাদা। সমুদ্রের একঘেয়ে নীল জল, নীল আকাশ অথবা জ্যোৎস্না রাতে অনন্ত মহাকাশের মতো অদৃশ্য রহস্য, স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের কক শব্দ অথবা দূরাগত কোনও নক্ষত্রের ইশারা জাহাজিদের ডাঙার জন্য বিহ্বল করে রাখে।

ডাঙায় নামতে পারলেই জাহাজিদের পরমায়ু বেড়ে যায়। তারা শুধু হাঁটে আর হাঁটে। শিস দিতে দিতে জেটি পার হয়ে দু'হাত তুলে দেয়। দু'পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট, আর আছে নারী রহস্যময়ী, যেন হাতের মুঠোয় গোপন করে রেখেছে জাহাজি মানুষের পরমায়ু, কখনও গভীর কোনও বনভূমিতে ঢুকে গেলে নিজের ছোট্ট গৃহটির কথা মনে পড়ে যায়। ভেতরে হাহাকার বাজে।

এত ভালমানুষ সেকেন্ড অফিসার, এতটা খচরামি না করলেই পারত। সাঁজ লেগে গেল। পাহাড গাছপালা বনভূমি অদৃশ্য। বিনয় ক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

পাইলট-বোট আগে আগে যাচ্ছে। পাইলট ব্রিজে বসে কাপ্তানের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে গেছেন। এরা কি ভেবেছে, জাহাজের নিয়তি এই, তাড়াহুড়ো করে কোনও লাভ নেই? এত সন্তর্পণে জাহাজটাকে আর কতকাল চালানো হবে?

এখনও ডেক-সারেং এসে 'টাল্টু' বলছে না।

'টাল্টু' না বললে বোঝা যাবে না জাহাজ বন্দরে ঢুকে যাচ্ছে। এমনকী দূরে অদূরে কোথাও আলোর বিন্দু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, সামনে পেছনে যতদূর চোখ যায় শুধু গভীর অন্ধকার। জাহাজের আলো, প্রপেলারের গোঙানি ছাড়া সবকিছুই বিস্ময়করভাবে অবাস্তব।

কে জানে তারা জাহাজ নিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে আমাজন নদীর মোহনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি না!

বিনয় কেবল ভাবছিল, এই খাঁড়িপথ গিয়ে হয়তো আমাজন নদীর মোহনায় পড়েছে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আর কিছুটা গেলেই আমাজন নদীর মোহনা সে দেখতে পাবে।

আসলে যে-কোনও অচেনা দেশে গেলেই এটা তার মনে হয়। সেই দেশের সবচেয়ে আশ্চর্য

বস্তুটি যেন তার দেখা দরকার। একবার অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন জঙ্গলের মধ্যে ক্যাঙ্গারু আবিষ্কার করে ফেলেছিল, গিরিমাটি রঙের প্রাণীগুলি তার চোখের উপর দিয়ে দ্রুত কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জিলং থেকে মেলবোর্ন যাচ্ছিল। বেশি দূর না। ষাট-সত্তর কিলোমিটার রাস্তা সমুদ্রের ধারে ধারে, বনজঙ্গল। কিন্তু তার সঙ্গীটি বলেছিল, কোথায় ক্যাঙ্গারু! আমি তো দেখছি না।

কেন দেখছিস না? মাঠের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছে। ওই তো হারিয়ে গেল। দাঁড়া।

বলে বিনয় গাড়ি থেকে নেমেও গেছিল। কিন্তু সব অদৃশ্য। শুধু বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই। তবু সে দেখে থাকে। এই দেখাটাই কে জানে আবার কোনও নদীর মোহনায় পৌঁছে দেবে কি না তাকে। বিশাল সব পদ্মপাতা, সে বসে আছে। যতদূর চোখ যায় ঘোলা জল, কত বিচিত্র সব পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোঁ মেরে মাছ তুলে নিচ্ছে।

কিংবা কখনও সে আমাজনের উৎসমুখে হেঁটে যায়। গভীর অরণ্য অথবা পাহাড়ের গুহায় আদিম মানুষের ছায়া, কখনও তারা নদীতে সাঁতার কাটছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিনয় টের পেল প্রপেলার ঘুরছে না। জাহাজ থেমে আছে। খাড়া পাহাড়ের নীচে নোঙর ফেলা। জেটি নেই। পাহাড়ের ভেতর থেকে চোঙের মতো কী একটা বের হয় আছে।

ইতস্তত আরও সব জাহাজ এধার-ওধার নোঙর করা। সমুদ্রের খাঁড়ি এদিকটায় বেশ প্রশস্ত। জেটি নেই। অথচ আট-দশটা জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। জেটি ক্রেন কুলি কিছুরই দেখা নেই। এ কেমনতব বন্দবে তারা হাজির! দূরে সমুদ্রের খাঁড়ির উপরে সেতু এবং ওদিকটায় শহর বাড়িঘর, গির্জার চূড়ো।

বিনয় কেটলি নিয়ে সিঁড়ি ধরে গ্যালিতে ঢুকে গেল। ভাণ্ডারি নেই, না থাকারই কথা। উনুনে আঁচ গন গন করছে। ভাণ্ডারির হুঁশ নেই। রেলিং-এ ঝুঁকে আছে। ডাঙা দেখার আশ্চর্য মোহ সবাইকে তাড়া করছে।

রবিবার। ছুটির দিন। কাজকর্মের ব্যস্ততা নেই। কেউ ফলঙ্কা বাঁধছে না। রঙের টব নিয়ে কেউ ছুটছে না। হাসিল নিয়ে কেউ টানাটানিও করছে না। ছুটির এমন সুন্দর আমেজ, অথচ বন্দরে নামার কোনও রাস্তা নেই। এমনকী কাছেপিঠে কোনও বোটও দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্য!

সকালে চা করার ভার পালা করা থাকে সবার। সব বিশুরই এই নিয়ম। বিনয়দের বিশুতে তারা চারজন। এক ফোকশালে থাকে। একসঙ্গে টোবাকো চা চিনির রেশন। সুজয়দা থাকে তার ঠিক উপরের বাংকে। দাদা এত কুঁড়ে যে ছুটির দিনে ঘুমই ভাঙতে চায় না।

জাহাজ নোঙর ফেলা, মেজাজ এমনিতেই খারাপ। সারাটা দিন ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে কাঁহাতক ভাল লাগবে। এমন মনোরম সকাল, চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য কত সব আগ্রহ সঞ্চার করছে ভিতরে, অথচ নেমে যাবার কোনও রাস্তা নেই। মেজাজ খারাপ। ধুস, খাবি তো খাবি, নালে ফেলে দেব! অত ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তুলতে আমার দায় পড়েছে।

এরা একই ফোকশালে থাকে। একই সঙ্গে রেশন তোলা হয়। একই সঙ্গে আড্ডা তাস সব। বেড়াতেও বের হয় একসঙ্গে।

জাহাজ বন্দরে ঢুকে গেছে ভেবে ভিতরে সাড়া অনুভব করেছিল, এখন সবকিছু কেমন বিস্বাদ। ছুটির দিন, অথচ ডাঙায় নামতে পারছে না। সকালে চা, চাপাটি খেয়ে শহরে ঘুরে বেড়ানো হল না। কোনও বোটেরও দেখা মিলছে না।

বন্দরে ঢুকে জাহাজ এভাবে কখনও-সখনও বয়াতে বাঁধা থাকে ঠিক, কিন্তু এতগুলি জাহাজ, সে দু'-একজনকে প্রশ্ন করেও সাড়া পায়নি। কেউ বলতে পারছে না। ব্যাটা সেকেন্ড অফিসার পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছে। ডেকে বের হচ্ছে না।

সিঁড়ি ধরে নামার সময় একবার ভাবল, সারেঙের ফোকশালে উঁকি মেরে যাবে।

সে নেমে দেখল, সারেঙের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে লক করা। কোথাও গেছে। সেকেন্ড কিংবা চিফ অফিসারের কেবিনে দেখা করতে যেতে পারে। বাথরুমেও যেতে পারে। ডংকিম্যানের সঙ্গে দেখা।

সে বলল, তাজ্জব রসিদ চাচা, জেটি নেই, ক্রেন নেই। মানুষজনও নেই কোথাও। কী ব্যাপার। সামনের পাহাড়ে পাথর আর গাছপালা। উপরে বসতি। কিন্তু মানুষজন যায় কী করে? এ কেমনতর বন্দর!

রসিদ উপরে যাচ্ছে, হাতে কেটলি। এ সময়টায় যে যার ফোকশালে বসে চা খায়। সকালের সূর্য দূরে পাহাড়ের গাছপালার ফাঁকে উঠে আসছে।। পোর্ট-হোলে রোদের ছায়া খেলা করে বেড়াচ্ছে। সিঁড়িতে ওঠা-নামার শব্দ। কেমন এক নিঝুম নির্জনতা চারপাশে। স্টিয়ারিং-ইঞ্জিন কিংবা প্রপেলারেব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে, বড় খালি খালি লাগে সবকিছু।

বিনয় দেরিও করতে পারছে না। ফোকশালে সবাই মুখিয়ে আছে। আর কেউ না হলেও ত্রিদিব, তার সকাল-সকাল ওঠার অভ্যাস। সে উঠেই *ঠেলাঠেলি* শুরু করে দেয়, এই ওঠ! কারণ বিনয় জানে, দেরি করে উঠলে চায়ের পিপাসা ব্যাটাদের আরও বেশি তাতিয়ে তুলবে।

গোলমাল যত টিন্ডালকে নিয়ে। স্টোক-হোলডে কয়লা মারার সময় যত রোয়াবি। ফোকশালে ব্যাটা কুঁড়ের হদ্দ! কে জানে ব্যাটা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে কি না। না ওঠারই কথা। চা নিয়ে বাংকে ডাকাডাকি না করলে বাংক থেকে নামতেই চায় না।

পোর্ট-সাইডের ঠিক সিঁড়ির নীচে বাঁদিকের ফোকশালে তারা থাকে। সে ঢুকেই বলল. মাইরি কিচ্ছু নেই রে। জাহাজ নোঙর ফেলে আছে।

সুজয় বলল, এতক্ষণে টের পেলে বাবা বিনয়, কিনারায় নামতে পারবে না? আহা রে, বেচারি। মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে।

তারপর আড়মোড়া ভাঙল, হাত উপরে তুলে দিল, হাই উঠছে।

দে বাবা, চা দে। দেখি তারপর তোকে কিনারায় পৌঁছে দিতে পারি কি না।

আমাকে নিয়ে একদম মজা করবে না। কিনারায় নামলেই তো ছুঁক ছুঁক বাই।

বিনয় লকারের দরজা টেনে খুলতে গিয়ে দেখল বন্ধ।

অঞ্জন বলল, বন্ধ।

চাবি কার কাছে?

কী জানি। চাবিটা এত রহস্যময় কেন বল তো? কে যে লুকিয়ে রাখে। খুঁজে পাচ্ছি না।

অঞ্জনের লকারে কাপ-প্লেট থাকে। চাবিও তার কাছে। চাবিটা খুঁজে পাচ্ছে না। মেজাজ খারাপ। মেয়েমানুষের আশ্চর্য সব সহবাসের রঙিন ছবি থরে থরে টাঙানো আছে। কে যে মেবে দেয়! দুটো অ্যালবাম হাপিশ। সেই থেকে সে সতর্ক হয়ে গেছে। জাহাজে টাকাপয়সা সোনাদানার চেয়ে নগ্ন ছবি চুরি যায় বেশি। অ্যালবাম দুটোয় দামি ছবি সব লুকিয়ে রেখেছিল। হাপিশ হয়ে যাবাব পব সতর্ক হয়ে গেছে। চাবিটা এক জায়গায় রাখে না। এখানে সেখানে লুকিয়ে রাখার অভ্যাস। অথচ কেউ ঠিক টের পেয়ে যায়। পছন্দমতো ছবি মেরে জায়গারটা জায়গায় রেখে দেয়।

সুজয় উপরের বাংক থেকে লাফিয়ে নীচে নামল। সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে বাথরুমে চলে গেল। চাবি কোথাও আছে, পাওয়া যাবে। হারামি অঞ্জনের ন্যাকড়ামি ফিরে এসে না পেলে বের করে দেবে। সেই বলতে গেলে অভিভাবক ওদের। দশ-বারো সফর সমুদ্রে। ফোকশালে, ডেক-এ, কিনারায় ফাতরামির চূড়ান্ত কিন্তু ওয়াচের সময় কাঠখোট্টা টিন্ডাল সাব। বেমাফিক কাজ-কাম করলেই পাছায় ধাঁই করে লাথি।

অঞ্জন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, না, মাইরি আমি কিচ্ছু জানি না। চাবিটা এই থাকে, এই হারায়। চাবির কি শেষ পর্যন্ত হাত-পা গজিয়ে গেল। যায় কোথায়।

তারপব কী মনে হতেই বলল, চাবিটা যে তুই নিলি, ফেরত দিয়েছিস?

বিনয় হাতে কেটলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি তো অঞ্জন সকালে বালিশের নীচ থেকে চাবিটা বের করে হাত বাড়িয়ে তাকে দিয়েছিল। ঘুমের আমেজ ভাঙেনি। চটকা লেগে যেমনটা হয়, তার মধ্যেই চাবিটা বের করে দিয়েছে। চা চিনি কনডেনসড মিল্কের কৌটা বের করেছে লকার থেকে। জাহাজ বন্দর ধরেছে, অথচ কিনারায় নামতে পারবে না, মনমেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে, কিছু মনে রাখতে পারছে না।

পকেট হাতড়ে চাবিটা পেল না।

টিন্ডাল নেমেই হম্বিতম্বি শুরু করে দেবে।

চা রেডি নেই। তোরা কি সব গাঁজাগুলি খেয়ে বসে আছিস! কাজের সময় হাতের কাছে চাবি পাস না!

সে কেটলিটা অঞ্জনকে দিয়ে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে গ্যালিতে ঢুকে গেল। যদি ফেলে আসে!

না নেই। গ্যালিতে নেই। ডেক-এ যদি পড়ে থাকে! না নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজছে।

সিঁড়ি ধরে ফের নামার সময় খুঁজল।

চাবিটা লক করে রাখল কোথায়।

সে পকেট হাতড়াচ্ছে আবার।— কোথায় রাখল!

মুখ ব্যাজার করে ফোকশালে ঢুকতেই দেখল, কাপ-ডিশ বের করে অঞ্জন চা ঢালছে।

এই শুয়োর, বললি চাবি আমার কাছে।

তোর কাছেই তো। চাবি বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে গেলি! শুয়োর, ডাঙা দেখলে মাথা খারাপ। তোর কপালে দুর্গতি আছে।

তোমাদের বাবা নেই?

না নেই। ডাঙা দেখলে নেশা ধরে না। মাতাল হই না। খালি চোখে কত কিছু দেখতে পাস। সুজয়দার দূরবিনটা চোখে দিলে আরও কী না দেখতিস। দাদা তো জাহাজ থেকে না নেমেই সব দ্যাখে। নারী, গাছের ছায়া, শহরের বাড়িঘরে রমণের ছবি, পার্কের বেঞ্চিতে প্রেম, সাদা পায়রার ঝাঁক, নীল সবুজ নক্ষত্ররা পর্যন্ত টুপটাপ ঝরে পড়তে থাকে। দাদার কাছ থেকে দ্যাখ হাতড়াতে পারিস কি না। ডাঙায় না নামলেও আসল কাজ হয়ে যাবে। কিনারায় না গেলেও চলবে।

সুজয় নেমে এসে বলল, হয়ে গেল। বন্দরে কাজকর্ম নেই। ধর্মঘট। এখন পচে মরতে হবে। সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার বলে গেলেন, কবে ধর্মঘট মিটবে কেউ জানে না।

ধুস, ধর্মঘট! ধর্মঘট না হলেই কী হত? জেটি কোথায়? সারা ডেক-এ ঘুরে এসেছি, নামার কোনও রাস্তা নেই। খাড়া পাহাড়। মাল বোঝাই হবে কী করে?

কেন? দেখছ না সুট বের হয়ে আছে।

কোথায়?

ওই যে চোঙের মতো। আয়।

সুজয় পোর্ট-হোলে মুখ গলিয়ে দেখাল, ওটা চালু হলে চব্বিশ ঘণ্টায় জাহাজ বোঝাই। সুটের মুখ থেকে গল গল করে তোমার মাল নেমে আসবে।

ত্রিদিব বলল, নেমে আসবে না বলে ওগলাবে বল। মনে নেই জিলঙের বন্দরে গম বোঝাই হল, কতক্ষণ লাগল?

তবে কি জাহাজিরা নামতে পারবে না কিনারায়?— বিনয় হতাশ গলায় কথাটা বলল।

নামতে পারবে না কেন? ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, যে করে হোক নামতে হবে। কবে জাহাজ মালবোঝাই হবে, আর আমরা সারাদিন পচে মরব! হয় না। তুই বরং উপরে চলে যা। পাহাড়ের মাথায় দু'-একটা করে বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

সস্তায় কেনা একটা বাইনোকুলার আছে সুজয়ের। কার্ডিফের সেকেণ্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। সুজয় প্রথম সফরেই এটা কিনে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে কসুর করে না। আসলে দূরবিনটা না থাকলে পরে আর সফর দিত কি না তাও বলা যেত না। দূরবিনে মেয়েমানুষের ছবি কখনও কখনও অলৌকিক রহস্য তৈরি করে।

সুজয় দূরবিনটা কখনওই হাতছাড়া করে না। কাউকে দেয়ও না। যেমন, পানামা ক্যানেল পার হবার সময় জলজঙ্গল পার হয়ে রাতের দিকে নির্জন শহর চোখে পড়েছিল। আসলে গভীর রাত বলে শহরটা দূরের মনে হয়েছে। কিংবা মৃত শহর, শহরটায় মানুষ থাকে বলে মনে হয়নি। স্বপ্নের শহর হতে পারে কিংবা মানুষজন এক অজানা ভয়ে শহর ছেড়ে পালালে যেমনটা হয়ে থাকে খালি চোখে সবাই অন্তত তাই দেখেছে।

সুজয় ফরোয়ার্ড-পিকে গোপনে উঠে গেছিল শহরের খবর পেয়ে। সে নোঙরের নীচে সবার অজান্তে বসেছিল দূরবিন চোখে। কে বলে মৃত শহর। আসলে আবছা বলে মানুষজন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সে পার্ক, স্কুলবাড়ি এবং রাস্তায় মজাদার দোকানের হোর্ডিংসহ সহসা কার্নিভেলের দরজায় এক রমণীকে বের হয়ে আসতে দেখেছিল। পাশে একজন পুরুষ, কুকুরের মতো পিছু নিয়েছে। ওরা হাঁটছিল। বড় কোনও গাছের ছায়ায় তারা হারিয়ে গেল। আশ্চর্য সেই পুরুষের মুখ দেখার যতবার সে চেষ্টা করেছে, ততবারই দূরবিনে এক বড় গাছ তার ছায়া, ছায়ার নীচে অন্ধকার। অন্ধকার এবং নারী কি এক। সে বুঝল, পুরুষমানুষটির মুখ দেখার চেষ্টা করা উচিত নয়। দেখতে গেলেই দূরবিন থেকে সেই রহস্যময়ী নারী হারিয়ে যাচ্ছে।

জাহাজ আবার সমুদ্রে পড়লে ভেবেছিল, পুরুষটি আসলে আর কেউ নয়, সে নিজে। বন্দরে কোনও যুবতী নারী দেখলেই মনে হয়, সে সফর করে যাচ্ছে এরা হেঁটে যায় বলে, দোকান সাজিয়ে বসে থাকে বলে। কখনও কার্নিভেলের জুয়ার রিঙে সে কী সব রূপসিরা! তাদের লাল নীল রঙের জ্যাকেটে গোলাপ ফুল, পায়ে নাইলনের মোজা এবং এত টান টান শরীর যে মনে হয় অন্তত ছুঁয়ে দিতে পারার মধ্যেও বেঁচে থাকার সার্থকতা থাকে।

সুজয় দূরবিনে আরও সব ছবি দেখতে পায়। সহসা সহসা তারা ফুটে ওঠে। একবার মনে আছে, দুটো তিমি মাছ সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। সে দূরবিনে দেখতে পেয়ে ডেক ধরে ছুটে গেছে, তিমি! তিমি! সাধারণত জাহাজে সফর যত দীর্ঘই হোক সমুদ্রে তিমি মাছের দেখা পাওয়া যায় না। খুব কম জাহাজিই বলতে পারে সমুদ্রসফরে তারা তিমি মাছ দেখেছে। গভীর সমুদ্রে নীল জলরাশি, আর কখনও অ্যালবাট্রস পাখি, মাঝে মাঝে অবশ্য ডলফিনের ঝাঁক ভেসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তিমি মাছ অথবা সমুদ্রের কোনও মনস্টার পাঁচ-সাত সফরেও সুজয় দেখতে পায়নি। কাজেই বিশাল তিমি মাছের মেটিং হচ্ছে, এ বড় দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তিমি মাছের মেটিং সম্পর্কে তার কিছু পড়াশোনা আছে। মাছদুটোর আচরণ দেখে মনে হয়েছিল সমুদ্রে পুরুষ ও নারীর এই সহবাস— তাকে অধীর করে তুলেছিল। সে দূরবিনটা সেদিন একা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিল। প্রথমে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়েছে, দেখুন স্যার। দূরে ইস্ট-ইস্ট-সাউথে তাকান।

ধুস। কিচ্ছু নেই!

দূরবিনটা ফেরত দিয়ে দিয়েছে।

সে এভাবে সবাইকে দিয়েছে, সারেং, টিন্ডাল, স্টুয়ার্টকে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কেবল সে চোখে দিলেই দেখতে পায়। কী ভয়ংকর দৃশ্য, তিমি মাছ দুটো দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে, লাফিয়ে মাথা তুলে দিচ্ছে আকাশের দিকে এবং এত নিকটবর্তী তারা যে একে অপরের উপর আক্রমণ করছে বোঝা যায়! কিছুক্ষণ সমুদ্রের নীচে। উপরে সমুদ্রের সরলরেখা দেখে বুঝতে পারে তারা আছে জলেরই নীচে। তারা আসঙ্গ লিপ্সায় কামার্ত হয়ে উঠেছে। কে যেন বলেছিল, এ সময় তিমি মাছেরা একরকমের শব্দ করে, মানুষের সহবাসের সময় হিক্কার শব্দ যেমনটা হয়ে থাকে আর কী! সেইসব শব্দমালাও সে শুনতে পেয়েছে। এটা তো হওয়ার কথা না! ইঞ্জিনের শব্দ কিংবা স্টিয়ারিং-ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে এমন গোপন শব্দমালা ভেসে আসবে কী করে? আর মনে হয়েছে, দোকানি ঠিকই বলেছে, এটা কিনে নেয় ঠিক, আবার কেন যে এটা তারা ফেরতও দিয়ে যায়। তুমি ইন্ডিয়ান, আমি ইন্ডিয়ান, তোমার কোনও ক্ষতি হয় চাই না।

সুজয়ের জেদ, সে কিনবেই। এবং কিনে ভেবেছিল তার না কোনও আবার বিপদ হয়। প্রথম-প্রথম দূরবিনটা নাড়াচাড়া করত। দেখত বসে বসে। চোখে দিত না। চোখে দিলেই কী আবার দেখে ফেলার ভয়। কিন্তু সফরে যারা যায় তারা জানে কী ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে এই সমুদ্রযাত্রা। ডারবান থেকে বুয়েনসএয়ার্সের দীর্ঘ যাত্রায় সে প্রায় পাগলা হয়ে যাবার উপক্রম। কিছু নেই, শুধু অসীম অনন্ত নীল জলরাশি। আর কিছু না। এমনকী কোনও অ্যালবাট্রস পাখিও জাহাজটার পিছু নেয়নি। শুধু ওয়াচে কাজ, বয়লারে স্টিম ঠিক রাখা, ঝড়ের দরিয়ায় মার মার কাট কাট, কাঁহাতক সহ্য হয়! আর পচা গোস্ত ভাত, সকালে চর্বিভাজা রুটি, কতদিন ভাল্লাগে। সে ভেবেছিল, দেখাই যাক না দূরবিনটা চোখে দিয়ে। সে যেমন গোপনে কিনেছিল তেমনি গোপনে রাতের বেলায়

বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে প্রথমে দূরবিনে চোখ রেখেছিল। ধুস, যত সব বাজে কথা। কিছুই নেই। সমুদ্র এবং অন্ধকার ছাড়া অলৌকিক কিছু দূরবিনের কাচে লেগে নেই। আসলে দূরবিন যেমন হয়ে থাকে তাই। বন্দরের কাছাকাছি গেলে দেখা যাবে, কিংবা কোনও দ্বীপ-টিপ চোখে পড়লে দেখা যাবে। যাইহোক এক বিকেলে সবাই শোরগোল তুলেছিল, মাটি মাটি! অর্থাৎ ডাঙা। দীর্ঘ সফরে এই ডাঙা জাহাজিদের পাগল করে রাখে। ডেক-এ সবাই উঠে এসেছে। সে-ও। দেখছে একটি সোনালি বালির ছোট্ট দ্বীপ নাক জাগিয়ে রাখার মতো সমুদ্রে ভেসে আছে। আর দুটো ফার্ন গাছ ছাড়া কিছু নেই। এমনকী কোনও কচ্ছপের খোল, মৃত স্টারফিশ এবং শামুক-টামুকও চোখে পড়েনি। সে গোপনে, একেবারে ফরোয়ার্ড-পিকের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখছে। আশা, যদি কোনও কচ্ছপ কিংবা পাখি দেখতে পায়। কিন্তু আশ্চর্য, দূরবিনে ফার্ন গাছ সে দেখল না। দুই নরনারী, নির্বাসিত হলে যা হয়, হাত তুলে তাদের ইশারা করছে। সে ভেবেছিল, সত্যি। শোরগোল তুলে ছুটে গেছে। কাপ্তান শুনে খুবই বিরক্ত, দূরবিনে তাঁরা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, দুটো ফার্নগাছ ছাড়া কিছু নেই। আব সে দেখছে দুই নির্বাসিত নরনাবী। দূরবিনটায় তবে অলৌকিক কিছু আছে।

দূরবিনের মজা সুজয় একাই ভোগ করত। কী দরকার, কেউ বিশ্বাস কবে না, সে যা দ্যাখে, অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। মাথায় তার ছিট আছে ভাবে। তার চেয়ে নিজে উপভোগ করা যাক এবং এভাবেই সে দূরবিনটা নিয়ে জাহাজ-ডেকে গোপনে উঠে যেত। গোপনে দূববিনেব মজা ভোগ করত। এভাবে সে তার নিজের মতো দূরবিনে মজার দৃশ্য দেখে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রাব একঘেযেমি থেকে আত্মবক্ষা করে থাকে। গত সফরে লস এঞ্জেলস থেকে জাহাজ নিযে ভ্যাংকুভার যাচ্ছিল। মাঝসমুদ্রে ঝড়। তালগাছ প্রমাণ সব ঢেউ জাহাজটার সঙ্গে যেন মাবদাঙ্গা শুরু কবেছিল। ঝড়ের সময় ডেক ধবে যাবার নিয়ম না। যদিও হিবিং লাইন বেঁধে দেওয়া হয়। ঝড়ে ঝাপটায় কোথায় কী ভেঙে পড়বে, উড়ে যাবে ঠিক থাকে না। ডেক-এ কাজ থাকেই, তখন হিবিং ধবে যাওযা-আসা। সে ঝড়েব মধ্যে বোট-ডেকে উঠে ঢেউয়ের তাণ্ডব দেখবে বলে দাঁড়িয়ে ছিল। এক হাতে হিবিং লাইন শক্ত কবে ধবে ঢেউযেব মাথায় প্রথমে আগুন জ্বলতে দেখেছিল। সে জানে, আগুন নয়, ঢেউযেব মাথায ফসফরাস জ্বলছে এবং অবলীলায় তাকে নেশার মধ্যে ফেলে দেবে কে জানত। সে টলছিল। সে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ কাত হয়ে যাচ্ছে, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সে বুঝেছিল বোট-ডেক খুব নিরাপদ নয়। বাত আটটা-বাবোটার ওয়াচ। মধ্যরাতে সব ধূসর। লক্ষ লক্ষ যোজন দূবেও ফসফরাসেব আলো সে যেন দূরবিনে দেখতে পাচ্ছে। আর মনে হল, মনে হল না, একেবাবে তাজা টাটকা দুই জলকন্যা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাচ্ছে। নাচানাচি কবছে। সে প্রথমে বিশ্বাস কবতে পারেনি। নীচে নেমে গ্যাংওয়ের পাশে কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ডান পা-টা খোঁটার মতো উইন্ডস-হোলে বেখে দাঁড়িয়েছে। যেন সে পড়ে না যায় কিংবা ঢেউযের ঝাপটা এসে তাকে ঠেলে ফেলে না দেয়, আত্মরক্ষা আগে, তবু নেশার আছে এক গভীর আগ্রহ, ভাল মন্দের কথা বোধহয় তখন মনে থাকে না। দুই জলকন্যা ভেসে যাচ্ছে। তারা ঢেউয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, সে তাদের স্তন এবং গ্রীবা দেখেছে। সোনালি চুল দেখেছে। কিন্তু কোমরের নীচেটা জল আড়াল করে রেখেছে। ইস্, কী আফসোস।

মুহূর্তের মধ্যে তারা এল, ভেসে থাকল জলে, হাত তুলে নাচানাচি করল, তারপর হারিয়ে গেল। সারা রাত জেগে থেকেও আর-একবার জলকন্যা দেখতে পায়নি। সে বেহুঁশ হয়ে কতভাবে আবাব দেখার চেষ্টা করেছে, চোখে পড়েনি। তাকে আবিষ্কার করা গেল উইনচ-মেশিনের তলায়। হুঁশ নেই। সবাই জানত, টিন্ডালের মাথায় ছিট আছে। ঝড় দেখতে গিযে জান নিয়ে টানাটানি। সে যে জলকন্যা দেখার জন্য সারা ডেক, ফরোয়ার্ড-পিক ছোটাছুটি করেছে রাতে কেউ জানে না। আব আশ্চর্য দূববিনটা সে দু' হাতে সাপটে ধরে রেখেছিল। ঝড়-জল হাত থেকে তার ওটা আলগা করে দিতে পারেনি।

গত সফরের দুই জলকন্যার কথা ভাবলে এখনও তার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। সে যে বেঁচে গেছে। গত জন্মের পুণ্যফল। ঢেউয়ের ঝাপটায় তার উড়ে যাবারই কথা। আসলে দূরবিনটা এমন সব অলৌকিক জগৎ তৈরি করে ফেলে যে সেখানে সে এক নিরুপায় মানুষ। অলৌকিক না সত্যি ঘটনা,

কে জানে। সাধারণত ওটা তোলাই থাকে। যত দিন যাচ্ছে তত দূরবিনটা সম্পর্কে তার নিজেরও সংশয় জাগছে। মন ভাল না। কবে দেশে ফিরতে পারবে জানে না। মুক্তার চিঠি বুয়েনসএয়ার্সে পায়নি। আজ সকালে পাইলট-বোট এসেছে। কিন্তু কোনও চিঠি আসেনি। জাহাজ থেকে নামাও যাচ্ছে না। অন্য সময় হলে, সে দূরবিন চোখে দিয়ে বসে থাকতে পারত। পর পর দু' বন্দরে স্ত্রীর চিঠি না পেয়ে সুজয় ভিতরে খেপে আছে ঠিক, কিন্তু আচরণে বুঝতে দিচ্ছে না, তার মন ভাল নেই। সে প্রায় প্রাচীন নাবিকের মতোই সমুদ্র-যাত্রায় সুখ পায়, সে তার আচরণে এমন প্রমাণ দিচ্ছে। যেন দূরবিনটা চোখে দিলেই এবারে দেখবে, মুক্তা নদীর পাড়ে বসে আছে। অথবা কোনও ট্রেনের কামরায় উঠে মুক্তা তার সেই দূর সম্পর্কের দাদার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে। সুজয় বিয়ে করার পরই টের পেয়েছিল, মুক্তাকে একা সামলানো দায়। সে যখন থাকে না তখন মুক্তা তার অবিশ্বাস্য যৌবন নিয়ে কী করবে? কিংবা এতদিন কী করেছে? তার দুই উরুর গভীরে এক অজ্ঞাত সমুদ্র বসবাস করে। সে ভেসে গিয়ে দেখেছে, ঝড়ের দরিয়ায় নিরুপায় জাহাজের মতোই তার যেন অস্তিত্ব। তবু কেন সে সমুদ্র-সফর শেষ করে যখন গায়ে নাবিকের ঘ্রাণ নিয়ে তার নারীর কাছে যায়, সে মনে করে মুক্তা তার একার।

কিন্তু সে দূরবিনে মুক্তাকে মাঝে মাঝে দেখে ফেলে। সমুদ্রে কয়েকবারই দেখেছে। বিবস্ত্র নারী। মুক্তা দাঁড়িয়ে আছে কিংবা শুয়ে আছে উলঙ্গ হয়ে। কোনও নির্দিষ্ট পুরুষের ভূমিকা সেই দাবদাহে জ্বলছে না। অরণ্য এক, কিংবা গভীর অরণ্য, জ্বলছে অথবা দাঁড়িয়ে আছে নিজের মতো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নারী এভাবেই জীবনে চুপচাপ গাছের ছায়া হয়ে থাকে। পথিক বিশ্রাম নেয়। পথিকেব জলকষ্ট সে দূব করে মাত্র।

এবারে মনে হয় দূরবিনটা চোখে রাখলে সাংঘাতিক সব ছবি দেখে ফেলবে।

এবং একবার মুক্তা তাব বাক্স হাঁটকাতে গিয়ে দূরবিনটা পেয়ে গেছিল। আর দূরবিনে চোখ রেখে সে যা বলে গেল, সব তাজ্জব ঘটনা।

তুমি জুয়ার রিঙে দাঁড়িয়ে আছ।

কোথায়!

কোথায় জানি না। ওরা লাল নীল বল এগিয়ে দিচ্ছে।

আরে, কোথায় বলবে তো?

জানি না। হাতের ইশারায় দরদাম করছ। সে তোমার ভাষা বোঝে না, তুমিও না। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে কী দেখাচ্ছ! পরে দু' হাতের দশ আঙুল। নীল চোখ মেয়েটির, নীল চুল। আপেলেব মতো গায়ের রং। তুমি ওকে জাপটে ধরেছ। সে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে। পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসলে। ঠিক পার্কের পাশেই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।

ধুস।

বলে দূরবিনটা কেড়ে নিয়েছিল। এবং রাতে কেন মুক্তাকে গোপনে খুন করার চেষ্টায় উঠে বসেছিল জানে না। মিছে কথা নয়। বানানো নয়। হুবহু মিলে যাচ্ছে। সে বেহুঁশ তখন। এবং সব মনে পড়ে যেতেই সংকোচে বলেছিল, দূরবিনটার মাথা খারাপ আছে।

তারপর সে ফের সঙ্গ দেবার আগে ওটা এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছিল যে মুক্তা খুঁজে বার করতে পারেনি। প্রায় সব ঘটনা দূরবিনের কাচে কি চালচিত্রের মতো ভেসে থাকে? সেবারই সে ভেবেছিল, কখনও ফের কার্ডিফে গেলে দূরবিনটা ফেরত দিয়ে দেবে। ফেলেও দিতে পারে। কিন্তু ভয় করে। যদি কিছু হয়! এবারে কার্ডিফ যাবার কথা।

জাহাজ বোঝাই হলেই সোজা কার্ডিফে জাহাজ পাড়ি দেবে। সে বিনয়কে বলল, তুই দূরবিনটা নিবি? ওটা চোখে দিলে বন্দরে নামার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। মনে মনে যা চাস তাই পাবি।

কী যে বলিস!

সত্যি বলছি।— সুজয় বেশ গম্ভীর গলায় বলল। তারপর কী ভেবে বলল, তুই নিয়েও নিতে পারিস। ফেলে দিতেও পারিস।

আবার কী ভেবে বলল, না, না, ফেলে দিবি না। ফেরত দিবি।

বিনয় দূরবিনটা নিয়ে উপরে উঠে বসেছিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। ত্রিদিবও গেল দেখতে। অঞ্জন বলল, দে তো দেখি, কী এমন আছে! ব্যাটার মাথা খারাপ। বউয়ের চিঠি না পেয়ে আরও মাথা খারাপ। মুখে যা আসে, বলে!

তারা দেখেছে, গাছপালা, পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় ঘরবাড়ি। এছাড়া নারী পুরুষ, বালক বালিকা, খেলার মাঠ। সাধারণত যা দেখা যায় তাই দেখেছে। আর কিছু না। তবু দূরবিনে চোখ রাখাব মধ্যে বোধহয় কোনও নেশা থাকে। জাহাজ বয়াতে বাঁধা। ডাঙায় নামতে পারছে না। তারা ফাঁক পেলেই এখন সুজয়ের দূরবিনটা নিয়ে বোট-ডেকে গিয়ে বসে থাকে। আশ্চর্য, সুজয় কোনও আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না দূরবিনটা নিয়ে। তবে একদিন বিনয় হঠাৎ অবাক হয়ে গেল, দূরবিনের ভেতর দিয়ে বিশাল নদীর মোহনা দেখতে পেল। ঘোলা জল দেখতে পেল। অজস্র কুমির ভেসে আছে দেখতে পেল। কোনও উপজাতি এলাকায় মানুষ কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে দেখতে পেল। গভীর অরণ্য এবং এক গোপন শুঁড়িখানাও চোখের উপর ভেসে উঠল।

কিন্তু এসব তো দেখার কথা না। শুঁড়িখানা অবশ্য পাহাড়ের মাথায় থাকতেই পারে, কিন্তু নদীর মোহনা আসবে কী করে? সে দেখল, দেখে কিন্তু বলতে পারল না, সে আমাজন নদীর মোহনা দেখে ফেলেছে। সে বলতে পারল না, বিশাল ব্যাপ্ত দিগন্ত জুড়ে পাহাড ভেঙে নদী নীচে নেমে আসছে। জলপ্রপাতে উড়ছে অজস্র অতিকায় পাখি, তারা কক্ কক্ করে ডাকছে, আব ছোঁ মেরে বড় বড় মাছ তুলে নিয়ে গভীর অরণ্যের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

আর-একদিন সে দেখল, পাহাড়ের মাথায় এক নারী দাঁডিয়ে আছে। ঢিল ছুঁড়ছে নীচে। ঢিলটা গড়িয়ে পড়ছে। পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে ঢিলটা ঠিক জাহাজের নীচে জলের মধ্যে টুপ করে ডুবে গেল।

আর-এক বিকেলে দেখল, কোনও নারী, না সেই একই নারী এসে দাঁড়িয়েছে পাহাডের মাথায়। মুখ কিছুতেই স্পষ্ট নয়। শুধু সে তার জ্যাকেট খুলে হাওয়ায় উডিয়ে দিল। লাল জ্যাকেট নীচে গড়িয়ে পড়ল না। গাছের ডালে আটকে থাকল। হাওয়ায় উড়তে থাকল।'

একদিন দেখল, সে তার স্কার্ট খুলে উড়িয়ে দিচ্ছে। ওটা আরও উপরে ঝুলে আছে। যেন সে পুরুষের প্রতি কোনও প্রতিযোগিতা ছুঁড়ে দিয়েছে। বিনয় একবার ভাবল, সবাইকে বলে। আবার কী ভাবল কে জানে, নিজের মধ্যেই গোপন করে রাখল, নারীর এই প্রতিযোগিতায় আহ্বানের কথা।

তবু যা হয়ে থাকে, কারণ ভেবেছে, প্রতিযোগিতার আহ্বানে সে সাড়া দেবেই। কিন্তু অবিশ্বাস্য এই প্রতিযোগিতার কথা বন্ধুদের বলবে কি না ঠিক করতে পারছে না। এই খাঁড়ি নদীতে হাঙর এবং কুমিরের উপদ্রব আছে। একদিন তারা ছোটমতো একটা কুমিরের বাচ্চাকে রোদ পোহাতেও দেখেছে। খাঁড়িতে যে বিশেষ নৌকা কিংবা অন্য জলযান কিংবা সাঁতার কাটা, কত কিছুই তো হতে পারে, এমন সুন্দর সমুদ্রের খাঁড়িতে কেউ সাঁতার কাটে না ভাবতেই তারা অবাক হয়েছিল, পরে বুঝেছে এই খাঁড়ির মধ্যে নামা খুবই বিপজ্জনক খেলা।

কিন্তু সে কী করবে? সে-ও এক বিপজ্জনক খেলার শিকার।

নারী একদিন তার জাঙিয়া খুলে ফেলল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই নারী পর পর একই সংকেত পাঠাচ্ছে। তারও কি আছে আশ্চর্য দূরবিন? যা চোখে দিয়ে বুঝতে পারছে, জাহাজের আগিলে যে বসে আছে সে আসলে কী খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে কী চায়। নারী টের পেয়ে গেছে।

একদিন সে সুজয়কে বলল, এই দ্যাখ তো, উপরে, ওই যে লালমতো বড় একটা পাথর আছে, আরে ওদিকে না, ওই যে দেখছিস না খাড়া পাহাড়? তার নীচে জলপাই রঙের একটা জঙ্গল, কোমর সমান উঁচু ঝোপজঙ্গল, মনে হবে একপাল হলুদ রংয়ের ভেড়া ঘাস খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

গাছটায় জ্যাকেট উড়ছে লাল মতো।

কোথায়!

দ্যাখ না। ভাল করে দ্যাখ।

না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি শালা কিছু দেখতে পাবে, কিছু দেখতে পাবে না। সর।

বলে কনুইতে ঠেলা মেরে এগিয়ে গেল। দূরবিনে সে দেখল, ওই তো সেই লাল জ্যাকেট, নীল রঙের স্কার্ট, সাদা রঙের জাঙিয়া গাছে ঝোপেজঙ্গলে আটকে আছে। সুজয় দেখতে পাচ্ছে না, সে পাচ্ছে।

আশ্চর্য!

বিনয় বিকেল হলেই সাফসুতরো হয়ে ফরোয়ার্ড-পিকে গিয়ে বসে থাকে। জাহাজ বন্দর ধরলে কিছু মেরামতির কাজ থাকে। এছাড়া কয়লার বাংকারেও কাজ থাকে, বিশেষ করে ক্রস-বাংকারে। কয়লা লেবেল করার কাজ, স্মোক-বক্স পরিষ্কার করার কাজ এবং এমন নানাবিধ কাজ যেমন ইঞ্জিন-রুমের রেলিং, পাটাতন সিরিশ কাগজ মেরে ঝকঝকে করে রাখতে হয়। তেল কালিতে নীল প্যান্ট-শার্ট ধূসর হয়ে ওঠে। বিকেলে কাজ সেরে আফটার-পিকে উঠে বিনয় এক দণ্ড দেরি করে না। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আজ আবার কী সংকেত পাঠাবে কে জানে! সে সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নীচে নেমে যায়। তোয়ালে সাবান বালতি মগ নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে যায়। রা রা করে গান গায়। এবং নীচে নেমে বাবু সেজে দূরবিনটা গোপনে পকেটে নিয়ে উঠে যাবার সময় অর্ডার, এই ত্রিদিব, আমার চা-টা দিয়ে আসবি।

ত্রিদিব দিয়েও আসে। কারণ বিনয় এ সময় জাহাজের সামান্য ফায়ারম্যান নিজেকে ভাবতে পারে না। মেজাজ-মরজি কাপ্তানের মতো একেবারে। ত্রিদিব অঞ্জন শুনেই বলবে, যে আজ্ঞে। আপনি যান। দিয়ে আসব।

কারণ তারা জানে, ওই সামান্য এক কাপ চা ফরোয়ার্ড-পিকে দিয়ে এলে, সকালের দিকে আর-কাউকে না উঠলেও চলবে। বিনয় তখন চা করে, কাপ সাজিয়ে সবাইকে ডেকে তুলবে কিংবা বারোটার মেসরুমে থালা ধুয়ে ভাত ডাল সবজি সাজিয়ে বসে থাকবে, মাত্র এক কাপ চা দিয়ে আসতে পারলে গোলামের মতো বিনয় সকালে দুপুরে সবার ফাইফরমাশ খাটে।

বিনয় ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে রুমাল দিয়ে পাটাতন সাফ করে নিল। সকাল থেকে জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে। ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলকায় সুট থেকে গলগল করে লাল পাথর নেমে আসছে। সারা ডেক ধুলোবালিতে ধূসর হয়ে উঠছে। হাওয়ায় উড়ছে তেমনি সেই দূরের জ্যাকেট। এবং বিনয় আজ এ কী দেখছে? একেবারে নিরাবরণ নারী?

বিনয় কেমন পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল। নীচে দেখল দু'-একটা বোট লেগে আছে, কিনার থেকে শাকসবজি মাছ নিয়ে আসছে বিক্রি করার জন্য। সবাই ল্যাটিন আমেরিকান, নাক থ্যাবড়া, চুল কোঁকড়ানো, তামাটে রং মানুষগুলির এবং সেই নারী যে অপেক্ষা করছে উপরে ঠোঁট পুরু, নাক থ্যাবড়া, চুল কোঁকড়ানো, আর স্তন এবং জংঘাস্থলে নীল মাছি, সে দেখেছে নীল মাছিরা ওড়াউড়ি করছে। এবং এইসব নীল মাছিরা তাকে যে ভিতরে ভিতরে পাগল করে দিয়েছে বোঝা যায়, কারণ সে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বোটে নেমে যাচ্ছে। টিন্ডাল বলছে, এই তুই একা কোথায় যাচ্ছিস! আরে তুই যাবি কোথা? দূরবিনটা দিয়ে যা। ওটা নিবি না।

সাবেং বলল, আরে তুই ফিরবি কী করে? কাছে-ভিতে সব জঙ্গল। খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা যায় না।

আসছি চাচা, বেশি দেরি করব না।

ত্রিদিব বলল, কোথায় যাচ্ছে?

ওরা রেলিং-এ ঝুঁকে দেখল, সে বোট থেকে দূরে লাফিয়ে নেমে গেল। ইশারায় কী বলতেই বোট লাগিয়ে দিয়েছে খাড়া পাহাড়ের নীচে। বিনয় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করছে। লোকগুলি কিছুক্ষণ দেখল, মাথা খারাপ আছে ভাবতে পারে। রাতে ফেরার বোট পাবে কোথায়? সকালে জাহাজ ছেড়ে দেবে।

ত্রিদিব বলল, কেন যে তুমি দূরবিনটা দিলে বুঝি না দাদা! এখন বোঝো!

সুজয় বলল, চল তো, ব্যাটাকে ধরে আনি।

এবং সুজয়ের অনুমান, দূরবিনের ভুতুড়ে দৃশ্য ব্যাটার মাথা খারাপ করে দিতে পারে। সে নিজেও

একবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। সে তার স্ত্রীকে খুন করবে ভেবেছিল। নেশা। নেশা মানুষকে পাগল করে দিতেই পারে। এবারে জাহাজ কার্ডিফ যাচ্ছে, দূরবিনটা ভেবেছে দোকানিকে দিয়ে দেবে। যা ফেরত দেয় তাই নেবে। এটা সঙ্গে রেখে জীবন বিপন্ন করার কোনও মানে হয় না।

ওরা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। বোটের লোকজন এক বর্ণ ইংরাজি বোঝে না। ইশারায় সব বলতে হচ্ছে। সারেং উপর থেকে বলল, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

ব্যাটাকে ধরে আনতে।

কিনারায় নেমে ওরা হতবাক। একেবারে এত খাড়া পাহাড় যে কিছুটা উঠেই মাথা পাক খেতে শুরু করেছে। ত্রিদিব বলল, আমার দ্বারা হবে না। সে গাছের গুঁড়ি ধরে খুব সতর্ক পায়ে নীচে নেমে এল।

ত্রিদিব জোরে ডাকল, এই বিনয় বি—ন—য়।

পাহাড়ে শুধু প্রতিধ্বনি ওঠে, বি—ন—য, বি—ন—য।

এমনকী ঢিল ছুঁড়লেও পাথরে, প্রতিধ্বনি ওঠে। আশ্চর্য প্রতিধ্বনি।

সাঁঝ লেগে গেল। অনেক উপরে শহর, ওখানে ওঠার এদিক থেকে কোনও রাস্তাই নেই, পাঁচ সাত ক্রোশ দূর থেকে লোকজন সব বোটে এসেছে। তারা কাজকর্ম করে বোটেই ফিরে যাবে। পাহাড়ের ভেতর থেকে জাহাজের উপর সার্চ লাইটের মতো আলো। এখন বিনয় কী করে যে ফিরবে। কিংবা গেল কোথায়? কতটা উঠতে পারবে? যতই সাহসী হোক, নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যাবে। কিংবা গাছের গুঁড়ি আলগা হয়ে গেলে নীচে গড়িয়ে পড়বে, কী যে করা। সুজয়ের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। পাহাড় ক্রমে ধূসর হয়ে উঠছে। জাহাজ থেকে পাহাড়ের-মাথায় ঘরবাড়ি দেখা গেলেও কিনার থেকে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সামনের গাছপালা, ঝোপজঙ্গল সব আড়াল করে রেখেছে।

বোটের মাঝিরাও আর থাকতে রাজি না। তারা ফিরে যাবে। অগত্যা কী করা? নিরুপায় তিন নাবিকের জাহাজে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না।

সারা রাত তারা জেগে থাকল। ডেকের রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল। মালবোঝাই শেষ। ধুলোবালির মধ্যেই দাঁড়িয়ে দেখল, কেউ জাহাজে উঠে আসে কি না। সারেংকে খবর দিল। সেকেন্ড অফিসারকে। কিন্তু কোথায় খোঁজ করা হবে, কে খুঁজবে। যে যার দায়িত্বে জাহাজে আসে। সকালে কাপ্তান লগবুকে লিখলেন, একজন জাহাজি নিখোঁজ। কিনার থেকে ফিরে আসেনি। জাহাজ ছাড়ার সময় ত্রিদিবের চোখ সজল হয়ে উঠল। কাপ্তান ওদের ডেকে পাঠিয়েছেন। লগবুকে সাক্ষী হিসাবে ওদের সই করতে হবে। কটায় গেছে, কীসে গেছে। স্থানীয় থানায় বেতার-সংকেতে একজন জাহাজি এবং তার নাম পরিচয়, আকৃতি, পরনে কী ছিল, কোন দেশের, সব বিবরণ দিয়ে ডাইরি করে রাখা হল।

আর তখন দেখা যাচ্ছে সুজয় ডেক-এ দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দূরবিনে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। যদি পাহাড়ের মাথায় কেউ হাত তুলে দেয়, আমি আছি দাদা, বেঁচে আছি।

কেউ কোথাও থেকে বেঁচে থাকার সংকেত পাঠাল না।

হঠাৎ মনে হল, দূরবিনের কাচ স্থির হয়ে গেছে।

মানুষের মৃতদেহ।

মরে পড়ে আছে।

অঞ্জন, অঞ্জন।

সে দৌড়ে এল ডেক ধরে। অঞ্জন ইঞ্জিন-রুমে। সারেং বলল, টিন্ডাল, কী হয়েছে? এভাবে ছুটছ কেন?

দেখুন, দেখুন।

হাঁকডাকে ত্রিদিব উপরে উঠে এসেছে। সে বলল, কই দেখি।

সে দেখল, পাহাড়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লে যেভাবে কোনও মানুষ পাথরে মরে পড়ে থাকে, তেমনি কোনও মানুষের ছবি। জাহাজ ভেসে যাচ্ছে। সে বলল, সারেং সাব দেখুন।

সারেং সাব বললেন, কই? কোথায়!

কেউ বিস্ময়কব কিছু দেখতে পেল না। কেবল গাছপালা, পাথর আর পাহাড়।

শুধু ওরা তিনজন দেখল, কেউ যেন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছে। আর উঠতে পারেনি। জাহাজ ভেসে যাচ্ছে। কোনও এক মধ্যরাতে দেখা গেল গভীর সমুদ্রে সুজয় দাঁড়িয়ে আছে। সে দূরবিনটা সমুদ্রেব জলে ফেলে দিচ্ছে।

বর্ণপরিচয়

লিয়ানার বাবা আরিতুসের ঘুম ভাঙে খুব সকালে। এটা তার অভ্যাস। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠতে না পারলেই তার খুব খারাপ লাগে। শুধু যে কাজ কামে দেরি হয়ে যায় বলে নয়, এমনিতেই স্বভাব তার আগে ওঠার। আসলে সূর্য ওঠার আগে এইসব দ্বীপ, পাহাড়, সমুদ্রের কোনও গভীর সৌন্দর্য এবং বিষণ্ণতা সে তখন আশ্চর্যভাবে টের পায়। এটা তার নেশা।

যেমন সে খুব সকালে পাহাড়ের টিলায় উঠে গেলে দেখতে পায় দূর সমুদ্রে কুয়াশার মতো মেঘ ঝুলে আছে। অথবা গভীর নীল আকাশের নীচে শুকতারা'টি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। একটিমাত্র তারা বিশাল সমুদ্র পার হয়ে আকাশের গায়ে কী যে রহস্যময়তা সৃষ্টি করে ফেলে, যতক্ষণ না নক্ষত্রটি হারিয়ে যায়, দিনের আলো ফুটে ওঠে, সে টিলায় বসে থাকে কোনও অবোধ বালকের মতো।

দূরবর্তী কোনও দ্বীপে তার প্রিয় সেই নারী চলে গেছে।

কোনওদিন দেখতে পায় সমুদ্র থেকে লাল সূর্যটা যেন লাফিয়ে উঠে যায় আকাশে। অ্যালবাট্রস পাখিরা উড়ে যায় সাদা ডানা মেলে। সে শুধু দ্যাখে।

আবার কোনওদিন গভীর কুয়াশার ভিতর সে হেঁটে যায়। দ্বীপের বাড়িঘর টিলা সব কেমন জাদুবলে অদৃশ্য। নারকেল গাছের ছায়ায় সে চুপচাপ বসে থাকে, কুয়াশা কেটে গেলে টিলার উপর বসে ভোরের সমুদ্র দেখবে বলে। কখনও ঝড়ের হাওয়া বয়ে যায় দ্বীপটির উপর দিয়ে। বৃষ্টিপাত হয়। সেই ঝোড়ো হাওয়া কিংবা বৃষ্টির মধ্যেও আরিতুস ভালবাসে সকালের সূর্য ওঠার আগে টিলার মাথায় উঠে যেতে।

অথচ আজ তার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। সে টেরই পায়নি সূর্য কখন জেটির ওপাশে উঠে গেছে। কখন নীচের রাস্তায় মাহিমের ঘোড়াটা পাথরের সবুজ ঘাস, সাদা ফুল চেটে খাবার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে বনজঙ্গল পার হয়ে যাচ্ছে।

আসলে ভোররাতের দিকে আজ টের পেয়েছিল, কেউ কাঁদে।

কে কাঁদে সে জানে।

কারণ সেও ভিতরে ভিতরে কোনও গভীর ভালবাসায় চোখ বুজে থাকলে টের পায় তার দু'গাল বেয়ে গোপনে অশ্রুপাত হচ্ছে। সে গোপনে অশ্রুপাত করে। যেন লিয়ানা টের না পায়, বাবা কাঁদছে। সে তো লিয়ানাকে প্রবোধ দিচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, হাতে টাকা পয়সা হলেই তারা দু'জন সেই দ্বীপে চলে যাবে। জাহাজে পাঁচ-সাতদিন লাগে। কোনও যাত্রীজাহাজ এখানে আসে না। মালবাহী জাহাজে যাওয়া যায়। পাঁচ-সাতটা কেবিন খালি পড়ে থাকে সব জাহাজেই। তবে যে জাহাজের ফিজি অঞ্চলে যাবার কথা, কেবলমাত্র সেই জাহাজেই তারা যেতে পারবে।

আজ হঠাৎ মাঝরাতে লিয়ানা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। তার টিলার উপর জামপাতার কুটিরে ঝড় বাদলা কিংবা কুয়াশা না থাকলে নক্ষত্রের কিংবা চাঁদের আলো ঢুকে যায়। চোখ মেলে তাকালে অস্পষ্ট আলোর আভাসে দেখা যায় সব কিছু। দু'পাশে দুটো ঝুলন খাটিয়া। দড়ি দিয়ে খাটিয়াদুটো চালের কাঠের সঙ্গে বাঁধা। বসে থাকলে ঝোলে, সমুদ্রের হাওয়ায় দোলে।

সে মেয়ের শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বালিশে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরিতুস কিছু বলতে পারে না। সে জানে, মা'র কথা মনে পড়লেই লিয়ানা কেমন স্থির থাকতে পারে না। দশ-বারো বছরের বালিকার কান্না এমনিতেই

পীড়াদায়ক। আর সে-কান্না যদি মা'র কথা মনে পড়লে হয় তবে অসীম কষ্ট। বুকটা ভার হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সে শিয়রে গিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখতেই লিয়ানা যেন আরও ভেঙে পড়েছিল। হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি আমাকে কোনওদিন আর মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি বুঝি না ভাবো!

আরিতুস জানে, লিয়ানা একবর্ণ মিছে কথা বলছে না। সে ফসফেট খাদের সামান্য একজন শ্রমিক। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়েও সে সমুদ্রযাত্রার পয়সাকড়ি জমাতে পারবে না।

আরিতুস তবু নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছে লিয়ানাকে।

যেমন বলেছে, সকালে উঠে লিয়ানাকে আজ বাজারের দিকে নিয়ে যাবে। তাকে নতুন ফ্রক কিনে দেবে।

যেমন বলেছে, টিলার মাথায় নারকেল পাড়তে গেলে ও একা যাবে না। সঙ্গে লিয়ানা থাকবে। কী মজা না হবে, উঁচু-নিচু রাস্তা খোয়াই ধরে দু'জনে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের কোনও টিলায় উঠে যাবে। যদি মাহিমের ঘোড়াটা রাস্তায় থাকে তবে লিয়ানা ঘোড়ায় চড়েও উপরে উঠতে পারবে।

লিয়ানা কোনও কথাই শোনেনি। কেবল ফুঁপিযে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

শেষে আরিতুস না পেরে বলেছিল, ঠিক আছে আজ আর কাজে যাব না। সকালেই আমরা ডিঙি ভাসিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাব। যাবি, দেখবি কী ঢেউ! কী সাদা ফেনা! তুই হালে বসে থাকবি। আমি সব শিখিয়ে দেব।

সত্যি নিযে যাবে?

হ্যাঁ, বলছি তো।

না, তুমি মিছে কথা বলছ।

আরে না না, যাবি। সঙ্গে যাবি। না হয় আজ আমরা সারাটা দিন সমুদ্রেই ভেসে থাকব। খাবার করে নেব। চিংড়ি মাছ পোড়া, সরষে বাটা আর ভাত। কী মজা হবে বল?

তারপরই হতাশ গলায় লিয়ানা কেমন বলে ফেলল, আমি সাঁতার জানি না যে! সাঁতার না জানলে যাব কী করে?

এটা ঠিক, লিয়ানা জলে নামতে বড় ভয় পায়। বাবা তাকে বালিয়াড়িতে কতদিন নিয়ে গেছে। হাত ধরে নিয়ে গেছে জলে। কিন্তু হাঁটুজলে নেমেই পালিয়েছে।

লিয়ানা জলে নামতে চায় না।

এ সমুদ্রে প্রায় বছরই কেউ নিখোঁজ হয়ে যায়। এমনকী বাবা কাজ থেকে ফিবে ডিঙি ভাসিয়ে দিলে সে জেটির পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। মাহিম দাদুর ঘরে গিয়ে বসে থাকে। তখন তার টিলার উপব জামপাতার ঘরে একা বসে থাকতেও খারাপ লাগে। বাবা গেছে সমুদ্রে মাছ ধরতে। না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা থাকে। নৌকায় থাকে লাল লম্ফ। তার আলো অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে আলোর সংকেত পাঠায় বাবা। রাত হয়ে গেলে আলোর সংকেতে টের পায় বাবা তার ফিরছে। সে তখন দৌড়াতে থাকে। কী মাছ পেল! এক রাতে তো বাবা ফিরেই এল না! ফিরে যে রোজই আসে তা না। তবে দূর সমুদ্রে গেলে বলে যায়। বলে যায় ফিরতে দেরি হবে। ইস্, সেদিন কী কান্নাকাটি! মাহিম দাদু বলেছে, কাঁদিস না। বড় মাছ গেঁথে গেলে হয়। আমার তো একবার তিন দিন তিন রাত লেগে গেছিল মাছটাকে কব্জা করতে। ব্যাটা কিছুতেই জলে ভাসবে না। আরে, আমার নাম মাহিম, আমি ঘোড়ায় চড়ে ডাব বিক্রি করে খাই, তুই সামান্য জীব জলের নীচে, কোথায আমাকে কতদূর আর নিয়ে যেতে পারিস!

সত্যি বাবা ফিরে এল পরদিন সকালে। ক্লান্ত। ডিঙিটা উপরে তুলে শুধু লিয়ানাকে বলেছিল, ব্যাটা হারমাদ। শেষে ডিঙি উল্টে দিয়ে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। কী আর করা! জলের মাছ, জলেই থাক।

বলেই টলতে টলতে উঠে বাজারের রাস্তা ধরেছিল। কত লোক, কত প্রশ্ন, বাবা কারও কথার জবাব দেয়নি। কতক্ষণে গিয়ে টিলার জামপাতার কুটিরে বাবার ঝুলন-খাটে গড়িয়ে পড়বে!

লিয়ানা হতাশ গলায় বলেছিল, আমি কবে সাঁতার শিখব।
সে তো তোর ইচ্ছে। তোকে তো জলেই নামানো যায় না।
আমি আজ সাঁতার শিখতে যাব। কেমন?
যাবি। ঠিক আছে যাবি।

আবিতুস জানে সকালে কোনও কথাই লিয়ানার মনে থাকবে না। সে তখন বাবার জন্য শাক তুলে আনবে পাহাড়ের বনজঙ্গল থেকে। বাবা কী খাবে, না খাবে, সেই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। দৌড়ে নামবে টিলা থেকে। জল নিয়ে আসবে নীচের কল থেকে। তারপর বাবা খাদে চলে গেলে সে এই ঘরে কিংবা সাগুনের কাছে চলে যাবে। লেসের কাজ শিখছে। লেসের সুন্দর সুন্দর কারুকাজ সে নিবিষ্ট মনে দেখতে ভালবাসে। শিখতে ভালবাসে।

আবিতুসের শেষরাতের দিকে ঘুম আসছিল না। মেয়েটা আবার শুয়ে পড়েছে। সে পাশের মোড়ায় বসে ঝুলন-খাটিয়ায় দোল দিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল লিয়ানা। সেও নিজের খাটে শুয়ে চোখ বুজেছিল। আর-একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। সারা দিন খাদে অমানুষিক খাটুনি। বড় বড় পিপের মধ্যে ফসফেট ভরে নীচ থেকে তাকে হাবিয়া হাপিজ করতে হয়। যখন খাদ থেকে উঠে আসে তাকে চেনা যায় না। ফসফেটের হলুদ রঙের গুঁড়ো জামা প্যান্ট ঝাড়লে বাতাসে উড়তে থাকে। চোখদুটো জবা ফুলের মতো লাল থাকে। মাথার টুপি ঝেড়ে সোজা সে সমুদ্রে যায় স্নান করতে। তারপর ঘরে ফিরে এক বালতি মিষ্টি জলে গা ধুয়ে নেয়।

আর-একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হত। তার হাই উঠছে। আর এ সময় চারপাশে শুধু সমুদ্রগর্জন। দিনরাত এই পাহাড়টায় এসে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রগর্জনের মধ্যে থাকে আশ্চর্য এক নেশা। তার ঘুম না এলে নিবিষ্ট মনে সেই গর্জন শুনলে কখন ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। আজও সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুম ভাঙলে দেখল বেশ বেলা হয়ে গেছে। রোদ এসে জানালায় পড়েছে। সামনের সবুজ লন, এটা সে অনেক কষ্টে দিনরাত খেটে, খুঁটি পুঁতে পাহাড় থেকে নুড়িপাথর এনে সামনের কিছুটা জায়গা উঠোনের মতো করে নিয়েছে। এখন সেখানে সবুজ ঘাস গজিয়েছে। শীতকাল এলে সবুজ ঘাসে সুন্দর সব সাদা ফুল ফুটে থাকে।

এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠায় মনটা খচখচ করছিল আবিতুসের। আজ টিলায় যেতে পারল না। সমুদ্রে কোনও নক্ষত্র টুপ করে ডুবে যেতে দেখল না, অথবা কোনও পালের ডিঙি দ্বীপে ফিরে আসছে তার দৃশ্য, অথবা চারপাশের গভীর বনজঙ্গলে শিশির পড়ে থাকে, ঘাসে শিশির পড়ে থাকে। সূর্যোদয়ের আগে ঘাসের শিশির মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়ার আনন্দই আলাদা।

দ্বীপের লোকজন সব যে-যার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। আজ রবিবার। ছুটির দিন, তাই রক্ষে। দূরে সে দেখল খাদের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে না। সাইরেন বাজছে না। দ্বীপটার ওদিকে আছে সমতলভূমি। সেখানে খাদের বড়কর্তাদের ঘরবাড়ি, শহর, রাতে বিজলি বাতি পর্যন্ত জ্বলে।

সকালেই দেখতে পায় কোনও কোনও জাহাজ দূরে বয়ায় বাঁধা। কোনও জাহাজ জেটিতে। একটাই জেটি। জাহাজ ফসফেটে ভর্তি হলে চলে যায়। বয়ায় বাঁধা জাহাজটা তখন জেটিতে এসে লাগে। সিজন টাইমে, তিন-চারটা জাহাজও ভিড়ে থাকে। এখন ঠিক সিজন টাইম নয়। ঝড় বাদলার দিন। ফসফেটের খাদে এত জল জমে থাকে, জল সরিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়াই কঠিন।

ছুটির দিনে আবিতুস সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সকাল-সকাল বের হয়ে পড়ে। তার আগে বাপ-বেটিতে হাতের কাজ সব সেরে ফেলে। কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠেই দেখল, লিয়ানা দরজায় চুপচাপ বসে আছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। লিয়ানা মাঝে মা'র কথা ভুলেই গেছিল। কিন্তু আবার কেন যে তার মা'র জন্য এত মন খারাপ বুঝে উঠতে পারছে না। অবশ্য শীতকাল এলেই এটা হয়। কারণ এক শীতকালের সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছিল, তার মা ঘরে নেই।

এক কথা, মা কোথায়?
আবিতুস ঝুলন-খাটে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। কোনও জবাব দেয়নি।
আমার মা কোথায় গেল।
আবিতুস বলেছিল, তোমার মা কাকাতিয়া দ্বীপে গেছে বেড়াতে।

কেন বেড়াতে গেল?

আরিতুস কী জবাব দেবে ভেবে পায়নি।

আমাকে নিয়ে গেল না কেন? আমি মা'র কাছে যাব।

যাবে। বড় হও। তোমাকে নিয়ে যাব।

আমি কবে বড় হব?

সেই তো কবে বড় হবে, আরিতুস কীভাবে বলতে পারে! আর সেই অনিশ্চিত বড় হওয়ার দিন আদৌ লিয়ানার জীবনে আর আসবে কি না সে জানত না। সে তার মেয়ের সামনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করত। যেন এটা এমন কোনও গুরুত্ব দেবার মতো বিষয় নয়। বেড়াতে যেতেই পারে। এক জায়গায় কেউ বন্দি হয়ে থাকতে চায় না। সে গোপনে যে কষ্ট এবং হতাশা পুষে রেখেছিল, লিয়ানাকে তা কখনও বুঝতে দেয়নি।

আজও বলল, এই রে, আবার চুপচাপ বসে থাকলি! চিনি আছে? চা করছি। খা।

সে নিজেই খড়কুটো জ্বেলে চা বানায়। নারকেলের সেদ্ধ মালাই, দুধ চিনি তেজপাতা, আখরুট বাদাম এবং আনারস দিয়ে তৈরি খাবার কৌটো থেকে বের করে মাটির পাত্রে ঢেলে লিয়ানাকে দেয়। সে খায়। খেতে খেতে দু'জনে গল্প শুরু করে দেয়।

কী রে, একটা জাহাজও আসেনি!

তুমি যে বাবা বলেছিলে ক্ল্যান লাইনের জাহাজ আসবে।

আসবে, ঠিক আসবে।

কারণ আরিতুস সময় পেলেই তার পূর্বপুরুষের দেশ, সেটা কোথায়, কারা সে জাহাজে আসে তার গল্প করত। ক্ল্যান লাইন, ব্যাংক লাইন, ক্রক লাইনের জাহাজ জেটিতে এসে ভিড়লেই আরিতুসের মন প্রসন্ন হয়ে যায়। লিয়ানা এটা অনেকবার টের পেয়েছে।

দুই

সুদূর ফিজি থেকে এসেছিল ইলিয়া। ইলিয়া আরিতুসকে বলত, তার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের মানুষ ছিল।

আরিতুস বলত, আমার ঠাকুরদার বাপের ঠাকুরদা এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। ঠিক এই দ্বীপটার মতোই সেখানে আম-জামের গাছ আছে শুনেছি। বর্ষা-শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম সব ঋতুই দ্বীপটার মতো।

অবশ্য আরিতুস বাঙালি নাবিক এলেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। আসলে সে যখন সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরে তখন তার একমাত্র লক্ষ্য সিটি কিংবা ক্ল্যান লাইনের জাহাজ এল কি না। চিমনি দেখে কোন লাইনের জাহাজ সে চিনতে পারে। এসবও তার নাবিকদের কাছ থেকেই শেখা।

আরিতুস ইলিয়াকে বলত, আমার ঠাকুরদার বাবার ঠাকুরদার ওসানিকা দ্বীপে কাঠের ব্যবসা ছিল।

আসলে এই অঞ্চলে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ। অধিকাংশ দ্বীপেই ফসফেট পাওয়া যায়। এজন্য দ্বীপগুলিতে মানুষের বসবাস গড়ে উঠেছে। যেমন এই নেরু দ্বীপটায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কোনও মানুষেরই বাস ছিল না। ব্রিটিশ ফসফেট কোম্পানি খাদের কাজে, বাড়িঘর বানাবার কাজে দূর ফিজি কিংবা ওসানিকা দ্বীপ থেকে মানুষজন আমদানি করেছে। তারাই এখন দ্বীপের বাসিন্দা। দ্বীপটা নিয়ে তাদের গর্বেরও শেষ নেই।

আরিতুস জানে না, তার পূর্বপুরুষ কী ভাষায় কথা বলত। তবে বাঙালি নাবিকদের কাছে শুনেছে, ভাষাটার নাম বাংলা ভাষা। সে দুটো-একটা কাজ চালাবার মতো বাংলা ভাষা জেনে নিয়েছে। বাঙালি নাবিক জানতে পারলেই বলবে, নমস্কার। এবং হাত জোড় করে সে ঠিক বাঙালি কায়দায় তার দেশের মানুষদের স্বাগত জানায়। তারপর বলবে, ভাল আছেন? আরও সে দুটো-একটা কথা জেনে নিয়েছিল, জাহাজ কোথায় যাবে? কতদিন আছেন। এমন সব কথা আর কী।

আরিতুস নিজে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে কথা বলে। কাজ চালিয়ে নেবার মতো। আসলে তার ভাষা যে কী সে নিজেও ঠিক জানে না। মাউরি ভাষায় সে ভাল কথা বলতে পারে, কারণ সে একজন মাউরি

উপজাতির বর্তমান বংশধর। তার ঠাকুরদা বিয়ে করেছিল মাউরি মেয়েকে। তার বাবাও। ফলে রক্তে নানা দেশের নানা উপজাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে তার। কারণ সে তো জানে না, তার ঠাকুরদার বাবার ঠাকুরদা কাকে বিয়ে করেছিল।

আরিতুস ওই দুটো-একটা বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। তার এটা একটা দুঃখ। সে একবার একজন বাঙালি নাবিককে বিনে পয়সায় মাছ দিত, শুধু এই কারণে তাকে সে বলেছিল বাংলা ভাষা শেখাবে। সে আবার যখন এ বন্দরে আসবে তখন বর্ণপরিচয় নামে একটা বই নিয়েও আসবে বলেছিল। বর্ণপরিচয়! এই নামটা সে বার বার মুখস্থ করত তখন। অবশ্য উচ্চারণ করতে পারত না ঠিকঠাক। অর্ন অরিচায় হয়ে যেত উচ্চারণে।

আসলে তার ভাষায় 'ব'-এর কোনও ব্যবহাব নেই। নাবিকটি অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিল, আরে অর্ন অরিচায় নয় বর্ণপবিচয়।

তারপর ইংরাজিতে লিখে দিয়েছিল শব্দটা। সে এটা নিয়ে বার বার মুখস্থ করত। ইংবাজি বর্ণমালাও সে জানে না। এ ব্যাপারে তাকে খুব সাহায্য করত মাহিম জ্যাঠা। মাহিম জ্যাঠাই এখানে একটা পাঠশালা খুলেছে সেই কবে থেকে। সকালে ঘোড়ার পিঠে ডাব বিক্রি করতে বেব হয়। বিকালে পাঠশালা। তার কাছ থেকেই সে 'ব'-এর উচ্চাবণ শিখেছে। সে এখন বাংলাদেশ বলতে পারে। সে এখন বর্ণপবিচয় বলতে পারে। আগে সে বাংলাদেশকে বলত, 'আংলাদেশ'। বাট-কে বলত, আট। তার এমনই উচ্চারণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের সেই নাবিক বন্ধুটি কতদিন হয়ে গেল এ বন্দরে আর এলই না, পরিচিত জাহাজ দেখলেই সে এখনও তাকে খুঁজতে যায়।

ইলিয়ার চেয়েও বেশি আগ্রহ যেন তাব সেই নাবিকটির জন্য। তারপরই ওব মনে হয়, সে নিজের সঙ্গে ছলনা করছে। কত বাতে সে উঠোনে এসে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই বাড়িঘরের সঙ্গে ইলিয়ার স্মৃতি বড় বেশি জড়িত। সামনেব কদমফুল গাছটা ইলিয়া লাগিয়েছিল। কত বড হয়ে গেছে গাছটা। বর্ষাকালে ঝেপে ফুল আসে। এত ফুল যে তখন সবুজ পাতা পর্যন্ত আড়ালে পড়ে যায়। যেন গাছটা সাদা হলুদ লাল কাগজের ছোট ছোট বলের থোকা নিয়ে ঝুলছে।'

ইলিয়া একটু একটু হিন্দি বলতে পারত। কারণ হিন্দি ভাষাটা ভাঙা ভাঙা ভাবে এমন মধুব শোনাত ইলিয়ার মুখে যে, প্রথমেই কেমন মোহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল আবিতুস। ইলিয়া বলত, এটা ভারতবর্ষের ভাষা। আমার সেই পূর্বজন্মের লোকেরা এ ভাষায় কথা বলত।

ইলিয়া এসেছিল ফিজি দ্বীপ থেকে। সেখানে ভাষাটার কতটা চল আছে জানে না। তবে ইলিয়ার কাছ থেকে ভাঙা ভাঙা হিন্দি শুনে বলতে পারত, বহুত আচ্ছা। খুবসুরত আদমি। তাকে দেখে ইলিয়া প্রথমে এ কথাগুলিই উচ্চারণ করেছিল। সে থ মেরে গেছিল শুনে। তারপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল ইলিয়া। গায়ে তার সবুজ ব্লাউজ, পবনে নীলরঙের স্কার্ট। মাথায় লালরঙের রুমাল। চুল খুব বড় না কিন্তু খুব ঘন। সে যে ইলিয়ার কথা বুঝতে পারেনি সেজন্যই হাসছিল। কারণ সে বলেছিল, নো মি ওসানিকান। অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছিল, আমি খুবসুরত আদমি নই, আমি ওসানিকান।

তখন ইলিয়া ইংরাজিতে বলেছিল, বিউটিফুল। ভেরি বিউটিফুল। তোমার দেশ বলছ বাংলাদেশ, আমার পূর্বপুরুষদের দেশ ভারতবর্ষ। তুমি খুব সুন্দর।

তারও কথাটাতে কম হাসি পায়নি। সে আদৌ সুন্দর নয়। বরং দেখতে খারাপই।

জাহাজ থেকে নেমে এজন্যই বোধ হয় সহজেই ইলিয়া আরিতুসের বউ হয়ে যেতে পারল। ইলিয়াকে খুশি করার জন্য বাড়িতে একটা জবাফুলের গাছও এনে লাগিয়েছিল।

ফসফেট কোম্পানি নতুন নতুন খাদ খোলার দরকার হলে ফিজি কিংবা পাশাপাশি দ্বীপগুলো থেকে লোক নিয়ে আসে। পাঁচ-সাত বছরের চুক্তি। কেউ অবশ্য ইচ্ছে করলে থেকেও যেতে পারে। অনেকেই থেকেও যায়। কারণ দেশে ফিরে আবার কোথায় রুজি-রোজগারের ধান্ধা করবে ভেবেই থেকে যায়। অবশ্য সবার মেজাজমর্জি তো একরকমের নয়, কেউ আবার দু'-পাঁচ মাসেই দেশে ফেরার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

ইলিয়া এসেছিল চুক্তিতে। মাটি খোঁড়ার কাজ। উপরের বালি-পাথর-মাটি সরিয়ে দশ, বিশ কিংবা পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত গর্ত করে খাদ তৈরি করতে হয়। আসলে তাদের কাজই হল সারফেসের মাটি তুলে

ফসফেটের সন্ধান দিয়ে জাহাজে উঠে যাওয়া। অবশ্য এদের অনেকেই থেকে যায়। বিয়ে করে ঘর বাঁধে। আর নিজের দ্বীপে ফেরার ইচ্ছে থাকে না। মানুষ তো এমনিতেই যাযাবর, মনের মতো নারী পেলে সে যত দুর্গম অঞ্চল হোক, সে বসবাস গড়ে তুলবেই।

কারণ ইলিয়া এ দ্বীপে এসে থেকে যাবে এমনই যেন ঠিক ছিল। এবং সে আর ইলিয়া কত যত্ন নিয়ে, কত পরিশ্রম করে বাড়িটা গড়ে তুলেছে। পাহাড়ের টিলায় বাড়ি করা কত কষ্ট, দ্বীপবাসীরা জানে। দ্বীপটায় অসংখ্য টিলা এবং কোথাও সমতলভূমি, টিলার ঢালুতেও বাড়ি করা যায়। বড় বড় গাছের নীচে কাঠের বাড়ি ছবির মতো লাগে দেখতে। এবং যারা শ্রমিকের কাজ করে, তারা থাকে জেটির এপারে, জেটির ওপাশে ছোট্ট শহর কর্তাব্যক্তিদের, ক্লাবঘর এবং দোকানপাট, নানা ফ্যাশানের জামাকাপড়ও পাওয়া যায় সেখানটায়। ডিঙিতে ভেসে ওপারে গেলেই হয়।

ইলিয়া এ দ্বীপে হয়তো চিরদিনের মতো থেকে যাবে ভেবেছিল, কারণ এমন দ্বীপ হয় না। দশ-বারো মাইলের বৃত্তাকার এই দ্বীপ, একটা জেটি আছে, আর চারপাশে দিগন্ত-বিস্তৃত নীল সমুদ্র। টিলার মাথায় উঠে গেলে দ্বীপের সবটাই দেখা যায়, কেবল জেটি পার হয়ে ওদিকের পাহাড়টা বিশাল পাঁচিলের মতো। তার ওপাশে কী হয় না হয় এখান থেকে জানা যায় না। তবে আরিতুসরা সমুদ্রের ধারে এই বিজলিবাতিয়ালা গঞ্জের মতো জায়গায় বাজার করতে যেতে পারে। বেশি মাছ পেলে, জাহাজঘাটার জাহাজ না থাকলে মাছও বিক্রি করে আসতে পারে। তাদের পক্ষে আর কিছু জানার উপায় নেই। শহরের আইন-কানুন দেখেন পুলিশের এক কর্তা। কোনও বে-আইনি কাজ কিংবা কোনও নারীধর্ষণ —সব বিচারের ভারই তাব।

এই দ্বীপে যেমন জেটি আছে, জাহাজ আছে, ক্রেন আছে, নারী-পুরুষের উদ্দাম নৃত্য আছে, তেমনি আছে আশ্চর্য সুন্দর একটা বালিয়াড়ি।

ইলিয়া সেখানে গিয়ে বসে থাকত।

ইলিয়া অপেক্ষা করত কখন ফিরবে আরিতুস। কখনও লণ্ঠন হাতে নেমে যেত। আরিতুস বিয়ে করার পরই বউকে আর খাদে যেতে দেয়নি। কারণ আরিতুস নিজেকে খুব পরিশ্রমী মানুষ ভাবতে ভালবাসত।

সে খাদ থেকে উঠে এসে দুটো খেত। শিফট ডিউটি তার। কখনও রাতে ডিউটি। কখনও দিনে।

খাওয়া সেরে সে পাল তুলে দিত ডিঙিতে। এবং ডিঙি ভেসে গেলে সমুদ্রে, সে কিছুক্ষণ তাতে ঘুমিয়ে নিত। এতেই চাঙ্গা হয়ে যেত শরীর তার। সে তারপর আবার মোষেব মতো খাটতে পাবত। যেমন বিশাল ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি তুলে নিয়ে যেতে পারত এক হাতে। বৈঠা এক হাতে। কখনও পালের দড়িদডা আর সুতো ছেড়ে সে সমুদ্রস্রোতের উজানে উঠে যেত, খুব পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ, কিন্তু তাঁর উচ্চাশা বলতে, ইলিয়াকে অবাক করে দেওয়া, সে যেভাবে হোক, যদি কখনও ইলিয়া দেশের জন্য মন খারাপ করত, তখন আরিতুস হাত টেনে তুলে বলত, এই ইলিয়া, মা-বাবার জন্য মন খারাপ করছে, চলো। ওঠো। ডিঙিতে তুমি থাকলে মজা হবে। তোমাকে আমি পালের দড়িদড়া বাঁধার কাজটা শিখিয়ে দেব।

ইলিয়াকে নিয়ে সমুদ্রে চলে যেত।

ইলিয়ার মন খারাপ হলেই আরিতুস তাকে নিয়ে সমুদ্রে চলে যেত।

সন্ধ্যা হলে তারা লম্ফ জ্বালত ডিঙিতে। সাঁঝ লাগলে নিয়ম কোনও লাল আলোর সংকেত রাখা। যদি কোথাও কখনও ডিঙি অজানা সমুদ্রে ঢুকে যায় এই ভয়। তবে আরিতুস পঞ্চাশ-ষাট কিংবা একশো মাইলের ভিতর কোনও না কোনও দ্বীপ পেয়ে যাবে জানে। সে একবার ভুলক্রমে অন্য দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল। তাতে খুব ক্ষতি হয় না। সেসব দ্বীপেও ফসফেটের কারখানা আছে, এবং সে আবার ঠিকঠাক বাতাসের গতিবিধি দেখে, সিন্ধুসারসদের ওড়া দেখে বুঝতে পারে কোথায় তার প্রিয় দ্বীপ। এবং জলের রং দেখেও টের পায়, কোনও গভীর খাত আছে কাছাকাছি—জলের রং, গভীর নীল নয়, ফ্যাকাসে নীল নয় কিংবা সবুজও নয়, একেবারে কালো রং। এইসব ইঙ্গিত তাকে বুঝিয়ে দেয় দ্বীপের দক্ষিণে আছে, না উত্তরে আছে। কারণ পালে হাওয়া লাগলে সে ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে পর্যন্ত সমুদ্রের ভিতর উড়ে যেতে পারে। দ্বীপটা সহসা কখনও চোখের উপর অদৃশ্য হয়ে গেলেও ভয় পায় না।

ইলিয়া সঙ্গে থাকলে ভারী মজা হত।

ইলিয়াকে ভয় দেখিয়ে মজা পেত।

প্রথম-প্রথম ইলিয়াও বিশ্বাস করে ফেলত, দ্বীপে আর তারা ফিরতে পারবে না। অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেছে। পরে অবশ্য, সবই মজা করার জন্য বলা, ইলিয়ার বুঝতে কষ্ট হত না।

আরিতুস বলত, কী হবে?

ইলিয়া ঠোঁট উল্টে বলত, সত্যি কী হবে?

কিছুই হবে না। একটাই হবে। কারণ নির্জন সমুদ্রে আরিতুস ইলিয়াকে কখনও জড়িয়ে চুমু খেত। তারপর ইলিয়া পাগলের মতো আরিতুসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে আনত পাটাতনের মাঝখানে।

আরিতুস কপট ভয়ের ভঙ্গি করত, আরে করছ কী!

দ্যাখো না কী করি!— বলেই পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরত আরিতুসকে।

আজ কেন যে আরিতুস সারাটা সকাল সেইসব মধুর স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে গেল। লিয়ানাকে সে খেতে দিয়েছে। তার আজ ছুটির দিন বলেই, বাপ-বেটিতে বেশ আয়েশ করে খেতে পারছে। লিয়ানা মা'র জন্য চোখের জল ফেললে সে আরও অন্ধকার দ্যাখে চোখে। নিজের গোপন অশ্রুপাত এক রকমের, সঙ্গে লিয়ানার অশ্রুপাত তাকে কেমন জীবন সম্পর্কে হতাশ করে দেয়। তার তখন কোনও কাজ করতে ভাল লাগে না।

সে তখন কদম ফুলগাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। লিয়ানা বোধ হয় বুঝতে পারে বাপের কষ্ট। সেও বাবার পিছু পিছু গিয়ে ডাকে, বাবা।

বল।— আরিতুস পেছন ফিরে তাকায়।

আমি আর কাঁদব না।

তখনই হেসে ফেলে আরিতুস। পাগলের মতো আদর করতে থাকে। আর দু'-চার বছর বাদে সে জানে লিয়ানা মা'র জন্য তেমন কষ্ট পাবে না। তার বুকে তখনই বোধহয় নতুন আর-এক কষ্ট তিল তিল করে জমা হচ্ছে। সেই কষ্টই তাকে তার মা'র কথা ভুলিয়ে দেবে সে জানে।

তিন

মাঝে মাঝে আরিতুসের মনে হয়, কেন যে ইলিয়া তার মতো হতকুচ্ছিত লোকটিকে বলেছিল, তুমি ভারী সুন্দর। এই একটা কথাই যে-কোনও পুরুষ কিংবা নারীর পক্ষে যথেষ্ট। অথচ সে থাকল না। দ্বীপে থাকল না। ইলিয়ার মুখে সামান্য হাসি ফোটাবার জন্য সে কী না করেছে! মাছ নিয়ে জাহাজঘাটায় গেছে। তার দেশ থেকে নাবিকেরা এলে তাদের সে খুব সস্তায় মাছ দিয়েছে। বলেছে, তোমরা আমার দেশের লোক। সে তাদের বাড়ি এনে, ইলিয়ার হাতের তৈরি খাবার খাইয়ে বলেছে, এমন সুস্বাদু খাবার আর কোথায় পাবে! তারাও ইলিয়াকে উপহার দিয়েছে, জ্যাকেট, রুমাল, ফারের কোট।

সে দুপুরে লিয়ানাকে বলল, আমি বের হব। বড়শিটা দে।

সমুদ্রের ধারে ধারে অজস্র পাহাড়ের খাঁজ, কোথাও সবুজ জলজ ঘাস। ঘাসে চিংড়ি মাছেরা উঠে আসে। সে ছোট্ট একটা তেকোনা জাল নেয় সঙ্গে। বড়শি ফেলে রাখলে কখনও চিংড়ি মাছ গেঁথে যায়। কুঁচো চিংড়ি দিয়ে সে সমুদ্রে যাবার আগে মাছের টোপ বানায়। পাউরুটির সঙ্গে কুচো চিংড়ি বেটে নানারকমের মশলা মিশিয়ে একটা হাঁড়িতে রেখে দেয়।

লিয়ানা একদিন বলল, আমি তোমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাব বাবা।

তুই তো সাঁতার জানিস না।

জানি।

কী বলে মেয়েটা! সে তো অবাক। কবে তুই সাঁতার শিখলি? তা শিখতে পারে। সকালে খাদে বের হয়ে গেলে পাহাড়ের উপত্যকায় লিয়ানা একা। ভাল লাগবে কেন? সে টিলার ঢালু ধরে নীচে আসে,

যেখানে সব ঘনবসতি আছে। মাহিম জ্যাঠার নাতনির সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব। সে হয়তো তারই সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গেছে। বালিয়াড়িতে বসে থেকেছে। হাঁটুজলে নেমে সমুদ্রের জল ছিটিয়ে দিয়েছে, কারণ বয়স বাড়ার সময়। দ্বীপের ফুল ফল গাছপালার মধ্যে সে হয়তো অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছে। এবং জেনে ফেলেছে, সাঁতার না জানলে জলে ভেসে যাওয়া যায় না। কিংবা জলে ডুবে স্নান করে হয়তো বালিয়াড়িতে শুয়ে থেকে কোনও নতুন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছে।

লিয়ানা সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে একসময় সত্যি তার বাবার কাছ থেকে একটা মাছ ধরার ছিপ পেয়ে গেল। ছোট্ট একটা সোনালি রঙের ছিপ পেয়ে কী খুশি লিয়ানা! সুতোর রং রুপোলি রঙের। সীসার নীচে দুটো ছোট ছোট রুবি মাছের চোখের মতো কালো বড়শি।

সেদিন খাদ থেকে ফিরে শরীরটা ভাল লাগছিল না আরিতুসের। মনে হয় গা গরম হয়েছে। অসুখ-বিসুখ হলে সে সাধারণত মেয়ের কাছে গোপন করে যায়। কারণ লিয়ানা বাবার জন্য অযথা দুশ্চিন্তা করতে ভালবাসে।

লিয়ানা কিন্তু টের পেয়ে গেল। সে ছুটে গেল মাহিম দাদুর কাছে। বলল, বাবার গা গরম। চোখ লাল। খেতে পারছে না।

মাহিম এই দ্বীপে আছে পঞ্চাশ-ষাট বছরের উপর। সে প্রায় তরুণ বয়সে দ্বীপে আসে। দ্বীপের গাছপালার গুণাগুণ সে যত ভাল জানে, আর কেউ জানে না। এজন্য দ্বীপে তার একটা আলাদা খাতির আছে।

মাহিম আসতেই আরিতুস হেসে দিল। বলল, তোমার নাতনি ডেকে এনেছে! কিছু হয়নি।

মাহিম তবু মুখ দেখল। চোখ টেনে দেখল। গায়ের তাপ দেখল হাত দিয়ে। তারপর লিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু হয়নি। তা গা গরম হয়েছে। অসুখ-বিসুখ মানুষেরই হবে। সেরে যাবে।

কিন্তু এ কী? লিয়ানা ভ্যাক করে কেঁদে দিল।

আরিতুস বুঝতে পারে, মেয়েটা বোঝে বাবার কিছু হলে তাকে দেখার কেউ থাকবে না।

সে লিয়ানাকে ডেকে আদর করল। বলল, বোস। তুই তো বড় হয়ে গেছিস। দেখিস ভাল হয়ে গেলে আরও বেশি মাছ ধরব। টাকা জমাব। তোকে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসব। একদিন আমরা ঠিক তোর মায়ের কাছে ফিরে যাবই দেখবি।

আরিতুস ভাল হয়ে একদিন লিয়ানাকে সত্যি সঙ্গে নিল। মাছ ধরতে যাচ্ছে। কারণ আরিতুসের কেন জানি মনে হয় আসলে সে মেয়েটাকে কোনওদিনই তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। দ্বীপেব যুবক ছোঁড়াগুলিও খুব ভাল নয়। কাজের চেয়ে নেশাভাঙ করতে বেশি ভালবাসে। বউকে ধরে পেটায়। এবং যখন মনে হয়, তার মেয়ের গায়ে কেউ হাত তুলতে পারে, ভেবেই যেন সঙ্গে নেওয়া। যদি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে খেতে শেখে তবে ভবিষ্যতের ভাবনা থাকবে না।

লিয়ানা বাপের সঙ্গে মাছ ধরতে যাচ্ছে, এটা কত বড় গর্ব, যেন লিয়ানা এখন বড় হয়ে গেছে, বাপকে সে সমুদ্রেও সাহায্য কবতে পারে, সে আর ছোট নেই। লায়েক হয়ে গেছে। সমুদ্রে যাওয়া কত বড় জীবনের ছাড়পত্র, দ্বীপবাসীরা তা জানে।

লিয়ানা পরেছে লতাপাতা আঁকা ফ্রক। পায়ে কাঠের জুতো নীলরঙের। হাতে সোনালি ছিপ। এবং তার সুন্দর স্তনে আশ্চর্য গরিমা ফুটে উঠছে। এই বয়সেই লিয়ানার মা ইলিয়া এসেছিল। আরিতুস এখন মেয়ের দিকে সোজা তাকাতে পারে না। মাঝে মাঝে কেমন বিভ্রমে পড়ে যায়। যেন ইলিয়া সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইলিয়াকে নিয়ে যেভাবে সে মাছ ধরতে যেত এবং নীচে নামলে বুঝতে পারত দ্বীপের সবচেয়ে ওস্তাদ মাছ-শিকারির সঙ্গে ইলিয়া যাচ্ছে, তেমনি সে লিয়ানাকে নিয়ে আজ যাচ্ছে।

করাতকলের কাছে সোজা একটা পথ গির্জার দিকে চলে গেছে। সে সমুদ্রে যাবার সময় গির্জার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যায়। গির্জার নীচে ঢালু জমি। বড় বড় তিতান গাছ। বিশাল তিতান গাছগুলি শীত আসছে বলে পাতা ঝরার কাজ শুরু করে দিয়েছে। গির্জা পার হয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য সে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে যায়। গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে হয়।

লিয়ানা বাপের পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। বাবা তাকে কুঁচো মাছ ধরতে হয় কীভাবে শিখিয়েছে। কোন মাছ কী টোপ ভাল খায় বুঝিয়ে দিয়েছে। কারণ সমুদ্রে মাছ সবসময় একরকমের

থাকে না। জোয়ারের সঙ্গে কিংবা ঋতুবদলের সঙ্গে মাছেব আনাগোনাও বদলে যায়।

তা ছাড়া আরিতুস মাঝে মাঝে কুঁচো মাছ শিকারের সময়ও সঙ্গে নিয়ে গেছে লিয়ানাকে। দ্বীপের কোনদিকটায় পাথরের কোন খাঁজে কিংবা কোথায় কম জলে চিংড়ি, সারডিন মাছের ঝাঁক উঠে আসে কোন ঋতুতে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে।

আরিতুস প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নীল মতো একটা সমুদ্রের লেগুন দেখাত লিয়ানকে। ছোট ছোট নীল ঢেউ লাল পাথরে আছড়ে পড়ছে। গভীর জল। পাহাড়ের উপর থেকে সামান্য প্রস্রবণেব জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিছু শামুক, গুগলি, রুমি মাছ দেখাত। সাবডিন মাছের ঝাঁকও পাক খেয়ে ঘুরে যায়। কীভাবে বড়শি ফেলতে হবে, নাচাতে হবে শেখাত। আবিতুস চায়, লিয়ানাও বাপেব মতো ওস্তাদ মাছ-শিকারি হয়ে উঠুক একদিন। তাবপর নানা রকম মশলার পাতা চেনাত। পাতাব উগ্র গন্ধে, জলের নীচে মাছ নাকি পাগলা হয়ে যায়। পাতাগুলির গন্ধ আবার সব মাছ একরকমভাবে টেব পায় না। কুঁচো চিংড়ির পাউরুটি আর পাতা বাটা মিশিয়ে টোপ।

এভাবেই লিয়ানা দ্বীপে বাপের পাশে বড় হয়ে যাচ্ছিল।

লিয়ানা এখন নিজেই সংসারের সব কাজ করে রাখে। সকালে সে আজকাল বের হতে পারে না। বাবার এ মাসটা দশটা-ছটা ডিউটি। অনেকটা বাস্তা হেঁটে যেতে হয়। তারপব লঞ্চে ওপারেব পাহাড়ে চলে যায়।

সকালে তার বাবাকে সে এখন রুটি আর মটবসেদ্ধ করে দেয়। বাবাব টিফিন যত্ন করে একটা টিনের বাক্সে ভরে দেয়।

সেই দুই বেণী বাঁধে। সে ঠিক তাব মা'র মতো বেলফুলের গাছগুলিব যত্ন কবে। বেলফুল ফুটলে এই জাম-পাতার কুটির এবং আশপাশের অঞ্চলে সুঘ্রাণে ভরে যায়। লতানে গোলাপ গাছগুলিতে সে সকালে জল দেয়। বাড়ির গাছপালাব পরিচর্যা করলে বাবা খুব খুশি হয়। তার আর এখন মা'ব কথা মনে পড়ে না। কিংবা সে আব তার মায়ের জন্য চোখের জলও ফেলে না। এই গাছপালা ঘরবাড়ি, দ্বীপেব বনজঙ্গল এখন তার সবচেয়ে প্রিয়। সে কোনওদিন কোথাও এই দ্বীপ ছেড়ে গিয়ে বাঁচতে পাববে না।

আর কোনও কোনও বিকেলে দেখা যায় চুলে পাথরের ক্লিপ এঁটে একটা সাদা বঙেব ফ্রক গায়ে সোনালি রঙের ছিপ হাতে লিযানা উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামছে।

কোনওদিন লিয়ানা সমুদ্রে যায় না। আরিতুস এখনও কোনওদিন গভীর সমুদ্রে তাকে মাছ ধরতে নিয়ে যায়নি। একটু গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে দু'-তিনদিন হাতে না বাখলে চলে না। পববে কিংবা রানিব জন্মদিন অথবা আরও যেসব ছুটিছাটা সে পেয়ে থাকে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধবতে গেলে সে-সময় সে যায়। তখন লিয়ানাকে বলে যায় তিন দিন, কি চার দিন, কারণ বড় সুরমাই মাছ দ্বীপের কাছাকাছি পাওয়া যায় না। বিশাল মাছ ধরার আলাদা নেশা আছে তার। বড মাছ পেলে বেশি টাকা। ট্রাউট মাছ কিংবা ম্যাকরল মাছের দাম কম। একটা সুবমাই মাছ ছিপে গেঁথে তুলতে পারলে এবং ঘাটে টেনে নিয়ে আসতে পাবলে মানুষজন জমে যায় দেখার জন্য, মাছের দামও পায়। বাবা বলেছে, এবার তার পাওনা ছুটি থেকে মাসখানেক ছুটি নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরাব আনন্দই নাকি আলাদা। লিয়ানা যখন ছোট ছিল, তখন তার মা-ও জামপাতার ঘরে কুশের আসন বিছিয়ে কুরুশ কাঁটায লেস বুনত, আর নাকি বাবার জন্য অপেক্ষা করত। কারণ বাবা তো মাকে অবাক করে দেবার জন্যই গভীর সমুদ্রে দু'-একবার ছোট থাকতে মাছ ধরতে গেছে। আজকাল বাবা কেন যে আবার বলছে ঠিক পেয়ে যাব। দু'-পাঁচদিন টুঁড়ে বেড়ালেই হবে সমুদ্রে। এবং বাবার আশা মজুরি বাঁচিয়ে এবং মাছেব টাকায় ঠিক লিয়ানাকে নিয়ে তার মায়ের কাছে চলে যেতে পারবে। সে তো আজকাল বাবার কষ্ট হবে ভেবে ঘুণাক্ষবেও মা'র নাম করে না। তবে কেন বাবা প্রায়ই বলছে, আমি যাবই। মায়ের কাছে যাবে শুনলে কাব না আনন্দ হয়।

করাতকল পার হয়ে যেতেই মাহিম দাদুর সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই বলল, লিয়ানা, কোথায় যাচ্ছিস?

কুঁচো মাছ ধরতে। বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে।

ঝড়-বাদলায় বের হবে। এত সাহস!

লিয়ানা জানে বাবার কাছে ঝড়ের সমুদ্র কোনও বিড়ম্বনাই নয়। এটা ঠিক ক'দিন থেকে বড় বেশি ঝড়-বাদলা শুরু হয়েছে। এ সময় সমুদ্র খুব বেশি পাগল হয়ে থাকে। বালিয়াড়িতে কিংবা যেখানেই টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকুক, শোঁ শোঁ গর্জন আর গায়ের জামাকাপড় সব উড়িয়ে নিতে চায়। সে বারবার লক্ষ

করছে তার ফ্রক বাতাসে কোমরের উপর উঠে যাচ্ছে। সে চেপে চুপে কোনও রকমে করাতকল পার হয়ে গেল। বাবার কাল থেকে ছুটি। পরশু বাবা বের হবে। দু'দিনে যা কুঁচো মাছ পাওয়া যাবে এবং বনজঙ্গল থেকে সেই মশলাপাতা তুলে এনে বেশি করে টোপ এবং মাছের চার তৈরি করতে না পারলে বাবার এবারকার অভিযান জমবে না।

সেজন্য সে গত দু'দিন থেকেই সব কুচো মাছ ধরে পচিয়ে রাখছে। আজ এবং কাল। তারপর তার বাবা যাবে মাছ ধরতে। তার তো আর কেউ নেই। বাবা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তবে মাঝে মাঝে কে যেন সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সে সবচেয়ে সুন্দর কোনও নাবিকের স্বপ্ন দ্যাখে। সে দেখেছে বাবার সঙ্গে জাহাজ থেকে নাবিকরা তাদের বাড়িতেও এসেছে। গল্পগুজব করেছে। বাবা তাদের ব্যাগভর্তি লেবু দিয়েছে। ওরা এলেই কত রকমেব শাক যে তুলে নেয়। লিয়ানা নিজেও মাতু শাক তুলে দিয়েছে। খেতে নাকি খুব সুস্বাদু। শাকের খোঁজেই বেশি আসে বাংলাদেশের নাবিকরা। শাক আর লেবু। জাহাজে বাসি গোস্ত, চপাটি, ভাত, ডাল, ফুলকপি, বাঁধাকপি ছাড়া আর কিছু খাবার দেওয়া হয় না। তাও নাকি টাটকা নয়। কতদিনের বাসি। বিস্বাদ খেতে। শরীরে চর্মবোগ হয়। এ জন্য বাঙালি নাবিকরা জঙ্গলের মধ্যে কতবার বাবাকে নিয়ে ঢুকে গেছে লেবু আব শাকেব খোঁজে।

বিকালবেলা থেকেই মেঘ জমছে আকাশে। আর জোলো নোনা হাওয়া। গরমের সময় নোনা হাওয়া। গা বড্ড কড় কড করে।

মাহিম দাদুকে দেখলেই লিয়ানা বড় প্রসন্ন বোধ করে। সে দাঁড়িয়ে যায়। মাহিম দাদুর কেবল এক কথা, তোকে আমি বিয়ে করব। বলেই ফোকলা মুখে হাসতে থাকে।

কেন আমি খারাপ দেখতে? পছন্দ হচ্ছে না! আমার কী নেই? দুটো গাধা আছে, একটা ঘোড়া আছে। ঘরে মিষ্টি আলু আছে। ওতে তোর পেট ভরবে না?

তা ঠিক মাহিম দাদুর দুটো গাধা আছে, একটা ঘোড়া আছে, ঘরে মিষ্টি আলু আছে। পাহাড়ের উপত্যকায় মাহিম দাদু মিষ্টি আলুর চাষ করে। জাভা থেকে লতা নিয়ে এসেছিল। তার দেখাদেখি এখন দ্বীপের অনেকেই মিষ্টি আলুর চাষ করছে, আনারসের চাষ করছে।

মাহিম দাদুব দাঁত নেই বলে নরম মিষ্টি আলুসেদ্ধ আর গাধার দুধ খায়। সে অনেকদিন দেখেছে দাদু তার জন্য, বাবার জন্য মিষ্টি আলুসেদ্ধ নিয়ে যেত। বাবার একমাত্র জ্যাঠা। দাদুর আর আছে একমাত্র নাতনি। যে তার খুবই বন্ধু।

ওব মা চলে যাবার পর বাবাকে, তাকে সবচেয়ে বেশি দেখাশোনা করত মাহিম দাদু। লিয়ানা মাহিম দাদুকে দেখলেই আনন্দে হাততালি দেয়। এখনও দিত। কিন্তু হাতে ছিপ বলেই সে হাততালি দিতে পারেনি। তা ছাড়া সে তো বড় হয়ে গেছে। তবে তার বউ হতে রাজি হয়েছে। কী খুশি বুড়ো!

মাহিম দাদু বলল, কী রে, আমাকে ফেলে মাছ ধরতে চললি!

বা রে, বাবা যে বলে গেছে। আচ্ছা তুমি জানো, বড় ঝড় আসছে?

লোকে তো তাই বলাবলি করছে।

ঝড়ে বাবা ভয় পায় না। বাবা তো বলে, কত ঝড় দেখলাম। ডিঙি আর পাল ঠিক থাকলে, হাল ঠিক থাকলে, ঝড়ের সাধ্য কী কিছু করে।

এবং লিয়ানা বাবার কাছে শুনেছে, ওতেই মজা। হাওয়ায় যেন ভেসে যায় ডিঙি। সে বসে থাকে পালের দড়িদড়া গলুইতে বেঁধে। আর হাল সম্পর্কে সজাগ থাকে, এগুলি থাকলেই যত বড় ঝড়ই হোক, কোনও ডিঙিকে কাবু করতে পারে না।

তবু কেন যে লিয়ানার মনটা দমে গেল! সে কুঁচো চিংড়ি জল থেকে ছেঁচে তুলেছে, বড়শিতে রুবি মাছ গেঁথেছে কয়েকটা, তবু কেন যে মনটা তার ভার হয়ে থাকল!

ফেরার সময়ও দেখল মাহিম দাদু ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। একটা নলের ডগায় মাটির পাত্র, আর ঝুনো নারকেলের মালা ফুটো কবা। ওতে একটা কাঠেব সরু নল ঢোকানো। বড় বেশি আত্মমগ্ন হয়ে তামাক খাচ্ছে। সামনে দিয়ে চলে যাবে, কথা বলবে না তা হয় না। কারণ মাহিম দাদু আজকাল দূর থকে ভাল দেখতে পায় না। মাহিম দাদুর সাদা দাড়ি। চুল সব সাদা হয়ে গেছে। সাদা জামা লুঙ্গি পরলে বরফের দেশের মানুষ মনে হয় মাহিম দাদুকে।

সে যাচ্ছে টের পেলে ঠিক ডাকত। বলত, দেখি কী মাছ পেলি। তাছাড়া বাবার খবরও নেয়। কারণ বুড়ো হয়ে গেছে বলে এখন আর টিলায় উঠতে পারে না। দম পায় না।

ছুটির দিনে মাঝে মাঝে বাবা এসে দেখা করে যায়। মন খারাপ হলেই বাবা মাহিম দাদুর কাছে আসে। তামাকের নেশায়ও আসতে পারে। বাবা এলে মাহিম দাদু সুগন্ধি তামাক সাজিয়ে দেয়। সেই কোন মুলুক থেকে দাদু আনিয়েছে, তার খবর দেয়। এ দ্বীপে এত সুগন্ধি তামাক আর কারও ঘরে পাওয়া যায় না।

চার

খাদ থেকে ফিরে আবিতুস দেখল লিয়ানা চুপচাপ কদমফুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন অন্যমনস্ক।

আকাশে মেঘের দাপাদাপি। মেঘ গুড় গুড় করছে। দূরে একটা জাহাজ বয়াতে বাঁধা।

বাবা খুব খুশির গলায় বলল, কলকাতা থেকে আবার জাহাজ এসেছে।

আবিতুস জানে কলকাতা খুব বড় বন্দর। ওখানে গঙ্গা নামে কী একটা নদী আছে শুনেছে। বন্দরে অনেক জাহাজ। কলকাতা থেকে নাবিকেরা এলে এমন গল্প করত। আবিতুস জানেই না, বন্দর কত বড় হয়। কলকাতা বন্দরে ত্রিশ চল্লিশটা জাহাজ সবসময় ভিড়ে থাকে। তার একটিই আফসোস, সেই বাঙালি নাবিকটি আর এল না। এলে তার ঘরে নিশ্চয়ই আসত। সে কথা দিয়ে গেছিল, তার জন্য বর্ণপরিচয় নিয়ে আসবে। তাকে বর্ণমালা শেখাবে। বাংলা ভাষা শেখাবে।

আবিতুস অবশ্য জানে, নাবিকরা আজ এ বন্দরে কাল ও বন্দরে, কোনও বন্দরে হয়তো একবারই যাওয়া হয়। পরে আর জীবনে সে বন্দরে যাওয়া হয় না। সে এজন্য নাবিকটিকে দোষ দেয় না। তার জাহাজ এ বন্দরে না এলে কী করবে? তবু জাহাজের চিমনি দেখে বুঝে ফেলেছে, সে যদি সমুদ্র থেকে বড় মাছটাকে শিকার করে আনতে পারে তবে বেশ দাম পাবে।

বাঙালি নাবিকেরা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। জাহাজে মাছ ওরা খেতেই পায় না। বন্দরে গেলেও সব জায়গায় যে মাছ পাওয়া যাবে তেমন কথা নেই। আর তাজা টাটকা মাছের কথা তারা ভাবতেই পারে না।

কিন্তু লিয়ানা চুপচাপ কেন কদমফুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে বুঝল না। সে ফেরার সময় সমুদ্রে ডুব দিয়ে আসে। বাড়িতে এসে মিষ্টি জলে শরীর ধুয়ে নেয়। সে যে এসেছে, টের পাবার পরও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকায় আবিতুস বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আবার কি তার মায়ের কথা মনে পড়েছে? দাঁড়িয়ে আছে গাছের নীচে। গোপনে কাঁদতে পারে। কারণ কদমগাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ালেই সামনের বিশাল সমুদ্র টিলার নীচে এসে যেন ঝপাৎ করে নেমে পড়ে।

সে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে যেতে সাহস পেল না। যদি লিয়ানা ধরা পড়ে যায়। লজ্জা পাবে। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে গোপনে অশ্রুপাত করতে ভালবাসে, আবিতুস তা জানে। ইলিয়ারও দেশের জন্য, মা-বাবার জন্য যখন মন খারাপ করত, কদমফুল গাছটার নীচে এসে দাঁড়াত। একবার ধরা পড়ে গিয়ে কেমন খেপেই গেল, আমি কখন কাঁদছিলাম? তুমি আমাকে কেবল কাঁদতেই দ্যাখো।

সেই ইলিয়া ওসানিকা দ্বীপে পালিয়ে চলে গেল। কেন যে সে আর তাকে মনে রাখল না, মেয়েটার কথা ভাবল না, জানে না। একজন অন্য পুরুষের সঙ্গ কি তার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি। তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া।

সে ডাকল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস। কী হয়েছে?

বাবা।

এভাবে মেয়েটা তাকে বাবা ডাকে না।

কী হল।

বাবা।

বল কী হয়েছে।

সমুদ্রে যাবে না।

কেন?

সমুদ্রে বড় ঝড় আসছে।
ধুস। তুই যে কী না! ঠিক মাহিম জ্যাঠার কাজ। মাহিম জ্যাঠা বলেছে?
সবাই বলছে।
আরে মাহিম জ্যাঠা বললে, সবাই তো বলবেই। বুড়ো মানুষের কথা কে অগ্রাহ্য করতে পারে? ও কিছু না। কত বড় ঝড় সামলেছি। তোর মা থাকলে বলতে পারত।
বাবার কথায় লিয়ানার মন পলকে হালকা হয়ে যায়। বাবা তো ওস্তাদ মাছ-শিকারি। মাহিম জ্যাঠাও বলে, তোর বাবা সমুদ্রে গেলে মাছের ঝাঁকের গন্ধ পায়। কোন সমুদ্রে কী মাছ আছে তোর বাবার চেয়ে কেউ ভাল বলতে পারে না।
সুতরাং পরদিন সকালে আরিতুস ডিঙি ভাসিয়ে দিল। গলুইয়ে বালতি, জল সেঁচার ডোঙা, ছোট্ট লালরঙের পাল। আর আট-দশটা হুইল। দুটো ছিপও সঙ্গে নিয়েছে। হালের কাঠে মবিল দিতে দিতে বলল, সাবধানে থাকিস। বড় মাছ নিয়ে আসব। সেই তোর মা একবার দেখেছিল, কত বড় মাছ! টেনে তোলা যায় না। হুকে জলে ভাসিয়ে রাখতে হয়। লোক জমে যাবে মাছের খবর পেলে।
লিয়ানা দেখল বাবার ডিঙি ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সকালে ঝোড়ো হাওয়া ছিল না। মেঘও কেটে গেছে। আকাশ ফর্সা। আর সব লালরঙের ডিঙি পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে।
লিয়ানা তারপর ফিরে আসতে থাকল। মাহিম দাদুর দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। দাদু গাধাদুটো নিয়ে, ঘোড়াটা নিয়ে করাতকলের ওপাশে উঠে গেছে। বুড়ো দাদুর নাতনি তার সই। সই দেখল, লিয়ানার মুখ ব্যাজার। সে বলল, এখানেই খেয়ে যাস।
বিকেলে বাড়ি ফিরেও লিয়ানার ভাল লাগছিল না। একা। দেখল আকাশে আবার কালো মেঘ জমে উঠেছে। এবং সাঁঝবেলাতেই সেই ঝড়। সাইক্লোন। আকাশ দামাল হয়ে উঠেছে মেঘে। বৃষ্টিপাত। আর মেঘের কড় কড় বজ্রপাত। লিয়ানা চুপচাপ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে। ঘরে লম্ফ জ্বালা। তার কিছুই ভাল লাগছে না। আর ঝড়ের রাতেই দরজায় খুট খুট শব্দ। বাবা বুঝি ফিরে এল, ঝড় দেখে বেশিদূর যেতে সাহস পায়নি। সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর আশ্চর্য, ভিজে-নেয়ে গেছে এক তরুণ! পরনে নীল রঙের প্যান্ট-শার্ট। নাবিকদের পোশাক। লিয়ানা যুবককে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বড় সরল এবং মায়ামাখানো চোখ-মুখ। সে পকেট থেকে একটা কী বের করে দেখাল। লিয়ানা দেখল, একটা বই। সে জানে না, বোঝে না, বইতে কী লেখা আছে।
নাবিকটি বলল, আরিতুস কোহেন নেই?
সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে।
তুমি একা?
লিয়ানা ঘাড় নাড়ল।
বইটা সমসের মিএগ্রা দিয়েছে। আমার জাহাজ নেরু দ্বীপে যাবে জানতে পেরেই বইটা দিয়ে বলেছে, এটা আরিতুস কোহেনকে দেবে। কথা দিয়ে এসেছিলাম। জাহাজ না গেলে কী করা। তোমার জাহাজ যখন যাচ্ছে, অবশ্যই এটা তাকে পৌঁছে দেবে। তাকে বইটা দেব, কথা দিয়েছিলাম।
তারপর কী ভেবে বলল, চলি। এটা রেখে দাও যত্ন করে। এলে দিয়ো।
বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। সাইক্লোন সমুদ্রে। কড় কড় করে বজ্রপাত।
একজন সবল যুবা বিপদসংকুল পথে এমন ঝড়ের রাতে নেমে যাবে ভাবতেই লিয়ানা বলল, যেতে পারবে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে। তোমার তো রাস্তাঘাট ভাল চেনা নয়।
বলে সে তার বাবার গোওয়া জামা লুঙ্গি বের করে দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল। ঠান্ডায় সরল যুবার চোখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এই যুবক, যেন কথা ছিল, এমনই কোনও সুন্দর তরুণ যুবক, তার দরজায় আজ হোক কাল হোক করাঘাত করবে। নাবিকের ক্লান্তি দূর করার জন্য ঝড়ের রাতে সে দিতে পারে না এমন কিছু অমূল্য ধন তার কাছে গচ্ছিত নেই। সে সহজেই তাকে রাতের জন্য আহার, উত্তাপ এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিল।